

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৪৭৫
আজকের মানুষ	...	১৪৭৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	— হরপ্রসাদ মিত্র	১৪৭৭
এ-ফুল ছিল তোমারই বুকে প্রিয় (কবিতা) —	আব্দুল কাশেম রহিমদ্দীন	১৪৭৮
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১৪৭৯
ভারতদর্শন	...	১৪৮০
স্মার্তজ্ঞাতিক	...	১৪৮৩
উপচ্ছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৪৮৭
সারাদিন সারারাত (গল্প)	— দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত	১৪৮৯
জ্ঞানান্তর (কথিতা)	— বনলতা সেন	১৪৯২
সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মধোপাধ্যায়	১৪৯৩

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌতুহল, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনাব ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
সদা মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমগ্র।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদভাগবত প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

এতেতত্তদেবের শ্রীকৃষ্ণভক্তের জ্ঞান যে
তা, এই 'প্রলাপে' তাহাব অভিব্যক্ত।
মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক'
এই তাহার একমাত্র বচন। শ্রীল
দাস গোস্বামীর মূললিত পঞ্চানুবাদে
সুমিষ মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

পের পরম উপভোগ্য উপজীব্য
ভক্তিচরিতামৃত।

তুলসীসার

ভক্তমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপঞ্জিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের পুঙ্খনুপুঙ্খ অঙ্কুরণ।

মনঃশিক্ষা

নিবন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-

সাধন-ভঙ্গনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

ঐচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের মূললিত
পঞ্চানুবাদ।

পাণ্ডুলিপি

মুস্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, নামসংকীর্তন
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা। মূলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথামিরা

শ্রীরামপদ মধোপাধ্যায়

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩২২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

গিরীজমোহনী দেবীর

গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আন।

বিগতকালের বরণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মধোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

কোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম,

ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না যাহু, কঙ্কাবতী, মজার গল্প,

মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চান পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



সূচীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন	...	১৪৯৯
টিউটন জাতির কথা ও কাহিনী	— নরেন ভট্টাচার্য	১৫০৫
তিনমুর্তি (কবিতা)	— আশরাফ সিদ্দিকী	১৫১১
সবার অলঙ্কার	— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৫১২
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৫১৯
স্মৃতির অঙ্গীকার (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	১৫২০
চার্লি চ্যাপলিন	— অশোক সেন	১৫২১
রঙ্গজগৎ	...	১৫২৪
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৫২৯
পাঠকমন	...	১৫৩২
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৫৩৩



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেশ্বনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলিকনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাশ্রেষ্ঠ আর নাহি
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-স্বর্ধেব সর্বতোমুখী প্র
কিরণজটায় ভারত-মহিমা চিব-ভ
সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতি
গনীষার অবতারণা—সাহিত্য-তপস্বী
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণেব মেঘে, মেঘ
বান্ধাকির জয়, ভারত-মহিলা, বাদ
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নি
মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার
রাশি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-স্বপ্নস্তী মা

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোরাঙ্গ ও প্রফুল্ল

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল

৥ দ্বিতীয় সংস্করণ ৥

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বাপনাবহারা গান্ধী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



বর্ষ: ২৪শ সংখ্যা-মূল্য: ২৫ পা
প্রতিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise

Thursday, 18th Nov., 1965

ভারত-ভাস্কর নেহরু

নেহরুহীন ভাবতবৃত্তবাস্তবের কথা পুনরাবৃত্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলি স্বাধীন ভাবতে নতুন সমাজ-গঠনের জন্য 'আদর্শ' ও ধ্যান-ধারণা আমাদের মধ্যে তিনি প্রেরিত করে গেছেন, তা আমাদের চিবকালের পদ। আবাব তাঁর বিশ্বব্রাহ্মবোধের জন্য আমরা আনন্দিত, সাবাজগৎ স্বপ্নী।

নেহরু জন্মদিনে আমরা তাঁর আদর্শকেই বজায় আনবো, অর্থাৎ কবির চেষ্টা করি, সেই আমবা সুযোগলাভ করি সেই আত্ম-স্বাস-স্বাস ফলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ব কবাব প্রয়াস পাই যে, তাঁর অসমাপ্ত কতোখানি পূর্ণ করতে আমরা সক্ষম হই।

এই কৌনোবকম প্রথাগত রীতিতে জন্মদিন পালন করা অর্থ-এবং সে রীতিতে তাঁর জন্ম-পালিত হয় নি। যে শিশুদের মনে আত্ম চাচা নেহরু নেই — তারাও লেছে, আমরা আছি স্বতঃস্ফূর্ত, জন্মদিনের মুহূর্তে ততোদিন তিনি ফিরে ফিরে আসেন এই পৃথিবীতে। তিনি দেবেন প্রাণে আসার মন্ত্র, মুখে দেবেন ভাষা, চিত্তে নিঃসৃত বিজ্ঞানীয় প্রতিশ্রুতি।

একথা সত্য, আমরা নেহরুর বিশ্বাসবোধেই সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি।

তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ হবে স্বদেশীয় উৎসর্গীকৃত, স্বাধীনতায় চির প্রেরিত।

রাজ্যের কর্তব্যবোধে যে ঐতিহ্য তিনি গেছেন, তার তুলনা মূলত বলা যেতে পারে। বৃটিশ শাসকশক্তি এদেশ থেকে বিদায় বাধ্য হওয়ার পর শব্দ খণ্ডিত ভারতই যার নি, তাবা রেখে গিয়েছিল উপবাস-কোটি কোটি মানুষ। নেহরু তাই নতুন অজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপেই ভারত-সুদান সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি চোখে দেখেছিলেন সোনার ভারতের বাস্তব স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ভাবতকে চেরেছিলেন কৃষিতে ও শিল্পে সমৃদ্ধ করে তুলতে। একেবারে পাঁচশালা পরিকল্পনার শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল মনে হলেও বিদেশী পর্যটকরাও তা দেখে বিস্ময়ভিত্ত হইছেন। সামগ্রিক উন্নতি হয়তো রাতারাতি সম্ভব হোত — যদি বিশ্ববাস্তবনৈতিক বুদ্ধির কাছে কিছুটা নতিস্বীকার তিনি করতেন। কিন্তু বলিষ্ঠচিত্ত নেহরুর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল স্বদেশের গৌরব ও স্বদেশের আদর্শ। সেই আদর্শের জয় শেষ পর্যন্ত হয়েছে। তাঁর নিরপেক্ষনীতি মানবতাবাদীদের স্বীকৃতি-লাভ করেছে।

কৃষির ব্যাপারে এদেশের উন্নতি সাধক হয় নি এবং তা সম্ভব না হওয়ার জন্য নেহরুকে দায়ী করা অনুচিত। বলা প্রয়োজন, দেশ বাদ্যে আত্মনির্ভরশীল নয়—এ ব্যাপার তাঁর অজানা ছিল না; তা জানা ছিল বলেই তিনি কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কৃষিক্ষেত্রেও সমবায়-নীতির প্রয়োগ।

বিশ্ববাস্তবনীতির ক্ষেত্রে নেহরু বিশ্বাস করতেন বুদ্ধিমান পৃথিবী। অথচ নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তা ছাড়া, এই সৈনিক পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যে বুদ্ধি শব্দ করেছিল তার জের এখনো শেষ হয় নি, ভগ্নস্তূপের মতো মার্কিনী প্যাটন ট্যাঙ্কগুলি এখনো মাঠের মধ্যে বাঁধা করছে। পাকিস্তানের এই সম্ভাব্য বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা জেনেও দুর্বদর্শী নেহরু জীবনের আদর্শকে ত্যাগ করেন নি। যে পাকিস্তান আজাদ কাম্বীব দখল করে নিয়েছিল, সেই পাকিস্তানের 'মতি' পরিবর্তনের তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের

কাছে অনাক্রমণ চুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। পাকিস্তানের অভিসন্ধি তাঁর অজানা ছিল না; কিন্তু পাকিস্তানের কাছে দেশ-গঠন কিছুই নয়, ভারত-লোলুপতাই সব। নেহরু চেয়েছিলেন, স্বদেশের মানুষের প্রতিষ্ঠা, শিল্পোন্নতি ভারত। সেই শক্তিতেই ভারত বিদেশী অস্ত্র সাহায্য না গ্রহণ করেও বিদেশী অস্ত্র সাহায্যে বলীয়ান পাকিস্তানের প্রপো-ক্ষমতাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। এখানেই নেহরুর দুর্বদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বশান্তি যার কামা, স্বদেশ বন্ধার সংকল্পও ছিল তাঁর।

এবার হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা স্বদেশের মর্যাদা রক্ষার সার্বভৌমত্ব অধিকারের প্রশ্নে কোনবকম আপোষের পক্ষপাতী নই। তেমনি আমরা চাই, বিশ্বের শান্তি স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের ন্যায্যচিত্রিত কার্বে সহযোগিতা দিতে। নেহরু আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা আমরা পালন করি।

নেহরু যেমন ছিলেন বাস্তববাদী, তেমনি তাঁর উচ্চাঙ্গ ছিল এতো উর্ধ্ব বে, তা আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। সেই কাণে তাঁকে অনেক সময় কল্পনাবাসী রাজনীতিবিদ বলা হয়। কিন্তু ভাবত-সংগঠনের তিনিই ছিলেন প্রথম স্বত্বক। সেই সংগঠনের কাজ আজো অসমাপ্ত। তা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ভারতের প্রতিটি নাগরিকের। তবু নেহরুই হচ্ছেন এই অসমাপ্ত ভারতের মহান ভাস্কর।

সম্পাদকীয়

আবুল কালাম মাসুদ

নেলী সেনগুপ্তার দেশপ্রেম যে কখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে একথা কি কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে? পাকিস্তান সরকার তাঁকে স্বাধীন অন্তর্গত করে এমনই এক অভাবনীয় ব্যাপার করেছেন। যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামীর ভিটায় থেকে জনসেবায় ব্রত গ্রহণ করেছেন; চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলের হৃদয়ে যিনি মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত; যিনি রাস্তার বার হলে বাঙালী মুসলমানবা সম্মান জর্নিয়ে পথ ছেড়ে দেয়, ছেলেমেয়েদের হাতজোড় করে নমস্কার করতে শেখায় সেই কল্যাণময়ীকে আজ আরবুশাহী ভয়েন চোখে দেখছে।

ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা মিস নেলী গ্রে ১৯০৯ সালে বাংলার প্রাগৈচ্ছল যুবক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সংগে পবিত্রের আবৃত্তি হয়ে ভারতে এসেছিলেন। সেদিন থেকে ভারতের তিনি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ দহিতা হয়েও ভারত-চিন্তার তাঁর মনপ্রাণ নিঃসংশয়িত। ভারতে তখন মানুষের মনে জেগেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। জনগণ গ্রহণ করেছে স্বদেশমুগ্ধ দীক্ষা। স্বামী-স্ত্রী দুজনা ঝাপিয়ে পড়লেন গান্ধীজীবন নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে। সেদিনই এই ভারতপ্রাণা মহিলা বুকে পেয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ। স্বাধীন গানবসমাজ ও বিশ্বমৈত্রীর দর্পণে দেশে পেয়েছিলেন নিজের জীবন।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে অগিগর্ভ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত চট্টগ্রামে বিকোভেব আগুন জ্বল উঠেছিল। চাঁদপুলে ঘুমন্ত চা-শ্রমিকদের উপর সাত্তাজবাদী সবকাবের গুলী-চালনাল প্রতিবাদে, চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং আলো-বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ধর্মঘটে সাবাপূর্ববন্ধ ও আসাম প্রজ্ঞাভিত্তি। সেই অগ্নিনয় দিনগুলিতে নেতৃত্ব-গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্ত। ইংরেজের ঘরে তাঁব জন্ম, আবাল্য ইংরেজদের জেনেছেন স্বদেশবাসী হিসাবে। সেদিন সেই ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়ালেন পরানীন ভারতবাসী একজন হয়ে। লক্ষ জনতার ব্রহ্ম গর্জনের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল— সাত্তাজবাদী দূর হটো, কোন জাতিব অন্য কোন জাতির ওপর প্রতুষ করার অধিকার নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অগ্নিপরীক্ষায় তাঁরা দুজনা গান্ধীজীর আশীর্বাদ লাভ করলেন। দেশবন্ধুর সহযোগী যতীন্দ্রমোহন

দেশবাসীর কাছে হলেন দেশপ্রিয়, তাঁর সহ-ধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তাকে সকলে গ্রহণ করলেন বাংলার প্রথম মহিলা সেবারতী হিসাবে।

১৯৩০ সালে একাদিকে আইন অমান্য আন্দোলন, আর একাদিকে চট্টগ্রামে বিপ্লবী যুবশক্তির উদ্যোগে অস্ত্রাগার আক্রমণ। বৃটিশ সরকার কাপুরুষের মত সাম্প্রদায়িকতাব বিবে মানদুখে বিভ্রান্ত করতে চাইল। মানুষের ওপর অত্যাচারে বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। সেদিন অসুস্থ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে নেলী সেনগুপ্তা অত্যাচারিত মানুষের কাছে উপস্থিত হলেন। স্বামীর সংগে লণ্ডনে গিয়ে সুসভা ইংরেজদের কীর্তি-কাহিনী শুনিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩০ সালে দিল্লীর কুইন্স পার্কে তিনি রাজদ্রোহাচক



নেলী সেনগুপ্তা

বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়ে চার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বে-আইনী/ঘোষিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী কবে নেলী সেনগুপ্তা আবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

১৯১০ হতে ১৯৩০ সালের ২২শে জুলাই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্তরীণাবাসে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সভা-সমিতি-আন্দোলনে নেলী সেনগুপ্তা তাঁর সংগ্রামের সাধী। ১৯৩০ সালে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর দুবার তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অন্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি কল্যাণময়ী স্ত্রী ও মা। যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রামের বাড়িতে

শাড়ি-পরিহিতা নববধূরূপে প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন— গ্রামের মহিলারা প্রদীপ-জ্বলিয়ে শাখা-বাঁধিয়ে তাঁকে করেছিল, পণ্ডব্যঞ্জন উপাখ্যায়িত করেছিল দিনের মধুর স্মৃতি আছো তিনি। সরলতায় পরম আনন্দে হলেন, স্বপ্ন প্রশংসায় পশ্চমুখ হয়ে ওঠেন। সেদিনেরই গ্রামের মেয়েদের সংগে তাঁব মেলামেশা সব সকলের তিনি আত্মীয়। নেলী সেনগুপ্তার জীবন। বর্তমানে একপুত্র জীবিত স্বামীর মৃত্যুর পব গভীর বেদনায় দিন তিনি নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যু চট্টগ্রামে গিয়ে স্বামীর ভিটায় থেকে ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস আইন সভার প্রার্থী মনোনীত কবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রে থেকে নির্বাচনে অবতীর্ণ রাজী কবায়। বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিত হলেন।

দেশ ভাগ হলো। অনেক নেতা, ও সুহৃদ নেলী সেনগুপ্তাকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সব করলেন স্বামীর ভিটায় থেকে দেশবাসীর করলেন। বার্তা তাঁকে নির্বাচিত করে তাদের তিনি ছেড়ে যেতে পারেন না। প্রাতি আনুগত্যবোধে তিনি সংকল্পে অবিরত পাকিস্তানে পরবর্তী নির্বাচনেও সমাধণ তাঁকে প্রতিনিধি করে বিধান পাঠিয়েছে। সংখ্যালঘুদের মনে আত্মনিজ্জাত করতে এবং সংখ্যালঘুদের অসম্পর্কে সংখ্যালঘুদের সচেতন করে গণতান্ত্রিকবোধ জাগাতে তিনি সচেষ্ট।

এই বৃন্দবনসে, অসুস্থ শরীরে, জনগণের বিপদের বহু। চট্টগ্রামে বন্যা ছিল, নেলী সেনগুপ্তা বিলম্ব নিয়ে হয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে। সাইক্লোনে জীবন ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়েছিল— সেনগুপ্তা উপস্থিত হয়েছিলেন অভয়া ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুবা দিশাহারা, স্ত্র-কোন সময় সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে, সেই দিনগুলিতে নেলী সেনগুপ্তা জেলা কত থেকে করাচী পর্যন্ত যোগাযোগ করে সকলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য। সালঘুদের তিনি অভয়দাত্রী, সকল সম্পদ বহু।

জনগণের বিশ্বাস ও ভালবাসা পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মবিষয়। আতঙ্কগ্রস্ত শাসকদল এই মহী নারীকে নজরবন্দী করার উত্তর দেশে গণের দ্বারা বিজ্ঞত। মানবতা, দেশপ্রেম জনগণের প্রাতি বিশ্বাসের প্রতীক— সেনগুপ্তা।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ মিত্র

এ-অবস্থায় মন সত্যিই চূপ হয়ে যায়।

চূপ করে থাকাই শ্রেয় এবং স্বাভাবিক।

শরৎচন্দ্রের এইসব রচনা পুরনো—হয়ে গেছে বটে। পুরোনো, কিন্তু এখনো ও-সব নায়ক-নায়িকার আবেদন ফুরোয় নি। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে তাঁর যখন ঐশ্বর্য-যুগ গেছে, যুগ মানব-জগৎ তার আগে থেকেই বেশ বদলাতে আরম্ভ করেছে।

এ কথা ঠিকই যে, জগৎ প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে। আমরা দেশে দেশে যে আলাদা আলাদা পরিমণ্ডলে বাস করি। তাই দূর দূর অঞ্চলের পরিবর্তনের খবর পৌঁছতে দৌর হতে পারে। বোদলেয়র অথবা ডস্টয়েভ্‌স্কির কথা ভাবলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দূরত্বের ধারণাটা স্পষ্ট হয়। তাঁরা তাঁদুজনে তো এক দেশের মানুষ ছিলেন না। ভিন্ন দেশের ভিন্ন দুই মন। ভিন্ন-এর আগেই আমি ভেবেছি উপলব্ধি তাঁদের কথা। আধুনিক মানুষের গভীর ব্যক্তিমনের অনুভূতি হারা আছে দুজনেরই রচনায়। ডস্টয়েভ্‌স্কির 'নেটস্‌ ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড' নেহ-এর নায়ক সেই নিগুঢ় মন। শরৎচন্দ্রের কোনো নায়কই সে-রকম নন। দিবস সেদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে বলছিলেন 'পরিণীতা' সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা। তিনি বললেন, বগর বেশ কাব্য হয়েছে ঐ লেখাটি'।

হাসতে-হাসতে বললেন, 'বেশ মেয়ে লালিতা, শেখরও বেশ ছেলে। লালিতা হরদম শেখরের টাকা বের করছে... কেতো টাকা, মশাই!'

প্রেম, নিষ্ঠা, মাধুর্য যতোই থাক, টাকা-পয়সার স্রোত বয় না সহজে। বন্ধুর অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

পাপ-তাপ-প্লানি-ক্রেদের কিছু অভিজ্ঞতা ফুটেছে শরৎচন্দ্রের রচনাতেও। সে-সবও ঠিক একালের নয়।

মানুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির স্বন্দর অবশ্য চিরকালের। কিন্তু কালে কালে তার চেহারা বদলায়। এই স্বন্দেদর সম্ভাবনা এবং গতিবেগ বোধ হয়, কোনো কোনো পূর্বে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কোনো কোনো ব্যক্তিব্যবহায়েই বোধ হয়, এ রকম

সম্ভাবনা বেশ দেখা দেয়। বোদলেয়র এবং ডস্টয়েভ্‌স্কি দুজনেই ভারি শান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। সে-কথা এই ভ্রমণেই আমার আগে ভাববার সুযোগ হয়েছিল। লিখেছি সে-কথা। বৃন্দদেব বসুর সেই বিশ্লেষণ মনে পড়ছে আবার। অভ্যস্ত নীতি-ধর্মের চাপে ভুগতে ভুগতে চল্লিশেই ডস্টয়েভ্‌স্কি বড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। বোদলেয়র তাঁর তিরিশ বছরই নব্বইয়ের চাপ অনুভব করেছিলেন।

আমাদের শরৎচন্দ্রের আমলে এ-দেশের গল্প-উপন্যাসে সে রকম ক্রান্তির চিহ্ন ছিল না। জন্ম, মৃত্যু, মিলন, বিচ্ছেদ—এসব তো চিরকালের ব্যাপার। আর দশজন গল্প লেখক বা উপন্যাসিকের মতন শরৎচন্দ্রও এই সবই তাঁর রচনায় ব্যবহার করে গেছেন। একালের সঙ্গে সেকালের বিভেদ নেই এদিকে বিভেদ অন্যত্র বিদ্যমান। একালের সেই বিশেষত্বেরই কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বিদেশের সাহিত্যে। এবং তারই অনুকরণ চলেছে এদেশের কোনো কোনো লেখকের প্রয়াসে।

সার্থের কথা থেকে কথায়-কথায় শরৎচন্দ্রের কথা উঠলো বটে, কিন্তু উপন্যাসের প্রকৃতি-বিচারে কোনো রকম সমধর্মিতার নজর হিসেবে দুজনের নাম কোনোমতেই একসঙ্গে উচ্চারণযোগ্য নয়। এ উল্লেখ নিতান্তই আকস্মিক, অথবা, খুবই ক্ষণিক অনু-বোধগত। সার্থের দর্শন আর শরৎচন্দ্রের দর্শন ভিন্ন ব্যাপার।

সোরেন কিরকেগার্ড [১৮১০-৫৫], এডমন্ড হ্যাসেরি [১৮৫৯-১৯০৮] আর মার্টিন হাইডেগার [জন্ম ১৮৮৯]—এই তিন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের দর্শন কাজ করেছে সার্থের উপন্যাসিক মনে। কেউ কেউ বলেছেন, লকের দর্শন যেমন রুশোর রচনায় মূলে, অস্তিত্ববাদ তেমনি সার্থের প্রেরণায়। এসেন্সের আগে একজিস্টেন্স—এই হোলো এ বাদের মূল কথা। আমাদের বাবতীয় সংবেদন, অভিজ্ঞতা, নীতিবোধ সবই আপেক্ষিক। সবই মনের খেলা।

মানুষের মগজই সব শাস্ত্রের উদ্ভাবক। যা কিছু আমরা বিশ্বের বিধি বলে মেনে নিয়েছি, সবই বদলানো যায়। ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব হতে পারে। সমাজে যে সব বিধি চালু আছে, একজন সাহসী মানুষ যদি তার নিজের জীবনে সেই সব বিধি স্থগিত রেখে চলাতে চায়, তাহলে তা অসম্ভব হবে কেন?

সুপ্রাকারে বিশ্লেষণ করলে সার্থের অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তা নাস্তিক্যবাদী, শূন্যনাস্তিক বা পেসিমিস্টিক, মানবানুগামী এবং প্রগতিপন্থী।

এসব কথা শুনে হঠাৎ খটকা লাগে। এসব বিশেষণ যেন স্মারকধী। যা শূন্যনাস্তিক, তা আবার মানবানুগারের লক্ষণ হবে কোন বিচারে? যা নাস্তিক্য, তারই নাম প্রগতি? তাও কি সম্ভব?

ব্যাখ্যাতা জবাব দেন,—মানুষ তো বিশেষ বিশেষ নীতিতে নিধিতে, লোকাচারে চিরকালের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার জীব নয়। মানুষ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অশেষ সম্ভাবনার পথে অগ্রসর। মানব-সমাজের বিধি-নিষেধ-লোকাচারের স্খাবর স্বভাবটা মে অলীক, সার্থে সেই সত্যই দেখিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকার প্রকৃতিবাদী উপন্যাসিকরা তাঁর ওপর হয়তো কিছু প্রভাব বিস্তার করেছেন। ন্যাচারালিস্টদের চঙটাই তিনি মেনেছেন। ম্যাথিউ-মার্সেল-দানিয়েল চার্লের ঘাত-প্রতিঘাতে তাই ই দেখা গেছে। জন ডস প্যাসস (জন্ম ১৮৯৬), উইলিয়ম ফকনার (জন্ম ১৮৯৭) ইত্যাদি মার্কিন লেখকের রীতি, ভঙ্গি, আঙ্গিক মেনেছেন তিনি। এই আঙ্গিকের দিক থেকে সার্থের 'Le suicide'—বার ইংরেজি নাম 'দি রিপ্রিভ' সেটি খুবই স্মরণীয় রচনা। চরিত্র, ঘটনা, কাহিনী তাতে সত্যিই অদ্ভুতভাবে সংশ্লিষ্ট। মনস্তত্ত্বের দিকে শুরুর থেকেই তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ১৯৪০-এ কিছুদিন বন্দী ছিলেন এক জার্মান কারাগারে। তার আগে অধ্যাপনা করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আবার অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অদ্ভুত

এ-ফুল ছিল তোমারই বৃকে প্রিয়

আবুলকালেশ রাহিমউদ্দীন

মাঝে-মাঝেই বদ-মেজাজী হাওয়া
ঘরে এবং বাইরে ডানা ঝাড়ে,
জমা-সুখের সোনা-রূপায় ছাওয়া
হাজার নীড় অকারণেই হারে।
অনিকেতন রূপকথার গান
দুর্বোগের মেঘের ভাঁজে ভাঁজে
মুখ লুকিয়ে খোঁজে বাঁচার দান।
দেয়ার মুখ চিতার মতো বাজে।
এবং দিকে দিকে
ষতো মনের করাপাতার ঢেউ
হারিয়ে যার, খোঁজ রাখে না কেউ।

তখনো দেখি বড়ের চোখে চোখে :
একটি ফুল, বৃকের ফুল কার
নবীন কোনো বাঁচার আশালোকে
হঠাৎ ফুটে হাসে দুর্নিবার।
সে-ফুল ছিল তোমারই বৃকে প্রিয়,
তারই ফোটার এবং সৌরভে
বদ-মেজাজী হাওয়াও রমণীয়
আপন রূপ ভাসায় গৌরবে।
তখন দিবা-নিশ
একই রঙের আলোয় ভেসে যার,
গানের দিন আবার ভাষা পায়।

তাইতো প্রিয় ষতোই হোক ফুল,
ফুলের মাঝে নিভুলের দান
তোমারই সেই রক্তে-শ্রান্ত ফুল
চিনতে পারে আমারাতের গান—
আলোয় যার সাগর তেলে মুখ,
ধূনিতে যার ইন্দ্রধনু ফোটে,
বিহঙ্গের ডানায় উৎসুক
শূদ্র উষা রঙিন হয়ে ওঠে।
এবং ষতো নদী
মোহনা খোঁজে ফেনিল উচ্ছ্বাসে,
সাগর দোলে গ্রহণ-অভিলাষে॥

ধরনের মানুষ,—অশ্রুত বোধের মানুষ
তিনি।

মানুষের মনের সময় যে বদলে
গেছে, আজ একালের এই দেশান্তরে
বসে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়লেও তা
বোঝা যায়। বেন শরৎচন্দ্র অনেক
দূরের মানুষ,—তার জগৎ ঠিক আমাদের
এই একালের জগৎ নয়। সাতের জগৎ
আরো গভীর পরিবর্তনের নজীর।

এবং শূদ্র-সাতের কথাই নয়,—
বিশ্ব-সাহিত্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে উপন্যাসের
স্রোত অফুরন্ত বটে, কিন্তু তার
মেজাজ বদলে গেছে, তার মনোযোগ
এখন অন্যদিকে। সে অভিমুখিতা
ভালো কি মন্দ, সেটা অন্য প্রসঙ্গ।
বদলেছে যে, সেটাই বক্তব্য। সেটাই
একালের পরিচিতি। ইংরেজি, ফরাসী,
বাংলা—যে-কোনো আধুনিক সাহিত্যের
দিকে নজর দিলেই—কথাটা অনুভবে
আসে।

কবিতার মতন উপন্যাসেরও বোধ-
হয় পরিমাণ বাড়ছে। অবিশ্য, ছোট

করে তা বলা চলে কিনা, জানি না।
সেজন্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন
সাহিত্যের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরি-
সংখ্যান চাই। অতএব সে-কথা থাক।
অন্য কথা বলি—উনিশ শ' তে যেটি
শ্রীমন্টাঙ্গে প্রকাশিত এক আলোচনার
ডক্টর ফ্রেডেরিক-আর-কার্ল বলেছেন
যে, ইংরেজি সাহিত্যে গত তিরিশ
বছরের ধারায় উপন্যাস ষতোই লেখা
হোক, উপন্যাসের ঐশ্বর্য সত্যিই
উত্তরোত্তর ক্রমশঃ পথে। জোসেফ
কন্‌রাডের মতন নীতির আগ্রহ,
জেমস্‌ জয়েন্সের মতন বাক্-বৈশিষ্ট্য
বা বাগ্‌বৈদম্ব্য, ডি-এচ্-লরেন্সের
মতন মনের বিশেষ ভাবাচ্ছন্নতা ইতি-
মধ্যে আর কোনো লেখকের লেখায় দেখা
যাচ্ছে না। আগেকার মতন লোক
ব্যবহারের বর্ণনায় কোঁক নেই
ঔপন্যাসিকদের,—আগেকার মতন নীতি
উদ্দীপনার লক্ষ্যে সমর্পিত নয়
উপন্যাস। তবু উপন্যাস-চর্চা কমে নি।

জয়েন্স-লরেন্স-কন্‌রাডের কাল ফুরি-
য়েছে বটে, কিন্তু গ্রাহাম গ্রীন,
স্যামুয়েল বেকেট, হেনরী গ্রীন,
এলিজাবেথ বোয়েন, সি-পি-স্নো,
আইভি কম্পটন-বান্‌ট, এভিলিন ওয়া
ইত্যাদি লেখক-লেখিকার উপন্যাস
দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে,—এবং এঁদের
চেয়ে বয়সে আরো অনুগামী বারা,
তাদের মধ্যে আছেন লরেন্স ডুরেল,
ইরিস মার্ভাক, উইলিয়াম গোল্ডিং,
ডোরিস লেসিং, অ্যান্থাস উইলসন,
ফিলিপ টরেনাবি ইত্যাদি আরো
অনেকেই।

ডক্টর কার্ল আমাদের এই বিশ-
শতকের মোট শতবর্ষকাল তিনভাগে
ভাগ করে দেখিয়েছেন যে, শতাব্দীর
প্রথম তৃতীয়াংশে উপন্যাসিকরা ছিলেন
জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা এবং সমস্যা
সম্বন্ধেই প্রধানত সজাগ। তারপর
ঔপন্যাসিকদের রুচি বদলেছে।

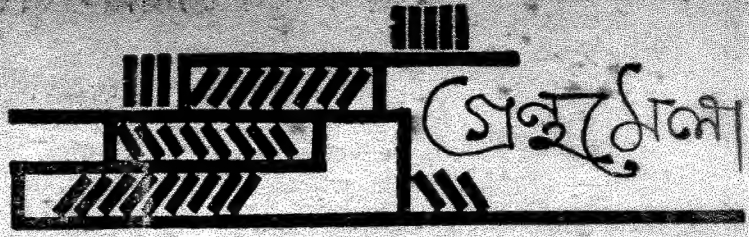
[কমশঃ]

পাখ্যায় অনূদিত। এম সি সরকার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, বার্কিম চার্টার্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা-১২। দাম : পাঁচ টাকা।

বাংলা মৌলিক সাহিত্যে গ্রীষ্মবানী মনো-পাখ্যায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। অনুবাদ-সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা অসামান্যই শ্রদ্ধা নয়, দেখানোও তাঁর মৌলিকতার ভূরি ভূরি নিদর্শন মেলে। বিশেষতঃ গল্প নির্ধারণে, মূল চরিত্রাঙ্কনে ও বাংলা বাগধারার সুকৃষ্ট ব্যৱহারে তিনি এক অনন্যশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন। উপর্যুক্ত গল্প সংকলনটি আরো অনেক কিছু নতুনত্বের দাবি করতে পারে। যেমন : (১) ছটি দেশের গল্প (ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী) সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। (২) প্রতিটি গল্পে বিশেষ নৈপুণ্যে সংগৃহীত—যন্ত্রা প্রমাণিত হয় যে, অনুবাদক অনুসন্ধানী মন, রসোপলব্ধি ও বহুপঠন সৌভাগ্যই এইসব অতুলনীয় গল্প পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। (৩) গল্পগুলির আন্তর্জাতিক আবেদন অবিস্মরণীয়। (৪) ছটি দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র আজ যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাদের প্রাক-স্বাক্ষররূপে এইসব গল্প তাদের রচিত্যতাদের সমগ্র দেশ, সমাজ, মানুষ ও বিব-জগৎ সম্পর্কে চিন্তানুভূতির কথা আজ নতুন করে ভাবতে শেখায়।

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের এই প্রথম খণ্ডটি আর এক কারণে অভিনন্দিত হবে। একেবারে হালের বাংলা সাহিত্যে গল্পের দৈন্য যেন মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি আমাদের অভিনব রসের আশ্বাদ দেবে এবং তরুণ লেখকদের অনুপ্রাণিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

এই সংকলনে লেখকদের পরিচিতিসহ একুশটি গল্পের লেখকরা বহুপরিচিত বা অপরিচিত হলেও এদের এইসব গল্প বাংলা ভাষার পূর্বে অনূদিত হয়নি। বিষয়বস্তুতেও গল্পগুলি দেশোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ। পিতৃদেব পরিচয় নিয়ে মৌলিক বস্তুগা শব্দ, ফ্রান্স ম'গাসার সময়েই সমীক্ষা ছিল না। সে বস্তুগা এদেশেরও, একালের মানুষেরও। পণ্ডিতপ্রহ্ম না সন্তানস্নেহ কোনটা বড়, সে প্রশ্নের উত্তর কি? আনাতোলাস সেই প্রশ্নের উত্তর নারীর বিবেকের কাছে। অথবা টলস্টয়ের দুঃখময় জেলজীবনের অংসার রচনায় সৃষ্টি হতে পারে নতুন ইতিহাস, নতুন রাষ্ট্র। মেনাডিসের 'হারানো তারকা' বৃন্দপ্রবণ। মানুষই মানুষকে করে পাগল, বিশেষতঃ সে মানুষ যদি সৈন্য-পণ্ডিত হয়—তারই আলোচ্য রচনা করেছেন ক্যান্ডিয়ার মৃত্যুতে ইতালীর লেখক আন্দ্রে-সিও। বলা বাহুল্য, প্রতিটি গল্পের আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। সেই কারণে ভালো গল্পের আলোচনাই বাদ থেকে গেল। নচেৎ কামু, কফম, মোরাত্তিয়া, জেমস জোন্স, মেইলর, সাতের গল্পের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে কে সংযত হয়? আশা করি পাঠকেরই স্বয়ং



উপর্যুক্ত গ্রন্থের সাহায্যে সে রসাস্বাদে চরিতার্থ হবেন। আপাততঃ আমরা অনুবাদকের কৃতিত্বে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আরো চারটি খণ্ডের অপেক্ষায় থাকলাম।

ভারতবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।
মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮০। দাম : পাঁচ
টাকা।

ভারতবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণের সন-
তারিখ-কণ্টকিত জীবনচিত্র নয় অথবা জীবনের
কল্পেটি ঘটনা অবলম্বন করে উপন্যাসিকের
কলমে লেখা গল্প নয়। গ্রন্থকার শ্রীপ্রণবরঞ্জন
ঘোষ প্রচলিত পথ পরিভ্রমণ করে মনন ও
হৃদয়বস্তুর আশ্চর্য সংযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের
যুগোচিত আবির্ভাবের কারণ অব্বেষণ করে-
ছেন। সম্ভবতঃ লেখকের এইটিই মূল উদ্দেশ্য।
জীবনের ধারাবাহিকতার মনোরম চিত্র কিছু

জয়ন্তী সেন

আছে বটে, তবে তার জন্যই ভারতবাসী
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারণা নয়। সমগ্র গ্রন্থটি
দুটি অংশে বিভক্ত।

স্মরণ অংশে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-
লীলার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের নির্লিপ্ত
নিরাসক্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা এই অংশে
সর্বাধিক প্রস্ফুটিত। এর মধ্যে আছে জীবনকে
দেখা, জীবনকে উপলব্ধি করা ও জীবনকে
জীবনরসে চিত্রিত করার যুক্তিবাদী মনের
শান্ত-সাপনা। লেখক কৃতিত্বের সংগে এই
দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

মনন অংশে লেখক গতানুগতিক জীবনী-
সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন।
বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান নেই। দৃ-এক
ছত্র ইতস্ততঃ বিকিঞ্চ থাকলেও সামগ্রিক
আলোচনা কোন সাহিত্য ইতিহাসবেত্তার কলম
থেকে নিঃসৃত হয় নি। দুঃখের বিষয় হলেও
এটি মর্মান্তিক সত্য। একদিন ধর্মনৈতিক
আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলার নবজাগরণের
নানা কর্মের, নানা চিন্তার পরিচয় বিধৃত
ছিল, জীবনের উত্তাপ সেক্ষেত্রেও সর্বাধিক
পরিমাণে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যখন,
তখনও এই আন্দোলনের ধারা মরুপথে হয় নি
হারা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বাংলার

সাহিত্যে, সমাজ-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ
জানা উপেক্ষিত। গ্রন্থকার শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
দেখাবার চেষ্টা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব
যুগোচিত। অকস্মাৎ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা
এটি নয়। যুগমানবের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিমূর্তি
হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

গ্রন্থকার আরও একটি মূল্যবান কথা
বলেছেন। বলেছেন রেনেসাঁর সময়ে অধ্যাত্ম-
জীবন ও মানবজীবন দু'রনের নয়—পরস্পর
সমৃদ্ধ। সেই বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম-
লোকের সাধক নন শব্দ, মানবাত্মার আলোক-
দীপ্ত দৃশ্যপটরূপে বটে। এইরকমভাবে
গ্রন্থকার বহু নতুন চিন্তার আমদানী করে
রামকৃষ্ণ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা কববার
অবকাশ সৃষ্টি করেছেন।

সমগ্র গ্রন্থটি আশ্চর্য সুলভ নিরুপম এক
অনুভূতির কাছে আব্ধসমর্পণ করে নির্বিঘ্নে
একটানা পড়ে যাওয়া যায়। এর কারণ,
লেখকের প্রকাশরীতির মধ্যে ধ্যানমোহন জীবন-
চর্চার অনুরূপ অপরাধ-মাধুর্যের অনির্বচনীয়
আশ্বাদ বর্তমান। আশা করতে পারি, গ্রন্থ-
খানি সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার সমর্থন
আদায় করতে পারবে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের
একটি আলোচ্যচিত্র থাকলে সর্বসংস্করণের হতে
পারতো।

চিকিৎসা জগৎ—সম্পাদক : অমূল্যধন মনো-
পাখ্যায়, পি-৭৯ নিউ সি আই টি রোড,
ইন্টালী, কলিকাতা-১৪। দাম : প্রতি সংখ্যা
৭৫ পয়সা।

পত্রিকাটি ক্রান্তিক মাসে সাইতিশ বছরে
পদার্পণ করেছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত
চিকিৎসা সংক্রান্ত এই ধরনের পত্রিকার সমাদর
হওয়া উচিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিল
বিষয়গুলি সরল সহজভাবে এই পত্রিকার প্রকাশ
করা হয়। যারা লেখেন তাঁরাও চিকিৎসা-
জগতে এক একজন বিশেষজ্ঞ। বর্তমান
আলোচ্য সংখ্যায় রক্ত প্রায়োগ সম্পর্কে লিখে-
ছেন ডাঃ সুনীলানন্দ সেন। একজন রক্ত
আর একজনকে দেওয়ার জটিল জ্ঞাতব্য বিষয়
এমন সহজে জানা যায়, তা আগে আমাদের
জানা ছিল না। 'অপঘাত মৃত্যুর তথ্যাবলী'
দান করেছেন ডাঃ ননীগোপাল দে। লেখাটি
চিত্তাকর্ষক। এছাড়া বিভিন্ন রোগ, অসুখ,
তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি, ওষুধ ও শল্য-
কথা লিখেছেন অনেকেরই। প্রশ্নোত্তর বিভাগ-
টির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। মহামান
হিপোক্রেটিশের প্রবর্তিত শপথবাদী ডাক্তার ও
রোগী উভয়েরই হৃদয়গম হওয়া উচিত।



ভারতদর্শন

শ্রী টি টি কুমারস্বামী—মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে

বিশ্ব প্রেমিক জওহরলাল

রাত্রির তপস্যা

১৪ই নভেম্বর। শিশুদিবস। বিশ্বপ্রেমিক জওহরলাল নেহরুর ৭৬তম পূণ্য জন্মদিবস। রাজধানী দিল্লী তথা সমগ্র ভারতে এবং সেই সঙ্গে তামাম বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ দিনটি যুগে যুগে বিশেষ অর্ঘ্য বহন করে আনবে।

শিশুপ্রেমিক জওহরলালে র আবির্ভাব দিবস বলেই নয়, মহান ভারতের সৃষ্টিশীল নেতার জন্মদিবস বলেই নয়; হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিত্য নিষ্ঠুর স্বপ্নেদের মাঝে সম্প্রীতি-নির্ভর সহাবস্থানের কবি-দার্শনিক প্রীতিতে অবিচলিত বিশ্বাসী গণ-তান্ত্রিক দুনিয়ার অকৃত্রিম সুহৃদ ও সংহারশীল যুদ্ধোন্মাদনার চিরবৈরী স্বপ্নাদ্রুতা গান্ধী-শিষ্যের এবং রবীন্দ্র অনুভাব-প্রভাবিত বিশ্বচেতনায় উদ্বেলিতবন্ধ দার্শনিক নেহরু-জন্মদিবস-রূপেই স্বমহাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ১৪ই নভেম্বর।

স্বপ্নাদ্রুতা তাতে সন্দেহ নেই। মহান নেতা সংঘাতজর্জরিত মহাবিশ্বকে মানবতার নামে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন শান্তিময় পারিবেশে মানবোতিহাসের অগ্রগতি। কুটিল আকাঙ্ক্ষাজীবী দুনিয়ায় এ জাতীয় শান্তিস্বপ্ন 'দুঃস্বপ্ন' ছাড়া মিতীয় ব্যাখ্যায় ভূষিত হওয়ার দাবি রাখে না। নেহরুজী সেই শান্তির দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন।

কিন্তু রাত্রির তপস্যা কোন ভবিষ্যৎ রাঙা সূর্যের রক্তরাগে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কেউ জানি না। কেউ বিশ্বাস পর্যন্ত স্থাপন করতে ভরসা পাই না। তাঁর সে ভরসা ছিল। ছিল উদার দর্শনের সঙ্গে উদার সহনশীলতা।

শান্তির শত্রু যাঁরা, মানুষের রুধিরাক্ত পথেই যাঁদের সামরিক অভিযান, সর্বসংহা ধরিগ্রীর মতো তাঁদের সহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের যুগব্যাপী মহাপ্রান্তির সংস্কারসাধন

করতে। হার! সে স্বপ্ন কবির খেদ মাত্র।

জীবন কবিতা হয়ে উঠল না। রক্তগোলাপ টাটকা প্রাণের স্বপ্নকে সার্থক করল না। নেহরুজী বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন জন এফ কেনেডি। শান্তির স্বপ্ন পুনশ্চ আবৃত হল পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে।

কিন্তু তবু কি নিরাশ হবে অসহায় বিশ্বমানব! রাত্রির তপস্যা সৈকি আনিবে না দিন? এ প্রশ্ন বারম্বার উত্থিত হয়েছে। জবাব মেলে নি।

কেবল একটি ক্ষণিক ভরসা : মহান প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাষায় বলা যায় : "When power leads man to arrogance poetry reminds him of his limitations When power narrows the area of man's concern, poetry cleanses."

বিশ্বরাজনীতিতে জওহরলাল নেহরু সেই কবিতা। ১৪ই নভেম্বরে ফিরে ফিরে সে কবিতাই পঠিত হবে। বছরের একটি দিন মানুষ অন্তত চিন্তা করবে শান্তির কথা, মানব-জয়যাত্রা কথা, শিশু-স্বপ্নের কথা, সহ-অবস্থানের কথা।

চাচা নেহরু

বহির্বিশ্বে ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ নেহরুজীর ছিয়াত্তরতম জন্মদিবসকে এবার নয়া প্রীতিতে পালন করছেন।

ডি আই পি সম্মেলন নয়, অনাথ শিশু সম্মেলনে চাচা নেহরুর জীবন-কথা। ডকুমেন্টারী ফিল্ম সহযোগে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে নেহরু-পরিচয়ের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা।

এই অভিনব আমন্ত্রণ যথার্থই অভিনন্দনযোগ্য। নেহরুজীর জীবন-কথা তাদের মধ্যেই প্রচারের প্রয়োজন যারা ভবিষ্যৎ দুনিয়ার সংগঠক হবে।

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গত নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নও মনে আসে। যুক্ত সংসদ সংস্থা (জয়েন্ট পার্লামেন্টারী বডি) নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়কে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। নতুন সংশোধনে কেবলমাত্র দিল্লীতে অতিরিক্ত একটি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিষয়কে ভারতব্যাপী প্রসারিত করার উদ্দেশ্য গৃহীত হয়েছে। এই নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নতুন কলেজ স্থাপন করারও অধিকার থাকবে এবং সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হবে। নেহরু গবেষণার বিষয়গুলির মধ্যে

উল্লেখিত হয়েছে,—জাতীয় সংহতি, সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণ-তান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি, আন্তর্জাতিক সহর্মিতা (International understanding) এবং দেশীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে নেহরু-দর্শন খণ্ডিতভাবে গৃহীত হয়েছে। নেহরুজীর সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তায় উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে, সুতরাং, যথার্থ প্রতিবাদ রেখেছেন শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী পি কে কুমারণ। তাঁরা মনে করেন সমাজতন্ত্রবাদের পাঠ (Study of socialism) তালিকাভুক্ত করা উচিত।

সন্দেহ নেই তাঁদের বক্তব্য সাধারণের সমর্থন মিলবে।

মিত্ররাষ্ট্রে টি টি কে

অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এই প্রথম সোভিয়েট দুনিয়ায় পদার্পণ করলেন। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এস এ স্ক্যাকভ ও রাশিয়াস্থ ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধি শ্রী টি এন কাউল।

—আগনি কি প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর কাছ থেকে সোভিয়েট নেতৃবর্গের জন্য কোনো বার্তা এনেছেন? —প্রশ্নের উত্তরে টি টি কে তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, নিশ্চয়, আমি নিয়ে এসেছি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর অভিনন্দন।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণমাচারী যে বার্তাই নিয়ে গিয়ে থাকুন, ভারতবাসীর অকুণ্ঠ শ্রুভেচ্ছা ও পাক-ভারত বিরোধকালীন অবস্থায় এবং ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মূহুর্তের কাল থেকে সোভিয়েট দেশ ভারতের প্রতি যে অকুণ্ঠ বন্ধু মনোভাব প্রদর্শন করে আসছেন তার জন্য ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সঙ্গে সোভিয়েটভূমিতে অবতরণ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রশ্ন (এই সাহায্য দানে ইতিপূর্বেই সোভিয়েট সরকার স্বিধাহীন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন) যেমন আলোচ্য বস্তু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর কাশ্মীর সমস্যার আলোচনাও তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনরূপ সর্তারোপ না করেই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সব সময়ই আগ্রহান্বিত।



একটি অন্তরঙ্গ মূহুর্ত

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চল্লিশটি প্রধান শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় সোভিয়েট সাহায্য অব্যাহতভাবে বর্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সোভিয়েট সফর ভারতের আপেক্ষিকালীন বিশেষ চাহিদা পূরণেরও যথোচিত প্রয়াস পাবে।

সোভিয়েটভূমির সঙ্গে অতীতে ভারতের সম্পর্কটি যতই ভাষা ভাষা থাক, পাক-চীন আক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে সে সম্পর্ক আরও গাঢ়বন্ধ হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণমাচারীর স্বয়ং সোভিয়েটভূমিতে ঘোষণা করেছেন, তাঁর স্থির বিশ্বাস ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী উত্তরোত্তরই গভীরতর হয়ে উঠবে।

আণবিক বোমা

ভারত আণবিক বোমা প্রস্তুত না করার যে সিদ্ধান্ত পূর্বাঙ্কে গ্রহণ করেছিল সে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন মহলে (পাক-আক্রমণ ও চীনা আলটিমেটামের কালে) দাবি উঠেছিল। দাবিদারদের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা ছিলেন, ছিলেন মন্ত্রীবর শ্রীখান্না।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী ঘোষণা করেছেন, না, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পূর্ব সংকল্প পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটে নি। ভারতবর্ষ বরং আণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও তার প্রসার রোধ করার জন্যই আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে নিম্নস্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অর্থাৎ শাস্ত্রীজীর ঘোষণায় এ কথাটিই প্রমাণিত হল যে, ভারত সরকার বিধে বিধক্ষয় পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমরা বুদ্ধি অস্ত্রের অধিকার ও অস্ত্র প্রয়োগ সমর্থক নয়। যদিও রোগের বিষ মারতে ঔষধনামক বিষ প্রয়োগই করতে হয় (ঔষধ মাত্রই অপবিস্তর বিষাক্ত), তথাপি অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা আণবিক অস্ত্রের প্রসার ও উৎপাদন রোধ করার জন্য ভারতবর্ষে নিশ্চয় কেউ ওকালতি করেন নি। যারা আণবিক অস্ত্র প্রস্তুতির পক্ষে ছিলেন, সম্ভবত তাঁদের মনোভাব, নয়মাস্ত্রা বলহীনেন লভ্য। আর এদেশে খুব অল্প সংখ্যকই বোধ করি আছেন, যারা এ যুগেও সেই আগ্রবাক্যে বিশ্বাসী যে বাণী বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধর্যা (বীর অর্থে অবশ্য এখানে হিংস্র গুণ্ডামীকেই গ্রহণ করা হয়েছে, হিরোইজমকে নয়)। সুতরাং তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতকে প্রস্তুত রাখতে। প্রস্তাবটি, বোঝা গেল, সরকারের মনে ধরে নি।

অথচ ভারতের মত জোট নিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে স্ববলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক ভারত-পাক সংঘর্ষই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারতবর্ষ প্রস্তুত না থাকলে স্যাবার জেট আর প্যাটন ট্যাঙ্ক ভারতের সমূহ বিপদের কারণ হ'ত।

ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়বাদী ভূমিকার ফলে ভারতের বন্ধু সংখ্যাও যে অগুণ্টিময় বর্তমানে তাও প্রমাণিত সত্য। তবু ভারতবর্ষের পক্ষে আর্থিক-অনীহা এহেন পন্থাটিতে গ্রহণ করা উচিত কিনা এ বিষয়ে সজ্ঞা স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন সরকার সে প্রশ্নকে নস্যাৎ করলেন।

সত্য সেলুকস

আর একবার বিহর্ভারতের মানুষ বলবে, সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!

এ দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধিরা একদিকে সম্বন্ধভাবে দাঁড়িয়ে বলল, ঐ জোড়ার পাকিস্তানকে খালের জলের ঢাকা দিও না। কারণ ওরা দেশী বিদেশী আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তিরই তোয়াক্কা করে না। ওরা বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে প্রতিশ্রুতি-বন্ধ হয়ে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। ওরা হাতে পেয়ে আন্তর্জাতিক ভদ্রতার মুখে জোড়া বটু তুলে দিয়ে অঘোষিত যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্বন্ধে লিপ্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ আটক করে মাল গায়েব করে। ওরা আন্তর্জাতিক সহবৎ নামক বস্তুটিকে পদদলিত করে বিবদমান রাষ্ট্রের দূতবাসের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। ওরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত যুদ্ধ-বিবর্তিত রোখা লঙ্ঘন করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। ওরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই চুক্তিভঙ্গে সামান্যতম বিশ্বাস-বোধ করে না (কছ চুক্তি) এবং দ্বিতীয়-বারের জন্য অপর রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে পররাজ্য গ্রাস করতে চায়। ওরাই প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ের চুক্তি করেও সে কথা কাজে পরিণত করতে নারাজ (নেহরু-নুন চুক্তি, ১৯৫৮ সাল)। ওরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৈন্যপাসারণ চুক্তি করেও (অগাস্ট, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ-বিবর্তিত চুক্তি) কাশ্মীরে চুক্তিবিরোধী কাজ করে। ওরা অবিরাম বিনামূল্যে পাওয়া গোলা-বারুদের শ্রাদ্ধ করে সীমান্ত এলাকায়।

তবুও, দেখ হে সেলুকস, কী বিচিত্র দেশ এই ভারতভূমি। এর নির্বাচিত সরকার ঐ কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দের চোখা চোখা বাক্যবাণ নীলকণ্ঠের মতো

বেমানম হজম করে ঠিক সময় ঠিক সুবিন্দুটি দান করতে সামান্যতম শ্রমসাধ বোধ করেন না।

শোন হে সেলুকস! ঐ বিচিত্রভূমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই হিমালয়-প্রমাণ-বিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ভারতের পক্ষে সিন্ধু চুক্তি মেনে নিয়ে শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে আট কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভারতের ন্যায়বাদী রূপটি বিশ্বের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করবে। ভারত “পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার কালেও ভারত তার প্রতিশ্রুত চুক্তি সম্মতবাদায় রক্ষা করতে জানে!”

বল হে সেলুকস, তাজব বোধ হয় কিনা তোমার!

সেলুকসের উত্তর শোনার দুর্ভাগ্যে কাজ নেই, প্রশ্নকর্তার তাজব বলার পেছনের ইতিহাসটায় বরং একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১৯৬০ সালে সিন্ধু জলচুক্তি অনুসারে ভারত এম্বাং পাকিস্তানকে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়েছে। দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে। এ পর্যন্ত পঞ্চম ফেব্রুয়ারি টাকা প্রদত্ত হয়েছে। গোল-মালটা বস্তু ফেপ নিয়ে। গোলমাল বাধত না যদি উল্লিখিত কারণগুলি দেশসমূহ লোককে চটিয়ে না তুলত।

অনেকেই বলেছেন, শুধু পাক-পক্ষে চুক্তি লঙ্ঘনের ব্যাপারটাই তো দেখলে চলবে না, ভারতের নিজের বিপদের কথাটাও মনে রাখতে হবে। পাকিস্তান যে ভারতপ্রদত্ত অর্থ নিয়ে ভারতেরই বিরুদ্ধে সমরসজ্জা সাজাবে না তার গ্যারান্টি কোথায়। তারা তো খাল অঞ্চলে জোরদার সামরিক প্রস্তুতির চিহ্ন এখনই সাজিয়ে রেখেছে। ট্যাঙ্ক চলাচলের উপযুক্ত রিজ ও তৈরি করেছে ভারত ধ্বংসের মূঢ় আকাঙ্ক্ষায়। তাছাড়া ভারতের নিজস্ব অঞ্চল যখন শত্রুকিয়ে কাঠ হচ্ছে এবং জল পেলে সেখানে যখন ফসল ফলাতে পারে তখন একটি অবিশ্বাসী চরিত্রের রাষ্ট্রের ওপর জলের মতো টাকা এবং প্রাণের মত জল ঢেলে শত্রুর হাত শক্ত করার মধ্যে কী এমন নয়া মহাভারত বিরচিত হবে।

উত্তরে সরকার পক্ষ বলেছেন, চুক্তিটা বড় বেকায়দার। ওটি একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। ওতে আবার বিশ্ব-ব্যাংকের প্রশ্ন জড়িত আছে। এখন দুম করে টাকা বন্দ করে দিলে বিশ্ব-ব্যাংকেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেতে পারে; আর রেগেমেগে তারাও যদি ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কড়দান বন্দ

করে তবে ভারতের পক্ষে সে কড়িটা হবে মারাত্মক। তার থেকে বরং দুর্জনের দাবি মিটিয়ে দেওয়াই ভালো। প্রায় অর্ধেক তো ইতিমধ্যেই গেছে ব্যাকটুকু নিয়ে আর বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চটা-চটি করায় কি সুবিধে হবে।

যুক্তিতে গরমিল লক্ষ্য করে কেউ কেউ হয়ত এখন প্রধানমন্ত্রীকে চেপে ধরে বলতে পারেন যে, মশাই, আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন তো : পৃথিবীকে কিছুর একটা দেখিয়ে দেবার জন্যেই চুক্তির যথার্থ রক্ষা, নাকি বিশ্বব্যাংকের হাইফেনটুকুই ভারতের কাস্তি চেপে ধরেছে বলেই এই বাস্তবতা?

প্রধানমন্ত্রীকে তখন আমতা আমতা করতেই হবে।

তা সে প্রসঙ্গ চুলোর যাক। এখন যদি সমস্যাটা বিশ্বব্যাংকগত বলেই ধরে নেওয়া যায় তবে আমাদের নিচের অংশটুকু মানে মানে মেনে নিতেই হবে।

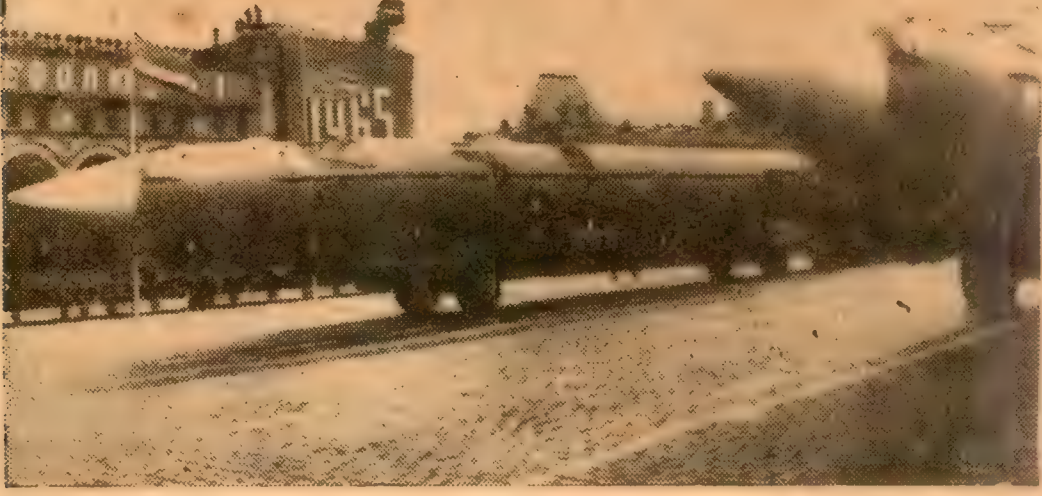
ক্ষমতাসীন দলের সদস্য হোন, কংগ্রেস প্যারামেন্টারী বোর্ডের সদস্য হোন অথবা বিরোধী দলের সমালোচক হোন, যারাই একযোগে সিন্ধু জল-চুক্তির ব্যাপারটা সমূহ কারণ এবং খুবই যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন করে বাতিল করে দিতে চাইছেন, তারা সম্ভবত দলগত মূলত এক জায়গায় একটা বিষম ভুল করে বসে আছেন।

যুদ্ধাবস্থায় ভারত কেন, যে কোনো রাষ্ট্রই দেশের মধ্যে সাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এমন বহুতর গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন যাতে মনে হতে পারে, সে রাষ্ট্র সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ধরাকে সরা জ্বল করেছে। অর্থাৎ সে সময় অবস্থা চরমে উঠেছে। তখনকার শ্লোগান করণে ইয়া মরণে। তখন অগ্নিপশ্চাৎ বিবেচনার বাতিল বালাই। কিন্তু একই অবস্থাকে চিরস্থায়ী করে রাখাটা পাকিস্তানি হলেও কুটনীতি নয়। তাই আবহাওয়া একটা স্থিতাবস্থার আসতে চাইলে অনেক হস্তম-বন্ধনের টাটকা সমাধি দিতে হয়।

এক কথায় সব কিছু নস্যাৎ করে দেব বলে যদি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উৎসাহ বোধ করে থাকি এবং অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাল ঘোরাতে ও হাওয়ার গতির সঙ্গে পাল খাটাতে না পারি, তবে বেদনার শিকারমাত্রই হতে হবে আমাদের।

কিন্তু যারা তা পারেন, স্টীয়ারিং হুইলটা তাদের হাতে থাকাই নিরাপদ। তাতে অকস্মাৎ এ্যাক্সিডেন্টের ভয় কম।

আন্তর্জাতিক



বলশেভিক বিপ্লবের ৪৮তম বার্ষিকীউদ্‌যাপন উপলক্ষে এই নভেম্বর মস্কো রোড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত নতুন সোভিয়েট রকেট।

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

শব্দ পশ্চাত আইয়ান স্মিথ একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ১১ই নভেম্বর সালিসবেরী থেকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান-মন্ত্রীরূপে আইয়ান স্মিথ ঘোষণা করেছেন, গ্রাথ থেকে রোডেশিয়া স্বাধীন। তবে তাঁরা ইউনিয়ন জ্যাককেই তাঁদের পতাকা রাখবেন, 'ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন' ইংরেজদের এই জাতীয় সঙ্গীত হবে তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত, রাণী এলিজাবেথকেই তাঁদের রাণীরূপে স্বীকার করবেন এবং তাঁরা কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে চান। স্মিথ তাঁর বক্তার ভাষণের উপসংহার করেছেন, 'ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন' এই ধর্মান দিয়ে।

বুটেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথ ও তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে বরখাস্ত করে রাণী এলিজাবেথ আদেশ জারি করেছেন। এখন থেকে এই উপনিবেশের সকল শাসনকর্তা থাকবে রাণীর প্রতিনিধি গভর্নর স্যার হামফ্রে গিব্‌সের হাতে। বিদ্রোহী স্মিথ ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার জন্য দক্ষিণ রোডেশিয়ার সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

কেবল তাই নয়, স্মিথ সরকারকে শাস্তাস্তা করার জন্য বুটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ারকে স্টার্লিং এলাকা থেকে বহিস্কার

করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে সকলপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুটেন দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে যে দেড় কোটি টাকার তামাক কেনে, তা আর কেনা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বুটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ভাবছেন। ইতিমধ্যেই কমন্সভার এটর্নী-জেনারেল স্যার এলউইন জোনস এই কাজের জন্য জরুরী

ক্রমতা মঞ্জুর করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

বুটেনের কাছে এ এক মহা চ্যালেঞ্জ। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণার পর আর কখনও কোন বৃটিশ উপনিবেশ জোর করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নি। প্রায় দু'শ বছর পরে আজ আবার বুটেন বিদ্রোহের সম্মুখীন। দু'লক্ষ স্বেতাঙ্গের এই বিদ্রোহকে যদি বুটেন দমন করতে না পারে, তবে তার মান-সম্মান কিছই থাকবে না।

আইয়ান স্মিথ ও তাঁর রোডেশিয়ান ফ্রন্ট পার্টিও সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত। দু-বৎসর ধরে তারা এই স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করে আসছেন। চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকার জনগণের বিরোধিতা, বিশ্ব জনমতের প্রতিবাদ ও বুটেনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে আজ তারা দম্ভভরে এই পথে অগ্রসর হয়েছে। বুটেনের হুমকীতে আর তারা ভীত নন। স্মিথ বলেছেন, ১৯৬১ সালের সংবিধান অনুসারে গভর্নরের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং গভর্নরের আদেশ তারা মানবেন না। গভর্নরকে বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য স্মিথ আদেশ দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীরা এখন কাকে মানবেন? স্মিথ কতৃক অগ্রাহ্য করা গিব্‌সকে, না রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধি গিব্‌স যারা পদচ্যুত স্মিথকে?

স্মিথদের এত সাহস হল কেন? চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকারকে ভোটাদিকার না দিয়ে দু'লক্ষ স্বেতাঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিবিশেষী সরকারের একচ্ছত্র কতৃক প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আফ্রিকা তথা



হ্যারল্ড উইলসন

সমগ্র বিশ্বের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এভাবে চলার সাহস স্মিথের হল কি করে? কেবল-মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ও পশ্চিমার ভরসাতে নিশ্চয়ই স্মিথ এ কাজ করেন নি। স্মিথের বাড়ি ভরসা বাস বটেন। বৃটিশ সরকার যতই গর্জন করুক, দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে তার শেষ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারবে না, এই তাৎক্ষণিক ধারণা। বিশ্বজনমন্ডলের দাবি, স্মিথদের বিরুদ্ধে দমনের জন্য সৈন্যবলের সাহায্য নেওয়া হোক। কিন্তু উইলসন পরিষদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সৈন্য নিয়োগ করবেন না। এতেই স্মিথের সাহস বেড়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা ভয় পান না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে তার কোন ক্ষতি হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরাচার সরকার বহাল তবিয়তে আছে, বরং তাদের অত্যাচারের খ্যাতি ক্রমেই বাড়ছে।

হারল্ড উইলসন ও তার সরকার অত্যন্ত স্মিথের বিদ্রোহের বিরোধী এবং বিদ্রোহ দমন করে দক্ষিণ রোডেশিয়া বটেনের অনুগত শাসন তারা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তবে তার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের তারা পক্ষপাতীন। কিন্তু রক্ষণশীল দল-সামান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিরোধী। বিরোধী দলনেতা এডওয়ার্ড হিথ ইতিমধ্যেই বলেছেন, তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমর্থন করবেন না। কম্যুনিজম তারা জরুরী ক্ষমতা দানেরও বিরোধীতা করবেন। স্মিথ চালাকি করে, রাণীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং ইউনিয়ন জ্যাককে পতাকা বানিয়েছেন। রাণী ও ইউনিয়ন জ্যাকের বিরুদ্ধে বটেন কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

দক্ষিণ রোডেশিয়ার বর্তমান সংকটের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বৃটিশ সরকার। এতদিন চুপ করে না থেকে, স্মিথকে প্রশ্ন না দিয়ে যদি তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তা হলে এ অবস্থা

হত না। এখনও যদি তারা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা হলে মৃত্যুতের মধ্যে স্মিথ-শাসনের পতন ঘটে। কিন্তু তাও তারা করবেন না; আত্মজন দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বৈরাচারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বটেনের মানব পছন্দ করবে না! বটেনের এই স্বাধীনতা নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীগোপাল পার্শ্বসারথি ও ঘানার প্রতিনিধি অ্যালেক্স কোরাইসনসাকে তীব্র আলোচনা করেন।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার এই একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে সমগ্র বিশ্ব তার প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। প্রায় সকল রাষ্ট্র এর নিন্দা করেছে। রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০৭-২ ভোটে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কেবল পশ্চিমার আর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ স্মিথ সরকারকে বৈআইনী বলে ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

আফ্রিকার দেশগুলি স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে নিজেরাই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছে। ঘানা, কেনিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। দর-এস-সালাম থেকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার নির্বাসিত অফিসার নেতারা ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার 'জান্দুর নেতারা পাটো জিম্বাবোয়ে গণসরকার' গঠন করেছেন। সোকোমবেনাতে এই সরকারের সদর দপ্তর। বৈআইনী স্মিথ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগতা, করদান বন্ধ এবং তীব্র-ধনুক নিয়ে স্মিথের পল্লিশের সঙ্গে লড়াই করার জন্য গণসরকার জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

বটেন যদি স্মিথকে শাস্তি দেয় তা হলে, তবে আফ্রিকারাই তাকে শেষ করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন:

এই নভেম্বর মস্কোর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নভেম্বর (অক্টোবর) বিপ্লবের ৪৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল রোডিয়ন ম্যালিনভস্কি অভিবাদন গ্রহণ করেন। মস্কো মার্শাল ম্যালিনভস্কির পাশে ছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ও প্রধান-মন্ত্রী আর্নেস্ট কোসিগিন এবং কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফাইডেল কাস্ত্রোর ভাই প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী রাউল কাস্ত্রো। রেড স্কোয়ারের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্শাল ম্যালিনভস্কি মার্কিন বক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। মার্কিন বক্তরাষ্ট্রের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী বৈকোন আক্রমণকারীকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে রেড স্কোয়ারে সামরিক উপকরণের বৈ প্রদর্শনী হয়, তাতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দুটি রকেট দেখানো হয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী এই এক জোড়া রকেট।

ক্রেমলিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম সহকারী প্রধান-মন্ত্রী ডিমিত্রি পলিয়ানসকি। পলিয়ানসকি তার বক্তৃতার কোথাও সোজাসুজি চীনের নাম না করলেও তিনি চীনের ভাবিতিক বক্তব্যের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। পলিয়ানসকি বলেন, এক দেশ থেকে অপর দেশে বিপ্লব চালান দেবার দিন শেষ হয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে যুদ্ধ নয়, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার পথেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।



রেড স্কোয়ারের কুচকাওয়াজে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করছে

পলিগ্যানসকি অবশ্য তাঁর ভাষণে ভিন্নতরভাবে মার্কিন নীতিরও নিন্দা করেন।

সোভিয়েট বক্তব্যের পাঠ্য জবাব এসেছে পিকিং থেকে। পিকিং-এ অনর্ন্তনত নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীর ভোজসভার চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ এন-লাই ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাশাল চেন ই সোভিয়েট জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করলেও, চিরায়ত প্রথামত সোভিয়েট সরকার বা নভেম্বরের সমৃদ্ধি কামনা করেন নি। এই কাড়িমর সকলেরই নজরে পড়েছে। তা ছাড়া নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষে 'পিপলস ডেইলী' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'স্বাধীনতা' কথা হয়েছে, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তার যাত্রাপথ সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পথ : পূর্বাধিকারের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা। আর চীনের পথ : বিপ্লব। কোন পথ ঠিক?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

নিউ ইয়র্ক শহরের বেয়র পদের নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থী বর্তমান বেয়র রবার্ট এক ওয়াগনারকে পরাজিত করে রিপাবলিকান পার্টির তরুণ প্রার্থী জন ভিয়েত লিওসের নির্বাচন এ মণ্ডায়ে মার্কিন রাজনীতির সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

লিওসে বর্ষন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন নবাই হেসেছিল। লিওসের জয়ের কোন সম্ভাবনা আছে, একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। নিউ ইয়র্ক শহর দলতে গেলে একচেটিয়া ভাবে ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে। এই শতাব্দীতে বার্ন মু'বার 'জেন রিপাবলিকান এই শহরের বেয়র হতে পেরেছেন, ১৯৩৩ সালের পর আর কোন রিপাবলিকান প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া ডেমোক্রাটিক প্রার্থী বর্তমান বেয়র ওয়াগনার জনপ্রিয়। তিনি পরাজিত হয়েছেন, এও এক মন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

কিন্তু এই বিস্ময়কর ঘটনাই যাচাই হবে এবং আর একবার সেই সত্যকেই প্রমাণিত করেছে যে, নির্বাচনের ফল যে শেষ পর্যন্ত কি হবে তা কখনও জোর করে বলা যায় না।

লিওসে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হলেও ডেমোক্রাটিক পার্টির তরুণ ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সমর্থন তিনি পেয়েছেন। নিগ্রোদের অধিকাংশের সমর্থনও লাভ করেছেন লিওসে। রিপাবলিকান পার্টির সংগঠনের ওপর লিওসে ভরসা করেন নি, তিনি নিজস্ব নির্বাচনী সংগঠন গড়ে তুলেছেন,



নির্বাচনী অভিযানে জন লিওসে

এবং এই সংগঠনে ডেমোক্রাটিক পার্টির অবশেষে তাঁর হয়ে কাজ করেছে। রিপাবলিকান পার্টির বিশিষ্ট নেতাদের তিনি নির্বাচনী অভিযানে নামতে দেন নি। এমন কি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের রিপাবলিকান গভর্নর রকফেলারকে পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে দেন নি। দল-নিরপেক্ষ ভাবে প্রধানত তরুণ কর্মী ও নিগ্রোদের ওপর নির্ভর করে তিনি নির্বাচন লড়েছেন এবং জিতেছেন।

এই জয় তাই তারুণ্যের জয়। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে তেভার্লি' বৎসরের তরুণের জয়। পুরোনো নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নতুন নেতৃবৃন্দের জয়। গতবারের সেনেট নির্বাচনেও এই নিউ ইয়র্ক থেকে উনচলি' বৎসরের রবার্ট কেনেডি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একমুষ্টি বৎসর বয়স্ক রিপাবলিকান প্রার্থী সেনেটর জ্যাকব জেভিস্টকে হারিয়ে জয়লাভ করেছেন। তাই এখন থেকেই কথা উঠেছে, আগামী বছর গভর্নর নির্বাচনে সাতার বৎসরের রকফেলার জিতে পারবেন ত? বঁরা একটানা বহু বৎসর ধরে একই পথে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁদের অপসারণের দাবি আজ সর্বত্র উঠছে। 'কাজ লোকদের সরিয়ে দাও' এই হল ধ্বনি।

কেবল তারুণ্যের জয়ই নয়, নিউ ইয়র্কের এই নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক পার্টির পরাজয়কে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা জনগণের নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের বিক্ষোভ বলে ব্যাখ্যা করছেন। ভিন্নতর ও অন্য কক্ষে জনগণ নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন বক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাপক বিক্ষোভ সূত্র হয়েছে, এ তারই প্রকাশ বার। 'হাই হোক, নিউ ইয়র্কের বিপ্লব' জনগণ ও তাঁর ডেমোক্রাটিক পার্টিকে রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছে।

জন ভিয়েত লিওসের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নিউ ইয়র্কের বেয়র পদে যিনি বসেন, তিনি আরও ওপরে যাবেন, এইটাই সকলে ভাবে। অনেকের মনে করছেন, আগামী দিনে লিওসেই হবেন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী। ব্যারি গোল্ডওয়াটার কার্য হলেও, কেনেডির মতই লিওসে সফল হবেন, রিপাবলিকান পার্টির বহুজনের মনে আজ এই আশা।

ইন্দোনেশিয়া :

রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় তাদের গণকে প্রচারের জন্য তাঁকে ঘৃণা দিতে চেয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন মাকিন রাষ্ট্রদূত হাওয়ার্ড পি, জোন্স ১৫ কোটি টাকা এই কাজের জন্য একজনকে দিয়েছিলেন। বাধীন নিশুর মতবাদ প্রচার করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ইন্দোনেশিয়ার মরোয়া ব্যাপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও হস্তক্ষেপের প্রমাণ স্বরূপ সোয়েকার্নো বলেন, বর্তমান মাকিন রাষ্ট্রদূত মার্শাল গ্রীন তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলেছেন, ৩০শে সেপ্টেম্বরের বিজোহ ব্যর্থ হওয়ায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র খুব খুশি।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের ব্যাপার নতুন কিছু নয়। সব দেশেই তারা সরকারী কর্মীদের এরকম ঘৃণা দিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে। কিছুদিন পূর্বে সিঙ্গাপুরের প্রধান-মন্ত্রী লি-কুয়ান-ইউ এইরূপ আর একটি খবরের কথা কীস করেছেন। জেকব বণ্ড নামে আমেরিকান সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের একজন গুপ্তচর সিঙ্গাপুরের অফিসারদের ঘৃণা দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। তাঁকে কীদ পেতে ধরা হয়। মাকিন সরকার এর জন্য কমা প্রার্থনা করেন এবং লি ও তাঁর দলকে প্রচুর টাকা দিতে চান। সংবাদপত্রে এই খবরটি বের হবার পর মাকিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। কিন্তু লি এবার খোদা মাকিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ডিন রাস্কের চিঠিটিই



লি-কুয়ান-ইউ

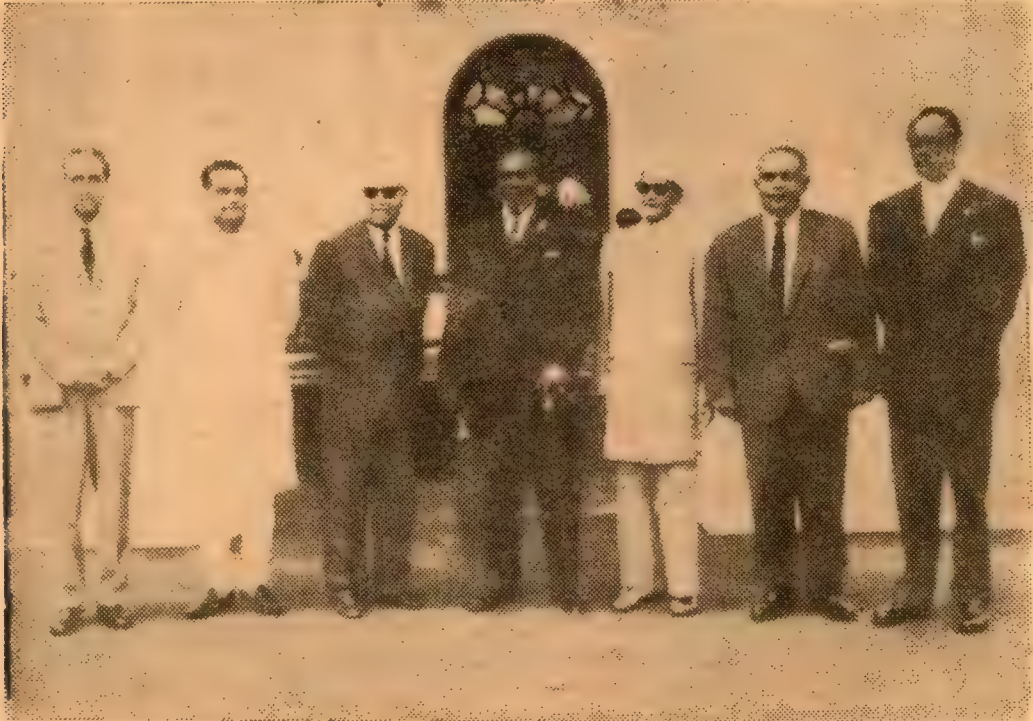
ছেপে নেন। এই ঘটনার জন্য সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমা চেয়ে ডিন রাস্ক যে চিঠি দেন, তা প্রকাশ হয়ে পড়ার মাকিন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত বিবৃত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, হঠাৎ এই সময় সোয়েকার্নো মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই প্রচারের পথ ধরলেন কেন? কারণ অত্যন্ত পরিকার। ৩০শে সেপ্টেম্বরের ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অত্যন্ত তীব্র হয়েছে। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিক্ষোভ না কমে কমেই

বাড়ছে। দক্ষিণপন্থীদের একাংশ প্রকাশ্যেই বলছে, তারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলতে চায়। 'মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জিন্দাবাদ' এমন ধ্বনিও উঠেছে বিক্ষোভ-মিছিলের মধ্য থেকে। সোয়েকার্নো মুখে কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার কথা ঘোষণা করলেও তিনি মোটামুটি-কমিউনিস্টদের সঙ্গেই চলতে চান। অন্তত তিনি যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মুকব্বিমানা মনে চলবেন না, একথা ঠিক। তাই এইসব চাকল্যকর কাহিনী প্রকাশ করে তিনি দেশবাসীর মনে মাকিন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে চান। মাকিন বিরোধী মনোভাব উগ্র হলে আবার কমিউনিস্ট বিরোধী বিক্ষোভও কমেবে।

কিন্তু সোয়েকার্নোর এই কৌশল সফল হবে বলে মনে হয় না। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে অনেকে মাকিন অনুরাগী হলেও, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাজনীতিতে যাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি সেই সৈন্যবাহিনীর প্রধানরা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরোধী। কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন যাতে মাকিন ঝপ্পরে গিয়ে না পড়ে তার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু, সৈন্যবাহিনী কমিউনিস্টদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদুল হ্যারিস নাস্ফন সেদিনও তাঁর বেতার-ভাষণে বলেছেন, কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু। তাদের শেষ না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই।



কেনিয়ায় নাইরোবি স্টেট হাউসে ভারতীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলকে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াট্টার সঙ্গে দেখা আছে। প্রতিনিধিদল কেনিয়ার শ্রুতচ্ছা সফরে এসেছিলেন।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

II সতের II

এক গলি থেকে আর এক গলি।
দুদিকে উঁচু দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে
পথ। সে পথ যেমন সরু, তেমন
অন্ধকার। বিজন সুনীলের পিছনে
পিছনে যেতে লাগল। তারপর এক
সময় বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন।'

সুনীল মূখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন,
ভয় পাচ্ছেন নাকি?'

একটু অস্বস্তি লাগছিল বইকি।
কিন্তু বিজন তা স্বীকার না করে
বলল, 'আপনি কি ভয় দেখাতে
চাইছেন?'

সুনীল হেসে বলল, 'না, তেমন
উদ্দেশ্য আমার নেই। তবে আপনার
যদি জড়ুর ভয় থাকে, সে কথা
আলাদা। এই যে আমরা এসে গেছি।
দেখবেন, যাতায়াতের পথটা একটু
দুর্গম মনে হলেও গন্তব্যস্থান তেমন
কিছু নয়।'

পুরোন দোতলা একটি রাড়ির
সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে লাগল
সুনীল। একটু বাদে সদর দরজায়
আলো জ্বলে উঠল। দোর খুলে
একটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

বিজন লক্ষ্য করল, মেয়েটি দেখতে
সুন্দরী। বেশ দীর্ঘাঙ্গী। বয়স চট
করে অনুমান করা শক্ত। চম্ভশ-
পাঁচিশের কম হবে না। চোখমুখ
দেখলে মনে হয়, এরই মধ্যে সংসারে
বেশ ঘা খেয়েছে, আর এক ধরনের
অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে।

মেয়েটি মৃদু হেসে সম্বোধনা

জানাল, 'এই যে সুনীলদা, আসুন।
আমি ভাবলাম, আজ বোধ হয় আপনি
আর এলেনই না।'

সুনীল বলল, 'কেন, আমি কি
একেবারে আসবার সময় পার করে
দিয়ে এসেছি? এখন পর্যন্ত তো
নটাও বাজে নি।'

মেয়েটি একটু চেঁখ নামিয়ে বলল,
'তা অবশ্য ঠিক। আপনি এর পরেও—'

সুনীল বলল, 'এর পরেও কোন
কোনদিন আসি, এই তো? ঠিক
বলেছি। আমি অবশ্য অত সময়-
অসময় হিসেব করে চলতে পারি নে।
আজ আমার একজন বন্ধুকে নিয়ে
এসেছি। তোমার সঙ্গে আলাপ
করবে। আমার দেরি করে আসার
ক্ষতিপূরণ। আলাপ, করিয়ে দিই।
আমার বন্ধু বিজনকুমার বসু। এক-
সময় আমার কলীগ ছিলেন। আর
এ হল কণা করগুপ্ত। খুব গুণী
মেয়ে। গানবাজনা জানে, অভিনয়
করতে জানে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি
কণা না জানে কি।'

কণা একটু হেসে বলল, 'থাক, আর
অত বাড়তে হবে না আপনাকে।'
তারপর বিজনের দিকে চেয়ে বলল,
'ওঁর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না।'

কণা বলতে বলতে সিঁড়ির পাশ
দিয়ে বিজনের একখানি ছোট ঘরের
মধ্যে ঢুকল। ছোট হলেও সাজানো-
গুছানো। দুদিকে দুটি সোফা আছে,
সেন্টার টেবিল আছে। লম্বা একটি
বইয়ের র্যাকে বাংলা গল্প-উপন্যাস
সমস্ত সাজানো। ভিতরের দিকে আরও

একখানা ঘর আছে। তার সামনে
নীল রঙের পর্দা ঝুলছে। ভিতরের
ঘরে রেডিওতে কী যেন একটা নাটক
হচ্ছে।

কণা বলল, 'বন্ধ করে দিয়ে আসি।
নইলে আপনার কথা কিছু শুনতে
পাব না।'

সুনীল বলল, 'হ্যাঁ, বন্ধ করে দিয়ে
এস। তারস্বরে যা বীররসের অভিনয়
হচ্ছে তাতে আমাদের সব কথা তুলিয়ে
যাবে।'

একটু হেসে কণা উঠে পড়ল।
তারপর ভিতরের ঘরে গিয়ে রেডিওটা
বন্ধ করে দিয়ে এল।

সুনীল একটু চুপ করে কণায়
দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখল।
তারপর হেসে বলল, 'কই, তোমার
বন্দ্যপাতি সব কোথায়?'

কণা হেসে বলল, 'বন্দ্যপাতি আবার
কিসের?'

'গানবাজনার।'

'আছে ভিতরে। ধুলো পড়ছে।'

সুনীল বলল, 'কিরকম অবলীলায়
বলে ফেললে ধুলো পড়ছে। ধুলো
পড়তে দিচ্ছ কেন?'

কণা একটু চুপ করে থেকে বলল,
'সব সময় কি মন-মেজাজ ঠিক থাকে
সুনীলদা?'

সুনীল বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।
কিন্তু মন-মেজাজকে যদি অমন লাগায়
ছেড়ে দাও, তা হলে কোনদিনই সে
পুরো বেশে আসবে না। তার চেয়ে
সুদূরতর তারস্বরে তাকে বেঁধে ফেল।
নিয়ে এস তোমার হারমনিয়মটা।'

কণা কাতরভাবে বলল, 'আজ থাক সুনীলদা। আজ সত্যি কিছু ভাল লাগছে না।'

বিজনের কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। মেয়েটি কোন জাতের, কীই বা তার জীবিকা, তা সহজে অনুমান করবার জো নেই। সেই সাধ্য আর যাই হোক, বিজনের নেই। গানটা তার জীবিকা কিনা তাও বিজন জানে না। কিন্তু যে কারণেই হোক, গান শুন সে গাইতে চাইছে না, তাকে এত পীড়াপীড়ি করা কেন।

বিজন বলল, 'আচ্ছা, আপনার শুন গানের মেজাজ নেই, গান বরং আজ থাক। আজ আমরা গুর কাছ থেকে গল্প শুন সুনীলবাবু।'

কণা যেন একটু চমকে উঠল, 'কিসের গল্প শুনতে চাইছেন উনি?'

সুনীল বলল, 'ভয় নেই তোমার। ভূতের গল্প, প্রেতের গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প। তার চেয়ে বেশি সাংবাদিক কোন গল্পের দাবি বিজন-বাবুর নিশ্চয়ই নেই। কি বলনু বিজনবাবু? আমরা যে কোন রকমের গল্প শুনতেই রাজী আছি।'

বিজন জবাব না দিয়ে একটু হাসল।

কণা বলল, 'কিন্তু আমি তো কোন গল্পই বলতে পারি নে। তবে শুনতে পারি। আপনারা ভাবতে থাকুন কী বলবেন, কী শোনাবেন। আমি ততক্ষণে চা করে নিয়ে আসি।'

বিজন বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, চা-টা থাক। চা তো আমরা এই একটু আগেই খেয়ে এলাম।'

কণা বলল, 'তাতে কি হয়েছে? আমার এখানেও তো আপনি এই প্রথম এলেন। সুনীলদা, শুনুন একটু।'

ডাক শুন সুনীল ভিতরে চলে গেল। একটু বাদে তার গলা শুনতে পেল বিজন, 'আরে না, না। তোমাকে দিতে হবে না, আমার কাছে খুচরো টাকা আছে। আমি নিয়ে আসছি।'

বিজন বুকতে পারল, তাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু বাদে সুনীল ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বিজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একটু বসুন বিজনবাবু। আমি এক্ষুণি আসছি।'

বিজন বলল, 'আপনার আসবার কিন্তু কোন দরকার ছিল না সুনীল-বাবু।'

সুনীল ফিরে দাঁড়িয়ে বিজনের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে বলল, 'কটে! আমার

আসবার আর দরকার নেই? আচ্ছা বেশ।'

বিজন লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনার যাবার দরকার নেই, এইটাই আমার বলবার কথা ছিল।'

সুনীল বলল, 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু না গেলে কণা ভারি দুঃখ পাবে। আপনি এখানে এই প্রথম এলেন। প্রথম অতিথি। আপনার সামনে যাই হোক কিছু ধরে দিতে না পারলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে বলে গুর ধারণা।'

আর দেরি না করে সুনীল বেরিয়ে গেল।

বিজন ভাবল, গৃহস্থ এখানে কোথায়? এই মেয়েটিকে ছাড়া আর তো কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটির সিন্ধিতে সিঁদুর নেই। কুমারীর মতই বেশবাস। যতদূর মনে হচ্ছে, সুনীল এ বাড়ির কেউ নয়। আলাপ-পরিচয় আছে এই মাত্র। মেয়েটির আর কি কেউ নেই? ছিল না? না কি সব সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে এসেছে? শহরে এমন মেয়ের অভাব নেই যারা ক্ষণিকের বাঁধনকেই স্বীকার করে নেয়। সেই সাময়িক স্বীকৃতির জন্য সমাজ তাদের অস্বীকার করে। কিন্তু কণাকে সেই শ্রেণীর মেয়ে বলেও তো মনে হচ্ছে না। যত মানুষ, জীবনের তত প্যাটার্ন। কে জানে কী গুর সমস্যা, কী গুর জীবনের রহস্য।

নিজের সঙ্কট-সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে বিজন এই সদ্যপরিচিতা মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল।

একটু বাদে পর্দা সরিয়ে কণা ফের এঘরে এসে বসল। মৃদু হেসে বলল, 'আপনাকে একা একা বসিয়ে রেখেছি। কিছু মনে করবেন না।'

বিজন বলল, 'না, না, না, মনে করবার কী আছে। কিন্তু আপনি একটা ছোটখাটো ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ আয়োজন করছেন বলে মনে হচ্ছে। সুনীলবাবুকে বাইরে পাঠবার দরকার ছিল না।'

'কণা একটু হেসে বলল, 'আপনার ভাবনার কিছু নেই। সুনীলদা এক্ষুণি এসে পড়বেন। মোড়েই একটা মিষ্টির দোকান আছে। ছোট্ট দোকান। বিশেষ কিছু পাওয়াও যায় না।'

বিজন বলল, 'কিন্তু ও সবের কিছু দরকার ছিল না। এই যে মিষ্টি ব্যবহার, আলাপ-পরিচয়—এই তো যথেষ্ট।'

বলতে বলতে বিজন থেমে গেল।

সামান্য আলাপে বোশ উদ্ভাস প্রকাশ সমীচীন নয়।

কণা বলল, 'তা জানি। তবু এই প্রথমদিন এলেন। আমাদের বহুদিনের সংস্কার। সেই মার কাছ থেকে শেখা। কারও সঙ্গে প্রথম আলাপ-পরিচয় হলে তাঁকে শব্দ এক কাপ চা দেওয়া যায় না।'

বিজন বলল, 'আপনার মা আছেন?'

কণা বলল, 'হ্যাঁ, আছেন।'

বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে থাকেন?'

কণা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, এখানে কেউ থাকেন না।'

মনে হল কণা নিজের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চায় না।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে নিজের কৌতূহল দমন করল বিজন।

একটু বাদে সুনীল এসে হাজির হল। হাতে মিষ্টির খুঁরি।

কণা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তারপর বিজনের দিকে চেয়ে বলল, 'আসছি।'

প্লেটে করে মিষ্টি এল। চা এল। বিজন ফের কী যেন অনুযোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কণা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না, এখন আর অন্য কথা নয়, এখন গল্প।'

বিজন হেসে বলল, 'আপনার গানের জন্যে মেজাজ চাই, আর গল্পের জন্যে বৃদ্ধি কোন মেজাজেরই দরকার নেই?'

সুনীল, একটু হেসে বলল, 'আপনার মেজাজ কিন্তু এসে গেছে।' ঠিক নির্দিষ্ট কোন প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলোচনা হল তা নয়, তবু কি করে যে ষণ্টাখানেক সময় কেটে গেল বিজন যেন তা টেরও পেল না।

অবশ্য বেশির ভাগ কথা সুনীলই বলল। গান-গাজনার কথা, নাটকের কথা, ক্লাব আর অ্যামেচার আর্টিস্টদের কথা। গল্প জমতে সুনীল বেশ ওস্তাদ। বিজন শব্দ শব্দে যেতে লাগল। আর লক্ষ্য করল, কণাও বেশ উপভোগ করছে।

তারপর সুনীলই নিজে সভা ভঙ্গ করল। হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈস, দশটা বাজে। উঠি এবার। কণা আজ বোধহয় তোমার রান্নাবান্না আর কিছু হল না।'

কণা বলল, 'যেন কত রান্নাবান্নাই আমাকে করতে হয়। একার জন্যে কী এমন লাগে, সুনীলদা।'

শেষ কথাটা ভারি করুণ শোনাল।



লালদীঘর নিস্তরঙ্গ কালো জল এখন কসাইখানার জ্বাই করা অজস্র পশুর রক্তের মত ধকধকে লাল। সূর্য ছুবে যাচ্ছে তার জলে। এখানে পাখিরা নেই। তাদের পরিবর্তে শ্রান্ত মানুষেরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। আর খানিক বাদেই ডালহোসী খালি হয়ে যাবে জাদুকরের ফুসন্তরের মত।

অফিস পাড়া এখন আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত লালদীঘর থির জলের মত, বেলাশেষের অবসন্ন রোদের মত, অথবা কার্নিসে, অলিন্দে শিশু অন্ধকারের গুঁড়োগুঁড়ো প্রাণগুলোর মত আত্মমগ্ন আর অশ্রুত স্তম্ভতায় জ্বলুজ্বলু হয়ে বসে রইলেন পীতাম্বর। দশ হাজার লোকের সংলাপ-মুখরিত অজস্র কক্ষ-গুলোতে এখন নিংড়ে নেওয়া ক্রান্তি। পীতাম্বর কুণ্ঠিত শব্দ কেশে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলোতে হাজার বছরের বলিরেখা। ঝুলে গেছে। পশ্চিমাটিকি বছরেই ঝুলে গেছে। তুলনামূলক বিচারে পীতাম্বর তার সমসাময়িক বন্ধুদের তুলনায় হয়ত অনেক বেশি ঝুঁকিয়ে। ক্ষয়িমাণ পীতাম্বরের শীত লাগছিল উত্তরে হাওয়ায়। খোলা জানালাটা দিয়ে বিমর্ষ আকাশটাকে দেখলেন তিনি। যেন বাতাসকেই তার চর্মচক্ষে দেখতে চাইলেন। পেপার ওয়েট দিয়ে ঢাকা টাইপ করা কাগজটার হরফগুলো কেমন যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ছেলেবেলার হুলো হুলো

খেলার মত। অনেক, অনেক আগে পীতাম্বরও ছেলেমানুষ ছিলেন। প্রোট পীতাম্বরের একদা ছেলেবেলা ছিলো এ কথাটা কি অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকর। চারদিক থেকে সীমাহীন শিথিলতার ক্রমান্বয় চাপ আর বড়ো বয়সের শ্রান্ত-ক্লান্ত স্নায়ুগুলো পীতাম্বরকে আরো বিমর্ষ কবে রাখল। অসংলগ্ন অগোছালো চিন্তার সমুদ্রে এলোপাতাড়ি হাবুডুবু খেতে লাগলেন তিনি। বলা-বাহুল্য এ হাবুডুবু খেতে তাঁর খারাপ লাগছিল না। জেছনা রাতে ডিঙি নৌকায় পাল তুলে দিয়ে নির্জন নদীতীরে হৈমন্তীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মত। নতুন বউ ভয় পেয়েছে। যেতে চায় নি। পাড়ার লোকেরা কি বলবে? ছি! পীতাম্বর ছাড়েন নি। শব্দ হাতে বৃকের সঙ্গোপনে টেনে এনেছেন। সবাই ঘুমোচ্ছে এখন চলো, দোহাই চলো। ঘাটের পুকুরে নিয়ে যেতে পায়েও হাত দিতে হয়েছে তাঁকে। হ্যাঁ। আসলে পা ধরাটা একটা আঁছলার নামান্তর। হৈমন্তী যথার্থই রাগ করে শেষে স্বামীর জেদ আর পাগলামোর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এ কথা পীতাম্বর খুব ভালো করেই জানেন। পুকুরের পদ্ম খাল পার হতে চিক্‌চিক্‌ করে উঠেছে বিস্তীর্ণ নদীতীর। লক্ষ লক্ষ রূপোর তরণা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। একহাতে বৈঠা অন্য হাতে হৈমন্তীকে নিয়ে পীতাম্বর

এগিয়ে যাচ্ছেন। হৈমন্তী ভীত হয়ে অনুন্নয় করেছে, ওগো আর নব, আশ্রয় নয়। সেই অজস্র রূপোলী-তরণের নাচন, শেয়ালের দুরাগত ডাক আর অপরাধ অশ্রুত নির্জনতা (হ্যাঁ, নির্জনতাই। কারণ হৈমন্তী বা তাঁর সস্তা তো তখন এক কেন্দ্রীভূত) পীতাম্বরকে উন্মাদ করে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত গাড়ি আবেশে এই পবিত্রেশ্বর এক শিকার হয়ে তিনি চাঁদেব দিকে তাকিয়ে আছেন হৈমন্তী পেলব দেহকে জড়িয়ে রেখে। ভীতু হৈমন্তী বলেছেন রসভগ্ন কবে। এবার ওঠো কবিবর। ওঠো। পীতাম্বর ততক্ষণে হারিয়ে গেছেন ওপাবের জঙ্গলে, আকাশের চাঁদে, নদীর স্রোতে—

একদিন অনেক দূরে চলে গিয়েছেন হৈমন্তী নিষেধ অগ্রাহ্য কবে। পীতাম্বর তেমন প্রকৃতির আফিং খেয়ে তন্ময়। লুপ্ত। হঠাৎ খেয়াল হল বাতাস বাড়ছে। তার বেগ ভয়ঙ্কর। চারদিক নিমিষে কালো হয়ে গেল। পীতাম্বর দ্রুত হাতে বৈঠা ঠেললেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকা উল্টোল। আব গভবতী হৈমন্তীকে অমানুষিক শক্তিতে জড়িয়ে নিয়ে দূঃসাহসী কোনো বিজয়ীর মত পাড়ে এসে উঠলেন। হাফাচ্ছেন। আব সেই মূহুর্তে উঠল হৈমন্তীর প্রসব বেদনা। চেয়ারটাতে নড়ে-চড়ে বসলেন পীতাম্বর। পশ্চিমাটিকি বছর আগেকার

এক মধ্যরাত্রির দুঃস্বপ্নকে শ্বিতীয়-বারের জন্য প্রত্যক্ষ করলেন যেন। পীতাম্বরের ভাঙা গালে হাসি খেলল। একটা সুগভীর শ্বাস। অনেকখানি রিক্ততার। সেই ঝোড়ো হাওয়ায় নির্জন বালুতটে হৈমন্তী জন্ম দিলেন প্রথম সন্তানের। পীতাম্বর আদর করে নাম রাখলেন বিপ্লব। কেন না তখন স্বদেশী আমলের ভাবালুতার জোয়ার চলেছে। সমস্ত রাত সেই বালুতটে কাটিয়ে পরদিন যখন পীতাম্বর বাড়ি ফিরলেন তখন কত শাসন। ধমক। ক্ষান্ত হন নি তিনি। নদীর সাথে তাঁর বন্ধন ছিল অচ্ছেদ্য। হৈমন্তীর সূত্রী সুডোল পা তিনি মাথায় লাগিয়েছেন। হৈমন্তী পরাজয় স্বীকার করেছেন। আবার গিয়েছেন। রাত-পাগল পীতাম্বর পাগল করে রেখেছিলেন হৈমন্তীকেও। আর বোধহয় তাই মারা যাবার আগে হৈমন্তী বলে গেছেন তুমি আর একটা বিয়ে করো। আমাকে ভুলতে না পারলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। না, পীতাম্বর পাগল হন নি। হুত্যাশে, অনেকদিন ছিলেন। ছয়ছাড়া হতভাগাদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারপর আবার নদীর আকর্ষণে ফিরে গেছেন। ফিরে গেছেন হৈমন্তীর জীবন্ত স্মারকচিহ্নগুলির লোভে। আজ ওরা সব কত বড় হয়ে গেছে আশ্চর্য!

আবার পীতাম্বরের মুখে হাসির মৃদু ঢেউ খেলে গেল। প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে সেই হাসি মিলিয়ে গেল। পীতাম্বর জল-পিপাসা পাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরলেন। না, কখন সেটা ফুরিয়ে গেছে। উঠতে ইচ্ছে হল না। লালদীঘির রক্তরাঙা জলে এখন কালচে আভা। আকাশটা ফ্যাকাশে, রুদ্র। অফিসের ভেতরে ভেটিংলেটের ফ্যাকারে চড়ুইগুলি একসাথে কতক্ষণ কিচিরমিচির করে উঠল। একটা নতুন চড়ুইকে টুকতে দিচ্ছে না পুরোনোগুলো। খুপ করে দ্দুটো এসে পড়ল ঠিক তাঁর কোলের ওপর। তারপর দুজনে দুদিকে ছিটকে গড়ল। পীতাম্বর ভারী চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। অফিসের দেয়াল ঘাঁড়টার শব্দ হচ্ছে টিক্ টিক্। এখন পরিবেশ এত স্তব্ধ, এত শান্ত যে পীতাম্বর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তিনি যেন আবেগ অনুভূতির এক বিশেষ জগতে পেঁাচ্ছে গেছেন। সচরাচর তা হয় না। এরকম পরিবেশ আর শীপির মিলবে কি তাঁর? অসম্ভব। চোখের সামনে কাগজটাতে তাঁর এ জন্মের চাকরি করার শেষ

মেয়াদের তারিখ উল্লেখ করা আছে। এটা অকস্মাৎ নয়। তিনি জানতেন। দুবার এক্সটেনশান হয়েছে আর হতে পারে না। আর তাই তাঁকে আর দশদিন পরে অবসর নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিশ বছরের চাকরির বিনিময়ে তিনি কি পাবেন? যাট টাকা পেন্সনের জন্য অন্যান্য বৃন্দদের সাথে মাস পয়সা গিয়ে জাইনের একজনের সামিল হবেন।

দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসতেই পীতাম্বর দুঃখিত হলেন মনে মনে। কোণায় খুপুচিতে অন্ধকার এতোক্ষণে দানা বেঁধে নানা প্রকারের অবয়ব পাচ্ছে। এ দৃশ্য পীতাম্বরকে কাছে পুরাতন। ফ্যাকাশে, লাল দলানের দুদিকের মধ্য দিয়ে পাতলা আলোটা এখন কত অসহায়। পীতাম্বর বুকটা বেদনায় টনটন করে উঠল। এই অফিসটা, এই পুরাতন ফাইলগুলো (অনেক ফাইল তিনি দূর থেকে দেখেই বলে দিতে পারতেন, এ্যাভো চেনা) এবং নিজস্ব সিটটা তাঁকে একটি অনুগত দাস হতে সাহায্য করেছে বছরের পর বছর। অথচ আর কদিন বাদেই তিনি আর এদের মধ্যে থাকবেন না। এই অফিসের কোনো সত্তা হিসেবেও তাঁর অভাব উপলব্ধি করবে না কেউ। নতুন কোনো বেকার ছেলে এসে কত উদ্দীপনা নিয়ে এই চেয়ারে বসে সুখজাল বুনবে। পীতাম্বর দুঃখিত হলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত অজানা যুবকটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

অফিস ভেঙে যাবার আগে নিয়োগী এসেছে। চ্যাটার্জী এসেছে। বড়বাবু এসেছেন। আর এসেছে সহকর্মীরা। কেউ সান্দ্রনা দিয়েছে। কেউ পিঠ চাপড়ে বলেছে, তাতে কি মিলেছে। এবারই তো মৃত্তি। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে শেষ দিন কটা ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দিন। স্বল্পভাবী পীতাম্বর যথার্থীতি চুপ করে রইলেন। যাদের পালা শীপিরই আসবে তারা সবাই তাকিয়েছে পীতাম্বরকে। আর যাবার সময় নিম্নতে অন্তরঙ্গ গলায় বলেছে, মিছে ভেবো না মিস্তির। চলি ভাই।

পীতাম্বরকে কাছে সবটাই লেগেছে নিরর্থক। ভবিতব্য আর তার অমোঘ পরিণতি অনুস্মারী যেন পীতাম্বর নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন নদীর স্রোতে। হঠাৎ হঠাৎ ভেসে ওঠা শব্দগুলির মত দম নিয়ে নিচ্ছেন অতিকণ্টে বাতাস থেকে। পীতাম্বর অফিসে কারুর সাথে মেলামেশা করেন নি। তিনি অসামাজিক ছিলেন। অথচ

লোকেরা কেন যেন তাঁকে ভালবাসত। ভালবাসে। সেটা পীতাম্বরকে ভাগ্য। অফিসের নিজীব আসবাবপত্রগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আবছা অন্ধকারে কেমন ভৌতিক। খানিকটা উঠে গেলেই লাইটটা জ্বালানো যায়। কিন্তু ইচ্ছে হল না। এই ভালো। এই অন্ধকার তাঁর ঈশ্বর। অনাবশ্যক মেকা আলোর তাঁর ঝাটা তিনি পছন্দ করেন না। আকাশটা এখন অনেক রুদ্র। আজ কি তিথি? পূর্ণিমা? হাতের কাছে কোনো পঞ্জিকা থাকলে তিনি দেখে নিতেন। আপাতত সে সুযোগ নেই। অথর্ব লোকদের মত পীতাম্বর শব্দ ও টেবিল ও টেবিলে দৃষ্টিপাত করলেন। অনাবশ্যক। জানালার ফাঁক দিয়ে একটা তারা দেখা গেল। সমগ্র আকাশে বেমানান এখন। তাই ভীত হয়ে যেন কাঁপছে থির থির। পীতাম্বর বুকটাও কাঁপছে তেমনি আমলকী পাতার মত। দ্রুত অঞ্চ আবশ্যময়। পীতাম্বর আবার হারিয়ে যাচ্ছেন। হারিয়ে ফেলছেন নিজেকে। আজ সকালে তাঁর বোবাজারের গিলির ভাড়া করা বাড়িটা যেমন হালকা কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল তেমনি। হাতের কাছে বাঁশী নেই। হায়! তা নয়ত বাজাতেন। হয়ত একটু কষ্ট হত। কেন না আগের মত দম নেই। দম থাকলেও সেই নদী নেই। নদী থাকলেও সেই পরিবেশ নেই। পরিবেশ থাকলেও হৈমন্তী নেই। গঙ্গা পদ্মা অনেক তরুণ। গঙ্গার বৃদ্ধ নৌকো ভাড়া করেও রাত কাটিয়েছেন পীতাম্বর। কিন্তু নিরর্থক। নিজের খেলাল-খুশিমত আর কোনোদিন নৌকো ভাসাতে পারবেন না তিনি। ভাবতে বড় আক্ষেপ জাগে। একটু রা বিরাগি। এই বয়সের প্রতি। শব্দ বয়সের নয় সময়েরও দোষ-বটে। অথচ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার স্নেহ কিছু নেই। শব্দ গুমরে গুমরে মরছে। পীতাম্বর নিরোধ শিশুদের মত আরার তাঁর পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকালেন। কোনো নিকষ কালো পিরামিডের গ্রিভুজ টুপার অভ্যন্তরে অজানা পথিকের মত আটকা পড়ে গেছেন তিনি। ভাল লাগে না অথচ সরে যেতেও ইচ্ছে করে না। কিম্বা যেন বাস্টল-কারাগারের নির্জন সেলে স্বেচ্ছানিবাসন নিয়েছেন তিনি। ঠান্ডাটা আরো তাঁর হয়ে গারে লাগছে। গায়ে চাদর নেই বলে তা অনুভূত হচ্ছে বেশি করে। আরো গাউনসুটি হয়ে বসলেন তিনি। এবার রাত নামছে

একটু একটু করে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই একচুল। সূর্য উঠবে, সূর্য ডুববে এই ব্যবস্থাটা কিরকম দাস-সুলভ। ঠিক তাঁর মত। তাঁর অফিসের সহকর্মীদের মত। হাজার লক্ষ কোটি মানুষের মত। এটাই নাকি জীবন। আর জীবনের সার্থকতা বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা...কথাটা মনে মনে আওড়ে নিলেন পীতাম্বর। নিজের প্রোট মনে কথাটা পড়োনো দিনের মত শিহরণ জাগাতে অক্ষম হল। কেবল অবক্ষয়ী কিছু বিতৃষ্ণা ছোবলাতে লাগল মনের অলিন্দে। ফলে গোপন রক্তমোক্ষণ হতে লাগল চুইয়ে চুইয়ে। ফোঁটা ফোঁটা। সেই গ্র্যান্ডুজ চাচের ওপরে ধূরগীটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। সমস্ত গীজ্জটার অস্তিত্ব ধ্বনিত হল চং চং চং.....। এখন আটটা। অথচ এখনই এ এলাকাটা কত নির্বাসিত। ঠিক তাঁর মত। ডালহোসীকে তাই এত ভালবাসেন তিনি। ডালহোসীর রাত তাই তাঁর এত প্রিয়।

‘বাবা, আপনি জানেন শ্যামলী রাগ করে তবু একটু আগে আসবেন না। রাত দশটার আগে এলে আপনারই বা এমন কি অসুবিধে হয় বন্ধুতে পারি না। তারপর মেজছেলে বউর হয়ে সাফাই গার, ও-ও তো অফিসের পর ক্লান্ত হয়ে ফেরে।’

‘আমি তো বলেছি আমারটা ঢেকে রেখো।’ চাপা শ্রান্ত কণ্ঠে বলেছেন তিনি।

ভাতের থালা-মাটিতে জোরে শব্দ করে ফেলে শ্যামলী কোনো কোনো দিন রাগ জানায়। সেদিন তাঁর মাথা ধরে। এবার মনে হল নিজের এই শেষ স্বাধীনতাটুকুও তিনি হারালেন। শুনতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। ‘চাকরি-বাকরি করছেন না তবু রাত দশটার পর বাড়ি আসার কোনো মানেরই হয় না বাবা। এ আপনার অন্যায় জেদ।’

আমার অন্যায় জেদ? ঠিকই ধলোঁছস। তাই। অন্তত এই স্বাধীনতাটুকু আমাকে দে তোরা। তোদের কাছে আমি তো আর কিছুই চাই না। ছেলেমেয়েগুলি জেদী, একগুয়ে। তাঁর দুর্ভাগ্য। অথচ তাঁরই ভাই রমাপতি কত সুখী। ছেলেরা বোমারা তাঁর সামান্য একটু অসুবিধে হলে কিরকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি মারা গেলে যে তাদের কি হবে ইত্যাদি সগর্বে ঘোষণা করেন যখন রমাপতি, তখন কেউ যেন তাঁকে চাবুক মারে। বিশেষ কোনো কাজ থাকার অজুহাতে তখন পীতাম্বর

সরে পড়েন। বড় মেয়ে ভালবেসে বিয়ে করেছে তার মাস্টারমশাইকে। পীতাম্বর দুর্ভাগ্য হয়েছেন। হৈমন্তী বেঁচে থাকলে সম্ভবত দুর্ভাগ্য হত। তিনি থাকলে হয়ত এমনটি হত না। কিম্বা এটাই ঠিক হয়েছে। কার্যত পীতাম্বরের কোনো গুরুদ্বন্দ্বই তাদের কাছে নেই। প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন পীতাম্বর এখন নিজের সন্তানদের কাছে এক গুরুদ্বন্দ্ব-হীন বিগত অধ্যায়।

ছেলেমেয়েদের প্রতি শূণ্য অভি-যোগগুলো পীতাম্বর যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন। নভেম্বরের এগার তারিখ থেকে পীতাম্বর প্রচুর অবসর পাবেন। চিরকালের জন্যে। শিশুর মত পীতাম্বর একটা কামার সুড়ঙ্গদাঁড়ি অনুভব করলেন। ব্যর্থ, ব্যর্থ—হৈমন্তী ও তাঁর স্বপ্নের ফুলগুলি অনেক যন্ত্রণাতেও চেতনার রাজ্যে অম্লান হয়ে ছিল, তা এখন শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। চোখের সামনে দুর্দান্ত ভিসুভিসকে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। সব ভেসে যাবে। এ যোধ করবার শক্তি তাঁর নেই। কারুর নেই। বস্তুত পীতাম্বর এখন বোমানান। পমাপারের সোনা রঙ আর বোবাজারে বিস্তর ফারাক। ঠিক ততখানি ব্যবধান পীতাম্বর আর তাঁর সন্তানদের। এখন কোনোরকম গোঁজা-মিলের প্রশ্নই ওঠে না। পীতাম্বর

এখন অনেক—অনেক দূরে সরে গিয়েছেন তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে। এর সবটা কারণই কি অর্থনৈতিক? কেবলমাত্র তাঁরই নিজের দোষে? পীতাম্বর মাংসে আড়াইশো টাকা দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া আর কি-ই-বা করতে পারতেন? মধু কি অন্য পড়াশুনো করে নি তার জন্যে তিনি দায়ী হতে পারেন না।

পীতাম্বর যেন প্রেসিডেন্সীর ভিজিটিং আউটডোরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ চুল, শীর্ণকায় বিপ্লবের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। আমি আর কি করতে পারতাম? ভীরা পীতাম্বর তাঁর রাজ-নীতিজ্ঞ ছেলের তীক্ষ্ণ তীরসম প্রশ্নের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চাইছেন। কিম্বা পীতাম্বর পলায়ন করছেন হৈমন্তীর প্রতিভুর সামনে থেকে। এই সাফাইয়ের সুদূর তাঁর কানেই খারাপ বাজল। ...মিছে কথা বাবা। মিছে কথা। আপনার জনেই থুতু, মধু, অন্য ভিন্নতাই ধ্বংস হয়ে গেছে। শূন্য আপনারই অবহেলার জন্য। গলাটা বিপ্লবের নয়। হৈমন্তীর। স্পষ্ট শুনতে পেলেন পীতাম্বর। একটুও ভুল হয় নি। এ চোখ এখন জ্বলছে না। অভিযোগ আর আক্ষেপে পরিপূর্ণ হৈমন্তী। হাত বাড়িয়ে দিলেন পীতাম্বর ছেলের দিকে। শিকের

ভারতের
আদিতন
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ



আয়ুর্বেদোক্ত শিশু উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ শূন্য ও পুরাতন সর্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা গোবাই কানপুর

জন্মান্তর

বনলতা সেন

জন্মান্তরে বিশ্বাস করি এমন নই।
তবু এক নব শিশুর শব্দ শুনি।
অচেনা কিছই নয় তার পৃথিবীর।
অস্থির
আমরা কেবল খুঁজে ফিরি সোনা বাঁধানো মই।
প্রহর কাটবে কখন—আশায় দিন গুণি।

তুংগভদ্রা ডাকছে, লাফায় যমুনার জলরাশি।
গৌরীশংকরে ঐ কি রৌদ্র নামে?
শহরে গঞ্জে গ্রামের ভিতরে
লোকগুণি আজো বিক্ষত সংগ্রামে;
কেউ বা শ্রমিক, কেউ বা কৃষক-চাষী।
মুখ ধুবড়ে কে ফুটপাতে আছে পড়ে?

আজ যে-শিশুর নবীন অভ্যাস,
তাকে ঘিরে কোটি শিশুর জন্মজন্মাস।

প্রশ্নঃ সত্য নব জন্মান্তর,
মৃত্যুতে প্রাণ হয় অরিনশ্বর?

গ্রহান্তরে কি তারি নাম! পৃথিবীতে
জন্মখচিত পবিত্র মৃত্তিকা।
যুদ্ধ-দামামা স্তম্ভ হলেই জীবনের সংগীতে
মানুষেরা নেবে কপালে হরিৎ টীকা।

মহাকাশে এক ধুমকেতু দেয় ঝাঁটা।
বেন সেই শিশু নিদ্রাবহীন ঘরে
সময় খুঁজছে আর এক নতুন কড়ে,
তখনই নকল মানুষের বাবে রঙিন পুচ্ছ কাটা।

কাল চৌদ্দই নভেম্বরের প্রাতে
সব শিশু ছিল কেন যে অধোবদন!
রক্ত গোলাপ সকলের হাতে হাতে।
এই যে পৃথিবী,—অন্তুত এক শান্তির নিকেতন!

ফাঁক দিয়ে দুহাতে নিজের অস্ত্রের
মুখটা কম্পিতহাতে তুলে ধরলেন
তিনি। চোখ আদ্র। বোধহয় আমিই
ভুল করেছি। আমার ক্ষমা কর। বুক
কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল এত জোরে
যে নিস্তম্ভ ঘরের বাতাসে একটা
চাপল্য জাগল। আবার নতুন করে
শুরু করা যায় না? নাঃ, বন্ড দেরি
হয়ে গেছে। সম্ভব হলে পীতাম্বর
একবার বিস্ময়ের কাছে আশ্রয়
খুঁজতেন। নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা
ভিক্ষে করতেন বড় ছেলের কাছে।
কিন্তু তা সম্ভব নয়। পদ্মাপারের
মত জীবনটা অনেক ভেঙেছে।
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তিমির অন্ধ-
কারের হরেক স্রবম বৃষ্টি পথ হাতড়ে
হাতড়ে অথর্ব পগু পীতাম্বরের মনে
হঠাৎ সমুদ্রের কথা মনে হল। সমুদ্র
অনেক প্রেষ্ঠ। হৈমন্তীকে সমুদ্র
দেখাবেন বলে কথা দিচ্ছিলেন তিনি।
সে কথা রাখতে পারেন নি তখন।
নিজেরও দেখার ভয়ানক শখ ছিল।
এখন আর কোনো মানে হয় না।

শীতের হাওয়ার শব্দিকরে যাওয়া
ঠোট দুটো চেটে নিলেন পীতাম্বর
জলের অভাবে। যেমে গেলেন। ভেতরে
গেঞ্জী ভিজে গেছে। এই কিছক্ষণ
আগেও কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল
জানালা দিয়ে। সাক্ষীর কাঠগড়া
থেকে নেমে বিচারকের প্রকৃতি-সুশীত
দৃষ্টি এড়ালেন প্রকৃত অপরাধীদের
মত। ছেলেদের প্রতি তিনি কর্তব্য
করেন নি। অথচ অফিসের কতবো
তারি হুটি ছিল না। তুমি একটি শঠ,

আসলে তুমি একটি স্বার্থপর।
প্রতারক। নিজেকে ছাড়া তুমি আর
কিছু ভাবো না। ভাবতে পারো না।
তোমাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, ভালো-
বাসে না। পীতাম্বর সংসারের দাঁড়ি-
পাল্লায় নিজেকে পুনর্বীর ওজন করে
নিলেন। মুখটা বিষাদ। মনে বিষাদ।
বোঁমার বিরক্তি মাখানো অবহেলার
ভাত আর ভালো না লাগলেও মেনে
নিতে হবে। যেমন মেনে নিচ্ছেন তাঁর
অবসরপত্রখানা। যেমন মেনে নিয়েছেন
হৈমন্তীর মৃত্যু-পরোয়ানা। এ মেনে
না নিয়ে উপায় নেই। মানুষ কেন
জন্মায়? মানুষের জন্মানো পাপ।
অন্তত তার মত অসার্থক মানুষের।
তিনি নিজের সংসারকে কতটুকু দিতে
পেরেছেন? নিজের মূল্যহীনতাগুলি
নতুন করে সূঁচলো বস্ত্র দিয়ে তাঁকে
বিধতে লাগল নিমর্মভাবে।

‘বাবুজী রাত বহুত হো গিয়া।
আব উঠিয়ে, নেহি তো যেন গেট বন্ধ
হো যায়েগা।’

চমক ভাঙল তাঁর। হাউস কীপার
চেনে তাঁকে। গত বিশ বছর ধরে
জানে। ঘড়ির দিকে তাকালেন।
দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।
সামনে পড়ে থাকা কাগজটা ভাঁজ করে
পকেটে ঢোকালেন। গ্লাসের জলটা
ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেন। কানদুটো
জাল হয়ে আছে উত্তেজনায়। কানের
পিঠে গ্লাসের তলানি জলের ছোঁয়া
লাগালেন। তারপর ঘরটা ছাড়তে
ছাড়তে বিড়বিড় করে হিসেব করলেন,
আর দশদিন। দশদিন। লিফ্ট বন্ধ

হয়ে গেছে কখন। ছতলা থেকে নেমে
এসে পথে দাঁড়ালেন পীতাম্বর। আবার
তাঁকে জগতের কঠোর নিয়মাবলীর
কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইচ্ছে
না থাকলেও। উপায় নেই। চার্চের
ঘড়িটার শব্দ হল ঢং ঢং...। সর্বনাশ
বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে পীতাম্বর
সংকিত হয়ে উঠলেন মনে মনে। একটা
সম্পূর্ণ খালি ট্রাম যাচ্ছে টিকিয়ে
টিকিয়ে। একটু পা চালিয়ে গেলেই
তা ধরা যায়। কিন্তু কেন জানি হঠাৎ
বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পীতাম্বর
নিজের দাস মনোবিস্তার ওপর।
অসম্ভব। আজকে এবং আরো দশ-
দিন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ
উপলব্ধি করতে পারেন নিজের খেলা-
খুশিমত। পারে পারে এগিয়ে গেলেন
তিনি লালদীঘির বাঁধানো চক্রে।
বসলেন। টেলিফোন ভবনের কাচের
আলোর ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে
তার জলে। হাওয়ার কাঁপছে তাঁর
তির। ঠিক তেমনি। ঠিক সেইদিনের
মত। বুকটা দুগ্ধে উঠল। কেবল
পরিবেশ পাণ্টেছে, সময় পাণ্টেছে,
পাল্টায় নি অন্যকিছু। আসলে সব
ঠিক আছে। কেবল তিনিই অতীত।
বিগত।

মৃত্যুবাস্তির চোখের দৃষ্টি নিলে
পীতাম্বর হতপ্রী ন্যাড়া গাছগুলোর
দিকে তাকালেন। দমকা হাওয়ার
হাওয়ার গায়ের লোমগুলো শক্ত হয়ে
দাঁড়িয়ে রইল। পীতাম্বর তখন সমগ্র
সত্তা দিয়ে অনুভব করলেন শীত এসে
গেছে।

১৯০১ সালের ৫ই মে।

স্বাধীনতা-যজ্ঞের ক্ষুধার্ত কবি শ্রীঅরবিন্দ
মুজিত্যভ করলেন। ঠিক একটি বছরের কারা-
খাসের অবকাশে তিনি ভগবান বাসুদেবকে
দর্শন করেছেন। কংসের কারাগারে
বে-অবতারের জন্ম, কাবাগার ছাড়া যোগ্যতার
আর কোন স্থানে মিলবে তাঁর দর্শন?

আজন্ম যে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর উন্মুখ
উন্মীলিত হয়ে ছিল ভগবৎ জ্ঞান পাবার
আকাঙ্ক্ষায়, সেই ভগবানের সাক্ষাৎ পেলেন
তিনি কারাগারে—সমগ্র হৃদয় দিয়ে, সমগ্র
জ্ঞতা দিয়ে, সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাঁকেই উপলব্ধি
করলেন; কবি নিশিকান্তের ভাষায় :

‘বে-দেশে দেশের নেতা
হয়েছেন জগৎ-গুরু,
আমাদের অর্ঘ্য সেখা
জগতের অর্ঘ্য শব্দ!’

আদালতের বিচারের শেষে কাব্যময়
ভক্তিবিনী ভাবার ব্যাবিন্টার চিত্তরঞ্জন দাশের
স্বস্ত-বস্ত্র মুখের হয়ে উঠল, প্রকাশ্য আদালতে
তিনি জাতীয়তাবাদের জনক শ্রীঅরবিন্দকে
উদ্দেশ্যে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করলেন।
ভবিষ্যৎবাদীর মত সেই অর্ঘ্যের প্রতিটি কথা
অক্ষরে অক্ষরে আজ এত যুগ বাদে সত্য
হয়ে উঠছে।

দেশবন্দু বললেন, “আজকের এই বিতংড়া
যখন বিলীন হয়ে যাবে নীরবতাব মগ্নে,
থেকে যাবে আজকের কোলাহল শব্দ—এই
ভিরোধানের দীর্ঘকাল পাবে, একে মানুষ
স্মরণ করবে প্রমত্ত কবির স্বদেশপ্রেমের কবি
মলে জাতীয়তার নবী বলে মানব-প্রেমিক
বলে। এই ভিরোধানের দীর্ঘকাল পাবে
এই বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে—কেবল
ভারতবর্ষেই নয়, দু-দুবান্তের সাগর-পারে,
দেশ থেকে দেশে।”...

শ্রীঅরবিন্দকে মহা-সম্মানেহে অভ্যর্থনা
জানালেন সর্বভাবতীর স্বদেশ-সেবকেরা।

ইতিপূর্বেই, ‘বন্দেমাতরম’ পট্টকার
প্রথম মামলার পব শ্রীঅরবিন্দ যখন নিদোষী
লাভস্বত হ’ল, বাংলার কবি-সম্রাট এগিয়ে
এসেছিলেন বিজয়মাল্য নিয়ে, শ্রীঅরবিন্দকে
‘নমস্কাব’ জানিয়ে রচনা করেছিলেন সুদীর্ঘ
কবিতা—

‘অরবিন্দ, রবীন্দ্রব লহো নমস্কার :
হে বন্দু, হে দেশবন্দু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।..

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রত্ন-দূতে বোলা কোন রাজা কলে
পারে শান্তি দিতে? বন্দন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা কবি করে নমস্কার,
কাবাগার করে অভ্যর্থনা। রত্ন রাহু
বিধাতার সুষপানে বাড়িয়াই বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পবে
ছায়ার মতন।...”

সাধক বিদ্রোহী যতীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জেল থেকে বেরিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ
করলেন ‘ধর্ম’ নামে বাংলায় আর ‘কর্মযোগিনী’
নামে ইংরেজীতে, দুটি সাপ্তাহিক। আবার
রক্ষিত হ’ল দিব্য-বীণায় বহি-তানের মন্ত্র।
দেশাঙ্গবোধের নতুন আহ্বান। আবার দেশ-
বাসীর মন পূর্ণ হ’য়ে উঠল অনিবার্ণ
প্রতীতির উন্মত্তে।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ
বর্ণনা করলেন কাবাগারে তাঁর দিব্য
অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ঘোর বাত। অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন
চলেছে। অনেকটা দূরের পথ। বর্ষাকাল।
হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল।

পাশেই নদী। লাইনের ওপব জল জমে
একাকার। গাড়ি আর বেতে পারবে না।
চারধায়ে থে থে করছে জল।

ঘণ্টার পব ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়। রাত
কাটে। ভোরের আবহা আলো জাগে। বেলা
বাড়ে। দুপুর আসে। ন স্বপ্নো ন তস্থো
অবস্থার দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। কী উপায়?

ট্রেনে বহু যাত্রী। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা
অনেক। কেউ-বা অসুস্থ। সকলেই অবস্থা
কাহিল। সবার মুখেই অসহায় প্রশ্ন : কী
উপায়?

যতীন্দ্রনাথও এই ট্রেনেই যাত্রী।

‘কী উপায়?’ বলে অসহায় হয়ে বসে
বসে কলকোপ কবাব পরিবর্তে তিনি গাড়ি
থেকে নেমে পড়েছেন। উপায় তো একটা-
কিছু কবা চাই। নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব,
অসহ্য লাগল তাঁর।

অদূরেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল।
ভর দুপুরের রোদে তিনি গ্রামে গিয়ে
ঢুকলেন। ঘুরে ঘুরে গিয়ে প্রথমেই তিনি
সংগ্রহ করলেন ঝোণী ও শিশুর পথ্য-দুধ,
চিড়ে, বাতাসা, মূড়ি ইত্যাদি...

অন্তসব পথ্য নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে ফিরে
আসতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে চাক্ষুষ জাগল।
চাপা গুঞ্জন উঠল : ‘যতীন মুখার্জী এসেছেন,
যতীন মুখার্জী এই ট্রেনে যাচ্ছেন, যতীন
মুখার্জী যাত্রীদের একটা ব্যবস্থা করছেন—’

সোৎসাহে স্বেচ্ছাসেবকের দল এগিয়ে
এল। সেই দুখ আর পথ্য বিল্লির বন্দোবস্ত
করে যতীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আবার
বার হ’লেন বাকি যাত্রীদের খাবার আয়োজন
করতে।

পকেটে ষত টাকা ছিল, গ্রামের মদী-
খানার সব উজাড় করে দিলেন যতীন্দ্রনাথ।
প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, নুন, তেল,
মসলা আর শাস-সম্বন্ধী সংগ্রহ করলেন।
স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই রসদ ভারে ভারে ব’য়ে
নিরে গেল যথাস্থানে। হাঁড়িও জোগাড়
হ’ল।

উনুন কেটে যতীন্দ্রনাথ নেমে গেলেন
খিচুড়ি রাঁধতে। রান্না চড়ল। মহা ফুটিতে
সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন যতীন্দ্রনাথ—
যেন কন্না বাড়িতে দুসোৎসবের সেই রাজ-
সূর পরিবেশে ফিরে গিয়েছে তাঁর মন।

খিচুড়ি নামল। যাত্রীদের ধরে ধরে
খেতে বসান হ’ল। এমন সময় কে যেন
আকোপ করল, ‘আহা! এমন খিচুড়ির
সঙ্গে ঘি যদি থাকত—’

তাইতো। ঘি জোগাড় করা যায় না?
যতীন্দ্রনাথ লোক পাঠালেন তখন।

খোজ, খোজ!...

একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে খবর দিল :
একজন সহযাত্রী স্নানে গিয়েছেন, তাঁর সন্ধ্যা
করক টিন ঘি চলেছে। তাকে ব’লে দেখলে
হয়।

নিজের কামরাষ ফিবে গেলেন যতীন্দ্রনাথ।
বাক্স থেকে অবশিষ্ট সমস্ত টাকা বাব করে
নিরে সেই সহযাত্রীটির কাছে যতীন্দ্রনাথ
উপস্থিত হ’লেন। তাঁর কাছ থেকে ঘি
কেনবাব প্রস্তাব শুনেই ভদ্রলোক জ্বিভ কেটে
যতীন্দ্রনাথের দুটি হাত জড়িয়ে ধরলেন।

‘বলেন কী আপনি?’ সহযাত্রী প্রতি-
বাদ জানান, ‘সবার জন্যে আপনি এত পবিশ্রম
কবে এমন আরোজন কবেছেন, এত খরচ-
পাত করলেন—আর সামান্য একটিন ঘি
আমি দেব না? এ তো আমাব পরম সৌভা-
গ্যেব কথা। টাকার প্রশ্ন তুলবেন না!’

নিজে হাতে সহযাত্রীটি ঘিষেব একটা
টিন তুলে দিলেন যতীন্দ্রনাথের হাতে।

বিরাট পিকনিক বসে গেল। পরম
তৃপ্তির সঙ্গে সবাই খেবে উঠল। ধন্য ধন্য
করল মনে মনে—মহানায়কের এই সুপ্রচুর
ব্যবস্থাব জন্যে।

গাড়ির ব্যবস্থাও করক ঘণ্টার মধ্যে
কতৃপক্ষ করে ফেললেন। যাত্রীদের মনে
পাকা রঙে অশ্লিক্ত বইল দুর্লভ এই দিনটির
স্মৃতি।*

১৯০১ সাল। জুন মাসেব শেষ সপ্তাহ।

শ্বিতীয় পুত্র তেজেন্দ্রনাথ ভূমিত হবার
সংবাদ পেয়ে কন্না বাড়িতে গির্ষেছিলেন
যতীন্দ্রনাথ। সবে কলকাতা ফিবেছেন।

শেরালদা স্টেশন থেকে বেবিষেছেন।
হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগে কিছু দামী জলকরাব

* কৃষ্ণনগরে, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
স্নেহভাজন জনৈক রায়সাহেব এই ঘটনাব
সময় উক্ত ট্রেনের যাত্রী ছিলেন। তাঁর
কাছেই ঘটনাটি শোনা যায়।

—পুণ্ড্রীন্দ্রনাথ

হয়েছে—দলের কাছে লাগবে য'লে সংগ্রহ করে এনেছেন।

আমহাস্ট স্ট্রীট আর মিস্ত্রীপুর স্ট্রীটের মোড়েই একটা মুসলমানের বিড়িব দোকান থেকে উচ্চারণের খেলায় গানের আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে যতীন্দ্রনাথ সেদিকে এগিয়ে চললেন। ভরসম্মোবেলা। জন-মানুষ খুব বেশি আর নেই তখন।

দোকানী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আসরের এক কোণে যতীন্দ্রনাথকে বসান।

গান শুনতে শুনতে হঠাৎ যতীন্দ্রনাথের চমক ভাঙে। তাঁকে ঘিরে ছ-সাতটা ফণ্ডামার্ক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছন দিকে।

শেষ পর্বস্ত গুন্ডার হাতে পড়তে ছল?—জেবে হাতের ব্যাগটা বগল-দাবার পুরে উঠে দাঁড়াতেই গুন্ডাগুলো তাঁকে আক্রমণ করল। যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুতই ছিলেন। পাল্টা বেই ঘৃষি আর লাথি বর্ষণ শুরু করলেন, চোখের পলকে গুন্ডাগুলো ধরা-শারী হল।

দোকান থেকে বেরিয়ে যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন নিজের পথে।

১৯০৭ সাল থেকেই মোক্ষদা সামান্যারীর প্রয়োচনার ও নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু হয়, মাণিকতলা বোমার বাগানে বিপ্লবীরা ধারা পড়ে বাওয়ার পব যতীন্দ্রনাথ এই ডাকাতিতে মত দেন—অর্থ সংগ্রহের অন্য পন্থা না-দেখে। তার আগেই হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ অবশিষ্ট নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা মিলিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথের পতাকাভূলে।

১৯০৮ সালের ২রা জুন ঢাকার বাহা গ্রামে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের পরিচালনার যে-ডাকাতি হয়, তার অস্ত্র ও অর্থ কলকাতার এসে পৌঁছল।

প্রায় এই সময়েই শিবপুরে যে-ডাকাতি হল তার জের টেনে সামসুল আলম দলবল নিয়ে উপস্থিত হ'ল কয়গ্রামে, যতীন্দ্রনাথের মাঝবাড়িতে। ছোট্ট মামা লালিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মৃদুহরি নিবারণ মজুমদার (কেব্দুদা) পড়লেন পুলিশের নেক-মজবে।

এ সেই-সামসুল আলম—কলকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'সবকার-পক্ষেব ভরস্কর কবিকর্মা লোক : বোমার বাগানে ধৃত বিপ্লবীদের কী করে চরম শাস্তির মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, তারই চক্রান্ত ফেঁদে সামসুল তখন অষ্টপ্রহর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফাঁসী, বাসজীবন স্বীপান্তর, সপ্তম কয়াদাঙ প্রভৃতি লোভনীয় শাস্তিগুলি বিপ্লবীদের ওপর বর্ষপের ধান্দায় মিথ্যা প্রমাণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি অজানামনে সামসুল জোগাড় করে করে আনছে তখন।

বোমার বাগানের অন্যতম রসিক-চ্যুড়ামণি উল্লাসকর দশ শত দুখে, দারুণ নিগ্রহের মধ্যেও তাঁর পিতৃদত্ত নামটির মর্যাদা কীভাবে তাঁর বন্দীজীবনে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তার বর্ণনা আজ অনেকেই জানেন।

আলিপুর কেসের সময় আসামীদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উল্লাসকরের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা যে 'নরক-গুলজার' করতেন, তার অন্যতম উপাদান ছিল সামসুলের নামে ছড়া বানিয়ে তাতে সুদ বেঁধে সবস জেরালো কণ্ঠে ধান গাওয়া :

ওহে সামসুল!

সবকারেব ল্যাম তুমি আমাদের শুল!

(তোমার) ভিট্টে কবে চকবে ঘুদু

(তুমি) চোখে দেখবে সবে-ফুল :

ওহে সামসুল!

এ-হেন সামসুল আলম উঠে পড়ে লাগল ব্যারিস্টার নটনের সহকারী ভূমিকার—রাজনৈতিক ডাকাতির মূলে কে বা করা রয়েছে? ভাঙা আসর-সরগরম করে রেখেছেন কে? হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, নদীয়া, সর্বত্র, যেখানে ডাকাতিব প্রকোপ বেশি, জাল ফেলল সামসুল আলম।

১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিং-এর বাজিতপুরে ও সেপ্টেম্বরে হুগলী জেলার বিখ্যাত গ্রামে পুলিশের হুম্মবেশে বিপ্লবীরা টাকা লুট করেন। বিখ্যাত কাতিক দস্ত এইসুত্রে ধবা পড়ে যান। কিন্তু নীববে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে থাকেন।—এই বছরেই এপ্রিলে গ্রীহবিধাপাড়া (হাওড়া), নভেম্বরে রায়তা (নদীয়া), ডিসেম্বরে মোরহালা (হুগলী) প্রভৃতি অঞ্চলে ডাকাতি হয়।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদু-পুরের ডাকাতি উল্লেখযোগ্য। তারপর এপ্রিল মাসে ডারমুন্ডহারবারের কাছে নেড়ুডাতে দু-হাজার চারশ' টাকা লুট করা হয় নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। গৃহস্বামীকে বলা হব, 'এই টাকা ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে ঋণ নেওয়া হ'ল; যথা-সময়ে ফেরত পাবেন।'

এই মর্মেই, কয়েক বছর বাদে, বাজ-নৈতিক ডাকাতির সময় বিপ্লবীদের পার্চনো যে-চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে, তাঁর উল্লেখ করি। চিঠির নিচে স্বাক্ষর করতেন—জৈ-বলবন্ত।

চিঠির ওপরে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শিলমোহর : পূর্ব-ভারতের ওপর সুবোধদের দৃশ্য, আব অশুভ ভারতবর্ষের মানচিত্রকে ঘিরে বৃত্তাকারে লেখা—'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীরসী,' আব তাব তলায়, United India লেখা। ওপরে, একদিকে একটা গোলাপ আঁকা; তার অর্থ সম্ভবত, ভগবানে আশ্রয়সম্পর্ক, তাঁর প্রতি নিবেদিত অন্তরের অনুরাগ। অন্যদিকে একটা

ময়ূর; তার অর্থ : বিজয় সূচনীচতা। ভগবানের ইচ্ছাই যেন জয়যুক্ত হ'তে পাবে।

চিঠিব শব্দতেই থাকত 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র। ডান-পাশে, ঠিকানার জারগায় ছাপা থাকত : 'সম্মিলিত ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রের শাখা : বাংলাদেশ।'

একটি চিঠিতে লেখা ছিল : 'আমাদের কলকাতার রাজস্ব-বিভাগের দু'জন অবৈতনিক কর্মচারী আপনার কাছ থেকে ঋণস্বরূপ নয়-হাজাব 'আটশ' একানন্দই টাকা এনেছেন; পরে সুদসমেত আপনি তা' ফেরত পাবেন।

আমাদের মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্যে আপনার নামে এই টাকা আপাতত জমা-রাখা হ'ল। ঋণের অনগ্রহে আমরা কৃতকর্ম হ'লে আপনি টাকা ফেরত পাবেন। আমাদের কর্মচারীরা আপনার কাছে যে-সম্মতবাহার পেয়েছেন, তা' আপনার মত মহানুজবের কাছেই আশা করা যায়। আমাদের কর্মচারীরাও আশা করি আপনার সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন।

কথায়, কাজে বা অন্য কোনও রকমে আপনি যদি আমাদের বিরুদ্ধচরণ করেন বা আমাদের ধরিয়ে দেন, তা' হ'লে আমাদের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পুলিশের কর্মচারীরা আমাদের পথের অন্তরায়; সেইজন্যে সম্মিলিত ভারতবর্ষের স্বাধীন শাসন-তন্ত্র উক্ত পুলিশদের উপযুক্ত দণ্ডবিধানে কখনো দ্রুতি করে নি এবং ইংরেজ সরকার শত চেষ্টা করেও ওই পুলিশ কর্মচারীদের প্রাণ বন্ধা করতে পাবে নি। আপনাকে তাই স্মরণ করিয়ে দিই—আপনি যেন এমন কিছু না করেন, যাতে করে ওই পুলিশদের সঙ্গে মাতৃভূমিকে কলুষিত করতে আমরা বাধ্য হই। আপনি বিচক্ষণ বিজ্ঞ; আপনার বোঝা উচিত যে, বৈদেশিক শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে দেশবাসীর স্বার্থত্যাগ, অর্থদান ও সহানুভূতি অপরিহার্য।

আমাদের কাজেব গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশেব ধনীরা যদি মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বামাসিক কিস্তিতে আমাদের অর্থসাহায্য করে দেশের সনাতন ধর্ম স্থাপনে-সহযোগিতা করতেন, তা' হ'লে দেশ-বাসীকে অনর্থক এ-ভাবে কষ্ট পেতে হ'ত না। আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না-করবার জন্যেই এই-ভাবে আমাদের অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে।

মাতৃ-জ্ঞান দীক্ষিত হ'লে নতুন ক্ষান্ত-ধর্ম গ্রহণ করে কিদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে দেশকে উদ্ধার করবার মহান যজ্ঞে আমরা রত হয়েছি; আপনি কি আমাদের জন্যে কিছু যত্নে কুণ্ঠিত হবেন? জাপানের উন্নতি ও ক্ষমতা-প্রাপ্তির মূলে তার ধনীরাই আছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে দেশ-বাসীদের উপযুক্ত মন ও অন্তরে উপযুক্ত মর্ষি দিন।...

১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে নাংলাব এক-হাজারের ওপব টাকা, সেপ্টেম্বরে হোগল-বুনিয়াব, অক্টোবরে নদীয়ার হলদাবাড়িতে এক হাজার চারশ' টাকা, ডিসেম্বরে বিকারায় প্রায়

হাজির-থানেক টাকা বিপবীর লুট করেন। তা' ছাড়া, নভেম্বরে নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যার উল্লেখ আগেই করেছি।

ইতিমধ্যে বলছি, ১৯০৯ সালের জুন মাসে ভূমিষ্ঠ হন যতীন্দ্রনাথের স্বতীয় পুত্র তেজেন্দ্রনাথ।

এবং ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে, বিপ্লবের স্পষ্টতম মূহুর্তের ঝোড়ো পারিবেশে বসেও মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ যে তাঁর মেহতাজন কুমারনাথ বাগচি বিশেষে স্বয়ং কবিতা রচনা করে উপহার দিয়েছেন, তার উল্লেখও ইতিপূর্বে করেছি।

হলুদবাড়ি ডাকাতির সূত্রে যতীন্দ্রনাথদের কল্যাণের বাড়ি আবার পুলিশ তল্লাশ করে। যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “আলিপুত্রের সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস—ধিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আলিপুত্র বোমার মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন—১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুত্র ফৌজদারী আদালতে প্রকাশ্য স্থানে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। এই সময় হইতেই C, I, B, পুলিশ যতীন্দ্রনাথের ওপৰ বিশেষ নজর রাখিতে আরম্ভ করে। মবারিকপুত্র বাগানের সমগ্রবে আলিপুত্র বোমার মোকদ্দমার পুলিশ অন্যান্য যে সকল বিপ্লবীর সম্মান পাইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই এক বেড়ালালে ছাঁকিয়া তুলিবার মতলবে দকলব বিরুদ্ধে একটি বিবাত ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা কবিবার পরিকল্পনা কবিল।* বিপ্লবীদের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য গভর্ণ-মেন্ট এইরূপে প্রস্তুত হইতছিল। ইহার ফলে ১৯০৯ সালে বাংলার মফস্বল শহরে অবধি তল্লাসী আবম্ভ হইল।...”†

নেংড়া (ডাঃমণ্ডহাবার) থেকে ললিত চক্রবর্তী (বেঙা) নামে একজন তরুণ কর্মী

* যতীন্দ্রনাথও এঁদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন একাধিক কারণে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনও অভিযোগ না থাকায় তাঁকে পুলিশ সহজে গ্রেপ্তার করতে পারছিল না। ললিতবাবুর ভাষায়, “যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যান্য তরুণ বন্ধুগণকেও এই বিপ্লবের দলে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধু মুরারিপুত্র বাগান-সাঁটীতে তল্লাসীর রায় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। যতীন্দ্রনাথ ঐ রায়তে তাঁহার এক মামতো ভাইয়ের বিবাহে ষাওয়ার সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়াই ধৃত হন নাই। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির পর যতীন্দ্রনাথই বাংলায় বিপ্লব-ক্ষেত্র কর্মময় বাখিয়াছিলেন ও যে বহিঃ শ্রীঅরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জ্বালাইয়া গিয়াছিলেন তাহা নির্বাণিত হইতে দেন নাই।”

† এই তল্লাসীর মূলেই ছিল সামসুল আলমেব কুচক্রী বুদ্ধি; আলম স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন অনেক তল্লাসীর সময়।

নেংড়ার ও অন্যত্র করকটি ডাকাতির পর পাগিয়ে গিয়ে দাঙ্গিলিঙে আশ্রয় নেন যতীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট স্থানে। ডাকাতির কিছু মোহর ও বালা নিয়ে রাজেন তথাকারী যান দাঙ্গিলিং বাজারে — সেগুলি ভাঙতে।

দাঙ্গিলিঙেই ১৯০৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর অসুস্থ ললিত (বেঙা) হবা পড়ে গেলেন। পুলিশের অভিযানে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রাজসাক্ষী হতে রাজী হন।

২৮শে রাত্রেই ওরিকে নদীয়ার হলুদবাড়িতে ডাকাতি হয়ে যায়। কেউ কেউ ধরা পড়েন এই সূত্রে। এবং মীরপুর পুলিশ ঘানার তাঁদের আটক রখা হল।

২৯শে অক্টোবর ললিত (বেঙা) পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেন।*

ললিত (বেঙা) যে-স্বীকারোক্তি করলেন, তার থেকে পুলিশ জানতে পারল : সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখনো একটি অখণ্ড দল রয়েছে, পাঁচ থেকে ছ' হাজার বিপ্লবী কর্মী সেখানে সক্রিয়। সৈন্যবাহিনীর অনেক বাঙালী ও পাঞ্জাবী হাবিলদারও এই দলের সভা; তাঁদের অনেকেই শিদিরপুরে ডাঃ শরণ মিশ্রের বাড়িতে ব্যাভাষ্য করেন। দলের হাতে দেড়শ' রিভলভার এবং দশটি বন্দুক রয়েছে। নেতাদের অন্যতম হচ্ছেন ননীগোপাল সেনগুপ্ত, শবৎ মিশ্র, ভুবন ও ভোঁতন মুনসজ্জী প্রভৃতি; এঁদের গুপ্ত-সমিতির অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র হচ্ছে কুষ্মনগরের ‘আব’ কোমি-ফালগওয়ার্স’; সে-অঞ্চলের নেতা হচ্ছেন কুষ্মনগরের উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির দিকটা দেখানো হবে ‘ছত্রভাণ্ডার’। বোমাব’ বাগানেব কর্মীরা ধরা পড়ে ষাওয়ার সময় তিনিটি ট্রাক নিয়ে এখান থেকে তিন দিকে চলে যান যথাক্রমে অবানাথ রায়চৌধুরী, নরেন বসু এবং ‘শিবপুত্র’ দলের কয়েকজন কর্মী। বিভিন্ন স্থানে এঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল বলে উল্লেখ থাকলেও অখণ্ড এক বিরাট দল এটি : দাঙ্গিলিঙে সেক্রেটারিগেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যতীনবা এঁদের মধ্যমি।**

* F, C, Dally (D. I, G.) সাহেবের যে-রিপোর্ট আই-জি পুলিশের মাধ্যমে বাংলার চীফ সেক্রেটারিবা কাছে পঠানো হয়, তারই মর্মান্বাদ দিচ্ছি। —পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

* যতীন্দ্রনাথের loose confederacy বা বিকেন্দ্রিক দলের স্ববৃপটা এখানে কতক উদ্ঘাটিত হতে দেখা যায়; অথচ রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী কতক অনুমানে আর কতক ভেতরের ব্যাপার দেখে বস্তুতে পারেন যে, ছাড়া ছাড়া এই দলগুলো বস্তুত অভিন্নই। যতীন্দ্রনাথ সরকারী চাকরিতে থাকার দব্বন, মহানায়ককে background-এ থেকেই কাজ করতে হচ্ছিল; তাঁর সহকর্মীবাও তাঁকে

।স. আব ক্রীভল্যান্ড সাহেবের রিপোর্টে দেখাছি সি-আই-ডি বিভাগ থেকে যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখা আছে যে, রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী (বেঙা) নেংড়া ডাকাতির পবেই গিবে কুষ্মনগরে উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। উকিল ললিতবাবুর মূহুরি নিবারণ-মজুমদার (কেব্দা) ললিত চক্রবর্তীকে স্টেশান থেকে নেবাব জন্য লোক পাঠান। নিবাববাবুও ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত বলে জানা যায়।

রাজসাক্ষী ললিত যে যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবাব জন্য একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ললিত (বেঙা)-কে নিয়ে যান কুষ্মনগরে। সেখানে সে উকিল ললিতকুমারের বাড়ি ঠিকই দেখিয়ে দেয়। “রাজসাক্ষী ললিত চম্বিশ পরগনার বাসিন্দা; তাব পক্ষে কুষ্মনগরের এই বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যদি তাব এই সাক্ষ্য সত্য না হত,” সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে। উকিল ললিতবাবুকে সে শিবপুরে নেতা ননীগোপাল সেনগুপ্তের বাড়িতেও দেখেছে। রাজসাক্ষী ললিতকে উকিল ললিতবাবুর বড়দাব (বসন্ত-কুমারের) ছেলে নিমাই স্টেশান থেকে পথ দেখিয়ে কুষ্মনগরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে।

রাজসাক্ষী ললিতকে নেংড়া ডাকাতির পর কুষ্মনগরের বাড়িতে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মূখ্যোপাধ্যায় — ললিতের সাক্ষ্যে উল্লেখ পাই।

উকিল ললিতবাবু প্রভৃতি বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারেব কাজে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন যে, তারও উল্লেখ করেছে রাজসাক্ষী ললিত। সে বলেছে যে, ১৯০৭ সালে যখন শান্তিপূর্বের পাদ্রিকে মাঝবার দরুন মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে নবন পবামাণিক বেঁবিরে আসে, তাকে সম্বর্ধনা জানানবার বিশেষ আয়োজন হবৈছিল উকিল ললিতবাবুর বাড়িতে।

উকিল ললিতবাবুকে জেরা কববার সমস্ত জিগ্যাস করা হবৈছিল মূবারিপুত্র বাগানে তিনি বারীন ঘোষের নামে টাকা পাঠানেন কিনা। তিনি তা' অস্বীকার করেন।* বারীর

আড়ালে রেখে তাঁরই নির্দেশে কাজ কব্বছেন। মোবহাল ডাকাতিতে ধৃত কর্মী (পরে রাজসাক্ষী) মম্বধ বিশ্বাস বসন্ত বিশ্বাসের ডাইনন এবং ললিত চক্রবর্তী (বেঙা)ও যতীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়েই স্বীকারোক্তি করেন প্রথম; তারপর পুলিশের চাপে পড়ে বাজ্ঞেভাবে তাঁকে জড়াতে চেন্টা করে কিন্তু ললিতও যতীন্দ্রনাথকে identifi করে নি।

* বোমার বাগানের অন্যতম কর্মী সূধীর সরকার বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের চিঠি নিয়ে তিনি কুষ্মনগরে উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতেন; ললিতবাবুর কাছ থেকে টাকাটি নিয়ে আসতেন। —পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

বা শ্রীঅরবিন্দকে যে জ্ঞানেন, একথাও অস্বীকার করেছেন তিনি পুলিশের কাছে।

“অথচ এ-প্রমাণ আমারদের হাতেই রয়েছে,” ক্রীডল্যাণ্ড রিপোর্ট দিচ্ছেন, “যে লালিতবাবু বার্মার নামে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন। ‘মুগালতর’ অফিসেও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নামে তাঁর চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছে। তাকে দেখা যায় ‘মুগালতর’ প্রচারে কী আকুল আগ্রহ তাঁর! সে-চিঠিতে এ-প্রমাণও মেলে যে, বার্মান ও শ্রীঅরবিনদের সঙ্গে তাঁর যোগ জানাই পরিচয় ছিল।”

ভারতবর্ষে ‘দুঃপ্রাপ্য’ কয়েকটি বিশেষ বিভাগীয় তদন্তের রেকর্ডের সঙ্গে এবং হলুদ-বাড়ি ভাড়াতিব রাজসাক্ষীর জবাবের সঙ্গে লালিতের জবাবের বহু মিল পাওয়া গেলে।

১৯০৯ সালের ১লা নভেম্বর দার্জিলিং থেকে রাজসাক্ষী লালিতকে প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় নিয়ে আসা হল ডায়মণ্ডহারবারে। তার আগে, দার্জিলিংতেই, লালিতের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন বিশ্বাত ব্যারিস্টার রজত রায়—যতীন্দ্রনাথের অভ্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।* সম্ভবত লালিতকে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ, কিন্তু লালিতের পক্ষে

*মুরারীপুকুরে ধব-পাকড়ের পর পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায় তাবা বলেছে যে, অনেক দিন থেকেই চারটি লোককে তারা স্বীপান্তরিত করতে বলছিল : শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং রজত রায়কে। সরকার কিন্তু বাজী হন নি। হলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না — ওদের বিশ্বাস, রজত রায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথেরই Political

duPLICATE — অর্থাৎ রাজনীতিব ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী বলে যেসব কাজ যতীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে করতেন পারতেন না, সেগুলো শুনিয়ে রজত রায়কে এবং ব্যারিস্টার জে. এন. রায়কেও সামনে রেখে করাতেন। এই দুইজন ব্যারিস্টার বন্ধুই ছিলেন বেপারোয়া। এইভাবেই বোম্বেয় সরকারি ফাইলে রজত বাব গুরুত্ব পেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গেও বজ্রত বাব শুব মেলায়মাশা করতেন বলে জানা যায়। এবং উত্তরকালে বিশ্বকাবি যতীন্দ্রনাথের পুত্রের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলে খবর পাওয়া যায়। জটিল প্রবীণ বিপ্লবী লিখেছেন, “রজত বাব সম্পর্কে আমার সন্দেহটাই বোধহয় সত্য। উত্তরপাড়ার মিশরিবাবু যেমন পুলিশের চোখে ‘ছিলেন অববেন্দ চ্যাটার্জীর duplicate’ তমনি রজত রায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথের duplicate ; অথচ আমি জানি মিশরিবাবুর দল’ বলে কোন দল ছিল না। অরবিন্দ, বার্মান, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিরকে যে টাকা অমরদা দিতেন তা’ বেশির ভাগ জোগাড়তেন মিশরিবাবু।... ওখানেই তাঁর রাজনীতির শেষ।...” — যতীন্দ্রনাথ

সরকারি প্রলোভন জয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

রাজসাক্ষী লালিত চক্রবর্তীকে পুলিশ দার্জিলিং থেকে ডায়মণ্ডহারবারে আনবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লুফে নিল কুখ্যাত ডেপুটি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট—সামসুল আলম। বার বার জেরা করে, নানা রকম চৌপ ফেলে ফেলে সামসুল লালিতের থেকে নতুন নতুন তথ্য ও নাম-ঠিকানা বের করতে লাগল। এবং নেংড়া ডায়মণ্ডহারবারেও লালিত যে ছিল, তা-ও স্বীকার করিয়ে নিল। এইবার চাপ দিবে লালিতকে পুরোপুরি রাজী করাল সামসুল রাজসাক্ষী হতে। অর্থাৎ সামসুলের ও অন্যান্য সরকারি ওপরাওয়ালদের কপাল-প্রসূত অর্থসভ্য ও অসত্যের সঙ্গে লালিতের জ্ঞাত সত্যটুকু মিশিয়ে জমাখিচড়াই করে লালিতের জবান বলে তা’ চালিয়ে স্বীকৃত হল এই রাজসাক্ষী।

ওদিকে যতীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে লালিতের পিছু পিছু লোক পাঠিয়েছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার থেকে সে খবর নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিল লালিতের বিস্তৃত জবাবের খবর।

১৯১০ সালের ২১শে জানুয়ারী সামসুল আলম সরকারি হুকুম আদায় করে ফেলল — লালিত যাদের বাদের নাম উল্লেখ করেছে, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।

যতীন্দ্রনাথকেই, লালিত চক্রবর্তী সমস্ত আন্দোলনের নেতা বলে উল্লেখ করল। সেই সঙ্গে নরেন ভট্টাচার্য, লালিত চট্টোপাধ্যায় (যতীন্দ্রনাথের মামা), তাঁর মূহুরি নিবারণ মজুমদার, নরেন বসু, হেম সেন, বিজয় চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, সতীশ সরকার প্রমুখ বহিঃ জনেরও নাম করল।

দ্বিগুণ উৎসাহে সামসুল আলম লেগে গেল ‘হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা’ নাম নতুন মামলা সাাজিয়ে তুলতে।

২. তিন

অকিলাসে সামসুল আলমকে শেষ না করলেই নয়।

মহানায়ককে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজুমদার (চণ্ডী) অন্য নিয়ে রওনা হলেন পথের কাঁটা সাবিয়ে দিতে। অকৃতকার্য হয়ে ফিরেও এলেন। কারণ সামসুলের কেশপাশে তখন স্পর্শ করা দুর্ভেদ্য—সর্বদাই সে প্রহরী-সুদর্শিত হয়ে আনগোনা করছে।

যতীন্দ্রনাথ চণ্ডীকে আবার পাঠালেন। সঙ্গে এবার সতীশ সরকার। গুলী চালানোর ভার রইল চণ্ডীর ওপর। এবারও চণ্ডী বিফলমনোবধ হলেন।

আজই বলাছি, চাকার বীরেন দত্তগুপ্ত এ-সময়ে চাকলাকব একটা কিছু করবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে চণ্ডীর অসাফল্যে

অসহিষ্ণু হ’য়ে যতীন্দ্রনাথের কাছে সামসুল হতাব তার তিনি চেয়ে নিলেন।

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য সুরেশ মজুমদার (পরাম : উত্তরকালে আন্দোলনকার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) অ্যাসিস্ট্যান্ট সিজিল সার্জন সরসীলাল সরকারের বাড়িতে থাকতেন তখন। সরসীলালবাবু মামা স্বাধিপূর্বব (উড়িষ্যার) ম্যাজিস্ট্রেট বাম্বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র মৌলিক সে-সময়ে কলকাতা আসেন। সুবেশবাবু পূর্ণবাবুব রিভলভারিটি সরিয়ে আনলেন, যতীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

এবং ১৯০৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর স্বয়ং সুরেশই দিবা ভাল ফেলের মতো পূর্ণবাবুকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সেই রিভলভারিটি বাবনের সঙ্গে দিয়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথ। আর সতীশ সরকারকে বলে দিলেন বাবনের সঙ্গে গিয়ে ভাল কবে সামসুলকে চিনি দিয়ে আসতে। এবার আর ফিরে এলে চলবে না।

নিভীক যুবক বীরেন দত্তগুপ্ত। স্বকৈশোরের সীমা পার হয়েছে। ধর্ম্মাভি-উচ্চ রক্তের প্রতিটি ফিঙ্গু নেচে উঠেছিল—এতদিনে ময়ের কাজের অধিকার পেয়ে।

২৪শে জানুয়ারী। ১৯১০ সাল। সোমবার।

কলকাতা হাইকোর্টে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা’র আপীল চলছে। নিত্য তাই সামসুল আলমকে সেখানে খাড়াভ্যক্ত করতে হচ্ছে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পুরনো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সামসুল আলম নেমে আসছে কাগজ-পত্র নিয়ে।

অদূরেই অপেক্ষমাণ বীরেন আব সতীশ। সামসুলকে নামতে দেখেই সতীশ বীরেনকে সতর্ক করে দিলেন : “ওই, ওই যে সামসুল!”

ভীরবেগে বীরেন ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন সামসুলের মুখোমুখি।

বিম্মিত সামসুল আলম জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে তাকাল। পলকে বৃষ্টি শিউরে উঠল তার অবচেতন পাণী মন। মৃত্যুর আগের শীতল এক স্পর্শে বৃষ্টি তার মস্তিষ্ক স্নেহ-দণ্ডে শিহরণ জাগল।

বীরেন রিভলভার বাব করলেন। গুলী চালালেন। আত্ননাশ করে সামসুল আলম লুটিয়ে পড়ল। তাজা রক্তের ধারায় পিচ্ছিল হয়ে গেল পাথরের সিঁড়ি।

“পাকড়াও! পাকড়াও!” বলে সামসুলের আত্ম অংশুদলি শেষ নির্দেশ দিবে গেল শাদি-চাপবাশিকে। বার-কয়েক অস্কট গোড়ানির পর দেহের মামা কাটিয়ে চলে গেল তার প্রাণ।

“খুন! খুন!” চিৎকার উঠল।

চারদিক থেকে ছুটে এল আরদাল, চাপরাশি, পাহারাদার, দবোয়ান, উকিল, মজল, সাক্ষীবা। আদালতে দায়বিশেষকর্ম অসম্ভব হৈ-দুঃস্বাদ-উত্তেজনা।

বীরেনও উত্তেজিত হয়ে গুলী চালাতে লাগলেন।

শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার* ভাষায় 'পুলী করিয়া হত্যাকারী যুবক যুব দোড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নিচে আসে এবং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে সদর রাস্তার উপর আসিয়া পড়ে। চারিদিকে 'খুন, খুন' শব্দ শুনিয়া এবং যুবককে পলায়ন করিতে দেখিয়া কয়েকজন তাহার পশ্চাৎগমন করে। হাইকোর্টের সামর্থনী ক্রমশঃ, একজন চাপরাশি, এবং আবার কয়েকজন পিয়ন তখন যুবককে ধরবার জন্য দোড়াইতে থাকে। যুবক তখন দোড়াইয়া হেস্টেস স্ট্রীটের দিকে যায়। যুবক যখন নিউ কোম্পানির বাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়াছে তখন আলী আহম্মদ খাঁ নামক একজন সোবার পুলিশ ঘোড়া লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া পথ বোধ করে। যুবক তাহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করে কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। পশ্চাদ্গত হইতে ইতিমধ্যে রামধনী পিয়ন আসিয়া যুবককে জাপটাইয়া ধরে ও ধারান-সিং কন্সটেবল তাহার হাত হইতে রিভলভার কাড়িয়া নয়। কিছুক্ষণ হাইকোর্টে রাখিয়া যুবককে ওয়াটাল্ড স্ট্রীটের ধানার চালান দেওয়া হয়।

"যেখানে আলম খুন হইয়াছিল, আলম এতক্ষণ সেইখানেই পড়িয়াছিল। প্রায় ২/১ মিনিট মধ্যেই প্রধান বিচারপতি জ্যেষ্ঠকস, বিচারপতি হার্বার্টন, বিচারপতি স্ট্রিফেন এবং অন্যান্য বহু উকীল কৌন্সিলি ছুটিয়া আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হন। প্রধান বিচারপতি তাহাকে জল খাইতে দিয়াছিলেন।...কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই আলম পুণ্ড্র পাইয়াছে। তাহার শবীব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে গুলীটা তাহার বুক ভেদ কবিয়া বাহ্য হইয়া গিয়াছে, পরে দেখা গেল যে গুলীটা বারান্দার পড়িয়া আছে।...

"হত্যাকাণ্ডী যুবক পুলিশ হস্তে ধৃত হইয়া স্বীয় পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই। যুবককে ধৃত করিয়া ওয়াটাল্ড ধানার লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ড্যালি, এসিস্টেন্ট ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ডেনহ্যাম এবং পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যাগলিডে আসামীর পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং রাতি ১টা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া আসামীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু আসামী কিছুতেই কোনও পরিচয় প্রকাশ করে নাই। পরে পুলিশ জানিতে পাবে যে, পূর্ববঙ্গের লোক, তাহার নাম বীরেন্দ্রনাথ

দত্তগুপ্ত।* সে এখানে তাহার ভ্রাতার সহিত ৬১নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে বাস করিত। এই সংবাদ অবগত হইয়া ঘটনাবিধি মথুরায়ে পুলিশ এই বাড়ি খানাতল্লাস করিয়াছে।...

"আসামী কেন এমন কাজ করিল, তাহার ভ্রাতা কতৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে সে, বলে, 'আমি বাহা ভাল ব্যক্তিরাছি, তাহা করিয়াছি।' পুলিশও যুবককে প্রেশুর করিয়া তাহার ঐ খুন করিবার কারণ জানিতে চাহিয়াছিল। তাহার উত্তরে যুবক বলিয়াছিল,— 'তোমরা আমাকে লইয়া বাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি।' যুবক আরও বলে যে সামসুলের উপর তাহার ব্যক্তিগত কোনরূপ অক্ৰোশ ছিল না।...

"...পুলিশের নিকটে আসামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরেন্দ্র বলিয়াছে যে, আসামী মধ্যম্যে গ্রে স্ট্রীটে তাহার কোনও কন্সল নিকটে বাইত। উক্ত বন্দু সম্প্রতি পাণ্ডিত হওয়ার বীরেন ইদানীং প্রায় সর্বদা তাহার নিকটেই অবস্থান করিত; হত্যার পূর্বদিন হইতে সে হ্যারিসন রোডের মেসে আসবেই আসে নাই।*...

* শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য 'সুবেশ চক্রবর্তী' লিখেছেন, "এই সময়ে অবিকল তামিল ভাষা শিখছিলেন।...মনে আছে একদিন তিনি তামিল পাঠ সাঙ্গ কবে ফিরে এসে তের-চোদ্দ বছরের স্কুল-বালকের মতো কৌতুক-বোধে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললেন— Do you know what is পীরেন্ডির নাড় তত্ত্ব কোপ্তা? আমরা অবশ্য সবাই অজ্ঞতার বাক্যহীন হয়ে রইলাম। তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে তামিলে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।'..." (স্মৃতিকথা)। শ্রীঅরবিন্দের মূখে বীরেন দত্তগুপ্তের এই উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় নয় কি?—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

* গ্রে স্ট্রীট নয়, বতীন্দ্রনাথের ২৭৫, আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে বীরেন দত্তগুপ্ত বেতেন; এই সময়ে বতীন্দ্রনাথের এক মামা অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে স্বয়ং বতীন্দ্রনাথ তার শ্রদ্ধা তো করতেনই, দলের অনেকেই পালা করে স্বেচ্ছায় এ-জাতীর কাজ করে আনন্দ পেতেন। এই

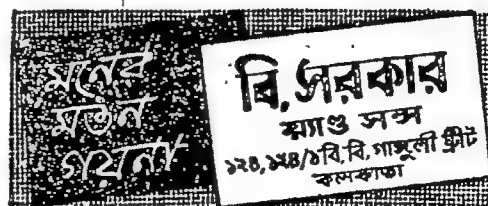
"প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর নিকট গত বৃহস্পতিবার বীরেন্দ্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। আদালতে পুলিশ, কয়েকজন উকীল, সংবাদপত্রাদির প্রতিনিধি ব্যতীত আর কাহ্নকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তবে বীরেন্দ্র এরূপভাবে আচরণ-ব্যবহার করিতেছিল যেন কিছুতে তাহার হুঁকমই নাই। মামলায় কি হইতেছিল না হইতেছিল তদ্বিষয়ে তাহার কোনই আগ্রহ ছিল না, সে কখন পুলিশের সহিত কথাবার্তা করিতেছিল, কখনও বা হাসিতেছিল। সরকারী পক্ষে মিঃ হিউম উকীল ছিলেন। সবপ্রথমে আলমের শরীর-রক্ষকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ...পিয়ন, সোয়ার ও ভাটার ইত্যাদি সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়। মামলা এখন চলিতেছে। হাইকোর্টে বিশেষ জুরীর নিকট আসামীর বিচার হইবে।"

বীরেন দত্তগুপ্ত ধরা পড়ে গেলেন দেখে সতীশ সরকার হাইকোর্ট থেকে সোজা উপস্থিত হলেন মহানারকের কাছে, এবং তারই নির্দেশে শ্যামপুকুরে 'কর্মযোগিনী' অফিসে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানিয়ে এলেন সামসুল আলমের সমাপ্তি-পর্বের বিবরণ।

ধর-পাকড়ের নতুন মরশুমে আবার শ্রীঅরবিন্দকে কারাগারে অভ্যর্থনা করবার অভিপ্রায়ে গোয়েন্দা-বিভাগ ভৎপর হয়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দ ও বতীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সুত্র আবিষ্কার করতে।

কিন্তু তাব আগেই, সামসুল হত্যার মাস-খানেকের মধ্যেই, তাঁর নামে প্রেশুরী পর্বোবাধা যখন আরী করা হ'ল, তিনি চলে গেলেন ইংল্যান্ডে নাগালের বাইরে—অন্ততঃ এক আদেশ শুনেন শ্রীঅরবিন্দ চলে গেলেন ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে। সেখান থেকে ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ফরাসী জাহাজ 'দুগ্লেস' চড়ে বতীন্দ্রনাথ মিশ্র ছন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ রওনা হলেন ফরাসী-ভাষ্যের প্রধান কেন্দ্র পন্ডিচেরী অভিমুখে।

মামাকে শ্রদ্ধাচারত অবস্থাতেই বতীন্দ্রনাথকে প্রেশুর করা হয় সামসুল হত্যার তিনদিন পরে, ঘোর রাতে।—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।



* সাপ্তাহিক 'ধর্ম' (সোমবার ১৮ই মার্চ ১৯০৬ সাল)।

ইংরেজ সাপ্তাহিক 'কম্বোয়ান' সম্পাদনার
সময় তিনি দিয়ে গেলেন সিস্টার নিবেদিতার
হাতে। আর, সমস্ত বিশ্ব-আন্দোলনের একচ্ছত্র
অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিয়ে চন্দন-
নগরের অতিলাল রায়কে বলে গেলেন—যতীন্দ্র-
নাথের সঙ্গে সংযোগ রাখা করে চলতে।

সতীশ সরকার একদিন কলকাতাভেই
আজগোপন করে রইলেন ছয় নম্বর ব্রাউচ
লেনের একটি মেসে। তাঁর ডাক নাম ছিল
কনিষ্ঠ পাণ্ডব। শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগরে
পৌঁছে দিয়ে এসে সুরেশ চক্রবর্তী ও সতীশের
(ওরফে কনিষ্ঠের) আশ্রয়ে ব্রাউচ লেনের মেসে

উঠলেন। এই মেসের সুরেশ চক্রবর্তী কিছুদিন
থাকার পরে, "হঠাৎ একদিন একটি ছোট
টুকরো কাগজে... সুরাবিন্দেব হাতে লেখা তিন-
চার লাইন পেলাম। তাকে এই নির্দেশ ছিল
যে, আমাকে পিণ্ডচরীতে যেতে হবে তাঁর
জন্য একটি বাড়ি ঠিক হবে রাখতে।"*

সুরেশবাবুর অনবদ্য ভাষার সতীশ সব-
কারের চিঠিটি কেমন ফুটেছে, দেখাই, "মধ্যম-
দৈর্ঘ্যের ময়লা রঙের পাতলা ছিপছিপে
মানুষটি এই কনিষ্ঠ পাণ্ডব। বয়স কুড়ি
পেরিয়েছে কিন্তু পিচিশ পেবোষ নি বলে মনে
হয়। পোষাক-পরিচ্ছদে উদাসীন, কেশ-
কলাপের পবিত্রাঙ্গ বৈরাগ্যপ্রবণ, আহার
জীবনধারণার্থে এবং বিহার অবান্তর। চোখ-
দৃষ্টিতে মল্ল মল্ল একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে যা
দেখে ইরোজী ক্রিয়াপদ 'চল' শব্দটি
মনে পড়ে—কুচকাওয়াজ অর্থে নয়, তীক্ষ্ণ অস্ত্র
ধাতু ভেদ অর্থে—তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির
সম্মুখে বেন গুপ্ত পুলিশের কোন ছদ্ম-
পোষাকই অব্যাহতি পাবে না।" কনিষ্ঠ
১৯১০-এর শেষের দিকে পিণ্ডচরীতে এসে
কয়েক মাস আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে
ছিলেন। এবং ডিম্বেভেলির কালেক্টর অ্যাশ্
Asher - সাহেবের হত্যার পর...সেই যে
কনিষ্ঠ একদিন সন্ধ্যায় জাবছাঘাতে তার
সুটকেসটি হাতে করে পিণ্ডচরী থেকে এক
স্টেশন এগিয়ে ট্রেন ধরে কোচাঘা উঠাও
হয়ে গেলেন তার পর এই বটিশ-তেরিগ
বসবেব মধ্যে তার কোন খবর পাই নি।...†

সুরেশ চক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দেব জনা বাড়ি
ঠিক করতে বাবার কিছুদিন পরেই, যতীন্দ্র-
নাথের নির্দেশে সতীশ সরকার চলে গেলেন
উড়িষ্যা; বালেশ্বরের কাছে কান্তপদাঘ বে-
আস্তানা করিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ ১৯০৮
সালে, সেখানে আজগোপন করে রইলেন
সতীশ এবং যতীন্দ্রনাথের অপর এক শিষ্য
নিলনীকান্ত কর। এখানে কয়েক মাস থেকে,
সতীশ চলে যান পিণ্ডচরী।

এই আস্তানাতাই পাঁচ বছর পরে মহা-
নায়ক যতীন্দ্রনাথ আসবেন তাঁর জীবনের শেষ
ছয় মাস অতিবাহিত করতে।
সে-কাহিনী আজ থাক ॥

(ক্রমশঃ)

* সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্মৃতি কথা' (পৃঃ
৫৮) ॥

* সতীশবাবু আজো নির্বাণ স্বামী' নামে
ইহলোকে আছেন, কলকাতার কাছেই এক ছোট
মঠে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, কিন্তু চোখদুটি
আজো তেমনি অন্তর্ভেদী দীপ্ত হারার নি।
তেমনি প্রথর রয়েছে তাঁর স্মৃতিশক্তি ॥

— যতীন্দ্রনাথ।

† সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্মৃতি কথা' (পৃঃ
৫৯) ॥

দৃশ্য কাব্য - পরিচয়

সত্যজীৱন মূখোপাধ্যায়
দ্বয় দ্বয় ঢাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক-
কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
জাতীয় তুলনামূলক বিচারিত। বি-এ ও এম-এ
পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লক্ষপ্রতিঃ সাহিত্যিক ও নাট্যসমা-
লোচক শ্রীযুক্ত হেন্সেলকুমার রায় এই গ্রন্থাংশ
সম্বন্ধে বলেছেন:—

"... * * * তথাকথিত ষোড়শতাব্দী
মকলিপক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা
ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন
কুই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এতদিন পরে
এই বিভাগে দুইখানি অনুদ্য গ্রন্থ আমাদের
হস্তগত হয়েছে। গ্রন্থখানির কথা 'দৈনিক
কল্পবর্তী'তে ইতিবোধেই আলোচনা হবে গেছে।

* * * যতীন্দ্রনাথের নার 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়',
রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীৱন মুখো-
পাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা
নাটক নিয়ে এমনভাবে বক্তৃতাচালনা কবাব
মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য
আমরা কাঁছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্মৃতি-
কালের গণনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা
করতে পারেন না। * * * অথচ বাঙালীর
হুই নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন
কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত সত্যজী-
বোহান বহু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্য-
কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীৱনবাব
অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * * যারা
ষোড়শতাব্দীর ভূমিকাগ অভিনয় কবন্তে
ইচ্ছুক নন, এই—পুস্তকখানি পাঠ করলে
তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য
সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা কবতে পারবেন।
এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর
নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন
নি। এইটিই হল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান
কৌবব। * * * তাঁর সমালোচনাও পবর উপ-
ভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী শৃঙ্খল দৃষ্ট,
নিরপেক্ষতা ও যুক্তিসম্মত মনের পরিচয় দিয়ে
তিনি আমাদের আনন্দিত কবেছেন। তিনি
কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন।
কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিবক্ত
কথা ব্যক্ত করে বক্তব্য-বিষয়কে করে

ভোলেন নি বোঁয়াটে। * * * বাংলা
নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা কববেন,
এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * *
বাঁদের নাট্যবৈদ্য আছে, এই বইখানি না থাকলে
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক
সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদভূমি, ভট্টাচার্য এম-এ
নবোদয় এই গ্রন্থখানি 'সংক্ষেপ স্বতঃপ্রবৃত্ত
হইয়া লিখিয়াছেন—

"... * * * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে
এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় আর আছে
কিনা জানি না, থাকিলেও গুরুত্বপূর্ণ বই আছে।
গ্রন্থকার শুধু ইতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়েই
তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সন্দেহ
নাই তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও
পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি
উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার
করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয়
নাট্যদর্শন সম্বন্ধে রাখিয়া তিনি এই বিচার
করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার
অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন
তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া
যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য।
অন্য সাহিত্য-পিপাসুবাও এই বই হইতে বহু
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই
ধরনের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—প্রাক্তীর্ণ্যপূর্ণ
ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক,
নাট্যখানার ইতিহাসলেখক ও নাট্যীয়
পরিগণ্যনিবিশ্রীযুক্ত বুদ্ধেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বলেছেন:—

"এই বিবটি গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির
ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত
লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * *
সত্যজীৱনবাবুর পক্ষে গুণার বিষয় এই যে,
তাঁহারই অকুণ্ঠ পবিত্রনের কলে অভিনীত
দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্র গ্রন্থাকারে
প্রকাশিত হইল। * * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়'
বক্তব্যকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব
বিদূরিত করিয়াছে। এমনটা লেখক সাহিত্য-
ব্যোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৫.জধানী:

ওদের হাতে গুলী

শ্রীমতী নির্মালা সামন্তর জীবৎ-
কালে তিনি কখনও শোনে নি যে,
সরকারী পুলিশ চাল দেখলে গুলী
ছোঁড়ে। সাধারণ মানুষের মত তাঁরও
সম্ভবত ধারণা ছিল, দেশী পুলিশের
যেমন হালচাল তাতে চাল দেখলে বড়-
জোর তারা দুপসসা কামাই করার জন্য
জাল ফেলবে। অন্তত নির্মালা সামন্ত
যদি তেমন কোনও ধারণা মনে মনে
পোষণ করে থেকে থাকেন, তবে তিনি
অন্যায় কিছু করেন নি। অবশ্য
নির্মালা সামন্তর পক্ষে দেশের দৈনন্দিন
হালচাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা
সম্ভব নয়; কারণ যতদূর বোধ হয়,
শ্রীমতী সামন্ত নিয়মিত সংবাদপত্র
পড়তেন না। সুতরাং তাঁর
পক্ষে এ ধারণা করাও বোধ করি সম্ভব
ছিল না যে, রিক্সা, লরী, গরুর গাড়ি
বোঝাই চাল বিদেশে চালান হতে
দেখেও দেশে পুলিশ কাঠপুতুলী
জগন্নাথবৎ খাড়া থাকে। তাঁর পক্ষে
এ ধারণাও অসম্ভব ছিল যে, চাল-
চালানের ব্যবসায় পুলিশের বখরা না
থাকলে ও ব্যবসা এতকালে লাটে উঠত।
আর যেহেতু শ্রীমতী সামন্তর পক্ষে
এমত দূরদর্শিতা অপ্ৰত্যাশিত যে,
নদীয়ার পথে চোরা চাল-চালানের
ব্যাপারটা রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর নজরবন্দী
হওয়াব পর পুলিশকে চাল-ধরা জালে
কিছু কুঁচোচিড়ি ধরতেই হবে, অন্যথা
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর মর্ষাধা বজায় থাকে
না,—এই সমস্ত কারণেই হতভাগ্য
নির্মালা সামন্ত বাউড়িয়া স্টেশনে
বীব পুলিশের গুলী খেয়ে খাদ্য-
গ্রহণের সকল সাধ মিটিয়ে নিলেন।
দুঃখের বিষয়, যে সময় শ্রীমতী সামন্তকে
মাত্র দু-এক কোঁজি চাল ক্ষুদ্রিম্বস্তির
জন্য গোপনে গৃহে নিয়ে যেতে দেখে
বীর পুলিশের রাইফেল গর্জন করে
ওঠে, হয়ত সে সময় নির্মালা সামন্তর
অদ্ভুত জঠর বেবাক শূন্য ছিল। নির্মালা
সামন্তর কোঁচড়-ভরা চাল তাঁর পেট
ভরাবার শেষ ইচ্ছটুকুও পূরণ করতে
পারে নি; স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ছত্রাকারে
ছড়িয়ে পড়েছে।
নির্মালা সামন্ত ক্ষুধার অন্ন হয়ত
সংসারের ঘটি-বাটি বেচেই সংগ্রহ
করতে গিয়ে অবশেষে অপঘাত মৃত্যুর
মুহুর্তে চোর সাজলেন; আর এদেশের
ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়েই বহু মানুষ
মহাজন হয়েছেন। নির্মালা সামন্তর
অদ্ভুত সংসারে আর কতজন অনাহারে
দিন যাপন করছেন জানি না।
নির্মালা সামন্তর মৃত্যুতে কবি-



হালতু অশ্বলকে পূর্ণ রেশন এলাকাকৃত্ত করার দাবিতে মহিলাদের
বিক্ষোভ-মিছিল।

গরুর একটি ছয়ই ফিরে ফিরে মনে
পড়ছে:

“তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ,
আমি আজ চোর বটে!”

নির্মালা সামন্ত একটি মারাত্মক ভুল
করেছিলেন, তিনি সভয়ে না পালিয়ে
আঁচল থেকে কিছু পয়সা বার করার
অভিনয় করলে (জানি না, তবে সন্দেহ
হয়) হয়ত এ যাত্রা বেঁচে যেতেও
পারতেন। দুঃখের বিষয়, নির্মালা
সামন্তর পক্ষে একটি বহুব্যবহৃত
শ্লোক—“যাশ্মিন দেশে যদাচার” জানাও
অসম্ভব ছিল।

সুতরাং নির্মালা সামন্ত ষথেষ্ট
কার্যকারণগত মোগাযোগের ফলেই
পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছেন।
আমরা নির্মালা সামন্তর জন্য শোক
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অজ্ঞতার
জন্য দুঃখ প্রকাশও করছি।

নির্মালা সামন্তর বয়স বিশ বৎসর।
তিনি আরও বিশ বৎসর, অন্যান্য
অবস্থা সমান থাকলে, বাঁচতে পারতেন।
হতভাগিনী বিশ বছর আগেই মরে
বেঁচেছেন।

এমনি একটি ঘটনাকে বিধানসভার
ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য শ্রীঅপূর্বলাল
মজুমদার “নির্মম পৈশাচিক অভ্যাস”
হিসেবে অভিহিত করেন। বিধান
পরিষদে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন
করেন শ্রীনির্মল বসু।

অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জী বিষয়টি
গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং
আশ্বাস দিয়েছেন, এ বিষয়ে অবিলম্বে
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।
বলা বাহুল্য নির্মালা সামন্তর অদ্ভুত

আত্মার তাতে কিঞ্চিৎমাত্র উনিশ-বিশ
হবে না।

পুলিশেরও খুব যে একটা মশ
আসবে এমন মনে করার কারণ নেই,
কেন না বেশ জুঁসই রিপোর্ট পুলিশ
ইতিমধ্যেই একটা তৈরি করে ফেলেছে।

পরবর্তী অবস্থায় কারও যদি
কোনও লাভ একান্তই হয়, তবে সেটা
হবে খাদ্যদ্রব্যের। কারণ, দেশব্যাপী
রেশনিং চালু হলে তাঁরা অন্তত একটি
পেটের হিসাব অক্লেশে বাদ দিতে
পারবেন।

কলকাতার একটি পত্রিকার সংবাদ
চয়নে প্রকাশ, নিহত মহিলার
বয়স বিশ। ইনি মডিফায়েড
রেশনিং এলাকায় অন্যান্য কিছু মহিলার
মত চাল রিক্সা করতে আসছিলেন।
তাই গুলী।

অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশ,
নিহতের বয়স পঁচিশ। ইনি জলেশ্বর
থেকে দশ আনা কিলো দরে চাল কিনে
বাউড়িয়া আসছিলেন সংসারের অনটন
পূরণের তাগিদে। পথে গুলী।

উভয় পত্রিকায়ই প্রকাশ, নিহতের
সংখ্যা এক নম্বর, একাধিক, অর্থাৎ দুই।

ঘটনাগত পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের
উপরোক্ত মন্তব্য উভয় ক্ষেত্রেই (যেটাই
বাস্তব হোক) একই রূপ। কারণ
খাবার জন্যই হোক বা বেচে খাবার
জন্যই হোক, চালের পরিমাণ ছিল এত
কম যে, পুলিশ মশা মারতে কামান
দেগেছে এমন এক রাজ্যে যেখানে
আজও স্বার্থমদমস্ত মুনামাফিকারীরা
হাজার হাজার কুইন্টাল চাল নিয়ে
ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বহাল ভবিষ্যতে।

ধরা পড়ে নি একজন

আজও সেই কুখ্যাত চালকল মালিককে পদলিখ কোনই সম্মান করে উঠতে পারে নি, যে চালকল মালিক সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে ধান-চাল আমদানী করায় রাজ্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ তাঁকে ভারতরক্ষা বিধি-বলে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিল্লী যাওয়ার আগে বলে গেছিলেন, ফেরার আসামী যেখানেই থাকুন তাঁকে ধরা চাই-ই।

আজও (১১-১১-৬৫) এই কুখ্যাত ব্যবসারীর গ্রেফতারের কোনও সংবাদ নেই। প্রকাশ, উক্ত সরকারী নির্দেশ কার্যকরী হওয়ার সুযোগ ঘটে নি। কারণ নির্দেশটি পূর্বাভাসেই ফাঁস হয়ে যায়।

অতঃপর মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন।

নবজাত শিশু গায়েব

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কাশীপুর এলাকার শ্রীমতী অঞ্জুবালা চৌধুরীর সদ্যজাত পুত্র-শিশুটি হাসপাতাল হর্ম্য থেকে ঠাা নভেম্বর অক্সমাং গায়েব হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ শিশুর পিতা শ্রীপরিমল চৌধুরীকে পুত্রটি মৃত বলে সংবাদ পাঠান বটে, কিন্তু শ্রীচৌধুরী তাঁর মৃত পুত্রকে দেখতে চাইলে প্রথমে তাঁকে একটি মৃত কন্যার দেহ দেখানো হয়, তাও হাসপাতালে তিন ঘণ্টা অধৈর্য অপেক্ষার পর। পুত্রের বদলে তিনি দেখতে পান অপর কোনও হতভাগ্য পিতা-মাতার মৃত্যু কন্যাকে। শ্রীচৌধুরী কন্যাটি শ্রীমতী চৌধুরীর সন্তান নয় বলে জানালে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে আরও কিছুক্ষণ অধৈর্য অপেক্ষায় বাধ্য করেন। পরে শ্রীচৌধুরীর কাছে আনা হয় আর একটি ব্যান্ডেজ-আবৃত শিশু। মিথ্যা নয়, এবার মৃত শিশুটি পুত্র-সন্তানই ছিল বটে, কিন্তু শিশুটি যে শ্রীমতী চৌধুরীর নয়, শ্রীচৌধুরী তৎক্ষণাৎ তা সনাক্ত করেন। শ্রীচৌধুরী কাতরকণ্ঠে আপন শিশু ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন, অপেক্ষা করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। শ্রীপরিমল চৌধুরীর সন্তানকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেন নি। শিশুটি গায়েব হয়ে গেল।

নিখোঁজ শিশুর অনুসন্ধান পদলিখও ব্যর্থ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, কি আর করা যাবে, আমাদের করণীয় আমরা করছি।

দুঃখের বিষয়, হাসপাতালের কী করণীয় সংবাদে তা পরিস্ফুট নয়।

হাসপাতালের কর্তব্য কি একের মৃত সন্তান অপরের বলে ভেজাল চালান করা, নাকি একে জীবিত সন্তান নিখোঁজ হলে, তাকে মৃত বলে প্রচার করে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব স্থানকন করা? এ সমস্ত কিছুরই সুস্পষ্ট বোঝাবার উপায় নেই।

কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে, হাসপাতালগুলি সাধারণের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সেবাকার্য চালাতে বারম্বার ব্যর্থ হচ্ছেন। হাসপাতালে যে সতর্কতা যে সহমর্মিতা না থাকলে এক মহাবিনষ্টিকারী ভয়াবহ অবস্থার জন্ম হতে বাধ্য, আমাদের দেশীয় হাসপাতালগুলি সেই ব্যাধির শিকার। এখানে অনাচার ও অবস্থার পক্ষকুণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। সমাজজীবনে সার্বিক স্বার্থান্ধতার ক্ষয়রোগ এখানেও সংক্রামিত, আর তাই ভয়াবহ ফলশ্রুতি হাসপাতালকে দায়িত্ব-হীন, সমবেদনাহীন সরকারী অফিসের প্রটোটাইপে পর্যবসিত করেছে। এর প্রতিকার প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রতিকার হাসপাতাল কাড় দিয়ে হবে না। ডাক্তারী বিদ্যার্থীদের সূচনায় মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাঁরা চিকিৎসা-রত গ্রহণ করার সময় এই অনন্যসাধারণ কাজটিকে অনন্য-সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখতে শেখেন। মূলে পরিবর্তন না করে শাখা সংস্কার করলে এই সমস্ত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিভরযোগ্য করে তোলা অসম্ভব।

বেবী নিয়ে ব্যবসা

গত সোমবার ভুবানীপুর এলাকার জনৈক ব্যক্তির (কদাচ কুকাডে লিপ্ত ব্যক্তির নাম প্রকাশযোগ্য নয়) কারখানায় হানা দিয়ে কলকাতা পদলিখ পনের-শত টিন টাটকা প্রানের অপরিহার্য খাদ্য উদ্ধার করেন। শিশুদুঃখের অন্ন কেড়ে নিয়ে এই (নাম প্রকাশ করা অন্যান্য) ব্যবসাদার ব্যক্তি তাঁর সুগন্ধি কেশ তৈলের কারখানায় মোটা মুনাকার লোভে পনের শ' মণ বেবী ফুড লুকিয়ে রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্য, এই সমস্ত সমাজজীবনের দুঃস্বপ্নের পরিচয় তো জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করতেই মানা, এদের প্রতি প্রস্তুত শাস্তিও প্রত্যক্ষ নয়।

এদের প্রতি ব্যবহারে আমরা মধ্য-যুগীয় রীতি যদি গ্রহণ করতাম তা হলে অন্তত উল্টোরথে পুণ্ডলাভ হত। কিন্তু তা হবার নয়, কেন না এরা মহাজন ব্যক্তি; উপরোক্ত নিম্নলিখ সামন্ত কিংবা নিম্নলিখ মিশ্র নন।

হ্যাঁ, টিনবন্দী টাটকা প্রাপকেই

এরা গুদামবন্দী করে মুনাকার লুটছেন।

সম্প্রতি এই ভুবানীপুর এলাকায় একটি ওষুধের দোকানে জনৈক পদলিখ অফিসারকে (ডব্লু, বি, পি) রুম্মকণ্ঠে চাঁৎকার করে উঠতে শুনিয়েছিলাম,— আমার ছেলোটো মরে যাবে! আপনাদের বলে গেলাম 'তার মায়ের অপারেশন হচ্ছে, মায়ের দুধ বাচাটা পাবে না! দয়া করে আমার জন্য একটা টিন রাখবেন!...

ভদ্রলোক সরকারী পোষাকে খাড়া দেড়ঘণ্টা কাকুতি-মিনতি রাগ-বিরাগ প্রকাশ করে ওষুধ কারবারীর আর এক পদা চড়ানো উত্তর ও অঙ্গুলি নির্দেশে দোকান ছেড়ে অবশেষে ফুটপাথে নেমে যেতে বাধ্য হন। শূন্য হাত। ঘরে ফিরে কচি শিশুটার মুখে তুলে দেবার মত খাদ্য তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না।

ভদ্রলোকের অভিযোগ ছিল, যে সময় দোকানে 'কোটা' আসবার কথা তার আগে, সেই সময় এবং তার পরে ও বচসার কালে এই দোকানের ম্বার-দেইই তিনি ভিক্ষুকের মত বসে অপেক্ষা করেছেন। আশ্চর্য, দোকানে 'কোটা' এলই বা কখন আর দোকান-মালিকের কথামত—সেইদিনই বেলা তিনটে থেকে সম্ভ্রা পাঁচটার মধ্যে ফুরিয়েই বা গেল কখন। এই মহাবিস্ময়ের ঘোর তাঁর মতই আমার ও জমায়েত বহু মানুুষের চোখেই অশ্চর্য সৃষ্টি করেছিল।

ভুবানীপুর এলাকার বর্তমান লেখক নিজেও একাধিকবার অনুরূপ দুঃস্থল একই জায়গায় ভোগ করেছেন, তবে তখনও বড়বাজার ধোলাই হয় নি।

একবার তো এক টিন হাতে পেয়েও-ফস্ক গেল। ওষুধের দোকানে নয়, স্টেশনারী দোকানে। পাশেই ছিলেন আর এক ওষুধ বিক্রেতা। সং ব্যক্তি। থাকলে ন্যায্য দামেই বেবী ফুড দিয়েছেন প্রতিবেশী খরিন্দারদের। সেদিন ছিল না। তবে সম্মান দিলেন, পাশের দোকানের। বললেন, এই কিছুক্ষণ আগেই ঙ্গদের 'কোটা' পেয়ে-ছেন (বোধ করি গ্ল্যাঙ্কো) এখুনি যান। গেলাম। জনৈক ব্যক্তি আশ্বাস দিলেন, পাবেন, তবে একটু পরে। ঘুরে আসুন। ঘুরব কি মশায়, তখন আমার মাথা ঘুরছে। ভুবানীপুর থানার আশপাশে দোকানটিকে চোখে চোখে রেখে ঘুরপাক খেলাম কিছুক্ষণ। আবার গেলাম। এবার বরষক মালিক! বললেন, নেই!

বললাম, নেই কি শশায়। এখুনি, এখুনি গেল কোথায়।

বললেন, অমনিভাবেই যাক।
অমনিভাবেই যাচ্ছে। - আমরা
নিরুপায়।

কিন্তু উপায় আছে সরকারের
হাতে। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রে
জনৈক পত্রপ্রেরক একটি চমৎকার
'সাজেশন' রেখেছেন। তাঁর 'বক্তব্য',
রেশন কার্ডের মত বেবী ফুড কার্ড
করা হোক। যাতে কার্ডের মধ্যেও
কার্যচাপি সম্ভব না হয়, তার জন্য
একমাত্র একটি বার্থ সার্টিফিকেটের
পিঠে একটি কার্ড সরবরাহ করার
ব্যবস্থা হোক। বিনা কার্ডে বেবী
ফুড বিক্রয় বন্ধ হোক।

এর চেয়ে সুবন্দোবস্ত আর কী
হতে পারে, আমার জানা নেই।
ডাক্তারী সার্টিফিকেটে বেবী ফুড
সংগ্রহের ব্যবস্থায় ডাক্তারের আয়
ঘাড়াবার নতুন ফিকির আছে।
ডাক্তারকে আর কতভাবে জনসাধারণ
ঘুষ দেবেন। তাঁরা মোড়কেল বিল করার
জন্য ডাক্তারকে ঘুষ দেবেন, মোড়কেল
দীভ আদারের জন্য ডাক্তারকে ঘুষ দেবেন,
কোর্টে হাজিরা দেওয়ার অবশ্যপালনীয়
কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য
ডাক্তারকে ঘুষ দেবেন। এর পরেও
সরকার কি ডাক্তারী রোজগারের বাম-
কর প্রসারণে আরও সহায়তা করে
সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলবেন!

বার্থ সার্টিফিকেটের পিঠে বেবী
ফুড-এই সূচীকৃত শ্লোগানটিই
বরং বেবী ফুড সমস্যার সক্রিয় সমাধান
হিসেবে অবিলম্বে গৃহীত হোক।

কবির পেন্সন

এককালে কাব্য-প্রেমিক রাজা-
রাজড়া আপন কণ্ঠহার কবির গলায়
পায়ে দিয়ে নতজানু হয়ে শ্রম্মা
জানাতেন শ্রম্মটাকে। এখন কবি-
সাহিত্যিকগণ আজানুলম্বিত সেলাম
ঠুকে রাজ দরবারে অথবা সরকারী
মহলে সমাদর ভিক্ষা করে আসেন।
কাজে কাজেই তাঁদের প্রতি দেয় শ্রম্মা
আজ পেন্সন নামে সরকারী বদান্যতার
মুখাপেক্ষী।

বিদ্রোহী কবি নজরুলকে পাক
সরকার এমনি এক পেন্সনে লালিত
করেছেন। দূর্ভাগ্য, কবি আজ অসুস্থ,
নচেৎ কবির প্রতি এই সরকারী বদান্য-
তার দৃষ্টিসহ অন্ততপক্ষে সম্প্রতি-
কালের ঘটনায় পাকিস্তানী বৈয়াক্ষরিক
জবাব যে কবি সমুচিতভাবেই দিতেন
তা আমরা জানি।

কবির অসুস্থতার দরদ পাক

দৃষ্টিসহসের জবাব কবিপুত্র কাজী
সবাসাচী উপযুক্তভাবেই রেখেছেন।

পাক সরকার কবিকে মাসিক ৩৫০০
টাকা 'পেন্সন' দিতেন। সম্প্রতি পাক
ডেপুটি হাই কমিশন জানিয়েছেন,
অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের 'পেন্সন' তাঁদের
স্বঘরেই জমা আছে এবং যেহেতু কবি-
পুত্রদের মধ্যে কেউ অথবা কবি-
পরিবার অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রার্থী
সেই অর্থ জুলাই মাসের পর থেকে
গ্রহণ করতে আসেন নি। সেজন্য ঐ
অর্থ খরচ করা যায় নি।

কবিপুত্র সবাসাচী উত্তরে বলে-
ছেন, ঐ অর্থ গ্রহণের জন্য কোনো
প্রতিনিধির পাক ডেপুটি হাই কমিশনে
যওয়ার প্রয়োজন করে না। বর্তমান
পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ বখন ডাকে পাঠান
হয় ঐ অর্থও তেমন ডাকেই আসবে
বলে আশা করা হয়েছিল। কবির
প্রতি পাক সরকারের প্রতিটি ও শ্রম্মা
থাকলে তাঁরা তা জকেই পাঠাতেন।

বলা বাহুল্য 'পেন্সন' বলে যে বস্তু
দেওয়া হয় তা সরকারী দপ্তর থেকে
লাইনবন্দী অবস্থায় নিয়ে আসার যে
নিয়ম চালু আছে, বোধ করি, পাক
সরকার সেই নিয়মেই কবির পেন্সনও
প্রদান করবেন আশা করেছিলেন।
কবিপুত্র বিদ্রোহী কবির পক্ষে উপযুক্ত
জবাবই দিয়েছেন।

পাক সরকারের কবির প্রতি প্রীতি
ও শ্রম্মায় সন্দেহান হওয়ারও যথেষ্ট
কারণ আছে। কবি "হিন্দু না ওরা
মুসলিম?" এ জিজ্ঞাসার একটিমাত্র
জবাবই জানতেন সে জবাব, "কাঁড়ারী!
বলো, ডুবিয়ে মানুষ, সন্তান মোরা
মার!" বলা বাহুল্য, যে সরকার
"ভাগের মাঁকে কেটে ভাগ করে তারা
এক জাতি, এক প্রাণ, একতার কবিকে
মনে-প্রাণে যে শ্রম্মা করতে অক্ষম তা
সহজবোধ্য। গোড়া ধার্মিকতা কবিকে
প্রাণ জাতিচ্যুত করতে চেয়েছিল, সেই
ধর্ম্মশ্রম্মতার ওপরই যে সরকারের
প্রতিষ্ঠা সে সরকার কবিকে শ্রম্মা করে
কবির 'পেন্সন' ব্যবস্থা করেছেন
এতো বড় বিষম ব্যাপার অবিশ্বাস্য।

শুধু তাই নয়, পাক সরকার
পশ্চিমা মুসলিম প্রাধান্যে পরিচালিত
সরকার। সে সরকার একদিন পূর্ব-
বঙ্গে বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধের জন্য
রক্তগণ্ডা বইয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালী
কবির প্রতি সে সরকারের দরদ কত-
খানি তাও অনুমেয়।

এমতাবস্থায় পাক দূতাবাস যথার্থ
আচরণই করেছেন। 'পেন্সন' কুড়িয়ে
নিয়ে যান নি বলে অভিযোগ তুলে
ধরেছেন।

কবির অক্ষম অবস্থায় সাহায্যদান,
যে 'পেন্সন'ের উদ্দেশ্য, তাতে শ্রম্মা
যে থাকতেই হক তার কোনো কারণও
নেই। এটা বেকার ভাতা বা পঙ্গু
আতুর অনাথ ও বৃদ্ধ ভাতার মতই
একটা সরকারী ক্রিয়াও হতে পারে।

শিল্পীকে 'পেন্সন' দেওয়ার
প্রস্তাবই একটি মূঢ় ব্যবস্থা। এই মূঢ়-
তাই পাক দূতাবাসকে অমন হঠকারী
উক্তি করতে সহায়তা করেছে।

কবি-শিল্পীর ক্ষেত্রে 'সাহায্য'
'পেন্সন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারই
অব্যঞ্জনীয়। শ্রম্মায় সঙ্গো যে দান,
তাকে কোন অর্থে সাহায্য বলা যায়।
কবি-শিল্পীর পক্ষে এমনতর সাহায্য
সম্মান প্রত্যাহান করাই উচিত তা সে
সাহায্য যে কোনো সরকারের পক্ষ
থেকেই আসুক না কেন।

নোংরা বই-কাগজ

সম্প্রতি চৌরঙ্গী এলাকার গোয়েন্দা
বিভাগের কর্মীগণ কিছু অশ্লীল বই-
কাগজ বাজেয়াপ্ত করেছেন বলে সংবাদ
চোখে পড়ল। এরপর সেই পুঁঝানো
শ্লীলতা-অশ্লীলতার সংজ্ঞা নিয়ে
চটকাচটকি সূর্য হবে কিনা জানি না,
হলেও তাই নিয়ে রূপাল ঘামাতে
প্রবৃত্তি নেই।

অশ্লীলতার স্বপক্ষে অধুনা কিছু
দার্শনিক বাড়াবাড়ির খবর জানি। পক্ষ
সমর্থকদের বিবৃতিতে প্রায়ই মনে
হয়েছে, অশ্লীল শব্দটি যিনি উচ্চারণ
করেন, তাগড়াই দর্শনের পাতা খুলে
তাকেই অশ্লীল বলে প্রমাণ করে দেওয়া
হয়ে থাকে।

অশ্লীলতা সম্পর্কে ততক্ষণ
গবেষণা নেই বর্তমান লেখকের।
সামান্য কিছু ব্যক্তিগত ধারণা আছে
যার স্বপক্ষে অবশ্যই কোন দর্শন নিয়ে
টানা-হেঁচড়া করার অভীশাও নেই।

নগ্ন প্রকাশের মধ্যে সদভিপ্রায়
থাকলে তাকে সৌন্দর্য বলে মানি;
কিন্তু সংগৃহীত বাসনা চরিতার্থের
মানসে বিশেষাঙ্গ উলঙ্গ কবে তুলে
ধরলে তাকে অশ্লীলতা বলে জানি।

যে উলঙ্গ প্রকাশের মনোগত অভি-
প্রায় সাধারণগো উত্তেজনা সৃষ্টি করা,
যার দ্বারা চক্রান্তকারী শিল্পী চালু,
মানুষের মধ্যে বর্বরকে উজ্জীবিত করে,
তার অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করে ইতি-
হাসের শেষের পাতার দিকে তাকে
ঠেলে দিতে, সে অভিপ্রায়কে সুস্থ
বলে মানতে নারাজ। যদুমানসে প্রগতি-
চিন্তাকে ঠুটো করে দিয়ে সাহিত্য-শিল্প
অথবা বলা ভাল, এগুটির ছদ্মবেশী

সংস্করণ) যখন তাঁদের মধ্যে যৌন-
কুসংস্কার উদ্ভূত করে : যখন তাঁদের
সমাজধর্মী সৃষ্টিধর্মী উৎসাহকে
কুচেতনার দ্বারা পর্ষদস্ত করার কৌশল
অবলম্বন করে ও সমাজের অগ্রগতিতে
বাধাব্যবস্থাপন শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ
করে, তখন তাকে কদম্ব অশ্লীলতা
বলে ও দৃষ্টান্তে এই অনাচার
দমন করার জন্য সাধারণকে আগ্রহী
হওয়ার আবেদন জানাতে স্বাভাবিক-
ভাবেই বিচলিত আবেগ অনুভব করি।

যে রচনা রাত্রের দৃশ্যবর্ণন সৃষ্টির
সহায়ক, যে চেতনা মানবিক কর্তব্যের
মধ্যে পার্থক্য কর্তব্যকে বিশিষ্ট করে
দেখে, তার পেছনে দর্শন থাকলে সে
দর্শন প্রতিষ্ঠাবাদের দালালচক্রের
সৃষ্টি বলে সমগ্র পরিচয়্য করতে
আন্তরিক প্রেরণা বোধ করি।

বুদ্ধি অশ্লীল তাই, যা জীবনের
স্বাভাবিক গতিতে বন্ধে বন্ধ্য
আত্মচিন্তার সমাজবন্ধ জীবকে আবদ্ধ
রাখার অভিসন্ধি আঁটে।

জানি না, অশ্লীল পুস্তিকা
হিসেবে পুঁজি কোন কোন পুস্তিকা
ধাজিয়েছে। ভারতের অপর
এক রাজ্যে অশ্লীল পুস্তকের
তালিকায় এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ
সাহিত্যকে পর্ষদস্ত করা হয়েছিল
যাতে আমরা ইতিপূর্বে বিস্ময়বোধ
করতে বাধ্য হয়েছি।

অধীনের বক্তব্যে ধ্বংসাত্মক সৃষ্টির
দ্বারা সত্যকে আচ্ছন্ন করার বদ-
ভ্যাতীর প্রয়াস নেই। যা আমাদের
সৃষ্টিমূলক চিন্তাকে তিমিমাচ্ছন্ন করে
ব্যভিচারী বোনাচারে উন্মত্ত করে তাই
অশ্লীল এবং সে অশ্লীলতাকে সমাজ-
স্বার্থেই গলা টিপে মারা দরকার।
অন্যথা অশ্লীলতার আঁফে স্বার্থ-
প্রগোদিত চক্রীর দল সমগ্র যুবমানসে
ধ্বংস ধরিয়ে প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে
গুস্তহত্যা (প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা) করার
সুযোগ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে কোনও
চমকপ্রদ দর্শনের দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে
চিন্তাবিদ মাথেরই সমগ্র ব্যাপারটি
অনুধাবন করার সময় উপস্থিত
হয়েছে।

পুঁজি মাঝে-মাঝে অকস্মাৎ
উত্তেজনার বশে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে
বসেন। কিন্তু অশ্লীলতার বিরুদ্ধে
অভিধান পুঁজি ক্রমশঃ নয়।
অশ্লীলতার পক্ষপাত থেকে নিমজ্জ-
মান বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্ধার করার গুরু-
দায়িত্ব তরুণ বুদ্ধিজীবীদের। তাঁদের
ওপরই সংস্কৃতি ফ্রন্টের অভিযানের
সাফল্য একান্ত নির্ভরশীল।

চাবিশ পরগণা :

কচু-মুলাও দুর্লভ

ট্রেন লাইনের একপাশে কলকাতা
মহানগরীর পৌর এলাকা। পূর্ণ
রেশন পয়সা ফেলতে পারলে অবশ্য
লভ্য। ট্রেন লাইনের অপর পাশে
হালতু-গড়ফার হাল রোজদিনের হাহা-
কার। এ অঞ্চল সংশোধিত রেশন
এলাকা। 'রেশন' বললে ভুল হবে
খাদ্যে বিলকুল রাসনালাইজেশন।

হালতু এলাকায় শব্দ যে চাল নেই
তাই নয়, খাদ্য বলতে কচু-মুলাও
দুর্লভ। পকেটে পয়সা থাকলেও
পেটে কড়নিং-এর বেল্ট। পয়সা না
থাকলে খওয়ার প্রশ্ন নেই। মণিমালা-
পরিবারের পদাঙ্ক অনুসরণই ভাগ্য-

দ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা (২০), ১১-১১-৬৬
তারিখে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পর্ষায়
আলোচনার ১৪৩১ পৃষ্ঠার প্রথম
স্তম্ভের চতুর্থ প্যারার পাঠ নিম্নরূপ
ছিল : "সরকার ঠিকিয়েছেন, ঠিকিয়ে-
ছেন ও শিখিয়েছেন"। মৃদু বস্তুর
কারসাজিতে অন্যরূপ পাঠ প্রকাশ
হওয়ার জন্য আমরা দৃষ্টান্ত।

লিপি (মণিমালা পরিবারের সংবাদ
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে)।

এই দ্রুত খাদ্যভাবের তাড়নায়
গৃহবধু ও কন্যারা সৈদিন পথে নেমে
এসেছিলেন শোভাঘাটা সহকারে,
বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হালতুকে পূর্ণ
রেশন এলাকাভুক্ত করার দাবি নিয়ে।

এপার গণ্ডা, ওপার গণ্ডা নয়,
এপারে আহার, ওপারে অনাহার, মাঝ-
খানে একাকার ট্রেনলাইন। আশ্চর্য
ব্যবস্থা!

অবিলম্বে এই অব্যবস্থার প্রতিকার
না হলে অমহান অভুক্ত পরিবারবর্গকে
মহানগরী কলকাতার রাজপথেই বোধহয়
আহার সংগ্রহে ভিক্ষুকবেশে আসতে
হবে। কে জানে, কিছ্র মানুষ এজন্যই
রাজধানীর রাজপথে নতুন করে বাসা
বাঁধছেন কিনা।

বলা হচ্ছে, কলকাতায় ভিক্ষার
বেড়েছে। কিন্তু বাঁদের রাজপথে বসতি
স্থাপন করতে দেখা যায়, কই ভিক্ষা-
বৃত্তি তাঁদের পেশা বলে তো মনে হয়
না। পথচারীর পকেট লক্ষ্য করে এরা
এগিয়ে আসেন না। তবে কি অনা-
হারের কবলে নিশ্চিত মৃত্যুকে এড়াতে
এরা রাজপথে নয়া উদ্ভাসিত। হালতু

অঞ্চলের জনগণও কি সেই পথ ধরতে
বাধ্য হবেন? পেট কিছ্রই বাধ্য
মানে না।

সরকার যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা
গ্রহণ না করেন, তবে বাধ্যতামূলক
না জানি আমাদের সামনে কী
বিসদৃশ দৃশ্য উদ্ঘাটন করবে। সুতরাং
বিলম্বে অঘটনের সম্ভাবনা এড়ানোর
জন্য অবিলম্বে কিছ্র একটা করা
দরকার।

বট বৃক্ষ

বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে বটবৃক্ষ
অসামান্য। গৃহহীন প্রাকৃতিক
আচ্ছাদন, ক্রান্ত পৃথিবীর পথপ্রদে
প্রান্ত নিবারণ। আবার এর প্রচণ্ড
শক্তিশালী মূলরঞ্জ প্রকাশ অট্টালিকার
কঠোরবর্গেরও ক্ষমতা রাখে। বট
মহিমা তাই একাধারে প্রশান্তরূপ।

কিন্তু কে জানত একটি বটবৃক্ষকে
কেন্দ্র করে কয়েকটি দুর্লভ মানুষের
ওপর নেমে আসবে। সবলের উদ্ভত
অত্যাচারী বট। কে ভাবতে পারে
পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি বটগাছকে নিম্নলি-
করে কেটে ফেলার প্রতিবাদে সাক্ষরিত
অভিযোগ রাখলে রেশনের চাল পর্ষদ
বন্ধ হয়ে যায়। কে জানত অঞ্চল-
প্রধানরা আজ এক-একটি খানজা খাঁ-এ
প্রমোদন পেয়েছেন। বাঁরা কয়েকটি
প্রতিবাদী মানুষকে শাস্তি দেওয়ার
জন্য অক্লেশে দশ হাজার টাকা মূল্যে
দুনীতি ক্রয় করার প্রকাশ্য হুমকি
ঘোষণা করে নিজেদের প্রাধান্য বজায়
রাখায় ডি ফ্যাক্টো অধিকার সম্বন্ধে
নিঃসন্দেহ। কে ভাবতে পারে,
স্বাধীন-গণতান্ত্রিক রাজ্যে সামন্ত-
তান্ত্রিক প্রভুরা, জন্ম নিচ্ছেন পণ্ডারতী
রাজ পরিবেশে।

বাঁরা ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে
করেন, তাঁরা 'হাতিয়ার' সংবাদ
সাপ্তাহিকের নিম্নোক্ত বিবরণটি
পড়ুন।

"বেড়গুম অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর
গ্রামসভায় পথের ধারে একটি বটবৃক্ষ
হঠাৎ নাকি কেটে দেওয়া হয়েছে।
শোনা যায় এ বটবৃক্ষের তলায় নাকি
বেড়গুম অঞ্চলের উপপ্রধান মহাশয়ের
একখণ্ড জমি আছে। তিনি নাকি
ইতিপূর্বে এ বৃক্ষের অধিক অংশ
কেটে দিয়েছিলেন এবং এবার
সুকৌশলে গাছটিকে একেবারে নিম্নলি-
করেছেন। ফলে গ্রামবাসীর ক্ষ-
হরে গ্রামসভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে
ছায়াদানকারী বৃক্ষটি ছেদন করার কারণ
জানতে চেয়ে নীরাস হয়ে পুনরায়
নাকি আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান

ও অশ্লীল প্রধানের কাছে এক আবেদন-পত্রে গাছটিকে কাটবার কারণ জানতে চেয়েছেন।

শোনা যায় এই আবেদনপত্রের কথা জানতে পেরে উপপ্রধান মহাশয় নাকি আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের ওপর ভীষণ খাপসা হয়ে খুব শাসাচ্ছেন। এমন কি স্বাক্ষর করার দরুণ নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ করে জেল খাটিয়ে শাস্তি করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। উপপ্রধান গ্রাম অধ্যক্ষ মহাশয় নাকি স্বাক্ষরকারীদের ওপর চটে গিয়ে শাসিয়ে বলেছেন, বাবু যদি ও হাজার টাকা খরচ করে তবে আমিও ও হাজার টাকা খরচ করব। মোট এই দশ হাজার টাকা ব্যয়ে স্বাক্ষরকারীদের শাস্তি করে ছাড়বেন যেন পঞ্চায়েত কর্তাদের ওপর কেউ কথাটি বলতে সাহসী না হয়। তাঁরা যখন পঞ্চায়েতের কর্তা হয়েছেন তখন তাঁরা যা করবেন সেটাই শিরোধার্য। এর মধ্যে আরার ভালমন্দ কি? এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কয়েকজন গ্রামসভার সদস্যও রয়েছেন।

শোনা যায় আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের কাহারও কাহারও রেশন-কার্ডের মাল নাকি উপপ্রধান মহাশয়ের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরা রেশন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তদন্ত-কালীন সময়ে উপপ্রধান মহাশয়ের অশ্লীল অপমানজনক মন্তব্যের জন্য নাকি গ্রামসভার ও অশ্লীলের কয়েকজন সদস্যও প্রতিবাদ করে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

আরও শোনা যায় উপপ্রধান মহাশয় নাকি জি, আর বিতরণ কালেও পুর্লিগের ভয় দেখিয়ে থাকেন। এবং তিনি নাকি খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই বটবৃক্ষটি ছেদন করার পর গত ১৫ই অক্টোবরের হাতিয়ারে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদে বি ডি ও মহোদয়ের তদন্ত চাওয়া হয়েছিল এবং গ্রামসভার বৈধ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তা ছাড়াও গাছ বিক্রি সম্বন্ধে প্রকাশ্য নীলাম ডাকা হয় নি কেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

একটি গাছ একটি অশ্লীল অধিবাসিবৃন্দের জীবনে মরণে যে এমন করে ওতোপ্রোত প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে, শহুরে মানুষ তা কল্পনায়ও ভাবতে পারেন না। কিন্তু এমনটাও হয়। আর শেষ পর্যন্ত গাছ নিয়ে গদীন নেওয়াও প্রকৃতি-পালিত জীবনে কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়। কিন্তু বেড়গুম অঞ্চলের ঘটনাবলী আক্রেপ্ত গাড়ুম করে

দিচ্ছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে অবিলম্বে দৃষ্ট প্রধানদের প্রাধান্য খতম না করলে গণতান্ত্রিক দেশে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার সমস্ত রকম জাতীয় প্রগতির পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ করে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে সচেতন হওয়া ও বিষবৃক্ষকে অশুকুরা-বস্থায় নিমূল করার একান্ত প্রয়োজন।

মালদহ:

শড়ার ঘুম নেই

পাদরি সম্প্রদায় বিদেশী হলে তো কথাই নেই, দিশী হলেও মেজাজে বিলিতি মাদক মিশ্রিত থাকে। বিলাতি কুটনীতিই পাদরি-জোন্সবার তলে তলে ঘোরে।

সম্প্রতি মালদহের বহুতারা ক্যাথলিক মিশন - ভারতভূমিতে একটি 'সাঁওতালভূমি' প্রতিষ্ঠার জন্য একটা নমুনা মানচিত্র পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

প্রকাশ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, এবং বিহারের সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়ার এই নয়া রাজ্যের এলাকারূপে বিচ্ছিন্ন করে, জনমত সৃষ্টির মানসে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ তাঁরা শুরু করেছেন ক্যাথলিক মিশনের চারিংশ প্রতিষ্ঠা দিনসে।

আরও প্রকাশ, দার্জিলিংস্থ জেসু-ইটস মিশনরীরা 'সাঁওতালভূমি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই কাগজও মালদহের 'সাঁওতাল'দের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মিশনরীরা যে বক্তব্য রেখেছেন তা যেমন অর্থোডক্স তেমনি বোকা-ভোলানো মূর্খতার নজীর। আসলে 'দুষ্কর্ম' ধরা পড়লে জবাব তার কিছই থাকে না। শূদ্ধ ধর্মকর্ম করেন যারা, তাঁরা নাকি তাঁদের সেই ধর্মস্থানগুলি নির্দেশ করার জন্যই অসীম সাহসে ভর করে ভারতভূমিতে 'সাঁওতালভূমি' নির্দেশ করেছেন মানচিত্র একে। যুক্তির কি বাঁধুনি।

এমন সব ব্যাপার অনায়াসে ঘটা সম্ভব হলে এরপর ভারতের বিভিন্ন অংশের নয়া মানচিত্র একে যদি কেউ কেউ দেখাতে শুরুর করেন, এইখানে 'টাটাভূমি', এখানে 'বাটাভূমি', সেইখানে 'বিড়লাভূমি', অমুক স্থানে 'দাশভূমি', তমুক জায়গাটা বাঙ্গুরভূমি তাহলেই বা কি বলার আছে। সৌভাগ্যত এসমস্ত জায়গা আপাতত নগর কলোনিতেই সম্মুখ আছে। কিন্তু ক্যাথলিক মিশন শাখা অফিস প্রদর্শনের জন্য যখন একেবারে 'নাগাভূমি'র মত

'সাঁওতালভূমি'র এ্যাডভোকেট হতে চাইছেন; তখন রামকৃষ্ণ মিশন ইংল্যান্ড আমেরিকায় 'আর কে মিশনভূমি' প্রতিষ্ঠা করে ম্যাপ একে ফেললে কেমন সাজাটি হত!

ধর্মিকদের নিয়ে অদ্যাবধি পৃথিবীতে শতবর্ষের যুদ্ধ অবাধে চলেছে। ধর্মপ্রাণ পাকিস্তান ধর্মের নামে কি কান্ডই না করছে। এর পরেও যদি ক্যাথলিক ধর্মের ধূজা ভারতবর্ষের মানচিত্রে পতাকা পুঁতে আরম্ভ করে তবে দেশের ভবিষ্যৎ গোম্মায় গেছে বুদ্ধিতে হবে।

শুনছি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ডি আই রুলের হাত অব্যাহত। ক্যাথলিক উৎসাহ নিবারণে ঐ জিনিসটিকে একটু গা ঝাড়া দেওয়ালে কেমন হয়।

কুচবিহার:

ইহা কি সত্য?

জানি না "ইহা সত্য" কি-না। কিন্তু আমাদের হাতে টাটকা অভিযোগ এসেছে।

অভিযোগ এসেছে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে কর্মরত জনৈক ডাক্তার ও জনৈক মহিলা ডাক্তার সম্পর্কে। এঁদের নামোক্ত অবাঞ্ছনীয় বোধে এঁদের স্বথাক্ষে পুং ডাক্তার ও মঃ ডাক্তাররূপে অভিহিত করা যাক।

অভিযোগে প্রকাশ, পুং ডাক্তার নাকি ঢালাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন এবং হাসপাতালের ওষুধ নিজস্ব প্রাইভেট ফার্মেসীবোধে যথেষ্ট বিতরণ (অর্থের বিনিময়ে অবশ্যই) করছেন স্বীয় মজ্জেলদের মধ্যে।

শোনা যায়, ইনিই নাকি স্বনামধন্য তিনি, যার কল্যাণে নীলরতন সরকার হাসপাতালে জনৈক মেঝাবী ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল। আমাদের ডাক্তারবাবু তখন ছিলেন সেখানকার হাউস-সার্জন। দ্রুতের বিষয় ভুলোক করিকর্মী ব্যক্তি। অন্যথা তাঁর বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটি যে কটি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, সরকারী চাকুরিয়ার খাতা থেকে নাম কাটা যাবার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কার্যত তা যে হয় নি, বর্তমান আলোচনাই তার প্রমাণ।

ইনি ইতিপূর্বে কিছুকাল নাকি নেফ মেডিক্যাল সার্ভিসেও পয়সা খেয়েছেন। কিন্তু শান্তির সময় যে চাকরি বেশ দেয়তোয়, সম্বর্ষের কালে তাই আবার জীবন নিয়ে টানটানি করে। আলোচ্য পুং ডাক্তারের জীবনের দৃশ্য-কদম বোঁশ, সাধ-আহ্লাদ অনেক। তাই শহুরে মুখে ছই দিয়ে (নাকি

নিজের মন পড়িয়ে?) ইনি চীনা আক্রমণের সময় আমায়-গরল চাকরিটিতে ইন্তফা দিয়ে তুফানগঞ্জের হাসপাতালকে নিজস্ব ফার্মেসী করে দিয়া জুং করে বসেছেন।

এমত ডি-আই পি ডাক্তার যে কোনোদিন গোটা হাসপাতালটিই সুবিধামত খরিদারের কাছে সোজা ভি পি করে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ভয় পেয়েছেন তাই স্থানীয় লোকেরা, অভিযোগ এসেছে আমাদের হাতে।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, ময় ডাক্তার ব্যবসার লাইনে আর এককটি সরেস। তিনি নাকি কতিপয় ডাক্তার-বাবুর যোগসাজসে এখন কালো টাকা আমদানির ব্যবসা খুলে বসেছেন আর একটি সহজতর উপায়ে। চালান গোপন ক্লিনিক; বন্ধ ফটকের অন্তরালে ডেলিভারি কেস নাড়াচাড়া করা হয়। বলা বাহুল্য, হাসপাতালের কল্যাণে এরও নাকি ওষুধপত্রের অভাব নেই।

কিন্তু এসমস্তই উড়ো অভিযোগ। এগুলির সঙ্গে জনস্বার্থ গভীরভাবে জড়িত বলেই প্রকাশ করা। এ ব্যাপারে তদন্ত আমন্ত্রণই আসল উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেলে ভাল হয়।

মুদ্রাধিবাদ:

পৌরপিতার পিতৃভূমি

বহরমপুরের রাস্তাঘাট নব-নামাঙ্কিত করার জন্য অর্বাচীন পৌর-পিতাদের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা ও মতবিরোধের পর পৌরসভার মাসিক অধিবেশন নিষ্ফল ও আশাহত অবস্থায় প্রসমাপ্ত হয়। পৌরপিতারা নাকি বহরমপুর শহরের সরপিশুল আপনাপন পিতৃপুরুষের নামাঙ্কিত করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। সৌভাগ্যত কতিপয় বিরুদ্ধবাদী এজাতীয় সুযোগ স্থানবিরোধ প্রবল বিরোধিতা করলে প্রস্তাবকদের আশার দরিয়া শুকিয়ে যায়।

পৌরপিতাদের শহর অধিকারের এমন নজীর সচরাচর মেলে না। সাধারণত নয়া নামকরণে পৌরসভা দেশের বরোয়া নেতাদের কথাই চিন্তা করেন। বহরমপুর পিতৃভূমির নয়া নির্দেশন স্থাপন করল। তবু যে কেউ চক্ষুস্পর্শে ঘুচিয়ে নিজের নামকরণের জন্য ব্যবস্থা দেখান নি, বহরমপুরের ললাটে, এ-ও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। (সংবাদ-উৎস-স্থানীয় 'জনমত')

বর্ধমান:

না পারি তো কাজে পারি।

আলু চাষে নামডাক আছে কার্না, মেমারী, মতেশ্বর ও জামালপুরের। তবু চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। অপরাধ তাদের নয়, প্রকৃতিরও নয়, অবহেলা সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের। সার নেই তাই সুযোগ থাকলেও আবাদের প্রসার নেই এইসব অঞ্চলে। যেখানে এই সুবিধার্থী এলাকায় মিশ্র সারের জন্য প্রয়োজন পনের হাজার টন সুপার ফসফেট, সেখানে সার সরবরাহের একচেটিয়া অধিকারী, মেমারীস্থ বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন এন্ড মার্কেটিং সোসাইটি এ পর্যন্ত গৃহীতমাত্র করতে পেরেছেন মাত্র আড়াই হাজার টন সুপার ফসফেট। কৃষকসম্প্রদায় ফলত হতাশ। সমগ্র ও স্বল্প। আলু চাষের মরশুম কার্তিক মাসেই খতম। অথচ চাষের জন্য নান্য পল্কা। প্যাকেজ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী গাফিলতিয় দরুন তাঁরা পার্শ্ববর্তী হুগলী এলাকা থেকে সার সংগ্রহে বাধ্য হচ্ছেন।

কিন্তু এমন অনাচার বি ডি ও মশাইকে ক্ষুব্ধ করেছে। প্রকাশ তিনি জনা-তিনেক চাষীর আমদানীকৃত ৬০ বস্তা সার চাকদাঁঘি অঞ্চলে সীজ করেছেন।

বি ডি ও বিচারে গলদ নেই।

গলদ হল, ভাত দিতে না পেয়ে কিল মারার গোসাই সাজার প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সার দিতেও পারব না, আবার সার সংগ্রহ করতেও দেব না, অথচ অধিক ফলাও-এর ধুনি তুলব—এ সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা বিশৃঙ্খলত, কর্তব্যাক্ষমতার মতিভ্রমতার পরিচয় রাখছে। ফলত চাষের ক্ষতি হচ্ছে অপরিমেয়, যার 'হাস্যকর পরিপূরক' হয়ে উঠবে হয়ত শহর কলকাতার অট্টালিকা সংলগ্ন বাগান-বাগিচা।

নিজে সীজ ফলান

বর্ধমান প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রকল্প উন্নয়ন আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্ধমান পৌর এবং মফস্বল এলাকার যে সমস্ত নাগরিক সীজ উৎপাদনে ইচ্ছুক তাঁরা প্রত্যেকে সরকারী সাহায্য হিসেবে এক হাজারটি পর্যন্ত চারা ও প্রায় দুই টাকা মূল্যের বীজ সম্বাহারের জন্য পেতে পারেন। এজন্য স্ব-স্ব চাহিদা জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তাঁরা। সীজ চারার মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টাটো, লঙ্কা ইত্যাদি পাওয়া বাচ্ছে।

যোগাযোগ কেন্দ্রঃ বর্ধমান পৌর-এলাকার জন্য, রাষ্ট্রীয় বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র; বিভিন্ন অঞ্চলবাসী, বি. ডি ও অফিস; রাণীগঞ্জ-আসানসোল পৌর-বাসী কাকসা সরকারী ফার্ম; কালনা-কাটোয়াবাসিগণ সহকারী বীজ উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট এ চারা ও বীজ পাবেন। (সংবাদ, 'দামোদর')

এ সমস্ত সরকারী বিস্তৃতিও কেমন একটি এলোমেলো প্রশাসনের পরিচয় বহন করে না কি? যে বর্ধমানে আলু চাষের সার যোগানে হাতটান পড়ায় চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। সেখানেই অধিকতর সীজ-চারার সরকারী ব্যবস্থা।

ছুত্তভোগীর অভিযোগ

রায়না পহলানপুরের জনৈক অঞ্চলবাসী আমাদের দস্তরে কয়েকটি অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর পত্রের স্থান বিশেষ নিম্নরূপঃ

রায়না দু নম্বর রকের পহলানপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধিকাংশই চাষী ও কৃষি-মজুর শ্রেণীর মানুষ। পহলান-পুর বর্ধমান-হুগলী জেলার সীমান্ত-বর্তী অঞ্চল। এখানের জমিতে ধান ও আলুর ফলনই বেশি। অন্যান্য ফসল জলাভাবে জন্মায় না। কাছাকাছি কোনো ক্যানেল ব্যবস্থাও নেই। মাইল চার-পাঁচ দূরে একটি ক্যানেল আছে বটে, তবে তাতে সুবিধা বড় একটা হয় না। কারণ অসমতল কাঠে জল আনা অসম্ভব।

রাস্তাঘাটের অব্যবস্থাও অঞ্চল-বাসীদের ভোগান্তির কারণ। উত্তরে রায়না মাইল বার পথ। দক্ষিণে আরাম-বাগ দশ মাইল। পূর্বে তারকেশ্বর পনের মাইল আর পশ্চিমে কুলচন্দ্রপুর নয় মাইল। সহজ রাস্তার যোগাযোগ নেই। মাঝে রায়না আরামবাগের মধ্যে কুড়ি মাইল রাস্তা সরকারী অনু-মোদনের সৌভাগ্যলাভ করেছিল, আজ অবধি কোনো সুব্যবস্থা হয় নি।

কর্মহানির আশঙ্কা: "বর্তমানে এখানকার ধানকলগুদাল চালান বন্ধ করিয়েছে। এখন মানুষের ধান কাটার সময়...। প্রত্যেকের-বহু মজুর প্রয়োজন। কিন্তু কলগুদাল সব বন্ধ। আবার টেকির প্রচলন করিয়া অতলেকের খাদ্য জোটাণোও প্রায় অসম্ভব। ফলে মাঠের ধান্য ঘরে তোলাও এবছর অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।..."

মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন। অভিযোগের প্রতি উপযুক্ত কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা।

ভূমিকা

[যে সকল বর্ষর জাতি সুপ্রাচীন রোম-দাদ্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, তাদের মধ্যে টিউটন জাতি অন্যতম। আধুনিক ইউরোপীয়দের মধ্যে টিউটন রক্তের প্রভাব বর্তমান। টিউটন সংস্কৃতির অধিকাংশই মধ্য ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে ইউরোপের অপরাপর অংশেও এই সংস্কৃতির প্রভাব যে একেবারে নেই তা নয়। খ্রিস্টানরা টিউটন জাতির বর্ষর আখ্যা দিলেও, বাস্তবিকক্ষেত্রে তারা বর্ষর ছিল না। তাদের নিজস্ব ধর্ম, দেবদেবী এবং ইতিহাস-পুঁথিাদি বর্তমান ছিল। তাদের দেবতা ওর্ডিন ও ধরের নামে ইরাজী বৃষ ও বৃষপতি-বাবের নামকরণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য খ্রিস্টান হয়ে যায়, অথবা হতে বাধ্য হয়। তাদের লোকগাথাসমূহ অত্যন্ত প্রাচীন, এবং যুগপ্রভাবে সেগুলির অধিকাংশই মূল্য হতে গেছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই বেশিরভাগ এখনো স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যে টিকে আছে। টিউটন গাথাসমূহের কিছুটা অংশ খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল, এগুলির নাম এড্ডা; তা ছাড়া বাওয়ালফ, নিবেলুংগেনলিড্ প্রভৃতি কাহিনীগুলিও উল্লেখযোগ্য। গত শতাব্দীতে রাইডবার্গ, গ্রিম, হল, ম্যাককজি, ফ্রেজার প্রমুখ পাণ্ডিত্যবর্গ টিউটন লোকগাথাসমূহের উপর যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। পবিত্রী-কালের ইউরোপীয় সাহিত্যে টিউটন জাতির কথা ও কাহিনী বর্ষর প্রভাব আছে। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট নাটকের কাহিনী সরাসরি টিউটন উপাখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে। আরও অনেক লেখক ও কবি টিউটন লোকগাথা থেকে রচনার উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন।]

দ্বর্গ-মর্ত-পাতাল ও দেবদেবী

টিউটন-পুঁথিতে বর্ণিত বিশ্ব-সৃষ্টির কাহিনী বহুলাংশে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণিত বিশ্বের অনুরূপ, তবে ঋগ্বেদের দার্শনিকতা এখনো অনুপস্থিত। সৃষ্টির আদিতে একটি অসীম শূন্যমণ্ডলের কম্পনা, টিউটন ডাবায় বার নাম পি-নুন-গা-গাপ, প্রথম সৃষ্টি হিসাবে কাল বা সময়ের ধারণা—ইত্যাদি কভকগুলি বিষয়ে বৈদিক চিন্তার সঙ্গে আদি টিউটন চিন্তার মিল আছে, কিন্তু বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবীর নাম মিডগার্ড, তাই চার্বিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। উপরে আশগার্ড, “আশা” উপাধিধারী দেবতাদের বিচরণস্থল; তারপর ভানা-হাইম, যেখানে “ভানা” উপাধিধারী দেবতারা বাস করেন; পূর্বে আলফ-হাইম যেখানে বামনরা বাস করে; নিম্নে নিফেল-হাইম বা নবক; মিডগার্ডের নীচে হেলা নামক প্রান্তর, আরও নিম্নে মুসপেল-হাইম—এগুলি অনেকটা



ইন্দুলোক গোলোকের মত; উত্তর-পূর্ব কোণে জোতান-হাইম যেখানে দৈত্যগণ বাস করে।

টিউটনদের কম্পনাব প্রথম সৃষ্টি সন্তান নাম ইমেন বা মিমর এবং দ্বিতীয় জন বুয়ে। মিমরের বাহু থেকে জম্মাল একটি পুত্র ও একটি কন্যা, মিমের এবং বেস্টলা, এবং পা-থেকে জম্মাল দানব ট্রিম-কুর-সয়।

মিমের থেকে জম্মাল “ভানা” দেবগণ, আর বুয়ের থেকে জম্মাল বোর যে “আশা” দেবতাদের মধ্যে প্রথম। বোরের সঙ্গে বিবাহ হল মিমের-ভানী বেস্টলার। এদের তিনটি সন্তান—জোন্ড ওর্ডিন, মধ্যম ভে বা হোনার এবং কনিষ্ঠ ভাইল বা লোডার বা লোকিক। এ-ছাড়া অপরাপর বহু দেবতার সৃষ্টি হল।

একচক্রে ওর্ডিন ছিলেন দেবতাদের প্রধান। তাঁর একটি চক্র তিনি জ্ঞানলাভের জন্য মিমেরকে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। তিনি

জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবীগণের রানী জিগেন গর্ভে। জিগেন ছিলেন রাত্রিদেবী নাট-এর কন্যা, এবং নুজরডের ভগিনী। নুজরড ছিলেন “ভানা” গোষ্ঠীর দেবতা, দেবতা ফ্রে এবং দেবী ফ্রেজার পিতা। এ-ছাড়া ছিলেন বৃষ-দেবতা টাইর, সঙ্গীত ও কাবের দেবতা ব্রজ বারি স্ত্রী ছিলেন যোবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইডান।

পাপের অনুপ্রবেশ

ওর্ডিনের ছোট ভাই লোকিক ছিল অন্য এবং দুর্বুদ্ধি। দেবতাদের শত্রু, হিম দৈত্যরা যারা বাস করত জোতান-হাইমে। দৈত্যরা যারা বাস করত জোতান-হাইমে। আব তাদের নেতা প্রেপ-এর ইচ্ছা ছিল সুন্দরী ফ্রেজা দেবীকে উপভোগ করা। তারা গুলডেগ-হেডার নামক একটি সুন্দরী তবুণীকে আশগার্ডে পাঠালো। সে কৌশলে ফ্রেজা দেবীর সহচরী হল এবং তাকে প্রলোভিত করতে লাগল দৈত্যপুত্রীতে যাবার জন্য। তা ছাড়া সে লোকিক সঙ্গে প্রেম করল ও তাকে বিবাহ কবল। লোকিক হল তার কুকর্মের সহায়।

এদিকে দানবদের সঙ্গে বৃষের আশংকা দেবতারা দুর্গ নির্মাণে মনোযোগী হল। ইত্যবসরে লোকিক একটি বামন কাবিগরকে এনে হাজির করল যে দেবতাদের আশ্বাস দিল যে সে একটি শীতকালের মধ্যে দুর্গ তৈরি করে দেবে। কিন্তু বিনিময়ে তার চাই ফ্রেজা দেবীকে। আসলে সে ছিল একটি ছদ্মবেশী ভূবার দানব। এই প্রস্তাব দেবতাদের রুচিকর হল না, কিন্তু লোকিক বোঝাল যে একটি শীতের মধ্যে দুর্গ তৈরি হওয়া অসম্ভব। কাজেই এই ব্রকম একটা চুক্তিতে কোন দোষ নেই। কাজেই দেবতারা তার সত্তে রাজী হল, তবে কথা রইল যে, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ সম্পূর্ণ না হয়, তা হলে ফ্রেজা দেবীকে দেবার কোন কথাই উঠতে পারবে না।

নরেন ডট্টাচার্য

সুপ্রাণারী ছিলেন। এক দুর্লভ সুবার অধিকারী ছিলেন সৃষ্টিগড়র নামক একজন দেবতা, যিনি সাত্তর নামক পাতালে দৈত্যদের আশ্রয়ে বাস করতেন এবং দৈত্যকন্যা গুনলাভের প্রেমিক ছিলেন। ওর্ডিন সৃষ্টিগড়রের রূপ ধারণ করে দৈত্যপুত্রীতে প্রবেশ করলেন এবং গুনলাভকে বিবাহ করে তাঁর সহায়তায় দুর্লভ সুবা অগ্রহরণ করে নিরে এলেন। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র, তিনি সেই দৈত্যকন্যাকে প্রবঞ্চিত করলেন। ওর্ডিন ছিলেন জগতের আদি কবি। তাঁর বাহুবী ছিলেন দেবী সাগা, বার নিকটে বসে তিনি রাতের পর রাত প্রাচীন কাহিনী শুনতেন। ওর্ডিনের দৈহিক শক্তি, বীর্য, কৌশল, জ্ঞান, হঠকারিতা এবং সুপ্রিয়তা ইন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওর্ডিনের পুত্র ছিলেন ধর, বার গর্ভ-ধারিণী ছিলেন পৃথিবী দেবী জর্ড। তাঁর অপর পুত্র ছিলেন সুন্দর বলভার, যিনি

ফলে সেই বান্দন দানব যখন চূড় কাছ
করতে লাগল, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই
সে ফাজ সম্পন্ন করবে এমন সম্ভাবনা দেখা
দেখল। ফলে দেবতার লোকিকে চেপে ধরল,
করণ সেই দেবতার মন্থনা দিয়েছিল।
প্রাণভয়ে লোকি জানাল যে, সে যাহোক একটা
ব্যবস্থা করবে যাতে ফেজা দেবীকে দিতে না
হয়। একদিন রাতে সে কারিগরের খোঁড়া
চুরি করল। তখন সেই কারিগরদুপী দানব
যখন যে দেবতারা, তাকে প্রবঞ্চিত করার
চেষ্টা করছে। সে তখন দেবতার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ঘোষণা করল। সেই যুদ্ধে দেবতা ধর
হাতুড়ীর আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

লোকির অভিসন্ধি ব্যর্থ হল, কিন্তু সে
তার কুবাস্থি ত্যাগ করল না। দেবী সিন্ধু
ছিলেন টিউটনদের লক্ষ্যদেবী। তাঁর
কেশরাশি ছিল ফসল, আর সেজন্যই দেব-
গণের এত সমৃদ্ধি। একদিন রাতে, যখন দেবী
গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন, লোকি তার সমুদয়
কেশ একটি ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে নিল।
পরদিন দেবতারা তা জানতে পেরে লোকিকে
চাপে ধরল। প্রাণভয়ে লোকি প্রতিজ্ঞা করল
যে, সে সিন্ধুর কেশ এনে দেবে এবং
দেবতার আরও অনেক উপহার দেবে।

অন্তঃপুর লোকি পাতালে গেল। যেখানে
দুই গোষ্ঠীর বান্দন কাবিগর ছিল—আইভালড
গোষ্ঠী আর সিন্ধুর গোষ্ঠী। আইভালডদের
কাজ গিয়ে লোকি অনুরোধ করল 'দেবী
সিন্ধুর সোনালী চুল তৈরি কবে দেবার জন্য।
তারা তা তৈরি করে দিল; এ ছাড়া তারা
আরও তৈরি করল ওড়নের জন্য একটি বর্শা
এবং ফের জন্ম একটি জাহাজ। দেবতারা
খুশি হলেন।

এইবার লোকি আবার ভাল চাল চলে
দিল। সিন্ধুর কাছে গিয়ে সে বলল যে তারা
আইভালডের গোষ্ঠীর মত ভাল কারিগর নয়।
ফলে সিন্ধুর নায়ক ব্রোক লোকিকে
চ্যালেঞ্জ করল। তারা বলল যে তাদের তৈরি
জিনিস যদি আইভালডদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়
তা হলে তাবা লোকি মাথা নেনে। লোকি
রাঙ্গী হল।

দেবতারের বিচারে সিন্ধুরের সামগ্রী
আইভালডদের চেয়ে উৎকৃষ্টের ঘোষিত হল।
তখনই সিন্ধুরের নেতা ব্রোক পূর্ব চুক্তির
লোকির মাথা দাবি করল। তখন লোকি
বলল, 'মাথা দেবার চুক্তি হয়েছে মাথা নাও,
কিন্তু ঘাড়ের বেন কোন ক্ষতি না হয়, ঘাড়
সম্বন্ধে তো কোন চুক্তি নেই।' দেবতারা
লোকিকেই সমর্থন করল।

এইভাবে প্রবঞ্চিত হয়ে ব্রোক ও-তাব
অনুগামী সিন্ধুরা দেবতাদের উপর ক্ষেপে
গেল। এদিকে আবার আইভালডদের জিনিস
ধারণ বলার তারাও ক্রুদ্ধ হল। তাবা সবাই
দৈত্যদের পক্ষ অবলম্বন করল, তা ছাড়া
অন্যও একটি অঘটন ঘটল। লোকির শত্রু
দুলভেগ-হোভারের প্ররোচনার ফেজা দেবী

দৈত্যপুত্রীতে পালিয়ে গেলেন। সেখানে দৈত্য
বেলী তাকে বন্দী করল। ফলে দেবাসুর
সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠল।

দেবাসুর যুদ্ধ

আইভালড ছিল সেই সৃষ্টিগত যার
বাগদস্তা গুললাডকে ওড়িন অপহরণ করে-
ছিলেন। তার শ্বিতীয়া পত্নী ছিল দৈত্যকন্যা
গ্রেইপ যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল
থ-জাস-সে-ভালাড, ওরভাডেল এংগল এবং
আইড যাদের অপূর নাম ছিল যথাক্রমে
হিউকি, হেজেল্ট এবং গেল্ডার। আই-
ভালডরা এবং সিন্ধুরা অতঃপর দেবতাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তারা দেবতা
ক্ষে-কে বন্দী করল। তখন দেবতা নুজরড
সন্ধি করার জন্য গেলেন; সঙ্গে গেলেন
দেবতা বলভাবের ভাই হোভার (ইনি তখনো
অম্ব হন নি)। কিন্তু কোন সম্মানজনক সত-
উপস্থিত হওয়া গেল না। ক্ষে-কে তারা
বন্দী করে রেখেছিল বেলীর কাছে যেখানে
দেবী ফেজাও বন্দী ছিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ
হয়ে হোভার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, কিন্তু
আইভালডদের হারাতে পারলেন না।

আইভালডরা অতঃপর উত্তর দিকে যাত্রা
করল। দেবতাদের বিচরণভূমি অশগাড দখল
করার জন্য। ভোলাড কর্মশালায় গিয়ে
একটি তরবার প্রস্তুত করেছিল, তা ছিল
ধরার হাতুড়ীর চেয়েও মারাত্মক। এই তরবারি
নিরে সে দেবতাদের কচকাটা করবে এই ব্রকম
প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু যখন পিতামহ
মিমের (এর কথা আমরা আগেই বলেছি,
ইনি অনেকটা আমাদের ব্রহ্মার মত) তার
মন্তব্য বাক্যে পারলেন তখন তিনি সোজা
তাকে বন্দী করলেন, এবং সেই তরবারিটি
একটি গোপন স্থানে পুড়ে রাখলেন। পরে
অবশ্য এই তরবারি গিয়ে পড়েছিল
শ্বিপভাগের হাতে, সে কাহিনী পরে উল্লেখ
করব।

দেবতাদের সেনাপতি হলেন ধরার পুত্র
হালফডান। এদিকে ভোলাডের অবর্তমানে
ওরভাডেল হল দৈত্যদের সেনাপতি। হাল-
ফডান এবং ওরভাডেল ছিল পবনপন ভায়রা-
ভাই। হালফডানের স্ত্রী সিডনে এবং ওর-
ভাডেলের স্ত্রী গ্লোয়া ছিল দুই বোন
হালফডান তার শ্বশুর এবং
ওরভাডেলকে পবাজিত করে এবং ওর-
ভাডেলের স্ত্রী গ্লোয়াকে ধর্ষণ করে। এ
প্রতিশোধ নিয়েছিল ওরভাডেলের পুত্র
শ্বিপভাগ, চন্দ্রদেব তাকে মিমেরের লুকাইত
তরবারির স্থান দিয়েছিলেন; তাই নিয়ে সে
হালফডানকে নিহত করে। হালফডানের
পিতা পবাক্রমশালী এবং শ্বিপভাগের কাছে
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

দেবতারা অবশ্য শ্বিপভাগের বাঁহ
দর্শনে প্রীত হয়ে তাকে দেবমন্ডলীর একজন
বলে ঘোষণা করে।

ফেজা ও ইডান

শ্বিপভাগ তার বিমাতা সিন্ধু-এর কাছে
প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে ফেজাকে উদ্ধার
করবে তুষার দৈত্যদের কবল থেকে। এই
কারণে সে তার সং-ভাই উল-কে নিয়ে
জোভান-হাইমের অভিমুখে যাত্রা করল।
বেলীর সুদূর দুর্গে ফেজা ও ফে বন্দী
ছিল। শ্বিপভাগকে দেখে দৈত্যবা কিপ্ত
হয়ে উঠল এবং তাকে মেবে ফেলার জন্য
ছুটে এল, কিন্তু যেহেতু শ্বিপভাগের হাতে
ছিল মিমেরের মন্ত্রপুত তরবারি, সেই হেতু
তারা কিছুতেই তাকে এঁটে উঠতে পারল না।
নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্যে তারা একটি কৌশল
অবলম্বন করল। ফেজাকে তারা একটি পানীর
সেবন করল যার ফলে তার স্মৃতি লোপ
পেল। শ্বিপভাগ দৈত্যদের পরাজিত করে
ফেজা এবং ফেকে উদ্ধার করল। কিন্তু
ফে তার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করল, এই
আশঙ্কায় যে দেবতারা তাকে কাপদুষ বলে
উপহাস করবে।

শ্বিপভাগ ফেজাকে ভালবেসে ফেলেছিল।
কিন্তু দৈত্যগণপ্রদত্ত পানীর প্রভাবে ফেজার
স্মৃতি লুপ্ত হয়েছে। শ্বিপভাগের অজস্র
অনুরোধে সে কোন কথা বলল না, এমন কি
তাকে উদ্ধার করার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করল না। তখন বিব্রত হয়ে
শ্বিপভাগ তাকে পবিত্যাগ করল। কিন্তু
কিছুকাল পরে তাব আবার মনে অনুতাপ
জাগল। তাকে সে খুঁজে আনল এবং বিবাহ
করল। কিন্তু ফেজা কোন কথাই বলল না।
বাসরঘবে সে বইল নিবৃত্তাপ। কিন্তু ইতি-
মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। ফেজার হাতে
একটি মোমবারি ছিল। সেটি জ্বলতে
জ্বলতে যে মুহূর্তে এসে ফেজার হাতে
ঠেকল, তখনই ফেজার পূর্বস্মৃতি ফিবে এল।
সে প্রেমপূর্ণ নয়নে শ্বিপভাগের দিকে
তাকাল। কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্য।
পবক্ষণেই সে অদৃশ্য হয়ে পালিয়ে গেল
আশগাডে, দেবতাব বাজ্যে।

এদিকে আবার একটি দুর্দৈব স্বর্গে
অপেক্ষা করা হল। তা হচ্ছে দেবী ইডান
নিরুদ্ভূত হবার ফলে, ইডান ছিলেন যৌবনের
দেবী; প্রতিদিন একটি করে সোনালী আপেল
তিনি দেবগণকে দিভেন আর তা ভক্ষণ করে
দেবগণ নিজেদের যৌবন অটুট রাখতেন,
ইডান নিরুদ্ভূত হলে দেবতারা বৃদ্ধা হয়ে
যেতে লাগলেন। ফলে দেবগণের সন্দেহ
লোকির উপর গিয়ে পড়ল। চাপে পড়ে
লোকি স্বীকার করল যে সে ইডানকে দৈত্য
থ-জা-সে-ভোলাডের হাতে সমর্পণ করেছে।
প্রাণভয়ে লোকি আবার প্রতিজ্ঞা করল যে, সে
ইডানকে নিয়ে আসবে। সে গোপনে দৈত্য-
পুত্রীতে গেল এবং মন্ত্রবলে ইডানকে একটি
বাদাসে পবিত্র করে একটি পাখির রূপ ধারণ
করে মধ্যে করে নিয়ে চলে এল। এদিকে

জানতে পেরে দৈত্য ঋ-জা-সে-ভোলাও একটি ইগলের রূপ নিয়ে তাকে ভাঙা-করল, কিন্তু ধরের হাতে সে নিহত হল।

এদিকে স্বিপডাগ ফ্রেন্সের জন্য আশগাড'র অভিমুখে এক কটকির যাত্রা শুরুর করল এবং বহু পরিশ্রমে সে ফ্রেন্সকে খুঁজে পেল। এবার তাদের মিলন হল সার্থক। স্বিপডাগের এই প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তি নিয়ে অনেক কাব্য লেখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে দেবতা নৃজবড তার পুত্র ফ্রেন্সকে উদ্ধারের জন্য জোতান-হাইসে অভিযান করলেন। দৈত্য বেল ফ্রেন্স হাতে নিহত হল এবং ফ্রেন্স স্বর্গে চলে এল। স্বিপডাগ তাকে সেই বিজয়-ভরবারি উপহার দিল।

বিজয় ভরবারির হস্তান্তর

এদিকে দৈত্য ঋ-জা-সে-ভোলাও ধর কর্তৃক নিহত হলে তার কন্যা স্কেন্ড যুদ্ধাস্ত্র ও বর্ম সজ্জিত হয়ে স্বর্গে গিয়ে একে একে দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করল। তার বক্তব্য ছিল তার পিতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। দেবগণও তার বক্তব্য সারবস্তা স্বীকার করল। অতঃপর তাকে প্রসন্ন করার জন্য লোকি একটি ছাগল নিয়ে তার সামনে নৃত্য করতে লাগল। তা দেখে স্কেন্ড হেসে ফেলল। তখন ওডিন তাকে বোঝালেন যে তার পিতা-মত্যুর পর, পরম গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন তার মত সুন্দরীর পক্ষে কতব্য কোন একজন দেবতাকে বিবাহ করে অগেই বাস করা।

স্কেন্ড রাজ্ঞী হল, কিন্তু তাব নজর পড়েছিল সুন্দর দেবতা বলডারের উপর। সত' হল, দেবতারার তার সামনে দাঁড়িয়ে এবং সে পায়ে বড়ো আঙুল দেখে স্বামী পছন্দ কববে। (এই বাঁটি আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে বর্তমান ছিল, এখনো কোথাও কোথাও আছে।)। এভাবে তার বরতে যে ছোটল সে হচ্ছে নরড, ফ্রেন্সের পিতা। সে তার ঘর করতে লাগল, যদিও তার মন পড়েছিল বলডারের উপর।

এদিকে নৃজবডের পুত্র ফ্রেন্স জীবনেও এসন্ত এসেছে। দৈত্য গাইমেরের কন্যা গেরড-কে দেখে সে প্রায় পাগল হবার যোগাড় হল। তার এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য তার পিতা স্বিপডাগকে অনুবোধ করলেন। দেবগোষ্ঠীতে প্রবিন্ট হবার পর তার নাম হয়েছিল স্কিরনার। সে ফ্রেন্স মনের কথা নিয়ে তা দেবগণকে জানাল। অতঃপর দেবগণ প্রদত্ত যৌতুক নিয়ে স্কিরনার দৈত্য গাইমেরের আলয়ে যাত্রা করল। বহু কৌশলে সে গেরডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানাল তাব প্রতি ফ্রেন্স ভালবাসার কথা। কিন্তু দৈত্যকন্যা গেরড সুন্দরী হলেও ছিল কঠিনহৃদয়া। ভাল কথায় যখন তার মন গলান গেল না তখন স্কিরনার তাকে ভীতি প্রদর্শন করল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দৈত্য-

কন্যা গেরড রাজ্ঞী হল একটি সত'। সত'টি হচ্ছে এই যে সেই বিজয়-ভরবারি তার পিতাকে দিতে হবে।

ফ্রেন্স মনস্কামনা পূর্ণ হল। দৈত্যকন্যাকে সে লাভ করল। কিন্তু বিনিময়ে সেই বিজয়-ভরবারি শেষ পর্যন্ত দৈত্যদের হাতে ভুলে দিতে হল। তাই লোকি ফ্রেন্সকে বাঙ্গ করে বলল: “এরপর যেদিন দৈত্যারা স্বর্গপর্বাতে চড়াও হবে, সেদিন পর্যন্ত তুমি জানবে না, কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়া সম্ভব।”

আশগাডের পতন

বার বার বিপর্যয়ের পর দেবগণ সেপুলির কারণ বিচার করতে বসল। তারা সন্দেহ করল লোকির স্ত্রী গুলভেগ-হোডারকে কেন-না সেই ফ্রেন্সকে ক'সলে নিয়ে গিয়ে-কেন-না সেই ফ্রেন্সকে ক'সলে নিয়ে গিয়ে-ছিল। সে তখনো ছন্দরূপে স্বর্গে বাস দেবতারার তাকে হত্যা কবল এবং তার দেহটিকে গুড়িয়ে ছাই করে দিল। কিন্তু তার ক্রটিপট্টাকে পোড়ান গেল না এবং লোকি সকলের অগোচরে সেটি খেয়ে নিল। কিন্তু এত করেও তাকে বিনষ্ট কবা গেল না, কেন-না পাপের বিনাশ নেই। সে দৈত্যপর্বাতে বাস করতে লাগল। অবশ্য তার আর স্বর্গে আসাব উপায় রইল না।

কিন্তু সে মাঝ গেলো তার কন্যা রইল। হাসলে সে দৈত্যপর্বাতে ছিল গাইমেরের স্ত্রী, এবং স্বর্গপর্বাতে লোকির। ফ্রেন্স পত্নী গেবড তাবই কন্যা। ফ্রেন্সের পিতা নৃজবডের স্ত্রী স্কেন্ডও দৈত্যকন্যা। ফ্রেন্স “আশা” দেবতাদের সঙ্গে “ভানা” দেবতাদের বিরোধ শুরুর হল। এবং পরিণামে “ভানা”

দেবতারার জয়লাভ কবল। “ভানা” দেবতাদের প্রধান ছিল নৃজরড, ফ্রেন্স, উল এবং স্বিপডাগ।

এদিকে যখন স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, পৃথিবীতেও তখন মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। স্বিপডাগের প্রজাদের যুদ্ধ আরম্ভ হল। স্বিপডাগের প্রজাদের সঙ্গে ধরের পুত্র হাসফডানের প্রজাদের। আমদা আগেই উল্লেখ করেছি যে, স্বিপডাগের নিকট হালফডান পরাজিত ও নিহত হয়েছিল। হালফডানের দুই পুত্র—হ্যাডিং এবং গুডহর্ম। হ্যাডিংকে ওডিন মানুষ করেন এবং তাকে বড় একজন বোম্বা করে তোলেন। পৃথিবীতে এই দুই ভাই-এর প্রজাদের সঙ্গে স্বিপডাগের প্রজাদের বিরোধ উপস্থিত হলে স্বিপডাগ নিজে তার মীমাংসা করতে আসে। উভয়কেই সে রাজ্যখণ্ড দিতে চায়, কিন্তু হ্যাডিং বাধ্য হয় না। কিন্তু গুডহর্ম স্বিপডাগের প্রস্তাব মেনে নেয় এবং সে ডেন জাতির অধীশ্বর হয়।

হ্যাডিং প্রতিজ্ঞা করে যে পিতৃহত্যা স্বিপডাগকে সে হত্যা না করা পর্যন্ত চুল-দাড়ি কাটবে না। তার সুইডিশ বাহিনীকে সে স্বিপডাগ এবং গুডহর্মের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে (এখানেই ডেনমার্ক ও সুইডেনের আদিমতন্ত্র পর্যায়ের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে)। এখানেও লোকি তার চিরন্তন ভেদনীতির খেলা শুরুর কববেছিল। হ্যাডিং পরাজিত হয়ে তার প্রাণিনী হার্ডগ্রেপকে সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করল।

এবং একটি কয়লা কাহিনী। হ্যাডিং এবং হার্ডগ্রেপ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশ্রয়ের সন্ধানে। ইঠাব তাবা একটি ঘর খুঁজে পেল। সেখানে প্রবেশ কবে তাবা দেখল একটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গল - শ্রীনগর - গোহাটী

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভবিষ্যৎ জানবার প্রেবণার হার্ডগ্রেপ মস্তবলে সেই মতদেহকে দিয়ে কথা বলাল। কিন্তু পেল অভিশাপ। “যে আমার আত্মাকে বিরক্ত করেছে সে কক্ষহস্ত দানবের হাতে প্রাণ হারাবে।”

তখন তারা সেখান থেকে ছুটে পালালো। একটি গভীর জংগলে তারা আশ্রয় নিল। মধ্যরাতিতে হঠাৎ গেল একটি কালো লৌহময় হাত। এক নিমেষে হার্ডগ্রেপ বলি হল।

অতঃপর হ্যাডিং-পাণ্ডলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওড়িন তাকে উদ্ধার করলেন।

সন্ধি

স্বিপডাগ তার মনুষ্য-অনুচরদের সাহায্যে পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা করল। তার যোদ্ধাদের বহন করে নিয়ে চলল একটি বিশাল নৌবাহিনী। কিন্তু ওড়িন সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন, কেননা স্বিপডাগ “ভানা” দেবতাদের একজন, “আশা” দেবতাদের সেনাপতি এবং ও তার পুত্র হালফডানকে পরাস্ত করেছে এবং হ্যাডিং-এর প্রচুর সামগ্রিক ক্ষতি করেছে। ওড়িনের অভিশাপে সে একটি সামুদ্রিক জ্বালনে পরিণত হল।

এদিকে তার স্ত্রী সেবী ফ্রেজা তার বিহনে দুঃখে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তিনি স্বিপডাগকে স্বপ্নে, পৃথিবীতে, পাতালে ভ্রমতম কবে স্বপ্নে বেড়ালেন, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রতীরে এসে তার দেখা পেলেন। জ্বালন হলেও স্বিপডাগকে চিনতে তার অসুবিধা হয় নি।

স্বিপডাগের সঙ্গে বাস করার জন্য তিনি গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর শরীর হারটি বিপরীত বাসাল। সেটি এত উজ্জ্বল যে সমুদ্র ভেদ করে তাব আলো পৃথিবীতে পড়ল। তখন ফ্রেজা সেই হারটিকে একটি পাথরের আড়ালে রেখে দিলেন।

এদিকে হ্যাডিং ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে স্নান করতে এল। সে লক্ষ্য করল যে সমুদ্রের জল অত্যন্ত গরম। তখন সে ফ্রেজার হারটি দেখতে পেল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই তার সঙ্গে ভ্রমন্তরূপী স্বিপডাগের সাক্ষাৎ হল। দৈবকলে বলীয়ান হ্যাডিং অভিশপ্ত স্বিপডাগকে নিহত করল। তাকে টেনে তীরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেজা দেবী উঠে গেলেন। বিলাপ করতে করতে তিনি হ্যাডিং-কে স্নানশাপ দিলেন। তার অভিশাপ হ্যাডিং-এর জীবনে সত্য হয়েছিল।

স্বিপডাগের মৃত্যুর পর তার পুত্র আসমুন্ড হ্যাডিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু হ্যাডিং-এর তরবারের আঘাতে তার মৃত্যু হয়। এবং সেই যুদ্ধে আসমুন্ডের বশীর আঘাতে হ্যাডিং-এর একটি প্রাচীর-কালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এরপর “আশা” দেবতা ও “ভানা” দেবতাদের মধ্যে সন্ধি হয়, আর ফলে ওড়িন তাঁর সিংহাসন ফিবে পান। দেবতাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেলে দানবরা

পুনরায় স্বর্গপূরী জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়।

লোকির তিন সন্তান

দৈত্যকন্যা গুলভেগ-হেডারের গুহা-লোকির তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রথমটি ছিল নেকড়েবাহ ফেনরার; দ্বিতীয়টি ছিল জোরমুনগান্ড নামক সর্প; আর তৃতীয়টি ছিল হেল, একটি অসুস্থ প্রাণী যাব গাধেব রং কাঁচা মাংসেব মত।

এদের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে এই আশঙ্কার ওড়িন হেলকে নিক্ষেপ করলেন নিফেল-হাইমে। জোরমুনগান্ড নামক সর্পকে আশগার্ডের বাইরে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করলেন, সেখানে সে এত বড় হয়ে উঠল যে কালক্রমে সে সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টিত করল। নেকড়েবাহ ফেনরারকে বন্দন কবে রাখা হল কিন্তু সেজন্য দেবতা টাইব-কে তার দক্ষিণ হস্ত বিসর্জন দিতে হল। সেই হাতটিকে নেকড়ে চিবিরে ধরে নিরোঁছল।

তখন লোকি টাইবকে বাগ্ন করল, দু’ হাতের কোন প্রয়োজন নেই, একটা হাতই যথেষ্ট। এই কথাতে উপলক্ষ্য করে লোকির সঙ্গে দেবতাদের বিরোধ বাধল।

দেবতা স্ত্রের জনৈক অনুচর ছিল রাইগ-ভার। মানুষকে খাদ্যের যোগান দেওয়াই ছিল তার কাজ। লোকি তাকে অভিশাপ দিল : অতঃপর তুমি কখনো মানুষকে সমভাবে খাদ্য বর্জন করে দিতে পারবে না। সেই থেকেই জগতে বৈষম্যের সৃষ্টি হল।

টাইব ছিল মস্ত বড় যোদ্ধা এবং ওড়িনের ভালকাইর নামক কাহিনীর অধিনায়ক। স্যাক্সন জাতি তাকে খুব শ্রদ্ধা কবে এবং তাকে স্যাক্সনট নামে অভিহিত করে।

ধরের মংস্য শিকার

ইজিব ছিল সামুদ্রিক ঝড়ের দেবতা। যে ওড়িন এবং “আশা” দেবগণের কাহিনী শ্রুনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। সে ছিল একজন বরষক দৈত্য। তার স্ত্রীর নাম ছিল রান, যার ছিল নয়টি কন্যা। ইজিব আশগার্ডে গেলে দেবতারা তাকে প্রচুর যত্ন করেছিল। কিন্তু তাকে ভুক্ত করার উপযুক্ত মদ্যভাজ্ঞ আশগার্ডে ছিল না। তাই নিয়ে কথা উঠতে একজন বলল সবচেয়ে বড় পাথ আচ্ছ হাইমেবেব কাছে। এই দৈত্যের কথা আমবা আগে উল্লেখ করছি।

তখন এবং ও টাইব সেই পাথ আনতে গেলেন। হাইমের তখন তিমি মাছ শিকার করছিল। এদের দুজনকে দেখে হাইমেব অপ্রসন্ন হল, কিন্তু মনে কিছু প্রকাশ করল না।

হাইমের সঙ্গে স্পর্ধা কবে এবং মাছ খবার জন্য নৌকোয় উঠলেন। একটি মাছকে বড়শিতে টোপ গেছে এবং জলে তা নিক্ষেপ

করলেন। যথাসময়ে টোপটি একটি মংস্য কর্তৃক গ্রাসিত হল। এবং প্রভূত শক্তি প্রয়োগ তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেন। সেটি মাছ নয়, জোরমুনগান্ড নামক সর্প, যে ছিল লোকির আশ্রয়, এবং যার দেহ পৃথিবীকে বেষ্টিত করে আছে।

তা দেখে হাইমের ভীত হল। কিন্তু ধর প্রাশপণ শক্তি দিয়ে সেই মহাসর্পকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে তার মাথাটি ভাঙার উপর উঠে এল। তখন ধর তাব মাথায় হাতুড়ি প্রচণ্ড এক ঘা মারলেন। দ্বিতীয়বারও মারতে মারতে এমন সময় ভীত হাইমের হিপের দাঁড় কেটে দিল।

মাছখব্দা সাগর হলে হাইমের থরকে শক্তির পরীক্ষা দিতে আহ্বান জানাল। ধরের এক কোণে একটি বিবাত পানপাত্র ছিল। সেটাকে চূর্ণ করার জন্য হাইমেব থরকে আহ্বান জানাল। ধর অতি সহজেই তা সম্পন্ন করলেন। তখন অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে হাইমের তাব মধ্যভাগটি উত্তোলিত করার জন্য থরকে আহ্বান জানাল। ধর এই সুবেগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। এক মাইল গভীর এই ভাঙটি নিম্নের মধ্যে উত্তোলিত করে ধর সেজা পাড়ি দিলেন আশগার্ডের দিকে।

ধরের দর্পচূর্ণ

ধরের একদিন বিশ্বপ্রমণের সখ হল। তখন লোকি বলল যে সেও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করবে। ধর কোন আপত্তি করলেন না, কেন না দৃষ্টান্ত হলেও লোকির জ্ঞানাতিক জ্ঞান প্রচুর। তাই প্রথমে দৈত্য গুরভাঙেলের আবারে গেলেন। এখানেও তাঁদের দুজন সঙ্গী জুটল। গুরভাঙেলের পুত্র বুল্লানফ এবং কন্যা ব্লকভা।

এই চারজন দুর্গম পথ দিয়ে হাটতে লাগলেন। পথে স্কিনের নামক এক দৈত্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। সেও এঁদের সঙ্গী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে একটি খাদ্যের ধলি বহন করে নিয়ে চলল। রাগি হলে তারা এক জলগায় বিচরার বাসনা প্রকাশ করল। দৈত্য তখন খাদ্যের ধলিটি ধরের হাতে দিয়ে ঘুমোতে গেল।

ধর বহু চেষ্টা করেও ধলিটি ধুলতে পারলেন না। তখন তিনি দৈত্যের কাছে গেলেন। দুর্মন্ত দৈত্যের মাথায় ফ্রোখে তিনি হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করলেন। দৈত্য হাই তুলে উঠল। ধরকে দেখে বলল, “গাছ থেকে বোধ হয় একটা গুক-পাতা আমাব দেহে পড়ল (ধরের হাতুড়ীর আঘাত তার কাছে একটি গুক-পাতার পতন মাত্র)। যাও বাছা, খেয়ে-দেখে ঘুমোও।”

স্বিগুণে ক্রুদ্ধ হয়ে ধর একটি গাছের তলার ঘুমোতে গেলেন। দৈত্যের নাসিকাগর্ভের চোটে ভাব ঘুম হল না। ভাবে তিনি আবার দৈত্যের কাছে গেলেন। সে তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ধর প্রচণ্ড শক্তিতে তার মাথায় হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করলেন। দৈত্য হাই তুলে

বলল, “বোধ হয় গাছের উপরের গাখিটা কোন অপকর্ম করল।” - ধর এবারেও অপ্রতিভ হলেন।

সকলে যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হল, তখন দৈত্য বলল যে “আমার পথ ভিন্ন। তোমাদের সঙ্গে আমার পোষাবে না। তোমরা সোজা পূর্ব বাবার উটগার্ডে চলে যাও। আর ধর, তোমাকে বলছি, তুমি নিজেকে বড় বেশি বলবান মনে কর। এটা ভাল নয়। অপরের শক্তিকে হেসজ্ঞান করতে নেই।” এই বলে দৈত্য অদৃশ্য হল।

অন্তঃপন তারা উটগার্ডে এল। সেখানকার লোকেরা তাদের সামনে অভ্যর্থনা জানাল। রাজসভার ঢুকে এরা বিস্মিত হয়ে গেল। একি, সেই দৈত্যই যে সম্রাট!

গম্ভীর স্বরে দৈত্য বলল, “তোমাদের গৃহের পরিচর দাও।” তখন লোকি বলল, “আমি যে-কোন লোকের সঙ্গে খাওয়ার প্রতি-যোগিতা বসতে পারি।” তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি হল। লোকির প্রতিশ্রুতী হল লোগ। দুজনেই খুব দ্রুত খেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, লোকি শব্দ মাসেই খেয়েছে, কিন্তু লোগ হাড়-মাসে দুইই খেয়েছে। লোকি পরাজিত হল।

তখন বজ্রালফ বলল, “আমি যে কোন লোকের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হতে চাই।” তখন একজন বানন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার নামল। তিনবার দৌড় হল, কিন্তু তিনবারই সেই বানন জয়লাভ করল।

বজ্রালফ লজ্জা পেল।
তখন দৈত্য ধবেব দিকে চাইল। ধর হলেন, “আমি যে-কোন লোকের সঙ্গে পান-প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হতে চাই।” তৎক্ষণাৎ একটি ছোট পানপাত্র এল। দৈত্য বলল, “যে ভাল মদ্যপায়ী সে এক চুমকে এই পাত্র শূন্য করতে পারে।” ধর বহুকণ ধরে পান করতে লাগলেন কিন্তু অর্ধেকের বেশি শেষ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত গভীর লজ্জা পেয়ে তিনি পানপাত্র পরিত্যাগ করলেন।

একটি বিভ্রাল সেই সভায় ছিল। দৈত্যপতি

থরকে সম্বোধন করে বললেন, “তুমি তো মহা-শক্তিমান। এই বিভ্রালটা তোলে দেখি।” ধর প্রাণপণ শক্তিতে বিভ্রালটিকে তোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার একটি পা মাঠ তুলতে সক্ষম হলেন।

তখন জুধু হয়ে ধর যে-কোন লোককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। এবং একটি বৃদ্ধা মহিলা সেই আহ্বানে সাড়া দিল। এ ক্ষেত্রেও ধর পরাজিত হলেন।

পরদিন বিয়ল মনে ধর দৈত্যপুত্রী পরি-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন দৈত্যরাজ তাদের সান্ন্যাস দিয়ে বলল, “দুজনের কোন কারণ নেই। লোকি খুব ভালই খেতে পারে, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতী লোগ হচ্ছে অগ্নি; সে সর্বভুক। বজ্রালফ-এর মত দৌড়বার কোথাও নেই, কিন্তু তার প্রতিযোগী বানন হচ্ছে চিন্তা, যার চেয়ে দ্রুত কেউ খেতে পারে না। ধর যে পাত্র থেকে পান করেছেন তার মধ্যে ছিল মহাসমুদ্র যা কেউ পান করে নিশ্চয় করতে পারে না; তবুও ধর অর্ধেক পান করে-ছিলেন। যে বিভ্রালটির একটি পা ধর তুলে-ছিলেন, সে আসলে মিডগার্ড সর্প যে জগৎ বারণ করে আছে। যখন ধর তার একটি পা তুলে-ছিলেন তখনই জগতে ভূমিকম্প শব্দ হইছিল। যে বৃদ্ধা মহিলার কাছে ধর পরাজিত হলেন, সে হচ্ছে বার্থকা, প্রত্যেকের জীবনেই সে আসবে, তাকে কেউই জয় করতে পারে না।”

ধরের বিপদ

দৈত্যপুত্রী থেকে ফিরে ধর ও লোকি এক নিজন প্রান্তরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। সহসা ধর আবিষ্কার করলেন যে তাঁর বিখ্যাত হাতুড়ীটি হারিয়ে গেছে। হাতুড়ী বিনা ধর শক্তিহীন। কাজেই দুজনে গোপনে আশগার্ডে ফিরে এলেন।

অন্তঃপন ধর ফ্রেজা দেবীর কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানালেন। দেবী তাকে হাতুড়ী খোঁজাব জন্য পক্ষী বহুমূষ দিলেন। ধর তা লোকিকে দিলেন যাতে সে হাতুড়ীর খোঁজ এনে দিতে পারে।

পক্ষী-বৃক্ষ লোকি সম্বোধন করতে করতে শেষ পর্যন্ত দৈত্য থিরম-এর কাছে উপস্থিত হল। থিরমকে সে প্রশ্ন করল, “তুমি কি থিরম হাতুড়ী লুকিয়েছ?” মৃদু হেসে থিরম তা স্বীকার করল এবং বলল যে, নৈটি একটি পাহাড়ের তলায় নয় মাইল নীচে পৌঁছে, আছে। যদি সে ফ্রেজা দেবীকে বহু হিসাবে পদ্য ভবেই সে হাতুড়ী ফেরৎ দিতে পারে।

লোকি বধ্যস্থানে সংবাদটি নিবদন করল। তখন দেবতার একটি বৈঠকে বসলেন। লোকি বৃদ্ধি দিল যে, ধরকে ফ্রেজা সাক্ষ্য দিয়ে বাওয়া হোক। স্ত্রীলোকের রূপ ধারণ করতে ধর আপত্তি করলেন কিন্তু সকল চাপ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। লোকি চলল তার দাসী সঙ্গে।

দূর থেকে ফ্রেজাপুত্রী ধরকে দেখে থিরম-মহা খুশি। সে বিশাল ভোজের আয়োজন করল। ধর গোপনে খেতে অস্বস্ত করলেন। নিমেষের মধ্যে তিনি একটি হাড়, আটটি স্যালমন, প্রচুর মিষ্টান্ন ও তিন ব্যারেল মদ নিঃশেষ করলেন।

এই দেখে থিরম-এর চোখ কপালে উঠল, “বিরের কনে এত খায়?” বৃদ্ধিমান লোকি বৃদ্ধির দিলে যে, দৈত্যরাজ বিহনে ফ্রেজা আট-দিন কিছই খায় নি। অন্তঃপন থিরম ফ্রেজা-পুত্রী ধরকে চুম্বন করতে গেল। কিন্তু ধরের জুধু চোখ দেখে বলে উঠল, “এত উসজ্জন এবং এত ভীষণ চোখ তো ফ্রেজার হতে পারে না।” বৃদ্ধিমান লোকি আবার বোঝাল।

দৈত্যরাজের বিরহে ফ্রেজা আতঁদন ঘুমায়ে নি। অন্তঃপন বিবাহ অনুষ্ঠান। লোকি প্রস্তুত করল, ফ্রেজার কোলে ধরের হাতুড়ী না বাবা পর্যন্ত বিবাহ হতে পারে না। তৎক্ষণাৎ বাহকেরা হাতুড়ী এনে ফ্রেজার কোলে রাখল। আর যেই না হাতুড়ী পাওয়া, ফ্রেজাপুত্রী ধর লাফিয়ে উঠে হাতুড়ীর এক এক ঘারে সকলকে খতম করলেন।

তারপর ধর বিজয়গর্বে আশগার্ডে ফিরে এলেন।

YOU ARE A SOLDIER TOO—

What are you doing to meet the challenge ?

হানগনার ও ধর

ওডিন তাঁর অশ্ব স্পিনগনারের পিঠে চেপে শূন্যমণ্ডলে ধরে বেড়াচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দৈত্য হানগনারের সংঘে দেখা হল যে গোষ্ঠ্যফাস্ক নামক অশ্বের উপর ভ্রমণ করছিল। উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি লাগল—কাব অশ্ব অধিকতর দ্রুতগামী। শেষ পর্যন্ত ওডিনের অশ্বই জয়লাভ করল। হানগনারও পিছু পিছু আশগার্ডে হাজির হল।

আশগার্ডে তাকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হল। যে বিশাল মদ্যভাণ্ড ধর নিলে এসেছিলেন তা দৈত্যের সামনে রাখা হল এবং ফ্রেজা দেবী তাকে পরিবেশন করতে লাগলেন। হানগনারও পাত্রের পর পাত্র শূন্য করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে মাতাল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ধর সেখানে হাজির হলেন এবং দৈত্যকে দেখে চীৎকার করে বললেন, “এই অসভ্যটাকে কেন এখানে আনা হয়েছে এবং কেনই বা ফ্রেজা তাকে মদ্য পরিবেশন করছে!” তখন সেই দৈত্য বলল যে, ওডিনের নিমন্ত্রণে সে এসেছে এবং তাকে অপমান করার অধিকার কারোর নেই। তখন হ্রুদ্ব-ধর তাকে প্রহাৰ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। দৈত্য জর্নালা যে, সে নিরস্ত, তবে সেও ধরকে চ্যালেঞ্জ করল, একটা নির্দিষ্ট দিনে, আশগার্ডের বাইরে কোন স্থানে।

নির্দিষ্ট দিনে দেবতাগণের সংঘে ধর সেই স্থানে হাজির হলেন। দৈত্য হানগনারও অপরাপর দৈত্য পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে এল। উভয়ের তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। এবং শেষ পর্যন্ত ধরকে হাতুড়ীর আঘাতে দৈত্য প্রাণ হারাল। কিন্তু এই দৈত্যের পদস্বর ছিল লোহী নির্মিত। মায়া বাবার অগে সে সেই পা দুটি দিয়ে ধরকে গলা চেপে ধবল। সেই পাবেব বন্ধন খোলা ধরের পক্ষে সম্ভব হল না। অন্য দেবতারাও তা করতে সক্ষম হল না।

তখন দৈত্যকন্যা জার্নাসারর গর্ভজাত ধরকে পুত্র মার্গান ধরকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করল। ধর পুত্রকে চন্দন করলেন এবং হানগনারের দ্রুতগামী অশ্ব গোষ্ঠ্যফাস্ককে জাব হাতে দিলেন। এতে ওডিন ক্ষুব্ধ হলেন, কেন না তিনি আশা করেছিলেন যে ধর ঘোড়াটি তাঁকেই দেবেন।

সুন্দর বলভার

বলভার ছিলেন গ্রীষ্মদেবতা; ওডিনের পুত্র; দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়দর্শন। তাঁর মা ছিলেন ফ্রিগ আর তাঁর ভাই ছিলেন অশ্ব হোডার। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুন্দরী সেরুকন্যা নননা।

একদিন ওডিন বলভার সহ একটি বনগণ দিয়ে যাত্রা করছিলেন। হঠাৎ বলভারের পক্ষে ক্রান্তিকারক কয়েকটি অশুভ চিহ্ন দেখা গেল। ওডিন তাকে সতর্ক করার জন্য মশপাঠ করতে লাগলেন।

কিন্তু বলভার শূন্যে যেতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টির আলো কমে এল, ঠোঁটে গড়ল বিষমের ছায়া। দেবতারা বলভারকে উদ্দেশ্য করে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। বলভার বললেন যে, তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন যে, তিনি মারা যাবেন।

বলভারের মা দেবী ফ্রিগ পুত্রের অসুস্থতা আশংকার পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি বস্তুকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তারা বলভারের কোন ক্ষতি করবে না। শব্দ বাদ গেল কিন্তু লতা মিসলটো কেন না তার কাছ থেকে বিষমের কোন আশংকা নেই।

এদিকে ওডিন বলভারের ভাগ্য জানার আশার মত্নর রাজ্যে গেলেন। সেখানে তিনি ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রশ্ন করলেন, “কার শয্যা এখানে পাতা হয়েছে? কার পান-পাঠ এখানে রাখা হয়েছে?” জবাব এল, “বলভারের।”

ওডিন চীৎকার করে বললেন, “বল কে ওডিনের পুত্র বলভারকে হত্যা করবে?” উত্তর এল, হোডার তার ভাইকে এখানে পাঠাবে। ওডিন পাঠা প্রশ্ন করলেন, “কে বলভারের হত্যার প্রতিশোধ নেবে?” উত্তর এল, “একজন, যে বলভারের হত্যাকারী চিতার না শোয়া পর্যন্ত হাত ধোবে না বা চুল আঁচড়াবে না।”

ওডিন অরও প্রশ্ন করলেন—কিন্তু কোন উত্তর এল না। শেষ পর্যন্ত একটি কথাই পাওয়া গেল, “যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকের বন্ধনমুক্তি ঘটে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত জগৎ-বিধবাসী দেবতাদের গোথলি উপস্থিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আর ভেঁকো না।”

ওডিন-কিরে এলেন, কিন্তু দেখলেন, আশগার্ডে দুঃস্বপ্ন চিহ্নমাত্র নেই। কেন না ফ্রিগ প্রত্যেককে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে কেউ বলভারের ক্ষতি করবে না। ফলে দেবতারা বলভারকে নিয়ে আমো-প্রমোদ করছে। কেউ তাকে ইট ছুঁড়ে মারছে, কেউ তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করছে, কেউ তাকে ডরবারির খোঁচা দিচ্ছে। কিন্তু বলভারের কোন ক্ষতিই হচ্ছে না। প্রাকৃতিক শক্তিতে বলভার শক্তিমান, আগুন তাঁকে পোড়াতে পারবে না, জল তাকে সিক্ত করতে পারবে না, পার্থিব কোন সামগ্রী দিয়ে আঘাত করলে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না। দেখে কোন আঘাতই লাগবে না।

কিন্তু এদিকে দৃষ্টান্ত লৌকিক বলভারের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল। সে একটি বস্ত্রের রূপ ধরে ফ্রিগের কাছে গেল। ফ্রিগকে সে বলল, “শিক আসচব!” সকলে বলভারকে আঘাত করছে, কিন্তু তব কোন ক্ষতিই হচ্ছে না।

ফ্রিগ বলল, “তা হবার উপায় নেই যে। আমি পৃথিবীর সব বস্তুকে দিয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়েছি যে কেউ বলভারের কোন ক্ষতি করবে না।”

লোক নামিয়ে বস্ত্ররূপী লৌকিক বলল, “সব বস্তুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন?”

“হ্যাঁ শব্দ ছোট লতা মিসলটো ছাড়া। এইরূপ লতার পক্ষে স্মার কি করা সম্ভব?”

লৌকিক তৎক্ষণাৎ বোরের এসে একটি মিসলটো লতা সংগ্রহ করল। তাই দিয়ে সে একটি তাঁর প্রস্তুত করল। তারপর সেজ্ঞা বলভারের ভাই হোডারের কাছে গিয়ে বলল, “তুমি কেন বলভারকে আঘাত করে সম্মানিত করছ না?”

হোডার জানাল যে, সে অন্য। সে কি করে তাঁর ছুঁড়বে? আর সে তাঁর গর্বেই যা কোথায়?

লৌকিক বলল, “কোন চিন্তা নেই, আমি তোমার তাঁর-বন্ধু দিচ্ছি, আর চক্ষুসম্মার হাতের নিশানাও ঠিক করে দিচ্ছি।” এই বলে লৌকিক হোডারের হাতে ধনু ও মিসলটোর তাঁর দিল। হোডার তাঁর নিক্ষেপ করল। তাঁরটি সেজ্ঞা বলভারের দেহে গিয়ে লাগল এবং তার সুন্দর দেহ ভেদ করে চলে গেল।

জন্মে, বিস্ময়ে দেবতারা নির্বাক হয়ে গেল। আর হতবুদ্ধি হয়ে হোডার দাঁড়িয়ে রইল। একটি গম্ভীর কণ্ঠ আশগার্ডের প্রতিটি-দুয়ারে জানতে লাগল, বলভার মৃত, সুন্দর বলভারের মৃত্যু হয়েছে।

সারা স্বর্গপূরী জুড়ে বিলাপধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ফ্রিগ চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন; ওডিন কাঁদলেন নিঃশব্দে।

এদিকে বলভারের আত্মা চলে গেল মৃত্যু-পূরীতে। তখন ফ্রিগ বললেন : “হারমন্ড (পূর্বকথিত হিমডলের পুত্র) মৃত্যুর রাজ্যে থাক। সেখানে সে দেবী উরদ-কে বলুক যে, আমরা যে-কোন মৃত্যু দিতে রাজী আছি। বলভারকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে দেবতারা বলভারের দেহটিকে তার নিজস্ব জাহাজে ছিঁড়ছেন—এ তুললেন। সেখানে তার চিতা সাজান হল। মৃত্যুতে বলভারকে আবেগ সুন্দর দেখাচ্ছিল। সকল দেবতারা সেখানে হাজির হয়েছিল—ওডিন ধর, বার্ক, টাইর, নজরড, ফ্রে, ফ্রেজা, ইডান; লৌকিক ছিল ধর, তাব মুখে শেকের কোন চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহুর্তে ওডিন বলভারের মৃতদেহের কানে কানে কি কথা বেন বললেন। তিনি যে কি বলেছিলেন তা কেউ জানে না, জানবেও না।

চিতায় মাউ মাউ করে জ্বলে উঠল, আর তা বহন করে বলভারের জাহাজ গভীর সমুদ্রের ওপর ভাসতে লাগল। তাই দেখে বলভারের স্ত্রী নান্না শোকাবেগ সংবরণ করতে পারল না, তারও মৃত্যু হল।

এদিকে হারমন্ড বহু পুত্রসন্তে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর রাজ্যে গেল। সেখানে তার সম্ভ্র বলভারের সাক্ষাৎ হল; তখনও মৃত্যুর ছায়া তার মুখ থেকে চলে যায় নি। সেখানে সে নান্নাকে দেখে বিস্মিত হল।

তিনমূর্তি

আশরাফ সিদ্দিকী

মূর্তি

দেখোছি প্রথম

উদ্যত উদ্যম। সেই নৌকোর উপরে

বন্যায় প্লাবিত গ্রামে, অশান্ত অন্তরে

কারাকঙ্কে কোনোদিন ছিল না সংশয়,

দীপ্ত চোখে দেখেছিল উদার উন্মত্ত হিমালয়।

মূর্তি

তার আছে আঙ্গ

নির্বাক নিস্তব্ধ তিনমূর্তির ভবনে,

মানুষের অবিরাম চিন্তায় মননে,

ক্ষেতে ও খামারে কারখানায় বিদ্যুতে

যেন অগ্নিমূর্তি ভালবাসার সিদ্ধিতে!!

মূর্তি

দেখোছি আবার

স্বাধীন ভারতে তার, উন্মত্তের পাশে।

কে জানতো এতো বৃষ্টি থাকে নীলাকাশে

যে হোতে পারতো নিজে একক সম্রাট,

সেই দিল জনতাকে একদিন এই রাজ্যপাট।

বলল : প্রেম মৃত্যুর চেয়েও বলবান, সমাধি
তাকে বিনষ্ট করতে পারে না।

বলভারকে ফেরৎ দেবার জন্য হাবমড
দেবী উরদকে অনুরোধ করল। শেষ পর্যন্ত
দেবী বললেন যে, নয়টি জগতের সকল বস্তু
যদি বলভারের জন্য ক্রন্দন করে তবেই তিনি
বলভারকে ছেড়ে দেবেন।

হাবমড এই বার্তা নিয়ে আশগার্ডে ফিরে
এল। দেবতাদের দূতগণ তখন বলভারের
জন্য শোক কবার নির্দেশ নিয়ে নয় জগতের
প্রতিটি প্রান্তরে গিয়ে হাজির হল। সমগ্র
জগৎ কন্ডার ভেঙে পড়ল। মানুষরা কাঁদল,
প্রত্যেকটি প্রাণী, গাছপালা এমন কি পাথর
পর্যন্ত বলভারের জন্য কাঁদল।

তবু দু-একজন দৃষ্টপ্রকৃতি ছিল যারা
কাঁদে নি। তাই বলভারের পক্ষে মৃত্যুর রাজ্য
থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয় নি।

লোকির পরিণতি

বলভারের হত্যাকারী হোভারকে হত্যা
করেছিল রিড-এর গর্ভজাত ওভিনের পুত্র
ভালে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যা দেখলাম, হোভার
বোকারী ছিল নির্দোষ। আসল শয়তান হচ্ছে
স্লাকি।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা লোকির বিরুদ্ধেও জাল
বুনাছিলেন এবং তা সম্পূর্ণ হাফেও এসেছিল।
একদা দেবগণ তাদের বন্ধু দৈত্য ইজ্জের
আবাসে নিমন্ত্রণ পেল। তারা প্রত্যেকে
সেখানে গেল, শূন্য লোকিকে সঙ্গে নিল না,
কেন না তারা লোকিকে বিশ্বাস করতে পারছিল
না। লোকি কিন্তু বিনা আমন্ত্রণেই সেই

ভোজসভায় প্রবেশ কবল। তাকে দেখে
দেবতারা ঝঙ্ক হল। কঠোর কণ্ঠে লোকি
জ্ঞানাল যে, সেও একজন “আশা” দেবতা এবং
সেই কারণেই এখানে আসন পাবার অধিকারী।

অন্তঃপর লোকি দেবগণের বিরুদ্ধে কুৎসা
গাইতে শুরু করল। প্রথমেই সে নক্ষত্রভেব
নামে যা তা বলল, তারপর বাক, টাইর ও

সর্বশেষে ফ্রে তার নিন্দার শিকার হল। ফ্রেকে
উদ্দেশ্য করে লোকি বলল, “এই নির্বোধটার
জন্যই দেবতাদের বিজয় ভরবারি” এখনো
দৈত্যদের হাতে রয়েছে।”

তখন দেবী ফ্রিগ ঝঙ্ককণ্ঠে বললেন,
“এখানে যদি বলভার থাকত তা হলে তেমনকে
প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না।” তখন উচ্চহাস্য
করে লোকি জ্ঞানাল যে, সেই বলভারকে মিসলটো
পাঠিয়েছে, কেন না সে-ই হোভারকে মিসলটো
লতাব তীব্র তৈরি করে দিয়েছিল।

দেবতারা তখন ফ্রেকে ক্ষিপ্ত হবে উঠল।
লোকি সভয়ে দেখল যে, তার পিছনে ধর
হাতুড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তখনই সে পলায়ন
করল এবং স্যালমন মাছ হয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে
রইল। শেষ পর্যন্ত লোকি ধরা পড়ল এবং
চার ওপর নির্মম শাস্তির বিধান হল : তাকে
একটি পাহাড়ের প্রান্তদেশে বেঁধে রাখা হল
এবং একটি বিষধর সর্পকে তার কাছে রাখা
হল। সে প্রাথমিকভাবে লোকিকে দংশন করতে
লাগল।

মহাপ্রলয়

এর কিছুকাল পরে এল মহাপ্রলয়, টিউটন
ভাষায় র্যাগনারোক, দেবতাদের গোখলি। নয়
জগৎ জুড়েই প্রথমে এল অনাচার এবং ব্যাভিচার
এর তারপর রক্তপাত। উত্তর বাতাস বইতে
আরম্ভ করল। বনজগৎ শূন্য হতে লাগল।
পশুরা তাদের আবশ্য-আবাস থেকে লোকালয়ে
আসতে শুরু কবল। তীর শীতে মাটি
কুকড়ে উঠল। ক্ষেত্র আকাশ অন্ধকার হয়ে
গেল।

এই সুযোগে দৈত্যরা আশগার্ড আক্রমণ
করল। প্রবেশপথের সেতু, যাব নাম বিফ-
রোষ্ট, দৈত্যদের আঘাতে ভেঙে পড়ল।
দৈত্য গাইমের দেবগণের ওপর প্রতিশোধ নেবার
জন্য সেনাপতি সাট-টাঙ্ক-এব হস্তে সেই বিজয়
ভরবারি সপর্ণ করল। পূর্বদিক থেকে দৈত্য
হিরম তার বাহিনী নিয়ে স্বর্ণ আক্রমণ কবল।
তারা লোকির পুত্র নেকড়ে বাঘ ফারনারকে

মৃত্যু করল। লোকির অপর পুত্র মিডগার্ড
সর্প যে পৃথিবী বেঁটন করে ছিল, সেও
বেরিয়ে এল। সর্বগ্রহী ভূমিকম্প হতে লাগল।
দেবতা, মানুষ, অসুর, দৈত্য, পশু পক্ষী
সকলেই বেরিয়ে এল। দক্ষিণ থেকে এল
সাতর। তার দেহ দিয়ে আগুনের হৃদয়
নির্গত হচ্ছিল।

ভিগ্নিড-এব সমতলে হল শেষ যুদ্ধ। ফ্রে
লড়তে লাগল, সাতরের বিরুদ্ধে, অব টাইর
যুদ্ধ করছিল পশুপক্ষী দৈত্য গাইমের সঙ্গে।
ইতিমধ্যে দৈত্যরা লোকিকে মৃত্যু কবেছে।
এতদিন বন্দী থেকে তার চেহারা হয়েছে ভীষণ;
তার চুল-দাঁড়ি ছুরির মত শক্ত ও ধাবাল হয়ে
গেছে। সে লড়ছিল হিমডালের সঙ্গে। শেষ
পর্যন্ত হিমডাল তার মাথা বেটে ফেলল।
কিন্তু সেই মাথাটি ছিটকে এসে হিমডালের
বক্ষে লাগল বার ফলে সেও মারা গেল।

এব লড়াইলেন মিডগার্ড সর্পের সঙ্গে।
সর্প তাঁর সর্বাঙ্গ বেঁটন করেছিল এবং তাঁর
দৈহে বার বাঘ ছোবল মারছিল। এবও তাকে
প্রাণপণে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন।
শেষ পর্যন্ত থকে হাতুড়ীর আঘাতে সর্পের
মৃত্যু ঘটল। সে-ও থকে মরণ-কামড় দিয়ে
গেল। বজ্রদেবতা থকের শেষ পর্যন্ত এই
পরিণতি হল।

আব ওভিন? তিনি লড়াইলেন নেকড়ে
ফারনারের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তার গর্তেই
তাকে যেতে হল। টাইর ও ফ্রে আগেই মারা
গেছে। কালো জ্বালান নিউহগেল নিম্বাসে
বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। চন্দ্র-সূর্য বাহু-
কেতু কতৃক চিবকাগেব জন্য গ্রাসিত হয়েছে।
সপ্তসমুদ্রে দাঁড় করে আগুনের জ্বলছে
আব তার ভেঙ্গে নয়টি জগৎ দগ্ন হচ্ছে। যুদ্ধে
যারা বেঁচেছিল তারাও আব কেউ বইল না।
আগুন নেভাব পল রইল শূন্য ঘোঁরা আর
ঘোঁরা। তারপরেই অন্ধকার, নি ব ব ছি ম
অন্ধকার, নিস্তরঙ্গ স্তম্ভতা। আর কিছু নেই।
শেষ অবশেষে এল, রাগনারোক, দেবতাদের
গোখলি। (ক্রমশঃ)



দেবার ওলেন্দু উপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নেতাজীর সঙ্গে ‘বি-ডি’র সংযোগ রক্ষা

সত্যাব্দ যতীশ গুহকে ডাকিবে ভকৎ-
ঘামের কাছে প্রাপ্ত সংবাদ এবং নেতাজীর
পবিত্রপনা ইত্যাদি সর্বাক্ষর জ্ঞানলেন।
অধিকন্তু তাকে সম্বন একজন লোকও স্থির
কবতে বললেন নেতাজীও নিদেশ মত কাবুলে
যাবার জন্যে।

তৎকালে ‘বি-ডি’র গোপন কাজকর্ম পবি-
চালনার ভাব ছিল যতীশ গুহর ওপর। তাঁর
প্রধান সংগী ছিলেন কামাখ্যা রায়, বিনয় সেন-
গুপ্ত। চন্দ্রশেখর সেন ও কমেট দাসগুপ্ত।
তাঁরা স্থির করলেন যে, শান্তিময় (চণ্ডল)
গান্ধুলীকে এ-কাজে পাঠান হবে।...

শান্তিময় গান্ধুলী বগুনা হয়ে গেলেন
পেশোয়ার অভিমুখে। পেশোয়ার পৌঁছলেন
১৮ই এপ্রিল (১৯৩৬) তারিখ। দেখা হল
ভকৎঘামের সঙ্গে। ট্রাইবেল-অঞ্চল থেকে
মাইল পনের দূরে একটি আস্তানার তাঁরা
থাকলেন। তাঁরা বলতে — ভকৎঘাম, শান্তি
গান্ধুলী ও সোদাই হুম্মাহিন্দব সিংকে বোঝা
লায়।... কমরেড সোদাইর আন্তর্দিক ইচ্ছা ছিল
এইফাকে স্বয়ং কোনরূপে বুধে পালিয়ে
যাবার চেষ্টা করা। নেতাজীর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট
কোন কিছুতে সম্পর্ক ছিল না।...

এবার তাঁরা তিনজনে পাহাড় ডিঙিয়ে
যাবেন ভিন্ন পথে। তার উদ্দেশ্য — পথে পথে
বিভিন্ন পার্বত্যজাতিগণের সঙ্গে ভবিষ্যৎ
বিদ্রোহাঙ্গক-কাজের জন্যে যোগাযোগ কবে
যাওয়া। ভকৎঘামের নতুন বন্ধু মাই গজন্
খাঁ এসব ব্যাপারে হলেন মস্ত সহায়ক।...

২১শে এপ্রিল ভকৎঘাম, শান্তিময় গান্ধুলী
ও ভকৎঘামের বন্ধু সোদাই হুম্মাহিন্দব সিং বগুনা
হলেন ‘মালাকান্দ’ পাস-এর মধ্য দিয়ে।
বর্ডার পর্যন্ত তাঁরা গেলেন জ্ঞানিত লোকের
টানায়। এ ব্যাপারে ফ্রিটায়ার গান্ধী আব্দুল
গফ্‌যব খাঁসাহেবের বন্ধু সমুন্দব খাঁসাহেব
ও তাঁর ভাইপো জিয়াবং গুলেব কাছে তাঁরা
বিশেষ সাহায্য পেলেন। সমুন্দব খাঁ ছিলেন
কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জিয়াবং গুলে
ছিলেন বামপন্থী নওজোয়ান দেশকর্মী।
জিয়াবং গুলে নিজেই টান্সা চালিয়ে নিলেন।
সঙ্গে আছে সমুন্দব খাঁসাহেবের দেওয়া
‘গাইড’। কাজেই ভকৎঘাম নিশ্চিন্ত মনে
বন্ধুদেবকে নিয়ে পথ চলছিলেন।

বলা বাহুল্য এদের সকলেই ছদ্ম নামে
ও পোশাকে ‘পাঠানের’ পবিচর।...

বর্ডারের কাছে এসে সবাই টাঙ্গা থেকে
নামলেন। জিয়াবং গুলে প্রমুখ প্রত্যাবর্তন
কবলেন পেশোয়ারের দিকে। ভকৎঘাম ও
শান্তিময়বাবু হাটা দিলেন বৃটিশের নিষিদ্ধ
বন্ধু পাহাড়ী-পথে। কিছুদূর এসে সমুদ্রের
পড়ল ‘ডিউর-চিহ্ন’ নদী। বেলা তখন ১টা
দাঁড়ি খোলাষ তাঁরা নদী অতিক্রম করলেন।
তাবপর হাটা-পথে বহুদূর এসে রাতটা
কাটালেন এক গায়েব প্রান্তে।

২২শে এপ্রিল তাঁরা ‘বাবলু’ গায়ে আব্দুল
লতিফ আফেন্দ সাহেবের গৃহে এসে উপস্থিত
হলেন। আফেন্দ সাহেব ডাবভরষের লোক।
ভকৎঘামের পূর্বপরিচিত বন্ধু। তিনি
আফগান পার্বত্য-এলাকায় এসে বসবাস
করছেন। নেতাজীর কাজে তিনি সহায়ক হবেন
বলেই ভকৎঘাম ও শান্তিময় তাঁর সঙ্গে দেখা
করলেন এবং বাতটা তাঁর ওখানে কাটালেন।

পর্বািন প্রাতে ‘চিন-গাই’ গ্রামে এসে
গাইডকে বিদায় দেওয়া হল। বাস্তবতা
‘সোমাল’ কিল্লা’র সোনাবর হোসেন সাহেবের
সান্নিধ্যে কাটলো। সোনাবর সাহেব অতিশয়
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি বাজনীতি বোঝেন।
ঐ মূল্যক তাব ভাবে। তিনি ইচ্ছা কবলে
হাজাব-হাজাব দূরর্ষ পাঠান নেতাজীর পতাকা-
তলে দাঁড়ি কবিষে দিতে পারেন বৃদ্ধের টাটকা
খুন দিয়ে ‘জালিম’ বৃটিশের খুন কবিষে
দেবার সংকল্পে।... ভকৎঘাম ও শান্তিময়
তাঁর সঙ্গে নেতাজীর কার্যক্রম নিয়ে বিশদ
আলোচনা করলেন। সোনাবর সাহেব সানন্দে
নেতাজীর পাশে এসে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি
দিলেন।...

২৬ তারিখ সন্ধ্যার বহু পঞ্চমের পর
তাঁরা এলেন ‘সফী ট্রাইবেল’ অঞ্চলে। সেখানে
সোনাবর মিঞা ও আফেন্দ সাহেবের বন্ধু
মহম্মদ কামিল-এর গৃহে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

২৭শে এপ্রিল ভকৎঘামের পাটি এসে
গেল লোহাবদের গায়ে। এরা লোহালকড়ের
কাজ কবে, রাইফেল তৈরি কবতে ওস্তাদ।
এদেরই একটি তরুণের সঙ্গে প্রয়োজনীয়
কথাবার্তা হলো। তার নাম আব্দুল বেজাক।
... পর্বািন ‘কুদাইখল’ অর্থাৎ মিবাক্সানদের গায়ে
তাঁরা উপস্থিত হলেন। মিরাজান অতি

কিশ্বাসী ও একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সঙ্গী। প্রচুর পার্বত্যজাতীয় লোক তাঁর অনুগত। তিনি যশপন্নপন্নয়ন বৃষ্টিপ্রায়ী। পাহাড়ী-এলাকায় কিছু কবতে হলে তাঁর মত লোকের সহ-যোগিতা অপরিহার্য। এ পর্যন্ত আফগানিস্তান সাহেব ও আফগান বোম্বার্ডার এঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন।... পরে আবার পথ-চলার শব্দ হল।...

পথে পথে নানা স্থানে এইভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে ভক্তরাগের দল পৌঁছল এসে মশক-এর ভেলার কাবুল নদী পেরিয়ে একটি গ্রামে। এতটা পথ পায় হেঁটে শান্তি-বাবুর পা বিবাক্রম কতে অকোজো হয়ে এসেছে। কাজেই একটি খজুর ভাড়া করা হল।... এবার জলালাবাদের তিন মাইল পূর্বে, বাজপথে এসে পড়ার গাইডকে বিদায় দেওয়া হল। এ-গাইডটিকে আফগানিস্তান সাহেব 'কুদাখিল' থেকে সপ্তে দিয়েছিলেন। বেলা তখন তিনটা।...

একটি কালভার্ট বেছে নেওয়া হল। তার নিচে শপ-শয্যার পথ সুখে ঘূমিবে; নিলেন ভক্তরাগ, শান্তি গান্ধলী ও সোদা।...

ঘুম থেকে উঠে রওনা হলেন তাঁরা জলালাবাদ অভিমুখে। পৌঁছলেন সেখানে বেলা আটটার। জলালাবাদে কোথায় নেতাজী উঠেছিলেন তা সন্ধানের দেখিয়ে দিলেন ভক্তরাগ তাঁর সঙ্গীদেরকে। সঙ্গীরা সাগ্রহে দেখে নিলেন বিশ্ব-পত্রিকার পথপ্রাপ্ত এক রাস্তার আশ্রয়ভীর্ণ।...

অতঃপর টাকার চড়ে তিনজনে চলে এলেন মুলতানপুর। সেখানে থেকে ট্রাক খরে কাবুল পৌঁছলেন ভক্তরাগ ও শান্তিবাবু ১৯৪১ সালের ১লা ২২ জুলাই।...

কাবুল পৌঁছেই ভক্তরাগ দেখা করলেন প্রথমে উত্তমচাঁদের সঙ্গে এবং পরে মিঃ ক্রোশন-র সাথে। শান্তিবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন পায়ের বিবাক্রম কতটা জন্যে। কাজেই সন্ধ্যাই জাজিরান-এ একটা ঘর নিয়ে সেখানে লুপ্তদের রেখে ভক্তরাগ একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন উত্তমচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

ক্রোশনকে ভক্তরাগ জানালেন যে, পূর্ব কথা মত কলকাতা থেকে একটি যুবক এসেছেন তাঁর সঙ্গে। ক্রোশন সে-সংবাদ ইতালীয় লিগেশনে পৌঁছে দিতেই তাঁরা খবরটা বালিনে নেতাজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ক্রোশনের মাধ্যমেই শান্তিবাবু জানেছেন যে, নেতাজী রাশিয়ান বর্ডার পেরিয়ে ট্রেনযোগে রুস্কা হয়ে জার্মান-দূতের সাহায্যে ২৮শে মার্চ বালিন পৌঁছে গেছেন। সেটা অবশ্যই ১৯৪১ সাল।...

কয়েকদিন পর ইতালীয় লিগেশন থেকে খবর এলো যে, নেতাজী জনতে চাচ্ছেন—(১) কলকাতা থেকে কে এসেছেন, তাঁর নাম কি? (২) সত্যজিৎ বসু জেলের বাইরে আছেন তো? (৩) সত্যবাবু বসুদের মধ্যে

নতুন কেউ প্রেরণ হন নি তো? (৪) প্রেরণ হলে তাঁদের নাম কি?...

শান্তিময় অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন বলেই লিগেশন-আপিসে যেতে পারছিলেন না। পত্র-যোগে তিনি জানালেন লিগেশনকে নেতাজীর উদ্দেশ্যে—“সত্য বসু মহাশয় বাইবেই আছেন, থরা পড়েন নি।... ‘বি-ডি’ বসু বাবুও অব কেউ প্রেরণ হন নি।... অসুস্থতা ও অন্যান্য সবজামাৎ এবং কর্মনির্দেশ চাই।... আফগান পার্বত্য-এলাকায় যথার্থ স্থানগুলোয় কর্মী ও সর্বাধিকার সঙ্গ যোগাযোগ করা হয়েছে। সবাই নেতাজীর আদেশের অপেক্ষা করছে।...”

উক্ত নেতাজী জানালেন : “অক্ষ-শক্তি সঙ্গ এখানে আমায় রাজনৈতিক-বোম্বপড়া হয় নি। কিছু বোম্বপড়া না-করই তাঁরা আমাকে সকলরকম সাহায্য দিতে রাজী। কিছু স্বাধীন ভারতবর্ষকে স্বীকার করে স্বাধীন-ভারতের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিত্বের জায়গা স্বীকৃতি না দেবার পূর্বে আমি তাঁদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেব না। কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হবে।... তবে বালিন-রোডিও থেকে হয়তো আমি দেশবাসীকে আমার বক্তব্য এখনি শোনাতে পারি।”...

মহাদেবপূর্ণ এই ঐতিহাসিক-পত্রের জবাবে শান্তিময় গান্ধলী জানালেন : “আমরা অপেক্ষা করবো।... আফগান পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহের জমি খুবই উর্বর হয়ে আছে।... নেতাজীর সম্মল অন্তর্ধানে প্রচুর আশা ও সম্ভাবনার উৎসব ভারতের ঐশ্বর্য্যের বিপ্লব-বহু হয়ে আছে।”...

অতঃপর শান্তি গান্ধলী একটু সুস্থ হতেই ইতালীয়-লিগেশনে পক্ষ থেকে একটি গোপন বৈঠক ডাকা হল কাবুল থেকে ২৫ মাইল দূরে এক পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে। জারগার নাম ‘পাছুমন’। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ও মিসেস কোরাবিন, আনজেলোটি, নবাগত একটি জার্মান, শান্তিময় গান্ধলীকে ইতালীয় লিগেশনের লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কালে ভক্তরাগ জানালেন যে, নেতাজীর নির্দেশমত শান্তিবাবুকে কলকাতা থেকে আনা হয়েছে ট্রেনিং নেবার জন্যে।... সবাই খুশি। পূর্ব কথা মত ট্রেনিং দেবার কাজ-ও শীঘ্র শুরুর হবে বলে ভরসা পাওয়া গেল।...

পরে আবার দু-একটি বৈঠক বসেছিল। প্রত্যেক বৈঠকেই ভক্তরাগ এবং শান্তি গান্ধলী উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু কাজ এগুচ্ছে না!...

দীর্ঘ একটি মাস কেটে গেল। কেমন যেন সবাই চুপচাপ!... ক্রমশ কাবুলের ইতালীয় ও জার্মান এম্বাসীস যেন যুদ্ধ-পরিস্থিতির চাপে বিচ্ছিন্ন হবে যেতে লাগল ইউরোপ থেকে!... ভাবতীয়-বিপ্লবীদের জন্যে হালে নেতাজীর কাছ থেকেও তেমন কিছু নির্দেশ আসছিল না।...

ক্রমশ বোঝা গেল যে, আপাতত ট্রেনিং-এর

কাজ কিছুই হবে না। তাই ভক্তরাগ শান্তিবাবু শ্মির করলেন যে, বর্তমানে দেখে ফিরে যাওয়াই ভাল। তাঁরা আবার শ্মির কবলেন যে, প্রযোজনে ‘লিগেশন’ উত্তমচাঁদের মানব সংরক্ষণ পাঠালেই তাঁরা পুনরায় কাবুল চলে আসবেন। নইলে বৃথা তিনিই যুবক কাবুল শহরে এইভাবে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালে পুনরায় নতুন তাঁরা এড়াতে পাবেন না।...

‘সোদা’ চেষ্টাচর্চা কবেও রুশে যাবার কোন সুবিধা কবতে না-পারায় ভক্তরাগের সঙ্গে দেশে প্রত্যাবর্তন করাই প্রশস্ত মনে করেছিলেন।...

জুন মাসের মাঝামাঝি শান্তিময় গান্ধলী কলকাতা ফিরে এসেছেন।...

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত চঞ্চল। কয়েক মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে শান্তি গান্ধলী দু-তিনবার লাহোর এসে গেছেন ভক্তরাগের কাছে, খবরাদিও জেনে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তিবাবুকে পুনরায় লাহোর পাঠান হল খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সে-সময় রাশিয়া জার্মানদের দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয়ে মিষ্ট-শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টিও তাই রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী-যুদ্ধকে জন-যুদ্ধরূপে অভিহিত করে ইংরেজের দোষের হয়ে গেছে। লাহোরের ‘কীতি-পার্টি’ তাই মত বদলিবে ফেলবার দিকে ক্রমশ খুঁকে যাচ্ছে। পার্টির কর্তারা শান্তিবাবুকে সে-বার্তাই শোনালেন। তাঁরা আরো বললেন যে, ‘জন-যুদ্ধের’ সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হবেন বলেই নেতাজীর কার্যকলাপে তাঁরা আর উৎসাহী নন।... শান্তিবাবু ভক্তরাগকে কোন এক সময়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কি কববেন? ভক্তরাগ অবশ্য পবিত্রকব বলেছিলেন যে, পার্টির বিরুদ্ধে তিনি যেতে না পাবলেও ইংরেজকে তিনি কোন ক্ষেত্রেই ‘বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁরা বংশপবপন্নর ইংরেজের ‘দুঃশমন’। দ্বারা তাঁর ভাইকে ফাঁসি দিয়েছে, তাদের ‘যুদ্ধ’ তাঁর-ও যুদ্ধ হবে—এ অসম্ভব।...

অবশ্য বহু ষোঁয়াখুঁজি সত্ত্ব ও অতঃপর ভক্তরাগের সঙ্গে ‘বি-ডি’-র আর কোন যোগাযোগ ঘটে নি।...

শান্তি গান্ধলী তাড়াতাড়ি কলকাতা চলে এলেন। ‘কীতি-পার্টি’-র লোকেরা ওখানেই হয়তো থাকেন নি। কারণ নেতাজীব পলায়নের পথ ও তাঁর প্রোগ্রাম সম্পর্কে শতটুকু তাঁদের জানা ছিল তা পুনিশও জেনে ফেলল। তৎ-সঙ্গে তাঁদের জানিত নেতাজীব ‘অন্তর্ধান-যুদ্ধের’ জড়িত নামগুলোও পুনিশ পেয়ে গেল। ফলে সত্য বসু ও যতীশ গুহকে ১৯৪২ সালের এপ্রিলে দিল্লী-ফোর্ট মিলিটারি হোপজতে এনে ফেলা হল এবং শান্তি গান্ধলী প্রথমবারি পলাতক ছিলেন বলে তাঁকে

পুলিশ খুঁজে পেল না। সভাবাবু ও বতীপ-বাবুর ওপর চলল মিলিটারি সার্কেটদের লাঠিগঠো ও ব্যাটনের অবিভ্রাম সম্বাহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস!...

এদিকে 'বি-ডি'র নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে কামাখ্যা রায় ছাড়া আর কেউ বাইরে থাকতে পারলেন না। যুদ্ধের মোড়-ও ঘুরে যাচ্ছে।... কীর্তি-পাটিল- কীর্তিতে উত্তব-পশিমা-সীমাতের সর্বাঙ্কর ব্যবস্থাও পুন্নিশের নবদর্পণে চলে গেছে। তাই এ স্ট্রেক্টের সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল।... 'মিবজ্ঞান' তখনো ভাবতবর্ষের জমিতে বিবাজমান!!...

বর্মী-স্ট্রেটে নেতাজী :

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ নেতাজী হার্লিন পেঁছে ফেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ-ও গঠন করে ফেলেছেন। ১৯৪১ সালেরই ৭ই ডিসেম্বর আচম্বিতে ভারতবাসী শুনলো : "আজাদ হিন্দু, বেডিও, কালিন। ... আমি, সত্যাব। এতকাল আপনাদের কাছে আমার বস্তবায়নের শোনান সূচ্যোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপ-বাদই দিক — আমি, জামি, আপনাবা তা' বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে না বলে-তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ... আপনারা আন্ত-জাতিক পরিব্রাতির দিকে লক্ষ্য বেশে প্রস্তুত থাকুন। আমি বেভাবে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টকে বিরান্ত করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসোঁছি, টিক তেমন কারেই বধানমবে আপনাদের কাছে সিরে উপস্থিত হব।... বে সূচ্যোগ আসছে সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগতে হবে। সে-জন্য নিজেরা জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন। চাই এক ও একান্ততা।"...

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর-ই ইঙ্গ-আমেরিকান আতাতের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করল।... দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকতা সূচ্যোগে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। রণ-ক্ষেত্রের তীব্রতা চলে এলো কটিকা মত প্রশান্ত মহাসাগরবে কূলে-কূলে।... জাপানের অতৃতপূর্ব যুদ্ধক্ষেত্রের সাথে ব্রিটিশসাম্রাজ্য চুরমায হয়ে যাবা উপক্রম হল।... নেতাজী বুদ্ধলেন যে, জর্মনি এখন আব তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। কাজেই জাপান-স্ট্রেটে চলে আসার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।... ইতিহাস-স্রষ্টা বিখ্যাতাও তাই চান। তাই ডাক এলো আব করো কাছ থেকে নয় — মহানায়ক রাসবিহারী বসু, কাছ থেকে। আজম বিপ্লবী, আজম স্বাধীনতার মহান যোদ্ধা রাসবিহারী জানলেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' সংগঠন কার্য হয়ে যাবে, যদি তাঁর হত থেকে নেতাজী সকল দায়িত্ব গ্রহণ না করেন। কাষণ, তরণ, সূচ্যের মধ্যে অন্তগামী-সূচ্য রিলম্ভ না হলে জাগামী দিনের প্রভাত যে আসবে না। বিন্ধ্য-কম নেতৃত্বের প্রয়োজন বলেই দেশপ্রেমী রাস-

বিহারী অমন ব্যাকুল হয়ে নেতাজীকে আহ্বান করলেন।...

এ আহ্বান বেন অপ্রতিহত 'আদেশ' হয়ে এসেছে নেতাজীর মনের কাছে। জর্মনি-গভর্ন-মেন্টকে প্রভাবিত করতে নেতাজীব বেগ পেতে হল না। তাই একটি ইউ-বোটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৯৪০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী 'কিকেল' থেকে গভীর সমুদ্রে ডুব দিলেন উক্ত ইউ-বোটের প্রধান-বাহী হয়ে। এ-সম্রা দীর্ঘকালীন শত্রু নর, বিশ্ব বিপদ-জনকও ছিল। বে-কোন মুহুর্তে 'শত্রু'র হস্তে বিক্ষত হবার আশঙ্কা ছিল প্রচুর।

২৮শে এপ্রিল মাদাগাস্কারের কাছে এক স্থানে ইউ-বোট এসে থামল। রবার-বোটের সাহায্যে যাত্রীদেরকে তোলা হল অপেক্ষমান আর একটি জাপানী সাব-ম্যারিন-এ। সাব-ম্যারিনটি 'পেনান্ড' পেঁছল ইরা জুন। পেনান্ড থেকে স্যাবোয়াজনে নেতাজী পেঁছলেন এসে থাম 'টিকিও'-তে ১৯৪০ সালের ১০ই জুন।

এর পরের অতৃতপূর্ব শৌর্যময় কাহিনী ইতিহাসবিদগণ 'আজাদ হিন্দু ফোর্স', 'আজাদ হিন্দু ফোর্স' এসের 'সিঁড়ি'র নেতাজী এবং প্রধান প্রচেষ্টা নেতা রাসবিহারীর অবদানে জাতিকে বহুবার সোনান-হয়েছে। আমরা এখানে সে-ইতিহাস বিবৃত করব না। শত্রু এইটুকু বলবে যে, ভারতের অধঃত বঙ্গবের সমস্ত-বিপ্লবের সফলতম পরিণতি নেতাজীর কর্মকাণ্ডে; এ বিপ্লব-নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ নেতাজীব মধ্যে।...

বর্মী-স্ট্রেটে নেতাজীর সঙ্গে দেশ থেকে 'বি-ডি'র যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা :

নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসেছেন। মন্ত্রিসংগ্রাম এবার চরম রূপ ধারণ করবে। আজাদ-হিন্দু-ফোর্স ভাবতবর্ষের বাইরে থেকে ব্রিটিশ-শক্তিকে আক্রমণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।... ভারতের অভ্যন্তরে 'অগাস্ট-বিপ্লব' বিপ্লবের রথে চড়ে যে 'মহামুক্তি' সমাগত, জনগণকে সে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা দেবে না — দেবে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক স্বাধীনতাও। এই স্বাধীনতা ও মানব-মুক্তির স্বপ্নই বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীরা এতকাল দেখে এসেছেন। নেতাজী সেই স্বপ্নকে বাস্তব সৃষ্টিতে রূপ দিতে যাচ্ছেন। ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তিনিই শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁর আদেশে ও মহোত্তম প্রেরণায় আসমগ্রহিমাচল এই জাতি সচকিত ও সমৃদ্ধ।...

বিপ্লবের 'বিজ্ঞান' বিপ্লবীদের জানা ছিল না বলে যাবা অভিমত প্রকাশ করেন—তাদেব সমালোচনা বিপ্লবী-বিশেষকে লক্ষ্য করে হতে পারে, কিন্তু সকল বিপ্লবী-নেতাদের বিষয়ে এ সমালোচনা প্রয়োগ করলে ন্যায়বিচার করা হবে না। 'বিপ্লব-বিজ্ঞান' যতীন মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, সূচ্য সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ,

বান্দোপাশাল বা আরো অনেক বিপ্লবীর তৎকালে জানা ছিল না বাংলা বৈজ্ঞানিক মনের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলার বিপ্লব-ধারা বুদ্ধবার ধৈর্য সেখানে নেই। বাংলার 'বিপ্লব-বাদ' বুদ্ধতে হলে শ্রম সূচ্যের 'শ্রম' ছাড়া কোন কস্তু বোকা যার না। কুদিবাম থেকে নেতাজী পর্যন্ত ছোট-বড় বিপ্লবীদের অপরাধ যে বিজ্ঞান কর্ম-ইতিহাস, তাকে এক করে ধরতে হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষকে বুদ্ধতে হলে যেমন তার বাল্যকাল থেকে বার্ষিক পর্যন্ত একত্রে পর্যবেক্ষণ করাই বাঁচি। সুতরাং এও বুদ্ধতে হবে সমালোচককে যে, বিগত অধঃতাজীর বিপ্লব-চেষ্টার পরিণতিই হল নেতাজীর প্রচণ্ড বৈপ্লবিক অভিধান।... বিপ্লবের গতি ব্যর্থ হতে-হতেও সাধকতাব পথে যার, ব্যর্থতার স্তম্ভ হবে পড়ে না। বাংলার বিপ্লবীরা কোনকালেই বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি, চেষ্টা সবেও হরতো অনেক স্থলে অক্ষমতার পথচর দিয়েছেন। এই অক্ষমতা বিপ্লব-বিজ্ঞান না জানার জন্যে নয় এই অক্ষমতা ছিল সাংগঠনিক বা-রিসোর্স-ফুলনেস-এর অভাবপ্রসূত।... বিপ্লবের সমাক জ্ঞান তাদেব ছিল বলেই — অর্থাৎ বিপ্লবের বিজ্ঞান তাদেব অজ্ঞাত ছিল না বলেই প্রথম মহামুক্তির কালে বিপ্লবচেষ্টার ব্যর্থ হবে মহানায়ক রাসবিহারী বসু, বহুর বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদেশে অন্তর্ধান করেছিলেন এবং অপব মহানায়ক যতীন মুখার্জী সংগীদের সহ সমুদ্র-সমরে প্রাণ দিয়েছিলেন। যতীন মুখার্জী নিয়ে গেলেন বিদ্রোহের প্রেরণা, যাকে ভিত্তি করেই যথার্থ বিপ্লবের আবির্ভাব সম্ভব হয়। তাই সম্ভব হল ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও রাইচাঁস বিদ্রোহ-এর খণ্ডবৃদ্ধ।... আমার বিপ্লব-বিজ্ঞানী রাস-বিহারী সূচ্যের জাপানে অবস্থান করে তাই দ্বিতীয় মহাসমরের সূচ্যোগ নিয়ে গড়লেন 'আই-এন-এ' এবং জুল দিলেন সর্বাঙ্কর বহুর নেতৃত্বের হাতে পরম আনন্দে। পঞ্চাশ বঙ্গবের বিপ্লবসাধনার চরম রূপাষণ আজাদ-হিন্দু বাহিনীর প্রচণ্ড কর্ম, পঞ্চাশ বঙ্গবের বিপ্লব-নেতৃত্বের চরম পরিণতি নেতাজীর নেতৃত্বে। ইতিহাস কিন্তু 'বিপ্লব-বিজ্ঞান' জ্ঞানের অভাব বিপ্লবীদের মধ্যে খুঁজতে যাবে না। ইতিহাস বলবে যে, ভারতের 'প্রথম বিপ্লব' সফল করেছেন বিপ্লবীরা নেতাজীর নেতৃত্বে।... এবং সে-বিশ্ববাব অবদানই হল ভাবতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আনন্দে মহাসমর অহিংস-বিশ্ববের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু আমা উচিত ছিল যে-স্বাধীনতা, তা' না-আসার মূলে কংগ্রেসের 'সমস্তোতা-বিশ্ববাসী' নেতৃত্ব। জুওরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা' না করলে তাঁরাই দ্বিতীয় 'বিপ্লব' আনতে পারতেন, এবং বাঞ্ছিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। তাঁরা তা আনেন বলে এ-ব্যাপারে অপরের দায়িত্ব অবশ্য

করিয়ে যার নি। অপরে শ্রমতীর বিপ্লব ঘটতে কেন পারছেন না তার উত্তর ইতিহাস খুঁজবে কিন্তু তার জন্যে যারা 'প্রথম বিপ্লব' ঘটিয়েছেন তাদেরকে ইতিহাস 'বিপ্লব-বিজ্ঞান' সম্পর্কে অজ্ঞ বলে দূর্বাস দেবে না।...

নেতাজী বর্মার কর্মক্ষেত্র রচনার মন। বাংলার বিপ্লবী কর্মীরা তখন কারারুদ্ধ। কিন্তু অতীতপূর্ব বৈশাখ-আরহে দেশে নতুন নতুন কর্মীদল দুঃসাহসিক মাধ্যমে শূন্যস্থান পূর্ণ করে যাচ্ছেন। বিপ্লবের গতি অনাহত। বহিঃউৎসারিত হবার কাল অদূরে।...

এ যুগে কত অনামী কর্মী যে হেলায় সর্বস্ব প্রত্যাখ্যান করে বিপ্লবযজ্ঞে আত্মহুতি দিয়ে গেছেন তার অবধি নেই। ইতিহাসকার কোন শূন্যস্থানে তাদের কর্মকথা যে দেশ-বাসীর গোচরে আনতে পারবেন তা জানি না। অলঙ্ঘ্য অবসিত এই মহৎ প্রাণগুলোর প্রতি আমরা শূন্য শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলাম।...

১৯৪০-১৯৪৪ সাল।

বি-ভি-র তরুণ কর্মীবৃন্দ বহু দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়ে তাদের কলকাতা-কেন্দ্রে তৎকালে সংগঠন-কার্য ভালভাবেই চালিয়ে গিয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সবাই কারা-গে। একমাত্র কামাখ্যা রায় তখনো বাইরে। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ধীরেন সাহ-রায়, গুল (সত্যব্রত) মজুমদার, রাতুল রায়-চৌধুরী, সুবোধ চক্রবর্তী, জগদীশ (পানু) সেন, জিতেন সরকার, নীরেন রায় (স্বর্গগত) ছিলেন অন্যতম। কিশোরগোপাল সেনও ছিলেন গুপ্ত-কর্মকান্ডের একজন বিক্ষুব্ধ কর্মী।... মেঘা ঘোষ বাড়ি থেকে একবার চার হাজার টাকা এনে দেন। অ ছাড়া তিনি অনেক দিন মাসে মাসে এক-ত থেকে দেড়শত টাকা দিয়ে গেছেন শেফটার-গার বাড়ি-ভাড়া বাবদ।

দিকি বাংলা-আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে অজিত রায় কর্মক্ষেত্রে চলে গেছেন। তাঁর এ কাজের সহায়ক ছিলেন বি-ভি-র বন্ধু এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা চট্টগ্রামের নীরঞ্জন ইসলামি ও তাঁর সহকর্মী-বৃন্দ। ইসলামাবাদি সাহেবকে এর মূল্য দিতে হয়েছিল ১৯৪৪ সালে লাহোর ফোর্টে মিলিটারির নির্মম হেপাজতে বন্দী-অবস্থায়।

ইসলামাবাদি সাহেব কৃষক-পত্রিকার সংগে যুক্ত হলেন। সে পত্রিকার কর্মপরিধিতে তৎকালে ছিলেন জিতেন, গাজুলী। যিজনের মাধ্যমে বি-ভি-র সংগে পরিচিত হলেন ইসলামাবাদি সাহেব। কামাখ্যা রায়ের সংগে তাঁর যোগাযোগ রক্ষা হত পানু (জগদীশ) সেনের মাধ্যমে। কৃষক আপিসের বোর্ডিং-এ মুসলিম কর্মীদের সাহায্যে) কিছুদিন শান্তি লাভলীক গোপনে রাখা হয়েছিল। বৃদ্ধ ইসলামাবাদি সাহেবের তেজস্বিতা, সংগঠন-

কমতা ও নির্ভেজাল দেশপ্রেম বি-ভি-র কর্মীদেরকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁকে ঘিরে বেসব কর্মী 'বেঙ্গল ডেসপ্যাচ' এবং তরফ থেকে কাজকর্ম করতেন তাঁদের মধ্যে রামলাল দাসের নামও উল্লেখযোগ্য।...

আবার বি-ভি-র হরিপদ ভৌমিক খাল আজাদ হিন্দ ফৌজে ঢুকে গেছেন। তিনি পূর্ব থেকেই সিঙ্গাপুরে নানা কাজের ভাগিদে নিজের একটি আস্তানা করে নিয়েছিলেন। হরিপদ শহীদ মতি মল্লিকের সহকর্মী ও বন্ধু। 'আজাদ-হিন্দ'-সৈনিকরূপে তাঁর একটি হাত ও অপর হস্তের আঙুল যে শত্ৰুপক্ষের বোমার আঘাতে উড়ে গিয়েছিল তা পূর্বে লেখা হয়েছে।...



জাজাহিহ' রেডিও, বার্লিন... আমি সত্যাব।

বি-ভি-র কর্মীদের সংগে ইতিপূর্বেই গোপন 'ট্রান্সমিটার' বর্মার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 'ট্রান্সমিটার' এনেছেন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কতিপয় কর্মী। তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন নেতাজী। ইউ-বোটে করে তাঁরা বঙ্গোপসাগরে ভারতের নানা উপকূলে এসে উঠেছেন। তারপর কতক কর্মী কলকাতা এসে বি-ভি-র কর্মীদের সংগে সুখীর বস্ত্র মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করেন। প্রথমে সুখীরবাড়ী এবং পরে ধীরেন সাহ-রায় ও সত্যব্রত মজুমদারের সংগে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কর্মীদের যোগাযোগ রক্ষা হতে থাকে।...

নেতাজীরই নির্দেশে বাংলাদেশে বি-ভি-র যে কর্মপ্রস্তুতি চলছিল তার ভূমিকার নীরেন

রায়, গোপাল সেন প্রমুখ কিশোর কর্মীদের অবদানও কিন্তু সামান্য ছিল না। ঢাকা, গোহাটি, বদরপুর, মণিপুর, কুমিল্লা, আগর-ডালা, ভৈরব, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর্মকেন্দ্রগুলোর মধ্যে কলকাতা-কেন্দ্রের পরি-চালনার যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ভালভাবেই সম্পন্ন হচ্ছিল।...

বি-ভি-র নেতৃবৃন্দও তৎকালে বাংলার নানা কারাগারে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। তবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বঙ্গা-বঙ্গীনিবাসে আবদ্ধ।

নেতাজী ভারতে পদার্পণের পূর্ব মূহুর্তে বঙ্গা-জেল থেকে সমস্ত বঙ্গীদেরকে বের করে আনার-প্র্যান ছিল বি-ভি-র। এর প্রস্তুতিও চলছিল কিছুটা। কিন্তু নেতাজীর মাল্টার-প্র্যান কার্যকরী না-হওয়াতে এসব ছোটখাট প্র্যান সফল করার দিকে আর নজর দেওয়া হয় নি।...

পূর্ববঙ্গের প্রধান কর্মকেন্দ্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে। দলের অধিকাংশ কর্মী জেলে থাকা সত্ত্বেও নতুন নতুন ছেলেরা এসে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ধীরেন সাহারায়, সত্যব্রত মজুমদার, অসিত ভৌমিক পলাতক হয়ে সারা বাংলার ঘুরে ঘুরে কাজ করে বেড়াচ্ছেন, তবে ঢাকার তাঁদের আনাগোনা বেশি। তা ছাড়া ঢাকার স্বল্পতাব দাসগুপ্ত, মণীন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্র দে প্রমুখও পলাতক হয়ে কাজ করছেন। তাঁদের একান্ত সহায়ক হলেন ঢাকার জ্যোতির্ময় ঘোষ, গৌর দত্ত, অরুণ গুপ্ত, সুবোধ রক্ষিত এবং নারায়ণগঞ্জের জগদীশ ভৌমিক, মাখন ভট্ট, বারীন ঘোষ, নির্মল চৌধুরী, গোপাল নন্দী (স্বর্গগত) প্রমুখ কিশোর কর্মীবৃন্দ। পরম উৎসাহে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য দেশের স্বাধীনসমাজকে প্রস্তুত করে রাখা যাতে নেতাজীর পদার্পণের সাথে সাথে তাঁর পাশে গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে পারেন মহানায়কের নির্দেশ পালনের জন্যে। কিন্তু পাশে দাঁড়াতে হলেও তো অস্ত্রশস্ত্র চাই। প্রাণপণে তাঁরা অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা করতী হলেন। গ্রামে গ্রামে স্বাক্ষর গ্রামবাসীসহ লাঠি-ছোরা-টোটো-বল্লম-তলোয়ার-কুপাল চতুষ্পাশ্বে মজুদ রেখে বাহুবল লেনের অপেক্ষার থাকবে, এ প্রস্তুতিও তাঁরা করে চললেন।...

কলকাতা থেকে রাশিরাশি ইস্তাহার আসছে 'ফ্রি ইন্ডিয়া লীগ'-এর নামে। তাতে উল্লেখ থাকে আই-এন-এর 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'-এর নির্দেশগুলিও। ফ্রি-ইন্ডিয়া-লীগের ইস্তাহারে কোনোবার আবেদন থাকে জনসাধারণের কাছে এই মর্মে যে, নেতাজীর সংগে 'অতিফোজ' আসছে বর্মাসীমান্ত পেরিয়ে ভারতবর্ষের স্বধন-দশা মোচন করতে — তাঁদেরকে বরণ করবেন সংগ্রামী জনগণ স্বাধীনসমাজে নিজেকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে। তারপর নেতাজীর নির্দেশে

চাঁদের কাঁপিয়ে পড়তে হবে নানা কর্মে দেশ-
রাত্কার মৃত্যুকালে।... আশ্রয় হওয়া আলম-
দালাদাতার আবেদন জানিয়ে ইন্তাহার আলমে
চাঁদের কাছে, মজদুরের কাছে।... আসছে
নারী, ছাত্র ও বৃকসদের কাছে।...

একবার খবর এলো যে প্রচুর ইন্তাহার
জানতে হবে ঢাকা উচ্চ পূর্ব-বাংলায় কলো।
কিন্তু প্রেন-সিটমারে-পথে-ঘাটে এতই পুলিশী-
খবরদারি হাড়ে গেছে যে, মাল পাঠানো বাতিল
না। তাই প্রীত্বা হেমলতা দেবীকে অনুরোধ
করতে হবে তার ছেলের (ভূপেন রক্ষিত-রায়)
সহ ইন্টারভিউ নেবার জন্যে কলকাতা যেতে।
(ভূপেনবাবু তখন প্রেসিডেন্সি জেলে কলী)।
তিনি ঢাকা দিগে আসবার সময় ইন্তাহারগুলো
নিরে আসছেন ইহাই ছিল ছেলের বক্তব্য।
কথাসমূহ ইন্টারভিউ পর (হেমলতা দেবী)
ঢাকা দিগে আসার সময় তার ট্রাঙ্কে একগুদা
ইন্তাহার নিয়ে দেওয়া হল। তিনি একাই
আসছেন কলকাতা থেকে। ঢাকা স্টেশনে
গৌর দত্ত এসেছেন। তার ওপর নির্দেশ ছিল
স্টেশনে 'দিদিমা'কে (হেলেরা তাকে 'দিদিমা'
হলে সম্বোধন করত) ব্রিসিং করে বাসার
পেছনে নিয়ে ইন্তাহারগুলো বখাল্য়ানে নিয়ে
কলকাতা। গৌর ঠিক সময়েই ঢাকা স্টেশনে
এসেছেন। ট্রেন প্রাটিকর্ম চুকলো। হেমলতা
দেবী গাড়ি থেকে নামলেন। গৌর এগিয়ে
বাহন 'দিদিমা'র কাছে কিন্তু দূর থেকেই
তিনি কলকাতা করলেন যে, ওরারেরা 'দিদিমা'কে
নিরে কেলেছে এবং কি বেন প্রশ্ন করছে।
গৌর আর এগলেন না।...

প্রশ্ন আর কিছুই নয়, ট্রাঙ্কের ভিতর কি
আছে তাই তারা জানতে চাচ্ছে। হেমলতা দেবী
প্রশান্ত চোখ দুটি তুলে আস্তে প্রশ্ন করলেন :
'তোমরা কে বাবা?... তারপর বললেন : 'থাকবে
আর কি? আমার জিনিসপত্র।'

— 'আমরা পুলিশের লোক। বাজটা খুলে
দেখতে চাই।'

— 'তাই নাকি? তোমরা পুলিশের লোক
হওয়াতে ভালই হলো। আমি আমার ছেলের
সম্পদ প্রেসিডেন্সি জেলে দেখা করতে গিয়ে-
ছিলাম। তার নাম হরতো শুনতে পারো।
(তিনি এখনে নামটি উল্লেখ করলেন)। যাক
যে, আমি বড়ো মানুষ একা এসেছি। তোমরা
বাবা, আমার একটু সাহায্য করো। আমার বাজটা
কুলি ডেকে একটা গাড়িতে তুলে দাও।
গাড়ীওয়ালকে বলে দিয়ে যে, ঈশ্বর দাস লেনে
যেতে হবে।'...

ওরারগুলো কি ভালো, কি বুকলো
তারাই জানে। কিন্তু দেখা গেল হাঁকহাঁক
করে কুলি ডেকে, গাড়িতে বাস তুলে দিয়ে
কিনয় 'নবার কালে জোড় হস্তে নমস্কার করে
বলল : 'মা, কোন অপরাধ নেবেন না। আমরা
বাই।'...

গৌর দত্ত দূর থেকেই দৃষ্টি দেখলেন।...
সাহসে, প্রত্যাগমনমতিতে এবং সর্বোপরি প্রচুর
ব্যক্তিগে সম্মতিতা এই মহিলাকে উপেক্ষা করে

কার সাধ্য? ওরারগুলো যেন সেদিন
অন্যদিক অলম্বনীর অহমসই পালন করে
গেল।...

হেমলতা দেবী যে ইন্তাহারগুলো নিয়ে
এসেছিলেন তা মারাত্মক ছিল। ব্রি-ইন্ডিয়ান-
লীগের ইন্তাহার হলেও ভারত নেতাজীর
'ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া লীগ' (বর্মী) থেকে
ভারতীয় সমরবাহিনীর উদ্দেশে প্রেরিত
আবেদন পালনের নির্দেশ রয়েছে। উক্ত
আবেদন এই ইন্তাহারের উদ্দেশ্যে করা ছিল।
ইন্তাহারটি ইংরেজিতে — **An Appeal to the Indian Soldiers!**
কি ভাবে, কখন ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ
করবে তার নির্দেশ রয়েছে ইন্তাহারে।
ভারতের প্রত্যেকটি সৈনিকই বীর ও দেশ-
প্রেমিক—সুতরাং তারা নেতাজীরও প্রিয়তম
সৈনিক, তাদের ওপর নেতাজীর অটুট বিশ্বাস
ও একান্ত নির্ভরতা।...

পরের দিন নানা স্থানে কর্মীদের কাছে
ইন্তাহার পাঠান হল। নির্দেশ দেওয়া হল
নির্ধারিত সময়ে সেনাবাসগুলোর কাছাকাছি
ইন্তাহার লাগিয়ে দেবার। এই ইন্তাহার বিলি
করার ব্যাপারে অনিল সেন (মাণিক) খুবই
সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাতের
অন্ধকারে অতি কৌশলে ঢাকা পিলখানার ঢুকে
ব্যারাকে-ব্যারাকে ইন্তাহার কেলে দিয়ে এসে-
ছিলেন। কেউ টের পার নি। ধরা পড়লে
'কোর্ট মার্শাল' প্রাপ হাতে করে প্রাণান্তকর
এই কার্য অতি নৈপুণ্যে সমাপন করে এসে-
ছিলেন কিশোর। পিলখানার ভৎকালে বহু
সৈন্যের সমাবেশ ছিল—গুর্খা-বাহিনীতে ভরা।
...পরদিন পুলিশের চক্ষুস্বধ! তারা ভেবে-
ছিল যে, গুর্খাদের মধ্যেই হয়তো কেহ বিপ্লবী-
দলের আওতার চলে গেছে। কাজেই দৃষ্টিভ্রমের
সীমা ছিল না আই-বির কর্তাদের।

পূর্বেই বর্নোই ঢাকার পলাতকের সংখ্যা
বেড়ে যাচ্ছে। তাই আগ্রয়স্থল না বাড়ালে
চলে না। গ্রামে গ্রামে আগ্রয়স্থল বঞ্চেট
থাকলেও শহরে তার সংখ্যা প্ররোজনমত
নয়।...

চুনীলাল পাল ঢাকার একজন বাসিন্দা
এবং ধনী ব্যবসায়ী। তিনি তার বিশ্বব্যবসায়
নামে একটি নতুন বাড়ি তুলেছেন স্বামীবাগে।
বাড়ির একতলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, দোতলার
মাত্র একটি ঘর উঠেছে। বিধবা মহিলার বয়স
চল্লিশের কোঠার। তার পুত্র বাহুরাম পাল
সবেমাত্র দলে ঢুকেছে। সে-সঙ্গেই দলের ছেলে-
দের খুব ঘনিষ্ঠতা এই পরিবারের সঙ্গে।
মাগের মেয়েই মহিলাটি এই ছেলেগুলোকে
গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন যে, ছেলেগুলোই
সম্প্রদায়িক-দাঙ্গার সময় কাঁপিয়ে পড়ে
দুর্ভিক্ষের রক্ষা করে এবং তাই তো পুলিশ
এদের পেছনে লেগেই আছে।...

একদিন হেলেরা বললেন, 'দাদীমা,

আপনার নতুন বাড়টার আমাদের থাকতে যান।
একটু পা-চাকা দেওয়া দরকার। পুলিশের
ভাড়ার আর পারছি না।'

ভরমহিলা তার শিতাকে কথাটা বলতেই
তিনি রাজী হয়ে গেলেন এবং সেরেকে
বললেন : 'ওদের ও-ভাবে থাকতে দিয়ে না।
তুমি নিজে গিয়ে একতলার থাকো। ওরা
থাকবে দোতলার। কিন্তু একটি সত। ওরা
কোন সময় দোতলা থেকে নাকতে পারবে না।
ওদের খাওয়া-দাওয়া, ঘান বা বাবতীয় কাজের
ব্যবস্থা আমি দোতলার করে দেব। কিন্তু
ভাবতে হবে না।'...

তাই ঠিক হল। সন্তোষ দাসগুপ্তকে
পাঠান হলো এই শেফটারে। মা তার ছেলে
বাহুরাকে নিয়ে রইলেন নিচের তলার।...

কাটলো কিছুদিন।... কিন্তু যেভাবেই
হোক পুলিশ একদিন টের পেয়েছে যে,
বাড়টার বিপ্লবীদের আনাগোনা হচ্ছে। তারা
এলো তালাস করত। মহিলা বললেন :
'খুঁজেপেতে দেখুন। এ-বাড়িতে থাকি আমি
ও আমার ছেলে — আর কেউ নয়।'...

পুলিশ নিচের ঘরগুলো দেখে ওপরে উঠতে
চাইল। মহিলা বাধা দিলেন। বললেন : 'আমি
মেয়েমানুষ, আমার বাড়িঘরে আপনাদের ঢুকতে
দিরোই এই তো বোঁশ। ওপরে আমার ঠাকুর-
ঘর। ঠাকুরঘরে আমাকে হত্যা না করে কেউ
ঢুকতে পারবে না। অজ্ঞাত-বেজাতের লোক
আমার ঠাকুরের ঘরে ঢুকবে, এ অসম্ভব।'

পুলিশের লোকেরা অমন শান্ত ও সেকেলে
মহিলার মধ্যে হঠাৎ অমন রণরংগণী মূর্তির
আবির্ভাব দেখে হকচাকিয়ে গেল। অনেক
চেষ্টার পর রক্ষা হলো যে, পাড়ার কোন
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তানকে এনে ঐ ঘরে বেতে
দেওয়া হোক এবং সে এসে যা বলবে তাই
পুলিশ মেনে নেবে।...

এরো এক ব্রাহ্মণসন্তান। মহিলা তাকে
অলঙ্কো ডেকে নিয়ে আস্তে বললেন : 'ঠাকুর-
ঘরে লোক আছে। কিন্তু তুমি এসে বলবে
যে, কেউ নেই। আমার কথা শুনলে তোমার
লাভ আছে, না শুনলে আজকের রাতে মৃত্যু
দেখতে হবে না — খুন করে ফেলবো
তোমাকে।'...

ব্রাহ্মণ ঘরে ঢুকে সন্তোষকে দেখে এসে
অতি নিষ্ঠার সহিত পুলিশের দারোগাকে
জানালো, 'ঘরে কেউ নেই, স্যার!'

ঢাকার বাসিন্দা-ব্যবসায়ীদের কন্যা এবং
বহু অশিক্ষিতা ও একেবারেই সেকেলে এই
মহিলা কী করে একটি খাঁটি বিপ্লবিনীর
গৌরবে সেদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন?
বিস্ময়ে এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হয়
পূর্বজন্মের 'বিপ্লবিনী' হয়তো আত্মবিস্মৃত
অবস্থায় ঐ অনগ্রসর পরিবেশে জন্মেছিলেন।
কিন্তু অনুকূল পরিপাঠে ভ্রম্যচ্ছাদিত আগুন
বধন জ্বলে উঠলো তখন ব্রাহ্মণকুমার ভরে
পুলিশের চেয়েও ঐ নারীকে অধিক সত্যরূপে
গ্রহণ করেছিল।...

এখানে একটি পলাতককে ধরা পড়তে হবে। তাঁর নাম মণীন্দ্র দত্ত। বাড়ি ছিল সাহজলানগর পল্লীতে। ঢাকাহরম্ভ লক্ষ্মী-মজার অঞ্চলের একটি পাড়া। মণীন্দ্র দত্তের মত বিপ্লবী এবং পার্টিদরদী কর্মী খুবই জল্পিত। দুঃসাহসী ও হৃদয়বান এই কর্মী বঙ্গবন্ধুর আপদ নিজের মাথায় বহন করে সবাইকে নিরাপদে রাখার জন্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। দুঃবৎসব ব্যাপী পলাতক-জীবনেও তাই। পার্টির নির্দেশিত যে-কোনো দুঃসাহসিক কাজে তাকে যেতেই হবে সবার আগে। ফেটে তাকে নিবৃত্ত করতে পারতেন না। কর্ম করে ফলে সবার নিঃশেষ হয়ে কর্মমুগ্ধি লাভ করাই যেন তাঁর সত্যনা। তাঁর বিরুদ্ধে ছোটবড় পরিশ্রমীটামলা খুলছিল। পল্লিশ তাকে খুঁজেখুঁজে হররান। কিন্তু মণীন্দ্র দত্তকে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না।...

একদিন খুব জ্বর নিয়ে মণীন্দ্র ফিরে এলেন মৈমনসিংহ-কেন্দ্রে থেকে ঢাকায়। দক্ষিণ-মৈশাণ্ডি অঞ্চলে এলেন একটি শেল্টারে। বাড়িটার কঠী হলেন একটি নারী। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী থাকেন। আর কেহ তাঁদের নেই বলেই ওটা একটি আশ্রয় শেল্টার। মহিলা করেন খুব পলাতকদের জন্যে। মণীন্দ্রকে তিনিই সেবাযত্ন করতে লাগলেন দ্বিদির মত। বন্ধুরা বধাসম্ভব খোঁজখবর করেন। তিন দিনের দিন অসহ্য বেদনার মণীন্দ্রের প্রাণ ওঠাগত, জ্বর প্রচণ্ড।...তখন ডাকা হল পার্টির শ্রদ্ধানুযায়ী ডাক্তার সত্যেন্দ্র দত্তকে। রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি বললেন : আসল বসন্ত ভিতরে বসে গেছে—তাই বাইরে থেকে কিছু বোকা যাচ্ছে না। এক্ষণি ওকে হাসপাতালে নিতে হবে, নইলে মাস্তে পারবে না।

বন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন : ডাক্তারদা, মণি তো পলাতক। পরিশ্রমীটামলা খুলছে ওঁর ঘাড়। কি করে হাসপাতালে নেব?

—তা আত্মসমর্পণ করলে না হয় দু-চার দশ বৎসর জেল হবে, কিন্তু হাসপাতালে না নিলে মৃত্যু অবধারিত।...

ডাক্তার চলে গেলেন।

মণীন্দ্র সব শুনলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে হাসপাতালে রাখার জন্যে রাজী করান গেল না। এই অসহ্য ব্রহ্মপার মধ্যেও প্রাণান্ত-কণ্ঠে তিনি বললেন : 'Death or Surrender. I prefer Death.'

আরো একদিন বোঁচোঁছিলেন মণীন্দ্র দত্ত। কিন্তু পরম ঐর্ষ্যে তিনি দৈনিক বস্ত্রা ও ব্যাধ্যদ্বারা ভোগ করে গেলেন। তবু বাঁচবার জন্যে আকুল হলেন না, হাসপাতালে গেলেন না। 'বিপ্লবী' মরতে জানেন, সাবোডাব করতে জানেন না।...

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মণীন্দ্রের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পরও যে তাঁর পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে পারে না। পলাতককে তাই অনামী হয়ে

চিত্তে আরোহণ করতে হবে। অথচ এই তরুণের বাপ-মা ও ভাইবোন সবাই মাত্র দশ-পনের মিনিটের পথ পেরিয়ে অবস্থান করছেন। কিন্তু তাঁদের খবর দেওয়ার উপায় নেই।...

নারী মহিলাটি ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি অনেক কষ্টে এই হাসপাতালে খেতে 'বেওয়ারিস লাস'রূপে মণীন্দ্র দত্তের মৃতদেহটি বেব করিয়ে আনলেন। জানিত বন্ধুরা কেউ এগিয়ে আসতে পারবেন না। তাই এগিয়ে এলেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ-বারটি ভাল ছাত্র। তাঁরা বিপ্লবীদলেবই কর্মী। পল্লিশের খাতাখান তাঁদের নাম জুটে নি। অনামী-হয়ে বিপ্লবী মণীন্দ্র দত্তের শব চিত্তানে ছাই হয়ে গেল। তাঁর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন তখনো ভাবছেন — ছেলে বেখানই থাকুক দুঃখের কষ্টে গেলে-তবাব মরে ফিরে আসবে।

কিন্তু মণীন্দ্র আর কোনদিন ফিরে এলেন না।...

অনামী শহীদ। কী দুঃসহ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কতো ব্রহ্মা ভোগ করে লোকান্তরিত হয়ে গেলেন। তাঁর পরিচয় অন্যপরে তো দুঃখের কথা, তাঁর সত্যিখরও কি ভাল করে জেনেছেন?...

শহীদ তপন :

এ যুগে বিপ্লবপ্রস্তুতা ক্রমশ ব্যাপকতর হতে থাকার দলে অর্জিত বাস্তবের কিছু সমাগম হওয়া স্বাভাবিক। ফলে পল্লিশের সুর্যোগ নিশ্চয়ই বাড়ি পার।...

'বি-ভি-র কর্মী'রা এদিকে ৪৬নং শিব-ঠাকুর লেনের (বড়বাজার) চারতলায় অবস্থিত কর্মকেন্দ্রটিকে আব গোপন রাখতে পারলেন না। পলাতকরা এখানে থাকেন এবং আসা-যাওয়া করেন। বাংলাব সর্বত্র বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারূপে 'বি-ভি-র' এ একটি প্রধান ঘাঁটি।...

১৯৪৪ সনের ২২শ সেপ্টেম্বর। বৃহ-স্পতিবার। সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে দুটি মহিলা-কর্মী কিছু 'জুজু' কাগজপত্র নিয়ে গোপন 'আশ্রয়' এসেছেন। তাঁদের নাম দীপ্তি ঘোষ ও হেনা ঘোষ। কাগজপত্র রেখে তাঁরা চলে গেলেন। ধীরেন সাহাবার ও সত্যরত মজুমদার পূর্বাঙ্কেই আশ্রয় উপস্থিত ছিলেন।

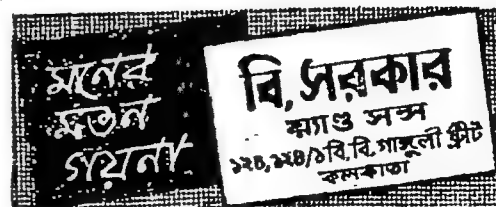
তাঁরা কাগজপত্রগুলো গোপাল সেনের জিম্মায় রেখে দিলেন। কিছু পরে উপস্থিত 'আজাদ হিন্দ ফোর্সে'-র গুটিদুই কর্মী'ব সঙ্গে শিব-ঠাকুর লেনের গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন ধীরেন ও সত্যরত। এসব 'আজাদ হিন্দ ফোর্সে'-র কর্মী'রাও বর্মী থেকে 'ইউ-বোটে' এসেছেন এবং পলাতকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। তাঁরা এসেছিলেন 'বি-ভি-ব' কর্মীদের কাছে এই আশ্রয়। সে-সন্ধ্যায় এঁদের সকলের গন্তব্যস্থান ছিল 'সেন্ট্রাল ক্যালকাটা হোটেল'। আজাদ হিন্দ ফোর্সের কর্মীদের একটি গোপন আশ্রয় ছিল তখন এই হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে।...

এই 'জুরুর' কাগজপত্র, এম কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। কলকাতার তৎকালে

Inter Allied Intelligence, chief-এর দপ্তর ছিল। 'এ্যালো-ইউ এস এ'-র সামরিক-ইন্টেলিজেন্স বিভাগ। এম অধিকর্তা ছিলেন একজন আমেরিকান মেজর-জেনারেল।

শ্রীমতী শান্তি রাহচৌধুরী একটি অতি আধুনিক (বুদ্ধিকালীন) মেয়ের জন্মিকার উক্ত মেজর-জেনারেলের পার্সোনাল ড্রাক্টেব কাজ অতি চাতুর্যে 'বি-ভি-দলের' নির্দেশে বোয়াড় করেন। মেজর-জেনারেলকে একদিন প্রচুর মাতাল অবস্থায় পেয়ে তাঁর টোকল থেকে তিনি 'Inter Allied Disposition of the Fighting Forces' সংক্রান্ত পল্লিত্তকা (Blue Print) অপসারিত করে দলের বিপ্লবী কর্মীর হাতে তুলে দেন। 'বি-ভি' এই পল্লিত্ত নেতাজীব কাছে পাঠিয়ে দেন। তার নকল ছিল তাঁদেরই কাছে। 'জুবু'বি-কাগজপত্রের মধ্যে উক্ত পল্লিত্ত বা তার নকল হয়তো আছে বলে পল্লিশের সন্দেহ ছিল।...

মেজর-জেনারেলের মস্ত অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে তিনি এই কাগজপত্রের অনুসন্ধান করেন। সন্দেহ হয় তাঁর পার্সোনাল ড্রাক্টেব। শ্রীমতী রাহচৌধুরী নির্বিকার। মিলিটারির গোপন জুরুর কাগজপত্র উমাও। 'ফাখারি' স্কোয়াড'-এর কাছে শাস্তিকে একাধিকবার দাঁড় করান হয় — কিন্তু কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। বিকারহীন এই মেয়েটিকে যখনই মেজর-জেনারেল-এম কাছে আনা হয় তখনই তিনি মনে করেন — এ মেয়ে



এতই নির্দোষ যে, এঁকে সম্মতই করা যায় না। কিন্তু মেথেরিট দূরে চলে গেলেই সাহেব মনে কবেন যে—এ মেয়ে ছাড়া আর কেহ এ-অপকর্ম কবে নি!...তাই বারে বারে তাঁকে ফ্যারিং-স্কেয়ারাডেব কাছে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু ফ্যারিং-স্কেয়ারাডকে ভয় পাবে না জ্ঞান অত্যাধুনিক হাল্কা মেয়ে, এ হতেই পাবে না। অতএব মেয়েটা একটি ধাঁধা বিশেষ। তাঁকে ভাই আই-বির হাতে তুলে দেওয়া হল। পুন্ডলিশ শান্তি বায়চৌধুরীকে প্রেসিডেন্সি জেলে রেখে অনেক চেষ্টা কবল তথ্য আদায় করতে। কিন্তু এ মেয়ে 'সিরিয়াস' হতেই জ্ঞানেন না, বেজার হাল্কা এবং 'বিপ্লবী' হবার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য মনে করে শেষটায় পুন্ডলিশ তাঁকে ছেড়েই দিল।...কিন্তু পুন্ডলিশ কেন, তাঁর সহ-বন্দিনীরাও জ্ঞানলেন না যে শান্তি বায়চৌধুরী সংসাহস ও বৈজ্ঞানিক ছমিকাতা তৎকালের গোপন বিপ্লব-ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।...

সম্মা গাড়তর হয়েছে। সাড়ে সাতটার কাছাকাছি। হঠাৎ গয়েল-পুন্ডলিশের দল শিবতাকুর লেনেব গছে হানা দিল। তরতর করে তারা উঠে গেছে চরতলায়। পশ্চাতে

পুরাতনে চিবনুতন মণিমাঞ্জুরা

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাস্বা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিবচিত্ত—হুতোম প্যাচার মজা বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্তি চন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—ভাষ্টিবলাস।

একত্রে ৯ টাকা মাত্র

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আত্মোপাত্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা চলন ও প্রেমের লীলায় চাক্ষু্যকর বইটি চাক্ষু্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী রাস্তা শ্রীট,

কলিকাতা-১২

উঠছে সশস্ত্র পুন্ডলিশ। গোপন-কেন্দ্রের রুদ্ধ ঘরে পুন্ডলিশ আঘাত হানতেই গৃহভাঙনের অবস্থিত কর্মী নীরেন রায় বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পারলেন। তিনি তড়িৎবেগে ছুটে গিয়ে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ-দ্বারা দবজা চেপে রাখলেন। এদিকে গোপাল সেন একান্ত ক্ষিপ্ততার গৃহদুর্ঘটনা কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন।...কিন্তু পুন্ডলিশকে এ-ভাবে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা চলে? মহুর্তে তাবা দবজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ কবল। গোপাল সেন দমবাব পায় নন। প্রায় সকল কাগজপত্রই পুড়ে গিয়েছিল। দমাবাশিষ্ট যেটুকু ছিল তা তুলে নিয়ে তিনি বারান্দার গরাদ ডিঙিরে পালাবার চেষ্টা কবলেন। পলায়মান-শিকারের ওপর শিকারী কুকুরের ক্ষিপ্ততার পুন্ডলিশ কাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু গোপালের দেহে তখন অমৃত হস্তীর বল। নিজেব কাছে গাছিত অর্ধদহ ব্যক্তি সামান্য কাগজপত্র বিপ্লবীই আনুগত্যে যে তাঁকে এখনো রক্ষা কবতে হবে!...পুন্ডলিশেব লোক কিছতেই সে-কাগজ ছিনিয়ে নিতে পারছে না। প্রবল জাপটাজাপটি সমানে চলেছে। অত সংকীর্ণ স্থানে বহু লোকের পক্ষে একজনকে এটে উঠবার কিছু অসুবিধা আছে — অধিকন্তু সেই একজন যদি সংকল্প রক্ষার, চাবিয়ে ও দুঃসাহসে অসামান্য হন।

জড়াজড় করে ভ্রমশ গোপাল সেন তাঁব প্রতিপক্ষের সঙ্গে কানিসের কাছে এসে যেতেই ব্যর্থকাম জনৈক ক্ষিপ্ত পুন্ডলিশ তাঁকে সজেরে এক ধাক্কা মারে। ফলে চাবতলা থেকে নিচে পথের কঠিন বৃকে গোপাল সেন নিক্ষিপ্ত হন। অত উর্ধ্ব থেকে পতনের নিমিত্ত গোপালের আস্থাপাঞ্জব চূর্ণ হয়ে যায়। মাথাব খুলি আন্ত থাকে না। কিন্তু নিজেব কাছে গাছিত কাগজপত্র তখনো তিনি বহুদৃষ্টিতে অকিড়ে আরছেন।...

মুহূর্তের নাড়ীতে প্রাণবারু দিকিধিকি বহমান। পুন্ডলিশবাহিনী বটা করে তাঁকে স্বেস্তাব করল। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছাব পূর্বেই এই ভরুশ বীরেব অজ্ঞান দেহ থেকে প্রাণবারু বেরিয়ে গেল। তাঁব জীবদ্দশায় তাঁর কাছে গাছিত পাটির সম্পদ কেহ ছিনিয়ে নিতে পারে নি।...

পুন্ডলিশ নীরেন ব্যাকে তাদের হেপাজতে নিয়ে গেল। শব্দ হলো এই দৃঢ়সংকল্প মানবচরিত্র ওপর অকথা অত্যাচার।...

গোপাল সেন। স্বল্পভাবী লাজুক একটি কিশোর। রিপূরা জেলার রাজপরিবারে মহ-কুমায় তাঁব জন্ম। ঢাকাশহরে নবকুমার ইন্সটিটিউটের নবম শ্রেণীতে (১৯০৭ সনে) পড়বার কালে বি-ভি-র কর্মী ক্ষিত রায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের মন্ত্র তিনি গ্রহণ কবলেন। মাত্র এইটুকু পরিচয় পৃথিবীর কাছে রেখে এই কিশোর একদিন সবার অজ্ঞাতে আত্মদান করে গেছেন। প্রকাশ্য রক্তমণ্ডে তাঁব অক্লান্ত ঐক্যবল। কিন্তু যতনকার অন্তরালে বিপ্লবসুন্দর রস-

শালার তাঁর কীর্তি অতি মহৎ, তাঁর আত্মোৎসর্গ অতি সুরূপ। গোপালের ঐ গোপন পরিচয় জনসমাজ সাড়সুরে না জানতে পাবলেও তার মূল্য তাতে কমে যাবার কথা নয়।...

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নির্বান্দব এই কিশোর হয়তো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে তাঁর কুটুম্ব খুঁজে পেয়েছিলেন বিপ্লবের অজ্ঞান নয়নে লাগিয়ে। সেই কুটুম্ববা নারায়ণের মূর্তি ধরে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁব তপঃসিদ্ধ জগতে। তাই তাদের কল্যাণকামনাব সেন-মৃত্যুকেই তিনি বরণ কবলেন—স্বাভাব্য মাধুর্যে চিবকাল তিনি সকলের স্বজন হয়ে রইলেন।...

পৃথিবীর মানুস গোপাল সেনেব তথা-কথিত কোন পবমান্বীকে হয়তো খুঁজে পাবে না। তাঁব পিতামাতাভাইবোন কেহ ইহলোকে নেই বলেই তাঁবা সবার অজ্ঞাত। কিন্তু গাছিত-বহু সেই পবিত্র অতিক্রম কবে গোপাল সেনের পরিচয় যে আরো বৃহৎ, আরো গভীর! শৃংখলিতা ভাবতবর্ষ তাঁব জ্ঞাননী। ভাবতের আপামর নরনারী তাঁব আত্মজ্ঞ। জননীব শৃংখলমোচন তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই বিপুল পরিচরিত্র পটভূমিই জ্যোতির্ময় তাঁর ক্ষয়হীন সত্তা।

“মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিবাছ অমর-মর্যাদা—সম্মত ভালে।”...

গোপালের আত্মবিলয়নেব মাসখানেক পর ধীরেন সাহাবা ও সুধীর বস্তু স্বেস্তার হলেন। পুন্ডলিশ তাঁদেরকে মিলিটারিবা প্রার্থনা মত তাদের হেপাজতে ছেড়ে দিল। প্লেনে করে তাঁদের নেওয়া হল লাহোর দূর্গে, ১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসে। তিন মাস ধবে প্রতিদিন তাঁদের ওপর চলল অকথা অত্যাচার। জামাকাপড় নেই, হান নেই, ঘুম নেই — আছে শব্দ বেটন-এব মার এবং লাথিগুতো ও বস্তিতব গালাগালি।...

সত্যরত মজুমদারকে তখনো পুন্ডলিশ খুঁজে পড়ে না।...কেটে গেল আরো একটি বৎসর। ১৯৪৫ সনের শেষের দিকে সত্যরত ধরা পড়লেন। তাঁকেও মিলিটারি হাতে ছেড়ে দিতে হল পুন্ডলিশকে। মিলিটারি-ইন্টেলিজেন্স প্লেনে করে তাঁকেও নিয়ে গেল লাহোর দূর্গে। তিন মাস দুঃসহ অত্যাচার ভোগ করার পব ফিকিরে দেওয়া হল তাঁকে পুন্ডলিশেব কাছে। পুন্ডলিশ পাঠিয়ে দিল সত্যরতবাবকে দমদম জেলে।

দমদম জেলে তখন বহু রাজবন্দীদের একত্রিত করা হয়েছে। এখান থেকেই মৃত্তি দেওয়া হবে বন্দীদেরকে দলে দলে। সুধীর বস্তু ও ধীরেন সাহাবা ইতিপূর্বেই এখানে আনীত হয়েছিলেন-পাঞ্জাবেব জেল থেকে।...কিছুদিন পর বন্দীমৃত্তি শব্দ হল। সুধীর বস্তু, ধীরেন সাহাবা, সত্যরত মজুমদার মৃত্তি পেলেন ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে।...

(ক্রমশঃ)

আদি মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেখর ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ধাড়াট ৯

ধর্গারি চলে যাবার পর নবাব বেদিন ভাগীরথী পাণ্ডে হয়ে শুশবগে মা-র সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন বাংলার বণিকরা গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে জানিয়েছিল তারা ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাবা জানিয়েছিল তাদের ছুটিবিশ্বাস, নবাব যতই চেষ্টা কবুন না কেন, ইংরেজরা বাংলায় রাজনীতিতে ঢুকে পড়বেই। তারা অভিযোগ জানিয়েছিল বিদেশী বণিকরা বিনাশুল্ক বণিক্য কবে ঐশ্বৰ্য্যে, প্রতিপত্তিতে ক্ষীণ হবে উঠছে আর বাংলার বণিকদের বণিক্যের ক্ষেত্র কমেই সঙ্কুচিত হবে আসছে।

নবাব তাদের কথা শুনেও শোনেন নি। অথচ ঠিক একই অভিযোগ তাঁকে জগৎশেষ আর জনকীরামের কাছেও শুনতে হল। তার কাণে তাঁর নতুন পোয়ানা।

এই একটি পোয়ানায় বাংলার নবাবের প্রতিটি চৌকিতে নির্দেশ গেল কোম্পানীর বেগদের কাছ থেকে মালুলা নিও না, তাদের বিরত কর না।

এ পোয়ানার নতুন কবে কি প্রয়োজন ছিল?

জগৎশেষ এ প্রশ্ন করতে পারেন, কেননা তিনি ধনাধ্যক্ষ। প্রয়োজনে ইংরেজদের তিনিই দায়বদ্ধ টাকা দিয়েছেন। তাঁর মতে এ প্রশ্ন শুধু নবাব বিস্মিত হলেন।

আমি ভেবেছিলাম জগৎশেষ, ফডেচাঁদ ফিরিঙ্গী বণিকদের শূভানুধ্যায়ী। তিনি বাংলা সুদার বিদেশী বণিক্যের বিস্মৃতি চান।

একথা শুনে জগৎশেষের শ্বেতপাখের মত সাদা রঙ লাগ হয়ে উঠল, তিনি ক্রোধে বেথে ধীরে বললেন, হুজি কেটে টাকা নিলে তাদের টাকা দিতে হবে আমার উপর এ নির্দেশের পর আমাকে তাদের সাহায্যকারী বললে তা উচিত হয় না। আমি আপনার আত্মবাহী, যখন যা কবেছি তা আপনারই ইচ্ছা তামিল করছি।

তাছাড়া, ইংরেজদের, এবং অন্যান্য বিদেশী বণিকদের সকল স্বার্থ শাহসুজা এবং ফারুখশিয়ারের ফরমানেই সুরক্ষিত ছিল। তবুও, নবাব তাদের স্বার্থরক্ষার্থে নতুন পোয়ানা জারী কবে আমাদের বিস্মিত করেছেন।

দশ বছর আগে এ ধবনের প্রশ্ন কবলে আলীবর্দী প্রশ্নকারী কণ্ঠ সিরতবে নীরব করতেন। কিন্তু নব দশ বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বর্গীর হাঙ্গামা তাঁকে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়েছে। আলীবর্দী জানেন, যারা তাঁর শূভানুধ্যায়ী, তাঁরা সময়ে আত্মা মানবেন এবং সময়ে প্রশ্নও কববেন।

‘প্রভু, জগৎশেষ ধীরে বললেন, ফারুখশিয়ার অব সুজার ফরমানে বিদেশী বণিকদের স্বার্থ একেবারে সুরক্ষিত। তাই, আপনার...

এ পোয়ানা সেই ফরমানে উল্লিখিত অধিকারগুলোকেই আবার জানিয়েছে। কাশিম-বাজার থেকে ওয়াটস-জানার, অন্তর্বণিক্য ইংবেজনা মালুলা দেবে না। দিল্লীর এ ফরমানে সন্তোষ রং। বরা তাদের কাছ থেকে মালুলা নিরে থাকে।

‘তাই আপনি রাহাদার, গুজারবান, চৌকি-দার, ইজারাদারদের জানিয়ে দিলেন তারা এ কাজ যেন আর না করে?’

‘হ্যাঁ।’

‘দেশের এ দুর্দিন, তা মনেনত?’

‘মহান।’

‘বাজিকোষ শূনাগ্রাব, তা জানেন ত?’

‘জানি।’

‘এমন-সময় যদি বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কিছু আদার করা হয়ে থাকে, তাতে অন্যার কোথায়? তারা কি এ দেশ থেকে প্রভূ লাভ করছে না?’

‘আমি তা পারি না, আমার হাত পা বাঁধা।’

নবাব হলোও সর্বদা যথা ইচ্ছা তাই করা যায় না। এ শিক্ষা বাংলার নবাবের বড় দেরিতে হল কি? জগৎশেষের মনে এ প্রশ্ন এসে।

‘দেশের এ দুর্দিনে, বারবার মত বর্গীর এসেছে। ভাগীরথীর পশ্চিম

স্মৃতির অঙ্গীকার

জয়ন্তী সেন

লবণাক্ত রক্ত আর অশ্রু দিয়ে লেখা আছে নাম
স্মৃতির তপর্ণ ক্ষেত্রে—দ্যাখো বন্ধু
এ হাতে কৃপাণ
কেমন উজ্জ্বল, উগ্র সমুদ্রত, বীর্ষে মহীয়ান
সূর্যের কিরণ দীপ্ত—জয়গর্বে উদ্ভত নিশান—
উদ্ভাস্ত কল্লোল শোন কোটি কণ্ঠে
মত্ত প্রাণোচ্ছ্বাসে।

যেদেশের ধূলিমাঝে মিশে আছ
সে দেশ তোমার
বিজয়ী সোচ্চার কণ্ঠে স্মরণের ঘ্রাথে অঙ্গীকার—
সময়ের কণ্ঠকিত সোপানের প্রতি ধাপে ধাপে
প্রাতিটি রক্তের বিন্দু পরিণত রক্তিম গোলাপে।

অত্যাচারে জনশূন্য, ধনশূন্য করেছে। বহু
লোক বসবাস ভুলে পূর্বে, যুগদেশে গালিরে
গিয়েছে। বহু লোক উত্তরে, বহু লোক
কলকাতার দিকে পালায়েছে। কৃষক চাষ করতে
পায় নি, গৃহস্থের বসতি জঙ্গলে ঢেকেছে।
একথা কি মিথ্যা?

এ কথাকে কে মিথ্যা বলে?

এ দুর্দিনে আমি কার কাছ থেকে কত
দুঃখ নিখোঁজ?

শ্রোতার নীবব।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ ষাঁদের জমিদারী
জায়গানে বিশাল, ষাঁদের জমিদারীর অধিকাংশই
পূর্ববঙ্গে, বা গঙ্গার অপব পায়ে বলে বগাঁও
অত্যাচারে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তাঁদের কাছ
থেকে আপেক্ষালীন আমি সামান্যমাত্র, হ্যাঁ,
ভাঁদের আঁখি অনুবাহী সামান্যমাত্র উপরি কর
গ্রহণ করছি। আর তাব ফলে, ফতেচাঁদের
একথা অজানা নয়, এমন কথা রাস্তা হয়েছে
অলৌকিক বড় অত্যাচারী, হিন্দুপ্রধানদের
সুনজবে দেখেন না।

আলিজাহা, সুনাম-দুর্নামে সামান্য
মানুষের এসে যায়। আপনাব...

আমি দোষ দিই না, কেন-না আমি জানি,
জায় আমার ঈশ্বর জানেন, আমি প্রজাবর্গকে
সম্মতিতে দেখতে চেয়েছি কি-না, পেয়েছি
কি-না। কিন্তু, দেশের দুর্দিনে, বাইবেব শত্রু
সাক্ষ্যে, বাদ দেশের মানুষই সামান্য ত্যাগ
স্বীকারেই বৃদ্ধ হন, ক্ষুধা হন, বিদেশী
বাণিকের কাছ থেকে আমি কতখানি সহানুভূতি
আশা করতে পারি?

কিন্তু প্রভু...

অনেক কথা আছে। ক্রম-ডল উপকূল,
দক্ষিণাতি, ফরাসী আব ইংরেজদের অগ্রগতির
সংবাদ আমি রাখি। আমাকে এ নয় বছর,
কগীর আক্রমণের সময়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতে
হয়েছে, কখন ওরা রাজনীতিতে প্রবেশ
করে।

সে আশঙ্কা এখনো আছে।

আশঙ্কা নেই কখন? ছিল না কখন?
ফতেচাঁদ কি সেই গল্প জানেন না, আলিফ
... সে উঠে গল্প, যে উট প্রথমে নাক
... সমস্ত দেহটিই ঢুকিয়ে দিয়ে
... করেছিল?

আলিজাহা, আমাদের পূর্বাপেক্ষে এরকম
অনেক কাহিনী আছে।

তাহলে আপনাব বোঝা উচিত, বাবা
বাণিজ্যে দেশকে ধনী করেছে, যারা বাংলার
বুকে বসে এত লাভ কবছে, তাদের মনে
লোভ কোন না কোন সময়ে দেখা দেবেই।
তাদের লোভ মানেই আমাদের আশঙ্কার
কারণ। তাই বলি, আশঙ্কা চিরদিনই আছে,
এবং থাকবে।

তাদের এভাবে বাণিজ্যের অধিকার.....

যাঁরা প্রথম তাঁদের অধিকার দেন, তাঁরা
জানতেন তাঁরা ঠিকই করেছেন। ভারতে
বিদেশী বাণিজ্য করতে আসাব ইতিহাস
অতি প্রাচীন, এবং বিদেশী বাণিক চিরদিন
এ দেশে সমাদর পেয়েছে। তারা তাদের
ক্ষমতার অপব্যবহার কবে নি।

কিন্তু এখন কি আর সেদিন আছে?

না। সেদিন নেই। মহাজোদরোর সভা-
তার যুগে, তার পরে, অন্য সময়ে হিন্দু-
কুশেব বুকে দিয়ে প্রাচীন সিল্ক বুট দিয়ে
রোম, গ্রীস, মিশর ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে
ভারত বাণিজ্য কবছে এবং বাণিজ্যের পথে
বাইরের পৃথিবী ব্যবহার ভাবতে প্রবেশ
করেছে।

তারা ক্ষমতার অপব্যবহার কবে নি।
এ যুগে বৈশ্য যে বৈশ্য থাকতে চাইবে না,
বাণিজ্য কবতে এসে রাজনীতিতে প্রবেশ
করবে তা জানলে কি জাহাঙ্গীর বিদেশী
বাণিককে ক্ষমতা দিতেন?

নবাব বলতে লাগলেন :

আমি চাই নি তাবা এ দেশের রাজ-
নীতিতে প্রবেশ করুক। ইংরেজ, ফরাসী,
জার্মান, ডাচ, পর্তুগীজ, আর্মেনী সকল
জাতির বাণিকদের দিকে চোখ রাখতে হয়েছে।
এদিকে আফগান বিদ্রোহী, পাঠান অসন্তুষ্ট,
মৌদনীগড়ে আদিবাসীবা বিদ্রোহী, বাঁকুড়া,
বীরভূম, বর্ধমান, বাচ ও গাঙ্গেয় কংগের
প্রতিটি জেলায় মানুষ অত্যাচারিত, বহিঃ-
শত্রু আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত। এমন সময়েও
বিদেশী বাণিকদের ক্ষমতা আমি খর্ব করে
রেখেছি।

জানি।

কিন্তু আজ তাবা কি করছে?

ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

জানি। জানি তারা দেশীয় বাণিকদের
নানাভাবে বিব্রত করছে। জানি তাবা আমার
মৃত্যু দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ
আমাকে সব সত্ত্বাও সম্মতিতে সবাইকে
দেখতে হবে।

ফলে?

ফলে কি হবে, তার বিচার করবে
ভবিষ্যৎ।

আলিজাহা, ভবিষ্যৎ কবে কার উপর
সুবিচার কবে?

কবে না, করতে পারে না, কেন না
ভবিষ্যতের দৃষ্টিও আবিল। আবিল দৃষ্টিতে
চেয়ে দেখে বলেই অতীতকে সে স্বচ্ছ, সত্য
রূপে দেখতে পায় না। কিন্তু ভবিষ্যতের
লোক আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখবে তাই ভেবে
আমি আমার আশু কর্তব্যে অবহেলা করতে
পারি না।

আশু কর্তব্য কি?

গাঙ্গেয় বংগকে, আমার সুবাকে
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

নতুবা...

এ ছাড়া আমার অন্য কর্তব্য নেই।
আমার উত্তরাধিকারী এক শান্তিময় সাম্রাজ্য
লাভ করুক, আমি এই চাই। এ কি খুব
বোঁশ চওয়া?

না আলিজাহা।

ওঁদিকে, শূন্যে পাই কলকাতা নগরী
ক্রমবর্ধমান।

হ্যাঁ আলিজাহা।

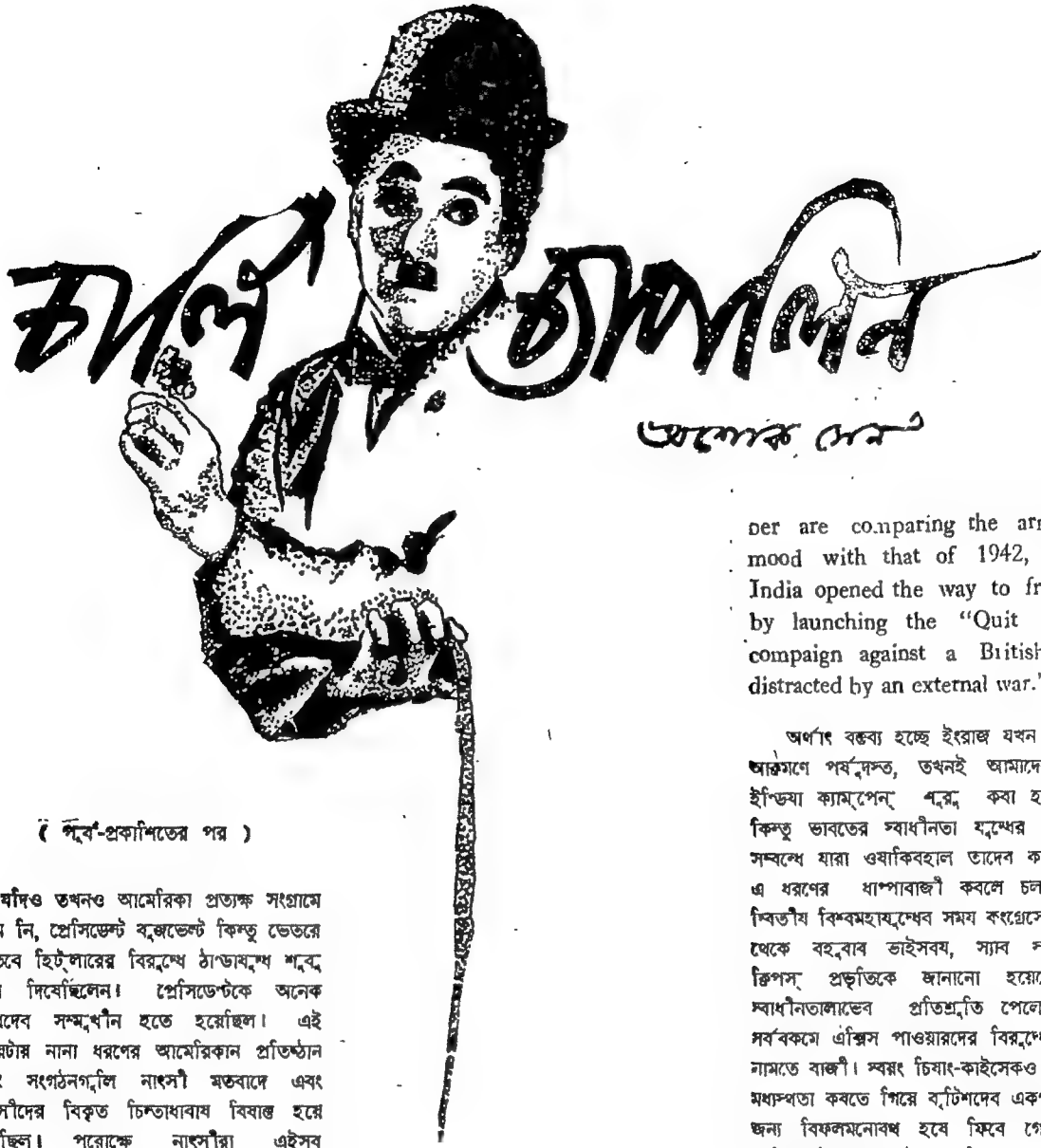
দেখব, দেখব আমি, বাংলার বাণিকদেরও
দেখব। আপনারা তাদের বলুন, আমি সব
জানি। আমি দেখছি, মুর্শিদাবাদের রাজ-
পথে সমস্ত পৃথিবীকে বেচাকেনা করতে
দেখছি।

আমরাও দেখছি। আবার দেখতে
চাই।

আমিও দেখতে চাই।

হ্যাঁ প্রভু।

আমি আবার সে অবস্থা ফিরিয়ে আনব।
আমার প্রজাবর্গ অতি হৃদয়বান। তারা
দেশের এ দুর্দিনে সব কিছুই মেনে নিয়েছে।
একবার, আর একবার তারা আমাব সঙ্গে
সহযোগিতা করুক। (ক্রমঃ)



(দ্ব-প্রকাশিতের পর)

বাঁও তখনও আমেরিকা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে নি, প্রেসিডেন্ট বৃজভেট কিন্তু ভেতরে ভেতবে হিটলারের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডাশুদ্ধ শব্দ করে দিবেছিলেন। প্রেসিডেন্টকে অনেক বিপদেব সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময়টার নানা ধরনের আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলি নাৎসী মতবাদে এবং নাৎসীদের বিকৃত চিন্তাধারায় বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। পরোক্ষে নাৎসীরা এইসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দর্শনেবই প্রচাব এবং প্রসার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে এমনটা কি করে সম্ভব হয়? যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকেরা কি যুক্তি এবং বিবেচনাশক্তি বর্জিত হয়ে গিয়েছিলেন? তা কি হতে পারে না? আজকেব দিনেব পবিত্র প্রেক্ষিতেই ব্যাপ্যবটাব বিচার কবে দেখুন না।

বিলেতের অবজ্ঞাভার কাগজের দিল্লী প্রতিনিধি সিবিল ডানের পাক-ভারত যুদ্ধ-বিবর্ত সম্বন্ধে একটি লেখা এ পত্রিকায় ওরা অস্ত্রের প্রকাশিত হয়েছে। এতে পরোক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতি কবা হয়েছে এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারতবিশোধী উক্তিব সাক্ষাৎ গাইবার চেষ্টা কবা হয়েছে। প্রবন্ধেব হেডিং-এ লেখা হয়েছে "Indians call for guns before butt." অর্থাৎ আমবা দেশেব খাদ্যসমস্যার থেকে যুদ্ধ-প্রস্তুতিব জন্যই উঠে পড়ে লেগেছি। বর্তমানে ভারত সরকার যদি সইমত ব্যবস্থাই করে থাকেন তাহলে সেটা

কি অন্যায়? ভারতবর্ষেব বিরুদ্ধে নানা বকমের গডগোল যাতে করতে পারে সেই জন্যই স্বাধীন পাকিস্তান রাজ্যেব সৃষ্টি কবে গেছিল ইংলাজরা—এবারের হামলার সময় ভবনকভাবে মার খেয়েছে পাকিস্তানীরা—সেটা আর বৃটিশদের কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।

Cyril Dunn এক জায়গার মন্তব্য করেছেন :

"Indians old enough to remem-

ber are comparing the armistice mood with that of 1942, when India opened the way to freedom by launching the "Quit India" campaign against a British Raj distracted by an external war."

অর্থাৎ বক্তব্য হচ্ছে ইংরাজ যখন বাইরেব আক্রমণে পৰ্ব্দুস্ত, তখনই আমাদের কুইট ইন্ডিয়া কাম্পেন্ শব্দ কবা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তাদের কাছে তো এ ধরনের ধাম্পবাজী কবলে চলবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসেব তরফ থেকে বহুবাব ভাইসরয়, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ প্রভৃতিকে জানানো হয়েছে যে, স্বাধীনতালভেব প্রতিশ্রুতি পেলে ভারত সর্ববকমে এন্ট্রিস পাওয়ারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাজী। স্বয়ং চিবাং-কাইসেকও এ-নিম্নে মধ্যস্থতা কবতে গিয়ে বৃটিশদের একগুঁয়েমির জন্য বিফলমনোবধ হব যাবে গেছিলেন। প্রেসিডেন্ট বৃজভেটও এ-নিম্নে কম বিরম্ব হন নি বৃটিশ সরকারেব ওপর।

এবপবই ডান সাহেব বর্তমানে ভারতীয়দের ভেতরকার বিষটে একা লক্ষ্য কবে গায়ের জন্মলার জন্মে উঠে মতপ্রবাস কবেছেন :

"They feel the same overwhelming sense of national unity. An outsider might examine this unity with scepticism, but almost every Indian you meet testifies to his absolute faith in its reality."

অর্থাৎ আমাদের একাটা ডান সাহেবেব কাছে সম্ভেদজনক বলে মনে হচ্ছে এখনও। কি অস্বভূত বিচাবশক্তি বলুন তো! রেভো! রেভো ডান—সাহেব বলে অভিনন্দন জানানতে ইচ্ছা করছে। এবপবে আছে—

"It is true that on September 7 Mr. Wilson delivered himself of some unfortunate words, fixing

the major blame for the war on India. At that time it might well have seemed in London that India had finally undertaken to destroy the separate existence of Pakistan. Only now is it plain that by the strict rules of the game the first fatal move was made by Pakistani troops."

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সময় পাকিস্তানী হামলার সত্যিকার বিবরণ রাখেন নি কেন? সিরিল ডানদের মত ইংরাজ-কাগজের প্রতিনিধিরাই বা নিজের দেশের সবকাষকে এবিষয়ে অবহিত করেন নি কেন? ওপরের উক্তির শেষের লাইনটাও নজর করবেন। পাকিস্তানীদের সোজা হামলাবাজি বলতে মুখে বাকছে এই ডান মহাপ্রভুব—তাই কিন্তু কিন্তু করে লিখেছেন : by the strict rules of the game—ইত্যাদি। ডান সাহেব! আবার বল চমৎকার!

এবং বসুমতীও পরাক্রান্ত দেখিয়েছেন সিবি। ডান। বলেছেনঃ

"Even so it is difficult to see why Indians should be so angry with us when their own claims to total victory suggest that our attitude had no effect whatever on the course of events."

ঠাট্টার সুরটা নজর করবেন। আমরা দাবি করছি টেটেল ভিডিও সম্পর্কে। এ বিষয়েও সহমতি ডানদের মনেই আছে। পরের বক্তৃতি আরও মজাদার—অর্থাৎ আমাদের মতে যখন টেটেল ভিডিও হচ্ছেই, তখন ইয়েজদের এটিচুড সম্পর্কে আমরা এত বিবর্ত কেন? উক্তবটা খুব সোজা—অর্থাৎ ব্রিটিশ এটিচুড যদি নিরপেক্ষ হোত তাহলে কোন্‌দিনই এই জাতীয় হামলা করবার সাহস পাকিস্তানী সরকারের হোত না।

আবার আগের কথা ফিরে আসি। ইত্যং ধরব এল জাপান, পল্লী হাসবাব, আক্রমণ করছে। এই অপ্রত্যাশিত এবং নিষ্ঠুর আক্রমণে আমেরিকা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পেল। যাই হোক দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতপর্ব চললো। অল্পদিনের ভেতরই ওভারসিজে চলে যেতে লাগল বহু ডিভিশন আমেরিকান সোলজার্স। এই সময়ই বাশিয়ানরা হিট্‌লারের দুর্ভাগ্য বাহিনীকে প্রাপপ্রণে বাধা দিচ্ছিল মস্কোব বাইরে। সপ্তে সপ্তে তাবা বাবাব অনুরোধ জানাচ্ছিল সেক্রেড ফ্রন্ট খোলবার জন্য। প্রেসিডেন্ট রুডভেল্টও এ বিষয়ে তাঁর অনুমোদন জানিয়েছিলেন। নাৎসীদের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি ছিল, বেসব লোকেরা যদিও এসময় আত্মপ্রাণে চলে গিয়েছিল, কিন্তু আকাশে-

বাতাসে তারা তাদের বিষ ছাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সবাই একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছিল অন্য এলাইজদের থেকে রাশিয়ানদের আলাদা করে রাখতে। চ্যাপলিন বলেছেন :

"Vicious propaganda was rife at that time, saying : 'Let them both bleed white, then we'll come in at the kill'—every kind of subterfuge was used to prevent a second front."

প্রভাই রাশিয়ানদের বিরাট হতাহতের সংখ্যার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এইভাবে দিনের থেকে সপ্তাহ এবং সপ্তাহ থেকে মাস সময় হয়ে চলাছিল ক্রমাগত। নাৎসীরা কিন্তু তখন পর্যন্তও মস্কোব বাইরে।

এই সময় আমেরিকান কমিটি অভ্যুত্থান ওয়ার রিলিফ ইন্‌ স্যান-ফ্রান্সিসকো থেকে টেলিফোন এল চ্যাপলিনের কাছে—তাদের অনুরোধ ছিল এই : আমেরিকার বাশিয়ান এ্যামবাসেডর বোশেফই ডেভিসের তাদের ওখানে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। শেষ মুহুর্তে তিনি ল্যারনজাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন—চ্যাপলিন কি ডেভিসের বদলে এসে বক্তৃতা দেবেন? যদিও সময় বেশি পাওয়া গেল না, তবু চার্লি রাজী হলেন। পরের দিনই বক্তৃতা দিতে হবে—সম্প্রদায়-দ্বৈত ধরে পর্বদিন সকাল আটটার চ্যাপলিন স্যান-ফ্রান্সিসকো পৌঁছলেন।

বক্তৃতার হলটি দশ হাজার লোক একেবারে ভর্তি। স্টেজের ওপর আমেরিকান এ্যাডমিরালস এবং জেনারেলস, তা ছাড়া স্যানফ্রান্সিসকোর মেয়র। বক্তৃতা পর্বাই যেন চেপে চেপে কথা বলছেন—প্রাথমিক কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। মেঘর বললেন :

"একথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাশিয়ানরা আমাদের এলাইজ!"

খুবই সতর্কভাবে তিনি কথা বলছিলেন—বাশিয়ানকে যে জব্বারী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, তাবা যে বীরবীরকে বক্ষ করছে, তারা যে দৃশ্যে ভিভিশন নাৎসীর বিরুদ্ধে, কাতাবে-কাতারে প্রাণ দিচ্ছে, এসব-কোন কথাই জোর দিয়ে মেঘর বললেন না। বক্তৃতা শুন্যে চ্যাপলিন মন্তব্য করলেন :

"Our allies were strange bed-fellows was the attitude I felt that evening."

কমিটির ওপবওয়াল চার্লিকে অনুরোধ করছিলেন যে, সম্ভব হলে তিনি যেন ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দেন। শুন্যে চ্যাপলিন বেশ ঘাবড়ে গেলেন। এর আগে চার মিনিটের বেশি তিনি কখনও বক্তৃতা করেন নি। কিন্তু অন্যদের চেপে চেপে বলা দেখে তাঁর মনে একটা বিবর্তিত ভাব এসে গেল। চার্লিকে ইনট্রোডিউস করা হল—তারপর তিনি বলতে

উঠলেন—তিনি ওটা মাত্রই দশকদের তরফ থেকে হর্ষধনি শব্দ হল—তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। সেটা কমবার পব চার্লি তাদের সম্বোধন করলেন 'কমরেডস' বলে—সপ্তে সপ্তে শব্দ হোল হাসিব হুজোড়। হাসি খামবাব পব বেশ জোর দিয়ে চার্লি বললেন—"আমি ইচ্ছে করবই কমরেডস শব্দটি বলছি"—আবার হাসির হুজোড় উঠল এবং সপ্তে সপ্তে প্রশংসাধনি। চার্লি ক্ষেত্র বলতে শব্দ করলেন—"আমি ধবে নিছি আজ রাতে এখানে অনেক বাশিয়ানরাও উপস্থিত রয়েছেন। যেভাবে তাঁদের দেশবাসীরা এই সময়ে প্রাপ্রণে বক্ষ করছেন এবং গুলাকে বরণ করছেন, সে কথা স্মরণ করে 'কমরেডস' শব্দটি উচ্চারণ করতেও আমি প্রস্তুত এবং তাঁর বোধ করছি এই মুহুর্তে।" আবার উচ্চ প্রশংসাধনি শব্দ হোল এবং অনেকে উঠে দাঁড়ালেন। "Let them bleed white" এই মতবাদটির কথা ভেবে চার্লি এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে 'নিজের' মনের বিবর্ত প্রকাশ করতে গিয়ে কিভাবে 'থেমে' গেলেন চার্লি, তারপর বললেন : "আমি কমিউনিস্ট নই, আমি মানুষ। এবং মানুষের মনে কিভাবে কিসের প্রতিক্রিয়া হব তাও আমার অজ্ঞাত নয়। কমিউনিস্টরা অন্যের থেকে আলাদা নয়। একটা হাত বা পা বাদ দিতে হলে, তারাও বেদনা অনুভব করে, আমাদের মত তাদেরও মরতে হয়। কমিউনিস্ট মারেরাও অন্য মারদের মতই। কমিউনিস্ট মারেরা যখন ছেলের মত শোচনীয় খবর পান এবং বুঝতে পারেন তাবা আর কিবে আসবে না, তখন অন্যান্য মারদের মত তারাও অশ্রু-বর্ষণ করেন। কমিউনিস্ট না হলেও একথা বুঝতে আমার কষ্ট পেতে হয় না। আজকের এই মুহুর্তে রাশিয়ান মারেরা যথেষ্ট অশ্রু-বর্ষণ করছেন এবং রাশিয়ান ছেলেরা দলে দলে মৃত্যুবরণ করছে..."

এইভাবে চার্লি মিনিট ধরে চার্লি বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। বক্তৃতা বিবর্ত ঠিকঠাক করে বলতে ওঠেন নি। কিন্তু আলানারকেই মুখে কথা এসে যেতে লাগল। কখনও রক্তশ্রুতি সম্পর্কে নানা ধরনের গল্প বলতে লাগলেন, কখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার তাঁর ওয়ার-বন্ড স্পিচের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রোতারা মহা শ্রমিক-এক-একবার তারা হেসে ওঠে, আবার প্রশংসাধনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। দেখেছেন মনে হতে লাগল চার্লি বা বলছেন তার ভেতর কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারে না।

চার্লি ক্ষেত্র শব্দ করলেন : "এবার এই যুদ্ধের কথা বল—আমি আজ এখানে রাশিয়ান ওয়ার বিলিফের ব্যাপারে এসেছি। অর্থ পেলে রাশিয়ানদের উপকার হবে—তবে অর্থের থেকেও আরও কিছু বেশি সাহায্যের দরকার। আমি জানি নিঃশঙ্কিত

দু' মিনিটের সোফার' উত্তর জার্মানিতে
আলসে সব কটোয়ে—অর্থাৎ একলা রাশিয়ান-
দের, দু'শো ডিভিশন মানুষদের অস্ত্রসম
সামান্যে হচ্ছে।" এইবার চার্লি একটু
খামসেন—সমস্ত হলে গভীর নিশ্বাসভা
বিস্রাভ করছিল।

'রাশিয়ানরা', বেশ ঘোরের সঙ্গে বললেন
চার্লি, 'আমাদের মিত্র। তারা শত্রু নিজেরদের
জীবনযাত্রা বজায় রাখবার জন্যই যুদ্ধ করছে
না, আমাদের জীবনায়ত' রক্ষা করবার জন্যও
তারা লড়াই করছে। আমেরিকানদের সম্বন্ধে
আমি বতব্বর জানি, তাতে আমার মনে হয়
নিজেরের যুদ্ধ তারা নিজেরাই করতে চায়।

স্ট্যালিনও বেমন নিজেরের দেশের হয়ে
নিজে যুদ্ধ করতে চান, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও
তাই চান। সুতরাং আলসে আমরা প্রস্তুত
হই—শ্বিত্যীর রণাঙ্গনে যেনে ফোর্স এখনি।'

চার্লিও উক্ত চিৎকারে মনে ফেটে পড়তে
লাগল। কারণ সবাই অন্তরে এবং মনে
তখন এই এক চিন্তা।

সাত মিনিট ধরে চিৎকার এবং আনন্দ-
ধ্বনির পর চার্লি এই বলে বক্তৃতা শেষ
করলেন : "আপনাদের মনের যখন এই ভাব,
তখন আমি অনুরোধ করছি প্রত্যেকে প্রেসি-
ডেন্টের কাছে একটি করে টেলিগ্রাম করে
ছেড়ে দিন যে, আপনারা শ্বিত্যীর রণাঙ্গনে
যেবার অনুরোধ জানাচ্ছেন—তা হলে ফাল-
কের ভেতরেই তিনি শ্বিত্যীর রণাঙ্গনের
স্বপক্ষে দশ হাজার লোকের তারবার্তা
পাবেন।"

এর পরেও চার্লিকে টেলিফোনে বক্তৃতা
দেবার জন্য অনুরোধ করা হোল—বক্তৃতাটি
শুনবে ম্যাডিসন স্কোয়ারের এক বিরাট
জনতা। একই বিষয়ে বক্তৃতা—সুতরাং চার্লি
রাগী হয়ে গেলেন। একমল সম্ভ্রান্ত লোক
এবং কয়েকটি নামকরা সংস্থা মিলে এই
বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। চার্লি চোদ্দ
মিনিট ধরে বলেছিলেন। দি কন্টিন্সল অফ্
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থানাইজেশনস্ এই বক্তৃতাটি
ছাপার অক্ষরে প্রকাশও করেছিলেন।

এর পরই চার্লির জীবনে এল এক
দুর্ভাগ্যের রাতি। জোন ব্যারি বলে এক
বক্তৃতার সঙ্গো এই সময় তাঁর আলাপ হল—
এবং মহিলা ক্রমশ তাঁর সঙ্গে বনিষ্ট হবার
চেষ্টা করতে লাগলেন। এই মহিলা কিছু-
কাল চার্লিকে খুব বিরত করেছিলেন—
এমন কি নিজের সন্তানের শিশু আরোপ
করে চার্লিকে আশাশ্রয়ী ভূমিকায় আদালত
পন্থত ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু
সমালোচকের বিচারে চার্লির নির্দোষিতা প্রমাণ
হয়ে গেল। তবুও জোন ব্যারির কবলে পড়ে
চার্লিকে বহুদিন ভুগতে হয়েছিল।

এরপর সেকেন্ড ব্রুস্ট থোলার ব্যাপারে
নিউ ইয়র্কের কার্নেজী হলে চার্লিকে আবার
বক্তৃতা দিতে হল। এখানে অরসন্
কলেসন্সও বলেছিলেন। তিনি বেশ ধীর

কল সা হুই পানি শোজের বক্তৃতা দিয়ে
সময়লেন। চার্লি কিছু রন খুলে বক্তৃতা
করেছিলেন।

এইসব বক্তৃতার জন্যই চ্যাপলিনকে
ভবিষ্যতে বহু শিগ্রহ ভোগ করতে হয়
আমেরিকাতে। এমন কি তাঁকে কমিউনিষ্ট
হিসাবে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাও হয়েছিল
নানাভাবে। চার্লি লিখেছেন—

"Now I felt I was caught up
in a political avalanche. I began
to question my motives: how
much was I stimulated by the
actor in me and the reaction of a
live audience? Would I have
entered this quixotic adventure if
I had not made an anti-Nazi
film? Was it a sublimation of
all my irritations and reactions
against the talking pictures? I
suppose all these elements were
involved, but the strongest one
was my hate and contempt for the
Nazi system."

আর একটা কথা—রাশিয়ান কমিউনিষ্টদের
শ্বিত্যীর রণাঙ্গনের রাবির ব্যাপারে চার্লির
পূর্ণ সমর্থন ছিল এই কারণে যে, সমস্ত
মিশ্রশক্তি তরফে রাশিয়াই তখন যুদ্ধ
চালাচ্ছিলেন হিটলারের দূর্বর্ষ বাহিনীর
বিরুদ্ধে—আর সবাই বসে বসে মজা
দেখাচ্ছিল। মানবিকতা বোধের মিক থেকে
যে কোন বিবেকসম্পন্ন লোকেরই অসহ্য মনে
হচ্ছিল এ সময় এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি-
গুলির নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার ব্যাপারটা।

রাশিয়ান কমিউনিষ্টরা জাতি হিসাবে
যে কত বড়—তারপরেও আমরা বাব্বার সে
পরিচয় পেয়েছি। যখনই কোন দূর্বল জাতি
কোনো প্রবল জাতির অত্যাচারের সম্মুখীন
হয়েছে এই রাশিয়াই এসে দেখা দিয়েছে
হানকতরূপে। আর আমরা ভারতবাসীরা
তো স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই দেখছি
রাশিয়াই আমাদের সত্যিকার মিত্র। আমরা
কমিউনিষ্ট নই—আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।
কিন্তু আমাদের বিপদে-আপদে এই কমিউনিষ্ট
রাশিয়াই সব সময় আমাদের সাহায্যার্থে
এগিয়ে এসেছে। আর বিশ্বের দুই বিরাট
গণতন্ত্রবাদী দেশ সব সময়েই একতন্ত্রবাদী
—পাকিস্তানকে অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য
দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঠেলে দাড়ি করবার
চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার বোম্বাইর এদের
এ-শিক্ষা হয়েছে যে, ওভাবে ঠেলে কাটকে
দাড়ি করানো যায় না। অতবড় জাদিরেল
হিটলারই অতশত আয়োজন সত্ত্বেও পারলো
না রাশিয়াকে অবনমিত করতে—সে সময়
রাশিয়া কতটুকুই না প্রস্তুত ছিল এ ধরনের

বিরাট যুদ্ধের জন্য। হিটলারের তুলনায়
কত তুচ্ছ আজকের পাকিস্তানী আরব খাঁ।
তখনকার রাশিয়ান শক্তির তুলনায় আজকের
ভারতীয় সামরিকশক্তি হয়তো অনেকটাই
পেছনে। কিন্তু পাকিস্তানও তো জার্মানী
নয়—আর রাশিয়ানদের মত ভারতভূমিতেও
আজ যে দেশান্তরোধ এবং একতা দেখা
দিয়েছে তাকে পর্যুদস্ত করবার ক্ষমতা
পৃথিবীর কোন শক্তিরই নেই। রাষ্ট্রপুঞ্জে
পাকিস্তানী পররাষ্ট্রসচিব মিস্টার ভুট্টো
ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে
ধরনের মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর নিজের
দেশের শিক্ষা এবং সভ্যতার পরিমাপ করবার
একটা চমককার পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বে
অন্যান্য রাষ্ট্রের সামনে। তবে বৈশ্বদিন চোখ-
কান বুজে পাকিস্তানের এ ধরনের অসভ্যতাকে
সহ্য করে গেলে লীগ অফ নেশনসের মত
রাষ্ট্রপুঞ্জকেও যে অলপকালের ভেতরেই
পাত-তাড়ি গোটাতে হবে সে বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই।

আর একটি কথা—আগের দু-একটি
অধ্যায়ে চ্যাপলিনের এমন একটা মনোভাব
দেখা গেছে যে, ছায়াচিত্র জগৎ থেকে সম্পূর্ণ-
ভাবে অবসর নিয়ে তিনি চারনার গিয়ে
বসবাস শুরু করবেন। ভাগ্য করেন নি।
অবশ্য তখন চ্যাপলিন চাইনিজদের আসল
স্বপ্নের পরিচয় পান নি। তখন গিয়ে
চারনার বসবাস শুরু করলে সমস্ত সম্পত্তি
খুইয়ে আত্ম হয়তো এই ব্যর্থ বরসে রাষ্ট্র
কুপিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন—মরাতো
চু-এন্-লাইয়ের লম্বা স্কিন্ট নিয়ে
চাইনিজ প্রখার চীনে। কমিউনিজম বিষয়ে
ছবি তুলতে তাকে বাধ্য করা হোত। অথবা
নতুন গ্রেট ডিক্টেটর তুলে দেখিয়ে দিতে
হোত যে ডিক্টেটরশিপই সেরা জাতির গভর্ন-
মেন্ট এবং মাত্র সে ডুং-ই হচ্ছেন নিগ্গে
প্রচাণ্ডিত আদর্শ সুপারমান। পরবর্তী
অধ্যায়ে আসবার আগে আর একটা কথা বলে
নিই। কাগজে খবর দেখলাম চার্লি আবার
নতুন ছবি তুলছেন—নিজেরই লেখা স্ক্রিপ্ট—
এতে অভিনয় করবেন সোফিয়া লরেন এবং
মার্লন ব্র্যাডো। চার্লিও নাকি একটি কমিক
রোলে নামবেন। এই বরসেও চার্লি যে
কতোটা সক্রিয় এবং প্রাণরসে উজ্জ্বল তা এই
খবর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

আরও একটা খবর—এক অধ্যাপক তাঁর
বইতে নাকি চার্লিকে শেজপীররের প্রায়
সমজাতীয় প্রতিভা বলে প্রতিপন্ন করতে
চেষ্টা করেছেন। এটা অতিশয়োক্তি ছাড়া
আর কিছু নয়—এবং এ ধরনের মন্তব্যের
দ্বারা মহাকবিকে ছোট করা হয় না, ছোট
করা হয় চার্লিকে।

(কমলা)

সুপার

‘রাজা রামমোহন’ ছবির প্রমোদকর মূর্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটি ভাল কাজ করেছেন—‘রাজা রামমোহন’ ছবিকে প্রমোদকর মূর্তি দিয়ে। ছবিটি কলাকৌশলের দিক থেকে প্রশংসনীয় বা আধুনিক না হলেও অথবা রাজা রামমোহনের সার্বিক পরিচয়মূলক না হলেও—একটি প্রেরণামূলক ছবি। ছবিটির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি। অকুণ্ঠচিত্তে আমরা ‘রাজা রামমোহন’-এর প্রশংসা করেছি। এরূপ ছবি—যা থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার, নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশের এবং কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা পাওয়া যায় সে ছবি অভিনবদনীয়। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে আমার ছবিটিকে আরো ভাল লেগেছে। কারণ এখনো ধর্মাত্মতার গৌরব করার মত মূর্তির অভাব নেই, এখনো অনেক শিক্ষিত লোক কুসংস্কারকে সম্বলে পোষণ করেন। যুবকরা জনকল্যাণমূলক কাজের পরিবর্তে পাড়ায় পাড়ায় পূজোর জন্য চাঁদার খাতা নিজে মেতে থাকে। তার চেয়েও বড় কথা বিদেশী শাসনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন সংগ্রাম করেছেন; অথচ আজ তাঁর স্বদেশবাসীর শাসনে সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধূলোয় লুপ্ত। আজ শাসকশক্তির পছন্দমত নয় এমন চিন্তা করার জন্যও বহু লোক লাঞ্চিত। তাই রাজ্য সরকার যখন ছবিটিকে প্রমোদকর মূর্তি দিলেন তখন আমার মনে হয়েছে—রাজ্য সরকার ছবিটিকে সম্মান দিলেন কিন্তু রাজা রামমোহনের আদর্শকে সম্মান দিতে পারলেন না। তথাপি, এই ভাল কাজের জন্য আমরা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

ইতিপূর্বে আরো কয়েকটি ছবিকে প্রমোদকর মূর্তি দেবার জন্য সংবাদপত্রের কলমে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। প্রমোদকর মূর্তি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর ছিল। ‘রাজা রামমোহন’ তথা বাংলার সিনেমাঙ্গল্যকার এই প্রথম রাজ্য সরকারের অনুগ্রহ লাভ করলেন। আমরা আশা করি এই ধরনের শূভবুদ্ধিসম্পন্ন, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ও মনুষ্যত্বের প্রেরণামূলক চরিত্রগুলি রাজ্য সরকারের সমর্থন ভবিষ্যতে লাভ করবে। —সুজন।

দ্বি-আলোচনা

‘জুলু’ উপনিবেশবাদের সাফাই

এলিট সিনেমার গত সপ্তাহে ‘জুলু’ ছবিটি মূর্তি লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে মূর্তিমের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা কিভাবে জুলু জাতির প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল এবং এই বীরত্বের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেছিল সেই কাহিনীকে এই ছবিতে দেখান হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে যখন উপনিবেশবাদ নিষিদ্ধ এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ উপনিবেশবাদকে দূর করে স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করেছে, তখন ‘জুলু’র মত ছবি নির্মাণের কি সার্থকতা? এরূপ

ছবি নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে দেড়শ বছর পূর্বে আফ্রিকার জুলু জাতি কত অসভ্য ও আদিম প্রকৃতির ছিল এবং উপনিবেশবাদীরা কত কষ্ট করে—এমন কি জীবন দিয়েও তাদের মানুষ করেছে তা দেখানো। উপনিবেশবাদের লক্ষ্যকে ঢাকবার জন্য ছবিতে এক শান্তিবাদী ধর্মবাজক ও তাঁর কন্যাকে উপস্থিত করা হয়েছে। যারা জুলুদের সাথে যুদ্ধ চায় নি। কিন্তু আমাদের দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সময় মিশনারীদের যে ভূমিকার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাতে এরূপ চরিত্রকে বিশ্বাস মনে করা যায় না। আশ্চর্যের বিষয়, আজকের দিনে—কি করে জুলুদের নিরোধ ও অসভ্য দেখিয়ে অন্য দেশের স্বাধীনতাহরণকারীদের পক্ষে সাফাই গাওয়া ছবি নির্মিত হয়। আরো আশ্চর্যের কথা ভারতের মত দেশের সেন্সর বোর্ড কি করে এই ছবি ভারতে দেখাবার মঞ্জুরী দিল। ভারত নিরপেক্ষ



মাধবী মূখার্জী

দেশ, আফ্রিকার জনগণের বন্ধুত্ব বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। ‘জুলু’ ছবির মূর্তি-লাভ কি আফ্রিকার জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের পরিচায়ক?

অপারেশন ক্রসবো

গত সপ্তাহে মেট্রোর ‘অপারেশন ক্রসবো’ মূর্তি লাভ করেছে। কার্লোপাণ্টি প্রযোজিত এই ছবি নাৎসী জার্মানীর রকেট ভি-১ ও ভি-২-কে কেন্দ্র করে একদিকে অপ্রতিরোধ্য নাৎসী ধ্বংসলীলা আর একদিকে এই রকেটখাঁটিকে খুঁজে বার করার ও ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দুঃসাহসিক কাহিনী। কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি বাস্তব চরিত্র আছে যারা মিত্রশক্তি অথবা নাৎসীদের পক্ষে বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। এই চরিত্রগুলির মধ্যে চার্চিল, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ডানকান সান্ডিস, নাৎসী জার্মানীর বিখ্যাত বিমানচালিকা হান্সা রেইশ্চ, হিটলারের পিনিমুন্ডে রকেট-খাঁটির ডিরেক্টর জিরম্যান এবং ব্রিটিশ (গোয়েন্দা) ফটোগ্রাফ বিভাগের সি, বারবিন্টন স্মিথ প্রমুখ। ‘অপারেশন ক্রসবো’ হিটলারের রকেটখাঁটি খুঁজে বার করার জন্য মিত্রশক্তির অভিযানের একটি কোড নাম।

তিনজন গোয়েন্দা হিটলারের ডাচ সহ-যোগী সেজে এক হোটেলে এসে ওঠে। হোটেল পরিচালিকা মিত্রশক্তির গোপনকর্মী। দেখানো পল্লীর দৃষ্টিতে পড়েও হোটেল পরিচালিকার বদ্বিধিতে দু-জন রকেটখাঁটিতে কর্মরূপে পেশীহতে সক্ষম হয়, একজন এস. বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। এই

দু-জনের একজনের নাম কার্টিজ (জর্জ পেপার্ড)। সে ডাচ রকেট বিশেষজ্ঞ সাজে। অকস্মাৎ তার স্ত্রী নোরা (সোফিয়া লোরেন) উপস্থিত হয়। কিন্তু উপস্থিত বৃষ্টিতে নোরাকে আটক করে, শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি করে কার্টিজের আত্মগোপনকে নিরাপদ করা হয়। ওরা দু-জন রকেট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সুযোগমত ঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে খবর দিতে থাকে। নাৎসীদের সতর্কতায় কার্টিজ করা পড়ার উপক্রম হলে সে বে-পরোয়া হয়ে কন্দুক হাতে নেয় এবং বিদ্যুৎগ্রহ দখল করে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিত্রশক্তির বোমারু বিমান এসে সংশ্লিষ্ট স্থানে বোমা ফেলে রকেট ঘাঁটি নিশ্চেষ্ট করে। এই ধ্বংসাত্মক মিত্র-শক্তির এই দু-জন সাহসী কর্মীও হলো-বালির সাথে মিশে যায়। কারো কারো মতে এই ঘটনার পর নাৎসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, এবং মিত্রশক্তির পক্ষে বিশ্বের মোড় ঘুরতে সুরু করে।

প্যানাভিশন পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফি—এই রঙিন ছবি বিস্ময়কর দৃশ্য গত মহাবিশ্বের ভয়ংকর দিনগুলিকে চোখের সামনে উপস্থাপিত করে। গ্যারেন্ডারহাস ও উল্বেগস-স্টিকারী এক দৃশ্যসাহসিক বৃদ্ধ-চিত্র হিসাবে ছবিটি



‘অপারেশন ক্রমবো’ ছবিতে জর্জ পেপার্ড ও সোফিয়া লোরেন

উপভোগ্য। বিভিন্ন ভূমিকায় আর কাল আছেন তাঁদের মধ্যে লিলি পামার, টেভি হাওয়ার্ড, জন মিল, সিলভিয়া সিমস, বার-বান্সা রুরোটং, রিচার্ড জন প্রমথের নাম উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ বন্যা

অর্ডিনারী ফ্যানসিড্রম

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মিখাইল রমের নতুন ছবি ‘অর্ডিনারী ফ্যানসিড্রম’ বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। বিখ্যাত লেখক কনস্টানটিন সিমোনোভ ‘ইজর্ভেস্টিয়া’ সংবাদপত্রে এই ছবিটির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ছবিটি দেখবার সময় আমার বারবার চেকো-স্লোভাকিয়ার জাতীয় বীর জুলিয়াস ফুচিকের একটা উক্তি মনে পড়েছে—‘জনগণ সতর্ক থাক’! ১৯৪০ সালে মৃত্যুকূঠরী থেকে তিনি এই শেষ বাণী পাঠিয়েছিলেন। এই বাণীকে আমাদের ভুলে চলবে না; আমরা ভুলব না। মিখাইল রম তাঁর নতুন ছবিতে এই কথা কয়টিই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই পৃথিবীতে এখনো এমন বহু লোক



গোরা সেনরায় পরিচালিত ‘নকল জীবন’ ছবির দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে ললিতা চ্যাটার্জী ও সনিতা সিন্‌হা।



‘রিস্তে নাতে’ হিন্দী ছবিতে নুতন ও রাজকুমার

ভলোডা এবং আনা গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাঁর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এদের প্রত্যেকের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক সমর্থন।

মারিয়া আলেকজান্দ্রানোভার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ইলেনা ফাদেয়েভা। তরুণ ভ্যাডিমির উলিয়ানভের (লেনিন) ভূমিকায় রোদিন নিখাপেটভ। চিত্রনাট্য লিখেছেন জেরা ভসকেনেনস্কায়া এবং ইরিনা ডনস্কায়া। ছবিটির প্রথম খণ্ড আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড জুলাই মাসে শেষ হবে।

কার্ল মার্কসের জীবনচিত্রের মূর্তিলাভ

মস্কিফিল্ম স্টুডিও নির্মিত ‘ওয়ান ইয়ার লাইফ এ হোল ইয়ার’ সম্প্রতি মস্কোর মূর্তিলাভ করেছে। কার্ল মার্কস ও তাঁর অভিনয়-হৃদয় সহযোগী ফ্রেডরিচ এঞ্জেলস-এর জীবন অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনা কাব্যচর্চা বিশ বছরের অধ্যয়ন

আছেন বার্না কিভাবে হিটলারবাদ বা ফ্যাসিজম আধিপত্য লাভ করেছিল সে কথা জানেন না। এই ছবির কাহিনী বড় কথা নয়, বড় কথা হলো কিভাবে এবং মানুষের কিরূপ অসন্তোষের দরুণ ইউরোপে ফ্যাসিজম ক্ষমতা লাভ করেছিল। ভাওতাবাজী এবং হুমকীর প্রতিবাদে পরিবর্তে মানুষের নিরাসক্ত মনোভাব, সত্যকে গোপন করা, বশ্যতা এবং ভীষণতা বিশদশকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিতাশীল রাজনীতিককে বাড়বার সুবিধা করে দিয়েছে। ছবিতে দেখান হয়েছে কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষকে ভুল ব্যিকরে ফ্যাসিজম ক্ষমতালাভ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যমান কালের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় হিটলার মরলেও ফ্যাসিজম মরে নি, ফ্যাসিজম দেশে দেশে জন্ম তৈরি করছে যুগোপমত্ত ক্ষমতার আসার জন্য।

লেনিনের মা

লেনিনের মায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত পরিচালক মার্ক ডনস্কয় একটি ছবি তৈরি করছেন। ছবির নাম—‘দি মাদার্স হার্ট’। ছবিটি হবে দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ড ‘মাদার্স হার্ট’, দ্বিতীয় খণ্ড ‘ফাইথফুলনেস’। লেনিনের মা মারিয়া আলেকজান্দ্রানোভা উলিয়ানোভা স্বামীকে হারিয়েছিলেন, বড়-ছেলে আলেকজান্দার জারকে হত্যা করতে গিয়ে ফাঁসীতে প্রাণ দি়েছিলেন, তারপরে



বিলম্বীকরণ লেন পরিচালিত ‘হেব’

৩ গবেষণায় শ্রীমতী গালিনা সেরেব্রাকোভা

পরিচালক গ্রিগরি রোশালের সহযোগিতায়।

শ্রীমতী গালিনা সেরেব্রাকোভা ইতিপূর্বে 'মার্কসের জীবন অবলম্বনে 'দি স্টিলিং অব ফায়ার' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই ছবিতে মার্কস ও এঞ্জেলসের জীবনের মাত্র এক বছরের ঘটনাবলী দেখান হয়েছে। এই একটি বছর — ১৮৪৮ সাল, এই বছরে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করা হয়েছিল এবং তারা 'নিউ রেইনিশে জেইতাং' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি করেছিলেন। মার্কস ও এঞ্জেলসের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে ইগোর ভাসা এবং আল্ফ্রেই মিরোনভ।

স্টুডিও থেব্র

জবানবন্দী

দিলীপ খস্র পরিচালনায় 'জবানবন্দী' নামে একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন অনুপ-কুমার, কালী বানার্জী, দিলীপ মুখার্জী, লিলি চক্রবর্তী, সম্ভারানী, কালীপদ চক্রবর্তী, অপরূপা দেবী, সুবোধ দাস, ভারতী দেবী ও



এম-কে-জি'র 'মুখার্জী পরিবার' চিত্রে
গালিনা দেবী



উত্তরা দাস। সংগীত পরিচালনা করছেন
রাজেন সরকার এবং চিত্রগ্রহণ করেছেন
নৃপেন দাস।

পাগলা ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অবলম্বনে
হিরেশ সেনের প্রযোজনা ও পরিচালনায়
'পাগলা ঠাকুর' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুত যত্নসহ
হচ্ছে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয়
করছে নবাগত স্বপনকুমার। অন্যান্য ভূমি-
কায় ছায়াদেবী, গীতা দে, পাহাড়ী সন্ধ্যাল,
বিপিন ভঞ্জ, শমিতা বিশ্বাস, সর্বিতা সিন্ধা
শ্রীমান সৌমিত্র প্রমুখ।

শোক সংবাদ

শৈলেন বসুর জীবনাবসান

সোনাল সংসার, রাঙাবো, সিন্ধ, বন্দী,
মানে না মানা, দেবীচৌধুরাণী, বাঘী সিপাহী,

অতনকুমার পরিচালিত 'ফিরে চল' ছবিতে আরতি দাস

সুলভানা প্রভৃতি বিগত যুগের ছবির আলোকচিত্রশিল্পী গ্রীশেলেন বসু গত ২রা নভেম্বর অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর



শৈলেন বসু

বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দক্ষিণভারতের কোয়েম্বাটুরের পক্ষীরাজ স্টুডিওতে চীফ টেকনিশিয়ানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের বাহুর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—খানি স্তব্ধ ডিটেকটিভ
উপন্যাস মূল্য ৩।০ টাকা
২য় ভাগে—খানি রহস্য উপন্যাস
মূল্য ৩।০

জাতীয়-কবি রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

গায়নী, হুবহু, কৰ্মদেবী, কুমার-
সম্বৎ, নীতিকুমারজি, কাকী-কাবেরী,
কবির জীবনী খানি একত্রে ২.০০।

গ্রামাকাঙ্ক্ষ তর্কপকানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী শূন্য দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরমায় নিরূপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

সঙ্গীত কথা

প্রকৃত লোকশিল্পীদের মধ্যে মণীন্দ্র দাস অন্যতম। মণীন্দ্রবাবু ছেলেবেলা থেকেই লোকসংগীতের প্রচার করে আসছেন।

মণীন্দ্রবাবুর জন্ম ১৯০০ সনে পাবনা জেলার যামিতা গদিবাড়ী গ্রামে। পিতা বিহারীলাল দাসও লোকসংগীতের একজন প্রকৃত দরদী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই মণীন্দ্রবাবুর লোকসংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি বাল্যকালে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে গান গেয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। লোকসংগীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া, চটকা ও দেহতত্ত্ব গানের সুর মণীন্দ্রবাবুকে ছেলেবেলাতেই আকৃষ্ট করেছিল—তাই তিনি ১২ বৎসর বয়সে কুচবিহার ও ১৪ বৎসর বয়সে রংপুরের গাইবান্ধা অঞ্চল থেকে পল্লীগীতি সংগ্রহ করার জন্য পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ান।

শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, শচীনদেব বর্মণ, ও জামিনী বৈকুণ্ঠী লোকগীতি মণীন্দ্রবাবুর



লোকশিল্পী মণীন্দ্র দাস

মন জয় করেছিল—তাই তাঁদের মত জনপ্রিয় শিল্পী হবার বাসনা নিয়ে মণীন্দ্রবাবু দেশ বিভাগের পর কলকাতায় আসেন ১৯৫০ সনে।

কলকাতায় এসে মণীন্দ্রবাবু একটু খেয়ে-পরে বিচারের জন্য অনেক প্রতাপশালী জ্ঞানী-গুণীর হাতে পায়ে ধরেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনই ফল হল না। কিছুদিন মণীন্দ্রবাবুকে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হল।

অবশেষে লোকশিল্পী তারাপদ লাহিড়ী মহাশয়ের সুপারিশে ১৯৫৫ সনে মণীন্দ্র-

বাবু কলকাতা বেতারের শিল্পী হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু তাতেও তাঁর অবস্থার খুব একটা উন্নতি হল না। আর তা হলেই বা কি করে? কলকাতায় লোকসংগীতের প্রকৃত দরদী বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা মণীন্দ্রবাবুর প্রকৃত অবিকৃত লোকসংগীতকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেন নি। কেন না মণীন্দ্রবাবুর লোকগীতিতে কমাঁশিয়াল হালকা রূপ ছিল না কোনদিনই।

মণীন্দ্রবাবু একজন সুকণ্ঠধারী লোক-শিল্পী। শব্দ তাই নয়, তিনি একজন সুদক্ষ দোতারা ও একতারা বাদকও।

মণীন্দ্রবাবুর কয়েকটি প্রিয় পল্লীগীতির উল্লেখ করা যাক। মণীন্দ্রবাবু যে ধরনের ভাওয়াইয়া গান গেয়ে থাকেন তা হল—

ওকি কাজল ভ্রমরা

গুরু, আকোরালরে

মুই নারি কোলে বাচা ছাওয়া।

ওপারে বন্ধু বাড়ী এপারে মুই নারি,

মধ্য আছে বিরল নদীর ধারা ॥

উপরোক্ত গানে বিরহ-করুণ ধরনের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

মণীন্দ্রবাবুর একটি 'মইশাল' গানে সুন্দর একটি পল্লীচিত্র পাওয়া যায় যেমন—

মৈশালী বন্ধুরে

শুকনা নদীর পাড়ে

মুখখানি শূকরাইয়া গেছে,

চৈত্রি মাসে কামালে!...

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু

এই না বরাবর

খাজুর গাইছা বাড়ী আমার

পুবে দুরারা ঘর ॥

মণীন্দ্রবাবুর সংগৃহীত একটি চটকা গানে সুন্দর একটি হাস্যরসাত্মক চিত্র ফুটে উঠেছে, যেমন—

শোন বাহে দেওয়ানীর ছাওয়া,

মোর বিচারটা "দেও" করিয়া

শব্দে হইয়া মার খাওয়ালে

মোকে ॥

মণীন্দ্রবাবুর আরোও একটি সংগৃহীত দেহতত্ত্ব গানে খুবই উচ্চ দার্শনিকত্বের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। যেমন—

কি চমককর ফল গো গুরু,

ধরিছে ঐ গাছে।

উপর দিকে গাছের গোড়া,

জমিনেতে ডাল মেলেছে ॥

মণীন্দ্রবাবুর এ ধরনের অনেক পল্লীগীতি আছে যা বাংলার সংস্কৃতি-ভাণ্ডারের এক-একটি রত্নবিশেষ।

এত অমূল্য সম্পদের অধিকারী যে শিল্পী তাঁর উপযুক্ত কদর আমাদের দেশের লোকসংগীত-দরদীরা দেন না। তাই মণীন্দ্রবাবুর মত লোকশিল্পীকেও আজ পেটের দারে এখানে-ওখানে ছুঁতে হয়।

—বৃন্দাবন রায়।

রাশিয়ান নাটক : রাশিয়ান

সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য অস্ট্রভাঙ্স্কির সহ টুর্গেনেভের (১৮১৮-৮৩) অবদানও কম নয়। যদিও ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পের লেখক হিসাবেই তিনি বিশ্ববরেণ্য। অস্ট্রভাঙ্স্কি তাঁর নাটকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতে একেবারে সিক্কহস্ত ছিলেন। ইতান সার্গেভিচ টুর্গেনেভ কিন্তু মানুষের অন্তরের জটিলতার দিকটাই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন তাঁর নাটকে।

টুর্গেনেভ এক ধনী পরিবারে (ভূমির মালিক) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব খুব সুখের ভেতর দিয়ে কাটে নি। বাড়িতে ফরাসী এবং জার্মান শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানে সাহিত্যচর্চা, সেক্সপীয়রের অনুবাদ, কাব্যতা এবং প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এরপর শিক্ষা সমাপ্তির জন্য তাকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় এবং ১৮৪৩ সালে তাঁর প্রথম নাটক—একটি রোমান্টিক প্লে প্রকাশিত হয়। এই বছরই বিখ্যাত রাশিয়ান সমালোচক বোলিনস্কির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং বোলিনস্কির চিন্তা-ধারণার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

১৮৫১ সালে টুর্গেনেভ 'এ প্রভিন্সিয়াল লেডি' নাটকটি রচনা করেন। এ নাটকে অস্ট্রভাঙ্স্কির ধরনের বিষয়বস্তু নিয়েই টুর্গেনেভ নাটকের পট রচনা করেছেন—কিন্তু নাটকের কাহিনীকে যেভাবে প্রতিভাত করেছেন তার সঙ্গে অস্ট্রভাঙ্স্কির রচনাধারার কোনও মিল

বহুমেধ ও দেশে এবং বহুদেশে মিনোমিন

নেই—ধরণটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। এ নাটকের ডারিয়া ইভানোভনা হচ্ছেন একজন প্রভিন্সিয়াল সিভিল সারভেণ্টের স্ত্রী—এটি সত্যিই একটি ক্রিয়েশন। অস্ট্রভাঙ্স্কির 'দি ওয়ার্ড' নাটকের নায়িকার মত এই যুবতীটিও এক ধনী মহিলার আশ্রিতা হিসাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। ঐ ধনী মহিলাই অল্প বয়সে ডারিয়াকে স্টুপেনডেভের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন—স্টুপেনডেভ ছিল কন্টসাইফু এবং পরিশ্রমী কিন্তু একটু বোকা ধরনের। ডারিয়া তার ছোট বাড়িতে বসেও ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বরের স্বপ্ন দেখতো—যে ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বরের ভেতর সে তার শৈশব কাটিয়েছে ঐ ধনী মহিলার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। এরপর ডারিয়া জানতে পারল যে, তার সেই আশ্রয়দাতার ছেলে কাউন্ট লিউভিন শহরে এসেছেন। কাউন্টের এখন বয়স হয়েছে। কিন্তু সাজপোষাকে এখনও তিনি ফুলবাড়—এক সময় এই মনিবপুত্রের সঙ্গে ডারিয়ার হালকা প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এইবার ডারিয়া কাউন্টকে তার মোহজালে আকর্ষণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল।

যে অস্ভূত হাস্যপরিভাসের পরিপ্রেক্ষিতে টুর্গেনেভ ডারিয়া চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর অস্ভূত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তার প্রণয় করবার ধরন-ধারণ, তার হেনসলিপনা এবং ধূর্তাম্বী দেখে বোঝা মুস্কিল হয়ে ওঠে সত্যিই সে নিজেকে কতোটা প্রেমাতা বা সমস্ত ব্যাপারটাই মজা করবার জন্য করা কি না।

কাউন্টকে দিয়ে স্বামীীর জন্য মস্কোতে একটি ভাল চাকরীর বন্দোবস্তের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে একথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু নিজে সে কতোটা কাউন্টের প্রতি অনুরক্ত তা একেবারেই ধরা যায় না। কতটা যখন তাকে তার কল্যাণকামের জন্য অভিনয়দর জানালেন তখনও ডারিয়া দ্বাধবোধক উত্তর দেয়—

“Count, you know one can play a comedy well when one feels one's part...”

এই ধরনের প্রাণবন্ত হাস্যখুশির পরিবেশে কিন্তু টুর্গেনেভকে সব সময় দেখা যায় না। ১৮৪৭-১৮৫০-এর ভেতর তিনি তাঁর ডার



স্টানিসলভস্কি নেজডানোভা ও সোবিনভ 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার'-এ ভূষিত হবার পর—১৯৩০ সালে।



টানিসলভার্স্ক ও বার্নার্ড শ—মস্কোতে ১৯৩১ সালে

নাটকগুলি লেখেন—এই সময়ের রচনা পড়লে দেখা যায় his mood varies from laughter to tears. 'এ কনভার-সেশন অন্ দি হাইওয়ে' নাটকটিতে বৈপরীত্য প্রথমে জমিতব্যরী এ্যারিস্টোক্র্যাট এবং তার বৃদ্ধ সত্যিকার ভৃত্যের চরিত্র দুটি সুন্দরভাবে জাকা হয়েছে। এ নাটকটি সিরিয়াস মূডে লেখা।

'এ মান্থ ইন দি কান্ট্রি' নাটকটির অব-সানে দেখতে পাই কৃষ্ণচিকিতার অন্ধকার। এটিই টুর্গেনেভের প্রের্ত নাটক। এই প্রের্তি পড়লেই বোকা যায় চেখভ তাঁর নাট্যরচনায় তাঁর পূর্ব-সূত্রী টুর্গেনেভের কাছে কতোটা কম। টুর্গেনেভের নাটকটির টেকনিক এবং পরিবেশের দিকে একটু নজর দিলেই মনে হবে আমরা যেন চেখভের রচনার একটা নজা চেখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্লট জটিল—চরিত্রগুলি সুন্দর-ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—কিন্তু এই পরি-ক্ষুটন হয়েছে অপ্রত্যক্ষরীতিতে। নাটকের অল-মর্শ নাটালিয়া পেত্রোভনা—কমল ২৯ বছর, ভূমির মালিক ধনী ইস্লামেরভের স্ত্রী। নাটালিয়া স্বামীকে ভালবাসে না, স্বামীর কথ-ম্যাকটিনের প্রতি যে আকর্ষণ সেটাও প্রেম

নয়। নিম্নোপরিমাণ সবসময়ের সঙ্গীর প্রতি যে মৃদু ভাললাগায় ভাবটা দেখা দেয় এ হচ্ছে অনেকটা সেই রকমের। এরপর নাটালিয়ার জীবনে এল দুঃখেরাগের রাত্রি। যুবক-ছাত্র বিলায়েভ নিযুক্ত হল তার ছেলে কোলিয়ার গৃহশিক্ষকরূপে।

নাটালিয়ার আশ্রিতা ১৭ বছরের যুবতী ভেরা অনুরক্ত হয়ে পড়ল এই গৃহশিক্ষকের। এর পর যুবক সূক্ষ্মভাবে টুর্গেনেভ দোষের-ছেন যে, নাটালিয়াও বিলায়েভের প্রেম-জর্জরিত হয়ে উঠলেন—তিনি নিজের যুবকে পারছেন এটা একটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন মনোভাব, কিন্তু কিছুর্তেই মনের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারছেন না।

কোনো সমসাময়িক ফরাসী নাট্যকার যদি এই নাটকটি লিখতেন—তাহলে এটি একটি উত্তাল আবেগময় রচনাতে পরিণত হোত; অথবা হয়ে দাঁড়াত একটি সমাজ-সমস্যামূলক নাটক; যে যুবকটির প্রতি নারীকা অন-রক্ত হয়ে পড়ছেন তাকে একেবারে হিরোতে পরিণত করা হোত। টুর্গেনেভের রচনার শিক্ষক বিলায়েভকে দেখানো হয়েছে অতি সাধারণ মানব হিসাবে—সে অত্যন্ত

অপরিণত এবং নাটালিয়া বা ভেরা কারো মন্বন্ধেই তার মনে এতটুকু অনুরাগের ভাব নেই। এই জন্যই মহিলা চরিত্রদ্বটির মন-স্তাত্ত্বিক দিকটার পরিক্ষুটনের সুযোগ পেয়েছে। নাটালিয়া প্রেমাবেগে এতটা অভি-ভূত হয়ে পড়েছে যে, ভেরাকে এক মর্ষ, বৃদ্ধ প্রতিবেশীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে; আর আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই যে এক নিষ্পাপ শিশু থেকে ভেরা এক পূর্ণবয়স্কা মহিলাতে পরিণত হয়েছে।

ফরাসী শৈলী হলে এ নাটকের কাহিনী-ধারাকে অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত এবং ঘনীভূত করে ফেলা হোত। টুর্গেনেভ কিন্তু প্লটের বিন্যাসের জন্যে দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতরণা করেছেন, দীর্ঘ এবং অসংবদ্ধ সব সংলাপের সংবোজনে গল্পের ভাবানুভূতি দিকটাকে রসঘন করে তুলেছেন।

নাটকের শুরুতে দেখা যায় চারটি চরিত্র বসে তাস খেলছে এবং র্যাটিফিকন 'ব কাউন্ট অন্ মর্টেস্টো' পড়ে শোনচ্ছে নাটালিয়াকে। প্রথমটায় মনে হয় এ দৃশ্য এবং এর পরের দৃশ্য শৃঙ্খমায় নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য লেখা হয়েছে—শৈলী শেষ হলে অবশ্য বোকা যায় নাটকটি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা কল্পনায় তার চাকর ম্যাটিভির জন্য একটি করেছে।

'এ পুরুর জেটলম্যান' নাটকটির প্লটটি অত্যন্ত সহজ সরল। এক নববিবাহিত দম্পতি, প্যাভেল নিকোলায়ভিচ এলেটস্কি এবং অল্গা পেত্রোভনা এসে উপস্থিত হলেন অলগার জমিদারীতে। সন্ধ্যাবেলায় স্বামীটি অর্ধাং প্যাভেল এবং তার বন্ধুবান্ধবেরা মজা দেখবার জন্য গরীব, বৃদ্ধ কুজোভস্কিকে খুব করে মল খাইয়ে মাতাল করে দিলেন। তাদের ঠাট্টা, টিটকারীতে বিরক্ত হয়ে কুজোভস্কিন হঠাৎ ঘোষণা করলো যে আসলে সেই হচ্ছে অল্গার বাবা। এ নাটকে প্লটের স্থান খুব বড় নয়। টুর্গেনেভ নানা জাতের চরিত্র এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের দিকটাই সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

মানুষ কি এবং তারা কি হয়ে দাঁড়ায়, মানুষ কি হবার স্বপ্ন দেখে এবং আসলে কি হয়—এইসব ব্যাপারই বোঝাতে চেয়েছেন টুর্গেনেভ তাঁর এই নাটকে।

'ইনসলভেবল' নাটকটিতে সৌজিকভ-কল্পনায় তার চাকর ম্যাটিভির জন্য একটি নতুন ধরনের গোলাকের পরিকল্পনা করছে, অথচ এই সময় পাণ্ডনারদের থেকে রেহাই পাবার জন্য সে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

স্বপ্ন এবং বাস্তবের জটলনিহিত বৈপরীত্য অন্যান্য নাটকেও দেখিয়েছেন টুর্গেনেভ—যেমন 'ইট ব্রেক্স হোয়ার ইটস থিন'। এ নাটকে গোরস্কি তার মানসীরূপিনী

হৃদয়টিকে স্নেহের করণ্ডে পারলো না
যথোপযুক্ত সংসাহস এবং দৃঢ়তার অভাবে।
অনেক সময়ে বৈপরীত্য প্রথার রচনা করতে
গিয়ে টুর্গেনেভ পরিণতিতে দুঃখ-মিশ্রিত
আনন্দ-রসের সৃষ্টি করেছেন—যেমন 'দী
ব্যাচিলার' নাটকে। আত্মকেন্দ্রিক যুবক পেট্রুসা
মারিয়াকে ভালবাসল। মারিয়ার অভিভাবক
ছিল মসকিন। পেট্রুসার এক বন্ধু তাকে
বললো মারিয়ার ভেতর যথোপযুক্ত শিক্ষা-
দীক্ষা এবং কৃষ্টির অভাব। একথা শনে
পেট্রুসা এবার পেছিয়ে এল—এরপর পাঠক-
দের বৃত্তিতে কন্ঠ হয় না যে, মারিয়া শেষ
পর্যন্ত তার অভিভাবককেই বিবাহ করবে।
এ নাটকে বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে এই-
ভাবে—একদিকে একজন দয়ালু হৃদয় লোক,
অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর আর
একজন লোক, একের ভেতর প্যাশন,
অন্যের ভেতর সেন্টিমেন্ট, একের ভেতর
উজ্জ্বল নির্ভরতা, অন্যের ভেতর স্বাভাবিক
স্নেহ প্রীতি।

রাশিয়ান নাটকে জার্মান নাটকের মত
প্রকটভাবে সবকিছুকে ব্যক্ত করা হয় না—
বা ফরাসী নাটকের মত বাস্তবতার বাইরের
রূপটো নিয়েই জড়বাদী নাটক সৃষ্টির প্রয়াস
নেই। রাশিয়ান নাটক বৃত্তিতে হলে চরিত্রের
গভীরে ঢুকে যেতে হবে, নাটকীয় পরি-
বেশকে অন্তর দিয়ে বৃত্তিতে হবে।

অস্ট্রভস্কি-টুর্গেনেভ রিয়ালিস্ট, কিন্তু
ডাঁদের রিয়ালিজমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে
রায়েছে একটা কাব্যিক মনোভাব। এঁদের
নাটকে আমরা জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে
পাই—কিন্তু সে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে নয়
অর্থাৎ চার দেয়ালের একটা দেয়াল না
থাকার তার ভেতর দিয়ে দেখি না—একই সঙ্গে
ভেতর এবং বাইরে থেকে, দৃশ্য এবং পরি-
বেশের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে, চরিত্রগুলোর
সঙ্গে পৃথক এবং একাত্ম হয়ে।

এ্যালার ভাইজ নিকল বলেছেন :

'Zola's drama, and Hebbels
too, is the drama of the spectator ;
Ostrovski's and Turgenev's is the
drama of the spectator—partici-
pant.

তবে একটা কথা এখানে মনে রাখা
দরকার। টলস্টয়ের 'দী পাওয়ার অভ্যাস-
নেশ' প্রকাশিত হবার আগে আধুনিক ড্রামার
ক্ষেত্রে রাশিয়ানরা সামনের সারিতে এগিয়ে
জাসতে পারেন নি। টলস্টয় যে একজন



মলিয়েরের নাটকের একটি চরিত্রের রূপায়ণে কনস্টানটিন স্টানিসলভস্কি।

বিরাট নাট্যকার এ ধারণা বহুদিন পর্যন্ত
আমার ছিল না। এ বিষয়ে নাট্যাচার্জ শিশির-
কুমার জাদুড়ীই আমাকে প্রথম অবহিত
করেন। অবশ্য এখনও আমার মনে হয় ছোট
গল্পের লেখক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে
টলস্টয় আরও বড়। থাক্ টলস্টয়ের নাটকের
আলোচনা শুরুর করবার আগে মার্টিন ল্যাসের
একটি আলোচনার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি।
এখানে চেকভের উপর টুর্গেনেভের প্রভাব
সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

'A Mouth in the Country
anticipates Chekhov in its atten-
tion to psychological detail, and
also in the way to the story full
circle to its starting point. Leshei
(The Wood Demon), a study
Diadia Vania (Uncle Vanya),
resembles Turgenev's play in its

general structure. Chekhov is
supposed to have said that he
tried to develop his technique on
the lines of Turgenev's subtle
analysis of everyday happenings.
A letter to his wife shows that in
his later years he no longer
admired A Mouth in the Country.
What he did praise at that time
was The Bread of others, a
moving play about an impoverished
but proud old nobleman who is
compelled to live as a dependant
with a rich couple in the country.
There is no trace of Chekhov's
originality in Turgenev's graceful
plays written in the French style.'

(কম-কম)

সাধারণত সর্বস্বত্বের মানুষ্যই
জন্মগ্রহণ করে। যদিও তা
কিছু বহুলপ্রচারিত হয়, তা হলেও
অন্যদেরই ব্যাপার। আপনার পত্রিকার
‘পাঠকমন’ বিভাগের বহু দূর-দূরান্তের
পাঠকদের বিভিন্ন সুস্পষ্ট সত্যময়
সেমন পত্রিকাকে সহযোগিতা করছে,
তেমনি তারাও তাদের নিজ নাম ছাপার
হরফে দেখে কম খুশি হচ্ছেন না।
সেই কারণে ‘পাঠকমন’ অলেখকদের
কাছেও নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা অর্জন
করেছে।

২৮শে নভেম্বর ‘৬৫র সংখ্যায়
প্রকাশিত ‘পাঠকমন’ বিভাগে রাশি
সরকারের একটি পত্র পাঠ করলাম।
কিছুদিন আগের ‘বঙ্গদর্শনে’ আলোচিত
শারদ সঙ্কলনে প্রকাশিত বিশেষ কোন
একটি উপন্যাসে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে
গিয়ে তিনি যে নিম্ন কটাক্ষপাত
করেছেন, সাহিত্য-পাঠক হিসেবে এ
প্রসঙ্গে কিছু না বলা হলে চরম অপরাধ
বলে মনে হবে।

এ প্রসঙ্গে সম্পাদককে যে কটাক্ষ
বর্ষণ করা হয়েছে, তাতে আশ্চর্য না
হয়ে পারি না। প্রথম কথা, সম্পাদকের
এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব থাকে না, কারণ
কোন সম্মানীয় আদর্শিত লেখকের যে
কোন লেখা সম্পাদক মুদ্রিত করতে
বাধ্য। আর পত্রলেখিকা বোধ হয়
জানেন না, পূজ্যসংখ্যায় উপন্যাসগুলি
৫-৬ পাতার কিস্তিতে দিয়ে লেখকেরা
তা সম্পূর্ণ করেন। তাই ‘জোগানদার’
বলে যে রুঢ় মন্তব্য সম্পাদকের
বিপক্ষে আরোপ করা হয়েছে, তা কি
সমর্থনযোগ্য? স্বতীয়ত, সাহিত্য
বিচারের উপর ভোট চাওয়া হয়েছে।
ক্যালিট পেপারে সাহিত্য বিচার?

.....হে ঈশ্বর! তার আগে ধরণী
থেকে সাহিত্য কথাটি মুছে দিও।
পত্রলেখিকা জানেন কি, দেশ এবং
সমাজের রায় কোন সাহিত্যের চরম রায়
নয়? আজকের জনপ্রিয় জরেন্সের
‘ইউলিসিস’ ১৯২৮ সালে আমেরিকার
কান্টমস কোর্ট থেকে চূড়ান্তভাবে
অস্বীকার বলে চিহ্নিত হয়। লরেন্সের
‘লেডী চ্যাটারলিস লাভার’ দীর্ঘকাল
ইংলন্ড আমেরিকার নিষিদ্ধ নাগপাশে
বন্দী থেকে সাম্প্রতিককালে মুক্তি লাভ
করেছে। বায়রনের স্মৃতিকথার অমূল্য
দ্রলিল যাতে তখনকার সমাজ, উচ্চ
মহলের নগ্ন জীবন আঁকা ছিল, তা
পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং আজকের
বিচার সাহিত্যের শেষ বিচার নয়, তার
জন্মে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে
হয়।

আমরা জীবনকে জানতে চাইব,
পরিচয় দিকটি নিয়ে আলোচনা করব,
অর্থাৎ সমাজের পটভূমির নগ্নতা বাদ



দিই কি করে? এও তো সমাজের
আরেকটি দিক। আর সাহিত্য যখন
সমাজ এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি, তখন
রচনার কি তা প্রতিবিম্বিত হবে না?
এদেশের একজন খ্যাতনামা বিদগ্ধ
প্রবন্ধকার বলেছেন ‘জীবনকে স্বীকার
করলে বোয়ানদুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করে
দূরে রাখা যায় না। লোকচক্ষুর
অন্তরালে তা রাখার চেষ্টা করলে যা
অত্যন্ত স্বাভাবিক তা কৃত্রিম রূপ
ধারণ করে।

‘জিহোরায় বৃগের নীতিবাণীশেরা
টোবিলের উল্লুখ পায়া দেখলে পশ্চত
শিউরে উঠেন, তাই অনেক বাড়িতে
টোবিলের পায়াগুলিকে প্যান্ট পরিয়ে
রাখা হত। সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে
আজকের সাহিত্য বিচার করতে যাওয়া
হাস্যকর।’

সং পাঠক হয়তো অনেকে, তা’ বলে
বাড়িসমূহ লোক সবাই সাহিত্য বিচার
করবে? এমন কি স্কুলের ফ্রক-পরা
মেয়েটা? পুত্রবধূ, পান-চিবানো গিন্নী,
স্ববাই? মাফ করবেন, কথাগুলি
খুবই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।
বিদেশী বিচারপতি স্টেবল বলেছেন,
সর্বদা কিশোরদের মুখ চেয়ে
[সাহিত্যের মোটামুটি পাঠককে
কিশোরই বলা উচিত] সাহিত্য রচনা
করলে সে সাহিত্য কখনও সাবালক
লাভ করে পরিণতির পথে অগ্রসর হতে
পারে না। আরও আলোচনা করার
ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সম্পাদিকা এর চেয়ে
বেশি জায়গা দিতে পারবেন না বলে
মনে হল। আজ মিল্টনের একটা কথা
বলেই শেষ করব—একটি ভাল বইয়ের
প্রচার বন্ধ করা নরহত্যার চেয়েও
মারাত্মক অপরাধ।—মিল্টনের এই
সাবধানবাণী মনে রেখে সাহিত্য-গ্রন্থ
বিচার করা উচিত।

.....অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিতর্কিত
উপন্যাসের কথা নাও আসতে পারে।

শান্তনু দাস
৪।১, আফতাব মস্ক লেন, কলিঃ—২৭

* * *
যখন অপপ্রচারের বন্যাস আসল-
নকলের রাজ্যে ভেদাভেদ প্রচণ্ডভাবে
ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং বাংলার সাহিত্য
পত্র-পত্রিকাগুলি যখন সেই আসরে

চটল-রোমাঞ্চ-প্রেমের ভূবিমালের পশর
সাজিয়েছে ঠিক তখনই একমাত্র
‘বসুমতী’ আমাদের চিন্তার রাজ্যে
সেই অরাজকতার দিকে ব্যাবহার দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছে। তাই আজ
‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ যার বয়স মাত্র
তিন বছরের কাছাকাছি, তার অবস্থান
সাফল্যে আমরা শুধু আনন্দিত হয়েছি
বললে কম বলা হয়। এ জয়ের গৌরব
একান্ত আমাদেরই ভাব-ভালবাসা
হাসি-কান্না, জয়পরাজয় সিঁদুয়ার চরম
পদস্কার। আজকের পৃথিবীতে
সংগঠে সংসাহসে হাটটাই বোধহয়
কঠিনতম কাজ। ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’
সে পথে সাফল্যের সাথে পারিক্রমা
করেছে, এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই।
আমরা অভিনন্দন জানাই আপনাকে,
বসুমতীর সাংবাদিক-লেখক-লেখিকা-
গোষ্ঠী ও সর্ব বিভাগের কর্মী
সাধারণকে—যারা আন্তরিকভাবে
আমাদের কথা বলবার চেষ্টা করছেন।

‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র আরো সফল
উত্তরণের জন্য কিছু কিছু সংযোজন ও
বিরোজন আবশ্যিক। সেকথা বারাত্তরে
প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো।

—সত্যেন্দ্র, ম্যাগাজিন ক্লাব,
ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাকাডেমি, দঃ পুঃ
লে, খজাপুর, মেদিনীপুর।

* * *
এক জওয়ানভাইয়ের চিঠি
আমি ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র নিয়-
মিত পাঠক। আপনাদের নিভীক সমা-
লোচনা, নিভুল সংবাদ পরিবেশনা
আমার কাছে খুবই ভাল লাগে।

কতকগুলি লেখা সত্যি বেশ আনন্দ
পাই পড়ে। যেমন: ‘দিল্লী থেকে’,
‘আন্তর্জাতিক’, ‘গ্রাম বাংলা’,
‘আজকের মানুষ’।

দেশের এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে
কোথায় আছি তাহা জানাতে পারলাম
না বলে দুঃখিত। আপনাদের ধারা-
বাহিক উপন্যাস ‘উপছায়া’ ভাল
লাগছে। তবে ২।৪ খানি পাতা বেশি
করে লিখলে ভাল হয়।

তবে প্রায় ২ মাস অন্য জায়গায় চলে
যাওয়াতে ‘উপছায়া’র সাথে কোন
যোগাযোগ রাখতে পারি নি।
‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ প্রতি সপ্তাহে
আমাকে বাড়ি থেকে পাঠায়।

আপনাদের এই পত্রিকাটি যে কত-
খানি Recreation দেয় তাহা
বোঝাতে পারব না। রোজ যখন ডাক
আসে তখন প্রথমেই আমি দেখি বাড়ি
থেকে ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ এসেছে কি
না?

রঞ্জিতকুমার লাহিড়ী
Rank : Electrician
c/o : 99 A. P. O.



স্পেনের বার্সেলোনার ক্রীড়ার ভবনের ডাবলস জুটি প্রেমজিৎ ও জয়দীপ।

সিডনির পথে

বার্সেলোনার রয়্যাল টেনিস ক্লাবের কাছেই দীর্ঘের ঘণ্টা হঠাৎ বেজে চলল একটানা; যেন কোন শূন্য উৎসবের সূচনার ঘোষক। সত্যিই এদিন শূন্য উৎসব বটে স্পেনের ক্রীড়াঙ্গণে, তাই ওই বিরাট আনন্দের দিনের আনন্দধারাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে একটানা চং চং আওয়াজ। অন্য একটি দৃশ্যে রয়্যাল টেনিস ক্লাবের সমবেত সাতহাজার টেনিস-পাগল দর্শক তাদের নয়নের মনি ম্যানুয়েল সান্তানাকে মাথায় তুলে নৃত্য করছে, আনন্দোন্মত্ত স্প্যানিয়র্ডদের মুখে শুধু একটি কথা: Ole! Ole!

রাঙন কাগজের টুকরো শূন্যে উড়িয়ে ওরা প্রাণভরে নিঃশেষে পান করার চেষ্টা করছে অপূর্ব বিজয়ের আনন্দ। বার্সেলোনার রয়্যাল টেনিস ক্লাব এক নতুন রূপ ধারণ করেছে, এরূপ ইতিপূর্বে কেউ প্রত্যাশ করে নি। স্পেনের জায়ী জীবনে এই বিজয় এনে দিয়েছে এক বিরাট আলোড়ন, কারণ এই প্রথম স্পেন ডেভিস কাপের ফাইনালে পদার্পণ করার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে।

টেনিসের রাজ্যে স্পেনকে নতুন পথ দেখিয়েছে ম্যানুয়েল সান্তানা। স্পেনের টেনিস রাজ্যের মুকুটহীন রাজা বলে ম্যানুয়েল সান্তানাকে অভিহিত করলে অত্যন্ত হবে না। বিশ্ব টেনিসের দরবারে ভারতকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেমন রমানাথন কৃষ্ণণ, ঠিক তেমন স্পেনকেও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন একাই মাদ্রিদের এক অখ্যাত পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করা ছেলে ম্যানুয়েল সান্তানা। স্পেনের মাদ্রিদ টেনিস ক্লাবের ময়ের কাজ করে সান্তানার ছোটবেলা কাটে। মৃদুগো প্যেলে ওরই মাঝে টেনিস র‍্যাকেট হাতে

তুলে নিভেন সান্তানা। প্রতিভা কোন-দিন ঢাপা থাকে না। ১৯৬২ সালের মধ্যে দেখা গেল স্পেনে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিলেন ম্যানুয়েল সান্তানা। কারণ উইমবল-ডেন ছাড়া বিশ্ব টেনিসের অন্য সব সেরা ট্রফি জয় করে এনে তিনি উপহার দিয়েছেন স্পেনকে। এবারও সান্তানাই হীরো—স্পেনের বিজয় পতাকা ডেভিস কাপের আসরে উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তার দলবল নিয়ে পৌঁছেছেন তো ফাইনালের দ্বার।

টেনিসের নিপুণ শিক্ষণী ম্যানুয়েল সান্তানা এবং ভারতের গৌরব রমানাথন কৃষ্ণণের লড়াইয়ের ওপরই নির্ভর করছিল দুই দেশের ভাগ্য। কিন্তু টেনিসের রাজপুত্র

শ্রীঅমিতাভ

ম্যানুয়েল সান্তানার নিখুঁত কলা-কৌশল কৃষ্ণণের মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কেও স্ট্রেট সেটে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করল। সান্তানা-কৃষ্ণণের একঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে প্রাণের সপ্তার করেছিল রয়্যাল ক্লাবের সেন্টার ক্রে কোর্টের বকে, শেষ মহুর্তে তৃতীয় সেটের ষষ্ঠ গেমে সান্তানার ব্যাকহ্যান্ডের একটি তীর ভলি সট কৃষ্ণণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে জয়ী করল সান্তানাকে আর স্পেনকে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন করল। ওই প্রচণ্ড ভলিস্টের সামনে বিমূঢ় হয়ে যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন তখন বিজয়ের আনন্দে নৃত্য শুরু করেছেন ম্যানুয়েল সান্তানা, সমবেত সাত হাজার স্প্যানিয়র্ডও প্রচণ্ড উল্লাসে সান্তানার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। কৃষ্ণণকে ৬—০, ৬—০, ৬—০ সেটের ব্যবধানে পরাজিত করার ফলে

সান্তানা এক রেকর্ডও সৃষ্টি করলেন। এ বছর ডেভিস কাপের খেলায় সান্তানা এখনও পর্যন্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেই একটিও সেট হারান নি।

ভারতকে ক্রে কোর্টে স্পেনের বিপক্ষে যত অসহায় আমরা মনে করেছিলাম, বার্সেলোনার ডেভিস কাপের আসরে ফলাফলের দ্বারা প্রমাণিত করল যে স্পেনের চাইতে কোন কারণে তারা কম নয়। ক্রে কোর্টে ম্যানুয়েল স্প্যানিয়র্ডরা আমেরিকাকে পরাজিত করেছিল ৪—১ খেলার, কিন্তু ভারত পরাজিত হল ০—২ খেলার ব্যবধানে। ভারতীয় বন টেনিসের বিজ্ঞ কর্তাব্যক্তিরা যদি নিজেদের না বিকিয়ে দিয়ে ভারতে খেলা অনুষ্ঠিত করান পারতেন তবে অনায়াসে ভারত ফাইনাল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে পারত।

ভারত-স্পেনের তিন দিনের খেলার প্রথম দিন ছিল দুটি সিংগলস খেলা—কৃষ্ণণ-গিসবার্ট, সান্তানা-জয়দীপ; দ্বিতীয় দিন জয়দীপ প্রেমজিৎ জুটি ও সান্তানা আদ্রিলা জুটির ডাবলস খেলা; তৃতীয় বা শেষ দিন ছিল সান্তানা-কৃষ্ণণ আর জয়দীপ গিসবার্ট সিংগলস খেলা।

প্রথমদিন খেলার ফলাফল হয় ১—১। কৃষ্ণণ পরাজিত করেন স্পেনের দু নম্বর খেলোয়াড় গিসবার্টকে ৬—২, ৬—০, ৬—১ খেলায়। গিসবার্ট কৃষ্ণণের অভিজ্ঞতা এবং দৃঢ়তার কাছে পরাভব স্বীকারে বাধ্য হন। স্পেনের পরলা নম্বর খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানা জয়দীপ মুখার্জীকে অনায়াসে পরাজিত করেন ৬—০, ৬—৪, ৬—৪ খেলায়। জয়দীপের খেলা উন্নত ধরনের হয় কিন্তু টেনিসের নিপুণ শিক্ষণী সান্তানার নিখুঁত মারের বিপক্ষে তার আর করার কিছু ছিল না।

সাপ্তাহিক বসুমতা

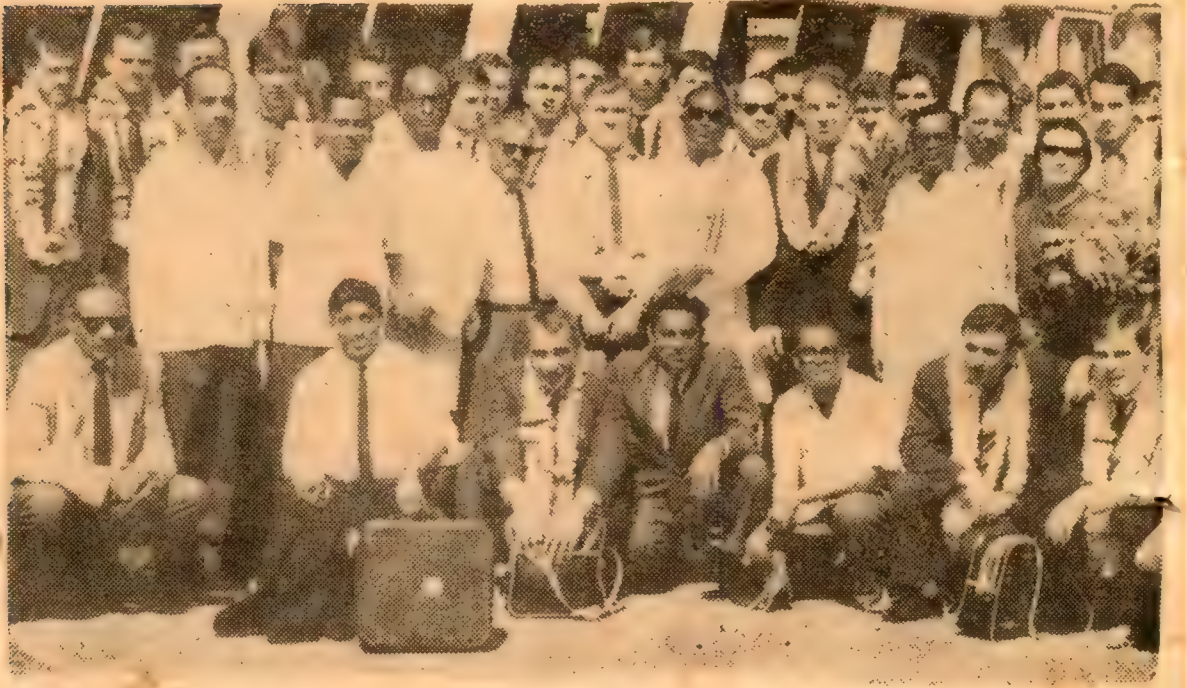


মানুয়েল সান্তানা

শ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় ডাবলস খেলা।
টোকিওতে কৃষ্ণ-জয়দীপ জুটি বাধা হবার
ফলে বাসেলোনার মাঠে ডাবলসে খেলতে
দেখা যায় জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুটিকে। এখানে
উল্লেখযোগ্য যে কয়েক বছর আগে এই
বাসেলোনার মাঠে কৃষ্ণ-জয়দীপ জুটি কিন্তু
স্পেনের সেরা সান্তানা-আরলা জুটিকে
পরাজিত করেছিল। বর্তমানে সান্তানা-
আরলা জুটির মধ্যে সান্তানাই খেলার সমস্ত
দায়িত্ব সন্ধে নেন। ভারতীয় ভরণ জয়দীপ-
প্রেমজিৎ জুটির মধ্যে জয়দীপের খেলা হয়
অনবদ্য। তিনি ছিলেন একাই একশো। শেষ
পর্যন্ত জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুটি পরাজিত হন
৮-৬, ৬-২, ১০-৮ খেলার ব্যবধানে।
এঁদের ডাবলস খেলার মধ্যে বিরতির বন্টি
খেলার বিষয় ঘটায় আর তাই প্রায় পনেরো
মিনিট খেলা রুদ্ধ থাকে। মাঠে সমবেত
ছ' হাজার স্প্যানিয়ার্ড কিন্তু বিরাট খেলোয়াড়ী
মনোভাবের পরিচয় দেয়। তারা জয়দীপের
কৌতুকপূর্ণতার স্বত্বাধিকার করে এবং দু-
একটি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে
পয়েন্ট চলে গেলে সমস্তের তীব্র প্রতিবাদের
ধ্বনিও তোলে।

শেষ দিনের খেলায় ছিল বিরাট আকর্ষণ।
সান্তানা-কৃষ্ণের মিলন এবং এর ওপরই
নির্ভর করছিল সমস্ত খেলার ভবিষ্যৎ।
সান্তানা এই খেলার জয়ী হবার ফলে শেষ
সিগনালসের গুরুত্ব কমে যায়। গিসবার্ট ৪-৬,
৭-৬, ৬-২, ০-৬, ৬-৪ খেলার পরাজিত
হন জয়দীপ মজাজীর কাছে।

আগামী ২৭, ২৮, ২৯শে ডিসেম্বর



দমদম বিমানঘাটিতে ভারত সফররত সোভিয়েট ফুটবল দল।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে ভেঁতস কাপের সম্মান নিয়ে লড়াই হবে স্পেন এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার জয়ী হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু সান্তানার দলবল মনে হয় সহজে নাতি ফর্কির করবেন না। বর্তমানে আবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ভরসা বিশ্বচ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সন তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারছেন না। এখন দেখা যাক এ বছর ভেঁতস কাপ কোন দেশের আতিথ্য গ্রহণ করে।

ভারতের ফুটবল অতিথি

ভারত শেষ রক্ষা করতে পারল না, প্রথমার্ধে এক গোলে অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জুটল ২-১ গোলে পরাজয়ের আশ্বাদ। বিদেশী দলগুলির বিপক্ষে ভারত ভাল খেলেও শেষ রক্ষা করতে পারে না। বোধ হয় শেষ পর্যন্ত দম রাখা ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, স্টুটগার্ট দলের বিপক্ষে কলকাতা মাঠে দেখেছি আই, এফ, এ দল প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী ছিল; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মানে সময় যত শেষ হতে লাগল দেখা গেল ভারতীয় খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং সেই সময় এক এক করে গোল দিয়ে গেল স্টুটগার্ট। গত বছর তাতাবানিয়ার বিপক্ষেও ভারতীয় দলের খেলার একই চিত্র আমরা দেখেছি।

খেলা আরম্ভের মাত্র বারো মিনিটের মধ্যেই রাজেন্দ্রমোহন একটি গোল দিয়ে ভারতকে অগ্রগামী করেন। রাশিয়ান দলের একজন খেলোয়াড় বলটিকে অন্য একজন খেলোয়াড়কে ঠেলে দিলে, সুযোগসম্মানী ফরোয়ার্ড রাজেন্দ্রমোহন ক্ষিপ্ৰ গতিতে সেই বলটি নিয়ে গোলের মধ্যে ঠেলে দেন।

রাশিয়ানদল গোল পরিশোধ করে দ্বিতীয়ার্ধের সাতাশ মিনিটে। গোলাটি করেন পুরুত। খেলায় রাশিয়ান দলের প্রাধান্যের ছাপ ছিল। আর ভারতীয় দলের আক্রমণধারা ছিল কাটিকার মত। রাশিয়ান খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। ভারতীয় দলের চুন্নী গোস্বামীর খেলাও বেশ ভাল হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় দলে পি, কে, ব্যানাজীর স্থানে খেলেন কাজল মুখার্জী এবং রাজেন্দ্রমোহনের স্থানে পরিমল দে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের ৩২ মিনিট সময়ে রাশিয়ান দলের পক্ষে বিজয়সূচক গোলাটি করেন ভয়নভ।

রাশিয়ান এবং ভারতীয় দলের মধ্যে চারটি টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লীর প্রথম টেস্টে জয়ী হয়ে রাশিয়া অগ্রগামী থাকল—এখন দেখা যাক অবশিষ্ট তিনটি টেস্টে কলকাতা কি হয়।

কুরুক্ষেত্রে কলকাতার বিজয়

কুরুক্ষেত্রে মাঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল যুদ্ধে পরাজিত করল ওসমানিয়া



রজনীন্দ্র কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়কে ১-০ গোলে। এবার জয়ী হবার ফলে কলকাতা উপর্যুপরি তিনবার সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আশুভোষ ট্রফি জয় করার কৃতিত্বের অধিকারী হল। এই বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের প্রতিযোগিতা আজ পর্যন্ত চতুর্বিধ বার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইনালে পৌঁছেছে মোট বারোবার। ট্রফি জয় করার সৌভাগ্য তাদের হয়েছে মোট দশবার।

কলকাতা এবং ওসমানিয়া দলের খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। ফুটবলে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আছে। কলকাতা দলের শক্তি বৃদ্ধি করে কলকাতা ময়দানের প্রথম ডিভিশনের কয়েকজন খ্যাতিনামা খেলোয়াড়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে ছিলেন মার্ভেল প্রত্যাগত ভারতীয় দলের খেলোয়াড় অসীম মৌলিক। ইতিপূর্বে দিল্লীতে তিনি ইস্টবেঙ্গল দলকে সাহায্য করছিলেন দিল্লী ক্রুথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায়। সেখান থেকে তিনি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মূল প্রতিযোগিতার আগে কলকাতার পক্ষে খেলতে দেখা যায়।

কলকাতার পক্ষে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গোলাটি করেন দলের অধিনায়ক সুরেন্দ্র। বিপক্ষ গোলের প্রায় দ্বিগুণ গড় দূরত্ব থেকে বল পেয়ে সরকার কমেডিয়ন দিয়ে হুট করে এগিয়ে যান। বিপক্ষ দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে বেশ চাতুস্রের সঙ্গে অভিযুক্ত করে তিনি বলটিকে গোলের মধ্যে ঠেলে দেন।

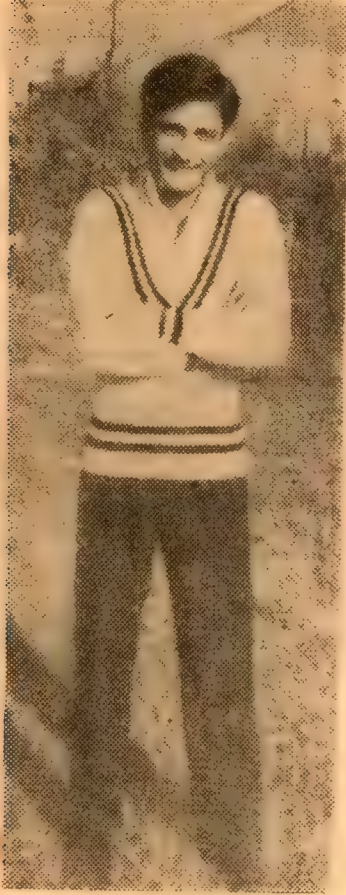
খেলার শেষে বিজয়ী কলকাতা দলের অধিনায়ক সুরেন্দ্রের হাত আশুভোষ ট্রফি তুলে দেন পাঞ্জাব সরকারের একজন কর্মী। প্রবোধ চন্দ্র; খেলার পূর্বে ইন্ডিয়ান স্কল দলের খেলোয়াড়ের পরিচয় কয়েক দেখা হয়।

সমস্যার দর্পণ

পৃথিবীর দুঃভাগ্যী মহিলা হওয়া আরও রিকার মিসেস লী ব্রীডলাভ। সবচেয়ে মজার

খেলোয়াড় প্রসঙ্গে

কথা যে ২৮ বছরের এই মহিলায় স্বামীও হলেন দুঃখাগামী পুরুষ। এর স্বামী মিঃ ক্রেস্ট্রীডলাভ জেট শক্তি সম্পন্ন যে মটরে ঘণ্টায় ৫৫-১২৭ মাইল ভ্রমণ করে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেন, সেই "স্পিডিট অফ আমেরিকা" নামক যন্ত্রখানে চড়ে মিসেস ব্রীডলাভ ৩০৮-৫৬ মাইল ভ্রমণ করে মহিলাদের নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করলেন। পাঁচটি



প্রবীর গাঙ্গুলী

সম্প্রদায়ের জননী পক্ষে এই কাঠিন্য কাজ করা সত্যি বিন্দুর সৃষ্টি করে।

* * *

কলকাতার জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারের সাহায্যে জলপাইগুড়িতে দুটি খেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম খেলায় মোহনবাগানদল ৫-০ গোলে পরাজিত করে জলপাইগুড়ি জেলা একাদশকে। চুণী গোস্বামী একাই চারটি গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক লাভ করেন। দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান ২-২ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে উত্তরবঙ্গ একাদশের সঙ্গে।

মাত্র তেরো বছর বয়স থেকে প্রথম ডিভিশনে খেলা সত্যি কীর্তির নমুনা নেই। হ্যাঁ প্রবীর গাঙ্গুলীও কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ খেলতে সুরু করেন ১৯৫৮ সালে যখন তিনি ছিলেন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রবীর গাঙ্গুলীর জন্ম কলকাতায় ১৯৪৫ সালে। তাঁর পরিবারের সকলেই—বিশেষ করে তাঁর বাবা তাকে খুবই উৎসাহ দিতেন খেলাধুলার। তাঁরা ক্রিকেটকে বেশি পছন্দ করতেন বলে অবশ্য চাইতেন তাঁদের প্রবীর একজন ভাল ক্রিকেটার হোক। এই সময় একেবারে কৈশোরে প্রবীর একজন ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসেন, যার কাছে তাঁর প্রথম খেলাধুলার হাতেখড়ি। ভদ্রলোকের নাম শ্রীকৃষ্ণ রায়। প্রাক্তন বিংশলী কুশাবাবু, অবিবাহিত এবং তিনি কিশোরদের খেলাধুলা শেখাতে দারুণ ভালোবাসেন। শব্দ খেলা শেখানোই নয়, খেলোয়াড়দের প্ররোজনীর সাজ-সরঞ্জাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুশাবাবু নিজেই দিতেন। প্রবীর এলেন এই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এবং এর কাছেই তিনি শিখলেন ফুটবল, হকি আর ক্রিকেট খেলতে।

প্রবীর তাঁর স্কুলজীবন সুরু করেন সাউথ সুদার্বন ব্রাঞ্চ হাই স্কুলে। সাউথ সুদার্বন স্কুলে যখন মাত্র সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র প্রবীর সেই সময় তিনি স্কুলের পক্ষে প্রথম দক্ষ কলকাতা স্কুল ক্রিকেট লীগে খেলার সুযোগ পেলেন। সেই বছর শ্রীকর্তিক বোসের স্কুল ক্রিকেটারদের শিক্ষা শিবিরে প্রবীর যোগ দিলেন। পরের বছর কিন্তু প্রবীর চলে এলেন চক্ৰবর্তী হাই স্কুলে। চক্ৰবর্তী হাই স্কুলে খেলোয়াড় হিসাবে প্রবীর প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। চক্ৰবর্তী স্কুলে কোন ক্রিকেট দল ছিল না, কিন্তু তিনি নিয়মিত ইডেন উদ্যানে শ্রীকর্তিক বোসের শিক্ষা-শিবিরে যোগদান করতেন। ১৯৫৯ সালে চক্ৰবর্তী স্কুল থেকে বাংলা স্কুলদলের সদস্য হিসাবে প্রবীর গাঙ্গুলীর নাম দেখা যায়। প্রবীর সেবার বাংলা স্কুলদলের সঙ্গে কটক সফর করে আসেন।

শব্দ মাত্র ক্রিকেটই নয় হকি এবং ফুটবলেও প্রবীর যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। চক্ৰবর্তী স্কুলে দু'বছর ফুটবল এবং হকি-দলকে তিনি স্কুল প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

কলকাতা ময়দানে ক্রিকেটের আসর প্রথম প্রবীর খেলেন ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষে ১৯৫৮ সালে। ভবানীপুর ক্লাবে তখন প্রবীর খেলোয়াড় মর্টন, ব্যানার্জী এবং জিতেন

বোয়ের কাছে তিনি বেশ সাহায্য পেয়েছেন। ১৯৬০-৬১ সালের ক্রিকেট মরশুমে তিনি গেলেন কালীঘাট ক্লাবে। ১৯৬১-৬২ সালে প্রবীরকে খেলতে দেখা গেল বালীগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবে।

প্রবীরের খেলোয়াড়ী জীবনের নবজন্ম হল এই বালীগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবে। বালীগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবের শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত প্রবীরকে হাতেকরে গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছেন। শ্রীদাশগুপ্ত বর্তমানে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর কোচ। ১৯৬৩-৬৪ সালে ব্যাটিং-এর গড়পড়তার তাঁর ক্লাবের সকলের ওপরে ছিলেন প্রবীর। এই বছরই লীগ খেলায় তিনি টাউন ক্লাবের বিপক্ষে ১১৩ রান করেন।

১৯৬১-৬২ সালে চক্ৰবর্তী স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে এসে যোগ দেন হেরম্বচন্দ্র কলেজে। হেরম্বচন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে বি. কম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে প্রবীর চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টস ছাত্র। কলেজে প্রথম বছর প্রবীর কম্বাইন্ডে সিটি কলেজ দলের পক্ষে খেলেন এবং তাঁরা ফাইনালে পরাজিত হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে। ১৯৬২-৬৩ সালে কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তিনি সেঞ্চুরী করেন; সেবার তিনি পোন্ট গ্র্যান্ডয়েট কলেজের বিপক্ষে করেন ১২৩ রান। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রবীর ছিলেন হেরম্বচন্দ্র কলেজের ক্রিকেটের অধিনায়ক। সেবার কলেজ ক্রিকেটের খেলায় হেরম্বচন্দ্র কলেজ ফাইনালে উন্নীত হয়, কিন্তু আবার পরাজিত হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট রু. হন। সেবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি বেনারসে এবং দিল্লীতে যান।

১৯৬৪-৬৫ সালে প্রবীর ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবে। এই ক্লাবের পক্ষে তিনি বোলার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ডান হাতের স্লো অফ স্পিন বলে প্রবীর বেশ উইকেটও লাভ করেন। কিন্তু এবছর আবার তিনি তাঁর পুরাতন ক্লাব বালীগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবে ফিরে এসেছেন। প্রথম থেকে দক্ষ ব্যাটসম্যান প্রবীর কিন্তু ভাল ফিল্ডারও বটে। শ্রীসুনীল দাশগুপ্তের কাছে বর্তমানে তিনি ভালভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং আশা করা যায় এই মরশুমে তিনি তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের সাহায্যে আরও সুনাম অর্জন করতে পারবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রাটস্ কলকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ...	...	...	১৫৩৯
আজকের মানুষ	...	...	১৫৪০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	...	হরপ্রসাদ মিশ্র	১৫৪১
আন্তর্জাতিক	...	...	১৫৪৩
ভারতদর্শন	...	...	১৫৪৬
উপজ্জ্বা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫৪৮
বঙ্গদর্শন	...	...	১৫৫১
সাধক বিংশতী যতীন্দ্রনাথ	...	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মল্লোপাধ্যায়	১৫৫৫
শহর কলকাতা	...	শ্রীপদাতিক	১৫৫৯
অধিরমণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৫৬৪
স্বপ্নমেল	...	জয়ন্তী সেন	১৫৬৪

আত্মজীবনী

স্বপ্নমণি অধ্যাপক সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—তুই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কথী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীত-মাত্র

সোপেন্সর বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ—৫১।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩

মোহন মেলা

শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথাশিল্পী
১৯-মহিলা-সন্তান ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বন্ধুদের বৃদ্ধি, কাঠের কপাল, হাঁড়ের মাটির চোখে জল, ভুলুর ভুল, মূর্গা চাচা, বন্ধুদের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাড়ুর গল্প, ইঁদুরের কীটকাহিনী, বাদরেরা মেটলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হট্টমালার বজ্রবাদী, হোহোহো বৃষ্টি বয়ে, পালোয়ান প্যালায়াম, উলটো ঘাড়ের দেশে, আজব দেশ, বীকা ভায়ের ব্যায়াম, হাবাবুর মনের কথা, আদি কালের বন্ধি বড়ি।

অসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুর্য রায় কর্তৃক
সুচিত্রিত।

উপহার দিবার মত বই।

হরেন্দ্র-চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুয়া

২০০

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত পূর্বা—পাঠ্যব্রহ্ম

লালা লাজপৎ রায়ে

জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ঘাত-

প্রতিঘাতময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্য পর্যন্ত আমূল
ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—
লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক
সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপরিচিত
হইয়া থাকে হইতে চান ত লক্ষ্য লাল
লাজপৎ রায়ে জীবনী পাঠে উদ্দীপিত
হউন—স্বদেশমঙ্গলক্ষেত্রে আত্মত্যাগের
আদর্শ দেখিয়া সম্বোধিত হইবেন।

মূল্য—১০ আনা

মুদ্রিত

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
টিউটন জাতির কথা ও কাহিনী	নরেন ভট্টাচার্য	১৫৬৯
ঘর উপবন (গল্প)	সুভাষ সমাজদার	১৫৭৩
সবার অলঙ্কার	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৫৭৭
কবিতার বিশ্বাস (কবিতা)	কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী	১৫৮৩
ধলভূমে (কবিতা)	অরবিন্দ ভট্টাচার্য	১৫৮৩
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	১৫৮৪
ব্রহ্মজগৎ	...	১৫৮৭
ব্রহ্মমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৫৯৩
পাঠকমন	...	১৫৯৬
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৫৯৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুন্দর আলোক। শাসক সম্বাদায়ের দ্বারা নির্ধ্যাত ও বাস্তব মুকুন্দরাম গ্রন্থ ও বেনারসিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির মুখে কি করিয়া সর্বজনকে হৃৎ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বসুমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। অবিহৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (বাঁধি বস্তুমত লিখিত), ৬। বিহৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

ঐ.মণিলাল বসুপাধ্যায়ের

মাণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খণ্ডি রচনা ২৩০ পৃঃ—৩

বস্তুমতের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অব্জলি বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংগগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

পৈবলিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

স্বপ্ন—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—
বীরকাশের মগনদে থাক, তাই সহায় হয়ে
বাঁজা হতে ইংরেজ নাম লোপ কববা—

বীরকাশ—পাণ্ডা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রভাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা।



৭০ বর্ষ : ২৫শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পঃ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত Price : 25 Paise
 বুধসপ্তমবার, ১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পত্রিকা Thursday, 25th Nov., 1965

শীতের অভিশাপ

শীত তাব আপন ধর্ম নিয়ে আসতে শুরু করেছে। জনাকীর্ণ কলকাতার ধীর পদক্ষেপে তাব আবির্ভাব এখনো পর্যন্ত অনুভব করা না গেলেও, উপকণ্ঠ বা গ্রামাঞ্চলে গেলে, মনে হয়, শীত এবার এসে পড়েছে। অবশ্য বৃক্ষসমূহ সম্পূর্ণরূপে এখনো নিশ্চল হয় নি। তবু তার আব দেরি নেই; তা না ঝিলেও চলে। শীত যখন সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে এসে পড়বে, তখন উচ্চশির ন্যাড়া গাছগুলির দিকে তাকালে আমাদের মনে অনুকম্পার সৃষ্টি হবেই।

এই ন্যাড়া গাছগুলির দিকে তাকিয়ে প্রকোপ শীতের মধ্যে আমরাও হয়তো এবার আমাদের নিজের প্রতি তাকাবার একটা সুযোগ পাবো। কিন্তু গাছগুলির সুবিধা এই যে, তাবা আবার পশুপক্ষের মঞ্জরিত হয়ে উঠবে, কোকিলগুলিও হৃদয়বিদারী চিৎকার শুরু করবে, হাব শীতাবসরনে আমাদের সেই এক দশা!

শীতকালটাকে আমরা এতোকাল বরণ করেই নিষেছি। অন্তত এই সময়েই নানা-রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হয় কম, আমাদের পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে তবিত্তরকারী বাজার থাকে সম্ভাব্য আবে চালের জন্যে হা-হেনো হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। শুধু কি তাই? শীতটাকে রুখবার জন্যে আমরাও যেন প্রস্তুত থাকি। যেসব খাদ্য এসময় আমাদের কপালে জ্বটে, তার দ্বারা শীতটাকে বেপরোয়া হয়ে কাটিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার বলে এতোকাল মনে হয় নি।

হায়, এবাব শীতকে আমরা কোন শক্তি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। চাল আটার কথা আর নাই বা ভুললাম। স্বয়ং সরকার তার ভার নিচ্ছেন,

সুতরাং আধপেটা হলেও একটা কলকিনারা হবে। মাছ তা আমরা আপাতত বর্জন করতেই বসেছি। যে দেশে বেগুনের কিলো টকা দরে বিক্রয় হয়, সেখানে লোকহাসাতে মাসে বা ডিসের কথা নাই বা বললাম।

খাদ্যের অভাব বদলাতে বদলাতে আমরা আমিষ থেকে নিরামিষ, নিরামিষ থেকে অর্ধ-উলবাসে এসে পৌঁছেছি। এরপর কাঁচকলা নেশা আর আলু, সেম্ব, চমৎকার আইটেম। একেবারে নিভেজল স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্য। অবশ্য সম্রাটচকরা ছাড়বার পার নন। আবার উঁরা যদি বৈজ্ঞানিক হন, তা হলে তত্ত্বের কথা ভুলে সব গম্ভগোল পাকিবে ফেলেন। সেই কারণে আলুর মধ্যে যে পরিমাণ জল থাকার কথা তাঁরা বলুন না কেন, সেটা যে পুষ্টিকর নে বিষের আমাদের সম্মেহ নেই। তাই বলে বেশি পরিমাণ আলু সেম্ব খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না তাতে কি খরচ কম? এ যে দেখছি, ঢাকীর দ্বারে মনসা বিক্রি। আব কলাসেদ্ধ? — তার ফলাফলটা উহাই থাকলো।

তবু সবাই যে অবস্থা মেনে নিতে রাজী, ত্রুতে দু-একজনের সুবিধা-অসুবিধার কথা তেবে বাজে কথা বলার কোনো মানেই হয় না। যা জুটবে তাই হাত পেতে নিতে হবে, এই নীতিতে আমরাও বিশ্বাস কবি। ক্ষীর, গোলাও বা সন্দেশ খাবার মতো আমাদের অর্থের প্রাচুর্য নেই, তাই সেদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও অর্থহীন। বড় জের কলাটা, মুলোটা, বেগুনটা এবং শীতকালে পচুর প্রাপ্য ফলকর্প বা বামাকপি—তাতেই সই। কিন্তু কাব গায়েই বা হাত দেব? স্বয়ং কাঁচকলার সম্মান আজ যখন কাগজে কাগজে ঘোষিত হচ্ছে, তখন ভুইফোড় মুলোটাই ব. সে সুযোগ ছাড়বে কেন? তাই ভাল

বুঝে কি দায় হাকার দেখুন। আহা! সেই সম্মানের কিছুটা স্বাদ মানুষও পেত!

এরা সম্মান পাক বা না পাক, এরা জানে রাশের দুঃস্বপ্ন দিনে এরা, সুখের দিন কি তা না জানলেও। সুখের আশাও এদের খুব বেশি নয়। এরাই এদের ছেলেকে রপক্ষের পাঠায় দেশের মর্যাদা রাখতে, ডিফেন্স ফান্ডে সাহায্যতীত দেয় চাঁদা, স্বাধীনতা অর্জনেও এদের দান কম নয়। এবাই আবার সামান্য সুখে অসামান্য হুশি। ভরপেটে এদের আনন্দের সীমা থাকে না, আধপেটা হলেও ক্ষতি নেই। নিজেদের কথাও এরা ভাবে না। শুধু কাঁচাকাচাদের মুখে দুঃমতো ভুলে দেবার সময় এদের যা কিছু ভাবনা। এই ভাবী নাপবিকদের নিয়ে কম ভাবনা তা আমাদের রাষ্ট্রনায়কদেরও নয়।

শীতের মরশুমি ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা, বই কেনাকাটার দায়, আরো কত কি! তাবপর্য পৌষমাস এলেই লক্ষ্যমাস! না লক্ষ্যমাস নয়, বরং সবনাশই বলুন। বনভোজনের পালাটা যে তখনই শুরু হয়। ছেলে থেকে বড়ো পর্যন্ত—এ সপ্ত যে সবাই। কিন্তু কোথায় চাল, ডাল, ঘৃত, তবিত্তরকারী। অবশ্য বনভোজন যখন বনে সম্পন্ন হয়, তখন সেখানে অনেক কিছুই মিলতে পারে। তাই বাঁরা বনভোজনে কোনকালে উদ্যোগী হন নি তাঁরাও আজ তারমুখে বনভোজনের কীর্তি শুরু করবেন। তাতেই বা আব দোষ কি!

সম্পাদিকা

জাতির মাতৃ

আমাদের সামান্য ফিলিপাইন সুবহং না হলেও ঐক্য-চেতনা আর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহেব আবহাওয়া থেকে কখনোই এদেশ আড়ালে নয়। উদ্ভাস জাতীয়তাবোধ ও গতানুগতিক স্নোতধারা গ্যা ভাসিয়ে না দিবে স্বাধীনচেতা উজ্জ্বল আলোব সুরগিতে হেঁটে যেতেই অভ্যস্ত এদেশের প্রতিটি মানুষ। নিত্য-নতুনদের প্রবণতাই শাসনক্ষমতাকে দৃঢ় ও সাধারণ জীবনের অনুকূল পথকে আরো প্রশস্ত করে দিয়েছে। জীবনপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিটি জনতাব এই রাজনৈতিক চেতনা ফিলিপাইনেব কোনো একক ব্যক্তিকে দীর্ঘ-স্থায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী হতে দেয় নি। জনতার এই প্রথব রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ উল্লেখ্য। যা কিছু মঙ্গলজনক স্বাধীনতার মানুষ তা ধৈর্য-বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে অনায়াসে নির্মিত করেছেন। ফলে চাপা ও বিবেকের দুই রূপ নেওয়ার আগেই বিলীন হয়ে গিয়েছে।

মাত্র উনিশ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে ফিলিপাইন একক ব্যক্তির কাকেশী ক্ষমতাকে ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্রতা প্রাচ্যচাঞ্চল্যে এর পরিচয় দিয়েছে। চার বছর আগের প্রেসিডেন্ট ও লিবারেল দলের প্রিভায়সডাডো ম্যাকাপাগলের পরাজয় ও ফারডিনান্ড মারকোস-এর সুবিপুল ভোটে জয়লাভ ফিলিপাইন স্বাধীনতার রাজনৈতিক চেতনার প্রথমতাকেই আজ প্রমাণ করে দিলো। রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন জীবন ও আদর্শ সমাজ শাসনের অনুকূলে থাকা উচিত। দীর্ঘ চার বছরের ক্ষমতায় আসীন প্রেসিডেন্টের পরাজয়ই তার প্রমাণ। এবং তা নিঃসন্দেহে পরাজিত চব্বি রাজনৈতিক শিক্ষা।

ফিলিপাইন নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে বাজ নৈতিক রংগমণ্ডে এক আকস্মিক পবিবর্তন ঘটে গেলো। নির্বাচনের মহাভাষ সরকারী ঘোষণায় একগ্রন্থন হতাহত হয়েছে। সম্ভবত ফিলিপাইনের লোকদের পক্ষেই একই সময়ে এমন ব্যাপক রক্তপাতের পবিত্রপন সম্ভব। যে পরিকল্পনাব পশ্চাতে ছিলো দুজন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার দায়, এ এক আশ্চর্য বিপরীত মনোভাব।

ফিলিপাইনেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুইজনের মানুষ হলেন ফিটার প্রেসিডেন্ট মারকোস। পবিত্র প্রতিকৃতি মিঃ ডায়োসডাডো ম্যাকাপাগলের মত ইনিও কম্যুনিষ্ট বিশ্ববী ও মার্কিনী সমর্থক। জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭-র। তীক্ষ্ণ রাজ-

নৈতিক চেতনায় উদ্ভীষ্ট দৃঢ় মনোবলের মানুষ হলেন মিঃ মারকোস। তাঁর চরিত্রের একদিকে তেজোদীপ্ত ভাব সাংগঠনিক চিন্তা ও চেতনা ও অপরদিকে জনজীবনের সামনে নিতীক-নির্লিপ্ত কঠোর উদ্যম আহ্বানের সম্ভব ঘটছে। রাজনৈতিক বুদ্ধির চাতুরী তাঁর জীবনকে ক্লাইমেক্স-এ তুলে ধরেছে।

জীবনের বর্তমান ভোরের আলোয় তাই তাঁর চোখে স্বপ্ন ছিলো আইনিবদ হওয়া-সেই মানুষই বিশ্বতীয় মহাবুদ্ধির পাণ্ডুর দিনগুলিতে নিজেকে গোপন করে রাখতে পারলেন না। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়েব গভীরে যে একটি তীক্ষ্ণতাই সোচ্চার কণ্ঠ আত্ম-গোপন করছিলো, তা প্রকৃত সময়ে ছিটকে



ফারডিনান্ড মারকোস

বেরিয়ে এলো। তাঁকে দেখা গেল সৈন্য-বিভাগেব উপদেষ্টা অফিসার হিসেবে। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হত্য বন্দী হয়েছিলেন সৈন্য মারকোস। কিন্তু এই বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি গ্যা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গোরলা দল গঠন করলেন। জাপানের আত্মনামপণের সময় তাঁকে পাওয়া গেল 'সিভিল এ্যাক্শন অফিসার' ও মার্কিন ফৌজের স্ত্রী এড-ভোকেট জেনারেল' হিসেবে।

যুদ্ধের দামামা শেষ হতেই, শব্দ হোলো বেসামরিক জীবনযাপনের কাল। প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল, এ, রকাস তাঁকে নিলেন তাঁর সহকারী টেকনিক্যাল হিসেবে। এর

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রবেশ ঘটলো House of Representatives-এ। ১৯৫৫ সালে মারকোস লিবারেল পার্টি'র ভাইস চেয়ারম্যান হলেন। সে দলে তখন ছিলেন মিঃ ম্যাকাপাগল। তারপর জাতীয়তাবাদী-মূল মারকোস 'মিকাবেল পার্টি'র ভাইস চেয়ারম্যান হলেন।

১৯৬১ সালে মিঃ ম্যাকাপাগল নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। ফিলিপাইনেব মানুষকে তথাকথিত রাজনৈতিক নোংরামীর থেকে দূরে রাখবার আশা দিয়েছিলেন তিনি।

মারকোস ও ম্যাকাপাগলের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফিলিপাইন স্বাধীনতা উৎসবের রঙে রঙিন মনে হয়। আত্মসমর্থনের নানা প্রচেষ্টায় নিজের জীবনব্যবস্থার পোড়ার বিলির বন্যা বয়ে গিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারকোস প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ৬০০,০০০ ভোটে হারিয়ে জয়লাভ করলেন।

এখন ফিলিপাইনের জনতা নির্বাচনে একদেবে জয়লাভের কাণ্ড খুঁজতে যাচ্ছেন। মারকোসের মধ্যে উত্তর তৈরিই ছিলো। ম্যাকাপাগল তাঁর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক নোংরামী দূর করতে পারেন নি, বরং দেশের মধ্যে দুঃশীলতা চরমে পৌঁছেছে। এর আগে একথা চিন্তা করে নি সে ম্যাকাপাগল নিজে কোন নোংরামীর সঙ্গে জড়িত-তবে মারকোসের বাণী যেন আজ সেইভাবেই জাগিয়ে তুলেছে।

নির্বাচন পরিচালনার মারকোসের যে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি রয়েছে একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। আপন ব্যক্তি-চরিত্রের উজ্জ্বল আলোয় স্বাধীনতার প্রতিটি জনতাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পেরেছেন মারকোস। বরণীর প্রশান্ত অবস্থার পত্নী হাসিমাখা মধু ছিটিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোট জুড়িয়েছেন নিজের ব্যপ্তে। প্রসঙ্গত স্বরণীয়, পত্নীই সেলদা ১৯৫৪-র মিস ম্যানিলা। মারকোস সত্যিবা দলের প্রেষ্ঠ নামক, বর্কসিং-কৃষ্ণিতে কম খান না, ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র মারকোসের রাইফেল চালনার রয়েছে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়।

১৯৬২ সালে তাঁর পিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বুলেটের ঘায়ে ধরাশায়ী করে কৃতিত্বের প্রকাশ দেখিয়ে আইনেব দুরারে অভিব্যক্তিও হয়ে-ছিলেন তিনি। শেষে পেলেন মৃত্যু, আর ফিলিপাইন ইতিহাসে পেলেন সর্বোচ্চ মার্ক। সুপ্রীম কোর্টে প্রস্নেব জবাবে অভিযোগকারী সাক্ষীকে করলেন। কক্ষচ্যুত। একে একে পথের বাঘা সরিয়ে মৃত্যু পেলেন তিনি। নৈতিক নোংরামী দূর করতে পারে নি, নিতীক সোচ্চার কণ্ঠ ও চতুর রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রদীপ্তিতে ফিলিপাইনের জনগণের পেলেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সুবিপুল সংখ্যক ভোটে দীর্ঘ চার বছরের প্রেসিডেন্টকে পবিত্র করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এগিয়ে এলেন একগাল হাসিভরা মুখে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হুমায়ূন মিত্র

‘রিয়ালিজম’ আর ‘ন্যাচারালিজম’—এই দুটি শব্দ নিয়ে এ-প্রসঙ্গেও ভাবনা উঠতে পারে। এর আগে, অন্য প্রসঙ্গে এই একই ভাবনা ভাবা গেছে। আমাদের এই শতকের প্রথম দিকে বিশ্ব-সাহিত্যের বড়ো বড়ো লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্য-উনিশ শতকের রুরোপীয় সাহিত্যের বাস্তবতার আদর্শই অনুসরণ করেছেন। ফ্লোরেন্স, টলস্টয়, ইবসেন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই বিশ শতকে প্রবেশ করেছে সেই বাস্তব-তার ধারা। টমাস ম্যানও এঁদেরই একজন। বাংলায় যে-বছর বঙ্কিম-চন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ প্রথম বই হয়ে বেরোল, টমাস ম্যান জন্মগ্রহণ করেন সেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বয়সে শরৎ-চন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক তিনি। অথচ, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কতোই না প্রভেদ। মধ্য-উনিশ শতকী বাস্তবতার আস্থা রেখেই ম্যান তাঁর স্বকীয়তার পরিণত লক্ষণগুলিতে গিয়ে পৌঁছেন। জীবন-মৃত্যুর চিন্তা অবশ্য সাহিত্যিকদেরই চিন্তা, তবু এই সাধারণ লক্ষণ মেনে নিয়েও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদের দিকটিও ধর্তব্য। ধর্মতত্ত্ব, দর্শনের তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে টমাস ম্যানের ঘেরকম আগ্রহ, শরৎচন্দ্রের সেরকম নয়। শরৎচন্দ্র মোটা-মুটি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা আর সমবেদনাবোধের ওপরেই নির্ভর করে-ছিলেন। কিছুদিন রাজনীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের ঘরোয়া পল্লী-জীবনের নিখুঁত ছবি রেখে গেছেন। মানবানুগ তাঁর খুবই ছিল। কিন্তু টমাস ম্যান বা আইভ্যান বুনিন (জন্ম ১৮৭০) বা সমারসেট মম (জন্ম ১৮৭৪) প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের সম-সাময়িকদের পৃথিবী আরো বিস্তীর্ণ। তাঁরা যে অর্থে পৃথিবীর বড়ো বড়ো ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন, আমাদের স্বদেশবাসী লেখকদের হয়তো সেরকম সুযোগ ছিল না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৃষ্টির খেলা, মননের জটিলতা ইত্যাদি ব্যাপার সাধারণভাবে দেশের ভেতরে যতোটা দেখা গেছে, দেশের বাইরে বোধহয়, সে ভুলনায় অনেক বেশি ঘটেছে বললে কথটা ভুল বৃথবেন না কেউ। আমাদের মনোযোগ খুবই নিকট ক্ষেত্রে। আমা-

দের এলাকাটাই ছোটো। সেই ছোটো এলাকার ঘর-সংসার দেখতে দেখতেই শরৎচন্দ্রের জীবন কেটে গেছে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর পরে এসেছেন যারা, তাঁরা বিদেশের সাহিত্য থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন বটে, তবু তাঁদেরও পৃথিবীর পরিসর খুব যে বেড়ে গিয়েছিল, তা নয়। বৃন্দাবন, অচিন্ত্য-কুমার, প্রেমেন্দ্র, শৈলজ্ঞানন্দ, বিভূতি-ভূষণ, মনোজ বসু বা সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মানিকবাবু বা তারাশঙ্কর—অথবা এঁদেরই কাছাকাছি সময়ের লেখক যারা, তাঁদের গল্প-উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের ভুলনায় সত্যিই বৃহত্তর পৃথিবীর পরিচয় আছে কি না, সে কথা হঠাৎ বলা সম্ভব নয়। হয়তো আছে, হয়তো নেই।

না থাকাটা অভিযোগের কথা নয়। আমাদের লেখকরা আমাদেরই দেশের গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। সে-সব রচনায় দেশের সঙ্গে বৃহৎ জগতের সংযোগ বাড়লো কি বাড়লো না, সেটাই শুধু চিন্তনীয়। ম্যান যেমন গোটে, নীটশে, ম্যুরেড, ইয়ং ইত্যাদি নানা মনীষীর বিভিন্ন সম্মানের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, আমাদের লেখকদের মনন সে-ভুলনায় বী রকম, সেটাই কৌতূহলের বিষয়। অম্বদাশঙ্কর বা দিলীপকুমার হয়তো অপেক্ষাকৃত সেই ধরনের মেজাজ নিয়েই দেখা দিয়েছিলেন। অম্বদাশঙ্কর তো বটেই। কিন্তু তার পর?

তারপর, আমাদের শতাব্দীর মধ্য-পর্বে পৌঁছে কবিতার মতন গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রাচুর্যটাই সর্বাধিক চোখে পড়ছে। রিয়ালিজম এদেশেও নাচারালিজমের দিকে ঝুঁকছে। মনস্তত্ত্বের দিকে ঝুঁকি বেড়েছে। আবার, কাছের জগৎ থেকে দূরে সরে থাকার খেয়াল দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক উপ-ন্যাসের নতুন মরশুমের আবির্ভাবে। দেশের সাহিত্যিক মন যে এখন নতুন সম্ভাবনার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সমাজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেই বদলের দৌড় যে কী পরিমাণ,—তামরা ঠিক কোন্ বিন্দুতে পৌঁছে যে আত্মস্থতা ফিরে পাবো, সেটা নির্ভর করবে দেশের সম্ভাবনায় এবং লেখক-দের ব্যক্তিগত সামর্থ্যে ওপর। সময়ের ধরা কোন্ দিকে বইবে, সে কি ঠিক

বলা যায়? আমরা শুধু নিজেদের বর্তমানের কথাই কতকটা বলতে পারি। সেই বর্তমান বড়ো চাঞ্চল্যময়। চাঞ্চল্য আছে, কিন্তু উদ্দীপনা? সহজ স্বাধা কোথায়?

এইসব জিজ্ঞাসা আর সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটছে। পথ আলোকিত, তবু অন্ধকার। মন খুঁশি হতে চায়, কিন্তু খুঁশি হবার উপকরণ কোথায়? প্রেমের অভাব নেই, কিন্তু অদৃষ্টই বিরূপ বোধ হয়। ভয়, প্রেম, বিস্ময় নেই জীবনে। অথবা, এ সবই আছে, কিন্তু এদের ধার ভেঁতা হয়ে গেছে।

জীবনের ধার ভেঁতা হয়ে যাবার দুর্দিন যখন আসে, তখনো সাহিত্যিক মন একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় না। বঙ্কিম-চন্দ্র যেসব নিষেধ শুনিয়ে গেছেন, সাহিত্যিকরা সকলেই কি সে-সব নিষেধ মেনে চলেন? বঙ্কিম বলেছিলেন, ‘যশের জন্য লিখবেন না’,—বলেছিলেন, ‘টাকার জন্য লিখবেন না’। অর্থাৎ? অর্থাৎ, তিনি সত্যিকার প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সাহিত্য যে-সংসারে জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে সে নিষেধ কি সহজে মানা যায়? ফ্রান্সে এডমন্ড, আর জুলে—এই গৌরুর প্রত্নযুগল যা করেছিলেন, সে কি কোনো মহতী প্রেরণার কাজ? অথচ তাঁদের রোজনামচারও দাম স্বীকার্য। আহরণের শ্রমও স্বীকার্য। সেকালের ভিন্ন দেশের সেই প্রেমের সঙ্গে আমাদের দেশে একালে যারা অনুরূপ কাজে নেমেছেন, তাঁদের পরিশ্রমও শ্রম্যার সঙ্গে স্মরণীয়। তবে কেবলমাত্র তথ্য আহরণ অথবা কেবলমাত্র আঙ্গিক-অনুকরণ দিয়ে আমরা কোনো বড়ো প্রাপ্তিতে পৌঁছে যাবো, এ-ধাবণা গ্রাহ্য নয়। গৌরব-প্রত্নযুগল যা পারেন নি, মোপাসাঁ তাই পেরেছিলেন। সে-সব আমি ইতিপূর্বে লিখেছি। এখানে আর পুনরাবৃত্তি নিঃপ্রয়োজন।

মন আমাদের ভ্রমণসুত্থের পিয়াসী। সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর যদি একই সমস্যাজালে আর একই অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহলে পাঠকের মনও কিমিয়ে পড়ে। শুধুই বাইরের দৃশ্য-বদল নয়,—মনে মনে চাই মনেরই দৃশ্য-পরিবর্তন। ভয় হোক, ভালোবাসা হোক, যাতে বা যে-উপারেই হোক, জীবন যে পরম আগ্রহের পদার্থ, সেই

সত্যটাই সাহিত্যে ব্যক্ত হোক—এইটুকুই কামনা। অতৃপ্ত সমাজের অতৃপ্ত ও বিস্ময়জনক হোক না। চুটি-বিচ্ছিন্ন-স্থল-পতন থেকে চমৎকার প্রহসন অথবা গভীর ট্রাজেডি দেখা দিক না। ভূতের গল্প কই? ভালো গোয়েন্দা-কাহিনী কই?

এইসব চিন্তার মধ্যেই কখন যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' খুলেছিলুম।

অনেকবার পড়া বর্ণনাই আবার পড়লুম—

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর; এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অশ্বকারে

হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ-আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশার প্রেতাস্থার নৃত্য দেখিতে আর্মানিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্ত-রণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশে সংখ্যাতীত গ্রহ-তারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই; নিজের বৃকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই।

করেকছয় পেরিয়ে গিয়ে পড়লুম—

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচর ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি আমার সাহস কত।

এই দৃষ্টি অংশে, 'সাহিত্য-ভাবনার এই বিশেষ অবস্থায় আমি বিশেষ দৃষ্টি অনুভূতির স্বাদ পেলাম। যুক্তি-তর্ক-চিন্তা-বিচিন্তা নয়,—প্রথম অংশে শুধু বিশুদ্ধ এক ভ্রমণেরই স্বাদ! শিমুলের ডালে ডালে কালো কালো বৃক্ষের মতো শকুন, অশ্বকারে শকুন-শিশুর কান্না, মহামাশানে অজস্র নরকপাল—এইসব উপকরণযোগে প্রস্তুত আশ্চর্য একটি দৃশ্য দেখে মন ভুস্ত হোলো। এইটুকুই যথেষ্ট। এ বর্ণনা পড়তে পড়তে মনের ভেতরে হঠকারী কোনো পক্ষই মাথা উঠিয়ে বলে না—আহা, সমস্যা কোথায়? এই স্বরং-সম্পূর্ণতা মানতেই হয়। মিতীয়াত যদিও শরৎচন্দ্র কেবল-মাত্র তাঁর পিয়ারীর সঙ্গে শ্রীকান্তের আলাপ-আলোচনাতে দৃষ্টিনিবন্ধ রেখেই ঐ মিতীয় অংশটি লিখেছিলেন বলে মানতে হবে, তবু কিঞ্চিৎ তির্যকভাবে ধরলে ওটিকে সাহিত্যিকের প্রতি পরামর্শ বলেও মানা যেতে পারে। ব্যাখ্যার এই স্বাধীনতার জন্যে মার্জনা চাই। কিন্তু আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—‘আমার সাহস কত’—বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে প্রস্তুত আমাদের বাংলা সাহিত্যের কোনো কোনো নিদর্শন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য মনে পড়া কি অসংগত?



স্বাক্ষর করে দাঁত আর সুন্দর হাসি

সাদনা দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেখা গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ.আম্বুর্বেদ্যাস্ত্রী, এফ.সি.এস.এল(গন),
এম.সি.এস(আমেট্রিক) ডাঙ্গলপুর কলেজের হোমায়নমাস্ট্রর
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডা. নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস(কলি) আম্বুর্বেদ্যাস্ত্রী

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

ব্রিটিশ সরকারের হুমকী ও বিশ্বজনমতকে অগ্রাহ্য করে আইয়ান স্মিথ ও তার স্বেতাক সহকর্মীরা দক্ষিণ রোডেশিয়ার একতরফা স্বাধীনতা (ইউ-ডি-আই) ঘোষণার পর পক্ষ-কাল অভিজ্ঞতায় হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আইয়ান স্মিথদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বুটেন আইয়ান স্মিথ সরকারকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতা ঘোষণা অবৈধ এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া এখনও ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন আছে, এই বুটেনের বক্তব্য। স্মিথ নন, গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবস্‌ই হলেন একমাত্র আইনসম্মত শাসনকর্তা। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদও স্মিথ সরকারকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছে। চার্লিস লক্ষ আফ্রিকায়কে বাদ দিয়ে দুই লক্ষ স্বেতাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা বিশ্ববাসী সমর্থন করে নি। প্রায় সব দেশই জানিয়ে দিয়েছে, তারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার নতুন সরকারকে স্বীকার করবে না।

স্মিথ যাতে কর্তৃত্ব করতে না পারেন, বুটেনের শাসন যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্য এ পর্যন্ত বুটেন কি করেছে? নিয়ম-তান্ত্রিক পথে বুটেন করেছে কী কাজ অবশ্য করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জরুরী ক্ষমতার আইন পাশ হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে প্রধান-মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন প্রয়োজনমত দক্ষিণ রোডেশিয়ার যে-কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। উইলসন নির্দেশ দিয়েছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার সকল সরকারী কর্মচারীকে গভর্নরের নির্দেশ মানতে হবে, স্মিথের আদেশ পালন করা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হবে। তিনি আরও বলেছেন, গভর্নরের কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য ব্রিটিশ সরকার সাহায্য করবে।

গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবস্‌ কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। তিনি স্মিথকে প্রধানমন্ত্রীরূপে স্বীকার করছেন না। স্মিথের নির্দেশমত তিনি গভর্নর-ভবন ত্যাগ করে যান নি। স্মিথের আদেশে গভর্নর-ভবনের টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, অন্যভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে, ভবু গিবস্‌ তাঁর সিংহাসনে অটল রয়েছেন—তিনি স্মিথকে স্বীকার করবেন না, রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরূপে তিনিই দক্ষিণ রোডেশিয়ার শাসন চালাবেন। স্মিথ গিবস্‌কে অগ্রাহ্য করে তাঁর জায়গায় তাঁর নিজের পছন্দমত নতুন গভর্নর নিয়োগ করেছেন।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার আদালতও স্মিথ সরকারকে স্বীকার করে নি। প্রধান বিচারপতি স্যার হার্গি বিল্ডল্‌ ও অন্যান্য বিচারপতিরা স্মিথের নতুন শাসন মেনে নিয়ে নতুন সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছেন। তারা জানিয়েছেন,



হামফ্রে গিবস্‌। পেছনে তাঁর স্ত্রী সলিসবেরী

এখনও তারা ১৯৬১ সালের সংবিধান ও ব্রিটিশ কর্তৃত্ব মানেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। শাসনতান্ত্রিক করেছে কী ব্যবস্থার সাহায্যে স্মিথকে জন্ম করা বাবে না। আরও নি। স্মিথরা বহাল ভবিষ্যতে তাঁদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বেতাকরাই প্রধান প্রধান সরকারী পদে রয়েছে, পুর্লিশ-বিভাগেও তারাই। তারা স্মিথ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। সুতরাং গিবস্‌-স্মিথ ঘন্থে সাধারণ অবস্থায় স্মিথই জয়লাভ করবেন। এখন পর্যন্ত স্মিথের আদেশমতই সব হচ্ছে। গিবস্‌ প্রায় নিজগৃহে বন্দীর মত।

বুটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি উইলসন আরও ঘোষণা করেছেন, কমন-ওয়েলথের সঙ্গে দক্ষিণ রোডেশিয়া কোনরকম ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না। কিন্তু এতেও দক্ষিণ রোডেশিয়া ভীত নরা। এ বছরের তামাক তাদের বিক্রি হয়ে গেছে, পরের বছরের কথা পরে ভাবলেও চলবে।

যদি সত্যি স্মিথকে শাসন করাতে হয়, দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহ দমন করে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখতে হয়, তবে বুটেনকে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বুটেন তা কিছুতেই করবে না। এ অনেকটা মারব, কিন্তু আঘাত লাগবে না' এই নীতি গ্রহণ করার মত হয়েছে। বুটেন স্মিথ সরকারকে স্বীকার করবে না, কিন্তু এই অবৈধ সরকার উচ্ছেদ করার জন্য বা করার দরকার তাও করবে না। রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্ট্রাট আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতিনিধিদের জোরালো বক্তব্যের

পরেও বলেছেন, বুটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বলপ্রয়োগ করবে না।

বুটেন যদি বলপ্রয়োগ না করে, রাষ্ট্রসংঘ যদি দক্ষিণ রোডেশিয়ার বেআইনী শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে, তবে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বরকটের জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানিয়ে ও বুটেনকে অধিলম্বে ভেল চালান বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২০শে নভেম্বর যে প্রস্তাব করেছে, তা নেহাৎই অপোষ-প্রস্তাব, এর ম্বারা কাজের কাজ কিছু হবে না। আফ্রিকা একা সংস্থার নেতৃত্বে আফ্রিকার জনসমাজ আজ দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বেতাক প্রভুত্বের অবসানের সংকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই নাহোরোবি ও দার এস সালামে আফ্রিকার নেতাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে। নাইরোবিতে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াটা ছাড়াও ওগা-জানিয়ার রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নিয়েরে, উগা-তারা প্রধানমন্ত্রী মিলটন ওবোটে, জাম্বিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী যেবেন কামাঙ্গা মুলুম্বার কীট অনেককণ আলোচনা করেন। তথাকথিত মহলের ধারণা, দক্ষিণ রোডেশিয়ার যে স্বাধীন জিম্বাবোয়ে গণসরকার প্রতিনিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন। প্রয়োজন হলে তারা বিদ্রোহীদের অন্ত-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি সরাসরি সৈন্য প্রেরণের কথাও ভাবছে।

উইলসন অবশ্য আফ্রিকার রাজনৈতানের
দাবধান করে বলেছেন; বাইরে থেকে কোন
রকম 'আত্মশুদ্ধি' চেষ্টা হলে বটেনতা বরদা-
করবে না। অর্থাৎ এটা বটেনের নিজের
ব্যাপার; যা করার সে নিজে করবে। কিন্তু
আফ্রিকার জনসাধারণ যদি বটেনের প্রতি
আস্থা না রাখতে পারে, তারা নিজেরাই যদি
দক্ষিণ রোডেশিয়ার চঞ্জিশ লক্ষ আফ্রিকায়ের
মুক্তির জন্য এগিয়ে আসে? তখন, একদিকে
বটেন আর দক্ষিণ রোডেশিয়ার শেতাসরা আর
একদিকে দক্ষিণ রোডেশিয়া তথা সমগ্র
আফ্রিকার কৃষ্ণকার মানুষ, এই সংগ্রামের
সম্ভাব্যতার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়
না।

ফিলিপাইনস :

গত সপ্তাহে ফিলিপাইনসের নির্বাচন শেষ
হয়েছে। এক বছর ধরে যে উত্তেজনাগর্ভ
বায়বহুল নির্বাচনী প্রচার-অভিযান চলাছিল,
তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদ, সেনেটের
প্রাতিটি আসন ও আইনসভার নিম্নকক্ষ প্রতি-
'নির্বাচনের সমগ্র নির্বাচন একই সঙ্গে হল।
কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
লিবারেল পার্টির প্রার্থী বর্তমান রাষ্ট্রপতি,
জিওসডরজা ম্যাকাপাগল ও ন্যাশনালিস্ট
পার্টির প্রার্থী সেনেটের বর্তমান সভাপতি
কার্দিনাল মারকোসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদের
দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ম্যাকাপাগলকে
প্রায়শে মারকোস বিজয়ী হয়েছেন। অনেকেরই

ধারণা ছিল, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁর
প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কিন্তু দেখা গেল মারকোস
বিপুল ভোটাধিকার জিতেছেন। ম্যাকাপাগলের
চেয়ে মারকোস প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ভোট
বেশ পেয়েছেন — মোট আশি লাখ লোক
ভোট দিয়েছে।

মারকোসের এত বেশি ভোট পাবার কারণ
কি? দু'জন প্রার্থীর মধ্যে রাজনৈতিক
মতবাদের দিক দিয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য
নেই — প্রধান প্রধান নীতির প্রশ্নে উভয়ের
মধ্যে কোন বড় রকমের তফাৎ নেই। গত
বৎসর পর্যন্ত মারকোস লিবারেল পার্টির সঙ্গে
ছিলেন। ম্যাকাপাগল রাষ্ট্রপতি পদের জন্য
আবার দাঁড়াবেন, এই কথা বুঝেই তিনি দল
পরিবর্তন করেছেন এবং নতুন দলের মনো-
নয়নও লাভ করেছেন। দু'জনের মধ্যে কোন
রাজনৈতিক মতপার্থক্য না থাকার জন্য
নির্বাচনী যুদ্ধ পরস্পরের কুংসা রটনার
পর্যবসিত হয়েছে। দু'জনেই দু'জনকে প্রাণ-
ভরে গাল দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচার-অভিযানে
ম্যাকাপাগলের বিরুদ্ধে মারকোসের প্রধান
অভিযোগ ছিল : ম্যাকাপাগলের আমলে
শাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেড়েছে, চোরাই
চালানে দেশ ছেয়ে গেছে, আর বেকার-সমস্যা
তীব্র হয়েছে। মারকোসের বিরুদ্ধে ম্যাকা-
পাগল রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগ এনেছেন।
ভূময়ভূ সালে ফিলিপাইনসের এক রাজনৈতিক
হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মারকোস জড়িত হয়ে পড়ে-
ছিলেন, এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে
মামলাও হয়েছিল — অবশ্য তিনি মামলার



জনতার অভিনন্দনরত্ন মারকোস

বেকসুর খালাস পান। এই ঘটনা ফিলিপ-
ফীপসে ম্যাকাপাগল মারকোসের বিরুদ্ধে
লাগাবার চেষ্টা করেন। দু'জনে মিলে জন-
সভা, পোল্টার, ইস্তাহার, সফর, কর্মীদের
ব্যয় সব মিলিয়ে আশি লক্ষ ডলারেরও বেশি
খরচ করেছেন। ফিলিপাইনসের বর্তমান
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় এ এক অবিদ্যাম্য
পাগলামি। মারকোসের নির্বাচনী জয়ের মূলে
তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সুগায়িকা ইমেনদার অব-
দানও কম নয়। তিনি স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র
নির্বাচনী অভিযানে বেরিয়েছেন এবং ফিলি-
পিনো লোকসঙ্গীত গেয়ে সাধারণ মানুষের
মন জয় করেছেন।

মারকোসের বয়স বেশি নয় — মাত্র ৪৮।
বরাবর তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন। যখন তাঁর
বিরুদ্ধে যুনের মাথলা চলছে, তখন তিনি
আইনের পরীক্ষা দিয়ে রেকর্ড নম্বর পান।
বিতীর্ণ মহাযুদ্ধের জাপানী আক্রমণের সময়
দেশরক্ষার জন্য তিনি অপূর্ব বীরত্বের পরিচয়
দেন। জাপানীদের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল
গেরিলা যুদ্ধ চালান। যুদ্ধের শেষে তিনি
সকলের কাছ থেকে বীরের মর্যাদা লাভ করেন
ও অসংখ্য পদক ও সম্মানসূচক উপাধি পান।
রাজনীতিতে প্রবেশ করেও তিনি বিশেষ
সাফল্য লাভ করেন। তিনি কখনও নির্বাচনে
পরাজিত হন নি এবং বরাবর বিপুলসংখ্যক
ভোট পেয়েছেন।

ফিলিপাইনসের লোকেরা আজ পর্যন্ত
কখনও এক ব্যক্তিকে পর পর দু'বার রাষ্ট্রপতি



নির্বাচনে পরাজিত পর্তুগী ম্যাকাপাগল। স্ত্রী ঘর দূরে দিচ্ছেন।

পরে নির্বাচন করে নি। সৌকর্য থেকেও ম্যাকাপাগলের পরাজয়ে বিন্মিত হবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে ম্যাকাপাগল ঘোষণা করেছেন, তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন।

মারকোসের আমলে ফিলিপাইনসের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হবে না। মারকোস মার্কিন-ঘোষা দর্শিতাই অনুসরণ করে চলবেন। নির্বাচনের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর পরই মারকোস ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনামে ফিলিপাইনস সৈন্য প্রেরণ করতে রাজী আছে।

নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশনের সভাপতি জুয়ান বোরা বলেছেন, নির্বাচনের খাপারে ফিলিপিনেরা যে ক্রমেই দারিদ্রশীল হয়ে উঠছে তার প্রমাণ, এবার নির্বাচনী স্বল্প বেশি লোক মারা যায় নি। — মাত্র ৫২ জন মারা গেছে, অথচ গতবার ১৯৬১ সালের নির্বাচনে ২০০ জন মারা গিয়েছিল।

ক্যানাডা :

প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসনের আশা পূর্ণ হয় নি। গত সপ্তাহে ক্যানাডার সাধারণ নির্বাচনে পিয়ারসনের লিবারেল পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি।

উনত্রিশ মাস ধরে সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার চালাবার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে পিয়ারসন নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর পরামর্শমত গভর্নর-জেনারেল কমন্সসভা ভেঙে দেন ও নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

পিয়ারসন ভেবেছিলেন, এবারের নির্বাচনে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল দলের নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জন ডিফেনবেকারকে হারিয়ে তাঁকে চিরকালের মত রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণে বাধ্য করবেন। তা ছাড়া এও তাঁর আশা ছিল, এবার তাঁর দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে। ছোট ছোট দলের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে তাঁকে সরকার চালাতে হবে না। পিয়ারসনের এই ভরসার কারণও ছিল। তাঁর আমলে ক্যানাডার অর্থ-নৈতিক অবস্থার আশাতীত উন্নতি হয়েছে—বিশ্বে গম বিক্রি করে ক্যানাডীয়রা প্রচুর অর্থ পেয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক ভাল হয়েছে, কুইবেকের ফরাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা কমেছে—ইংরেজ-ফরাসী সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে এবং ক্যানাডার জন্য একটি স্বতন্ত্র পতাকার ব্যবস্থাও করতে পেরেছেন পিয়ারসন। তাই তিনি জয়লাভের আশা করেছিলেন।

কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল, কমন্সসভার ২৬৫টি আসন—একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য অন্তত আরও দু'টি আসন তাঁদের প্রয়োজন ছিল। বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ৯৭টি আসন।

এই অবস্থা হল কেন? রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, ক্যানাডার জনসাধারণ এই নির্বাচনে কোন উৎসাহ বোধ করেন নি। তাঁরা

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই নেতার ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পিয়ারসনের বয়স ৬৮, আর ডিফেনবেকারের ৭০। দুই বৃদ্ধেরই এবার অবসর গ্রহণ করা উচিত। চার-চারটি নির্বাচনে ক্যানাডীয়রা এঁদের দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছেছে। এখন তাঁরা এঁদের কাউকেই চয় না। ক্যানাডার রাজনীতিতে আজ নতুন নেতার প্রয়োজন হয়েছে।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পিয়ারসনই সরকার পরিচালনা করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগের মতই তিনি ছোট দলগুলির সাহায্যে পরিষদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করবেন। অবশ্য ডিফেনবেকার ঘোষণা করেছেন, জানুয়ারীতে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হলে তিনি পিয়ারসন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। কিন্তু ৯৭টি ভোটের জোরে



পিয়ারসন

ডিফেনবেকার পিয়ারসন মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারবেন বলে মনে হয়।

ক্যানাডার এবারের নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, নির্বাচনের ফল ঘোষণা শেষ হবার আগেই অর্থমন্ত্রী ওয়ালটার গর্ডন পদত্যাগ করেছেন। গর্ডন পিয়ারসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, লিবারেল পার্টির বিশিষ্ট নেতা ও দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি। গর্ডন বলেছেন, তিনিই প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন, জয়লাভের এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু দেখা গেল, তিনি ভুল পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভুল পরামর্শ দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

ওয়ালটার গর্ডনের এই পদত্যাগ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধারণার ঠিক থেকে এক

উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সব দেশেই কি মন্ত্রীর তাঁদের ভুল পরামর্শ দেবার জন্য স্বেচ্ছায় মন্ত্রীপদ ত্যাগ করতে রাজী হবে?

পাকিস্তান :

রাষ্ট্রপতি আগু বখা জানিয়েছেন, তিনি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের প্রস্তাবমত তাসখন্দে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।

আগু বখার এই সিদ্ধান্তে সবাই বিম্মিত হয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে যখন পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিল, যখন উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল গুলীবর্ষণ চলেছিল, তখন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব করেছিলেন। শান্তির আশায় কোসিগিন বলেছিলেন, তাঁদের আতিথেয়তায় দু'জনে মিলিত হয়ে আপোষে বিবাদ মিটিয়ে নি। ভারত সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৈন্য বিনাশর্তে এই আলোচনায় বসতে রাজী হয় নি।

আজ কিন্তু পাকিস্তান বিনাশর্তেই আলোচনায় বসতে রাজী আছে। হঠাৎ এই মত পরিবর্তনের কারণ কি? সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ভেবেছিল, সামরিক শক্তিতে সে ভারতকে হারিয়ে দেবে, তাই তখন আলোচনায় প্রস্তাব তার মনোপুত হয় নি। তারপর সে ভরসা করেছিল রাষ্ট্রসংঘের ওপর। সেখানেও এবার বিশেষ সন্নিবিধা হয় নি। তাই এখন অনুনোপায় হয়েছে পাকিস্তান এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। তা ছাড়া আর একটা মতলবও পাকিস্তানের আছে। পাকিস্তান জানে, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত নতিস্বীকার করবে না। তাসখন্দে গিয়ে ভারত যদি পাকিস্তানের কোন প্রস্তাবই না মানে, তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে পাকিস্তান এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, ভারত শান্তি ও আপোষের পথে চলতে চায় না—সোভিয়েট ইউনিয়নের ডাকেও সে সাড়া দেয় না।

পাকিস্তানের এই মতলবের কথা ভারত জানে। কিন্তু ভারত বরাবর এই কথা বলে এসেছে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কাশ্মীর নিয়ে কোন আলোচনা সে করবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নও স্বীকার করেছে, কাশ্মীর ভারতের অংশ। তবে কি নিয়ে আলোচনা হবে? ভারত চায়, সমগ্র পাক-ভারত বিরোধ নিয়ে সাধারণ আলোচনা হোক।

তাই প্রস্তাবিত তাসখন্দ আলোচনায় বিশেষ কোন ফল হবে না। সীমান্ত পরিষ্কারিত উন্নতি না হলেও আপোষের কোন মনোভাব গড়ে উঠবে না। তবে সবাই তাসখন্দ বৈঠকের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে থাকবেন।



ভারত দর্শন

রাজ্যপাল সম্মেলনে শাস্ত্রী

রাজধানী :

রাজ্যপাল সম্মেলন

রাজধানী দিল্লীতে সম্প্রতি রাজ্যপালগণের দুদিনব্যাপী সম্মেলন সাক্ষর্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সোবিয়েত দুনিয়া থেকে সদ্য প্রত্যাগত অর্থমন্ত্রী তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের স্বত্বাধী ও উপস্থিত করেন রাজ্যপালগণ।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও খাদ্য সমস্যা। সেই সঙ্গে কয়েকটি আশঙ্কাজনক আলোচনাও দেশবাসীর নদে মনো দুর্ভাবনা বহন করে আনল।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ভবিষ্যতে পুনঃ কর বৃদ্ধির ইঙ্গিত, অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে বৈদেশিক মুদ্রার অনটন ও তত্ত্বাবধিত ভারতীয় শিল্পের কতিপয় হওয়ার সম্ভাবনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে ধারিক ও রবিশস্যে ঘাটতিজনিত সমস্যার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপতির ভাষণে সীমান্ত শত্রু আক্রমণ আশঙ্কা ভবিষ্যতের জন্য কোনো নবোন্নয়ন চিত্র উদ্ঘাটিত করতে পারে নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতের দৃঢ় মনোভাবই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। পাক-ভারত আলোচনার জন্য আনন্দের সন্ধান

ভারতের অকৃত্রিম মিত্র রাষ্ট্র সোবিয়েত প্রস্তাব উপস্থাপিত আছে কেনেই রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি মর্যাদাপালিনী ও যুক্তিপূর্ণ শীমান্তের উপনীত হওয়ার বিষয়ে ভারতের আগ্রহের কথা ঘোষণা করেছেন, তেমনি একই সঙ্গে এ প্রসঙ্গও উচ্চারিত রেখেছেন যে, আলোচনার মতো পরিস্থিতির উত্তর হলে তবেই ভারত আলোচনার কসতে আগ্রহী। সোবিয়েত প্রস্তাব সামনে রেখে রাষ্ট্রপতির ভাষণের এই অংশ সেজন্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তান প্রথমত সোবিয়েত প্রস্তাবে রাজী হই নি; কিন্তু ভারতের দৃঢ়তা লক্ষ্য করে পাকিস্তানকে অবশেষে এটো হাত বুয়ে কেলতে হয়েছে। সোবিয়েত প্রস্তাব গ্রহণে তাদের আপত্তি নেই একথা সুস্পষ্টভাবে জানাতে হয়েছে পাক সরকারকে।

তথাপি রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন, পাকিস্তানের দ্বারা পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনা অবলুপ্ত হয় নি। আর সেজন্য পাকিস্তানের তরফে সতর্কতার বিশ্লেষণ প্রাধান্য না দেখা পর্যন্ত ভারত তার সৈন্য-পসরণ করতে পারে না। বস্তুত, ভারত কেন; দেশের সার্বভৌমত্বকে এবং দেশবাসীর নিরাপত্তাকে বাজি ধরে কোনো রাষ্ট্রই শত্রু রাষ্ট্রের শত্রুতার সম্ভাবনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত মুছ-বিরতি রেখা থেকে সৈন্যপসরণ করতে পারে না। ভারতের পক্ষেও তা করা অসম্ভব।

পাকিস্তান কর্তৃক দখলীকৃত রাজস্থানের অংশত্ব পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ভারতের দৃঢ় মনোভাব রাজ্যপাল বৈঠকে শ্রীশাস্ত্রী পুনঃ প্রকাশ করার সঙ্গে আলোচনার বসতেও যে ভারত গররাজী নয় একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সোবিয়েত সতর্কতা-প্রণোদিত আলোচনা প্রস্তাবের প্রশংসাও এই বৈঠকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভোলেন নি।

এই সমস্ত দৃঢ় উক্তিই স্বাভাবিক দেখা গেছে দুর্ভাবনার ভূমিকা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বর্গবণ্ড ও প্রতিরক্ষা ঋণ প্রকল্প আশানুরূপ ফললাভ না করলে দেশে আবার করত্যা চাপাতে হবে। ওলিকে অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে শতকরা দশ ভাগ ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য উপযুক্ত হিসাব-পত্র তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ-মন্ত্রণালয়ের ঘরোয়া পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে।

রাজ্যপাল সম্মেলনে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির প্রসঙ্গ ও অর্থ-মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হ্রাসের প্রকল্পের পরিচয় প্রতীয়মান হচ্ছে, অর্থ-মন্ত্রীও নদে নদে কর বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে লালন করছেন। করত্যা উৎপাদিত জনসাধারণের কাছে এ সংবাদও সীমান্ত আক্রমণের খবরের চেয়ে কম বড় দুঃসংবাদ নয়।

খাদ্যমন্ত্রীর কথায়ও ভারতবর্ষের খাদ্য-শস্যের যে চেহারা প্রকাশ পেয়েছে তাও গভীর

শ্রমিকদেরই ইচ্ছিত বহন করে। বাণ্যবাহী বিদেশ থেকে বাণ্য আমদানীর অপরিহার্যতা সম্পর্কে এই বৈঠকে ভিন্নমত পোষণের কোনো সম্ভাবনাই রাখেন নি।

ভরসার কথা একমাত্র এই যে, রাজ্যপাল সন্মেলনে জাতীয় ভিত্তিতে বাণ্য-সমন্বয় সমাধান করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন, বর্তমান বাণ্য-পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে সমস্ত রাজ্যেই রাজ্য সংগ্রহকারী চালাতে হবে এবং যাচাতি অঞ্চলের অভাব পূরণে এগিয়ে আসতে হবে উন্নত রাজ্যগুলিকে। বাণ্য-সমন্বয় সমাধানে এ জাতীয় একটি জাতীয় নীতিরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একটি সাধারণ বাণ্যভাণ্ডার রক্ষা করে সমগ্র দেশের মানুষকে সমান আহারের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাজ্যপাল সন্মেলনে সে প্রয়োজন স্বীকৃতি লাভ করল।

ভারতের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের পক্ষে ক্ষমতাবান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে চলার অসম্ভব কষ্ট উল্লেখ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির ভাষণে তিনি বলেছেন, তৃতীয় বোজনার শেষে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে পঞ্চাশ কোটি মানুষের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির এই দ্রুত হার রোধ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পকে বহন প্রচারিত করার অনুরোধও রাষ্ট্রপতি রেখেছেন।

এই সন্মেলনে আমদানীর পরিমাণ কমানোর রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অধিক উৎসাহের আবেদনও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বিদেশ থেকে ঋণ প্রাপ্তির আশা বেখানে ৪৮৯ কোটি টাকা (১৯৬৫-৬৬ সালে) সে ক্ষেত্রে ভারত এ পর্যন্ত বিদেশী সাহায্য ব্যবহৃত মাত্র ৬৯ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে পেয়েছে; অন্যভাবেই বৈদেশিক মুদ্রার অনটন আমদানী-যোগ্য ব্যবসার পরিমাণ হালে বাধা করবে। এবং অধিকতর পরিমাণে বহির্বিশ্বে ভারতীয় উৎপাদন-রপ্তানি করতে না পারলে ভারতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার যাচাতি পূরণ করা (যদি বৈদেশিক সহায়তার হাত ওঠলে আসে) অসম্ভব।

এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি আশাবাদী-উৎসাহের দ্বারা দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের বিপুল সম্পদ ও জনশক্তির সার্থক ব্যবহার যদি আমরা করতে পারি তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই।

কিন্তু বর্তমান সমস্যাটার চেহারা ভাঙে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে নি। একথা যেমন সত্য যে, ভারতবর্ষ বিপুল সম্পদের অধিকারিণী অন্য কথা তেমনি ততোধিক সত্য যে আমরা সে সম্পদকে উপযুক্তভাবে আজও ব্যবহার

করতে সক্ষম হই নি। পদ্ম ভবিষ্যতেও যে হাতে পারব কিংবা সেই পরিস্থাপেক্ষিতার ভূগর্ভে ভারতও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তবে এই তমিস্রাজ্ঞতার মধ্যেও একমাত্র আশার আলো যদি কিছু বিকীর্ণ হয়ে থাকে তবে তা এই যে—আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে অকস্মাৎ আমরা আজ সচেতন হয়েছি। আর এজন্য যদি কেউ ধন্যবাদার্হ হন তবে সে ধন্যবাদ তাঁদেরই প্রাপ্য, ভারতের দুরবস্থার চেহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শত্রুতার মাধ্যমে যারা আজ তুলে ধরেছেন ভারতের সামনে।

স্বপ্নভঙ্গ

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কোরানের এক সভার ভাষণদানকালে বোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মোটাও একটি অদকার ভবিষ্যতের চিত্ররূপ হাছির করে জানিয়েছেন, বিদেশী সাহায্য ছাড়া ভারত নিরুপায়।

অবস্থা নাকি এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, ভারতকে তার অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের পথে নতুনভাবে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। অর্থাৎ চলে যাওয়াতে হবে প্রকল্পগুলিকে। কারণস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে,—বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা।

তিনি বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় লব্ধ ভোগের আমরা মজুতের পরিমাণ যদি পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ বৃদ্ধি করতে না পারি এবং রপ্তানির পরিমাণ যদি এক শতাংশ বাড়ানো না যায় তবে বিদেশের মুখ চেয়ে পড়ে থাকার ছাড়া ভারতবর্ষের নানোপায়।

উন্নতির পথে দেশীয় বাধার বিরুদ্ধে যেবেন, তিনি জানিয়েছেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম আন্যোপায় নির্ভর বাণ্য প্রাধান্য ও বাইরের ক্ষেত্রে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ আমরা করি নি। তাছাড়া পরিকল্পনার পদ্ধতি-গুলির মধ্যে বোঝাপড়ার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবও আমাদের অগ্রগতিতে প্রকাণ্ড বাধার অচলারতন সৃষ্টি করে, অনড় হয়ে বসে আছে। সরকারী দপ্তরের কর্মোদ্যোগের অভাবেও শ্রীমোটা হতাশ। শুধু বিভাগীয় দুর্বলতাই নয়, মন্ত্রিবর্গ তাঁদের দপ্তরের গভীৰ চিন্তার আবদ্ধ। এ ছাড়া রাজ্যসরকারগুলির পরশ্বরের সঙ্গে একযোগে বিরোধিতার অবসান ঘটতেও তৎপর নয়।

এমতাবস্থায় শ্রীমোটা আগামী দু-এক বছর ভারতের কপালে যে দুর্ভোগ লেগে আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভারতবাসীর কাছে এ সমস্যাটাই আজ বিনা মধ্যে বজ্রাঘাতের মত মনে হবে, কেন না একটা

মাকড় ফেরে নি বহন ভারতের ক্ষমতাসীন নেতৃ-বর্গ বিদেশী সাহায্য প্রত্যাখ্যানের অপেক্ষে গরম গরম বজ্রতা রেখেছিলেন। আজ অকস্মাৎ তাঁদেরই মুখে উল্টো গাওনা শুনে চম্পিত ইচ্ছা বৃক্কের ছাতি চুপে ছয় ইচ্ছিতে সজ্জিত হচ্ছে আমাদের।

কিন্তু এই সম্ভোচন-প্রসারের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ও ওয়াকিফহালমহল এমন একটা গ্রহসন রচনা করে কেলেদ কেন, তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। আজ আমাদের এই বোঝানাল অবস্থাটা এমন করে স্বীকার করতে বণবার আগেই তো তাঁরা এই বজ্রবহু ভারত-মাতার প্রকৃত চিত্র অবগত ছিলেন। আমরা যখন এতই নিরুপায় তখন আমাদের পক্ষে বাণ্যভণ্ডার এড়িয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।

ভারতবর্ষের স্বপ্নভঙ্গ হল হতাশা এবং বিষাদের মাঝে। কিন্তু অভিজ্ঞমহলেদ যে মোহভঙ্গ ঘটল তার কারণ তাঁরাই ভালো বোঝেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ন্যায় এবং আমাদের বলতে হবে, আমরা টেকিলাস, টেকিলাস এবং টের পাইলাস (মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে শব্দ তিনটির সাম্প্রতিক ব্যবহার করেছেন)।

শিক্ষকের জাতীয় পুরস্কার

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে বাছাই করে ভারতীয় শিক্ষকদের নবম জনকে বর্তমান বছরের জন্য (১৯৬৫-৬৬) জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্ট-জৈন শিক্ষাবৃদ্ধিগণ।

শিক্ষকসমাজের প্রতি প্রজ্জ্বল প্রকাশই জাতীয় পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার-বিতরণী সভায় সেই সহৃদয় উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গ সমরণ করেন।

রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই ভারতবাসীর সম্মানই নয়, বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয়। প্রকৃত শিক্ষা বলতে, জ্ঞতরাং, তিনি যে সার্বিক চরিত্র গঠনের কথা বলতে চেয়েছেন—একটি পুরো মানুষ হয়ে উঠতে হলে বস্তুত এ সমস্ত গুণেরই সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসেশের আবহাওয়া সর্বথা প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয় আর তা শিক্ষকগণের সম্প্রদায়গত প্রচেষ্টার সম্ভবপরও নয়। ভারতীয় উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দলদলি ও ক্ষমতালোভী কুচক্রীর মূসাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে আজও পর্ববসিত আছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, দেশব্যাপী সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দুর্ভাগ্যের পটভূমি। তবে বহু ক্ষেত্রেই এটা সত্য। এ সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ করার

প্রয়োজন নেই। কারণ এ বিষয়ে অস্পষ্টতার কারণে অনেকেরই আছে।

শিক্ষক-সম্প্রদায় সম্পর্কে ভিন্নতর এক ধৃংজনক অবস্থার উদ্বেগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা। তিনি আলোচ্য অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, দেশের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা যথোচিত ব্যবহার করে উঠিতে পারি নি। তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। রাজ্যসরকারগুলি মূল্যবদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন সারভার্টদের মাগণী ভাতা বৃদ্ধি করেন কিন্তু অবহেলিত পড়ে থাকেন শিক্ষক-সম্প্রদায়। অর্থাৎ এটা দুর্বোধ্য যে, শিক্ষক-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রেও অনুমত হয় না কেন। শ্রীচাগলা আগামী পরিকল্পনাকালে রাজ্যসরকারগুলি এ বিষয়ে চিন্তা করে শিক্ষকদের বাহিনী বৃদ্ধি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীচাগলা নিজে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তিনি সচেষ্ট হলে শিক্ষাখাতে রাজ্যওয়ারী ব্যয়-বৃদ্ধির পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিতে পারে। রাজ্যের ওপর এক প্রভাব তিনি বিস্তার করতে পারেন না এমন খাণ্ডা লব্ধ। যে সময় রাজ্যে প্রকৃত পক্ষেই ঘটিত আছে—কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে সমস্ত রাজ্যকে যাতে সাহায্য দিতে সক্ষম হ'ন শ্রীচাগলা তার জন্যও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি যে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন শিক্ষকগণ সে সত্যকে মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সুতরাং আপা কুখকিনী যাতে রাত ভোর হলেই অশ্রু না হয় সেমিকে তিনিই দৃষ্ট রাখবেন বলে আশা রাখি।

উজ্জয়ী:

গুজাতন্ত্র

ঠিক যে সময় পাক আততায়ী বিমান চুপিসাড়ে এসে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিমানটিকে গুলী করে ভূপাতিত করল তারই কিছুকাল পর আনন্দ উৎসবের মজ্জ্বল শুরু হয়েছিল গুজরাটের বোড়া গ্রামে। একাধিক পদের স্বাধীন শাসনব্যবস্থা মাহত তাসুক পকারেভের সভাপতি আপ্যায়িত করেন তাঁর সমর্থক দলবলকে।

মাহতার অকল সভাপতি মহানুভব নিমেষে। কেন না সমগ্র ভারতবর্ষ স্বনাম সংগ্রামরত জোয়ানদের জন্য আহাৰী সংগ্রহে ব্যস্ত, গুজরাট রাজ্য বংকালে অকলমাজনিত খাদ্য-ঘাটতির কবলে অসহায়ভাবে নিপীড়িত এবং সমগ্র রাজ্যে স্বনাম খাদ্যস্বা স্বহযোগে একাধিক অভিজ্ঞ আপ্যায়নের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা বর্তমান, ঠিক সেই সময় অকল

সভাপতি এমারি ব্যবস্থা করেছিলেন নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে।

দৈনিক যীরা উদর-পুতির আনন্দে উৎসাহ নিঃসরণ করেছিলেন তাঁদের সৌভাগ্যে আর যে কেউ ঈর্ষা বোধ করে থাকত বিস্ময় হয়েছিলেন একজন সত্যকার সমাজকর্মী। নাম তাঁর, মানবেন গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীর নাতনী—গান্ধীজীর তিরোধানের পর থেকেই মানবেন মাহত শহরে বসবাস করছেন ও একাধিক সমাজোন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে নিবেদন করে আসছেন।

মানবেনের চোখে ঘটনাটি বিসদৃশ এবং আইন ভঙ্গকারী স্বর্ধারূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি সে কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশও করেছেন। তাঁর ভাষার স্বানীর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ কর্মচারীদের (যীরা ভোজনসভায় উপস্থিত ছিলেন) তিনি নিশাও করে-ছিলেন। কিন্তু মানবেন বৃহতে পারেন নি তাঁর এই মায়ার দাবি সমালোচনার দুঃসুত-কারীরা এতদূর সাঁপা হয়ে উঠবেন যে, প্রকাশ্যে তাঁর ওপর দৈহিক আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করবেন বা তাঁর অনুগামীদের হতন করার ভবন্বয় সৃষ্টি করবেন। মানবেন ভাবতেও পারেন নি হয়ত, গান্ধীজীর নাম রাজ্যে আজ গুণাতন্ত্রের কার্যসীমা স্বাধ প্রতিষ্ঠা লভান করছে। কিন্তু তাঁর ভাষা উচিত ছিল। তিনি হয়ত ভেদন আশঙ্কা করেও ছিলেন কিন্তু অন্যায়কে অন্যান্য স্বানীর কংগ্রেসী পাণ্ডার মতো সাগ্রহে মেনে নিতে পারেন নি। পারেন নি গুণাতন্ত্রের মধ্যে নিজের নাম লিখিয়ে কোনো মৃণ্য স্বাধী সিন্ধির নিচ চিন্তার ছিটকৌটাও মনের কোণে স্থান দিতে। ফলও যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে।

শ্রীমতী মানবেন গান্ধীর জীবন বিপন্ন আজ। তিনি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও ভবনগর জেলা কর্তৃপক্ষকে তাঁর জীবনাশঙ্কার কথা জানিয়েছেন।

মানবেনের জীবনরক্ষার জন্য বর্তমানে জেলা পুলিশ দুইজন দেহরক্ষী নিযুক্ত রেখে-ছেন গুণাতন্ত্রের কবল থেকে মানবেনকে আগলে রাখার জন্য। কিন্তু কেবলমাত্র মানবেনরই জীবনাশঙ্কা দেখা দেয় নি, বিপদ নাচছে মানবেনের আদর্শবুদ্ধ অনুগামীদের শিরেও। মানবেন তাঁদের জন্যও উদ্বিগ্ন।

কার্যসীমা স্বাধীপ্রণোদিত দুষ্টচক্রের যে ভয়াবহ রূপ শ্রীমতী মানবেন গান্ধীকে দিবে গুজরাট রাজ্যে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল—কমলাগীর্ন দলের দুই গালে তা যথেষ্ট চুপ-কারী মাখিয়েছে। ভবনগর পুলিশ স্বপার-ঘটনাক্ষীর একটি ভদ্র অনুষ্ঠানের আদেশ দান

করেছেন। এই ভদ্র নিমেষেই গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস সরকারের আইনভঙ্গকারী কংগ্রেসী পাণ্ডারা নিজেই, এ সংবাদ এমন কোনো চমকপ্রদ ঘটনা নয় যা সাধারণকে বিস্ময়ে হতবাক করবে। কিন্তু আইনকে এরা এতদূর করতলগত করেছেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ মূর্খ খুললে তাঁকে জানে সাবাড় করে দিতেও ইতস্তত করে না তাঁদের গণতান্ত্রিক বিবেক।

রাজস্থান:

রঙ্গীর ওপর রাজস্থান

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে চিকিৎসা ব্যয় সরকারই বহন করে থাকেন অথবা বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। রাজস্থান সরকার সম্প্রতি ঔষধের ওপর শতকরা ছয় ভাগ বিক্রয়কর চাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দুঃখ বোগীকে নিপীড়িত করার অপরাধই শুধু নয়, বিক্রয়করের হারও অত্যন্ত বেশি করে চাপিয়ে দিয়ে সাধারণের ওপর অত্যাচারের এ এক নয়া নিদর্শন স্থাপন করেছে রাজস্থান। ফলত বিক্রোত রাজ্যব্যাপী নানা বাঁধতে কল্লর করে নি। বিশেষত প্রতিবাদে মূর্খ হইয়েছেন ঔষধ ব্যবসায়ীগণ তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের বিক্রয়করের হার উদ্বেগ করে রাজস্থান সরকারের অবিচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সন্নিহিত রাজ্যে বিক্রয়করের হার নাকি শতকরা দুই ভাগের বেশি নয়।

কেমিস্টগণ তাঁদের প্রতিবাদ প্রকাশের যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাতে রাজ্যব্যাপী অস্থিরতা নেমে এসেছে। উপর্যুপরি তিনদিন জয়পুরের ওষুধের দোকানগুলি বন্ধ করে রাখা হয়। রাজ্য সরকারের তাতে চৈতন্যোদয় কতদূর হবে তা ভবিষ্যতই জানে, কিন্তু নির্দোষ সাধারণ মানুষ বিনা ওষুধে যে রোগ-পথ্যার এবং মৃত্যুপথ্যার ভুগলেন তার আর কোনো প্রতিকার সম্ভব হবে না। আশ্চর্য দেশ এবং দেশের কর্তৃপক্ষগণ। এ দেশে ওষুধের ওপর ট্যাক্স হয় তার প্রতিবাদের ফলভাগী হন সাধারণ দুর্বল মানুষ। পাপ চক্রাকারে বাড়ছে, পাপীরা নিশ্চিন্ত!

রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীদামোদরলাল ব্যাস অভঃপর ডি আই কল প্ররোগের হুমকী দিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপযুক্ত কাজই বটে। তিনিদিনে অস্থির রুগীদের কী হাল হল সে খবর নেওয়ার চাইতে ডি আই জুজু ছেড়ে দেওয়া অনেক স্বল্প পরিপ্রণের ব্যাপার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সে সুযোগের অপব্যবহার করেন নি। অবশ্য স্বনাম দেখি আন্দোলনটা কেবলমাত্র ধর্ম করার দেয় হার নিয়েই হচ্ছে, তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ডি আই কলের কমতা দেখে বিস্ময়ের কারণ খুঁজে পাই না। মানুষের রোগভোগও যে করতার পীড়নের আওতার পড়ে কল্যাণবৃত্তী সরকারী রাষ্ট্রে বসবাস না করলে তার ধর্ম করাও অসম্ভব।

नमो भगवते वासुदेवाय

॥ आभार ॥

স্বামীর ওপর কোন আশাবরসা
ছিল না হীরেজের মার। মেয়েদেরও
পড়াশুনা হয় নি। স্কুলের গাড়ী কেউ
পার হতে পারে নি। গান-বাজনা

অভিনয়-চর্চাভিনয়ের দিকে ওদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। হয়তো তাই শেষ পর্যন্ত ওদের পড়াশুনার বাধা হয়ে থাকবে।

শুধু ছেলেই ছিল ভদ্রমহিলার সব আশাভরসা। সে বড় হবে, বিদ্বান হবে ভালো চাকরি-বাকরি করে সংসারের সব দুঃখ ঘোচাবে এই প্রত্যাশাই ছিল তার বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু সেই আশা তাঁর পূর্ণ হলে না। নিতান্ত আকস্মিক এক ঝড়ের ঝাপটায় তাঁর সেই একটিমাত্র আশার দীপ নিভে গেল। যে বছর ইকনমিকস্-এ এম, এ দেবার কথা সেই বছর পরীক্ষার মাত্র মাস কয়েক আগে আত্মহত্যা করে বসল। শুধু সুনীল নয়, যে শুনল সেই অবাক হয়ে গেল। অমন স্থির ধীর বুদ্ধিমান ছেলের মধ্যে যে এমন এক ধ্বংসের বীজ আত্মগোপন করে ছিল তা কে জানত? এই আত্মহত্যার মূলে কেউ বলল বাথ' প্রেম, কেউ বলল ধারিদ্য, কেউ বলল পরীক্ষার ভয় থেকে এই চিন্তাবৈকল্য হয়েছে। কিন্তু আসল কারণ সুনীলের জানতে দেরি হয় নি। মৃত্ত অবস্থায় এর বাবা নাকি একদিন ঘাড়ে ফিরে এসে যা-তা কাণ্ড শুধু করে দিয়েছিলেন। হীরেনের আর সহ্য হয় নি, বই রেখে সে তার বাবার সামনে এসে রুখে দাঁড়িয়েছিল, 'আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন কি না বলুন।'

বাবাও জবাব দিয়েছিলেন, 'কার বাড়ি? তোরা না আমার?'

এই তর্ক-বিতর্ক ঘণা-বিশেষ শুধু, থাকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি।

বাপ আর ছেলের মধ্যে হাতাহাতিও

হয়েছিল। তারপর এক সময় হীরেন নাকি সত্যিই সদর দরজা খুলে ওর বাবাকে বার করে দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বেশিদূর যেতে পারেন নি। দরজার সামনেই মুখ খুঁবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। আর সব চেয়ে আগে হীরেনের মাই নাকি 'তোমরা কে কোথায় আছ, ধরো এসে' মানুষটাকে পাশে ছেলেটা মেরে ফেললো।'

সঙ্গে সঙ্গে হীরেন তার বাবাকে ছেড়ে দিয়েছিল। খিল দিয়েছিল গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে। জীবিত অবস্থায় আর বেরিয়ে আসে নি। কিন্তু ও মৃত বিবেচক-বুদ্ধিমান ছেলে এই 'সামান্য কারণে গলায় ফাঁস দিতে পারে তা সুনীলেরও সহজে বিশ্বাস হয় নি। হয়তো 'আরো কিছু' কারণ থাকবে। হয়তো অনেকদিন থেকেই হীরেনের ঐর্ষ্যচ্যুতি হয়েছিল।'

এই দুর্ঘটনার পর অল্প কিছুদিনের জন্য হীরেনের বাবার স্বভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু সে পরিবর্তন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তিনি তাঁর আগের পথেই চলতে লাগলেন। হীরেনের মার মধ্যেও কেমন একটা অসুস্থতার ভাব দেখা গেল। এই অবস্থায় মেয়ে দুটিই সংসার চালাবার ভার নিল। তাদের বিদ্যা বেশি নয়। সামথাই বা কি, যা ছিল সখ তাই তারা পেশা করে তুলল। তারা নানা অ্যামেচার ক্লাবে নাটকের মহড়া দেয়। অভিনয় করে। যা পায় মার হাতে এনে দেয়। এই সূত্রে নানা ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে। তার মধ্যে ভালো-মন্দ সবই আছে। বারা অকিঞ্চন তাল্লাও আসে আবার দু-একজন বিস্তবানেরও দেখা পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে গ্রীবিলাসবাবুকেও একদিন দেখতে পেল সুনীল।

বিজন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন গ্রীবিলাসবাবু? আমাদের— সুনীল একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ আপনাদেরই। গ্রীবিলাস চক্রবর্তী। তিনি অবশ্য তখন তেমন বিস্তবান ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধির জোর তাঁর তখন থেকেই ছিল।'

গরীবের সংসারে তিনি আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। দরকার হলে হীরেনের বাবাও তাঁর কাছে হাত পাততেন। গ্রীবিলাসবাবু সেই হাত ভরে না দিলেও তিনি একেবারে বিমুগ্ধ করতেন না। গ্রীবিলাসের বয়স হয়েছে। তিনি তখনই উত্তর চল্লিশ। বিয়ে করেছেন। গুটিচারেক ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু সুদর্শন, স্বাস্থ্য-বান ভদ্রলোক। নাট্যরসিক। তাঁর

পারিবারিক পরিবেশের কথা ভেবে দেখবার মত অবস্থা অনুরণিত ছিল না কণারও ছিল না। চতুর গ্রীবিলাস দুই বোনকে নিয়ে খেলছিলেন। কখনো এর দিকে হেলাছিলেন কখনো ওর দিকে। একজনকে আর একজনের ওপর বিম্বেষী করে তুলেছিলেন। সুনীল ওদের অনেকবার ইসারা-ইংগাতে, কখনো স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। হীরেনের মা মাঝে মাঝে অনুরোধ করতেন, 'তুমি ওদের বাঁচাও। অন্যতম একজনকে রক্ষা করবার সাধ্য তো তোমার আছে।'

কিন্তু দূরা করে আর যাই কিছু করা যাক বিয়ে করা যায় না। প্রথম-দিকে ওদের ওপর সুনীলের যদি বা একটু-আধটু সহানুভূতি আসত ওদের চালাচলন, মতিগতি দেখে সেটুকু শেষ পর্যন্ত আর অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু বড় বোনের অঙ্গপই মোহভগ্ন হল। সে গ্রীবিলাসের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওই ক্লাবেরই একটি ছেলেকে বিয়ে করল। খুব যোগ্য পাত্র অবশ্য নয়। তবু খেয়ে-পরে অন্য এখন মোটামুটি ভালোই আছে। একটি ছেলেও হয়েছে ওদের।

কিন্তু কণা অত সহজে নিস্তার পায় নি। অনেক দুঃখ-দুর্ভোগ গেছে ওর ওপর দিয়ে। সেসব কথা সুনীলের পক্ষে বলা সঙ্গত নয়। সব সে জানেও না। তবে শেষ পর্যন্ত কণাকেও সরে আসতে হয়েছে। বিষয়-আশয় প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিকে নজর দিয়েছেন গ্রীবিলাস। এবং সফলও হয়েছেন। কিন্তু কণা আর বিয়ে করে নি। ঘর-সংসারে ওর নাকি কোন স্পৃহা নেই। সব জেনেশুনে ওকে বিয়ে করবেই বা কে। কোন একটি বন্ধুর অনুরোধে এই বাড়িতে দুখানি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেই বন্ধুটি এখন আর আসে না। ঘর দুখানি নিজেই দখল করে রয়েছে কণা। বাড়িওয়ালার মেয়ে-দের সঙ্গে বেশ ভাব আছে। তাই থাকতে পারছে। তা ছাড়া রাইরে থেকে বাড়ি-বাড়ি তো কিছুই ওর নেই। ভদ্র, শান্ত মিশ্র ব্যবহার। ঘা খেয়ে খেয়ে হয়তো খানিকটা বদলেও গেছে। একাই এখন থাকে কণা। থাকবে না যাবেই বা কোথায়। ওদের বাবা মরে গিয়ে সবাইকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছেন। মা আছেন দিদি-জামাইবাবুর কাছে। সেখানে গিয়ে থাকা কণার পক্ষে সম্ভব নয়। দিদি ওকে এখনো ভালো চোখে দেখে না।

(ক্রমশঃ)

ছায়া ভাষার প্রকাশিত দ্বিতীয় সর্বাধিক

প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর চার দশ

বার্ষিক	...	১৪.০০
ষাণ্মাসিক	...	৭.০০
ত্রৈমাসিক	...	০.৬০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা

চাঁদা সবাইই অগ্রিম দেয়

সাহুলেশন ম্যানেজার

জীবিকা হরণ

সম্প্রদেয় 'লোকসভা' নাকি সম্প্রদেয় 'ককমারি' এ সম্পর্কে বিবিধ সন্দেহ ইতিপূর্বে পরিবেশিত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, লোকমুখে, লোকপ্রতিনিধিদের মুখে মুখে এবং মন্ত্রীমহোদয়দের বিবৃতিতে। অতঃপর সম্প্রদেয় আইনত অসিদ্ধ বস্তুতে পরিণত হলে জনৈক ব্যবসায়ী মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন। মাননীয় বিচারালয়ের দ্বারা সম্প্রদেয় বন্ধে দৃষ্টির যোগান সমীচীনভাবে বৃদ্ধি পায় নি বলেও মতব্য করা হয় এবং বিচারালয়ের আদেশেই মিস্টারবিক্রেতার দৃষ্টি দিন তাঁদের কাচের বাসে পরমথরে সম্প্রদেয় সাজিয়ে রাখার ও বিক্রি করার সুযোগ পান।

কিন্তু এতোটা তাঁদের বিমুখভাগ্যে মইল না। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্র সম্প্রদেয়ই নয়, ছাড়পত্র পাওয়া অন্যান্য দ্রব্যজাত মিস্টারমের উৎপাদনও এক আদেশ বলে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন। অর্থাৎ এই আদেশের দ্বারা বন্ধ হল লক্ষাধিক লোকের (যাঁরা মিস্টারম ব্যবসায়কেই পুরুষা-নুক্রমে এবং বর্তমান সময়ে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে আসছিলেন) রুজি-রোজগারের পথ, অর্থকার নেমে এলো এঁদের প্রতিটি পরিবারে।

দেশে এ পর্যন্ত যতগুলি নয়া ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে আর কে জানে অদূরভবিষ্যতে হবে, তার অনেকগুলিই মানুষের মুখ থেকে অম্ব কেড়েছে, কেড়েছে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বহু অভিজ্ঞতালব্ধ জীবিকা। ইতিপূর্বে স্বর্ণকারদের জীবিকা হরণের সময়ও দেশব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে শোনা গিয়েছিল সহস্র আতঙ্কিতের চীৎকার।

সরকারী বয়ানে বিকল্প লাভের গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। দ্রুতের যোগান বাড়বে ছানাবন্ধ আদেশে! বলা হচ্ছে, শিশু রোগী দুর্বলের জন্য দ্রুত সংস্থান সম্ভব হবে। এতদ্ব্যতীত পশুপালনমন্ত্রী শ্রীকল্লুর মহামান্য বিধানসভাকে আশ্বস্ত করার জন্য এমনতর ঘোষণাও করেছেন যে, মিস্টারম বন্ধের দ্বারা কর্মহানির আশংকা অমূলক, কেন না মিস্টারম বন্ধ হলেও পশ্চিমা লাভজাতীর প্রসার প্রচলন অব্যাহতই থাকবে। দ্রুতের বিশ্বর অন্যান্য মিস্টারম প্রস্তুতির জন্য ভাল মরদা ও আটা যে পরিমাণে প্রয়োজন তাও যথেষ্ট মিলবে কি না এ প্রশ্নও বিবেচ্য। আমাদের অমপূর্ণতার ভাঙারে কোন বস্তুটি যে "বাড়ন্ত" নয় হিসাব করে তার হৃদিশ মেলা ভার। অন্তত কালোবাজারীর কল্যাণে সমুদ্রের জলও ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেলে রাজ্যরাজ্য দ্রুতপ্রাপ্য হয়ে যেতে পারে। শত শত অগন্ত্য একযোগে সমুদ্রশোষণের ভৌতিক দেখিয়ে ভারত মহাসাগরকে বিশুদ্ধ করার কামতা ধারণ করেন।

এমতাবস্থায় ছানাজাতীর মিস্টারমের স্থান দখলকারী লাভজাতীর 'চীজ' (লাভ-আদ)



সরকারী ষাদানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মিছিল

বন্ধ পশ্চিমে বড় আদরণীয়) যে দুর্ভাগ্য হবে এ বিষয়ে আমরা বর্তমানে নিশ্চিত থাকতে পারি।

এতৎসত্ত্বেও দ্রুতের যোগান সত্য সত্যই বৃদ্ধি পাবে এতবড় দুরাশাও জনসাধারণের নেই।

তবে একটি পুরোছ উপকার ছানা-কীর 'বন্ধ' আদেশবলে যে নিঃসন্দেহে সাধিত হবে সে বিষয়ে সম্প্রদেয় কারণ দেখি না। 'হিন্দী' চাপানোর আগে অতি সহজেই হিন্দুস্থানী মিস্টারম চাপিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন মিস্টারমের ইতিহাসে গজা-লাজুর হিন্দীকরণ সম্ভব হবে। আর মুখ বদলালে ডাঙা বদলাতে কতক্ষণ।

বিরোধী সদস্যরা সরকারী আদেশটিকে মহামান্য বিচারালয়ের আদেশের প্রতি অবহেলা এবং স্বেচ্ছাচারমূলক অগণতান্ত্রিক আদেশ বলে আখ্যাত করেছেন।

আখ্যা যেমনই দেওয়া হোক, সরকারী-মহল মিস্টারমসংস্কার আদেশটিকে বিখ্যাত করবেন বলে আশা রাখেন। কেন না তাঁরা মনে করেন, এই আদেশের বলে কারও অম মারা তো হবেই না উপরন্তু দ্রুতপোষাদের পরিপোষণ সম্ভব হবে। (অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, মস্তাবীর গ্রীষ্মে মৃত্যুপাধ্যায়, গ্রীষ্মগ্রাস্য কোলে ও গ্রীতরুক্ষকামিত খোব উক্ত আদেশের বিরোধিতা করেন।

যাই হোক, সরকারী প্রচেষ্টার যদি সত্যিই প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করা যায়, তবে মিস্টারম-বিলস করে শিশু, রুগী ও দুর্বলের প্রয়ো-

জনীর দ্রুত-সংগ্রহ-প্রচেষ্টার নিশ্চয়ই কেউ বাধ সাধতে যাবেন না। কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন একটি ভরস্কর জিজ্ঞাসার মত সাধারণকে বিচলিত করেছে। সরকারী ভরসে এই নয়া আদেশ জারির ব্যাপারে শ্বাসরুদ্ধ তাড়ন, ভা, এ বেন বিচারালয়ের প্রতি অশ্রুত চ্যালেঞ্জেরই সাক্ষি। সাধারণের মনে যদি এমন সন্দেহ জাগ্রত হয় যে, কিসের-বিভাগের ওপর শাসন-বিভাগের দাপটই এর দ্বারা সরকার প্রমাণিত করতে চাইলেন, তবে তাতে সত্যাসত্যের পরিমাণ মাই থাক না কেন, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণাটিকে অবলম্বন বলাও সম্ভব-পর নয়।

তা ছাড়া, এতাবৎকাল বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের নৈতিবাচক উপসংহার দেখতেই বর আমরা সমর্থিত অভ্যস্ত আছি। সুতরাং সরকারী ভরসে গলভরা কথার সাধারণের মন ভরে না। আর পেট ভরানোর চিন্তা, সে তো অকালকুসুম!

সরকারী আশ্বাস আজ তার তাত্ক্ষণিক মূল্য হারিয়ে বসেছে। সব ব্যাপারেই সাময়িক তাই অপেক্ষা করেন, বলেন পরিচয় লাভের অপেক্ষার।

জীবিকাহরণে গ্রিন জাতীর বিকল্প খাবার প্রস্তুতিতেই যে কারিগরগণের জীবিকা-সমন্বয় মিটেবে এমন কথাও চি করে ভাবতে পারা যায় না। বিকল্পগুলি তো ইতিপূর্বেও চালু ছিল।

তাই মনে হয়, কিছু বিকল্প যেনেও হয়ত পরোজন!

কাঁচকলার পেরাগী

বিস্ময় দেশে বদাচার। জনটনের রাজারে খাদ্য-মেনু, পাল্টাতে হয়। সাম্প্রতিক 'মেনু' বদলে মধ্যমশ্রী শ্রীপ্রমুদচন্দ্র সেন যে বৈপ্লবিক রদবদল করেছেন তা সমরোচিত তো বটেই, দেশ-কালোচিতও সূচনশীত।

মিষ্টান্ন মেনুতেও দু-চার কিসিম ওলট-পালট হলে শূন্যস্থান পূরণ হতে পারে। মধ্যমশ্রীর খাদ্য-মেনুতে ভাতের বদলে কাঁচ-কলা ও আলুসেদ্ধ গুহীত হয়েছে। মিষ্টান্নের রদবদলেও এজাতীয় দু-একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার অসম্ভব নয়।

রাজ্য আলুর পাল্টুয়া, কাঁচকলার পেরাগী (চপের বিকল্পে), মেথিশাকের মেথিকুট (তিল-কুটের মত), গাজরের হালুয়া, বিটের রসমুন্ডি, মনোপাতার বরফি প্রভৃতি প্রস্তুত হতে পারে। শস্যজাত কিসমিস ইত্যাদি বণগবাসীর স্বল্প-কমতার মাপকাঠিতে রাজকীয় ভোগ। তবে স্বাস্থ্য বরফির বিকল্পে চিনাবাদাম বরফি চালু হতে পারে।

যেমন করেই হোক পদ বাড়ানো দরকার। পদ বাড়ালে কারিগরগণের পদেরও স্বাধীন সম্পর্কে ভরসা বাড়বে।

নির্মম অভিযান চাই

কলকাতা ট্রাফিক পলিশের কনস্টেবল শ্রীরামবিলাস সিং কতবার জন্য আইন অমান্যকারীদের হাতে প্রাণ দিলেন। রাম-বিলাস কোনো সম্মুখ-সমরের সুযোগ পর্বত পাননি। আততায়ী ভীক্রে তাদের প্রাইভেট বাসে তুলে জনারগের বাইরে চপট দেয়। পরে নির্মমভাবে হত্যা করে। অথচ ঘটনাটি একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পর্ববসিত হতে পারে, এমন ধারণা সাধারণ বুদ্ধিতে অকল্পনীয়। রামবিলাসের হত্যাকারীরা যে স্বভাব-ধূনী আলোচ্য ঘটনার মূলীভূত কারণের অকিঞ্চিৎকর লক্ষ্য করলেই তা দুঃসংগত হয়।

ঘটনা সামান্য চৌরঙ্গী রোড ও সুরেন্দ্রনাথ ঞান্যার্জী রোডের সংযোগস্থলে ট্রাফিক নির্দেশ অমান্য করার জন্য মধ্যরাত্রে কতবার কন-স্টেবল শ্রীরামবিলাস সিং নির্দেশ অমান্যকারী বাস আটক করেন ও বাসটিতে উঠে বাসটি তালতলা খানায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পরিণতি রামবিলাসের হত্যায় পর্ববসিত হল। রামবিলাসের মৃতদেহ পাওয়া গেলে শ্রীরামপুরের একটি নালায় পর্যায়ন সূর্যভোবার প্রাকালে।

রামবিলাসের মৃত্যুতে শুধু যে রাম-বিলাসের পরিবার-পরিজনদের সহজ জীবন-যাত্রার সাময়িক সূতা ফটল তাই নয়, এ মৃত্যু প্রায়জীবনে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক বিস্তার করল। রাজধানী কলকাতার বৃক্রে এমন এক দুঃসংগতকারী চক্রের অবস্থান সম্ভব

হয়েছে, যারা শুধু আইনভঙ্গকারীই নয়, আইন প্রয়োগের জগতের শিকারীও নন-জবন করতেও পশ্চাৎপদ নয়।

এ পর্বন্ত ৩০৪এ আই পি সি ধারায় কলকাতার ট্রাফিক পলিশ একাধিক অভি-যোগ নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রাইভেট বাস, লরী ও ট্যাক্সির বিরুদ্ধেই অভিযোগ বারংবার প্রমাণিত।

১৯৬১ সালে লরী ড্রাইভার মালিকিং সিং-এর বিরুদ্ধে ট্রাফিক পলিশ হত্যা-প্রচেষ্টার বিচার হয় এবং বিচারে মালিকিং সিং-এর সাড়ে চার বছর জেলও হয়েছিল। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০৪-ধারার অন্তর্গত সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন মহামায়া বিচারালয়।

ডেপুটি কমিশনার লোকান্তরিত শ্রী এস এন চক্রবর্তীর দুঃঘটনার মূলেও ছিল এ লরী। সাজেস্ট শ্রীচিরন্তন ভট্টাচার্যকেও আইন অমান্যকারী লরীতেই নিশ্চিহ্ন করে যায়। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর মটর সাইকেল নিয়ে পল্লারনগর লরীটিকে অনুসরণ করেন, লরী ড্রাইভার ডায়রিন রোডে শ্রীভট্টাচার্যের ওপর দিয়ে লরী ছুটিয়ে দিয়েছিল।

ট্যাক্সিগুলিও রাতের অন্ধকারে সম্মুখ মানুষের বধে ভরসা উপপাদনকারী যান হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারে নি। শুধু যে রাজপথ দুঃঘটনার সংগেই ট্যাক্সির দুর্নাম জড়িত তাই নয়, সুযোগ পেলে সওয়ারীর প্রাণ হরণ করতেও ট্যাক্সিচালক স্বিধায়ন্ত হয় নি (দেহদম স্টেশনের কাছে দুঃঘটনা স্মরণীয়)।

প্রাইভেট বাস, লরী ও ট্যাক্সি রাজপথকে বোমপথের মত ব্যবহার করতে চায়। যশোহর রোড, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি দুঃপাল্লার রাস্তায় এমন কি গলিঘুঁজির মধ্যেও এরা বেসরোয়া গাড়ি ছুটিয়ে চলে—যা যে কোন মহুর্তে দুঃঘটনাকে আলিঙ্গন করতে পারে। এই মনোভাবও স্পষ্টতই আইনভঙ্গকারী স্বভাব-অপরাধীর মনোভাব দ্বারা আইনকে পরোয়া তো করেই না, পরোয়া করে না জনসাধারণের প্রাণ হরণেরও।

রামবিলাস সিং-এর মত কতব্যপন্নরূপ পলিশকর্মীদের জীবন নিয়ে এজাতীয় খেলা একাধিকবার সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও আজও পর্বন্ত এই দুঃসংগতকারী দমনের যথোচিত ব্যবস্থা হয় নি। লরী চালকরা পালিয়ে বাঁচতে পারে। অনেকই হয়ত বা লাইসেন্সবিহীন আইন অমান্যকারী। কিন্তু লরীর হিসাব তো মটর ভেঁকলসের আওতাই থাকে। পলিশ ইচ্ছে করলেই এই লরীমহলে সমাধিক দুঃভাবনা সৃষ্টি করে এ জাতীয় ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্ত না হয় তার সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সম্প্রতি ট্রাফিক পলিশের হাতে বঙ্গেরাজ্য দেওরাজ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ। কিন্তু বিজ্ঞমতাবে দুঃ-একজন পলিশের যেট

অহমস্বাস্ত যে যেট নয় তা সত্য-ই চিরন্তন ভট্টাচার্য এবং রামবিলাস রোডের ওপর আলোর দৃক্কন কনস্টেবলের (একজন আগেরস্বাস্ত ব্যবহার করেছিলেন। ঘটনা ৩০শে অক্টোবর) ওপর আক্রমণের ঘটনা থেকে সপ্রমাণিত হয়। এদের হাতেও আগেরস্বাস্ত ছিল, কিন্তু কাজ হয় নি।

কিন্তু কলিকাতা মহানগরী এবং দুঃ-পাল্লার রাস্তার ওপর এই খুনীবাঁহনীকে অবাধে আক্রোশ মেটাবার সুযোগ দিলে শুধু ট্রাফিক শৃঙ্খলাই নয়, সামাজিক শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়বে। লরী ট্যাক্সি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। অন্ধকারের অন্তরালে কালো টাকার খেলার এই অটমোবাইলবাঁহনী ঘোরতর মোবাইল।

অতঃপর এ বিষয়ে আরও কিছু কার্য-করী পস্থা গ্রহণের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য। স্পেশাল মোবাইল পলিশ স্কোয়াড গঠন করে দলবদ্ধভাবে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান শুরু করতে পারলে নিশ্চয়ই কার্যকরী কিছু ফলাফল করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে।

পূর্ণ রেশনিং

গত বৃহস্পতিবার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ মিছিল রাজভবনে এক স্মারকলিপি পেশ করে এসেছেন।

স্মারকলিপিতে বিবিধক রেশনিং এলাকার সমিহিত গ্রামাঞ্চলে ও সংশোধিত রেশনিং এলাকায় পূর্ণ রেশনিং চালু করার দাবি লিপিবদ্ধ ছিল।

বঙ্গদর্শনের পাতায় ইতিপূর্বে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরাও বলেছিলাম, যে পরিমাণ খাদ্য পড়ে, চুরি হয়, ভিন রাষ্ট্রে চোরাপথে চালান হয় এবং মজুতদারী দুর্নীতির গুদামে আঁধার চাপা হয়ে বাজার থেকে অদৃশ্য হয় সে পরিমাণ খাদ্য সরকারের ভান্ডারে যথার্থ জমা-বিলি হলে দেশের লোক উপোস করে মরত না। বঙ্গদর্শনের আলো-চনার বিভিন্ন জেলার শস্যাদি নষ্টের উপর-পরি উদাহরণ উদ্ধার করেও আমরা প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, প্রশাসনিক গলদে মঠভরা সোনার ফসল কেমনভাবে গোঁরী সেনী মালের মত প্রতি মহুর্তে অবাধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে এই অপচয় যে মানুষের মূখের অন্ন অনেকাংশেই কেড়ে নিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশেরও সুযোগ নেই।

পূর্ণ রেশনিং এলাকা কলকাতা মহা-নগরীর হোটেল রেস্তোরাঁর অবাধে কালিয়া কোপার সংগে ফ্রাইড রাইস ও বিরিয়ানী পরিবেশন চলছে। ওদিকে কলকাতা পৌর-অঞ্চল পার হলে হাড়ি ফোটাবার চলণ্ড মিলাছে না। এই আশ্চর্য বৈষম্য একই রাজ্যে কত অদ্ভুতের অদ্ভুত ফারাক সৃষ্টি করেছে।

মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে আর্থিক অসমতাব গোলাক পবে, দু'নিযাবাপী মন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সেটা বিধিসম্মত, আইন দ্বারা সুবিস্তৃত ব্যবস্থা। কিন্তু পকেটে পয়সা থাকে সন্তোষ দুই ব্যক্তির একজন খাদ্য রন্ধনের অধিকারী, অপর সে অধিকারে বঞ্চিত, এমন দু'ব্যবস্থা আর কোথাও আছে বলে শোনা যায় না।

বিধিবদ্ধ সংশোধিত পূর্ণ-অপূর্ণ প্রভৃতি রেশন ব্যবস্থা এতদেশীয় ভৈক্ষ্য।

এই হাস্যকর খাদ্যপরিবর্তিত অবিলম্বে অবসান না ঘটলে দেশব্যাপী এই নয়া অসাম্য এক ঘোরতর অবিচারের জন্মদান করবে—যাক জবাব কোনো যুক্তিতেই সিদ্ধ নয়, কোনো যুক্তির সাধ্যও নেই এই অসাম্যের পক্ষে সাফাই গার।

জলপাইগুড়ি :

স্কুল কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দ

.. “আলিপুরদুয়ার গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মারা মজুমদার পরিচালক-মণ্ডলীর বিবৃদ্ধি লড়াই করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। ঐ স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীকে বাতিল করিয়া আলিপুরদুয়ার এস-ডি-ও সবার্গার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পরিচালকমণ্ডলীর কার্যের প্রতিবাদ করার এবং তাহাদের নজরজনক আচরণের বিরোধিতা করার পরিচালকমণ্ডলী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে সাসপেন্ড করেন। কিন্তু শ্রীমতী মজুমদার সাসপেনশন অর্ডার না মানিয়া মামলা করেন। এতেই এস-ডি-ও মহোদয়ের হাতে স্কুল পরি-তাহদের নজরজনক আচরণের বিরোধিতা ১৫/১১/৫৫)।

উপরোক্ত সংবাদবিন্দুতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ দর্শন মিলবে। ইতি-পূর্বে ‘বঙ্গবর্শনে’ পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষা-নিকेतনগুলিতে দুর্নীতির আড়ং সৃষ্টি হইলে এই মর্মে আমরা আলোচনা রেখে-ছিলাম। জলপাইগুড়ির উপরোক্ত সংবাদ আর একটি নজীর হাজির করিল।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বহু স্কুলের কতৃপক্ষের বিরুদ্ধেই স্বতন্ত্রাচার দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, স্কুল ফান্ড তহবুদ এবং মহিলা বিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন কতৃপক্ষের অন্যায় এক হামেশা ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। উপযুক্ত ওয়াকি-বহাল মহল জানেন, কেমনভাবে দরিদ্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর কতৃপক্ষ অবাধ মালিকানার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। মালিক-সেক্টোরীর খুশির ছন্দে কদম মেলাতে না পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে চাকরী বজায় রাখা তো অসম্ভব ব্যাপার, বহুক্ষেত্রে তাঁদের দৈনিক আখ্যাত ও বাচনিক অবমাননার সম্মুখীনও হতে হয়।

মাসের পর মাস মাহিনা বাকি ফেলে এবং এক অন্ধ এ্যাকুইটাস রোলে লিখিয়ে

নিয়মে অপর অন্ধ গ্রহণ করতে বাধ্য কবে পরিচালকমণ্ডলী শিক্ষকদের ওপর অবাধ-অত্যাচার চালিয়ে গেছেন এমন উদাহরণও অল্প নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীর কর্মে বিঘ্নসৃষ্টিকারী স্বাধীনচেতা ন্যায়-পরায়ণ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদেরও অসহিষসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শেষে উত্তম শিক্ষক স্কুল ছেড়ে পলায়ন করে মান রক্ষা করেন। অযোগ্য বংশব্দ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে কার্যত স্কুলের ডি ফ্যাক্টো ডিক্টেটর কবে পরিচালকমণ্ডলী স্কুল পরি-চালনায় আপনাদের দুর্ভাগ্যবশিষ্ট চর্চাভাষ্য করে নেন।

এ সমস্ত ঘটনা এতো ব্যাপক যে, বিশেষ উদাহরণের প্রয়োজন করে না। ডি-আই মহো-দয়ের কাছে খোঁজ-খবর করলেই জানা যাবে, শিক্ষা-নিকेतনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ আজও মধ্যযুগীয় দলাদলি এবং গ্রাম্য নীচতার কুক্ষি-গত হয়ে আছে। অথচ পূর্বে স্বল্প ক্ষেত্রেই পরিচালকমণ্ডলীর বিবৃদ্ধি কতিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। কেন না শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-দের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট বিধি-ব্যবস্থার অভাব।

পরিচালকমণ্ডলী কয়েকটি সাজানো প্রমাণ দেখিয়ে নোটিশ করে অথবা বিনা নোটিশেই শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরী খতমের মালিক অঙ্ক এ দেশের অধিকাংশ স্কুলেই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। তন্মত মূল ক্ষমতা পরিচালক-মণ্ডলীর ওপরই ন্যস্ত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলির বিবৃদ্ধি মৈনিক হাজারো অভিযোগ ডাকবোলে চালাচালি হচ্ছে। এবং এ সমস্ত অভিযোগই স্বয়ং ডি-পি-আই বাহাদুরের নজর ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ভালো আশ্চর্য হতে হয়, সবকারে যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরী অনুমোদনের কার্যত অধিকারী, চাকরী থেকে বরখাস্ত করার অধিকার সেখানে স্কুল পরিচালকমণ্ডলীর প্রস্তাবনির্ভর হয়ে থাকে কেন। এ'বা স্কুলের সাময়িক ভাগ্যবিধাতা। এ'দেব কার্যকলাপে স্কুলের প্রতি সভ্যকার দব্দ স্বল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু যে শিক্ষকমণ্ডলী স্কুলের সঙ্গে আজীবন জড়িত থাকবেন তাঁদের ওপর খবর-দারির এমন ঢালাও ব্যবস্থা এই সাময়িক পরিচালকমণ্ডলীর ওপর ন্যস্ত থাকবে কেন।

স্কুল বোর্ড এবং ডি-পি-আই-এব-পূর্বে অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং স্কুল বোর্ডে পূর্বাঙ্কে বিচার অনুষ্ঠান না করে পরিচালক-মণ্ডলী যে-কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।

কিন্তু স্কুল বোর্ড বা ডি-পি-আই-এব অনুমোদন না-পাওয়া পর্যন্ত যদি শিক্ষকগণেব চাকরী খতম করা বা তাঁদের সাসপেন্ড করার অধিকার পরিচালকমণ্ডলীর হাতে না-থাকত, তবে তাঁরা শিক্ষকমহলে ভীতিসঞ্চারের সুযোগ পেতেন না।

স্কুল বোর্ডের আপীল কমিটির মত একটা বিচারকমণ্ডলীর কাছে পূর্বাঙ্কে সমগ্র ঘটনার বিচার হওয়া দরকার। তাঁদের বিচার অনুসারে কোনোও শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তার পবেই পরি-চালকমণ্ডলী ব্যবহার করতে পাববেন, এজাতীয় নিয়ম থাকলে শিক্ষকসকলের ওপর পরিচালক-মণ্ডলী যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পেতেন না, শিক্ষকগণও তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ পেতেন।

আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুলের ন্যায়া বহু স্কুলেই গোলমাল দানা বাঁধলে কমিটি বাতিল করে এ্যাজমিনিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু স্কুলের প্রধান সন্তুষ্টরূপ শিক্ষকগণের ওপর পরিচালকমণ্ডলীর অবাধ ক্ষমতা না থাকলে শিক্ষালয়ঘটিত গোলমালও যে অনেকাংশেই কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত যে আলোচনার সূত্রপাত করা হ'ল সে আলোচনার প্রতি এবং শিক্ষা-নিকेतন থেকে অবিলম্বে দুর্নীতি অপসারণের অন্যতর পন্থা হিসেবে আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের প্রতি উপযুক্ত কতৃপক্ষের সহদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

চব্বিশ পরগনা :

খাদ্য ফ্রন্টে ব্যাপক আক্রমণ

ব্যাপকভাবে বসিরহাট, হাসানাবাদ ও সন্দেশখালিবে ক্ষেতগুলি আক্রান্ত হয়েছে বলে সংবাদ।

লক্ষ লক্ষ পামরী পোকা হাজার হাজার বিঘা জমিবে ফসল অবাধে ভক্ষণ করে যাচ্ছে, কেন না আমাদের পোকারিবোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দোষ দিবেছে গলদ এবং আশংকা দেখা দিবেছে খাদ্য ফ্রন্টে বিবাত ক্ষতির। আমাদের রাসায়নিক কীটনাশক অপ্রাদিগ্ধ গঠনপক্ষ পোকা পল্টন নিধনে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রকাশ।

এমতাবস্থায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে হোলিকটপ-বেগে আক্রমণ চালাবার জন্য অনুবোধ যাচ্ছে সবকবের কাছে। তাঁদের বক্তব্য, পামরী পোকাবা রীতিমত হানাদাবা ভূমিকা গ্রহণ কবায় এক ক্ষেত্রে কীটনাশক গুড়া ছড়ালে তাবা অপর ক্ষেত্রে আগ্রস গ্রহণ করে শ্বিগুণ আক্রোশে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সর্বাংশে পোকা নিধন কবতে হলে অস্তবীক থেকে হেঁচি বর্ষং

লম্বা হটন

বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কবিয়া অধিকতর স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-মেহী হটন। হিম্মিতে বিশেষ বিবরণ পাইবেন।

283, Azad Market, (W.B.C.) Delhi-4



ওপন ওয়ান্ডা

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新

形勢任務

9448

সাধক বিদ্যাবী যতীন্দ্রনাথ পূর্ণানন্দ নাথ মুদ্রাসাধ্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বীরেন বেনিন সামসুদকে হত্যা করেন, তার তিনদিন बादেই—১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি—সলিত চক্রবর্তীর স্বাক্ষরোক্ত ও সামসুদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যতীন্দ্রনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ২৭৬ আপার টিৎপদর ড্রাডেন বাড়ি থেকে।

হাকিম মরে তো হুকুম মরে গা।

স্নাত জেগে যতীন্দ্রনাথ তার এক মামাকে সেবা করতে ব্যস্ত। বীরেন এর চারদিন আগেও যতীন্দ্রনাথের পাশে বসে এই মামার শ্রদ্ধা করে গিয়েছেন। এদিনও অন্য দু-একজন সহকর্মী উপস্থিত। এমন সময় গভীর বাতের অতিথিরা এসে হাজির।

ওয়ালেট দেখতেই যতীন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। বেন বললেন, “মিথ্যা প্রচেষ্টা করছ তোমরা। কোনও অভিযোগেই আমার জড়িতে পারবে না।”

তম তম করে তন্মাস করেও আপত্তি-কর কিছুই হাদিস যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে পাওয়া গেল না। সতীশ সরকার ও অন্য দু-একজন শিষ্য সবকিছুই সবিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ইতিপূর্বে।

‘The Scheme and Form of the Vililance Committee’ নামে যতীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ শ্রদ্ধা পাওয়া গেল। সেটাই হস্তগত করল টেগার্ট-সাহেব ও তার সাঙ্গপাঙ্গ।

যতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের বিপোর্ট বেরিয়ে গেল ত্রিঅবিলের ধর্ম সান্তাহিকে। সেই-সঙ্গে লেখা হল, “৫৯নং বেলটেলো লেন হইতে যতীন্দ্রবাবুর মামাবাবু অনাথবাবু চট্টোপাধ্যায়কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। অনাথবাবু আলিপুর বোমাব মামলায় প্রদর্শিত চিঠিপত্রাদি অনুবাদ করিবার জন্য গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ হাই কোর্টেও উকিল কিশোরীলাল সরকারের বাটীও তন্মাসী হইয়াছে। তথ্য গ্রেপ্তারীও হইয়াছে কিন্তু পুলিশ কিছুই প্রকাশ হইতে দেয় নাই। ১০৭নং আমহার্ট স্ট্রীটস্থ ছাত্রাবাসটিও তন্মাসী হইয়াছে।... বীরেন্দ্র নাকি এই ছাত্রাবাসে বাস করিত। কলকাতার হইতে উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাহার মৃদুরিকে গ্রেপ্তার

* ১৯২০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর

উপলক্ষে স্বাক্ষরিত যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার একটি প্রবন্ধে দেখি, যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ভয়ে উত্তেজনার টেগার্ট সাহেব এতই উতলা হয়ে পড়েছিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে হোট্ট থেকে পড়ে যান; তাড়াতাড়ি, সৌজন্যে নিখুঁত যতীন্দ্রনাথ সাহেবকে তুলে ধরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, “Sorry, Mr. I” সাহেবের সারা মুখ ভরে বাঙা হয়ে ওঠে।

—পূর্ণানন্দনাথ

করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছে। পুলিশের সন্দেহ, তাহারা সামসুদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন।”

ইতিপূর্বে, ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে ললিতবাবুর বাড়ি তন্মাসী হওয়া সম্বন্ধে ‘ধর্ম’ লিখেছিল, “গত ৩০শে নভেম্বর প্রাতঃ-কালে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ গুপ্ত ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রসিদ্ধ কর্মচারী সামসুদ আলম একদল পুলিশ সহিয়া কলকাতার উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি ঘেবাও করেন। তন্মাসী পত্রওয়ানা দেখাইয়া তাহারা তাহাদের কার্য আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে ভগবান চিরকালই অশ্রম্ভাই লিখিয়া রাখিয়াছেন দেখিতেছি। কয়েকখানা চিঠি, একখানি পত্রাবলী পত্রিকা পুলিশ সহিয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ‘আর্থ কেমিকাল ওয়ার্কস’-এর বাড়িটিও পুলিশ তন্মাসী করে।* তথ্যের জড়তা কালি, লিখিবার কালি, তরল আলতা এইরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। পুলিশের কি সন্দেহ হয় বা না হয় তাহা বলিয়া বিচার করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে কাচের কিছু বস্তাদি পুলিশ হস্তগত করিয়াছে।...”

যতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের কথেকদিন পর।

বহুদৈব স্বীকৃতি গোয়েন্দা অফিসে যতীন্দ্রনাথকে আনা হইয়াছে। অতীত, স্নান বিশ্রামে বিন্দিত মহানাসকের মুখ থেকে সামান্যতম জ্বলন্ত স্নানায়ের সবপ্রকার প্রচেষ্টার ব্যর্থ হইয়াছে বর্বর বিদেশী পুলিশ। ছদ্ম, বল, কৌশল সবই পবাস্ত হইয়াছে।

যে-যতীন্দ্রনাথের স্নেহজন প্রফুল্ল চাকী রেখে গেলেন আত্মত্যাগের নিশ্চয়ন, চারু বসু দেখিয়ে গেলেন বীরবীর দৃষ্টান্ত, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত দেখালেন সহনশীলতার উদাহরণ—সেই নেতা যে কী ধাতু দিয়ে গড়া, তা বিদেশী পুলিশের কল্পনারও অতীত বৃদ্ধি।

তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে স্পষ্ট তারা বুঝেছে ত্রিঅবিলের পবেই Treaster-mind বলতে, সুদূর-প্রসারী সুক্ষ্মদৃষ্টিতে অধিকারী একজনে নেতা বলতে এই একজনই আছেন এ-দেশে। অথচ কিছুতেই আইনের প্যাঁচে বাঁধা পড়ছেন না ইনি।

* সম্মুখ থাকতে পারে, এখানেই বিপ্লবীদের প্রথম বোমা প্রস্তুত করেন বিজুতি চক্রবর্তী, ১৯০৫-সালে।

—পূর্ণানন্দনাথ

জাই রয়েড স্ট্রীটে নতুন অপটেশ্যর শেরা নিল গোয়েন্দা বিভাগ।

অদৃষ্টের পরিহাস। চারদিন অতীত রাখবার পর, চারদিন যতীন্দ্রনাথ জলস্পর্শ না করবার পর, এক ইংরেজ অফিসার ভাবল প্রলোভনের পথে এবার যতীন্দ্রনাথকে আয়ত্ত করা হয়তো যাবে।

ঘনিষ্ঠতার নিবিড় হাথে অফিসারটি বলল, “Mukherjee, perhaps you get young beantie: and whiskies?”

মহানাসক যতীন্দ্রনাথের মত লোকাকুর চেতনার সাধকের সমীপে ইংরেজের বাধল না নিজের সারমেশমূলক মনোবৃত্তি প্রকাশ করতে।

দূর্বিনীত ইংরেজের মুদ্রতা আর স্পর্শ দেখে আগুন জ্বলে উঠল যতীন্দ্রনাথের আয়তনে। অফিসারটি শ্বিতীষবার তাব প্রস্তাবটি উচ্চারণ করা মাত্র, বারুদের স্তূপে আগুন লাগবার মতই, পলকে বিস্ফোরণ ঘটল বেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দিয়ে সামনের টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘৃষি বাসিয়ে দিয়ে অপারিসমীম ক্রোধ আর ভবসনায় হৃদস্পর্শ দিয়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ, “Shut up... nonsense!”

সেই রক্ত অটনন্দে গোটা গোয়েন্দা অফিস কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল দূত বিপ্লবী-দের অন্তর, মহানাসকের উপস্থিতি এইভাবে ঘোষিত হওয়ায়। কেঁপে উঠল সমবেত অফিসারদেরও মন।

আর, যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীরা (যাদের অনেকেই তখন বন্দী হইবে বয়েড স্ট্রীটের গোয়েন্দা অফিসে নীত হইয়াছিলেন) বলেন—যতীন্দ্রনাথের সেই প্রচণ্ড মৃদুত্যাগে সশব্দে ফেটে গেল গোয়েন্দা অফিসের কাঠের টেবিলটাব পদ্ব তক্তা।

অফিসারেরা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল যে, এই মৃদুটির আঘাতেই শ্বিতীষ-ভিত হইয়াছে রয়াল বেংগল টাইগারের কুলীশ-কঠিন শ্বালি, এই মৃদুটির আঘাতেই একাধিকবার কুলীশিত হইয়াছে জাতি-বর্ণ নিবিশেষে অগণিত অত্যাচারীর উন্মত্ত শির, এই মৃদুটির আঘাতকেই সবচেয়ে বোঁশ ভয় করে চলে ভারতের বিদেশী সরকার।

দীর্ঘকাল অনাহবে, অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচারেও যে-লোকের মৃদুতে এত জোড়, তাঁকে ঘাঁটানোব পবিণাম স্মরণ কবে নিবস্ত হই গোয়েন্দা অফিসের ক্ষীণজীবী অফিসারেরা।

নির্জন কারাগারে বিচারামীন যতীন্দ্রনাথকে নিষে যাওয়া হল।

সেদিন ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ সাল। চারদিন হাজত-বাসের পব পুলিশের জ্ঞান এসে থামল হাওড়া জেলে।

সশস্ত্র প্রহরী নামল জ্ঞান থেকে। দরজা খুলে দিল। নামলেন পরাধীন বিপ্লব এই দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত পদদলিত মানুষের মস্তি-সাধক যতীন্দ্রনাথ। মহানাসক।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব থেকে শ্রদ্ধা করে কাবাগারের নিশ্চয়ন কর্ম-চারী পর্যন্ত চরে দেখেন সুদূর-কান্তি সৌম্য-দর্শন এই কিস্বদন্তীর নায়ককে। উদাস

সম্মানস্বরূপে মৃত আকাশচুম্বী জহাঙ্গীর আলীকে
নেত্রে নিম্নলিখিত প্রশংসিত। প্রতি পক্ষকে শান্ত
সুদৃঢ় আত্মনির্ভরশীলতা।

তখন সখ্যা হয়ে এসেছে।

নিয়ম অনুযায়ী জেলায় বতীন্দ্রনাথকে
সামান্য পোশাক বেখে আর সব পরিধের খুলে
ফেলতে অনুরোধ করলেন। তারপর, তিনি
স্বয়ং পরীক্ষা কবলেন কানুন-মাসিক সর্বাধিক
সম্পন্ন হয়েছে কিনা।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল—বতীন্দ্রনাথের
গলায় সুতো-বাঁধা কি-একটা কলছে।
সুপারিন্টেন্ডেন্টও এগিয়ে এলেন। তিনি
বোঁকে বসলেনঃ উহু! ওটা খুলে ফেলতে
হবে। ইন্ডিয়ান কুী না কী তুতাক ওতে
আছে, কে জানে? ওটা খুলতেই হবে।

বতীন্দ্রনাথ ধীরবশে বললেন—ওতে
তুতাক কিছুই নেই। ওটা তাঁর গুদুর
দেওয়া বস্ত্রাঙ্কুর মালা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
বিলোপ-সঙ্কম কোনও বিস্ফোরক বস্তু ওতে
পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কুসংস্কারাঙ্কুর সাহেবের মন নারাজ
হল। ওই কালো ম্যাজিক নিয়ে জেলে ঢোকা
চলবে না।

বতীন্দ্রনাথেরও কথাব নড়চড় নেইঃ প্রাণ
থাকতে এ-মালা তিনি কাছছাড়া করবেন না।
জ্বরবস্ত্রের দরকার হলে তা-ও শিখ-পা
হবেন না।*

“বটে? এতখানি স্পর্শ?” জেলার
কয়েকটা সেপাইকে ডেকে আনলেন। “জোর
করে ওই মালা কেড়ে নাও। নষ্ট করে
ফেল!”

অভিস্ত দশাই সেপাইবা এগিয়ে যায়।
কিন্তু তাঁর গাত্রস্পর্শ করা-মাত্র আবার রক্ত-
মুর্তি ধারণ কবলেন তিনি। ভয়ঙ্কর
ভিন্নকরের সঙ্গে এক ধাক্কার নিজেই ছাড়িয়ে
নিলেন তিনি।

লৌহভীমের মত কঠোর প্রতিবাদে তাঁর
সারা দেহের পেশী কুলে উঠল ধবে ধবে।
রোবস্ত্র বদন দেখে জেলার কপালে রাতিমত
স্বপ্নের সঞ্চার হল।

সুন্দর-কাণ্ডিত সৌম্যদর্শন ওই বৃদ্ধের
চোখের কী কবে আত্মগোপন করে থাকতে
পাবে এত আগুন, আত্মগোপন কবে থাকতে
পারে এমন নিখুঁত এক লৌহমানব—ভেবে
পেলেন না জেলের কর্তৃপক্ষ।

এক গোরেন্স-অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্টকে
কি যেন পরামর্শ দিলেন চাপি চাপি।
বেগতিক বৃদ্ধ, ওই রক্তাঙ্কুর মালা-সমেতই
বতীন্দ্রনাথকে প্রবেশাধিকার দিতে হল।
নির্জন সেল-এ স্থান হল তাঁর।

ওদিকে, বীরেন দত্তগুপ্তের ওপরে চলেছে
অমানুষিক অত্যাচার। দিনের পব দিন,

* বতীন্দ্রনাথের দেহাবসানের ক্ষেত্রেও
দেখা যায় তাঁর কঠোর শোভা পাচ্ছে ওই
রক্তাঙ্কুর। —প্লেদীন্দ্রনাথ

রাতের পর রাত-গৈশাচিক পীড়ন আর-দুর্জ-
প্রলোভনের টানা-পাড়েই বিক্ষুব্ধ করে তুলছে
পুলিশ অবস্থায় প্রতিটি বিপ্লবীর মন।

শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত ‘ধর্ম’ সাম্প্রতিক
(২৫শে মার্চ, ১৩১৫) লিখছে, “নড়পুটী
সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলবী সামস-উল আলম
খাঁ বাহাদুরের হত্যাপর্যন্তে অভিযুক্ত শ্রীমান
বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তকে গত ১লা (ফেব্রুয়ারি)
তারিখে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মহাশয়
ও পাঁচজন ইউরোপীয় ও চারজন দেশীয়
লোক গঠিত একটি বিশেষ জুরির সম্মুখে
বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল।...
প্রধান বিচারপতিব অনুরোধানুসারে শ্রীমান
নিশীথচন্দ্র সেন বীরেনের পক্ষে উপস্থিত
হইয়াছিলেন।

“বীরেন্দ্র যখন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ডকে
প্রবেশ করিল তখন তাহার মুখে শান্ত,
উৎসাহময় ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল।
তাহার পা নগ্ন, পরিধানে একখানি ধূতি ও
গায়ের একখানি আলোমান ছিল। আদালত-
গৃহ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলটেনের কর্তৃত্বাধীনে
পুলিশ কর্তৃক বিশেষভাবে সুরক্ষিত হইয়া-
ছিল।

“সর্বপ্রথমে সরকারের কেরানী অভিযোগ-
লিপি পাঠ করেন—আসামী তৎপ্রতি নিভাস্ত
ওদাসীনা দেখাইবা নিরস্তরই ছিল। তৎপরে
মিঃ সেন উঠিয়া বলেন যে, আসামীর নিকট
তিনি পরামর্শদি চাহিয়া পঠান তাহাতে
আসামী বলে যে, তাহার উকিলের কোন
প্রয়োজন নাই, সে দোষ স্বীকারই করিবে।
এরূপ স্থলে, মিঃ সেন বলেন যে, তিনি
আসামীর পক্ষ হইয়া এইটুকু মাত্র বলিতে
পারেন যে, আসামীর মস্তিষ্ক সুস্থ
অবস্থাতেই গ্রহিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা
হউক—কী অভিপ্রায়ে যে আসামী এই কার্য
করিয়াছে তাহা নিম্ন আদালতের শুনানী
হইতে কিছুই স্থির করা বাইতেছে ন।

“ইহার পর প্রধান বিচারপতি আসামীকে
আহ্বান করিয়া বলেন : বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত,
তোমার পক্ষ হইয়া এই আদালতে উপস্থিত
হইতে আমি কৌন্সিলকে অনুরোধ কবিবাহি,
মিঃ সেন দবা করিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়া-
ছেন। তুমি ইহাতে রাজী আছ?

“বীরেন্দ্র ইহাতে কোন প্রত্যুত্তর দেন না।
তাহাকে বাংলা করিয়া বুদ্ধাইবা দিলে সে
বলে : না মহাশয়, আমাৰ কোন কাউন্সিলের
প্রয়োজন নাই।

“মিঃ সেনকে প্রধান বিচারপতি ধন্যবাদ
প্রদান করেন ও তৎপরে মিঃ আলি ইমাম
বলেন যে, আসামী ত নিজ দোষ স্বীকার
করিয়াছে, বিচারপতি মহাশয় তাহাকে প্রথমে
নির্দেশী ধরিয়াই বিচার করিতে চাহেন
কিনা তাহা তিনি জানেন না; ইহাতে বিচার-
পতি মহাশয় বলেন যে, আসামী নিজ দোষ
স্বীকার করিলেও সরকার পক্ষকে প্রমাণ
উপস্থিত করিতে হইবে। ইহার পর আলি

ইমাম, মোকদ্দমার মূখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করেন ও
তৎপরে সাক্ষী সকলের জবানবন্দী গ্রহণ করা
হয়। সরকারের পক্ষ শেষ করিলে বিচারপতি
মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন আসামী কি কিছু
বলিতে চাহ; সে বলে—না।

“ইহার পর জুরির নিকট বিচারপতি
মহাশয় সকল কথা সংক্ষেপে উপস্থিত করেন
এবং আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য কেহই
ছিল না, এমন কি তাহাকে অনুরোধ করিলেও
সে স্ব-ইচ্ছায় কোন সমর্থনই চাহে নাই উক্তন্য
তিনি দৃষ্টপ্রকাশ করেন।...

“জুরি একবাক্যে বীরেন্দ্রকে দোষী বলিয়া
নির্দেশ করে। তৎপরে বিচারপতি মহাশয়
তাহার প্রাণদণ্ডদেশ দিতে বাইয়া বলেন :
বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, জুরির এক সিদ্ধান্তক্রমে
তুমি মৌলবী সামস-উল-আলমের হত্যার
অপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছ এবং
আদালতের দণ্ডদেশ এই যে, যে স্থান হইতে
তুমি আসিয়াছ এস্থান হইতে তোমার তথায়
লইয়া যাওয়া হইবে ও তৎপরে সে-স্থান
হইতে তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া
হইবে এবং সেখানে যে পর্বন্ত তোমার মৃত্যু
না হয় সে পর্বন্ত গলদেশে রম্ভা যারা
তোমাকে লম্বমান কবিবা রাখা হইবে।

“বীরেন্দ্র এই দণ্ডদেশে অতি শান্তচিত্তেই
পরিগ্রহণ করিয়াছে, সে সর্বদাই প্রফুল্ল ও
হাসিমুখে ছিল। বিচারের পূর্বে অপরাধী-
দিগের গম্যস্থানের অবস্থিতিকালে বীরেন্দ্র
কচুরী, সন্দেশ ও বসগোলা খাইবার ইচ্ছা
প্রকাশ করিয়াছিল। ডেপুটী কমিশনার মিঃ
টেগার্টকে এ সম্বাদ জানান হইলে তিনি
বলেন যে, আসামী বাহা খাইতে চান তাহা
বেন তাঁহকে দেওয়া হয়—তাহার আদেশ
কার্য পরিণত করা হয়। বীরেন্দ্রকে হাই-
কোর্ট হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া
হয়। তথায়ই তাহার ফাঁসী হইবে।”

ইতিমধ্যে, ৩১শে জানুয়ারি তারিখে
বতীন্দ্রনাথ, তাঁর দুই মামা—নদীরার মহা-
রাজার কলকাতাধি প্রতিনিধি অনাথবন্দু
চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের উকিল ও আইন
কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়,
—ললিতবাবুর মূহুরি নিবারণ মজুমদার,
প্রোসিউটর কলেজের B. C. ক্লাসের ছাত্র
জ্ঞান মিত্র, কৃষ্ণনগরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মজুমদার
(হাইকোর্টের উকিল কিশোরীলাল সবকারের
বাড়িতে ইনি থাকতেন)—পরে আনন্দবাজার
পত্রিকা প্রকাশ করেন) প্রভৃতিগণে সামসুল
আলমের হত্যার অভিযোগে পুলিস কমিশনার
মিঃ হ্যালিডের কাছে উপস্থিত করা হয়।

অনাথবাবুকে ১০০০ টাকার জামিনে ও
যখনই পুলিস ডাকবে হাজির হবেন—এই
শর্তে বালাস দেওয়া হয়। জ্ঞান মিত্রের
বাবাও জেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বরবান হবেন
এই অপেক্ষায় তাঁকে ছাড়িয়ে আনলেন;
জেলের বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ ছিল না।

বতী প্রদীপ প্রদীপ জগৎ চারিজনকে
জনের অভিযোগ হইতে খালাস দেওয়া
হইয়াছে। কিন্তু নেতারা ডাকাতিতে লিপ্ত
থাকা অভিযোগে বিচারের জন্য তাঁহারা
হাওড়ার প্রেরিত হইয়াছেন। সেদিন শিবপদ
হইতে যে পাঁচজন গ্রেপ্তার হইয়াছেন*
তাঁহাদিগের সহিত ইহাদের চারিজনকে
বিচার হাওড়ার জেলেট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ
স্মিথের নিকট হইবে।†

১৯১০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি, শনি-
বার। বতীন্দ্রনাথ, ললিত চট্টোপাধ্যায়,
লিবারেল মজুমদার ও সুব্রহ্মণ্য মজুমদারের
শিবরম্বে দণ্ডবিধির ৪০০ ধারা অনুসারে
রাজনীতিক ডাকাতির যে অভিযোগ উপ-
স্থাপিত হইয়াছে, হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট
এইচ. টি. এস. ফরেষ্টার আদালতে ঐ
সামান্য শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। আলি-
পুরের উকিল শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সরকার পক্ষে, এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাইন,
শ্রীযুক্ত চাবুচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ
পাইন আসামীরপক্ষে পক্ষে মোকদ্দমা পরি-
চালনা করিতেছেন।...

“ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এই মোকদ্দমা হাই-
কোর্টের দ্বারা আদালতে বিচার, নতুন
ক্রাইমস্ অ্যাক্ট অনুসারে বিচার হইবে।...
সম্ভবত পুলিশ সমস্ত শেষ হইবার পূর্বে
বিচার বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ হইবে না।”
ফাঁসীর হুকুমের পর অকম্পিত চবে
অবিচলিত চিত্তে বীরেন নেমে এলেন কাঠ-
গড়া থেকে। অত্যাচার, প্রলোভন, ধোঁসা-
মোদ, শাসন—কোন কিছুতেই পুলিশ তাঁর
মুখ খোলাতে পারল না।

কিন্তু আরেকটা বাঙালী তরুণের কাঁচা
প্রাণ নষ্ট করে তো আর গোটা দেশের
বিশ্ব প্রচেষ্টাকে অবরোধ করা যাবে না।
ফাঁসী তো অনেকে গেল। স্বাধীনতারও কম-
জন বাধা নি।

বীরেনকে তাই রাজসাক্ষী দাঁড় করানোর
আশ্রয় প্রচেষ্টার নামক পদক্ষেপ।

কিন্তু, উপায় কী? দুর্দান্ত বেপারোয়া
হলে। মরবে শূনে হাসে। দারুণ তেঁতাল
কাঁড় হয়ে জল চেয়েছে—গোলান-ভরতি প্রভাব
ধরে দেওয়া হচ্ছে; দাঁতে দাঁত চেপে বাঁসে
ধাকছে। একটু নরম হচ্ছে না। যেমন গুরু
তার তেমন চোকা।

বীরেনের গায়ের জ্বর। একটু কিম্ব
এসেছে। একজন পুলিশ অফিসার জেল
অফিসার সঙ্গে নিয়ে তার নিজের সেল-এ
গিয়ে দেখা করে। এবার তারা নিল ছলনাব
পথ।

* ননীগোপাল সেনগুপ্ত, ছবন
মুখার্জী ও তাঁর ভাই ভৌতন, মোগেশ-
চন্দ্র মিত্র এবং বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ॥

† সাপ্তাহিক ‘ধর্ম’ (২৫শে মার্চ, ১০১৬) ॥

* সাপ্তাহিক ‘ধর্ম’ (১ই ফাল্গুন, ১০১৬) ॥

“আমি যে বোচারা এত কষ্ট করছি সে-
দেশের উল্লেখ ভবিষ্যতের কথা ভেবে, সেই
দেশের বিশবী নেতারা কি না একে বিশ্বাস-
ঘাতক, দেশদ্রোহী, কুলাঙ্গার আখ্যায় ভূষিত
করছেন?”—অফিসার ক্রিম সহানুভূতিতে
মুখর হয়ে ওঠে।

জেল অফিসার কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন
করেন, “তাই নাকি?” বিশ্ববীরেন ভেতরের
খবর অনেক-কিছুই আপনি সংগ্রহ করেছেন
দেখছি?”

“সংগ্রহ করছি মানে? এই দেখুন।
বিশ্ববীরেন ইস্তাহার। তাদের সমস্ত পরিবার
এই ইস্তাহার ছেপে বিলি করা হচ্ছে—”
বলে বীরেনের বাত চোখে পড়ে, এইভাবে
নতুন পর্বীর ‘অদ্বান্তর’-এর একটি নকল কপি
মলে ধরলেন ভুললোক। কপিটি এ’বাই
ছাপিয়ে নিষেধে কাজ হাসিল করার জন্যে।

তার প্রতিটি ছত্রে বীরেনের প্রতি কী
ঘনাই না প্রকাশ পেয়েছে। বড় বড় হরকে
তাঁর নামে অজ্ঞান নিদ্রাবাদ বেরিয়েছে। তিনি
নাকি কাপড়ব, দেশদ্রোহী!

“আদালতে বিচারের সময় আমার পক্ষ
সমর্থনের জন্যে দাদা কি একজন ব্যারিস্টার-
কেও পাঠাতে পারবেন না? দাদাও কি তবে
তাঁকে বিশ্বাসঘাতক “মনে কবেন?...”
বীরেনের মনে সন্দেহের দোলা লাগল। তাঁর
চোখের সামনে থেকে নিভে গেল জগতের সব
আলো, সমস্ত আশা, সমস্ত তাৎপর্য।

প্রগাঢ় আঘাতে, ভরাট নিবাসীর বীরেন
মুহমান!

অফিসারটি ফেড়ন দিল, “দেখলেন তো
ভায়া, কী ধরনের স্বার্থপর এই বিশ্ববীরী?
বোচারার কাঁচা বরেন। কী দাগাটাই না দিলেছে
এঁকে—”

বীরেন জানে না বতীন্দ্রনাথও ধরা
পড়েছেন। হঠাৎ সে উত্তোজিত হয়ে বলে
ফেলে, “না, না। এঁদের মধ্যে সবাইকে আপনি
স্বার্থপর বলতে পারেন না। ‘দাদা’ অন্তত
আমার শত অপরাধ চিরকাল ক্ষমা করবেন।
তিনি অন্তত আমার ধৃণ করেন না, বিশ্বাস-
ঘাতক বলে মনে করেন না। তাঁর ভালবাসা
থেকে কক্ষণো তিনি আমার বিজিত করবেন
না।”

“তাই নাকি? এমন লোকও এই ডাকাতি-
দেব দলে থাকতে পারে?” ভাণ করে
অফিসারটি ইশ্বন জোগায়।

হিতাহিত চেতনাতুই বীরেনের অবশ হয়ে
গিয়েছে তখন প্রবল দুঃখের বজ্রাঘাতে। তিনি
ভুলে যান মন্ত্রগুপ্তির শপথ। গর্জন করে
শোনান তিনি গুরুর মহিমা—“বতীন্দ্রনাথকে
আপনারা চেনেন না তাই। বাংলায় বাধ তিনি,
আমাদের জীবন-মরণের হত্যাকর্তা, দেব-
তুল্য—”

“ওঃ, বতীন্দ্র মুখার্জী?” অর্থপূর্ণ হাসি
হেসে মন্তব্য করেন অফিসার, “তবে আর

বলতে হবে না। তাঁকে তো খাঁচায় পুরে
ফেলেছি। সবকথা ফাঁস করে দিয়েছেন। কাল-
পরশুই বোম্বের রাজসাক্ষী হবেন। তিনিই
তো তোমার সবচেয়ে নিষেধ করলেন—বললেন,
একেবারে অপদার্থ ছেলেটো, সব অনর্থের মূল!”

নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ অশ্বকারে শেষ আলোক-
বর্তিকাতুই নিভে গেল হতাশাব কাল-
বৈশাখীতে। কামাখ বৃজে এল বীরেনের
কণ্ঠ, “সে কী? দাদা? বতীন্দ্রনাথ ধরা
পড়েছেন? তাঁর অনুমতি নিবেই যে আমি
সামসুলকে হত্যা করতে এলাম—”

দেশপ্রেমিকের দুর্বলতাব এই সুযোগ
নিরে চরম অস্ত্র প্রয়োগ কবল পদক্ষেপ
মরিয়া হবে বীরেন একের পল এক দাঁত
স্বীকারোক্তিতে সবকথা বলে দিলেন।

১০১৬ সালের ১৬ই ফাল্গুন (২৮শে
ফেব্রুয়ারি) তারিখের সাপ্তাহিক ‘ধর্ম’
লিখেছে:

“করেকদিন হইল শোনা গিয়াছিল যে,
বীরেন্দ্র পুলিশের নিকট আবও অনেক
ব্যক্তিকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত করিয়া জব-
বন্দী দিয়াছিল। বীরেন্দ্রের ফাঁসিবি কিছু পূর্বে
কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সে সেই উক্তি
শুনায় কবে।

* “গত ৭ই ফাল্গুন* শনিবার রাত্রি
আলমের হত্যা উপলক্ষে ধৃত বতীন্দ্রের
আত্মীয়গণ সংবাদ পান যে, বতীন্দ্রকে রবিবার
দিন প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া
যাওয়া হইবে এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের
জন্য একজন ব্যাবিস্তার উপস্থিত হইলে ভাল
হয়।

“সেই অনুযায়ী গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার
প্রাতঃকালে তাঁহার আত্মীয়গণ একজন উকিল
ও ব্যাবিস্তার জে. এন. রায়কে সঙ্গে করিয়া
জেলে উপস্থিত হন। জেলেই চীফ প্রেসি-
ডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো কোর্ট
করিতেছিলেন এবং এখানেই বীরেন্দ্রের জবান-
বন্দী লওয়া হইয়াছিল। বীরেন্দ্র পুলিশের
নিকট বাহা বলিয়াছিল ঠিক তাহাই ম্যাজি-
স্ট্রেটের নিকট বলিয়াছে।

“তাবপর মিঃ সুইনহো মিঃ জে. এন.
রায়কে বীরেন্দ্রের জেরা করিতে বলেন। কিন্তু
মিঃ জে. এন. রায় বলেন, এইরূপ বিচার
পদ্ধতি আইনসম্মত নয় এবং তিনি জেরা
করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এই
অবস্থায় জেরা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।
হঠাৎ তাঁহাদের কাছে এ বিবরণ বলা হইয়াছে।
মজেলের সহিত পরামর্শের কোন সুযোগই
তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই কাজেই কোন
বিষয় ধরিয়া জেরা করিবেন তাহা তিনি
জানেন না। তিনি জেরা মূলতঃই রাখার জন্য
আবেদন করেন। এইরূপ হইলে তিনি বীরেন্দ্রের
ফাঁসী সেদিন স্থগিত বাধিতে চেষ্টা করিতে

* ১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ॥

পারিবেন এক আসামীর নিকট পবামর্শ লইয়া উপযুক্তরূপে জেরা করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তিকে এখনই ফাঁসী দেওয়া হইবে তাহাকে হঠাৎ জেরা করিতে বলা হইতেছে কিন্তু ইহার কয়েক মিনিট আগেও তিনি জানিভেন না যে, আসামীর বিরুদ্ধে কিসের চার্জ আনা হইয়াছে এবং আসামীর সঙ্গে দেখা করিবাব কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই সকল কারণে মিঃ জে. এন. রায় এরূপ পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

“বীরেন্দ্র বে অতি-সুদীর্ঘ জবানবন্দী দিয়াছে অন্যান্য কথাল মধ্যে সে বলে যে, আলমের হত্যার কয়েক মাস পূর্বে সে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক যতীন্দ্রের সহিত পরিচিত হয়।

“বীরেন্দ্র প্রথমে যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে রামসদয় মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করিবে কিনা। কিন্তু যতীন বলেন যে, তাহা হত্যার আবশ্যক নয়। তারপর বীরেন্দ্র যতীনকে জিজ্ঞাসা করে, সে ডাকাতি করিবে কিনা। তাহাতে যতীনবার্ধ বলেন যে, ইহাতে দেশের ক্ষতি হইবে। পরে বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে সামসুল আলমকে হত্যা করিবে কিনা। তাহাতে যতীন স্বীকৃত হন এবং বীরেন্দ্রকে সত্যীশ নামে এক ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দেন।

“এ সত্যীশই বীরেন্দ্রকে কনওরাশিল স্কয়ারের রিভলভার, গুলী, টোটা ইত্যাদি দিয়াছিল এবং হাইকোর্টে লইয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র বলিয়াছে সে এইরূপ জবানবন্দী দিতেছে তাহার কাণে প্রথম তাহার পরিবারকে সাধারণ লোক যে নিন্দা করিতেছে তাহা হইতে উহাদের রক্ষা করা, দ্বিতীয়—কেবল এইরূপ রাজকর্মচারী হত্যার দ্বারাই দেশের উদ্ধার হইবে না। তাহা সামান্য প্রকাশ করা।

“তখন আসামী পক্ষের কাউন্সিল জানিতে পারিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে খুনের সহায়তা করার অপরাধে অভিযোগ আনা হইয়াছে। এবং ধীরেন্দ্রের তাহারই সাক্ষীরূপে জবানবন্দী পাওয়া হইয়াছে।

“তখন মিঃ রায় বলেন যে, তিনি ছোট-দাটের সঙ্গে দেখা করিয়া বীরেন্দ্রের ফাঁসী প্রসিদ্ধি রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এবং ইতিমধ্যে আসামীর সঙ্গে দেখা করিয়া বীরেন্দ্রের জেরা করিবেন। একজন দেড়ঘণ্টার জন্য কোর্ট বন্ধ থাকে। এবং মিঃ রায়, মিঃ হ্যাগলিও ও মিঃ হিউমের সঙ্গে ছোটদাটের সহিত দেখা করিতে যান।

“বেলভিডাবে পের্ণিছিয়া মিঃ হিউম ভিতরে প্রবেশ করিয়া ছোটদাটের সঙ্গে দেখা করেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার মিঃ রায়কে সংবাদ দেন যে, ছোটদাট ফাঁসী একদিনের জন্যও স্থগিত রাখিতে রাজী নন। এবং তাহার ফিরিয়া আসিবার মিঃ সুইনহোকে এই বিষয়ে অবগত

করান। মিঃ রায় ফিরিয়া আসিয়া বলেন, এরূপ অবস্থায় তিনি বীরেন্দ্রের জেবা কবিতা পারিবেন না।

“যতীন্দ্রনাথের মোকদ্দমা আগামী এই মার্চের জন্য মূলতুর্বা বহিল।”

প্রেসিডেন্সী জেল। যতীন্দ্রনাথের ছোট সেল। যথাসময়ে যতীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছল বীরেন দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তির ব্যাতি, আর তার ফাঁসীর দিন ধার্য হবার সংবাদ।

যতীন্দ্রনাথের দু-চোখ ডারে উঠল জলে। অকুণ্ঠ কমা আর অজ্ঞান আশীর্বাদে পূর্ণ প্রসবণে। মহর্ষের দুর্বলতার ফলে, নিদারুণ চক্রান্তের মধ্যে পড়ে দিশাহারা হবার ফলেই বীরেন-এ-কাজ করে ফেলেছে। এ-স্বীকারোক্তির জন্যে তাকে দারী করা চলে না।

যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এইভাবে—এক-একটি লালিতের রাজসাক্ষী হবার অপবাধে, এক-একটি বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে—উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত হয়ে চলে অভিযোগ। বীরেনকে যদি ব্যারিস্টার জে. এন. রায় প্রকাশ্য আদালতে জেরা করতেন আর বীরেন যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করত, তা হলে যতীন্দ্রনাথের ফাঁসী অবধারিত।

অবিচলিত গম্ভীর বদনে যেভাবে পুরা-কক্ষেব এক বিপ্লবী চিন্তানায়ক গ্রহণ করে—ছিলে হেমলকের বিবাহ-ভ্রাসব, সত্যের পূজাবী তিনি যেভাবে নিলগ্নচিত্তে পান করেছিলেন মারাত্মক সেই পানীয়—তেমনি উদার প্রসন্নতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শিষ্যের দেওয়া গম্বীর অর্ঘ্য। বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র নশ্বনের হলোহল শেষ-বিন্দু পর্যন্ত পান করে তিনি হবেন নীল-কণ্ঠ। পরবর্তী যুগের জন্যে রেখে যাবেন স্বাধীনতার অক্ষর অমৃত-ভাণ্ডার।

ওদিকে বীরেন বিন্দু রজনী বাপন করছে তার সেল-এ। তার জীবনের সর্বশেষ রাতি।

অবাক অনুশোচনার আবুল হয়ে উঠেছে সে : একী করলে ভগবান? মাতৃমুন্ডির দীক্ষা পেলাম যে-মহামানব গুরুর কাছে, বার পদতলে বসে আমি নিলাম দত্তগুপ্তের শপথ—সেই অলোকসামান্য মহানারকে, সেই যুগপুরুষকেই তুলে দিলাম আমি সাক্ষীর মৃত্যুর হাতে? এই গুরুরই না দিনের পর দিন আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন গীতার শিক্ষা? দিবেছেন সংঘর্ষের, নিন্দার কর্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত? ... দেশের কাছে এইটুকুই থেকে যাবে আমার পরিচয়?

... প্রাণভিক্ষা মঞ্জুর হল না। সেই এক বিরাট সালফনা। বাঁচতে যদি হত, জীবনই যে নরকের সামিল হয়ে উঠত। ফাঁসীর মণ্ডেই এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন হয়ে যাবে।...

বীরেনের সম্মুখে জাগে যতীন্দ্রনাথের উক্তি : দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া যে জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য-অর্জন। দেশের জন্যে প্রাণ

দিলে খণ্ডন হয় বহুজন্মের সঞ্চিত পাপ।

দুঃখের অনুভূতির পরিবর্তে ধীরে ধীরে বীরেনের মনে জাগে নিশ্চয়তা : এই কাল-রাত্রির শেষে সে নতুন দিনের সুখের কাছে সমর্পণ করে দেবে তার জীবনের নৈবেদ্য। তার নেতার অজ্ঞান আশীর্বাদ, ভালবাসা আর ক্ষমার সে অভিযুক্ত। ফাঁসীর রক্তের চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই তার জীবনে।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ সাল। সোমবার।

ভোবেব আলো ফোটে নি তখনো; তখনো জেলের কুপণ আকাশ, কুপণ মাটি, গাছপালা অশ্বকারে সমাচ্ছন্ন। তবুও বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত স্নানান্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে কবচে নিভীক-পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বধ্যভূমির দিকে। মুখে তাঁব পরিভূপ্তব আলো। অন্তরে দেশপ্রেমের পবিত্র শিখা।

সেলেব বাইরে থেকে বীরেনের মনে হয়—যতীন্দ্রনাথ যেন দাঁড়িয়ে আছেন একটা কুঠির গরাদেব আড়ালে—বিনন্দ বজনীর অবসান-পথ চেয়ে। নমনে তাঁর অঝোর অশ্রুর অভিবেক-বাঁধ। অনন্ত ক্ষমার ববান্ডর।

বীরেন অম্মকে দাঁড়ায়। দাদার সেই মুখে দেখে মনে হয়—দাদারই সন্তার একটা অংশকে দাদা এগিয়ে যেতে দেখেছেন ফাঁসীর মণ্ডের পানে।

জংল-ভারাক্রান্ত বীরেন সামান্য নত হয়ে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে উচ্চারণ করে—‘বন্দে মাতরম্!’

‘মহর্ষদে, বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিত গোট্টা জেল যেন কে’পে উঠল। জেলের প্রতিটি করোদী অভিনন্দন জানান অমৃতলোকেশ্বরীর উদ্দেশে ‘বন্দে মাতরম্’। সেই মন্তের মাদলিকে অবগাহন করে বীরেন এগিয়ে যার শহীদ বীরেন দত্তগুপ্ত।

প্রেসিডেন্সী জেলে ভোর সাড়ে-ছটার ফাঁসীর মণ্ডে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল শহীদ বীরেন দত্তগুপ্ত।

প্রাণভবে যতীন্দ্রনাথ ভালবেসেছিলেন এই-সব আগুনের ফুলকিকে। তাদের দেশপ্রেম, তাদের আত্মত্যাগের অমর্ত্যিক আত্মহে যতীন্দ্রনাথের বুক দশহাত হয়ে ওঠে গর্বে, জ্ঞানন্দে, অমুণ্ডত আশার।

একবার সুরেশ মজুমদার কথায় কল্পের বীরেন সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত কিছু মন্তব্য করেন যতীন্দ্রনাথের কাছে। শূনে যতীন্দ্রনাথ জ্বলে উঠেছিলেন ঋজু শিখাব মত। মুদ্র তিরস্কারে বলেছিলেন, ‘দেখ! আমার সামনে কক্ষণে ওর নিন্দে করিস নে। ছেলেমানুষ, পুলিশের কুটবুদ্ধি প্রত্যাগিত্যের হেরে গিয়েছে মাত্র। কিন্তু তার সাহস আব তাব দেশভক্তি কত বড়—সেইটা ভেবে দেখেছিস?’

শোনা যায়, এর চার বছর বাদে, যখন যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র ভূমিষ্ঠ হলো, বীরেন দত্তগুপ্তের সম্মুখেই যতীন্দ্রনাথ তাঁব নাম রাখেন বীরেন্দ্রনাথ। (ক্রমশঃ)

বাদবপুরের কথোপকথা

চাকুরিয়া থেকে গড়িয়া এবং উত্তরের হালতু থেকে দক্ষিণের রাণীতুটি পর্বত অবিচ্ছিন্ন ভূভাগের প্রসিদ্ধি আজ বাদবপুর নামে। তবে নবাবী আমলের আদি-অন্তে এমন পরিখ্যান্ড প্রভাব ছিল না এ-নামের। তখন বসতিগত দিক থেকে এই বিন্তীর্ণ ভূভাগ ছিল বিশেষ বিশেষ নামের বিভাগীয় পারিচয়ে অভিযুক্ত। সেই বিশেষ বিশেষ নামসমূহের অবিকৃত উচ্চারণ শোনা যায় আজও। যেমন রাজাপুর, আরাকপুর, সন্তোষপুর, সৌলমপুর, ইব্রাহিমপুর, কৈব-ঘাটা প্রভৃতি। এই প্রতিবেশে তখন সহ-বস্থান ছিল বাদবপুর নামেরও। আজ যে-অংশে বিশ্ববিদ্যালয়, বন্ধু-হাসপাতাল এবং অন্য আরও একাধিক উচ্চ মানের শিক্ষা-নিকেতন স্ব-স্ব-মর্যাদায় নগর-প্রতিম নিসর্গে অবস্থিত, একদা কেবল সে-অংশটুকুই ছিল বাদবপুর নামের স্মরণাগত।

মুসলিম আধিপত্যের আদি-অন্তিম পর্বে এডমণ্ডসনের সার্বিক চিত্রে কোনো সমৃদ্ধ জন-পদের আত্মপ্রকাশ ছিল না। তখন বনোপবনের বাহুবল্লভের মধ্যেই অধিকাংশ ভূভাগ ছিল আত্ম-সমর্পিত। কনের পাশে বাচ-বিল এবং তার সমীপবর্তী সীমিত আবাসী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কুককুলের যে-বিক্ষিপ্ত বসতির আত্মবিকাশ ঘটে পাঠান আমলের পঞ্চমাস্ত্রে, সম্ভবত মোগল আমলের মধ্যাকালেই তা উত্তরে-দক্ষিণে এবং পূর্বে-পশ্চিমে আরও বিন্তার লাভ করায় এক-একটি ক্ষুদ্র গ্রামরূপে বিভাজিতকরণ ঘটে লোকালয়ের। তারপর প্রায় আরও একটি যুগের পরপারপ্রাপ্তির লগ্নে দক্ষিণ-পূর্বে ভাগের অরণ্য-ছায়ার পতন ঘটে বৈকবঘাটার। বৈকবঘাটার এই বৈকবসমাজের আদি-অধিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্বোপ-কূলে। সেখানে কোনো এক মহাত্মিকের আবির্ভাব ঘটে একদিন। তারই নির্দমনীর প্রভাবে চরমপন্থী শাস্ত্রকুলের সংখ্যাধিকা হাজার বৈকবসমাজ সে-অঞ্চল থেকে সরে আসেন। তারপর অরণ্যের অনাদৃত অংশে যে-দীন অধিবাসকে তার রচনা করেন, পরে তাই স্বতন্ত্রভাবে ধারণ করে বৈকবঘাটার নামবলী।

বাদবপুর নামটির আত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটে আরও পরে। এ-সম্পর্কে আদিবাসীদের মধ্যে যে-কিংশদ্বিতের প্রচলন আছে-তা এইঃ বৈকব-ঘাটার একজন বৈকব-কুলগুরু একদা এক রূপসী বিধবার পাণিগ্রহণ করায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। তমানীন্তন যুগের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার অর্থই মৃত্যু-প্রতিম শাস্তিবিধান। কারণ সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে তখন কেউ কৃপা করতো না। আত্মীয়-পরিজনদের নানুতম সহানুভূতি থেকেও সে বঞ্চিত হতো। সমাজ-জনে কেউ একমুঠো তিস্তাও মিত্তিও না বলে সে-ব্যক্তির পক্ষে অনশন বরণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না তখন। এমন কি, অর্থ

শহর কলকাতা



বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

থাকলেও, সে-অর্থের বিনিময়ে তাকে কোনো-রূপ পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করতো না কোনো বিপণিনদার। অতএব সেই কুলগুরুও সমাজ-দ্রষ্ট হওয়ার দিশেহারা হয়ে পড়েন বংপরো-নামিত। পক্ষকাল নানাভাবে চিন্তা করার পর তিনি তাঁর বিভ্রান্ত বৃদ্ধির জটাজাল থেকে আহরণ করেন আত্মহতয়ারই অভিপ্রায়। অতএব একদিন উষালগ্নে তিনি বিধবা পত্নী-সহ উপস্থিত হন বৈকবঘাটার অনতিদূরের এক নদীতীরে। সম্ভবত সে-নদী বিদ্যাধরী। নদীর কূলঘেষে ভাসছিল তখন মৎস্য-শিকারী

শ্রীমদাতিক

এক নৌকো। সমাজচ্যুত কুলগুরু ডাবলেনঃ এই নৌকোর সাহায্যেই তিনি স্ত্রীসহ নদীর মধ্যভাগে যদি যেতে পারেন, তাহলে তাঁদের উভয়ের পক্ষেই নদীগর্ভে কাঁপিয়ে পড়ে ইহলীলা সাংঘ করা হবে অনেক সহজ। নৌকোয় ছিল দু'জন ধীবর। সুতরাং সভা-গোপন করে ধীবরদের তিনি অনুরোধ করলেন নদীর অন্য পারে পৌঁছে দেবার জন্য।

সরল কিস্বাসে ধীবরদ্বয় তাঁদের তুলে নেয় নৌকোর। তারপর বথারীতি অনুপারের দিকে বাত্মা করে ডব্বা। বধ্য সময়ে বধন নদীর মধ্যভাগে আসে নৌকো, তখন পূর্ব-পরিব্রাজনা অনুবাহী বৈকব-কুলগুরু তাঁর শিখাগ্রস্তা পত্নীকে প্রথম তেলে ফেলে দেন নদীতে। তারপর নিজেও কাঁপিয়ে পড়েন হঠাৎ।

এই আকস্মিক অবতানে যেমন চমকে ওঠে, তেমনই মৃত্যুকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে ধীবরদ্বয়। তারপর নিজেদের সামলে নিয়ে তারাও কাঁপিয়ে পড়ে একসঙ্গে। তারা তাদের বলিষ্ঠ বাহুর নিপুণ কৌশলে উভয়কেই নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনে আবার নৌকোর। নৌকোর ফিরে আসতেই বৈকব-কুলগুরু, আঁত আত'কণ্ঠে ধীবরদ্বয় উপদেশ বলেনঃ "ওহে, তোমরা আমাদের উদ্ধার করলে কেন? আমরা যে মরে বাঁচতে চাই।

বৈকব-কুলগুরুর এই আত'স্বর শুনে ধীবরদের একজন প্রশ্ন করেঃ ঠাকুর আত্মহত্যা মহাপাপ আপনারা জানেন। তবুও এভাবে মরতে চাইছেন কেন?"

ধীবরদের এই প্রশ্নের প্রতি উত্তর-সুত্রেই তখন আত্মহননের কারণ ব্যাখ্যা করেন বৈকব-কুলগুরু। তাই ধীবরদের একজন আবার তাঁকে করজোড়ে বলেঃ "ঠাকুর, আমরা ধর্ম-ঠাকুরের ডব্বা। এভাবে আপনাদের আমরা মরতে দেখ না। আপনারা দু'জনেই আমাদের গায়ে বাস করবেন চলুন। সেখানে আপনাদের কেউ অনাদর করবে না।

নবীনা পত্নী সহ বাঁচতেই চেরোছিলেন বৈকব-কুলগুরু। কিন্তু বাঁচার পথ তখন মৃত্যুভুল্য ভেবেই মৃত্যুর বেদীমূলে টেকে হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন তিনি। এবার আবার ধীবরদের প্রস্তাবে ইহলোকে ধর বাঁচার বাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর মনে। সুতরাং আর কোনো শিরশ্চি না করে তাদের এই প্রস্তাবের

খতি তিনি দান করেন তার গভীর আশ্রমধর্ম।

তারপর? পরসীহ সেই বৈষ্ণবঠাকুর আসেন ধীবরদের পাড়ায়। যেমন নির্বোধ, তেমনই নির্বোধ এই ধীবরগোষ্ঠী। তারা সাধারণই তাকে গ্রহণ করে গুরু মতো। ঘর বেঁধে দেয় নতুন। ধীবরদের গুরু প্রতিপন্ন হওয়ায় ধর্মঠাকুরের পূজারীরাপে বৈষ্ণব-মূলগুরু জীবিকারও সংস্থান হয় সেখানে।

ধীবরপাড়ার এক সুদৃশ্য কুড়িঘরে স্থাপিত ধর্মঠাকুরের কুম-সদৃশ বিগ্রহ। এ-বিগ্রহ বৈষ্ণবঠাকুরের মনের বিগ্রহ নন। তাই বেশ কিছুকাল অতিবাহনের পর, একদিন গভীর রাতে হঠাৎ নানাসুরে চিৎকার সুরু করেন তিনি। তাঁর অস্থির চিৎকারে জেগে ওঠে ঘুমিয়ে-থাকা সমস্ত গ্রাম। স্ব-স্ব ব্যস্ততায় সবাই এসে সমবেত হয় বৈষ্ণব ঠাকুরের ঘরের উঠানে। কেউ কেউ বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে: “কী হলো, কী হলো ঠাকুর?”

বৈষ্ণবঠাকুর শান্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিজনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বলেন: “এইমাত্র আমি স্বপ্ন দেখলাম—আমাদের ধর্মঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাকে আদেশ করছেন: ‘হে ঠাকুর, আজ থেকে কৃষ্ণরূপেই তুমি আমার উপাসনা কর এবং বৈষ্ণবমতে দীক্ষা দাও সমস্ত ধীবরকে।’ কারণ আমিই কৃষ্ণ, আমিই বিষ্ণু, আমিই দেবাদিদেব সবভূতে।”

বৈষ্ণবঠাকুরের কথা শুনে নির্বোধ ধীবরগোষ্ঠী ঝংপোরানিস্তি অবাক। তাদের কিস্ময়-বিস্ময়িত দৃষ্টি ঠাকুরের মুখের ওপর ভাসতে থাকে একক তালপত্রে মৃদু হাওয়ার দোলার মতো। তারপর কে একজন হঠাৎ বলে ওঠে: “ঠাকুর, আপনার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে মন্দিরে আমাদের ধর্মঠাকুরের কুম-মূর্তিও নিশ্চয়ই বদলে গেছেন!”

বৈষ্ণবঠাকুর নির্বিকার কণ্ঠে বলেন: “কে জানে, হয়তো হবে। চলো, সবাই একবার মন্দির দেখে আসি।”

ঠাকুরের কথায় আলো হাতে সবাই আসে মন্দিরে। ঠাকুর মন্দিরের দ্বার খুলতেই আলোর প্রতিফলন ঘটে অন্তর্দর্শে। সে-আলোর দেখা যায়: ধর্মঠাকুরের কুম-মূর্তি নেই, সে-স্থলে অধিষ্ঠিত অপূর্ণ-এক কৃষ্ণের মূর্তি।

এ-দৃশ্য দর্শনমাত্রই সমস্ত চিন্তার খেঁচি হারিয়ে ফেলে ধীবরগোষ্ঠী। নববিগ্রহের প্রতি তৎক্ষণাৎ তারা সাম্রাণ হয় একসঙ্গে। এবে বৈষ্ণবঠাকুরেরই এক গোপন কারসাজি—তা উপলব্ধি করা বা তলিয়ে দেখার মতো কোনো বোধশক্তির উদ্ভাবন নিরর্থক মনে করে অবোধ ধীবরসমাজ।

তারপর সাতাই বৈষ্ণবমতে দীক্ষালাভ করে ধীবরপাড়ার সমস্ত ধীবর। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বদ্বংসে। তাই কুম-সদৃশ ধর্মঠাকুরের স্থলাভিষিক্ত সেই নববিগ্রহের নামকরণ হয় ‘বাদবঠাকুর’।

প্রাচীন অধিবাসীদের বস্তুমূল প্রতিষ্ঠিত এই ষেব-বিগ্রহ বাদবঠাকুরের সূত্রেই কিছুকাল পর ধীবরপাড়াও নামধারণ করে ‘বাদবপূর’। অবশ্য নবাগতদের মধ্যে অনেকের ধারণা: বাদব নামে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সূত্রেই বাদবপূর নামের পত্তন ঘটে একদা। এই শ্বিমভের মধ্যে সত্তা-শরণে অক্ষর কোন অতিমত—আজ তা গবেষণা করা দুসাহ্য বলেই বর্তমান নিবন্ধকারের কলম এ-সম্পর্কে এখানেই যতবন্ধ হতে বাধ্য।

নিয়মিত পদ-সম্ভারে মহাকালের নিঃসীম সরণী অতিক্রম করে যায় যুগের পর যুগ। নানাযুগের ধারাবাহিক অভিঘাতের ফলে একাধিক বিবর্তনের ডেউ ভেঙে মোগল আমল পার হয়ে আসে বাদবপূর। সুরু হয় ইংরেজ

দ্বাশাসনের দুর্বিষহ অধ্যায়। তখন সমস্ত অঞ্চল কৃষিপ্রধান। বৈষ্ণবঘাটার বৈষ্ণবসমাজ তখন নিদারুণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠতায় যেমন অনু-ল্লেক্ষ্য, তেমনই ধীবরপাড়ার ধীবরকুলেরও বংশগত দিক থেকে চরম সংকোচন বেশ লক্ষণীয়। প্রতিবেশী রাজাপুর, আরাকপুর, সলতাষপুর, সোনিমপুর, ইরাহিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম কৃষকসমাজের ঘেঁর্বাক্ষিপ্ত বসতির উদ্ভব দেখা যায়—দিনে দিনে তা বাহুবিস্তার করে একাদিকে যেমন বৈষ্ণবঘাটায়, অন্যদিকে তেমনই ধীবরপাড়া বা বাদবপূরেও। তবে অধিবাসীর সংখ্যা তখনও অর্ধাঙ্গিকর। সেই তুলনার জমির বিস্তৃতি অপরিমেয়। সে-জমি কোথাও আবাদী, কোথাও অনাবাদী, কোথাও বনোপবনের ছায়ানতরালে আচ্ছন্ন এবং কোথাও বা গৃহপালিত পশুকুলের চারণাযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পদযাত্রার প্রাকালে এতদঞ্চলের জমিদাররূপে যারা ছিলেন সর্বশেষ প্রতিপত্তিশালী, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গীর্জিত রায়চৌধুরী, স্মারিকনাথ চক্রবর্তী এবং তিপুসুলতানের কোনো উত্তরপুরুষ। তাঁদের আমলে মূল বাদবপূরের যে-অংশে ছিল তালবন, খেজুরবন এবং কেয়াবনের অব্যবহৃত-ভূমি—১৯২২-২৪ খৃষ্টাব্দে সেখানেই নবপরিষ্করণের স্মারী আসন লাভ করে ঐতিহাসিক ন্যাশনাল কলেজ।

ন্যাশনাল কলেজের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। তদানীন্তন যুগে এই অবিষ্করণীয় কলেজের প্রতিষ্ঠা-পথে যে-সমস্ত বরণ্য দেশ-হিতৈষীর অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রাজা সুবোধ মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, তারকনাথ পালিত, অধ্যাপক ডঃ হীরলাল রায় অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রভৃতি। বর্তমান বাদবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রীহিগুণা সেন ন্যাশনাল কলেজেরই ছাত্র ছিলেন প্রথমদিকে। তারপর যথারীতি স্নাতক হয়ে উক্ত কলেজেরই প্রীতিমুখকপে আত্মনিয়োগ করেন তিনিও।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় বউবাজারে। বউবাজার স্ট্রীটে বর্তমানে যে-ভবন বসুমতী সাহিত্য মন্দির-রূপে স্বনামধন্য। একদা তা-ই ছিল ন্যাশনাল কলেজের সম্পত্তি এবং তার কার্যক্রম সুরু হয় প্রথম সেখানেই। তারপর বউবাজার থেকে কলেজের স্থানান্তর ঘটে আপার সাকুলার রোডের তারক পালিতের ভবনে। উক্ত ভবনে ন্যাশনাল কলেজের অবস্থিতি ছিল ১৯১১ সাল পর্যন্ত। তারপর যে-কোনো কারণেই হোক, ১৯১১ সালেই সে-কলেজ আবার তার অবস্থান-কেন্দ্র নির্বাচন করে মাণিকতলার অন্তর্গত মুরারিপুকুর রোডে। সেখানে প্রায় ঐগারো বছর কলেজের কার্যক্রম চলে বেশ সাড়ম্বরেই। তারপর ডঃ হীরলাল রায়, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক



বসুমতী হালপাতালের অন্তর্গত বৈষ্ণব রায় রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

সুরেন্দ্রকুমার রায় এবং আরও কয়েকজন
বিশেষায়িত বৌদ্ধভাবে গঠন করেন 'Jadav-
pur Estate Limited' নামে একটি সংস্থা।
সেই সংস্থাই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলেজের একটি
স্থায়ী গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনে জমি ক্রয়
করেন যাদবপুরে। সম্ভবত সে-বছরেই
গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং দু'বছর
পর, অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই আবার নতুন
গৃহে নবপরিচালনার সূত্র হয় কলেজের
কার্যক্রম। তখন অন্যান্য বিভাগ বাতিল কবে
কলেজকে কেবল কারিগরি বিদ্যার মধ্যেই
সীমাবদ্ধ রাখা হয় বলে তার নতুন নামকরণ
হয় 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৯৫৪
খ্রিস্টাব্দের অন্তিমভাগ পর্যন্ত কৃতী ছাত্র-
ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার কলেজ-গৃহ মূখর হয়ে
থাকতো অবিরাম। এই সময়ের মধ্যে অগণিত
ছাত্রকে অশেষ কৃতিত্ব অর্জনের সুযোগ দান
করে প্রভুল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যাদবপুর
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তারপর অবশ্য
কলেজের অভিনব পদক্ষেপ সূত্র হয় বৃহত্তর
ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দেই মধ্যমশ্রেণী
জাত বিশালচন্দ্র রায়ের পরিচালনা অনুযায়ী
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রূপায়ণ ঘটে যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই
সেখানে কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে সংযোজন ঘটে
কলা বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিভাগের। ফলে
প্রাচীন গৃহের পাম্ব'বর্তী 'পানাকীর্ণ' জলা-
ভূমি এবং আগাছাকীর্ণ স্বলভাগ অনতি-
বিলম্বেই লাভ করে প্রভূত সংস্কারের প্রসাদ।
তারপর দেখতে দেখতেই সেখানে বিচিত্র
ভঙ্গীতে মাথা তোলে গৃহের পাশে আরও
অনেক গৃহ। সাদা পড়ে সারা বাংলাদেশে।
দিনে দিনে সমাগম ঘটে অসংখ্য নবীন বিদ্যা-
ধীর, রিদম্ভ অধ্যাপকের এবং অভিজ্ঞ কর্মীর।
সব মিলিয়ে এক নগর-শূন্য পরিবেশে প্রতিষ্ঠা-
লাভ করে একটি কলরব-মূখর আশ্চর্য জগৎ।
বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা

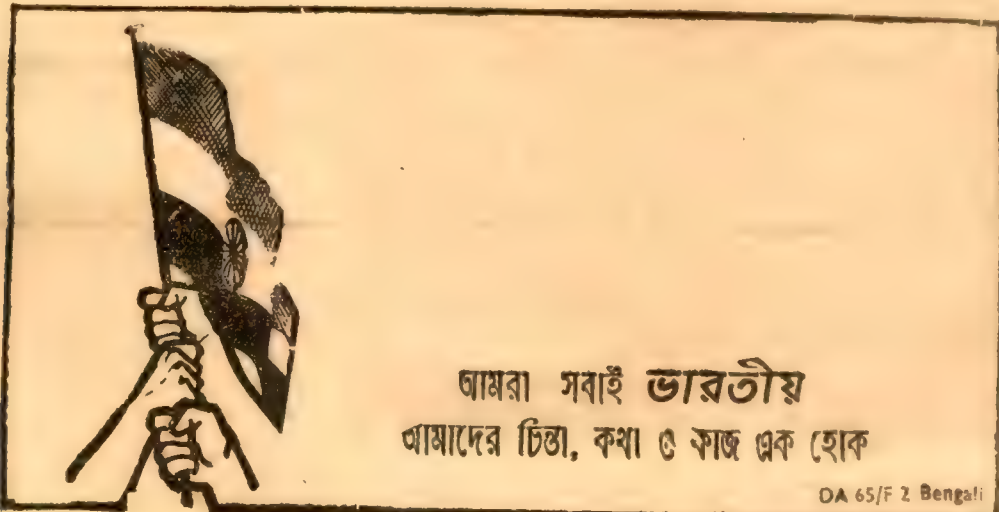


প্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

চার হাজার পঁচিশ নম্বর জন এবং নানা-
বিভাগে তাদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনে নিযুক্ত
আছেন চার শ' কুড়িজন অধ্যাপক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন
ভূখণ্ডেই অবস্থিত প্লাস এন্ড সিরামিক
রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
পলিটেকনিক। এই সংস্থাসমূহের সুশোভন
গৃহের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপবর্তী
হওয়ার প্রধান রাস্তার পূর্বভাগের সার্বিক
চিত্র নিঃসন্দেহেই নয়নাভিরাম।

রাস্তার পশ্চিমভাগেও আজ কোনো
দীনতার স্বাক্ষর নেই। পশ্চিম ভাগেই
অবস্থিত 'দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর
কালিভেশন অব সায়েন্স'-এর উদ্যানশোভিত
ভবন। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা উনিবিংশ
শতাব্দীর এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তার নাম
ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তার এই প্রতিষ্ঠানের
অবস্থান ছিল প্রথমত বউবাজার অঞ্চলে।
সেখানেই দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর পৃথিবীর
সর্বোচ্চ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' অর্জন করেন।



DA 65/F 2 Bengali

স্যার সি ডি রমণ। আজ থেকে মাত্র বছর কয়েক আগে স্বর্ণগীর মেঘনাথ সাহা প্রমুখের প্রচেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে 'দী-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সারেন্স'-এর স্থানান্তর ঘটে যাদবপুরের এই সুদৃশ্যতম ভবনে।

'দী ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সারেন্স'-এর পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডেই পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করেছে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ফ্যাক্টরি', 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব বাইয়ো-কেমিস্ট্রী' এণ্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন', প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শূদ্রকান্তি ভবনসমূহ। এই ভবনপুঞ্জের অধিষ্ঠান হেডুই রাস্তার পশ্চিম ভাগেও আজ দৃষ্টি-বন্দনে নিদর্শন যোগ্য সম্পূর্ণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ সীমান্তেই বিবেকনগরমুখী রাস্তা। রাস্তার অপর পারেই অবস্থিত উন্নত আশ্রম-সদৃশ কুমদশঙ্কর রায় বঙ্ক্যা হাসপাতাল। এখানে এই হাসপাতালেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে যিনি প্রথম তাঁর যাবতীয় স্বাবর এবং অস্বাবর সম্পত্তি দান করেন, তাঁর নাম প্রভাসচন্দ্র ঘোষ। তখন ১৯১৪ সাল। প্রভাসচন্দ্র তখন মদ্র উনিশ অথবা কুড়ি বছরের বৃদ্ধক। এ-বয়সেই তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হন বঙ্ক্যা রোগে। এই রাক্ষসে আক্রান্ত হওয়ার তাঁর পিতা ডাঃ চন্দ্র মোহন ঘোষ তাঁকে লন্ডনে পার্চান সার্জিক্যাল সার আশায়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলে সেখানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগীর কোনো পরিবর্তন লক্ষিত না হওয়ায় লন্ডনের ডাক্তার প্রভাসকে সন্দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেন।

অতঃপর স্বদেশেই ফিরে আসেন প্রভাসচন্দ্র ঘোষ। ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হন পিতা চন্দ্রমোহন। প্রভাসচন্দ্রই তাঁর একমাত্র

সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীনে আসেন প্রভাসচন্দ্র। ডাঃ রায় তাঁকে নিরাময় করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার সর্বোচ্চ কণা-কৌশল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিনের পর দিন মৃৎমূর্তির পর্বায়ে নেমে আসে রোগীর অবস্থা। অগত্যা ডাঃ রায় হাল ছেড়ে দেন। প্রভাসচন্দ্রও উপলব্ধি করেন দিন তাঁর ক্ষুরিরে আসছে। তিনি তাই তাঁর সমুদয় সম্পত্তি কোনো সংকল্পের উদ্দেশ্যে উইল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ডাঃ রায়ের কাছে। ডাঃ রায় তখন সজলনেত্রে প্রভাসচন্দ্রকে বলেন :

—“প্রভাস, যে-কাল ব্যাধি তোমাকে আজ পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ব্যাধির বিপক্ষেই সংগ্রাম করার জন্য তুমি তোমার সম্পত্তি আজ দান করে যাও।”

এ-কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি প্রভাসচন্দ্র। একটি বঙ্ক্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রভাসচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে কুমদশঙ্কর রায় বঙ্ক্যা হাসপাতাল কর্তৃক প্রকাশিত এক গুণ্ডিতকায় উল্লেখ করা হয়েছে :

“In 1914 Sri Provash Chandra Ghosh, son of a well known medical practitioner of Calcutta, Dr. Chandra Mohan Ghosh, contracted tuberculosis while studying medicine. He came under the treatment of Dr. Bidhan Chandra Roy. In spite of Dr. Roy's best efforts and administration of the best remedies avail-

able at the time, the precious life could not be saved and Provash Chandra died in the prime of his life in the year 1918.

In his sick bed Provash Chandra conceived the idea of leaving his estate for founding a hospital for the treatment of this deadly disease, which had claimed in a victim. Before his death he bequeathed all his property in cash and land to a Board of trustees for the purpose of founding a Tuberculosis Hospital. The first Trustees were (1) the late Acharya Prafulla Chandra Roy, (2) Dr. Bidhan Chandra Roy (late) and (3) the late B. K. Ghosh, Bar-at-Law.

In 1922 the Trustees formed a society under the name and style “Calcutta Medical Aid and Research Society” with the late Dr. Nilratan Sircar as the first President. The late Dr. Kumud Sankar Roy, then a youngman, became the Secretary and Organiser.”

প্রভাসচন্দ্র ঘোষের প্রদত্ত অর্থের জমি ক্রয় করা হয় যাদবপুরে। তারপর সেখানেই একটি অপরিসর গৃহে উদ্ভোধন ঘটে হাসপাতালের। পরিচালকবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সেই হাসপাতালের নামকরণ হয় “ডাঃ চন্দ্রমোহন স্যানাটোরিয়াম।”

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই স্যানাটোরিয়ামের প্রতি আকৃষ্ট হন অসংখ্য সহস্র ব্যক্তির বিমুগ্ধ দৃষ্টি। তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, তদানীন্তন সরকারের সান্দ্রাঙ্গ সহানুভূতি, গৌরবভার অক্লিষ্ট বদান্যতা এবং সর্বোপরি ডাঃ কুমদশঙ্কর রায়ের অক্লান্ত আত্মনিয়োগের ফলে জমির পাশে আরও প্রভূত পরিমাণ জমি ক্রয় করার প্রয়াস পান কর্তৃপক্ষ। তারপর সেখানে প্রথম গৃহটির পরিসর বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একাধিক গৃহের সন্নিবিষ্টত বিন্যাস ঘটায় এবার একটি পরিপূর্ণ হাসপাতালের রূপ পরিগ্রহ করে “ডাঃ চন্দ্রমোহন স্যানাটোরিয়াম।” ফলে এবার তা নাম ধারণ করে ‘যাদবপুর বঙ্ক্যা হাসপাতাল।’

গ্রীষ্মকাল গড়ে যাদবপুর বঙ্ক্যা হাসপাতালের আরও সুচারু পদযাত্রার সুযোগ সৃষ্টি করেন ডাঃ কুমদশঙ্কর রায়। তাঁরই



কুমদশঙ্কর রায় বঙ্ক্যা হাসপাতাল

নির্ঘটিত অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষীণ হইতে গেল হাসপাতালের অর্থভান্ডার। একাধিক গৃহে অজস্র রোগীর সুসংস্থানের পথ হয় নুগম। হাসপাতালের পরিসীমা প্রসারলাভ করে আরও। ফলে তার অন্তঃসীমায় আত্মপ্রকাশ ঘটে একাধিক সরোবর এবং উদ্যানের। তাছাড়া হাসপাতাল-সংলগ্ন ভূখণ্ডেই গড়ে ওঠে ডাক্তার, নার্স এবং কর্মীবৃন্দের মনোহর নিবাস। এভাবেই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালকে উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে এক স্থায়ী আসন দান করে ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ইহলোক ত্যাগ করেন অকস্মাৎ।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের মহাপ্রয়াণের পর ১৬০ বিঘা জমিতে অবস্থিত সেই হাসপাতাল আবার নাম ধারণ করে : ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল। এ-সম্পর্কে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত পুস্তিকাতেই উল্লেখ আছে :

"On 24th October 1950, Dr. K. S. Roy suddenly died at Vellore. By his untiring effort and able management, who dedicated his life to the growth and development of the Hospital, the dreams of the Society could be fulfilled. So after his sad demise, as a mark of appreciation of the unique services he rendered to the Society during his life time, the Hospital at Jadavpur was re-named as Kumudsankar Ray Tuberculosis Hospital."

১৯৫০ সালের পর, দিনে দিনে আরও অনেক রূপান্তরে রহস্য ধারণ করেছে হাসপাতাল। বর্তমানে তার অন্তঃসীমানাতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ডাঃ বি সি রায় রিসার্চ ইনস্টিটিউট 'প্রভাস-স্মৃতি ভবন' এবং ক্ষর রোগাক্রান্ত শিশুদের একটি স্বতন্ত্র স্যানিটোরিয়াম।

সমগ্র হাসপাতালের পরিবেশ সত্যি বড়ো রমণীয়। এখানে পাখির গানে ফুল ফোটে এবং ফলভারে আনত হয় নানা বৃক্ষের নির্বিকার বৃন্ত। আর বহুবর্ণ মণালরাজ জাদবর স্বীয় লাভাগের উদ্ভাস ঘটায় একাধিক সরোবরে। সব মিলিয়ে হাসপাতালের অভিরাম অন্তঃদেশকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বললেও সম্ভবত অতিশয়োক্তি করা হয় না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির ভবনপুঞ্জের সমাহারেই কেবল নগর-নিসর্গে উন্নয়ন লাভ করেছে যাদবপুর—এ-কথা বললে ভুল হবে। দেশ বিভাগের



ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালিভেশন অব নার্সিং

পর থেকে এতদঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাগম ঘটেছে যে-সমস্ত উদ্ভাস্তুর, যাদবপুরের সার্বিক উত্থানের প্রতি তাঁদের অবদানও উপেক্ষা নয়। তাঁরাই এসে বসতি স্থাপন করেছেন সন্তোষপুরের অনাবাদী জমিতে, রাজাপুরের পানাকীর্ণ জলাভূমিতে, আরাক-পুরের কাঠালবনে, ইব্রাহিমপুরের উপবনে এবং সেলিমপুরের মতো আরও অনেক পতিত ভূখণ্ডের সমান্তরাল বন্ধদেশে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বরপ্রাপ্তিরূপে গড়ে উঠেছে বিজয় গড়, পদ্মার নগর, বাগদুর্জী নগর, বিবেক নগর, যাদবপুর কলোনী, শ্রীকলোনী, বাঘা হতীন কলোনী প্রভৃতি। প্রতি কলোনীই আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুপমেয়। উদ্ভাস্তুরদের স্বকীয় রুচিবোধ যথেষ্ট উন্নত বলেই তাঁদের কলোনী অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বিরল। তাঁরা ঘর সাজাতে জানেন এবং জানেন মন্বন্তরেও বেঁচে থাকার মন্ত্র। তা এক-একটি কলোনী আজ নিজগুণেই উপনগররূপে প্রতিপন্ন। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিরও এক অকৃত্রিম একতান শোনা যায় কলোনী অঞ্চলে। এ সবই উদ্ভাস্তুর সমাজের শোপাঙ্কিত এবং সত্যি অনিন্দ্য। তাই মূল কলকাতার কৃত্রিম শিক্ষা বা সংস্কৃতির অতিশয় উত্তাপের প্রতি যাদবপুর ভেমন আকৃষ্ট নয়।

যাদবপুরের উত্তর সীমান্তে বোধপুর পাক। এ-পার্শ্ব যাদবপুরের সঙ্গে অবিক্ষিৎ। একদা এখানে ছিল ইংরেজ বিত্তজনের গলফ ক্লাব। ইংরেজ-দুঃশাসনের চিরাবসানের পর বেশ কিছুকাল তা পতিতাবস্থায় পড়ে থাকে। তার পর মাত্র বছর কয়েক পূর্বে দেশীয় সরকার কর্তৃক সমগ্র পার্কের জমি খণ্ড খণ্ডরূপে বধ্যাধ অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় সাধারণের মধ্যে। সাধারণের

মধ্যে অর্থের সত্তর বাদির অধিকৃষ্টকর নয়, তাঁরাই ক্রয় করেন বোধপুর পার্কের জমি। বর্তমানে এ-পার্কের কোথাও আর অব্যবহৃত নেই কোনো জমি। তার প্রতি অংশেই আধুনিক শিল্পবোধের ক্ষুদ্র পরিচায়করূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিবর্তন এবং স্তিতল অট্টালিকা। গৃহ-পাল্লবর্তী যাবতীয় রাস্তাও বেশ সুনিরীক্ষিত এবং সুবিন্যস্ত। সব মিলিয়ে এখানেও যেন এক স্বতন্ত্র-সুন্দর জগতের সমুদ্ভাস লক্ষ করা যায়—যা নগর-প্রতিম যাদবপুরের আসীমান্তের চিত্রকে আরও সুবেশ এবং সমৃদ্ধ করার পক্ষে নিঃসন্দেহেই অপরিহার্য।

বিনামূল্যে

আপনার পছন্দমত রঙে প্রমাণ সাইজ কাশ্মীরী শাল মাত্র ৭, টাকার পাইবেন। ডাকমাশুল ১-২৫ পঃ। দুইটি শাল ১৩, টাকা, ডাকমাশুল ২, টাকা। তিনটি শাল ১৮, টাকা, ডাকমাশুল লাগবে না। চারটি শাল ২৪, টাকা এবং ডাকমাশুল ৩-৭৫ পঃ অতিরিক্ত।



বিনামূল্যে—দুই টি সিলেক্ট লেডী স্কার্ফ চারটি শাল ক্রেতাকে দেওয়া হইবে। স্টক সীমাবদ্ধ।

Mahalaksmi (Shawl)

P. B. No. 1595 (W. B. C.) Delhi-6

আধির ম্যানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস



মহাশেবতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তেঘটি ॥

ফারসী-বাগিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সব-রকম সুবিধে দেওয়ার অবিচার, বাংলার বাগিকদের প্রতি সুবিচার, এই নিয়ে বড় জগৎ-শেঠ আর জানকীরাম নবাবের সংগে কথা চললেন, জানকীরাম স্বগৃহে ফিরে এলেন।

তার বাড়িতে বসেছিলেন হীরালাল শেঠ। রাজা জানকীরামের মুখের কালিমায় বাংলার বাগিকদের সব প্রশ্নের জবাব দেখা ছিল। আর কিছ্, বলতে হল না।

জানকীরাম শূন্য বললেন, 'আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি।'

'ভয়! নবাবকে সহায়তা করেছেন, এই বিপুলবৈভব অর্জন করেছেন, দুর্লভরাম চাঁচপদে সমাসীন, এখনো আপনার ভয়?'

জানকীরাম সে কথার জবাব দিলেন।

হীরালাল ফান হেসে বললেন, 'ভয় সকলেরই সংগে সংগে ফেরে। কেউ সে কথা জানে, কেউ জানে না। তবে, আমি ভেবেছিলাম, এ যুগে মানুষের যতটা উন্নতি সম্ভব সবই আপনার হয়েছে। বিহারের সুন্দারী আপনার, দুর্লভরাম-ও স্বথাক্ষর পদ পেয়েছেন, এখন কি?'

'কি ভয়, কিসের ভয় তা বলতে পারব না, কিন্তু আমি আজ ভয় পেয়েছি।'

'আর জন্যে ভয়?'

জানকীরাম সে কথার উত্তর দিতে পারেন নি। হীরালাল শেঠকে উত্তর দেন নি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাবার আগে তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও ফতেচাঁদকে জিগ্যেস করা ঠিক হবে না মনে করে তিনি মহাপতি আচার্যকে কাছে ডেকে নৌকায় তুলে গঙ্গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাপতি তখন জগৎশেঠদের সংগে কাজ করেন না, সঞ্চিত টাকা নিয়ে হীরালাল শেঠদের সহযোগিতায় কাপড়ের আড়ত খুলতে চান, সব জেনেও রাজা নিরস্ত হন নি।

গঙ্গার দিকে চেয়ে মহাপতির হঠাৎ মনে হয়েছিল সুরকঠের সেই কথা। মুর্শিদাবাদে, এই গঙ্গাতীরে নাকি একটি যুগ অস্ত হবে।

'আপনি এখনো তাঁদের বিশ্বাসভাজন, তাই প্রশ্ন করি, আমার এ ভয় কি অমূলক?'

'কি ভয়?'

'আমার কেন মনে হল জগৎশেঠরা অপেক্ষা করছেন মাত্র। প্রয়োজন হলে তাঁরা আনুগত্য অন্য পাঠে ন্যস্ত করবেন?'

এ কথা শোনবার সংগে সংগে মহাপতির মনে হল এবার বৃদ্ধ মরবেন। মৃত্যুকাল আসন্ন না জানলে, নিতর্নে এমন প্রশ্ন রাজা করতে পারতেন না। এ প্রশ্ন, বলতে গেলে রাজা-

দ্রোহিতার সমতুল্য। বাদির সম্পর্কে প্রশ্ন, তাঁরা এখনই ক্ষমতাশালী, পরে হয়ত তাঁদের ক্ষমতা আরো বাড়বে।

'তা হতে পারে বইকি। একদা তাঁরাই সুরফরাজকে সরিয়ে নবাবকে বাংলা ও বিহারের মসনদ দিতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।'

'তা হলে কি হবে?'

'এ বিষয়যুগে টাকার ঋণ নিয়ে ওরা বেখানে থাকেন, সেখানেই পাত পাখেন। দিল্লীর বাদশা, পুনার পেশবা, ভৌসলা শাসকরা, দাক্ষিণাত্যের নিজাম, বাংলার আকবরী, অর্ধের প্রয়োজন নেই কার?'

'এই আশঙ্কা করে আমি ভয় পেয়েছি।'

'কি আশঙ্কা?'

'সুরফরাজকে ছেড়ে ওরা আলীবর্দীকে ধরেছিলেন। প্রয়োজনে নবাবকেও হয়ত ত্যাগ করবেন।'

'না করতেও পারেন।'

'খদি করেন?'

এ কথার উত্তর কে দেবে? নবাবকে ত্যাগ করে জগৎশেঠ ডাইয়েরা কোথায় যাবেন? কোন পরদ্র, কোন মতুন আধারে তাঁদের আনুগত্য রাখবেন?'

'নয়-দশ বছর ধরে দেশে যা চলেছে তাকে কি আর ঋণ, রাঢ় ও গাঙ্গেয়বঙ্গ যেন রক্তমান করে উঠেছে বললেই হয়। এতদিন ধরে দলে

সাপ্তাহিক বসুমতী

দলে মানব প্রোভের শেওলার মত ভেসে বেড়িয়েছে, যারা পূর্বে, বঙ্গদেশে পালিয়েছে তারাও, এখন শূন্যে পাই মগদের অত্যাচারে পীড়িত। এ সর্বনাশের পর এখন আমরা আর কিছুর চাই না, শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

কে না চায়?

আমরা সামান্য চাই মশায়। চাষী নিশ্চিন্তে গোলায় খান তুলতে পারে কি না, শূন্য এটি দেখুন, দেশের স্থিতিবস্থা আপনি ফিরবে। চাষী যৈদিন নিশ্চিন্তে চাষ করত, চাষীরা তাইব তাই চলে, মুর্শিদাবাদের চকে দাঁড়ালে বিশ্বদর্শন হত। সব দেশের কনসারী এখানে এসে ভিড় করত। সেই অবস্থাটি কি আর ফিরতে পারে না?

নবাব অবিরুদ্ধ নন।

জানকীরাম ধীরে বললেন, 'তিনি এতদিন আলগজুরী আদায় করতে জামিদারদের পারত-পক্ষে পীড়ন করেন নি। কিন্তু বগীবদ্দকালে যে বিপুল ব্যয় হয়েছে, তা পূরণ করতে গেলে আবওয়াব না ধরলে চলে না। বাংলার নবাব সমস্ত বঙ্গদেশে যদি বাইশ লক্ষ টাকা আবওয়াব করেন তাকে কি বেশি বলা যায়?'

কে দিচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে।

যারা দিতে পারে তারা দিচ্ছে মহাশয়, আপনি জগৎশেষের গদীতে বিশ্বাসী মুন্সী ছিলেন, আপনার অজানা নেই বাংলার কতজন অবহেলে বাইশ লক্ষ টাকা দিতে পারে।

মহীপতি কি জবাব দেবেন?

আমার মনে হয়...

আমার মনে হয়, দেশের অবস্থা বাই হোক, দিতে হচ্ছে এ জনেই কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হবেন। বিপদ যদি আসে তাঁদের অসন্তোষের গায়েই আসবে।

আমাবও এই ভয়।

নবাব এখন এই দশ-এগারো বছরের পুরনো ঘা সত্তর সেবে নিতে চেষ্টা করছেন, তা আমবা বুঝি। কিন্তু বত চেষ্টাই করুন না কেন, জরা ও বার্ধক্যকে তেঁকান এমন শক্তি তার নেই।

জানকীরাম বেন শিউরে উঠলেন। যাকে লাহার মানব বলে জেনেছেন, অপব্যয় বলে জেনেছেন, আফগান বিদ্রোহ, বগীব অত্যাচার, প্রজাদের হায্যকার, কুচক্রী চক্রান্ত সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করতে দেখেছেন, তাঁকে পবাবলিত দেখবেন মনে করতেনও তাই কষ্ট হল।

আমি যেন তার আগে যেতে পারি।

গঙ্গাব জলের দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে ফলেন। সম্ভবত এ প্রার্থনা বিধান্থানে পৌঁছেছিল। কেন না পরের বছরই নবাবকে আর একটু নিঃসঙ্গ বেখে জানকীরাম দেহ-জাগ কবলেন। অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ উচ্চাশা যে তুচ্ছ-আরব যুবককে একদা দিল্লী ত্যাগ করে বন্দুকের ও জটিল পথে বাংলার দিকে ধাবিত করেছিল, বারংকো তিনি নিঃসঙ্গ ও হীনবল। কোনদিনই কাতর হন না, রাজ্য

মৃত্যুতেও তিনি কাতরতা দেখালেন না। এখন তাঁর সামনে অনেক কাজ। চোখের জল ফেললে ক্ষয় দুর্বল হয় মাত্র।

তার এ আচরণ দেখে সবাই আড়ালে নিশ্বাস করল। বলল এক ঘোঁহর ছাড়া আর কেন দুর্বলতা নেই লোকটার। এত কঠোর হওয়া অনুচিত।

এমন কি তার নিকটজনেবাও তাই বলল। তাঁর সংযমী, জিতেন্দ্র স্বভাব, বিলাসে অরুচি, নাবীর প্রতি সম্মান, অন্যান্য ঘোষণার সঙ্গে এ সব উচ্ছল গুণ দেখে বিদেশীরা অবধি বিস্মিত হত, স্বদেশীরা ত' হবেই। অষ্টাদশ শতকে সিংহাসনে বসে চরিত্র ঠিক রাখা বড় একটা দেখা যায় নি।

জানকীরাম মাথা গেলেন, মহীপতি হীরালাল শেঠ, বারানসী বসাক, আজিম কামীরী প্রমুখ ব্যবসারীদের বললেন, আর কেন? এখন অনেকেই যাচ্ছে, আমবাও কলকাতা গিয়ে আড়ত ফেঁদে বসি না কেন?

আর একটু দেখি, হীরালাল শেঠের মুখে এই এক কথা।

আর কি দেখবেন?

কেন, মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে যুগ অস্ত হয় কি না হয় দেখব না?

বলেন কি। কলপান্ত অবধি কসে থাকবেন না কি?

পরকার হলে তাই থাকব।

সুদূরকণ্ঠের সে পাগলামি দেখছি আপনি বিশ্বাস করেছেন। কলপান্ত হলে সব অর্থকার হবে যে।

আমার হলে আধারমাণিকের লোক আপনি, পথ দেখাবেন।

পথ দেখাব আমবা কি সেই যোগ্যতা আছে?

না না, সব কথার পবিহাস নয়। সুদূরকণ্ঠ রায় জালী মানব ত' বটেন। তিনি একপক্ষে ঠিক কথাই বলেছিলেন। তা দেখুন, সর্বনাশ আসবে বলেছিলেন, সর্বনাশ এল। হয়ত গঙ্গার তীরে সর্বনাশ হবে কিছু একটা। কি হবে, সেইটি দেখবার হচ্ছে।

হীরালাল শেঠের দুঃখের মত রঙ উদ্ভেজনার জাল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ গঙ্গার তীরে ধরে হেঁটে হেঁটে গৌড়ে এসেছিলেন। তারা কচ্ছ ও

সুদূরকণ্ঠের গায়ে থাকতেন। আসবার সময়ে তাঁদের গায়ের ভোটকম্বল বগলের নিচে গ্রন্থি দেওয়া ছিল। বত বাংলার কাছে আসেন, তত গরম বোধ হয়, অবশেষে কম্বল ভাঁজ করে কথি রেখে গৌড়ে এসে দাঁড়ালেন। সে সময়ে গৌড়ের রাস্তায় সেদিনকার বিশ্বপৃথিবী এসে দাঁড়াত ও পরস্পরের ভাষা কিছুমাত্র না বুঝে গা ঠেলাঠেলি কবে ইংগিতে কথা বুঝিয়ে চন্দন, গজদন্ত, মসলিন ও লুণ কিনত।

সে কবে?

অনেক, অনেক আগে। তারপর দেখুন, আমরা এখন যেখানে থেকোঁছি সে দেশকেই আপনি বলে জেনেছি। নইলে তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, রাজমহল, সর্বত্র যুগ যুগে ভেসে বেড়াতে পারতাম না। সপ্তগ্রামের পতন হুগলীর উত্থান আমার প্রপিতামহ দেখেছেন। সে ও তা গঙ্গারই কোঁকুকে ঘটেছে। এ যুগে আমি মুর্শিদাবাদের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি, তা আপনি বলেন বৈশ্যযুগ আসছে। বৈশ্য-যুগে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা আবার কি দেখায়, তা দেখে যাব না?

দেখে যেতে যেতে দেরি হয়ে যাবে না?

দেরি? হীরালাল শেঠ বিষম হাসলেন।

বললেন, 'দেরি যদি হয়ও, তা হলে আপনার নতুন জনপদে কি জঙ্গল মিলবে না?'

কে বললে? একদিনের কালিকাক্ষেত্র, নগণ্য জঙ্গল সুতোদুটি এখন চারদিকে বেয়ে চলেছে যে।

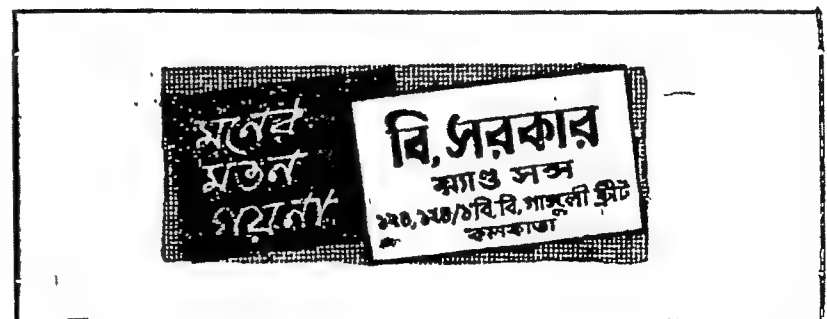
আমচর।

হীরালাল শেঠ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, একশো বছর আগেও গঙ্গাতীরের জনপদ বলতে আমরা কুমারহাটি, ভাটপাড়া, গ্রিবেণী, বংগবাটি, বৈদ্যবাটি বুঝতাম। তারপর এল চন্দননগর, প্রীরামপুর, হুগলী আব কলকাতা, এই একটি নাম আপনার প্রতিটি গ্রাম, ডিহা, সব গ্রাস করে নিলে।

এই হয়, এই বিশ্ববাসারের নিবন।

জানি, তা জানি আচার্যমশায়, সব জানি।

মুর্শিদাবাদের নাতিশ্বাস উঠতে ব্যক্তি নেই তাও জানি। এখনি মনে হয়, রাত জাগলে মনে হয়, কে কাদছে, কোথায় কাদছে। আবার মনকে বলি বগীর হতে যখন উপযুক্ত ছেলে গেল, বউ মরল, তখন বত কামা কাদি নি



জব বুদ্ধি আমার বৃকে বাসা বেঁধে আছে।
হয়ত নিজের কামাই শুন, না কি বলেন?

মহাপতিব মনে হল অনেক, অনেক আগে
সূর্যকণ্ঠ বলেছিল তার গুরুদেব ভাগীরথীর
কামা শুনছেন। সেই জনেই তিনি জাহ্নবীর
জলে কান পেতে থাকতেন। সেই জনেই
বলতেন আমরা তাকে পাপ দিয়েছি মা,
তোর জলে পাপমোচন করোঁছি, তোর বৃকে
নিরপেক্ষ জায়গা বলে কুচক্রী এসে তোর বৃকে
কুমন্ত্রণা করেছে, বিদেশী বেণেরা তোব বৃকে
বৃদ্ধ করেছে, সেই জনেই তুই কাঁদিস।
সেই জনেই তুই বিরূপ হয়েছিস, জানি,
তোর বৃক দিয়েই বাংলার সূদিন এনেছিলি,
সর্বনাশও তুই-ই আনিবি। এ কলিকালে, সেই
শেষ সর্বনাশ এনে, তুই হয়ে যাবি নদী, আর
দেবী থাকবি না। সেদিন তোর বৃকে চড়া
পড়বে, জল স্রোত হারাবে, যেদিন নাভিস্রাব
উঠবে সেদিন হযত আমরা বৃকব কি সর্বনাশ
করেছি।

বলেছিলেন সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে
আশীর্বাদও আনিস মা, একটি বৃগ অস্ত
হলে নতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে যেন
আশীর্বাদও আসে।

আজ মহাপতির কেন মনে হচ্ছে সেই
বৃক ধর্মোন্মাদের প্রতিটি কথা সত্য?
সংসারী মহাপতি, অশ্ববিশ্বাস তাঁর আসে
মা, ধর্মকে তিনি মনে কবেছেন দুর্বলের
অবলম্বন, আশঙ্কিতের আশ্রয়। আজ কেন
মনে হচ্ছে বৃকের কথার কিছু কিছু সত্য
ছিল? কোন যুগ অস্ত হবে, কোন যুগ
আসবে?

কাশীশ্বর বলেছিল, ব্যাডেল চার্চের
বিদেশী ফাদার বলেছেন, পৃথিবীতে কোথাও
সামন্তব্যুগ আর থাকছে না। বৈশাখি এখন
সবচেয়ে ভবংশশক্তি, তন্নাই জিতবে। সামন্ত-
যুগ কাকে বলে? রাজা থাকবে, প্রজা থাকবে,
চাষী দেখে ছিন্ন কাঁথা, নবাব-বাদশাহ
বিলাসের মাদুল জোগাতে চাষীর ধনের গোলা
বারবাব নিঃস্ব হবে এরই নাম কি সামন্ত-
যুগ? এ যে বিধাতার নিয়ম, মেপে দেওয়া
নিয়ম। এ ১৭৫২ সালে কে সে নিবমকে
জেবা কবে? আসামীর জারগায় পড়ি
করাবে?

‘আমায় একটি কাজ এখনো বাকি,’ তিনি
জম্বুটে বললেন।

কি কাজ?

‘আমার ভাইবু ফুলেশ্বরী, আজ অনেক,
অনেকদিন হল স্বামীকে ছেড়ে এসেছে।
তাকে আনন্দীরামের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে
হবে।’

‘আব কোন কাজ নেই?’

না। হাবার সময়ে আমি আনন্দীরামকেও
চাই, তাব মা বিশালাক্ষীকে চাই, আনন্দীর
ছেলেকেও সঙ্গে নিতে হবে।
বিশালাক্ষী যাবেন শুভশক্তির মত, ওর ছেলে

হবে বাপের ডানহাত হয়ে। ওরা গেলে
আমিও চলতে পারব।’

কিন্তু, আমরা বড় আগিরে ভাবছি।
এখনো, এখনো নবাব জীবিত। এখনো
মুর্শিদাবাদের ফরমান পেলে কাশিমবাজারের
ওআটস, কলকাতার হলওয়েল, চন্দননগরের
জাঁ ল’ দৌড়ে আসে।

‘জানি।’

মহাপতি বর্তমানে ফিরে এলেন।

তারপর চারবছর কাটল। এবার চৈত্রমাসে
অনেক, অনেকদিন পর প্রচুর ববিশস্য হল।
বাঁকড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া,
মুর্শিদাবাদের ক্ষেত অড়হর, ছোলা, ধব,
চৈতালী ধানে ঢেকে গেল। এখন আব ধান
কেটে গোলাব তুলতে বগীর ভর নেই অনেক,
অনেকদিন পর মুর্শিদাবাদে আসন্ন পুণ্যাহ
উৎসবের ধুমধাম শুরু হল।

নগরের মাঝে মাঝে নৌবতখানার মাচা
বাঁধা হল। রাজমিস্ত্রিরা কলি ফিরিয়ে রাজ-
প্রাসাদ বকমক করে তুলল। এবার আবার
বাংলার বড় বড় রাজারাজড়াবা রাজধানীতে
আসবেন। তাঁদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে
মানবজনের সাজা। হোলিতে, অনেকদিন
বাদে মোতিবিলে রঙের ফোয়ারা ছুটস, নবাব
নিজে শেঠদের বাড়ি যাবেন। কুজখাটের
নন্দকুমার রায়, সৈদাবায়ে বাশীকণ্ঠ সেন,
পুণ্যাহের জন্যে গানের দল বারনা করতে
বললেন।

আর এল বর্শেল, লেটেল, ঢালী, ঢুলী,
পাইক, পেয়াদা। সড়কীর বকবকে ফলার
লালকাপড় বাঁধা, তাবা সম্মানী দিতে, বিদারী
পেতে এসেছে। নবাববাড়ির বাইরের মাঠে
তারার খেলা দেখাবে, গান গাইবে, রণপার-
নাচ, বাঁশবাঁজী, লাঠিবাঁজী দেখাবে। বাজি-
কররা বাজীর বরাত নিল, করেদারী মুন্সি
পাবে, মাঠে মাঠে পাকা ধানের গম্ব, গরুর
গাড়িতে করে চাষীরা শূদ্ধ ধান বইছে আন-
বইছে, পাকা ধানের গম্ব, নগরীর পথে পথে
ছটিয়ে পড়া ধান সব খেতে পাখিরা কাকে
কাকে নামল। পাখমারাবা ফাঁদ নিয়ে ঘুরে
ঘুরে পাখি ধবছে।

অনেক, অনেকদিন পব মহাপতির
বাড়িতে আনন্দের অব্যাহ নেই। কলকাতা
থেকে কাশীশ্বর এসেছে, সে তাঁকে নিয়ে
আধিবমাগিক যাবে।

আধিবমাগিক গিয়ে আমি আনন্দীর মা-ব
পা ধব বউটান, বুদ্ধিকে নিতে বলব।

মহাপতিব কথা শুনেন জলেশ্বরীর চোখে
জল এল। একসময়ে, যখন জগৎপতি
আচার্যের ঘরণী ছিলেন, সোনার গয়না গায়ে
বাজত বলে মথমলের পটি দিয়ে হাব, অনন্ত,
বালা পবতেন, তখন তাঁর বুদ্ধি ছিল না।
সেয়ে, যতে শব্দরবাড়ি না যায়, সেজন্যে
তিনিও চেষ্টা করতেন। স্বামী তাঁকে পথে
বসিয়ে চলে যাবার পর থেকে, দেওরের

সংসারে এসে দুঃখের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে
নিয়ে এখন তিনি অনেক শিখেছেন।

দেওরের কথায় তিনি সম্মতি জানালেন।
ফুলেশ্বরী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন-
ছিলেন, তিনি ধীরে সবে গেলেন। এখন আর
সংসারের কাজে, কোন পথে, শৌখীনতায়,
তাঁর মন বসে না। সর্বদা মনে হয় এখানে
নয়, অন্য জায়গায়, অন্য কোথাও তাঁর ঘর।
কাকার কথা শুনেন তিনি বিশ্বনাথের হাত
ধবে এগিয়ে দিলেন। তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ
এখন বড় হয়েছে। পইতের সময়ে স্বামী
আসেন নি, আধারমাগিককে একসময়ে তিনি
অবহেলা করেছেন, সতীন কুন্দলতাকে গরীব
বলে তাজিয়া করেছেন, এখন বিচার করে
দেখলে তাঁর মনে হয় সকলকে তিনি দুঃখই
দিয়েছেন।

দুঃখ দিয়েছেন সূর্যকণ্ঠকে, হয়ত তিনি
সেদিন বালিকা ছিলেন, তাই সূর্যকণ্ঠের
দুঃখের পরিমাণ বোঝেন নি। স্বামীর প্রেমে
অবহেলা করেছেন, ছেলেকে তাব ন্যাব্যবর থেকে,
বঞ্চিত করেছেন, আজ মনে হয় সব ভুল হয়ে
গিয়েছে। যদি, যদি স্বামী ক্ষমা করেন, ঘরে
ফিরে নেন, তা হলে অনেক অঙ্গপতে আজ
ফুলেশ্বরীর সুখ হবে। স্বামীর প্রেমের এক-
ছর অধীশ্বরী হতে চেয়েছিলেন, আজ শূদ্ধ
সে সংসারে জায়গা পেলেই তিনি বাঁচেন।

মহাপতির স্ত্রী বিছানা ছেড়ে উঠতে
পারেন না। বোন নিদুলীই এ সংসারের
কর্তা। ফুলেশ্বরী তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন।
কালো পাথরবাটিতে জল রাখতে গিয়ে হঠাৎ
চোখ পড়ল মাথার দুটি-একটি শাদা চুল
দেখা দিয়েছে, মূখে মেচেতার দাগ।

অনেক, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এক-
দেরি তিনি কেন করলেন?

অনেক, অনেকদিন পবে আজ আবার
আধারমাগিক গ্রামের শ্মশানভলার মাঠে
চড়কের বাজনা বাজছে।

এবার গাজনে বড় ধুম, এবার রামাই-এর
পালা সাগর বাসনী মূলসম্মাসী। গাজনে
যারা মাতবে তাদের আনন্দ এবার ষিগুদু,
কেন না সূর্যকণ্ঠ রায় এতদিন বাদে আবার
আধিবমাগিক।

জানি না সূর্যকণ্ঠদাদা ভবিষ্যৎ দেখতে
পায় কি না, কিন্তু চোন্দ বছর হতে চলল,
সে এমনই চড়কের আগে, আচার্যপুত্রকে
অজ্ঞানগাছেব নিচে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল
সামনে ভয়ংকর দুর্দিন।

কাশীশ্বরের এ কথাব কোন উত্তর দিলেন
না মহাপতি। অনেক, অনেকদিন তাঁর চোখ
যেন তৃষ্ণার্ত হয়েছিল, আজ এই ছোট নদীর
বালিব ওপব ন্যাংটো ছেলেদের জলছেটাইটি
খেলা, পুতুবপাড়ে সবুজ শূদ্রাশীশকের মেলা,
উঠোন ধব, অড়হব, ছোলা আব লঙ্কার
স্তুপ, সব দেখতে বড় ভাল লাগছে তাঁর।
বয়স হয়েছে বলেই বোধহয়, কাশীশ্বরের

কথায়-বাস্তব একটা আলাদা গান্ধী' এসেছে। তাঁর পরিচ্ছন্ন পোশাক, সুন্দর চেহারা দেখে মহাপতিবর নিম্বাস পড়ল। তিনি জানেন, শরীরে ধরেছিল যাকে, তাঁর সেই জ্ঞাতকন্যা নিম্নলিখিত ভাববাসতে কাশীশ্বর। হতভাগিনী বাঁদীহাটে বিক্রি হবার নিয়তি এড়াতে আশ্রয়-হত্যা করবার পর থেকেই কাশীশ্বর অন্য মানুষ হয়ে গেল। তিনি অনেক পরে যা জেনেছেন, যা জানাতে আনন্দীবাসের কাছে যাচ্ছেন, সেটি কাশীশ্বর অনেক আগেই জেনেছিলেন, বিপুল চ পুত্রী। জেনেছিলেন বলেই সে নিজের জায়গা খুঁজে নিতে পেরেছে।

কলকাতার যে যেতে চাইছে কাশীশ্বর, সেখানে গিয়ে আনন্দীরাম কি কাজ করবে? 'কাজ ত' সেখানেই, কাশীশ্বর অন্য-মনস্কভাবে বলল। শূকোর না, কোন ক্ষতই শূকোর না। গ্রামে প্রবেশ করবার সময়েই কেন তার নির্মলার কথা মনে পড়ল? নির্মলার অনেক আশা ছিল, বাঁচবার আশা তাকে অসম্ভব সব পরিস্থিতিতেও আশা জোগাত। মইলে বগী'দের হাতে ধরা পড়ে, তারপর শিবকলী গাঙ্গুলী'র কাছ থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে তার স্বামী বেঁচে দেয় দাসব্যবসারীর হাতে। সুরাট, অথবা ভৈরোতে বিক্রি হয়ে দাসের কথা, তখন কাশীশ্বরের সঙ্গে আবার লগ্না। কাশীশ্বরকে সে ভাববাসত, সে কথাও কত পরে জানাজানি, তবু তাবা চেষ্টা করে-ছিল।

আমরা বিশ্ববাসিনী মন্দিরের কাছে এলাম, আধারমাণিকের মাটিতে পা দিলাম, সে অক্ষুটে আবার বলল। আজ সব কথা মনে পড়ছে। নির্মলা আশ্রয়ত্যা না করলে সে হয়ত সাহস পেত না। নির্মলাকে বাঁচাবে বলে সে যখন বিশালাক্ষী'র কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল তখনই নির্মলা আশ্রয়ত্যা করে।

এ ছেলটি কে, আচার্য' কাকা?

আনন্দী'র ছেলে, বিশ্বনাথ।

আনন্দী'রামকে নিয়ে যেতে চাই, সুদ্রকণ্ঠ

দ্রাক্ষে নিয়ে যেতে চাই, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, দ্রাক্ষকে যেতে হবে।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এখন থেকে পথময়ই

হমে ওদিকে যাবে, কলকাতার দিকে।

অন্য জীবন, কাশীশ্বর অক্ষুটে বলল, ও এখন আনন্দী'রাম ও ফুলেশ্বরীর ছেলের আটচালা দেখে থমকে দাঁড়াল। আটচালা, কালের প্রকোপে কিছ্র জীর্ণ, কিন্তু এখনো তার খড়ের চাল, কাঠের কপাট ও ধামের

কলকাতার বাঙালী'র জন্যে কি কাজ আছে কাশীশ্বর?

অনেক, অনেক কাজ।

বল।

আমি কাজ কবি জয়রাম ঠাকুরের কাছারীতে।

কাশীশ্বর একটু থামল। দূরে চড়কের বাজনা বাজে। এমনিই এক চড়কের মেলায়

বিশালাক্ষী'র ছেলে কানাই হারিয়ে যায়! সে কতদিনের কথা হ'ল?

পদ্মান ঠাকুরের পুত্রপুত্র ছিলেন রাঢ়ে। সেখান থেকে তাঁদের বংশে পুত্রবলী দোষ ঘটলে যথোঁচলে চলে যান। পদ্মান ঠাকুর কলকাতার কেল্লার কাছে গোবিন্দপুরে বাড়ি করেন। তাঁরই ছেলে জয়রাম চম্পশ-পবগনার আমীন। আমি তাঁরই কাছারীতে কাজ করি।

তিনি বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি।

সংগদে বর্ধিষ্ণু, বিদ্যার অগ্রণী, শিক্ষা, শিক্ষা ছাড়া আজ আব অন্য পথে স্ত্রী আসবে না। ফারসী'র সঙ্গে সঙ্গে আমিও ইংরেজী শিখছি আচার্য' কাকা।

ইংরেজী! আমাদের ছেলেরা ইংরেজীও শিখবে।

শিখবে কেন, শিখছে ত'। এই ত' একটি ছাত্র দেখে এলাম রামনিধি গুপ্ত। ইংরেজদের কাছে লেখাপড়া শিখে কত নাম করেছে। লেখাপড়া না জানলে আজ আর দাঁড়তে পারতাম না আচার্য' কাকা।

মহাপতিবর বড় আনন্দ হল। এখন মনে হল না, সামনে আরো পথ আছে, ভবিষ্যতের পথ। হয়ত আনন্দী'র ছেলে বিশ্বনাথ সেই ভবিষ্যতের পথে হাঁটবে। নতুন জায়গায় আধারমাণিক গ্রাম একটুখানি বেঁচে থাকবে, হয়ত এ বাজকের মধ্যে।

মুখোটি বাড়ির সামনে এসে তিনি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। সবাই পথে দাঁড়িয়ে কেন? এ সুদ্রকণ্ঠ, এ আনন্দী'বাস, এ কি বিশালাক্ষী? সবগুলো চুল সাদাকালো মেশা, তাঁরও-চুল সাদা হয়েছে, তিনি বিশ্বনাথের দিকে তাকালেন।

ছোটকাকা।

আনন্দী'বাস।

আচার্য' কাকা।

সুদ্রকণ্ঠ। তোমরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আনন্দী'রাম অক্ষুটে বললেন নবাব আলীবর্দী নেই। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু হয়েছে। মহাপতিবর মনে হল শূন্যলেন বটে নবাব অসম্ভব।

হ্যাঁ আচার্য' কাকা, নবাব মৃত। এখন দৌহিত্র সিরাজ বাংলার নবাব।

সিরাজ নবাব।

মহাপতিবর মনে হল গেল, সত্যিই একটি যুগ শেষ হবে গেল। আর আটকে থাকবার দরকার নেই। আধারমাণিকের চারটে সীমা কেন ভেঙে গেল, মিলিয়ে গেল অনেক, অনেক বড় এক অনাগত ভবিষ্যতের সীমানায়।

আনন্দী, আমি তোমাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে এসেছি। এই যে, এই যে তোমার ছেলে।

বিশালাক্ষী বিশ্বনাথকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর চোখে জল। দূরে বাজনা, চড়কের বাজনা, আধারমাণিকের আকাশে সম্ভাব্যতার বাজনা বাজছে।

সুদ্রকণ্ঠ।

আমিও যাবো আচার্য'কাকা।

সকলে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চড়কের বাজনা ধীরে ধীরে অনেক কণ্ঠের কোলাহলে স্পষ্ট হতে লাগল, ক্রমে কাছে এল। মহাপতিবর চোখে জল। এ কলরোলের মধ্যেই কি তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ যুগের সমদ্রকম্পের শব্দেতে পড়ছেন?

শেষ

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দের

ANANDAMATH

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের তমর ২৭রাজা ও জুবাদ

- আনন্দমঠে—আধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূচক
- আনন্দমঠে—'বংশোদ্ভূত' মন্ত্রের পুণ্ড্র-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—শ্রী বঙ্কিম ও শ্রী অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্থশতাব্দীর সাধনে

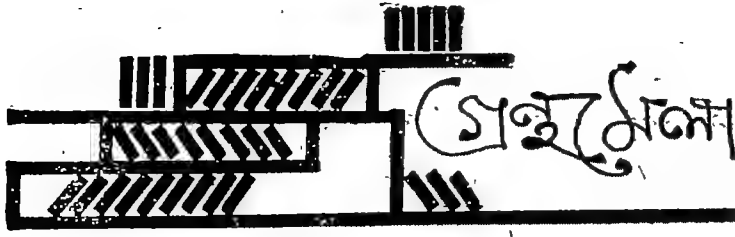
ভারতের আধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পায়

দাম—১০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



কুচ্ছড়া—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বীকস চার্ট্রস্‌ প্রীট, কলিকাতা—১২। দামঃ ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

“একটা উপন্যাস লিখব—নস্টালজিক উপন্যাস? নাম সেব কুচ্ছড়া? কিন্তু আজকের সাদার কলোয়, জটিল তেখার গোলকধাঁধার ভেতরে সে উপন্যাস চলে কি?...” (পৃঃ ৫৪)

“দুঃখ আমি পাই নি। আমার কঠিন বৈষ্ণবতা সার্টিফে কুচ্ছড়ার দ্বারা কেশ তাকে শীতল করে দিয়েছে। নইলে কি কুচ্ছড়কে আমি চিন্তে পারতুম? নইলে কি জমিদারপেক্ষা করতে পারতুম প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যে? মুক্তিতে পাবতুম তার যন্ত্রণার রূপ?... আমি একখানা উপন্যাস লিখব, ‘কুচ্ছড়ার মন্ত্রণা’। জানি না—এ যুগে তার পাঠক আছে কি না...তবু সে উপন্যাস আমার লিখতেই হবে। নিজের মৃত্যুর জন্যেই আমি লিখব।” (পৃঃ ২০১)

বলেছে কিরণ, উপন্যাসের যিনি নামক। জানদেন কথা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস তবু নস্টালজিক নব। যে কোনো ব্রহ্মচর্য গািবিক কবিতার মত এর গতি এবং ব্যঙ্গনা। জন্তব-মস্তন-করা আশ্চর্য এর অর্থনা।

কিরণ সাহিত্যিক। থাকতেন তেভলার সোসে। লুন্যাটিক এসাইলামে স্ত্রী প্রতিমা। জপে দাদার সংসার। কিরণ একদা শিক্ষকতা করেছেন, কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা এমনই যে, সেই শিক্ষকতা তাঁকে ত্যাগ করে দেখাকেই তেলাব সংগে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। তারই বিনিময়ে হয় প্রতিমার চিকিৎসা, চলে দাদার সংসার এবং নিজের প্রায় ছয়ছাড়া জীবন। থেকেও যেন তার কিছুই নেই। দায়, জায়গা, সাহিত্যসাধনা সব কিছুকে যেন তখনছ করে দিতে চায় ফণাধারার মতো প্রেম। সেই প্রেমের আছে সত্যীর জন্মলা, নেই তবু জন্মের প্রকাশ। অসম্ভব স্ত্রী প্রতিমার বাঁধনে গািবন বাঁধা। একদা যে স্ত্রী নিছক সন্দেহ-

বশেই স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে নিজেই বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে সেই অসহায় স্ত্রীর প্রতি আশ্চর্য মমতা-বোধেই ভিত্তি করে নি তাকে। এমন সময় নেহাৎ শরীর ভালো করায় জন্মেই কিরণ পাড়ি দিল সাঁওতাল পবননার। সেখানেই-পরিচয় হোল মিসেস শর্মিলা রায়-চৌধুরীর সঙ্গে। শর্মিলা বিধবা। বিরের করেক-মাস পরেই-স্বামী এক দুর্ঘটনার মারা যায়। শব্দ সময় কাটাবার জন্যেই রীতিতে অধ্যাপনা করেন শর্মিলা। বিষয় তার বিজ্ঞান। আশ্চর্য, যে-কিরণ বন্দুর উপন্যাস তার এডো প্রিয়, তার সঙ্গে এমন আকর্ষকভাবে পরিচয় হবে—এ ছিল কল্পনাতীত। এই মিলনমধুর সুরেই দেখা গেল এক অবাধ-জন্মলা, সে জন্মলা জন্ম-নিঃশব্দে ডলবাসাব। যে ভাল-

জন্মস্টী লেন

বাসাব কিরণ কল্পনা করে কুচ্ছড়া উপন্যাসের, আব মনোভূমিতে মৃত স্বামী অমিতাভের জায়গার কিরণের পদধ্বনি শব্দে মন থেকে আরো বেশি সর্বিষে ফেলাব চেন্টা করে কিরণকে, এমন কি তাব বইগুলোকেও। কিন্তু প্রেমের আগুনে যাব হৃদয় দগ্ধ হয়, পবাস্তব হয় তাব পড়ে পড়ে। অধ্যাপিকা গায়ত্রী শর্মার মাধ্যমে পরিচিত ডঃ ভৌমিককে শর্মিলা বিয়ে করেও পেল না মনে শান্তি। অমিতাভ অনেক দূরে, বিবাহিত ডঃ ভৌমিককে বির্যে কবেও না পাওয়ার এক নিদারুণ কষ্টনা। অনেকদিন পর যখন দেখা হলো শর্মিলাই বললো কিরণকে—“তোমার কিছু দিতে পারি নি—সাহস-ছিল না। তুমি আর এক পৃথিবীর মানব। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।” এ যেন বিজয়ী শর্মিলায় ভাষা নয়, রুদ্ধ কামার ভেঙে-পড়া মিসেস শর্মিলা ভৌমিকের নিজেকে নিঃশেষ করার অলৌকিক আত্মনিবেদন। এই হয়তো হয়। এটাই জীবনের ধর্ম। কিন্তু যে কিরণ বন্দুর উপন্যাস পাঠকের প্রেরণার সম্ভার হয়, সে নিজে কি পেল?—শব্দ সাহিত্যের মিটিঙে যোগদান, স্ত্রীর অজৈতুক সন্দেহ, আর তেভলা মেসে

বহুভক্ত সমাকীর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন। এই কারণে হয়তো এমন জীবনধর্মী উপন্যাস বের হয় তার হাতে। আর উপন্যাসিক ভবেশনা? যিনি শব্দ আদর্শকেই আঁকড়ে থাকলেন, তিনি নিঃশব্দিত হলেন মৃত্যুর গহবরে। হয়তো অমরতা তাবও আছে, কিন্তু কলেক স্ত্রীটের শব্দ ছাড়া আব কি? হয়তো লেখকদের জীবনে এই অহংভাব, এমন অসহায়তা, এমন জীবনবোধ থাকে বলেই তাবা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য। “কুচ্ছড়া” উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে একটি প্রশ্ন। তবু এই অসাধারণ উপন্যাসটি পড়তে আরম্ভ করলে কোনোমতে শেষ না করে ওঠা যায় না। পড়ে মনে হয় শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভাব যাদুস্পর্শ এক নতুন জগতে পাঠক-দেব নিয়ে হাজির করেন। অথচ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রেই যেমন কাঁচ ভেদনি জন্মলা, আব তাব সঙ্গে মিশেছে অলঙ্কারসচেতন ভাবার নিপুণ চিত্রকর উপন্যাসিক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সুগভীর আন্তরিকতা, অতলস্পর্শ বৈদনা। কুচ্ছড়ার চরিত্রেও সেই একই ভাবব্যঞ্জনা। “এ পৃথিবী একবার পার তর, পার নাকো আর?”

উপন্যাসটির প্রচ্ছদ অলংকরণে শ্রীঅজিত-মুন্ডের শিল্প-কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য।

মুন্ডের জন্য—পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। নবায় প্রকাশনী, ১০১১, ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬। দামঃ দুই টাকা।

‘মুন্ডের জন্য’ কাব্যনাট্য। নাট্যকাব্য নয়। মুন্ডের উপবৃত্ত নাট্যকাব্যের অভাব-বাগ্যাদেশ নেই, অভাব শব্দ কাব্যনাট্যের। রবীন্দ্রনাথ সে অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। একালের কবিরের কাছে কাব্যনাট্য রচনার রবীন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। তবু টি এস এলিঅট-কে অবলম্বন করে বা তাকে বেমানান চরিত্র করে আজকাল অনেকেই কাব্যনাট্য লিখছেন। বলা বাহুল্য অক্ষমের শক্তি বড়ই সীমিত। তাই শিব গড়তে হয় শিবা। অবশ্য ‘মুন্ডের জন্য’ যিনি লিখেছেন তিনি স্বক্ষেত্রে কবি, সেক্ষেত্রেই তাঁর গৌরব। তবু তিনি যে কাব্যনাট্য সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক।

এই গ্রন্থে মুন্ডে পরিবেশনের উপবৃত্ত মোট পাঁচটি কাব্যনাট্য আছে। কাব্যনাট্যকারের কৃতিত্ব এই যে, পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অন্যদের তুলনার কিছুটা এগিয়ে যাবার সম্ভবদ্যন্ত ও সাহস দেখিয়েছেন। চাষী পরিবার, বিকৃত শূদ্রাণীরা পাহাড়, সাঁওতাল কন্যা, কীরাত সমাজ, প্রভৃতি তারই উদাহরণ। অবশ্য অন্দুমাত্র তাঁতি বর্মার একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস; ‘সীগ ভ্রম’ প্রাচীন টিউটন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। বা ‘হোক মুন্ডে এগুনি অন্দুমিত্র হলে ভিন্নতর নাটকীয় রূপে দর্শকদের ভালো লাগবে।

বাওয়ালফ

টিউটন পদ্যে অননুযায়ী জন্মের আদি মানব-জীবনী এছাড়া আসফ এবং এম্বায়া। ফালফলে মানবের বংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেবতাবা স্কাইল্ড নামক একজন রাজাকে পাঠান। ইনি খুবই সুশাসক ছিলেন। এই পুত্র বাওয়ালফ (ইনি আমাদের কাহিনীর নায়ক নন)। তাঁর পুত্র হালফডেন যার তিন পুত্র—হোথগার, হেবোগার এবং হলগা—এবং একটি কন্যা, এলান, একজন সুইডিশ সদস্যের পত্নী।

হোথগার যখন সম্রাট তখন স্কেডেল নামক একটি নবজুক রাফস, যে আবেল-হস্তা কেনের জ্ঞাতি, প্রতাহ বায়ে রাজসভায় প্রবেশ কবে যাকে সামনে পেত তাকেই খেঁষে ফেলত। কোন অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করা যেত না। ফলে সম্রাট বড়ই কষ্টে দিন যাপন করছিলেন। (এখানে কোন খৃস্টান অনুলেখক বাইবেলের কাহিনী ঢুকিয়ে দিয়েছেন, কেন ও আবেল, আদম এবং ঈভের দুই পুত্র, একজন কৃষি-জীবী অপর জন পশুপালক)।

ডেনমার্কের যখন এই বিপদ তখন তাব পরিচরিত হয়ে এলেন বাওয়ালফ নামক গীটশ-দেশের জনৈক সামন্ত, সে যুগের যিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি। রাফস স্কেডেল ও তার মা, দুজনকেই বাওয়ালফ হত্যা করলেন। মা বা ডেনমার্ক বাওয়ালফের স্নেহ-ধর্মীতে মৃত্যু হতে উঠল। সম্রাট হোথগার তাকে প্রচুর সম্মান ও উপহারে ভূষিত করলেন। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বাওয়ালফ তাঁর সম্রাট হাইজেলারকে সমুদয় উপহার সমর্পণ করলেন। বাণী হাইজেলারকে দিলেন একটি সুন্দর পবিত্র ও তিনটি মূল্যবান অস্ত্র। বাওয়ালফের বীরত্বের কাহিনী শুনে প্রীতিলাভ করে রাজা হাইজেলার তাকে একটি সোনার তববারি, একটি জমিদারী এবং রাজ-পুত্রের সমতুল্য মর্যাদা অর্পণ করলেন। বাওয়ালফের কাহিনীর সঙ্গে পূর্বকথিত স্বিপডাগের কাহিনীর মিল আছে বলে রাইডবার্গ মনে করেন। আমরা পবে দেখব যে শব্দ বাওয়ালফই নয়, আরও বহু কাহিনী স্বিপডাগের কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে গড়ে উঠছে এবং আবও বহু চরিত্রের উপর বাওয়ালফের প্রভাব পড়েছে।

বাওয়ালফ বরাবরই বাজা হাইজেলারের অনুগত ছিলেন। স্কিটিস এবং হুগদের সঙ্গে যুদ্ধে হাইজেলার মাঝে যান। তখন বাওয়ালফ হুগদের নেতা ডেনেক্সফনকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। বাণী হাইজেলার বাওয়ালফকে সিংহাসন নেবার জন্য অনুরোধ করেন। বাওয়ালফ রাজা হাইজেলারের সিংহাসন নিতে অস্বীকার করেন, এবং নাবালক রাজপুত্র হোথগারকে রক্ষক হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। পবে যখন এই তরুণ রাজপুত্র এয়ানমাস্কেড হাতে নিহত হন তখন বাওয়ালফ সম্রাট হন। তিনি অবশ্য এয়ানমাস্কেড তাই এয়ানমাস্কেডকে হত্যা করে রাজপুত্রহত্যার



(আলভের পর)

প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কথিত আছে অতঃপর তিনি রাণী হাইজিলকে বিবাহ করেছিলেন।

পঞ্চাশ বছর বাওয়ালফ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে একটি ভয়াল ভ্রাণন তাঁর রাজ্যে গ্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বৃক্ষ বাওয়ালফ বাবোজন মাত্র সৈনিক নিয়ে এই ভ্রাণনকে বধ করতে যান। এই বারোজনের মধ্যে এগারজনই ভর পেয়ে পালিয়ে আসে, শব্দ উইগলাফ নামক একজন তাঁর সঙ্গে যাবার ছিল। একা বাওয়ালফ ভ্রাণনটিকে

নরেন ভট্টাচার্য

বধ করেন, কিন্তু সেই বৃক্ষেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সারা দেশের লোকই তাঁর জন্য শোক করেছিল, কেন না তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সাহসী, শক্তিশালী, দয়ালু এবং মহানুভব।

এখন এই ভ্রাণনটি কে? সম্ভবত এখানে স্বিপডাগের কাহিনীর প্রভাব আছে। কেন না স্বিপডাগ শেষ পর্যন্ত ভ্রাণন হয়ে সমুদ্রে বাস করেছিল। পবিত্রী অনুচ্ছেদে এ রহস্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

হোথগার ও বলভার

আবার বলভারের কাহিনী, তবে বর্তমান কাহিনী পূর্ববর্তী কাহিনীর উপর রং-চড়ানো ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নয়। বলভার এ কাহিনীর প্রতিনায়ক।

নমাক হোথগার রাজা গোগার-এর পালিত এবং গোগারের কন্যা নান্নার প্রেমিক (পূর্ববর্তী কাহিনীতে নান্না বলভারের স্ত্রী)। একদিন নান্না যখন স্নান করছিলেন, তখন ওডিনের পুত্র বলভার তাকে দেখে মম্ব হয়ে যায়। ফলে হোথগারের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু বলভার একজন দেবতা সেই কারণে তাকে নিহত করা অসম্ভব। শব্দ একটিমাত্র বিশেষ তত্ত্বটির

ম্বাবাই তাকে হত্যা করা সম্ভব। সেই তববারি আছে মিমিং-এর গৃহায়। হোথগার সেই তববারি নিয়ে এল (প্রথম পর্বে বিজয়-তববারি কথ্য বলা হয়েছে যা গীতিত হিস মিমেরের কাছে। মিমিং চিহ্নে মিমেরের ছাপ পড়েছে, এবং হোথগারের সঙ্গে স্বিপডাগের কিছুটা মিল আছে)। মিমিং-এর তববারি অপহৃত হলে স্যান্নি বজা গেলভার হোথগার বিবুদ্ধে বৃক্ষ ঘোষণা করেন, কিন্তু হোথগার তাকে পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে বৃক্ষ করেন। তা ছাড়া হোথগারের বৃক্ষ ছিলেন হালোগাল্যাণ্ডের রাজা হোথগার যিনি নরওয়ের রাজকন্যা থেরা-কে ভালবাসতেন। তাঁর জন্য হোথগার নরওয়ে আক্রমণ করে এবং তাঁর দখিতাকে তাঁর হাতে তুলে দেয়।

যখন হোথগার এইসব কাজে ব্যস্ত ছিল তখন বলভার গোগার-এর রাজ্য আক্রমণ করে এবং নান্নাকে দাবি করে। তখন গেলভার ও হোথগার সহযোগিতায় হোথগার বলভারকে পরাস্ত করে নান্নাকে বিবাহ করে। মে জল্যাণ্ড এবং সুইডেনের রাজা হয়।

বলভার সহজ মনে এ পরাজয়কে মেনে নেয় না। সে পাল্টা আক্রমণ করে হোথগারকে বিপন্ন করে, কেন না বলভার ছিল দৈবশক্তিযুক্ত বলীয়ান। হোথগার পালিয়ে গিয়ে জুটল্যাণ্ডে আশ্রয় নেয়। তারপর চূড়ান্ত যুদ্ধে হোথগারের হাতে বলভার নিহত হয়।

বলভারের মৃত্যু সংবাদ শুনে ওডিন জানতে চান কে তার প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ নিয়েছিল ওডিনের পুত্র বো অথবা বাও, (পূর্ববর্তী কাহিনীর ভালে)। বাও জন্ম হয়েছিল রিন্ডা-ব (পূর্ববর্তী কাহিনী বিন্ড) গর্ভে। পূর্ববর্তী কাহিনীর ভালে, যে বর্তমান কাহিনীর বাও, একটি নেকড়ে বাঘ (উলফ, ওয়ালফ) মেরেছিল। তবে এই কি ডেনিশ কাহিনীর বাওয়ালফ? বাওয়ালফ মাঝে গিয়েছিল ভ্রাণনকে হত্যা করতে গিয়ে। আমরা আগে দেখেছি স্বিপডাগ শেষ পর্যন্ত

দ্রাগন হয়েছিল। অপরাধকে হোখারকে বলভারের অধ ভাই হোখারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এদিকে আবায় স্বিপডারের একটি নাম ওভার। এগুলি হচ্ছে গৌরবিক মিশ্রণেব উদাহরণ। প্রতি যুগে, তার পূর্ব-বর্তী যুগের বীরদের কাহিনী সমসাময়িক যুগের বীরদের উপর আরোপিত হয়েছে।

হ্যামলেট উপাখ্যান

হোখারের পুত্র রোরিক। তিনি হরওয়ে-ডিল (পূর্ববর্তী কাহিনীর ওরডাডিল?) নামক একজন বিস্কৃত সম্রাটকে জুটল্যান্ডের শাসনভাব অর্পণ করেন। হরওয়েডিল যত্ন যুগে জরলাভ করেছিলেন, ফলে রাজা রোরিক তাকে স্বাধীন রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নিজ কন্যা-গেরুধা-ব সঙ্গে তার বিবাহ দেন (গেরুধা হচ্ছে শেক্সপীয়ারের গার্ডুড)। এঁদের যে পুত্র জন্মায় তার নাম আমলেথ (শেক্সপীয়ারেব হ্যামলেট)।

হরওয়েডিলের ভাই ছিল ফেঙ্গ। দ্রাতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে সে তাকে হত্যা করে এবং গেরুধাকে বিবাহ করে জুটল্যান্ডের সম্রাট হয়। প্রজাদের সে বা হোক করে হাত করে।

কিন্তু ব্যাপারটা আমলেথের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন সে আশ্রয়ার্থে ও প্রতি-শোধ গ্রহণার্থে উল্লেখ্যতার ভাণ করে। তখন রাজার একজন বন্ধু ও সভাসদ (শেক্সপীয়ারের পোলোনিয়াস) ফেঙ্গকে বোঝায় যে আমলেথ সত্যিই পাগল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তারকে তাব মায়ের কাছে পাঠানো হোক, এবং সে নিজে পদীর আড়ালে থেকে ব্যাপারটা বুঝবে। তাই করা হল, এবং যখন আমলেথ তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল তখন সেই সভাসদ আড়ালে লুকিয়ে বইল। আমলেথ তা বুঝতে পেরে তখনই তাকে ভরবারির আঘাতে হত্যা করল। তাব মাকে সে ভীষণ তিরস্কার করল কেন্দ্রকে বিবাহ করার জন্য।

তখন ফেঙ্গ আমলেথকে হত্যা করার কথা ভাবল, কিন্তু রাজা বোরিকের ভয়ে তা করতে সক্ষম হল না। সে আমলেথকে বুটেনে গঠাল একটি গোপন লিপি দিয়ে। তাতে লেখা ছিল যে বুটেনবাজ আমলেথকে যেন হত্যা করেন। সেই লিপি গোপনে আমলেথ খুলে পড়ল এবং সেটি নষ্ট করে দিবে আর একটি জাল পত্র রচনা করল—বুটেনরাজ যেন তার কন্যার সঙ্গে আমলেথের বিবাহ দেন।

এক বছর পবে আমলেথ ফিবে এল। রাজসভায় সেদিন ছিল একটি আনন্দোৎসব। সেই সভায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমলেথ সভাসদের হত্যা করল। তারপরে বিছানা থেকে নির্দ্রিত ফেঙ্গকে টেনে বাব করে এনে জ্বলে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ ছিল। এইভাবে আমলেথ ডেনমার্কের রাজা হল। সে বুটেন এবং স্কটল্যান্ডে অভিযান করে-ছিল। এই সময় রাজা রোরিক মারা যান।

তার পুত্র উইগলেক কিছু আমলেথের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। সে আমলেথকে রাজদ্রোহী হিসাবে গণ্য করল। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাসল এবং যুদ্ধে আমলেথ নিহত হল।

জুটল্যান্ডে এখনো আমলেথের সমাধি আছে বলে অনেকের ধারণা। যে স্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার নাম অরমেল হেথ।

ভোলসাংগদের কাহিনী

আমবা পূর্বে দৈত্য ঋ-জামে ভোলসাংগেব উল্লেখ করেছি যে বিশ্বাত বিজয় তববারিবা প্রস্তুতকারক। অ্যাঙ্গল এবং স্যার্লদের নিকট এই বাতি ওয়েলান্ড নামে পরিচিত। আরও বহু স্থানে এই ওয়েলান্ড বা ভোলসাংগকে নিয়ে অনেক লোকগাথা রচিত হয়েছে।

আমবা এও দেখেছি যে দেবতা মিমের ভোলসাংগকে বন্দী করেছিলেন এবং বিজয় তববারি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই কাহিনী-টিকেই পল্লবিত করা হয়েছে। সুইডসদের কাছে মিমের মিখাড নামে পরিচিত।

ভোলসাংগের সমস্ত ধনসম্পদ হুইডমার নামক জনৈক বামন রাজা ভোগ করত। তাব তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র তিনটি হচ্ছে কাফনার, ওটার এবং রেগিন। একদিন ওডিন এবং হোনার হুইডমারের রাজ্যে এলেন, সঙ্গে এল লোক। দুইজন লোক দেখল যে হুইডমারের পুত্র ওটার নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাচ্ছে। তার মাথার একটা কুমতলব খেলে গেল। সে ওটারকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করল।

কিন্তু হুইডমার বুঝতে পেরেছিল তাব পুত্রের হত্যাকারী কে। সে লোকিকেই হত্যাকারী বলে ঘোষণা করল, এবং শাস্তি-স্বরূপ ওটারের সমস্ত সোনা দাবি করল; জামিনস্বরূপ সে ওডিন ও হোনারকে বন্দী করে রাখল। লোক তখন সেই পরিমাণ সোনা সংগ্রহ করে এনে দিবে যত্ন হল। কিন্তু সেই সোনা ছিল অভিশপ্ত।

ফলে সেই সোনার অধিকার নিয়ে হুইডমারের সঙ্গে কাফনারের বিরোধ বাসল যাব পরিণামে কাফনার তাব পিতাকে হত্যা করল। তাব অপর ভাই-রেগিন ও তিন ভগিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই সম্পত্তি ভোগ করতে লাগল। কিন্তু শাস্তি সে পেল না। শেষ পর্যন্ত সে একটি বনে গিয়ে দ্রাগন হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত এই দ্রাগন মরা গেল সিগমুন্ডের হাতে।

এখন এই সিগমুন্ডের বংশ পরিচয় দেওয়া যাক। ওডিনেব এক পুত্রের নাম সীজ; তাব পুত্র রেগিব; তার পুত্র ভোলসাংগ, তার নামে এই বংশে ভোলসাংগ বংশ বলে পরিচিত। ভোলসাংগের পুত্র সিগমুন্ড এবং তার পুত্র সিগমুন্ড।

ভোলসাংগের দুই পুত্র এক কন্যা।

কন্যাটি সিগমুন্ডের বন্ধু। নাম সিগনি। তার সঙ্গে গাউটল্যান্ডের রাজা সিগগেইয়ের সঙ্গে বিবাহের সংবন্ধ হয়। সেই বিবাহ-সভায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে একটি দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

যেখানে বিবাহের ভোজসভা বাসেছিল সেখানে হ্যান্ডটক নামে একটি বৃহদাকার ওক গাছ ছিল। হঠাৎ দেখা গেল হিমবসন পরিহিত একটি বৃক্ষ এসে একটি উল্লেখ্য ভরবারি সেই ওক বৃক্ষের কাণ্ডে আমল প্রোথিত করে ঘোষণা করল যে, এই দৈবগুণ-সম্পন্ন ভরবারিটি যে টেনে বার করে নিজে পারবে তারই অধিকার আসবে। এই বলে সেই বৃক্ষ চলে গেল। এই বৃক্ষ ওডিন ছাড়া আর কেউ নয়।

তখন সকলেই একে একে সেই ভরবারিটি টেনে বাব কববার চেষ্টা করল, এমন কি নতুন জামাতা সিগগেইও। কিন্তু কেউই তা করতে সক্ষম হল না। অবশেষে সিগমুন্ডই ভর-বারিটিকে টেনে বার করল এবং তার মালিক হল। তখন সিগগেইব সেটি কিনে নেবাব প্রস্তাব করল, কিন্তু সিগমুন্ড রাজী হল না। বিবাহ উৎসব মিটে গেল। সিগনিকে নিয়ে সিগগেইর গাউটল্যান্ডে ফিরে গেল।

তিন মাস পবে সিগগেইর ভোলসাংগ ও তার দুই পুত্রকে নিমন্ত্রণ করল। তারা নিমন্ত্রণ গ্হণা করতে গলে সিগগেইব অতর্কিতে তাদের হত্যা করল এবং সেই ভরবারি অধিকার করল। একমাত্র সিগমুন্ডই বেঁচে গেল। সে যখন-জগলে পালিয়ে বেড়াতে লাগল এবং মনে মনে এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করল। আরও একজন পিতৃ-ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ সম্পন্ন নিয়েছিল, সে হচ্ছে সিগগেইবের স্ত্রী সিগনি।

সিগনি জানত সিগমুন্ড কোথায় আছে। সে তার একটি পুত্র সিনফকোটাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। সিগমুন্ড তাকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিল এবং তারক নিয়ে একদিন হঠাৎ সিগগেইয়ের প্রাসাদ অতর্কিতে আক্রমণ করল। সিগগেইরকে তারা বিছানা থেকে তুলে হত্যা করল এবং সমগ্র প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিল। এইভাবে ভোলসাংগের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল।

সিগমুন্ডের পুত্র হেলজি। তার মত বীর সে যুগে ছিল না। রাজা হারল্ডকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তার নাম হয়েছিল হারল্ডসবেন। এই হেলজি যখন তার বাহিনী নিয়ে পূর্ব-মুখে যাত্রা করছিল তখন তাব সঙ্গে সিগমুন্ড নামে এক-রাজকন্যাব সাক্ষাৎ হয় যে ছিল রাজা হোমনির কন্যা। মেয়েটিকে হেলজি প্রথম দর্শনেই ভালবাসে ফেলে, কিন্তু সিগ-মুন্ড জনম্য যে তার পিতা হারল্ডের পুত্র হোমল্ডের সঙ্গে তার বিয়ে সংবন্ধ করেছে। তৎক্ষণাৎ হেলজি পূর্বকথিত সিনফকোটাকে সঙ্গে নিয়ে হোমল্ডের ও হোমনির সম্মিলিত

বাহিনীর বিরুদ্ধে হুম্ব মোষণা করে এবং উভয়কেই পরাজিত ও নিহত করে। হোগার্নির পুত্র ডাম শমু হেলজির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অতঃপর হেলজি সিগমুন্ডকে বিবাহ করে পরম সুখে দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু একদা ডামের চক্রান্তে হেলজির মৃত্যু হয়। তার সঙ্গে সিগমুন্ডও অনুমৃত্যু হয়। হেলজি এবং সিগমুন্ডের প্রেম নিয়ে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে।

সিগমুন্ডের ভ্রাতৃপন সিনফজোটল অতঃপর হুনল্যাণ্ডে ফিরে আসে। এখানে সে এক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতদ্বী হয়ে দাঁড়ায় রাজা সিগমুন্ডের শ্যালক, রাণী বোয়াহিল্ডের ভাই। শ্যালক শেষ পর্যন্ত স্বন্দরীকে সিনফজোটলের হাতে নিহত হয়, এবং এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে গোপনে বিষ প্রয়োগে সিনফজোটলকে হত্যা করেন।

ব্যাপারটি জানতে পেরে, বিবস্ত্র হয়ে সিগমুন্ড রাণীকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। এ পক্ষেব স্ত্রীর নাম হুজরডিস, রাজা এইলাইমের কন্যা। কিন্তু হুজরডিসের পায়প্রার্থী ছিল আরও একজন, সে হচ্ছে হিল্পে, হেলজি কতৃক নিহত রাজা হাফিড-এর পুত্র। হিল্পে সিগমুন্ডকে পরাজিত ও নিহত করল। সিগমুন্ডের স্ত্রী হুজরডিস পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় পেল ভাইকিদের দলপতি আলফ-এর নিকট। এখানেই তার গর্ভে সিগমুন্ডের পুত্র জন্মাল, যে হচ্ছে সিগুড।

এই সিগুডের সঙ্গে পরিচয় হল রোগিনের, যে হচ্ছে সেই কক্ষনারের ভাই যে তাদের বশিত করে সকল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিল এবং পরিণামে ভ্রাগন হয়ে বাস করছিল। রোগিনের তৈরি অস্ত্রের সাহায্যে সিগুড সেই ভ্রাগনকে বধ করল। তারপর সে একটি দৈববাণী শুনল : হিণ্ডারফেলের এক দুর্গে ব্রাইনহিল্ড নামে এক সুন্দরী অনন্তকাল ধরে নিদ্রিত আছে। সিগুডকে তার হুম ভাঙাতে হবে।

হিণ্ডারফেলের দুর্গে এসে সিগুড দেখল যে বর্ম পরিহিত একটি মেয়ে ঘুঙ্গিরে আছে। সে তববারি দিয়ে বর্মটি কেটে দিতেই মেরেটির ঘুম ভাঙল। মেরেটি, যার নাম ব্রাইনহিল্ড, অতঃপর জানতে চাইল যে সিগুড একজন ভোলসাঙ্গ কিনা, কেন না একজন ভোলসাঙ্গ তাকে উদ্ধার করবে এ রকমই নাকি কথা ছিল। যখন সে জানল যে সিগুড একজন ভোলসাঙ্গ, তখন সে প্রতিশ্রুতি মিল যে, সে সিগুডকে বিবাহ করবে।

তারপর সিগুড রাজা গিউকির আলয়ে গেল। বাজার ইচ্ছা যে রাজক্যা গুডমুন-এব সঙ্গে সিগুডের বিবাহ হোক। কিন্তু রাণী ব্রিডহিল্ড মন্থনালে জানতে পারল যে সিগুডের মন পড়ে আছে ব্রাইনহিল্ডের উপর। তখন সে যাদুশক্তিসম্পন্ন একটি

পানীর সিগুডকে বাইরে তাকে তার অতীতের সব কথা ভুলিয়ে দেয়। অতঃপর সিগুডের সঙ্গে গুডমুনের বিবাহ হয় বার ফলে তাদের সিগমুন্ড নামে একটি পুত্র জন্মায়। এদিকে ব্রাইনহিল্ডের গর্ভে সিগুডের অসলোগ নামক একটি কন্যা পুবেই জন্মেছিল।

একদিন ব্রাইনহিল্ড এবং গুডমুন এক-নিজপুত্র গুডমুনের সঙ্গে বেন ব্রাইনহিল্ডের বিবাহ হয়। মন্ত্রের প্রভাবে ব্রাইনহিল্ডও সিগুডের সঙ্গে তার পূর্বসম্পর্কের কথা ভুলে গিয়েছিল। ফলে বিবাহ হতে কোন বাধা হল না।

একদিন ব্রাইনহিল্ড এবং গুডমুন এক-সঙ্গে স্নান করছিল, হঠাৎ গুডমুনের হাতে সিগুডের আঁঠি দেখে ব্রাইনহিল্ডের পূর্ব-স্মৃতি ফিরে এল। দুঃখে এবং ক্রোড়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যদিও সে বুঝতে পারল এতে-সিগুডের কোন-লোভ নেই, তবুও সে মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। সে তার স্বামী গুডমুনকে প্ররোচিত করল বেন সে সিগুডকে হত্যা করে। ফলে ঘুমন্ত অবস্থায় একদিন সিগুড আততায়ীর হাতে মারা গেল।

সিগুডের মৃত্যুর পর ব্রাইনহিল্ডের চেতনা ফিরে এল। সে বুঝতে পারল কি জঘটন ঘটে গেল। সিগুডের চিত্ত সে-ও সহমৃত্যু হল। আর গুডমুন নির্বাক হয়ে বসে স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করতে লাগল। গুডমুনের দুঃখকে অবলম্বন করেই টেনিসন তার "হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড" কবিতাটি লিখেছিলেন।

ব্রাইনহিল্ডের গর্ভে সিগুডের অসলোগ নামে একটি কন্যা জন্মেছিল। সে ছিল শেষ ভোলসাঙ্গ। তাকে পালন করেছিল হাইমের। সিগুডের মৃত্যুর পর, পাছে তার কন্যাকেও কেউ হত্যা করে এই আশঙ্কায় হাইমের তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। সেখানে সে ঋক এই নামে বাস করতে থাকে। অবশেষে ভাইকি-দের রাজা রাগনার তাকে বিবাহ করেন। তাদের বংশধররা পরে নরওয়ের রাজা হয়েছিল।

সিগুডের বিধবা পত্নী গুডমুন স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল তার ভাইদের উপর।

এই হল বিখ্যাত "ভোলসাঙ্গ সান্স" বা ভোলসাঙ্গদের কাহিনী।

নিবেলুগেনলিড

এ কাহিনীর নায়ক সিগফ্রিড, নেদার-ল্যাণ্ডের রাজা সিরেগমুন্ডের পুত্র, বালক বয়স থেকেই সে ছিল অসীম শক্তিশাল ও অসমসাহসী। তার দুর্বলতপনার অস্থির হয়ে লোকে রাজার নিকট নাগিশ করত। ফলে রাজা তাকে মিমের নামক কর্মকারের নিকট বিদ্যালয়িকার জন্য পাঠালেন। মিমের বাস করত গভীর বনে। সেখানে সিগফ্রিড যুগ্মবিদ্যায় কৃশলী হয়ে উঠল।

কিন্তু মিমের লোকটি ভাল ছিল না। সে এবং তার সহকারী ওয়েলান্ড (এখানে পূর্বের মিমের-ভোলাস্ট কাহিনীর প্রভাব আছে) সিগফ্রিডকে কষ্ট দিত। একদা মিমের একটি ভাল তরবার তৈরি করেছিল। সেই তরবারি সিগফ্রিড তার কাছে থেকে চেয়েছিল। কিন্তু তা দেওয়া তো দুঃস্বপ্ন কথা, এর জন্য মিমের সিগফ্রিডকে ভীষণ করেছিল। ফলে সিগফ্রিড একদিন মিমের এবং ওয়েলান্ডকে প্রহার করল।

সেই বনে এক ভ্রাগন বাস করত। সিগফ্রিডের হাতে মার খাবার পর মিমের তার কাছে গিয়ে সিগফ্রিডকে হত্যা করবার জন্য উৎসাহিত করল। কিন্তু সিগফ্রিড ভ্রাগনকে সহজেই নিহত করল। তারপর মিমেরকে হত্যা করে সোজা রাজপ্রাসাদে ফিরে এল।

অতঃপর সিগফ্রিড সমুদ্রযাত্রা করে এক দেশে এল যেখানে সুন্দরী বার্নহিল্ড বাস করত। তার চেহারা যেমন সুন্দর, তৃষ্ণ-বিদ্যাতেও সে তেমন পারদর্শী। সে সিগফ্রিডকে বিবাহ করতে চাইল, কিন্তু সিগফ্রিড তাকে প্রত্যাখ্যান করল, কেননা বোম্বা মেরে তার পছন্দ নয়।

তারপর সে নিবেলুগেনের দেশে গেল যেখানে বারটি রাক্স অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং সেখানকার দুই রাজপুত্র পারম্পরিক কলহে মগ্ন। রাক্সদের মেরে সিগফ্রিড নিবেলুগেনে প্রীতি আকর্ষণ করল যারা তাকে তাদের রাজ-পদ দিতে চাইল। কিন্তু সর্বিনে ভ্র প্রত্যাখ্যান করে সিগফ্রিড নেদারল্যাণ্ডে ফিরে এল। তার খ্যাতি শুধুকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে ফিরে সে শুনল বার্গাণ্ডির রাজকন্যা ক্রিমহিল্ড-এর সৌন্দর্যের কথা। তাকে বিয়ে করার জন্য সিগফ্রিড অস্থির হয়ে উঠল এবং সে একটি বাহিনী নিয়ে বার্গাণ্ডি অভিযানে যাত্রা করল।

তিনপুত্র, পাম্পার, গেরনট এবং গিলেলহার ও কন্যা ক্রিমহিল্ডকে রেষে বার্গাণ্ডিরাজ মারা গিয়েছিলেন। সিগফ্রিড যখন বাহিনী নিয়ে দুর্গস্বরে পৌঁছাল তখন হ্যাগেনের পরামর্শে রাজা গাম্পার তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সিগফ্রিড তখন দলবল নিয়ে বার্গাণ্ডির দুর্গে বাস করতে লাগল যদিও ক্রিমহিল্ডের সঙ্গে তাব সাক্ষাৎ হয় নি।

এদিকে স্যারনরাজ লুডগাব এবং ডেনরান্স লুডগাল্ট একত্রে বার্গাণ্ডি আক্রমণ করল। সিগফ্রিড বার্গাণ্ডিরাজ গাম্পারের হয়ে তাদের চড়াবলভাবে পরাজিত করল। একমাত্র তারই বীরত্বে বার্গাণ্ডি রক্ষা পেল।

তখন সিগফ্রিডকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য এক বিরাট ভোজসভা ও সপ্তাদশদিনব্যাপী উৎসবের ব্যবস্থা হল। এখানে সিগফ্রিড ক্রিমহিল্ডের দেখা পেল। তার হৃদয়ের ভুলনা নেই। সিগফ্রিড দীর্ঘস্বাস ফেলল। কেননা প্রেমের ব্যাপারে সে সর্বাধিক করতে পারছিল

সাম্প্রদায়িক বসুমতী

দা। কৃষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে সে বাবাব বাগানিঙ জাগ করার সংকল্প বঁধছিল, কিন্তু ক্রিমহিলডের কথা ভেবে যেতে পারছিল না।

এদিকে রাজা গান্ধার পূর্বোন্নিখিত বান'হিলডকে বিবাহ করার জন্য সচেষ্ট হল। সম্বণ থাকতে পারে এই বান'হিলড সিগফ্রিডকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সিগফ্রিড কতৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বান'হিলডের একটি সত' ছিল, যে তাকে যুদ্ধবিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে, না পারলে তাকে নিহত হতে হবে। এই বিষয় গান্ধার সিগফ্রিডের সহানু্য চাইল। সিগফ্রিড জানাল যে যুদ্ধবিদ্যায় বান'হিলডকে পরাজিত করা গান্ধারের কর্ম নবা। তবে যদি গান্ধার ক্রিমহিলডের সঙ্গে সিগফ্রিডের বিয়ে দিতে রাজী হয়, সিগফ্রিড যেমন করেই হোক বান'হিলডকে গান্ধারের কাছে এনে দেবে। গান্ধার সানন্দে রাজী হল।

মোট সাতজন লোক নিয়ে গান্ধার ও সিগফ্রিড ইসেনল্যাণ্ডে বান'হিলডের দুর্গে গেল। সিগফ্রিডের কৌশলে গান্ধার প্রতি-বোধিতার জয়লাভ করল এবং বান'হিলডকে বিবাহ করে নিয়ে এল। পূর্বে প্রতিশ্রুতিমত গান্ধার ক্রিমহিলডের সঙ্গে সিগফ্রিডের বিবাহ দিল। সিগফ্রিডের আশা পূর্ণ হল। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে সে নেদারল্যাণ্ডে ফিরে গেল।

এদিকে সিগফ্রিডের প্রত্যাখ্যান বান'হিলডের মনে ছিল। সে চেষ্টাছিল সিগফ্রিডের উপর প্রতিশোধ নিতে। পর বৎসর সিগফ্রিড বান'হিলডে এলে বান'হিলড ক্রিমহিলডকে সামন্তের পদী বলে উপহাস করল। ক্রিমহিলডও পাট্টা জবাব দিল।

তখন বান'হিলড গান্ধারকে সিগফ্রিডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু গান্ধার জানাল যে সিগফ্রিড কখনো তার উপকার ছাড়া অপকাব করে নি। কাজেই সে কখনো সিগফ্রিডকে শত্রু মনে করে না। তখন হন'হিলড গান্ধারের ভাই হ্যাগেনের শরণাপন্ন হল। হ্যাগেন সিগফ্রিডের বীষয়ে ঈর্ষান্বিত ছিল। সে সহজেই সিগফ্রিডকে হত্যা করতে রাজী হল।

একদিন রাজা গান্ধার সিগফ্রিডসহ শিকারে গিয়েছিল। শিকারকর্ম সমাপ্ত হবার পূর্বে তারা বিশ্রাম করছিল। সিগফ্রিড তার ভাইর ধনুক ও বর্ম খুলে রেখে পান করছিল। এই সময় পিছন থেকে হ্যাগেন এসে তার পৃষ্ঠ-সঙ্গে আঘাত করল। আহত সিগফ্রিড আততায়ীকে শাস্ত দেবার জন্য ভীষণদ্রুত নিতে গিয়ে দেখল যে সেগদুলকে আগে থেকেই সরানো হয়েছে। হ্যাগেন ইতিমধ্যে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে সিগফ্রিডের চোখে মৃত্যুর ছায়া নেমে এল। গান্ধার এই কিস্যাসম্বাতকতার স্তম্ভিত হয়ে গেল। সকলেই শ্রোদন করতে লাগল। তারপর সিগফ্রিডের মৃতদেহকে দুর্গে নিয়ে

আসা হল। ক্রিমহিলড মুহিত হয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হল তখন সে নিজস্ব মানুস। তার চোখে প্রতিশোধের আগুন। সিগফ্রিডের হত্যাকারীকে সে চিনতে পেরেছিল।

রাজ্যব্যাপী তিন দিন শোকের পর গীর্জার প্রাঙ্গণে সিগফ্রিডকে সমাধিস্থ করা হল।

সিগফ্রিডের মৃত্যুর তের বছর পূর্বে ক্রিমহিলড হুনরাগ এটেলকে (এটীলা) বিবাহ করল। ইতিহাসে এটীলাকে নিষ্ঠুরভাবে চিত্রিত করা হলেও, টিউটন পূর্বাণে তাকে খীরশ্বর, নম্র, প্রতিহিংসাবিশ্বাস নরপতিরূপে অংকিত করা হয়েছে। ক্রিমহিলডের উদ্দেশ্য ছিল সিগফ্রিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। তাব মন্ত্রণায় রাজা গান্ধার, হ্যাগেন ও অপকাবর বাগানিঙের নাইটসের নিমন্ত্রণ করে আনা হল। রাজা এটেল নিমন্ত্রিতদের প্রতি অসম্মানবোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু রাজদ্রোহী ব্রোয়েডেলকে ক্রিমহিলড গান্ধার ও হ্যাগেনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত রাজা এটেলের প্রাসাদে রীতিমত যুদ্ধ বেধে যায়। ডিরেক্টর নামক এক সামন্ত গান্ধারকে হত্যা করে এবং হ্যাগেনকে বেঁধে এনে রাণী ক্রিমহিলডের হাতে সমর্পণ করে। ক্রিমহিলড স্বহস্তে তাকে হত্যা করে সিগফ্রিড হত্যার প্রতিশোধ নেয়। এদিকে একজন যুদ্ধ সেনাপতি ক্রিমহিলডের মৃত্যু হয়ে ক্রিমহিলডকেও হত্যা করে। সার্বিক রক্তপাতের মধ্যেই সিগফ্রিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। তার ফলে বহন করার জন্য আর কেউই বেঁচে ছিল না।

নিবেলুংগেনলিডের কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই।

উপসংহার

শ্বিতীয় পর্বের কাহিনীগুলি পূর্ববর্তী পর্বের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। এগুলির পটভূমি স্বর্গ নয়, পৃথিবী; দেবতা নয়, মানুস; দৈত্য নয়, রাক্ষস। প্রথম পর্বে ইউরেনপের প্রাক-খৃষ্টীয় প্যাগান ধর্মের পরিচয় পওয়া যায়। টিউটন দেব-দেবী সম্ভবত প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিগুলিরই প্রতীক। তাদের কাহিনীসমূহের মধ্যে অতীত জাতিগত স্মৃতির পবিচয় আছে। "আশা" ও "ভানা" এই দুই দেবগোষ্ঠী নিম্নলিখিত টিউটন জাতির দুইটি ধারা প্রতীক। বিভিন্ন দৈত্য এবং বাক্স-বংশ, তাদের বাজা অথবা নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ, টিউটনদের শত্রু জাতিসমূহের প্রতীক, যদিও কোন কোন সময় টিউটনদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, টিউটন পূর্বাণের দৈত্য-গণ পূর্ববর্তী অন্য কোন জাতির পূরাণ অবলম্বনে কল্পিত হয়েছে—যেমন গ্রীক ডলম্পিয়ানদের সঙ্গে টাইটানদের যুদ্ধ, অথবা ভারতীয় দেবাসুর যুদ্ধ প্রভৃতির কাহিনী সম্ভবত তাদের পূরাণকে প্রভাবিত করে থাকবে। সকল প্রাচীন জাতির ধর্মই ভালো

এবং মঙ্গের মূল্য, আলো ও অধার, গ্রীষ্ম ও শীতের স্বপ্নের রূপকে প্রকাশিত হয়। গ্রীক পূরাণে প্রভাতের দেবতা হার্মেস রাত্রি দেবতা আর্গাসকে বধ করেছে। সেন্ট (কেল্ট) পূরাণে সূর্যদেবতা লুথ রাত্রিরূপী বালোককে পরাজিত করেছে। এই যুদ্ধ টিউটন পূর্বাণে বর্তমান। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অসং সংকে জয় করেছে, তমসা জ্যোতির্কে জয় করেছে। গ্রীষ্ম-দেবতা বলডাব নিহত হচ্ছেন শৈত্যের লতা মিসলটো দ্বারা। দেবগণের পতন ঘটছে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় মেজিন্টাকিলিস, লোকি। অলো পরাজিত হচ্ছে অশ্বকারের কাছে, বসন্ত শীতের কাছে, ন্যায় অন্যায়ের কাছে। সর্বশেষ আলছে দেবতাদের গোষ্ঠী, র্যাগনারোক, যেখানে দেবতারা নিহত হচ্ছেন, দেবীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, দিভুবন তমসায় আবৃত হচ্ছে।

শ্বিতীয় পূর্বে দেবতার চেয়ে মানুসই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রতি-বৃগে, তার পূর্ববর্তী যুগের বীরদের কাহিনী সমসাময়িক যুগের বীরদের উপর আয়োগিত হয়েছে। সব কাহিনীগুলিই মূলত একই ধরনের। নায়ক মহাবীর, বাহুবল, শত্রুকে জয় করে, নিজের গুণপনার পরিচয় দেখিয়ে, সে নারিকার হৃদয় জয় করে। কিন্তু পরে সে একজন খল-নায়কের চক্রান্তের বলি হয়। তারপর শত্রু হয় বংশগত শত্রুর ইতিহাস। প্রথম পর্বের শ্বিপডাণের বা কাহিনী, সেই একই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বাওরালকে, হ্যামলেটকে সিগফ্রিডে। এখানে নায়ক-নারিকার নাম শত্রু ভিন্ন, কাহিনী সেই একই। তবে শ্বিতীয় পর্বের কাহিনীগুলির কিছুটা ঐতি-হাসিক মূল্য আছে। এই কাহিনীগুলির পটভূমি হচ্ছে প্রধানত নবওরে, সাইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, তবে মাঝে মাঝে এই পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এমন কি স্কটল্যান্ডও। আলৌকিক বিষয়-গুলি বাদ দিলে, ঘটনাবলির বাস্তব হতে কোন বাধা নেই। টিউটন পূরাণের বিভিন্ন চরিত্রে মূলত টিউটনিক জাতিগোষ্ঠীই অভিনব করেছে, তবে রোম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার টিউটনদের অপর্ব এক শরিক হুনদেরও কিছু ভূমিকা আছে। ডিরেক্টরের কাহিনী এখানে আর্মি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি, কেননা তা স্পষ্টতই হুন, টিউটন নয়। তাছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে যা হচ্ছে খৃষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ। টিউটনদের দেবলোক ও সংস্কৃতি প্রাক-খৃষ্টীয় প্যাগান সংস্কৃতির নিদর্শন এবং সমগ্র টিউটন জাতি খৃষ্টীয় ম্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত হয় নি। তবে মাঝে মাঝে খৃষ্টান সংস্কৃতির পবিচয় পাওয়া যায়। টিউটন দেবতা ও বীরপুরুষেরা সচরাচর চিতায় শূর্যহেন, কিন্তু হ্যামলেটকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর সিগফ্রিডকে তা দেওয়া হয়েছে গীর্জার প্রাঙ্গণে।

সমাপ্ত



একটা নিরন্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেই ঘন হয়ে নেমে আসবে সম্মার অন্ধকার, চক্ৰবানী পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলে উঠবে, শব্দের গম্ভীর শব্দে মূখর হয়ে উঠবে চারিদিক—ঠিক তখন সে এসে দাঁড়াবে।

কড় হোক। জল হোক। রোজ আসা চাই তার। হাবু চুল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আব তীর অস্বস্তিতে মনটা চুল্লীর ভেতরের লোহার রঙের মতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।—এই করছি কী রে চাঁদু? ভাত খাস না, বালি খাস।

হাপর টানতে টানতে চাঁদু তাড়া খেয়ে চমকে ওঠে। আস্তে খুব আস্তে অস্পষ্ট গলায় বলে, জোবেই তো টানছি হাবুদা—

গোকুল বন্দাবনে

পেরেছি রূপ রতনমণি।

একতাবার ঝঙ্কার তুলে থেমে গেল নিতাই।—কি গো হাবুদা কেমন আছে?

হাবু কথা বলে না। আগুনে পোড়া লোহার রঙটা গনগনে লাল হবে উঠছে।

কামরশালার অন্ধকার কোণে কোণে তার

আঁকা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোর হাবুদা মুখখানা কেমন একটা শিলাখণ্ডের মত দেখালো।

—বাবা এতক্ষণে তাহলে মনে পড়ল বান্ধাজী! পাশেই চা পেঁয়াজীর দোকান থেকে এল শৈবলিনী।

—চল তোমার দোকানেই বসা থাক। কানারগালটা যা গবম।

—আমার ওখানেও তো উনুন জ্বলছে বান্ধাজী। বলেই অকাবণে ঝিল ঝিল করে হেসে উঠল শৈবলিনী। হাসির দমক কমলে নিতাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এস চাপা গলায় বলল, মনে শান্তি না থাকলে সব জায়গাই গরম লাগে না কি বলে। বান্ধাজী?

আবার হাসির ফোয়ারা উঠল।

—আহা—আহা করছো কি হাবুদা, গবম লোহাটা নিষে চুপ করে বসে আছো কেন? মৃত. পারে হাবুদা কাছে এল নিতাই। কতক পড়ে হাবুকে আবার বলল, ঠান্ডা হবে গেলে হাবুড়ির ঘা দিয়ে আব কিছ করতে পারবে না ভাই—

—দ্বিম যেখানে যাচ্ছে যাও না—খুব

হুক আব কক'শ শোনালো হাবুদা গলার স্বব। জ্বলে উঠে দাঁড়ালো। একটা পা নেই তার। অনেকদিন আগে ধলদীঘির মেলায় গোরুর গাড়ির চাকর নিচে পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছিল।

মফস্বল শহরের হাসপাতালে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার মূল্য দিয়ে এসেছিল হাবুদা। অপারেশন করতে গিয়ে পা এত বেশি খারাপ হয়েছিল যে কেটে বাদ দিতে হলো।

কিচ বগলে দিয়ে যেতে যেতে বলল বলল—চাঁদু, মোস্তাবপাড়ার দাস, লাঙলের ফলা কিনতে আসতে পারে। বাস্তব ভেতরে আছে দিবে দিস—খুড়িয়ে খুড়িয়ে বাস্তব ঘন কালো অন্ধকারের দিকে এগোতে লাগল।

ছোট মফস্বল শহর। আধা টাউন আধা পাড়াগাঁব মত! সবাই সবাইকে চেনে জানে। হাড়ির স্বব রাখে। তাই—

তাই শব্দ হাবুদা চোখেই তার স্ত্রীর সঙ্গে নিতাই বাবাজীব দহরম-মহরমটা খাবাপ লাগে না। খাবাপ লাগে আরও অনেক চোখেই। কে কার মুখে হাত চাপা দেবে। মূখরোচক বিষয় পেয়ে লোকে মূখর হলে

কঠ। ডাবে, বলে দেবে একদিন বাবাজীর
মুখের ওপরে। কিন্তু—

পারে না। লোকটা তার একমাত্র সন্তান
চল বহুবেল মেয়ে মালাকেও বড় ভালবাসে।
আপদে-বিপদে সাহায্য করে। তাদের পরি-
বারের অকৃত্রিম বন্ধুর মত। মাস দেড়েক আগে
তার জ্বর হয়েছিল। নিতাই এসেই শৈবালিনীকে
বলল, এ কী কাজকর্মের মান্দ্য। ডিনিদিন
হলো জ্বরে পড়ে আছে। আমাকে একবার
খবর দাও নি—

ডাক্তার নিয়ে এল। ওষুধপত্র কিনে দিল।
ঘবে চাল বাড়ন্ত ছিল। নিজের আখড়া থেকে
কিলো দুই চাল নিয়ে এসে দিল।

—এসব কি করছেন বাবাজী? মৃদু
আপত্তি জানিয়েছিল শৈবালিনী।

—আপত্তি করো না বোঠান। আমি
মাথুকবী করে ঢের চাল পাই। আমি একা
মান্দ্য। অত চাল দিয়ে কি করবো?

শুধু তাই নয়। তার কেমন সন্দেহ হয়।
নিতাই বাবাজী জাত বৈষ্ণব নয়। কামার-
শালাব সব কাজ তার নখদর্পণে।

—বাবাজী একটা কথা বলবো। তুমি
দেশে থাকতে কি করতে? কোথায় তোমার
দেশ ছিল? একদিন সে কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন
করেছিল। চুপ করে গিয়েছিল নিতাই।

চোখের দাঁড়িতে ব্যথার ছায়া নেমেছিল।
মাথা নিচু করে ছাড়া ছাড়া গলায় বলেছিল,
দেশভাগ শুধু বাস্তবীভূতে ছাড়া কবে নি।
একবারে জন্মান্তর কবে দিয়েছে হানুসা।
নিতাই কথাগুলো বেন অনেক-অনেক দূর
থেকে বলাছিল।

ও গান করে। হাসে। ঠাকুরের নাম
সংকীর্তন করে বটে। কিন্তু মনের এক কোণে
কোন গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

শৈবালিনীও বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু
কিছুতেই নিতাই পুরানো দিনের কথা বলতে
চায় না। কেন বেন হাসিখুশি মধুখানা তার
ভাব হবে ওঠে। তাই ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে
ওব অতীতটাকে টেনে বেব কবার চেষ্টা করে
নি।

করেকদিন হলো নিতাই বাবাজী আর
কামারশালাব আসে না।—তুমি একবার যাও,
খোঁজ নিয়ে এস।

শৈবালিনী বলল। মালাও গুটি গুটি
এসে বাপের কোলে চড়ে গলা জড়িয়ে ঘরে
আধো আধো ভাবার বলল, বাবা গান-
আলা কাকু আসছে না কেন? আমাব মন
খারাপ লাগে—

মেয়ে বলেছে। বাধ্য হয়ে ক্রাচ নিয়ে উঠে
দাঁড়তে হলো।

—যা হোক তবুও মেয়ের কথায় খোঁজ
নিতে বাচ্ছে। তুমি বা স্বার্থপর!

স্বার্থপর! নিজের কাজ ছাড়া আর
কিছু বুঝতে চায় না। শুধু শৈবালিনী নয়।
সবাই একথা বলে। কিন্তু কেউ অনুভব করে
মা। করতে পারে না যে, সাধারণ মানুষের

মত চলাফেরা করার শক্তি তার নেই। অধিকাংশ
সময়ে এক জায়গায় বসে কাজ করতে হয়
বলেই হয়তো মনটা বড় বেশি অন্তর্মুখী হয়ে
উঠেছে। এসব ভাল বুঝতে পারে না। শুধু
এইটুকু বোঝে, পা না থাকার জন্য সে একে-
বারে পাশে গেছে।

—হো—ই—হা—বু—দা—

ফাঁকা মাঠেব ওপর দিয়ে একটা চাঁৎকার
ভেসে এল।

—আমার এই খন্টার মুখটা ভুবে গেছে।
একটু ঠিক করে দেবে হাবুদা? হাতে খন্টা
নিয়ে ছুটেতে ছুটেতে এল বণীর হীরা।

হীরা দিনমজুরী করে। খন্টা, দা, কোদাল
ছাড়া তার কাজ চলে না। টুকটাক মেরামতী
কাজের জন্য তাকে হাবুর কাছে আসতে হয়।

—আমি পাকবো না হীরা, হীরার মুখের
ওপর কথাটা ছুড়ে দিয়ে হাঁটিতে শুধু করল
হাবু। উদ্বেজনাব জ্বলছে তার চোখদুটো।
মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

পাশর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হীরা। এত
শক্ত হতে পারে মানুষটা। হবে না কেন।
খুব মজবুত দাঁড়িও তো শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে
যায়। অনেক কাজ করে দিয়েছে। কিন্তু
কোনদিন একটা পরস দিতে পারে নি—

—এত রোদে দাঁড়িয়ে থাকল কেন।
চাঁদ ফেটে বাবে যে—দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল
হাবু—খন্টার মালার মার কাছে বেশে আর—
বেগা গড়িয়ে গেল। শৈবালিনী দোকানে
তখনো বেশ ভিড়ে। কেউ চা খাচ্ছে। কেউ
বিড়ি খেতে খেতে গল্প করছে।

—আজ বৌদির মন ভাল নেই বুঝি—
—কেমন করে ভাল থাকবে। দাদা নেই
যে। কামারশালা বন্ধ দেখছে না—

সব কানে পড়ে। কিন্তু শৈবালিনী কথা
বলে না। সে পেয়ালা পরিচের টুং টাং শব্দ
ভুল চা করে।—কখনো বাস্ত হাতে কাপগুলো
ধুয়ে নেয়; নিচু হয়ে বসে উনানে বাতাস
করে। খোঁপা ভেঙে চুল এলিয়ে পড়ে
পিঠের ওপরে। ওর ব্যস্ত রনণী মূর্তির
দিকে লোভী চোখে তাকায় চা-পিরাসীর
দল।

আজ কিন্তু এক এক ব্যব চা তৈরি
করছে আর দূরে বিসর্পিল লাল মাটির
রাস্তাব দিকে আকুল আগ্রহে তাকাচ্ছে।

মাশার বাবা আসছে না বেন।

হাবু ফিরে এসে বলল, ওর আখড়ার
লোক বলল, কুমারগঞ্জের দিকে গেছে নাকি।
—কবে আসবে?

চুপ করে থাকল হাবু। মনের ভেতরটা
চিন চিন কবে জ্বলে উঠল। বড় বেশি দরদ।
খুব আগ্রহ। মোহেই পড়েছে না কি?

হঠাৎ হাঁটুর দিকে তাকালো। হাঁটুটা
শুন্যে কুলছে। পা নেই। তার সব দুর্ভাগ্য
সব দুঃখ বেন অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে
তার ডুমো ডুমো মাংস-কুলে-পড়া এই কাটা
পা-টার।

এক একটা করে দিন কেটে যেতে লাগল।
হাবুর সংসারে আনন্দ নেই। একটা অদৃশ্য
শব্দ বেন ওদের মুখের জীবনে অভিশাপের
বিষ ঢালছে। শৈবালিনী আর ভাল করে কথা
বলে না হাবুর সাথে। হাবু কিছু বলতে
গেলেই খিটমিট করে ওঠে।

মা-বাবা যগড়া কবলেই মালা ভয়ে
এককোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট মুখ-
খানা ধম ধম করে। বুঝতে পারে না বড়
বড় মানুষগুলো কেন যে হঠাৎ মারমুখী হয়ে
ওঠে।

একদিন রাত্রে হাবু বলল, তুমি আমার
সঙ্গে ওরকম করছো কেন, বলেই আস্তে আস্তে
হাত বলিয়ে দিল শৈবালিনীর ঘন কালো
চুলে।

হঠাৎ শৈবালিনীর বুকের ভেতরটা কেন
বেন মুচড়ে উঠল। আর চোখের কালো
তারার ঘন বর্ষার মেঘের মত কি বেন টলমল
করতে লাগল। অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি
বড় অন্যায় ব্যবহার—আর বলতে পারল না।
চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। আঁচল দিয়ে
চোখ মুছে নিয়ে বলল, দেখ; লোহার কাজ
করে আমাদের সংসার চলে না বলেই আমি
চা কুলদরীর দোকান করছি। আমাদের তো
কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। ওই লোকটা
আমাদের জন্য অনেক করতো তাই—

চুপ করে থাকে হাবু। মনের ভেতরে
পরর জ্বলের মত কতগুলো চিন্তা টগবগ করে
ফুটেতে থাকে। ওর টানটা কি বাবাজীর
ওপরে এই জনোই। সে অন্ধম। তার রোজগারে
সংসার চলে না। নিজের অক্ষমতার জন্য
তার দুঃখ হলো। দুঃখ হলো তার কাটা
পা-টার জন্য। পা ভাল থাকলে গ্রামে গ্রামে
ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করতে পারতো। বোঁকে
দিয়ে চারের দোকান দেওয়ারত হতো না—

—হাবু, কার নাম?

খাকি জামা পরা একটা লোক হাবুর
কাঁপ বন্ধ করা কামারশালায় সামনে এসে প্রশ্ন
করল।

হাবু ভয় পেল। সরকারী লোক।
দোকানের লাইসেন্স-টাইসেন্স নিয়ে হয়তো
কোন ক্যাসাবে ফেলবে। ক্রাচটা বগলে লাগিয়ে
তাড়াতাড়ি করে বাঁশের মাচা থেকে নেমে এল।

—পতিরাসের সরকারী এগ্রিকালচারাল
কার্ম থেকে এসেছি—

—কি চাই—

—আপনার নামই হাবু—

—হ্যাঁ।

—কামারশালা কোনটা?

—ওই তো কাঁপ বন্ধ আছে। ওই ঘরটা—

—বন্ধ কেন?

—কি করবো। অর্ডার নেই। লোহা
কিনতে পারছি না। তৈরি মালও নেই—

লোকটা চুপ করে কি বেন ভাবল
করেক মূহূর্ত। আস্তে আস্তে বলল,—
শুনুন, দিন পনেরোর ভেতরে বিশট

সাপ্তাহিক বসুমতী

কুড়াল, দশটা খুঁত, ছয়টা কোদাল আর
তিনটা খুঁতপী তৈরি করে দিতে পারবেন?

হাবুদে বিস্ময়কে আবার চমকে দিবে
কল, নিতাই হুদুত আমাদেব বড়সাহেবকে
কলছে, আপনি পারবেন—

—বাবাজী কলছে? হাবুদে বেগুনী
আজব কাটা ফাটা ঠোটে বতকগুলো কথা বেন
কেপে কেপে খেনে গেল।

—পনের দিন পর আসবো—লোকটা
স্নানতর দিকে হাটতে লাগল।

—শুনুন—শুনুন—বাবাজী কোথাব?
হুটে এল শৈবলিনী। বেসনের গোলা
লেগে আছে এখানে-সেখানে। কুঁলুদী
ভালতে ভালতে চলে এসেছে।

—কয়েক দিন আগেও তো পতিরাণে
ছিল। এখনও আছে কি না বলতে পারবো
না—আচ্ছা নমস্কার!

শৈবলিনী হাবুদে দিকে তাকালো।

হাবুদে মাথা নীচু করল।

শৈবলিনীর মূখ্য দুটো চোখের দৃষ্টি
বেন কলছে, দেখেছো তো কতবড় মনেব
সন্দেহ। দুই গিরেও লোকটা তাদের কথা
ভোলে নি!

মোটো অর্ডার। মানসের কথা। বিস্মু
হাবুদে মাথায় আকাশ ছেঁতে পড়ল।

লোহা কেমন করে কিনবে?

স্তিন-চারটা লোহের চাদর আছে। তাই
দিয়ে কুড়াল তৈরি করতে সুরু করে। আর
ভয়ে দিনবাত শূন্য ভাবে, কোথাব পাবে
টাকা।

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে।

—এক কাজ করো, গয়না বন্ধক দাও—

—না। তোমার চারগাছা চুড়ি আমাদেব
একমাত্র সম্বল—চুল্লীর গনগনে আগুনের
দিকে তাকিয়ে থাকে হাবুদে পলকহীন চোখে।
ধরে তাকে কেউ দেবে না। আর দু-এক
টাকার তো ব্যাপার নয়! হাবুদে ভাবতে ভাবতে
কিষ্ট হয়ে উঠল।

আকাশে তারার নীপালি জ্বলছে।
রাস্তা লোক চলাচল নেই বললেই হয়।
শাওয়ার পরই ক্রাচ নিয়ে বেবোতেই শৈবলিনী
এসে দাঁড়ালো।

—এত রাতে কোথায় বাচ্ছে?

—দেখি যদি কিছু করতে পারি—

গম্ভীর হয়ে গেল শৈবলিনী। তার
হাতের কুপির আলোর শিখাটা মুখেব একটা
পাশ উজ্জ্বল করে তুলল। আব একটা পাশে
অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারে একটা চোপ
কটিন হয়ে উঠল।

—শোন, তুমি বাবে না—

—কোথায় বাবো না?

—যেখানে যাচ্ছে—

—বাঃ রে কোথায় যাচ্ছ!

—না—না বাবাজীর ওখানে তুমি বাবে
না, এক কথা বলে দিচ্ছি—বলেই হাতের
ছেতোর কুপিটাকে আড়াল করে ঝড়ের বেগে

দ্রাসাঘরের দিকে চলে গেল।

হাবুদে বিস্ময়ে স্তম্ভ হয়ে গেল।

শিল্পীভূত মূর্তিব সত্তা দাঁড়িয়ে রইল।

আর বাওয়া হলো না। শৈবলিনীর
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করলে বেগে কেঁদে
কেটে একেবারে অনর্থ বাধায়। সে তাকে
ভস ববে না। ভয় করে অশান্তিকে। কিন্তু—

এতবড় একটা অর্ডার এইসব মেয়েলী
কল্মকাটি, মান-অভিমানের জটিলতাব
ভেতর হারিয়ে যাবে? এক-একবার মূখ্য
হর শৈবলিনীর ওপরে আবার রাগও হয়।
এই সময় সে এসব ছেলেমানুষী করছে কেন?

সে ঝাঁপ বন্ধ করে বাইরে এল। চাঁদের
আলোর চারিদিক দিনমানের মত লাগছে।
সন্ধ্যার শোঁ শোঁ বাতাস তার চোখেমুখে ঠাণ্ডা
জলের কাপট্য মত আছড়ে পড়ল। বৃক
ভরে নিশ্বাস নিল সে। দুই হুসব চাঁদের

আলোয় ভরা হু-হু শ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে
ধাকতে ধাকতে হঠাৎ তার মনটা এক উদাস
ও ম্লান অনুভবে ছোট ছোট সুখ-দুখ-
স্বার্থের এই পৃথিবী থেকে অনেক—অনেক
ওপরে উঠে গেল। নিতাই বাবাজীকে,
শৈবলিনীকে, জগতের সব মানুষকে তার
ভাল—বড় ভাল বলে মনে হলো।

না। শৈবলিনী কিছু মনে কববে না।
করতে পারে না। নিতাইও খল প্রকৃতির ও
লালসাদুর্ভল লোক নয়!

সে রওনা হলো। কিন্তু কয়েক পা
বেতেই তার কানে ভেসে এল উদাস কণ্ঠের
এক সুমধুর গানের সুর—

নিতাইবাবু, সিঁচিল সাজন

অম্বিত প্রেমের মহাজন।

শ্রীনিবাস শিবানন্দ তাইই

কম্পাউ অরী করে—

গানের কথাগুলো ফঁকা মাঠের বাতাসে
ভাসতে ভাসতে দুই-তিনদুই দিগন্তে চলে
যাচ্ছে।

—আবে, হাবুদা যে—

—আমি তোমাবই কাছে যাচ্ছিলাম—

—আমাব কাছে? কাশীতে ভূমিবসপ
বে গো! হো হো কবে হেসে উঠল। হাসি
থামলে একতাবাষ কণ্ঠের তুলল।

—আমি নিজে গান বোঝেছি হাবুদা।
শুনবে? শোন—

তোবা আর কি যাবি রে নিতাইচাদের
হাসপাতালে নদীয়াপুরে।

পথ্য কবে দিলেন বাবু, সাধুসংগর
দুঃখসবু।

দিলেন হরিনামমুখ পাতিলেবু
বাহাতে অব্যচি সারে।

—তোমাকে একটা কথা বলবো? হাবুদে
অনেকক্ষণ থেকে চঞ্চল হয়ে ছিল। এবার
কাজেব কথা পাড়িলে, তুমি পতিবাম থেকে
অডাব পাঠিয়েছিলে?

—ওহা মূলদহেব কোন কামারশালায়
পাঠাচ্ছিল অর্ডার। আমি বললাম, তোমাব
কথা—

—বেশ কবেছো। কিন্তু ফাসাদে যে
ফেলেছো ভাই!

সব শূনে নিতাইয়ের মুখখানা ধমধম

মূলেখা
ড্রইং এর
কালি

অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম

মূলেখা
ওয়ার্কস্
লিমিটেড

মূলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

মূলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে

মূলেখা
কাউন্টেন পেন-এর
কালি

সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়ার্ক

মূলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

করতে লাগল। দুই হোসেনপুরের বাঁশ-
নের মাথার জলজলে সন্ধ্যা-ভায়াটার দিকে
ভাকিরে রইল।

—তুমি কি হাবুদা। ঘরে তোমার মালার
মত মেয়ে আছে, শৈবলিনীর মত বৌ আছে,
হলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

চোখের দৃষ্টি বিষম ও সুন্দর হয়ে উঠল।
কোন দুবকালের বেদনাময় স্থান ঘন হয়ে
মামল তার মুখাবলি।

—কি ভাবছো?

—কিছু না। একটু হাসল। বলল, দেখ
হাবুদা, আমার কিছু নেই। কারো জন্য
কিছু করবার নেই। মাথুকবীতে বেরোলেই
ভিক্রা পাই। সকাল-সন্ধ্যা গোরাচারে
সামগান করি। হঠাৎ তার কানের কাছে

মুখ নিয়ে এসে বলল চাপা গলায়,
ময়ে ময়ে মনে হয় একেবারে অলস হয়ে
গেছি, একেবারে অপমার্য হয়ে গেছি।
ভাল লাগে না—ভাল লাগে না আমার এই
জীবন। বলেই আর একটু দাঁড়ালো না।
দুর্ভাগ্যবশত সত্য বলে ফেলেছে বলেই
হঠাৎ লক্ষ্যের জোরে পায়ে হাঁটতে সুন্দর
করল। আশ্চর্য দিকে।

—ও নিতাইবাবাজী শোন-শোন—

দুব দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল
তার ডাকটা। আর ভয় পেয়ে তীব্রবরে
ডেকে অশ্রুকার আকাশের দিকে উড়ে গেল
কটকট। নিশাচর পাখি।

সাদা দিল না নিতাই।

ফিরে এল না।

আছে। আছে কেন গোপন ব্যাখা। হাবু
বাড়িরে বাড়িরে হাঁটে আর ভাবে। ওর এই
নামবলী, কপালে লবণাতিলক, নরক রস-
কলি, বেল নাম বরিষ অক্ষরে নামগান, সব
কিছুই আড়ালে কোন নিবিড় ব্যাখ্য ইতি-
মুস্ত-লুকিবে আছে।

ঘেটু লোহা ছিল, তাই দিয়ে দশ-
শারোটো কুড়াল তৈরি হলো। আ বা লোহা
নেই। কাঁপ বন্ধ করে বাড়িতে বসে দুই
হাঁটর ভেতবে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে ভাবছিল
হাবু পতিবাসে গিয়ে অর্ডারটা বাতিল
করে দিবে আসবে। জানিয়ে দিয়ে আসবে
যে, সে পাবে না।

—তুমি এত কি ভাবছো বলো তো?

—জানোই তো সব।

—শোনো, মাল ভেলভারী দেয়ার সঙ্গে
সঙ্গে টাকা দেবে তো?

—হ্যাঁ। সরকাবী ব্যাপার। টাকা দেবে
নিশ্চয়ই।

—তাহলে এক কাজ করো। আমাদের
মত পেতল-কাঁসার বাসন আছে সব বাঁধা
য়েথ টাকা নিয়ে এস।

হাবু হাসে। হাসি হাসি। জানে
অসম্ভব হবে। তবুও—তবুও আবাব
কলস, নিতাই বাবাজীকে বলি না। কি হবে?
সেই তো কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল।

অস্বস্তির চিহ্ন কটে উঠল তার চেহে-
আর কেমন একটা সঙ্কেতের ছায়া পড়ল
মুখে। বলল, তুমি—স্বামী হয়ে যদি নিজের
সংসারে অশান্তি ডেকে আনো। তাহলে আমি
আর কি বলবো—বলো? বলল আন্তে
আন্তে। অভিযাপ উচ্চারণ করার মত করে
প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে।

চাপ করে রইল হাবু। নিঃশব্দ পায়ের
চলে গেল শৈবলিনী। হঠাৎ হাবুর মনে
হলো শৈবলিনীর নিতাইয়ের ওপর দুর্ভাগ্য
আছে বলেই ওকে দূরে দূরে রাখছে না তো?
না, কি সত্যিই নিতাইকে ঘৃণা করে। না।
আর সে ভাবতে পারে না। এসব চিন্তা
করার ঠিক নেই, সময় নেই তাই।

সেইদিন—সেইদিনই। রাত্রি ঘটে গেল
কাঁড়টা।

মালার—নিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল
শৈবলিনী। বাইনে টিপ টিপ বৃষ্টি করছিল।
হাবু পা টিপে টিপে বাইরে এল।
বারান্দার এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্রাচ
নিরে নিঃশব্দে বোঁবের গেল।

পূর্বপাড়ার নিতাই বাবাজীর আখড়া
চকভানী থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ।
হাবু বসে, পেঁচিতে আঁখি ঝট্টা লাগল।

উঠানের—আমগাছের ডালে লণ্ডন
ঝুলছে। সেই অল্প আলোর চক্কারে বসে
নিতাই তার ভক্তদের নিয়ে নামগান করছে।

—এস—এস হাবুদা যে। কি ভাগ্য
আমার—

—তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবাজী।
ভক্তদের বিদায় করে দিল নিতাই।

—তুমি অর্ডারটা ফিরিয়ে দিয়ে তামার
ব্যবস্থা করে দাও তাই।

—কেন?

—কোথায় পাবো লোহার চাদর। আমার
টাকা নেই। পরনাগাটি বন্ধক দিয়ে ঋণ
কবে—

—ওসব কিছু করতে হবে না। নিতাইয়ের
মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ নামল। নিঃশব্দে
ইগিত করল তার ঘরের দিকে।

টিনের ঘর। লালমাটি দিয়ে নিকনো
ঝকঝকে তকতকে বারান্দা। তার ধারে ধারে
দোপাটি ফুলের গাছ।

হাবু সম্মুখের মত নিতাইয়ের সঙ্গে
সঙ্গে তার ঘরের ভেতরে এল।

—হাবুদা নিচু হয়ে বসে তত্তাপোষের
নিচে ডাকাও—

—তাকালো হাবু। আর চমকে উঠল—
এ কী! কি করেছো তুমি?

তত্তাপোষের নিচে খান ছয়েক লোহার
চাদর।

—কোথায় পেলে বাবাজী? কেন তুমি
আমার জন্য এত করছো—কে—কে—তুমি—

তীর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে নিতাইয়ের
হাত চেপে ধরল। সে খর খর করে কাঁপতে
লাগল।

—বসো—হাবুদা—শান্ত হয়ে বসো—হাবুদে
হাতদুটো ধরে আন্তে-তাকে বিছানার ওপর
বসালো।

দু চোখে ব্যথার ছায়া ফুটল। আন্তে
আন্তে বলল, হাবুদা, তোমাদের বাড়িতে বাই।
তাই চকভানীর লোক অনেক অনেক রকম
বলে। তুমি আর তোমার স্ত্রীও ইদানীং
অস্বস্তি বোধ করছিলে। কিন্তু তোমার
ওখানে কেন ঘন ঘন যেতে হচ্ছে করে জ্বনা?
খামল নিতাই। তীর কোন ব্যাখ্য তার
মুখখানা দুমড়ে উঠতে লাগল। চোখের
পাতাদুটো ভিজে গিয়ে চিকচিক করে
উঠল।

—খামলে কেন বাবাজী। কি তোমার
দুঃখ—

—রাজস্বামী জেলার এক গ্রামে মহাশয়-
পুরে আমারও তোমার মত একটা সুখের
সংসার ছিল। তোমার চেয়েও বড় ছিল আমার
কামারশালা। আমার হাতেব কাজ তোমাদের
এই বাসুদেব, পতিবাস পর্বত চালান হয়ে
আমতো। আজ পর্বত এদিককার বহু
মহাজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।
কিন্তু—

বহুর পাঁচেক আগে হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত
এসে আমাদের গ্রাম ঘেরাও করল। স্ত্রীকে,
আমার প্রদেব চেয়েও প্রিয় মেয়েকে ভায়া
খুন কবল। সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল।
আমি পাটেকের ভেতরে লুকিয়ে প্রাণ
বাঁচালো। কিন্তু—

না বাঁচলেই ভাল হতো হাবুদা। দুর্বৃত্তের
স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন।
হেঁটে হেঁটে অনেক কষ্টে এদেশে এলাম।
আবার কাদের জন্য নতুন করে সংসার রচনা
করবো? কে আছে আমার?

দুীকা নিলাম। হয়ে গেলো নিতাই
মহানত। বেশ ছিলো। আগের চাঁদ-চাঁদকে
কুশাশর ঢাকা আবছায়া বহু—কিন্তু
কোন উপকারের মনে হতো।

কিন্তু তোমার স্ত্রী, তোমার মেয়ে
তোমার ভ্রাতৃত্ব সংসারের ভেতরে আমারই
অতীত জীবনের ছায়া দেখতে পেলাম
তাই—

—আর বলো না—বলো না—নিতাই
বাবাজী, বলতে বলতে বাদবাকী কথাগুলো
তার গলার ভেতরে আটকে গেল।

তার মনে পড়ল কোদালের ছাঁচ একদিন
সে ফুল করেছিল, নিতাই নিখুঁত করে
ছাঁচে ঢেলে কোদাল তৈরি করে দিয়েছিল।
লোহার কাকের আরও কত খুঁটিনাটি কথা সে
বলতো। ছি ছি এই লোকটাকে সে কত
হীন সন্দেহ করেছে—লজ্জায়, সঙ্কেতে,
বিস্ময়ে, উত্তেজনায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে
রইল হাবু।

নিতাইয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে
পারল না।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[সূচনা]

অবিস্মরণীয় দ্বু-চারজন

[বাংলা ভাষা ভারতের সুদীর্ঘ বৈপ্লবিক-ইতিহাসে দলনির্বিশেষে অবিস্মরণীয় বহু জ্ঞানীগুণী, শৌর্যশালী ও আত্মত্যাগে-সুন্দর স্বর্ণময় চরিত্রের সংস্পর্শে আমরা এসেছি। তাদের মধ্যে দ্বু-চারটি চরিত্রের আভাস আমরা দেখি। আমাদের ধারণা বিপ্লবীর প্রতীক বিভিন্ন চরিত্রের এই মানব কণ্ঠের মধ্যে গোটা বিপ্লবী-চরিত্রের অনেকটা ছায়াপাত ঘটবে।]

হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত :

বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তমহাশয় প্রথমবার এক পত্রে (৬-৭-৬৫) লেখেন :—
...বিদেশে বিপ্লবী-কর্মীদের নাম আপনাদের লেখায় এক স্থানে উল্লেখ করেছেন। সেখানে হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতের নাম আছে। হেমেন্দ্রকিশোরের ভূমিকা (বিপ্লবক্ষেত্রে) কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকরমন সিংহাই যেমন বিপ্লবীদের 'বালিন-কর্মিট'-র প্রতিষ্ঠাতা-সভা, হেমেন্দ্রকিশোর-ও তেমনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সভা ছিলেন 'নিউইয়র্ক কর্মিট'-র।

"হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিতের কর্মভূমিকা বিশেষ করে অনুদান করার চেষ্টা করবেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, কোথায় জন্ম, বাল্যজীবন, কবে বিদেশে যান এবং কিভাবে কোন পথে যান তা' লিখবার চেষ্টা করবেন।" ...

আমরা হেমেন্দ্রকিশোর সম্পর্কে-ই প্রথমে লিখবো।

হেমেন্দ্রকিশোর ১৮৮৭ সনের ৫ই নভেম্বর পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলার 'আটি' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আটির 'রক্ষিত-রায়' পরিবার নানাদিক থেকে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। দানশীলতার, উদারতা ও তেজস্বীতার এ জমিদার-পরিবারটির একশত বৎসর পূর্বে ঢাকা অঞ্চলে বিশিষ্ট স্থান ছিল।

হেমেন্দ্রকিশোরের পিতামহ সম্পর্কে এখানে কিছু না বললে হেমেন্দ্রকিশোরকে বোকা যাবে না। পিতামহ রক্ষিত-রায়ের রক্ত-রায়ের মত তেজস্বী জমিদার সেকালে-ও দলিত ছিল। এ সময় ঢাকা অঞ্চলে ছিলেন এক নীলকর। নানা ভরি মিঃ ওয়াইজার অতি দুঃখ, উদ্ভত, প্রতিপত্তিশালী ও বিস্তারিত নীলকররূপে ওয়াইজসাহেব পরিচিত। তাঁর ভয়ে নাকি বাঘ-গরুতে একঘাটে জল খেতো।

উক্ত ওয়াইজসাহেবের সঙ্গে রক্ষিত-রায়ের লড়াই বেঁধে যায়। উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের রক্তে সিক্ত হয়ে যায় বাড়িগঙ্গার অনেক চড়া-ভূমি। একবার রক্ষিত-রায়ের লাঠিয়ালরা রাতারাতি ওয়াইজসাহেবের দখলকৃত জমি থেকে নীলের চারা সমূলে উৎপাটিত করে নদীর জলে (বহু ঘড়ায় ভরে) ডুবিয়ে দিয়ে মাঝ-কলাইয়ের চারা বুনেন। সকালে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে এসে দেখেন রক্ষিত-রায়ের উক্তি মিথ্যা। ওগুলো সত্যি নীলকরের 'নীলক্ষেত' নয়, রক্ষিত-রায়ের উক্তি-মায়িক 'মাঝকলাইয়ের ক্ষেত'। মামলায় ওয়াইজসাহেবের হার হয়। যে-জমি তিনি বৈদখল করেছিলেন তা স্বার্থ-মালিক রক্ষিত-রায়ের হাতে ফিরে আসে। এভাবে রক্ষিত-রায়ের নাকি ওয়াইজসাহেবের বিরুদ্ধে নানা ব্যাপারে ৩০টি ফৌজদারি ও ৩০টি দেওয়ানি মামলা করতে হয়। কিন্তু

স্বার্থের ওয়াইজসাহেব এতই পরাক্রমশীল হন যে, সমস্ত জমিদারি বিক্রি করে দেশে পালিয়ে যান। এই ওয়াইজসাহেব-ই একদিন ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল আনন্দ রায়ের পিতা গৌর-সুন্দর রায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ দেখিয়ে গৌরসুন্দরবাবু, 'ওয়েলিংঘামে আমি কায়সা আদমি হুঁ আপু জানতে? আপু'কা দেশেমে আটিকা রক্ষিত-রায় যায়সা ভারী আদমি হায় এয়াসসা' ...

হেমেন্দ্রকিশোরের পিতা গোবিন্দকিশোর রক্ষিত-রায় ঢাকা বারের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি যোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহ থেকে বিলাতী দ্রব্য বর্জিত হয়।...হেমেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় রাজনীতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন বলে সরকারী-চাকুরি থেকে অপসারিত হন। তৎকালে তাঁর জাতীয়তাবদ্ধ উদাত্ত সঙ্গীতে পূর্ববঙ্গবাসী মূগ্ধ হতো, প্রচুর প্রেরণা পেত। কোন রাজনীতিক-সভাই তাঁর সঙ্গীত বিহীন জন্মতো না। যোগেন্দ্রকিশোরের সততা ও অনকরণযোগ্য মহৎ চরিত্রের জন্মে তিনি সবার ভক্তিজান ছিলেন।...হেমেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ও স্বদেশী শিল্পসৃষ্টির আহবান এ যুগে শুনতে পান। এবং পিতা ও ভ্রাতৃভ্রাতার অনুমতি নিয়ে তিনি আইমদাবাদ চলে যান দেশপ্রেমী কেশব-লাল মেটার কাছে বয়ন-শিল্প শিখবার উদ্দেশ্যে। কেশবলাল কয়েকটি বাঙালী তরুণকে অন্তর্ভুক্ত নিষ্ঠার শিক্ষাদান করেন। দেবেন্দ্রকিশোর যথায় যোগ্য শিক্ষালাভ করে বাংলায় ফিরে আসেন। তৎপর বহু ঝড়ঝন্টা অতিক্রম করে উত্তরকালে ঢাকার 'চিত্তরঞ্জন কটন মিল' প্রতিষ্ঠায় তিনি

ফলকাম হন। স্বদেশীভাবাপন্ন তৎকালীন বাঙালী মিল-প্রতিষ্ঠাতাদের (কটন-মিল) অন্যতম ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর।... হেমেন্দ্রকিশোরের মাতার নাম ছিল ভবতারিণী দেবী।...

মানুষ হঠাৎ বড় হয় না। তার পরিপাক্য তাকে বড় হতে সাহায্য করে। তাই আমরা হেমেন্দ্রকিশোরকে বৃদ্ধবার জন্যে তার পরিবারের একটু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলাম।

হেমেন্দ্রকিশোর সত্যি বড় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর 'স্বগন্ত' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লিখিত হয়েছিল : "হেমেন্দ্রকিশোর একটি ব্যক্তি — ব্যাপক অর্থে তিনি একটি ইতিহাস। তিনি একটি যুগের বিক্ষুব্ধ-মানসের নিদর্শন হস্তগত প্রতীক। পরাধীনতার জ্বালা এ দেশের যে দূরন্ত তারণের বৃদ্ধে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, হেমেন্দ্রকিশোর তারই প্রতিনিধি। দেশকে যারা ভালোবেসেছিলেন, অথচ রাজস্বের ষাঁদের পক্ষে দেশে থাকা সম্ভব হয় নি, যারা ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতের বিপ্লবের সহায়ক-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, হেমেন্দ্রকিশোর তাদেরই অন্যতম অগ্রদূত।"...

(যুগান্তর পত্রিকা—১২৬৪)

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯৬১ সনে ভারতবর্ষে বাস করবার ইচ্ছায় হেমেন্দ্রকিশোর মিলে এলে আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁর মধ্যে সত্যি আমরা বিগত অর্ধ-শতাব্দীর বহুদুখী জীবন-ইতিহাসকে ধরা-ছোঁয়ার আরম্ভে পেরেছিলাম। সে-কস্তু উপলব্ধি করার, বর্ণনা করার নয়।...

১৯০৫ সালে যে তরুণদল সর্বপ্রথম সরকারী-বিদ্যালয় বন্ধকট করেন, হেমেন্দ্রকিশোর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তখন তিনি ঢাকা কলেজিয়েট-স্কুলের এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র। সরকারী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তিনি পিতা ও ক্রান্তভ্রাতার সমর্থনেই সদস্যপািত 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এ ভর্তি হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সে-সংস্থার সভাপতি এবং প্রীতরবিল্ব ছিলেন তার অধ্যক্ষ।

১৯০৭ সালে উক্ত জাতীয় মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পাশ করে তিনি সেনহাটি গ্রামে (বিক্রমপুর, ঢাকা) বিনয় সরকার মহোদয় প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। তাঁর গোপন কর্মকেন্দ্র ছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গের মলাবহ জেলায়।...

১৯১১ সন। ইংরেজের চক্ষুশূল একদল ছাত্রকে এ বছর 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' পুলিশের তাড়না থেকে রক্ষা করে উক্ত-বিদ্যালয়ের জন্যে আমেরিকায় পাঠবার ব্যবস্থা করেন। হেমেন্দ্রকিশোর-ও তাঁদের দলভুক্ত হন। পুলিশ-তাড়িত মেধাবী একটি দলকে সর্বপ্রথম এভাবে বিদেশে পাঠবার মূলে ছিলেন জাতীয়-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বিনয় সরকার, রাধাকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের আরো কতিপয় সতীর্থ।...

২১শে জুলাই (১৯১১) তারিখে বিকেলবেলা খিদিরপুর থেকে 'ম্যাটিমন্স' নামক জাহাজে হেমেন্দ্রকিশোর রওনা হলেন। দ্বিতীয়-শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হয়েছিল তাঁদেরকে। হেমেন্দ্রকিশোরের কামরার নম্বর ছিল ২০নং।

তাঁদের জাহাজ মাদ্রাজ, সিংহল, এডেন, জেনোয়া ও মার্সেলিস্ হয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছল। সেখান থেকে আমেরিকান যাত্রী-জাহাজে তাঁরা উঠলেন। জাহাজ যথাসময়ে পৌঁছল এসে



হেমেন্দ্রকিশোর রাক্ষত

আমেরিকায়। হেমেন্দ্রকিশোর চলে গেলেন 'উইস্‌কন্সিন্স' নগরে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা মত।

উইস্‌কন্সিন্স - বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার কালেই ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে হেমেন্দ্রকিশোরের সংগঠন-কার্য শুরুর হয়। প্রথম মহাবঙ্গের সময় 'নিউইয়র্ক কমিটি'-র (বিপ্লবীদের) পক্ষে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সাথী ছিলেন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী। তরুণ হেমেন্দ্রকিশোরের স্বপ্ন তখন উড়ে চলে। তিনি আপ্রাণ খাটতে লাগলেন ভারতীয়দের মধ্যে আসন্ন বিপ্লবের গোপন বার্তা ছড়িয়ে দেবার

সংকল্পে।... কিন্তু ভারতবর্ষে 'বিপ্লব' বাস্তব হলে। তবু বাস্তবনোরথ হলেন না বিদেশের এই ভারতীয়েরা। তাঁরা বৃদ্ধলেন আরো দীর্ঘকালের তপস্যা ব্যতীত 'বিপ্লব' আসবে না। বিপ্লব নিষ্ঠুর। তার দাবি সহজ নয়। নিজেকেকে আরো তৈরী করতে হবে আলস্য-হীন চেষ্টায়। হেমেন্দ্রকিশোর নিজেকে তৈরী করার দিকে মন দিলেন। মন দিলেন 'আমেরিকাকে বৃদ্ধবার দিকে। কারণ, এই ভরদ-দের মাধ্যমেই তো ভারতকে বৃদ্ধিতে হবে আমেরিকার!...

১৯১৫ সনে প্রীতিপূর্ণ কৃতিত্বের সহিত উইস্‌কন্সিন্স বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র নিয়ে বি-এ পাশ করেন। নিজের ব্যয়ভার বহন করেন তিনি অবসর সময়ে নানা হোটেলে কাজ করে।... এই ছাত্র-দলের সঙ্গে জাতীয়-মহাবিদ্যালয়ের শর্ত ছিল যে, তাঁরা পাবেন শূন্য-বিদেশে যাবার খরচ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করতে হবে নিজেকেকেই যে-কোনভাবে খেটেখুটে, পরে মানুষ হয়ে রাজস্বোজগার করে যেন-কণ তাঁরা পেলেন মহাবিদ্যালয় থেকে তা' শোধ দিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য শর্তপূরণে এঁরা কেহই পশ্চাৎপদ হন নি।

১৯১৬ সন থেকে ১৯১৮ সনের মধ্যে হেমেন্দ্রকিশোর ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন — নাম তার 'হিন্দুস্থানি স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে একটি মাসিক কাগজ — তার নাম 'হিন্দুস্থানী স্টুডেন্টস্'। পরে এই পত্রিকার নামকরণ হয় 'ইন্ডিয়া'। হেমেন্দ্রকিশোর ছিলেন সংস্থার সভাপতি এবং মাসিকপত্রের সম্পাদক।

১৯১৮ সনেরই এক সময় তিনি সাংহাই কলেজে (চীন) শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। নতুন কার্যে ষোগ দেবার জন্যে তিনি চীনদেশে যাত্রা করেন। পথে সানফ্রান্সিস্কো শহরে তাঁর দেখা হয় লাল্য লাজপৎ রায়ের সঙ্গে। লাজপৎ রায় তখন সর্বমোট চীন দেশ থেকে প্রত্যাভর্তন করেছেন। তাঁর সংবাদ হলো যে, ব্রিটিশ-সরকারের পাহারাদার জাহাজগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে কড়া টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং কারণ-অকারণে যে-কোন ভারতীয়কে আটক করে এক বিশ্রী রাজনৈতিক-সন্তানবাদের পরিত্যগ দিচ্ছে। প্রীতিপূর্ণ লাজপৎ রায়ের নির্দেশমত তাঁর চীন-যাত্রা স্থগিত রাখলেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হলেন। 'হিন্দুস্থানি স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কাজ সমানভাবেই চলল।

১৯১৯ সনে তিনি এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এখানে পাঠ্যাবস্থায় তাঁর পরিচয় ঘটে একটি প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রীর সঙ্গে। তিনি হাঙ্গারি দেশের মহিলা-উত্তর-ডিগ্রি কোর্সেরই শিক্ষারতী। তাঁর নাম ছিল মিস্ জেন কোন্স্টা

চিক্কলয় তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটিছিল কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন চিত্রশিল্পীদের কাছে। হেমেন্দ্র-কিশোর এই বিদ্যুৎ মইলার পাণ্ডিত্য করেন ১৯২০ সনে। তখন তিনি-ও এম-এ পাশ করেছেন।

এই সময় আমেরিকান পানামা প্যাসিফিক-প্রদর্শনীতে হেমেন্দ্রকিশোরের একটি প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আর্গাতিক শিক্ষা সম্মেলনীয় (International Education Conference) আধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতীয়-প্রতিনিধি বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

১৯২০-১৯৩২ সাল ব্যেপে হেমেন্দ্র-কিশোর রাজনীতিক-কাব্যকলাপে ডুবে যান। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনকে ঘিরে তাঁর কর্ম-ব্যস্ততা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এ সময়-ই তিনি রকফেলার ইনস্টিটিউশনের সহকারী ডিরেক্টর এবং উহার একটেনশান-বিভাগের প্রধানের পদ লাভ করেছেন। তাঁর বিশেষ দায়িত্ব ছিল বিদেশী (এশীয় ও আফ্রিকান) ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতাকল্পে সচেতন করা এবং যথাপ্রয়োজন তাব-বিধিব্যবস্থার চেষ্টা করা।

মিস্ত্রীভাবী, স্বদেশভক্ত ও হৃদয়বান এই ব্যক্তির কাছে বিদেশী ছাত্রছাত্রী এবং বিশেষ করে ভারতীয় তরুণেরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে তো বটেই, বিশেষ উপকৃত হতেন।...

বঙ্গীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে অবস্থানকালে মিসেস জেন কেনেডি রাকিভের ভারতীয় নামকরণ করেন স্রীমতী অনুন্কা রাকিভ। মদ্রাসের বিষয় এই প্রতিভাশালী মহিলার মৃত্যু ঘটে নিউইয়র্ক শহরেই মদ্রাসের 'কানসার' শ্মাধিতে ১৯৩১ সনে।

তাঁর মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকার মার্কিন সংবাদদাতা লিখেছিলেন :

...“Mr. Rakhit is now an Assistant Director of International House—home for University students of all nationalities and both sexes in New York—the magnificent building on Riverside Drive—owing its existence to the munificence of Mr. John D. Rockefeller, prompted by his spirit of universal brotherhood, but the idea originated from the intensely internationally minded Harry Edmonds, the Director.

“Her husband being connected with such a unique institution,

Mrs. Rakhit came in contact with all Indian students and also visitors to the ‘House’ and identified herself with all their activities.

“Mrs. Rakhit was of a literary turn of mind and had at one time aspired to be an author. But her talents for drawing having latterly been discovered, she took to it enthusiastically & preferred to express herself in paintings... Her pictures were exhibited in several Art Galleries lately—her ‘Village Procession’ was chosen among seven hundred paintings by noted artists, for a special exhibition at the well known Grand Central Galleries. She had a gorgeous sense of decorative colour and some of her canvases light up the wall like stained glass windows. The mark of genius the art connoisseurs at once, saw in her work. Poet Rabindranath Tagore seeing her pictures last year appeared to have been well impressed and was heard to remark, in effect, ‘she seems to be particularly gifted for painting Peasant Life—her simplicity and spontaneity help her in reaching into the very soul of things.’... She loved India. She was deeply stirred, lying in her sickbed, when she heard over the radio Mahatma Gandhi’s living voice for the first time addressing the American nation from London and when he appealed on behalf of the semi-starved millions of India to the conscience of the world to come to the rescue of a people

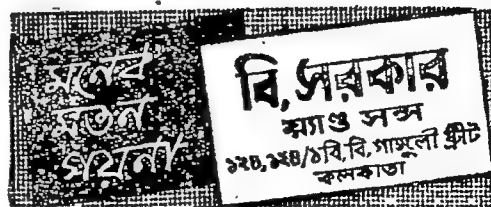
dying for regaining its liberty. She reproached her husband as he did not seem to have been much moved.” (A. B. Patrika—13. 11. 31)

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলে যে, মিসেস রাকিভ স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, স্বামীর মাধ্যমেই তিনি ভারতবর্ষ ও তাব মানবগুলোকে ভালবেসেছিলেন; যাহাযা গান্ধীর ‘ভাষণ’ রোগশয্যা তাকে তাই বিশেষভাবে বিচলিত করে। কিন্তু আজন্ম বিপ্লবী ও সর্বোচ্চ রাজনীতিক হেমেন্দ্রকিশোরের কাছে ‘মহাত্মার ভাষণ’ স্বাভাবিকই অন্য সুরে পরিবেশিত হয়েছিল। সেখানে ভাবালুতার অতিক্রম করে রাজনীতিক বুদ্ধি ও ‘বিমর্শালিটিস’-এর বিচার-বোধ হস্ত ছিল মুখ্য।...

১৯৩৩-৩৪ সাল তাঁর কাটে চীন, জাপান ও কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোব দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন সমন্বয় কোন্ পথে এই সম্পর্কে পর পর বক্তৃতা দেবার কার্যে।

১৯৩৫-৩৬ সনে নিউইয়র্কে ফিরে এসে আবার তিনি বেব হন ভাবতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উদ্দেশে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মাত্র তিন মাস পরই তাকে আমেরিকায় চলে যেতে হয়, কারণ ইংবাজের পদলিখ তাকে পদে-পদে বিরত ও বিরক্ত করে তুলেছিল।

১৯৩৬ সনে হেমেন্দ্রকিশোর আমেরিকায় ফিরে এলেন। এবার তিনি যোগ দিলেন ‘সোশালিস্ট অ্যান্ড কোং (ইনক)’ নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্কে-ই অবস্থিত। এ’রা ভাবতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ থেকে হস্তশিল্প আমদানি করেন আমেরিকায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যত্ন থাকায় জনাই হেমেন্দ্রকিশোরকে আমেরিকার ‘ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স’-এর সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। পর পর বেশ কয়েক বৎসরই তিনি এই সভাপতি পদে বৃত্ত হন।...



১৯০৭ সনে ভারতীয়রা খোলাখুলিভাবে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন নিউ-ইয়র্কে। ইহার নাম দেওয়া হয় 'ইন্ডিয়া লীগ অব আমেরিকা'। এই সংস্থা 'সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় সহায়তা দান-ই ইহার প্রধান করণীয়। ইন্ডিয়া লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রী জে. জে. সিং এবং শ্রী এইচ. কে. দ্বিভক্ত। সংস্থার সভ্যদের মধ্যে নানা দেশের এবং আমেরিকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ছিলেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কথালিঙ্গী পাল বাক্ এবং সিন ইয়ুটাঙ-এব নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এ সংস্থার পবিত্রসীতারূপে ছিলেন বহু জার্মান সিনেটর, মার্কিন কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের কতিপয় জাস্টিস এবং দেশ-বিদেশ-খ্যাত মার্কিন পণ্ডিতগণ।

১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও 'ইন্ডিয়া লীগ'-কে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কার্যকরী রাখা হয়েছিল নানা কারণে এবং ভারতের রাষ্ট্রকর্ষাধবদের আগ্রহে। তখন শ্রীগেব কাজ ছিল নবীন ভারতকে আমেরিকাবাদীর কাছে পরিচিত করা এবং ইহার সার্বিক বিপ্লবী-সত্তাকে প্রকাশিত করা। হেমেন্দ্র-কিশোরের মতে আমেরিকার ভারত-সরকারের প্রচার-বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল থাকায় তাঁদের প্রতিষ্ঠান প্রচারণার কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।...

১৯৫২-৫৯ সাল। এই সময়টা হেমেন্দ্র-কিশোর স্বদেশে পাকাপাকিভাবে ফিরে আসার ব্যবস্থা করছিলেন। কারণ বৃদ্ধবয়সে চিরকাল্য স্বাধীন-ভারতে বসবাস করার তাগিদ তাঁকে অশ্বিধ করে তুলেছিল। ভারতের ধূলিমাটি-সন্ধানকৃষ্টিবল্ল তাঁকে তাঁর পঞ্চাশ বৎসরের বিদেশ-জীবনেও ভারতমুখী করেই রেখে ছিল। কাজেই তিনি কখনো অনেকের মত আমেরিকার মারগরিক হবার কথা ভাবেন নি। ১৯৫৯ সনে তাঁর সত্যার্থ উত্তর পারুলেকর (পূনাব 'সকাল' দৈনিকপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী) তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানান তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন'র কর্মদায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যব আমেরিকা-প্রবাসী হেমেন্দ্রকিশোর সে-আমন্ত্রণ বরণ করে নিলেন এবং ১৯৬১ সনের অক্টোবর মাসে তিনি পাকাপাকিভাবে / ভারতে পদার্পণ করলেন।...

'ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন'র প্রধান কার্যালয় পূনা শহরে। এ প্রতিষ্ঠান কিছুদিন যাবৎ মারা ভারতবর্ষ থেকে মেধাবী ছাত্র সংগ্রহ করে প্রতি বৎসর বিশেষে (বিশেষ করে আমেরিকায়) পাঠাচ্ছে। তাঁরা সাধারণ ও কারিগরি উচ্চ-শিক্ষার শিক্ষিত হবেন। হেমেন্দ্রকিশোর হলেন এ-সংস্থার একজন জিরটর ও আমেরিকায় প্রতিনিধি।...

সমগ্র জীবন হেমেন্দ্রকিশোরের কেটেছে

আমেরিকার ভারতীয় স্বাধীনতা-সম্রাসেব উল্লাসারূপে। তাঁর অর্থ, বিদ্যা, কর্ম ও চিন্তা ব্যাধিত হয়েছে স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি সমগ্র মার্কিন মূল্যকে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম করে এসেছেন কেবল ভারতীয়দের জন্যে নয়, পৃথিবীর সমগ্র নির্বাচিত জাতিদের জন্যে-ও। তাঁর সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী আমেরিকার অবাসিত) যে-কোন ওয়াকিবহাল লোকই বলতেন :

'Mr. Rakhit is known from coast to coast!'

দেশে ফিরে এসে ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি দণ্ডকারণ্যে ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গীয়দের পুনর্বাসনের ছবি স্বচক্ষে দেখবার আগ্রহে।...কোবাপটে অবস্থান করছেন তিনি।...২৬শে জানুয়ারীর প্রভাত। সৈদিন প্রজাতন্ত্র-দিবসে যোগদানের জন্যে তাঁর চম্পলতা লক্ষ্য করার বস্তু ছিল। কারণ, এই তো প্রথম তিনি যোগ দিচ্ছেন পরাধীনতা-মুক্ত তাঁর জন্মভূমির স্বাধীনতা-জ্ঞাপক উৎসবে। এ যে মহামার্যাপ্তিকের সম্মুখে তাঁর লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ।...

চরিত্রে দৃঢ়, ব্যবহারে মধুর, পাণ্ডিত্যে গভীর, কর্মে অনলস, আদর্শানুগত্যে ও দেশ-প্রেমে অবিচল, একান্ত সহদয় ও উদার এই ব্যক্তি যথার্থই বিগত যুগের বলিষ্ঠ বঙালী-চরিত্রের প্রতীক। প্রতিভাবান-এই কর্মযোগী আজ আর ইহজগতে নেই।...

১৯৬০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হঠাৎ হৃদবোগে পূনা শহরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শহীদ উম্ম সিং :

প্রকৃতিব নিয়ম হল, আঘাতের উত্তর প্রত্যাহাত। তাকেই বলা হয়—

Action has got its reaction।

প্রাদীজগতে-ও এ নিয়ম সিদ্ধ। মানুষ বা জাতি আঘাত পেলে প্রত্যাহাত করে সুবোধ মত, কারণ সে বুদ্ধিমান জীব। মনুষ্যজগতে এই স্বাভাবিক-ধর্মের ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটে থাকে। জাতি সাধারণ ক্ষেত্রে তা ঘটে প্রচুর আত্মক-ক্ষমতা থেকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঘটে অক্ষমতা থেকে। সে-অক্ষমতাকে লক্ষ্য করেই কবিগুরুব্দ আক্ষেপ :

"দরিদ্রের ভগবানে বাবেক ডাকিয়া

দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে।"...

১৯১১ সালের জালিনওয়ালাবাগ। অমৃত-সর শহরের একটি ক্ষুদ্র খোলা জায়গা। তাব তিন দিক বড় বড় অট্টালিকার ঘেরাও হয়ে আছে। এক দিক খোলা। বছরে এখানে নানা

রকম মেলা বসে। সভাসমিতি হয়। জাতি প্রাচীন এই বাগ; বাদিও বাগিচা বলতে কিছু নেই এখানে।...

'রাউসার্ট আইন' সম্প্রতি পাশ হয়েছে। বিনাবিচারে যাকে খুশি বন্দী করা যাবে। ওয়ারেন্ট ছাড়া মানুষ ধরে, স্পেশাল জজের কাছে তাদের বিচার হবে। জুরির বিচার চলে না—ইত্যাদি। গান্ধীজী এ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ভারতবর্ষ জুড়ে ৬ই এপ্রিল হরতালের আহবান দেওয়া হল। সারা দেশের মত পান্ডাব-ও এই আহবানে সাড়া দিল বিশাল আবেগে। পান্ডাবের লোকটেনল্ট গভর্নর তখন সার মাইকেল ওডার্স। তিনি দেশীলোকের বুদ্ধবুদ্ধি এক তুড়িতে নস্যাৎ করার লোক। পান্ডাবকে তিনি এমনিতই তাঁর বুটের তলার চেপে বেষেছেন। তাঁর মত দাপটে লোকের তুলনা কই? তাঁর সম্পর্কে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন :

"Michael O'Dwyer, who had exasperated the whole Province by his cruel recruiting compaigns, his ruthless suppression of the people, and insults heaped upon the educated classes. He interned hundreds of local men with little or no cause. He gagged the Vernacular Press and prevented the nationalist papers published outside the Panjab from entering the Province. He asked the 'Lam bardar's (village land-owners)-to furnish recruits on the panalty of forfeiting their rights to the land." (History of Freedom Move -ent—Vol. III—P21)

[জনসাধারণের ওপর বীভৎস নির্বাসন, শিক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর অকথা অপমান বর্ষণ এবং বুদ্ধের (প্রথম মহাবুদ্ধ) জন্যে সৈন্য-সংগ্রহেব নিষ্ঠুর পদ্ধতি অনুসরণ করে ওডার্স পান্ডাবের দম বেব কবে দিচ্ছিলেন। বিনা দোষে বা সামান্য দোষে শত শত ব্যক্তিকে অন্তবীণ করা হয়। দেশীয় ভাষার কাগজ-গুলোর প্রকাশ বন্ধ করবার আদেশ হয়ে যায়। অন্যান্য প্রদেশের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর পান্ডাবে ঢুকবার হুকুম থাকে না। সন্দরদারদের (গ্রামীণ ভূস্বামী) ওপর আদেশ জারি হয় যে, নিয়মিত হারে সৈন্যসংগ্রহ না করলে তাঁদের জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে]

এদিকে ১০ই ডায় সভ্য পাল ও ডায় কিচলুকে গ্রেপ্তার করার জন্যে দেশবাসী ক্ষেপে আছে। ১২ই তারিখ থেকে ডারার কঠিন হস্তে শাসন শুরুর করে দিল। সে শাসন বর্বরের, আদম অসজ বুনো মানুষের। শহরে হরপাকড়, মারগিট, অপমান, অত্যাচার

নশন হয়ে উঠল। সামরিক-শাসনের ভাঙন
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।...

১২ই এপ্রিল জালিনওয়ালাবাগে একটি
জনসভা ডাকা হয়েছে নেতাদের জেপ্তারের প্রতি-
বাদ জ্ঞাপনের জন্যে। জঙ্গী ডায়ার সে-সভা
বন্ধ করার কোন হুকুম দিল না। সুতরাং
একান্ত বৈধভাবেই সভা শুরু হয়ে গেছে।
লোকসংখ্যা হাজার দশেক হবে। কারো হাতে
একগাছা বেত পশ-জেনেই। নিরস্ত, নিরীহ,
আহিংস অশস্ত্র জনতা!... কিন্তু নিষ্ঠুর
ডায়ার এই মুহূর্তের অপেক্ষায়ই ছিল।
ই-দর কলে পড়েছে, এবার তরক বুঢ়িরে
জারাব আনন্দ পেতে হবে। বীরপুংগব ডায়ার
আর্মড-ফোর্স ও সৈন্যদল নিয়ে এসে বাগের
মুখে একটা উঁচু টিবার উপর সামরিক
কারমাষ তাদের অবস্থান কবল। পূর্বেই
কলা হয়েছে জালিনওয়ালাবাগের তিন দিক
রুদ্ধ এবং চতুর্দিকের মধ্যে সাজোরা-গাড়ি
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যবাহিনী সেরা কামান-
বন্দুক নিয়ে!... তারপর না দেওয়া হল কোন
হুঁশিয়ারি বা সাবধান বাণী। হুকুম দিল
বুঢ়িশের জঙ্গী মুল্লাল রিগেডায়ার জেনারেল
ডায়ার—“ফায়ার!” পঞ্চাশটি রাইফেল সমানে
গুজ-চলল। চলল বুঢ়ির মত বুলেট-বর্ষণ।
চলল মেশিন-গান। কাকে কাকে গুলী-গোলা
বিধ্বস্ত করে দিতে থাকল নিরাশ্রয়, নির্দোষ
জনতাকে। দশ মিনিটে ডায়ার-বাহিনী তাদের
গুলী-গোলা নিঃশেষ কবে ফেলল। তারপর
সৈন্যসামন্ত নিয়ে বীরবর ডায়ার বিদায় নিল।
...দশ হাজার নরনারী শিশুবংশ সেখানে নরক-
যন্ত্রণা ভোগ করে করুক—তাতে রিগেডায়ার
জেনারেল ডায়ার-এর কিছু করণীয় নেই।
হাজার লোক তখনই মরে গেছে। জখম হয়েছে
সবাই। যারা দৈবে গুলীব আঘাত থেকে
বঁচে গিয়েছিল তারা পলায়নের ব্যা চেষ্টার
ভিত্তির চাপে মৃতপ্রায় বা মৃত্যুকে আশ্রয়
করেছে। তিন দিকের প্রাচীরগুলো বহুকাল
সেই অজস্র গুলী-গোলাব ক্ষত বহন করে ছিল,
আজও হয়তো বহন করছে।... সৈন্যরা চলে
যাবার পরও কেউ বেরুতে পারে নি। কে
কাকে বার করবে? কে কাকে হাসপাতালে
বা শ্মশানে নেবে? শহবে কার্ফু জারি হয়ে
গেছে! পথেরদুট বেরনেট-উঁচিরে উঠল দিচ্ছে
সেন্যবাহিনী! হাসপাতালে গেলে বাচতো
যারা, তাদেরও মৃত্যু হল। এপ্রিল মাসের
দুইসহ গরমে রাতারাতি পচন ধবল মৃতদেহ-
গুলোয়। শৃগাল-কুকুরের মহোৎসব। বে-
সামরিক সরকার অস্ত্রালাে চলে গেছে।
সামরিক-সরকারের কাজ হলো গুলী করা—
শবের সংকর বা আহতকে শত্রু বা দানব
কর্তব্য তাদের নয়!...

অস্ত্রহীন, অবলম্বনহীন, নির্দোষ শিশু-
বংশপ্ৰবরনারীকে বুলেটের বন্যার ধরাশায়ী
করেও ওডায়ারের বন্দু ডায়ার শাস্ত হলো না।
মিল-জ দানব অমৃতসর শহর শত্রু নয়,
লারা পাজাব জুড়ে দাপাদাপি করে বেড়াতে

জাগল। তাতে মানব মান গেল, নারীর
সম্মান গেল, জাতির প্রজন্মবোঝে বিনষ্ট হতে
চলল।...

ওডায়ার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি
পরম আনন্দে তাঁর রাজ্যমর নারকীর দৃশ্য
উপভোগ করতে লাগলেন। ডায়ারের বীরকে
তার শেভডমেহে গুলীকে সৃষ্টি হতে থাকলো।...

ডায়ার, ভাগ্যবান পুরুষ। তার সহকর্মী
জুটেছিল আরো কটি নিল-জ পাখ-ড।
ডেভেটন, কর্নেল ওয়াগেন, লেফটেন্যান্ট
ডব্লিউ. মেকর কবেরি ও বসু-ওয়াথ স্মিথ।
এরা নিবস্ত্র-মানব খুনের বম, এরা পলায়মান
ভীতহস্ত গ্রামবানীর উপর আর এক এ-র
প্লেন থেকে বোমা বর্ষণে ওস্তাদ, এরা নারী-
বর্ষণে তৎপর।...

ডায়ার আর একটি প্ল্যান করে শহরে
কলের জল দিল বন্ধ করে, বিজলি বাতির
সেন্দুই দিল কেটে। ফলে অমৃতসর
শহরের মানুষ এপ্রিলের দাবুণ গ্রীষ্মে তৃষ্ণার



উঃ সিং

আশ্বর, রাস্তার অশ্রুকারের আঁড়শাপে বিরত।
এ ছাড়া ডায়ার-এর দশ সারা পাজাবে অপমান
করে ব্যাছিল মানবের। শহরগুলোব গণ্যমান্য
ব্যক্তিদেবকে সব থেকে টেনে বের কবে বুলেট
হেঁটে পথ চলাতে বাধ্য করেছিল। প্রকাশ্য জন-
পথে মানবকে দিয়ে নাকে খৎ দেওয়ান এবং
জোয়ানদেরকে বেত সেয়ে মেবে অজ্ঞান করে
ফেলা তো মামুলি খেলা ছিল জঙ্গী-
জানোয়ারদের।... বসু-ওয়াথ স্মিথ নিজে ডব্লিউ
মেয়েদের বে-আবদ কবে তাঁদের অঙ্গে ধতু
দিচ্ছে, বাস্তব-ভাষায় গালি দিচ্ছে, অসভ্য
ইশ্টিগত করছে। এ-হেন বাব নারকদের
অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর হাতে মেয়েদের ইচ্ছা
যে কতটুকু রক্ষা পেয়েছিল তা অনুস্মের।...

ডায়ার মজদদার বলছেন :

“The cold blooded massacre at

Jalliwalla Bagh, to which it would
be difficult to find a parallel in the
annals of any Civilised Government,
took place before ‘Martial Law’
was declared and the administra-
tion was still at least nominally,
in the hands of the civil authority.”
(History of Freedom movement—
Vol. III—P 29)

[জালিনওয়ালাবাগের নির্বচারে রক্তক্ষিণ্ড
হত্যাকাণ্ডের তুলনা পৃথিবীর সভ্য-শাসনতন্ত্রের
ইতিহাসে বিরল। এ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটাবার
কালে শাসনভার কিন্তু বেসামরিক কর্তৃপক্ষের
হাতেই ছিল, ‘মার্শাল ল’ অর্থাৎ সামরিক-
আইন ঘোষিত হয় তিন দিন পরে।

সমগ্র বৃটিশ-জাতি ডায়ার-ওডায়ারকে
তাদের মহান কার্যের জন্যে পুরস্কৃত করেছে,
বহু সম্মান জানিয়েছে কিন্তু একজন বৃটিশ
কঠিন কঠে তাব প্রতিবাদ করেছিলেন, আতের
সেবার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি দীনবন্ধু
সি. এফ. এম্বুজ। ডায়ার-এর অপকর্ম
সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন :

“A cold and calculated massacre.
An unspeakable disgrace, indefen-
sible, unpardonable, inexcusable.
(Hist. of Freedom movement—
Vol. III—P 29)

[অনুভূক্তক ও সুপরিচিত ব্যাপক হত্যা।
অকথ্য নিল-জতা। স্বপক্ষে এর কোন বুজি
নেই। ক্ষমার অযোগ্য, অমার্জনীয় এ অপরাধ।]

জালিনওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে
দমগ্র ভাবতবর্ষে প্রবু ফোড সম্ভাবিত হল।...
রবীন্দ্রনাথ তেজোদীপ্ত-প্রতিবাদে ‘স্যার’ উপাধি
প্রত্যাহ্বান কবলেন। মহাত্মা গান্ধী আবদন-
নিবেদনের কোমর-ভাঙা রাজনীতিস পরি-
বর্তন ঘটল। তাঁর মধ্যে জনগণ ‘গুডবুড’কে
থেকে গেল। দেশজোড়া বহু উন্মাদ বড় উঠে
ইংরেজকে নির্মিত করল।... কিন্তু গুগল-ওয়াথ
বর্ষ নির্বিকার।...

পূর্বেই কলা হয়েছে যে, মাইকেল ওডায়ার
ছিলেন তৎকালে পাজাবেব লেফটেন্যান্ট-গভর্নর।
কঠিন হস্তে তিনি পাজাবেব জমি থেকে
বিদ্রোহের বাঁজ উৎপাতিত কবে বৃটিশ-সমর-
শক্তির পীঠস্থানকে বিপন্ন করত বুলেট
তার মান বেড়ে গেল। ভাবতবর্ষে তাঁকে
আব রাখা নিরাপদ নব ভেবে বৃটিশ-সরকার
গভর্নর-পদ থেকে সরিয়ে মোটা অর্থ
দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফিবিরে
নিলেন। ১৯১৯ সনের-ই ৩০শে মে তারিখ
এই মহাপুরুষ বিজয়মন্ডে ইংলন্ড অভিমুখে
রওনা হয়ে গেলেন।...

ইংরেজ নাকি বড়ই ধুবধব রাজনীতিক।
তাই ‘নাটের গুরু’ মাইকেল ওডায়ারকে সার

দিয়ে ইংরেজ ভাবলো যে, ভারতীয়দের অর্বাচীন-রাজনৈতিকবুদ্ধি এতেই তুষ্ট হবে এবং আস্তে-আস্তে গোলামের জাত সব ভুলে পরম সুখে আবার গোলামীর কার্যে ডুব দেবে। এদিকে ও'ডায়ারকে তাঁর অপূর্ব দেশ-প্রেম, সংসাহস ও কর্মদক্ষতাব জন্মে ইংলন্ড-মাসীবা স্বদেশে পদার্পণের পর-ই বিশ হাজার পাউন্ড-এর একটি তোড়া গদগদাচিতে দান হবে। — ইংরেজ-জাতি মনে কবেছিল যে, গোলাম ভাবতবাসী শেও-প্রভুদের এ উল্লাস-ও হজম করে যাবে।

ভাবতকে অপমানিত করার অপচেষ্টা এখানেই থামে নি। এরপর ও'ডায়ার সাহেব ভারত থেকে বহু দূরে একান্ত নিরাপদে অবস্থান করে একটি বই লিখলেন—“India as I knew it”... এ পুস্তকে ভাবতবাসীর বিরুদ্ধে বিবোধারের সীমা ছিল না।...

ভারতবাসী সত্যি কি মৃত? গোলাম হলে-ও গোলামী? কি সে মেনে নিয়েছিল? একটি বিদ্রোহী-সভা কি তার মধ্যে প্রথম জন্মপন্ডনের দিন থেকেই জেগে ছিল না? সেই বিদ্রোহী-সভা গোলামীকে মেনে মেনে নি হলে-ই মহারাজা নন্দকুমার ফাঁসির-মণ্ডে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর একক বিদ্রোহ সমাধিগতভাবে রূপ নিয়েছিল ১৭৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহে। সে-বিদ্রোহেব শিখা বিজ্ঞমভাবে ছড়ানো রয়েছে ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক-ইতিহাসে।

তার অনেকদিন পর ‘বিদ্রোহ’ বঙ্গবের মধ্যে দালা-বেঁধে উঠলো ভারতীয়-চিন্ত

শ্রীঅরবিন্দ-লোকমান্য তিলক-লোকমাতা নৈবেদিতা ও বিপ্লবগুরু পি. মিত্রের প্রত্যক্ষ অবদানে। সে-বিপ্লবের ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির ইতিহাস আমরা কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা করছি ইতিপূর্বে।...

জাতির অপমান বিপ্লবী ভুলতে পাবেন না। কাণ্ড, বিপ্লবী অক্ষমতার উপাসক নন। আঘাতের উত্তর আঘাতকারী যে ভাষা বন্ধে তার সে-ভাষা-ই তাকে দেবেন তিনি সুযোগ মত। কারণ তিনি বীর। কাপুরুষের দম্ভ চূর্ণ না করলে জাতি-ও কাপুরুষ হয়ে যায়। প্রবল ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভারতব সামরিক-জাতি পাল্লাবীরকে যদি বুকে-হেঁটে পথ চলতে বাধ্য করা হয় এবং এর কোনো সঠিক জবাব দেবার সামর্থ্য যদি দেশবাসীর না থাকে — তবে জাতির পৌরুষ অবলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য।...

বিপ্লবী ভুললেন না এ অপমান। বিপ্লবী ভুললেন না তাঁকে, যার মাধ্যমে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদিক-দম্ভ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্যে যাকে পুরুষকৃত করার বিকৃত রুচি ইংরেজ-জাতি দেখিবে-ছিল।...

১৯০৪ সালের ১০ই মার্চ। মাইকেল ও'ডায়ার তাঁর কেমিস্টনের গৃহ থেকে সেজে-গুজে বেরুলেন এক সভার যোগদান করার জন্যে। যাবার সময় পরিজনদের বলে গেলেন:

“Good-bye, I shall be back in time for tea at 5 O' clock.” (The Roll of Honour—Page 552-554)

[বিদায়। ঠিক সময় ফিরে এসে পাঁচটার জাখাব।]

ও'ডায়ার সোজা চলে গেলেন ক্যান্সটন হল-এ। উক্ত গৃহে ‘টিউডর রুম’-এ সভা বসেছে। সভা আহ্বান করেছে ‘রয়েল সেন্সিটাইজিয়ান সোসাইটি’ ও ‘ইন্সট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন’ নামক দু'টি প্রতিষ্ঠান একত্রে। বক্তৃতা হবে ‘আফগানিস্থান’ সম্পর্কে।...

সভার যথেষ্ট লোক এসেছে। সভাপতি লর্ড জেটল্যান্ড উদ্বোধন-বক্তৃতা দিচ্ছেন। এহেন সভায় একটি ভাবতীয় তরুণ ভিড় খেলে বক্তৃতা-মণ্ডেব কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। দেয়ালে পিঠ রেখে মণ্ডেব মুখোমুখি হয়ে তিনি দাঁড়ালেন।...

সাড়ে-চার ঘণ্টাকার সভা ভঙ্গ হল। বক্তা এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হতেই প্রোতার দল আসন ছেড়ে উঠছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে এগিয়ে এসেছেন বিপ্লবী। সহসা হলগৃহ প্রকম্পিত করে গর্জে উঠল তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র। পব পর কয়েকটি বুলেট ছুটে এলো। চতুর্দিকে বিজ্ঞানিত, ঠেলাঠেলি, কে কার আগে পালাবে সে-জন্যে গুলোগুটি শব্দ হয়ে গেছে। তখন দেখা গেল একটি বলিষ্ঠ দেহী ভাবতীয় তরুণ চিংকার করে বলছেন—‘হটো, হটো’—এবং দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।...

অবশ্য তরুণকে ধরে ফেলল সবাই মিলে। ...বন্দী বীরের তাকে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ জাতির দীর্ঘ একুশ বৎসরের দুঃসহ অপমানের বোঝা আজ তিনি লাঘব করতে পেরেছেন।...

ও'ডায়ারের পিঠে দু'টি বুলেট ঢুকে একটি বেরিয়ে গেছে দেহেব বাঁ-পার্শ্ব দিয়ে মস্ত একটি বহুক্ষরা ক্ষত সৃষ্টি হবে; অপবটি ঢুকে গেছে পেটের ভিতরে। প্রথম গুলীর আঘাতেই কুখ্যাত ও'ডায়ারের গর্ভোদ্ধত-দেহ বৃটিশের প্রচণ্ড আগ্রহের মধ্যে-ই ধূলায় গড়িয়ে পড়ল। পাঁচটার গৃহে চাষেব টেবিলে ফিরে যাবার অবকাশ আর তাঁর এ-জন্মে হলো না।...

আতভারী বন্দী!... পুলিশের কাছে বলেছেন যে, তাঁর নাম মহম্মদ সিং আজাদ এবং তিনি ইজিনীয়র।

পরদিন ১৪ই মার্চ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তাঁকে উপস্থিত করান হল। সেখানে বন্দী কোন প্রশ্নেবই জবাব দিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পুলিশ-হাজতে থাকবায় হুকুম দিলেন।...

অতঃপর কিছু অনুসন্ধানের পর পুলিশ জানতে পারল যে, যত ব্যক্তির আসল নাম উল্লম সিং। তিনি নিজের পবিচয় অনেক সময় (অবশ্য ভারতে-ও) দিতেন মহম্মদ সিং আজাদ নামে। ধর্ম তিনি শিখ, বাড়ি পাল্লাবে, কিছুদিন পূর্বে-ও রাজদ্রোহমূলক

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

বীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - মাগপুর
বেঙ্গলোয়াড়া - শ্রীমগর - পোহাটী

কবিতার বিশ্বাস

কাজী আবু জাক্বার সিদ্দিকী

কবির কল্পনা থামে; পশুদের অক্ষম হৃৎকল
নদী গ্রামে কে'পে ওঠে,
উদ্ভত নখর মুষ্টি—রক্ত চায় রক্ত।

সৈনিক ভাগ্যের দাবি অনিশ্চিত অসম্ভব
ঘরের একান্তে। তন্ত বৃকের যন্ত্রণা
নিজের মৃত্যুর লোভে চেয়েছে শত্রুর পরাজয়।

হৃদয় তবে গল্প নয়? কবিতার অপার বিশ্বাস,
ভাঙা মেঘে রক্তসূর্য প্রেম বিনিময়ে
স্বামধনু রেখে থাক। অগ্নিবাহন তুলে।

এ মাটি আমার,
তোর মিথ্যা শরিকানা।
সরে যারে প্রতারক, এখনি আগুনতন্ত তীক্ষ্ণশেল
বিশ্বব তোর বৃকে!...

মা গো! আমার কবিতা,
রক্তলেখা লিখে থাক তোমার বিজয়।

ধলভূমে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কী নিখর ক্রান্ত বন। রৌদ্র নামে পাতার পাতার
হঠাৎ আঁখার খুঁড়ে: ভোর হ'ল ধলভূমগড়ে।
এখানে পাখিরা আছে, আছে জন্ম, মৃত্যু ঘরে ঘরে,
আছে ঘুম, আছে রাগ, দিন নামে সবুজ খাতার
নাম লিখে: আছে আর সিন্ধু নীরবতা,
অসীমে বাড়িয়ে হাত হাতে হাত শাল মহুয়ার
ঈশ্বরের প্রতি হাতছানি। জীবনের নিত্যকার হাসির সম্ভার,
পরিচিত সুখ-দুঃখ, একঘেয়ে মনের জড়তা
ছেড়ে-এসে দৌধি ভোর অপরূপ আবির্ভাব
পাহাড় দিয়েছে ভরে সূর্য্যত ধলভূমে।

আমিও রোদের সাথে বনে বনে ছড়াবো আমাকে।
অরে লালীর স্বাদ, বৃকে রক্তে নতুন উচ্ছ্বাস:
ঘাস চন্দ্রে খেয়ে যাওয়া শ্রান্তিহীন সুন্দর বাতাস
সময় উড়িয়ে নেবে। আমি বাব পাহাড়ের ডাকে
প্রেমের আতর ঢেলে উচ্ছ্বাসিত রঙীন নজরে
যেখানে সাঁওতালী বউ ঘসামাজা বাড়ির উঠানে
শুকায় ক্ষেতের ধান: পদক্ষেপে ঢেউ ওঠে পড়ে,
রূপ করে প্রতি শিহরত।

যুক্তা দেওয়ার অপরাধে ভাবতবুে, তাঁকে
অল্পদিন কবান্ড ভোগ করতে হয়েছিল।...

১৯৪০ সালের ২রা এপ্রিল। উধম সিংকে
জবাব আনা হল পুলিশ-কোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেটের
সম্মুখে বিদ্রোহী বীর বললেন: "এ-লোকটির
বিরুদ্ধে আমার চরম অভিযোগ। উপযুক্ত
পরিণতি ঘটেছে এর নিশ্চয়ই।... আমি নিজে
মৃত্যুকে পরোয়া করি নে। বড়ো বয়স পর্যন্ত
বেচে থাকার কী লাভ? যৌবনে মৃত্যুকে
ছিনিয়ে আনা-ই আমার কাম্য। তাই মৃত্যুকে
আমি আজ হাতেব কাছে পেতে যাচ্ছি।... লর্ড
জেটল্যান্ড কি করেছেন? তাঁর-ও মরা উচিত।
তাঁর দিকেও ঠিক এই জারগা লক্ষ্য করে
(নিজের পাকস্থলী দেখিয়ে) দটো গুলী
ছুঁড়েছিলাম।"...

উধম সিং-এব কাছে একটি ছদ্মরার
আমেবিকান আগেরাস্ত পাওয়া গিয়েছিল,
আর পাওয়া গিয়েছিল কিছু বুলেট ও একটি
ছবি।... ম্যাজিস্ট্রেট হাঁক দিলেন তাঁর নাম
ধরে। উত্তরে তিনি বললেন: "মহার, আমি
উধম সিং নই। আমার নাম রাম মহম্মদ সিং
—আজাদ।"...

২১শে এপ্রিল 'বো স্ট্রীট পুলিশ-কোর্টে'
প্যার মাইকেল ও'ডারলকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা
করার অপরাধের চার্জ গঠিত হল উধম সিং-
এর বিরুদ্ধে।...

পিঞ্জরাবক তরুণ-ভারতীয়কে কিন্তু ব্রিটিশ
পুলিশ-অফিসারগুলো প্রকার চক্ষে দেখতো।
ফারণ তাদের ভারত-বিশেষ প্রকট ছিল না।

কাজী বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলে-ও তারা
তরিক বীরের মর্যাদা দিত। তাঁকে একটি
অফিসার বলছিলেন: "তোমার বিচার শেষ
হতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে।" উত্তরে
উধম সিং তখন বললেন: "দেবী করাব কী
আছে? সবই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে।...
দ্যাখা, আমি যে দেখেছি ভারতের অগণিত
মানুষকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী-শাসনে উপবাসে
নিঃশেষ হয়ে যেতে। আমার কঠোর এই প্রতি-
বাদ-জ্ঞাপনের জন্যে আমি বিদ্রোহী দর্শিত
নই। এ তো আমার মহান কর্তব্য, দেশের
সম্মান রক্ষার্থে একাজ সম্পন্ন করা। আমি
দশ-বিশ-পঞ্চাশ বৎসর কারাদণ্ড বা ফাঁসির
হুঁকমকে হুঁকম করি নে।"...

ওল্ড বেইলী সেন্ট্রাল-ক্রিমিন্যাল-কোর্টে
উধম সিং-এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হল।...

১২ই জুন, ১৯৪০ সাল। উধম সিং
লন্ডন শহরে ফাঁসির-মঞ্চে আরোহণ করলেন।
...নিম্নবাসী জানলো যে, দীর্ঘ একুশ বৎসর
পব ভারতবর্ষের এক মহান বিপ্লবী সাগর-
পথে হাজাব-হাজার মাইল অতিক্রম করে
ব্রিটিশর রাজধানী লন্ডন শহরে এসে সেই
মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ১৯৪০
সালে, যে-মানুষ ১৯১৯ সালে তাঁর (উধম
সিং-এর) দেশের অসংখ্য নিবস ও নির্দোষ
মানুষকে হত্যা করে খুঁশি হয়েছিলেন, জাতির
সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে বৃকে-হাঁটিয়ে তামাসা
দেখেছিলেন।...

অমন অপূর্ব নিষ্ঠাব জাতির প্রতি হিংস্র-
আচরণের উত্তর প্রতিহিংসার পালনের রক্ত
নৈব্যতিকভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা দুর্বলের
থাকে না; আত্মসম্মান-জ্ঞান বাদের শুল
তাদের-ও থাকে না; গোলামী বাদের মজ্জা
চুকে গেছে তাদের-ও থাকে না।

এ ক্ষমতা থাকে বিপ্লবীর। এ ক্ষমতা
থাকে তাঁর-ই, যে-মানুষ মহা রাজনীতিজ্ঞ
চাপকোর মত প্রতিজ্ঞা নিতে জানেন যে,
"অন্যায় যে করেছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি না
দেওয়া পর্যন্ত 'শিখা' আমি বাঁধবো না।"

উধম সিং সেই জাতি-ই পুরুষ। উধম
সিং-এর ঐতিহাসিক প্রতিহিংসা-গ্রহণ তাই
ধৈর্যে, শৌর্বে ও অস্বাভাবিক দেশাত্মবোধে
অনির্বচনীয়। বিদ্রোহী উধম সিং-ই বলতে
পারেন:

"আমি অরুণ খুনের তরুণ
আমি বিশ্ব দর্পহাবী।"
(নজবুল)

বিশ্ব দর্প হরণ না করলে-ও তিনি
ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ-বিধাতার দর্প বিচূর্ণ করে
দিখে গেছেন।...

উধম সিং তাই চিবকাল বেঁচে থাকবেন
আত্মসম্মানলোভীদের কাছে। বেঁচে থাকবেন
দেশকালব্যাপি জুড়ে, পবানীন ও নিৰ্বাচিত
জাতিগুলোর মনেব কাছে।... (ক্রমশঃ)

দ্রষ্টব্য: বিশ্ববস্তুর উপাদান 'The Roll
of Honours' থেকে সংগৃহীত।



১ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ;

একদিন চার্লি বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা হ্যারী সৌন্দর্যক হাউউইক ও সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান উপন্যাসিক সিন্‌ক্লেরার লিউইসের সঙ্গে বসে লাগু খাচ্ছেন—খাবার সময় কথা-প্রসঙ্গে 'ম্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' স্ট্রিটের কথা উঠল। এ নাটকটি লন্ডনের রঙ্গমঞ্চে বিরাট সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল এবং হ্যারী সৌন্দর্যক ছিলেন স্ট্রিটের স্টল এ্যাক্টর। লিউইস বললেন এ নাটকের স্ক্রিপ্ট চার্লি হাউইক একটি মডার্ন জেন্স অফ আর্ক। তাছাড়া তিনি এই অভিনয়ও প্রকাশ করলেন যে স্ট্রিট থেকে একটি চমৎকার ছবি হতে পারে। একথা শুনে চার্লি নাটকটি সম্বন্ধে অনেক ইন্টারেস্টেড হলেন এবং সৌন্দর্যকে জানালেন তিনি বইটি পড়তে চান। সৌন্দর্যও একদিন বাদেই নাটকটির একটি কপি চার্লিকে পাঠিয়ে দিলেন।

বইটি পড়ে বেশ ভালই লাগল। কিন্তু তখনও এ চিত্ররূপ দেবার বাইট চার্লি পান নি—আবার সৌন্দর্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাইই সাহায্যে ফিল্ম রাইট কিনলেন ২৫০০০ ডলারে।

রুমে নাটকটির স্ক্রিপ্টও তাঁর হয়ে গেল—নিজের বিচিত্র স্ক্রিপ্টটি বেশ ভালই লাগাছিল চার্লি'র।

বেভারলে হিল্‌সের বাড়িতে বসে যখন ম্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স নিয়ে কাজ করছেন চ্যাপলিন, এসময় একদিন অবসর ওয়েলস্ এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির। ওয়েলস্ তখন

ঠিক করছেন কয়েকটি ডকুমেন্টারী ছবি তুলবেন। এ ছবিগুলো হবে বাস্তব জীবনের ওপর ভিত্তি করে—একটি কাহিনীর নায়ক ছিলেন এক প্রখ্যাত ফরাসী হত্যাকারী, তার নাম হচ্ছে ব্রুনিয়ার্ড লন্দ্রো। ওয়েলস্ বললেন যে, তাঁর ধারণা চার্লি যদি এই ভূমিকায় অভিনয় করেন তবে একটি অস্বাভাবিক নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি হবে।

চার্লিও এ প্রস্তাবে উৎসাহ বোধ করলেন—প্রথমত কমেডী থেকে একটু অন্য জাতের নাটকে অভিনয় করা হবে। তাছাড়া ছবির কাহিনী লেখার দায়িত্ব থাকলো, একই সঙ্গে অভিনয় এবং ছবির পরিচালনা করতে হবে না—এসব তো বছরের পব বছর ধরে করে আসছেন। চ্যাপলিন একবার স্ক্রিপ্টটা দেখতে চাইলেন।

ওয়েলস বললেন—এখনও লেখা হয় নি। আর তাছাড়া এবিষয়ে তো বিশেষ হাঙ্গামাও কিছ্ নেই। লন্দ্রো প্রায়শঃ বেকড সগুণো পেয়ে গেলেই হোল—সে আপনাকে জোগাড় করে দেওয়া হবে। আপনি নিশ্চয় স্ক্রিপ্ট লেখা বিষয়ে সাহায্য করবেন।

চার্লি—স্ক্রিপ্ট লেখার দায়িত্ব আমার উপর দিচ্ছে—আমি এবিষয়ে ইন্টারেস্টেড নই।

এইখানেই এ ব্যাপারের ইতি হয়ে গেল।

এব দ্ব-একদিন বাদে চ্যাপলিনের মনে হোল লন্দ্রোব জীবনী নিয়ে একটি চমৎকার কমেডী ছবি তোলা যায়। তিনি তৎক্ষণে ওয়েলসকে ফোনে ডেকে বললেন—শোন, তোমার লন্দ্রো সম্বন্ধে ডকুমেন্টারী ছবিটার প্রস্তাব থেকে আমার মাথায় একটা ভাল কমেডী আইডিয়া এসেছে। আমি অবশ্য লন্দ্রোকে ছবিতে আনবো না—তবে প্রথম থেকেই যাতে এবিষয়ে সর্বকিছ্ পরিষ্কার হবে যায়, সেজন্য আমি তোমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে বাঞ্ছী। এর কাণ্ড হাউইক তুমি প্রস্তাবটা তুলেছিলে বলেই এই ছবি তোলাবার চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে।

ওয়েলস্ ফোনে ইতস্তত ভাব দেখাতে লাগলে চার্লি আবার বললেন—শোন, লন্দ্রোর কাহিনী তোমার নিজের মৌলিক গল্প নয়—জনসাধারণের যে কেউ ইচ্ছামত গল্প নিয়ে ছবি তুলতে পারে।

অল্পকণ ক্রমে চিন্তা করে ওয়েলস্ চার্লিকে বললেন এবিষয়ে তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। এবপর একটা চুক্তি হোল। ওয়েলস পাঁচ হাজার ডলার পাবেন—আর চার্লি'র এবিষয়ে তাঁর কাছে আর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

ওয়েলস্ এই ব্যবস্থায় রাজ্যী হলেন, তখন একটি সত্ৰে আরোপ করলেন। ছবিটি দেখার পূর্বে তাঁর ইচ্ছা হলে একথা ছবির আগে লিখে ঘোষণা করতে হবে যে, 'এই ছায়াচিত্রে আইডিয়া পাওয়া গেছে অবসন্ন ওয়েলসের কাছ থেকে।'

তখন যদি চার্লি বুঝতে পারতেন যে ভবিষ্যতে এ নিয়ে ওয়েলস কি ধরনের আশ্বাস-প্রদায়ক শব্দ কববেন তাহলে তিনি এ সত্ৰে কখনই রাজ্যী হতেন না।

এবং চার্লি 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' শিরের বোধে ম'সিয়ে ভাদু' লিখতে শব্দ করলেন।

এক কয়েক মাস বাদে মিস মিনা ওয়েলস নামে হালিউডের একজন ফিল্ম এক্সেস্ট্রা ফোন করে চার্লিকে জানালেন, নিউ ইয়র্ক থেকে আগত তাঁর একজন মজলদার 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' নামের একটি ছবিতে 'স্যাডো' এবং 'সাবস্টেন্স' নামের দুই ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁর মনে হয়। তখন ম'সিয়ে ভাদু'র কাহিনীকে আশ্বাসের ভেতর জানতে গিয়ে হিম্মিস্ট থেকে যোগাযোগ করে চার্লি। মিস ওয়েলসের মেসেজটা যেন নতুনভাবে চার্লিকে উদ্দীপিত করে। 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' ছবিটা তোলবার জন্য। সুতরাং তখনকার মত ম'সিয়ে ভাদু'কে সর্বদা রাখলেন। আবার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে জানাবার জন্য ফোন কথা বললেন চার্লি।

মিস ওয়েলস জানালেন যে, তাঁর মজলদার নাম উনা ও'নিল। 'ইনি বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের মেয়ে। চার্লি মিস ওয়েলসের কাছ থেকে জানতে চাইলেন উনা অভিনয় করতে পারেন কিনা। মিস ওয়েলস—'হ্যাঁ, ওর অলিম্পিক অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আছে। তবে একটা ফিল্ম টেস্ট নিয়ে নিজেই বিচার করে দেখা ভাল।' তিনি এও কললেন, যদি চার্লি তাঁর বাড়িতে উনার দেখতে চান সে বন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

চার্লি একদিন ব্যবস্থামত সম্মান দিতে মিস ওয়েলসের বাড়ি গিয়ে হাজির—একটু আগেই গিয়েছিলেন। সিটিং রুম দেখলেন একটি অল্পবয়স্ক শব্দ—ফায়ার প্লেসের কাছে বসে আছে। মিস ওয়েলস তখনও আসেন নি—চার্লি নিজের পরিচয় দিয়ে শব্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, বোধহয় তিনিই মিস ও'নিল? উনা মৃদু হেসে সম্মতি জানালেন। মেয়েটির ভেতর একটা অদ্ভুত উজ্জ্বল সৌন্দর্য, এমন একটা মাধব্য যা অবশ্য সব নারীর থেকে তাকে যেন আলাদা করে বৈশিষ্ট্য দেয়। আর রয়েছে একটা কমনীয়তার ভাব যা একেবারে মর্মস্পর্শে গিয়ে সাড়া জাগায়। মিস ওয়েলস আসা পর্যন্ত দুজনে মনে অনেকক্ষণ গল্পগুজবে কাটলেন।

শেষ পর্যন্ত মিস ওয়েলস এলেন এবং পরিচিত রীতিতে দুজনের আলাপ করিয়ে দিলেন। ডিনারে এঁরা তিনজন ছাড়া আর

ছিলেন টিম ডুরেন্ট। প্রত্যক্ষভাবে কাজের আলোচনা না হলেও, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ বিষয়েই কথা হোল। চার্লি কথায় কথায় বললেন, 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' নামের ছবিটি হচ্ছে অল্প বয়সের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মিস ওয়েলস জানালেন উনার বয়স হবে সত্তেরো থেকে কিছু বেশি। ভেতরে ভেতরে চার্লি একটু খতমত খেয়ে গেলেন। যদিও তাঁর নামের বয়স বেশি হবে না একথা ঠিক, কিন্তু ভূমিকাটি এত জটিল যে আর একটু বেশি বয়সের এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিনেত্রী না হলে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলা মুশকিল হবে। ভেতরে ভেতরে চার্লি ঠিক করে ফেললেন যে একে দিয়ে তাঁর কাজ হবে না।

এর কয়েকদিন বাদেই মিস ওয়েলস চার্লিকে ফোন করে জানতে চাইলেন উনা সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করছেন—কারণ ইতিমধ্যে ফিল্ম কোম্পানী ও উনার বিষয়ে ইন্টারেস্ট হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদ শুনে মাত্রই চার্লি উনাকে দিয়ে চরিত্রের স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। এই প্রসঙ্গে চার্লি মন্তব্য করেছেন :

"This was the beginning of what was destined to be over twenty years of complete happiness—and I hope many more."

চার্লি বলেছেন, উনার সঙ্গে বর্তমানে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ততই তাঁর স্নেহ অর্থাৎ হিউমার এবং সহনশীলতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন। উনার চরিত্রের আবেগ নানা দিক ছিল যা চার্লিকে বিস্মিত এবং আকৃষ্ট করে তুললো উনার প্রতি—

"She could always see the other person's point of view."

চার্লি এবার বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি উনার প্রেমে পড়ে গেছেন। উনার বয়স এই সময়টার আঠারো বছর—কিন্তু এই বয়সের হালকা ভাব বা তাবল্য তাঁর ভেতরে ছিল না। উনাকে দেখে চার্লি'র মনে হোত সাধারণ নিষ্পেষে মাপকাঠিতে তার পরিমাপ করা যায় না। প্রথমটার দুজনের বয়সের বিবর্ত পার্থক্যের দিকটা ভেবেচিন্তে চার্লি'র মনে একটু সন্দেহ ভাব আসছিল। কিন্তু উনা তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সে যেন জীবনের সব থেকে বড় সত্যকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। দুজনে মিলে ঠিক করে ফেললেন 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' ছবিটি তোলা হবে গেলেই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

স্ক্রিপ্টের প্রথম ড্রাফ্ট শেষ করে চার্লি প্রডাকসন শব্দ কববার জন্য তাঁর হাজির। চার্লি ভাবছিলেন—

"If I could get on film that rare quality of charm Oona had, Shadow & substance would be a success."

এই সময় আবার এসে নানা কথাট স্মরণ করে দিলে সেই স্নেহ ব্যারী নামে মহিলাটি।

চার্লি'র আইনজ্ঞ লয়েড রাইট উপদেশ দিলেন ছবি তোলা কিছুদিন স্থগিত রাখতে এবং উনাকে কিছুদিনের জন্য নিউ ইয়র্কে চলে যেতে।

কিন্তু চার্লি'র শেষ উপদেশটি কিছুতেই মেনে নিতে রাজ্যী নয়। যত ইচ্ছা গোলমাল করুক না এ ব্যারী নামধারী মহিলা এবং বিদ্রোহী প্রচারকার্য চালানো খবরকাগজ-ওলাবা, চার্লি'র এসব অগ্রাহ্য কববেন ঠিক কবলেন। আগেই দুজনের ভেতরে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে, আর তাঁর না কবে এখনই বিয়ে করে ফেলবেন এই সিদ্ধান্ত করে ফেললেন উনা এবং চার্লি।

সাঁটা ব্যবসায় থেকে পনের মাইল দূরে কারপিনটোরিয়া নামে একটি ছোট নির্জন গ্রামে চার্লি ও উনার বিয়ে হয়ে গেল।

সাঁটা ব্যবসায়তে দু'মাসের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নির্জন জীবন যাপন করতে লাগলেন চার্লি দম্পতি।

এরপর লস্ এঞ্জেলস, তারপর ক্যালিফোর্নিয়া এবং সেখান থেকে নিউইয়র্কে চলে এলেন চার্লি'রা। সেখান থেকে নামকে গিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। নামের জায়গাটা ছিল অত্যন্ত নির্জন—শহুরে আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে। পাঁচ সপ্তাহ এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিশ্রাম কবলেন চার্লি'রা।

ম'সিয়ে ভাদু' ছবিটি প্রায় শেষ হয়ে এলেও সম্পূর্ণ করা হয় নি। এবার চার্লি'র ইচ্ছা হোল ছবিটি শেষ করে ফেলেন।

নামকে থাকতে বেশ লাগছিল—কিন্তু ওখানে বসে থাকলে তো কাজ এগাবে না। সুতরাং আবার ক্যালিফোর্নিয়াতে ফিরতে হোল।

বিয়ের কিছু পরেই উনা চার্লিকে জানিয়েছিলেন যে, আর মত বা ছায়াছবির অভিনেত্রী হবার ইচ্ছা তাঁর নেই। চার্লি একথা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলেন। এতদিন বাদে সত্যিই একজনকে পেলেন যে কেবলমাত্র গার্ল না হয়ে তাঁর স্ত্রী হতে চায়। সুতরাং 'স্যাডো এন্ড সাবস্টেন্স' আর চিত্ররূপ দেওয়া হোল না—চার্লি ম'সিয়ে ভাদু' নিয়ে সেতে উঠলেন। এই সময় বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার 'বাবল্ট' ব্রেক্স্টের সঙ্গে চার্লি'র আলাপ হয়। মাঝে মধ্যে ছোট কবে ছাড়া, মূর্খ সবসময়েই চরিত্র এবং সবসময়েই প্রাণরসে ভরপুর—ব্রেক্স্টের এই চরিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ম'সিয়ে ভাদু'র স্ক্রিপ্ট পড়তে দিয়েছিলেন চার্লি ব্রেক্স্টকে—তিনি পরে চার্লিকে বলেছিলেন—'আপনি স্ক্রিপ্ট লেখেন চাইনিজদের মতো—মাঝে মাঝে অলঙ্কারে হালকাভাবে সজ্জা দেয়া হোত। এই সময় হালকা উগ্র রকমের মিস্টিক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সত্যি কথা বলতে

কি, টোয়েন্টিজেন্থ সিনিক হাজলিকেই চার্লি'র ভাল লাগতো।

১৯৫৪ সাল বা ওবই কাছাকাছি কোন সময়ে চার্লি'র বন্ধু জ্যাক টেলর টেলিফোনে জানালেন বিখ্যাত ওরেলস্ কবি ডাইলান টমাস চার্লি'র সঙ্গে আলাপ করতে চান। চার্লি বললেন, তাঁবাও এতে খুব আনন্দিত হবেন। একটু ইতস্তত করে জ্যাক জবাব দিলেন যে ডাইলান টমাস অপ্রমত্ত অবস্থায় থাকলে তাঁকে তিনি সঙ্গে করে চার্লি'র বাড়িতে নিয়ে আসবেন। ডাইলান টমাস (১৯১৪-১৯৫৩) এই সময়ে কবি হিসাবে ইংল্যান্ড সাহিত্যিক এবং সমালোচকমহলে বিবর্তি আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫২ সালে তাঁর কাব্যসংকলন প্রকাশিত হোল—মানডে টাইমসে সিরিল কনলান লিখলেন :

At his best he is unique, for he distills an exquisite mysterious moving quality which defies analysis as supreme lyrical poetry always has and—let no hope—always nill.

আর অবজ্ঞার্তার পত্রিকায় ফিলিপ টরেনসি মন্তব্য করেছিলেন :

Seeing the scope and intensity of the total work it need no longer be eccentric to claim that Thomas is the greatest living poet in the English language... His language is seldom colloquial, nearly always in the grandest of grand manners. Yet he is an adept at transforming an old and dead familiarity.

বাই হোক সম্মান্যবেলায় স্বর্গীয়দান শ্রুনে চার্লি তো গিরে দবজা খুলে দিলেন—ডাইলান টমাস কোনরকমে এসে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর দশা দেখে চার্লি ভাবলেন, এই যদি অপ্রমত্ত অবস্থা হয়, তাহলে মাতাল হলে তাঁর আচরণটা না জানি কি রকম হয়। এব দু-তিনদিন বাদে অবশ্য কবি এসে চার্লি'র ওখানে ডিনার খেলেন। সেদিন তাঁর অবস্থা ছিল বেশ স্বাভাবিক। স্ববাচিত একটি কবিতা পাঠ করেও শোনালেন—তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর এবং অনুবণনপূর্ণ। কবিতার ইমেজবানী চার্লি'র মনে নেই—কিন্তু সেলোবেস শব্দটি সুখ-কিরণের মত ছুটে এসে পড়েছিল তাঁর হৃদয়ে ভরা কান্যকুঞ্জ থেকে।

চার্লি আগেই বলেছেন মাঝে মাঝে মানসিক অস্থিরতা এই সময়টা তিনি বিরত হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কোন বিধা ছিল না যে, একটি ভাল কমেডী ছাঁচ তুলতে পারলে তাঁর সমস্ত মুস্কিলের আসান হয়ে যাবে। এই মনোভাবের সঙ্গে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে মসিয়ে জার্ন ছবিটি শেষ করে ফেললেন। ছবিটির তোলার কাজের জন্য দু' বছর সময় লেগেছিল। অবশ্য আসল শটটিং হয়েছিল বার সপ্তাহ—এটা একটা

বেকড' টাইম। দু' বছর বৈশিষ্ট্য ভাগ সময় লেগেছিল ছবির অন্যান্য দিক ঠিকমত বাগে আনতে।

ব্যক্তিগত নানা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চ্যাপলিন এতদিন ইউনাইটেড আর্টিস্টের ব্যবসা বিভাগে চলছে সেদিকে কোন নজর দিতে পারেন নি! এক সময় এ প্রতিষ্ঠান প্রচুর লাভ করেছে বটে কিন্তু নানা অসুস্থতার জন্য ক্রমশ কোম্পানীর লোকসান সুরু হয়। স্টকহোল্ডারস্ ক্রমশ কোম্পানীর কাছেই শেষার বিক্রী করে দিতে থাকে এবং এইভাবে চার্লি একদিন আবিষ্কার করলেন যে, তিনি এ কোম্পানীর অধিক স্বত্বাধিকারী হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর পার্টনার হিসাবে রয়েছেন ম্যারী পিকফোর্ড। এদিকে কোম্পানীর ধাব হয়ে পড়েছে ১,০০০,০০০ ডলার। ব্যাংকগুলো আর এ কোম্পানীকে ঋণ দিতে রাজী নয়। ম্যারী খুব শক্তিক হয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু চার্লি তখনও খুব বিরত বোধ করছিলেন না। তার কারণ আগেও এ ধরনের বিপাকের ভেতর কোম্পানীকে পড়তে হয়েছে এবং একটি সাক্ষেসফুল ছবি তুলতে পারলেই আবার অবস্থা ফিরে গেছে। তাছাড়া চার্লি ভরন মসিয়ে জার্ন তুলে ফেললেন এবং আশা করছিলেন যে এ ছবি প্রচণ্ড বক্স অফিস সাক্ষেস হবে। চার্লি'র প্রতিনিধি আর্থার কেলী মনে করছিলেন যে, এ ছবি থেকে ১২,০০০,০০০ ডলার আয় হবে। এ কথা সত্যি হলে কোম্পানীর সমস্ত ঋণ

শোধ করে দেবার পরও ১,০০০,০০০ ডলার লাভ হবার কথা।

হলিউডে একটি বিশেষ প্রদর্শনী করে ছবিটি চার্লি'র বন্ধুদের দেখানো হল। শো-এর শেষে টমাস মান লায়ন ফিউকটওয়ে হটায় এবং অন্যান্য অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের উপর সকলর সমর্থন এবং প্রশংসা-ধ্বনি করলেন।

প্রচুর আর্থবিশ্বাসের সঙ্গে চার্লি নিউ ইয়র্ক রওনা হলেন। কিন্তু সেখানে পৌছনো মাত্রই ডেইলি নিউজ পত্রিকাবা আক্রান্ত হলেন। পার্টিকাটিতে লেখা হয়েছিল :

চার্লি সহজে এসেছেন তাঁর নতুন ছবির উন্মোচন কববার জন্য। তাঁর বাদ সাহস হয় প্রেন কন্ফারেন্স আমাদের সপে মিলিত হবেন। কারণ সেখানে তাঁকে দু'একটি প্রশ্ন করে বিরত করতে চাই।'

ইউনাইটেড আর্টিস্টের প্রচার বিভাগের লোকেরা চিন্তা করতে লাগলেন যে, চ্যাপলিনের পক্ষে আমেরিকান প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু চার্লি এতে বিরক্ত বোধ করলেন—তার আগের দিন সকালেই তিনি বিদেশী প্রেসের সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছিলেন এবং তারা তাঁকে অস্ত্রের সঙ্গে সম্বর্ধনা এবং অভিনন্দন জানিয়েছিল। তাছাড়া সাক্ষাৎকারের সময় প্রেসের লোকেরা তাঁকে ক্রন্দ করে দেবে এ চিন্তাটাই তাঁর অসহ্য মনে হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

সৌন্দর্যের কোমলতা ও
সজীবতা রক্ষার জন্য
কোল্ড ক্রীম অভ
রোজেজ





শীতে মুখ, হাত ও পায়ের
বসন্তে ভাব দূর করে
আপনার রসকে নবম ও
মোলায়েম রাখতে হ'লে
স্নেহপদার্থ সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ
গন্ধযুক্ত কোল্ড ক্রীম অভ
রোজেজ ব্যবহার করুন।
মিত্য ব্যবহারে আপনাকে
আরও শ্রীমরী ক'রে তুলবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা: বোম্বাই
কানপুর

বঙ্গভ্রমর

বাস্তবজীবন-নির্ভর ছবির ভিত্তি

কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রতিক পাকিস্তানী আক্রমণ সম্পর্কে তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণের জন্যও সরকার অর্থ সাহায্য দিতে নাকি রাজী। ইতিপূর্বে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কেও তথ্যচিত্র নির্মাণের সরকারী আহ্বান এসেছিল। কিন্তু এমন কোন সার্থক ছবি নির্মিত হয় নি, যেটাকে একটি যথার্থ চলচ্চিত্র বলা যায়। 'হকিকত' সরকারী পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু ছবিটি যারা দেখেছেন তাঁরা পুরস্কারের যোগ্য ছবি বিবেচনা করেন না। ছবিটির বিরুদ্ধে বড় সমালোচনা—বিশ্বাস্যভাবে জীবন এখানে প্রতিফলিত নয়।

আজ সরকার যে ধরনের ছবি নির্মাণের কথা বলছেন সেরকম ছবি একমাত্র তাঁরাই তৈরি করতে পারেন, যারা জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। অত্যন্ত মূর্খিম্বে কয়েকজন ছাড়া এমন কোন পরিচালক নেই যিনি বাস্তব জীবনের ধারেকাছে থাকেন। এমন কোন প্রযোজক নেই যিনি বাস্তবজীবন-নির্ভর ছবি করার সাহস রাখেন। যখনই গতানুগতিকতার বাইরে কোন ছবি হয় তখন সমালোচকরাও বুদ্ধিতে পারেন না, ভাল কি খারাপ বলবেন। আমাদের এই দুর্বলতার কারণ ভারতীয় ছবি এখনো জীবনধর্মী নয়। এখনো খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের উপন্যাসের গান্ডির বাইরে যাবার মত অবস্থা নয়। এখনো হয় জমিদারের ঘরের ছেলে নয় উচ্চ মধ্যবিত্ত যুবক ছবির নায়ক। কাহিনী পটভূমি হয় বোম্বাই, কোলকাতা, নয় কোন বিখ্যাত স্থান। বিষয়-বস্তু প্রেম বা যৌন সম্পর্ক। কাহিনী অগ্রসর হবে ছকবাঁধা গতিতে নাট্য-শাস্ত্রের সকল রসকে একই জায়গায় উপস্থিত করে। এই পরিস্থিতিতে জীবন দেখার সুযোগ কোথায়। জীবনকে যারা চেনে না, জানে না, দেশ ও সমাজের পরিচয় রাখে না তারা কি করে সীমান্ত-সমস্যা, পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় সমস্যা বুঝবে? সুতরাং এমন লোকের হাতে পড়ে নায়কের দুর্গম সীমান্তে প্রেম করা, অথবা শাড়ি পরে দুর্গম

তুঘারাছন পর্বতে স্বামীর অন্বেষণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সেসব ছবি দেশে যদিও দেখান চলে বিদেশে দেখিয়ে কোন ধারণা সৃষ্টি করা চলে না। কারণ বিদেশের দর্শকদের চোখ ছবির কৃগ্রমতা ধরতে অনেক বেশি সতর্ক ও সক্ষম।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুদীর্ঘ কালের। শ্রদ্ধা গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন নয়, সিপাহী বিদ্রোহ থেকে পরগনায় পরগনায় কৃষক

বিদ্রোহের কত গৌরবময় গাথা আমাদের ইতিহাস ভরে রয়েছে। কিন্তু তার কয়টি কাহিনী আমাদের সচেতনতা ও চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে? সাহিত্যিকরা মোগল হারেমের বেগম-বাঈদের নিয়ে গাথা ঘামাচ্ছে কিন্তু কোন মূল্য সংগ্রামী নারীর কথা নিয়ে কি ভেবেছে? আজকের স্বাধীন ভারতে কত কত বড় কারখানা হয়েছে, বাঁধ ও বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে, ভারতের মজুর ও বিনোদন সাহী নিয়োগ করেছেন, কিন্তু সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে তার প্রতিফলন কোথায়? আমাদের বিরাট গ্রাম, গ্রামনির্ভর জনতা; সমুদ্র অভিযাত্রী জেলে, মাঝি, কল-খানার শ্রমিক, আজকের ছবির বিষয় ও নায়ক হয়ে ওঠে নি। সীমান্তকে নিয়ে সমস্যা, এত চক্রান্ত, সীমান্তের মানুষের সদা শঙ্কিত জীবন। তার কত কথা, কত কাহিনীই আমরা কাগজে পড়ি। চোরাকারবারের দৌরাণ্ডো মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতিতে



‘হকিকত’ ছবিতে সুশর্মা সেন।



গোপীকৃষ্ণ ফিল্মসের 'পান্ডবের বনবাস' ছবিতে সাবিত্রী।

মানুষ দিশেহারা। কিন্তু ক্রাইম ছবিতে এদের দেখা যায় না। বাস্তবজীবন-নির্ভর ছবি করার সাহস নেই, উৎসাহ নেই। সরকার ছবি নির্মাণের জন্য টাকা লগ্নী করেন, সেই টাকার যতটা গতানুগতিক প্রেমকাহিনীচিত্রের প্রযোজক পায় তার একাংশ বাস্তবজীবন ভিত্তিক ছবির প্রযোজক পায় কিনা সন্দেহ। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে সরকারকে আত্মরক্ষামূলক জবাব দিতে হয়। কেউ যদি এমন নাটক ও ছবি করেন যা শাসক দলের মনোমত নয়, তাহলে তার বিপদের সীমা থাকে না। তাহলে সভানিষ্ঠ প্রযোজক ও পরিচালকরা সাহস-ভরসা পাবেন কি করে? বাস্তব-ধর্মী ছবি নির্মাণের ভিত্তি প্রযোজনায় স্বাধীনতা।

সুতরাং আজ দেশের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ছবি করার অনুরোধ করতে হচ্ছে, অনুপ্রেরণা জাগছে না।—সুজন।

চিত্র-আলোচনা

মুখ্যো পরিবার

(এমকেজি: অজিত গাঙ্গুলী)

প্রচুর কৌতুক রসের মাধ্যমে একামবতী পরিবারের আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে 'মুখ্যো পরিবার' ছবিতে। কিভাবে একামবতী পরিবার ভাঙে, আবার কিভাবে পারিবারিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং পুনর্মিলন হতে পারে ছবিতে তারই একটি কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। শান্তি নিবাসের অধিবাসী অতীন, সতীন, যতীন তিন ভাই, বড় ও মেজো দুই বউ, রীণা আর রীতা দুই কন্যা আর এক পুত্র। বড় ভাই অতীন প্রধান রোজগারে—সেই দম্পতি তিনি সুযোগ পেলেই ব্যবহার করেন। বড় বোনের স্বভাব তার উল্টো—তিনি সকলের সম্মান রক্ষা করে চলে চান।

মেজো ভাই—এর রোজগার কিছুটা কম বলে সে কোন বিষয়ে উচ্চাচা করে না; কিন্তু মেজো বউ তালুরের খোঁচা দেওয়া কথা সহ্য করতে পারে না। পরিণতিতে অতীনের ইচ্ছানুসারে পরিবার ভাগ হয়ে গেল। যতীন অনেক চেষ্টা করেছিল এই ভাঙন রোধ করতে কিন্তু পারে নি। তাদের মেজো ভাই যতীন অসবর্ণ বিয়ে করার আগেই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, দূরে শিক্ষকতার কাজ করে। এই সম্পত্তি ভাগাভাগিতে অতীন তাকে বণ্ডিত করে।

এই ভাঙা সংসারে সতীনের সংসার চালানো দার হয়ে পড়লে যতীন নিজের ঘর ভাড়া দিয়ে সেই টাকার সতীনকে সাহায্য করে। ভাড়াটে পরিবারের একমাত্র পুত্র অবিবাহিত এবং হাকিম। এই কথা জানার পর অতীন উঠেপড়ে লাগে তার কন্যা রীণাকে এখানে পাশ্চাত্য করতে, এবং এতে পাত্রের পিতার সম্মতি আদায় করে। আর একদিকে মেজো বৌ পাত্রের মাকে রাজী করিয়ে তার কন্যা রীতার জন্য চেষ্টা করে। দুই পক্ষের একই পাত্রের জন্য হাস্যকর প্রতিযোগিতা যখন চরম সীমার পৌঁছেছে তখন যতীন ও বড় বৌ মিলে তার এক চমৎকার মীমাংসা করলো, যা তারা দুজন ছাড়া আর কেউ আঁচ করতে পারলো না। যতীন হাকিম পাত্রের সঙ্গে রীণার বিয়ের সব ব্যবস্থা করে অতীনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বর্ণ ও অর্থ সবই আদায় করে নিল। বিয়ের দিন অতীনের বিস্ময়ের সীমা নেই—একবারে বোকা বনে গেল। তারই অর্থে হাকিম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলো মেজো ভাই যতীনের মেয়ের; একই দিনে বিভিন্ন লসেন রীণা ও রীতার বিয়েও হয়ে গেল। এবার অতীনের যেমন ভুল ভাঙলো, মেজো বৌও নষ্ট হলো। যতীন ও বড় বোনের চেষ্টায় শান্তি নিবাসে শান্তি ফিরে এলো।

কাহিনী ও চিত্র নাট্যকার পঞ্চাচর্যের ফর্মুলা অনুসারে যেমন প্লট তেমন চরিত্রগুলি সাজিয়েছেন। বাঙালী পরিবারের পক্ষে ভাববেগ সম্পন্ন কাহিনী চরিত্রগুলির মধ্যে বড় ভাই দাম্পত্য, মেজো ভাই নিরীহ, মেজো ভাই উদাসীন, ছোট ভাই আমসে ও সরল। বউদের মধ্যে বড় বৌ কল্যাণময়ী, মেজো আত্ম-কেন্দ্রিক। মেয়েদুটি স্বার্থজানহীন, হাসি-গানে মেতে আছে। সুতরাং ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনীতে এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে সকল রস সিদ্ধি হয়েছে। পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীর এটি প্রথম ছবি। তিনি চিত্রনাট্যকে সর্বসে রসান্বিত করে দর্শকদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছেন। সর্বসে রসোপযোগী দিতে গিয়ে রীণা ও রীতাকে স্মারনতা অবস্থায় বাধনুয়ের দৃশ্যেও হাজির করেছেন। অবশ্য মধ্যবিত্ত বাঙালীর আটপোরে জীবনের প্রতিবন্ধকতার জন্য এখানে হিন্দী ছবির পাখি বিদেশী ছবির সাম্রাজ্যের বাদশা বেগমের বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রতিশ্রুতি ও পরিবেশ রচনা, বিশেষ করে



সত্যজিৎ রায়ের 'নারক' ছবিতে উত্তমকুমার ও শর্মিষ্ঠা ঠাকুর.

কাহিনীর পরিণতি যথার্থ বিশ্বাস্য হয়ে না উঠতে পারে, তবে হাস্যরসের যে পরিমিত অবতারণা করা হয়েছে তা দর্শকরা উপভোগ করেন।

বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলী, জীবন বসু, অনুপকুমার, শৈলেন মুখার্জী, প্রসাদ মুখার্জী ও সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভানু বল্লভাচার্য ও কমল মিত্র এবং সুলতা চৌধুরী, লীলা চক্রবর্তী, ছারাদেবী, অনুভা গুপ্তা, মলিনা দেবী, গীতা দে ও কাজল গুপ্ত যথার্থ রূপ দিয়েছেন।

ছবির চিত্রগ্রহণ (দীনেন গুপ্ত), সম্পাদনা ও সংগীতায়োজনের কাজ যথার্থ। মানবেন্দ্র মুখার্জী সুরারোপিত গানগুলি সুগীত।

রিস্তে নাতে

মাদ্রাজের কে, এস, গোপালকৃষ্ণ পরিচালিত হিন্দী ছবি 'রিস্তে নাতে'। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং।

কাহিনী সুন্দর হয়েছে অধিক ফসল ফলাও জগাগানের প্রেরণায়। শেষ হয়েছে আহত নায়িকার প্রায় পুনর্জীবনের মধ্যে দুটি হৃদয়ের মিলনে। এক উদার জমিদার (সত্য যুগের চরিত্র) অধিক ফসল ফলাবার জন্য পুরস্কারের টাকা নিজে গ্রহণ না করে সুন্দর নামে এক কৃষককে দিলেন। মাটির প্রতি তাঁর এত টান এবং পরিগ্রহের প্রতি এত মর্য়দাবোধ যে কৃষক সুন্দরের সাথে নিজের কন্যা কম্পনার

বিয়ে দিলেন। সুন্দরকে বিয়ে করে কম্পনা সুখী; তারা আদর্শ দম্পতি কেবল নয় সব-গুণেই অসাধারণ। নিজেদের সন্তান নেই এই একমাত্র দুঃখ। কম্পনার অকর্মণ্য ভাই রাজের কন্যা মীনাক্ষীকে তারা নিজ কন্যাজ্ঞানে মানুষ করে। মীনাক্ষীকে রক্ষা করতে গিয়ে কম্পনা ষাড়ের গুতোয় প্রাণ হারালো। এই শোক সুন্দর ভুলতে পারে নি। কিন্তু কম্পনার পিতা জমিদার ঠাকুরসিং একরকম-জোর করেই তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করালেন। পাশ্চাত্য কলেজের সাহেবের কন্যা সাবিত্রী। সাবিত্রী শহরের মেয়ে এবং শিক্ষিতা; তা সত্ত্বেও কৃষকের সঙ্গে তার ঘর করতে আপত্তি থাকলো না। বরং পৌরাণিক কাহিনীর সাবিত্রীর মতই পতিপ্রাণা হয়ে উঠলো। তবুও সুন্দর কম্পনাকে ভুলতে পারে না—সাবিত্রীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এতদসত্ত্বেও সাবিত্রী কিন্তু নিজেকে সুখী দেখাতে চেষ্টা করে। একদা রাজের শব্দরের ভাড়টিয়া গুন্ডার আক্রমণ থেকে সুন্দরকে বাঁচাতে গিয়ে সাবিত্রী আহত হয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে। ডাক্তার আশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরমহুঁত্রে দেখা গেল সাবিত্রী বেঁচে উঠেছে; মৃত্যু পূর্বে তার শরীরে রক্ত দেওয়া হজিল সে এক পাশে মীনাক্ষী আর এক পাশে সুন্দরকে নিয়ে যেসে কথা বলছে। এবার সে সুন্দরকে জয় করেছে।

বলা বাহুল্য ছবির সবকয়টি চরিত্রকেই বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ধরা যায় না, যতটা কম্পনায় অনুভব করা যায়। সত্যিই যদি এমন জমিদার, এমন কলেজের এবং তাদের এমন কন্যা

হতো এবং সমাজে শ্রেণীব্যক্তি না থাকতো তবে কেমন হতো তার একটি কাল্পনিক ছবি উপস্থিত করা হয়েছে, যাতে ভোলানাথ দর্শকরা আনন্দ পাবেন।

ছবিটির সুন্দর ফটোগ্রাফী ও সংগীত উপভোগ্য। অভিনয়ে আছেন নতুন, রাজ-কুমার, বমুনা, অমিতা, নাজিরহোসেন, খমল, কানাইয়ালাল, দেবন বর্মী, ডোভড, বেবী শাকিলা।

দি হাই রাইট সান

এলিট সিনেমার দুঃসংসাহবাপী 'জুলা' প্রদর্শিত হবার পর 'দি হাই রাইট সান' মুক্তি লাভ করবে। 'জুলা'তে দেখান হয়েছে আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপনে ব্রিটিশ সৈন্যদের বাহাদুরী ও বুদ্ধি। 'দি হাই রাইট সান'—এ দেখান হয়েছে সাইপ্রাসের মুক্তিযোদ্ধারা কত কাপুরুষ ও হৃদয়হীন আর ব্রিটিশ সৈন্যের কত সাহসী ও হৃদয়বান। ব্রুটেন এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলি থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কত ত্যাগ ও দুঃখবরণে তারা জংলী জাতিগুলিকে মানুষ করেছে, তাই জে আজ আফ্রিকা সভ্য মানুষের সভ্য স্থান পেয়েছে। সাইপ্রাসে যারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চায় তারা কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং বিবেকহীন, রাজনীতি সম্পর্কবিহীন এক নারীর উপর আক্রমণে যাদের বিবেকে বাধে না,

নাট্যকর্ম

মৌন মুখর

(পঞ্চমিহম)

ইত্যাদি ব্রিটিশ ছবি সম্প্রতি এরূপ প্রচারকের
কৃত্রিম গ্রহণ করেছে।

‘দী হাই রাইট সান’-এর নায়িকা মার্কিন
তরুণী সাইপ্রাসে বেড়াতে এসে ব্রিটিশ মেজরের
সাথে পরিচিত হয়েছিল। এক ডাক্তারের
বাড়িতে তরুণী আশ্রয় নিয়েছিল। সে বাড়িতে
বিস্ফলবীদের বৈঠক বসতো। ডাক্তার বিস্ফলবী-
দের জায়গা দিলেও মনে প্রাণে তাদের সমর্থন
করতো না। বিস্ফলবীরা বন্দুকের জোরে
মানবের সমর্থন আদায় করেছিল।
একদিন এই তরুণী অকস্মাৎ
বিস্ফলবীদের দেখে ফেলে। তারপর
থেকে ওর উপর বিস্ফলবীদের সন্দেহ এবং তারা
তরুণীর প্রাণ নাশের সিদ্ধান্ত করে। কিভাবে
তরুণী বিমানবন্দরে যাবার পথে বিস্ফলবীদের
ফাঁদ থেকে রক্ষা পায়, কি ভাবে মেজরের
বাড়িতে তুমুল যুদ্ধে বিস্ফলবীরা পিছু হটতে
যাযা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিমান বন্দরের
আক্রমণ বার্থ করে মেজর তরুণীর সাথে মিলিত
হয় ইত্যাদি ঘটনা ছবিতে দেখান হয়েছে।

বলা বাহুল্য একমাত্র প্রণয় কৃতিত্ব ছাড়া
ব্রিটিশ ফোঁজের কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে
না। বিস্ফলবীদের দেখান হয়েছে টেরিস্ট
হিসাবে।

এরূপ বিভ্রান্তিকর এবং সাম্রাজ্যবাদী
স্বার্থে প্রচারমূলক ছবিগুলি এদেশে কেন
দেখাতে দেওয়া হয় আমরা বুঝি না।



লেনিন-জেনারেল জীবনী অবলম্বনে নির্মিত হাব ‘মাদার’ হাট’ পরিচালনা করছেন
বিখ্যাত পরিচালক মার্ক ডনস্কয়।

পরামর্শে এই দৃশ্য ঘটাবার জন্য সহপাঠী
ডাক্তার কল্যাণের সাহায্য গ্রহণ করলো।
কল্যাণ তার সার্জন, কম্পাউন্ডার, আর্দালী
এবং করাত হাতুড়ী পেরেক নিয়ে উপস্থিত।
যথাসময়ে অপারেশন হয়ে গেল এবং স্ত্রী
মিনতির মুখে কথার ফোয়ারা ছুটলো। অনর্গল
সে কথা বলে চলেছে। জন্ম-জন্মান্তরের
কথা বেন একসঙ্গে তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে।
অতীন এতদিন নির্বিশেষ কাজ করতে
পেরেছে। এখন মৌন মিনতি এত মুখর হয়ে
উঠেছে যে তার কাজ করা দায়। মামলার
নিষ্পত্তি সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এই
মুখরতার হাত থেকে সে নিস্তার চায়। আবার
ডাক্তারকে ডাকা হলো। ডাক্তার এবার ব্যবস্থা
দিলেন—মুখের স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচার এক-
মাত্র উপায় নিজের কালা হয়ে যাওয়া। এই
ব্যবস্থানুযায়ী অতীন বান্ধ কালা হয়ে গেল।

মৌনতা যেমন দুঃখের অতি মুখরতাও
তেমন বিরক্তিকর। এইরূপ পরিস্থিতিতে
কেন্দ্র করে এই প্রহসন নাটকটি দর্শকদের
মুখে হাসির উজ্জ্বল ফুটিয়ে তোলে।
কৌতুক রসসৃষ্টির পথে বাংলা দেশের শিশুদের
ছড়াগুলিকে এখানে কাজে লাগান হয়েছে।
এই ছড়াগুলির তালে তালে, সুরে ও ছন্দে
প্রেক্ষাগৃহে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। প্রথম
অঙ্কে কিছুটা মন্থরগতির মনে হয়, কিন্তু
দ্বিতীয়াংশে নাটক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়
এবং সংলাপ ও ছড়ায় দর্শকদের মাতিয়ে
রাখে। আবহসঙ্গীত এবং আলোকের কাজ
সন্তোষজনক; দৃশ্যসজ্জায় আরো আভিজাত্য
প্রকাশ পাওয়া উচিত। নাটকটি পরিচালনা
করেছেন শ্যামল রায়।

‘মৌন-মুখর’-এর সার্থক অভিনেতাদের
মধ্যে রয়েছেন যথাক্রমে অসীম সেন (রমণী),
দীপক সেনগুপ্ত (অতীন), শমিতা বিশ্বাস
(মিনতি), শ্যামল রায় (সমর), কৃষ্ণদাস ঘোষ
(বইওয়াল), পুলকময় ঘোষ (ডাক্তার), নিতাই
দাস (কম্পাউন্ডার), হৃষীকেশ মাইতি
(আর্দালী), শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সার্জন),
মাণিক রায় (করিম) এবং বিজয় দাস
(দোরোয়ান)।

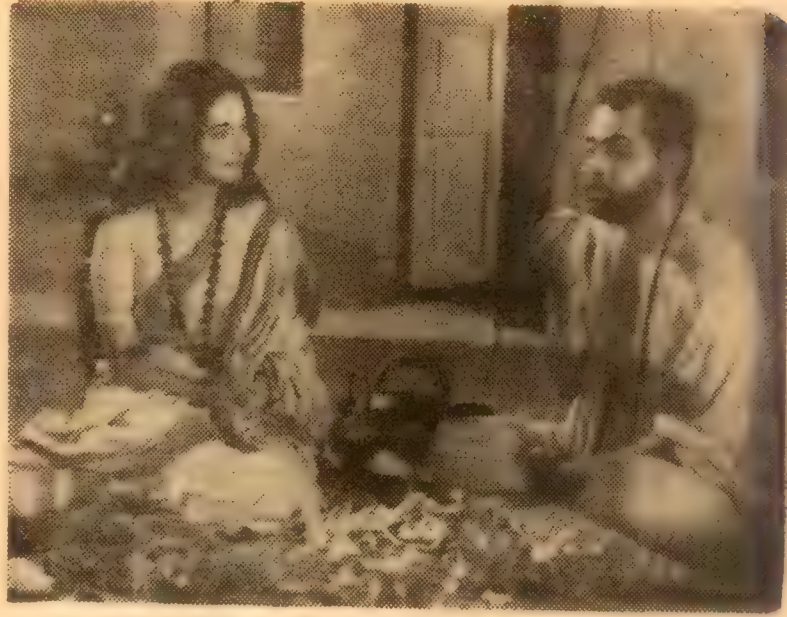
অনুশীলন সম্প্রদায়

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা ‘অনুশীলন সম্প্রদায়’
আগামী ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৫ হতে প্রতি
বৃহবার সন্ধ্যা সাতটায় ‘থিয়েটার সেন্টার’
মঞ্চে বেরটল্ট ব্রেক্‌স্ট অলম্বনে সৌমিত্র
চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিধি ও ব্যতিক্রম’ এবং
রমেন লাহিড়ীর ‘পান্থশালা’ নিয়মিত
অভিনয়ের আয়োজন করছেন।

নাট্যকার পরিষদ-এর নাট্যোৎসব

নাট্যকারদের নিজস্ব সংস্থা নাট্যকার
পরিষদ ডিসেম্বর মাসের প্রতি রবিবার সকালে

মুজোমল মতে চারদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানসূচীতে আছে এই ডিসেম্বর অমিতা রায়-এর 'নাম না-জানা তারা', ১২ই ডিসেম্বর অশোক সরকারের 'কাকে ধরে কাকে ছাড়ি', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জীবনান্ত', রমেশ লাহিড়ীর 'সুমনসার তীরে', ১৯শে ডিসেম্বর বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'পাকে চক্রে', মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'চেউ-এর পর চেউ', কিরণ মৈত্রের 'অমোঘ' এবং ২৬শে ডিসেম্বর 'সুনীল দত্তের 'দোলা'। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন কিরণ মৈত্র, উমানাথ ভট্টাচার্য, সুশীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, অশোক সরকার, প্রণব শ্রু, রবীন মুখার্জী, অম্বুজ সেন, শমিতা বিশ্বাস, অঞ্জলি লাহিড়ী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি পরিচালনা করবেন বিদ্যুৎ গোস্বামী। অনুষ্ঠান প্রত্যহ রকাল দশটার শুরু হবে।



হিরণ্ময় সেন পরিচালিত 'খাওয়া ঠাকুর' ছবিতে শমিতা বিশ্বাস ও শ্বপনকুমার।

সংবাদ প্রত্যা

চারটি সোভিয়েট ছবি

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীমাস উপলক্ষে ইন্ডো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি ও ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির যুগ্ম উদ্যোগে চারটি সোভিয়েট ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ২২শে নভেম্বর একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম-বঙ্গের অর্থমন্ত্রী ত্রীশৈলকুমার মুখার্জী উদ্বোধন করবেন। ২২শে, ২৩শে এবং ২৭শে ও ২৮শে সন্ধ্যায় যথাক্রমে থাউ' টাইম

(৫, কারেলভ), লালাবাই (এম, মালিক), মাইলস অব ফারার (এস, সামসোনভ) এবং 'নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার' (মাইকেল ব্রস) ছবিগুলি দেখান হবে।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগে গত ১৬ই নভেম্বর সুরসাগর হিমাংশু দত্তর মৃত্যুবার্ষিকী এক অনাড়ম্বর ভাব-গম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে

আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে রবীন চৌধুরী পরিচালনায় স্বর্গত সুরকারের কয়েকটি গুরু পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সব কাঁটা গানই সুগীত। বিশেষ করে "আজ আমারি কথা", "খিল চাঁদ মেঘের পারে", "নিশীথে চলে হিমেল বার", "রাতের ময়ূর" ও "খদি ভুলে যাবে মোরে" গানগুলি উপস্থিত শ্রোতা-মণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। সঙ্গীতে অংশ নেন মিতা চক্রবর্তী, শমিতা চট্টোপাধ্যায়, গোতম বসু, পুরবী চট্টোপাধ্যায়, রুম ঘোষ, গৌরী দাশগুপ্ত ও রবিতীর্থের শিল্পবৃন্দ।



চিত্ত বসু পরিচালিত 'গৃহসম্মানে' চিত্রে বিকাশ রায় ও শ্যাম লাহ।

সুটি ও শব্দ

শব্দ, একটি বছর

শব্দ, একটি বছর' ছবির ইউনিট সমল-বলে উৎসর্গ করে গেছেন বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। এই সভার শিল্পীদের মধ্যে উত্তমকুমার ও সপ্রিয়া চৌধুরী আছেন।

গৃহ সম্মানে

গৃহসম্মা এবং পারস্পরিক ভুল বোঝা-বাক্যকে নিয়ে চিত্ত বসু পরিচালিত 'গৃহ সম্মানে' ছবির কাজ মৃত অগ্রসর হচ্ছে। গৃহের সন্ধান করতে গিয়ে গৃহিণী লাভ আর গৃহত্যাগ করে গৃহিণীর কাছে ফিরে আসার কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে।



চারণ-মন্ত্রিত ও শিল্পী

মানব মনে সংগীতের প্রভাব অত্যন্ত দৃষ্টীয় ও প্রত্যক্ষ-ফলপ্রসূ। সংগীতের যে চিন্তা মূর্ছনায় মনুষ্য লাভ করে অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি—সেই সংগীতই আবার পরিবেশনের ভিত্তিতে মানবকে করে তোলে ঐক্য-কঠিন-লৌহ-মানব। তখন মানবের শিব ধরে রত্নের মূর্তি। সংগীতের এমনই অসীম শক্তি। তাই দেশের যখন ঘোর দুর্দিন,—আশা নাই, ভরসা নাই; চারিদিক নিরাশার তমিপ্রায় আচ্ছন্ন, তখন দেশনেতাদের মতই, দেশের চারণ-দল শোনার—জাগরণী সংগীত,—হুম ভাঙার গান। আমাদের দেশেই আমরা শুনোছি—এই রকম কতশত চারণ-কবির কাব্যকণ্ঠ—রাজপুতনার গ্রামে গ্রামে, মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে। আমাদের বাংলাদেশেও ছিল ভাট গীতি,—অনেকটা এই চারণদলের অনুরূপে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জাতীয় সংগীত-শিল্পীদের দান অসামান্য। বাংলা দেশে কবি মিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম রাজপুতনার চারণ কবিদের অনুরূপে সার্থক চারণ-সংগীত রচনা করেন। এই কারণেই জাতিসংগের বিপ্লবীগণ মিজেন্দ্রলালের “রংগ আমার জননী আমার” প্রভৃতি গানগুলি মুখে নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছেন। এই গান-মল্লোয় যেমন ছিল স্বদেশ-প্রেমের সুললিত ভাষা ও দীপ্তি, তেমনই ছিল সূর-সংযোজনায় অপূর্ব উদ্ভাস ও বলিষ্ঠতা।

চারণসংগীত রচয়িতার একাধারে সুরকার, গীতিকার ও স্বয়ং গায়ক হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকার সমাবেশ হলে তবেই হবে সার্থক সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ, মিজেন্দ্রলাল, জলপ্রসাদ, কালকবি, নজরুল প্রভৃতি

কবিগণ সকলেই এই সকল গুণের সাধক অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁদের গান এখনো আমাদের যমুনীতে উদ্ভাসনা জাগায়।

তবে এঁদের মধ্যে মিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের মধ্যে ওজঃশক্তি ও সূরের বলিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভীপক গান বা চারণ-সংগীত পরিবেশনের জন্য প্রয়োজন হয় না কণ্ঠের সুকৃতিতম কারুকার্য বা মিহি স্বর। এর জন্য প্রয়োজন শুধু বিশেষ বিশেষ কণ্ঠের উপর উদাত্তকণ্ঠে বিশেষ জোর প্রয়োগ করার। এ গানে গায়কের কণ্ঠের মিষ্টতা অপরিহার্য নয়। কবি নজরুল যখন তাঁর স্ব-রচিত উদ্ভীপক গান নিজ সুরে গাইতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতা-মণ্ডলী উদ্বেল হয়ে উঠতো। অথচ নজরুলের কণ্ঠ সূক্ষ্ম ছিল না—কিছুটা ধরা গলা বলা যেতে পারে। কিন্তু অপূর্ব পরিবেশনের জন্য কোন বাধাই একে রসোতীর্ণ হতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি।

সত্যিকারের চারণ-কবি বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে মকুন্দদাসকেই বোঝায়। ইনি তাঁর স্বদেশী যাত্রা ও স্বদেশী গানের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী। যদিও প্রথম প্রথম তিনি বরিশালের সর্বজনপ্রিয় নেতা মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার দত্ত ও হেম কবির লেখা গান করতেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কালকবির কিছু গানও তিনি করতেন। কিন্তু পরে তিনি নিজেই গান লিখতেন ও নিজ সুর সহযোগে কন্ঠকণ্ঠে তা পরিবেশন করতেন। তাঁর বীর ভঙ্গিমায় সূরগঠিত দেহে, ততোধিক বলিষ্ঠ কণ্ঠের সংগীত পরিবেশন শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করতো। তাঁর গানের প্রতিভা তখনই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যেত। তিনি বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য মেয়েদের বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি পরতে বারণ করে যখন যে আসরে গান করেছেন, গান শেষে সেইসব আসরে দেখা যেত মেয়েরা তাদের কাঁচের চুড়ি ভেঙে রেখে গেছে। ভাঙা কাঁচের চুড়ির পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যেত সেখানে। এমনই তাঁর ছিল তাঁর গানের প্রভাব।

আজও প্রয়োজন এমন উদ্ভীপক সংগীত। এখনও আমাদের দেশে বহু ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের চারণ-সংগীত সম্বন্ধে সত্যিকারের কোনই ধারণা নেই। তাঁরা মনে করেন যে, দেশ জাগাবার উপযুক্ত উপায় হলো, আধুনিক ছায়াচিত্রের গানে অভ্যস্ত দুর্বল মিহি-কণ্ঠের জনপ্রিয় শিল্পীদের দ্বারা পাকের পাকের মাইক সহযোগে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা। এর

দ্বারা দেশ জাগে না। দেশকে জাগিয়ে তুলতে, দেশের বীর্ষকে প্রকাশ করতে যে কণ্ঠ ও যে বলিষ্ঠতা থাকা দরকার, তা এসব শিল্পীদের নেই। তাছাড়া ওটা সঠিক পথও নয়। দরকার নজরুল-মকুন্দদাসের মত কণ্ঠের বলিষ্ঠতা, মনের বলিষ্ঠতা, ভাষার ওজঃশক্তি এবং সূরের মধ্যে বীর্ষের প্রকাশ। সর্বোপরি দরকার উপযুক্ত পরিবেশন ও সার্থক শিল্পী নির্বাচন। যদি উপরি উক্ত গুণাবলীর সমাবেশ কোন শিল্পীর মধ্যে ঘটে তবে, তিনিই সত্যিকারের চারণ-শিল্পী। এ বিষয়ে কলকাতার আকাশবাণী ও রেকর্ডিং কোম্পানীর ব্যর্থই হয়েছে বলবো। কারণ তাদের পরিবেশিত সংগীতের দ্বারা কোন চেতনাই সৃষ্টি হয় নি। আকাশবাণী বা রেকর্ডিং কোং স্বদেশী বা উদ্ভীপক গানে লঘু-সংগীতের চর্চা করেই চলেছে। আমি



আমরা ধরনার তরুণী শিল্পী শ্রীমতী সূমিত্রা চট্টোপাধ্যায়। এবার সবারপে সংগীত সম্মেলনে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। ইনি প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী অর্ণবা চক্রবর্তী-ছাতী।

সেই অনাগত চারণ-কবিকে স্বাগত জানাই—যিনি দেশের এই চরম দুর্দিনে সেবেন বীর্ষ, শক্তি ও সূর্যমুখী পথ-নির্দেশ।

—শ্রীমতেশ্বর মল্লোপাধ্যায়

রাশিয়ান নাটক: রাশিয়ান সাহিত্য এবং

সোশ্যাল হিস্ট্রীতে একেবারে শীর্ষপথে যাদের নাম লিও নিকোলায়ভিচ টলস্টয় তাদের অনাতম (১৮২৮-১৯১০)। তাঁর সমগ্র রচনার অতি সামান্য অংশই থিয়েটারের জন্য লেখা। আর একথাও সত্য টলস্টয়ের প্রতিভার পূর্ণ প্রস্ফুটন হয়েছে উপন্যাসে—কারণ তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং বিস্তৃতির জন্য যে আয়তনের দরকার তা উপন্যাসেই সম্ভব, নাটকে নয়। স্টেজের জন্য লেখার ভেতর যে গভীর বাহ্য-বিপত্তি মেনে চলতে হয়, তা বেন টলস্টয়কে মাঝে মাঝে অধীর করে তুলেছে — তাঁর নাটকের দৃশ্যগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই অনেক সময়ে তাঁর নাটকের স্ট্রাকচারে একটা শিথিলতা এবং ঠাসবন্দানির-অভাব দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও টলস্টয়ের চরিত্রের তেজস্বিতা এবং জীবনশক্তি এবং অকৃত্রিমতা সুন্দরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট নাট্যচরিত্রগুলিতে। এর ফলে এসব চরিত্রের ভেতর একটা গভীরতার আভাস পাওয়া যায় এবং দৃশ্যগুলি হয়ে ওঠে ভয়াবহ চমৎকারিণী ভরা।

হারলে গ্র্যান্ডিল বার্ক'র বলেছেন, ১৮৮৬ খালে লেখা 'দ্য প্যাওয়ার অফ ডার্কনেস' এই একটিমাত্র নাটকের রচয়িতা হিসাবেই টলস্টয় আধুনিক নাট্যকারদের ভেতর উচ্চ আসনের অধিকারী।

এর আগে ১৮৬৩ সালে টলস্টয় 'দ্য নিহিলিস্ট' নাম দিয়ে একটি নাট্য-নক্সা রচনা করেছিলেন। এটি একটি পারিবারিক উৎসবে প্রমোদনদ্রষ্টাদের জন্য লেখা হয়েছিল। এই সময়েই টলস্টয় একটি পূর্ণাঙ্গ কমেডীও রচনা করেন—এটির নাম 'দ্য কণ্ট্রামিনেটেড ফ্যামিলি'। এ নাটকটি মস্কোর ইম্পিরিয়াল

বঙ্কিমেন্দ্র ওদেশে এবং ব্রদেশে

থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই নাটকটি সম্বন্ধে বার্ক'র মন্তব্য করেছেন:

'The contaminated family has some interest to the student of Tolstoy. - It is farce rather than comedy, slapdash to a degree, and crude in its stage-craft; but a farce of character, not of mechanical trick, and abounding in vitality, abounding too in humanity and good sense.

এর পর কুড়ি বছর আর তিনি নাটকে হাত দেন নি। পরে জীবনের শেষ কুড়ি বছরের কর্মজীবনে তিনি আবার মাঝে মাঝে নাট্যরচনার মনোযোগ দেন—অবশ্য সমস্ত অন্তর দিয়ে নাট্যসাহিত্যের সাধনা তিনি কখনই করেন নি।

ইংলণ্ডে কিন্তু টলস্টয়কে নাট্যকার হিসাবে খুব একটা উচ্চস্থান দেওয়া হয় নি কখনও। ছাপার অক্ষরের সমালোচনার হয়তো তাঁর নাটকের অনেক স্তুতিগান করা হয়েছে—কিন্তু মগ্ধে তাঁর নাটকের অভিনয় বিশেষ একটা হয় নি। অথচ কণ্ট্রামিনেটেড টলস্টয়কে বড় নাট্যকার বলে ধরা হয় এবং ওখানকার সব স্টেজে তাঁর লেখা নাটকের অভিনয় হয়। টলস্টয়ের প্রথম

নাটকের প্রকাশের তেরিশ বছর পরে এবং তাঁর মৃত্যুর ন' বছর বাবে লন্ডন থিয়েটারে টলস্টয়ের নাটক প্রথম লন্ডন স্টেজে মঞ্চস্থ হয়। অবশ্য 'রেসারেকসন্' এবং 'আনা ক্যারেনিনা' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছিল—কিন্তু এসব নাট্যরূপ টলস্টয় করে দেন নি। এই নাট্যরূপ বিক্রে তাঁর কোন অনুমোদনও ছিল না।

টলস্টয়ের নাটক সম্বন্ধে নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা শুনেই আমি প্রথমে এসব নাটক পড়তে উৎসাহিত হই। শিশির-বাবু বলতেন স্টেজে রিয়ারলিজমের আবির্ভাবের জন্য, শ্রী-ডবার্গ, ইবসেন, জোলের সঙ্গে সঙ্গে টলস্টয়ের অবদানও কম নয় — ইবসেনের 'গোল্‌স্ট' বা শ্রী-ডবার্গের 'মিস্ জুলিয়ার' থেকে বান্ডবধর্মী নাটক হিসাবে টলস্টয়ের 'দ্য প্যাওয়ার অফ ডার্কনেস' কোন অংশে কম নয়। এ নাটকটি রাশিয়াতে মঞ্চস্থ হবার আগেই প্যারিসে প্রিভিউসড্ হয়। এ নাটকটি যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য প্রচণ্ড উৎসাহ সহ-কারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন স্বেঃ এমিল জোলা। রিহার্সালের সময় জোলা বলতেন—“নাটকের একটি শব্দ বাদ দেবে না—এ নাটকের সাক্ষ্য সম্বন্ধে কারোর কোনেও চিন্তাই করতে হবে না।” নাটকটি অল্প সময়ের



ইয়েভগেনি ওনোশিন (১৯২২)—রাশিয়ান অপেরার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।



স্ট্যানিসল্‌ভস্ক প্রযোজিত পি চারকোভস্কির বিখ্যাত অপেরা
ইয়েভগেনি এনোখিন।

ভেতর গাভ জনপ্রিয় হয়েছিল যে, শ্যারিসে একসঙ্গে তিনটি নাট্যলয়ে এ নাটকের অভিনয় চলতে থাকে।

‘দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস’ নাটকটি লন্ডনে জর্জ বার্নার্ড শ টেলস্টারকে চিঠিতে লিখেছিলেন :

“I remember nothing in the whole range of drama that fascinated me more than the old soldier in your Power-of Darkness. To me the scene where the two

drunkards are wallowing in the straw, and the older rascal lifts the younger one above his cowardice and his selfishness, has an intensity of effect that no merely romantic scene could possibly attain.”

জ্যোন্সারডাইন্স নিকলের মতানুসারে ‘দি ফার্স্ট ডিস্টিলার’ নাট্য-নক্সাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে এবং ‘দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস’ ১৮৮৯-তে। প্রথমটি নীতিমূলক রচনা। কৃষকদের ভেতর অতিরিক্ত মন্যমানের কৃষকের দিকটাকে নজর আকর্ষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি কম্বল রসায়ক বাস্তবধর্মী নাটক। এ নাটকের পরিবেশের মধ্যে জার্মান নাটকের হাউস্ট-ম্যানের বিবর্তের সানরাইজ’ নাটকের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। দুটি নাটকেরই কাহিনী রোমাঞ্চকর এবং ভয়াবহভাবে পরিকল্পিত—কিন্তু টেলস্টারের নাটকটির সমাপ্তিতে যেমন কৃষ্টিয়ান উদ্ভাপ অনুভব করা যায়, হাউস্ট-ম্যানের নাটকে সে ভাবগম্য দেখা যায় অজ্ঞাবাদ-মূলক (এ্যাগনিস্টিক) হতভাগ্য।

‘দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস’ নাটকটি আজ অবধি যত কৃষকনাট্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে সেরা। বাস্তবজীবন থেকে এর বিষয়বস্তু আহরণ করা হয়েছে। টুলা নামে জার্মানিতে একটি ক্রিমিনালকেসের শুনানী হয়—তারই ওপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত। প্রথমে প্যারিসে এবং তারপরে বার্লিনে এই নাটকের প্রদর্শনী হয়। গ্রাম্যজীবনের নিবন্ধিতা মানুষকে কত নিম্নস্তরে নামিয়ে আনতে পারে তারই জীবন্ত আলোচ্য এই নাটকটি।

এ নাটকের প্রধান চরিত্র নিকিটা একজন কৃষক। প্রভুপত্নীর সঙ্গে সে প্রেম, করতে শুরু করে। নিকিটার মা ছিল অত্যন্ত লোভী এবং খারাপ চরিত্রের স্বীলোক। সে নিকিটার প্রেমিকা প্রভুপত্নীকে প্ররোচনা দিল তার স্বামীকে মেরে ফেলতে। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রভুপত্নী তার স্বাক্ষর প্রেমিক নিকিটাকে বিয়ে করল। কিন্তু নিকিটা এখন শুরু করল প্রভু-পত্নীর সংমেরকে প্রলুব্ধ করতে। এরপর মেয়েটির হল সন্তান সম্ভাবনা। আবার নাটকে নিকিটার মাকে দেখা গেল। সে বললে, এই জারজ সন্তানটিকে মেরে ফেলে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। তার সঙ্গে ষোণ দিলে নিকিটার বর্তমান স্ত্রী অর্থাৎ আগে যে ছিল প্রভুপত্নী। সে মনে করলে স্বামীকে বধ করে তার আত্মা ষেভাবে দূষিত হয়েছে, ঠিক একই অপরাধে নিকিটাকে অপরাধী করতে পারলে, তাদের দুজনের ভেতর আর কোনও প্রভেদ থাকবে না। শেষ পর্যন্ত নিকিটা শিশুটিকে মেরে ফেলে সেলারের ভেতর তাকে কবর দিয়ে রাখল। এর পরেই শুরু হল নিকিটার বিবেকদংশন। মনের ভার লাঘব করবার জন্য সে তার নতুন প্রেমিকার বিবাহ সভায় সমবেদ অতিথিদের সামনে নিজের শিশুহত্যার কাহিনী ঘোষণা করল।

“In Tolstoi’s hands accordingly the stark depiction of life’s brutalities serves a purpose different from that which it had in the hands of others. The entire drama is shot through with a moral, or religious, concept of a kind which but rarely is apparent even in vaguest from among the works of the realists.”

[Allardyce Nicoll]].

‘দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস’ নাটকটি অংশত রাশিয়ান গ্রাম্যজীবনের আলোচ্য এক অংশত অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক।

এমিল জোলা মন্তব্য করেছিলেন ন্যাচারে-লিস্টিক জ্ঞানায় বিষয়বস্তু প্রত্যাজীবন থেকে আহরিত হওয়া উচিত—অর্থাৎ জীবনে সত্য সত্য বা ঘটছে তাই প্রতিফলিত হওয়া উচিত বাস্তবধর্মী নাটকে। কিন্তু নিজে লেখবার সময় পূর্বলিখিত উপন্যাসেরই তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। টেলস্টার নিজেকে ন্যাচারে-লিস্ট মনে করতেন না—কিন্তু জোলা মতবাদ তাঁরই নাটকে প্রতিভাত হয়েছে। কারণ টেলস্টার তাঁর নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন সত্যিকার একটি স্টেট কেসের থেকে। প্রথমটায় তিনি ভেবেছিলেন এই কাহিনীর ওপর নির্ভর করে তিনি একটি উপন্যাস রচনা করবেন—

but the wish to hear his characters speak was too much for him.

অ-অ-ক-থ

শ্রীউপেন্দ্রক মল্লিক এনিত
মূল্য বসু আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও যুক্তাকর ধ্যান শিখা যেরূপ অতুলনীয় ছন্দের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারও সহজ হইয়াছে। এ গ্রন্থকে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুথিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঞ্জন আ ট
পেপারে বড় হরকে ছাপা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত—এ নাটকের বিষয়ের সঙ্গে জোলের থেরেস 'ব্লাকুইনের' অনেক সাদৃশ্য আছে।

নিকিটা তাদের পরিবারের ব্যাকসিপ—কিন্তু সে স্থিরমস্তকবিশিষ্ট জাত শয়তান-প্রণীর ভিলেন নয়। তার চরিত্রের মূল এবং ভয়াবহ দিকটার সঙ্গে মিশে আছে রাশিয়ান চরিত্রের ভাবাবেগ প্রবণতা এবং ইমোশন।

নিকিটার বাপমার ভেতর পরস্পর-বিরোধী দু'টি বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন টলস্টয়। নিকিটার মা হচ্ছেন অত্যন্ত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এবং খল স্বভাবের। তার বাবা হচ্ছে সত্যিকার পবিত্র চরিত্রের লোক।

অন্যান্য চরিত্রগুলোও খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন টলস্টয় দি পাওয়ার অত ডার্কনেসে। নিকিটার প্রভুপত্নী এনিশা—অর্থাৎ যাকে নিকিটা পরে বিয়ে করলো, অত্যন্ত লোভী এবং হৃদয়হীন। বিয়ের পরেই নিকিটা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো তার সংময়ের সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু এই শাস্তি পাবার পরও এনিশার চরিত্রে কোন পরিবর্তন এল না। নাটকের শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।

আকুলিনা, অর্থাৎ সংময়েরটি অত্যন্ত কদাকার এবং একটু ওভারগোন চাইল্ড ধরনের। প্রথমটার সে ছিল সংময়ের হাতের পুতুল, শেষে বাপের মৃত্যুর পর নিকিটার সাহায্যে এই সংমাকেই সে অশ্রুতভাবে জন্ম করে দেয়।

অন্যান্য পুরুষ এবং নারী কৃষক-চরিত্র-গুলোও অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং সহজেই দৃষ্ট আকর্ষণ করে।

সমালোচক মার্টিন ল্যাম মন্তব্য করেছেন:

"Though Tolstoy did not attach as much importance to realistic environment as his successors, Chekov & Gorki, there is a genuine flavour of the mujik's hovel in this play. The very tone of the dialogue goes a long way to give an impression of the setting. In contrast to Zola, Tolstoy does not write a single line of thetoric and very few which are faultless in logic or construction. Most of the dialogue is in peasant dialect which can only be faintly conveyed in translation, but even so the absence of elegant phrases is apparent. Everything, even scenes of horror, seems to happen and be discussed as if it



ইয়েভগেনি ওনেগিন পেরার আর একটি দৃশ্য

were quite natural, with the result that the audience is doubly moved.

mendous scale, but Tolstoy never gives the impression of having to achieve it."

[Martin Lamm]

(ক্রমশঃ)

নিকিটার অপরাধ স্বীকারের ব্যাপারটা বেশ দুর্বোধ্যই মনে হয়। সে তো ঠিক দুর্বলচিত্ত ধরনের নয় যে পাপ করার পরই অনুশোচনার অস্থির হয়ে উঠবে। আসলে এই স্বীকারোক্তির পেছনে রয়েছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক কয়েকটি ঘটনা। এনিশাকে বিয়ে করবার পর সে বৃকতে পারে যে তার প্রতি ভেতর থেকে সে কোন আকর্ষণ অনুভব করছে না। বরং ক্রমশ স্ত্রীর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব মনে আসতে থাকে। তার বাল্য-প্রেমিকা মারিনার সঙ্গে আবার দেখা হয় নিকিটার। মারিনার স্বামী একটি মদ্যপ কৃষক। মনটা হতাশার ভরে যায়, নিজের জীবনটা যদি এভাবে নষ্ট না করে ফেলতো তা হলে এই সুযোগে সে হয়তো নতুনভাবে জীবনের পথ বেছে নিতে পারতো আবার—ভাবে নিকিটা।

নিজের বিগত অপরাধগুলির কথা বারবার তার মনে হয়—এসব অপরাধ করে তার সত্যিকার কি স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে! সাধুপ্রকৃতি বাপের কথায় প্রভাবিত হয়ে এইবার সে তার বিভ্রান্তরা জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়—চায় অপরাধের শাস্তি এবং বেছে নেয় জেলে যাবার পথ।

"The Power of Darkness has the sure balance of classical drama, and its creative calm. Our world, with all its rottenness and crime, is presented with a sober and confident realism. The whole conception is treated on a tre-

সম্বীত-সুধাকর

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিল্লী

বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের ইতিহাস—সম্বীত-সাধন—বিষ্ণুপুরের বাদকগণ—অভিনয়—কাব্য-সাধনা—কথক-পরিচয়—বঙ্গী সঙ্গদায়—ভূস্বামী ও শিল্পীগণের জীবন-সাধনার সহিত—ভারত বিখ্যাত গায়কগণের লোক-প্রসিদ্ধ সম্বীত-সমূহের স্বরলিপির অপূর্ণ সংকলন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কীৰ্ত্তি-সম্পদ চিত্রে প্রদর্শিত।

মূল্য—১০।

কল্যাণ দেপিয়ে

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

মূল্য এক টাকা।

ভুলেদের ভক্ত আর একাধি বসন্তোপকাস। পাঠ্য ভাবম্বল করিলে শেষ না করিয়া ছাড় যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সূচিত্রিত।

ছাপা ও বঁধাই মুদ্রকর।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১০

এই ছাপাবার জন্যে এই পত্র নয়, কিন্তু
লেখকের জন্যে। তাই নাম বাদ দিতে পারেন।
আপনাদের পত্রিকায় কোনো একটি উপন্যাস
নির্নেয় আলোচনা হচ্ছে। কোন উপন্যাস তা
জানা নেই। তবে সেই সপ্তে দেখা যাচ্ছে, যে
বিবরণকে কেন্দ্র করে আপনাদের বর্ণনাদর্শন বাড়
ফুলেছে, রাষ্ট্র সরকার ও শাস্ত্রনু দাসের চিঠি
ছাপা হয়েছে—ঠিক সেই বিষয় নিয়েই পরোক্ষতর
আলোচনা চলছে। আমার মনে হয়, বিষয়টি
সাহিত্যে শ্রীলতা ও অশ্রীলতা নিয়ে।
অশ্রীলতার পক্ষে অনেক ধনুদী ময়লা ফুলে
জমা করেছেন। শ্রীলতার পক্ষেও অনেকে
সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

আমারও মনে হয়, শ্রীলতা ও অশ্রীলতা
নির্ভর করে সাহিত্যিকের সক্ষম ও পূর্ণাঙ্গ
শক্তির উপর। এই সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের
উপর লেখা বিষ্ণুচন্দ্রের প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ
করাছি। সেইখানে তিনি বিষয় তথা ব্যবহৃত
শব্দের শ্রীলতা ও অশ্রীলতা নিয়ে বিস্তার
আলোচনা করেছেন। আজকালকার নবীন
সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য তাঁরা কোনদিনই
বিষ্ণুচন্দ্রের এই প্রবন্ধটির কথা উদ্ধারণ করেন না।
হাস্তের দেশ, হাস্তের কাল, হাস্ত বাংলা সাহিত্য।

শাস্ত্রনু দাস রক্তে চেয়েছেন, একটা যে
গৃহীত হয় নি, কালে সেটা গৃহীত হয়েছে।
এটা অপরিস্রব সত্য। হরিমতীর গুপ্তকথা
আমরা কবে ছাড়তে কল্যাণ। অথচ দেখুন,
কালিদাস সেকালেও গৃহীত হয়েছেন আজও
নয়না। এমন কি জার্মানি কবি গ্যাটে বলেছেন,
শকুন্তলা হচ্ছে বসন্তের কল, শরতের কল।
এই বিচারের তুলনা নেই। বিষ্ণুচন্দ্রের
লেখক কেন অভিজ্ঞান-শকুন্তলা লিখেছিলেন—
তা আজকের অশ্রীল পট, মাতঙ্গুর তরুণ
লেখকদের জানা উচিত।

“অমরুশতক” সেকালেও জনপ্রিয় ছিল,
আজও পবিত্র কাব্যগ্রন্থ। অথচ একে ক্রমাগত
অশ্রীল বলাই না। তেমনি লেডী
চার্লটের লিটার প্রভৃতিতে আমরা অশ্রীল
বলব না।

লেখকের উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে লেখা
কোনোভাবে অশ্রীলতার গভীর পার হয়ে সং
গৃহীত হয়ে ওঠে। কামা, জটিলৈক্যিক,
টমাসম্যান—কত নাম বলব?

এঁদের রচনা শক্তি এমন স্ক্রিট এবং
উদ্দেশ্য এমন মহান যে, এঁদের সাহিত্য আজ
দেখোতাইগ। দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যের
কয়েকজন লেখক ব্যাঙাচির শক্তি নিয়ে বর্তমান
সমাজের কথা বলতে গিয়ে শিবির বদলে গড়েন
গজকচ্ছপ এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গজ-
কচ্ছপই দর্শন করেন।

এঁদের শক্তি বড়ই সামান্য। এঁরা বিকৃত
যোনাবেদনমূলক রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেন। হে
ঈশ্বর, এঁদের সপ্তে যেন বায়রন, লরেন্স কিংবা
মোরিয়াভার মত লেখককে এক পংক্তিতে না
সমান হয়।

বর্তমান বিকারগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের
বিষয় বই-প্রোডাক্টের মত হচ্ছে একেবারে
হালের বাংলা সাহিত্য। আমেরিকার ফেল্ডের



ফিল্ডের মতো এইসব বই গাথা করা থাকে। অথচ
কি মজা দেখুন, হালের কবি-সাহিত্যিকরা জাহির
করছেন—তাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করছেন ও
তাঁরা পরীক্ষা চালাচ্ছেন, এমন কি তাঁরা সমাজ-
তান্ত্রিক। আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে এই
ধরনের সমাজতান্ত্রিকদের রচিবিকৃতি কল্পনা
করা যায়। তাছাড়া ভাঙের সপ্তে আলকাডরা
থাকলে যেমন একটা পরীক্ষা তেমনি একালের
সাহিত্যে চলছে অর্থহীন পরীক্ষানিরীক্ষা। এতে
বিজ্ঞান নেই, আছে অন্ধমের বিকৃতি।

দেখুন, স্পিলেন, হাডলি প্রভৃতি রোগ-
গ্রস্ত বিকৃত রচির জন্য ইংরেজী সাহিত্যের
পংক্তিতে একেবারেই বসতে পান না। বাংলা
সাহিত্যের তথাকথিত উপন্যাস এঁদের চেয়েও
নিষ্কণ্টক। অবশ্য তুলনামূলকভাবে বঁরা পড়েন
নি, তাঁদের বলা অরণ্যে রোমনমা।

মেটালিয়াস, ওয়ালেস প্রভৃতির লেখা অতি
সাধারণ পত্রিকা সাটারডে ইভিনিং পোস্ট, বা
একটু ভালো পত্রিকা, নিউ ইয়র্ককে ছাপার
যোগ্য বলেও বিবেচিত হয় না। শুধু এঁরা
বই বার করে বিকৃত রচিসম্পদ পাঠকদের
লালসা মেটোতে। ধনতান্ত্রিক দেশে বরং এই
ব্যাপারটাকে প্রচ্ছন্নভাবে উপসাহিত করে।
বাংলাদেশের সাহিত্যিকের অস্তিত্ব সে পথের
হাঙ্গী নয়, একথা আজ বলা দরকার। সেই
কারণে এই চিঠি না লিখে উপায়ও ছিল না।

শিবের চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপক,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীপৃথ্বীন্দ্র মহোপাধ্যায় রচিত “সাধক
শিবলী যতীন্দ্রনাথ”—দুর্যাসাহিক প্রবন্ধটি
আগের সপ্তে পড়ছি। বীর যতীন্দ্রনাথের
ব্যক্তিগত সার্বিকজীবনের পরম সৌভাগ্য
আমার জীবনে ঘটেছিল। যতীন্দ্রনাথের আসন
আমার অন্তরে চিরকাল শ্রদ্ধার মণ্ডিত
থাকবে। কিন্তু পৃথ্বীন্দ্রের লেখায় সাপ্তাহিক
বসুমতী, ১১/১১/৬৫) প্রফুল্ল চাকীকে
ধারিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় অপরাধী নন্দলাল
বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এবং
দণ্ডদানের বিবরণ দেখে স্তম্ভিত হলাম।
কারণ আমি নিজে এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ
গ্রহণ করেছিলাম—এবং আমি আজও জীবিত।
ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহের বিধিবদ্ধ
কতগুলি নিয়ম পালনের প্রয়োজন।
পৃথ্বীন্দ্রনাথ, সে নিয়ম পালন করলে এমন
দ্রষ্টামূলক উপাখ্যান রচনা সম্ভব হত না।

তার সংগৃহীত তথ্যের সূত্রগুলি জানতে
পারলে বোঝার সুবিধা হত। হাওড়া গ্যাং
কেসে লালিত চক্রবর্তীর বিবৃতি যে পৃথ্বীন্দ্রের
সাজান কথা একথা অনেকেই জানেন। কাজেই
তার বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। চীফ জাস্টিস
জেনারেলের রায়েও এই অভিমত সমর্থিত
হয়েছে। নন্দলাল হত্যার সংঘটিত হয়
১১/১১/১৯০৮ সালে। পৃথ্বীন্দ্রের উদ্ভূতি
সরকারী রিপোর্টে লালিতের স্বীকারোক্তি—
১১/১১/১৯০৮-এ তাকে নির্দেশ দেওয়া
হয় নন্দ বাড়জোর বাড়ির প্রতি নজর
রাখতে—এ কথা বিদ্রান্তমূলক।

যতীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনার কথা জানতেন
কিনা সে সম্পর্কে সঠিক বলার দৃষ্টিসাহস
আমার নাই—বোধ করি আজ আর কারো পক্ষেই
তা বলা সম্ভব নয়। আমি যতদূর জানি—
একথা তিনি জানতেন না। তবে এই পরি-
কল্পনার বা সক্রিয় অংশ নরেন ডট্টাচার্য যে
যুক্ত ছিলেন না সে কথা আমি দৃঢ়তার সপ্তে
বলতে পারি। অন্তত একথা বলার অধিকার
আমার আছে।

আমি নন্দলালের ওপর নজর রাখার
এবং হত্যার নির্দেশ পেয়েছিলাম আয়োজিত
সমিতির হরিশচন্দ্র শিকদারের কাছে থেকে।
এই ঘটনায় আরও একজন সক্রিয় অংশ গ্রহণ
করেছিলেন। তিনি ঢাকার প্রখ্যাত বিলম্বী
শ্রীশচন্দ্র পাল। শ্রীশ পাল তখন থাকতেন
হরিশচন্দ্রের বাড়ির পাশে আমহার্ট স্ট্রীটে
ছাত্তার পাড়ার মোড়ে।

পৃথ্বীন্দ্রনাথের হত্যার সময়ের বর্ণনাটিও
সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

যেহেতু আমরা ধরা পড়ি নি, যেহেতু
পুলিশ শত অত্যাচারেও আমাদের কাছ
থেকে কোন বিষয়ে কোনো জ্ঞানবন্দী আদায়
করতে পারে নি—সেই কারণে এখন দেখা
যাচ্ছে সুযোগ বুঝে বাড়ি বা গোষ্ঠী যেমন
ভাবে পারছেন নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করার
চেষ্টা করছেন। যেমন দেখা যাচ্ছে রডা
কোম্পানীর অস্ত্র লুট বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনার
ভিতর দিয়ে। নানা দুঃখ কষ্ট ও
নির্বাসনের মধ্য দিয়ে দিন কাট্টের জীবনের
শেষ সীমায় এসে-মধ্য ইতিহাস রচনার নানা
প্রকার অপচেষ্টা দেখে এখন মনে যন্ত্রণার
উদ্রেক হয়। আজ বীর যতীন্দ্রনাথ, নীরব
কর্মী হরিশচন্দ্র শিকদার, অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র
দে, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি জীবিত থাকলে
এই সকল বিষয় একটা নিষ্পত্তি হতো।

সর্বশেষে বলি যে বীর যতীন্দ্রনাথের
জীবনী রচনার বা সে যুগের অনুরূপ কোনও
ঘটনার বিবরণে অতিরঞ্জনের কোনও স্থান
নাই—সে প্রচেষ্টা মহান আত্মা এবং মহৎ
ইতিহাসকে অবমাননার সামিল বিবেচিত
হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কখনোই এ কার্য-
কলাপকে প্রশ্রয় দেবে না।

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মহোপাধ্যায়
১৪. বিষ্ণুচন্দ্র বসুদেবী লেন
হাওড়া



কলকাতার রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে ভারত বনাম রাশিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় রাশিয়ার পুরোভাগের আক্রমণধারা ব্যর্থ করছেন ভারতের স্ট্রকার জর্নেল সিং

একটি আশার অপমৃত্যু

একটি বিরাট আশার অপমৃত্যু ঘটল রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের বুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ সমবেতপ্রায় ত্রিশ সহস্র দর্শক অনুভব করতে পেরেছেন কিনা জর্জিন না, কিন্তু আমার মনে হয় সকলেই নিরাশ হয়েছেন ভারতীয় ফুটবলের ন্যাতিশবাস দেখে। একচ্ছত্র প্রাধান্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে ২-০ গোলে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ী হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া দল বিদায় নিল কলকাতা থেকে।

সত্যিই সেদিন ওখানে বসে তীব্রভাবে অনুভব করলাম স্বর্গত কোচ রহিমের অভাব। কোচ হিসাবে রহিমের স্থান পূরণ করতে পারেন এমন কোন কোচ বর্তমানে ভারতবর্ষে নেই। ভারতীয় ফুটবলকে গড়ে-পিটে তোলার যে গুরুদায়িত্ব রহিমের ওপর অর্পিত হয়েছিল তা তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করে গিয়েছেন। ফুটবল কোচ হিসাবে রহিমই ভারতীয় ফুটবলকে নতুন পথ দেখিয়েছেন, এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন মর্যাদার আসনের দিকে। মেলবোর্নে অলিম্পিকের আসরে ভারতীয় দলের সাফল্যের পর, ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত ফুটবলে রেখে

এসেছিল সম্ভাবনার ইশিত। এরপর ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে ফুটবলে এশীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে ভারত আনল স্বর্ণপদক। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের দুর্ভাগ্য, মর্যাদার আসনে ভারতীয় ফুটবল আরোহণের পথেই অকালে আমাদের হারাতে হল পথপ্রদর্শক রহিমকে। কারণ রহিমের মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে টোকিওতে

কীডাধারা আমাদের সত্যিই বেদনা দিয়েছে। এই রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে গত বছর জুন মাসে অলিম্পিকের বাছাই খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করে ইরানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। দেখলাম এই দীর্ঘ আঠারো মাসের মধ্যে আমাদের ফুটবলের মানের এতটুকু উন্নতি হয় নি এবং অবনতিই হয়েছে বলা চলে।

প্রীতিমিতাক

অলিম্পিকের আসরে ফুটবলে বাবার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারল না ভারত। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ফুটবলে প্রথমে অংশগ্রহণ করার পর এই সর্বপ্রথম প্রাথমিক পর্যায়েই ভারত বিদায় নিতে বাধ্য হল।

কলকাতার ভারত বনাম রাশিয়ার দ্বিতীয় ফুটবল টেস্টে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তরুণ রাশিয়ান ফুটবলের কাছে আমাদের ভারতীয় ফুটবলের তথাকথিত সব হীরোদের দুরবস্থা দেখে। মাত্র আঠারো থেকে বাইশ বছরের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত রাশিয়ার প্রথম বিভাগের 'বি' টিমের খেলোয়াড়দের কাছেই পরাস্ত হলেন আমাদের দেশের সেরা খেলোয়াড়রা। ভারতীয় দলের ছয়জোড়া



রাশিয়ান ফুটবলদলের অধিনায়ক সেরগেই

সাপ্তাহিক বঙ্গমণ্ডলী

দ্বিতীয়বারের মত ভারত ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু ভারত বেশি গোলের ব্যবধানে ভারতের পরাজয় টেলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে প্রায় চল্লিশ গজ দূর থেকে গোলভূবভব বে প্রচণ্ড স্ট্রট মারেন তা গোলরক্ষক মস্তাকাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে বিদ্যুদ্গতিতে গোলে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটে ভানাকিন খে গোলাটি করেন তার জন্য ভারতীয় দলের স্টপার জনেল সিংকে দায়ী করা চলে।

সবচেয়ে দূরত্বের কথা যে, আমাদের পুরো-ভাগের খেলোয়াড়েরা রাশিয়ান গোলরক্ষকে পরীক্ষা করাই সুযোগ পান নি। ভারতীয় দলের তরুণ গোলরক্ষক মস্তাকার বিরুদ্ধে দুটি গোল হয় বটে কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন হাক প্রশান্ত সিং। নিরলসভাবে প্রশান্ত একদিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন বিপকের আক্রমণধারা আর অন্যদিকে পুরোভাগের সতীর্থদের বল যোগানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নরীম এবং অরুণ ঘোষের ধীর স্থির ক্রীড়াধারায় বেশ বৃক্ষিমস্তার ছাপ পাওয়া যায়। পুরোভাগে চুনী গোস্বামীর খেলা উল্লেখযোগ্য হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন খেলোয়াড় বদল হয় এবং তখন ভারতীয় দলের খেলার কিছুই উন্নতির লক্ষণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ার্ধে যোগদান করে জাম্বকা এবং ইউসুফ খাঁ চেষ্টার কোন চুটি রাখেন নি। রাইট আউটে পি কে ব্যানাজীর খেলার এদিন ছিল ব্যর্থতার স্পষ্ট ছাপ। পি কে ব্যানাজীর খেলা দেখে মনে হল যে, তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হয়েছে। জনেল সিং-এর খেলা দর্শকদের নিরাশ করেছে আর লেফট আউট জানকীরাম খেলার বেশির ভাগ সময়ই বলা চলে দর্শকদের ভূমিকা গ্রহণ করে কাটিয়েছেন।

সফরকারী রাশিয়ান দলের খেলার মধ্যে নৈপুণ্যের ছাপ ছিল, তবে তরুণ খেলোয়াড়েরা এখনও সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠেন নি। বাই হোক না কেন আঠারো থেকে বাইশ বছরের এইসব খেলোয়াড়েরা যে ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করেছেন তার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে হয়।

কলকাতার পর রাশিয়ান ফুটবল দল গোহাটিতে আসাম ফুটবল একাডেমির সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলার মিলিত হয়। গোহাটির লোকেরা এই বিদেশী অতিথি ফুটবল দলকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। গোহাটির প্রদর্শনী খেলায় রাশিয়ান দল শোচনীয়ভাবে ৭-০ গোলে আসাম ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে

কলকাতার সোভিয়েট দূতাবাস আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হন রুশ প্রজাতন্ত্রের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আলেকজান্ডার স্তারেস্কিন এবং কয়েকজন খেলোয়াড়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদানের পর বেশ বুরাতে পারলাম আমাদের দেশ ফুটবলে অনেক পশ্চাতে, আর এই অনগ্রসরতার কারণ কি তাও অনুভব করবে



ভারতীয়দলের রাইট-ব্যাক অরুণ ঘোষ ও রাশিয়ার বোরোনভ একটি বল হেড করার চেষ্টা করছেন

মুষ্টিযুদ্ধের মুকুট হ'ল

রাজা

সত্যিই চিন্তায় পড়েছেন মুষ্টিযুদ্ধ প্যাটার্নসন?

রাজা গিরেছে অনেকদিন আগে; শক্তি সঞ্চার করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছেন কিন্তু সর্বকিছুই নির্ভর করছে এই লড়াইয়ের ওপর। জয়ী হলে হাত রাজার আবার ফিরে পাবেন আর পরাজয়ে হারিয়ে যাবেন একবারের বিস্মৃতির অতল তলে। বিশ্ব হেতী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের মননে বর্তমানে বিরাজ করছেন ক্যাসিয়াস ক্রে।

প্যাটার্নসন বেশ আনন্দে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হিসাবে বিরাজ করছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে মূসকতুর মত আবির্ভূত হলেন জেল-ফেরত এক সময়ের দাদী সোনি লিস্টন। মূস-জব্ব আর রাহাজানীতে ওস্তাদ কুখ্যাত গুন্ডা লিস্টন জেলে গিয়ে বাঁজিং চটা শব্দ করলেন। এই বাঁজিং লিস্টনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করল এবং তারপর হঠাৎমত বাঁজারের সাধনা শুরু করলেন লিস্টন। জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে লিস্টন কিন্তু একেবারেই পারেনি গেলেন, বাঁজাই হলে উঠল তার ধান-জান। রিয়ার উঠে লিস্টন অসম্ভব রকম সাফল্য অর্জন করলেন। তখন তিনি সম্বন্ধ সমরে আহ্বান করে বসলেন প্যাটার্নসনকে।

প্যাটার্নসন-লিস্টন প্রথম সাক্ষাৎকারে দেখা গেল বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান প্যাটার্নসন মাত দুই মিনিট ছয় সেকেন্ডেই ধরাশায়ী। লিস্টন পড়লেন ঠিক একটা দানবের মত। লিস্টনকে কিন্তু লোকেরা কিছুতেই ভাল চোখে গ্রহণ করতে পারে নি, সকলেই লিস্টনের অতীত জীবনের কথা ভুলতে পারল না তার প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষের বাস। নিরুপেক্ষ করতে লাগল সকলে একযোগে। একঘরে-হওয়া অবহেলিত এই মুষ্টিযোদ্ধা ফিরতী লড়াইয়ের বাজী মাং করল দুই মিনিট কষ সেকেন্ডে। নতুন বিশ্ব হেতী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান সোনি লিস্টন বিজয়ের পর দু-হাত শুলে তুলে বলে উঠলেন, 'আমাকে ভাল হবার সুযোগ দাও, আমি ভাল হব।' বিজয়ী তিনি হলেন বটে কিন্তু অকুণ্ঠচিত্তে সকলে তাঁকে সম্মান বা সমাদর করল না। মুষ্টি-যুদ্ধের অপরাধী ছেলে তাঁর রাজত্বের সম্পূর্ণ সময়টা থাকলেন অবহেলিত হয়ে।

লিস্টন-প্যাটার্নসন মুষ্টিযুদ্ধের সময় থেকেই লিস্টনের পেছনে উঠে পড়ে লাগলেন এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্রে। মূখে মূখে ছড়া তৈরি করতে ওস্তাদ ক্যাসিয়াস অংশ সময়ের মধ্যে অসম্ভব রকমের জন-প্রিয়তা অর্জন করে ফেললেন। যে লিস্টন প্যাটার্নসনের মতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে পরাজিত করেছে তাকে বিদ্রূপ বাণে বিরক্ত করে মারলেন ক্রে। অবশেষে ক্রে আর

কোন কষ্ট হল না। দেশের ফুটবল সংস্থার সভাপতি মিঃ আলেকজান্ডারের সঙ্গে ফুটবলের নিবিড় সম্পর্ক বহুদিন। স্তারেস্টিভন মূল প্রজাতন্ত্রের একজন জনপ্রিয় ফুটবলার ছিলেন অতীত। বিখ্যাত 'স্পোর্টস' দলের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। আর আমাদের দেশের ফুটবল সংস্থার ভার দায়ের ওপর নাস্ত বা বারী উচ্চ আসনগুলি আলো করে বছরের পর বছর অঁকড়ে আছে, তাঁদের যে কজন, ফুটবল নিয়ে অতীতে নান্দা-চান্দা করেছেন সন্দেহ। হার ভারতের ফুটবল হাতুড়ে বাঁজার হাতে তেমনার নাড়িধ্বাস দেখে আমরা সত্যিই অতলত দর্শিত।

আমরা আন্তর্জাতিক ফুটবলে অংশগ্রহণ করি যেখানে পুরো খেলার সময় নম্বই মিনিট। আমাদের দেশের ফুটবলের আসরে নম্বই মিনিটে খেলার প্রথা চালু করার দিকে পারিচালকদের কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে কি? নম্বই মিনিটে খেলতে অভ্যস্ত রাশিয়ানদের এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিলে সত্তর মিনিট খেলে, শব্দে খুবই লক্ষ্য পেয়েছিলাম।

রাশিয়া চার তাদের দেশ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করুক। তাই এখন থেকেই প্রমুখিত-পূর্ণ শুরু হয়েছে আগামী ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের জন্য। ১৯৬৮ সালের মেলবোর্নে ফুটবল চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে আর ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে বার্ষিকের পর, মেক্সিকোতে ফুটবলের দ্বিতীয়বার পুনঃপ্রবেশের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই আত্মো থেকে বাইশ বছরের বাছাই করা তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতে পাঠিয়েছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। লক্ষ্য এই সমস্ত তরুণদের ক্ষুদ্র-পটে মেক্সিকোর আলবের জন্য পুরো-পূর্ণ তৈরি করে রাখা। আমাদের দেশে আবার খেলোয়াড়দের চোরে কর্মকর্তাদেরই ভিড় বেশি। জারিটি স্মৃতি প্রদর্শনী মাচা নিয়ে টাকার খেলার ব্যস্ত থাকলে কি আর ফুটবলের উন্নতি করা যায়।

আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়েরা কেলেই কিভাবে। প্রায় সারা বছরই তাদের স্থলে লাগে মারতে হয়। পূর্ণ ফুটবল মরশুমে তো বিশ্রামের বিলম্বমাত্র অবসর থাকে না, রোজই খেলা। আর রাশিয়ার আট মাসের ফুটবল মরশুমে একজন খেলোয়াড়কে পঞ্চাশটির বেশি খেলা খেলতে হয় না। একটি মাঠের পর বিত্তীয় মাঠে অংশ গ্রহণের পূর্বে প্রায় চার-পাঁচদিন বিশ্রামের সুযোগও তাঁরা লাভ করেন। ক্রাব, কলেজ আর অফিস নিয়ে আমাদের এখানে মরশুমে প্রায় প্রতিদিনই একজন খেলোয়াড়কে খেলতে হয়। রোভার্স, জুরাড প্রভৃতি প্রতিযোগিতা নিয়ে একজন প্রথমশ্রেণীর খেলোয়াড় বোধ হয় মাত্র সারা বছরে এক মাস টিক দু'মাস ফুটবল থেকে বিশ্রাম পায়।

রাশিয়ার খেলোয়াড়েরা মরশুমে প্রতি-

দিন প্রায় দু'বটা অনুশীলন করেন। এমন কি দিনে দু'বার, মানে সকালে এবং বিকালে তাঁরা অনুশীলন চালান। মরশুমের বাইরের সময় কিন্তু প্রতিটি খেলোয়াড় প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা অনুশীলন করেন শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য। রাশিয়া ফুটবলে নাকি এখনও অনেক পশ্চাতে আছে আন্তর্জাতিক আসরে, বললেন সভাপতি মিঃ আলেকজান্ডার স্তারেস্টিভন। কারণ তাঁর মতে ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ ফুটবলে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের নাগালের মধ্যে পেতে গেল বেশ সময় এবং পরিশ্রমে প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে গেলে কি বিরাট যেষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন একবার কল্পনা করুন। পারিচালকদের বলাছি যে, ঘনঘন বিশেষী দলকে এনে খেলিয়ে নিয়ে গেলে বা দু-একবার বিশেষ সফর করলেই যে ভারতীয় ফুটবলের বিরাট কল্যাণ সাধন করা হল এ ধারণা ভুল।

আবার কতদূর

শুনছেন কখনো যে লাইন্সম্যান মারমুদী দশককে টপেট ঠেঙেছে। আরো তো দেখেছি রেফারী আর লাইন্সম্যানদেরকে নিদ্রহীত হতে হয় অসন্তুষ্ট দশকদের হাতে। দশকদের মন চিরকালই অব্যব; আর অশ্ব হল সমর্থকদের অভাব থাকে না, রেফারী বা লাইন্সম্যানের সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেলেই মাঠে নেমে পড়েন তাঁরা।

ব্রেজিলের সাঁও পাওলোতে কিন্তু ঠিক একটা উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। একটি ফুটবল মাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন ব্রেজিলের দুটি সেরা দল স্যান্টোস এবং করিন্থিয়ান দল। এই খেলাটি দেখার জন্য প্রায় লক্ষাধিক দর্শকের সমাগম হয়েছিল। খেলাটিতে স্যান্টোস ৪-২ গোলে জয়ী হয়। স্যান্টোসের বিতর্কমূলক চতুর্থ গোলেটি রেফারীর স্বীকৃতি পাবার পরই গড়গোলের সুত্রপাত। একজন উগ্র সমর্থক এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেন। পুলিশ এসে বাধাদানের পূর্বেই লাইন্সম্যান যথেষ্ট তৎপরতার মধ্যে এসে সেই অনধিকার প্রবেশকারীর মুখের ওপর একটা ঘুষি চালিয়ে দেন।

লাইন্সম্যানের হাতে সমর্থকের নিগ্রহের দৃশ্য দেখে ক্রোধে উদ্ভূত প্রায় পাঁচশত দর্শক 'বুদ্ধি' মৌহ' ভাবে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েন। শুরু হয় পুলিশ বনাম দর্শকদের খণ্ডযুদ্ধ। এরই মধ্যে কয়েকটি গুলী ছোঁড়াছড়িতে দর্শকদের মধ্যে রাসের সঞ্চার হয়। বুদ্ধ শেষে দেখা গেল প্রায় বোলজন দর্শক আহত আর কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।



প্যাটার্সন



ক্যাসিয়াস ক্রে

লিস্টনের মনোবল বাবস্থা হল। বাজী তারি কেন্দ্র ছিল লিস্টনেরই পক্ষে; কারণ দৈত্যাকার লিস্টনের কাছে তরুণ ক্যাসিয়াসের অবস্থা কল্পনা করে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ক্রে কিন্তু এতটুকু না ঘাবড়ে বরাবরই খলতে লাগলেন যে আট রাউন্ডের মধ্যেই লিস্টনকে তিনি শেষ করবেন। লিস্টন বলল যে তার ভয় লাগছে যে ক্যাসিয়াসের সঙ্গে লড়াই করলে হয়ত তাকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে। ক্রে কিন্তু তার সব লড়াইয়ের পূর্বেই একটি করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন লড়াই সম্বন্ধে, আর আশ্চর্য অপ্রান্ত তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী। শুধু একবার সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়েছিল। একটা লড়াইয়ের আগে ক্রে বললেন—

To night when the crowd roar,
He will lay at my feet within four.
আর বললেন যে, যদি এই কথা ব্যর্থ হয় তবে ক্রে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে নতজানু

হয়ে প্রাতিশ্রুতীর পদচূষন করবেন আর সঙ্গে সঙ্গেই দেশ ত্যাগ করবেন। সত্যি সেই রাতিতে ক্রে কথা ব্যর্থ হল, বহু কন্টে ক্রে জয়ী হলেন। সেই লড়াইয়ে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনী লিস্টন। ক্যাসিয়াস প্রাতিশ্রুতীকে নিয়ে রিংয়ে দাঁড়িয়ে পরোক্ষভাবে লিস্টনকে শোনালেন একটা ছোট ছড়া।

He is second best to me.
Better than Liston, you wait
and sec.

লিস্টনের সঙ্গে লড়াইয়েও অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ক্যাসিয়াস ক্রে। সহজেই পরাজিত করলেন দৈত্যাকার সোনীকে। সকলেই অবাক কিম্বদন্তি প্রত্যক্ষ করল এই চণ্ডল তরুণের অবিশ্বাস্য কীর্তি। এর পর মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে ক্যাসিয়াস ক্রে হলেন মহম্মদ আলি ক্রে আর সেই সঙ্গে বিবাহপর্বটাও সাঙ্গ করলেন। অল্প দিনের মধ্যে দেখা গেল আমেরিকার র্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় পাণ্ডা হয়ে উঠেছেন তিনি।

ফিরতি লড়াইয়ের সময়েও ক্রে বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিলেন মুক্তিবুদ্ধ জগতের মুকুটহীন রাজা তিনিই। মুসলমান ধর্মগ্রহণ করার ফলে ক্রের কিন্তু শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, পূর্ণ জনপ্রিয়তার কতকাংশ হারালেন তিনি—কিছু অসংলগ্ন ধর্মসম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলে। ফিরতি লড়াইয়ে মাত্র ষাট সেকেন্ডে বাজী মাং করলেন তিনি।

এবার প্যাটার্সনের লড়াইয়ের পূর্বে বকবকিয়ে বক্সার ক্রের মধ্যে নরম সুর সত্যিই আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। ক্রে বলেছেন, “সকলেই ভাবছে যে প্যাটার্সন আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না; কিন্তু প্যাটার্সন অত শক্তিশালী নয়, শেষ সময় পর্যন্ত ও লড়বে।” ক্রে মতে প্যাটার্সনপর্ব সাঙ্গ করতে তাঁকে আট রাউন্ড লড়তে হবে। এখন দেখা যাক ক্রের এবারের ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সত্য হয়, কতদূর অপ্রান্ত হয় তাঁর কথা—

He will fall,
The round I call.

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৬০০
আজকের মানুষ	...	১৬০৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	— হরপ্রসাদ মিত্র	১৬০৬
ভারতদর্শন	...	১৬০৮
আন্তর্জাতিক	...	১৬০৯
উপজায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬১২
বাঙলা আমার ডাক দিয়েছে (কবিতা)	— পরিমল চক্রবর্তী	১৬১৪
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	১৬১৬
অনুদত্ত (কবিতা)	— লক্ষ্মীনারায়ণ রায়	১৬১৯
সাধক বিংশলী মতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬২০
স্বপ্নদর্শন	...	১৬২৪



বক্তৃতাগুলির বিবরণী ওক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নিরীক্ষিতের আত্মকথা, উন্নয়নশীল, নিরীক্ষিত, অনুভবের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিচ্ছিন্নতা, পথের সন্ধান, বাঙালি মানুষ, বর্ষ ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিত কথাশিল্প

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—বৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

বেঙ্গাচারী, আশা, মহাকবি, সপ্তশতী

মূল্য—৩ টাকা

৩সত্তা

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিমন্ডল, আদর্শ বসু, বাতুরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরেব উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুণালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক। প্রতি ভাগ আড়াই টাকা।

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বসুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গব্রহ্মণী, নিরুপ-সঙ্গীত, মায়াদেবী, ধুমকেতু, শবৎকাল, দেববাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত।

মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবিব মূল্যবান সংকলিত ও বাংলা
বচনাব সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্য
অভিনব আয়োজন।

বিজ্ঞানসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিকুপ্তিমা,
মহামায়া চর ও পুণ্ড্রমালিন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ ভাষ্য

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমাতা, বঙ্গসংসার
স্নাতন গোষ্ঠাধী, পুজার মালা ও
হাঙ্গী ব্রহ্মসংহী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রাট, কলিকাতা-১২



দ্বিতীয়



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সমাজ, বিজ্ঞান এবং আচার্য হান্ডেন	— আশিসকুমার সিংহ	১৬৩০
কালপদ্য (গল্প)	— চিত্রা সেনগুপ্ত	১৬৩০
সবার অলঙ্কার	— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৬৩৮
প্ৰবন্ধমেলা	— জয়ন্তী সেন	১৬৪৬
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৬৪৭
ভালোবাসার পতাকা (কবিতা)	— বাসুদেব দেব	১৬৪৮
প্রতিদ্বন্দ্বি (কবিতা)	— বিশ্বেশ্বর সামন্ত	১৬৪৮
চার্লি চ্যাপলিন	— অশোক সেন	১৬৪৯
বঙ্গজগৎ	— ...	১৬৫২
বঙ্গদেশ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৬৫৭
পার্কমন্ড	— ...	১৬৬০
বেলাধোলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৬৬২

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষাব্রহ্মাণীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

*** স্বল্পপ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যস্বার্থী ***
উপেক্ষনীয় ব্রহ্মোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অধিতম সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩.৫০ । ইংরাজী হইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড : মূল্য আট টাকা)

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

সম্পূর্ণ-প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য,
বীরভূষণ কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক,
বৃদ্ধো শালিকের বাড়ি ঘোঁ,
একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কঙ্কুয়ারী নাটক,
শমিতা নাটক, ইতোভিত্তি-সম্বৎ
কাব্য, বীরভূষণ কাব্য, চতুর্দশপদী
কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য,
মায়ী কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর ব্রহ্মোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০
৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বাণেশ্বরবাজারী গাছুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



৭০ বৎ : ২৬শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পঃ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত

Price : 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

Thursday, 2nd Dec., 1965

শিক্ষায়তন বা ধর্মমন্দির

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনী বিলটি মাঠে মারা যায় নি। আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরলটিকে স্থগিত রাখা হয়েছে। লোকসভায় হয়তো আবার একদা ভূমূল তর্কের ঝড় উঠবে। কিন্তু এখন শান্তি। আর এই ধরনের শান্তি যারা কামনা করেন তারা যে কোনো প্রগতিমূলক বিষয় স্থগিতের ক্ষেত্রে এর পূর্বে যেমন মনস্তত্ত্বের নিম্নস্বাস ফেলেছেন, এবারও সেই রকম মনস্তত্ত্বের নিম্নস্বাস ফেলবেন।

তবু যে শাস্যমাটা ব্যাপারটা আমরা আজ অনুভব করছি, তা হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যাপারেই আমরা সত্যিকার পদক্ষেপে অভ্যস্ত নেই, তাই তাড়াহুড়ো করে উত্থাপিত সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পাশ হলে লোকসভা তাকে স্থগিত রেখেছে।

স্থগিত রাখার পূর্বে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মদনমোহন মালব্য কাশী বিশ্ববিদ্যালয় রাখার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষের কেউ বলেছেন, এই দাঁত ভাঙা নাম গৃহীত হওয়া অসমীচীন, কেউ বলেছেন মদনমোহন মালব্য কিংবা কাশী বিদ্যালয় নামকরণই যথেষ্ট, কোনো ব্যক্তি বিশেষের নামে (তা তিনি যতোই সম্মানিত হোন না কেন) নামকরণ করতে কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা কেউ কেউ 'হিন্দু' শব্দটি উৎপাটিত করার বোরতর বিরোধী। এমন কি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা নাম পরিবর্তনের আদি ও অকৃত্রিম সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও, লোকসভায় তাকে জানাতে হয়েছিল যে, কংগ্রেসী সদস্য স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী ভোট দিতে পারেন।

লোকসভায় যখন সংশোধনী বিলটির আলোচনা চলছিল তিক সেই মুহূর্তে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মিছিল, ধর্মঘট, অনশন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক স্বীকৃত আধুনিক ভাষা থেকে ছাড়া

বিক্ষোভ-শর একের পর এক নিক্ষেপ হচ্ছিল। আমরা জানি না, ছাত্ররা অনেক সময় যে ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিক্ষোভ জানায় এক্ষেত্রেও সেই আবেগ ও পন্থা অনুসৃত হয়েছিল কিনা এবং লোকসভা সেই বিক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও স্বীকার করেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সংশোধনী বিল উত্থাপন করার যথার্থ সময় নয়।

দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমরাও স্বীকার করি যে, সত্যিই এখন এমন কিছু ঘটা উচিত নয়, যা দেশের সহিংস-বিনাশক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সূত্রে একথা বলতেই হবে, প্রগতিমূলক যে কোনো বিষয়কে বিপদের দিনেও যদি আমরা অগ্রগতিতে সাহায্য না করি, তাহলে তা হবে আরো বিপজ্জনক পন্থা। শিক্ষিত মনের কাছে অন্তত সে আবেদন রাখা নিরর্থক নয়। বরং ভিতরেই চাপা ক্রসংস্কার বাইরের লোকদেখান ভদ্রতার কথনা চাপা থাকে না। দেশের ও দেশের ক্ষতি হয় তাতে চোর বেশি।

প্রসঙ্গত আমরা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়টির কথা বলবো। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একালেই শূন্য নয় সেই বৃটিশ সরকারের আমল থেকে জঘন্য মনোবৃত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে এসেছে। আমরা আশা করেছিলাম, এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করা হবে। কিন্তু তা করতে অপারগ হয়ে অনেক আশার শ্রীচাগলা হাত দিলেন হিন্দুদের প্রগতিমূলক মনোভাবের উপর বিশ্বাস রেখে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনে। মনে হয়, এবার তাকে তার শিক্ষা হয়েছে।

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় কোনো যুগেই সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে নি, বরং মালব্যজীর আদর্শই সেখানেই অনুসৃত, সেই আদর্শ কোনো হিন্দু বা অন্য ধর্মচারে প্রতিষ্ঠিত বিষয়

আদর্শ নয়। সেই আদর্শ মনুষ্যের অধর্মের চরিত্র গঠনের মহান আদর্শ। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিনই সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায় নি। আর, যে হিন্দু শব্দটি নিয়ে এতটা কলহ তা 'ভগিনী নিবেদিতাই দিরোছলেন'। যাহোক আমরা তবু হিন্দু বা মুসলিম কোনো নামই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনো বিদ্যালয়ে জড়িত দেখতে ইচ্ছুক নই। সেই কারণে হিন্দু নাম বর্জন করার জন্য আমরা যেমন আগ্রহী, তেমনই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম শব্দটি উৎপাটিত করতে গিয়ে পিছপা হওয়া উচিত ছিল না। তাহলে লোকসভায় মতমৈথল বা ছাত্রদের আন্দোলনেরও সন্ধি হোত না।

কোনো ধর্মীয় নামের পরিবর্তে 'চরিত্রগত আদর্শ' চিত্র উজ্জ্বল ব্যক্তির নাম রাখাও স্বেচ্ছা পারে। এতে হিরোইজম-এর গুণ্য করা হয় না। শিক্ষায়তনে ডোঁড় ডোঁড় হওয়ার, স্বাধীনতা বা ডিরোজিওর নাম জড়ানো কি কতিপয় তবু বিরাট কিছু পরিবর্তন করার আগে ছোট ছোট কর্মকাণ্ডের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন, ভারতের স্বাধীন শব্দটির সংগে কতগুলো বিদ্যালয় যে ধর্মের সংগে আটপেগুটে জড়িত, তার ইয়ত্তা নেই। সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই ধরনের বহু ধর্মীয় বিদ্যালয়ে স্বধর্ম দীক্ষিত করাই যেন মহত্বময়। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা কখনো নেহাৎ ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু অহরহ এসব আমরা প্রত্যক্ষ করছি বলেই কিছু কাজ করার আগে এইসব ঘটনাকেও তুচ্ছ ভাঙ্গা উচিত নয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কংগার রাজনৈতিক গণশালায় এক উদ্ভূত বিশদের গাড় জ্বারা ঘুরে ফিরছে। ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে লাটুর মতো পাক খাচ্ছে নতুন নতুন চেহারা। কংগার এক কোটি প'রিশ্রম লক্ষ মানুষের জীবনে স্থায়ী শান্তির রেশ এই ঘন ঘন পট-পরিবর্তনের ফলেই আরও অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক অকারণের টুকরো ও বিচ্ছিন্ন এইসব কালো মেঘের ইসারা ভবিষ্যৎ অশুভকেই আরও বাড়িয়ে তুলছে। মাত্র পাঁচ বছরের কংগার রাজনৈতিক জীবনে খে দীর্ঘ শ্বাসনের প্রোত বয়ে চলেছে তা নাটকীয়। কত নট-সুখই না অন্তিমিত হল বেলা-অবেলায়, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও হতভাগা কংগার জীবনের অশান্ত দিনগুলি পরিবর্তিত হল না। আজিকার চিরন্তন গোরবের সাক্ষী লম্বেশ্বর হত্যার পর কংগার রাজ্যে ত্যাগ-স্বর্গ মন্দির প্রহরকেই নীরবে গুণে চলেছে। মোবতু, কাসাভুব, টি শোম্ব প্রমুখ শাসক-দল পশ্চিমী বণিকস্বার্থের থেকে পৃথক হয়ে কখনই স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক জন-জীবনের সামনে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারে নি। পারে নি শাসনকার্যে নতুন পথ খুলে দিতে।

কংগার রাজনৈতিক মসনদ থেকে শ্বান-মুখে দূরে অপেক্ষমাণ হতভাগ্য প্রেসিডেন্ট কাসাভুব একদিন এই মোবতুর সাহায্যেই স্বাধীন লম্বেশ্বাকে গদিচ্যুত করেছিলেন। লম্বেশ্বর জাতি গড়ার স্বপ্ন-সাধ সেদিন মুছে ফেলেতে হয়েছিল। প্রতিশ্রুত ও আরম্ভ কাজ করতে তিনি সেদিন পারেন নি। লম্বেশ্বর ক্ষমতের কন্দরে কন্দরে ফেনারিত হয়ে উঠেছিল পূজ্যত বেদনা। আজকের কাসাভুব গদিচ্যুতই সেই অমোঘ বেদনার প্রকাশ প্ররণ করায়। বিদেশী স্বার্থের মুখেদ্বারী শোম্বের সহচর মোবতু আজ কংগার ক্ষমতার আসীন।

মাত্র পাঁচ বছরে কংগার বিরাট পরি-ভূতন সূচিত হল চারজন প্রধানমন্ত্রী, চার-চারবার গৃহযুদ্ধের ঘনঘটা, দুই দফা শাসন-ভুক্ত পরিবর্তন প্রভৃতি। কখনও শাসনকার্যে রম দক্ষিণপন্থীরা, কখনও বা বামপন্থী। কিন্তু সকল পরিবর্তনের মধ্যেও আগুন আসনে বরাবর অটল ছিলেন আজকের গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট কাসাভুব।

জেনারেল মোবতুর নেতৃত্বে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে অভ্যুত্থান সুসম্পন্ন হয়েছিল। পাঁচ বছর পরে আবার তারই পুনরাবর্তি ঘটে। এও সেই রাসেলস স্বার্থেই সম্বর্তিত। প্রেসিডেন্ট কাসাভুব, সিংহাসনচ্যুত হওয়ার

কারণের পশ্চাতে রয়েছে কংগোলীজ বাহিনীর বেলজিয়ান অফিসারদের নেতৃত্বের বিরোধিতা।

যোসেফ কাসাভুব হলেন একজন অবিচলিত মানুষ, এমন কি রাজনৈতিক-সামাজিক আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কংগার নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক হয়ে আছেন, সুদীর্ঘ বিশ্বস্থলার মধ্যেও। যখন সকল রাজনীতিজ্ঞ যে বার আসতে ও চলে যেতে লাগলেন কাসাভুব তখন পশ্চাৎ থেকেই ক্ষমতার কটি-দেশকেই পছন্দ করলেন। সুবিবেচ্য সম্প্রদায়ের সাথে তিনি সম্পদ করেছিলেন তাঁর কাব্যবলী। সামাজিক পদমর্যাদার সচেতন মানুষ কাসাভুব



যোসেফ কাসাভুব

নিজেকে মনে করতেন সকল রাজনীতির উদ্ভেদ এবং যে কোন জাতীয় নিষ্পত্তি বা মীমাংসার মধ্যস্থ মানব হিসেবে। তাঁর মনোবৃত্তি ঐতিহ্যানুগামী। তাই ব্যাকরণো উপ-জাতীয়রা যখন তাঁকে রাজা উপাধি অর্পণ করেছিলেন—তা তিনি বেশ প্রফুল্লচিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন।

কাস ব. মূলত রাজক সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত এবং রোমান ক্যাথলিক সেমিনারী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য তিনি শিক্ষকতা করেন। সমাজসেবারও পরে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি এবং ব্যাকরণো জাতীয় ব্যাপারেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৬৬ সালে তিনি এর সভাপতি হন। ১৯৬৮ সালের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে আবাকো লরী হয়েছিলেন লিওপোল্ডভিল জংশনে এবং কাসাভুব নির্বাচিত হয়েছিলেন উলুভেলের মেয়র।

কাসাভুব একদিকে ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, নিজের সম্পর্কে তাঁর ছিল বিশেষ উদ্ভেদ চেতনা। অপরদিকে তিনি বাণিম-প্রবর। তিনি কংগোলীজ জাতীয়তাবাদের হয়ে উঠলেন প্রবক্তা। ঔপনিবেশিক শাসক-বংশ তাঁকে শ্রদ্ধা, সম্মান দেখিয়েই খালাস দিল না, উপরন্তু তাঁরা ছিলেন কাসাভুবের প্রতি ভীত। ১৯৬৯ সালে কাসাভুব প্রোতার হন।

কাসাভুব বহির্দৃষ্টিতে ট্র্যাডিশনালিস্ট ফিউড্যাল ও আদব-কায়দায় ছিলেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জনকারী কতৃপক্ষের সমর্থক। তাঁর পরিচালনগত ক্ষমতা পরবর্তীদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। কাসাভুব ছিলেন ব্যাকরণো দেশপ্রেমী। কোনও এক সময়েই তাঁকেই দেখা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর পদে 'কেন্ডারেশনিস্ট' পদপ্রার্থী হিসেবে লম্বেশ্বার বিরুদ্ধে।

রাম্বুসংঘ ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর কাছেও বিশেষ প্রদ্ববহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ কংগার এই নতুন সরকারকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। কারণ, আজ তাঁরা কোন সরকারকে স্বীকৃতি জানাবেন এও এক প্রশ্ন-বহুল চিন্তা। কারণ, লম্বেশ্বর যখন প্রেসিডেন্ট কাসাভুবকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন এই রাম্বুসংঘ ও পশ্চিমী শক্তিশালী লম্বেশ্বার কার্যকারণকে সমর্থন জানান নি।

তাই কাসাভুবের গদিচ্যুতির ফলে স্বাভাবিক জটিল প্রশ্ন উঠতে পারে এর পাট্টা সরকার গঠনের চিন্তা নিয়ে। যা হোক আবার কংগার জীবনে নতুন করে কোনও এক অনিশ্চিত ভয়ের কারণকে সংঘটিত করে তুলতে পারে। কংগার জন-জীবনের শান্তি ও আনন্দের খোরাক মোবতুও কতটুকু এনে দিতে সক্ষম হবেন তাও অনিশ্চিত। কারণ পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূলের ক্ষমতার কায়ম মোবতু কংগার এমন কিছু নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারবেন না, যাতে করে শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রহর সম্পদ জগে উঠতে পারে।

তাই একদিকে ক্ষমতার পট-পরিবর্তন যেমন নতুন চেহারা দর্শনের আনন্দ এনে দিচ্ছে, তেমনি আবার কাসাভুবের গদিচ্যুতও ভবিষ্যৎ দিনগুলির জন্যে না জানি কি অনিশ্চিত ইসারা নিয়ে আসে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হৃদয়সাদ নিত্র

কী সংগত আর কী যে অসংগত, সে সব কি স্রষ্টাকে সমালোচক বলে দেবেন?

ভেতর থেকে বিদ্রূপের ধ্বনি শোনা গেল।

অন্য পক্ষ বললেন,—এ মন্তব্য অবান্তর। অবান্তর, কারণ পাঠকের কোনো অধিকারই নেই,—এরকম ধারণা অন্যায় এবং অবান্তর।

—অর্থাৎ? পাঠক যদি কথায় কথায় টিক্ টিক্ করেন, তাহলেও আসর শান্ত থাকবে বলে মনে করেন।

—থাক্, থাক্, অশান্তি ঘটুক, এ আমরা কেউ চাই না। কিন্তু একথা ঠিকই যে, বাংলায় শরৎচন্দ্রের লেখা আমাদের কারও কারও আজও সত্যিই ভালো লাগে। শুধু তাই নয়, অনেক তথাকথিত 'আধুনিক সাহিত্যের বদলে আমি বরং হেমিঙুয়ে বা বনফুল বা শরদ্বন্দ্যু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে পেলো সুখী হই।

—আহা, তাতে আপত্তি করবে কে? কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি একালের জীবন একালের সাহিত্যের বিষয় হতে পারবে না?

অতীতে আরো অনেকবার যেমন ঘটেছে, এবারও এই বিতর্ক আমি বন্ধ করে দিলুম। এ বিতর্ক কোনো গ্রাহ্য পরিণামে নিয়ে যেতে অক্ষম। এরকম অবস্থায় আমি এই পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথা-কাটাকাটির সঙ্গে নিজের অজ্ঞাত-সারে নিজেই কীরকম যেন জড়িয়ে পড়ি। আমারও তর্ক করতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু তর্কে আমার রুচি নেই। আমার দম্ভকারও নেই। আমি ভ্রমণে বেরিয়েছি। কোথাও রাঙা মাটি, কোথাও কালো পাথর। নদী-নালা, ক্ষেত-জঙ্গল, উঁচু-নিচু, ঢেউ-তোলা পথই আমার যথেষ্ট।

কোন উপকরণযোগে কী ঘটে উঠতে পারে, সে-চিন্তা ভ্রাম্যমাণ চরণসুখীর নয়। কিন্তু তবু বাজ অন্তরপুরদ্বকে ভবু থামানো শক্ত। ভেতর থেকে ফিস্ ফিস্ করে তিনি বললেন,—আহা, তর্কের কি দরকার? একথা তো মানতেই হবে যে জীবনের নীতিবোধ এবং শিল্পের স্বপ্নস্ব-জ্ঞান

সাহিত্যকের পক্ষে অপরিহার্য। যেমন ফুলের পক্ষে ফুলের বোটা!

আমি বললুম, কোথায় যেন পড়েছি এই ধরনের কথা?

তিনি গুণ্গুণ করে কবিতা শোনালেন :

তুমি ভাবো এই-যে বোটা
কিছুই বাকি নমকো ওটা,

ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাঁধন স্বীয়

তখনি ফুল হয় যে পড়ো পড়ো।

আমি বললুম, বাঃ ঠিক ঠিক। অতিরিক্ত প্রকৃতিবাদ আর সৌন্দর্য-বিমুখতার আড়ম্বরে সাহিত্যকুসুমের সত্যিই আজ 'পড়ো পড়ো' অবস্থা! কথাটা ভালোই শোনালেন!

তিনি বললেন :

বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচার
অপমানের থেকে বাঁচায়

ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা

গোপনে রয় একা একা,

নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।

আমি জোর করে নিজেকে চুপ করিয়ে রাখলুম। ও-পক্ষের কবিতার ইশারা আমার খুবই ভালো লাগছিল। এ অবস্থায় ঠুকে তারিফ করলেই বিরুদ্ধ পক্ষ ফোঁশ করে আবার কোন ছড়া শুনিয়ে আমার মনের ঘোর ভেঙে দেবেন, এই আশঙ্কায় আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম শুধু। উনি বললেন—

বনের ও তো আদুরে নয়,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,

গায়েতে ওর নাইকো অলঙ্কার;

রস জোগায় সে চুপে-চুপে,

থাকে নিজে নীরব রূপে,

আপন জোরে বহে আপন ভার।

শুনতে শুনতে 'আধুনিক' সাহিত্যের জৈব আবহাওয়ার আত্নানদের ব্যাখ্যা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এসব কথা আরো স্পষ্ট করে ধরতে গেলোই

রুচ হয়ে উঠবে ভাষা। তাই মনে মনে বললুম,—মন, তুমি মনে রেখো, তুমি সমালোচক নও। তুমি ভ্রমণে বেরিয়েছ। সুখী হতে চাও শুধু। সেই সুখ যেখানে যতোটুকু পেরেছ, সেইটুকুই শুধু মনে রেখো। তার বেশি কোনো দায়িত্ব নেই তোমার। তোমার হেমিঙুয়ে ভালো লাগে, শরৎচন্দ্র ভালো লাগে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি ভুলতে পারো না, শরদ্বন্দ্যু তোমার অত্যন্ত প্রিয়—আবার কামদ, সাত্তে, কাফ্কা ইত্যাদিকেও ক্ষণে ক্ষণে তুমি স্মরণ করো! এরা সকলেই তোমাকে সুখী করেছে। তোমার তো সম্প্রদায়-বন্ধন নেই। তুমি ফুলের ফসল দেখে যাও। সৃষ্টির ফুল যে স্রষ্টার কান্ড-জ্ঞানের বোঁটার বাঁধা থাকে, সেটা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু ওসব কথা বলতে গেলেই অশান্তি ঘটবে। জড়িয়ে পড়বে শক্ত শক্ত পিঁড়ির তর্কে। চুপ করে থাকো, তুমি চুপ করে থাকো মন!

আমার সেই কবিতা পাঠক বললেন :

কাঁটা বধন উঁচিয়ে থাকে
অহিংস কেউ কয় না তাকে—

যতই কিছু করুক-না বদমান,

পশুর কামড় থেকে বাঁচবে

বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে

সেই তো জানে কাঁটার কত দাম!

অনুভব করা গেল যে বোঁটার মতন কাঁটাও সত্যিই মূল্যবান! লেখকের নিজের মধ্যেই যদি কাঁটা এবং বোঁটা না জন্মায়, তাহলে ফুলের সুস্থতা এবং নিরাপত্তার জন্যেই পাঠককে সে-কথা বলতে হয়। পাঠক বাধ্য হয়ে উচ্চভাষী সমালোচকও হতে পারেন। কিন্তু সে-কথা থাক্। ইতিমধ্যে কবিতা পাঠ শেষ করে তিনি বললেন—'বলুন তো কার লেখা?'

আমি বললুম : 'দিনরাত তোমার এ হিদ্ হিদ্ হিদ্কারে আমার পাজিরিতে তিড়িৎক লাগে।'

তিনি বললেন : 'সাবাস!'

শেষ



ভারতদর্শন

রাষ্ট্রপতি জেনারেল অরুণ চৌধুরী ও এয়ার-মার্শাল অর্জুন থেকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে সন্মানিত করছেন।

খণ্ডিত সমাধান

আলিগড় যা পারে নি, বারাণসী তাই করে একটা মহৎ-ও উদার আদর্শ স্থাপন করবে এমন কথাটা বারি ভেবেছিলেন, অবশ্যই তাঁদের দাবিতে আশার অতিরেক ছিল। ভারতীয় ইউনিয়নে তাঁরা বারংবার এ জাতীয় একদেশদশী দাবিই রেখে আসছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের গোড়া গোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাঠশালার উদ্যমের কথকতা প্রচারে অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব নামকরণ করে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি যে ক্ষেত্রে, সেই অবস্থায় অনেকে চেয়েছেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করুক তার 'হিন্দু' শব্দ। এই চাওয়ার মধ্যে মহৎ আদর্শের আহ্বান আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যেই দাবিদায়ের দুর্বলতাও প্রকট হয়েছে বললে অত্যুক্তি অপরাধ নেই। এমনও যদি হত, শ্রীচাগলা যদি কেবলমাত্র মালবাজীর নাম প্রতিষ্ঠার দ্বারা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নামটিকে ইতিহাসের বস্তুমাত্র পর্ষবসিত করতে চাইতেন, তাহলেও হয়ত বা রাষ্ট্রপতির সামনে দশ সহস্রাধিক ছাত্র বিক্ষোভ প্রকাশ করতে এগিয়ে আসতেন না। মালবাজী সর্বজন-প্রমথ্য। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাঁর দান সর্বজনেই অবিস্মরণীয়। মালবাজীর নামে নব নামকরণে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপস্থিত হত না। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল ভিন্নরূপ। শ্রীচাগলা চেয়েছিলেন স্বগুণে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে হিন্দু ও মুসলিম শব্দ দুটির বিলকূল বিলোপ সাধন। কাজটা তিনি ভালই করছিলেন।

সাধারণের এ জাতীয় সংস্কার পন্থাতির প্রতি ঐকান্তিক সমর্থনও ছিল। অন্তত জাতীয়তাবাদী, মূকচেতনার মানুষ্যমাত্রেরই এই সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি সপ্রসন্ন সহানুভূতি ছিল।

দুর্ভাগ্যত আলিগড় রাজী হল না। রাজী হলে বারাণসী যে গররাজি হত না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। যদি সরকার এক সম্প্রদায়ের গোড়ামির কাছে নতিস্বীকার না করতেন, তবে অপর সম্প্রদায়ের গোড়া মতাবলম্বীরা শ্রীচাগলার সংস্কারমূলক কাজে বাধা দানের জন্য পায়ের তলার শক্ত মাটি খুঁজে পেতেন কি?

আলিগড়ে যে হাওয়া ঘুরল, বারাণসী আজ সেই বাত্যাগ্রবাহেই চঞ্চল একধার স্বপক্ষে আরও দু-একটি নজীর তোলা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় আইনসভার বহু সদস্যই উদার-ভাবে 'হিন্দু' শব্দটি পরিত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রস্তাবকালের প্রথম অবস্থায় বারাণসীতে কেন্দ্রীয় বঙ্গোহীন বিক্ষোভও দেখা যায় নি। 'হিন্দু' শব্দ বর্জনে আপত্তি ছিল না কংগ্রেসী দলের। এক বহুসংখ্যক সদস্যবর্গের, আপত্তি ছিল না কমিউনিস্ট ও পি-এস-পি সদস্যবর্গের। অথচ হাওয়া ঘুরলে দেখা গেল ঐ পি-এস-পি দলেরই নেতা শ্রী এইচ ভি কামাথ ঐ বিতর্কিত বিলটি স্বগীত রাখার প্রস্তাব টেবলস্ব করলেন এবং স্বপক্ষে সমর্থনও পেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর প্রস্তাবটি ১৩৭-৫১ ভোটে গৃহীত হল। কতিপয় সদস্য 'শেম শেম' ধর্মান দিগে অপদস্থ করতে চাইলেন বটে প্রস্তাবটিকে, কিন্তু সে ধর্মানের মধ্যে লজ্জাটি ঠিক কার বা কাকে দেওয়া হল সাধারণ লোক সম্ভবত তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

করবেন কি করে! কাজটা ও'রা কি যথেষ্ট চিন্তা করে করেছেন। ধর্মানদানে বাধা নেই, বিশেষত আইনসভায়। কিন্তু হাওয়া একক্রে অধোবদন হয়েছেন তাঁরা, অপর ক্ষেত্রে উদার প্রদর্শনের বায়না ধরেন কেমন করে! আর এ বায়না কি এটাই প্রমাণ করে না যে, ভারতবর্ষে একপেশে বিচারের দ্বারা সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার বাহাদুরি আদার করার মনোভাবই তাঁদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু সেকুলারিজম একমিথিত ধর্মসম্প্রদায়ের মাথার কীটাল ভেঙে পড়িত্য ক'বা যায় না। যেখানে সম্প্রদায়বিশেষের ওপর সমান দাবি প্রয়োগের ক্ষমতা দুর্বলতার দ্বারা ক্ষেত্রবিধে নরম, যেখানে গরম কথার চেয়ে ক'বা ক'ব্ব করাই বাঞ্ছনীয়। মূলতুর্বা প্রস্তাব গ্রহণ করে অধিকাংশ সদস্য সেই উচিতাই পালন করলেন।

ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রম জ্ঞা করে একটি বিবরণ সুস্পষ্ট হল যে, সেকুলারিজম তখনই সাধক হবে—যখন সর্বধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি দেশনেতৃবর্গ সমান দাবি রাখার মত মনোবল অর্জন করবেন। নচেৎ সংস্কারের প্রাণ শিকের ডোলাই থাক। ঘাঁটির কদম তেলোর প্রয়োজন নেই।

হিন্দু এবং মুসলিম শব্দ দুটির অস্তিত্বে সেকুলারিজম কোথায় ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে তা কিন্তু খুব সূক্ষ্ম বিচারে না গেলে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে বস্তুি এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামের ওপর ধর্মীয় টিকেট ক'লে কেন। অকাট্য বস্তুি। অনাচিত।

সর্বজনপ্রমথ্য বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রেষ্ঠ মনস্বী আমাদের রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে যে মূল্যবান বাণী দান করেন, তাতে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পুণঃখণ্ড বিদ্যার বাইরে ছাত্রমনে উদার মননমুষ্টির জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করার আহ্বান

জানিয়েছিলেন। হর্ম-সম্প্রদায় জাতিবর্ণের গোড়ামি সেই ঔদার্যের পরিপন্থী। শ্রীচাণ্ডার মাননিক ঔদার্য সে সত্য উপলব্ধি করেছিল। সে সত্য উপলব্ধি করেন প্রকৃত আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সংগে ধর্মীয় নামের সংযুক্তি সে ঔদার্যের মধ্যে অবশ্যই সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার মনোভাব জ্বিইয়ে রাখতে সহায়তা করবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎমাত্র স্খিমত নেই যে, বিদ্যালয় প্রকৃতি জনশিক্ষাধানে ধর্মীয় প্রভাবের পক্ষ বিস্তারিত থাকলে সজোরে সেই প্রসারিত পক্ষে আঘাত হানতে হবে।

কিন্তু বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কোনও অভিযোগ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আলিগড়ের ঘটনাই বারাণসীতে পরিণতি লাভ করেছে। আর তার সুযোগ গ্রহণ করেছেন গোড়ামিতত্ত্ব মহাব্যগীর চিন্তাদর্শের ধারক-বাহকগণ। মিছিলের মুখে শোনা গেছে 'হর হর মহাদেও' রব।

সেকুলার রাষ্ট্রে ধর্মার্চনায় কারও ওপর বিনিময় নেই। কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামি ধর্মের প্রতিজ্ঞা আছে।

কোনও সেকুলার রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষভাবে এক সম্প্রদায়ের গোড়ামিতে আঘাত হানার সংকল্প পরিহার করতে বাধ্য হয়, তবে তার দ্বারাই অন্য সম্প্রদায়ের সম্বল-লালিত মনোভাব ও ভাবাবেগের ওপর খবর-দারির অধিকার সে স্বকর্মের দ্বারাই হারিয়ে বসে।

সন্দেহ হয়, বিচক্ষণ চিন্তাবিদ শ্রীচাণ্ডা কি তবে সে সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন: আর সেজন্যই কি তিনি রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক ভোটবলে সংশোধনী প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাওয়ার পরেও লোকসভায় এই বিল উত্থাপনকালে কংগ্রেসী সদস্যবর্গকে বিলটির উপর স্বাধীন মতামত প্রকাশের আহ্বান জানান।

ঘটনা বা দুর্ঘটনা বাই হোক, বর্তমান ভারতের সমস্যাশীড়িত পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ভিগির বন্ধের জন্যই সম্পূর্ণ ন্যায়চার্য ওপর একটা পদা বিছানোর প্রয়োজন ছিল। এটা কোনরকম হারজিতের প্রশ্ন নয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রশ্ন। সে প্রশ্নের আপাতত এই খণ্ডিত সমাধান অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতই মানে মানে মেনে নেওয়ার মধ্যে নতুন কোনও বিস্ময়ের কারণ নেই।

ইন্দো-নেপাল মৈত্রী

নেপালের মাননীয় মহারাজা ও রাণী উল্লেখযোগ্য বিবর্তিত পর পুনরায় ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করে ভারত-নেপাল মৈত্রীর অবিচ্ছেদ্যতাই প্রমাণ করলেন। নেপালের মত ক্ষুদ্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বরের পক্ষে ভারত-বৈরী চীন ও পাকিস্তানের

প্রতিবেশী-অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ভারত-ভ্রমণে আসা মধ্যস্থিত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করার কারণ আছে। চীন ও পাকিস্তানের কথা স্মরণ রেখেই নেপালকে পাক-ভারত বিরোধের কালে নিষ্কিন্দ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারতবাসী সেজন্য তিলমাত্র বিচলিত নন; নেপালের ভৌগোলিক অবস্থিতিজনিত রাজ-নৈতিক অসুবিধার কথা তারা মর্মে মর্মেই অনুভব করতে জানেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ভারত থেকে নেপালে পলাতক সূচা সিংকে কেন্দ্র করে ইন্দো-নেপাল সম্পর্ক সাময়িকভাবে কিছুটা বিচলিত যে হয় নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র চিড় ধরে নি দুই ভূমিস্থানীয়া রাষ্ট্রের সম্প্রীতিপূর্ণ মনোভাবে। বরং নেপাল-ভারত সমঝোতা সময় সাপেক্ষে গভীরতরই হয়েছে।

নতুন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভোজ-সভায় নেপালধর্মী রাজা মহেন্দ্র যে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি স্বেচ্ছায় উচ্চারণ করেছেন তাতেই ভারতের নীতিধর্মী কার্যকলাপের প্রতি রাজার আন্তরিক সমর্থন স্পষ্টপ্রকাশ হয়েছে।

নেপাল ও ভারত উভয়ের স্বার্থেই উভয়কে হাত হাত মিলিয়ে বসবাস করতে হবে। নেপালেরও যে সে বিষয়ে মতবৈধতা নেই, তারও ইংগিত মহামান্য রাজা তার মূল্যবান বক্তব্যে রেখে গেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, শান্তিপূর্ণ ভারতের নীতিতে নেপাল চিরকালই শ্রদ্ধাশীল।

স্মরণ থাকতে পারে, সংঘর্ষকালে নেপাল-

ভারত সমঝোতাযে যাবে মিশে। প্রচারণা দ্বারা ফাটল ধরাবার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন পাক সরকার। কিন্তু সেসবের ফলশ্রুতি হয় নি।

বীরচক্রে পদ্ম বিভূষণ

এক বিশেষ সমারোহপূর্ণ উৎসবে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলকর্তৃবল্লের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ ভারতবর্ষের বীর ভূষ-দের এবং ভারত রক্ষার জন্য যারা বীরচক্রে সংগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ভারতবাসী ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান পদক বিতরণ করেন।

বরণক্ষেত্রে যারা বিদায় নিয়েছেন তাদের মধ্যে ক্যাপটেন চন্দ্রনাথ সিং-এর পিতা বীর সন্তানের প্রতি প্রদত্ত সম্মান মহাবীর চক্র গ্রহণ করেন যথার্থ সৈনিকের মত অবিচলিতভাবে। তিনি মহাদাপূর্ণ মৃত-কাওয়াজ করে ভারতের পালমুলে গিয়ে পুত্রের প্রতি অর্পিত দেশবাসীর প্রার্থার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন প্রকৃত সৈনিক গান্ধীর্ষের সঙ্গেশ। পিতা ক্যাপটেন কলবন্ত সিং নিজেও একজন প্রাক্তন জওয়ান অফিসার।

মহাবীর চক্রের সম্মান লাভ করেন আরও চারজন লোকান্তরিত অফিসার লেঃ কঃ নরেন্দ্রনাথ খান্না ও হরবরলাল মেহতা, এবং মেজর ভূপিন্দর সিং ও এ আর ত্যাগী। বীরচক্রে দেওয়া হয় মেজর এম এ আর শেখ ও এস এস শর্মা এবং ল্যান্স হাবিলদার উমরাও সিং ও লেঃ নায়ক প্রীতম সিংকে।



নেপালের রাণী রত্না দেবীর সংগে শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী

এঁরাও বীরের মতো বরণ করায় এই শ্রদ্ধাার্হ গ্রহণ করেন এঁদের বিধবা পরগণ।

পদ্মভূষণের সম্মান অর্জন করেন লেঃ জেঃ হরবল্ল সিং (কারাগল-কাসুর-হিরো) এবং অপরাপর তিনজন কোর কমান্ডার লেঃ জেনারেল এস কে কাটোচ, জে এস ধীলন এবং পি ও ডুন। একই সম্মানে ভূষিত হ'ন, এয়ার ভাইস মার্শাল পি সি লাল এবং জাব রাজারাম।

এছাড়াও রান্ধক নির্বিশেষে বহু বীর জওয়ানকেই এই অনুষ্ঠানে মহাবীর চক্র ও বীর চক্রে ভূষিত করা হয় বীরের নামের সুনীর্ঘ তালিকা পাঠক সাধারণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় হাঁতমধ্যেই দেখেছেন।

বিশিষ্ট সেবা পদক পেয়েছেন, মেঃ জেঃ বোগীন্দর সিং ও লেঃ জেঃ হরবল্ল সিং। এঁরা পেয়েছেন প্রথম শ্রেণীর পদক। ডাছাড়া এই পদকের মর্যাদা লাভ করেছেন, গ্রুপ ক্যাপটেন জি কে জন ও ডব্লু এ লয়েড।

আর এই উজ্জ্বল বীরবৃন্দের নক্ষত্র-মণ্ডলীয় মধ্যে উজ্জ্বল রক্তস্বরূপ জেনারেল চৌধুরী ও এয়ার মার্শাল অর্জন সিংকে ভূষিত করা হয়েছে পদ্মবিভূষণের সর্বোচ্চ সম্মানে।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ চ্যাটার্জী

ভাইস এ্যাডমিরাল বি এস সোমনের অবসর গ্রহণের সময় সমাগত। আগামী বছর তিনি কার্খভার থেকে অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজের বর্তমান কমান্ডাণ্ট ভাইস এ্যাড-মিরাল এ কে চ্যাটার্জী।

বর্তমানে তিনি একদল বৎসরের কর্মঠ জওয়ান। ১৯৩৩ সালে ক্যাডেটরূপে শ্রীচ্যাটার্জী যোগদান করেন রয়াল ইন্ডিয়ান নৌভেতে। শ্রীচ্যাটার্জীর নৌ-শিক্ষা অতঃপর ইংল্যান্ডের মাটিতে। বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন তিনি ডুবোজাহাজী যুদ্ধে।

আবার আলোচনা

সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পত্তি নিয়ে ইচ্ছামত ছিন্দিমিন খেলার পর আবার আলোচনায় বসতে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ রাজী হয়েছেন। তার কারণ, সোভিয়েট জনগণের ভাঙতে প্রতি একান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবকে মনে মনে ভয় করতে শিখেছে এখন পাকিস্তান। সোভিয়েটের আহ্বানকে তাই প্রথম দফার কার্খত প্রত্যাখ্যান করলেও বর্তমানে আয়ুব সরকার গতানুগত খুঁজে পান নি।

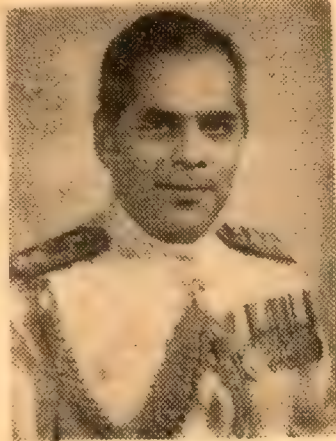
তা সে বাই হোক। পাক খেলার সাময়িক অবসান যখনই উপস্থিত হয়েছে ভারতবর্ষ তখনই সাড়স্বর আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করে চুক্তিপত্রের শ্রাশ্ব করেছে। এবারও তাঁর ব্যত্যয় ঘটবে না এটা জানা কথা। তবে এবার শাস্ত্রী সরকার কিছু অনমনীয় মনো-ভাব গ্রহণ করেছেন। ভারতের শর্তাদি মেনে না নিলে শাস্ত্রী আলোচনা নিষ্পত্তি একথা সম্পর্ক-

ভাবে শাস্ত্রী সরকার বারম্বার ঘোষণা করে পাক-মনকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। পাক-মনের পাচি কিছু শিখিল করে অতঃপর যদি কোনো স্থায়ী সমাধানে পাকিস্তান সত্যিই রাজী থাকে তবে ভারত যে সানন্দে পাকিস্তানের সঙ্গে গলাগলি বসবাস করবে এ বিষয়ে ভারতের কেন, বিশ্ববাসীর মনেও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়।

বিহার :

আই এন টি ইউ সির জবর দখল

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে বিহার আই এন টি ইউ সি দখলের অভি-সন্ধিতে নিজের বাছাই করা বশব্দ সদস্যগণকে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার মনোনয়ন দিচ্ছেন বলে একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃবর্গ। তাঁদের অভিযোগ, এমন স্বেচ্ছা-চার সঙ্ঘবদ্ধ পথাবলম্ব



এ. কে. চ্যাটার্জী

রীতির বিরুদ্ধাচরণই নয়, এভাবে আই এন টি ইউ সি-র সংখ্যাধিকের মনোনীত সদস্য-গণকে বাদ দিয়ে অপর কোনো রাজ্যে এমন কি কেন্দ্রেও ট্রেড ইউনিয়ন গ্রাসের নজীর নেই।

ফলত যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে বিহারে তাই প্রকাশ্য পরিচয় প্রদান করেছেন রাজ্য ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামানুজম ও সভাপতি সদস্যবর্গকে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার যোগদানে বিরত থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সদস্যরা যাতে বিহার সেন্ট্রাল লেবার এ্যাডভাইসারি বোর্ডেও যোগদান না করেন নির্দেশ প্রচারিত হয়েছে তার জন্যও। সদস্যবর্গ স্টি্যাণ্ডিং লেবার কমিটি এবং ইন্ডাল্লেশন কমিটিতেও যোগ দেবেন না।

রাজ্য আই এন টি ইউ সির সঙ্গে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহার-এর বহুকাালের স্বেচ্ছা এবার প্রকাশ্য ক্ষমতার টানা পোড়নের রূপ নিল এবং মনে হয় শ্রমিক নেতাদের এই চ্যালেঞ্জের ফলে শ্রীমহার এবার বেশ বেকারদায় পড়বেন।

অঙ্গ :

বিচারালয়ের অবমাননা

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার স্পীকার শ্রীযুত সূক্ষা রোহি রাজ্য সরকারের প্রতি একটি সাবধানবাণীতে বলেছেন, মহাধর্মার্থ-করণের (হাইকোর্টের) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত (Struck down) অতিরিক্ত এ্যাসেসমেন্ট এ্যাক্টের বলে কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিচারালয় অবমাননা করা হবে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকার যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন।

বিরোধী সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতেই স্পীকার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বিরোধী দলের অভিযোগ, রোভিনউ বিভাগের অফিসারগণ ডিম্যান্ড নোটিশের দ্বারা অধুনা-বাতিল আইন অনুসারে রাইয়তগণকে অধিকতর রাজস্ব দানে বাধ্য করেছেন। স্পীকার শ্রীরোহি বলেছেন, রাইয়তগণ অধিক রাজস্ব দিতে বাধ্য নন, বাধ্য করা হলে তার দ্বারা বিচারালয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হবে। তিনি এ জাতীয় ডিম্যান্ড নোটিশের নমুনা কপি দেখানোর জন্য বিরোধী সদস্যকে অনুরোধ করেছেন। রাজস্বমন্ত্রী শ্রী এন রামচন্দ্র রোহি বিরোধী বক্তব্যের জবাব দিতে অস্বীকার করলেও একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকার এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের স্মরণাপন্ন হওয়ার পরিকল্পনা আঁটছেন বটে, কিন্তু হাঁতমধ্যে কোনও সাকুলার প্রকাশ করে অধিক রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ কোনও রোভিনউ অফিসারের কাছে প্রেরণ করা হয় নি।

সংবাদটি গুরুতর। রাজস্বমন্ত্রীর ভাষণে সরকারী দায়িত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন-বিভাগ বিচারবিভাগের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। আবার বিরোধী বক্তব্যকেও একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন নি রাজস্বমন্ত্রী।

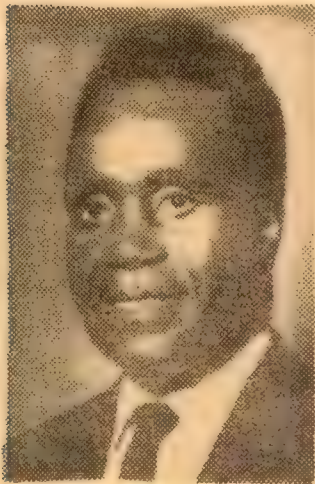
সুতরাং বিরোধী বক্তব্যের সারবত্তাকে পরোক্ষে কিছুটা বরণ আমলই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন অভিযোগ যে তাঁরা রাখেন নি, শ্রীরামচন্দ্রের এ সম্পর্কে কোনওরূপ মন্তব্য না করার ঘটনাটিই সে সন্দেহ উদ্ভূত করে।

এমতাবস্থায় রাজ্যসরকার সুপ্রীম কোর্টে কবে আবেদন করবেন সেটাই বড় কথা নয়; গুরুতর প্রশ্ন হল, সরকারী আমলাবর্গ তবে কার নির্দেশে এবং কোন দৃষ্টান্তে ডিম্যান্ড নোটিস ছাড়ছেন, তার তদন্ত করা দরকার। আমলাতন্ত্র কি তবে বিচারালয় ও সরকারকেও অতিক্রম করে চলতে সুরু করেছে! স্বভাবতই এ প্রশ্ন সাধারণের মনকে নাড়া দেবে এবং তারই জবাবে অবিলম্বে তদন্ত ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে। কাজটা তিনি ভালই করছিলেন গ্রহণ করা না হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অরাজকতার সৃষ্টি হবে।

বুটেন কি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছে? ২৭শে নভেম্বর লন্ডনের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে এই খবর খুব বড় করে ছাপা হয়েছে। রক্ষণশীল দলের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন জাম্বিয়ায় ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর দুটি ইউনিটকে পাঠাবেন—দক্ষিণ রোডেশিয়ার বে-আইনী স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকায়ের স্বাধিকার অগ্রাহ্য করে দু'লক্ষ শ্বেতাঙ্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আইয়ান স্মিথ ও তার দল দক্ষিণ রোডেশিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার পর বুটেন এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অবৈধ ও স্মিথ সরকারকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছে। স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে বুটেন কিছু কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। কিন্তু বুটেন স্মিথ সরকারকে স্বীকার না করলেও এই সরকারের অবসানের জন্য কার্যকরী কিছুই করেছে না, আফ্রিকা তথা সমগ্র বিশ্বের আজ এই অভিযোগ। বুটেনও বুঝেছে, অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা স্মিথদের জন্ম করা যাবে না। এই কারণেই কি বুটেন সামরিক ব্যবস্থার কথা ভাবছে? প্রত্যেকটি দেশ যখন দাবি জানিয়েছে, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, বুটেন তা মানতে অস্বীকার করেছে। এই নিয়ে শ্রমিক দলের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

জাম্বিয়ার অর্থনীতির দিক দিয়ে অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা বাধ। এই বাধ থেকে ভাঙার খনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কৌন্ডার আশংকা, স্মিথের চরম এই বাধ ধ্বংস করবে। তাই তিনি উইলসনকে অনুরোধ করেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাম্বিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ



কেনেথ কৌন্ডা



জাম্বিয়ার সৈন্যরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে

পূর্ণ বাধ ও বিদ্যুৎ-লাইন রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানো হোক। সম্প্রতি এই কবিতা বাধে বড় রকমের একটি নাশকতামূলক ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনার পরই হ্যারল্ড উইলসনের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড লুসাকা এসেছেন, কেনেথ কৌন্ডা ও অন্যান্যের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য। এর পরেও যদি উইলসন জাম্বিয়ার সৈন্য না পাঠান, তবে ঘানা, তানজানিয়া, ইথিওপিয়ার সৈন্য আসবে এবং তা বুটেনের পক্ষে মোটেই ভাল হবে না।

ব্রিটিশ সৈন্য যদি সত্যি জাম্বিয়ায় আসে, তাহলে তা যে শেষ পর্যন্ত জাম্বিয়ার মধ্যেই থাকবে, এ কথা জোর করে বলা যায় না। জাম্বেসী নদীর দুই তীরে জাম্বিয়া ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বিবাদ বাধিতে কতক্ষণ?

এদিকে সংবাদ পাওয়া গেছে, দক্ষিণ রোডেশিয়ার গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবস্ তার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ার কয়েকজন উদারনৈতিক শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে ন্যাক তার এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে; খাস বুটেন থেকেও সম্ভবত কয়েকজনকে মন্ত্রিসভায় নেয়া হবে। এই মন্ত্রিসভার প্রধান কাজই হবে

অবিলম্বে দেশে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সত্যি যদি গিবস্ এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তাহলে স্মিথের সঙ্গে তার কতক্ষণ বিরোধ চরমে পৌঁছবে। তখনও কি বুটেন তার প্রতিনিধি গিবস্কে কতক্ষণ সমর্থন সৈন্য প্রেরণ করবে না?

কংগো:

কংগোর রাজনীতিতে আবার পট-পরিবর্তন হয়েছে। ২৫শে নভেম্বর এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্রপতি যোশেফ কাসাভুবু অপসারিত হয়েছেন, এবং তার জায়গায় নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন অভ্যুত্থানের নামক কংগো সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল যোশেফ মবুতু।

২৪শে নভেম্বর কংগো সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের এক বৈঠকে এই ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেনাবাহিনীর প্রধানের অতি সহজেই সরকারের সকল বিভাগের কর্তৃত্ব দখল করে কাসাভুবুকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। ২৫শে নভেম্বর রেডিও লিওপোল্ডভিল থেকে এই অভ্যুত্থানের কথা ঘোষণা করা হয়। কংগো-বাসী এই পরিবর্তনকে শান্তভাবে গ্রহণ করেছে। কোথাও এ নিয়ে কোনরূপ

গোলযোগ শুরু হয় নি। কাসাভুবু নিজেকে এই অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন।

মবুতু নিজেকে রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'চীফ অব দি আর্মি স্টাফ' কর্বেল লিওনার্ড মূল্যবাক্যে কংগার নতুন প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগের কথাও জানিয়েছেন। মবুতুর জারগার সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান হয়েছেন মেজর জেনারেল লুই বোবোজো।

কাসাভুবুকে ক্ষমতাচ্যুত করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মবুতু বলেছেন, কাসাভুবু সম্পূর্ণরূপে বার্থ হয়েছেন। কাসাভুবু ও ময়সে টি শোম্বের বিবাদের ফলে দেশে চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। সর্বনাশের হাত থেকে কংগোকে রক্ষা করার জন্যই মবুতু সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, রাজনীতিতে অংশ নেবার কোন ইচ্ছা সেনাবাহিনীর নেই। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেই তাঁরা শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আবার সেনাদলে ফিরে যাবেন।

কাসাভুবু ও টি শোম্বের বিবাদের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তারই পরিণতি এই সামরিক অভ্যুত্থান। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে যেদিন কাসাভুবু টি শোম্বেকে অপসারিত করেছেন, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে উত্তরের শান্তি পরীক্ষা। আগামী বৎসরে কংগার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবার কথা ছিল। এই নির্বাচনে টি শোম্বের কাসাভুবুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এই আশঙ্কা করেই কাসাভুবু টি শোম্বেকে জারগে এভারিস্টে কিম্বাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। টি শোম্বের সহজে এই অপমান হুজুম করার লোক নন। তিনি কাসাভুবুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, এবং আগামী বৎসর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাসাভুবুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এদিকে কংগার সংবিধান অনুসারে নতুন প্রধানমন্ত্রী কিম্বাকে তাঁর মন্ত্রিসভার জন্য প্যারামেটের আস্থাসূচক ভোট গ্রহণ করতে হবে। ১৪ই নভেম্বর কিম্বা যখন এই আস্থাজ্ঞাপক ভোটের জন্য প্যারামেটের সম্মুখে এসেছেন, টি শোম্বের সমর্থকরা তাকে হারিয়ে দিল। ১২১-১০৪ ভোটে কিম্বা পরাজিত হলেন। কাসাভুবু অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কিম্বাকে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অগ্রহা করে এভাবে কিম্বাকে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থ্য বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এরপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার ফলেই মণ্ডে মবুতুর আবির্ভাব।

কাসাভুবুর অপসারণের সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই টি শোম্বের উল্লসিত হয়েছেন। ২৫শে নভেম্বরের অভ্যুত্থানের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে তিনি একটি বিবৃতি পৰ্যন্ত প্রচার করেছেন। কিন্তু মবুতুর পরবর্তী ঘোষণা

সমূহ তাঁকে হতাশ করেছে। মবুতু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অন্তত পাঁচ-বৎসর রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন। আগামী বৎসর নির্বাচন হবে না, এবং শীঘ্রিই তিনি সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তা হলে টি শোম্বের কি হবে?

এখন প্রশ্ন হল: মবুতুর আমলে কি কংগার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির কোন পরিবর্তন হবে? ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় রৌডিও লিওপোল্ডভিল থেকে যে তেরো দফা ঘোষণা করা হয়, তাতে রাষ্ট্রসংঘের প্রতি কংগার আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, এবং বলা হয় যে, কংগা আফ্রিকা এক সংস্থা বা ও-এইউ-এর মধ্যে থেকে কাজ করবে। কাসাভুবু ও টি শোম্বের দু'জনেই বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাসভাজন ছিলেন। টি শোম্বের অপসারণের পর আবার অনুষ্ঠিত আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম কাসাভুবু পশ্চিমী-মেরা রাজনীতির পরিবর্তে আফ্রিকার সংহতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। মবুতু কাসাভুবুর এই নতুন পন্থা অনুসরণ করে আরও বামপন্থার চলবেন, না আরও বেশি পশ্চিমী-মেরা নীতি গ্রহণ করবেন, সে কথা এখনই জোর করে বলা শক্ত। তবে তিনি ইতিমধ্যেই কংগার প্রাক্তন সহকারী প্রধানমন্ত্রী অ্যাণ্টনি গিজেনগাকে মৃত্তি দিয়েছেন। গিজেনগা কংগার বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও লুমুম্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। টি শোম্বের আদেশে তাঁকে চোদ্দ মাস আটক থাকতে হয়েছে। সুতরাং কংগোতে স্বাধীন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অস্তবিরোধের নিষ্পত্তির জন্য মবুতু লুমুম্বাপন্থীদের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করবেন, এবং জেট নিরপেক্ষ স্বাধীন নীতি গ্রহণ করবেন, এমন একটা আশা কোন কোন মহলে দেখা দিয়েছে।

মবুতুর বয়স সবুই কম—মাত্র ৩৫। সেনাবাহিনী ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা আছে। ১৯৬০ সালে আর একবার মবুতু না মাসের জন্য ক্ষমতা দখল করে কলেজ অব কমিসনারের সাহায্যে কংগার শাসন চালায়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা অর্জিত করে থাকেন নি। অধীর বেসামরিক লোকদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই এবারও আশা করা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জাতির প্রয়োজনেই তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, জাতির জন্যই তিনি কাজ করবেন।

গায়ানা:

অবশেষে ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব এন্ড্রান গ্রিনউড ঘোষণা করেছেন, আগামী বৎসর ২৬শে মে ব্রিটিশ গায়ানা স্বাধীনতা লাভ করবে, এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম থেকে 'ব্রিটিশ' কথাটি বাদ গিয়ে হবে শুধু গায়ানা। সতেরো

দিন ব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর গত ১৯শে নভেম্বর গ্রিনউড লন্ডনে এই কথা ঘোষণা করেন। 'ব্রিটিশ' গায়ানার প্রধানমন্ত্রী ফরবেস বার্নহাম ব্রিটিশ মনে ব্রিটেন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

১৬২ বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পর ল্যাটিন আমেরিকার এই ক্ষুদ্র দেশটি স্বাধীনতা পাবে। বহু পূর্বেই এই দেশ স্বাধীনতা পেত, কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থেই এতদিন তা আটকে রাখা হয়েছিল। 'ব্রিটিশ' গায়ানার অধিবাসীরা প্রোগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু এই আন্দোলন দমন করা যায় নি। ১৯৫৩ সালে যখন দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রোগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে, এবং দলের নেতা ডঃ ছেদী জগান প্রধানমন্ত্রী হন। উইলস্টন চার্চিল তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। কিছু দিন পরেই তিনি ব্রিটিশ গায়ানার সংবিধান বাতিল করে দেন। ছেদী জগানের অপরাধ, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আকের ক্ষেতের শ্বেতাম্রণ মালিকদের স্বার্থে তিনি যা দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর চাকরি থাকবে না। কিন্তু তারপরও ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও ছেদী জগান ও তাঁর দলই জয়লাভ করলেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ছেদী জগানকে সরানো গেল না। তখন শুরু হল ইংরেজদের চিরকালের খেলা। তারা গায়ানাবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পারস্পরিক দাণ্ডা-হাংগামার উস্কানি দিতে লাগল।

ব্রিটিশ গায়ানার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ মোট জনসংখ্যার ৪৮ ভাগ। অপর সম্প্রদায় নিগ্রো—তাদেরও সংখ্যা দু' লক্ষের কিছু কম। ইংরেজরা ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ছেদী জগানের সহকর্মী নিগ্রো নেতা ফরবেস বার্নহাম ইংরেজ ও মার্কিন মূল্যবাদের পরামর্শে প্রোগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টি ত্যাগ করে পিপলস্-ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে নিগ্রোদের পৃথক দল গঠন করলেন। এর পরও ছেদী জগান বার্নহামের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করতে চেয়েছেন, দু'দল মিলে এক সংগে স্বাধীনতার দাবি তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু বার্নহাম রাজী হন নি। ১৯৬২ সালে ছেদী জগান আবার জয়লাভ করার পর ইংরেজদের প্রকাশ্য উস্কানিতে শুরু হল দেশব্যাপী রক্তক্ষয়ী দাণ্ডা—করেক শত নিরপেক্ষ ভারতীয় ও নিগ্রো নিহত হল। এই দাণ্ডার 'ব্রিটিশ' গায়ানার ইংরেজ গভর্নর থেকে পুলিশ প্রধান সবাই অংশ গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার জগান সরকারকে বাতিল করে দিল।

এর পর সংবিধান সংশোধন করে, 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার' ভিত্তিতে নির্বাচনের প্রস্তাব সহ নতুন একটি সংবিধান প্রবর্তন করা হ'ল। সমাজবাদী ছেদী জগান যাতে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন তার জন্যই এত সব আয়োজন। ছেদী জগান ভারতীয়দের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়, আর ভারতীয়রাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। সুতরাং ভারতীয়দের প্রাধান্য নষ্ট করতে হবে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ১৯৬৪-এর শেষ দিকে নতুন নির্বাচন হল। এবারও ছেদী জগান ও তাঁর দল সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বান'হামের সংখ্যালঘুগণ পিপলস্ ন্যাশনাল কংগ্রেস পিটার ডি' আগুয়ারের ইউনাইটেড ফোর্স পার্টির সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন।

ইংরেজ ও মার্কিন কারেমী স্বার্থের বিকৃত বান'হাম ও তাঁর দলের হস্ত ক্রমতা দিতে ব্যুতনের আপত্তি নেই। তাই সূর্য হল লন্ডনে সম্মেলন। 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রচার' নির্বাচন বহাল রেখে ক্রমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ওঠায়, ছেদী জগান ও তাঁর দল লন্ডনে সম্মেলন বয়কট করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত বান'হাম ও ব্রিটিশ সরকার মিলে এই স্বাধীনতার সিংহাস্ত নিয়েছেন।

গায়না ব্রিটিশ কর্তৃত্বমুক্ত হচ্ছে, এ নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। কিন্তু তিন লক্ষ ভারতীয়কে বাস দিয়ে সংখ্যালঘুগণদের দিয়ে শাসন চালাবার এই ব্রিটিশ প্রচেষ্টা কতটা সামল্য লাভ করবে বলা শক্ত। গায়নার ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যই নেই—ইংরেজদের বিভেদনীতিতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বেধেছে। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসানের ফলে যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন পড়ে ওঠে, তবেই গায়নার স্বাধীনতা সার্থক হবে। না হলে আবার নতুন করে গায়নার রাজনৈতিক সম্ভট দেখা দিলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

ইজরায়েল:

ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার নির্বাচন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। ক্রমতা দখলের জন্য ডেভিড বেন-গুরিয়ন ও লেভি এশকলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই উত্তেজনার কারণ।

ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার দিন থেকে একটানা ১২ বৎসর বেন-গুরিয়ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া দল মাপাই দেশের প্রধান দল। দু' বৎসর পূর্বে তিনি বখন স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন, তখন তিনি নিজে তাঁর জায়গার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য এশকলের গম প্রস্তাব করেন:

সেই এশকলকে বিভাড়িত করার জন্য হঠাৎ ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ বেন-গুরিয়ন ক্ষেপে গেলেন কেন? অনেকে আছে অবসর নেবার সময় হলেও অবসর নিতে চায় না, যদি বা



বান'হাম

অপরের চাপে অবসর নেন, তবু সে চায় তার কথামত সবাইকে চলাতে হবে। বেন-গুরিয়নও তাই চেয়েছেন। এশকল হবেন নামে মাত্র প্রধানমন্ত্রী। সব কাল তাঁর কথামত হবে, এই



সম্প্রতিক এশকল

হল বেন-গুরিয়নের ইচ্ছা। কিন্তু এশকল তা মানবেন কেন? দল ও পার্লামেন্টের আস্থা-ভাজন তিনি, প্রধানমন্ত্রী হবার পর ক্রমতার স্মৃতিও পেয়েছেন। তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা

অনুসারে চলার চেষ্টা করবেন। সূর্য হল বিরোধ।

বেন-গুরিয়ন প্রথমে মাপাই দলের মধ্যে এশকলের বিরুদ্ধে মত গঠনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু দলের অধিকাংশ সদস্য বেন-গুরিয়নের পরিবারে এশকলকে সমর্থন জানাল ও অপমানের জ্বালায় কিন্তু ইজরায়েলি জনক বেন-গুরিয়ন মাপাই থেকে বেরিয়ে আসা নামে নতুন একটি দল গঠন করে। ঘোষণা করলেন, আসন্ন নির্বাচনে দলকে পরাজিত করে এশকলকে ক্ষমতা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী মসে দায়ান ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিমোন পেরেস সহ বেশ কিছু মাপাই-সদস্য যোগ দিলেন। যুবকদের মধ্যেও একটা অংশ বেন-গুরিয়নকে সমর্থন করল।

অশীতিপর বৃদ্ধ নিজে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পল্লীতে পল্লীতে সভা করে বেড়াতে লাগলেন, সংবাদপত্রে এশকল সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। তাঁর অভিযোগ: এশকল যুবসম্প্রদায়কে উপেক্ষা করছেন, নতুন বেসব ইহুদী বিদেশ থেকে আসছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন না, এবং শাসনে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে।

কিন্তু নির্বাচনের কল প্রকাশের পর দেখা গেল, ইজরায়েলবাসী 'জাতির জনক' বেন-গুরিয়নকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর দল রফি মোট ভোটের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ লাভ করেছে, আর পার্লামেন্ট 'নেসেটে' ১২০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন পেয়েছে। বিপরীত দিকে, এশকলের মাপাই দল শতকরা ৪০টি ভোট ও ৪২টি আসন পেয়েছে। এককভাবে না হলেও মাপাই দল আধাব্যমপন্থী আহবৃত হাভোলা দলের সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে, এবং এশকল প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকবেন।

মাপাই আর রফি'র মধ্যে আদর্শগত বিরোধ কিছুই নেই। সম্পূর্ণ বাস্তবগত কারণে এই দলদ্বন্দ্বি। তবু দেখা যায়, বেন-গুরিয়নের দল একটু বেশি গোড়া, এবং আরবদের সঙ্গে যে-কোন রকম বোঝাপড়ার বিরোধী। এশকল ও তাঁর সহকর্মীরা সম্প্রতি আরবদের সঙ্গে কিছুটা মীমাংসার কথা ভাবছেন। তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি বরগুইবার প্রস্তাবমত ইহুদী-আরব আপোষে তাঁদের মত আছে। তবে সত্যি সত্যি যদি তাঁরা এই মীমাংসার অগ্রসর হন, এবং আরব জাতিরাও যদি মীমাংসার প্রস্তাবে সাড়া দেন (বেত'মানে তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না), তখনও আরববিশেষী ইহুদীরা এশকলকে সমর্থন করবে কিনা বলা শক্ত। তবে আপাতত এই নির্বাচনের ফলে ইজরায়েলের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না।

উপহাস

নব্ব্বদ্বাদশ খণ্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২ উনিশ

সব শোনার পর বিজন বলল, 'কিন্তু আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? আর আমাকে এসব শোনার অর্থই বা কি?'

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সুনীল একটু হাসল। লাইটপোস্টের আলোয় আলোয় সেই হাসি কেমন যেন অপার্থিব আর অস্বস্তিকর বলে মনে হল।

'অর্থ' আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি?'

'না।'

সুনীল বলল, 'কণার এখনো চূড়ান্ত বিশ্লেষণ আছে ওই লোকটার ওপর। ওর কাছে এমন সব চিঠিপত্র আর উপহারের জিনিস-টিনিস রয়েছে যাতে শ্রীবিলাসের বিলাসিতাকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। তিনি আপনার ওপরও তো সুবিচার করেন নি। বন্ধুর বেশে সর্বনাশটি করে ছেড়েছেন। এমন লোকের মুখোশ খুলে ফেলা আমাদের সামাজিক কর্তব্য।'

বিজন চুপ করে রইল।

সুনীল বলল, 'আমি প্রথমদিনই এসব কথা ওর সামনে তুলি নি। তবে কণাকে জানিয়ে রেখেছি, শ্রীবিলাসকে আপনিও চেনেন। বেশ ভালোভাবেই চেনেন। আজ আমি শ্রদ্ধা আপনাদের দুজনের পরিচয়টা করিয়ে দিলাম। তারপর ভেবে দেখুন।'

বিজন অক্ষুণ্ণভাবে বলল, 'আজ্ঞা ভেবে দেখব।'

সুনীল তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলল, 'আজ্ঞা তাহলে চলি আজকের মত। আশা করি শীগগিরই ফের একদিন দেখা হবে।'

বিজন নিরন্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

সুনীল চলে যাওয়ার পর বিজন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেই বাসস্টপটিতে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকটি জীবনকে ঘিরে-ঘাত-সংঘাতের যে তীব্র আবর্তের কথা সুনীল প্রায় এক নিশ্বাসে বলে গেল বিজনের মনে হল তা যেন অত সহজে শেষ হবার নয়। যদিও তেমন কোন সাদৃশ্য নেই তবু তার মনে হল কণার দৃষ্টিগোচর সঙ্গে বিজনের অবস্থার কোথায় যেন এক নিগূঢ় মিল রয়েছে। তার কথা যদি কণা শোনে সে হয়তো সহানুভূতি অনুভব করবে। সে যেন বড়ো একা পরিবারের মধ্যে থেকেও নিঃসম্পর্কীয়। বিজন এমন একজন কাউকে চায় যার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারে, এমন একজন যার কাছে নিঃসংকোচে সব কথা বলতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই নির্ভরযোগ্য পরম বন্ধু।

আরো কিছুক্ষণ বাদে বিজন নিজেদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়তে সুরমাই এসে দোর খুলে দিলেন। তার মুখখানা গম্ভীর, বিষম।

তিনি বললেন, 'কোথায় গিয়েছিল বল তো?'

বিজন বলল, 'কোথায় আর যাব। এই একটু ঘুরে-টুরে এলাম।'

সুরমা দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে বললেন, 'মুখ হাত ধুয়ে আয়, খেতে দিই তোকে। দিনেও ঘুরছি রাত্রেও ঘুরছি, রাত দুপুর পর্যন্তও তোর ঘোরাঘুরির শেষ হয় না। শ্রদ্ধা কি ঘুরে বেড়ালেই চলেবে?'

বিজন বলল, 'তোমার ধারণা আমি বুঝি শ্রদ্ধা অমনিই অমনিই ঘুরি? কাজের জন্যে ঘুরি নে?'

সুরমা মুখ ভার করে বললেন, 'কী জানি বাপ, কী তোমার কাজ ভুঁমিই জানে। এই তিনমাসের মধ্যে আমি তো তোমাকে কিছুই করতে দেখলাম না। না গেলি একবার তোর সেই পুরোন অফিসে, না অন্য কোথাও তেমন করে চেষ্টাচারিত করলি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবি ভুঁতের মতন বসে থাকবি। আর বাইরে বেরোলে রাস্তার ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। একেই কি চাকরির চেষ্টা বলে?'

বিজন মায়ের কথার কোন জবাব দিল না। নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছাড়ল। ইরা তার তক্তপোষে ঘুঁমিয়ে পড়েছে। দৈয়ালের দিকে মুখ করে শুরুরেছে ইরা। এরই মধ্যে কেমন যেন রোগা আর বিবর্ণ হয়ে গেছে। বোনের জন্যে হঠাৎ যেন ভারি মমতা বোধ করল বিজন। এতক্ষণ নিজের পরিবারের অস্তিত্বের কথা সে যেন ভুলে গিয়েছিল। আবার নতুন করে তারা তাদের অস্তিত্ব নিয়ে তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।

মার দিকে তাকিয়ে বিজন বলল,

ইরা বাকি বাকি পড়ল। ও খেয়েছে না?

সুরমা বললেন, 'হ্যাঁ খেয়েছে। এতক্ষণ তোর জন্যে জেগে বসেছিল। ওর শরীরটা তো ভালো নী। আমি শেষে বললাম, তুই খেয়ে নে।' বিজন বলল, 'বেশ করেছে। আর রং?'

সুরমা একটু জ্বরে বললেন, 'ওর কাছে গিয়ে শূরেছে গল্প শোনার জন্যে। এতক্ষণ বোধহয় ঘুমে বিভোর। যিনি গল্প বলছিলেন, তাঁর অনেকক্ষণ ধরেই নাক ডাকছে।'

বিজন একটু হাসল। সংসারের এই অবস্থার মধ্যেও গল্প বলা গল্প শোনার আয়োজন হয়েছিল শূনে খুব ভালো লাগল। মনে পড়ল ছেলেবেলায় সেও বাবার পাশে শূয়ে গল্প শুনত। কোনদিন ডাকাডের গল্প, কোনদিন রাক্ষস-খোক্তার গল্প, কোনদিন বা বাদির আর হনুমানের গল্প।

শূনেতে শূনেতে বিজন জিজ্ঞাসা করত, 'বাবা তারপর? গাছে উঠে হনুমানটা কী করল?'

বাবা কোন জবাব দিতেন না। গল্প শেষ হবার আগেই তাঁর নাকডাকা শূর হয়ে যেত। বিজন ভাবল সেই ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই না ছিল। তারপর বত বরষ বাড়ছে তত যেন ব্যবধান বেড়ে উঠেছে। মনে হয় সে বাবার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে নি। কোন ছেলেই কি পারে? বাবা আর ছেলের মধ্যে কোনদিনই কি সম্পূর্ণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়? ভুল বোঝাবুঝির শেষ হয় কোনদিন?

সুরমা বললেন, 'আর দেরি করিস

নে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে আয়। খেতে দিই ডেকে।'

বিজন বলল, 'তুমিও তো খাও নি মা। আমার দেরি দেখলে খেয়ে নেবে। কতদিন বেরোছি তোমাকে।'

সুরমা বললেন, 'যাক, তোমাকে আর আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি যাও এবার। তাড়াতাড়ি সেয়ে এসো।'

মুখ হাত ধুয়ে বিজন এসে খেতে বসল। ভাত, বাটিতে করে খানিকটা ডাল আর একটু মাছেরও ব্যবস্থা আছে।

বিজন খেতে বসে বলল, 'মা, বেকার ছেলের তো একপদের বেশি দু'পদ জোটার কথা না। তুমি কী করে এসব ব্যবস্থা করছ?'

সুরমা স্নান একটু হেসে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার।'

বিজন ভাতে হাত না দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে কিছু আছে তো মা? না সবই দিয়ে দিলে?'

ছেলের এই কথায় কেন যেন সুরমার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল।

তিনি বললেন, 'আছে, তুই খা।'

বিজন আর কিছু না বলে মুখ নিচু করে ভাত মাখতে লাগল।

সুরমা বলতে লাগলেন, 'কিছু মনে করিস নে খোকা। উনি বলেন—শূধু উনি কেন তোর ধরন-ধারণ দেখে আমারও মনে হয় গা লাগিয়ে তুই চেষ্টা করছিস নে। নইলে তোর মত বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলের একটা চাকরি হয় না? অত ভালো চাকরি না হোক যেমন তেমন একটা চাকরি হলেও তো হোত। সেরের কাছ থেকে নিতে আমার লজ্জার মাথা কাটা যায়। জামাই-ই বা

কী মনে করে বল তো। কদিনই বা ওদের বিয়ে হয়েছে?'

খানিক আগের মমতা কোমলতা যেন বিজনের মন থেকে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে মুখ তুলে রুদ্ধস্বরে বলল, 'না নিলেই পারো।'

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলেন না। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'না নিলে চলে কী করে?'

'না চলে না চলবে।'

বিজন উঠে দাঁড়াল। খাওয়া শেষ করেই অবশ্য উঠল। বত রাগ বত উত্তেজনার কারণই ষটুক খাবার জিনিস সে নষ্ট করে না।

আঁচাতে যাবার আগে বিজন বলল, 'তোমার কী করে এমন ধারণা হল মা? আমি ইচ্ছে করেই বেকার থাকছি আর তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা বসে বসে দেখছি একথা কী করে তুমি ভাবতে পারলে?'

সুরমা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বললেন, 'মা মুখ ধুয়ে আয়। রাতে আর চটাচটি করতে হবে না।'

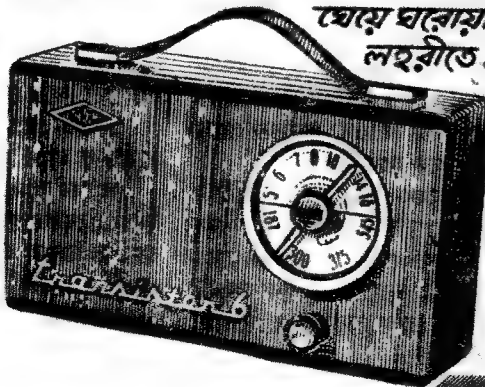
বিজন বলল, 'আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলছে আমি অনেক টাকা মেরে ব্যাংকে জমিরোছি। তাই চাকরি-বাকরির আর দরকার নেই। যা আছে পয়ের ওপর পা তুলে বসে তাই সারা-জীবন খেতে পারব। তোমারও কি সেই ধারণা?'

সুরমা বেন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুই কি সরারাত কেবল ঝগড়াই করবি? তা হলে কর।'

বিজন এবার গলা নামিয়ে বলল,

স্ক্রু ও স্প্রিংয়ের ক্ষমতার আপনার ঘর আনন্দমুখর করে
তুলবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং আর ই জি রেডিও...

আর ই জি-র একটি রেডিও আপনার ঘরে রাখুন, আপনার এক
ছোয়ে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহূর্তে স্ক্রু ও
লহরীতে মাধুর্যময় করে তুলবে...



আর ই জি মডেলগুলি একান্ত
নির্ভরশীল ও সঙ্গীতময়...
পৃথিবীর সব স্টেশনই যুগ্মে
ধরা পড়ে...

৬ ট্রানজিস্টর মডিয়াম ও লুভ
মডেল-৬টি ৪ মূল্য-১৬৫ টাকায়
জানীয় কর আতিরিক্ত

আমি যাবোই। বাঙলা আমার ডাক দিয়েছে।
আমি যাবোই॥

পথ-ঘাট-মাঠ সব পৌরয়ে
পাহাড় সাগর সব ডিঙিয়ে
আমি যাবোই, আমি যাবোই,
বাঙলা দেশের আকাশ বাতাস
আমার প্রাণে বড় তুলেছে,
আমার বাউল উদাস হৃদয়
তাই বঁধি আজ সব ভুলেছে...সব ভুলেছে...
আমি যাবোই, আমি যাবোই॥

বাঙলা দেশের ফিগে-দোয়েল,
ধানের খেতের শ্যামল ছবি,
বাঙলা দেশের মা-হারানো গ্রাখাল ছেলে,
দাসি ছেলে, দামাল ছেলে,
সবাই বঁধি খুঁজছে আমার, খুঁজছে আমার ব্যাকুল হয়ে.
আমি যাবোই, আমি যাবোই॥
আমি যাবোই। বাঙলা আমার ডাক দিয়েছে।
আমি যাবোই॥

‘আমাকে বিশ্বাস করো মা। ভদ্রভাবে
ষতটা চেষ্টা-চরিত্র করা যায় আমি করে
যাচ্ছি। তাতে কোন চুটি হচ্ছে না।
তবু যদি না হয় কী করব বলো।’

সুরমা বললেন, ‘তোকে কিছুই
করতে হবে না। এ’টো মুখ ধুয়ে আর।
এসে শূরে পড়।’

কিন্তু বিজন মুখ ধুয়ে এসে দেখল
তার শোয়ার আগেই মা মাটিতে বিছানা
পেতে শোবার ব্যবস্থা করছেন।

বিজন বলল, ‘ও কি মা, তুমি শূরে
পড়ছ যে? খেলে না।’

সুরমা বললেন, ‘খেতে ইচ্ছে করছে
না।’

বিজন বলল, ‘আমি ঠিক ধরেছি।
‘তুমি সব আমাকে ধরে দিয়েছ। নিজের
জানো কিছুই রাখো নি।’

সুরমা বললেন, ‘না না। ভাত আছে
হাঁড়িতে। এমনিই খেতে ইচ্ছে করছে
মা আমার।’

বিজন বলল, ‘আচ্ছা দেখি গিয়ে
কেমন ভাত আছে। কেমন তুমি সত্য-
বাদী যুধিষ্ঠিরের মেয়ে।’

রান্নাঘরে গিয়ে বিজন নিজেই সরা
সরিয়ে ভাতের হাঁড়ি দেখে নিল।
একজনের যোগ্য ভাত সত্যিই আছে।
আর একটু ডালও থরা রয়েছে। আর
কোন ভরকারিই মা নিজের জন্য রাখেন
নি।

একমুহূর্ত চুপ করে সেখানে
দাঁড়িয়ে রইল বিজন। তারপর নিজেই
একটা থালা নামিয়ে নিয়ে ভাত বাড়ল।
আসন পাতল। তারপর জোর করে
মাকে তুলে নিয়ে এসে তার ওপর বসিয়ে

দিয়ে বলল, ‘খাও, খেতে হবে তোমাকে।
না হলে বুঝব তুমি আমার ওপর রাগ
করেছ।’

সুরমা বিরতভঙ্গিতে একটু হেসে
বললেন, ‘পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ।’
গোলমালে ইরারও ঘুম ভেঙে গিয়ে-
ছিল। সেও উঠে এসে এই ভোজ-
সভার যোগ দিল।

ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে
সুরমা খাওয়া শেষ করলেন।

বিজন বলল, ‘নিজের জন্যে তুমি
আর কোন-কিছু রাখো নি মা?’

সুরমা বললেন, ‘এই তো রেখিছ।
এই আমার ‘অমৃত’।’

খেয়ে উঠে সুরমা বললেন, ‘ভালো
কথা, তোর একখানা চিঠি আছে থোকা।
কই ইরা, দে তো চিঠিখানা।’

ইরা একটু চুপ করে থেকে বলল,
‘ও চিঠি তোমার কাল পড়লও হবে
দাদা। এমন জরুরী ব্যাপার কিছু
নয়।’

বিজন বুঝতে পারল চিঠিটা আর
যাই হোক সুখের নিয়ে আসে নি।
তাই ইরা ব্যাপারটাকে চেপে বেতে
চাইছে। কিন্তু যত অশুভ খবরই হোক
বিজন ব্যাপারটা আজই জানতে চায়।
আর দেরি করে লাভ কি।

ছোট বোনের কাছ থেকে চিঠিটা
পায় জোর করেই আদায় করে নিল
বিজন। খামের মুখটা ছেঁড়া। তালুক-
দার কোম্পানীর নামাকিত খাম দেখেই
ইরা বোধহয় কৌতূহলী হয়ে চিঠিটা
খুলে ফেলোছে।

কিন্তু বিজনের কোন কৌতূহল

ছিল না। নিস্পৃহভাবেই চিঠিটা সে
খুলে দেখল। যা ভেবেছে তাই।
অস্থায়ী পদচ্যুতির পর স্থায়ী পদচ্যুতির
খবর।

চিঠিটা ইরাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিজন
বলল, ‘নে, এইজন্যেই তুই লুকো-
ছিলি? এ তো জানা কথা।’

মা আর বোন দুজনেই যেন দুই
মুখ প্রতিমা। কারো মুখেই সান্দ্রনা
কি আশ্বাসের কোন কথা নেই। কিন্তু
চোখে আছে। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির
মধ্যে আছে।

একটু বাদে সুরমা ছেলের পিঠে
হাত দিয়ে বললেন, ‘মা এবার শূতে যা।’

বিজন শূতে গেল। শূরে শূরে
সারাদিনের ঘটনার কথা ভাবতে লাগল।
একটু আগে দেখা মা আর ছোট বোনের
স্নেহসিক্ত দুখানি মুখের কথা মনে
পড়ল। তারপর তেমন সঙ্গত কোন
কারণ নেই তবু আরো একখানি মুখ
সেই মুখের ভাষাভঙ্গি সর্বাঙ্কুরে
ছাপিয়ে স্থির হয়ে রইল। মাত্র আজ
সন্ধ্যায় বিজন এই মুখখানি দেখেছে।
সুনীলের কাছে তার অবর্ণনীয় দুঃখের
কাহিনী শুনছে।

বিজনের মনে হল মিল আছে তাদের
দুজনের মধ্যে মিল আছে।

পৃথিবীর সমস্ত দুঃখীজনের মধ্যে
কিসের যেন একটা অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে।
ভাবতে ভালো লাগল। ঘুমোবার আগে
একটি সদ্যপরিচিতা মেয়ের কথা ভাবতে
ভালো লাগল।

[ক্রমশঃ]

* প্রমথবাঙ্গলার কথা

দেবানন্দপুর-কৃষ্ণপুর

“দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামদত্ত মুনসী
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে দেশে বশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল ফারসী।”

অমর কটি ছত্র রায়গুণাকর কবি
ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরের মাটি এবং মানুষের
প্রতি তাঁর সত্যত্ব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিবেদন
করে রেখে গিয়েছেন।

দেবানন্দপুরের কথা জানতে গিয়ে আজ
অনেকেরই হস্তোত্তর আসে না, একদা
বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণা-
কর ভারতচন্দ্রও তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ
সময় এই দেবানন্দপুরে অতিবাহিত করে
গিয়েছিলেন। না—দেবানন্দপুর তাঁর জন্মভূমি
না। ফারসী ভাষা অধ্যয়নের প্রয়োজনে তিনি
দেবানন্দপুরে এসেছিলেন। তৎকালীন বর্ধমান
জাজের অধিকারভূক্ত ভূরশট পরগনার পেঁড়ো-
গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। দেবানন্দপুরে অবস্থান-
কালে রচিত তাঁর সতানারায়ণের পাঁচালীর
ভাণ্ডার নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি
বলেছেন—

“ভরম্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ।
সদাভাবে হতকসে ভূরশটে বসতি ॥
নরেন্দ্র রায়ের সূত ভারত ভারতী যুত।
ফুলের মৃৎটী খ্যাত বিজ পদে সূমতি ॥”

শিক্ষায়, দীক্ষায়, কর্ম-আভিজাত্যে বাংলা
দেশের তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বংশগুলির মধ্যে
দেবানন্দপুরের দত্ত মুনসী পরিবার ছিলেন
অন্যতম। তাঁদের পূর্বপুরুষ শ্রীকামদেব দত্ত
প্রথম এসে দেবানন্দপুরে বসতি করেন। তাঁর
পুত্র শ্রীকল্যাণপ্রসাদ দত্ত নবাব-সরকারে পদম্ভ
কর্মচারী ছিলেন। দিল্লীর শাহী দরবার থেকে
মুনসী খেতাবটিও সামরিকভাবে তাঁরই অর্জন
করা। মুনসী বংশের গৌরব-সূচকের পূর্ব
প্রকাশ কল্যাণপ্রসাদের পুত্র, স্বয়ং ভারতচন্দ্র
বীর নাম সগৌরবে উল্লেখ করে গেছেন, সেই
রামরাম দত্ত মুনসীর আমলে। আশ্চর্য
ভীষণী এবং এই অসাধারণ কর্মকুশল-পুরুষ
শুধু রাজকাষেই দক্ষ ছিলেন না, আরবী এবং
ফারসী ভাষায় তাঁর অধিকারও ছিল অসাধারণ।
১১৫১ সনে স্বয়ং দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তাকে
প্রভূত অর্থ, প্রচুর জায়গীর এবং বংশানুক্রমে
মুনসী খেতাব ব্যবহার করবার অধিকার দিয়ে
সম্মানিত করেন। দেবানন্দপুরে ফিরে এসে
রামরাম প্রথমেই মনোযোগ দিলেন শিক্ষা
বিস্তারে। তাঁরই উদ্যোগে দেবানন্দপুরে একটি
ফারসী এবং সংস্কৃত শিক্ষালয়ের পত্তন
ঘটলো। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র তৎকালীন

বাংলা দেশে আরও অনেক ছিল; কিন্তু ফারসী
পড়বার ব্যবস্থা ছিল মাত্র মুন্সীমের করেকটি
স্থানে, দেবানন্দপুরের শিক্ষাকেন্দ্রটি সেই
স্বল্প সংখ্যকেরই অন্যতম। এবং এই ফারসী
ভাষা অধ্যয়নকল্পেই ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুর
আগমন।

ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুর বাস, ফারসী
শিক্ষা এবং তাঁর সতানারায়ণের মিতার পাঁচালী
(যেটি চতুষ্পদী ছন্দে লিখিত) রচনার কাল,
এবং এমন কি তাঁর জন্ম সাল পর্বন্ত নিয়ে
বহু মতবৈধ আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র
সম্বন্ধে সঠিক তথ্যপূর্ণ কোন জীবনী বা
ইতিহাস রচিত হয় নি দীর্ঘকাল। এ সম্বন্ধে
সর্বপ্রথম সামান্য কিছু তথ্য সহযোগে ১২৬২

পারুল ডট্টাচার্য

সালের প্রথম জ্যৈষ্ঠের “সংবাদ প্রভাকর”—এ এক
জীবনীগ্রন্থের সূত্রপাত করেন প্রসিদ্ধ গুপ্ত
কবি (কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)। কিন্তু
ভারতচন্দ্রের জন্মকাল এবং তাঁর দেবানন্দপুর
বাসকাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তিনিও দিতে
পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেবানন্দপুরে বাস-
কালে মুনসীপরিবারেরই বাড়িতে সতা-
নারায়ণের পূজা উপলক্ষে পাঠ করবার জন্য
ভারতচন্দ্র পর পর দুইখনি পাঁচালী রচনা
করেন। প্রথমটি ত্রিপদী ছন্দে, মিতারটির
ছন্দ চতুষ্পদী এবং এইটিরই উপসংহারে
পাঁচালীর রচনা সময়ের ইংগিত আছে—

“শবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁখি
তেমনি করিও গতি, না করিও দূষণ
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর হারি হন বর দায়
রতকথা সাজ প্রায়, মনে রুদ্র চৌগুণা ॥”

মনে রুদ্র চৌগুণা। এই রুদ্র চৌগুণা
সন নিজেই বত গুণ্ডগোলা। গুপ্তকবি রুদ্র
চৌগুণার অর্থ করেছেন—রুদ্র অর্থ একাদশ
অর্থাৎ ১১। এবং অক্ষয়া বামাগতি নির্যমে
চৌগুণা অর্থ চৌরিশ অর্থাৎ এই পুঁখি
রচনার কাল ১১০৪। এবং যেহেতু মৃৎ মৃৎ
একটি প্রাচীন লোকপ্রতি প্রচলিত ছিল যে
পাঁচালী রচনা কালে ভারতচন্দ্রের বয়স ছিল
মাত্র পনের বৎসর, সেইহেতু তাঁর জন্মকাল
দাঁড়াবে ১১১১ সাল।

কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র
লোকপ্রতি অচল। মনে রাখতে হবে দেবানন্দ-
পুরে আসবার আগে ভারতচন্দ্রের জীবনের
একটা সূদীর্ঘ পর্ব পার হয়ে গেছে। পরপর
করেকটি পুরুষের ঘটনা সেই পর্বের অক্ষ-
সম্মিলিত ছিল।

কোন সময়ে কোন কারণে বর্ধমানের মহা-
রাণী বিজয়মারীর সঙ্গে ভূরশট পরগনার
অধীশ্বর ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র রায়ের
বিবাহ উপস্থিত হয়। মহারাণী প্রায় কণ
হাজার সৈন্য সহযোগে দুই সেনাপতি পালিয়ে
নরেন্দ্র রায়ের সকল সম্পত্তি দখল করে নেয়।
স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে রাজা নরেন্দ্র রায়
পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় কলেন। বালক
ভারত আশ্রয় নিলেন মণ্ডলঘাট পরগনার নওর-
পাড়ার তাঁর মামার বাড়িতে। দীর্ঘকাল তিনি
এই নওরাপাড়াতেই ছিলেন। এইখানেই তাঁর
সংস্কৃত শিক্ষা, কৈশোর অতিক্রমণ এবং অল্পে
কাছাকাছি এক গ্রাম সারদার কেশবকুণী
আচার্য বংশের এক কন্যাকে বিবাহও করেন
তিনি।



হৃদয়ী রায় মুনসী, ভারতচন্দ্রের বাসভবনের পাঠভবন



শরৎচন্দ্র স্মৃতিমন্দির (দেবানন্দপুর)

নরেন্দ্র রায়ের চার পুত্রের মধ্যে ভারত ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর এই স্বয়ং প্রভু বিখ্যাত অপরাপর ভাইয়েরা খৃস্ট হতে পারলেন না। তাঁরা ভারতকে তিরস্কার করলেন। ঐশ্বর্য্য ক্ষমতাহীন সংসারের অনুপযোগী ছিল অনুযোগও করলেন অনেক। অভিমানী ভারত তন্দ্রেই ঘর ছেড়ে একবারে চলে এলেন দেবানন্দপুরে। উদ্দেশ্য মুনসীপরিষদের আশ্রয়ে থেকে ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ। কায়দা সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুপ্রাপ্তির সূত্রপাত তখন থেকেই হয়ে গেছে। রাজসরকারে নিব্বা নবাবসরকারে উচ্চপদ পেতে হলে, আরবী এবং ফারসীতে দক্ষতা অবশ্য প্রয়োজন। অভিমানী হুতবিস্ত রাজাহারা রাজপুত্র নিতান্ত দীন ভিখারীর মতই গ্রামে আশ্রয় নিলেন দেবানন্দপুরে। কঠিন চেষ্টা, কঠোর শ্রম এবং কঠোরতর জীবনযাপন শ্রদ্ধা হল তাঁর। নিতান্তই বাহিরাগত বিদেশী শিক্ষাভিলাষী মাত্র তখন তিনি। কীর্ত্তিমান রায়গুণাকর কবি তখনও অশ্বকরের গর্ভে। দেবানন্দপুরে বাস শেষ করে আবার তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠে ফিরে যান। এবং হুতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কোপে পড়ে বন্দী হন। তারপর অকস্মাৎ একদিন প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে মল্লীশালা থেকে তাঁর পলায়ন এবং আবার এক দুঃসহ ক্রেশকর জীবনের সূত্রপাত। সম্রাসীর বেশ প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষ ঘুরে আসবার পর চন্দননগরে ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান শ্রীহিন্দ্রনাথরায় চৌধুরীর আশ্রয়ে এসে তাঁর অসুখ কিছুটা প্রশম হয়। এই হিন্দু-নারায়ণই তাঁর পাণ্ডিত্য এবং কবি-প্রতিভা দেখে নদীয়াধিপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কাছে পাঠিয়ে দেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক চারশ

টাকা বৃত্তিতে আপন সভার তাঁকে সভাকবি করে নেন। এক রাজার রোষ থেকে পলায়িত ভারতচন্দ্র আর এক রাজার আশ্রয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বোধকরি। এই আশ্রয়েই তাঁর জীবনের শেষ ভাগ কাটিয়ে ছিলেন তিনি। এইখানেই তাঁর সৃষ্টিশীল অমরদাম্পত্য, রাসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য রচনা। রায়গুণাকর উপাধিলাভ এবং অবশেষে মাত্র আটচালিশ বৎসর বয়সে অকাল-মরণের করক্ষেপে ইহলোক পরিতাগ। সংক্ষেপে এই হল ভারতচন্দ্রের জীবনকথা। কাব্য কিম্বা উপন্যাসের মতই বৈচিত্র্যময়, ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ।

ভারতচন্দ্রের বয়স বা জন্মকাল নিয়ে গুপ্ত কবির মত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত না হওয়ার কারণ—দুটি। প্রথমত গৃহভাগ, শিক্ষালাভ, বিবাহ এবং তিরস্কৃত হয়ে পুনরায় গৃহভাগ—এতগুলি গুরুতর সময়-সাপেক্ষ ঘটনা ঘটে গেছে মাত্র পনের বৎসর বয়সের মধ্যে একথা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত গুপ্ত কবির হিসাবে সন, রত্ন-চৌগুণ্ডার অর্থও ঠিকমত পরিষ্কার হয় নি। অস্তিত্ব অথবা বামাগতি নিয়ম যে রক্ষিত হয় নি, এটা ঠিক রত্ন অর্থে যদি একাদশ হয়, চৌ অর্থে তবে চার এবং গুণ্ডা অর্থে তিন। অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যাটি দাঁড়াল তাহলে ১১৪০। এবং সম্ভবত এইটেই ঠিক। গাঁঢ়ালী রচনাকালে কবির বয়স মাত্র পনের বৎসর ছিল, এই লোকপ্রবাদকে অশ্বভাবে আমল না দিয়ে, তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি ঘটবার মত সম্ভাব্য সময় বোঝা করে কবির বয়স যদি তখন কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও ধরা যায়, তাহলেও তাঁর জন্মকাল ১১১৮ সনের কাছাকাছি। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ কিম্বা দ্বিতীয় দশকের সূত্রপাতে।

যাইহোক ভারতচন্দ্রের জন্ম, কর্ম বা দেবানন্দপুরে বাসকালের যতই মতবিরোধ থাক না কেন, সেদিনের সেই সহায়-সম্মলহীন দারিদ্র্য-পীড়িত রাজকুমারকে মসনতের আশ্রয় দিয়ে রামরাম দত্ত মুনসীই যে তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতা লাভ করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। দেবানন্দপুরের মাটি এবং মানুষের কাছে বাংলা তথা বাঙালী জাতির ঋণও তাই অনেক।

দুঃখের বিষয় কবির স্মৃতিরক্ষার কোনও উল্লেখযোগ্য সুবন্দোবস্ত দেবানন্দপুরবাসী করে উঠতে পারেন নি আজও। সরকারী বর-করও কৃপণ এ ব্যাপারে। শ্রদ্ধা পথের ধারে একখানি পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ কবিতার উল্লিখিত ছত্র কটি দেখে চলতি গণিক থমকে দাঁড়ায়। হয়তো বা কার্য-কারণ-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টাও করে। তারপর আবার চলে যায় তার আপন কাজে। রায় গুণাকর কি বিলুপ্ত হতে বাসেছেন দেবানন্দপুরের স্মৃতি থেকে?

ওপাশে কৃষ্ণপুর। কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে শীর্ণা সরস্বতী। একেবারে কিনারে স্বচ্ছ জলে প্রায় ছায়া ফেলেই দাঁড়িয়ে আছে কাল-জীর্ণ একখানি ভবন। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হিরণ্যদাস মজুমদার, গোবর্ধন-দাস মজুমদারের বংশধর, চৈতন্যচরিতামৃত-খ্যাত ছয় গোষ্ঠাবমীর অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোষ্ঠাবমী স্মৃতিপুত্র রঘুনাথদাসের শ্রীপাঠ।

হিরণ্যদাস এবং গোবর্ধনদাস এক সময়ে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এঁরাই ছিলেন হুগলী এবং সপ্তগ্রামের অধীশ্বর। সপ্তগ্রাম থেকে তাঁর আর ছিল বার্ষিক দ্রিশ লক্ষ টাকা। এবং গোড়েশ্বরকে রাজস্ব দিতেন তাঁরা বার লক্ষ টাকা। দক্ষিণ রাঢ়ীয় এই কায়স্থ পরিবারের নবাব-প্রদত্ত উপাধি ছিল মজুমদার। বার জন্য পরে এঁরা দাসমজুমদার নামে বিখ্যাত হন।

হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন। গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে উজ্জ্বলতম রায় রাজকুলের যোগ্য পুত্র রঘুনাথ কিন্তু বিষয়-সম্পদে মন দিতে পারলেন না। এই সময়েই বাংলা দেশ উজ্জ্বল করে নদীয়ায় শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় ঘটেছে। দিকে দিকে বয়ে চলেছে নবপ্রেম ধর্মের জোয়ার। রঘুনাথ সেই জোয়ারে ভেসে গেলেন। তাঁর বৈরাগ্য তাঁকে সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহা করে তুলতে লাগলো দিন দিন স্নেহকাতর পিতা-মাতা বিবাগী পুত্রকে গৃহভিমন্বী করবার জন্য এক অপরূপ রূপসী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। চোখে চোখে রাখবার জন্য ব্যবস্থা করলেন দিবা-রাত্রি পাহারার। তবু রঘুনাথ পালিয়ে যান। ঘরে তাঁর মন টেকে না। কেবলই

অবসর গ্রহণে থাকেন গৃহত্যাগ করবার।
বার বার রঘুনাথ পালিয়ে যাবার চেষ্টা
করছেন দেখে আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে বেঁধে
রাখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হতাশ
গোবিন্দনাথ জবাব দেন—

“ইন্দুসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপসরা সম
এসব বান্ধিতে যার নারিলেক মন
দাঁড় বন্ধনে তারে বান্ধিবে কেমনে
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারম্ভ বুচাইতে।”

বিবাহের আগেই শ্রীগোরাংগের সঙ্গে
তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে
ঘরে ফিরে গিয়ে সময়ের জন্য অপেক্ষা
করতে বলেছিলেন। বিবাহের পর আর
তাঁকে ধরে রাখা গেল না। প্রতিদিন প্রায়
ষোল ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে সুন্দর নীলাচলে
মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন
রঘুনাথ। এবং শ্রীস্বরূপ গোবিন্দামীর শিষ্যত্ব
গ্রহণ করে ডুবে গেলেন কঠোরতম তপস্যায়।
এরপর মাতা ও পত্নীর মৃত্যুর পর শ্রীমদ্-
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র একটি-
বারের জন্য তিনি কৃষ্ণপুরে ফিরে এসেছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত
গ্রন্থে লিখেছেন—

“রঘুনাথ দাসের মদ্য প্রভু সঙ্গে স্থিতি
তাঁর মৃত্যু শ্রুতি লিখি করিয়া প্রতীতি।”

১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৫৭৮
খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে
প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান।
বর্তমান শ্রীপাঠবাড়ির সঙ্গে রঘুনাথের
পৈত্রিকভবনের কোন সম্পর্ক নেই। ষোড়শ
শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তগ্রাম বখন মুসলমান-
অধিকৃত হয়, রঘুনাথের পৈত্রিকভবন
এবং কুলদেবতার মন্দির তখনই ভূমিস্যাৎ
হয়েছিল। পূজারী ব্রাহ্মণ বিগ্রহগুলিকে
সরস্বতীর জলতলে সমাহিত করে পালিয়ে
য়েছিলেন প্রাণভয়ে। রঘুনাথেরই এক
শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকবির প্রথমে বিগ্রহগুলিকে
উদ্ধার এবং যৎসামান্য সেবার বন্দোবস্ত
করেন। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে দানবীর
মতিলাল শীলের পিতামহী বর্তমান পাঠবাড়ি
এবং সরস্বতীর যে স্থানটি থেকে বিগ্রহ-
গুলিকে পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানটিকে
বাঁধিয়ে একটি ঘাট নির্মাণ করিয়ে দেন।

তারপরেও বিগত হয়েছে বহুকাল।
শ্রীপাঠের অবস্থাও শোচনীয়। জরাজীর্ণ
ভবনখানি আজ-কাল—সম্মুখে নতজানু।
গোবিন্দামীজীর স্বহস্তে লিখিত অনেকগুলি
পুঁথির পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে। বিগ্রহরা
সেবা পান বটে— তবে অনাদরের মলিনতা
যে তাঁদের অঙ্গে লাগে নি এমন কথাও বলা
যায় না। শ্রীপাঠ গৃহের সংস্কার অতি
অবশ্যই দরকার। কারণ, এই শ্রীপাঠ বাড়িটি
শ্রবণময় একটি মন্দির বা তীর্থস্থানই নয়।



ওপারে দিঘড়া এপারে জগদীশপুর। মন্দির সম্পত্তি সারস্বতীর উপরে ছোট একটি
বাঁধের সাঁকো তারই একপাশে মাছ ধরাছিল।

সপ্তগ্রামে হিন্দু-ঐতিহ্যের একটি বিশেষ
অধ্যায় সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। যেটি
সংরক্ষিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যিক।

প্রতি বৎসর ১লা মাঘে উত্তরায়ণ
সংক্রান্তির মেলা বসে শ্রীপাঠের চারিদিকে।
মেলায় প্রধান সওদা মাছ এবং পালাং শাক।
পালাং শাকও যে কখনও কখনও বর্ধিত
আকারে প্রায় ষট্‌ফুটের সঙ্গে পাল্লা দিতে
পারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—কৃষ্ণপুরের
মেলায়। মৎস্য-বুড়ু কলিকাতাবাসী জেনে
আম্বত হবেন যে—বাংলা দেশের কুলীন
মৎস্যকুল এখনও নিম্নলিহ্ন হয়ে যায় নি।
দেখতে চান আসুন কৃষ্ণপুরের মেলায়। তারিখ
১লা মাঘ। রুই, কাংলা, টিগেল, বড় বড়
বোয়াল, মাঝারী আকারের শোল এবং বই,
মাগুর, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি মাছের অটল
সমারোহ। পার্সে, ভগসে বাটা ফল্‌ইও সে
নেই এমনও নয়। এবং রমনার-তপো-ফল
হৃদয়নয়নলোভনকারী দু-চারখানা গাংগেয়
ইলিশের মধুর মুরতিও যে দেখতে পাওয়া
যাবে না, এমন কথাও বলা যাবে না। দাম?
সেকথা এখন থাক। কালে প্রকাশ্য।

পূর্বে মেলাটি বাংলা দেশ—বিশেষ করে
চন্দননগরের দুর্গাচারী ধনীকুলের আভা-
বিশেষ ছিল। বাচ্‌ খেলা, বাই নাচ তো হতই
আরও অনেকগুলি বিশেষ মকারের অবাধ
প্রবেশও ঘটতো এখানে। সুখের বিষয় এখন
গ্রামবাসী সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম
হয়েছেন এবং সব মিলিয়ে সমগ্র মেলাটিতে
সৃষ্টি করতে পেরেছেন একটি পরিচ্ছন্ন
পরিবেশ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি দেবানন্দ-
পুর অঞ্চলে হাই স্কুল একটিও নেই। একটি-
মাত্র জুনিয়র এবং গোট্টা পাঁচেক প্রাথমিক

বিদ্যালয় সম্বল। জুনিয়র হাই স্কুলটি এখনও
সরকারী এ্যাকলিয়েশন পায় নি। কবে পাবে
তাও অজানা। অথচ এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
প্রায় পঁচিশো। স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা
ভাল। শিক্ষকরাও আপন আপন কর্তব্যে
ওয়ারিফবহাল। শিক্ষাবিভাগের শিখণীতা
ছাড়া এটিকে আর কিছু মনে করা যায় না।
এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চিকিৎসা-কেন্দ্রও দেবানন্দপুরে কিছু
নেই। ব্যাণ্ডলে একটি চ্যারিটেবল ডিস-
পেনশারী আছে মাত্র। অসুখে-বিসুখে তাই
এখানকার মানুষের দুর্গতি অসহ। অথচ
খাস দেবানন্দপুরেই একটি চিকিৎসাকেন্দ্র
হবার মত যথেষ্ট সুব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্য

বিনামূল্যে

আপনার পছন্দমত রঙে প্রমাণ সাইজ কাস্মীরী
শাল মাত্র ৭ টাকার পাইবেন। ডাকমাশুল
১-২৫ পঃ। দুইটি শাল
১০ টাকা, ডাকমাশুল
২ টাকা। তিনটি শাল
১৮ টাকা, ডাকমাশুল
লাগবে না। চারটি
শাল ২৪ টাকা এবং
ডাকমাশুল ০-৭৫ পঃ
অতিরিক্ত।



বিনামূল্যে—দুই টি
সিল্কেন লেডী স্কার্ফ
চারটি শাল ত্রেতাকে দেওয়া হইবে। স্টক
সীমাবদ্ধ।

Mahalaksmi (Shawl)

P. B. No. 1595 (W. B. C.) Delhi—6

বিভাগ এ ব্যাপারে একটু কৃপাদৃষ্টি প্রদারিত করেন।

ছেলেদের ব্যায়ামাগার আছে একটি। খেলাধুলার ব্যবস্থাও ভাল এখানে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন—সব রকম খেলার চর্চাই হয় দেখা গেল। ফুটবলের 'শরৎ স্মৃতি কাপ' খেলানও হয়ে থাকে প্রতি বৎসর।

ভারত-শরৎ নাট্য সংস্থাটি দুই মনীষীর নাম-যুঁজিত। দেবানন্দপুর মহিলা সমিতির অল্প-বিস্তার কাজ এবং উদ্যোগের সাক্ষ্যও পাওয়া গেল।

চাষ-বাস দেবানন্দপুর অঞ্চলে কম। কিছু ধান, কিছু পাট, সামান্য আখ, কলাই এবং রবিশস্য এই এঁদের সম্বল। সস্কী চাষ বিশেষ নেই। হবেও না—কারণ জমির পরিমাণ কম। আলু চাষ হয়তো বা কিছুটা বাড়ানো যেত; কিন্তু সেচের ব্যবস্থা নেই। সরস্বতী নদীর বৎসামান্য জল নিয়ে তাই চাষীতে চাষীতে হানাহানি লেগেই আছে। শোনা গেল একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এখানে, চালু হবে হবে, কে জানে! হলেও সমগ্র অঞ্চলের জলাপিপাসা যে তাতে মিটেবে না এটা ঠিক।

ফলের চাষ কিছু আছে দেবানন্দপুরে। আম, কলা, আনারসই প্রধান। কিছু বাতাঁবি লেবু, লিচু এবং কঠালও আছে। দেবানন্দপুরে প্রবেশের পথে প্রথমেই দুটি আকর্ষণ করে এইসব ফলের বাগান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং প্রতাহ প্রসারিত কল-কারখানার আধিক্যে বাংলা দেশের বন-জম্পল আজ প্রায় ঝুটে বেতে বসেছে। পল্লবধন আত্মকানন হয়েছে স্বপ্ন। তাই দেবানন্দপুর প্রবেশে প্রথমেই যখন আগন্তুকের চোখে পড়ে সুস্বকর-সুসুচিৎস্বন নিবিড় সবুজে ঢাকা আমবাগান,

যর করে রুয়ে রাখা সারি সারি কলার কাড়, ফলভরে অবনত ঝাঁকড়া বাতাঁবি লেবুর ডালে ডালে বাবুই, টুন-টুনী আর বসন্ত-গোঁরীদের নাচানাচি, তখন বাংলার আদি পল্লী প্রকৃতির একশত সংরক্ষিত রূপ যেন চোখে পড়ে। ফলের চাষে দেবানন্দপুরবাসীর লাভ প্রচুর। দেবানন্দপুরের একটি আম, পাঠক কমা করবেন, নামটা সঠিক মনে করতে পারছি না, লালফুলী বা মরুরমুখী হবে বোধ হয়, বাংলা এবং বাংলার বাইরে থেকেও যার চাহিদা আসে।

কিন্তু না লালফুলী আম নয়, পল্লবধন আত্মকানন নয়, ভারতচন্দ্র কিম্বা রঘুনাথ দাস গোম্বাখীও নয়। বাঙালীর মানস-সরসে দেবানন্দপুরে যে একটি অমৃত কমলের মত অক্ষয় আনন্দ প্রস্ফুট হয়ে থাকবে চিরকাল সে আর এক কারণে।

দিন যায়, রাত্রি আসে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তের আগমনে ধরণী হয় স্বতন্ত্র-রংময়ী—স্মৃতি-বিস্মৃতিতে গিরে মেশে। কীর্তিস্তম্ভ হয় ধ্বাশায়ী, এক কালের প্রখ্যাত ইতিহাসের উপরে নেমে আসে আর এক কালের অনিবার্য অবলুপ্তির যবনিকা।

তথাপি বাতিক্রমও ঘটে কখনও কখনও। বিশেষ একটি প্রিয় নাম বেঁচে থাকে তার আনন্দময় স্মৃতি-সৌরভটুকু নিয়ে। মহাকালের চক্র-শাসন অগ্রাহ্য করে এই মৃত্যুঞ্জয়ী ধরণীতে টিকে থাকে একটি-দুটি অমৃত-তত্ত্বের মত একটি কথা, দুটি গান, কিছু কর্ম কিছু না ভালবাসার স্মৃতি-স্বাক্ষর, নিত্যকালের পাষণ প্রাকারে হাড়ুড়ী-বাটালীর ঘারে ঘারে দাগে দাগে তা উৎকীর্ণ, সহজে মোছে না, ক্ষয় হতে চায় না কিছুতেই।

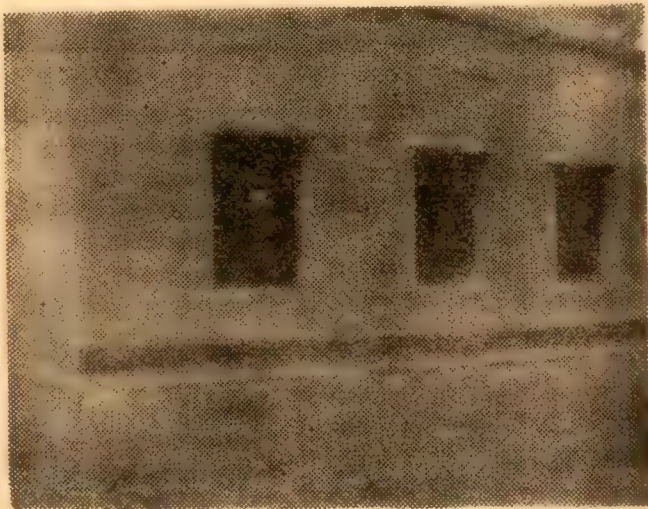
বাংলার সাহিত্যাকাশে একদিন চাঁদ উঠেছিল। পূর্ণোজ্জ্বল পূর্ণীর্থাধির প্রভাস

পূর্ণচন্দ্র। দেবানন্দপুরের মাটি—গৌরবে আজও—পূর্ণময়ী। দেবানন্দপুরের পল্লী-প্রকৃতি সেই বিচ্ছেদের বেদনার আজও ব্যাধুয়া।

১২৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ভাদ্র দেবানন্দপুরবাসী শ্রীমাতীলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্বরে বাংলার অপরাহ্নের কথাসিঁপা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। দেবানন্দপুরে খুব বেশি দিন বাস করা তাঁর হয়ে ওঠে নি। অতিজ্ঞানত কৈশোরেই ভাগলপুর, সেখান থেকে রেপ্পন, তারপর জীবনের কত ঘাটে ঘাটে জল খেয়ে কতভাবে তাঁর স্মৃতি, তাঁর সঠিক বিবরণ আজও জানা যায় নি বটে তবে সুদূর-প্রসারী বিপুল জীবন অতিক্রান্তের সেই বৈচিত্র্যময় বিবরণ ধরে ধরে সাজানো আছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতিটি পাতার পাতার।

দরদী দৃষ্টি, প্রখর অনুভূতিবোধ এবং প্রবল সংগ্রামীসত্তা, যা নিয়ে বাংলাসাহিত্যে তাঁর অজয় আবির্ভাব, তার মূলে দেবানন্দপুরের দানও বড় কম নয়। শরৎ-সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই দেবানন্দপুরের গভীর ছায়া। দত্তার বাঁশের সাকো, বিরাজবৌ-এর সরস্বতী নদী কিংবা শ্রীকান্তের গলারদড়ের আমবাগানের অন্তিম আজও ঝুঁজে পাওয়া যাবে দেবানন্দপুরে। গহর, গোসাঁই আর কমললতা বৈকুণ্ঠীয় স্বপ্ন দিয়ে গড়া গোসাঁইজীর আখড়াটিকে যদি কৃষ্ণপুরের শ্রীপাট বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়, খুব বেশি প্রত্যাবার দোষ ঘটবে না আশা করি। পিরারী পান্ডিতের পাঠশালা কল্পনা মাত্র নয়, মাছ চুরির রাতের সেই করালিনী নদী আর ছোট খাল আজও আছে। শেষ সম্বল কানের মাকড়ী দুটি যে দোকানে বিক্রয় করে ঋণমুক্ত হয়ে এই পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছিলেন অন্নদা-দিদি, সে দোকানটি আজও টিকে আছে বলেই দাঁবি করেন গ্রামবাসী আর আছে বৈচীবন। বৌদিকে তাকানো যায়, বতদুর নজর চলে দেবানন্দপুর আর কৃষ্ণপুরের পথে-ঘাটে, সরস্বতী নদীর তীরে তীরে সর্বত্র যখন কণ্টকময় ছোট ছোট কুঞ্জ রচনা করে অমর পরমায়ু নিয়ে টিকে আছে এই বৈচীবন। শরৎচন্দ্রের লেখনী-কল্যাণে বাংলাসাহিত্যের পাতায়ও ওদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ওই বৈচীবন, আর একগাছি পাকা বৈচীফলের মালা—

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার বন্দোবস্ত যে খুব সম্পূর্ণভাবে করা হয়েছে দেবানন্দপুরে তা নয়। সর্বত্রই একটা অসম্পূর্ণতার ছাপ। নামাঙ্কিত শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারটি প্রায় ৫০ বৎসরের পুরনো। প্রথমে গ্রামবাসীর উদ্যোগেই স্থাপনা হয় এটির। ১৯৫৬ সালে সরকারী রুর্যাল লাইব্রেরী স্কীমে গ্রহণ করা হয় একে। তারপর থেকে চেষ্টা চলছে অনেক কিছুই—শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন, প্রতি বার্ষিক হিসাবে চালু করার চেষ্টা, শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত একটি মেসার পত্তনের চেষ্টা, লেখক-লেখিকাদের



শরৎচন্দ্রের গৈরুতিভাষ্য বৈকুণ্ঠনা ঘর শ্রীকান্ত যদি জীবনকাহিনী হয়, তবে অসম্পূর্ণ শ্রীকান্তের সন্ধান পেয়ে উদ্ভাসিত রাজলক্ষ্মী হুটে এসেছিলেন এইখানে।

অবস্থান এবং বিশ্রাম স্থান হিসাবে ছোট-খাটো একটি ভবন নির্মাণের চেষ্টাও চলছে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অনেক-কিছুই এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। গ্রন্থাগার হয়েছে কিন্তু শরণচন্দ্রের প্রথম সংস্করণের কোন বই এখানে নেই। যেহেতু এটি স্মৃতিমন্দির তাই দর্শনাধীরা এখানে তাঁর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র দেখবার আশা করেন। তাও নেই। স্মৃতিমন্দিরের চারপাশের দেওয়াল তৈরি হয় নি এখনও। শরণচন্দ্রের পৈত্রিক ভিটা এবং তাঁর জন্ম-কক্ষটিকে সর্বসাধারণের জন্য অবাধে উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেই বাড়িতে হারা বাস করেন তাঁদের উপযুক্ত অর্থমূল্য দিয়ে ঘরখানি ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে অবশ্যই তারা সম্মত হতেন সম্ভব নেই। কিন্তু সেরকম কোন উদ্যোগ আজও হয় নি। লেখক-ভবনের জমি পাওয়া গিয়েছে। হেল-পড়া বাঁশের খুঁটিতে কুললত একখানি কাঠের বোর্ডে তারই নির্দেশ পাওয়া গেল। কিন্তু ভবন এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। মোটকথা সাহিত্যিকের তীর্থভূমি বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠ-স্থান দেবানন্দপুরেও শরণ-স্মৃতি বিষয়তায় স্থিরমাণ। সেখানে যা-কিছু আশা করা যায়, তার অনেক-কিছুই নেই।

কিন্তু না থাক, না থাক, না থাক। এখন আর ওসব ভাবতে পারি নে। কি থাকা উচিত ছিল, কতখানি নেই, কতটুকু হলে শোভন হত, আর কতটুকুই-বা হয় নি সেই না হওয়ার কত দায়িত্ব দেশের সরকারের আর কতটাই-বা দেবানন্দপুরের মানুষের, নিতা-কৃতা দৈনন্দিনের সেই কচ-কচি ছাড়িয়ে এখন আমি একটু মৃগ্ধ পেতে চাই। এখন আমাকে একটু নিশ্বাস ফেলতে দাও। বসতে দাও সেইখানে যেখানে পরম্বর্তী জলে ছায়া ফেলে নিয়ে নিয়ে গাড়িতে আছে গভীর বৈশ্ববন। যেখানে



শেষ সম্মেলন কালের মাকড়ী দুটি বিক্রি করে বিপুল পৃথিবীর জনারপো মিশে গিয়ে
অমরাদমি-গ্রামবাসী দাবি করেন এইটিই সেই দোকান।

পাতার-পাতার, পত্রান্তরাল রচনা-করা কুঞ্জ-বাঁধের গা বেয়ে কুলছে কুমকোলতার বড় বড় বেগুনি ফুল। আর সেই জলের ধারে ধারে, সরস্বতীর কিনারে কিনারে বুনো আদার নিবিড় তাঁর-গন্ধ, বুনো পাখিদের অবিরাম ডাকাডাকি, বুনো ফুলে লাল, নীল, হলুদের অফুরন্ত বাহার। সেইখানে বসে আমার একটু স্তব্ধ হতে দাও, মগ্ন হতে দাও, মৌন হয়ে রচনা করতে দাও একখানি স্বপ্নখণ্ড। বহু যুগ আগেকার হারিয়ে যাওয়া একটি বন্য ভালবাসার স্মৃতিস্বপ্ন—

জলের ধারে ধারে বন কণ্টকময় বৈচী-গুল্মের কোপে কোপে উঁকি দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক মেয়ে। পরণে রাঙা ডুরে

শাড়ি, মাথায় এক বাঁক ঝাঁকড়া রুম্বু চুল, কোঁচড়ে পাকা ফল, আর হাতে স্চ-স্চো। মালা তাকে গাঁথতেই হবে। সুপুষ্ট সুপারিসর একগাছি মালা—নইলে আছে এক মাস্টার-মশাই তার হাতের সর, বেত কমা জানে না শোনে না কোন কৈফিয়ৎ। লিকলিক করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঠের ঢগর, হাতে, গারে, মুখে। বালিকা কোপে-ঝাড়ে উঁকি দেয় আর পাকা ফল খোঁজে। অলঙ্ক্য দাঁড়িয়ে জীবন-দেবতা হাসেন, প্রসন্নতার নিতা হাসি।*

[* আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত।
পরের বারে বাণবোধিয়া।]

অনন্দ ভূ

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়

মুহুর্তে মুহুর্তে করি
অনন্ত সুখের আয়োজন।
যত করি তত বাড়ি আশা
অগণিত প্রবাহের মত
একে একে জমে ওঠে নিম্ফল সুখের স্তূপ
অনন্ত জিজ্ঞাসা।
অবাঞ্ছিত অতিথির মত
দুঃখশোক বিরহবেদনা
ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থ করে দেয়
দুঃখহীন সুখের কল্পনা।

তবু তাই নিয়ে মত্ত থাকি।
সংসারের চক্রে চক্রে
নিজেই জড়াই।
ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র সুখ
ধরে রাখি প্রাণপণে সারাক্ষণ।
তোমাকে ডাকার মত
একটি মুহুর্ত শূন্য
কোনমতে উন্মত্ত না পাই।

১৯১০ সাল। ৪ঠা এপ্রিল।

দিদি বিনোদবাবার চিঠির জবাবে আলি-পুর সেন্ট্রাল জেল থেকে যতীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিলেন, তার প্রতিটি ছব্রে পরিষ্কৃত হয়ে উঠল সাধক বিপ্লবীর দিব্য মনোভাব।

এইখানে পঠাটি উদ্ধার করে দিলাম—
শ্রীচরিত্রকমলেব্দ—

দিদি, আমার অসংখ্য প্রশ্ন জ্ঞানিবেন। জাপানার সেনহানীবাঁদী পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট অবগত হইলাম।—আপনারা সকলে ভাল জাহেন জানিয়া সুখী হইলাম।—আপনি আমার অসুখের সংবাদে ব্যস্ত হইয়াছেন; ব্যস্ত হইবেন না। আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি, তবে অসুখটা একটু বেশি হইয়াছিল তাই দ্বন্দ্ব হইয়া পড়িয়াছিল, আমার শ্রীগুরু কৃপায় আস্তে আস্তে সবল হইতেছি।—বাহা হউক, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারই চরণে আমার ক্রিয়াদান করিয়া রাখুন, তিনি যেমন আমাকে শৈশব হইতে নানা বিপদে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এম্বলও তিনিই একমাত্র ভরসা। তিনি আমাকে যত বেশি ভালবাসেন তাহাকে তত বেশি পরীক্ষা করেন এবং সেইজন্যই নানা বিপদের মধ্যে নিপাতিত করিয়া তাহারই আশ্রিত বৃদ্ধাইয়া দেন।—তিনি বাহা কহিবেন তাহার উপর মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই; মানুষ কেবল তাহাতে নির্ভর করিয়া পুরুষকার করিতে পারে; ফলাফল তাহারই হাতে। বাহা হউক আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তাহার প্রতি চাহিয়া বুক বাঁধিয়া সংসারে অবস্থান করুন।—আমরাও ভগবানের অধিক স্নেহ আপনার প্রতি, তাই আপনার পরীক্ষা আমা-পেক্ষা অধিক ও কঠিনতর। বাহা হউক, তাহার দয়া ভুলিবেন না। অথবা তাহাতে অবিশ্বাস করিবেন না। ইন্দ্রকে* ও অপর সকলকে এই পন্থাই দেখাবেন। মেজসামাকে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।—তাহারা সকলে কেমন আছেন?

শ্রীচরণে নিবেদনামিতি
প্রণত সেবক
জ্যোতি—

১৯১০ সালের ২৫শে এপ্রিল, 'হাওড়া-শিবপুর' রাজনৈতিক ডাকাতের সামলাসংক্রান্ত 'সে-রিপোর্ট' বাংলার আই-জি পুলিশ দাখিল করেছে, তার থেকে জানা যায়—

এ-যাবৎ এই মামলার জন্যে ছেচালিশজন

* যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী।

† শোভাবাজারের ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; ইনিই যতীন্দ্রনাথের আত্মীয়দের তরফ থেকে জেলে গিয়ে দেখা করে আসতেন মচরাচর।—পৃথ্বীন্দ্রনাথ ৯

সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দেশকর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে; ছজন অন্তর্ধান করেছেন; প'চিশজনকে জেরা করা হয়েছে, তাদের দু'জন—ললিত চক্রবর্তী ও যতীন হাড্ডার, রাজসাক্ষী হয়েছেন। সাক্ষী বেসব সংগ্রহ করা গিয়েছে, তারা সকলেই ডারমুন্ডহারবার সার্ভিভিশনের লোক—নেতড়ার ডাকাত ও সুন্দরবনে রিভলভার শিকার ব্যাপারে এরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

সরকারি রেকর্ডে উপরোক্ত বিপ্লবী কর্মীদের দলে দলে ভাগ করা হয়েছে; যদিও এরা কেউই উক্ত দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এদের সকলেই যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে আপাতদৃষ্ট এই রকম পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করলেও প্রতিটি দলের সংগেই প্রত্যেকের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান ছিল আন্তরিক নেতাদের সুবিধানবায়ী এবং—সর্বোপরি, যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে। একেই জনৈক প্রবীণ বিপ্লবী দার্শনিক অভিহিত করেছে Loose Confederation, বা 'বিকেন্দ্রিক দল' বলে। সাধারণত প্রত্যেক দলের নেতাই শব্দ সংযোগ রাখতেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সংগে এবং যতীন্দ্রনাথের রেহের খারাই এমন অকুণ্ঠ ছিল যে, প্রত্যেক নেতারই খরগা হত তিনি স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রেই দলের লোকেরা বিশেষ কেউ জানত না সর্বাধিনায়ক যতীন্দ্রনাথের ভূমিকা বা তার সংগে দলগুলির সম্পর্কের কথা। এই ছিল যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত-সংগঠনীর রীতি।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী নিম্নোক্ত দলগুলি এই সময়ে ধরা পড়ে:

- (ক) হাওড়া-শিবপুর দল—(১) ননীগোপাল সেনগুপ্ত, (২) ভুবন মুখার্জী (৩) ছোটন মুখার্জী, (৪) যোগেশ মিত্র, (৫) বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী, (৬) শৈলেন চ্যাটার্জী, (৭) অতুল মুখার্জী।

ললিত চক্রবর্তীর জবান অনুযায়ী এই দলের এই সাতজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলেও এরা ছাড়াও দলের আরো সভা যে আছেন, সে-বিষয়ে সরকারের জ্ঞান বেশ টনটনে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে ননীগোপালই সবচেয়ে গভীর জলের মাছ বলে গোয়েন্দাদের বিশ্বাস। ললিতের জবান অনুযায়ী ননীগোপাল, ভুবন, ছোটন ও যোগেশ সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বিষ্ণুপদ প্রত্যাকভাবেই নেতড়া ডাকাতের সংগে জড়িত।

(৬) এবং (৭) নম্বর আসামীর হলুদবাড়ি ডাকাতের মামলার বিচারামীন।

তা ছাড়া দশম লম্বা বাহিনীর সূর্যন সিং স্বীকার করেন যে, শিবপুরেই তাঁকে গুপ্ত-সমিতির দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল; দীক্ষার স্থান হিসেবে তিনি ভুবন ও ছোটনের বাড়ি সনাক্ত করেছেন। নরেন চ্যাটার্জী (ভোলা) তাঁকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে সূর্যন স্বীকার করেছেন; নরেন গা-ঢাকা দিয়ে আছেন—তাঁকে এখনো ধরা যায় নি।

রাজসাক্ষী যতীন হাড্ডার ও অন্যান্য সাক্ষীর জবান অনুসারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্থানের ডাকাতগণ এই শিবপুর দলের সহযোগিতার সম্পন্ন হয়েছে: শিবপুরে, বিখ্যাত, প্রতাপচক্রে, মোরহালে, কালচাঁরয়ার, মান্দপুরে (২ বার), নেতড়ার। তা ছাড়া দশম লম্বা বাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়ানোর মূল্যেও এদেরই হাত আছে বলে পুলিশের বিশ্বাস।

অধিকাংশ আসামীর চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা; এ-মহল্লার অধিবাসীরা প্রধানত রাইটাস' ব্রিটিশদের চাকুরে হওয়ার যতীন্দ্রনাথের পরিচিত; যতীন্দ্রনাথের প্রতি প্রভাবশত তাঁদের কারো কাছ থেকে অনুসন্ধান করেই কোন কথা আদায় করা যায় নি। জনৈক সাক্ষীর সতে ননীই নিম্নোক্তে—এ-দলের নেতা; ননীর বাড়ির কাছেই একটা পুকুরে কিছু কাড়জ পাওয়া গিয়েছে এবং ননীর সহকর্মীরা সকলেই ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলেন; মহারাজপুরের ডাকাতিতে ছিলেন বলে যোগেশ মিত্রকে সনাক্ত করানো কঠিন নয়; হলুদবাড়ি ডাকাতের মামলার শৈলেন ও অতুল বিচারামীন। কুচি গ্রামে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, শিবপুর থেকে সেখানে প্রায়ই লোক বেত এবং শিবপুরে ননীর আশ্রয়ভাঙেও কুচির অনেকের যাতায়াত ছিল। শিবপুর এবং শিবপুর দলের মধ্যেও যথেষ্ট বোঝা ছিল।

(খ) কলকাতার বারী শিবপুর শাখার সংগে প্রত্যেক সাক্ষী রাখতেন—

- (৮) গণেশ দাস, (৯) শৈলেন্দ্র দাস, (১০) হরেন ব্যানার্জী।

(৮) এবং (৯) নম্বর আসামীর হলুদবাড়ি মামলার বিচারামীন। এরা তিনজনেই ননীগোপালের সংগে কাজ করতেন শৈলেন্দ্র ডা' স্বীকার করেছে; ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তিতেও দেখা যায় যে, এই তিনজনেই বিপ্লবীদলের কাজে সক্রিয় ছিলেন এবং নেতড়া ডাকাতিতেও লিপ্ত ছিলেন। হরেন্দ্র মূলত ইন্দ্রনাথ নন্দীর সহকর্মী, 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর কাজেও ছিলেন। উপেন্দ্র দেব বাড়িতে একটি তালিকা পাওয়া যায়, তাঁত শৈলেন ও গণেশের নাম কর্মরূপে চিহ্নিত ছিল। জোঁগাছার এক আসামীর বাড়িতে অন্য একটি তালিকা পাওয়া যায়; এটি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছে কী ব্যাপক এক ষড়যন্ত্রে এই দু'জন লিপ্ত ছিলেন; গণেশ ভো 'বৃগাস্তর' বিক্রেতাও ছিলেন এবং মাণিকতলা বোমার মামলার প্রদর্শিত জিনিস-পত্রের মধ্যে অবিশদ্য অন্য

চারের যে-ভারের ছিল, তাকেও গণেশের উপেক্ষা মেলে।

(গ) খিদিরপুর—(১১) শরৎচন্দ্র মিত্র, (১২) সুরেশ মিত্র, (১৩) সত্যীশ মিত্র, (১৪) নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (ধরা বার নি এখনো), (১৫) বিমলা দেব।

ললিতের মতে এই পাঁচজনই খিদিরপুর কলের প্রধান কর্মী, অত্যন্ত সক্রিয়। (১১) নম্বর হচ্ছেন এঁদের নেতা; হলদেবাড়ি আমলার প্রদর্শিত জিনিস-পত্রের মধ্যে যে বিষের বাড়ি আছে, ইনিই সেগুলো সরবরাহ করেন। (১২) নম্বর নেতড়া ডাকাতিতে অংশ নিয়োছিলেন। নরেন চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল শিবপুর, প্রতাপচক, নেতড়া প্রভৃতির ডাকাতিতে অংশ নেওয়া এবং দশম জাতি বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগানো। ঊষ বাহিনীর সূত্রন সিং-এর সঙ্গে এবং তাঁর পরিচরে বিপ্লবের কাজে ইনি পাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এবং শিবপুর ও খিদিরপুরের মধ্যে যোগসূত্রও ইনিই। শরৎচন্দ্রের আসল বাড়ি হচ্ছে সোনারপুর।

(ঘ) কুচি—(১৬) বতীন হাজারা (রাজসাকী), (১৭) শিবু হাজারা (১৮) আব্দুল পাল, (১৯) মোহাম্মদ চ্যাটার্জী, (২০) হরিপদ অধিকারী, (২১) মন্মথ রায়চৌধুরী।

এই পাঁচটি সম্বন্ধে ললিত চক্রবর্তীর প্রত্যেক বিশেষ জ্ঞান নেই। সে বলেছে, যদিও তার জানা ছিল যে, এঁদের মধ্যে দু'জন হাড়ডা-আমতা লাইট রেলওয়ে দিয়ে এসেছিলেন নেতড়া ডাকাতিতে, যোগ দিতে। অবশ্য বতীন হাজারা স্বীকার করেছে যে, কুচি ও তার প্রতিবেশী গ্রাম ঘোষ-ভবানীপুরে যে পাখা দুটি আছে, তা ননীগোপালের নেতৃত্বে শিবপুর দলেরই অধীন। প্রতাপচক, মোরহাল, কালচাঁর ও মালপুরে (২ বার) যে-ডাকাত হন, তার অনেকেই এখানকার লোক।

এ-কথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, স্থানীয় নেতা শিবু হাজারা খিদিরপুরের এমন একটি দোকানে কাজ করতেন যেখানকার লব কর্মীই গুপ্ত-সমিতির সভা—এঁদের কেউ কেউ মোরহাল ডাকাতি মাল্যায় বিচারাদীন আছেন এবং মন্মথকে সাত-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বর্তমান অনুসন্ধানের সময় এঁদের কেউ কেউ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মোরহাল ডাকাতির মূলে ছিলেন 'ছত্রভা'ডার' দলের ভোলানাথ। এই ভোলানাথই যে নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (ধরা গড়েন নি) — সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। শিবু হাজারার বাড়ি তলাস করে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছে।

(ঙ) মজিলপুর—(২২) রজনী ভট্টাচার্য, (২৩) তিনকড়ি দাস, (২৪) ভূপেন বানার্জী, (২৫) ইন্দুকিরণ চক্রবর্তী, (২৬) চণীলাল নন্দী।

(২২), (২৩), (২৪) এবং (২৫) নম্বরের আসামীকে ললিত বিপ্লবী-সমিতির সভা বলে উল্লেখ করেছে এবং নেতড়া ডাকাতিতে এঁরা ছিলেন বলেছে। (২৩) নম্বর এঁদের নেতা এবং কেশবলাল দেকের ইনিই হত্যার করান।* (২৬) নম্বর ছিলেন 'ছত্রভা'ডার' দলের সভা এবং কিছুকাল ইন্দ্রনাথ নন্দীর নেতৃত্বেও কাজ করেছেন।

নেতড়া ডাকাতির সময় এঁদের সকলকেই বিশেষভাবে সন্দেহ করা হয়, কারণ এঁরা সকলেই ছিলেন মজিলপুর ইয়ংমেনস্‌ অ্যাসোসিয়েশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবক-সমাজের সভা। ডাকাতির পূর্বেই এঁরা যেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে কিছু কাগজের চিরকুট পাওয়া যায়; এগুলো (২২) নম্বর আসামীর। তার মধ্যেই একটিতে (২২) নম্বরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মজিলপুর ইয়ংমেনস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের একটি বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে। এই অনুসন্ধানের ফলে মজিলপুর ও কলকাতার বেশ-করকটি তলাস করা হয়। চণীলালের জারেরিতে (১১) নম্বর আসামীর (শরৎ মিত্রের) ঠিকানা পাওয়া যায়। তিনকড়ি 'শে' মাঝে মাঝে শরতের ওখানে যেতেন, তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ : এইসব অনুসন্ধানের সময় স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর বোগেন মুখার্জী লক্ষ্য করে দেখেন, একটা লোক সর্বদাই তাঁর পিছ পিছ ঘুরছে;

তাকে প্রেস্তার করে দেখা যায়, সে রজনীর ভাই সত্যাকরণ। ললিত একে মজিলপুর অ্যাসোসিয়েশনের সভা বলে উল্লেখ করেছে।

(ঢ) নেতড়া—(২৭) ললিত চক্রবর্তী এবং (২৮) হেম সেন (৪৬, দেহুরাবাজার স্ট্রীট)।—গ্রামবাসীদের মতে ললিতও ওইসব বন্দে-মাতরম্‌ দল-টলের সভা ছিল। ২৮ নম্বরের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই।*

(ছে) কোলালিয়া - সোনারপুর — (২৯)

*নির্বাপন্যামী (সত্যীশ সরকার) বলেন, কেশব দেকের সত্যিসত্যি হত্যা করা হয় নাই। কিন্তু ললিত যখন নাটোরের আশ্রয় নিয়ে ছিল, তখন তার ভাবচরিত্র দেখে আশংকা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তখন তাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে বলা হয়, কেশবকে মেরে সেখানে পুতে রাখা হয়েছে। এ থেকেই কেশব-হত্যার কাহিনী রটে।

*অথচ পুলিশ জানে না কী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে হেমবাবু অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্বতীন্দ্রনাথের কত প্রিয় সহকর্মী ইনি ছিলেন। —পুন্ড্রীন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ভবিষ্যতের এম এন বার), এবং (৩০) ভূষণ মিত্র (গোলে)।

ললিত বলেছে নরেন্দ্রও নেতড়া ডাকাতিতে ছিলেন, কিন্তু ললিতের সনাক্তকরণ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। চ্যাড়িপোতা আমলার নরেন্দ্রকে বিচারাদীন রাখা হতোছিল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ওখান থেকে তাকে 'আরো গভীরের মাহ' বলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চ্যাড়িপোতা কেসের থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 'অ'মান্তর' দলের সঙ্গে এর সম্পর্ক—এবং কলকাতার তো ইনি খাস আদি 'অনু-শীলন' দলের বাড়িতেই থাকতেন। ভূষণ মিত্র বরষে ভরপূর্ণ হলও অত্যন্ত মারাত্মক কর্মী। ললিতের মতে ইনি নেতড়া ডাকাত, এবং সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বানার্জী ও নেতড়ার কেশব দেকের হত্যার মধ্যে ছিলেন। চ্যাড়িপোতা ডাকাতিতে সন্দেহভাজন হয়ে ইনি অন্তর্দান করেন। এঁর আত্মীয় চেতলার চারু ঘোষ বাঁদের রিভলভার চালানো দেখাযে সন্দেহবনে নিয়ে যেতেন, ইনিও তাদের অন্যতর ছিলেন বোধহয়।

(জ) কলকাতার কল-নগরের লোক—(৩১) উকিল ললিত চট্টোপাধ্যায়, (৩২) বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩৩) সুরেশ মজুমদার ওরফে পরাণ, এবং (৩৪) নিবারণ মজুমদার।

এই চারজনের সঙ্গে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট সামসুল-আলমের হত্যার সম্পর্ক দেখিয়ে একটি রিপোর্ট ইতিপূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছে। রাজসাকী ললিত চক্রবর্তীর স্বীকৃতিতেই প্রথম তিনজনের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে। উকিল ললিত চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণের বিরুদ্ধে প্রমাণ অত্যন্ত কীংকির্ত। বতীন্দ্রনাথ ও পরাণের হাত একে সন্দেহ। বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতি, ললিতের স্বীকারোক্তি এবং বতীন্দ্রনাথের স্বর ভল্লাসীর সময় গুপ্ত-সমিতি গঠনের যে-পারকল্পনাটি পাওয়া যায়—এ-সব মিলিয়ে বতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই মারাত্মক। পরাণের ক্ষেত্রে অবশ্য পরাণ যে-রিভলভারটি চুরি করে আনেন সেটি সম্বন্ধে আদালতের মতামতই চূড়ান্ত গণ্য হবে—এই রিভলভারটি দিয়েই সামসুলকে হত্যা করা হয়। সাক্ষ্য দ্বারা সম্ভবত এক-কথাই প্রমাণিত হবে যে বতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরাণের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরাণের খাতায় বেসর যড়যন্ত্রকারীর নাম পাওয়া গিয়েছে, তা থেকেই ললিতের স্বীকারোক্তির সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

(ঝ) আত্মঘাতী সমিতি—(৩৫) হরিন্দাস চক্রবর্তী, এবং (৩৬) নরেন্দ্রনাথ বসু।

ললিতের মতে ইন্দ্রনাথ নন্দী ও তাঁর বেশ কিছু বন্ধু ছিলেন 'আত্মঘাতী' নামে

এক বিপ্লবী সমিতির সভা। ০৫ এবং ০৬ নম্বর আসামী এই সমিতিরই সভা। সমিতিটি এখন উঠে গিয়েছে, এবং জামালপুরের মাগা সম্মুখে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে নরেন বোসও এই মাগায় গিয়েছিলেন। লালিত বলেছে যে নরেন অত্যন্ত সক্রিয় এবং কার্যকরী সভ্য; নন্দলালকে হত্যা এবং নেতৃত্ব ডাকাতি-দুটোতেই ইনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। জামালপুরের যে-চারজন ধরা পড়েন, তারা হচ্ছেন : নরেন্দ্রনাথ বসু, বিপিন গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং শিশির ঘোষ।* আলিপুর বোমার মামলার শিশির-বাসু সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইন্দ্রনাথ নন্দী সে-মামলার অব্যাহতি পান। বারাগসীতে অনুসন্ধান করে জানতে হবে সেখানে নরেন বসুর কার্যাবলী কি কি ছিল।

(৫৫) কাউগাছা—(৩৭) উপেন্দ্র দে, (৩৮) কালীচরণ চক্রবর্তী, এবং (৩৯) পুলিন সরকার।

লালিত এবং যতীন হাজরার স্বীকারোক্তি : হুদুদবাড়ি মামলার বিচার্য্যীন আসামী উপেন্দ্রই ছিলেন আঞ্চলিক নেতা। এঁরা তিনজন প্রতাপচক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। উপেন্দ্রের বাড়িতে একটি নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে গণেশ দাস (৮) নম্বর, শৈলেন দাস (৯) নম্বর প্রভৃতির নামও ছিল।

(৬) ঢেংলা—(৪০) চারু ঘোষ, এবং (৪১) কিরণ রায়। প্রত্যেক দলের ছেলেদের নিয়ে চারু সুন্দরবন অঞ্চলে, ফুলেশ্বর ও বাদার কাছাকাছি অন্যত্রও যেতেন রিভলভার

* যশোরের কবিরাজ বিজয় রায়ের মাধ্যমে ইনি যতীন্দ্রনাথের বিনীত সংস্পর্শে আসেন বঙ্গভঙ্গের সময় বা তারো আগে; যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইনিই প্রথম কর্মী সংগ্রহে নামেন বোধহয়। ইনি, বীরেন, হেমেন এবং জিতেন, চার ভাই-ই যতীন্দ্রনাথের দলে ছিলেন; ছাড়া পেয়ে বীরেন খয়ের দোকান করেন যশোর শহরে; যতীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল সেখানে।

+ বারাগসীতে বিপ্লবের খবর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র অগ্নিবৃগের সূচনা থেকেই ছিল, এবং নরেন্দ্রনাথ সেখানে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে যাতায়াত করতেন; একটা ব্যবসায়ও ফেঁদেছিলেন পুলিশের চোখে খুলো দেবার জন্যে। ইতিপূর্বে Daily এবং Cleveland-এর রিপোর্টে দেখেছি, লালিত তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে, তারানাথ রায়-চৌধুরী, নরেন বসু প্রভৃতি কর্মীরা অস্ত্র-ভর্তি এক-একটি ট্রাক নিয়ে কুকনগর থেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে যান বোমার বাগান, ধরা পড়ে বাবার সময়!—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

চালানো শিক্ষা দিতে। ভূষণ মিত্র (৪০) নম্বর ছিলেন এঁর সহ-যোদ্ধা। কিরণ রায় বর্তমানে হুদুদবাড়ি মামলার বিচার্য্যীন। তার বাড়ি ভাঙ্গা করে বহু সাম্প্রতিক রিপোর্ট ও পত্রিকাগুলি রিভলভারের কার্যকরী পাওয়া গিয়েছে।

(৬) বোলরাশি ও উত্তর নদীয়া—(৪২) বিধু বিশ্বাস, (৪৩) সুশীল বিশ্বাস, (৪৪) নরেন বিশ্বাস, এবং (৪৫) মম্বথ বিবাস।

লালিতের স্বীকারোক্তি : প্রথম দু'জন গুপ্ত-সমিতির সভা। (৪৪) নম্বরের বিরুদ্ধে প্রমাণ সামান্যই পাওয়া গিয়েছে। হুদুদবাড়ি মামলার সুশীলের সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। সম্ভবত এই মামলার সে রাজসাক্ষী দাঁড়তে রাজী হবে। মম্বথও বোধহয়; রায়পুর বোলরাশি (রাজসাহী) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মম্বথই; এটিও একটি গুপ্ত-সমিতি। পুষ্টিয়ার কুমার নৃপেন রায় বলেছেন যে গণেশ দাস, মম্বথ ও বিধুকে তিনি একত্রে নাটোরের দেখেছেন।

(৬) নাটোর-দীঘাপাতিয়া—(৪৬) শ্রীশ সরকার (৪৭) বিজয় চক্রবর্তী, (৪৮) সত্যীশ সরকার।

বিপ্লবী দলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক শাখা আছে নাটোরে এবং উপরোক্ত তিনজন সে-শাখার পরিচালক। শ্রীশ সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ (যা লালিতের স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে)—এক সাক্ষ্যের খাতায় দেখা যাচ্ছে কিছু সেনার গরনা তিনি বিক্রি করেছেন; লালিত বলেছিল, পাটনার থাকা-কালীন শ্রীশ ওই অলংকার চুরি করেছিলেন “কাজে” লাগবে বলে। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে পাটনার শ্রীশ যখন গিয়ে উকিল কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গঠেন, তখন কেদারবাবুর স্বীয় একটি গরনা হারিয়ে যায়।

বিজয় চক্রবর্তীর দীঘাপাতিয়ার বাড়িতে চারটে রিভলভার পাওয়া যায়। লালিতের জবাবের সঙ্গে এটাও মিলে যাচ্ছে।—সত্যীশ সরকারও দলের অত্যন্ত কার্যকরী একজন সভ্য। আলিপুর বোমার মামলার এঁর বহু চিঠি আদালতে তোলা হয়। বোধ হয় উপেন বাড়ীকো, শৈলেন্দ্র বসু, এবং মুরারিপুর বাগানের আরো অনেক কর্মীর সঙ্গে এঁর যোগ ছিল। পুলিশের দৃষ্টি বিশ্বাস, সামসুল হত্যার সময় ইনিও বীরেন দত্তগুপ্তের সঙ্গে হাইকোর্টে যান।

লালিতের স্বীকারোক্তি থেকে সরকারের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে যে, এই মামলা কোন-একটা মাত্র ডাকাতি দলের বিরুদ্ধে নয়, খোদ বিপ্লবী সংগঠনেরই বিরুদ্ধে, দেশে কর্মরত তাঁদের এক বিরাট অংশের বিরুদ্ধে,—উক্ত সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ পাই। “লালিতের জিজ্ঞাসে কোথাও দেখা যায় না ননীগোপালকে

গোটা সংগঠনের নেতা বলে উল্লেখ করতে; লালিত শব্দমাঝে দেখিয়েছে বিরাট এই সংগঠনে ননীও ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, বা ইন্দ্র নন্দী, শরৎ ডাক্তার কিংবা অন্য-কোনও শাখার নেতাদের চাইতে উচ্চতর ননীকে কোথাও বসায় নি লালিত। গুপ্ত সমিতির পরিচালনার যতগুলি প্রকাশ্য অঘটন ঘটানো হয়েছে, তার অনেক-গুলোতেই যে ননী অংশ গ্রহণ করেছেন সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ; এর থেকে বোঝা যায় তার কর্মক্ষমতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য কতখানি ছিল, এবং সংগঠনের এই শাখাটি তার নেতৃত্বে কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল—কী অস্ত্র-শস্ত্র, কী বিপ্লবী কর্মীতে।

লালিতের স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ননীগোপালেরও মাথার ওপর একজন বা একাধিক নেতা আছেন, এবং বিভিন্ন শাখা-গুলি পরস্পর মতামতের দ্বন্দ্ব না হয়েও সমবার প্রণালীতে পরস্পরের সহায়তা করে কাজ করে চলেছেন। এই বিপ্লব-সংগঠনের প্রকৃত নেতাদের মূলে কুঁঠারাত করা—একমাত্র অব্যবস্থিত যোদ্ধার ক্ষেত্রে ছাড়া—আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব মনে হয়েছে বরাবর। এবং এ-ক্ষেত্রে আমরা বলতে বাধ্য হ’ব যে, অনেক-কাল আগেই যদি ব্যারিস্টার পি মিত্র, রজত রায়* এবং সখারাম গণেশ ডেউস্করকে গ্রেপ্তার করা হ’ত, তবে অবশ্য আজ এতটা সংগীন হ’তে পারত না।”...

উপরোক্ত দলগুলি ছাড়াও অভিযুক্তদের মধ্যে “দুগান্তর”, “হুদুদবাড়ি”, খানাবুল-কুকনগর, মুরারিপুর বাগান প্রভৃতি শাখার সভ্যরাও আছেন। সাক্ষী শৈলেন দাসের মতে কাঁচি, বাঁকুড়া, ব্যারাকপুর, বারাগসী প্রভৃতি বহু জায়গায়ই এঁদের শাখা আছে। এ মামলার অভিযুক্তদের তালিকা সম্পূর্ণ হ’বে না রায়তা ডাকাতের অভিযোগে হ’ত আসামীদের নাম না করলে। সুশীল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় এঁদের নাম :

(৪৯) প্রকৃত মজুমদার, (৫০) কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, (৫১) রমাপদ মুখার্জী, (৫২) বিজুতিভূষণ মুখার্জী, (৫৩) ভূপেন্দ্র রায়-চৌধুরী, (৫৪) শান্তিপদ মুখার্জী (৫৫) সত্যীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (ধরা পড়েন নি)। সুশীলের স্বীকারোক্তিতে দেখি (৫৬) নম্বরের নেতৃত্বে এঁদের কেউ কেউ রায়তা ডাকাতের ঠিক আগেই সেখানে গিয়েছিলেন, ব্যারামস্কাপ এবং ম্যাজিক লণ্ডন দেখেছিলেন।

সরকারের চোখে রজত রায় যে যতীন্দ্রনাথেরই Duplicate অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্যে তাঁরা রজত রায়কে দায়ী মনে করতেন—একথা আগেই বলা হয়েছে।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরীর ডায়েরিতে, তিনি রম্যাদ, বিদ্যুৎ (৪২) এবং মন্থন (৪৫) বেশ-শব্দ গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। ভূপেন্দ্রের বাড়িতে বহু কাচুজ, কাচুজ ভর-বার যন্ত্র, বুলেট বানানোর সীসে প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে এবং তার ডায়েরিতে রিভলভারেরও উল্লেখ আছে।... শান্তিপদ মুখার্জী এবং সতীশ দাশগুপ্ত-দুজনেই “কুখ্যাত” অনুশীলন সমিতির সভ্য।* সদৃশীলের জীবনে দেখা যায়—এরা ক’জন একটা নৌকায় বাস করতেন সমিতির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে, এবং এই নৌকায় ক’রেই তারা ডাকাতি করতে আসেন। সরকারের বিশ্বাস, বাহা ডাকাতির পরেই অনুশীলনের এই সভ্য দুজন রাজ-সাহী গিয়ে গা-ঢাকা দেন এবং সেখানকার গ্রামপূর-বোয়ালিয়া শান্তি-সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলেও ডাকাতি করেন।...

শান্তিপদ কিছদিন নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সম্যাসীর বোশেও ঘুরে বেড়িয়েছেন বলে প্রকাশ।

ছাত্রভাণ্ডার দল—(৫৬) পবিত্র দত্ত, (৫৭) রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৮) প্রভাসচন্দ্র দে, (৫৯) অমদা রায়, (৬০) শরৎচন্দ্র খান, (৬১) নম্বর (পবিত্র দত্ত) অভ্যন্তর কারি-কর্মী সভ্য এবং ছাত্রভাণ্ডারের সম্পাদক। বৈশ্ববিক প্রচারের কাজে ছাত্রভাণ্ডারের অবদান অসামান্য—এঁদের অনেকেই “বুগান্ডার” দলের সঙ্গে যোগ রাখতেন। মোরহাল মামলার এক আসামী বলেছেন যে উক্ত ডাকাতির প্ররোচক জোহান্নাথ (ওরফে নরেন চাটাজী) ছাত্রভাণ্ডারেরই সভ্য। তারানাথ রায়চৌধুরীর স্বীকারোক্তিতে জানা যায় পবিত্র দত্তই তাঁকে “ছাত্রভাণ্ডার” থেকে কয়েকটি রিভলভার দেন—৪, রাজা লেনে এগুলো ধরা পড়ে। শহীদ সত্যের বসুর সঙ্গেও পবিত্র দত্তের সংযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।†

১৯০৮ সালে, (৫৯) নম্বরের আসামী অমদাচরণ রায়ের ২০২, ক’ওয়েলিশ স্ট্রীটের বাড়ি ভরসী হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্রাদি সেখানে ধরা পড়ে। একটি চিঠিতে কার্তিক দত্ত (বিখ্যাত ডাকাতির মামলার ছ*

বহুরের কারাদণ্ডে দাঁড়ত) তাঁকে লিখেছিলেন যে পাথর কাঁচ খুব ভালই এগিয়ে চলেছে, একটি “ঠাকুর” (রিভলভার) প’রতাল্লিশ টাকার সংগ্রহ হয়েছে, এবং দরকার হলে “বুগান্ডার” পত্রিকার জন্যে নতুন একজন প্রিটার সংগ্রহ করা যায়। অন্যান্য চিঠির মধ্যে “কুখ্যাত” মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তী* কিছ চিঠিও পাওয়া যায়—তার মধ্যে দুটিতে পলাতক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর উল্লেখ আছে, এবং একটিতে দেখা যায় অবিনাশবাবু একটি পরিচয়-পত্র দিয়ে জনৈক উকিলকে নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতা পাঠাচ্ছেন, অমদাবাবুকে নির্দেশ দিয়েছেন উকিলটিকে “নিজের লোক” মনে করতে এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার আলোচনা করিয়ে দিতে। সেইসঙ্গে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর রচনাবলীর একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করা গিয়েছে। চিঠিগুলোতে অনেক-বারই রহস্যজনক সব উল্লেখ পাওয়া যায়। অমদা রায় ছিলেন সাধনা প্রেস (বুগান্ডার)-এর অন্যতম ডাইরেটর—অন্য ডাইরেটরদের মধ্যে বারীন ঘোষ এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীও ছিলেন।

৬০ নম্বর আসামী শরৎচন্দ্র খান ছিলেন “ছাত্রভাণ্ডার” প্রতিষ্ঠানের ডাইরেটর এবং শেরারহোল্ডার। হগাড়া থেকেই ইনি “বুগান্ডার” পত্রিকার সহায় ছিলেন।

“বুগান্ডার” দল—(৬১) কার্তিকচন্দ্র দত্ত এবং (৬২) তারানাথ রায়চৌধুরী।

বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের মামলা পরিচালনা করতে গেলে প্রথম অপরিহার্য কাজ হল এই “বুগান্ডার” দলের সঙ্গে অন্য শাখা-গুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করা। বিখ্যাত মামলার কার্তিক ইতিপূর্বেই দাঁড়ত (এই

ডাকাতির জন্য হাওড়া থেকে কেশব বৈ উদন-জনকে নিয়ে এসেছিলেন)। উকিল ললিত চাটাজী* নদীয়াতে রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান কারণ; এবং ললিত চাটাজীর সঙ্গে কার্তিক দত্তের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করা যায়। শান্তিপূর পাদরিকে আক্রমণ করবার অপরাধে কার্তিক যখন ছয় মাস কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করেন, ললিতবাবু কার্তিকের সম্বন্ধনার আয়োজন করেছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্যকে লেখা ললিতবাবুর একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ এক বারীনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬২ নম্বর (তারানাথ) এতদিন পলাতক ছিলেন; রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির ফলে এঁকে কাশীতে গ্রেপ্তার করা হয়। “ছাত্রভাণ্ডার” এবং “বুগান্ডার”-এর সঙ্গে এঁর যোগ ছিল।

৬৩ নম্বর—শিশিরকুমার ঘোষ জামাল-পুরে ইন্দ্র নদী প্রভৃতির সঙ্গে ধরা পড়েন। বড়বস্তুর অন্যান্য সবাই সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল।

খানকুল-কৃষ্ণনগর—(৬৪) বিহারীলাল রায়, এখনো ধরা পড়েন নি; ইনি এবং নরেন গাঙ্গুলী ছিলেন এই ছোট শাখার প্রধান কর্মী; “আব” কোমকাল ওরাক’স-এর সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল—নিবারণ মজুমদার (৩০ নং) এবং সুরেশ মজুমদার (৩৪ নং) প্রভৃতির সঙ্গেও।

(৬৫) নম্বর—হারান বান্যাজী, শিব-পুরের বাসিন্দা, ননীগোপালের সঙ্গে ধরা ছিলেন। খুবই সম্ভব যে কৃষ্ণনগরের কাছে মহারাজপুরের ডাকাতিটা (গেল বছর জুন মাসে) কৃষ্ণনগর সমিতিরই সাহায্যে করা হয়। গণেন (জানেন?) বিশ্বাসকে সূচিশ সন্দেহ

* আমাদের কাছে প্রাচ্যঃস্মরণীয় ইনি; সরকারের কাছে ছিলেন না।

* ইনিও, রক্তত রায়ের মতই, যতীন্দ্র নাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতেন।

* স্মরণে রাখতে : হ’ব, সরকারি রিপোর্টের ভাষা এগুলো।—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

এই সম্পর্কটা পবিত্র দত্তের সঙ্গেই শব্দমাত্র নয়; প্রকৃতপক্ষে মতীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে ছিল। পবিত্র দত্ত বলেন : আমি ছিলাম পোস্টাফিস মাত্র; মতীন্দ্র মুখার্জী, অমর চাটাজী, নির্খিল রায়মৌলিক, মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অমদা রায় (কবিরাজ)—এঁদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল তখন আমার ওখানটা।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক : বীরেন্দ্র দেবনাথ

এ সংখ্যার বারী লিখেছেন—

শ্রীহরিশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ শীতলশ্রী মৈত্র, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ সুশীল রায়, কবি শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর আছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর “বড়বা” প্রমথেরা হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণ।

অনুসন্ধান : পত্রিকা-সম্পাদক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪ স্মারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা চার টাকা (গ্রাহকের দায়িত্বে সার্টিফিকেট অব পোস্টে বোঝে) এবং রেজিস্ট্রীযোগে সাত টাকা।

পরিবেশক : পত্রিকা সিন্ডিকেট (প্রা) লিঃ

১২/১ লিংডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

করে; শৈলেন্দ্র দাসের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় ইনিও দলের সভ্য ছিলেন।

(৬৬) নম্বর—জ্ঞানেন্দ্র (?) দাসের নদীয়া ও কলকাতার বাড়ি তল্লাসী করা দরকার।

এইসব তথ্য থেকে আমরা বুঝছি যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোর, খুলনা এবং মিছরিবাবুর* দল ও অনুশীলন সমিতি ছাড়া—বিশ্বলবী সংগঠনের অন্যান্য সবকটি প্রধান শাখার ওপরেই মোক্ষম আঘাত দিয়েছে এই মামলাটি।.....অনুশীলন সমিতি তো উঠে যাবার মতই ছিল।.....আলাদা আলাদা করে যশোর এবং খুলনা জেলায় তল্লাস করতে হবে; ললিতের উদ্ভিষ্টে জানা যাচ্ছে যে, যশোরের কম্বীরা অন্যান্য আর-সব শাখার সংগে সহযোগ করে চলেছে।.....খোঁজ করে দেখতে হবে বারানসীতে এঁদের সত্যিই কোন শাখা আছে কিনা; হয়তো গান্ধীকা দেবার আশ্রয় এবং পরস্পরের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ ও বৈঠকের স্থান আছে ওখানে।

বাঁকুড়ার রামদাস চক্রবর্তীকে দাঁড়িত করবার স্বপক্ষে আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শৈলেন্দ্র দাসের স্বীকারোক্তিতে সবচেয়ে বড় কথা যা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হল—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ লাইফ ইনশুরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে তার লিখিত অভিযোগ : এ-কোম্পানী বিশ্বব আন্দোলনেরই অংশ নয়; বিশ্ববের কাজে বারী নেমেছেন—তাদেরই ভরণপোষণের জন্যে এটি একটি কেন্দ্র-বিশেষ।

প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনারেলসের রায় থেকে দেখা যায় যে দশম জাট রোজমেন্টের বিরুদ্ধে সরকারের প্রধান অভিযোগ—উক্ত রোজমেন্টের সূরজন সিং এবং রামগোপাল জুবন মুখার্জীর শিবপুরের বাড়িতে যেত এবং সেখানেই দীক্ষা নিয়ে দলের সভ্য হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ : সূরজন সিংকে নরেন চ্যাটার্জী একবার এবং লালিত দু'বার টকা দেন। তৃতীয় অভিযোগ : জাট রোজমেন্টের এই দু'জন অনবরত নরেন চ্যাটার্জীর সংগে বোমা রাখত এবং শরৎ নিত্রের বাড়িতেও

যাতায়াত করত; নদীয়াগোপালের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই।.....জাট সাক্ষীদের জবানে বলা হয়েছে ওরা শিবপুর ডাকাতের আগে এবং পরেও ৮৬/১, ডায়মন্ডহারবার রোড শরৎ নিত্রের ডিপেন্সারিতে যাতায়াত করত।.....

১৯১৬ সালের ১১ই মাঘ সাপ্তাহিক 'ধর্ম' লিখল, "সৈদীন 'ইংলিশম্যান' সংবাদ-পত্রিকা-সভ্যে একটি ভীষণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—ইংগপ্রবর লিখিয়াছেন যে আলিপুরে যে ১০ম জাট সৈন্যদল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বিশ্ববকারিগণ তাহাদিগের মধ্যে বিশ্বব ও বিদ্রোহের বীজ ছড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল।...উক্ত সৈন্যদলের দশজন সৈনিকের গ্রেপ্তার করিয়ে জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কতৃ-পক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তাহার জন্যে করিতেছেন যে, শীঘ্রই ঐ-বিষয়ে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। সহযোগী আরও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সৈন্যদলকে শীঘ্রই কলিকাতা হইতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, তাহাদিগকে আরও তিন বৎসর এখানেই রাখা হইবে। সৈনিক-কতৃপক্ষগণ ন্যাক শে করিয়াছেন যে, কিছুদিন হইল দেশীয় সৈন্যদল মারকেই এইরূপ কুপথে চালিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু কোথাও তাহা সফল হয় নাই। বর্তমানকালে কেবল কয়েকজনের ব্যবহার সম্ভবজনক বোধ হইয়াছিল, তাই তাহাদিগের সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি চলিতেছে। কতৃপক্ষ আরও বলিতেছেন যে, সৈনিকদল যে বিদ্রোহী হইবে এমন কোন আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ দলের সহিত পূর্বে আরও কয়েকজন বাঙালী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়।...অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে, ফল শীঘ্রই ন্যাক প্রকাশিত করা হইবে।"

পরের সপ্তাহে 'ধর্ম' লেখে, "...সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত সৈন্যদলকে আর তথায় (আলিপুরে) রাখা হইবে না। এই ব্যাপ্যারের পরেও তাহাদিগের অবস্থিতি-কাল যে বেশি করিয়া দেওয়ার কথা শুন্য গিয়াছিল তাহা মিথ্যা। এই সৈন্যদলকে ১লা ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরে ডাক হইতে করাচী

লইয়া যাওয়া হইবে। হাইদরাবাদে হাইদর কার্ভার দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আলিপুরে যে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহার সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি চলিতেছে।"

পরের সপ্তাহে 'ধর্ম' লিখল, "...সৈন্যদলের যে দশজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আটজনকে মৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চুণী হাবিলদার ও সূরজন সিংহাজীর এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড আদেশ হইয়াছে। উক্ত সৈন্যদলকে আলিপুর হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

"রিচার্জিং নামক জনৈক পশ্চিমদেশীয় যুবককে আলিপুরের মৌজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাসের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে—অভিযোগ এই যে, প্রকাশ্যভাবে জীবনধারণ করিবার কোন উপায় তাহার কতৃক প্রদর্শিত হয় নাই। এই যুবকটিই আলিপুরে জাট সৈন্যদলের সমিতিতে অতি সন্দেহভাজনভাবে চলাফেরা করিতেছিল। পুলিশের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই; তাহার হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

জাট-সৈন্যদলের সংগে এবং অন্যান্য দেশীয় সৈন্যদের সংগে বিশ্বলবীরা যে বোম-স্থাপন করিয়াছেন, তার বিবরণ যথাসম্ভবে উদ্ভূত করব কলকাতার তদানীন্তন জার্মান কনসাল কাউন্ট টর্ন Thurn জার্মানিতে কাউন্ট ব্যাথটেলড-এর কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন বাংলা-দেশের বিশ্বব আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে—সেই রিপোর্টটি থেকে।

১৯১০ সালের ১ই মে তারিখে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগের ডিরেক্টর সি আর ক্রিড-ল্যান্ড সাহেবের মেমো-তে লেখা আছে : (১) পুলিশ যেসব তথ্য পূঞ্জীভূত করে এনেছে, সেগুলো সাজিয়ে বিরাট এক যন্ত্র-যন্ত্রের বিরুদ্ধে "হাওড়া-শিবপুর মামলা" শুরুর হয়ে গিয়েছে। (২) এঁদের সবাইকে নিবাসিত* করে দেবার যে-প্রস্তাব করা হইয়াছিল তা' নামজার হয়ে গিয়েছে। গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ত নিরেছেন যথাসম্ভব আইনসিদ্ধ উপায়েই মামলা বন্ধ করে এঁদের অপরাধ প্রমাণ করতে হবে। এই মামলার ফলাফল যাই হক—দীর্ঘকাল যাবৎ এতগুলি কিশোর, তরুণ ও যুবককে অবরুদ্ধ রাখার ফলে দেশে প্রকাশ্য আন্দোলনের স্বাভাবিক স্ফীতি হ'য়ে এসেছে।

সরকারি তরফ থেকে এই সংবাদও কম সান্দ্যদায়ক নয়। দেশের "অরাজকতা" তাঁদের সত্যিই চিন্তাকুল করে তুলেছিল। এবং তার পশ্চাতে, ধৃত বিচার্যধীন যুবকদের সবাই না-হলেও কিছ' যে দায়ী—এ-ধারণাও সরকারের স্পষ্টত দৃঢ়মূল হ'য়ে উঠল।

* নিবাসিত অর্থাৎ "Deportation Under Regulation III of 1818"—সরকারি ভাষায়।

* মিছরিবাবুর দল বলতে কোনও দল ছিল না; আগে একথা লিখেছি।

মানের মতন গয়না

বি. দরকার
ম্যাণ্ড সাম
১২৪, ১২৪/১ বি. বি. গামুলী স্ট্রিট
কলকাতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিবর্তন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যবস্থায় যে অনেক গগদ আছে, এ বিষয়ে ভিন্নমতের অবকাশ কম। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সময় লাগে; সেনেট, সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনটি প্রধান সংস্থার মধ্যে কর্মবিভাগ স্পষ্ট নয়, এবং এর জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনুমোদিত কলেজগুলি অন্যান্য কাজ করলেও বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না—এই সব কারণে শিক্ষাবিদ মহলে বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯৫১) পরিবর্তন করে নতুন একটি আইন প্রণয়নের দাবি উঠেছে।

তাই যখন গত বৎসর রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করবেন বলে সংবাদ বেরুল, তখন অনেকেই আশাবিভ হইয়েছিলেন। কিন্তু বিল দেখে আশাবিভ হওয়া দূরে থাক, সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, এই বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা করে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৬৫ প্রায় এক বৎসর ধরে বিধানমণ্ডলীর দুই পক্ষের ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যুক্ত সিলেক্ট কমিটির দ্বারা বিবেচিত হয়েছে। কদিন আগে বিধানমণ্ডলীর নিকট কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল বসু, অধ্যাপক শম্ভুচরণ ঘোষ, শ্রীনিখিল দাস, শ্রীশৈলেন অধিকারী, শ্রীগোপাল হালদার ও অধ্যাপিকা ইলা মিত্র, বিরোধী দলভুক্ত এই কজন সদস্য ছাড়াও কংগ্রেস দলের প্রবীণ সদস্য ডঃ শ্রীকুমার ষট্টপাধ্যায় ও অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টের সঙ্গে একমত না হতে পেরে তাঁদের ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। কমিটদের মধ্যেই এই বিলটির ওপর বিধানসভা ও বিধান পরিষদে বিতর্ক শুরু হবে।

কিভাবে এই বিলের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে? প্রথমত, সেনেটে আচার্যের (চ্যান্সেলার অর্থায় রাজ্যপাল) মনোনয়ন বাধিত করা হচ্ছে—বর্তমানে ১৫ জন মনোনীত সদস্য আছেন, প্রস্তাবিত বিলে তা বাড়িয়ে ২০ জন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সিন্ডিকেটে এতদিন আচার্যের কোন মনোনীত সদস্যের ব্যবস্থা ছিল না। রাজ্য সরকারের শিক্ষাধিকর্তা (ডি, পি, আই) ও মহাশিক্ষা পর্ষদের সরকার মনোনীত সভাপতি পদাধিকারধারী সিন্ডিকেটে থাকতেন—এরাই মোটামুটি সরকারী বক্তব্য রাখতেন। কিন্তু নতুন বিলে এ দু'জন ছাড়াও আচার্যের মনোনীত আরও দু'জন, অর্থাৎ সরকারের চার জন সিন্ডিকেটে থাকবেন। নতুন বিলে সিন্ডিকেটকে সর্ববিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতা



সিনেটর কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় এখানে সরকারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাধিত ভয়ের কথা। তৃতীয়ত, সরকারী স্পনসর্ড কলেজগুলির ওপর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এজিয়ার আছে, তা বাতিল করে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুরোপুরি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হচ্ছে। চতুর্থত, উপাচার্যের সহকারী রূপে বে দু'জন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাঁদের নিয়োগ করবেন শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শনুসারে আচার্য-উপাচার্য কিংবা সেনেটের এ বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকবে না। পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয় যখন কোন কলেজকে অনুমোদন দেবেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দানের পূর্বে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া হবে কি হবে না, এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে স্থির করার অধিকারী একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্ষমতা সংকোচন করা অত্যন্ত আপত্তিকর। সরকারকে শেষ পর্যন্ত কলেজের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, সুতরাং অনুমোদন দেবার পূর্বেই সরকারের মত নিয়ে তবে অনুমোদন দিতে হবে, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুমোদনের ব্যাপার কেবলমাত্র আর্থিক ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে শিক্ষামূলক প্রশ্নই প্রধানত জড়িত। সরকারের অভিমত নেবার ব্যাপার থাকলে, এই ফাঁকে দলীয় রাজনীতির খেলা শুরু হবে। সরকারী দল ছাড়া অপর কেউ কলেজ খোলার চেষ্টা করলে অনুমোদন পাবে না। এতে দেশে শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে। সরকারের হাতে অনুমোদন সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকলেও বে বিনা প্রয়োজনে এলোমেলো ভাবে কলেজ হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখা যাবে কাঁধি অঞ্চলে। রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্যের প্রত্যয়ে সেখানে প্রায়

গ্রামে গ্রামে কলেজ হয়েছে। সেখানে না হয় ছাত্র, না আছে পড়াদানার উপযুক্ত ব্যবস্থা। সুতরাং সরকার এই ক্ষমতা পরিকল্পিত উপায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চাইছেন না, এই ক্ষমতা আজ তাঁদের প্রয়োজন নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য।

স্পনসর্ড কলেজের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাধিত প্রচেষ্টার রাজ্যের কলেজ অধ্যাপকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্পনসর্ড কলেজ সরকারী কলেজ নয়। এখানকার অধ্যাপকরা সরকারী কলেজের মত বেতন পান না, পেনসন বা চিঠিবৎসর সুযোগ পান না। সরকারী কলেজের মত এখানে অর্থব্যয়ও করা হয় না। অন্যান্য বেসরকারী কলেজের সঙ্গে স্পনসর্ড কলেজের একমাত্র পার্থক্য স্পনসর্ড কলেজের বাটারি দায়িত্ব সরকার বহন করেন। কিন্তু কল্যাণ-কর রাষ্ট্রে কেবলমাত্র এই কারণে কি এক কলমের খেঁচায় স্পনসর্ড কলেজের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে, এদের ওপর রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়? কলেজ অধ্যাপকদের চাকরীর সর্বাধি প্রণয়ন, অধ্যাপক ভিন্ন অন্য কর্মচারীদের চাকরীর সর্বাধি প্রণয়ন, কলেজের পরিচালনা সমিতি গঠন, কোন অধ্যাপক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিরোধী বিষয়টি সালিশী বোর্ডে প্রেরণ প্রকৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। কিন্তু স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপক বা কর্মচারী কিংবা পরিচালক সমিতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না, তা করবেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। নতুন বিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কোন কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা ব্যাপার

জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক ভাবে তার কার্য গ্রহণ করতে পারবেন, প্রয়োজন হলে 'স্টাড' হক কমিটি গঠন বা 'স্টাড' মিনিস্ট্রি'র নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু আল্ফোর্ডের বিষয় স্পনসর্ড কলেজের ক্ষেত্রে এইরূপ অধি-
বেশ্য এলে বিশ্ববিদ্যালয় কিছু করতে পারবেন না। কেন এই বৈষম্য? এই বিষয়গুলি নিম্নক প্রশাসনিক ব্যাপার নয়, এর অধিকাংশই শিক্ষামূলক। শিক্ষামূলক ব্যাপারে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের চেয়ে রাইটস' বিল্ডিং-এর অফিসাররা ভাল বোঝেন, এ ব্যক্তি কে স্বীকার করবেন? সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলে কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা ভাল হয়, এ ব্যক্তিও মান্য
হয় না। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্পনসর্ড কলেজের অবস্থা শোচনীয়। যদি সরকার
মাত্র ভালভাবে কলেজ পরিচালনা করতে চান হ্যাঁ সব স্পনসর্ড কলেজকে পুরোপুরি
সরকারী কলেজে পরিণত করুন। এই মাঝ-
মাঝি অবস্থা কেন? স্পনসর্ড কলেজের
অবস্থা না বরক, না 'ঘটকা' এই রকম।
অর্থানকার অধ্যাপকরা সরকারী কলেজের
অধিষ্ঠা পাবেন না, কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের
সীমাকালে পিট হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-
বিদরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাধাকৃষ্ণ
কমিশন ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা
করেন। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভীত অভি-
প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী
কমিশনের সভাপতি ও শিক্ষা কমিশনের
সভাপতি ডঃ ডি, এস, কোঠারীও একই রূপ
অভি প্রকাশ করেছেন। বর্তমান বিল সম্পর্কে
দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মত চাওয়া হয়।
কয়েকটি বিষয়ে এদের মতের মধ্যে পার্থক্য
থাকলেও এই বিষয়ে সকলেই একমত যে,
এই বিলের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর
সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে, এবং শিক্ষার দিক
থেকে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বর্তমান,
কল্যাণী, উত্তর বংগ, রবীন্দ্রভারতী, এই বিশ্ব-
বিদ্যালয়গুলির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি
করা হয়েছে, এবং তার ফল ভাল হয় নি।
এখন ভারতের প্রাচীনতম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্বাভাব্য ন্যায়ের চেষ্টা চলছে।

বিলের আর একটি আপত্তিকর বিষয়
সেনেটের ক্ষমতা হরণ। দশ জনের একটি
সভাকে 'সর্বোচ্চ পরিচালক সমিতি' করা যায়
না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে কি নীতি নির্ধারণের
ক্ষেত্রে একে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করা
যায় না? সেনেট, নীতি নির্ধারণ করবে,
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে
সম্পূর্ণ গ্রহণ করবে, এবং সেনেট কার্য-
পরিচালনা করবে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই
নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিলে এই
নীতি গ্রহণ করা হয় নি। সেনেটকে কোন

ক্ষমতাই দেয়া হয় নি। বাইক রিপোর্ট বা
বাইক আর-বায়ের হিসাব সম্পর্কেও সেনেট
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কোন সিদ্ধান্ত নিতে
পারবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত
সেনেট সভাকে একটি ক্ষমতাহীন বিতর্ক সভায়
পরিণত করে মন্টিমেয় সদস্য (বাঁদেব অধি-
কারণই আবার মনোনীত ও পদাধিকার বলে
সিডিকেটের সদস্য হবেন) নিয়ে গঠিত
সিডিকেটের হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ কোন
মতেই সমর্থন করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কলেজ
অধ্যাপকদের বিশেষ অংশ দেয়া হয় নি।
দশ জনের সেনেটে কলেজ অধ্যাপকদের
প্রতিনিধি থাকবেন মাত্র বার জন, একশ' জনের
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে মাত্র দশ জন, আর
সিডিকেটে একজনও নন। প্রোফেসর ও
বিভাগীয় প্রধান ছাড়া পোস্ট গ্রাজুয়েট
বিভাগে আর যে সব অধ্যাপক আছেন, তাদের
কোন প্রতিনিধি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও
সিডিকেটে থাকবেন না। শিক্ষকে বাদ দিয়ে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার এই নীতি গণ-
ভন্দের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আইনসভার সরকারী দলের সংখ্যা-
গরিষ্ঠতা আছে, সুতরাং হয়তো জোর করেই
তারা এই বিল পাশ করবেন। কিন্তু দেশের
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকসমাজের অভিমত
অগ্রাহ্য করে এই বিল পাশ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে
এক মহা অপরাধ করা হবে। শিক্ষা জাতির
সকল অংশকে স্পর্শ করে, আগামী দিনের
মানুষ তৈরি হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সুতরাং
শিক্ষার প্রশ্নটিকে কোনরূপ দলীয় দৃষ্টিকোণ
থেকে বিচার না করে, অকারণ জিদের বশবর্তী
না হয়ে, রাজ্য সরকার শিক্ষাবিদদের সর্বসম্মত
অভিমত অনুযায়ী বিলটি সংস্কারসাধন
করুন, এই অনুরোধ।

বৈজ্ঞানিক খাদ্যনীতিতে বৈষম্যের ফাঁক

একচেটিয়া খাদ্যচাল সংগ্রহের নয়া খাদ্য-
নীতি গ্রহণ করে আসা দৃষ্টিক্রম রক্তচক্-
শাসনীর মোকাবিলা করার জন্য সরকারী
প্রস্তুতি চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৬ সালের
আঁধারার রাতে একেবারে কাবু হয়ে পড়তে
না হয় এজন্যই এই নয়া খাদ্যনীতি। কিন্তু
বর্তমান ঘোষিত খাদ্যনীতি যে একটি
সুসম্পূর্ণ প্রকল্পের দাবিদার নয়, খাদ্যনীতি
পর্যালোচনার সেক্ষেত্রে সর্বগ্রহণ জানিয়ে রাখা
প্রয়োজন এই কারণে যে, এ নীতির সাফল্যের
পথে যদি কোনো ভবিষ্যৎ বাধা দেখা দেয়—
তবে সেজন্য বর্তমান ঘোষিত নীতির দায়িত্ব
অস্বীকার করা চলবে না। এজন্যই অগ্রগেভাগে
স্বীকার করা ভালো যে, এই খাদ্যনীতি
অংশিকতার দুর্বলতা বৃদ্ধি করেই আমাদের
সম্মুখে হাজির হচ্ছে।

তথ্যটি একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, যদি
আংশিকতা অতিক্রম করে দেশের সর্বত্র পূর্ণ

রেশনিং আরক্ষণ সম আহরণ ও সম বটনের
নীতিতে রেশন সরকার সফললাভ করতে
পারেন তবে নিকট ভবিষ্যতের খাদ্য ঘাটতি-
জনিত দুর্ভিক্ষের ভয়াল ঘনঘটা আমরা
এড়াতে পারব।

নয়া নীতি আংশিক এই কারণে যে,
দেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং-এর ব্যবস্থা এই
নীতি প্রবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে নি।

নয়া নীতির দ্বারা সমগ্র উৎপাদন সরাসরি
উৎপাদকের কাছ থেকেই লেভি করে আদায়
করার ব্যবস্থা নেই।

জমির পরিমাণ অনুযায়ী লেভির পরিমাণে
তারতম্য সৃষ্টির দ্বারা অসম লেভি অধিকতর
জমির অধিকারভোগীর কাছে ধাপে ধাপে
অধিকতর ছাড় রাখছে। প্রকাশ, যেখানে সেচ-
ব্যবস্থা নেই এমন জমির জন্য ৪র্থ ৫ম একর
বা তার অংশবিশেষ অধিকারভুক্ত জমির ক্ষেত্রে
একর প্রতি দুই কুইন্টাল ধান দেয়; কিন্তু
১১শ থেকে ২৫শ একর অধিকারভুক্ত জমির
ক্ষেত্রে দেয় ধানের পরিমাণ মাত্র পাঁচ কুইন্টাল।

আবার সেচ ব্যবস্থা আছে এমন জমির
ক্ষেত্রে ৪র্থ ৫ম একরের জন্য লেভিযোগ্য
ধানের পরিমাণ যেখানে একর প্রতি সাতের চার
কুইন্টাল সেখানে ১১শ ২৫শ একর বা তার
অংশ বিশেষ অধিকারভুক্ত জমির ক্ষেত্রে দেয়
ধান্য হবে আট কুইন্টাল মাত্র।

অর্থাৎ অধিকতর অধিকারভুক্ত জমির অধি-
কারগণ অনুপাতে অধিকতর ছাড় ভোগে
সুযোগ পাচ্ছেন। অন্য পক্ষে উৎপাদক পরি-
বারের জন্য মাথাপিছু দেশের সর্বত্র সম
পরিমাণ ছাড় দিয়ে সরকার যদি সমগ্র ধান
চাল লেভির দ্বারা তুলে নিতেন তবে কোথাও
উৎস্র ধানচাল থেকে-বাওয়ার সম্ভাবনা থাকত
না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছাড় ও বটনে
কোনো ক্ষেত্রেই সর্বত্র একই নীতি গৃহীত
হচ্ছে না যার মারাত্মক ফল বৈষম্যের এমন কি
এক এক শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভোগের কারণ হবে।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, জাতীয়
সংকটেও দেশীয় সমস্যার প্রতিকারের জন্য
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ সরকারের সহায়তায়
এগিয়ে আসা দূরের কথা সরকারী নীতিতে
তাদের স্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা
থাকলে ক্ষমতাসীন সরকারকে নাস্তানাবুদ
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেন। এদের কাছে
স্বদেশের অনেক ওপরে। এদের
প্রতিক্রিয়া সরকারী শৃঙ্খলিক্রমেও পর্যাপ্ত
করে। সুতরাং যে কোনো পরিকল্পনা হোক
করার সময় এ্যান্টি-ফোর্স হিসেবে সর্বগ্রহণ
সরকারকে এদের দাবিটাই গণনা করে নিতে
হয়। সরকারী খাদ্যনীতিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ-
ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নেপথ্যচারী
স্বার্থান্বেষণের মধ্যে ভাগ ও শৃঙ্খলার
প্রয়োজন। অন্যথা সরকারী পরিকল্পনা
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহত হতে থাকবেই। সরকারী
অভীপ্সা যতদূর সম্ভব কঠিন হলেও এদের

আন্তরিক সহায়তা ব্যতিরেকে সর্বাঙ্গ সফল পরিকল্পনার সাধন অর্জন করা কোনও ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আনাবি এই নেপথ্য শক্তির সঙ্গে একাধিকবার সম্মুখ সম্মেলন অবতীর্ণ হয়েছেন। কালোবাজারী দমন, বেবীফুড আটক, সরিষার তেলের অতি মূল্য, মাছের বাজারে অনাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি কোমর বেঁধেই এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু কোনোক্ষেত্রেই পূর্ণ সাফল্যের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।

মহা খাদ্যনীতি ঘোষণার কালে এজন্য তিনি অপরিসর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন। সহযোগিতা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পেলেও, সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের চিরায়ত রীতিতে খাদ্যদ্রব্যে কালোবাজার টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করেন না তা বলাই বাহুল্য। এই কালোবাজারী দমন করার একমাত্র উপায় সাধারণের হাত থেকে সমস্ত রকম উদ্ভূত খাদ্যদ্রব্য লোভি দ্বারা তুলে নেওয়া। বলা বাহুল্য নয়। নীতিতে তার আংশিক প্রচেষ্টা আছে।

কতিপয় রূপপথ

অন্যদিকে খাদ্যচালের দরদাম একভাবে বেঁধে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় পাইকারী ব্যবসায় সুযোগ-সুবিধা রেশে সরকার যথাক্রমে চারিদের যে উপকারই করুন বা সমস্যাপূর্ণ অঞ্চলে ধনী ব্যক্তির খাদ্য প্রাপ্তির যে সুযোগই করে দিন, এর দ্বারা দুটি বহু রূপপথ রয়ে গেল এবং এরই পাশাপাশি অপূর্ণ রেশনিং এলাকার বিধম উপস্থিতিও নয়। নীতির সাফল্যে আংশিকতার সুযোগ রাখল মাত্র।

প্রকাশ, চাষীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত আয়তনের জন্য ভরসূচ্য কোনোমুদ্রা ছাটাকা করা হবে না। এজন্য উপসংহারে সরকারের হিসেবের খাতার অবস্থা বেশ কিছু লোকসান বহন করতেই হবে। কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য পান এটা সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, কিন্তু এ যে সরকারী হিসাবটির ফাঁক থেকে যাচ্ছে সেটি অনেকেরই আশঙ্কার কারণ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত অডিট রিপোর্টগুলিতে প্রশাসনিক পর্ষায় হিসাব গরিমলের একাধিক নজীর উপস্থাপিত হয়েছে বলেই আশঙ্কা। অতিরিক্ত আয়তনের হিসাবে কারচুপি রোধ করার জন্য সরকার আগেভাগে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সংবাদপত্র মারফৎ তার কোন সংবাদ জনসাধারণ পান নি।

রেশনিং ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি পাইকারদেরও ব্যবসা চালাবার অনুমতি দান করতে পারবেন জেলা অফিসার, এই মর্মে যে বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষিত হয়েছে তার দ্বারাও যে কালোবাজারের রূপপথ তৈরি হবে না এমন কথা কেউ কল্পনার স্থান দিতে পারেন না।

আর বন্টনের ব্যাপারে বতদিন না পূর্ণ রেশনিং চালু হচ্ছে সর্বত্র ততদিন দুর্ভোগ

যুগে, এতবড় দুর্ভোগা অমূলক। ইতিমধ্যেই মডিফায়েড রেশনিং এলাকার সাধারণকে একমুঠো অন্নের জন্য কীভাবে হন্যে হরে ঘুরতে হয়েছে সরকারের তা অবদিত নৈই। বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং এর ন্যায্য দাবিও উত্থাপিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতিপয় বিশেষ অঞ্চলবাসীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বাদ্যিক দেশটাকে চরম অনিশ্চয়তার শিকারে পরিণত করলেন।

যে দেশে সরকারী প্রশাসন ও মনোবাহাল্য শরতানের অসম্ভাব নৈই, সে দেশে এই আংশিক রেশনের সুযোগ-সুবিধা বহুস্তর কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ির মত বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত না হওয়ার জমিহীন অর্পণিত মানুষের সামনে ভরস্কর দুর্দিনের আভঙ্ক সৃষ্টি করা হল।

সরকার যেমনভাবে অভাব মোচনের কথা ভাবছেন, কামনা করি তারও থেকে দৃষ্টান্তে সাধারণের অভাব বিমোচিত হক; কিন্তু উল্লিখিত পূর্ণ রেশনিং-বহির্ভূত এলাকার আশঙ্কা যে দ্রবীভূত হবে না তা স্পষ্টতই অনুমেয়।

কংগ্রেসী সংসদ

প্রকাশ, সরকারী খাদ্যনীতিতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ আছে স্বীকার করার পরও কতিপয় কংগ্রেস সদস্য কুমার সিংহ হলে অনুষ্ঠিত উক্তপর্ষায়ের দলীয় বৈঠকে এবং বিধান সভার লবিতে এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, সরকার একর প্রতি বতটা ধান সংগৃহীত হবে বলে আশা রাখেন প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহ ততদূর আশাপ্রদ হবে বলে তাদের মনে বিশ্বাস নৈই। অনেকে ম্ব ম্ব জেলার একর প্রতি উৎপাদন হ্রাসের চিত্রও তুলে ধরেছেন।

সৌভাগ্যত সরকার এজাতীয় আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। কারণ এইসব হিসাবের সভ্যসভা অনির্ধারিত। একদল যেমন অল্প কলনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছেন, জনপ্রতিনিধিদের অপরদল তেমন সোচ্চারে বলছেন ঠিকমত সংগ্রহ কার্ণা চালালে ঘাটতির আশঙ্কাই এড়ান যেতে পারে। তাদের বক্তব্য, সরকার যে হিসেবটা সংগ্রহ করেছেন ওটা সাদা হিসেব, কাগজের ওপর আইনরক্ষার জন্য কারবারী লোকের সাজান হিসেব। আসল হিসেব অন্যরকম। তার অনেকাংশই বহির্ভূত। আর সেই পড়িত কাগজী হিসাবের কালোবাজারের পথ হিসেব কারচুপির পক্ষেই কালোবাজারের পথ সুগর হয়েছে।

সরকার তার ঘোষিত নীতির সাফল্যের জন্য এবং কোনো কোনো মহলে এই নীতির অবাস্তবতা সম্পর্কে যে সশ্রব প্রকাশিত হয়েছে তার উত্তর হিসেবে সংগ্রহকালীন হিসাবের মধ্যে যাতে কোনোমুদ্রা কারচুপি না থাকে সেদিকে দৃষ্টিদান করলেই সরকারী

নীতি যে অংশত সাফল্যলাভ করেছে, এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কারণ নৈই।

তবে বত শীঘ্র সম্ভব দেশের সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং চালু না করলে, সরকারী তরফে অল্পমাজনিত, বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা-জনিত ভারতের সর্বত্র আশানুরূপ ফলন না হওয়ার জন্য এবং সে কারণ কেন্দ্রীয় সাহায্যের অনিশ্চয়তার দরুণ যে বিরাট খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা করছেন, তেমন ঘাটতি সভ্য-সভাই দেখা দিলে পূর্ণ রেশনিং এলাকাবহির্ভূত জমিহীন মানুষকে অশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হতে হবে।

দেশের স্বার্থে খাদ্যনীতি সফল করুন

দুঃখের বশল করুন চিনি

দুঃখজাত মিষ্টান্ন ছাড়া অন্যান্য খাবার তৈরি করতে যদি আরও বেশি চিনি আসে ও মরদার প্রয়োজন হয়, আর তা প্রয়োজন হবেই,—তা হলে আমি এ সকল ব্যক্তি জিনিসের জন্য পারমিট দিতে রাজী আছি। —সম্প্রতি দুঃখজাত মিষ্টান্ন বন্ধ করার উদ্ভূত সমস্যা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আকাশবাণী মারফৎ মুখ্যমন্ত্রী উপযুক্ত ভরসা দান করেছেন।

আনন্দের কথা। মিষ্টির মোকাদ্দমুলি (বর্তমান রচনা ছাপাখানায় যাওয়ার কাল পর্যন্ত) আজও বন্ধ। মিষ্টান্ন বিরোধগণ বিক্ষুব্ধ, কর্মচারিবৃন্দ ভবিষ্যৎ অনাধারের আশঙ্কায় মরমে মূমূর্ষ। এমন এক সময় মুখ্যমন্ত্রী যথার্থ ভরসার কথাই শোনালালেন বটে। কিন্তু কথাগুলি স্থিতির বিক্ষম মিরে সাধারণের কাছে উপস্থিত হল। ঠিক যে মুহূর্তে আমরা শুনতে পাচ্ছি উদাস ঘোষণা—পি এল ৪৮০ অনিশ্চিত; আর তার ফলে বাংলাদেশের ভাগ্যে আটা মরদাও অনিশ্চিত। কেন না পি এল ৪৮০-র জন্যই কেন্দ্র পারেন পশ্চিমবঙ্গকে গম সরবরাহ করতে। দুটি বক্তব্যকে পাশাপাশি ফেলে মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ভরসার কিম্বদন্তি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। গমের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও তিনি অতিরিক্ত পারমিটের ভরসা দেন কেমন করে! তবে কি পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে গমের অর্থ্যাং পি এল ৪৮০তে প্রদত্ত খাদ্যবস্তুর যোগান যথার্থই অধিকমুদ্রা কিছু বেশি পরিমাণেই মিলবে। বর্তমানে বহুস্তর কলকাতার বাইরে গমজাত দ্রব্য প্রায় দুর্লভ। সরকারী বিবৃতিতে আগামী বছরের চিত্র আরও করুণ। তৎসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি বিরোধভাসের সৃষ্টি করেছে যার আলম্কারিক অর্থ আপাত বিরোধ বিরোধই নয়। সুতরাং শৃঙ্গ আনন্দের নয়, নশেট ভরসার সংবাদই দিয়েছেন স্রীসেন।

পশ্চিমবঙ্গে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে বৃত্ত প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের কর্মহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ছানা কীর ব্যবসার আদেশে। অবস্থা সংকটজনক। এই মুহূর্তে বিক্ষিপ্ত খাবার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়

স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি উৎসাহরাজক, যদি তা প্রকৃত পক্ষেই সম্ভবপর হয়।

শ্রীসেন দত্তের দোকান বন্ধিতে চার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের অধিকার বাক্য হতে বহু আশা প্রকাশ করেছেন। মন্দের ভালো। অস্তিত আইনের ধাক্কা বেকার হয়ে আসার সরকারের প্রচেষ্টার কর্ম সংস্থানের সুযোগ সচরাচর ঘটে ওঠে না। বর্তমানে দুটি ক্ষেত্রে সে সুযোগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মিস্টারের ব্যাপারে ও ধান-চালের পাইকারী ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে। শ্রোত্র গোষ্ঠী নয়া খাদ্যনির্গত অনুযায়ী ধানচাল সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হবেন বলেও একটি সরকারী ঘোষণা নজরে এলো। পাইকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ইতিপূর্বে কালো-বাজারের ঘাটঘাট জেনে বসে আছেন তাদের লোভের কাজে নিয়োগ করা কতদূর স্বীকৃত তা অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়, কিন্তু মিস্টার কারিগরদের অন্ততপক্ষে এক দশমাংশও যে বিকল্প কাজ পেতে পারবেন এ সংবাদ সুখের বটে। বাকি নয় দশমাংশ কি করবেন। তার দ্বারাই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী পারামিটের স্বাধীনতার কথা ভুলছেন।

আমরা মুখ সংগ্রহের সরকারী নীতি স্বীকৃতকরণে সমর্থন করব নিশ্চয়ই—যখন দেখব মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বক্তব্য বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরবৃন্দ বেকারী ও অনা-হারের দ্বারা পরিত্রা হইছেন না।

অবস্থানসম্মত বিকল্প খাদ্যভান্ডার আশ্রিত কোন ব্যক্তিগত কারখানা নেই—যদি তৎক্ষণাৎ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে। শ্রীসেন দত্ত যোগানের আশা প্রদ চিত্রও এই সঙ্গো তুলে ধরেছেন।

এখন সর্বকিছুই বাস্তব ঘটনার দ্বারা পরিমিত হওয়া দরকার। অতি সাম্প্রতিক ঘটনার স্মৃতিভার থাকার দরুন আমরা এখনই শ্রীসেনের ঘোষণাকে উদ্ভাব্য হয়ে অভিনবিত করেতে সাহস পাই না। মিস্টার স্মরণ আছে, বোর্ডিংয়ের কালোবাজার খেঁচিয়ে সাক করার সময় আমরা যেখানে উৎসাহ বোধ করেছিলাম। কিন্তু আজও সাধারণের 'বাবি' তার প্রয়ো-জনীয় 'ফুড' পাচ্ছে কৈ!

সুতরাং না আঁচিয়ে বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ পূর্বস্মৃতির ফলে আমাদের হাতে ক্ষ একটা থাকে না। তাই সর্বদা নিবেদন-কল্পে কথায় কাজে কিছু সামঞ্জস্য বিধান করা হলে সাধারণের আশা অঁচিয়েই ফিরে আসবে। সরকার সৈদিক দৃষ্টি রাখবেন এই আশা।

যোড়দৌড়-কর

১৯৪৭-৪৮ সালে যোড়দৌড়ের ওপর করের হার শতকরা সাড়ে বার থেকে বাড়িয়ে শতকরা দুই টাকা করে তোলা হলে রাজস্বের পরিমাণ এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা থেকে একচোটে এককোটি লক্ষ টাকা বেড়ে যায়।

১৯৬১ সালে তখন কর্তার কামরে সরকারকে করের হার বাঁধতে হয়েছিল শতকরা সাড়ে বার টাকাতাই। বলা বাহুল্য, রাজস্ব কর্ম হওয়ার কারণ এই নয় যে, রেসপন্সে রাষ্ট্রাতি রেস খেলায় ইন্তফা দিয়েছিলেন। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, লোকের যে-আইনীভাবে রেসের বাজি খরা সুবি-করাইছিল।

এমতাবস্থায় সরকার পুনরায় সাড়ে বার থেকে শতকরা পনের টাকা হারে যোড়দৌড়ের ওপর কর বাঁধার প্রস্তাব এনেছেন এবং প্রমোদক সংশোধন বিলটি ২৫-৮-৬১ ভোটে গ্রহণ হয়েছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন সামান্য আড়াই শতাংশ বৃদ্ধি উপর্য উপর নয়। যোড়দৌড়টা জুয়া। ওটার ওপর প্রমোদক এমন হওয়া উচিত যাতে এ খেলা থেকে এক শ্রেণীর অসম্পত্ত মানুষ সরে আসতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য উল্লিখিত রাজস্ব আদায়ের হিসাব দেখে বিরোধী বক্তব্যে যুক্তি থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেন না যার দ্বারা রাজস্বের স্বার্থ তেমন বাক্যস্থান আছে সরকারী ডান্ডারে লোক-সানেরই সম্ভাবনা। তাছাড়া যোড়দৌড়, মদ্যপান ও অন্যান্য নেশার ক্ষেত্রে করবৃদ্ধি করেই একমাত্র সুফল পাওয়া যাবে এমন ধারণা হ্রাস। আর তার প্রমাণ সিগারেট। সিগারেটের ওপর ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরে বাজেট প্রকাশের আগেই ধূমপানকারীদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির উপর চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবুও ধূমপান কমে নি যদিও ধূমপানে নেশাদূরী রে-আইনী পন্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। ধূমপানে নিরস্ত করার জন্য চারুকর্মমহলেও একা-ধিকবার ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনার বড় উঠেছিল; কাজ হয় নি। সুতরাং নেশার ওপর করের চাপে যারা মনে করেন নেশা ছাড়বে নেশাদূরী-ভাদির কাছে বক্তব্য এই যে, তারা বরং নেশা করার উপায়টি বন্ধ করার চেষ্টা করুন অন্যথা বাটঘাট বেচেও নেশাদূরী তার নেশা ঠিকই চালিয়ে যাবেন। সুতরাং পথ অন্যত্র। নেশার উপা-দান বজায় রেখে রাজস্ব বাড়ানার মংলবাট আর যাই হোক, সমাজের মনের পথে উপযুক্ত উপায় নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদ্যবিরোধী বক্তব্যে যখন দেশের আকাশ বাতাস লাউড স্পীকারে পরিণত হয় তখন অকস্মাৎ দেখতে পাই বাংলা দৈনিক-পত্রগুলি পূর্বতর মতের বিজ্ঞাপন ছেপে চলেছেন। জনসাধারণের উপায় যে কেবলমাত্র গরম বক্তব্য নয়, সর্বসত্তরের সহযোগিতায়ই একমাত্র সৌভাগ্য, এদেশে সেক্ষণ আমরা প্রায়শই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। পুনরুত কট, হলেও একথা যদি বলা যায় যে, মদ্যবিরোধী বক্তব্য করার পর কিম্বা নীতিবর্ষী আলোচনা কাগজে কলামে লিপিবদ্ধ করার পর অথবা একটি ফিল্ম তৈরির পর বলা, লেখক

বা পরিচালক চলেছেন রেসের মাঠে অথবা মদের দ্বারে তবে অত্যাধিক হয় না। যেমন অত্যাধিক নেই একথায় যে, যে সমস্ত দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মদ্যবিরোধী বক্তব্যের ওপর ফলাও আলোচনা থাকে সেই কাগজেই দীর্ঘ মদের বিজ্ঞাপন ছেপে আরের পথ সুগম করা হচ্ছে।

এ সমস্যার পর জনসাধারণ যে ঠিক কার ওপর আস্থা রাখবেন যদি ভেবে না পেয়ে বিপক্ষে পা বাড়ান, তবে সে দায়িত্ব একই সঙ্গের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী-দের ওপরই বর্তাবে।

মুখ্যের বিষয় এ নিয়ে চিন্তা বড় একটা কেউ করেন না। আমরা কারণ-অকারণে যত উপদেশ বর্ষণ করি, কথাক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই যদি নিজেরা করি তবে সাধারণের মনে অনেক সুবৃদ্ধিই বিনা চাঁৎকারে অনুপ্রাণিত করার যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত কার্যক্ষেত্রে ঠিক উঠোটাই দেখতে পাওয়া যায়।

সুতরাং 'আগনি আচার ধর্ম' পরকে শেখানোর দায়িত্বটা সর্বোপায় গৃহীত হওয়া উচিত। অন্যথা জনসাধারণকে পশুনিদে শের গরুদায়িত্ব দ্বারা স্বেচ্ছায় বন্ধন করছেন বা করবেন বলে মনস্থ্য করেছেন, তাঁরা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়ার সুযোগ কমই পাবেন এবং সাধারণের "ও তো কথার কথা" বলে সমস্ত ব্যাপারটিই উড়িয়ে দেওয়ার চিরাচরিত মনোভাব অবলম্বন করে বসে থাকবেন।

প্রসঙ্গত উপযুক্ত আলোচনার সুযোগ নেওয়া হল।

বর্তমানে আলোচ্য বিষয়ে ফেরা থাক। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার। করবৃদ্ধির দ্বারা যে ক্ষেত্রে সমাধিক রাজস্ব আদায় সম্ভব, সে ক্ষেত্রে সৈদিক নজর দেওয়াই স্বীকৃত। তবে যোড়দৌড় মদ্যপান প্রভৃতি মারাত্মক নেশার বকল থেকে যদি জনসাধারণকে উদ্ধার করতেই হয় তবে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। জনমত গঠন, নেশার সুগম পথ বন্ধ বা দুর্গম করে তোলা এবং দেশের প্রাচ্যের ব্যক্তিদের আপন আচরণের মাধ্যমে আদর্শ সৃষ্টি করাই হবে তার উপায়।

অন্যথা সব আলোচনাই ভ্রমে বাতায়িত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হবে না

বীরভূম :

মুন্সীফার বন্ধন

বীরভূম বাতীর নিজস্ব বাতীবহ-প্রেরিত এক সংবাদ প্রকাশিত নিম্ন বিবরণটি পাঠ করলে রেশন এলাকার বাইরের চাল-চিরাটি প্রকট হয়ে ওঠে। মুন্সীফা উত্তোলনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে চালের প্রত্যাভিষমের দ্বারা নিরস্ত-ভক্ত বজায় রেখে কেমনভাবে অতি মুন্সীফা অর্জন করা যায়—নিম্নের সংবাদটি তারই একটি উদাহরণ।

সংবাদ প্রকাশ : 'স্বাভায়ে নৃত্য অত্যাধিক'

মান্য আসতে সূর্য করিয়াছে। মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীগণ উহা ক্রয়কালে আউসের সরকার নির্ধারিত সাড়ে সইরিশ টাকা দাম দিতেছেন উৎপাদককে। কিন্তু এই আউস ধানই মিলে চাউলে পরিণত হওয়া মাত্রই “ফাইন রাইস” বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এবং ক্রেতাসাধারণকে এই আউস চালই মিহি চালের দরে বেশি দামে কিনিতে হইতেছে। ফলে উৎপাদক বঞ্চিত, ক্রেতা নিপীড়িত, মিল-মালিকগণ এই সুযোগে মুনামফাজীতে সিদ্ধহস্ত। সরকারের বলিষ্ঠ আদর্শনীর অভাবই এই বৈষম্যের কারণ বলিয়া সকলের অভিমত। বীরভূমে আউস ধান্য সাধারণত “আগাম্ আমন” বলিয়া অভিহিত হয়; কিন্তু চাষীদের তথা উৎপাদকের নিকট তাহা গোপন রাখিয়া আউসের দামই দেওয়া হয়, কিন্তু চাউল উৎপাদনের পর তাহা বিক্রয়-কেন্দ্রে “আগাম্ আমন” (আলি আমন) চাউল বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। উৎপাদকের এইরূপ ন্যায়দামে বঞ্চিতা খাদ্যোৎপাদনে উৎসাহিত করার পথ কটকিত করিতেছে বলিয়া সকলের আশংকা। (১০-১১-৬৬)।”

জলপাইগুড়ি:

মেয়ে বিক্রি

পেটের দামে এবং সন্তানকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষার মানসে আপন কন্যা সন্তানকে হাতে বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার সংবাদ মূলত শ্রদ্ধা বিম্বর নাও হতে পারে, কেন না বিশ শতকটাও বর্ষের মানুষেরই মতিগত। তাদের হাতেই টাকা, সূত্রায় বাঁচতে হলে ইসলাম ঠেকে তাদের মতেই থাকে।

দুর্যের বিবর, দুঃখগান্ধার হল, কিন্তু মানবচরিত্র কতপন্ন জীবের মধ্যে আজও সেই প্রাগৈতিহাসিক জানওয়ারটি অব্যাহত বস-বাস করছে। তাদেরই বিবাক্ত মাস-প্রমাসে প্রকৃতির অঘাতিত জলবায়ু, পর্যন্ত শূন্যকরে যায়। মাঠ কাটে, ক্ষেত খামার অজন্মার মড়কে ভোগে। মানুষের মূখের গ্রাস গৃহাম-জাত হয়ে পড়ে। পচে মানুষের হাড়মাস। পচে পচে তাদের বাগানের সার হয়, তাদের বিলাসের ফল ফেটে। আর তাই তারা ই বেঁচে থাকে। অধিকাংশের শব্দেদের ওপর আসনপাটি হয়ে বসে দৈনিক আচমন করে চায়।

এহেন অবস্থার একদল মানুষ অপর এক জেলের “নামান্তরে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী” ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমরা অধিকাংশই মৃদ্ধি-মেয়ের বাগানবাড়িতে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী।

তবে মধ্যযুগে মানুষ ক্রয়ের রীতি ছিল এক, সভ্যযুগে মানুষ বিক্রয়ের নীতির ঊল্লেখ পরিয়ে কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ চাপান দেওয়া হয়েছে। কারাকটা এই মাত্র। আর সেজন্য কোথায় দটো চাষা শ্রেণীর মানুষ চামড়ে রীতিতে আপনাপন কন্যাকে মধ্য-বঙ্গীয় প্রথার বিক্রিপাটী করল এবং কোন

মহাজন কাপালিক বিশশতকীর নীতির পোষাকটুকু পর্যন্ত না পরিচর উদ্যোগ নবনভার মধ্যে সে কন্যা ক্রয় করল, সেটা ততখানিই বিস্ময়াবহ খবর, বতখানি উল্লেখ্যতার মধ্যে বিশশতকের সাধের পোষাক ছাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক ‘জনমত’ একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে এমন এক উল্লেখ চিত্র উদ্ধার করেছেন ইহা কি সভ্য শিরোনামের সর্বদোষ হর পতাকার নিচে।

সংবাদ:

“এই জেলার গ্রামাঞ্চলে চরম খাদ্যাভাব সূর্য হওয়ার কৃষক সন্তান বিক্রয় সূর্য করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহা কি সভ্য?”

ঘটনার প্রকাশ যে, ফালাকাটার ব্যালাসুন্দর এলাকার দুজন কৃষক অনাহারের জ্বালায় ৬।৭ বৎসরের দুইটি মেয়েকে কেচবিহারের জোতদার হেমন্ত বর্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বিক্রতার নাম ত্রাকি মনোবব বর্মণ ও চেংটা বর্মণ। খাদ্যাভাব সম্পর্কিত আর একটি সংবাদ—এই জেলার জমাদার পাড়ায় জনৈক ব্যক্তি না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে।”

কলা বাহুল্য সভ্য হোক চাই মিথ্যা হোক, সংবাদটি অন্তত একটি চরম সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে—দেশের খাদ্যাবস্থাকে যে দুই নির-পার পিতা সন্তানের কৃধার অঙ্গ সংগ্রহ করতে না পেরে তাদের অশ্বকার ভবিষ্যতের কোলে কেবলমাত্র প্রাণ বেঁচে থাকার ব্যবস্থাকটুকু করে দিয়ে পিতৃ কর্তব্য পালন করেছেন চোখের জলে, তারা নিরপরাধ; অপরাধ যদি কিছু মাত্র থাকেই তবে তা এই যে, তারা বিশ শতকের মূখোশটা খুলে ধরেছেন। অনুন্নতভাবে যিনি ক্রেতা তিনিও ঠিক ততটুকু অপরাধী বা অপরাধের অংশভাগী—বতটুকুর দ্বারা তিনি তার সভ্য সমাজব্যবস্থার পোষাক ছাড়িয়ে তাকে উদ্যোগ গায়ে প্রদর্শন করেছেন। তা ছাড়া যে সভ্যতা নারী ভাড়া করার কিস্মা নারীকে রক্ষিতা রাখার পরওয়ানা দেয়, সেই সভ্যতার মধ্যে সিঁদুর লেপন করে তিনি নারী খোক টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।

সংবাদ সভ্যই হোক অথবা ভিত্তিহীনই হোক, এ সংবাদ অন্তত একটি মাত্র স্বস্তির খবর বহন করে এনেছে এই যে, দুটি অনাহার-ক্রিষ্ট মৃত্যুশয্যাগিরী শিশু নারী (নারীর মূল্য ধরে দেওয়া হয়েছে) অন্ততপক্ষে বেঁচে থাকার একটা উপায় গেল।

পাচজনে পাঁচশতজনের এইভাবেই তো চমৎকার বাচার উপায় করে দিচ্ছেন। এও কি কম ভরসার কথা?

বড় স্বস্তি পেলাম। বড় নিশ্চিন্ত করলেন ‘জনমত’ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা।

বর্ধমান:

বিজলী-বিলে শ্বেচ্ছাচার

প্রকাশ, গোটা বর্ধমান শহরটাই নাকি

অক্টবর মাসে দেয় ইলেকট্রিক বিলের অকস্মাৎ অসম্ভব অশ্ববৃষ্টিতে বতমান মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। শূন্য খরিদারগণ নয়, ইলেক-ট্রিসিটি বোর্ডের কর্মীরাও এই অকস্মাৎ অশ্ব-স্বর্গীর বৈমল্যম সামারণীকরণে বেবোকে বিস্মিত। ঘটনাগতিককে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি বাড়ির ইলেকট্রিক বিলই সাধারণ বিলের দুগুণো বা ততোধিক আকার নিয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল? গোটা শহরটা রাত-ভোর আলো জ্বালিয়ে এখন হর্রা করে নি তখন ইলেকট্রিক বিলের এই অসম্ভাবিক স্বর্গীত কেন; এ প্রশ্নের উত্তর কতৃপক্ষ নাকি উপযুক্ত জবাবই খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ এই ভানুমতীর খেলার কারণ নির্ধারণে অসহায় অক্ষমতাবোধ করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ। আর অসহায় অবস্থা খরিদারদেরও। তারা একই সঙ্গে অত টাকা পাবেন কোথায়?

স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় (বর্ধমানী, ১২।১১। ৬৫ প্রস্তাব) এ বিষয়ে একটি অধিবেশনে তদন্তের দাবি উঠেছে। কলা বাহুল্য, ন্যায় দাবি। কতৃপক্ষের উচিত, বিল অন্-সন্ধানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইলেকট্রিক বিলগুলিতে উপযুক্ত ছাড় দেওয়া। অর্থাৎ এমাবৎকালের এক এক নম্বর বিলের এক একটি গড় হিসাব অনুযায়ী বিলের টাকার আদায় করা। তদন্তের পর কম বেশির হিসাবটা কয়লেই হবে।

ইলেকট্রিকের ব্যাপারটা মনোপলির মৌরসীপাটী ভোগ করে বলে বিজলীভোগ-কারীগণ বিজলীবিক্রেতা কতৃপক্ষের জন্ম-জন্মই হচ্ছেন স্বতন্ত্র। কেন না ক্রেতা-সাধারণ নিরশ্রম, বিক্রতা যোগ্য বস্তু-হুমকি দিলেই হুড়মুড় করে তাঁর দোরে ভিড় করতে হবে সকলকে

দার্জিলিং:

লাল গম

চৈনিক গম নয়, নিকৃষ্ট জাতের দেশী গম (লাল গম) দীর্ঘদিন ধাবধ শিলিগুড়ির রেশন দোকানগুলি সরবরাহ করে আসছে সাপ্তাহিক ‘সৈনিক’ প্রকাশ, শিলিগুড়ি সরকারী গদ্যমে যুগপৎ শাদা গমও আমদানী হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি কল্যাণে সাধারণের ভাগ্যে শ্বেতবস্তুর ম্যাকশন মেলে না। স্থানীয় সাধারণের ধারণা, লাল গমকে জারগা ছেড়ে দিয়ে শাদা গম এখন সোজা চোরাবাজারের পিথ ধরেছে। কারণ শাদা গম লালের চাইতে কুইন্টাল প্রীতি প্রায় শিশ টাকা বেশি।

তিরিশী মুনামফার শিলিগুড়ি হাতে রাতা-গাড়ি লাল হয়ে না যায় এজন্য কতৃপক্ষের অধিদান-দৃষ্টি-আকর্ষণের সুযোগ গ্রহণ করল।

সমাজ, বিজ্ঞান এবং আচার্য হুন্ডে

পূত বছর এমন দিনে ডুবনেবারে আচার্য হুন্ডেনের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও আমরা জানতাম যে, দুরারোগ্য ক্যান্সার তাঁকে আক্রমণ করেছে এবং শীঘ্রই তাঁকে আমরা হারাতে চলেছি তবু এই মৃত্যু আমাদের বৃকে জাকস্মিকের মত বোকাইছিল। আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম, সে ব্যথার বিস্ময়ও কম ছিল না। এ-রকম স্বয়ংসম্পূর্ণ উজ্জ্বল মৃত্যু, বার জালোকে সারাজীবনের বুদ্ধিনিষ্ঠর আত্মনিষ্ঠর স্বাধীনচেতা ঘোষা মানুষটিকে এক নিমেষেই সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়, আমরা খুবই কম দেখেছি। মৃত্যুর প্রাকৃতিক রকম মানবিক আবেগ-প্রসূত পুষ্পাঘার অর্ধহীন অনু-প্রবেশ তাঁর বুদ্ধিনিষ্ঠর সৌন্দর্যচেতনার সম্মতি পেল না, আর গবেষণার জন্য আপন শব্দেই দানের মধ্যে আজীবন অপরাধিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষক হুন্ডেনকে আমরা শেষ-বারের মত দেখতে পেলাম। আমাদের মধ্যে ঝাঁরা বড়, মানুষের দরবারে তাঁরা কেউ শব্দ, রসমন্ডা, কেউ বা শব্দই বিজ্ঞানী। আচার্য হুন্ডেন ছিলেন সেই মৃদুস্রোতের জনসমষ্টির একজন—এ-যুগে বাঁদের “প্রকৃত বিজ্ঞানী” বলা যায়। নিজে একজন বড় বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞান বিজ্ঞানসাধনার মধ্যেই তিনি দিন কাটান নি। জেনেটিস-এ শব্দ তাঁর মৌলিক অবদানগুলিই তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী অমরতা দিতে পারত। কিন্তু সেখানেই থেমে না থেকে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মত নিজের পরীক্ষাগৃহের ঝাইরে বিরাট মানবসমাজের প্রতি তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়েছেন, সম-

সাময়িক সমস্যাগুলিকে সেই দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, সাধারণের মধ্যে সেই দৃষ্টিকে জাগ্রত করার জন্য স্বয়ং প্রচারে নেমেছেন—এখানেই তাঁর অবদানের ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কথাটিকে একটু বিশদভাবে বুরু নেওয়া প্রয়োজন।

মানুষের ইতিহাসে এই যে-বিশেষ সময়টিতে আমরা বেঁচে আছি সাধারণভাবে তাকে বিজ্ঞানের যুগ বলে। এর সুবচেয়ে স্পষ্ট কারণ এই যে, বিজ্ঞান এ-যুগে মানুষের প্রবৃত্তি-গুলিকে খুব জোর করে নাড়া দিয়েছে। বিজ্ঞান আজকের পৃথিবীতে একাধারে প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসীম আতঙ্কের হেতু। মানুষ তাই বিনা ঝিঝার এই ভয়ঙ্কর সুন্দরকেই মেনে নিয়েছে যুগদেবতারূপে। কিন্তু এই কারণটিই একমাত্র কারণ নয়। ঝাইরের এই দেবতা বিংশশতাব্দীর অস্তর্লোকেও এক বিরাট এবং সর্বব্যাপী পরিবর্তন সাধন করেছে। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানচর্চার ফলে আজ একটি

বিকল্প হিসেবে কাজ করে। অতীতকে অর্থাৎ বিবর্তনবাদকে জানবার সহজাত আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি জেনেটিস-এর ক্ষেত্রে এসেছিলেন। অর্থাৎ মানুষের সহজাত একটি আকাঙ্ক্ষাই তাঁর বিজ্ঞানসাধনার মূল কারণ ছিল। ভারতীয় ছাত্রদের তিনি দামী বস্ত্রপাতি পাওয়া না গেলেও গবেষণার সাধারণবুদ্ধি প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকতাকে আজ্ঞার করে বলে ব্যুরোক্রাসীকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। গৌড়ামির সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানচেতনা কোনদিনই রফা করে নি। স্ট্যালিনীর রাশিয়ার গৌড়ামিতে ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টি ছেড়েছিলেন, যদিও মার্ক্সবাদে তাঁর বিশ্বাস অক্ষুর ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আস্থা আরও, “এ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি) সভ্যসংধানী এবং সেইজন্যই নিরপেক্ষ।” এই নিরপেক্ষতা তাঁর মতে আইনের নিরপেক্ষতার চেয়ে ব্যাপক। আইনের রাজ্য শব্দ মানুষের মধ্যে, আর বিজ্ঞান মানুষ, ইতরপ্রাণী তথা গোটা সৌরজগতের সব-কিছুকেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করে। বস্তৃত আরও অনেক ঘটনার, যেমন নিজের ওপরে পরীক্ষা বা ইংল্যান্ড ত্যাগ প্রভৃতিতে, তাঁর সহজ মানুষের সহজ আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক প্রকাশ চোখে পড়ে।

আশিসকুমার সিংহ

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যাস ঘটেছে বা এই বিংশশতাব্দীর পরম সম্পদ। শব্দ বিজ্ঞানেই নয়, সমসাময়িক শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে—সর্বত্রই এই দৃষ্টিভঙ্গির জয়জয়কার। উদাহরণরূপে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা বলা যায়। প্রথাগত Traditiona দর্শন বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলে এই দার্শনিক তাকে বিনাশ-মুখী decaying বলে ঘোষণা করেছেন।

এখন প্রশ্ন, এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ কি? এর ধারক-বাহকদের মতে পরীক্ষা দ্বারা পরি-শোধিত সাধারণ বুদ্ধিই বিজ্ঞান। আচার্য হুন্ডেন এই ধারক-বাহকদের মধ্যে প্রথম সারিতে। “আমি কি ভাবি” নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, “শব্দ, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেই আমি উৎসাহী নই, বিজ্ঞান-বিরোধিতা এবং নকল-বিজ্ঞানের চিৎকারের মধ্য থেকে সাধারণবুদ্ধির মদ্য অথচ অবিচল কণ্ঠটিকে শব্দে নিতেও সমান উৎসাহী।” সাধারণবুদ্ধির প্রতি তাঁর এই অনুরাগের কারণ মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন মৌল মানবিকতার সমস্ত বোধ, বুদ্ধি এবং ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়ে সচেতনভাবে গঠিত একজন সাধারণ মানুষ। গণিতশাস্ত্র তিনি ভালবাসতেন, কারণ সাধারণবুদ্ধি দিয়ে যে-জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারি না গণিত সেখানে সাধারণবুদ্ধির

সাধারণবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যবর্তী যোগসূত্রটির প্রতি কাজে-কথায় এই বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ—আমার মনে হয় এটাই হুন্ডেনের সবচেয়ে বড় অবদান। তার কারণ, এর থেকে তাঁর উত্তরসূরীরা দৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। প্রথমত এর থেকে দেখা যায় যে, সমাজ ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই মানবসমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সামাজিক বা একক জীবনে যে-কোন বৃহৎসংর কানারা করার জন্য মানুষ প্রথমে তার সাধারণবুদ্ধির প্রয়োগ করে। পৃথিবীতে অভ্যাসের প্রথম লগ্নেই সে তাই করেছে এবং আজও তাই করে চলেছে। বুদ্ধি দিয়ে কিছু সে বুরুতে পেরেছে, কিছু পারে নি। বুদ্ধিতে যার নাগাল পেল না তাদেব নিয়ে বানিয়েছে ভূতপ্রভু, দেবদেবী। নিজের তৃপ্তির জন্য সেমেন নিয়েছে যে, এদের বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, বিশ্বাস করতে হয়। সেই বিশ্বাস এবং বুদ্ধি উভয়ের সমবাহে নির্মাণ করেছে তার গৃহ—তার আশ্রয়। কিন্তু তখনই ছুটে এসেছে “সীমানাভাঙার দল”। আবার তাকে টেনে বার করেছে বুদ্ধির পথে। বুদ্ধির নতুন প্রয়োগে ভেঙে গেছে পুরনো বিশ্বাসের তারের ধর। এইভাবে সাধারণ-

বাংলা ভাষার প্রকাশিত দ্বিতীয় সর্বাধিক

প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিক

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তীর চাঁদার হার

বার্ষিক	...	১৪-০০
সাপ্তাহিক	...	৭-০৫
ত্রৈমাসিক	...	০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা

চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়

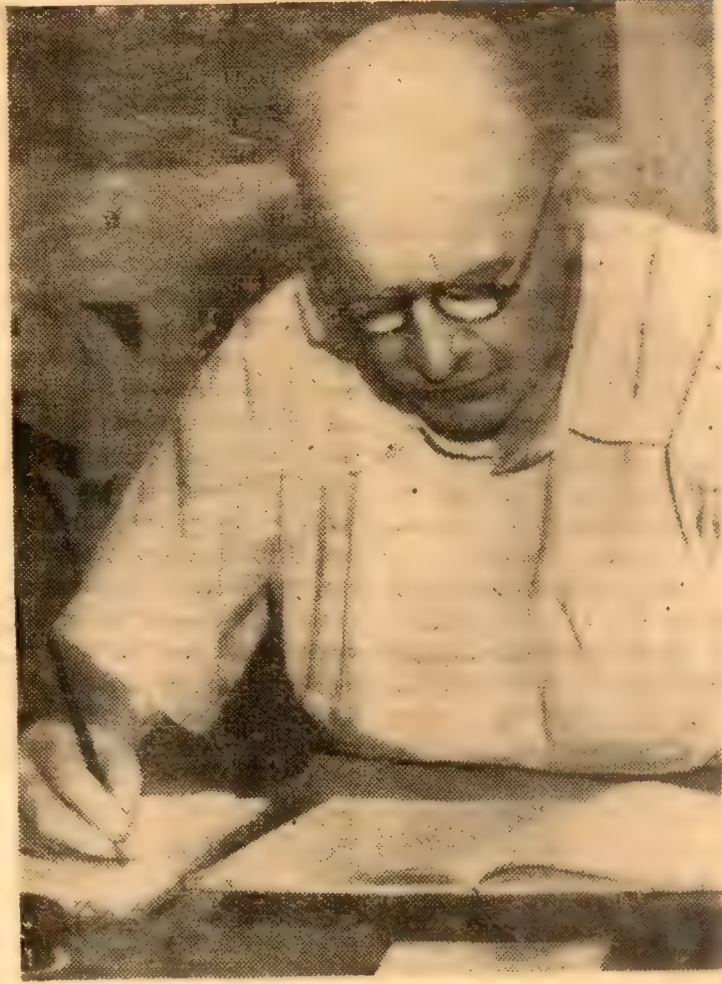
সাহু সেন শ্রী রায়সেন

জীবনের পথ থেকে কিস্বাসের ধরে যাওয়া এবং
জানার পথে বেরিয়ে আসা—এই নিয়েই রচিত
হয়েছে ইতিহাস, গড়ে উঠেছে সভ্যতা, মানুষের
ঐতিহ্য, যা কিছ। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য
সাধারণবুদ্ধি পরিশোধিত হতে - হতে
সুপায়িত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

মানব-ইতিহাসের এই মূল কথাটিকে যিনি
জীবনে মেনে নিয়েছেন—চিত্রকর সাহিত্যিক
দার্শনিক বা বিজ্ঞানী বেই হোন না কেন,
তিনিই এ-ধরনের প্রকৃত বিজ্ঞানী। চিত্রাচারিত
ধর্মের কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না।
“আমার জীবনদর্শন” নামক বেতার-ভাষণে
(১৯২৯-এ প্রদত্ত) আচার্য হলডেন বলেছেন—
“আমি বিশ্বাস করি যে, বিজ্ঞানী চেষ্টা করছেন
পরম সত্যকে প্রকাশ করতে, আর কলাকুশলী
মনোভাবে চাইছেন পরম সৌন্দর্যকে; আমি তাই
বিজ্ঞানে এবং শিল্পে, আর ভালভাবে বেঁচে
থাকার চেষ্টায়, আমার আকাঙ্ক্ষিত সবটুকু
মুঠই পেয়ে গেছি।”

বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞান-প্রভাবিত শিল্পে
মানুষের এই যে নতুন ধর্ম আবিস্কৃত,
এর ওপরে ভিত্তি করেই হলডেনের
মৌলিকবোধও গড়ে উঠেছিল। এই বেতার-
ভাষণেই অন্যর তিনি বলেছেন—“আমি একজন
জীববিজ্ঞানী; তার মানে আমি জীবিত প্রাণীর
প্রকৃতি অধ্যয়ন করি এবং স্বভাবত জীব-
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব জিনিস দেখি।
ধরণীকে আমি আপন বলে অনুভব করি,
কারণ আমি জানি যে, অন্যান্য প্রাণীর, এমন
কি গাছপালার সঙ্গে আমার-রক্তের বোগ
আছে। এমন কি অনেক জড়পদার্থও অতীতে
জীবিত ছিল। আজ যখন একটি চুগাপাথরের
পাহাড়ের দিকে তাকাই, আমি অনুভব করি
যে, এই বিষয় এবং নিজীব মূর্তিটি আমার
কোটি কোটি অতিকৃত সহজীবী প্রাণীর দ্বারা
গঠিত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে,
আমার মনে হয় চুগাপাথর হতে কেমন লাগে
তাও আমি খুব অস্পষ্টভাবে ধারণা করতে
পারি। সাধারণত জড়পদার্থকে আমরা বাইরে
থেকে জানি, আমাদের শরীরকে জানি ভিতর
থেকে। ঠিক যেভাবে একজন গরম হলে কেমন
লাগে এটা বোঝে তেমনি আমি আমার নিজস্ব
অভিজ্ঞতা থেকে জানি অত্যন্ত বড় বা ছোট
ক্যালসিয়াম কার্বনেটের স্ফুপ, যা দিয়ে চুগা-
পাথরের পাহাড় নির্মিত হতে কেমন লাগে।
এইরকম স্পষ্ট এবং ব্যাপকভাবেই চারপাশের
পৃথিবীর সঙ্গে আমি আমার আত্মীয়তা
অনুভব করি।” লক্ষ্যণীয় যে ‘প্রবাসী,’
‘সমস্যা,’ ‘সমুদ্রের প্রতি’ প্রভৃতি কবিতায় ও
‘ছিন্নপত্রের দৃষ্টি’-একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথও
একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।
যারা কোনদিন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করেন
নি এমন দেশী-বিদেশী আরও অনেক
স্বাধীন কাজে ও কথায় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-
ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ-কথা অবশ্য ঠিক যে, প্রতি যুগে এক-



আচার্য হলডেন

শত মানুষ নানা কারণে বিজ্ঞানের বিরোধিতা
করে এসেছেন এবং আমাদের যুগেও এমন
ব্যক্তি বিরল নন। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা
যাবে যে, তাঁরাও বিজ্ঞানের প্রভাব কিছুতেই
এড়াতে পারেন নি। রুনোকে যারা পুড়িয়ে
মেরেছিলেন, আগুনের ব্যবহার তাঁরা শিখে-
ছিলেন বিজ্ঞানের কাছ থেকেই; এমন কি মৃত
মানুষ যে আর কখনও ফিরে আসতে বা
বিরোধিতা করতে পারে না তাঁদের এই সাধারণ-
বুদ্ধিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সমগোত্র, খৃস্ট-
ধর্মের পুনরুত্থানতত্ত্বের সমগোত্র নিশ্চয়ই
নয়। সাধারণবুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সম্পর্কটি
তাঁরা জানতেন না, তাঁদের আগে-পরে আর-ও
যারা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছেন বা করছেন
তাঁরাও এই অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন।

সাধারণবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির
যোগসূত্রটি বুঝতে পারলে দ্বিতীয় যে-গুরুত্ব-
পূর্ণ সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছান যায় সেটা হল
এই যে, বিজ্ঞান একজন বা কয়েকজন বিশেষ
ব্যক্তির সম্পদ নয়, এর অধিকার সমস্ত

মানুষের। আগেই আমরা দেখেছি ল্যাবরেট-
রীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন নি এমন
অনেক মনীষীও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জয়যোযা
করেছেন। এর থেকেই বিজ্ঞানের সামাজিক
চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক
আবিষ্কারগুলিকে তাই সাধারণ মানুষের কাছে
পৌঁছে দেওয়া প্রকৃত বিজ্ঞানীর অবশ্যকর্তব্য।
সাধারণবুদ্ধি যেহেতু সব সুস্থ মানুষেরই
আছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে তাই সকলকে পরিচিত
করান যাবে বলেই হলডেন বিশ্বাস করতেন।

লম্বা ইউন

বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম করিয়া
অধিকতর স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-
দেহী ইউন। হিন্দীতে বিশেষ
বিবরণ পাইবেন।

283, Azad Market, (W.B.C.)
Delhi-6



“আমার জীবন-দর্শন” ভাষণের শেষাংশে তিনি বলেছেন—“একটি মনের পক্ষেই বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের একটি ভাল জ্ঞান আহরণ করেও মানবজীবনের সাধারণ খুঁটিনাটি কাজের জন্য সময় করে নেওয়া সম্ভব।” এই বিশ্বাস বৃদ্ধি নিয়ে তিনি বিজ্ঞান-প্রচারের কাজে নেমেছিলেন। এ-কাজের উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—“যতদিন না বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সকলে গ্রহণ করছেন, ততদিন আমাদের সভ্যতার একেবারে গোড়ায় একটি অসংগতি থেকে যাবে। এর যত্নগত ভিত্তিটি বিজ্ঞাননির্ভর, অথচ এর বুদ্ধিগত ভিত্তিটি প্রাক-বিজ্ঞান যুগের। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় এই অসংগতিটি দূর করার জন্য একটি বেশ জোরদার চেষ্টা না হলে আমাদের এই বিশেষ সভ্যতাটি অতীতের কৃষ্টিগুলির দশা লাভ করবে। যাঁরা একে রক্ষা করার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন, প্রয়াসটি কি ধরনের হবে এবং সেই প্রয়াসের কি রকম বিরোধিতা হতে পারে সেটা তাঁদের বুকে নেওয়া উচিত।”

—(বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি)

আর এক জায়গায় বলেছেন, “কতখানে আমাদের সভ্যতার পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে।... শূন্য জড়পদার্থ সম্বন্ধেই নয়, আমাদের নিজস্বের ও পরস্পরের সম্বন্ধেও বিজ্ঞানসম্মত পক্ষে চিন্তা করতে আমাদের শিখতেই হবে।”

—(আমার জীবন-দর্শন)

এবং এ-কাজের জন্য “বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিকে অবশ্যই ল্যাবরেটরীর বাইরে এনে প্রাতিহিক জীবনের কাজে লাগাতে হবে।”

—(বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি)

নিজের কাজ সম্বন্ধে এত ব্যাপক এবং স্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই সাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি অসাধারণ সফলতালাভ করেছিলেন। বিজ্ঞান-প্রবন্ধ তিনি লিখতেন এমনভাবে যেন বিজ্ঞান নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে গল্প করছেন। যাতে করে পাঠকেরা বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে তাকে সহজভাবে নেয় এবং কাজে লাগাতে পারে। তাঁর লক্ষ্য ছিল “পাঠক যাতে তার বাকী জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানকে এক করে নিতে পারে।” (—কি করে বিজ্ঞানপ্রবন্ধ লিখতে হয়) তার দিকে। কোন প্রবন্ধে যেমন ‘ক্যাডের জন্য সিনেমা,’ ‘মৌমাছি কিভাবে কথা বলে,’ ‘মৌমাছি কি করে পথ চেনে’ প্রভৃতি তিনি জীবজন্তুদের মজার মজার ব্যবহার সম্বন্ধে এবং যে-সব ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সেগুলি জানা গেছে সে-সম্বন্ধে লিখেছেন। ‘গ্রহদের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান’ অথবা ‘যে যন্ত্র-চিন্তা করে’ প্রভৃতি প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়েছেন দর্শনকে, বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজনীতিকে মিলিয়েছেন প্রায় সব প্রবন্ধেই, যদিও এদিক দিয়ে ‘ডারউইনবাদ ও তার বিকৃতি,’ ‘মানব-বিবর্তনের অতীত ও ভবিষ্যৎ,’ ‘জীববিজ্ঞানের পরীক্ষারূপে সমাজ’ এবং ‘জৈববিসারন ও গাশ্বীজী’ প্রভৃতি প্রবন্ধ-গুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমেই গণিতনির্ভর হয়ে উঠছে। এটা যে সাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে একটি প্রতিবন্ধক সেটা বুকে তিনি পাঠকদের এই সংবাদটি দিলেন যে, কনট্রাস্ট ব্রীজ খেলতে যে পরিমাণ গণিতের জ্ঞান মাসে, হেরিডিটি বা বংশগতি বুঝতে তার চেয়ে বেশি লাগে না। আর শব্দ, সংবাদই

হয়। ‘আমার ফাসিল চাই’ প্রবন্ধে কয়লাখনির মজুরদের আহ্বান করবেন যিনি থেকে তাঁকে ফাসিল বা জীবনশ্ব খুঁজে দেওয়ার জন্য। ফাসিল তিনি পেয়েও ছিলেন। এইভাবে তাদের তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজেও নিয়োগ করেছিলেন। তার মানে, বিজ্ঞানকে সমস্ত দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আরোজনে তাঁর কোন দ্রুতি ছিল না।

“সমাজ-সম্বন্ধে-অচেতন বিজ্ঞান থেকে সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানের সবে জন্ম হচ্ছে”— বলেছেন বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নল তার Science In History গ্রন্থে। আচার্য হলডেন তাঁর কাজে ও লেখায় সৈদিকে একটি বিরাট পদক্ষেপ। বিজ্ঞান বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি খুবই বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজ-সচেতনতার তাকে অশ্বিতীয় বলা যায়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় এ-কথা স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শেষ-জীবন তাঁর ভারতে কেটেছে। গ্রামে, বাসে, ল্যাবরেটরীতে আমরা তাঁকে খুব কাছে পেরে-ছিলাম। ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে তিনি খুব বড় কথা বলে গেছেন, সে আমরা সকলে জানি। প্রীমতী হলডেন এখনও এদেশে তাঁদের আরও কাজ করে চলেছেন। এ-সব কারণে তাঁদের কাছে দেশবাসী কৃতজ্ঞ। কিন্তু আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মনে হচ্ছে শব্দই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ খুবই সামান্য কাজ হবে। আমাদের দেশ বিজ্ঞানে অনুন্নত। এত অনুন্নত যে, আমরা এখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করি এবং কোন কোন তথাকথিত বড় বড় বিজ্ঞানী (?) তাঁদের জুনিয়র বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্রে অহেতুক নাম যোগ করার মিথ্যাচারেও বিশ্বাস করেন না। রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-ব্যাপজ—সবই সমাজ-সচেতনতার নিদর্শন অভাব। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ যাঁরা সাধারণবুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে বিচার করতে চান, তাঁরা সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। কি করে এই অবস্থার পূর্ণ নিরসন হবে বলা দুরূহ। তবে সাধারণবুদ্ধির জয় ঘোষণায় এবং তাকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলায় বিজ্ঞানকর্মীদের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানমুখী না হলে কয়েকটিমাত্র ল্যাবরেটরীর দীপ জ্বললে রাখার খুব বেশি মানে হয় না। বিজ্ঞানপ্রচারে তাই বিজ্ঞানকর্মীদের সক্রিয়-ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পথের আলো আসবে হলডেনের কাছ থেকে, আর এ-দেশের সেই বৃদ্ধ শিক্ষকটির কাছ থেকে ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম যুগেই যিনি সমাজের কথা ভেবেছিলেন, উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় ল্যাবরেটরী ছেড়ে নিজে গিয়েছিলেন বন্যাত-লের সেবার। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমি আচার্য প্রমুখচন্দ্রের কথা বলছি।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ভরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে ন্যায় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। উক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস ক্রমশঃ অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় শততপস্বিনী সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা

করিয়াছেন সূক্ষ্মর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ণ কীর্তির নতুন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

হালা—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

‘সঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড’ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কাল কুম্ভ

চন্দ্রা ভট্টাচার্য



মনায়মান অশ্বকরে আসশ্যাওড়া আব তে'তুলগাছেব প্রলম্বিত ভৌতিক ছায়াটা দীর্ঘব গহন কালো জলের বৃকে আরো নিবিড় করে নেমে আসতেই সম্ভ্রান্ত সচকিত শেষ পালকোড়িটাও ঝাপটিয়ে উড়ে গেল অশ্বকাবের বৃকে। নিঃশব্দ নিস্তব্ধ অতলন্ত দীর্ঘব বৃকে সাপলা আব হিন্‌চেলতার কোপে কোপে হঠাৎ দোলো জাগিয়ে জলতবগগলো আবাব নিখর হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

বাবলু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জলের দিকে। কেমন একটা অশুভ ভয়াবহ আতঙ্ক যেন জেগে উঠছে দীর্ঘব আশেপাশে। মনটা আবার ছটফট কবে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল বাবলু। একটু আগেই মার সেই আকুল ডাকটায় যদি সাড়া দিতে পাবত বাবলু, কে জানে... তাহলে হুততো আব এখানে আসতেই হত না ওকে।

মার ডাকটা... দীর্ঘব এই পাড়ের ঘন ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পাচ্ছিল বাবলু, উষেগাকুল নিরুপমার ভয়াবহ দৃষ্টিকাত কণ্ঠস্ববটা দুবন্ত একবাশ এলোমেলো হাওয়ার বেন ক্রমাশ্ববে পাক খেতে খেতে ভেসে আসছিল বাবলুর কানে, বাব... লু... বা... লু... উ... উ...

দুবন্ত বাঁশবাঁ দূর্নিবাব আহ্নানের মত নিরুপমার কণ্ঠস্ববটা যেন আকাশে বাতাসে তবগিত সকবন রাগিণীর ব্যাকুল মুহূর্ণাব ডরে উঠছিল। হৃদযেব সমস্ত আবেগ দিয়েই বোধহয় ছেলেকে ডেকে সারা হাচ্ছিলেন নিরুপমা। আর অভিজুতব মত মার ডাকটা

শুনতে শুনতে স্থিথা-শ্বশ্বের দোলার দূলে উঠছিল বাবলু।

আশ্চর্য! মা আজ এমন উতলা হয়ে পড়েছেন কেন? তবে কী ওর মনের নিদারুন মর্মবেদনা নিরুপমাও অনুভব করতে পেরেছেন! আব তাই এমন উতলা হাহাকার করে চলেছেন একটানা। গভীর অশ্বসিডতে আবার ছটফট কবে ওঠে বাবলু। নিকষ অশ্বকাবের বৃকে মৃত্যুর ভয়াবহ আতঙ্কটা যেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় কোপেব আড়ালে আড়ালে।

সভয়ে এতক্ষণেব সংকল্পটাকে আবেকবার টলাতে চেষ্টা করে বাবলু। ভাববার চেষ্টা কবে... নাকি ফিবেই বাবে শেষ পর্যন্ত! কিন্তু... একরাশ দুবন্ত মাতাল হাওয়ার গাছেব নিখর পাতাগলোকে হঠাৎ একটা দোলায় চঞ্চল কবে আবার ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল এক সময়। ভবে একটু চমকেই উঠেছিল বাবলু। কিম্বা বাড়ি ফিরে যাবাব দুর্বাব প্রলোভনটা বৃকি ওব মনেও পাতাব শিখিশরানিব মত কাঁপুনি দিয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। শব্দ একবাশই নয়, কতবাশই তো ভেবেছে... তবু কেন কে জানে বাড়ি ফিরে যাবার মত সাহসটুকুও যেন কেমন নিঃশেষে কেড়ে নিবেছে দুপূরেব সেই মর্মান্তিক অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। কত আশ্চর্য-ভাবেই না মুহূর্তে ওর চোখের সামনে বদলে গেছে পৃথিবীটা।

অনেকবার ঘটনাটাকে মনে মনে ভেবে হাঁপিয়ে উঠেছে বাবলু। আর ভাবতে গেলেই

একটা অজানিত আতঙ্ক যেন এখনো ওর হৃৎপিণ্ডটা বিকল হয়ে ওঠে বৃকেব মতো। নিজেব কাছেই বড় আশ্চর্য লাগে... এমন এতটা কাণ্ড কী করে কবে বসল বাবলু! ঘটনাটায় আকস্মিকতায় এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, সেই মুহূর্তে বিষয়টাব গুব্ব ভাল কবর বৃকে উঠতে পারে নি বাবলু।

পবীক্ষাব হলেব মধ্যে কোথায় যে হিংস্র নেকড়েব মত এতক্ষণ শিকারের ওপর ওব পেতে ছিলেন অশ্বকর টিচার দশাংকরাদ একটুও টের পাব নি বাবলু। হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা আত্নাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাকলু ওপব—এই, এই ছোকরা, দেখি, দোঁব কাগজখানা...

সমস্ত পৃথিবীটাই বৃকি হঠাৎ একটা প্রচণ্ড দোলায় দূলে উঠেছিল বাবলুর চতুষ্প্র নাগনে। বৃকেব মতো ওর হৃৎপিণ্ডটা কী ভীষণ আতঙ্কে লাগিযে উঠেছিল সেই মুহূর্তে! মনে হযেছিল কথা-বলবাব চেষ্টা করলেই বৃকি হৃৎপিণ্ডটা লাকতে লাকতে ওব গলা দিয়ে বেবিরে আসবে এখনি। অপবিসমীম ভবে আব অতঙ্কে গলাটা শক্তিরে কাঠ হয়ে উঠেছিল। তাই একটা কণাও বলতে পারে নি বাবলু।

একটা স্তব্ধ আতঙ্ক ছাড়িয়ে পড়ল পবীক্ষার সাবা ঘরটাষ। পবীক্ষাষীরা সচকিত সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল। অপবিসমীম লক্ষ্য আব চাঞ্চল্য ফুটে উঠল সকলের মুখে চোখে। আশ্চর্য, বাবলু চোর! চুরি করছি বাবলু...!

শশাঙ্কবাবু ততক্ষণে ছোট্ট এসে
ওর হাত থেকে কান্ডের টুকরোটা ছিনিয়ে
মাগে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা কবে নিঃসন্দেহ
হয়ে নিলেন। তারপর আবার তেমনি চিংকার
করে উঠলেন—উঠে এস...উঠে এস বলছি...!

এবার যেন সত্যিই ফিসে পেল বাবলু।
দুগে দুগে গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল
ওর কণ্ঠস্বর—এবারকি মত কমা করুন স্যার...
আর কক্ষণে করব না স্যার...!

কিন্তু বিবর্তিত আল অসহিষ্ণুতার শশাঙ্ক-
বাবলু কণ্ঠস্বর যেন আনো কক্ষণ হয়ে উঠল
এবার—আগে উঠে এস বলছি...চলো হেড-
মাস্টারমশাইয়ের ঘরে।

এবটা ভীষণ ভরাত শিহরণে বাবলুর
সর্বাগে কে'পে উঠল। হেডমাস্টারের ঘরে?...
তার মনে! আর যেন ভাবতে পারে না
বাবলু। একটা করুণ অর্ডার ওর বুক ঠেলে
উঠে এসে হঠাৎ গলাব কাছে আটকে গেল। পর
পর শব্দকো করেকটা চোক গিলে আবার কথা
বলার চেষ্টা করল বাবলু—এবারের মত কমা
করে দিন স্যার.....জীবনে আর.....

বিন্তু শশাঙ্কবাবুর দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার
জটিলতার অসামান্য ছাত্রদের সম্মুখে নিজের
মজাতেই কেমন একটা বুদ্ধিবাবিজ্ঞান কঠোর
হৃদয় গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। সেখানে আঘাত
করার চেষ্টা করলে প্রত্যুত্তরে একমাত্র প্রত্যাহাত
হাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তাই আল
শাস্ত্রবায় না কবে বাবলুব খাতাপত্র নিয়েই
পড়তিয়ে নিয়ে চললেন হেডমাস্টারের ঘরে।

অগত্যা ভয়-দুঃস্বপ্ন-বন্ধে শশাঙ্ক-
বাবলুর পেছনে পেছনে হেডমাস্টারের ঘরে এসে
চুকতে হল বাবলুকে।

হেডমাস্টারের সঙ্গে বোধহয় কিছু একটা
পূর্বসূচক বিষয় নিয়ে আলোচনা কবিছিলেন
হেডমাস্টারমশাই। শশাঙ্কবাবু ঝড়ের মত
স্বরে চুকতেই আর পেছনে শব্দিত বাবলুকে
দেখে একপলকেই যেন আদম্ব্য কবে নিলেন
বিষয়টা। কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না।
আমত্বের কিছু নেই। পরীক্ষা এ কদিনে
ছাত্রদের এই গুণপন্য বহু দৃষ্টান্তই এসে
লগ্নিচ্ছে তাঁর ঘরে। সকলের প্রতি সমান
যত্নবাহই এখানে তাঁর একমাত্র কর্তব্য। তাই
ব্রহ্ম করে ভাবনারও কিছু নেই তাঁর। কেবল
পাণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনাটুকু শেষ
করার অপেক্ষা।

আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে পাণ্ডিত-
মশাই বিদায় নিতেই শশাঙ্কবাবুর দিকে সপ্রশ্ন
দৃষ্টিতে তাকালেন হেডমাস্টারমশাই। গভীর
চকচকায় গলা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিল
বাবলুর। সংক্ষেপে অভিযোগগুলো বলে
চলেন শশাঙ্কবাবু...আব চেরারে হেলান দিয়ে
কেমন নিপুণ নিবাসন্ত দৃষ্টি তুলে বাবলুর
দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হেডমাস্টার-
মশাই। সব শোনার পর আবার পিঠ সোজা
করে বসলেন তিনি। তারপর...আর

এক মুহূর্তের দেরি না করে বলে উঠলেন—ওস
খাতাটা আমার টেবিলে বেবে যান শশাঙ্ক-
বাবলু...! আরো কী যেন বলতে গিয়েও হঠাৎ
থমে গিয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ।
তারপর বাবলুকে বললেন—বাড়ি যাও। তোনায়
আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।

শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ। কিন্তু যেন
কোন জুর ব্যথের নিষ্করণ শরসন্ধ্যানে ছিন্ন-
ভিন্ন হয়ে গেল পক্ষীর কোমল হৃদয়। অবশ্য
যন্ত্রণার ছটফট করে উঠল বাবলু—কমা করুন
স্যার...আর কক্ষণে এ কাজ করব না আমি...!

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই শশাঙ্কবাবুর
চেরেও নিষ্করণ। শশাঙ্কবাবুর আক্ষয়নের
মধ্যে তবুও প্রাণের উল্লাস ছিল। হেডমাস্টার-
মশাই ঠিক তার বিপরীত। আশ্চর্য শান্ত
সমাহিত। কথকো আবিচল। নিঃসন্দেহে
এটা তাঁর স্বভাবের বৈচিত্র্য। তা-না হলে
এতগুলো শিক্ষকের মধ্যে একমাত্র তিনিই বা
কেন প্রধান হলেন। বাবলু আসল হয়ে হেড-
মাস্টারের পা দুটো জড়িয়ে ধরল—আমায়
এতবড় শাস্তি দেবেন না স্যার! তাহলে
আমায় আর বাঁচা হবে না...এবারের মত আমায়
ছেড়ে দিন স্যার! আমি এমন...

হেডমাস্টারমশাইয়ের চোঁটের কোণে
কেবল একটা প্রস্থম কৌতুকব হাসি খিলক
থলে গেল। তবু মুখ ঝুললেন না হেড-
মাস্টারমশাই। পা দুটো কেবল সরিয়ে
নিতে চেষ্টা করলেন তাড়াতাড়ি। তবু বাবলুকে
নাছোড়বান্দা দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন—চুপ
করার সময় এ জানটা থাকে না কেন? আর
তুমি...

আবার চুপ কবে কী যেন ভেবে নিলেন
হেডমাস্টারমশাই। তারপর বললেন—আব
এতদিন তোমায় লেখাপড়ার একটু ভাল বয়েই
জানতুম। কিন্তু আজ তাব কারণটা বুকল্যাম।
লক্ষ্য কবছে না ধরা পড়ার পর কমা চাইতে?
অসম্ভব।

আশ্চর্য! হেডমাস্টারমশাইয়ের গলায়
শব্দ বাগ্নই নয়...কী অশ্রুত বিকাতার ঘুঘর
বাবলুকে কথাগুলো বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘর
ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর এক
অপরিসীম বিহ্বলতা যেন একটু একটু করে
গ্রাস কবে নিল বাবলুকে। সারা দুনিয়াটা
টল উঠেছিল সেই মুহূর্তে ওর চোখের
সামনে। আতঙ্কপ্রদিত চোখ দুটো থেকে
পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক ফুৎকাবেই
নিভে গেল। কিছুই বুকতে পারাছিল না
বাবলু। কেমন একটা নিঃসীম স্তম্ভতার স্নায়ু-
গুলো নিখর হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ
হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে হেডমাস্টারের
ঘব থেকে নিশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল বাবলু।

স্কুলের পরীক্ষা তখনো শেষ হয় নি...
তবু বাবলু অনুভব করতে পারাছিল যেন
শতসহস্র কৌতুক চোখ উৎকট স্বপ্নভর
চেরে রক্তাক্ত ওর দিকে। তাড়াতাড়ি স্কুলের

সীমানা পাব হয়ে কাঁকা মাঠটায় পড়ে
উদ্‌শ্বাসে এগিয়ে চলল রাস্তাটার দিকে।
সকলের ঘৃণা আর ঝপের হাত থেকে পালিয়ে
বাঁচতে চায় বাবলু। যেমন কবেই হোক
গলাতে হবে। ভীষণ একটা ভয় আর
অস্বস্তিতে যেন মরীয়া হয়ে ছোট্ট চলল
বাবলু। বড় বাস্তবতা ছাড়িয়ে, মাঠঘাট পার
হয়ে গিয়েই শেষ প্রান্তে যে বিশাল উন্মত্ত
বুড় প্রান্তবটা রৌদ্রকর্য আকাশের নিচে
নুর্মুখ, অধবের মত সূর্যের আদি-
কাল থেকে ধুকছে তাব কাছে
এসে এতক্ষণে থাল বাবলু। তবু মন
বেন খামতে চায় না ওব। আরো অনেক
দূরে পালিয়ে বাঁচতে চায়। পালিয়ে যেতে
চায় এমন দেশে-বৈখ্যনে ওব পরিচিত নিষ্ঠুর
পৃথিবীর এতটুকু ছায়া পড়ে নি কোনখানে।
যেখানে নেই প্রতিদিনের ছককাঁচা জীবনের
শ্বাসরুদ্ধ অবসাদ, নেই হেডমাস্টার আব
শশাঙ্কবাবুর কঠোর অনুশাসন, নেই বাবার
আতঙ্ক আর নিষ্ঠুরতা...!

আব যেন ভাবতে পাবে না বাবলু।
হৃৎপিণ্ডটা বুকি কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে
চায় না আব বকের মধ্যে। বাবার কথাটা
মনে পড়তেই এতক্ষণের স্তম্ভ-ক্লান্ত পৃথিবীটা
যেন হঠাৎ ভীষণ তপস্কর দোলায় দুলে উঠল
বাবলুর চোখের সামনে। চতুর্দিক আচ্ছন্ন
করে আতঙ্কের নিবিড় ঘনছায়া চঞ্চল তনার
ভর সুরে নেমে এল পৃথিবীর বুক। কী
ভীষণ অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে মাঠঘাট! একটা
প্রলম্বের কড়ের সংকটে পৃথিবীটা যেন
কেমন আশ্চর্য স্তম্ভ নিখর হয়ে উঠেছে দিকে
দিকে। একটু পরেই হস্ততা দমকা ঝড়ব
সর্বনাশা আক্ষয়লতা তাঁর গতিতে দিগ্বিদিক
লুপ্তভব কবতে করতে ছোট্ট আসবে ওর
দিকে...

ভাবতে ভাবতে আতঙ্ক ওর নিঃসাসটাই
আটকে গিয়েছিল বকের মধ্যে এতক্ষণ।
ঘোর করে নিঃসাস ফেলল বাবলু। দাবুণ
অস্বস্তিতে আবার ছটফট কবে উঠল।
কিছুতেই যেন নিজেকে সংবত করতে পারছে
না। চতুর্দিকে সেই স্তম্ভ আতঙ্কটা
যেন শশাঙ্কবাবুর মত ওং পেতে রয়েছে। তাই
আবার পালাতে চায় বাবলু। বাবার আতঙ্ক
আর উৎপীড়নের সীমানা ভিঙিয়ে...আরো
অনেক দূরে...বহুদূরে হারিয়ে যেতে চায়
বাবলু। যেখানে থেকে বাবা আর কোনদিনই
ওর নাগাল পাবেন না।

কিন্তু...তবু কেন কে জানে পালাতে আর
পা ওঠে না বাবলুর। নিবৃত্ত-নিঃস্বস্ত মনের
একধারে বড় অস্বস্তি গাছটার ছায়ার বসে আবার
কেমন ছটফট কবে উঠল। কোথায় পাল্যাবে
ও। মাকে ছেড়ে ছোট্ট তাই বাবলুকে ছেড়ে
একদিনও কি কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকতে
পারবে বাবলু। বাড়ির কথা মনে পড়তেই
বাবলুর চোখ দুটো যেন কেমন সজল হয়ে

উঠল। ভাববাব চেঁচা কবে বাবলু...মা এখন কী কবছেন। হযত হাকলুকে কোলেব কাছে নিয়ে নিবুপমা আজও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে বাবার বড় খাটটার ওপর। এবড় যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল বাবলুর জীবনে তাব হয়ত কিছুই এখনো জানতে পারেন নি নিবুপমা? কে জানে, ঘটনাটা জানতে পেয়ে কী কববেন নিবুপমা? হয়ত খুব বিস্মিত হবেন। কিম্বা প্রথমটা কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পারবেন না নিবুপমা। অসম্ভব... বাবলু এমন কাজ কখনো কবতে পারে না। এমন কী বাবা বললেও মা প্রতিবাদ না করে ছাড়বেন না। ছেলের এই দম্ভকর্ষের চেয়ে নিবুপমাব অশ্ব-সন্তান-স্নেহের পরিণতিব কথা চিন্তা করে সুবেশবাবু আজও কমা কববেন না নিবুপমাকে। হযত ভীষণ একটা কাণ্ড কবে বসবেন সুবেশবাবু। বেগে গেলে সুবেশবাবু বেন কেমন অশ্রুত বদলে বান নিমেষে। চিরদিন বাবাব এ মৃতিটাকে ভর করে এসেছে বাবলু। কী ভীষণ আতঙ্কেই না ভরে বুক কেঁপে ওঠে। ওব চিন্তা জ্ঞান আর অনুভূতিব স্তরে স্তবে বাবাব সম্মুখে একটা সীমাহীন আতঙ্ক পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

ছেলেব এই অপকীর্তির কথা জানতে পেবে সুবেশবাবু, বে কী ভবৎকব হয়ে উঠতে পাবেন তা একমাত্র বাবলু ছাড়া আর কেউ অনুমান করতে পারবে না। বাবাব হাত থেকে আজ নিষ্কৃতি পাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না বাবলু।

ছেলেব লেখাপড়ার বিষয়ে বরাবরই একটু অতিরিক্ত কঠোর আচরণ কবেন সুবেশবাবু। নিবুপমা কিন্তু বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না একটুও। এ, নিয়ে কতদিন বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে তাব ঠিক নেই।

সুবেশবাবু দোষবোপ কবেন স্ত্রীর ওপর—তোমাব অস্কাবায়তই ছেলোটো মানুহ হল না।

নিবুপমাও এক কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন—তোমাব মত কেবল চোরেব মার মাকলেই ছেলে মানুহ হয় না।

—খুব হয়। নিজের মৃতিটাকে বেন জোর কবেই প্রতিষ্ঠিত কবতে চান সুবেশবাবু। —কেবল হয না তোমাব মত মারবেদেব জন্মে...।

এক-একদিন হয়তো শুধু সেই অভিমানেই স্বামীব হাতে ছেলেকে বেদম মাব ক্ষেতে দেখেও জোর কবে নিষ্পৃহ থাকতে চেঁচা করেন নিবুপমা। ছেলেকে লেখাপড়ার একটু অমানোযোগী হতে দেখলেই বাগে কাউজান হাবারে ফেলেন সুবেশবাবু। দীর্ঘদিনক আনন্দ্য হয়ে কাঁপিয়ে পড়েন বাবলুব ওপর। চুলের মৃতি ধরে টানতে টানতে ঘবেব বাইরে নিয়ে আসেন ছেলেকে। ভয়ে আব আতঙ্কে ধরধব কবে কেঁপে চলে বাবলু। কিন্তু সুবেশবাবু সম্পূর্ণ অন্ধেকপহীন। রাগে মরীয়া হয়ে বেপরোয়া মারধোর শুরু করে দেন।

বাবলু আতঁচংকাব কবে উঠতে গিয়েও পরিণামের কথা ভেবে চুপ কনে নির্ভাতনটা সহ্য করার চেঁচা করে। কিন্তু অসহ্য বস্ত্রণাব বুকফাটা অশ্রুট গোষ্ঠানির শব্দটা নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে বাবলুব মুখ দিয়ে। একটা করুণ আতঁনাদে আকাশ-বাতাস ঘন ঘন সচকিত হবে ওঠে। নিবুপমাব বুকটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মূঢ়ে ওঠে বারবার। তবু মুখ টিপে বসে থাকেন ঘবেব মধ্যে। আশ্চর্য উদাসীন থাকবাব চেঁচা করেন। বেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাঁর। মার খেতে খেতে মবে যাক বাবলু। শেষ হয়ে যাক এখনি। তাঁর কী? ছেলে তো তাঁব একার নব। বাবলুব বস্ত্রণাকাতব চিংকারটা শাণিত ছুরির মত হৃদয়টা ছিন্নভিন্ন করে গেল। তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকেন, যা হয় হোক...তবু ওদিকে আজ যাবেন না।

কিন্তু কোন কোনদিন আর সহ্য করতে পারেন না নিবুপমা। শেষ পর্যন্ত নিজের সংকল্পটাই কেমন ঘুলিয়ে ফেলেন। মাব খেতে খেতে কেমন বেহুসের মত মাটিতে মুখ ধুবড়ে পড়ে আছে ছেলোটো তবু যদি এতটুকু কাউজান থাকে মানুহটার। বুকের জ্বলন্ত অঙ্গাবের উত্তাপে বেন দম্ব করে ফেলতে চান স্বামীকে। ছুটে এসে ক্রোধোন্মত্ত সুবেশবাবুব হাতটা আচমকা চেপে ধরে চিংকার করে ওঠেন নিবুপমা—মেরেই ফেল ছেলোটাকে...একবারে শেষ করে দাও...।

বোজ রোজ আধমবাক্যাব চেয়ে...। বলতে বলতে রাগে দৃখে নিজেও বেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন নিবুপমা। দুড়দাড়িয়ে নিজেও ঘা কতক বসিয়ে দেন অচৈতন্য-প্রায় ছেলোটাব দেহে—সবতে পাবিস না হতভাগা কোথাকার। এত লোকের ছেলে মরে...আব তুই বেহায়া বেংচে থাকতে চাস, কোন মুখে...।

নিবুপমাব এই আকস্মিক পরিবর্তনে সুবেশবাবুও বেন হকচকিয়ে ওঠেন। তাবপর নিবুপমাব হাতটা চেপে ধবে চিংকার করে ওঠেন—নিবু...। এ কী কবহ তুমি।

নিদাঘে অভিমানেব অব্যক্ত বেদনায় নিবুপমাব চোখ দুটো ততক্ষণে ঝাপসা হবে ওঠে। সুবেশবাবুর হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে সমস্বরে চিংকাব কবে ওঠেন—সে তুমি বুঝবে না...বুঝে তোমাব কাজ নেই...দোহাই তোমাব, তুমি সবো একটু। সরে যাও সামনে থেকে বলাছি। একটু দম ফেলতে দাও ছেলোটাকে।

নিবুপমাব ভয়ঙ্কর মৃতিটার সামনে বেন আর দাঁড়াতে পাবেন না সুবেশবাবু। বেদনাজ হৃদয়ে সরে বান স্ত্রীর মৃতিটির আড়ালে।

বাবাব সেই ভয়ঙ্কর মৃতিটির কথা ভাবলে এখনো ভয়ে গিয়ে কাটা দিয়ে ওঠে বাবলুর।

কিন্তু নিবুপমা! বিনি চিরদিন বাবাব এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে গভীর মমতায় রক্ষা করে এসেছেন ছেলেকে। স্নেহের

বেঙ্গল কেমিক্যালের

শারফিউমড

তিল তৈল

আয়ুর্বেদমতে কাঁচা তিল তৈল কেবল মস্তিষ্ক ও শরীর শিশু রাখে না - ইহা কেশোদগমের সহায়তা কবে - কেশকে উজ্জ্বল ও মৃৎ রাখে।



সাপ্তাহিক বসুমতী

পরশ বুলিয়ে ওর সব যন্ত্রণা, দু'লিয়ে দিয়েছেন। হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে ওর মৃতপ্রায় চেতনায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন...তারি কাছ থেকেও আজ সব চেয়ে প্রয়োজনের দিনে যে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার পাবে কখনো কী কল্পনাও করতে পেরেছে দাবলু?

মার মৃৎটা মনে পড়তেই বাড়ির জন্যে ভীষণ ছটফট কবে উঠেছিল বাবলুর মন। কী গভীর মমতার ঘেরা সে আশ্রয়টুকু। বিভীষিকার মত বাবার আতঙ্কটাকে শ্লান করে মার মৃৎটা একটা উজ্জ্বল তারার মত জ্বলজ্বল কবছে অশ্রুকাব আকাশের গায়ে। ঘরে বাঁচার সেই 'দুঃস্বপ্ন' মত রাহুগ্রাসের হাত এড়িয়ে ভয়-দুঃস্বপ্ন-বন্ধে বাড়ি-ফিরে এসেছিল বাবলু। এ সময়টা সুরেশ-বাবু বাড়ি থাকেন না। অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়। তাই বাড়ি ফিরে আসতে কোন বাধাও আর পথ আগলে দাঁড়তে পারে নি ওর সামনে।

নিবুপমা আরগেই খবরটা শুনোছিলেন বন্ধুতে পাবে নি বাবলু। অন্যান্যদিন পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে সাগরে খোঁজ নেন। পরীক্ষা সমাপ্তে এটা-সেটা প্রশ্ন করেন। ক্ষুধার্ত ছেলেকে শাওলালার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আজ! বাবলুকে চোরের মত ঘরে ঢুকতে দেখেও না দেখার ভাণ

করলেন নিবুপমা। মুক্কেপহীনভাবে খাটের ওদিকে মৃৎটা বুলিয়ে নিলেন।

ঘরের মধ্যে একটা গুমোট স্তব্ধ আবহাওয়া স্বমে রয়েছে একটুও অনুভব করতে পারে নি বাবলু। বন্ধ আবহাওয়া-টাকে নিজের মনেই অবস্থা ভেবে নিয়েছিল অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে রইল বাবলু। অন্যান্যদিনের মত নিবুপমা আজ ছেলেবেলা কাছ ছুটে এলেন না। মার এই শুদাসীনে অস্বস্তিও লাগছিল বাবলুর। ভয়-আবো কিছূক্ষণ বসে বইল নিজের ঘরে। বসে বসে অবৈধ হয়ে উঠল এবার। উসখুস করতে করতে শেষে এক সমস্ত নিজে এসে দাঁড়াল নিবুপমার কাছে।

কিন্তু ওকে ভীষণ অবাক করে দিলে চাকিতে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলুর গালে সজোবে একটা চড় বসিয়ে দিলেন নিবুপমা—এতটও তোমার শিক্ষা হল না? ...অসভ্য বেহারা ছেলে...আবার চুপি করতে যাওয়া...। রাগে দুঃখে অভিমানের ধরধর করে কেঁপে উঠেছিল নিবুপমার কণ্ঠস্বরটা।

সাতঘণ্টা মর খেয়ে স্তম্ভপায় চিব্বকার করে উঠতে গিয়েও নিবুপমার সজল দুটো চোখের দিকে তাকিয়েই অপরিণামী কিম্বদন্তি হয়ে উঠল বাবলু। এ কী! নিবুপমার চোখে জল! চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় অনেকক্ষণ থেকেই কাদছেন নিবুপমা। সুরেশবাবুর হাতে আলকের এই ঘটনার কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে ভেবে ভেবে নিবুপমাও কম শঙ্কিত হন নি। স্তোমসমস্ত সুরেশবাবুরও সেই ভরস্কর মূর্তিটাকে বাবলুর মত নিবুপমাও কম ভয় পান না। খবরটা শুন্যে পর্যন্ত ভবে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন নিবুপমা। আকাশে বাতাসে যেন একটা আসন্ন দুর্ঘটনার ইশারাত ল্পট হয়ে উঠছে। গভীর আতঙ্কে ধমধম করছে চারিদিক। অস্বস্তিতে সারা দুঃস্বপ্ন ছটফট করেছেন নিবুপমা। অব্যক্ত অভিমানের বেদনায় নিজের মনেই কেঁপে কেঁপে আকুল হয়েছেন।

মার চোখের দিকে অনেকক্ষণ কিম্বদ-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল বাবলু। ভাবপল কী যেন বলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিবুপমার ষেঁও নিঃশব্দিত হয়ে উঠেছিল। আবার ঠাস ঠাস করে ওর দুঃগালে চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—তুমি কিছূ জান না, এই তো? তাই বলবে সে আমিও জানি। লক্ষ্যধোয়াও নেই...আবার সাধু সাজবান চেষ্টা হচ্ছে। বেশ তাই কর। বাবার কাছে সেই চেষ্টাই কর। মার খেয়ে কী করে আজ বাঁচ...দেখব আমি। কিছূ জানি না আমি...কিছূ জানি না...। বলতে বলতে দুঃদাম পা ফেলে রাসাঘরে গিয়ে ঢুকলেন নিবুপমা। তারপর ধালার

খাবার সাজিয়ে দেখে তেমন ককশ গলার আবার ডাকলেন—কই...এস? এবার দয় কর দিলে গিয়ে কৃতার্থ কর আমায়...

কিন্তু সীমাহীন বিস্ময় আর বেদনার বাবলুর হৃদয়টা বৃষ্টি এতক্ষণে পাথর হয়ে উঠেছিল। অশ্রু! ভাবতেই পারে নি বাবলু...মার কাছ থেকেও এমন একটা নির্মম ব্যবহার কোনদিন পেতে পাবে ও। নিষ্ঠুর নিষ্পদের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুঃখে অভিমান অভিভূত হয়ে পড়েছিল বাবলু। বাঁচার শেষ আগ্রহটুকুও এমন নিষ্ঠুর হাতে নিভিয়ে দিতে পারেন নিবুপমা...ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা বৃষ্টি চিরদিনের মত বিকল হয়ে উঠল। একটা কথা উচ্চারণ করার মত ক্ষমতাও বৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল বাবলু। নিবুপমার ডাকটাও আর শুনতে পাচ্ছিল না বাবলু। একটা নিঃসীম শূন্যতাব মধ্যে যেন চারিদিক তাকিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নিবুপমা-নিষ্ঠুর বাতির বুকে অসংখ্য কিরির সুভীক্ষা শিসেব মত একটানা শব্দটা যেন বিভীষিকার-আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে।

নিবুপমা শুধো নিজে মনেই গল্প গল্প কবে যাচ্ছিলেন। ছেলেকে অনেকবার ডেকেও কোন সাড়া না পেয়ে বোম্বের একটু অবাক হয়েই এ করে এসেছিলেন। কিন্তু...ভীষণ একটা আতঙ্কে সেই মৃদুতে বৃষ্টি নিবুপমার বুকেটাও ভয়ে হিম হয়ে উঠেছিল। কোথায় গেল বাবলু। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন নিবুপমা। সচকিত দৃষ্টি বুলিয়ে চারিদিক ভ্রমভ্রম কবে খুঁজেও বাবলুর দেখা না পেয়ে চিব্বকার করে ডেকে চলেছিলেন—বা...বলু...উ...উ...

দূর থেকে নিবুপমার কণ্ঠস্বরটা শুনে আসাছিল বাবলুর কানে। কী করণ আর আতঙ্ক চিব্বকার করে একটানা ডেকে বেড়াচ্ছেন মা...শুন্যে কিছূতেই নিজেকে শিথল রাখতে পারে না বাবলু। কখনো তো ও ডাকে সাড়া না দিয়েও পাবে নি ও।

আজও পারছে না বাবলু। ছুটেতে ছুটেতে পা যেন আপনা থেকেই জড়িয়ে আসে। ফিবে বাবার দুর্নিবার একটা অক্ষরশে কে যেন পেছন থেকে টেনে ধরে ওকে। ভয় যেন কিছূতেই ধামতে পারে না বাবলু। দিকহীন অন্তহীন ক্ষুধা নীলাম্বরের নিচে ছোট্ট কোন ওবিবন্ধ নেই-ওব। একটা ভীষণ আতঙ্ক যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কী ভরস্কর তার রূপ, কী ভীষণ সে আতঙ্ক। তাঁর কুটিল ভয়াল অশ্রুত দুটো ডানা মেলে ঠিক ওর পেছনেই জেড়ে আসছে আতঙ্কটা। একবার নাগালের মধ্যে পেলো...

—না...না...না। নিজের মনেই ভয়ে চিব্বকার কবে ওঠে বাবলু। ধামা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মার ডাকে থেমে যান

রোমাঞ্চ উপভোগের বাসুকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি পুস্তক ৫ ডিটেকটিভ
উপভোগ মূল্য ৩।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপভোগ
মূল্য ৩।০

জাতীয়-কাঁচ রত্নলাল বন্দোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, সুরেশবাবু, কর্মদেবী, কুমার-
সত্ত্ব, নীতিকুমারজাল, কাকী-কাবেরী,
ফিরি জীবনী। ৭খানি একত্রে ২০.০।

ত্রামাকান্ত তর্কপকানন সম্পাদিত

নাড়াজান-প্রদীপিকা

(নাড়ী শূণ্য স্বাস্থ্য রোগ নির্ণয় ও
পরীক্ষা নিবুপণ)
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

প্রলোভনটাকে সভয়ে এড়িয়ে দূরন্ত আবেগে ছুটে চলে বাবলু। ফেরা আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে। কোনদিন নয়...হয়তো আর কোনদিনই ফেরা হবে না ওর।

ছুটে ছুটে দাঁঘিষ পাড়ে পৌঁছে মৃত্যুব ভয়াবহ আতঙ্কটাকে যেন স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে অপরিসীম ভয়ে গারে কাঁটা দিয়ে উঠল বাবলু। রুম্মানিষাসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। শুকনো পাতার বৃকে খসখস আওয়াজ তুলে কোথায়...কত দূরে কে জ্বলন, তাঁরগতি কী যেন একটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভয়ে বৃক শুকিয়ে উঠল বাবলু। দম বন্ধ কবে অন্ধকারের মধ্য অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইল। একটা দমকা হাওয়ায় গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো হঠাৎ দুলে উঠল। পাতার শনশনানি শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল -দূর থেকে দূরবাস্তে। আর সেই শব্দটা, গলাটা ভয়ে কাঠ হয়ে উঠল বাবলু। একটা ভৌতিক আতঙ্ক যেন সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। মৃত্যুর ভয়ের চেয়ে আরো ভীষণ একটা আতঙ্ক যেন নিঃসর ডানা মেলে স্তম্ভ হয়ে রয়েছে চারিদিকে।

সভবে গাছের আড়ালে সবে এসে দাঁড়াল বাবলু। ভয়ে আর আতঙ্কে ওর মাথার স্নায়ুগুলোও যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। বাবার আতঙ্ক-জড়িত মুখখানা মনে করাব চেষ্টা করল বাবলু। মায়ের বিবাদকবুণ মুখখানা বারবার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। অস্বস্তিতে হটকট কবে উঠল আবার। তাই ঘন অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে নিরুপমার মুখটাকে হারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল বাবলু। হাবলুর জন্যেও মনটা বরুণার

ভরে উঠল। কী করছে এখন হাবলু... আর মা।

আবার নিরুপমার মুখটা মনে পড়ে গেল বাবলুর। সেই একই চিন্তা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে মাথায়। সংকল্পটা হারিয়ে ফেলার ভয়েও যেন পেরে বসে ওকে। আবার সভয়ে দাঁঘিষ দিকে তাকায় বাবলু। উঃ... কী গহন কল জল। অভ্যাসত দাঁঘির বৃকেও যেন সে বিভীষিকাটা আশ্চর্য নিকর হয়ে রয়েছে।

চিন্তার অভ্যাসত হাবলুকে খেতে খেতে আরেকটু হলেই বোধহয় দম বন্ধ হয়ে মরে যেত। বাবলু। কতক্ষণ যে বেহুঁস হয়েছিল খেতলাই ছিল না ও। কিন্তু ভীষণ ভয়ে হঠাৎ চমকে উঠল বাবলু। ভয়াবহ অন্ধকারের বৃক চিবে একটা প্রাগৈতিহাসিক বিপদাকার দৈত্য যেন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বোধকর্ষাণিত চোখ দুটো হ্রিস্ত নেকড়ের মত দৃপদপ্ করছে আদিমতম জিঘাংসায়।

ভয়ে হিন হবে এল বাবলুর দেহটা... কব 'মতি' ওটা? ববাব। এত জ্বরে? এমন ভয়ঙ্কর? আবার মায় মুখটাকে মনে করল চেষ্টা করল বাবলু। কিন্তু কোথায় তো আর চোখে পড়ছে না সেই করুণাময়ী মায়ের মুখটা। মায় মুখটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ আতঙ্কটা।

অভিভূতের মত দাঁঘির আবো করছে কয়েক পা এগিয়ে গেল বাবলু। ভেবেছিল আর হস্তত এগিয়ে আসবে না জীবটা। কিন্তু না...এখনো তেমন এগিয়ে আসছে ওটা। রুম্মানিষাসে আরো একটু সরে এল বাবলু। সন্নতে সন্নতে অভ্যাসত দাঁঘির চিখর ভয়াবহ আতঙ্কটাকে যেন আরো স্পষ্ট অনুভব করতে পারল বাবলু। কিসের

একটা সংগাহিনী আকর্ষণে যেন ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ও। ভীষণ ভয়ে বোধহয় প্রাশান্ত চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল বাবলু। ভব হল বোধহয় এখনি দম বন্ধ হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে ও।

তবু সেই ভয়াবহ আতঙ্কটা এক মুহূর্তের জন্যেও এগিয়ে আসা বন্ধ করে নি। সমস্ত পৃথিবীটাই বোধহয় অশান্ত দোলায় ঘন ঘন দুলে উঠেছিল ওর চোখের সামনে। ভয়ে আর আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর বোঝে এতক্ষণে এগিয়ে পড়ল বাবলু।

নিরুপমার স্তম্ভ অতলাস্ত জলবাশিশ বৃকে জমে-থাকা নিদারুণ আতঙ্কটা ব্যক্তি সেই মুহূর্তে খানখান হয়ে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। বাবলু জলের বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আকাশ-বাতাস আচমকা সন্তস্ত-সচকিত হয়ে উঠল নিমেষে। বিকৃত তবৎগন দোলার দোলার সুষ্পষ্ট দাঁঘির বৃক তোলপাড় হয়ে উঠল। আতঙ্কভিত্তি ব্যগ্র হাওয়ার হাওয়ায় সেই ভয়াবহ আতঙ্কটা প্রতিধ্বনিত মত ছড়িয়ে পড়ল দূর হতে দূরবাস্তে।

কিন্তু...সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর চারিদিকের সেই হঠাৎ-জোরে-ওঠা চাপলাটা আবার ধীরে ধীরে নিঃসর হয়ে এল। প্রতিধ্বনিটাও দিকচক্রবালের স্তবে স্তবে কাণ্ড গুঞ্জরণের মত মৃদু আওয়াজ তুলে মিলিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে বিকৃত অশান্ত জলতরংগ-গুলোও আবার আশ্চর্য শান্ত হয়ে এল একসময়।

মাথার ওপর অন্ধ আকাশটার বৃক অগণিত জ্বলন্ত নক্ষত্রসম্মিলিত দৃশ্যভাণে সুমহান কালপদ্যটা কেবল আপন গল্ভব্য পথে পাড়ি দিয়ে চলেছে ধীরে...ধীরে...



আমরা সবাই ভারতীয় ...

কেউ যেন আমাদের মাধ্য

বিভেদ সৃষ্টি করাত না পারে

DA Ganga
Bengali



হুসৈন্দবিশ্বাসের রক্ষিত রায়

পূর্ব-প্রকাশিত

কিরণচন্দ্র মুনোজ্জী :

বাংলাদেশের সমগ্র বিপ্লবী-সত্তা যে কতিপয় মানুষের জীবনকে আবৃত করে রেখেছে তাদের অন্যতম কিরণচন্দ্র মুনোজ্জী। শত্রু থেকে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক-আবেগকে একই সুরে ও ছন্দে স্থায়ী অস্তিত্বে ধারণ করে বাখার বৈশিষ্ট্য কিরণবাবুর জীবনে লক্ষ্য করা বস্তু। প্রথম কৈশোরে যে রত তিনি তখনমূলের সংকল্প নিয়ে গ্রহণ করে-ছিলো, চূড়ান্ত বৎসরের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) সে-রতকে তিনি পবন নিষ্ঠুর লালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু আপন ধ্যানেব অন্তহীনতায় বেন আত্মবিলয়ন। তাঁর মৃত্যু অন্তহীন-জীবনের সঙ্গে নিখুঁত মিতালি। যে 'শব্দ' চূড়ান্ত বৎসর মূখর হয়ে ছিল, সে শব্দ নির্বাক-তরণাদোলায় অনন্ত অস্তিত্ব আজ বহমান। যে আলোক-শিখা চূড়ান্ত বৎসব বাংলাব শ্রুতসম্প্রদায়কে পথবর্তিকা-হরে পথ দেখাতো, সে আলোক-শিখা অদৃশ্য ডেউ হয়ে দেখাকাল ব্যাপ্তি আজ বর্তমান। মৃত্যুহীন এই পূর্ববর্তাই প্রতিক্রমে আমাদের কাছেও জীবন্ত হয়ে আছেন। তাঁর কণ্ঠ কানে শুন। স্পর্শ অনুভব কর। কলোজ স্কোয়াবের দিকে গেলে অনেক সময় মনে হয়, ঐ চির-চেনা পদধ্বনি বুঝি কাছে এসে ধামল। পরম মেহের 'সম্বোধন' বুঝি এখনই উচ্চারিত হবে। কিন্তু তখনহুতেই ভেবে নিতে হবে যে, কিরণবাবু তো দশ-এগার বছর হল দেহত্যাগ করেছেন। হাঁ, কিরণবাবুর মৃত্যু-তারিখ হল ১৯৫৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর। তবু মনে হয়-মৃত্যু তাঁর হয় নি।

কিরণচন্দ্র মুনোজ্জীর সম্পর্কে প্রথম-কারের-কল্পিত অভিজ্ঞতার কথা এখানে ব্যক্ত করা হবে।

“১৯২৫ সনের এক অপরাহ্ন। বোম্ব হর প্রাবণ দ্রাস। আমি, বেণু-আপিসে বসে শাজ করছি। বেণু-আপিস তখন ৯০।১।এক বৈঠকখানা রোডে। হঠাৎ দেখি এক প্রণীণ ব্যক্তি ঘরে এসে উপস্থিত — হাতে মোটা লাঠি, পায়ে কোম্বসের সাদা জুতা, জামাকাপড় সাধারণ কিন্তু ধোপাধবস্ত, চলল একটু ঝড়িয়ে...বুকের পকেট থেকে একটি ট্যাকি-ঘড়ি বের করে-পুনরায় রাখাখানে তা' রেখে তিনি বললেন : পনের মিনিট বসব।

“আমাকে কথা বলার অবকাশ না দিয়েই তিনি শুরুর বললেন : খুব ভাল কাজে হাত দিয়েছিস। আমাদের কথা অপরকে শুনায়ত হবে। শ্রুতি কি কানে-কানে মস্ত দিবে আর পারা বাব?

“আমি ভুলোককে চাক্ষুষ চিনি না। নাম শুনে অবশ্য চিনে ফেললাম। কিন্তু গারে পড়ে একেবারে 'তুই' সম্বোধনে একান্ত প্রিয়জনের মত অমন করে কথা বসতে দেখে বিস্ময়ে চেয়ে বইলাম। পনের মিনিট আলাপেই মনে হল, এ মানুষটি বেন আমার বিগত জন্মের চেনা — কেবল এ-জীবনের কটা বৎসরের ব্যবধানে তাঁকে ভুলে ছিলাম!... কটায়-কটায় পনের মিনিট পার হ'তই মথুরে হাসি হেসে গভীর মেহে আমার গায়েমাথার হাত বুলায়ে তিনি চলে গেলেন।...

“এবংব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসব জেলে ও জেলেব বাইরে-কিরণদার সান্নিধ্য বহুরূপে বহুক্ষেত্র-পরেছি। কিন্তু পনের মিনিটের কিরণদা-র

প্রাচুর্যকে কোন কেবলব পরিচয়ই ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। মনে হতো সর্বের আলোকে যেমন অন্তহীন বিভা, সমুদ্রের কল্লোলে যেমন বিরামহীন গুঞ্জন, হিমালয়ের শিখরদেশে যেমন অক্ষরন্ত শোভা — কিরণদার জীবন-সভারও তেমন সীমাতীত প্রাণধারা। কাজেই কিরণদা পুরাতন হবার মত নন। কিরণদার প্রতিমূহুর্তেব অস্তিত্বই একটি পরম সাধনার বহু বিকাশ। তাঁর কাছে একই কথা বারবারে শ্রুতও কোনদিন প্রাপ্ত হই নি। প্রথম দর্শনের পনের মিনিটের মানুষটিকেই তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গত ২৮ বৎসব অবধি দেখে এসেছি — কিন্তু ঐ প্রথম-দেখা সর্বের মতই তাঁর অস্তিত্ব চিরদিন আমার কাছে ছিল অলান, সমুদ্র-কল্লোলেব মত গুঞ্জরিত, পর্বতশিখরের মত শোভান্বিত।...

“১৯০০ সালে চট্টগ্রাম-অস্তাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবীদের মন তখন দুর্গম পথের আহ্বানে চঞ্চল। একদিন সন্ধ্যায় কিরণদা আমাকে বেণু-আপিসে সংবাদ পাঠালেন জনতিবলসেব তাঁর সঙ্গ দোষা করবার জন্যে। তাঁর আঙা ছিল তখন সিন্ধাপুরে স্ট্রীটেব ৭১নং বাড়িতে। তেতলার একটি ঘরে কিরণদা বসে আছেন। আমি যেতেই তিনি বললেন : তোমার, ভাই, একদৃশি চন্দননগরে যেতে হবে। গণেশ ঘোষ সেখানে এক শেল্টারে আছেন। সেখানে তাঁর আর থাকা হবে না। তুমি আমার দেওয়া ঠিকানার গেলেই গণেশের খোঁজ পাবে। এবং কিছুমাত্র কিশ্ব না করে তাঁকে কলকাতার নিয়ে এসে আজ রাতটা বেণু-আপিসেই তাঁকে রেখে

দিলো। কাল খুব সকালেই তাঁর নিরাপদ ফ্ল্যাটেরে বসে আঁশ করবো।...

“প্রথম দিনের পানের মিনিটে-র পরিচয়ে কিরণদা আমার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন অনাড়ম্বর, পূর্বজন্মের পরিচয়ের মত। সেদিন-ও তিনি আমাকে এই গুরুতর কর্মভার দিলেন বিনা ভূমিকায় এবং অনেক-জানিতের মত। আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে তাঁর গুপ্ত-কার্যকলাপ সম্পর্কিত সরাসরি কোন যোগাযোগ ঘটে নি। তা ছাড়া আমরা বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির লোক। কিন্তু এই মানুষটি তাঁর কর্ম-সাধনার এক দিবা লগ্নে আমাকে জড়িত সহজে স্মরণ করে বসলেন!...

“প্রত্যেকের সংগেই আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কিরণদার রসিকতার দিকটাই বেশ প্রকাশ থাকতো। কিন্তু ঐ রসালো কীর্তি-কীর্তি তিনি যে-কোন মানুষের মন বুঝে নিতেন এবং তাকে দিয়েই কাজ হাসিল করার পথ খুঁজতেন।...

“এ-মানুষটির দেহ ‘রেজাল্‌ প্যারালাই-সিস্’-এর আক্রমণে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অমানবিক সৈম ও মনোবলে নিজের পঙ্গু-দেহটাকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি সবলে টেনে চলেছেন। তাঁর মত সচল ব্যক্তি ভরুণদের মধ্যেও কম ছিল। ঘড়ির কাঁটার-ফাঁটর তাঁর নিশিদিনের কর্মব্যস্তা চলেত। পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরি-মিত।... রুচি কথাও অপূর্ব মাধুর্যে অথচ ভীকৃত্যের বলবার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল তাঁর আস্তে। মেহ, ভালবাসা, সংযম, তীক্ষ্ণতা, সাহস, আদর্শনিয়োগ এত প্রচুর ছিল এই মানুষটির যে, শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ ও প্রবীণ-প্রত্যেকেই তাঁকে প্রিয়তম অগ্রজের মতই দেখত। যে-কোন দলনির্বাণে প্রত্যেক বিপ্লবী শূন্য নর, রাজনীতির আওতার পড়ে না এমন তরুণদলও কিরণদার দুলভ স্নেহ ও শাসন লাভ করে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে গেছে।...

“কিরণদা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র। ক্ষুদ্রকথা উপেক্ষা করে বিশাল বটের মতই অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে তিনি নিজের অজস্র স্নেহপল্লবে তাঁর অগাধিত গুরুমুখ্যদিগকে নীড় বঁধিত দিয়েছিলেন। সেই সুস্থ-নীড়গুলো আজ বৃক্ষচূড়। বরা নীড় রচনা করেছিলেন, তাঁরা অর্থশতাকার ইতিহাসে এমন-একটি শাখাপত্রের আশ্রয়স্থল আর খুঁজে পান নি। বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে কিরণদা তাই অনন্য। এ সূত্রে তাঁর বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না।...

“কিরণদার আদর্শবোধ ও আদর্শপ্রয়োগের মধ্যে বিশদ মাত্র ফাঁক ছিল না। তাঁর জীবন-দর্শন, কর্ম, ব্যক্তিক-চলারের ও কথার মধ্যে এতটুকু অসামঞ্জস্য বাক্য করা সম্ভব নয়। কাজেই গোটা মানুষ হিসেবে কিরণদা অপূর্ব।... কিরণদার আদর্শ ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন

করার জন্যে দল গঠন করা। সেই-দল গড়তে হলে জনসাধারণের মন কেড়ে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণের মন পেতে হলে রোগেশোকে তাদের কাছে বাওয়া চাই এবং তা করতে হলে ‘হামিওপ্যাথি ওষুধ’ বিতরণ করা প্রশস্ত। ‘পলিসি’ হিসেবে ঔষধ বিতরণের ব্রত কিরণদা একদিন গ্রহণ করেছিলেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে-ও তাকে দেখেছি বস্তিগুলোয় ঘরে-ঘরে গিয়ে দুঃখী-দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করতে। যা একদিন ছিল ‘পলিসি’, তা-ই হল কর্ম, তা-ই হল ধর্ম! এইরূপ ছোটবড় সকল কাজকে-ই আদর্শনিয়োগ করবার ভাগিদে ‘পলিসি’রূপে প্রথমটির তিনি গ্রহণ করলে-ও ক্রমশ তা কর্মের স্তর পার হয়ে হয়ে নিজস্ব ধর্মে পরিণত হত।

“এ-মানুষটির প্রতি রক্ত-তাই আদর্শের



কিরণচন্দ্র মুখার্জী

মহিমায় উজ্জ্বল ছিল, কর্মের প্রবণতায় গতিশীল, উপলব্ধির স্পর্শে আনন্দময় ছিল। সে-জন্যই এ মহৎ পূর্ববের কাছে একই কালে বাঙালীর তিনটি ‘পূর্ব’ বা ‘ধাপ’ সমান রেহ পেয়ে গেছে। পিতা-পুত্র-পৌত্র অর্থাৎ প্রবীণ-তরুণ-বালক — এই তিনটি ধাপের মানুষই কিরণ মুখার্জীর মধ্যে সেই ‘দাদা’-কে লাভ করেছিল, যে-দাদা একাধারে শিশুর মত সরল, তরুণের মত তেজস্বী, প্রৌঢ়ের মত প্রাজ্ঞ। তাই ছোটবড় সবার-ই ছিলেন তিনি বন্ধু এবং পথ ও মনের দিশারী।...

“পুলিশের ছোটবড় কর্তারা এই ক্ষীণ-দেহী ছোট মানুষটিকে চিরকাল ভয় করে

এসেছে। কারণ তাঁর কঠিন ও যত্নের সত্তা-ভাবের সম্মুখীন হবার সাহস তাদের মধ্যে ছিল না।...

“যুগান্তর-প্রবর্তকদের অন্যতম হলেন কিরণদা। শূন্যে, তিনি বিপ্লবের মস্ত গ্রহণ করেন দেবরত বসুর কাছ থেকে। কিরণদার জীবন সুদীর্ঘ। সেই সুদীর্ঘ জীবনে বহু ও ক্ষুদ্র কর্মপ্রচেষ্টা প্রচুর। সেসব বেগবিন-কর্মের ইতিহাস নিশ্চয়ই দুঃসাহসে ও চরিত্র-বলে সুন্দর। ১৯০৪ সাল থেকে যার বিপ্লবী-জীবন শুরু হয়ে পলায়ন-কালকাল পূর্ব দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তাঁর ঘটনা-বহুল জীবনের ইতিহাস লেখার যোগ্যতর ব্যক্তি নিশ্চয় আছেন। কিন্তু যে-মানুষটি তাঁর কর্মের চেয়ে-ও বড়, তাঁর স্বপ্ন হতে-ও সুন্দর, তাঁর আদর্শ থেকেও আকর্ষণীয়—তাকে যে যেমনটি দেখেছে, সে তেমনটি করেই প্রকাশ করবে। তাই এ লেখাটি-ও ‘অনিতি-হাসিক’ নয়।...

“কিরণদা সম্পর্কে অনেকের ধারণা, তিনি ‘প্রাচীনপন্থী’ ও ‘রক্ষণশীল’। কথাটা সত্য আবার কথাটা ঠিক নয়। তাঁর আদর্শ ছিল স্থির, সেই আদর্শে পৌঁছবার পথ-ও তাঁর জানা ছিল। পথ-চলার কতগুলো নীতি ও রীতি তিনি আন্তরিক প্রত্যয় দিয়ে স্থির করেছিলেন। এবং সেসব রীতিনীতি সম্পর্কে কোন আপোষ-মীমাংসা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ, প্রতিক্ষেপেই তাঁর একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান ছিল লক্ষ্যে পৌঁছবার। এ হিসেবে তাকে রক্ষণশীল বা প্রাচীনপন্থী বলে তাঁরা-ই স্থির করবেন, বরা তাঁর আদর্শ-প্রীতি এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার একাগ্রতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন।

“কিরণদা তাঁর প্রথম যৌবনে গৃহভ্রম করেছিলেন। দেশভ্রমণের আকর্ষণে তিনি নিজের জননীর কোল ছেড়ে তিনি যাত্রী হলেন দুর্গমের পথে। এর পর বে-গৃহ ছেড়ে এসেছেন সে-গৃহে তিনি আর ফিরে যান নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষুদ্র সংসারের আবর্ত এবং নারীজাতির সংস্পর্শ বহুতর ঘরে তাকে পৌঁছতে দেবে না। তাই চির-জীবন তিনি সংসার-আত্মীয়-নারীসমাজকে বহু দূরে রেখে পথ চলেছেন। তাঁর জীবনে স্বীকৃত হয়েছিল একমাত্র ‘দেশমাতৃকা’র স্থান। এই ‘দেশমাতৃকা’ বলতে তিনি বুঝতেন ভারত-বর্ষকে। ভারতবর্ষ বলতে তিনি বুঝতেন লালিত মানবগোষ্ঠী এবং তাঁর বর্ষাধী মুখের সংগ্রামকে। এই যৌব থেকেই তিনি ছিলেন অজস্র সংগ্রামী। সংগ্রামী কিরণচন্দ্র তাই অবিচল নিষ্ঠা ও কর্মশক্তি অর্জন করেছিলেন তাঁর পাথরেরূপে। তিনি মনে করতেন তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মশক্তির পরিপন্থী হল ক্ষুদ্রতর সংসারের মায়া এবং নারীজাতির আকর্ষণ। কাজেই নিজের বিশ্বাস মত নিজেকে শক্তিদান রাখার সাধনার তিনি সংসারের দিকে তাকান

নি, নারীর দিকে-ও চোখ ফেরান নি। কিন্তু একদিনে আমরা যদি মনে করি যে, কিরপদারী সংস্কারকে দৃষ্টা করতেন, নারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তবে ভুল করব। আর আসনে দেশমাতাকে যিনি বসালেন, ক্ষুদ্র-সংসারের স্থানে বহুতর সংসারের কল্যাণার্থে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করে গেলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত কর্মময়ী হলেন 'ভাল'-র বিনিময়ে 'আরো ভালো'-কে পাবার সাধনায়।...

"কিরপদাকে বুঝতে হবে 'আদর্শ' ও উদ্দেশ্যের প্রতি তার সত্য রক্ষার দিক থেকে। তার আদর্শ ছিল দেশের মঙ্গল। তার উদ্দেশ্য ছিল দেশকে সর্বতোভাবে মুক্ত করার সংকল্পে জীবন-ব্যাপী শক্তিসম্পন্ন করা। এ উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছিল। মৃত্যুক্ণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অটুট শক্তির অধিকারী, আপোষ-হীন-সংগ্রামী নিন্দার সন্দের। শেষ-জীবনে প্রিয়তম বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার তিনি নিজের ব্যক্তিগত-চলার পথ-ও নতুন করে বেছে নিয়েছিলেন। ইহা তার অনন্য-সাধারণ আদর্শ-প্রতি ও অনমনীয় শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। মতবিরোধিতা থাকলেও কারো সঙ্গে তার 'মনান্তর' হত না। এক্ষেত্রেও প্রিয়তম বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলেও তাঁদের সঙ্গে তার 'মনান্তর' ঘটবার আকাঙ্ক্ষা হয় নি।...

"নিজের সংসার না থাকলে-ও সংসারী-মানুষদেরকে নিয়েই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কারবার। কাজেই সংসারবিশেষী তাকে কি করে বলা চলে? কোন 'বন্ধু' বিবেক করে এ তিনি সত্য চাইতেন না—ভর, বন্ধুটির দুঃখ পথযাত্রা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু বহু কর্মী ও বন্ধু তাঁর ছিলেন যারা বিবাহিত অথচ তাঁরই মত আদর্শের জন্যে মৃত্যুপথযাত্রী। কই, মৃত্যুতর জেনে-ও তো তিনি তাঁদেরকে সন্মান বা স্নেহ কম করতেন না? বরঞ্চ কলতেন যে, ওরা তো শক্তমান, ওঁদের পক্ষে যা সম্ভব তা কি সবার পক্ষে সম্ভব হতে পারে?... "

"তার দৃষ্টি ছিল মৃত্তির সম্মানে একান্ত নিবদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তথাকথিত প্রকণশীলতা-র কঠিন-বেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ না রাখলে পিচ্ছিল-পথের যাত্রা সফল হতে না-ও পারে। কিন্তু যারা তাঁর নীতি অতিক্রম করে-ও তাঁর কর্মপথের যাত্রী হতে পারতেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনকালেই স্নেহ বা মতের বিরোধ দেখি নি।

"কিরপদা বলতেন—'যা' প্রিয় তা-ই তো প্রেরণার জন্যে বলি দিতে হবে। তাই তিনি আমার মমতা থেকে দূরে এসে বহুতর মায়ার আবদ্ধ হলেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আমার প্রতি ভালবাসা বা প্রীতি তাঁর কিছন্নত কম ছিল।...

"কতগুলো নিয়মনিষ্ঠার নিজেকে শক্তমান করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই কতক ব্যাপারে কিরপদার মত অকপট উদার-মতাবলম্বীও কম

দেখা যায়। প্রাকপশ্চিমের বংশে জন্মগ্রহণ করেও সেই ১৯০৫ সালেই কিরপদা বুদ্ধ-ছিলেন যে, মানুষ এক, জাতিভেদ বা বর্ণভেদ মিথ্যে। শ্রীটি বিপ্লবীর মত তাই তিনি সে-দিনই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক বাদ্যী—'এক জাতি, এক বর্ণ, এক মানুষ, এক সভ্য।' জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি প্রত্যেককে বুদ্ধে টেনে নিতে জানতেন বলেই ওঁদাদের মহিমায় তিনি ছিলেন চির-আনন্দ-ময়।... বিপ্লবীদের বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে কঠিন মন-কথাকথির দৃশ্যসময়-ও তাঁকে দেখেছি নিরবিকার। কোন দলের কোন মানুষই কোন ক্ষণে তাঁকে পর ভাবতে পারে নি।...

"ভগবানে অটুট বিশ্বাস তাঁর যে-পরিমাণে ছিল, ঠিক সম-পরিমাণেই তিনি ছিলেন সর্ব-বিধ কুসংস্কারবিরোধী। কাজেই দূর থেকে কেউ যদি তাঁকে 'নাস্তিক' বলে আখ্যা দেয় তাতে-ও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যারা তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁরা জানেন যে, নাম-বর্ণ-লোভ ও প্রচারের প্রতি বাঁতরাগ এই মানুষটি ছিলেন কত উদার, কত মহৎ এবং কি মজার ভগবাবিশ্বাসী। এ-জনেই কর্ম-চঞ্চল আপনভোলা এই পুরুষের সামিথ্য গত পঞ্চাশ বৎসরকাল বয়েসে সকল দলের সকল কর্মীর কাছেই ছিল মধ্যম।...

"কিরপদার মধ্যে একটি শিল্পী-মন বেঁচে ছিল। সে 'শিল্পী-মন' ছিল রঙ্গের সাধক। কিরপদার বাসকে রচিত বিন্যাস দেখেছি নানা তরুণ-শিল্পীর রেখাঙ্কনে। কিরপদা বেছে বেছে শিল্পী যুগে বার করতেন, যারা তাঁর শিল্পী-মনের চাহিদা মতই শিল্পসৃষ্টি করে যেতেন। কাজেই কিরপদার কাছাকাছি সে-সব চিত্র-ই থাকতো, যা অক্ষর বাঁধের রমা রূপ-রচনা।"...

অটুট কান্তশক্তির পূজারী, কঠোরতপা এই মহাকায় এবং আজন্ম বিপ্লবী তাই মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'তারুণ্যধর্ম' রক্ষা করে গেছেন। এই মহান 'তারুণ্য'কে বিস্মৃত হওয়া বাঙালীর পক্ষে উচিত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে আজ বাংলার চতুর্দশম আদর্শবাদ অবলুপ্ত, আদর্শবাদীর আসন শূন্য। কিন্তু সে-দৃষ্টি সত্য কি? কিরপদাব্যুর মত মানুষ বলবেন—তা সত্য নয়, 'আদর্শবাদ' অজের, 'আদর্শবাদী' মৃত্যুহীন। মনে হয় কিরপদাব্যুর মত মহানদের বিশ্বাস-ই সত্য। নইলে দূর্ঘ্যেগের পর পরিশালত-পরিবেশ আসে কেন? রাতির অন্ধকারের পর অরুণোদয় হয় কেন?

মদনমোহন ভৌমিক :

আদর্শের জন্যে যারা আত্মদান করেন, যারা ফাঁসির মস্তক এবং গুলীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। কিন্তু অজ্ঞ

প্রয়োজন হয় করে আত্মবিশ্বাস নিজের আদর্শ অক্ষত রেখে ফাঁসি বা গুলীর জন্যে তৈয়ের থেকেও যারা তেমন মৃত্যু লাভ করার সুযোগ না-পেরে স্বাভাবিক মৃত্যুকেই আদর্শ সৈনিকের মত গ্রহণ করলেন, তাঁরা কি 'মৃত্যুঞ্জয়ী' নন? তাঁদেরকে 'শহীদ' আখ্যা দেওয়া কি ভুল? নির্ভীকচিত্তে আত্মত্যাগে-বা-আদর্শের জন্যে তিলে-তিলে জীবনদান করলেন তাঁকে 'শহীদ' বলার আপত্তি না থাকলে মদনমোহন ভৌমিক-ও একজন মৃত্যুঞ্জয় বা শহীদ।...

মদনমোহন ভৌমিকের জন্মকাল হবে আজ থেকে ৮০ বৎসর পূর্বে। ১৯০৫ সনে তিনি তরুণ। স্বদেশী-আন্দোলনের কর্মস্রোতে তিনি ভেসে চললেন। ১৯০৫ সনেরই কোনো এক লগ্নে 'অনুশীলন সমিতি'-র মাধ্যমে দেশ-মাতৃকার পদধ্যানে তিনি জীবনমন সমর্পণ করেছিলেন। তারপর শূন্য হয়েছিল তাঁর কর্মকাণ্ড, যেমন শূন্য হয়েছিল তাঁরই মত অনন্যসাধারণ আরো কিশোর ও তরুণদের কর্মযাত্রা মহান বিপ্লবী পুলিন দাসের নেতৃত্বে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র আহ্বানে।...

মদনবাবু সম্পর্কে প্রমথকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা তুলে দেওয়া হচ্ছে :—

"মদনবাবু কোন এক নিভৃতলগ্নে সবার অলক্ষ্যে বিপ্লবের 'দীক্ষা' গ্রহণ করেছিলেন জানি নে। তবে আমাদের বালক-কাল থেকেই তাঁকে দেখে এসেছি বিপ্লবের সাগর হোজ-রূপে।

"মদনবাবুর পরিবারটি আমাদের পরি-বারের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাঁর পিতা কৈলাসচন্দ্র ভৌমিককে আজও আমাদের মনে আছে। অমন স্বাস্থ্যশালীন শক্তিশালী বিরাট পুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। তাঁর কোলপিঠে চড়ে কেটেছে আমাদের ভাইবোনের শিশুকাল। এই শক্তমান বৃদ্ধের স্নেহধারার স্নাত আমাদের মন আজও তাকে তুলতে পারে নি। শৈশবের অনেকগুলি সন্ধ্যায় এই 'ভুইঞাদাদার' কাছে কত যে গল্প আমি ও আমার ছোট বোন (উর্মিলা দেবী) শুনতাম তার হিসেব ছিল না। তিনি ছিলেন আগের দিনের জবরদস্ত 'নায়েক' আমাদের প্রপিতামহের আমল থেকে।... মদন-বাবুর স্বগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা উমেশবাবু ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির মিষ্ট মানুষ। তাঁকে স্নিগ্ধ ও বহু কথা আমাদের মনে পড়ে। শিশু বয়স থেকেই মদনবাবুকে জেনে এসেছি। তাঁদের নির্বিরোধী পরিবারে মদনবাবুকে মনে হত একটি ব্যতিক্রম। আমার অজ্ঞাতে আমার একান্ত শৈশবেই মদনবাবুকে আমি তাঁর ঐ বিশিষ্টতার জন্যে ভালবেসেছিলাম।

"১৯১৩ সালের দিকে একদিন দেখি মদনবাবুকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে পুলিশ কোথেকে যেন! আজও স্পষ্ট মনে পড়ে মদনবাবুর সেই চেহারা—হাতে হাতকড়া, কোমরে মোটা দাঁড়ি বাঁধা গায়ে কমলারঙের

একটি পশ্চিম আলোয়ান; পল্লিশ তাঁকে নিয়ে এসেছে ঢাকা গোয়ালনগরের বাসায়। এ বাসায় ছেলে পড়িয়ে তিনি থাকতেন এবং তাঁর-বাজার 'জাতীয় মেডিক্যাল স্কুলে' পড়তেন। সে-বৎসর ছিল তাঁর 'ফাইনাল ইয়ার'। যেখানেই হোক তাঁকে ধরা হয়েছিল; তৎপর তাঁর বাস-স্থান সার্চ করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে সেদিন সেখানে আনা হয়েছিল। ও-সময় আমাদের বাসা-ও ছিল গোয়ালনগরেই, মদনবাবুর হাওদের বাসার খুব কাছে। তাঁর ছাত্র দু'টির পিতার নাম ছিল রজনী চক্রবর্তী। বড়ই ভাল-মানুষ ছিলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। বাড়িতে পল্লিশ আসায় এবং 'দেবভূমি' মা-টার-কে (গৃহকর্তার উক্তি) কোমরে দড়ি বেঁধে ও হাতকড়া পরিয়ে সহসা গৃহে এনে তাঁর ঘর লুণ্ঠন করায় তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন! আমার মনে পড়ে, ঘণ্টা দুই-এর মধ্যে পল্লিশ তাদের কাজকর্ম সেরে বন্দীকে নিয়ে চলে গেলে পর শব্দ রজনীবাবুর গৃহ-ই নয়, সমস্ত পাড়া-ই যেন শোকে মুহূর্তমান হয়ে গেল। শব্দ রজনীবাবু ও তাঁর গৃহিণীর চোখ শুকনো গেল না।...

“এর পর মদনবাবুর বিরুদ্ধে কোন মামলা সাজানর চেষ্টা চলল। তাঁকে প্রায়ই কোর্টে আনা হত হাকিমের কাছে উপস্থিত করার জন্যে বা অন্য কোন কারণে। কোর্টের পাশেই ছিল কোর্ট-হাউজ—বারান্দা নিয়ে একখানা ঘর। বন্দীরা ওখানে কোর্টের সময়টা থাকতেন। স্কুলের টিফনের সময় আমরা ঐ হাউজের কিছু দূরে রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম—উদ্দেশ্য, আমাদের ঐ প্রিয়জনটিকে বারোবারে বিস্ফারিত-চোখে দেখে নেওয়া।...

“অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পল্লিশ মামলা ভুলে নিল প্রমাণভাবে। মদনবাবু মৃত্তি পেলেন বন্দনদশা থেকে। তারপর তিনি আত্মগোপন করলেন। ১৯১৪ সালে অসুস্থ অবস্থায় পলাতক মদনমোহন গ্রেপ্তার হন কলকাতার, মেডিক্যাল কলেজের কাছে একটি গৃহে। দুই নম্বর বরিশাল-যডবন্দ-মামলার আসামীরূপে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তিনি দশ বৎসর স্বাধীনতারবাসের দণ্ড লাভ করেন।...

কিন্তু এসব তো হলো ইতিহাসের কথা। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলতে গেলে ঐ সেদিনটির কথাই বলতে হয় যেদিন তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে পাড়ায় নিয়ে এসেছিল অসভ্য পল্লিশগুলো।... পরম বেদনায় সেদিন মদনবাবুকে দেখেছিলাম। আমাদের একান্ত প্রিয় ঐ স্বজনটিকে কেন্ অপরাধে পল্লিশ বেঁধে এনেছে তা তেমন ভাল করে না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম যে, ঐ মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই শক্তি, যাতে ছাড়িয়ে আছে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ ও গৌরব। এ-শক্তির আকর্ষণ দুর্দমনীয়।... ‘অবদেশী’ এবং ‘পল্লিশ’ সম্পর্কে কিছু

ধারণা শিশু-বয়সেই আমাদের হয়। কারণ আমাদের ঐ গোয়ালনগরের বাসায়ই বছর তিনেক পূর্বে একটা পল্লিশকে দীর্ঘকাল ধরে রাতদিন পাহারা দেবার জন্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। সে-পল্লিশ আমার বাবার গতিবিধি লক্ষ্য করত এবং তিনি যেখানেই যেতেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে যেতো।...

“যা হোক, সে-সময় এবং আরো বহু সময়ে আমার মার কাছে শব্দবসে একান্ত নিভতে মদনবাবুদের মত বিদ্রোহীদের কথা, জেলখানার কথা, দেশপ্রেমী নেতাদের কথা



মদনমোহন ভৌমিক

গল্পের ছাল শানে শানে ‘স্বদেশীদেরকে ঘিরে আমার একটি স্বপ্নরাজ্য গড়ে ফেলে-ছিলাম।...

“শুনিয়েছিলাম দীর্ঘ দশ বৎসরের কারা-দণ্ড নিয়ে ‘আন্দামান সেলুলার জেলে’ মদন ভৌমিক অসহ্য নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছেন। কালেভদ্রে তাঁর পিতার কাছে কয়েদী-পত্নীর পত্র আসতো—মার কাছে শুনতাম।...

“তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। মদনবাবু

যখন কয়েদকাল কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন, তখন আমি যুবক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তৎকালের সেই দিনগুলি মস্তুর-কালের প্রচণ্ড বিপ্লবকোডের অবিস্মরণীয় কর্মচঞ্চলতার পূর্বসূরী। তখন সারা বাংলায় নতুন করে বিপ্লব-সূচনার পত্তন ছাটছে। মদনবাবুর সঙ্গে আমার সেকালের যোগাযোগ, সতীর্থের যোগাযোগ। তিনি জনশ্রুতীন সমিতির নেতৃস্থানীয়দের একজন, আমি অপর একটি বিপ্লবীদের তরুণ এক কর্মী। কিন্তু তাঁর ও আমার মধ্যে যে যোগসেতু বিরাজিত ছিল, তা পরস্পর আমরা চির দলের লোক হলেও চিরদিনই তাঁর সমতার এবং আমার প্রাধার ছিল অনন্যমধুর।...

“১৯৫৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর মদনবাবুর একখানা চিঠি আমার কাছে তাঁর গ্রামের বাড়ি (ডুমুরি, ঢাকা) থেকে যখন আসে তখন ভুলেও ভাবি নি যে, ঐ চিঠির অন্তরালে, মদনবাবুর ও অজ্ঞাতে রয়েছে সেই সাবধান-বাণী :

‘আর বিলম্ব কোরো না গো

ঐ যে নেভে বাতি,

দুয়ারে মোর নিশীথিনী

রয়েছে কান পাতি’

“‘বিলম্ব’ হয় নি। কেউ বুঝতে পারে নি। এর অববাহিত পরেই মৃত্যু-নিশীথিনী তাঁর জীবন-দীপ নিভিয়ে দিল।”...

মদনবাবুর মত নিতীক, নিরলস, আদর্শ-নিষ্ঠ ব্যক্তি বিপ্লবীদের মধ্যেও অগণিত নয়। তাঁর চরিত্র আদর্শরক্ষার কোন ক্ষেত্রে স্তান হয় নি। অমন দৃঢ়চিত্ত মানুষ বিরললভ্য। কিন্তু তার চেয়েও বিরললভ্য ঐ দৃঢ়তার মধ্যে সমিষ্ট নিটোল একখানি মাধুর্য। মদন-বাবুর ওষ্ঠের স্মিত-হাসি তাঁকে সকলের বন্দু করে তুলতো। ঐ হাসিটুকু ছাড়া তাঁকে কেহ বড় একটা দেখে নি।...

জীবনে নিজস্ব সাধ বা সমাপ্তি সম্পন্ন করার কথা তিনি শেখেন নি। সম্মান, স্বা, আত্মপ্রচার তাঁর স্বারে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। সারা জীবন বিপ্লবের কাজে, সংগঠনের কাজে, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন ঐ মানুষটি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি চলে গেলেন তাঁর নগণ্য গ্রামে, শহর থেকে বহু দূরে। কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন ক্ষুদ্র সেই পরিবেশে। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গ্রামের ও পরগনার হিন্দুদেরকে অতন্ত সাহসে ও শৌর্বে উৎসাহিত করে স্বদেশে রেখে দেবেন। ‘উৎসাহ’ হবার দৃষ্টি থেকে তাঁদের রক্ষা করবেন।...হয়েছিলও তাই। মদন ভৌমিকের সাহসে সাহসী হয়ে ডুমুরির প্রত্যেকে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলোর অনেকে নিতেন্দ্র জন্মভূমির মায়া তৎকালে ত্যাগ করে যি... মদনমোহন রাজনীতি থেকে অবসর নি

নিজের গ্রামকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কখন? যখন হাজার হাজার মানুষ দেশত্যাগী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছোট্ট আসছে ভাঙনি এই জরি গ্রাম জেলার অগ্ন্যাত এই ভূমি-গ্রামে, তাঁর প্রিয়তম জন্মস্থানে গিরে বসেছেন বীরের মত, ভূপালের মত। গ্রামবাসীকে অভয় দিলেন তাদের আপদে-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়বার প্রতিজ্ঞা জানিয়ে। ফলে ভূমি ও তার চতুঃপার্শ্বের গ্রামগুলো সাহস সঞ্চারিত হল। দরিদ্র অমূল্যমানরা গল্পবিশ্বের এক আশ্রয়-জায়গা বৃক্ বেঁধে নিজেদের ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে রইল।...

১৯৫৬ সালের ২৭শে নভেম্বর একাত্তর বৎসর বয়সে নিজের জন্মস্থানে (ভূমি) একান্ত নিরাপন্ন এই বীর লোকের দেহাবসান ঘটে। তখন তাঁর মাথার উপরে ছিল নিঃশীর্ণ লম্বন আকাশ; চতুঃপার্শ্ব বিধুর গরীর ক্ষুধা পরিবেশ; সম্মুখে স্বপ্ন-অতিক্রান্ত সেই সুন্দর লোকের আহ্বান, যেখানে অপেক্ষমাণ তাঁর পিতামাতা ও পুরোদায়ী আত্মীয়বন্ধু এবং বাংলার শহীদকুল।...

এই অনাড়ম্বর মহৎ ব্যক্তিকে আমরা দেখেছি আদর্শচক্রে তাঁর শেষ কৈশোরে, দেখেছি আদর্শদীপ্ত তাঁর যৌবনে, দেখেছি আদর্শমুখ তাঁর প্রৌঢ়ত্বে, দেখেছি আদর্শ-নিমগ্ন তাঁর ব্যর্থতায়। কিন্তু তবু, জানি, সে-সেবার পরিসরে তাঁর যে-পরিচয় আমরা পেরেছি তার চেয়েও তিনি বড়, তার চেয়েও তিনি মহৎ।...

অনুশীলন-সমিতির নেতৃস্থানীয় মদন ভৌমিক দেশ-ভাণ্ডার্যগিরে গোরাক্ষা বিপর্যস্ত স্বদেশবাসীকে পরিভ্রমণ করে নিরাপদ ভারতে চলে আসেন নি। স্বদেশ-নেতার গৌরবে পরিভ্রমণ দেশবাসীদের পাশে অবিসল দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অমৃত্যু, আত্মবরহীন সৈন্যবে। এই বিশেষ লক্ষ্য করেই তাঁকে আমরা সম্মান দিচ্ছি শহীদদের।...

প্রেসি ডন্সি জেলে তাঁরা তিবজুন

(অমলেন্দু দাসগুপ্ত, কোহিনুর ঘোষ, রাখাল দত্ত)

অমলেন্দু দাসগুপ্ত, কোহিনুর ঘোষ ও রাখাল দত্ত — তাঁরা তিনজনই আজ বিদেহী। তাঁদের মধ্যে বয়সে অমলেন্দু বাবু ছোট হলেও দেহরক্ষা করেছেন তিনি সবার পূর্বে ১৯৫৫ সালের ১১ই অগাস্ট। কোহিনুর বাবু দেহ-ত্যাগ করলেন তার কিছু পরে ১৯৫৯ সালের ১১ই এপ্রিল। রাখাল বাবুর মৃত্যু তার-ও আড়াই বৎসর পর ১৯৬১ সালের ৭ই অক্টোবর।...

অমলেন্দু দাসগুপ্ত মাদারীপুরের লোক।

পূর্বচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদলে কলকাতা-কোয়ে প্রবেশ করেন। তার বৈপ্লবিক-জীবনের ইতিহাস দুঃসাহসে ও সাংগঠনিক-কর্মভার গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক ও চিন্তাশীল নায়ক।...

কোহিনুর ঘোষ ঢাকা জিলার অধিবাসী হলে-ও ছোট বয়স থেকেই মৈমনসিংহে বসবাস করতেন। তিনি তাই শুরুরশ্রমেই ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে বৈপ্লবিক-কাজে লিপ্ত হন শৈশবকাল থেকেই। তাঁর কর্ম-জীবন-ও বর্ণাঢ্য এবং দুঃসাহসিকতার রোমাঞ্চকর।...

রাখাল দত্তের বাড়ি কুমিল্লায়। প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেতা এবং পরাধীন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় আইনসভার (দিব্লী) 'ডেপুটি স্পীকার' অধিলক্ষ্য দত্ত মহাশয়ের প্রথম পুত্র তিনি। তিনি নিজেও আইনজীবী ছিলেন। তাঁর বৈপ্লবিক-রাজনীতি সম্পর্কে সংযোগ ছিল 'শ্রীমতের' সঙ্গে।...

আমরা এখানে অমলেন্দু বাবু, কোহিনুর বাবু ও রাখাল দত্তের বৈপ্লবিক-জীবন সম্পর্কে কিছু লিখতে না। আমরা বিপ্লবী অমলেন্দু বাবু, বিপ্লবী কোহিনুর ঘোষ ও বিপ্লবী রাখাল দত্তের মতাবলম্বী সংকীর্ণপ্রোক্ত 'মানুষকে' শুধু দেখবার চেষ্টা করবো।...

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের প্রেসিডেন্সি জেলে। এ-জেলে তৎকালে বন্দীদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল। নানা জেল ঘুরে এসে যে-কোন বন্দী এখানে ঢুকবার পর-ই স্বাস্থ্য বোধ করতেন। কারণ, এ-জেলের বন্দীরা খাচা-খাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য জেলের বন্দীদের মত গোষ্ঠীপ্রেমী ছিলেন না। তাঁদের জেল-জীবন ছিল অনেক বেশি উদার এবং ভদ্রতার ও সামাজিকতার সুস্ব। তিনটি দলের সমাবেশ এখানে-ও। কনগ্রেস ব্রক, আর-এস-পি ও কংগ্রেস। কিন্তু তাঁদের 'চৌকা'-ও আলাদা নয়, স্বাক্ষর ব্যবস্থা-ও মিলেমিশে-ই। তাই দলগত সংকীর্ণতার লড়াই প্রেসিডেন্সি জেলের তৎকালীন পরিবেশে ছিল না।...

প্রেসিডেন্সি জেলের আবহ অগাধোড়া সুন্দর রাখার চেঁচায় স্বাদের দান প্রচুর তাঁদের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি মানুষের নাম-ও করা চলে। অমলেন্দু বাবু ও কোহিনুর বাবুর ব্যক্তিগত এবং দলগত প্রভাব ছিল অসামান্য। অমলেন্দু বাবু, কোহিনুর বাবু ও রাখাল বাবুর সমবেত প্রভাবের মূল্য-ও ছিল প্রেসিডেন্সি-জেলের মিলেমিশে-খাকার ইচ্ছার ওপর মথেন্ট।...

এঁদের চরিত্রমাধুর্য বৃদ্ধিতে হলে একটি 'বন্ধুচক্রের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই বন্ধুদের এক-বছরের মন্ত লোভনীয় একটি বস্তু ছিল — সে হল 'সাত খাতা'-র দ্বিতলের একটি ঘর। গোটা ঘর নয়। ঐ বিরাট হল-ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণের খানিকটা। রাখাল দত্ত কখনও গিয়ে ঘেরাও করে ঐ কোণে

এক টুকরো নির্জন আবাস সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘদিন জেলবাসের ঐ একটি নিমগ্ন।... প্রকাশ-প্রকাশ হল যখনগুলোর বন্দীদেরকে রাখা হয়েছে। তাঁরা জেলে ঢুকে প্রথমটার 'ব্যারাক'-জীবন' হৈহুজোড়ের মধ্য দিয়ে সানন্দে ভোগ করেন। কিন্তু যতই দিন কাটে ততই তাঁরা নিভৃতজীবন খুঁজে পেতে চান। এবং কিছুদিন পরেই দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর খাটিরার চতুঃপার্শ্বকে কম্বল খুলিয়ে নিজস্ব কামরার পরিণত করে ফেলেছেন। এইভাবে একাদারে জনতা ও নির্জনতাকে আরম্ভে পাবার চেষ্টা-ই বন্দীদের দীর্ঘকালীন জেল-জীবনে লক্ষ্য করা যায়।...

রাখাল বাবুর কম্বলখেরা ঘরে একটি 'আড্ডা' বসতো। সে আড্ডার নিরামিত সভ্য ছিলেন শ্রীরাখাল দত্ত স্বয়ং, শ্রীকোহিনুর ঘোষ এবং শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্ত। ভূপেন রক্ষিতরায় ছিলেন চতুর্থ সভ্য। চতুর্থের এই সভা দিনে-রাত্রে যখন-তখন বসতো। সেখানকার আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সংসারের কোন জিনিস-ই বাদ পড়তো না। তবে এই বন্ধু-চক্রের প্রাণপ্রেরণা ছিল রবীন্দ্র-কাব্য। রবীন্দ্র-নাথের কাব্য-সমালোচনা বড় বেশি হতো না, হতো কাক-পাঠ — তন্ময় স্তব্ধতার পাঠ। এই পাঠের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-কব্যকে, রবীন্দ্র-দর্শনকে এঁরা স্পর্শ করতে চাইতেন — কাব্য-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়। এঁরা রস পান করতেন, রসচর্চা করতেন না।

রাখাল বাবুদের আড্ডার কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। অব্যাহত হার। যে-কেউ ঢুকতে পারতেন। ঢুকতেন-ও কেউ কেউ। কিন্তু চুপ করে কতক্ষণ কবিতা বা প্রবন্ধ শোনা যায়? কাজেই ওখানে ভিড়ের ব্যঙ্গই ছিল না।

এই রসকেন্দ্রটির মধ্যস্থি ছিলেন অমলেন্দু দাসগুপ্ত। রবীন্দ্র-রচনা বেশির ভাগ পাঠ করতেন অমলেন্দু বাবু ও ভূপেন বাবু। কোহিনুর বাবু ও রাখাল বাবু ছিলেন অশ্রুত নীরব শ্রোতারা। এমন আশ্রয়-হয়ে-আওয়া প্রোভা ঘটায় পর ঘণ্টা ধরে পাওয়া খুঁই দুর্দিকল।... একদিন কবিতা পাঠ হচ্ছে। ঘরের আবহ স্তব্ধ। দু-একজন বাইরের লোক-ও আছেন। রাখাল বাবু ও কোহিনুর বাবুর কাছে ইহলোকের অস্তিত্ব যেন গোপন হয়ে গেছে। অমলেন্দু বাবু-ও সৈদিল শ্রোতা। তাঁর দীর্ঘায়িত চোখ দুটো নিম্নীলিত হয়ে আছে, তাঁর সর্বাঙ্গ একটি অনবদ্য পূলকসম্পন্ন তপস্যান্বিত রূপ গ্রহণ করেছে। সৈদিল যে-রূপটি অমলেন্দু বাবুকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছিল তা সাধকের রূপ। জানি না এই লোকটি সাধনমার্গে কতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এইটুকু বলা চলে যে, তাঁর কোথাও সিদ্ধি ঘটে থাকলে রবীন্দ্র-কাব্য তাঁকে হাত ধরে বহুদূর সেই সিদ্ধির পথে নিশ্চর নিয়ে গিয়েছিল।...

অমলেন্দু বাবু তাঁর 'বন্ধু ক্যাম্প' পুস্তকে বন্দীদের প্রেরিত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে কবি-

গুরুদেব 'প্রত্যাভিনন্দন'-এর শেষ পংক্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন : "...শেষ কথাটিতে কবি প্রশ্ন করেছিলেন—'বন্দীর শৃংখলছন্দে মস্তুর কে দিল পরিচয়?' উত্তরে আজ তার বলিতে পারি না, আমি বা আমরা। অপরের কথা জানি না, কিন্তু নিজের কথা যতটুকু জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃংখলছন্দে মস্তুর পরিচয় অন্তত আমি দিতে পারি নাই। আমার মস্তুর পরিচয় আমার কাছে এখনও অনদ্ভূত রহিয়াছে, বাহিরের শৃংখলছন্দে তাহার পরিচয় দেওয়ার কথা তো ওঠেই না।" ('বঙ্গ ক্যাম্প'—পৃঃ ১৫৪)।

আজ মনে হয় অমলেন্দুবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা পূর্ণ করার পথে চলেছিলেন বলেই তাঁর মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর জিজ্ঞাসার মধ্যেই এর উত্তর রয়েছে। অমলেন্দুবাবু-ই লিখেছেন : "কিন্তু কবি এমন কথা কেন লিখলেন? 'অমৃতের পদ্র মোরা', এ কথা তো আমরা জানি না, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লিখলেন, 'আম্বারে কে জানিল অক্ষর'। অথচ শূন্যে পাই 'ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।' প্রত্যাভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঋষিকবির এই উক্তি কি প্রকৃতই সত্য—ইহাই প্রশ্ন।" ('বঙ্গ ক্যাম্প'—পৃঃ ১৫৪)।

অমলেন্দুবাবু যদি মনে করে থাকেন যে, বিপ্লবীরা দল বেঁধে মস্তুর পরিচয় দেবে তবে তাঁর আশা সফল হয় নি। কিন্তু বিপ্লবীদের অনেকে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনে 'মস্তুর' হয়ে গেছেন তা'তো শহীদদের জীবনে-ই অমলেন্দুবাবু লক্ষ্য করেছেন। আমাদের-ও অমলেন্দুবাবুর মতই বিশ্বাস যে, 'ঋষিবাক্য মিথ্যা হতে পারে না'। মিথ্যা হতে পারে না বলেই 'ঋষিকবির প্রত্যাশা' নেতাজীর জীবনে পূর্ণ হয়েছে। নেতাজীর জীবনে পূর্ণ হয়েছে বলেই বিশ্বাস করা যায় যে, আবার তেমন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে, যে-নেতৃত্ব কবির প্রত্যাশা পূর্ণ করেই ভারতবর্ষে 'দ্বিতীয়'-বিপ্লব ঘটতে সমর্থ হবে। অমলেন্দুবাবুর ভাষায়-ই বলা চলে : 'মহাযাজ্ঞিক ও মহা-তাপসের অপেক্ষায় এক কণা অগ্নি এখনও অপলক তাকাইয়া আছে' বলেই তা থেকে উৎসারিত হবেন অগ্রিকল্প নেতা যাঁর নেতৃত্বে অমলেন্দুবাবুদের মত বিপ্লবীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভারতবর্ষে নিশ্চয় একদিন আসবে।...

অমলেন্দুবাবুদের কন্ঠস্বরের চক্রে যখন কাব্যপাঠ চলতো তখন কোন বন্দী-ই বড় একটা সে-ঘরে ঢুকতেন না। সকলেই একান্ত বিরচিত এ কাব্য-সভার প্রতি কেমন যেন একটি গম্ভীর-মমতা পোষণ করতেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন একটি তরুণ। আপন খুশিখেল মত উচ্চতম গ্রামে নজরুলের গজল অথবা রবীন্দ্রনাথের দু-একটি চরণ ভাঁজতে-ভাঁজতে যখন-তখন তিনি এসে ঘরে ঢুকতেন। ঘরে ঢুকেই

গগন দীর্ঘকারী অটুহাস্যে গভীর আবহকে শত টুকরো করে এক অদম্য প্রাণবন্ত্য বইয়ে দিতেন। অমন দিলখোলা হাসি, অমন সরল সহজ ব্যবহার বড় একটা চোখে পড়ে না। সত্য সেনকে আমাদের ভাল লাগত। ঝড়ের বেগে তার আসা এবং যাওয়ার সেই প্রাণস্রোতকেই খুঁজে পাওয়া যেত বাক্য নিয়ে কবির কাব্য গড়ে উঠেছে :

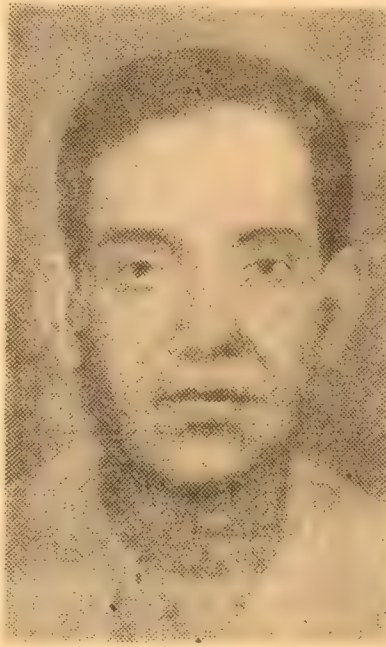
"তোমায় দিব ধন্যধনি মাথায়

বহি সর্বনাশ,

হাসামুখে অদ্ভুতের করব মোরা

পরিহাস।"

জেলখানায় সত্য সেন সত্যি ছিলেন প্রাণের ফোয়ারা। তাঁকে উপেক্ষা করতে হলে প্রাণকে



অমলেন্দু দাসগুপ্ত

উপেক্ষা করতে হয়। কাজেই তাঁর প্রয়োজন ছিল সবার কাছে। সত্য সেনকে ভালবাসতেন তাই সকলেই।...

অমলেন্দুবাবুকে কেন্দ্র করে রাখালবাবু ও কোহিনুরবাবু যে নিটোল কাব্যপাঠচক্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাগ্রত করে রাখতেন তা সম্ভব হয়েছিল জেলখানার পরিবেশেই। কারণ অফুরন্ত অবসরকে নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত করার স্থান মাত্র দুইটি—জেলখানা অথবা অগাধ-পর্বতের নিরালা।

বন্ধুরা তিনজনেই আজ স্বর্গগত। 'স্বর্গ' বলে কোন বস্তু থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা সেখানে সানন্দে বাস করতেন। কারণ যে-পুণ্য অর্জন করলে মানুষ স্বর্গগামী হয় তা তাঁদের তিনজনেরই অর্জন হয়েছিল কিনা আমাদের না জানা থাকলেও এটুকু জানা আছে যে, বধ্যার্থ পুণ্যবানের চরিত্র তাঁদের ছিল। তাঁরা উদ্যবে

অথচ দৃঢ় মনন-শান্তিতে অপূর্ণ ছিলেন। 'স্বর্গ' ক্ষুদ্র, যা ছোট তা থেকে ছোটবড় সকল ব্যাপারেই তাঁরা দূরে থাকতেন। 'স্বর্গ' মিথ্যা, যা অকিঞ্চকর তা-ও তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকতো। বৃহত্তর পানে সন্নিহিত পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিঃশব্দে তাঁরা উপভোগ্য বলেই তাঁদের চতুঃসীমার মানুষকে যা ছোট করে তা ঘেঁষতে দেখি নি। বিপ্লবের মস্তুর সঠিক বুদ্ধিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা নিজস্ব দলের যেমন খাঁটি সদস্য হতে পেরেছিলেন, তেমন পেরেছিলেন দলের উর্ধ্ব উঠে বাংলার বিপ্লবী-জগতেও খাঁটি কর্মনিয়ক হতে। বিভিন্ন গোষ্ঠীনির্বিশেষে সকল বিপ্লবী-তরুণ-ই তাঁদেরকে আপন মনে করতেন।...

একদিন সকালবেলা, গোটা দশকের সময়, বেজে উঠল 'পাগল-ঘণ্টা'। মনে হলো কোথা থেকে বিরাট এক রক্তপায়ী রাক্ষস যেন ছুটে আসছে জেলখানার দিকে। 'পাগল-ঘণ্টা' শুনে দেবার উল্লাসে। কিন্তু কান্না জন্ম ছিল না। 'রাখাল-এম্বার' বন্দীর উপন কাব্যালোচনায় মগ্ন হয়ে। কিন্তু পূর্ণ বয়সেও শব্দ শুনেন সবাই কেমনে? 'পাগল-ঘণ্টা' মত মহত্বকাল দাঁড়ায় নতুন বন্দীরা। পরক্ষণেই রোকা গেল, কান্না পড়ল সংগে বিরোধ নয়! কতৃপক্ষ দু'দিক দিয়েছে আতঙ্কে। গোলমাল বন্দীদের মধ্যেই। ডান্ডা হস্তে দুই পক্ষীয় অতি-তরুণদের এ সাজ-সাজ রব। একজনের মাথা ফেটে রক্ত বের-করে পড়ছে দেখে-ই এ রণসঙ্ঘাত আক্রোশে ও ক্রোধে কুৎসিত হয়ে উঠেছে।... বুদ্ধিমানদের সক্রিয় চেতনার অবশ্য সে ক্রোধবর্ধি নিবাপিত হতে খুব সময় লাগল না।... কিন্তু সেদিন আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম অমলেন্দুবাবুর আশ্রয় একটি রূপ। তাঁরই দলের এক তরুণ বন্ধু, বিজয়ীর গর্বে ঘটনাটি বিবৃত করতে এসে-ছিলেন তাঁর 'অমলদা'-র কাছে। অমলেন্দুবাবু তেমন কিছু শুনছিলেন না। তাঁর ঠোঁট দু'টি কাঁপছিল। সত্যীর্থ স্বভাব তথা ঐ ঠোঁটের-ই এক কোণে ঝিলিক দিয়ে গেল। বেদনার মূখখানা হয়ে উঠল পাখুর!... তরুণ বন্ধুটির বাক্য বন্ধ হয়ে গেল।... লজ্জায় তাকাত পড়তেন না 'অমলদা'-র দিকে।... অতঃপর আহত ব্যক্তির কাছ থেকে তাকানা লাভ করে সে-সংবাদ যখন তাঁরা অমলেন্দুবাবুকে দিতে পেরেছিলেন তখনই খুব এ শান্ত মানুষটির অশান্তি দূর হয়েছিল।...

আর একদিনের ঘটনা। এবার সত্যি জেল-কতৃপক্ষের শাসনদণ্ড হস্তে 'পাগল-ঘণ্টা' বেজে উঠেছে। বন্দীদের সংগে জেল-কতৃপক্ষের বিরোধ ঘটায় তারা বাজিয়ে দিয়েছে 'পাগল-ঘণ্টা'। সে-ঘণ্টা শুনতে-ও কেউ ঘরে ঢুকলেন না বন্দীরা। তাঁরা প্রতিদিনের মত পুকুরপাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেপাইরা লাঠি চালাল। মারপিট শুরু হয়ে গেল। হুলস্থূল কাণ্ড। সমগ্র জেলখানা যেন একটি বৃক্ষক্ষেত।... আহত বন্দীদেরকে নীচের

হল ঘরে আনা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা
লাগে। ডাক্তার-কম্পাউন্ডার এসে গেছেন।
জেলের বড়কর্তারা এসেছেন। চোখাচোখা
বাক্যবাহে বিদ্রূপ করছেন তাঁদেরকে বন্দীরা!...

ঘটনাক্রমে মধ্য পরিবেশ অনেক শান্ত
হয়ে গেছে। আহতদের পাশে বন্ধুরা সেবা-
শুশ্রূষা করছেন। হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে গেছে।
হাজার হোক এঁদের সবার-ই সৈনিকের মন।
রক্ত দেখে এঁরা ভয় পান না। রক্ত করতে
পারলে খুশি হন। রক্ত দিতে পারলে কত'ব্য
বোধ হল মনে করেন।...

রাখালবাবু এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন কত'-
পক্ষের সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের কার্যে। বন্দীদের
'প্রতিনিধি'র কাজে তাঁর সুনাম ছিল। খুব
জরু অথচ শক্ত। ছেড়ে কথা বলবার লোক
নয়। কোহিনুরবাবু সেবার্কে তদারক
করছেন। রাখালবাবুর খেয়াল হল যে,
অমলেন্দুবাবুকে যেন কোথাও দেখছেন না!
তিনি উঠে এলেন দোতলার। অমলেন্দুবাবুর
ঘরে ঢুকে দেখেন ডেকেরোরে বসে তিনি
দীর্ঘ 'লাইক ডিভাইন' পড়ছেন!

বললেন : 'ও কি মশায়! নিচে মার গেরে
মর গোজাচ্ছে, আর এখানে শুরে-শুরে লাইফ
'ডিভাইন' চালাচ্ছেন?

মুখে স্নিগ্ধ হাস্য, চোখে কৌতুক।
বললেন অমলেন্দুবাবু : আপনাদের পেলে
একটি কবিতা-পাঠের ব্যবস্থা করা যেত।...
ছাপনবাবু কোথায়?

—সাম্য-র (কোহিনুরবাবুকে 'সাম্য' বলা
হতো) হুকুম আহতদের তদারক করছেন।

হাসির ফোয়ারা তুলে অমলেন্দুবাবু
বললেন : সাম্যের উল্টোবুদ্ধি। নিজে লাঠি-
শেষী হতে পারলেন না? তা হলে তো আমরা
সিঁরেই তাঁর তদারক করতাম।... থাক, ঠিক
আছে। ওরা যখন কার্যক্ষেত্রে আছেন তখন
আমরা নিচে গিয়ে প্রয়োজন নেই। আসুন
দলপ করা যাক।...

অমলেন্দুবাবু মুখর হয়ে উঠলেন।
বললেন : আজকের এই লাঠিশপর্শ কিন্তু
ক্রমেই ভাল। আমাদের বন্দীজীবনে একান্ত-
কোষ আরো বাড়বে।

রাখালবাবু বললেন : রক্তকর হল কিন্তু
কম নয়।

অমলেন্দুবাবু : তা তো হবে-ই।
আমাদের রক্তকরে কতাদের পরাজয়। কতাদের
পরাজয়ে আমাদের জয়। এ সত্য জেলে ও
বাইরেজলে সর্বত্রই প্রযোজ্য।...

তাঁদের কথা বেশিদূর এগুলো না। নিচে
স্বাক্ষর ডাঙিগদ এসেছে। 'সাম্য' জানতে
চেষ্টা করেন—'তারা' কি করে?

সাম্যের জানতে চাওয়া হুকুমের-ই সামিল।
অমলেন্দুবাবু সুবোধ বালকের মত রাখাল-
বাবুকে বললেন : চলুন 'ডিটা' (রাখাল
বাবুকে তাঁরা দলের বদলে 'ডিটা' বলতেন),
'এসেছে আহতান লক্ষ্যবরে'—আর গৃহে থাক
চলো না।...

দু'জনে তরতর করে নিচে নেমে এলেন।
আহতদের কাছে গিয়ে এমন হালকা-রসে
আবহুকে অমলেন্দুবাবু নিম্ন করে দিলেন
যে মনে হল এ লোকটি যেন জীবনে কঠিনকে
সহজ করে পেতে চান এবং সহজকে পেতে
চান কঠিন করে। এঁর সাধনা একটু স্বতন্ত্র
পথে, সে পথ বাকি অনাসক্তের পথ।...

অমলেন্দুবাবুর খুঁটিনাটি বহু আচরণ-ই
নিকটতর বন্ধুদের মনে রেখাপাত করত।
এক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক উল্লেখ
করা প্রয়োজন।...

আমাদের-ই এক বিশেষ বন্ধুর কনয় নিজে
পাত্র মনোনয়ন করে অসবর্ণ বিয়ে করেছেন
শিতার অনুমতি না নিয়ে। শিতা তখন
আমাদের সঙ্গেই রাজবন্দী। 'বন্ধু' এ-সংবাদে
কিপ্তপ্রায়।... অমলেন্দুবাবু তাঁকে সান্ত্বনা
দেবার ছলে বললেন : আমি নিজে অমন ক্ষেপে
গেলেন কেন? মেরের বর-নির্বাচন তো খারাপ
হয় নি। পাত্রটি তো সর্বাদিক থেকেই যোগ্য,
কেবল বর্ণ আলাদা। রাজশকুমার নয়।...

বন্ধু বললেন : আমি মেরের ঔদ্ধত্য
কিন্তুতে কমা করব না। সে আমার কাছে
মৃত।...

অমলেন্দুবাবুর কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হল :
বলেন কি? যে মেরেকে ভালবাসেন তাঁর
সম্বন্ধে এই কথা?... আমি তো আমার মেরে
'মেরী'-র চোখে জল দেখলে স্থির থাকতে
পারি নে!...

বন্ধু চুপ করে রইলেন।...

আজ্ঞা চলে এলাম কিছুক্ষণ পর।

রাখাল-কন্যে ফিরে এসেই সবাই।...

'ডিটা' বললেন : স্বত কঠিন কথা-ই ভুললোক
তাঁর মেরের উদ্দেশ্যে বলুন না কেন, তাঁর
পিতৃস্নেহ প্রভু।

অমলেন্দুবাবু উত্তর দিলেন : তবে ভয়
নেই। নির্ভর জাতিভিমান গভীর পিতৃস্নেহের
কাছে হার মানতে বাধ্য।...

অমলেন্দুবাবুর কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য
হয়েছিল। আমরা জানি পিতৃসংস্কারগ্ৰেহী
কন্যাকে সংস্কারজরী-পিতা অবশেষে বুকে
টেনে নিয়েছিলেন।...

পূর্বেই বলা হয়েছে, অমলেন্দুবাবুর পথ
অনাসক্তের পথ। কার্য-ত-ও দেখা গেছে যে,
প্রতি পদক্ষেপে এই লোকটি সমগ্র চিত্ত দিয়ে-ও
যে-কাজ করে যাচ্ছেন তাতে আসক্তিবোধ
করছেন না। সংসারের ছোটবড় সকল কাজেই
তিনি ব্যস্ত, অথচ তাতে জড়িয়ে যাচ্ছেন না।
একটি নিষ্পৃহ, উদ্ভূতচরী মন তাঁর মধ্যে
ছিল বলেই কাদামাটি ঘেঁটেও নিষ্কলুষ
থাকতো তাঁর চৈতন্য।

প্রয়োজনে বজ্রের মত কঠিন হতে তাঁকে
দেখা গেছে। কিন্তু তখনো চিত্ত তাঁর কঠিন
হয়ে যেতো না। তাঁর ক্ষেত্রে সত্য-ই তখন
বলা যেতো :

"সহজ সাধনলক্ষ্য নহে সে মূর্খের
নিবেদন—

অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে

কঠোর বেদনা।"

কোহিনুর বোধ সম্পর্কে উপরের উক্তিটি
সর্বসময়েই কিন্তু প্রয়োগ করা যেত। ভদ্র-
লোককে সকল সময়েই মনে হতো কঠিন। কিন্তু
তাঁর নিভূতে যে অন্তঃসলিলা মেহফল্য
বিরাজিত ছিল তা তাঁর একটু কাছে গেলেই
বোকা যেতো। কাজেই কোহিনুরবাবুর বন্ধু-
সংখ্যার সীমা ছিল না।...

কোহিনুরবাবুর মনটা একটি ঘটনার
উল্লেখে পরিষ্কার বোঝা যাবে।... ঘটনাটি
ঘটেছিল বাইরে, জেলে নয়।... জেল থেকে
বেরিয়ে এসে তিনি শ্যামবাজারের দিকে অদ্বৈত
দত্তের সঙ্গে একটি বাড়ি ভাড়া করেন।
একা মানুষ, সংসারে কেউ নেই, কাজেই
ভদ্র-বন্ধুর সামান্য তত্ত্ববধানের আশায় তাঁরই
পাশে স্থান নেন। উত্তরের ফ্ল্যাট আলাদা।
কোহিনুরবাবুর ফ্ল্যাটটি সুন্দর—অবশ্য এক-
জন মানুষের পক্ষে অথবা একজোড়া স্বামী-
স্ত্রীর পক্ষে।... বেশ কাটছে তাঁর দিনগুলো,
শরৎ-আকাশের হালকা ও 'নিরুদ্বেগ মেঘের
মত।...

একদিন তাঁর-ই জানিত এক যুবক স্ত্রী-
পুত্রের হাতে ধরে এসে উপস্থিত। ছোটটি
ভাল চাকুরি করে, কিন্তু কলকাতার বাসস্থান
পাচ্ছে না, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মহাবিপদগ্রস্ত।...
কোহিনুরবাবু তাঁদের আপাতত স্থান দিলেন।
কিন্তু এ যে 'স্থান' সে দখল করল আর
কিন্তুতেই তো নড়ে না! ক্রমে তারা নিজে-
দেরকে এতই বিস্তার করে চলল যে, বোঝা
কোহিনুরবাবু, বাইরে-বাইরে সারাদিন ঘোরেন
এবং রাতে অতিকষ্টে নিজ-গৃহে শোবার স্থান
করে নিয়ে রাত কাটান।... বন্ধুবান্ধব সবাই
কোহিনুরবাবুকে গালমন্দ করেন। উল্লেখ
হডাশকণ্ঠে তিনি বলেন : "তাড়িয়ে তো
দিতে পারি। কিন্তু ওদের ঐ বাচ্চা শিশুটো
বদী বলে—'দাদা, আমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে
দিছ, আমরা কোথায় যাব?'—তখন আমি
কী উত্তর দেব?"...

দখলকারী ভদ্র-বন্ধুর পরিবার অনড়
হয়ে বসে থাকে কোহিনুরবাবুর গৃহে, আর
কোহিনুরবাবু ঘুরে বেড়ান 'আনাবানে'।...
স্বাক্ষর বন্ধুদের হস্তক্ষেপে অবশ্য শেষটার
কোহিনুরবাবু স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন
এবং ঐ নির্লজ্জ অনুপ্রবেশকারী বিতাড়িত
হয়েছিল।... কিন্তু ঐ ঘটনা না ঘটলে
কোহিনুরবাবুর চরিত্র অমন সুন্দর করে ফুটে
উঠবার অবকাশ পেত না অন্তত আমাদের
কাছে।...

প্রেসিডেন্সি জেলের পূর্বোক্ত আড্ডাটির
কথার ফিরে আসা যাক। এ আড্ডাটির জীবন-
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অমলেন্দুবাবুর উপচে-ওঠা
রসপ্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে এবং অতি ভদ্র ও
বন্ধুবৎসল রাখালবাবুর অপরিমিত সাধুর্বে।
এতো কবিতা, এতো সাহিত্য, এতো হিউমার-
চর্চার মধ্যে-ও রাজনীতির স্থান সেই বন্দী-

অবস্থায় কিন্তু আমাদের কাছে সামান্য ছিল না। ভারতবর্ষের রাজনীতির স্পন্দন জেলের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়তই প্রবাহিত ছিল। অমলেন্দুবাবুর মন সেখানে বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভাগিতে ছিল সক্রিয়। সেখানে ভাবপ্রবণতার স্থান ছিল না — সেখানে তাঁর বিচরণ ছিল স্বাভি-আপ্রিত। কিন্তু বর্মার কূলে-কূলে বে-রাজনীতি জীবনবেদের রূপ ধারণ করেছিল, তার আলোচনার এবং বিশেষ করে তার মহান মায়কের প্রসঙ্গে কথা উঠলেই অমলেন্দুবাবু জ্বলেমানুষের মত উজ্জ্বলিত হয়ে উঠতেন। এমনিতেই তিনি পরম আশাবাদী, নেতাজী প্রসঙ্গে তাঁর 'আশা' বাস্তবিকতার দিব্যরূপ ধরে বেন তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতো!...

এই সময় বাংলার বহু জেলে আটক ছিলেন রাজবন্দীর দল। এসব বন্দী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। নানা দলের কলহে তাই কারাগৃহগুলোর আবহ কখনো কখনো বিবাক্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্সি জেলের বন্দীরা এ-বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান। তাঁরা মিলেমিশে সামাজিক-জীবন রক্ষা করতেন।...

ফরওয়ার্ড ব্লক তৎকালে খুবই শক্তিশালী সম্প্রদায়। এই ফরওয়ার্ড ব্লকে-ই অধিকাংশ বিপ্লববাদী ছিল বৃত্ত হয়ে। এ ছাড়া কংগ্রেস ও আর-এস-পি দলের লোকসংখ্যা-ও ছিল স্বল্পেষ্ঠ। আপিসের সঙ্গে বন্দীদের সম্পর্ক একটি কমিটির মাধ্যমে রাখা হত। কমিটি গঠিত ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি ও কংগ্রেস মনোনীত সভ্যদের দ্বারা। প্রতি মাসে কমিটি-নির্বাচিত প্রতিনিধিই সমগ্র বন্দীদের 'একক' প্রতিনিধিরূপে আপিসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন।—বাংলার অন্যান্য জেলে এ জিনিসটি ছিল না। সেসব স্থানে বিভিন্ন দলগত প্রতিনিধি জেল-আপিসে যেতেন। বন্দীদের গৃহ বিভক্ত ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলে সে সম্ভাবনা ছিল না। এখানকার এই শূন্য পরিস্থিতির বনিয়াদ বারী গড়েছেন তাঁদের মধ্যে অমলেন্দুবাবু ও কোহিনুরবাবু যে অন্যতম সে-কথা বলা হয়েছে।...

অমলেন্দুবাবুর আর একটি কাজ ছিল দুতপাণ্ডিত্য ফরওয়ার্ড ব্লকে-ও এক করে



কোহিনুর ঘোষ

রাখা এবং তিনটি দলকে সম্মিলিত করে জেলখানার অন্তত একটি বন্দী-কন্ট্রোল বাঁচিয়ে রাখা।...বারে বারে বহু জেলেই অমলেন্দুবাবু তাঁর কারাজীবন অভিবাহিত করেছেন। কিন্তু কোনদিনই তিনি জেল-পলিটিক্স-এ যুক্ত থাকতেন না। সময় কাটতো তাঁর একখানি আরামকেদারায় এলায়িত হয়ে বইয়ের পাতার মন ডুবিয়ে, অথবা ক্ষুদ্রসম্মানে তন্ময় দৃষ্টি প্রসারিত করে, কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে উজ্জল রসালোপে। কিন্তু এবার প্রেসিডেন্সি জেলে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তাই তাঁর আর একটি রূপ প্রকটিত হল—জেল-পলিটিক্সে ওতপ্রোতভাবে জড়ান সক্রিয় ও সরস তাঁর পঞ্চপরিভ্রমার রূপ। অথচ এই কর্মবাস্তব পঞ্চলস্য তাঁর পরিপ্রান্ত কাব্যাপ্যাসু মন ও রসগভীর চেতনা বিন্দুমাত্র আহত হতো না। এর কারণ ছিল। জেল-পলিটিক্সের প্রতি অমলেন্দুবাবুর প্রীতির উৎস হলো তাঁর নিজস্ব আদর্শপ্রীতি। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিপ্লবীরা এক হোক; 'করেণ্ডো ইয়ে মরেণ্ডো'র কংগ্রেস এবং বিপ্লবী-বাংলার সমবেত চেম্টার ভারতবর্ষ সেই পথে স্বাধীন হোক, যে পথ দিয়ে মহান নেতাজী সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেছেন—এই যে স্বপ্ন, এ স্বপ্ন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বাঙ্গিক মন তাঁর তাই দল-নির্বিশেষে জেলের বন্দীদেরকে নিয়ে জেল-পলিটিক্সে অন্তত একটি 'কন্ট্রোল' অক্ষর রাখার কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে-উৎসাহ তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন তাঁর জেল-জীবনে।...

অমলেন্দুবাবুর সংস্পর্শে এসে যে-কোন মানুষ শ্রদ্ধাশ্রবিত হতো, তাঁকে ভালবাসতো। তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভা ও তাঁর জীবনদর্শন তাঁরই কৌতুকোজ্জ্বল আলাপ-আলোচনার সর্বদা পরিস্ফুট হয়ে থাকতো। তাই তাঁর

নামকরণ করা হয়েছিল বিশিষ্ট বন্ধুত্বমূলক—'দেড় হাত'। অর্থাৎ সাধারণের স্তর থেকে দেড় হাত উঁচু স্তরে তিনি বিচরণ করেন এ-অর্থেই উক্ত নামকরণের সূত্রপাত। ঠাট্টা করে 'দেড় হাত' বললেও সে-উত্তির মধ্যে নিহিত ছিল নামদাতাদের বিশ্বাস, স্নেহ, মমতা ও শ্রদ্ধা। রসিক অমলেন্দুবাবুও সাদরে এ-নামটি গ্রহণ করেছিলেন। 'রাখাল-কনারের বন্ধুদের কাছে জেলের বাইরে এসেও চিঠিপত্র লিখতে বরাবরই তিনি স্বাক্ষর করতেন—ইতি আপনাদের দেড় হাত'।...

দেহে ও মনে প্রচুর স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটির মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পার না-হতেই আকস্মিক মৃত্যু ঘটে গেল। কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল বন্ধুর সংখ্যা তাঁর অপ্রত্যাশিত। যে-শক্তি বহুকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছিল, সেই শক্তিই দল-নির্বিশেষে বিপ্লবীদের মনের সঙ্গে অজ্ঞান সখা স্থাপনের সুযোগও তাঁকে দান করেছিল। সেই মধুর সখা বন্ধুদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। তা' মৃত্যুহীন।...

অমলেন্দুবাবু বা কোহিনুরবাবু বা রাখাল দত্ত—এঁদের প্রত্যেকের চরিত্রেই একটি মিল আছে। এঁরা তিনজনেই ক্ষুদ্রের সীমাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর পানে ধাওয়া করেছিলেন, দু'কে নিকট এবং পরকে আপন করবার বিদ্যা আয়ত্তে এনেছিলেন, সাংস্কৃতিক-বিভার ও সং-চিন্তায় নিকের চতুঃসীমাকে সুন্দর করে তুলেছিলেন।...

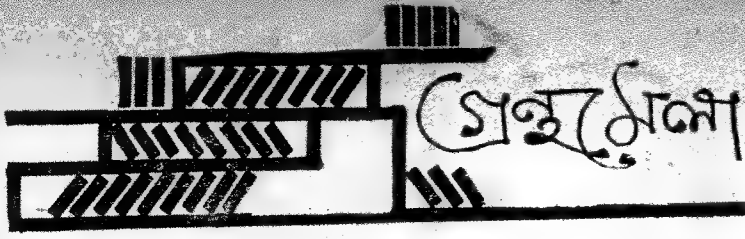
এঁদের কথা ভাবতে গিয়ে লাওৎসে-র বাণী মনে পড়ে :

"One who may die but will not perish has life everlasting."

(দেহ অবসিত হলেও ধ্বংস বারি হয়না, তিনিই তো চিরজীবী)।.. (ক্রেমশঃ)



রাখালচন্দ্র দত্ত



অমর প্রেমকথা: শ্রীশ্রীতিশচন্দ্র কুশারী।
ইউ, এন, ধর এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৫, বার্কম
চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য: ছয়
টাকা।

মূল সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের নায়ক-
নায়িকার প্রেমোপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই 'অমর
প্রেমকথা'র মূল্য সূত্র অনুরূপিত হয়েছে। মোট
একাদশটি কাব্য ও নাটক থেকে সংগৃহীত
তেরোটি কাহিনী স্থান পেয়েছে আলোচ্য
গ্রন্থে। মূল গ্রন্থের ধ্রুপদী সুরকে বজায়
রেখে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত কুশারী
যে পথে এগিয়ে এলেন তা প্রথম না হলেও
নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

'প্রিয়দর্শিকা', 'দশকুমার চরিত', 'কপূর-
জ্ঞারী'র ভাবরস সমৃদ্ধ সংস্কৃত কাহিনীকে
লেখক এই প্রথম তুলে ধরলেন। সংস্কৃত
কাব্যনাট্যের কথা বা কাহিনী বিবৃত করতে
হলে ভাবরস সমৃদ্ধতা ও বর্ণন বিন্যাসের যে
আভিজাত্যের প্রয়োজন তা আলোচ্য গ্রন্থে
সম্পূর্ণরূপে বর্তমান।

অথবা উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ থেকে মুক্ত
হয়ে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক চলিত ভাষার
কাহিনীর গভীরবেগকে প্রশংসনীয় ভাবে পথ
করে দিয়েছেন। সর্বোপরি ভাষার প্রাজ্ঞতা
ও বর্ণনভঙ্গীর মিষ্ট ছোঁয়ার স্বাদ, বইখানিকে
নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছে। পড়তে
পড়তে কোথাও ক্রান্তির বেদনা আসে না।
একটি স্বল্প দ্রোণীশ্বরীর মতোই দৃকুল
ছাপিয়ে এগিয়ে চলেছে কাহিনীর পর
কাহিনী 'মোক্ষাভিলাষী' কামমঞ্জরী স্বর্গের
পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললে মনিবর,
আপনি আমার কৃপা করুন। আমি ভোগ
করেছি জীবন, ভোগ করেছি ধৌবন। মিথ্যা
অনুরাগের জ্যোৎস্নায় উন্মাদিত করেছি
প্রণয়ভিলাষী পরুষের চিত্ত। সৌন্দর্য-
মুগ্ধ নাগরজনের কাছ থেকে মর্যাদাবী বস্তুতে
অর্জন করেছি প্রভূত বিত্ত। প্রতিদিনের প্রতি-
রাতির নারীত্বের এ অপমানের দুঃসহ জ্বালা
আমি আর সহিতে পারছি না। মৃত্যু মানবীকে
উদ্ধার করুন প্রভো, রক্ষা করুন শান্তি হতে।
আপনি আমার দান করুন শান্তি, আনন্দ,
ভৃশ্টি। আমার যৌবনের কামনাময় চিত্তাশ্রিত
নির্বাপিত হোক।' (মেরীচি ও কামমঞ্জরী: পৃঃ
২১৫)।

এইভাবে প্রতিটি কাহিনী বর্ণনের মধ্য
দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্মোচিত হওয়ার
পড়তে পড়তে সমস্ত কিছই যেন জীবন্ত-
প্রাপবন্ত হয়ে ফটে ওঠে।

গ্র্যান্টিকে ৩০৮ পাতার ঝকঝকে ছাপা
বাধাই বইখানিতে মাঝে মাঝে ছবির সংযোজন
আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

আখের স্বাদ নোনতা: সৌরীন সেন।
মৈত্র প্রকাশনী; ২৬।২বি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-১। মূল্য: নয় টাকা।

উপন্যাস নয়, কাহিনী নয়, এমন কি ভ্রমণ
কাহিনী একে বলতে হলেও এর জাত আলাদা,
স্বাদ পৃথক। 'আখের স্বাদ নোনতা' পড়তে
পড়তে এ্যালভারজের কণ্ঠে যেন শুনতে
পাই 'নোনা অশ্রু জলে আখ তুমি এত মিষ্টি
কেন হলে।' এত শব্দ পাবলো নেরদার
প্রতিধ্বনি নয়, কৃষকজীবনের বাস্তব রূপ।
'আখের স্বাদ নোনতা'র প্রতি পৃষ্ঠায় তার
চাঙলাকার স্বাক্ষর। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও

॥ জয়ন্তী সেন ॥

তাই সেই তথাকথিত ভাগ্যবানদের দলে পড়েন
না, ষাঁরা সচিহ্ন গাইড বুক দেখে কিংবা রূপসী
গাইডদের সাহায্যে বিচিত্র ভ্রমণের তথ্যমূলক
বিচিত্র সৌন্দর্য মূল্যবান ব্যাগ ভরে দেশে ফিরে
লেনেন ভ্রমণকাহিনী। সৌরীন সেন সে চেষ্টা
করেন নি। অবশ্য তাঁর লেখার স্টাইলে
স্বতঃসিদ্ধ রস ও বেদনার ফল্গুধারা প্রবহমান।
কিন্তু কাহিনী যে আরো ভরস্কর। কেন না
তার কোনোটিই মিথ্যা নয়, নয় অতিরঞ্জিত।
যে কিউবা আন্ত সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী
মানুষের প্রেরণামূলক, প্রতিবিলম্বীরা যেখানে
বিদেশী অর্থে পৃষ্ঠ হলে অনর্থ সৃষ্টি করতে
চায়—তার আছে নিপুণ আলোচনা। কিউবার
ধনীত হয় ফিদেল কাস্ত্রো জিন্দাবাদ! কিন্তু
লেখক কোনো গোড়ামিতে তাঁকে হিরোও
বানান নি। বরং জনচিন্তের প্রত্যক কাস্ত্রোর
কর্মকাণ্ডের বাস্তব মূল্যায়ন করে তাঁর
অতুলনীয় নেতৃত্বকে প্রমত্ত করে তুলেছেন।
অবশ্য কাস্ত্রো সেখানে একা নন; তাঁর
সহচররাও কিউবার আদর্শ রচনায় ও স্বাধীনতা
রক্ষায়, কিউবার জনকল্যাণ ও প্রতিবিলম্বী-
দের ধ্বংসমূলক কাজকে পর্যবেক্ষিত করতে কম
সক্রিয় নয়। তবে এই দেশ বৃহত্তর রাজনীতির
শিকার। কেননা পানামা বর্তী দেশের মানুষ
না জানি কখন কিউবার আদর্শকে অনুসরণ
করে ফেলে। সেই ভয় বড়ই ভরস্কর। তবে
ধনতন্ত্রের বিন্যাস হৃদয়মুগ্ধ করে ধ্বংস পড়বে
একদিন সেই ভয়ের পথেই।

শ্রীসেন কিউবার গঠনকর্মে নেতৃত্বের
অসামান্য প্রয়াসের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কালো টাকা ত' সেদেশেও ছিল। ছিল
ক্রোড়পতি। কিন্তু কী আশ্চর্য নেপাংগে সবই
আজ জনগণের হাতে। এ থেকে যেন আমাদের
শেখবারও অনেক কিছু আছে।

লেখক শব্দ কিউবার বিপ্লবের কথাও
বলেন নি, সেই সংগে ল্যাটিন আমেরিকাকেও
চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন
নিকটবর্তী রাষ্ট্রের অর্থলিপ্সা সেই সংগে
ল্যাটিন আমেরিকার কৃষক ও শ্রমিক জীবনের
অসীম দারিদ্র্য। 'পানামা' খালের ঘটনা পড়েও
চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। মনে হয়, এ সব
জায়গায় বিপ্লব একদিন আসবেই ইতিহাসের
অমোঘ নিয়মে।

'আখের স্বাদ নোনতা' আত্মপ্রচারমূলক
ভ্রমণকাহিনী নয়, বরং এ বই পড়ে আমাদের
চৈতন্যে নতুন চিন্তা যোগায়। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-
পটে খালেদ চৌধুরীর বলিষ্ঠ শিল্পমূর্তি
সুন্দর। গ্রন্থটিতে একটি মানচিত্র থাকলে
ভালোই হতো।

মুন বেলাভূমি: মৃণাল বসুচৌধুরী।
সাহিত্য: ১৮ পম্পপুকুর রোড, কলিকাতা-২০,
মূল্য: দু' টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় কিছু কিছু
ভরস্ক কবিকর্মের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।
আধুনিক কবিতার পাঠকসংখ্যাও যে ক্রমশ
বেড়ে চলেছে কবিতার বই ও কবিতা পত্রিকার
নিত্য নতুন আত্মপ্রকাশ সে কথাকেই সোচ্চার
কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গতানুগতিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হবে
সাম্প্রতিক ভরস্ক কবিদের কাব্যচিন্তায় নতুন
করে কিছু বলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
যদিও সে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি—জগৎ ও জীবন
সম্পর্কে অনুভবের সম্পূর্ণতা ও বিশুদ্ধ
কতদূর প্রসারিত তা প্রশ্নাতীত নয়, তবে
আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ভরস্ক কবি মৃণাল বসু-
চৌধুরী বিষাদ-বিষমতার অ- ক্রান্তিক
অনুভব করছেন, এবং ভবিষ্যৎ-র পথকে
তিনি প্রশস্ত করে তুলবেন বলে মনে হয়।

শাল্মলি-মালিকা: শ্রীযতীন্দ্রনাথ শর্মা-
মজুমদার কাব্যবিনোদ। বেহালা শিক্ষায়তন,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪, মূল্য: দুই টাকা।

সব কিবই যুগ-যুগের কাতর নান, এমন
কি প্রাচীন কাব্যধর্মেও আজো বিশ্বাসী। এঁরা
তবু জীবনধর্মে নিঃশব্দ নন। এঁদের কবিতা
পড়ার মতো বাংলা দেশে যদি পাঠক থাকে, তা
কি অন্যায় হবে? শাল্মলি-মালিকা উত্তর
আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সাদরে অভিযোজিত
হয়েছে। মূখবন্ধে সে স্বীকৃতি রয়েছে।
শাল্মলি-মালিকা'র কবিতাগুলি পাঁচ খণ্ডে
বিভক্ত। পৌরাণিক কাহিনী থেকে বর্তমান
রাজনীতি—কিছই বর্জিত হয় নি। 'ফর্ম'
ও 'কন্টেন্ট' নিয়ে যাদের তর্ক নেই তাদের
এ বই ভালো লাগবে।

আবার দু'দলের পরখানী পাঠ করে
জাহান-আরা দিশেহারা হয়ে উঠলেন। ইচ্ছে
করছিল গলা ফাটিয়ে বিশ্বভূবনকে আপন নব
লক সম্পত্তির কথাটুকু জানিয়ে দিতে। কুমারী-
জীবনে প্রথম প্রেমপত্রখানা ঠিক প্রিয়জনের
প্রথম চুম্বনেরই সাক্ষী। ইচ্ছে করছিল নতুন
স্ববাই লিখতে। সূফী কবিদের সঙ্গীত ছাড়িয়ে
দিগ্বীপের সম্রাটনন্দিনী চাঁপাকলি আঙুল নাচিয়ে
জাহান-আরা নতুন কবিতা লিখতে বসলেন
তাপন প্রেমরূপদের উদ্দেশ্যে।

গোলাপ হয়ে ফুটলো আজি
আমার রিক্তবন
আনন্দ কোমলরহত শব্দ
নুড়ে আমার গলা



স্ববাই লেখা হলো। শব্দকে উঃ
কোথায় সেই রক্তশ্রমে পারাবত? শব্দেছেন
সম্রাটনন্দিনী পারাবতশব্দ কোনদিন বহন
করেছে প্রিয়জনের শব্দবার্তা। দিল্লীর লাল-
কেরা থেকে সেরা চলেবে না। হতে আওর-
কেরা থেকে চারিদিকে। নজবখান ভাঙে
আঙুল করে চলেছে ঠিক একটা প্রেতের ছায়ার
জতন। প্রয়োজন নেই। সূফী কবিরাই
হলেছেন অন্তর দিল্লী চিন্তা করলেই সে
চিন্তার তরঙ্গ আপন প্রিয়জনের মনের গহনে
গিয়ে আপনি শোঁছার।

জাহান-আরা বেগম আর একটা স্ববাই
লিখতে বসলেন—

“কে আসে? এ দূর বনানীছায়ে
বাজে কার পদধ্বনি?
আমি যে বসেই শব্দ তাঁরি লাগি—
প্রতিকল্প গঢ়ি
এ হৃদয় কমলদলে সে ভ্রমর একদিন
আসিবে যে জানি ...

জাহান-আরা জীবনে এত আনন্দ কখনও
অনুভব করেন নি। ভাষা যেন আপন ম্বতঃ-
স্কর্ত পতিভেই নেচে আসছে। তাঁর স্ববাই
লেখা কখনও হয় নি এত মধুর—

ফুটেছে আমার অঙ্গনে রজনীগন্ধা
ঝরেছে স্ববাস নবীন অলকানন্দা
আমার বাগানে ফুটেছে আজ যে শতকুল
কাহার গন্ধে মনপ্রাণ মোর এত আকুল?
বলতে পারো কেউ নামটি?

হৃদপাল বৃন্দীশাল। দু'দলো। একটি
কবিমনের কবিতা। সম্পূর্ণ কবিতা। যার
ছন্দ, মাত্রা চালাচ্ছে আরেকটি কবিতাকে
আপন প্রেমবার্তিতে। সূফীর আলোর যেমন
নিম্নোক্তাসিত চন্দ্রছটা!

আরত-ই-গুলাবের গন্ধে চারিদিক মোহিত
হয়ে উঠলো। এ আতরের সাথে মোগলের
রক্তপ্রবাহের একটা আপন আপন ভাব মাখানো
আছে। সেলিম-সকিনী নুরজাহাঁ শব্দ
জগতের আলো ছিলেন না। রচীতে ছিলেন
অবিতীয়া। আতর মাখলেই নুরজাহাঁ কণ

মনে পড়ে কেন? কেন মনে পড়ে সেলিমের
প্রেমধন শব্দমািমনির না-দেখা দৃশ্য?

সমস্ত কাঁচুলীখানা আতর-ই-গোলাবে প্রায়
ভিজিয়ে ফেললেন জাহান-আরা। সত্য কি
প্রেম ছিল। দু'জনার মাঝে আসে নি কোনো
দিন কোন বিরহ।

একদিন নুরজাহাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে হুকুম
দিলেন নতুন গন্ধে মানপাঠ ভরে দিতে।
মানপাঠ মানে একটা হউজ্—মানে একটা
পুরোদস্তুর সুইমিং গুল। জাহাঙ্গীর ছিলেন
সৌখীন রসজ্ঞের রাজা। নানা গন্ধে হউজ্
ভরেও মন ভরে না। নুরজাহাঁর চাই নিত্য-
নতুন মনমাতানো গন্ধ। একদিন জানের ঠিক

ভরে না। সমস্ত জগৎ ভাসছে একটা নতুন
পদার্থ—অনেকটা যেন তেলের মতন। গন্ধ
মন নেচে ওঠে।

সম্রাট শুনলেন।

স্ববাই এসে দেখলেন। নতুন পরাধী
কিছুই নয় — আতর। গোলাপের নিশা।
সেইদিন থেকে দু'নিয়ার প্রসাধনে স্ববই হাথ
একটি নতুন নাম—আতর-ই-গোলাব।

সেই আতর।

কাঁচুলীটার প্রবর্তনও করেন এই মহীরদা
নারী। রক্তআবরণী।

এই কাঁচুলীখানা এসেছে দু'দলের চিঠির
সহে। কাঁচুলীটা আরও কাছে টেনে ধরেন
জাহান-আরা। যেন ফুলশয্যার রাতের প্রথম
চুম্বন। কাঁচুলীর প্রচ্ছদভাগ ঘন লাল রেশম
জড়ানো। তাতে রয়েছে পদ্মরাগ মণি দু'জো
আর প্রবাল।

এ পদ্মরাগ মণির দাম সম্রাট শাহ জাহানের
রাজকোষে আছে কি?

দরিয়া বেগম কখন নিষ্পত্তি হয়ে পড়েছে
কে জানে?

অলিন্দ-পাশে জুলাছে নীলাভ প্রদীপ।
যেন অস্তগামী চাঁদের আলোর প্লাবন শেখ
দ্যুতি।

প্রাণভরে জাহান-আরা আশীর্বাদ জানান
প্রিয় সহোদর দারাকৌকে। খোদাতালা তাঁর
দীর্ঘজীবন দান করেন। জাহান-আরার
জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে এ একটি

প্রীববেকরজন ভট্টাচার্য

অবপক্ষ পূর্বে সম্রাটকে হুকুম দিলেন তাঁর
হউজ্-টা ফুটন্ত গোলাপ দিয়ে ভরিয়ে দিতে।

মোগল বাগানে গোলাপের অভাব?

দু'নিয়ার সেরা গোলাপ সোঁদন ফুটতো এ
বাগানে। মুহুর্তে গেল হুকুম। সম্রাটের
হুকুম সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গোলাপ চরনের।
জীবন্ত গোলাপের দল নিয়ে গেল ফুলের
রাজা গোলাপ হাত। খাস হউজে পূর্বের
প্রবেশ নিক্ক। সুন্দরীর দল গোলাপের গন্ধে
মেতে উঠলো। ভরা গোলাপের হউজে
দু'নিয়ার আলো নুরজাহাঁ সুন্দর দেখানো
ভাঙ্গিয়ে রান করলেন। রান শেষ হল। মন



জালোবাসার পতাকা

বালদেব দেব

জালোবাসা, তোমার পতাকা আজ কোথায় রাখবো বলে, এই
আকাশে গন্ধক মেখে রক্ত করে,
ঝাতাসে ধ্বনিত অবিশ্বাস।

ভব শরতের নীল অবশ্য দুর্মর দূত,
দুর্ভাগ্যের হৃৎপিণ্ডে বুলেটের তন্ত স্পর্শ, ঘরে
কপমান অন্ধকারে জননীর দু'চোখে প্রদীপ; উঠনো
শিশির শিউলি ভেজে, শালিখেরা বসে না তো ঘাসে।

টপানে দামামা বাজে দ্রিমি দ্রিমি, সাঁওতাল-যুবক সবাই—
দীপ্রহাতে ভেঙে ফেলে লাশপটা, অপ্রেম, ভীতি, বন্য়ার মতন
শতোর্ষি প্লাবিত করে, ধ্বংস করে সৃষ্টির উদ্গাতা।
তোমার পতাকা আজ শরতের দিবা নীলাকাশ।

প্রতিধ্বনি

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

আকাশ এখানে ছাড়িয়ে রয়েছে ফুলে
জলে ভর করে দু'চোখ অশ্রু কাঁপে,
আবছায়া মন নাম লিখি সংক্ষেপে।
কি যেন পেয়েছি, কি যেন পাই নি ভুলে
সত্য কি তাই? আকাশ ঢেকেছে ফুলে।
চরণের মূলে রেখেছি পদধ্বনি
যদি তো ছিলোই আমার ছিল না বাসা,
ঘাতকের সাথে ছোরা হাতে সন্ধানী
পিছে পিছে ঘোরে ছায়া ছায়া জালবাসা।
আমরা এখানে রয়েছি কেমন করে
যদি বেঁধে বার মাস।
জায়গা ও জমি সব হয়ে গেছে খাস
যদি ছেড়ে যেতে কেবল চাবুক মারে।
তবুও এখানে রয়েছে কি করে মারে?

নেকের ইচ্ছার ওপর শব্দ — শাহ বুলন্দ
একবাল — ভাগ্যবান শাহজাদা-দারাগিহো।

ভাবতেও বুকটা কেঁপে উঠছে। ফুলশয্যার
রজনী আসবে তাঁর জীবনে। আকাশের
অন্ধকার ভেদ করে হেসে ওঠে চাঁদ, তাঁর
জীবন পূর্ণ করে প্রেমধন করে জ্বলবে
হুলেরা। সেজন্য চাই শাহজাদার আশীর্বাদ
— তাঁর সহায়তা, তাঁর হুকুমনামা।

গরা বলেছেন সিংহাসনে বসেই তিনি
শত্রু আকবরের হুকুমনামার পরিবর্তন
জানবেন। সম্রাট আকবর হুকুম দিয়েছেন
সম্রাজ্ঞের বাদশা বেগমের বিবাহ নিষিদ্ধ।

কি কঠোর বিধান।

আকবর ভেবেছিলেন বাদশা বেগম যদি
সম্মতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হোন না কেন,
সিংহাসনের প্রতি তাঁর লোভ থাকবেই। তা
হাড়া তাঁর দাবিটাও নেহাৎ অগ্রাহ্য করা সহজ
হবে না। তা হোক না কেন। জীবনে

সম্পত্তি প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য বৈভবই কি সব?
সিংহাসন আরোহণই কি মানুষের জীবনের
সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা?

জাহান-আরা রাতের পর রাত দ্বারার
সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দরদী
দারা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন দিল্লীর
সিংহাসনে বসেই তিনি এ কঠিন কানুন
কেটে দেবেন।

দিল্লীর লালকোয়ার আরোখার মস্ত
অলিঙ্গ কসে গভীর নিশীথে সুন্দরী কবি
জাহান-আরা জেগে জেগে দিবাসবনে বিভোর
হয়ে পড়লেন।

কচিলার পাশে রাখা চিঠিখানা আবার
খুলে পড়লেন। দরিয়া, দরিয়াম, গুলশন
কেউ পাঠে নেই। এমন অবসর আর কখন
জুটবে?

কিন্তু এঁক?

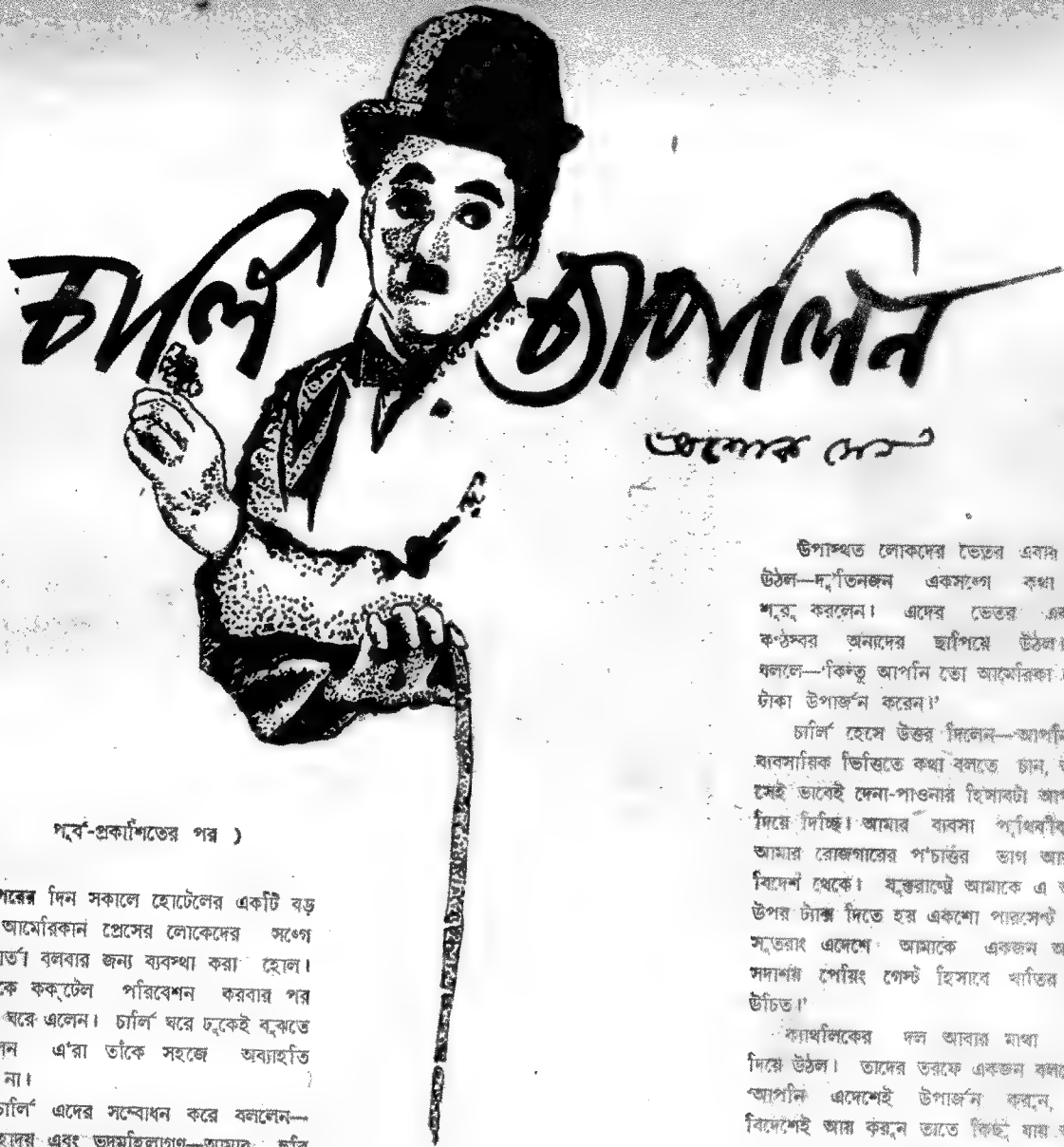
এতবার এ চিঠি পড়া হলো। এ ছোট্ট

ছন্দহীনতা তো এতক্ষণ তাঁর কানে বেঁধে
নি। এ কি লিখেছেন দুলেরা, “মোগল রাজ-
কুমারীর আলোখ সংগ্রহে চৌহান রাজপুতের
চিহ্ন শোভা পাবে কি?”

এ কি কথা? এ কি ছন্দপতন? চৌহান
রাজপুত বলে কি মোগল হুময় দুমার তাঁর
কাছে কখনও বন্ধ হতে পারে?

আপন অজানায় নীল সিন্ধু প্রদীপের
পাদদেশে আনন্দ-বেদনার ভার মাথায় নিয়ে
ধূমিয়ে পড়লেন রূপসী কবি সম্রাটনন্দিনী
জাহান-আরা। মরণে আর শয়নে যেখানে
পৌঁছে সবাই হয় সমান।

অদূরে শব্দভাষা মৃদুভাবে কেঁপে
উঠলো। শেষ রাত্তিরে চলছিল রাতের
পাখির দল। চাঁদনীচক্রে লোকের পদধ্বনি
থাকে শোনা। রজনীর সাথে দিবসের স্রোত
দেঁরি নেই।



(দুর্ভাগ্যবশতের পর)

পরের দিন সকালে হোটেলের একটি বড় ঘরে আমেরিকান প্রেসের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য ব্যবস্থা করা হোল। সবাইকে কফি পরিবেশন করবার পর চার্লি ঘরে এলেন। চার্লি ঘরে ঢুকেই বক্তৃতা পারলেন এঁরা তাকে সহজে অব্যাহতি দেবে না।

চার্লি এদের সম্বোধন করে বললেন— ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ—আমার ছবি—এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আপনারা যদি কিছু জানতে চান, আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। চার্লি মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করবেন না।

স্বামনের সারির এক মহিলা রিপোর্টার এবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি কমিউনিস্ট?

শেষ জোর দিয়ে চার্লি বললেন—“না”।

এরপর এক ভদ্রলোক মিন্ মিন্ করে একটি ম্যানসক্রিপ্ট থেকে কি পড়তে লাগলেন।

‘কমা করবেন—আর একবার পড়তে হবে—আমি আপনার একটি কথাও শুনতে পাই নি’—বললেন চার্লি।

লোকটি ফের শুরু করলো—‘আমরা ক্যাথলিক ওয়ার ভেটেরানস্‌রা.....’

চার্লি বাধা দিয়ে বললেন—আমি এখানে ক্যাথলিক ওয়ার ভেটেরানস্‌দের কোন প্রশ্নের

জবাব দিতে আসিনি; এটা একটা প্রেস মিটিং।

‘আপনি এখন পর্যন্ত আমেরিকার নাগরিক হননি কেন?—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

‘এখন পর্যন্ত ন্যাশনালিটি বদলাবার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। নিজেকে আমি পৃথিবীর নাগরিক হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত’—জবাব দিলেন চার্লি।

উপস্থিত লোকদের ভেতর এবার গুঞ্জন উঠল—মুর্খতাজন একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। এদের ভেতর একজনের কণ্ঠস্বর অন্যদের ছাপিয়ে উঠল। সে বললে—‘কিন্তু আপনি তো আমেরিকা থেকেই টাকা উপার্জন করেন?’

চার্লি হেসে উত্তর দিলেন—‘আপনি যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কথা বলতে চান, তাহলে সেই ভাবেই দেনা-পাওনার হিসাবটা আপনারকে দিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্যবসা পৃথিবীব্যাপী। আমার রাজস্বের পঁচাত্তর ভাগ আর হয় বিদেশ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে এ আমের উপর ট্যাক্স দিতে হয় একশো পারসেন্ট করে। সুতরাং এদেশে আমাকে একজন অভ্যস্ত সদাশয় পেরিং গেল্ট হিসাবে খাতির করা উচিত।’

‘ক্যাথলিকের দল আবার মাথা চাট্টা দিয়ে উঠল। তাদের তরফে একজন বললেন—‘আপনি এদেশেই উপার্জন করেন, কি বিদেশেই আর করুন ভাতা কিছু যায় আসে না। আমরা ধারা ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ লড়েছি।—তারা আপনার এ দেশের আ-নাগরিকত্বের ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করি না।’

চার্লি—‘শুধুমাত্র আপনারাই ঐ সব সমরক্ষেত্রে যুদ্ধে যান নি। আমার দুটি ছেলেও প্যাটনের সৈন্যদলে ফ্রেঞ্চে গিয়ে যুদ্ধ করেছে—কিন্তু আপনাদের মত তারা ঐ কারণ দেখিয়ে অন্যকে এক্সপ্লোয়েট করবার চেষ্টা করছে না।’

‘হান্স আইসলারকে আপনি জেনেন?’

—এ প্রশ্নটি করলেন আর একজন রিপোর্টার।

‘তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একজন বিরাট সংগীতজ্ঞ’—জবাব দিলেন চার্লি।

‘আপনি কি জানেন তিনি কমিউনিস্ট?’

—জিজ্ঞেস করলেন অপর একজন।

‘তিনি কি তা জানবার আমার দরকার নেই। কার কি রাজনীতিক মতবাদ—তার উপর নির্ভর করে আমি কখনো সঙ্কল্প বন্ধ করি না।’

এই ধরনের ভিত্তি কথাবার্তার আদান-

প্রদর্শন আরও কিছুক্ষণ ধরে ইন্টারভিউ চললো। মিটিং শেষ হবার পর চার্লি বেন ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি বেশ ব্যস্তে পারছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক ধরনের শত্রুতা সূর্য হঠাৎ করে শুরু হয়ে।

চার্লি কিন্তু তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সবাই তাঁর এত বিরুদ্ধবাদী হয়ে গেছে। তখনও দি গ্রেট ডিক্টেটর ছবিটি সম্পর্কে সম্বন্ধমা জানিয়ে বহু চিঠি তাঁর কাছে আসছিল। এ ছবিটি থেকে আরও হয়েছিল প্রচুর—এবং ছবিটি সম্পূর্ণ হবার আগেই অনেক ধরনের বিরাট সমালোচনা এবং বিকৃতী পাবলিসিটি চলে ছিল গ্রেট ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে। তবুও ছবির সাফল্যের বা জন-প্রিয়তার কেউ বাধা দিতে পারে নি। তাছাড়া মালিক ডাদার সাফল্য সম্পর্কে চার্লি এবং ইউনাইটেড আর্টিস্টের সবাই একেবারে দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে বসেছিলেন।

ম্যারী পিকফোর্ড টেলিফোন করে জানালেন তিনি উন্য এবং চার্লির সঙ্গে উল্লেখ্য রজনীতে ছবিটি দেখতে যাবেন। চার্লিও তাঁকে নৈশ-আহারের জন্য নেমন্তন্ন জানালেন।

চার্লির মন প্রেক্ষাগৃহের কাছে এলেন, চারদিক একেবারে লোক গিস্গিস করছে।

সেদিন রাতে থিয়েটার গৃহের পরিবেশটাই কি রকম অ-সহজ মনে হচ্ছিল চার্লির। অন্যান্য সময়ে যখন চার্লির নতুন ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল, দর্শকদের ভেতর একটা উদ্‌গ্রীব প্রতীকার ভাব দেখা গিয়েছে ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত—তাছাড়া প্রত্যেকেই খুশি মনে এবং আগ্রহের সঙ্গে চার্লির ছবিকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। এবারে যেন দর্শকদের দল কি রকম নার্ভাস হয়ে এই ছবিটি দেখতে এসেছে—মাঝে মাঝে হিসিং-এর শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন চার্লি। প্রেসের শত্রুতার থেকে এই ধরনের দু-চারবারের হিসিং-এ অনেক বেশি মর্মান্বিত হচ্ছিলেন চার্লি। ছবি যত এগিয়ে যেতে লাগল চার্লি ততই চিন্তাম্বিত হতে লাগলেন। মাঝে মাঝে হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু এ হাসি সেই আগের হাসি নয়—যে হাসি তিনি শুনছেন গোল্ড-রাল্ফ বা গিসিট লাইটস বা গোল্ডব্রের আর্মসের সময়। এ যেন বার্য হিস্ করছে ভেদের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতা করে প্রতিপক্ষীয়ে হাঙ্গার চেষ্টা করছিল। চার্লি এত অসুখে পড়লেন যে, আর সিতে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ফিস্‌ফিস্ করে উনাকে জানালেন দর্শকদের এ ধরনের ব্যবহার তিনি সহ্য করতে পারছেন না—সুতরাং আর ভেতরে বসে না থেকে তিনি লবীতে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। উন্য তাঁর হাতে অসুভাব চাপ দিলেন।

অবশেষে প্রদর্শনী শেষ হোল। চার্লির

নিরুপস্থিতি আশ্চর্য্যজনক একে বললেন—
—অবশ্য এছবি থেকে টুরেলড মিলিয়ন আয় হবে না...

চার্লি তাঁটার ভাব দেখে জবাব দিলেন—
—তার আর্থিক ব্যাপ্ত হয় সেভাবে ব্যবস্থা করবো।" চার্লি দেউশো লোকের জন্য সাধারণ পাঠির বন্দোবস্ত করেছিলেন—এর মধ্যে কিছু ছিলেন পুরোনো বন্ধুরা। খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছবির সম্বন্ধে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। চার্লির বন্ধু ডন স্ট্রাট—তিনি তখন একটু মত্ত অবস্থায় ছিলেন—বললেন, "চার্লি এ লোকগুলো সব বেজগা, তোমার ছবিটি নিয়ে এরা আসলে রাজনীতি সুরু করেছে।" কিন্তু আমি বলছি এটা সত্যিকার উচ্চ জাতের ছবি, আর দর্শকদেরও ছবিটা ভাল লেগেছে।

এসব শুনেও চার্লির মনে কিন্তু ছবিটির গুণাগুণ সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস আসে নি। তাঁর মনে তখনও দৃঢ় ধারণা যে ছবিটি সবদিক দিয়ে তাঁর একটি সেরা ছবি।

এরপর চার্লি একটু অবকাশই হলেন যখন মর্সিয়ে ডাদা হুস্পতাহ ধরে নিউ ইয়র্কে বেশ ভাল হাউস দিল। এরপরেই বিকি কমে আসতে লাগল। ইউনাইটেড আর্টিস্টের গ্র্যাড লিয়ার্সকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে তিনি চার্লিকে বললেন—
—তুমি যে কোন নতুন ছবি তুললে প্রথম তিন-চার সপ্তাহ প্রচুর লোক আসবে এবং ভাল বিজনেস হবে। কারণ এসব দর্শক হচ্ছে তোমার পুরোনো ফ্যান।

কিন্তু তার পরের থেকেই নিরুপেক্ষ দর্শকদের আসবার কথা—আর দশ বছর ধরে প্রেসের লোকেরা ক্রমাগত তোমার বিরুদ্ধে বিবোদ্যার করছে—সুতরাং তার একটা প্রতিক্রিয়া সূর্য হওয়াটা তো আশ্চর্য নয়—সেই জন্যই এ ছবির বিকি পড়তে শুরু করেছে।

চার্লি জবাব দিলেন—
—কিন্তু সাধারণ দর্শকদের সেস অর্ড হিউমার বলে কি কিছু নেই?"

এবার গ্র্যাড চার্লিকে ডেইলী নিউজ এবং হারল্ড পেপারস দেখালেন। এরমধ্যে একটিতে ছবির মারফতে দেখানো হয়েছিল যে, একটি প্রেক্ষাগৃহে, যেখানে মর্সিয়ে ডাদা দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে, পিকেটিং করা হচ্ছে। পিকেটিংসদের হাতে নানা ধরনের প্রচারপত্র—এক-একটিতে এক-এক ধরনের লেখা, যথা—
"Chaplin's a fellow traveller."
"Kick the alien out of the country,"
"Chaplin's been a paying guest too long."
"Chaplin, the ingrate and communist sympathizer."
"Send Chaplin to Russia..." ইত্যাদি।

যাই হোক যেখানেই বিরুদ্ধবাদী প্রচার হয় নি, সেখানেই মর্সিয়ে ডাদা ছবিটি থেকে ভাল বিজনেস হয়েছে।

ম্যারী জারগা থেকে ছবিটির বিকি হতে লাগল—কিন্তু আনোরকান লিজন এবং অন্যান্য প্রেসের গ্রুপস থেকে ভীতি প্রদর্শন করে এসব জারগার চিঠি লেখা হতে লাগল শো বাতিল করে দেবার জন্য। একজিবিটার-লেক ডক্স দেখানো হোল। যে থিয়েটারে চার্লির ছবি দেখানো হবে সে থিয়েটারকে এক বছরের জন্য বয়কট করা হবে। ডেনভারে এক রাতের জন্য মর্সিয়ে ডাদা দেখানো হয়েছিল এবং সে রাতে প্রচুর বিজনেস হয়—কিন্তু পরের রাতে ভয় দেখানোর ফলে ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই সবের ফলে ডাদা থেকে ১২,০০০,০০০ ডলার পাবার আশা ত্যাগ করতে হোল। ফলে ইউনাইটেড আর্টিস্ট কোম্পানী পড়ল বিবম বিপদে। খরচ কমানোর জন্য ম্যারী পিকফোর্ড চাইলেন চার্লির প্রতিনিধি আর্থার কেলীকে বরখাস্ত করতে। চার্লি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কোম্পানীর অধীক মালিকানা স্বত্ব তাঁর—সুতরাং চার্লির প্রতিনিধিদের সরাতে হলে, ম্যারীর প্রতিনিধিদেরও সেই সঙ্গে সরাতে হবে। এ নিয়ে যখন কোল্ড সন্মাদানে আসা যাচ্ছিল না তখন চার্লি বললেন—
—আমাদের মধ্যের একজনের উচিত অন্যের শেয়ার কিনে নেওয়া, বা নিজেরটা বেচে দেওয়া। কি দামে তুমি শেয়ার বেচেতে চাও বল।" কিন্তু দুজনের কেউই শেয়ারের দাম বলতে রাজী হলেন না।

শেষে এক ইন্সটান সারকিট অভ থিয়েটারসের তরফে এক আইনজ্ঞের কার্ম এসে একটা প্রস্তাব দিলেন। এ দলটি কোম্পানীর কন্ট্রোল চাইছিল এইভাবে : তারা চার্লিদের ১২,০০০,০০০—৭,০০০,০০০ নগদ দেবেন এবং ৫,০০০,০০০ ডলারের স্টক থাকবে কোম্পানীতে চার্লিদের। চার্লির মনে হল ইন্সবরের কৃপাতাই এ প্রস্তাবটা এসেছে।

চার্লি ম্যারীকে বললেন—
—আমাকে এখনি পাঁচ মিলিয়ন নগদ দিয়ে দাও, আমি সরে যাচ্ছি—যাকী টাকাটা সমস্তই হবে তোমার। ম্যারী এবং কোম্পানীক অন্য সবাইও এ প্রস্তাবে রাজী হল।

অনেক কথাবার্তা এবং চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চললো, ডুকুনেটস্ তাঁর হোল। চার্লির লাইয়ার একদিন কোনে বললেন—
—চার্লি আর দশ মিনিটের ভেতরই তুমি পাঁচ মিলিয়নের মালিক হতে যাচ্ছ।" দশ মিনিট বাদে আবার তাঁর কোন এল—সব ভেঙে গেল।" কলম হাতে নিয়ে সই করতে গিয়ে ম্যারী থেমে গিয়ে হঠাৎ বললেন—
—না, কেন চার্লি এখনই পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাবে, আর আমাকে নিজের টাকা পেতে দু বছর অপেক্ষা করতে হবে?" ম্যারীকে বোকাবার চেষ্টা করা হল যে, এই অপেক্ষা করবার জন্যই তিনি দু মিলিয়ন ডলার বেশি পাবেন। কিন্তু

মারী ওজর দেখাতে লাগলেন যে, এর ফলে তাঁর ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে অনেক সমস্যা দেখা দেবে।

এইভাবে একটা স্বর্ণসুযোগ হারাতে হল এবং পরে অনেক কম দামে চার্লি'র কোম্পানী বেচতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এরপর ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এলেন চ্যাপলিন। ম'সিয়ে ডাদুর অসুস্থতাপূর্ব তভাবে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এর খবরাটাও সম্পূর্ণভাবে সামলে নিয়েছেন চার্লি এতদিনে। সুতরাং আবার নতুন ছবির বিষয়ে নানা ভাব-খায়া মনের পদাঘ উকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। এই সময়েও চার্লি পুরোমাত্রায় আশাবাদী— তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না যে আমেরিকান জনসাধারণের স্নেহদৃষ্টি থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। সাধারণ আমেরিকান নাগরিকেরা রাজনৈতিক কুপ-মুচুকতার দ্বারা চালিত হয়ে, সম্পূর্ণভাবে হাস্যরসানুভূতির ভাবটা অন্তর থেকে বর্জন করে ফেলেছেন—একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না চার্লি। একটা ছবির আইডিয়া তাঁর মাথায় এল—সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ভাগিদ আসতে লাগল এর চিত্রগ্রহণ দিতে হবে—ফল যাই হোক তার জন্য আজীবনে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। পৃথিবী যতই আধুনিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চক্ষু আবরণের দ্বারা সজ্জিত হোক না কেন, চিত্রকল প্রেমের গল্প শুনতে ভালবাসে। হ্যাঙ্গলিট বলেছেন মানুষের হৃদয়ে বৃষ্টির থেকে স্টিমট্রেনের আবেদন অনেক বেশি এবং শিপের ক্ষেত্রে এর অবদানও বৃহত্তর। চার্লির ছবির আইডিয়াও প্রেমের গল্পের ওপর ভিত্তি করে। তাছাড়া ম'সিয়ে ডাদুর সিনিক্যাল পোস্টিমজমের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারার ছবি হবে এইটি। তারপর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এ ছবির বিষয়বস্তু এবং চাবখায়া চ্যাপলিনকে ওরানকভাবে উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

লাইমলাইটের প্রভূত্বতপর্বেই জন্য অঠারো মাস সময় লাগল। এ ছবির নায়কর ভেতর যে সব গুণের সমন্বয় চার্লি খুঁজছিলেন তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল—চার্লি চাইছিলেন যে, মেয়েটির ভেতর থাকবে সৌন্দর্য, প্রতিভা এবং প্রচণ্ড ভাবাবেগ। মাসের পর মাস খুঁজে খুঁজে হসরান হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধু আর্থার লরেন্সের সুপারিশমত পেয়ে গেলেন ক্রেয়ার রুমকে। সবাই জানেন এই ক্রেয়ার রুম আশ্চর্য অভিনয় করেছেন লাইমলাইট ছবিতে।

এই ক্রেয়ার রুমকে পরে (১৯৬৬-৬৭ সালে) লন্ডনের ওল্ড ভিক থিয়েটারে বহু নাটকে আমি অভিনয় করতে দেখেছি। কিন্তু লাইমলাইটে তাঁর অভিনয় যে হাইটে উঠেছিল তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না তাঁর ওল্ড ভিকের অভিনয়ের। এর থেকে এই কথাটাই শুধু আমার মনে হয়েছে যে, চার্লির

মত ডিরেক্টরের হাফ শর্টেই ক্রেয়ার রুম অভিনয়ের একটা চরম পরাকাত্য দেখাতে পেরেছিলেন লাইমলাইটে।

ইতিমধ্যে উনা এবং চ্যাপলিনের চারটি সন্তান হয়েছিল—জেরালডিন, মাইকেল, জিসি এবং ভিকি। বেভারলে হিলসে বেশ সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন চ্যাপলিন-দম্পতি। রবিবার বন্ধু-বান্ধবেরা আসতেন এবং সবার সঙ্গে গল্পগুজবে ভারি আনন্দ কাটতো।

লাইমলাইট তোলা শেষ হয়ে গেল। এ ছবির সাফল্য সম্বন্ধে চার্লির মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের জন্য একটা প্রাইভেট শো করা হোল—সবাই ছবি দেখে দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। চার্লি'র ভাবছিলেন এবার একবার ইউরোপ ঘুরে আসবেন। উনার ইচ্ছা ছেলোপেলেরা ইউরোপের স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করে—তাহলেই হলিউডের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত রাখা যাবে।

এর তিনমাস আগে চার্লি এংলাই করেছিলেন রি-এনট্রি পারমিটের জন্য—কিন্তু তখন পর্যন্ত কোন উত্তর আসে নি। তা সত্ত্বেও বেড়াতে বের হবেন ধরে নিয়েই চার্লি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারাদির বিধিব্যবস্থা করতে মন দিলেন। ট্যাক্সের ব্যাপারেও কাগজপত্র দাখিল করা হয়ে গিয়েছিল এবং ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও চার্লি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল রেভিনিউ সার্ভিস যখন জানতে পারলো যে চার্লি ইউরোপ যাচ্ছেন, তাবা আবিষ্কার করে ফেললো যে, ট্যাক্স রানদ চার্লির কাছে তাদের আরও টাকা পাওনা আছে। ছয় ফিগারের একটি অঙ্কও তারা তৈরি করে ফেললো—তারা দাবি করলো ২,০০০,০০০ ডলার। চার্লি জমা রাখলেন—যে নতুন টাকার অঙ্ক তারা পাওনা বলে তৈরি করেছিল, জমা দেবার অঙ্কটা তার দশগুণ বেশি। চার্লির ইনস্টিটিউট সেন চার্লিকে উপদেশ দিল এক পরমা জমা না দিতে এবং ব্যাপারটা অবিলম্বে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। এর ফলে খুব তড়াতড়াই একটা অল্প অঙ্কের টাকাত সেটলমেন্ট হয়ে গেল। জার ট্যাক্সের দাবি না থাকতে চার্লি ফের রি-এনট্রি পারমিটের জন্য এংলাই করলেন। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবার পরও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এর পর চার্লি ওয়াশিংটনে চিঠি লিখে জানালেন রি-এনট্রি পারমিট না পেলেও তিনি ইউরোপের দিকে রওনা হবেন।

সপ্তাহখানেক বাদে ইমগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে টেলিফোন এল যে, তাঁরা চার্লিকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে চান। এজন্য তাঁরা চার্লির বাড়িতে আসতে চাইলেন।

চার্লি জানালেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা এসে হাজির হলেন—মহিলার হাতে

একটি ছোট টাইপরাইটার ছিল। অন্যদের হাতে ছোট ছোট ট্রিক্‌কেস—বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাতে টেপ রেকর্ডিং মেশিন আছে। প্রধান প্রশ্নকর্তাটি ছিলেন রোপা লম্বা ধরনের, বয়স প্রায় চত্বিশ, সুন্দর চেহারায় মুখে বিচক্ষণতার ভাব। চার্লি বুঝছিলেন এই প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে তাঁর অবস্থা ফের টু ওয়ানের মত—তাঁর উচিত নিজের লাইয়ারকে সামনে রেখে কথা বলা—আবার ভাবলেন তিনি তো কিছু লুকোচুরি করতে যাচ্ছেন না।

চার্লিকে প্রশ্ন করা হোল—‘চার্লি চ্যাপলিন কি আপনার আসল নাম?’

উত্তর—‘হ্যাঁ।’

প্রশ্ন—‘কেউ কেউ বলে আপনার নাম হচ্ছে—(এখানে একটা বিদেশী নাম বলা হয়েছিল) এবং আপনি গ্যালিসিয়ার অধিবাসী।’

উত্তর—‘না। আমার নাম চার্লস চ্যাপলিন, আমার বাবারও এই একই নাম ছিল, এবং আমি জন্মগ্রহণ করি লন্ডনে।’

প্রশ্ন—‘আপনি কি বলতে চান, আপনি কখনও কমিউনিস্ট হন নি?’

উত্তর—‘কখনও না। জীবনে কখনও কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আমি যুক্ত হই নি।’

প্রশ্ন—‘একটি বক্তৃতা দিতে উঠে আপনি ‘কমরেডস’ শব্দটি দিয়ে শুরু করেন। এর দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?’

উত্তর—‘এ শব্দটিতে যা বোঝায় ঠিক তাই। অভিযানে শব্দটির মানে দেখলেই বুঝতে পারবেন। শব্দটির সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের কোন বিশেষ দাবি থাকতে পারে না। এই ধরনের আর কিছু প্রশ্নের পর হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করা হোল—

প্রশ্ন—‘আপনি কি কখনও এডালটারী করেছেন?’

উত্তর—‘দেখুন, যদি কোন টেকনি-ক্যালিটি সৃষ্টি করে—আমার এদেশে পুনঃ-প্রবেশ বন্ধ করতে চান, তবে স্পষ্ট করে বলুন। আমি সেই অনুসারেই সব ব্যবস্থা করবো। কারণ আমি কোন জায়গাতেই পারসোনা-নন-গ্র্যাটা (অনাস্থাভাজন হয়ে) হয়ে বসবাস করতে চাই না।’

প্রশ্নকারী বললেন—‘তা নয়, পুনঃ-প্রবেশের অনুমতি চাইলেই এ প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।’

চার্লি—‘এডালটারীর সংজ্ঞা কি?’

দুই তরফেই অভিযান দেখার পর প্রশ্ন-কারী বললেন—‘ধরুন যদি বাল, অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা।’

চার্লি—(অল্প চিন্তা করে) ‘জ্ঞাতসারে এ অপরাধ করিনি।’

(রমেশ)

সুপারস্টার

প্রমোদকর ও নাইটক্লাব

বিধানসভায় প্রমোদকর সম্পর্কে আলোচনা এবার বেশ চরমে উঠেছিল। বিরোধীদের অনেক সদস্য যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সরকারী প্রমোদকর নীতির প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা ঘোড়দৌড় এবং মদের দোকানগুলির ওপর করবৃদ্ধি, এমন কি বন্ধ করার কথাও বলেছেন। এই যুক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সদস্যদের কিছু বলার যেমন ছিল না, সাহসও ছিল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী উঠে সরকারের পক্ষে ওকালতি করেছেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্যও তেমন জোর যে ছিল না তা সকলে অনুভব করেছেন।

প্রমোদকরের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের সর্বপ্রথম মনে পড়ে চলচ্চিত্রের ওপর প্রমোদকরের কথা। সরকার ঘোড়দৌড়ের উপর ১৫ শতাংশ কর ধার্য করে বলেছেন এর বেশি হলে দুর্নীতি প্রসার লাভ করবে। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রমোদকরের চাপে এই শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, টিকেট প্রতি ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কর চেপে আছে। করের জন্য টিকেটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে গ্রন্থনমধ্যদের পক্ষে সিনেমা দেখা কিছুটা বিলাসিতা হয়ে উঠেছে। অথচ সস্তায় জনগণের



রেক' ছবিতে ভারতী রায়

আনন্দ উপভোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল সিনেমা। প্রমোদকরের চাপ যে দর্শকের ওপর বেশি সম্প্রতি করমুক্ত ছবি 'রাজা রামমোহন' দেখার জন্য আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়। আট সপ্তাহব্যাপী ছবিটি যেভাবে দর্শক আকর্ষণ করেছে, করমুক্ত না হলে তা মোটেই সম্ভব ছিল না; হয়তো এতদিনে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে বিদায় নিত। এক টাকার স্থলে ১.৪০ পয়সা দিতে হলে গরীব দর্শকদের পক্ষে সিনেমা দেখা বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু আমাদের জনকল্যাণকামী সরকারের নজর চলচ্চিত্রের ওপর যত বেশি পড়ে সেরূপ আর কিছুই ওপর পড়ে না। তাঁরা ঘোড়দৌড় থেকে নাইটক্লাব, সবকিছুকেই ক্ষমার চোখে দেখেন। জানি না নাইটক্লাবগুলিতে তাঁরা জনস্বার্থের কোন চিহ্ন দেখতে পান কিনা! কারণ দীর্ঘদিন থেকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ সত্ত্বেও নাইটক্লাবগুলি প্রমোদকর থেকে রেহাই পাচ্ছে। কলকাতার বৃকে এখন এক ধরনের রেস্টোরাঁ বা নাইটক্লাব গড়িয়ে উঠছে, যেখানে মদ ও তরুণীদের নৃত্য-গীতে সম্প্রদায় আসর জমে ওঠে। বড় বড় হোটেলগুলিতে বিদেশ থেকে নর্তকীর আমদানী হয়। তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দর্শক আকর্ষণ করে। এসব হোটেলের নাচের আসরে যেমন অনেক কালো-বাজারী ও বিত্তবানদের জমায়েতে জন্ম-জমাট হয়ে ওঠে; তেমনি গীত-নৃত্যযুক্ত পানশালগুলিতে শহরের অনেক বৃদ্ধি-জীবী ও সাংবাদিকদের পর্যন্ত দেখা যায়। তাঁরা সম্ভবত এসব স্থান থেকে বৃদ্ধিতে ধার দিয়ে আসেন!

বিশেষভাবে বাংলা সিনেমাকে কিছুটা রেহাই দিয়ে নাইটক্লাবগুলির ওপর যদি চড়া হারে প্রমোদকর ধার্য করা হয় তাহলে শহরে নাইটক্লাবের দৌরাস্ব্য কিছুটা কমবে। অন্তত বর্তমান হারে এত দ্রুত বাড়ার সুযোগ কিছুটা কমবে। এতে সরকারী তহবিলে অর্থ আদায় কম হবে না, অথচ বাংলা সিনেমার ওপর করের চাপ কমান ফলে



লিলি চক্রবর্তী

গরীব জনসাধারণের আনন্দ উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এবং শহরের শালীনতার রক্ষা পাবে। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ঘোড়দৌড়ের ওপর স্বার্থভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু নাইটক্লাবগুলির কথা উল্লেখ করেন নি। নাইট ক্লাবগুলির উপর অবিলম্বে কর ধার্য হওয়া উচিত।

দুর্জন

দ্বিতীয় আলোচনা

সোভিয়েত ছবি

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীমাস উপলক্ষে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির যুগ্ম উদ্যোগে একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে গত ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর দু'টি সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ২২শে প্রদর্শিত হয়েছে ই, কারেলভ পরিচালিত 'হার্ড টাইম', ২৩শে প্রদর্শিত হয়েছে এম. মালিক প্রযোজিত 'লালাবাই'। এ দু'জনই তরুণ পরিচালক।

একদা সোভিয়েত চলচ্চিত্র সারা বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাতলিসিপ পটেমকিন' 'আইভান দি টেরিবল' প্রভৃতি এবং পুডভ-কিনের 'মাদার' ডবকেঙ্কার 'দি আর্থ' প্রভৃতি ছবি বিশ্বের চলচ্চিত্র রসিকদের কাছে বিশ্ময়ের জিনিস। এই ছবিগুলি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি বর্তমানকালেও মার্ক ডনস্কয়, মাইকেল রস, গেরাসিমভ প্রমুখ বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। যে দেশে এমন মহৎ ছবি নির্মিত হয়েছে, যে দেশে

এত বড় বড় পরিচালকের জন্ম হয়েছে; সে দেশের বর্তমান কালের তরুণ পরিচালকদের নির্মিত ছবি দেখলে হতাশ হতে যেতে হয়। প্রশ্ন জাগে সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হলেও চলচ্চিত্রের এই অধোগতি কেন? বর্তমানকালের তরুণ পরিচালকদের চলচ্চিত্রে ক্যামেরার কাজের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, বিস্ময়-কর দৃশ্য গ্রহণে মূগ্ধ হতে হয় কিন্তু সমগ্র ছবিতে অপরিণত চিন্তা ও অসঙ্গতির লক্ষণ স্পষ্ট। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে এতদিনকার ধ্যানধারণা এসব ছবি দেখে আর থাকে না। প্রশ্ন জাগে তাহলে সোভিয়েত সমাজ কি আর দশটি ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজের মত একই গতিতে চলেছে? তরুণ পরিচালকদের ছবিতে ধনতান্ত্রিক দেশের ছবির অনুকরণ অত্যন্ত বিসদৃশভাবে দেখা যায়।

‘থার্ড টাইম’ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে একদল আটক বন্দীদের নিয়ে। নাৎসীরা এই বন্দীদের দিয়ে এক ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিল। খেলাতে নাৎসীরা অন্যর করেছিল এবং খেলার পরে আবার তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে মর্ম-স্পর্শী করে তোলার চেষ্টা করেছে পরিচালক। জেল থেকে বাইরে আসা আর খেলা এই সময়ের মধ্যবর্তীকালে বন্দীদের ব্যক্তিগত জীবনকে দেখান হয়েছে। এই মধ্যবর্তী কালের ঘটনার একটি বিরে, একই শব্দায় রাত্রিবাস, কোন মহিলার ঘরে নাৎসী সৈন্যের রাত্রিবাস, এবং নাৎসীদের সহযোগী রুশ ইত্যাদি চোখে পড়ে। ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ করে যৌনজীবনের আঙ্গিক সৃষ্টিতে পরিচালক পশ্চিমী ছবিকে অনুকরণ করেছেন। জই বিষময় নরনারীকে একই শব্দায় অথবা স্নানাগারে উলঙ্গ দেখা যায়। না গত যুগের সোভিয়েত ছবিতেও দেখা যেতো না।

একই রূপ বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত একটি হাঙ্গেরীয় ছবি ইতিপূর্বে আমরা দেখেছিলাম। তুলনায় সেটি অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী, নাৎসীদের প্রতি ঘৃণাসঞ্চার এবং নির্মাণ-কৌশলে উন্নত ছিল। বর্তমান ছবিটির বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক থেকেও স্পষ্ট নয়। কিন্তু দেশনে এরূপ নিকৃষ্ট ছবি দেখার আশা আমরা করি নি।

দ্বিতীয় ছবি কে, কালিক পরিচালিত ‘জালালাই’ প্রথমটির তুলনায় বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও নির্মাণ কৌশলে উন্নত। এই ছবিতে কয়েকটি মহত্ব সৃষ্টি ও মানসিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে ক্যামেরার কাজ বিস্ময়কর। ই. ক্যারেলভের তুলনায় এম. কালিকের সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের চেতনা বেশি। তিনি আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে সোভিয়েত সমাজকে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর ছবিতে সোভিয়েতের সব মানুষ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, সোভিয়েত সমাজে ডাঙ গৃহস্থ ও হাল্কা



দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ‘মোঁচ’ ছবিতে সম্মুখাঙ্গী ও কানী বামজাঁ

যুবকদের তিনি আড়াল করেন নি। কিন্তু সোভিয়েত সমাজে গভীর মানবতা যোধ তিনি প্রকাশ করেছেন।

গত মহাযুদ্ধের কালে নাৎসীরা এক হাস-পাতালে বোমা ফেলে। এই পরিত্যক্ত শহরে রেড আর্মির একজন সৈনিক শিশুদের উদ্ধার করে আর এক শহরে নিয়ে এসে কয়েকজন অধিবাসীদের বিলিয়ে দেয়—শিশুদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। আঠার বছর পরে সেই সৈনিক খুঁজে বেড়াচ্ছে সৈন্যদের উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশু-দের। তাদের জীবন, তাদের ভাগ্য দেখাব কোতুহলে। এই কোতুহলী অভিযানে সে বহু মানুষের বহু শিশুর সান্নিধ্য লাভ করে, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ছবিতে অসঙ্গতি এবং কিছু বাহ্যিক ইত্যাদি প্রশ্ন থাকলেও মানবিক আবেগনের দিক থেকে ‘জালালাই’ উপভোগ্য।

জাপানী ছবি ‘এটাক স্কোরাজুন’

নিউ এম্পায়ার সিনেমার জাপানী ছবি ‘এটাক স্কোরাজুন’ মুক্তি লাভ করেছে। গত যুদ্ধের শেষভাগের পটভূমিকার একটি স্বীপে জাপানী কোজের দ্রুতসাহসিক সংগ্রাম, তাদের মানসিক অবস্থা ও চিন্তা এই ছবিতে প্রতিফলিত। জাপানী জংগীবাদী শাসকদের অদ্রুতশক্তির জন্য কিভাবে হাজার হাজার যুবক অনর্থক প্রাণ দিয়েছে বিস্ময়কর বিমান যুদ্ধের মাধ্যমে তা দেখান হয়েছে। ছবিটিতে বিমান যুদ্ধের দৃশ্যগ্রহণ ও সম্পাদনা কৃতিত্ব তাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বস্তুত্ব করে তোলা জাপানী চলচ্চিত্রের কলাকৌশলগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

ছবিটির বক্তব্য যুদ্ধ-বিরোধী। যুদ্ধ জাতির জীবনে দুর্ভাগ্য ডেকে আনে; শাসক-

দের ভুল নীতির জন্য ঘরে ঘরে শোকের কালো ছায়া বিস্তার করে। অমৃত মানুষ চার শান্তি-পূর্ণ জীবন ও স্বাধীনতা।

নাটক রচনা

শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা

নাটক ও নাটক্যভিনয় নিয়ে সমগ্র দেশে যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এবং তার সফল অগ্রগতি স্বীকৃতি পেয়েছে—এমন সময় বিস্ক-রূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ নতুন এক পরিকল্পনার হাত দিয়েছেন। এ’রা বাংলার নাট্যক্ষেত্রে শিশু নাটকে প্রভাব ও প্রবর্তনের মানসে শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা বিভাগ গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আগামী ১৫ই জানুয়ারী দৃশ্য আড়াইটা থেকে প্রতি শনিবার মিশ্রপ্রহরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে বিস্ক-রূপার আবেদনপত্র গাওয়া যাবে।

সুড়ি ও গরুর

আর, ডি, বীর পরবর্তী ছবি

প্রযোজক আর, ডি, বনশালের পরবর্তী ছবি ‘মীরব সাকী’ শ্রীতীর্থ চট্টোপাধ্যায় লিখিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা



তাপসী ছবিতে শিউলি মজুমদার ও শিল্পী রায়

করছেন শ্রীমশাল সেন। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীঅজয় কর। 'দীর্ঘ সাক্ষী' একটি অপরাধমূলক কাহিনীচিত্র। বোম্বাই শহর ও শহরতলীতে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মণিহার

সলিল সেন পরিচালিত অরূপ প্রোডাকশন্সের 'মণিহার' ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ছবিটি সূর্য সংযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখার্জী। অভিনয়ে আছেন বিশ্ববিজয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, আশা দেবী, বল্লু গাঙ্গুলী, সুপর্ণা সেন, ভারতী রায়, রবি ঘোষ, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, মণি শ্রীমানি, পাহাড়ী সান্যাল।

তাপসী

শুদ্ধবার, তরা ডিসেম্বর শ্রীবিজয় পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র নবতম নিবেদন 'তাপসী' উত্তরা, পূর্ববঙ্গ ও শহরতলীর আরও ৯টি ছবিঘরে মণ্ডিলাভ করবে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের মণ্ড-সফল নাটক 'তাপসী' অবলম্বনে এই ছবিখানি গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে স্টার থিয়েটারে কয়েক শত রজনী ধরে নাটকটি অভিনীত হয়েছিলো এবং সর্বশ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন করেছিল। জনপ্রিয় পরিচালকগোষ্ঠী 'অগ্রদূত' মণ্ডের ঐ নাটকটিকে চিত্রনাট্যায়িত করেছেন এবং পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছেন। ছবির উপযোগী অতিরিক্ত সংলাপ রচনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত।.....নাটকের চরিত্রগুলি বাতে সুদৃঢ় ও জদমগ্রাহী অভিনয়ের গুণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার জন্য



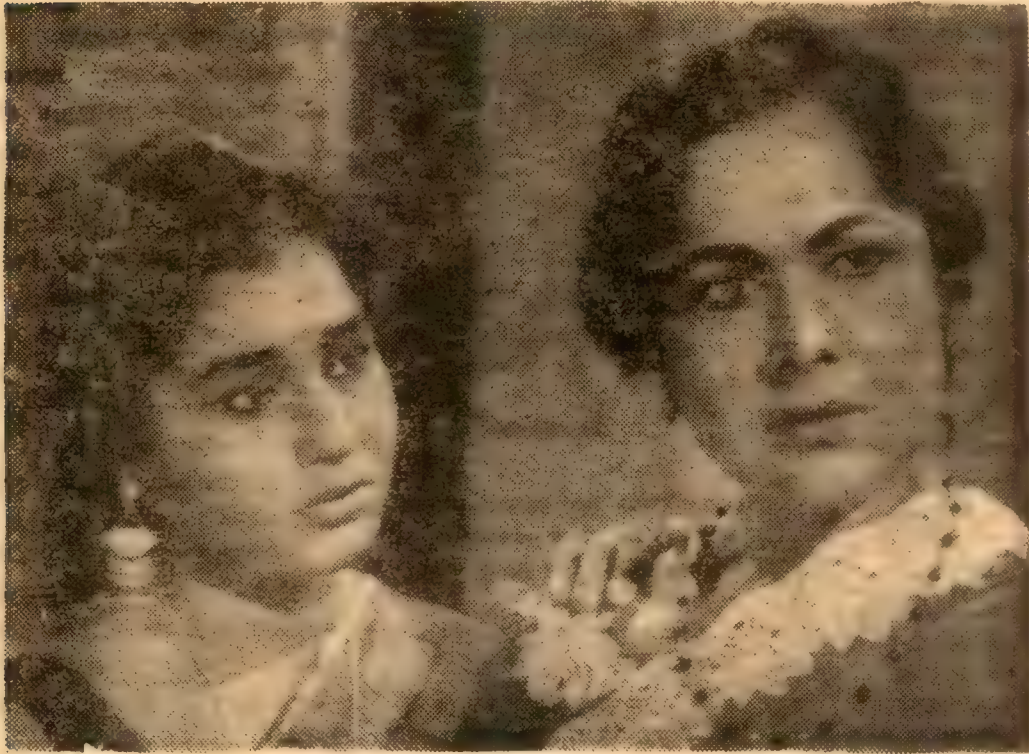
সম্রাট পরিচালিত 'কোলাগোবিনদের কুচা' ছবির একটি দৃশ্যে প্রাণী বসু ও সত্যীশ ভট্টাচার্য

পাদ্যাহিক বসন্ততী

যে শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে—এই শিল্পী- কমল মিত্র, অনন্যকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, রেণুকা রায়, চৌধুরী মধো আছেন সম্মারাগী, সম্মা রায়, অজয় গাঙ্গুলী, দিনীপ রায়, জ্যোৎস্না সর্বাঙ্গী, ডানু বসন্তকুমার প্রভৃতি।.....



দিল্লীতে বাংলা সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী



ভাপসী ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও বনানী চৌধুরী

সংবাদ প্রভা

চেকোস্লোভাক নিউওয়েভ ছবি

সিনেমাটির অব কালকটির উদ্যোগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে চেকোস্লোভাক নিউওয়েভ ছবির এক ফিল্ম সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সেশনে ছয়টি পুরস্কার-প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ ছবি ও ছয়টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হবে। এই ছবিগুলি চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতি ও পুরাতন গণ্ডি ভেঙে নতুন অভিব্যক্তির নিদর্শন। অথচ চেকোস্লোভাক ছবির যে বৈশিষ্ট্য তা এনে সম্পূর্ণভাবেই দেখা যাবে। নব পর্যবেক্ষিত-নির্মাতাদের মধ্যে লেমেক, ক্রমান, জিরেস, চাইটিলোভা, কাদার এবং ক্রোস প্রমুখের ছবি এই সেশনে দেখান হবে। সম্প্রতি এদের ছবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রিশ্চদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমেরিকান বিজ্ঞান চিত্র প্রদর্শন

২৯শে নভেম্বর এভারডিস অব ফাইন আর্টস হলে আমেরিকান বিজ্ঞান চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন এবং ইউ. এস. আই. এস ব্যক্তি চলে। 'এ নাইট আউট উইথ মি: টোমাস', 'দি আর্থ ইজ বরন' প্রাইচলস ল্যাবরেটরি' ছবিগুলি দেখান হবে।

মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবে

মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবে 'চারলতা' ভারত সরকার কর্তৃক প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছে। 'আকাপুলকো উৎসবে' ছবিটি প্রদর্শিত হবে। উৎসব শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে। এই উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে 'চারলতা'র পরিচালক গ্রিসভার্জিং রায় গত ২৫শে নভেম্বর এবং প্রযোজক শ্রীআর. ডি. বনশাল ২৮শে নভেম্বর মেক্সিকো রওনা হয়েছেন। ছবিটির নামক গ্রীসমিহিত চর্যাপাধ্যায়েরও উৎসবে যোগদানের কথা আছে।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যকলা প্রদর্শন

গত ২০শে নভেম্বর, গ্রেসাম এ্যান্ড সন্ডন হলে বিদেশী অতিথিদের ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। গ্রেসাম এ্যান্ড কেরাভেন অর ইন্ডিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা নৃত্যকলা প্রদর্শিত হয়। ভারত নাট্যম নৃত্যে ক্ষমা রায়, মণিপুরী (রাসলীলা) নৃত্যে ধালো বাগচী ও সুতপা দত্ত, পাঞ্জাবী হাওয়া নৃত্যে অনুপমশঙ্কর, আলো বাগচী, পাগড়ী বোস ও কুফা রায়ের নৃত্যকলা প্রদর্শনে অতিথিবর্গ মুগ্ধ হন। নৃত্যে তাল, ঢোলক ও মদঙ্গ সংগত করেন জগদীন্দ্র মিত্র।



লোকশিল্পী প্রিয়বালা দাস

ফরিদপুরের মহিলা লোকশিল্পীদের মধ্যে প্রিয়বালা দাসী অন্যতম। গায়ের সকলের কাছে তিনি প্রিয় দাসী বলে পরিচিত। প্রিয়বালা নিজে বৈষ্ণবী। সারাদিন ঠাকুর-দেবতা নিয়েই গায়ের তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে তিনি থাকতেন। সংস্কার পর তাঁর ঘরে সবাই গান শুনতে যেত। তিনি আপন মনে পুজো শেষে খজুরী বাজিয়ে প্রাচীন দেহতত্ত্ব-মূলক পল্লীগীতি ও রাখাক্ষ, নিমাইয়ের



প্রিয়বালা দাসী

গান গাইতেন। কোন কোন দিন গান গাইতে গাইতে দু'চোখ বেয়ে অবরে অশ্রু বেয়ে পড়ত। তাঁর গানের এত দরদ যে তা সবাই শুনে মুগ্ধ হত।

প্রিয়বালা দেবীর খুবই প্রিয় ও দরদ-ভরা গান ছিল—

বলব রাখে সই
ছেড়ে গেল প্রাণ-গোবিন্দ
তারে পাব কৈ?

“ছেড়ে গেল প্রাণ-গোবিন্দ তারে পাব কৈ” এই বলে প্রিয়বালা দিনরাত কায়াকাটি করতেন। তাঁর সে দৃশ্য দেখলে মনে হত সত্যিই তিনি প্রাণ-গোবিন্দের জন্য পাগলিনী হয়েছেন।

প্রিয়বালা দাসীর এই ধরনের আরও একটি গানে গ্রীকৃষ্ণবিরাহে প্রীরাধার দুর্দশার কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

জনন দুখী রাখে রে তোর,
কপাল ভেঙেছে,
(ও তোর) অতি সাধের বনমালী,
খাচা ছেড়ে চলে গিয়েছে॥

কাহার জন্য রে তুই গাখনি রে মালা,
সাজবি বিনোদ খোঁপাতে ফুল
গোয়ালার বালা

ও তোর ছিঁড়ে গেল
খোঁপার কুসুম,
সিঁথির সিন্দূর কাল হইয়াছে॥.....

প্রিয়বালা দেবীর এই ধরনের সুন্দর সুন্দর অনেক গান আছে।

১৯৪৭ সনে অক্টোবর মাসে প্রিয়বালা দাসী কলকাতায় চলে আসেন। মশা বাতাসের পর পূর্ববাংলায় থাকতে না পারায় প্রিয়বালা দাসী উদ্ভাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। আজ তিনি প্রোড়া, শক্তিও অনেক কমে গেছে—আরও কমে গেছে অভাবে, খেতে ন পেরে। বর্তমানে তিনি থাকেন কাঁকড়াগাছিতে একটি বাসিতে। খুবই কষ্টের মধ্যে তিনি আছেন। ভিক্ষা করে তবে দিন চলে। অভাবে তাঁকে অনেক কমেজোর করে দিয়েছে। এখন আর তাঁর গানের মত দমও নেই—কণ্ঠস্বরও নেই—শুধু আছে হৃদয়ের দরদ।

আধুনিকসমাজে নাকি লোকসংগীতের জনপ্রিয়তা বেড়েছে—কদর বেড়েছে। আমাদের মত শিক্ষিতেরা লোকসংগীতের সত্যিকারের দরদী হয়ে উঠেছেন। আধুনিকসমাজে যদি সত্যসত্যি লোকসংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তবে আজ এই লোকশিল্পীদের এমন চরম দুর্দশা কেন? কেন এই প্রিয়বালা দাসীর মত লোকশিল্পী আজ দুর্ভাগ্যে অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান? লোকসংগীত যদি লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে থাকে তবে এইসব শিল্পীর দুর্দশার কোন সত্যিকারের চেষ্টা আধুনিকসমাজের শিক্ষিতদের তরফ থেকে হয় না কেন?

এই লোকশিল্পীরা আজ আমাদের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই এঁদের সত্যিকারের দরদী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের—তাদেরই দুর্দশা মোচাতে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের বাঁচবার পথটিকে প্রশস্ত করতে।

—বুদ্ধদেব রায়—

রাশিয়ান নাটক : 'পাওয়ার অড' টাক-
নেসের পর টলস্টয় 'দি লাইট ইন দ্য
এন্ডলাইটস' নাটকটি রচনা করেন।
১৯৮৬ সালে এটি লিখতে আরম্ভ করেন।
এবং প্রকাশিত হয় ১৮৯১-তার পরের বছর
মস্কো মালী থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।
শুধু সূক্ষ্মাতি এবং জনপ্রিয়তার সঙ্গে নাটক-
টির অভিনয় হয়েছিল। গ্রামের ভ্রমশ্রমীর
জীবনধারাটা যে অনেকটা পরগাছা জাতীয়,
তারা যে কত সামান্য ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠতে
পারে, দারিদ্র্যাক্রান্ত কৃষকদের তারা কিভাবে
এক্সপ্লোয়েড করতে পারে—এইসব কথাই
নাটকটিতে দেখানো হয়েছে।

"Besides the society comedy which makes the play, it has in it, as an undertone, the distress of the peasants from lack of land and indicates how clearly already, in 1889, Tolstoy perceived the grievance which some thirty years later was a main factor in bringing about the downfall of the social order the play derides.

[Aymer Maude]

এক হিসাবে এ নাটকটিকে ক্লাসিকসের
পর্বারে ফেলা যায়—সময়ে রচিত, তখনও
এর বক্তব্য বর্তমান সত্য এবং প্রাপবল্য ছিল,
আজকের দিনেও ঠিক তেমনিটিই আছে।

এক হিসাবে বলা যায় এ নাটকের মূল
বক্তব্য বর্তমান সময়ে আরও বেশি করে সত্য।

এ নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে স্পিরিচুয়ালি-
জম এবং সিয়ান্সও যুক্ত হয়ে আছে।
এলারডাইজ নিকল বলেছেন :

Tolstoy bitterly attacks the
parlour spiritualism of his age,

বাইবেল ও দেশে এবং বিদেশে মিউজিয়াম

and adroitly mingles this topic
with the larger one of opposition
between peasants and landowners.

একটি কৃষককন্যা এমন ভাব দেখালো
যেন মিডিয়াম হবার সমস্ত ক্ষমতাই তার
ভেতর আছে। এই মেয়েটির সমগ্র প্রণীর
কয়েকটি লোক তার সাহায্যে এক জমির
মালিকের থেকে একজারগার কিছুটা জমি
কিনে ফেলল—আগে মালিকটি কিছুতেই
এদের কাছে জমি হস্তান্তর করতে চাইছিল
না। কয়েকটি স্পিরিচুয়ালিস্টিক দৃশ্যের
ভেতর দিয়ে কৃষকদের কাছে সম্পত্তিভাবে
প্রতিভাত হয়ে গেছে যে, উচ্চশ্রেণীর লোকদের
জীবনধারাটা একেবারে অসাড় এবং উদ্বেগ-
হীন—

Already in 1891 Tolstoy sensed
that the class to which he belonged
was rudderlessly drifting to
disaster. [Allardyce Nicoll]

টলস্টয়ের আর দুটি প্রধান নাটক 'দি
লিভিং কর্পস' বা 'রিডেম্পশন' এবং 'দি লাইট
সাইন্স' ইন্ 'ডাকনিস' বেশ গুরুগম্ভীর
ধরনের। এ দুটি নাটকে যেন টলস্টয়ের
নিজের জীবনের বেদনাভরা দাম্পত্য কাহিনীর
খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। টলস্টয়ের যে-
সব লেখার তার নিজের জীবনের প্রতিফলিত

রূপ দেখা যায় এদুটি রচনা তার ভেতর
প্রধান।

টলস্টয় তার বিষয়সম্পত্তি এবং প্রথম
দিকের রচনাবলীর কপিরাইট স্ত্রীকে দান
করে দিয়ে ইয়াশনিয়া পরিচালনার শ্রমিকের
জীবনব্যাপন করবেন বলে চল যান। এর
কারণ তিনি মনে করছিলেন যে নিজের আদর্শ
অনুসারে তিনি চলতে পারছিলেন না—
আপোষ-মীমাংসার সাহায্যে দিনরাত পাশ-
ক্ষর করে চলেছেন। ১৯১০ সালে অর্থাৎ
জীবনের একেবারে অন্তিম তিনি গৃহত্যাগ
করে চলে যান, এবং রাশিয়ার একটা গ্রামের
রেলওয়ে স্টেশনে জরাজীর্ণ অবস্থায় শেষ-
নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

'দি লিভিং কর্পস' (১৯০০) নাটকের
মূল কাহিনী বাস্তবজীবনের সত্য ঘটনা
থেকে নেওয়া। এক মহিলা—তার ধারণা
হয়েছিল যে তার স্বামী আর ইহজগতে নেই—
শ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এরপর প্রমাণিত
হল যে তার প্রথম স্বামী জীবিত আছেন
এবং আইনবিদম্ব শ্বিবিবাহমূলক অপরাধের
জন্য মহিলাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া
হোল। এই কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া
হয়েছে লেখকের নিজের জীবনের কয়েকটি
ঘটনা।

জীবন সম্বন্ধে প্রটাসভ্ এবং তার স্ত্রীর
সম্পর্ক বিভিন্ন মতামত। প্রটাসভের মতে



লাইট ইন দি সে নাটকের একটি দৃশ্য



বিখ্যাত রাশিয়ান নট এবং নাট্যগীতালক কনস্টানটিন স্টানিসলভস্কি

কিন্তু সে তার স্ত্রী, পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবের
কাজ বোকাবুদ্ধ হইয়া দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী
হৃদয় সমস্ত সম্পত্তি তুলে দিয়ে সে কিছু-
খিন জিনিসদের দ্বারা মিশে বোহেমিয়ানের
জীবনযাপন করলো। তাদের সঙ্গের অনবরত
সঙ্গ গায় এবং গান করে নিজের অর্থাভা

সে ভুলতে চাইল। তার আশা হয়েছিল তার
স্ত্রী এবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ক্যারেনিন
বলে একটি বোকা-কিন্তু-সম্মানিত অফি-
সিয়ালকে বিয়ে করবে। কারণ তার স্ত্রী
লিজা প্রচুর সঙ্গের আলাপ হবার আগে
একই ভালবাসতো। লিজা কিন্তু তা করল

না, সে অত্যন্ত কঠোরপন্থা এবং বিশ্বাসী
স্ত্রীর মত আচরণ করতে লাগল—নিজের
কাছেও স্বীকার করতে চাইতো না যে সে
ক্যারেনিনকে ভালবাসে। স্বামী ভয়গেয়ে কথা
সে কল্পনাতেও মনে আসতে পারল না।
এর পর প্রচুর দৈনন্দিন জীবন যে সে আশ-
হত্যা করেছে—একটি নদীর ধারে নিজের
পোশাকপত্র ফেলে রেখে সে অদৃশ্য হোল।
ভাগ্যবশত কয়েকদিন বাদে একটি শব্দে
ভেসে উঠল এবং লিজা এসে দৈনন্দিন তার
স্বামীর মৃতদেহ বলে সনাক্ত করলো। ব্যাপারটা
দাঁড়াল এই যে, লিজা এখন বিশ্বাস—মৃতরা
ক্যারেনিনকে বিয়ে করতে আর কোন বাধা
রইল না।

এদিকে প্রচুর সঙ্গের তার সকল আশা
নিয়ম নানা জায়গার মত খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে।
একদিন মত্ত অবস্থায় সে তার সমস্ত গোপনীয়
কথা একজন সঙ্গীর কাছে বলে ফেলল।
একজন স্ত্রীলোকের গোয়েন্দা কাছেই বসে ছিল
এবং এইসব কথা শুনতে ফেললো। এর ফলে
প্রচুর সঙ্গের বরা হোল এবং ক্যারেনিন-
দের সঙ্গের তাকে আদৃত করে এনে হাঁজির করা
হোল। এবার এসে প্রচুর সঙ্গের জানতে পারলো
যে, তার পুত্র স্ত্রী নিজেকে নতুন স্বামীকে
ছেড়ে আবার তার কাছে চলে আসতে হবে—
এই নাকি আইন। অসম্মতের দরজার কাছে
দাঁড়িয়ে সে নিজেকে গুলী করে আত্মহত্যা
করলো—মৃত লিজা এবং ক্যারেনিন এর পরে
শান্তিতে দাম্পত্যজীবন কাটাতে পারল।

এলজাইজ নিকল বলেছেন যে, এ নাটকের
প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে প্রচুর সঙ্গের চরিত্রটি।
কখনও সে সর্বভাগ্যী সম্রাটের মত, আবার
কখনও সে আদর্শহীন উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক,
সবরকম বিলাসের ভেতর গা ঢালে দিয়েই মেনে
সে খুশি। অর্থাৎ সমাজে তার প্রেমীর অন্যান্য
অনেকের মতই সে নিহিলিস্ট। এক জায়গায়
এক বন্ধুর সঙ্গের আলাপ প্রসঙ্গে সে বলেছে—
সমাজের যে প্রেমীতে আমার জন্ম, সেখানকার
লোকদের সামনে তিনটি পথ খোলা রয়েছে।
এর মধ্যে যে-কোন একটি বেছে নিতে হবে।
প্রথমটি হচ্ছে যে ক্যারেনিনের মত করতে হবে।
অর্থসম্পদের দ্বারা নিজেকে মোহিত করে প্রেমীটিকে
আরও কমতাপালী করে ভুলতে হবে। এই
পথে যেতে আমার মন চায় নি। দ্বিতীয় এমনও
হতে পারে, কিতাবে এই পথে সম্মতভাবে
করা যায়, তাও আমি জানতাম না। তবে
প্রথমত এ পথে চলবার ইচ্ছা আমার একবারেই
হয় নি। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই প্রেমীর সন্তানকে
জব্দলাকে কেঁটিয়ে সাফ করে পরিষ্কার করা
—কিন্তু সে কাজ করবার ক্ষমতা থাকে লোক-
নারকদের—সে ক্ষমতা আমার কোনোকালেই
ছিল না। তৃতীয় পথ হচ্ছে মদ খেয়ে, গান
গেয়ে ঘরে বেড়ানো—সেই পথেই আমি
চলেছি। আজ আমার সেই গানও শেষ হয়ে
গেছে।

বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গমতীর অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দ

ANANDAMATH

শ্রী বঙ্গমতীর অমর আনন্দমতীর অমর হংসরাজী তলুবার

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার শক্তির সংগ্রামের পূর্বসূরী
- আনন্দমঠে—‘বঙ্গমতীর মত’ মতের পূত-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—শ্রী বঙ্গমতীর ও শ্রী অরবিন্দের আদর্শ সমন্বিত।

আনন্দমতীর এই মহামতীর অমরতাব্যবহার সাধনে

তারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

তারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দান—শত টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

সুইডিশ সমালোচক মার্টিন ল্যাম বলেছেন :

"In reality Protasov though fallen from his own class, represents in a slightly different from the same fundamental ideas in the Russian soul that Tolstoy had already treated in The Power of Darkness and in the Root of All Evil. The conflict is still between bestial passion and the inexhaustible goodness of the human heart. But even at a higher level of culture there is no question of any internal conflict; we are not dealing with 'either-or' but with 'both-and'. Tolstoy believes that he is presenting universal human qualities. We are all a combination of beast and angel."

নাটকটিতে সত্যিকার করুণরস পরিবেশন করা হয়েছে। সমাজের অর্থহীন আইন-কানূনের প্রতি সহজেই দর্শকের বিরাগ জেগে ওঠে এ নাটক দেখে। 'দি লাইভ কর্পিস' নাটকটি অত্যন্ত সহজ ধরনে লেখা—অনাবশ্যক ঘটনা বা সংলাপের চাপে রচনাটিকে ভারী করে তোলা হয় নি। সেই সময়ের থিয়েটারের প্রচলিত রীতি অনুসারেও নাটকের অঙ্ক-বিভাগ, দৃশ্যের বিস্তৃতি ইত্যাদি টলস্টয়ের করেন নি। নাটকের গল্পাংশই আমাদের সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে। কাহিনীর পরিষ্কৃতিতে বাহ্যিক না থাকার দর্শকদের পক্ষে একাগ্রমনে নাটকটি উপভোগ করবার সুবিধা

হয়েছে। নাট্যরচনা করে ষাঁচা বশ পেতে চান বা কিভাবে স্বল্প সংলাপের সাহায্যে চরিত্র এবং বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্পষ্ট করে তোলা যায় বুঝতে চান, তাঁরা নিচের ক্যারেনিন এবং লিজার কথাবার্তার অংশ-বিশেষ নজর করে পড়ুন। ক্যারেনিন লিজার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু লিজার বিপথগামী স্বামীরও সে বিশ্বাসী বন্ধু—লিজা তার মারফতে ক্ষমাবিন্দা করে প্রটাসভের কাছে খবর পাঠাচ্ছে :

ক্যারেনিন—আমার স্বামীর বা 'সম্ভব তা' আমি করবো।

লিজা—তোমাকে এ কাজ করতে বলাতে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছ?

ক্যারেনিন—না ... তবে, সত্যি কথা বলতে গেলে—হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি।

লিজা—কিন্তু তুমি নিশ্চয় রাগ কর নি?

ক্যারেনিন—তোমার ওপর রাগ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

লিজা—তোমাকে এ কাজ করতে বললাম, কারণ জানি তুমি তাকে ভালবাস।

ক্যারেনিন—তাকে, এবং তোমাকেও। আর একথা তুমিও জান। আমি নিজের সম্বন্ধে ভাবছি না—ভাবছি তোমাদের দুজনের কথা। যাক, আমাকে যে এতোটা বিশ্বাস করে সেজন্য ধন্যবাদ। আমার যা সাধ্য তা আমি করবো।

লিজা—সে কথা আমি জানি।

সামান্য কয়েকটি বাক্যের সাহায্যে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের মনের চেহারা, আদর্শ, পারস্পরিক সম্বন্ধ সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে।

'The Living corpse is a problem play centering upon the conflict between the christian doctrine of

self-sacrifice and the marriage laws of the state. It made a great impression when it was first seen in Europe, and Lenin, in his analysis of Tolstoy's work, said, "it is a wonderfully powerful direct and truthful protest against social lies and hypocrisy." [Oxford companion to the theatre.]

১৯১১ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার এ নাটকটি সঞ্চালন করেন।

তবে একটা কথা—নাটকটির সহজ প্রত্যক্ষ-ভাবটা প্রথমাধিকই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তেমনভাবে আমাদের মনকে ধরে রাখতে পারে না। অল্প-ক্ষণের ভেতরই নাটকের পায়-পাঠীদের চরিত্র বেশ বুঝতে পারলেও, নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে তারা কিছু স্পষ্টতর হয়ে ওঠে না। গল্পটা শুনে বেশ ভাল লাগে—কিন্তু এ পর্যন্তই। একটা গল্প শুনলাম এই মনে হল। ফেডিরা, ক্যারেনিন, লিজা এবং অন্যান্য চরিত্রেরা যে সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষের মত স্মৃতিপটে জেগে থাকবে এমন অনুভূতি হয় না। এর কারণও এমন কিছু জটিল নয়—

'Tolstoy had his use for them. They told his tale and pointed his moral. He gave them as much life as would suffice for that, and no more. He cared for the moral, but never for them.

[Granville-Barker]

(ক্রমশঃ)



জারস্ রাইট নাটকের একটি দৃশ্য

কিছুদিন আগের বঙ্গদর্শনে আলোচিত কোন এক শারদ-সম্পর্কের একটি বিশেষ রচনা সম্পর্কে গত ২৮শে অক্টোবরের সংখ্যায় 'পাঠকমণ্ডল' বিভাগে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। আমার চিঠির মূল বক্তব্য পরিহারপূর্বক মূল আলোচনার অনুপ্রবেশ না করে (আমার লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র বঙ্গদর্শনে আলোচিত সেই বিশেষ রচনা), গত সংখ্যায় শান্তনু দাস কিছু বলেছেন। আমার বক্তব্য যে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি, অপ্রাসংগিক এবং অহেতুক তথ্যাদানের মতোই আমার চিঠি প্রকাশের তারিখ-উল্লেখ (২৮শে অক্টোবর নয়, অক্টোবর) এর প্রমাণ। মহাশয়, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই প্রতিকার 'পাঠকমণ্ডল'-বিভাগ খোলা হয়েছে। বোধ হয় এর পাওনা-দায়ও কম নয়। অলেখকদের নাম প্রকাশের সুযোগে অনেকের মত এবং আমার মত, ছাপার অক্ষরে নাম প্রকাশ করতে পারায় আশা করি শান্তনু দাসও আনন্দিত। বাদ-প্রতিবাদের অবতারণা করে সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শনের হাজার হাজার পাঠকের মূল্যবান আলোচনা-স্থানের গুরুত্ব খর্ব করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার চিঠির মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পারায় শান্তনুদাসের পত্রমাত্রে যে অহেতুক, তা জানাবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠি।

পত্রলেখক যে আমার বক্তব্য অনুধাবনে অসমর্থ, আমার আলোচনার সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত তাঁর দীর্ঘ এবং প্রাজ্ঞ নতামত এর প্রমাণ। কিঞ্চিৎ সময় নষ্ট করলে তিনি অনায়াসেই বুঝতে পারতেন আমার যা কিছু বক্তব্য কেবলমাত্র সেই বিশেষ রচনা সম্পর্কে। সমগ্র সাহিত্যবিশ্লেষণ প্রতি অনুদর্শন মন্তব্য আমার উদ্দেশ্য ছিল না। "একটি ভাল ইং-এর প্রচার বন্ধ করা নরহত্যার চেয়েও অমারাত্মক" —মিউনখেনের উক্তি ভুলভাবে করে তিনি কি বলতে চেয়েছেন? আমার চিঠিতে এমন বক্তব্য কিছু ছিল না যা মহৎসৃষ্টি-বিরোধী, যাতে এই ধরনের কোনরূপ উক্তি প্রযোজ্য হতে পারে। তবে কি বরং, সেই বিশেষ রচনাকে বর্তমান লেখিকার মহৎ-পদমাত্রেয় স্বীকৃতিদানের অনীহাই পত্রলেখককে গবেষণার মত কিছু সত্যনিষ্ঠ-সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেছে! অনায়াসে বেনেট বলেছেন, "ক্রান্তিক সর্গিত্য ভাষাই বলা হয়, যা আমরা স্বারে স্বারে প্রশংসা করে তুলে ধরি। এই প্রচেষ্টার অভাব ঘটলে একদিন তার অবলম্বিত অবশ্যসত্যাই।" শান্তনু দাসের বোধ হয় অজানা নেই যে, লরেন্স চট্টোয়েডের অথবা কাম্বু কেউ মানবতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। এমন কিছু লেখেন নি যা মানবতার বিরোধী। মহাশয়গণ অনাচারের মত তাঁদের অনেকের রচনাকে কঠোরভাবে উত্তেজিত হতেও, অস্বীকারে আলোচ্য মত, ঐতিহাসিক পিণ্ডাসার সমাপ্তিতে মানবতার রেজারেক্সনই ঘোষিত হয়েছে। এমন কি জটিল ইউলিসিসের জটিলতার নায়কের ডাবলিন শহরকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে পাঠকেরা মানবসমাজকেই প্রত্যক্ষ করে। সেই সঙ্গে নিজেদেরও।



কিন্তু বঙ্গদর্শনে আলোচিত সেই বিশেষ রচনা সম্পর্কে কেবল আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম মাত্র। 'ডিমোটিক' শব্দের ব্যবহারে পপ-কালচার বা পপস লিটারেচারে যে সাহিত্য ভরপুর, যা কেবল মনোবিকলনের ব্যস্তিক বিকৃতি মাত্র, যে-বিকলন আংশিক, সার্বজনীন আবেদন যেখানে অস্বীকৃত, কেবলমাত্র সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম। সাহিত্য বিচার করতে বাঁসনি, পান-চিবানো-গিন্নি এবং পাঠকভাতি প্রসঙ্গে শান্তনুদাসের কাছে হাস্যকর ঠেকলেও, আমি নিরুপায়, কারণ কলকাতার সাহিত্যে পপ-কালচার অনুপ্রবেশ করেছে—এ কথাই বলতে চেয়েছি।

আর, কে না জানে, "ফ্যানি হিলে"র চাহিদা মেটানোর জন্য সংপ্রাকশকের অভাব নেই।

রাতি সরকার
কাড়গ্রাম, মৌদীনীপুর

গত ১৪শে অক্টোবরের সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শনে 'পাঠকমণ্ডল' গ্রীকালীপিদ বাগচী মহাশয়ের পত্র পড়িলাম। কালীপদবাব্ অনর্থক দুই কলাম স্থান দখল না করিয়া দুই লাইনেই তাঁহার বক্তব্য সারিতে পারিতেন। তিনি লিখিলেই পারিতেন যে, **আমরা অস্বীকার** যে জায়গায় ফরওয়ার্ড বুক সংগঠনে সভাপতিত্বকে সহায়্য করার প্রসঙ্গে কতিপয় বিপ্লবীদের নামোল্লেখ হইয়াছে সেখানে উত্তরবঙ্গ গ্রুপের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল।" লেখক গ্রীকিত-রায় উহার উল্লেখে যথাসময়ে দুটি সংশোধন করিতে পারিতেন। ইহা অবশ্য সাধারণ বস্তু হইতে আমাদের হস্তগত। কালীবাবু, সামান্য কারণে অতিরিক্ত ব্যস্ত থকা করিয়া বাঁসিয়াছেন।

অবশ্য কালীবাবুর লেখাটি ভাল করিয়া পাঁড়িলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি কেন কিলের আক্রমণে ফটিয়া পড়িতে চান। তিনি লিখিয়াছেন, "কিন্তু মন্তব্য ও লোক-মুখে শুভ ইতিহাস নয়।" তিনি যা তাঁহার মত সমালোচকগণ জানিয়া রাখুন যে গুপ্ত সমিতির ইতিহাস যদি প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ-ভাবে কর্ম-যুক্ত থাকা লোকদের দ্বারা বর্ণিত হয় তবে উহা ইতিহাস।" ভূপেনবাবু যাহা

এতাবৎ লিখিয়াছেন তাহা (পড়ার অন্তিম দুই হইতে শুরু করিয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ হইতে সংগৃহীত ইতিহাস বলিয়া তিনি ব্যস্ত করিয়াছেন। অতএব ইহা ইতিহাস হইবে না কেন? ইহা ইতিহাস না হইলে ফাফিয়ান, হুজেন সাহু, আলকেশ্বরী প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গ সংগৃহীত রচনাও ইতিহাস হইতে পারে না। এবং ইহা ইতিহাস না হইলে বিপ্লবের (গুপ্ত সমিতির) ইতিহাসও কোন কালে কেহ লিখিতে পারিবে না। কারণ বিপ্লবীরা তাঁহাদের কথা পাথরে খুঁদিয়া বা ডামা-পেতলের মূদ্রায় অঙ্কিত করিয়া মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়া যান নাই। পুলিশ রিপোর্ট হইতে কিছু তথ্য পাওয়া যায় বটে। ভূপেনবাবুও সকল লেখকের মত উহার আশ্রয় প্রয়োজনমত গ্রহণ করিয়াছেন।

কালীবাবু লিখিয়াছেন, "তাঁহার (ভূপেনবাবুর) বিবৃত ঘটনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একাধিক প্রতিবাদপত্র বাহির হইয়াছে।" আমরাও স্মৃতিমত 'পাঠকমণ্ডল' যিচারটি পাড়িয়া থাকি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভূপেনবাবুর লেখার প্রশংসার এবং তথ্য-কথিত বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রত্যয়কে একাধিক পত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই লেখাটি বহু লোক মন দিয়া পড়িতেছেন।

কালীবাবুর মতে "তাঁহার (ভূপেনবাবুর) অস্বীকার লেখনী বিপ্লববর্ণনে শুভটা জাগ্রত ছিল বাস্তব ঘটনা ততখানি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।" কালীবাবুর এই অভিমতের কিছু মূল্য আমরা দিতে পারিতাম যদি ভূপেনবাবু "উত্তরবঙ্গ" বা অন্য কোন গ্রুপের গুপ্ত ইতিহাস লিখিতেন। এই কারণেই সবার অজ্ঞানের ভূমিকায় ভূপেনবাবু জানাইয়াছেন যে, তিনি অন্যান্য দলের কথা লিখিবেন না, কারণ উহা লিখবার যোগ্যতা তিনি দাবি করেন না। তিনি বাংলার বিপ্লব-যুগের পরিবেশে প্রধান 'বি-ভি'র ইতিহাসই লিখিবেন। কারণ বঙ্গবান্ধবদের সক্রিয় সাহায্যে এখনও তিনি উহা লিখবার চেষ্টা করিতে পারেন। ভূপেনবাবুর চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কালীবাবু, কিন্তু এইসব পত্র লেখার মাধ্যমে শক্তিকর না করিয়া নিজেই অনায়াসে তাঁহার দলের ইতিহাস লিখিতে পারেন। আমরা সারগ্রে তাহা পড়িব। কিন্তু তিনি যদি 'বি-ভি' বা চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের ইতিহাস লিখিতে যান তবে তাঁহার উক্তি-ই পুন-বুল্লখমাণ আমরা করিব যে, "বাগচী মহাশয়ের কলামের জোর যতটা জাগ্রত, বাস্তব ঘটনা ততটাই তাঁহার অজ্ঞাত।" নিজের দলের ইতিহাস নিজেরা না লিখিলে অপরে কি করিয়া লিখবে? প্রত্যক্ষদর্শীদের মতুর পর ভো শোনা কথার ইতিহাস লেখা ছাড়া গতন্তর থাকিবে না। তখন কালীবাবু বা যে কোন বিপ্লবীর গোপন কার্যকলাপের কথা লিখিতে হইলে কেবলমাত্র পুলিশ রিপোর্ট-গিলির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।

সেখানে পুলিশ কাহার কোন মতি পড়িয়াছে কে জানে? তাহা ভেদিকফাই করারও কোন সাক্ষী তখন পাওয়া যাইবে না। অতএব আমাদের অনুরোধ যে কালী-বাবুর মত বৃদ্ধ ব্যক্তি (তাহার পত্র পড়িয়া তাঁহাকে খুবই বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়) সময় থাকিতে নিজের দলের ইতিহাস লিখুন। দেশ কৃতজ্ঞতা বোধ করিবে। অপরের সম্বন্ধে চেষ্টাকে অথবা আক্রমণ করিয়া নিজেদের মান খোয়াইবার প্রয়োজন কি? কালীবাবুকে সম্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূপেনবাবু বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের পটভূমি 'বি-ভি'র ইতিহাস লিখিতেছেন। অপরাধের দলের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে যতটুকু আসে তাহাই তিনি দিতেছেন।

উত্তরবঙ্গ গ্রুপের সেরকম কোন Revolutionary action থাকিলে তাহা হয়তো তাহার লেখার আসিয়াছে, যেমন আসিয়াছে, 'হিলি ডাকাত'র কথা। ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে 'বি-ভি'র যতটুকু যোগাযোগ তাহাই অতি সংক্ষেপে ভূপেনবাবু লিখিয়াছেন বলিয়া 'সবার অলঙ্কো' পাঠে আমাদের মনে হয়। সেখানে বহু দলের নাম করা হইয়াছে, তৎসঙ্গে উত্তরবঙ্গ গ্রুপের নাম উল্লেখ করিলেই চুকিয়া যাইত। 'হলওয়েল' মনোমোহন সন্ন্যাসীর আন্দোলন সম্পর্কেও খুবই casual reference আমরা দেখিতে পাই। ভূপেনবাবু কোনমতেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' বা 'হলওয়েল' আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। উহা লিখিলে হয়তো কালীবাবুর অনন্যসাধারণ অবদান অথবা নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, খগেন দাশ-গুপ্ত বা অতুলকুমার প্রমুখের আত্মত্যাগ ও কর্মকমতার উল্লেখ তিনি তাহার 'অনিবচনীয়' ভাষায় করিয়া আমাদেরকে উদ্ভুদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের ইতিহাস অথবা 'এফ-বি' গঠনে বিপ্লবীদের 'অবদান' সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক পুস্তক লিখিতেছেন না। অতএব কালীবাবু চণ্ডল হইলে চলিবে কেন?

তিনি এতই কিন্তু হইলেন যে, অন্যায়সে লিখিয়া বসিলেন—ভূপেনবাবু নাকি বিপ্লব-যুগের বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে তেমন ওরাকিবহাল ছিলেন না? তিনি কি বলিতে চান যে, ভূপেনবাবু ইচ্ছা করিলে 'ওয়ারিক-হাল' হইতেও পারেন না বা পারিতেন না? এই মহা ঔষ্মতাপূর্ণ 'রায়গি' দিবস আলিঙ্গন কি গ্রীকালীপদ বাগচী, না 'বি-ভি' দলের নেতারা? ভূপেনবাবুর ব্যক্তিগত দারিদ্র্যপূর্ণ যোগাযোগ বিপ্লবকর্ম না থাকিলে সেই যুগে হাজার হাজার বিপ্লবী 'ভের্টানিউ' হইতে

বাঁহিয়া বাঁহিয়া সেই আটার জন বিপ্লবের নেতাকে ইংরেজ সরকার 'গিটন আইনে' স্টেট প্রিজনার করিয়া বাংলার বাঁহিরে সাত-তাড়াতাড়ি আলাদা-আলাদাভাবে পেশোয়ার হইতে মাদ্রাজ অর্থাৎ বিভিন্ন কারাগারে বন্দের পর বন্দের রাখিয়া দিয়াছিল তাহাদের অন্যতম তিনি (ভূপেন্দ্রকিশোর) হইতেন কি? ভূপেন-বাবুর মত সূচ্যাত বিপ্লবী তাহার দলের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিবেন না এই ধারণা তিনিই করিবেন, যিনি কোন ব্যক্তিগত কারণে তাহার উপর চটিয়া গিয়াছেন।

কালীবাবুর উদ্দেশ্য মাত্রা কিন্তু এখানেই থামে নাই। রায়ের চোটে তিনি একটি অসত্য কথা বোলায় লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন : "বি-ভি—গ্রুপের দুইটি ব্যক্তি ছাড়া আর কোন সহায়তা সূভাষচন্দ্রকে পাইতে দেখি নাই।.....সূভাষচন্দ্র প্রথমে সতারণন বন্দির ব্যক্তিগত সহায়তা এবং উপদেশ ছাড়া কংগ্রেসের কাজে কোন সহায়তা পান নাই".....এখানে প্রশ্ন—সত্যবাদী কি একক ব্যক্তি? একজন individual না 'বি-ভি'র লোক? কালীবাবু মনে রাখিবেন যে—বি-ভি essentially বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি ছিল, কিন্তু তার Public Activity-ও ছিল। দলের নির্দেশে উহার একাংশ মাত্র কংগ্রেস বা 'এফ-বি'র কাজ করিত। সূভাষ-চন্দ্রকে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনে 'বি-ভি'র যোগাযোগের (মানে ঐ একাংশের যোগা-যোগের) কথাই ভূপেনবাবু তাহার লেখার উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সেই কাজে সত্য বন্দি মহাশয় ছিলেন যে দলের প্রতিনিধি সে-কথা ভূপেনবাবু পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন।

'বি-ভি'র কর্মীরা বা নেতারা (দু-চার জন ছাড়া) যাহারা সূভাষচন্দ্রের বাড়িতে বাইয়া ভিড় করিতেন না ঠিকই। কারণ কোন নিয়মানু-বর্তী দলই সে-যুগে ও-কর্ম করিত না। 'বি-ভি'র প্রধান কর্মস্থল Public Work-এর) ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও মেদিনীপুরে। সেখানে বি-ভি বা উহার সতীর্থ অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলি যে কাজ করিত তাহা কালীবাবুর মত অভিজ্ঞ 'এফ-বি' নেতা বিস্মৃত হইলেন কি করিয়া? তিনিও কি তাহা হইলে 'দলীয় স্নেহ-প্রবণতার দরুণ' বিস্মৃত হওয়ার কষ্টকর প্রয়াস করিয়াছেন? উত্তরবঙ্গের লোক গর্ববোধে কাজ করিতেন না। পূর্ব-বঙ্গের শ্রমিকই পূর্ববঙ্গে কাজ করিতেন।

তাহা হইলে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি জিলায় কাহার F—B র কাজ করিতেন তাহা কালীবাবুর জানা নাই নাকি? বি-ভি, গ্রীসেন্দ পূর্ণ দাস মহাশয়ের বন্ধুরা ঢাকাত কি পরিমাণ 'এফ-বি' গঠনে তৎপর ছিলেন তাহা তো সূভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সেক্রেটারীর জানবার কথা। পরে ময়মনসিংহ জিলায় জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার যে প্রায় এগার হাজার 'আজাদ-সেবিকা-সৈনিক-বাহিনী' সংগঠন করিয়া এবং 'এফ-বি'র নানা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সম্ভাবনা পর্যন্ত দূর করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও কি ঐতিহাসিক? সূভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক মন্তব্য কি ১৯৪৭ সনে সেই কথা শরৎচন্দ্রের মুখেও শোনে নাই?

দলের ইতিহাস লিখিলেই যে তাহা অহেতুক দলপ্রীতিমূলক না হইয়া বর্ণনামাত্র গড়ার উপযোগী ইতিহাসও হইতে পারে তাহা ভূপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় সর্বাংশে প্রমাণ করিতেছেন বলিয়া আমাদের অভিমত। অধিকন্তু ইহাও বলিব যে, ঐ যুগে (১৯৩০ সাল হইতে) বিপ্লবের ক্ষেত্রে 'বি-ভি' বা 'চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা' যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা এমনিতেই কাহিনীর মত রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসে ও নৈপুণ্যে অপূর্ব। উহা কাহারো স্নেহ প্রবণতার সিত করিয়া পরিবেশন করিতে হয় না। শব্দ, বৈশ্বিক মন হইতে ঘটনার উল্লেখ করিয়া গেলেই চলে। ঐ সব ঘটনা অনন্য-সুন্দর বলিয়াই 'সবার অলঙ্কো' পাঠে আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি।

ধ্রুব দাশগুপ্ত

৩০, হাইট স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯

* * *

গত ১২ই কার্তিক তারিখের 'সাপ্তাহিক বসুমতীতে' (৭০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মল্লোপাধ্যায় লিখিত 'স্বাধিক বিপ্লবী বতীন্দ্রনাথ'-এর যে অংশ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একটা তথ্যগত ভুল আছে। দার্জিলিং যাত্রার কালে বতীন্দ্রনাথের সাথে চারজন ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসারের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিলো, সেটা শান্তাহার স্টেশনে নয়। শিলাগড়ি স্টেশনে।

মালি ঘোষ

বাগজোখরা, শিলাগড়ি



খেলাধুলা

ইস্টার্ন রেল কুস্তি প্রতিযোগিতায় মিতলওয়েটে চন্দ্রশেখর ও রাম-জনসের লড়াইয়ের দৃশ্য

দ্বাদশ রাউন্ডের কাহিনী

এনিশচরভায় পূর্ণ জুডাঙ্গন, নইলে প্যাটার্সন বারো রাউন্ড পর্যন্ত টিকে থাকলেন না ভেগাসের রিংয়ে ক্রোর বিপক্ষে। এখন শব্দ একটু প্যাটার্সন-লিস্টন এবং লিস্টন-ক্রোর মুষ্টিযুদ্ধের ফলাফলের কথাটা চিন্তা করে দেখুন। যে লিস্টনের কাছে দু'বার লড়াইয়েই প্যাটার্সন একেবারে নস্যাত হয়েছিলেন, সেই নরদানব-সম সোনালী লিস্টনকে কিন্তু অবলীলাক্রমে কাৎ করে দিয়েছেন দলবারই তরুণ ক্যাসিয়াস ক্রে। শেষেরবার তো ওই দৈত্যসম লিস্টনকে ঠিক এক মিনিটে ক্রে যে কি করে ধরাশায়ী করেছিলেন তা চিন্তা করতে আশ্চর্য লাগে।

সকলেই এবার ক্রে-প্যাটার্সন মুষ্টিযুদ্ধের পূর্বেই চিন্তা করে নিয়েছিলেন যে, ক্রোর ছাতে প্যাটার্সনের দূরবস্থা এবং দৃষ্টান্ত আছে। কারণ সোনালী লিস্টনকে যেখানে ক্রে কাৎ করেছে তা চিন্তাই করা যায় না।

লড়াইয়ের পূর্বাভাসে মহম্মদ আলি ক্রে বলেছিলেন যে, প্যাটার্সনকে যত দুর্বল বলে মনে করছে সকলে ততটা সে অবহেলার পাত্র নয়, সে লড়াই ভালই। ক্রোর মতে তাঁর প্যাটার্সনকে ঠান্ডা করতে বেশ কয়েক রাউন্ড লড়াইতে হবে।

“আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ আমি আবার দিলাম” বলেছেন মহম্মদ আলি ক্রে। আর সাংবাদিকদের বলেছেন, “এবার থেকে আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে গুরুত্ব দেবেন তো?”

উত্তরে সাংবাদিকরা বলেন, “নিশ্চয়

মহম্মদ।”

দ্বাদশ রাউন্ড টেকনিক্যাল নক-আউটে ক্রে বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হন বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ক্রোর একচ্ছত্র প্রাধান্য। শেষ শক্তি নিঃশেষ করে মরীয়া হয়ে লড়েছেন প্যাটার্সন, নিজের সম্ভিত মারের তুণ থেকে বাছা বাছা অঙ্গগুলি ছুঁড়েছেন ক্রোর দিকে, কিন্তু ক্রে শব্দ যে অবহেলাভরে সেগুলি ফিরিয়ে দিয়েছেন তাই

শ্রীঅমিতাভ

নয়, দ্বিগুণ শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন প্যাটার্সনকে প্রত্যন্তরে। ধীরে ধীরে এনিশ্চয়, ক্রান্ত, রক্ত প্যাটার্সন তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে পরাজয়ের পথেই এগিয়ে গিয়েছেন।

ক্রে-প্যাটার্সন মুষ্টিযুদ্ধের শুরুতে কিন্তু আক্রমণের ঢেউ তুলেছিলেন প্যাটার্সনই। প্যাটার্সন প্রারম্ভেই চেষ্টা করতে লাগলেন ক্রোর নিকটবর্তী হয়ে লড়াই। প্রথম রাউন্ডে ক্রে তাঁর স্বভাবসুলভ পদ্ধতিতে প্যাটার্সনের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগলেন।

এর পরের রাউন্ডগুলি ক্রে আস্তে আস্তে নিজের কন্ট্রোল করে নিলেন। আর সারাক্ষণ দশকদের চিংকার করে বললেন যে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মত প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে তাঁরা দিন, কারণ প্যাটার্সন প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়। ক্রে সারা লড়াইয়ে প্যাটার্সনকে লক্ষ্য করে চোখা-চোখা বিদ্রূপাণ নিক্ষেপ করে এলেন, কিন্তু প্যাটার্সন সারাক্ষণ খেলোয়াড়ী মনোভাৱে পরিচর দিয়েছেন, শান্তভাবে একমনে লড়ে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় রাউন্ডের শুরুতেই ক্রে আক্রমণ-ক্ষমক ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ক্রে একটা আঘাত হানলেন প্যাটার্সনকে, এই সময় প্যাটার্সন পা হড়কে পড়ে গেলেন। রেকর্ডারী কিন্তু প্যাটার্সনের এই পতনে সময় গণনা করেন নি কারণ মৃদ্যাবাহতে তাঁর পতন হয় নি বলে।

তৃতীয় রাউন্ডে ক্রে প্রথমেই প্যাটার্সনের মুখের ওপর একটি তাঁর ঘাঁসি চালান। ঠিক এর পরই ক্রোর একটি প্রচণ্ড হুক প্যাটার্সনকে প্রথম কিণ্ডিং আহত করে। এরপর চতুর্থ রাউন্ডে দুজনের মধ্যে লুকোচুরি খেলার মত শুরু হয়। একসময়ে দশ সেকেন্ড দুজনে রিংয়ের মধ্যস্থলে মুখোমুখি অগভীর করেই কাটিয়ে দেন। ক্রে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে আঘাত হেনে প্যাটার্সনকে প্রায় কোণঠাসা করে দেন।

পঞ্চম রাউন্ডে ক্রে-কে দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে লড়াই সম্বন্ধে বিস্ময়মাত্র উদ্বিগ্ন নয়। দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে নাটের তালে ক্রে প্রতিপক্ষকে প্রদীক্ষণ করতে করতে সুযোগ খুঁজতে থাকেন জোরালো আঘাত হানার। এই সময় ক্রে এমন ভাবভঙ্গি করছিলেন যাতে সত্যি মনে হচ্ছিল তিনি কোন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান-শীপের লড়াই লড়ছেন না, অনুশীলন করছেন। এই রাউন্ডে প্যাটার্সন শেষ চেষ্টা করলেন ক্রে-কে আঘাত হানার কিন্তু তৎপর ক্রে অনায়াসে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলেন।

ষষ্ঠ রাউন্ডের শুরুতে কিন্তু প্যাটার্সনকে বেশ তৎপর মনে হল। তিনি ডানহাতের একটি সুন্দর আঘাত করলেন ক্রে-কে। ক্ষণিক বিচলিত ক্রে কিন্তু অশ্রুত আঘ-

বিশ্বাসের সঙ্গে এবার সমান তাতে আঘাত করতে লাগলেন প্যাটার্সনকে। ক্রিকেট কাছ থেকে জানহাতে ও বাঁহাতে পরপর দুটি প্রাথমিক আঘাত পাবার পর প্যাটার্সন ধরাশায়ী হলেন। রেফারী গণনা শুরু করার সাথে সাথেই অবশ্য তিনি উঠে পড়লেন। কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে বিপর্যস্ত প্যাটার্সনের তখন অসহায় অবস্থা, রাউন্ডের বিরাতির ঘটনাধীনতে তিনি তখনকার মত রক্ষা পেলেন।

সপ্তম রাউন্ডের শুরুতেই ক্রে আক্রমণ করে বসলেন প্যাটার্সনকে। ক্রান্ত প্যাটার্সনকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল তিনি পরাজয়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। অষ্টম রাউন্ডে প্যাটার্সন প্রাণপণ শক্তিতে বিপর্যস্ত লক্ষ্য করে আঘাত করার চেষ্টা করতে লাগলেন সবই প্রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

নবম এবং দশম রাউন্ডে দেখা গেল যে, বিজয় ক্রেয় করায়ত্ত। ক্রে-কে তখনও দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি বেশ সতেজ এবং উৎফুল্ল। দশম রাউন্ডে দেখা গেল যে প্যাটার্সন টলছেন আর প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে তাঁর যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। ক্রে ধীরে ধীরে প্যাটার্সনকে একেবারে রিংয়ের এক-কোণে ঠেলে দিলেন, অবসন্ন প্যাটার্সন তখন হাঁপাচ্ছেন।

একাদশ রাউন্ড শুরু হবার পূর্বে চিকিৎসক পরীক্ষা করলেন প্যাটার্সনকে। ক্রে সমান উৎসাহে লড়তে লাগলেন। কিন্তু প্যাটার্সন শূন্যে ঘুঁসি চালাতে লাগলেন। বোঝা গেল যে, প্যাটার্সনের অন্তিম সময় ঘনিষে এসেছে। দ্বাদশ বা শেষ রাউন্ড প্রায় দুর্দামিন্ট আঠারো সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এই শেষ রাউন্ডে দ্বাপার কাট, হুক আর দু'হাতের ঘুঁসি ক্রে মহা আনন্দে প্যাটার্সনের ওপর চালাতে লাগলেন এমনভাবে—মাতে দেখা গেল যে, যে-কোন মুহূর্তে প্যাটার্সনের পতন হতে পারে। প্যাটার্সন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে অক্ষম বৃদ্ধে মহম্মদ আলি ক্রে-কে দ্বাদশ রাউন্ডে টেকনিক্যাল নক আউটে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন রেফারী।

লড়াইয়ের শেষে প্যাটার্সন বলেন যে, চতুর্থ রাউন্ডে তিনি তাঁর কিডনীতে আঘাত গান। ক্রে অবশ্য প্যাটার্সনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাবার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

কুপারেজে বিপর্যয় :

কুপারেজের আসরে কলকাতার বিপর্যয় এটেছে; আমাদের কলকাতা ময়দানের ফুটবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন রোভার্স ক্লাবের আসর থেকে। এখন ভরসা ময়দানের অন্যতম শ্রেষ্ঠচতুর্দয়। এদের মধ্যে অবশ্য আছে গভাবরের বিজয়ী এবং বিজিত দ্বয় বি এন রেল, মোহনবাগান এবং অন্য দু'টি হল ইস্টার্ন রেল ও মহামেডান দল। কলকাতা ময়দানের একটি প্রবল শক্তি ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব এবার রোভার্সে শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হয় নি।

সাতারের ইন্টিগ্যাল কোচ ফাউন্ট্রী কলকাতার প্রথম টিম বাটাকে ২—১ গোলে পরাজিত করল প্রথম রাউন্ডের খেলায়। বাটা ও ইন্টিগ্যাল কোচ ফাউন্ট্রীর খেলার মীমাংসা হয় অতিরিক্ত সময়ে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে কলকাতার রাজস্থান ক্লাব শোচনীয়ভাবে ৪—১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয় গোয়ার ভাসকো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। প্রথম খেলার কৃতিত্বের পরিচয় দেন কলকাতার বালী প্রতিভা দল। প্রথম রাউন্ডে বালী প্রতিভা মাতুঙ্গা এ্যাথলেটিকস্কে ৬—১ গোলে অনারাসে পরাজিত করে। এই দুটি গোলের মধ্যে একাই তিনটি গোল দেন নীলেশ সরকার। অবশ্য তিনি হ্যাট্রিক লাভ করতে পারেন নি।



বিল লরী

দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় ভাল খেলোও বালী প্রতিভা দল পরাজিত হয়। বোম্বাই ফুটবল চ্যাম্পিয়ান সেন্ট্রাল রেল দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে তৃতীয় রাউন্ডে কোনক্রমে পৌঁছায় ১—০ গোলে বালী প্রতিভাকে পরাজিত করে। খেলার মধ্যে কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্যের পরিচয় দেয় বালী প্রতিভাই, কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা লক্ষ্যবস্তুর কাছে পৌঁছেই ব্যর্থ হয়েছেন।

কলকাতার চতুর্থ দলের রোভার্সের আসর থেকে বিদায় ঘটে যখন উরাড়ী দল ২—০ গোলে পশ্চিম রেলওয়ের কাছে পরাজিত হয়। উরাড়ী কথেন্ট উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। গতবার রোভার্স এসেছিল কলকাতায় এবার দেখা যাক অবিশিষ্ট শক্তির কার্যিত-কাহিনী।

চিকিৎসা বিভ্রাট :

ফুটবলের মাঠে অশান্তির বড় বিচলিত করেছে শান্তিকামী ক্রীড়াসোদীনের, আর ফুটবলের কর্তব্যাব্তিদেরও টনক নড়ছে। বিশ্ব-

ফুটবলের বিভিন্ন দেশের মাঠের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, ফুটবলের আসরের খণ্ডস্বচ্ছ লেগেই আছে। মাঝে মাঝে অবদুর্ভ দর্শক বা অল্প দল-সমর্থকদের কার্যকলাপ খেলার মনোভাব অবস্থার সৃষ্টি করে। খেলাধুলা হচ্ছে নিম্নলি আনন্দের উৎসস্থান, সেখানে যদি অশান্তির আধিক্য ঘটে তবে ক্রীড়াস্থানের সঙ্গে রণাঙ্গনের আর পার্থক্য কোথায়!

বিশ্বফুটবলের ভাগ্যনিরন্তা ফিফা (বিশ্ব-ফুটবল সংস্থা) এবার এই সমস্যা দুরীকরণের জন্য ব্রতী হয়েছেন। তবে এখন তাদের প্রচেষ্টা বলা চলে কতকাংশে পরীক্ষামূলক। তবে ফিফা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন তা মনে হয় বড়ই জটিল। কারণ তারা বলেছেন যে, দলের সমর্থকেরা খেলার মাঠে বিশ্বখেলার সৃষ্টি করবে তাদের ক্লাবকে শাস্তি দেওয়া হবে।

ফিফার ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যানলী রাউস বলেছেন দর্শকদের অসভ্য কার্যক্রমই মাঠে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং প্রায়ই ফুটবলের আসরে এই ধরনের গণ্ডগোলের ফলে ফুটবলের মর্যাদা ক্ষয় হচ্ছে।

ফিফা ঠিক করেছেন যে, খেলার মাঠে দর্শকদের মধ্য থেকে খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে যদি কোন কিছু নিক্ষেপ করা হয় এবং ভয়াবহ খেলোয়াড়দের আহত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে রেফারীকে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে। দর্শকদের অসভ্য এবং অত্যাচারপন্থে জন্য যদি শাস্তিমূলকভাবে দর্শকদের মাঠে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় তবে তা সত্যি চরম শাস্তি হবে এবং অনেক নির্দোষ দর্শক খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হবে, সেইজন্য ফিফা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তবে যে সমস্ত দলের সমর্থকদের দোষী বলে ধরা হবে, সেই সমস্ত দলকে সাসপেন্ড করা হবে এবং দোষ মারাত্মক হলে সেই দলকে দীর্ঘদিনের জন্য কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

নতুন নায়ক

লন্ডোনে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসরে দীনেশ খায়ার বিজয়কে অপ্রত্যাশিত বলে অনেকেরই মনে হয়েছিল। কারণ ভারতের ২০ বছরের এই স্বল্পবয়স্ক তরুণ খেলোয়াড়ের পক্ষে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের সিংগলসে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করার এক আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। লন্ডোনে ফাইনালে তিনি পরাজিত করেন থাইল্যান্ডের স্বর্ণপল রত্নসেনকে, যিনি একজন ভাল খেলোয়াড় বলে স্বীকৃত।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে দিল্লীতে উত্তর রেলওয়ের ব্যাডমিন্টন হলে দীনেশ খায়ার প্রমাণিত করলেন যে, লন্ডোনে তাঁর অর্জিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানের গৌরব আকস্মিক নয়, তিনিই বর্তমানে শ্রেষ্ঠ। যাত্রা এক সপ্তাহের মধ্যে দু'টি দুর্লভ সন্ধান অর্জন করে পাঞ্জাবের এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার দীনেশ

খামা ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণের হয়ে হয়ে গিয়েছেন।

লক্ষ্যে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শেষ হবার পরই দিল্লীতে শুরু হয় নেহরু মেমোরিয়াল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এই নেহরু ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রাই অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই দীনেশ খামার প্রতি কিশু সকলেরই লক্ষ্য ছিল। দীনেশ খামা কোয়ার্টার ফাইনালে দীপু ঘোষকে পরাজিত করে উন্নীত হলেন সেমি-ফাইনালে। সেমি-ফাইনালে সম্মুখীন হতে হল তাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত নন্দু নাটেকারের। অবশেষে নন্দু নাটেকারও নীতি স্বীকারে বাধ্য হলেন এই উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়ের কাছে। দীনেশ খামা ফাইনালে গিয়ে পৌঁছালেন। ফাইনালে দীনেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মালয়েশিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় ইউ চ্যাং হো।

ফাইনাল খেলার শুরু থেকেই দেখা গেল তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস। প্রথম গেমটি

কয় অনামী খেলোয়াড়ের কাছে তার পরাজিত ঘটেছে। দু-একটি পরাজয়কে সামলিয়ে আকস্মিক বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু কয়েকটি পরাজয় কেমন যেন সন্দেহ জাগায় মনে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে রয় এমার্সনকে তাঁর দেশের মাটি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে পরাজিত করেছেন অনামী এক বিদেশী তরুণ খেলোয়াড়। ২০ বৎসর বয়স্ক আর্থার এ্যামে কুইন্সল্যান্ড টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস ফাইনালে রয় এমার্সনকে পরাজিত করে বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। কুইন্সল্যান্ডের কোর্টকে রয় এমার্সনের টেনিসের লীলাভূমি বলা হয়। আর্থার এ্যামে হলেন ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডের টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্ব টেনিসের আসরে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান এমন কিছই হৌ, কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে তাঁরই দেশের মাটিতে পরাজিত করে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

রয় এমার্সনের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে যে-সে চিন্তায় পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেনিসের কর্মকর্তারা। কারণ আগামী ডিসেম্বর মাসে

মুম্বাই হতে শুরু হবে ফিলিপ পান, কিশু খেলোয়াড়সমূহ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজয় বরণ করেন।

আগামী বছর কমনওয়েলথ বা এম্পায়ার গেমসের আসর বসবে জামাইকার কিংসটনে। এবার রেকর্ড সংখ্যক দেশ এই এম্পায়ার গেমসে অংশগ্রহণ করবে। জানা গিয়েছে ৩৫টি দেশকে এই গেমসে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে।

ভারত সফরকারী রাশিয়ান ফুটবল দল তাদের জরুরী অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে আরও তিনটি খেলার তারা অংশগ্রহণ করেছে। একটি খেলার তারা পরাজিত করেছে বিহার একাদশকে ৩-১ গোলে। বিহার দলের পক্ষে গোলাটি দেন বিধান। পরবর্তী খেলা অনুষ্ঠিত হয় খজাপুরের সেরা স্টেডিয়ামে ভারতীয় রেল একাদশের সঙ্গে। এই খেলার রাশিয়ান দল জয়ী হয় ৩-০ গোলে। তৃতীয় খেলাটি কটকের বরমাটি স্টেডিয়ামে

।। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা ।।

নব পর্যায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র তৃতীয় বর্ষ এখনো পূর্ণ হয় নি। অনুরাগী পাঠকদের আনন্দকল্যাণে এরই মধ্যে এই পত্রিকা যে প্রচার-গৌরব অর্জন করেছে, তা সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে বিরল ও অদ্ভুতপূর্ণ।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক বসুমতীর বড় প্রচার সংখ্যা হচ্ছে এককোটি হাজার চার শ পঁচানব্বই (৪১,৪৯৫)।

এতদসম্পর্কে অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন লিমিটেডের সার্টিফিকেটের অবিকল অনুলিপি প্রকাশ করা হল।

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দীনেশ হারালেন, কিন্তু পরের গেমটি দীনেশ করায়ত্ত করলেন। তৃতীয় গেমটিও দেখা গেল দীনেশ দখল করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছেন। দীনেশের এই বিজয়ের সমবেত দশকরা আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। দশকদের আনন্দের আরও কারণ হল যে, জুনিয়ার বিভাগে থাইল্যান্ডের তামসাতেনিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হন ভারতের গোতম ঠকুর।

অস্ট্রেলীয় টেনিসের সমস্যা

বর্তমান বিশ্ব টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনের একচ্ছত্র প্রাধান্যের অবসান বোধহয় হতে চলেছে। পর পর দু'বার উইমবলডেন বিজয়ী রয় এমার্সনকে বিশ্ব অপেক্ষাদার টেনিসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে অভিহিত করা চলে। কিন্তু কিছদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এমার্সনের খেলার জৌলুশ কমে আসছে।

তাঁদের ডেভিস কাপের জন্য লড়তে হবে স্পেনের সঙ্গে, তাঁদের পুরোভাগে আছেন ম্যানুয়েল সান্তানা। সান্তানা এমন দুর্দান্ত খেলছেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ভরসা এমার্সন যদি তাঁর পুরাতন খেলা ফিরে না পান তবে ডেভিস কাপ হাতছাড়া হলে আশ্চর্য হবার কিছই থাকবে না।

সম্পাদার দর্পণ

বাংলা টেবল টেনিসের পয়লা নম্বর মহিলা খেলোয়াড় রূপা মুখার্জীর পরাজয় ঘটেছে মধ্য কলকাতা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায়। রূপা মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে স্ট্রেট সেটে পরাজিত হন তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা রবীনা রায়ের কাছে। পুরুষদের সিংগলসে দিলীপ মুখার্জী পরাজিত হন নন্দন ভট্টাচার্যের কাছে। খেলার সমগ্র দিলীপ

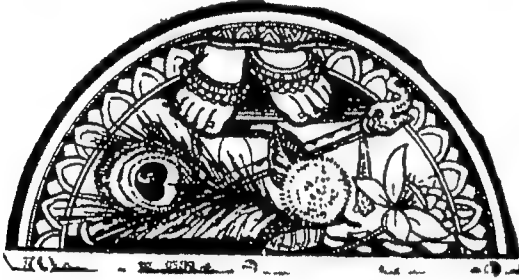
অনুষ্ঠিত হয় উড়িষ্যা রাজ্যপালের একাদশের সঙ্গে। উড়িষ্যা রাজ্যপালের একাদশ তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে পরাজিত হয়। খেলার প্রথমার্ধে ফলাফল ছিল ড্র এবং এই ফলাফল খেলার ৬০ মিনিট পর্যন্ত বজায় ছিল। শেষ দশ মিনিটে রাশিয়ান দল দুটি গোল করেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের সফরের প্রথম পরাজয় ঘটেছে মেলবোর্নের মাঠে। এম সি সি দল ৩২ রানে পরাজিত হয়েছে ভিক্টোরিয়া দলের কাছে। এই খেলার দুই দলের পক্ষে দুটি সেগুরী হয়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে শত রান করেন বিল লরী এবং এম সি সি-র পক্ষে কেন ব্যারিংটন। দুজনের ব্যক্তিগত রান হয় যথাক্রমে ১৫৩ এবং ১৫৮।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনারহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে প্রিন্ট করা গৃহমজুরদের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬৬৫
আজকের মানুষ		১৬৬৮
বিশ্বসাহিত্য-প্রসঙ্গ	ভবানী মৃধোপাধ্যায়	১৬৬৯
ভারতদর্শন		১৬৭১
আন্তর্জাতিক		১৬৭৪
গ্রন্থসেবা	জয়ন্তী সেন	১৬৭৭
নতুন আদর্শীতি প্রসঙ্গ	হলধর পটল	১৬৭৮
দবার জগৎ	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৬৮৩
মতগদর্শন		১৬৯০



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেশ্বনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী

শ্রোমের জলকল্যাণ

জামের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মহাপ্রবন্ধ আর নাই

চিহ্নসমূহ—সুশোভন—সর্বোচ্চ সংস্করণ

মূল্য পনের টাকা

যে জ্ঞান-হৃদয়ের সর্বতোমুখী প্রতিভার
কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চিব-ভাস্বর—
সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও
মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্বানিষ্ট—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ দাস্তী

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মঘদত
বাগ্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাহালা
সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-
মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-
রাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জগন্তী মাত্র ১।।০

নীলাচলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোরাঙ্গ ও প্রকুর

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

স্টুডীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬৯৪
ওস্তাদ (অনুবাদ-গল্প)	— মিতা সেন	১৬৯৬
মনের বিষ (গল্প)	— ছবি সেনগুপ্তা	১৬৯৯
সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭০২
তোমার জন্যে (কবিতা)	— মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৭১১
চার্লি চ্যাপলিন	— অশোক সেন	১৭১২
রংগজগৎ	— ...	১৭১৬
রংগমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৭২২
খেলাধলো	— শ্রীঅমিতাভ	১৭২৬

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌশলভরত, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা
গদ্য মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্রত্নপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণাভেব জন্ত যে
উৎকর্ষ, এই 'প্রলাপে' তাহার অভিযুক্ত।
শ্রীমদ্রত্নপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক'
'প্রাকই' তাহার একমাত্র বচন। শ্রী
কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুসংলিত পঞ্চানুবাদে
এই অমিয় মাধুরী লীলাযিত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপদ্রব্য
ভক্তচরিতামৃত।

হুল'ভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস
বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপৃজিত।
আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের হৃদয়তম অমুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

প্রাচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য
পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুসংলিত
পঞ্চানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মুস্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লালা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপদ্মন, শ্রীশ্রীশুক-বন্দনা, নামসংকীর্ণন
চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর
শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি
চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরণিত।

মূল্য : ৩ টাকা।

প্রখ্যাত কথাকিশোরী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

গিরীন্দ্রমোহনা দেবার

গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

বিগতকালের বরেন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম,
ভয়কচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

কৃত না মাহুয়, কহাবতী, মজার গল্প,
মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ : ২৭শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত

Price : 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

Thursday, 9th Dec., 1965

বঙ্গ-চিন্তা

‘বাংলা আজ যা চিন্তা করে, ভাবত তাই কাল চিন্তা কবে।’ বাংলাদেশের এই গৌরব সম্পর্কে আবার নতুন কবে চিন্তা করার দিন এসেছে। আমরা এতিহ্যে বিশ্বাস করি, সেই কারণে আজ পুনর্বিচার করে দেখার সময় হয়েছে—অতীতে যা সত্য ছিল, যে গৌরবে বাংলাব আকাশে অসংখ্য প্রতিভার জ্যোতিষ্ক-পুষ্প উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, বর্তমান দিনে তার আভাসটুকু পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় কি না। শব্দ, আভাস লক্ষ্য করাই নয়, অতীতের যে গৌরব নিয়ে আমরা বড়াই করি, শব্দ, তাবি স্মৃতিবন্ধা করে চলেছি কি না সে প্রশ্নও আজ উঠছে। অথচ অতীতে আমাদের যা ছিল, তা থেকে ত আবে অনেক এগিয়ে যাওয়ার কথা। আধুনিক পৃথিবীতে অন্তত তাই হয়। অবশ্য বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অংশ হলেও, ইংরেজ আমল থেকে এই প্রদেশটিকে কম ‘কাল’ সামলাতে হয় নি। প্রচণ্ড বিরোধী শক্তি সব সংগ্রাম করা সত্ত্বেও বাংলার শৌর্য, বীর্য, মননশক্তি, শিল্পভাবনা, রাজনৈতিক চেতনা কোথাও স্থান হয় নি, বরং এই দেশের প্রতিভা বহুগুণে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। অথচ একালে বাংলার গৌরব কোন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন? হতো বাংলাব ছিন্ন প্রান্ত, ভগ্ন-বাস্তা, কর্তৃত্ব দেহ দেখে তিনি মৌন দীর্ঘশ্বাস ভাগ করছেন। আব আমরা? আমরা সেই সূযোগে দাঁড়বার চেষ্টা না করে, আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, রাজনীতি প্রভৃতিকে ভুজ-তাড়িলা করে অহং সর্বস্ব মনোভাব নিয়ে দু’বেলা পরস্পর নিজেবা খাওয়া-খাওয়া করছি। সর্বত্রই জঘন্য স্বার্থপরতার বিষাক্ত বাতাসে বাংলাদেশের প্রাণ যেন আইটাই ফুরছে। স্বার্থান্বেষী মানুষের চাফুড় কন্ন নয়। তারা পরের স্বার্থের কথা বলে শব্দ-

মাত্র আত্মতৃপ্তি সাধন করেন। এঁরাই মূখে জ্ঞাতি বা দেশ জাহানমে যাওয়ার কথা সঘোষে উচ্চারণ করেন। সমস্যা সমাধানের দিকে না তাকিয়ে ইন্কুল পালানো ছেলোদের তিরস্কার করেন, সিনেমার লাইন দেখে মাসিকাকুস্তন করেন। কিন্তু যাবা এমন করেন তারা কেউ সত্যিকারের তপস্বী নন। এঁরাই হচ্ছেন বিভ্রান্ত-তপস্বী। এঁদের ভাগ্যেই সব সময় রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির শিকা ছিঁড়ে পড়ে। লোকে বলে, ভাগ্য এঁদের সূত্রসম, এঁদের নামে কঠোর পৈতা সোনার দুপাতারিত হয়। হায সেই অবসরে যে, সোনার বাংলাব দফাবকা শেষ, সেদিকে কে আর লক্ষ্য রাখেন?

বাংলা দেশের দুর্বন্থার জন্য আজ মনে হয়, তা হলে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র বলে কি কিছু নেই। যে বাঙালী খেলোয়াড় খেলার মাঠে বিজয়োদ্ধত ইংরেজ শক্তিকে একদা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছিল, আজ কেন তারা গেলের হিন্দ্য নিয়ে নিজেবাই মারামারি করে? এই অবস্থা ত সাহিত্য-সংস্কৃতির পবিত্র মন্ডপেও। দীনতাকে ভূষণ করে যে বুনো রামনাথ আমাদের জাতীয় চরিত্র গড়ে তুলতে চেষ্টাছিলেন, তার ভিলমার কি আজ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু অবশিষ্ট যদি নাই-ই থাকে আমরা কি এক-বাবো পরিণামেব কথা চিন্তা কবেছি। শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেবাই যে, ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রসঙ্গত, স্মরণ করুন আমাদের মাননীয় প্রতিনিধিবৃন্দেব কথা, যাবা আমাদের হয়ে অনববর্ত শক্তি ক্ষয় করছেন। আমাদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁদের চিন্তার শেষ নেই, রাগিতে ধ্বংস নেই; পাছে আমরা অর্ধাঙ্গনে কিংবা অনশনে থাকি। আমবাও তাবি এঁরা দুর্দিনেই সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

এইসব কারণে জনসাধারণেব যে অর্ধ বাব হয়, তার পরিমাণ বিরাট-কিছ, বলে মনে হলেও সে ত জনস্বার্থেই।

মনে কবুন রবীন্দ্রনাথের সেই কথা, ‘উভয়-পক্ষের যে টাকটা খরচ হইয়া গেল ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই,’ দুর্ভাগ্যবশত খরচের সমস্ত টাকাই জনগণেব।

এতদুসত্ত্বেও যে মূল প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা আজ হইয়াছি, তা হচ্ছে এই, জনগণের প্রতিনিধি বলে যাবা বড়াই করেন, তাঁদের ধৈর্যের সীমা এতাই কম যে, তাবা সোচ্ছা ব্যাপারেও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। এমন কি, মধ্যমস্তরীয় ন্যায় বাংলাব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট স্বন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমবা অপেক্ষা করে থাকি তখন অকস্মাৎ দেখা যায়, তিনিও ধৈর্যচ্যুত। তাবি সামান্য-মাত্র প্রভাব ও স্থিতিচিন্তার গুণে সব বিষয়ের মিটমিট সহজেই হোতে পারে। তা নিয়ে টোবিল চাপড়ালে কোন ফললাভ করা যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় নেতৃস্থানীয়দের কাছ থেকে শিক্ষণীয় কি আছে—যম্বা আমবা উপকৃত হতে পারি। হায়, বাংলাদেশ! এসব কথা চিন্তা করতে গেলেও যে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

সম্পাদক

আজকের মানুষ

উড়িষ্যার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বেশ কিছুদিন থেকেই উত্তপ্ত, জম-জমাট হয়ে উঠেছে। দশকের ভিত্তি না থাকলেও প্রবর্তন-ত ভূমিকা সৌখীন অভিনয়ের একসে এক নট এখনে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। তাই বিজুবীরেনব দেশ উড়িষ্যাকে আজ আর মনে করতে বেগ পেতে হয় না। রাজনীতির ইতিহাসে যিনি নতুন নজীর তুলে ধরে উদাস-কণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সম্পত্তি সব নামমাত্র এক টাকার ষে-কোনো ভারতীয় নাগরিকের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। সেই সূচক্য রাজনৈতিক মানদণ্ডটির সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই, তবে ক্ষমতার মসনদ ও দায়দায়িত্বের রদবদল হয়েছে।

জনতাব একান্ত কাক্ষের মানুষ হিসেবেই গণিপথ—রাজপথ পরিভ্রমণ করে গদীপথে উপস্থিত-হয়েছিলেন বীরেন মিত্র; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেইসব সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আশ্রিত্যকে মজবুত করতে পারেন নি, রাজনৈতিক আবেগ গৃহস্থে—নেবার কৌশলী চেষ্টা জনতার মনোবলের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হোল। তাই সত্যিই সব মিলিয়ে উড়িষ্যার রাজনৈতিক পটভূমি আজ একটি নিরুৎসাহ ছোটগল্পের কাঠামো হয়ে আছে।

সুদেহজনক কার্যকলাপ ও দুর্নীতির অভিযোগে উড়িষ্যার বাতাস ভারী। বিজুবীরেনকে কেন্দ্র করে বিকোভ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে উড়িষ্যার জনজীবনে। বীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেসের প্রশাসনিক প্রহসন সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

অতি সম্প্রতি ১০টি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। এদের কণ্ঠে উদাসভাবে উচ্চারিত হয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিকোভ। তাই এই কংগ্রেসী কর্মীবৃন্দ কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছেদ করবেন অথবা কংগ্রেসের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করবেন। এ প্রশ্নের উত্তর যদিও অনেকটা কুহেলিকার ঘেরা। তবে অনুমান করা যায় এই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীগণ উড়িষ্যায় আগামী সাধারণ নির্বাচনে হরত স্বতন্ত্রভাবে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এগিয়ে আসবেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব হলেন এই দলের নেতা। যার সমগ্র জীবনের বর্মহীন ব্যক্তি এক অপরিমিত আশার মিনাবে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নিজেকে ঘূরু করেছেন। তবুও তাঁর সূদীর্ঘ রাজ-নৈতিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার অপরিমেয় সুযোগ পেয়েও তেমন কিছু উল্লেখনীয় প্রতিষ্ঠিত বান্না তিনি তৈরি করতে পারেন নি। তাঁর গঠনশীল

নেতৃগণের অভাব তাঁকে হতাশা ভরা নৈরাশ্যই এনে দিয়েছে।

সম্প্রতি ইনিই আবার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের একজন ও অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। উড়িষ্যার বর্তমান নেতাদের শাসনকায়ে বার্ষিক তার সমালোচনার বাক্যবাণ মহতাবের কণ্ঠকে জোরালো ও উদাস করে তুলেছে। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের উচিত সাধারণকে একটি সঠিক পথের নেতৃত্ব দেওয়া—এই হোল আজ মহতাবের অস্পষ্ট অনেক উপদেশ কিংবা পরামর্শের জোর হাতিয়ার। ডঃ মহতাব আজ কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর মনের সম্পূর্ণ অভীশাস পাথরকে খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে কংগ্রেস পরিত্যাগ করা, কিংবা এতে লেগে থাকার কোনোটাকেই স্থির মস্তিষ্কে ভেবে উঠতে অসারগ। তাঁর কণ্ঠে নাকি ধ্বনিত হচ্ছে বিপ্লবের ভীতিপ্রদ সংকেত। তবে তাঁর এই চড়াগলার আওয়াজ আজ খুব বেশি কাউকে প্রভাবিত করতে পারবে না, সাধারণ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানমূহের কাছে তাঁর সে ভিত্তিও আজ খুব অল্প। একথা সত্যিই যে, তিনি যে সমস্ত সুযোগ-বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে পেয়েছেন, তাতে করে তিনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী। ১৯৫২—৫৪ পর্যন্ত ডঃ মহতাবকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক-রূপে। বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবেও তিনি কাজ করেন ১৯৫৫—৫৬ সালে।

তিনি কখনো নিজেকে দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। উড়িষ্যার প্রাক্তন শাসকবৃন্দ বখন গণতন্ত্র পরিষদ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি এর বিরুদ্ধাচরণ না করে তাদের সাথেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টাছিলেন, যা তাঁকেই আবার দূর্থে ও অনুশোচনা এনে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ডঃ মহতাব উড়িষ্যার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও উদীয়মান প্রম-শিল্পীদের সাহায্য করে বিজয়ের মূকুট গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের তিনি একদিন সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন, কার্যত ভয়াবহ আবার তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—এই মনোভাব তাঁর কাছে স্থায়ী দূর্ভেদ্য কারণ হয়ে আছে।

আজকের ৬৬ বছর বয়সের ডঃ মহতাব হাতের রসি দৃষ্ট করে ধরতে চাইছেন। উড়িষ্যার রাজনীতির বৃদ্ধ অ্যালবের্টস ১৯২৪ সালে প্রথম এম-এল-এ নির্বাচিত হন। উড়িষ্যার কংগ্রেসে তিনি ইতিমধ্যেই উল্লেখ-যোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও লেখক-সাংবাদিক হিসাবে জন-মনের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও সম্মান তিনি পেয়েছেন যথেষ্ট। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের দিকে বখন ফিরে তাকানো



হরেকৃষ্ণ মহতাব

তবে রাজনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য চিহ্ন রেখে যেতেন।

প্রাক-স্বাধীনতার পূর্বে দীর্ঘ আট বছর ধরে এই মানুষটি কংগ্রেসের সদস্যগণে আসীন ছিলেন। ১৯৪৬-৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। পুনরায় ঘবে-ফিরে তিনি এ পদেই ফিরে এলেন ১৯৫৭—৬০-এ। মাঝখানে ১৯৫০—৫২ সালে তিনি ছিলেন

যায়, তখন কোনো কৃপিতাই তাঁকে কিংবা আমাদেরও হাত তুলে আশ্রয় করতে পারে না। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভাই স্থান হতে দেখা গেছে, কিন্তু জীবনব্যাপী একের পর এক সুযোগ পেয়েও স্থান হারিয়ে অকমল দেখে নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। তাঁর জীবনের বর্তমান অস্পষ্ট দৃশ্যব গোড়ালি অসুখের ছায়ায় আবৃত হয়ে আছে।



ভবানী মুখোপাধ্যায়

কনকর্ড-গোষ্ঠীর লেখক

ইমারসন

বুনিয়াদের মৃত্যুর পর ইংরাজী-সাহিত্যে নীতিবাগীশ রচনারীতি অনেকদিন আর মাথা তুলতে পারে নি। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যেমন ধর্মের আবহাওয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই অনুপাতে চলেছে অধর্মের প্রাবল্য। নীতিবাগীশতা বা পিউরিট্যানিজমকে যদি বলা যায় 'আধ্যাত্মিক স্বাভাবিক' তা হলে জন ওয়েসলে একজন নীতি-বাগীশ লেখক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে পিউরিট্যান সাহিত্য বলে কিছুই প্রায় লেখা হয় নি। উনিবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন পিউরিট্যান গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ে বাবে এই পিউরিট্যান ধারা ইংলণ্ডের সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনু-পস্থিত।

নিউ ইংলণ্ডে একদল পিউরিট্যান ইংল্যান্ডত্যাগী মানুষের এক উপনিবেশ গড়ে ওঠে, নিউ ইংল্যান্ডদের লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটা পিউরিট্যান ভাবধারা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছেছে। সুবাদান-বিরোধী আন্দোলন বা ধর্মপানকে আইনত এক দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এই জাতীয় উৎকট নীতিবাগীশতার পরিচায়ক। শূদ্ধ ওয়ালট হুইটম্যান এবং এডগার আলান পোর মধ্যে এই শূচিবাগীশতার প্রভাব নেই, কিন্তু ন্যাথানিয়েল হথর্ন, রালফ ওয়ালডো ইমারসন, হেনরী ডিভিড থোরো, ব্রনসন এলকট, মার্গারেট ফুলার, জেনস ভেরী, চ্যানিং প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা এবং লং ফেলো বা হুইটম্যান প্রভৃতি লেখকদের এই পিউরিট্যান লেখকদের সগোর বলা যায়।

রালফ ওয়ালডো ইমারসন (১৮০৩-১৮৮২) মার্কিন সাহিত্যে এক বিরাত

পদবী। ইমারসনের জন্ম বোস্টন শহরে। আঠারো বছর বয়সে হার্ভার্ড থেকে স্নাতক হয়ে দিনকতক স্কুলমাস্টারী করলেন, তিন বছর সেই একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে ধর্মযাজকের যোগ্যতা অর্জনের জন্য পড়াশোনা শুরুর করলেন। কয়েক বছর বোস্টনে ইউনিটেরিয়ান চার্চে ধর্ম-প্রচারকের কাজও করলেন, কিন্তু বিরোধ বাঁধল ধর্মমত-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে চার্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ইমারসন ছেড়ে দিলেন যাজকত্ব, পরিপূর্ণভাবে সাহিত্য-সেবায় মন দিলেন। ১৮৩৪ থেকে ইমারসনের জীবন এই কনকর্ডে কাটতে লাগল, এই ছোট্ট শহরপ্রান্তে ইমারসনকে কেন্দ্র করে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় এসে ভিড় করলেন। ইমারসনের প্রকৃতি ঋষি-তুল্য। সেন্ট অফ কনকর্ড ইমারসন অষ্টাদশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপিডিয়া রচয়িতাদের মতে দার্শনিক। অনেক তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যা তিনি স্বয়ং নিজের জীবনে পালন করেছেন। শতাব্দীর মাঝামাঝি বোস্টন শহর অলিভার ওয়েন্ডেল হোমসের মতে সারা বিশ্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত না হলেও, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। হেনরী জেমস হথর্নের একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই গ্রন্থে তিনি বোস্টন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বোস্টনের ড্রয়িং-রুমগুলিতে সাংস্কৃতিক বুদ্ধির তীব্রতা অনুভব করা যেত। দান্তের মহাকাব্যের প্রেরণায় আঁকা ফ্র্যাক্স-ম্যানের আঁকা একটি অক্ষম চিত্র সেখানকার মানুষকে সারা সন্ধ্যাটি আনন্দে কাটানোর সুযোগ দিত। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি নির্জন স্থানে এক বাড়িতে গিয়ে হথর্ন লক্ষ্য করেন যে, সেইখানে রাসকিন রচিত "প্রি-র্যাফেলাইট ইজম" রয়েছে, গ্রন্থটি তার এক বছর আগে ইংলণ্ডে

প্রকাশিত। এই পরিবেশে ইমারসন সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মমতের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে ইমারসন লিখেছেন—

“মাঝে মাঝে ইতস্তত কয়েকজন নর-নারী দেখেছি যাদের পড়াশোনা এবং রচনাগলী মধ্য প্রচুর প্রাণ-শক্তির পরিচয় পেয়েছি। এরা সবাই কিন্তু সঙ্গীহীন মানব। তবে একটি জিনিস এদের সকলের মধ্যে দেখা যেত, কোলরিজ, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও গায়টার রচনাবলী এরা সবাই পড়েছিলেন, তারপর পড়ে-ছেন কার্লাইলের রচনা। এমনিতে এদের সাধারণ শিক্ষা বা পড়া-শোনার মধ্যে বিচিত্র ধরনের বিচ্ছিন্ন ছিল না। আমেরিকানদের চারিত্রিক বিশিষ্টতাসমূহে মানসিক অগভীরতা এদের ছিল, সবাই নিবাল্য নির্জনে বসে পড়াশোনা করতেন।”

ইমারসনের এই উক্তি থেকে বোঝা সহজ যে, মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই গোষ্ঠীজীবন পরিহার করে স্বাভাবিক পছন্দ করতেন। হুইটম্যান প্রভৃতি কবিবৃন্দ সমকালীনদের মধ্যে মেলামেশা বা মতবিনিময়ের যোগ্য সহচর হবে অসম্ভব পেয়েছেন।

ইমারসন, থোরো এবং হথর্ন একই কালে কনকর্ডের এই পল্লীতে বাস

লম্বা হউন

বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কবিতা অধিকতর স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-দেহী হউন। হিন্দীতে বিশেষ বিবরণ পাইবেন।

283, Pzad Market, (W.B.C. Delhi-6



করতেন। এদের লেখা ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে একটা সুগভীর যোগসূত্র ছিল, মেলামেশা হত, মতবিনিময় ঘটত। অথচ সবাই স্ব স্ব প্রধান, স্বতন্ত্র মত বিশ্বাসী, কিংবা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে প্রয়াসী বলা যায়। এই বিষয়ে ইমারসন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

“আমাদের পরিচিত বন্ধুদের সকলের মনই কি একটা সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ, কি আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা। সেই লেখকই পরম পরিভূক্তির অধিকারী যিনি অন্য বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে নিজের মত লিখতে পারেন। আমার এবং আমার বন্ধুদের আচারআচরণ যেন মাছের মত, তাঁরা পিছলে যান, আমার পক্ষে ধোরোর হাত ধরে বেড়ান আর একটা এলম গাছের ডাল ধরে বেড়ানো প্রায় একই কথা।”

যখন ন্যাথানিয়েল হথর্নের মৃত্যু হয় তখন ইমারসন লিখেছিলেন, ‘একদিন হয়ত হথর্নের সঙ্গে মিলন হবে, তার চিন্তাজয় করে মিত্রতা অর্জন করতে পারব এই আশা ছিল, আজ তার মৃত্যুতে সেই আশার অবসান ঘটল।’

এই লেখকদল কোনো-কিছুতেই একাত্ম বা একমত হতে পারতেন না। কিছু জার্মান দার্শনিকের অস্পষ্ট তত্ত্ব-কথার ইংরাজী অনুবাদ তাঁদের আকৃষ্ট করে এবং তার জন্য একটা অস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁদের মনে গড়ে ওঠে।

ইমারসন স্বয়ং একজন স্বতন্ত্র মতের অধিকারী মানুষ। তিনি যখন ডিউ-নিটি স্কুলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

“বাঁধাধরা প্রথার দস্তুত ত্যাগ কর, মানুষের সঙ্গে দেবতার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন কর।”

সেদিন ধর্মসমাজের যারা মদুরস্বি উপস্থিত ছিলেন, একথা শুনে তাঁদের চোখ কপালে উঠল। এ আবার কোন দেবতা, কোথাকার ঈশ্বর, ইমারসন ‘দি ডিউটি’ না বলে বলেছিলেন শব্দ ‘ডিউটি’। ‘দি’ কথাটি না থাকায় বিভ্রান্ত সৃষ্টি হল, নামের আগে ‘ত’ কোনো বিশেষ নির্দেশক নেই। তা ছাড়া এই বিশেষ ঈশ্বরের কোনো পাস্তা কোনো ধর্ম-পুস্তকে পাওয়া যায় না। এমন কি একেশ্বরবাদীদেরও অস্বীকার।

একেশ্বরবাদী ধর্মসমাজের কাজ পরিত্যাগ করে ইমারসন সারাজীবন কাটিয়েছেন এক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি

প্রচারে, ১৮৫২ খৃস্টাব্দে তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় লিখেছেন :

“সৌন্দর্য, ক্ষুদ্রবস্তু মध्ये অনেক সময় পাওয়া যায় বৃহত্তর সন্ধান। চুরটের যে আগুন তার ভেতর দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত তার তরঙ্গ উপলব্ধি করা যায়। এই যে স্পন্দন, এ এক বিশ্বজনীন সত্য। সমুদ্রে যে জোরার-ভাঁটার খেলা এ তার এক অভিব্যক্তি মাত্র।”

হথর্ন বলেছেন একদিন বনের ভেতর তিনি একটি মানুষকে ঘোরাক্ষরা করতে দেখে কাছে এগিয়ে গেলেন, কাছ থেকে দেখেন, সেই ব্যক্তি স্বয়ং ইমারসন। ইমারসন বললেন—তিনি এখানে আনন্দে আছেন। এই অরণ্যে কলা-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছে। বাতাসে ভেসে আসছে তাঁদের অস্পষ্ট কলধ্বনি।

ইমারসন যে ডায়েরী লিখে রেখেছেন, তা অতিমূল্যবান। তিনি একজনকে লিখেছিলেন যে—“সারা বৎসর ধরে আমি হেসব বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি, তারপর ডিসেম্বরে যখন দেশের লোক বক্তৃতা শোনার জন্য পাগল হয় তখন আমি আমার ডায়েরীর লেখাগুলি একত্র করে নিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে একটা শৃংসই নাম দিই, আমার এই ধরনের ছেঁড়া কাঁথার ঝুলির নাম-করণ করছি ‘ইংরাজী সাহিত্য’, বা ‘ইতিহাস দর্শন’ বা ‘মানবের সংস্কৃতিক-ক্ৰমবিকাশ’, তখন বিজ্ঞানেরা আমার ওপর চটে উঠতেন, কিন্তু আজকাল তাঁদের এসব সয়ে গেছে। তাঁরা আর পথরোধ করেন না। পথ ছেড়ে দিয়েছেন।”

ইমারসন ছিলেন লাজুক প্রকৃতির মানুষ। চরিত্রে স্বভাবগত চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা ছিল না। অন্য মানুষের সম্পর্কে তিনি আসতেন সভা-সমিতিতে বক্তৃতার সময়।

ইমারসন বলতেন, “আমি নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তি মানুষকেই পছন্দ করি, ব্যক্তি-মানবের সমীচীন আমার পছন্দ হয় না।”

হেনরী জেমস ইমারসন সম্পর্কে বলেছেন—“অন্য লেখকদের রচনার মনে হয় তাঁরা প্রত্যেকেই একটা নিজস্ব শিল্পরূপের সন্ধান পেয়েছেন যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিন্তু ইমারসন যেন এখনও শিল্পরূপের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।”

কালহিলাকে শ্রদ্ধা করতেন ইমারসন। কালহিলের সঙ্গে একটা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুতা স্থাপিত হয়েছিল ইমারসনের।

কালহিল বলেতেন—“ইমারসনের

বাক্য সরল এবং নিরঙ্কর বটে, কিন্তু যেন সুন্দর চতুষ্কোণ গুলী রাখার আধার, ওপরে ক্যানভাসের আচ্ছাদন না থাকলে সব ছাড়িয়ে পড়বে।”

ইমারসনের রচনায় শিল্প সঙ্গীতের অভাব ছিল, এবং সেই অভাবটাই সমালোচকরা বড় করে দেখেছেন। কবি, কিংবা কনকডে ট্রান্সেনডেন্টাল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইমারসনের স্থান উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দ—

“Viewed the world of phenomena as a sort of symbol of the inner life and emppasised individual freedom and self-reliance.”

ইমারসন তিনবার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। প্রথম গিয়েছিলেন ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে। তখনই কালহিলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৪৮-এ বোস্টনে ফিরে এসে যেসব বক্তৃতা দান করেন তা সাত বছর পরে ‘ইংলিশ ট্রেটস্’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সাহিত্য সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে।

এই প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছেন—“আমি বুটেনে প্রাচ্য দর্শনের প্রতি আগ্রহ অনুসন্ধান করছি। প্রাচ্য দর্শনের বৃহত্তর-পরিবেশে, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, বাঁধাধরা জীবনের মুক্তি পথ নির্দেশ আছে। ইংরাজী শালাীনতা অবশ্য এই চিন্তায় একটু উপীড়িত হয়।”

এর পর তিনি বলেছেন যে, ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর স্বদেশবাসীকে যে ভাগ-বতের একটি অনুবাদ উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে অন্তত ভারতীয় রচনার স্বাদ পাওয়া যায়। ইংরাজদের সংস্কারমুগ্ধ মন নিয়ে এই মহৎ গ্রন্থ পড়ার অনুরোধ জানিয়েছেন হেস্টিংস। ইমারসন এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করে প্রীতিলাভ করেছিলেন সেদিন।

ইমারসন শান্তিময় পুরুষ। ‘কনকড’—শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক। ইমারসন বিদ্রোহী, কিন্তু সেই বিদ্রোহের মধ্যে ছিল একটা নিরুদ্ভাপ জ্বালা-হীনতা। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিস্পহতা।

বতমণি যুগে ইমারসনের নব-মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে।

ভারতদর্শন



একটি অপ্রবর্তী ঘটিতে জওয়ানদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি

জোড়া নৌকা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে অতঃপর জল্পনা-কল্পনার ইতি হয়েছে। তিনি একযোগে ইউ এস এবং ইউ এস এস আর-এর দুই বিপরীতমুখী নৌকার একই ভ্রমণের যৌক্তিকতাকে নতুন করে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রস্তাবিত তাসখন্দ বৈঠকে শাস্ত্রী-আব্দুল বৈঠক একাধিকবার অনুষ্ঠিত করতেও তাঁর আপত্তি নেই, কেন না এই বৈঠকের মাধ্যমেই তিনি ভারত-পাক শান্তি আলোচনার ফলপ্রসূ উপসংহার আশা করেন। ওদিকে মার্কিন দেশ ভ্রমণে এক সময় তাঁর আপত্তি ছিল এবং বর্তমানে পাতিল-বিড়লার চাপে গড়েই যে তিনি সেখানে যেতে সম্মত হয়েছেন, কোন কোন তরফে এজাতীয় আলোচনার প্রতিবাদ করে শাস্ত্রীজী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ সমস্ত আলোচনা ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। বস্তুতপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরে তাঁর অনাগ্রহ বা এমন কোনও ধনুকভাঙা পণ ছিল না যাতে নতুন করে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের মত নিরপেক্ষ দেশের ক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রতিজ্ঞাও প্রত্যাশিত নয়। শাস্ত্রীজী, সুতরাং স্বেচ্ছায় মার্কিনমূল্যে ভ্রমণে অভিলাষী। আর তাছাড়া ইতিমধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট এল বি জের আমন্ত্রণও পেয়ে গেছেন। অতএব সেখানে যাওয়ার পথও নিষ্কণ্টক।

সুতরাং শাস্ত্রীজী যাচ্ছেন, এবং দুই

দেশেই যাচ্ছেন। অতঃপর শাস্ত্রীজীর এই সুমেরু-কুমেরু ভ্রমণের সম্ভাব্য ফলাফলটুকুই আলোচ্য, অন্য প্রশ্ন আলোচনার বাইরের বস্তু।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে শাস্ত্রীজী পি এল ৪৮০-র পুরানো কাসন্দ্রী ঘাটবেন না সম্ভবত, কিন্তু পাক-ভারত সম্পর্কের বিষয় যে সেখানে আলোচিত হবেই এ বিষয়ে তর্কোত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

মার্কিন মূল্যে গিয়ে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন দরদে যাতে কিছু পরিমাণ কমে এজন্য শাস্ত্রীজী নতুন করে চেষ্টা করবেন সম্ভবত। পাকিস্তানের হাতে নতুন করে ভারত আক্রমণের সরঞ্জাম মার্কিনী বন্দুকের হাতে তুলে না দেন সে বিষয়েও স্পষ্ট বক্তব্য তিনি অস্বীকার করে আনবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়। পাক-চীনা মিতালী সম্পর্কেও মার্কিন মূল্যে শাস্ত্রী বৈঠকে একটি আলোচনা আশা করা যায়।

তাসখন্দে আলোচনা বৈঠকের প্রাক্কালে ভুট্টো সাহেব মস্কো দরবারে গেছিলেন ভারতের প্রতি সোভিয়েট বন্ধুত্ব কিছুর চিহ্ন ধরাবার প্রচেষ্টায়। বলা বাহুল্য পাক চরিত্র সম্পর্কে সোভিয়েট দেশের কোনো মোহ নেই। ভুট্টো-প্রচেষ্টা অতএব, বানচাল হয়ে গেছে। সোভিয়েট বন্ধুরা জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক রুশ-ভারত সম্পর্কের অবনতির বিনিময়ে অর্জিত হওয়ার বস্তু নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর উক্ত দেশ ভ্রমণেই আজ একটি

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্ষ্য লিপিত করেছে। এবং বর্তমান অবস্থায় উক্ত দেশের সঙ্গেই নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রধান ধাতী ভারতের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার সর্বশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

শাস্ত্রীজীর জোড়ানৌকা-বিহীন সফর, অবিসংবাদিত বিষয় যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ওপর যাবনিকা ইতিমধ্যেই টেনে দেওয়া হয়েছে।

তবে তাসখন্ডের আলোচনা কতদূর সফলপ্রসূ হবে স্বয়ং শাস্ত্রীজীর মনেও সে বিষয় সন্দেহ সম্ভব।

প্রথমত কাস্মীর সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব অপরিবর্তিতই থাকবে, এসম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনোভাবের প্রস্তর দিতে শাস্ত্রীজী নারাজ। তিনি বারম্বার ভারতের এতৎ বিষয়ক দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ও করছেন।

দ্বিতীয়ত যুদ্ধ-বিরতি রেখা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনাই যে কার্যকরী হবে না একথাও ভারত বারম্বার প্রচার করেছে। দৃষ্টান্তের বিষয় পাক পক্ষে, যুদ্ধ-বিরতি রেখা লঙ্ঘনের পরিচ্ছেদ পুরোপুরি মুড়ে ফেলার সর্বাঙ্গপ্রায় বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। সে জন্যই হস্ত বা শাস্ত্রীজী একাধিক বৈঠক প্রয়োজন বলে অনুমান করছেন।

ভারতবর্ষ তার নীতিতে অবিচলিত থাকবে এটাই মুখ্য বিষয়। কেবলমাত্র তাসখন্ডেই নয়, ওয়াশিংটনেও ভারত যে তার নীতি পরিহার করে কোনরকম নমনীয়

কোনোভাবে অবলম্বন করবে না সে কথাও শাস্ত্রীজীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় পাক-ভারত সম্পর্ক যে অক্ষম হাতে হাত মিলিয়ে ফেলবে এতটা আশাবাদী স্বপ্নাজন এখনো পর্যন্ত কারও চোখেই নেই। বিশেষত পাজাব, রাজস্থান ও পূর্ব সীমান্তে পাক আক্রমণ ও গোলাগুলি অব্যাহত থাকায় সে আশা এখনো সুদূর-পর্যন্ত।

ভারতের নিরপেক্ষ নীতি তবুও মধ্যবর্তী থাকবে এবং ভারত শান্তি প্রচেষ্টার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্ভাব্য সমস্ত চেষ্টাই চালিয়ে যাবে।

অন্তঃসংস্কৃতিক উন্নতি ও শান্তিকামী কোনোও দেশের পক্ষে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রয়োজন অনাবশ্যক, এ বিশ্বাসে ভারতবর্ষ অবিসৃত বলেই শাস্ত্রীজীর পক্ষে জোট-নৌকা-বিহার কোনো আপাতবিরাধী ঘটনা ম্লর, বরং সেটাই অনিবার্য এবং স্বাভাবিক।

ভারত পাক আক্রমণ

তাসখন্দকে সামনে রেখেও পাকিস্তান পুনশ্চ হামলার সর্বাঙ্গক তেড়াকোড়ে কান্ড হই নি। বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি নিক্ষেপ বৃদ্ধ-বিরতির পর অব্যাহতই ছিল, সম্প্রতি প্রতি-রক্ষামন্ত্রী প্রীতাবনের বিবৃতিতে জানা গেল, পাকিস্তান আবার রণসাজে সাজছে। রাজস্থান সীমান্তে তানোট এলাকা বরাবর কয়েকটি সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, কয়েকটি ঘাঁটি দখলের জন্য সৈন্যচালনাও অব্যাহত আছে। রাষ্ট্রের বিপরীত দিকে টাংকসহ পাকি-স্তানের রণং দেখি মৃত্যু ও ভারতীয় টেলিফোন-গণের নজরে এসেছে।

এই আক্রমণের পেছনে আছে পাকিস্তানের মল্ল কূটনৈতিক চাল। বৃদ্ধাবিরতি তদারকির উদ্দেশ্যে চিহ্নিত জেনারেল জুলিও মারাম্বিওর আগমনের পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের পক্ষে ভারতীয় ঘাঁটি দখলের নতুন উদ্যম একান্ত প্রয়োজন। কেন না যে বিচ্ছিন্ন কতিপয় ঘাঁটির দখলিস্বত্ব বর্তমানে তাঁরা ভোগ করছে সেই ঘাঁটিগুলির মধ্যে একটি বোগস্ত্র রচনা করে সমগ্র এলাকায় যে পাক দখলে ছিল এটাই প্রমাণ করতে চায় তারা। আর এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই বড় রকমের পাক আক্রমণের সম্ভাবনাও বর্তমান বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

অন্যপক্ষে ভারতও মধ্যবর্তী হাত গুটিয়ে বসে নেই। ভারতের যে সমস্ত জমি অন্যা-ভাবে পাকিস্তান জবরদখল করে আছে সেগুলি পুনরুদ্ধারের বা সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদের চেষ্টাও চলছে। এ পর্যন্ত পাক-কবলিত তেইশটি ভারতীয় ঘাঁটির মধ্যে অন্যান্য নয়-দশটি ঘাঁটি থেকে তাদের উচ্ছেদসাধনও সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে পাক আক্রমণের যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার মোকাবিলা করার জন্য ভারত যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছে এ বিষয়েও আশ্বস্ত করেছেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী।

পাক-ভারতের মধ্যে এই ঠাণ্ডা লড়াইও চলতে থাকবে ওদিকে সেই কথ্যা আলোচনাও ঘটা করে বসবে এই ন্যাকারজনক অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের মতি সম্ভব হল না। পাক সরকারী পর্বতারের বৃদ্ধোদ্ভাদনা দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনধারণকে ঐ টাঙানো সংঘর্ষ দেখিয়ে বিবৃত বিচলিত ও পর্যুস্ত করে রাখতে চায়। এ এক ক্যান্ডিহীন কুনীতি যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার উত্তর রাষ্ট্রের নাগরিক জীবন তার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে হারতে বাধ্য হচ্ছে। বৃদ্ধাবিরতি এবং আলোচনা বহুবার হল বা উত্তর রাষ্ট্রের পক্ষেই কম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়। হত্যাও কম হল না।

কিন্তু একটা বৃদ্ধ টাঙিয়ে রেখে অনন্ত-কাল যদি সাধারণ মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে পাকিস্তানের নড়বড়ে অগণতান্ত্রিক সরকার তাঁর গদি টিকিয়ে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে থাকেন, তবে সেই মারাত্মক ভুলের ফলা-ভাসের অতি কঠিনভাবেই পরিশোধ করতে হবে।

ভারত সরকার সর্বপ্রকারে শান্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গো সহযোগিতার জন্য বাহু প্রসারিত রেখেছেন। কিন্তু - বৃদ্ধার আবহাওয়ায় পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে পাক সরকার সহজে রাজী হবেন না আপন স্বার্থেই। বৃদ্ধ একটা তাঁদের চাই-ই।

পাক সরকারের এই দুরভিসন্ধি বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিজ্ঞদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড-তাই আজ তাসখন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছেন ভারত-পাকিস্তানের বৃদ্ধকবলিত শান্তিপ্রিয় জনগণ। পশ্চিমা মধ্যমভাগ বহুবার পাক-ভারত কোন্ডলের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সোভিয়েটভূমি এই দুরভিসন্ধিপ্রসূত বৃদ্ধোদ্ভাদনার অবসান করতে পারলে ভারত-পাকিস্তানের ইতিহাসে নতুন বৃদ্ধ-স্বর্ষের আবির্ভাব ঘটবে।

বর্তমানে সেই ক্রীণ আশার আনোক-রশ্মির দিকে সাধারণ মানুষ একান্ত আগ্রহে তাকিয়ে আছেন।

উনিশ হাজারের ভাগ্য

পাকিস্তানের অবিরত অত্যাচারে পাকি-স্তানের জন্মকাল থেকেই নিরীহ মানুষ ভিটে-মাটি ছেড়ে ভারতে আগ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ভারতবর্ষ এই অবিরাম উদ্ভাস-ভ্রমেতে প্রতিমুহূর্ত নবতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনো পন্থাই

গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তান থেকে বিভাজিত সাধারণ মানুষের পুনর্বাসিতর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি কেড়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ সে পথের পথিক নয়।

সম্প্রতি পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ভাগ্যী রাজসভাকে জানিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসায় সীমান্ত দিয়ে যে উনিশ হাজার উদ্ভাসভূর সাম্প্রতিক ভারত-প্রবেশ ঘটেছে, যেহেতু তাঁদের কাছে কোনও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নেই সেজন্য সরকার তাঁদের পুনর্বাসিতর জন্য কোনোই সাহায্য দেবেন না।

বস্তুতপক্ষে সমগ্র হিন্দু পাকিস্তানকে যদি ভারতবর্ষে পুনর্বাসিত করতে হয় তবে ভারতের সেই ভুলনার জমি ও খাদ্যের প্রয়োজন। এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; পাকিস্তানের হিন্দু-বিভাজন নীতি স্বতকাল অব্যাহত থাকবে ভালমানুষ ভারতকে ততকালই তাঁদের পুন-বাসিতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেন দেশ বিভাসের দায়িত্বটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষেরই। পাক মসনদটিও যে পড়ে পাওয়া জোন্ড আন-দুর্ভিত্ত মনোবৃত্তি সেকথা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কিন্তু ভারতের মর্যাদাশক্তি কিংবদন্তি বোশ থাকবে লক্ষ লক্ষ মানুষের দায়িত্বকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই বলে এমন অবস্থাও তো অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না যে, যখন পাক সরকার আপন প্রজাবন্দকে থাওয়াতে পরাতে অক্ষম হবেন তখনই বেওয়ারিশ মালের মত তাঁদের ভারত সীমান্ত পার করে তেলে দেবেন ভারতের দায়িত্বে। অথচ এমনটাই হয়ে আসছে এবং পাকবর্ষতার জবাবও কোনোভাবে দেওয়া হয় নি।

ভারতবর্ষ যখন লোকবিনিময়ের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি তখন বাড়তি লোকের দায়িত্বই বা অস্বীকার করবে কি করে। পাক দুর্ভিত্তের ভয়ে খারা দলে দলে দেশ-ভাগী হচ্ছেন তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারতকে কাজে কাজেই গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রতি প্রবিন্ট উনিশ হাজারের ভাগ্যও তাই ভারতভাগ্যবিধাতাদেরই হাতে। তাঁরা এই উনিশ হাজারকে ফেলতে পারবেন না আর তাই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট থাক বা না থাক এঁদের রাখবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। অন্যথা এঁদের ভবিষ্যত কী হবে, আর বা হলে তার কান্ড-ভারত সরকারই বা অস্বীকার করবেন কোন মুখে।

শান্তিযশন ও নাগাবাহিনী

কেবলমাত্র পাকিস্তানের কাছে গেরিলা বৃদ্ধেই যে নাগারা ডালিম পাচ্ছে এমন কথা খারা মনে করেন তাঁরা পাক-গুরু ও নাগা শিষ্যদের ক্ষুদ্রতর কপাসে দেখতে চান। বৈরা নাগাসের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বেশ বোঝা

বাংলা গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয়টোও পাক-গুরুরা বৈরী নাগামনে চারিত্র্য করতে কসর করেন নি। তাই দেখা যায়, শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা স্বকালে বিলুপ্ত হয় নি। ভারত সরকারের উদার স্বকপট স্বখন বৈরীনাগাদের আলিঙ্গনে উন্মুখ এবং বৈরী নাগারা স্বয়ং যেখানে সম্ভব থেকে বিরত থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ঠিক সেই মহত্বই আবার উত্তর-পূর্ব রেলপথের লামডিং-মারিয়ান অংশে গানসিতি স্টেশনের কাছে একটি স্বাভাবিক বৈরী ওপর অতিক্রমিত চড়াও হয়ে তিন ব্যক্তিকে নিহত এবং আট ব্যক্তিকে জখম করে অশান্তি সৃষ্টিতেও তারা বিরত নন।

দুই সহস্র বৈরী নাগা ইতিপূর্বেই বর্মী সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সম্প্রতি আরও এক হাজার নাগা পূর্ববর্তীদের অনুগমন করেছেন বলেও সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, বৈরী নাগারা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দুটি গ্রাম থেকে পনেরজন দেশভক্ত আত্মীয়তাবাদী নাগাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। অন্যতর সংবাদে জানা যাচ্ছে, অধিকৃত কাশ্মীরে কতিপয় নাগাকে পাক বাহিনীর সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষার সহযোগিতা করতেও দেখা যায়। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বৈরী নাগানেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছুক নন জেনে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে আপোষ ও শান্তিতে তারা অবিশ্বাসী তাদের সঙ্গে আলোচনাচক্রে কোন কতদূর ফললাভ সম্ভব আজ সে সম্পর্কেই অনেকের মনে গভীর সন্দেহ উদ্ভূত হয়েছে। একথা মনে করারও যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও শান্তি মিশন নাগা সমস্যাকে স্বার্থ-কক্ষা করতে না পারায় জন্মই নাগা-বৈরাদিপাকে নির্বিন্দে সহ্য করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন ভারত সরকার। অন্যথা বিদ্রোহী দমনে যে দৃঢ়তা প্রয়োজন শুদ্ধ নীতিই গৃহীত হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী আশাবাদী। তিনি মনে করেন, নাগা নষ্টামি করেকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমষ্টিমাত্র, সাম্প্রদায়িকভাবে নাগাদের এই রাষ্ট্রবিবোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপে কোনো একব্যক্তি হাত নেই। মশকভাটিয়া মন্দিরের নাগারাই শান্তি আলোচনাকে ব্যর্থ করার জন্য বিরুদ্ধ কার্য-কলাপে আত্মনিযুক্ত। আর এই যখন অবস্থা তখন “এক শ্রেণীর শত্রুতাচরণের জন্য” নাগা নেতাদের সঙ্গে শাস্ত্রীজীর সাক্ষাৎকারে সম্মীকৃত হওয়া অনুচিত। সেই সঙ্গে শাস্ত্রীজী অন্যতর আর একটি সত্যও অস্বীকার করেন নি যে নাগারা দলবদ্ধভাবে পাকিস্তানের কাছে তালিম নিচ্ছে যদিও এ বিষয়ে কোনোরূপ চীনাৎপরতা আছে বলে তাঁর জানা নেই।

নাগা নষ্টালির কথা যেভাবে প্রধানমন্ত্রী

ভাবে পারছেন, অজ্ঞানে কিন্তু ব্যাশরী কত সহকৃত্যবে মনে নিতে পারেন। তারা বাস্তব সংবাদের ভিত্তিতে স্বেচ্ছানুভূতি এই ধারণার উপনীত যে, কেবলমাত্র মন্দিরের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে দুর্ঘটনা সৃষ্টি হতে পারে না। তরাজ প্রধানমন্ত্রীর আশা যদি সত্য হয়। তবে সেটা অসম্ভব আনন্দেরই সংবাদ।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি মিশনের প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয় তবে তার থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু উপর্যুপরি ঘটনাবলীর পটভূমিতে তেমন আশা পোষণের যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়াই যায়। বরং নাগা তৎপরতা যে ক্রমেই বাড়ছে তারই চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

এই জটিল পরিস্থিতিতে আরও আনতে হলে অপেক্ষাকৃত কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতেই হবে। তাবশেষে দ্বারা বৈরীতার অবসান অসম্ভব একথা বুঝতে হবে অন্তঃপর কেন্দ্রীয় সরকারকে। মনে রাখতে হবে নাগা তৎপরতার কোনো সময় পূর্বাঞ্চলে অনিচ্ছাপ্রত ঘটনার উদ্ভব হলে তা সমগ্র ভারতের পক্ষেই নতুন ও কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিতে পারে। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানী রণসজ্জা সমতলেই এগিয়ে চলেছে। পূর্ব সীমান্তে পাক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতেই নাগা সমস্যাকে স্থাপন করে তার সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ফলাফলের মোকাবিলায় জনাই ভারত সরকারের পক্ষে কঠোরতর নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন মহলেই আলোচ্য বিষয়। আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে যথাসম্ভব বাস্তব দৃষ্টি গ্রহণ করেই নাগা সমস্যা সমাধানের পরবর্তী সোপানে আরোহণ করবেন।

দুর্ভিক্ষের কালোহারা

না, কেবলমাত্র ছায়া বললে ভুল হবে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং দুর্ভিক্ষের কালো মৃতিকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু বড় দৌর করে দেখেছেন এই যা দুঃখ। তিনি যাকে ‘দুর্ভিক্ষের’ অবস্থা দেখা দেবে’ বলে ‘অস্বাভাব্য হত ইতি গজ’ করতে চেয়েছেন, গোটা দেশের চেহারাটা সেই অর্ধস্ফুট বাক্য-বোরখার অন্তরাল থেকে মুখ্যবাদান করে শরীরের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। শরীরের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি যে চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে এ সম্পর্কে ভারতের সাংবাদিক মহল বেশ কিছুকাল থেকেই দেশকে সচেতন করছিলেন। সরকারও অচেতন ছিলেন না। তবে হয়ত সাহায্যার্থীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য অনাহার অর্ধাহারাক্রান্ত নিচতলাব মানদুর্গালির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করার ফরসৎ হয়ে ওঠে নি। এখন অবস্থা একেবারে বেসামাল হয়ে ওঠায় শ্রীসূরক্ষণিয়ম ও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা

একযোগে চীৎকার শুরু করেছেন। গেল গেল সামাল সামাল রব চতুর্দিকে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবের খাতায় দেশে খাদ্যঘাটতির পরিমাণ আশি লক্ষ টনেরও বেশি হতে পারে বলে প্রকাশ। ফসলের অবস্থা নৈরাশ্যজনক এবং অনাবৃষ্টিই তার প্রধান কারণ একথাও আবেগকম্পিতকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। তবে এখনো খাদ্যমন্ত্রীর ভরসা, ঐ আসে ঐ অতি তৈরব হরবে—কিন্তু সরসা যুবতী বর্ষাণী নন,—ঐ আসে সাহায্য তরণী। হয়ত আসবে। দুর্ভিক্ষ কবলিত ভারত উদ্ভারে ৪৮০-র আশীর্বাদ এসে পড়বে হয়ত। অন্তত তেমন আশা একেবারে নিরর্থক নয় বলেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই পরমুখাপেক্ষিতার ভারতবর্ষ আর কতদিন খেয়ে পরে বাঁচবে তাতে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভূত খাদ্যশস্য নিরন্তর করবেন বলে চিন্তা করছেন। ১৯৭০-এর পর উদ্ভূত খাদ্যের পরিমাণই শূন্য হ্রাস করা হবে না, উদ্ভূত শস্যোৎপাদন বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেবেন বলে এ-এফ-পি-র সংবাদ প্রকাশ।

তখনও অনাবৃষ্টি দেখা দিতে পারে এবং স্বার্থই সংকটজনক পরিস্থিতির যে চেহারা এবার দেখা গেছে তারও পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তখন ভারত কোন অল্পস্বর্ণার ভাড়াতে চোখ রেখে তার কৃষিক্ষেত্রে অবহেলিত রাখবে এ প্রশ্নও এখনই চিন্তা করে দেখা উচিত।

অনেকানেক পরিকল্পনার পরও দুর্ভিক্ষ মুখ চেয়ে জমি চাষের দৈন্য আমাদের ঘূরছে না। সেচ ব্যবস্থার এমন উন্নতি সম্ভব হয় না যার দ্বারা বোম্বুখাপেক্ষিতার লঙ্ঘন থেকে আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা রেহাই পেতে পারি। ১৯৭০ খৃস্টাব্দে নেই। পি-এল ৪৮০-র ধাক্কা গ্রাহি গ্রাহি রব ছুটেছে। ১৯৭০-এ অকূল পাথর।

একে অনাবৃষ্টি তার জোতদার চক্রান্ত মাঝে মানবজন স্ত্যাকুইচড।

গ্রামাঞ্চলে সবাই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মহারাষ্ট্রে তো সাবিক চেহারা অনাবৃত। মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান উত্তর-প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ কোথাও আশার ছিটেফোঁটা নেই। নতুন সরকারী খাদ্যনীতিও এই বেসামাল অবস্থাকে কার্যদা করে উঠতে পারবে বলে ভরসা কৈ।

এজন্য অর্ধাহার ও অনাহারের ফিরিস্তি শূন্যি আমরা। সাপ্তাহিক এক দিবস অনশন, অপরিপক্ব কলা ভক্ষণ আরও বহুতর প্রেসকিপশন হাজির আছে। তাতেও সমস্যার কতদূর সমাধান সম্ভব তা কল্পনাপ্রবণ পরি-কল্পনাবাদীরাই জানেন।



সপারিষদ আইয়ান স্মিথ

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

আফ্রিকীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও বিশ্ব-জনমত অগ্রাহ্য করে আইয়ান স্মিথ ও তাঁর দলবল কর্তৃক বে-আইনীভাবে দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রায় এক মাস হতে চলল, কিন্তু এখন পর্যন্ত, এই শাসনকে পরিত্যক্ত করার জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণই সম্ভব হয় নি। অনেক তর্জন-গর্জন করা সত্ত্বেও বৃটেন আইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে বলতে গেলে কিছুই করে উঠতে পারে নি।

বৃটেন চেষ্টা করলে মহত্বের মধ্যে আইয়ান স্মিথের বে-আইনী শাসনকে শক্তম করতে পারে; বৃটেনের কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেই এ কাজ করা সম্ভব। তবু, বৃটেন তা করছে না। স্বাভাবিকভাবেই আফ্রিকীয় জনমত এতে ক্ষুব্ধ। বৃটেনের নীক্ষিততা দৃষ্টিতে তাদের ধারণা হয়েছে, বৃটেন সত্যি-সত্যিই দক্ষিণ রোডেশিয়ার উচ্চতর শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় না।

তাই আফ্রিকা-বৃটেনের উদ্দেশ্যে চরমপত্র দিয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর আন্দিস আবার 'আফ্রিকা একা সংস্থা' বা 'অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি'র (ও-এ-ইউ) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটেন যদি আইয়ান স্মিথ সরকারকে 'চূর্ণ' না করে, তবে আফ্রিকার ৩৬টি রাষ্ট্র বৃটেনের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আফ্রিকার যে নটি রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য, তারা কমনওয়েলথ

থেকেও বেরিয়ে আসবে। এই সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সত্যি সত্যি আফ্রিকার দেশগুলি বৃটেনের সংগে কোনরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক না রাখে, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের মর্যাদার ওপর চরম আঘাত তো হানা হবেই, উপরন্তু বৃটেনের অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্র হবে। কমনওয়েলথের দিক থেকেও আফ্রিকীয় রাষ্ট্র-গুলির কমনওয়েলথ ত্যাগ প্রায় এই সংগঠন-টির মৃত্যুপর্যায়ের মত মনে হবে। এখন দেখা যাক, বৃটেন আফ্রিকার এই হুমকীর জবাবে কি করে।

আন্দিস আবার সম্মিলিত পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর ফেব্রুয়ারি বৃটেনকে চরমপত্রই দেন নি, তারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন। আইয়ান স্মিথ সরকারকে ধ্বংসসাধন ও স্বাধীন জিম্বাবোয়ে আন্দোলনের সমর্থনের জন্য আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির একটি স্বল্প সৈন্যবাহিনী গঠনের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আলোচনা করেছেন। তারা আরও ঘোষণা করেছেন যে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকারের বে অর্থ আছে তা তারা বাজেয়াপ্ত করবেন।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আফ্রিকীয় রাষ্ট্র-গুলি আইয়ান স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এদিকে দেশের অভ্যন্তরেও আইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। গত সপ্তাহে মলিসবেরীতে রোডেশীয় পালি-

মেণ্টের অধিবেশন বসেছিল। ১১শে নভেম্বর এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই প্রথম পালিমেণ্টের অধিবেশন বসল। স্পীকার আর্থার স্টাম্বলস্ তাঁর আসন গ্রহণের প্রায় সংগে সংগেই রোডেশীয় পালিমেণ্টের একমাত্র নির্দলীয় শ্বেতাঙ্গ সদস্য ডঃ আল্‌ প্যালে বৈধতার প্রশ্ন তুলে বলেন, এই পালিমেণ্টের কোন আইনসংগত ভিত্তি নেই। আইয়ান স্মিথ ও অন্য মন্ত্রীরা ১৯৬১ সালের সংবিধান অমান্য করে, রাণীর নির্দেশ ভঙ্গ করে শাসন চালাচ্ছেন, সুতরাং পালিমেণ্টের এই অধিবেশন বা তার আলোচনা সম্পূর্ণ বে-আইনী। ডঃ প্যালের স্বজাতীয় স্মিথ-অনুচররা এই 'বিভীষণকে' জোর করে বসিয়ে দেয়, এবং বাণ-বিদ্রুপে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ডঃ প্যালে তাঁর বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলে তাকে পালিমেণ্ট-কক্ষ থেকে বহিস্কৃত করা হয়। ডঃ প্যালের সংগে সংগে নিম্নো নেতা যোশিয়া গোম্বোর নেতৃত্বে ইউনাইটেড পিপলস পার্টির ৬ জন আফ্রিকীয় সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন। পালিমেণ্ট-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এঁরা সোজা গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবস-এর ভবনে যান, এবং স্মিথের শাসনের পরিবর্তে রাণী এলিজাবেথ ও তাঁর প্রতিনিধি গিবসের শাসনের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ডঃ প্যালের প্রতিবাদ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয়, এখনও দক্ষিণ রোডেশিয়ার কিছু-সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ স্মিথ শাসনের বিরোধিতা করছে। যোশিয়া গোম্বো আফ্রিকীয়দের মধ্যে নরমপন্থী এবং মোটামুটি তিনি স্মিথদের সংগে মিলেমিশেই চলতেন। কিন্তু এবার স্মিথের আচরণ তাঁর পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং স্মিথের বিরুদ্ধে



হামফ্রে গিবস

রোডেশীয় জনসমাজের বিভিন্ন অংশ আঙ্গ এগিয়ে আসছে।

কেবলমাত্র শান্তি বিক্ষোভেই স্মিথবিরোধী আন্দোলন থেমে নেই। দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান শিল্পনগরী ব্লেটওয়ার্ডে গত সপ্তাহে আফ্রিকারীদের সঙ্গে পুলিশের প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ জনতার ওপর গুলী চালিয়েছে ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছে। সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন নিহত হয়েছে, এবং প্রতিবাদে ব্লেটওয়ার্ডের শ্রমিকরা পূর্ণ হরতাল পালন করেছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে।

দেশব্যাপী যদি গণবিক্ষোভ সূত্র হয়, এবং অন্যান্য আফ্রিকীয় রাষ্ট্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে, তাহলে বৃটেনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আইয়ান স্মিথ শাসনের পতন ঘটবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডোমিনিকান রিপাবলিক :

ক্যামেনো দিনের নেতৃত্বে ডোমিনিকান রিপাবলিকে যে বিদ্রোহ সূত্র হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা দমন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু ডোমিনিকান রিপাবলিকের ঘরোয়া ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকায় বিক্ষোভ গড়ে ওঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুটা আপোষের চেষ্টা করে। দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনার পর মার্কিন পরামর্শেই বিদ্রোহী ক্যামেনো দিনো ও 'অনুগত' ইমবার্টো ব্যারেরাকে বাদ দিয়ে হেঁকর গার্সিয়া-গোডয়েকে ডোমিনিকান রিপাবলিকের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। ডোমিনিকান রাজনীতির উভয় পক্ষই গার্সিয়া-গোডয়েকে মেনে নেয়। ঠিক হয়, আগামী মে মাসে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচনের প্রস্তুতি করাই হবে গার্সিয়া-গোডয়ের কাজ।

কিন্তু এখন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্সিয়া-গোডয়ের ওপর বিরূপ হচ্ছে? এমন অভিযোগ মার্কিনমহল থেকে উঠছে, গার্সিয়া-গোডয় বামপন্থী-ঘোষা নীতি গ্রহণ করছেন। বিদ্রোহীদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার যে কথা ছিল, তা নাকি গার্সিয়া-গোডয় পালন করছেন না। গার্সিয়া-গোডয় মন্ত্রিসভা থেকে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এন্টন-জেনারেল ম্যানুয়েল রামলকে অপসারিত করার জন্য যে আন্দোলন হয়, তার পেছনে মার্কিন সমর্থন ছিল, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। সম্প্রতি আর একটি 'হাস্যকর' ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা হয়েছে। স্যাণ্টিয়াগোর একজন চিকিৎসক অ্যালিসিরিয়াদিস এসপিভোসার নেতৃত্বে ৬০ জন লোক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করে। এদের

সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, গার্সিয়া-গোডয়ের সরকার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চলছে।

বিপরীত দিকে ডোমিনিকানে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ আবার গড়ে উঠছে। বিদ্রোহের অবসান ঘটলেও মার্কিন সৈন্য কিন্তু এখনও আছে। আমেরিকান রাষ্ট্র সমিতি বা 'অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটসের' নাম করে ডোমিনিকান রিপাবলিকে বর্তমানে ৯,২০০ বিদেশী সৈন্য আছে, এবং এদের অধিকাংশই মার্কিন। ডোমিনিকানে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান, এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নানাস্থানে বিক্ষোভ

প্রদর্শন হচ্ছে। সংযুক্ত সারাজীবাদ বিরোধী ফ্রন্টের আহ্বানে গত সপ্তাহে স্যাণ্টিয়াগোর ছাত্ররা 'ন্যাশনাল প্যালেসের' সম্মুখে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল। ছাত্ররা সেখানে মার্কিন পতাকা ছিঁড়েছে, এবং পতাকা পুড়িয়ে বহুত্বসব করেছে।

মে মাসের নির্বাচনে যাত্র মার্কিন অনুগামী কেউ জয়লাভ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই চেষ্টা করছে। বিরোধীরা ভাবছে মার্কিন সৈন্য যদি দেশে থাকে, তবুও রাজনৈতিক খবরদারি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে স্বাধীন নির্বাচন অসম্ভব। তাই বতই নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসবে, হস্তক্ষেপ

শুভমুক্তি শুক্রবার ১০ই ডিসেম্বর

রহস্য ও রোমাঞ্চ ঘেরা এক অসাধারণ কাহিনী

অনিল চ্যাটার্জী
শবনম
বলরাজ সাহানী
রাজা ও হেলেন



পরিচালনা গিতাকী মুখার্জী
সংগীত ও প্রযোজনা হেমন্তকুমার

জবতা : লোটার্স : বসুপ্রী : বীণা

পূর্ণশ্রী : নাজ

শান্তি	বর্ণা	ভিহার	চন্দা	সিগাড	বিভা
(কন্দনতলা)	(বাতাইতলা)	(ররিয়া)	(ব্যারাকপুর)	(গালকিয়া)	(বেলঘরিয়া)
নারায়ণী	দ্রীক	রামক	অরুণা	বসন্ত	আরতি
(আলমবাজার)	(জগদল)	(নৈহাটি)	(ব্যাংগল)	(জামসেদপুর)	(বর্ধমান)

দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত

মধ্যে বিরোধ তীব্র হবে। মাঝখানে থেকে বেচারী গার্সিয়া-গোডয়ের সদিচ্ছা থাকলেও তিনি কিছু করে উঠতে পারবেন না।

রেজিল :

গত সপ্তাহে রিও জ্যানেরোতে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক বসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাগিদে ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নের জন্য 'আলোরেন্স ফর পিস' পরিকল্পনা অনুসারে যে আমেরিকান রাষ্ট্রসমিতি (ও-এ-এস) গড়ে উঠেছে, তারই সম্মেলন উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মিলিত হয়েছিলেন।

ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে দশবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৯৭১ সালে তা শেষ হবে। প্রধানত মার্কিন যুক্ত-



ডিন রাস্ক

রাষ্ট্র এই পরিকল্পনার জন্য অর্থায়ন করে। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কাজের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। রিও বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে জানিয়েছে, এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা মাত্র সূত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও সাহায্য করার জন্য আগ্রহী, তারা ১৯৭১ সালের পরেও এই পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যাবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্ক এই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি. জনসনের একটি শব্দচ্ছবাণী পাঠ করেছেন। জনসন তাঁর বাণীতে ল্যাটিন আমেরিকার জন্য ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে এখনও অগ্র পিছিয়ে

আছে। সুতরাং তাদের উন্নয়নের জন্য আন্তঃসম্মুখ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে, এতে কারও আপত্তি হতে পারে না। বরং সবাই এতে আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও সাহায্য করুক, এই তারা সবাই চায়। কিন্তু অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন সত্ত্বেও ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃক প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অধিকাংশ দেশ ক্ষুব্ধ। তাই যখন ডিন রাস্ক 'আন্তঃ-আমেরিকান শান্তি ফোঁজ' গঠনের প্রস্তাব রিও বৈঠকে উত্থাপন করেন, তখন যোগদানকারী ২০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দৃঢ়তার সঙ্গে তার বিরোধিতা করেন। মেক্সিকো ও চিলি বিশেষভাবে মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। রেজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাস্কা লাইটাও দ্য কুনহা ছাড়া আর কেউ খুব উৎসাহের সঙ্গে রাস্ককে সমর্থন করেন নি।

রাস্কের বক্তব্য ছিল, আমেরিকা মহাদেশে যারা গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে সকলের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ডোমিনিকান রিপাবলিকের ঘটনার পর অধিকাংশ ল্যাটিন আমেরিকান দেশ শঙ্কিত যে, তাদের যে কোন দেশের যে কোন ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই তারা মার্কিন নেতৃত্বে এরকম কোন ফোঁজ গঠনের বিরোধী।

মার্কিনবিরোধী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন কলাম্বিয়ায় প্রতিনিধি। তিনি সোজাসুজি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ডোমিনিকানের ঘটনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিল্লা করা হোক।

কলাম্বিয়ার প্রস্তাব যেমন শেষ পর্যন্ত চাপা পড়েছে, রিও বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত আমেরিকান বাহিনী গঠনের প্রস্তাবও তেমন চাপা পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এখনও অর্থনৈতিক সাহায্যদানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাহলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিনবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হবে। রিও বৈঠক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

কুবাইত :

কুবাইতের রাজা আমীর শেখ আবদুল্লা এস-সালাম এস-সাবা গত সপ্তাহে ৭০ বৎসব বয়সে মারা গিয়েছেন। তাঁর জায়গার তাঁর ভাই শেখ সাবা এস-সালাম এস-সাবা কুবাইতের নতুন আমীর হয়েছেন।

আবদুল্লাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শেষ ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সাবাকে আমীর পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়, এবং পরে 'ন্যাশনাল অ্যাসেমবলী'তে সাবা শপথ গ্রহণ করেন।

আরব জগতে কুবাইত ও কুবাহতের পরলোকগত শাসক আবদুল্লাহর বিশিষ্ট স্থান আছে। আবদুল্লাহ তাঁর ১৫ বৎসরের শাসনে দরিদ্র দেশ কুবাইতকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত করেছেন। এখন এখানে পরিবার পিছ গড় বার্ষিক আয় ৩০ হাজার ডলার। বেকারসমস্যা ও নিরক্ষরতা দেশে একেবারে নেই। দেশের পৌনে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রার মান যে কোন উন্নত দেশের ঈর্ষার বিষয়। অবশ্য এ সবই সম্ভব হয়েছে কুবাইতের তেলের জন্য। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় মরুভূমির এই ক্ষুদ্র দেশটিতে।

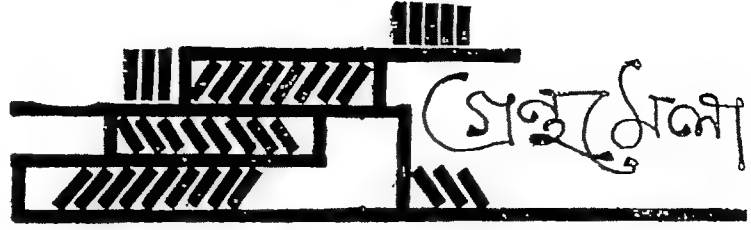
কুবাইতে রাজকীয় শাসন প্রবর্তিত থাকলেও, দেশে পার্লামেন্ট রয়েছে, এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। পার্লামেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে রাজার যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে।

১৯৬১ সালে যখন আবদুল্লাহ বৃটেনের কাছ থেকে কুবাইতের স্বাধীনতা আদায় করেন, তখন ইরাক কুবাইতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ তাঁর বিচক্ষণতার সাহায্যে ইরাকের বৈরিভাব দূর করে, ইরাকের বন্ধুত্ব অর্জন করেন। আবদুল্লাহর মৃত্যুতে ইরাক রেডিও নির্দিষ্ট কার্যসূচী বাতিল করে কুবাইত-রাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এবং ইরাকের সর্বত্র তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। 'সুদান ও লেবাননের পার্লামেন্টে আবদুল্লাহর সম্মানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

আরব দেশগুলির কুবাইতের প্রতি কৃতজ্ঞ হবার প্রধান কারণ, কুবাইত আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর সাহায্য করেছে। গত বৎসরও কুবাইত বিভিন্ন আরব দেশকে ৪৭ কোটি ডলার টাকা ধার দিয়েছে।

কুবাইত-রাজ শেখ আবদুল্লাহ এস-সালাম এস-সাবা কবৎসর আগে ভারতে এসেছিলেন, এবং ভারতের সঙ্গে কুবাইতের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুবাইত ঋণও দিয়েছে।

নতুন আমীর শেখ সাবাহর আমলে কুবাইতের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না বলেই মনে হয়। তবে কুবাইত পশ্চিমীশেবা নীতির পরিবর্তে কিছুটা জেট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে পারে বলে অনেকের মনে হচ্ছে। নতুন প্রধানমন্ত্রীরূপে অর্থমন্ত্রী শেখ জব্বর আল-আহমদ এস-সাবার নিয়োগই এই অনুমানের কারণ। অর্থমন্ত্রীরূপে জব্বর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তেলের দেশ কুবাইতের পক্ষে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এইসঙ্গে যদি সে চীন-সোভিয়েটের সঙ্গেও চলতে চায়, তবে তার বৈদেশিক নীতির কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে।



জাতিকে আত্মানুসন্ধান প্রবৃত্তি করিতে এবং আত্মসম্মানবোধে উদ্বেগ করিতে বিক্ষমের অবদান তুলনাহীন। উপন্যাস রচনার স্মারক, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে, সাময়িক পরিচয়-সম্পাদনার আদর্শ-প্রতিষ্ঠার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠার আচরণে, তিনি এমন এক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যা কে-কোনো দেশের ইতিহাসেই দুলভ। সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর গণ্ডি অতিক্রম করে এক দেশ এক জাতি ও এক ধর্ম-সংস্কৃতির অনুভূতি বিক্ষমের পূর্বে বাংলাদেশে জাগ্রত হয় নি, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

ইংরেজের সংস্পর্শ বাঙালী বিক্ষমের পূর্বে শতাব্দীকাল ধরেই পেরোছিল। কিন্তু প্রাক-বিক্ষম কালে তা ছিল বণিক ও পাদ্রীর লোভী ও মূঢ় আত্মপ্রাধান্যবোধসম্পন্ন বিশেষীর সংস্পর্শ। ইংরেজের বৈশিষ্ট্য ও পাদ্রীর পরিচয় অস্তরালে যে আর একটি বহুস্তর ও আকর্ষণীয় পর্বে আরোহণ—জ্ঞান, বিদ্যা ও সংস্কৃতির পরিচয়,—তা বিক্ষমের আবির্ভাবের কাল থেকেই ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয়। পোস্ট অফিস, রেলওয়ে ও শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন,—নিজেদের সাম্রাজ্য-সুদৃশ্যের উদ্দেশ্যে হলেও ইংরেজ এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই অজ্ঞাতে আপন সংস্কৃতির বিস্তার করিচ্ছিল। ইংরেজের সংস্কৃতি-প্রবাহে যেসব ভারতীয় প্রথম অবগাহন করিচ্ছিলেন, বিক্ষম তাঁদের মধ্যে শূন্য অনুভবই নন, একচ্ছন্দ। ইংরেজের সংস্কৃতি শূন্য ইংরেজ জাতির ইতিহাসের ঐশ্বর্য্যই বহন করে আনে নি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের ধ্যান, জ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্ভার সে বহুগন নবা-বাঙালীর সামনে তুলে ধরিচ্ছিল। আচরণ-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালী থেকেও মনেপ্রাণে ও চিন্তার আদর্শে বিক্ষম সেই উপলব্ধিকে ভারতীয় মননের উপযোগী করে গ্রহণ করলেন। এবই ফলে বিক্ষমের অন্তরপটে এক শাবিত প্রস্নের উদ্ভাসন হলো : ‘জীবন কিইয়া কি করিতে হয়?’ বিক্ষমের শাবিতীয় রচনা,—প্রত্যেকটি উপন্যাস, কল্যাণকামের দপ্তর, কৃষ্ণ-চরিত্র, সাম্য,—এই জীবন-জিজ্ঞাসার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

এক শতাব্দী ধরে বিক্ষমের রচনা বাঙালীর স্মৃতি অধীত হয়ে আসছে। বহুস্তর পট-পটিকা ও পুস্তকে তাঁর উপন্যাস ও অন্যান্য রচনার আংশিক আলোচনাও যে হয় নি তা নয়। তাই প্রতি প্রমুখ-নিবেদনে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকই লিখেছেন। লোকমুখে তাঁর জীবনের খণ্ড খণ্ড কাহিনীও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত্র ও তাঁর শাবিতীয় রচনার সামগ্রিক আলোচনা এতকাল লিখিত হয় নি।

শ্রীমণি বাগাচি বিক্ষমচন্দ্রের জীবনচরিত্র ও তাঁর রচনাসমূহের একটি সুলিখিত আলোচনা-গ্রন্থ বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট উপস্থাপিত

করেছেন। বিভিন্ন লেখকদের রচনা থেকে এবং বিক্ষমের সমকালীন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গৃহীত বহুবিধ অজ্ঞাত ঘটনার সমাবেশে এই পুস্তকটি বিশেষ মূল্যবান হয়েছে।

শাস্ত্রী—নমিতা চক্রবর্তী। প্রকাশ ভবন,
১৫, বিক্ষম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
মূল্য : পাঁচ টাকা।

যে উপন্যাস বা বড় গল্পে বার্থ-ডে বা জন্মদিনের ঘনঘটা সোচ্চারে ঘোষিত হয়, তার পটভূমি, পরিবেশ মার সমাজ পর্যন্ত ঠিক সাধারণ বাঙালী পাঠকের চেনা মহলের জিনিস নয়। অবশ্য হালে অনেক কিছুই শহরের নিয়ন আলোয় হচ্ছে, কিন্তু বাংলা দেশটা

২২ রসমতী সেন ২২

অনেক বড়, তার চেয়ে বড় তার জন্ম। তবু শাস্ত্রীতে সমাজ বিশ্লেষণ, সুস্পষ্টত্ব, সমাজ বিশ্লেষণ অপেক্ষা ইঙ্গবংশ সমাজের সেই ছবি ফুটে উঠেছে, যা আমরা এতকাল চোরালঠনের আলো ফেলে দেখতে চেরোছি। এই কাণ্ডে ‘শাস্ত্রী’ উপন্যাসটি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি একই জীবন বৃত্তান্তের পুনরু-চারণ নয়। আবার এতে লেখিকার নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে আর এক কাণ্ডে,—তা হচ্ছে ইঙ্গ-বংশ সমাজকে তিনি গাহ-স্থান বাঙালী পরিবারের পাশাপাশি আঁকতে চেরেছেন। অবশ্য মধ্য ঘটনার তপতীয় মতো সহজ সফল গাহ-স্থানময়ী শিক্ষিতা নারীর মৃত্যুর পর তাব স্বামী বিলাতক্ষেত্র ভাস্কর স্বনাম ইঙ্গ-বংশ সমাজের অন্তর্গত লিলিকে বিয়ে করেন, তখন মনে হয় কোন উদ্দেশ্যে তা তিনি করলেন? যে লিলি বহুজনসিগনি, ভাস্কর যার মধ্যে মৃত্যু স্মৃতি তপতীকে ঝঞ্জে পাবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ কবে, সেই লিলিই হল শেষ পর্যন্ত ভাস্করের অধাধীনী। লিলি সে-ই যেন হুমারসম্ভবের উমা। বিবাহের পর ‘বড় সতর্ক’ লিলি মিত্র। ক্লাব, হাজার বকসেব সমাজ কল্যাণেব ফ্যানসেবল কাজ, কিন্তু স্বামীর অনিয়ম হবার উপায় নেই। যে তপস্যা উমার মধ্যে ছিল, সেই কঠিন রতের জন্য

যদিও আত্মদহন লিলির চরিত্রে পাই না, তবু দেখতে পাই তাঁর রূপান্তরিত চরিত্র ও চিন্তা। হয়তো শাস্ত্রী নাম সেই কারণে সার্থক। উপন্যাসটিতে বহু চরিত্র দেখা গেছে, সবাই যে পরিণতিতে পূর্ণ তা নয়, তবু উদ্দেশ্য-সাধনে নিরর্থক নয়।

সাধক-সোপান—স্বামী বিষ্ণু পুরী।
প্রকাশক : ব্রহ্মচাৰী সত্যরত, পবমার্থ-সাধক
সম্ব, ডি ৫০/১০৫, ছোটী গৈবী, বারানসী-
১। মূল্য : ৩.৫০ পয়সা।

বর্তমান বহুমণ্য বিজ্ঞানের জ্ব চারিদিকেই। সুতরাং তার জ্বগান না করে যদি সাধন-মার্গের কথা কেউ বলেন, তিনি হয়তো উপহাসিত হবেন। তা হোক, কিন্তু বহু-বিজ্ঞানের দানের মূলে নিশ্চয় আবিষ্কারক ব্যক্তিকভাবে কিছুই সৃষ্টি করেন নি, তাকেও সাধনমার্গে পৌঁছতে হয়। শেষ মর্মেই তিনিও সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হন, ‘আমি কে?’ আর ভারতীয় দর্শনে যেখানে বিজ্ঞানময় কোষের কথা বলা হয়েছে, তাব সত্যকেও তখন তিনি উপলব্ধি কবেন অনায়াসে।

আত্মোপলব্ধি তত্ত্বের আদর্শ ভারতীয় দর্শনেই। কিন্তু তা বড়ই দুর্বোধ্য। শুদ্ধ দর্শন পথ কেটে যাওয়া এতাই কঠিন যে, ইচ্ছা থাকে সত্ত্বেও সে পথ অনেকেই পরিহার করেন। অথচ আত্মোপলব্ধি ছাড়া জীবের গতান্ত কি?

যা হোক, বিষ্ণু পুরীজীর ‘সাধক-সোপান’ তত্ত্ব ও তত্ত্বের বিশ্লেষণে জিজ্ঞাসাদের অশেষ সহায়তা করবে। স্বামীজী আনন্দেব সন্ধান থেকে শূন্য করে ব্যাখ্যা করেছেন আনন্দলাভের উপায়। জীবের স্বার্থ কাম্য কি নিত্যসুখ? তবে তা প্রাপ্তির উপায়? মৃত্যুপঙ্কার কি প্রয়োজন? প্রশ্ন উপাসনা, অবতাব বাদ, অভেদ বাদ, সাধনক্রম প্রভৃতি জটিল তত্ত্বের এমন সুস্পষ্ট আলোচনা ধর্ম তথা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তকেরও সহজেই আকৃষ্ট করবে। গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রণতি জানিয়েছেন ডক্টর রমা চৌধুরী। এমন সমস্ত ভক্তি-নিবেদন কদাচিত লক্ষ্যভ্রত হয়।



পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতি নিয়ে রসিকতা সাজে না। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমশ্রেণী এই খাদ্যনীতির যখন জনক। খাদ্যনীতি নিয়ে কোনও রসিকতা করতে না হলেই যে-কোন সং, নিরপেক্ষ নাগরিক ঝুঁপি হতো। কিন্তু বাধ্য হোয়ে যখন একটা খাদ্যনীতিকে অখাদ্যনীতি বোলাতে হয় তখন সেই বলার পেছনে যে কত, যত্ন, মানসিকতা কাজ করে তা বোঝ হয় সেটা যে-কোন নাগরিকের কাছেই এক মর্মান্তিক বেদনার কারণ হোয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬০ সালের সেই কুক্ষণ।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাস কি কুক্ষণেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য এসেছিল। এই বছরেই প্রথম সাম্প্রতিক কালের মধ্যে চালের দাম ৩৮ টাকা উঠেছিল। হঠাৎ ৪০ টাকা মণ উঠতো। তারপর যথানিয়মেই থামতো। কাবল অক্টোবর নভেম্বর মাসই চালের সরবরাহের ক্ষেত্রে বাহু-দ্রুত। স্মরণাতীত কাল থেকেই এসময় দব কিছ্র বাড়ি। আবার নভেম্বরের শেষ থেকে ৮ নামতে থাকে। কিন্তু ১৯৬০ সালে চালের গাজারদাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে লাগলো সরকারী মুখপাত্রদের বাণীদানের প্রাবল্য। স্বয়ং মধ্যমশ্রেণী প্রায় প্রতিদিনই বিবৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে লাগলেন যে, চালের দর বতাই বাড়ুক না কেন সবক'বেব কিছ্রই করণীয় নেই। মধ্যমশ্রেণীর এই বিবৃতিতে চাল-বেপারীরা সাংগেব পাচ পা দেখলো। হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের গদ্যদেব চালের গাড়ি আটকে রেখে পশ্চিমবঙ্গের চালের কৃত্রিম সঙ্কট তারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হোল। চালের মণ দাঁড়াল ৫০ টাকা প্রতিমণ। রাইটাস বিল্ডিংস-এর রাটোডায় মধ্যমশ্রেণী মিটিং বসালেন ব্যবসারীদের সঙ্গে আপোষরক্ষার। জল্পলোকের চুজি হোল। ব্যবসারীরা ৩৫ টাকা মণ চাল বেচবে। ফা বাহু এ চুজি টেকে নি। ১৯৬০ সাল ড়ামুলোই কাটলো। এল ১৯৬৪ সাল।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন হওয়া ইস্তকই প্রায় খাদ্যমন্ত্রী। বিধান রায় মশায়ের সময় উনি খাদ্যমন্ত্রীই ছিলেন, নিজের মধ্যমশ্রেণীকে উনি চাইলেন খাদ্যবিশেষজ্ঞ হোতে। ১৯৬৪ সালের জন্য ঠিক হোল যে, চালকলগুলির কাছ থেকে

তাদের উৎপন্নের শতকরা ২৫ ভাগ লেভী আদায় নিবে একট' বাফার স্টক তৈরি করা হবে যতে টানের মাথার বেপারীরা বাজার চাড়িরে জনসাধারণের মাথার কাঁঠাল ডাঙতে না পারে। কিন্তু কি দরে সরকার চাল মিল থেকে কিনবেন? সেটা হোল সমস্যা। কারণ চালের দাম বাঁধতে হোলে আগে ধানের দর বাঁধতে হয়। কিছ্রই পরোয়া না কোরে চালর কোন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা না কোরেই ধানের দাম বাঁধা হোল ১৫ টাকা মণ। এইখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার করলেন হিমালয়প্রমাণ একটা ভুল। চালরী আজ গত

গ্রীষ্মকাল পটল

দুবছর ধরে ১৭ টাকা থেকে ২০ টাকা মণ ধান বেচেছে। চালকলের লেভী দেওয়ার জন্য তার কাছে কম দামে ধান কেনার নির্দেশ এলেও চালকল তা কোরলো না। বেশি দামেব ধান কিনেই লেভী দিতে বাধ্য হোল। লেভী দিতে গিয়ে বেটুক লোকসান হোল সেটুক অনেক গুল বেশি চালকল ওষালীল কোরতে শুব কোরলো। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন্যায্য-মূল্যের দোকানে ৮০ পয়সা কেজি চাল বিক্রি কোবতে দিবে প্রমাণ করলেন ধানচালের ব্যাপারে তাঁদের অপদার্থতা সীমাহীন। ধানের দাম ১৫ টাকা হোলে চালের দাম ৩০ টাকা মণ হোতে পারে না। ব্যবসারীরা ৮০ পয়সা কেজি-তে চালের দাম স্টাণ্ডার্ড ধরলো। সবক'বেব ২৫-২৬ টাকা দামে লেভী দিতে গিয়ে যেটা লোকসান সেটা ৮০ পয়সার ওপরে চড়াতে লাগলো। ১৯৬৪-তে গড় দাম ১ টাকা কেজি-তে পৌঁছল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসারীদের মনোফাবাজর সদরদরজাটা দেখিবে দিলেন।

কালোবাজার প্রসাধন

১৯৬৫-র এই জানুয়ারী থেকে কালো-বাজারেব ম্হবং কোরলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশন উদ্বোধন কোরে। মন্ত্রীর বোম্ব হস্তরী বোলেই অস্বীকার কোবতে চাইবেন বে নিয়ন্ত্রণ ও কালোবাজারেব দুই বসন্তভাই। কিন্তু জন-সাধারণ এই সত্যটি শ্বিতীয় মহামুশ্বের কাল থেকেই হাড় হাড় জানে।

কলকাতার অন্তত একখান দৈনিক কাগজ ১৯৬০ সাল থেকেই চাঁৎকার করছিল ধান-চালের ক্ষেত্রে স্টেট ট্রোডিং শুব্দ কবা হোক। করকার স্টেট ট্রোডিং-এর আধাখানা করলেন। কিন্তু কোন শ্বুজিতে বে করলেন সেটা বেশ বোধগম্য হোল না। শহরের জন্য বিধিবদ্ধ বেশনিং-এ ২৪০০ গ্রাম "সিরিয়েল" বরাদ্দ হোল যতে কোন সুস্থ নাগরিকের এক সপ্তাহ চলতে পারে না। কলকাতা বা বেশনিং অঞ্চলে একটা ঘাটতি রেখেই দেওয়া হোল। রাখা হোল কালোবাজারীদের ম্হং চেয়ে; আহা তারাও তো দেশেব সন্তান। ওই জানু-য়ারী থেকেই কালোবাজারের অবাধ কারবার শুব্দ হোল।

দেশপ্রেমিকের উপোস

কলকাতার লোক ঘাটতি মেটাবার জন্য— প্রকৃত প্রবোজন সরবরাহ করার জন্য সরকারেব বিন্দুমাত্র চাপ দিল না। একটা চোরাই পথ বেছে নিল। বেছে নিল ভুতুড় কাড় বাখাব পথ। এই কারচুপিতেই কিছ্রদিন চললো। তারপর ব্যাপক ধবপাকড়ে কিছ্র ভূত ছাড়ানো হোল। তখন আবার অন্য ভূত এসে চাপলো। পাকিস্তান ভাবতেব ঘাড়ো শুব্দ ছুড়ে মারল। বাস্ দেশেব নেতাবা চাইলেন— দেশপ্রেমের পরীক্ষা দাও। পরীক্ষাটি অভিনব। আধপেট খেয়ে থাকার পরীক্ষা। কেন না পাকিস্তানেব সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার পি-এল ৪৮০ মার্ক গন্ আর আসবে না দেশে। সুতবাং ইউনিট-পিছ ৫০০ গ্রাম "সিরিয়েল" কম কবা হোল বেশনে। এতটুকু প্রতিবাদ উঠলো না। কারণ চালের চোবাবাজাররী গৃহস্থের আপনজন হোবে গিয়েছিল গত ৯ মাসে। তাদের চোবাই সবববাহের আঁলিখিত গ্যাবাপিটেই বিধিবদ্ধ বেশনিং এলাকার লোকেরা নিশ্চিত ছিল। সদরদরজাতে টান্ডন হোল আমরা প্রত্যেকে পম্বলা নম্বরের দেশপ্রেমিক — খিড়কী-দরজার টান্ডন হোল কালোবাজারেব চাল বেন এই দরজা দিয়ে বাড়িতে আনা হয়—প্রত্যেকেই জানুয়ারী থেকে সপ্তাহে ২/১ কেজি চাল কালোবাজারে কিনছে। মনব ভাবখানা দাঁড়াল এই যে, না হয় আবও ৫০০ গ্রাম ইউনিট-পিছ কালোবাজারীদের কাছ থেকেই কেনা যাবে।

বিস্ফোরণ

ঘটনা ঘটলো আবার। ঘটলো অক্টোবরে। মধ্যমশ্রেণী সীমান্ত জেলা নদীয়ার একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটলেন। ফুলিয়ার এই বিস্ফোরণ একটি দৈনিক পত্রিকা বদৌতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নদীয়ার হতভাগ্য জেলাশাসক—হতভাগ্য পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তারা নাকি অপদার্থ, ঘৃণ্য, পাকিস্তানী গুপ্তচর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারেব বিশেষণে বিশেষিত হোলেন।

আশ্চর্য। চাকরির কি মারা। এই দুই

সংখ্যাতত্ত্বের ফাঁকিবাজী

জনের কেউই চাকরিটা ছেড়ে প্রমাণ করতে পারলেন না যে, তাঁরা এতটা নিচ নন। কলকাতাতে ক্ষিরেও মৃৎসম্পন্ন নাকি বললেন—ম্যাজিস্ট্রেটকে এস-ডি-ও কোরে দেব—এস-ডি-ও-কে বি-ডি-ও কোরে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। অবশেষে বিধান সভার আলোচনার জন্য গেল মৃৎসম্পন্ন বিবৃতি বিকৃতি ঘটিয়েছিল সেই দৈনিক পত্রিকাটি। পত্রিকাটিও নির্বিন্দে চাপে গেল। যাই হোক, বিবৃতি সত্য হোক মিথ্যা হোক মৃৎসম্পন্ন বিবৃতির পাবেই পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীরা কড়ন ব্যবস্থাপটিকে একটু কড়া কড়ি করলেন। শহর-বাসিন্দা এতদিন দুখের গাই-এর বাটের দিকে ভাগ নিয়ে “দুখ” খাচ্ছিলেন—পল্লী-গ্রামের লোক গাইগরুটির মধ্যে খড়-বিচালি মোগাচ্ছিল, ওলোট-পালোট হেঁচকে গেল ব্যবসায়ী। শহরে হাহাকার ছুটে গেল। চালের কেজি তিন টাকায় এসে দাঁড়াল। গ্রামের মজিস্ত্রেট রেশনিং বছরের প্রথম দিন থেকেই ছিল একটি সরকারী ধানপাড়া। কোনও দিনই গ্রামের ঘাটতি লোক চাল পায় নি। তাদের বরাবরই খেলাবাজীর কালোবাজারী দরেই চাল কিনতে হোয়েছে। পুলিশ গারের দ্বারে খেলাবাজারী বন্ধ কোরতে গারের লোকের চোখের সামনেই একরাশ সর্বেকুল ফুটে উঠল ফাঁতক মাসেই।

১৯৬৫ সালের খাদ্যনীতি সফল (?) হোল কট।

সালফার

গ্যাসমাখা সাবান



গন্ধক চমরোগে বিশেষ উপকারী।
সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে,
বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোসা,
কোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি
চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

প্রাপ্ত সংখ্যাতত্ত্ব, প্রাপ্ত ধারণা, প্রাপ্ত সংগ্রহনীতি, প্রাপ্ত বটননীতি সবকটি প্রাপ্তির চরম নিদর্শন এই নতুন খাদ্যনীতি যা ১৯৬৬ সালের জন্য বিচিত্র হয়েছে। সবকটি প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা কোরতে গেলে একটা মহাভারত রচিত হবে—দু-চার কথায় এই নীতি ব্যাখ্যান কোরবো।

প্রথমেই ধরা যাক সংখ্যাতত্ত্বকে Lie, Dammed i.e., statistics—মিথ্যা, ভ্রাম্যমাণ্য ও সংখ্যাতত্ত্ব এই তিনটি হোল চরম অসত্য বস্তু। মিথ্যা ও ভ্রাম্যমাণ্য নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান। আমরা সংখ্যাতত্ত্বকে বিশ্লেষণের পাটখ আছাড় মেরে দেখি।

১৯৬৫ সালের উৎপাদন ছিল ৫৭ লক্ষ টন। এই ধরই খাদ্যনীতি প্রস্তুত হোয়েছিল। যোগবিষয়গের সাধারণ হিসেব কোবে ঘাটতি ও ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা খাতার-পত্তরে ছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকলো না। দেশে খাদ্যের চরম ঘাটতি দেখা দিতেই বলা হোল যে, ১৯৬৫ সালের উৎপাদন ৫৭ লক্ষ টন ছিল না—ছিল ৫০ লক্ষ টন। অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব রবারের তৈরি—টনকে বাড়াবে—ছেড়ে দিলেই গুটিয়ে যাবে। কতটা বাড়বে বা কতটা গুটিয়ে যাবে নির্ভর করে যে বস্তু নিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব তার চাহিদা, যোগান, ঘাটতির ওপর। তাই ৫৭ লক্ষ টন ৫০ লক্ষ টনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন খাদ্যনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৪ কোটি ২ লক্ষ। গত ১৯৬১ সালের সেন্সাসে ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ। বৃদ্ধির হার মোটামুটি শতকরা ২০.৪৬ ধরলে—

১৯৬২—৩ কোটি ৫৮.৭৫ লক্ষ	২৩%
১৯৬৩—৩ কোটি ৬৬.৯৫ লক্ষ	হাব
১৯৬৪—৩ কোটি ৭৫.১৭ লক্ষ	মোটামুটি
১৯৬৫—৩ কোটি ৮৪.৫৫ লক্ষ	হিসাবে।
১৯৬৬—৩ কোটি ৯৬.০০ লক্ষ	

অর্থাৎ রাজ্যসরকারের হিসাব থেকে আসল জনসংখ্যার হিসাব ৬ লক্ষ কম। যদিও “ভাসমান জনসংখ্যা” প্রতিমহুতেই পশ্চিমবঙ্গের “কসমোপলিটান” শহরগুলিতে আছেন। তাঁদের ধবে না হয় কিছু আসল জনসংখ্যার উপরে “ফাউ” মেনে নেওয়া গেল। জনসংখ্যার হিসাব খুব বেশি বিতর্কমূলক নয়।

কিন্তু আসল বিতর্ক মোট খাদ্যের পবিমাণে। রাজ্যসরকারের ঘোষণা আগামী ১৯৬৬ সালে মোট ৬৭ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে বেসব সাকুলার গেছে তাতে দেখা গেছে যে গ্রামবাসীর জন্য ১৬ আঃ হিসাবে প্রতিদিন ও শহরবাসিন্দার জন্য ১৪ আঃ হিসাবে প্রতিদিন খাদ্য বেশনে দেওয়া হবে। গ্রামের লোকসংখ্যা—শহরের লোকসংখ্যা ও তাব হিসাব বড় জটিল হবে ভেবে আলাদা হিসাব দিতে বিবত বইলাম। যদি ১৬ আউন্স খাদ্য গড় প্রতিটি মানুষের জন্য ধরা হয় তা হলে হিসাব দাঁড়ায়—

১টি ইউনিট দৈনিক ১৬ আঃ হিসাবে বছরে ৩৬৪ পাউন্ড=৪৩ মণ। প্রতিটি মানুষের জন্য বছরে ৪৩ মণ খাদ্য ধবে ৪ কোটি ২ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য খাদ্য লাগে উচিত ৬৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৫১ টন ২০ মণ মাত্র। অতএব রাজ্যসরকারের হিসাব ৬৭ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন বিশেষণের ধোপে টেকে না।

উপরের হিসাবের মধ্যেও আর একটু ফাঁকিবাজী রোয়ে গেল। মোট হোল—৪ কোটি ২ লক্ষ জনসংখ্যার সবাই কিছু পূর্ণ ইউনিট নয় বা সরকার বেসনিং—এর মাধ্যমে তাদের তা দেবেনও না। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আধ ইউনিট। যদি ধরা যাবে যে, শতকরা ২০ ভাগ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং যা হবেই তা হলে মোট খাদ্যের দরকার ৫৮ লক্ষ ৬ হাজার ৬৬৬ টন ২০ মণ।

আরও প্রশ্ন আছে। সবাই কি দুবেলায় ১ পাউন্ড হিসাবে সিরিয়েল খাবার পয়সা জোটেতে পারে? ক্রমকমতা কি সকলেরই আছে? পশ্চিমবঙ্গে এই ক্রমকমতাহীন মানুষের সংখ্যা কত? খুব কম ধরলেও অমৃত শতকরা ১৫ ভাগ। তা হলে আসল প্রয়োজন খাদ্যের ক্ষেত্রে কতটা?

এ বছর স্ট্যাটিস্টিক্যাল বুরোবর হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হবে। এই হিসাব দ্ব্যর্থক। উৎপাদন যা হবে তা নিয়ে হিসাব চলবে না। মোট উৎপাদন থেকে চাষীর চাষের জন্য বাকি ধান ঐ উৎপাদনের মধ্যে। যাব পবিমাণ ১ কোটি ১৫ লক্ষ আমন চাষের জমির জন্য কমপক্ষে বিষয় ৫ সেব হিসাবে ১.০৬ লক্ষ টন ধান লাগবে। অর্থাৎ ১.০৬ লক্ষ টন চাল মোট উৎপাদন থেকে বাদ যাবে। আসল ভক্ষণযোগ্য উৎপাদন হবে ৪৮ লক্ষ টন।

চাহিদা (ক্রম-
কমতাহীন জনসংখ্যা বাদ না দিয়ে)

উৎপন্ন ৪৮ লক্ষ টন
ঘাটতি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৬ টন ২০ মণ

গল্পনাতত্ত্বের ভয়

ঘাটতি পূরণের উপায় বলা হোয়েছে ১০ লক্ষ টন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যাব ৭ লক্ষ টন গম ৩ লক্ষ টন চাল। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে কোন ঘাটতিই থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু থাকবে। আসল ঘাটতি না থাকলেও নকল ঘাটতি রাখতেই হবে। আর সেইটি রাখার জন্য নিশ্চিত আগামী বছর “অক্টোবর বিবৃতি”র জন্য সংখ্যাতত্ত্ব আবও ১০ লক্ষ টন কমিয়ে এখন থেকেই তৈরি করে রাখা হচ্ছে, যেমন ১৯৬৫ সালেই ঘটেছে। ১৯৬৫-র প্রথম দিকে ৫৭ লক্ষ টন উৎপাদন ধরে খাদ্যনীতি প্রস্তুত হোয়েছিল।

সাম্প্রতিক বস্তুসমী

১৯৬৫-র মোট প্রয়োজন ৬৫ লক্ষ টন (?) ধরে ঘাটতি ছিল ৭ লক্ষ টন। এই ঘাটতি কেন্দ্রীয় সরকার মিটিয়েছেন। সুতরাং বাজারে ঘাটতির এতদূর প্রচণ্ড বেগ কোথা হোতে এল। সৌটিব জন্য ময়নাতদন্ত কোরলে খুন হওয়া ১৯৬৫-ব খাদ্যনিতির মেহে অনেক অপকর্মের সাক্ষ্য পায় বেরিয়ে পড়ে সেজন্য সার্টকার্ট এবং নিরাপদ উপার হোল উৎসবের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। লেখা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাই কোরলেছেন। এক বক্তৃতাতেই উৎপাদন ৫০ লক্ষ টনে নামিয়ে এনেছেন?

৫৭ থেকে ৫০ নেমেছে এবছরে—আগামী বছরে ৪৯ লক্ষ টন কতটা নামবে একথা বলতে পারেন একমাত্র খাদ্যদপ্তরের “অতি সুবোধ্য” কনিষন্যার শ্রী বি সি গাঙ্গুলী মহাশয়—অন্য চকুট নয়।

গণতন্ত্রে আলোচনাই একমাত্র পথ

১৯৬৬ সালের যে খাদ্যনীতি নেওয়া হয়েছে তাতে একহাত সংগ্রহ, অন্যহাতে কটন। জট পাকিয়ে গেছে সংগ্রহের নীতি নির্ধারণে। ফলে চাবিদিকে জেগেছে চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য গ্রামে—সেখানে লেভীর আতঙ্ক; শস্যের শহরে—সেখানে বিধিবদ্ধ রেশনিং ভেঙে পড়ার আতঙ্ক; চাঞ্চল্য শ্রী স্কুল স্ট্রীটে, লাইটল বিল্ডিংস-এ, চাঞ্চল্য ম্যাডামস্ট্রেট, এন-ডি-ও ও বি-ডি-ও মহলে—সেখানে জরাজীর্ণ প্রমাণিত হবার আতঙ্ক; চাঞ্চল্য কংগ্রেসকর্মীদের মনে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অপ্রিয় হেয়ে পড়ার আতঙ্ক। সারা দেশ আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ে পড়েছে। খাদ্যনীতির প্রশ্নে মধ্যমশ্রী এত স্পর্শকাতর হোয়ে গিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশেও তার বিদ্রোহিত-কর খাদ্যনীতি নিয়ে কথা বললে ডি-আই-আব প্রবৃত্তি হবার আশঙ্কায় দেশের লোক মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হোয়েছে। তাছাড়া মধ্যমশ্রী খাদ্যনীতির সম্বন্ধে কারও সঙ্গে মুক্তি-পরামর্শ করার সপক্ষে নন। এমন কি গত ২৯শে নভেম্বর বিরোধীপক্ষের যে প্রতিনিধিদল মধ্যমশ্রীর সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছিলেন, তাইদেব সঙ্গে ব্যবহারে নাকি তিনি প্রতিনিধিদলকে অপমান কোরেছেন। খাদ্যনীতিকে মধ্যমশ্রী তার নিজের প্রেসিটজ ধরে নিচ্ছেন কেন? তিনি খাদ্যসংকটেব সমাধান চান, তারই জন্য কিছু কঠোর নীতি হরত নিতে হোয়েছে—। নীতি কঠোর হোক কিন্তু অর্থোত্তিক হবে কেন? যদি অর্থোত্তিক হয় তবে তাকে সংশোধনের চেষ্টা যে কেউ কববেন তাহেই তো মধ্যমশ্রীর অভিনন্দন মননো উচিত। কারণ মূল উদ্দেশ্য খাদ্য সমস্যার সমাধান—খাদ্যনীতি সেই উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত। সুতরাং নীতি নিয়ে স্পর্শ-কাভরতার বলাই কেড়ে ফেলে দিয়ে সকলের জ্ঞান/সহযোগিতা কামনা করাই বাঞ্ছনীয়।

লিভারি কল

খাদ্য সংগ্রহ নীতি যে অত্যন্ত প্রান্ত-ভার প্রমাণ খাদ্যনীতিতে “লেন্ডারি” প্রয়োগ। লেন্ডারি পরিমাণ কিসের উপর নির্ধারিত হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই উৎপাদনের উপর। জমির পরিমাপের উপর কখনই নয়। খাদ্য দপ্তরের অসাধু অপদার্থ কর্মচারীদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রবোচনার মধ্যমশ্রী বিভ্রান্ত হোয়েছেন। অর্থোত্তিক লেন্ডারি চাপলে কৃষক ভা দিতে পারবে না—সুতরাং অসাধু উপায়েরই কৃষককে “লেন্ডারি” হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। ফলে খাদ্য দপ্তরের ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের অসাধু উপায়ের পথ পরিষ্কার হবে। বস্তুত্বপক্ষে গত তিন বছরে খাদ্যনীতির সংগে স্পষ্ট হার প্রত্যেকটি কর্মচারীর পকেট ঘূরের টাকায় এত সমৃদ্ধ হোয়েছে যে দেশে এই সব কর্ম-চারীগণ এক নতুন বনিকশ্রেণীর সৃষ্টি করছেন। এদের হাতে হোয়েছে অপর্যাপ্ত টাকা। টাকা নিয়ে এরা ছিনিয়ে নিচ্ছেন। মধ্যমশ্রী প্রমাণ চাইলে এব ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারি। দিতে পারি এই সব কর্মচারীদের শাস্তির গ্যারান্টি পেলে।

লেভারি পরিমাণ যে প্রান্ত তা নিজের হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। উৎপাদনের সরকারী হার সেচবিহীন এলাকার একরে ১২ মণ।

সেচবিহীন এলাকা—(২ একর ছাড়)

জমির ধান	লেভারি হার	একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মালিক	উৎপাদন	লেভারি দেবেন	হাতে রাখতে পারবেন
তৃতীয় একর	১৯ কুইন্টল	৫ একর	৩৬ মণ	৪ মণ	৩২ মণ
৪র্থ ও ৫ম একর	২ কু	৫ ”	৬০ মণ	১৪ মণ ২৮ সের	৪৬ মণ ১২ সের
৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম,					
৯ম ও ১০ম	৩ কু	১০ ”	১২০ মণ	৫৪ মণ ৩৩ সের	৬৬ মণ ৭ সের
১১শ হতে ২৫শ	৫ কু	২৫ ”	৩০০ মণ	২৫৫ মণ ১৮ সের	৪৪ মণ ২২ সের

সেচ এলাকা—(১৯ একর ছাড়; উৎপাদন একর প্রতি ১৮ মণ)
 দ্বিতীয় একর ২ কুইন্টল ২ একর ৩৬ মণ ২ মণ ২৭ সের ৩০ মণ ১০ সের
 তৃতীয় একর ৩ কু ৩ ” ৫৪ মণ ১০ মণ ২৮ সের ৪৩ মণ ১২ সের
 ৪র্থ ও ৫ম একর ৪ কু ৩ ” ৯০ মণ ৩৬ মণ ৪ সের ৫০ মণ ৩৬ সের
 ৬ষ্ঠ ও ৭ম একর ৬ কু ৭ ” ১২৬ মণ ৬৮ মণ ৮ সের ৫৭ মণ ৩২ সের
 ৮ম, ৯ম, ১০ম একর ৭ কু ১০ ” ১৮০ মণ ১২৪ মণ ১৫ সের ৫৫ মণ ২৫ সের
 ১১শ হতে ২৫ একর ৮ কু ২৫ ” ৪৫০ মণ ৪৪৫ মণ ১৫ সের ৪ মণ ২৫ সের

লেভারি হিসাব অতি সহজ নয়। বেশ জটিল। ২৫×৩০=৭৫০ মণ। সরকারকে লেন্ডারি দিয়েও তার হাতে ধান থাকবে প্রায় তিনশ মণ। কিন্তু যদি একরে দ্বিশ মণ ফলনই হয় তাহলে আর পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি কিসের। একরে দ্বিশ মণ গড় ফলন হোলে তো কোনও চাবীবই অসুবিধা হওয়াব কথা নয়। তাহলে

প্রথম ধাপ—(২ একর—১৯ একর) অথ একরের জন্য— $11 \times 2 \text{ কু} = ১ \text{ কু}$
 দ্বিতীয় ধাপ—তৃতীয় একর $\times ৩৯ \text{ কু} = ৩৯ \text{ কু}$
 তৃতীয় ধাপ—৪র্থ + ৫ম $\times ৪৯ \text{ কু} = ৯৯ \text{ কু}$
 চতুর্থ ধাপ—৬ষ্ঠ + ৭ম $\times ৬ \text{ কু} = ১২ \text{ কু}$
 ৫ম ধাপ—৮ম + ৯ম + ১০ম $\times ৭ \text{ কু} = ২১ \text{ কু}$

সেচ দশ একরের জন্য ৪৬৯ কু = ১২৪ মণ ১৫ সের

ধানের নাম। দামের প্রশ্নই বা ওঠে কি কোবে। গড় ফলন বাড়লে তো উৎপাদন খরচও কমতে বাধ্য। শিশুপাঠেব বিদ্যা নিয়েও এ জিনিস বোঝা যায়। তা হলে তো খাদ্য-নীতিরই প্রয়োজন ছিল না—এত “কম খাও আর-গম খাও” স্লোগান কিসের?

আসল চির অন্যরূপ। ধানের গড় ফলন কম বোলেই যেতো “অনাছিন্টি” কাণ্ডকারখানা দেশে চলেছে। সরকারের সংগ্রহ করা সংখ্যা-তত্ত্বের ভিত্তিতেই সরকারী সংগ্রহনীতি বিবেচনা করলে তবেই প্রাপ্তি ধরা পড়ে।

গ্রীহলধর পটল কোনো “ইউটোপিয়ান স্বপ্নে” বাস করে না। বাস করে চাক্ষুস্মিয়ই একপ্রান্তে। সুতরাং তাঁর দেওয়া হিসেবেই মাটির গন্ধ বেশি। প্রকল্প সেন মশাই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের “ইউটোপিয়ান” হিসাব নিয়ে মাতামাতি করছেন—বিরোধীপক্ষও তাই করলে চাবীরা দাঁড়ায় কোথা?

ভেনে কুটে দাও

সরকারের কৃষিদপ্তরের কথা আর কী বলব। সরকারী বন্দ্য খরচ করার সামর্থ্যও তাদের নেই। কৃষি বাহিনীতে কতকগুলি এমন “হাইব্রিড” আছে বরা টেবিলিন সাউট পরে ব্লকের সাজান অফিস থেকে ভিএল ডবল মারফত চাবীদের কাছে সাকুলার জরী করে। এ রাজস্ব বস্তুত সাকুলারের রাজস্ব। কৃষিদপ্তরেব রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কমিশনার থেকে ব্লকের এ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেন অফিসার, কেউই কৃষিকাজের সম্পর্কে উৎসাহী নয়—উৎসাহী নিজেদের আমলাতন্ত্র বজায়েব দিকে। চাবীদের কাছে কখন এ ই ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে গেছেন? ব্লকের জাঁপে চড়ে রাস্তার ধারে দু-পাঁচখানি ভাল ধানের ফলনের দিকে এঁরা উপরিওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—স্যার! এসব আমরাই শিখিয়েছি। উপরিওয়ালারা সার্টিফিকেট দেন—কাজের লোক বলে।

ব্লকের কাছ থেকে কোন সাহায্যই চাবী পায় না। কৃষি স্বর্ণ, বলদ খরিদা স্বর্ণ অত্যন্ত সামান্য। লালফিরাব পাহাড় ধাক্কা খেতে খেতে তা চাবীর হাতে আসে প্রয়োজনের অনেক পরে। সার নেই—কোন মৌসিন নেই—নেইকো কোন টেকনিক্যাল জ্ঞানদানের শব্দ চেষ্টা। আছে শব্দ কয়েকখানা লিফ্লেট—স্বার্থে বাণীসম্মত পুস্তিকা। কি লাভ এই মঞ্জুরের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ কোরে? কৃষিদপ্তর তুলে দেওয়া—হোক। কৃষির বরাদ্দ টাকা পণ্ডরেতের হাতে সোজাসুজি দেওয়া হোক তবে উৎপাদন বাড়বে।

আসলে আজকের দিনে চাবী কয়েক বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে যেন দেশের সকলের কাছে চোরের দারে ধরা পড়েছে। একজন না একজন সফল সময়ই তাকে খোঁটা দিয়ে

যাচ্ছে। একটাও ভাত-যোগাবার মানুষ নেই—কিনা মারবার গোসাই আছে পাল পাল। তেমনি হয়েয়ে সরকার চাবীর ফলন বৃদ্ধিতে এতটুকু সাহায্য দেবার নাম নেই। চাবী ধারখোব করে—৫ বছর লোকসান খেয়ে যখন এক বছর হয়ত ফসলের মুখ দেখে—আশা কবছে যার শোখের, সেই সময়েই সরকার হাজির হোচ্ছেন ভারতবন্ধা কিংবা পণ্যমূল্য আইনের দড়িদড়া নিয়ে চাবীকে ফাঁসে বাঁধতে। কি অসহনীয় অবস্থা দরিদ্র চাবী!

এ বছর চাবী অবশ্যই ছাড়বে না। পশু-তান্ত্রিক উপায়ে সে অন্যান্য দামের প্রতি-রোধের জন্য চেষ্টা করবেই। পশ্চিমবাংলার অবস্থা দাঁড়িয়েছে উত্তপ্ত বারুদের মত। একথা অতিরঞ্জিত নয়—বরং খবর যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে অবস্থা আরও ঘোরালো। এবং এ অবস্থা দাঁড়তে বাধ্য। চাবীর জীবনের কোনো দার সবকার স্বীকার করেন নি, অথচ তাকে নির্দেশ হোচ্ছে তুমি ভেনে-কুটে দাও, আমি ফুটিয়ে ভাত রাখি।

সমবায় নক আউট হয়ে

চাবীর কাছ থেকে সংগ্রহীত ধান নানান চ্যানেল দিয়ে সবকারের হাতে আসবে। সরাসরি ধান কিনবে মিলমালিক, সমবায় সমিতি। মিলমালিকরা মোঘা তুলসীপাড়া, আশচরী মিলমালিকদের গজুতদারী ও অতি-মুদ্রাফা দায় সবকারের কোন খাদ্যনীতিই যখন সাফল্যলাভ করছে না তখন আবার সেই মিলমালিকদের সরাসরি ধান কিনতে দেওয়াব সিদ্ধান্ত যে কিভাবে গৃহীত হোতে পারে সেটা ভাবলে যে কোন প্রকৃতিস্ব মানব অপ্রকৃতিস্ব হোয়ে পড়বে। আসলে এর মূলে খাদ্যদপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগে অতি-ধনী মিলমালিকদের অশুদ্ধ যোগাযোগ। তাই মিলমালিকের অপরাধের দারে চাবীর মাথা ভাঙা হোচ্ছে। কি সুন্দর সমাজতান্ত্রিক রাজস্ব! রামেব অপবাণে শ্যামের মাথা ভাঙার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে?

সমবায়ের মূলধন কম। মিলের বেশি। সমবায় ঘূষ দেবার ফাড পাবে না। গিলেব সে ফাড অপসাঁপ্ত। ফলে ধান কেনার প্রতিযোগিতায় সমবায় নক আউট হোয়ে যাবে প্রথম বাউন্ডেই। বাকী থাকবে শব্দ মিল আর মিল। মাস চাকের মধেই বিপর্যয় দেখা যাবে ধান-চালের বাজারে।

রেশনের প্রশ্ন

১৯৬৬ সালের রেশন ব্যবস্থার বিবৃদ্ধে ফলকাতার লোকের এখন থেকেই প্রতিবাদ তোলা উচিত। কেন না সাত দিনেব রেশন বোলে যা দেওয়া হয় তা পাঁচদিনের খোরাক। গত ১৯৬৫ সালে কালাবাজারের সরবরাহ

প্রথম থেকেই ছিল বলে অসুবিধা হয় নি। এবার তা থাকবে না দুটি কারণে। প্রথমটি হোল কন্ট্রন ব্যবস্থা দৃঢ় হবে। যাব ফাঁক গলে চাল কলকাতার পৌছান কন্ট্রোল হবে। কন্ট্রন ব্যবস্থা যত কঠোর হবে চালের দাম ততই বাড়বে। কারণ চালের দামের সংগে কালাবাজারীর কৃদিকর দাম যুক্ত হবে। চালের ক্রয়মূল্য + অতিমুদ্রাফা + কালা-বাজারের কৃদিক = কলকাতার চালের দাম।

দ্বিতীয়ত গ্রামের লোক ধান বেচেই চাইবে না। প্রতিটি লোকের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে অন্য লেভী আদায় করতে সময় ও কষ্ট দই-ই বেশি লাগবে। এ নিয়ে দাণ্ডা-হাঙ্গামার ফলে সরবরাহ সূত্রটি সাগরিকভাবে বিপর্যস্ত হবে মাঝে মাঝে। তার উপর লেভী আমায়ই সব নয়। লেভী বাদে বেশি ফলন এলাকার যে ধান উৎপন্ন হবে তা কিছুতেই বাজারে আসবে না।

সেজন্য রেশনিং যোচনাই চালান হোক না কেন—রেশন বরাদ্দ প্রকৃত প্রয়োজন মোতাবেক চাই। চালের ঘাটতিতে যদি শাকসব্জী ও অন্যান্য বস্তু খেতে হয় তবে সেগুলিতেও আগুন লাগবে। সুতরাং শহরের অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হবেই। সভা-সমিতিতে কম-খাওয়াব প্রতিজ্ঞা নেওয়া আব বাড়িতে প্রকৃতই কম খাওয়া দুটো আলদা জিনিস। পদসা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কেউ কম খেয়েছে বলে শোনা যায় নি। সুতরাং উপার্জনের সবটুকুই পেটের খোরাক মেটতে চলে যেতে পারে।

“সার্বহিউম্যান” বোধার্জি

গ্রামের সংশোধিত রেশনিং চিরকালই (১৯৬৪ থেকে) মিউজিয়ামে বাখার মত বস্তু। এর প্রকৃত ঘটনা যদি কেউ লিখে ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত কবে রাখেন তাহলে আমাদের পবে বাবা এই ভারতবর্ষে বাস কববেন তাঁবা গবেষণা কববেন যে, ১৯৬৪ সালের পন্ন পশ্চিম বাংলাব এক “সার্বহিউম্যান” সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো যাদের সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য নিয়ে চবম বসিকতা কবেছিল—যাদের ক্ষুধার্ত চাঁৎকার আমিষে-ছিলেব বেতারভাষণ ও খবরেব কাগজেব বিবৃতি মারফৎ—যাদের জন্য আসে দু-এক-বার ২।৪ শত গ্রাম ত-তুলজাতীয় খাদ্যবস্তু মিডফায়েড বেশনিং-এর মাধ্যমে সবববাহ কোরে উপোসী রেখেছিলেব। গবেষকবা দেখবেন এই “সার্বহিউম্যান” শ্রেণী মজ্জায় মজ্জায় দালালী ও ভাঁতি উত্তরবিধ রসের প্রাবল্য-হেতু এবা কোনদিন বলিষ্ঠভাবে সবকারকে খাদ্যসবববাহে বাধ্য কবে নি—কোনদিন ফেড়ে খায় নি—কোনদিন বিক্ষোভ কবে নি।

গবেষকদের জন্য এটাও জ্ঞান দবকাব যে ১৯৬৫ সালেই ঘটেছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা পশ্চিম দিনাজপুরের গোয়ালপাথর

সাম্প্রতিক বসুমতী

ধানার ঠেলামারি গ্রামে পিতার চোখের সামনে ক্ষুধার্ত শিশুপুত্র কেঁদেছিল পোড়া পেটের জন্যে। কেঁদেছিল দশগুণ ক্ষুধার্ত পিতার কাছে। পিতা পাবতো নিজের অক্ষমতার প্রতি বিস্তারিত আশ্রয়তা করতে—কিন্তু আশ্রয়-হীন সে করে নি—করেছিল আশ্রয়হীন। যে হননেব অশ্রু পিতা পুত্র হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সশ্রু এই অভিশপ্ত পৃথিবীর নাস্তিকের ঈশ্বরের হৃদয়ের মর্মমূলে কোরেছিল নির্মমতম আঘাত। কিন্তু.....কোন চাপল্য ছাড়া নি দেশে—সভ্যতা হাহাকার কোরে ওঠে নি। আর পরিবর্তিত হয় নি দেশের খাদ্যনীতি।

১৯৬৬ সালের জন্য আবার সেই মডিফার্ড রেশনিং।

এবারে ঠিক হয়েছে গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রতিদিনের বরাদ্দ হবে ১৬ আউন্স। রেশন কার্ডের পাঁচটি শ্রেণী। ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

এ নীতিতে গ্রামে প্রায় একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার সুরু হবে। আগে গায়ের লোক একমুঠো ভিক্ষে দিতে পারতো। ১৯৬৬ সালের খাদ্যনীতিতে ভিক্ষারীকে একমুঠি ভিক্ষা দেবার চাল ভাঁড়াবে থাকবে না—প্রতিবেশীকে সাহায্য তো দরুর কথা? লক্ষ্মীর বাপি গায়ের মাটিতে—লক্ষ্মীছাড়াদের হস্তক্ষেপের ফলে কে যে বাঁচবে আর কে মরবে একমুঠা নিশ্চিত বলা যায় না।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোড়াতাল

গ্রামের একটা অর্থনীতি ছিল। ভারত অত্যাচার, অবিচার, কুসীর্ণ উপজীবিকা সবই ছিল কিন্তু ভাল দিকও ছিল। ১৯৬৬-র খাদ্যনীতির আক্রমণে তার মৃত্যু হতে বাধ্য। সরকারী সরবরাহ নিশ্চিত হোলে গ্রামীণ

ভোলার পরমা কোথায়? সেইজনাই তাকে কালোবাজারে দিনের উপার্জনমণ্ডিক চাল কিনতে হবে বার দাম বেশি। সুতরাং কৃষির প্রমিতক মজুরী বৃদ্ধির দাবি স্বাভাবিক। অন্যদিকে চাষীর মজুরী বাড়বার সামর্থ্যও সরকারের ১৫ টাকা মণ ধান কেনার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। অতএব চাষী কিছুতেই বাড়তি চালের দাম মজুরকে দেবে না—দিতে পাবে না। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই সংঘাতে কিছু রক্তপাত হবে মানুষের দেহ থেকে কিছু প্রচুর রক্ত সরবে কৃষির। এই প্রচুর রক্তপাতে কৃষি আর বাঁচবে না। বাধ্য হোলে চাষীকে চাল ছেড়ে দিতে হবে। তাতেও সে মরবে। কিন্তু নানাঃ পক্ষা বিদ্যতে অনার। চাষী বতটুই সম্পূর্ণ নিজেব গারে-গড়রে পারবে ততটুই চাষ করবে বাকটুই পড়ে থাকবেই। একথা ঠিক যে, একদল কৃষিপ্রমিত চিরকালই প্রয়োজন। বাবা প্রতিদিনের মজুরীর সঙ্গে কাজ করবে। চাষী ও কৃষিপ্রমিত এই জোড়া খুনের দার চাপবে সরকারের ঘাড়ে। পরে কৃষির অব্যবস্থার সারা জাতিই এন্তেকাল ফরমাবে।

সমাধান

তাই সাবধান হোতে হবে এশনি। এখনও সময় আছে। খাদ্যনীতিতে চেলে সাজিয়ে হবে। লেভী উঠে বাক। ওর কোন প্রয়োজন নেই। উৎপাদক তার উদ্ভব্ত ধান বাজারে সরকারকে বেচেতে বাধ্য হর তারই ব্যবস্থা দরকার। উৎপাদকের দাম উৎসাহবাজক করা হোক। এই দাম অন্ততপক্ষে ১৯ টাকা মোটা ধানের—২০ টাকা মাঝারি ও ২১ টাকা সরু ধানের বাধা হোক। চালকল মালিকের সময় উৎপাদন সরকারকে সরবরাহ কোরতে বাধ্য করা হোক—হাস্কিং মেশিন পণ্ডারের ব্যবস্থাপনার চলাক। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খামারে আসার ছ' মাসের মধ্যে উদ্ভব্ত ধান বিক্রি করাতে বাধ্য করা হোক। ঘাটতি চাষীকে রেশন দেওয়া হোক প্রয়োজন মণ্ডিক—তবেই খাদ্যনীতি হাসতে পাববে নইলে সারা জাতির কল্যাণ করবে এই খাদ্যনীতিতে—একথা নিশ্চিত ঘোষণা করা বাব।

সেচ বিহীন এলাকা

ক শ্রেণী ভূমিহীন

খ	বা	১	একরের পূর্ণ উৎপাদন পান	৯	মাস	"	"
গ	"	১-২	"	"	৬	"	"
ঘ	"	২-৪	"	"	৩	"	"
ঙ	"	৪-২৫	"	"	চাল আটা পাবেন না	"	"

(সেচ এলাকা)

ক	শ্রেণী	বাঁরা ভূমিহীন	ভাঁরা	রেশন	পাবেন	১২	মাস
খ	"	"	১/২ একরের ৫০%	উৎপাদন	পান ভাঁরা	৯	মাস
গ	"	"	১	"	৫০%	"	৬
ঘ	"	"	১।১০	"	৫০%	"	৩
ঙ	"	"	১।১০ একরের বেশি	অধির উৎপাদন	পান	চাল আটা পাবেন না	

দুর্য্যোগ ডারলেট

সেচবিহীন এলাকার চার একরের বেশি জমির মালিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরা হোয়েছে। অর্থাৎ চাষ একরের কম জমির মালিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা যদি না হয় তবে চার একরের মালিকেব কাছে লেভী আদায় হব কি কেদের? ঘাটতি চাষীকে কি আরও ঘাটতি করা নব? সেচ এলাকার আধ একরের ৫০ শতাংশের জন্য শ্রেণীবিভাগ। অর্থাৎ ২৫ শতাংশ জমির পার্থক্য দুই শ্রেণীর মধ্যে। ২৫ শতাংশ জমিতে সরকারী হিসাবে মাত্র সাড়ে চাষ মণ ধান হয় বা তিন মণ চাল হয়। তিন মণ চালের উৎপাদনের ভিত্তিতে তিন মাসের বেশন কম হোয়েছে অর্থাৎ এক মাসের জন্য এক মণ চাল খরচ। দুই একর জমির ৫০ শতাংশ যদি উৎপাদন পাবেন তিনি রেশন পাবেন না। অর্থাৎ (২×১৮)-র ৫০ শতাংশ ১৮ মণ ধান পেলেই রেশন পাবার হকমাবী ঘটে গেল। কি অবিচার। ১৮ মণ ধান কারও বছর চলেবে? এ কোন নীতি?

অপমৃত্যুর শোক প্রকাশ করতাব না। কিন্তু সরকার যেখানে কুপণ ও হুদয়হীন সেখানে গ্রামবাসীদের পারম্পরিক সহযোগিতাই ছিল প্রাণ বাঁচানর পথ। এবারে সে পথও গেল।

গ্রামে এক বিরাট বাহিনী আছে কৃষি-প্রমিতকর। যারা কিছু পরিমাণ চাল ও কিছু পরমা নিবে মজুরী খাটো। খাদ্যনীতিতে তাদের খুন করা হোয়েছে। চাষী মজুরকে খাটিয়ে পরমা দেবে। কিন্তু কত পরমা? ধান বিক্রি করবে ১৫ টাকা মণ—সেই টাকাতাই তাকে তো পরমা দিতে হবে। যদি রেশনিং-এর দরবে ১ সের চালের দাম দেয় তাহলেও প্রমিতক রেশন নিতে পারবে না। কারণ বেশন বাদি দিবে যে খোলাবাজারে চলেবে কালোবাজারে তার দাম বেশি হবে। প্রশ্ন আসে যে ভূমিহীন প্রমিতক তো রেশন পাবে ১৬ আঃ প্রতিদিন হিসাবে। ১৬ আঃ প্রতিদিন হিসাবে পাবে ঠিকই কিন্তু প্রতিদিন মজুরীর পরমা নিয়ে চাল কিনতে গেলে রেশন দোকান তা দেবে না। সপ্তাহের রেশন এক দিনে তুলতে হবে। কৃষিপ্রমিতক সমগ্র সংসারের জন্য সপ্তাহের রেশন এক দিনে

শ্রীমতী গোমতী রিভিউ

বিনয়-মাখন

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'টীকাসহ']

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাঙ্গাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমতী গোমতীর মারা শ্রীবিদ্যধন-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়েছেন—

‘অমর প্রসন্ন ইহাব কাব্য সালংকার।

এছে কবির বিনা নহে রসের প্রচাব।’

মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১৯



উপেন্দ্রবিহারী রক্ষিত রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[সংদর্শ]

প রি শে য়

বিপ্লব চিরন্তন—বিপ্লব নার্থ হয় না :

‘বিপ্লব’ দীর্ঘজীবী হোক’ কথাটি কেবল-মাত্র প্রোগান নয়। ইহার মধ্যে মন্দের বীজ নিহিত। যথার্থই ‘বিপ্লব’ চিরন্তন। উহার ‘দীর্ঘজীবন’ কামনা না করলে-ও সে শব্দ, দীর্ঘজীবী নয়, সে চিরজীবী।...

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তার অভ্যন্তরে ‘ভাল’ ও ‘মন্দ’ নানারূপে সম্মিশ্রিত রয়েছে। সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাল ও মন্দ বিভিন্নরূপে আমাদেরকে ঘিরে বেঁচে থাকতে বাধ্য। সৃষ্টিতত্ত্বের ইহাই মূল রহস্য। দেবতা ও অসুর একই পিতার সন্তান। যখন দেবতা হেরে যান অসুরের কাছে, তখনই প্রয়োজন হয় বিপ্লবের। সেই বিপ্লব মেঘের অন্তরাল থেকে সত্য-সূর্যকে পুনঃপ্রকাশিত করে। দেবতার মধ্যকার দেবত্ব ক্ষয়িত্ব হতে থাকলেই অসুরের রাজ্য শুরুর হয়। কাজেই ঐ দেবত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এককালের বিপ্লবের অবদানকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখা প্রয়োজন। বিপ্লবের অবদান ভুলে না গেলে দেবত্ব-ও ক্ষয় পায় না, অসুরের আবির্ভাব-ও ঘটে না। কিন্তু ঐশ্বর্যের মোহে, আলস্যের আবেশে, নিষ্ঠা ও বীর্যের অপপ্রয়োগে দেবতার বৈপ্লবিক-সত্তা যখন বিলুপ্ত হয় এবং অসুর বিজয়ী হয়, তখন পরাজিত ‘দেবতাকে’ বহু দুঃখ ও তপের অনলে দগ্ধ হতে হয়। বহু সাধনা, ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে দীর্ঘদিনে দেবতা হারানো বৈপ্লবিক-সত্তা পুনরায় অর্জন করেন। সেই বৈপ্লবিক-সত্তা থেকে উদ্ভূত মহাশক্তি রক্ত-ক্ষরিত পথে অসুরের বিনাশ ঘটান। দেবতার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।...

“History repeats itself”—বড় সত্য কথা। ভাল এবং মন্দের লড়াই এ-ভাবেই পৌরাণিক যুগ থেকে বারম্বার ঘটে আসছে। এ-ভাবেই ঘটে যাবে চিরকাল। সুতরাং মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা ধর্মগত জীবনে ঐ মন্দকে বারবারে পরাজিত করার জন্যেই ‘বিপ্লবকে-ও’ বেঁচে থাকতে হয়



রামকৃষ্ণ পরমহংস

চিরকাল। এর মত্ব নেই। গীতার বাণী ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’—অর্থাৎ ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে, ধর্মরক্ষার্থে আমি (কৃষ্ণ) যুগে যুগে আবির্ভূত হই’—এর অর্থ

তো ঐ একই। অর্থাৎ বিপ্লবের প্রতীক ‘শ্রীকৃষ্ণরূপে’ যে ‘অবতারবাদ’ বা বিপ্লববাদ, তার আবির্ভাব ঘটে বারবারে।...

‘বিপ্লব’ কি তা’ বারে বারে স্মরণ করা ভাল :

বিপ্লবের জন্ম বিদ্রোহের গর্ভে। ‘বিদ্রোহ’ শাখাপল্লবিত হয়ে ‘বিপ্লবে’ পরিণত হয়—যেমন ‘ইচ্ছা’-র পরিণতি ঘটে তার ফলপ্রসূ প্রকাশে।... যাকিছু প্রচলিত অন্যায় বা অন্যায় তাকে অস্বীকার করেন ‘বিদ্রোহী’, তাকে সমলে উৎপাটিত করে তার স্থলে ন্যায় ও সত্যায় প্রতিনিষ্ঠ করেন ‘বিপ্লবী’।

ভারতবর্ষ যেদিন ইংরেজের কবলে গেল, সেদিন এই দেশে একটিও মানুষের মত মানুষ ছিল না বললে ভুল বলা হবে। অমানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, দুর্বল ও কাঙ্ক্ষালের দল ভিড় করায়, স্বল্পতমসংখ্যক খাঁটি মানুষকে-ও অমানুষদের কাছে বাহাত হার মানতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা মন থেকে হার মানেন নি। মানুষ বলেই তাঁরা বিদ্রোহ-বহির গোপন তাপে নিজেদেরকে দগ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের সবার কথা ইতিহাস জানে না, তাতে ক্ষতি নেই। একটি মহান বিদ্রোহী-ই সকল বিদ্রোহীর বাণী প্রচার করে গেছেন অপূর্ব শোভে। মহারাজ নন্দকুমার ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে পরাধীন-ভারতের প্রথম ‘শহীদ’ হয়ে জীবন দান করে গেলেন। বিদ্রোহের বাণী অগ্নিগর্ভ-ইচ্ছারূপে আগামী-কালের মহাবিপ্লবের সূচনা রেখে গেল।

নন্দকুমারের ‘ইচ্ছা’ কখন কি সূত্রে মজল পাড়ের জীবনকে অলংকার বিদ্রোহী করেছিল তা অব্যক্ত ইতিহাসের জানা আছে। বিদ্রোহের

অশরীরী ছায়াসঙ্করগের ছবি সে-ইতিহাসের দেখা আছে সিপাহীদের সশস্ত্র উত্থানে, তাঁতিরাতোপী-নানাসাহেব-রাণী কালী প্রমুখের প্রচণ্ড ইংরেজ-বিরোধিতায় ও আত্মদমনে। খণ্ড-খণ্ড মেঘ বেমন আচ্ছাদ-গগনে একত্রে পরিবেশিত হয়ে বিপুল রূপ ধারণ করে সারা দেশকে ধারাক্রমে প্রাণিত করে, ঠিক তেমনি খণ্ড-খণ্ড বিদ্রোহ-শক্তিও ভারত-ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে পঞ্জীভূত হয়ে ভবিষ্যৎ বিপ্লব-বন্যার সম্ভাবনা রচিত করে চলল। ব্যাপক 'গন্দ' দেশের 'জলাকে গ্রাস করে ফেলেছিল' বলেই তার বিরুদ্ধে সরেগে আত্ম তুলে দাঁড়াবার সংকল্পে এ আত্মকথ 'ভাল' ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল দেশ-বিদেশের মতুহীন রক্তবের বাণী থেকে।

ক্রমে এদের উল্লিখিত শতাব্দীর যুগসন্ধি-কাল। বাংলার জীবনে সকল ক্ষেত্রে মহা-মানবদের আবির্ভাব ঘটতে থাকলো। ধর্মে, সমাজে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতি স্তরে বিপ্লবের বহুমুখী আবির্ভাব প্রাতিষ্ঠিক বিপ্লবের-ই সূচনা করে চলল।

শ্রীচৈতন্য ধর্মজীবনে একদিন বে-মহা-বিপ্লব ঘটবে গিয়েছিলেন তাতেই বাংলার জমি উর্বর হয়েছিল। তাই বাঙালী পেল রাম-সোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, কণ্ঠকম, মধুসূদনকে। সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে শূন্য নয়—রাষ্ট্রিক ধারণা-ও তাঁরা বিপ্লবের বে-বাণী দিয়ে গেলেন তাকে সমগ্র ভারতের বিদ্রোহী-চিন্তাই মন্ত্রের মত গ্রহণ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' বিজয়-মন্ত্রে সজীবিত করল ভারতবাসীকে। তাঁর 'আনন্দ-মঠের' প্রতি অক্ষরে জীবন্ত হয়ে রইল রাজ-নীতিক-বিপ্লবের আহবান। শূন্য আহবান নয়, বাঙালীর বিপ্লবী-মন তার সাংগঠনিক-ধোরাক পেল সন্তানদের সংঘ রচনার টেকুনিকে।

পৃথিবীর নিখাতিত জাতিগুলোর উত্থান-চেষ্টা পরাধীন ভারতকে বিদ্রোহশক্তি দান করল। মার্টিন-গ্যারিভল্ড-সান-ইয়েত-মান-ইজ-ভ্যাগেরা-সোনি-ষ্ট্রিক-কামাল প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ভারতীয় তরুণ-রক্তে ক্রমে আগুন জ্বলিয়ে দিলেন। দেশের শিবাজী, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্য, কান্সর রাণীর শৌর্যগাথা রক্তের আগুনকে লেলিহান করে তুলল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হলে চাই শক্তি, চাই সাহস, চাই বীরবানের সান্নিধ্য। এসব মৌলিক উপাদানে বিপ্লবীকে তৈরি হতে হয় কেনেই বাঙালী সেদিন দেশ-বিদেশ থেকে বিপ্লবী-চরিত্রের শিক্ষা আমদানী করে বিপ্লবের সাধনা শুরু করেছিল, অতীতের (ভারতীয়) ভাঙার থেকে শৌর্যবীর্যের সম্ভার আহরণ করে বীরপূজা আত্মনিয়োজ্য করেছিল।

জাতিত্ব যখন পরাধীন হয় তখন তার স্বা-কিছ, থাকে, থাকে না কেবল আত্মসম্মানবোধ। —কথটা সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের। আত্ম-সম্মানবোধ থাকে না, কার? থাকে না দুর্বলের।

যে দুর্বল, যে ভীরা, যে হতাশের সদা কাতর সে অসম্মানের সাথে অসম্মান করেই বচিবর চেষ্টা করে।

কাজেই জাতিকে বাঁচাতে হলে শূন্য ধার-করা বাঁল দিয়ে কাজ হয় না। সেই 'বুলিকে' নিজের অন্তরের জবার রূপ দিতে হয়। জাতির অনবলুপ্ত বিদ্রোহী-সত্তা সে-ভাবেই গ্রহণ করে। বাংলার সেই বিদ্রোহী-সত্তাকে স্বনেকের মধ্যে সংক্রামিত করতে হলে প্রথম



স্বামী বিবেকানন্দ

প্রয়োজন হলো প্রচণ্ড বীর্য ও দুঃসহ আত্ম-ভ্যাগের নিদর্শন সৃষ্টি করা। এ জন্যে চাই 'মার্টিন-গ্যারিভল্ড' বা 'আনন্দমঠ'।

শহীদত্ব তরুণরক্তে 'স্বনিনাশের নেশা' জাগিয়ে দেয়। একের পর এক কিশোর, তরুণ, যুবক, যুবতী, আত্মবলিদানের জন্যে এগিয়ে আসেন।... তাই আমরা দেখি 'পুণ্ড্র' প্রথম আবির্ভূত হলেন ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম শহীদ **বালকৃষ্ণ চন্দ্রসেকার** ১৮৯৭ সালে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে চাপেকার বা বানাতে কিংবা বালকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব হতো না, বাল-গঙ্গাধর তিলকের মাধ্যমে বিপ্লবের আলোক-দর্শন না ঘটলে। তিলক তৈরি করেছিলেন বিপ্লবের ভাবধারায় প্রয়োজনীয় পরিপার্শ্ব মহারাষ্ট্রের ভূমিতে।...

মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহ-শিখা থেকে শিখা আত্মসাৎ করে নিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এলেন তিনি বাংলায়। বাংলার ভূমি ছিল শতগুণে উর্বর। সেখানে ইতিপূর্বেই ধর্মে, সমাজে, জীবনজুড়ে বৈপ্লবিক-চিন্তা ঢেউ তুলেছে অজস্র

প্রতিভাধর কণজন্মা পুরুষদের প্রভাবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে-ও সুরেন্দ্রনাথ-নীরজদেবকে লক্ষ্যে রেখে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সংগ্রামী-মনে বিদ্রোহের সূর। শক্তির উপাসিকা সরল দেবী 'স্বীরাটমী' পালন করেছেন তরুণদেরকে নিয়ে 'স্বীরাটমী' মানসে। ক্যারিস্টার পি. মিত্র শৌর্য-শিখা জ্বলিয়ে দেবার সংকল্পে ছিলেন উদ্বুদ্ধ। ভারতবর্ষের 'হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পার্সী ধর্মে' আলাদা হলে-ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তার বেদীমূলে এক ও অখণ্ড—“এই যে নতুন 'অখণ্ড জাতীয়তাবোধ' এ-বস্তু বিপ্লবচন্দ্র পাল পেয়েছিলেন রুজেন্দ্রনাথ শীলের কাছ থেকে, রুজেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন রাজা ব্যামোহনের কাছ থেকে।”

[শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ—পৃঃ ৩১৫]

বিপিন পাল তাঁর 'নিউ ইন্ডিয়া' কাগজে এই জাতীয়তাবাদ-ই বাস্তব ভাষায় প্রচার করা শুরু করেছিলেন।... অর্থনৈতিক-জগতে চিন্তা-বিপ্লব ঘটাবার মূলে রমেশ দত্তের অবদান প্রচুর। অরবিন্দ বলেছেন : রমেশ দত্তের গ্রন্থগুলো না হলে বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের 'বয়কট' এত সহজ সফল হতে পারতো কিনা সন্দেহ। "It not only wrote his story but created it." (Aroviind).

এ ছাড়া সাংবাদিক কাব্যাবশ্যরদ বা সখ্য-রায় গণেশ দেউস্কর প্রমুখ সুলেখকদের আগুন-ঝরনো লেখার বাংলার মন বিদ্রোহী হয়ে-ই ছিল। তাই অরবিন্দের বাংলার আগমনের সাথে সাথে বিপ্লবের চিন্তাধারা সাংগঠনিক রূপ গ্রহণের পথে নিরাক্রান্ত হতে চলল। সংগঠিত হতে থাকলো একাধিক গুপ্ত-সমিতি। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' প্রেরণা থেকে অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির' এবং 'ভবানীমন্দির' থেকে 'স্বগান্তরের আত্মা' শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব-বধানেই সারা বাংলায় বহু গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতির সূত্রপাত ঘটতে থাকল। চিন্তার রাজ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছিল 'জন পত্রিকা' (১৮৯০), 'নিউ ইন্ডিয়া' (১৯০২), 'সখ্য' (১৯০৫), 'স্বগান্তর' (১৯০৬), 'বন্দেমাতরম' (১৯০৬) এবং বিপ্লবী দেবরত বসুর 'অব-শক্তি'।...

রাষ্ট্রিক সমস্ত-বিপ্লবের উদ্গাতা শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন নিবেদিতর কাছ থেকে প্রচুর। ১৯০২ সালেই নিবেদিতর আমাদের দেশের বিপ্লবী-রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পূর্বেই তিনি ছিলেন বখাখ' বিপ্লববাদিনী ও বিপ্লবকর্মী। আইরিশ-বিদ্রোহ ও রুশ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগা-যোগ ছিল এবং স্বামীজীর কাছ থেকেও তিনি বিদ্রোহের বাণী সারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতর জনপানী-বন্দ, ওকা-কুরার ভারতপ্রীতি-ও এখানে উল্লেখযোগ্য।

তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তান প্রাচ্যপ্রাচ্য ও সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যবর্জনে অধিকতর তৎপর হন। ফলে নিবেদিতা, ওকারুরা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় 'Asia is one' (এশিয়া ইজ্ ওয়ান) তত্ত্বটি রূপ গ্রহণ করে। বিপ্লবিনী নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভা। তিনি ভারতবর্ষের আমলে পরিবর্তনের মধ্যে শাসনতন্ত্রকে আধারবিমুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আত্মনিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রভু স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে। তাই তাঁর নামকরণ করেছিলেন স্বামীজী 'নিবেদিতা'। মাতার মত ভারতীয়-জীবনের সকল অকল্যাণকে দূর করে সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক-চেতনায় দীপ্তন আনতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বললেন 'লোকমাতা'। মায়ের মত অরবিন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি কৃপাণ হস্তে। মায়ের-ই মত অবনীন্দ্র-মাথাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি প্রাচ্য-রীতিতে নতুন করে চিত্রাঙ্কন আবিষ্কার করতে। মায়ের-ই স্নেহে জগদীশচন্দ্রকে তিনি প্রণোদিত করেছিলেন ভারতীয়-বিজ্ঞানের হারিয়ে-যাওয়া ধারাকে ইউরোপীয়-বিজ্ঞানের ধারান্যানে পুনর্জীবন দান করতে। তিনি জানতেন যে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ধর্মে আত্মস্থ হবার সাধনসাধে-ই স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রিক-বিপ্লবের জন্যে তৈয়ের হবে জাতি। বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি মনীষীকেই তিনি মহামায়ার শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে গেছেন সেই কালে। বিপ্লবচন্দ্রের 'নিউ ইন্ডিয়া'-তে নব-জাতীয়তার উদ্বোধনকল্পে প্রচুর প্রবন্ধ লিখে এবং 'ডন সোসাইটি'-র তরুণদলের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের স্বীকৃতি করে এই মহারসী মহিলা বিপ্লবের ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি বোধহয় নিবেদিতার ব্যবহারিক বৈপ্লবিক-জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া রূপে গ্রহণ করতো না।...

[শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ,—পৃ. ৩২৬—৩২]

শুধু গুপ্ত-সমিতি সংগঠনে নয়, সমগ্র বিপ্লব-আন্দোলনেই নিবেদিতা অরবিন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অধিকন্তু অরবিন্দকে জড়িয়ে ফেলা (চন্দননগর হয়ে পণ্ডিত্য) ও তৎপর তাঁর কাজ চালাবার দায়িত্বে-ও অবিচলিত থাকে এই মহাশক্তির দৃঢ়-অপূর্ব শৌর্যময়ী সাধিকার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।...

আলীপুর মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অরবিন্দ পুনরায় ইংরেজ পত্রিকা 'কর্ম-যোগিন'-এর সম্পাদকীয় লিখতে বসলেন। ইতিমধ্যে একদিন রামচন্দ্র মজুমদার পুর্লিশের কাছ থেকে গোপনে খবর বার করে নিয়ে এলেন যে, অরবিন্দকে শ্রী পুনরায় গ্রেপ্তার করা হবে। খবর শোনার পর অরবিন্দ বললেন: "নিবেদিতাকে বলে এসো।"

সকল কথা শুনে ভাগিনী নিবেদিতা বললেন :

"Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things."

তার উত্তরে অরবিন্দের উক্তি :

"If Nivedita continues the work I shall leave."

কথা কয়টি বলেই বহুক্ষণ ধরে লিখলেন তিনি—

'Open letter to my Co-Citizens' এবং 'My Political Testament' নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা। ঐ লেখা সমাপ্ত করে চলে গেলেন তিনি নিবেদিতার গৃহে। একান্তে



রাজা রামমোহন রায়

দুই সাধকের স্মৃতির্ব আলোচনা হল।

"These last tense hours were, such is the mystery in the temple, veiled in secrecy, Two worshippers of the 'Divine Mother' met together to transmit their powers to each other."

[নিবেদিতার ফরাসী-জীবনচরিত, পৃ. ৩২১—২২]

অরবিন্দ তাঁর কর্মভার নিবেদিতার হস্তে অর্পণ করে রাতের অন্ধকারে একটি ফরাসী-বোটে চন্দননগর পালিয়ে গেলেন।... বাগ্না-কালে নৌকা ছেড়ে দেবার পূর্বে তিনি রামচন্দ্র মজুমদারকে বলছিলেন :

"Be rare in your acquaintances. Seal your lips to rigid Secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest."

[উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫২, পৃ. ২৩০—৩১]

এর অব্যাহতি পরে একদিন রামবাবুকেই অরবিন্দ বলেন :

"Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide!"...

চিত্রে, নাট্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে ও জীবনদর্শনে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন রাম-মোহন-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাবের পরিপূর্ণ বাংলায় মাইকেল, বাঁকিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, গিরিশ চন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, শিশির ঘোষ, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশ-চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রজনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মহারথী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী-রাজনীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তার প্রবর্তন করেছিলেন বিপ্লবচন্দ্র, অরবিন্দ, রজনীন্দ্রনাথ, মিত্রসাহেব, চিত্তরঞ্জন, সরলা দেবী, লিলাকং হোসেন, অশ্বিনী দত্ত, রসূল সাহেব প্রমুখ দেশনেতা। কালজয়ী এই প্রতিভাধর পুরুষদের পরিচর্যায় উর্বর ভূমিতেই বিপ্লবের মূখপত্র 'কন্ধ্যা', 'বন্দে-মাতরম্', 'বঙ্গভারত', 'কর্মযোগিন' শব্দ-বিপ্লব ঘটানোর পক্ষে সেরাসীরভাবে বা পরোক্ষ মানসিক আবহ তৈরি করতে লেগে গেল।... শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গুপ্ত-সমিতি গড়ার পূর্বেই কিছু তাঁর ভ্রাতৃমহ সর্বজনপুজ্য রাজনারায়ণ বসু, ঠাকুরবাড়ির স্বকদের নিয়ে প্রথম 'গুপ্ত-সভা' স্থাপন করেছিলেন। স্বগৃহের পুষ্টি, মড়ার খুলি ও মৃত্ত অসি সাক্ষী করে এবং রক্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর প্রমুখ তরুণদল ভারত উদ্ধারের দীক্ষা নিয়েছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কাছ থেকে।...

"মন অগ্নিশুদ্ধ মূর্ত্তে" অরবিন্দ-নিবেদিতা-রজনীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতা বন্ধন তরুণের কানে কানে শোনালেন সশস্ত্র-বিপ্লবের মন্ত্র—তখনই দেখা গেল প্রকাশ্যে বোরিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয় বীরের এক বৃষ্টি-সাপ্তাজ্যবাদকে প্রচণ্ড আঘাত দেবার সংকল্পে!... বাংলার প্রথম শহীদরূপে ঘটলো প্রফুল্ল চাকর বীর প্রকাশ। আরো আবির্ভূত হলেন বীর শহীদ ক্ষুদীরাম, কানাইলাল, সত্যেন বসু, বীরেন দত্ত-গুপ্ত, চারু বসু প্রমুখ। "শহীদ-বরণের যুগ" এগিয়ে এসে রূপান্তরিত হলো বিপ্লবের শিবতীর অর্থাৎ "শব্দ-যুদ্ধের যুগ", ১৯১৪ সালের পর থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতে ও বহির্ভারতে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিপ্লব ব্যর্থ হলো না। বালাসোয়ের যুদ্ধে বিপ্লবের শিবতীর যুগের পদসঙ্কর। তৎপর বেশি বাঙালীর ছেলে যুদ্ধের স্বাদ পেয়ে গেছে। বালাসোয়ের পর গোহাটি-ও কলতাবাড়ার (ঢাকা) বিপ্লবীরা যুদ্ধ করেছেন। এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবের ইতিহাসে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই আমরা দেখে এসেছি আত্মদান ও স্বাধীনতার অম্ল্য মহড়া আদর্শ বিপ্লবের প্রস্তুতিরূপে। চট্টগ্রামের নান্দা যুদ্ধ, রাইটার্স-অলিগে অথবা মেদিনীপুরের খেলার

মাঠে দেখেছি আমরা সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে তরুণ বিপ্লবীদের দুর্জয় যুদ্ধ। আবার দেখেছি সুবর্ণ সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বসু, মৃগেন দত্ত, কানাই-ভবানী-রজগোপালের মত বহু বীর ও বীরীগণ রক্তে 'মার্টায়ার ডম'-এর নেশা!...

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়ে, প্রসারিত এই যুগের ইতিহাস জাতির 'পুনর্জন্ম'লাভের ইতিহাস। এ ইতিহাস জানা না থাকলে বাংলার 'বিপ্লববাদ' বোঝা যায় না। কাজেই আমরা অত কথা সংক্ষেপে লিখতে বাধ্য হলাম।...

ইংরেজ-রাজত্ব শুরুর হতে না-হতেই যে বিদ্রোহ-বহিঃস্ফূর্তি হচ্ছিল সবার অগোচরে, তা' স্বাভাবিক মহাযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম বিপ্লবের ধ্যানে প্রজ্জ্বলিত হয়ে চলল দেখা ও না-দেখা বহিঃতরঙ্গে। তারপর এলো স্বাভাবিক মহাযুদ্ধ। মহানায়কের ভূমিকার পদ-যাত্রা করলেন সুভাষচন্দ্র বহিঃভারতে, বিপ্লবের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার সংকল্পে।...জাপান ও জার্মানি ইংরেজকে দিল একান্ত হীনবল করে। নেতাজীর 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ' বর্মার উপকূল থেকেই 'ভারতের বিপ্লব' সংঘটিত করল। সেই বিপ্লব-তরঙ্গ স্পর্শে ভারতবর্ষে মহাযুদ্ধ 'কুইট ইন্ডিয়া' ও 'করণেগে ইয়ে মরণেগে' আন্দোলন ও বিপ্লবের রঙে-রঙীন হয়ে গেল! অগাস্ট-বিপ্লবের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের কণ্ঠে শোনা গেল :

"My own interpretation of the Congress position (not Gandhiji's is clear and definit. Congress is prepared to fight aggression violently if the country became independent. Well, we have declared ourselves independent, and also named British as an aggressive power ; we are, therefore, justified within the terms of the Bombay resolution itself, to fight Britain with arms, If this does not accord with Gandhiji's principles that is not my fault." (History of Freedom Movement, Vol. 3, Page 669)

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জয়প্রকাশ-অরুণা আসফ আলি-লোহিয়া প্রমুখ পরিচালিত 'অগাস্ট-বিদ্রোহ' ভারতের বৃক্কে উত্তাল তরঙ্গে আপেক্ষা করছিল বর্মার উপকূল থেকে প্রাণিত হয়ে-আসা বিপ্লবতরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবার স্বাক্ষরতায়।... অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি নেতাজীর নেতৃত্বে। সে-বিপ্লবের আঘাতে জর্জরিত ব্রিটিশকে তাই ভারত ত্যাগ করতে হল নানা অবস্থাবিপর্যয়ে ১৯৪৭ সালে।...

আমরা পূর্বেই বলেছি 'বিপ্লব' ব্যর্থ হয় না, কারণ তার অবদান অক্ষয় এবং চির-কালের। বিপ্লবের 'খণ্ড' রূপ নেই। তার রূপ সামগ্রিক। ঋণাকে বাদ দিয়ে যেমন সাগরসংগমকে বোঝা যায় না, তেমনি বোঝা যায় না 'মার্টায়ার ডম' থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবের সম্পূর্ণ রূপকে। বিপ্লবের মধ্যে নিহিত রয়েছে বিদ্রোহের অদম্য ইচ্ছা, দুর্জয় সাহস, নিয়মানুবর্তিতা এবং মৃত্যুভয় ও স্বাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের বাণী। বিপ্লবীর আয়ত্তে থাকে এই গুণগুণো। এই গুণাবলী বিপ্লবের মৌলিক উপাদান। এসব গুণ মৃত্যুহীন, চিরন্তন। কাজেই দেশকাল-পরিসরে ব্যক্তি বা জাতির জীবনে এইসব গুণের প্রয়োজন অপরিহার্য।

যে মানুষ বা যে জাতি তার নির্বাসিত সুখের দিনে এই প্রয়োজনকে ভুলে যায়, তার দুর্ভাগ্য কেউ রোধ করতে পারেনা। দেবতার রাজ্য অস্বপ্নের আক্রমণে ধ্বংস হয়। তাই আমরা দেখি যে, সুখে-দুঃখে ভরহীন ও একনিষ্ঠ হবার আবেদন তাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, যাঁরা যে-কোন ক্ষেত্রে বহুতর পানে ধাওয়া করেন বা করতে চান। বিপ্লবীর ত্যাগ, সাহস ও 'মার্টায়ার ডম' তাঁদের কাছে আরাধ্য বস্তু সর্বমহতেরই। যাঁরা 'ধর্ম' স্থাপন করতে চান অধর্মকে বিনাশ করে, তাঁদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়—

"Blood of martyrs is the seed of church!"

আত্মদানের আবেদন সর্বক্ষেত্রে। পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক রাজ্য, প্রত্যেক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মদানের পথে। সে-



রক্তপ্ৰস্রাব শীল

আত্মদান প্রচণ্ড শৌর্বে প্রথম সম্ভব করেন কতিপয় বীর। তারপর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে।...

স্বাধীনতার পরে দেশের স্বরূপ— তার মূল্যায়ন :

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। সেই স্বাধীনতা-লাভের দিন থেকে আমরা ১৮ বৎসরের মত এগিয়ে এসেছি। স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফলরূপে আসে নি। বিপ্লব এবং বিপ্লব-রাজনীতিক পরি-স্থিতির চাপে ইংরেজের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়; কিন্তু সামরিক-শক্তির হার হলেও তার (ইংরেজের) 'ডিপ্লোমেসি' বা 'কুট-রাজনীতিক-শক্তি' হার হল না। কাজেই স্বাধীনতা লাভ হলো ব্রিটিশ-কুপাভিতরণের ফলরূপে।...এতেও কিছু ক্ষতি হতো না, যদি যাঁরা হাত পেতে স্বাধীনতা-ফলটি গ্রহণ করে-ছিলেন তাঁরা মেকী-আহিংস না হয়ে যথার্থ রাজনীতিক হতেন। তাঁরা 'বিপ্লবী'দের প্রত্যাখ্যান করেও যদি 'বিপ্লববাদের' মর্মটুকু আয়ত্ত করে নিতেন, নেতাজীকে অন্তরালে রেখেও যদি 'সুভাষবাদ'কে বরণ করার সাহস দেখাতেন তবে তাঁদের শাসনেই ভারতবর্ষ বহু পূর্বে সাবালক হতে পারতো। অথচ এতে তাঁদের ব্যক্তিগত বা দলগত কোন ক্ষতি হত না। কারণ যেসব বিপ্লবী নিজেদের রক্ত ও যৌবন দিয়ে স্বাধীনতা-স্বপ্নকে একদিন জয়-যুক্ত করতে বন্ধপারিকর ছিলেন তাঁরা বাস্তব স্বাধীনতা না-আসায় ব্যথিত হলেও আগামী বিপ্লবের নীরব কামনায় তাঁদের বাধাকোর অনশনক্লিষ্ট-জীবন ক্ষুদ্রই দিয়েই খুশি থাকতেন। তাঁরা কংগ্রেসী-গদি দখল করার অপচেষ্টা করতেন না। অধিকন্তু কারো বাড়ি-ভাতে ভাগ বসাবার জন্যে নেতাজীর ছুটে-আসার ভয়ও ছিল না। [অবশ্য নেতাজী বা তাঁর স্তরের কোন মহানায়ক যদি স্বাভাবিক বিপ্লবের ভগীরথরূপে সত্যি আজ অবতীর্ণ হন তবে কারো কোন বাধাই টেকসই হবেনা।]...

যাহোক কংগ্রেস-সরকার আত্মতৃপ্তি লাভে মগন হয়ে উঠলেন।...অহিংসার ধারক ও বাহকরূপে বিশ্বের কাছে নেতারা প্রায় 'বৃক্ষের' আসন পেয়ে গেলেন। মনে করলেন যে, প্রেমের মন্ত্রে পৃথিবীর অসুর-শক্তিকে প্রায় তাঁরা জয় করে ফেলেছেন। নিজেদের 'ডিফেন্স'-অস্ত্র-অনু্যায় আর শক্ত করে তোলার প্রয়োজন নেই। বর্মার ঐ নীতি ত্যাগ করে 'হৃদয় জয়' করার নীতিই তাঁরা সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিগুলোকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে ছাড়লেন। সুতরাং সৈন্যধাতো বায়ুভার কমিয়ে বড় বড় জলসেচ বা বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রজেক্ট ইত্যাদি গাড়ার দিকে সরকার মন দিলেন; সাংস্কৃতিক শাভেজা আদানপ্রদানে সকল দেশ-

পুলোকে আপ্যায়িত করার জন্যে দেশের জরুরী-শক্তিকে উৎসাহিত করলেন; পরের কাছ থেকে ধার-করে-আনা অর্থ থেকে অকাতরে অর্থ-সাহায্য দিতে থাকলেন পাকিস্তানকে তার জনসেতের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যে; এবং এদিকে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা-গুলোর শুরুর হলো সিগারেট-লাইটার বা শিশুদের খেলনা তৈরির কাজ। মহাত্মা গান্ধীর অনুচররা জওহরলালজীর নেতৃত্বে 'মিলেনিয়ারাম' এনে ফেলেছেন। এখন তাঁরা মহাচারী 'ব্রাহ্মণ'! 'ক্ষত্র'-শক্তির কোন প্রয়োজন নেই বলেই স্থির হয়ে গেছে।...

ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 'ক্ষত্রশক্তি'-বিবর্জিত দেশের 'ব্রহ্মণশক্তি' তার মিথ্যে ঘৃণা থেকে ফেলল ক্ষমতা, অর্থ ও বশের চোভে। গোটা দেশ ঘোর তামসিকতার বে-পথে জীবনযাত্রা চালান, সেখানে মহাত্মার 'অহিংসার' অন্তত সমাধি লাভ ঘটে গেছে।...

বিপ্লবীর জীবনকে বর্জন করার যে ভুল, সেই ভুলের মামুলে তাই কংগ্রেস ও তার সরকারকে দিতে হচ্ছে গত ১৯৪৭ সাল থেকেই। 'ক্ষত্রশক্তি'বিমুখ-ভারত সেই জন্যে 'নেকা'-চুষ্টে চীনের কাছে খেয়েছে প্রচণ্ড মার; নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে ভারতকে ক্ষুদ্রে পাকিস্তান; এমন কি নাগাসদীররা পর্যন্ত সামান্য মহিলা-সর্দারের ক্ষমতা ধারণ করেও দুর্বলচিত্ত ভারতকে দেখিয়ে ছেড়েছে তুর্কি-নাচ। খাল কেটে জল বইয়ে নিয়ে সেতের বে-ব্যবস্থা করার জন্যে পাকিস্তান যে-মান হাত পেতে গ্রহণ করল ভারতবর্ষ থেকে, তা দিয়েই তুললো সে পাকিস্তানী 'ম্যাজিনো-প্রাচীর'!...বৈদেশিক ব্যাপার থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখি-রাতারাতি পলিশের লোক ও বান, আই-সি-এস ইত্যাদি বৃকে জাতীয় পতাকার স্বাক্ষর ধারণ করে দেশপ্রেমিক সেজে গেল।

যারা অহিংস ও সহিংস স্বাধীনতার বোধ-দেয়কে 'শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ' নির্বিশেষে প্রভু ইংরেজের নির্দেশে পশুর মত নির্ভীক করেছ একদিন আগও, তারাই মহত্ব-দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের ধারক, বাহক ও রক্ষক হয়ে গেল। মাথার খন্দরের টুপি টাপিয়ে কংগ্রেসীরা মস্ত্রী হলে-ও তাঁদের কাজ হল ভাষণ দান ও মানপত্র গ্রহণ মাত্র। দেশ-শাসন রূপ কার্য ইংরেজের প্রাক্তন গোলাম কর্মচারী অর্থাৎ ভারতীয় ক্যুরো-ক্রেসী ও পলিশ কৃত্তক পরিচালিত হতে থাকলো। 'নেক্‌টাই' আর 'গান্ধী-টুপি'র অপব্যব সমন্বয়ে কালো-রেড্‌টোপিজম' জয়-ধ্বনি তুলে চলল। ফলে কি দেখলাম? দেখলাম-যাদের বিত্ত আছে তারা অধো-বিস্তারন হবার জন্যে কালোবাজারের কালো-পথে গোটা দেশকে টেনে নাবাচ্ছে, চাকুরের দল আত্মসর্বস্ব হয়ে দেশকে জাহান্নামে ঠেলে দিচ্ছে, প্রমিক-কৃষক ও স্বল্পশিক্ষিত দিনের পর দিন গরীব থেকে আরো গরীব

হতে-হতে জীবনবৃক্ষে হার মানতে বসেছে। সরকার নিশেহারা। কোন ক্ষেত্রেই শক্ত হাতে রাশ টানবার ক্ষমতা তাঁর নেই। দেশজোড়া 'লাইটপোস্ট' আছে, কালোবাজারী পথেঘাটে 'কিল্‌বিল্‌' করছে — কিন্তু জওহরলালজীর ভাষণ মত একটি 'কালোবাজারীকে'-ও কোন আলোকস্তম্ভে ঝোলান হল না। সরকার পক্ষের শত্রু করে মতনির্ধারণ-ক্ষমতা সর্ব-



ভগিনী নিবেদিতা

ক্ষেত্রেই অলক্ষিত। শ্রীমতী পিণ্ডিতের কথা-ই ঠিক:

"The Government is the prisoner of its indecisions!"...

কিন্তু এত দুর্দশারও কিছুমাত্র নিরাশ হবার কারণ থাকতো না, যদি জাতির তরুণ-শক্তি বিদ্রোহ ও বিপথগামী না হত। তার গতিধারা যে মাথা খুঁড়ে মরছে প্রকাশিত হবার আবেগে! কিন্তু অন্ধ আবর্তের প্রাচীর ভেঙে ছুটে চলার আহ্বান তাকে কেউ শোনায় না। দুঃসহ সৃষ্টির পথ-সংকেত তাকে কেউ দেয় না। ভুরো নেতৃত্ব অথবা

অসং-এর প্রলোভনভরা ইংগিত তাকে স্বেচ্ছা-চ্যুত করে ফেলেছে।...

তারুণ্যশক্তির এই দুর্দশার মূলে জাতির 'ব্যর্থ'-নেতৃত্ব। সেই 'ব্যর্থ' নেতৃত্ব এসেছে কংগ্রেসের কাছ থেকে, এসেছে কংগ্রেস-বিরোধী প্রত্যেকটি দলের কাছ থেকে, এসেছে কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে।...

কংগ্রেসী-সরকার পঞ্চসালার পর পঞ্চসালার নামে দেশমর নানা 'পরিচালনা' সার্থক করে তোলার দায়িত্বে কত 'প্রজেক্ট' সৃষ্টি করেছেন। সেসব প্রজেক্ট বেখে অনেকের মনে হয়েছে যে, নেতারা কি একটি 'মানুষ' পক্ষের 'প্রজেক্ট' এ-দুর্দিনেও গড়তে পারলেন না? খাদ্য-বস্ত্র-ইস্পাত-তেল-বিদ্যুৎ-পানীয় জল-বন্দোবস্ত ইত্যাদির সমস্যা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাচ্ছেন—ইহা বড়ই আনন্দের কথা। কিন্তু এসব সমস্যা কাদের? কাদের জন্যে এসব সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে? নিশ্চয়ই 'মানুষ'ের জন্যেই সর্বকিছ করা হচ্ছে? কিন্তু সে 'মানুষ' কোথায়? সর্বের মধ্যে ভূত ঢুকে আছে, সেই সর্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানের মন্ত্র আওড়ালে কাজ হাসিল হতে পারে না। অথচ কৃত্তপক্ষ ভুলে-ও বৃকতে পারেন না যে, 'মানুষ' গড়ে তোলার সমস্যাই হল সর্বপ্রধান। এবং সেই সমস্যাটির সমাধান 'টপ-প্রাররিটি' না দিলে তারুণ্যশক্তির মৃত্যু ঘটবে, দেশ জগৎসভার নিকট আসন লাভ করবে।...

কংগ্রেসী-নেতারা 'হিংসা' নামক জংঘর ডরে 'ক্ষত্রশক্তিকে' বর্জন করে দেশবাসীকে 'সাত্ত্বিক' করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু ভাঙামাী পথে পথে ধরা পড়ে গেল। কল দেশ হারালো রক্তক্ষয়, আরো এলো বা তার সত্ত্বাব, ছুটে চলল সে ঘোর তামসিকতার বিপথে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ বা স্বাধীনতার স্পর্শ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকলো সকলের ধারণা থেকে।...

কংগ্রেসের পরই বৃহৎ ও কর্মক্ষম স্বাধীন-নীতিক-দল বলতে বোকা যার কম্যুনিস্ট-পার্টিকে। এই পার্টির ইতিহাসে 'মানুষ' গড়ার চেষ্টা কোন কালে হয় নি। ভারতীয় কম্যুনিস্ট-পার্টি কতগুলো ধর-তাই-বুজির সোল্‌ এজেন্ট। রুশ বা চীনের ডাডাটির প্রচারকের ভূমিকার সেই 'বুলি' বা স্লোগান

মতের
মতন
গহন

বি.সরকার
ম্যাগ ও সঙ্গ
১২৪, ১২৪/১ বি.গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা

ছাড়িয়ে-মাওয়া ছাড়া তাদের অপর কোন কাজ দেখি নি। অথচ রুশ তার দেশকে কেন্দ্র করেই বহুতর সন্ধান পেয়েছে ও পাচ্ছে, চীন তার দেশকে কেন্দ্র করেই বহু হবার সন্ধান করেছে। কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্টদের নিজস্ব দেশ বলতে কোন বস্তু নেই। কাজেই দেশের সমস্যা বা দেশবাসীর সমস্যা তাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তারা হয় 'রুশপন্থী', নয় 'চীনপন্থী'—কিন্তু কোন মূহুর্তেই 'ভারতপন্থী' নয়! সুতরাং যুবকদের দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ তারা শেখাতে পারে না। তারা বরঞ্চ তরুণ-চিন্ত থেকে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ বিলুপ্ত করার চেষ্টা করবে। তারা মানুষকে চলে সেজে 'বন্দ' করে তুলবে পরের জন্যে। সে-বন্দ বাজবে রুশীয় বা চৈনিক ইচ্ছা



বঙ্গবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

তালে তালে। 'ভারতপন্থী' হওয়া মানে (তাদের ভাবায়) বর্জেরা-মনোভাবের প্রপ্রর দেওয়া, বিশ্ব-মজদুরের বিরোধিতা করা। কলে অবস্থার নানা চাপে বেসব-তরুণদল তাদের দলে ভিড়ে গেল, তারা-ও ভ্রমশ পদে পদে বিজ্ঞান হতে থাকল। কারণ চোখের সামনে দেখে তারা 'ভারতবর্ষ' ও 'ভারতবর্ষের সমস্যা'—চীন বা রুশ নয়, তাদের সমস্যা-ও নয়। তাই তারা না বোকে বিশ্ব, না মজদুর, না বিপ্লব। তারা শব্দ হারিয়ে ফেলে সাধারণ-বুদ্ধি ও দেশাত্মবোধ।...

১৯০৯ সালের যুদ্ধে ইংরেজ-বিরোধী লড়াই-এ কম্যুনিস্টরা-ও যোগ দিল—কারণ রুশ ছিল ইংরেজের বিপক্ষে, জার্মানির পক্ষে। কিন্তু যে-মূহুর্তে 'নিজের দেশের স্বার্থে' রুশ ইংরেজের পক্ষে চলে গেল জার্মানির পক্ষ ছেড়ে-সেই মূহুর্তেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট-দল-ও ব্রিটিশের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে 'ব্রিটিশ-পন্থী' হয়ে ব্রিটিশ-

বিরোধী সংগ্রামী-ভারতের বিরুদ্ধে চলে গেল! কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের সংগ্রামে তারা বাধার সৃষ্টি করে চলল পুলিশ ও স্পাইদের কাজে নিল'জ মদং দিয়ে। তাদের এই দেশদ্রোহী কার্যকলাপের নানা ব্যাখ্যা দিয়ে একাংশ তরুণদলকে তারা বাধ্য করল দেশের স্বার্থ ও মর্যাদা ভুলে যেতে। এখানেই বিশ্বাসঘাতকতা শেষ হলো না। সাম্প্রদায়িক-তার আগ্রয়ে সংগ্রামী কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করতে-ও তাদের অসুবিধা হয় নি। তাই তারা প্রগতিবিমুখ ধর্মশ্রম মসলিম লীগকে (কংগ্রেসের বিরুদ্ধে) সাহায্য করতে বারের বারই ঈগিয়ে এসেছে।

"The conference of the Communists student, in December, 1940, led by Hiren Mnkherjee and K. M. Ashraf, challenged the right of the Indian National Congress to speak for the whole of India and passed a resolution declaring 'that the future India should be a voluntary federation of regional states based on mutual confidence'."

অর্থাৎ হীরেন মন্খার্জী ও কে, এম. আশরাফের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট ছাত্রদের কনফারেন্স স্থির করল যে, ভারতবর্ষ তার সকল মানুষ নিয়ে একটি জাতি হবে না, হবে একাধিক জাতির সমাবেশ! এতে ঐতিহাসিক বলছেন:

"...this was a clear bid to enlist the support of the Muslims by conceding the claim of 'Pakistan'. In various other ways, too, the Communist Party of India (C P I) conciliated The Muslims in an attempt to win time over to Communism."

(History of Freedom Movement Vol.—3. P 687)

অব্যয় 'পাকিস্তান' কম্যুনিস্টদের চেষ্টায় হয় নি। পাকিস্তান ইংরেজের দৌলতেই হয়েছে মুসলিম-লীগকে সামনে রেখে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর সুবিধা মত ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে কম্যুনিস্টরা বহুদিন ব্যাকো মদং দিয়েছে। তাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করা, জাতীয়তাবাদকে অপদম্ব করা। কাজেই ভারতবর্ষের তরুণ উক্ত কম্যুনিস্টদের মাধ্যমে দেশকে চিনতে পারলো না, জাতিতে বন্ধতে পারলো না, নিজেকে গড়ে তুলতে পারলো না। শব্দ-মাত্র শ্লোগান, সুবিধা-বাদ ও ধার-করা নেতৃত্বের নির্দেশগুলি কি মনুষ-গড়ার উপাদান হতে পারে?...

১৯৪১ সালে জার্মানিকে বর্জন করে রুশ মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিল তার

নিজের গরজে। ইতিপূর্বে জার্মানির সঙ্গে এবং মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে রুশ সংযুক্ত ছিল নিজেরই গরজে। রুশ 'কম্যুনিস্ট' হলো-ও স্বাধীন-তার দেশীয় বা বিদেশীয় নীতি গঠিত হয় তার স্বদেশকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আমাদের ভারতীয় কম্যুনিস্টরা এ-বিষয়ে নিতান্ত অনাথ। তাদের 'স্বদেশ' নেই, স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যদেশীয় নীতির-ও প্রয়োজন নেই। কাজেই তাদের পথ ও মত স্থির করবে সেই দেশ, যে-দেশের কাছে নাবালকের মত বাঁধা রয়েছে তারা তাদের মস্তিস্ক। ১৯৪০-৪১ সালে একটি দেশ-ই ভারতীয়-কম্যুনিস্টদের অভিভাবক ছিল, তার নাম রাশিয়া। কিন্তু হাল শিবীয় প্রভুর উদয় হয়েছে—তিনি চীন।

রুশ 'মিত্রপক্ষে' যোগ দিচ্ছে আমাদের



চন্দ্রকান্ত দাস

কম্যুনিস্টবন্দুরা ব্রিটিশের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে গ্রহণ করলেন। তাঁদের কাছে ইংলণ্ড-রাশিয়া-ফ্রান্স-আমেরিকা বড়ই আপন হয়ে গেল। পর হলো ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামকে প্রমাণিত করতে চাইল কম্যুনিস্টরা ফ্যানিস্ট-মনোবাস্তি-সম্মত আন্দোলন বলে।

"During the great national upsurge of 1942, the Communists acted as stooges and spies of the British Government, and helped them against their own countrymen fighting for freedom. The part played by the Communists can be best understood from confidential correspondence during the years 1942, 1943 & 1944 between P. C. Joshi (General Secretary of the Communist Party in India) and

Sir Reginald Maxwell (Home member, Govt. of India).
(History of freedom movement, P. 689-690, Vol. 3)

একবার চিঠির মর্ম এখানে তুলে দেওয়া হল। যোশী-ম্যাক্সওয়েলের একবার চিঠি। 'বম্বে ক্রনিকেল' পত্রিকায় ১৭-৩-৪৬ তারিখে কম্যুনিষ্ট-পার্টির প্রাক্তন সদস্য বাটলিওয়ালা ছাপিয়েছেন এই পত্রের মর্ম কথা।

"Batlivala added that" Joshi had, as general secretary of the Party, written a letter in which he offered 'unconditional help' to the then Government of India and the Army G H Q to fight the 1942 underground workers and the Azad Hind Fauz (I. N. A.) of Subhas Chandra Bose, even to the point of getting them arrested. These men were characterised by Joshi in his letter as 'traitors' and 'fifth columnists'. Joshi's letter also revealed that C P I was receiving financial aid from the government, had a secret pact with Muslim League, and was undermining Congress activity in various ways." (History of Freedom Movement, P 690, Vol.—3.)

এর পরের ইতিহাস হলো চীন-আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীন ভারতবর্ষকে পদানত করার ঔন্মত্যে চীন করল সমস্ত আক্রমণ। কম্যুনিষ্টদের একাংশ সেই চীনেই জানাল তাদের সক্রিয় সমর্থন। আজও তারা পররাজ্যপাহারী চীন এবং তারই বন্ধু ধর্মোন্মাদ ও একনায়কত্বের প্রতীক পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে উদ্বুদ্ধ। এ না করলে নাকি তাদের 'বৈশ্ববিক রোল' ভাঙে হবে যায়!...

চীনের প্রথম আক্রমণ ঘটে ১৯৬২ সালে এবং দ্বিতীয় আক্রমণের হুমকি শব্দ হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে পাকিস্তানী-বন্ধুর সাহায্যে। চীন-পক্ষী ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বাভিমান ভৎসণেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং এহেন বিভীষণ-পক্ষী কী শিক্ষা দেবে ভারতীয় তরুণদেরকে? দেশদ্রোহিতা, অসত্য ও অনাচার এদের মূলধন। মানুষ যেসব গুণে আয়ত্ত করে 'মানুষ' হয়ে ওঠে, এসব গুণ এবং তার মূল্যবোধকে ধ্বংস করার

চেষ্টাই শব্দ এতকাল করে এসেছে কম্যুনিষ্ট-পক্ষীরা। এবং, 'কম্যুনিষ্ট-চীন'পক্ষীরা এখনো তা-ই করছে!...

অথচ আজকের তরুণ আর বিপ্লবী-যুগের তরুণদের মধ্যে আধারগত কোন প্রভেদ থাকার কথা নয়—যেমন ব্রিটিশের ভারতীয়-



শ্রীঅরবিন্দ

ফৌজ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে আধারগত কোন পার্থক্য ছিল না। বিপ্লবী-দের নেতৃত্বে তৎকালের তরুণদল যেমন অসাধা-

নাধন করে সেহেন, নেতাজীর নেতৃত্বেও তেমনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সেনা করিয়ে গেছেন।

কিন্তু সেই 'নেতৃত্ব' আজকের যুগে কেউ দিচ্ছেন না। স্বাধীনতার পূর্বে পঞ্চাশ বৎসর ধরে এই 'মানুষ-গড়া' ভার নিরোচ্ছলেন বিপ্লবীরা। কাজেই তাঁদের লোক মানুষের-ই মত দুর্জয় আঘাত হানতে পেরেছিলেন 'অন্যায় যে করে' তার বিরুদ্ধে। কিন্তু কংগ্রেসীরা তো ভুলে-ও বিপ্লবীদের নামোচ্চারণ করে 'হিংসাকে প্রদ্রব দেবেন না। আজকের তরুণদের কাছে ভুলে-ও তাঁরা বিপ্লব-যুগের ইতিহাস বা ধীর শহীদদের আত্মদানের কাহিনী ব্যস্ত করবেন না! এ-ব্যাপারে কিন্তু কংগ্রেসী-কর্তা ও কম্যুনিষ্ট-দের ভারি মিল। উভয় পক্ষের মনস্তত্ত্ব হয়তো বিভিন্ন 'কমপ্লেক্স' দ্বারা বিকলিত। সেটা 'শ্রমমনাতা', 'হীনমনাতা' বা কোনবিশ 'মনাতা' থেকে জন্মলাভ করেছে জানি না। তবে উভয় পক্ষের এক্ষেত্রে আচরণ যে এক-ই, তা লক্ষ্য করা যায়। অথচ সুদৃষ্টান্তে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও পন্থাতান্ত্রিক ভারত-রাজ্য চালু রাখতে হলে কংগ্রেসীদের যেমন 'মানুষ গড়া' কাজে সর্বপ্রকার নজর দেওয়া প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভারতে কম্যুনিষ্ট-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে-ও প্রতিষ্ঠাতাদের 'মানুষ গড়া' কাজেই হাত দেওয়া সর্বাধিক প্রয়োজন।

কিন্তু উভয় দল-ই এ-বিষয়ে নির্বিকার। কাজেই তাঁদের নেতৃত্বে সেদের ভারদ্যাক্ষিক পথহারা!... (ভ্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যালবার্ট ডোভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া

শ্রীলংকা

গোহাতী



প্রেস ফটোগ্রাফারের সামনে

পরিপ্রান্ত হট্টমোলা

ইতিপূর্বে আমরা যখন পাশ্চাত্য-মঙ্গা বিধানসভার অধিবেশনকে হট্টমোলার অধিবেশন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, তখন সেইসঙ্গে এমন বক্তব্যও রাখা হয়েছিল যে, দেশের বর্তমান কঠিন খাদ্য-সমস্যার জন্য আমাদের প্রতিনিধিগণের মনে আলোড়ন যেমনই হয়ে থাক, বিধানসভায় ব্যক্তিগত ও দলগত বোঝাপড়ার মূল্য তাঁদের কাছে সে তুলনায় অনেক বেশি। সময় খুব বেশি লাগে নি, জনসাধারণের কণ্ঠার্জিত একুশ হাজার টাকা ফাঁদে দিয়ে আমাদের মহামান্য জনদরদী প্রতিনিধিবর্গ 'বঙ্গদর্শন'ের বক্তব্যকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করে একটা গণ-তান্ত্রিক আইনসভায় নির্মম স্বেচ্ছা-তন্ত্রের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করলেন।

মাননীয় স্পীকার মহোদয় তিনদিন বিধান সভায় অক্ষুরন্ত বাদানুবাদের পর অবশেষে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, বিশৃঙ্খল সভায় কর্ম-সূচী পরিচালনা করা দূর্ব্বহ কর্ম হয়ে গড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মূলতঃ রাখে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। গণতন্ত্রের জয়চক্কা খোলকরতালস্বরূপ পোর্টফোলিও ব্যাগ, ওয়ালেট ও ফাইল হাতে সদস্যরা বিধান সভাভবনের 'কেয়ার্ড বন্ধ' অসাধারণ অর্থ-সম্পত্তি সভা শেষে জনাগণে নেন।

এলেন। জানি না অধোমুখে কিনা, তবে প্রেস ফটোগ্রাফারের সামনে যেমনই 'পোজ' করুন, বড়ুক্ষ সাধারণের কাছে মূখ দেখাবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ তাঁদের আর নেই। কেন না তিন দিন ধরে গুঁরা সাধারণের টাকা ঝেঁজি নষ্ট করেছেন অথচ এই তিন দিন খাদ্যের মত একটি সর্বগ্রাসী সমস্যা নিয়ে সাধারণের মূখ চেয়ে আলোচনা রাখতে পারেন নি। অবশ্য এ আলোচনা বর্তমানে এক হিসেবে কিছুটা গুরুত্বহীন এই কারণে যে, খাদ্যনীতি বা গৃহীত হবার তা ইতিমধ্যেই সরকার গ্রহণ করেছেন এবং তদনুরূপ কাজও বর্তমান মাস থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তবুও বাঁরা সাধারণের ভোটে সাধারণের কথা বলতে গেছিলেন তাঁরা যে খাদ্য-সমস্যাকে আদর্শে আমলই দিলেন না এটাও সাধারণে বোঝা চোখে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন, পরিপ্রান্ত প্রতিনিধিবর্গ কেমন বাগবান্দে কাহিল হয়ে গণতান্ত্রিক আইনসভা থেকে সরাসরি ফেরৎ আসেন।

কিন্তু কেন। কী এমন ঘটেছিল যে একুশ হাজার টাকা ও তিনটি অমূল্য দিনকে নিয়ে এমনভাবে ছেলেখেলা করতে হবে।

বিরোধীরা বলছেন, চরম অবমাননা।

কমতাসীন দল বলছেন, কিস্যু না,

কিস্যু না, আসলে খাদ্যনীতির ওপর বিরোধীদের বক্তব্য দেউলিয়া হওয়ার জন্যই তাঁরা আলোচনা বন্ধ করার একটা অপপ্রয়াস করেছেন।

যথার্থ চিন্তাশীল দায়িত্বসম্পন্ন সদস্যরা বলছেন (দৈনিক বঙ্গমতীর সংবাদানুসারে), আপোষ রক্ষার জন্য যদি শাসকদলই আগিয়ে আসতেন তবে তাতে শাসকদলের মর্যাদা বাড়ত বই কমত না।

অর্থাৎ গুজগোলটা শেষ পর্যন্ত মর্যাদার প্রশ্নেও একঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেছে বোঝা গেল।

তার মর্যাদা? মধ্যমন্ত্রীর? নাকি বিধানসভার নেতা মধ্যমন্ত্রীর, নাকি শাসকদলের, নাকি বিরোধী দলের?

গোলমালের সূত্রপাত প্রথমস্ত বিরোধী দলের মর্যাদাহানিতে! প্রকাশ, দুজন বিরোধী সদস্যসহ পি এস পি দলের এক প্রতিনিধিবৃন্দ মধ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে মধ্যমন্ত্রী নাকি দর্শনদান দ্বয়ের কথা, প্রতিনিধি দলটিকে ঘর থেকে বার করে দেন।

সভাস্থ বিরোধী সদস্যরা এ ঘটনাকে সরাসরি বিধানসভার প্রতিই অবমাননা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং দাবি রেখেছিলেন, মধ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। তাৎ বিধানসভা এই দাবিতে

ও পাল্টা চাঁৎকারের সঙ্গে সভাগৃহের নিরীহ টেবল কাণ্ডখণ্ডগুলিকে বেদম প্রহারও করেছেন।

কিন্তু তাতেও ফললাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী স্রেফ 'ডেস্ট, কেসার' করে দিয়েছেন বিধানসভাকে। তাঁর বক্তব্য, তিনি আদৌ কোনো রকম অসৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করেন নি। ক্ষমতাসীন দলও এই একইভাবে অভিযোগ অস্বীকার করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যিনি সেই শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়-এর নিকট ঘটনার বিবরণ শ্রবণের জন্য বিরোধী দলকে পীড়া-পীড়ি করতে শুরু করেন।

ফল হয় নি। দুই পক্ষের পীড়া-পীড়িতে অবশেষে স্পীকার মহোদয় মানসিকভাবে পীড়িত বোধ করায় অনিদিষ্টকালের জন্য সভা বন্ধ করে দিয়ে সকল তর্কের মীমাংসা করে দিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিরোধী বক্তব্য হ'ল, কেবলমাত্র সদস্যবৃন্দের মর্ষাদাহানিই নয়, মর্ষাদাহানি হয়েছে সমগ্র বিধানসভার। অপরপক্ষের অভিযোগ, আদৌ কারও মর্ষাদাহানিই হয় নি, বিরোধীপক্ষের মর্ষাদাবোধ বরং কিছু 'জাদা' হয়ে উঠেছে, অন্যথা তাঁরা শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যেই সন্তুষ্ট হতে পারতেন।

এর পর সাধারণ মানুষের বক্তব্য যদি আহ্বান করা হয় তবে নিশ্চিতই তাঁরা বলবেন, না, 'মর্ষাদা', 'দেমা' ও সমস্ত ষাঁর যতই থাকুক, আসল মর্ষাদাহানি যদি কারও হয়েছে থাকে তবে তা হয়েছে জনসাধারণের অর্থাৎ গণতন্ত্রের। কেন না দেশটা যখন অদ্যাবধি গণশাসিত দেশ বলে কাগজে-কলমে স্বীকৃত—তখন কারও ব্যক্তিগত মর্ষাদার অথবা দলগত মর্ষাদার প্রশ্ন এখানে দ্বিতীয় ধাপের প্রশ্ন হিসেবেই পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। সাধারণের জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত যে খাদ্য প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক-সভা-সেখানে পক্ষান্তরে মর্ষাদার প্রশ্নটি এতেই বড় হয়ে উঠল যে, আসল খাদ্যবিতর্কই অবহেলিত পড়ে রইল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মর্ষাদাহানি ঘটেছে গণতন্ত্রের।

গণতন্ত্রকে এভাবে পুরনো খবর-কাগজের মতো চুলো ধরাতে ব্যবহার না করে বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়াই উচিত ছিল। বলা বাহুল্য অনেক উচিত কাজের মত এটাও মূল্যবান রইল।

কিন্তু কতিপয় দায়িত্বশীল সদস্যের সূচিন্তিত মন্তব্য কার্যে

পরিণত হলে তিন দিন যাবৎ মূক নিষ্ক্রিয় ও নিরীহ কয়েকটি স্থাবর সম্পত্তির ওপর সভাগৃহে এই তুমুল অত্যাচারের কোন প্রয়োজন হত না হয়ত। (তৃতীয় দিবসে সদস্যরা নাকি টেবল চেয়ার প্রহারে ব্রত ছিলেন)।

মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বিধানসভার নেতা তিনি যদি একবার সভাগৃহে পদার্পণ করতেন এবং যে বিতর্কিত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান করতেন, তাহলে তাঁর মর্ষাদাই শতগুণে বৃদ্ধি পেত। ঘটনা যা-ই ঘটুক, সভার প্রতি মর্ষাদা প্রদর্শনের ম্বারা তিনি আপন মর্ষাদাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন সমস্ত চাঁৎকার স্তব্ধ করে দিয়ে। তিনি যে এ সুযোগ গ্রহণ করলেন না, এতেও কতিপয় আলোক-প্রাপ্ত সদস্য বিশেষ বিমর্ষ বোধ করেছেন বলে প্রকাশ।

দৈনিক বঙ্গমতীর নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানিয়েছেন, "একজন বিশিষ্ট মুদ্রাপত্র (সদস্য) লবীতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দরদী হিসাবে পরিচয় দিয়া কয়েকজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রীকে হেয় করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আর বিরোধীরাও এই চক্রের পাতা ফাঁদে পা দিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অপদস্থ করানোর ব্যবস্থা করিতেছেন। এই চক্রের দীর্ঘদিনের বাসনা এইভাবে চরিতার্থ করার চেষ্টা হইতেছে।"

সুতরাং এই বক্তব্যের সারবস্তা যদি কিছুমাত্র থেকে থাকে তবে এই দীর্ঘ টেবল চাপড়ানিটা একটা সুক্কর রাজনৈতিক চাল বলেও মনে রাখতে হবে। আর তা হলে এবিষয়ে উপযুক্ত মহলের আশু সাবধানতা যে প্রয়োজন তা নিশ্চয় তাঁরা উপলব্ধি করবেন।

আপাতত এই চাল ও বেচালে যে অপূরণীয় ক্ষতিটা প্রত্যক্ষ, তা হ'ল, আইনত অনিদিষ্ট দিনের অবসান ঘটলেও খাদ্য-বিতর্ক অসমাপ্ত রয়ে গেল। এমনভাবে চলতে থাকলে বিধানসভার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একটা নাম কা ওয়াস্তে সভা সাক্ষরে রেখে দৈনিক সাত হাজার টাকা খরচ করারও কোনো মানে হয় না। মর্ষাদার লড়াইটাই দেশের স্বার্থহানি করেও যখন এমনই একটা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন ভবিষ্যতেও সম্মিষ্ট মর্ষাদার প্রশ্ন বারম্বার উত্থাপিত হতে পারে। তাতে নিরীহ টেবল চেয়ারের ওপর পুনরায় মুষ্টাঘাত ও দেশবাসীর ওপর অর্থাধাতের মুষ্টারই নেমে আসবে, কাজের কাজ হবে না কিছুই।

ভবিষ্যতের সেই দুর্দিন এড়াবার

জন্য এদেশে হয়ত সর্বাত্মক প্রয়োজন এসব ক্ষেত্রে দলগত ও ব্যক্তিগত মর্ষাদার প্রশ্নকে সাবিকভাবে গণতন্ত্রের মর্ষাদার নিকট অবাধে ঝাটো হতে দেওয়া। তাহলে এসব বড় বড় অতি ঠুনকো প্রেস্টিজ ফাইট আমরা এড়াতে পারব এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতি-নিধির উপযুক্ত মর্ষাদাও রক্ষা করতে পারব। সবার উপর জনতাকে প্রতিষ্ঠা না দিলে অর্থাৎ জনগণের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা না দিলে, গণতন্ত্রের বড়াই করাও ঠিক মানানসই হবে না।

অবশ্য গণতন্ত্র যদি কেবলমাত্র কথার কথা হয়; যদি ওটা চক্ষু-পরি-শীলনের ব্যাপার মাত্র হয়ে থাকে—তবে আর কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্নোৎপাদনে ভয় আছে। সে দুর্দিন দূরেই থাক।

ছাত্রসহলে বিক্ষোভ

বহুকাল কলকাতা শহরে ছাত্র বিক্ষোভের কোনো সংবাদ নেই। অথচ ছাত্র বিক্ষোভহীন কলকাতা এককালে প্রায় অকল্পনীয় ছিল।

সম্প্রতি এম-কম পরীক্ষার্থী ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। শিরোনামের পর আসল খবর পড়ে আশ্চর্য হওয়া গেল; না, অন্য কিছু নয়; সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। প্রতিবাদে তাঁরা পরীক্ষা হলত্যাগী হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র-লার অব এগজামিনেশন শ্রীঅরুণ রায় ক্ষুব্ধ ছাত্রদের স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে ব্যাপারটি সিদ্ধিকটের গোচরীভূত করবেন বলে জানিয়েছেন।

ছাত্রবিক্ষোভ অতঃপর প্রশমিত হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ এক বিবৃতিতে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ছাত্ররা যাতে কোনোরূপ সমর্থন না জানান তার জন্য একটি আবেদন রেখেছেন। তবে সেই সঙ্গে প্রতি বছরই স্নাতকোত্তর পরীক্ষা নিয়ে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তার জন্য গভীর উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। বস্তুতপক্ষে এজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় তরফেরই মর্ষাদাহানিকর ব্যাপার।

পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত প্রশ্নে উত্তর ঠিক পরীক্ষাগৃহে দাবি করাটা এক হিসেবে অযৌক্তিক। পরীক্ষাগৃহের কয়েকটি পরিমিত ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হলে থাকে। মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে

এই পরিমিত সময় যথেষ্ট নয়; তার ওপর যদি ছাত্রদের উপর পাণ্ডিত্যও এই একই সময়ে যাচাই করার ব্যবস্থা থাকে তবে দাবীটা বেশ বেশীই হয়ে পড়ে। ছাত্রাবস্থা এমনই এক সময় যখন সাধারণ ছাত্রের মনে পুরোপুরি আত্ম-বিশ্বাস প্রদীপ্ত থাকে। পরীক্ষা পাশের দুর্ভাবনা তাদের স্বাধীন চিন্তাকে যথার্থ বিকশিত হওয়ার সুযোগ দান করতে পারে না। তাই অসম্মত একটি ব্যাপার সর্বক্ষেত্রেই সমান লক্ষণই যে, পরীক্ষা পাশের পর-মুহূর্তেই অতিক্রান্ত শ্রেণীর পঠনপাঠন বিষয় উত্তীর্ণ ছাত্রের সামনে অনেক সহজ ও সরল হয়ে আসে। অর্থাৎ পরীক্ষার ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট থাকার জন্য তার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন দূর-হ মনে হত, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে সর্বিস্ময়ে দেখে যে, এককালে ভীতিপ্রদ সেইসব প্রশ্নগুলিই পরীক্ষার আগুতার বাইবে এসে জলবৎ তরলম বোধ হচ্ছে। এর কারণ অবশ্যই এই যে পরীক্ষার রুদ্ধস্বাস মুহূর্তে গুলি তার আত্মবিশ্বাসকে অবদমিত করে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কৃতী ছাত্রের জ্ঞানের পরিধিও যেন প্রসারণ লাভ করে। পরীক্ষাভীতি যে জ্ঞানকে সংকুচিত করে রেখেছিল, উত্তীর্ণ হওয়ার পরমুহূর্তেই সেই জ্ঞানকোষক শতদল বিস্তার করে সদ্য উত্তীর্ণ ছাত্রকেই বিস্মিত করে।

বহুক্ষেত্রে ছাত্রমহলে একটি অনু-যোগ থাকেই পূর্ববর্তীদের প্রতি। তারা কোন একটা বিষয়কে সহজ ও সরল বললে ছাত্রমহল সে বক্তব্যকে নেহাৎ দাম্ভিকতা বলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝেন। এবং যে উত্তীর্ণ ছাত্র অতঃপর এককালের সমস্যাকে সহজ-ভাবে ব্যাখ্যা করার মত দৃষ্টিলাভ করেন তিনিও যথার্থ বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে পারেন না যে, আজ তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুনই একথা বলতে পারছেন বলে পরবর্তীরা যে অভিযোগ রেখেছেন, আসলে সেটাই সব থেকে বড় সত্য। কেন না আজ পরীক্ষা-চিন্তা নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি ভাববার স্বাধীনতা তিনি লাভ করেছেন।

এতোগুলি কথা বলার পেছনে অধীনের একটিই বিনীত বক্তব্য এই যে, পরীক্ষার হলে ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তার ওপর খুব বেশি অত্যাচার করা অনুচিত এই কারণে যে, তখনও ছাত্ররা ছাত্রাবস্থার পরীক্ষকনির্ভর জ্ঞানের পরিধি সীমিত করেন নি। আর প্রশ্নকর্তাগণ তাঁরা পরীক্ষার হলেই ছাত্রদের সমগ্র জ্ঞানসমৃদ্ধ মণ্ডিত করার সুযোগ

গ্রহণের জন্য অর্ধেক হয়ে পড়েন—তাঁরা ছাত্রমনের এই মহৎ অসুবিধার কথা বিস্মৃত হন।

পাঠ্যতালিকাভুক্ত প্রশ্নের বাইরেও পরীক্ষার বাঁধা সময়ের মধ্যে যে ছাত্র উত্তর দান করতে সক্ষম তাঁর আত্ম-বিশ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু পরীক্ষাপত্র একটি সাধারণ মাপ-কাঠিতেই রচিত হওয়া উচিত। তার মধ্যে বিকল্প প্রশ্ন হিসেবে অসাধারণ ছাত্রের জন্য দু-একটি প্রশ্ন অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু প্রশ্নপত্র যেন প্রশ্নকর্তার অসাধারণের পরিচয়বাহক মাত্র না হয়।

এ আলোচনা উপর্যুক্ত পরীক্ষা বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হল। বর্তমান আলোচনাকে তাই বর্তমান এম-কম পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত করে না দেখবার জন্যই অনুরোধ করি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখেতে পারেন। বর্তমান লেখক একটি অতি সাধারণ উদাহরণের আশ্রয় গ্রহণ করে ছাত্রদের একটি অতি সাধারণ “কমোন” অসুবিধার কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন।

ভারতীয় বেতার ইতিহাসে নতুন সংযোজনা

কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী শ্রীসত্য-নারায়ণ সিংহ কলকাতা দূরভাষ ভবনে কলকাতা-আসানসোল মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্বোধন করে বলেন যে, মাইক্রোওয়েভ স্থাপনার ফলে ভারতীয় বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হল।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ সর্বাধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। শব্দ তাই নয়, মাইক্রোওয়েভ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে টেলিভিশন চালু করার উপায়ও স্বাভাবিক করা যাবে। আর হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে ভারতও অন্যান্য দেশের মত কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ মাইক্রোওয়েভ লিংক পরিচালন করবে।

এই ব্যবস্থায় বেতারে আসাম, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার মধ্যে দূরভাষী যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে দাঁড়াল এবং বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয়ের পরিমাণও হ্রাস পেল অনেকাংশে।

শ্রীসিংহ মনে করেন, মাইক্রোওয়েভ প্রবর্তনের, ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও অধিকতর সুদৃঢ় হবে।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এই-ভাবে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার কৃতিত্ব যে সমৃদ্ধ ভাবতীয় ইঞ্জিনিয়ার-

দের, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্য মন্ত্রামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

কলকাতা মহানগরীর তথাকথিত ‘দুঃস্বপ্ন নগরী’ বদনামই চালু আছে। মন্ত্রামন্ত্রী কিন্তু এই অনুষ্ঠানে নতুন কথা (যদিও এটাই একমাত্র সত্য কথা) শোনানেন। তিনি বলেছেন, কোনো কিছুর শূন্য সূচনা কলকাতা থেকেই শুরুর হয়।

মাইক্রোওয়েভের সূচনাও কলকাতা মহানগরীর বৃকে। ভবিষ্যতে এই যোগাযোগের সম্প্রসারণ ভারতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুতর সুবিধা-সুযোগ এনে দেবে।

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী

‘চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করুন’ ও পাক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রক আয়োজিত উল্লিখিত বিষয়ের একটি প্রদর্শনীর শূন্য উদ্বোধন করা হল মহানগরী কলকাতায়। শহীদ বেন্দীতে মাল্যোপণ ও শহীদ ভারতের প্রাতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হলে পাক তাম্বির পর্বদস্ত চেহারাটা সাধারণে স্বচক্ষে দেখতে পেলেন। পাকিস্তানী পল্টনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র-শস্ত্র, মর্টার, ট্যাংক প্রভৃতি এই প্রদর্শনীর দর্শনীর বস্তু। এ প্রদর্শনীর সেজন্য একটি ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যও আছে। ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে জওয়ান ভারত আত্মোৎসর্গ করেছেন, প্রদর্শনীতে তাঁদের প্রতিকৃতিও দেখতে পাওয়া যাবে। প্রদর্শনীর প্রবেশপত্রের বিক্রেতৃত্ব অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে সমর্পিত হবে বলে জানা গেছে।

‘বঙ্গদর্শন বিষয়ক’ আলোচনা:

‘প্রবাসী বাঙালীর স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে’ বুদ্ধিদীপ্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা:

‘বঙ্গদর্শন বিষয়ক’ শিরোনামসম্বলিত উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর নিজ দায়িত্বে পত্রাদি প্রকাশার্থ সম্পাদকের নম্র পত্র প্রেরণ করুন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি লেখক সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ করবেন।

সমাজগঠনের চুম্বিকায় সকলের সহ-যোগিতা একান্ত কাম্য।

বাকুড়া :

ভবন্ত প্রার্থনা

এক অভিনব উপায়ে খান-চালের বস্তা-
শিচ্চু চাঁদা আদায়ের নিষ্ঠুর সংবাদ জানিয়ে
শিল্প টি রোড পত্রিকার সংবাদদাতা ঘটনাটির
প্রতি কৃতী জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ
করে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধির পর এ বিষয়ে
প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং
ক্ষমতাব্য নিষ্পত্তিজনক বিধার আমরা সংবাদটি
উদ্ধার করে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত
করবার দায়িত্ব অনুভব করছি।

সংবাদে প্রকাশ :

বাকুড়ার জেলাশাসক শ্রীসুকুমার
সেনগুপ্ত অত্যন্ত কৃতিত্ব সহিত খান সংগ্রহ
করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অভ্যন্তর
সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি জেলায় খানের
দর বাড়তে দেন নাই। কিন্তু তিনি যে দরে
খান কিনেছেন বা চাল কিনেছেন সেইরূপ
দরে কি চাউল বিক্রয় করছেন? শ্রীসেন আমা-
দের জানাবেন কি যে, বাকুড়া কনজার্স
সোসাইটিতে আসানসোল বা এই জিলাপাণ্ডলেব
জন্ম যে চাউলের পারমিট কটেন তার দর
৭০ টাকা কুইন্টাল কিন্তু ১০ টাকা দিয়ে
সেই চাল সরবরাহ করা হয়। অবশ্য ক্যাস-
মেয়ে থাকে ন্যায় দরের। কুইন্টাল পেছ
১৭ টাকা যে বেশি দাম লওয়া হয় সে
অন্যথা অবশ্য সরকারী কর্মচারী বা জেলা-
শাসকের পকেটে যায় না। সেটা ন্যাক নাম
করে দেওয়া হয় যেমন—রবীন্দ্র ভবন
ইত্যাদি। তিনি যদি এ খবর না রাখেন তবে
অনুসন্ধান করে ব্যাপারটি আমাদের
জানাবেন কি? (১৭। ১১। ৬৬)

বীরভূম :

অশুভ আভাস

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবিভাগের
জিরকীর জেনারেল বীরভূম পরিদর্শন করিয়া
গেলেন। তাহার এই আগমনের সময় বাহা
দেখা গেল, তাহা অনেককেই স্তম্ভিত
করিয়াছে। একজন অবাঙালী মিল-
মালিকের সহিত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-
বিভাগের একজন প্রধানতম কর্মচারীর এই
অশুভ বিনিময় এবং দহরম-মহরম নিবন্ধক
কি না তাহাই সাধারণ মানুষের কৌতুহলী
জিজ্ঞাসা।

বীরভূমের প্রাক্তন জেলাসমাহত্যা এবং
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবিভাগের প্রধানতম
কর্ত্তা হিসাবে তাহার উল্লেখ জেলা বীরভূম
পরিদর্শন নিবন্ধক নহে, কিন্তু সেই সপ্তে
জেনের একই প্রণীতে সেই অবাঙালী
ব্যবসায়ীর ভ্রমণ এবং সঙ্গদানের সপ্তে
জেনাদানের যে সুযোগ গ্রহণ করেন তাহাও
অর্থহীন নহে। সেইদিন সাইবিয়া স্টেশনে
জেন হইতে অবতরণ হইতে সূত্র করিয়া তাহার
বীরভূম সমবেদ সময়কাল এই ব্যবসায়ীর

কার্যকলাপ ঘোষণা সকলেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টান্তে
একে অপরকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,
কেহ বা বাংলাদেশের বড়ুকু মানুষের
অদৃষ্টের প্রতি অশুভলী নির্দেশ করিয়া এই
অশুভ আভাসের অর্থ বুঝিতে চাহিয়াছেন।
গ্রাম্য মানব সাধারণত অসাধারণ ব্যাপার
লইবা মাথা ঘামাইতে রাজী নহে—তবে
জাতীয় সংকটে সময় অশুভ আভাতে সমস্যার
জটিলতাই বৃষ্টি পাইবে—ইহা সাধারণ
মানুষের আশঙ্কা এবং এই আশঙ্কা
স্বাভাবিক।

২০শে নভেম্বরের বীরভূম বাতাস
উপবৃত্ত সংবাদটি প্রকাশ করে একটি বিষয়
অন্ততঃ পবিষ্কারভাবে প্রকাশ করলেন যে,
সাধারণের চোখে এখন দুর্নীতি ভাগাভেব
শকুনের দৃষ্টি। উক্ত ঘটনার পেছনে
দুর্নীতির অভিসার নাও থাকতে পারে;
অন্ততঃ তেমন কিছু যে থাকবেই এমন কেমনা
লেশাভাষা নাই। তবে এসব ব্যাপারে কাগজ-
কলম সরিয়ে রাখা হয়—মা লিখ, মা লিখ।
আর তাই সাধারণ নির্বাসিত মানুষের দৃষ্টি
ক্রমেই গোয়েন্দাপ্রার্থনা লাভ করছে। এটা
শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই, আশার কথাও বটে।
এমন নিঃশব্দ "ভিজিল্যান্স" সর্বত্র সম্ভব
হলে দুর্নীতির বেগরোয়াতাব কিছু কমে
বাধ্য হবেই। উক্ত ঘটনা সাধারণের প্রচণ্ড
করে স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক বঙ্গ কল্যাণ
পালন করেছেন। উক্ত ঘটনার পেছনের
ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধানের কর্তব্য এখন
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের।

শ্রীগুরুজীবলাল নন্দ তাঁর স্বশ্রদ্ধে
সম্প্রতি দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু
শ্রীশ্রদ্ধেই একমাত্র যিনি দেশব্যাপী একটি
প্রশংসিত দুর্নীতি-বিরোধী মনোভাবও তৈরি-
করে দিয়েছেন। অদৃশ্য হাতেব চাপে তিনি
কী করতে পারেন নি সেটা স্বস্তর কথা;
কিন্তু সমাজচেতন মানুষকে তিনি যে
অভ্যুত্থানের মধ্যে দুর্নীতি-চেতন করে
তোলায় অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় ও অগ্রণী ভূমিকা
পালন করছেন এজন্য অন্ততঃ তাঁর ব্যক্তিগত
প্রচেষ্টার জন্য ইতিহাস তাঁকে প্রশংসা
করবেই।

আমরা সংগৃহীত সংবাদটির গুরুত্ব
দৃষ্টান্তে উপলব্ধি করার জন্য ক্রমভাসীন
নেতৃবর্গকে অনুরোধ করব।

পরলা নম্বর : দায়িত্বশীল সরকারী
কর্মচারীদের কিছু শাসনতান্ত্রিক সাবধানতা
অবলম্বনের যে নীতি অবশ্যপাল্য, ইদানীং
সে নীতিও যে স্বাধায্য পালিত হচ্ছে না এখ
জন্য শাসকবর্গের নিজস্ব দায়িত্ব উপলব্ধি
করা দরকার।

শ্রীতীর নম্বর : সাধারণের মনে যে
দুর্নীতি-বিরোধী চেতনার স্ফূরণ দেখা
যাচ্ছে, তাতে কালক্রমে যে তা সার্বিক আকার
গ্রহণ করবে সেই ভবিষ্যৎ পরিণতিব কথা
মনে রেখে অবিলম্বে দুর্নীতি-বিরোধী কঠোর

ব্যবস্থাবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করা
প্রয়োজন।

জলপাইগুড়ি :

দুর্নীতি হি কেবলম

“পশ্চিম দিনাজপুর—পূর্ব পাকিস্তান
সংলগ্ন রায়গঞ্জ থানার অশ্রুগত ডাটেলিহাট
চোরাকারবাণীদেব গুপ্তঘাট। প্রকাশ, ভাঙুন
অশ্রু পশ্রুয়েত এবং স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেস-
এর কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শ ও
যোগসাজসে এখনে একটি অতি শক্তিশালী
দুর্নীতিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় জন-
সাধারণ ইহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ষাণ্মত
সন্দেহ পোষণ করে। স্থানীয় পুলিশেরও
ইহাদের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা বহিয়াছে
বলিয়া প্রকাশ। সংবাদে প্রকাশ, বিগত
পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই
দুর্নীতিচক্রটি অত্যন্ত সক্রিয় থাকিয়া প্রচণ্ড
চাল, তেল, লবণ ও মশলা পাকিস্তানে পাচার
করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়াছে।
রায়গঞ্জ, ডালকোলা ও রাসাখোলা প্রভৃতি
স্থানের তেল ও লবণ এই স্থান দিয়া পাচার
হইয়া পাকিস্তানে হাইতেছে। ইহাদের
বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী ও বাস্তবিকবাদী
কার্যকলাপের বহু অভ্যুত্থান থাকা সত্ত্বেও
পুলিশ ইহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা
অবলম্বন করিতেছে না। (২২। ১১। ৬৬)

কিন্তু কেন? পুলিশ এমন অস্বাভাবিক
হয়ে গেছেন কেন? দুর্নীতি চক্রের জন্য
একটি নিবাহি মহিলার গ্রাফ টেকাস করে এক
দুর্নীতি সাবড়ে দেওয়ার মতো কবিত্বকর্ম।
ব্যক্তি ব্যাধি, তাহা জেনে-গুনেও শৃংখলের
গা ঢাকা দেন কেন? এই সমস্ত বহুতর
উদ্বাপিত প্রশ্নই প্রায়ঃ তুলতে হন স্থানীয়
সংবাদ সাপ্তাহিক জনমতের উপনি উদ্ধৃত
সংবাদটি পাঠ করার পর। বলা বহুতর
প্রশ্নোত্তরনের জরগা থাকলেও প্রশ্নে কর্ণ-
পাতের মতো সংবেদনশীল কান একটিও
নাই। অন্ততঃ কানে ধরে না শোনালে দুর্নীতি
সংবাদপত্র কেন, স্বয়ং পুলিশ-ইশার নির্দেশই
কর্ণপাত করে কিনা সন্দেহ।

○ হুজুগে তৎপরতা অবশ্যই তাহা দোষের
থাকে। যেমন নদীমাষ মুখামুখী সন্দেহ
ও তস্য বিমগ্ন ফলপ্রসূতি। কিন্তু সে
সাময়িক আর্থ পরিশীলন মাত্র।

কিন্তু বাদ ব্যক্তি পাবিশীলদেব ব্যবস্থা
কি কখনও হবে। সব যে হবে এমন
বৈজ্ঞানিক কথা বলার দৃঃসাহস নাই। তবে
সাধারণে যে অভ্যুত্থানগর্ভিত হাজির করেন
সে তো মাত্র লক্ষ ঘটনার একটি মাত্র। তা,
না হয়, সেইগুলিই নাচাব হয়ে তাঁরা কিছু
নাড়াচাড়া করুন। ভয় নাই, তাতে শতবরা
হার অতি নগণ্য এবং তাঁরা দ্বারা চোলা-
কাববার ও দুর্নীতি সমলে উপাটিত হবে
এমন আশঙ্কার কোনো কারণই নাই

नमो भगवते वासुदेवाय

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ कुड ॥

ধূম্র ভাঙতে আজও বেশ দৌর
হয়ে গেল বিজনের। জানালা দিয়ে
ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। প্রতি-
দিনের সংসারযাত্রা যেমন শূন্য হয়
তেমনি শূন্য হয়েছে। রস্টা পড়তে
বসেছে। তার গলা শূন্যতে পেল বিজন
ইরা বলছে, “মা তুমি বাসনগার্ল নিয়ে
কেন বসলে। তুমি ওঠো আমিই মেজে
দিচ্ছি।” বিজনের মনে পড়ল বাসন
মাক্সর জন্যে যে ঠিকে কিটি ছিল তাকে
অনেকদিন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
এখন মা আর ইরাকেই সব করতে হয়।
মা অবশ্য মেয়েকে বেশ কিছু করতে
দিতে চান না। কিন্তু গুর হাত থেকে
কাজ কেড়ে নিয়ে করে। লক্ষ্মী মেয়ে
ইরা। কিন্তু বিজন তেমন সুবোধ ছেলে
নয়। তার বাবাই বাজার করেন, রেশন
ধরেন, সংসারের ছোট-বড় সব রকমের
কাজই তিনিই করেন। আগে যত প্রসন্ন-
মনে করতেন এখন আর তেমন করেন
না। এখন যে কোন কিছু করবার সময়
গজগজ করেন। বিজনের যখন চাকরি
ছিল তখন তিনি ছেলের এসব কাজ-
কর্মে অনভ্যাসই হোক আর অনিচ্ছাই
হোক, সহ্য করতেন। কিন্তু এখন
বেকার ছেলের নবাবী তাঁর আর নয়,
না। বিজন সবই বোঝে। কিন্তু বুঝেও
স্বভাব বদলাতে পারে না। বাবার মত
সব রকম কাজকর্মে ভগ্ন হলে ওঠা
তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিজন
যেন আরো বেশ করে কুণ্ডলিমির গহন

টেকে নৈশ্চর্ম্যের আড়ালে আশ্রয়
নেয়। অথচ প্রতিমহদেতে সে অনদ্ভব
করে উচিত হচ্ছে না। তার এই কিছু
না করে থাকা, কাজ থেকে পালিয়ে
পালিয়ে বেড়ানো মোটেই ভালো
দেখাচ্ছে না। বিজ্ঞান যে এ সব চায়
তাও নয়। সে চায় সংসারের আরও
পাঁচজনের একজনের মত হতে। সুস্থ
স্বাভাবিক কর্মমতঃপর জীবনযাপন
করতে। কিন্তু কে যেন তাকে অন্য
পথে ঠেলে নিয়ে যায়। তাকে জীবনের
প্রতি বিমুগ্ধ করে তোলে। এই শক্তি
কি বাইরের পরিবেশের? না কি এ
তারই অন্তরলোকের বাসিন্দা? বিজ্ঞান
মাঝে মাঝে ভাবে। ভেবে ভেবে নিজের
গোপন-প্রকৃতির উদ্ঘাটন করতে চায়।
কিন্তু পেরে ওঠে না।

‘দাদা আজ কি মতলব তোমার
বল দেখি? উঠবে না?’

ইরা এসেছে তাকে ডেকে তুলতে।
বিজ্ঞান বোনের দিকে তাকাল।
ভোরের ফোটা ফন্সলের মতই তার নদ্য।
দীনতা, দাঈদ্রা, অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে
ক্লিষ্ট করতে পারে নি।

বিজ্ঞান বলল, 'না উঠব না।
ভেবেছি আজ সারাদিন শুদ্রসেই
কাটা'।'

ইরা হেসে বলল, 'চমৎকার পরি-
কল্পনা, খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছ নেই।
শুধু শুয়ে থাকা। সদৃশ্য মনুষ্য
ওইভাবে বড়ি কখনো শুয়ে থাকতে
পারে?'

বিজ্ঞান বলল, 'সেই তো হয়েছে

মহা মদসকিল। সুস্থ গান্ধ শূদ্রে
 থাকতে পারে না। ইচ্ছা থাকলেও পারে
 না। এই জন্যই আমি মাঝে মাঝে
 অনুস্থতার কামনা করি। বেশ শান্ত
 কোন অসুখ-বিসদৃখে যদি শয্যাশায়ী
 হলে থাকতাম। তাহলে কেউ কিছু
 ভাবত না। আর তুইও ওঠো ওঠো
 বলে ডেকে ডেকে হয়রান হলে পড়তিস
 না। বরণ বলতিস শূদ্রে থাকো দাদা।
 তোমার আর উঠে দরকার নেই। কী
 মজাই না হত।’

ইরা বলল, 'শুধু মজা হত বন্ধি? কিন্তু মজার আর একটা দিক ভেবে দেখ। শূন্যে শূন্যে তেতো ওষুধ গিলতে হত। আর পথের মধ্যে সাগর বালি। পারতে খেতে? নাও ওঠো আর অসুখ-বিসুখকে সোহাগ করে ডেকে আনতে হবে না।'

ইরা তার হাত ধরে একটা টান দিল।
বিজ্ঞান এবার উঠে পড়ল। বোনের
এই উল্লাস-উৎফুল্লতা কিছুক্ষণের জন্য
তার নিঃসীম নৈরাশ্য আর অবসাদকে
যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সুদূরমা সকাল থেকেই রান্না-বাঁসার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইরাই দাদাকে চা কপ্পে দিল। মৃদুি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করল বিজন। তারপরে উঠে দাঁড়াল।

বোনের দিকে চেয়ে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে?'

ইরা বলল, 'তোমার কেমন মনে হচ্ছে তাই বল?'

বিজ্ঞান বলল, 'বাঃ রে আমি কি আমার নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছি?'

ইয়া বলল, 'তাহলে সত্যি কথা বলি, শোন। যখন শুরুর দিকে তখন শরশায়ী কাপড়ের বসে মনে হচ্ছিল। এখনতো উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন আর তা মনে হচ্ছে না।'

বিজ্ঞান হাসল, 'এখন কি বীরশ্রেষ্ঠ পদবী পাবেন বলে মনে হচ্ছে?'

ইয়া গিয়ে পড়তে বসল। আর বিজ্ঞান বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ভাবল মন বড়ো বিচিৎর বস্তু। এক মুহূর্তে অবসাদে নুয়ে পড়ে পরমসুহৃৎ বিচিৎর স্বাদে ভরে ওঠে।

রাস্তায় বেরিয়ে অনেক দিনের পর মনের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ অনুভব করল বিজ্ঞান। এই উৎসাহের আপাতত কোন কারণ নেই। কোন কাজ-কর্মের সম্ভাবনা পায় নি। বরং আগের অফিসের কাজটির নিশ্চিত অবসানের খবর এসেছে। বাইরে থেকে উৎসাহ-উল্লাস বোধ করবার মত কিছুই ঘটে নি। তবু বাইরে এসে নীল উজ্জ্বল আকাশকে যেন অনেক দিন পরে দেখতে পেল বিজ্ঞান। চোখে পড়ল চারদিকের বিচিৎর জীবনযাত্রা।

শহরতলীর এ অঞ্চলটার সম্পন্ন লোকের বাস খুব কম। উষ্মাসুহৃদের বড় একটা কলোনী আছে। তাদের অধিকাংশের দিন যাপন কৃষ্ণতা রোজ চোখে পড়ে না। কিংবা দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই অভ্যাসের পদ পদ টাঙানো আছে যেন সামনে। সব সেই পদার আড়ালে পড়ে যায়। বিজ্ঞানের যখন চাকরি ছিল তখন আরো সচ্ছল জীবনের কথা সে ভাবত। তখন নজর উঠে দিকে তোলা ছিল। নিচুতলার জীবনের দিকে চোখ পড়তে চাইত না। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে এদের সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। শূন্য চৈতন্য আর কিছু না, শূন্য সহানুভূতি। কিন্তু যে অনুভূতি মানুষকে কর্মে উদ্ভূত করে না তার কি কোন মূল্য আছে। বিজ্ঞান মাঝে মাঝে ভাবে।

কর্পোরেশনের জলের ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। কলোনীর ভিতর থেকে একদল বউ আর মেয়ে বালতি আর কলসী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

বিজ্ঞান দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। একটা কলার দোকান। মালিক আর ক্রেতায় কথা কাটাকাটি হচ্ছে। পাশের ছোট্ট চায়ের দোকানটার পাড়ার কয়েকটি ছেলে এসে জুটেছে। এখানে বসে তারা রাজা-উজির মারে। রাজ-নৈতিক বিভক্ত আসর গরম করে

ডোলে। বিজ্ঞান-ওদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারে না। ওদের হয়েও যেন ওদের কেউ নয়।

মোড় থেকে স্বাতীনের ফ্লাট বাড়িটা চোখে পড়তে বিজ্ঞান একটু থেমে দাঁড়াল। ভাবল আজও একবার যাবে না কি খোঁজ নিতে? কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনটা বিমুগ্ধ হয়ে উঠল। না, কাজ নেই গিয়ে। কালকের উদাসীনতার কথা সে কি আজই ভুলে যেতে পারে? অবশ্য স্বাতীর সৌজন্য ভদ্রতার দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু অস্তরের উদ্ভাপ? তার বেঁ বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না তা কি বিজ্ঞান অনুভব করতে পারে নি? তবে কেন সেখানে যাবে বিজ্ঞান? থাকে পূর্ণতার মধ্যে পেতে হয়—তার কাছে শূন্য হাতে ভিত্তারীর মত দাঁড়িয়ে লাভ কি। ভালোবাসা তো ভিত্তারীর বস্তু নয়। বাইরেরই হোক অস্তরেরই হোক ঐশ্বর্য দিয়ে তাকে আকর্ষণ করতে হয়। সেই সম্পদ কোথায় বিজ্ঞানের? যদি কোন দিন ফের সেই দিন আসে গৌরবেদ সঙ্গো গর্বের সঙ্গো মাথা উচু করে যদি কোনদিন ফের দাঁড়াতে পারে তবেই ওখানে যাবে বিজ্ঞান। দীন কাঙালের বেশে আর নয়।

স্বাতীর প্রতি বিমুগ্ধতাই বোধ হয় বিজ্ঞানকে কণার কথা মনে করিয়ে দিল। তার জীবনের সঙ্গো তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গো ফের বেন নিজের এক মিল খুঁজে পেল বিজ্ঞান। আশ্চর্য, আর সঙ্গো সঙ্গো কণার সঙ্গো আর একবার দেখা করবার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু কী হবে দেখা করে? কালই সম্মুখ যার সঙ্গো আলোপ হয়েছে—আজই কি সকালে বিনা কারণে তার বাড়িতে যাওয়া যায়? সে কী ভাবে? নিজের এই অসঙ্গত অভীক্ষায় বিজ্ঞান নিজেই লজ্জা বোধ করল।

বরং শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর সঙ্গো বিজ্ঞান একবার দেখা করতে পারে। যে লোকটি তাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্যের মূলে তাঁর মুখোমুখি একবার দাঁড়ানো উচিত। এতদিন কিসের যেন একটা বাঁতস্পহায় সে পালিয়ে পালিয়ে বোড়িয়েছে, অশুভ এক গ্লানিবোধ থেকে তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে গেছে বিজ্ঞান। এখন মনে হল সে ভুল করেছে পরম কাপড়ের কাজ করেছে। শ্রীবিলাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার তার কৈফিয়ৎ দাবি করা উচিত ছিল।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান কিছুক্ষণ কি যেন ইতস্তত করল।

তারপর সমস্ত বিধা-বন্দন অতিক্রম করে বিতল বাসে উঠে পড়ল।

এখনো অফিসের ভিড় শুরু হয় নি। বাস অনেকটা ফাঁকা। দোতলায় উঠে বিজ্ঞান একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে বসল। শ্রীবিলাসের সঙ্গো দেখা হলে কী সে বলবে, কোন কথায় কি জবাব দেবে মনে মনে উত্তর-প্রত্যুত্তর রচনা করতে করতে চলল।

শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। মন-মেজাজ ভালো থাকলে এই দীর্ঘ যাত্রা ভালেই লাগে বিজ্ঞানের। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে সারা শহরের জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। কিন্তু দেখবার মত চোখ কি সব সময় থাকে না কি ভাববার মত মন?

এক শহরতলী থেকে আর এক শহরতলী। বালিগঞ্জের মোড় থেকে বাস বদলাতে হল বিজ্ঞানকে। তার পর অশোক এভেনিউর মোড়ে এসে নেমে পড়ল।

ভারি সুন্দর ধবধবে সাদা একটি দোতলা বাড়ির অধিপতি হয়েছেন শ্রীবিলাস। সামনে একটি ছোট লন আছে। ডান দিকে একটি গাধবী ফুলের লতা বাড়িটির ধাব ঘেঁষে উঠেছে। অজস্র ফুল ফুটেছে গাছটার।

এই নয়ন-মনোহর শূন্য-সুন্দর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কে বলবে যে এর পিছনে কোন কলঙ্কমলিন ইতিহাস আছে? কেউ কি তা বিশ্বাস করবে? শ্রীবিলাস চক্রবর্তী বোধহয় নিজেও এখন তা বিশ্বাস করেন না।

কথাটা ভেবে বিজ্ঞান নিজের মনেই একটু হাসল। তার পর এগিয়ে এসে কলিং বেল টিপল। ঘন্টার ধনিট-ধু ভারি মধুর। কিন্তু গৃহকর্তার আপ্যায়নে কি এত মাধুর্য থাকবে?

কিন্তু বিজ্ঞান প্রস্তুত হয়েই এসেছে। দোর এবার খুলে যাবে। পরমুহূর্ত-টির জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক

শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়ের

অসমজ গ্রন্থাবলী

৩খানি বড় উপন্যাস ও ১খানি

নির্বাচিত গল্প মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

উদ্ভাস

মানবকৈ মোকদ্দিম



বসন্তকাল এলো, কাজেই আমিও জুটে গেলাম ভিড়-জমানো সেই সব জামগায়—যেমন কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের সামনে পিষাচার, অথবা গার্মেন্টস পিষাড়া কলোনার দ্বাৰা দোকান ঘর সাজানো রাস্তার মোড়ে। আমার পূর্বনে ছিলো একটি হাটকা বাদামী সুট। কোটের পকেটের নিচে ইচ্ছা করবেই—ইংরাজী সাতের আকারে একটুখানি ছিঁড়ে রেখেছিলাম। ছেঁড়া অংশটুকু একটি ছোট দরজার মত বার বার নড়াচড়া করত। সার্জের গলার বোতাম কখনো লাগাই নি, টাই ছিলো না। আর ভদ্রপরি পাবে একজোড়া ক্যান-ডাসের জুতোর বেটপ আকৃতি। আমার পেশা অনুযায়ী চেহারাটিও স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছিলো।

সুযোগের অপেক্ষায় আমি ৩৭ পেতে বসে থাকতাম, আর ঠিক মানুষটিকে পেলে কাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দেরি হতো না। আমার মূখের বুলি ছিল—কি আশ্চর্য তুমি? মনে-পড়ছে না? আমরা একই সংগে যুদ্ধে মেহলাম। মনে করতে পারছ? রেগানোনে

অফিসাবদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে ছিলাম—মনে পড়েছে?

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য ছিলো যে লোকটি কম্পনকালেও আমাকে দেখে নি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা অথবা আমাকে কখনও সে চিনত এমন একটু সন্দেহ তার মনে জাগিয়ে তোলা। যদি এমন বলতাম—“সেই কাসের কথা তোমার মনে আছে? অথবা অমুক পরিবারকে কি জুলে গেছে? তাহলে তার পক্ষে অতি সহজে বলা সম্ভব হতো—না, আমাদের কখনো পরিচয় হয় নি। আমার কিছুই মনে নেই।”

কিন্তু এরা সকলেই কোন না কোনদিন সৈনিক ছিল, আর জানা কথাই এতকাল পরে হাজার মানুষের মধ্যে একজনকে জুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, দশ জনের মধ্যে ন’জনই আমার দিকে তাকায়। আর তাবপর আমিও সুবিধা অদায় করে নিতে ছাড়ি না।”

শুকি সুখেই না কেটেছে সেসব দিনগুলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তারপর থেকেই আমার সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। দিন-গুলো এখন কিভাবে চলে, তা যদি তুমি জানতে। দেখ না কি অবস্থায় আছি—চাকরী নেই, কোন কাজ নেই।”

এইটুকু বলতেই হয়, নিজের স্মরণশক্তির অভাবে লিপ্সিত হবে, অথবা আমার প্রতি করুণার কিংবা আবণ্ড সহজতর কারণে নিজের তাক্সা আছে বলে কষ্ট করে মনে আনার প্রয়াস ছেড়ে পকেটে হাত পুরে তিনশ’ অথবা পাঁচশ’ লীরা আমাকে দিবে দেবে। বলা বাহুল্য এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে খুবই সেইটুকুই—। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানুষের মনে দয়া আছে। একশ’ জনের মধ্যে একজনও আমাকে বলে নি—“বেরিবে যাও, আমি তোমাকে চিনি না, কখনো দেখি নি পর্যন্ত।”

বা বলছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে কখনও কেউ আমার গল্পটা বাঁচিয়ে দেখতে চায় নি। আসল কথাটা হোল আমি কোনদিন অফিসারের মেসে ছিলাম না। বিষবার সন্তান বলেই যুদ্ধেই আমাব যাওয়া হয় নি। ইচ্ছে করেই আমি ব্রেনানোর নাম উল্লেখ করছি। অনেক দূরের শহর বলে এখানকার খুব কম লোকেই সেখানে গেছে। অতএব কারো পক্ষে আমাকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হোত না।

এই কারণে চালু করে এবং আরও নানা উপায়ে আমি কোনমতে দিন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। চালিয়ে যাওয়া অর্থে আমার খাওয়া আর সিঁড়ির নিচে একটা খৌদলে খানকার খবচাটা উঠিয়ে নিতাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলব। ৭ একদিন দুপুরের দিকে নিম্নমত গ্যাম্বোয়েতে বেরাফেরা করছি, হঠাৎ চোখ পড়লো একটি মানুষ প্রতিটি দোকানের শো-কেসে জিনিসপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। মনস্তির করে ফেললাম পিছনে ধাওয়া করতে হবে, কারণ একমাত্র এই লোকটিরই বোধহয় ব্যস্ত ভিড়ের রাস্তায় কোন তাক্সা ছিল না। যেমন ভাবতেমনি কাজ। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে ধামিয়ে আমার সেই অর্ধহীন বুলি কপাচতে সুরু করলাম—“আশ্চর্য—তুমি— অফিসারের মেস—রসানোন।” কথা বলতে খুব করার পর ওকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখে ভুলটা ততক্ষণে ধরে ফেলছি, কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই। লোকটার বয়স তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন সংখ্যা হতে

পারে। মৃৎখটা অনেকটা ছুঁচোর মত—সরু, লম্বাটে। নাক অব গালের পাশে উঁচু হাড় মূটো ছাড়া অব কিছু চোখে পড়ে না। কৃৎসিত হলদে চামড়া, চন্দ্র কপালের নিচে কোঁচকানো চোখ দুটো। বেগুনী ঠোঁট মুখের অনেকখানি জুড়ে ছড়ানো। লোকটাব কান দুটো পাখনাব মত খাড়া, কদম ছাঁট দেওয়া মাথাটা দেখে রোঁষা-না-ওঠা বাচ্চা মূরগীর কথা মনে করিয়ে দেয়। রোগা, অসম্ভব বোগা—কিন্তু সে একটা বেটপ আকাবের প্রকাণ্ড দো-ফেবতা ওভার কোট গায়ে দিয়েছিল, যাব কাঁধের ফুড়ে শক্ত করে কাপড়ের পরত ভাঁজ করা। কোর্টটি শ'রো-ওঠা কবলের তৈরি, তাতে আবার বড় বড় সবুজ চেক।

কখনও কি গিবগিটিকে নিঃশব্দে পোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জিভ বাড়িয়ে উদবাস কবতে দেখেছে? ঠিক সেই রকম ক্ষিপ্ত বেগে সে আমার কথা শুন ফিরে ছাকলো। আমাকে গল্পটা পুরো শেষ কবতে দিয়ে খুব আমদে চটে বলে উঠল—“নিশ্চয়—তোমাকে মনে পড়েছে। কেমন আছ? কেমন আছ গো তুমি? বাঃ, খুব ভালোই হোল।”

উপস্থিত বৃষ্টি ঝাঝ অবশ্যই একটি মহৎ গুণ। আমার যদি একটুও উপস্থিত বৃষ্টি থাকতো তাহলে ঠিক সেই মহত্তে কোন না কোন অজহাত দেখিয়ে সবে পড়তাম। এ ছাড়া সে মহত্তে অব কিছুই করণীয় ছিল না। এতকাল অনেকে চমকে উঠতে দেখাই আমার অভ্যাস, কাজেই নিজেকে যে এভাবে চমকে উঠতে হবে, সে কথা কোনদিন ভাবতে পারি নি। বোকাব মত মিনমিনে গলাব বলে ফেললাম—“তা এক রকম মন্দ নয়—” তার পরে আগেকাব অভ্যাসমতো জুড়ে দিলাম—“যদি ভাই জানতে কি অবস্থার মধ্যে দিন-গুলো কাটিয়েছি।”

কমবয়সী মোরগের মত চটপটে আর আমদে ধবনে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো—“তাহলে সেসব কথা শোনা যাক। সত্যিই সব গল্পটা শোনার জন্যে আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু আগে একটা পান-শালা চল। সেখানে আমবা দেশে ফেরার শূভলক্ষণ বেশ ভালোভাবেই উদ্ঘাপন কবতে পারব।”

আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সে বাব বারই বলতে লাগল—

“যোগ্যবোগটা খুবই সৌভাগ্যজনক। তোমাকে দেখে কি বে ভালো লাগছে।” নীরস, মৃত হিস্‌হিস্‌ শব্দে ও কথা বলছিল। বাকশক্তি থাকলে সাপেও বোধহয় ঠিক এই ভাবেই কথা বলত। আমি এবারে ওকে খুব ভালো কবে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। ভরা বসন্তে পায়ে চাপানো শীতকালের ওভারকোটটির বর্ণনা আগেই দিয়েছি। কোর্টের নিচে ইস্ত্রি-করা বাদামী ট্রাউজারের অনেক এখানে-ওখানে ভালির চিহ্ন। কালো জুতো আয়নার মত পালিশ হলেও পুরানো হয়ে গিয়েছে। শূক-

তলা খুব ভাবি, কিন্তু উপরের চামড়া ঘষা খেতে খেতে সুতো-ওঠা মখমলের মত পাতলা। তারপরে চোখে যা পড়ল, তা দেখে আমার বাকি উৎসাহ সবটুকু দপ্ করে নিভে গেল। চলতে গিয়ে ওর সবুজ চেক টানা ওভার কোর্ট একটু খুলে যেতেই স্পষ্ট দেখতে গেলাম কোর্টের তলার কামিজ নেই। একটা নকল কাপড়ের টুকরো দুটো ফিতে দিয়ে গায়ে সঙ্গে বেঁধে বাধা হয়েছে। ঐ কাপড়ের টুকরোর দু'পাশে পোকাব আঠাব মত চটচটে হলুদ রঙের খালি গা এককলক দেখা যাচ্ছে। আসলে লোকটি আমার মতই নিঃশব্দ, আমার চেয়েও আরও শোচনীয় ওর অবস্থা। তবে তফাৎ এই, যে আমি সর্বদা মন ভালোনা হাঙ্গিরাগিতে ভবা আর আমার মুখের ভাবে কোমলতা আছে। এই লোকটিকে সে জারগার পুরোপুরি ভরস্কর বলা যাবে।

পানশালাব ঢুকে সে সোজা মদ পরিবেশন করার জারগার গিয়ে দুটি ভারমুখ অর্ডার দিয়ে তারপর এক নিশ্বাসে বলে চলল—“ব্রেসানোনের সেই অফিসারদের মেন্স—আমর পবিস্কার সব কথা মনে পড়েছে। কি সুন্দর শহর সেই ব্রেসানোন—কি সুন্দর শহরের মধ্যে এঁকে বেকে চলা সেই নদীটা অব রাস্তার দু'ধারে দোকানঘরের সারি-গুলোই বা কি চমৎকার। তাছাড়া আনও একটি অপূর্ব শহর বোলজানো শুখান থেকে মাত্র একটুখানি তফাতে, তাই না? তোমার কি ব্রেসানোনের সেই বিরাটো হোটেলটি মনে আছে, যেখানে মস্তবড় একটা বেস্ট্রান্ট ছিল। অফিসারবা হোটেলটার সর্বদা ভিড় জমাতো আর মানুষজন পছন্দ কবে এমন বুঝতী মেয়েদের দলও জুটত সঙ্গে সঙ্গে। চাবনিকে লতানো আঙুরের ক্ষেত বোকাই পাহাড়ে ঘেঁষা সেই ব্রেসানোন—আব তার বিখ্যাত আশুদের বস—। কি যেন বলা হোত সেই বসকে—? ও, হ্যাঁ—মনে পড়েছে তেরনানো।”

কথাব মাঝখানে এবারে আমাদের “ভার-মুখ” পরিবেশিত হোল। লোকটি একটি প্লাস উঁচু করে তুলে বলল—“আমাদের দেশে ফিরে আসার শূভলক্ষ উপলক্ষ্যে—।” আমিও তখন আমার প্লাসে চুমুক দিতে বাধা হলাম, যদিও দেশে ফিরে আসাব শূভলক্ষ বলতে কি বোকাব তা আমার একেবারেই বোধগম্য হয় নি।

গ্লাসটা নিজশেষ হয়ে যাওয়া মাত্র এক মহত্তে না ঝেমে দবজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সোকাটি বলল—

“দেখ, লাগু খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এস ভাই, আমরা আজ একসঙ্গে খাই। প্রত্যেক দিন তো আর তোমার মত বন্দুর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য হয় না।”

“কিন্তু—কিন্তু আমি—” ওর পিছ ধরে সরে পড়ার চেষ্টা করলাম। পানশালাব পরিবেশকের চোখ আমাদের দিকেই ছিল।

“এই যে স্যাব—দুটো ডাবমুখের দাম—।”

লোকটিকে ডেকে দাম চুকিয়ে দেবার কথা বলতে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যেই সে দরজার ওধারে চলে গেছে। অগত্যা পকেট থেকে পরস্য বাব কবে দাম মিটিবে বাইবে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ও যেন শূন্য ফুড়ে বেরিয়ে এসে আমার হাতটা আবার আঁকড়ে ধরে বলল—

“চলে এসো—চলে এসো। ওখানে সত্যিই ভালো একটি বেস্ট্রান্ট রয়েছে।”

ব্রেস্ট্রান্টে ঢুকে যখন আমি একটা আঙ্কলের বোবের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে ওর হাত থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করছি—“আমাব একেবারেই খিদে নেই, আব তাছাড়া একজনকে সঙ্গে একন দেখা কবাব কথা।” সে ততক্ষণে চেরের গা এলিয়ে বসে বেশ জ্বরদস্তিবে সরু একটি পেট-ভরানো লাগেব অর্ডার দিয়ে ফেলছে, রোস্ট করা স্কেডার মাংস আর মরদার নুডল্‌স্‌ স্বে তালিকার প্রধান জারগা জুড়ে আছে। তারপর আমার দিকে ফিরে সে আবার বলতে শুরু কবল—

“অফিসার মেসের সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে। ক্যাপ্টেন মস্‌চিভো—তার কথা ভোল নি আশা করি। তার সেই চিরকেলে ম্ভাব—যে কোন পার্টিতে, যে কোন মেয়ে দেখলে, তা সে সুন্দরী কিংবা কৃৎসিত হোক না কেন, নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়ে প্রেম করা। তিনি এই প্রেম করার ধনকে বলতেন—ধনুক তুলে লঙ্কের দিকে তীর ছোঁড়া।—ক্যাপ্টেন মস্‌চিভো একটি আদর্শ প্রেমিক ছিলেন। তুমিও ভাই কিন্তু এই ভালোবাসার খেলাকে ঠিক হান্ধাভাবে নিতে না—।”

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকটি যে ইতালীর এত শহর থাকতে শুরু ঐ ব্রেসানোন অব তার হোটেল ব্রেস্ট্রান্ট বান্ধা, ঘাট, নদী, তাব মেয়ে আর মদের তালিকা, মুখস্থ করে রেখেছিল, তা নয়। ক্যাপ্টেন মস্‌চিভোর নামও তার দিবা মনে আছে, আর একথাও সে ভোলে নি যে আমি সেকালে একজন চটুল প্রেমিক ছিলাম। ক্রমশ আমাব মনে একটি অনুভূতি জন্ম নিতে শুরু করেছিল, বাকে বলা চলে শ্রদ্ধা। অনুভূত শক্ত কাঠামো লোকটির। ও যে এত বড় বড় ওস্তাদ সে কথা আমি কল্পনা পর্বন্ত করতে পারি নি।

আমাদের সামনে নুডল্‌স্‌ পরিবেশন করা হোল। লোকটি প্রথমে কাঁচা জড়িয়ে তুলে এক মুখ নুডল্‌স্‌ গিলে ফেলল। তারপর আবার তাব আমদে, বিবামহীন ভন্ডারিতে ভবা কথার কচকাচি শুরু, ঠিক যেন মুখের মধ্যে একটা জুড়ে মেসিন পুরে রেখেছে সে।

“ব্রেসানোন—। কি সুখেই না সেসব দিন কেটেছিলো। কিন্তু তুমি ভাই সেই নেলা নামে মেয়েটির প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলে। যদি কিছু মনে না করো তো স্থিতি, একেবারে সত্যিকারের কঠিন হৃদয়

জানবের মত।—সত্যিই খুব দুর্বিহার কর-
ছিলে—সেদিন।”

মুখের মধ্যে একরাশ নুড়ল, কাজেই
জড়ানো গলার বললাম—“নেলা? সেটি আমার
কে?”

হো হো করে হেসে উঠল লোকটি—।

“না, বন্দু—বিনয়ী হতে চেষ্টাও কোব না।
আমাকে ওভাবে বোকা বানাতে পারবে না।
দ্বিবি বা হোক খরি মাছ না ছুই পানি কবে
পাল কাটিবে পাশিয়েছিলে। কিন্তু স্নেহেটা
সত্যিই স্বপ্নের মত সুন্দর ছিলো—ফুটফুটে
কসী, নীল চোখ আর ফিগারটাও মারাত্মক।
তুমি মসৃণতার ভাবার ভীতি লঙ্ঘন দিকে
ছুড়ে বেচারীই হৃদয় বিদীর্ণ করে তাকে
একবারে বিপদে ফেলে দিয়ে কেটে পড়লে।
সম্মানো পর্বন্ত তোমার কাজটাকে অতি
জঘন্য বলেছিলো।

“মদুগনো আবার কে? আর দেখ, একটু
সাবধানে কথাবার্তা বল—” ঝগড়া লাগিয়ে
সেবার আশায় আমি ওর কথার স্রোতে বাধা
দিলাম। কিন্তু লোকটি কদে পা দেওয়ার
প্রায় নয়—।

“তুমি ভাই সত্যিই জঘন্য,” এই কথা
কলে প্রাস কাগার কাগার ভীতি করে নিয়ে
এক চুমুকে সাবড় করে—রোস্ট ভেড়াটির
উপর আক্রমণ চালালো। উসাহী ওয়েটার এই
ভিসিটিও একেবারে ওর নাগালের মধ্যে নামিয়ে
প্রদর্শন করল।

“তোমার হাতে তখন অবশ্য আরও একটি

রোমায় উপস্থানের ষাটুকর

•দানেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—এখানি পুস্তক ডিউকটিভ
উপস্থাপন মূল্য ৩।।০ টাকা

২য় ভাগে—এখানি রহস্য উপস্থাপন
মূল্য ৩।।০

জাতীয়-কাঁচ বয়লাগ বন্দোপাধ্যায়ের

বঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী

পান্ননী, অরুণেশ্বরী, কর্ণদেবী, কুমার-
শম্ভব, নীতিকুমারজাল, কাকী-কাবেরী,
কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২০০।

স্রামাকান্ত তর্কপকান সম্পাদিত

নাড়াজান-প্রদীপকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও

পরীক্ষা নিরূপণ)

মূল্য এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

মেয়ে ছিল—যার নাম পিনা। বেশ সুন্দরী,
রঙা যদিও বাগামী। ভগবান জানেন আরও
কত মেয়েকে নিয়ে সেদিন ছিন্‌মিনি
খেলোছিলো। কিন্তু নেলাকে ওভাবে অপমান
করা তোমার সত্যিই উচিত হয় নি। বেচারী
এত অসুখী হয়ে পড়েছিলো যে আত্মহত্যার
কথা ভেবে তারপরেই মৃত্যুর ওদুশগলো
থেকে নেব। পরে অবশ্য সেও উঠে নেলা সেই
লোকটার সংগেই আবার জুটে ছিল—কি বেন
তার নামটা?—ও হ্যাঁ—লেম্বটেনাট তেঁসিতোর।”

“তেঁসিতোর? কোনদিন নামও শুনিনি এই
লোকটিব।”

“হ্যাঁ—তেঁসিতোর। সত্যিই কি অসুখ
মানুষ ছিলো এই তেঁসিতোর। তোমরা দুজনে
নেলাকে উপলব্ধ করে প্রায় হাতহাতী শব্দ
করেছিলে। একদিন সম্মানবেলা নদীর ধারে
কুশাশা জমে বিবাকর করে বৃষ্টি পড়েছিলো।
আমি—মাঝখানে পড়ে তোমাদের ধামাই।
হ্যাঁ—সেদিন একদিকে নেলা অন্যদিকে আমি
প্রাণপণে তোমাকে টানটান করছিলাম।—আব
তারপরে মজা কি জানো—শেষকালে নেলা
তোমার সংগেই গেল। হ্যাঁ—বদমাশ—দোষটা
সম্পূর্ণ তোমারই। নেলাকে অন্য পুরুষের
সঙ্গে মিশতে দেখে তুমি হিংসার জ্বলে
উঠেছিলে। তা সত্ত্বেও তেঁসিতোরের হাত থেকে
ওকে ছিনিয়ে আনতে তোমার বিশেষ বেগ
পেতে হয় নি। আসলে একটি একের নম্বন
ফাট ছিলো। তুমি চলে যাওয়ার পর মেজব
পেতার-নস্ট্রো কি বলেছিলেন জান? মেজব
বলেছিলেন—ও গেছে বাঁচা গেছে। না হলে
এখানকার সব মেয়েদের বাগিয়ে নিতো।”

বোস্ট ভেড়াটি খতম করে আমার পিঠে
চাপড় মেরে লোকটি আবার হাসির তোড়ে
ভেসে গেল। “তুমি মেয়েদের নিয়ে কি
করতে সেটি জানতে বড়ই ইচ্ছা হয়।”

আমার ভেড়া বোস্টও হাঁতমধ্যে খতম
হরে গেছে। পেটে কিছু পড়াতে আমি
সাহস সপ্তয় করে সত্যি কথাটা বলে বলাই
ঠিক মনে করলাম। একটু সরে আমার ঘাড়
কুলিবে বাধা হাতটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সোজা
ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—

“এবারে এই গজাখরী গল্প থামাও।
সব ভালোরই একটা শেষ আছে। এটা ঠিক
যে আমি কোন দিন ত্রেসানোনে বাই নি।”

“তুমি কোনদিন ত্রেসানোনে যাও নি?”

“না—। আব আমি মসৃণচোতা, মদুগনো,
তেঁসিতোর অথবা পেতার-নস্ট্রো বলে কোন
লোককে কোনদিন দেখি নি—।”

“তাব মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?”

“একবারে নির্জলা সত্যি কথা বলছি।
যদিও মেয়েদের আমার ভালোই লাগে, কিন্তু
আমি কোনদিন সে অর্থে প্রেমিক ছিলাম না।
নেলা অথবা পিনা বলে আমার চেনা কেউ
কখনো ছিল না। তাব উপবে আমি যুগ্মে
যোগ দিতেই পারি নি। বিধবা মায়ের ছেলে
কলে আমাকে রেহাই দিবেছিল ওরা—।”

ঠিক সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ দুটো তুলে
সে আমার দিকে তাকালো। আবার আমার
মনে হোল লোকটি অসম্ভব ওস্তাদ। দেখা
যাক, এবারে ও কি গল্প ফেঁদে বসে। বেড়ালের
মত উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়লেও নিজের
পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে এ
বিশ্বাস আমার ছিল। আর ঠিক তাই সে
করল। চিন্তা করতে এক মূহুর্তের বেশি
লাগল না।

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন, অনুযোগভরা গলায়
সে চিৎকার করে উঠল—

“তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী—।”

আমি একটু ভড়কে গেলাম।

“না, না” তোতলার মত জড়িয়ে গেলে
আমার কথা—“আমি ভুল করেছিলাম। আমার
মনে হোল—”

“ভুল কবেছ, তার মানে? প্রথম কথাই
বললে যে, তুমি ত্রেসানোনে গিয়েছ। আর
এখন দেখা যাচ্ছে তুমি কোনদিনই সেখানে
যাও নি—আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে,
তুমি একটি ভণ্ড, ভবঘুরে জোচ্চোব—।”

“ওহে, একটু যত্নশূন্যে কথাবার্তা
বল—।”

“তুমি একটি জোচ্চোর এবং সেই কারণেই
আমাকে ঠকানোর মতলব এঁটেছিলে।
বেরিয়ে যাও—গাট স্রাউট।”

“কিন্তু আমি মানে—”

“অথেষ্ট হয়েছ। ভাবতে কেমন লাগছে
যে একজন জোচ্চর, শয়তান ভবঘুরের সঙ্গে
এতক্ষণ মেলামেশা করেছি—।” গালাগালি
দিতে দিতে সে লাফিয়ে উঠে তার নকল
কামিজের উপবে ওভার কোটেব বোতাম
আটকে নিয়ে শেষকালে বলে উঠল—“আমার
পিছ নিতে চেষ্টা কোর না, তাহলে পদাঙ্ক
ডাকব।”

কথাটা বলেই প্রায় একটি দ্রুতগতি
হাবিদের মত সে দরজার বাইবে গলে অদৃশ্য
হয়ে গেলো।

সত্যি বলতে কি অনেকক্ষণ আগেই
বুকেছি কোন ফন্দি-ফিকির করে খাবার
থাক আমার পকেট থেকেই ও বার করবে
কিন্তু এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি ওর
উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তা একবারও মনে
হয় নি। লোকটি ওস্তাদ, আমার তুলনায়
অত্যন্ত বেশি বকমেব ওস্তাদ। বিষয়টিতে
যা কিছু পকেটে অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে
বিগ মিটিয়ে দিলাম। বেস্ট-রাউট থেকে
বেরোনের মধ্যে একজন আমাকে ডাকল—

“মশাই—দয়া কবে বলতে পারেন—।”

হয়তো সময় জানতে চাইছিলো লোকটি,
অথবা কোন ঠিকানা। কিন্তু আমি সঙ্গে
সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম—“আমি তোমাকে
চিনি না—আমি কাউকে জানি না”

অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি
এক ছুটে পালায়ে গেলাম সেখান থেকে।

অনুবাদ : দ্বিতা সেন



ছোট টুলে বসে বড়মামা একমনে ছবি আঁকছেন। তাঁর কাঁচাপাকা চুল হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো। চশমার ভেতরে দীর্ঘপক্ষ্ম চক্ষু দুটি নিম্পলক ইঞ্জেলের দিকে আছে তাকিয়ে। ডান হাতে তুলি ধরা আছে। তুলি তার কাজ করছে—কখনো খুব দ্রুত, কখনো খুব মৃদুতালে। টুলের ওপর বসেছেন সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে, বাঁ হাতটি হাঁটুর ডানার মতন দিয়েছেন ঝুলিয়ে। বাঁ হাত বশতুত কোন কাজ করছে না কিন্তু মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। নাচের মূদ্রা যেমন আঙুলে আঙুলে কথা কয়, বড়মামার ডান হাতের রূপোর তুলি, রঙের তুলির ভাষা কিছুটা ডান হাতে কথা বলছে, কিছুটা ভাগ করে নিয়েছে বাঁ হাতের লগ্নে।

আধখানা আঁকা নর্তকীর ছবিটা পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে তিলদু। ছবিটা কর্দন থেকে আঁকার চেষ্টা করে চলেছেন। আঁকা আর শেষ হচ্ছে না। কে জানে কোথায় আটকেছে। বারবার রঙ পরখ করছেন। একটার সঙ্গে আরেকটা মেশাচ্ছেন। লালের সঙ্গে হলদে, সবুজ নীলে। ফলে যে নতুন রঙগুলি আবিষ্কার হচ্ছে তাও তেমন পছন্দ হচ্ছে না। আসলে কোন রঙটা পছন্দের, মনের মতন তাই এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

ছবিটা কবে শেষ হবে তিলদু জানে না। তবে শেষ হলে তিলদুর খুব আনন্দ হবে। এ বেশ মজা যে মাথা ঘামিয়ে, রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকছেন চিত্রকর আর সেই ছবি তার মনের মতন না হলে, রঙটা চোখে না ধরলে তিলদুর মন ভরবে না। বড়মামা কাগজে ছবি আঁকছেন আর সেই ছবির মতন আরেকটা ছবি আপনা-আপনি আঁকা হচ্ছে যাচ্ছে তিলদুর মনের মধ্যে। কল্পনায় বিচিত্র রঙে রঙ করা হচ্ছে সেই ছবির বিষয়টা। ঘরবাড়ি, খুঁসর কোন মাঠের দৃশ্য; ছুটন্ত ঘোড়া অথবা মানুষের মূখ।

বড়মামা যখন আবার একমনে ছবি আঁকতে শুরু করেন, সেই ফাঁকে চুপি চুপি তিলদু পাশের ঘরে যায়। পাশের ঘরে ছোট খাটের সুন্দর শূন্য বিছানায় বড়মামার ততোধিক সুন্দর, অখচ নিম্প্রভ শরীর নিয়ে শূন্যে আছেন। তিলদু মামাবাড়ি এসে অবধি বড়মামাকে ঠিক ওইভাবে, একই এলানো ভঙ্গীতে বিছানায় শূন্যে থাকতে দেখেছে। বড়মামার অসুখটা যে কি তিলদু জানে না। শুনছে, বড়মামা যতদিন বেঁচে আছেন, ওই বিছানাতেই শূন্যে থাকবেন। উঠে-হেঁটে বেড়ান আর চলবে না। ডাক্তারের নিষেধ। হয়ত বা তাঁর শরীরে

সে সামর্থ্যও আর নেই—দেখলে তাই তো মনে হয়।

বড়মামা খোলা জানালার দিকে মুখ করে পাতলা নক্সা-আঁকা চাদবে গলা পর্যন্ত মুড়ে শূন্যে আছেন। হাঁটু একটি তোলা, আর একটি আলস্যে তেরচাভাবে ছড়ান নিচের দিকে। শীর্ণ দু'খানি হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি কনুই পর্যন্ত নেমে গেছে। জানালায় দিকে মুখ করে থাকায় তিলদু আস-টের পান না।

ঘরের মধ্যে মালিশের তীব্র কাঁঝালো গন্ধ আছে ছড়িয়ে। এই এত সব বিদ্রী় বিদ্‌ঘটে কাঁঝাল গন্ধের মধ্যে বড়মামা কি করে টিকে রয়েছেন তাও তাঁর আশ্চর্যের মনে হল তিলদু। হয়ত হয়। সবকিছুই আস্তে আস্তে মানুষের সহ্য হয়ে যায়। এই যেমন হেঁটে চলে না বোঁড়িয়ে শূন্যে শূন্যে থেকেই বড়মামা বাঁচতে পারছেন।

বড়মামা ঘুমিয়ে রয়েছেন কি না বোঝা যায় না। হয়ত জেগে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন কিম্বা কিছু ভাবছেন। কিন্তু এত নিশ্চুপে শূন্যে আছেন, নিশ্বাসের গুঁঠানামা এত স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলছে যা মানুষ ঘুমে অচেতন থাকলে তবেই সম্ভব।

অবশ্য উত্তোজিত হওয়া ডাক্তারের বারণ। এমনও হতে পারে সব

উত্তেজনা বৃদ্ধির ভেতর চেপে বড়মামী এমন নিষ্ঠুর বকম শাস্ত আর শাস্তি হলে শূন্যে আছেন।

রুগীর বিছানায় বসা, শবীর স্পর্শ করা অন্তত ছোটদের পক্ষে বারণ—তিলু তাই জানত। তাই মথার কাছে দাঁড়িয়ে বড়মামীকে দেখে।

—বেলা কত হল রে তিলু? মানুস মা কি আজ আর আসবে না? বিষম চোখ তুলে বড়মামী তিলুর দিকে তাকান। বিষমতার সঙ্গে তাব চোখে উদ্বেগ মিশে আছে।

—মানুস মা অনেকক্ষণ চলে গেছে তো। বাসন একটা কম কেন মানুস মা জিজ্ঞেস করছিল আমাকে।

—তুই কি বললি?

—বা রে কম হবে না। বড়মামী যে আজ দুপুরে তাঁত খেল না। বলল, শরীর ভাল নয়।

বড়মামী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—আমি জানি আমার জন্যেই এসব হচ্ছে। এতই যখন ঘেন্না আমার তবে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে কেন? আমি তো বেঁচে থাকতে চাই না—মরে যেতেই চাই। আমি মরে গেলে আবার সব ঠিক হবে—আমি জানি, সব জানি।

তিলুর নাকে ওহুধের গন্ধটা তখন আবার জোরালো হয়ে লাগে এসে। বড়মামীর হঠাৎ রেগে ওঠা, নিজের মৃত্যু কামনা, কোন কিছুর অর্থই

স্পষ্টভাবে তাকে স্পর্শ করে না। বড়মামীকে সারিয়ে তুলবার জন্য বড়মামী কি রকম চেষ্টা করছেন, সে দেখেছে। গরম জলে গা মোছান থেকে ওষুধ খাওয়ান, ফলের রস খাওয়ান, কখনো ঘরের মধ্যে হাত ধরে একটু একটু করে হাঁটতে শেখান—বড়মামী একাই করেন। মনে ঘৃণা থাকলে এসব কি করে একজনের পক্ষে করা সম্ভব তিলু বুঝতে পারে না। বড়মামীর কথায় অবাক হয়ে তিলু শব্দ বড়মামীর শীর্ণ, দুর্বল দেহের অসহ্য বিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নার্স মালিকা বড়মামীর বিছানার পাশে বসে বড়মামীর শীর্ণ কঙ্ক মূঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে নিজের হাতের তেঁতুল বিচির মত ঘড়ির দিকে চুপ কবে চেয়ে রইল। কয়েক মিনিট পরে কঙ্ক ছেড়ে দিয়ে বলল—টেম্পারেচার যেন একটু হয়েছে মনে হল। আগে একটা টেম্পারেচার চার্ট রাখা দরকার।

বড়মামী নার্সের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন দেখে নার্স বলল—আমার কিছুর বলবেন? বলুন আপনার কি কষ্ট?

বড়মামী বললেন—কষ্ট? কষ্ট তো কিছু নেই। আমি কিসে মরব বলতে পার নার্স?

—ছি ছি ওকথা বলবেন না। ওকথা বলতে নেই আপনার।

—হু বলতে নেই! তুমি তো জান না, কত দুঃখ বুকে পুষে আমার বেঁচে থাকতে হচ্ছে?

নার্স চুপ করে রইল।

খানিক পরে নার্স মালিকা পাশের ঘরে এসে বড়মামীকে বলল—বাড়িতে বেখে এ রোগের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। নার্সিংয়ের জন্য আমার না রেখে আপনি ঠিকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। সেখানে নার্সিং চিকিৎসা দুটোই ভালভাবে হবে।

—আমিও ঠিকে হাসপাতালে ভর্তি করার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু হাসপাতালের নামে ও এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আপনি ঠিকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমি জানি ঘর-দোর ছেড়ে ও কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজী হবে না, তবু—। আমার সুখের দিনে ও এসেছে। ওর ধারণা ও কাছে না থাকলে আমার দুঃখের দিন শূন্য হবে। কী ছেলেমানুষ!

এমন সময় বড়মামীর গলা শোনা গেল ওঘরে। নার্স মালিকা আর বড়মামী ছুটে গেলেন।

বড়মামী বোধহয় বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন। ভর দিয়ে ছিলেন। পড়তুল সাজান কাচের আলমারিতে। হাত লেগে পড়তুলগুলো



নিম
টুথ
পেস্ট

একমাত্র
ডেন্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
ফ্লুরোরাইড অর্থাৎ
বহুবিধ আধুনিক
ভেবর

এর প্রচুর ফেনা দাঁত
সাদা স্বকর করে আর
মুখে আনে মনুগন্ধময় স্নিগ্ধতা।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি:

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পড়ে ভেঙে গেছে। কুস্কনগরের মাটির পুতুল, রঙিন জল পোরা কাচের জীবজন্তুর মূর্তি সব মাটিতে পড়ে ভেঙে ছয়খান। পুতুলের ভাঙা সংসারের টুকরোর মধ্যে বড়মামীর শরীর মেঝেতে মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে।

নার্স ধরে তুলতে গেলে বড়মামী ঝাঁক মেয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। —তোমায় কে আসতে বলেছে, তুমি সরে যাও, এ বাড়ি থেকে চলে যাও। আমি মরব বেশ করব, তুমি চলে যাও, এখনি—এই মর্মে। বড়মামী নার্সের দিকে বিশাল বিস্ফারিত ঘৃণা আর সন্দেহের চোখ তুলে তাকিয়ে রইল।

বড়মামা নার্সকে পাশের ঘরে ঘাবার জন্য অনুরোধ করে বড়মামীকে তুলে বসালেন খাটের ওপর। তিলদুকে জল আর ডেটলের শিশি আনতে বললেন।

কাটা জায়গায় ডেটল লাগাতে লাগাতে বড়মামা বললেন—এ কি পাগলামি শুরুর করেছ বল তো? তুমি কি চাও আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

—তুমি—তুমি ওই নার্সটাকে এনেছ কোথেকে? খুব পয়সার গল্প হয়ছে বুঝি? ছবি একে এর মধ্যে লাখ টাকা কামাতে শুরুর করলে নাকি? আমার গল্পনা বেচে রঙ-তুলি কেনার কথা বুঝি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ? প্রত্যেক কোথাকার!

তিলদু হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছিল। সে দেখল, বড়মামীর মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে। চোখ অস্বাভাবিক বড় হয়ে গিয়েছে। সে আর বড়মামীর মুখের দিকে তাকাতে

পারছিল না। পাখাটা ফেলে সেই ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধে-ভরা অন্ধকুপের মতন ঘর ছেড়ে পালিয়ে এল।

বড়মামা নার্সকে নিয়ে পরশু শহরে গেছেন। হাসপাতালে বড়মামীকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে এসে বড়মামীকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবেন।

আজ বিকেলবেলা তিলদুকে ডাকল বড়মামী।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন উনি। জানলার পরে মাঠ। মাঠে এখন শীতের বেলা শেষের ধূসর ছায়া পড়েছে। মাঠটা এত বিশাল আর এত শূন্যতায় ভরা যে, সেদিকে তাকিয়ে তিলদুর মাথার মধ্যে কিম্বদন্তি করে উঠল। অথচ যখনই দেখে বড়মামী ওই মাঠের দিকেই তাকিয়ে আছেন। ওপাশের জানলা খুলে নিজের হাতে তৈরি ফুলের বাগানের শোভা দেখতে পারেন কিন্তু যে জানলার ফুলের বাগানের শোভা চোখে পড়ে বড়মামী সে জানলা কখনোই খোলেন না।

মাঠের মধ্যে দূরটো শালিক, কি ভীষণ ঝগড়া করছিল। কি নিয়ে যুদ্ধ বেধেছে ওদের কে জানে। মহিষের পিঠে চড়ে তিলদুর চেয়েও ছোট একটা ছেলে আড়াআড়ি মাঠ পাড়ি দিয়ে চলেছে। মাঠের বুকে হাওয়ার ঢাকের বাজনা ভেসে আসছে। আজ কি পূজো?

বড়মামী বললেন—কাছে আয় তিলদু, এখানে বোস।

তিলদু বসল। তিলদু ঘাড় গুঁজে বড়মামীর শীর্ণ হাতের দু'গাছা সরু লিকলিকে চুড়ির দিকে চেয়ে রইল।

—আমি আর বাঁচব না রে তিলদু। ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না।

হাওয়ার সেই ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধ। বড়মামী চোখ বুজে বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে শূন্যে আছেন। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না।

—তোমার বড়মামা কোথায় গেছে রে তিলদু?

—শহরে। তোমার জন্য হাসপাতালের বেড ঠিক কবতে গেছে।

—মিথ্যা কথা। তুই কিছু জানিস না। তোকে মিথ্যা কথা বলেছে, আমাকে মিথ্যা বুঝিয়ে গেছে তোর বড়মামা।

হাসপাতালের বেড ঠিক করতে দু'দিন লাগে না। সখ করে বেড়াতেই এত সময়, এর চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগতে পারে একটা মানুষের। আমি সব বুঝি।—বড়মামী যেন কারো ওপর ঘৃণাভরে মুখ বিকৃত করে সরিয়ে নিজ জানলার দিকে।

অনেক রাতে ঘরে কিসের শব্দ পেয়ে তিলদু বিছানায় উঠে বসেছিল। তিলদু তাকিয়ে ঘর অন্ধকার দেখেছিল। মেঝের ওপর বিছানায় মানদু মা ঘুমিয়েছিল। বড়মামীর ঘরের নীল আলো তেমনি জ্বলছিল। শব্দটা একবার শোনা গিয়ে আর শোনা যাচ্ছিল না।

তিলদু ভেবেছিল হয়ত শব্দটা সে তার স্বপ্নের মধ্যে শুনেছে। প্রকৃতপক্ষে ছেগে উঠে শব্দটা আর শুনতে পাওয়া যাবে না। কেন না শব্দটার বাস্তব কোন শরীরই নেই।

এই মনে করে নিশ্চিন্তে শূন্যে পড়ার আগে বীভৎস একটা চীৎকার কানে এল তার। শব্দটা বড়মামার ঘর থেকে আসছিল। যেন কেউ বড়মামীর কণ্ঠ-নালায় চেপে ধরেছে। বড়মামী প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠেছেন।

মানদুর মার সংগে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে সাদা শরীর তিলদুর শীতল, অবশ হয়ে গিয়েছিল। নীল আলোয় বড়মামীর শরীর মেঝেতে মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে। একটা ছোট নীল রঙের শিশি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝেতে। আর কোথাও কোন বিকার ছিল না শব্দ বড়মামীর সারা শরীরে শোচনীয় যন্ত্রণা এবং ঘবের আলোর রঙে মিশে তাঁর রক্ত নীল হয়ে উঠেছিল।

পরে ঘরের সেই বীভৎস মৃতদেহ লাশকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর যে কারণ আবিষ্কার করা হয়েছিল—তিলদু তা শুনেনিছিল। তবে মৃত্যু হয়েছিল বড়মামীর, কিন্তু বিষের চেয়ে বিষাক্ত যে মনের ব্যাধি থেকে বড়মামী মৃত্যু বিষ তুলে নিয়েছিল তার জটিল আর গোপন রহস্যটা জনতে তিলদুর অনেক বেশি সময় লেগেছিল। পরে বড়মামীর মৃত্যুর আসল রহস্যটা বুঝতে পারার পর বিষের ক্রিয়ার চেয়েও তাঁর সেই ব্যাধিকে সে ভয় পেয়েছিল। আরও অনেক পরে তিলদু যখন শোকে ব্যর্থতার অপূর্ণ-তায় তার পূর্ণ বয়স পেয়েছিল তখনও সে সেই বিষের শিশির কথা, মৃত্যু এবং পরাজয়ের সহজতম পন্থাটির কথা ভুলতে পারে নি। কিন্তু বয়স এবং অভিজ্ঞতা তাকে এমন কিছু মূল্যবান সহনশীলতা দান করেছিল যে জন্য অভিজ্ঞতার আয়ত্নকে সে সংক্ষেপ করতে পারে নি। যে জন্য কোন এক সময়ে বড়মামীর আত্মহত্যা স্মৃতিকেও সে নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিল।

হাওয়া ভাষায় প্রকাশিত মিত্রতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর চাঁদার হার

বার্ষিক	...	১৪-০০
ষাণ্মাসিক	...	৭-০০
ত্রৈমাসিক	...	৩-৫০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা

চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়

সাকুলেশন ম্যানেজার

মহাকাব্য বিপ্লবী যতীনন্দন

দুঃস্বপ্ননাথ মুখোপাধ্যায়

৪ অধ্যায়

ভারতবর্ষের কারাগারগুলির শোচনীয় দুর্ভাবস্থা চরমে পৌঁছেছিল নরেন গোসাঁইকে কারাগারে হত্যা করবার পর। অমানুষিক দুঃশেষতা, খাদ্যের নামে মনুষ্যত্ব জীবেরও অরুচির খোবাক, মৃত্ত আলো-হাওয়ার অভাব—দুর্ভাব ক’রে তুলল রাজনৈতিক কারণে বিচাৰ্য্যধীন এই বিপ্লবীদের জীবন। শ্রীঅবিলম্ব-বর্ণিত ‘কারাকানীন’ পড়ে যাঁরা আঁৎকে ওঠেন কারাকানীনের জঘন্য চিত্র দেখে, তাঁদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে না ভাব পরবর্তী পর্বে—যতীনন্দন প্রমুখের কারাকানীনে, কী ভীষণ রূপ পরিগ্রহ ক’বে থাকবেন কাব্য-কর্তৃপক্ষ।

বাহ্যিক এই অভ্যাসের যত প্রবল হ’লে উঠল, ততই নিজেদের অন্তর্মুখী ক’রে তুললেন যতীনন্দন। সাধক-বিপ্লবীর এই নির্জন-বাস নতুন এক উপলব্ধি আনলোকে উদ্ভাসিত হ’লে উঠল।

বীবেন দত্তগুপ্তের স্বীকাব্যোক্তির ফলে যখনকতক যতীনন্দনকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হ’ল। বীবেনের কাঁসী হ’লে গেল ফেরাবাবি শেষ নাগাদ আলিপুর সেন্দ্রাল জেলে যতীনন্দনকে স্থানান্তরিত করা হ’ল। এই জেলেই ক্ষুদ্র-একটি সেল্-এ দীর্ঘ চৌদ্দটি মাস অস্থানবদনে কাটলেন যতীনন্দন।

যতীনন্দনের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “যতীনন্দন স্ত্রী-পুত্র সকলকে ছাড়িয়া জেলের এই কঠোরতাব মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করিতে পারিতেন ও তাহাই করিয়াছিলেন—কোনওদিন তিনি বিপ্লবী হবার বিচলিত হন নাই। ভগবানের উপর ভাঁহাব অসীম নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি তাহা পারিয়াছিলেন।”

নিজের প্রসঙ্গে ললিতবাবু বলেছেন, “ভাঁহাব (যতীনন্দনের) ছোটমামার মনে তেমন বল ও নির্ভরতা ছিল না। একদিন রাতে তিনি চিন্তায় ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিঃসাড়ভাবে সেল্-এর মধ্যে জায়গা অবস্থায় বসিয়াছিলেন।” যে-স্বপ্ন মাস তিনি কারাগারে ছিলেন, অসহ্য ক্লেশ-

জনক এই পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন নি। নিজেই তিনি লিখেছেন যে, জেলে থাকতে তাঁর চোখের সের ওজন কমে গিয়েছিল। জেল-পরিদর্শক মিঃ মেটকে একদিন জেলের জঘন্য খাওয়া সম্পর্কে তিনি জানালে প্রত্যন্তরে মেটা প্রতিকার করা দূরে থাক, জানালেন, “You eat the same food outside!”*

নীলব এই তামস-তপস্যার প্রতিটি মুহূর্তে যতীনন্দন অন্তরে অনুভব করেন দিব্য এক প্রেরণার নিববাক্সিম উপস্থিতি। আনন্দে, উদ্দীপনায় সেই উপস্থিতি সমৃদ্ধল।

দিনে দিনে যতীনন্দনের দেহের ওজন যায় বেড়ে।

কারাগারের দরজা একদিন অসমবে খুলে যায়।

জেলার-সাহেব প্রবেশ করেন। স্মিত অভিবাদনের অভাব নেই। তাবপর জেলার-সাহেব তাঁর অভিসম্মি ব্যক্ত করেন, “মিঃ মুকার্জি, আপনাব কোনও ছবি আমাদের রেকর্ডে নেই।”

“কী ক’তে পারি?” সকাঁচুক প্রশ্ন।

“ওপবওয়ালার নির্দেশ, আপনাব একটি ছবি তুলতেই হবে। আপনাব আপত্তি নেই আশা করি?” সর্বমুখে উদ্ভাসিত সাহেবের মুখ।

“আমার ছবি তুলবেন?” দু-তিন সেকেন্ড কি ভেবে যতীনন্দন জবাব দেন, “বেশ তো, তুলুন না। কখন নেবেন?”

তাবপর রসসিদ্ধ সহজাত হাসিতে ভাস্বর হ’লে ওঠে তাঁর মুখ, “ভবে আপনাদের এই মহামূল্যে অর্জিতব পোশাকে নিশ্চয়ই ছবি তুলতে বাধ্য নই আমি? আমার নিজস্ব পোশাক পাই যদি তবেই বজ্রী।”

“সে তো বটেই, মুকার্জি।” জেলার-

*সম্ভ্রান্ত এই জমিদার-পরিবারের বর্ণনা ললিতবাবুর ‘পারিবারিক কথা’, ‘দুঃস্বপ্ননাথ’ প্রভৃতি গ্রন্থে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে মেটার এই উক্তিও ক্লেশ সন্নিবেশ করা কঠিন হতে পারে।

সাহেব উৎকর্ষচিত্তে বলে ওঠেন। যতীনন্দনকে রাজী হতে দেখে তিনি যান ফটোগ্রাফারের সম্মানে।

যথাসময়ে ফটোগ্রাফার আসেন।

যতীনন্দনকে কোট জমা ছিল জেল অফিসে, তা আনা হ’ল আর আনা হ’ল যতীনন্দনের প্রিয় ভোরাকাটা চাদরটি—পছন্দ ক’রে দাখিলিতে কিনেছিলেন এটি।

জেলার-সাহেবের অনুবোধে যতীনন্দন এসে বসলেন ক্যামেরার সামনে ধ্যানদৃষ্টি মেলে।

ফটোগ্রাফারের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—যেন আর-এক জগতের মানুষ এসে বসে—ছেন তার সামনে, যেন পুঞ্জীভূত স্তম্ভতার আর ভেজের মূর্ত এক বিগ্রহ। কোথায় বা ক্যামেরা?...কোথায় ফটোগ্রাফার?... কোথায় জেল?... কোথায় জেলাব?...উধাও উদাস দৃষ্টিতে যতীনন্দন যেন এক হ’লে যান দূর আকাশটার সঙ্গে।

দূর আকাশের প্রসঙ্গে মনে পড়ে যার আর-একটা দিনের কথা। সেদিনের তরুণতম বিপ্লবী ভূপেন দত্ত লিখেছিলেন, “আর এক-দিনের কথা মনে পড়ে। যতীনন্দন বসেছেন উদার আকাশের নিচে, দৌলতপুর কলেজ হোস্টেলের দোতলার খোলা বাবান্দার। গভীর রাত। আমি একলা গুঁর দিকে চেয়ে বসে। যতীনন্দন এই মুখখানা, এই চোখদুটো, এই বুকখানার সঙ্গে এই আকাশখানার কোথায় যেন যোগ আছে, কোথায় যেন মিল আছে। আকাশের রবিকে যতীনন্দন মিতা বলে ডেকেছেন, এই আকাশখানাও যেন যতীনন্দনকে মিতা।...চোখ নামের বললেন, ‘প্রফুল্ল, ক্ষুদ্রবাহু, সত্যেন, কানাই—একে একে মরে দেশকে জাগিয়ে গেছে। এখন আর একে একে নব, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ করে মরে দেশকে জাগাব।’...বার বছর বরষে মহা-রাম্ভ্রী জীবনপ্রভাত পড়ে রথনাথজী হাবিলদারকে কবেছিলাম জীবনের আদর্শ।—ভোবের দিকে যতীনন্দন চলে গেলেন। রাস্তার তুলে দিয়ে ফিবেতে ফিবেতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, রথনাথজীর মতোই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পাব তো? যুদ্ধ মরে জীবন সাধক করতে পারব তো?”

এ আবে-বছর-চারেক পরের কথা।

দিদি বিনোদবালা দেবীর চিঠি আসে। দিদির মনে বড়ি কাগে উৎকণ্ঠা; একমাত্র ভাইয়েব কাবাবাস বকে বড়ি শেল হয়ে বজ্জ-যে-বীরকে অন্য-কোনও জাতি হ'লে গোম্বের আসনে অধিষ্ঠিত কবে গুজ্জা কবত, স্বদেশেরই কাবাগারে তিনি অববৃন্দ, বিদেশী শাসকের আদালতে বিচাৰাধীন।

যবে নীবব প্রতীক্ষার দিন গোপনে সহর্মিগণী ইন্দুবালা। কন্যা আশালতা আব পুত্র ভেজেন্দ্রনাথকে দিনেব শেষে কোলে ভুলে নিরে শোনান তাদেব বীর পিতার কাহিনী।

যতীন্দ্রনাথের স্মরণে কি উদিত হয় না এঁদের মৃৎগুলি? যতীন্দ্রনাথের চিন্তে কি বিস্ময়মাত্র চিন্তা জ্বলে না এঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। যতীন্দ্রনাথের কি কর্তব্য নেই এঁদের প্রতি—যতই তিনি বলুন না কেন বিশ্ব-সংসারই আমাব সংসার?*

শ্রীঅবাবব্ব একবার লিখেছিলেন, “এমন অনেকে আছেন যারা স্বতঃসিদ্ধরূপেই অতি-মানব, মহান্ মহান্ আত্মা তাঁরা মানবদেহের অন্তরালে। তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিরই অভিব্যক্তি, একটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য আহুত ঐশী-ভাবের পরিচালনার দিব্যশক্তিই অভিব্যক্তি, সেই ঐশীভাব পবন সর্বশক্তিময়ের প্রতিনিধি, যিনি মানুষের ক্ষমতা ও দুর্বলতা বরণ করে নিষেও তাদেব বাঁধনে ধবা পড়েন না। তাঁরা মায়-অন্যায়ের উদ্বেগ* এবং সচবাচর বিবেক-বিহীন, আপন প্রকৃতিরই নিরমে চলেন তাঁরা। কারণ তাঁরা তো পশু থেকে দেবতাব পর্য্যয়ে উন্নীত হবার জন্যে নিম্নপ্রকৃতির সশ্রেণে যবতে যুদ্ধে এগিয়ে চলেন না, তাঁরা নিজেদের অন্তরেই সিদ্ধিলাভ কবে স্ববংস্পর্শ হয়েছেন। তাদেব মধ্য পুণ্যতম ষায়া, তাঁরাও সাধারণ বীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কবেন এবং সহজেই বিনা অনুতাপে সে সবেব পাশ ছিন্ন করেন, যেমন একাধিক ক্ষেত্রে খুঁস্ট করেছিলেন—সুদূর পান করে, স্যাৰাণ্ অমান্য করে, সরাইওলা ও গণিবাদের সঙ্গ করে, যেমন কবেছিলেন বুদ্ধ—পতিব, নাগবিবেক এবং পিতাব যে স্বেচ্ছায় গৃহীত দাষ্য তাঁর ছিল, সেগুলি পরিত্যাগ কবে, যেমন শঙ্কব করেছিলেন যখন তিনি পবিত্র ধর্ম অমান্য কবেন, মৃত জননীর ভূপ্তির জন্যে সংস্কার ও আচর্যেব গারেও পদাঘাত করত তিনি কসদুর কবেন নি।...”

এই উক্তিই প্রতিধ্বনি পাই যতীন্দ্রনাথের অপূর্ব একটি জীবন-চবিতে, “স্বার্থ কখনও যতীন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শও কবিতে পাবে নাই, অকণ্ঠ স্বদেশ-প্রেম ও প্রাণে বিশাল

উদারতা লইয়া তিনি সর্বজন-হিতসাধনে রতী ছিলেন; বহুল-গুণসম্পন্ন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা সকল ছাড়া স্বদেশের জন্য এককথায় যিনি এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন—তাহাতেই দেখা যায় যতীন্দ্রনাথ কতবড় আর্সক্তিমান বীর এবং কর্মী ছিলেন। জগতের মহাপুরুষগণের সাহিত তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের তুলনা কবিয়া বলিলে ইহা অতুলিত হইবে না যে, যতীন্দ্রনাথ বুদ্ধ চৈতন্যের ন্যায় স্বাধীন অন্তরের মন-সাধনাব জন্য স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সকল বন্ধন ছিন্ন কবিয়া মহাসম্মান লইয়া সংসারের বাহিরে অবস্থে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।”

দিদি বিনোদবালা শ্রুতমাত্র যতীন্দ্রনাথের সহোদরা অগ্রজই নন। তিনি যতীন্দ্রনাথের জীবনে গুরুসমান প্রজ্ঞাপদ, সখাসমান প্রিয়, মাতৃসমান প্রেরণাদায়ী, তিনি যতীন্দ্রনাথের গুরুভগ্নী, তিনি যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ জীবন-পথেরই পথিক, সহযোগী, যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সর্বত্র কর্মধারার সাক্ষী, দেশের কাজেও যতীন্দ্রনাথ তাঁর পরামর্শই শিবোধার্য জ্ঞান কবে এসেছেন।

২০শে অগস্ট। ১৯১০ সাল।

দিনি বিনোদবালাকে চিঠি লিখতে বসলেন যতীন্দ্রনাথ নিজের কারাপ্রকোষ্ঠের অন্তরালে। সেই পত্রের প্রতিটি বাক্য, প্রত্যেক ছত্র টাইটল্ড হ'য়ে ওঠে মহান সন্ন্যাসীর অন্তরের অনাবিল উৎসাহেব বাণীতে, যে-বাণী উদাত্ত নিষ্ঠুরতার দূর হ'য়ে যায় সমস্ত অবসাদ, সব নিরাশা। যতীন্দ্রনাথ লিখলেন :

শ্রীশ্রীচবৎকমলেশ্বর—

দিদি, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম এবং সকলেই শারীরিক কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।—থোকাদের লইয়া সর্বদা সাবধানে থাকিবেন। আমি আর সে বিষয়ে আপনাকে কি লিখিব?—আমার জন্য বিশেষ কোন চিন্তা করিবেন না।—আমি শারীরিক ভাল আছি। মেজমামাকে* মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব; তিনিই আপনাদিগকে আমার সংবাদ লিখিবেন। কতদিনে মোকদ্দমা উঠবে এখনও জানিতে পারি নাই।—যাহা হউক সেই সর্বমঙ্গলময় পরম পিতার চরণেব দিকে চাহিয়া আছি।—তিনি যে বিধান করেন, তাহাই তাঁহার আশীষ বলিয়া গ্রহণ করিব। তিনি আমাদের অমঙ্গলেব জন্য কখনই কিছু করেন না। আপাতদৃষ্টিতে বাহকে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহারও পশ্চাতে কোন মহৎদেশ্য নিহিত থাকে বাহা দ্রান্ত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহাব উপবে সম্পূর্ণরূপে নিভর করিয়া প্রাণে বস ধাবা সময় প্রতীক্ষা করুন—অবশ্য নির্দোষীকে তিনি বিপন্ন

করিবেন। যথাযোগ্য স্থানে আমাব প্রণাম ও আশীষ দিবেন।—ইতি—

প্রণত সেবক জ্যোতি।

১৯১১ সালের ২১শে মৈত্রসারী।

হাতড়া ফড়ফড় নামকান বোনমতই যতীন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত কবতে পাবল না সরকাব-পক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও প্রমাণ করা গেল না। তাই—দীর্ঘ বৎসরাধিক কালের দুর্বিষহ কাবাবাসেব পর যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুলাভ করলেন।

যতীন্দ্রনাথের শিষ্যরাও সকলেই ছাড়া পেলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথ দেখলেন—দেশের বহু স্থানেই আত্মত্যাগের মহান আদর্শ-বাহি, সেই উদার উচ্চ জীবন-দর্শের তাঁর এষণা নিতে এসেছে, বির্ময় পড়েছে। তাব পবিত্রত বিপ্র বী দে র মধ্যে এসে পড়েছে কিছু কিছু দলাদলি, পরপ্রীকাতবতা, সম্পর্গতা।

সাইনাই* পর্বতের বহি-বাণী নিয়ে ইহুদীদের মহানায়ক যোদিন নেমে এসে দেখলেন, তাঁর অনুগামী মূর্তিবামী জাতি অল্প সময়েই ভুলে গিছে তাঁকে, ভুলে গিছে তাদেব প্রতিভূত ভূখণ্ড যাবা সম্পূর্ণ-অসম্মান্য হন নি তিনি, নতুন প্রেরণার আলোকে উজাসিত হ'য়ে উঠল তাঁর মৃৎমণ্ডল, আহবান জানালেন তিনিঃ উত্তীর্ণত জাগত।...

যতীন্দ্রনাথও নতুন কবে আগন্তুণ জানলেন যখন, সাড়া দিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তেব নেতাবা, বাঁবা পূর্ব আদর্শেব ধূনি জ্বালিয়ে দিন গুণাছিলেন মহানায়কেব প্রত্যাবর্তনেব।

বিবিশালেব স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (সতীশ মৃৎজী*), ময়মনসিংহেব হেন্দ্রিকশোণ আচার্যচৌধুরী, করিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, স্বনামধন্য শিক্ষারতী শিশুভূষণ রায়চৌধুরীর আদর্শে গড়া খুলনার কয়েকজন কিশোর ও যুবক নেতা, উত্তর-বালাব নেতা যতীন রায় (বগুড়া) প্রমুখ এগিয়ে এসে মিলিত হলেন যতীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে—তাদের দ্বিজ নিজ সংগঠনের সমস্ত শক্তি ও সহযোগিতায় বলীযান হ'য়ে নতুন আশাব বুদ্ধ বোধে।

আব সাড়া দিলেন চন্দননগরের মতিলাল রায় প্রমুখ বিপ্লবী সংগঠকেরা; শ্রীঅবাবব্বের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পরিচালিত হ'বাব নৌভাগ্য হইছিল এঁদের। সারসংহাষী বসু, শ্রীণ ঘোষ প্রভৃতি এঁদের অন্যতম।

কান্তিপদাব মণি চক্রবর্তী লিখেছেন, “ইংরেজেরা বলিত, যতীন হিপনোটাইজ কবিতে জানে। তাঁহাব সাহিত একবার যে যুবকেব আলাপ হইয়াছে, সেই তাঁহাব অমিত প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বশ্যতা স্বীকার কবিয়াছে।”—এই সহজাত স্বভাব-নাথুর্ষ, নিমল প্রেমেব অবিমিশ্র সন্ম-স্বাদ তাঁর ব্যক্তিতে এমনই প্রবল

*লোকমান্য তিলকও বর্জাছিলেন, “Great people are above the principles of common morality.”

*শোভাবাজারের বিখ্যাত ডাক্তার ‘হেমন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

সাপ্তাহিক বসুমতী

যে, বশীকরণসূত্রে এক মহাশক্তি তিনি মহতেব মধ্যেও দূরের লোককে টেনে আনেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে। এবং এই শক্তির প্রকাশণেই আবাব নতুন করে দানা বেঁধে উঠল বিপ্লবী দল কলকাতায় এবং দেশের জেলায় জেলায়, গ্রামে, শহরে।

তাব আগে, ষোল জনা গুপ্ত-সমিতির কাজে আবাব নেমে পড়বাব প্রাকার্ল, ইংবেজ-সবকাবাব সমস্ত সনেহের আওতা থেকে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যেই, যতীন্দ্রনাথ সিবনীত একটি পত্র লিখলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে। আপাতদৃষ্টিতে পত্রটি নিছকই চাকরিব উমেদারি-বত এক ছাপোষা বাঙালীর আবেদনের মতো ঠেকবে। কিন্তু অনবদ্য ইংরেজিব বাদুর্নিত রাজশক্তির প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করে, কেন চাকরি থেকে তাকে বখাস্ত করা হ'ল—তার কৈফিয়ৎ চেয়ে যতীন্দ্রনাথ এই যে পত্র দিলেন, তার প্রতিটি বাক্যে যে শাপিত যুক্তিবা পাচি দিয়েছেন তিনি, এর থেকে অনুমান করা যায় দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ভূমিকাতেও তিনি অশ্বিত্যই ছিলেন।

মূল ইংবেজিতে এই পত্রটি যতীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসমেত ন্যাশনাল আর্কাইভসে রক্ষিত আছে। তাব কিয়দংশ এই সূত্রে উদ্ধার করি।—

১৯১১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর বাংলা সরকারের সেক্রেটারি মিঃ এইচ. হুইলার স্পেন্সারি হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে লিখলেন:

“বাংলাব সেক্রেটারিয়েটের প্রাক্তন কর্মচারী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'ব একটি পত্র আপনাকে পাঠানোব নির্দেশ পেবেছি; উক্ত পত্রে, এই বছরের ২৬শে জুন তারিখে স্থানীয় সরকার তাকে সবকারি চাকরি থেকে বখাস্ত করার বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছিলেন তাব বিরুদ্ধে মিঃ মুখার্জী' আপীল করেছেন।

“উক্ত পত্রলেখক ‘হাওড়া মামলা’ নামে পবিচিত মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইছিলেন—সে-বিষয়ে, অবগত আছেন। এ-কথা সত্য যে পত্রলেখক সব অভিযোগ থেকেই খলাস পান। কিন্তু কিছু প্রমাণ আছে বাব সাহায্যে নিশ্চিতরূপে কলা যায বে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'কে সবকারি চাকরিতে আর বহাল করা একান্তই অসম্ভব।

“এক।—রাজসাক্ষী লালিত চক্রবর্তী' তার জবানে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'কেই বড়বন্দর-নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

“দুই।—সাক্ষী রবি ভাদুড়ী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'কে সনাক্ত করে বলেছেন যে কুচিয়ার এক আখড়ার তাকে সে দেখেছে আলিপুর বোমার-মামলার আসামী ভবভূষণ মিত্র প্রভৃতি বিপ্লবজনক চরিত্রের লোকের সংগে মেলামেশা করত। তার সংগী ‘পরান’ (সংগ্ৰহ মজুমদার)—সাক্ষী তার উল্লেখও করেছে, অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক।

“তিন।—সামসুল আলমের হত্যাকারী বীরেন দত্তগুপ্তকে দেখা গিয়েছে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'র মামা * কুজমোহন চক্রবর্তী'র অসুস্থের সময় সেবা শ্রুশ্রবা করতে বীরেনের স্বীকারোক্তি, তার দাদা বীরেনের বিবৃতি, এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'র কাছে কুজমোহনের বে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে—এ-সবের সাহায্যে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

“চার।—Exhibit No. 34 (1) : যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'র ঘরে বৈশ্বিক কর্ম-সূচী'ব একটি খসড়া পাওয়া গিয়েছিল।

“পাঁচ।—সরকার থেকে মুদ্রিত গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায়, অভিযুক্ত শৈলেন দাসের স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় বড়বন্দরকারীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, “One who is very strong and works in the Bengal Secretariat” —সরকারের দৃঢ়মূল সন্দেহ এ-উক্তি যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

“ছয়।—Exhibit No. 112 : বিখ্যাত বিপ্লবী সবাদপত্র ‘বুদান্তব’-এর পরিবেষণে সক্রিয়রূপে উৎসাহী শ্রীপ্রকাসচন্দ্র রায় † উক্ত পত্রিকাব ম্যানেজারের কাছে একটি পত্রে উল্লেখ কবেছেন যে প্রয়োজন হলে তার স্বপক্ষে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী' জামিন দেন।

“সাত।—মামলার মুদ্রিত বিবরণী গ্রন্থের ৩৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য: Exhibit No. 115 থেকে প্রমাণ হচ্ছে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী' নিজে ‘বুদান্তব’-এব গ্রাহক ছিলেন।

“আট।—সামসুল আলমের হত্যাকারী বীরেন দত্তগুপ্ত বর্গেছিল যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী'ই বিপ্লবী বড়বন্দরকারীদের নেতৃ-স্থানীয় এবং তিনিই তাকে এই হত্যার কাজে পাঠান (বীরেনের স্বীকারোক্তি এই সংগে পাঠান হ'ল)।—

“বেহেতু লালিত চক্রবর্তী' সাক্ষ্য হাই-কোর্ট থেকে বাতিল ক'বে নেওয়া হয়েছে এবং বীরেন দত্তগুপ্তকে আদালতে জেরা করা হয় নি—তাইই ওপব নিত'ব করে পত্রলেখক জোর ক'রে বলছেন, তিনি নির্দোষ যে—এ বিষয়ে অন্যমত যদি থাকেও তা' আইনত প্রমাণিত নয়। যদিও উক্ত বড়বন্দর মামলার জড়িত ব'লে প্রমাণ করার মতো ব'লেও সাক্ষ্য আদালতে উপস্থিত করা যায় নি যতীন্দ্রনাথ

মুখার্জী'র বিরুদ্ধে, তবু ছোটলাট-বাহাদুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর থেকেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিপ্লবাত্মক প্রচারে রতী ছিলেন এবং বৈশ্বিক মতবাদ পোষণ করে থাকেন। তাছাড়া আরো সন্দেহ জাগে যে সরকারের বিরুদ্ধে মারাত্মক-তম অপরাধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লিপ্ত আছেন। এর থেকেই যুক্তিযুক্তভাবে যতীন্দ্রনাথকে সবকারি চাকরি থেকে বখাস্ত করা চলে। এবং পাবলিক সার্টিফিকেট আদ্য বহাল করা প্রাদেশিক সরকারেরই স্বার্থের প্রতিকূল।

“এইসঙ্গে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, মুদ্রিত গ্রন্থের ভল্যুম-ডিনটি (হাওড়া বড়বন্দর মামলার তথ্যাদি সম্বলিত) এবং বীরেন দত্তগুপ্তের সাক্ষ্যের কাঁপটি বখা-সময়ে যেন আমদের অফিসে ফেবত পাঠানো হয়।”

এব সব “His Excellency the Right Honourable Charles Baron Hardinge” ইত্যাদি, “Viceroy and Governor General of India”-র কাছে “The humble memorial of Jyotindra Nath Mukerjee* of 275 Upper Chitpur Road, Calcutta”

শিরোনামায়ুক্ত নাতীদর্শ পত্রটি সংশ্লিষ্ট দেখা যায় এই পত্রে যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের উন্নতি কত দ্রুত হইছিল এবং সরকারের কতদূর বিশ্বাসভাজন তিনি ছিলেন, স্পষ্ট দেখা যায়। কিছু উদ্ধৃতি দিলাম :

“এক। পত্রলেখক ১৯০৩ সালের ১১ই আগস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে মাসিক গ্রিশ টাকা বেতনে টাইপিষ্টের কাজে বহাল হয়।

“দুই।—কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে সত্তর (৫০-৭০) টাকা গ্রেডে তাকে উন্নীত কর হয়।

“তিন।—১৯০৪ সালের ১৫ই মে তাকে মাসিক একশ টাকা বেতনে বাংলা সরকারের ফিন্যান্সিয়াল সেক্রেটারির স্টেনোগ্রাফারের পদে নিয়োগ করা হয়।

“চার।—তারপর পত্রলেখককে পুরো এক-বছরব্যব জন্য বাংলার Gazetter Revision-এর স্পেশ্যাল ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়; মাসিক একশ আঠাশ টাকা বেতন এবং মাসিক আশি টাকা ডেপুটেশন এলাওয়ারেন্স দেওয়া হয়।

“পাঁচ।—বাংলা সরকারের ফিন্যান্সিয়াল সেক্রেটারিদের অধীনে পত্রলেখকের কর্মকর্তা এতই প্রীতিপদ বিবেচিত হয় যে স্পেশ্যাল ডিউটি থেকে তার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

* যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বানানই ব্যবহার করতেন এবং এই বানানেই তার স্বাক্ষর আছে পত্রটির নিচে।

* যতীন্দ্রনাথের মারের মামতো ভাই, পাবনার চাটমোহরে এঁদের বাড়ি; কলকাতার ডাঃ হেমন্ত চাট্জোর ওখানে ইনি উঠেছিলেন।

† বিখ্যাত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই; যতীন্দ্রনাথের বহু বিপ্লবী শিষ্য আচার্য রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেকেই পরবর্তী জীবনে কুড়ী হ'ল।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ভরক ১২৫,—১৫০, টাকা গ্রেডে নিয়োগ করা হয়।

“হয়।—১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী মামরাতের অনতিকাল পরেই পত্রলেখককে যুস থেকে ডেকে ডেরলেন জনকরক পুন্নিশ অফিসার; তাঁরা বলেন যে, কলকাতার পুন্নিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁরা জরাসী পরওয়ানা এনেছেন এবং ২৭৫নং আপার চিৎপুর রোডের বাড়িটি বেখানে পত্রলেখক ও তার মামা ডাঃ এইচ. কে. চ্যাটার্জী, আর-এম-এস থারকেন) জরাস করে দেখতে চান।

“সাত।—পুন্নিশ অফিসারেরা সারারাত জরাসী চালিয়ে যান এবং ভোরবেলা যাবার আগে পত্রলেখককে গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে যান।

“আট।—পত্রলেখককে বলা হয় যে, স্বর্গত তেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৌলবী সাকসুল আলমকে হত্যার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

“নয়।—পত্রলেখককে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ-কাল কারাগারে রাখা হয়; তারপর, ১৯১০ সালের ৩০শে জানুয়ারী, কলকাতার পুন্নিশ কমিশনারের কাছে তাকে উপস্থিত করা হয়; পবে তিনি তাকে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন।

“দশ।—তর্কুণি পত্রলেখককে আবার আঁড়-হুত করা হয় ভাবতীর পেনাল কোডে ৪০০ ধারা অনুযায়ী যে এক ডাকাতদলের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট এবং তাকে আবার গ্রেপ্তার করে হাওড়া জেলে রাখা হয়।

“এগারো।—পত্রলেখককে হাওড়া জেলে কিছুদিন রাখা হয়, তাবপর ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাকে আলিপুর-সেশনাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাকে নির্জন একটি সেল-এ রেখে অজ্ঞান পীড়ন ভোগ করানো হয়।

“বারো।—১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, আলিপুর সেশনাল জেলে থাকাকালীনই পত্রলেখককে জানানো হয় যে, পব-দিন তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হবে; সেখানে কে একজন তার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে।

“তেরো।—তদনুযায়ী পরদিন তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জনৈক বীরেন দত্তগুপ্ত পত্রলেখকের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়।

“চোদ্দ।—তার কিছু পরেই, কাবাগাবের মধ্যেই পত্রলেখককে নতুন কবে গ্রেপ্তার করা হয় ভারতীয় পেনাল কোডে ১২১, ১২১এ, ১২২, ১২৩ এবং ১২৪নং ধারা অনুযায়ী অপরাধী সন্দেহে।

“পনেরো।—তারপব বহুবাব পত্রলেখককে উপস্থিত করা হয় হাওড়ার এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেব এজলাসে; বহু মাস যাবৎ এই তদন্ত চলতে থাকে।

“ষোল।—১৯১০ সালের ২০শে জুলাই

পত্রলেখক এবং অন্যান্য আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা হয় হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে।

“সতেরো।—১৯১০ সালের ১লা ডিসেম্বর এই বিচার শুরু হয়; বেগে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চীফ জাস্টিস, মাননীয় জাস্টিস ব্রেট এবং দ্বিগম্বর চ্যাটার্জী।

“আঠারো।—১৯১১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, বিচার শেষ হবার আগেই উক্ত ট্রাইব্যুনাল পত্রলেখককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন এবং মুক্তি দেন।

“উনিশ।—ছাড়া পেয়ে পত্রলেখক তার অফিসে ফিরে গেলে তাকে বলা হয়, তার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

“কুড়ি।—১৯১১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, পত্রলেখককে নিম্নোক্ত নোটি পাঠানো হয়; স্বাক্ষরকারী মাননীয় কিনার্সিয়াল সেক্রেটারি মিঃ হুইলার :

১৯১১ সালের এই মার্চের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী যেন আমাদের কাছে কর্তৃক উপস্থাপিত করেন—সম্রাট বনাম ললিত চক্রবর্তী ও অন্যদের মামলার সংগৃহীত বিবৃতি ও সরকারি ডকুমেন্টস আলাদা করে—কেন তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না।...

“একুশ।—কিন্তু পত্রলেখকের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিবৃতি ও স্বীকাব্যোক্তির কোন কপিই না থাকায় সে ১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তার কৈফিয়ৎ পেশ করবার জন্যে সময় চাব এবং তা' মঞ্জুর করা হয়।

“বাইশ।—১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ দুপুরে পত্রলেখক তার কৈফিয়ৎ পেশ করে—যার কপি এইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল এবং পত্রলেখকের অনুরোধে যে, এই পরেই অংশ বলে তা যেন গণ্য করা হয়।

“তেইশ।—পরদিনই সকালবেলা নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করেন ফিন্যান্সিয়াল সেক্রেটারি—বাংলা-সবকারের কাছে এবং পত্রলেখকের কাছে :

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রদত্ত কৈফিয়ৎ (গত ৩০শে তারিখে) আমি গর্হিত এবং লভ্য প্রমাণ থেকে এই আমার ধারণা হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে তাকে ছাড়া বহাল করা কাম্য নয়। অতএব তাঁকে-বোম্বিন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার নির্দেশ বলাবৎ করছি।

“চল্লিশ।—উক্ত বরখাস্তের নির্দেশ পেয়ে মর্মহতভাবে পত্রলেখক ১৯১১ সালের ২২রা জুন ছোটলাট বাহাদুরের কাছে আপীল করে।

“পঁচিশ।—২৬শে জুন বাংলা সরকার পত্রলেখককে নিম্নোক্ত নির্দেশ পাঠান :

যাও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রেরিত ২২রা জুনের মেমোরিয়াল পড়লাম। সিদ্ধান্ত : ছোটলাট পত্রলেখককে পক্ষ সপর্শন করা যার কিনা বিবেচনা কবেছিলেন এবং

হস্তক্ষেপ করবেন না, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নির্দেশ : এই সিদ্ধান্তের অব্যক্তি পত্রলেখককে পাঠানো হ'ক।

“ছাষিংশ।—মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের এই নির্দেশে মর্মহত হবে পত্রলেখক অনু-মতি প্রার্থনা করছে ইওর এক্সেলেন্সীর কাছে এই আপীল পেশ করবাব—মূলত নিম্নোক্ত কৃটি কারণে :-

“ক। বিচারে পত্রলেখক অব্যাহতি পায় বলে।

“খ। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল একব্যাক্য রাজ-সাকী ললিত চক্রবর্তীর বিবৃতিতে সর্বতোভাবে অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন; একমাত্র উক্ত বিবৃতিটাই পত্রলেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ-উত্থাপন করেছিল বলে।

“গ। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল বিশেষভাবে পত্রলেখকের বিরুদ্ধে রাজসাকীর উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করে দেখানোর জন্যে উদাহরণস্বরূপ মনি-অর্ডার পাঠানো সংক্রান্ত উক্তিটির উল্লেখ কবেছেন বলে।

“ঘ। পত্রলেখকের বিরুদ্ধে অপব একটি মাত্র অভিযোগে বিবৃতি দিয়েছিল বীরেন দত্তগুপ্ত এবং সেটি যে অদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তার সর্বগ্রহী অপব কোনও হাতের সাক্ষ্যে কাহিনী যে বিদ্যমান, সে বিষয় ট্রাইব্যুনালে নিঃসন্দেহ হন, বিবৃতিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বিবেচনা করেন বলে।

“ঙ। যেহেতু পত্রলেখকের কৌশলীকে উপবৃত্ত সুযোগ দেওয়া হয় নি বীরেন দত্তগুপ্তকে জেবা কববার—তা' হলেই তার বিবৃতির অসত্যতা যাচাই হবে যেত।

“চ। দেশেব সর্বোচ্চ ট্রাইব্যুনালের চেয়ে মিথ্যা বলে প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে সিদ্ধ হয় সবকারের একজন বিবস্ত ও অনাগত কর্ম-চারীকে এইভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে।

“ছ। যেহেতু সবকার থেকে কোনও যুক্তি দেখানো হয় নি—কেন পত্রলেখককে সবকারি চাকরিতে বহাল রাখা অব্যাহতীয়।

“জ। যেহেতু পুন্নিশের হাতে একদম কোনও প্রমাণই ছিল না পত্রলেখকের বিরুদ্ধে এবং তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যেহেতু তারা পত্রলেখকের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ খাড়া করতে পারে নি।

“ঝ। যেহেতু দীর্ঘ কাবাবাস এবং বিচারের ফলে স্বাস্থ্য এবং অর্থের দিক থেকে পত্রলেখক সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে এবং তার জীবনের এমন

এক পরিমিতায় মধ্যে তার চাকরি
যাওয়াটা বিশেষ পীড়াদায়ক বলে।
“অভাব, পত্রলেখকের অনুরোধ, ইওর
এক্সেলেন্স যেন তাকে আবার চাকরিতে বহাল
করবার নির্দেশ দেন। ইত্যাদি—

(স্বাঃ) যতীনন্দনাথ মুখার্জী।”

২-১-১৯১১

Jyotindra Nath Mukherjee

যতীনন্দনাথের হংকংয় স্বাক্ষর : লর্ড হার্ডিঞ্জকে লেখা চিঠি থেকে
(২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১১) II
: গ্রীষ্মপেত্রকুমার দত্তের এবং ফিল্মার National archives-এর সৌজন্যে I

এই পত্রের সঙ্গে মহানায়ক যতীনন্দনাথ
সংশ্লিষ্ট করেছেন বাংলা সরকারের ফিন্যান্স
ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মিঃ হুইলারকে লেখা
তার প্রথম পত্রটি। এই পত্রটি থেকে কিছু
উদ্ধার কববার আগে স্মরণ রাখা দরকার যে,
আজকের বাঙ্গালীরাইব দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ধ-
শতাব্দীরও আগেকার বাঙ্গালীত্বকে বিচাণ
করতে যাওয়া অত্যন্ত প্রান্তিকজনক হবে।
সেদিনকার বাঙ্গালীরাইব অপরিহার্য অঙ্গ
হিসেবেই মহানায়ক যতীনন্দনাথকে যুক্তিব পূর্ব
যুক্তি সাজিয়ে বুদ্ধিব মারপ্যাট অবতীর্ণ হতে
হয়েছিল বিদেশী সরকারের জটিল কূট ব্যুহ-
কল্পে।

প্রেমে এবং সমবে যোদ্ধা ন্যায় ও অন্যায়ের
সাধারণ বোধগম্য অকল্পে ধাকা উচিত বলে
প্রবাদ আছে, তেমনি স্মরণ রাখা প্রয়োজন
লোকমুখে বালগদ্বন্দ্ব - তিলকের উক্তি,
“Great people are above the
principles of common morality”
(সাধারণ নীতিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাপুরুষেরা বাধা
পড়েন না)।

এই সূত্রেই পূর্বে উদ্ধৃত গ্রীষ্মবাবুদেব
উক্তিটির পুনরাবৃত্তি আবশ্যিক : “...সেই ঐশী-
ভাব পবন সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি, যিনি
মানুষের ক্ষমতা ও দুর্বলতা বর্ণন করে নিষেধ
তাদের রীতিতে ধরা পড়েন না। তাঁরা ন্যায়-
অন্যায়ের উদ্দেশ্য এবং সচরাচর বিবেকহীন,
আপন প্রকৃতিই নিয়মে চলেন তাঁরা।”

যতীনন্দনাথ লিখিত পত্রটি থেকে কিছুটা
শোনাই :

“১৯১১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী
তারিখে লেখা আপনার মেসো নং ১০৪৯
পত্রে আমায় যে নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি
চাকরি থেকে কেন আমায় বরখাস্ত করা হবে

মা প্রমাণ করিতে—তার উত্তরে আপনারকে
নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা জানাতে চাই।

“প্রথমতই আমি বলতে চাই যে, আপনার
পত্র পেয়ে আমি বিশেষ মর্মাহত হই, কারণ
আমার ধারণা ছিল যে, এ-দেশের উচ্চতম
আদালতে সুদীর্ঘকাল ধাবৎ একটানা বিচারের
পূর্ব অব্যাহতি লাভ করে আমি স্বভাবতই

আমার চাকরির ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হব।
এমন আশা পূর্বত করেছিলাম যে, অনর্থক
কিনা স্পর্শবাবে আমার এতদিন ধরে যে
বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল এবং অল্প অর্থদণ্ড
দিতে হয়েছিল, গভর্নমেন্ট তা বিবেচনা করে
দেখবেন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন।
যাই হোক, নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আপনার
বিবেচনার জন্যে পাঠাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস
যে, এর সাহায্যে আপনি নিঃসন্দেহ হবেন যে,
বাস্তবিকই এবং আইন-ও আমি নির্দোষ—
এখনো স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে যে-বিচার চলছে,
সেই ক্ষুদ্রস্তরের আংশিক বা সামাজিক কোনও
অভিযোগেই আমি লিপ্ত নই।

“আপনার চিঠিতে আপনি দুটি পৃথক
বিবৃতি বিরুদ্ধে আমার আলোচকপাত করতে
বলেছেন : প্রথমত, যেসব কথা আমার বিরুদ্ধে
সাক্ষ্য বলা হয়েছিল এবং, দ্বিতীয়ত, যেসব
অভিযোগ বীবেন দত্তগুপ্ত আমার বিরুদ্ধে
খাড়া করতে চেয়েছিল।

“প্রথমটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমায়
অপবাদী সাব্যস্ত কববার পক্ষে যথেষ্ট নয়
যেহেতু তাব প্রতিটি অভিযোগ বোল আনা
বাচাই করবার পবে মাননীয় বিচারকেরা স্বয়ং
দিরেছেন যে, আমার বিরুদ্ধে কোনও দোষ
খাড়া করতেই তা অক্ষম।

“রাজসাক্ষীর লিখিত চক্রবর্তীর বিবৃতিগুলি
সবক্ষে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আমায়
সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পবি-
স্থিতিতে সে যেসব উক্তি করেছিল তা
স্পষ্টতই হয় রাজসাক্ষী একটু একটু করে
নিজের কল্পনাব সাহায্যে গড়ে তুলেছে, নবতো
অন্য কারও চাপে পড়ে সে ওসব বানিয়ে
বলেছে।...

“ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাজসাক্ষী আমার
বিরুদ্ধে প্রধান যে উক্তি করেছিল তা হল যে,
আমি তাকে ছদ্মনামে মনি-অর্ডার করে দশ
টাকা পাঠিয়েছিলাম সে ম্যাজিস্ট্রেটের

কাজীন। এ-উক্তি যে মিথ্যা, রাজসাক্ষীর
পরবর্তী বিবৃতিগুলি থেকে তা প্রমাণ হয়।
স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে জেরাব সময় রাজসাক্ষী
বলে যে সে-টাকা তাকে আমি পাঠাই নি,
কলকাতা থেকে জনৈক সতীশ সরকার পাঠায়।
জেরাব সময় তাকে বখন বলা হয় যে, ম্যাজি-
স্ট্রেটের সামনে সে আমার নামে বিবৃতি দিয়ে-
ছিল। তখন সে দুটো উক্তিই তালগোল পাকিয়ে
দেবার উদ্দেশ্যে একটা চিঠি বেব করে বলে
যে, সতীশ সরকার তাকে টাকা পাঠানোর
সময় এই চিঠিতে লেখে যে, আমিই সতীশকে
এই টাকা দিয়েছি রাজসাক্ষীকে পাঠানোর
জন্যে। এ-কথাও যে মিথ্যা তার প্রমাণ, আমি
তখন ম্যাজিস্ট্রেটেই ছিলাম এবং রাজসাক্ষীকে
অর্থসাহায্যের প্রবোজন হলে আমি তা
অনেক সহজেই তার স্যানিটারিয়ারে পাঠাতে
পারতাম—টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে সেখান
থেকে আবার ছদ্মনামে ম্যাজিস্ট্রেট-এ পাঠানোর
দরকার হত না।

“আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী আর যে
বিবৃতিটি ভারমণ্ডাবাবাবের এস-ডি-ও
সাহেবের কাছে প্রথমে দেয় তা হল : শ্যাম-
বাজার সমিতির জনৈক যতীনদাদা (তার
পুরো নাম তাব জানা নেই) এই ক্ষুদ্রস্তরে
লিপ্ত ছিলেন এবং তিনিই তার কাছে একটা
ছেলেকে পাঠান। আবার মিঃ দ্যুভাল-এর
সামনে সে সর্বপ্রথম বলে যে, এই যতীনদাদা
হচ্ছেন মুখার্জী এবং রাইটার্স বিন্ডিংয়ে
চাকরি করেন এবং রাজসাহী, নদীয়া, যশোর
ও খুলনাব তার সম্পূর্ণ গুর ওপব ছিল।
মিঃ দ্যুভাল-এব কাছে রাজসাক্ষী এ-কথাও
বলে যে, ননীগোপাল গুপ্তব শিবপুত্রের
বাড়িতে সে প্রায়ই এই যতীনদাদাব সঙ্গে দেখা
করত। উক্ত যতীনদাদা যে আমি হতে পারি
না তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কারণ স্পেশ্যাল
ট্রাইব্যুনালের সামনে বিবৃতি দেবার সময়
রাজসাক্ষী আমায় সনাক্ত কববার সময় বলে
যে, আমার ইতিপূর্বে মাত্র একবারই দেখেছিল
ডালহৌসি স্কোয়ারে। সে যতীনদাদা আর
যেই হোন আমি যে নই তার অন্য প্রমাণ
এই যে রাজসাক্ষী তার বিবৃতিতে বলেছিল,
বাকিপুরেব বাবু কেদারনাথ ব্যানার্জীর বাড়িতে
যতীনদাদা প্রায়ই বাতাবাত করতেন। অথচ
কেদার ব্যানার্জী তার জ্ঞানবান্দিতে বলেছেন
যে, তার বাড়িতে যতীন নামে কেউ কিস্মন-
কালে যায় নি; কেদারবাবাবু জ্ঞানে এ-কথাও
তিনি বলেন যে, ইতিপূর্বে আমার কোনদিন
তিনি দেখেন নি, আমার চেনা তো দবের
কথা।...ডালহৌসি স্কোয়ারে রাজসাক্ষীর
সঙ্গে দেখা হওয়া প্রসঙ্গে বণি যে, মিঃ দ্যুভাল-
এব কাছে রাজসাক্ষী বিবৃতি দেয় যে, আমি
গিয়ে রাজসাহীতে তাব থাকবার জন্য পববর্তী
ব্যবস্থার কথা তাকে বলেছিলাম। আবার
স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে সে বলে যে,
রাজসাক্ষীর সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয় নি,
আমি ওর পথপ্রদর্শককে বলেছিলাম যেন ও

নদীয়ার বেলিয়াশিশি গ্রামে যায় ও খুব সাময়িকেন থাকে সেখানে। উক্ত দুটি বিবৃতিই মিথ্যা। ও-দুটির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই। এবং আমি বলতে পারি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষীকে দেখবার আগে কোন-দিন তাকে আমি দেখিই নি।

“আমার বিরুদ্ধে এ-কথাও প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, আলিপূর বোমার কেসের সঙ্গে জড়িত কুষ্টিয়ার কয়েকজন অধিবাসী আমার খুব পরিচিত লোক। কুষ্টিয়ার অত্যন্ত নিকটবর্তী কয়লাগ্রামের অধিবাসী আমি এবং কুষ্টিয়া ও আশেপাশের বহু জায়গা থেকে সম্প্রদায় ব্যক্তিরা দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে আমার বাড়ীমাঝে কুশনগরের গভর্নমেন্ট প্রাইভাট হাউস বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়ার বাড়িতে সমবেত হতেন বটে, কিন্তু মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ অনুযায়ী এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, আমি “ভবভূষণ মিত্র ও অন্যান্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু” ছিলাম। একমাত্র সাক্ষ্য দিয়েছে হেড কন্স্টেবল বিবি ভাদুড়ী : দু-একবার আমি নাকি কুষ্টিয়ার আশুড়ার গিয়েছিলাম। তবে থেকে, আমার ধারণা, আশুড়ানুষ্ঠান লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল প্রমাণিত হয় না। আমি আদৌ কখনো এই ভবভূষণ মিত্রকে দেখি নি। তবে কুঞ্জলাল দাহ্যকে আমি কুষ্টিয়ার এবং কয়লাতেও দেখিছি, যদিও জানতাম না যে, বোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সে বিপ্লবমাত্রণ্ড সংশ্লিষ্ট। এ-কথা প্রসঙ্গক্রমে ধলব যে, কুঞ্জলাল সাহা আলিপূর বোমার মামলার নির্দেশ প্রমাণিত হবে ছাড়া পারব। মামলার আমার বিরুদ্ধে এই কাঁটি অভিযোগই নথিভুক্ত হয়েছিল।

“অন্যান্য নথিপত্রের মধ্যে আমার অপরাধী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে exhibit No. 34 (1) থেকে : সংবাদ-পত্রের ও গুপ্ত ইস্তাহারের জন্যে লিখিত একটি পরিকল্পনা, আমার ঘরে নাকি এটি পাওয়া যায়। আমার মামা ডাঃ হেমন্তকুমার চ্যাটার্জীর বাড়িতে ওই ঘরটিতে আমি রয়ে শুনতাম। সরকারি হস্তাক্ষর-বিশারদের মতে উক্ত ডকুমেন্টটি আমার লেখা নয়। ওটি যে আমার সম্পত্তি, এমনও প্রমাণিত হয় নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, ওই ঘরে আমার মামাতো ভাইবেবা দিনের বেলা লেখা-পড়া করে এবং তাদের প্রাইভেট টিউটররা ছাড়াও বাইরের বহু লোক নিত্য সেখানে আসে বাস। তাদেরই কারো কাগজপত্র ওখানে পাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং তাব জন্যে আমার দায়ী করা যায় না। উক্ত ডকুমেন্টটি পারাব আগে পর্যন্ত ওটি সম্বন্ধে বা ওব বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না, আবার বলি।

“বিচারের সময় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-স্বরূপ যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা করে মাননীয় বিচারকেরা যে আমার মৃত্তি দেন তা কোনও আইনগত বা

টেকনিকাল মারগ্যাটে নয়, কাবণ যেহেতু আমার অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় নি।

“এবার বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতি প্রসঙ্গে আসি। - দুটি পরিস্থিতিতে এই বিবৃতিগুলির সংযোগ বাদের প্রতি আপনাব বিশেষ দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি। প্রথমটি হল : ১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ ডি. সুইনকো সহবেব সামনে বীরেন দত্তগুপ্ত প্রথম যে বিবৃতি দেয় তহতে সে বলে যে, পুলিশ তাকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছে যে, রিভলভারটি সে যতীন্দ্রনাথের কাছে থেকে পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথ (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি) : মিঃ সুইনকো-র ধারণা যে, বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতির সমস্ত তাব হতে একটি লিখিত ডকুমেন্ট ছিল যা সে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিল বিবৃতি দিতে দিতে। সে ডকুমেন্টটি আদালতে দেখানো হয় নি এবং সেটি কাব হতেব লেখা জানা যায় নি; কিন্তু প্রথম পরিস্থিতির সঙ্গে এটি যুক্ত করলে প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হয় যে, বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতিটি স্বার্থ বা স্বেচ্ছাকৃত নয়; বাইবে থেকে কেউ চাপ দিয়ে ওই বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতি-গুলি পাঠ করলেই এ-বিষয়ের সব সন্দেহের নিরসন হয়।

“অন্যান্য কথার মধ্যে তার বিবৃতিতে সে বলেছে যে, ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে কলকাতার আমার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাবপব থেকে প্রতি সপ্তাহে এক-বার করে আমার সঙ্গে সে দেখা করত। এ কথা মিথ্যা। যেহেতু ১৯০৯ সালের গোটা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ আমি দার্জিলিংয়ে ছিলাম আপনাবই সহকারীবুপে। আমার এ-উক্তি সত্য কিনা আপনি অফিসের রেকর্ড দেখলেই বুঝবেন। দেখতে পাবেন, আগস্ট মাসের শেষদিকে আমি কলকাতা ছাড়ি এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ ফিরি। কেন যে বীরেন দত্তগুপ্ত এমন বিবৃতি দিল এবং এভাবে কোন উদ্দেশ্যে মিছিমিছ আমার নাম এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়ালো, আমার পক্ষে তা অনুমান করা অসম্ভব—আমার কৌশলী তাকে জেবা কববার সুযোগ পেলে হয়তো এব সদৃশ পোতেন। ১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ সুইনকো-র কাছে বীরেন দত্তগুপ্ত যখন এই বিবৃতি দেব তখন তাকে পুলিশ বলে রেখেছিল যে তারা টেব পেয়েছে ওর রিভলভারের মূলে আমি আছি এবং আমার গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আমার বলতে স্মৃতি নেই যে, খুব সম্ভব এই কথা শুনই বীরেন দত্তগুপ্ত আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সরকারি অপরাধী বা অপরাধীদের নাম গোপন কবতে চেষ্টা কবেছিল।

“আমি আপনাকে এর সাহায্যে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে নথিভুক্ত এমন কোনও বিবৃতি বা সাক্ষ্য মাফলয় সংগৃহীত নেই

যার সাহায্যে আমার সরকারি চাকরির অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা চলে। আমার কী জন্য যে এই মাফলয় জড়িত করা হয়েছিল আমি নিশ্চিত হয়ে তা বলতে পারি না, কিন্তু ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকেই—যখন দুর্ভাগ্যক্রমে শিলিগুড়ি কেল-স্টেশনে ক্যাপ্টেন মার্ক ও লেফটেন্যান্ট সামারভিল্ড-এব সাংগে আমার বাধ্য হয়ে ঝগড়া কবতে হয়—তখন থেকেই পুলিশের চোখে আমি সন্দেহভাজন ও অবিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠি এবং তাবদব ধারণা হয়, আমিও বুদ্ধি সবকাবের বিবুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ-কথাও আমার বলতে হচ্ছে যে, আমার প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাব অভিযোগে নয়, প্রথম আমার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নবহত্যাব অভিযোগে, কিন্তু তার বোনও প্রমাণ না-থাকার আমি মৃত্তি পাই। তারপবে ভাবতীষ পেনাল কোডের ৪০০ ধাবা অনুযায়ী আবার আমার গ্রেপ্তার করা হয় হত্যাব অভিযোগে, এবং আবার ম্যাজিস্ট্রেট আমার নির্দেশ বলে ছেড়ে দেন। অবশেষে আমার বিবুদ্ধে বড়-যন্ত্রের অভিযোগ আনা হল।

“এর থেকেই আপনি দেখছেন কীভাবে আমার অবস্থা নামতানাবদ হতে হয়েছে। দীর্ঘ, তেরো মাস আমি কাবাবন্দী ছিলাম যতক্ষণ না স্পেশ্যাল ষ্ট্রাইবানাল আমার মৃত্তিব আদেশ দেন। গত সাত বছর আমি যে সবকাব চাকরিতে বহাল আছি, বরাবরই আমার আপনি সবকাবের অনুগত এবং অনুরক্ত বলে জেনেছেন, এবং আমার সম্বন্ধে আপনি যে সিম্বলন্তই গ্রহণ করুন না কেন, আমার আনুগত্যে চিড থাকে না কোনদিনই। তবে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুবোধ, আমার কথাটা একটু সহদয়ভাবে যেন বিবেচনা কবেন, এবং, আমার ধারণা, যেহেতু আমার নির্দেশিতা প্রমাণিত হচ্ছে, যেহেতু আমি সব অভিযোগ থেকেই অব্যাহতি পেয়েছি—আপনি নিশ্চয়ই আমার চাকরিতে ফিবিয় নিতে স্মৃতি করবেন না।* পরিশেষে আপনাকে অনুরোধ জানাই যে, প্রেরিত প্রমাণাদিতে যদি নতুন করে কোথাও আলোকপাতের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ কবে আমার জানালেই, আমি তার বিশেষণ করে

* ১৯১১ সালের ২৬শে জুন তাবিখেও, দেখা যাচ্ছে, বাংলা সরকারেব চীফ সেক্রেটারি C. G. Stevenson Moore, I. C. S. একটি চিঠিতে ভাবত সবকাবের হোম ডিপার্ট-মেন্ট-এর সেক্রেটারিব কাছে ঠিকিরং দিচ্ছেন—কেন যতীন্দ্রনাথকে খালাস কবে দেওয়া হল! এই রিপোর্টটিও কম চিন্তাকর্ষক নয়; কিন্তু পবিসবের কথা চিন্তা কবে এখানে তাব উল্লেখ দিলাম না—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

দেখাব এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের
সুবিধার্থে। ইতি—

বঙ্গবন্ধু,
(স্বাঃ) বতীন্দ্রনাথ মুখার্জী
২৭৫, আপার চিৎপুর রোড
কলকাতা
২০শে মার্চ, ১৯১১

দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের ফাইলে
এই পত্রের পরেই গ্রথিত আছে পেশায়েল ট্রাই-
বুনায়েল বতীন্দ্রনাথের বিবরণে রাজসাক্ষী
লিখিত চক্রবর্তী বেসব বিবৃতি বের তার
কপি।

ডায়েরি-স্বাক্ষরবাক্যের এস ডি ও সাহেবের
কাছে রাজসাক্ষী প্রথম বিবৃতিতে বলে :
শ্যামবাজার সন্নিবিষ্ট বতীনদাদা একটি
হুজুরকে পাঠান, তাব নাম সতীশ সরকার,
বাড়ি নার্টের। (মুদ্রিত গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠা
স্মৃতি)।

বিত্তীয় বিবৃতি : বতীনদাদাকে আমি
দেখলে সন্তুষ্ট করতে পারি। তিনি কোথায়
থাকেন, আমি জানি না। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর
পুত্রের নাম আমি জানি না। (এ, পৃষ্ঠা ৫)।

তারপর লিখিত বলে : আমি তো বলি
মি বেস-অর্ডারটি সতীশ তার নিজের
নামে পাঠিয়েছে।

প্রশ্ন : মনি-অর্ডারটা সতীশ পাঠিয়েছে,
বলেছিলে?

উত্তর : হ্যাঁ, বলেছিলাম।

প্রশ্ন : তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে
টাকার কথাটা তুমি এখন সতীশের ঘাড়ে
চাপাচ্ছ যেহেতু তুমি জানতে পেরেছ এ সময়ে
বতীন্দ্রনাথ ছিলেন দাঙ্গালিতে এবং সেখানে
থেকে এ টাকা তিনি পাঠিয়েছেন বললে
কথাটা হাস্যকর ঠেকবে বলে।

উত্তর : টাকটা যখন এসে পৌঁছবে আমি
তখন অস্বস্থ। আমি তখন জানতাম না
বতীনদাদা দাঙ্গালিতে ছিলেন কিনা।

প্রশ্ন : অস্বস্থ অবস্থায় জানতে না
এ-কথা; কখন তুমি জ্ঞাত পারলে যে
বতীনদাদা দাঙ্গালিতে আছেন?

উত্তর : সেবে ওঠবার পর মল-এর দিকে
যখন কেঁড়ে যেতাম, প্রায়ই শুঁকে দেখতাম।

প্রশ্ন : তাহলে, শুঁকে তুমি একটি-বার
মাত্র ডলরহাঁস স্কেবারে দেখেছিলে যে
কথা সত্যি নয়?

উত্তর : সে-কথাও সত্যি।

হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট দাঃদাল সাহেবের
কাছে লিখিত চক্রবর্তী বলে : বতীনদাদা
ওরফে মুখার্জী কৃষ্ণনগরের দিকে কোথাও
থাকেন, রাইটস বিল্ডিংসে কি যেন কাজ
করেন আমি ঠিক জানি না। (পৃঃ ১৫)

আবার সে বলে : বতীনদাদার ওপর
রাজসাহী, নদীয়া, বশোর ও খুলনার ভাব
ছিল। (পৃঃ ১৫)

অনন্ত সে বলে : ননী গুপ্তের বাড়িতে

অন্যান্য সকলের সঙ্গে বতীনদাদাকেও প্রায়ই
আসতে দেখতাম। (পৃঃ ১৯)

আবার রাজসাক্ষী বলে : ভুবন মুখার্জীর
বাড়িতে আমি থাকাকালীন মাদার (যোগেশ
মিত্র) একদিন আমার লাগদীঘিতে (ডাল-
হোসি স্কেবারে) নিজে যার। সেখানে বেলা
দুটোর বতীনদাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়।
রাইটস বিল্ডিংসের দিকের গাছ-ঘেরা একটা
বেষ্টিতে আমি বসেছিলাম। বতীনদাদা এসে
বসলেন আমার রাজসাহী বাবার ব্যবস্থা
তিনি করেছেন, সতীশ সরকার রাতে এসে
শিবপুরে দেখা করবে আমার সঙ্গে। সেদিন
রাতে শিবপুরে শমশানঘাটে সতীশের সঙ্গে
আমার দেখা হয়; মাদার আমার সেখানে
নিরে যাব; এবং সতীশ আমার ১০১২,
মুসলমানপাড়া লেনের মেস-বাড়িতে নিরে
যায়। (পৃঃ ৩১)

এই জাতীয় আরো কয়েকটি বিবৃতি উদ্ধার
করবার পরে, সরকারি কৌশলী একের পর
এক চোখা চোখা প্রশ্নে রাজসাক্ষীর বিভিন্ন
বিবৃতিব অসঙ্গতি ক্রমে উদ্ঘাটিত করে
দেখান তাব বিশদ বিবরণ এই মেমোরিয়ালে
সংশ্লিষ্ট আছে।

অবশেষে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিজের তরফ
থেকে M. S. D. Butler (Home
Dept.—Political) ১৯১১ সালের
২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলা থেকে বাংলা
সরকারের ফিনাল সেক্রেটারি লেখেন যে,
বতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পক্ষ সমর্থন করে এ-
বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ না করাই ভাল মনে
করেন।

এইভাবেই এ-প্রসঙ্গে চূড়ান্ত বর্ণিকা নেমে
আসে। শেষ হয় বতীন্দ্রনাথের চাকরি-জীবন
এবং কারা-জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি।

২ সাত

কলকাতা-কেন্দ্রে ভার বতীন্দ্রনাথ অর্পণ
করলেন তাব সেনাভাজন সহকারী অতুল
বোম্বের হাতে। শীঘ্রই মহাশয় বাধাব্যব আভাস
দিয়ে বললেন, ইংরেজ আর জার্মানরা সাক্ষ্যগোক্ত
শব্দ করে দিচ্ছে ভাষা-তলায়।

অতুল বোম্বকে বললেন, খুন-ডাকাত
রোখে এখন মন দে দল গড়বার কাজে।

বাংলার জেলাগুলি এবং ভারতের বিভিন্ন
প্রান্ত পরিদর্শন করে দেশের বৈপ্লবিক
প্রস্তুতিব দোড় কতটা, নতুন করে কাগজে
নিলেন বতীন্দ্রনাথ।

গুরু ভোলানন্দ গিরি মহারাজের দর্শন
অভিলাষে হরিষ্যাবে যাবাব অঙ্কুরেতে সমগ্র
উত্তর ভারতটোও দেখে এসেন বতীন্দ্রনাথ।
বেনারসের কেন্দ্রটিতে দিয়ে এসেন নতুন প্রাণ-
শক্তি।* আর বন্দবনে গিরে সাক্ষ্য করলেন

* এই সময়ে বিলালেব স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
(সতীশ মুখার্জী) সম্প্রদায় বেনাবসে ছিলেন
রংপুরের জমিদার সাবদা সৈত্র মহাশয়ের

নিয়ালব-স্বামীর (জে, এন, যানাজীর)
সঙ্গে।

পূর্ব, উত্তর আর পশ্চিম বাংলার ছত্রভঙ্গ
দলগুলোকে আবার একত্রিত করবার পর শীঘ্রই
কলকাতায় ফিরবেন বলে গেলেন বতীন্দ্রনাথ।

যশোব। পৈতৃক ভিটে বিশখালি গ্রামের
কাজেই স্নানাইবার বতীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে
পশ্চিম করলেন তাঁর হেডকোয়ার্টার। দীর্ঘ
বিনোদবালা, সহধর্মিণী ইন্দুবালা, কন্যা
আশালতা এবং পুত্র ভেকেন্দ্রনাথকে নিয়ে
সেখানেই আস্তানা গাড়লেন।

বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া
দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত। গুরুদেবের
অতুল বোম্ব একাই একশ জনের বিরুদ্ধে নেমে
পড়লেন সংগঠনের কাজে। কলকাতা কেন্দ্র
সাক্ষরে তুলতে।

বতীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন এই নেতা
সম্বন্ধে বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “স্বদেশ
বেদলের বেক-উ তরি (অতুলদার) সম্পর্কে
বেদন আসতেন, মূর্খ হয়ে যেতেন—পছন্দ
ফিরেই নিজেরা বলাবলি করতেন, এমন প্রশ্ন
হয় না যে!—তিনিও যেন প্রতি কাজে, প্রতি
কথায় বতীনদার কাছে আত্মনিবেদন করতেন,
বতীনদারই অনুকরণ করতেন, চিন্তায় অনু-
ভূতিতে অবধি। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ
সেকালে ছিল বিপ্লবীদের দীক্ষার এক অপরি-
হার্য অঙ্গ। কিন্তু এঁদের কর্তব্যকে দেখেছি,
এঁদের আত্মসমর্পণ ছিল—একান্তিক আত্ম-
সমর্পণই ছিল—আদার কাজে।”

ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

অনতিকাল পরে, ১৯১১ সালেই, পারস্য
দেশ ভাগাভাগি নিয়ে ভাবী প্রথম মহাযুদ্ধের
সম্ভাবনা দেখা দিল। উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে
ইংরেজ—হুমকি খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে
পড়লেন পাকিস্যার শাহ।

বতীন্দ্রনাথের বন্ধু লিয়াকৎ হোসেন এক
জনসভায় ভূবিদ্যাদানী করলেন “ইউরোপের
আগ লগ্ জাফগী!”

আগ লগ্ জাফগী!... কথাটা নতুন
উদ্দীপনার সঞ্চার করল বেন। কথাটা বিপ্লবী-
দেব মধ্যে চাউন হয়ে গেল। বতীন্দ্রনাথ জেল
থেকে বেরিয়েই তো এর আভাস দিয়ে-
ছিলেন: এত শীঘ্র তা বাস্তবে পবিপত্ত হতে

বাড়িতে। ইনি তখনকাব প্রখ্যাত বিপ্লবীনেতা।
আব, মোকদা সামাধ্যাবী-প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী
দলও তখন বেশ উৎসাহেব সঙ্গে এখনে কাজ
করছেন। এই সম্মিলিত দলের সঙ্গেই পরে
রাসবিহারী বসু যোগাযোগ করেন; এবং আরো
পরে ১৯১৪ সালে মহাশয় শব্দ হবারও
পরে, শচীন সান্যাল কলকাতা থেকে বতীন্দ্র-
নাথের শিবা অতুল বোম্বের পরিচয়পত্র নিয়ে
ওখানে গেলে পরে রাসবিহারী বসু সঙ্গে
যোগদানের সুযোগ পান। —পৃঃ বতীন্দ্রনাথ

চলছে দেখে মৃদু আন্তরিকতার ভঙ্গি হারে উঠল দলগুলো।

যতীন্দ্রনাথের অনুগামী বিপ্লবীরা যুদ্ধলেন : মহাবীর বাঘে ভারতে ইংরেজের বস্ত্রশ্রমী আলাগা হতে বাধ্য। তার ওপরে, ভারতের প্রাচীন সহানুভূতি নিয়ে বিদেশী শ্রমিকগণ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, তবে ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন সকল হতে দৌরে লাগবে না।

এই রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে কাকে কাকে কিশোর, তরুণ, যুবক কাঁপিয়ে পড়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে, তাদের অনেকেই হাল ছেড়ে দেয় নি, এগিয়ে চলেছে তারা মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে আবে তরুণ, কিশোর, যুবক উদ্ভাস হলে ছুটে আসছে জন্মভূমির শ্রমিকমোচনের দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। শ্রমীয়ে এই জাগ্রত শ্রমবীরের আত্মত্যাগে অস্বাভাবিক সর্গেই পথে সূত্র কোটি কোটি প্রাণ জাগবে, জনচেতনায় উৎসাহ হয়ে উঠবে তাদের একমাত্র আশ্রয়, প্রত্যক্ষ ও পবিত্রভাবে শ্রমীয়ে এই পাগল আপনতোলাদের কাছে সহানুভূতি নিয়ে সহযোগিতা মনোভাব নিয়ে দেশবাসী বৈদিন উঠে দাঁড়াবে, সৌদিনই সার্থক হয়ে উঠবে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা।

সেই ব্যাপক জাগরণকে স্বরাশ্রিত কবাবা জনোই না শ্রমীয়ে জাগ্রতদের আমন্ত্রণ জানালেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ সবিশেষ মহাকালী তাকে নৃত্যে ছন্দ মেতে উঠতে, বললেন, “আগা মরব, দেশ জাগবে।”

মাণিকতলার বোমার বাগানের কর্মীরা ধবা পড়ে ধাবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি সূত্র ধরে পুঁজি বখন প্রবল ধব-পাকড়ের জাল পেতে গুপ্ত-সমিতির সংগঠন প্রায় অকেজো হবে তোলে—তখন বলো, গোষ্ঠী সম্প্রদায় দলেব সব বিভেদ ভুলে গিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে নাবাধ-গল্পের প্রাক্তন মূহুর্ত অবিনাশ চক্রবর্তী ঘবে ধরে গিয়ে তাক দিতে লাগলেন—“ওরে, দেশে যে এখনো যতীন্দ্রনাথ বসেছেন ভুলে বাস কেন? এত সহজেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘবে ফিবিবি? যতীন মুখুজ্যেব মতো মহামানব তো হাল ছাড়ে নি! তাকে ঘিবে দাঁড়া তোবা—”

পিতৃদত্ত বাট হাজাব টাকা তিনি নিঃশেষে দাঁপে দিয়েছিলেন বিপ্লবের কাজে ব্যবহারের জন্যে। তা ছাড়া তাঁর উপার্জনেরও প্রতিটি কপর্দকে ছিল বিপ্লবীদেরই একচ্ছত্র আধিকার। ১৯০৬ সালে ‘যুগান্তর’, ‘সন্ধ্যা’, ‘বন্দেমাতরম’, ‘নবশক্তি’ প্রভৃতি বিপ্লবীদের মূখ্যপত্রগুলি পরিচালনার জন্যে যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্ম-সামর্থ, গায়সুল্লাহ চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীও ছিলেন তার সদস্য।

অবিনাশ চক্রবর্তীর এই সশ্রমলবীর উদ্যোগে সেদিন বহু ধরমুখো বিপ্লব-কর্মীকে

দলে টেনে আনেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বহিষ্কৃত চারপের মতো একতার সৌহারদের ঘে বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা প্রথম ফলপ্রসূ হয়ে উঠল ১৯১১ সালে, যতীন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এলেন যখন নতুন কর্মসূচী নিয়ে। আর মহান একেব এই যে বীজ বপন করছিলেন মূহুর্ত অবিনাশ চক্রবর্তী, তার প্রথম ও শেষ সাক্ষ্য সাক্ষ্য রূপ দেখা গেল

১৯১৪ সালে, যখন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের পতাকাভলে সমস্ত বিপ্লবী দলগুলিই সমাবেশ হয়ে দৃঢ়সমিদ্ধ ব্যূহেব আকার ধারণ করল।

বৃটিশ গোয়েন্দা-বিভাগের কড়া নজর আঁটার মতো লেগে রইল যতীন্দ্রনাথের পিছু পিছু। তবে, তাদের বিপোর্ট থেকে ভাবত সরকার আমন্ত্রণ হলে যে, সবকারি চাকরি থেকে ববশান্ত হয়ে এবং বংসবাধিক কাল জেলের

যাক একে দাঁত আর সুন্দর হাজি

সাদনা দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দস্ত্রোগের ভয় থাকে না। দস্ত্রাজী সূক্ষ্ম, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র ঘোষ, এম.এ., অধ্যাপক সত্যেন্দ্র, এফ.সি., এম.এ. (লণ্ডন), এম.সি., এম.এ. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা থেকে হুঃ ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) অধ্যাপক

নিপীড়নে নাজেহাল হয়ে যতীন্দ্রনাথ এবার কিনাইদা-তে গিয়ে শ্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে গৃহস্থ জীবনে মনোনিবেশ করেছেন। বিপ্লবের নেশা ছুটে গিয়েছে। টাকা রোজগারের খালি সাইকেল ঠেঙিয়ে নবোত্তম ঘোড়ার চেপে সরকারের এবং জেলা-বেডর কন্ট্রোল বতীন মন্ত্রণালয় সর্বদা আনাগোনা করছেন বশোর, নদীয়া, খুলনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা-গুলোতে। যতীন মন্ত্রণালয় স্বাধীন কন্ট্রোল বতীন বসন্তা বেশ ফেপে উঠছে দিনে দিনে। কিনাইদা-য় বেড-অফিস। ব্রাণ্ড-অফিস একটা কলার শহরে, অন্যটা মাগদুরা। মাগদুরা অফিসের দার দিয়েছেন নলিনীকান্ত কর নামে এক কর্মচারীর হাতে। ... পুর্নালেশের মতো—অসুস্থ কর্মচারীর যতীন্দ্রনাথ। বড় বড় রিজ আর রাজপথের কন্ট্রোল নিচ্ছেন তিনি। ময়দানবে উদ্যমে কাজ শেষ করে ফেলছেন। ওসব অঙ্গুলে অঙ্গুল সময়ের মধ্যেই নতুন করে কখনো রিজ আর রাজপথ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে লিপ্সী যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায়।

কুষ্টিয়া রিজ গড়ে ওঠবার মর্মসুত্র কাহিনী যতীন্দ্রনাথ তার জননী শরৎশশী দেবীর মুখে শুনিয়েছেন। সেদিন তার সর্বান্তঃকরণে জ্বল উঠেছিল একটিমাত্র খুব-সম্পন্ন : বড় হয়ে দেখিয়ে দেব সাকো কীভাবে গড়ে উঠেছে। তার প্রাণে বড়ই বেজেছিল নির্দেশ ফুলদের ওপর শাসক সাহসবদের অত্যাচারের ক্রোধ কাহিনী আর এ-দেশের লোক অলস অকর্মী অকর্ম—এইসব মিথ্যা অপবাদ।

জুলাই যান নি যতীন্দ্রনাথ তার শৈশবের সেই প্রতিজ্ঞা। আসা-বাওয়াব পথে আবল্য কুষ্টিয়ার রিজ তাই সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাবিদার দেশবাসীকে রক্ষা করার অনুরোধের মতো, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার সম্প্রদায়ের কথা আর তার জননী সমস্ত লিপ্সুর মধ্যে প্রমত্ত জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের কথা।

তাই যতীন্দ্রনাথ অমন অভিনিবেশ নিয়ে মড়ে জুলাই লাগলেন একেব পব-এক রিজ, নতুন নতুন রাজপথ, দৌড়ে দিলেন কত কর্মঠ তবু আর কুশলী হতে পারে এ-দেশের লোক—ছোটখাটো কাজের মধ্যেও।

যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি বহন করে আজো সেইসব রিজ দাঁড়িয়ে আছে। সেইসব রিজের তলা দিয়ে নৌকায় যাতায়াতের পথে অজো পথিকেরা পবনকে স্মরণ করিয়ে প্রণাম্য এই মহাপুত্রের অগণিত কীর্তি কাহিনী,

* নলিনীকান্ত করের উল্লেখ পূর্বেই করেছি; কুষ্টিয়ার কাছে এংমামপুর গ্রাম থেকে ইনি এবং অতুল ঘোষ যতীন্দ্রনাথের কাছে অল্প বয়স থেকেই যাতায়াত করতেন এবং বিপ্লবের কাছে যতীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠেন।

—পুত্রীন্দ্রনাথ

প্রাণের ঠান্ডারের মতো প্রথম জানা তার উদ্দেশ্য আর বৃদ্ধ ফুলিয়ে তার কথা স্মরণ করে—যেন তাদেরই ঘরের লোক ছিলেন তিনি : এ'বই কোল-পাঠে চাপবর সৌভাগ্য হয়েছিল হুজুতো এদেরই কারো বাপ কিংবা জোঠা নয়তো কাকার।*

শুধুমাত্র রিজ গড়া নয়, কন্ট্রোল করা নয়। ইংবেজ গোয়েন্দা-মহল চমৎকৃত হয়ে যায় : বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ এবার তা হলে পুরো সংসারী হলেন? তিনি জমি কিনছেন, পরিবারের জন্য ইমাং গাঁথাচ্ছেন, কিনছেন ফলের বাগান, খেত-খামার। পুর্নালিত হন বিদেশী কণ্ঠগন্ধ।

বিদেশী সরকারের মনোভাব শুনে বিপ্লবীরাও হেসে বাচেন না। যতীন্দ্রনাথের কন্ট্রোল আর আগেরগাড়াই যে জেলার জেলার ঘুরে গুলু-সমিতির সংগঠনগুলো পোতা কবে তেলবার অছিল এ-সঙ্গে গোয়েন্দাদের মাথা বুকল বখন, তখন বড়ই দেরি হবে গিয়েছে। সেকথা পরে বলব।

যতীন্দ্রনাথ গভীরে গোপনে কী কাজ করে চলেছেন তার সম্ভান বিদেশী সরকারের গোয়েন্দারা তো দূরে থাক, তার সহকর্মীরাই খুব কম জানতেন। লোকচক্ষুর অগোচরে নীরবে কাজ করে যাবার এই প্রবৃত্তি তার মধ্যে এত প্রবল ছিল বলেই তো আজ আমবা সম্প্রদায় বিহীন হয়ে পড়ি নয়তো যিয়ার কৃপণ হয়ে উঠি তারই কীর্তিকে তাঁর অবদান বলে আজ স্মরণ করতে, স্বীকৃতি দিতে।

অথচ যতীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটি তাৎপর্য কেমন প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল তার জনৈক জীবন-চরিত্রের কবিতা : “... এই শক্তিশালী জীবন-প্রবাহ তাহার সমস্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ লইয়া কখনো লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। গভীরতলসগুণী বিবর্ত-কাম তিমির মত, এই জীবন, জাতির গভীর গোপন অন্তরতল-আলোড়িত বিক্ষোভিত করিয়াছে, কদাচিৎ দুই-একটি আবর্ত একান্ত অসতর্কভাবে বাহিরের দ্রুত শান্তিকে ক্ষণ-কালের জন্য ক্ষুদ্র কবিতায়ে মাত্র।”

আলোচ্য পর্বে যতীন্দ্রনাথ কতদূর কর্ম-বাস্তব, বিপ্লবের আবেগের তলার তলার কতদূর তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তার একাধিক বর্ণনা তার বিভিন্ন জীবন-চরিত্রে পাই। উদাহরণস্বরূপ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

* গৌরীকিশোর ঘোষের ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ উপন্যাসেও সম্প্রতি এই উক্তি সমর্থন পাই নি কি? —পুত্রীন্দ্রনাথ

* বাগেশ্বর যুদ্ধের সাত-আট বছর পরে বিপ্লবী নেতারা মিলিতভাবে “বিপ্লবের বল” নামে যে জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন এবং চন্দননগর থেকে প্রকাশ করানোর পিঠিপঠিই বাজেন্দ্রনাথ হয়ে যাওয়া সেই ইতিহাস-বিশ্লেষণ “বিপ্লবের বল” থেকে উদ্ধৃত।

‘বাবা যতীন’ থেকে মাত্র একটি দিনের ঘটনা শোনাই নিজের ডায়েরি :

সকালে চুয়াডাঙ্গা থেকে সাইকেলে চড়ে যতীন্দ্রনাথ বগুনা হলেন, একঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছলেন কিনাইদার।—এককাপ চা খেতে খেতে বিপ্লবী সহকর্মী বিভূতি দেবরায়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি তখন রওনা হলেন বশোর। কিনাইদা থেকে বশোর আঠাশ মাইল রাস্তা। কবিদাজ বিজন রায় মশাইকে সমিতি-সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে পাঁচ-সাত মিনিটকাল বশোরে কেটে গেল। সবচেয়ে বেশি মাকে দরকার সেই সত্যেন সেনকে গিয়ে ধরতে হবে মাগদুরা।* অতঃপর যতীন্দ্রনাথ তখন পাড়ি দিলেন মাগদুরা—আরো আঠাশ মাইল পথ। সেখানে পৌঁছে যতীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, তিনি আসছেন। এই কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে সত্যেন একটু আগেই রওনা হয়ে গিয়েছেন কিনাইদা, সাইকেল নিয়ে। এ-কথা শোনার মাত্র যতীন্দ্রনাথ আবার ছুটলেন কিনাইদার দিকে, নক্ষত্রগতিতে। মাগদুরা থেকে কিনাইদা সত্যেনের মাইল পথ। সত্যেন সেখানে পৌঁছবার আগেই তাতে ধবে ফেলতে হবে।—নইলে তিনি যদি আবার যতীন্দ্রনাথকে খুঁজতে বশোর যান?...

যতীন্দ্রনাথ প্যাডল করে চলেছেন খুব জোরে। কিন্তু সত্যেনকে তো দেখতে পাচ্ছেন না। মধুপুরের হাটতলা পার হয়ে গেলেন—আর মাত্র চাব মাইল পথ। কিন্তু সত্যেন গেল কোথায়? আরো জোরে—আরো—আরো জোরে ছুটল সাইকেল। এল মোপাঘাটার পোল—কিনাইদা আর মাত্র দুই মাইল। কিন্তু সত্যেন কই? আরো জোরে...আরো...সাইকেল ভেঙে যাবে না তো?...আর মাত্র মাইল-দেড়েক পথ। রাস্তাটা এখানে খুব ভাল। দু-পাশে বড় বড় কাড়ি। হাল্লা-শীতল।

ওই দূরে—কে একজন সাইকেল চড়ে যাচ্ছে না?—আগের সাইকেলটা ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। আরে—ওই তো, সত্যেন! ব্যাস, আর কোথায় যার? কিনাইদা শহরের একে-বাকে প্রান্তে, টুইডি স্পোর্টিং গ্রাউন্ডের কাছে এসে যতীন্দ্রনাথ সত্যেনকে ধরে ফেললেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন মাঠের ধারে। আউ-গাছ-তলার কথাবার্তা হল। পোস্ট-অফিসের ধারেই চক্রবর্তী মশাইয়ের মিষ্টি-দোকান। পেটভরে কাঁচাগোলা খেলেন দু'জন। সত্যেনকে নির্দেশমতো পথে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চললেন চুয়াডাঙ্গা। আবাব বাইশ মাইল পথ। সেখান থেকে বিকেল পাঁচটার ডাউন চাটগা মেল-ট্রেন চেপে রওনা হলেন তিনি কলকাতা।

অল্প কয়েক ঘটনার মধ্যে এই একশ*

* দু-এক বছরের মধ্যেই এই সত্যেন সেনকে দলের কাজে যতীন্দ্রনাথ আমেরিকা পাঠালেন। যুদ্ধের সময় ইনি আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে যতীন্দ্রনাথের কাছে বিদেশী সাহায্যের চুক্তি সংবাদ নিয়ে আসেন।

পাণ্ডাহিক বসন্তমতী

সভেরো মাইল পথ মাইকেলে অভিক্রম করবার মতো অতি-মানব ইংরেজের গোয়েন্দা-বিভাগে ছিল না বোধহয়। তাই, কথটা যখন সরকার থেকে জানতে বাকি রইল না যে, কনষ্টান্টিনর আড়ালে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের ঝিই-ছিড়িয়ে চলেছেন চাবধারে, গোয়েন্দা-বিভাগের ওপর আবার তৎপর হবার জবুর নির্দেশ এল।

ফলে যতীন্দ্রনাথের গতিবিধি অনুসরণে অক্ষম গোয়েন্দাব্যবস্থা অনেকটাই তাই শব্দশূন্য হল। ছা-পোষা এই গোয়েন্দাদের শাস্তি দিতে বলাবলি বেগেছে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের মানবিকতা-বোধে। তিনি ওদের বহুবাহু নিবেদন করেছেন তাঁর পেছা নিতে। কিন্তু তাবা যখন জানাল, “দাদা, এ-কাজ না করলে আমরা সসোব যে অচল হয়ে যাবে”—করুণা-পবন তখন থেকে যতীন্দ্রনাথ আর তাদের দিকে হৃদয়ঙ্গম করেন নি। তারা তাদের সাধামতো যতীন্দ্রনাথের গতিবিধির স্বতন্ত্র হৃদয় পাথ, তাই দিয়েই দিনের পর দিন তাঁর নামে রিপোর্ট দাখিল করে চলে।

আবার অনেক দিন একবারেই যতীন্দ্রনাথের নাগাল সারাদিন না পেয়ে কোন কোন গোয়েন্দা পরদিন গাড়ি ভাড়া করে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিল, “দাদা, আজ আমার গাড়িতে আপনার না-গেলেই নয়। কাল তো একদম রিপোর্ট পাঠাতে পারি নি—”

“ওঃ, এই কথা। তা’ এই নে, এই রিপোর্ট লিখে দিস।” বলে কোনদিন যতীন্দ্রনাথ সত্যি ঠিকিই তাই গতিবিধির হৃদয় দিয়ে দিয়েছেন, কোনদিন-বা মৃদু হেসে গোয়েন্দার ভাড়া কবা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসেছেন। প্রাণের মমতা তিনি কবেন না। ভয় তিনি কাউকে কবেন না। জীবনমুখ পুরুষের আবার কি?

এমনি এক গোয়েন্দা অফিসার একদিন যতীন্দ্রনাথকে পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ গুরুত্বভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তরুণ অফিসারের দুর্গতি দেখে যতীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন সোজা নিজের বাড়িতে। ঘরের ছেলের মতো তাকে রাখলেন, সেবা-স্বয়ং করলেন, সারিবে তুলে তাকে তাব বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

এমনি তো কতই ঘটেছে।

১৯১১ সাল। কাশী স্টেশান।

গাড়ি থেকে যতীন্দ্রনাথ নামলেন সপরিবারে। স্টেশানে তাঁর জন্যে অপেক্ষমান বিপ্লবী কর্মীরা এগিয়ে এলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কর্মীরা কাশীর কেন্দ্রগুলিতে ব্যাভারাত করেছেন, সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের মিলন-কেন্দ্রগুলির অন্যতম প্রধান হল কাশী।

এদের কাছে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এলেন তাই নতুন আশাবাণী বহন করে।

কাশীর কর্মীদের সঙ্গে স্টেশান থেকে বাইরে এসেই যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল—অদূরে তাইই পরিচিত দৃষ্টি গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে। ...কর্মীদের একজন ব্যাঙ্কলেন কুলি ডাকতে। যতীন্দ্রনাথ তাকে নিরস্ত করলেন, “দাঁড়া, কুলির দরকাব নেই। একটু মজা দেখাই।”

গোয়েন্দাদৃষ্টির দিকে ফিরে নাড়ালেন যতীন্দ্রনাথ। হাতছানি দিয়ে তাদের ডাক দিলেন। পকপরের মুখ চাওরা-চাওরি করে তাবা বুকল, বেগতিক। অগত্যা, মুখ কাঁচু-মাচু করে এগিয়ে এল।

কাছে আসামাত্র যতীন্দ্রনাথ তাদের নির্দেশ দিলেন, মালগুলো ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিতে।

হুকুম তামিল হল।

বিপ্লবী কর্মীরা গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। অন্যটিতে সপরিবারে যতীন্দ্রনাথ। আর, মস্তাবিস্তের মতো গোয়েন্দারাও পিছা নিল।

যতীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় গিয়ে গাড়ি থামল। আবোহীরা নামলেন। আবার কুলিগিরি করতে হল গোয়েন্দাদৃষ্টিকে।

তরপর, তাদের ডেকে নির্দিষ্ট করিয়ে যতীন্দ্রনাথ বেহাই দিলেন, “নাও, বাড়ি চেনা হল তো?”

সঙ্গের বিপ্লবী কর্মীরা তো অবাক।

গভীর বাত।

ঘোড়াষ চেপে যতীন্দ্রনাথ কিনাইদার বাড়িতে ফিরলেন। পথে ভীষণ অসুস্থ। সরু একটা পথে-চলা পথ। বুনো লতা কাটা-কাড়ে সে পথও বৃদ্ধি এসেছে।

ঘোড়া হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

ঘোড়াকে আদর কবে যতীন্দ্রনাথ তখন দিলেন, “চল, চল!”—কিন্তু শত চেষ্টাও তাকে এক-পা চালানো গেল না।

নতুন আরবি ঘোড়া, মিশকালো রেশমের মতো গা। ইষৎ ভীত হয়ে নাক উঠিয়ে কাঁপাড়া করে কী যেন শব্দে আব চন্মন করে উঠেছে।

যতীন্দ্রনাথ বুকলেন, কাছই কোনও বড়-রকমের বিপদ। গায়ের কোট খুলে নিয়ে ঘোড়ার নাকে বেশ করে বেঁধে দিলেন যতীন্দ্রনাথ। সামান্য আদরেই ঘোড়া এবার চলেতে শুরুর করল।

সজাগ দৃষ্টি মেলে যতীন্দ্রনাথ চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চললেন।

কয়েক গজ এগিয়েছেন মাত্র। স্লাদ জোছনার হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল বিরাট একটা ছায়া নড়ছে। একটা বাঘিনী। তিনটে বাচ্চা সে শিকার করা শেখাচ্ছে : সামনেই আধ-ময় একটা খরগোশ ছটকট করছে।

যতীন্দ্রনাথের সাধ হল বাঘের ছানা-গুলোকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। পুরুষের।

গুলীর পক্ষার মধ্যে পেঁপেই নিঃশব্দে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা গাছে অবতালে। বন্দুক বাব করলেন। আবহা অন্ধকারে বাঘিনী চোখদুটো জ্বলছে—জ্বলন্ত সেই চোখদুটোর মাঝখানে তাগু কবে গুলী চালালেন যতীন্দ্রনাথ।

অব্যর্থ অগ্নিনালিকা। দুটি-মাত্র গুলীর আওতা। মাত্র একটিবার রাতির বনভূমি কাঁপবে বাঘিনী গর্জে উঠল কাতব হুকাবে। তারপর, প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল জুমট স্তব্ধতার বৃক্কে।

যতীন্দ্রনাথ কাছে গিয়ে দেখলেন, বাঘিনী মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। আর বাচ্চা তিনটে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু দ্বিবে।

সব্বলে যতীন্দ্রনাথ তাদের চাদবে বেঁধে নিয়ে ঘোড়ার চেপে বসলেন।

কিনাইদার পেঁপেছিলেন যখন, রাত তখন শেষ হব হব। কিনাইদার বাড়িতেই প্রতিপালিত হতে লাগল বাঘের বাচ্চাগুলো।

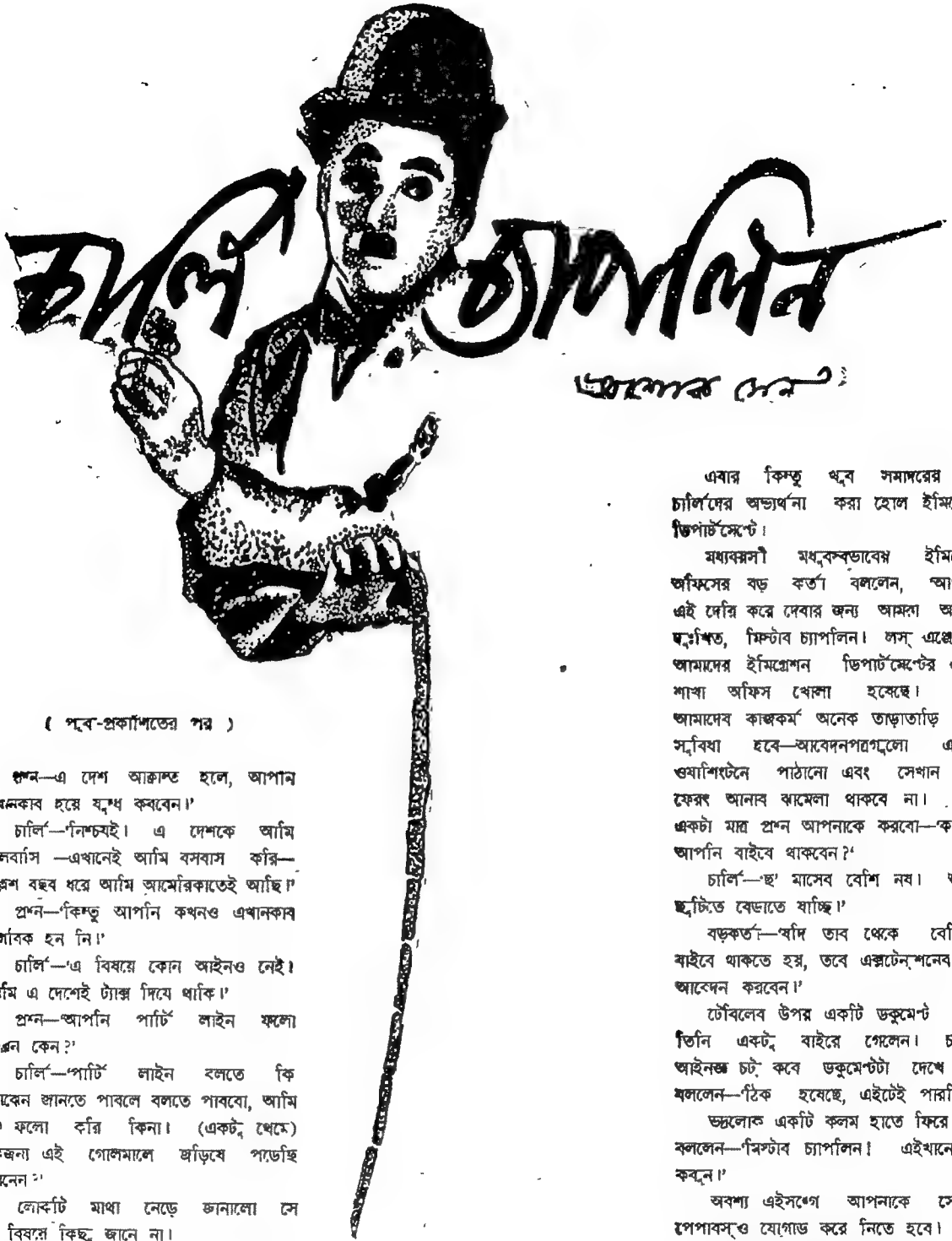
(রমেশ)

তোমার জন্যে

স্বহিমরজন মুখোপাধ্যায়

তোমার জন্যে কষ্ট আমার ভাগ্যে লেখা ছিলো
বৃকের মধ্যে অশ্বখগাছ উপড়ে ফেলে ঝড়
বাকি এশন পদস্থলন সমুদ্র-সৈকতে
কেমন করে বাঁচি—

দুঃখ বৃষ্টির অনন্তকাল ভাগ্যে লেখা ছিলো
কবে বৃকের জানলাগুলি খুলবে সূর্যালোকে—
যায় আসে না আমার মনে রাখো না-রাখো, তুমি
সুখে থাকলে বাঁচি।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কখন—এ দেশ আক্রান্ত হলে, আপান
কখনকার হয়ে যুদ্ধ কববেন।'

চার্লি—'নিশ্চয়ই। এ দেশকে আমি
অবাস্য—এখানেই আমি বসবাস করি—
'প্রশ্ন—কিন্তু আপান কখনও এখানকার
অপারক হন নি।'

চার্লি—'এ বিষয়ে কোন আইনও নেই।
আমি এ দেশেই টাঙ্গ দিখে থাকি।'

প্রশ্ন—আপনি পার্টি লাইন ফলো
কেন কেন?'

চার্লি—'পার্টি লাইন বলতে কি
নাকেন জানতে পারলে বলতে পারবো, আমি
কি ফলো করি কিনা। (একটু থেমে)
কিন্তু এই গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি
কেনেন?'

লোকটি মাথা নেড়ে জানালো সে
এ বিষয়ে কিছু জানে না।

চার্লি—আপনাদের সবকবের উপকার
করে গিয়ে।'

লোকটি বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো।

চার্লি—আপনাদের রাগিয়াব এম্বাসেডর
জোসেফ ই. ডেভিডস ল্যান্ডবাইটিস বোংগ
আক্রান্ত হয়ে স্যানফ্রান্সিসকোতে শেষ
হুহুতে বাশিষান ওয়াব বিলিফ সম্বন্ধে
বক্তৃতা দিতে যেতে পাবেন নি। সবকারের
একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিব দ্বারা অনুদ্রুত
হয়ে আমি গিয়ে ডেভিডসের জায়গায় বক্তৃতা
দিই। সেই থেকেই অববত এই ধরনের
খামেলা আমাকে পোহাতে হচ্ছে।'

তিন ঘণ্টা হবে এইভাবে চার্লিকে
বিরত করা হয়েছিল। এক সপ্তাহ বাদে
তাকে টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হোল
ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে দেখা করতে।
চার্লি লইয়াব ইন্সিস্ট করলেন যে এবার
তিনিও চার্লি'র সঙ্গে যাবেন। কাবণ আবারও
তাকে অন্যান্য প্রশ্ন কবা হতে পারে এবং
সেক্ষেত্রে আইনজের সঙ্গ পাকা দরকার।

এবার কিন্তু খুব সমস্যার সঙ্গ
চার্লি'দের অভিযন্তা করা হোল ইমিগ্রেশন
ডিপার্টমেন্টে।

মধ্যবয়সী মধুবস্বভাবের ইমিগ্রেশন
অফিসের বড় কতা বললেন, আপনাব
এই দেরি করে দেবার জন্য আমাব অত্যন্ত
হুশিষ্ট, মিষ্টাব চ্যাপলিন। লস এঞ্জেলসে
আমাদের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের একটি
শাখা অফিস খোলা হবেছে। এখন
আমাদের কাজকর্ম অনেক তাড়াতাড়ি করার
সুবিধা হবে—আবদনপরগুলা একবার
ওয়াশিংটনে পাঠানো এবং সেখান থেকে
ফেরত আনাব খামেলা থাকবে না। আর
একটা মাত্র প্রশ্ন আপনাকে করবো—কতদিন
আপনি বাইবে থাকবেন?'

চার্লি—'ছ' মাসের বেশি নয়। আমরা
ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছি।'

বড়কতা—'যদি তাব থেকে বেশিদিন
বাইবে থাকতে হয়, তবে এক্সটেনশনের জন্য
আবেদন করবেন।'

টোবিলের উপর একটি ডকুমেন্ট রেখে
তিনি একটু বাইরে গেলেন। চার্লি'র
আইনজ চট করে ডকুমেন্টটা দেখে নিলে
হললেন—'ঠিক হবেছে, এইটেই পরমিট।'

ভুললোক একটি কলম হাতে ফিরে এসে
বললেন—'মিষ্টাব চ্যাপলিন! এইখানে সই
করুন।'

অবশ্য এইসঙ্গে আপনাকে সেইলিং
পেপারস্ও যোগাড় করে নিতে হবে।

সই কবা হবে গেলে ঐ ভুললোক চার্লি'র
পিঠ চপড়ে দিখে জানালেন ঐ ডকুমেন্টটিই
চার্লি'র পারমিট। এবপব গন্তব্য কবলেন—
আশা কবি ছুটিটা সুন্দবভাবে বাইরে কাটতে
পারবেন—অবসব যাপনের পব আবার
অবিলম্বে দেশে ফিরে আসবেন।'

এই দিনটি ছিল শনিবাব। রবিবার
সকালে নিউ ইয়র্কে যাবাব ট্রেন ধবতে হবে।
চার্লি'র ইচ্ছা তাব সেক্ষে ডেপার্ট বায়টা
উনাও যাতে খুলতে পাবেন সে বিষয়ে একটা
ব্যবস্থা কবে যাবেন। কাবণ হঠাৎ যদি তাঁর
একটা কিছু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে উনাকে এই

ক্ষমতা দেওয়া থাকলে কোনো বিষয়েই কোনও অসুবিধা হবে না। সেফ ডেপার্টমেন্টেই তার বেশির ভাগ সম্পত্তি কাগজপত্র ভাবে রাখা হয়েছিল। উনা এই বিষয়ের ব্যাপ্তির কাগজপত্র সই করতে বড় দৌঁধ করে ফেলেছিলেন। এই দিনটিই ছিল চার্লিসের লস এঞ্জেলসে থাকবার শেষ দিন। ব্যাপ্তি বন্ধ হতে আর দশ মিনিট মাত্র বাকী। আর দৌঁধ করলে চলবে না—দশ মিনিট মাত্র সময় হতে আছে—বললেন চার্লিস।

উনার এসব বিষয়ে ভয়ানক বকসের আলস্য—তার ইচ্ছা ইউরোপ থেকে ঘুরে এসে এই ব্যবস্থার পাকাপাকি করেন। কিন্তু চার্লিস কিছুতেই রাজী হলেন না এবং ব্যাপ্তি গিয়ে উনাকে দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে নিলেন। এই কাজটা করতে খুবই ভাল হয়েছিল। কারণ তা যদি না কবা হতো তাহলে আমেরিকা থেকে সম্পত্তি বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বাকী জীবনটা চার্লিসের আদালতে আদালতেই ঘুরে বেড়াতে হতো। নিউ ইয়র্ক রওনা হবার দিন, মেইজু হেলেন এবং বাটলার হেনরী'র কাছে বিদায় নিয়ে চার্লিস কিচেনে ঢুকলেন কুকু আনার সংগে দেখা করতে—আনা ছিল মোটাসোটা এবং গোলগাল ধবল—সে একটু কলাও ছিল। সবশেষে বিদায় নিয়ে এলেন উনা। তার কাছে চার্লিস শুনলেন যে, উনাকে বিদায় দিতে গিয়ে পবিচারিকারা কেঁদে আকুল হয়েছিল।

চার্লিস সহকারী পরিচালক জেবি এসপুস্টেইন 'সি-অফ' করতে স্টেশন অবধি এসেছিলেন।

সেইল কববার আগে এক সপ্তাহ চ্যাপলিনরা নিউ ইয়র্কে কাটলেন। চার্লিস লাইয়াব চার্লিস সাওয়ার্ডজ একদিন এসে জানালেন যে ইউনাইটেড আর্টিস্টের একজন ভূতপূর্ব কর্মী কয়েক মিলিয়ন ডলারের জন্য কম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করছেন। কিছুটা বিভ্রম্বনা কবা ছাড়া লোকটা আর কিছু অবশ্য করতে পারবে না। বাই হোক চার্লিস ওপব যাতে কোন সামন্স জারী করা না হয় সে ব্যবস্থা কবাব দরকার—বললেন আইনজ্ঞ। সময় তা না হলে ছুটির ভেতরেই চার্লিসকে ফিরে আসতে হতে পারে।

এই কারণেই নিউ ইয়র্কে শেষ চারদিন চ্যাপলিন আর ঘর থেকে বেরোলেন না।

যাত্রার দিন ভোব পাঁচটার চার্লিস এসে ফুইন এলিজাবেথ জাহাজে উঠলেন। তার লাইয়াবের নির্দেশ ছিল অন্যের অলঙ্কার জাহাজে এসে উঠতে হবে এবং জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত নিজের সুইট ছেড়ে চার্লিস ডেকের উপর আসবেন না। এইভাবে সাবধান থাকলেই আব তার উপর প্রেসস সার্ভিস হতে পারবে না। চার্লিস দেখলেন আবার হাঙ্গামার পড়ার চেয়ে এই নির্দেশ মেনে চলাই ভাল। হঠাৎ ক্ষমতা শূন্য আঘাতের শব্দ হল—সঙ্গে

সঙ্গে উনাব গলার আওয়াজ—'আমি উনা!'। চার্লিস উঠে দরজা খুলে দিলেন।

উনা বললেন—'জিম', এগাী এসেছে আমারেব বিদায় অভিনন্দন জানাতে। আমি তাকে চিৎকাব কবে জানিয়ে দিবেছি তুমি প্রেসেস সার্ভিসদের হাত থেকে রক্ষা পাবাব জন্য সুকিষে আছ। তাকে আরও বলেছি পেট'হোল দিয়ে তুমি তাকে ওয়েভ কববে। ঐ ঐখানে সে পিয়ারের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে আছে।'

চার্লিস দেখলেন একদল লোকের থেকে একটু দূরে জিম দাঁড়িয়ে রয়েছে। চার্লিস ও উনা দুটি পোর্টহোল দিয়ে অনেকবার ওয়েভ করলেন বটে, কিন্তু জিম তাদের দেখতে পেল না। চার্লিসও জিমকে এই শেষবারের মত দেখলেন। এর দু'বছর বাদে তিনি স্টে অ্যাটরকে মার যান।

জাহাজ ছাড়ল। ঘর থেকে বোঝে চার্লিস জেনের ওপর এলেন—এখন তিনি মুক্তপুরুষ। বেশব কবুদেব পেছনে ফেলে এলেন তাদের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল উনার সংগে। উনা এবং চার্লিস ঠিক করলেন বেশ দীর্ঘ সময় অবকাশে কার্টাবেন এবং প্রচুর আনন্দ করবেন। এই সময়টোতেই আবার লাইমলাইট মৃত্তিকাত কববে—সুতরাং একই সংগে ব্যবসা এবং আশাদ-আহ্বাদে দিন কাটাবাব সুযোগ পাওয়া যাবে।

পরের দিন শ্বশিতে ভরা মন নিয়ে সবাই লাঞ্জে বসেছেন। চ্যাপলিনদের অতিথি হিসাবে আছেন আর্থার বুবলনটাইনবা এবং এডল্ফ গ্রান খাওয়া চলেছে এমন সময় হ্যারী ক্রোকরের হাতে একটি কেবলগ্রাম দিয়ে গেল একজন পরিচারক। ক্রোকর সেটি পকেটে ভরে রাছেন, কিন্তু মসেজাব বললেন ও'রা ওয়ারলেসে এর উত্তরবের জন্য অপেক্ষা করছেন। হ্যারী কেবলটি নিয়ে পড়লেন—তার মুখটা কি রকম কাল হয়ে গেল—তিনি সবার অনুমতি নিশ্চ টেবিল থেকে উঠে গেলেন।

পরে হ্যারী চার্লিসকে নিজের ক্যাফিনে ডাকিল কেবলটি পড়ে শোনালেন। তাতে লেখা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে চ্যাপলিনের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে—এবং যদি তিনি ওদেশে পুনঃপ্রবেশ করতে চান, তাব আগে তাঁকে ইমিগ্রেশন বোর্ড অফ এনকোয়ারির কাছে রাজনৈতিক বিষয়ক এবং নৈতিক অবনতি ঘটত কয়েকটি চার্জের উত্তর দিতে হবে। নি ইউনাইটেড প্রেস জানতে চেয়েছে এ সম্বন্ধে চ্যাপলিনের কোন কিছু মন্তব্য করবার আছে কিনা।

এ খবরে অত্যন্ত-উত্তাপ হয়ে উঠলেন চার্লিস যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা, বা না-ফেরার ব্যাপারে অত্যন্ত অর্থহীন বলেই মনে হচ্ছিল তার। ঐ বিব্রী বিষাক্ত পরিবেশের বাইরে চলে আসতে পেরেছেন এইটেই বড় কথা। আমেরিকান সরকার বহুভাবে তাঁকে অপমান

করেছেন, বহু বড় বড় নীতির বুলি মর্ডারছেন—সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত একহুয়ে মনে হচ্ছিল চার্লিস। কিন্তু চার্লিস নিজের বলতে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি কবেছেন সবই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে—চার্লিস ভাব হতে লাগল কোন একটা অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রে সবকাব ওসব বাজেয়াপ্ত কবে নেবাব চেষ্টা কববেন। সুতরাং বাইরে গোলমাল না করে চার্লিস এক বিবৃতি দিলেন যে তিনি আমেরিকাতে ফিরে যাবেন, তাঁদের চার্জসেব উত্তর দেবেন। তাছাড়া তার পুনঃপ্রবেশের অনুমতিপত্রটা তো বাজে কাগজের টুকরো নব—যুক্তরাষ্ট্রে সবকাব থেকে পাওয়া একটা সত্যিকার ডকুমেন্ট।

এরপব জাহাজে থাকাকালীন মনোব সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে অনবরত প্রেস বেড়িবাগাম আসতে লাগল তার বিবৃতির জন্য। সাদাম্পটের আগব স্টপেজে (চেরবুর্গ) শতাব্দিক ইউরোপীয়ান সংবাদদাতা সাক্ষাৎকারের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। লাঞ্চার পর বড় বড় মুখে খণ্টা খানেকের জন্য চার্লিস তাদের সংগে দেখা করবেন এই ব্যবস্থা করা হোল। এদের সবার ভেতরেই খুব সহানুভূতিব ভাব ছিল—তা সত্ত্বেও চার্লিস অত্যন্ত পবিগ্রান্ত এবং ক্রান্ত বোধ করছিলেন।

তিনি যেন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন—মনে হচ্ছিল চার্লিস।

সাদাম্পটন থেকে অবশেষে লন্ডনের ওয়াটাবল স্টেশনে এসে পৌঁছিলেন চার্লিস। অনুবক্ত জনতা উদ্গীর্ষ প্রতীক্ষার তাদের আসবাব পথ চেয়ে অপেক্ষা কবাছিল। চার্লিসের দেখে তাদের কি উৎসাহ এবং আনন্দ! থেকে থেকে তাবা আনন্দধ্বনি এবং ওয়েভ করাছিল। চার্লিস গিয়ে গাড়িতে উঠে হোটেলের পথে রওনা হলেন।

যখন খানিকটা অবসর পওয়া গেল চার্লিস এবং উনা স্যান্ডয় হোটলে ফিফথ ফ্লোরে তাঁদের সুইটের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চার্লিস নতুন ওয়াটাবল রিজের দিকে এববার তাকালেন। এর ওপরেব বাস্তবীতি সোজা গিয়ে পড়েছে সেই পাড়ার যেখানে তাঁব সমস্ত ছেলেবেলাটা কেটেছে। অনেকদূর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাস্তব দিকটায় তাবিবে রইলেন চার্লিস। শেষবার যখন লন্ডনে এসেছিলেন তাবপব প্রায় কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

উনাকে নিয়ে চ্যাপলিন লেস্টাব স্কোয়ার, পিকার্ডেলী প্রভৃতি জায়গার ঘুরে বেড়ালেন। একসময়ে লোকে কত সাক্ষসম্ভা কবে ওয়েষ্ট এন্ডে বেড়িয়ে বেড়াতো—হাতে থাকতো হস্ত রত্ন-এর দস্তানা এবং গয়নাকি-স্টক্। সে যুগ এখন বদলে গেছে এবং সবকিছু অন্যকর হয়ে গেছে।

চার্লিস ট্যাক্সি কবে কনিংটনে গেলেন—তিনি নব্বয় পাউন্ডাল টেরেসে দেখলেন, বাড়িটা

তখন খালি — অস্পদনের ভেতরই চেঙে ফেলা হবে।

দুশো সাতাশ নম্বর কনিংটন বোড়র বাড়িটা কছে গাড়ি থামানো হল। এখনে সিডনে এবং চার্লি তাঁদের বাবার সঙ্গে কিছুকাল ছিলেন। কত পুরনো স্মৃতি মনে আসতে লাগল চার্লির।

এরপর কিন্তু অনেক সমস্যা দেখা দিল চার্লির সামনে। যুদ্ধরাজ্য থেকে কিভাবে টাকা আনানো যার ভাবতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দশদিনের জন্য উনাকে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে যেতে হোল। সেফ-ডিপোজিট-বক্স থেকে সর্কিছু খুলে নিবে উনা ফিবে এলেন। চার্লি উনার কছে শুনলেন যে, ব্যাঙ্কের কেরানী প্রথমটা খুব ভালভাবে উনার সহী পরীক্ষা কবে দেখল, উনার দিকে একবার ফিরে তাকালো, তাবপর সেখান থেকে উঠে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘবে গিয়ে অনেকক্ষণ সলা-পরামর্শ করলো। কিছুক্ষণের জন্য উনা বেশ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন—পরে অবশ্য তারা ডিপোজিট-বক্সটি খুলে দেবার ব্যবস্থা করলো।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ কবে উনা বেভারলে হিল-সেব বাড়িতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সবই ঠিক, বাবার আগে বেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই আছে—ভারি সন্মের দেখতে হবো ফুলের বাগান এবং চারপাশের বিস্তৃত জায়গাটা। লিভিং রুমটিতে কিছুক্ষণ একলা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন উনা—মনটা বেন ভাববেগে ভরে উঠেছিল। এবপর তাঁদের সুইস্ বাউলার হেনরীর সঙ্গে দেখা হোল। হেনরী জানালো চার্লিদের আমেরিকা ত্যাগের পর এফ্. বি. আই-এর লোকেরা দুবার এসে তাকে নানাবকম প্রশ্ন করে গেছে। তারা জানতে চেয়েছে চার্লি কি ধরনের মানুষ ছিলেন, কোনও উগ্র ধ্বনের পাটির ব্যবস্থা এ বাড়িতে হোল কিনা এবং সেই ধরনের পাটিতে নম-স্ট্রীলোকদের নাচের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হোল কিনা।

হেনরী তাদের বলেছিল যে, চার্লি স্ট্রী-পারিবার নিয়ে এ বাড়িতে অত্যন্ত শান্ত এবং ভদ্রজীবন যাপন করতেন। এবপর তাবা হেনরীর সঙ্গে অত্যন্ত রুঢ় ব্যবহার শব্দ করেছিল—তার দেশ কোথায়, কতদিন সে আমেরিকায় আছে, এ ধরনের প্রশ্ন তো

কবেই ছিল, এমন কি তার পাসপোর্ট সেবে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিল।

এসব কথা শোনবার পর, বাড়িটি সম্বন্ধে যেটুকু টান অবশিষ্ট ছিল তাও মিলিয়ে গেল। পারিচারিকা হেলেনের কামাতেও তাঁর মন এতটুকু নরম হোল না—যত তাড়াবাড়ি সম্ভব ওখানকার কাজ সেবে উনা আমেরিকা ত্যাগ করলেন।

বন্ধুরা অনেকে চার্লিকে জিজ্ঞেস করেছেন কি কারণে তিনি আমেরিকার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। চার্লি এ-বিষয়ে বা উত্তর দিচ্ছেন, তা হচ্ছে এই :

“আমেরিকানদের কছে আমার সব থেকে বড় অপরাধ ছিল এবং এখনও আছে, যে আমি নন-কন্ফার্মিস্ট। আমি কমিউনিস্ট নই—কিন্তু ওদের দলে ভিড়ে আমি কমিউনিস্টদের ঘৃণা করতে রাজী হই নি। এইজন্য অনেকে আমাব ওপর চটে গেছে, যেমন আমেরিকান লিঙ্করন। এই সংগঠনটির কনস্ট্রাক্টিব ক্যাজের দিকটা প্রাতি আমার বধেই প্রজ্ঞা আছে। কিন্তু লিঙ্কওনেরারসূরা যখন আইন-সম্মত অধিকারের গড়ী ছাড়িয়ে দেশভক্তির ছন্দ-আবরণমণ্ডিত হয়ে অন্যের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কবতে চায়, আমি মনে করি তখন তারা আমেরিকান গভর্নমেন্টের কন্ডা-মেন্টাল স্ট্রাকচারের ওপরই আঘাত হানছে। এই ধরনের সুপার-পেট্রিয়ারাই আমেরিকাকে ফ্যাসিস্ট স্টেটে পরিণত করতে পারে।

তা ছাড়া কমিটি অভ্ আন-আমেরিকান এ্যাকটিভিটিজ-এর সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ মনো-ভাব পোষণ করতাম। এই-নামটিই অন্যায় এবং অসাধুতার পরিচায়ক বলে আমার মনে হোল—

Elastic enough to wrap round the throat and strangle the voice of any American citizen whose honest opinion is a minority one.

আমার প্রতি আমেরিকানদের আর একটি অসন্তোষের কারণ—আমি কখনও আমেরিকার নাগরিক হবার চেষ্টা কবি নি। অথচ বহু আমেরিকান ইংলণ্ডে এসে বসবাস এবং জীবিকার্জনের জন্য চাকরি করছেন, কিন্তু এরা কেউ ইংলণ্ডের নাগরিক হবার চেষ্টা করেন নি। এম্. জি. এ-এর একজন আমেরিকান এজিকিউটিভ ইংলণ্ডে পরিগ্রহ

বহুরেরও বেশি থেকেছেন। এবং রোজগার করেছেন প্রাতি সমগ্রহে ডলারের হিসাবে—চার অঙ্কেরও বেশি—তিনি বৃটিশ সাবজেক্ট হলে নি এবং ইংরাজরাও এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি।”

এবপর চার্লি লিখেছেন :

“This explanation is not an apology. In summing up my situation, I would say that in an atmosphere of powerful clignes and invisible governments I engendered a nation's antaenism and unfortunately lost the affection of the American public.”

লাইমলাইট লেস্টার স্কোরারের ওড়িবে দেখবার জন্য বুকুড হয়েছিল। এ ছাবর সম্বর্ধনা কিভাবে হয় সে কথা ডেবে চার্লি উদ্বিগ্ন হবে উঠেছিলেন—কারণ এ ছাবটি সাধারণ চ্যাপলিন-কমেডীর প্যাটার্নে ডোলা হয় নি। ছাবটির উদ্বোধন রজনীতে কি একটা চ্যারিটির ব্যাপাব ছিল—সে রাতে প্রিন্সেস মার্গারেট লাইমলাইট দেখতে এসেছিলেন। পরদিন থেকে সাধারণ দর্শকদের জন্য প্রদর্শন শুরু হোল। কাগজে খুব উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা না পেলেও লাইমলাইট ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করলো। আমেরিকার ছাবটিকে বরকট করা হলেও এর থেকে চ্যাপলিনের বে বিরাট আদর হল তা তাঁর আগেব কোন ছাব থেকে হয় নি।

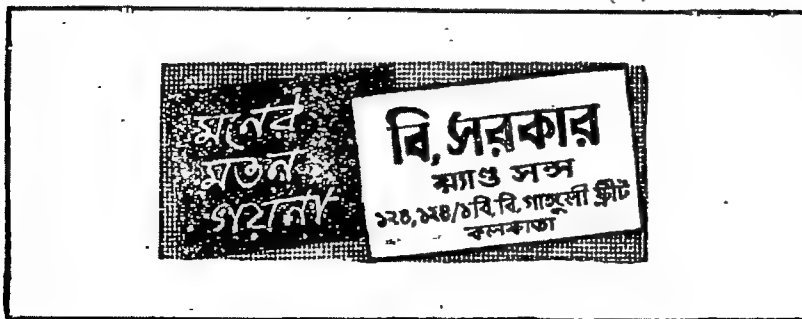
লন্ডন থেকে চার্লিরা প্যারিস এবং রোমে গেলেন—ওসব জায়গার দর্শকজয়ী বীরের মত সম্মান দেখানো হোল চার্লিকে। প্রেসিডেন্ট ডিন্বেস্ট অরিল চার্লিকে লণ্ডে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—বৃটিশ এম্‌বাসীতেও তাকে লণ্ডে ডেকেছিল।

ফরাসী সরকারের তরফ থেকে তাঁকে অফিসার অভ্ দি লিজন অভ্ অনার পদে উন্নীত করা হোল এবং এ একই দিনে সোলাইটি দ্য অর্টিথবস এ কম্পোজিটিউরস জ্যাম্‌টিক্স চার্লিকে তাঁদের অনারারী মেম্বার করে নিলেন।

প্যারিসে লাইমলাইটের শব্দ-উদ্বোধনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন—তার ভেতর ফরাসী ক্যাবিনেট মিনিষ্টারের দল ও বহু বিদেশী এ্যাম্বাসেডবও এসেছিলেন—একমাত্র অনুপস্থিত ছিলেন আমেরিকান এ্যাম্বাসেডর।

কমেডী ফ্রাসেজে চার্লিদের সম্মানিত অর্তিহা হিসাবে নিয়ে মালিয়েবের ডন য়ুনের একটি বিশেষ প্রদর্শনী দেওয়া হয়। অভিনয় করেছিলেন সম্মিলিতভাবে ফ্রান্সের সেরা আর্টিস্টের দল।

রোমও ফ্রান্সের মতই বিবর্তভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। এখানেও প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীর দল চার্লিকে নানা সম্মানে সম্মানিত করেন—তা ছাড়া পদবীর দ্বাৰাও তিনি বিভূষিত হন।



রোমে যাবার আগে কবি লুই গ্র্যারাগন, জ্যাক পল সার্ত্রে এবং পিকাসোর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল চার্লিস। পিকাসো তাঁর আঁকা অনেক ছবি চার্লিসকে দেখিয়েছিলেন।

প্যারিস এবং রোমে লাইমলাইটের ওপনিং-এর পর চার্লিস আবার লন্ডনে ফিরে এসে কয়েক সপ্তাহ কাটালেন। কিন্তু এবার এক জায়গায় ঘরবাধা দরকার। একজন বন্ধু সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে থাকবার কথা বললেন। লন্ডনে স্টেটল কর্তে পারলেই ভাল হতো—কিন্তু মনে হোল ওখানকার ক্লাইমেট ছেলেপিলেদের ঠিক সহ্য হবে না।

সুতরাং দৃষ্টিভারাক্রান্ত অন্তরে চারজন শিশু এবং জিনিসপত্র নিয়ে চার্লিস সুইটজারল্যান্ডে এসে হাজির হলেন। প্রথমটার জাসানের বো রিভেজ হোটলে উঠলেন অল্পদিনের জন্য। সামনেই ছিল লেক। চারপাশের পাহাড়গুলোকে তাঁর সুন্দর দেখতে লাগতো।

চারমাস ধরে চার্লিস একটা পছন্দসই বাড়ি খুঁজে বেড়ালেন। উনার গর্তে তখন তাঁর পঞ্চম সন্তান—তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে, হাসপাতাল থেকে ফিরে তিনি হোটলে উঠতে চান না। এজন্যই আরও তাড়াতাড়ি চার্লিসকে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করতে হল—বাড়িটির নাম ম্যানয়ের দ্য ব্যান, করসিয়ার ভিলেজে ভিত্তির একটি ওপরে এই বাড়িটি পাওয়া গেল। লাইচিশ একর জমি বাড়িটির চারধারে। নানা-রকমের ফুল, ফলের অর্চার্ড রয়েছে জমির ওপর।

সুইটজারল্যান্ডের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চার্লিসের প্রায় বছরখানেক সময় লাগল। ছেলে-পিলেদের করসিয়ারের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোল। এখানকার শিক্ষার বাহন ছিল ফরাসী ভাষা। প্রথমটার শিশুদের পক্ষে এটাই হোল একটা বড় সমস্যা। অবশ্য অল্পদিনের ভেতরই এ ভাষা তাদের এত আয়ত্ত হয়ে গেল যে, বেশ অনর্গলভাবে ফরাসী ভাষাতেই তারা কথা বলতে পারতো।

সুইসদের জীবনযাত্রা প্রণালীটাও তারা এত সহজে রপ্ত করে নিল যে, তা দেখে চার্লিস তাই অবাক বনে গেলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যাকিছু সম্পর্ক তা একে একে তাগ করতে শুরু করলেন চার্লিস। এরজন্য অবশ্য সময় লাগল। আমেরিকান কনসালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে রি-এন্ট্রি পারমিটটা দিয়ে চার্লিস জানালেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসের পাট তিনি উঠিয়ে দিলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি আর ফিরে যাবেন না?

চার্লিস—না, আর ওখানে গিয়ে অনর্থক হাঙ্গামা পোহাবার মত বয়স আমার নেই।

এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে তিনি বললেন—ফিরে যাবার ইচ্ছা হলে যে-কোন সময় আপনি সাধারণ ভিসা নিয়ে, যেতে পারেন।

মুদ্র হেসে চার্লিস জানালেন যে, তিনি সুইটজারল্যান্ডেই স্টেটল করবেন বলে ঠিক করেছেন। এরপর তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডসেক্ করে চার্লিস ফিরে এলেন।

এরপর উনা ঠিক করলেন যে, তাঁর আমেরিকান নাগরিকত্ব তাগ করবেন। একবার লন্ডনে এসে এ কাজটাও সমাধা করা হোল।

সুইটজারল্যান্ডে অতি সুন্দরভাবে এবং মনের আনন্দে দিন গুজরাণ হচ্ছে চার্লিসের। মাঝে মাঝে যখন ইচ্ছা হয় লন্ডন, প্যারিস, ভিনিস বা রোম থেকে বোড়রে আসেন সবাই। এসব কেন জায়গাতে যেতেই দু'ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

চার্লিস বলেছেন :

“My life is more thrilling to-day than it ever was. I am in good health and still creative and have plans to produce more pictures—perhaps not with myself, but

to write and direct them for members of my family—some of whom have quite an aptitude for the theatre. I am still very ambitious; I could never retire. There are many things I want to do; besides having a few unfinished cinema scripts, I should like to write a play and an opera—if time will allow.”

এ কথাগুলো শুধু কথাই নয়—কয়েকদিন আগেই কাগজে বেরিয়েছিল যে, চার্লিস একটি নতুন বই তুলেছেন এবং এতে নায়ক ও নায়িকা সাজবেন মার্লিন ব্র্যাডো এবং সোফিয়া লরেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, চার্লিস আলস্যে অবসরবাপন করতে চান না। এখনও নতুন নতুন স্ট্রিট করে দর্শকদের কাছে তাঁর বিরাট শিল্পপ্রতিভার আধুনিকতম নিদর্শনের পরিচয় দিতে চান। আমাদের চোখের সামনেই দেখলাম কত কমেডিয়ান এলা এবং গেল, কিন্তু চার্লিস আবেদন আজও পর্যন্ত এতদূর দূর হয় নি।

শেষ পর্যায়ে ইউনাইটেড আর্টিস্টসের হয়ে চার্লিস এইসব ছবিগুলো তুলেছিলেন :

- (১) এ উরোমান অভ প্যারিস ... ১৯২০
- (২) দি গোল্ড রাশ ... ১৯২৫
- (৩) দি সার্কাস ... ১৯২৬
- (৪) সিটি লাইটস্ ... ১৯৩১
- (৫) মডার্ন টাইমস্ ... ১৯৩৬
- (৬) দি গ্রেট ডিক্টেটর ... ১৯৩০
- (৭) মাসিয়ে ভাদু ... ১৯৩৭
- (৮) লাইমলাইট ... ১৯৫৩
- (৯) দি কিং ইন নিউ ইয়র্ক ... ১৯৫৭

এইবার ওপরের ছবিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক :

(জমশাহ)

আপনিও একজন সৈনিক-

এই রণহকারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনি কি করছেন ?

Bengali DA 65/F1

সুপারস্টার

সেন্সর বোর্ড সম্পর্কে প্রশ্ন

ভারতের চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কাজ কি নীতিতে পরিচালিত হয় এ প্রশ্ন আজ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশের একদল লোক মনে করেন চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কোন প্রয়োজন নেই। সেন্সর বোর্ড তুলে দেওয়া উচিত। এদের সঙ্গে একমত না হয়েও আমাদের প্রশ্ন সেন্সর বোর্ডের কি ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক কোন নীতি আছে?

সম্প্রতি সারা ভারতে পর পর কয়েকটি 'বাই নাইট' ছবি দেখান হয়েছে। এসব ছবিতে কোন কাহিনী নেই। পৃথিবীর নানা দেশের নাইট ক্লাবগুলিতে কি-ভাবে মৌনরস পরিবেশন করা হয়, এবং মেয়েরা কতভাবে দেহসৌন্দর্য প্রদর্শন করে, অথবা দেহ পশারিণীরা কত রকমভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং মানুষের কুসংস্কার ও বিকৃত-বাসনা ইত্যাদি এসব ছবির বিষয়বস্তু। কল-কাতাতেও পর পর এ ধরনের ছবি দেখান হয়েছে, এবং লোকে ভিড় করে এসব ছবি দেখেছে। এ ধরনের ছবি যে সনাজের পক্ষে কোনক্রমেই শূদ্র হতে পারে না, একথা কোন সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র সমালোচকদের লেখায় প্রকাশ পায় নি। এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে নি। একমাত্র সাম্প্রতিক বসুমতীর রংগজগৎ এবং দৈনিক বসুমতীর বিদেশী ছবির আলোচনায় এ ধরনের ছবির নিন্দা করা হয়েছিল। আমাদের নগরপিতারা শহরের নৈতিক বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে সিনেমাপোস্টার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, অশ্লীল প্রাচীরপত্র তরুণ মনকে কলুষিত করছে। কিন্তু পোস্টারের অপেক্ষা জীবন্ত এসব নোংরা ছবির বিরুদ্ধে তাঁরা কোন মন্তব্য করেননি।

আরো আশ্চর্যের কথা দেশে যখন বৈদেশিক মদ্য-সংকট, তখন কি করে এ ধরনের ছবি আমদানী মঞ্জুর করা হয়। এরূপ জনরব যে কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অশীর্বাদপুষ্ট কোন এক ভাগবান ব্যবসায়ী এই ছবিগুলি আমদানী করেছেন, তাঁর আমদানী লাইসেন্সের দ্বারা। চলচ্চিত্র আমদানীর লাইসেন্সকে এভাবে অপব্যবহার না করে তার দ্বারা যদি বিশ্বের সেরা কিছু ছবি আমদানী হতো তা হলে দর্শক এবং ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্প দুয়েরই উপকার হতো। আজো আমাদের দেশে চার্লি চ্যাপলিনের 'এ প্রিন্স ইন নিউইয়র্ক' অথবা এ কালের অনেক ভাল ছবি আসে নি, অথচ বেনো জলের স্রোতের মত এসে পড়ছে এসব নোংরা ছবি।

এসব ছবির সঙ্গে কিছু কিছু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রচারমূলক ছবিও দেখান হচ্ছে। সম্প্রতি 'জুদ্‌নু' এবং 'দি হাই রাইট সান' নামক দুটি ছবি দেখান হয়েছে। প্রথমটিতে আফ্রিকায় কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তার বীরত্বপূর্ণ এক কাহিনী দেখান হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে সাই-প্রাসের বিপ্লবীরা কত নিষ্ঠুর এবং মানবতা বোধহীন আর সেই তুলনায় ব্রিটিশ দখলদাররা কত মানবিক সে কথা বলা হয়েছে। দুটি ছবিতেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে হেয় করা হয়েছে। তার আগে দুটি মার্কিন ছবিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণতান্ত্রিক সংগ্রামের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভিয়েনামের পরি-স্থিতিতে বিকৃতভাবে দেখান হয়েছে।

অথচ ভারত এক নিরপেক্ষরাষ্ট্র এবং আফ্রো-এশিয়ান জাতিসমূহের মুক্তি-চেষ্টার এক বড় শরিক। এ ধরনের ছবি যদি দেখাতে দেওয়া হয় তবে আমাদের নিরপেক্ষতার মর্যাদা থাকে কোথায়? আমরা মাত্র ১৬ বছর পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলমুক্ত হয়েছি; অথচ আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী ছবি দেখান হচ্ছে জুদ্‌নু-জাতি ও সাইপ্রাসের মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে উপহাস করে। ভিয়েনামে আমেরিকানদের হস্তক্ষেপ ভারত সমর্থন করে না, অথচ ভিয়েনামের যুদ্ধের মার্কিনীভাষ্যকৃত ছবি অবোধে এদেশে দেখাতে দেওয়া হচ্ছে। এসব দেখে মনে হয় এদেশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ প্রচারক্ষেত্র হয়ে গেছে।

কাজেই প্রশ্ন জাগে সেন্সর বোর্ডে যাঁরা আছেন, তাঁরা ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবির ছাড়পত্র মঞ্জুর করেন কিনা এ বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। নতুবা ভারতের নীতিবিরোধী এসব ছবি দেখাতে দেওয়া হয় কিভাবে?

—সুজন।



সন্ধ্যা রায়

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির যুক্ত উদ্যোগে প্রদর্শিত দুটি ছবি সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছি। সেই দুটি ছবির নাম 'থার্ড টাইম' ও 'লালাবাই'। ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর প্রদর্শিত হয়েছে 'মাইলস অব ফায়ার' এবং 'নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার'।

মাইলস অব ফায়ার

১৯১৭ সালে সর্বহারা বিপ্লবের পরে রাশিয়ার ধনিকশ্রেণী বিপ্লবকে বার্থ করে পুনর্বাস ক্রমতা লাভের জন্য এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। এই গৃহ-যুদ্ধে নবজাত শ্রমিক সরকারের যেমন দারুণ সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, তেমন জন-সাধারণের দর্দশার সীমা ছিল না। কিরূপ সংকটের মধ্য দিয়ে নবজাত সোভিয়েত শক্তি জয়লাভ করেছিল—সে সম্পর্কে ধারণা এই ছবি থেকে পাওয়া যায়। প্রতিবিপ্লবী





সরকার প্রোডাকশনের 'একটুকু হোয়া লাগে' ছবির তিনটি চরিত্রে বিবাহ, আজরা ও কিশোরকুমার

হোয়াইট গার্ড'রা ট্রেনের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করার এক বিশেষ বার্তা নিয়ে একজন বিপ্লবী রেড গার্ড নায়ক ঘোড়ারগাড়ি জোগাড় করে রওনা হয়েছিল। তার সংগে ছিল একজন মহিলা কমিউনিস্ট, একজন ডাক্তার, একজন শিল্পী ও একজন ছদ্মবেশী প্রতিবিপ্লবী। খুলিমের অনুবর্তী ভূমির মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাদের সতর্কতা ও মানসিক অবস্থা, মধ্যপথে ছদ্মবেশী হোয়াইট গার্ডের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চারিদিক থেকে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র দু'জন কিভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলো ও প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত ব্যর্থ

করলো এই নিয়ে চিত্রনাট্য। বাকি অংশ হৃদয় বিনিময়ের কাহিনী। রেড গার্ড নায়ক জীবনে প্রথম অনুভব করল পথের সঙ্গী নারীটির ভালবাসা তার জীবনে পরম আশীর্বাদ। পরিচালক সামসোনভ সোভিয়েত চলচ্চিত্রে নবরূপীতির প্রবর্তকদের অন্যতম। তিনি কৃতিত্বের সাথে গৃহযুদ্ধের কাল ও সেকালের মানুষকে রূপায়িত করেও 'ওয়েস্টার্ন' ছবির মেজাজ সৃষ্টি করার লোভ সামলাতে পারেন নি। তাই দেখা গেল রেড গার্ড নায়ক দলবল নিয়ে বিশ্বাসঘাতক প্রতিবিপ্লবীকে খুঁজে বার করার পর এককভাবে প্রতিবিপ্লবীর

সঙ্গে গুলী বিনিময় হচ্ছে এবং 'ওয়েস্টার্ন' ছবির অপরাধের বাহাদুর নায়কের মত সে জরলাভ করল। ছবিটির ফটোগ্রাফিক বিশেষ প্রশংসনীয়।

নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার

শেখদিনের ছবি 'নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার' সোভিয়েতের বিখ্যাত পরিচালক মিখাইল রুমের একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। মিখাইল রুম সোভিয়েত চলচ্চিত্রে মধ্যবর্তী জেনারেশনের পরিচালক। সমাজতান্ত্রিক



শিখর পিকচার্সের অগ্রবৃত্ত পরিচালিত 'তাপসী' ছবির দুটি দৃশ্যে সন্ধ্যারানী ও অজয় গান্ধী, কমল মিত্র ও সন্ধ্যা রায়

মানবতাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও সমাজ-জগৎ ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস এই ছবিতে প্রতিফলিত। ছবির বিষয়বস্তু থেকে আণ্ডিক সৃষ্টিতে ন্যায়ীতির পরিচালকদের সঙ্গে তার তফাৎ দর্শকদের চোখে পড়বে।

নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার-এর চিত্র-নাট্য তৈরি হয়েছে পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের জীবন, চিন্তা ও নৈতিকবোধকে অবলম্বন করে। ছবির নায়ক গুসেভ এবং অন্যান্য চরিত্রগণই সকলেই সাধারণ মানুষ। আর জনজনের মত তাদেরও আছে সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নাসাবোধ। অসাধারণ কেবলমাত্র এখানে যে তারা মানবসমাজের মহত্বের কাজে নিজেদের নিমজ্জিত করেছে। তাদের সন্মত চিন্তা ও স্বপ্ন বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। পারমাণবিক গবেষণায় তাদের জীবনের আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে, অথচ ধীর বা শহীদ বলে ওরা কখনো স্নীকিত পাবে না। ধীরে ধীরে ওরা মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হয়, যেমন প্রফেসর সিংটসভ রেডিয়াম অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেছে, এবার ডিমিট্রি গুসেভ একই কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

এই পরিবেশেও জীবন তাদের নিরানন্দ নয়, হাসিতামাসা বর্জিত নয়। প্রথম দৃশ্য দেখা গেল প্রফেসর সিংটসভের কৌতুককর ব্যবহার। তারপরে একদিন দেখা গেল রেক্টরেটের ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গুসেভ ছেলেমানুষের মত সংগী কুলিকসভের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র আর সাধারণ জীবনের মধ্যে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে। লয়লা গুসেভকে ভালবাসে কিন্তু এক সময়ে সে বিজ্ঞানী কুলিকসভের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গুসেভকে তার কাজ সাহায্য করতে, অনুপ্রেরণা জাগাতে নিজেই প্রস্তাব করে গুসেভকে সে নিষে করে। অথচ তার জন্য কোন পক্ষে রাগ নেই, দ্বিধা নেই, ব্যর্থতাবোধ নেই। তাদের তিনজনের বন্ধু ও সহযোগিতা অটুট। ভালবাসার প্রশালিততে তাদের জীবন পূর্ণ। রেডিয়াম অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্বিতীয় ডিমিট্রি স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নিজের মজ্জা দান করে তাকে নিরাময় করে তুলতে। মৃত্যুশয্যা থেকে গুসেভ শেষ উপহার পাঠালো বাইরে প্রতীক্ষারতা লয়লাকে। তার নিজের আঁকা ছবি, মাঝখানে লয়লা, তার দু'হাত ধরে দু'পাশে দাঁড়িয়েছে গুসেভ ও কুলিকভ। পরের ঘটনা আরো মর্মস্পর্শী, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে শেষদশ্যনের জন্য লয়লাকে নিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে গেল। পথের কাজ করলেও তার নান্দীর টান জন্ম-স্থান গ্রামের সাথে। রাস্তা বাবা তাকে প্রশ্ন করেছিল পারমাণবিক গবেষণার কাজে জীবন-বিপন্ন হবার আশঙ্কা কি আছে? সে বলে-

ছিল-হ্যাঁ। আরো বলেছিল, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পারমাণবিক গবেষণায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য। মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষমাকে রোধ করা যায় না। আজ যদি আমরা থেমে যাই, আমাদের পরবর্তীরা একাজ গ্রহণ করবেই।

ইতিপূর্বে সমাজতান্ত্রিক অথবা মন-তান্ত্রিক কোন দেশের ছবিতে এমন চরিত্রের মানুষ দেখা যায় নি। এখানে এমন কয়েকজন নর-নারীকে দেখা গেল যারা বৃদ্ধি, উদারতা, আদর্শ চরিত্রের মহত্ত্ব পরিপূর্ণ মানুষ। এদের ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা জাগায়। পরিচালক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশে বৃদ্ধিজীবীদের এভাবেই দেখতে চান।

ছবিটির চিত্রনাট্যে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচালনা কৌশল। একটি বছরের নয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিনের কাহিনী, চরিত্র এবং এক মহৎ বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। যদিও ছবিটি সংলাপ-প্রধান—কিন্তু যেভাবে এখানে মড এবং পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সে কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। চিত্রগ্রহণের কৃতিত্ব কাহিনী ও বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাবিং অত্যন্ত ট্রাটিপূর্ণ। এই ট্রাটির জন্য সংলাপের মাধুর্য উপভোগ করা যায় না ও ছবির উপভোগ্যতা একারণে খর্ব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রদর্শিত চারটি ছবির কোনটির ডাবিং ভাল নয়। এরূপ বাজে ডাবিং অপেক্ষা সাবটাইটেল অনেকাংশে ভাল।

প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন আলোয় বাটালভ (গুসেভ), ইনোকেন্ট স্মোকটনোভস্কি (কুলিকভ), তাতিয়ানা লায়োভা (লয়লা), নিকোলাই স্টলটনিকভ (প্রফেসর সিংটসভ)। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ডানিল খারোভিটস্কি।

নাটকের কথা

নায়িকার নাম নিয়তি

(রূপচর্চা)

বিংশ শতাব্দীর ষাটদশকের পশ্চিমবংগ একটা জায়গায় এসে যেন মূখ থেবেড়ে পড়ে আছে। পাপের পাকৈ আজকের সমাজ এত জড়িয়ে পড়েছে যে, উদ্ধার পাবার পথ পাচ্ছে না। ঠিকাদার, মুনাক্ষাথোর একচেটিয়া

ব্যবসায়ী আর মুনীতিপরাগ আমলারা সমাজের বৃকের ওপর চেপে বসেছে। গভ মহাবৃক্ষের সমস্ত এই ঠিকাদারদের চেহারা দেখেছিলাম, তারা বাঙালীর মা-বোনকে বড় সাহেবদের ঘরে উপঢৌকন দিয়ে মুনাক্ষার পাহাড় জমিরেছিল, সেই ঠিকাদারদের অনেকে আজ অর্থকোলাল্যে সমাজের মান্যবাতি। সেই একই পথে আজো তাদের ব্যবসার সাফল্য। এরূপ এক ঠিকাদারদের শিকার হয়েছে মালতী। মালতীকে দিয়ে ঠিকাদাররা জাল পাতে, সেই জালে বড় বড় আমলারা ধরা পড়ে, আর চোখ বুজে বিলে সই করে দেয়। ঠিকাদারের লাভের অংক ফেপে ওঠে।

মালতী রূপযৌবন-সম্পন্ন এক নারী। সকল নারীর মত তারও মনে ভালবাসা আছে, সংসার পাতার সাধ আছে, পরিবারের প্রতি কতব্যবোধ আছে। এই কতব্যবোধের সুযোগ নিয়ে রায়-চাটাজী ঠিকাদারগোষ্ঠী তাকে জালে বন্দী করে। এই জাল থেকে বের হবার ইচ্ছা তার মনে জাগলেও একবার যে ধরা দেয় তার বের হবার উপায় থাকে না। মালতীও জীবিত অবস্থায় পারে নি। বিষ খেয়ে তাকে ফাঁদে ধরা দেবার মূল্য দিতে হয়েছে।

গত ২৬শে নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে রূপচর্চা প্রযোজিত 'নায়িকার নাম নিয়তি' নাটক অভিনীত হয়েছে। নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় মালতীকে কেন্দ্র করে একদিকে অর্থগৃহস্থদের বিবেকহীনতা আর একদিকে পাপচক্রের কাছে আত্মসমর্পণের যন্ত্রণা ও চরম পরিণতির নাট্যদৃশ্য উপস্থাপিত করেছেন। নাটক পরিচালনা করেছেন রণজিৎ বসু।

নাটকে একটিমাত্র স্ত্রী চরিত্র মালতী। এই চরিত্রটির সার্থক রূপায়ণের উপর নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে। মালতীর চরিত্রে রূপদান করেছেন শ্রীমতী শূভা ঘোষ। শ্রীমতী ঘোষ এ্যামেচার শিল্পী হয়েও এরূপ এক দূরত্ব চরিত্র সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। একদিকে মালতীর ভালবাসা, স্নেহ ও কতব্যবোধ, আর একদিকে রূপচর্চার, একদিকে জীবনের স্বপ্ন—আর একদিকে পাপচক্রের জালে বন্দিনীর যন্ত্রণাকে শ্রীমতী ঘোষ কৃতিত্বের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু রূপ-সজ্জা আরো চটকদার হওয়া দরকার ছিল। অর্থগৃহস্থ দুই ঠিকাদার—একজন নরম আর একজন গরম, এই দুয়ের মাঝখানে রয়েছে সাহিত্যিক লোকনাথ, যে মালতীকে ভালবাসে। কিন্তু যতটা কথার ফান্দে ততটা ব্যক্তিগতসম্পন্ন নয়। তাই মালতীকে পাপচক্র থেকে মুক্ত করার পরিবর্তে তার শেষ মুহূর্তে নিজের লেখা নাটকের শেষ দৃশ্য পরিবর্তনের অসহায় আশ্বাস দিয়ে সরে পড়া ছাড়া তার আর পথ থাকে না। কারণ সে যে নিয়তিকে মেনে নিয়েছে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোক সরকার। দুই ঠিকাদারের চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন যথাক্রমে নিশিকান্ত



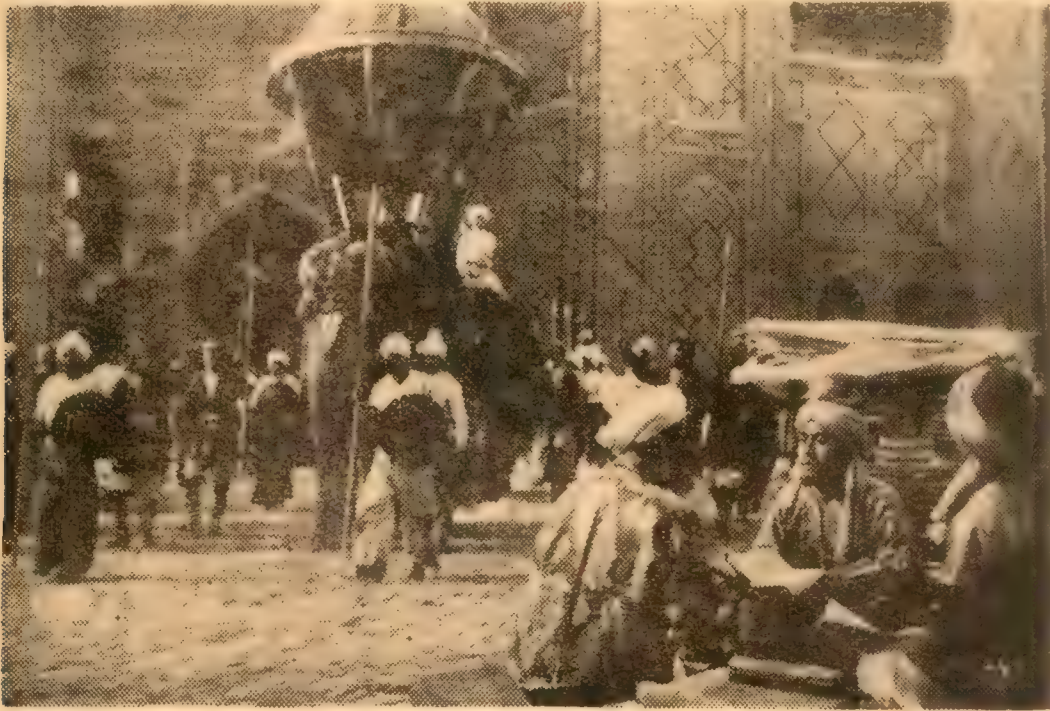
বি কে প্রোডাক্সনের 'গৃহসভানে' ছবির একটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক ও অন্যান্য শিল্পিনগণ

ঘোষ ও অবন্তী প্রসাদ। অন্যান্য চরিত্রে
বলরাম মিত্র, রতন দে, দিলীপ মৌলিক,
সম্ভেদা গণ্ডিত, জয়ন্ত দাঁ অভিনয় করেছেন।

লেবেদেফ দিবস

গত ২৭শে নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে

লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে প্রথম ইউরোপীয় ধরনের ডান্সিং নাট্যশালায়
প্রতিষ্ঠার ১৭০তম বার্ষিক উদ্‌যাপন হয়।



উজবেকিস্তানের চলচ্চিত্র 'উল'গবেগ'-এর একটি দৃশ্য

দাখ্যাতিক বসুধা

অনুষ্ঠানে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম বাংলা নাটকের প্রযোজক রুশ শিকদী গেরাসিম লেবেদেফের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সোভিয়েত দূতস্থানের বাতী বিভাগের প্রধান ডি, গুগেনভ তাঁর ভাষণে বলেন, গেরাসিম লেবেদেফ ছিলেন ভারত ও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মৈত্রী দূত। ১৭৯৬ সালের ২৭শে নভেম্বর রুশ সংগীতকার, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক ও ভারতবিন্দু গেরাসিম লেবেদেফ কলকাতায় তাঁর বাঙালী বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রথম ইউরোপীয় ধরনে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এই নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই বাঙালী ছিল। তিনি আরো বলেন, লেবেদেফ রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, কলকাতায় প্রচলিত হিন্দী ব্যাকরণ, হিডোপদেশ ও অন্যান্য কাহিনীর রুশ অনুবাদ প্রকাশ করে তৎকালীন রাশিয়ার মানুষকে ভারতের সাথে পরিচিত করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য বক্তাবলি গেরাসিম লেবেদেফ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই অনুষ্ঠানান্তে মিনাভার শির্ষপাণ্ডা কতৃক উপলব্ধি দত্তের 'কল্লোল' নাটক অভিনয় হয়।

এই দিন সংখ্যায় দক্ষিণ কলকাতার মৃত্যুগণন মাগে শৌভনিক সম্প্রদায় কতৃক গেরাসিম লেবেদেফের প্রতি শ্রদ্ধার্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

নাট্য সম্মেলনের আঞ্চলিক জমিবেশন

নাট্য সম্মেলনের উদ্যোগে শহরতলীর মধ্যবিন্দু মানুষকে সাম্প্রতিক নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে আগামী ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর বেহালায় চারদিনব্যাপী দক্ষিণ শহরতলী নাট্যোৎসব শুরু হবে। এই উৎসবে রূপকার, নান্দীকার, ইংগিত, লোকনাট্য, নবগত

আন্তরিক এবং দীর্ঘিত সংঘ নাটক অভিনয় করবে। অনুষ্ঠান স্থান বেহালা থানার সামনে প্রস্তুতি সদনের প্রাঙ্গণ।

অনুশীলন সম্প্রদায়ের নতুন নাটক

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা অনুশীলন সম্প্রদায় থিয়েটার সেন্টার মধ্যে প্রতি বুধবার বেরটল্ট রেখট অবলম্বনে সৌমিত চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বিক্রম ও ব্যতিক্রম' এবং রমেন লাহড়ীর 'পান্ডাশালা' নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

থিয়েটার ক্যাম্প-এর নতুন নাটক

থিয়েটার ক্যাম্পসম্প্রদায় আগামী ১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যা ৭টার মিনাভার থিয়েটারে কলিক সিংহের 'মৃত্যুদ্রাক্ষস' নাটক অভিনয় করবে। নাটক পরিচালনা করবেন সত্য নন্দোপাধ্যায়।

৩-রা ডিসেম্বর শুভরত্ন

স্বামী-পরিভাষা এক অল্প নারীর জীবনের গভীরতম অভ্যর্থনের
এক মধুর-করণ আলোখ্য...



সম্ভার্যাপী-সম্ভার্যাপী
কমল রায়-অনুপ্রসঙ্গ
পাহাড়ি সান্দ্যনি
অজয় পাহাড়ী
বনালী সৌধুরী-বৈষ্ণব
সরস্বতী-জ্যোতিষা
শিউলী মজুমদার
দিলীপ রায়-জানু মন্ডল
অভিনেত্রী

জ: নীহাররত্ন ওপ্ত

লেখক-সংকলন
চিত্রকর্ম-সংকলন



পরিচালনা-অগ্রদূত-সম্পাদ-গোপেন মল্লিক
প্রবিন্দু পিকচার্স প্রা: লি: প্রযোজিত ও পরিবেশিত

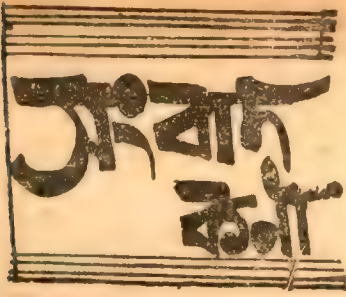
উত্তরা • পূর্ববী • উজ্জলা

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে



সুশান্ত শা

আঁজিত কর ও অর্ধেন্দু সেন প্রযোজিত লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের 'সুশান্ত শা' ছবিটি বর্তমানে রাধা, পূর্ণ ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত। আইন-জীবী নীরোদরঞ্জন দাশগুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন : অর্ধেন্দু সেন। সুরসৃষ্টি করেছেন : সুধীর দাশগুপ্ত। অনন্যসাধারণ এই ছবিটির রূপায়ণে আছেন : বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চ্যাট্টাঙ্গী, ললি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, কমল মিত্র, মলিনা দেবী, জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, শিশির মিত্র, অমর মল্লিক, শিশির বটব্যাল, অমল্য সান্যাল, প্রীতাম বাপী ও গীতালি রায়। প্রখ্যাত জমিদার সাহাচৌধুরী পরিবারের সত্যিকারের ঘটনা অবলম্বনে বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন : ভবতারিণী পিকচার্স।



উজ্জবেক ফিল্ম উল্লেখযোগ্য

প্রযোজক লতিফ ফাইজিয়েভ উজ্জবেক স্তানের ফিল্ম স্টুডিওতে বিখ্যাত উজ্জবেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবন অবলম্বনে একটি ছবি নির্মাণ করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমকালে উল্লেখযোগ্য জীবনকাল। মুখসুন্দর শেইকজাদে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। লতিফ ফাইজিয়েভ একজন ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালক, তিনিই ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রগ্রহণ করেছেন আলেকজান্ডার পান।

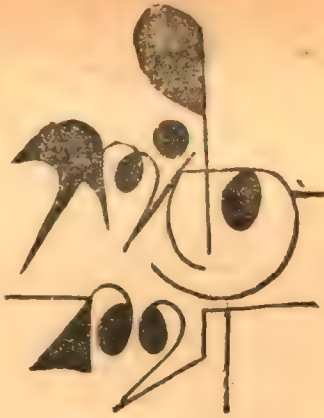
ছবিটি উজ্জবেকস্তানে মুক্তিলাভ করেছে। নামভূমিকায় অভিনয় করেছে বিখ্যাত উজ্জবেক অভিনেতা সুকুর বুরখানভ। তিনি অনন্য অভিনয়ে ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নিষ্ঠাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে উল্লেখযোগ্যক রূপায়িত করেছেন, তাঁর অভিনয় দর্শকরা প্রশংসা করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহের চলচ্চিত্র উৎসবে সুকুর বুরখানভ এই অভিনয়ের জন্য ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

বুক গয়া আশমান

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত 'বুক গয়া আশমান' ছবির সঙ্গীত গ্রহণ করা হয়েছে বোম্বাই-এর ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরিতে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শঙ্কর-জরকিষণ। এই মূল সঙ্গীতের ধারাতেই ছবির কাহিনী প্রকাশ লাভ করবে। গানটি গেয়েছেন মহম্মদ রফী। ছবিটি পরিচালনা করছেন লেখ ট্যাডন। চিত্র গ্রহণে আছেন স্বরকা দিত্তো। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, রাজেন্দ্রনাথ, পরভীন চৌধুরী, দুর্গা খোটে প্রমুখ।

প্রসাদ সিংহের জীবনাবলম্বন

'উল্টোরথ' ও 'সিনেমাভগৎ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রীতমাদ সিংহ গত ৩০শে নভেম্বর কলকাতায় এক নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচারের পরে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। তিনি বৃন্দা মা, স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বহু চলচ্চিত্র ও নাট্য-সমালোচক, চলচ্চিত্রশিল্পী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি নার্সিংহোমে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। চলচ্চিত্র-জগতে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। 'মণিহার' নামের একটি চলচ্চিত্রের তিনি সহ-প্রযোজক ছিলেন।



লোকশিল্পী দেবীন্দ্র বৈরাগী

দেবীন্দ্র বৈরাগী পূর্ববাংলার একজন লোকশিল্পী।

দেবীন্দ্রবাবুর জন্ম মাদারীপুরের একটি গ্রাম কাইলকাপুরে। ছেলেবেলা থেকেই দেবীন্দ্রবাবু খুব ভাল গাইতে পারেন। তাঁর চেহারাও যেমন সুন্দর, কণ্ঠস্বরও তেমন সুমধুর ছিল। এখন অবশ্য অভাবে তাঁর দেহ-সৌন্দর্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর কণ্ঠস্বরে পড়েছে টা। তবে এখনও তিনি



দেবীন্দ্র বৈরাগী

বে দরদ দিয়ে গান করেন তা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করে যে, এক সময়ে দেবীন্দ্রবাবু খুবই দরদী শিল্পী ছিলেন। যৌবনে দেবীন্দ্রবাবু গ্রামের নিমাই সন্ন্যাস বাহ্যায় নিমাইয়ের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে উদাত্তকণ্ঠে গান করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। দেশ বিভাগই দেবীন্দ্রবাবুর মত পূর্ববাংলার অনেক লোক-শিল্পীর ভাগ্য-বিপন্ন ঘটিয়েছে।

দেশ বিভাগের পরও পূর্ববঙ্গে দেবীন্দ্র-

বাবু ছিলেন। তাছাড়া ভিটে ভ্যাগ করে কোথায় বা যাবেন? কিন্তু যখন তিনি একেবারে অপারগ হয়ে উঠলেন—অর্থাৎ, ঠিক ১৯৪৭ সনের দাঙ্গার পর তিনি অনন্যোপায় হয়ে বাস্তুভিটে ভ্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। বহু চেষ্টা করেও যখন কলকাতায় তাঁর স্থান হল না, তখন তিনি কালনার চলে যান। কালনার বহু কন্ঠে মাথা গুঁজে থাকবার মত একটু জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

প্রাচীন পল্লীগীতি ও কীর্তন গান গেয়ে দেবীন্দ্রবাবু ভিকল অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন।

পল্লীগীতির মধ্যে দেহতত্ত্ব ও বাউল গানই সাধারণত দেবীন্দ্রবাবু গেয়ে থাকেন। রাখা-কৃষ্ণ ও নিমাই সন্ন্যাসের অনেক গান তিনি গেয়ে থাকেন।

নদীয়ার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে দেবীন্দ্রবাবুর একটি গানে। যেমন—

এল গৌর বিনোদিতা গো
দেইখা বা দেইখা বা ধনী তোর
হইল ভাবের গৌর নইদে উদর,

সোনার কলক দিয়া গো।

সোনার কটিতে গুন্দুগুন্দু

চরণে নুন্দুর,

মণির মনহরা,

গোরা বার পানে বার

তারে গো ভুলার,

প্রাণে করে সারা গো॥

দেবীন্দ্রবাবুর বাউল গানও তাঁর চমৎকার। তাঁর একটি বাউল গানে গুরুদেবের সাথে খুব উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব-কথার উল্লেখ আছে। যেমন—

আমার মন ফিকির মনের কথা

গুরু ছাড়া কেউ জানে না।

জলের মাঝে নাইত রে ঢেউ

কূলে লাগে ঢেউ

বাবার তখন হয় নাই জন্ম

আগে ছেলের কোলে বউ।

দেবীন্দ্রবাবুর এ ধরনের অনেক গান আছে যা লোকসংস্কৃতির এক-একটি রস-বিশেষ।

দেবীন্দ্রবাবুকে আজ ভিক্ষা করে খেতে হয় স্মারে স্মারে—আর আমরা, লোকসংস্কৃতির দরদীরা—লোকসংস্কৃতির দরদীরা কলকাতা শহরে নিজেদের ঘরে বসে, পার্কে মরদানে, খবরের কাগজে গলা ফাটিয়ে নিজেদেরকে লোকসংস্কৃতির দরদী বলে জাহির করি।

এটাই কী লোকসংস্কৃতির প্রতি সাচ্চা দরদ? আর তাই যদি হবে তবে দেবীন্দ্রবাবুর মত প্রকৃত লোকশিল্পীদের ভিক্ষা করে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে হয় কেন?

—বৃন্দদেব রায়।

বাইবেল ও দেশ এবং দেশ

রাশিয়ান নাটকঃ 'দি রুট অফ্‌ অল্‌ ইভিঙ্গ' বা 'দি রুট অফ্‌ ইট্‌ অল্‌' প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে—এর আগেও হয়তো দু-একবার এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করে, আমার অদল-বদল করেছিলেন টলস্টয়। 'দি পাওয়ার অফ্‌ ডার্কনেসের' বিষয়বস্তুর সংগে এ নাটকের বিষয়বস্তুর বিশেষ প্রভেদ নেই। রাশিয়ান চরিত্রের উদ্ভাসিতা এবং রাশিয়ান-চরিত্রের মাধুর্যের দিকটাও অতি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে নাটকটিতে। নামহীন, স্ট্রজার চরিত্রটিই এই শ্লে-টির প্রধান পাট।—যদিও নায়ক হচ্ছেন মুজিক মাইকেল। রাশিয়ান কৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হয়েছে এই মাইকেলকে। চরিত্র পরিচায়িকা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, মাইকেল আবেগপ্রবণ, আত্মকেন্দ্রিক, অহংকারী এবং শত্রুধরণের বলিষ্ঠ লোক। সে মদ্যপ—মত্ত অবস্থায় সে যেন উগ্রভাবে রক্ত-পিপাসা হয়ে ওঠে—কিন্তু যখন সে স্বাভাবিক থাকে তখন তার মত মহদয়, অসুরসদৃশ ব্যক্তি আর দেখা যায় না। 'দি রুট অফ্‌ অল্‌ ইভিঙ্গ' বলতে গ্রাভির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন নাট্যকার।

নাটকের আরম্ভে বাড়ির মেয়েদের সংগেই আমাদের পরিচয় ঘটে—মা, স্ত্রী এবং ছোট মেয়েটি বিবর্তভাবে প্রতীক্ষা করছেন, কি অবস্থায় ফাদার অফ্‌ দি ফ্যামিলি শহর থেকে ফিরবেন এই ভেবে। তাদের এই বিবাদাত্মক জল্পনা-কল্পনার মাঝে এসে দেখা দিলেন গ্রামের বৃদ্ধ কনস্টেবলটি—তিনি একজন পরদেশী লোকের সংগে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—এ লোকটি রাত্রের আশ্রয় খুঁজছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত শীর্ণ—দেখেই বোঝা যায় যে ভালভাবে খেতে পায় না—পরিধানে শতাব্দির ফলাফল। তার বয়স হবে চল্লিশের কোঠায়। কিন্তু লোকটির বিদেশী ধরণের কথা এবং টেকনিক্যাল প্রকাশভঙ্গী শুনে এঁদের মনে হচ্ছিল যে বিরাট পণ্ডিত।

He is a highway philosopher of the kind so often to be described by Gorki.

এই বাউছুলে লোকটি যখন তার সজ্জিত জ্ঞানভান্ডার থেকে আহরণ করে নানা মজার মজার কথা বলছিল এবং বাড়ির মেয়েরা প্রচুর জল্পনা উপভোগ করছিলেন, এই সময়ে বাড়ির স্বামী এক সহৃদয় বন্ধুকে সংগে নিয়ে ফিরে এলেন। এঁরা দুজনেই অত্যধিক মদ্যপানের ফলে টলছিলেন—সুন্দর স্ত্রী মারফা এঁদের হাস্যমুখ দৃষ্টিতে অস্বীকার করলেন—কারণ তার

বোধহয় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যার এতটুকু খাবার নেই, সে আবার মদ খাবে কি? স্বামীর দৃষ্টি রাগে প্রায় জ্বলে উঠলেন—স্ত্রীকে গালাগাল দিয়ে তার শালটা টেনে আঁকড়ে ধরলেন। এই পানোন্মত্ত অবস্থায় স্বামী-প্রভুটি স্ত্রীকে প্রায় হত্যা করে ফেলতেন যদি না ভাগ্যবশতী এসে বাধা দিত।

এই প্রসঙ্গে সুইডিশ সমালোচক মার্টিন ল্যাম লিখেছেনঃ

The husband is furious and, roundly abusing his wife, he clouts her over the head and grabs her shawl. In his drunken



রাশিয়ান টলস্টয়

rage he is nearly killing her when the vagabond, almost drunk himself but retaining some instinct of chivalry and a faint echo of modern ideas of emancipation, rushes forward exclaiming, "You have no right at all to insult the female sex."

এই ধরণের অশ্রুত কথা শুনে কৃষকটি প্রথমটায় ক্রিয়াকর্ম হকচকিয়ে গেল। অবশ্য তারপর সে বাউছুলটিকে আত্মা করে উত্তম-মধ্যম দেবে বলে ভর দেখাল। স্ট্রজারটি উত্তরে

মুখ বাড়িয়ে দিলে অত্যন্ত ভয়ভয়ে এবং কৃষককে আহ্বান করলে তাকে আঘাত করলে। মাইকেল কিন্তু ঈষৎ মাথা নেড়ে হাত নামিয়ে নিয়ে বললে—

"That's an odd body."

রাগের উত্তাপটা কমলে কৃষকটি এবার বেশ ভালভাবেই স্ত্রীকে উপদেশ দিল—“এই অপরিচিত লোকটির খাতিরে তোমার একটি মোমবাতি জ্বালানো উচিত। কারণ ও না বাধা দিলে আজ আমার কাছে তুমি বেদম প্রহার খেতে।”

এরপর সে পকেট থেকে বের করলে, কয়েকটি কপেক, অর্থাৎ ষেটুকু সামান্য অর্থ তার পকেটে ছিল, এক প্যাকেট চা এবং চিনি—যা সে শহর থেকে নিয়ে এসেছে।

পানোন্মত্ততার দৃষ্টিটি এবার ধীরে ধীরে অন্য পরিবেশের দৃষ্টি করলো—উপস্থিত সবার ভেতরেই একটা সহৃদয় আবেগপ্রবণতার ভাব দেখা দিল। এরপর অত্যন্ত দ্রুত তালে পরদেশী ট্রাম্পটি গৃহস্বামী এবং তার বন্ধুর সংগে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে গ্রাভির গুণ বর্ণনা করে এক বিরাট বক্তৃতা দিল। ট্রাম্পটি এবার মদ্যপানের ষৌভিকতা দেখিয়ে দু-চার কথা বলে একটি বিদ্রোহাত্মক গান গাইল—

Tramp—What it means—the power of enershy! One was in a state of melancholy, and now there's nothing but pleasantness and friendly disposition. Grainnie, I love you and I love everybody. Brothers dear (Sings a revolutionary Song).

Michael—It has got right hold of him in his hunger

এ নাটকে টলস্টয় দুটি দৃশ্যের ভেতর দিয়ে রাশিয়ান জনসাধারণের আত্মিক-স্বরূপটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। রাশিয়ান চরিত্রের পরস্পর-বিরোধী দিক-গুলোও তার সহজ, সরলভাবে দেখানো হয়েছে। পরদিন সকালে কৃষকটির যখন ঘুম ভাঙল—আগের রাত্রের অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য শরীরটা তখন তার বেশ খারাপ লাগছে—সে আবিষ্কার করলো যে বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙার আগেই পরদেশী ট্রাম্পটি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। আর তারই সংগে সংগে উধাও হয়ে গেছে চায়ের প্যাকেট এবং চিনি। এরপর কৃষক মাইকেল বের হল চোরটিকে ধরতে।

প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে ভাগ্যবশতীকে ধরে ফেলে বাড়িতে টেনে নিয়ে এল—তার পকেটে তখনও সেই চায়ের প্যাকেটটা। হস্ত-ভাগ্য চোরটি দেখল তার শেষ সময় উপস্থিত, ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে বলতে লাগল, সে চোর নয়, অন্যের অন্যায়াভাবে অধিকৃত সম্পত্তির অপহরণকারী। সে আরও বললে—“নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য মাথা পেতে শাস্তি নিতেও যারা প্রস্তুত নয় আমি

তাদেরই জ্বলন্ত উদাহরণ। তোমরা যদি শিক্ষিত লোক হতে, তাহলে আমার কথা সারমর্ম বুঝতে পারতে।”

তার এইসব বড় বড় এবং অদ্ভুত ধরনের কথাগুলো অশিক্ষিত কৃষকদের বেন মাদুর মায়াজাল সৃষ্টি করলো। স্ত্রীটি স্বামীকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল—“গরীব বেচারাকে ছেড়ে দেও, প্যাকেটটা তো পাওয়াই গেছে ইত্যাদি।”

স্বামী রেগে উত্তর দিলে—“আমি কি করবো না করবো, সে কথা কি তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে? তুমি কি জান না তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি নিজের কতকটা শ্রম করতে পারি?”

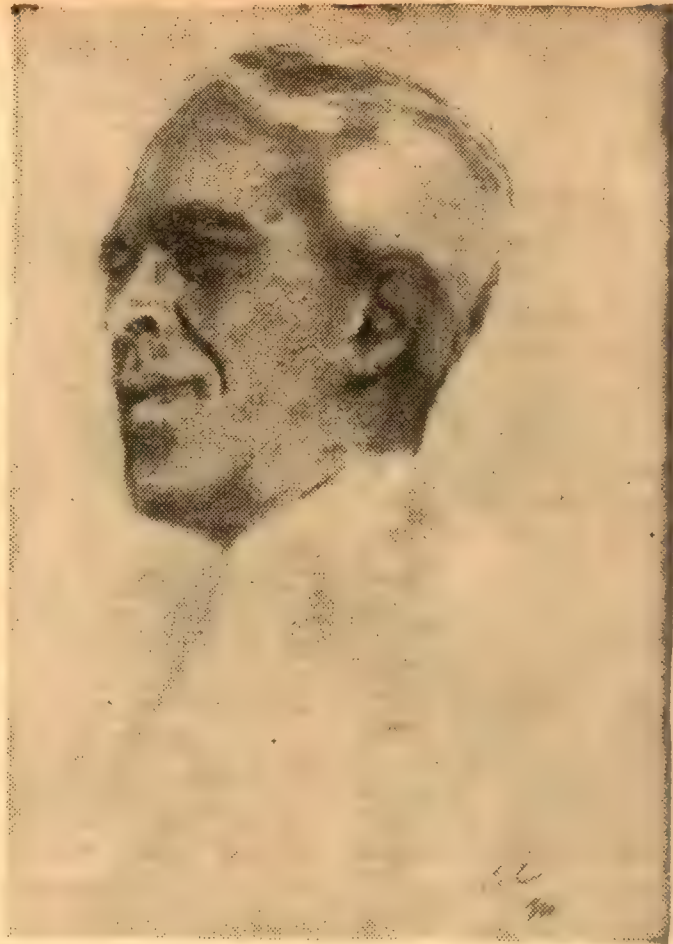
তারপর সে ঐ পরদেশী ট্রাম্পটিকে তার ঐ হীন কাজের জন্য খানিকক্ষণ গালাগালি দিল। যেসব শব্দ সে ব্যবহার করছিল তার দ্বারা নিজেই এত মূর্খ হতে গেল যে তখন উদারতা দেখানোর আগ্রহে সে স্ত্রীকেও ছাড়িয়ে উঠতে চাইল। চুরি করা প্যাকেটটি সে ট্রাম্পকে ফেরৎ দিয়ে দিল যাতে পথ চলবার সময় সে ওটার ব্যবহার করে রিক্রেশন্ড হতে পারে—বাড়িতে খাদ্য বলতে এই প্যাকেটটাই মাত্র অবশিষ্ট ছিল সেই সময়টার। এবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে ফিরে আবার সেই আগের কথা বললো—“আমি কি করবো না করবো, তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে, না?”

এই ধরনের উদার প্রস্তাবে ভ্যাগাবন্ডের মন্তব্য গলে গেল, কাঁপা গলার সে উত্তর দিল, “তুমি যদি এর থেকে কুকুরের মত আমার মার দিতে তাহলেও আমার এতোটা খরাপ লাগতো না। আমি অত্যন্ত গরীব এবং হত-ভাগ্য। আমি নিজেও জানি আমি কত নিচ প্রকৃতির। খুস্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কর।” কান্দতে কান্দতে প্যাকেটটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে সে দ্রুতবেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কৃষকটি কিন্তু তখন পর্যন্ত অস্ফুটস্বরে একটানাভাবে বলে চলেছে—“আমি কি করবো না করবো, তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে, না?”

তার স্ত্রী কিন্তু অনেক বেশি বিষয়বস্তু-সম্পন্ন। ট্রাম্পটি প্যাকেট রেখে যাওয়াতে সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো, আর কৃষকের মা চিন্তিতভাবে মন্তব্য করলেন, “যাই হোক না কেন, ওই লোকটিও তো মানুষ।”

কৃষকদের জীবনের একটি বাস্তব ছবি এ নাটকে পাওয়া যায়। আজকালকার দিনে তো এই শ্রেণীর নাটক লেখাই একটা ফ্যাসনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে টলস্টয়ের নাটকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর হাস্য ভাবটা। মার্টিন ল্যাম বলেছেন:

“It lacks entirely that heaviness and clumsiness which often seem inherent in dramatic presentation.”



বিখ্যাত রাশিয়ান পরিচালক এবং নট স্ট্যানিসলাভস্কি

of the life of the people. The comedy is never forced and the manifestations of human feeling never degenerate into sentimentality.”

কোন কোন সমালোচকের মতে এইটিই হচ্ছে প্রথম রাশিয়ান নাটক—যার ভেতর পরবর্তী কালের সোভিয়েট আমলের বিদ্রোহী শ্রমিকের প্রথম চেহারা আমরা দেখতে পাই।

অনেকের মত টলস্টয়ও বিশ্বাস করতেন যে সবরকম সর্বনাশের মূলে রয়েছে অ্যাংকহল্। এক সময় তিনি একটি নাট্যনক্সা লেখেন—এতে আছে শয়তান তার একজন গুপ্তচরকে পাঠালেন কিভাবে শস্য থেকে ডিস্টিল করে ভড্কা তৈরি করতে হয়, কৃষকদের তাই শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু গোপক বলেছেন যে মদ্যপানের প্রতি টলস্টয়ের চিরকাল একটা আন্তরিক সহানুভূতি ছিল।

“Tolstoy held that intoxication endowed people who were dull when sober with originality and

wit, ‘with beauty of thought — a wealth of expression. At such

অ-আ-ক-খ

ব্রীউপেন্সের বল্লিক প্রণীত
মূল্য বর আনা।

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও বৃত্তাক্ষর সহ বানান শিক্ষা যেকোন অতুলনীয় ভাবে গাছাঘো করিয়েছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষারস্ত্র সহজ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুঁথি হিসেবে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঙান আর্ট
পেপারে বড় হরকে ছাপা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৩, বিনয়বিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা

times I am ready to sing the praises of wine.' It is this freedom from prejudice which makes a slight peasant comedy into an impeccable work of art."

বিখ্যাত রাশিয়ান নট এবং পরিচালক স্ট্যানিসলাভস্কি তাঁর 'মাই লাইফ ইন্ 'আর্ট' বইতে লিখেছেন : "তখন আমাদের অপেশাদারী সংস্থা টুলাতে কয়েকটি প্রদর্শনী করে। রিহা-সাল এবং অন্যান্য বিধিব্যবস্থা করা হত আতিথ্যপূরণ নিকোলাই ড্যাসিলভিচ ভেভিভের বাড়িতে। ইনি ছিলেন টেলস্টয়ের ঘর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

কথাপ্রসঙ্গে থিয়েটারের আলোচনা সূত্র হয়। স্ট্যানিসলাভস্কি গর্বের সঙ্গে বলেন যে, তাঁদের দলই সর্বপ্রথম মস্কোতে 'দ্য চুটস্-মন্স ডার্ক'নেস' নাটকটির ওপর থেকে সেন্সর-করেছেন।

টেলস্টর তাঁকে বলেন : "এই বড়োকে একটু আনন্দ দাও—সেন্সরদের বুকিয়ে 'দ্য পাওরার অন্ড ডার্ক'নেস' অভিনয় করবার অনুমতি আদায় করে নাটকটি মঞ্চস্থ করো।"

দলের সবাই সম্মুখে প্রশ্ন করলো— "আপনি আমাদের এ নাটক মঞ্চস্থ করবার অধিকার দেবেন?"

"আমি কারোকে কখনও আমার নাটক মঞ্চস্থ করতে মান্য করি নি"—বললেন টেলস্টর।



জার্মান—পাওরার অন্ড ডার্ক'নেস নাটকে

আবার কয়েক বছর বাদে টেলস্টরের সঙ্গে স্ট্যানিসলাভস্কির দেখা হয়। তখন 'দ্য পাওরার অন্ড এন্লাইটনমেন্ট' নাটকটি মঞ্চস্থ লিগ্-ব্যান্-তুলে নেওয়া হয়েছিল। নাটকটি কয়েক জায়গায় মঞ্চস্থ করাও হয়েছিল—কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের বিবিধ রচনা দুটি যুক্ত করে অভিনয় করা হয়নি। [পাওরার অন্ড ডার্ক'নেস নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি দুভাবে লেখা

হয়েছে।] টেলস্টর এসব অভিনয় দেখে-ছিলেন—নাটকের কিছু অংশের অভিনয় তাঁর ভাল লেগেছিল। আবার কিছু অংশ দেখে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। এবং কিছুদিন বাগে টেলস্টরের এক বন্ধুর কাছ থেকে স্ট্যানিসলাভস্কি নোট পেলেন যে টেলস্টর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যানিসলাভস্কি টেলস্টরের মস্কোর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন—একটি ঘরে তাঁকে টেলস্টর আপ্যায়ন করে বসালেন। টেলস্টর বললেন—"টুলাতে যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল তুমি এ নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি একটু বদলাতে চেয়েছিলে। বল দেখি, কিভাবে তখন এটা বদলাতে বলেছিলে? তোমার কথা-মতই আমি এই অঙ্কটা বদলাবো— তারপর তোমরা নাটকটার অভিনয় করবে।"

টেলস্টর এমন সহজভাবে এই প্রস্তাবটা করলেন যে স্ট্যানিসলাভস্কির কোনই সন্দেহ হল না এই নাটকটি সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে। অনেককণ ধরে এবিষয় নিয়ে তাঁদের দুজনের আলোচনা হল। স্ট্যানিসলাভস্কি তখন ধারণাতেও আনতে পারেন নি যে টেলস্টরের স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা পাশের ঘরে বসে তাঁদের সব কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছেন।

সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা স্বামীর প্রতিভা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং গর্বিত মনোভাব পোষণ করতেন। সুতরাং স্ট্যানিসলাভস্কির মতন একজন অপেক্ষবস্ক বৃদ্ধ তাঁর পৃথিবী-খ্যাত স্বামীকে নাট্যরচনা সম্বন্ধে উপদেশ, নির্দেশ দেবেন এ তাঁর পক্ষে প্রায় অসহ্য বৈরাগ্যী বলে মনে হচ্ছিল। তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। ছুটে এ ঘরে চলে এসে আচ্ছা করে ধমক লাগালেন স্ট্যানিসলাভস্কিকে আরও কড়া কড়া শুনতে হত কিন্তু এই সময় টেলস্টরের মেয়ে মারিয়া এসে অনেক বুকিয়ে-সুঝিয়ে মাকে শান্ত করলেন। টেলস্টর কিন্তু স্তব্ধ। শান্তভাবে বসে রইলেন—স্ট্যানিসলাভস্কির পক্ষ হয়ে একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরোল না।

সোফিয়া চলে যাবার পর, স্ট্যানিসলাভস্কি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে টেলস্টর মৃদু হেসে মধুরভাবে বললেন—

"Don't mind her. She is very nervous and in a bad mood. Now, where were we?"

বিশ্ব-সাহিত্য বসুমতীর অমর অবদান

শ্রী অরবিন্দের

ANANDAMATH

শ্রী বসুমতীর অমর আনন্দমঠের অমর ২৭রাজা তম্রাবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ণাভাস
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' গানের পুত-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—শ্রী বসুমতী ও শ্রী অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামঠের অর্জনশাকীর সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইডেনের তিন তরুণ নায়ক

পরাজয়ের মাঝে জয়ের আনন্দ, এ জয় হল তরুণের জয়। সুন্দরী ইডেনের প্রাণ-চঞ্চল পরিবেশে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে পূর্বাঞ্চলের পরাজয় ঘটেছে মধ্যাঞ্চলের কাছে। কিন্তু টেস্ট তারকা খচিত মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পূর্বাঞ্চল দিয়েছে তা সত্যিই অসামান্য। পূর্বাঞ্চলের তিন বীর তরুণের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের সঙ্গে এক প্রবীণের অধিনায়কোচিত প্ররাস একত্রিত হয়ে পূর্বাঞ্চলকে পৌছাতে সাহায্য করেছিল সম্মানজনক স্থানে। এই দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে যে তিন তরুণ নায়ককে আমরা নতুনরূপে আবিষ্কার করেছি তাঁরা হলেন অম্বর রায়, দেব মুখার্জী এবং সুব্রত গুহ। এদের মধ্যমাণি বলে অভিহিত করা চলে।

প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রথম উইকেটের পতন হয় মাত্র দশ রানে। এরপর উইকেটে আসেন তরুণ খেলোয়াড় দেব মুখার্জী। বয়সে নবীন হলেও অভিজ্ঞতার দেব মুখার্জী একজন পরিণত খেলোয়াড়। দার্জিলিং নর্থ গয়েট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দেব স্কুলজীবনেই ক্রীড়ামোদী মহলে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন। সর্ব-ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের এবং শ্রেষ্ঠ ফিল্ডারের দুলভ সন্মান তিনি অর্জন করেছেন। স্কুলজীবনে বাংলার রঞ্জী ট্রফিদলে স্থান পাবার সৌভাগ্য দেবের হয়েছিল। গত বছর মাদ্রাজে সিংহল দলের বিপক্ষে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের পক্ষে দেব মুখার্জীর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা অনেকেরই স্মরণ আছে।

পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হল ৫৬ রানে, ২৭ রান করে বড়ুয়া বিদ্যায় নিলেন। এক তরুণের সঙ্গে এসে ঝগা মিলেন আর এক তরুণ; দেব মুখার্জী আর অম্বর রায়। এই দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে অদ্ভুত এক বোঝাপড়ার ভাব লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য এই দুই খেলোয়াড়ের একসঙ্গে খেলার সুযোগ বহুব্যবহার ঘটেছে। স্কুলজীবনে বাংলা স্কুল এবং পূর্বাঞ্চল স্কুলদলের পক্ষে এক-সঙ্গে খেলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটেও এক বছর এক সঙ্গে খেলেছেন। অম্বরের নেতৃত্বে যে বছর পূর্বাঞ্চল স্কুলদল সর্ব-ভারতীয় ক্রিকেটে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল সেবার দেব মুখার্জীর ছিল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। গত বছর মাদ্রাজের মাঠে সিংহলের বিপক্ষে সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে কলকাতার এই দুই তরুণ খেলোয়াড়ই সৌন্দর্য দলকে রক্ষা করেছিলেন, অম্বর রায় করেন সেঞ্চুরী। এবারও পূর্বাঞ্চলের বিপর্যয় রোধের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অম্বর ও দেব। ধীরে



ইডেন উদ্যানে দলীপ ট্রফির খেলার পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় ও মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক মঞ্জুরেকার টল করছেন।

ধীরে স্কেয়ার বোর্ড রান উঠতে লাগল, দলীয় রান অতিক্রম করল ১০০ রানের কোঠা। দুজনেরই ব্যক্তিগত রান সংখ্যা অর্ধ শতের ঘর অতিক্রম করল প্রায় একই সঙ্গে। অম্বর রায় কোন বোলারকেই সম্মিহ না করে একজন দক্ষ ব্যাটসম্যানের মত পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের

জমিতাভ

সঙ্গে উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে রান তুলতে লাগলেন। দেব মুখার্জীর খেলার মধ্যে কিছুটা আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াধারার ছাপ পাওয়া যায় প্রথমদিকে, কিন্তু পরে অবশ্য তিনি অম্বরের সঙ্গে সমান তালে খেলতে থাকেন। অম্বর-দেব জুটির ভাঙ্গন ঘরে যখন দলীয় রান সংখ্যা ১৮৮। ব্যক্তিগত ৬৩ রান সংগ্রহ করে প্যাভেলিয়ানের পথে গা বাড়ালেন দেব মুখার্জী। দেব মুখার্জী টেস্ট খেলোয়াড় সৌলম দুর্দানীর বলে সরাসরি বোল্ড আউট হন। দেব যথেষ্ট কষ্ট নিয়ে দুর্দানীর এই বলটি খেলার চেষ্টা করেন, কিন্তু চতুর

দুর্দানীর বলের ফ্লাইট তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে উইকেট স্পর্শ করে। দেব-অম্বর জুটিতে সংগৃহীত হয় ১০২ রান।

দেবের পর বিদ্যায় নেন অম্বর রায়। অম্বরের দৃঢ়তা মাত্র সাত রানের জন্য তিনি শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি, তিনি ১০ রানে আউট হন। কাজেই সামান্যলের ব্যর্থতা এবং শ্যামসুন্দরের বিদ্যায়ের পর অধিনায়ক পঙ্কজ রায়কে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে উইকেটে দাঁড়ান তরুণ সুব্রত গুহ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার সুব্রতর এই প্রথম আবির্ভাব। পঙ্কজ রায় ৮৩ রানে রান-আউট হন। সুব্রত অগ্রসর হতে থাকেন কিন্তু ৪০ রানে সুব্রতও বিদায় নিতে বাধ্য হন, আম্পায়ারের একটি দুর্ভাগ্য সিদ্ধান্তের ফলে। ঘাটানির একটি বলকে ড্রাইভ করেন সুব্রত এবং বলটি উল্টোদিকের উইকেট স্পর্শ করে অন্যদিকে চলে যায়, বেল পড়ে যায় মাটিতে। এই সুযোগে একটি রান সংগ্রহের পর দ্বিতীয় রান যখন সুব্রত সংগ্রহ করছেন সেই সময় উইকেটে বল মারেন মঞ্জুরেকার

এবং আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দেন। এই ক্ষেত্রে ক্রিকেটের আইন বলে যে, বেল অপসারিত থাকলে যে কোন হাতে বলটি নিয়ে উইকেট উৎপাদিত করতে হবে। কিন্তু মঞ্জুরকার বলটি ছুঁড়ে উইকেটে আঘাত করেন, উইকেটটি উৎপাদিত হয় নি এই ক্ষেত্রে। যাই হোক আউট না হয়েও সূত্রতক প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসতে হয় ব্যক্তিগত ৪০ রানে। পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয় ৩৯২ রানে। মধ্যাঞ্চলের মাত্র ১৮ বছরের তরুণ মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ঘাটানি সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট।

মধ্যাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে। মধ্যাঞ্চলের প্রথম উইকেটের পতন ঘটান সূত্রত গুহ। দ্বিতীয় দিনের শেষে মধ্যাঞ্চল ২ উইকেটের বিনিময়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। খেলার শেষ দিন প্রকাশ পোন্দার ব্যক্তিগত ৬৫ রানে বিদায় গ্রহণ করেন। এর পর ইডেনের আসরে টেস্ট খেলোয়াড় হনুমন্ত সিং অবতীর্ণ হন। অনারাস ভাগমায় খেলে হনুমন্ত ঘাড়ের কাটার সংগে প্রায় তালে তালে দলের রান সংখ্যাকে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাজ সিং বিদায় নেবার ফলে তার স্থান পূরণ করতে আসেন মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক বিজয় মঞ্জুরকার।

দুই টেস্ট-তরুণ হনুমন্ত-মঞ্জুরকার জুটি এক দৃড়ভাষ্য বাহু রচনা করেন। দ্রুত-তালে রান উঠতে থাকে আর মধ্যাঞ্চলও নিভরিয়ে অগ্রসর হতে থাকে জয়ের পথে। হনুমন্তের খেলা দর্শকদের প্রচার আনন্দ দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মধ্যাঞ্চল

লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। ৩৯২ রান অতিক্রান্ত হয়, বিজয়পর্বও তাদের সমাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সময়ে মধ্যাঞ্চল দলীয় রানসংখ্যাকে পৌঁছে দেয় ৪১৬ রানের ঘরে মাত্র ৪টি উইকেটের বিনিময়ে। হনুমন্ত সেঞ্চুরী করেন কিন্তু সময়ের অভাবে মাত্র নয় রানের জন্য মঞ্জুরকারের ভাগ্যে আর সেঞ্চুরী করা হয়ে ওঠে না। স্কোর বোর্ডে হনুমন্ত এবং মঞ্জুরকারের নামের পাশে লেখা হয় ১৬৮ রান অপরাধিত এবং ৯১ রান অপরাধিত।

দলীপ ট্রফির ফাইনালে উন্নীত মধ্যাঞ্চল দল এবার সম্মুখীন হল দক্ষিণাঞ্চলের। পশ্চিমাঞ্চলের একচ্ছত্র প্রাধান্য ক্ষুদ্র করে দক্ষিণাঞ্চল এবার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে এবং শেষ পর্বন্ত জয়সীমার নেতৃত্বে তারা ই এবার দলীপ ট্রফি ঘরে তুলবে বলে মনে হয়।

ক্যাসিয়াস প্রসঙ্গে

চোম্বাসের শান্তিমূলক ব্যবস্থার অবসানেও কিন্তু সরকারীভাবে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান ক্যাসিয়াস ক্রের ভাগ্যে জুটল না। কিন্তু সারা বিশ্বের চোখে বিশ্ব হেভী ওয়েটের একচ্ছত্র অধিপতি বলে স্বীকৃত ক্যাসিয়াস ক্রে; বল্লি সংস্থা কিন্তু ক্রে-কে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান বলে স্বীকার করেন না।

গত বছর লিস্টনের সংগে ফিরতি লড়াই-এর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিশ্ব বল্লি সংস্থার চোখে অপরাধী হয়ে একঘরে হলেন ক্রে। মাঝখানে ফাঁকি তালে সরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ানের সম্মান লাভ করলেন আমেরিকার এরনি টেরেল এডি ম্যাচনকে একটি চ্যালেঞ্জ মর্ডিটবুদ্ধে পরাজিত করে। অবশ্য বর্তমানে ক্যাসিয়াস ক্রে-কে টেরেলের পরলা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকার করেছেন বিশ্ব বল্লি সংস্থা। ক্রে'র কাছে সদ্য পরাজিত প্যাটার্সন পেরেছেন তালিকার চতুর্থ স্থান।

প্যাটার্সনকে পরাজিত করে প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছেন বলে আমেরিকার প্রাক্তন মর্ডিটবুদ্ধা সংস্থা ক্যাসিয়াস ক্রে-কে তাদের বার্ষিক সভার সম্বর্ধনা জানান। এই সভায় বলা হয় যে, ক্রে'র সাফল্য নিঃসন্দেহে আমেরিকার তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের মধ্যে উৎসাহের এবং প্রচেষ্টার প্রেরণা যোগাবে।

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের দুই উদ্যোক্তা উঠে পড়ে লেগেছেন ক্রে-কে ইংল্যান্ডে একটি লড়াই-এ নামানোর জন্য। তারা ক্রে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনোনীত করেছেন ৩১ বৎসর বয়স্ক মর্ডিট-বুদ্ধা ব্রায়ান লণ্ডনকে। ১৮৫৮ সালে এই ব্রায়ান লণ্ডনকে প্যাটার্সন একাদশ রাউন্ডে নক-আউটে পরাজিত করেন। ক্রে-কে এই লড়াই-এ অংশগ্রহণ করার জন্য এই উদ্যোক্তা দ্বয় প্রায় এক অবিশ্বাসী অঙ্কের অর্থ দিতে রাজী আছেন।

বিজয়ীর বিদায়

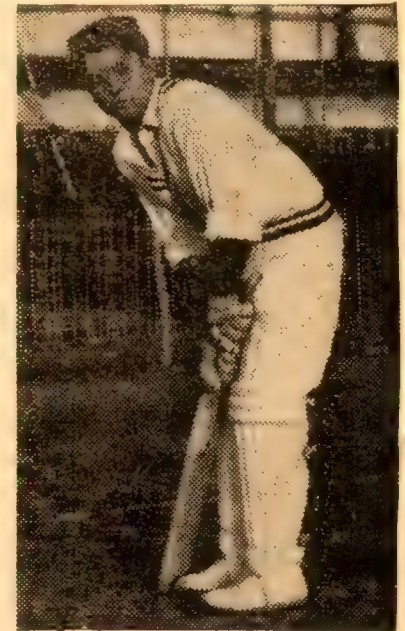
গতবারে বলিছিলাম যে কুপারকে কলকাতার বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু চিন্তাও করতে পারি নি যে আরও বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। গতবারে রোভার্স-বিজয়ী বি, এন রেল তৃতীয় রাউন্ডে ২-১ গোলে বোম্বাইয়ের মফংলালের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নিল। দ্বিতীয়ার্ধের সূর্যতেই আম্পালারাজু দলকে অগ্রগামী করেন কিন্তু মফংলালের পুরোভাগের সমবেত প্রচেষ্টায় দুটি গোল হয়ে যায় এবং শেষ পর্বন্ত প্রথম গোল করেও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় গতবারের চ্যাম্পিয়ান।

কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রোভার্স বিজিত মোহনবাগান দ্বারা সূর্যতেই হোচট খেয়েও সামলে নিয়েছে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব কিন্তু মোহনবাগানের বিপক্ষে প্রথম গোল করে। অশোক চ্যাটার্জী গোলটি পরিশোধ করেন এবং দলের পক্ষে বিজয়-সূচক গোলটি করেন দীপু দাস।

মহামেডান স্পোর্টিং অনারাসে ০-১ গোলে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটস্ দলকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কলকাতার ইস্টার্ন রেলদল প্রথম দিন হায়দ্রাবাদ টেলিফোনস্ দলের সংগে জু করে প্রথমে গোল করে অগ্রগামী থেকেও। দ্বিতীয় দিন ইস্টার্ন রেল অবশ্য হায়দ্রাবাদ টেলিফোনসকে ২-১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে



জম্বর রায়



দেব মল্লিক

পেশীক্ষে। এইদিন পেনাল্টি থেকে একটি গোল দিয়ে হারদ্রাবাদের দলই অগ্রগামী থাকে।

রাশিয়ান ফুটবলদল মাদ্রাজের তৃতীয়

অনুষ্ঠিত হয় বয়ঙ্গালোরে। এই খেলায় রাশিয়ান দল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে ২-১ গোলে জয়ী হয়।

ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গন একজন সভাকারের বন্দু এবং শূভাকাঙ্ক্ষীকে হারাল। তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি আর তাঁর শোক-

পরলোকে ভিজি

ক্রিকেটের ইংরাজীর খারা বিবরণীতে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটি আর শোনা যাবে না। গত ২রা ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লেঃ কর্নেল ভিজিয়ানা-গ্রামের মহারাজকুমার পদ্মশ্রী ডঃ বিজয় বেনারসে পরলোকগমন করেন।

ভিজি ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছাত্র-জীবনের কতকাংশ ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। ভিজি ১৯০৬ সালে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসাবে ভারতীয় দলকে ইংলণ্ড সফরে নিয়ে যান। বিশ্বক্রিকেটের বহু বর্ষস্বাী খেলোয়াড় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরই আমন্ত্রণে ভারতের মাঠে খেলে গিয়েছেন স্যার জ্যাক হবস, ব্যাট সার্টিফিক, স্যার লিয়রী কনস্টানটাইন প্রমুখ খেলোয়াড়েরা। ভিজি বহু ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি বর্তমানে রাজ্য সভার সদস্য ছিলেন। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বহুবার তিনি ক্রিকেটের বেতার ভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভিজির মৃত্যুতে সত্যই



ভিজি

সন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আমাদের অন্তর্নিবেদন সমবেদনা।

ঘাটান

স্টেট খেলার ভারতকে ০-১ গোলে পরাজিত করেছে। অন্য একটি প্রদর্শনী খেলা

॥ খেলোয়াড় প্রসঙ্গে ॥

ক্রিকেটের নন্দনকানন সুন্দরী ইডেনের অঙ্গনে হঠাৎ প্রক্ষুণ্ণিত হল ফুলটি। সদ্য প্রক্ষুণ্ণিত এই ফুলটিকে নিয়ে মাতামাতি করতে ভয় লাগে, শঙ্কা জাগে মনে, ক্ষুণ্ণের প্রাণায় যদি ক্ষণকালেরই শূন্য ছন্দ থাকে। কিন্তু এই ফুলটির পূর্বইতিহাস জানবার, আর কোরকে একে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই মনে হয় এ পদ্ম পাতার জল নয়।

সদ্য সমাপ্ত দলীপ ট্রফির আসরে ইডেনে যে কজন তরুণ নায়ককে আমরা নতুনরূপে আবিষ্কার করতে পেরেছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাত্র উনিশ বছরের কলেজের ছাত্র সুব্রত গুহ। অবাধ হয়েছেন সবাই টেস্ট তারকাখচিত মধ্যাঙ্গুলদলের বিপক্ষে এই তরুণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখে। আপনারা শুনলে সত্যই বিস্মিত হবেন যে, রাজী ট্রফি খেলার সৌভাগ্য এখনও সুব্রতের হয় নি, একেবারে প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করলেন দলীপ ট্রফির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আসরে। প্রথম আবির্ভাবই বাংলা ক্রীড়াসিকদের হৃদয় জরে সক্ষম হয়েছেন এই তরুণ খেলোয়াড়।

সুব্রতের জন্ম ১৯৫৬ সালে কলকাতায়। সুব্রতের পিতা 'শ্রীসুন্দরজান গুহ' ছিলেন উত্তর রেলওয়ের একজন পদস্থ অফিসার। প্রথমদিকে কটা বছর সুব্রতের বাংলার বাইরেই বিভিন্ন স্থানে কাটে, ১৯৫২ সালের পর থেকে স্থায়ীভাবে তিনি কলকাতায়। সুব্রত তাঁর স্কুল-জীবন সুব্রু করেন দক্ষিণ কলকাতার জগবন্ধু ইন্সটিটিউটসনে।

খেলাখেলার সঙ্গে সুব্রতের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুব্রতরা হলেন তিন ভাই, মেজদাদা শ্রীসুজিৎ গুহ একজন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়, তিনি বর্তমানে ইস্ট-বেঙ্গল ক্রিকেটদলের নিয়মিত খেলোয়াড় এবং দু'বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সুব্রতের পিতাও ছিলেন খেলাখেলার পরম উৎসাহী। তিনি ছিলেন রেলওয়ে স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য। বর্তমানে সুব্রতের স্বর্গত পিতার নামে আন্তঃ-রেল ক্রিকেটে বিজয়ীকে দেওয়া হয় গুহ কাপ।

সুব্রত বললেন যে, কবাবরই ক্রিকেটের প্রতি তাঁর দৃষ্টির আকর্ষণ। খেলার রাজ্য ক্রিকেট ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রাণ-মন জুড়ে

বিরাজ করত, স্বপ্ন দেখতেন ব্যাট ক্রিকেট খেলোয়াড় হবেন। স্কুলে যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখনই স্কুল ক্রিকেট দলে প্রবেশ করেন সুব্রত এবং এর পর শেষ দিন পর্যন্ত স্কুল ক্রিকেট দলের নিয়মিত এবং অন্যতম নিভর-যোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন সুব্রত। অন্য খেলার তেমন উৎসাহী ছিলেন না বটে কিন্তু স্কুল-জীবনে ক্রিকেটের সঙ্গে হাকি আর ফুটবলেও স্কুলকে তিনি সাহায্য করেছেন। স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসরে 'সুব্রতের সংগ্রহের' পুঞ্জিতে আছে অনেক রান আর উইকেট; তখন তিনি ব্যাটে বলে সন্ধান দক্ষ ছিলেন। স্কুল-জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল দক্ষিণ কলকাতা স্কুল ক্রিকেটে 'কলকাতা ওরিয়েণ্টালের' বিপক্ষে একটি হাট্রিক।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুব্রত ইডেন উদ্যান ক্রিকেট বোর্ডের স্কুল ক্রিকেটারদের জন্য শিক্ষাশিবিরে যোগ দেন। ১৯৬০-৬১ সালে প্রথম তিনি বাংলা স্কুলদলের পক্ষে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেন, সেবার খেলা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৯৬১-৬২ সালেও পূর্বাঙ্গল স্কুল ক্রিকেটের খেলা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় এবং সুব্রতকে বাংলা স্কুলদলের পক্ষে খেলতে

সুদীপ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭৩১
আজকের মানুষ	...	১৭৩২
ভারতদর্শন	...	১৭৩৩
জাত্তর্জাতিক	...	১৭৩৭
দুই মহাজন	শ্রীদিলীপকুমার রায়	১৭৪০
শেষ দৃশ্যে (কাবিতা)	নচিকেতা ভগ্নস্বামী	১৭৪৩
সবার অলঙ্কার	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতব্রাহ্ম	১৭৪৪
কেল্ট জাতির কথা ও কাহিনী	নরেন ভট্টাচার্য	১৭৪৫
টপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৭৫৩
হাজার ম্যাজিক (কাবিতা)	সুনীল বসু	১৭৫৪
কচবরের স্বপ্ন	দিলীপ মিত্র	১৭৫৫
সারক বিশালী মতীন্দ্রনাথ	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭৫৬
গ্রাম বাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	১৭৭০
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৭৭৪
চার্লি চ্যাপলিন	অশোক সেন	১৭৭৫
রংগজগৎ	...	১৭৭৯
রংগমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	শিল্পালি	১৭৮৫
পাঠিকমণ্ড	...	১৭৮৮

বিগতকালের বহুগুণ সাহিত্যশ্রষ্টা
ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলো দ্বিগুণ, পাণ্ডুর পরিণাম,
ডমকচরিত ।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মাহুয়, কঙ্কাবতী, মজার গল্প
মুক্তামালা ।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রখ্যাত কথাসিদ্ধা
রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর
গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য,
বীরচন্দ্র কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক,
বুড়ো শালিকের বাড়ি বোঁ,
একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক,
শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব
কাব্য, ব্রজচন্দ্র কাব্য, চতুর্দশশতাব্দী
কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য,
যায় কানন, হেক্টর বধ ।

মূল্য—দুই টাকা

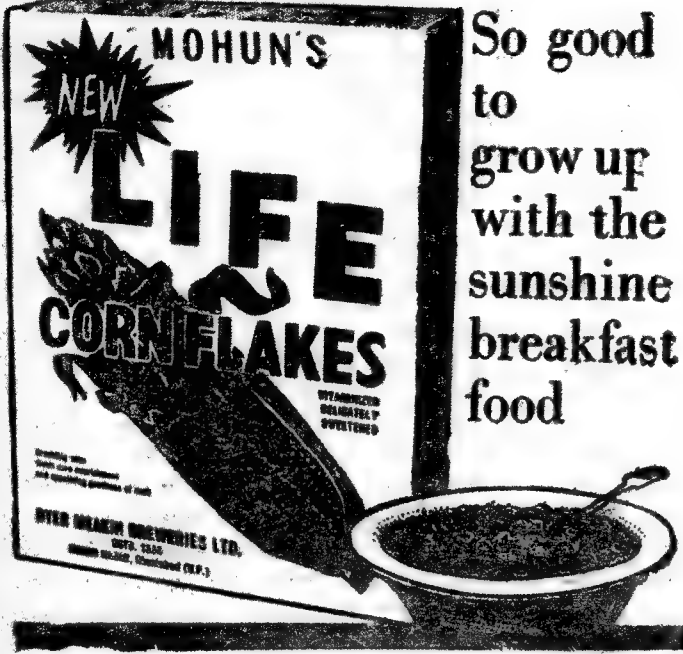
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

বিষয়
খেলাধুলা

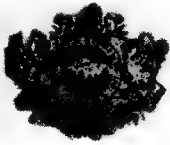
লেখক
শ্রীঅমিতাভ

পাতা
১৭৮৯



So good
to
grow up
with the
sunshine
breakfast
food

মোহনের “নিউ লাইফ” কর্ণ ফ্লেব্‌স



আপনার শিশুকে প্রাতরাশ হিসেবে
মোহনের “নিউ লাইফ” কর্ণফ্লেব্‌স খেতে
দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পুষ্টিকর অথচ লঘু
পাক খাদ্য দেওয়া—মজবুত এবং স্বাস্থ্য-
সমৃদ্ধ দেহ গড়ে তোলার বাপ-মায়ের
সতর্ক যত্নের মতোই যা আবশ্যিক।

১০০ বছরেরও বেশী কালের অভিজ্ঞতা পুষ্ট আমাদের প্রব্যাবলী

ডায়ার মীকিন ব্রিওয়্যারীজ লিঃ

স্থাপিত—১৮৫৫

মোহননগর, গাজিয়াবাদ (ইউ.পি.)

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগ-
সাধনার দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগগণপ্রদত্ত পুণ্ড্রদুষ্টি সুসংকল্প
কণ্ড অঙ্করে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ
সংযুক্ত পরিবর্তিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ
দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনার প্রকাশিত।
১। শিবসংহিতা, ২। শ্বেতসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-
সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্চক্র-
নিরূপণম্, ৬। দত্তারের যোগরহস্যম্,
৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দৃষ্টান্ত
সাতখানি যোগপ্রস্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে
সকল গৃহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের
নিভৃত গৃহ্য নিহিত ছিল—যে সকল মহা-
পুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—
অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নান্য
রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি,
একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায়
তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার
অর্থপূর্ণের বলবীৰ্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধি-
কারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-
সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনার
আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ
দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম,
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৃতি,
শৃদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃ-
শৃদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভৃতি সকল
প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—
দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ
সাধনে সিদ্ধিলাভ সন্নিহিত। অশেষ মংগল-
নিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধ-
ঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—
সাধনায় যোগের অতল বিভূতিলাভ সম্ভব
হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নিভুলভাবে
মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য :
তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড:

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ : ২৮শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পাঃ
বৃহস্পতিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 16th Dec., 1965

বিরোধীদের কত'ব্য

বিধানসভার স্বাগত অধিবেশন পূনরায় শুরু হয়েছে। যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তারও অবসান হয়েছে। বিরোধাবসানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। সভার যিনি নেতা, তাঁর কাছ থেকে তো ধৈর্য, তীক্ষ্ণা সহনশীলতাই কাম্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তাঁর কক্ষ থেকে কোনো বিরোধী সদস্যকে বের করে দেওয়া অকল্পনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন হৃদয়তার কথাও বলেছেন। এমন কি তাঁদের অনেকেই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট থেকেও একথা তিনি বিস্মৃত হন নি। তিনি বলেছেন যে, বিধান সভাকক্ষে বিরোধীপক্ষের যে ভূমিকাই থাকুক না কেন, বাইরে তাঁরা তাঁর বন্ধু।

আমরাও মনে করি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদের দায়িত্ব বহুক্ষেত্রে সরকার অপেক্ষা অধিক। যদিও রাষ্ট্র-তরণী পরিচালনার ভার সরকারের উপরেই ন্যস্ত থাকে, তথাপি গণজনীন কত'ব্যের সঙ্গে দ্রুততা এক এক সময় এতো বেশি প্রয়োজন হয় যে, কৃত-কর্মের দ্রুতি-বিচারিতর জন্য পরে আফশোস হয়। সেই দ্রুতি-বিচারিতকে পূর্বকল্পে পরিণত করাই হচ্ছে বিরোধীদলগুলির কত'ব্য। এমন কি সরকার অপ্রতিহত ক্ষমতার ধারণাবশে যে অন্যায় বা অসাম্যের সৃষ্টি করে, তখন তা প্রতিহত করাই বিরোধীদলের কাজ।

এতাবৎকাল আমাদের পাল্লামেটে বিরোধী-দলগুলি সরকারকে বহু সময় পথনির্দেশ করেছেন। পাকিস্তান কত'ক ভারত আক্রমণের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী বিরোধীদলের নেতাদের এক বিশেষ মৰ্যাদায় গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে পাল্লামেটের বাইরেও মিলিত হয়ে, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে ভারতের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে কাঙ্ক্ষিতরূপে অনেকখানি এগিয়ে

নিরে গেছেন। অবশ্য সর্বকিনয়ে একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, এই সর্বভারতীয় বিরোধীদল নেতারা দলের অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ যাই হোন কেন, জনসাধারণ এঁদের ব্যক্তিত্বেই সম্মোহিত। তাই এঁদের কার্যাবলীকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন সরকারকে এঁরা কিভাবে অবহিত করে জনসাধারণকেও সতর্ক করছেন, তা বিশেষ লক্ষ্য রাখার বিষয়। নচেৎ ভারতীয় গণতন্ত্রই কুপোকাব!

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদলের নেতাদের অপেক্ষা এ দলগুলির সংখ্যা অনেক সময় বেশি বলেই অনুভূত হয়। অবশ্য এরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক। তবু জনসাধারণের মনে আজ কেন এঁরম ধারণা হয়েছে তাঁর বিচার হওয়া দরকার। কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিরোধীদল এঁ দলের একচ্ছত্রাধিপতি হওয়া কাম্য নয়, আর তা যদি কাম্য হয়, তাহলে সংবিধানকেই বদলে ফেলতে হয়। তখন কোথায় থাকবে গণতন্ত্র? নেতৃবৃন্দ যখন সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন তখনই দেখা গেল সমাজতন্ত্রের হাল! বিগত সপ্তাহে একচেটিয়া ব্যবসায়ের যে হিসেবপত্রের মহা-নিবিশ কমিশন বের করেছেন, তাতে ত' চক্ চড়কগাছ! এই যদি সমাজতন্ত্রের নমুনা হয়, তাহলে লুটে পুটে খাই' নীতিটা এমন কি দোষের।

যা হোক, যে কথা বলছিলাম, সেই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী-দলগুলি নিজদের কত'ব্য সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকুন। আমরা তাঁদের কাছে চাই সংগঠন মূলক সমালোচনা। তাঁরা যদি 'কান নিরে গেল চিলে' শুনে কানটাকে পরীক্ষা না করে চিলটাকে ভাঙা করেন তাহলে আসল কাজই পণ্ড হবে।

আমরা বিরোধীদলের কাছ থেকে আশা করেছিলাম যে, তাঁরা সরকারের খাদ্যনীতি সম্পর্ক হয়তো কিছু নতুন কথা বলবেন,

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। খাদ্যনীতিকে আমল না দিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিগত মৰ্যাদার নীতিকে বড় করে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, 'সব ঠিক হয়।' এবং খাদ্যনীতি সম্পর্কে বাইরে বাই বলুন না কেন, সেই নীতিকে অস্বীকার করার মতো তাঁদের কোনো বলিষ্ঠ কর্মসূচী নেই। এমন কি, কেন্দ্রীয় সরকার যখন অল্প আমাদের জন্য পশুর খাদ্য পচা চাল পাঠিয়েছেন তখনও আমরা নিশ্চুপ নির্বিকার। দু' লক্ষ আশি হাজার টাকার পচা চাল হরতো অভুক্তদেরই খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু আসল টাকার নকল মাল কেনা মানে অর্থের প্রাণ্য।

খাদ্যসমস্যা নিয়ে যখন সরকার বিরত—তখন এই ধরনের চাল কিভাবে গ্রহণ করা হোল, সেই ব্যাপার জানা দরকার। আমরা মনে করি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কেন্দ্রীয় সরকার কত'ক অখ্যাত গাছিয়ে দেওয়ার ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে এর ষাটে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই ব্যর্থতায় করবেন। আর আমাদের বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ সরকারী খাদ্যনীতিকে কার্শ পরিণত করার ব্যাপারে কোন নীতি অবলম্বন করছেন—সেটাও আজ লক্ষ্যণীয়। মনে রাখা দরকার, গৃহীত নীতি সরকার কত'ক পরিচালিত হলেও, তাঁর দ্রুতির দায়ভার বিরোধীদলের উপরেও কত'ব্য। কেন না তাঁদের কত'ব্যই হচ্ছে সুসংগত সংশোধনী প্রস্তাব হাজির করা। কিন্তু আমরা কি জা পাচ্ছি?

সম্পাদকীয়

নেতৃত্বের মানুষ

পাঁচবে আর নিবে মেলাবে শিল্পবীর দেশ সোভিয়েট। রাশিয়া তীর্থভূমি। এদেশের জল-হাওয়া-মস্তিকায় মানবতার গান। সাম্য-শান্তি-মৈত্রীর আহবানে সততই এদেশ সাড়া দিয়েছে। হাত তুলে অভয় জানিয়েছে আমরা আছি... থাকবো। অন্যায়, অসত্য ও দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে বজ্রনির্ঘোষে ফেটে পড়েছে, অন্যায়ের সাথে সমঝোতা এদেশ করে নি। আদর্শগত এই সুদৃঢ় একাকীত্বই ভারতবর্ষের সাথে সোভিয়েট মৈত্রী ও আত্মীয়তাকে এত অভিন্ন ও মজবুত করতে পেরেছে। লেনিন-মার্সাকোভস্কির দেশ রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব-বান্ধবের দেশ ভারত-বর্ষের মিলন তাই স্বাভাবিক।

সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিতে হাওয়া বদল শুরু হয়েছে; ক্ষমতার রদবদলও পরি-লক্ষিত হচ্ছে; তবে তা যখন অনেক ক্রমে অসম্ভাব-বিক্ষোভ এবং একতরফা স্বাধীনতা হুমকিগার বিপ্লবের বিবে নীল, ঠিক সেই মুহূর্তেই সোভিয়েট রাশিয়াতেও পরিবর্তন দেখা গেলো; কিন্তু পার্থক্য হল এই যে, কোনো দীর্ঘ ধৈর্যচ্যুতি অন্তর্বিপ্লব কিংবা বিক্ষোভ ও অসম্ভাব্যের পাতালকা হাওয়ার সে পরিবর্তন নয়।

মিকোয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে-ছিলেন গত বছর জুলাইয়ে। সুদীর্ঘ জীবনের চল্লিশ বছর তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রশংসা ও সম্মানের সাথে কাজ করেছেন। মিকোয়ান একজন প্রশংসনীয় রুশনায়ক। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে তিনিও পরিচিত। সাধারণ ছুতার-তনয় মিকোয়ান সাংগঠনিক মনোবল ও সত্যতার জন্যই সর্বোচ্চ প্রেসি-ডেন্টের সম্মানীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। এই গত বৎসরই অক্টোবরের দিকে রুশচন্ডের পদচ্যুতি ঘটেছিল। নেতৃত্বের ও পরিবর্তন রাজনৈতিক জীবনে কোনো জটিল আবর্তের উদ্ভব করতে পারে নি। তাই প্রেসিডেন্ট মিকোয়ান ও সহকারী প্রধান-মন্ত্রী শেলোপিনের রদবদল কোনো আভ্যন্ত-রীণ ক্ষোভ-বিক্ষোভের কারণ নয়।

আন্তর্জাতিক দূনিয়ার মানুষের মধ্যে আজ ঘুরে ফিরছে রাশিয়ার এই পরি-মার্জিত রাজনৈতিক জীবনের কথা। যে রাজনৈতিক সমুদ্রের উর্মিমালা হেসেথেনে অক্ষরন্ত প্রাণচাপল্যে মাতেসারা হয়ে উঠছে, অথচ সে সমুদ্রের বৃক শান্ত, কাচের মতোই মসৃণ, কোথাও যেন এতটুকু তরঙ্গ বিক্ষোভ নেই। যা কিছদ সই যেন স্বাভাবিক—সহজ নিয়মেই আবর্তিত হচ্ছে দেখে আন্তর্জাতিক দূনিয়ার কাছে এ যেন

আরো বিস্ময়কর, আরো রোমাঞ্চকর বলে অনুভূত হচ্ছে।

নেতৃত্বের রদবদল হলেও জনজীবনে এর আঁচ এতটুকুও এসে লাগে নি। জনমনের সঙ্গে নেতৃত্বের সুগভীর আত্মীয়তা ও সঠিক পথের সম্মান ব্যতলে দেওয়াই এর মূল কারণ। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক রণরঙ্গ যখন উত্তপ্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে, সেখানে সোভিয়েট রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেও বাইরের ঝোড়ো হাওয়া থেকে তা মুক্ত হয়ে আপন অনুকূলে পথকেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে বলেই তা পৃথিবীর মানুষকে আশ্বস্ত করতে পেরেছে। আভ্যন্তরীণ এই শান্ত আবহাওয়াই তাকে বাইরের পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসনকে আরো সুদৃঢ় করে তুলেছে।

আজকের এই সর্বনিম্ন প্রেসিডেন্ট



নিকোলাই তিকট্রোভিচ পদগরনি

নিকোলাই তিকট্রোভিচ পদগরনি প্রেসিডেন্ট-পদে নতুন হলেও রাজনীতির জগতে এই মানুষটি মোটেই নতুন নন। রুসাইনের সম্মান পদগরনি জীবনের বহু বছরকে অতিক্রম করে সার্থকতার সাথে এগিয়ে এসেছেন আজকের বাবাটি বছর বয়সে। পদগরনির গঠনশীল অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সোভিয়েট দেশে তাকে বিশেষ

পরিচিত করে রেখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইনিই ছিলেন রুশচন্ডের নিকটতম বন্ধু।

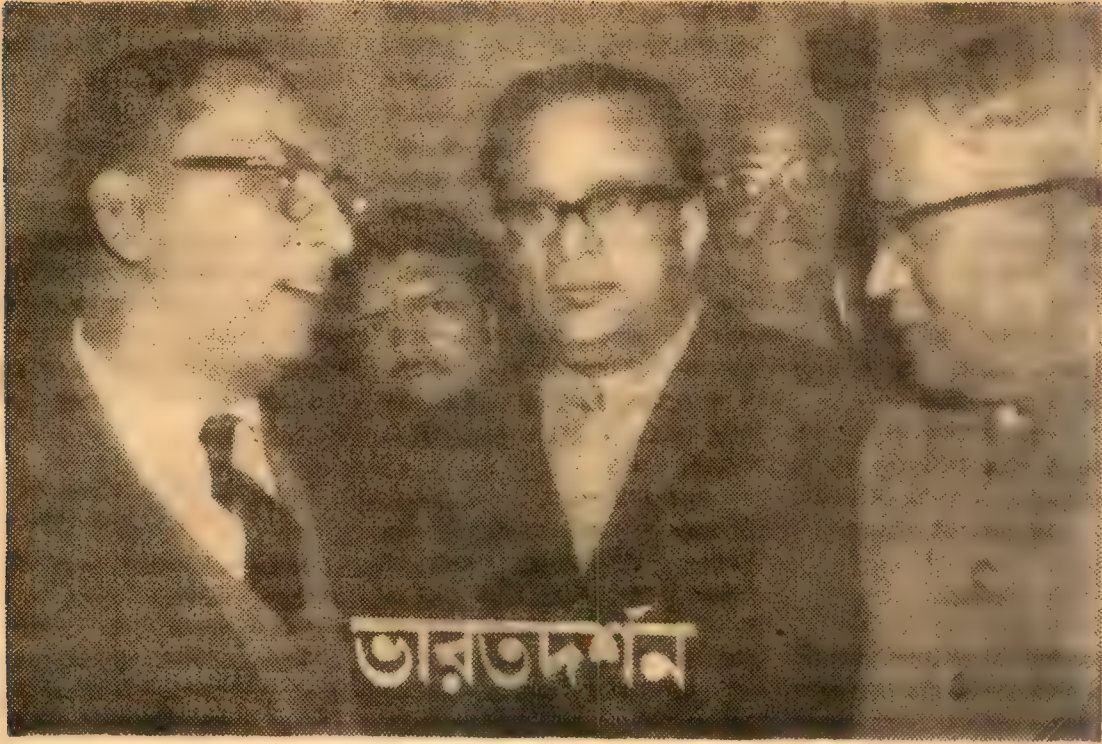
দীর্ঘ প্রাতিভাবান নিকোলাই, ডি পদগরনি দ্বন্দ্বগ্রহণ করেন ১৯০০ সালে। রুসাইনে। নিকোলাই-এর বয়স যখন সবেমাত্র চোদ্দ বছর, যখন তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ডক কারখানার মেকানিক্যাল শপে। ১৯০১ সালে কিয়েফ কারিগরী ইন্সটিটিউট থেকে তিনি স্নাতক হন। অতঃপর ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন চীনকল ও ট্রান্স-এ ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি, ইঞ্জিনিয়ার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে তিনিই আবার রুসাইনের ও মস্কোতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যোৎপাদন দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী ছিলেন।

স্বাভাবিক মহাযুদ্ধের সময় আবার এই মানুষটি কেই দেখা গিয়েছিল মস্কোর খাদ্যোৎপাদন কারিগরী বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টরের পদে। আবার ১৯৪৬ থেকে '৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মস্কোতে রুসাইন সরকারের সম্প্রদায়ী প্রতিনিধি। ১৯৫০ সাল থেকেই পদগরনি রুসাইনে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। রুসাইন কমিউনিস্ট পার্টির স্বাভাবিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করার পর ১৯৫৭ সালে তিনি রুসাইনীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। এ ছাড়া তিনি সর্বোচ্চ সোভিয়েটেরও সভ্য।

সোভিয়েট এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসেবেই পদগরনি পরিচিত। সোভি-য়েট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করে তিনি কিউবা, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছিলেন।

পদগরনি এইভাবে তাঁর বাবাটি বছরের জীবনকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। জীবনে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সোভিয়েট জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সোনালী প্রভাতে কলকারখানার মেকানিক্যাল শপের কঠিন-রুঢ় বাস্তবতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে মনের আনন্দকে পেয়ে যিনি জীবনসমুদ্রে একের পর এক ফেনারিত তরঙ্গমালা আঁকড়ে ধরে স্বপ্ন-রঙীন চোখে সুন্দরের আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, তিনিই আজ সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে সত্যিই আনন্দ লাগে। মনের অশ্বকারেও তাই দেখে সোনা জ্বলে।



পালাল বিমানঘাটিতে শ্রীঅশোক নেনের বিপদল সম্বন্ধে।

রাজধানী :

সহয সংবাদ

অবশেষে বহু-বিতর্কিত পি-এল ৪৮০-র আশীর্বাদ ভারতের অঞ্জলিবন্ধ হস্তক্ষেপে অবিলম্বে ঢেলে দেওয়া হবে বলে দৃষ্টিশক্তি-গ্রাস্ত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম আম্বাস পেরেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পনের লক্ষ টন গম এবং সারের জন্য আসছে পাঁচ কোটি ডলার সাহায্য। শুধু তাই নয়, মার্কিনী বদান্যতার খাদ্যসেতার বিক্রীত মূল্যের শতকরা অশীভাগ ভারতকে সরাসরি পরিশোধ করতেও হবে না। এই অর্থ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবেন।

এসব সংবাদ লোকসভার পরিবেশন করা হলে কংগ্রেসী সদস্যগণ সহর্ষে সংবাদটিকে অভিনন্দিত করেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এই সংগে আরও আশা প্রকাশ করেছেন, শীঘ্রই দীর্ঘদিনের জন্য ভারতবর্ষের খাদ্য ঘাটতি পি-এল ৪৮০-র কল্যাণে মিটিয়ে ফেলা সম্ভবপর হবে।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, এইরূপ খাদ্য আমদানীর ফলে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সহজ হবে আমাদের পক্ষে। ভারত ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যেই খাদ্যে স্বনির্ভরতার আশা রাখে।

অবশ্য খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে বুঝতে হবে যে, আমদানীর ফলে স্বনির্ভরতা নয়; আমদানীর ফলে আসন্ন বিপদমুক্তির ফল-স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন ব্যর্থতার দিকে মনো-

যোগ দানের সুযোগ। খাদ্যমন্ত্রী ১৯৭০ সালটি বাছাই করেছেন জেনে সাধারণের আশঙ্কাও দূরীভূত হল। কারণ ১৯৭০ সালের পর মার্কিনী লাইফ-বেল্ট পি-এল ৪৮০-র খাদ্যসম্ভার হ্রাস আর এসে গেছে। ইতিমধ্যে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭০-এর পর উৎসব খাদ্যসম্ভার উৎপাদনই বন্ধ করে দেবেন বলে মনস্থ করেছেন। সুতরাং তখন ভারতের খাদ্য-তরগী মাঝ-দরিয়ায় যতই তরঙ্গ দোলনে দোদুল্যমান হোক মার্কিনী লাইফ-বেল্ট প্রেরণের সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। কাজে কাজেই এই সন্তর-এর মধ্যেই আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করে নিতে হবে। অর্থাৎ আকাশের ও চোখের জলের ওপর নির্ভর না করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্যোৎপাদন ব্যর্থতার সর্বত্র ব্যবস্থা সমাপন করে ফেলতে হবে। আর তা যদি সম্ভব হয় তবে সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তামাম ভারতবর্ষ একযোগে অভিনন্দিত করবেন। সফলভাবে ভারতবাসী বলবেন, আমাদের পরনির্ভরতা ঘটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কম নয়।

জনসন সকাশে শাস্ত্রীজী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীলিন্ডন বি জনসন প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে ভারতে গম প্রেরণের আশ্বাস প্রদান করায় ভারত-

মার্কিন উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রতি যে পুষ্টমোট মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার অবসান হল। প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় তাঁর আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরের বাতী ঘোষণাকালে শ্রী এল বি জে-র সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী শাস্ত্রী-জনসনের যে নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে, সেই বৈঠকে উভয় রাষ্ট্রের তৎপার নিরন্তরতার ভারমুক্ত চিত্তে কল্যাণের আশ্বাসওয়ার নতুন বছরের আলোচনা শুরু করতে পারবেন। সুতরাং আলোচনা যে ফল-প্রসূ হবে, এ বিষয়ে গভীর আশা পোষণ করা যায়।

ব্রহ্মদেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র যাচ্ছেন বিশেষ ডিসেম্বর। ১৯৬৫-র জীর্ণ ক্রান্ত রাষ্ট্রের অবসান-মুহুর্তে শাস্ত্রীজীর সফল সফর শুরু। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের সংগে শাস্ত্রী-সফরে ব্রহ্ম-ভারত সমঝোতার পথ পরিষ্কার করে শাস্ত্রীজী যাবেন। সেখানে পাক প্রেসিডেন্টের সংগে পাকিস্তান বসবে নতুন বছরের পয়লা সমঝোতা জানুয়ারী। সুসংবাদ, বৈঠকে পাকিস্তান-ভারত কৌনরূপ বায়না না নিয়েই উপস্থিত হবেন। বিগত ১৬ই নভেম্বর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিনের নিকট লিখিত পত্রে ভারতীয় সাহেব শ্রীকোসিগিনকে তাসব্বদ প্রেরণ পাক প্রেসিডেন্ট নিঃসর্ত উপস্থিতিতে সম্মত আছেন বলে জানিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী উক্ত বৈঠকে ভারতের উপস্থিতিতে ভারতের সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন

সাপ্তাহিক বঙ্গভূমি

অনেক আগেই। সুতরাং তাসখন্দ বৈঠকে শাস্ত্রীজী যাচ্ছেন জানুয়ারীর গোড়ায়। ফেব্রুয়ারীতে শাস্ত্রীজী থাকবেন মার্কিনী যুদ্ধদের মধ্যে।

আগামী বছরের আবহাওয়ার এই অনুকূল সূচনার সভাগৃহ সহর্ষে প্রধানমন্ত্রীর সফল সফর কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সেই সুপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য পুনরুদ্বারিত করে বলেছেন, ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করতে চায়। বলা বাহুল্য, সেই আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই শাস্ত্রীজীর এই বিদেশ সফর।

ভারতের সঙ্গে একমাত্র যে দেশের বোঝাপড়ার অদ্যাবধি কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না সাত সমুদ্রের তের নদীর মাঝে এক বিচ্ছিন্ন স্বাধীনরূপ, সে দেশের নাম লাল চীন।

নয়া যোয

তার সফরসূচী আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে করেকটি নয়া বোধের কথা ঘোষণা করেছেন লোকসভায়।

এক। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নিজের শত্রে-দাঁড়াতে হবে।

দুই। সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা গেল, জনগণের একাই সব বাড়ী শক্তি।

তিন। বর্তমান সংকটকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন।

চার। ভারতের ভৌগোলিক সংহতি বিপদ না হলে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থ শারিরা দুরীকরণে ব্যয় করা সম্ভব হত।

পাঁচ। খাদ্য-সংকট থেকে উদ্ধার চাই-ই।

বলা বাহুল্য, এই বোধ-পঞ্চকের কোনটিই নতুন নয়, নতুনভাবে উচ্চারিত নয়া পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধ সত্য মাত্র। তন্মাত্র পঞ্চবোধের উচ্চারণ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এ শব্দ মন্ত্রের বাণী মাত্র নয়, প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত নিয়ে যে সম্প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করছেন, এ ভারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আশার কথা, আমাদের সংবাদ।

দস্তোভি

দেশরক্ষা কর্মসূচীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে জনগণ যেন জগণী মনোভাবাপন্ন না হয়ে পড়েন, তার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

নব বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য এক সগর্ব ঘোষণায় যখন বললেন, যে ন্যাট পাকিস্তানের স্যাবার ধ্বংস করেছে বাঙ্গালোর সেই ন্যাট নির্মাণের

জন্য গর্ব করতে পারে। রাষ্ট্রপতির তখন এই দস্তোভি কটু বলে মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর ভাষণে তাই যথারীতি সম্বোধন করে দিয়েছেন চ্যান্সেলরকে। বলেছেন, আমাদের এই জয়ের ওপর অভ্যুত্থান না হয়ে কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির অপেক্ষা ভারত কতদূর পিছিয়ে আছে সে সভ্যই সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উপযুক্ত উপদেশই লাভ করলেন বাঙ্গালোরবাসী উষা সমগ্র ভারতবর্ষ। বাইশ দিনের একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে ভীষণ আত্মফালন আমাদের মনকে কুপম-ডুকতার আচ্ছন্ন করছিল ঠিক সমস্ত রাষ্ট্রপতি সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করলেন।

বস্তুত, অজলিবল্য যে দেশ পরামর্ভোজী, যে দেশের সর্বব্যাপারে পরনির্ভরতাই লগাট লিখন, এ পর্বন্ত যে দেশ স্বয়ংস্বত্ব হতে অক্ষম; বাইশ দিনের একটি সামরিক অভিযানকে ক্যাপিটাল করে সে দেশে এই আত্মনিক মতিমাত্রি কেবলমাত্র দৃষ্টিকটুই নয়, দর্শনভার পরিচায়ক। রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ, তিনি রাষ্ট্রনেতারূপে দেশবাসীকে প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন করেছেন।

পরনির্ভরতার রক্তবান

সরকারী প্রকল্প রূপায়ণে বৈদেশিক উপদেষ্টা ও সহযোগিতার ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার সমালোচনা করা হয়েছে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থা সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে। বলা হয়েছে, আমরা এই দীর্ঘকাল ধরে স্বপদচালিত হওয়ার যোগ্যতা তো অর্জন করিই নি এমন কি কয়েকটি কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি জ্ঞানও আমাদের নেই।

যা আছে তা হল পরমুখাপেক্ষিতা। সর্বব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশায় দৌড়োণ। কমিটির রিপোর্টের ভাব লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, কমিটি এই গা এলানো পরনির্ভরতার মূলে বাস্তব অসুবিধা যতদূর আছে বলে মনে করেন, তারও থেকে বেশি বিশ্বাস তাঁদের দেশীর উদ্যোগে অক্ষমতার অস্তিত্বে।

কমিটি মনে করেন, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধের জন্য নিবিড় পরীক্ষা দরকার। সরকারী সংস্থার যেভাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয়, কমিটির মতে, তা একান্ত উদ্বেগজনক।

কমিটি আরও আপত্তি তুলেছেন, সংসদকে না জানিয়ে সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের হের-ফের করায়। সংসদকে এ ব্যাপারে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখলে অনেক গলদ প্রকাশ হতে পারে ও উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যায় বলে কমিটি মন্তব্য করেছেন।

কমিটির সুপারিশ তাই: সরকারী উদ্যোগে সংস্থা স্থাপনের আগে, সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সময়সীমা ও নির্মাণব্যয় ঘোষণা করতে হবে।

বলা বাহুল্য, কমিটির সুপারিশ যে যথার্থ এ বিষয়ে অন্যতর বক্তব্য থাকতে পারে না। কিন্তু সুপারিশ মত কাজ কতদূর হবে সন্দেহ সেইখানেই। ইতিপূর্বে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলি সম্পর্কে সরকার তখনই তথ্য জ্ঞাপন করেছেন যখন সদস্যগণ প্রশ্নাদি উত্থাপন করেছেন। কমিটির সুপারিশে এই সচেতক প্রশ্নের জন্য অপেক্ষার অবসান ঘটানোর প্রস্তাব সভ্যই প্রশংসনীয়।

অপবাদের বাস্তব প্রতিবাদ চাই

পচাই চালানোর জবাব কি?

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীমতী ভট্টাচার্যের অভিযোগে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে তের হাজার মণ 'পচা চাল' মাস দুই আগে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকটের সুবোধ গ্রহণ করে পিছরে দিয়েছেন ভাল চালের মূল্য। এ পচা চালের মূল্য হবে দু'লক্ষ আশি হাজার টাকা।

গত শুক্লাব দশই ডিসেম্বর ১৯৬৪ তারিখের দৈনিক বঙ্গভূমিতে এ চাপ্ত্যাকর সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং এ দিনই বিধানসভার এ বিষয়ে সরকারী তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান শ্রীমতী ভট্টাচার্য।

প্রকাশ, এই বস্তা কত পচা চাল, যা পশ্চিমবঙ্গ বই অন্য কিছু নয়, তাই বাংলার বড়বড়, সন্তানদের ক্ষুধিত উদর পূরণের জন্য সরকার বাহাদুর বিভিন্ন জেলার প্রেরণ করেছেন।

শ্রীভট্টাচার্যের অভিযোগে জানা যাচ্ছে, এ জাতীয় সত্তের শ' টন পশ্চিমবঙ্গ মজুত আছে হুগলীর গুদামে। এগার শ' বস্তা কল্যাণী গুদামে।

দৈনিক বঙ্গভূমির সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, আরও কয়েক শ' টন অখাদ্য চাল-গম পশ্চিমবঙ্গকে বিক্রী করার কুমতলব এ'টেছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-দপ্তরের বড়কর্তারা চড়া দামে সেই বস্তাপচা বিষ কেনার জন্য ইতিমধ্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রুকলীনস্ব গুদামে রক্ষিত সত্তের শ' টন এবং কল্যাণী গুদামে সংরক্ষিত এগার শ' বস্তা পচা চাল-গম পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন।



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ম
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোদয় প্রতিদিন আহারের পর
চুইবার করে ট্রামচ স্কুটসজীকরীর সঙ্গে
চার চামচ সহজাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অমল ডাঃ যোগেন চন্দ্র বোম্ব, এম-এ,
আর্কেনশারী, এক, বি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র বোম্ব,
এম-বি, বি-এস, আর্কেনশারী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

সাপ্তাহিক বঙ্গমত

এই চাণ্ডাল্যকর সংবাদে শত্রু শক্তিতে
কর, যথেষ্ট মানসিক প্রদাহ দেয়া দেবে
অন্যোন্মত্ত একশত টাকা দরের চাউলভক্ষক
বঙ্গবাসীর মনে। জেনেশুনে এই বিষবৎ
পচা চাল ঝর-ঝরনের সংবাদের প্রমাণাদি-
সহ প্রতিবাদ সরকারী তরফে উত্থাপিত না
হলে পশ্চিমবঙ্গে একটি বহু মারণযন্ত্রের
অপবাদ বহন করতে হবে উভয় সরকারকেই।
এই বিষবৎ খাদ্য ভক্ষণে যদি তাৎক্ষণিক মৃত্যু
না-ও ঘটে, তবু এই খাদ্য গ্রহণের যে কী
প্রতিক্রিয়া হবে তা আমরা কেউ জানি না।
তা ছাড়া প্রতিক্রিয়া হাই হোক, পচা চাল পশু-
খাদ্য বিতরণের কোন অধিকার নেই যোগান-
দাতার।

বিষভক্ষণে পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্য
অভ্যস্ত। কাকর ও দুর্গম্ভী চাল গলধঃ-
করণের পর গরম বকৃতায় পা সেঁকে আবার
অভ্যাস এ রাজ্যে বেশ রসত আছে।
স্বাধীনতার সমুদ্র মঞ্চনে বত গরল উঠেছিল
তার প্রারম্ভেই চুমুকে চুমুকে আশ্বাদ
করে বঙ্গবাসী নীলকণ্ঠ হয়েছে। তাই
পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় দাবি রোজদিনই
বোড়ে চলেছে। প্রাপ্য বঙ্গমতই শত্রু নয়,
প্রদানে নোহা হাত সর্বদাই প্রদর্শিত হয়ে
থাকে। আলোচ্য অভিযোগের সারবত্তা প্রমাণিত
হলে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি
মনোভাবের বিকৃতি আর একবার প্রমাণিত
হয়ে যাবে। এই অপবাদ স্থালনের
সম্ভবত কোনও পথই আর নেই। তবু এ
বিষয়ে উদন্ত ও ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি
উঠেছে। তদন্তে এই অপবাদ অসত্য
বলে প্রমাণিত হোক, দেশবাসী তাই সর্বান্তঃ-
করণে প্রার্থনা করবেন।

আইনমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন

ভারতের আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা
মন্ত্রীর মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন দক্ষিণ
আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ সফরের পর
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ভারত সন-
কারের পক্ষ থেকে চীন-পাক হামলা সম্পর্কে
ভারতের বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য যে
কমিউনিস্ট মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য গুডউইল টারে
বিশ্ব-পরিভ্রমণ করে এসেন, শ্রীসেন তাঁদের
অন্যতম।

দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে আমরা যত-
দূর তথ্যভিত্তক, দক্ষিণ আমেরিকাও আমাদের
সম্পর্কে ততটুকুই অসম্পূর্ণ পরিচয় রাখে।
তবুও শ্রীসেনের দক্ষিণী সফরও আশাপ্রদ
সংবাদ বহন করে এনেছে। অর্থাৎ শ্রীসেন
জানিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকাতেও ভারতের
ঐতিহাসিক বজায় আছে। শত্রু তাই
নয়, আমরা তাঁর কাছে জেনে শুধী হলাম
যে, দক্ষিণ আমেরিকার রবীন্দ্রনাথের নামে
রাস্তা ও পার্কের নামকরণ তিনি দেখে
এসেছেন। দক্ষিণ আমেরিকা কবিকবির
প্রতি শ্রদ্ধাশীল; তারা নেহরুজী ও
গান্ধীজীর নামের সঙ্গেও পরিচিত।

শ্রীঅশোককুমার সেন কিংবে এসে একটি
মূল্যবান প্রস্তাবও রেখেছেন। দক্ষিণ
আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতের কূটনৈতিক
মিশন স্থাপন করে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে
আমাদের সংযোগসূত্র বর্ধিত করার প্রস্তাব।

বলা বাহুল্য প্রস্তাবের গুরুত্ব অনস্বী-
কার্য। পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশেও ভারতের
শান্তি ও সহাবস্থানের বাণী, ভারতীয়
দর্শনের মহান ঐতিহ্যের কথা প্রচার করার
প্রয়োজন আছে। বৈদেশিক অপপ্রচার
ভারতের উদার মনোভাবের কথা বহু সময়
বহু কারণে গোপন করে ভারতের বক্তব্য ও
প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে দেখার বলে
ইতিহাসে এদেশে একাধিকবার অভিযোগ
উত্থাপিত হয়েছে। আর এ সমস্ত অভিযোগ
যে ভিত্তিহীন নয়, তারও টাটকা পরিচয়
ভারতবর্ষ মনোভাবেই পেয়েছে, সুতরাং
ভারতের বাণী দুনিয়ার সর্বত্র ভারতকেই
বহন করে নিয়ে যেতে হবে। কোনও
অঞ্চলকেই অবহেলিতভাবে ফেলে রাখলে ভুল
হবে।

জন্ম :

স্বাভাবিক বিলোপ

অল্প রাজ্যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে জন্মিত
একজনই না কি কংগ্রেসের টিকিট কাটা
সদস্য। কানে না তুলে দিলে একমুখ
অবিস্বাস্য যে এ রাজ্য প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসীদের
দ্বারা "লোকোলাইজড"। এই বছরের হিসেবেই
চোখ কপালে তোলার কারণ আছে। ১৯৬৪
সালে কংগ্রেস সদস্যসংখ্যা যেখানে ছিল
২,২০,৫২১, বর্তমানে সে সংখ্যার অস্বাভাবিক
ক্ষীণতা ১০,১৬,০৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে।
এদের মধ্যে হাজার হাজার তে রীতিমত
কর্মী।

অম্বের এই নিরস্ত কংগ্রেস প্রীতিতে
রাজনৈতিকমহল বশাখই তাগজব।

অনেকের মতে ব্যাপারটা নিছক ভুল।
সদস্য তালিকা প্রণয়নের দ্বারা খাড়া করা হয়
নি। বরং এই আত্যন্তিক ক্ষীণতার অন্যতম
কারণ, স্বাভাবিক স্বতন্ত্র পার্টির স্ব-তন্ত্র
মোহভঙ্গ সৃষ্টি করে কংগ্রেসে যোগদান।

স্বতন্ত্রের এই স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত স্বাভাবিক
বিলোপের পক্ষে একটি বিবৃতিতে বলা
হয়েছে : যেহেতু কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র পার্টির
মধ্যে অধুনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
মতভেদ বড় একটা দেখা যাচ্ছে না—সুজনা
স্বাভাবিকদের কংগ্রেস প্রবেশে আর বাধা নেই!
তাছাড়া কংগ্রেস দলভুক্তির পর তাঁরা এক-
যোগে দেশের প্রতিরক্ষা ও কৃষাণ মজুরদের
জনা কাজ করে বাওয়ার আগ্রহও প্রকাশ
করেছেন।

আরও প্রকাশ, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি
শ্রীখিন্মা রেন্ডির প্রভাবেই স্বাভাবিকদের
স্বাভাবিকলোপ সম্ভব হয়েছে। খিন্মা রেন্ডি
"ভারত কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠা করছেন জেলায়

জেলায়। তবে দুঃখের বিষয়, কংগ্রেসের
রায়ভরা নাকি এমন সব জাদিয়েল পরমায়ালা
লোক যে, তারা যে-কোনরকম ভূমিসংস্কারেরই
বিরোধী। হবে না কেন, প্রকাশ, এইসব
রায়ভরাই ছিলেন ভূস্বামী।

ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র দলের খিন্মা-
দর্শনে অভিভূত হওয়ার কারণটা যে নেহাৎ
অসমর্থ নয়, সুতরাং অনেকে সে কারণটাও
ভাবতে পারেন বৈ কি :

উত্তর প্রদেশ :

প্রতিরক্ষা তহবিলের টাকা

প্রতিরক্ষা তহবিলে সংগৃহীত অর্থকে
কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশে ইতিপূর্বে অনেক
অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটেছে
নেহরুজীর জীবনকালেই।

ইন্ডিয়ান প্রেস এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ,
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের
প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯৬২-৬৩ সালে
উত্তর প্রদেশ প্রতিরক্ষা তহবিলে সর্বমোট
সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত
কোটি টাকা। তারই মধ্যে থেকে দেড় কোটি টাকা
অর্থ ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে। প্রধান-
মন্ত্রী শ্রীনেহরু সে সময় ছয়টি বার্ষিক বাৎসরিক
পত্র লিখেও নাকি এ দেড় কোটি টাকা
শ্রীগুপ্তের হাত থেকে বার করে আনতে
পারেন নি। শ্রীনেহরু তাঁকে প্রতিরক্ষা
তহবিলের সমগ্র সংগৃহীত অর্থই কেন্দ্রের
নিকট গচ্ছিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
কাজ হয় নি।

এই টাকা নিয়ে টালবাহানার মারামারক
ফল ভোগ করছেন নিহত ও আহত জওয়ান-
গণের পরিবারবর্গ। জওয়ানদের সাহায্যার্থে
কেন্দ্র উত্তর প্রদেশকে দেয় তিনায়ত্তর লক্ষ
টাকা প্রদান করতে অস্বীকৃত হয়েছেন এ
জনাই। শ্রীগুপ্তের এই আটক করা অর্থের
জনাই জওয়ানদের সাহায্যে উত্তর প্রদেশ
তার প্রাপ্য আয়ও এক লাখ টাকা থেকে
বর্তমানে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় কৃতপক্ষ উত্তর
প্রদেশে এই খাতে আর একটি পরমাণু দেবেন
না, স্বতন্ত্র পক্ষই এ টাকার একটা মীমাংসা
হয়। তহবিলের টাকা কীভাবে খরচ করা
হয়েছে তারও একটা হিসাব দেওয়ার নির্দেশ
দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এখন প্রশ্ন উঠেছে
জবরদস্তি টাকাটা আদায় হোক।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি এক বিবৃতিতে
জানিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশে প্রতিরক্ষা
তহবিলের টাকা জোর-জবরদস্তি করে আদায়
করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী
অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে স্বয়ং
শ্রীগুপ্তের নির্বাচনী এলাকায় পাঠা বক্তৃতা
দিয়ে এসেছেন। লক্ষণীয় এই যে, বেনারসে
অনুষ্ঠিত এই সভার সংবাদ পর্বত শ্রীগুপ্তকে
জানান হয় নি।

ফ্রান্স :

গতকাল সেখানেই স্বয়ং স্বাভাবিক
যেখানে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি মোহাচ্ছন্নতা কম।
জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধনের জন্য
যে জাতি ব্যক্তি-মোহনিরূপে ক্ষমতাবে তার
নেতা নির্বাচন করেন জাতীয় কল্যাণের মুখ
চেয়ে, সে জাতি গণতান্ত্রিক শাসনের উপযুক্ততা
অর্জন করেছে একথা মেনে নিতেই হবে।
জাতির প্রয়োজন মিটিয়ে ব্যক্তি যদি সরে দাঁড়ান,
জাতীয় অগ্রগতি তাতে খরসোঁতাই হয়। অবশ্য
নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাঙিও ঘটতে পারে,
কিন্তু কেবলমাত্র জাতির ভীতিই যদি জাতিকে
একমানব আঁকড়ে ধাক্কা দ্বর্বলতা পক্ষাঘাত-
গ্রস্ত করে তোলে তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের
মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জাতীয় ভাগ্য
নির্ধারণের বলিষ্ঠতা হারিয়ে গণতন্ত্র একনায়ক-
তন্ত্রী শাসনের কাছে ক্রমেই আত্মসমর্পণে বাধ্য
হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে এই আত্মসমর্পণ,
ব্যক্তি অথবা দলগতভাবেই আত্মসমর্পণ।
সৌভাগ্যবত নির্বাচনগুলি তুল-ক্রটির যথেষ্ট
মুঁকি মাধ্যম নিয়েও প্রয়োজনীয় শাসনতন্ত্রকে
শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও সরিয়ে
বসাবার সাহস রাখেন, তারই পরিচয় পাওয়া
যায় সুস্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দেশে।

দ্বিতীয় মহাসুদ্ধের কালে দিশাহারা বিটেনকে
যে মহানায়ক বিস্তৃতপক্ষ বিস্তার করে অবিশ্রান্ত
বোনাবর্ধনের বিপর্যয়ের মাঝেও দৃঢ়তার সঙ্গে
রক্ষা করেছিলেন, প্রয়োজন মিটে যাবার পর
ইংরাজরা সেই আশ্চর্য ব্যক্তির স্যার উইনস্টন
চার্চিলকে অকল্পিত চিন্তেই শাসন ক্ষমতার
গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি দান করতে কিছুমাত্র
দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। চার্চিল-বিহনে সমগ্র জাতি যে
বসাতলে ডুব মারবে না, বা তেমন অবস্থা
দেখা দিলে চার্চিল সাহেব যে কোনোরূপ
অভিমান না রেখেই পুনরায় রাষ্ট্র-ভরণীর হাল
ধরবেন, এ বিশ্বাস গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন
ইংরেজ মনোভাবে অটুট ছিল বলেই চার্চিল
সাহেবের শাসনকাল তাঁর জীবৎকালেই অবসিত
হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

ফ্রান্সের দ্য গল জাতির এক মহা দুর্ঘোপের
দিনে ফ্রান্সকে বিপন্নজ করেছিলেন। সেটা
টনিশ ন' আটায়াল।

সে সময় আলজিরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামীরা
প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছেন। ফ্রান্সের পর পর দুটি
মন্ত্রিসভারও পতন সম্ভব হয়েছে মাত্র ছ'মাসের
ব্যবধানে। ফরাসীরা তখন জেনারেল দ্য
গলকে ডেকে এনে তাঁর হাতে প্রায় একনায়কী
শাসনভার তুলে দিয়েছিলেন আগের বিপত্তি
থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। ইঁদা, দ্য গলের
ইচ্ছা অনুসারে ছ'মাসের জন্য রাজ্য শাসনের
নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই তাঁকে দান করা হয়েছিল।
অন্যকার যা, প্রকৃত গণতন্ত্রে তা মেনে
লাই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার উপায়।



প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্য গল ভোট দিচ্ছেন

কিন্তু আজ আর আলজিরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামীদের
মত কাউকে দমন করার, সেনাবাহিনীর মধ্যে
শৃঙ্খলা আনয়নের জন্যেই প্রয়োজন নেই
দ্য গলের। তাই ১৯৫৯ সালের অবস্থার পরি-
বর্তন ঘটেছে ফ্রান্সে। সেদিন দ্য গল জাতির
তাপ্রিয়মন্তাক্রমে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিপুল
ভোটাধিক্যে। সম্ভব বিপর্যয়ের মুখ থেকে
ফিরিয়ে এনেছিলেন ফরাসীদের। সামরিক
অস্ত্র বানৎকারের অবসান ঘটিয়েছিলেন কীতি-
মান পুরুষ জেনারেল দ্য গল।

কিন্তু জাতির মনে এই বাস্তব পরিবর্তনের
আশঙ্কা সম্ভবত স্বয়ং দ্য গলেরও ছিল না।
তিনি ভেবেছিলেন কৃতজ্ঞতাবোধই তাঁকে
পুনর্নির্বাচিত করবে প্রেসিডেন্ট পদে। কিন্তু
ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ যে দ্য গলীয় ক্ষমতা
কেন্দ্রীকরণের প্রতি ক্রমশ ভ্রান্ত হারিয়েছে—
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক
ফলাফলই তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করল।

একদা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী ছিয়ার্ডর
বহুরের বৃদ্ধ এবার কুড়োলে মাত্র পঁয়তাল্লিশ
শতাংশ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট
সমর্থিত ফ্রাসোয়াঁ মিত্তারাল আপন কোলে
টেনে নিলেন একত্রিশ শতাংশ ভোট। ফ্রান্সের

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী দ্য গল এই বিপর্যয়ের
জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি হয়ত
এমন একটা অঘটনের কল্পনাও করেন নি।
ফরাসী জাতিকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত
করে আত্মগরিমাকে জাতীয় শক্তিগরিমার
রূপদানের স্বপ্নে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তিনি।
কিন্তু এই আঘাত যে অনিবার্য ছিল, সম্ভবত,
দ্য গলের আত্মবিশ্বাস সে প্রশ্ন আমল দেয় নি।
আর তাই নির্বাচনের জন্য বিশেষ কোনো
প্রস্তুতির তোয়াক্কা করেন নি পূর্বাধে।

প্রতিপক্ষ কিন্তু উপযুক্ত প্রচারের সুযোগ গ্রহণে
কার্পণ্য করেন নি। মিত্তারাল পারমাণবিক
অস্ত্র-বিরোধী সমাজকল্যাণমূলক কার্যসূচীর
প্রতিজ্ঞা সামনে রেখেছেন—দ্য গল পারমাণবিক
অস্ত্রকে অপরিহার্য জানে বিপুল অর্থ অপচয়
করছেন—মিত্তারাল দ্য গলের সমালোচনায়
এই বিষয়টিকে প্রধান আলোচ্য করেছেন।
মিত্তারাল বৃদ্ধ গলের বয়সের প্রশ্নও জাতির
সামনে তুলে ধরেছেন। দ্য গল বর্তমানে
ছিয়ার্ডর। প্রেসিডেন্ট পদে আরও সাত বছর
পুরোদমে তাঁর পক্ষে দামিষ্ট পালন সম্ভবপর
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টিই এই প্রচারের
আগল উদ্দেশ্য। তাছাড়া জোটবিরোধী দ্য

সাম্প্রতিক বঙ্গবাসী

গল যে ন্যাটো সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ও ক্রান্তিকালে সামরিক উন্নতির পক্ষেই টেনে নিতে আগ্রহী একথাও শান্তিপ্ৰিয় জনগণ ভালভাবেই জানেন। জানেন তাঁরা, দ্য গল মানেই এক জাতি এক নায়ক এক শক্তির দাপট। কিন্তু সাধারণ মুশুফা হয়ত দ্য গলীর দাপটের আরও মাত বছর খেছানীতি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত নন।

জনগণের মাঝে দ্য গলকে অতঃপর আত্মপর্বা খেছানীতি থেকে কিছুটা সরে দাঁড়াতে হবে যদি চূড়ান্ত নির্বাচনে তিনি স্বপ্নে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। আর তা হতে হলে বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্বিতা নির্বাচনে জরী হয়ে আসতে হবে তাঁকে। কিন্তু দ্য গল বিজয়ী হলে তাঁর পুরনো নীতিই বহাল থাকবে বলেই বোধহয় তাঁর মত ব্যক্তিগতচেতন মানুষ গণপরিষদের কাছে আপন মতবাদকে নবনীর করবেন এজেন্ডা প্রকাশ্যে। অতি আশা নিশ্চয়ই। কেন না দ্য গলের বয়সের দিকে তাকালে মাত বছর তাঁর পক্ষে সুদীর্ঘ সময়ই বলতে হবে। আগামী মাত বছরের পরিবর্তনকেও তৃতীয় নির্বাচনের জন্য গণপরিষদের প্রয়োজন তিনি অনুভব করবেন এমন আশা কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

সে কারণেও অকনিউনিস্ট বিভাগসার স্বাস্থ্য সামরিক ভাষায় বলে আশা করা যেতে পারে। অকনিউনিস্ট হয়েও কমিউনিস্ট সমর্থন তিনি পেয়েছেন এবং সম্ভবত মধ্যপন্থীরাও নিজা-স্বাস্থ্য পান্না ভারী করার চেষ্টায় অনাগ্রহী হবেন না। ওদিকে দ্য গলের হাত শক্ত করার জন্য বঙ্গপন্থীরা ভোটদানে বিরত সমমতাবলম্বীদের মুখে এনে ভোট বৃদ্ধির প্রয়াস পাবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে প্রচারকার্য দুতরফেই জমে উঠেছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমভালে টি-ভি সাক্ষাৎকারে মুখ দেখাচ্ছেন।

দ্য গলবাদী শক্তির সঙ্গে গণবাদী শক্তির এই সংঘর্ষে ক্রান্ত যে অগ্নিপরিষ্কার সমুদ্রীন, সে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। বিশ শতকীয় গণ-চেতনায় ব্যক্তিগরিমার স্থান কতদূর টিকে আছে করণী নির্বাচন তারও সাক্ষ্যদান করবে।

সোভিয়েট রাশিয়া :

গত বছর সোভিয়েট নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারী শ্রীমিকিতা ক্রুশ্চেভ। সেটাও বছরের শেষ দিকে, অক্টোবর মাসে। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বর্তমান বছরের শেষপাদে বিদায় নিলেন শ্রীমিকোয়ান।

শ্রীমিকোয়ানের অবসর গ্রহণ অবশ্য কোনো কূট রাজনীতির ফলশ্রুতি নয়; তিনি

দীর্ঘদিন ধাব্য শারীরিক কারণে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বর্তমানে তাঁর বয়সীনাও সত্তর পার হ'ল।

শ্রীমিকোয়ানের স্থলাভিষিক্ত হলেন শ্রীপদ-গরনি, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে যার স্থান ছিল পার্টির বর্তমান প্রধান সম্পাদক শ্রীবেজ-নেভের পরেই। শ্রীপদগরনির এই প্রভাব-শীল পদ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে রাজনৈতিক বিকর্তন অবশ্যই শ্রীপদগরনির পক্ষে রাজ-নৈতিক দিক থেকে খুব লাভজনক তো নয়ই, বরং এক হিসেবে ক্ষমতাচ্যুতিরই কারণ হ'ল। আর এজন্যই হয়ত শ্রীপদগরনি সভা-পতির পদ গ্রহণ করে তাঁর ক্ষেত্র প্রকাশ করে বলেছেন, এই পদবিকর্তনের দ্বারা কার্যত তাঁকে বিশাল গ্রহণই করতে হ'ল। সভাপতির বা প্রেসিডেন্টের পদটি অন্যান্য অনেক দেশের মতই কার্যত 'রবার স্ট্যাম্প' পদ। সুতরাং কাজের লোকের পক্ষে এমন পদে আসীন হওয়াটা যতই কবদ্যপূর্ণ হোক, মোতদীয় মোটেই নয়।

উচ্চ পর্ষায়ে রদবদলের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা, সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীআলেকজান্দার সেলেপিনের ঐ পদ থেকে ইস্তফা ও পার্টি কর্ম পরিষদে শ্রীবেজনেভের সহকারীরূপে যোগদান। এই পদ পরিবর্তনও সমবিকভাবে ক্ষমতাচ্যুতি বলে মনে করা যেতে পারে। কেন না শ্রীকোসিগিনের ও শ্রীবেজনেভের পরেই ক্ষমতানীর্ঘ স্থান ছিল শ্রীসেলেপিনের। তাঁর পদটি রাজনৈতিক প্রভাব বিভাগের পক্ষেও ছিল অনুকূল। তাছাড়া শ্রীসেলেপিন ছিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রধান। এই ক্ষমতাও একই সঙ্গে শ্রীসেলে-পিনকে হারাতে হয়েছে।

রাশিয়ার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট শ্রীমিকোয়ানই একমাত্র—যিনি এশিয়ান রাশিয়ার স্তান হয়েও রাশিয়ার সর্বোচ্চ কবদ্যপূর্ণ আসন অধিকার করে ছিলেন ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে। তৎপূর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার সরকারী নীতি প্রচার করে রূপ প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব সাকল্যের সঙ্গে পালন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও প্রেসিডিয়ামে রয়েছেন এখনও।

ক্রুশ্চেভ-বাহুব শ্রীপদগরনিও (নিকোলাই ভিকটরোভিচ) শ্রীসেলেপিনের মতে সোভিয়েট রাজনীতিতে অন্যতম ক্ষমতাবান নায়ক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি আছেন ১৯৬০ সাল থেকে। তিনি প্রেসি-ডিয়ামেরও সদস্য। শ্রীপদগরনি বর্তমানে বাঘাটি বছরের কর্ণবীর।

শ্রীআলেকজান্দার সেলেপিনের বয়স অপেক্ষা-কৃত অল্প। তিনি এখন ছেল্লিশের যুবক। তাঁর কীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন গুরুত্ব-

পূর্ণ ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণকালের মধ্যে প্রেসি-ডিয়ামে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাসিকারেই সফল হয়েছিলেন তাই নয়, তিনিই ছিলেন পার্টি ও রাষ্ট্রের নির্দেশ কার্যকর কমিটির চেয়ারম্যান। যুবশমাজের নেতৃত্বের সুযোগ এবং গোপন পুলিশবাহিনীর পরিচালকরূপেও শ্রীসেলেপিন অগাধ ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন শ্রীমিকিতা ক্রুশ্চেভের আমল থেকেই। তাঁর পদ বিবর্তন, সুতরাং অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলে সর্বাধিক আলোড়নের কারণ হয়েছে। সোভিয়েটের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বর্তমান রদবদলে শ্রীসেলেপিনই সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তি।

পশ্চিম জার্মানী :

"পশ্চিম জার্মানী আজ স্যাক্তান্যে দিয়েছে ট্যাঙ্কবংসী ক্ষেপণাস্র। আগামীকাল যে পারমাণবিক অস্ত্রও সরবরাহ করতে পারে।" একথা জানিয়ে পূর্ব জার্মান বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নতুন অধিকর্তা শ্রীহার্টট ফিশার মধ্যিক আর এক আশঙ্কার খবরও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির যোগ্যতা পশ্চিম জার্মান ইতিমধ্যে অর্জন করেছে। তৎসত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানীকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করার চেষ্টা চলছে বা বিশৃঙ্খলির পক্ষে যারায়ক।

তিনি সূত্র দিয়ে দিয়েছেন যে, দু-দুটো বিশৃঙ্খলের দায়ভাগী জার্মানী। তৃতীয় বিশৃ-মুদ্রের সূত্রপাতও সেখানেই ঘটতে পারে।

ন্যাটো চুক্তি অনুসারে পশ্চিম জার্মানীর হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে এ-বিষয়েও শ্রীফিশার সচেতন করতে চেয়েছেন পশ্চিমী শক্তিবর্গকে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাঁর এই আহ্বানে কতদূর সাড়া দেবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। হিটলারকে অস্ত্র অবস্থায় সহ্য করেই বিপুল ইতিহাসে সভ্য মানুষের মধ্যে একটি পৈশাচিক নরখাণ্ডকের সৃষ্টি করা হয়েছিল সেদিন। আবার আর এক ভাঙি দ্বিতীয় মারময়জের আয়োজন করছে জানলে, স্বভাবতই বিশৃঙ্খল আশঙ্কার দোলায় অতিত হবেন।

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

কতিপয় শাদা মানুষের ঔদ্ধত্যে সমগ্র আফ্রিকা তথা মানবতাবাদী ন্যায়বাদী বিশ্বের বিস্ময় ও বিস্ফোত যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছে, রোডেশিয়ার প্রভুত্বের দাবিদার শাদা বিটেন এখনও বোধ হয় তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। কমনওয়েলথের নড়বড়ে বাঁচায় বিটেন আজও যাদের ধরে রাখতে সক্ষম, রোডেশিয়াকে কেন্দ্র করে তাদের অনেকেই বিটেনের সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষচিহ্নরূপ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

যাযের কমনওয়েলথীয় বাটারি ফটক ভাঙার
তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চকল হয়ে উঠেছেন।

কমনওয়েলথের আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি রোডে-
শিয়ার ব্যাপারে ব্রিটেনের 'আনকমন' পলিসি
লক্ষ্য করে হতাশ হয়েছেন।

উদ্ধৃত আইমান সিমথের একতরফা স্বাধীনতা
ঘোষণার প্রাক্কালে ঘোষিত ব্রিটিশ ইতিহাস যে
আগলে চিরন্তন ব্রিটিশ ধর্মতানি বই অন্য কিছুই
নয়, ক্রমেই এই বিশ্বাসে আফ্রিকান রাষ্ট্র-
সমূহ এখন যথার্থ প্রাণ পেয়েছেন। কেন না
দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন অব্যাবহিক
কার্যকরী কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি।

সামরিক অভিযানের প্রশ্ন তো চুলোর পেছে,
অর্থনৈতিক অবরোধের ক্ষেত্রেও উইলসন
সরকার পরোক্ষ পশ্চাদপসরণই করছেন।
অর্থনৈতিক অবরোধের ক্ষমতা যে ধীরগতি
জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে তদুপায় দক্ষিণ
রোডেশিয়ার বিদ্রোহী আইমান সরকারের প্রতি
ধরং ব্রিটেনের পরোক্ষ সহযোগিতাই প্রমাণিত
হচ্ছে। সম্প্রতি তামান আফ্রিকা ছাত্র সংসদের
প্রতিবাদলিপিতে (বা ব্রিটিশ দূতাবাসে প্রেরিত
হয়েছে) তো স্পষ্টই এ সন্দেহ প্রকাশ করে বলা
হয়েছে যে, "দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যানসিট এবং
পার্টগালের সহযোগিতায় তথা ব্রিটেনের
নেতৃত্বে" আইমান সিমথ এই দুঃসাহসিক এক-
তরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ঝুঁকি গ্রহণ করতে
পেরেছেন; এবং "ব্রিটেনের ক্রিয়াকলাপ
বিবেচনায় বোধহয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রীউইলসন
রোডেশিয়া গফরে যান কেবলমাত্র স্বাধীনতা
ঘোষণার ব্যাপারে আইমান সিমথকে বনাবল
প্রদানের উদ্দেশ্যেই।" ছাত্ররা স্পষ্ট ভাষায়
দক্ষিণ রোডেশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য
সর্বশেষ দাবী করেছেন ব্রিটেনকেই।

কমনওয়েলথের আফ্রিকান রাষ্ট্রজোটও
এক চরমপন্থে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্রিটেন
যদি অবিলম্বে রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শালা
সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে
তাঁরা একযোগে ব্রিটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক
সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

কতিপয় আফ্রিকান রাষ্ট্র দক্ষিণ রোডে-
শিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার
দাবিও পেশ করেছেন।

তানজানিয়ার নবী প্রীকামবোবার মন্তব্যে
এই চরম পর্বেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি
দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকান রাষ্ট্রবৃন্দকে
উদ্ধারের নিমিত্ত আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিকে
সর্বশক্তি প্রয়ুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে এ জাতীয় চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে
নিষেধের একব্যবস্থা শক্তি সম্পর্কে স্থির নিশ্চয়

হওয়া উচিত, অন্যথা আফ্রিকান রাষ্ট্রজোটের
ভাঙন ধরতে পারে বলেও দায়িত্বশীল কোনো
কোনো নেতা বিশেষভাবে চিন্তিত।

নিশর :

পররাষ্ট্রসী কলোনিয়ালিজমের শত্রু নবীন
নিশর কিন্তু চিন্তার ভোম্বালা রাখে না। আইমান
সিমথের ঔদ্ধত্যের জবাবে নিশর সরকার দক্ষিণ
রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এক সরকারী নির্দেশে
বলা হয়েছে যে, সূর্যক হয়ে দক্ষিণ রোডেশিয়ার
যেসব জাহাজ মালপত্র নিয়ে বাবে সেগুলিকে

আটক করে বাজেয়াপ্ত করা হবে জাহাজী
মালপত্র। বাজেয়াপ্ত করা হবে নিশরে প্রাপ্ত
দক্ষিণ রোডেশিয়ার ঘাটতীয় সম্পত্তি। সূর্যক
খালের বধ্য দিয়ে কোনও রোডেশীয় জাহাজকে
চলাচল করতে দেওয়া হবে না বলেও ঘোষণা
রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার দায়নীয়তা বিসর্জিত
শালা শরতানির জবাবে ঐ ঐতিহাসিক সূর্যকই
সর্বপ্রায়ে দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করল,
শেবত ঔদ্ধত্যের জন্য প্রয়োজন হলে নিশরই
অকৃতোভর পররাষ্ট্র উৎপাটনের দায়িত্ব গ্রহণ
করবে ব্যর্থতার।



সোভিয়েত দেশ

রুশ ভারত মৈত্রীর সচিত্র পার্শ্বিক পত্রিকা
পড়ুন ও গ্রাহক হোন

তিন বৎসরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সনের একখানা সাত
পৃষ্ঠার সচিত্র, সুদৃশ্য, রঙীন ক্যালেন্ডার ও একখানা পুস্তিকা
সেওয়া হইবে।

আজই তিন বৎসরের চাঁদা মনিওর্ডার যোগে পাঠান। চাঁদা
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ক্যালেন্ডার ও পুস্তিকা উপহার
পাঠান হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন ৩১/৩/৬৬ (ইংরেজী) পর্যন্ত
কনসেশন হার চালু থাকিবে।

এক বছরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সালের একখানা ক্যালেন্ডার
পাঠান হইবে।

চাঁদার হার

এক বছর

তিন বছর

বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়—

—টাকা ৫'০০

টাকা ১০'০০

ইংরাজী ভাষায়—

—টাকা ৬'০০

টাকা ১২'০০

নীচের ঠিকানায় মনিওর্ডার পাঠাইবেন

‘সোভিয়েত দেশ’

১/১, উড স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬

মহাজন

শ্রী দিলীপ কুমার রায়

(বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রীতিরদারজন রায়ের উদ্দেশে লিখিত পত্র প্রবন্ধ)

আপনার পত্রটি আমার সতিই ভালো লেগেছে। নানা বিশ্লেষণে আপনি আপনার স্বজ্ঞার পরিচয়ও দিয়েছেন চমৎকার। কিন্তু আপনি যখন লিখে বলেন : “মানুষের নিজের কোনো স্বাধীনতা আছে বলে আমি মনে করি না; এমন-কি সে যে ইচ্ছা করে ভাতেও তার স্বাধীনতা নেই; তার অন্তর ও মহিজ্জগতের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলাফলই তার মনে জাগিয়ে তোলে বিবিধ ইচ্ছা; সে নিয়তির অধীন”—তখন একটু আশ্চর্য না হয়ে পারি নি। কারণ এ-কথা সত্য বলে মনে নিতে হলে মানুষের আত্মিক সাধনার দুর্বীর প্রেরণাকেও খসে নিতে হয় এক বাইরের-চাপে-গড়ে-ওঠা প্রণোদনা ওরফে অদৃষ্টবাদ। The old story—হাজার হাজার চিন্তাশীল মানুষই পড়েছেন এই দুরন্ত অসহায় “বাদ”-টির কবলে। যুক্তির দিক দিয়ে এ বাদটিকে কাবু করা যায় না। কারণ যা ঘটছে তা না ঘটাই পারত না, এ-কথা যদি কেউ বলে, তা হলে সে না-ঘটাকে উল্টিয়ে (reverse করে) সে-অবস্থায় আনা যায় না যে-অবস্থা ছিল ঘটনাটি ঘটবার আগে। গেলে মানুষের ইচ্ছার মোড় ফিরিয়ে পুরুষকারের সত্যতা প্রমাণ করা যেত—যা ঘটেছে তার ভোল বদলে দিয়ে, নয়কে হয় ও ইয়াকে নয় করে।

এ-কথাও বলা যায় সমান যুক্তির জাঁকে যে, মানুষের ইচ্ছা বা শক্তি সীমাবদ্ধ বলার মানে এ নয় যে, এ সীমার মধ্যেও তার স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না। উদাহরণত, কোনো অদৃষ্টবাদী যদি ভবিষ্যদ্বাণী করতে সরোষে বলেন : “এই মূহুর্তে তোমাকে নাকে খুঁ দিতেই হবে”—তা হলে আমি নাক উঁচু করে তাকে ধূয়ো দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে, এখানে কোনো নিয়তিরই সাধ্য নেই আমাকে নাকে খুঁ দেওয়ার। কিন্তু তার উত্তরেও অদৃষ্টবাদী বলতে পারেন এবং সতিই বলে থাকেন যে, আমাকে নাকে খুঁ দিতে হবে এ-চ্যালেঞ্জ তথা সে-চ্যালেঞ্জকে দাবিয়ে নাক উঁচু করে প্রশ্নানও ঐ অদৃষ্ট নিয়তিই লিখেছিলেন আমার ললটালিপ-রূপে। তা হলে তাকেও অপ্রমাণ করা যায় না। কাজেই এ দাঁড়ায় না-হার না-জিৎ তর্ক।

কিন্তু এ হল খতিয়ে ন্যায়ের তর্ক—
তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল—তর্কেরই
সগোত্র। কেন-না মত্থে বতই বলি না কেন,



শ্রীদিলীপকুমার রায় সাধক। কী সংগীত,
কী সাহিত্য—সাধনার সর্বস্তরেই তার অশ্রুত
শক্তির পরিচয় আমরা পেরেছি। সংগীত
নাটক আকাদেমির ফেলোশিপের জন্য তিনি
নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীদিলীপকুমার বহু
ভাষাবিশ। বিশ্বের অসংখ্য গুণীজনের
সংস্পর্শে তার জ্ঞানভান্ডারে অকুরন্ত তথ্য।
তিনি তত্ত্ববিলাসী নন, সাধনমার্গের পথিক।
এই প্রবন্ধে তিনি এমন দুই মহাজনের কথা
বলেছেন, যারা ধূলিময় ধরণীর ধূলিতে
অবহেলিত মানুষের জন্য স্বর্গ রচনার মহৎ
প্রেরণায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

আমরা মনে মনে কেউই বিশ্বাস করি না যে,
আমার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাই নেই
প্রতি ইচ্ছাই এক অলক্ষ্য স্পর্শের অশ্রুত

বাঁশির স্পন্দনে ফণা মেলেছে বা মাথা
নোয়াচ্ছে। আমার কাছে বেশি ভালো লাগে
ভাবতে মহাজনদের কথা—যাদের ইচ্ছার
বলিষ্ঠতা আমাকে মুগ্ধ করে—যারা থেকে
থেকে দেখা দিয়ে তাদের বিরূপ প্রতিভা ও
অগাধ মহত্ত্বের আলোর আমাদের পথ-চলার
পাথের দেন, আধারে আলো ধরেন, তামাসিক
বিষাদে আমাদের সমুদ্র আত্মশক্তি জাগিয়ে
তুলে উধাও করেন ধ্রুব স্বপ্ন ছেড়ে অধ্রুব
অনুপের দূরভিসারে।

এমন একটি মহাপুরুষের কথা সম্প্রতি
পড়ছিলাম মুগ্ধ হয়ে। তিনি দিন কয়েক
হল ঠাঠা সেপ্টেম্বর তারিখে নব্বই বৎসর
বয়সে দেহরক্ষা করেছেন সুদূর আফ্রিকায়
ল্যান্সবারেনে গ্রামে নিগ্রোদের মধ্যে, যেখানে তাঁর
জগন্নিখাত হাসপাতাল গড়েছিলেন একক
চেষ্টায়। তিনি পঞ্চাশ বৎসর আগে এ
পাণ্ডববিজিত বিহুয়ে বান ডাক্তার হয়ে এক
অবজ্ঞাত বিদেশী জাতির সেবা করতে যাদের
কাছ থেকে তিনি কোনো প্রতিদানই চান নি
শুধু তাদের সেবা করার অধিকার ছাড়া।

এ-মহাপুরুষ জর্মন আলসাসে জন্মে-
ছিলেন ১৮৭৫ সালে। মানস মনীষা ও শিল্প-
প্রতিভা ছিল তাঁর যেন সহজাত কবচকুণ্ডল।
শৈশব থেকেই তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি সবারই
চোখে পড়েছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি
তিনটি বিষয়ে ডক্টর উপাধি পান—দর্শনে,
সংগীতে ও ধর্মতত্ত্বে (Theology)। সবাই
আশা করেছিল তিনি অচিরেই দেশের ও
দশের একজন হয়ে যুরোপের প্রতিভাধরদের
সংসদে নিজের স্থান করে নেবেন। কিন্তু
হঠাৎ তাঁর মন মোড় নিল এক “শ্রাবণীয়
দিকে—তিনি স্থির করলেন তার পরে নয়টি
বৎসর ধরে বিজ্ঞান ও আর্টের চর্চা করে তার
পরে ব্রতী হবেন মানুষের সেবার।”

কিন্তু কার সেবা? ভাবতে ভাবতে তাঁর
মনে হল যে, তাকে সেবার লাগতে হবে সব-
চেয়ে অনাদৃত যে-জাতি তারই, যাদের সংগে
সংস্কৃতিদীপ্ত পাশ্চাত্য জাতি অমানুষিক
ব্যবহার করে এসেছে আবহমান কাল—অর্থাৎ
নিগ্রো। তিনি বললেন তিনি করবেন এর
প্রায়শ্চিত্ত সবার হয়ে—খানিকটা খৃষ্টান
vicarious atonement-এর সগোত্র বলব।

সাম্প্রদায়িক বসুমতী

মানুষ সব দেশেই নানা আদর্শ পড়ে যুগে যুগে—বিশেষত কৈশোরে ও যৌবনে। কিন্তু সম্প্রদায় ও বৃত্ত গ্রহণ এক জিনিস নয়। শ্বাইংজাং সম্প্রদায় কবলেন ডাক্তার হবেন নিগ্রোদের জন্যে আফ্রিকাতে হাসপাতাল গড়তে। অমনি পাঁচ বৎসর সব ছেড়ে ডাক্তারি পড়া শুরু হল। ডাক্তারি পাশ কবে নানা শহরে পিয়ানো বাজিয়ে বস্তুত দিবে তথা চাঁদা আদায় কবে গেলেন মধ্য আফ্রিকাতে প্রিয়পরিজন সবারই আপত্তি অগ্রাহ্য করে। একেও কি বলবেন তাঁর নিয়তি, না পুরুষ-কারের স্বৈচ্ছার স্বাধীনতাকে খানিকটা মেনে নেবেন—হোক না গভীর অনিচ্ছার?

তার পর সেখানে গিয়ে সে কি বসুমতী প্রতিষ্ঠা পাবার পক্ষে। তাঁর স্ববচনিত দুটি স্মৃতিচারণ পড়তে পড়তে মৃগ হতে হয় : On the edge of the Primeval forest ও More from the Primeval forest। নিজে হাতে তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছিল বিখ্যাত হাসপাতালটি যার জন্যে তিনি পরে নোবেল প্রাইজ পান। এক্ষেত্রে আরো স্মরণীয় যে, যাদের সেবার তিনি আত্মোৎসর্গ কবলেন তাদের সন্দেহ ও বিমূঢ়তাও তাঁকে দমতে পারে নি। এ বই দুটি পড়তে পড়তে সত্যিই প্রাণে পুলকশিহরণ জাগে ভাবতে যে, মানুষ পারে পণ নিয়ে দেবতা হতে—সব মানবিক লোভ ভয় জয় করে নিষ্কাম কর্মরত হতে, আর সে এমন দুর্ভাগাদের সেবার যাবা তাঁকে অন্তত প্রথম দিকে বহু দিন ধরে অবিশ্বাস করেই এসেছিল। তিনি হেসে লিখেছেন—শ্বিতাঈবাব বখন যান ল্যান্সবারেনে তখন এক নিগ্রো বালিকা তাঁর ছাত্রা মাড়াতোও চাইত না, বলত : human leopard? কেউ তাকে বোঝাতে গেলে সে মাথা নেড়ে বলত : শূঁমি বললেই হল। কাল আমি স্বাচ্ছন্দ্য দেখলাম বাঘটা অমূল্যকে সম্বোধন করে গেল তার হাসপাতালে, তখন সে বেঁচে ছিল। তার পবে সকালে তাকে নিয়ে যখন বাঘটা বেরিয়ে এল তখন সে মরে গেছে।”

এহেন পরিবেশে এই মহাত্মাকে কাজ করতে হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তিনি লিখেছেন প্রথম বইটিতে যে, অনেক বৎসর তাদের মধ্যে থাকার পরে তবে তারা তাঁকে বিশ্বাস করছিল। তখন সে কি তাদের কৃতজ্ঞতা! চোখে জল আসে পড়তে পড়তে। বিশদ বর্ণনা কবাব স্থানা-ভাব, তাই অনুরোধ করি বইটি পড়বেন। এমন বই কটা দেখা যায় যা পড়লে মন উন্নত হয়, মানুষের বিশ্বাস আসে? একদিকে আদ্য খবর পাচ্ছি নিরীহ নরনারীরা ঘাড়তে এমন-কি হাসপাতাল, গুরুদ্বার ও গির্জারও একদল সন্দেহানুসারীদের বোমা ফেলা—অন্যদিকে মনে পড়ে এই মহাপুরুষের কথা যিনি এমন পরিবেশে বেছে নিলেন তাঁর সেবার জন্যে যে পরিবেশে খুব কম মানুষই স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারে। তাঁর

বর্ণনা পড়লে দেখতে পাই যে, যাদের মধ্যে তিনি গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখনো অনেক গ্রামেই মানুষ মানুষকে খায়।

কী? ভাবছেন বাস্তব বলাই? তবে শুনুন মহাত্মা শ্বাইংজাং নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃত দিচ্ছি। তিনি More from the Primeval Forest-এর প্রথম অধ্যায়েই লিখেছেন (অনুবাদই দিলাম এখনে) : “দুআলার মিশনারিরা বলেন—নানা জেলার এই নরখাদকরা তাদের নৃত্য করে থাকে যাদের উপাধি ‘মানুষ বাঘ’ (human leopard)। তাদের ভয়ে কেউ সম্মার পর ঘর ছেড়ে বেরতে পারে না। এরা সত্যিই বিশ্বাস করে—লিখেছেন শ্বাইংজাং—‘যে, তারা বাঘ, কাজেই মানুষকে তাদের মারাই চাই। তারা দল বেঁধে উধাও হয় হাতে বাঘের নখ বেঁধে। কোনো পশুকে সামনে পড়লে বাঘের মতোই সব আগে ডব্বি ঘাড়ের ধমনী ছিঁড়ে ফেলে (gorilla catoid artery)। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হল এই যে, এরা সত্যিই অজ্ঞাত রক্ত হৃদয় দাঁড়িয়েছে। কোনো মানুষকে ইত্যা-কবার পবে মানুষের খুলিতে করে তার রক্ত পান করে। আর যারাই এ রক্ত পান কবতে বাধ্য হয়, তাদেরই জোব করে। ‘বসুদের দলে’ ভর্তি কবা হয়। এমনি তাদের প্রভাব যে, যারা রক্ত পান করে তারাও বিশ্বাস কবে বসে যে, তারা আর মানুষ নেই। তার পবে তাদেরই কোনো একটি ভাই বা বোনকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়—নবে সকলেই সেই হত্যাকাণ্ডে যোগ দেন মহৎসর্বে।”

ভাবতে পারেন এত দেশ থাকতে সব ছেড়ে তিনি এই অমানবিক বর্বরতার দেশে স্বেচ্ছায় গেলেন—শুধু বাওয়া নয়, নিজে হাতে তাদের জন্যে হাসপাতাল গড়লেন একাই? পড়তে পড়তে যেন সত্যিই বিশ্বাস হতে চলে না—রূরোপেব কোনো মহামনীষী ভেবেসিঁতে খোলা চোখেই কি কাঁপ দিতে পারেন এভাবে এমন অভাবনীয় গহন যে যাব সম্বল কিছই জানেন না? বিচক্ষণতা বলেছেন : যো ধ্রুবাণি পবিত্রাঙ্গ অল্পব্যাণি নিবেবতে—যে ধ্রুব ছেড়ে অল্পবের পিছনে ধাওয়া কবে—তারই নাম মৃত্যু আশ্রয়ভাট। সুবিশ্বাস দিক দিবে তাই বটে কিন্তু এ যুগের ইতিহাস যখন লেখা হবে—যখন পঞ্চাশ বৎসর বাদে—তখন এখনকার বিচক্ষণদের কজনেব নাম তাতে থাকবে বলা না গেলেও একথা বলা যাবে অসংশয়ই যে, সে ইতিহাসে আধুনিক রূরোপেব দুটি মহাপুরুষের নাম স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকবে : পাদ্রে পিও ও আলবার্ট শ্বাইংজাং

শ্বাইংজাং পুরোছ বইটির বিস্তারিত অধ্যায়ে লিখেছেন যে, থেকে থেকে তাঁর হাসপাতালে দেখা যেত নানা রুম্মরুকে তাদের প্রতিবেশীরা রাতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ত্রিকূলে যাদের কেউ নেই,

তাদেরও এ মহাজন কেলতেন না। দিতেন ঠাই, অল্পান্ত অনুরূপায় কবতেন চিকিৎসা—কখনো কুষ্ঠরোগীর, কখনো নির্কালস রোগীর, কখনো দৃষ্টান্তাত্মক রোগীর—আরো যে কত বোগ—ele ping sickness, যক্ষ্মা, হার্নিয়া, পক্ষাবাত, ইত্যাদি। লিখেছেন তিনি :

“My hospital is open to all sufferers. Even if I cannot save them from death I can at least show them love, and perhaps make their end easier. They are welcome, therefore, to come at night and lay such poor creatures at my door.”

(আমার হাসপাতালে সব আত্মবৈ স্থান আছে। তাদের যদি আমি বাচাতে নাও পারি অন্ততঃ একটু স্নেহও তো পারে তাবা আমার কাছ থেকে—সত্যুর স্বর্ণগা একটু তো কমবে তাদের।)

আমাদের নানা দর্শনে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নানা ব্যাখ্যা আছে। প্রতি দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যেই কিছু সত্য থাকে—বলতেন শ্রীঅরবিন্দ। আমার মন যখন মানুষের দুঃখবৈশ্বের কথা ভেবে গভীর দুঃখ পাব তখন আমি একটু সান্ত্বনা পাই ভাবতে যে, নরায়ণদের বোধ দেখা মিললেও বিবল মহাজনদের আলোও তো থেকে থেকে এসে ছাড়বে পড়ে এ আত্ম পৃথিবীতে—যাব উদ্ভাস কিছটাও তো আঁধার কাটে, মন একটুও তো ক্ষতিপূরণ পায় দুঃখাত্মদের অভ্যাচারে। এ আমার কথার কথা নয়। বর্তমান যুগের পাকিস্তানের বর্বর আচরণে পাণাপাশ এই মহাপুরুষের কথা ভেবে সত্যিই আমার ক্রিষ্ট অশান্ত মন কিছটা সান্ত্বনা পেয়েছিল বলেই এ মহাত্মার নাম কবলাম আজ।

মন আমার সবচেয়ে অতিভূত হয় ভাবতে যে, এ মহামনীষী প্রতিভাযব রূপে সর্বদ্যত শিল্পী ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকের প্রতিষ্ঠা পাবার পবেও চান নি নাম বশ অথ দেহসুখ। সত্যিই সময়ে সময়ে তাঁকে নিজে হাতে হাসপাতালের দেবাল তুলতে হলে, ছাদ ছাইতে হলে পথটালি (patrol) দিলে। একবার তিনি এক নিগ্রোকে বলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তাতে সে বলে : “আমি বোঝা বইব। সে কি। আমি যে ইনটেলেকচুয়াল।” শ্বাইংজাং তাকে হেসে বলেন : “খ্যা। তুমি বনতে পেরেছ যা আমি চেষ্টা কবেও হতে পারি নি।”

এমনই সরস মানুষ ছিলেন তিনি। কখনো কারুর কাছে নিজের জন্যে কিছু চান নি। নোবেল প্রাইজের সবটুকু শুধু হাসপাতালে দেওয়াই নয়, থেকে থেকে ফিরে যেতেন রূরোপে নিগ্রোদের জন্যে কমস্ট দিবে টাকা তুলতে। এক এক সময়ে দারুণ

পরিপ্রম করতে হত এজন্য—বিশেষ বৃক্ষ ধরসে। কিন্তু অসমামান্য ছিল তাঁর প্রশংসিত। তাই—লিখেছেন তাঁর একাধিক জীবনীকার—তিনি নিযমিত দিনে ১০।১৪ ঘণ্টা খাটতেন। সম্মার সময় পেলে তাঁর একমাত্র চিঠিবিনো-ধনের উপায় ছিল পিয়ানো বাজানো। আর সময় পেলে নানা দার্শনিক বা ধর্মীয় বা সাম্প্রতিক বই লেখা, যথা The Philosophy of Civilization, The Quest of the Historical Jesus, The Mystery of the Kingdom of God, J. S. Bach, Goethe. শেষ জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শনেরও গভীর অনুপ্রাণী হয়ে উঠেছিলেন, লিখেছিলেন একটি চমৎকার বই Indian Thought and its Development. এ ছাড়া এর আরো অনেক বই আছে বিম্বসমাঙ্গে সমাদৃত ও মহদুপস্থিত।

এছেন মনীষী। কেমন করে এ দুই সাধনা সমভাবে করে এলেন—দুর্গাভবের সেবা ও ধর্মীয় দার্শনিক সাম্প্রতিক গবেষণা! ভাবতে অবাক লাগছে না কি? প্রতিভার বরপুত্রদের ক্ষেত্রেও কখন পারে এ দুই বৃক্ষ সম্বল করতে? বিরল আধার বৈ কি। কতখানি দুর্দম্য উৎসাহ প্রাপশক্তি তথা প্রেমের সম্পদ থাকলে তবে মানুষ পারে এ অসাধ্য সাধন করতে, বলুন তো? এ সত্যই কি নিরীতিনির্দিষ্ট ছক কাটার পথে চলা বলবেন—না! পদব্রজে করেও কিছুর দান আছে এতে?

এ মহাপুরুষের সম্বন্ধে আবার অনেক লিখবার আছে যা লিখতে শব্দে যে ভালো লাগে তাই নয়, মন উন্নত হর প্রামাণ্যভিত্তি আরবেগে। কিন্তু মন আমাব এখন উদ্ভাসিত আছে দেশের অশান্তির কথা ভাবতে। দুর্দিকে দুই আর্স্টেরিক শক্তি খাড়া তুলেছে এ পদ্য-ভূমিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে। প্রার্থনার আমি কিবাস করি। তাই প্রার্থনা করি বৈ কি রোজ সন্ধ্যা থেকে বাত বারোটা পর্যন্ত। মাক রাতে জেগে উঠেও ডাকি ঠাকুরকে। জানি, তিনি এ পদ্যভূমিকে তালিয়ে যেতে সেনেন না, তবু ডাকি জানি বলে যে, আমাদের মতন সামান্য সাধকের প্রার্থনা তিনি ভাব করণ-পূরণে টেকে রাখেন, শব্দে যে ভক্তকেই রক্ষা করেন তাই নয়, পবের জন্যে তাঁর নিঃস্বার্থ প্রার্থনারও কান দেন। তাই আজ আর কিছুর লিখব না। শব্দ বলি যে এ যুগন্ত বৃক্ষের সময়ে বার বারই মনে প্রশ্ন জাগছিল সে কী দুঃস্বপ্নের মোহে বার ফেরে পড়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলে—দেশেও দেশে না যে, ইতিহাস কড়াকড়ি করে কেননা জাতিকেই কখনো সত্যি বড় হতে দেখা যায় নি। জাতি বড় হয় কেবল মানুষের প্রেরিত আদর্শকে মনকে অভ্যাসকে রূপ দিয়েই। বিবেক-মন্দের কথা মনে পড়ে : চল্যাকি দিয়ে কোনো

মহৎ কাজ হয় না, চালাক বস্তু তান্ত্রিকতার অন্তিম ফল সর্বনাশ। শ্বাইংজার আমাদের প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণকে এই প্রশ্নটিই করে-ছিলেন ১৯৬২ সালে :

‘Les deux nous avons le souci de l’aveni spirituel de l’humanite. Nous nous rendons compte qu’elle n’a de la peine à se débarrasser des pensées matérialistes auxquelles elle s’est adonné et de se décider pour les pensées du vrai et du biens qui sont conformes a notre nature véritable. Il faut qu’un autre esprit vienne animer et guider les hommes. Quand prendront conscience les peuples de notre époque de la triste situation dans laquelle il se trouvent parce qu’ils restent sur la route du matérialisme au lieu de choisir celle de la spiritualité?... Cette confiance mutuelle arriver-at-elle a temps pour nous préserver de la guerre atomique, le terrible et inimaginable catastrophe, que nous avons a re-douter ?

(ভাবার্থ : তোমাকে ও আমাকে মানুষের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়ে দিচ্ছে বৈ কি। আমরা উভয়েই জানি—অবশ্য যে, যে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা এতদিন লালন কবে এসেছি তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন—আমাদের আসল স্বভাবের অনুকূল সত্য ও মঙ্গলের চিন্তাকে বরণ করাও সহজ নয়। আমরা কবে সত্যি দেখতে শিখব—ধর্মের পথ ছেড়ে বস্তুতান্ত্রিকতার পথে চলতে গিয়ে আমাদের আজ কী দুঃবস্থা হয়েছে? .. যে আর্থবিক যুদ্ধের কথা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় সে ভয়াবহ ও অভাবনীয় বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে যদি আমরা অবিলম্বে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে না শিখি?)

এ মহাত্মা চিঠিটি থেকে এতখানি উদ্ধৃতি দিলাম শব্দে আমাদের এ যুগের নাস্তিকতার মোহের নিদারুণ কর্মজলের কথা বলতেই নয়। ওদেশের একটি মহামনীষী ভাবধারার খবর দিতেও বটে। শব্দ মহা-মনীষী নয়—যেভাবে এ যুগে তাকে অনেকেই “সেন্ট” উপাধি দিয়েছেন। এ যুগের বুদ্ধিবাদী সংগঠী বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ সেন্ট বা মহাপুরুষের জীবনের অনুকূল নয়। বিশেষ করে তাঁদের জীবন যাদের স্বভাবের মূল প্রবণতা ধর্মের দিকে—শব্দে জনহিত নয় খৃষ্টপ্রেমপ্রবৃত্তি বিশ্বপ্রেমের দিকে। অবশ্য ধর্মপন্থী সাধক সাধিকা ওদেশের নানা মঠে

কনভেন্টে আজও মেলে। কিন্তু ধর্মকে হৃদয়ে বরণ করে তার আলোয় নিজের মানবিকতার সব নিম্নমুখী গতিকেই উন্নত-মুখী করতে পারা সম্ভব কেবল তাঁদের পক্ষে যারা শ্বাইংজার বা পাদ্রে পিওর মতন বিরল আধার, ওরফে যারা তাঁদের সাধনায় একান্তই—একজন নিষ্কাম কর্মযোগে নিজেকে নিয়োগ করেছেন, অন্যজন—পাদ্রে পিও—প্রেমোম্বুধ কর্ম তথা ভক্তিযোগে। তাই এবার এ মহাত্মার সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলব। শুনুন।

শ্বাইংজার ছিলেন জার্মান—আলসাস প্রদেশের। ফরাসী ভাষারও ছিল তাঁর অসামান্য দখল।

পাদ্রে পিও ইতালিয়ান।* ইতালির দরিদ্র পরিবারে এক অখ্যাত গ্রামে তাঁর জন্ম। আজ তাঁর বয়স আটাত্তর বৎসর। থাকেন এক মঠে পাহাড়ের উপর। মঠের পাশে একটি গির্জা আছে সেখানে বোজ হাজার হাজার নরনারী তাঁর সাধুতাব টানে তাঁর কাছে আসে জীবনের গোপনতম কাহিনীও খুলে বলতে যার নাম “কনফেশন”। বৎসরের পর বৎসর বোজ সকাল সন্ধ্যা তিনি শতাধিক ধর্মার্থীর কনফেশন শুনেন আসছেন—অর্থ শতাব্দী ধরে। এছাড়া পাশের গির্জায় তিনি ভোর বাতে ভাষণ দেন (Mass) শুনতে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও ভক্তিমতী। তাঁর প্রাধান্য বহু নরনারীর রোগ সেবেছে, আজও সারে। তাই অল্প রত্ন নরনারী তাঁর কাছে আসে। সবাই যে বোগ সাবে তা নয়, যাদের রোগ সাববে না তাদের পাদ্রে পিও খোলাখুলি বলে দেন যেমন দিতেন আমাদের বিখ্যাত বোগী সাইবাবা।† কাব বোগ সাববে, কাব সাববে না তিনি জানতে পাবেন সেই অমৃত-ধর্মীর নির্দেশে যাব কাছে প্রার্থনা করে তিনি দিনের পর দিন রত্নদের নিবাসন করেন। সব কথা অবশ্য তিনি খুলে বলেন না সবাইকে—মন্ত্রগুপ্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু যার যেটুকু দরকার তিনি জানিয়ে দেন সোজাসুজিই। দীন-দুঃখীর জন্যে তাঁর অনুকম্পার অবাধি নেই, কিন্তু সেন্টমেন্টালিটির ধারণা দিলেও

* পাদ্রে পিওর বহু জীবনী বেরিয়েছে দশ-বারোটি ভাষায়। আমি পড়েছি মাত্র পাঁচটি জীবনী : Face of Padre Pio—Maria Winovska-র লেখা; Padre Pio—Oscar de Liso-র লেখা; Padre Pio—M. d. Carroll-র লেখা; Padre Pio—Rev. Carty-র লেখা; Padre Pio—Mesta de Robeck-র লেখা।

† সাইবাবাব সম্বন্ধে একটি চমৎকার জীবনী লিখেছেন রমণ মহর্ষি’র শিষ্য আর্থার অসবোর্গ : The Incredible Sai Baba.

শেষ দৃশ্য

নাট্যকোত্তর ভাষ্য

পৃথিবীর শেষ দৃশ্য আজো কিছু বাকী আছে বাকী, আমরা আজ কী দূরদূরান্তে আন্তিম নামক বিয়োগান্ত এ নাটকে। অথচ বাকী না সোজাসুজি এখনো কিছুই আমরা—যথাযোগ্য ভূমিকাটি ছাড়া অভিনীত নাটকের। মণ্ডের উপরে নাটক দৃশ্যে দৃশ্যান্তরে চলছে; কিন্তু ষড়যন্ত্র পেছনে সাজসজ্জা। শূন্যস্থান অধিকারী বিবরণী-ধারা পাঠ করে পেছন থেকে। হাততালি পড়ছে অবিরত। সময়ের হাত থেকে হেমলক আন্তিম বীক্ষণে নিতে হবে হাতে তুলে। কী ভীষণ প্রহরার রত চারিদিকে কারা সব। মৃত্যুসেরও চোখে নত অশ্রু। চারিদিকে নৈপুণ্যে নন্দিত ষড়যন্ত্র, ভীষণ আঁধার সব, অথচ আলোকে সমস্ত সংহতিময়, অথচ এ নাটক রচিত বহুদিন বহু-সংগ থেকে—পৃথিবীতে অভিনীত।

আজ শেষ অঙ্কে আমরা অস্থির অসহ্য ভূমিকা পালন করছি। কিছুই করার নেই আর। অথচ নিশ্চিত জ্ঞান ভয়াবহ অন্ত্য যবনিকা। চাপা কান্না, পদশব্দ, কী রকম অশ্রুত স্তম্ভতা চারিদিকে। সকলেই বুঝতে পারছি মৃত্যু-পরিখার মৃত্যুশব্দ, ভয়ানক পাতালের দিকে আমরা তীব্র রসাতলে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি, অসহায় বৃহন্নলার নবীর্ষ ভূমিকা ছাড়া,—হৃদয়ের তীব্র অসন্তোষ ধস্তের বাইরে এসে—বিদ্রোহের ভীষণ কল্লোলে ফেটে পড়তে পারছে না। স্বপ্নের নামকেব মত প্রাণপণে উদ্যম নিয়েও যেন—কর্মহীন দুঃখের প্রদোষ চারিদিকে। সাজানো প্রতিমা হয়ে স্থির বিসর্জনে সব বেন ডুবে যাচ্ছে : চিত্রাঙ্গিত নগর বন্দর রাজধানী মানুষের ইতিবৃত্ত অন্ধকার—কী গ্লান বার্থ অভিমাত্রী।

তিনি যান না, আত্মের ধনমনপদবী নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা নেই। কেবল তিনি চান লোকে তাঁর কাছে এসে মিথ্যা বলবে না, বা ঝড়ই করবে না অবান্তর কীর্তিকলাপের। যারা জাঁকালো লোক তাদের তিনি অপদস্থ কবেন প্রাইই মৃদু হেসে। কাবুর কাছে তো কিছুই চান না কখনো—কেউ কিছু দিলেও নেন না, তাই তিনি কাউকে রেয়া করবেন কেন বলুন? এক গল্প মনে পড়ে গেল, ছেলেকেলার শুনছিলাম। এক ফকির মসজিদেব সময়ের গলিতে পা ছড়িয়ে বসে। একদা আকবর বাদশা মসজিদে নমাজ পড়তে আসছেন তাঁর ভাঙ্গা চোখে। ফকির পা ছড়িয়ে সমান বসে। বাদশাব দেহবক্ষীর এসে ধমকায় : “হটো!” ফকিরের তাপ উত্তাপ নেই—সমানে একভাবে বসে পা ছড়িয়ে। বাদশাব হুকুম—ফকিরকেব অসম্মান করা না হয়। কী করে? রক্ষীবা ফিরে গিয়ে রিপোর্ট কবে ফকিরের বেপারোয়া উদাসীনোয়। বাদশার মনে কোতুল জাগে। কে এ ফকির—যে আকবর বাদশার নাম শুনলেও তটস্থ হয় না? ভাঙ্গা থেকে নেমে এসে হেসে বললেন : “ক্যা ফকির সাব? পাও পসারে কবসে?” (কবে থেকে পা ছড়িয়ে দিয়েছে?) ফকির সাহেব হেসে মৃত্যু করা হাত দেখিয়ে বললেন : “হাথ জমেটা জবসে।” (যেদিন থেকে হাত মৃত্যু করোছি—অর্থাৎ কারব কাছে হাত পাতি না) ভাবটা চমৎকার নয়? যে অনুপেক্ষ, কাবুর কাছে কিছু চাষ না, সে বাজা-উজীর ধার ধারবে? এমন যোগী আমি তো স্বচক্ষেই দেখেছি সাহেবসদ্বো রাজপুত্রবেবাও যাদেব কাছে এসে মাথা নোষাত। এখনো এমন যোগী মেলে ভারতের নানা সাধনপাঠে—যাদের দলে ছিলেন সাঁইবা—মুখহলসা মানুষ—যিনিই আসুন না কেন, স্রেফ বলে দিবেন যা বলবাব। কারুর মুখে এক মনে আর হলে দিতেন

ধমকে, কেউ মিথ্যা বললে উপদেশ দিতেন সত্য কথা বলতে, কেউ দুর্বাস্তব নিয়ে এলে করতেন তাকে নাড়হাল। কিন্তু সবল ভক্তিগ্রন্থা নিয়ে যাবা আসত তাদের পরে সাঁইবাবের করুণা অস্ত ছিল না। পায়ে পিওর সম্বন্ধেও অবিকল ঐ কথা। তাই পাশাপাশি বললাম এ দুই মহাত্মার কথা। পায়ে পিওর শৈশব কেটেছিল দারিদ্র্যে। বাপ আমেরিকা গিয়ে কিছু টাকা উপায় করে ফিরে এসে ছেলেকে পড়ান কলেজে। সেখানে পায়ে পিওর জ্যাটিন শিখেছিলেন ধর্মশাস্ত্র পড়তেই। আরব্য ধর্মগ্রন্থ। খেলা-খলাষ মন ছিল না। প্রার্থনা ও উপবাসে দিনেব পব দিন কাটত। ফলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এক মঠে যান, তাবা কিছুদিন বাসে ভাঙার দেখাব। ভাঙার বলেন : “বিশ-দিন বাঁচবে না। ক্ষয়রোগ ধরেছে একে (Inbercular)।” তারা ভয় পেয়ে তাকে পিতৃগৃহে ফেরত পাঠাব।

কিন্তু পায়ে পিওর বিশ্বাস ছিল অগাধ। কেবল প্রার্থনা করেই সেবে উঠলেন কোনো ডাক্তারের সাহায্য না নিয়েই। মনের জোর এত বেশি ছিল যে, একবার হারিন্সাব অপারেশন সহ্য করেন ক্লোরোফর্ম বা অ্যানা-স্থেটিক বিনা।

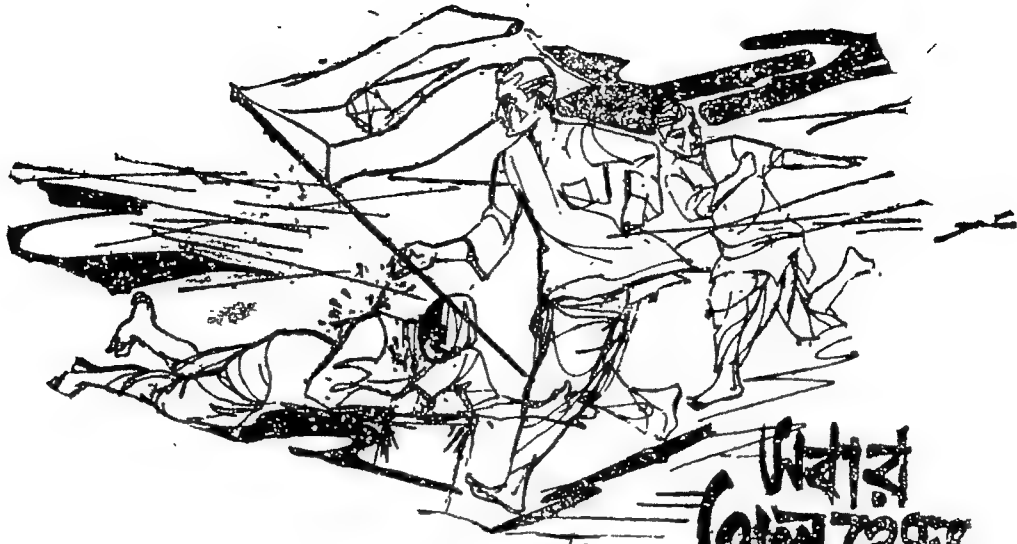
সেবে ওঠার পবে ফকিরের শহরের কাছে সান জিওভান্নি রাস্তায়া গ্রামেব দারিদ্র মঠে আশ্রয় নেন। ১৯১৮ সাল মেকে আজ পর্যন্ত বেথানেই আছেন নিজের একটিমাত্র ছোট কুঠিয়ার (cell)। এই ৪৭ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও বাইরে কোথাও যান নি। খান অতি সামান্য। ঘুমোনে দিনে তিন চার ঘণ্টা। বাকি সময় কাটে তাঁর প্রার্থনায়, গীর্জা ভাষণে (mass) ও হাজার হাজার নরনারীর কনফেশন শ্রবণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি প্রার্থনায় ও ধ্যানে মন ধাকেন নিজের কক্ষে। ভগবানের দেখা

যে তিনি পেয়েছেন তা কাউকে বলেন নি কোনো দিন, কিন্তু তাঁর ভাষণ থেকেই লোকে বুঝতে পারে। বলে সবাই : “He is not praying, he is a living prayer.” তাঁর কয়েকটি প্রার্থনাও আছে অতি চমৎকার : “শান্ত্রে আমরা ভগবানকে খুঁজি, ধ্যানে আমরা তাকে পাই।” “প্রার্থনা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল—যার চাষিতে ভগবানের হৃদয়দুর্দার খোলে” ইত্যাদি।

২০। ৯। ১৯১৮ তারিখে পায়ে পিওর জীবনের আবির্ভাব হয় খৃস্টদেবের দুঃখ-বদান—বড় বিচিত্র ভাবে : ইঠাৎ ফকিরের তিনি চোঁচিয়ে ওঠেন—হাত পা ও পিঠেব দু দিকে দিব্য বরদান—বড় বিচিত্র ভাবে : ইঠাৎ তিনি চোঁচিয়ে ওঠেন—হাত পা ও পিঠের দু দিকে দিব্য ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয় ও রক্তপ্রাব হতে থাকে—দিনেব পর দিন, মাসের পব মাস, বৎসরের পর বৎসব। একে খৃস্টানবা বলেন stigmata—অর্থাৎ খৃস্টের হৃদয়বিশ্ব ক্ষতের পুনবাবি-ভাব তাঁর প্রিয় ভক্তদের দেহে। ইংল্যান্ডী বিশ্বকোষে (Encyclopaedia Britannica) পাই :

খৃস্টের বরপুত্র সেন্ট পলের দেহে সর্বপ্রথম এ-দিব্যক্ষত দেখা দেয়। তাব পবে সেন্ট ফ্রান্সিস (যাকে অনেকে বলেন দ্বিতীয় খৃস্ট) এ-পদবী পান—১৪। ৯। ১২২৪ খৃস্টাব্দে। বহু সাক্ষী আছে এ-অঘটনের। বিশ্বকোষে আছে : “পোপ আলেকজান্ডার ও আবো অনেকে একত্রভাবে দিয়েছেন যে, তাঁরা সেন্ট ফ্রান্সিসের দেহে এ-দিব্যক্ষত দেখেছেন তাঁর মৃত্যুর পবেও।” অতঃপবে (বিশ্বকোষে লিখছে) ৩৪১টি দিব্যক্ষত প্রকট হয়েছে—৪১টি ভক্তের দেহে, আর ৩০০টি ভক্তি-মতীর দেহে। এদের মধ্যে তেরোটা নরমানের কথা আমি লিখেছি আমার “অঘটনের মণ্ড” রমন্যাসেব ভূমিকায়।

—রবীন্দ্র



ঘোঁসে ওলংক

হুসেনবিশ্বাসী রক্ষিত রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতঃ নঃ)

বিশ্বব-যুগের অবদান

বাংলা তথা ভারতের বিশ্বব-যুগের প্রধান অবদান হলো 'মার্টিনলুডম' বা আত্মদানের শিক্ষা। 'ভাবনাহীন চিন্তে' জীবন ও মৃত্যুকে শায়ের তৃত্যরূপে গ্রহণ করার তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে অজস্র বিশ্ববী শহীদেদের আত্মোৎসর্গে, লত সহস্র বিশ্ববী-কর্মীদের দুর্জয় কর্ম-তত্ত্ব। বিশ্ববীর সাহস, মৃত্যুভয়হীনতা, কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও বহুতের গমন সমত দুর্দীর্ঘ জীবনের বেঁচে থাকার লক্ষ্য। বিশ্ববীর ইতিহাস মিউজিয়ামে যত্ন করে তুলে রাখার কস্তু নয়, ইহা জীবনপথে নিত্য কাজ লাগাবার সম্পদ।

বিশ্বব জাতিকে নৈতিকবাদ শেখায় না। সে যা দেয় তা 'জিরেই' ও 'পজিটিভ'। বিশ্ববী শৃংখ্র ধরনের বাতী শোনান না। তার এক হাতে রণতুর, অপর হাতে স্বেচ্ছামুখ্য বাণীর। তার কণ্ঠে একই সংগে ঘনিত হয় ধর্ম ও সৃষ্টির আহ্বান। তার দৃষ্টি তাই চিরন্তন। সে-বাণী লালন করতে হয় সূত্র-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বক্ষণ। যে জাতি শান্তির দিনে, আরম্ভের লগ্নে ছুল থেকে বিশ্ববীর বাণীকে—তার শান্তি-মুহুর্তে বিনষ্ট করে দেয় বিরুদ্ধ শক্তি। কারণ শান্তি মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, আলস্য নয়, প্রস্তুতিহীনতা নয়—সুতরাং বিশ্ববজ্ঞান বঞ্চিত নয়। সকল শক্তিকে সমাহিত রাখা এক প্রম্ভের কস্তু। মহাদেবের মত নিষ্কণ্টক সে। কিন্তু সকল শক্তিকে হারিয়ে ফেলা অমার্জনীয় অপবাধ। তখন সে প্রয়োজনে যুদ্ধের সংগ্রামী মূর্তি ধারণ করে অন্যান্যকে ধ্বংস করতে পারে না।.....

কিন্তু বিশ্ববীর এ-শিক্ষা অহিংস-

কংগ্রেসীরা নিলেন না। তাঁরা হিংসার দোহা দিবে বীরকে তাড়িয়ে দিলেন। বিগত সত্তের-আঠাব বৎসরের মধ্যে বীরকে বর্জন করে মেকী-অহিংসাব (যথার্থ অহিংসা নয়) পথে তাঁরা বাক পূজা দিলেন সে 'ক্লাব'। শৌর্যকে বধ করে 'মানুষ গড়া'র কাজ হয় না। যথার্থ অহিংসালব্ধ 'দুর্জয়' আত্মিক শক্তিকে বাদ দিবে কণ্ঠ আত্মবিলাসে মগ্ন থেকে তরুণকে সঠিক পথ দেখান চলে না।

কংগ্রেসীরা রাজ্যপাট দখল করে ভাবলেন যে, জননেতৃত্বের সকল দায়িত্বভার তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সরকারই। সর্বাত্মে গ্রহণ করার অধিকারী। শিক্ষা, আর্থগ্রাণ, সমাজসেবা, জাতীয় চরিত্রগঠন, দুর্দমন, শরীরচর্চা, দেশেব যাবতীয় কল্যাণ সাধনের ভারই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন-সবকার। অর্থাৎ জন-সাধারণকে নিজেদের কতব্য থাকলো শৃংখ্র গ্রহণ করার, দেবার নয়। তারা সমগ্র কর্মভার সরকারের উপর অপর্ণ করে স্বং করোমি জগন্মাত্তত্ত্বদেব তব পূজনম্' রত অবলম্বন কবে নিশ্চিন্ত থাকবেন। ফলে এই আঠার বৎসব ধরে আমরা শৃংখ্র শুনলাম মিস্ট-গোস্টার অজস্র বাণী শীতলাচাকুরের পূজামণ্ডপ থেকে শূর্য করে আত্মজাতিক-সমস্যালেচনার সভা পর্যন্ত সর্বত্র। আর আমাদের শাসন ও সকল কল্যাণসাধনের দায়িত্ব বহন করতে দেখলাম পুলিশ ও সবকারী কর্মচারীদেরকে। আমাদের প্রত্যেকটি রাজ-কর্মচারীই নাকি এক-একটি সমাজসেবক—কারণ আমাদের যে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' অর্থাৎ কল্যাণরাস্ট্র পুলিশ ও রাজকর্মচারীদের হস্তে সর্ব-কল্যাণের ভার সমপর্ণ করে ঠাটো-জগন্মাত্ত হয়ে বসে রইল দেশের জনসাধারণ। খীরে খীরে তাই আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার

ভাগ্য রাষ্ট্রমুখ্যপক্ষী তরুণদেরও-লোপ পেয়ে যেতে লাগল। 'মানুষ'-গড়ার কাজ পুলিশ বা রাজকর্মচারীদের দ্বারা সম্ভব হয় কি?.....

কংগ্রেসবিরোধী প্রত্যেকটি দলই জাতি-গড়ার কোন দায়িত্ব নিল না। দলগুলোর কর্মীদের একমাত্র কাজ হলো কারণ-অকারণে শাসননেতৃত্বের বিরুদ্ধে অকস্ম বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা। তবু তাঁরা দেশদ্রোহিতাব বিরুদ্ধে সজাগ। কারণ তারা দেশকে ভালবাসেন। কিন্তু সেই 'ভালবাসা' তরুণদের মধ্যে সংক্রমিত করতে তারা চেষ্টা নন!.....

কম্যুনিষ্টদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা দেশকে চিনতে চান না বলেই তাঁদের কর্মের মূলধন হল—শৃংখ্র কংগ্রেস-সবকার নয়, দেশের সব কিছু—এমন কি ঐতিহ্যকে পর্যন্ত ঘৃণা করার শিক্ষা। তাই তাঁদের অনুগামীরা (কিশোর-বৃদ্ধ নিবিশেষে) 'ব্র্যাক্ মেইল্' করতে যেমন পারদর্শী, 'স্ক্যান্ডেল' রংগারের ভূমিকারও তেমন নিপুণ। তাঁদের সাক্ষ কোথায় 'মানুষ' গড়ে তোলার?.....

কাজেই বিপথগামী তরুণসমাজকে চোখে সন্মুখে অমানুষেব ভূমিকার আত্মঘাতী হতে দেখে আমাদের বারেকবার মনে হচ্ছিল যে, তাদেরকে আজই বিশেষ করে শোনান প্রয়োজন বিশ্ববীর শৃংখ্র বীরবস্ত্র কাহিনী, আত্মদানের কাহিনী। মৃত্যুহীন বিশ্বববাদ—বাংলা তথা ভারতের অমর ঐতিহ্য—তারা জানুক এবং বৃদ্ধক। আপন প্রাপ্তের তারে তারা অনুরাগিত করুক সৌন্দর্যকার বিশ্ববীরের কর্ম-ইতিহাসের শৌর্যবাণী। আজকের ব্রাহ্মী পূর্বগামীদের উদ্দেশে বলুক যে, তাঁদের তারা ভালো নি।.....এই কামনা

থেকেই আমরা 'সবার জলকো' লিপিবদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করছি। এবং ইহাই হল 'সবার জলকো' রচনার 'মুখ্য' বা প্রধান কারণ।.....

বাংলার বৃকে ক্ষুদ্রিরাম ফাঁসির রক্ত কণ্ঠে ধারণ করে গাইলেন দেশমাতার যশনা গান। প্রফুল্ল চাকি আত্মবিলয়ন ঘটালেন পুন্নিশের দম্ভকে চূর্ণ করার মুসাহসে। কোন ভ্রুক্বেপ নেই তাঁদের। প্রেরণ বিপ্লবী যমন্ত জাতিকে প্রচণ্ড প্রভেতে একটু এপাশ-ওপাশ করিয়ে দিলেন। তাঁরা জানতেন এ জাগরণ কণকালের। তাতে তাঁদের নালিশ নেই, যেমন নালিশ ছিল না মহারাজা নন্দকুমারের একান্ত এককভাবে লাভের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করার কালে। প্রফুল্ল-ক্ষুদ্রিরাম বৃদ্ধাঙ্কলেন অরবিন্দ-নিবেদিতা বা রক্তবল্লব-মিতসাহেব প্রমুখ বিপ্লবী চিন্তানায়কদের বিপ্লবতত্ত্ব। সে-তত্ত্ব রবীন্দ্র-কণ্ঠ থেকে প্রাণ-প্রীরের গানে তাঁরা শুনেছেন :

"...চারিদিকে
এ কী কারাগার ঘোর
ভাঙ-ভাঙ-ভাঙ-কারা—

আঘাতে আঘাত কর'।"

বারে বারে বীরের দল এসে ভয়হীন বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করে ভেঙে দেবেন পরাধীনতার প্রাচীর—এই প্রত্যয় নিয়েই আত্মদান করে গেলেন ক্ষুদ্রিরাম, আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, বসন্ত বিবাসের মত বহু শহীদ ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৪ সালের পরিসরে।...

১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকার বে-বিদ্রোহবাণী কণ্ঠে নিয়ে প্রথম শহীদ হলেন পরবর্তীকালের মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের অগ্রদূতরূপে—সেই বিদ্রোহ-বাণীই রূপান্তরিত হল ভয়ঙ্কর প্রকাশে ১৯০৮ সাল থেকে বাংলার বৃকে। সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে গেল বিশেষ করে পাঞ্জাব-মহারাজ-যুক্তপ্রদেশ জুড়ে। ভারতের বাইরে ছড়িয়ে দিলেন তাকে সাদারকর, গিগলে, সত্যেন সেন, জিতেন জাহিড়ি, হনাম সিং, সুরেন বসু এবং আরো অনেক ভারতীয় বিপ্লবী—বাদের অনেকের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভারতের বিপ্লবকে শক্তিশালী করার জন্যে সুইজারল্যান্ডে বেরতে থাকলো মাদার কামার 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' পত্রিকা।... বাস লন্ডন শহরে ১৯০৯ সালে মদনলাল খিড়ার কর্মকাণ্ড এক দুঃসাহসী ঘটনা। তাঁর আত্মবিসর্জন এক বিস্ময়কর কাহিনী।... বৃটিশ-ভারতের সেক্রেটারী-অব-স্টেটের রাজনীতিক এ-ডি-সি ছিলেন কার্জন উইলি। তাঁর কার্যকলাপ ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধে নিয়ত আঘাত দিয়ে যাচ্ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ লন্ডন শহরে কার্জন উইলিকে হত্যা করলেন কণিগদেহী একটি ভারতীয় যুবক। নাম তাঁর মদনলাল খিড়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের

রাজধানীর বৃকে প্রচণ্ড এই আঘাত হানবার তারিখ হল ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই। ঘটনাক্ষেত্রে ধৃত তরুণ খিড়ী ওল্ড বৈলির সেশন্স আদালতে নির্ভয়কণ্ঠে বলছেন :

"I believe that a nation held down by foreign bayonets is in a perpetual State of War, Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by surprise ; since guns were denied to me. I drew forth my pistol and fired." Roll of Honour—P. 211)

[আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশী বেয়নেটের চাপে একটি জাতিকে দাবিয়ে রাখা মানে সেই জাতিকে নিয়ত যুদ্ধরত থাকতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রকাশ্য-যুদ্ধের সুযোগ নেই—কারণ আইন করে আমাদের অন্য অপহরণ করা হয়েছে; তাই আমি আচম্ভক্য শত্রুকে আক্রমণ করেছি। বন্দকের লাইসেন্স কিছুতেই আমাকে দেওয়া হবে না; তাই গুলে উঠেছে আমার গোপন পিস্তল।...]

বীর তরুণ আরো বলছেন :

"The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it



মদনলাল খিড়

is by dying ourselves ; therefore I die and glory is my martyrdom." (R. H—p 211)

[বর্তমানের ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটি শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে—সে মৃত্যু-বরণের শিক্ষা। এবং সে-শিক্ষা দেবার পদ্ধতি-ও মাত্র একটি—নিজে মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুভরহীন হবার শিক্ষা-

ধন। তাই আমি নিজে মৃত্যুকে বরণ করছি। জয় হোক আত্মবিলয়নরূপে মহান রতের।...]

ভারপর তাপসের কণ্ঠে মহাকাব্যের তাঁর বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানালেন :

"My only prayer to God is that I may be reborn of the same Mother and I may re-die for the same sacred cause till the cause is successful and she stands free for the good of Humanity." (R. H.—p 211)

[আমার একমাত্র কামনা যে, আমি যেন এই দেশেই জন্মগ্রহণ করি; এবং আমার দেশমাতার মুক্তিকল্পে আবার মৃত্যুকে বরণ করে আমি যেন দ্বন্দ্ব হই। যতদিন আমার দেশ বিশ্বের কল্যাণার্থে মুক্ত না হয়, ততদিন আমি-ও আমার মুক্তিকামনা করি নে।]

এই মহান বিদ্রোহীকে নমস্কার। এই বিদ্রোহীর কর্মে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে করে দিয়ে জাতির 'ভয়ভীতি' দূর করার সংকল্প। এই বিপ্লবীর স্বপ্নে মিশেছে আত্মদানের পথে তেমন স্বাধীন ও সবল ভারতবর্ষ গড়ে তোলার-ই স্বপ্ন, যে-ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীর কল্যাণের কথা ভাববে।...

১৮৯৭ সালের দামোদর চাপেকার থেকে ১৯৪৭ সালের অমলেন্দু ঘোষ (খোকন) পর্যন্ত ভারতীয় তরুণদের স্মারা বিরাচিত বে-মার্টারায়তমের ঐতিহ্য তা অহিসংসার পুঞ্জায়ী মহাত্মা গান্ধীকে-ও প্রেরণা দিয়েছে বলেই বার বারে তিনি বিপ্লবীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগে বিচলিত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, He derived lessons of Patriotism from the Revolutionaries!

'মার্টারায়তম'-এর তত্ত্ব যে কতো ব্যাপক, কত গভীর এবং কত ফান্ডামেন্টাল তা যে কোন দেশের (শত্রু থেকে শেষ পর্যন্ত) বিপ্লবের ইতিহাসে লিখিত থাকে। ভারতের সশস্ত্র-বিপ্লবের ইতিহাসেও উহা অস্বল্প সৌন্দর্যে স্বাক্ষরিত।...

১৯২৯ সালের ৬ই জুনের একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ভারতবর্ষের বিপ্লব-যুগের পরিসরে এ-ঘটনা 'মার্টারায়তম'-এর একটি বর্ণনা চিত্র বহন করে।

দিল্লীর এ্যাসেমব্লি। মাইন সাহেব-এ বিশিষ্ট দর্শকের স্থানে উপবিষ্ট। দর্শকের গ্যালারিতে স্থানান্তরিত। মৃত্যুকাল জন্মের 'বিল' নিয়ে আলোচনা হবে। এবং প্যাটেল সাহেব (বিলভলাই) স্বীকার-এর আসনে উপবিষ্ট।... এমন সময় অচম্ভক্যে ঘটলো বিপ্লবী ভকৎ সিং ও বটুকেশ্বর রস্তের সশস্ত্র আবির্ভাব। তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন দর্শকের

সাংগাহিক বসুমতী

গ্যালারি থেকে 'রেড প্যামফ্লেট'। তারপর গজে উঠল বিপুল শব্দে 'জীবন্ত কম্ব'। সে এক বিস্ময়ের বস্তু! ততোধিক বিস্ময়ের বস্তু হলো যে, তাদের অন্য কোন ইংরেজকে ঘায়েল করল না—এমন কি 'গো ব্যাক' সাইমনকে-ও না! শান্ত হয়ে গেল রুদ্রের অস্ত্র কেবলমাত্র ইংরেজের কনস্টিটিউশনাল ডাডামীর পাঠ-স্থান ও তার মাহাত্ম্যের উদ্দেশে গগনভেদী অট্টহাসির সূচনা করে। বিপ্লবীদের 'কম্ব' যে-ভাষার সেদিন কথা বলেছিল তা-ই হলো একমাত্র বোধগম্য-ভাষা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে!...

ভকৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ইস্তাহার জ্বলদগড়ীর স্বেরে জানিয়েছিল :

"It takes a loud voice to make the deaf hear"—let the government know that while protesting against the Public Safety and the Trade Disputes Bills and callous Murder of Lala Lajpat Rai, on behalf of the helpless Indian mass, we want to emphasise the lesson often repeated by history that it is easy to kill individuals but you cannot kill ideas. Great empires crumbled while ideas survive... We are sorry to admit that we attach great sanctity to human life. But the sacrifice of individuals at the altar of a great revolution that will bring freedom to all rendering exploitation of man by man impossible, is inevitable. Long Live Revolution." (History of Freedom Movement—P 515, Vol. 3)

['বধিরকে শোনানোর জন্যে প্রচণ্ড কণ্ঠ-স্বরের প্রয়োজন'—সরকারপক্ষ-ও শুনে রাখুন যে, তাঁদের আনীত 'পাবলিক সেফ্টি বিল' বা 'ট্রেড ডিস্পুট বিল' কিংবা তাঁদের দ্বারা সাধিত লাল লাজপত রায়ের হত্যার প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমরা করে যাচ্ছি ভারতের অসহায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে। আমরা আরো জোরের সহিত বলছি যে, অজস্র ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু আদর্শের হত্যা-সাধন অসম্ভব। বিশাল সাম্রাজ্য ধূলায় গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু ঘটে না। মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র মনে করি। কিন্তু যে মহান বিপ্লব দেশের সেই মৃত্তি এনে দেবে যে-মৃত্তির আবির্ভাবে মানুষকে মানুষ আর কোন মতেই শোষণ করতে পারবে না, সেই-বিপ্লবের বেদী-মূলে বহু ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতেই

হবে। তা অনিবার্য...বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!]

আইন-পরিষদের গজমান বোমার শব্দে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ জানাবার হেতু সম্পর্কে তাঁরা বলছেন :

"Our practical protest was against an institution which, since its birth, has eminently helped to display not only its worthlessness



প্রবীণ এক সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা-রত বটুকেশ্বর দত্ত

but its far-reaching power for mischief... If exists only to demonstrate to the world India's humiliation and helplessness and it symbolises the overriding domination of irresponsible and autocratic rule. Time and again the national demand has been passed by the people's representatives, only to find the wastepaper-basket as its final destination."

(History of Freedom Movement —P 516, Vol. 3)

[এ আইন-পরিষদের ভাল করার ক্ষমতা কিছুই নেই। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কথা এই সভার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে-ও তাকে কোন মূল্য দেয় না স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ। এর অস্তিত্ব শব্দ পৃথিবীর কাছে ভারতবাসীর অপমান ও অপদাৰ্থতা প্রচার করার জন্যে। জনসাধারণের তরফ থেকে সরবে সেই

গভ্রই আঙ্গ বাজ করা হলো এ-সভাখালে দাঁড়িয়ে।]

বিস্ত্রাহীদের 'রেড প্যামফ্লেট'-র আগুন-ছোঁয়া ভাষার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল দেশ-বন্দু চিত্তরঞ্জন দাশের সুবোধ্য দ্রাড়া ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন 'লা'-মেম্বার এস. আর. দাশের একটি উক্তি। তিনি তাঁর পত্রকে এক পরে লিখেছিলেন, "That the bomb was necessary to awaken England." সে-উক্তির মর্ম বিপ্লবী উপলব্ধি করেই নিজের ভাষায় লিখলেন ইস্তাহারে :

"Our sole purpose was 'to make the deaf hear' and to give the heedless a timely warning."

বিপ্লবীরা বুকেছিলেন যে,

"From under the seeming stillness of the sea of Indian humanity a veritable storm is about to breakout. We have only hoisted a danger signal to warn those who are speeding along heeding the grave danger ahead."... (Roll of Honour—p 397)

'রেড প্যামফ্লেটটি' সভা-সমক্ষে পাঠের পর দুই বীর তাদের রিভলভার ত্যাগ করে শান্ত মৃত্তি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের কাজ এবারের মত শেষ হয়ে গছে!... ভকৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বন্দী হলেন। স্বাধীনতা তাঁদেরকে জেলখানায় রাখা হল। তারপর শব্দ হলো মামলা। বিচারকের হাতে দিলেন তাঁরা একটি যুক্ত-বিবৃতি। এই বিবৃতি থেকে ভারতীয়-বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার কিছু ধারণা করা চলে। তাঁরা বলছেন :

"Revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there only place in it for individual vendetta. It is not the cult of bomb and pistol. By 'Revolution' we mean that the present order of things which is based on manifest injustice must change... There should be radical change to re-organise the society on a socialistic basis, so that exploitation of man by man or of nation by nation is brought to an end ushering in an era of Universal peace... This is our ideal. If (our warning) goes unheeded and the present system of Government continues, a grim struggle must ensue to pave the

way for the consummation of the ideal of Revolution." (Hist. of Freedom Movement—P 527)

['বিপ্লব' মানে রক্তাক্ত নয়। বিপ্লবে ব্যক্তিগত ঘৃণা, ক্রোধ বা প্রতিহিংসার স্থান নেই। 'বন্দ্য-পিস্তলবাদ' একে বলা চলে না। বিপ্লব মানে বর্তমানের অন্যায় যে দ্বন্দ্বব্যবস্থা—তার আমূল পরিবর্তন। সমাজবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ঘটতে হবে—যার ফলে মানুষ মানুষকে শূন্যে খাবে না, জাতি জাতিকে ঠিকিয়ে স্বার্থোপস্কার করবে না। এই পথে-ই বিশ্ব-শান্তির সম্ভাবনা প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করলে বর্তমান সরকারকে প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। সে-সংগ্রামই দেশকে টেনে নেবে মহাবিপ্লবের পথে।]

বিপ্লবী 'খুৎস' চায় সৃষ্টির জন্যে। ডাঃ মুহাম্মদ মজুমদার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

'Far more interesting is the 'comprehensive ideal of Revolution.' The revolutionaries had not only destructive but also constructive ideas. They not only wanted to replace British Imperialism by a republican form of Government in India, but they also wanted to place it on a socialistic foundation.' (Hist. of Freedom Movement—P 527, Vol. 3)

* * *

কিন্তু ইংরেজ শুনলো না বিপ্লবীর সাবধানবাণী। 'খাপাবাজী' ও 'ভেদনীতি'

নামক দুইটি অশ্রে পরিচালিত তার সাম্রাজ্যবাদ সর্বোৎকৃষ্টে এগিয়ে চলল।... বিপ্লবীরা-ও ঘুমিয়ে রইলেন না। এলো ১৯৩০ সাল। শূন্য হলো বিপ্লবের রথঘর্ষ-ধূনি। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ঝঞ্ঝার বেগে বিবর্তিত হয়ে গেল বিপ্লবীদের দুর্জয় কর্মকাণ্ড। কত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হল, কত লোক ফাঁসি গেলেন, কত কর্মী জেলে ও বন্দীশালায় জীবনকে ফুটিয়ে দিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক ঢাকা-চট্টগ্রাম-মেদিনীপুর-কলকাতা থেকে শূন্য করে সারা বাংলায় ও গোটা ভারতবর্ষে জড়ালিয়ে গেলেন বিদ্রোহবাহি, সম্ভাবিত করলেন বিপ্লবের প্রস্তুতি। সে-প্রস্তুতিই প্রচুর শ্রমিকশ্রমের পথ ধরে রূপায়িত হলো 'বিপ্লব'ের আন্দোলনকে ছুঁয়ে, নেতাজীর সার্থক বিপ্লব-কাণ্ড।...

কিন্তু বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশকে করা হলো স্বার্থোপস্কার। এলো বৃটিশের কৃপাবিজ্ঞপ্তি হয়ে পূর্ববর্ণিত একজোড়া 'স্বাধীনতা' ভারতবর্ষের দুইটি খণ্ডের জন্যে।... 'পাকিস্তান' সৃষ্টির মূলে ব্রেক ইংরেজ ও



আবদুল হক (খোকন)

ইংরেজ-সৃষ্ট মুসলিম লীগের বিকৃত ষড়যন্ত্র। এতে কারো একবিন্দু রক্তপাত করতে হয় নি, এক কানাকাড়ি-ও ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে নি। এ-ষড়যন্ত্র লাভবান হয়েছে ইংরেজ, লাভবান হয়েছে কতিপয় মুসলিম নেতা এবং মুসলিম বিভ্রান্তালী দল। পাকিস্তানের জনসাধারণ যা ছিল-তার চেয়ে-ও দুর্দশায় নেমে গেছে। তাদের দুঃখের সীমা নেই। ক্ষুদ্র পশ্চিম-পাক্সাব ব্যতীত পাকিস্তানে দেশ হিসেবে-ও কোন অণ্ডল কল্যাণের স্পর্শ পায় নি। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত, বেলুচিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের মানুষদের অবস্থা তো যেন তারা—

'Helots in their own soil'!... পাকিস্তানের জীবনে অসুর-শক্তির এই

'তা'ডব' (বিপ্লবের ধমনীসারে) প্রথমে নিশ্চয়ই চিহ্নিত করবে 'বিদ্রোহ'ের সূচনা। করেছে-ও তাই। এই অসুর-শক্তির বিরুদ্ধে শূন্যতেই বিদ্রোহ চালিয়ে এসেছেন সর্দার—গান্ধী আবদুল গফ্ফর খাঁ এবং বালুচ-গান্ধী আবদুল সামাদ খান। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সারা স্বার্থ রাজনীতিক এবং স্বার্থ অহিংস বা সঁহিংস তাঁরা কোন প্রলোভনেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন না। তাঁরা বিপ্লবের বাণী ভুলতে অক্ষম।... এদিকে পূর্ব-বঙ্গের তরুণদল-ও পিছিয়ে থাকলেন না। 'ভাষা-আন্দোলনে' তাঁরা বুকিয়ে দিলেন যে ইংরেজের বদলে পাক্সাবীদের গোলামী করার জন্যে তাঁদের জন্ম হয় নি। তাঁদের এ-বোধ আকাশ থেকে লভ্য বস্তু নয়। তাঁদের রক্ত রয়েছে যে-বিপ্লববাদ, তার-ই ইহা সমাক অভি-যুক্তি। পূর্ব-বাংলার শহীদ বিনয় বসু, নলিনী বাগচী, দীনেশ গুপ্ত, সুর সেন বা প্রীতিলাতা যে তাঁদেরই ঘরের মানুষ! তাই এ-শহীদকুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বোয়রে এলেন ছাত্র বরকৎ আলি প্রমুখ একাধিক বীর। বুক পেতে তাঁরা পাক্সাবী-বুলেটের আঘাত গ্রহণ করে ভাষা-আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঢাকা শহরে। শাস্ত বিপ্লবের পথ পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহী-মনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলল। এই বিদ্রোহ একদিন 'বিপ্লব'ের সার্থক রূপ নিতে বাধ্য।...

এতো কথা বলার মূলে ঐ একটি কথা। বিপ্লবের যে শাস্ত অবদান তাকে ব্যক্তি বা জাতির জীবনে অগ্রহা করতে নেই। চিরকাল জাতির যুগ-শক্তির কাছে তুলে ধরতে হয় তার দেশের শৌর্যশালী ঐতিহ্যের কথা এবং বিপ্লবের বাণী। যে-গুণাবলী পরাধীনকে 'স্বাধীন' করে, সেসব গুণাবলী হারিয়ে ফেললে অর্জিত স্বাধীনতাকে-ও হারাতে হয়।...

বিপ্লবের শাস্ত অবদান কি? শাস্ত অবদান হল—আত্মদান, সাহসিকতা, মৃত্যুভর-শূন্যতা, একনিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, পরার্থবোধ এবং সর্বকছা জড়িয়ে নিরমানুষ্যতার শিক্ষা। আমরা আবার বলবো, অহিংস 'কংগ্রেসী' সরকার যে-কারণেই হোক বিপ্লবীদের সহ্য না করতে পারলেও তাঁরা বিপ্লবের অবদানস্বরূপ ঐ গুণগুণলোকে আরম্ভে আনার শক্তি অর্জন করতে পারেন। জাতির জীবনে ঐ সব গুণাবলী সাদরে বরণ না করলে তার 'যৌবন' দেউলে হয়ে যাবে। এবং শূন্য হবে দুর্দিন। সে দুর্দিন চরমে পৌঁছতে দৌর হবে না। তখন পূর্নবিপ্লব ঘটবার জন্যে জাতিকে আবার নতুন করে শূন্য করতে হবে সেই কুর্দার-পর্ব থেকে।...

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইজবু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধঃখর

চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসিঙ্গী—সর্বস্বের অনন্ত নিষ্কার—বিশ্বসাহিত্যগোবর ওপ-ম্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলস : বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই গুণ্যপ্রভা মাত্র ১।০ টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিঃ

১৯৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

কেন্ট জাতি

কথা ও কাহিনী

ভূমিকা :

[বর্তমান গ্রেট ব্রুটেন কেন্ট জাতির (কেউ কেউ সেল্ট উচ্চারণও করে থাকেন) আদি নিবাস। সম্ভবত ব্রুটেনে রোমান আক্রমণের পূর্ব থেকেই এই কেন্ট জাতি সেখানে বসবাস করত। এদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল; সেই হিসাবে কেন্টীয় ভাষার সঙ্গে গ্রীক, লাতিন, স্লাভনিক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু অপরাপর আর্য জাতিদের সঙ্গে কেন্টদের পার্থক্য এই যে, তাদের সমাজের গঠন মাতৃতান্ত্রিক। তাদের বংশধারা টানা হত পিতার দিক থেকে নয়, মাতার দিক থেকে। সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশিই ছিল। তাদের দেবতাদের চেয়ে দেবীদেরই প্রাধান্য বেশি। টিউটনদের মত কেন্ট ধর্মকেও প্রাক্‌খ্রিস্টীয় প্যাগান ধর্মের পর্যায়ে ফেলা যায়। তাদের দেবদেবীর কাহিনী ও লোকগাথাসমূহ পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের কাহিনীর সঙ্গে অনেকই পরিচিত। শেক্সপীয়ারের কিংলীর নাটকটির বিষয়বস্তু কেন্টীয়।

গ্রেট ব্রুটেনের কেন্ট জাতি প্রাক্‌-কেন্ট আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে কেন্ট জাতি দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—গোইডেল বা গেল এবং ব্রাইথন বা ব্রুটল। প্রধানত আরল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের কিছুদংশ গেল বা গেলীয় সংস্কৃতির ধারক; ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ব্রুটন সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করেছে।]

গেলীয় দেবতা ও অসুর :

আমাদের পুরাণে যেমন দিতির গর্ভ থেকে দৈত্যরা এবং অদিতির গর্ভ থেকে দেবতারা জন্মেছে, তেমনি গেলীয় পুরাণে দৈত্যরা জন্মেছে দমলুর গর্ভে এবং দেবতারা জন্মেছে দলুর গর্ভে। এখানে দৈত্যরা দেবতাদের পূর্ববর্তী। কেন্টীয় অসুরদের বলা হত কোমর, তাদের নেতা ছিল ইন্ডেথ। এ ভিন্ন নামজাদা দৈত্যদের মধ্যে ছিল একচক্ষু

বালোর, দৈত্য এলাথান ও তার পুত্র ব্রেস। এই দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের বারবার যুদ্ধ হয়েছে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে দেবতারা বিজয়ী হয়েছে।

আগেই বলেছি দেবী দলুর গর্ভ থেকে দেবতারা জন্মেছে, যার অপর নাম ছিল অন, বা আনা, যিনি ছিলেন জগন্মাতা, গ্রীক ডিমিটার বা আমাদের দুর্গার মত ধরণীর ফলপ্রসূতার প্রতীক। গেলীয় দেবতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল নুয়াদা দগডা, ব্রিজিট, এংগাস মিডার, ওগমা, বডন প্রভৃতি। কিন্তু এরা কেউই টিউটন-দৈত্যদের মত ব্যক্তিসম্পন্ন ছিল না। একমাত্র ব্যক্তিসম্পন্ন ছিল দেবতা লুঘ বা লুগা, যার যুদ্ধি ও পরাক্রমে দৈত্যগণ পরাজিত হয়েছিল।

দেবী দলুর বংশধরদের গেলীয় নাম তুয়াহ্ - দায়ে - দোয়ান। অবশ্য এরাই আরল্যান্ডের আদি দৈব অধিবাসী নয়,

নরেন উত্তাচার্য

এদের আগে দু'টি দেববংশ এখানে বাস করেছে। প্রথম বংশের নাম পার্থোলোন বংশ এবং দ্বিতীয় বংশটি দোমেড বংশ নামে খ্যাত। এই দু'টি বংশই ফোমর দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মড়কে তারা নির্বংশ হয়ে যায়।

দলুর বংশধর দেবতারা দৈত্যদের পরাজিত করলেও, নিজেরা পরাজিত হয় মানুষের কাছে। এই মানুষেরা মিলেশীয় নামে খ্যাত। দেবতারা এদের হাতে পরাজিত হয়ে পাতালে পালিয়ে যায়। মানুষের হাতে দেবতাদের পরাজয়ের কাহিনী একমাত্র গেলীয় পুরাণেই পাওয়া যায়। আইরিশদের প্রথম মানুষ রাজার নাম এরমন।

দেবতা লুঘ :

আগেই বলেছি গেলীয় দেবতাদের মধ্যে ওডিন, থর এমন কি লোকির মতও কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। একমাত্র ব্যক্তিক্রম সূর্যদেবতা লুঘ। লুঘের দেহে দেবতা ও দৈত্য উভয় শ্রেণীরই রক্ত ছিল। তার পিতামহ ছিল দেববৈদ্য ডিয়ানচেখট এবং পিতা ছিল দেবতা কিয়ান। মাতার দিক থেকে সে দৈত্য বালোরের পৌত্র এবং এথনিউর পুত্র।

লুঘ ছিল একাধারে সূর্যধর, কর্ম-কার, চিকিৎসক, বীণাবাদক, কবি ও কথক, যাদুকর এবং যোদ্ধা। প্রথমে দেবতারা তাকে বিশেষ আমল না দিলেও পরে তার নেতৃত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর ধরে লুঘ দৈত্যদের বিরুদ্ধে দেবতাদের প্রমুখিত-পর্বের পরিচালনা করেছিল।

লুঘের পিতা কিয়ানের সঙ্গে ওগমার তিন নাতি, ব্রিয়ান, ইউচার এবং ইউচারবার শত্রুতা ছিল। কিয়ানকে একা পেয়ে তারা হত্যা করল। তখন লুঘ তাদের খুঁজে বার করল এবং এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবি করল হেম্পরিডেসের বাগানের তিনটি আপেল যা ভক্ষণ করলে অনন্ত শক্তি লাভ করা যায়, গ্রীসের রাজা তুইসের বিখ্যাত শূকরের চামড়া, পারস্যরাজ পেজারের বিখ্যাত বর্শা, সিসিলির রাজা দোবারের বিখ্যাত রথ এবং অম্ব ইত্যাদি। ব্রিয়ান এবং তার ভাইরা এগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। এইভাবেই লুঘ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল।

লুঘের নেতৃত্বে সাত বছরের প্রমুখিতের পর অবশেষে দেবাসুরের যুদ্ধ বাধল। এ যুদ্ধের ভঙ্গি অতি প্রাচীন। জনে জনে যুদ্ধ। প্রত্যেকেই এক-একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বেছে নিল। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা চলবে না।

দেববৈদ্য ডিয়ানচেখট পবিত্র ড্রোয়েস নদীর জল দিয়েই যুদ্ধে মৃত দেবতাদের বাঁচিয়ে তুলত। শেষ পর্যন্ত দৈত্যরা তা জেনে ফেলল এবং নদীর জল দূষিত করে দিল। ফোমর দৈত্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে জয়লক্ষ্মী যখন দেবতাদের পরিত্যাগ করে যাবার উপক্রম করেছে তখন লুঘ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হল। সেই যুদ্ধে দেবতা ওগমা যখন দৈত্যরাজ ইন্ডেথকে নিহত করল, তখন রুদ্ধ হয়ে দৈত্য বালোর রণক্ষেত্রে এল। তার একটিমাত্র চক্ষু, তা দিয়ে সে যা দেখে তাই ভস্মীভূত হয়ে যায়। নিরপায় হয়ে বালোর তার চক্ষুটির আবরণ উন্মোচন করার আদেশ দিল। কিন্তু ষড়তর্গতিতে লুঘ একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বালোরের চোখে প্রচণ্ড আঘাত করল। ফলে তার চক্ষুটি খুলে পড়ল।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

বালোর দৃষ্টিহীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্যদের পরাজয় ঘটে।

আইরিশরা এই যুদ্ধকে মাগু কুই-রিন্সা না ব-কোমরাথ আখ্যা দিয়ে থাকে। ক্যারোমোরের সমতলভূমিতে অনেকগুলি পাথরের চিহ্ন আছে। আইরিশরা মনে করে এগুলি সেই যুদ্ধে নিহত বীরদের সমাধি।

কিন্তু এত সামর্থ্য থাকতেও লম্ব মানুষের হাতে দেবতাদের পরাজয় রোধ করতে পারেন নি। পরবর্তী কাহিনী-গুলিতে লম্বকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পিণ্ডিতরা মনে করেন যে, লম্ব চরিত্রটির পরবর্তীকালের চরিত্রগুলির সঙ্গে এমন জগাখিঁড়ি খুঁজে যে, তাকে আলাদা করে চিনবার কোন উপায় নেই।

কুচুলাইন :

এরমূহন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কীর্তিকলাপের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে এই বংশের একজন রাজা, যার কিছুটা ঐতিহাসিকতা আছে, তিনি হলেন টাইগানমাস যার সঙ্গে এথেন্সের থিসিডাস অথবা ক্রীটের মিনোসের তুলনা করা চলে।

কালক্রমে অয়ল্যান্ডের পৌরাণিক ইতিহাসে কুচুলাইন নামক এক নায়কের উত্থান হয়। সে ছিল আলস্টার নামক স্থানের এক সামন্তের পুত্র। তার মা ডেথটাইর একদিন যখন ভোজন করছিল তখন একটি মাছি তার পেটে চলে যায়। সেই রাতে দেবতা লম্ব তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে যে, মাছি হয়ে সেই তার গর্ভে ঢুকেছে এবং তার সন্তান হয়ে সে জন্মাবে।

কুচুলাইনের আসল নাম সেটানটা। বালক বয়সেই সে ছিল সকলের চেয়ে বলশালী। আলস্টারের রাজা কোং-কোবার একদা ক্রীড়ারত এই বালকটিকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে কুলান নামক অপর এক সামন্তের ভোজসভায় যান। কুলানের একটি কুকুর ছিল যার তুল্য শক্তিশালী অন্য কোন পশু ছিল না। বালক সেটানটা এই কুকুরটিকে ক্রীড়া-চ্ছলে বধ করে। ফলে কুলান তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়। তখন সেটানটা তাকে আশ্বাস দেয় যে, ওই রকম একটি কুকুর সে তাকে যোগাড় করে দেবে এবং যতদিন সে তা সংগ্রহ করতে না পাবে ততদিন সে নিজেই কুলানের কুকুরের কাজ করবে। সেই থেকে তার নাম হয় কুচুলাইন অর্থাৎ কুলানের কুকুর।

কালক্রমে সে অয়ল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বীর হয়ে উঠল। ফলে মেয়েরা তাকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্য পাগল হয়ে গেল। কিন্তু কুচুলাইনের নজর

ছিল একটি মেয়ের প্রতি, যার নাম ছিল এমের, উইলির রাজা ফরগালের কন্যা। ফলে সে উইলিতে গেল। তাকে দেখে এমের বলল, 'তুমি তো বালকমাত্র, তোমায় কি বিয়ে করব?' তখন কুচুলাইন তার সামনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জগতের সব বীরদের হারিয়ে দিয়ে তার বীরত্ব দেখিয়ে তাকে নিয়ে যাবে। এমেরের পিতা ফোরগাল জানাল যে, যদি কুচুলাইন স্ক্যাথবাথ-ছীপের রাণীর কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখি আসে তবেই সে এমেরের সঙ্গে তার বিবাহ দেবে। ফোরগাল-জানত সেখানে যাওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু কুচুলাইন সেই বিপজ্জনক যাত্রায় রাজী হল।

অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে, বহু কষ্ট সহ্য করে, বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুচুলাইন সেই ম্বীপে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানকার রাণীর কাছে সে মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করল। সেই রাণীর সঙ্গে তার পাশের ম্বীপের রাণী এফার বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধে কুচুলাইন মধ্যস্থতা করেছিল।

তারপর সে সোজা উইলিতে হাজির হয়ে ফোরগালের কাছে এমেরকে প্রার্থনা করল। কিন্তু ফোরগাল তার পূর্ব-

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। তখন কুচুলাইন ম্বন্দ্রযুদ্ধে ফোরগালকে নিহত করে এমেরকে নিজ রথে তুলে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এল এবং সেখানে তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হল।

কিন্তু এগুলি তার বীরত্বের সামান্য নিদর্শনমাত্র। তার বীরত্বের চব্বিশ পবিত্র পাওয়া গেছে কোনটের রাজা এবং রাণী, আইলি ও মেডবের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট অয়ল্যান্ডের যুদ্ধে। যুদ্ধের কাণ্ড সামান্য কিন্তু কালক্রমে তা মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায়। রাজা আইলি এই যুদ্ধ চালাতে রাজী ছিলেন না, কিন্তু রাণী মেডব স্বহস্তে এই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

বলা বাহুল্য কুচুলাইনের বীরত্ব রাণী মেডবের সৈন্যরা বার বার পরাজিত হচ্ছিল। তখন কৌশলী রাণী কুচুলাইনের সঙ্গে একটি চুক্তি করল। চুক্তিটি হচ্ছে প্রত্যহ কুচুলাইন রাণীর প্রেরিত এক-একজন যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই। এদিকে কুচুলাইনের বীরত্ব দেখে যুদ্ধের দেবী মরিরিগু তাকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু কুচুলাইন কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান করে সে ঠিক করে যে সে তার শত্রুতাচরণ করবে।

প্রথমেই কুচুলাইনকে লড়াইতে হল লোথ নামক এক যোদ্ধার সঙ্গে। এই

সুলেখা

প্রতিদিনের প্রয়োজনে

সুলেখা
ডুইং এর
কালি

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি

অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম

সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স

সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

সুলেখা ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

যুদ্ধে দেবী মরিরগু একবার ঘোড়া হসে, একবার ইল মাছ হসে এবং একবার নেকড়ে বাঘ হসে কুচুলাইনকে বিব্রত করার চেষ্টা করল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। কুচুলাইনের তরবারির আঘাতে লোথ মারা গেল।

একের পর এক লোক যুদ্ধ করতে আসে এবং কুচুলাইন তাকে যমের দস্যুরে পাঠায়। তার চোখে নিদ্রা ছিল না, সর্বাঙ্গ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হসে গেছল। ক্রোধে উন্মত্ত হসে রাণী একে একে বীরপুরুষদের সড়তে পাঠায়, কিন্তু কেউই ফিরে আসে না।

রাণী মেডব শেষবারের মত পাঠাল ফেরদিয়াদকে। এই ফেরদিয়াদ ছিল কুচুলাইনের সহপাঠী; রাণী স্কাথ-বাথের কাছে একহে অস্ত্রশিক্ষা করেছে। ফেরদিয়াদকে দেখে কুচুলাইন স্বাগত জানাল। কিন্তু ফেরদিয়াদ দুঃখের সঙ্গে জানাল যে সে এসেছে শত্রুরূপে, বন্ধুরূপে নয়। প্রথম দুদিন তারা বন্ধুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করল, তৃতীয় দিনে সে বন্ধুত্বের ভাব কেটে গেল, এবং চতুর্থ দিনে কুচুলাইনের হাতে ফেরদিয়াদ নিহত হল। ফেরদিয়াদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাণী মেডবের জরাজীর্ণ লুপ্ত হল।

গেলীয় সোহরাব-রুস্তম :

পাণ্ডিতেরা কুচুলাইনকে অ্যাকিলিস বা হারকিউলিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে ইরাণী বীর রুস্তমের তুলনা করাই সঙ্গত। নিম্নলিখিত কাহিনী থেকে সেটাই প্রমাণিত হবে।

কুচুলাইন যখন রাণী স্কাথবাথের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে গেছল, তখন সেই রাণীর সঙ্গে আর একটি দেশের রাণীর একটি বিরোধের মধ্যস্থতা করতে তাকে হসেছিল। একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই রাণীর নাম এফা। তার সঙ্গে কুচুলাইনের প্রেম হসেছিল যার ফলে তার গর্ভে কন্যা নামক একটি পুত্র জন্মায়। এফা ভেবেছিল যে ছেলের একটু বয়স হলেই তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু যখন সে শুনল যে কুচুলাইন এমেরকে বিবাহ করেছে তখন সে ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হসে উঠল। পুত্র কন্যাকে সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষিত করে তুলল। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিল আয়ল্যাণ্ডে। সেখানে পাঠানোর পূর্বে পুত্রের ওপর সে তিনটি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিল: সে কখনো ফিরে আসবে না; সে কখনো কোন চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করবে না এবং

সে কখনো নিজের নাম প্রকাশ করবে না।

আয়ল্যাণ্ডে কন্যা কুচুলাইনের বাড়িতে প্রবেশ করল। রক্ষী তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কন্যা তাকে স্বপ্নযুদ্ধে আহ্বান করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নিরস্ত ও বিপর্যস্ত করে দিল। তখন কুচুলাইন স্বরং বেরিয়ে এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কন্যা জানাল যে, সে পরিচয় দিতে অক্ষম। এতে ক্রুদ্ধ হসে কুচুলাইন তাকে আক্রমণ করল।

বীরবিক্রমে কন্যা যুদ্ধ করতে লাগল। সে বৃদ্ধিতে পেরেছিল যে, সে তার পিতার সঙ্গেই যুদ্ধ করছে। তাই সে সুযোগ পেতেই কুচুলাইনকে আঘাত করে নি। শেষ পর্বন্ত কন্যার হাতে বিপর্যস্ত হতে হতে কুচুলাইন তার চরম অস্ত্র প্রয়োগ করল। সেই আঘাতে কন্যা মারা গেল। মারা যাবার আগে সে নিজের পরিচয় দিয়ে গেল।

নিজপুত্রকে হত্যা করার পর কুচুলাইন শোকে-দুঃখে উন্মত্ত হসে গেছল। পুরোহিতেরা মন্ত্রবলে তাকে মৃত্যু পাড়িয়ে রাখত।

ডায়েরি ও নাইসি :

আলস্টার প্রদেশের রাজা কোংকোবার ফেডলিমিড নামক এক সামন্তের গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেই সময় ফেডলিমিডের স্ত্রী একটি অপূর্ণ সুন্দরী কন্যা প্রসব করল। পুরোহিত ক্যাথোড গণনা করে জানাল যে, এই কন্যার জন্য বহু লোক মারা যাবে এবং তা আলস্টারের দুঃখের কারণ হবে কেউ কেউ চাইল যে, মেয়েটিকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু রাজা কোংকোবার তাতে রাজী হলেন না। স্থির হল, একজন বিশ্বস্ত পরিচারকের অধীনে তাকে একটি গোপন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে তার পরিচয় কেউ জানবে না। মেয়েটির নাম রাখা হল ডায়েরি।

ক্রমে ডায়েরি যৌবনপ্রাপ্ত হল। এই সময় তার পরিচয় হল উন্মত্ত পুত্র নাইসির সঙ্গে। উন্মত্তের ভালবাসা জন্মাবার পর ডায়েরির প্ররোচনায় নাইসি তাকে নিয়ে যায় আলবা প্রদেশে, রাজা কোংকোবারের এলাকার বাইরে। তাদের সঙ্গে যান নাইসির দুই বিশ্বস্ত দাস আরডান এবং আইনলে। সেখানে উন্মত্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এই খবর পেয়ে রাজা কোংকোবার মোটেই খুশি হল না। সে ঠিক করল যে, নাইসি ও তার দুই ভাইকে হত্যা করাবে। সে ফারগাস নামক এক

সামন্তকে পাঠাল তিন ডাই ও ডায়েরিটিকে আলস্টারে নিয়ে আসার জন্য। মিশ্র কথায় এই চারজনকে বশীভূত করে ফারগাস তাদের নিয়ে এল। ফারগাস জানত না যে, রাজা তাদের হত্যা করবে স্থির করেছে।

এদিকে রাজা কোংকোবার ফারগাসকে অনুর সন্নিবেশ দিল। তখন ফারগাস তার পুত্র ইলানোর হাতে এই চাবকনের জীবনরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল।

তখন রাজা কোংকোবার তার পুত্র ফিফাচাকে পাঠাল নাইসি এবং তার দুই ভাইকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ইলান স্বপ্নযুদ্ধে ফিফাচাকে হত্যা করল, নিজেও নিহত হল। এদিকে নাইসি এবং তার দুই ভাই ডায়েরিটিকে মাঝখানে রেখে লড়াই করতে লাগল। তারা নিজেরা খুব বড় বীর ছিল, কাজেই প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও নিজেদের পরাক্রমের দ্বারা তারা পালাতে সক্ষম হল।

তখন রাজা পুরোহিত ক্যাথোডকে অনুরোধ করল যাতে সে মন্ত্রবলে এদের বন্দী করে দেয়। ক্যাথোড বলল যে, যদি রাজা এমন প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই তিন যুবককে সে হত্যা করবে না, তবেই সে তাদের বন্দী করে দিতে পারে। রাজা তখন প্রতিশ্রুতি দিল। তখন ক্যাথোডের মন্ত্রবলে ডায়েরি সহ তিনজন বন্দী হল।

কিন্তু রাজা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নাইসি ও তার দুই ভাইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল। সেই দুঃখে ডায়েরিও মারা গেল।

রাজা কোংকোবারের পক্ষে ব্যাপারটি মহলজনক হল না। ডায়েরিটিকে উপভোগ করাও তার বরাতে জড়টল না। রাজার নিজের অনুচররাও তাকে ক্ষমা করল না। ফারগাস এই সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহ করল এবং রাজার বিপক্ষ দেশে চলে গেল। পুরোহিত ক্যাথোড রাজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তাকে এবং তার রাজ্যকে অভিশাপ দিল। যতদিন কুচুলাইন বেঁচে ছিল তার শক্তিতে আলস্টার-প্রদেশ কোনগিতকে টিকেছিল, তার মৃত্যুর পর সবই ধ্বংস হল।

আলস্টার-প্রদেশের রাজা খানী এম্মেন মাচা কালক্রমে ভূগর্ভে মিশে গেল। এখন তা তৃণাচ্ছাদিত একটি বন্য অঞ্চল মাত্র।

ফিন এবং ফেনীয়গণ :

আয়ল্যাণ্ডের পৌরাণিক রাজবংশ-গুলির তৃতীয় পর্বরে আমরা কোরমাক নামক একজন বিখ্যাত রাজার পরিচয় পাই। তিনি ফিন ম্যাক কাউল নামক

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

এক ব্যক্তিকে ফিয়ান্না এইরিন নামক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। এই ফিন এবং তার বাহিনীকে নিয়ে অয়ল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের গেলীয়দের মধ্যে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তাদের বিরুদ্ধে ফিন এবং তার বাহিনী লড়াই করেছিল তাদের বলা হত লোচনাথ; সম্ভবত তারা ছিল টিউটন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

ফিনের পিতা কুমহাল শত্রুদের হাতে মারা যাবার পর ফিনের জন্ম হয়। তাকে গোপনে একটি পাহাড়ে রেখে দেওয়া হয় পাছে শত্রুরা তাকে হত্যা করে। কালক্রমে এই বালক কুলুলাইনের মত সে যুগের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা হয়ে ওঠে। একদিন সে যখন ময়ন নদীর তীরে ভ্রমণ করছিল তখন একটি স্যালমন মাছ তার হাতে ধৃত হয়। সেই মাছ খেয়ে সে সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করে।

এখানে স্যালমন মাছদের কাহিনী বলা দরকার। পূর্বে দেবতাদের আমলে, নরটি হেজেল গাছ দিয়ে ঘেরা যাদুশক্তি-বিশিষ্ট একটি কূপ ছিল। সেই হেজেল গাছগুলিতে যে বাদাম হত তা খেলে সর্বজ্ঞান লাভ করা যেত, এই কারণেই তা খওয়া নিষিদ্ধ ছিল, শত্রু কূপে বসবাসকারী স্যালমন মাছেরা তা খাবার অধিকারী ছিল। এবং সেই কারণে এই স্যালমন মাছেরাই ছিল সর্বাধিক-বিশারদ। একদা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দেবতা ভগডান স্রী বোয়ান এই বাদাম ভক্ষণ করে, ফলে কূপের জল ফুলে উঠে সেই নরটি বৃক্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে দুর্বারগতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রবাহই হচ্ছে ময়ন নদী। এখানে বাইবেলোজ ইন্ডের নিষিদ্ধ ফল-ভক্ষণের কাহিনীর প্রভাব আছে।

আবার পূর্বকথায় ফিরে আসি। পরম শক্তিমান ও সর্বাধিকবিশারদ ফিন সহজেই নিজ গোষ্ঠীর নেতা হয়। তার কীর্তিকলাপ নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। একটি কাহিনী পূর্বতন দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেবতা ভগডা দেবসিংহাসন পরিত্যাগ করলে পাঁচজন দেবতা সেই সিংহাসনের দাবিদার হয়। তারা ছিল অ্যাসাস, মিডার, লের, ইলবচ এবং বডব। শেষ পর্যন্ত বডবই রাজ্যপদ লাভ করে, কিন্তু মিডার তা মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ করে।

মিডারের কন্যা মিডারের তরফ থেকে ফিনকে অনুরোধ করে তাদের সাহায্য করার জন্য। ফলে ফিন মিডারের হয়ে অপরাপর দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তার বিপক্ষে ছিল দেবতা বডব ও তার সাত পুত্র, দেবতা অ্যাসাস ও তার সাত

পুত্র, দেবতা লের ও তার সাতশতজন পুত্র, দেবতা ফিয়ান্নাভার ও তার সত্তের-জন পুত্র এবং আরও অসংখ্য ছোটখাট দেবতা। বলা বাহুল্য, ফিন ও তার অনুচর ফেনীয়গণই এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

পরাজিত দেবতাদের নেতা অ্যাসাস অত্যন্ত ফিন ও তার অনুচরগণকে একটি ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করে। সেখানে অ্যাসাস বলে যে, দেবতাদের জীবন ফেনীয়দের শিকারী-জীবনের চেয়ে অনেক বেশি সুখের। ফিন এ কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে যে, বিনা পরিগ্রমে পাওয়া দেবতাদের শূকরের চেয়ে, ফেনীয়দের কুকুর অনেক বেশি মূল্যবান। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে তীব্র বচসা হয় যার পরিণামে ফেনীয়দের কুকুরদের সঙ্গে দেবতাদের শূকরদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শূকরের দল নিশ্চিহ্ন হয়, কিন্তু ফিনের বহু কুকুর নিহত হয়। দেবপক্ষেরই ক্ষতি বেশি হয়, কেন না শূকরগুলি ছিল ছদ্মবেশী দেবতা।

কিন্তু ফিন যুদ্ধবিদ্যার বর্তী সাক্ষ্যলাভ করুক না কেন, প্রেমের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। অধিক বয়সে তার বিয়ের ইচ্ছা হল এবং সে পছন্দ করল রাজ্য করমাকের মেয়ে গ্রাইনেকে। কিন্তু গ্রাইনে ভাসবাসত ফিনের ভাগ্নে ডায়ারমেটকে। তখন তারা দুজনে পালাবার ব্যবস্থা করল।

একটি গভীর জঙ্গলে ডায়ারমেট ও গ্রাইনে ঘর তৈরি করে বাস করতে

লাগল। এদিকে ফিন দলবল নিয়ে যুদ্ধে যুদ্ধে তার ডেরা আবিষ্কার করল এবং সেটিকে ঘিরে ফেলে ডায়ারমেট ও গ্রাইনেকে বেরিয়ে আসার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু দেবতা অ্যাসাস ছিল ডায়ারমেটের সহায়। সে তাদের একটি ম্যাজিক আবরণ দিল যা দেহে ধারণ করলে অদৃশ্য হওয়া বার। তারই সাহায্যে দুজনে ফিন ও তার লোক-জনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। পথে দেবতা অ্যাসাসের কাছে তারা বরেকটি মূল্যবান উপদেশ পেল : একটি শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষে আশ্রয় নিও না; একটি দ্বারবিশিষ্ট গৃহে বাস কোরো না; একটিমাত্র যাবার পথ আছে এমন কোন দ্বীপে যেও না; যেখানে রান্না করেছ সেখানে খেও না; যেখানে খেয়েছ সেখানে ঘুমিও না।

তারপর এইভাবে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং ফিন ও তার অনুচররা তাদের পিছু নিল। শেষ পর্যন্ত তারা একটি নির্জন প্রান্তরে একজন ফোমর দৈত্যের আশ্রয়ে বাস করতে লাগল। সেই দৈত্যের ভয়ে ফিন এবং তার অনুচররা ডায়ারমেট ও গ্রাইনেকে বিব্রত করতে সাহস করল না।

শেষ পর্যন্ত দেবতা অ্যাসাসের চেষ্টায় উভয় পক্ষে একটা মিটমাট হল। ডায়ারমেট ও গ্রাইনে স্বদেশে ফিরে এল। মুখে মিটমাট করে নিলেও ফিন মনে মনে ডায়ারমেটকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। একদিন ফিন একটি

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা-৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীলঙ্কা - গোয়া

মৃত শূকরের মাপ খালি পায়ে নেবার জন্য ডায়ারমেটকে আদেশ দিল। ডায়ার-মেটের শরীর বস্তুর মত দৃঢ় হলেও তার পায়ের গোড়ালিতে একটি দুর্বল স্থান ছিল (অ্যাকিলিসের কাহিনী স্মর্তব্য)। ফিন তা জানত এবং সেই-জন্যই কয়েকটি বিষাক্ত কাঁটা কৌশলে মৃত শূকরটির দেহে বেখে দিয়েছিল। আর এইভাবেই ডায়ারমেটের জীবনান্ত হল।

ফিনের অনুচররা কিন্তু তাদের নেতার এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করে নি। তারা ফিনকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। স্বজন-পরিত্যক্ত নির্বন্ধব অবস্থায় ফিনের মৃত্যু হয়।

ওসিয়ান :

ওসিয়ান ছিল ফিনের একজন অনুচর। কুচুলাইনের মত সেও এক দেবীর নিমন্ত্রণ পেয়ে সদস্যবলে অচিন-পূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। পথে নিয়াম নামক এক পবনাসুন্দরী দেবী ওসিয়ানকে দেখে খুব পছন্দ করে এবং তাকে নিয়ে সমুদ্রপারে বহু দূরদেশে চলে যায়।

অবশেষে তারা গিয়ে পৌঁছায় চির-যৌবনের দেশে, যেখানে তারা তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীবৃপে বাস করে। এর পর ওসিয়ানের মনে স্বদেশের স্মৃতি জেগে ওঠে, তখন সে অয়ল্যান্ডে ফিরে আসতে চায়। নিয়াম তখন তাকে একটি ঘোড়া দিয়ে তার পিঠে চেপে যেতে অনুমোদন করে। সে আরও জানায় যে,

ওসিয়ান যেন কখনো মাটি স্পর্শ না করে। তা করলেই সর্বনাশ।

অয়ল্যান্ডে উপস্থিত হয়ে ওসিয়ান দেখে যে সবই যেন বদলে গেছে। এমন কি লোকগুলির চেহারা পর্যন্ত। তাদের কাছে গিয়ে সে ফেনীয়দের খবর জানতে চায়। লোকেরা স্বাক্ষর বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল যে, ফেনীয়দের কাহিনী তো অতীতের বস্তু। তাদের কথা নাকি পুরাতন কেতাবে লেখা আছে।

ইঠাৎ ওসিয়ানের নজরে পড়ে যে, তিনশো লোক একটি বড় প্রস্তবন্ধব বয়ে আনতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অনুকম্পাবশত সে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে মাটিতে পা দিল অমনি সেই দৈব অশ্বটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তার নিজের চেহারাও বদলে গেল। সে পরিণত হল লোলচর্ম একজন অতি-বৃদ্ধ।

অতিকষ্টে তার কাল কাটতে লাগল। নিজের অন্নটুকুও সংগ্রহ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। বার্ধক্যের প্রাবল্যে তার জীবননির্বাহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

তখন সেন্ট প্যাট্রিক তাকে নিজ আলয়ে নিয়ে গেলেন। তখন খৃস্টধর্মের প্রচার অয়ল্যান্ডে স্রীতিমতভাবেই চলছে। সেন্ট প্যাট্রিক তাকে খৃস্টধর্ম-দীক্ষিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণগান করলেন

ওসিয়ানের কাছে, খৃস্টীয় ঈশ্বরকে তিনি যুক্তি দ্বারা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। ওসিয়ান বলল : “দেবতানের আমরা ভাল করেই চিনি, তাদের সঙ্গে নৃখে-দৃখে বরাবরই আছি। সর্বশক্তিমান কোন ঈশ্বরকে আমার দরকার নেই। তবে তাঁর যদি আমাকে প্রয়োজন থাকে তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তিনি নিজেই ব্যাধিত করুন। আমরা ফেনীয়রা কখনো মাথা নত করতে শিখি নি।” তখন সেন্ট প্যাট্রিক ওসিয়ানকে বোঝালেন স্বর্গরাজ্যের কথা, একমাত্র ঈশ্বরের করুণায় যা পাওয়া যায়, আর যা পেতে গেলে পুণ্যের প্রয়োজন। স্বর্গে আছে অনন্ত-জীবন।

ওসিয়ান বলল : “আমি যদি স্বর্গে যেতে ইচ্ছে করি কে তা রোধ করতে পারে? স্বর্গে অনন্ত-জীবনে লাভ কি যদি সেখানে শিকারের না ব্যবস্থা থাকে, সোহিনী নারীর পিছনে ছোট্টার প্রয়োজন না থাকে, কবিদের সঙ্গীত বা চারপের গাথা শোনার সুযোগ না থাকে? তার চেয়ে তের ভাল স্বজন পরিবৃত্ত গৃহকোণ। স্বর্গে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করলেই চলবে।”

একেই বলে খাঁটি প্যাগান দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু কালক্রমে খৃস্টধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী লোপ পেরেছিল। * খৃস্টীয় প্রচারকগণ পূর্বতন গেলীয় দেবতা ও বীরদের সেন্ট হিসাবে ঘোষণা করে আইরিশদের প্রভাবিত করেছিল।

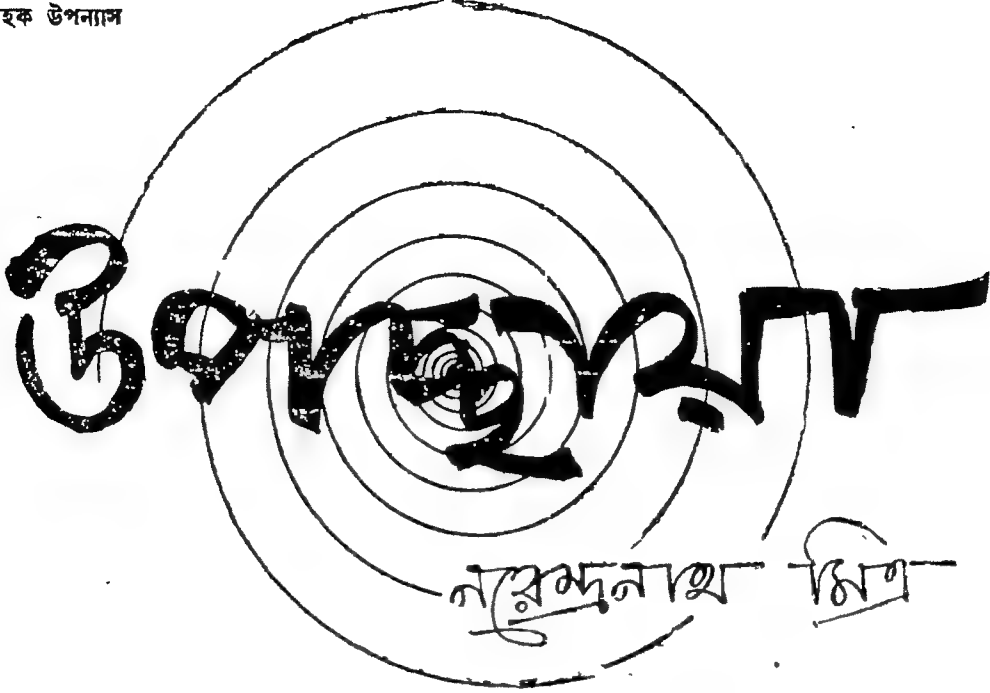


আমরা সবাই ভারতীয় ...

কেউ যেন আমাদের মাধ্যমে

বিভিন্ন স্থিতি করতে না পারে

DA 63/23
Bangali



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১ একুশ

৫ প্রহর একটু ছেলে এসে দবজা খুলে দিল। কালো লম্বা চেহারা। বয়স যোশ-যতের বোর বেশি হবে না। গায়ে একটা গেঞ্জি, পবনে হাফপ্যান্ট। দেখলেই বোঝা যায় পবিচাবকদের একজন।

‘কাকে চাই?’

বিজ্ঞান বলল, ‘শ্রীবিলাসবাবু আছেন?’

‘আছেন। আপনার নাম?’

বিজ্ঞান নিজের নাম বলল।

‘আচ্ছা একটু দাঁড়ান। বাবু দোডলায় আছেন। আমি তাঁকে শব্দ দিচ্ছি।’

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রীবিলাসবাবু নেমে এলেন। দীর্ঘ চেহারা। সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পক্ষাংশের কাছাকাছি বয়স। দেখে অবশ্য অতটা মনে হয় না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে ঘন কালো চুলের বাশের মধ্যে দু-একটি কপালী বেঁধা চোখে পড়ে।

‘আ বে এসো এসো।’

শ্রীবিলাসবাবু বিজ্ঞানের দিকে চেয়ে হাসলেন। দাঁতগুলি শাদা স্নগদ স্বগঠিত। হাসিটি যাই হোক দাঁতগুলি অকৃত্রিম বলেই মনে হল বিজ্ঞানের।

তাবপর চাকরদের দিকে তাকিয়ে তাকে মৃদু ধসক দিলেন শ্রীবিলাস, ‘তোব আক্কেল কিবে কেটে। ভদ্রলোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে বেখেছিস? জানিস ইনি কে?’

যেন সত্যিই বিজ্ঞান একজন কেটবিটু-গোছেব কেউ।

‘এসো বিজ্ঞান এসো।’

সন্তোষে সাদরে শ্রীবিলাস তাকে খুব ডেকে নিলেন।

ডান দিকে ছোট স্নগদ একটি বসবাব ঘর। সোফা সেটে সাজানো। বিজ্ঞানকে সোফায় বসতে অনুবোধ করলেন শ্রীবিলাস।

পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ঘর। শর্দার ফাঁক দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে হবে। সেণ্টার টেবিলে শাদা চিনেমাটির পটে একটি সানি প্লাণ্ট। বিজ্ঞান ডাবল, অর্ধই শ্রীবিলাস-বাবুর উপায়া দেবতা। সেইজন্যই কি বেছে বেছে মানি প্লাণ্ট রাখা হয়েছে? কিন্তু প্লাণ্টের সবুজ স্নগদ পাতাগুলি মনে কোন বকন বিরূপতা আনে না। বরং চোখকে শিনাক্ত করে। অর্ধট এই অর্ধ বে সহজ সবল বাজপথ দিয়ে এসেছে তাও জো নয়। কিন্তু এই স্নগদ শাদা পবিচ্ছন্ন দেয়ালগুলি, স্ননির্বা-চিত আগবাবপত্র, বিশেষ করে গৃহকর্তার অমায়িক মধুর ব্যবহাব দেখে অদ্ভুত কোন স্নজড় পথের কথা কারো মনেই আসবে না।

‘তাবপর কেনন আছো বলো?’

শ্রীবিলাসবাবু মৃদু হেসে বিজ্ঞানের দিকে তাকালেন।

বিজ্ঞান বলল, ‘বেকাব মানুষ এমন থাকে।’

‘বেকাব?’

শ্রীবিলাস যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

‘কেন তুমি কি তালুকদারদের ওখানে নেই?’

‘আপনি কি কিছুই জানেন না?’

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, ‘কী করে জানব? ওঁরাও কিছু জানানি; তুমিও কিছু

বলো নি। তুমি তো জানো ওঁদের কনসার্ন আমি অনেকদিন ছেড়ে এসেছি।’

কিন্তু এও কি বিশ্বাসযোগ্য শ্রীবিলাসবাবু কিছুই জানেন না, কিছুই শব্দ বাধেন না? তালুকদারদের মংশুর তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে ছেড়েছেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু উনি শব্দ বলছেন জানেন না তা যেন নেওয়া হাজা উপায় কি।

বিজ্ঞান সবই ধীরে ধীরে শ্রীবিলাসবাবুকে জানালো। কিছুই গোপন করল না।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, ‘ছি ছি ছি। তুমি আগে আমাকে জানাতে পারতে। তাহলে ওঁরা এখন অবিচাব করতে পারতেন না। তাহলে একটা না একটা ব্যবস্থা হতই। অস্তত কোনও যদি করে দিতে—’

বিজ্ঞান বলল, ‘আমার কোন কোন বদ্দ বলছে কেস করতে।’

শ্রীবিলাস একটু হাসলেন, ‘তোমার বদ্দরা বাইরে থেকে যে যাই বলুক, তুমি নিজেকে তো ভেতরের ব্যাপার জানো। কেস করে স্ননিবে হবে না। তবে অনুবোধ-উপবোধে হনতে কিছু হয়। তুমি যদি বলো তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।’

বিজ্ঞান বলল, ‘না ওখানে আর আপনায় কিছু চেষ্টা করে দবকাব নেই। ওখানে বি প্রেসিটল নিয়ে কোন কাজ করা যায়?’

শ্রীবিলাসবাবু আশ্চর্যে আশ্চর্য বললেন, ‘প্রেসিটল? তুমি কি কোন কাজটাজ পেয়েছ?’

বিজ্ঞান বলল, ‘না পাই নি। ত’ মাস ধরে

হাজার ম্যাজিক

সুনীল বসু

দিনগুলি বড়ো হিংস্র হিংসা, রাত্রি বিড়াল-চক্ষু
স্বাভাবিক শীত পড়ে না শহরে, শহরে স্বাস্থ্যহানি
প্রতিটি মানুষ, মারমুখী আর বদরাগী, মৃৎ
পরস্পরের কেঁজুতে চলে নিষ্পথ রাহাজানি
স্বপ্নে ছিদ্র, বাজারে ও হাটে ধাম্পার দাপাদাপি
রাতারাতি ভোল পাগেট যাচ্ছে পোশাকে-আসাকে ঢা
হরেক কাপড়ে জমা-পারজামা, মিহি মোটা খাপি
দিনগুলি বড়ো কিস্তিত ছবি আঁকা হয় ছয়-রঙে
রূপকথা ফটো, ধাম্পাই বটে শস্যশ্যামলা দেশ
মোটরের গাঁতো, ফুটপাতে হাট, পারাপার সাবধানে

হাজার ম্যাজিক দেখে বনে গোঁছ নিরুপায় দরবেশ
কোথায় পালাবো, নিজ্নতাও আছড়ে ভাঙছে শানে
কী মহা লগ্নে বসবাস চলে, পাররা-খুপরি ডেরা
দিনকাল সব ডিগ্বাঙ্গি খায়, হটমেলার দেশে,
জনতার স্রোতে শৃঙ্গ মিশে যায় কয় লাখ কালো ভেড়া
বৈকালী সব কেরানীরা ফেরে কার্পাস হয়ে ফেঁসে।
ভুলোই চলেছে, হে মধুসূদন, কেমন আছ হে তুমি?
দাঁত তো পড়েছে, ফুলও উঠছে, যৌবন গেল বয়ে,
বানিয়ে দিয়েছ উচ্চ আশাকে সমতল মালভূমি
কাটে রাত-দিন পথে-ঘাটে গাড়ি চাপা পড়বার ভয়ে।

বেকাব বসে আছি। তবু কাউকে খোঁসানো
কবতে খাই নি।

শ্রীবিলাসবাবু একটুকাল বিজ্ঞনের দিকে
তাকিয়ে বসলেন। যেন তাই এই পৌকমের
ভিত্তি কতখানি দৃঢ় তা একটু পরখ করে নিলেন।
তাবপব আগের মতই ধীরে ধীরে বললেন,
'এই তো চাই।'

একটু চুপ করে রইল বিজ্ঞন। তারপর
শ্রীবিলাসের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি তা হলে
চিঠি।'

শ্রীবিলাস বললেন, 'আ'র এখনই উঠবে
কি। বোসো বোসো। চা-চা খাও। কেট,
দু'কাপ চা নিয়ে আয়। দিদিমণিকে বল একটু
তাড়াতাড়ি—'

কেট বলল, 'চা হয়ে গেছে বাবু। আমি
নিয়ে আগছি।'

মাঝি আকাবের জুসব একটি পট।
পট ভবতি চা। পেটে জীষ-কেকার বিকিট
মাখন মাখানো। শ্রীবিলাসবাবু নিজেই
বিজ্ঞনের দিকে পেটখানা এগিয়ে দিলেন।
নিজের কাপে চা ঢালবার আগে বিজ্ঞনের
কাপে আগে ঢাললেন। দারি চায়েব সৌবত
বিজ্ঞনের ধারণক্ষমকে তৃপ্ত করল।

কে বলবে শ্রীবিলাস অকস্মে এক সময়
বিজ্ঞনের ওপরওয়াল ছিলেন। অতিথি সেবার
স্তাব নৈপুণ্য চেয়ে দেখবার মত।

বিজ্ঞন চায়ে চুক দেওয়ার পর শ্রীবিলাস
নিজের কাপ ঠোঁটে ধোঁসালেন। তাবপব
সহানুভূতি, সঙ্গে বললেন, 'তোমার জন্যে
সত্যিই বড় দুঃখ হচ্ছে বিজ্ঞন। এই বাজারে
ছ' বাস বেকাব বসে ধাকা কি সোজা। আমি
তোমার জন্যে চেষ্টা করব। বিশ্বাস করো
সত্যিই চেষ্টা করব। না তলুকদারদের ওখানে
নয়। সত্যিই ওখানে আর তুমি যেতে
পাবো না। আমারও ছোটখাটো একটা বিজ্ঞ-
নেগের মত আছে। কিন্তু সেখানেও আমি
তোমাকে আসতে বলি নে। তোমার যোগ্য
মর্যাদা আমার কার্য তোমাকে দিতে পারবে না।
আমি অন্য চারপাশ তোমার জন্যে চেষ্টা করব।
অনেকের গদেই তো আলাপ-পরিচয় হয়েছে।
এ পর্যন্ত আমি কাবো কাছে কিছু চাই নি।
কিন্তু তোমার জন্যে চাইব।'

বিজ্ঞন চায়েব কাপটি টেবিলের ওপর
নামিয়ে বেধে শ্রীবিলাসের দিকে তাকাল।
তাবপব একটু হেসে বলল, 'আমার তো মনে
হয় চাওয়া আপনাতঃ উচিত। কিছু নৈতিক
দাবি আপনাব আছে।'

শ্রীবিলাসের বুখানা কি, একটু কঠিন
হবে উঠল? হলেও নিষেধের জন্য। তিনি
সিন্ধু-কোমল হাসির প্রলোপে সেই কাঠিন্যকে
চুকে দিলেন। তাবপব মৃদুস্বরে বললেন,
'নৈতিক দাবি? কথটা বড়ো শক্ত কথা
বিজ্ঞন। যে চুক্তি তোমার সঙ্গে আমার ছিল
আমি তা বেধেছি। তুমি তোমার প্রাপ্য
নিষেধ। আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়েছি।
তাবপব আমি তলুকদারদের কনসার্ন ছেড়ে
এসেছি। নৈতিক দাবি আমার সেখানেই
শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আগাসের দুজনের
মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক তো
অত সহজে শেষ হবার নয়। তার দাবি
নৈতিক দাবির অনেক ওপরে। সেইজন্যেই
তোমার জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে।
না তবে আমি শান্তি পাব না—'

ভালোবাসা দাবি। বিজ্ঞন মনে মনে একটু
হাসল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। কপার
কাছেও কি এক সময় এই ভালোবাসা
সেহাই পেড়েছেন শ্রীবিলাসবাবু? সেই সেহাই
দিয়েই কি তাকে পরিবারের আশ্রয় থেকে
সবিয়ে এনেছেন? তাবপব তাকে হুঃ ছাড়া আর
কিছুই মেনে নি। নব্বু ভাষাব বিনীত ভঙ্গিতে
তিনি কি বিজ্ঞনের গায়নে নতুন এক ছলনার
জাল বিস্তার করে ধবেছেন? কিন্তু ইতিমধ্যে
অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে বিজ্ঞনের। সে আর
সহজে শ্রীবিলাসবাবুর কান্দে ধবা দেবে না।
তিনি যদি খেলতে চান বিজ্ঞনও খেলবে। তার
আর ভয় কিসের? বাটপাডকে ভয় করবার
মত তাব কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে?

এর মধ্যে কয়েকবার ইচ্ছা হয়েছে বিজ্ঞনের
কপাকে শ্রীবিলাসবাবু চেনেন কি না দ্বিজাস
কবে। কিন্তু কেমন যেন একটা সংকোচ
হয়েছে। রুচিতে বেধেছে। হিং, শ্রীবিলাস-
বাবু যাঁই করুন না কেন বিজ্ঞন ব্যাকবেল

করতে পাবে না। তা ছাড়া সুনীল যে কাহিনী
তাকে শুনিচ্ছে তাই যে আগাগোড়া সত্য
তাবও তো কোন প্রমাণ নেই। সে কথা কপার
কাছ থেকেই আগে শুনে নিতে হবে বিজ্ঞনকে।
তাব সত্যতা সহজে নিঃসংশয় হতে হবে।
তাব সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া দরকার।
কিন্তু এত সানান্য পবিচয়ে কি ওসব কথা
বলা চলে?
দোবের সারনে একটি তরুণী এসে
বাঁড়াল।

'বাবা, তোমার কোন এসেছে।'
শ্রীবিলাসবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাঁড়িয়ে
বললেন, 'যাচ্ছি।'

একটু ইতস্তত করে বেধের সঙ্গে পবিচয়
করিয়ে দিলেন, 'আমার মেয়ে নলিতা।
হিস্টিতে এসে পড়েছে। আর এ হল বিজ্ঞন
বোস। আমবা একসঙ্গে কাজ করবার, ওস
কথা নিশ্চয়ই তুমি এর আগে শুনেছ।'

শুনেছে কি গোনে নি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে
নলিতা বিজ্ঞনের দিকে চেয়ে শুধু হেসে ছোট
একটু-নমস্কার করে কের তাব বাবাব দিকে
তাকাল, 'তুমি কি এখন বেবোবে বাবা?'

'তাহলে আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে একটু
যেবাচ্ছি?'

শ্রীবিলাস সিন্ধু বাৎসল্যে হাসলেন,
'আমার গাড়ি বুঝি তোদের গাড়ি নয়?'

এ কথাব কোন ছবার না দিয়ে নলিতা
বলল, 'বেশি দেবি হবে না-বাবা। যাব আর
আসব। যাও, তুমি ওপরে যাও। ভয়লোক
কোনটা অনেকক্ষণ ধরে আছেন।'

'যাই।'
গাড়ি বেবিয় বাওয়াব শব্দ শোনা পর্যন্ত
অপেক্ষা করলেন শ্রীবিলাস। তাবপব বিজ্ঞনের
দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা তাহলে ওই কথা
রইল। তুমি এসো আর একদিন। কি
কোনে যোগাযোগ করো আমার সঙ্গে। মনে
হয় কিছু একটা করতে পারব। মানে কবতেই
হবে।'

শ্রীবিলাস দোভাব দিকে পা বাতালেন।
বিজ্ঞন পেটের দিকে এগিয়ে চলল। (ক্রমশঃ)



প্রাথমিক শিক্ষকদের বিকোভ

মিছিল নগরী

কলকাতা মহানগরীর পথ জুড়ে আবার মিছিলের মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিগত সপ্তাহটিতে একাধিক মিছিল রাজভবনের দুরারে গিয়ে পথ-জমিরে বসেছে। মহানগরীর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, প্রতিবাদী মানুষ যেন মরণ-চেতনায় অকস্মাৎ নড়ে উঠেছে। আর কটা দিনই বা। এর পর মিছিল কেন, মিটিং পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠবে কি না এই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে অনেকেই এবং ভোর ও পর বন্ধ ঘরে ডিবেটিং পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেলে আশ্চর্যের কারণ খুব একটা থাকবে না। মিছিল মিটিং-এর সাথ পুরণের শেষে ইচ্ছাটুকু বেলাবেলি পদ্বিরে নেওয়া আলো থাকতে থাকতেই ভালো। শ্লোগানঃ হেঁটে নাও, দুদিন বৈ তো নয়।

পারতপক্ষে ঝাঁপ হাটেন না তাঁদের কথা বাদ। কিন্তু হেঁটে হেঁটে ঝাঁপ চিতার চড়েন, মিছিলে হাটর বৈচিত্র্যে তাঁদের মধ্যে এক চিরন্তন উদ্দীপনা প্রসঙ্গ থাকে। খামকা মিছিল-মিটিং বন্ধ হলে নিখরচার এই উত্তেজনাটুকুও হারাতে হবে তাঁদের। সেটা কম দুঃখের কথা নয়।

আশঙ্কা বাস্তবায়িত হলে অতঃপর মহানগরী কলকাতাকে হাত আঁচিয়ে বসে থাকতে হবে। পূজাদি পালপার্বণ, বিবাহযোগ ও শশানযাত্রা ছাড়া মিছিলের মুখ দেখার জন্য

বিশেষ বিশেষ দিবসের অপেক্ষায় এক পারে খাড়া থাকতে হবে তখন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রভাতফেরী ও ইতস্তত লরিযাত্রা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব উপলক্ষে মিছিল, গ্রীষ্মকালের পূণ্য মর্ত্যগমন দিবস উপলক্ষে চৈতন্য-গুড়ুম-করা মহাভাবযাত্রা, পরেশনাথ শোভাযাত্রা, গুরু নানক জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, মহরম দিবসের শোভাযাত্রা, মহাত্মাজী স্মরণে শোভাযাত্রা, ইত্যাদি কিছু কিছু থাকবে। আর থাকবে মাননীয় অতিথিবর্গের সম্বর্ধনা শোভাযাত্রা। তা সে সবার জন্যে হা পিজেশ করে বসে থাকা ছাড়া নিরুপায় তখন।

কলকাতার সেই পথোপবেশনকারী অনিকেতরূপ কলকাতার সদাসতর্ক চেতনাকেই বারম্বার শারীররূপ দিয়েছে। সে কোনো দৃশ্যের নিশাষাপন নয়; সে হল নিকরের স্বপ্নভঙ্গের কলোচ্ছ্বাস, বেঁচে-থাকা মূর্খের প্রাণের প্রাচুর্য-প্রকাশ। মিছিল-মিটিং নিরন্তর হলে সেই সতর্ক মহানগরী অদৃশ্য হবে নিত্যদিনের দৃশ্যপট থেকে।

ট্রামহীন বহুর কলকাতা যেমন অক্ষমতার মতো ফ্যাক ফ্যাক করে, মিছিলহীন কলকাতা ডেমিন মতের মত ফ্যাকাশে দেখাবে।

হায়, সেদিন দূরে থাক!

ভি, আই, পি-প্রসঙ্গে সপ্তকোষ রূপী অথবা প্রসূতির গাড়ি পর্যন্ত আটক থাকে।

মিছিল নগরী অন্তত রাস্তাঘাটের একটা দিক উন্মুক্ত রেখে পথ চলে।

ওরা আর যে কটা দিন হাটিবে, মহানগরী কলকাতা হুঁমুড়ি খেয়ে ওদের দিকে পরিচিত চোখে তাকিয়ে আশ্বস্ত হবে।

মিছিল-মিটিং নিরন্তর হব, সম্ভাবনার প্রতিবাদে অক্ষমতায় একাধিক স্থানে জনসভাও কিছু কিছু হয়ে গেছে। বিগত সপ্তাহটি প্রায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই মিছিল সপ্তাহে দু'শ গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষক মিছিল

কলকাতার পথ জুড়ে দু-দুটো শিক্ষক মিছিলের একটি ছিল সর্বাধিক নিষ্প্রতিভ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মুখের মুটি-ভিক্ষা মিছিল; অপরটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মুক মিছিল। প্রথমটির মুখের দাবি, অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষারতীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারী দৃকপাত ও হস্তক্ষেপ; শেষোক্তের মুক আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্পনসর্ড কলেজের ওপর থেকে পরিকল্পিত সরকারী হস্তের অপসারণ।

প্রাথমিক শিক্ষারতীদের আটটিশ দফা দাবির অন্যতম বৈতনবান্ধি। অধ্যাপকগণের দাবির মূল কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ববান্ধি। প্রথম বাহিনী গেছেলেন বিধানসভার

সাম্প্রতিক বসুধা

ট্রেনেশ্যে, মিত্রীয় বাহিনী নীরবে দাঁড়িয়েছিল সেনেট সভার স্মারদে। উভয় বাহিনীই যথারীতি আপনাপন বিকোভ সরবে-নীলবে প্রকাশ করে ফেরৎ গেছেন স্ব স্ব স্থানে, গ্রামে নগরে। আর সেই সপ্তে রেবে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা নিয়ে বাম-খেয়ালীপন্যর বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদ।

কলা বাহুল্য এ সমস্তর যথারীতি ফলাফলই প্রত্যাশিত। ইদানীংকালের অতিজ্ঞতার কাঁপি খুলে চোখ বুজেই কলা যাবে, অতঃপর কিছু অপবাদ প্রত্যাগাচর হবে। আতনাদ প্রতিবাদ ইত্যাদির পর সরকারের বা অবধারিত প্রাপ্য। ততোধিক আশা আশাবাদীর মানস-সরোবরেই একমাত্র প্রক্ষুটিতব্য।

প্রাথমিক শিক্ষার্তীর্ণগ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন, “যাট টাকা বেতনে আমরা খাব কি, রাজ্য সরকার জবাব দাও।”

শুন দেশের লোক তাম্বব হবেন না কি? কি খেতে হবে তা তো ইতিমধ্যেই কলা হয়েছে। ওরা কি খবরকাগজটাও পড়েন না? অবশ্য যাট টাকা মাইনের বোল পয়সার কাগজই বা পাবেন কোথায় তাঁরা। কিন্তু ওরা তো মিছিল-মানুষ, কানে তো আর তুলো নেই। তবে কশাঘ্রামও কি মতুন মেনের খবর পান নি তাঁরা?

তবে শুনেন কী খেতে হবে:

চপ কাটলেট পান্ডুরা

এল নয়, গম নয়। আলু, মটর, কাঁচকলা ও দাঁধ সহযোগে ফলার। প্রকাশ, পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যরা কাঁচকলার চপ, কাটলেট, মটরের ঘুগুনী, আলুর পান্ডুরা ও পরটা এবং দাঁধ সহযোগে (সম্ভবত) আলু, ক্ষুদ্র অর্থাৎ দইবড়া মধ্যাহ্নভোজে পরম পরি-তৃপ্তপূর্বক আহার করেছেন। ভোজনালয় —“ড্যাংলেক্সের মোকাবিলা করুন” প্রদর্শনী গড়প। আরও প্রকাশ প্রত্যেক ডিশের মূল্য ধার্য ছিল, একশত সত্তর পয়সা।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একশত আশি টাকা সর্বনিম্ন বেতনে হিসেবে দাবি করেছেন। মন্ত্রিমহোদয়ের মত দেশসুখ মানুষ অতঃপর আলু-কলা-মটর-দাঁধর আশ্বাদ পলে একশত সত্তর পয়সা ডিশ কত মূল্য-মানে উল্লিখিত হবে তা অবশ্য একমাত্র কোন্ড স্টোরেজই জানিত, তবে ডিশ পিছ দশটা পয়সা যে নির্ধার্য বাড়বে তাতে হিসেবের অপেক্ষা রাখে না। তাহলেই জর্নাপিছ প্রতি ডিশ ১৮০ পয়সা হলে ওদের দাবিটা অর্থাত্তিক কলা মানে বৃষ্টির মাথা চিবিয়ে যাওয়া। কেন না কেবলমাত্র দৈনিক দুবেলা দুটো ডিশেই খরচ পড়বে ৩৬০ পয়সা। অর্থাৎ একজন এজাতীয় ডিশ দুবেলা খেলে ১৮০ টাকার পণ্ডাশ দিন আহার করতে পারেন। অর্থাৎ, মাসে ৭২ টাকা উদ্ভূত।

এর পর যদি ধরা যায়, মন্ত্রীরা বা থাকেন

হোঁজ-পোঁজর কলও তাই থাকেন নাকি! তাহলেও প্রশ্ন থাকে, শব্দ খেলেই তো বাঁচা যায় না; চাই বাসস্থান, লক্ষ্যনিবারণ, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি। তা এসব হিসেব করলে দেখা যাবে, ১৮০ টাকার একটা সংসার ঘুরে থাক একটা খাটো মানুষের একর পক্ষেই খেয়ে পরে থাকা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং হিসেবে চললে একশ আশিও নিতান্ত বৈহিসেব। এবং শেষ পর্যন্ত ওদের দাবি এ বৈহিসেব বলেই বাতিল হবে।

কিন্তু তারও থেকে বড় বিষয়, বাঁদের যাট টাকার এতোকাল চলে গেল, হিসেব কষতে গেলে দেখা যাচ্ছে তাঁদের একশ আশিতেও অচল। সুতরাং কেন হিসেবে দেশের অর্থনীতিটা চলছে সেটাই সব বাড়া তাম্বব ব্যাপার।

এদেশের সাধারণ মানুষের হাতে আলাদািনের আশ্চর্য প্রদীপ আছেই।

তবে আর সমস্যার আকণ্ঠ-কবরস্থ সরকারকে উত্তর করা কেন?

বড় লজিকের অভাব। স্রেফ সক্ষমত ব্যাপারটাই ইলজিক্যাল।

দুঃখেরালা ফেরীওয়াল

ফেরীওয়াল ও দুঃখ ব্যবসায়ীগণও মিছিল বার করেছিলেন। প্রথম বাহিনী চান বিকল্প জীবিকা—অন্যথা ফেরী করার সুযোগ-সুবিধা। মিত্রীয় দলের বক্তব্য, পুলিশ তাঁদের ওপর অত্যাচার করছে। দুঃখই প্রতিকার প্রার্থী।

ফেরীওয়ালারা বেকার হতে নারাজ। এঁদের কথা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন মধ্যমন্ত্রী। তবে এখনই নয়। ইংরেজিতে বলে, হোয়েনেবল, অর্থাৎ কিনা যখন সম্ভব হবে তখন।

কিন্তু কী এমন নতুন কথা শোনাতে ফেরীওয়ালারা ঘটা করে মিছিল বার করলেন হাজার হাজারে, কাতারে কাতারে! বেকার কি তাঁরাই হলেন নাকি, স্বর্ণকররা হন নি, মিস্টার কারিগররা হন নি, কিছু পরিমাণে শ্রমজগতি যানবাহন পরিচালকরা হন নি, ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়াও দেশজোড়া শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ও মধ্য বেকাররা কি বেকার নন? তবে? উপ্গার শব্দ ওদেরই করতে হবে এতবড় আশা দুরাশা নয় কি? মিছিল করেছেন, ভালো কথা। খিল দিলে ঘরে শব্দে থাকলেই বা এমন কেন ক্ষতিটা হত।

আশ্চর্য! সব জায়গায় একটা লজিকের গড়গোল! দেশসুখ বৃষ্টি-ফুটি লোপাট হয়ে গেল। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সঁভাই দুর্ভাবনা হয়। তা সে যতই ভাবব না ভাবা থাক না কেন।

সার আশুতোষের স্বপ্ন

সার আশুতোষ মূখোপাধ্যায় গভীর্ছিলেন ভিলে ভিলে ভিলোত্তমা, কলিকাতা কিং-

বিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ নতুন বিলে সরকারী প্রশাসনিক আলো পর্য্যবসিত হতে চলেছে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর সমেত সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।

সরকারী নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আবাত থাকবে নাকি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আড়কাঠি। বিরোধীরা তাই প্রতিবাদে মুখর। বলছেন, ব্যাপারটা বাস্তবিকই সোনার সোহাগা হয়েছে। এরপর রয়াল বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন সম্ভব কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় হবেন সরকারের সেলাম বাদকমাত্র। মধ্যাশিকা পর্বদের সপ্তে উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থানের আর কোনো ফারাক থাকবে না। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা, অতঃপর, ও কংগ্রেসী সরকার তৎসং করে বাণেশ্বরী পূজাবেদীমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করবেন। শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি চলবে অব্যাহতভাবে।

অপরপক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে রাজনীতির আসর বিরোধীরাই জমিয়ে তুলেছেন। নয়ত সরকার যা করেন, মণ্ডলের জন্যই। আশঙ্কার কারণ ভিত্তি-হীন। সরকার সরকারী কর্মচারীকে সরকারী সরকারী অফিসরকে চ্যান্সেলর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সিঁড়িকেট সদস্য করতে যাচ্ছেন না। তাছাড়া সরকারী প্রতিনিধি নামমাত্র। আর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর মশাইকে নিয়ে মাথা গরমেরই বা প্রকৃত কারণ কি। তিনি আসলে ভাইস চ্যান্সেলরের সহকারী কাজ করবেন (যদিও তাঁর জন্য বাৎসরিক নম্বই হাজার টাকা অতিরিক্ত বহন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে)।

বিরোধীরা সব সময় সুযোগ পেলেই রাজনীতি করেন।

খুব বোধিদান হয় নি, রবীন্দ্রনাথের নিয়ে ক্যাথিড্রাল রোডে শিল্পী সমাবেশের ইশ্বন তো ওরাই জুগিয়েছিলেন! ওরা রাজনীতি ছাড়া একটি কথা খসাবার পাত্র নন। সুতরাং বিরোধী বক্তব্যে কল্যাণতরী সরকারের কর্ণপাতের অর্থই হচ্ছে রাজনীতির খপ্পরে পড়া। আর দেশেই হয়ত বিরোধীদল কর্তৃক মন্ত্রানৈতিক জনসাধারণের মধ্যে বিলটি প্রচারের জন্য যে সংশোধনী প্রস্তাবটি রাখা হয়েছিল—ভোটটিধকো বাতিল করে দেওয়া হয়। জনসাধারণও তো এ। বিরোধী রাজনীতি একটু ফুসলালেই ওদের কাডাকাড-জান লোপ পায়। তাই ও সমস্ত প্রচার প্রস্তাবও হয়ত বা বিরোধী রাজনীতিরই চালবাজি।

দলীয় সদস্যের বক্তব্য

কিন্তু ফাসাদ বাধিরে বসলেন কংগ্রেসী সদস্য গ্রীনহের সেন। তিনি অকস্মাৎ কঠোর সমালোচনার মুখর হলেন। বললেন, জাতীয় সরকার যেখানে শিক্ষা প্রসারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কিছুটা সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাখা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

করা অসংগত নয়। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগসমূহের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না, সেখানে ষামোকা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করে অতিরিক্ত বার্ষিক নশ্বই হাজার টাকা ব্যয় বাস্তবিক অর্থায়নিক। তাছাড়া এ নিয়োগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও রেবারেব সৃষ্টি হবে। প্রশাসনিক দৃষ্টান্তে অব্যাহত রাখতে সরকার শেষে যে এইসব নতুন পদ সৃষ্টির বাসনা করেছেন তা মোটেও সানন্দে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়।

শ্রীমতেন সেন এই বলে দুঃখ প্রকাশ করায় আমাদের আবার আনন্দপূর্বক ভাবিত হতে হল। সরকারী দলের বক্তাই বলছেন, দৃষ্টান্তে সৃষ্টিতে সরকারই অংশ গ্রহণ করছেন। ওদিকে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, বিরোধীরাই রাজনীতির ঘেঁট পাকাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের স্ববিরোধে সমস্ত ব্যাপারটাই জিলিপির পাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যওয়ারী চিত্র

তার ওপর আবার পশ্চিমবঙ্গের আশ-পাশের আবহাওয়াও কম আশঙ্কাজনক নয়। উত্তর প্রদেশে প্রাক্তন সরকারী অফিসর শ্রী আর কে হেহর, আই সি এস-কে নিয়ে বিচারালয়ের আদেশের নির্দেশ 'ডোন্ট কেমার' করে রাজ্যপাল এক অর্ডিন্যান্স জারী করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে শ্রীনেহরুর নিয়োগ বৈধ করলেন। এই অর্ডিন্যান্সেই লকো, আগ্রা, গোরখপুর ও ধারাবাসীর ব্যাপারও সামলে রাখা হল। এটা অবশ্য রাজনীতি নয়, রাজ্যপাল নীতি, যা সন্দেশ মিটার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত বিস্তৃতপক্ষ।

অন্ধ্ররাজ্য সব বিতর্কের ইতি করবার জন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবকটিতেই উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা চ্যান্সেলর অর্থাৎ রাজ্যপালই সরাসরি প্রয়োগ করবেন বলে নতুন সংশোধনী বিল উত্থাপন করল।

এরপর বিরোধীদের ওপর আর বে দোষই চাপানো হক, তারা রাজনীতি করছেন বলে স্বভাবতই পটকা লাগবে।

নতুন মধ্য সচিব

শ্রীমৎস্য গঙ্গু আই, সি, এস মহোদয়ের অবসর গ্রহণের পর বিনি শ্রীমৎস্যের স্থলাভি-বিস্ত হলেন, দীর্ঘকাল দক্ষতার সঙ্গে সরকারী কার্যপরিচালনার তাঁর সুনাম সুপরিচিত। শ্রীমৎস্যমৌলী বঙ্গ কৃতী ছাত্র হিসেবে একদিন সুনাম অর্জন করেছিলেন, কৃতিত্ব তারপর তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। ১৯৩৪ সালে শ্রীমৎস্য আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে সরকারী

কাজে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে নিবৃত্ত হন স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে। তদবধি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর আরম্ভ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

মধ্য সচিবের কার্যকালে শ্রীমৎস্য তাঁর সেই পরিচিত দক্ষতারই স্বাক্ষর রাখবেন এ বিষয়ে অভিজ্ঞমহল নিঃসন্দেহী।

মধ্য সচিবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে, সুতরাং, শ্রীমৎস্য নির্বাচন অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীমৎস্য মল্লিক

ছাত্র হিসেবে উজ্জ্বল ও মেধাবী শ্রীমৎস্য মল্লিক আই সি এস হয়েছিলেন ১৯৪০ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কেমিস্ট্রি করে তিনি যোগ দেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে। অতঃপর দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন গুরুদায়িত্বসম্পন্ন পদ অলঙ্কৃত করে কল-কাতার ট্রান্সপোর্ট কমিশনাররূপে শ্রীমল্লিক তাঁর দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

বর্তমানে তাঁর সুদক্ষ কর্মজীবনের আকর্ষণেই ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের দায়িত্বের ওপর কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দায়িত্বও এসে পড়ল। ট্রান্সপোর্ট কমিশনার শ্রীমৎস্য মল্লিক তাঁর বর্তমান কার্যভারের সঙ্গে সি আই টির চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্বও গ্রহণ করলেন।

উনপঞ্চাশ বছরের কর্মী শ্রীমল্লিক কর্ম-ক্ষমতার এখনও নবীন যুবক। কেবলমাত্র বিদ্যার্জনেই নয়, খেলাধুলায় এবং দেশ পছতিনেও তিনি একটি উল্লেখ্য নাম। বহু-দেশ পছতিনের অভিজ্ঞতা, কর্মজীবনে সততা এবং ব্যক্তিগতভাবে সুদক্ষ স্পোর্টসম্যান শ্রীমল্লিকের হাতে মহানগরীর তবিস্য তুলে দেওয়ার সময় সেজন্য স্বভাবতই নাগরিকগণ অনেক আশা রাখেন তাঁর প্রতি।

মৌদীনীপুরঃ

অধিক ফলন প্রসঙ্গে

নতুন খাদ্যনীতি আলোচনার পরে মৌদীনীপুরে নন্দীগ্রাম সমবায় কৃষি-বিপণন সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমৎস্য হুসীকেশ জানা একটি পত্র পাঠান। নিম্নোক্ত পত্রে তাঁর এতাবৎকালের অভিজ্ঞতাংশ কৃষি ও সমবায় সম্পর্কিত ধারণার একটি সূচনামূলক চিত্র ছবি ধরা পড়েছে। আমরা অবিকৃত ভাষায় শ্রীজানা উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশ করে কৃষকের গোচরীভূত করার জন্য উদ্যোগ করলাম। এ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের নিজস্ব কোনো মন্তব্য রাখা হ'ল না। খাদ্যনীতি সম্পর্কে বর্তমান লেখকের বক্তব্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে :

শ্রীজানা লিখছেন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পিত নতুন খাদ্যনীতিতে পাঁচ একরের উর্ধ্বের জমির মালিকগণের নিকট হইতে খোরাকী বীজধান বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত ধান-চাল লেভারী প্রথার দ্বারা সরকার নেবেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে পাঁচ একর জমির মালিক স্বয়ং ঐ জমি চাষ-আবাদ করেন, অথবা বণিকদ্বারা দ্বারা চাষ করানো হয়, তাহা সরকারী কৃষিপক্ষে সর্বশেষ জেনে এবং জমির মালিক প্রকৃতই বণিকদের নিকট কি পরিমাণ উৎপন্ন ধানের অংশ পেয়েছেন, অথবা আদৌ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হন নি, তা অবগত হয়ে, তবে জমির মালিকের উপর ধান-চাল প্রদানের সরকারী লেভারী নির্দেশ প্রয়োগ করা হোক। অন্যথায় লেভারী নির্দেশ প্রয়োগের দ্বারা জমির মালিকের উপর জুলুম হতে পারে, সেই কারণে কৃষকের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করি।



শ্রীমৎস্য মল্লিক

সাম্প্রতিক বঙ্গবর্তী

স্থানীয় পণ্ডারের প্রদত্ত মনগড়া জমির ভালিকা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, অনেক পণ্ডারের ভালিকা প্রদানের সুযোগ পেয়ে হয়ত কাহারও প্রতি বিবেচ্য পোষণ করে ইচ্ছামত ভালিকা প্রদান করে গ্রাম্য দলদলীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অতএব জমির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে একমাত্র স্থানীয় রাজস্ব আদায়কারী তহশীলদারগণ কতৃক প্রদত্ত ভালিকা গ্রহণের দ্বারা ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ স্থির করার জন্য কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বর্তমান কৃষি বৎসরে পূর্ব-নন্দীগ্রাম এলাকার অধিকাংশ কৃষি জমি নদীর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হওয়ায় এবং পোকা ও রুদ্দিনীয়া শেওলার আক্রমণে ব্যাপক ধান্য ফসলের অক্ষয় ঘটেছে। স্থানীয় ব্লক অফিসের কৃষিবিভাগীয় কতৃপক্ষ কেবল দপ্তর বজায় রেখেছেন। কীটনাশক ঔষধ বা তান্ত্রঘটিত ঔষধ আদি যথাসময়ে প্রয়োগ করতে পারলে অবশ্য ব্যাপক অক্ষয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব কৃষিবিভাগীয় স্থানীয় কতৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁরা তাঁদের দপ্তর বজায় রাখবার জন্য ভুল উৎপাদনের হার তৈরি করে সরকারের নিকট প্রদান না করেন। ধান ভানা চৌকিকলগুলির মধ্যে কতকগুলি চৌকিকল ভারত সরকারের Rice Milling Industries Act অনুসারে জামিনী অর্থ জমা দিয়ে ও প্রতি বৎসর লাইসেন্স ফি জমা দিয়ে লাইসেন্স পূর্নবী-করণের দ্বারা ধানভানার জন্য ভাড়া বাণী পরসী গ্রহণ করে চৌকিকলগুলি চালাচ্ছেন, আর অধিকাংশ চৌকিকল আইন-কানূনের তোয়াক্কা না করে স্থানীয় কতৃপক্ষের জ্ঞাত-স্মারে বেপরোয়াভাবে তাঁদের চৌকিকলগুলি চালাচ্ছেন। এই বিষয়ে বে-আইনী কার্যের প্রতিকার না করে যে-সকল চৌকিকলমালিক আইনানুগভাবে লাইসেন্স গ্রহণ করে ভাড়া বাণী পরসী নিয়ে কেবলমাত্র স্থানীয় উৎপাদক-গণের খোরাকী চালের যোগান দিচ্ছেন, তাঁদের জীবিকার পথ সরকার যদি বন্ধ করতেই বন্ধপরিকর হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের পূর্বেই ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করে ধানভানা চৌকিকল জাতীয়করণ করার জন্য কতৃপক্ষের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি প্রায় প্রতি গ্রামে গ্রামে গঠিত হয়েছে। সমবায় সপ্তাহে আমরা সমবায়ীগণ সমবায়ের জয়গান করছি। সেই সপ্তাহে সমবায় কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, প্রকৃতপক্ষে কৃষি উন্নয়ন কতদূর অগ্রসর হয়েছে অথবা প্রাচীন সমবায় স্বপ্নদান সমিতির কার্যধারা অব্যাহত আছে তাহা পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। অবশ্য ব্যাপক সমবায় স্বপ্নদানের ফলে উৎপাদক কৃষকগণের আর্থিক অনটনের যথেষ্ট সুরাহা হয়েছে সত্য, কিন্তু এই পূর্ব-নন্দীগ্রাম

এলাকার অল্পমাত্র ফলে বর্তমান বৎসরে স্বপ্নের টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য অনেক সমবায় সমিতির সদস্যগণের নেই। অতএব স্বপ্নপ্রদানকারী সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতৃপক্ষকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা স্বপ্ন গ্রহণকারী সমবায় সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হউন এবং আবশ্যক-বোধে বর্তমান বৎসর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক স্বপ্ন আদায় স্থগিত করার নির্দেশ প্রদান করে স্বপ্ন গ্রহণকারীগণকে পরিবারের খোরাকী ও বীজধান পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচার ইংরেজ সরকারের আমল থেকে হচ্ছে, কিন্তু খণ্ডিত-ভাবে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ব্যক্তিগত মালিকের প্রচেষ্টার জমি চাষের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে না বলেই দৃঢ়-বিশ্বাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে জমি চাষের পরিবর্তে যৌথভাবে সমবায় প্রথার বাধ্যতামূলকভাবে উন্নত প্রথার উৎকৃষ্ট বীজ, সার ও সেট প্রয়োগ করে জমিকে দো-ফসলী করে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়তে পারে। অতএব আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় কৃষির ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নদীয়া:

নির্বাচনী সফর?

সাম্প্রতিক পত্রিকা লোকবাহার প্রতিনিধি পশুপালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গ্রীফজলুর রহমান সাহেব সম্পর্কে একটি অভিযোগ উত্থাপন করে জানাচ্ছেন, শ্রীরহমানের মনে নাকি সরকারী নীতি অনুসারে গ্রামে গ্রামে খাদ্য সংগ্রহে অকস্মাৎ ভীতির উদ্বেক হচ্ছে। তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার রুদ্দিনীয়ার আলোচনার স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণকে ধান সংগ্রহ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে মানা করে দিয়েছেন।

অভিযোগ একেবারে গুরুত্বহীন নয়। অভিযোগ সত্য হলে ধান সংগ্রহ নীতির প্রতি শ্রীরহমানের মানসিক দুর্বলতা আছে, এমন ধারণা অমূলক নয়। যদিচ একজন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর এজাতীয় দুর্বলতা থাকা স্মেটেই বাছনীয় নয়।

এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিপ্রয়োজন। শ্রীরহমানের নজর আকর্ষণের জন্যই আমরা লোকবাহার সংবাদটি উদ্ধার করলাম।

“গত ২১শে নভেম্বর রাজ্য পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব তাঁহার নির্বাচনী কেন্দ্রে ঘুরোয়া বৈঠক করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি কংগ্রেসের উপদলীয় দলবাজি এই সফরের অংশল্য করণ। রাজ্য দপ্তরে যে তৃফানের আঘাত বাজিয়াছে, তাহার অভিঘাত হইতে দূর মক্ষ্মলের কংগ্রেসী সংস্থাগুলিও নাকি দূরে নাই। কাজেই নেতৃবর্গকে স্বেচ্ছায়

বা আনিচ্ছায় অনেক দ্বন্দ্ব বা বিতর্কের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

শ্রীরহমানের রুদ্দিনীয়ার-কক্ষ আলোচনা-চক্রের কঠিন অর্গল ভেদ করিয়া যে খবরের টুকরা আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহা সত্যিই আশ্চর্যজনক। বর্তমান সরকার যে নতুন খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে চাষীমহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য, এই ক্ষোভের কারণ সঙ্গত। আর কৃষকদের অসন্তোষের এই ধ্বংসাত্মকতা সরকারের একে-বারেই অজ্ঞাত নহে। কাজেই শ্রীরহমান নাকি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে ধান সংগ্রহ করিতে বাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা যেন অঞ্চল অফিসের কর্মী, অথবা খাদ্য বিভাগের কর্মী হন। কোন কংগ্রেস কর্মী বা সদস্য যেন এ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে না যান। কারণ, তাহা না হইলে নাকি গ্রামের লোকের কাছে কংগ্রেস তাহার জনপ্রিয়তা হারাইবে। শ্রীরহমানের ভাষায়—“তা হ’লে আগামী নির্বাচনে আমরা ভোট পাবো না।” শ্রীরহমান নাকি তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন।

জনসভার খাদ্যনীতির জয় গাহিয়া মন্ত্রী-প্রবর কর্মী সম্মেলনে এ কি কথা বলিলেন? যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে—তবে ইহা কি সরকারের নীতিবিরোধী, জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী নহে?” (৩।১২।৬৫)

বীরভূম:

পুলিশী নজর

প্রকাশ, উদ্ভূত খাদ্য অঞ্চল বীরভূমে দুই এক সের চালের খিলির প্রতি পুলিশের শৃঙ্খলিত পড়েছে। যদিও জেলার মধ্যে চাল চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ নেই, তবু হাওয়া গরম বৃষ্টি পুলিশ নাকি জেলাবাসীর ওপর দৌরাডা শুরুর করেছেন। শহরবাসী যেসব লোকের গ্রামে গ্রামে জমি জমা আছে তাঁরা আপন পরিবারের ব্যবহারযোগ্য দু-এক সের চাল গ্রাম থেকে শহরে (জেলার অভ্যন্তরে) নিয়ে আসতে দেখতে পেলেই কান্ড চেপে ধরছেন নাকি করিংকর্মী পুলিশ-প্রহরা। পুলিশ অবশ্যই চাল আটক করছেন না, হাওয়া বৃষ্টি দু-পাঁচ টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন।

যে পুলিশ চাল ফেরৎ দেন সে পুলিশ নিশ্চয় জানেন, যতটুকু এলাকার মধ্যে চাল বহন করা হচ্ছে ততটুকু এলাকার সেকা-অবৈধ নয়। যদি অবৈধ না হবে তবে চালের টানে জনসাধারণকে টাকা ফেলতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন। উৎকোচ গ্রহণের এই অপব্যব থেকে প্রহরিগণকে উদ্ধার করার জন্য উপযুক্ত কতৃপক্ষ কি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। বর্তমান সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হবে না বলে আশা প্রকাশ করছি। জেলা পুলিশ সুপার এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেই বিশ্বাস।



প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য। একই সংলাপের পুনরাবৃত্তি!

বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পরবর্তী বাসটার জন্য। ঠেলেঠেলে লোকে উঠে পড়ে। ক্রাচে ভর দেওয়া মানুষটার জন্য কারো সহানুভূতি নেই। সবাই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বাসও সময় দেয় না গুঁঠবার জন্য। তারও চলার তাগাদা আছে।

আজকাল অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে গেছে অজয়। ভিড়ের মধ্যে নিজেই ঠেলেঠেলে বাসে উঠে পড়ে। ক্রাচটা কারো পায়ে লাগলে বকাবকি করে যাত্রীরা। অজয় প্রথম-প্রথম কষ্ট পেত মানুষের হৃদয়হীনতা দেখে। আজকাল অবশ্য এসব সেন্সিটিভ নেই।

চলতে চলতে চলার পথে মানুষ যেমন অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে চলে, অজয়ের মনের এখন তেমন অবস্থা। কোন কিছুতেই আর অবাক হয় না। দুঃখও পায় না। মানুষের শেষ সংবাদটাও যেন ওর জানা হয়ে গেছে।

বাসে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে ক্রাচে ভর দিয়ে। সিটে বসা লোকগুলো কেউ চোখ নামিয়ে থাকে কেউ বা অন্য দিকে মৃদু মৃদুরে বসে রয়।

—বসুন।

লোডিস সিট থেকে ডাক আসে। পাশের জায়গাটা কৃষ্ণকলি ছেড়ে দেয়। অজয় তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণকলির দিকে। হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে বাসটা ঝাঁকান

দিয়ে অশুভ একটা করুণ শব্দ করে একটুক্ষণের জন্য থেমে যায়। অজয় পড়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। বাসটা আবার চলছে। এসে পাশে বসে অজয়। পারেন কাছে রয়েছে হাত দিয়ে ধরে রাখা ক্রাচটা।

প্রায়ই কৃষ্ণকলির সঙ্গের দোষা হয়। পাশে খালি সিট থাকলেই কৃষ্ণকলি বসে বলে। হয়ত একটুক্ষণের জন্য বসেও। আবার লোক এলেই উঠে পড়ে অজয়।

বাস চলেছে। চারদিকে লোকের ভিড় যান্ত্রিক কলকাতা। সবই যেন ছুটছে। কারও একটু সময় নেই থেমে থাকে।

পাশে বসে কৃষ্ণকলিও চুপচাপ। জানালার দিকে আপন মনে কি যেন ভাবে। হয়ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মানুষকে। অসংখ্য মানুষ চারদিকে। ভিড় অথচ কোন মানুষের মৃদুতা পূর্ণিচিত মনে হয় না।

অজয় তাকিয়ে দেখে কৃষ্ণকলিকে। কালে গভীর দৃষ্টি চোখে এখন শূন্য ক্রান্তির ছায়া। বয়সও বোধহয় হয়েছে। দৃষ্টি উদাস। প্রতিদিনই অজয় ভাবে, ওকে কিছুর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আর সময়, নুযোগ হয় ওঠে না। তাছাড়া জিজ্ঞাসা করার মধ্যে নিজেকে কেমন যেন হীন মনে হয়। অক্ষম এক কাপড়ের পুরুষের স্মৃতিটা বারবার ফিরে আসে।

কিন্তু একদিন তো এ ভিড়ের জগৎ

ছিল না। মনের জগতে সৌন্দর্য দুটি প্রাণ। কিন্তু সময় কি কারও জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করে? সময় চেয়েছিল অজয়। যদিও জানে এই সময় চাওয়ার প্রার্থনাটাই আরেকটা ব্যর্থ সময় কাটানো। জানে, সময় চিরকাল এমনিই থাকবে। এমনি করেই দিনেব পর দিন সে কৃষ্ণকলিকে বলবে, আর একটু অপেক্ষা করো। কিন্তু এই অপেক্ষা করতে করতে কেমন করে দুটি মন যেন দুটিকে ছিটকে যায় একদিন। প্রথমটার হয়ত নিজের মনের কাছেই অবাক লাগে একদিন। তারপর সব কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন থাকে শূন্য একটা দুঃখজনক স্মৃতি। সেই স্মৃতিও একদিন ঝাপসা হয়ে যায় মনের কাছে। জীবন কিন্তু থেমে থাকে না। নে কিম্বা এগিয়ে যায় সব কথা, সব গান সব স্মৃতি পিছনে ফেলে। তার দাবি সীমাহীন, প্রেম নয়, স্মৃতি নয় একমাত্র মৃত্যুরই কাছে তখন নে আত্মসমর্পণ কবতে পারে!

রাস্তা দিয়ে একটা পাখিওলা যাচ্ছিল। খাঁচার পাখিগুলো ঠেটি দিয়ে খাঁচাটাকে ঠোকরাচ্ছে। ঝাবার পড়ে আছে ভেতরে। এখন সেদিকে দৃষ্টি নেই। একবার এ কোণ থেকে ও কোণে ছুটোছুটি করে মিছেই খাঁচাটাকে ঠোকরাচ্ছে পাখিটা। এক সময় খাঁচায় মধ্যে এসে বসে চোখ বৃজিয়ে কিম্বা যেন জেনে গেছে। খাঁচাটাকে ঠুকিয়ে

করে কোন লাভ নেই। ওতে ঠোঁটটাই আঘাত পাবে।

বাসটা দাঁড়িয়েছিল একটুক্ষণের জন্য। বোধহয় কোন মহিলা বাগ্গী নামাছিল। আবার বাসটা ছেড়ে দিল। বাসটা ছুটছে। পেট্রোলের পোড়া গন্ধ, বাসের যান্ত্রিক শব্দ। লোক ওঠা-নামার ঘণ্টা, সব মিলিয়ে অশ্রুত এক অনুভূতি জাগাছিল অজন্মের মনের মধ্যে।

—চলি।

অস্পষ্ট করুণ কোমল গলায় কথা বলল কৃষ্ণকলি। ঘণ্টার শব্দ হল। কৃষ্ণকলি নেমে গেল। আবার ঘণ্টার শব্দ। কন্ডাক্টরের গলার স্বর, টিকিট। পরসার শব্দ। ব্যাগে পরসার পুরতে পুরতেই ঘণ্টা বাজল। বাস এগিয়ে চলে।

প্রায়ই দেখে এই স্টপেজটাতেই নামে কৃষ্ণকলি। কতদিন অজন্ম ভেবেছে, ওকে জিজ্ঞেস করে, কি করছো আজ-কাল? কেমন আছো?

বাদিও অজন্ম জানে, সব মানুষের কাজের সীমানা কতটুকু! কেমন আছোর উত্তর আজ সবার প্রায় এক! তবু কেন যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অজন্মের। কাটা পা-টা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। ক্রাচটাকে সবল মৃদুঠিতে আঁকড়ে ধরে।

বাইরে লোকজন চলছে। বাস, ট্রাম ছুটছে। নিজের বাসটাও চলছে। শব্দ, নিজেই যেন কেমন আর চলতে পারছে না ওদের সবার সঙ্গে তাল রেখে। জানে, কেউ তার জন্য অপেক্ষা করবে না। সবাই ছুটবে। একমাত্র সে আর ছুটতে পারবে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটিবে। আর কোন দৃষ্টিজনক অভিজ্ঞতাকে বৃকে বয়ে নিয়ে তার শব্দ মনে হবে, সবাই এগিয়ে গেল। সে শব্দ পিছিয়ে পড়ল!

রাতে অন্ধকার ঘরে শব্দে শব্দে ঘুম আসতে চায় না। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বাবা, দুজন সাবালক বোন, বিয়ের চেষ্টা করেও ওদের বিয়ে হচ্ছে না। ওদের দেখে অজন্মের এক-এক সময় মনে হয়, ওরাও যেন আর পৃথিবীর সঙ্গে পা রেখে চলতে পারছে না। ওদের জন্য কষ্ট লাগে। খোঁড়া পা নিয়েই অজন্ম চাকরি করে। ওদের বিয়ের কথাও এখন বড় একটা ভাবে না। সবচেয়ে বড় কথা ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বেঁচে থাকাটাই যখন বাধ্যতামূলক যাঁচ।

একেক দিন টিনের চালে বৃষ্টি নামে। টুপদর টাপদর, টুপদর টাপদর। কেমন অশ্রুত লাগে কান পেতে

শুনতে। শুনতে শুনতে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। বৃষ্টির ধারাপাত পড়া আরও জোরে শব্দ হয়। তখন টিনের চালের বৃষ্টির শব্দকে বস্তু বেসুরো মনে হয়, বৃকটা খা খা করে। কে যেন নেই, কি বেন নেই! পাশে পড়ে থাকা ক্রাচটাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ছুটে চলে যায় এই বৃষ্টির সীমানা পার হয়ে। বাইরে গিয়ে বৃক ভরে নেয়, রৌদ্র-গন্ধে-ভরা আলোর স্পর্শ।

পারে না। অক্ষম যন্ত্রণায় মন ছুট-ফট করে। চোখের ওপর কালো মশারিটা আকাশ হয়ে ঝুলে থাকে। যেন এই মূহুর্তে মাথার ওপরে পড়বে।

মনে মনে সবার ওপর বিরক্ত হয় অক্ষম অভিমানে। আফিস থেকে ফিরে এসে অসহায় ভাই-বোনদের গালাগাল দেয়। যেন আর কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না জেনেই ওদের ওপব সমস্ত ক্রোধটা গিয়ে পড়ে।

ওরা ভুল বোঝে। বলে; ছোড়দা আজকাল আর আগের মত নেই। ওদের অভিমান। ভরা কথা শূনে অজন্মেরও চিংচার করে বলতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীর কোনটা আগের মত আছে। না মানুষ, না তার প্রেম, না তার দৃষ্টিবোধ। এই পৃথিবীতে মানুষও যেমনি পুরনো হয়ে গেছে তার মনের অনুভূতিগুলিও তেমনি পুরনো হয়ে গেছে। কিছুই আর আগের মত নেই।

অন্ধকার হরে কৃষ্ণকলির মুখটা আরও অন্ধকার হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। কালো দুটি চোখে যেন তির তির করে জলের ধারা নামতে চায়। মৃদু ঘুরিয়ে নেয় কৃষ্ণকলি। গালের একপাশে একটা কালো তিল।

অসহায় হয়ে অজন্ম বলত, কি করব বলো? কতব্য দেখতে গিয়ে আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু ভাবো তো, ওদেরই বা কি করব? ওদের ফেলে দিয়ে তোমাকে পাশে পেয়েও তৃপ্তি পাব না। বায়বার মনে হবে, আমি অন্যায় করেছি। কতব্যভ্রষ্ট হয়েছি। তারপর কোনদিন তোমার সঙ্গে মনোমালিন্য হলে মনে হবে, ওদের দৃষ্টি নিয়েছি বলেই, আমাদের সুখের আকাশটাকে ছুঁতে পারলাম না। তাছাড়া এই ব্রোজগারে কি তোমাকে সুখী করতে পারব? যদি না পারি, তখন মনে হবে আমি পাপী। নিজেই নিজের ভালবানার গলা টিপে মেরেছি।

কৃষ্ণকলি বলেছিল, বৃকোঁচি। অক্ষম মানুষ ওরকম অনেক নীতির কথা আওড়ায়। আসল কথা কোনটাকেই

তুমি মন দিয়ে বিশ্বাস করতে পার নি, না তোমার প্রেমকে না তোমার কতব্যকে। আসলে তুমি একটা ভাঙা-চোরা মানুষ। তোমার মধ্যে কোন সামগ্রিক সত্তা নেই! হেরে-যাওয়া জীবনের জন্যই তুমি আমার কাছে শব্দ আশ্রয় চাও। প্রেম তোমার জন্য নয়। প্রেম অনেক বড়।

কষ্ট পেয়েছিল কৃষ্ণকলি। কালো হরিণের মত দুটি চোখে যেন সমাজ, সংসার জীবন ওকে বিষের তীর ছুঁড়ে মেরেছিল। আর সেই কালো চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল যেন বৃকের উষ্ণ রক্ত হয়ে গাল বেয়ে নেমেছিল। পারের ওপর লোকজনের ভিড় এসে পড়েছে বারবার। নানা-রকমের আলোচনা। একটু চুপ করে ভারবারও উপায় নেই এবুগে। সে সময়ও নেই, সে পরিবেশও নেই, বহু মানুষের ভিড়ে তার একক জগৎটা আজ চাপা পড়েছে। মাঝে মাঝে মাটিষ টিবি থেকে সেই অশ্রুত প্রাণের গানটা বেরিয়ে পড়ে বহু কষ্টে। ক্ষণিকের জন্য মানুষ কষ্ট পায়। আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

বাসটা চলেছে। কৃষ্ণকলির যেন এখন আর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় না। একটা সময় আসে মানুষের, যখন হঠাৎ একটা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কেমন যেন একই চেহারা মনে হয় তখন।

বাস থেকে নেমে পড়ে। রাস্তা পার হতে চেষ্টা করে। মনে হয় যেন কোন যন্ত্রদানব এই মূহুর্তে ছুটে এসে তাকে গুঁড়িয়ে দেবে, অথচ এই বেঁচে থাকার মধ্যে কোন আনন্দ আজ আর উপলব্ধি করতে পারে না অজন্ম। তবু মরতেও ইচ্ছে করে না। বিপদ এলেই যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে।

রাস্তার পাশের বিরাট নিষ্পত্ত গাছটাকে প্রায়ই কাছে যাওয়ার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, একটা পাখিও বসে না শব্দকনো গাছটার। কত যেন বরষ হয়ে গেছে গাছটার। মাটির নিচের শেকড় বাইরে বেরিয়ে আছে। তবু অশ্রুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ গাছ-পালার মুখোমুখি। পাশাপাশি। হয়ত এও এক ধরনের যুদ্ধ। হারতে হারতেও সে টিকে থাকে শেষ সংগ্রামের জন্য।

গাছটার নীচে বসে একজন বাঁশী-ওয়ালা বাঁশী বাজাচ্ছিল আপন মনে। হয়ত লোকটা এতক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করেছে। এখন ক্রান্ত হয়ে নিজের

মনেই একটু নিজের বাঁশীর সুর শুনেনিচ্ছে।

অজন্মের মনে হচ্ছিল বরষ হলে-
মাওয়া গাছটা যেন আবার যৌবন ফিরে
পেয়েছে। গাছটার ফুল হয়েছে। সবুজ
পাতায় ভরে গেছে সমস্ত ডালপালা।

বাঁশী বেশিক্ষণ শোনা যায় না।
লোকটা আবার চলে যায় কাজের
উদ্দেশ্যে। লোকজনের ভিড়ে আর
স্পষ্ট করে শোনা যায় না তার বাঁশীর
সুরকে।

মুখোমুখি কোন বাস এসে
দাঁড়ালেই কেমন যেন আজকাল ভর
পায় অজন্ম। সেই ভীতিকর দৃশ্যটা
চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন মনে
হয় আরেকটা পাও বোধহয় এবার
যাবে। একটা পা চলে যাওয়ার
আরেকটা পায়ের জন্য ওর সতর্কতাটা
যেন বেড়েছে।

আজকাল কাজ করতে করতে
প্রথমটার একটু অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে।
জানালার দিগে দূরের - চলমান-গাছটার
দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়ত মানুষের
মনের গতি স্বপ্ন স্তম্ভ হয়ে আসে,
তখনই সে বহুদূরের গতির দিকে চোখ
রেখে জীবনের চলাকে অনুভব করে।

এক-একদিন বাড়িতেও ফিরতে
ইচ্ছে করে না। কিন্তু যাবেই বা
কোথায়? সেই একই বাড়ি, একই
প্রাণান্তকর ঘর। ইটের ফোকরে
ফোকরে পাখির বাসা। বস্তু পূরনো
মনে হয় ঘরটাকে।

অথচ একদিন একজন তাকে সাহস
দুগিয়েছিল। বলেছিল, ভয় কি?
আমি তো আছি?

এই ছোট্ট কথাটুকুও যেন বাঁচিয়ে
রেখেছিল অজন্মকে। কিন্তু জীবন যেন
তার প্রেমকে হারিয়ে দিল।

শুনে শুনে হাড় বের করা দেয়ালের
দিকে চেয়ে থাকে আর নিজের কাটা
পাটার কথা মনে হয়। ঘরের মধ্যে
মায়ের চিংকার, চেঁচামেঁচি, বাইরে
অসুস্থ আবহাওয়া। এক-একসময়
অজন্মের ইচ্ছে হয় ছুটে দৌড়ে অন্য
কোন জায়গায় যায়, আর তা না হলে,
সুস্থ সক্ষম মানুষের মত জীবনের
পথে পা ফেলতে ফেলতে এদের সবার
সঙ্গে বড়ই করে।

কিন্তু পারে না। শুধু মনে হয়
সে এই পৃথিবীতে বস্তু একা। জীবন
দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সে কি করে তার
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?

আজকাল কৃষ্ণকলিকে খুব মনে
পড়ে। প্রেমিকার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা
হওয়ার ঐতো এক জ্বালা। দেখা হয়,
তবুও কাছেও বসে। ভিড় আবার

তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। মনে মনে
কত কথা জমে থাকে অজন্মের, কিন্তু
কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধের মধ্যে
বেদনা বুদ্ধ চেপে বসে থাকে। নড়তেও
চায় না, সরতেও চায় না, কতবার সে
ভেবেছে, ভুলে যাবো, কি লাভ এই সব
স্বপ্ন দেখায়! সে নিজেই আজ সারা
বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে
গেছে। হয়ত কৃষ্ণকলি অন্ধকাল অন্য
কাউকে ভালবাসে। কালো দুটি চোখ
হয়ত আজ অন্য কারো কথা শুনেনি
নিবিড় পলক অনুভব করে। এক-
একসময় মনে হয়, অন্য কেউ বোধহয়
তার কাছ থেকে কালো কৃষ্ণকলিকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল। উপায়হীনভাবে
তাকিয়ে দেখা ছাড়া তার আর কি উপায়
আছে? ওরা সুস্থ, সবল, সক্ষম।
অজন্ম ওদের সঙ্গে পারবে কেন?

কখনও ভাবে, একা কোথাও গিয়ে
থাকে। এই আত্মীয়-পরিজন এদের
ছেড়ে, কতবাক্যে ভুলে গিয়ে নিতান্ত
নির্জন হয়ে মনের দিকে তাকায়। কিন্তু
পারে না। কতবার, প্রেম সব কিছুকে
একসঙ্গে পেতে গিয়ে নিজের যে করুণ
চেহারাটা ফুটে ওঠে, সে ছবি ফাঁদে
পড়া জানোয়ারের করুণ শব্দগার ছবি।

মাঝে মাঝে ভাবে, একদিন কৃষ্ণ-
কলিকে দাঁড় করিয়ে দুজনে দুজনের
কথা শোনে। কিন্তু মনের মধ্যে ভয়

হয়। যদি কৃষ্ণকলি বলে, তার সমস্র
নেই। তখন যে বুদ্ধের মধ্যে আরও
দুঃখ লাগবে। প্রেমিকার কাছ থেকে
আঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু অবহেলা
নয়।

কখনও নিজের পাটাকে আরও
প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানতে ইচ্ছে করে।
সবাই সমবেদনা জানায়, করুণা করে।
কিন্তু ভালবাসে না। পাটা চলে
যাওয়ার পর মানুষের নিষ্ঠুর স্বরূপ
যেন আশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করতে
পারছে অজন্ম। শুধু মনে হয়, তার
জন্য কেউ অপেক্ষা করবে না! সবাই
এগিয়ে যাবে।

এই আসা যাওয়ার পথেই কৃষ্ণ-
কলিকে একদিন বেহারার মত বলেছিল
অজন্ম, তোমার বাড়ি একদিন যাবো,
কৃষ্ণকলি প্রথমটার কি যেন একটু ভেবে
নির্ভেছিল, পরে বলেছিল, আচ্ছা।
গলায় এক ধরনের বিষমতা!

হয়ত ওদের বাড়ি না আসাই ভাল
ছিল। নতুন করে যেন অজন্মের কাছে
অনেক কিছু প্রকাশ পেল। শুধু,
সেই সকাল বেলায় বেরিয়ে যায় কৃষ্ণ-
কলি টিউশনিতে। আসে, এসে খেয়েই
আবার আফিসে ছোটে। আফিস থেকে
ফিরে আবার সন্ধ্যায় টিউশনি, এই ওর



ভারতের
আদিত্য
কনসাল্টেন্ট

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত, বিপ্লব উপাদানে প্রস্তুত



চ্যবনপ্রাশ শ্রুত ও পুরাতন সদ্ধি কাশি,
শ্বাস ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্বল্য ও ক্লান্ত দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর

সাম্প্রদায়িক বন্দনতী

জীবন। কিন্তু এই বইয়ের জীবনের
মাইরেও আরেকটা করুণা গোপন জীবন
স্বয়ংছে ওর।

চা খেতে খেতে সেই আগের মতই
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অজয়।
চোখে শ্রদ্ধা আর ভাগবাসা মিলে
অপূর্ব এক আরেশ। যেন চোখের
পলক ফেলেও কৃষ্ণকলিকে হারাতে ইচ্ছে
করে না।

কৃষ্ণকলিই বলে, কি দেখছেন অমন
করে।

চাপা, একটা বোবা বেদনায় অজয়
শুধু বলে, তোমাকে। হয়ত একথাটা
চিৎকার করে বললে, বুকের জ্বালা
অনেক কমত। কিন্তু বুকের দ্বন্দ্ব কি
কখনও চিৎকার করে বলা যায়?

অজয়ের কথা শুনে কৃষ্ণকলি স্নান
হাসি হাসে। ওর গলার কাটা দাগটা
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অজয়ের
কাছে। এক সময় ভেতরে চলে যায়
কৃষ্ণকলি। একটু পরেই হাসতে
হাসতে ঘরে ঢোকে।

পূর্বমুহুর্তের বিবাদ করুণ কৃষ্ণ-
কলি যেন আর নেই। ছোট ভাইপোটাকে
চুমু খেয়ে আদর করতে, করতে বলে
এরাই আমার সঙ্গী। ভেতর থেকে
ওর বাবার গলা শোনা যায়।

যাই বাবা, বলে কৃষ্ণকলি আবার
ভেতরে চলে যায়।

এসে হেসে বলে, বাবার মকস্‌সদ্বজ।
আমি না দিলে বাবা খেতে পারে না।
অজয় তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।
কৃষ্ণকলি বলে, কৈ কথা বলুন। চুপ-
চাপ ভাল লাগে না।

অন্য সময় হলে চুপ থাকাটা
অজয়েরই ভাল লাগত না। কিন্তু এখন
যেন সমস্ত কথাকে অনুভূতির বিন্দু
করে বুকের মধ্যে চুপ করে সজিয়ে
রাখতে ইচ্ছে করছে। যেন কথা বললেই
অনুভূতির সমস্ত বিন্দুগুলো জল হয়ে
সরে পড়বে।

সমস্ত সংসারটা কৃষ্ণকলিই চালায়।
ভায়েরা পড়াশোনা করছে। বোনদের
বিয়ের চিন্তা করে। মাঝে মাঝে শুধু
নিজের মনে গান গায়। বলে, গান
মইতে পারি বলে এখনও বেঁচে আছি
অজয়দা।

অজয়ের ইচ্ছে করে একটা গান
শোনে, সেই গানটা, 'আমি মারের সাগর
পাড়ি দেব' কিন্তু শুনতে চাইলেও,
ফলতে পারে না। লোকজন এসে
ধাঁড়িয়েছে, সবার চোখে করুণায় দৃষ্টি।
সবাই জানতে চায় কি করে পা-টা

গেল? নতুন করে মনে হয় সমস্ত
পৃথিবী যেন ওকে করুণা করছে।
কৃষ্ণকলিও তাকিয়ে দেখে কাটা পা-
টাকে। এখন আর পাটাকে ঢেকে
রাখতে ইচ্ছে করছিল না কৃষ্ণকলির
সামনে। অজয়ের ইচ্ছে করছিল, চিৎকার
করে ওকে বলে, দোহাই তোমার, আর
যেই করুক। তুমি অন্তত করুণা
কোর না। আমাকে সাহস দাও। জানো
কৃষ্ণকলি, পৃথিবীর কাছে মার খেতে
খেতে বড় ভীত হয়ে গেছি। কিন্তু
আশ্চর্য হয়ে গেছি তোমার সাহস দেখে,
তুমি কি অনুভূতভাবে পাশ্চাৎ লড়ছ
পৃথিবীর সঙ্গে।

দ্রাস্তা পর্বত এগিয়ে দিতে এসে-
ছিল কৃষ্ণকলি। অজয়ের সাথে আসার
সময়ে বাড়ি থেকে ছোট বোন এসে
বলছিল, দিদি বাবা ডাকছিল তোকে,
কৃষ্ণকলি স্নান হাসি হেসে বলল, ভয়
নেই যাচ্ছি। কোথাও। ওকে একটু
এগিয়ে দিয়ে এখনি চলে আসব।
অজয় রুদ্ধ হয়ে পেরেছিল ওর বাবা
খুশি নয় অজয় আসতে। হয়ত
মনের মধ্যে ভয় যদি কোন দিন কৃষ্ণকলি
দুর্বল হয়ে পড়ে!

কাকিরভরা রাস্তায় কষ্ট হাচ্ছিল
অজয়ের। ক্রাচটা মাঝেমাঝে পিছলে
যাচ্ছিল। পাশাপাশি দুজনই হাঁটিছে।
পথে যেতে যেতে লোকজন সবাই
তাকিয়ে দেখছে ওকে। সক্ষম মেয়ে
আর অক্ষম পুরুষকে জড়িয়ে হয়ত
কৌতুককর অনুভূত একটা কল্পনা কারো
মনে মনে চলছে। সামনে খুঁটানদের
বড় গাঁজাটা। আকাশ স্পর্শ করে
আকাশের চেয়েও বড় হয়ে ক্রশ্চিহটা
দাঁড়িয়ে আছে। এদিকটা একটু নির্জন।
একটা বিষণ্ণ কাক ডাকতে ডাকতে
কোথায় যেন দূরে মিলিয়ে গেল। ধূসর
ছায়া হয়ে সন্ধ্যা নামছে। দূরের গ্রাম
লাইন থেকে গ্রামের চাকার শব্দ খানিকটা
শোনা গেল। আবার চুপ!

দুজনই হাঁটিছে। অথচ কেউ কোন
কথা বলতে পারছে না। সব কথা
হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন অসহায়
হয়ে কথা হাতড়ে বেড়ায়, দুজনেরই
মনের তখন তেমনি অবস্থা বোধহয়।

অজয় ভাবছিল, বাড়িতে হয়ত
কৃষ্ণকলির জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।
ওর বাবা ওষুধের কথা বলবে। বোনরা
আশ্বাস করবে শাড়ি, ব্লাউজের জন্য।
সংসারের কত দায়-দাবি নিঃশব্দে
হাসিমুখে মেয়েটা মোটায়। অথচ—

কৃষ্ণকলির করুণ কোমল মুখখানা মনে
পড়ল অজয়ের।

আর সেই মুহুর্তে ক্রাচটা ছিটকে
অজয় পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। কৃষ্ণ-
কলি এগিয়ে এসেছিল ক্রাচটা তুলে
দিয়ে ওকে ধরতে। অজয় বলল, তুমি
ছেড়ে দাও, আমি একাই উঠতে পারব।
যেন এই একা ওঠার শিক্ষাটা ও
কৃষ্ণকলির কাছ থেকেই পেয়েছে।

ধীরে ধীরে কোনরকমে উঠে
দাঁড়াল অজয়। লেগেছে। লাগুক।
তাকিয়ে দেখে কৃষ্ণকলি পাশে দাঁড়িয়ে
আছে। হঠাৎ অজয়ের মনে হল, একা
অনেকটা পথ ওকে যেতে হবে, এই-
ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভিড়ের
সঙ্গে যুদ্ধ করে। তার পর আবার
সেই অশ্রুকার ধর। আর সেই অশ্রুকার
ধরে মুখোমুখি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ।
প্রতিদিন এইভাবে সে ক্ষতিবিক্ষত হয়।
ইচ্ছে করছিল কৃষ্ণকলিকে বলে, চলো
তুমি আমার সঙ্গে, একা আমি অল্প
যেতে পারবো না। চারদিকের ভিড়,
নিষ্ঠুরতা আমাকে মেরে ফেলে দেবে।
কথাগুলো মনে মনে ভেবে নিজেই
লজ্জা পেল অজয়, যেন একটি হাসির
স্বপ্নের কথা সে ভাবছিল এতক্ষণ।
হয়ত কৃষ্ণকলিই এসব কথা শুনলে
এখন হাসবে। শিশুর মত অসহায়
হয়ে তাকায় কৃষ্ণকলির দিকে। কৃষ্ণ-
কলি মুখ নিচু করে কি যেন ভাবতে
ভাবতে যাচ্ছে।

হঠাৎ দূর থেকে আবার ডাক ভেসে
এল। কৃষ্ণকলির ছোট বোন ডাকছে।
দিদি...এই দিদি... বাবা ডাকছে।
চমক ভাঙল যেন কৃষ্ণকলির। করুণ
চোখে তাকাল অজয়ের দিকে। স্নান
হাসি হেসে বলল, ডাকছে। এদের জন্য
আমায় কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।
অজয় বলল, তুমি এসো। এই
তো গ্রাম রাস্তা। যেতে পারব।

অজয়ের মনে হাচ্ছিল ওর পা-
কাটা। পঙ্গু। কিন্তু কৃষ্ণকলি যে পা-
থেকেও পঙ্গু। ওর বুকের মধ্যে
অনুভূত একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে
উঠছিল নিষ্ঠুরভাবে।

কৃষ্ণকলির ছবিটা দূরে দেখা যাচ্ছে।
ছোট বোন দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে
ক্রাচ হাতে অজয়।

৬৭ ৬৮...খণ্টা পড়ছিল গাঁজার।
ঘণ্টার শব্দ আর কৃষ্ণকলির পায়ের
শব্দ যেন এক হয়ে গেছে।

অজয়ের মনে হাচ্ছিল, এই শব্দকে
বুকে নিয়ে আরও অনেকটা পথ সে
ক্রাচ ভর দিয়েই হাঁটিতে পারবে।

মহাকবিবল্লভসংগীত

প্রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাংলার ঘরে ঘরে পুজিত যুগপদ্রুম
যতীন্দ্রনাথ।

কাবানুষ্ঠিত পর থেকে গোটা দেশে তিনি
যখন ঘরে বেড়াচ্ছেন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে—
জেলায় জেলার প্রতিটি ঘরে তখন তাঁর
আসন পাড়া। মাইলের পর্ব-মাইল সাইকেলে
অথবা ঘোড়ার পিঠে কবে তিনি বিপ্লব
সংঘটনের জন্যে ঘুরছেন; দিনের শেষে
অনেক রাতে কৌনিদিন বা আশ্রয় নিয়েছেন
সামনেই যে-গৃহস্থ বাড়ি চোখে পড়েছে,
সেখানে : দেখেছেন, প্রায় দিনই, তিনি
আসবেন এই প্রতীক্ষাতেই। বুদ্ধি গহকরী
কিছু মিষ্টি আর এক জামবাটি দুধ অন্তত
রেখে দিয়েছেন। দুধ যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত
প্রিয়।

আন্তরিক এই অভ্যর্থনাব উপায়ে রাতে
কবেক ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর
হবাব আগেই অশ্রুকাব থাকতে পাড়ি
দিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ, কেউ টেব পায় নি।
আজ রাতে পাংশা, পরদিন রাতে বগুড়া,
তাব পরদিন রাতে হুগুড়া বা হরিনারায়ণপুর
নষতো দৌলতপুরে কাটছে যতীন্দ্রনাথের।

এইভাবেই ভারতের মহান বিপ্লবী নেতা
মহাবিপ্লবের বঙ্গ-অনলকে উদ্দীপিত করে
ভুলতে লাগলেন সুপ্ত জাতির জাগরণ-
ক্ষমাব।

এমনি একদিন—

বাংলাব এক পল্লী অঞ্চল দিয়ে যতীন্দ্র-
নাথ চলেছেন সাইকেলে। সঙ্গে আছেন
পূর্ববংগব বিখ্যাত এক নেতা।

পথের ধারে এক বাড়ি হঠাৎ হাত নেড়ে
নেড়ে তাঁদের ডাকছে, যতীন্দ্রনাথের চোখে
পড়ল।

“আমতো, দেখি, বাড়ি-মা কি বলতে
চায়,” যতীন্দ্রনাথ তাঁব সংগীকে ডেকে নিয়ে
গেলেন বাড়ির কাছে। সাইকেল থেকে নেমে
বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মিষ্টি
গলাব প্রশ্ন করলেন, “কি বাড়ি-মা, আমার
ডাকছে কেন?”

“বাবা, তোকে আমি প্রায়ই এ-পথে

আসতে-যেতে দেখি,” একটু থেমে বাড়ি
বলে। “ভানি ভাল লাগে তোকে দেখে।
শুনোছি, তুই নাকি আমাদের দুঃখ মিটিয়ে
দিবি বলে সাযেবদেব সঙ্গে মারপিট কবেছিস?
ওরা তোকে আটকে রেখে দিবেছিল খানায়,
কিন্তু তোকে কৌশলিন ধরে বাখতে পাবে
নি? পাববে কি? আমবের সবার
আশীষাদ কি মিথ্যে ক’বে দেবেন তিনি—”

বাড়ির চেহারায় অপূর্ব এক দীপ্তি
দেখে বিস্মিত হ’লেন যতীন্দ্রনাথ। নীববে
তিনি শূন্যতে থাকেন বাড়ির কথা। এক-
নাগড়ে বাড়ি বকে চলে, “দেখিস বাবা,
আমার মন বলছে তুই পারবি, তুই পারবি।
তাঁর আশীষাদে তোকে কেউ ধরে রাখতে
পারবে না।”

সংগী চঞ্চল হ’য়ে উঠেছেন। দেবি হ’য়ে
যাচ্ছে।

বাড়ি বলে, “আমার অনেক দিনেব সাধ
বাবা,” কেমন যেন ইতস্তত করে সে থেমে
যাব।

“বল না, মা?” যতীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন।

“আমার অনেক দিনের স্নেহ তোমার
ডেবে কিছু খেতে দিই। কিন্তু আমি
মোচলমান, তার ওপর গরীব। খাবে কি
তুমি আমাব হাতে—”

“খাব না মানে?” অটুহাসে মৃদু হন
যতীন্দ্রনাথ, “তুমি আমার জাত মাত্রতে পাববে?
আমাব যে জাতই নেই! আমি তোমাবই
ছেলে—”

বিবাক্ষিতে অবজ্ঞাব কুণ্ঠিত সংগীর মৃদু-
মন্ডল দেখে যতীন্দ্রনাথ বাড়িকে পথ দেখাতে
বলে তার পেছন পেছন চললেন সংগীকে
নিয়ে। এবং অনুরক্তে বললেন, “কিরে,
গরীব, নোংরা, মোছলমান—খুব বুদ্ধি যেমা
তোর?”

“না দাদা, দেখছেন না কী নোংরা? ওর
হাতে খেতে পাববেন আপনি?” সংগী বাধা
দেন।

যতীন্দ্রনাথের চোখ-মুখে যেন বিদ্যুৎ
চমকে উঠল। চাপা গলাব তিনি সংগীকে
বললেন সমাহিত শান্তভাবে, “পারব না?
এই কি প্রথম এ রকম খাব নাকি? আমাদের

এই তো সাধনা বে! জাত-বৈজাত নিয়ে কি
আমাদের আর বাছ-বিচার রাখা সাজে?...
জাতটা কী, ভেবে দেখেছিস? স্বার্থপর
মানুষের সুবিধার্থে একটা সম্বন্ধীপতা ছাড়া
তো আব কিছুই নয়!.....”

অপ্রতিভ সংগীব পিঠে হাত বাখলেন
যতীন্দ্রনাথ। সন্নেহে বললেন, “আমি জাতও
মানি না, তোদের ওই সমাজপতিদেরও
তোমার রাখি না; কুসংস্কারে ছেবে গিয়েছে
এই সমাজ। নতুন সমাজ গড়ে ওঠবাব দিন
এসেছে। দিন এসেছে প্রতিটি মানুষকে
তার ন্যায্য অধিকাব দিবে সাদবে পাশে এনে
বসানোর।”

সংগীটি মাথা হেঁট করে চললেন
যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

পরম তৃপ্তভরে বাড়ির কুটির বসে
যতীন্দ্রনাথ, আর তাঁব সংগীও খেলেন দুধ
চিড়ে গুড় আর পাকা কলা দিয়ে ফলার।

বাওমা হ’য়ে গেলে পরিতৃপ্ত বাড়ি
নিমন্ত্রণ জানিবে রাখল, “বাবা, এ-পথে তুই
যখন আসবি, আমাব ঘরে তোর আসা চাই।
যা থাকবে খেবে যাবি!... ”

বাওয়ার পথে বাড়ি এমন মমত্ববোধ নিয়ে
যতীন্দ্রনাথের দিকে তাকিবে রইল, দেখে
সংগীটি মনে মনে ভাবলেন : এই না হলে
নেতা?

আরো একদিন।

অনেক রাত। বিনাইদাষ ফিবছেন
যতীন্দ্রনাথ। শহব থেকে কয়েক মাইল দূরে
এক গ্রাম দিয়ে যেতে যেতে তাঁর কানে এল
বালক-কণ্ঠের তাঁর আত্নাদ। ফাঁকা মাঠের
মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো এক-আখটা কুটির।
গ্রামেব শেষ প্রান্ত। লোকালয প্রায় নেই
বললেই চলে।

আত্নাদ লক্ষ্য করে তিনি গিয়ে
ধামলেন একটি কুটিরের সামনে। দারুণ
বন্দনার একটা ছেলে ককিরে কাঁদছে
অস্পষ্ট আলোর যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল।

বিনা বিশ্বায় যতীন্দ্রনাথ ভিতবে ঢুকে
পড়লেন। ছেলোট মাটিব ওপর কবলে শয়ে
ছটকট করছে। আর অসহ্য সেই দুশোর

সাপ্তাহিক বসুন্ধরী

পাশে অসহায় এক প্রৌঢ় নতমস্তকে বসে
অগ্রসোচন করছেন। ছেলোটর বাবা বোধহয়।
যতীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, কী
কথা পার।

ছেলোটর বাবা তাঁর শোচনীয় দারিদ্র্যের
কাহিনী শোনালেন তাঁকে। কিছুদিন বাবু
ছেলে পেটের ব্যথা ভুগছে। কিন্তু কোনও
চিকিৎসার সংগতি তাঁর নেই। প্রচুর দেনা।
কে চিকিৎসা করবে?

ছেলোটকে যতীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে
দেখলেন। চিকিৎসা ও শূদ্রের সঙ্গে তাঁর
আবল্য পরিচয়। দুঃস্থের সেবা করে
সুফলও পান যথেষ্ট।

সন্ন্যাসী ছেলোটর শূদ্র চলা অক্লান্ত-
ভবে।

ভোর হল। ছেলোটর বাবার অনুমতি
নিরে যতীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন
ঝিনাইদার, নিজের বাড়িতে। ভাল ভাতার
ডেকে তাঁর চিকিৎসা করালেন। ওষুধ-পথের
ব্যবস্থা করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলোট
সেরে উঠল।

দিদি বিনোদবালা এবং স্ত্রী ইন্দুবালার
ইচ্ছাক্রমে ছেলোট যতীন্দ্রনাথের কাছেই রইল।
ঘরের ছেলের মতো মানুষ হতে লাগল। তাঁর
বিদ্যাশিক্ষা, খাওয়া-পরা, সব ভাবই যতীন্দ্র-
নাথ গ্রহণ করলেন। কোনও ছুটি রইল না।

আজ তিনি বিশিষ্ট একজন নাগরিক।

এরানি তো কত অজানা-কই তিনি
পেরেছেন জীবনে প্রাতিষ্ঠান সুযোগ, কত শত
জনহার ছেলে-মেয়েকে নিজের খরচে নিজের
তত্ত্বাবধানে স্নেহে ভালবাসার স্বরে মানুষ
করে তুলছেন। পরকে তিনি যেমন ঘরে
ঠেনে আনতে সক্ষম ছিলেন, তেমনি বিস্বজন
দুর্ভাগ্যেই তো ছিল তাঁর হৃদয়।

সৌভাগ্যক্রমে যতীন্দ্রনাথের স্নেহময়
অনেক ছাত্র-ছাত্রীই আজ কৃতি হয়ে দেশের
মুখ উজ্জ্বল করছেন।

কৃতজ্ঞতা-পরবশ অথবা সম্মান-বশত কেউ
হয়তো যতীন্দ্রনাথকে কোনও মূল্যবান উপহার
এনে দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাস্পা-
কুল হয়ে উঠেছে : হ্যাঁ, যে-দেশে লোকে
অনাহারে অথবা লাঞ্ছনায় পীড়িত, মৃতপ্রায়,
সে-দেশে কি এই বিলাসিতা আমাদের সাজে ?
এই পরসাতা তুই যদি কোনও গরীবকে
দিতিস, তবে পরসাতা সত্যিই সম্ভাব্য
হয়েছে বুদ্ধতাম।

কত সময় এমন উপহার যতীন্দ্রনাথ দীন-
হৃদয় নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন সবার দৃষ্টির
অগোচরে।

আত্মব, দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, সকলেরই
দুঃখ বিচলিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে
গিয়েছেন তাঁর সাহায্য করতে। দুঃখ-নিরোধের
এমন রাস্তা তিনি ছিলেন সর্বদাই কৃতসঙ্কল্প
প্রণয়ী।

ঝিনাইদার যতীন্দ্রনাথ জন্ম অবধি
১৯০২-১৯১০

তাঁর চোখে পড়ল—পথে পথে একটা
পাগল ঘুরে বেড়ায় আর তাঁর পেছনে লেগে
লোকে মজা লাগে। পাগলের দুঃশয়
ব্যাকুল হয়ে তিনি রাস্তার ঘূটে যান।
পাগলকে ধরে নিয়ে আসেন বাড়িতে।

তাকে ভাল করে স্নান করিয়ে খাইয়ে
ছোট্ট একটা ঘরে বসে করে রেখে দিলেন
তিনি। নিঃশব্দে তাঁর সেবা-যত্নের ব্যবস্থা
করলেন নিজে হাতে।

কিছুদিন কেটে গেল এইভাবে।

প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে যতীন্দ্রনাথের
প্রথম কাজ হল পাগলটাকে ভাল করে
কবিরাজী তেল মাখিয়ে সুগন্ধি সাবান
দিয়ে স্নান করানো। ধবধবে পরিষ্কার
জামা-কাপড় পরিয়ে স্বচ্ছ বসে তাকে
খাওয়ানো।

দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই সুফল
দর্শলো। বস্তু উন্নাদ ও মেনে নিল যতীন্দ্র-
নাথের স্নেহের বশ্যতা। দেখা গেল, সে
দ্রাব্য সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। চলায়
বলায় সব বিকারই প্রায় কেটে গিয়েছে।

কাহিনীর সূচনায় করাঘাতের যে পাগল
বুড়ো পালের কথা বলছি, সেও ছিল যতীন্দ্র-
নাথের স্নেহের বশ। তাঁর চেষ্টায় সে বছরের
অনেকটা সময় সুস্থ থাকত; কয়েক মাস
মাত্র বিকৃতি দেখা যেত।

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে যতীন্দ্রনাথ
সহকারী বা বর্ষদের নিয়ে দাবা খেলতে
বসেন। দাবা খেলতে তিনি খুবই
ভালবাসেন।

কোন কোন শিল্প রসিকতা করে বলেন :
দাদার দাবা খেলা হচ্ছে আসন্ন অভ্যুত্থানের
পরিচয়সূচী। রাজা, মন্ত্রী, নৌকা,
ঘোড়া—সবকিছুই দাদার মনে বিশেষ বিশেষ
অর্থের প্রতীক।

এরানি একদিন দাবা খেলতে বসে
অত্যন্ত বেপরোয়া চাল দিচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ
একের পর এক। আড়াই চাল চলে প্রতি-
পক্ষের ঘোড়া প্রায় মাং করল বলে—
একজন অনাগামী আবধাকতে না-পেরে
চৌচিরে উঠল, “দাদা, দেখছেন না আপনি?
সর্বনাশ হয়ে গেল যে—”

যতীন্দ্রনাথের নির্বিচল আনন্দে স্মিত-
হাস্য ফুটে উঠল। তা লক্ষ্য করে শিল্পিটির
মন সঙ্কোচে ভরে গেল। যতীন্দ্রনাথ যেন
নীচব হারিয়ে তাকে তিরস্কার করলেন : অত
উতলা হলে কি চসে রে?

শিল্পিটি মনে পড়ে গেল যতীন্দ্রনাথের
সজাগ দৃষ্টি একটি কাহিনী।*

যতীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। ফেরাজ
মিঞার কাছে অশিক্ষা করছেন। ...কৃষ্ণগর
অঞ্চলে সে-কালে লাঠিয়ালদের অধ্য এক

কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তার নামই ছিল
‘ডাকাতে-খেলা’। বিশ-পাঁচশ জন দক্ষ
লাঠিয়াল যত্নে রচনা করে একটা নির্দিষ্ট
কোনও জিনিস রক্ষার ভার নেবে, আব বুঝ
ভেদ করে সেই জিনিসটা শিক্ষার্থী ছিনিয়ে
আনবে অতগুলো লাঠি ভেদ করে। শিক্ষার্থীর
লাঠির জের অতখানি যেদিন হবে, সেদিনই
তাকে অন্যান্য লাঠিয়ালেরা ওস্তাদেব পদ-
যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেবে।

ওস্তাদ লাঠিয়ালদেব একদিন আসব
বসেছে।

লাঠিয়ালরা সকলেই ফেরাজকে বেশ
খাতিব করে গুদী বসে। মিঞাব সাববেদ
কিশোর যতীন্দ্রনাথ সেই আসরে গৌ ধরে
বসলেন—তিনিও ডাকাতে খেলায় যোগ
দেবেন, বুঝ ভেদ করে ওস্তাদদের বাজি
জিতে আসবেন।

ফেরাজ কিছুতেই বাজী হয় না। বলে :
অতগুলো দড় লেটেলদের সঙ্গে তুমি পারবে
কেন দোস্ত? আর একটু বড় হও, তারপর
তুমিও খেলবে।

অন্যান্য সর্দার সকলেই সার, দেয় : দাদা-
বাবু, তুই বাবুনেব ছেলে; অস্ত হাতে পড়লে
আমাদের জ্ঞানগম্য লোপ পেবে মাঝ-পেঁপে
পর্যন্ত বাবুনেব রক্ত পাত করে আমাদের
কেন তুই পাগের ভাগী করবি বল? তা
ছাড়া বড়বাবুর কানে কথাটা গেলে তিনি
আমাদের আস্ত রাখবেন?

বিপদকে যতীন্দ্রনাথ ভয় পান নি কোন-
দিন। জননীর কাছে তো এই শিক্ষাটিই
তিনি সর্বপ্রথম পান।

তাই অভ্যাসভরে কিশোর যতীন্দ্রনাথ
জবাব দেন : ভবে সর্দার এতদিন তুমি আমার
শেখালে কী, এটুকু সামথাই যদি আমার
না হয়ে থাকে?

অবশেষে ফেরাজ রাজী হ'ল।

শিষ্যের পরীক্ষা আবশ্যিক হ'ল। বুঝ
ঠেঁবি। পেশাবহুল নবনবক লাঠিয়ালেরা
মুঠো মুঠো মাটি মেখে রক্ত চুল দুলিয়ে
রুখে দাঁড়াল লাঠি বাগিয়ে। লৌহমানবের
মতো এক-একজনের চেহারা।

ধীব-গম্ভীর কিশোর যতীন্দ্রনাথ মাল-
কোঁচা মেরে লাঠি-হাতে এগিয়ে এলেন।
সুদাম বলিষ্ঠ ভেজোমস দেহ। সুপুষ্ট
পেশাবহুল আবেগে ইব্ব চঞ্চল। কীণ
কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহগ্রীবা। সাবদেহে
পেরুয়েব দস্ত ভগ্নী, অপবপ লাভ্য এবং
অজস্র শক্তির যেন গগণা-বমনা সংগম। প্রশস্ত
ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। দুটি
ডাগব চোখ রঞ্জিত হয়েছে অশনি-
দীপ্তিতে। ...*

* যতীন্দ্রনাথের জৈনিক জীবনীকার,
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা
অবলম্বনে ॥ পৃথিবীন্দ্রনাথ ॥

* পরে এটি বৈষ্ণবের বলি গ্রন্থের ২১
পৃষ্ঠার স্থান পায় ॥ পৃথিবীন্দ্রনাথ

সাম্প্রতিক বঙ্গমত:

গর্বে উত্তেজনা ফেরাজ তার সাক্ষেপে দেয় দিকে চেয়ে থাকে। নির্ভীক পদক্ষেপ। সঙ্কপ-কঠোর মুখশ্রী। দেখে চমৎকৃত হয় অসহৃদুব অন্তর। ফেরাজ চেঁচিয়ে ওঠে : সাবাস, সাক্ষেপ।

যুহুমুখে পৌঁছনো-মাত্র দমাদম লাঠি পড়তে থাকে যতীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে। কিন্তু, সব চোট ঠেকিয়েই শূন্য লাঠি ঘূর্ণিয়ে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেন বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিমুখে।

নির্দিষ্ট বাজির জিনিসটা ছোঁ মুখে তুলে নিয়ে চোখের পলকে লাঠি ঘূর্বোতে ঘুরোতে অক্ষত দেহে বেঁচিয়ে এলেন লৌহ-ভীমের মতোই দৃঢ়কাষ কিণার বীর।

বিজয়ী যতীন্দ্রনাথকে বুকে টেনে নিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সর্দার ফেরাজ মিঞা।

“সাবাস সর্দার।”

মুখ লাঠিরালেবা হুঙ্কার ছাড়। লাঠি নামিয়ে কাঁধে তুলে নেয় তারা যতীন্দ্রনাথকে। অকুণ্ঠ প্রশংসার স্রোত ধবে তাবা ফেরাজ মিঞাকে।

দাবার চালে কিস্তি মাং কবে মৃদু হাসলেন যতীন্দ্রনাথ। “শিষ্যটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, “কিবে, হুখে?”

সম্বোধে আবাব আবস্ত হ'য়ে উঠল শিষ্যের মুখ। যতীন্দ্রনাথ তার পিঠে হাত রেখে আহ্বান জানান, “নে, বসে যা তুইও।”

নতুন কবে চাল শুরু হয়।

■ আট ■

১৯০৯ সালে বাংলা দেশ থেকে যে-কবজন বিপ্লবীকে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশান অনুযায়ী দেশান্তরী করলেন ভারত সরকার, পদূলিন দাস তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

জে, এন, ব্যানার্জী ও বারীন ঘোষের সঙ্গে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের অমিল যখন ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্ফুট হ'য়ে ওঠে কলকাতায় একত্রে কাজ করবার প্রচেষ্টায়, শ্রীঅরবিন্দ তখন স্বাভাবিক এ'দের মিটমাট করে দিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা টিকল না। অথচ আদি অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র জে, এন, ব্যানার্জী এবং বাবীন ঘোষ দু'জনেই তখনও অটল রয়েছেন, যদিও আলাদাভাবে দু'জনেই নিজের নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজে হাত দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাবীন ও জে, এন, ব্যানার্জীর মনোমালিন্য যখন প্রকট হ'য়ে উঠল, হতাশ হ'য়ে জে, এন, ব্যানার্জী তখন বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বাবীনবাবু আবার কিছদিন অনুশীলনের ব্যাঙ্কতে যাতায়াত করে —পরে মাণিকতলা বাগানে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

এই পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ১৯০৮ সালে ঢাকায় যান বিপিনচন্দ্র

পাল ও তারকনাথ দাসকে নিয়ে; এবং তখনই তিনি ঢাকায় অনুশীলন সমিতির একটা শাখা প্রতিষ্ঠা করে আসেন। পদূলিন দাস এই শাখার প্রাথমিক হ'য়ে ওঠেন। এই শাখায় শরীর চর্চা, কুস্তি, লঠিখেলা প্রভৃতির ওপর বেশি ঝোক দেওয়া হয়; ফলে শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্তিত চরমপন্থী বিপ্লবের কর্মসূচী থেকে এ'রা খানিকটা সরে গেলেন, এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে সর্কেন্দ্রিক হ'য়ে উঠলেন।

সর্কেন্দ্রিক হবার বিশেষ একটি কারণ ছিল। পূর্ব বাংলায় ১৯০৫ সাল থেকেই বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি এবং ময়মনসিং-এর সুহৃদ সন্মিত ও সাধন-সমাজ সক্রিয় ছিল। লাঠিখেলা প্রভৃতি ছাড়াও স্বদেশী ও বরকট আন্দোলন সম্পর্কে এই সমিতিগুলির অবদান তখন অসম্ভাব্য জন-প্রিয়ত অর্জন করে। পরে ১৯০৮ সালের শেষে সমিতিগুলি বেআইনী হ'ব যখন, ধর-পাকড়ের ধূম পড়ে যায়—এই পূর্বনো সমিতিগুলি তখন গুপ্ত-সমিতির কাজেই বিশেষ জোব দেয়। তখন বরিশালে সতীশ মুখার্জী (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) এবং ময়মনসিং-এ হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

ইতিমধ্যে যখন ওইসব জাবগার ঢাকা থেকে গিয়ে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে, স্বতঃই স্থানীয় এই সমিতিগুলির পক্ষ থেকে অনুশীলনের কর্মসূচী বাধাপ্রাপ্ত হ'ন। কলকাতার মূল অনুশীলন বিকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু ঢাকায় পদূলিন দাস গোড়া থেকেই অনুশীলনকে centralised party রূপে গড়ে তুলতে চান। তার ওপরে অন্য সমিতিগুলির সঙ্গে স্বদেশের চাপে ঢাকা অনুশীলন পুরো-পূরিই সর্কেন্দ্রিক অথবা আকেন্দ্রিক দলেব রূপ নেয়।

হেমেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিসর হয়, আগে বর্লোহি, স্বদেশী যুগের সূচনাতেই, কুস্তিগা এবং কলকাতার। আর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই যতীন্দ্রনাথ যখন কালী যান ১৯১১ সালে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এ'দের দলেব মধ্যে মেলামেশা শুরু হয় তারও দু-তিন বছর পরে।

চোদ্দমাস অন্তরীণ থাকবার পর পদূলিন দাস ১৯১০ সালে ছাড়া পেয়ে আবার ধরা পড়লেন ঢাকা ফকির মামলায়। আর এই সময় নাগাদ ব্যাকিস্টার প্রমথ মিত্র সম্মান্স রোগে মারা যান।

পদূলিনবাবুর নেতৃত্বে সর্কেন্দ্রিক ঢাকা অনুশীলন সমিতি পূর্ববংগের গুপ্ত-সমিতিগুলির সঙ্গে রেবারেবির ভাব নিয়ে কিছদিন চলবার পাবেই দেখা গেল তাঁদের প্রতি অনাস্থার ভাব প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছে পূর্ববংগের কর্মীদের মধ্যে। শোষণের

কলকাতায় গিয়ে তলায় তলায় যতীন্দ্রনাথের শিষ্যদের সঙ্গে, বিশেষত যতীন্দ্রনাথের তৎ-কালীন প্রধান কর্মসচিব অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে মিশতে থাকেন। এবং দেশে ফিরে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন সংগঠনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করে অন্যান্য কর্মীদের মনও তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। এবং যথাসময়ে তাঁরা জানতে পারেন যে, নেতাবাও প্রাক্তন সকলেই অল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোপনে সংযোগ বন্ধা করে কাজ করছেন। এইভাবেই ব্যাপক হ'য়ে উঠতে লাগল সংঘবন্ধ হ'য়ে কাজ করবার সঙ্কল্প—দেশের সর্বত্রই।

পদূলিনবাবুর পরবর্তী নেতাদের মধ্যে ঢাকা অনুশীলনে মাখন সেন ও নরেন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। মাখনবাবু ১৯১০-১১ সাল নাগাদ কলকাতায় চলে আসেন এবং উল্লেখ্য অফিসে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দ্বিপ্লবী দেবরত বসু) প্রভৃতির সঙ্গে মিশে ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে শ্রীবামকৃষ্ণ মিশ্রের আদর্শে উদ্ভব করবার একটা পরিচালনা খাড়া করেন। তাই নিয়ে ঢাকা অনুশীলনের ভিন্নমতাবলম্বী নেতা নরেন সেনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল কলহ চলে। এবং দু'দলের কয়েকজন কর্মী নিয়ে তিনি গুপ্ত রাজনীতির আওতা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এমন সময় অমবেশ চট্টোপাধ্যায় মাখন সেনকে প্রম-জীবী সমবাসে ঢুকিয়ে নিলেন। তৎকাল-ব্যুৎখর অধিবাসী ছিলেন মাখনবাবু। বধমানে বন্যাস সময় তাঁর সেবাকারের ব্যবস্থা দেখে অনেকেই খুব সন্তুষ্ট হ'ন।

১৯১১ সালে বাবাগসাঁব বিপ্লবকেন্দ্র থেকে তরুণ বিপ্লবী শচীন সান্যাল কলকাতায় এলেন। সে সময়ে কলকাতার ডাডাস হোস্টেলে বাবাগসাঁব দেবনাথবাবু 'মুখোপাধ্যায় (পরে রায়সাহেব) এবং খগেন বসু (পরে দিল্লীর খাতনামা চিকিৎসক) থাকতেন। এ'দের সঙ্গেই থাকতেন স্কটিশ চার্চের ছাত্র ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। কলকাতায় এসে শচীন সান্যাল যখন অরুণ কর্তে লাগলেন, “কিশীর দলেব নেতা সুবেশ মুখার্জী তো অবতার হ'য়েছে, আমায় তোরা অন্য কোনও দলেব সঙ্গে জুড়ে দে। অতুলবাবু এ'নিছ রাজনীতি ছেড়ে দিবেছেন। যা হোক একটা দলের সঙ্গে আমার ভিড়বে দে।”

দেবনাথবাবুদেব সন্দেহ ছিল—এবং সে-সন্দেহ অমূলক নয় যে, ভূপেন্দ্র দত্ত নিশ্চয়ই কোনও বিপ্লবী দলেব সঙ্গে জড়িত। তিনি ছিলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র এবং সেখানে অনুশীলনের সভাও হ'য়েছিল। ফরিদপুরেব অমৃত গুপ্ত আর তিনি তখনও ঢাকা অনুশীলনের কলকাতা-কেন্দ্রে যাতায়াত করছেন। দেবনাথবাবুদেব ভূপেনবাবুকে বললেন শচীন সান্যালেব একটা ব্যবস্থা করতে। ভূপেনবাবু ও অমৃতবাবু তখন মাখন সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে

শচীনবাবুকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। মাখন-
বাবু ও শচীনে ঝগড়া বেধে গেল আলোচনার
সূত্রে। শচীন রেগেমেগে উঠে পড়লেন;
ভূপেনবাবুদেরও অগত্যা উঠতে হল।

ঢাকাব শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরা
মাখনবাবুর কাছেই বসেছিলেন। শচীনবাবুরা
চলে যাবার পরে তিনি ভূপেনবাবুর হোস্টেলে
গিয়ে শচীনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

শশাঙ্ক (অমৃত হাজরা) ছিলেন অভ্যস্ত
মুদ্রাবদ্ধ। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। ঢাকা
অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গেই—
নবেন সেন, মাখন সেন, রবি সেন, প্রতুল
গান্ধলী, মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য,
ফ্রেন্সিস মহারাজ, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতির
সঙ্গে সংযোগ রেখে তিনি চলতেন। তার
বাইরেও, বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত কর্মী-
সমূহের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। যেমন
ধর্মপ্রবণ (মাখনবাবুর সঙ্গে তাই মিল)
তেমনি আবার ডাকাতিতে উৎসাহ। যতীন্দ্র-
নাথের শিষ্যদের মধ্যে অতুল ঘোষের সঙ্গেই
শশাঙ্কের খুব মেলামেশা ছিল। ভূপেন্দ্র
দত্তের কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিল।

শশাঙ্কের অনুবোধে ভূপেনবাবু, শচীন
মান্যলকে পরদিন নিয়ে গেলেন শশাঙ্কবাবুর
ঘাড়ুবাগান লেনের বাসায়। পরে শশাঙ্ক
শচীনকে নিয়ে যান নবেন সেনের কাছে।
যারাপসী দলের সঙ্গে ঢাকা অনুশীলনের এই
প্রথম সংস্পর্শ।

যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে, দল নির্বিশেষে
অতুল ঘোষ বাংলার বিভিন্ন জেলার এবং
বাংলার বাইরের কর্মীদেরও কলকাতার আশ্রয়
দিয়েছেন হিমাংশু মুদ্রী লেনে তাঁদের বিখ্যাত
বাড়িতে, নিজেদের অনুবিধা করেও।
সে-বাড়িতেও স্থান সংকুলান যখন হত না,
অতুলবাবু আট-দশজন করে কর্মী নিয়ে
গিয়ে তুলেছেন তাঁর ভবনীয়পতি অধ্যাপক
কে, পি বসুর বাড়িতেও; অতুলবাবুর দাঁড়ি
মেঘমালা দেবী হাসিমুখে তাঁদের সকলের
উপস্থিত আগ্রহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।
ঢাকা অনুশীলনের সভ্যরাও কোনদিন বিধা
করেন নি এই আতিথ্য গ্রহণ করতে।

ঢাকা অনুশীলনের নেতা ফ্রেন্সিস মহারাজ
(বিরজা হুসেনায়ে) এবং প্রতুল গান্ধলী
(হিমাংশু হুসেনায়ে) কলকাতার এসে অতুল
ঘোষেরই শরণ নিতেন। তাঁদেরই পীড়া-
পীড়িতে অতুল ঘোষ, 'শ্রমজীবী সমবায়'
যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা
করিয়ে দেন।

এই সাক্ষাৎকালে যতীন্দ্রনাথ তাঁর
পরিকল্পনার কথা বলেন এবং ভারত-
জার্মান যুদ্ধের আভাস এঁদের দেন।
আমন্ত্রণ জানান এই প্রচেষ্টার বোগ দিতে।

অনেকভাবে হতাশ হয়েও অতুল ঘোষ
যে ঢাকা অনুশীলন দলকে সাহায্য করতেন,
তার পিছনেও যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগীতার
প্রভাব অনুভব হত। কারণ, অতুল ঘোষ

সবকথা যখন যতীন্দ্রনাথকে খুলে বলতেন,
যতীন্দ্রনাথ হাসতেন। ক্ষমার সুরে বলতেন,
“ওসব ভুলে যেতে হয়।”

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার শেষে
অবশ্য প্রতুল গান্ধলী একদিন এসে যতীন্দ্র-
নাথকে বলে যান যে, বর্তমানে অনর্থক
তাঁদের দলের শক্তি অপচয় করতে তাঁরা
নারাজ।

ঢাকা অনুশীলনের নগেন দত্ত (কুমিল্লায়
বাড়ি, গিরিজাবাবু বলে দলে পরিচিত)
যারাপসী গিয়ে শচীনকে বলেন যে, জার্মান
সাহায্য নিয়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটা
বিশ্ববের অয়োজন চলছে—অথচ ঢাক দলের
নেতারা তাতে বোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।
শচীন সান্যাল তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে
কলকাতার এসে যতীন্দ্রনাথের জনৈক শিষ্যকে
দৃষ্টি করে বলেন, “তোমরা এতকড়ি কাজে
হাত দিয়েছ, অথচ আমদের ডাক নি? আমার
সম্পর্ক, তো তোমাদেরই সঙ্গে ছিল। কেন
অনর্থক ওই বাঙালির দলে আমার ভিড়িয়ে
দিয়েছ, জানি নে।”

যতীন্দ্রনাথের শিষ্যটির নাম ডাঃ বাদু-
গোপাল মুখার্জী। বাদুবাবু কথাটা গিয়ে
অতুল ঘোষকে বলেন। এবং দুজনে পরামর্শ
করে সিদ্ধ করেন শচীনকে কাশীতে রাস-
বিহারী বসুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। সেই
থেকে শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত (গিরিজা),
নলিনী মুখার্জী প্রভৃতি অনুশীলনের নেতৃ-
স্থানীয় কর্মজন রাসবিহারীর সঙ্গে কাজ
করতে থাকেন যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা
অনুযায়ী।

ইতিপূর্বে চন্দ্রনগরের মণীন্দ্র নারকে
(বোমাবিশাবদ) এর কাছে রাসবিহারী বসু
লোক পাঠান অতুল ঘোষকে contact
করতে। অতঃপর তখন রাসবিহারীর
দুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন; দত্ত
তাকে বলেন যে, তখনকার পরিস্থিতিতে
রাসবিহারীর পক্ষে বাংলা দেশে ফেরা বিশেষ
বিপজ্জনক—অথচ উত্তর ভারতের পরিকল্পনা
সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে রাসবিহারীর
আলোচনা করা নিতান্তই প্রয়োজন।

সব শূন্যে যতীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি নিজেই
যাবেন। এবং অতুল ঘোষ ও নবেন ভট্টা-
চার্যকে সঙ্গে নিয়ে আবার তিনি যারাপসী
গিয়েছিলেন। তখন বাংলা দেশ নিয়ে সমস্ত
উত্তর-ভারতের অভ্যুত্থানের একটা পরিকল্পনা
তাঁরা আলোচনা করেন যতীন্দ্রনাথের পূর্বনো
বন্ধু রাসবিহারীর সঙ্গে। উত্তর-ভারতের
সংগঠন ও সৈন্য-বিভাগের সঙ্গে সর্বোপেক্ষ
বিশেষ দায়িত্ব রাসবিহারীর উপরেই ন্যস্ত
থাকে।

বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় ভারতের সর্বত্রই
সম্মাসীরা এবং সম্মাসীবেশী বিশ্ববীররা উগ্র
বিরোধের ভাবধারা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।
সরকারি নথিপত্রেও এঁদের কার্যবলীর কিছু
কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ

এবং আরো কেউ কেউ নিরামিত রামকৃষ্ণ
মিশনে যেতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে দেবরত
বসু (প্রজ্ঞানন্দ) ও অন্যান্য কোন কোন
সাধুর সঙ্গে মিশতেন। যার ফলে সরকারি
মন্তব্য দেখি একটি ফাইলে :

“Jatin Mukherjee seems to be
a confirmed member of the Rama-
krishna Mission”

আপেক্ষেই বলছি, তারক দাস এবং অপর
লক্ষের বিদেশে যাবার আগে মাদ্রাজে সম্মাসীর
বেশে বিশ্ববের বাণী প্রচাৰ করেন গিয়ে।
পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বনামধন্য জে. এন. ব্যানার্জী
(স্বামী নিরালম্ব) তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত কববার
পরেও যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, নিখিলেশ্বর দাস
মৌলিক (‘মুগান্দর’ পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা
ও ‘ছাত্রতা ডার’-এর পরিচালক) স্বামী ভবানন্দ
নামে ও-অঞ্চলে গিয়ে বহু কর্মীকে উদ্ধৃত্ত
করেন। বোম্বাই ও নাসিক অঞ্চলে ছিলেন
যতীন্দ্রনাথের বন্ধু ও অনুগামী ভবভূষণ মিত্র
(স্বামী সত্যানন্দ) প্রভৃতি কর্মকর্তা। বাংলা
দেশে এই যুগের বিভিন্ন সময়ে যতীন্দ্রনাথের
বিশেষ অনুগামী সম্মাসীদের অন্যতম ছিলেন
যশোবের কালিদাস সম্মাসী এবং সাধক বাম-
শ্যাপার যোগ্য শিষ্য তারাশ্যাপা। এঁরা
সকলেই কোন না কোনও সময়ে বিরোধের
বীজ ছিড়িয়ে দিয়েছেন জাতির মনে।

সর্বোপরি, যতীন্দ্রনাথের গুরু স্বামী
ভোলানন্দ গিবি মহারাজের অবদানও এইসূত্রে
স্বয়ংসিদ্ধ। সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা
সম্ভব নয়; তার প্রয়োজনও নেই। এঁরা সকলেই
জাতির জীবনে এনে দিতে সাহায্য করেছেন
নতুন আলোর রশ্মি।

জুন মাস। ১৯১০ সাল।

প্রায় প্রতি বছরেরই মতো জল নামল
দামোদরের বুকে। প্রলয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে
কত না গ্রাম ভাসিয়ে দিল দামোদর। কত
মানুষ, গরু, মোষ, ছাগল ভেসে চলে দারুণ
বন্যায়। ভেসে গেল মাঠ মন্দির জনপদ।

বর্ধমান শহরও প্রলয়ের আবর্তে টলটলান-
মান। শত সহস্র বাস্তুহারা বিচলিত অসহায়
হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল।

এই বন্যার দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই
চাপের কাজে নামলেন। রেলওয়ে প্রাটেক্স
অবধি জলময়। ষে ষে করছে চারিধার। পূর্ব,
পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বাংলা, এমন-কি আসাম
থেকেও কর্মীরা এলেন। তা ছাড়া মারোয়ারী,
মাদ্রাজী, বিহারীর সংখ্যাও কম নয়।

সমস্ত গুপ্তসমিতি থেকেই স্বেচ্ছাসেবক
সংগৃহীত হল। যতীন্দ্রনাথও সদলবলে
অকুশলে গিয়ে পৌঁছিলেন সাহায্যের অর্থ,
খাদ্য, বস্ত্রাদির রসদ নিয়ে।

সর্বভারতীয় বিশ্ববী সংগঠনের কর্মীদের
এই অবস্থা মেলামেশার সুযোগ পূর্ণিলের চোখ
এড়াল না। কিন্তু যে অক্লান্ত নিষ্ঠা ও উদ্যম
নিয়ে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা আত্মত্যাগের রত

সাপ্তাহিক বঙ্গমন্ডল

মামুলেন, তা' দেখে পুঁলিশ কতৃপক্ষ পর্যন্ত মুগ্ধ হলেন। খুব ভালই রিপোর্ট পেশ করলেন এঁদের গ্রাফকার সঙ্গীতকে।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "১৯১০ খৃস্টাব্দে বর্ধমান ও কাঁথিতে বন্যা হয়। বন্যাপ্রাণীদের সেবায় জন্য তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। যতীন্দ্রনাথও আসেন।...এবার তাকে সামনে পেয়ে কর্মীরা খুব খুশি।...

স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর "বাঙালীর বল" গ্রন্থে লিখেছেন, "কন্যার যে তখন শূদ্ধ বাণীব্রহ্ম আনয়ন করিয়াছিল তাহা নহে—বঙ্গের প্রাণ সেই প্রাণে ভাসিয়া আসিয়া বাঙালীর স্বাবে স্বারে ফিরিয়াছিল—সেই উপপ্লব ভাবিতে বুদ্ধিতে ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে শিখাইয়াছিল : আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ—আমার পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ—আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ—আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ।"

ইংরেজদের মুখপত্র English men লিখল যে, ভারতবাসীরা সত্বস্বতার পরীক্ষা ইতিপূর্বে বিন কোনদিন হয়েও থাকে, এই বন্যা ও আতের-রোদন অবশ্যক বার তা' পরখ করে নিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা' অত্যন্ত আনন্দজনক। এঁদের মধ্যে আবাব বাঙালী, মারোয়ারী ও বিহারী স্বেচ্ছাসেবকেরা এক নবীন আলোকের নতুন প্রভাব সমুদ্ভাসিত হয়েছেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও সংসাহসের দৃঢ়তা সর্বদা স্মরণে থাকবে।

দিল্লী থেকে বড়লাট তার কবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানালেন : "বন্যাপীড়িত জেলাগুলির সুদূর গ্রামে পর্যন্ত গ্রামে বাক্সে ছাত্ররা যে সাহস ও সাহসুতার পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে মন আমার প্রচণ্ড ভরে গিয়েছে।"

টাইন হলেন জনসভায় বাংলার গভর্নর বললেন, "এঁদের কাব্যবিরণ আমরা সকলেই পড়েছি। এই ব্যাপারে বাঙালী যুবকদের স্বাধীনতা, কাব্যকুশলতা এবং সাহসের কথা সহজে ভুলব না।"

বন্যাপীড়িতদের সেবার আড়ালে সংগঠনের কাজ অত্যন্ত তরুণতাব সঙ্গো যতীন্দ্রনাথ এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন যে, বিপ্লবের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে বইল। ১৯১০ সালের এই বন্যা।

বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গো সাক্ষাতের একটি বিবরণ দিয়েছেন চন্দননগরের মতিলাল রায়। তাঁর জবানেই শোনাই যতীন্দ্রনাথের মর্মগীতি :

"...সে এক গভীর রাত্রিকাল। যখন স্বেচ্ছাসেবকেরা সকলে তন্দ্রাতুর, তখন আমার মনে রামপ্রসাদী সুরে একজনের কণ্ঠে মাতৃ-কন্দনার স্বরকব উঠিল। জ্যোৎস্নার চারিদিক ভাসিতেছে। তরুণপ্লব জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া অপরূপ কান্ডিতে স্বিকার্ম করিয়া বাতাসে

মোল খাইতেছে। কিছুদূরে রেলগাড়ির হুস-হুস শব্দ উদাত্তকণ্ঠে সপ্নাতের স্বরগা করিতেছিল।..."

অপূর্ব এই পরিবেশে যতীন্দ্রনাথের সাধক-কণ্ঠেব মাতৃবন্দনা সম্বন্ধে এর পর মতিলাল লিখেছেন, "কী আবেগকণ্ঠে কবিতা দিয়া তিনি গাহিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া সোদিন যাইবা শুনিয়াছেন, তাহারা ভিন্ন আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।..."

গায়কের দিকে আকৃষ্ট হলেন মতিলাল। তিনি লিখেছেন, "রাত্রি জাগরণেব অভ্যাস আমার ছিল। আকাশের চাঁদ দেখিতে দেখিতে আমি বিভোর হইতাম। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর আমায় বেন আহ্বান করিয়া গায়কের কাছে লইয়া চলিল। আমি ধীরে ধীরে গায়কের নিকটস্থ হইতেই কানে গেল—ভায়া যে! পরিচয় ছিল।...আজ তাহার চক্রে জলধারা করিতেছে। আমি বিশ্বস্বাধীন নেত্রে তাঁহার দিকে চাইতেই যতীন্দ্রনাথ আমার আলিঙ্গন কবিবা বলিলেন, 'আমার গাঙ্গা কি ভিজবে না?' সে মধুর কণ্ঠ আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। দেশমাতৃকার প্রেমে আনন্দে তাঁহার গাঙ্গা যে ভিজিয়াছে, সে প্রমাণ তাঁহার জীবনের ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট।..."

মুগ্ধ মতিলালবাবু আরো লিখেছেন, "তাঁহার কবিতার স্পর্শ পাইয়া আমি স্বাধীনতা-বাহির আশ্বাস অনুভব করিলাম। যতীন্দ্রনাথের সহিত আমার এই অস্তর-মিলনের মধুর দিনটি চিরদিনের জন্য আমার চিত্তপটে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

বালাব রাজনৈতিক যন্ত্রণা থেকে শ্রীঅরবিন্দ যখন বিহার নিয়ে পণ্ডিচেরী যান ১৯১০ সালে, তখন যতীন্দ্রনাথ কানাগারে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গো তাঁর তখন সাক্ষাৎ হয় নি। তারপর, সামসুল হত্যাকারী বাঁবেন দত্তগুপ্তের সঙ্গোই হাইকোর্টে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের যে অনুগামী, সেই সতীশ সন্ন্যাস পণ্ডিচেরী থেকে শ্রীঅরবিন্দের বাতী নিয়ে কলকাতায় ফেরেন ১৯১১ সালে এবং যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে উত্তর-প্রদেশ গিয়ে সৈন্য-বিতরণের সঙ্গো যোগস্থাপনের কাজে লিপ্ত হন।

ওদিকে চন্দননগরে মতিলালবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার প্রাক্কালে মতিলালবাবুকে নির্দেশ দিয়ে যান

বিপ্লবের মশালবাহী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করবার। মতিলাল লিখেছেন :

"...শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সংকেত দিয়া গিয়াছিলেন। আম-কাননে বসিয়া দুইজনে কত কথা হইল। শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-বৃণের বর্ণনা তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন।...তাঁহার প্রেম-বিহীন অধি-দুইটি পুনঃ-পুনঃ জলে ভবিল। তিনি দেশমাতৃকার মৃত্তিপথের কথাই শুনাইলেন।..."

১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলু-মঠে গিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ। সঙ্গো অতুল ঘোষ।

উৎসব শেষে যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় একটি তরুণ এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মূখে তাব মিষ্টি বিনীত হাসি।

"আরে মধু যে!" যতীন্দ্রনাথ তাকে সামরে জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে। অন্য হাত অতুল ঘোষের কাঁধে রেখে কুশল সংবাদ নিতে নিতে এগিয়ে চললেন যতীন্দ্রনাথ।

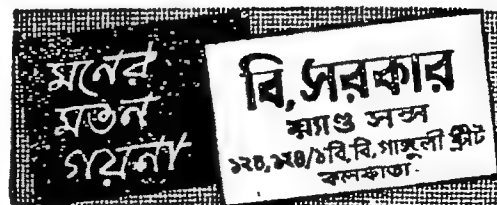
মধু অর্থাৎ সুব্রহ্মসিংহ ঘোষ, মহম্মদ-সিংহের বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য-চৌধুরীর ছেলে। হেমেন্দ্রবাবুর নির্দেশে ১৯১২ সালে কলকাতায় আসেন দলের কাজে। তখন অতুল ঘোষের সঙ্গো আলাপ হয় এবং অতুলবাবু মধুবাবুকে নিয়ে যান মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের কাছে, অতুলবাবুদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে।

মধুবাবু বলছেন, "দেশে ফিরে হেমেন্দ্রবাবুকে বলতে গেলাম যতীনদাব কথা। হেমেন্দ্রবাবু হেসে বললেন : তাকে ভো আমি চিনি।..."

হেমেন্দ্রবাবুর বোনের বিয়ে হয় যতীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম কুমারখালিতে, কথার কাছেই। হেমেন্দ্রবাবুর ভগিনীপতি গিবিজা-প্রসন্ন চক্রবর্তী ছিলেন কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র।

এই সুবাদে ১৯০৪ সাল থেকেই হেমেন্দ্রবাবু যতীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন।

কলকাতায় ১৮৭৭ ফরিকাদি মিত্র স্ট্রীটের মেসে মহম্মদসিংহের কর্মীরা থাকতেন। ১৯১০ সালে দীনেশ এবং উপেন রায় (বিধু) নামে দু'জন মহম্মদসিংহের কর্মী কলকাতায় দুটি গুপ্তচরকে হত্যা করেন। তাঁদের নামে গুয়াবোট রায় হয়।



সুবেন্দ্রসোহন (মধুবাবু) বলছেন, “যতীনদা আমাকে আর অতুলকে নিয়ে বেলাড় মঠ থেকে যায় হচ্ছেন, এমন সময় অশ্বিনী চৌধুরী হস্তদস্ত হবে এসে দাদাকে বলল : বিধুকে ধরে নিয়ে গেছে উৎসব থেকে।...”

“দাদা বললেন, ওদেব যে-করেই হোক ছাড়িয়ে আনতে হবে। চাই কি খেল ভাঙতে হবে।...”

“আমরা দাদাকে বললাম, আমরা আগে খোঁজ নিয়ে আসছি। তিনি নিজেকে যাবেন কেন? ওদিকে বিধুকে নিয়ে স্টীমার ছেড়ে দিল। দাদা অত্যন্ত ব্যস্ত হবে পড়লেন।

“খবর এল বিধুকে জামিনে খালাস দিয়েছে।”

শোনা যায়, সামান্য একজন কর্মীকে খালাস করে আনবার জন্যে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের এতটা উতলা হয়ে পড়া মধুবাবুর ভাল লাগে নি। তাই সেখান থেকেই হেসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল। প্রথম মহাস্থান ঘোষিত হবার বাইশ দিন পবে।

কলকাতার বিশ্বাত বন্দুক ব্যবসারী আর. বি. রডা কোম্পানী তখন বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র আনাচ্ছেন। বিশেষত জার্মানীর প্রসিদ্ধ মাউজার : Mauser পিস্তল।

যতীন্দ্রনাথের মেহালপর সহকর্মী বিপিন গাঙ্গুলী এবং বিপিনবাবুর সহযোগী গিবীন ব্যানার্জী (দলের পুরনো এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী) ওই অস্ত্রের একাংশ স্বক্ৰমে করে নিতে উদ্যোগী হলেন। গিবীনবাবুর চেলা শ্রীশ মিত্র (বা হাবুলা) দলেব পরামর্শেই কড়া কোম্পানীতে ঢাকাবি নিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস অর্জন করছিলেন। একেবারে এক বিবানবুই বাল্ল অস্ত্র তিনি গঙ্গাব ঘাটে কাস্টমস থেকে খালাস করিয়ে গরুর গাড়ি করে বড়ার দোকানে পৌঁছে দেন।

তারপরে, নির্দিষ্ট ২৬শে আগস্ট তারিখে, তিনি অবশিষ্ট চট্টগ্রাম-বাল্ল অস্ত্র-সমেত গরুর গাড়ি থামলেন মলঙ্গা সেনে এক লোহা-লকড়ের গদামে : গিবীনবাবুর একান্ত অনুপ্রাণী কর্মী কালিদাস বসু এই অস্ত্র গদামে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

কিন্তু গদামে অস্ত্র বেশি দিন রাখা সম্ভব হল না; বাল্লগদামো তখন অতুল ঘোষের বন্ধু ডুজঙ্গর রায়চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কলেজে এম.এস-সি'র ছাত্র) মশায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হল। সেখান থেকে ববাহ-নগরের এক মন্দিরে প্রায় সব বাল্লগদামো তোলা হয়। ওদিকে রডা থেকে খবর পেয়ে পদলিখ বখন তৎপর হয়ে উঠল, মন্দিরের পুরোহিত ভন্ন পেয়ে তাঁর আত্মীয় নরেন ভট্টাচার্য (M. . Roy) -কে বলেন ওগদামো মন্দিরে ফেলতে।

অস্ত্রগদামো তখন আনা হল অতুল ঘোষের

হৃদয় মদী সেনের বাড়িতে। সেগুলি মাদারিপুর, মরমনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা, উত্তরবঙ্গ, চাঁচিশ পবগনা, হুগলি, চন্দননগর প্রভৃতি কেন্দ্রের নেতাদের হাতে ভাগ করে তুলে দেবার ব্যাবস্থা করলেন যতীন্দ্রনাথ। এবং এই মতুবান প্রয়োগের বিধিও শিক্ষা দেবার ব্যাবস্থা কললেন তিনি।

বড়বাজারের এক গদামে কিছু কাড়ুজ পেয়ে গেল পদলিখ; সেইসঙ্গে মামলা দায়ের হল। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অনুকূল মুখার্জী, গিবীন ব্যানার্জী, হাবিদাস বসু, নবীন ব্যানার্জী, কালিদাস বসু, ডুজঙ্গর, বৈদনাথ বিশ্বাস প্রভৃতির বিচার হল। বিপিন গাঙ্গুলী ফেরাব হয়ে কলকাতার বিজ্ঞ কলেন্টে গালিবে বেড়াতে লাগলেন, বিশেষত যতীন্দ্রনাথ-শিষ্য ফনী চক্রবর্তী'দের বাড়িতে—১২, মিল্কফার সেনে (বর্তমান কলেজ বো)—তিনি অনেক সময় থাকতেন।

যতীন্দ্রনাথ তখনও প্রকাশ্যেই এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছেন। অতুল ও অমর ঘোষেরে ছিলাম মদী সেনের বাসাই তখন তাঁর হেডকোয়ার্টার, আর বেশি সত্যাত ছিল ফনী চক্রবর্তী'দের ওখানে, ইডেন হিন্দু হোস্টেলে, কলেজ স্ট্রীটে জীবনরতন ধরেন, মিস-এ, হুতুবিবাপান সেনের মেস-এ, কবিবাজ বিজয় রায়ের দোকানে, শিয়ালদা'র আশ্বিনবাস বোর্ডিং এবং অন্যান্য কয়েকটি আশ্রয়াল।

প্রসঙ্গত বাল্ল, ক্রিস্টিফোর্ডের হুতুমে বেরাহত বিশ্বাত সুশীল সেন উপবোধ ইডেন হোস্টেলেই যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করেন। সুশীল সেন আলিপুর মামলায় সাত বছর স্বাপিস্তার পান; আপীলে বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং বেফারেন্সে মজিলাড করে সুশীল যান শ্রীঅববিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শ্রীঅববিন্দেব নির্দেশে তিনি বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাগ করে পড়াশুনোর মন দেন। ১৯১০ সালে সুশীল আই-এস-সি পাশ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাবু (ইনি যতীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক কর্মে বহু-সহায়তা করেন) ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের (ইনি, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি নিষিদ্ধ যতীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করতেন) স্নেহভাজন হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নে বি-এস-সি পাঠ্যক্রম গ্রহণ করে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে উঠে যান।*

সুশীলের দাদা বীবেন্দ্র সেন (ইনি আলি-

পুর মামলায় দাঁড় হ'য়ে আন্দামানে যান) বলছেন, “ইডেন হোস্টেলে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশি। এর কিছু পরে দামো-দরের বন্যাব ঠাপকা'র উপলক্ষেও সুশীল যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। এই পরিচয়ই আবার তাঁর জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেয়। দামোদরের বন্যা হইতে ফিরিয়া আসিবা তিনি এক গভীর অন্তর্জগতের মধ্যে পড়েন, কোন পথ লইবেন, তাহা লইয়া। পুরোপুরি সাতদিন নিজের মনেব সঙ্গে বন্ধু কবিয়া তিনি বিপ্লবের পথে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।”

দলেব স্বার্থে আবার বখন যতীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে ডাকাতির অনুমতি দিলেন, তখন নদীয়াব প্রাগপুর্বে ডাকাতির সময়ে সুশীল সেনের অমলা জীবনীটি খেসারৎ দিতে হয়। পদ্মা নদীর ধারে পদলিখের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হাছিল; সুশীল সেন গুলীভরা মাউজার পিস্তল নিয়ে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে—এমন সময় নদী'র পাড়েব চাপ ধসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের পিস্তলের গুলীই তাঁর চিবুকের নিচে লেগে মাথার খুলি ভেদ করে যায়। নদীর ভাঙা পাড় সমেত মৃতদেহ নদীতে ভেসে যায়।

কিরে যাই বড়া কোম্পানীর অস্ত্র-প্রসঙ্গে।

পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল এবং ছোটগিল হাফব কাড়ুজ সমেত বাল্লগদা'র পেবে দেশেব বিপ্লবীরা যেন নতুন প্রেরণা পেলেন। এই পিস্তলগদা'র হালকা কাজেও যেমন ব্যবহার করা চলে তেমনি আবার ঠাপ-টাকে বাটোব মতো লাগিয়ে নিয়ে মাঝাক দুব-পজ্জাব বাইফেলের কাজেও এই অস্ত্র তখন ইওবোপে প্রসিদ্ধ।

রডা কোম্পানীর কর্মচারী শ্রীশ মিত্র (হাবুলা) এই বিঘাট দায়িত্বপূর্ণ কতবাটি সমাপন করে দিয়ে অস্ত্রধান করেন। অনেকের ধারণা, তাঁকে তিস্তাবের পথে চীনেব দিকে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু হিংস্র জন্তুব কবলে তাঁর প্রাণ যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীশবাবু সম্মানী হ'য়ে যান।

একটি একটি করে এইভাবে নিঃস্বার্থ সমাপিত জীবন দেশজননীর চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে তারা পথ বেঁধে দিয়ে গেলেন—তাদের কথা ইতিহাসের বৃকে আজো অলিখিত। অথচ তাঁদের পাজিরের হাড় নিজেই তো গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম অস্ত্র—তাঁদের ভিল ভিল স্পন্দনের স্কুলিগেই তো জ্বলন্ত উঠল স্বাধীনতার হোমানল। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই ইতিহাস এগিয়ে চলল নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণার বশবর্তী হয়ে।

২ নম্বর

দক্ষিণেশ্বর। রাসমণির বাগান। পঞ্চাশটিলা।

*যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শৈলেন ঘোষ (বিদেশে যান), সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই ইডেন হোস্টেলেটিকে পুরোপুরি কনভার্ট করে ফেলেন যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-পন্থায়। মেঘাবী ছাত্র-মহলে সে-সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য।

যতীন্দ্রনাথ পরামর্শ সভা ডেকেছেন। উল্লেখযোগ্য নেতাদের হাতে বিশেষ বিশেষ কর্মভার ন্যস্ত করছেন।

“রাসবিহারী”, যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, “ফোর্ট উইলিয়ামটা দখল করতে হবে। পারবে তুমি?” মন্ত্রাবিস্টের মত রাসবিহারী অভিভূত কণ্ঠে জবাব দিলেন, “হ্যাঁ। পারব।”

আলোচনা শেষ হল। যতীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় নিয়ে রাসবিহারী বঙ্গ সোজা উপস্থিত হলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। কেল্লার শিখ কর্তা মনসা সিং-এর সঙ্গে অঙ্গকালের মধ্যেই রাসবিহারী আলাপ জমিয়ে ফেললেন। বহুভাবাবিদ তিনি। বিশুদ্ধ পাঞ্জাবী সংলাপ তাঁর আয়তাবলী।

যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনসা সিং-এর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেল যে, নির্দেশ পেলেই সৈন্য মনসা সিং কেল্লার বিপ্লবীদের ধ্বংস উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন, প্রবেশ-পথ অব্যাহত করে দেবেন। বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হবেন। কেল্লা দখলে আসবে।

সেক্ষেত্র কলকাতা তথা বাংলা দেশেই ইংরেজের ক্ষমতা অবশ করে দেবার এই সহস্রাব্দ কল্পনা। অস্ত্র রাক্ষসের প্রাণ-ভোজনা এই কেল্লা মধ্যে নিহিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে আছেন, সহযোগিতা করবেন বলে। তাব উপর বৈদেশিক সাহায্য যদি সময়মতো এসে পড়ে, তা হলে একীভূত প্রচেষ্টার ভারত-স্বত্বকে স্বাধীন করা খুব দূর হবার কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দের একালের একটি লেখন্য আছে,

“At that time the military organisation of the great empires and their means of military action were not so overwhelming and apparently irresistible as they now are : the rifle was still the decisive weapon, air power had not yet been developed and the force of artillery was not so devastating as it afterwards became. India was disarmed, but...with proper organisation and help from outside this difficulty might be overcome and in so vast a country as India and with the smallness of the regular British armies, even a guerrilla warfare accompanied by general resistance and revolt might be

effective. There was also the possibility of a general revolt in the Indian army. At the same time he had studied the temperament and characteristics of the British people and the turn of their political instincts, and he believed that although they would resist any attempt of self liberation by the Indian people and would at the most only concede very slowly such reforms as would not weaken their imperial control, still they were not of the kind which would be ruthlessly adamant to the end : if they found resistance and revolt becoming general and persistent they would in the end try to arrive at an accommodation to save what they could of their empire or in an extremity prefer to grant independence rather than have it forcefully wrested from their hands.”

(Sri Aurobindo On Himself...)

এই উক্তিই স্পষ্ট অভিযান্ত্রিক পাই যতীন্দ্রনাথের সেকালের একটি উক্তি, “আমরা যদি অস্ত্রপাতি কিছু কিছু পাই, দেশের বিভিন্ন স্থানে এক-একদল যুদ্ধ করে মরব। তা হলে দেশ স্বাধীন করার পথ জাত চিনবে। শেষ পর্যন্ত দেশের জন-সাধারণ না এলে দেশ স্বাধীন হবে না।” চলতি ভাষায় যতীন্দ্রনাথ প্রায় বলেছেন, “ঠালায় ঠালায় দেশ উঠবে।”

যতীন্দ্রনাথের তরুণ অনুগামী বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত মশাই বলেছেন, “১৯২৮-৩০ সালে সাহিত্যিক শরৎবাৎস আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। তখন তিনি একটি প্রশ্নকে রূপ দেন— বিপ্লব না বিদ্রোহ? এতসব বুঝবার মত বিদ্যাবৃষ্টি অভিজ্ঞতা ১৯১৪-১৫ সালে আমাদের ছিল না, কিন্তু দাদা (যতীন্দ্রনাথ) আমার কাছে একদিন একটি কথা বলেন যাতে এই প্রশ্নেরই আভাস ছিল, পরে বুঝছি...এর আনন্দটা তখন দলের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল...এ বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় সে যুগে কতকটা যেন দেখছি বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভিতর আর ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর ভিতর...”

এই অত্মতানের যে তরঙ্গমালা, তার পরিণতি কোথায়? প্রথমে, একের পর এক ব্যর্থতার চরম অর্থাৎ তারপর, অবশেষে, দাঁসবে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীন ভারতীয়

রাষ্ট্রের আগমন আকস্মিক বলে যত্নে অনুভূত না হয়, তার জন্যে যতীন্দ্রনাথের অনুগামী ও শিষ্যদের প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সরকার, আইন-কানুন, দেশরক্ষা বিভাগ, শিক্ষা-উন্নয়ন বিভাগ প্রভৃতির কথা স্মরণ করেই তো তাঁরা প্রথম অগ্নিযুগের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ১৯০৫ সালে জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যত্নসূচী যে শিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মনে, তার সাধকতার মহালক্ষ্য বৃষ্টি সমাসার হল। যেখানে রাষ্ট্রনীতির ভ্রাস নিয়েছেন বরণ্য নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ; অর্থনীতির ও ইতিহাসের ভ্রাস নিয়েছেন সখারাম গণেশ দেউলেকর ও সুব্রহ্মনাথ ঠাকুর; সমাজতন্ত্র, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ধর্মে নবকিছুতেই হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন উনিশ শতকের দিকপাল প্রতিভারা—সেই জাতীয় বিদ্যাপীঠের শিক্ষাবীজ এতদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে উদ্ভূত। আগন্ত মিন। আবি-চলিত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বিপুল জন-অভ্যুত্থানের কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন বিভিন্ন বেসরকারি নেতৃবৃন্দ, তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বোসও একজন।

ইতিপূর্বে তাঁর কথা সামান্য আলোচনা করেছি। আর একটু করব। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ২৫শে মে রাসবিহারীর জন্ম। অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর ছয়-সাতের ছোট তিনি। চন্দননগরে এঁর বাবা থাকতেন। সেই সূত্রে চন্দননগরের সঙ্গে ইনি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

চন্দননগরের বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক চারু রায়ের কাছেই রাসবিহারীর বিপ্লবী দীক্ষা, যেমন কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতিও। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের কারও কারও সঙ্গে রাসবিহারীর সামান্য পরিচয় ছিল; যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়।

১৯০৮ সালে যখন বারীন ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা বোমার বাগানে ধরা পড়ে গেলেন, সেই সময়েই মুরারিগুপ্তের বাগানে রাসবিহারীর দুটো চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে।

২৪ পরগনার শশিভূষণ রায়চৌধুরীর সহায়তায় রাসবিহারী আত্মগোপন করলেন গিয়ে দেহাদানে এবং কিছুদিন রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করে, দেহাদানের বন বিভাগে তিনি বড় একটা চাকরি পেলেন।

যতীন্দ্রনাথ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সংগঠনকে আবার দাঁড় করালেন, তখন বিভিন্ন নেতাদের কাছে নতুন করে অগ্রসর হবার যে আশ্বস্তি পান, রাসবিহারীও তাঁদের একজন।

(কুমার)

* যুদ্ধ উপলক্ষে অধিকাংশ সৈন্যই তো তখন মোতায়েন করা হয়েছে ভারতের বাইরে, বিভিন্ন ফ্রন্টে। যতীন্দ্রনাথ ॥

❄ ঐশ্বর্যবাহিনী

নাশবেড়িয়া আদিকালের

আগে ছিল বংশবাটী, এখন হয়েছে
নাশবেড়িয়া। গঙ্গার পশ্চিমকূল বারানসী
সমতুল। ঘন বাঁশবন কেটে শিয়াল, ডাম,
নেকড়ে আর ভোরা বাঘ ভাড়িয়ে জংগলাচ্ছন্ন
এই ভূখণ্ডটিতে সু-সংস্কৃত একটি জনপদের
পত্তন যিনি করেছিলেন—তার নাম রাঘব রায়।
বংশবাটী রাজবংশের, বংশবাটী শাখার আদি-
গুরু। পাটলীয়ার রাজা জয়নন্দের জ্যেষ্ঠ
পুত্র। ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট
শাহ-জাহানের কাছ থেকে প্রভুত্ব অর্থাৎ, প্রচুর
ভূ-সম্পত্তি এবং চৌধুরী ও মজুমদার উপাধি
পেয়ে বংশবাটীতে নব রাজধানী স্থাপন
করেন। তার আগে বংশবাটীতে জনবসতি
ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। কারণ
আরও প্রাচীন গ্রন্থকাবি রাম রচিত দিগ্বিজয়
প্রকাশের কিলকিলা বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে—

“বংশবাটী প্রভুত্বো হুগলী মাজবর্ততে।
খলাপী তটিনী নিতং বহতে বালুকান্তরে॥”

বংশবাটী, প্রভুত্বো, অর্থাৎ বংশবাটী
এবং আর অনেক গ্রাম—বোকা যাচ্ছে জনপদ
হিসাবে বংশবাটীর তেমন গুরুত্ব তৎকালে
ছিল না। হুগলী মাজবর্ততে,—আরও
পাঁচটা গ্রামের সংগেই একসঙ্গেই তাই তার
উল্লেখ করেছেন কবি রাম। খলাপী তটিনীর
আজ আর কোন নাম নিশানা পাওয়া যায়

না। গঙ্গা বা সরস্বতীর কোন শাখানদাই
এ নাম ধরে থাকবে তৎকালেও এখন আর
যার অস্তিত্ব নেই।

শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ
বংশবাটীর বর্ণনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু মিত্র
তার সূত্রধনী কবো স-উচ্ছ্বাসে বলেছেন—

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যেদিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর।
বিদ্যা বিশারদ কতো পাণ্ডিত্যের বাস
সগৌরবে শাস্ত্রচর্চা করে বার মাস।
এই স্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রতন
কথক্কুলের কেতু কান্তন বরপ,
সুভাবে রচিলা কতো গীত মহিমর,
শুনিলে আনন্দে নাচে গৌরবের হ্রদর।

গারুল ভট্টাচার্য

শুধু শিক্ষা এবং সংস্কৃতিচর্চাই নয়,
পরবর্তীকালে সমাজকল্যাণমূলক নানাবিধ
আন্দোলনেরও নেতৃত্ব করেছে বংশবাটী। নীল-
কর উৎসাদন আন্দোলনের এইখান থেকেই
সূত্রপাত। বংশবাটীর নীলকুঠি এবং
কুঠিয়ালদের অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেই
দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্শন প্রণয়ন করে-
ছিলেন বলে প্রকাশ। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ
এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নী আন্দোলনেও বংশ-
বাটীর একটি বিশেষ স্থান আছে।

বংশবাটীর নীল কুঠিয়ালদের মধ্যে
বার্চ সাহেব এবং টেম্পল সাহেবের নাম আজও
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৮২২ এবং
১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এঁরা বংশবাটীর কুঠিয়াল
ছিলেন। প্রতি বিধায় বার্ষিক মাত্র এক টাকা
খাজনা দিয়ে প্রায় দু-হাজার বিঘে জমিতে
নীলের চাষ করতেন টেম্পল সাহেব। ফলাও
চাষের সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষীর প্রতি তাঁদের
দোদাঁড় অত্যাচারের কাহিনীও হৃৎকম্প
উপস্থিত করতো সাধারণ মানুষের। নীল-
দর্পণে সম্ভবতঃ সে অত্যাচারের সমস্ত
বিবরণই লিপিবদ্ধ করা আছে।

লর্ড ক্যানিং-এর চেষ্টায় নীল চাষ উঠে
যাবার পর বংশবাটীর কুঠি-বাড়িটা প্রথমে
উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় কিনে
নেন। পরে গ্যাজেট ম্যানেজারের কাছ দিয়ে
বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন জমি কিনে নিয়ে
সেখানে তাঁদের কারখানা করেছেন।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের বেশির ভাগ
সভ্যতাই রাজন্যপোষিত। বংশবাটীও তার
ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে বংশবাটীর যারিকিছ,
সমৃদ্ধি তার অধিকাংশই ‘সম্ভব হয়েছে’
‘রাজা মহাশয়’ উপাধিধারী বংশবাটীর এই
রাজপরিবারের সাহায্য এবং বদন্যতায়।

কিছ, কিছ, রাজপরিবারের মত এঁরা
শুধু রাজা খেতাবধারী গভানুগতিক ভূস্বামী
মাত্রই ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে রাজা বলতে
যে পূর্ণাঙ্গ চিঠিটি ভেঙ্গে ওঠে চোখের সামনে
—এঁরা ছিলেন তাই। এঁদের কেজা ছিল,
কামান ছিল, প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ
ছিল, অশ্বারোহী-পদাতিক-তীরামদাজ এবং
গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী ছিল। দুর্বলকে
অভয়, আশ্রিতকে রক্ষা সাধুর প্রতিপালন,
রাজকীয় কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধের সংগেই
করে এসেছেন এঁরা। বাংলার প্রাচীনতম
কীর্ত্তন্য রাজপরিবারগুলির মধ্যে এঁরাও
অন্যতম। তাই এঁদের কথা কিছ, না বললে
বংশবাটীর ইতিহাসের বার আনা ডাঙাই
অনুভব করে যায়।

দত্ত পদবীধারী কুলীন কায়স্থ এঁদের
পূর্বপুরুষ দেবদত্ত মহারাজ আদিশূরের
আমন্ত্রণে হরিন্দরের মায়াপুরী থেকে এসে
মুর্শীদাবাদের কাছে দত্তবাটীতে প্রথম বস-
বাস করেন। কিছুকাল পরে এই বংশেরই
একটি শাখা দত্তবাটী ত্যাগ করে চলে আসেন
পাটলীতে। এঁদের মধ্যে কবে কে কোন
কৃতিত্বের জন্য ‘দেবরায়’ উপাধি লাভ করলেন
তা জানা যায় না। তবে এই বংশেরই উদয়
হায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নন্দ রায় সম্রাট



অনন্তদেবের মন্দির (নাশবেড়িয়া)

শা-জাহানের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি এবং কেটে একতিয়ারপূর পরগনা জারগীর পেয়েছিলেন। সে সময় বাংলাদেশে মোট চারজন মজুমদার ছিলেন—জয়ানন্দ তাঁদের অন্যতম। আর একজন ছিলেন সপ্তগ্রামের ভবানন্দ মজুমদার। ভারতচন্দ্র তাঁর অম্বদা-মংগলে—অম্বদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন—

“বর মাগ মনোমত বাহা চাহ দিব
ভবানন্দ মজুমদার ভবনে রহিব।”

দত্তপরিবারের অধিকারে পাটুলী গ্রামাঞ্চি যথেষ্ট ছিল ১৮৮২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ হেজ্জস্ তাঁর রোজনামচার পাটুলী অধিকারী উদয় রায় ও জয়ানন্দ রায়ের নাম খস্মেথ করে গিয়েছেন।

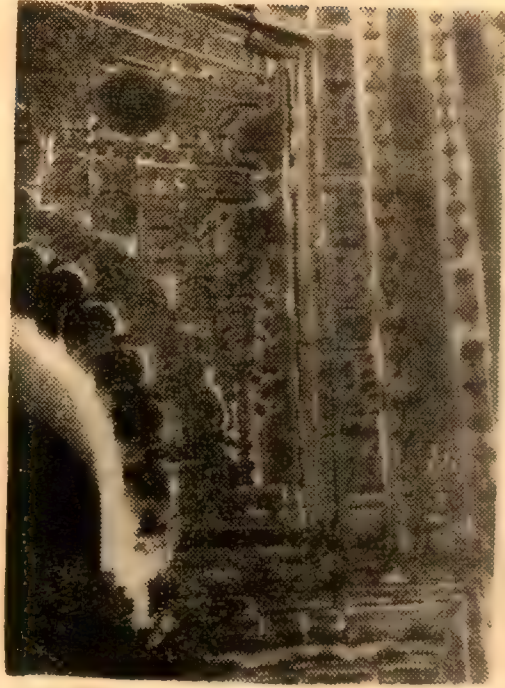
(Hedgess Diary, Vol. 1, Page 29)

দ্বিবিজয় প্রকাশে পাওয়া যাচ্ছে—

“গংগা-যমুনাবর্ষা মধ্যে পাটুলী গ্রাম বাসী নাম
জয়ানন্দ নাম শাসনাধী বর্ততে অধুনা নৃপ।”

রায়ব রায়ের দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেব। এঁদের থেকেই বাঁশবেড়িয়ার রাজ-বংশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মধ্যদা বিচারে দশ আনা ছয় আনা হিসাবে দুই পুত্রের মধ্যে রায়ব আপন সম্পত্তি ভাগ করে দেন। রামেশ্বর রইলেন বাঁশ-বেড়িয়ায়। বাসুদেব থেকে শেওড়াকুলি রাজবংশের পত্তন। রাজা নৃসিংহ দেবরায়কে বাদ দিলে রাজা রামেশ্বর দেবরায়ই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিধন্য পুরুষ। অনন্তর অরুণ্যাকীর্তি বংশবাটীতে নব জনপদের পত্তন, প্রাসাদ, প্রাকার, পরিখা এবং দুর্গ নির্মাণ দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী, দক্ষ লাঠিয়াল এবং সুশিক্ষিত পদাতিক-তীরামদাজ দল আনিয়া শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তোলা প্রকৃতি তাঁরই কাজ। দিল্লীর মসনদে তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। পরধর্ম বিবেচনী এবং চক্রান্ত-প্রিয় সম্রাটের স্বভাবের দোষে দেশের সর্বত্র একটা চাপা অসন্তোষ। কুশাসনে এবং দুঃশাসনের দাপটে শাহী-শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হচ্ছে সর্বত্র। তার ওপরে বাংলা বহু দুর্গ। বাদশাহী শাসন-সীমানা এত দূরে প্রসারিতই নয় ভালভাবে। ফলে সমস্ত বাংলা দেশেও তখন প্রবল একটা মাংসান্যায় চলেছে। ছোট ছোট জমিদার এবং ভূস্বামীকুল যে যখন যেখানে পারছেন স্বাধীনতা ঘোষণা করে বন্ধ করে দিচ্ছেন রাজকর। অপেক্ষাকৃত দুর্বল জমিদারী-গুলিকে সুবিধে মত আক্রমণও যে করছে না এমনও নয়। খৃস্ট খৃস্ট যুদ্ধবিবাদ আত্ম-কলেব বাংলাদেশ তখন পূর্ণ, সাধারণ প্রজার জীবন অতিষ্ঠ, কষ্টের সীমা নেই।

সেই বিশৃঙ্খলা এবং ডামাডালের কালে স্বহস্তে সৈন্য চালনা করে ইতস্তত উখিত বিদ্রোহী জমিদারকুলকে বশে এনে প্রায়



কার্যকর্মখচিত অনন্তদেব মন্দিরের গাঠনিক ইটের গাঁথনীতে ফটল ধরেছে দেখা যাচ্ছে

অর্ধেক রাত-বগের শান্তিপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামেশ্বর রায়। প্রজাকুলের স্বাস্থ্য-বিধান এবং শাহী রাজস্ব যথাসময়ে পরিশোধ করে মৃদল সৈন্যদলের আক্রমণ এবং এক বৃহত্তর যুদ্ধের ক্ষয়কারী সম্ভাবনা থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন বললেও চলে। তাঁর এই কাজে বিশেষ প্রীতি হয়ে ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে পঞ্চপটী খেলাত এবং রাজা মহাশয় উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। রাজা মহাশয় উপাধিটির কিছু বৈচিত্র্য আছে। সমস্ত বাংলাদেশে ‘রাজা মহাশয়’ উপাধিধারী আর কোন পরিবারের সম্মান পাওয়া যায় না একমাত্র বাঁশবেড়িয়ার রাজ-পরিবার ছাড়া।

উপাধি সর্বালিত মূল সনদখানি পাশাঁ-ভাষায় লেখা। যার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়—যেহেতু ভূমি পরগনাগুলি অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া রাজ্য শাসনের সহায়তা করিয়াছ এবং তোমাকে যখন যে কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে সবই সুসম্পন্ন করিয়াছ, সেই হেতু ভূমি পুরস্কার পাইতে পার। তোমার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে পঞ্চপটী খেলাত এবং ‘রাজা মহাশয়’ এই উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠপুরুষ এই উপাধি ধারণ করিবেন। কেহ ইহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না। (১০ সফর, ১০৯০ হিজরী)। বর্তমান মূল সনদখানি পুরাতত্ত্বের একটি নিদর্শন হিসাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ডকুমেন্ট গ্যালারীতে সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু রাজা রামেশ্বর রায়ের সবচেয়ে বড়

কীর্তি বোধহয় বংশবাটীর বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা। চতুষ্কোণ, চৌচালা চার অলিম্ব-বেষ্টিত একচুড় এই মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৬৭৯ খৃস্টাব্দ। মন্দিরের সামনের দিকের দেওয়ালে ছোট একখানি পাথরে উৎকীর্ণ করা আছে—

“মহাব্যোমার সীতাংশু গণিত শক বৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দন্তেন নির্মমে বিষ্ণু মন্দিরম্”

কি গঠনসৌকর্য, কিবা সর্বাত্মক আশ্চর্য পোড়ামাটির অলংকরণে মন্দিরটিকে ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যশালী শিল্পকীর্তিগুলির অন্যতম বলে মনে করা যেতে পারে। তিন শতকের কালপ্রবাহ অবিরাম বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। তথাপি প্রাচীরগায়েব কারু-কার্যগুলি আজও তাদের কালজয়ী প্রাণ মহিমায় সমৃদ্ধ। হাতুড়ীর ঘরে, বাটলীর ঘারে কেটে তোলা পাথর নম্র। ছাঁচে ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া মৃৎখণ্ড মাত্র। কিন্তু জড় মাটির তোলাও যে কথা কয়, প্রাণ রাখে দর্শনাধারীর নয় চৈতন্যকে মুহূর্তে পৌঁছে দিতে পারে শিল্প আর সৌন্দর্যের আনন্দ-লোকে, বংশবাটীর বিষ্ণুমন্দির প্রত্যক্ষ নয় করলে তা অনুভব করা যাবে না।

শব্দ দেব-দেবীর মূর্তি কিংবা রামায়ণ মহাভারতের খণ্ড চিত্রই নয়। তৎকালীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন চিত্র। যেমন—জোলা-তলা, খোল-করতাল সহযোগে নৃত্যবত কীর্তিনীয়া দল, বাজতী এবং পানিদ পানিত নৌকাবিনাসী বাবু, ছোট ছোট তেলেরাগুলি লাল কুঁড়ি গায়, বংশবাটীর বিষ্ণু মন্দিরের



তের চড়া বিশিষ্ট হংসেশ্বরী মন্দির (বানবেড়িয়া)

দেওয়ালে কুঁড়ি-পরা চুপি মাথার ঘোড়সওয়ার কিংবা পদ্যাতক ফিরঙ্গী ব্যাড পাটিরও মাফাং পাওয়া যাবে। পৌরাণিক কথ্যচিত্র বা দেব-দেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে কংস বধ, রাবণ হনন, কৃষ্ণ বাসুদেব, মহিষাসুরমর্দিনী, অশ্বত্থা সহ শ্রীমাধা প্রভৃতি চিত্রগুলি আজও চমৎকার। বাতায়নবর্তিনী, সাগর লঙ্ঘনোদাত মহাকার মনুদ্বিত কিংবা জটাবক্ষধারী খল-চমড়যিত কুঠারস্বন্দ পরশুরামের দৃষ্টতেজা মূর্তিটি আজও দশককে স্তম্ভিত করবার ক্ষমতা রাখে। মন্দিরটির এই শিল্পসৌন্দর্যে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের আদেশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু স্মার্য এসে এক সময় কিছুকাল বংশবাটীতে বাস করেছিলেন এবং প্রায় সমস্ত চিত্রাঙ্কিত ইটগুলির ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন বলে জানা গেল।

মন্দির এবং দেবতার আসন সংস্থাপনে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত হিন্দু দেবমন্দিরগুলি পশ্চিম বা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে থাকে। দেবতাও থাকেন পশ্চিম কিংবা দক্ষিণাভিমুখী হয়ে। পূজক বসেন পূর্ব কিংবা উত্তর মুখে। কিন্তু বংশবাটীর বিষ্ণু মন্দিরের অবস্থান পূর্বমুখী। দেবতাও পূর্ব-মুখী। স্বভাবত পূজকের অবস্থান পশ্চিমাভিমুখী হয়ে থাকবে। এই রকমই বিপরীত অবস্থানে সংস্থাপিত আরও দুটি-একটি মন্দির দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে। জীরেটের শ্রীকৃষ্ণগোপীনাথ জীউ এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত উল্লার কাশীশ্বর মিত্র-মুস্তৌফী প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্দিরটি যাদের অন্যতম।

সম্ভবত মন্দির-শিল্পে এটি উড়িষ্যা

শিল্প-পদ্ধতির প্রভাব। উড়িষ্যার দেবমন্দির-গুলি বেশির ভাগই পশ্চিমমুখী। বৌদ্ধ ঋত পদ্ধতির একটি সুদূরগত আভাসও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধরা তাঁদের উপাসনার মন্দিরের মূণ পশ্চিমদিকেই নির্মাণ করে থাকেন।

দুঃখের বিষয় মন্দিরটির অবস্থা এখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। খিলানগুলি স্থানে স্থানে জীর্ণ, লাল ইটের গাথনির স্তরে স্তরে সমুদ্রের ক্ষর। উন্নত চূড়ার এখানে-ওখানে ছোট-বড় ফাটলের দাগ। উৎকীর্ণ চিত্রময় ইটগুলিও অদৃশ্য হচ্ছে একে একে। বনচর বালক রাখালের দল কিংবা সংগ্রহ-পাঙ্গল এক-শ্রেণীর দশনাথী বিশেষের হস্তক্ষেপে একে একে অদৃশ্য হচ্ছে বাংলার প্রাচীন শিল্প উষ্মা স্থাপত্যের এক-একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভর হয়—প্রাচীন বাংলার নিজস্ব ঢালা-পদ্ধতি এবং পোড়ামাটির কারুকার্যের এই অতুল্যম নিদর্শনটি হয়তো বা লুপ্তই হয়ে যাবে কালক্রমে।

পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগের কাজকর্ম বৃক্কে ওঠা দার। তাঁরা পার্বত্য অগ্নিকৃত অধুনাকালের হংসেশ্বরী মন্দিরটিকে নিয়েছেন সাংরক্ষণিক অধিকারে। কিন্তু অধিকতর প্রাচীন এই বিষ্ণুমন্দিরটি কেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না তা বৃক্কে পারা কিছু দৃষ্কর।

প্রতিষ্ঠিত দেবতা আছেন অনন্তদেব। শংখ-চক্র-গদা-কমলধারী লক্ষ্মী-সরস্বতী সম-ভিষাহারী চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি। সাধারণে ইনি বাসুদেব নামে পরিচিত। কিন্তু এটি ভুল।

হংস-পদ্ধতি বা মূর্তি লক্ষণে একে অনন্তদেব বিষ্ণু বলেই চেনা যায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্নেও পাওয়া যাচ্ছে—

“On the west of the temple of Hamsesvari, there is a temple of Ananta Dev which is said to be about 200 hundred years old.”

প্রতিষ্ঠিত প্রথম মূর্তি অপহৃত হয়েছে কয়েক বৎসর আগে। দেবতাহীন দেবালয় দীর্ঘকাল ডুবেছিল এক বিংগ বিঘাদিগ্নয় ম্লান ক্রান্ত অন্ধকারে। তারপর সম্প্রতি কাশী থেকে এই মূর্তি নির্মাণ করিয়ে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজবংশের বংশধরগণ। মন্দির-প্রাঙ্গণ আবার মুখরিত হচ্ছে মন্ত্রধ্বনিতে। ধূপ-দীপ আরতি উপচারে আবার দেখা যাচ্ছে নিত্য শিহরিত পূজাপ্রস্তুতি।

বিষ্ণুমন্দিরের প্রায় সংলগ্ন আর একটি মন্দির ছিল এখানে। শ্রীমং স্বয়ম্ভবা মন্দির। বর্তমানে সেটি বিনষ্ট হয়েছে। তার পাশেই হংসেশ্বরী। রাজা নৃসিংহ দেবরায় কর্তৃক পরিকল্পিত এবং মহারাজা শংকরীর প্রতিষ্ঠিত প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন দক্ষিণদুয়ারী তের চূড়া দেবী মন্দির।

রাজা নৃসিংহ দেবরায় বংশবাটী রাজ-বংশের আর এক কীর্তিমান পুরুষ। প্রথম জীবনে প্রভুত দারিদ্র্য, প্রচুর দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা রঘুদেবের মৃত্যুর তিন মাস পরে তাঁর জন্ম হয়। এদিকে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন জেনে নবাব আলিবর্দী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে অধিকার করে নেন। জ্ঞান হবার পর হতেই বালক নৃসিংহ দেব দেখলেন রাজা রঘুদেবের একমাত্র সন্তান এবং পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি নিঃস্ব।

তারপর নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু। মাত্র এক বৎসর রাজত্বের পর সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্তগমন এবং অবশেষে বালকের মানদণ্ডে রাজশক্তির সভাবনা নিয়ে বাংলার শাসনক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আত্মপ্রকাশ। নৃসিংহ দেবের বয়স তখন মাত্র সতের বৎসর। তৎকালীন অধিকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসকে পত্র লিখে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি প্রতাপনের আবেদন জানানেন। অনেক তদন্ত-তত্ত্বাসের পর হেস্টিংস তাঁর চাম্বিশ-পরগনার অন্তর্গত সম্পত্তিগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কারণ কোম্পানীর অধিকার তখন কেবলমাত্র চাম্বিশ-পরগনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় লর্ড কনওয়ালিশের কাছে দরখাস্ত করে নৃসিংহ দেব তাঁর আরও কিছু সম্পত্তি ফিরে পেয়েছিলেন বলে প্রকাশ।

তদন্ত, বোগ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে নৃসিংহ দেবের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ভূকলাসের রাজা জয়নারায়ণ তাঁর কাশীবাসকালে রাজা নৃসিংহ দেবরায় জগন্নাথ মন্দিরের সহায়তার

সংস্কৃত কাশীখণ্ড গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গ্রন্থকার বলেছেন—

“মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি,
ভাষার সহায় হয় কাহারে না দেখি।”

শত্ৰুঘ্নকুলে জন্ম পাটলী নিবাসী
শ্রীযুত নৃসিংহ দেব রামাগত কাশী
তার সহ জগন্নাথ মুখার্জী আইলা
প্রথম ফল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা

পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার
রায় করিলেন সর্বগ্রন্থের প্রচার।

কাশীখণ্ড ছাড়া সংস্কৃত উদ্ভীষতন্ত্র তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ১৭১১ খৃস্টাব্দে কাশী থেকে বাংলায় ফিরে আসেন নৃসিংহ দেব। লর্ড কর্নওয়ালিস তাকে বাকী সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য বিলাতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরসে আবেদন জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু বিবরণাদিকারে ব্যস্ত নী থেকে রাজার মন চলে গেল ইস্ট আরাধনার পানে। তারই ফলশ্রুতি হংসেশ্বরী মন্দির।

মানব শরীরের ইড়া-পিসলা-বজ্রাঘাত-সুখ-দুঃখ ও চিহ্নগণী। এই পাঁচটি নাড়ীর অনুকরণে ষট্চক্রভেদ প্রণালীতে নির্মিত পঞ্চতল তের চুড়াবিশিষ্ট এই মন্দিরটির মধ্যে কুলকুন্ডলিনী শক্তিস্বরূপিণী হংসেশ্বরীকে স্থাপনা করবার মানসে তিনি মন্দির আরম্ভ করান। কিন্তু মাত্র ষ্টিতীয়-তলা গাথা হবার পরেই অনুমান ৬০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আরজ কাজ শেষ করেছিলেন ষ্টিতীয়া মহারাণী শংকরী। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে মন্দির নির্মাণ এবং দেবীপ্রতিষ্ঠার কাজ সুসম্পন্ন হয়। হংসেশ্বরী মন্দিরের প্রধান দ্বারে লেখা আছে—

“শাক্যেন্দ্রে রম-বন্ধি-মৈত্র-গণিতে

শ্রীমন্দিরম্ মন্দিরম্
মোক্ষদার চতুর্দশেশ্বর সমং

শ্রীহংসেশ্বরী রাজিতং।”

চুপালেন নৃসিংহদেব কৃতি

নারায়ণ তদাজ্ঞানদ্বা
ভূপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা

শ্রীশংকরী নির্মমে।

(শকাব্দা—১৭৩৬)

হংসেশ্বরী নাম নিয়েও কিছু সংশয় আছে। আত্মা হংসেশ্বরূপে। হংস যেমন ক্ষীর-নীর পার্থক্য বিচার করে নীরভাগ ভাগ করে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম, আত্মাও তেমনি সংসারের অসার বস্তুকে ভাগ করে পরমাখ্যার পানে ধাবিত হতে সক্ষম। মানব-তত্ত্বের গহন গভীরে শবাকার শিবরূপী পরমাখ্যা নিহিত। তাঁরই ন্যাতকমলে ভর দিয়ে আত্মশক্তিরূপে বার জাগরণ, তিনিই পরমা প্রকৃতি কুলকুন্ডলিনী হংসেশ্বরী। সম্ভবত হংসেশ্বরী প্রতিমার এই-ই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

স্থাপত্যে হংসেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের

এক বিস্ময়। ভুলনায় ভুবনেশ্বরের মন্দিরও বোধ করি এর কাছে ন্মান হয়ে যার। অশ্রের কারুকার্য, চুড়াগুলির ক্রমগাণ্ডিত গঠন এবং উচ্চতার, দ্বার এবং সম্মুখবর্তী অলিন্দের সুন্দর সংস্থাপনা সব মিলিয়ে মন্দির নয়, ও বেন একখানি কাব্য, একটি গীতি কবিতা, সুন্দরতম সঙ্গীতের এক কলক সুরবাক্য। রাজা যায় রাজ্যও থাকে না, রাজবংশ তলিয়ে যায় মৃত্যু আর বিস্মৃতির অবলোপনে। মহাকালের অট্টহাস্য ধুনিকে অগ্রহা করে যা টিকে থাকে তার নাম কীর্তী।

বাঁশবেড়িয়া রাজবংশে বহু পুরুষ এসেছেন, কালস্রোতে ভেসেও গেছেন তারা। কীর্তিস্বাক্ষরে অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছেন শত্ৰু রাজা রামেশ্বর দেবরায় এবং রাজা নৃসিংহদেব দেবরায়। পাশাপাশি উন্নতচুড়া কালজয়ী হংসেশ্বরী আর অনন্তদেব—

কীর্তিবর্ষাস জীবতি।

একাধিক সরকারী এবং বেসরকারী গ্রন্থে হংসেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত List of Ancient Monastries in Bengal-এ অনেক ভুল তথ্যও লেখা হয়েছে। সেগুলি সংশোধন হওয়া দরকার। যেমন হংসেশ্বরী মূর্তি প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন—The Goddess is made of black stone.—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হংসেশ্বরী মূর্তি কাল পাথরে নয়, নিম কাঠে নির্মিত এবং প্রতিমার গায়ের রং নীল, ষ্টিতীয়ত The Temple is made of stone বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটিও সর্বৈব নির্ভুল নয়। হংসেশ্বরী মন্দির কিছু পাথর এবং বেশির ভাগই লাল ইটে নির্মিত।

রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় এবং কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় বাংলাদেশের নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের সংগ দীর্ঘকাল যাত্রা ছিলেন।

বিশেষত ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে সেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বোগ দিয়ে কুমার মুনীন্দ্র প্রভূত ধন এবং সম্মান অর্জন করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর অতিভাবগ-গুলি অতি মূল্যবান।

একদা বংশবাটীর শ্রীও ছিল, সমৃদ্ধিও ছিল। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিচর্চারও বংশবাটীর স্থান এবং মান নিত্যন্ত খর্ব ছিল না। অক্ষরকুমার রায়, দীনবন্ধু মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত মনীষিবৃন্দ বংশবাটীতে পদার্পণ করেছেন একাধিকবার। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে রেভারেন্ড ডক্টর ডাক্ প্রমুখ বংশবাটীতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্রের মধ্যে অনেকেই কালে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাকের মধ্যে শ্রীপ্যারীমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়টি উঠে যায়। প্রকাশ্য বাড়িখানি শিবপুরের জমিদার শ্রীললিতমোহন সিংহ কিনে নেন। ডাক সাহেব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের এইখানেই ইতি।

বংশবাটীর সর্বনাশের সূত্রপাত হলো ১৮৬০ খৃস্টাব্দে কুখ্যাত বর্ষমানের জ্বর বা ম্যালেরিয়ার মহামারীর আক্রমণে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বর্ষমান জেলা কিংবা হুগলী জেলার গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী এইসব গ্রামগুলি যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এমন আর কোথাও নয়। প্রাণভরে পলাতক নর-নারী দলে দলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো কলকাতায়। অপরাপর আরও বহু গ্রামের মত একদা ধন-জন-সমৃদ্ধিসম্পন্ন বংশবাটীও তার সব সম্পদ হারিয়ে পরিণত হলো এক পরি-তাপ্ত জনপদে।*

* [আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীতঃ
পরের বরে “আজকের বাঁশবেড়িয়া”]



বংশবাটীর কামাখ্যাপীঠের প্রায়-অবলুপ্ত নিষ্পট্টার নিয়ত দেখা যাবে।

গ্রেহমেনা

সকাল সন্ধ্যা রাতি—শ্রীমতী বাণী রায়
মিঃ ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২। দাম : দশ টাকা।

উপবৃত্ত সর্বং উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধা নতুন শিল্পরীতি নিয়েই উপস্থিত নয়—এর বিষয়বৈচিত্র্য অভিনব, ভাষা আকর্ষণীয় এবং এটি লেখিকার সংস্করণিত লেখনীর শাসনে অভূতপূর্ব এক সৃষ্টি-স্বাক্ষর। নতুন শিল্পরীতি বলতে বোঝায় যে, একটি প্রবহমান ও তাঁর গতি-বিশিষ্ট কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিরাট গ্রন্থ লিখিত হলেও “সকাল সন্ধ্যা রাতি” (ক) ‘পল্লী মেসর’, (খ) ‘রায়বাড়ি’, (গ) ‘সংসারিক’, (ঘ) ‘শেষ বসন্ত’, (ঙ) ‘সুন্দরার জন্মদিন’, (চ) ‘জল’, (ছ) ‘নৃত্যরিশ’, (জ) ‘মহাশয়’ প্রভৃতি নামসমূহে বিভক্ত—এ যেন বোম্বাই মেলে কলকাতা থেকে বোম্বাই যাওয়ার পথে ঋতুসঞ্চারে ঘড়িধারা বিগ্রহ। এই রীতি স্বীকৃত থেকে পৃথক। দ্বিতীয়ত যে বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ডা হচ্চে এই যে, প্রাচীন জমিদার বাড়ির সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের সংঘাত কাহিনী এবং সেই সংঘাতে অসংখ্য সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন যাত্রাকে আবিষ্কার। অন্যান্য লেখকরা শ্রদ্ধা হুমিদারী প্রসঙ্গে ইতিহাস পর্যালোচনা করেন; বড়ই আনন্দের কথা, লেখিকার সে উদ্দেশ্য নয়। বনিরায়ী জমিদার রায়-বাড়ি। অন্য কোন জমিদারকুলের সঙ্গে পাবনার এই রায়-পরিবার মিলবে না। বীরভূমের ধনী জমিদার অথবা কলকাতাই অভিজাত জমিদারের ধরণ-ধারণ এদের মত নয়। এরা গৃহস্থ জমিদার। আধুনিক ক্র্যাশনে ও বংশগরিমায় প্রেপ্ত। রাজা দেবীদাস তাঁদের পূর্বপুরুষ। কল্যাণ সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার তারাই আদি। সেই রায়বাড়ি কলকাতাতেও প্রয়োজনবোধে জট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু দিন ত’ ক্রমান্বয়ে যায় না। এই রায়বাড়ির অর্থ-প্রাচুর্য হারিয়ে গেলো। এমন কি এই বংশের ছেলের চাকুরিজীবী হওয়া ছাড়া গতানুগতিক থাকলো না। একদা দরিদ্র এবং পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কণ্ট্রাক্টরীতে ধনী দীপঙ্কর হাত বাড়ালো রায়বাড়ির মেয়ে শ্রীলতার শ্রীহস্তের জন্য। এইভাবে লেখিকা অর্থ-নীতির যে জগৎ সমাজকে চালনা করে তারই ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। অবশ্য দীপঙ্কর অর্থবান হয়েও অর্থপিপাচ নয়। জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ অপেক্ষা সৌন্দর্য-বোধ তাকে অধিক বিমোহিত করে। তবু

টাকাকে সে টাকা বলেই বোঝে। বিপদগ্রস্তা রমণীর সম্ভাব্য পুরুষ পিতৃদেবতার মতো মনে ঔদার্য ও তার আছে। শ্রীলতার ছোট সম্প্রীতি রায়বাড়ির জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয় রাজতকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতি তাকে ত্যাগ করে প্রলেটেরিয়ান (?) সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে বরণ করে নেয়। কোথাও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই, যদিও পথে ছিল সমস্যাসংকুল অসংখ্য কটাকা। এমন রায়বাড়ি—সে বাড়ির বোঁ ছায়া জানে যে তার স্বামী অধিক উপার্জনশীল, তাই অহমিকাও তার বেশি। আশ্চর্য, নিখিলেন্দ্র নিয়ে করে ফরাসী মেয়েকে। এমন কি ছোট মেয়ে হামিদুল্লা হককে। রায়-পরিবারের জাত্যাভিমান চরম। আর গতিময় জগতে এটাই ‘ত’ নিয়ম। উপন্যাসটির ঘটনাকাল পূর্ব-পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে এসে থেমে যায় নি। নেহরুর মৃত্যুদিনটিকেও অনুভব করা যায়। দুই বংশের মিলনসূত্র যেন এই রায়-পরিবার। মালতী ও হামিদুল্লা। হিন্দু-মুসলমান সবাই মানুষ। অবশ্য কাহিনীকে সৌখিন কোথাও ঘটনার স্ফারা চমকিত করেন নি। আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্য এক-একটি জটিল চিত্রপট চোখের সামনে তুলে ধরে। অসংখ্য জাতি-কুটুম্ব, প্রজা, চাকুরে। অসংখ্য সমস্যা। সমাধানের যোগফল বলিষ্ঠতম। সর্ব দেশ-কুলের সমন্বয়ে সৃষ্টি উপন্যাসটির ভাষায় যেন বাদ আছে। সাধুভাষার প্রয়োগে রায়-বাড়ির গম্ভীরবন শব্দ ধ্বনিত হয়। এ ছাড়া পূর্ববংশের গ্রাম্যকবির কবিতা ও গ্রাম্য ছড়ার ঘটনানুগ উদ্ভূত উপন্যাসটির রস-উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটির অসংখ্য চরিত্র ও বিরাট কাহিনীর আলোচনা স্বল্প পরিচয় সন্তোষ নয়, তবু সেই গুণগরিষ্ঠ অজিত গুণের প্রজ্জ্বলিত আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত।

আজ বসন্ত—আশিস সান্যাল। সেকান্ডার একাল, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-১। মূল্য : তিন টাকা।

‘আজ বসন্ত’ আশিস সান্যালের স্বকীয় প্রতিদ্বন্দী মেঘডব্বরের মতো প্রত্নত হয়। তাঁর প্রতিপ্রত আশার কাব্যজগৎ জীবনের জয়গানেই উজ্জ্বলিত কিন্তু বেদনার এক করুণজন স্পর্শ আমাদের ব্যথিত করে তোলে। আবার রক্ত অভিজ্ঞতার হাসে বলীমান তাঁর কাব্যচেতনা কখনো কখনো আমাদের আন্দোলিত করে তুলতে সহায়তা দান করে। ‘আজ বসন্তের’ দুই পর্বের কাব্যে আছে তারই আভাস, ইংগিত আর আলোড়ন। কাব্যগ্রন্থটির প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম দুর্গম পর্বের ২৭টি স্বরং-

সম্পূর্ণ শব্দ কবিতা, যেন একটি গানের এক-একটি গোলোপফুল। দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ‘আজ বসন্ত’ একটি কাব্যনাটক, যেন জীবন এক রজনীগন্ধার ঝড়। প্রথমার্ধের নামকরণের সঙ্গে সংহতভাবে সংগীত ও প্রগতি লক্ষণীয়। ‘একটি শোকসভা স্মরণে’, ‘আত্মহননের প্রবন্ধ’, ‘আত্মবিলাপ’, ‘ফিরে যেতে বড় ভয়’, ‘ক্লমশ’ অন্তিম দৃশ্য থেকে কবি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন ‘এখনো দুঃখ মেললে’তে। অবশ্য এখানেই শেষ নয়। কৌতুহলী কাব্যপাঠক তারপর নিজেই এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য করবেন যে, যুগযুগান্ত থেকে উত্তরণের জন্য কবির কী অসীম প্রয়াস। ‘আজ বসন্ত’ কাব্যনাটকটি রসসঞ্চিত সার্থক, তবু মণ্ডুর সীমানার এর সার্থকতা সর্বত্র প্রয়োজন।

অনির্বাক—সম্পাদক : রত্নেন্দ্র সরকার। পরিচয় : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইমিং, ১৪, বকিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : তিন টাকা।

জহর-স্মৃতি এই পৃথিবীতে চির অনির্বাকরূপে বিরাজ করবে। তাই যে গ্রন্থ নেহরুর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত তার নাম ‘অনির্বাক’ নিশ্চয়ই সার্থক। আর সার্থকতার এই কারণে যে, গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা নেহরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তরুণ সম্পাদকের প্রচেষ্টাকে যথায়ো উপসাহ যুগিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমতেন বোস। তিনি ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকার মধ্যে তিনি নেহরুমানস বিশ্লেষণ করেছেন। অনির্বাকের যাদের কবিতা সংকলিত ও সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী, রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী এবং একালের তরুণ-দল। রাজনীতির চর্চা করেন এমন দু-একজনও এই সংকলে আছেন। অবশ্য সংকলিত কবিতার অধিকাংশই গোলাপ বিবাজিত না হলেও ব্যক্তিগতাকেন্দ্রিক নয়। জীবনীর ক্ষেত্রে যেমন কবিতার ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ মন হওয়া অধিকতর প্রয়োজন। একাধিক কবিতা, প্রতিটি পৃথকধর্মী তবু তাই নিয়ে ভারতের একমুখবর্তী পরিবার, সেই পরিবারের প্রিয়-পুত্র জহরলাল—রাজনীতিই যার সব নয়। জহরলালকে বুঝতে গেলে এই কবিতাগুলি পড়া দরকার। সম্পাদকের প্রতিবেদন সালিখিত ও সুভাষিত। প্রসংগত সংকলিত কবিতার কবিদের কয়েকজনের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, কুমুদরজন মল্লিক, জয়ীদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত, মনীষ ঘটক, হুমায়ুন কবির, বনফুল, বন্দে আলী মিয়া, বিশু মৃধোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মৃধোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, বাণী রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকুমার রায় প্রমুখ। গ্রন্থটির অলংকরণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সুন্দর। গ্রন্থমধ্যে চিত্রাদীপ্ত নেহরুর প্রতিকৃতিটি প্রেরণাদায়ক। —জয়ন্তী সেন

চালি চাপলিন

তরঙ্গের সের

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

এ উরোমান অভ্যাস : এটি কমেড
মর। চালি এ ছবিতে ছোট্ট একটি ভূমিকায়
নেমেছিলেন। তৎকালীন চিত্রশিল্পের পরি-
চালকেরা এ ছবি থেকে অনেক কিছু শিখতে
পেরেছিলেন। স্থূল বাস্তবতাকে পরিহার করে
কিভাবে সূক্ষ্ম সংকেত এবং হাস্যের দ্বারা
মানুষ ঘটনাকে বোঝানো যায় তা চালিই
প্রথম ব্যক্তির দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পীদের
এবং দর্শক-সাধারণকে এই ছবির মাধ্যমে।
যেমন ধরুন, ম্যারী যখন স্টেশনে অপেক্ষা
করছেন ট্রেন আসবার অপেক্ষায়। সোজাসুজি
ট্রেনটাকে না দেখিয়ে একটা গাড়ির আলোর
খেলা দেখিয়ে ব্যাপারটাকে সুন্দরভাবে ব্যক্তি-
করিয়ে দিলেন চালি। তারপর, ম্যারীকে ম্যাসাজ
করবার দৃশ্যটি—একবারও নম্রগায় অবস্থায়
ম্যারীকে দেখানো হয় নি—পরিচায়িকাদের
হাতের মডেলের ভেতর দিয়ে ম্যাসাজের
ছবিটি পরিষ্কৃত করে তোলা হয়েছে। জাঁ-এর
আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অতি সূক্ষ্মভাবে পরি-
বেশিত হয়েছে—রেস্তোরার ভেতরের লোকেরা
গুলীর আওয়াজ শুনতে পেয়েই ফেলারার
ভেতর জাঁ-এর মৃতদেহ আবিষ্কার করলে।
এ ছবির কাহিনীও লিখেছিলেন চালি।
মার্ক, নার্সিকার ভূমিকায় নামেন এ্যাডলফ
মেজ, এবং এডনা পুর্নভিয়াস। এ্যাডলফ এর
আগে কয়েকটি ছবিতে ছোট্ট ছোট্ট ভূমিকায়
অভিনয় করেন। কিন্তু উরোমান অভ্য-
পারিসে সুন্দর অভিনয়ের জন্য ভবিষ্যতে
আরও অনেক ছবিতে প্রেমিকের রোল তাকে
ডাকা হয়।

ফ্রান্সের একটি গ্রামে গল্পের শুরূ—

গ্রামের মেয়ে ম্যারী—তার প্রেমিকা জাঁ। এক-
দিন বেশি রাতে বাড়ি ফেরতে ম্যারীর
বাপ-মা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।
জাঁ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল কিন্তু
সেখানেও জাঁর বারামা তাকে রাখতে রাজী
হলেন না।

অগত্যা তারা রাস্তার বেরিয়ে পড়ল।
ঠিক করলো ট্রেনে করে অন্য কোনও জায়গায়

চলে যাবে। দু'জনে স্টেশনে এসে হাজির—
এখানে কুলির সঙ্গে কিছুক্ষণ রামারামির একটি
দৃশ্য আছে। এই কুলির রোল অভিনয়
করেছেন চালি।

কিন্তু ট্রেন আসতে তখনও বাকি দেরি।
জাঁ ঠিক করল বাড়ি গিয়ে তার মাল্যপত্র নিয়ে
আসবে। কিন্তু বাড়ি এসে সে মহাবিপদে
পড়ল। দেখে তার বাবা ভয়ানক রকম অসুস্থ
হয়ে পড়েছেন—তখনই তাকে ডাক্তারের খোঁজে
বেরিয়ে পড়তে হোল।

ম্যারী এদিকে তার জন্য অপেক্ষা করে
বেরি বিরক্ত হয়ে স্টেশন থেকে চলে গেল।
এবং ম্যারীর একটি খুব বড়লোক নতুন
প্রেমিক—এ্যাডলফ মেজ—জুটে গেছে।
ম্যারিসের একটি প্রাসাদোপম হোটেলে দু'জনের
দেখা গেল—ম্যারী খুব দামী পোশাকে
সজ্জিত হয়ে এসেছে। এ্যাডলফকে সবাই
বেভাবে আপ্যায়ন করছিল তা দেখেই লম্বা
বোকা যার সমাজে তার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি
আছে।

এর কিছুদিন বাদে ম্যারী কাগজে একটি
বোকা দেখে চমকে উঠল—তাকে জানানোর
হয়েছে একজন ধনী মেয়ের সঙ্গে এ্যাডলফের
বিরের বন্দোবস্ত পাকাপাকি হয়েছে। অতঃ
ম্যারী নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যে তাকেই এ্যাডলফ
বিরে করবে। এই আশ্বাস পেয়ে সে কামার
ভেঙে পড়ল। এ্যাডলফ এসে তাকে সামান্য
দিল যে, এই বিরের জন্য তাদের সম্পর্ক
কোন ভাঙন ধরবে না। আগের মতই প্রেমিক-
প্রেমিকা হিসাবে তাদের জীবন কাটবে। ঐ দিন
সন্ধ্যায় এক শিল্পীর স্টুডিও থেকে এ্যাডলফ
ফোন করে ম্যারীকে জানালো যে, সেই
স্টুডিওতে একটি পাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে
এবং ম্যারী যেন তখনই সেখানে চলে আসে।

স্টুডিওতে আসবার সময় পথ হারিয়ে
ম্যারী অন্য এক শিল্পীর স্টুডিওর এসে
হাজির। কিন্তু এই শিল্পীকে দেখে সে
একেবারে হতবাক হয়ে গেল—তার পূর্বপ্রেমিক
জাঁ-ই হচ্ছে এই নতুন শিল্পী। জাঁর মারের
কাছে অনেক কথা জানতে পারল ম্যারী।
যে রাতে তাদের পালিয়ে যাবার কথা, সেই

মার্টিন জাঁ-র বাবা মারা যান। মাকে নিয়ে জাঁ এখন এখানেই আছে। শিশুপী হিসাবে জাঁ-র প্রচুর নামডাক হয়েছে।

এরপর জাঁ জানালো যে, মারীর একটি পোস্টেট আঁকতে চায়। কি পোশাকে মারী সিটিং দেবে ঠিক করবার জন্য দু'জনে মারীর বাড়িতে এসে হাজির। মারীর ওয়ান্ড্রোব খুলে পোশাক বাছাই করতে গিয়ে সেখানে এ্যাডলফের পোশাক দেখতে পেল জাঁ— ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার একটুও দেরি হল না।

যাই হোক গ্রাম্য পোশাকে সজ্জিত করে মারীর একটি সুন্দর ছবি আঁকল জাঁ।

মারীর সঙ্গে এ্যাডলফের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরেও জাঁ-র মনোভাব বদলালো না। সে তখনও মারীকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল। এদিকে জাঁ-র কথা জানতে পেরে এ্যাডলফও বিরতবোধ করতে লাগল। মারীকে সে বোঝাল বিয়ের বন্ধনে গিয়ে দরিদ্রভাবে কাটানোর থেকে, তার সঙ্গে এই বিবাহ-বন্ধন প্রেমের জীবন কাটানোই সবদিক দিয়ে ভাল। এর ফলে দারিদ্রের দুঃখ-কষ্ট তাকে ভোগ করতে হবে—এম্বেরের ভৈতর শরুণ বিলাসে সে দিন কাটাতে পারবে। মারীর মনটা কিন্তু অস্থির হয়ে ওঠে—অর্থের লোভে যদি প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়, তবে সে এম্বেরে লাভ কি!

এরপর কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্য বিপরীতা প্রথায় এ্যাডলফের এম্বেরে এবং জাঁ-র দারিদ্রের সুন্দর রূপায়ণ করা হয়েছে।

একদিন রাতে এ্যাডলফ এবং মারীকে অনুসরণ করে জাঁ তাদের হোটেলে গিয়ে হাজির। তার সঙ্গে সে নিয়েছে গুলীভরা রিভলবার। সে মারীকে একটা কাগজের টুকরোয় লিখে পাঠাল যে, শেষবারের জন্য সে মারীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। কাগজের টুকরোটা এ্যাডলফকে দেখাল মারী। এ্যাডলফ জানাল এই সাক্ষাতে তার কোনও ক্ষতি নেই। জাঁ এসে ঢুকে এ্যাডলফের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলো। এ্যাডলফ তরুণ পাশের সিটে বসালে—একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলে—তারপর জাঁ লেখা কাগজের টুকরোটা পকেটে ভরলো। হঠাৎ জাঁ তার ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে আক্রমণ করলো। ওয়েটাররা এসে জাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

হোটেলের প্রবেশপথের সামনে একটি কোয়ারা ছিল—জাঁ সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে গুলী করে আত্মহত্যা করলো।

ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে জাঁ-র মা একটি রিভলভার নিয়ে বেরোলেন মারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু কোথাও মারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়িতে ফিরে এসে মারীর মা দেখে তার ছেলের মৃতদেহের ওপর পড়ে মারী ফুলে ফুলে কাঁদছে। এ দৃশ্য দেখে প্রতিশোধের কথা ভুলে

গেলেন জাঁ-র মা। ধীরে ধীরে তিনি মারীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

এর পরের দৃশ্য দেখা যায় জাঁ-র মা আর মারী একসঙ্গে বাস করছে—তাদের বাড়িটা গ্রামাঞ্চলে—সেখানে কয়েকটি অনাথ শিশুকে তারা প্রতিপালন করছে।

শেষটা ভারি চমৎকার। খড় বোঝাই একটা গাড়িতে বসে গান গাইতে গাইতে চলেছে মারী—পাশে বসে একটি অনাথ শিশু। দামী মোটরগাড়ি হঠাৎ পাশ দিয়ে চলে গেল। এই গাড়িতে বসে এ্যাডলফ তার এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলে—মারী বলে যে মেরটিকে তুমি ভালবাসতে, তার খবর কি?

এ্যাডলফ একটা অস্বস্ত ভঙ্গিতে নিজের কাঁধদুটি নাড়া দিয়ে বললে—তার কোন খোঁজই আমি রাখি না।

ফি মোড রাশ : এ উয়েমান অভ প্যারিসের পর এই ছবিটি তুলতে শুরু করেন চার্লি। প্রথমটায় নায়িকার ভূমিকায় নামানো হয় লীটা গ্রেকে। কয়েক হাজার ফিট ছবি তোলার পর লীটাকে বাতিল করে তার জায়গায় নেওয়া হোল জর্জিয়া হোল-কে। আগের তোলা দৃশ্যগুলো সব বাতিল করে দেওয়া হোল। চোদ্দ মাস লেগেছিল এ ছবিটি তুলতে। চার্লি খোঁষণা করলেন—

“This is the film I want to be remembered by.”

চার্লি'র এই উক্তি থেকে খুব সিরিয়াসলি না নিলেও চলে। কারণ এই একই কথা তিনি বলেছিলেন, ‘দি কিড’ এবং ‘মার্সিয়ে ভাদু’ ছবিগুলো তোলার পর। তাছাড়া ছায়াছবির দর্শকেরা তাঁকে কখনও ভুলে যাবে সে কথাও মনে হয় না।

ছবির নামকরণে খানিকটা গলদ আছে। কারণ—

“There is very little about rushing after gold.”

ছবির আরম্ভে দেখা যায় তুমারে ঢাকা পাহাড়ে পথ দিয়ে একদল গোল্ড ডিগার্স চলেছে সোনার সন্ধানে। ব্যাপারটা হচ্ছে ১৮৯৮ সালে। এই দলের সবচেয়ে পেছনে রয়েছেন চার্লি—হাতে তাঁর ছড়ি। চলতে চলতে এক খাদের ভেতর পড়ে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেলেন। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখেন এক ভয়ানক ব্যাপার—একটা বিরাট ভয়ঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। তাড়া-তাড়ি নিচের দিকে নামতে গিয়ে হাত ফসকে গেল—গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়লেন চার্লি। কিছুক্ষণ বাদে ভীষণ বড় উঠল। আর সে কি হাওয়ার দাপট। অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা কাঠের তৈরি ঘর দেখতে পেলেন। কিন্তু ভেতরে লার্সেন নামে একটা লোক আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা একটা জারেট—সে চার্লিকে হুকুম করলো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে।

কিন্তু কড়ের দাপটে ঘর থেকে বেরোবেন কি—এক-একবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান চার্লি, আর অমনি হাওয়ার ধাক্কায় ভেতরে ছিটকে পড়েন। এরপর আর একজন বিরাট আকারের লোক, বীগ জিম মাকে, হাওয়ার বেগে প্রায় উড়ে এসে ঘরের ভেতর গড়ল। এদিকে লার্সন এদের তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। খেই সে কয়েক পা এগিয়েছে অমনি হাওয়ার ধাক্কায় ছিটকে পড়ল বাইরে—তার পরে এক মজার দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে—তিনজনেই হাওয়ার ধাক্কায় বাইরে গিয়ে পড়ে, আবার কোনমতে সামলে ঘরে এসে ঢোকে।

লার্সন ভীষণ রেগে গিয়ে বন্দুক উঠিয়ে তেড়ে এল—কিন্তু গুলী করবার আগেই বীগ জিম তার ওপর বাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে কিছুক্ষণ ধনুসধনুসি চলে আর বন্দুকের নলটা চার্লির দিকে আসে—চার্লি এদিক থেকে ওদিক করছে, আর নলটাও সমানে তার দিকে ঘুরছে। এ দৃশ্য অভিনেত্রীরা হাঁসির হুন্সোড় বইয়ে দেয়। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলীর আওয়াজ হল—চার্লি তো শব্দ শুনে চিপচিপ—তার মনে হোল তাঁকেই গুলী করা হয়েছে এবং তিনি মারা গেছেন। কয়েকবার মাথা নাড়ায় দিয়ে, গায়ে চিমটি কেটে তবুও নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনি মারা জান নি। বীগ জিম ততক্ষণে লার্সনের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছে—সেই এখন কেবিনটার মালিক। সুতরাং তাকে খুঁশি করবার জন্য চার্লি খুব নম্রভাবে তার যত ফাইফরমাস খাটতে লাগলেন।

এইভাবেই আরও কয়েকদিন কাটে—বড় সমানেই চলেছে এবং তুমারপাত হচ্ছে। কেবিনে সবাই বন্দী, খাবারও ফুরিয়ে এসেছে—কিন্তু বাইরে খাবার উপায় নেই। খিদের জ্বালায় একটা মোমবাতির ওপর নুন ছিটিয়ে সেটাকেই চিবাতে লাগলেন চ্যাপলিন। পরের দিন ঠিক করা হোল লটারী করে যার নাম উঠবে তাকেই বাইরে গিয়ে খাবার যোগাড় করে আনতে হবে। লটারিতে লার্সনের নাম ওঠতে এই বড়-বৃষ্টির ভৈতরও তাকে বেরোতে হল। এদিকে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং তাকে রাস্তার দেখতে পেয়ে ধরতে এল। বন্দুক চালিয়ে তাদের ভয় দেখিয়ে তাদেরই স্লেজে চড়ে পালিয়ে গেল লার্সন।

ওদিকে লার্সনের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে খিদের জ্বালায় পাগলের মত হয়ে উঠেছেন চার্লি এবং বীগ জিম (মাকে সোয়ান)। শেষকালে তারা ঠিক করলো চার্লির এক পাটি জুতো রাস্তা করে খাবেন। এই দৃশ্যটির কোন তুলনা হয় না।

পাত্রের ভেতর জুতোটি ভরে উনুনে চ্যাপরে দিলেন চার্লি। মাঝে মাঝে রাস্তা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য চোখে নিতে লাগলেন। জুতোটি রাস্তা করে দু'ভাগ করে কেটে দু'টি ভিংশে সাজিয়ে দেওয়া হল। হাতায় করে তার

ওপর প্রেতা চাললেন—জুতোর মোলের দিকটা মিলেন বীগ্ জিমকে এবং ওপরের নরম অংশটা নিজের জন্য রাখলেন চ্যাপলিন। বীগ্ জিম তখন ডিশ দুটো বদলে নিলেন—অগত্যা চার্লি জুতোর সেলাটাই খেতে শুরু করলেন। এই খাবার ব্যাপারটা খুব পরিপাটিভাবে দেখানো হয়েছে। রবার্ট পেইন বলেছেন :

Big Jim settles for the uppers. Charlie is perfectly content with the sole, sucks the nails and the laces, and finding a nail shaped like a wishbone offers to break it with Big Jim.

পরের দিনও বাইরে বেরিয়ে কোনো খাবার ভোগাড় করতে পারলেন না চার্লি। বাকী দুটোটা রান্না করে খেতে বসা হোল—খেতে খেতে বীগ্ জিম উদ্ভাবন হয়ে গেল—তার মনে হতে লাগলো তার সামনে যে বসে আছে সে চার্লি নয়, একটি মোটোসোটা মুরগী। মুরগীকে ধরবার প্রচেষ্টা এবং চার্লির আশ্চর্য্যকর জন্য নানাধরনের কসরৎ দৃশ্যটিকে খুবই জমিয়ে ফেলে। বীগ্ জিম এবার বন্দুক নিয়ে চার্লিকে তাড়া করলো—চার্লি বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বীগ্ জিম। চোখে-মুখে তাঁরা হাওয়ার বাপটা লাগায় বীগ্ জিমের জ্ঞান ফিরে এল—এবার সে বৃকতে পারলো এতক্ষণ মুরগী ভেবে চার্লিকেই মারতে গিয়েছিল।

এরপর দুজনে একই বিছানায় শুয়ে পড়লো তারা। এইবার ঘরে এসে ঢুকলো একটা ভক্ত। বন্দকের গুলিতে সেটাকে মেরে ফেললেন চার্লি—এ না হলে আবার চার্লির বিপদ আসছিল—কারণ বীগ্ জিম শূন্যে শুয়ে ভাবছিল চার্লিকে খেয়ে নিলেই তো খিদের জ্বালা কমানো যায়। ভক্তকটা মারা যাবার পর সেটাকে কাটবার জন্য চার্লি ছুরি শানাতে লাগলেন।

বড় খেমে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে চার্লি এবং জিম দুজনে দ' পথে চলে গেলেন। চার্লি এরপর এক শহরে গিয়ে হাজির হলেন। এখানে একটি নাচঘরে সুন্দরী জর্জিয়া হেলের সঙ্গে দেখা। জর্জিয়া ক্যাবারে সিঙ্গার। চার্লির মনে হোল মেরেটি তাকে দেখে হাসল—চার্লি জানান্দে মশগুল হয়ে উঠলেন। আসলে কিন্তু সে চার্লির পেছনের লোকটিকে দেখে হেসেছিল। চার্লির মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

এরপর কাছাকাছি একটি ক্যাবিনে চার্লি আশ্রয় নিলেন। ভাগ্যবশত একদিন চার্লির ঘরের সামনে জর্জিয়া এবং তার বাম্বাধীরা স্নো-বল নিয়ে ছোড়াছড়ি খেলাছিল। জর্জিয়ার হাত থেকে একটি বল ছুটে এসে চার্লির মূখে আঘাত করল। তারা চার্লির কাছে জমা চাইল এবং তিনি জর্জিয়া এবং তার

বন্ধন সন্ধিনকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। চার্লি এবার জুলালানিকটে আনতে বাইরে গেলেন। জর্জিয়া তাঁর বালিশের তলা থেকে নিজের একটা পরিত্যক্ত ছবি আবিষ্কার করলো। সে বৃকতে পারলো চার্লি তার প্রতি অনুরক্ত এবং পরে যখন চার্লি তাকে এবং তার সঙ্গিনীদের আমন্ত্রণ জানালেন নিউ-ইয়র্ক ভিনারে তাঁর ক্যাবিনে এসে নৈশ আহার করতে তখন জর্জিয়া এমন মর্শ্চিভাবে হাসলো, যে চার্লি নিশ্চিত হলেন যে, তারা তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে।

কিন্তু এদের যে খাওয়াবেন, তার টাকা আসবে কোথা থেকে। অনেক কষ্টে কিছু টাকা শেষ পর্যন্ত যোগাড় হোল। পার্টির উদ্যোগ আয়োজনে লেগে গেলেন চার্লি। একটা খবরের কাগজ কেটে কলরঙা টেবিল ক্রথ তৈরি করা হোল—ছুরি, কাটা সব পরিষ্কার করে একটা নড়বড়ে টেবলের ওপর সাজিয়ে রেখে মুরগী রান্নাটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা একবার দেখে নিলেন চার্লি। এরপর নব-বর্ষের প্রজেক্টগুলি গুছিয়ে রাখলেন।

হঠাৎ দরজার ধাক্কা—নিচয় ওয়াই এসে গেছে। দরজা খুলতেই একটা গাধা ঘরে ঢুকে সব ওলোট-পালট করে দিলে। অনেক কষ্টে সেটাকে বের করে দিয়ে দরজা আটকে দিলেন চার্লি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল—জর্জিয়ার আসছে না। চার্লি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন জর্জিয়ার এসেছে—ওদের আনন্দ দেবার জন্য কাঁটার মাথায় ক্রিম-রোল গাঁধে নিয়ে ফর্ক নৃত্য শুরু করলেন চার্লি। গোল্ড রাশের এটি একটি সেরা দৃশ্য। ঘুম ভেঙে গেল। না, ঘরে কেউ নেই।

এরপর পথে বেরিয়ে এলেন চার্লি। নাচ-ঘরের সামনে এসে জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন—জর্জিয়া সেখানে তার বন্ধুদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত। ওয়া তাঁর কথা ভুলে গিয়েছে। ওখান থেকে আবার চলে এলেন রাস্তায়—চার্লিকে ভুয়ার পড়ছে, ভয়ানক শীত, পথে পথেই ঘরে বেড়াতে লাগলেন চার্লি।

জর্জিয়ার এদিকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল চার্লির কথা। তাড়াতাড়ি চলে এল চার্লির ক্যাবিনে, দেখলো তাদের আসবার কথা ভেবে সবকিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন চার্লি—তারা না আসাতে শেষে হতাশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। মনটা অনুশোচনায় ভরে গেল।

এরপর চার্লির আবার বীগ্ জিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনে সোনার সম্মানে বের হলেন। আবার লাসেনের সেই ক্যাবিনটায় এসে উঠলেন। এবার আর খাবারের ভাবনা নেই—অনেক খাবার রয়েছে তাদের সঙ্গে। আবার বড় উঠলো। এখানে খুব মজার দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। কাড়ের ধাক্কা ধাক্কা কাঠের ক্যাবিনটা প্রায় খাদের কিনারায় এসে পড়েছে। চার্লি কিন্তু কিছুই বৃকতে পারেন নি—তাঁরা ভাবছেন

বৃক্শস্য ভাঙে তাঁরা মনে করছেন মরুটা মূল্যহীন। কোনো রকমে শেষে যখন দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা পড়লো নিচের গভীর খাদে।

শেষ দৃশ্য দেখানো হয় চার্লিরা দুজনে আমেরিকা ফিরছেন জাহাজে করে। তাঁরা সোনার খনি আবিষ্কার করে এখন খুব বড়-লোক হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এত সহজে আগেকার স্বভাব বদলাবেন কি করে। একজন বাহী তাঁর সিগারেটে শেষবার টান দিয়ে সেটা ফেলে দিলেন। অমনি চার্লি বাট এন্ডট নিয়ে আরাম করে ঘুমপান করতে শুরু করলেন।

এরপর খবর কাগজের ফোটোগ্রাফারেরা চার্লির ছবি তুলতে এল—ভয়ে পেছিয়ে যেতে গিয়ে চার্লি পিছলে পড়ে গেলেন নিচের ডেকে—যেখানে পড়লেন তার পাশেই বসে রয়েছে জর্জিয়া। এই জাহাজেরই অল্প ভাড়ার ডেক-প্যাসেজার হিসাবে দেশে ফিরছে জর্জিয়া। সাংবাদিকেরা এসে চার্লিকে জর্জিয়ার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে চার্লি বললেন—ইনি আমার ভাবী স্ত্রী।

রবার্ট পেইন বলেছেন :

"The Gold Rush has only one imperfection, and that is its ending. For the rest of the world which Chaplin conjured out of the snows is terrifyingly real. The very simplicity of the snow scenes gives dimension to Charlie. To have placed the wildest comedy against the snowfields was a mark of genius, for in the field of the cinema this was the equivalent of playing out a comedy on the stage without props; and with only a single white sheet as a back-cloth. This is comedy naked, and set in the white fields of eternity."

দি সাক্স : ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ছবিটি মুক্তিলাভ করে—অর্থাৎ গোল্ড রাশ ছবি বাজারে আসবার প্রায় আড়াই বছর বাদে। চার্লি যে একবার না একবার সাক্সাস পার্টি সহ ছবি করতে নামবেন এতো একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ সাক্সাস যেসব ফ্যাকাশে মুখওয়ালা ক্রাউনেরা রিং-এর এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায় তাঁরা তো চার্লির একরকম জাতভাই। যৌবনে চ্যাপলিন একবার স্ট্র্যাপিজ-আর্টিস্ট হবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু একদিন দাঁড়ির ওপর থেকে পড়ে যাওয়াতে তাঁর সাক্সাসে কাজ করবার সম্ভাবনা মিটে যায়। চ্যাপলিন হিসাবে যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, জীবিতে চার্লি হিসাবে

সেই সবটাই মিটিয়ে নিশেন দি সার্কাস হ'ল তুলে। রবার্ট পেইন বলেছেন :

The Circus is the most homogeneous and the most deftly constructed of all Chaplin's films. It obeys the classic unities. It tells a single story in a single place at a single time.

কাহিনী বলতে বিশেষ কিছু নেই এ ছবিতে। তবে অনেক মজার মজার ঘটনা দেখানো হয়েছে। যেমন—পকেটমারের হাত লাফাই করে লুটেরি মাল চার্লি'র পকেটে ভরে দেওয়া এবং এ নিয়ে তার নানারকমে বিপদে পড়া ও শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাত থেকে মুক্তিলাভ। অথবা দর্শকদের দ্রুত ধারণার জন্য বাধ্য হয়ে চার্লি'র সার্কাসের ক্লাউন হওয়া, বা—আসল ট্র্যাপিজ-আর্টিস্টের অনুপস্থিতিতে দড়ির খেলা দেখাতে বাওয়া এবং বিপদ এড়াবার জন্য অদৃশ্য ভারের বান্ধন খাটানো—সেই তার আত্মা হয়ে যাওয়ার চার্লি'র বিপদ ইত্যাদি। সিংহের ঘরে ঢুকে পড়বার দৃশ্যটিও অতি মজাদার। সার্কাসের মালিকের স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেরে মাথা কেনেডি—সে ঘোড়ার খেলা দেখায়। চার্লি তার প্রেমে পড়লেন—কিন্তু সেই রকম এসে এই দলে যোগ দিল দড়ির খেলা দেখাবার জন্য মাথা তার দিকে ঝুঁকে পড়লো।

বেশ দৃশ্য দেখানো হয়েছে যে, চার্লি'রই সাহায্যে রেক্স এবং মাথার বিয়ে হয়ে গেল। সার্কাসের দল তাঁর উঠিয়ে গাড়িতে গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করে অন্য জায়গায় যাবার জন্য রওনা হল।

চার্লি কিন্তু তখনও সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন—সার্কাসের দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক তাঁর চুকে গেল। ব্যর্থ প্রেমের হতাশা করুণভাবে ফুটে উঠল—তার স্ব-চোখের ভঙ্গিতে। রবার্ট পেইনের মতে—

The Circus is the only Chaplin film where the setting is wholly credible.

সিটি লাইটস : ছাত্রছাত্রীর অভিনেত্রী পরলোকগতা বিখ্যাত জীম হালোর নাম সবাই পরিচিত। সিটি লাইটসে ছোট একটি ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন—তখন তাঁর কোনো বয়স বা খ্যাতিও হয় নি—সে সময় তাঁর নাম ছিল জীম পোপ।

লক্ষ্যের উইথ টিয়ারের পরম পরিষ্কৃতন হয়েছে এই ছবিতে।

ছবির শুরু একটি ছোট শহরে—একটি জনসভার দৃশ্য দিয়ে বই আরম্ভ হয়েছে—লোকজন জমায়েত হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভের আবেশ

উদ্দেশ্যে। এক ভুলোকে বক্তৃতা দিতে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে সর্গাও রেখে ক্রমাগত স্যারোফোন বেজে যাচ্ছে—ভুলোকের মুখ থেকে কথার পরিবর্তে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে আসছে—এখানে সবকিছুই পরিহাস করেছেন চার্লি।

আবরণ সরিয়ে নেওয়া হলে দেখা গেল তিনটি মূর্তি—মাকেরটি নারীর, আর তার দুপাশে দুটি পুরুষের—একজন পুরুষের হাতে একটি তরোয়াল। ঢাকনা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে। কারণ দেখা যায় নারীমূর্তিটির কোলে শূন্যে ঝুলে আছে ভবঘুরের পা চাপলিন। চাপলিন ভেবেছিলেন এইখানে বেশ নিরিবিলাতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবেন—একটু বাদেই যে এখানে জনসভা হবে তা তার জানা ছিল না। যাই হোক দর্শকদের হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এবং ডাড়াডাড়াই সরে যেতে গিয়ে চার্লি গিরে পড়লেন পুরুষ মূর্তিটির তরোয়ালের উপর। আবার হাসির হুলোড় উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নিচে নেমে এলেন চার্লি।

এ বইতে আরও অনেক মজাদার হাসির দৃশ্য আছে। যেমন—খবরের কাগজের হকারের সঙ্গে চার্লি'র দৃশ্যটি, লিকিটের দৃশ্য বা ট্র্যাপিজ পলিলকে থোকা দেবার জন্য রাস্তার দাঁড়ানো বিরাট গাড়িটির এক দরজা দিয়ে ওঠা এবং অন্য দরজা দিয়ে নেমে যাওয়া। গাড়িটি থেকে নেমেই চার্লি গিরে পড়লেন এক অশ্লীল ফুলওয়ালীর সামনে। গাড়ির দরজার আওরাজে অশ্লীল মেরেটি ভেবেছে গাড়ি থেকে কোন বড়লোক নামলেন। ফুলের পাত্র নিয়ে সে চার্লি'র সামনে দাঁড়ালো—ভারি দৃষ্টি হোল চার্লি'র এই অশ্লীল মেরেটিকে দেখে। পকেটে তাঁর শেষ সন্কল একটি মাত্র ডলার। সেইটাই বের করে ওর হাতে দিয়ে দিলেন। তারপর তার পাশে গিরে বসলেন—মেরেটি কিন্তু বৃকতে পারে নি। একটা জলের বালতি খালি করতে গিরে সে চার্লি'র মাথার উপর উল্টে ধরল। চার্লি'র সমস্ত কাপড়-জামা ভিজ গেল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেখানে থেকে উঠে গেলেন।

এরপরে একটি অত্যন্ত মজার দৃশ্য। নদীর ধারে একটা ফুল হাতে চার্লি ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মাঝে মাঝে ফুলের গন্ধ শুকছেন। হঠাৎ এক বিরাট ধনী লোক ভীষণ মাতাল অবস্থায় সেখানে এসে হাজির। তার মাথার চেপেছে সে আত্মহত্যা করবে। গলার একটা দড়ি বেঁধে, অন্যদিকে এক বিরাট পাথরের সঙ্গে দড়িটা জড়িয়ে লোকটি কাঁপিয়ে পড়তে গেল নদীতে—চার্লি এসে বাধ্য দিলেন। এই দৃশ্যে বেশ হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে।

এরপর দুজনে মিলে ওই কোর্টপাতি

বাড়িতে ফিরলেন। সেখানে গিরে আবার মদ্যপান চললো। দুজনেই এবার বেশ মাতাল হয়ে উঠেছেন। ধনী লোকটির আবার আত্মহত্যা করবার সাধ জেগে উঠল—এবার বন্দুকের গুলীতে। তাকে অনেক বাকিয়ে-সুকিয়ে চার্লি বললেন, চল বেড়িয়ে আসা যাক। এক নাইট ক্লাবে গিরে ঢুকলেন চার্লি আর সেই কোর্টপাতি। নেশার প্রভাবে চার্লি'র তখন এমন অবস্থা যে মেনুটাকে নিয়েই তিনি গান করতে শুরু করে দিলেন। বড়-আর চার্লি তখন এসে আগুন ধরিয়ে দেন লোকবন্দুটি মুখে এক-একটি চুরুট নেন তাতে—মত্ত অবস্থাতেও চার্লি'র এ খেয়াল আছে যে, এই ধনী লোকটিকে খুশি রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।

খেতে বসে স্প্যাঘেটির সঙ্গে খানিকটা কাগজের শিকলি খেয়ে ফেললেন চার্লি। এসব দৃশ্যগুলোতে যে কি অনাবল হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে তা না দেখলে বোঝানো যায় না।

সারারাত ফাঁতিতে কাটিয়ে ভোরের দিকে নেশা ছোটার পর সেই ধনী লোকটি কিছু চার্লিকে আর চিনতে পারলেন না। পরের রাত্তি আবার বন্দুর সঙ্গে দেখা—সে তখন পুরো মাতাল। সুতরাং চার্লিকে চিনতে তার অসুবিধা হোল না—তাকে নিয়ে আবার নাইট ক্লাবে গেল। এ রাত্তি যা কিছু হাসির দৃশ্য দেখানো হয়েছে তার মূলে রয়েছে চার্লি'র হুইসল গিলে ফেলার ব্যাপারটা।

নাইট ক্লাব থেকে ফিরে বন্দুর বাড়িতেই রাত কাটল—বন্দুর বিছানাতেই দুজনে পাশাপাশি শুলেন। পরদিন সকালে উঠে সেই একই বিপদ—বন্দু তাকে তো চিনতেই পারলো না—তারপর চাকরদের ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দিল।

এদিকে সেই ফুলওয়ালী মেরেটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ডাক্তারের কাছে চার্লি শুনলেন যে চিকিৎসা এবং সেবার জন্য টাকা দরকার। টাকা কোথায় পান? চার্লি একটি কাড়মারের কাজ জুটির নিলেন। যে পরসা রোজগার করেন তাই দিয়ে মেরেটির জন্য এটা-ওটা কিনে আনেন।

একদিন কাগজে একটা খবর বেরোল। ভিয়েনাতে নাকি একজন চিকিৎসক আছেন যিনি অশ্লীল ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন। মেরেটি তো এ খবর শুনে মহা-খুশি। চোখ ভাল হয়ে গেলে আর কিছু না হোক চার্লিকে সে দেখতে পাবে।

চার্লি জানেন মেরেটি যখন তাঁকে দেখবে তখন সে কি রকম শক পাবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—তাকে ভাল করে তুলতেই হবে। কিন্তু অত টাকা পাওয়া বাবে কোথায়? এরপর চার্লি ঠিক করলেন বন্ধু করবেন—কারণ বন্ধু-এ হেরে গেলেও অনেক টাকা পাওয়া যায়।

সংগীত

সঙ্গীত সাম্মলনার গতি-প্রকৃতি

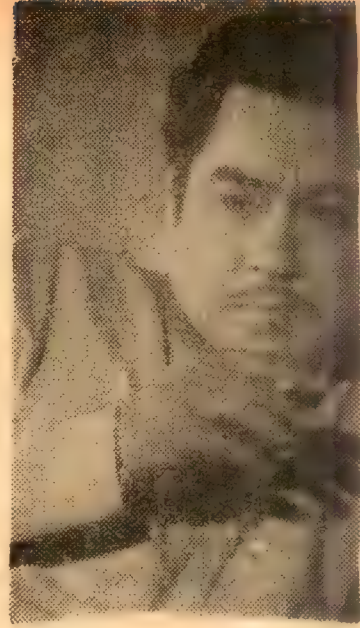
শীতের মরশুমে সংগীতের জলসা জমে উঠে। কয়েক বছর আগে দেখা যেতো প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে রাত জেগে শীত অগ্রাহ্য করে গান শুনছেন। সেসময় ভারতের বিখ্যাত শিল্পীরা উপস্থিত থাকতেন। বিভিন্ন রাজ্যের বিখ্যাত শিল্পীদের গায়কী ও বিভিন্ন ঘরোয়ানার পরিচয় লাভ করবার জন্য শ্রোতারা উৎসুক থাকতেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সংগীতধারা ও বিভিন্ন ঘরোয়ানার সান্নিধ্যে আসার এই ছিল অন্যতম সুযোগ। এ ধরনের সংগীত সাম্মলনার ফলে বাংলার সংগীত-জগৎ উপকৃত হয়ে এসেছে। সংগীত শিক্ষার্থীরা উৎসুক হয়ে থাকতেন এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য।

এখন আর সে অবস্থা নেই। শহরের পাড়ায় পাড়ায় সংগীত সম্মেলন হচ্ছে। গায়ক নির্বাচনে আজ আর বিশেষ কোন মানের পরিচয় পাওয়া যায় না। দু-চারজন বড় বড় শিল্পীকে সামনে রেখে আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ফিল্মী গানের আসর বসে। কোন কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঘটা করে বোম্বাইয়ের ফিল্মী গায়কদের ও অভিনেত্রীদের হাজির করেন। তাঁদের নামের প্রচার জোলাসে শহরের প্রাচীর ভরে যায়। সিনেমায় যাদের 'দিল' এর গানে ছবি হিট হয়; এসব জলসায়ও তাদের অনুরাগীরা এসে ভিড় করেন। অভিনেত্রীরা নাচের দিক থেকে ষেরূপ নিন্মমানের হোন না কেন, সিনেমায় যেমন দেহসর্বস্ব, এসব অনুষ্ঠানেও দেহের লালিত্য দেখার জন্য দর্শক আকর্ষণ করেন। আজকালকার সংগীতের জলসায় আরও একদল শিল্পীর পর্যায়ে স্থান লাভ করে, যাদের বাবা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছে। তাদের অনেকে হয়তো নাচ বা গানের স্কুলে পাঠ শেষ করে নি, কিন্তু তাদের মুখস্থ-করা গান বা নাচ দর্শকদের দেখতে হয়। কারণ দর্শকরা টিকেট কিনে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছেন, এবং শেষের দিকে প্রধান শিল্পীদের গান শোনার জন্য তাঁরা ধৈর্য ধরে ঘসে আছেন।

জমিদার ও ধনীদেব হাউস থেকে বৈদ্যুতিক ক্রাসিক্যাল সংগীত জনতার আসরে উপস্থিত হতে পেরেছিল সৈদীন সকলেই আনন্দিত হয়েছিল। মনে হয়েছিল সাধারণ মানুষের ভারতীয় সংগীত উপলব্ধির পথ সুগম হলো। কিন্তু তখন কে জানতো যে সংগীত নিয়েও এমন ব্যবসা চলতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে আজকাল সংগীতের জলসাগরুল একদল ব্যবসায়ীর কৃষ্ণগত। ভারতীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার নামে তাঁরা দু-পয়সা আয় করার, সমাজে নিজদের জাহির করবার এবং শাসকবর্গের সান্নিধ্যে যাবার ফিকির খোঁজেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে দেখা যায় উদ্বেগজনক কোন মাননীয় মন্ত্রী, অথবা মন্ত্রীদের উপরে শক্তির কোন কৃতি ব্যক্তি। তিনি সংগীতের প্রতি উৎসাহী বা সমর্থদার না-ও হতে পারেন। সেই মুহূর্তেই হয়তো দেখা যায়, সংগীত-শাস্ত্র পারদর্শী বা সুপণ্ডিত শিক্ষারতী শ্রোতার আসনে বসে ভরসিকের কাছ থেকে রসের নিবেদন শুনছেন। আমন্ত্রণ-পত্রের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবেন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং বিশেষ করে কটি সরকারী মহল। কারণ এরা বিরূপ হলে সম্মেলনের জের কিছুটা বেশিদূর গড়াতে পারে। এ ছাড়া সাংবাদিকদের হাতে না রাখলে চলে না। প্রচার না হলে টিকেট বিক্রি হবে কি করে! তবে সাংবাদিকদের খাতির কাগজের প্রচারসংখ্যা অনুযায়ী। আজকাল আরও দেখা যায়—অনেক সংগীত সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতির আসনে বসে আছেন অবাঙালী একচেটিয়া ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর লোক। খাদ্যে, বস্ত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাদের শক্তি আমরা নিদারুণভাবে অনুভব করি। ভাগ্যের পরিহাস, এদের আজ সরস্বতীর কমলবনে বিচরণ করতে আহবান জানানো হয়েছে।

অবশ্য শহরের সকল সংগীত সাম্মলনার চরিত্র এরূপ নয়। ভারতীয় ক্রাসিক্যাল সংগীতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও মহৎ আদর্শ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এমন সংস্থাও আছে। নিষ্ঠাবান সংগীতানুরাগীরা এখনও কয়েকটি অনুষ্ঠানকে ব্যবসায় স্বার্থের উদ্দেশ্য রাখতে পেরেছেন।

—সুজন।



কিশোরকুমার

চিত্র-সমালোচনা

এটুকু ছোঁয়া লাগে

(সরকার প্রোডাকশন : কমল মজুমদার)

বাংলা ছবির পালে রীতিমত বোম্বাইয়ের হাওয়া লেগেছে। কিন্তু আঞ্চলিক দর্শকরা এই হাওয়ার বেগ সামলাতে পারবেন কিনা, এটাই চিন্তার কথা। এক ত্রিকোণমাত্রিক প্রেম কাহিনীতে যারা রূপ দিয়েছেন তাঁরা তিনজনই বোম্বাইয়ের শিল্পী। এই তিনজনের মধ্যে একা কিশোরকুমারই একল হয়ে দর্শকদের তৃপ্ত করতে চেষ্টা করেছেন। এবং দর্শক মাঠই তাঁর প্রশংসা করবেন। বাকি দুজনের কথা না ভোলাই ভাল। শ্রীমতী আজহার তো এখনো বাংলা রস্তু হয়নি। কিশোর কুমারের মত শক্তিশালী অভিনেতার কাছে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন।

এই তিনটি প্রধান চরিত্রের কথা দিয়ে শুরু করলাম এ কারণে, এখানে বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে চরিত্র সৃষ্টি হয়নি এবং কাহিনী আসেনি; তিনজন শিল্পীকে ব্যবহারের প্রয়োজনে কাহিনী গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সেই কাহিনীকে বাস্তববোধ দিয়ে বিচার করলে, তা অবিশ্বাস্য এবং কাল্পনিক। হিন্দু ছবির ছাঁচে ঢালা। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তায় বাস্তববোধ যেমন নেই, কাল্পনিক কাহিনী গঠনেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। এই আবাস্তবতার ভিত্তির উপর পরিচালকের আঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।



হিন্দী ছবি 'আরজ'-র একটি দৃশ্য রাজেশ্বরকুমার ও সান্না

পরিচালক কমল মজুমদার পূর্বে একটি মজাদার ছবি (লোকচুরি) নির্মাণ করেও এক্ষেত্রে তেমন সন্নিবিধা করতে পারেননি। তাঁর প্রধান অন্তরায় চিত্রনাট্য।

কাহিনীর দুই নায়ক বেকার বন্ধু— একজন লেখক, আর একজন গায়ক। বাড়ি-ওয়ালা ওদের মত দিলদারিয়া। ভাড়া পায় না, ভবু চা খাওয়ায়, স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলে ওদের ধমক দেয়। তাদের আভ্যার এসে পড়লো পুরুষের ছদ্মবেশে এক তরুণী। সে বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু মায়ের নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে চায় না বলে পালিয়ে এসেছে। যে রকম টাইট পোষাক পরে এসেছিল তাতে দর্শকরা তার দেহের কাঠামো দেখে নাকী বলে চিনতে পারলেও গল্পের স্বাভাবিক দুই বন্ধু চিনতে পারলো না। রাগে অবশ্য ওরা বুদ্ধিতে পারলো সে আশ্রিত এক তরুণী। তারপরে এক তরুণী, দুই তরুণ, তিনজনের খুব বন্ধুত্ব। মেয়েটির রূপের দৌলতে এক থিয়েটারে তিনজনেরই কাজ হয়ে গেল। তিনজনেই তিনজনকে ভালবাসে। মেয়েটিকে ভালবাসা নিয়ে দুই বন্ধু বিগড়ে পড়েছে। দুজনেই চায় তাকে ভালবাসতে। আবার দুজনেই একে অন্যের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে চায়।

মেয়েটি আরো উদার। এই উভয় সংকট থেকে বাঁচবার জন্য সে থিয়েটারের মালিককে বিয়ে করার প্রস্তাব করে। এ সময় দুই বন্ধুই তাকে ভুল বোঝে। এবার সে বাড়ি ফিরে গিয়ে মায়ের নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে রাজী হয়। বিয়ের যখন সানাই বাজছে তখন কিশোর এক সাজানো বো নিয়ে এসে উপস্থিত। এতে দুজনেই বেন মৃত্তির

চাল পেলো। সে ছুটে গেল বিশ্বজিভের কাছে। চরিত্রের উদারতা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির উপাখ্যান এভাবেই শেষ হয়েছে।

ছবিতে যে সব চরিত্র উপস্থিত হয়েছে তারাও কাহিনীর মেজাজের অনুরূপ। থিয়েটারের মালিক, নির্বাচিত পাত্র ইত্যাদি চরিত্রগুলিতে খারাপ অভিনয় করেছেন তাঁরা বোম্বাইয়ের ছবিতে অভিনয় করতে অভ্যস্ত। সেভাবেই রূপ-রস ফুটিয়ে তুলেছেন।

পরিচালক মাঝখানে একটি ছায়ানাট্য সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু এই ছায়ানাট্য রূপান্তর দিক থেকে যেমন স্পষ্ট নয়, তেমন তার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য পরিষ্কৃত হয়নি। এই অংশ বাদ দিলে ছবির উপভোগ্যতায় কোন অসন্নিবিধা হবে না। 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' ছবিতে কিশোরকুমারের হাস্যকর অভিনয়ের পাশে গানগুলিই একমাত্র উপভোগ্য।

ফারার

(গীতাঞ্জলি পিকচার্স,
পিনাকী মুখার্জী)

নীল আকাশের নীচের পর হেমন্ত মুখার্জী হিন্দী ছবি প্রযোজনার মনোনিবেশ করেছেন। প্রতি বছর তিনি একটি করে হিন্দী ছবি প্রযোজনা করেন। বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি অপরাধমূলক কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ফারার' বাংলা ছবি 'রক্ত পলাশ'-এর হিন্দী চিত্ররূপ। বাংলা এবং হিন্দী ছবির পরিচালক একই ব্যক্তি রয়েছেন। আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার

বী 'পলাশ'-এর চিত্র-বিশৃঙ্খিত ছিল বড়। শহরের জীবন থেকে জাহাজঘাটার জাহাজ পর্যন্ত। ক্রাইম ছবির সাসপেন্সের সঙ্গে এই বিশৃঙ্খিত দর্শকদের মগ্ন করছিল। 'ফারার' ছবিতেও প্রায় একই পটভূমিকা রয়েছে।

শেখর এক গৃহস্থ চোরাই কারবারি দলের সঙ্গে যুক্ত। আহত অবস্থায় তাকে আশ্রয় দিয়ে নো-অফিসার শঙ্কর তার বোন নীলার সাথে পরিচিত হয়। এবং প্রথম দর্শনেই দুজনার প্রেম হয়। যাওয়া আসার মধ্যে ডাকু নামক এক কিশোরের সাথে শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। শেখর নিজের বোনকে তার চোরাই চালানের কাজে নিয়োগ করলে তা নিজে শঙ্করের সঙ্গে কচসা থেকে ধস্তাধিস্তিতে পরিণত হয়। শেখর রিভলবার বার করে এবং সেটি নিয়ে কাড়াকাড়ির এক মহাত্মে নিজের অস্ত্র নিজে নিহত হয়। ফেল-যাওয়া একটি লাইটারের সূত্রে শঙ্করের নাম পুলিশের কানে যায়। পুলিশ তাকে খোঁজ করে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ডাকু। ঘটনার পর সে নিজের কাছে রিভলবারটি লুকিয়ে রাখে এবং স্কুলে ছাত্রদের দেখায়। পুলিশ তাকেও খোঁজ করে। জাহাজে করে বিদেশে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শঙ্কর তাকে লুকিয়ে রাখে। শঙ্করের জাহাজ যখন গঙ্গার মাঝখানে তখন পুলিশ ডাকুকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। শঙ্কর তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলে অভিমানী ডাকু ভরা জোয়ারে গঙ্গার কাঁপ দেয়। তাকে বাঁচবার জন্যে শঙ্করও কাঁপ দিয়ে পড়ে। তারপরে ডাকু মুখে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে বিচারে শঙ্কর মুক্তি লাভ করে।

চিত্রনাট্যের মূল বিন্যাস বাংলার মত একই রকম থাকলেও ছোটখাটো কিছু সংযোগ ঘটেছে হিন্দী দর্শকদের রুচি অনুযায়ী কিছুটা দীর্ঘ করার জন্য। যথার্থীতি এখানেও নাইট ক্লাব দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে কড়া বোন রসান্ত্রিত হেলেনের একটি নাচ দেখা হয়েছে। এসব দৃশ্যগুলি বাস্তবসংগতি রেখে হয় না, এখানেও হয়নি। পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক আঞ্চলিক ছবির সীমাবদ্ধতার বাইরে যেতে পারেননি। কেবলমাত্র নাইট ক্লাব ছাড়াও একটা চোরাকারবারি আড্ডা এবং জাহাজঘাটা ও জাহাজকে নিয়ে হস্ততো আরো রহস্যময়তা সৃষ্টি করা যেতো। নীলা-শঙ্করের প্রেমের ঘটনাকে আরো বিশ্বাস্য করে ফুটিয়ে তোলা যেতো।

অভিনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায় (শঙ্কর) এবং শবনম (নীলা) নায়ক ও নায়িকা। শবনমের মধ্যে কিছুটা জড়তা থাকলেও হিন্দী ছবিতে অভিনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায় ভালই করেছেন। বলরাজ সাহানী এখানে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁর পক্ষে গ্রুপ চরিত্রে অভিনয় ব্যতিক্রম। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে বোম্বাই ও কলকাতার শিল্পীরা

মুহুর্তে আভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে
আছেন-লীলা চিটনীশ, জগদেব, কে এন সিং,
ভরুণ বোস, অসিত সেন, ইন্দিরা বনশাল,
অসিতবরণ, অজিত চ্যাটার্জী প্রমুখ। ডাক্তার
চরিত্রে কিশোর অভিনেত্রী প্রশংসনীয়।

ছবিতে পাঁচটি সুগীত গান আছে।
গানগুলি হিন্দী ছবির রীতি অনুযায়ী
প্রযুক্ত হয়েছে।

ফল অব দি রোমান

এম্পায়ার

(এলিট)

শ্যামুয়েল ব্রনস্টোন প্রযোজিত, এম্বনী
ম্যান পরিচালিত বর্ণাঢ্য ছবি 'ফল অব দি
রোমান এম্পায়ার' ঘটনা বহুলভাষ্য এবং নতুন
ভাষ্যে ও বুদ্ধিবিরোধী বক্তব্যে দর্শকদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ছবিটির দৃশ্যরচনা,
এবং সম্পাদনাগুণে বুদ্ধ দৃশ্যগুলি বিস্ময়-
কর।

ঘটনাকাল খ্রিস্টীয় ১৬১-১৮০ সাল।
মার্কাস অরেলিয়াস যখন রোমের সম্রাট
ছিলেন, তখন থেকে তাঁর দুর্মতি পুত্র
কমোডাসের রাজত্বকাল এবং পরিণতি বা
রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রারম্ভকাল এখানে
চিত্রিত হয়েছে। অরেলিয়াসের সময় রোম
সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও চিম্তার স্বাধীনতা
ছিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রতি তিনি
বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করতেন। দূর্বিনীত
পুত্র কমোডাসের পরিবর্তে বীর লিডিয়াসকে
তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সিংহাসনের
উত্তরাধিকারী বিবেচনা করতেন। এ ব্যাপারে
শত্রুর সাথে আরো কিছুসংখ্যক রাজপুরুষের
ভ্রাতৃত্ব সম্রাট অরেলিয়াসের মৃত্যু হয়।

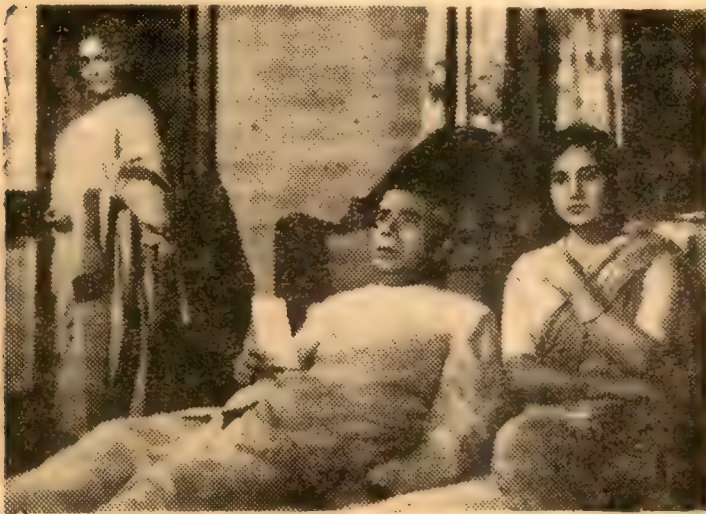


পীতার্লি পিকচার্সের 'ফল অব দি রোমান' ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শবন

সময়ক্ষেত্রে লিডিয়াস কমোডাসকেই সিজার
ঘোষণা করে তার সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করে
দেয়। কমোডাসের বার বছর রাজত্বকালে
রোম সাম্রাজ্যে ফাটল ধরে। এ সময় জাতি-
বিশেষ প্রকল হয়ে ওঠে, পশ্চিম ও চিত্তা-
শীলরা লালিত হন। টিমোনিডাসের মত
গ্রীক দার্শনিক ও শান্তিবাদী নিজের বিশ্বাস
ও আদর্শের জন্য প্রাণ হারান। টিমোনিডাস
বিশ্বাস করতেন যুগ্মকে প্রেম দিয়ে জয়
করতে হয়। বুদ্ধ জাতির সমৃদ্ধির অন্তরায়।
বুদ্ধ আনে দারিদ্র্য, ধ্বংস ও অশান্তি।
কেবল অস্ত্রবলে কোন জাতি শেব পবনিত
জয়লাভ করতে পারে না। কমোডাস আমে-
নিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করে এবং
পূর্বাঞ্চলে জাতিসমূহ বিদ্রোহ করে। কমো-
ডাসের বিরুদ্ধে আমেনিয়ানদের পক্ষে দাঁড়ায়
তার সহোদরা অরেলিয়াসের আদরের কন্যা

সুন্দরী লুসিলা। বীর সেনাপতি লিডিয়াস
সম্রাটের বিদ্রোহ দমনের আদেশ পালনে
অস্বীকার করে কলী হয়। লুসিলা তার
প্রণয়ী লিডিয়াসের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণের
জন্ম প্রস্তুত হয়। কিন্তু কমোডাস যখন
জানতে পারে যে সে সম্রাট অরেলিয়াসের
উরসজাত সন্তান নয়, তখন মানসিক প্রতি-
ক্রিয়ার নিজের পিতাকে হত্যা করে সে
লিডিয়াসকে শৈতবৃন্দে আহ্বান জানায়
চূড়ান্ত পরিণতির জন্য। শেষে কমোডাস
নিহত হয়।

ছবিটিতে অজিতমুগ্ধ সেট এবং
চিত্তাকর্ষক বহির্দৃশ্যের ও নিপুণ অভিনয়
মাধ্যমে বুদ্ধ ও জাতিবিশেষ বিরোধী বক্তব্য
প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিহাসের ছত্রদের
পক্ষে ছবিটি দর্শনীয়। যদিও ছবিটিকে
সেন্সর বোর্ড "এ" চিহ্নিত করেছেন, বাস্তব-
বিকপক্ষে ছবিটি কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য
সীমাবদ্ধ করার কোন কারণ নাই। বিভিন্ন
চরিত্রে স্বার্থক অভিনয় করেছেন
আলেক গিনেস (সম্রাট অরেলিয়াস), ক্রিস্টো-
ফার প্লামার (কমোডাস), স্টিফেন বরেক
(লিডিয়াস), সোফিয়া লোরেন (লুসিলা),
জেমস ম্যাসন (টিমোনিডাস)।



'তাপসী' চিত্রে বনানী চৌধুরী, কমল সিং ও সন্ধ্যা রায়

স্টুডিও গ্রাফ

ডানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট

জয়দীপ পিকচার্স নতুন আলিফ 'ডানু
গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট' নামে একটি
ছবির ছবি তুলছে। টেকনিশিয়ান স্টুডিওর
চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। ছবির জন্য
কাহিনী রচনা করেছেন প্রণব রায়।



দ্রুতি প্রতীকায় হিন্দী ছবি 'ফকিরো কী বস্তি'-তে সূত্রধারানী ও অজিত সিং

পরিচালনা করছেন পূর্ণেশ্বর রায়চৌধুরী। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তানু স্যানাঙ্গী, জহর রায়, কল্যাণী ঘোষ, অসিত-করণ, মলিনা দেবী, নৃপতি চ্যাটার্জী, রেণুকা রায়, অজিত চ্যাটার্জী, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, লাল চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করছেন যথাক্রমে দেওজী ভাই ও অমির মুখার্জী।

পরিচালনায় উত্তমকুমার

উত্তমকুমার চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবে জনপ্রিয়। এবার তিনি চিত্র পরিচালনারও হাত দিয়েছেন। 'শুদ্ধ একটি বছর' নামে যে ছবিটি বর্তমানে নির্মাণমাণ সেই ছবিটির পরিচালক হিসাবে এতদিন 'বন্দু' নামটি প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ছবিটি আসলে পরিচালনা করছিলেন উত্তমকুমার। এক খবরে প্রকাশ ছবিটির পরিচালক হিসাবে এখন উত্তমকুমারের নাম থাকবে। এবং এটি হবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনা। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, নৃপিয়া চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ বসু, শৈলেন গাঙ্গুলী, বেবী গুপ্তা। ছবিতে সংগীত পরিচালনা করছেন স্ববীন চ্যাটার্জী।

অরোর পরবর্তী ছবি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন তারারশঙ্কর মন্ডোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘণ্টা বাজলো' কাহিনী দুটির চিত্ররূপ দেবে স্থির করেছে। প্রথম ছবিটি পরিচালনা করবেন 'রাজা রামমোহন'-খ্যাত বিজয় বসু; দ্বিতীয় ছবিটি পরিচালনা করবেন সূর্যকুমার দাশগুপ্ত।

নাটকের কথা

নাট্যকার পরিষদের নাট্যোৎসব

নাট্যকার পরিষদের উদ্যোগে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গত ৫ই ডিসেম্বর মৃত্যুগান মঞ্চে এই উৎসব উদ্বোধন করেন ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য। ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর উদ্ভাবনী ভাষণে বলেন, যে নাটকে সমাজ ও বাস্তবজীবন প্রতিফলিত নয়, আজকের দিনে অর্থব্যয় করে সেরূপ নাটক অভিনয়ের প্রয়োজন নাই। এমন নাটক চাই, যে নাটক দর্শকদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। বর্তমান পৃথিবী সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দুই শিবিরে বিভক্ত, সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেছে সমাজতন্ত্রেই জগতের মঙ্গল। বৃদ্ধ, দারিদ্র্য, ক্ষার্য অবসান একমাত্র সমাজতন্ত্রের পথেই সম্ভব। সুতরাং নাট্যকারদের এই চেতনা নিয়ে নাটক লিখতে হবে।

নাম না জানা তারা

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নাম না জানা তারা' অভিনীত হয়। রূমানিয়ান নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ানের মূল নাটক থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী অমিতা রায়। কাহিনীর হৃদয়গ্রাহিতা, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যে সূর্যচিসম্পন্ন এই নাটকটির আবেদন গভীর। অনুবাদিকা মূল নাটকের

মেজাজ ও রস এত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে অনুবাদ নাটক মনে করার কোন অবস্থা ঘটেনি। মূল নাটকের বিষয়-বস্তু, সংলাপ এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি চরিত্রগুলিকে বাঙালীর পোষাকে ও নামে উপস্থিত করেছেন। কোন মহকুমা শহরের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করলে চরিত্রগুলি বেমানান নয়।

আকাশের তারাগুলি যেমন আপন কক্ষপথে ঘুরছে, মানুষের জীবনের গতি তেমন কক্ষপথে বাধা। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো উল্কার মত ছিটকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির জন্য আবার সে তার কক্ষপথে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ঠিক এমনিভাবে এক সুন্দরী নাম-না-জানা মেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক মানসের ঘরে। মানসের সারা মন ব্যস্ত রয়েছে এক অজানা তারা আবিষ্কারের চিন্তায় ও অধ্যয়নে। জ্ঞানের জগতের বাইরে জৈবিক কোন চিন্তা তার মনে ঠাই পায় নি। সুতরাং এই অজানা মেয়ে তার জীবনে সেই নতুন তারার মতই বিস্ময় ও আনন্দ সৃষ্টি করলো। মেয়েটির জীবনেও এরকম একজন পুরুষের সান্নিধ্যলাভ এই প্রথম। তার পরিচিত জগতের বাইরে এই মানুষ তার চেতনার দ্বার খুলে দিল। দুঃজনে দুঃজনকে অনুভব করলো। এমন সময় মেয়েটির পুরনো পরিবেশের গিরগীন এসে উপস্থিত এবং তাকে জোর করে নিয়ে গেল এই নতুন জগৎ থেকে তার গতানুগতিক কক্ষপথে। শাবার আগে মেয়েটি বলে গিয়েছিল তার নাম খনা। এই নামটিই মানসের অনাবিকৃত তারার নাম হয়ে তাদের প্রেমের প্রতীক হয়ে থাকলো।

উন্নত বুদ্ধিবোধসম্পন্ন 'নাম-না-জানা' তারার একদিনের মগুরপায়গকে কিন্তু সার্থক বলা যায় না। প্রথমত এরূপ নাটকের জন্য মৃত্যুগান উপযুক্ত মঞ্চ নয়; সেখানে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। প্রথম দৃশ্যে ছোট একটি টেবিল ও আলো দিয়ে স্টেশনের প্রতীক দেখানো যেতে পারে কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। অধ্যাপক মানস সর্বক্ষণ পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে অথচ তার ঘরে বইয়ের তাক বা কাগজপত্র তাকে খুব পড়ুয়া মনে হলো না। এক-একটি অঙ্ক পরিবর্তনে দীর্ঘ সময় ক্লেপে পূর্বে সৃষ্ট মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত অভিনয়ে মনে হয়েছে উপযুক্ত রিহাসাল ছাড়া শিল্পীরা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এবং প্রমটারের উপর নির্ভর করে তাঁদের সংলাপ বলতে ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হয়েছে। স্টেশন মাস্টারের ভূমিকায় সুনীল দত্ত সম্পূর্ণ বার্থ। এই চরিত্রের জন্য একজন পাকা অভিনেতা দরকার। মানসের চরিত্রে বিভূতি মুখোপাধ্যায় মোটামুটি ভাল করেছেন। প্রমটারের উপর নির্ভর না করলে

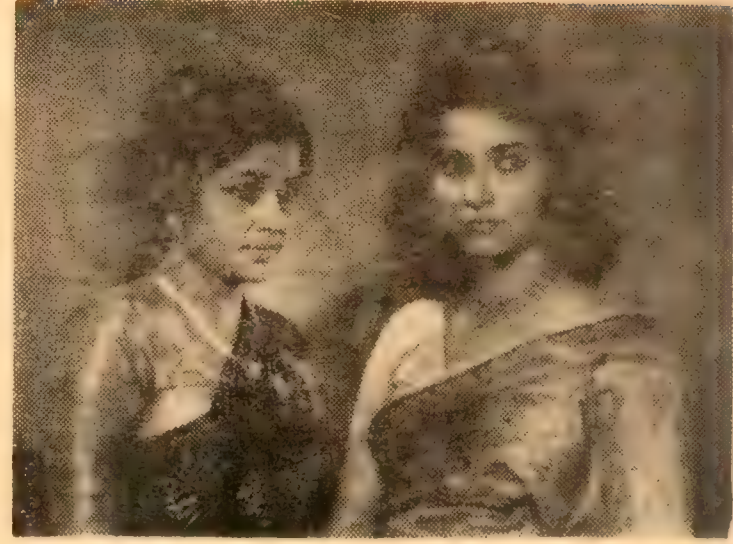
সাপ্তাহিক বসুমতী

তিনি আরো ভাল করতেন। খনার চরিত্রে স্ফূর্তি বিম্বাস হালকা মৃদুত্বগুলি সূক্ষ্মর প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যখনই গম্ভীর মৃদুত্ব উপস্থিত হয়েছে তখন উপযুক্ত বুদ্ধি বোধ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তবে স্টেজ ফ্রি থাকার জন্য তিনি অন্যদের তুলনায় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মিস কোকিলার চরিত্রে শ্রীমতী অঞ্জলি লাহিড়ী এবং অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুণ সরকার, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সুপর্ণা চ্যাটার্জী, সুনীত মুখার্জী, শিব-প্রসাদ মুখার্জী, অম্বুজ সেন।

নাটকটিতে আলোর কাজে অনেক করণীয় ছিল। সংগীতে অনল চট্টোপাধ্যায় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। পরিচালনা করেছেন বিদ্যুৎ গোস্বামী।

‘ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের’ নৃত্য-গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান

বিগত ওই ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর টেডিয়ামে ‘সংস্কৃতির’ বাৎসরিক অনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা ভারতীয় নৃত্যকলা, প্যাতিমান নৃত্যশিল্পী—



অংসরা ফিল্ম পরিবেশিত ‘রেক’ ছবির একটি দৃশ্যে ভারতী রায় ও ললিতা চ্যাটার্জী

নীলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৃষ্ণা রায় ভারত-নাট্যম, আলো বাগচী ও সূতপা দত্ত মণিপুরী (রাস লীলা), পাপুড়ি

বোস ও কৃষ্ণা রায় রাজস্থানী, মনীষা খাস্তগীর ও পূর্ণিমা হালদার কথাকলি প্রণাম, অনুপমশঙ্কর ও আলো বাগচী বাংলা লোকনৃত্য (জেলে-জেলেণী), অনুপমশঙ্কর, আলো বাগচী, কৃষ্ণা রায় ও পাপুড়ি বোস ভাংরা, পরিচালক নীলেন্দ্র সেনগুপ্ত ও পূর্ণিমা হালদার কথাকলি (কাতি-কির) পাপুড়ি বোস কথক, সূচরিতা ঘোষ, মানসী ঘোষ, রত্নাবলী ঘোষ ও মলয় ঘোষ গুজরাটি লোকনৃত্য পরিবেশন করে দর্শকের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তরণ চৌধুরী, বিনি পর পর দু'বছর মুরারি স্মৃতি সংগীত সম্মেলন-এ গীত ও আধুনিক গানে রসিক জনের মন জয় করেছেন, ও কবিগুরু “এখন আর দেবী নয়—” গানটি পরিবেশন করে অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেন। হাস্য-কৌতুকে আনন্দ দান করেন সুবোধ মুখার্জী। সম্পাদনার ও বস্ত্রসংগীতে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন কথাকলি—অসিত চক্রবর্তী এবং অরবিন্দ মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, বিক্ মিত্র, অনিল ঘোষ, বীরেন্দ্র চন্দ ও ফেলু চন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে মেজর এন. দত্ত এবং শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি ভাস্কর্যের রুচিসম্মত পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।



হিন্দী ছবি ‘জিহান ফাটল’-এর একটি দৃশ্যে কুমকুম ও নাজমা

লম্বা ইউন

বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম করিয়া
অধিকতর স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-
দেহী ইউন। হিন্দীতে বিশেষ
বিবরণ পাইবেন।

283, Azad Market, (W.B.C.)
Delhi-6



বিশ্বদেশী-বাউল

‘রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এক বিস্মৃত-প্রায় নাম—যিনি বিশ্বদেশী যুগে গানে গানে বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন তাঁর কব্জিকণ্ঠে। মরুদাসের মতই তাঁরও ভাগ ও অবদান রয়েছে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং রজেন্দ্রলাল যথার্থ সে আমন্ত্রণ রক্ষাও করেছিলেন। বড়ই দৃঢ়ভাগের কথা তিনি আজ বিস্মৃত-প্রায়। ঠনকো গান জলসা করে এদেশের ছেলেরা পাগল হয়ে উঠেছে। কিছুদিন জরুরি মনগর সচ্চাষিপাড়ার বাঙালী স্ট্রীটচারিত্র্যের আয়োজিত ক্রীস্ট-মাস উৎসবে গাইতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে সেদিন একজন জামাই ছিলেন ধর্মসংগীত শিল্পী। আর সবাই বাংলার জনপ্রিয় হালকা রসের আধুনিক সংগীতশিল্পী ছিলেন। কাজেই আমার গানের পরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই চাঁদ আর ফুলের মামুলী বাংলা ও হিন্দী গান। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলাম যে, এই জাতীয় জলসার অনুপ্রবেশ তাহলে এ পর্যন্তও ঘটেছে। এই ঘটনার উল্লেখ এইজন্যই করলাম যে, স্মৃতিশক্তি বা কোন কোন ব্যক্তির স্মরণশক্তি বর্তমানে আমাদের দেশের ছেলেদের নিকট একেবারেই গ্রহণীয় নয়—বসি না সেখানে থাকে হালকা ধরনের গানের জলসা। এই কারণেই আজ জাতীয় সংগীতের নামে যখন দেখি আমাদের ছেলেরা রবীন্দ্রনাথ, রজেন্দ্রলাল, নজরুল প্রভৃতির জ্বালাময়ী গান করেন—তখন তা আধুনিক সঙ্গীত পরিবেশনের সামিল হয়। হালকা সঙ্গীত গাইতে অভ্যস্ত-কণ্ঠে কোথায় সেট কেমন? কোথায় সেই বলিষ্ঠতা?

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভাগের প্রস্তাবকে জন্মীকার করে ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল,

কল্যাণ ভাষার প্রকাশিত বিত্তীয় সর্বাধিক

প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

বার্ষিক	...	৩০ ০০
ষাণ্মাসিক	...	৭.০০
ত্রৈমাসিক	...	৩.৫০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা

চাঁদা সর্বদাই জরিপ দে

সাহিত্যিক বসুমতীর



বীরশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, অশ্বিনীকুমার ও রবীন্দ্রনাথের মত নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে রজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম প্রভৃতি সম্মানদল সরকারী নিবেদন অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম সংগীত বা ধ্বনি উচ্চারণ। কিন্তু বন্দেমাতরম সংগীতের সাধক-সরকার ও শিল্পী রজেন্দ্রলাল এবং তাঁর সহকর্মীগণ কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিয়ে শত্রুবাহে ভেদ করে এগিয়ে চললেন। আরম্ভ হলো অমানুষিক পুলিশী অত্যাচার। আঘাতে আঘাতে রজেন্দ্রলালের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কণ্ঠ এক মহাত্মের জন্যও নীরব হলো না। যতক্ষণ না তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, ততক্ষণ অবিরাম তাঁর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করেছে। এমনই ছিলেন লোকের প্রতি অবিচল আস্থাশীল নিভীক হৃদয় রজেন্দ্রলাল। তাঁর বিশ্বদেশী-বাউল নাম স্বার্থক হয়েছিল! বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে অসাধারণ বাণী ও নেতা বিপিন পালের সঙ্গে রজেন্দ্রলাল সারা বাংলা দেশ ভ্রমণ করেন ও তাঁর গানের মাধ্যমে তাঁর প্রচারকর্ম আরম্ভ করেন। একবার চাঁদপুরে কোন একটি এই জাতীয় সভায় জনসাধারণ শত্রুর চরদের স্মার্য বিচ্যন্ত হয়ে মরুদাস হয়ে ওঠে। কিন্তু রজেন্দ্রলালের দরদীকণ্ঠের জাতীয় সংগীতে শান্ত হয় ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে লিপ্ত গ্রহণ করে। এমনই ছিল তাঁর কণ্ঠের সম্মোহনী শক্তি। এ ছাড়াও, বিশ্বদেশী-বাউল, দেশবন্দ, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে বিশ্বদেশী সংগীতের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন। রজেন্দ্রলাল, মহারাজা সূর্যকান্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়মনসিংহ ‘সুহৃদ-সমিতি’ নামে একটি বিশাল সংস্থা গড়ে তোলেন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে সমিতির শাখা স্থাপন করেন। এই সমিতির মাধ্যমে ব্যায়াম, লাঠিখেলা ও গোপনে অস্ত্র-

শিক্ষা দিয়ে দেশের কিশোর ও যুবকদের স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। রজেন্দ্রলাল তখন প্রত্যক্ষভাবে বৈশ্ববিক সংস্থায় জড়িত ছিলেন। তাঁর অশ্রুত সাংগঠনিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে খ্যাত অরবিন্দ, মনীষী বিপিন পাল, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাগণ রজেন্দ্রলালকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু ইংরেজের শ্যান দৃষ্টি রজেন্দ্রলালের উপরে পড়ে। ইংরাজ সরকার পূর্ববঙ্গ হতে রজেন্দ্রলালকে বহিস্কারের আদেশ জারী করে। ফলে বাধ্য হয়ে রজেন্দ্রলালকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি জাপানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তবে তাঁর এই কলকাতা আগমন তাঁকে সংগীতজগতে এক উজ্জ্বল স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কলকাতায়ও অনেক অবস্থা বিপদব্রতের মধ্য দিয়ে, পুলিশী-কুনজর এড়িয়ে এবং স্বাধীন সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ করে তিনি তদানীন্তন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জামশেদজী চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয়লাভ করেন। শত্রু হলো তাঁর প্রকৃত সংগীতজ্ঞের জীবন। বিশাল রজেন্দ্রলালের পক্ষে বা ছিল অসাধ্য, শিল্পী রজেন্দ্রলাল সংগীতের মাধ্যমে দিয়ে তথ্য লাভ করলেন অবাধগতি ও সহজ আধিপত্য। বিখ্যাত শিল্পী দিলীপকুমার রায় রজেন্দ্রলালের গানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বিশ্বদেশী গানে ‘গমক’ প্রয়োগের নীতি তাঁর নিকট হতেই লাভ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, যথার্থ বলিষ্ঠ সংগীত হলো ‘ধ্রুপদ’। বাংলার ছেলেদের এই ধ্রুপদ গান শোনাবার জন্য তিনি শিল্পীদের অনুরোধ করেছিলেন। প্রকৃতই বীর ও ওজস্বী রয়েছেন এই ধ্রুপদ সংগীতে। স্বামীজী আদর্শ সংগীত প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ধ্রুপদের বিজ্ঞানের সঙ্গে কীর্তনের ভাব মিশ্রিত হয়ে আদর্শ সংগীত সৃষ্টি করবে। তাই আদর্শনিষ্ঠ রজেন্দ্রলাল ভারতবিখ্যাত ধ্রুপদ ও ধামার শিল্পী বিশ্বনাথ রাও-এর নিকট ধ্রুপদ ও বিখ্যাত কীর্তনীর রজগোপাল অধিকারীর নিকট কীর্তন শেখেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন খ্যাতিমান কীর্তন শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বন্দেমাতরম সংগীতের মধ্যে ভারতাত্মক যে শব্দত বাণী নিহিত ছিল, তারই শেষ পরিণতি, বন্দেমাতরম সংগীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মধ্যে লাভ করলো—কীর্তন গানে। প্রেমের বন্যার আশ্রিত হয়ে রজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন আনন্দ সাগরে।

১৮৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী রজেন্দ্রলাল ঢাকা-বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০৯ সালে কলকাতায়, টালিগঞ্জ দেহভ্যাগ করেন।

—বীতিচার্য প্রীতজ্যোতির মৃদোপাধ্যায়

বিশ্বমস্ত ও দেশে এবং দেশে

১৯৫৬ সালে আমি ছিলাম প্রবাসে—সে সময় নাট্যচার্য শিশিরকুমার একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—“Tolstoy-এর চারখানি বড় নাটক—তার মধ্যে একখানির শেষ অঙ্কের dialogue নেই, শুধু synopsis আছে—অমূল্য।”

এখানে নাট্যচার্য ‘The Light Shines In Darkness’ নাটকটির কথাই লিখেছেন। হার্নাড শ’ও বলেছেন যে, এটি টলস্টয়ের সব দিক দিয়ে সেরা নাট্য রচনা। ১৮৯০ সালের কিছু আগে থেকে টলস্টয়ের নাটকটি লিখতে শুরু করেন। তারপর ১৯০০ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত নাটকটির রচনার মনোনিবেশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রচনাটি অসমাপ্তই থেকে যায়। ‘For the last act only rough drafts exist.’

নিজের বিবেকের সঙ্গে টলস্টয়ের মনোবিশ্ব এবং সংসারের দিকটাই এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাছাড়া দেখানো হয়েছে বিক্ষুব্ধ বিবেকের প্রতিরূপা নিজের মনের উপর এবং নিজের অনুভূতি এবং নিজের উপর নির্ভরশীল আত্মস্বপ্নবন্ধনের উপর। এছাড়া আছে তাঁর পরবর্তী জীবনের বহু বিবাদপূর্ণ ঘটনার প্রতি আগে থেকেই ইঙ্গিত দান, ইংরাজীতে থাকে বলে “কোরবোডিংস্”। অর্থাৎ টলস্টয়ের তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে এসে স্পষ্টই বড়তে পারাছিলেন, তাঁর জীবনান্ত হবে চরম বেদনা এবং দুঃখপূর্ণ পরিবেশের মাঝে। তাঁর নাটকের নামকের মত টলস্টয়ও বহুব্যাপ্ত ভেবেছেন গৃহ, সমাজ, সংসার পরি-ত্যাগ করে পালিয়ে যাবেন—কিন্তু কি ভেবে আবার এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন।

এ রচনার কাব্যিক ছন্দবেশটা এত পাতলা যে টলস্টয়ের নিজস্ব জীবনের ঘটনাবলীই অত্যন্ত বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে নাটকটিতে। রচনার আত্মজীবনীমূলক ভঙ্গীট আমাদেব বারবার স্ট্রীডবার্গের ডায়ামান্ডস্ লেগেলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—তবে টলস্টয়ের লেখাটা একটু বেশি বিস্তৃত। এর সংলাপের অনেক সেন্টেন্স অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় টলস্টয়ের অন্য অনেক লেখার সঙ্গে, তাঁর চিঠিপত্র এবং জার্নালের ভাষার সঙ্গে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি নাটকটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ‘ওরাক’ অর্থাৎ ‘আর্ট’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। টলস্টয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানেন না এমন পাঠকও কিন্তু নাটকটি পড়ে মন্থ, বিস্মিত এবং আকর্ষিত হন—এইখানেই নাট্যশিল্পী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। নিজের ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী মডেলের থেকে নায়ককে কোনোদিক থেকেই বড় বা বেশি মহৎ করে তোলেন নি। সমালোচক মার্টিন ল্যাম লিখেছেন:

“Tolstoy has not fallen into the usual trap that awaits the

painter of self-portraits, the temptation to beautify his model.”

শিল্পীর পক্ষে এ ধরনের আত্মসংকম ভো কন শ্রাব্য বিষয় নয়। এই শ্রেণীর asceticism of imagination থাকতেই অসমাপ্ত-রূপেই নাটকটি জগতের একটি সেরা নাটক বলে বিবেচিত। মার্টিন ল্যাম বলেছেন:

“The hero of the play, Nicolai Ivanovitch Saryntsov, is no impressive prophet. Any contemporary of Tolstoy who wanted to describe him would have made him a much more heroic figure.”

নিজের জীবনের আদর্শগুলোকে পূর্ণভাবে ছুঁতার সঙ্গে কখনও কার্বে পরিণত করতে



মোর্ক

পারেন নি টলস্টয়। তাঁর নামকের তেতর দিয়ে নিজের চরিত্রের এই সব চরুটি পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করতে টলস্টয়ের এতটুকুও বিধা হয় নি।

নাটকের যে সব অংশ সম্পূর্ণ তাতে নিকোলাই-এর শিষ্যরাই তাঁর সমস্ত আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করতে গিয়ে শহীদ হয়ে-ছেন। নিকোলাই এসব আদর্শ তুলে ধরেছেন—কিন্তু নিজে এসব আদর্শের অনুসরণ করেন নি। ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিলাসবাসনে ভরা গৃহে বসবাস করেছেন, শেষে এ সব বিলাসের কনু স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন। ভেবেছেন এই-ভাবেই পরের অমানুষিক পরিভ্রম এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টার বিস্তৃক অনায়ভাবে উপভোগ করছেন—এই মানসিক প্লানি থেকে মৃত্তি পাবেন। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় নিকোলাইয়ের

বাড়িতে একটি বলনাচের ব্যবস্থা হয়েছে—নিকোলাই ঠিক করলো এই ছুঁতারের মাঝে সে গৃহত্যাগ করবে—কিন্তু বশেষ্ট মনের জোর না থাকতে এই সিদ্ধান্তকে সে কাজে পরিণত করতে পারলো না।

টলস্টয়ের এ নাটক লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই রকম—চরিত্রগুলো মোটেই প্রশংসনীয় নয়, তারা মানুষ—সুতরাং তাদের তেতর দুর্বলতা থাকবে—যে সব ভাল তাদের মনে আসে, তা কাজে পরিণত করবার মত মনের জোর বা সাহস তাদের নেই।

কিন্তু যে সব আদর্শের প্রচার করা হয়েছে নাটকটিতে, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে পাঠক বা দর্শকেরা কিছুতেই উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারবে না। আর সেটাই হল বড় কথা—বাস্তবজীবনে এ সব আদর্শ যদি গৃহীত হয় তাহলেই সত্যিকার কাজ করা হবে। তার অভ্যস্ত বিলাসপূর্ণ জীবনের পরিবেশে নিকোলাই ঘুরে বেড়াচ্ছে—এর দ্বারা এই কথাই বোঝাচ্ছে যে, সে আনন্দপ্রাপ্তি-কাল ভ্রমার। এমন কি টলস্টয় এমন করে একটি দৃশ্যও তাকে এনেছেন যার ফলে তাকে কঠিন চরিত্র বলে মনে হতে পারে।

নিকোলাই প্রথমে এসেই বিরত গৃহ-ভূতটির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো। পরে তার মস্তকের বাঁড়ুর ভেতরেই একটি ছুঁতারের দোকান খুললো। এটি করার একমাত্র উদ্দেশ্য যে সে আর আলসো জীবন কাটাবে না—কাজ করে যাবে। এদিকে যে ছুঁতারের কাজের সাহায্য করে সে ভাবছে হিজ এঞ্জেলিসিস হল কি। ছুঁতারের কাজে এমনিতেই তো অনেক বেশি শ্রমিক এসে জুটেছে—আর তাদেরই জীবিকা অর্জন করা মন্ডিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধনী ভদ্রলোক এসে এ কাজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? পরে এই ছুঁতারটি নিকোলাইকে জিজ্ঞেস করলো সে তার সমস্ত অর্থসম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে না কেন? লজ্জিত-ভাবে নিকোলাই জবাব দিল—‘আমারও তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারলাম না। সব কিছু আমি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছি।’

“Until the period in the Seventies when he was troubled by problems of religious faith, Tolstoy had been a believer in the Orthodox Russian Church. After this period, when he came under the influence of the Bible critics, he preached undenominational Christianity with the Sermon on the Mount as its



চরকালভ

core, exactly as Nicolai Ivanovich did. Like his hero, he was mainly concerned with ethical problems, and like him he suffered from being a parasite. According to his gospel it was above all important to avoid sharing in the guilt of evil-doing, to avoid offering resistance in any way, to act as little as possible according to previously determined principles, and to allow impulses to determine one's actions. "Not to act according to any made up plan," says Nicolai Ivanovitch, "but only when one's who'e being craves action." The illogical attitudes which the hero adopts in the play are due simply to this fear on Tolstoy's part of doing too much. "It is worse to do too much than too little" is Nicolai Ivanovitch's motto. At other times he reproaches himself for continuing in this way to acquiesce in situations of which he disapproves. "Any one is entitled to say... that I am a traitor, that I speak but do not act, that I preach the gospel of poverty but in practice I live in

luxury, under the pretext that I have given everything away—to my wife... O God, it is Thy manifest will that I should live as a labourer in Thy Vineyard, that I should be humbled, that all men should point the finger of scorn at me and say, 'He preaches what he does not practise.' Well, so be it, He knows best what He desires." [Martin Lamm]

রাশিয়ার সর্বত্র নানা ধরনের সংঘ সৃষ্টি হতে লাগল—এদের উদ্দেশ্য হোল টলস্টয়ের উপদেশাবলী এবং আদর্শ অনুযায়ী জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করা। এই সব অনুগামীরা আইন-অমান্য করতে শুরু করলেন, বৈশ্ববিক মনোবৃত্তির জন্য কারাগারে প্রেরিত হলেন, আরও নানা ধরনের কড়া কড়া শাস্তি গ্রহণ করলেন হাসিমুখে—টলস্টয়ের মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এইভাবে শহীদের জীবন বেছে নিলেন। অনেকে তাঁদের ভূ-সম্পত্তি, বিরাট জমিদারী পর্বন্ত বিলিয়ে দিলেন। অথচ বাকি কেন্দ্র করে এই সব বিরাট আন্দোলন, সেই টলস্টয় কিন্তু তাঁর বিরাট ইউরোপীয়ান রেপুটেশনের জন্য সবদিক থেকে অকৃত রইলেন। সেন্সরসিপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারলো না, আইন-আদালত বা সরকারী অনুশাসন তাঁর উপর আরোপ করবার সাহস কারোয় হোল না। স্ত্রীর বেনাম-দারীতে সখে, স্বচ্ছন্দে তিনি নিজের অধিদারীতে বাস করতে লাগলেন। টলস্টয়ের

সময়ের অনেকেই বলেছেন যে, টলস্টয় যে সব উপদেশ দিতেন, নিজের জীবনে তা কখনই পালন করতেন না। এবিষয়ে তাঁর শিষ্য এবং অনুগামীরাই সত্যি সত্যি মান্ডারের নির্দেশ—মত নিজেদের জীবনধারণকে সংযত এবং সংহত করে ফেলেছিলেন। টলস্টয় নিজেও সেকথা বুঝতেন এবং বিবেকের দংশন অনুভব করতেন। নাটকটি ভালভাবে পড়লেই একথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

"In the later part of the play Nicolai Ivanovitch gives place to young Prince Boris, who refuses to take the allegiance and is imprisoned in an asylum."

[Martin Lamm]

টলস্টয়ের শেষ অঙ্কের নর্দা দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে নিকোলাইয়ের জীবনের পরিণতি হবে চরম স্ট্রাজেডিতে এই ভাবেই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। নিকোলাই শেষটার বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারল যে, বোরিসকে সে সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে—তার অন্য একজন শিষ্যও তাঁর উপদেশাবলীকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলো। নিকোলাই এই সময় স্বীকার করলো। "আমি দুর্বলতার চরম প্রতীক। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ঈশ্বর আমাকে তাঁর ভৃত্য হিসাবে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁর অনেক পরিচারক আছে, তাঁর কাজ আমাকে ছাড়াই চলবে এই সত্যকে যখন উপলব্ধি করি তখনই ভিতর থেকে শান্তি পাই।" যে মূহুর্তে নিকোলাই প্রার্থনা করবার জন্য মাথা নিচ

করলেন, ঠিক তখনই বেগে প্রবেশ করলেন বোরিসের মা এবং তারপর তিনি নিকোলাইকে হত্যা করলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিকোলাই “ভাইকোবর” সংগঠনের এক প্রতি-নিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাজী হলেন— আসলে এই রাশিয়ান সংগঠনটির সঙ্গে টলস্টয়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

মূল নক্সাটি বদলিয়ে টলস্টয়ের আর একটি ড্রাক্ট করেন—তাতে নিকোলাইয়ের হত্যার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এই নতুন নক্সায় নাটক শেষ হচ্ছে নিকোলাইয়ের এই ধরনের চিন্তায়—“একশো বছর বাদে আমার আদর্শগুলোকে অনুসরণ করে মানুষের জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মার্টিন ল্যাম বলেছেন:

This indeed, is the real significance of the title, ‘The Light shines in the darkness,’ which is taken from St. John’s Gospel. St. John’s text continues, “And the darkness comprehendeth it not.” It is still the Power of Darkness against which Tolstoy is fighting.

আগামীর মোড় বলেছেন যে, শ’-এর মতে টলস্টয় ‘বিদ্যুৎপায়কভাবে’ হৃদয়হীনতার মত ব্যবহার করেছেন নিজের প্রতি এই নাটকে। মৃত্যুর স্পর্শের দ্বারা এক ধরনের আত্মহত্যা করেছেন। আর এই মতটাই বোধহয় সর্বজন-গ্রাহ্য। মোড় কিন্তু সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি এই মতবাদের সঙ্গে। তাঁর ধারণা টলস্টয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই কথাটা প্রমাণ করা যে শত সদিচ্ছা থাকলেও মানুষ উচিত কাজ করতে পারে না—কারণ—এবিষয়ে সে ভয়ানকরকম বাধা পায় সমাজের তরফ থেকে, স্ত্রী, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং সামাজিক পরিবেশের থেকে। টলস্টয় বেশ ভালভাবেই জানতেন, যে সব আদর্শ, সত্য বা উপদেশাবলীর তিনি প্রচার করে এসেছেন, তার ভেতর কোন ব্রুটির স্পর্শ ছিল না, কোনো খাদ ছিল না।

ইচ্ছা থাকলেও যে নিজের ইচ্ছাকে ঠিক-মত কার্যকরী করা যায় না এবং তার জন্য নিজেকেও দায়ী করা চলে না তার একটি সন্দেহ উদাহরণ টলস্টয়ের জীবন থেকেই পাওয়া যায়। জীবনের শেষ তিরিশ বছর টলস্টয় তাঁর রচনা এবং নাটকের জন্য কোন টাকা নিতে চাইতেন না। কিন্তু ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের (এইখানেই টলস্টয়ের সমস্ত নাটক মণ্ডস্থ হোত।) অফিসিয়াল আইন অনুসারে প্রত্যেক নাটক বাবদ একটা বাঁধা অঙ্কের টাকা দিতে হোত নাট্যকারকে। এরা ঠিক করলেন টলস্টয় যদি তাঁর পাওনা টাকা না নেন, সেই টাকাতা খরচ করা হবে

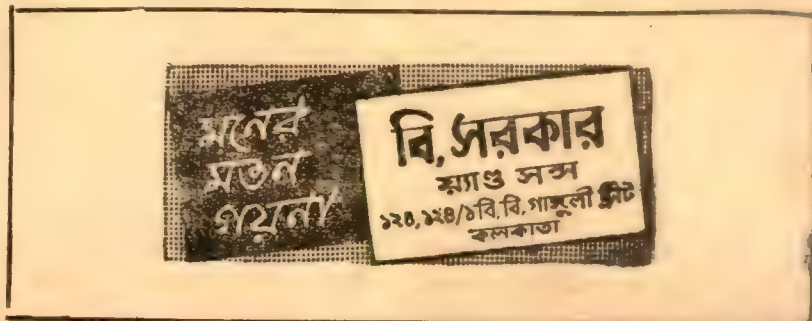


টলস্টয়

ইম্পিরিয়াল ব্যালের উন্নতির জন্য। টলস্টয় আবার ব্যালে ব্যাপারটাকে দৃষ্টে দেখতে পারতেন না। সুতরাং ‘মন্দের ভাল’ এই হিসাবে তাঁর প্রাপ্য টাকাতা তাঁর স্ত্রীর নামে দেওয়া হোত এবং টলস্টয়ের স্ত্রী সে টাকাতা

নানা সং প্রাপ্তমানে দান করে দিতেন। ব্যালের ফান্ডে টাকা দিতে টলস্টয় রাজী ছিলেন না। সুতরাং এক্ষেত্রেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকাতা স্ত্রীর নামে নিতে হোত।

(কমলা)



গত ২৫শে নভেম্বরের সাপ্তাহিক বঙ্গ-মতীতে শ্রীরাধেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঠটি পড়লাম। তাঁর মতো প্রবীণ দেশকর্মী যে সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ নির্যমিত পড়ছেন, তেঁনে সুখী হললাম : সরাসরি গ্রন্থাকার প্রকাশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আমি যে-উদ্দেশ্যে বইটি ধারাবাহিক ছাপতে দিচ্ছি, মনে হচ্ছে তা কতকাংশে সার্থক হয়েছে। জানি না, ও-যুগের আর-কোনও নেপথ্যচারী দেশকর্মী নির্যমিত লেখাটি পড়ছেন কিনা। পড়লে, এই সুযোগে তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক নিবেদন জানাই— তাঁদের যা-কিছু বক্তব্য আমার জানালে আমার প্রয়োজন এবং সাধ্যমতো গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তা ব্যবহার করব। তবে, আশা করব, সকলেই রঞ্জন-বাবুর মতো ‘বৎস পৌর’ মূল্যেতে প্রকট হবেন না—অন্তত এইটুকু নিবেদনাবোধের স্বাভাবিক বোধের এই যুগের আওতা থেকে তাঁদের যুগ অতিক্রমণে যাবার, সে-যুগটিকে জানা-চেনার এমন কোনও যোগসূত্র তাঁরা রেখে দেন নি যার সাহায্যে আমরা ইচ্ছামতো অনারসে (অনারসে যুগের কথা, দীর্ঘকাল অস্বাভাবিক পরও) নিশ্চিন্ত চিন্তে উপলব্ধি করতে পারি সেই যুগটির স্বরূপ।

ইতিহাস-রচনার বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়মের প্রসঙ্গ এনেছেন গাঙ্গুলীমশাই। সেই সোনার পাথর-বাঁটি কোথায় পাওয়া যায় কারো জানা থাকলে হাঁস দিতে পারেন? গত নব্ব্ব-বছর ধরে আমি তার সম্মান করছি, তারই সম্মানে আমি ১৯৬৪ সালে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সরকারী নীচপত্র অধ্যয়ন শেষে ১৯৬৪ সালের গোড়ার দাম্পত্য-হাঙ্গামা তুলে করেও অপ্রকৃতভাবে ব্যারাকপুর থেকে বালটি-কুরি ছুঁতেই প্রবীণ বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে গাঙ্গুলীমশাই তখন বিশেষ অসুস্থ শূনে তাঁর কাছে—এবং অনুরূপ কারণে আরও দু-একজনের কাছেও যাওয়া হয় নি; যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি এইভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিন্তু বাংলায় বিপ্লব আলোচনার ইতিহাস রচনার উপকরণ কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করলে সংগ্রহ করা যায়-বুঝতে পারি নি।

প্রসিদ্ধ প্রবীণ একজন ইতিহাসিকের মুখে একটা কথা শূনে আমি একদিন হেসেছিলাম : তিনি বলেছিলেন, “বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যা-কিছু, সবই প্রকৃতপক্ষে ঢাকার ‘অনুশীলন’ সমিতির কৃতিত্ব। ‘যুগান্তর’ দলের সবাই মিথ্যাবাদী, সবাই পরের মুখে বাল খেয়েছে, কেউ কাজের বেলা নামে নি!”—(রঞ্জনবাবু যুবকতাই পারছেন যে ‘যুগান্তর’ দল বলতে উক্ত চক্রলোক ‘আয়োজন’ প্রমুখ উপসমিতি-গুলিকেও হিসেবের মধ্যে রেখেছেন। কারণ, বস্তুত এই উপসমিতিগুলির অস্তিত্ব সে-যুগে তেমন পৃথক ছিল না আদৌ!) আমাদের ইতিহাসিক ভ্রমলোকের প্রচণ্ড আধিক্যারিত্ব হেতু এই যে, তিনি সাক্ষাতিক ‘অনুশীলন’ সভাদের কাছ থেকে বিবৃতি চেয়ে বেশ দাজানো-গোছানো আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনীই



পেরেছিলেন; অথচ ‘যুগান্তর’ দলের কাছ থেকে বিকেন্দ্রিক সংগঠনের অনুরূপ অসম্ভব কতক উক্তি ছাড়া তিনি কিছুই পান নি। সবই তাঁর কাছে উদ্ভাসিত পিণ্ডি বৃথার ঘাড়’ থেকেছে। যতীন্দ্রনাথ-পরিচালিত বিকেন্দ্রিক সংগঠনের যে-সুত্রগুলি আমার কাছে উন্মোচিত করেছেন অনেকাংশেই দল-নিরপেক্ষ পুরনো দিনের কয়েকজন প্রচেষ্টা নেতা, তাঁদের বিবৃতি মিলিয়ে এবং সেই সঙ্গে সরকারি রিপোর্টকে পরিপূরক হিসাবে ধরে সম্পূর্ণ সত্যের একটা আভাস পাওয়া যায় বই কি। পুলিশের কাছে লালিত চক্রবর্তীর সব কথা যে সত্য নয় এ তো যে-কেউ স্বীকার করবেন। রঞ্জনবাবু ইটাং ও-কথার ওপর এত জোর দিলেন কেন? লালিত চক্রবর্তী দলের অনেক কথাই টের পান নি। কিন্তু লালিতের স্বীকারোক্তির মধ্যে থেকেও সত্যটুকু বাচাই করে খাটুক ফেলে দেওয়া সম্ভব যদিও রঞ্জনবাবুর বিধিবদ্ধ নিয়মের

সবিনয় নিবেদন

বর্তমান বছরের ১১ সংখ্যার বঙ্গ-মত-এর “স্বাধীন-পটিকা” শীর্ষক অঙ্গলোচনাটিকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে কয়েকটি চিঠিপত্র প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে আর কোনো চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স: সা: ব

অন্তর্ভুক্ত তা হবে কিনা সন্দেহ) এবং জীবিত প্রবীণ বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি লালিত চক্রবর্তীর ও অপরাপর স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্য অংশগুলিই পরিবেশন করেছি আমার লেখায়, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তির মৌল আনাই মিথ্যা হতে পারে নরেন গোস্বাইয়ের ক্ষেত্রে, কারণ গোস্বাই স্বীকারোক্তি করবেন অনুমান করেই বিপ্লবীরা তাঁকে বিশ্বস্তরম বৃত্ত ইত্যাদি নেতাদের কীর্তি-কাহিনী শোনাতে। লালিত ঠেলার পণ্ডে স্বীকারোক্তি করেন এক এমন মনোভাবের বঙ্গবর্তী হয়ে এঁরা এক-একজন কথা ফাঁস করে ফেলেছেন যে-সমস্ত যে-অবস্থায় মিথ্যা আসে কম ক্ষেত্রেই।

বিকেন্দ্রিক দলের ধর্ম অনুযায়ী আমরা দাবি যে, সেই যুগে কুশীলবেরা পুরো নাটকের মত না জেনেও স্ব স্ব ভূমিকায় স্বেচ্ছাচারে উদ্ভীর্ণ (কখনো-বা বিফলপ্রায়) হয়েছেন। কিন্তু এই কুহেলিকার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি আজ অম্বা দাবিদারের সমন নিয়ে ইটাং হাজির হন, তার আগে শতকরা শতভাগ তাঁর নিচসন্দেহ হওয়া উচিত—সত্যই তাঁর যুগের সবাই পরলোকের বাসিন্দা কিনা।

আজ ইটাং “মিথ্যা ইতিহাস রচনার নানা প্রকার অপচেষ্টা”-র বিরুদ্ধে গাঙ্গুলীমশাই যত্নবশত হয়ে উঠলেন কেন বুঝতে পারছি না এবং তেমন ইতিহাসের একটি তালিকা তিনি যদি দিতে পারেন তাঁকে আমরা যেমন স্বাগত জানাব, তার চেয়েও সুখী হব যদি গাঙ্গুলীমশাই বলতে পারেন—তাঁর মতো যারা, যারা ধরা পড়েন নি, “পুলিশের শত অভ্যাসেরও” বরা কৈনক জবাববন্দী দেন নি, তারা কি এই দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন দেশসুদ্ধ লোককেই পুলিশের চর ভেবে? স্বাধীনতার পরেও এঁরা সত্য ইতিহাস এতদিন লেখেন নি কেন, সে-কৈফিয়ত না দিয়ে গেলেই কি ভবিষ্যৎ বংশ-ধরেরা এঁদের ক্ষমা করবে? আজকের তরুণ সমাজ উচ্ছ্বসে গিয়েছে, দেশটাকে জাহান্নামে তেঁনে নিয়ে চলেছে—এই অভ্যবহারের নানা রকমফের, তো তরুণেরা গুরুজনদের মূর্খ শূনেছে, কিন্তু তরুণেরা যদি ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চায়, “আমাদের জন্যে কোনও ভ্রাদশটী রেখে দিয়েছেন, বলুন পিতামহ, আমরা সেই আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলি—” আর-একটা প্রশ্নও তরুণেরা করতে পারে : ধরাই যদি না পড়লেন, পুলিশ “শত অভ্যাসের” করল কোথায় এবং কী ভাবে? অতি-রজন-বিরোধী গাঙ্গুলীমশাইকে আমি প্রত্যক্ষ করতে বলব এইসব সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত জানাই, ডাঃ যাদুগোপাল মুখো-পাধ্যায় লিখিত বহু-পৃষ্ঠিত “বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি” গ্রন্থেও (৩৩৬) কিন্তু নন্দলাল হাজার ব্যাপারে গাঙ্গুলীমশাইয়ের নাম কোথাও নেই। আমার সংগৃহীত তথ্যের সূত্রগুলি যত ভ্রান্তই হোক, সৌভাগ্যক্রমে আমার এইসব সূত্রের কল্যাণেই গাঙ্গুলীমশাইয়ের উল্লেখ পেরেছিলাম বলে (আলোচ্য ১১/১১/৬৬ তারিখের ‘সাপ্তাহিক বঙ্গ-মত’ দ্রষ্টব্য) অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই চিঠির জবাব দিতে ব্রতী হতে হল এবং এইসূত্রে তাঁকে অন্তরের প্রজ্ঞা জানাতে পারলাম।

পরিশেষে দুটি মূদ্রণ-প্রমাদের উল্লেখ করছি : ১৯৪৭ পৃষ্ঠায় (১৮/১১/৬৬) শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাওয়ার সাল হওয়া উচিত ১৯১০ এবং ১৯৫৫ পৃষ্ঠায় (২৫/১১/৬৬) যতীন্দ্রনাথের হাওড়া জেলে যাবার বছর ১৯১০ সাল হবে। অন্যত্র ইংরেজি উদ্ধৃতি প্রভৃতির মূদ্রণে থেকে থেকে কয়েকটি শব্দ পড়ে গিয়েছে, পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন।

—যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



কুয়ালালানগরে বাল্কেটবল প্রতিযোগিতার ভারতীয় দলের খেলার দৃশ্য

কুপারেজের মাঠে

সেমিফাইনালের ধাপে পৌঁছেও যেন প্রাণের সঞ্চার হল না কুপারেজের বৃকে। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম দুটি প্রধান শক্তি কলকাতার ইস্টবেঙ্গল এবং হায়দ্রাবাদের অম্বু পলিশের অনুপস্থিতি রোভার্সের জৌলুস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ১৯৬৫ রোভার্স কাপ ফুটবল সমাপ্তির পথে।

গত বছর সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে কলকাতার দলগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। কিন্তু এবার দিল্লীর ডি, সি, এম ট্রফিতে সেমিফাইনালের ধাপ থেকে বিদায় নিল কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি দল ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং। কলকাতার সদ্য আই, এফ, এ শীল্ড জয় সমাপ্ত করার পর দিল্লীতে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় বাধেট কিম্বারের সঞ্চার করে ত্রীভূ-মেদীমহলে।

বোম্বাইয়ের রোভার্সের আসরে এবার কলকাতার যে আটটি দল অংশ গ্রহণ করেছিল

তার মধ্যে প্রায় প্রথম ধাপ থেকেই চারটি দল বিদায় নেয়। গতবারের রোভার্স বিজয়ী বি, এন, রেল প্রথম খেলায় পরাজিত হয়। মহামেডান স্পোর্টিং কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উন্নীত হয়। কিন্তু ০-২ গোলের ব্যবধানে তারা পরাজিত হয় বোম্বাই ফুটবল লীগ বিজয়ী সেন্ট্রাল রেলের কাছে। জয়-লক্ষ্যী বোম্বাইয়ের বিরূপ ছিলেন মহামেডান দলের প্রতি, নইলে ভাল খেলেও তাদের বিদায় নিতে হত না। প্রথম গোল দিয়ে অগ্রগামী

প্রীতিমিত্রতা

হয় মহামেডান দল। সেন্ট্রাল রেলদল পেনাল্টি থেকে একটি গোল পরিশোধ করে এবং শেষ পর্যন্ত ০-২ গোলে জয়ী হয়ে সেমি ফাই-ন্যালে উন্নীত হয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনালে টাটা স্পোর্টস এবং কলকাতার ইস্টার্ন রেলদলের খেলার মীমাংসা দু'দিনেও সম্ভব হল না। প্রথম দিন খেলা

গোলশূন্যভাবে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় দিনেও একই ফলাফল। তৃতীয় দিন নিশ্চয়ই জনা যে খেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই খেলার মীমাংসা না হলে টেসের সাহায্যে মীমাংসা করা হবে। এই দুই দলের বিজয়ী দল সেমিফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে সহজেই পরাজিত করে বোম্বাইয়ের ডি, সি, আই, এলকে ২-০ গোলে। এই ফলাফল মোহনবাগানের স্বাভাবিক ত্রীভূত্বের বর্তমান ছিল। কারণ পূর্বের দিনেই মোহনবাগান খারি অনুযায়ী বোম্বাইয়ের কাছে হারেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের পরাজিত উন্নীত হয়। মোহনবাগানের পক্ষে একটি দুটি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করে কলকাতার মধ্যভারী। কাজলের সুন্দর খেলা বোম্বাইয়ের প্রশংসা অর্জন করে।

এখন রোভার্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা মন্তব্য করব না। অপেক্ষা করা যাক তারা একটি খেলার মীমাংসার জন্য।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তুস্করের কীর্তি

গোপন প্রবেশকারী এক তুস্কর ভ্রম-লোকের দ্বারা কয়েকজন এম, সি, সি ক্রিকেট খেলোয়াড় বোল্ড আউট হয়ে গিয়েছেন। ব্রিসবেন হোটেলে অনধিকার প্রবেশকারী ভ্রম-লোক কয়েকজন খেলোয়াড়ের অর্থ অপহরণ করেন, কিন্তু সেই চুরি ধরা পড়ে পরদিন।

সেইদিন সকালবেলা কুইন্সল্যান্ডে এম, সি, সি দলের একটি খেলা ছিল একদিনের জন্য। ক্রিকেট মাঠে পৌঁছে গোষাক পরি-বর্তনের সময় হঠাৎ ফাস্ট বোলার ডেভিড লার্টার আবিষ্কার করেন যে, তাঁর বারো পাউন্ড- অপসারিত হয়েছে ব্যাগ থেকে। লার্টার গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন দলের ম্যানেজার গ্রিফিথকে। কৌতূহলবশত গ্রিফিথ



জর্নেল সিং

নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখেন যে পকেট গাড়ের মাঠ।

বেচারি গ্রিফিথ অন্যান্য খেলোয়াড়দের বললেন যে, তাঁদের পকেটের অবস্থা কি? অনুসন্ধানের পর দেখা গেল চোরের দ্বারা আউট হয়েছেন বব বারবার এবং মারে। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা বৈঠে গেছেন।

বিলি গ্রিফিথ এবং মারের মার যায় ৪০ পাউন্ড, বারবারের ৭ পাউন্ড এবং লার্টারের ১২ পাউন্ড। এই মোট অপহৃত ৫৯ অস্ট্রেলীয় পাউন্ডের ভারতীয় অর্থে তার মূল্য প্রায় ৫৯০ টাকা।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের খেলার শেষ দিন কলকাতার একটি জনপ্রিয় হোটেলের একটি কক্ষ থেকে দুজন টেন্স্ট খেলোয়াড়ের কিছু দ্রব্য অপহৃত হয়। হনুমন্ত সিং এবং সৌলিম দুর্জানীর একটি টেনিসজিস্টার এবং দুটি হাতভাড়া চুরি যায়। জটিন্য প্রকাশ যে একজন অটোগ্রাফ শিকারী



কাজল মজাজী

হনুমন্তের ঘরে অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য আসে, কিন্তু তারা অটোগ্রাফ দিতে রাজী হন না। ঘরের দরজা হনুমন্ত খোলা রেখেছিলেন বেড-টীর জন্য।

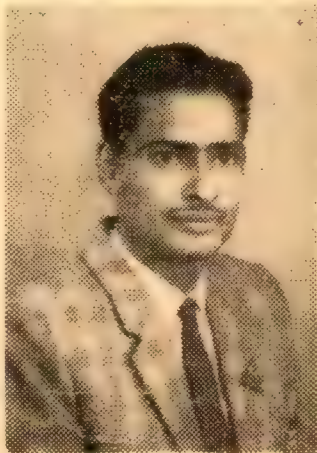
শুভ প্রচেষ্টা

এবার সি, এ, বি'র তরুণ ক্রিকেটারদের শিক্ষা দেবার জন্য কলকাতার আসছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের সর্কারী ক্রিকেট কোচ মিঃ ওয়ার্দিংটন।

ইতিপূর্বে কিছুদিন মিঃ ওয়ার্দিংটন মাদ্রাজের মাঠে তরুণ খেলোয়াড়দের কোচিং দিয়ে এলেন। তিনি কলকাতার উপনীত হবেন ১৪ই ডিসেম্বর।

সি, এ, বি'র পক্ষ থেকে প্রতি ক্লাবকে দুজন খেলোয়াড়কে এই শিক্ষা শিবিরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের বয়স কুড়ি বছরের নিচে হওয়া চাই। এই সমস্ত খেলোয়াড়দের নিজেদের নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ দেওয়া হবে ১০ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ইডেন উদ্যানে।

এই বাছাইয়ের পর যারা টিকে থাকবেন



কমল সরকার

তাঁরাই আসল শিক্ষাশিবিরে যোগ দেবার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন। ১৬ই ডিসেম্বর এই শিক্ষাদান পর্ব সূচ্য হবে। তবে এই স্বল্পকালীন শিক্ষাদানে কি সত্যকারের কোন উপকার হবে আমাদের বাংলা দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের।

রঞ্জী ট্রফি

বাংলা এবার রঞ্জী ট্রফির খেলা শুরুর করবে। বাংলা দলের প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হবে কটকে ১৪ই ডিসেম্বর থেকে উড়িষ্যার সঙ্গে। পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটে একচ্ছত্র অধিপতি বাংলা মূল প্রতিযোগিতার আসরেই বেকারদার পড়ে, পূর্বাঞ্চলের খেলাগুলি



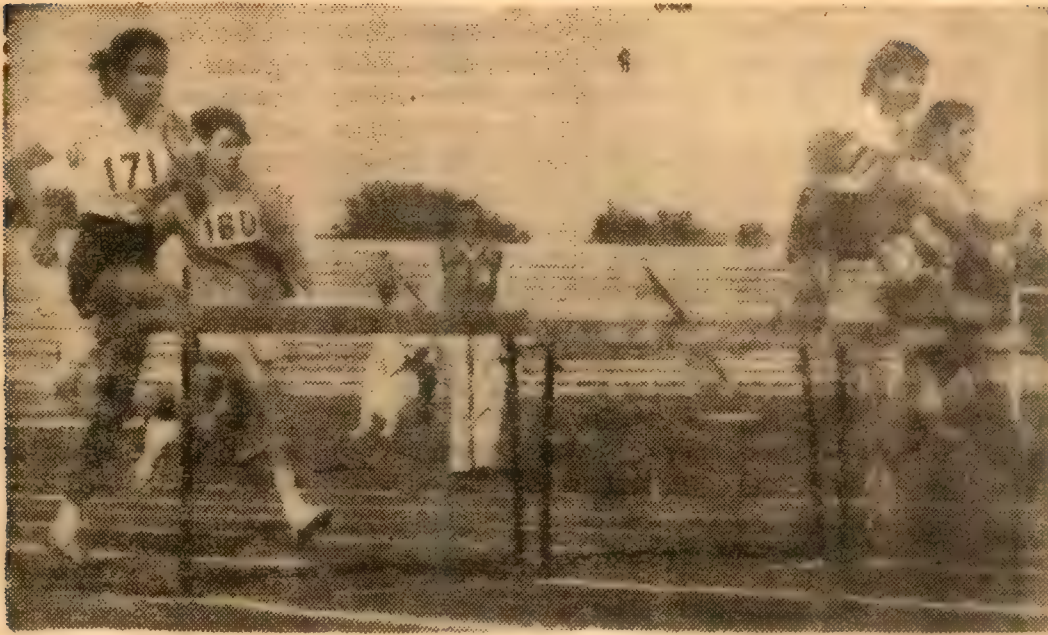
সুভ্রত গুহ

বাংলা দলকে তেমন কোন অসুবিধারই সম্মুখীন করে না।

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক ট্রায়াল খেলার মাধ্যমে বাংলার রঞ্জী ট্রফি দল নির্বাচিত হয়েছে। এখানে ধীরেন দের একাদশ এবং নীহার মিত্রের একাদশের খেলার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

গত সপ্তাহে ইডেনের দলীপ ট্রফির খেলার তিন নাম্বারের এক নাম্বার সুভ্রত গুহ সম্বন্ধে আপনাদের জানিয়েছি। এই ট্রায়াল খেলার সুভ্রত গুহ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধীরেন দের একাদশের ৩৩৪ রানের সঙ্গে সুভ্রত ২০০ রানে অপরাধীত থাকেন, বোলার হিসাবে খ্যাত সুভ্রত এই ডাবল সেঞ্চুরী করে বুকিয়ে দিলেন যে, ব্যাটেও তিনি কম যান না। সুভ্রত এই ব্যক্তি-গত ২০০ রান সংগ্রহ করেন ২০০ মিনিটের কিছু বেশি সময়ে। বোলিং-এও সুভ্রত নৈপুণ্য দেখান ৪৩ রানে ৩টি উইকেট সংগ্রহ করে। নীহার মিত্র একাদশের পক্ষে ব্যাটে

মাসিক বঙ্গমতী



রবীন্দ্রসরোবরে অনুষ্ঠিত বেহালা স্পোর্টসে মহিলাদের হার্ডল রেসের দৃশ্য

নৈশদৃশ্য প্রদর্শন করেন অনন্তবিক্রম রায় ৮২ রান সংগ্রহ করে। এই ট্রায়াল খেলার ব্যাটে উল্লেখ্য নৈশদৃশ্য প্রদর্শন করেন দেব মুখার্জী, শ্যামসুন্দর মিত্র, নিমাই রায় প্রভৃতি এবং বোলিংয়ে সুপ্রকাশ সোম, অলক মজুমদার, জলি সরকার প্রভৃতি।

এবারের নির্বাচিত বাংলা ক্রিকেট দলে বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় আছেন। গতই আনন্দের কথা যে, আমাদের ক্রিকেট পরিচালকরা তরুণদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তাদের সুযোগও দিয়েছেন। অলক মজুমদার, সুপ্রকাশ সোম এবং টি জে শ্যানার্জী, অনন্তবিক্রম রায় ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত দেখে মনে হচ্ছে যবনিকার অন্তরালে অন্যবার যে সমস্ত ব্যাপার হয় এবার তার তুলনায় যা হয়েছে তা উপেক্ষারই যোগ্য। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ পঞ্চক রায়।

সমাচার দর্পণ

রবীন্দ্রসরোবরে অনুষ্ঠিত হল বেহালা

এ্যাথলেটিকস ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টস। এবারে সমারগভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। পুরুষদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান যশমভাবে লাভ করেন মোহনবাগান ক্লাবের সমীর চ্যাটার্জী এবং ইস্টবেঙ্গলের জি আর প্যাটেল। উভয়েই সংগ্রহ করেন দশ পয়েন্ট। দশ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জুনিয়ার বিভাগে বিজয়ী হয় এরিয়ারসের তপন দাশগুপ্ত। মহিলাদের বিভাগে বেহালা ক্লাবের সোফিয়া খাতুন বিজয়ী হন পনেরো পয়েন্ট সংগ্রহ করে।

* * *

১৯৬৫ সালের নেহরু মেমোরিয়াল হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করল শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার ১-০ গোলে বোম্বাই একাদশকে পরাজিত করে। ষোণ্য দল হিসাবেই শিখ রেজিমেন্টাল দল গ্রীফ লাভ করেন, কারণ খেলার ওপর তাদেরই ছিল

প্রাধান্য। পেনাল্টি কনীর থেকে বিজয়সূচক গোলটি দেন মালে সিং। সেমি-ফাইনালে শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার ক্যাম্পলোরের এর ই জি-র সঙ্গে খেলা গোলান্দুভাবে শেষ করে; একই দিন অপর সেমি-ফাইনালে বোম্বাই একাদশ এবং উত্তর রেলদলের খেলাও ১-১ গোলে অসমীয়াসিতভাবে শেষ হয়। টেসে জয়ী হয়ে শিখ রেজিমেন্টাল দল এবং বোম্বাই একাদশ ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন।

* * *

জাপানী হকি দল জলম্বরের প্রথম টেস্ট খেলার ভারতীয় একাদশের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এই জাপানী দলটি ইতিপূর্বে দিল্লীতে নেহরু মেমোরিয়াল হকি টি অন্তর্গত করে, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে বোম্বাই একাদশের নিকট পরাজিত হয়ে তারা বিদায় নেয়।

টেনিসের অভাগা ছেলে

বিজয়ের ভরা পানপাত্র মুখের কাছে উঠেও আচম্বিত পাড়ে ভেঙে গিয়েছে, অপূর্ণ থেকে গিয়েছে জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত বাসনা, স্বপ্ন হয় নি সার্থক। ফ্রেড স্টোলের খেলোয়াড়ী জীবনের কাহিনী সত্যই বিচিত্র। পর পর তিনবার উইমবলডেনের দুলভ সম্মান তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ফসকে গিয়েছে। পর পর তিনবারই ফ্রেড স্টোলের বিজয়ের সম্মান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে

বিশ্ব টেনিসের পুণ্যতীর্থে উইমবলডেনের সিঙ্গলসে।

এক এক সময়ে ফ্রেড স্টোলের হয়ত মনে হচ্ছে যে, এ জীবনে আর হয়ত উইমবলডেনের সম্মান হস্তগত করার সুযোগ তাঁর আর হল না। অবশ্য হতাশ হবার পাত্র অন্তত অস্ট্রেলিয়ার দু-নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলে নন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য স্বভূতে গড়া। স্টোলের অদম্য বাসনা অন্তত একবার মাথায় ধারণ

করতে হবে উইমবলডেনের সিঙ্গলসের বিজয়-মুকুট, তারপর বিদায় নেবেন টেনিসের অঙ্গন থেকে। অপেশাদার টেনিসের অঙ্গন পরিভ্রমণ করার ইচ্ছা স্টোলের নেই, তাই পেশাদার টেনিসের একজন উদ্যোক্তা জ্যাক সেজম্যানের কাছ থেকে আসা লোভনীর প্রস্তাব অনায়াসে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফ্রেড স্টোলের স্বদেশবাসী সতীর্থ খেলোয়াড় গত দু-বছরের উইমবলডেনে বিজয়ী রূপ এমার্সনের কাছেও

সাম্প্রতিক বসুমতী

এসেছিল কয়েকবার পেশাদার গ্রহণের জন্য মোটা অঙ্কের প্রস্তাব, কিন্তু অপেশাদার টেনিস সান্নাঙ্কের মসনদের মায়া তিনি কাটাতে পারলেন না। সম্মানের ডালির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল টাকার ভোড়া।

অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার টেনিসের অন্যতম প্রধান ফ্র্যাংক সের্জম্যান ফ্রেড স্টোলের দিকে টোপ ফেলোছিলেন। সের্জম্যানের টোপের চার ছিল ৩০,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড দু-বছরের জন্য। এইরকম লোভনীয় টোপ এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়, কিন্তু ফ্রেড স্টোলের এখন পেশাদার টেনিসের অঙ্গনে প্রবেশের ইচ্ছা নেই।

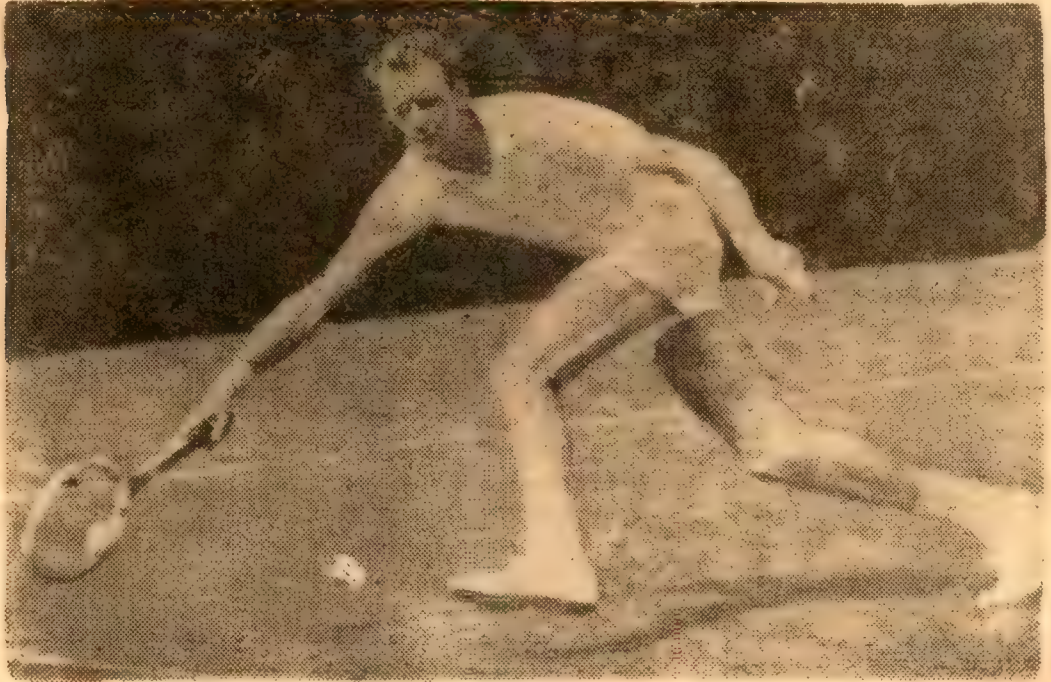
স্টোলে অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন যে বয়স তাঁর এমন কিছু বেশি তাও নয়। ফ্রেড স্টোলের বর্তমান বয়স হল ছাশ্বশ। ছা ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘদেহী

উন্নীত হলেন স্টোলে। গতবারের ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ ঘটল সেমি-ফাইনালে। পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্টোলে। ১৯৬৪ সালের বিজয়ীকে ফিরিয়ে দিলেন উইমবলডেনের আসর থেকে। সেমি-ফাইনালে ১৫০ মিনিটের টেনিস যুদ্ধ চলল স্টোলে ও ম্যাকিনলের কিন্তু অবশেষে নতি স্বীকারে বাধ্য হলেন ১৯৬৪-র উইমবলডেন বিজয়ী আমেরিকার চাক ম্যাকিনলে; ফ্রেড স্টোলে পৌঁছলেন ফাইনালে। সেবার মুখো-মুখি রয় এমার্সনের। ফাইনালে স্টোলকে পরাজিত করে এমার্সনের প্রথম উইমবলডেন চ্যাম্পিয়ান হবার সৌভাগ্য হল প্রায় ১৪০ মিনিটের কঠিন শক্তি পরীক্ষার পর। স্টোলে খেলা শুরু করেছিলেন বিরাট সজাবনার সৃষ্টি করে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

রয় এমার্সন অস্ট্রেলিয়া টেনিসের মর্যাদা রক্ষার গুরুদায়িত্ব স্বন্ধে নিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার কাছে ডেভিস কাপে পরাজিত হবার পর আবার দেশে ডেভিস কাপ ফিরিয়ে এনেছেন এই দুই খেলোয়াড় এমার্সন এবং স্টোলে।

এবারের উইমবলডেন ফাইনালে আবার মিলিত হয়েছিলেন এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলে। কিন্তু এবারও রানার্সের সম্মান জুটল তাঁর ভাগ্যে। উইমবলডেন মিস্ট্র ডাবলস এবং ডাবলসে চ্যাম্পিয়ান হবার সৌভাগ্য স্টোলের কবার হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল উইমবলডেন সিঙ্গেলস বিজয়ীর সম্মান।

টেনিস কোর্টে এমার্সন এবং স্টোলে হলেন একজন আর একজনের শত্রু, কিন্তু কোর্টের বাইরে দুজনের মধ্যে আবিষ্কার্য



ফ্রেড স্টোলে

ফ্রেড স্টোলে বছর চারেক হল বিশ্ব টেনিসের দরবারে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু স্টোলের দুর্ভাগ্য এই বছর তিনি তাঁর কেটে গেল রয় এমার্সনের খ্যাতির এবং অসামান্য নৈপুণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। ফ্রেড স্টোলে ১৯৬৩ সালে সকলকে অবাক করে এক-একটি বাধা অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছলেন উইমবলডেন সিঙ্গেলস ফাইনালে। আমেরিকার এক নম্বর খেলোয়াড় চাক ম্যাকিনলের সঙ্গে ফাইনালে সাক্ষাৎ হল কিন্তু পরাজিত হলেন ফ্রেড স্টোলে।

১৯৬৪ সালের উইমবলডেনের আসরে এক-একটি বাধা অতিক্রম করে সেমি-ফাইনালে

অবশ্য খেলার মধ্যে ব্যস্তির জন্য তিনচারবার খেলা বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তাঁর সার্ভিসের সময়। এর ফলে তাঁর মনোবল এবং একাগ্রতা কতকংশে ক্ষুণ্ণ হয়।

ফ্রেড স্টোলে খেলোয়াড়ী জীবন শুরু করেন খুবই অল্প বয়সে এবং দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এই খেলোয়াড়টি অস্ট্রেলীয় টেনিসে পরিচিত হয়ে উঠলেও সাক্ষাৎ অর্জন করতে তাঁর বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। বিশ্ব টেনিসের দরবারে ফ্রেড স্টোলের আত্মপ্রকাশ বলতে গেলে ১৯৬৩ সালেই।

গত প্রায় তিন বছর ফ্রেড স্টোলে এবং

বিশ্বদুর্ভ। উইমবলডেনে দুজনে যখন খেলতে আসেন তখন দুজনেই থাকেন একসঙ্গে একটি ফ্রাট ভাড়া করে।

পৃথিবীর সবকটি টেনিসের সম্মান ফ্রেড স্টোলের সংগ্রহশালার জমা পড়েছে, শুধু উইমবলডেনে সিঙ্গেলসে জয়লক্ষ্যীর অনুগ্রহ থেকে তিনি বারবারই বঞ্চিত হচ্ছেন। যে সম্মানের জন্য তিনি অন্যায়সে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন মোটা টাকার তোড়ার সপক্ষে পেশাদার জগতের হাতছানি, সে সম্মান তাঁর ভাগ্যে জুটবে কি!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুচীমা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭৯৫
আজকের মানব	...	১৭৯৬
বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গ	— ভবানী মদুখোপাধ্যায়	১৭৯৭
ভারতদর্শন	...	১৮০০
আন্তর্জাতিক	...	১৮০৪
বড়দিন : আন্তর্জাতিক উৎসব	— সাত্যিকি কাংসারিক	১৮০৭
দুই মহাজন	— দিলীপকুমার রায়	১৮১০
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৮১৪
উড়ন্ত বোড়সওয়ার (অনুবাদ গল্প)	— আভা পাকড়াশী	১৮১৬
উপভাষা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৮১৯

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের অস্পষ্ট আলোক। শাসক সম্রাটদের দ্বারা নির্ধ্যাতিত বাস্তব্য মুকুন্দরাম হুঃখ ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তিগত হুঃখ কি করিয়া সর্বজনীন হুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বঙ্কমাম প্রভু আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। অবিভূত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিভূত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

প্রোডাক্টান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩০০ পৃঃ—০৮

বক্তব্যচক্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অনুভূতি বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবলিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

শ্রবণ—ইংরেজ একবার পেলে হয়—

বীরকাশের মননে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নান লোপ করবা—

বীরকাশের—পাশা এই রাজ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে করবে।

প্রভাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্যঃ দুই টাকা।



সূচীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন	...	১৮২১
লালক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মদ্যোপাধ্যায়	১৮২৫
নবাব অলকো	— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৮২৯
বাড়ি ফেরা (গল্প)	— প্রভাত দেবসরকার	১৮৩৫
প্রেম (কবিতা)	— সুসিতকান্তি রায়	১৮৩৭
চার্লস চ্যাপলিন	— অশোক সেন	১৮৩৮
রঙ্গজগৎ	...	১৮৪০
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১৮৪৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৮৪৯
পাঠকমন	...	১৮৫২
বেলাহুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৮৫৩

আত্মজীবনী

স্বগীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—দুই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কবী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীত-নাটক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ—৫/-

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩/-

মোহন মেলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথাসিঙ্গীত
রস-নাট্যের সমস্ত ছাড়াও গল্প ভরণ।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বৃদ্ধদেবের বৃদ্ধি, কাঠের কপাল, হাঁড়ের নীরবের চোখের জল, তুলসী তুল, মুগা চোরা, বৃদ্ধদেবের গল্প, একটীর বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাঁতের গল্প, ইঁদুরের কীটিকাহিনী, বাঁদরেরা মেটলিচচ্চিড়।

ছড়া—হট্টমালার বজ্রবাড়ী, হোহোহো বু-ঝরে, পালোয়ান প্যালায়াম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শামের ব্যায়াম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদি কালের বৃদ্ধ বৃদ্ধি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুর্য্য রায় কর্তৃক
প্রচলিত।

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুষা

২৫০

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত সূত্র—পাণ্ডাবকেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের

জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ব্যস্ত-
প্রতিফলিত মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্য পর্যন্ত আমূল
ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—
লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক
সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপরিচিত
হইয়া ধস্ত হইতে চান ত সমস্ত লালা
লাজপৎ রায়ের জীবনী পাঠে উদ্দীপিত
হউন—বদেশমন্ডলযুক্ত আত্মজীবিতর জলন্ত
আদর্শ দেখিয়া সন্মোহিত হইবেন।

মূল্য—১০ আনা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ : ২৯ সংখ্যা-মূল্য : ২৫ পাঃ
রুহুপতিবার, ৭ই শোণ, ১০৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise

Thursday, 23rd Dec., 1965

আইনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গেছে। এই বিল নিয়ে তোলপাড় কম-হয় নি। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের দ্বারা কি অচল সমস্যা সচল হয়ে উঠবে?

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়-আইনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে চতুর্থতম। প্রথম ও দ্বিতীয় আইনের মধ্যে ৪৭ বছরের ব্যবধান ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইনের মধ্যে ছিল প্রায় ঐ একই ব্যবধান। কিন্তু তৃতীয় আইনটির সঙ্গে চতুর্থ আইনের বর্তমান আইনের তফাৎ মাত্র চোদ্দ বছর। স্বাধীনতা অর্জনের ঊনত্রিশ বছরের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার আইনের পরিবর্তন হয়তো নতুন কিছুই নয়। তবে পরিবর্তনের পর সমস্যার যদি সমাধান না হয়, তা হলে খুঁজে দেখতে হয় দোষটা আইনের, না বাঁরা আইন রচনা করেন তাদের দূরদর্শিতার অভাব।

পুরাতন আইনে কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, এই কারণে পরলোকগত উপাচার্য ডঃ সুবোধ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অবশ্য এর পূর্বে যখন ডঃ জ্ঞান ঘোষ উপাচার্য ছিলেন, তখন তিনিও আইনের দুটি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন দক্ষতা ও বিচার-শক্তির গুণে বিশ্ববিদ্যালয়কে জড়তাভাব থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিলেন। হয়তো সেই স্বাতির আশংকাতোষের পর জ্ঞান ঘোষের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম এবং সেই ব্যক্তিত্বের অবসানে জোরদার আইনেরই প্রয়োজন হয়। তাই ফোর্ড ফাউন্ডেশনের তিনজন বিশেষজ্ঞ ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে রিপোর্ট দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আইন করার জন্যে পরামর্শ দিলেন।

তারপর আইনের খসড়া তৈরি হল। মূল আইনের খসড়া তৈরি করেছিলেন আমন্ত্রিত ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞরাই। এই খসড়া আইনের প্রস্তাবিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাও কম হয় নি। নিঃসন্দেহে সরকারী উদ্যোগেই এই আইন এবং এই আইন সম্পর্কে এমন কথা উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের হায়ে জুড়ে দেওয়া হোল।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির মতামত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মতামত বাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ বা রাজনীতির উদ্দেশ্যে, আবার কেউ কংগ্রেসী বা বিরোধীদের অন্তর্গত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়েও খসড়া বিল সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতাব্যক্ত করেছেন। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমতীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে "সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে" এই বিল পাশ করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা হরণ করা হচ্ছে। আমরা বিরোধীদের বিরুদ্ধ মতাব্যক্ত না হয় বান্ধই দিলাম। তবে, বিধানসভায় তাদের বক্তব্য ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোনো বিল সম্পর্কে যদি মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তা হলে সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা রাজ্যসরকারগুলির নিকট লিখিত শ্রীচাগলার একটি চিঠির কথা উত্থাপন করে বিলটির অধিকতর আলোচনা স্পর্শিত রাখার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা যেহেতু রাজ্য সরকারের অন্তর্গত—সেই যুক্তিতে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবীন্দ্রলাল সিংহ বিরোধীদের কোনো কথায় কণ্ঠপাত না করে বিলটিকে আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন।

স্বভাবতই যেখানে সিলেক্ট কমিটির মতামত অগ্রাহ্য করা হোল এবং বিরোধীদের সংশোধন প্রস্তাবগুলিকে পর্যন্ত গ্রহণ করা হোল না—সেখানে মেজরিটি ভোটের জোরে নিজেদের দাবি অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তবে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদে যেসব শিক্ষাবিদগণ রয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে পূর্বাভাসে বাঁরা বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করেছেন, এখন তাঁরা কি বলতে চান তা জানার জন্যে বাংলাদেশেরে যুক্তিবাদীদের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

বিশ্ববিদ্যালয় বিল পূর্বের আইনে সুপারিশ করার জন্য সরকারের যে উদ্যম ও উদ্যোগ আমরা বর্তমানে লক্ষ্য করলাম, তা যদি শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে সাধক করে তোলত, তা হলে নিশ্চয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তের সৃষ্টি হবে। কিন্তু যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অবস্থা হয়রানি, আত্মলিপ্তক বিলম্ব, মুসাবিদা ও আত্মলিপ্ত-তান্ত্রিক মনোভাবই অচলারতনের মানদণ্ডরূপে বিরাজ করেছে—সেখানে শিক্ষা বা সরকারী নামপাশে আবদ্ধ হয়ে মরণ-বন্দনা ভোগ করবে না তার প্রতিশ্রুতি কি আমরা পাচ্ছি?

সম্পাদকীয়

অজিত মিত্র

আশা-নিরাশার-আধা-জ্বলন্ত দোলায় অবশেষে দ্য গল ভূমিও! রাজনৈতিক দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যখন বিভিন্ন কণ্ঠস্বর জোরালো ও সোচ্চার হয়ে উঠছে গতানুগতিক ভাবধারা ভেঙে দিতে, কমসেকম মোড় ঘোরাতে, ঠিক সেই হাওয়া বদলের পর্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশেও রঙ ধরেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মুহূর্তে জেনারেল দ্য গল আজ আশাহত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্বে ফ্রান্সে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে, এ চিন্তা অনেকেরই অধিগত ছিলো না, তাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আজ আর ফ্রান্সে সেই গণতান্ত্রিক সমর্থনলাভের আনন্দময় ক্ষণিক নয়। দ্য গলের ব্যক্তিগত ধারণাও বদলে গেছে। আশার মিনারে আজ তাই তিনি যেন কোন আদ্যা হাতের চিড়খাওয়ানো ভবিষ্যৎ কিছুর দেখতে পাচ্ছেন। শূন্যে পাচ্ছেন যেন অন্য কোনো কণ্ঠস্বর। তা হলে কি আজ তিনি (দ্য গল) দেশের মানুষের কাছে একান্তই অব্যাহত। অথচ আজও তো মনে পড়ে সেই ১৯৫৮ সালের ফ্রান্সকে। যেদিন ফ্রান্সের মানুষ দ্য গলকে ডেকে এনেছিলো দুর্দিনের জমানিশার বৃকে আশার রোশনাই জ্বালিয়ে দিতে। ফ্রান্স যদিও তার সেই সংকট-দুর্দিনের মূহুর্তকে হাসিমুখে অতিক্রম করে এসেছে। দ্য গল নির্বাচিত হয়েছিলেন সেদিন ভাগ্য-নিমিত্তরূপে সুবিপ্লবসংখ্যক ভোটখিকো।

ব্যক্তিগতভাবে প্রতি মোহাম্মদা অপেক্ষা ন্যূনতম মঙ্গলসাধনই শূন্য গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ও প্রশংসামুখ্য নিঃসন্দেহে এবং সেই বিচারে ফ্রান্সের মানুষ যদি সেই কোনো-একজনের প্রতি মোহাম্মদা থেকে দূরে সরে এসে, জাতীয়-জীবনে পরিবর্তন চিন্তায় প্রস্তুত হয়ে ওঠেন, তবে তাকে অকৃতজ্ঞতা কিংবা কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ না বলে গণ-তান্ত্রিক দেশের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠা করার প্রতি জাতীয়-জীবনের নতুন চিন্তা ও স্বীকৃতিই একে বলা চলে।

ফ্রান্সের মানুষ গতানুগতিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রকেই যে তাঁরা মর্যাদা ও প্রজ্ঞার চোখে দেখেন এও তারই স্বীকরণ, হবে এতে করে ফ্রান্সের মানুষ যে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন, তাঁর প্রতি পূর্বের মতো যে আর আস্থা রাখতে পারছেন না, কিংবা দেশের শান-ক্ষমতা যাতে দ্য গলের পরেও অটুট থাকে তার জন্যই হয়ত এ পরিবর্তনের ইশারা, যা সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলই নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছে বলা যেতে পারে।

দ্য গল ফ্রান্সের রাজনীতিতে বহুদিনের পরিচিত নাম। ইনিই একদিন সুবিপ্লব-সংখ্যক ভোটখিকো জয়লাভ করে প্রেসিডেন্টের

পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, আজ তিনিই আবার ছিয়াত্তর বছর বয়সে পা দিয়ে পেলেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ভোট। আর তাঁর নিকট-তম ৪৯ বছর বয়সের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সোয়া মিত্তারী পেলেন একত্রিশ শতাংশ ভোট। ফ্রান্সের রাজনীতিতে এই শেষোক্ত নামের মানুষ মিত্তারী নতুন বড় ভুলেছেন। জাতীয়-জীবনে নতুন করে বিশ্বাস ও প্রগতিকে প্রতিষ্ঠিত করার রঙীন স্বপ্ন তাঁর চোখে-মুখে।

ফ্রান্সে একনামে পরিচিত ক্ষমতায় আসীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গল স্বপ্নেও ভাবেন



ফ্রান্সোয়া মিত্তারী

নি তাঁর সাজানো বাগানের এতটুকু রকমকমের হতে পারে, এমন কিছু অঘটন ঘটতে পারে। তাই সত্যিই! অঘটন অজ্ঞা ঘটে।

উনপঞ্চাশ বছর বয়সের অপেক্ষাকৃত নবীন রূপমণ্ডিত ফ্রান্সোয়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক-জীবনে নতুন করে স্পন্দন ভুলেছেন। জাতীয়-জীবনে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ করে মিত্তারী প্রসারিত করেছেন সমাজতন্ত্রের আদর্শকে। দ্য গল ফরাসী জাতিকে যেখানে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত রাখতে চেয়েছেন ও সেই খাতে অর্থের বিরাট অপচয় করেছেন, সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ মিত্তারী জনজীবনের কাছে ভুলে ধরেছেন পারমাণবিক অস্ত্র-বিরোধী ভূমিকা ও সমাজ-

কল্যাণমূলক কর্মসূচী। মিত্তারীর কণ্ঠ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সুশ্রী-সুন্দর-ফ্রান্সোয়া তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিগত ও স্নাতক্যো শোভনীয় মানুষ। সামান্যমাত্র রেলপথ কারিগরের সন্তান হয়েও ফ্রান্সোয়া মিত্তারী পর পর তিন-তিনটি (আইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী লাভে সক্ষম হয়েছেন। রাজনৈতিক বুদ্ধি ফ্রান্সোয়ার মধ্যে প্রথমেই কাজ করেছে। তিনি একজন কঠোর রাজনীতিজ্ঞ, যিনি ১৯৪৬ সাল যাবৎ পার্লামেন্টে রয়েছেন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭-এর মধ্যে একাদশ মন্ত্রিপরিষদের সভ্য হন ও ছ' বছরের অধিক অফিস-ভার গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষের চোখে তিনি একজন সুবিধেবাদী ও সুযোগসম্পন্ন। মানুষ হিসেবে পরিচিত হলেও মিত্তারী বাস্তবিকই ব্যক্তিগত ও আদর্শহীন মানুষ নন।

তা ছাড়া মিত্তারী গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মানুষ হলেও অপরকে নস্যাত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা তাঁর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি, মিত্তারী কখনো অস্বীকার করেন নি জেনারেল দ্য গলের অতীত মহৎ কার্য-কারিতাকে। ১৯৫৮ সালে মিত্তারী বাধ্য হয়েছিলেন দ্য গলের ক্ষমতার অবরোধে। মিত্তারী পার্লামেন্টে ও তার বাইরে সরকারের একজন তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী সমালোচক বলে পরিচিত হয়ে আছেন।

অপ্রধান দলের সদস্য হলেও মিত্তারী ছিলেন চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের একজন মধ্য রাজনীতিজ্ঞ। ফরাসী জাতিকে নেতৃত্ব বাতলে দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জনৈতিক মিত্তারী সমাজতান্ত্রিক মনের মানুষ।

আজ ফ্রান্সোয়া মিত্তারীর সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্য গল অনিশ্চিত। মধ্যপন্থী ভোটারদের কাছেই আজ উভয়ের ভাগ্যলিখনের সোনারকাঠি জমা রয়েছে; তাই এই মধ্যপন্থীরাও যদি অবশেষে মিত্তারীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে দ্য গলের পক্ষে শেষ বয়সে এই নির্বাচনে জয়লাভ খুব সহজ হবে না।

সত্যিই রাজনীতি অতীব কঠিন। শেষ বয়সেও দ্য গল আজ প্রচারবন্ধে নেমেছেন। তাই একদিকে দ্য গলের শক্তি ও অপরদিকে গণবাদী শক্তির পরীক্ষা নিয়ে ফ্রান্সের রাজনীতি এখন সরগরম। ফ্রান্সের এই পরীক্ষার ফলাফল আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ফরাসী নির্বাচনের ঔৎসুক্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবার নতুন পথের সম্মুখীন হয় নিয়ে যেতে পারে; সত্যিই গতানুগতিক ভাবধারা থেকে আজ পৃথিবীর মানুষও যে স্বস্থিত পেতে চায়, না সে পুরাতনী ব্যক্তি মোহাম্মদকেই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আজ ফ্রান্সের মানুষ পা ফেলেছেন। সভ্য দুনিয়ার সামনে হয়ত সে সঠিক কিংবা কোনো নতুন পথ খুলে দেবে। আর মিত্তারী হলেন এই পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার অগ্রপথিক!



ডুবানী মুখোপাধ্যায়

জীবন-শিল্পী সমরসেট মম

১৯১৮ খৃস্টাব্দে ডব্লু এল জর্জ নামক জনৈক লেখক “এ নভেলিস্ট অন মডেলস” নামক একটি গ্রন্থে প্রশ্ন করেছিলেন ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ইংরাজী উপন্যাসের জগতে কে কোন স্থান অধিকার করে থাকবেন। বিশেষ করে ওয়েলস, আর্নল্ড বেনেট, গলস্-ওয়ার্দি এবং যোসেফ কনরাদের আসন কে বা কারা গ্রহণ করবেন? সেইকালে উইলিয়াম সমরসেট মমের “অফ হিউ-ম্যান বনডেজ” প্রকাশিত হলেও জর্জের ভবিষ্যদ্বাণীতে সমরসেট মমের নাম উল্লিখিত হয় নি।

সমরসেট মম দ্বিশ বছরকাল ধরে কথাসাহিত্য বিভাগে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। কখনো হয়ত একখানি নাটক দৃঢ়তার স্পৃহা সহ বৈশিষ্ট্য দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু উপন্যাস প্রকাশ মাত্র একেবারে বেস্ট সেলার।

পাঠক সাধারণের কাছে এই রহস্যময় লেখক সম্পর্কে কম আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি। শুধু তাঁর সাহিত্যকর্ম নয়, ব্যক্তিজীবনে মানুষটি কেমন তা জানার আগ্রহ সকলের। নিজের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত ছায়াচিত্রে মম নিজেই সূত্রধার হিসাবে রূপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। বার্নার্ড শ’র পরে সমরসেট মমই একমাত্র সাহিত্যিক যার হাজার রকমের আলোচিত ছাপা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যক্তি-চরিত্র সব-কিছুই পাঠকের জন্য, সব বিষয়েই কৌতূহল।

তথাপি তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন নি, তাঁর সাহিত্যের জন-প্রিয়তা অসীম, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান যেন পিছনের সারিতে।

সাহিত্যিকের খ্যাতি প্রতিপত্তি

‘সাগর লহরী সমান’, জলেই ঢেউ উঠে জলে মিলে যায়, কালজয়ী সাহিত্যিক আর কজন? যার সম্পর্কে কিছু বলতে মন সরে না, সমালোচক যেখানে রাখা নেড়ে বলেন—মহাকাল বিচার করবেন।

মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের নির্ভুল বিচারে যার যেথা স্থান

যুগ-সৃষ্টির এক বিরাট শারিক সমরসেট মম। তাঁর রচিত সাহিত্যের মতই তাঁর নিজের জীবনও কম চাঞ্চল্যকর নয়। সেই মম পর-লোকগমন করেছেন। হৃদয়তেও যিনি অমর, তাঁর সম্পর্কে এ সংখ্যায় শ্রীডুবানী মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন।

—সম্পাদিকা

সেই ঠিক ঠিক আসন মিলবে, এক ইঞ্চি কম নয়, বেশিও নয়।

সমরসেট মম জানতেন এসব কথা, তিনি তাঁর ‘দি স্যামিং আপ’ নামক গ্রন্থে তাই সখেদে বলেছিলেন—

“In my twenties the critics said I was brutal, in my thirties they said I was flippant, in my forties they said I was competent and now in my sixties they say I am Superficial—”

সব শিল্পী আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেন না, কারো জ্ঞান একটু বেশি কারো বা নিজের সম্পর্কে ধারণা অনেক কম, অবশ্য তাঁরা সংখ্যালঘুর দলে। মমের কিন্তু নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল, হরত কালের কণ্ঠ-পাথরে দেখা যাবে জীবনশিল্পী মমের সেই ধারণা অতিরঞ্জিত নয়।

তাই তিনি এ ‘স্যামিং আপ’ গ্রন্থেই বলেছেন—

“There is only one thing about which I am certain and this is that there is very little about which one can be certain—”

দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন মম, অনেক ব্যর্থতার গ্লানি, তিক্ততার ইলাহলে কষ্ট পূর্ণ হয়েছে তথাপি বিষ উৎপীর্ণ না করে অমৃত পরিবেশন করেছেন তিনি। আশ্চর্য প্রসাদ-গুণ এই লেখকের তাই জীবনকে সামনে ধরে তাঁর ছবি এঁকেছেন একেবারে নিখুঁত ফটোগ্রাফ। চেনা চরিত্র, চেনা কাহিনী, ঘটনার বিস্তার ও বিশ্লেষণ মমের নিজস্ব, এই এক আশ্চর্য গল্প-বহন-ভঙ্গীই সমরসেট মমকে অমরত্ব দান করবে। তিরিশের দশকেই মমকে ‘ইংলিশ ম’পাসা’ এই বিশেষণে সম্মানিত করেছিলেন বিখ্যাত সমালোচক মিঃ ডেসমন্ড ম্যাক কারাথ। তিনি সেদিন মম প্রসঙ্গেই বলেছিলেনঃ “সমরসেটের নাটক রচনার শক্তি সম্পর্কে আমার মনে সংশয় ছিল। পরে দেখলাম ‘কারোলিন’ এবং ‘হোম এন্ড বিউটি’, সেই থেকে কমেডির সম্পর্কে তাঁর শক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়। প্রথম মহামুদ্রের আগে মমের খ্যাতি ছিল জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে। আমার নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যাক, ১৯১৪ খৃস্টাব্দে মিঃ মমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইপ্রেসের প্রথম যুদ্ধের পর রেডক্রসের এমব্লেম কোরের কর্মী হিসাবে আমরা দুজনে ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। মানুষ হিসাবে তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য বিষয়ে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকলেও (সাহিত্যিকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও কৌতূহল থাকার কত সাহিত্যিকের সঙ্গে উপযাচক হয়ে

আলাপ করেছি), সাহিত্যিক হিসাবে মিঃ মম সম্পর্কে আমার আগ্রহের অভাব ছিল। এক সপ্তে থাকার ফলে তাঁর সম্পর্কে এতটুকুও আগ্রহ ছিল না।

ডানকার্কে'র কাছাকাছি মালোর একটি শয়নকক্ষের দৃশ্য মনে পড়ে। মিঃ মমের প্রকাশক এক তাড়া প্রুফ পাঠিয়েছেন। আমার পড়ার মত তেমন বইপত্র সপ্তে ছিল না বলে নয়, প্রুফে তিনি অতি কম সংশোধন করছেন দেখে নজরে পড়ল। আমি তার এ বিষয়ে মন্তব্য করায়, মিঃ মম আমাকে বললেনঃ প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠানোর আগেই আমি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিই। আমি মনে মনে ভাবলাম, নাটকের মত মম দেখাছি উপন্যাস সম্পর্কেও সমান ব্যবসাদার, সংশোধনের জন্য তেমন মাথা ব্যথা নেই। হয়ত বইটা বেশ বিক্রী হবে। জনল্যাম এই গ্রন্থের নাম 'অফ্‌ হিউম্যান বনডেজ'। আমার মনে হয়, হয়ত 'ওলড্‌ ওয়াইভস্‌ টেলস্‌' ফ্লোরওয়েল টু আর্মস্‌', 'কিপস্‌', 'ব্যাবিট' এবং আরো কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের মত মিঃ মমের এই গ্রন্থ কাল সমুদ্রে ডাসমান থাকবে—আর একালের অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থ হয়ত কালের অতলে তলিয়ে যাবে।"

সমরসেট মম ১৯৪৯-এ প্রকাশিত তাঁর "এ রাইটার্স নোট বুক"-এ দোকান বন্ধ করার ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন :

"I have retired from the hurly-burly and ensconced myself nor uncomfortably on the suely. Any ambition I may have had has long since been satisfied. I contend with none not because none is worth my strile but because I have said my say, and I am well pleased to let others occupy my small place in the world of letters."

এই উক্তি সমরসেট মমই করতে পারেন। এতটুকু অহমিকা মনে না নিয়ে তিনি সৈদিন এই উক্তি করতে পেরেছিলেন।

আমার আর একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম যে আধুনিক কালের ইংরাজী সাহিত্যে দুটি বিস্ময়কর বস্তু বর্তমান, যেন রহস্যময় ধাঁধা, এক সমরসেট মম আর একটি ই, এম, ফরস্টার। মমের লেখনী অবিপ্রান্ত, আর ফরস্টার মধ্য পথে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বলা হয়, তাঁর প্রাচুর্য আছে, বস্তু নেই। আর ফরস্টারের রচনায় বস্তু আছে প্রাচুর্য নেই। মমের জীবনের ভূমিকার প্রথম কথা সাফল্য, আর তাঁর সাহিত্য কর্মের ফলশ্রুতি হল—'নিথিং ফেলস্‌ লাইফ সাকসেস'।

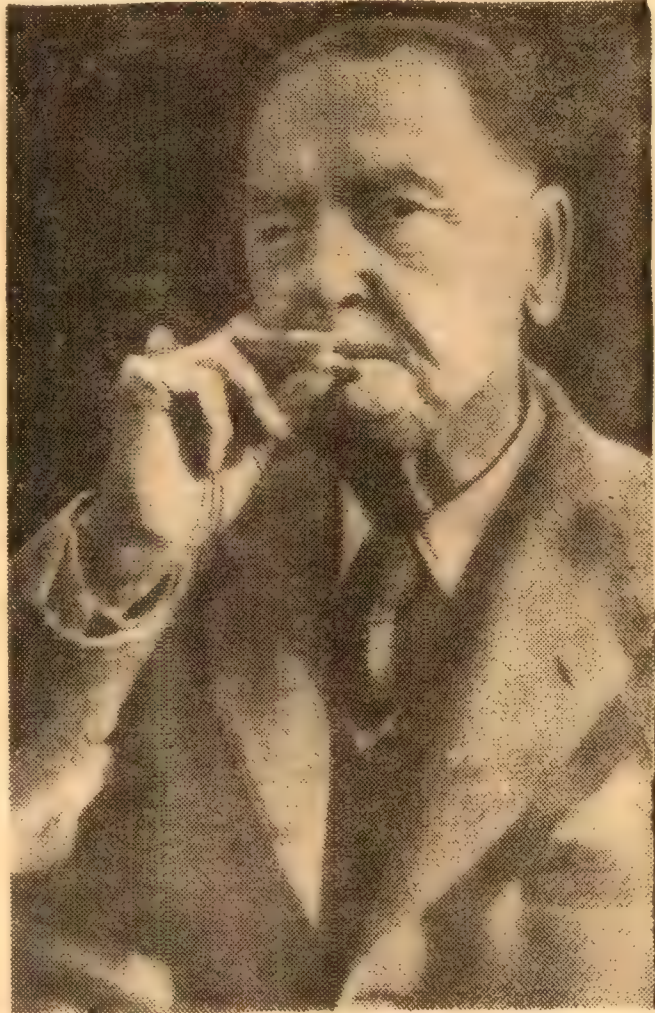
এই সাফল্য শূন্য হয়েচে মমের সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই এবং চরমে উঠেছে 'অফ্‌ হিউম্যান বনডেজ' প্রকাশিত হওয়ার পর।

'অফ্‌ হিউম্যান বনডেজ' জীবনের প্রস্তুতি ও প্রস্ফুটনের এক বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী। যে সময়ে আশা অসীম, পাওয়া কম, সেই দারিদ্র্য ও বদ্ধুষ্কার ইতিহাস এই 'অফ্‌ হিউম্যান বনডেজ'। জীবনের ফাঁদে বিজড়িত এক বালকের কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। জীবন স্বপ্নের ক্রমিক অবসান এই কাহিনীর বক্তব্য। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, বণ্টনা ও বেদনার পেষণে যে মন কিছতেই পরাজয় স্বীকার করে না, সেই মানব মনের আলোখ্য 'অফ্‌ হিউম্যান বনডেজ'। সমরসেট মমের সাহিত্য বিচারে এই উপন্যাসটির মূল্য অসীম।

সমরসেট মমের জীবনের যে সাফল্য অতি অল্প সংখ্যক লেখকের ভাগ্যে সেই সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সেই

সাফল্য এদিনের সমালোচকের মন ভরা-বার হয়ত উপযুক্ত নয়। জনপ্রিয়তা চিরদিনই একটা অবিবাসের ভাব সৃষ্টি করে। এই শতকের গোড়ার দিকে একটা ধূয়া ওঠে যে আর্টের একটা উদ্দেশ্য থাকবে, এবং বার্নার্ড শ, জন গলসওয়ার্থ এবং এইচ, জি, ওয়েলস প্রভৃতি লেখকের দিকে তরুণ বয়সী পাঠকরা একটু বেশি আকৃষ্ট হলেন। সমরসেট মম এই কালে অবহেলিত, কারণ মমের রচনা কোনো বিশেষ বাণী বহন করে আনে নি। সমরসেট মমও মানুষের উন্নয়নে সচেত্ন হন নি। কথা উঠল, সমরসেট মমের লেখক হিসাবে কোনো মূল্য নেই। শূন্য একজন চিত্ত বিনোদক লেখকমাত্র। ১৯০০-তে সমরসেট মম যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন ১৯১০-এ তা একেবারে নেমে গেল অনেক নীচে।

এরপর সাত বছর ধরে সমরসেট মম শূন্য বঙ্গমণ্ডের জন্য লিখলেন। 'কমেডি থিয়েটারে' তাঁর 'মিসেস ডট' অভিনয়



সমরসেট মম

হাউস, প্রতিদিন 'হাউস ফুল' টাঙানো হয়, একদিন প্যানটন স্ট্রীটে সূর্যাস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে সমরসেট মম ভাবলেন:

"Thank God, I can look at sunset now without having to think how to describe it."

মম স্থির করলেন আর কিছু নয়, আর কিছু লিখব না। নিজের অতীতে ফিরে গেলেন মম, সেই অতীতের গহনে। এমনই তাঁর মানসিক অবস্থা যে এক সময় তাঁর মনে হল এই সব যদি উপন্যাসের আকারে লিখে বাই তাহলে হয়ত একটু মানসিক স্বস্তিলাভ করতে পারি।

সেই সময় প্রথম যুদ্ধ শুরুর হওয়ার প্রাকাল। আর এই জীবন যন্ত্রণার কাহিনীর নাম 'অফ হিউম্যান বনডেজ'। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশের পর তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করল না। যুদ্ধের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোনো সংযোগ নেই, এই উপন্যাসের যে অন্ত-নিহিত সূর পরবর্তী যুগের পাঠকদের আকৃষ্ট করেছে সেই যুগে তা কোনো প্রকম প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। পাঠকের চিন্তা জয় করতে না পারলে লেখকের অপমৃত্যু। কেউই তাঁর কপালে জয়টাকা পরিণয় দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে না। মানুষ যখন দৈনন্দিনের ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত তখন সমরসেট লিখেছেন এক চিরকালীন সমস্যার কথা।

কুড়ি বছর পরে সমরসেট মম তাঁর 'দি সামিং আপ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"Success may well cut the author off from the material that is its source."

তাই হয়ত হত, নাটকের বেশ সাফল্য, মে ফেরারে একটি চমৎকার বাড়ি কিনলেন। তারপর বিবাহ। নাটক থেকে প্রচুর অর্থ সমাগম হচ্ছে, সেই কালে ইনকাম ট্যাক্সের হার অনেক কম। যদি মমের বিবাহিত জীবনটা তেমন সুখের হত, তাহলে হয়ত নাগরিক জীবনের পরিবেশে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে শৃঙ্খল মণ্ডসফল উপন্যাসই লিখতেন মম। অন্তত কিছুদিন একটানা ভাবে তাই চলত। তা হল না।

সাহিত্যের সৌভাগ্য যে তা হল না, শেষ পর্যন্ত বিবাহটা তেমন সুখের হল না। অসফল বিবাহ জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করল। সমরসেট লিখেছেন:

"I was tired of the man I was and it seemed to me that by a

long journey to some far country I might renew myself."

তখন মমের বয়স মাত্র চল্লিশ। সমর-কালীন কতবোর জন্য ইংলন্ডের সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্যুত হলেন। এই সুযোগ পেয়ে তিনি সাউথ প্যাসিফিকে ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। সাউথ সাী তাকে 'দি জেন' এবং 'দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেনস' নামক দুটি বিখ্যাত সাহিত্য-সৃষ্টির মাল মশলা দিয়েছে। কিন্তু দূর-প্রাচ্য থেকে শৃঙ্খল এই দুটি কাহিনী মাত্র নয়, তাঁর ভাষ্যের পূর্ণ করার জন্য দূর-প্রাচ্য যেন অপেক্ষার ছিল, অজলি ভরে সাউথ সাী লেখক সমরসেটের ভিলাপার পূর্ণ করে দিয়েছে।

সমরসেট ছোটখাটো পাবলিক স্কুলে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এই জাতীয় স্কুলের ছাত্ররাই ব্যাঙ্কর কেরানী, ডিস্ট্রিক্ট অফিসর এবং প্ল্যানটার হয়ে থাকেন। সমরসেট মমের মালয়ের কাহিনীগুলি এই জাতীয় নায়কেরই কাহিনী। তাঁর চরিত্রাবলীর কাজিন বা সহোদর-সহোদরা ইংলন্ডে যেভাবে জীবনযাপন করে থাকেন তা হয়ত লেখক সমরসেটকে বিরক্ত করত, কিন্তু সুন্দর মালয়ের জঙ্গলে যারা থাকেন তাদের কাহিনী বিচিত্র রূপে রসে ভরা।

সমরসেটের কাহিনী সর্বদাই 'সাধারণ মানুষের কাহিনী', কিন্তু 'সাধারণ' হলেও চরিত্র হিসাবে তারা সবাই 'অসাধারণ'। সমরসেট মমের 'দূর-প্রাচ্যের অধিকাংশ কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে হয় খুন নয় আত্মহত্যা'। অনেকগুলির মূলে আছে ব্যভিচার। এই কাহিনীগুলি অস্বাভাবিক দীর্ঘ, এবং 'য়েন' এবং 'লেটার' এই কাহিনী দুটির নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল।

প্রায় একদশক কাল ধরে এই ভাবে ভ্রাম্যমাণ থাকার ফলে সমরসেট মম দুখানি মূল্যবান উপন্যাস লিখেছেন 'দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেনস' এবং 'দি পেনটেড ভেল'। দুখানি ভ্রমণকাহিনী—'অন এ চাইনিজ স্ক্রীন' ও 'দি জেনটেলম্যান ইন দি পারলর', একখানি সুন্দর নাটক 'দি ইস্ট অফ সুয়েজ', এছাড়া যুদ্ধকালীন গদ্যচরিত্র বিভাগের 'কাহিনীগুলিতে এসেনডেনের চরিত্র আমদানী করলেন।

হালকা মেজাজের উপন্যাস 'দি কেকস অ্যান্ড এলস' প্রকাশিত হওয়ার পর সারা লন্ডন চঞ্চল হয়ে উঠল। শৃঙ্খল যে উত্তেজনাযুক্ত এবং নাটকীয় রচনার লেখক হিসাবে নয় সমরসেট মমের রচনা সেই কালের মানসিকতার সঙ্গে আশ্চর্য খাপ খেয়ে গেল। প্রান্ত যুদ্ধোত্তর সমাজের

কাছে সমরসেট মমের কাহিনী যে ক্ষতের ওপর প্রলেপ।

দশ বছর কাল সমরসেট মম শৃঙ্খল স্টুটগেসে মিরেই জীবন কাটিয়েছেন ভ্রাম্যমাণের জীবন পরিব্রাজকের জীবন। এরপর হঠাৎ মনে হয়েছিল ঘরের প্রয়োজন। নীড় থেকেই পাখি উড়তে পারে। কাপ ফেরাতে একটি ভিলা বা বাগিচা কিনলেন এনটিবিসেস উপকূল থেকে তা দেখা যায়—চার দিকে পাইলের বন। আর দরজার আঁকা অশুদ্ধ দৃষ্টির প্রতিবেশক বিন্দু বা তাঁর সবকিছু গ্রন্থে আঁকা থাকে। সমরসেটের কাহিনী সংক্ষেপে শেষ করা অসম্ভব, তাঁর ভারত ভ্রমণ, এবং 'দি রেজার্ম' এবং একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধের দাবি রাখে। সমরসেট মম ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে অনেক চিন্তার খোরাক দিয়েছেন, তাই তিনি আমার প্রিয় লেখক।

আজ যেন ১০ বছরের বৃক্ষ লেখকের কণিকণে শোনা যায়—

"When they read my obituary in the Times and say: Is he not already dead? My genial Ghost will chuckle."

বহু-অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সরকারী, বেসরকারী ও বহু-মাস্ট্রেট অফিসের কার্য-পদ্ধতি অল্পমানে লিখিত

MAN OF BUSINESS

কাজের লোক বা কেরানী শিক্ষাদর্শন পাঠ করিলে আর চাকরীর জন্য উৎসাহী করিয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। বাহারা অভিজ্ঞ কেরানী বলিয়া বেতন বাঞ্ছা করিতে চাহেন, তাহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন, কাজের জ্যোত্ব হইবেন।

মূল্য ১৫০ টাকা

শ্রীমৎ গোপবান্দী বিবচিত

নিদর্শন-মাধব

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা সহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাগুরুর অপ্রাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমৎ গোপবান্দীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"অধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালংকার।

এছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১০৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদানকারী বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে
শ্রীঅশোক সেন

সীমান্তে চীনা তৎপরতা

আবার অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে
তোলার জন্য তিব্বতে চীনারা তৎপর হয়ে
উঠেছে বলে সংবাদে প্রকাশ।

তিব্বতে তারা নাকি কুড়ি ডিভিশনের মত
সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং ভারত, নেপাল,
সিকিম ও ভুটান সীমান্তে রেখেছে ষোল ডিভি-
শনের বাহিনী। সংবাদে প্রকাশ, প্রায় প্রতি-
দিনই সৈন্য আনয়নের কাজ পুরোদমে চালিয়ে
যাচ্ছে চীনারা। সমর-সম্ভারও আসছে রাশি
রাশি। চীনের নতুন সড়কগুলি এখন অস্ট্র-
শস্ত্র আমদানীর কাজেই পুরোপূর্ণ দখলীকৃত।

লাডাকেও চৈনিক পাবতা ডিভিশন প্রেরিত
হয়েছে। এই চীনা তৎপরতা লক্ষ্য করে
চীনের ভারত অভিযানের নয়া অভিসন্ধির
আশংকা স্বভাবতই ওয়াকিবহাল মহলে গভীর
উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করেছে।

চীনের এই নয়া প্রস্তুতি ও চীন কর্তৃক
পার্কিস্তানে প্রেরিত ও প্রেরিতব্য অস্ত্রশস্ত্রের
সংবাদে আবার একটি আন্তর্জাতিক অশান্তির
আশংকা প্রকট হয়ে উঠেছে।

চীন রক্তবীজের বংশধর। ডিভিশন
মোতায়েনে তার মাথা ঘামাতে হয় না, ডিভিশন
প্রতিপালনেই মাথা ঘামে শূন্য। কিন্তু সেই
ঘর্মস্রোত হিমালয়ের হিমস্রোতকে উত্তপ্ত করলে
আর একটি আন্তর্জাতিক সংকট ঘনিয়ে উঠতে
বাধ্য। তত্বে বহু শক্তিবর্গ ভারতকে সামরিক
সাহায্য দানে ও সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য
কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করছেন না। বরং
ভারতের ওপর সর্বাঙ্গ দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে

ভারতকে বেকারদার ফেলার ফিকিরে আছেন।
বহু শক্তিবর্গের এই ভারত-পেষণ নীতি
সংকটের একতরফা সমাধানের মুখ দেখতে চান
হয়ত। তবে তার সাংঘাতিক ফলাফল যে
একভাবে ভারতের ওপরই বর্তাবে না, সে
আশংকার কথাও একই ভাবে চিন্তা করার
বিষয়। আর ভারতেরও সীমান্ত সংঘর্ষ
মিটিয়ে ফেলার জন্য অন্যান্যরপেক্ষ একটি
কঠিন পথ বেছে নেওয়ার দরকার।

দীর্ঘদিন ধরে বগীর ভাবনা জিইরে রেখে
দুনিয়ার যে শক্তিরই যে লাভ হ'ক, ভারতের
সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তাতে প্রচণ্ডভাবে
ব্যাহত হবেই। ফলত তার দ্বারা অনেকের
গুরু অভিসন্ধি সফল হতে পারে।

কিন্তু অন্যের অভিসন্ধি চরিতার্থ করার
পথ যাতে সুগম না হয় সেজন্যই আজ
ভারতের প্রয়োজন আবারও নতন করে নতুন
পথে চিন্তা করা।

সামাজিক নিরাপত্তা

“জনগণকে শূন্য ভোটের অধিকার ও
রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিলেই চলবে না,
সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থাও একই সঙ্গে
করতে হবে।”

সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলনে তাঁর স্বাগত
ভাষণ দান কালে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন
কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের
মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন।

নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এশিয়া ও
সিনিয়ার আন্তর্জাতিক সামাজিক নিরাপত্তা

সমিতির দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলনের
অনুষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যকে
সংক্ষিপ্ত চূম্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে গ্রীসেন
বলেছেন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার
রূপায়ণে ভারত সাহসী পদক্ষেপে অগ্রসর
হচ্ছে।

বর্তমানে এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের
অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ কর্মচারী পরিবার স্বাস্থ্যাবীমা
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। শিল্পখনি শ্রমিকদের
পি এফ পরিকল্পনার উল্লেখ করেও গ্রীসেন
জানিয়েছেন যে, এই পরিকল্পনার দ্বারা উপ-
কার পাবেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কর্মী।

গ্রীসেনের আশা, শীঘ্রই বেকারসহায়ক
একটি পরিকল্পনা প্রবর্তিত হবে। তা ছাড়া
বহুসংখ্যক ক্ষেত-মজুরকেও সামাজিক নিরা-
পত্তা ব্যবস্থার আওতার আনা হবে।

আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রীর
ভাষণে উৎসাহিত হওয়ার বশেই বর্তমান।
তথাপি একথাও ঠিক যে, ভারতের মত একটি
দরিদ্র দেশে তার বিপুল লোকসংখ্যার অনু-
পাতে গ্রীসেন প্রদত্ত চিত্র জনগণকে আশ্বস্ত
করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। না হওয়াই স্বাভাবিক।
সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রকৃত চিন্তা খুব
বেশি দিন দানা বেঁধে ওঠে নি। সম্প্রতি-
কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গ্রীসেনই এবিষয়ে জনমনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য প্রচারণা শুরু
করেছেন এবং তাঁর আগ্রহে সামাজিক নিরাপত্তা
বিষয়ক, নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার
বশেই সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বস্তুত
সামাজিক নিরাপত্তা না থাকলে রাজনৈতিক
স্বাধীনতার স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন মাত্র। আত্মবিশ্বাস
না থাকলে যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণের কল্পনা শূন্য-
মাত্র কল্পনাই। সামাজিক নিরাপত্তা রাজনৈতিক
স্বাধীনতা রক্ষায় যে একান্ত অপরিহার্য, গ্রীসেন
তারই যথার্থ ব্যাখ্যা করে সামাজিক নিরাপত্তার
প্রশ্নটিকে তার উপযুক্ত গুরুত্ব দান করেছেন।

উন্নত এশিয়ার স্বপ্ন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আন্ত-
র্জাতিক সামাজিক নিরাপত্তা পরিষদের দ্বিতীয়
আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে নতুন
সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য এশিয়ার উন্নয়নশীল
জাতিগুলির প্রতি আহ্বান জানান। তিনি
গ্রীনেহরুর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর ন্যায় এশীয়
দেশগুলিকে মিলিতভাবে বিশ্বশান্তির উপযুক্ত
পরিবেশ রচনার জন্য আবেদন জানিয়ে
বলেছেন, ভারত শান্তিপ্রিয়। সম্প্রতি ভারত
সীমান্তে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে
ভারতকে বাধ্য হয়েই জড়িয়ে পড়তে হয়।

ভারতের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে
গ্রীশাস্ত্রী বলেছেন, ভারতের সাধারণ সমস্যা-
বলীর আভ্যন্তরীণতাই তাকে বাঞ্ছিত স্বার্থের
প্রতি যথার্থ নজরদারির সুযোগ দেয় না।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ভারতের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ সৃষ্টি করার জন্য শিল্প ও কৃষির প্রতি ভারতকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতের চিরন্তন মনোভাব প্রকাশ করে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে অধিকাংশের অধিকার হরণের নিন্দাও এই সূত্রে করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একাধারে ভারতের সামগ্রিক শক্ত্যচিন্তা ও কল্যাণরত্নী রাষ্ট্রগঠনের পথে নানা অসবিধার ঝুঁকি পরিস্কারভাবে বাস্তব করেছেন।

বস্তুতপক্ষে ভারতের সমস্যা সমুদ্র তরঙ্গের মতো। এক ডাঙে তো আর এক সৃষ্টি হয়। তটরেখা নিরন্তর গ্লাবিত হচ্ছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে সমস্যাই জীবন। সেই সমস্যাকে সমাধান হওয়ার মধ্যেই জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির ঐক্যবন্ধ প্রতিজ্ঞার, অটুট মনোবলের এবং স্বাধীনতাশীল দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। দুর্ভাগ্যত সত্য কথা বলতে হলে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে যে ভারত ছিল একনিষ্ঠ দেশাত্মবাদী আদর্শপরিচয় জাতি, ক্ষমতালোভের পর সেই ভারত হয়েছে কুচক্রী স্বার্থবাজের লীলাভূমি। কোনও সরকারের ক্ষমতা নেই সমাজজীবনের ময়লা বৈশ্ববিক দূষণে আমলে ধৌতকরণ ছাড়া হীনস্বার্থের আগাছা উৎপাটন করা। বলা বাহুল্য, ভারত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথ গ্রহণ করেছে। সে ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যীকল্পিত অথবা শ্রীঅশোক সেন পরিকল্পিত ভারত সমাজের আবির্ভাব সময়সাপেক্ষ নিশ্চয়ই।

তথ্য সমস্যার কারণগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করে একই সমস্যা যাতে জ্বিয়ে থাকতে না পারে তার জন্য ভারতবর্ষ সংকল্পবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে পারে। সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে যে সব রাষ্ট্রে উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে, দৃঢ়চিত্ত পদক্ষেপই সে উন্নতি সফল করে তুলেছে।

ভারতের সকল সমস্যার মূলে স্বাধীনতার দ্বন্দ্বকাল থেকে একটি মূল সমস্যার আচ্ছন্ন সমাধান হয় নি। তা হল পাক-ভারত সমস্যা।

বৃটিশ সৃষ্ট এই পাকিস্তানের আজন্ম ভারত-বিরোধিতা ও সংকীর্ণ ধর্মাত্ম সাম্প্রদায়িকতা ভারতের চিন্তায় কর্মে প্রাতিদর্শনিক সমস্যাকে জ্বিয়ে রেখেছে।

ভারতকে তার প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয়-সাধ্য অপব্যয় করে যেতে হচ্ছে তার প্রয়োজন না থাকলে ভারত আজ অনেক নয়া পরিকল্পনা খনায়সেই হাতে তুলে নিতে পারত। উন্মাদিত সমস্যা ভারতে খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাকে তীব্রতর করেছে। পাক-ভারত সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হলে এবং যদি লোক বিনিময়ের ও সম্পত্তি বিনিময়ের দ্বারা উন্মাদিত সমস্যার সমাধান সম্ভব

হত বা হবার নয়) ভারত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক সম্ভবপর করে তুলতে পারে।

সাম্রাজ্যীর বক্তব্যে তারই যেন কণিণ আশার সুর শুনতে পাওয়া গেল। তিনি বলেছেন, তিনি আশা করেন, আর লড়াই হবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্ভাবে বসবাসের সুযোগ পাবে ভারতবর্ষ।

সেই সূচিনের আশায় ভারতবাসী মাঠেই অপেক্ষায় থাকবেন। সেই শব্দলং যেন বিলম্বিত না হয়।

অন্তরীণ বিনিময়

পাক-ভারত অন্তরীণ বিনিময় ব্যবস্থানুসারে প্রথম ক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তান বন্দী শিবির থেকে ছাড়প্রাপ্ত নশ পয়ষটিজন ভারতীয় নাগরিক আনন্দাপ্রভুতে ভারতের মাটি ভিজিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। বেনাপোল সীমান্তে পাক চেক পোস্টে ছাড়প্রাপ্ত ভারতীয় নাগরিকদের যখন তল্লাসী করা হচ্ছিল, ভারত সীমান্তে তখন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য উপস্থিত

ভারতীয় অফিসরদের অভিভূত করে। সীমান্তে এপারে শয়ে শয়ে আত্মীয় পরিজন কাপসা চোখে তাঁদের ফেরৎ পাওয়া প্রিয়জনদের সহস্র চোখে খুঁজছিলেন। এই আবেগমগ্নিত হারানো-প্রাপ্তির দৃশ্য শুরু হয় ১৮ই ডিসেম্বরের ভোর সকাল থেকে। বেলা দুটো পর্বন্ত অসার পালা চুকলে শুরু হয় ভারতে অন্তরীণ পাক নাগরিকদের বিদায় অনুষ্ঠান। ভারতের শূভেচ্ছা সংগে নিয়ে পাক নাগরিকগণ (সংখ্যায় এক হাজার আটনব্বই) বিদায় নিলেন স্বদেশের উদ্দেশ্যে।

যারা ফিরলেন

যারা ফিরলেন তাঁদের চোখে জল বৃকে আনন্দ। ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি চোখের পাতাকে বেদনাসিক্ত করেছে, অনেকের নিকটতম আত্মীয় পরিজন পাক নাগরিক হওয়ার তাঁদের ছেড়ে আসতে হয়েছে, উভয় সীমান্তের টানা-পোড়নে তাই ঠুঁদের মনে। একটা মৌকি অগচ্ছদের মাধ্যমে যে দেশভাগ সে দেশভাগের



দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

মালিকরা এমনি করেই মারের বুক থেকে সন্তান ছিঁড়ে নিয়েছেন। তাই আসা-যাওয়ার পথ তাঁদের কাছে সমান বেদনাদায়ক।

বিচ্ছিন্ন জর্মানের মত বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমান এমনিভাবেই চোখের জলে কালাতিপাত করতে বাধ্য। কালের প্রলেপে এ বাথা একদিন মুছে যাবে। কিন্তু সে-ও এখনও এক পুরুষের অপেক্ষা।

যারা যাবেন

পাক নগরিক যাদের এবার দেশে ফিরতে হবে তাদের অনেকেই কিন্তু পাকিস্তান প্রত্যা-বর্তনে নারাজ। অন্তরীণ নন এমন অনেকে তো গা ঢাকা দিয়েছেন পাছে তাঁদেরও পাজা-কোলা করে তুলে পাককুণ্ডে বিসর্জিত করা হয়। কিন্তু ভারতপ্রমী এই পাকিস্তানীদের কতজন যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়ে পাকিস্তানের স্বার্থে ভারতে অবস্থানের ফলি এটেছেন তা সহজে ধরা মুস্কিল। তাই ভারতে বসবাসে ইচ্ছুক পাকনাগরিকদের দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন আশংকা খুবই সংগত। গা ঢাকা-দেওয়া পাকিস্তানীদের সুতরাং তত্ত্ব-তত্ত্বাস দরকার।

জেনারেল থিমায়্যা

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল থিমায়্যা আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ সকলকে বিচলিত করেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ঊনষাট বৎসর। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে প্রকাশ। তাঁর মরদেহ নিকোসিয়া (সাইপ্রাস) থেকে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ বিমানে ভারতে আনীত হয়। সাইপ্রাস সরকার জেনারেল থিমায়্যা প্রাতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সমস্ত সরকারী ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেন।

জেনারেল থিমায়্যা ছিলেন সাইপ্রাসে; রাষ্ট্র-সংঘ শান্তি বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে মর্যাদাপূর্ণ পদাধিকার কালেই তাঁর মৃত্যু হল প্রায় কতবারও অবস্থায়। জেনারেল থিমায়্যা অধীনে ছিলেন, ব্রিটেন, আলজার, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের ছয় হাজার সংখ্যক বৃহৎ সেনাবাহিনী। তাঁর অপরূপ কর্মদক্ষতায় শান্তিবাহিনী সাইপ্রাসে শৃঙ্খলা রক্ষার সক্ষম হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ গৃহযুদ্ধ গ্রীক বনাম তুর্কী সাইপ্রটে সন্তাবনা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে রোধ করেছিলেন।

ভারতের এই বীর নায়ক বার হাজার ফুট উঁচু কাম্মীর জো জি লা গিরিবন্ধ ট্যাংক নিয়ে গিয়ে প্রথম কাম্মীর অক্রমণকারী পাক-সৈন্যদের সঙ্গে যে অশ্রুত কলকৌশলী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সারা দুনিয়া সে সর্বোদ-বিস্ময়ের সঙ্গে প্রবণ করেছিল ১৯৪৮ সালে।



থিমায়্যা

তাঁর শ্বিতীর স্মরণীয় কীর্তি ১৯৫৩ সালে পশ্চরাষ্ট্র নিরপেক্ষ জাতির বন্দী বিনিময় কমিশনের সভাপতি রূপে। তাঁর চেষ্টাতেই কোরিয়া যুদ্ধের কঠিনতম এবং বিতর্কিত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। এজন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন।

জে: থিমায়্যা ১৯২২ সালে মাত্র বোল বছর বয়সে দেহাদুর্ন প্রিন্স অব ওয়েলস রয়্যাল ইন্ডিয়ান কলেজে ভর্তি হন ও কমিশন প্রাপ্ত হন ১৯২৬ সালে। প্রথমে রাষ্ট্রীয় বাহিনী নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নয়া রাষ্ট্রতে বৃদ্ধ পরিচালনাই ছিল জে: থিমায়্যা বৈশিষ্ট্য। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের আসন লাভ করেন ১৯৫৭ সালে। অবসর গ্রহণের সময় আসে ঠিক চার বছর পরেই। কিন্তু জীবনে একটি মূল্যবান মুহূর্তও তিনি অবসরে উদযাপিত করেন নি। শেষদিন পর্যন্ত তাই তাঁর সঙ্গে সক্রিয় কর্মের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

কীলার দি ট্রেভার

পাক পর্ববেক্ষণের দুরাশা শ্বিতীরবাবের জন্য কাটা ঘড়ির মত ভারত সীমানায় লটকে পড়ল। বাহাদুর ন্যাট চালক স্কোয়াড্রন লীডার ট্রেভার কীলারের অবাধ অভিযানে পাকিস্তানের একটি পর্ববেক্ষণ বিমান এপ্র-১৯ অক্টোবর ১৬ই ডিসেম্বর অমৃতসরের আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতীয় এলাকায় ভূপাতিত হয়।

ওরা সেপ্টেম্বরও ঐ ট্রেভার কীলারের গুলীতেই ছান্স-জোঁরিসন এলাকায় সর্বপ্রথম পাক স্যাবার জেট মুখ খুঁড়ে পড়েছিল।

ট্রেভার কীলার এখন পাক চোখে কীলার দি ট্রেভার। কীলার থাকতে পাকিস্তানের পর্ব-বেক্ষণের দুরাশা ত্যাগ করতেই হবে। কীলার ওরা সেপ্টেম্বর যে স্যাবারটিকে গুলী করে নিচে ফেলে দেন সেটিও ছিল পর্ববেক্ষণ বিমান।

পাক বিমান চালক ঘটনাক্রমে মারা গেছেন। জীবন্ত বন্দী হয়েছেন পাকিস্তান শ্বলবাহিনীর জনৈক মেজর।

ভাগ্যবান পুরুষ ট্রেভার কীলার। দু-দুবার শব্দ অভিসন্ধির প্রথম মোকাবিলায় গুণযোগ তিনিই পেয়েছেন।

কেরালা:

নির্বাচনী জল্পনা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের মন্তব্যকে ঘিরে কেরালা রাজ্য বিধানসভায় আশু নির্বাচনের সন্তাবনা নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। শ্রীজৈনের বক্তব্যে কিঞ্চিৎ আশার সূত্র ছিল, কেন না তিনি আশু নির্বাচনের সন্তাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি। রাজনীতির কারবারীরা সুতরাং আশান্বিত। আশা, হয়ত বা ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নির্বাচনের মহড়া শুরু হবে। অবশ্য শ্রীজৈনের মন্তব্যে অভ্যুত্থানের কারণ খুব একটা আছে এমন কথা ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ আশু সন্তাবনার কারণ যতই থাক সেই সঙ্গেই আবার শ্রীজৈন এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নির্বাচনের ব্যাপারটা “পরি-স্থিতির হেরফেরের ওপর নির্ভরশীল”। সুতরাং নতুন আর এক চিন্তাও দেখা দিয়েছে। তা হল, পরিস্থিতি বলতে শ্রীজৈন যে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে নির্দেশ করছেন তা স্পষ্ট নয়, ইঙ্গিতগ্রাহ্য মাত্র। পরিস্থিতি বলতে তিনি রাজ্য অথবা সমগ্র দেশের পরিস্থিতি বলছেন কিনা অভিজ্ঞ মহলে তা নিয়েই এখন গবেষণা চলছে।

যদি রাজ্যের পরিস্থিতিই বক্তব্য হয়, তবে বলতে হবে, রাজ্য পরিস্থিতিতে এখন কড়ের সন্দেহ জানাচ্ছে খাদ্যপরিস্থিতি।

আর সর্বভারতীয় সমস্যা খাদ্য ছাড়াও,



ট্রেভার কীলার

সীমালত সমস্যা। সীমান্তে যদি পরিস্থিতি কিছু শান্তভাবে অবলম্বন করে তবে হয়ত কেওলা রাজ্য বিধানসভায় শীঘ্র নতুন নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কিন্তু যদি নির্বাচনের পথই পরিষ্কার হয়ে আসে তবে কি কেওলার দলগত সমস্যা সরা আঁততে নতুন করে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারবে?

যে কেওলা কংগ্রেসের জন্ম বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসী সাফল্যের প্রতিবন্ধকতা করেছে, ভবিষ্যতেও সেই কেওলা কংগ্রেস কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবে এমন কথা এখন থেকে চিন্তা করা যায় না। কুট রাজনীতি সে মিলন সেক্টর মূলে কুঠারাঘাতের জন্য সদা সতর্ক। নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আর তাই দু'পক্ষের নেতৃবলোভী হোমরা-চোমরা কেউ যে মনে প্রাণে স্বার্থ বিসর্জনে রাজী হবেন, তেমন আশাও করা যায় না।

এহেন অবস্থায় অনেকে মনে করেন, দুই কংগ্রেসী লড়াই-এর অবসান ঘটাতে প্রয়োজন একটি প্রশস্ততর হাইফেনের অর্থাৎ সাধারণভাবে রাজ্যের স্বার্থে একই প্ল্যাটফর্মে যদি একাধিক দলকে সম্মিলিত করা যায় তবে হয়ত তাঁদের গায়ে গায়েই কেওলা কংগ্রেসের সঙ্গে একটি সমঝোতার আসা সম্ভবপর হবে।

কম্যুনিষ্ট দল কিছু পরিমাণ জনপ্রীতি হারাবেন যদি তারা পি এল ৪৮০ নিয়ে অধিক নাড়াচাড়া করেন। রাজ্যের সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের ভয়ালছায়া দেখছেন বর্তমানে। তাঁদের কাছে পি এল ৪৮০ প্রত্যাখানের হুজুগ তুলে অগ্রিম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মনে রাখা উচিত, ক্ষমতাসীন দল সমগ্র বৃক্কে পি এল ৪৮০ নিয়ে উচ্চবাচ্য রাতারাতি বন্ধ করে এখন নতুন সূত্র ধরেছেন। কম্যুনিষ্ট গোয়াতুর্মি রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণের বিরাগ উপাদানেরই পথ প্রশস্ত করে। কেওলায়ও সে পথ তাঁরা তৈরি করছেন পি এল ৪৮০-র বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলে।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টদের ই এম এস-বিরোধী এবং রাশিয়ারাদী শ্লোগানও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভরাডুবি হতে চলছে।

আজ অনেকেরই ধারণা, কাম্মীর প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই শত্রু নয়; রাশিয়াও যে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে এমন ভরসা বড় একটা নেই। তাই চীনবাদী ই এম এস-কে গালিগালাজ করে রাশিয়ার ভরসায় যে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টরা রাশ্যামুখী হয়ে আছেন রাশিয়ার 'স্বাধীন কাম্মীরের' চিন্তা তাঁদেরও শ্লোগানকে দুর্বল করে তুলবে।

ফলত চীনবাদীই হন আর রাশ্যামুখীই হন, জাতীয় স্বার্থের হিসেব খাঁজা বিদেশী নীতিতে কখনো, নির্বাচন তরণীকে টাল সামলে ডাংগায় তুলে আনা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর। কম্যুনিষ্ট দলের মুস্কিল হচ্ছে, চীন বা রাশিয়া খাঁর দিকেই মূখ্য তুলুন না কেন তাঁরা, চীন রাশিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের

অস্তিত্ব নাস্তিদের মুখ চেয়ে কখনো আপন মুখ তাঁদের দিকে ঘুরিয়ে দেখাবেন না।

এমতাবস্থায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা জটিল হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়।

বিহার:

কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট

বিহার রাজনীতিতে একটি নতুন ধুম-কেতুর উদয় হয়েছে যার কালকেতুরূপ বৃষ্টিতে কংগ্রেসী মহল বর্তমানে বেশ ব্যতিব্যস্ত। অবশ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বাহ্যত কোনো দুর্বলতা প্রকাশে নারাজ। কিন্তু আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে ঠিক তাকিয়া ঠেস দিয়ে



শ্রীকৃষ্ণবরদ সহায়

বসে থাকার অবস্থা যে নয়, তা এখানকার কংগ্রেসী মহলের তৎপরতা লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কতিপয় বিরোধী দল আগামী নির্বাচন সামনে রেখে একটি সাধারণ নিয়মতান্ত্রের নিচে সমবেত হওয়ার জন্য সক্রিয়। এঁদের মধ্যে খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন সি পি আই, এস এস পি ও আর এস পি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত-মৈত্রী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে মত পার্থক্য সত্ত্বেও এই দলগুলোর মধ্যে দেশীয় অর্থনৈতিক প্রশ্নের অনেকক্ষেত্রেই নীতিগত একো উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। চেষ্টাও চলছে সেই দিক থেকে। চেষ্টা সফল হলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট মাথা তুলতে পারে। আর মৌখিক অস্বীকৃতি জানালেও কংগ্রেসী মহল এমন একটি নির্বাচনী আঁতাতের সম্ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারছেন না। রাজ্য ও কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট

সম্পর্কে উচ্চমহলে বাতীত চলছে কলো প্রকাশ।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রীর নীতিই যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী। তিনি একদিক থেকে বিরোধী দলগুলিকে কেঁপিয়ে তুলে তাদের জোটবন্ধ হওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

তবে যে জনতা পার্টি নামে জনতার দল, নীতিতে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসকারী তার সমাজ-তান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন কোনো দলের সঙ্গে হাত মেলাবে না বলেই ধারণা। খাদ্যনীতিতেও বিরোধীদলের সঙ্গে তাঁদের পর্বতপ্রমাণ মত-পার্থক্য। ওরা স্বাধীন মুনাকার প্রচারক। বিরোধী দলেরা যখন খাদ্য স্টেট স্ট্রাইক ও রেশনিং প্রবর্তনের সমর্থক, জনতা পার্টি তখন চার স্বাধীন ব্যবসার সুযোগ এবং বিরোধিতা করে যে কোনোৱকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার। তবে ঝাড়খণ্ড পার্টির পক্ষে বামপন্থী জোটে যোগদান হয়ত সম্ভব হবে। বামজোটে সুতরাং, একমাত্র সমস্যা আসন সংরক্ষণ নিয়ে।

কংগ্রেসের স্বঘরে বিরোধ পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। বিহারের মন্দি-সভাবাদী ও বিরুদ্ধবাদীরা এখনও প্রাথমিক সংস্থা ও জেলা পরিসরে ক্ষমতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অবশ্যে। বিশেষত বিরোধী নজন কংগ্রেসী সদস্য (আইনসভার) এবং ঝাড়খণ্ড পার্টির বিরুদ্ধাচরণ কংগ্রেস ও বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবরদ সহায়ের দৃষ্টান্ত শক্ত খুঁটি বলে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা। ছোটনাগপুরে ইতিপূর্বে তার কিছু পরিচরও পাওয়া গেছে। সুতরাং বিহারের বর্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব ঘরে বাইরে প্রতিকূল আবহাওয়ার ঘনঘটা লক্ষ্য করছেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অবশ্য মার্কামারা পি এস পি ও জনসংঘ বিরোধী জোটে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন না। কংগ্রেসের পক্ষে এ দুটি পার্টির অস্তিত্ব স্বস্তিকর বটে। পি এস পির চক্রশূন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি; এস এস পি শত্রু শিবির। তবে পি এস পির কিছু চিন্তাশালী সদস্য মনে করেন বাম জোটের বাইরে থেকে পি এস পি দুর্বল হয়ে যাবে। বাকি দল তাতেও অবচলিত। বাই যটুকু পি এস পির ঐতিহ্য তাঁরা বৃকে আঁকড়ে বজায় রাখবেন-ই।

জনসংঘ কংগ্রেসী ক্ষমতাকে বলবৎ রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনসংঘের বক্তব্য, বামকুল নেতিবাচক নীতির দ্বারা পরিচালিত। অন্য-পক্ষে জনসংঘ বরং কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলানো প্রয়োজক মনে করেন। জনসংঘ কংগ্রেসী মহলে একদল দেশোদ্বাদীর দর্শন পেয়েছেন।

তথাপি পি এস পি, জনসংঘের মত কতিপয়ের দলও কংগ্রেসের স্বার্থ ভরসামূল্য বলা যায় না। কারণ রাজনৈতিক দল হিসেবে এদের অস্তিত্ব খুব একটা গণনীয় বিষয় নয় এ কথা সবাই জানেন।



আন্তর্জাতিক

ইউ থাণ্টের সঙ্গে আয়দুব খাঁ

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ শাসন আইয়ান স্মিথ সরকারকে ধরুস না করলে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে বলে যে ঘোষণা আন্ডিস আবাবার করা হয়েছিল, তা পুরোপুরি না হলেও অন্তত কিছুটা কার্যকরী হয়েছে। ছয়টি আফ্রিকীয় রাষ্ট্র বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এই রাষ্ট্রগুলি হল: গিনি, তানজানিয়া, ঘানা, মালি, স্যারিটোরিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। সুদান, কেনিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি রাষ্ট্র এখনও সম্পর্ক ছিন্ন করে নি বটে, তবে বৃটেন যদি ভবিষ্যতেও তার বর্তমান নীতির নীতি চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে তারাও সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছে।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি যাতে রোডেশিয়ার প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না করে তার জন্য বৃটেন আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাদের নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বৃটেনের বক্তব্য ছিল, ইতিমধ্যেই বৃটেন আইয়ান স্মিথ শাসনের বিরুদ্ধে যে সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার ফলে এই শাসন ভেঙে পড়তে বাধ্য। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য বৃটেন আবেদন করেছে সবাই-এর কাছে। ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন রোডেশিয়া সমস্যার সমাধানের জন্য সময় প্রার্থনা করেছেন। উইলসন তাঁর বক্তৃতার ফলেছেন, বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গ শাসনকে স্বীকার করে না, এবং

এই বিদ্রোহী শাসনকে ধরুস করতে সে বন্ধ-পরিকর। তবে তার জন্য এখনই কোন সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

বৃটেনের সঙ্গে ছয়টি আফ্রিকীয় রাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, এ নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা 'আফ্রিকা একা সংস্থা' বা 'ও-এ-ইউ'-এর সঙ্গে বৃটেন আর ৩০টি রাষ্ট্র সম্পর্ক ছেদ করেছে। অর্থাৎ আন্ডিস আবাবার ও-এ-ইউ-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এই সম্পর্ক সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

অধিকাংশ আফ্রিকীয় দেশ পিছ হঠেছে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। এই সব দেশের সঙ্গে বৃটেনের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তা নষ্ট হলে বৃটেনের বেমন ক্ষতি হবে, সেই সঙ্গে এদেরও ক্ষতি কম হবে না। তাছাড়া বৃটেন এই সব দেশের উন্নয়নের জন্য বহু কোটি পাউন্ড অর্থসাহায্য করেছে। সুতরাং, আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র যদি দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিপত্য নাশের প্রশ্নের উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্বার্থকে বড় করে দেখে, তাহলে দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভবিষ্যৎ কি? আফ্রিকারই বা ভবিষ্যৎ কি?

এই অবস্থায় দক্ষিণ রোডেশিয়া তথা আফ্রিকার রাজনীতি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। বৃটেন আইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, আফ্রিকার সমবেত চাপেও বৃটেন তার নীতি পরিবর্তন করে নি। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। পশ্চিম জার্মানী, জাপান, স্পেন, পর্তুগাল-এদের সঙ্গে দক্ষিণ রোডেশিয়া বেশ ভাল

ভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক আফ্রিকীয় রাষ্ট্রই এখন পর্যন্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে নি। ৩৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র এখন বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদে রাজী হয়েছে, তখনই বোঝা গিয়েছে আফ্রিকীয় রাষ্ট্ররা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। ঘানা, তানজানিয়া প্রভৃতি যদি নিজেরাই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে, তাহলেও কি তারা সফল হবে? অন্তত জাম্বিয়ার সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ করা শক্ত। আর জাম্বিয়া এখনই বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ অথবা দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের দায়িত্বে কোন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ, কিংবা অপরকে এ কাজ করার সুযোগ দেয়া, কোনটাই করবে না।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার অভ্যন্তরে গোলবোণ সৃষ্টির চেষ্টা, কিংবা বাইরে থেকে গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থাও বিশেষ কিছু করা যায় নি। বৃলাওয়েতে শ্রমিক ধর্ম-ঘটও পুলিশ দমন করেছে।

সুতরাং ঠিক এই মুহূর্তে দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের অবসানের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল নয়। বরং নানাভাবে স্মিথ সরকারের শক্তিসত্ত্বের প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে। তবে দীর্ঘদিন এ অবস্থা থাকতে পারে না। আফ্রিকার দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার সমন্বয়ে যে শক্ত শ্বেতাঙ্গ ঘাঁটি আফ্রিকার বৃকে গড়ে উঠবে, তার ফলে সমগ্র আফ্রিকার গণতন্ত্রই বিপন্ন হবে। বৃটেনকে চাপ দিয়েই হোক, অথবা নিজেরাই হোক, দক্ষিণ রোডেশিয়ার আইয়ান স্মিথের শ্বেতাঙ্গ শাসন অবসানের জন্য আফ্রিকাকে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাম্বিয়া :

দক্ষিণ রোডেশিয়ার সমস্যা দুজন প্রধান মন্ত্রীকে উত্তর সশকটে ফেলেছে। এঁরা হলেন: বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন আর



হ্যারল্ড উইলসন



শেখ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাম্বিয়ার রাজকীয় বিমানবাহিনীর চারটি 'জ্যাকভলিন' যুদ্ধবিমান প্রধান সড়ক কারাগারে রোডের ওপর উড়েছে।

জাম্বিয়ার প্রধান মন্ত্রী কেনেথ কাউন্ডা।
স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ
করলে বিপদ, আর না করলে আরও বিপদ।

কেনেথ কাউন্ডা উদারনৈতিক নরমপন্থী
নেতা বলে পরিচিত। তবু দক্ষিণ রোডেশিয়ার
শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর মত খুবই
তীব্র। দক্ষিণ রোডেশিয়ার একেবারে সীমান্তে
অবস্থিত জাম্বিয়ার জনসাধারণও এ ব্যাপারে
ভীষণ বিক্ষুব্ধ।

তবু কাউন্ডা কিছু করতে পারছেন না।
আফ্রিকার অনেকে আশা করেছিল, জাম্বিয়াকে
ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করে তারা দক্ষিণ
রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে
অভিযান চালাবে। কিন্তু কাউন্ডা এতে রাজী
নন। কারণ এর ফলে জাম্বিয়ার অর্থনৈতিক
বিপর্যয় দেখা দেবে, এবং সমগ্র অঞ্চল ধরে
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হবে। এখনও
জাম্বিয়ার ৭০,০০০ শ্বেতাঙ্গ রয়েছে—দেশের
বিভিন্ন উৎপাদন কার্খের সঙ্গে এরা যুক্ত। তা
হাড়া দক্ষিণ রোডেশিয়ার ওপর জাম্বিয়াকে

অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। বিদ্যুৎ ও
কয়লার জন্য জাম্বিয়া দক্ষিণ রোডেশিয়ার
ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ রোডেশিয়া ছাড়া
জাম্বিয়ার সমুদ্রপথও নেই। ইতিমধ্যেই স্মিথ
সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার
বন্দর দিয়ে জাম্বিয়ার আমদানী-রপ্তানীর জন্য
বেশি শুল্ক দিতে হবে। সুতরাং জাম্বিয়ার
পক্ষে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন
ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, এমন
কি বাস কেনেথ কাউন্ডার মন্ত্রিসভার মধ্যেও
দক্ষিণ রোডেশিয়া বিরোধী মনোভাব ক্রমে তীব্র
হয়ে উঠছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন কাপটপুই-
এর নেতৃত্বে একদল প্রভাবশালী রাজনৈতিক
নেতা অবিলম্বে স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে
সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন।
তাঁদের কাছে আজ বাস্তব বাবসীবুশির চেয়ে
জাতীয়তাবোধ ও গণতন্ত্রের দাবি অনেক বেশি
জোরদার।

এই উত্তর সম্মুখে পড়ে কেনেথ কাউন্ডা বা

করছেন, তা হল বৃটেনের ওপর তিনি চাপ
সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। বৃটেন যদি কোন
ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সব দিক দিয়ে ভাল
হয়। কদিন আগে জাম্বিয়া পাল্লামেন্টে ভাষণ
দিতে গিয়ে কাউন্ডা বৃটেনের কঠোর সমা-
লোচনাও করেছেন। আইরান স্মিথ সম্পর্কে
বৃটেনের কি করা উচিত তা বলতে গিয়ে
কেনেথ কাউন্ডা বলেছেন, 'পরিদ্রোহীকে
গ্রেপ্তার করে, কোর্ট মার্শালে বিচার করে,
গুলী করে মারা উচিত।'

বৃটেনও কেনেথ কাউন্ডাকে চটতে চা-
না। তাই বৃটিশ বিমান বাহিনীর একদল
সৈন্য ইতিমধ্যেই জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকা
এসে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল: এই
বৃটিশ সৈন্য কি জাম্বিয়াকে রক্ষা করতে ও
দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজন বোধে
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এসেছে, না অন্য আফ্রিকার
রাষ্ট্র বাতে স্মিথ শাসনের বিরুদ্ধে কোন
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে, তার ব্যবস্থার
করার জন্য এসেছে

পোল্যান্ড ১

পোল্যান্ডের নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন, এ. গ্রোনোস্কি ওয়ারশ এসে পৌঁছবার প্রায় পর পরই চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়াং কুও চ্যাং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভিয়েতনাম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং এইভাবে মাঝে মাঝেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে আলোচনা করে ভিয়েতনাম প্রশ্নের সমাধান-সূত্র বের করার চেষ্টা করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের আসল দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। এদের দুজনের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলেও দু'পক্ষের মধ্যে কোন মীমাংসা হয় নি।

এবারও গ্রোনোস্কি ও কুও-চ্যাং-এর মধ্যে আলোচনায় কোন ফল হয় নি। ১৫ই ডিসেম্বর ওয়ারশ-র আলোচনার ঠিক পূর্বে গ্রোনোস্কি গ্যারিসে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ডিন রাস্কের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছেন।

গ্রোনোস্কি চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনায় সাক্ষ্য লাভ না করতে পারলেও পোল সরকারের সঙ্গে মার্কিন সরকারের সম্পর্কের উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা রাখেন। গ্রোনোস্কি নিজে জাতিতে পোল। তাঁর পিতামহ আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রশাসন ক্ষেত্রেও গ্রোনোস্কির অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেনেডির মন্ত্রিসভায় তিনি পোস্টমাস্টার-জেনারেলের পদে ছিলেন।

পোল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গোমুলকা ও তাঁর সহকর্মীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও অন্যান্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁর বহু-প্রতীক্ষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি. জনসনের সঙ্গে আয়ুব খাঁ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ. থাণ্টের সঙ্গে কথা বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়েছেন।

সদস্য-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকপ্রধান রাষ্ট্রসংঘে এলে তাঁর জন্য বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা থাকে। এই রীতি অনুসারে আয়ুব খাঁর জন্য সম্মানের পূর্ণ আয়োজন করা হয়েছিল। শিষ্টাচার অনুসারে ভারতও এই সম্মান প্রদর্শনে অংশীদার ছিল। কিন্তু এবার আয়ুব রাষ্ট্রসংঘে তাঁর আচরণের দ্বারা অধিকাংশের বিরক্তভাজন হয়েছেন। বিশ্ব দরবারে তিনি মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে আয়ুব খাঁ রাষ্ট্রসংঘের অনেক প্রশংসা করেছেন, এই বিশ্বসভার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অনেক শৃঙ্খলা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নিম্নতম শিষ্টাচার পালন করা প্রয়োজন, আয়ুব তার তোয়াক্কা রাখেন নি। সকল রীতি লঙ্ঘন করে তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের বিরুদ্ধে বিবোম্মার করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের দীর্ঘকালের স্বীকৃত রীতি হল, সাধারণ পরিষদে যখন কোন রাষ্ট্রপ্রধান সৌজন্যমূলক ভাষণ দেন, তখন অপর সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধীয় কোন বিষয়ের উল্লেখ তিনি করেন না। কিন্তু ভারত-বিষয়ে আয়ুব এতই অস্থির, এই সব নিয়ম মানার কোন প্রয়োজনই তিনি বোধ করেন নি। এর ফলে অন্যান্য সদস্যরা রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আয়ুব তাঁর ভাষণে ভারতের প্রতি বদ্দ না করার চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আয়ুব ভেবেছিলেন, এই প্রস্তাব দিয়ে তিনি কিস্তিমাৎ করবেন এবং তিনি যে কতটা শান্তিকামী সেই কথা সবাইকে বোঝাতে পারবেন। কিন্তু অসংখ্য শর্ত-কণ্টকিত আয়ুবের এই প্রস্তাব যে আসলে একটা চাল মাত্র, এর পেছনে শান্তির সামান্য মনোভাবও নেই, এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় নি। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীগোপাল পাঠ-সারথি তাঁর বক্তৃতায় আয়ুবী চালকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফাঁস করে দিয়েছেন।

কাশ্মীর প্রশ্নে আয়ুব চিরায়িত ভঙ্গীতে হৃৎকার ছেড়েছেন। বিশ্বসভায় শান্তির বুলি আওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, কাশ্মীর না পোলে পাকিস্তান আবার ভারত আক্রমণ করবে!

জনসনের সঙ্গে আয়ুব দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন। উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কাশ্মীর, ভিয়েতনাম, চীন, পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সাহায্য—এই সব বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের



লিনডন জনসন

প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন মহলে যে দুশ্চিন্তা আছে, আয়ুব তা কতটা দূর করতে পেরেছেন বলা শক্ত। তবে আরও বেশি করে মার্কিন সাহায্য-পাবার জন্য আয়ুব যে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অহেতুক উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন, সে কথা সবাই জানেন। ভারতের বিরুদ্ধে জনসনকে উত্তেজিত করার জন্যও তিনি চেষ্টার চাটি করেন নি। এ কাজে তিনি কতটা সফল হয়েছেন, তা বোঝা যাবে আর কদিন পরে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ওয়াশিংটন যাবেন।

এর আগেরবার যখন আয়ুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন তখন তিনি বেরূপ সম্বন্ধনা লাভ করেছিলেন, এবার তাঁর সিকিও পান নি। এর থেকেই বোঝা যায়, আয়ুবের এবারের সফর বিশেষ সফল হয় নি।

* * *

মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখ্য থাকবে। মানুষ মহাকাশ-বিজয়ের পথে আর একটি ধাপ এগিয়ে গেল। এই দিন প্রথম দুটি মহাকাশযান আকাশপথে পরস্পর মিলিত হয়েছে। মার্কিন মহাকাশযান জেমিনী ৬ ও ৭, মহাকাশে মাত্র ১২০ ফুটের ব্যবধানে মিলিত হতে পেরেছে।

মহাকাশ অভিযানে এ এক মস্ত জয়। এর ফলে চন্দ্রলোকে যাবার পথ আরও সুগম হল।

জেমিনী-৬-এর নভচারী টমাস স্ট্যাফোর্ড ও ওয়ালটার শিরা এবং জেমিনী-৭-এর স্ট্যাংক বরম্যান ও জেমস লভেলের নামও এই সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সাফল্যের জন্য মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও নভচারীরা সকলের অভিনন্দন পাবেন। এই জয় কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সমগ্র মানব-সমাজ আজ জয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত!



গোপাল পার্শসারথি

কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর খুবই খাপ্পা। এখন গ্রোনোস্কির কাজ হবে এঁদের মার্কিন বিরোধিতার তীব্রতা হ্রাসের জন্য চেষ্টা করা।

বড়দিন : আত্মজীবনিক উৎসব

বড়দিন।

কলকাতার বড়দিনের উৎসবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর কোথাও না হোক, বিদেশী শাসকদের পরম যত্নে গড়া চৌবন্ধী, ক্রি স্কুল স্ট্রীট আর নিউমার্কেটের দোকানে দোকানে রঙীন কাগজেব ফুলের সমারোহ আর নিগুন আলোর অপরূপ বর্ণবাগ কলমল করে উঠবে।

২৫শে ডিসেম্বর নয়। আজই এখনি সন্ধ্যার পাবে গড়ের মাঠের দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে দাঁড়ালে দেখা যাবে আসন্ন ক্রিস্টমাস উৎসব উপলক্ষে নানা বর্ণের আলোকমালায় সেজে বৃপসী চৌরঙ্গী চলমান জনতাকে আমন্ত্রণের হাতছানি দিচ্ছে। দোকানে দোকানে ফাঁড়ের শো-কেসেব আড়ালে অপরূপ সুন্দর ক্রিস্টমাস কার্ড, বড় বড় বিচিত্র কেক আর নানাবিধ উপহারের সামগ্রী ধরে ধরে এখনি সাজানো রয়েছে।

ক্যালেন্ডারে কালো কালো কালিতে লেখা তারিখের অবগতির ভেতরে পশ্চিমে ডিসেম্বর আজও রক্তলাল ফুলের মত পৃথিবীর অগণন মানুষের মনে বিপুল আনন্দের সাদা জাগাচ্ছে। ২৫শে ডিসেম্বর ছুটির দিন।

এই আনন্দ, এই উৎসব, পৃথিবীর দিকে দিকে এই তাঁর সমাবাহের মাকথানে দাঁড়িয়ে সুন্দর অতীত দিনের—সেই উনিশশো পঁয়ষাট বছর আগের একটি পুণ্যদিনের স্মৃতি আজও আমাদের চোখের পাতার ঘন হয়ে নেমে আসে।

জেলুজালেমেব একটি ঘরে অতি দরিদ্র পবিত্রবেশে ঋড় বিচারির ভেতরে জন্ম নিয়েছিলেন মানবপুত্র যীশু। জন্ম নিয়েছিলেন ২৫শে ডিসেম্বর।

এই ২৫শ ডিসেম্বর দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে। শব্দ আনন্দ উৎসব হজোড় নয়, কেক পুড়িয়ে-এব ক্রিস্টমাস প্রেজেন্টেশান নয়—একটি সারমানে বলছে—

The mystical meaning of christ's choice of the day on which He was born....

যীশু যৌদিন জন্মেছিলেন—সেই দিনটি শব্দ পুণ্যদিন নয়। নতুন আলোর, নতুন আশার দিন—দুঃখশোক-জর্জরিত পৃথিবীর মানুষের মুক্তির দিন।

আরও আছে। সন্দেহ নেই। খুব সুন্দর কথা—

Mary, the earth for which Truth has sprung....

আরও একটি সারমানে বলছে, মেরীর জন্ম

কোথা থেকে? এ্যাডাম থেকে। আর এ্যাডাম কোথা থেকে হয়েছেন? পৃথিবী থেকে। এই পৃথিবী—এই বসুন্ধরার চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। তাই মেরী-মাতাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সত্য।

বহু-বহু দুঃখকালের বিমূর্ত্তিত্ব ওপার থেকে মানবপুত্রের ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—

The night is passed and the day is at hand. Let us cast off the workers of darkness and put on one armor of light—let us walk honestly....

বাণী শেষ হয়েছে। দিন এসেছে! অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হও। দুঃ দিনেব আলোর বেধা লক্ষ্য করে এস আমরা সত্যের সঙ্গে অগ্রসর হই...

বড়দিনের উৎসবের স্রোতে গা ভাসিয়ে কমজন এসব কথা মনে রাখে? কমজন মনে রাখে, অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতরে, সংশয় বন্দুর কষ্টকাটীর্ণ পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে

সাত্যিক কাসোয়িক

এগিয়ে চলেছেন মানবপুত্র। তাঁর সঙ্গে চলেছেন আবার তেরজন শিষ্য—তাদের ভেতরে একজন জুডাস ইস্কাযিয়াট। সঙ্গে তাঁদের অস্ত্র নেই, নেই জয়বাদ্য। চারিদিকে অন্ধকারে ইহুদীদের কুটিল হিংসা সরাসরি পের মত তাঁকে ছেবল মাঝবাব সুবেগ ঝুঞ্জছে। কিন্তু সত্যের আলো তাঁর মন থেকে মুছে দিয়েছে সমস্ত সংশয়, নিশ্চয় করে দিয়েছে ভয়ের ক্ষীণতম বিন্দুটুকুকেও। তিনি এগিয়ে চলেছেন, মাথাব ওপরে তাঁকে পক্ষ দেখাচ্ছে সেখেলহেমের শিষ্যের জাগ্রত সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি।

এই রকম বহু শোক, বহু দুঃখবরণ বহু ত্যাগ আর নিঃশব্দ নিরবাতন নহা করতে হয়েছে যীশুকে; সহ্য করতে হয়েছে শব্দ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর পরন্ত পৃথিবীর অধোকেবও বেশি মার্জিত তাঁরই ধর্ম প্রসারিত। কিন্তু—

কিন্তু সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে ত্যাগ আর দুঃখ সহ্য করতে করজন? কমজন মনে ও মুখে এক? পৃথিবীর কয়টি খ্রিস্টান রাষ্ট্রনায়ক আজ সত্যের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে পারবে?

তাঁরা অকপটভাবে যীশুর অনুগামী

হলে আজ পৃথিবী থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভীতির লেশমাত্র থাকতো না।

২৫শে ডিসেম্বর। খ্রিস্টের জন্মদিন—বড়দিন নাম। কিন্তু কবে কত যুগ আগে থেকে পশ্চিমে ডিসেম্বর পৃথিবীর দেশে দেশে পালিত হচ্ছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে ২৫শে ডিসেম্বর তারি জন্মদিন বলে গণ্য করা হতো না। কোথাও করা হতো মাঠের পশ্চিমে তারিখ, আবার কোথাও করা হতো ২৫শে ডিসেম্বরকে। একটি রেকর্ড পাওয়া যায়, পৃথিবীর আদিমতম খ্রিস্টের জন্মদিন উৎসব পালনের ইতিবৃত্ত। ল্যাটিন ভাষার লেখা একটি বিবরণ পান্ডুলিপি আজও সবসঙ্গে রক্ষিত আছে এথেন্সের নিকটবর্তী গ্র্যান্টওকের থিয়ো-ফিলাস নামে এক পুর্বোহিতের কাছে। সেই পান্ডুলিপিতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর আর দীক্ষিত হওয়ার পুণ্যদিন হলো ২৫শে মার্চ।

খ্রিস্টধর্মের অভ্যুত্থানের বহু বহু পূর্বে সেই প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ সূর্যপূজো করতো। দক্ষিণ ইউরোপে, মিশরে, পাবস্যের সবথ শীত ঋতুতে মহাসমাবাহে সূর্য-পূজার আয়োজন করা হতো। পণ্ডিতদেব ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এই সূর্যপূজার ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করেই পৃথিবীর দেশে দেশে আজ ২৫শে ডিসেম্বরের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

শীতের হিমকুশাশা আজও পৃথিবীর দিকে দিকে ভূমিলক্ষ্মীর পরশিত আশীর্বাদ করে করে পড়ে। বাতাসে পাকা ধানের গম্ব। গাছে গাছে পাতা যেমন ঝরে তেমনি নতুন নতুন পাতার আবির্ভাব হয়। চারিদিকের নতুনের সূচনায় পৃথিবী যেন নতুন সাজে সেজে ওঠে। তাই এই সময় জগতের প্রাচীনতম মানুষেরা ইশবাবের কাছে শক্তি প্রার্থনা করতো।

খ্রিস্টের জন্মের এই সময় আর প্রকৃতির নতুন প্রাণস্পন্দনের সময়টা এক। তাই নিষ্ঠাবান খ্রিস্টানরা বলেন—

Mystical meaning of christ's choice of the day on which He was born.

খ্রিস্টের জন্ম জগতের কল্যাণের ইতিহাসে বহন করছে।

খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পরন্ত এই পশ্চিমে ডিসেম্বরের উৎসব শব্দমাত্র চার্চের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রেরণার

সাংগ্ৰাহিক বসুধাতী

এক মিশনারীর সয়ঙ্গ চেষ্টায় পৃথিবীর সর্বত্র পঁচিশে ডিসেম্বর খ্রিস্টের জন্মোৎসব হিসেবে পালিত হতে লাগল।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে ইয়েরেজ মিশনারীরা গিরেছিগেন জার্মানিতে। সেই থেকে জার্মানিতে খ্রিস্টের জন্মদিনের উৎসবের প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু—

জার্মানিতে উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রাক-খ্রিস্টযুগের উৎসবে যেমন আলো আর আগুনের সমারোহ ছিল, সেই আদিম কালের প্রভাব রয়ে গিরেছিগেন জার্মানের এই উৎসবে।

ইংল্যান্ডে গভীর ঘরে ও নিষ্ঠার সঙ্গে গম্ভীরভাবে খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালিত হয়। যুগের প্রভাবে এই উৎসবে আনন্দ আর খুশির সোয়ার আজ যেন বড় বেশি করে মজরে পড়ে। কিন্তু ইংল্যান্ডে এই উৎসবের ভেতরে ধর্মীয় প্রভাবটা আজও আছে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে এই জন্মোৎসবের আরোহণ পঁচিশে ডিসেম্বরের অনেক আগে থেকে শুরু হয়। প্রচণ্ড শীতের দেশ। তাই তার প্রস্তুতিও আরম্ভ হয় আগে থেকে।

নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে ২৫শে ডিসেম্বর একটি পবিত্র ও শান্ত দিন। ইয়েরেজীতে বহুকে বলে কোরাইট অ্যান্ড রিলিজিয়াস হলিডে। এইসব দেশে বহুকাল পরে খ্রিস্টমাস কেক আর খ্রিস্টমাস কাডের প্রচলন হয়েছিল। ইটালীতেও ইংল্যান্ডের মত পবিত্র ও গম্ভীরভাবে এই উৎসব পালিত হয়। এদেশে বড়দিনের ভোজের নাম হল 'কেনোন'। এই ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে ভোজের আসর বসে। আর দুই পাহাড়ী জঙ্গলে আরণ্যক পরিবেশের ভেতর থেকে বাণীর সূক্ষ্ম স্বর শোনা যায়। এই মিষ্টি দুয়ের মুহূর্তের ভেতরে বড়দিনের আসন্ন উৎসবের আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠে। পাহাড়ী

রাখালেরা বাশী- বাজার বড়দিনের অনেক আগে থেকে।

ফ্রান্সে বড়দিনের উৎসব শব্দ হয় মহা-রহস্য। গীজার এত বোশ ভিড় হয় সেই হাড়-কাঁপানো শীতের বাত্রেও যে আগে থেকে বুকিং করে না রাখলে দাঁড়ানোর জায়গা পর্বন্ত পাওয়া যায় না। আর মার্কিন মূল্যকে—

সেখানে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্বন্ত খ্রিস্টের জন্মোৎসব সাধারণভাবে গৃহীত হয় নি। পিউরিটানরা সর্বতোভাবে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তারপরে বহু যুগের বিবর্তনে বহু দেশের সংস্কৃতির প্রভাবে আজ এদেশে জন্মদিনের উৎসবের বিচিত্র পরিণতি হয়েছে। নিউইয়র্কে, চিকাগোতে সাবান্নাত রাস্তাপথে লোকে হৈ-হল্লা কবে। আর আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

সুইডেনে বড়দিনের উৎসব হলো ঠিক আমাদের দেশের দুর্গাপূজার মত। শুরু হয় ১৩ই ডিসেম্বর, শেষ হয় ১৩ই জানুয়ারী। এই দীর্ঘ একমাস বাড়িতে বাড়িতে আসার দীপালি জ্বলে আর উপহারের আদান-প্রদানের বন্যা বয়ে যায়।

আছে—আরও আছে। পৃথিবীর সূদূর উত্তরে তুহিন শীতল উত্তর মেয় থেকে শুরু করে বিপুল এই পৃথিবীর এমন জায়গা নেই, এমন দেশ নেই, এমন পল্লী নেই যেখানে খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালিত হয় না। আজ এই উৎসব—একটি আন্তর্জাতিক উৎসব। কিন্তু এক এক দেশে এক এক রকমভাবে এই উৎসব উদ্ঘাটিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক কালের প্রভাবেই এই উৎসবে ধর্মীয় প্রভাবের পরিবর্তে আনন্দ আর হৃদয়ভেদ দিকটাই বেশি হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে শরে আরও বলছি—

খ্রিস্টমাস ডে। এই কথাটির সঙ্গে 'খ্রিস্টমাস কাড' এই কথাটিও শোনা যায়।

খ্রিস্টমাস ডের মত খ্রিস্টমাস কাডেরও বিবর্তনের ইতিহাস বিচিত্র।

আজ থেকে ঠিক একশত তেইশ বছর আগে ডিসেম্বর মাসের নয় তারিখে এক কিশোর শিল্পী একটি সুদৃশ্য সচিত্র কাড তৈরি করেছিলেন। শিল্পীর নাম উইলিয়াম মাউ ইগলি। লন্ডনের এক অখ্যাত পল্লীর শ্বাসরোধী অন্ধকার ঘরে বসে অবখ্যাত এবং ষোল বছরের আর্টিস্ট যে কাড তৈরি করেছিলেন সেই কাডকে খ্রিস্টমাস কাড বলে গ্রহণ করেছিল পৃথিবীর সমস্ত দেশ। এই কাডের উচ্চতা ছিল ৫ই ইঞ্চি আর প্রস্থ ছিল ৩ই ইঞ্চি। এই কাডের চার কোণে চারটি ছবি এঁটি করা থাকতো। ওপরে ডাইনে থাকতো, সপরিবারে খ্রিস্টমাস ডীনার পার্টির ছবি আর বামে একদল তরুণ-তরুণীর নৃত্যরত দৃশ্য। নিচের দিকে ডাইনে থাকতো একদল ছেলেকে টিং করছে। আর উল্টো দিকে ছিল দরিদ্র একদল মানুষ খ্রিস্টের জন্মদিনের উপহার সামগ্রী গ্রহণ করছে। চারকোণে চারটি ছবির মাঝখানে লেখা থাকতো 'ফ্রম' আর 'টু'।

এই কাডের অবশ্য বহু পরিবর্তন হয়েছে আজ।

এইবার পৃথিবী পরিভ্রমণের পরে মহা-নগরী কলকাতায় আসুন। কলকাতা—জব চানকের কলকাতা। ভাগ্যান্বেষী বিদেশী ইয়েরেজদের সয়ঙ্গলালিত মানস এই কলকাতা। অতএব ইয়েরেজরা এখানে মহাসমারোহে খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করতো। ১২৫৭ সালের ১১ই মাঘের সংবাদপ্রভাকরে কাঁচ ইশ্বর গুপ্ত লিখে-ছিলেন :

খ্রিস্টের জন্মদিন বড়দিন নাম।

বহু সূত্রে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধামে কোরাণী দেওয়ান আদি বড় বড় মেট। সাহেবের ঘবে ঘরে পাঠাইছে ভেট

আপনিও একজন সৈনিক-

এই রণহস্তারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আগ্রহী কি করছেন ?

BANGLA DA 63/P1

পাদ্যাহিক বসন্ত

বড়লাট, বড়কাঠ, বড়খানা, বড়সাহেব, বড়-
সাহেব—সেকালের শহর কলকাতার সবই তখন
বড়। ২৫শে ডিসেম্বরের প্রত্যয়ে তোপের
ধ্বনিতে যীশুর আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিক-
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তো। তাবপর শব্দ হতো
বড়দিনের 'ব্রেকফাস্ট'—

ভেটক, কমলা আদি মিষ্টান্ন বাদাম।

ভাল দেখে কিসে হয় দিবে ভাল দাম।

প্রেটে রাশি রাশি খাবার। দুপুরে বড়খানা।

সন্ধ্যায় নৈশভোজ। তারপর—

তারপর সাবা বাত ধরে গ্র্যান্ড বল।

শিব গুপ্তর ভাষাতেই বলি—

বেহুগা খুশীনগণ ভাবে ঢল ঢল।

গোরা প্রেমে মত্ত যথা নেড়ানোড়ীর দল।

নাচা গানা খানা পিনা আব উপটোকন

গ্রহণই ছিল সেকালের ইংরেজদের বড়দিনের
উৎসবের প্রধান অঙ্গ। তাই ফ্যানি পার্কস
তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

"How many presents I received
this day and such odd one—a
sketch of Lord William Bentinck,
a bag of walnuts, a diamond ring,
a hill shawl, two jars of jam and
two bottles of hill honey,...

ফ্যানি পার্কস বহুকাল কোম্পানীর কাজে
ভাবতবর্ষে ছিলেন। তার দীর্ঘদিনের বিদেশ-
যাত্রার অভিজ্ঞতাকে ভার্যরী আকারে লিপি-
বদ্ধ করেছেন তাঁর 'ওষাডাং অফ এ পিলাগ্রাম'
গ্রন্থে। বেশ বড়তে পাবা যায় খ্রিস্টমাসের
ডালি যারা দিত সন্তানদের তাদের এই
উপহারের আড়ালে স্বার্থের গন্ধ ছিল। তাই
লিখেছিলেন, 'কত রকমের উপহার যে পাই।
লাড উইলিয়াম বেন্টিনকের ছবি, বাদাম, হীরের
আংটি, পাহাড়ী শাল, দুই লিঙ্গি জেলী, দুই
বোতল পাহাড়ী মধু...'

আরও এক জারগার তিনি লিখেছেন,
'শাড়িগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।
আর আর কদলী বৃক্ষের পল্লবে পল্লবে,
গোলাপের পাপড়িতে এক একটি প্রাসাদ যেন
একবারে ছেঁবে যেত। কিন্তু—

কিন্তু আমরা খাঁটি ইংরেজদের পবিত্র
খ্রিস্টমাসের পূণ্যপ্রভাব থেকে অনেক-অনেক
দূরে বাস করছি। এখানে চাকররা তাদের
প্রভুদের (আমাদের) সন্তুষ্ট করার জন্য ঠোঁটে
করে আনছে আপেল, আঙুর, কিসমিস, চিনি
আরও কত কি...

দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উপাধি খেতাবের
আশায় এই বড়দিনে বহুদুলা উপহার দিতেন।
তাই ১৩ই জুন ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদত্ত'
ফাগুজে সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল 'জনরত্ন'
হইয়াছে যে, এতদেশীয় লোকের নিকট হইতে
কোম্পানী বাহাদুরের রাজকীয় ও বৃদ্ধ
সম্পর্কীয় কার্যসম্পাদক সাহেব লোকের ফল-
জন্মে আমিয়াদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপটোকন
কিন্তু নিবেদন করণা হইতেছে।

হিল্টন ব্রাউন তাঁর 'সাহেব' নামে বিখ্যাত
গ্রন্থের পাতায় খ্রিস্টমাসের একটি বিবরণ
দিয়েছেন। তার ভেতরে সেকালের কলকাতার
সাহেবদের বড়দিনের খিচরী ছবি ফুটে উঠেছে।

Dec. 25 (1825) christmas day.

"We shall try and make it as
cheerful as we can; I have ordered
an English dinner and we shall
have champagne. Batt (Mrs)
will have as much party as she
can....

All our people have been to us
to make SALAM. . .

বড়দিন সম্ভব আনন্দময় করাও চেষ্টা করি
আমরা এই দিনটিকে। আমি ইংলিশ ডিনারের
আর্ডার দেই। শ্যাম্পেনও সেখানে থাকে।
মিসেস বত খুশি পার্টি দেয়। আর আমাদের
লোকজনেরা আসে দল বেঁধে 'সেলাম'
জানাতে—

তাই তবতবানী ইংরেজ কবি কিপলিং
দৃষ্টি করে বলেছিলেন, 'উই আর রিচ ফর
ওয়ান মিকিং খ্রিস্টমাস পার্টি'—এক একটি
বড়দিন পাব হয়ে যায় আর আমরা জমেই থনি
হই—

এই সেলাম, খানা, নাচা, গানা স্মৃতি
আর নীচ স্বার্থের জন্য উপটোকন ইত্যাদির
সমীচীন ছিল আদি কলকাতার বড়দিনের
উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

শত শত শতাব্দীর এপারে এসেও এই
পুণ্যদিনের উৎসবের আড়ালে স্বার্থ স্বার্থের
সঙ্কলিত আমরা ভুলি নি। ভুলতে পারি নি।
যেমন পারি নি ইংরেজদের প্রচলিত 'নিউ-
ইয়ার্স ডে'র প্রভাব। যেমন পারি নি 'এপ্রিল
ফুলের দিনে কৌতুক করার লোভ। আজও
আমাদের বস্ত্রে বস্ত্রে অশ্রুতে অশ্রুতে মিশে
রয়েছে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চের আর
সানিডে মডের জগজগতী প্রভাব।

আজও বহু শিক্ষিত বাঙালী পবলা
জানুয়ারীকে একটি বিশেষ দিন বলে মনে
করে। খ্রিস্টমাসের পূণ্যদিনে অফিসের বড়-
সন্তানকে খ্রিস্টমাস 'কেক' উপহার দিয়ে
নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু—

গঙ্গার বহু জল গড়িয়েছে। পৃথিবীর
মানচিত্রেরও হয়েছে অনেক পরিবর্তন। বহু
শোক, বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বহু মৃত্যু আর
অনেক ব্যর্থতার পথ স্বাধীনতা এসেছে।
সাগরপারে প্রত্যাবর্তন করেছে ইংরেজ। কিন্তু—

এদেশের মানুষের মনে তাদের কদাচরণের
বে বিষ মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে, তার প্রভাব
এতটুকু কমে নি। দাস-অন্যোভাব, স্বেচ্ছাসি-
মেন্টালিটি বলে অনেক নিদ্রা করেছেন
জাতীয়তাবাদী নেতারা। কিন্তু—

কোন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না।
আজও উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত বাঙালী তথা
ভারতবর্ষেরা তাঁদের ছেলেকনেকের দেশীয়

বিদ্যালয়ের পরিবর্তে 'কনভেন্টে' পড়তে
পারলে কৃতার্থ মনে করেন। এদেশের শিশুরা
জানবে না কোথায় জন্ম হয়েছিল খ্রীকৃষ্ণ,
চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—জানবে না
এঁরা কারা, কোথায় তাঁদের দেশ—কিন্তু জানবে
যীশুর কথা। মুগ্ধ কবানো হবে বেথেল-
হেমের চৌহান্নি।

কিন্তু যীশুর সদাচার, সত্যপালন, দৃষ্টি-
বশ্য তাঁর আদর্শবাদ নিজেদের জীবনে
রূপায়িত না করে—তারা করবে, শত শতাব্দী
পূর্বের কলকাতার সাহেব নবাবদের বড়দিনের
উৎসব পালনের সেই নাচ গান হুগোভের
অশ্রু অনুকরণ।

কলকাতার গভীর শীত নেমেছে। এখন
গড়ের মাঠ ঘন কুমার আচ্ছন্ন। দূর থেকে
মনে হবে যেন শহর কলকাতা নয়। অবলুপ্ত
কাঁতি'র মহাশয়শান একটি। সত্যিই আজ
রাজা-প্রজা নেই, নেই ভেট আর খেতাব
বিতরণের সেই অষ্টপ্রহর উৎসবের সমরোহ।
কিন্তু—

তবুও সেকালের ইংরেজ রাজপুত্রদের
পদবেশুখ্য এ শহর কলকাতার কয়েকটি
পল্লীতে আজও আছে বড়দিন। কুমারী
করে, ঘন অন্ধকারে চোখ দুটোকে প্রখর করে
জ্বালিয়ে নিয়ে এসে পড়ুন গ্র্যান্ড হোটেল-
সামনে। দেখবেন আলোকসজ্জায় কলকাতা
কবছে রাজপথ। দোকানে দোকানে রঙীন
কাগজের ফুল ফুটকের মত দুলছে... আসুন
নিউ মার্কেটে, লিঙ্গজে স্ট্রীটের দোকানে,
নিওনের অত্যাশ্চর্য ছটার চোখ কলসে বাবে
আর তখন—

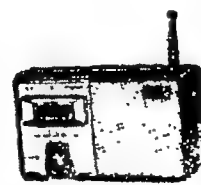
তখন বিশ্বের গুপ্ত মনের ভেতরে গুন
গুন করে উঠবে—

ভুবন করেছে বহু কৃষ্ণের ডোবে।

হাস বে কুমারীপুত্র বলিহাবি তোরে।

জ্যাপি পকেট রেডিও

জাপানের পকেট রেডিও আবিষ্কার।
বড় বড় রেডিওর মতন আওয়াজ। অল ট্রান-
জিস্টার এবং লাউড স্পীকার গ্যাবাটীযুক্ত।
জাপানে প্রস্তুত। যেভাবেই বেড়াইতে গানবাংলা



শুনুন। স্থানীয়-
ভাবে জগতের প্রত্যেক
কোণে হইতে শুন-
বার জন্য গ্যাবাটী-
যুক্ত। ব্যবহার ও
প্রাপ্যযোগ্য করিয়া
সরবরাহ করা হয়।

চীৎ সেলে চালাইতে হয়। ক্ষুদ্র এবং
হালকা ওজন। ৩ বৎসরের গ্যাবাটীযুক্ত।
নং টি পি-৮৮ মূল্য ৩৫ টাকা ভি পি পি
চার্জ ৫ টাকা রেডিওর কেসের জন্য ৫ টাকা।

SULEKHA TRADERS

(WBM-88)

BEAT NO. 13, ALIGARH

হীরা

শ্রী দিলীপ কুমার দাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাদ্রে পিওর কথা প্রথম ইংবাঙ্গীতে লিখি একটি পত্রে, সেটি ছাপা হয় গত বৎসর আমার **PLUTE CALLS STILL** গ্রন্থে। বাংলায় লিখব ভাবিলাম অনেকদিন থেকে। অবশেষে আজ সমস্ত পেয়ে কলম ধরোঁছি জেনে-শুনে যে, বহু সংসারী বুদ্ধিবাদীই বিশ্বাস করবেন না। নাই কবলেন। সতাকে অবিশ্বাস করলে ক্ষতি তো সত্যের হয় না, হয় তাঁদেরই বাবা সত্যকে অসত্য ভেবে মূখ ফিরিয়ে রাখেন। একথা বিশেষ কবেই খাটে ধর্মীয় সত্য তথা তত্ত্ব উপলব্ধি সম্বন্ধে। তবে ভাবত ধর্মপ্রাপ্ত দেশ। বহু ধর্মসম্মানী তথা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সৎকথায় প্রেবণা পান, আনন্দ পান। তাঁদের কাছ থেকে বহু পত্র পাই। তাঁদের জনোই ধর্মের কাহিনী লেখা—চোবাদের জন্যে তো নয়। তাই বলি, সোজাসাদু বা আমি সত্য বলে চিনেছি, বিশ্বাস কবেছি, এবং লাভ কবেছি। এ-বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকে। বাবা অবিশ্বাস কবেন, থাকুন না তাঁদের অবিশ্বাস নিয়ে। “To each his Eden,” বলতেন শ্রীঅরবিন্দ।

খৃস্টানধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের এক জায়গায় কিছু অমিল আছে। খৃস্ট এসে-ছিলেন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে তাকে মুক্তি দিতে—যার নাম খৃস্টান পরিভাষায় vicarious atonement : মহামানবী শ্বাইজ্জাব এ-বাণীতে বিশ্বাস কবাতেন। কাজেই এ-বাণীকে ঠিক বুঝতে না পারলেও অশ্রদ্ধা করার প্রশ্নই ওঠে না। ভাগবতে ব্যাস-দেব বলেছেন : প্রত্যেককে তাব নিজের ধর্মেই চলতে হবে, কিন্তু অপেক্ষ ধর্মকেও শ্রদ্ধা করা চাই—যেখানে আমাদের ধর্মের সঙ্গে মেলে না সেখানেও। নানা আধারের জন্যে নানা ব্যবস্থা, বলতেন না শ্রীবামকৃষ্ণ? ওদের সংস্কার এই-ভাবেই গড়ে উঠেছে, তাই খৃস্টের এক নাম Men of cowards, মানুষের দুঃখ-তাপে তাঁর মহান হৃদয় কাঁচিয়ে উঠত, তিনি চাইতেন তাদের সব দুঃখ-তাপ থেকে মুক্তি দিতে, তাই তাদের ডেকেছিলেন মন্ত্রমুখ

ছন্দ : “Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest” (এসো তোমরা যারা আত, আমি তোমাদের শান্ত দেব।) পরের দুঃখের ভার বহন করে তাদের

বেদনার বোঝা হালকা করা—খৃস্টধর্মের এ একটি মহাবাণী। আমি আমার জীবনে তাঁর এ-সেবাবাণী থেকে কম প্রেরণা পাইনি। তাই হবত খৃস্টদেবের অপার ভরসার কিছু ছিটেফোঁটা পেয়ে থাকব, যার আলোর দেখতে পেয়েছি খৃস্টধর্মের মহিমার দিকটা। এ-মহিমার গভীরতা ও দীপ্তি কয়ক না অনুপ্রাণিত করবে যে মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবা ছেড়ে হৃদয় দিয়ে ভাবার দীক্ষা পেয়েছে সাধুসন্তের প্রেমের কাছ থেকে? পাদ্রে পিওর কথা ভাবতে তাই তো আমার মন গলে : পঞ্চাশ বৎসর ধরে এই প্রাত্যহিক বেদনার আগুনেই বৃষ্টি তাঁর সব খাদ্য সোনা হয়ে গেছে। নৈলে কি তিনি দিনের পর দিন খৃস্টের দেওয়া এই দিব্যাকৃত হাসিমুখে সহ্য করে আসতে পারতেন আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে? প্রতিদিন হাত ও পায়ে রক্ত থেকে হয় রক্তপ্রাণ। লিখতে পারেন না একছত্রও। হাত মুঠো করতেও না। কিন্তু কী সৌম্য তাঁর কান্দি, কী করুণাতরা দৃষ্টি! ছবি দেখেই মন মূগ্ধ হয়—সামনে দেখলে না জানি কী হত।

আমাদের হিন্দুধর্মের বাণী একেত্রে ভিন্ন হলেও খৃস্টধর্মের এই বেদনান্দীক্ষার বাণীর মহিমা আমি উপলব্ধি করি। আমাদের কৃষ্ণও দুঃখের বর দেন বৈ কি তাঁর ভক্তকে। ভাগবতে বলেছেন তিনি যে, থাকে তিনি অনুগ্রহ কবেন, তাকে তিনি সর্বস্বান্ত করেন—“যস্যাহমদুঃখহরি হবিষো ভক্ষ্যনং শনৈঃ”। কিন্তু তবু তাঁর সত্য ঋতরে আনন্দময়ই বলব। দুঃখের আগুনে মানুষ শূন্যলাভ করলেও তার অন্তিম লক্ষ্য আনন্দই হটে। আনন্দই এ-জগতের আদি-উৎস, আনন্দই আশ্রয়, আনন্দই লক্ষ্যস্থান, আনন্দরাজ্যকে জানলে জীবনে আর ভয় থাকে না—বেদের এ-সনাতন মন্ত্রবাণীতে আনন্দময় পুরোষোত্তমের পূর্ণ সাধ আছে। তিনি এসেছিলেন এ-ধরণীতে

দুঃখদমন করতে একথা গোণভাবে সত্য। তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল রূপের মধ্যে দিয়ে প্রেম জাগিয়ে মানুষকে আনন্দের বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দিতে। খৃস্টদেবও আনন্দের কথা বলেছেন, কিন্তু বারবারই বলেছেন, সে-আনন্দ এ-মাটির পৃথিবীতে মিলতে পারে না যেখানে পবন ভাগবতের মধ্যে রাখাবও স্থান নেই।† মনুষ্যের জন্যে খৃস্টের প্রাণদান, এরই খৃস্টান নাম redemption যার প্রসাদে মানুষ পাপমুক্ত হবে ঠাই পারে বিশ্বপিতার স্বর্গে—কিন্তু মর্ত্যে যে স্বর্গ হতে পারে, এ-ভবসম্মত খৃস্ট কোথাওই জোর কবে বলতে ভবসা পান নি। তিনি যে ভুক্তভোগী, দেখেছিলেন যে, মানুষ চাষ না দেবতাব প্রসাদ, চাষ মিথ্যার পুরোহিতকে (‘false prophet’) বরণ করতে। তাঁর একটি গভীর বেদনার দীর্ঘ-শ্বাস বাইরে ফুটেছে অপূর্ণ কবিত্বময় বাণীতে :

“O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them who are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not !”

দেবতার কবুদাকে প্রত্যাখ্যান করার এই ঔজ্জ্বল্যই বাইরের মহানাতোর উপজীব্য—খৃস্টের জীবনবাণী : এ-জগৎ কী না হতে পারত, যদি সে মনেপ্রমে চাইত ভাগবতী করুণাকে, যদি সে দেববাণীকে হেনস্থা না করে ভগবানের প্রিয়পুত্র ও সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞ-দেব কথার কান দিত—যাদের নাম সাধু-সন্ত-মনি-ঋষি দেবকুমার ও অবতার—এই বিষয় প্রশ্ন বাইরে খৃস্টের নানা কথায়ই ফুটে উঠেছে মহিমময় হয়ে। খৃস্টের এ-ঐশ্বর্য পড়তে পড়তে আমার বুকের মধ্যে বারবারই

* আনন্দাশ্রয় খলিফারি ভূতানি জায়লতে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি ; আনন্দং প্রসন্নতাভিসংবিশন্তি (ঠেত্তিরীর উপনিষদ)

† আনন্দং ব্রহ্মসো বিশ্বানু ম বিভীতি কদাচন (ঐ)

‡ The foxes have holes, and the birds of the air have nests ; but the son of man hath not where to lay HIS head.” (St. Matt. 8. 20)

অশ্রুসাগর দলে উঠেছে, এ কথা সত্যিই অত্যাশ্চর্য নয়। তবু আমি না বলে পারি না যে, আমার হৃদয় খুঁটের ভগবৎস্মরণ ক্রমসূচরূপে অভিভূত হলেও তাঁর এ-বাণীতে আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না যে, এ-মর্ত্যলোকে আমরা এসেছি দুঃখভোগ ক'বে শৃঙ্খল হয়ে দেহান্তের পরে স্বর্গরাজ্যে বিশ্বপিপতার শান্তিকোলে পেঁগে, তবে কৃতকৃতার্থ হ'তে। উপনিষদের অমৃতশব্দই আমাকে ডাকে, কৃষ্ণের প্রেমের বাণী, শ্রীঠাকুরের হবিনামসুখের আনন্দমুষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের মা-কে পেয়ে খেঁকার টাটিং সংসারকে 'মজার কুঠি'-তে রূপান্তরিত করা, শ্রীঅবিনেশ্বর মানুষের মানবতাকে দিব্য-জীবনের আনন্দে উত্তীর্ণ করার বাণীই আমার মনকে সবচেয়ে বেশি দোলা দেয়।

কিন্তু তা বলে আমার হৃদয়ে পায়ের পিণ্ডর অপার দিব্য করুণার বাণীতে সাড়া দিতে অক্ষম এমন নয়। আত্ম মানুষের হাজারো কামার তাঁর অক্লান্ত প্রার্থনা ক'বে ভাগবত কৃপার মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেওয়াব প্রেরণকেও আমি নমস্কার না করে পারি না। যে যেখানে থেকেই আসুক না কেন, পাপী-তাপীকে তিনি কখনো ক্রিয়াকে দেন না, তাদের পাপমুক্তি (absolution) দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। বিধাতার বর পেয়েছেন তিনি, তাই তাঁর আশীর্বাদে হাজার হাজার পাপী নিপাপ হইবে, তাবা সন্তোষেই স্বীকার ক'বেছে। শত শত পুণ্য রত্ন মন্দির নিবাস হইবে তাঁর যোগ-বিভূতিব স্পর্শে। সবচেয়ে বড় কথাঃ তাঁর ভগবৎ-ভক্তি পুণ্যচক্রের দৃশ্যে অগ্নি-অবিশ্বাসীর মনেও ভগবানে প্রাণী বিশ্বাস যেন নতুন করে জেগে উঠেছে, সংসারীয় মন সংসারমেধকে কাটিয়ে বিশ্বাসের আলোক-লোক চিহ্নিত পেরেছে, এমন কি রুদ্ধ নাশিককণ্ঠে মথোও অনেক তাঁর ভগবৎপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে বিময় সিঁদুর জীবনে দিশা পেয়েছে অমৃতকরুণার।

আর কী দীনতা! দুঃস্বপ্নের রোগী তাঁর আশীর্বাদে মুহূর্তে রোগমুক্ত হইবে বহু-ক্ষেত্রেই * কিন্তু তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে না-দিতে তিনি বলেন—তিনি শ্রদ্ধা প্রার্থনা করেন মাত্র, সারান ভগবান।

বলেনঃ “ভগবান তোমাকে করুণা করেছেন—কৃতজ্ঞতা জানাও তাঁকে—আমাকে কেন?”

আপনি জানেন, আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবান দরকার হ'লে অবশ্যই ঘটবে নানা আত্ম বা পরগাথীকে নিরাময় বা সন্তোষমুখ করে। না, বিশ্বাস করি বললে কম বলা হবে—আমি চাক্ষুষ করেছি ভাগবতী কৃপার নানা অঘটনী শক্তিকে। এসব অন্য অভিজ্ঞতার কিছু খবর দিইনি আমার নানা প্রবন্ধে ও রমন্যাসে। অনেকে বিশ্বাস করেছেন আমার সাক্ষ্য, অনেকে কবেন নি। বারী কবেন নি তাঁদের সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই, শ্রদ্ধা আমার একটি গানের আখর ছাড়াঃ “ওরা জানে না, তাই মানে না, আমি জানি তাই মানি। আমি অন্তরে তোমার বাণীর শুনছি, তাই নাথ আমি জানি।”

না, আরও একটু বলা চলে। সাধু-সন্তদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল একসময়ে। দীনদায়িত্বের মনে এ-প্রাণী এখনো সমানই দৃঢ়মূল আছে। কিন্তু শিক্ষিত—বিশেষ ক'বে ইনটেলেকচুয়াল নামে বারী পবি-চিত হ'তে চান, তাঁদের অনেকেই সাধুসন্তের মহিমাকে স্বীকার করাটা অস্বাভাবিক বর্ণায় সেক্ষেত্রে কুসংস্কার মনে কবেন। কিন্তু এঁরা যদি একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে নানা খাঁটি সাধু-সন্তের জীবনী ও অভিজ্ঞতার একত্রিত পড়তেন তা হ'লে তাঁদের বুদ্ধিদৃষ্টি অবিশ্বাসের বন্ধ হাওয়াব অশান্তিসম্বল হবে কাল কাটাতে হ'ত না, জীবনের মন্ত্রমুগ্ধ যে ভগবানকে পাওয়া, এ-সত্যটি দেখতে পেয়ে সেই লক্ষ্য-মুখে চলবার কিছু পথের অন্তত পেতেন প্রণামের আবাহনে।

পায়ে পিও সার্বকালিক মহাপুরুষদের মতনই দিয়েছেন এই সার্বভৌম প্রণামের, রিনিতির, দীক্ষা। এ-দীক্ষা বিনা আধাব মনে আলো নামে না, নামতে পারে না। যাকে বুদ্ধির বা জ্ঞানের অভিমান একবার পেয়ে বসেছে, সে জ্ঞানার মত কিছু জানতে পারে না—শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাবাদের নিবালোক গোলোকধামের ঘুরে ঘুরে অন্তহীন লক্ষ্যহীন পার্থিব কর্মের প্রান্তিকবিলাসে। অথচ এইসব কর্মই তাদের হয়ে উঠতে পারত সাধক (ওবফে বৃত্ত) কর্ম যদি ভগবানকে হৃদয়ে বরণ ক'বে তাঁর কর্ম ছেবে নিষ্কাম কর্মযোগে দীক্ষা নেওয়া হ'ত। কিন্তু এ-দীক্ষার মূল কথা শ্রদ্ধা বিশ্বাস বিনিতি, বুদ্ধিব মতমত নয়।

বলা বাহুল্য, পায়ে পিওর দীপ্ত পবার্থ-ব্রতেরও আদম প্রেরণা এই বিশ্বাস, যার বনেদেব পরে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রার্থনাসম্বল ধ্যানসুন্দর প্রেমের সোঁধ। তাই তো তাঁর মুখে ফুটে উঠল এমন অপূর্ব বাণীঃ “ঠাকুর। তুমি আমাকে দেখিয়ে দিইনি যে, আমাদের সাধী বন্ধুদের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারার নামই প্রেম। প্রেমের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আব কী হ'তে পারে?” আপটঃ “ঠাকুর। কত শত আত্ম

যে আমার কাছে আসে যাদের দুঃখতাপের কিছু উপশমও হয় আমার প্রার্থনার—তোমার এ-করুণার জন্যে আমি তোমাকে কী করে জানাব আমার কৃতজ্ঞতা?”

ভগবানের কাছ থেকে সাধুদের এই করুণার আশীর্বাদেব কথাই বলেছেন ঠাকুর গীতার (৫-২৫)ঃ

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুখ্যঃ কীর্তনম্বাঃ।

হিমমেষা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

নিপাপ কথিবা—যারা সংসারের পাশ ছিন্ন করি

ব্রহ্মপদলাভে হন জীবনমুখ একান্ত সাধনে—

ধন্যজন্মা হন তাঁরা সর্বজীব সেবারত বরি।

কিন্তু হ'লে হবে কি, এই সেবা কববার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত জীবসেবা করতে হ'লে সব আগে চাই জ্ঞান, নৈপুণ্য ও অতন্দ্র চিন্তাশুদ্ধির সাধনা। কেন-না শ্রদ্ধা সাধনার ফলেই আসে সেবার শক্তি, আর জ্ঞানই কেবল পথ দেখাতে পারে কিভাবে সেবা যথার্থ নিষ্কাম ব্রত হয়ে ওঠে। বহুক্ষেত্রেই ঠাকুর তাঁর প্রিয় সাধকদের জীবনমুখি দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে দিবে থাকেন যোগবিভূতি স্বল মাধ্যমে তাঁরা মানুষের নানা আধিভাষি দুর্ব কবতে সক্ষম হন। পবমহৎসদেব এই অধিভাব লাভ কবাকেই বলতেন চাপবাস ওবফে ভগবানের আদেশ পাওয়া। সাধুসন্তের জনসেবার ভিত্তি এই আদেশ, পথের পথের—সাধনালব্ধ জ্ঞানের নির্দেশ। এ-নির্দেশ পেলে তবেই তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন তাঁদের যোগবিভূতি।

এ-সেবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা নিশ্চয়ই মানুষকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেওয়া—যতটা পারা যায়। এ-মহৎ সাধনার পূর্ণ সিঁদুরলাভ করতে পারেন যেমন অবতাবকম্প বা লোকোত্তর মহাপুরুষেবা। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য সেবাও যথার্থ জনসেবা হ'তে পারে, যদি সেবা নিষ্কাম হয় ও সাধু নির্দেশ পান আবায়ের কাছ থেকে এ-সেবার। বহু সাধু-সন্তই নানা বোগীকে নিরাময় করেছেন যাতে করে তারা বোগমুক্ত হয়ে ভগবানের দিকে চলতে পেরেছে। যেখানে-তাঁরা দেখেন সে-সম্ভাবনা নেই সেখানে তাঁরা জবাব দেন খোলাখুলিই। কিন্তু যেখানে দেখেন এ-সম্ভাবনা আছে সেখানে তাঁরা যে ভগবানের কৃপার যোগলব্ধ শক্তিবলে তাদের বোগমুক্ত করতে পারেন, এর বহু প্রমাণ আছে নানা সাধুর জীবনীতে। এ-মুণ্ডেও রোগমুক্তি দিয়েছেন নানা সাধু—যাদের মধ্যে সিঁদুর সাহিবাবা ও পায়ে পিওর নাম বিশেষ করেই উল্লেখযোগ্য। সাহিবাবার যোগবিভূতির খবর পাবেন যদি আর্থার অসবোর্নের The Incredible Sai Baba বইটি পড়েন। এখানে আমি কেবল পায়ে পিওর যোগবিভূতির কিছু খবর দেব সংক্ষেপে।

* তাঁর সব কয়টি জীবনীতেই বহু সাক্ষ্য আছে, ডাক্তার তথা নানা পরীক্ষকের যে, তিনি শিবের অসাধ্য ব্যাধিও শ্রদ্ধা প্রার্থনা করে সাধিবছেন বেন অলৌকিক জাদু বলে, যথাঃ ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, আর্থারাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, প্লুরিসিস, বক্ষা, নানা ক্র-রোগ, রক্ত বিষণ্ণে-ওঠা, ম্যালেরিয়া, মূগী, বিশেষাটক, জ্বারের নানা ব্যাধি, বাঁধরতা, অম্বতা...কত বলব? করেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি শেষের দিকে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

তাই বহু রোগীকে নিরাসয় কবাব দাঁততই আশ্চর্য ও অলৌকিক। দু-একটি কথা বলি।

(১) ১৯৪৭ সালে সিসিলিতে জেম্মা বলে একটি মেয়ে দেখা যায় চোখের ভাবা নেই। জন্মাত। ডাক্তারেরা জবাব দেয়, বলাই বাহুল্য। মেয়েটির ঠাকুরমা ডাক্তারের রাব নামজব্ব করে নাতনীকে নিয়ে গেলেন সোজা পাদ্রে পিওব কাছে খ্রিওভামি দি রোডভানোয়। গির্জার তার ধর্মভাষা শুনবার পরে ঠাকুরমা অশ্ব বালিকাকে নিয়ে বেদীর কাছে গিয়ে পৌছাতেই পাদ্রে পিও তার দুচোখে হাত বুলান। অমনি জেম্মা চোঁচিয়ে উঠল : আমি দেখতে পাচ্ছি। শুন ডাক্তারেরা সবাই হতভম্ব। চোখের তারা অনুদৃশিত তবু জন্মাতের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল কী করে? এ মেয়েটির ছবিও ছাপিয়েছেন রেভারেন্ড কার্টি, বিশেষ করে চোখে ফটো।*

(২) ভেনেজিয়া দুটি সন্তানের মা। হার্ট-এর ব্যাধি। হার্ট সেরে গেছে কী করে কেউ জানে না। কেবল বমন। মৃত্যু আসন্ন। পদদুটিকে ডাকা হল—মার মৃত্যুশয্যার। রাত সাড়ে এগারটায় ছোট ছেলে যে মার শিরেরে জেগেছিল, হঠাৎ দেখল যে, বিছানার ওদিকে পাদ্রে পিও তার মাকে আশীর্বাদ করছেন। পবদিন ভেনেজিয়া সম্পূর্ণ সেরে উঠল ও কয়েকদিনের মধ্যেই চলাফেরা শুরু করল।†

(৩) অস্কার লিসো তাঁর জীবনীতে এক অবিস্বাসী ডাক্তারের কাহিনী লিখেছেন ফলিয়ে ১১-১৪ পৃষ্ঠায়। আমি এখানে তার চূষকটুকু পেশ করছি।

ডাক্তার রিচিয়ার্দি (Dr. Ricciardi) মনেপ্রাণে অবিস্বাসী। কথায় কথায় ধর্ম, গীর্জা, সাধুসন্তদের বিদ্বেষ করেন। বড় অহংকার—তিনি বৈজ্ঞানিক-পন্থী বলে। বলেন : “Monks are smart and full of tricks” (সমুদ্রা নানা চতুর্ন বুদ্ধবুদ্ধিক জানে)।

* এ-দৃষ্টান্তটি পাদ্রে পিও-র পাঁচটি জীবনীতেই আছে। এটি বিশদ করে লিখেছেন M. G. Carroll সাহেব ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায়। শেষে তিনি মাদাম বিরেব কথাও লিখেছেন—যিনি দুটি সন্তানের মৃত্যুর পর অশ্ব হয়েছিলেন ১৯০৮ সালে ফেরারি মাসে। তিনি লুর্দ-এ যান আগস্ট মাসে ও ভার্জিন মেরি'র গুবু'র কাছে গিয়ে। Only communion প্রসাদ পেতে না পেতে দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পান। লুর্দ-এর কথা লিখেছি অন্যত্র—(কব্জা অলৌকিকী নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)

† Rev. Carty-বইটি দ্রষ্টব্য—CURES অধ্যায়, ১১৫ পৃষ্ঠা। এ-অধ্যায়ে তিনি শতাধিক অলৌকিক আরোগ্যের কাহিনী জ্ঞাপন করেছেন।

একদিন সকালে উঠে ডাক্তার দেখেন তিনি উঠতে পারছেন না। দুজন ডাক্তার বন্ধু—ডাক্তার ফেরা ও ডাক্তার বুভা—দেখে রললেন মস্তিস্কে ফোঁড়া (brain tumour), কোনো আশাই নেই। ডাক্তার রিচিয়ার্দি নিজে বিখ্যাত অধ্যাপক লস্টোজোর শিষ্য, জানতেন যে, এ-ফোঁড়ার ভয় নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তিনি আগে থাকতেই বললেন : শবরদার, পাদ্রে পিওকে যেন না ডাকা হয়।

(গ্রন্থকাব পাদ্রে পিওর সূক্ষ্মদেহে গতি-বিধির একটি প্রমাণ দিয়েছেন Father Orion-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে)।

পাদ্রে পিওর অভ্যুদয় হল মৃদুর্ষ'র শরন-কক্ষে। পাদ্রে পিও ল্যাটিনে জিজ্ঞাসা করলেন : “দৈব তেল নেবে কি আমার কাছ থেকে?” ডাক্তার পাদ্রে পিওর হাত চেপে ধরলেন সন্তোষে, পাদ্রে পিওর দিবাক্তের কথা ভুলে। পাদ্রে পিও অক্ষুণ্ণ চিৎকার করে উঠলেন ব্যাথা।

ডাক্তার বললেন : “আমি নিতে রাজী।” পাদ্রে পিও বললেন মৃদুর্ষ'র পরিজনদের সামনে : “তোমার অন্তরায়ার সম্মতি হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার দেহও নিবাসন হবে।”

ডাক্তার ক্রিসমাস mass-ভাবে গির্জার গেলেন সেরে উঠে—কেন? পূজা দিতে। অবিস্বাসী নাস্তিক বৈজ্ঞানিক পদমুর্ষ'ক হয়ে ধার্মিক বদনাম কিললেন।

মহীরসী পূণ্যবতী সেস্ট ভেরেসা (আভিলায়) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন শ্বশুরের কাছে প্রার্থনা করে তিনি বারবাবই কিভাবে নানা মৃদুর্ষ'কে নিবাসন করতেন। সেস্ট ভেরেসা নরমানের জীবনীতেও তাঁর এই অলৌকিক শক্তির কথা লিখেছেন তাঁর নানা জীবনীকার। বুদ্ধিবাদীরা গায়েব জোরে অবিস্বাস করলে হবে কী? এ যে অকাট্য সত্য যে প্রার্থনার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনা যায়। আমাব নিজেরও তিনবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সে অন্য কথা। পাদ্রে পিওর কথায় ফিরে আসি।

পাদ্রে পিওর আরও নানা যোগবিভূতির কথা আছে তাঁর প্রতি জীবনীতে। আমি বাহুল্যতার কেবল একটি কথা বলব। রেভারেন্ড কার্টি লিখেছেন ষষ্ঠীর অধ্যায়ে যে একটি মেয়ে একথা পাদ্রে'র কাছে এসে প্রার্থনা করল তার স্বামী'র জন্য—যে সম্প্রতি দৃষ্টি-শক্তি হারিয়েছে।

পাদ্রে পিও বললেন : তাকে অশ্ব হকেই প্রার্থাশিত করতে হবে—তার পিতাকে মারার জন্যে। স্ত্রী বিশ্বাস করতে না পেয়ে ফিরে এসে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল। স্বামী প্রথমে অস্বীকার করে শেষে কবুল করলেন যে, তিনি একবার পিতৃনিগ্রহ করেছিলেন লোহার ডাঙা সেরে।

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন একবার যে, যোগেশ্বর যোগীদের নানা যোগবিভূতি

দেন তাদের মাধ্যমে মানুষের সেবা সম্ভবপর হয় বলেই। তবে এ জন্যে সব আগে চাই যোগীর চরিত্রবিশুদ্ধি—অর্থাৎ আধ্যাত্মের শোভন। যে লোককে মেয়ে দিতে যোগবিভূতির প্রয়োগ করে সে বিপক্ষে পা দিবে একুল-ওকুল মৃদু-কলুই হয়র। কিন্তু মহাযোগীরা যোগ-বিভূতির প্রয়োগ করেন যথাস্থানে—যেভাবে ভগবান চান সেই পথে, এ-শক্তিপ্রয়োগ লোককে মৃদু করতে বা নাম কিনতে নয়। তিনি নিজে, যে তাঁর যোগশক্তিতে অনেক রোগীর দুরারোগ্য রোগ সারাতেন একথা অনেকেই জানেন। আমি নিজে তাঁর এ-শক্তি কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছি সে বিবরণ অন্যত্র লিখেছি।*

কিন্তু এ-সব যোগবিভূতি আশ্চর্য ও সত্য হলেও পাদ্রে পিওকে আমি মহাপুরুষ বলে ভক্তি করি কোনো অলৌকিক শক্তির জন্যে নয়। আমার মনে হয়, মানুষ সবচেয়ে মহনীর হয় নিঃস্বার্থ প্রেম শূন্য ভগবন্তভক্তি ও স্থায়ী পরার্থনিষ্ঠার সমন্বয়ে। এই নিবন্ধে পাদ্রে পিও ও আলবার্ট শ্বাইৎজারকে এ বড়গের ইওবোপের দুটি লোকান্তর মহামানব উপাধি দেওয়া চলে। আমার মন আরো সানন্দ বিস্ময়ে তাঁদের অভিনন্দন করে তাঁদের দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে। শ্বাইৎজারকে তাঁর আত্মিকার হাসপাতালের জন্যে পাদ্রে পিওকে তাঁর ইতালির গ্রামে Casa Solievo-ব della Sofferaza র (আতের আরোগ্যালয়) জন্যে।

কিভাবে তিনি এ-প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করেন সে আর এক অলৌকিক কাহিনী। শুনুনই না।

পাদ্রে পিও রোগক্রান্ত মানুষের বহুগার অভ্যন্ত দৃষ্টিবোধ করতেন বলেই বহু রোগীর জন্যে শূন্য যে প্রার্থনা করতেন তাই নয় বহু আতের চিঠি পেয়েও তাদের আশীর্বাদ পাঠাতেন। তাঁর জীবনীতে পাই তিনি পঞ্চ-পড়তা দিনে ছশো থেকে আটশো চিঠি পান, ও পঞ্চাশ থেকে আশিটা টেলিগ্রাম। তিনি বহুদিন (১৯২৪-এর পব থেকে) নিজে হাতে চিঠি লেখেন না। কয়েকজন সভাব তাঁর চিঠিপত্র পড়েন তাঁর সঙ্গে উত্তরও দেন। কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু তাঁকে লেখে তার পিতার পক্ষাঘাত হয়েছে। উত্তরে পাদ্রে পিওর চিঠি আসে : “আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করব বৈকি, তিনিও যেন করেন।”

১৯৪৬ সালে পাদ্রে পিও বলেন যে, তাঁদের গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

অসম্ভব-কল্পনা! গত বৃহৎ জার্মানির পরাজয়ের পরে ইতালীর সে কী দুরবস্থা! দেশব্যাপী নিরাশা, দৈন্য, হাহাকার। কিন্তু পাদ্রে পিও পেয়েছে ন ঠাকুরের আদেশ,

* Sri Aurobindo Came to Me দ্রষ্টব্য Messenger of the Incommu-nicable অধ্যায়।

সাপ্তাহিক বসুদত্তী

ধরলেন এ করতাই হবে এবং হাসপাতালও গড়ে উঠবেই উঠবে। তাঁর কাছে একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তিনি বললেন : “এই প্রথম চাঁদা নাও—আমাবা।”

ঠাকুরের কৃপা অলৌকিকী—আমি লিখেছি অন্যত্র। অঘটন ঘটল ফের। অপ্রত্যাশিতভাবে চাঁদা আসতে লাগল পায়ে পিওর কাছে। তাঁর নাম আমেরিকারও পৌঁছেছিল, সেখান থেকেও এল বহু লক্ষ ডলার। দশ বৎসরে বিরাট হাসপাতাল গড়ে উঠল (রেভারেন্ড কার্টি এ সন্দেহ হাসপাতালটির ছবি দিয়েছেন)। The Fiorello LaGuardia Clinica ব উদ্ভোধন হল ৫-৫-১৯৫৬ তারিখে। সবসম্মত খরচ হল পঞ্চাশ লক্ষ ডলার—দেশদেশান্তব থেকে এল পনের হাজার তীর্থযাত্রী—ভক্ত ভক্তিমতী ধর্মার্থী কৌতুহলী। পায়ে পিও ভাষণ দিলেন প্রথমে শেখাবাহিনী খল্লদেব (ভাট্টারদেব) : “তোমাদের কাজ বোগীর পাবিবে।” কিন্তু তোমরা মনে রেখা যে এ-সেবা করতে হবে প্রেমের সঙ্গো। ভাট্টারেরা লব্ধ নব। ১৯১৬-১৭ সালে আমার যখন খুব অসুস্থ তখন ভাট্টারেরা আমাকে বলে আমি বড় জোর আর একটি বৎসর বাঁচব।... তাই বলি ভগবানকে ডাক দিতে হবে বোগী-দের রোগশয্যায় পাশে। সে-আবাহনের শক্তি সব দাওয়াইকেই ছাড়িয়ে যায়।”

কিন্তু পায়ে পিও প্রায়ই বলেন যে, ভাট্টার শাস্ত্রও তিনি বিশ্বাস করেন, কারণ ভাট্টারদেব বটিকা বা ছুরির পিছনেও ভগবানের করুণা আদান। তীর্থযাত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে : “তবে তুমি কী কবাবে এ-হাসপাতালে?” উত্তরে পায়ে পিও বলেন : “আমি আছি বোগীদের প্রাণে শান্তি ও সান্থনা দিতে। শোনো। আমি জানি—তোমরা খুবই দুটি জিনিস : সুখ ও সত্য গুরুত্ব ভগবান। প্রথমটি পাওয়া অসম্ভব, কারণ এ-পৃথিবী হল আসলে অশ্রু-উপত্যকা (valley of tears) যেখানে প্রতি যাত্রীকেই বইতে হবে বেদনার বোঝা। তাই পৃথিবী সুখ হল মরীচিকা। তবে দ্বিতীয়টি—অর্থাৎ ভগবান—তোমরা পেতে পারো যদি চাও, কিন্তু আজকেব দিনে তোমরা যে পথে চলছ সে-পথে চললে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নব। কারণ এ-পথ হল মিথ্যার পথ, অহংকারের পথ। বিজ্ঞান পাবে না তাঁর খবর দিতে। উচ্চতম বিজ্ঞানও তাঁর বিরাট মহিমায পাশে বামন—তুচ্ছ। তোমরা যদি ভগবানকে চাও তবে কাম-ক্রোধ-লোভ থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে, আর হতে হবে দীন-ধূলিনীন হবে করতে হবে প্রার্থনা (Drop passions from your heart, humble yourself in the dust and pray) এ-ধর্মদীক্ষা যদি তোমরা গ্রহণ করো তবেই তাঁকে পাবে আর সেই সঙ্গো

পাবে এ-জীবনে অচলা শান্তি ও পরপারে শান্তি আনন্দ।”

খৃষ্টধর্মের সেই চিরন্তন বানী : এ-জগৎ পাম্পশালা, এখানে সুখের আশা বিভ্রম্বনা, জীবনে আশা কুহকিনী মরীচিকা, ভেগ শান্তিবিলাস, জাঁকজমক সব মারা—“vanity vanity all is vanity,” “in the midst of life we are in death.” “Whited sepulchres which indeed appear beautiful outward, but all within full of dead men's bones” ইত্যাদি।

কিন্তু এ-দুঃখবাদ প্রতি ধর্মেই আছে, সব দেশেই জীবনের অন্তর্হীন দুঃখ-নিরে হা-হুতাশ কবছেন নানা বোগী-ঋষি, কনি-ব্রাহ্মণিক, ভাবুক-তত্ত্বজ্ঞ। নানা মন্দির সমাধান খুঁজেছেন জগৎকে মার্মা বৎসে সন্তোষকার করে। কিন্তু খতিয়ে সবাইকেই বদ্বিনে কষ্টগণ কষ্ট পেতে হয়েছে—মহা-পুরুষদেরও দেহ দুঃস্বপ্ন ব্যাধিতে ক্রিষ্ট হতে হয়েছে বৈ কি। এ চিরন্তন দুঃখবেদনার তাৎপর্য কি? সুখকে আরো উন্মুল্ল কবে ধরতে? বৈতবাদ? বিরহ বিনা মিলনের নহিমা কে জানত? অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য বুঝতাম কি আমবা? ইত্যাদি। এ-সবই জানি। কিন্তু তবু দুঃখ যে সাজে পনেরো আনা মানুসকে আশ্বাস দিতে পারে না একথা বলা যায়।

উত্তর যদি খুঁজতে হয় যেতে হয় এই মহাজনদেরই কাছে—যারা দুঃখনিবৃত্তি খুঁজেছেন পরার্থনিষ্ঠার অপরের দুঃখের ভার বহন করে। এক কথার প্রেমেই কেবল যা একটু শান্তি মেলে, অবরু মন মাথা নিচু করে যখন দেখে পরের জন্য মহাপুরুষেরা হাসিমুখেই দুঃখ সবেছেন, কখনো বলেন নি—আমার বা আমাব সাংগোপাঙ্গদেব সুখ হলেই হল। জর্জ রাসেলের ভাষা :

When the spirit wakes
It will not have less
Than the whole of the world
for its tenderness.

হৃদয়দেবতা যখন জাগে

থাকে না সে আর স্বল্পসুখী,

গাঢ় কোমলতা আঁকশনে

হয় প্রাণ তার বিশ্বমুখী।

পায়ে পিওকে আজ পঞ্চাশ বৎসর প্রাত্যহিক দেহদুঃখ সহিতে হয়েছে চিব-উন্মুল্ল কৃত থেকে রক্তপ্রাবে। তিনি মহাপুরুষের পদবী পেয়েছেনও এই দুঃখব ববে। তাই তিনি ডাকতে পেয়েছেন হাজার হাজার দীনদুঃখী নিঃস্বকে। আতের কানে দিতে পেয়েছেন খৃষ্টের প্রেমের মন্ত্রদীক্ষা—যে, পবের দুঃখ দুবে করার মধ্যে দিয়েই মানুস পৌঁছবে তাঁর চরণে, প্রেমের আলোই পথ দেখাবে দুঃখের কাঁটাবনে। শ্বাইজার এই দর্শনকে বলেন ধর্মের world affirmation—কিনা জীবনকে অংশীকার করার দিক। পায়ে পিও আরো মধুর ধর্মীর (মিস্টিক) ভাবার বলেন :

The life of a Christian is nothing but a perpetual struggle against self ; there is no flowering of the soul to the beauty of its perfection erupt at the price of pain, অর্থাৎ :

ঈশাব পূজাবী তাব যাপিবে জীবন নিলন্তর
স্বার্থ অহমিকা সাধে সংগ্রামে। যে-

সর্বগুণসুন্দর

বিকাশ প্রাপের লক্ষ্য, মঞ্জরিতে

পাবে না তো তার

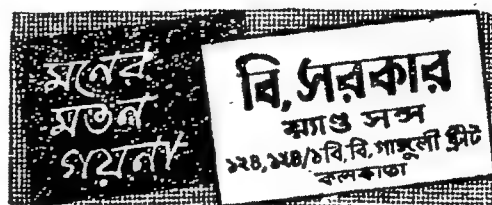
পায়ে যদি—না বাঁধা রক্তবাতা

মাথা-অভিসার। ইতি।

প্রীতিবন্ধ দিলীপ

মহালয়া, ১ই আশ্বিন, ১৩৭২

২৫।১।৬৫





জাহান-আরাম শূন্য প্রাসাদে যেন আজ
একটা বহুতল নারী হঠাৎ উর্কি মেরে চলে
গেল।

কে সে?

অনেক চিন্তা করে বেগম জাহান-আরা
যেন সেই অশরীরী আত্মাকে চিনতে পারলেন।
তিনিও সম্রাটনন্দিনী। শূন্য সম্রাট-দুহিতাই
নয়। তিনিও একদিন অরোহণ করেছিলেন
হিন্দুস্থানের সিংহাসনে। তখন ময়ূর
সিংহাসন তৈরি হয় নি, তা না হোক। তবুও
সঙ্গারী হিন্দুস্থানের তত্ত্বতাউসের মোহ
সামর্য ঠনকো মোহমাত্র নয়। সবই ছিল
ভাব। তবুও কিছুই পাননি তিনি। মনে
পড়ে সেই প্রেম-পিরমাসিনী নারীর নাম?

সুলতানা রাজিয়া।

আপন জীবনপাত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন
ঘাঁকে-সমাজ তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা চেষ্টা
মেশে নি।

এই দিল্লীতেই তা ঘটেছিল সেই
প্রেমভিনয়। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে প্রতাপ-
শালী আমাত্যবর্গ যখন আপন শক্তি প্রতিপত্তি
নিরে ব্যস্ত; তখন সিংহাসনে বসে একটি অতি
দীন দরিদ্র ভাগ্যবানের সাথে হৃদয় নিয়ে খেলার
প্রমত্ত ছিলেন—দিল্লীর একমাত্র মহিলা-সম্রাজ্ঞী
সুলতানা রাজিয়া।

দাস বংশোদ্ভব। তাতে কি হয়েছে?
সম্রাটনন্দিনী তো। ভারত-সম্রাজ্ঞীও বটে।
তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে সোদীন সমগ্র
দিল্লীতে পড়েছিল কি এত টেং টেং? তা
বোধহয় পড়েছিল।

শূন্য আলোচনা নয়। শূন্য সমালোচনা
নয়, দিল্লীর ঘরে ঘরে শূন্য একই আলোচনার
দবাই ছিল মন। সম্রাজ্ঞী এ কি করছেন?

দিল্লীর সিংহাসনে বসেও সুলতানা রাজিয়া
বহুদিন পর্যন্ত পরিপনসূত্রে কারুর সাথে
নিজেকে আবদ্ধ করেন নি কেন? কুমারী
সম্রাজ্ঞী আপন শক্তি প্রতিষ্ঠার শূন্য মাত্র

অভিনয়-কৌশলে সম্রাজ্ঞীর অমাত্যবর্গকে
সোদীন বশীভূত করেছিলেন। শূন্য আমাত্য-
বর্গকেই না। শত্রুকেও তিনি এই ছলনা-
কৌশলে প্রতারণা দিয়ে ফেলে রাখতেন
প্রেমবারির মাত্রা স্রষ্টাচকার।

অমাত্যবর্গকে শূন্য কটাক্ষাতে বশীভূত
করে থাকলেও রাজ্যের জীবন ছিল না শূন্য
ময়ূরমি। রাজিবা-হৃদয় মন দিয়ে থাকে ভাল-
বেসেছিলেন তিনি ছিলেন অতি সাধারণ একজন
প্রলিটেরিয়েট—হাটপার কথাই অতি সাধারণ
নাগরিক। বোধহয় সাধারণতঃ নিম্ন ছিল
তার স্থান। কবে কোথেকে কিভাবে তিনি
হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীতে এসে
পড়েছিলেন সেটা বোধহয় তিনিও তুলে গিয়ে-
ছিলেন। দিল্লীতে তাঁকে আনা হবোঁছিল অন্যান্য

প্রীবিকেরজন ভট্টাচার্য

ক্রীতদাসের সাথে। তিনি এসেছিলেন বহুদূর
থেকে। অন্যান্য ক্রীতদাসের সাথে তাঁর একটা
পার্থক্যও যে না ছিল তাও নয়।

ক্রীতদাসদের সবাইকে আনা হয়েছিল মধ্য
এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। একে আনা
হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। কে এনেছিল?
ইতিহাসে তার হিসেব নেই।

দিল্লীতে অন্যান্য ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁকে
দিয়েও প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করিয়ে নেওয়া
হত। বেশ পরিপ্রমী বলে তাঁকে সম্রাজ্ঞীর
অশ্বশল পরিদর্শনের ভার দেওয়া হল। ছিল
ক্রীতদাস হল স্টেবল বয়। স্টেটাসের দিকে
নিশ্চয়ই খানিকটা পদোন্নতি। হঠাৎ একদিন
ঘোড়ার দেখানো করতে করতে সম্রাজ্ঞীকে
ঘোড়ার তুলে দেওয়ার কাজটা তাঁর ভাগ্যে
জুটে গেল।

নরম মসৃণ সেহলতা সঙ্কটে ভর ভরে
ঘোড়ার তুলে সুলতানার স্মার্ট চেহারার দিকে
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সে। মনে
মনে ভাবত অহা ক্রীতদাস না হয়ে কোন রাজ-
পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে নিশ্চয়ই এ সুলতানী
অম্বারোহিণীর পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে
বাবার সুযোগটুকু আসত তার জীবনে।

দিনের পর দিন ক্রীতদাসের সখ্য
সহায়তার সম্রাজ্ঞী অম্বারোহণে দিল্লীর
রাজপথ অতিক্রম করে গেছেন, নিজের অসতর্ক
মহুত্রে কখন সম্রাজ্ঞী এই অম্বারোহণ
মহুত্রে অধীর অপেক্ষার প্রহর গুণে
শূন্য কবলেন নিজেরই খেলার ছিল না।
রাজকাজে মন বসল না। অমাত্যবর্গের
উপস্থিতিতে মেজাজ যেন কেন অকারণে
আজকাল নারাজ হয়ে যাচ্ছে, সভাসদবৃন্দ
চতুর রাজনীতির আটঘাট জ্ঞানেন, তাঁদের
দৃষ্টি এড়ানো এত সহজ ব্যাপার নয়। দিল্লীর
রাজসভায় আব কারুর জানতে ব্যক্তি রইল না
যে সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া ক্রীতদাস স্টেবল
ঘরের প্রেমে পড়েছেন।

যখন জানাজানিই হয়ে গেল তখন আর
ভয়ের কি আছে? গোপন প্রেমই মানুষের
মনে ধীরে ধীরে এক অপরিণামী সাহস সঞ্চার
করে।

সুলতানা রাজিয়া এতদিন পদক্ষেপ
বেশেই সম্রাজ্ঞীর রাজকাৰ্য সম্পন্ন করে
আসেছিলেন। মুসলিম সম্রাট-দুহিতা।
বোম্বার পাট অনেকদিন আগেই তুলে দিয়ে-
ছিলেন। অবগুঠন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল
অনেকদিন আগে। রাজসভায়, বণিক্রে ক্যাম্পে
কুমারী সুলতানাব ঐ এক বেশ। পরিবেশের
সাথে বেশটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

ভুক্তিস্থানের রাজবস্ত্র যেসব সভাসদের
রঙে ছিল প্রবাহিত তাঁরা কিন্তু এ প্রেমের
অভিনয়ে ছিলেন না নীবব সাক্ষী। শূন্য
একটি কুমারী নারী নয়, সাথে রয়েছে সঙ্গারী
হিন্দুস্থানের সিংহাসন। লোভটা সম্বরণ করা
শূন্য সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া এতগুলো
ভুক্তী সুলতানান্ত সভাসদ পরিভ্রাণ করে

সম্রাজ্ঞী যখন আপন স্বজন পরিভ্রাণ করে
হৃদয়ের খেলার সুদূর আফ্রিকার ক্রীতদাসকে
সাধী হিসাবে নিবাচন করলেন—তখন
দিল্লীতে সমবেত সভাসদবৃন্দের যে মনে
ভুকান বইবে তাতে আর কিম্বদের কি আছে?

রাজকাজে প্রবোজন মতন সুলতানাকে
পাওয়া যায় না। রাজপ্রাসাদের প্রমোদকাননে
অপবৃপ সাথে সান্নিধ্য হয়ে প্রেমিকের পাশে
নবদুর্ভাগ্য ধীর পদক্ষেপে সুলতানা তখন
মনের গোপন অনুভূতি প্রকাশে উদ্ভাসিত।
সম্রাজ্ঞীর চঞ্চল মনোবল তাত্ক্ষণিক নিতে কেউ
ছাড়ে নি। ধীরে ধীরে রাজসভাসদবৃন্দ
আপন শক্তি সংহত করে প্রবলভাবে তাঁর
কিরম্বে চক্রান্তের জন্য হলো তৈরি।

জেনেও যেন সম্রাজ্ঞী কিছুই জানেন না।
রাজকাজে তাঁর মন বসে না, এ তামাম
সঙ্গারী হিন্দুস্থান বাঁ হাতের মতোই তিনি
তখন শূন্য বেড়াচ্ছেন একটি হৃদয়। এ
প্রাসাদপূর্বী ভাল লাগে না। চাই একটি ছোট
নীড়। এতটুকু বাসা। যেখানে আর কেউ
নেই—শূন্য প্রেমিকা-হৃদয় চিরন্তন প্রেম
স্বায় আপন স্বর্ণ তৈরি করতে পারে।
যেখানে চিরবসন্ত রইবে বিরাজমান।

মনে পড়ে সেই ভাগ্যান ক্রীতদাসটির
নাম? দুরন্ত আফ্রিকার ঘন বন থেকে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

হুন্দা অবস্থায় হিন্দুস্থানে পদার্পণ করে চিবজীবন সাধারণ ভূতের জীবিকা নির্বাহ করেও হৃদয়ের খেলায় যে সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গকে অবদমিত করে পেরেছিলেন পরম পুণ্ডরিক-সম্রাজীব হুন্দা? মনে পড়ে তার নাম? ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—বিদেশী বোমার্শটিক স্টেন্সল বর জালালুদ্দীন ইয়াকুভের নাম চিবভাসব। পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাসে কীতদাস জালালুদ্দীন ইয়াকুভ আজও বিজয়ী সম্রাট।

দিল্লীর লাল কিল্লার রাজপ্রাসাদে আপন নিরালা শয়নকক্ষে প্রেমপাগলিনী জাহান-আরার চোখের সামনে যেন এসব প্রেমিকবৃন্দ গোপন পদসপ্তারে তার মনটা আরও চঞ্চল করে তুলেছে।

শূন্য শয্যায হৃদয়ের অব্যক্ত গোপন বেদনার সম্রাট-দুহিতা ছটফট করে যে বিনিস্রবজনী কাটাচ্ছেন এ বিরাট মোগল অস্ত্রপুর্বে কেউ বেখেছে তার কোন হিসেব?

দুর্লভা আজকাল বাজসভায় সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করেছেন কেন কেউ জানে? কেন সম্রাট সাজাহান প্রতিনিধি পাঠিয়ে তার কোন খবর আনাচ্ছেন না? অসাবধান মুহুর্তে মুখ দিয়ে হঠাৎ কয়েকটা কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজপুত্রোত্তর ছত্রশাল বৃন্দী তাতে মনঃকুল হন নি তো? কে জানে মেঝেবের কোনো সন্দেহী হবতো তার হৃদয় জয় করে নিচ্ছে, যে কণ্ঠস্বরের অপেক্ষার জাহান-আরা আজকাল দিব্যামিনী প্রহর গুণছেন এ বিরাট দিল্লী শহরে আছে কোন সহদর মহাপ্রাণ যিনি বলে দিতে পারেন তার জীবনে সে শূন্য-মুহুর্তটুকু কখন আসবে? বহুদূর কলভানের মাঝে তাল মিলিয়ে রাজপুত্রীতে পাঁচবার নহবৎখানায সানাই বাজে, তার শূন্য-পরিণয়ে আশাবরী সুরে কোন সুপ্রভাতে বাজবে সানাই?

জাহান-আরা মনেপ্রাণে অনুভব করলেন হতভাগিনী রাণা দিল-এর মনের অকথা। বেরানি কবে হোক বদরাজ দাবাব সাথে রাণা দিল-এর পরিণয় সম্পন্ন করতেই হবে। আজ পর্যন্ত এ প্রাসাদে সম্রাট সাজাহান প্রিয়পাত্রী কন্যার কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন নি।

দারার এ মানসিক দুর্ঘোষে এ বিরাট প্রাসাদে তার পাশে মেহনিসিদ্ধি রূপশে তাকে সাশ্বনাটক দেবার সাহসটুকু কারুর নেই কেন?

সম্রাট আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট-পুত্র আওরঙ্গজেব, সজাব চরিত্র নিয়ে যদি মোগল রাজপরিবারে কোনদিন কোনো প্রশ্ন না উঠে থাকে—তা হলে নর্তকীর প্রণয়ে আশঙ্কিত জন্য যুবরাজ দারাসিকোর চরিত্র নিয়ে আলোচনার প্রশ্ন উঠছে কেন? মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাট ও সম্রাটপুত্রদের এ হৃদয়ের খেলার পূর্ণ ইতিহাসটুকু দিল্লীর রাজসভায় কীর অজ্ঞাত?

আগামী দিনের কোন ঐতিহাসিক লিখবে কি তার জীবনের নববসন্তের প্রেম-ঘন কাহিনী? তাঁর নামের পাশে দুর্লভার নামটা জড়িত করতেও জাহান-আরার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ লাগে।

কোনো অলসমুহুর্তে রাজপুত্র প্রাসাদে ষাড়লপ্তনের নিছনিভু আলোর অধঃশায়িত

বৃন্দীবাজ ছত্রশাল দুর্লভা ডাবছেন কি সম্রাট-দুহিতা জাহান-আরার কথা? পেবেছেন কি কবি বেগম বাদশা প্রবেশ কবতে দুর্লভার মনের গহনে?

রাজধানী দিল্লীর লাল কিল্লায় আছে কোন দরদী-প্রাণ যিনি এ প্রশ্নের জবাবটুকু দিতে পারেন?



ধর্মক. যাকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি

সাদনা
দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
করিলে কোন দন্তরোগের ভয়
থাকে না। দস্তরাজী সুস্থ, সবল
ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হরিতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অম্বুর্বেদমাস্ত্রী, এফ.সি. এম.এ. (লণ্ডন),
এম.সি. এম.এ. (আমেরিকা) ডাঙলপুর কলেজের ব্রহ্মায়নশাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ লক্ষ্মীচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) অম্বুর্বেদমাস্ত্রী



অতীত শ' একষাট সাল। আমোরকাব
স্বয়ংস্বের আগুন পশ্চিম ভার্জিনীয়াতে
জ্বলছে। পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে দারুণ স্বয়ংস্ব
খোঁস। কিন্তু নিচের এ বারুদেব ধোঁসা
আকাশ কালো কবে নি—ওখানে স্বল্প নীল
আকাশে শরতের নাদা মেঘ ভাসছে।

পশ্চিম ভার্জিনীয়াব এই সুবিশাল উদ্ভূত
পাহাড়—এরই বিশাল উঁচু একটি চুড়ার
ওপরে একেবারে পাহাড়ের কিনাবাধ একটি
সুন্দর পাথর, সেই পাথরের ওপরে পড়ে আছে
ও। পাথরটিকে পাশে ফেলে ওখান দিয়ে
একটি রাস্তা মোড় ঘুরেছে—আর সেই বাক-
টুকুতে এ সৈনিকটি ভ্রমণ কবে তলপেটে
ভর দিয়ে উপড় হব শুরুর করেছে। একটা
পা অন্য পায়ে গাড়ালিট ছুঁয়ে আছে—
মাথাটি বাঁ হাতের ওপরে এলানো আর ডান
হাতটা আলাগোছে রাইফেলটি জড়িয়ে
রয়েছে—ওর এই অসহায়, নৈতিয়ে-পড়া ভাগ
দেখে হঠাৎ মনে হব বৃদ্ধি বা একটা মৃতদেহ
পড়ে রয়েছে এখানে। কিন্তু না, নিশ্বাসের
তালে তালে গিঠেব ওপরকার কাঁড়ের এ
বালুটা একটু একটু উঠছে নামছে। ওটাই
ওর জীবনের স্পন্দনের একমাত্র প্রমাণ। একটা
বিরাট দায়িত্বের ভার নিয়ে ও এই পাহাড়ের
চুড়ায় এসেছে, কিন্তু সেসব ভুলে ভিউটিব
মধ্যে এইরকম ঘুমিয়ে পড়া। মাঝাক
অপবাস! এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ধবা
পড়লে অবশ্য তাই ওব বরাতে আছে।

ওব পায়েব ধার দিয়ে মোড় ঘুরে যে
রাস্তাটি চলেছে সেটি দক্ষিণ দিকে গিয়ে
একেবারে খাড়া চড়াইতে উঠেছে। ফের কোথা-

বেচে চক্কর দিবে পশ্চিমে ঘুরে গেছে—প্রায়
একশো গুজ মত দূরে গিয়ে এঁকে-বেঁকে
নিচে নেমে জংগলের বুক কোথায় যেন
মিলিয়ে গেছে পথটি।

যেখানে ও শুরুর করেছে সেই পাথরের
ওপরে দাঁড়িয়ে যদি একটা পাথর নিচে ফেলা
যায় তবে সেটা প্রায় হাজার ফিট নিচে গিয়ে
তবে এ সবুজ রেখাব মত পাইন গাছগুলোর
মাথা ছুঁতে পারবে। এ ঘুমন্ত প্রহরী যদি
জেগে থাকত তবে সে তাব উল্টো দিকের
কর্কশ-কঠিন এ পাহাড়ের খষেবী বং-এব
চুড়োব তার ওপারের স্বল্প নীল আকাশ;
নিচের সবুজ উপত্যকা; তারও নিচে এ
চড়াই-এব মাঝাকাব নীলে-সবুজে মেধা
ধোঁয়া-ধোঁয়া জংগলের আভাস, স্বসুন্দর
মিলিয়ে বিবট প্রজ্জ্বলপটে আঁকা একটা সুন্দর
প্রোফাইল দেখতে পেত। কিন্তু অতটা
নিচে! এ অতল গহবরেব একটা মূহুর্তীন
মাধ্যাকর্ষণ। ওকে অসুস্থ করে দিত। হয়ত
মাথাঘুরে যেত ওব।

ঘন জংগলে ভবা দেশ—বার্তাক্রম শব্দ এ
উপত্যকাটি। এই এত উঁচু থেকে মনে হয়
ওটা একটা গেরস্ত বাড়ির ছোট্ট উঠান—
কিন্তু তা নষ—বেশ কয়েক মাইল জুড়ে এ
ভ্যালিটির বিস্তৃতি, পুরো পাঁচটা রেঞ্জ-
মেন্টের বিশাল সৈন্যবাহিনী ধবে ওখানে।
একটা মৃদু অস্পষ্ট কুলকুল আওয়াজ কান
পেতে থাকলে শোনা যাবে। এ শব্দ রণরার
—সবুদ রূপোলী ফিতের মত এ খরগাটি
উপত্যকাকে যেন মৃদুভগে চিরে দিয়েছে। কিন্তু
তবু সবটা দেখা যায় না। পাহাড়ের বাঁকে

লুকিয়ে গিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে
খরগাটি যেন নিচে নেমেছে। বনের সবুজ আর
উপত্যকার সবুজে কিন্তু এক হয়ে মেশে নি
—ভ্যালিব সবুজের এ গাঢ় যেন নিজেই
একটা মানচিত্রের সীমাবেখাব আকাব নিয়েছে।
এ খরগাব মত কবে পথটিও লুকিয়ে গেছে।
যেন মনে হয়, এ উপত্যকাতে ঢুকলে বেরবার
আব কোন পথ নেই; বা বোঁবিয়ে এসে আবার
ডোকবাব চেন্টা করাও বৃথা! উপত্যকাব গা
বেয়ে আবার অন্য ধাবে বয়েছে এ দুর্গম
পাহাড়। বাব একটি চুড়ো ঝুঁকে বোঁবিয়ে
এসে আমাদের ঘুমন্ত প্রহরীর সামনের
আকাশ আড়াল করেছে।

এই যে একটি এইরকম ভয়াবহ দুর্গম
পাহাড়ে জায়গা। মানুষের প্রায় অগম্য
স্থান। তবু আজ এইটাই হয়েছে এদের
যুদ্ধস্থল। এই মৃত্যুংগনটিকেই ওদের রণাংগন
করেছে ওবা। কিন্তু মাত্র জনা-পঞ্চাশেক
লোকই ইচ্ছে কবলে এ উপত্যকা থেকে
বেরবার একমাত্র পথটুকু অবরোধ করে এ
কয়েক হাজার সৈন্যকে অনায়াসে শব্দ উপোস
কবিয়ে মেবে ফেলতে পারে। তবু এখানে
এ ইদুব-খাবা-খাবাব মত উপত্যকাটির মধ্যেই
ফেডারেল ইনফ্যান্ট্রি পাঁচ-পাঁচটা বোঁজমেন্টের
সৈন্য এসে জড় হয়েছে। এরা গতকাল
দিনবাত সমানে মার্চ কবে এসে ওখানে
বিশ্রাম নিচ্ছে। সূর্য ডুবে গিয়ে রাত
নামলে আবার তখন ওদের চলা শব্দ হবে।
রাতের তন্দ্রাকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওবা এ নিচে
জংগলের ভেতরের লুকিয়ে-থাকা পথ বেয়ে
ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসবে। তারপর

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

এই যে ওদের দায়বদ্ধতাহীন, ঘৃণা অচেতন সৈনিকটি যেখানে শূন্যে রয়েছে এইখানে এসে ঐ মোড় ধরে দক্ষিণের ঐ খাড়া চড়াই পিঁপিয়ে নিঃশব্দে অতিক্রম করে শিকারী বাজের নত শব্দ-শিঁশিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হিম্মতের কবচ দেবে। কিন্তু যদি এ কাজে তাবা সফল না হয়? যদি কোনরকমে শত্রু-পক্ষ ওদের গতিবিধি টের পেয়ে বাধ—তবে আর ওদের রক্ষে নেই, বাঁচাব কোন উপায় নেই—এই বিবাত সৈন্যবাহিনীটি নিঃশব্দে ধরসে হঠাৎ যেতে বাধ্য, কেননা পালিয়ে যাবার বা পিঁপিয়ে আসবার আর কোন পথই তাদের জন্য খোলা নেই। এখন তাই শত্রু নিবাস বন্ধ করে মধ্যযাত্রার জন্য প্রহর গোপা, অতি সাবধানে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করা। পাঁচ-পাঁচটা বোজবোজের এই বিশাল সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বক্ষাব ভাব স্বপ্নেই যার ওপর সে সদা-সতর্ক পাহারা বোঝার বদলে, কিনা নির্বিকারে ঘুমোচ্ছে! তবে মৃত্যুদণ্ড কি তার জন্য কিছু বেশি দণ্ড। ওর এই অসতর্কতার সুযোগে শত্রুদের প্রলয় হয়ে যেতে পারে না কি!

এ ঘুমন্ত সৈনিকটির নাম কার্টার ব্রুস—সম্রাট জর্জের বংশের একটিমাত্র সন্তান। পশ্চিম জার্মানীর এই পাহাড়ী অঞ্চলের সবটাই প্রায় ওর জমিদারী। আবাম আর স্বেজেন্দোর মধ্যেই মানুষ হয়েছে ও। এ যেখানে ও ঘুমিয়ে রয়েছে সেখানে থেকে অল্প দূরেই ওর বাড়ি।

সোঁদন সকালে বাবার সঙ্গে একসঙ্গে রেকফোর্ট খাঙ্কল কার্টার ব্রুস। খাওয়া শেষ হতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল—বাবা! ব্রাক্‌টনেও ইউনিয়ন বোজবোজ এসে গেছে। আমি তাদের দলে যোগ দিতে বাচ্ছি।

বাবার তখন খাওয়া শেষ হয়নি—আচমকা এই কথা শুনলে বেন কেনন হতভম্ব হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে নিজের শ্লেটের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে প্রায় আদেশের স্বরেই বললেন—বাও কার্টার! তোমার মত একজন দেশদ্রোহীকে বিদায় দিতে জার্মানীর কোন ব্যাধা বাজবে না—নিচু সূরে বললেন—বাজা উচিত নয়। এই গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরও যদি আমবা দুজনে বেঁচে থাকি তখন না হব আবাম এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

এবার বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন—একটা কথা। যাই কিছু ঘটুক। যত বাধাই তোমার সামনে আসুক নিজের কর্তব্য থেকে কখন বিচ্যুত হবে না! বা নিজের দায়বদ্ধতার কথা কখন বিস্মৃত হবে না। এবার আবাম স্বব ভারী হয়ে আসে—বলেন তোমার মা কতটা অসুস্থ তা তুমি ভালই জান—হয়তো মাত্র আর কয়েক হস্তা তিনি আমাদের কাছে থাকবেন—আর তার ফুরিয়েই এসেছে—তাই এই অবস্থায় এত কড় একটা আঘাত আমি ভাব দিতে

চাই না। শেষ সময়ে অস্তিত্ব তার শান্তিটুকু বজায় থাকে এই আমি চাই। কার্টার ব্রুস একজন কমাডাকে যেভাবে অভিযান করে সেইভাবে সম্মানিত করল তার বাবাকে, তিনিও সৈনিকোচিত অভিযান করে বিদায় দিলেন ছেলেকে। এ অভিযান হল তার ভাঙা বুকটায় বর্ম। কতবোয় কাঠিন্য হল সেনাহকে মল মুখের মুখোশ। ছেলে তাই বিপক্ষ দলে যোগ দিতে চলে গেল।

আবাম, আলসা, আবালোর অভ্যাস সব ছেড়ে কার্টার ব্রুস সৈনিক জীবনের রত নিল। অসীম ঐশ্বর্যের সঙ্গে নিজের প্রত্যাশমতিকে আর সহনিকতার সে তার সাথী সৈনিকদের ছাড়িয়ে গেল। আবও উন্নতি করল। শেষ পর্যন্ত এই বিরাট দায়বদ্ধ সতর্ক প্রহরীর পদ পেল। ভাঙা এই পাহাড়ী জায়গার সব-কিছু ওর নখদর্পণে। আজন্ম ও এখানেই রয়েছে, এই কাবনে ও এ পদমর্যাদার অধিকারী।

কিন্তু বিবেক বা কর্তব্য সর্ব-কিছুকেই ছাপিয়ে ওঠে শরীরের ক্রান্তি। অতিবিক্ত পিঁপিয়ে চেষ্টা-পড়া শরীরটাই আসলে ওর সঙ্গে এমন নিদ্বন্দ্ব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

স্বাচ্ছন্দ্য-অভ্যস্ত দেহ একটু বসবাস অবসর পেয়ে ঐ কঠিন পাহারের বুকটাই ঢলে পড়েছে।

ঘুমের মধ্যে ও যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে। কোন দেবদূত না শয়তান নাকি অশরীরী আত্মা সে পার্থক্য ওর অচেতন মনে ধরা পড়ল না, কিন্তু সে যেন ওর বিবেককে নাড়া দিচ্ছে সচেতন কবে দিল। না হলে এই নীচ-নিচের উত্তম পাহাড়ে ওর ঐ উঁচু চুড়া একধারে মডাব মত ঘুমন্ত কার্টারকে, কে জাগিয়ে দিল! ওখানে শব্দের মিষ্টি বোধ মেখে ঐ ধোঁরা ধোঁরা পাহাড়ের নীচে ছায়াব আমেজের মৌতাত তে প্রকৃতি নিজেই ঘুম বিড়োব। কিন্তু ও নড়ে উঠল—ওর ডান হাতটা বাইফেলের বাঁটা একটু ভাল করে আঁকড়ে ধরল। মাথাটা একটু তুলে নিচে, অনেক নিচে, দূরে পাহাড়ের মাক দিবে গাড়ি-বাওয়া ঐ করপাটব দিকে তাকান। তারপরেই ওর চোখ পড়ল ঠিক ওর উল্টো দিকের পাহাড়ের গা থেকে বোবিয়ে আসা ঐ চুড়াটি দিকে—একটি মূর্তি। মূর্তিটি খোঁড়ার ওপর বসে আছে। যেন কোন গ্রীক ভাস্কর্য! নীল আকাশের পটভূমিতে শিল্পেতে অঁকা এক অপূর্ব

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কৃতি সিরিজ

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাঁকুড়ার মন্দির-গুলির ভগ্নাবশেষ পবিচয় দিরাছেন।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্প্রদিত। আর্ট প্লেটে ৬৭টি ছবি। [১৫.০০]

ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্তি-সাহিত্য

উক্ত শান্তিচূড়ামণি দামগুপ্তর এই বইটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫.০০]

রবীন্দ্র-দর্শন

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকবিব জীবন-বৈদের সয়ল ব্যাখ্যা।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। [২.৫০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত দর্শন বিষয়ের মর্মকথা প্রাঞ্জল পবিবেশন। [৭.৫০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যের শ্রীহরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ সংকলিত ও সম্পাদিত। পদাবলী সাহিত্যের বৃহত্তম আকর-গ্রন্থ। [২৫.০০]

পুস্তক-ভালিকার জন্য লিখুন



সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা ৯

জ্যোতিষী যোড়সওয়ার—তাব মাথায় শির-
দ্রাণ, রোদের আলোয় চমকচ্ছে—মুখের নিচে
পুরুষব্যাক্তক ছুঁলো দাড়ি। এক হাত সে
কল্যাণ ধরে আর অন্য হাতে কোন অস্ত্র।
যোড়ারই বা কি সুদৃশ্য সতেজ ভঙ্গী।
যোড়সওয়ারের দৃষ্টি এ নিচের ভ্যালির
দিকে, খুব অভিনিবেশের সঙ্গে যেন সে
ওদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এ মূর্তির
ছবির ওর থেকে এতটাই বেশি যে পরক্ষণেই
তাব মনে হল এ বোধহয় তার নিজের
ছবিনা।

তার মনে এমনও একটা চিন্তার ঢেউ
গলে গেল যেন সব বিবাদ-বিসংবাদ মিটে
গিয়ে ভার্জিনীয়ার আবাব শান্তি ফিরে
এসেছে। যুদ্ধ শেষে শান্তি আর জয়ের
প্রতীক এ দেবদূত যোড়সওয়ারের মূর্তি
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ওখানে। একটা কোভ
আর আকস্মিক প্রজ্ঞা বেদনা জাগল তার মনে
—হিঃ, সে যুঁটুয়েই সমস্ত নষ্ট করল। কিভাবে
কি হল। কিছুই সে জানল না। দেখতেও
গেল না।

কিন্তু ওকি! মূর্তিটি তো স্থির নিশ্চল।
কিন্তু যোড়টা যেন একটু নড়ে উঠল না।
সেও সেই ঘূমের আনন্দের মধ্যেই সচকিত
হয়ে রাইফেলের বাঁটা আরও একটু জোরে
ঝুটোর চেপে ধরল। এবার যেন সেই যোড়-
সওয়ারও নড়ল। আকাশের নীল পটে আঁকা
যোড়সওয়ারের সম্পূর্ণ ছবিটাই কেঁপে উঠল
—না। এ তো পাথরের শিল্প নয়। এবার সে
সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এদিকে লক্ষ্য রেখে
কোণের ভেতর দিয়ে রাইফেলের নিশানা ঠিক
করল। যুঁটুনের নিচে রাইফেল ধরেছে; হাত
ট্রিগারে, যোড়সওয়ারের বুকের দিকে তার
লক্ষ্য। হঠাৎ সেই মূর্তি মুখ ফেরাল—
সমস্ত বোদটা তার মুখে পড়েছে, কার্টারের
দৃষ্টিও সজাগ, স্বচ্ছ, সে দেখল কি সুদৃঢ়
কঠোরতা, বীরব্যাক্তক মুখশ্রী—এ বিশাল চোখ
কি গভীর মমতা আর মাছুড়ির প্রতি প্রস্ফা-
কটে বেরুচ্ছে। এই মূর্তির হৃদয় প্রতিষ্ঠিত
কোন শিল্পী কি তার ভাস্কর্যে ফুটিয়ে
চুলতে পারবে? এ সে যেভাবে মথাসী একটু
কটকট করে নিচের ভ্যালির দিকে নিরীক্ষণ
করছে। হৃদয়, এ ‘পশ্চাৎ’।

আচ্ছা একজন সৈনিকের পক্ষে কি তার
শরুকে বধ করা খুবই কঠিন কাজ। না হলে
কার্টার জুস-এর এই ভাবান্তর কেন। ওব
হাত কাঁপতে লাগল শেষে সমস্ত শবীরটা
সুন্দর শিউরে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গুকে
মুহুর্তের মধ্যে যেন পুণ্ডু করে দিল।
মাথাটা একদিকে কাঁপ করে ঘাসের ওপব
এলিয়ে দিয়ে সে, খরখর করে কাঁপতে
লাগল। কিন্তু একটু পরেই সে নিজেই একটু
সামলে নিল, পবিস্কার মাথায় চিন্তা করতে
চাইল—নিজের স্বপক্ষে যদি খুঁজতে লাগল
—ভাবল, এছাড়া আর উপায়ই বা কি। এ
শরুকে তাড়া করে ধরতেও পারবে না সে।

কারণ ও রয়েছে বহু দূরে ভ্যালির ও
প্রান্তেব চুড়োয়। কোনবকম সাড়া দিয়ে গুকে
সচেতনও করা যাবে না, তবেই তো ও
এদের গতিবিধি টের পেতে যাবে। না। সে
সৈনিক। আর সে কিছু নয়। কেউ নয়।
মুহুর্তের সময় না দিয়ে, ইক্ষুরের নাম নেবার
অবকাশ পর্যন্ত না দিয়ে শরুকে নিশ্চিহ্ন
করে দেওয়াই হল সৈনিকের ধর্ম। আবার
সে থিতুয়ে যায়। শিথিল হয়ে ভাবে—হয়ত
এ মূর্তি কিছুই দেখে নি, নিচের ভ্যালির
গোভাই দেখেছে—হবে। ও কি দেখেছে—তাই
পরখ করার জন্য সে নিজেই এবার নিচের
সিকে চাইল—দেখল ভ্যালির সেই গাঢ়
সবুজের-সমুদ্রে কয়েকটি কালো কালো
বিন্দু। আর একটু, মনোযোগ দিতেই চোখে
পড়ল সেই রুপোলী করণা, কিছু মনুষ্য আর
জানোয়ারের আকৃতির সচল গতিবিধি। এই
দিন দুপুরবেলা জম্বুদের জল খাওয়ার
হুকুম দিয়েছে কোন বোকা কমান্ডার কে
ছলেন!

নাম, আর কোন সংশয় নয়। এবার সে
যেন তার কানের খুব কাছে বাবার বলা শেষ
কথাটির প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।—যাই
কিছু ঘটুক, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক,
নিজের কর্তব্য থেকে কখন বিচ্যুত হবে না,
নিজের দায়িত্ব ভুল যাবে না। এবার সে
নিজেই নিজেকে হুকুম দিল—স্থির হও
কার্টার।—আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও,
—তার শরীর মন এখন শান্ত—নিশ্বাসও
স্বাভাবিক। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে রাইফেলের
নিশানা ঠিক করল—এবার তার লক্ষ্য যোড়-
সওয়ার নয়, যোড়টা। কেন। কি লাভ এতে!
সে তা ভাবে নি, শব্দ নিজেই চোখ ঠেরে
একটু এড়িয়ে যাওয়া। জুস অকম্পিত
হাতেই ট্রিগার টানল, গুলী বেরিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় একজন অফিসার তাব
লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে নিচেব এ
উপত্যকায় রাস্তা বেয়ে ওপরে আসছিল।
ওপরে চেরে সে বেরুছিল এ পাহাড়ের খাঁজ
থেকে বেরিয়ে আসা চুড়োটাও কত উঁচুত,
আব সে কত নিচে, এই দূরত্ব তার মাথা
ঘুরিয়ে দিল তবু সে ওপরে চেরে পাহাড়
আর আকাশের সীমানা মাপতে চাইল, দেখল
পাহাড়টাই অত উঁচুতে উঠে যেন ধোঁয়াটে
নীল হয়ে গেছে আর এ চুড়োটা যেন একটু
ফেটে সবে গেছে আর সেই ফাটলের মধ্যে
দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ নীল আকাশ। হঠাৎই
সে দেখল এক আদিত্যবর্ণ যোড়সওয়ার সেই
শূন্য নীলিমায় মধ্যে দিয়ে সী-সী করে নিচে
নেমে আসছে। কি জ্যোতিষী যোদ্ধা বংশ!
একহাতে সে যোড়ার বলা ধরেছে। মাথায়
কিন্তু তার কোন টাঁপি নেই কান পর্যন্ত
চুলগলো যোড়ার লেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
হাওয়ার উড়ছে। প্রথমটা সে নিজের চোখকেই
বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর একটা
অশ্রুত আভ্যন্তর তার পা কাঁপতে লাগল, পড়ে

গেল সে। সেই মুহুর্তে এ পাহাড়ের অতল
গহ্বরে পাইনেব রেখারও নিচে, যেন একটা
ভারী কিছু আছড়ে পড়ার গম্ভীর শব্দ সে
শুনল—কিন্তু এত নিচে শব্দটা হল যে আর
কোন প্রতিধ্বনি তার কানে এল না।

এবার সে কোন রকমে উঠে ছুটতে শুরু
করল। দৌড়তে দৌড়তে ভাবল,—না জানি কি
অমঙ্গল হবে। হায়! হায়! এ আমি কি
দেখলাম। কেন দেখলাম। এখন সে তার
নিজের দলের লোকদের কাছে পৌঁছতে
পারলে বাঁচে! আশ ঘটা দৌড়ে সে পৌঁছে
গেল—তারপর কমান্ডারের প্রশ্নের উত্তরে
হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—না স্যার, দেখে
এলাম, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে ভ্যালিতে
নামবার কোন পথ নেই। তিনি ওর চেয়ে
বেশিই জানেন—তাই শব্দ একটু হাসলেন।
সেও চুপ করে ভাবতে লাগল। বা দেখেছে
তা কিছুই প্রকাশ করল না, কেন না সে জানে,
এই অশ্রুত দৃশ্যের কথা সত্যি হলেও কেউ
কিভাবে কববে না।

কার্টার জুস তখনো সেইখানে শুরুরই
তার রাইফেলটি রিলোড করছিল। ষড়্
দেখল, মাত্র দশ মিনিট হল সে গুলী
ছুঁড়েছে। একজন সার্জেন্ট হাতে প্যারে ডর
দিয়ে বেষ্টে নিজের জায়গা ছেড়ে ওব দিকে
এগিয়ে এলো। জুস তার দিকে ফিরেও
তাকাল না। কথাও বলল না তার সংগে।

সেই সার্জেন্টই ফিসফিস করে ভিজেস
করল—ভূমি গুলী ছুঁড়েছিলে।

ও-ও তেমনি ফিসফিস কবেই উত্তর দিল
—হ্যাঁ।

—কাকে গুলী করলে।

—একটা যোড়কে। এ বে উল্টো দিকের
এ উঁচু চুড়োটা। দেখ! দেখতে পাছ? এখান
থেকে দু'ঘণ্টা অনেক। এখানে দাঁড়িয়েছিল।
দেখ। এখন আর নেই। এ চুড়োটা থেকে সে
সরে গেছে। খালি হয়ে গেছে ওখানটা।

কি ব্যাপার। জুস-এব মুখটা যেন
ফ্যাকাসে হবে গেল, না। অথচ তার কথার
অন্যে তো কোন দৃশ্যের প্রকাশ নেই। ওভাবে
অবে চুপ করেই বা গেল কেন? সেই
সার্জেন্ট কিছুই বুঝতে না পেরে এবার
হুকুমের সুরে বলল—দেখ জুস। এ মকম
হেঁয়ালী করার কোন মানে হয় না। আমি
তোমার অভাব করছি সাক্ষ্য জবাব দাও। এই
যোড়ার ওপর কোন মানুষ ছিল।

—হ্যাঁ ছিল।

—কে ছিল।

—আমার বাবা।

সার্জেন্টটি এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল
—যাবার সময় একটি বেদনাত দীর্ঘ
নিশ্বাসের সঙ্গে সেই চিরন্তন বাক্যটিই
উচ্চারণ করে গেল—অশ্রুতে বলল—হায়
ভগবান।

অনুবাদক : আতা পাকদারী



॥ বাইশ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবিলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল বিজ্ঞান। যে সব কড়া কড়া কথা তাঁকে শুনিয়ে দেবে বলে সে ভেবেছিল, তার কিছুই হল না। কিন্তু তার জন্যে খুব যে একটা ক্ষোভ মনের মধ্যে জমে উঠল বিজ্ঞানের তা-ও নয়। যতটুকু সে বলেছে, তাই যথেষ্ট। ভদ্রভাবে এর চেয়ে কী-ই বা সে বলতে পারত। আব কণার নাম যে সে করে নি, এক হিসাবে ভালোই হয়েছে। সুনীলের পরামর্শমত একটি মেয়েকে এর মধ্যে না জড়িয়ে ভালোই করেছে বিজ্ঞান। তাতে হয়তো শ্রীবিলাসের কোন ক্ষতিই সে করে উঠতে পারত না, কিন্তু বলা যায় না, এই মেয়েটির হয়তো ক্ষতি হত। কারণ শ্রীবিলাস এখন বিস্তাশালী মানুষ। আর যার বিস্তা আছে, এ সংসারে তাঁরই প্রতিপত্তি আছে। তাঁরই অন্যের উপকার কি অপকার করবার ক্ষমতা আছে। বাসে উঠে বিজ্ঞান ভাবতে ভাবতে চলল। শ্রীবিলাস যে প্রতিশ্রুতি তাকে দিয়েছেন, তা কি তিনি রাখবেন? সত্যিই বিজ্ঞানের জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্র করে দেখবেন? না-কি, এ-ও তাঁর একটা চাল। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বিদায় করা। তাই যদি হয়, তা হলে শ্রীবিলাসকে সহজে ছেড়ে দেবে না বিজ্ঞান। সবাইর কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে। কিন্তু কী করে করবে? শ্রীবিলাসের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গেলে বিজ্ঞান নিজেও কি জড়িয়ে পড়বে না? নিজেকে সে কি কলঙ্ক-কালিমা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে? সে শ্রীবিলাসের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে গেলে তিনিও কি বলবেন না? প্রচার করবার শক্তি বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রীবিলাসের কি অনেকগুণ বেশি নয়? লোকে কার কথা শুনবে? কার কথা

বোঁশ বিশ্বাস করবে? শ্রীবিলাস যে অসং তা প্রমাণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে খুবই কঠিন হবে, কিন্তু বিজ্ঞান যে সং নয়, তা সহজেই শ্রীবিলাস প্রমাণ করতে পারবেন। অসং বলেই তার চাকরি গেছে। কিন্তু শ্রীবিলাস নিজে থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে ব্যবসায় নেমেছেন। একবার তার দৃষ্টির বেলায় ভিন্ন ফল ফলেছে। যাদের শক্তি আছে, সমাজে বিস্ত-প্রতিপত্তি আছে, তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কিছুই করবার নেই।

হঠাৎ ভারি অসহায় বোধ করল বিজ্ঞান। তার সাহায্যের জন্যে কেউ নেই। শুধু মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া কেউ তাকে কিছু দেবে না। প্রতিদূল শক্তির হাতে পড়ে পড়ে তাকে শুধু মার খেতে হবে। এই কি তার অদৃষ্ট? শেষ পর্যন্ত সে কি অদৃষ্টবাদী হবে? দুর্বল ভীরু কাপুরুষের মত সে কি সব মেনে নেবে? অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সে কি একবারও হাত তুলবে না? কিন্তু একা সে কী করবে? মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া আর কী করবার শক্তি তার আছে? নিজের মনে ক্ষোভে বিষ্ময়ে জ্বলবে আর বড়জোর আত্মীয় বন্ধুদের কাছে ভাগ্যেব বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে। এর বাইরে তার যেন আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু কেন? কেন তার কিছু করবার থাকবে না? সহজ পথে যদি নাই কিছু হয়, বাঁকাপথে হাটতে কেন ভয় পাবে বিজ্ঞান? কিসের তার

এত সন্দেহ? এত লজ্জা? সিন্ধি— বৈজ্ঞানিক সিন্ধি যেখানে মানুষকে পরিমাণ করবার একমাত্র মাপকাঠি? যে পথেই হোক, যে কোন প্রকারেই হোক, বিজ্ঞান কেন সেই সিন্ধিলাভে সচেষ্ট হবে না?

কণা কি তাকে সাহায্য করবে? সুনীল যা বলেছিল, সে কি কণারও মনের কথা? একবার বাচাই করে নিলে হয়। যদি প্রয়োজন হয়, শ্রীবিলাসকে এক্সপোজ করবার ব্যাপারে কণা তাকে সাহায্য করবে কি না একবার শুনতে যেতে ক্ষতি কি।

বিভিন্ন স্ত্রীটির মোড়ে বিজ্ঞান নেমে পড়ল। তারপর পশ্চিম মুখে হাটতে লাগল। একজন সদ্য-পরিচিতা মেয়ের কাছে সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে, তার অশোভনতার কথা বিজ্ঞানের মনে হল না। কিন্তু হলেও মনের এক ধরণেব চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার কাছে তা চাপা পড়ল।

এমন অস্বাচিতভাবে আসা, দেখা-সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা—এর মধ্যে যে সব অসঙ্গতি আছে, তা বিজ্ঞানের অন্য বাসনার কাছে আমল পেল না।

নয়নচাঁদ লেনে ঢুকে নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান নিজেই অবাক হয়ে গেল। ছি ছি এ সে কী করছে? সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে সে একটি মেয়ের সঙ্গে কী উদ্দেশ্যে দেখা করতে এসেছে? মেয়েটি কী ভাববে? বিজ্ঞানের স্বভাব সম্পর্কে কী ধারণা হবে তার? খুব ভালো

ধারনা হওয়াই সম্ভব। নিজের মৃত্যুকে আর প্রশ্ন না দিয়ে এবার চলে যাওয়া। তা হলে কেউ আর কিছু জানতে পারবে না। বিজ্ঞান যে এসেছিল, তার কোন চিহ্ন না রেখেই সে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু বিজ্ঞান যা-ই ভাবুক, ওভাবে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে প্রবল ইচ্ছা তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে, সেই দুর্দম ইচ্ছা-শক্তি যেন তার গতিশক্তি বন্ধ করে দিয়ে তাকে অনড় করে ধরে রাখল।

বিজ্ঞানের পা নড়ল না, কিন্তু হাত নড়ল। একটি স্বল্পপরিচিত বাড়ির কথা তার হাতের ছোঁয়ায় নড়ে উঠল।

আর পলাবার পথ নেই। এবার যা ঘটবার ঘটুক। বিজ্ঞান যেন অভাবনীয় কোন ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পরমহুত্রে গৃহস্বামিনী এসে দোর ধুলে সামনে দাঁড়াল।

প্রথমে তার মুখে একটু যেন কিস্ময়ের আভাস দেখা গেল। শব্দ কিস্ময়? নাকি বিহ্বলতাও?

কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু হেসে অতিথিকে সাদরে আহ্বান করল, 'ও আপনি? আসুন। ভিতরে আসুন।'

বিজ্ঞান বলল, 'ভিতরে আসব?'

'বাঃ আসবেন না? আপনাকে কি ঘোরের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি?'

একটু চটুপতা আছে কণার গলায়। কিন্তু বিজ্ঞানের তা ভালোই লাগল। এই চটুপতার মধ্যে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের আভাস পেল বিজ্ঞান। সে যেন এই চেয়েছিল। নারীর এই প্রগলভতা আর প্রশ্ন। জীবনের বড় বড় সমস্যা আর সঙ্কট বিজ্ঞান এই মহুত্রে ভুলে থাকতে চায়। একটি অল্প পরিচিত বাড়িতে সে যে আহ্বান পেয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি যেন এই মহুত্রে তার কাছে আর নেই। ঘরে এসে বসল বিজ্ঞান। দোর ভেজিয়ে দিয়ে কণা এসে বসল তার সামনে।

আটপোরে বেশ। পরনে সাদা খোলার শাড়ি। দু হাতে দুটি চুড়ি ছাড়া গায়ে আর কোন গয়না নেই। তবু এই অসম্পূর্ণতা প্রায় নিরাভরণা মেয়েকেও বিজ্ঞানের দেখতে ভালো লাগল। সে লক্ষ্য করল, কণার চোখে-মুখে এক ধরণের প্রাণপ্রাচুর্যের ছাপ আছে। সেই প্রাচুর্য নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে দৃঢ়-দুর্বিপাকেও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি দেখে বিজ্ঞানের ভালো লাগল।

একটু চুপ করে থেকে বিজ্ঞান বলল, 'এই পথ দিয়ে ফিরছিলাম। ভাবলাম—'

কণা বলল, 'তা বন্ধুতে গেরেছি। আপনি যে সারাসরি আমাদের এখানেই আসবেন এমন আশা আর কী করে করি?'

বিজ্ঞান ভরসা পেয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি তো আমাকে আসতে বলেন নি।'

পরক্ষণেই বিজ্ঞান নিজের কথায় নিজেই লম্বিত হল। 'হি হি হি, এ কী কাঙালিনা তার? সামান্য পরিচয়ে এ কী আত্মনিবেদনের পালা সে শব্দ করে দিল! কিন্তু বিজ্ঞানের ভিতর থেকে একজন সামিথাকামী মানুষ যেন বেরিয়ে আসছে। তাকে আটকে রাখবার শক্তি যেন আর বিজ্ঞানের নেই।

কণা চোখ ভুলে তাকিয়ে একটু হাসল, 'আসতে না বললে কি আপনি আসতে পারতেন? সব সময় শুনিয়ে বলাটাই শীকার?'

বিজ্ঞান একটু অবাক হল। চমৎকৃতও হল। বিভিন্ন অ্যামোচার ক্লাবে অভিনয় করাই কণার জীবিকা। এখনো কি সে অভিনয় করছে? সামান্য পরিচয়ের এই অন্তরঙ্গতার অভিনয় ভাষায় ভাষিতে মাধুর্য ছাড়িয়ে দিয়ে আর একজনকে মুগ্ধ করে রাখা এও কি সেই অভিনয়েরই অঙ্গ? এ কি শব্দ কণারই বৈশিষ্ট্য, না কি নারী-মায়েই এই ক্ষমতা আর কৃতিত্বের অধিকারিণী?

বিজ্ঞান বলল, 'তা অবশ্য নয়। সর্বব আমন্ত্রণই একমাত্র আমন্ত্রণ, একথা কে বলবে? তা ছাড়া সেদিন আপনি আমাকে মুখেও আসতে বলেছিলেন। আমি সেই আমন্ত্রণকে শব্দ মৌখিক ভদ্রতা বলে ধরে নিই নি, আজ তারই প্রমাণ দিতে এসেছি।'

কণা একটু হেসে বলল, 'আপনি ভারি মজার মানুষ।'

বিজ্ঞান বলল, 'এর মধ্যে মজার কি দেখলেন?'

কণা বলল, 'বাঃ রে, মজা নেই? আপনি এসে অবাধি জবাবদিহি করছেন, কেন এলেন। কিন্তু আমি তো ওসব কথা শুনতে চাই নি। এসেছেন, বেশ করেছেন। মানুষের বাড়িতে মানুষ আসবে, তার আবার অত কৈফিয়ত কিসের? এসেছেন, বেশ, করেছেন। কেই বা আজকাল আর আমার খোঁজ-খবর নিতে আসে? আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই তো আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।'

'কেন বলুন তো?'

কণা বলল, 'সে অনেক কথা।'

ধরুন, আমি তাদের মনের মত হতে পারি নি বলে। তাদের পছন্দমত কাজ করতে পারি নি বলে।

বিজ্ঞান একটু চুপ করে রইল। তারপর কিসের একটা সন্স্কাচ কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বন্ধি শব্দ, সুনীলবাবু আসেন? শুনোছি তিনি আপনার দাদার বন্ধু ছিলেন।'

কণা বলল, 'সুনীলদা বলেছেন বন্ধি?'

বিজ্ঞান বলল, 'হ্যাঁ, বলেছেন। অনেক কথাই তিনি আমাকে ঝোঁকের মাধ্যমে বলে ফেলেছেন।'

কণা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানতাম তিনি বলবেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বলবেন, তা ভাবি নি।'

'আপনি কি রাগ করলেন?'

'না, রাগের কি আছে? তা ছাড়া আজ হোক, কাল হোক, আপনি তো শুনতেনই। হয়তো আমিই বলতাম আপনাকে।'

বিজ্ঞান বলল, 'শুনবার কথা তো শেষ হয় নি। আমি আপনার মুখে আপনার কথা আরও শুনতে চাই।'

কণা বিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে একটু থামল, 'আপনার কোঁতুহল তো দেখছি প্রায় ছেলোমানুষের মত। বসুন, আসছি।'

উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেল কণা।

তারপর খানিক বাদে দু কাপ চা নিয়ে ফের বিজ্ঞানের সামনে এসে বসল। হেসে বলল, 'আজ কিন্তু শব্দ চাই দিচ্ছি।'

বিজ্ঞান বলল, 'আবার কি? বেশি আপ্যায়নের ঘটা দেখলে আমি ভারি অস্বস্তিবোধ করি।'

কণা বলল, 'আপনাকে আপ্যায়ন করব এমন কি সাধ্য আছে আমার।'

একথা-ওকথা চলতে লাগল। বিজ্ঞান ভাবল এক ফাঁকে শ্রীবিলাসের কথাটা তোলে। কিন্তু কিছুতেই তুলতে পারল না। শ্রীবিলাসের সামনে যেমন কণার নাম সে করতে পারে নি, তেমনি কণার কাছেও তার অতীত জীবনের প্রসঙ্গ টেনে আনতে বিজ্ঞানের সন্স্কাচ হল।

আধঘণ্টাখানেক বাদে সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

কাজের কিছুই অবশ্য হল না।

কিন্তু বিজ্ঞানের মনে হল না তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে। বিদায় দেওয়ার আগে কণা স্মিতমুখে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আবার আসবেন।'

(ক্রমশঃ)

সভা বন্ধের প্রতিবাদ সভা

গণতন্ত্রে গণশোভা ও গণমিছিল বরদাশ্ত করা হবে না। গণদাবির এই সহজ পথটি বড়ই বে-আক্কেল। কথা নেই, বাতী নেই, হট বলেই সভা করা, আর শোভাযাত্রা বার করা (আহা, কী শোভারে! ছেঁড়া জামা ময়লা কাপড় হাড় জিরজিরে চেহারার আবার শোভা!) অশ্লীল! ও-সমস্ত চলবে না।

বিচক্ষণ সরকার-বাহাদুর বাহাদুর বটে। এমন একটা প্রস্তাব জনগণের মুখ চেয়েই এবার বিলের আকারে এনে ফেলছেন। আব-হাওয়ার হিমেল শীত শরীরে শ্বেদশোত বহিয়ে গরম হয়ে না উঠলে ভোটের জোরে তা পাশও হয়ে যাবে, তাই বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন সম্প্রতি মুক জনগণ। ঝাক, ওসব ট্যা-কোঁ দুদিনে ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে না অবশ্য। ডি আই ক্লনের যা-কয়েক গুঁড়ো পেটে কোমর গড়লেই, সব বাহাদুর ঝড়ঝড় করে সরে গড়বেন। কঁাকা রাস্তা চিং হয়ে পড়ে থাকবে।

এমন এক চোস্ত রাজধানীর পথ ভুড়ে সভা শোভাযাত্রার 'অবসিনিটি' সতিই 'অবনকাস!' ধন্যবাদ সরকার-বাহাদুরকে, তাঁরা যে সুবিবেচকের মত—'একবারে না পারিলে দেখো গতবার'-এর পন্থা অনুসরণ করেছেন, ধন্যবাদ সেজন্যই। (ইতিপূর্বে অনুরূপ চেষ্টা ফলবতী হয় নি)।

ইংরেজ আমলে এক ডাকসাইটে রাজপুরুষ মোটার প্রেসের কন্ঠরোধের আরোহণ করে-ছিলেন। সে এক মহাকাণ্ডই হয়েছিল সেদিন। (আমরা তখনও জনগণের বর্ষা পাই নি। পরাধীন জনতা ছিলাম স্বাভাবিক)।

তবু সেদিন ইংরেজের কালা কানুন নিয়ে হে-টে কম হয় নি।

রাজপুরুষের নাম লর্ড লিটন। সমালোচনা দেখলেই তুলেবেঙনে জলে উঠতেন, বিশেষ করে তা যদি আবার নোংরা 'নোট' হরফে লিখিত হত।

এই সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এক ঐতিহাসিক কাণ্ড করে বসলেন। রাতারাতি ছেপে ফেললেন বাংলা অমৃতবাজার ইংরেজি হরফে। দেশে শুধু অবাঁক, লাল চামড়া রাজা-মাজড়ার দল হতবাক। মাই হোক, কালা কানুন দূর! ইংরেজদের মধ্যেও কিন্তু ন্যায়বাদী শক্তিদেরও কদাচ অভাব হয় না। গারগপারে নি: গুয়াডেস্টোন এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুলেছিলেন। উদাত্তকণ্ঠে ইংলন্ড-শরীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন এই মর্মে যে, সমালোচনা সব সময়ই আশ্রয়যোগ্য। মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার মধ্যে শক্তির দস্ত যতই থাক, জনগণমন অধিনায়কের বর্ষা তাতে কণামাত্র বৃদ্ধি পায় না। বলা বাহুল্য, নি: গুয়াডেস্টোনের হাতে ক্ষমতা আসার পরই ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের কালাকানুন রদ করা হয়ে-



কলকাতায় মহাক্ষমত-ই কানুনের প্রত্যাশিত

ছিল ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে। আর এতদুপলক্ষে নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন বলে-ছিলেন—

“...all measures of the Government of every description should be freely and fully discussed by the public in the press. The Government derives very great advantage from that discussion; any error that may creep into its proposals are pointed out; suggestions often very valuable, are made, and the Government has an opportunity of learning in what respect the public misinterprets or misapprehends the intentions by which it is animated, so that by timely explanation the real meaning of these intentions may be made plain.”

ভাবার্থ: মানুষের মুখ বন্ধ করে নয়, তাদের মুখে অবাধ ভাষার অধিকার দিলে অনেক মূল্য-বান মন্তব্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার লাভবানই হতে পারেন। সাধারণের সমালোচনায় সরকার জানতে পারেন ঠিক কোন সরকারী নীতির বাপাখ্য সাধারণের বোধগম্য হয় নি এবং কোন পন্থায় তাদের কাছে সে নীতি ব্যাখ্যা করতে হবে।

মুখের বিষয়: সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সর-

কারের রাজপ্রতিনিধি আজ থেকে বহু বছর আগে যে সভা, যে যুক্তিতে অন্যায়সে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিলেন—আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের হস্ত বা সেটুকু বিশ্বাসেও শৈথিল্য জন্মেছে। শোভাযাত্রা অথবা সভা সম্মেলনের উদ্দেশ্যই হল একাবদ্ধভাবে ক্ষমতা-মীন সরকারের দৃষ্টিতে বিবেচনার জন্য সাধারণের দাবি উপস্থাপিত করা। পত্র-পত্রিকা তো আছেই। সেখানে বহু বক্তব্যের সারাংশ মাত্র প্রকাশিত হয়। জনগণের বক্তব্য একটা গোটা শরীর সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে যেমনভাবে রূপ গ্রহণ করতে পারে, কোনো সংবাদপত্র তেমন করে কিং জনতার বক্তব্যকে তুলে ধরতে পারে না। বিশেষত বহু বিচিত্র দাবি-নাওয়া, অভাব-অতিযোগ পেশ করার উপায় এই সভা ও শোভাযাত্রা: ধবর-কাগজ নয়। আজ দেশবাসী সভাশোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব সম্পর্কে জনবিক্ষোভের পরি-প্রেক্ষিতেই সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূরণ হচ্ছে। সংবাদপত্র গণবাজার পুনর্নির্মাণ করে স্বাভাবিক, কিন্তু জনগণের বক্তব্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে সভা-সমিতির মাধ্যমেই। সেই জনগণের মুখে তালচাচি ঝুলিয়ে দিলে, কিম্বা সে মুখের বাণী নিয়ন্ত্রণের ঝেঁড়ার আড়ালে থাকলে একমাত্র সংবাদপত্রের উপস্থিতি অথবা অবাধ মুক্তিও গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে সক্ষম নয়। জনগণের বক্তব্য ছাড়ার করার দুটি পন্থাই যদি আজ নয়া সরকারী প্রস্তাবে বাতিল হয়ে যায়, তবে গণতান্ত্রিক সরকার নিজেই জন-গণের পারিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তখন সে-সরকার একরূপ অন্ধ।

সভা ও পৌতখ্যাতা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আজ দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে, সরকার সে বিষয়ে সম্যক অবহিত হয়েই ইতিকর্তব্য স্থির করবেন বলে সাধারণ মানুষ একান্ত বিশ্বাস রাখেন। গণ-বক্তব্যের অবদান সরকারী অনুষ্ঠিত কোন কার্যসিদ্ধি করবে কামরা জানি না; কিন্তু জন-গণের কঠোরবেধে যে দেশব্যাপী ঘূমারিত বহির স্রষ্টা হবে জাতীয় কল্যাণকামী শুভবুদ্ধি তা পরিহার করতেই পরামর্শ দেবেন। একদিন মুক মুখে ভাষা দেওয়ার জন্য যে দল সংগ্রাম করেছেন আজ তাঁরাই হাত বাড়িয়ে জনগণের ভাষা কাড়তে চাইলে বিষয়ে বাক্যরোধ হয়। এই চরম আসন্ন দুর্ভাগ্যের বেদনা তুলে ধরার মতো ভাষাও কালি-কলম বোগান দেয় না।

যে ক্রাশা সামনে দেখে যেমন ধমকে ঝাঁড়াতে হয়, পরপার দুর্লভ্য; সরকারী প্রতাপ সামনে নিয়ে তেমনি জামার গণচেতনাসম্পন্ন মানুষের আভেল ওড়ুর হয়ে গেছে। গণ-তন্ত্রের স্বজাধারী সরকারের একত বনোভাষ মতাই অপ্রত্যাশিত ছিল।

এখনও অবিশ্বাসই একমাত্র সান্ত্বনা। ঐগব মুক মুখের ভাষা, ঐগব ছিন্নকরা পরিহিত, সমস্যা-প্রস্তুত মানুষের মিছিল দেখে গণতান্ত্রিক সরকারের স্বাদের ঘুম কেন যে অবলুপ্ত হবে এ প্রশ্নের জবাবও নেবে না।

মি: গুয়াডেলোপ অকুতোভরে পরাবীন ভারতের ভাষানুষ্ঠির জন্য দরবার করতে পেরেছিলেন; লর্ড রিপন বিদেশী শাসকের প্রতিনিধি হয়েও বনিষ্টতার সঙ্গে নিশ্চেষিত জনতার বক্তব্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের হজির পরওয়ানা একটি পরাবীন জাতির হাতে তুলে দিতে তিলমাত্র বিধাগ্রস্ত হন নি; তবে আমাধের জাতীয় সরকার, জনগণের দ্বারা নির্ধাচিত সরকার—কোন লজ্জার গণ-দাবির তরে গণবার্তা ও গণ-বিচ্ছিন্নের মুত্যা-চিত্তায় অকস্মাৎ বিনিহ্ন হবেন। প্রকৃত গণ-প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন, সে সরকারের মনে মিটিং মিছিল দমনের কুচিন্তা জাগরুক হবে কেন।

আমরা বরং এ প্রত্যাবকে সাময়িক চিন্তার অস্থায়ী ফসল বলেই ধরে নিয়ে আশ্বস্ত হতে চাই।

মুহাম্মদীয় প্রত্যাবর্তন

মুহাম্মদী শীপ্রকুরচয় সেন সম্প্রাপ্ত নয়া-দিবী বৈঠক করে ফিরে এলেন প্রায় শূন্য হাতেই।

গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্য চালের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ টন। কিন্তু আগামী বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুহাম্মদীকে

১৯৬৬-৬৭র যে কোটা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন তা যথার্থ উত্তরণজনক। পশ্চিমবঙ্গ আগামী সনের জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে এক লক্ষ টনের বেশি পাবে না। কারণ একে তো দেশে খাদ্য-সঙ্কট, তদুপরি বিদেশী সাহায্যের মতিগতিও অনিশ্চিত। সুতরাং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীই বা করবেন কি।

ঘাটতির কারণ ও তত্ত্বনিত এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তির ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরু জেনে এখন কোমর বেঁধে প্রস্তুতির মহড়া শুরু করবে ঠিকই। কিন্তু তত্ৰাচ একটি প্রশ্ন থেকেই গেল: সেই কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পটাই চালানোর প্রশ্নটি।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সঙ্কটের সুবোধ নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গকে যে সড়ে ডের হাজার মণ পটা চাল বাস দুই আগে গহানো হয়েছে বলে অভিযোগ, সে বিষয়ে আপো কোনো বাত্চিত হয়েছে বলে ছিটে-কোটা সংবাদও নজরে আসছে না। ঐ পটাই-সাক্ষি-এর অভিযোগ যদি তিতিহীন না হয়, তবে আগামী কেন্দ্রীয় লটে পটাই চালের বদলে অতিরিক্ত দু লক্ষ আশি হাজার টাকার চালও কি (পটা চালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের দেয়) প্রদান করা উচিত নয়? পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-ভাণ্ডার কি এতাই উদার যে, চোখ বুজে দু লাখ আশি হাজার টাকার পত-খাদ্য ক্রয় করবে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় শুভামের দুর্ভাগ্য সাক্ষরু জন্য।

মুহাম্মদ-ই-কাম্বীর

কাম্বীরের মুহাম্মদী শ্রী জি এম সাদিক সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গেলেন। জাতীয়-ভাবানী এই কাম্বীরী নেতাকে নিখিল জরত মৌলানা আজাদ সোমাল ওয়েলকেয়ার মিশন কাম্বীরের লৌহমানব বা মুহাম্মদ-ই-কাম্বীর আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমান তাই-বোনেদের কাছে মুহাম্মদ-ই-কাম্বীর আজ এতৌদুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র যে মুসলিম সম্প্রদায় তাঁকেই একটি গুরু কর্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণে আবেদন জানিয়েছেন। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কাম্বীর সম্পর্কে কোনোরূপ আপোষমূলক কথাবার্তা পাকিস্তানের সঙ্গে যাতে না চালান হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীশ্রীকে অনুরোধ জানানর দায়িত্ব কাম্বীরের লৌহমানবের ওপরেই অর্পণ করতে চেয়েছেন তাঁরা। বলা বাহুল্য, শ্রীসাদিক কাম্বীরী জনগণের মর্মকথা ইতিমধ্যেই সর্বত্র প্রকাশ করেছেন।

মুহাম্মদ-ই-কাম্বীরী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কাম্বীরী জনগণ ১৯৪৭ সালের যুদ্ধ-বিরতির রেখা মানেন না। তাঁরা চান পাক্যপোজ একটি আন্তর্জাতিক সীমানা।

কেন না পাক কুচক্রান্তে কাম্বীরীগণ আজ আর কোন যুদ্ধ-বিরতি রেখায় আস্থা স্থাপন করতে ভরসা পান না। পাকিস্তান একাধিকবার ঐ রেখা লঙ্ঘন করেছে ও ঐ রেখার কোনো ইজ্জতই দিতে চায় নি। ভারতের সঙ্গে একটি অস্থায়ী বৈরী মনোভাব পোষণই তাদের সরকারী নীতি। সুতরাং স্বভাবতই কাম্বীরী শান্তিপ্রিয় জনগণ এই পাক চালাকির দ্বারা বারবার জেনে-বুঝে বোকা সেজে থাকতে এখন স্পষ্টতই গররাজী।

শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ-ই-কাম্বীরী একথাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তথাকথিত আজাদ কাম্বীরের যে অঞ্চল বর্তমানে ভারতের অঙ্গ, সে অঞ্চলও কাম্বীরী জনগণ ছেড়ে দিতে নারাজ।

কাম্বীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান যে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে কাম্বীরে মুসলিম প্রাধান্যের মুক্তিবে কাম্বীর দাবি করছে তাও যে কতদূর অসার শ্রীসাদিক তাঁর মুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন। পাকিস্তানের ধর্মের বয়ান নিত্যন্তই স্বাধীনসিদ্ধির কটু-কৌশল মাত্র। মুসলিম স্বাভাবিক শ্রোগান যে পাকিস্তানের মুখে একেবারেই বেমানান—বালু-চিত্তানে পাকিস্তান কর্তৃক বোমাবর্ষণ ভারী অন্যতম প্রমাণ। কাম্বীরেও নামাজ পাঠরত মুসলিমদের ওপর অতর্কিত বিমান আক্রমণ এবং মসজিদ ধ্বংস কোন দেশী ধর্মপ্রাণতা, এ প্রশ্ন তুললে পাকিস্তান কি জবাব দিতে পারে? জাহাড়া শুধুমাত্র ধর্মের বুলি আউড়ে আজকে বৈজ্ঞানিক যুগে যে রাজত্ব করা অসম্ভব, একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা যে সে সত্য হনয়করে পরাভূষ। সে জন্য শ্রীসাদিকের বক্তব্যে একথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ধর্মের জিগির তুলে কাম্বীরী মুসলমানদের মনে কোনো কটিল স্রষ্টার চেটায় সঙ্কল হবে না পাকিস্তান।

কাম্বীরী মুসলিম সম্প্রদায়েরই একজন পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংবাদ সর্বপ্রথম পুনির্দেশ নজরে এনেছিলেন। আশুদী গণ-তন্ত্রে দশ কোটি লোকের মধ্যে ভোটদাতার অধিকারী মাত্র আশি হাজার। তাই আশি হাজারী গণতন্ত্রের বুলি কাম্বীরকে প্রভাবিত করবে এমন দুরাশা পাক-পক্ষে উন্মাদ কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পবিত্র হজরতবালকে মূলধন করে পাক নষ্টানির জবাবও কাম্বীরীরাই দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে।

এই বাংলা

যে কিছু সময়ের ব্যবধানে বাংলা ও বাঙালীর সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সমরণ করলে পশ্চিমবঙ্গে সফররত একজন অবাঙালী ভারতীয় নেতা। তিনিই মুহাম্মদ-ই-কাম্বীর, কাম্বীর-লৌহমানব মুহাম্মদী শ্রীসাদিক।

সাম্প্রতিক বঙ্গবাসী

তিনি বলেছেন, বাংলা দেশ তার কাছে আদর্শরূপ। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বাংলায় মাটিতেই সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালী শহীদের আরক্ত কান্নাই আজ তুলে নিতে হবে ভারতবাসীকে। সাম্প্রতিক সংগ্রামে বিজয়ী বাঙালী জগৎমানুষের প্রতিও তিনি আত্মবিশ্বস্ততা জানান।

বহুকাল পবেই বটে। অবহেলিত বঙ্গদেশের দিকে তাকালে আজ মনে হয়, ষড়-ছিন্ন বিকল্প বাংলা যেন উচ্ছিন্নের মতো একান্তে নিষ্কিন্দ। তার ঐক্য আজ এক কিসদস্তী মাত্র। হযত অনেকে ভুলেছেন, অনেকে ভুলবার চেষ্টা করছেন, সর্বস্বত্ব স্বাধীনতার জন্য অকাতরে কুছ-লাগনের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস বুঝে ফেলার নয়। আব সীমাদিকের সত্তা অনেকেই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও যাবেন।

তবু বাংলার ভাগ্যে পচাই ছাড়া অন্য কিছু নিলবে না। কেন না আত্মরক্ষার গর্বেই বাংলার মাটি চির হরিৎ।

স্বাধীনতা :

চাউল উৎপাদন

“আমরা শব্দ পাইলাম যে বঙ্গবাসীক পূর্বে (২ই সেপ্টেম্বর—১৯৬৪) শিলিগুড়ির সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে কুচবিহারের সরকারী স্টোরিং এবং ক্যারিং কন্ট্রোল্লার মের্স পি কে স্ত্রহনিয়োগী এক ট্রাক ভর্তি ১৮০ ব্যাগ আমেরিকান চাউল (৮০৮৪ কুইণ্টাল) ডেলিভারি নিয়াছেন। নির্ভরযোগ্য গুরু হইতে জানিতে পারা গেল যে, এই বিপুল পরিমাণ চাউল কুচবিহার পৌছায় নাই। কোথায় উঠাও হইয়াছে তাহা হৃদয় কেহই দিতে পারে না। এই চাউল উক্ত স্টোরিং এজেন্টের হিসাবে জমা হয় নাই। ওই সময়ে কুচবিহারে চাউলের মূল্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মধ্য সর্বাধিক। ১-৭৫ পয়সা কে-জি। আমরা প্রশ্ন করিতেছি এই হাওয়াবানীতে উক্ত ক্যারিং কন্ট্রোল্লারের ভূমিকা কি?”

উপরোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন শিলিগুড়ির স্থানীয় সাম্প্রতিক “সৈনিক”।

গদ্য-চরিত্রের সংবাদ আরও কিছু কিছু পোনা গেছে বটে, তবে উপরোক্ত সংবাদে সরকারের প্রতি ‘কঁচকলা’ প্রদর্শনের এ এক কন্ট্রোল্লারী ষাণ্ডুবিদ্যার নয়া নজীব পাণ্ডবা গেল।

প্রকাশ, এতৎ সত্ত্বেও নাকি উক্ত সংস্থা স্বাধীনতা কাছ চালাবে যাচ্ছেন। কেনন করে স্টোই বা সত্ত্ব এ প্রশ্নও সাধারণ মনে আলোড়ন তুলেছে।

ধর্মের মূল্যের কথা জানি, ঠগের মূল্যের

কাহিনী জানছি, ঠগ বাছাইয়ের বাহিনী কবে সত্যিকার ঠগ বেছে গাঁ উজাড় করবেন একমাত্র সে কাহিনী শোনার জন্য অস্বাভাবিক কানেক পড়া সম্বন্ধে টিকিয়ে রাখা।

‘দেবা ন জানন্তি’, সে গল্প কি আসে শোনা হবে?

কুচবিহার :

নয়া ষাণ্ডুবিদ্যার প্রতিজ্ঞা :

কুচবিহার জেলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়া ষাণ্ডুবিদ্যার চাপে বিভিন্ন দিক থেকে যে নিচিহ্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাই একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি। আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি প্রেরিত সেই বক্তব্যকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্ঘব দৃষ্টিব সম্মুখে উপস্থাপিত করে কুচবিহারের স্থানিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য আবেদন জানাই :

“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপেক্ষিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নগরায়ন ছোট কুচবিহার জেলাটির প্রতিটি মানুষের মনে সরকারের নতুন ষাণ্ডুবিদ্যার নিম্নে নানান সন্দেহ এবং ভীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ হতে উঠেছে। এম পরিণতি কি দাঁড়াবে জানি না। তবে কুচবিহার বর্তমান পাক ও চীন হানলার মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

পাকিস্তান অর্থসচিবের একে দিবে রয়েছে, দিবে রয়েছে প্রতিবেশীর রাজ্য—আসাম, মিকিন, ভূটান। সেই কারণেই এখানকার মানুষ মনে করে ষাণ্ডু-সমস্যা এখানে তীব্র হলে বৃহত্তর ষাণ্ডুবিদ্যার ক্ষেত্রে এর বিকল্প প্রতিজ্ঞা দেখা দেবে। সরকার এ সম্পর্কে কতটা সচেতন তা আমাদের জানা নেই।

বর্তমান ষাণ্ডুবিদ্যার প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জানতে হলে কুচবিহারের আগের ইতিহাস কিছু জানা প্রকার—তা না জানলে বর্তমান অবস্থাকে বোঝা যাবে না।

দেশ বিভাগের পূর্বে কুচবিহার রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল—কারণ সেই সময় আবাবী জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা ছিল কম। ১৯৫০ সাল থেকে এ রাজ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে অবিরাম উল্লাস এসেছে—যার বলে লোকসংখ্যা জম্মন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ। ১৯৬১ সালে লোক গণনায় ৬ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লক্ষ। ইতিমধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ লক্ষের ওপর।

কুচবিহার জেলায় পাঁচটি মহকুমা। এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল তামাক ও পাট। দিনহাটা ও মাথাভাড়া মহকুমায় ব্যাপকভাবে তামাক চাষ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই জেলা থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা Excise duty

পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদনে কুচবিহার জেলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও (২) তামাক ও পাটের উৎপাদনের জন্য ধানের অাবাদ স্বাভাবিক ভাবেই এখানে কম। সেই জন্যে ১৯৫১ সাল থেকে এই জেলাকে খাটতি জেলা হিসাবে ধরা হয়। এখানে উল্লেখ্য থাকতে পারে যে, ১৯৫১ সালে এই জেলায় খাদ্য খাটতি এবং ‘প্রকিয়রনেটর’ দক্ষণ এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় মানুষ সেদিন প্যাপন হয়ে ভুটে এসেছিল সাধারণ দীর্ঘির পাবে ভেপুটি কবিশনারের কাছে। সরকার সেদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারেন নি বরং নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য গুলী চালিয়ে নিশাপ ৫টি প্রাপকে হত্যা করেছিলেন। সেই ২১শে এপ্রিলের কথা এখানকার মানুষ কোনদিনও ভুলতে পারবে না। তাই ধান নিয়ে সমস্যা দেখা দিলেই এই জেলার মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

কুচবিহার জেলায় গত ৩ বছরের চাল ও গমের উৎপাদন ছিল :

১৯৬৩ সাল

চাল — ১৭৯’২ হাজার মেট্রিক টন,

গম — ২’১ হাজার মেট্রিক টন।

১৯৬৪ সাল :

চাল — ২৪১’৯ হাজার মেট্রিক টন,

গম — ০’৯ হাজার মেট্রিক টন।

১৯৬৫ সাল :

চাল — ২১৩’ হাজার মেট্রিক টন,

গম — ১’০ হাজার

এ বছর পঃ বঙ্গ সরকার কুচবিহার জেলা থেকে ৬০ হাজার টন চাল বা ৯০ হাজার টন ধান লেভি করে সংগ্রহ করবেন বলে ঠিক করেছেন।

গত বছর ফলন ভাল হওয়া সত্ত্বেও এই জেলায় চালের উৎপাদন ছিল মাত্র ২ শত মেট্রিক টন। এ বৎসর ফলন অনেক কম হওয়ার বলে সেখানে উৎপাদন ১৮০ হাজার টনের বেশি হবে না বলে মনে হচ্ছে। সেখানে কিভাবে ৯০ হাজার টন ধান লেভি করে আদায় হতে পারে তা বোঝা মুশ্কিল। বার জন্ম অনেকেই আশঙ্কা করছেন সরকারের এই ৯০ হাজার টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য গরীব চাষীদের ওপর অযথা জুলুম ওস্তাদ হবে।

এই জেলাতে ধান জমিতে যেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ফলে প্রতি বিঘাতে ৪ নগের বেশি ধান হয় না।

এখানকার কৃষকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

ক। যারা নিজের জমিতে নিজে চাষ করে

এ লোক দিখে চাষ করে ভাবা জমির সব ফসলটা নিজে পায়।

খ। যাবা ভাগে চাষ করে কিন্তু ভাগী-দারকে চাষের জন্য বন্দ ও বীজ দেয়—তার ফসলের ৫০% (অর্ধেক) পায়।

গ। যাবা ভাগে চাষ করে কিন্তু ভাগী-দারকে চাষের জন্য কোন খরচ দেয় না—তার ফসলের ৪০% ভাগ পায়।

এই জেলায় শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে ভাগে চাষ হলেও এইসব ভাগচাষীরা কাগজে-কলমে স্বীকৃত ভাগচাষী নয়। যার ফলে লেভি আদায়ের সময় দেখা দেবে এক চরম বিশৃঙ্খলা।

এর ওপর দেখা যায় পব পব এটি পবি-কল্পনায় সরকার অনগ্রসর কুচবিহার জেলা সম্পর্কে কোন গুরুত্বই দেন নি। আজ পর্যন্ত সেচ বা শিল্পের জন্য সরকার কোন পবি-কল্পনা গ্রহণ করেন নি।

সেচের জন্য মাত্র দুটি গভীর নলকূপ খন্যো হয়েছে তাও আবার বিদ্যুৎ অভাবে চাল হয় নি। তৃতীয় পবিকল্পনার শেষে আরও পঞ্চাশটি গভীর নলকূপ বসাবার কথা ছিল—কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। বর্তমান জরুরী পবিস্থিতিতে চাকচোস পিটিয়ে সমস্ত দেশব্যাপী ‘অধিক ফসল ফলাও-এবং যে অভিযান শুরু হয়েছে, কুচবিহার জেলা কিন্তু সেই অভিযানে, যে তিসিরে সেই তিসিরেই রয়েছে। কৃষির উ্যাভি জন্য সরকার আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেন নি। বন্যা, শিলাবৃষ্টি, ও পোকাকার প্রতি বৎসর এই জেলার প্রচুর ফসল, নষ্ট হয় এবং ধান্য ঘাটতির এও একটা কারণ, কিন্তু শত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও সরকার এ ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেন নি—বিশেষ করে বন্যায় প্রতি বৎসর এখানে ফসলের দারুণ ক্ষতি হয়।

প্রতি বৎসর এই জেলায় বাইবে থেকে চাল পাঠাতে হয় এবং সেই চাল দিয়ে M. R.-এ চাল সরবরাহ করা হয়।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দেখানো ৭০০ হাইস মিল আছে—সেখানে কুচবিহারে মাত্র ৭টি হাইস মিল আছে। Paddy Hasking Machine-এর সংখ্যা নগণ্য। সাধারণত মেঘেরা ঢেকে পান ভেদে চাল ভেঁজি করে।

এ বৎসর ১-১-৬৫ থেকে ৩১-১০-৬৬ পর্যন্ত M. R.-এ কুচবিহার জেলাতে চাল (Fig. in M. Ton) ১২’২৬৩ এবং পরে আরও ৪০০ শত মেট্রিক টন চাল পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়া থেকে পাঠান হয়। বাঁকুড়া থেকে আরও প্রায় ৬০০০ হাজার কুইন্টাল চাল আমদানী হয় এবং তা ‘ফেয়ার প্রাইস’ দোকানের মারফৎ বিলি করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে; প্রতি বৎসর বাইবে থেকে হাজার হাজার মণ চাল আমদানী

হলে এ জেলায় মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে। এই অবস্থায় সরকারের নতুন ধান্য-নীতি এখানে কতটা সফল হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাকে থেকে এর চাপ গিয়ে পড়বে গরীব ভাগচাষীদের ওপর, ফলে আগামী বছরে হবতো আর সে ভাগে চাষ করার জমি নাও পেতে পারে। সত্যিকার চাষী যে, তাকে জমির ওপর কোন খরচ না দিয়ে ‘নিবিড় চাষ’ বা ‘অধিক ফসল ফলাও’ প্রতিষ্ঠা কোন পদ্ধতি কার্যকরী না হয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই জেলার ভাগচাষীদের সংখ্যা বেশি হওয়াব ফলে ঐ সমস্যা আবও ব্যাপক আকারে দেখা দিচ্ছে।

তাই সরকারের নতুন ধান্যনীতি থেকে উদ্ধৃত পরিস্থিতি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার মত।

চাষের পরগনা :

অধিক ফসল প্রসঙ্গে

কলাতলা হাট, ঝাণ্ডালিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশশীশের রাথ তাঁর নিম্নো-ক্ত পত্রে জোতদার বর্গাদার ও জমি-মালিকদের সম্পর্কে কিছু তথ্যপূর্ণ মন্তব্য আনাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। শ্রীশশীশের মতামত বহুদর্শনের দ্বারা উপযুক্ত মনে হলে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদ্ধৃত হল। বলা বাহুল্য শ্রীশর তাঁর মতামত বৈধ; এবং বিষয়ে বর্তমান লেখক কোনো-রূপ মন্তব্যে বিভব হইলেন। এ বিষয়ে অভিন্ন মতের পত্রাদি কৃষি-সমস্যা বিষয়ক প্রশ্নকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কখন ও নতুন আলোকপাত করন। এটুকুই কান্য :

‘সম্প্রতি সরকার হঠাৎ একটা সেরালের বশে বর্গাদারদের জমির মালিকানা দিবার পবিকল্পনা কবিতেন। কিন্তু এভাবে আগাগোড়া অনুমান, ভুল পরিসংখ্যান এবং বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে দেশের একটা বিরাট সম্প্রদায়কে অর্থোক্তিকভাবে গিচ্ছিত করা কি ঠিক হইবে? বহু বিবদা, স্ত্রীলোক, অসহায় বা বৃদ্ধ কৃষিকর্মী সন্ততির অভাবে এবং অন্যান্য কারণে গাখান্য ভূমিও চাষীদের দ্বারা চাষ করা হয় অতিক্রমে দিনাতিপাত করেন। কিন্তু বিগত রিভিউয়াল নেটেলেমেন্টের সময় দুর্নীতি-পব্যায় কর্মচারীদের দ্বারা বহুক্ষেত্রে অসং-উপায়ে বর্গা রেকর্ড করানো হইয়াছে। অনেক বর্গাদার যথেষ্ট নিজের ভূমির মালিক হইয়াও দূর গ্রামবাগী মালিকের জমি নিজের নামে বর্গা রেকর্ড করাইয়াছেন।’ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেকর্ডকৃত ভূমি নিজে চাষ না করিয়া ভাড়াটে শ্রমিক বা অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারা চাষ করাইয়া মাঝখান হইতে কিছু সুনাফা পান। এক্ষেত্রে যে সত্যিকার চাষী

জাহারও যেমন জমিতে কোন অধিকার নাই, সেইরূপ যে দুষ্ট মালিক স্বহস্তে চাষ করিতে

চান, বর্গা রেকর্ডের দোষাচো তিসিও বিড়িহিত হন। নিজেব হাতে চাষ না করিলে যাহাঁদের কিছুতেই চলে না এমন হাজার হাজার ৫১৭ একর জমির গরীব মালিক অন্যায়কৃত বর্গা রেকর্ডের জন্য নিজহাতে চাষ করার অযোগ্য পাইতেছেন না। সরকারী পবিকল্পনা এই শ্রেণীর মানুষও জোতদার আখ্যায় নিশ্চেষ্ট। অন্যক্ষেত্রে বহু বিভাগীয় অর্থবান ব্যক্তি অসাধু উপায়ে বহু মালিকের প্রচুর জমি নিজের নামে বা আত্মীয়-স্বজনদের নামে বর্গা রেকর্ড কবাইয়া কৃষকের ছদ্মনামে আত্মপোষন করিতেছেন। সাধা জীবনের সন্তানের বিনিময়ে যাহারা ২১০ একর জমি ক্রয় করিয়া কৃষির উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিলেন—প্রমাদপূর্ণ সেটেলমেন্ট নথিবি বিষে তাঁহারা আজ জর্জবিত।

সুতরাং রেকর্ড দেখিয়া বর্গাদার পোষণ যা জোতদার নিধন কোনটাই উচিত হইবে না। যাহা বা গড় ফলনের অধিক শস্য ফলাইতে এবং সেই অনুপাতে লেভি দিবার প্রতিশ্রুতি দিবেন; এমন সমস্ত মালিককে নির্ধারিত পরিমাণ জমি স্বহস্তে চাষ করার অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে ধান্য-সমস্যার সুরাহা হইবে—সত্যিকার চাষীও সজল হইবে। অন্যথায় এই ছিন্নমূল সম্প্রদায়কে শিল্পাঞ্চল বা শহরঞ্চলে বসবাসের স্থান দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য বা ঋণ দেওয়া উচিত। পেশাদারী কায়দার বর্গা অধিকার কায়েম কবিতো গিয়া যাহা বা নমো নমো করিয়া চাষ সাবিতোছে তথাপি দুষ্ট মালিককে কিছু কিছু জমিও স্বহস্তে চাষ করার অধিকার দিতেছে না, তাহা বা দেশের ধান্য-সমস্যাকে তীব্রতর করার জন্য বিশেষভাবে দাবী। তাহারাই পল্লীবাসী এক শ্রেণীর বিড়িহিত মালিককে নির্ধারিত করিয়া পল্লীকে আবে শ্রীহীন করার চেষ্টা কবিতোছে। সর্বোপরি সরকারের ‘অধিক ধান্য ফলাও’ নীতির বিবোধিতা করিয়া পরোক্ষে প্রবল দেশজোহিতা করিতেছে। অতএব প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া বহু সংখ্যক কৃষিকর্মী বাহাতে জোতদার নামে উচ্ছন্ন না হব সেমিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ -।

প্রবাসী বাঙালী

নিজের মজলের আগ্রহ লক্ষ্য করে জানাচ্ছি, যারা প্রবাসে দ্বারী বসবাস করেন এবং বাঙালী হিসেবে বঙ্গসংস্কৃতি-বিষয়ক স্থানীয় সমস্যা-বলীর দ্বারা প্রায়শই নিজেদের বিচলিত বোধ করেন, আর সেই অনুষ্ঠিতাগতুলির যথামত প্রকাশের জন্য অহরহ আন্তরিক আবেগ অনুভব করেন—‘বঙ্গদর্শন বিষয়ক’ শিরোনামধুক্ত পরে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বক্তব্যকে নিজ দায়িত্বে সাম্প্রদায়িক বসুন্ধরতীর সম্পাদিকার কাছে অকপটে স্তাপন করতে পারেন। প্রকাশযোগ্য পর অবশ্যই পত্র হইবে।

মুক্তিবিপ্লবী সংবাদ

স্বাধীনতা সংগ্রাম

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রমী অভ্যন্তরীণ শস্য রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর 'বিশ্ববী বাঙালী' গ্রন্থে লিখেছেন যে স্বাধীনতার কোনও সংগীত নিদর্শে বসন্তকুমার বিশ্বাস গিয়ে বাস-বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।* তারপর থেকেই দেখা যায় রাসবিহারী পূনরায় বিশ্ববী মলে প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল আচার্য আরো লিখেছেন যে, ইন্দো-জার্মান বড়বন্দ বখন শব্দ হয়, তখন চন্দন-নগরে ও কাশীতে স্বাধীনতার সঙ্গে নানা-বিধ পবামর্শ কবে বাসবিহারী উত্তর-ভারতে গিয়ে দেশী সৈন্যদের দলে টানবার কাজে নামেন এবং পাজার ও যুক্তপ্রদেশের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ স্বাধীনতা-বন্দ হবার পরের বছর, সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভ্যন্তরীণ উপলক্ষে দিল্লী দরবার বসেছে। বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন রাজ-ধানী দিল্লীতে প্রবেশ করতেন, এমন সময় ডিক্টর মধ্যে থেকে বাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস বোমা ফেললেন বড়লাটের ওপর। বোমা ফাটল। বড়লাট আহতও হলেন। রাসবিহারী অন্তর্ধান করলেন।

* এই প্রসঙ্গে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দত্ত আরো আলোকপাত করে জানিয়েছেন যে, বসন্তবাবু নিজে বোমা-বিশারদ ছিলেন না : রাসবিহারী বসন্ত বোমা চেয়ে পাঠান অতুল ঘোষের কাছে, অতুলবাবু চন্দননগরের মণীন্দ্র নাথকে (বোমাবিশারদ) দিয়ে বোমা করিয়ে অমবেন্দ্র চ্যাটার্জীর ওপর তার দেন সেগুলো রাস-বিহারীর কাছে পৌঁছে দেবার।

১৯০৭ সাল থেকেই নদীয়ার পোড়া-গাছার স্বাধীনতার একটা দল ছিল, জ্ঞান বিশ্বাস তার নেতা। সেই দলের সভা বসন্ত ও মম্বা বিশ্বাস (দেই ভাই) ছিলেন কল-কাতার 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর কর্মী। বসন্ত বিশ্বাসের হাত দিয়ে অমবেন্দ্রবাবু বোমাগুলো পাঠালেন রাসবিহারী বসন্তের কাছে।

—পূর্বসূচীনাথ II

দেবাদনে গিয়ে মহা আড়ম্বরে সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি জনসভা আহ্বান করে প্রাণ শূলে আততায়ীদের উদ্দেশ্যে নিপা বর্ষণ করলেন। সরকারি চাকুরে তিনি। আনুগত্যে সরকার-তোষণে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল সবত্র।

শ্রীঅবিনন্দ বলছিলেন যে, ইংবেজ-প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকারের কাঠামোর মধ্যেই গোপনে গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাস্তব—'State within the state'। স্বাধীনতা থেকেই কার্যকরী করে তুলতে চাইলেন। বিশ্ববীদের অস্ত্রের মানচিত্র প্রাপ্যবস্ত রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন স্বাধীনতা এই ইঙ্গিত বাস্তব।

স্বাধীন এই স্বাধীন বাস্তবের বৃদ্ধি করে তুলতে হবে বিশ্ববের পর বিশ্বব সংঘটিত হবে। তার জন্যে যে অস্ত্রাধান প্রয়োজন, তার অপরিহার্য অংশ হচ্ছে অর্থ, অস্ত্র, আর জনগণের সচেতনতা।

স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সূচনা-প্রত্যাশার সার্বিকভাবে স্বাধীনতা অনুমতি দিলেন—ইংবেজ-শাসিত পর্বাধীন দেশের কোষাগার অল্পে অল্পে উন্মুক্ত করে জন-গণের স্বার্থে অর্থ ছিনিয়ে আনতে হবে। সেই অর্থ মুক্তিসেনানী গঠন করা হবে। সেই সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে বিদেশ থেকে আনা বিজ্ঞানের অধুনাতম অবদান, সুযোগ্য অস্ত্র। দিতে হবে তাদের সাম্প্রতিক বর্ণনাত্মক সমাক শিক্ষা। স্বেচ্ছা-সেবক থেকে বোল আনা সৈন্য গড়ে তোলাই হবে এখন লক্ষ্য।

প্রশ্নের সুন্দরমোহন ঘোষ বলেছেন, "স্বাধীন এল। কলকাতার গড়ের মাঠে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প পড়ল। বাড়ি বাড়ি নিয়ে বিশ্ববীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হল সামরিক ক্যাম্প : সামরিক পতাকার ব্যবহার, আলোর সংকেত, মিলিটারি প্যারেড, ব্যান্ড-পার্টি, ঘোড়দৌড়, মোটর চালনা—সবই কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হল। Hierarchy ছিল। কিন্তু বালেশ্বর বৃদ্ধ স্বাধীনতার

দেহাবসানের পর সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আমরা মফস্বলে ছড়িয়ে পড়লাম সবাই আত্ম-গোপনের ভাগিদে।"

সারা ভারতেই প্রবল উদ্দীপনা। সেই সঙ্গে স্বদেশী ডাকাতের নতুন প্রকোপ। কিন্তু বিদেশী শাসকদের শিক্ষা অনুযায়ী দেশবাসীরাও অধিকাংশই বিশ্ববীদের 'ডাকাত' নামে অভিহিত করতে লাগল সব-কারিমহলে প্রতিপত্তি ব্যক্তি। আরও অনেকে বিশ্ববীদের "সঙ্গে গিয়ে হাতও মেলাল।

বিশ্ববীদের মূলপত্র Administration Report-এ চেষ্টা করা হল দেশবাসীর কবাব। কেন এই টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে তার কৈফিয়ৎ দেওয়া হল : "যে দেশের সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সরকার সহজেই স্বাধীনতা আদায় করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠার আগে? লুণ্ঠিতবাজ ছাড়া গতস্তব স্বাক্ষর না। আমাদের দেশীয় সরকার এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেজন্যে বলপূর্বক কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন। এগুলি স্বাধীনতার স্বপ্ন বলে গণ্য করা হবে।"

* 'বিশ্ববী জীবনের স্মৃতি' : ডাঃ যাদু গোপাল মুখার্জী।

স্বাধীন মহাশয়ের পরিপ্রাণে স্বাধীনতার এই পবিত্রতায়ই পুনোপনি পুনরাবৃত্তি ঘটতে দাঁখ না কি নেতাজী সূত্রাচন্দ্রের প্রচেষ্টা? এই প্রশ্নে স্বাধীনতার তব্ধ সহকর্মী শ্রমের ভূপেন্দ্র দত্ত মশাই লিখেছেন : "কৃষ্ণনগরে এই সময়ে ...বৃদ্ধদের কাছে হেমন্ত সরকার প্রচার করতেন : মুক্তপদ্ব্য না হলে বিশ্ববের কাছে যোগ দেওয়া উচিত নয়।—মাঝে মাঝে সূত্রাচন্দ্র কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যেতেন, আমি যেতাম দৌলতপুর থেকে। হেমন্ত হঠাৎ একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেন : স্বাধীন মুখার্জী কি মুক্তপদ্ব্য? আমি বলি : মুক্তপদ্ব্য কি তাহা আমি নিজেই জানি না—তবে গীতার আদর্শে গড়ে ওঠা কাউন্সিল যদি জীবন্তে দেখে থাকি তাহা থেকেই দেখছি।...

গাঢ়াঙ্ক বসুধতী

যশোর অঞ্চল থেকে কর্মবাস্ত বতীন্দ্র-নাথ যখনই কলকাতায় এসেছেন, আশ্চর্যের সময় উঠেছেন গিয়ে, তাঁর অন্যতম প্রধান আস্তানা—শিয়ালদায়, ‘আর্থানিবাস’ বোর্ডিং-এ। তাঁর অপর একটি আস্তানা হচ্ছে কবিরাজ বিজয় রায়ের দোকানবাড়ি।

‘আর্থানিবাস’ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করছি। এর মাধ্যমেই বতীন্দ্রনাথ ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে প্রচাৰক শব্দ কবান জালিপদ বোমার মালিক। বতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালে ‘হাওড়া মামলা’ যখন শব্দ হয়, তখন জাতি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখও করছি। এই পাঁচুগোপালবাবু ছিলেন ‘আর্থানিবাস’ বোর্ডিং-এর পরিচালক।*

“তার (বতীন্দ্রনাথের) বিরাট পৌরুষ যে সূভাষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি যখন বলি, গীতার আদর্শে গড়া ঐ একটি মনুষ্যই আমি দেখছি, তখন সূভাষের পক্ষীয় মনে যে ছাপ পড়ে তা আমার চোখে এড়াইনি।...”

*ফোর্ট উইলিয়মের দশম জাতি বাহিনীর সঙ্গে দলের তরফ থেকে ১৯০৮-৯ সালে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন হাওড়া-শিব-পুরের নরেন চ্যাটার্জী—‘ছাত্রভাড়াবা’-এর ভোলাদা বলে সে যুগে বিখ্যাত। ইনি হাওড়া মামলায় পলাতক ছিলেন, আগে কলিকাতা। পদাধিকার ধারণা, ইনি তখন কাশীতে ছিলেন।

সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে নরেন চ্যাটার্জী পেশোয়ার থেকে শব্দ কবে দ্বারা উত্তর ভারতের ঘোরেন তখন। হাওড়া মামলার পরে একে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সময় নাগাদ বতীন্দ্রনাথ (অথবা তাঁর কথার নিখিল রায়মৌলিক) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে Fort William সৈন্যদের যোগাযোগ করে দেন। নরেন চ্যাটার্জী এই সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন একদিকে শিবপুরের নন্দীগোপাল সেনগুপ্তদের সঙ্গে, অন্যদিকে ব্রিটিশদের শরণ মিত্রদের সঙ্গে। এরা হাওড়া মামলার পরে রাজনীতি থেকে সরে যান। ব্রিটিশদের দল তখন থেকে শিক্ষক আশু ঘোষ ও দুর্গাচরণ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এঁদেরই সঙ্গে পাঁচুগোপাল-বাবু যোগাযোগ। ১৯১৫ সালে গুৱা যখন ১৮১৮ সালের ‘ব্রেগলেন্সন ডিন’ অনুযায়ী ধরা পড়েন, পাঁচুগোপালবাবু তখন পলাতক হন।

উক্ত বোর্ডিং-এ বতীন্দ্রনাথের বিশেষ আসনা-বাওয়া ছিল যশোরে থাকাকালীন। শিখর ঘোষ, বীরেন ঘোষ, বিজয়া বায়, মণি চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, বিজুটি দেবরায় প্রমুখ

হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সত্যীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বতীন্দ্রনাথের শিষ্য ও আঞ্চলিক নেতারা আসতেন এইখানেই মহানাবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, নির্দেশ নিতে।

হরিকুমারের কাছে শোনা যায়—এই সময়, ১৯১৪ সাল নাগাদ, বহুদিন খোঁজা জানলা দিয়ে দাদাকে তিনি দেখেছেন : গভীর নিশ্চিন্ত রাত্রে দাদা একা বসে আছেন, ধ্যানমগ্ন, চোখে দরবিগলিত ধারা।

এ যেন সেই আকৃতি, যার কথা মতিলাল বাবু লিখেছেন : আমার গাঙ্গা কি ভিজবে না? এই ধ্যানমগ্নতার ভবন সিন্ধি, দুর্লভ পরিণতি দেখা যাবে কপিতপোদা (বালেশ্বর) অকল্যাণকালে বতীন্দ্রনাথের প্রীতিকৃষ্ণ দর্শনের যে প্রাক্কপশী বর্ণনা দিয়েছেন মণি চক্রবর্তী মশাই।

১৯১৫ সাল। আনুয়ারি মাস। কাশী। বতীন্দ্রনাথ সপরিবারে ‘ভীষ’ দর্শনে এসেছেন। তার বাড়িতেই আনাগোনা করছেন উত্তর ভারতের গুরু সন্ন্যাসীর নেতৃবৃন্দ এবং বতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন আঞ্চলিক নেতা রাসবিহারী বসু।

বতীন্দ্রনাথের ছোটমামা লালিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “...তাহাকে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার অবশেষে বতীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইয়া তাহার জিনিসপত্র বহিরা তাহার সঙ্গে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। বতীন্দ্রনাথ কখন তাহাদের দ্বারা সত্য সত্যই মোট বহাইয়া লইতেন, আবার কখন তাহাদের চোখে ধোলা দিয়া এমন অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন যে, তাহার তাহার কোন সন্ধানই পাইত না, তাহার গতিবিধিও কিছু জানিত পাবিত না। এই সময় বতীন্দ্রনাথ কিছুদিন তাহার ছেলে-মেয়েদের লইয়া দেওঘর ও কাশীতে গিয়া ছিলেন। এ সকল স্থানেও পুলিশ তাহাকে অনুসরণ করিত। তাহায়া সকল সময়ে সকল স্থানে তাহার পিছনে না থাকে এ জন্য কাশীতে এক পুলিশের চরকে তিনি বিশেষ করিয়া বারম্বার কথিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ পুলিশ তাহার পিছু লইতে ছাড়েন নাই। একদিন রাত্রিতে কাশীর বাঙ্গালীটোলার এক গলির মধ্যে বতীন্দ্রনাথ তাহাকে দৌড়তে পাইয়া কাছে ডাকিলেন। সে নিকটে আসিবামাত্র তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘তোমাকে বাবণ করা সত্ত্বেও কেন তুমি এঁরকম জ্বালাতন কবিতো? এইবার তোমাকে শেষ করিয়া দিই?...’ এই বলিতেই সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বতীন্দ্রনাথের বহুমুখী ছাড়াইয়া বাইবার কথ্যতা নাই।

যশোবাবু নেতৃস্থানীয়রাই বেশ আসতেন এখানে। উত্তর বাংলার বতীন রায়ের দলেব লোকেরাও

“অবশেষে বতীন্দ্রনাথ তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন, ‘তোমার মত নিকট জীবকে মারিয়া আমি হাত কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু তুমি সাবধান হইও, আর আমার পিছু লইও না।’ সেই হইতে গুরুচরিত বতীন্দ্রনাথকে আর নানাশাসন দেখা দেন নি।”

উক্ত ভাষ্যের বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখার্জীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে শেঠ দামোদর স্বরূপ, আউধবিহারী, শচীন সান্যাল প্রভৃতি নেতারা আলাদা আলাদাই কাজ করতেন। শচীন সান্যাল কলকাতায় গিয়ে মাখন সেনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন।* এর পর, রাসবিহারীর সংস্পর্শে এসে কাশীর বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা সহজ গুণে বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতে কর্মস্থলের সম্প্রসারণ ঘটে। ছাত্র ও যুবকরা বিশেষ সাড়া দেন।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শচীন সান্যালের আগেও অন্যান্য অনেককে যোগ ছিল, বাংলা দেশ থেকে নিম্নমিত অর্থ সাহায্য হতে উত্তর ভারতের গুরুসন্ন্যাসিত। ১৯১১-১২ সালে কলকাতার ‘শ্রমজীবী সমবায়’ থেকে বাস-বিহারীর কাছে কলকাতা থেকে বোমা সমেত পাঠানো হয়; ইনিই রাসবিহারীর সঙ্গে এই বোমা নিয়ে যান হার্ডিগকে হত্যা করে। তারপর ১৯১৪ সালে মল্লিক বিপ্লবকে দশটা বোমা সমেত কলকাতা থেকে পাঠানো হয়; সেই বোমা সমেত পিগলে ধরা পড়েন। তখন আউধবিহারী প্রভৃতি কয়েক জন বিপ্লবীকে জেপ্তার করে অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার করা হয় এবং নামমাত্র বিচারের পরে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রাসবিহারী গিয়ে কাশীতে আত্মগোপন করেন।

রাসবিহারী উত্তর ভারত সম্বন্ধে বতীন্দ্রনাথকে রিপোর্ট দেন যে দেশী সৈন্যেরা এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যে, আর বোধহয় বেশি দিন অপেক্ষা করা চলবে না। ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে আসা এসে পড়েছে, স্বর পৌঁছেছে। সেই অস্ত্র এলে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিলি-বন্টন করতে যে-সময় লাগতে পারে, হিসেব করে earliest firm date রূপে ২১শে ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়; অন্তত সমস্ত উত্তর ভারত, বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান হবে ওইদিন, ঠিক হল। বতীন্দ্রনাথেরও মত ছিল যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে হাত গুটিয়ে বস থেকে শক্তিব অপচয় করবাব বদলে যেখানে যেখানে সম্ভব ঞ্জবৃদ্ধ করে নিজেদের বেহিসেবী মৃত্যু দিয়ে জাতটাকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন—তদনুযায়ী রাসবিহারী কলকাতা থেকে ফিরে গেলেন প্রস্তুতির পরিকল্পনা নিয়ে।

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে—কলকাতার ভিড়ল এসে সাল্যামিন জাহাজ। অ্যামোবিকা

*প্রথমে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বিবৃতির উল্লেখ আরগই করছি।

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

থেকে 'গদর' দলের একমাত্র বাঙালী নেতা সত্যেন সেন ফিরিয়েলেন দেশে। স্মরণে থাকতে পারে, ১৯০৬ সালে যশোরে সীতারাম উৎসব উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ বসুর সন্মিলিত করেছিলেন গদর একটি বৈঠকে, তাঁদের মধ্যে তবকনাথ দাস, অধর লক্ষব, শ্রীশ সেন ও সত্যেন সেন ছিলেন অন্যতম; তারপরেই তারক দাস বিদেশে যান, এবং পর পর কয়েক বছরের মধ্যে বাকি কজনকেও যতীন্দ্রনাথ বিদেশে পাঠান। সত্যেন সেনকে সর্বশেষ পাঠানো হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা যথাসময়ে বরাব।

যতীন্দ্রনাথের পবিত্রকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার তারক দাসের সঙ্গে সত্যেন গিয়ে দেখা করেন এবং কয়েক বছর ওতপ্রোতভাবে সেখানকার শ্রীশ্রমণীরা বিপ্লবীদের মধ্যে কাজ করেন। তারপর জার্মানী থেকে সাহায্য পাবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যান জাপানে। সেখানে তখন শক্তি সংগ্রহণ করছেন চীনের বিপ্লবী নেতা ভাং সান-ইয়াং সেন।

সান-ইয়াং ইতিপূর্বেই ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর সহযোগিতার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছে সত্যেন যতীন্দ্রনাথের বাণী পৌঁছে দেন। অতীত উৎসাহিত ও আশাব্যস্ত-হরে সান-ইয়াং সেন চীনের ও জাপানের মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লবকে সহায়তা করার বিভিন্ন পন্থা ব্যাংগে দেন এবং নিজেও সে-পথে আগ্রহ হন।

'সলামিন' জাহাজ থেকে সত্যেনের সঙ্গে নামলেন 'গদর' দলের মাঝাটী বিপ্লবী পিংলে আর বাইশ বছরের যুবক কর্তার সিং; কর্তার সিং আমেরিকা থেকে এরোসেলেন তাঁর কল-কৌশল শিখে এসেছেন। তা ছাড়া সত্যেন সঙ্গে কবে এনেছেন কিছু অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র; আর 'গদর' দলের চাব হাজার সদস্যও এসেছেন সঙ্গে।

পিংলে ও কর্তার সিংকে নিয়ে সত্যেন সেন উঠলেন গিয়ে যতীন্দ্রনাথের বন্দু-যশোবেব কবিরাজ বিজয় রায়ের আশ্রয়। 'গদর' দলের সদস্যদের কয়েক দিন বিশ্রামের পর যতীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব, গ্রামে গ্রামে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে কাজ করবার জন্যে। কর্তার সিং গেলেন তাঁদের সঙ্গে।

পিংলেকে যতীন্দ্রনাথ দূত হিসেবে পাঠালেন কাশীতে, রাসবিহারীর কাছে। সেখানে সর্বভারতীয় নেতাদের একটি বৈঠক ডাকতে হবে, তারই নির্দেশ নিয়ে গেলেন পিংলে। আরো বিশ হাজার 'গদর' সদস্য শীঘ্রই এসে পড়বেন, এ-সংবাদও যতীন্দ্রনাথ পাঠালেন রাসবিহারীকে।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাসবিহারী পিংলে ও শচীন সান্যালকে পাঠালেন পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিপ্লবী নেতৃ-বৃন্দের কাছে। পরামর্শ সভার আমন্ত্রণ দিয়ে তাঁরা কাশীতে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

কাশীতে, যতীন্দ্রনাথের বাড়িতেই বঙ্গ-পবামর্শ সভা। উত্তর ভারতের বিপ্লবী নলিনী মুখার্জী গিয়েছেন যে ভারতের বিভিন্ন নেতাদের বৈঠক বঙ্গ কাশীতে; দিল্লী, কানপুর, অমৃতসর, লাহোর, আজমীর, বাকিপুর প্রভৃতি স্থান থেকে নেতারা এলেন। সাময়িক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হল। বাইরে থেকে কয়েক ক্ষেপে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র ও অর্থ এসে পড়বে। তার আগে, জার্মান সরকারকে দেখাতে হবে দেশে প্রস্তুতি কতখানি হয়েছে। ১৮৫৭ সালেই মতো সারা দেশে এবং 'গদর' দলের সহযোগিতার, ভারতের বাইরের সমস্ত প্রতীবেশী অঞ্চলে—আফগানিস্থান, পাকিস্তান, তুর্কিস্তান, মৌলভান, সিন্ধুপুর, ব্যাংকক, বার্মাভায়া, পেনাং, সাংহাইয়ের, স্কায়া, জাভা, আন্দামানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভ্রমের বিরুদ্ধে জুলে উঠবে এই বিপ্লবের আগুন। সমস্ত অঞ্চল থেকেই দেশী সৈন্যবাহিনী খাঁপিয়ে পড়বে বিপ্লবের পথে।

বিপ্লবের প্রথম অভ্যুত্থান-দিবস ধার্য হল: ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সাল।

যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভার। রাসবিহারী ও পিংলে নিলেন পাঞ্জাবের ভার, বিশেষত লাহোরের সৈন্যবাসের ভার। কর্তার সিং, শচীন সান্যাল প্রভৃতিও রাসবিহারীর সহযোগিতা করবেন। মহারাজের ঘাটি আগলে বইলেন কলকাতা মৌড়িকাল স্কুলের ছাত্র ডাঃ সাভারকর (বিখ্যাত বিনায়ক সাভারকরের ভাই); সেখানে তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার প্রত্যক্ষ প্রভাবে দানা বেঁধে উঠেছে শক্তিশালী দল; তাতে ইন্দ্রন জুগিয়েছেন যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ভবভূষণ মিত্র বা স্বামী সত্যানন্দ। মধ্যপ্রদেশের ভার পেলেন নলিনী মুখার্জী, চলে গেলেন তিনি জম্মুলপুরে। দামোদর স্বরূপ গেলেন এলাহাবাদের ভার নিয়ে। চক্রবর্তী ও কুলেপ্যাতে রইলেন ভোলানাথ চাট্টোজ্যে, বিজয় চক্রবর্তী প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে রাসবিহারী একদিন বসে গল্প করতেন। কাশীতে। হঠাৎ শিশু-কণ্ঠেব চিৎকারে তাঁরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন দোতলার বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে যতীন্দ্রনাথের পুত্র তেজেন; আর তাই দেখে তাঁর মেয়ে আশালতা চোঁচছে ছোট বীরনকে কোলে নিয়ে।

একতলার উঠানে চোবাচ্চা ভর্তি জল। তারই ওপর তেজেন গিয়ে পড়ল গড়াতে গড়াতে। রাসবিহারী ছুটে তাকে কোলে তুলে নিজেই তেজেনের মুখে প্রথম কথা—“ওই দেখুন কাকা, কী বড় একটা হনুমান!”

হৃৎকরের জেলে তেজেন। চোখের জল মুছে রাসবিহারীকে বলল—তারা তিন ভাই-বোনে মিলে দোতলার বারান্দার খেলছিল এমন সময় হনুমানটা এসে তেজেনকে ধাক্কা

কাঁবে তেজেন, কাঁদিসনি তো?” বলে তাকে কোলে নিয়ে হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ।

দাদা বিনোদবালা “কাঁদিসনি তো” কথাটার ইতিহাস বললেন: কিনাইদার বাড়িতে, কাউকে কিছু না বলে তেজেন গিয়েছে তাব বাবার ঘোড়ার চাপতে। কাণে প্রায়ই বাবা তাকে বেঁট দিয়ে বেঁধে ঘোড়ায় বসিয়ে দেন; সেদিন সে নিজেই তাই পরখ করতে গিয়েছিল। কিন্তু বাহাদুর করে যেই তেজেন ঘোড়ার লেজে হাত দিয়েছে অমনি প্রতিবাদস্বরূপ একটি চাঁট মেবে ঘোড়া তখনই তেজেনকে ছটকে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথ অচৈতন্য অবস্থায় তেজেনকে তুলে আনেন। তার শূন্য কন্ঠে বসেন। জ্ঞান হতেই বাবার কাছে তেজেন বলে ওঠে, “বাবা, আমি কিন্তু কাঁদিনি!”—কারণ কান্না অপরূপে তাকে একদিন যতীন্দ্রনাথ শাসন করেছিলেন।

কলকাতা। ১৯১৫ সাল।

কর্মব্যস্ত যতীন্দ্রনাথের কাছে সংবাদ আসে: গদর ভোলানাথ গিরি মহারাজ কল-কাতার এসেছেন। ব্যাকুল হয়ে যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন অভুল ঘোষকে: চল, তাকে একটা জ্বরগাথ নিয়ে যাই।

২১শে, হ্যারিসন রোড। এ-বাড়িতেই গিরি মহারাজ এসে ওঠেন। এ-বাড়িতেই যতীন্দ্রনাথের এক গুরুভাইয়ের মুখে শুনোছি, এখানে এলেই যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে গদর প্রসঙ্গ খেঁষে যেতেন। উক্ত গুরুভাইয়ের মুখে শুনোছি, একদিন গদর-দর্শনের শেষে যতীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন; গিছেন উক্ত গুরুভাই। এমন সময় সিঁড়িতে মূখোমুখি যতীন্দ্রনাথের দেখা হয়ে গেল স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল আর মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে।

বিপিনচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে যতীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন: “আরে, যতীন সো, কী খবর?”—সমগ্র যতীন সুরে যতীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। গুরুভাইয়ের বন্ধুতে দেরি হল না, এঁদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কত গভীর পরিচয়।

আলাপের শেষে যতীন্দ্রনাথ বললেন, “এবার চলি?”

চমকিত হয়ে গুরুভাই শুনলেন বিপিন-চন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার যতীন্দ্রনাথকে বলছেন, “তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করে আছি যতীন। তোমার দেখে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। তুমি যে আমাদের কুল-দেবতা!”

কুল-দেবতা?..... গুরুভাইয়ের খটকা লাগে, তুলে শুনলেন নাকি।.....ততক্ষণে অশ্বিনীকুমার যতীন্দ্রনাথকে বলে উঠলেন—“মিথ্যা বলিনি যতীন, সত্যিই তুমি আমাদের কুল-দেবতা!”

ফিরে আসি এঁদের কথায়।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

অতুল ঘোষকে নিয়ে গুরু-সংগ্রহীনে উপাস্থত হলেন যতীন্দ্রনাথ। ২১১ নম্বর বাড়ির সামনে রাস্তাটা ছেয়ে গিয়েছে গাড়িতে গাড়িতে। গুরু, ভোলানাথ গিরি মহারাজের অগণিত শিষ্য আছেন কলকাতার সর্বশ্রেণীর মধ্যে। অনবরত দর্শনাধারী আসছেন—যাচ্ছেন।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অতুল ঘোষকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ গেলেন ওপরে। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই উল্লাসিত হয়ে উঠল গুরুর মুখ। “আরে মেবা বহাদুর! রে গুরুর বীর আ!”

দুই বাহু প্রসারিত করে গুরু, উল্লাসিত হয়ে উঠেন।

জুতো খুলে, কোট-সুট পরেই যতীন্দ্রনাথ সামটাগে লুট্টিরে গড়লেন গুরুর শ্রীচরণে।

মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হয়। অতুল ঘোষ বললেন, “আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। দাদার প্রণাম আর শেষ হয় না। গুরুরও হৃদয় নেই। শিষ্যও তেমনি। শানিক

বায়স সাদরে-সাদরে মাথায় আর পিঠে চাপড় দেন গুরু: উঠ, বেটা!.....”

যতীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ান। নীচব হাস্য গুরুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। গুরুও হাসিমুখে একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অসন্তে আস্তে আস্তে ভাব-বিভোল স্বপ্নাতুর যতীন্দ্রনাথ চলে আসেন, সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন, যেন আরেক জগতের লোক।

রাস্তার পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান।

“এই রে! দাঁড়া অতুল!” বলে ইতস্তত করছেন দেখে অতুল ঘোষ বলেন, “কি হল?”

“আবার ওপরে যেতে হবে দেখছি!” বলে বাড়িতে ঢুকতে যাবেন, পথ আগলে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলেন অতুল ঘোষ, “কেন দাদা? ওপরে কি হবে?”

“বলিস কেন? জুতোছোড়া ফেল এসেছি!”

“নাও। আর ওপরে যেতে হবে না,” বলে অতুল ঘোষ বগল-দাবা থেকে যতীন্দ্রনাথের জুতোছোড়া নামিয়ে দিলেন।

জুতো পরতে লবতে অপ্রতিভ হাসি হেসে যতীন্দ্রনাথ বললেন, “জানিস অতুল, গুরু কি বললেন?”

“গুরু?” অতুল অবাক হন, “কই, তোমাদের দুজনকে তো টাঙ্কটি করতে দেখলাম না? কথা আবার কী হল?”

“গুরুদেব বললেন আমায়: সামনে যখন এগিয়ে যাবি, পিছন-পানে আব ফিরিস্নে!”

এর কয়েক দিন আগেই, যিনিইদার বাড়িতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ শেষ দেখা দেখে এসেছেন দ্বিদিগে, সূর্য্যাস্তপক্ষে, নাবালিকা কন্যা আশালতাকে, নবালক পুত্র জেজেন্দ্রনাথকে, আব শিশুপুত্র বীরেন্দ্রনাথকে। আব কস্তুরীস্বরূপ ব্যবসায়ের সহকারী নলিনীকান্ত করকে বলে এসেছেন, “আমি চললাম। তোর শিগিরি ডাক পড়বে। তৈরি থাকি!”

অতুলের কাছে হাত রেখে যতীন্দ্রনাথ ২১১ নম্বর বাড়ি থেকে বোয়রে বললেন, “কিছু বড় মাছ ধরতে গিরে লোকে যখন সূতো খেলাতে থাকে, সূতো ছিঁড়ে মাছ অনেক সময় পাগিয়ে যায়। বড়শিটা কিন্তু গলায় তার বিঁধেই থাকে। উঠতে-সতে অর্ধ-প্রহর তাকে সহিতে হয় সেই লোচনটির বিড়ম্বনা!...”

অতুল ঘোষ তাকান যতীন্দ্রনাথের দিকে। “আমারো গলায় বড়শি গেঁথে ছিল,” যতীন্দ্রনাথ বলে চলেন, “সমসার ছেড়ে পুর-পরিবারের বধন অবহেলায় আলগা করে এই যে আমি অবলালারসে ঘুরে বেড়াই—তবু কাঁটার মতো আমায় বিঁধত একটা দায়িত্ববোধ। জানি, তোরা আছিস, ওদের কোনদিন অসু-বিধে হবে না।”

মাথা নীচু করে অতুল ঘোষ চলতে থাকেন যতীন্দ্রনাথের পাশে পাশে।

“আজ গুরুদেব আমার গলা থেকে সেই কাঁটাক্ত তুলে নিয়ে স্বাধীন করে দিলেন,

বুঝলি? মনে করিয়ে দিলেন: যিনি ওদের ইহলোকে পাঠিয়েছেন, তিনিই তো আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। তিনিই তো তাদের ভরণ-পোষণের মালিক। আমি কে? পিছন-পানে তাই ফিরতে গুরুদেব মানা করে দিলেন আজ।”

সম্ভবত এ-ই যতীন্দ্রনাথের শেষবারের মতো গুরুদর্শন।

জীবনে কেনিখনই তিনি পিছন-পানে ফিরে তাকাননি। গুরুর এই নির্দেশ পাবার বহু আগেই তো অন্তর থেকে পবন দেবতা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন সমুদ্রের তিরন্তন পথে, নিঃশেষ করে নিজেকে বিলায়ে দেবায় অমন নিটোল ভূমিকার। ত্যাগের আদর্শেই যতীন্দ্রনাথ শিখিয়ে গেলেন জয়ের পন্থা।

যতীন্দ্রনাথের গুরুভক্তি প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি কথা। তার জনৈক তরুণ অনুগামী একদিন কথার কথার তাঁকে বলে ওঠেন, “দেখুন, দাদা, ওসব ধর্ম-টর্ম আমার ভাল লাগে না। কী আপনি সব গুরুগির্গির মহিমা-কীর্তন করেন? ওর কি কিছু প্রয়োজন আছে?”

প্রাণথলে যতীন্দ্রনাথ হেসে ওঠেন। তারপর তরুণটিকে গালটা প্রদন করেন, “হ্যাঁ, তাকে কি কখনও আমি গুরু পূজতে বলছি, না ধর্ম অনুষ্ঠান করতে বলছি? তোর যা পথ তার নির্দেশ তো তোর অন্তর থেকেই আসবে!...”

তারপর বুঝি-বা খাদে নেমে গেল যতীন্দ্রনাথের মধুর কণ্ঠস্বর, “আজ্ঞা বলতো তুই আমার কাছেই বা আসিস কেন? কেনই বা—লোকে যাকে বিপদের পথ বলে, সেই পথে চলবার আদেশ চাস? আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসায় কেন তোর মন ভবে না? কেন তুই অন্য-পাটজনের মতো অর্থ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সম্মান ছেড়ে মরণের পথে এগিয়ে যাস?...?”

অন্তর্মুখী এক উদাস দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে যতীন্দ্রনাথের নয়নে; তিনি বলেন, “আমি গুরুর নাম করে হনুমানের মতো তেজ পাই। রামায়ণে যেমন বলেছে,

জয় রাম বলিয়া বীর

ছাড়িল হৃৎকার

মহাতে যোজন শত

হইলেন পার—

ঠিক সেই রকম, জয় গুরু বলে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুঃসাহস পাই। জানিস—

যব গুরু গোবিন্দজীকী নাম সুনাম।

সত্তা লাখ পর এক চড়াব।

গুরুভক্তি এতদূরই দুর্নিবার স্পর্ধা সামান্য মানুষ্যের বুকে জাগিয়ে দিতে পারে।

বুঝলি?*

(রসমত)

* ভূগতি মজুমদারের লেখা থেকে।

—যতীন্দ্রনাথ।

এডিনাপুর সুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

“অনুভব গ্রন্থ হয়েছে”—বঙ্গ-সংগ্রহীনে।

“কইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।”

—স্বামী সপাশ্রয়ানন্দ

“কইখানি দেবিতে অল্প, বিষয়বস্ত্র অমল ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থ এত মহা-মূল্য যত্নের সন্নিবেশ পূর্বের আর হয় কই।”

—স্বামী শুক্লভ্রামরজী

নতুন উপন্যাস—নতুন শৃটি

বর্তমান সময়ের লম্বা ও

জাহান লম্বাশ্রয়

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

প্রমুখ ইল করে কিছু মানুষের মন যদি

পলিত থাকে, তবে তুল তাজিতে কিয়।

৩য় ৯ মূল্য ১১০০ টাকা

বনামবস্ত্র কথাশ্রী

বিভূতিভূষণ সুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

স্বর্গদীপ বহীঃসী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),

দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩-৫-

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা—১০



বিহার এল হুদা

উপেন্দ্রবিহারী বসু

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

স্বাধীনতার ইতিহাস কি? তার প্রয়োজন কোথায়? তা' লিখবার দায়িত্ব কার?

মানুষ ও জাতির জীবনে ইতিহাসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইতিহাস 'ঐতিহ্য'কে ধারণ করে রাখে, ইতিহাস অতীতকে প্রাতি-দিনেব জীবনের কাছে পৌঁছে দেয়। অতীতের গোববকে বুকে ধারণ করে 'বর্তমান' শক্তি সঞ্চয় করে। শক্তিশালী বর্তমানই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে গতিমুখর হতে পারে।

স্বাধীনতার মূলে থাকে পবাস্বীনতার বিরুদ্ধে দুঃস্বপ্নের বিদ্রোহ-স্পৃহা। সেই স্পৃহাই বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। কাজেই স্বাধীনতার ইতিহাস জানে 'বিপ্লবের ইতিহাস'—সংগ্রামী-জীবনের আলোখ্যা।...

সবার অলঙ্কার গ্রন্থ ঐ বিপ্লবেরই ইতিহাস। অর্ধশতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত বাংলাব বিপ্লব-ইতিহাসের একাংশ ঐ সবার অলঙ্কার। এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ হলেও এব মধ্যে পরি-স্ফুট হয়ে আছে পূর্ণ ইতিহাসের ছায়া।...

আমরা পূর্বেই বলিছি যে বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস কোন একজনেই লিখতে পারেন না। খণ্ড খণ্ড নানা দলের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস গেথে তুলতে পারলেই বাংলার বিপ্লব-ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে। সে-কাজ প্রত্যেকটি বিপ্লবী-দলের উপযুক্ত কর্মীরা একটিত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু আজ কে তাদের একত্রিত করবে? কে সেই ইতিহাস বচনার ব্যয়ভার বহন করবে? হয়তো সরকারী চেম্বার তা' হতে পারে। কিন্তু সরকার কি সত্যি বিপ্লবের ইতিহাস চান? তাদের অন্তরে যে ভয়চকিত প্রশ্ন—অতীতের

বিপ্লব-ইতিহাস পড়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার তরুণেরা যদি 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠে? বিদ্রোহী-তরুণদল যদি হিসোর পথে বেরিয়ে পড়ে? তবে অহিংস-কংগ্রেস-পরি-চালিত ভারত-সরকার তাল সামলাবেন কি হবে?...

এর অর্থ হল, আমাদের বান্ধকর্তারা ইতিহাস—সত্য ইতিহাস আলোচনার ভয় পান। তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান এই ভেবে যে, 'অহিংস' কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা এনেছে হিসোকে বর্জন করে। তাঁরা অবশ্য লোকমতেব চাপে বহুবার বিপ্লবীদের সাহস ও ভাগ্যেব প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তৎসঙ্গেই তাঁদের কর্মের নিম্নতা করে অহিংসা-মন্ত্রকে পুত রাখার চেষ্টা করেছেন। বান্ধকর্তারা অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামন্ত্রের ধারক ও বাহক। অথচ অহিংসা তাঁদের কাছে বড়ই ঠুনকো বস্তু। তাঁরা মনে করেন যে ভারতীয় বিপ্লবের মূল্যায়নে বা ইতিহাস লিখনে তরুণসমাজ সহসা হিংসে হবে উঠবে, এবং বোমা-পিস্তল নিয়ে তাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু এবশ আলঙ্কার্য নৈতিহাসিক।... যে-অহিংসার শান্তিসৈনিক-রূপে গোটা ভারতবর্ষের মানুষদেরকে তৈরি করে এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় জয় করে তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলেন, সে-অহিংসাব মায়া কি সিংহাসনে বসবার পরই নষ্ট হয়ে গেল? নইলে বিপ্লবীদের অবদান আক্ষরিক রূপে গ্রহণ করলেই 'অহিংসা' পরাস্ত হবে কেন? অথবা অহিংস কংগ্রেসী-মসনদ কে'পে উঠবে কেন?

অথচ 'মানুষের ইতিহাস' জানে যে

ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা হাজার বছরের চেষ্টারও অহিংসার পথে আসতো না। কাবণ স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী স্বদেশেব মাত্র একটি লোকের হয়তো হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন তাঁর নাম সন্ত বিনোবা ভাবে। বিনোবা ভাবে মাঝে মাঝে দু-একটি রাজনীতিক-বাক্য উচ্চারণ কবলেও আদতে তিনি রাজনীতিক নন। রাজনীতিকদের মধ্যে একটি লোকই মহাত্মাব আদর্শ সঠিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর নাম শান আবদুল গফ্ফর খাঁ। তিনি আজ বিদেশী ভাষা পাকিস্তানবাসী। খান-সাহেব মহাত্মাব নিচবই খাঁটি শিষ্য। খাঁটি বলেই তিনি অহিংসভাবেই গান্ধীজীবী অনু-গামীদের দ্বারা পরিভাজ্য হলেন। সে ইতিহাস অত্যন্ত কম্প ও লক্ষ্যাকর্ষক।...

যাহোক উল্লিখিত দুইটি প্রাণী ব্যতীত কংগ্রেসেব মধ্যে ছোট-বড় একটি মানুষকেও পাওয়া যাবে কি; যাকে মহাত্মা মনে-প্রাণে ও কাজে 'অহিংস' কবতে পেরেছিলেন?..

ভারত-বিভাগেব ব্যাপাবেই বোকা বাব যে মাউন্টব্যাটেনের খপপবে পড়ে আমাদের কংগ্রেসী-নেতারা কত সহজে তাঁদের 'বাণদাঁড়' এবং জাতিব পিতাকে পথে বাসিয়ে ছাড়লেন। মহাত্মার অহিংসা তাঁহাব অনু-গামীরা কেহই গ্রহণ করেন নি বলেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবতে তাঁরা এতটুকু শিথিবোধ করলেন না। কিন্তু আবদুল গফ্ফর খাঁ? তিনি সকল নিম্নমানবর্তিতম স্বদেশপ্রেমকে সর্বান্তকবণে আশ্রয় করে অহিংসাব বাণী গ্রহণ করেছিলেন বলেই শিথিব সঙ্গ কোনকালে রফা কবতে পারলেন না। কংগ্রেস কতক পবিত্র হলেও তিনি কংগ্রেসেব আদর্শকে পবিত্র্যায় করলেন না। তাই গত ১৭ বছর ধরে তাঁর স্থান হলো

দাঙ্গাহিক বসুমতি

পাকিস্তানের কাবাগায়ে। নিম্নম নিম্নতনে তাঁর হেঁ অজ্ঞ প্রবাসীণ। রাজনীতিক কারণেই আজ তিনি বাধ্য হয়েছেন কাবুলে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করতে। মন তার উত্তপ্ত নি আদর্শ তার লুপ্ত হয় নি, সংকল্প তাঁর শিথিল হয় নি। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে তিনি অবিচল।...

গান্ধীজীর প্রাক্তন সেক্রেটারী প্যারীলাল সোদান খান সাহেবের সঙ্গে কাবুলে সাক্ষাৎ করে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরে খান সাহেব বলেছিলেন :

"Neither the issue of Partition nor of a Referendum in the N. W. F. Province was discussed with us. When a referendum was mentioned to us we strongly objected to it as the 1946 election had specifically been held on this very issue, viz, the issue of India V. Pakistan. Gandhiji supported us and opposed Partition. But Sardar Patel and Rajaji pressed for it. Speaking to me with great excitement the Sardar said that we were worrying over nothing, etc."

('With the Frontier Gandhi in Kabul'—Statesman, 6. 10. 65)

[দেশ-বিভাগ বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে 'রেফারেন্ডাম'—ইত্যাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হয় নি। আমাদের কাছে (পরে) রেফারেন্ডাম—এবং কথা তুলতেই আমরা 'প্রচণ্ড আপত্তি জানাই, কারণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেই বিশেষভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর।... গান্ধীজী আমাদের সমর্থন করলেন, দেশ-বিভাগ সমর্থন করলেন না! কিন্তু সর্দার পেটেল ও রাজাজী পার্টিশনের পক্ষে খুব জোর দিলেন। আমাদের লক্ষ্য করে বিশেষ উত্তেজিতভাবে সর্দার বললেন যে, আমরা অহেতুক ভাবিত হচ্ছি।]

গফর খাঁ আরো বলেছেন :

"We were stunned to find that the decision on both the issues had already been taken by the Congress High Command. After the Working Committee's meeting I said to Gandhiji, 'you have thrown us to the wolves.' Gandhiji asked us to have no fear. He would spare no effort to see that

Justice was done to us. India would by us if we were oppressed." (Statesman, 6. 10. 65)

[আমরা হতবুদ্ধি হলাম এই কথা জেনে যে, হাইকমান্ড উল্লিখিত দু'টি বিষয়েই ইতিপূর্বে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা অশ্রুত আশি গান্ধীজীকে বললাম, 'আমাদের আপনি নেকড়েব মধ্যে ঠেলে দিলেন।' গান্ধীজী বললেন, ভয় করার কিছু নেই। আবো বললেন যে, আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার ঘাটে না হয় সে বিষয়ে তিনি চেয়ারম্যান হুটি রাখবেন না। অধিকন্তু আমাদের লক্ষ্যের ভারত নাকি আমাদেরই পাশে এসে দাঁড়াবে।]...

মহাত্মা হরতো তখনো বোঝেন নি যে, ইতিবসবে তাঁর রাজনীতিক-হত্যা অতি সূচাব্যবস্থাপে সাধিত হয়ে গেছে। তিনি বুঝে-ও বোঝেন নি যে, ক্ষমতা-লাভের দুর্জর লেহে তাঁর অহিংস শিষ্যবৃন্দ প্যান্থ মার্কিক তাঁকে অকর্মণ্য করে দিচ্ছেন। নইলে যে-বাঁকি চোখের সম্মুখে তাঁর সাথের ভারতবর্ষকে দুটুকরো হয়ে যেতে দেখে-ও প্রতিরোধ করতে পারতেন না—তিনি কি করে প্রতিশ্রুতি দেন খান সাহেবকে যে তাঁদের উপর কোন অবিচার হতে তিনি দেখেন না বা পাকিস্তানের অত্যাচারিতদের পক্ষে প্রয়োজনে ভাবত কোমর বেঁধে দাঁড়াবে?...

উক্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেই মহাত্মার অপব ভক্ত মোলানা আজাদ সাহেবের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। খান সাহেবের ভাষার-ই সে-কথা উল্লিখিত হল :

"Maulana Azad was sitting near me in the Working Committee. Noticing my dejection he said to me, 'you should now join the Muslim League.' It pained me to find how little these comrades of ours had understood what we had stood for and fought for all those years. Did they imagine we would compromise our principles for the sake of power?"

(Statesman, 6. 10. 65)

[ওয়ার্কিং কমিটিতে আমারই কাছে মোলানা আজাদ বসেছিলেন। আমার হতাশা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আপনাদের উচিত এখন মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া।' আজাদের এই উক্তি শুনে আমি ব্যথিতচিত্তে ভাবলাম যে, আমাদের এসব সতীর্থরা এই দীর্ঘকাল আমরা কি বলেছি এবং কিসের জন্যে সংগ্রাম করছি তা কত অল্প-ই না বুঝেছেন! তাঁরা কি ভেবেছিলেন যে, আমরা

ক্ষমতার স্রোতে আমাদের আদর্শ পরিত্যাগ করব?]

কংগ্রেস হাইকমান্ড তথা নেতৃবৃন্দ নিজেরাই 'আদর্শ' ত্যাগ করে ক্ষমতার স্রোতে পথচলা শুরু করেছেন, সুতরাং তারা অপবকেও আশ্বাস-মনে করলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আজ গফর খাঁর উক্তি থেকে হস্ততা আরো স্পষ্ট করে বোঝা গেল যে, মহাত্মার কংগ্রেসে একটি লোক-ও সত্যনিষ্ঠ 'অহিংস' হতে পারেন নি, এবং তাঁরা প্রত্যেকে সান্মিলিত হয়েই শব্দ পেয়েছিলেন মহাত্মার আদর্শকে হত্যা করে তাঁর রাজনীতিকমুখ্য ঘটতে! খান সাহেব একমাত্র নেতা ও কর্মী, যিনি মহাত্মার আদর্শ সঠিকভাবে আদৃত করেছিলেন বলেই পাকিস্তানের জন্মকাল থেকেই উঁহাব নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছেন।...

অতএব আবদুল গফর খাঁকে বাদ দিলে 'অহিংস'র পথে 'স্বাধীনতা' আনবার যোন্ধ্যা ছিলেন মাত্র একটি পুরুষ—তিনি গান্ধীজী স্বয়ং। এই একক যোন্ধ্যা কি তাঁর অহিংসার মন্ত্র একটি ইংরেজের-ও হৃদয়ে কিছুমাত্র পাববর্তন ঘটতে পেরেছিলেন? তাঁর প্রভাব-কেনো ইংরেজ কি এমন স্তরে কখনো উঠেছিলেন—যেখান থেকে প্রাপের সাঁহত বলতে পারতেন তিনি যে, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক'? ভাবতে পারতেন সে-ইংরেজ যে, তাঁর দেশের প্রায় সম্ভাব্যসবের যে-যোন্ধ্যা ভারতবর্ষ থেকে আসে তা' না আসুক? ভাবতে পারতেন যে, যে-সমাজ্যে কখনো 'স্ব' অস্ত যায় না সেই সমাজ্য পরকে বিলিয়ে দিয়ে তাদের 'সমাজ্য' ইংল্যান্ডের মত একটি ছোট্ট স্বাধীপের সামান্য 'রাণী' হয়ে থাকুন? ...

গান্ধীজী কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর চরিত্রে, নিষ্ঠায় ও নেতৃত্বে। তাঁর কংগ্রেসে তাই দেশকে প্রভাবিত করেছিল প্রচুর। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বারে বারে দেশকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, শব্দমাত্র কংগ্রেস এ-দেশের স্বাধীনতা আনে নি, আনতে পারতো-ও না। স্বাধীনতা এনেছে সংগ্রামী-ভারতবর্ষ। এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে ভারত পবাসীন হবার পরমুহূর্ত থেকে চিন্তায়, ভাবে এবং স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কার্বে। এই সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর শব্দ থেকে ক্রমশ প্রচণ্ডতর হয়ে এসেছে দু'টি ধাবায়—অহিংস কংগ্রেস-আন্দোলনে এবং

সহিংস বৈপ্লবিক-কর্মে। ... সংগ্রামী-ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সুযোগ পেয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। কিন্তু দেশ প্রস্তুত ছিল না বলে বিলাতীদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিম বংসব পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভরষকর সৌন্দর্যে সেই সুযোগ এনে দিল সংগ্রামী-ভারতবর্ষের কাছে। সে-সুযোগ লক্ষ্যে নিলেন বিপ্লবী নেতাজী। ছিনিয়ে আনলেন তিনি বিজয়-ধ্বজা। কংগ্রেসের

সাম্প্রতিক বঙ্গদেশ

গণসংযোগে দেশ' এ-যারা ভৈরব ছিল বলেই সেই বিজয়-মুদ্রা কংগ্রেস-নেতাবা ওড়াতে পারলেন লালকল্লায় উর্ধ্ব চড়ায়। ..

ইংরেজ দেখেছিল—কংগ্রেসকে শাসনস্থতা স্বা-সত্ত্বও তার 'বিমায়ীশেষ আন্দোলন ভাঙে পেরিয়ে দেশের মনকে বৈ-জায়ায় নিয়ে গিয়েছিল সে-বান থেকে সেই মনকে ফিবিতে আনা সম্ভব হয় নি অহায়া-পক্ষেও। ইংরেজ ব-বোঁদে—সাধারণ ভাবতরাসী প্রত্যেকই অদ্বৈত ঘণ্টা করতে গিয়েছে বৈত-প্রভু-দয়কে। রাজার জাতক তাবা আব মান দিতে চায় না। কারণ তারা যে এবাব স্বচক্ষে দেখেছে জাপানীদের হাতে ইংরেজের প্রচণ্ড মার খাওয়া, দেখেছে ইংল-রগণ-গলে ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বত্ব-দিয়ে-গড়া আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিপুল শৌর্ষ, দেখেছে ব-বোঁদ-বিবোধী দেশীয় লো-বাহিনীর অতুতপূর্ব বিদ্রোহ। দেখেছে ভবন নয়নে অরণ-বহি! ..

সম্রাট্যলোপ ইংরেজ এভে-ও খাবড়াতো না। কিন্তু লালকল্লার বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে অচিরলক্ যখন জনত পারলেন যে, সেনাবাহিনীর শক্তবা পা-চাত্তর ভাগ সৈন্য-ই বিদ্রোহ-করবে নেতাজী-আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসারদের কোন সা-লা দিলে—তখন বৃটিশ রক্ত-হিম হয়ে গেল। ...

ভাবতবর্ষ থেকে অচিরে তাঁড়িত হাত হবে এ-সত্য মূর্ত ইংরেজ বুঝে ফেলেই কংগ্রেস ও লীগ-এর হাতে রাজত্ব ভুলে দিয়ে নিজ অলক্ষ্যে কলকাটি চালাবার বড়কল্পে কবল। বৃটিশ—'ডিভাইড্ এন্ড্ রুল্' নামক নীতি অনুসারেই কংগ্রেস ও লীগ-এব অম্বে বৃটি-ভাগভাগির লড়াই বাধিয়ে দিয়ে শ্রমবটায় নিজেই সে-দাঁড়িপায়া নিয়ে হাজির হলো। এই বাটোয়ারার কটা রাড-ক্রিস্-এব দেওয়া লাইন ধবে দুই টুকরো কবে ফেলা হল ভাবতবর্ষকে। ইংরেজ তখন এক টুকরো খরবাত কবলো লীগকে, এক টুকরো কংগ্রেসকে। যথাক্রমে তাদের নাম হলো 'পাকিস্তান' ও 'ভারত'। সেটা ১৯৪৭ সাল। ...

পৃথিবীব্যাপী অপরূপ সম্রাজ্যবাদীরা ধন্য ধন্য করে উঠল ইংরেজের উদ্দেশ্যে। তাব চেবে-ও বেশি ধন্যবাদ জানাল মহাশা-গান্ধীর কংগ্রেস। কুতজতায আকুলিত হয়ে স্বাধীন-ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল মাউন্টবটেন সাহেবকেই করা হলো। মুসলিম লীগ অহিস-ও নয়, নিলোভ-ও নয়—কাজেই স্বাধীন-পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হলেন জিন্নাহ-সাহেব স্বয়ং। ...

অবশ্য এহেন অপূর্ব স্বাধীনতা দানের কালে-ও ইংরেজের হল 'মিস্ত্রি ফিলিং'—বুধ ও আনন্দ। রাজ্যপাট হারাবার দুঃখ কায় না হয়? উহা সবারই বোধগম্য। কিন্তু আনন্দ কেন? আনন্দ হলো এই জন্যে যে, তার 'ডিভাইড্ এন্ড্ রুল্' নীতির অস্ত্র

হল না। ভারতবর্ষকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে তখনো ল-বিবাদের বাঁজ বুনে দেওয়া হল তা-পল্লবিত হয়ে দুটো দেশের মধ্যেই স্বাভাবিক লড়াই বাধিয়ে রাখবে অনেককাল। এবং সেই ফাঁকে ইংরেজের মোডলী থাকবে অক্ষয় হয়ে, তার বাণিজ্য ফাটল ধরবে না বহু দিন। হলোও তাই। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর অন্তত সতের বৎসরের ইতিহাসের পাতায় এ-সত্যই লিখিত হয়ে আছে। ...

কিন্তু এ-কম্বু সম্ভব হল কি করে? সংগ্রামী-কংগ্রেস বিলাতের প্রতি বিবাস-স্বাতকতা কবল কেমন করে? আমাদের সে-কথাও এখানে বুঝতে হবে।

মুসলিম লীগকে দিয়ে ইংরেজের কোন ভর ছিল না। কারণ উহা ইংরেজের নিজের হাতেরই পুতুল। এক কিন্তু বজ্র নাকরে, কেবলমাত্র সংগ্রামী-ভারতবর্ষের বিরুদ্ধতা-কবে জিন্নাহ-সাহেব ও তার অনুচরবল 'পাকিস্তান' কলুটি ইংরেজের হাত থেকে উপটোকে পেয়েছিলেন। কাজেই আজ অবধি তাদেরকে আপন জানেই ইংরেজ গ্রহণ কব্ছে। ... কিন্তু ভর ছিল কংগ্রেসকে নিয়ে। কারণ কংগ্রেস অহিস-এলেও তো প্রচণ্ড ত্যাগ ও রক্তকণ্ঠে-সাম্যে এককাল এগিয়ে এসেছে মুক্তির দুর্জর সংগ্রামে। ওব ব্যাক্ এন্ড্ ফাইল্'কে বিশ্বাস করা যায় না। 'অগাস্ট-বিদ্রোহ' তরাই বরোঁছিল। তাই সময় থাকতে কংগ্রেস-কর্তাদের সাম্যে-স্বাধীনত্ব তাদেরকে-ও ক্ষমতাবাদ স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে।

"Power is the worst corruptor" —এব ফাঁদে ফেলাতে হবে অহিস-নেতাদের সর্ব-প্রথম। ইংরেজ শিথ কবল যে, নেতাদেরকে

গুচ্ছিয়ে বলতে হবে—পৃথিবীর প্রাচীন-তম ও প্রেষ্ঠতম সভ্যতার ধবক ভোমরা! ভোমরা বুদ্ধের সন্তান! ভোমরা শান্তির অগ্রদূত! অতএব এবাব অগ্র সম্ভরণ কব। ভোমরা নিয়ে নাও লীগ-এব সপ্নে আপোষবধা কবে ভারতবর্ষের বহুতর অংশ এবং কনিষ্ঠ প্রাতাকে দিবে দাও উহাব ছোট অংশ। তারপর কমনওয়েল্-এ অবস্থান কবেই ভোমরা এবং আমবা মিলে-মিশে এই পৃথিবীর বুকে সখে বসতি করব। আমাদের স্নেহছায়ায় থাকলে বুশ-আমেরিকা বা অন্য কোন দেশ-ই ভোমাদের ধারে-কাছে এগুতে পারবে না। সমন থাকতে এ যদি না কর তবে ভোমাদের কমীর-ই বিশ্ববীদলে ভিড় কববে। আশ্বরে ভোমরা অনুগামীহীন কয়েকটি তথাকথিত নেতা দেশের লোকের কাছে তো যটেই, আমাদের কাছেও কোন পাত্তা পাবে না। ...

জগদ্রলাল, প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ মহান নেতাবা সাব বুঝে ফেললেন। শ্রমের বাপুজীকে তাঁবা এবার আব এসব ইহজাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলেন না। 'সেটেজ ফাট'কে তাই গহায়া-ও 'আন-সেটেজ' করার কুক নিলেন না! ...

এ প্রসঙ্গে নিয়োনর্ড মোসলি-ব উষ্ণ প্রাধিকারযোগ্য :

"But for Nehru and Patel and all the Congressmen yearning for the fruits of power, the carrot Mountbatten dangled in front of their noses was too detectable to be re-used. They gobbled it down."

(The Last Days of the British Raj—P 247)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডোভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বৈজ্ঞানিক - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

[অর্থাৎ ক্রমতা ভোগের জন্যে লালাষিত নেহরু-প্যাটেল এবং তাঁদের কংগ্রেসী কনুয়া আরেক ডগায় বুলতে-থাকা মাউন্ট ব্যাটেন প্রস্তুত গান্ধীজীর লোভ সম্পূর্ণ কবতে পারলেন না। তাঁরা ওটা গোপ্তাসে গিলে ফেললেন।]

Mosley আরো বলেছেন তাঁর গ্রন্থে:

"There are many who believe—and not only Gandhi's disciples—that they were the victims of a Salesman's trick which won them freedom but cost them the unity of the country. A little patience and all the troubles might have been avoided. Pakistan was the one-man achievement of Mohamad Ali Jinnah, and Jinnah was dead within a year of Pakistan's Foundation. A little patience. A refusal to be rushed. It was Gandhi's counsel and, of course, from the Indian point of view, it was right" (Page—247)

[গান্ধীজীর বহু শিষ্য এবং তাঁদের বাইবে-ও বহু লোক মনে করেন যে, তাঁরা পাক্সা একটি সেল্‌স্‌ম্যানের চাতুর্যে ধারেল হয়ে দেশের মৈত্রী বিনাময়ে এক স্বাধীনতা লাভ কবেছেন। কিন্তু সামান্য ঐর্ষ্য ধ্বংস পথের সকল বাধা এড়িয়ে চলা বেত। পাকিস্তান একটি মানবেরই অবদান—তাঁহার নাম জিন্না। এই জিন্না পাকিস্তান জন্ম নেবার এক বছরও মধোই মাঝা পেলেন। ... সামান্য ঐর্ষ্য। শূন্য সবেগে (মাউন্ট ব্যাটেন-প্রস্তুত) প্রত্যাহার-এই ছিল গান্ধীজীর উপদেশ। ভারতের দিক থেকে অবশ্য এ-উপদেশই ছিল সঠিক পথনির্দেশ।]

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর লিয়োনাড মোসলি'র সংগে ১৯৬০ সালে নেহরুজীর কিছু প্রাপ্তখোলা আলোচনা হয়। তখন নেহরু বলেছেন:

"The truth is that we were tired men, and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us. We saw the fires burning in the Punjab and heard everyday of the killings. The plan for Partition offered a way out and we took it."

(The Last Days of the British Raj—Page 248)

[ইহা সত্য যে আমরা হারত হয়ে পড়েছিলাম, বার্ষিক-ও এংগরে আসছিলাম। আমাদের পক্ষে অল্পসংখ্যকই পুনরায় কারাবন্দন সহ্য হতো না। অথচ অবিকৃত ভারতবর্ষ যতই কামনার বস্তু হোক না কেন উহা দাবি করলে কারার কপাট আমাদের জন্যে খুলে যেতো। আমরা দেখছিলাম পাক্সার বন্ধকে বিস্মৃত আগুনের শিখা, প্রতিদিন শূন্যছিলাম মানুষ হত্যার কাহিনী। ভাবত-বিভাগের পরিকল্পনা এই অবস্থায় মুক্তির পথ দেখাল। আমরা তা গ্রহণ কবলাম। ...]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অহিংস-কংগ্রেসের একক চেষ্টার এসেছে বললে ইতিহাস-ই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাষায়:

"Either by habit or by convention the name of Gandhi (Non-Violent Congress) alone is in popular view associated with the freedom of India... But incidental reference should be made here to other agencies at work towards the same end. Among these I have laid special stress on the Revolutionary movements in India and the formation of I. N. A. by Subhas Bose."

(History of Freedom Movement—Vol. 3—Preface, XXIX)

[অভ্যাসবশতই হোক বা প্রথাগতই হোক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ইতিহাসে কেবল গান্ধীজী তথা অহিংস-কংগ্রেসেরই নাম বৃদ্ধ করা হয়। ... কিন্তু আরো সঙ্গীত বয়েছে, যারা এক উল্লেসে এ-পর্বত কাজ করে আসছে। তাদের-ও উল্লেখ করা বিধেয়। এসব সংস্থা বলতে আমি বিশেষ জোর দিয়েছি ভারতবর্ষের একাধিক বৈপ্লবিক-দল ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি, এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সংগঠিত আজাদ-হিন্দ ফৌজ-এর প্রতি।]

খাঁটি সত্য কথা। বহু পথের এবং বহু দলের সংগ্রামী-শক্তিই এসেছে এই দেশের স্বাধীনতা। ... মানুষ আসে স্বাধীনতা। কিন্তু পরিপাক্ষ্য সৃষ্টি না-হলে 'মানুষ'-ও স্বাধীনতা আনার সুযোগ পায় না। 'নেতা' সৃষ্টি করে পরিপাক্ষ্য। 'আবার পরিপাক্ষ্য'-ও গড়ে তোলে নেতাকে। উভয় কথাই ঠিক। কিন্তু তার চেয়েও ঠিক হল, নেতা এবং প্রয়োজনীয় পরিপাক্ষ্যের যোগাযোগেই বৃহৎ কর্মের সাফল্য সম্ভব। একটি অপরটি পরিপূরক। ...

কংগ্রেসের প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মত নেতা ব্যতীত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তিনি-ই গড়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী-

জনমত আসমুদ্রাহিচ্চল ভারতবর্ষ জুড়ে। আবার বিপ্লবের প্রতীক নেতাজীর মত নেতা ব্যতীত ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ বাস্তবে পরিণত হতো না। কাবণ ইংরেজের সমর-শক্তিকে তিনিই পরাজিত করেছিলেন বিপ্লবী-শক্তির প্রহারে ও প্রভাবে, ব্রিটিশের বেতন-ভোগী ভারতীয় সেনাবাহিনীর হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের দূর্বীর আগুন তাঁরই—আজাদ-হিন্দ-ফৌজ। এ-ও সত্য যে, ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা লাভ হতো না বিশ্বগ্রাসী শ্বিত্যব মহাযুদ্ধ সংঘটিত না হলে। কাবণ উক্ত মহাযুদ্ধজনিত পবিপাক্ষ্য ছাড়া সুভাষচন্দ্র বসুর নেতাজী হয়ে ওঠার সুযোগ হরতো এত সঘর আসতো না, ইংরেজের দুর্জয় শক্তিও সহসা তাদের ঘরের মত উড়ে যেতো না। ...

কংগ্রেসীরা আজও বলে থাকেন যে, ব্রিটিশের হাত থেকে নাকি মহাত্মাই স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁদের এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে, মহাত্মা বা তাঁর কংগ্রেস কোন কালেই ইংরেজের কাছে রাজনীতিক পাতা পেতেন না যদি দেশের বৈপ্লবিক-আন্দোলন মাঝা উঠে করে না দাঁড়তো। ...

কাজেই স্বাধীনতার বর্ষা ইতিহাস উন্মার করার দাবি দেশবাসী করবেই। এই দাবি হলো জাতীয় দাবি। এ ইতিহাস উন্মারের চেষ্টা করতে হবে সরকারকেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে। সেটা হবে সংগ্রামী-ভারতের ইতিহাস-কংগ্রেস বা অন্য কোন দলের এক চেষ্টার বা কর্মের ইতিহাস নয়। উক্ত সামগ্রিক ইতিহাস রচনার ফলে কংগ্রেসের গৌরবময় অবদানের সঙ্গে অপরাপর শক্তিগুলোর অবদান-ও যদি লিখিত হয় তাতে কংগ্রেস বা 'অহিংস-আন্দোলন' স্থান হয়ে যাবে কেন? সত্য উন্মার্টিত হলে অহিংস সংগ্রামের অতীত অধিকতর পরিষ্কৃত হবে বলেই তো আমাদের বিশ্বাস। সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হলে দেখা যাবে বহুকাল থেকে অনুষ্ঠিত অহিংস ও সহিংস সংগ্রাম এবং নানা কাণ্ডকারের সমন্বিত শক্তির প্রভাবেই ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা এসেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ হয়েছে কিনা, তা না হলে তাব কিরূপ রূটিতে আমরা পিছিয়ে গিয়েছি তা-ও দেখা হবে। এই আসল ইতিহাসটি এমন নৈপুণ্যেই রচনা করতে হবে যাতে জাতিব ভাবী বংশধরেরা অতীতের সংগ্রাম থেকে প্রাণ লাভ করে, প্রেরণা পায় এবং ভবিষ্যৎ পথচলকে দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিভুল করে বরণ করতে পারে। এই ইতিহাসকরবা মামুলি ইতিহাস-লেখক হলে চলবে না। তাঁদের ভাব নিতে হবে জাতি গড়ার। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'They shall create history'—তাদের ভূমিকা record keeper—এর ভূমিকা নয়।

(কমলা)



আর ব্যাধ প্রশান্ত সহজে অবাধ হব না, বিস্মিতও বোধ হবে না! সে বয়স যেন কবে কেটে গেছে।

বিশ্বমামাকে এখানে এভাবে দেখবার কথাও নয়, প্রত্যাশাও নয়। তবুও কখনো কখনো এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে কাব্যে করো জীবনে।

চোখ-কান চেয়ে প্রশান্ত দেখবার আগেই চলন্ত একটা মোটর গাড়ির দবজা খুলে চনাকীর্ণ, উৎক্লিষ্ট এবং উদ্ভ্রান্ত জনতার মাঝখান থেকে কে যেন তাকে টপ করে তুলে নিলে। তারপব গাড়িটা খানিক দূর এসে পদলিশের হাত-দেখানোষ অচল হয়ে গেল।

সিটয়ারিং-এ হাত বেখে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছে বিশ্বমামা বললেন, তাবপব কেমন আছ? তোমাদের খবর কি প্রশান্ত?

ভাল! মূখ দিয়ে কথাটা কেমন অদ্ভুত সূবে বেরিয়ে এল, মিয়োন যেন! প্রশান্ত মেন সাক্ষমবে নিজেকে প্রশ্ন করলে, বিশ্বমামাই তো? সেই বিশ্বমামা যিনি তাব শ্বশুরবাড়িব সম্পর্কে আশ্রয়; একদা সহজ, সবল, নির্বোধ, আত্মবাহ কাব্যস্বপন ছোটটি? আজ চেনাই যায় না একেবা বোধ হয় এইভাবেই দুনিয়ার বদল হয়ে যায়। একটা

দাম্পী গগলস্ চোখে, আশ্বির পাঞ্জাবীর হাতা গিলে করা, বাঁ হাতের কব্জিতে নতুন ঘড়ি বাঁধা, চোখ-মুখ বেশ পুরুস্ত-ঘসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো আসার মত একটা শূণি যেন উপছে উঠেছে মূখময়।

অনেকক্ষণ পদলিশটা হাত দোখিয়েছে, বিশ্বমামা বিবস্ত হয়ে বললেন, বাবিশ! আজ-কাল সব হয়েছে সমান!

কিন্তু প্রশান্তব বিবস্ত হবার কোন কারণ নেই, অন্তত আজকের মত বাড়ি ফেরা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে—মামামশুরের গাড়িতে কবে যাচ্ছে! তবু যেন একটা কিছু সূব মিলিয়ে না বললে গাড়িব মালিক-চালক মনে মনে অসন্তুষ্ট হবেন, প্রশান্ত বললে, ভিড়ও হয়েছে তেমন।

গাড়ি চাপা না দিয়ে পথ থেকে যে লোকটাকে গাড়িতে তুলে এনেছেন তাব কথা যেন এতক্ষণ বিশ্বমামা ভুলেই গিয়েছিলেন, খচ্ কবে এক্সিলেটরে টান দিয়ে সবিম্মাষে বিশ্বমামা বললেন, এত ভিড়ে তোমবা যাও কি কবে? বাবিশ!

তেমন অল্পগট, অদ্ভুত সূবে প্রশান্ত বললে, এই এক বকম কবে!

বিশ্বমামা বললেন, এই জন্যেই তো

আজকাল দ্রামে বাসে চড়া ছেড়ে দিয়েছিও কি অবস্থা দেখলে না? কে এমন গুতো-গুতি করে? বাবিশ!

সেই জন্যে বিশ্বমামা নিজের গাড়ি নিজে চালিয়ে চলা-ফেরা করেন বোধ হয়।

আব জিজ্ঞেস কবতে হল না, বিশ্বমামা নিজে থেকেই বললেন, আজকাল গাড়ি না হলেও চলে না। এই তো অবস্থা!

অবস্থাটা কাব, কোথায় দেখবাব জন্যে যেন প্রশান্ত চোখ দুটোকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নেখ—ভিড়, ভিড়! কেবল ভিড়! যানবাহন আব মানু্বেষ স্রোতে গড়ের মাঠেব সবুজ যেন অনেকটা ঢাকা পড়েছে। গাড়ি চড়ে অনায়াস ভ্রমণে যেন মজাব মত মনে হয় অবস্থাটা, দৃশ্যটা! দেখবার মত!

তাবপব চোখ ফিরিয়ে বিশ্বমামাকে খুঁটিয়ে দেখলে প্রশান্ত। বেশ প্রফুল্ল, উল্লসদল, আশ্রপ্রত্যয়ে দৃঢ় মনে হয় মামাকে। নতুন গাড়িটাব মতই সপ্রতিভ।

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস কবলেন, শোভা কেমন আছে?

গাড়িটা চলতে আরম্ভ কবেছে। গোটা-দুই গাড়িকে ওভার-টেক কবে। বিশ্বমামা বললেন, আজকাল গাড়ি চালানও মশকিল!

পাঠ্যাহিক বসুদন্তী

যত সব আনাড়ির হাতে গাড়ি পড়েছে—
কিছুতে সামনে এগোতে দেয় না, পথ জুড়ে থাকে! রাবিশ!

প্রশান্ত ইতিমধ্যে বিশুমামার গাড়িচালনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন—বেশ ভালই গাড়ি চালান বিশুমামা, গাড়িটা খেলাব পড়ুল বেন! কৌশল সম্পর্কে আরও! ধর্মক্ষেত্রে কুর-ক্ষেত্রে কৌরব সৈন্যের মতো একটা কুক এভাবে রথ চালিয়েছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু বিগুমামা যেভাবে তাঁর গাড়ি চালিয়ে জনাকীর্ণ রাস্তা পার হতে লাগলেন, তাতে তাঁকে সারথ্য বিদ্যায় সর্বাধিক পাবদর্শী বলে মনে হয়। বেশ গাড়ি চালাতে শিখেছেন বিশুমামা! নেশার মত বেন লাগছে প্রশান্তব বিশুমামার পাশে গাড়িতে বসে—কি অবলীলাক্রমে উত্তাল জন-সমুদ্রকে কাটিয়ে অবহেলাই না গাড়িটা চলেছে, একে-বেকে কখনো বা সবল গতিতে, উদ্দামবে!

প্রশান্ত একসময় ভয়ে ভয়ে বললে, অত জোরে চালাবার দরকার কি? 'আজকাল' যা কাউ হুচ্ছে পথেঘাটে—

ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে ত্রেক কবে বিশুমামা বললেন, আস্তেই যদি চালাবো তা হলে গাড়ি চড়বে কেন? সাথে আর রাস্তা 'জাম' হবে, গাড়ি চালায় না খেলা করে সব! সময় বাঁচানোর জন্যেই তো গাড়ি করা!

প্রশান্ত চুপ কবে গেল। সত্যিই তো বিশুমামা আর বেকার নন, যে, অটেল সময় তাঁর আছে, ট্রাফিক-বাসে যাতায়াত কবেন!—নিজের গাড়ি নিজে চালাবার সচেতনতা তাঁর আছে! তিনি কাজের লোক হয়েছেন!

কিন্তু সেই এখানেও দাঁবি! চারমাথা মোড়। স্ট্রিয়ারিং থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে বিশুমামা বিরক্ত হয়ে বললেন রাবিশ! অর্থাৎ কখন ছাড়বে কে জানে। এদিক নেই ওদিক আছে!

গাড়ি ছাড়তে বিশুমামা আবার সামাজিক হ'লেন, বললেন, শোভা আমার কথা বলে টেল আর! না, একেবারে জুলে গেছে? তোমরা তো আসই না, সেই কবে এসেছিলে, আমার সঙ্গে দেখাই হয় নি!

প্রশান্ত বললে, নিজের সংসার হয়ে একেবারে সব—

কথাটা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বিশুমামা হেসে উঠলেন হো-হো করে!

প্রশান্ত অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

বিশুমামা বললেন, শোভা খুব গিম্বী-বার্মি হ'বে গেছে বলা? মা আমার সংসার করে মামাদের সঙ্গে দেখা করবার সময়ই পাখ না!

প্রশান্ত স্তব্ধ পক্ষে আমতা আমতা ক'বলে, না না, তা নয়—

বিশুমামা হাসলেন। হঠাৎ বেন বড় বিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন বিশুমামা! কতই বা তাঁর বরস, শোভনার সমবয়সী, কি দু-এক বছরের বড়। এই সেদিনও নড়-নাড় করে প্রশান্তদের বাড়ি আসতো, কুটুম্বের মত কোন আপ্যায়নও বোধ

হয় ঠেকে করা হতো না। কতদিন হাতের-পাতের খেয়েও গেছেন, কিছু মনে করে নি কেউ। একবার এসে ভান্নার বাড়ি দু-একদিন ছিলেনও। কি ব্যাপার? কলকাতার মধ্যেই আত্মীয়বাড়ি এগাড়া ওপাড়া, রাত কাটাবার দরকার কি?

প্রশান্তব মনে পড়ছে শোভনা খুব কাতর হয়ে বলেছিল, মামীরা ওকে দেখতে পারে না, চাকরের মত খাটায়, মদ্যনাড়া দেয়, বাতা বলে। সেখানে কখনো মানুষ থাকতে পারে? অবশ্য বিশুমামা দুদিনের বেশি তিনদিন থেকে প্রশান্তকে বিবর্ত করেন নি। আপন সংসারে মনোমালিন্য অচিরে মিটে গিয়েছিল। তবু শোভনা বিশুমামার মমতার অনেকবার প্রশান্তকে তড়া দিয়েছিল, বিশুমামাও জ্বন্তে একটা চাকরি যোগাড় করে দাও না গো! আরো কিছু করে না বলে সবার রাস। বা হোক একটা কিছু তোমাদের অফিসে কি কোম্পাও হয় না?

চাকরি বেন প্রশান্তব হাতের পাঁচ। আর কতবড় চাকুরে মেন প্রশান্ত নিজে! তবু বিশুমামার সুপারিশের ভেত্রে প্রশান্ত তখন মূখে অনেকবার দেখবো দেখবো বলেছে। মনে মনে জানে তাঁর কত পণ্ডিত বিশুমামা! চাকরি কববার যোগ্যতা কত!

বিশুমামা এমনি খুব নেটপটি ছিলেন! সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু, বিশেষ করে শোভনার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। শোভনা বিশুমামার পক্ষ নিয়ে নতুন জামাই প্রশান্তর কাছে একদিন মামাবাড়ির অনেক নিমন্ত্রণ করেছিল। বিশুমামার হয়ে বলবার কেউ নেই যে সংসারে। বেচারাকে কেউ দেখতে পারে না!

অবশ্য সেটা প্রথম দিনেই প্রশান্তর চোখে পড়েছিল। নতুন জামাই সে, তার আপ্যায়নের ঘটা খুব, কিন্তু তাতে ঐ বিশুমামারই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। বাজার-হাট, দৌড়-কাপ, সবই ঠেকে করতে হয়েছে। বোদিরা ওকে এক মুহূর্তও বসতে দেয় নি।

প্রশান্ত অথবা দু-একবার গিয়েও দেখেছে, বিশুমামার স্থানটা সংসারে বড় সঙ্কুচিত। ভায়েরা চাকরি-বাকরি করেন, তাঁদের বউ-এরা সংসার চালান, লোক-লৌকিকতা দেখেন, আর সবার ছোট বিশুমামা খেটে-খেটে মরেন। মামাবাড়ির সব ঘরে বিজলী পাখা, বাট-আলমারী—তেতলার সিঁড়ির ধারে খুপবী মত একটা ঘরে ছোট একটা তত্তোপোবে চাকড়া মত বিছানা পাতা বিশুমামার, না আলো না বাতাস। বেন বাড়ির চাকরের ঘর!

কারো হস্তো চোখে পড়ে নি, কি কেউ বেকার পোষের জন্যে মাথা ঘামাব নি। শোভনা মামার বাড়ি এলে কিন্তু ঐ বিশুমামার ঘরে গিয়ে অনেককণ কাটাতো, মামীরা অসন্তুষ্ট হ'তেন, 'কেন তোমার কি আর বসবার জায়গা নেই, গলদঘর্ম হয়ে গেছিস!' এখানে এসে বস না!

শোভনা তখন বলতে পারতো, কিন্তু সম্পর্ক যখন রাখবার জন্যে মামীদের মুখের ওপর বলে নি, কেন বিশুমামার ঘরে একটা পাখা দিলে কি তোমাদের সংসারের খরচ যত বাড়বে? সংসারের ও-ও তো একজন!

মামার বাড়ি যেত, আর ফিরে এসে শোভনা গজগজ করতো। মরবার সময় শোভনার দাদামশাই নাকি অনেক টাকা আব গরনা বিশুমামার জন্যে বউদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। সে-সব এখন নিজেরা পেটে পুরে বিশুমামাকে হেনস্তা করছে!

মামীদের সংসারে এখন কে কাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে দেখতে বড় ইচ্ছে করে! বিশুমামার জন্যে নিশ্চয়ই সেই পানরা-খোপের মত ঘরটা আন রেই! হয়তো বিশুমামাই এখন নিজের থাকবার জন্যে বাড়ি তৈরি করেছেন! গাড়ি যখন হয়েছে, বাড়ি কি আর হয় নি?

হঠাৎ বিশুমামা জিজ্ঞেস ক'বলেন, তোমরা সেই বাড়িতেই আছ তো?

অব কোথায় যাব? বেন আরেকপের সুবে বলতে চাইলে প্রশান্ত, কিন্তু মনে দিয়ে বেরিয়ে এল, হাঁ!

অনেক দিন আছ না ওবাড়িতে? বিশুমামা বেন খুব বিস্ময় বোধ করেন প্রশান্ত-দের এক বাড়িতে অনেকদিন থাকার দরুণ!

প্রশান্ত তেমনি কুণ্ঠিত সুবে বললে, হাঁ!

বিশুমামা তবু ছাড়েন না, ঐ বাড়ি থেকেই তো তোমার বিয়ে হ'বেছিল, না? বাড়িটা ভাল, তবে বস পুরনো আর ছোট!

প্রশান্তর ইচ্ছে হয়, ঐ সুযোগে বিশুমামাকে নিমন্ত্রণ করে তাদের বাড়ি আসবার জন্যে, গাড়ি-আছে যখন-কতক্ষণই বা সময় বাবে। কিন্তু না, মনের কোথাও বেন খোঁচা লেগে বিশুমামার জিজ্ঞাসাবাদটা বড় উশ্বত মনে হ'ব। এত জিনিস থাকতে তাদের বাড়ি-বা খোঁজ কেন?

এখন নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক হয়েছে? আর এক মোড়ে গাড়ি ধামিবে বিশুমামা জিজ্ঞেস ক'বলেন।

বেন তারা শহরেই বাস করে, না, এমনি মনে হয় বিশুমামার প্রশ্নটা।

প্রশান্ত বললে, এখনো কি বাকি আছে! কত গিয়ে ইলেকট্রিক হয়েছে গেল!

বিশুমামা হেসে বললেন, না তাই মনে পড়ল! মা আমার তখন কে'দেই অশিশু কিনা শহরের শব্দ-বাবাড়িতে হারিকেন লঠন জ্বলে! অভেস সেই তো জ্বলছে কখনো লঠন বাতি দেখাব!

শব্দ-বাবাড়িতে শোভনা কোনদিন মুখ ফুটে বলে নি সে অসুবিধার কথা। অস্তি-যোগও কিছু কবে নি, কেন নেই বিজলী আলো আর পাঁচটা বাড়ির মত। শহরবাব মাঝখানে থেকে কেন এই ব্যবস্থা আলোব?

তাহলে শোভনা আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে কোন্ প্রকাশ করতো? কৌতুক করতো

মাস্তাহিক বসুমত।

শব্দরবাড়িতে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলা নিয়ে? সুখে-দুখে যে শোভনকে এতদিন চিনেছে প্রশান্ত এ যেন সে শোভনই নয়! মনেমনে রাগ হয় প্রশান্তব।

বিশুমায়া বললেন, প্রথম প্রথম তোমাদের বাড়ি গিবে আমারও খুব অসুবিধে হত। একদিন তো তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে মাথা ঠুকে গেল।—হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়েছি কিনা, চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

প্রশান্ত মুখে হাসলে; মনে মনে বিশু-মায়ের তাদের বাড়ির আলো নিয়ে কৌতুককর অভিজ্ঞতায় ক্ষয় হ'ল। কেন যে সে সময় তাদের বাড়িতে তখনো বিজলী আলো আসে নি প্রশান্ত কিছুতে মনে করতে পারে না। মনেই করা যায় না কোনদিন তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না! প্রশান্তদেব বাড়ি ক'থা নিয়ে বিশুমায়া আর একটা প্রশ্ন করলেন, শোভা বলতো একটা বিস্ফট হলেই নাকি তোমাদের বাড়ির উঠানে একহাট্টা জল জমে যায়! এখনো জল জমে?

স্বাভাবিক ক'থা আজ এতদিন পবে জানতে পেরে প্রশান্ত রুষ্ট হয়। ঘরের ক'থা এমন কবে মামাদের কাছে গিয়ে বলে আসতো শোভনা? হি, হি!

অপ্রতিভতা কাটিয়ে প্রশান্ত সচেতন হয়ে বললে, আমাদের ওদিকটা নিচু কিনা, তাই একটু বৃষ্টিতে জল জমে।

বিশুমায়া হাসলেন, এখন উ'চু-নিচু কিছু নেই, সব সমান।

প্রশান্ত কিছু জল উ'চু-নিচু'র কাণে বিশুমায়াকে বোঝাতেই চাইলে, বললে, আজ-কাল কলকাতায় সব জায়গায় জল জমে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই—

কথাটা বিশুমায়ার যেন মনে পড়ে গেল, বললেন, যা বলেছ বৃষ্টির সময় আজকাল রাস্তায় গাড়ি বাব কবাই যায় না! কোথায় যে আটকা পড়তে হয় তাব ঠিক নেই।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে, বিশুমায়া ঠিকই ঘলছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির চিত্রটা চোখে ওপব ভেসে উঠল প্রশান্তব, করুণ ছাব দীন যেন এখনো। আজো বর্ষার রাস্তার নোংরা জল এসে তাদের উঠানে ঝেঁঝে কবে বৃষ্টি থেমে যাবার পৰ্বও কতক্ষণ লে-জল নিকাশ হয় না। প্রথম বর্ষা হয়ে এসে শোভনার খুব ঘেন্না করতো; এখন মল্লপ পবিসব ঘবে ভিজে চল, ভিজে বাপডেব গত সহ্য হ'য়ে গেছে, গল্ফটা আব নাকে লাগে না। সত্যি প্রশান্তদেব বাড়িটা ভাল নয়, সেই কতদিন থেকে একই বাড়িতে তাবা বাস করছে। পূর্বনো, বিবর্ণ তালি-দেওয়া জুতোব মত বিনা আয়্যাসে পা ঢুকিয়ে হাটা যেন।

এবার বিশুমায়া অভিভাবক করলেন, একটা বাড়িটাড়ি কব এবার।

প্রশান্ত মনে মনে হাসলে, হাঁ, বাড়ি করার অবস্থাই বটে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

শুভানুযায়ী মত বিশুমায়া বললেন, দিনদিন জায়গাজমির দাম বা বাড়ছে, এই-বেলা না কবলে আর পাববে না। বেয়লায় কচু বন ঘেটু বন তাই কিনা পাচ হাজার ছ-হাজার। কলকাতাব প্রপারে তো পাবেই না।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জায়গাজমি নিয়ে বিশুমায়া বোধহয় করার করছেন। এক নিম্নয়ে তিনি শহরের আশেপাশে অনেক খাল জমির সংবাদ দিলেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ তাঁব দৃষ্টির বাইরে নয়, আরো ছটা দিকের ফাঁকা জমির সম্ভানও বোধ হয় তাঁর জানা আছে।

বিশুমায়া হঠাৎ আপশোসেব সুরে বললেন, ইস্-স্ একটা জায়গা খুব সস্তায় হাতছাড়া হ'য়ে গেল। তোমাকে খবর দিলে হত বস্ত ভুল হ'য়ে গেছে!

প্রশান্ত মামাব ভুলের জন্যে মনে মনে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হ'ল। এসময় বিশু-মায়ী কিনতে বললে কি রাজী না হ'য়ে পারতো। তবপরি জমির মূল্য বোগাড় করতে ঘটি-বাটি বাঁধা দিবের রেহাই পাওয়া যেত না। সমরকাকাব বাড়ি করার কথাটা প্রশান্ত ভোলে নি। সমরকাকা এই সৌদীন নিজের বাড়িতে অবশ্য দেহত্যাগ কবেছেন, কিন্তু তাঁর শ্রাম্ধ-শান্তিব জন্যে আত্মীয়স্বজনকে চাঁদা

ভুলে খবচ করতে হ'য়েছে। বাড়ি কবে সমব-কাকা বড় দুবসখায় পড়েছিলেন, অফিসেব দেনা শোধ কবতে না কবতে, প্রকৃতিব দেনা তাঁকে শোধ কবতে হ'য়েছে, মাবাই গেলেন দুশ্চিন্তাব আব অধাহাবে। বাড়ি কবে মববেন বলে' সমবকাকা জানতে পেরেছিলেন, বলেছিলেন, সর্বস্ব খুইয়ে পাকা শেবতান। বাড়ি কবা একটা নেশা আমাদের মত অবস্থাব লোকের পক্ষে। কুলিমজুর ছোটলোকের ঘেনো খেবে মাত্লামি। কি হ'ল। এখনো বাইবে বালিব কাজ কবতে পাবল্য না, ছাদের সিঁড়ি সম্পূর্ণ হ'লো না?

বিশুমায়া বললেন, থাক গে, আবা আছে আমাব সম্ভানে, বল কবে দেখতে চাও।

হঠাৎ প্রশান্ত যেন নেশাখোরের মত হ'য়ে গেল। বললে, আমাব আব কি দেখবাব আছে? আপনার মেয়ে কি আপনি দেখলেই হবে।

বিশুমায়া বোধ হয় জায়গাজমিব দালালীই করেন, যেন একটা শাসাল মজেল পেয়ে গেছেন, বললেন, বেশ, কবে শোভাকে দেখাবো বল?

মন মনে লুকোচুরি লোভ সামলাতে পারে না প্রশান্ত। যেন এতকাল খেয়াল কবে নি বলেই বাড়িঘর হয় নি, বললে, আপনাব বেদিন সুবিধে।

বিশুমায়াব অভিজ্ঞতা এবং কর্মপ্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা নেই। বললেন, এখন যাতেই

**সৌন্দর্যের কোমলতা ও
সজীবতা রক্ষার জন্য
কোন্ড জ্রীম অভ
রোজেজ**



শীতে শুষ, হাত ও পায়ের
বসখসে ভাব দূর ক'রে
আপনার ত্বকে নরম ও
যোলায়েম রাখতে হ'লে
স্নেহপদার্থ সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ
গন্ধযুক্ত কোন্ড জ্রীম অভ
রোজেজ ব্যবহার করুন।
নিত্য ব্যবহারে আপনাকে
আরও জ্রীময়ী ক'বে তুলবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই
কানপুর

হাত দেবে, লাগ হ'য়ে যাবে! টাকা যেভাবেই মাড়াচাড়া কর কিছু আসবেই! দেখেছিলে তো তখন আমাদের সোহাগ কারবার, 'অত পরমা ঢেলা হ'য়েছিল—কিছু হ'য়েছিল? কিছু নয়! আর এখন? জারগা কিনে ফেলে রাখলেও কাজে দেবে! দু'চার কাঠা বেচে তোমার বাড়ি হ'য়ে যাবে!'

হঠাৎ গর্তে পড়ে গাড়িটা লাঞ্ছিত উঠলো, 'বিশ্বমামা সামলে নিলেন। বিষম হ'য়ে বললেন, রাবিশ! রাস্তাঘাটের যা অবস্থা হ'য়েছে, গাড়ি নিয়ে চলা যার না! ট্যাক্সের বেলায় ঠিক আছে!

গতটা বড়ই ছিল, বিশ্বমামা লক্ষ্য করেন নি। স্বাক্ষরিত বৈশিষ্ট্যেই লেগেছে। গাড়ি ধাক্কা দিয়ে বিশ্বমামা নেমে পড়লেন—ঘুরে ঘুরে গাড়িটা দেখলেন। তাবপর গাড়িতে উঠে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বললেন, নতুন গাড়ি অবশ্য কিছু হ'বে না, ভবু দেখলুম কোন স্প্রিংটিং গেছে কিনা! বড় শখের জিনিস!

কি মনে করে প্রশান্ত বললেন, আপনাদের গাড়িটা কিন্তু বেশ ভাল!

বিশ্বমামা হাসলেন। ভাল কি এমনি, গাড়ির পেছনে অনেক ষাটতে হয়। বৌদিরা উত্তা বলেন, গাড়ির জন্যে নাকি আমি বিয়ে করছি না!

প্রশান্ত মনে মনে হিসেব করে দেখল, বয়সের দিক থেকে বিশ্বমামার আর বিয়ে করা চলে না। কিন্তু যখন চলেতো তখন ঠিক ভাজে-গ্লাই বলতো, কে মেয়ে দেবে সাতভাগের এই একটা বাড়ি দেখে কেবল? বাংলা দেশে মেয়ে অত সস্তা নয়!

কথটা অবশ্য সত্যি নয়। তখন শোভনকে কি পাগলামিতে পেরেছিল—বিশ্বমামার কিরের জন্যে দিনকতক সে খুব ছোটোছোটো করেছিল। তার পর একদিন নিজে থেকেই কান্ড দিয়ে বলেছিল, বিয়ে দেবে কে? ভরজবাই ভাঙটি দিচ্ছে। সবাই জমনি চাকরি ক'বে হবে বিয়ে করে? মামাসেব কি করে বিয়ে হ'য়েছিল, সব লাট-সাহেবের চাকরি করতো? জানতে আর বাকি নাই!

এখন প্রশান্ত যেন শোভনের অসমাপ্ত কত'বাটা করতে চায়—সত্যিই তো, আপনি এখনো কিরে করছেন না কেন?

বিশ্বমামা হেসে বললেন, কেন এই তো কবেই!

স্ট্রিটলিং-এ মুখ রেখে বিশ্বমামা গাড়িটাকে যেন আদব করে নিলেন। তাব পর সগর্বে বললেন, জমনি এই গাড়িটাকে আমি কোথা থেকে পেরিয়েছি?

প্রশান্ত - অবাক হ'য়ে এদিক-ওদিক চাইলে, গাড়িটার কোথাও লেখা আছে নাকি পিতৃপরিচয়?

এক গ্রীক সাহেব আমাকে দিয়ে গেল। অসোচ্চ 'বিশ্বমামা' গাড়িটা আমার খুব

আদরের, তুমি একে দেখো! পাঁচ হাজার টাকা গণে দিয়েছি; ঠিকি নি কি বল?

সবিস্ময়ে প্রশান্ত বললে, আমি তো মনে করছিলাম নতুন কিনেছেন—বিলে থেকে আনিয়েছেন বোধ হয়! ঠকা কি বসছেন?

বিশ্বমামা হাসতে লাগলেন। গাড়ি নয় প্রেরসী, সহর্মিণী!

বিশ্বমামা বললেন, আর একটা গাড়ি কিনবো, একটোতে আর চলে না, সবাই নিয়ে টানাটানি করে। নতুন দশী গাড়ি কিনবো না, পুরনো মেকারী গাড়ি কিনবো! আছে নাকি তোমার সম্মানে কোন? দেখো না!

এ যেন আদার ব্যাপারকে জাহাজের শেজ নিতে বলা! ভবু প্রশান্ত ছোট হ'লো না মুখে, যেন গাড়ির দালালী করে—বললে, সেদিন একটা গাড়ি বিক্রি হ'লো কর্মিশন ভাল ছিল, দামও বেশি নয়! জানলে আপনাকে বলতুম!

বিশ্বমামা বললেন, কার গাড়ি? সাহেবের না বাঙালীর?

খাস্ বিলিভী সাহেবের, আমাদের হ্যাঁবিসান কোম্পানীর সৈলস্ ম্যানেজারের। চুক্ চুক্ করে' বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে, এবাব সম্মানে এলে বোলে!

মনে মনে প্রশান্ত খুব জানে এই গাড়ি থেকে নেমে তার বাড়ি পৌঁছতে যতটুকু সময় লাগবে, তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তাবা পরস্পরকে ভুলে যাবে। আগে শোভনা কত আত্মীয়বন্ধনের বাড়ি যেত, গল্প-গুজব, আমোদ আহলাদ সুরতো, এখন সে নিজের ঘরটি, নিজের সংসারটি ছাড়া আর কোথাও নড়তে চায় না।

প্রশান্তও নড়ে না। কিন্তু সে অন্য কারণ। অর্থসামর্থ্যের হীনতা, অপরাধিতা! কেবল বিশ্বমামা নয়, আশেপাশে আরো অনেকে তাদের ভুজ করে দিচ্ছে। হীনমন্যতার একশেষ হ'য়েছে। নিজের ওপর নিজের বাঁতপ্রম্বা দিন দিন বাড়ছে—সব ভয়তে কেমন যেন মুখলুকোন তাব হ'য়েছে। এখন কেবল বয়স হিসেব করে' করে' দেবের ওপর অবস্থান্তরের সাশা! অশুভ একটা নিব্দপার নৈবাশা!

বিশ্বমামাসেব সগে সস্বন্দ একরকম উঠেই গেছে। আরো দু'রহটা বেড়েছে, সবাই ছোট বিশ্বমামা - ভদ্রলোকের মত রোজগার করতে আবন্দ করা থেকে। হঠাৎ একদিন শোভনা মামাবাড়ি থেকে সগর্বে উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এসে বলেছিল, বিশ্বমামা বা কান্ড করেছেন!

কান্ডটা আর কিছু নয়, ব্যবসাটা কে'পে উঠেছে, একটা অশুভ রহস্য কেউ যেন ধবডে পাবে না কি, কিন্তু জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সব বস্তুই তাতে ল্যভ হ'চ্ছে।

মামাবাড়ির হঠাৎ ঐশ্বর্যের ছটার শোভনা বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল, মাকে মাকে তুলনা করে বলতো, কি ছিল কি

হ'য়ে! এখন ঘরে ঘরে পাখা, খাবার-তাখ্ণ্ডা রাখা মোশিন, চান সুরবার ফোয়ারা, ফ্রিনিস-পত্তরে ঠাসা! তারপর একদিন শোভনা 'কি ডেবে আপনা থেকেই চুপ হ'য়ে গিয়েছিল! মামাবাড়ি যাবার নাম করে নি আজ বেশ কয়েক বছর! হযতো তুলনায় তার নিজেকে ছোট মনে হ'য়েছিল!

ছোট আজ তার নিজেকেও মনে হয় প্রশান্তর। সেই বিশ্বমামা আজ কি হ'য়েছেন! ভাগ্যচক্র কেমনভাবে ঘুরে গেছে! শোভনার সুপারিশে যদি বিশ্বমামা সেদিন প্রশান্তের অফিসে একটা চাকরি পেত, তা হ'লে কি এমনি গাড়ি চড়তে পারতো, না কাউকে চড়াতে?

বিশ্বমামা বললেন, ভাল কথা মনে পড়েছে, যাক তোমার সগে দেখা হ'য়ে গেল, ভালই হ'ল! একটা হিসেব রাখবার লোক বোগাড় করে দিতে পার? তোমাদের অফিসে তো অনেক কেবানী আছে! পার্ট টাইম হ'লেও চলেবে।

প্রশান্তরও চলে। টুইশানিতে আজকাল বড় ভিড়, প্রতিযোগিতা, নানা ব্যয়নাক্ষা! কিন্তু নিজের জন্যে প্রশান্ত বলতে পাবে না। ভাগ্যে বিশ্বমামা তাব মুখের ওপর তার অভাবটা পড়তে পারছেন না, তার মনটা প্রত্যক্ষ কবতে পারছেন না! জানতে পারলে সে বড় লজ্জার হ'তো, ছি, ছি!

প্রশান্ত বললে, দেখবো! কত মাইনে দেবেন?

কত আর একশ' কি একশ পাঁচ-দশ! বিশ্বমামা চোখের তুলিটা নামিয়ে যেন প্রার্থীকে বাজারে নিতে চাইলেন।

আর প্রশান্তই যেন প্রার্থী, মুখ নামিয়ে নিয়োগকর্তার মনোভাব অনুধাবন করতে চাইলে।

বিশ্বমামা বললেন, কাজ কিছু নেই, বসে বসে কেবল খাতা কপি করা! মাছিমারা আর কি!

প্রশান্ত ক্ষুব্ধ হ'ল! কথটা যেন তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন বিশ্বমামা! কেরানীগিরি সেও করে।

বিশ্বমামা আজ সর্বজ্ঞ, সব কাজের নাড়ি-নক্সর জেনে ফেলেছেন। চাকরি নিয়ে বিশ্বমামা কৌতুক করলেন, তোমাদের মত চাকরি করলে আর ভাবনা ছিল কি! এ এক স্বামেলা, রোজগার করেও শর্মিতে নেই, কাগজ-পত্র ঠিক রাখতে জান থেকে দেখ। আজকাল যা হচ্ছে, রাবিশ! তোমরা বেশ আছে!

চুপ করে' প্রশান্ত যেন বলতে চাইলে একবার থেকে দেখুন না? এ-বেশ আর সহ্য করতে পারছি না! এ ব্যঙ্গ না প্রশান্ত? কথটা যেন হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল প্রশান্তর। বিশ্বমামার আশ্বিন পাঞ্জাবীর ফাঁকি দিয়ে কাবে ওপব নতুন গেঞ্জীর জালিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বড় সুন্দর, চিরকল্প! শোভনার মামাবাড়িতে কি একটা কাজ

প্রেম

সুদৃশিতকান্তি রায়

সুদৃশিতকান্তি রায়

বকের ভিতর

নিখুঁত বেন হেম

একরসি প্রেম

একটি বেলের পাতা

আমি ঘুটের ঢাকা

বেবাক ফাঁকা

মাঠে বিসর্জন

এক টুকরো মন

দুর্বাধাসের লতা

বলের পাতা অশ্বকারে

বিরাত ফাঁকা শূন্য নীলে

ঘুটী-ঘোরে ঘোরে

কি এসে যায়?

লতার দেহ খাচ্ছে কুরে

আজো ঘুটের পোকার,

হলেই বা কি?

ঘুটের বোঝা সরিয়ে নিলে

হবেই মাখামাখি

লতা এবং পাতার।

সুদেহের সময় প্রশান্ত গিরেছিল। সেদিন শোভনা সশ্রমে ছিল না। নতুন জামাই, মামী-শাশুড়ীরা খাতির করে ধরে রেখেছিলেন, আপ্যায়নও যথোচিত করেছিলেন। সেদিন অনেক অজুহাত দেখিয়ে প্রশান্ত মামামশ্বশুরবাড়ি রাত্রিবাস এড়াতে পারে নি। শালীরা খুব হাসাহাসি করেছিল, জামাইবাবুকে সৈন্য আখ্যা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতেই হ'য়েছিল প্রশান্তকে।

খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ চুকে গেছে; প্রশান্ত তখনো দিবা শালীদের সন্তোষ বসে গল্প করছে, বেন রাতটা সে গল্প করেই কাটিয়ে দেবে।

একসময় বিশুমায়া এসে বললেন, কি বাবাজী এখনো যাবার মতলব নাকি? গ্রাম-বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে শূন্যে পড়।

পা ঘসে প্রশান্ত বললে, এই যে।

শুভবাণী কামনা করে শালীরা চলে গেল। তেতলা বাড়ির নিচের তলার বাসনকোসন নাড়চাড়াব শব্দ হল। বিশুমায়া বললেন, তুমি খাটে উঠে শোও, আমি মেজের শূঁছি।

এদিকে প্রশান্তের জামা-কাপড় ছাড়ার কোন আগ্রহ নেই, বসেই আছে। বললে, খাটেই একসঙ্গে শূঁই আসুন না।

হঠাৎ বিশুমায়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর প্রশান্ত দেখলে এই সুযোগ। পট করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গায়ের জামাটা খুলে, ভেতরের শতছিন্ন গেঞ্জীটা পট্টার ছাল-ছালানব মত মাথা গলিয়ে টেনে বার করে ফিপ্র হাতে দল্য পাকিরে বালিসের তলার গুঁজে দিল। তারপর দম বন্ধ করে খাটের উপর লম্বমান হ'য়ে শূন্যে পড়ল।

অশ্বকার ঘবে ঘিরে এসে বিশুমায়া জিজ্ঞেস করলেন, কি বাবাজী শূন্যে?

প্রশান্ত বললে, না।

তারপর স্নেহ-অবস্থার কথাটা প্রশান্ত অনেকদিন ভুলতে পারে নি। পরিপাটি শালীরা তলার ঢাকা ছেঁড়া গেঞ্জীর লম্বজার

সেদিন সে 'ধরণী-শিখা' হ'তে বলেছিল, চোরের মত মুখ লুকতে চেয়েছিল। ঘটনাচক্র এমন যে, সেই বিশুমায়াই আজ পাশে আছেন। কিন্তু গঙ্গার জল অনেক গড়িয়েছে, উঁচু-নিচু অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। আজ অবশ্য জামাব ভেতর প্রশান্তের গেঞ্জীটা আশুতই আছে। সেদিন কাক ডেকে ডোব হবার আগেই প্রশান্ত মামামশ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। ছেঁড়া গেঞ্জীটা বাতিল করবার আগে অনেকবার ঘটনাটা মনে হ'য়েছিল। পবে শালীরা দেখা হতে রহস্য করে বলেছিল, জামাইবাবু, কি ভীতু, বাম্বা! দিদির অরে একেবারে রাত থাকতেই দৌড়।

এতদিন পরে হঠাৎ প্রশান্তের মনে হল, সেদিন বিশুমায়া বোঝ হ'য়ে তার সঙ্কোচের কাবপটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই অকারণে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার লম্বজার কারণটা গোপন করার সুবিধে করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিনকার নতুন জামাইদের লম্বজাটা আজ জেনেশূন্য প্রকট কবে দিতে বিশুমায়া প্রস্তুত কবলেন, চল, তোমাদের বাড়ি যাই, মাকে দেখে আসি।

ঠিক আজকের মতই সেদিন প্রশান্ত মামামশ্বশুরবাড়ি রাত্রিবাস করতে চায় নি, চোবের মত মুখ লুকতে চেয়েছিল।

প্রশান্ত নির্জলা মধ্যে বললে, শোভনা তো নেই, দেশে গেছে।

হঠাৎ এ সময়? বিশুমায়া বললেন।

শবীরটা ভাল বাজছিল না, তাই পাঠিয়ে দিলুম। প্রশান্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললে।

বিশুমায়া আর কিছু বললেন না। হঠাৎ তারি আজ আর তেমন আগ্রহ নেই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাবার। এমন বললেন। সময়ই বা কোথায়?

নিজের বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ মিনিট পথের মাঝখানে নেমে পড়ে প্রশান্ত বিশুমায়া কাছে বিদায় নিয়ে বললে, শোভনা এলে আপনাকে খবর দেবে।

স্বামীকে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে বাড়ি ফিরতে দেখে শোভনা বেশ অবাক হ'য়ে গেল। এখনো কলের জলে সুতো কাটছে, গলির খুঁদে ছেলেরা খেলছে; উনুনে উনুনে আঁচ পড়ছে। কুখড়োব ফালি আকাশটার আলো আছে।

শোভনা সাগ্রহে জিজ্ঞেস কবলে, কি ব্যাপার। আজ এত তাড়াতড়ি এলে যে?

প্রশান্ত বেন সহস্রো বলতে চাইলে, একটা মস্ত কান্ড সে করেছে, একটা বাহাদুরি। সে বলে' তাই। কিন্তু অক্ষুটে মুখ দিয়ে বেবিয়ে এল, কেন আসতে নেই?

না, তাই জিজ্ঞেস করছি। কোনো দিন ভেে আস না। বেশ খুশি খুশি মনে হয় শোভনাকে, ঘরো লোক মত তাড়াতড়ি পাতে ঘরে ফিরে আসুক।

প্রশান্ত উত্তর পেরিয়ে ঘরের রোরকে উঠল। শোভনা বেন সেই কবেকার ছেলেমানুষের মত হ'য়ে উঠেছে, সকাঁত-হল প্রস্তুত কবলে আজ ট্যান্সি করে' এলে বদ্বি।

কেন?

না, যা ভিড় আজকাল ট্রেনবাসে শূন্য তো। সেদিন মামারবাড়ি যাব ভাবলুম যাওয়া হল না।

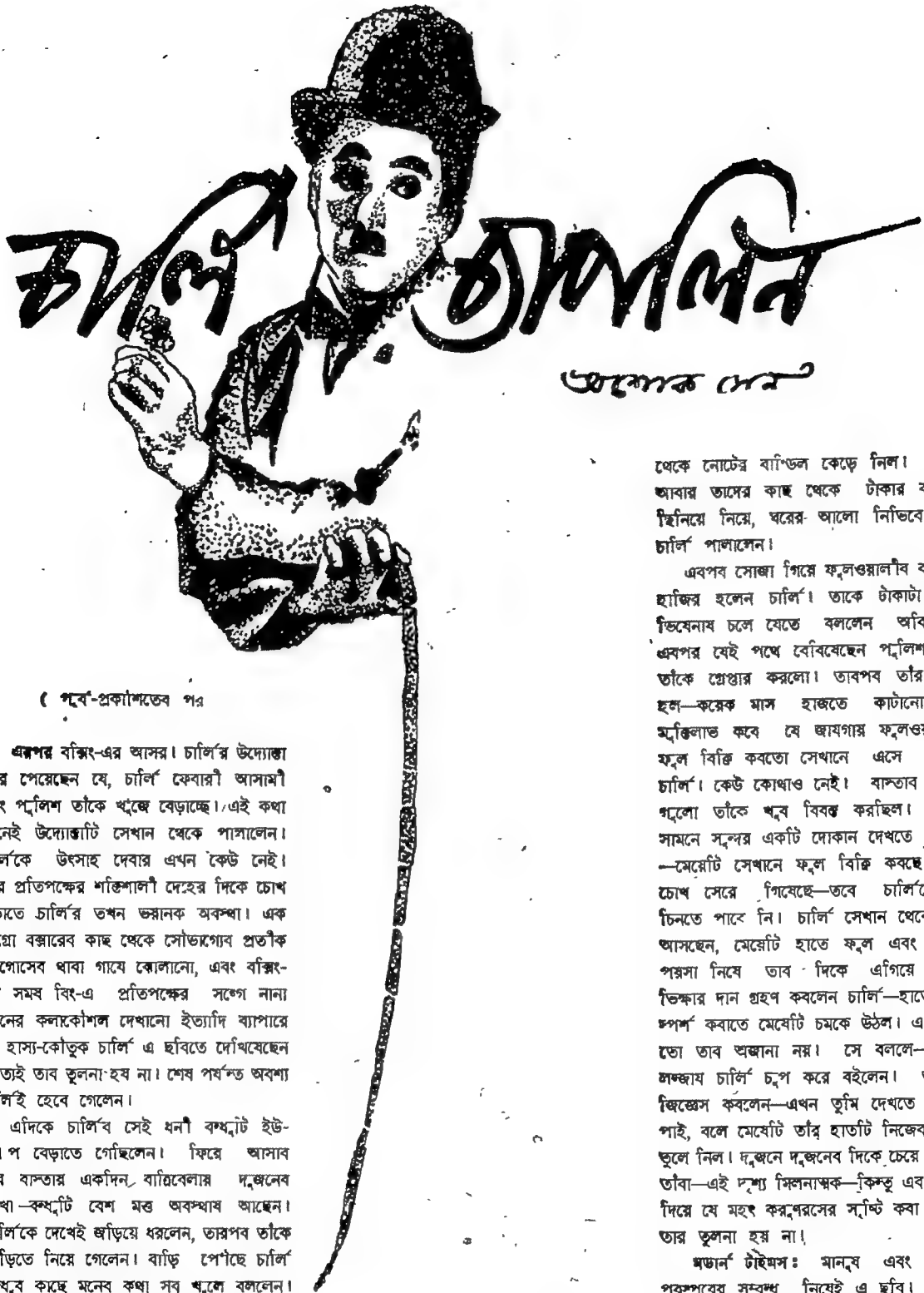
হু! বলে' প্রশান্ত ঐ শেওলা-বহু রোরাকটাব মত গম্ভীর হ'য়ে গেল।

স্বামীকে অতঃপর ভোলাতে বেন শোভনাকে ভেবে পেল না, স্বামী তাব হঠাৎ বিবৃদ্ধ হ'লো কেন। তা হ'লে কি ট্যান্সির কন্ড বলতে অপব্যবের কথাটা মনে পড়ল? তাই দৃশ্য।

স্বামীর মুখের ওপব চেয়ে শোভনা কাছে সবে এসে লম্ব কর' বললে, ভাড়টো আমি দিয়ে দেব গো। অত ভাবনার কি আছে?

হঠাৎ প্রশান্ত জ্বলে উঠলো, সবাই দেহ অমনি! পরসা দেখার?

স্বামীর এ রাগের কারণও শোভনা বুঝতে পারে না। মেজাজও না।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এরপর বক্সিং-এর আসর। চার্লিস উদ্যোক্তা খবর পেয়েছেন যে, চার্লিস ফেবারী আসামী এবং পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই কথা শুনেই উদ্যোক্তাটি সেখান থেকে পালালেন। চার্লিসকে উৎসাহ দেবার এখন কেউ নেই। তাঁর প্রতিপক্ষের শক্তিশালী দেহের দিকে চোখ পড়তে চার্লিস তখন ভয়ানক অবস্থা। এক নিম্নো বজ্রের কাছ থেকে সৌভাগ্যব প্রতীক স্বপ্নগোসেব ধাবা গায়ে কোলানো, এবং বক্সিং-এর সমস্ত বিং-এ প্রতিপক্ষের সন্তোষ নানা ধরনের কলমকোশল দেখানো ইত্যাদি ব্যাপারে যে হাস্য-কৌতুক চার্লিস এ ছবিতে দেখিয়েছেন সত্যিই তাব তুলনা হয় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চার্লিসই হেবে গেলেন।

এদিকে চার্লিস সেই ধনী বন্ধুটি ইউ-বো প বেড়াতে গেলেন। ফিরে আসার পর বাস্তব একদিন, ব্যারিবেলার দুজনের দেখা—কথুটি বেশ মস্ত অবস্থায় আছেন। চার্লিসকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন, তারপর তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ি পেঁচে চার্লিস বন্ধুর কাছে মনের কথা সব খুলে বললেন। বন্ধু সে কথা শোনামাত্র কয়েক প্যাকেট নোট তাঁর হাতে দিয়ে বললেন টাকার জন্যে কিছু আটকাবে না। এদিকে কয়েকজন চোর সে ঘরে বসে ছিল—তারা এদের দুজনের মাথাঘ ডান্ডার বাড়ি মেবে অজ্ঞান করে ছিল এবং কিছু দামী আসবাবপত্র নিয়ে সরে পড়ল। নোটগুলোর সম্মান অবশ্য তাবা পায় নি।

জ্ঞান হবার পর কোর্টপাতি ভদ্রশোকের নেশা ছটে গেছে। চার্লিসকে দেখে তিনি

চিনতে পারলেন না—তাব ওপর তাঁর পকেটে নোটের তাড়া—চাকবদেব ডাক পড়ল, পুলিশে খবর দেওয়া হোল। চার্লিস দেখলেন মহা-মুস্কিল—এবা তো টাকাটা কেড়ে নেবে—তখচ এ টাকাটা মেয়েটির চিকৎসার জন্য দরকার। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি সারা ঘরে ছুটোছুটি কবে বেড়রতে লাগলেন। এর ভেতর পুলিশ এসে গেল। তারা চার্লিস কাছ

থেকে নোটের বাণ্ডিল কেড়ে নিল। কিন্তু আবার তাদের কাছ থেকে টাকার বাণ্ডিল হিঁচিয়ে নিয়ে, ঘরের আলো নিভবে দিয়ে চার্লিস পালালেন।

এবপর সোজা গিয়ে ফুলওয়ালীর বাড়িতে হাজির হলেন চার্লিস। তাকে টাকাটা দিয়ে ভিষেনার চলে যেতে বললেন অবিলম্বে। এবপর সেই পথে বেবিবেছেন পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করলো। তাবপর তাঁর জেল হল—কয়েক মাস হাজতে কাটানোর পর মুক্তিলাভ হবে যে জায়গায় ফুলওয়ালীটি ফুল বিক্রি করতো সেখানে এসে হাজির চার্লিস। কেউ কোথাও নেই। বাস্তব ছেলে-গুলো তাকে খুব বিবস্ত করছিল। হঠাৎ সামনে সুন্দর একটি দোকান দেখতে পেলেন—মেয়েটি সেখানে ফুল বিক্রি করছে। তার চোখ সেরে গিয়েছে—তবে চার্লিসকে সে চিনতে পারে নি। চার্লিস সেখান থেকে সরে আসছেন, মেয়েটি হাতে ফুল এবং একটি পয়সা নিয়ে তাব দিকে এগিয়ে এল। ভিক্টর দান গ্রহণ করলেন চার্লিস—হাতে হাত স্পর্শ করতে মেয়েটি চমকে উঠল। এ স্পর্শ তো তাব অজানা নয়। সে বললে—তুমি? লক্ষ্য চার্লিস চুপ করে বইলেন। তাবপর জিজ্ঞেস করলেন—এখন তুমি দেখতে পাও? পাই, বলে মেয়েটি তাঁর হাতটি নিজের হাতে তুলে নিল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছেন তাঁবা—এই দৃশ্য মিলনাস্থক—কিন্তু এব ভেতর দিয়ে যে মহৎ করুণারসের সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনা হয় না।

মডার্ন টাইমসঃ মানুষ এবং মনের পক্ষপাতের সম্বন্ধ নিয়েই এ ছবি। চার্লিস ঠিক করলেন এটিও নির্বাক ছবি হবে। গানের ব্যাপার অবশ্য তিনি সাউন্ডের ব্যবহার করেছেন—কিন্তু তাবও উদ্দেশ্য ছিল সবাক ছবিকে ঠাট্টা করা।

ছবির প্রথম দৃশ্যটিই চার্লিস সুন্দর শিল্পমনের পরিচয় দেয়। দৃশ্যটিতে দেখা যায় একপাল ভেড়া খাড়াখাড়া করতে করতে এগিয়ে চলেছে—এ দৃশ্য মিলিয়ে গিয়ে তাব জায়গায় ফুটে ওঠে একদল শ্রমিক কারখানাতে

কাজ করতে বাচ্ছে। শ্রমিকদের ভেতর একজন হচ্ছেন চার্লি। এখানকার সুস্বাদু ইশিগতটা কারোর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত নয়।

চার্লি'র কাজ বস্তু লাগানো—সমস্ত দিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রেস্তোর সাহায্যে তিনি বস্তু লাগিয়ে চলেছেন। সামনেই কনভেইর বেল্ট। একবার পা পিছলিয়ে গিয়ে ঐ বেল্টে উপর পড়লেন চার্লি—বেল্টটা তাকে টেনে নিয়ে বেতে লাগল নিশ্চিত মরণের দিকে। যাক বহু চেষ্টা করে তাকে উদ্ধার করা হলো। কয়েকদিন বাদে আবার মেশিনে কাজ করতে গিয়ে চার্লি আর তাঁর এক সহযোগী মেশিনের চাকা'র আটকে গেলেন। প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে এ সব দৃশ্যে।

এরপর টিকিন খাবার সেই মজার দৃশ্যটি। মালিক ঠিক করলেন শ্রমিকদের নিবাস্ত্রিক খাবার সময়টা সংক্ষেপ করিয়ে দিতে পারলে—তাবা বেশ সম্ভব কাজ করতে পারবে এবং তার ফলে প্রভাৎসন বেড়ে যাবে। একটা যন্ত্র আনা হোল যেটা এসে শ্রমিকদের খাবার খাইয়ে দেবে। চার্লিকে নিয়েই প্রথম পরীক্ষা শুরুর হোল। তাকে সেই যন্ত্রের ভেতর শাঁসিয়ে দেওয়া হোল। যন্ত্রের ভেতর সারি সারি কাটা-চামচ, তোষালে ইত্যাদি রয়েছে। বোতামে প্রেস করলেই দুটি হাত বোয়িয়ে এসে কাটা-চামচ দিয়ে শ্রমিকদের খাইয়ে দেয়। একটু পরেই কল বিগড়োল। সুপের বাটি চার্লির গায়ে উল্টে পড়লো। নাট আন বস্তু ক্রমাগত এসে খাবার পাত্রে পড়তে লাগলো, আর কাটা-চামচ সেগুলো চার্লির মুখে গুঁজে দিতে লাগলো—সে এক বিতর্কিচ্ছ ব্যাপার। হাসতে হাসতে দর্শকদের দম ফেটে যাবার যোগাড় হয়। অবসর সময় কমানোর ব্যবস্থা তো বাতিল হবে গেল। এরপর কারখানার প্রায় সব জায়গায় পদা টাঙিয়ে দেওয়া হোল—আলিকের একটি চলচ্চিত্র তুলে তাতে প্রতিফলিত হতে লাগল—যাতে শ্রমিকেরা সব সময় মালিককে সামনে দেখতে পান এবং ভবে কাজে অবহেলা না করতে পারেন। চার্লি একটু নিরিবিলিতে সিগারেট খাচ্ছেন—সামনে দেখেন মালিকের ছবি, ভয়ে তিন পা পেঁচিয়ে এলেন। ক্রমাগত এই ভয়াবহ আব-হাওয়ার ভেতর থাকতে থাকতে শেষে উন্মাদ হবে গেলেন চার্লি। দুটো রেশ নিয়ে কাব-খানার সর্বত্র ছোটোছোট শব্দ করে দিলেন—চোখের সামনে বস্তু'র আকাবের যা কিছু দেখতে পান রেশ দিয়ে এ'টে দেন। এবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হোল। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে চার্লি জানতে পারলেন যে তাঁর চাকরী গিয়েছে।

অনেক চেষ্টার পর যদি বা নতুন কাজ একটা জুটল প্রথম দিনেই সেখানে ধর্মঘট শুরুর হোল। কি আন করেন, বাস্তব বোঝে এলেন। দেখলেন একটা লরি যাচ্ছে—চুপি চুপি তার পেছনে উঠে বসলেন চার্লি। লরির

ভেতর ছিল বিস্ফোরক—পান্থ—হঠাৎ এক-শ্লাসন হওয়াতে চার্লি ছিটকে গিয়ে রাস্তার পড়লেন—সেই সঙ্গে বিপদের সংকট লাগল। গাটিও এসে তাঁর সামনে পড়ল। চার্লি পতাকাটা তুলে নিয়ে দোলাতে লাগলেন চালকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিল—পুলিশ এসে দেখল চার্লির হাতে লাল ঝাড়া, সুতরাং তাকেই বিং-লীডাব ভেবে ধরে নিয়ে গেল।

বিচারে কয়েক মাস জেল হয়ে গেল চার্লি'র। হঠাৎ একদিন দেখেন কয়েকজন বন্দী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চার্লি তাদের বাধা দিলেন। কতৃপক্ষ এ শব্দ জানতে পেবে মহা খুশি—কয়েক দিন বাদেই তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হোল।

অনেক কষ্টে জাহাজ মেরামত করবার একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন চার্লি। জাহাজ ঘাটে পলেটের সঙ্গে আলাপ। সসোরে আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। চুরি করেই তার জীবিকা নির্বাহ হয়। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াজে। চার্লি এবার ভুল করে একটা ভাঙা জাহাজকে জলে নামিয়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটা গেল ডুবে। তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হোল। রাস্তার বোঝে পড়লেন চার্লি—হঠাৎ পলেটের সঙ্গে দেখা। দুজনে কথাবার্তা বলছেন এমন সময় পুলিশ এসে হাজির। তাবা পলেটকে জাহাজ থেকে মুক্তি এবং কল্যা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করতে চায়। চার্লি তাদের বোকাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনিই আসল অপরাধী—কিন্তু তাঁর কথায় তারা বিশ্বাস করলো না। পলেটকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললো। এরপর চার্লি কখনো কি একটি রোস্টারার ঢুকে দামা দামা খাবার-দাবার খেবে, পরে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে কোনও পয়সা নেই। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে বে ওয়গানে তুললো সেটিতেই পলেটও বসে ছিল। সুবিধামত ওয়গান থেকে দুজনে রাস্তার লাফিয়ে পড়ে পালালেন। একটি ভাঙা বাড়িতে এসে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

পরের দিন সকালে উঠে বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখে, চার্লি তো সুইমিং কন্সটিউম পরে ডাইভ দিয়ে পড়লেন পুকুরে। ও হবি। জল প্রায় নেই বললেই চলে—সর্বশেষে কাদা মেশে চার্লি উঠে এলেন—তখন কাব তাঁর চেহারা দেখে হাসি সামলাতে দায় হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন বাদে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাহাযাদাবের কাজ পেলেন চার্লি। মালিক বাড়ি চলে যাবার পর সাবরাড দোকানের মালপত্র পাহারা দিতে হোত তাকে। চার্লি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। একদিন ইচ্ছা হোল পলেটকে দোকানটা ভালভাবে দেখাবেন। মাঝরাতে

পেছনের দরজা দিয়ে পলেটকে সঙ্গে নিয়ে 'একদিন চার্লি দোকানে এলেন। পলেটকে দোকানের সব সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র ঘুরে ঘুরে দেখালেন—একটা ফাব কোর্ট তাব গায়ে জড়িয়ে দিলেন—তাবপব কিছুক্ষণের জন্য একটা নরম বিছানার উপর পলেটকে শাইরে রাখলেন।

এরপর আনন্দের আবেগে চার্লি ঘরময় স্ট্রেট করে বেড়াতে লাগলেন—প্রথমে চোখ খুলে এবং পরে চোখ বোঁধে। ব্যারান্দাব এক জায়গায় রেলিং নেই—চাখ বাঁধা অবস্থায় স্ট্রেট করতে গিয়ে চার্লি প্রায় সেখান থেকে ছিটকে পড়েন আব-কি—দর্শকরা সব এ সময় প্রায় শিউরে ওঠেন—যাক দেয়ালে থাকা খেয়ে অশ্রুপব জন্য তিনি বেঁচে গেলেন।

এরপর পলেটের সঙ্গে চার্লি গল্প করছেন এমন সময় একদল ডাকাড এসে হাজির। প্রথমে তাদের সঙ্গে বচনা হোল—কিন্তু তারা চার্লিকে বন্ধুত্ব দিল যে তারা এক সময় কারখানার শ্রমিক ছিল এবং চাকরী যাওয়ারতই তাদের বাধ্য হয়ে এই চৌর্যবৃত্তি নিতে হয়েছে। চার্লি তাদের প্রতি এরপর অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠে চুরির কাজে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন। পরে মালিক সেকথা বুঝতে পেরে চার্লিকে জেলে পাঠালেন।

পলেট এক ক্যাবাবেতে চাকরী নিলেন। হোটেলের বাবা খেতে আসেন তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য তাঁকে নাচতে হয়। মুক্তি পেয়ে চার্লিও এখানে এসে ওয়েটারের ক'ব নিলেন। একজন খন্দেরকে ডাব-বোল্ট পরিবেশন করতে গিয়ে যে অশ্লুত কা-ত চার্লি ঘটলেন তা ব'না করে ঠিক বোকা'নো যায় না—দর্শকদের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় এ দৃশ্যটিতে।

এরপর একটি গান গাইবার মজার দৃশ্য আছে চার্লি'র। ছ-সাতটি ভাবায় শব্দের মিশ্রণে এক অশ্লুত দুর্বোধ্য গান। এরপরই হোটেলের পুলিশ এসে হাজির—পলেটকে তারা গ্রেপ্তার করবে।

পুলিশদের বোকা বানিয়ে পলেটকে নিয়ে উধাও হলেন চার্লি। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় চার্লি আব পলেট হাতে হাত বেধে সুন্দর দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

দি গ্রেট ডিক্টেটরঃ এটি চার্লির প্রথম সবাক ছবি। চার্লি এতে দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রথম বোলটি অত্যাচারে জর্জবিত ইহুদি নাপিতের রোল—আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হিটলারের ক্যারিকচার হিস্কেলের ভূমিকা।

দি গ্রেট ডিক্টেটর ছবিটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমাজ, শাসনতন্ত্র, একনাশকত্ব, মানু'বের সঙ্গে মানু'বের সম্পর্ক, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর চিন্তা এবং গবেষণা করবার ফলেই চ্যাপলিন এ ধরনের একটি অপরূপ ছায়াচিত্রের সৃষ্টি করতে

পেয়েছেন। চার্লি বেশ জোরালোভাবেই ব্যঙ্গ করেছেন যে, কোন রকমের ডিক্টেশনশীপই কোনো অবস্থাতেই তিনি মেনে নিতে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর আক্রমণ শব্দ ফ্যাসিস্ট স্টেটের বিরুদ্ধেই নয়, নন-ফ্যাসিস্ট স্টেটেও এ জাতীয় যে সব ফোর্সেস; তিনি দেখতে পেয়েছেন সে সবার বিরুদ্ধে তাঁর আঘাত হেনেছেন এই ছবিতে। ববার্ট পেইন ছবিটি সম্বন্ধে মূলতঃ কবিতা গিষে বলেছেন:

Confused, brilliant, wonderfully constructed with passages of comedy as exquisite as any that came before, it was unlike everything he had created before, for it could not be called a comedy simply, and it was not in any real sense a satire. There was no name for this kind of desperate knife edge adventure into territory never penetrated before—the territory of the darkest shadows, the most incontrovertible evil, the most tragic dilemmas; and under the strain of these evils the old character of Charlie broke down, and an entirely new character was being brought into being, with only a faint passing resemblance to the Charlie who appeared on the streets of Venice. Beginning with the real Charlie, who appears in a kind of curtain-raiser, we watch the gradual emergence of a host of Charlies until at last, when we have penetrated through all the veils, when we think we are about to see the final approaches of the Tramp and the Vagabond, we see—the despairing face of Chaplin himself.

চার্লি যে কত বড় একজন মনীষী, তিনি যে কি বিরাট এবং প্রান্তভাবান শিল্পী, চিন্তার গভীর এবং ব্যাপকতার দিক দিয়ে তিনি যে ছায়াচিত্রের জগতে অতুলনীয় এবং অস্বীকার্য, এ ছবির প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তার পাবিত্র পক্ষিফুট হয়ে উঠেছে।

হিটলারের তর্জনগর্জন সম্মিলিত বজ্রতা মেঘাব ভগ্নীকে সুন্দরভাবে অনুকরণ করা হয়েছে হিটলারের ভূমিকায় যখন দর্শক এবং শ্রোতাদের কাছে চার্লি বজ্রতা দিচ্ছেন স্বেচ্ছ উপর থেকে। বজ্রতাব আবেগে হিটলার যখন জানেনারের মত ফুসে ফুসে উঠছেন তখন তাঁর চেহারাটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে

গিয়ে সে জার্মান ফুটে উঠেছে এক বিবর্তকার গিরিয়ার মত।

শিল্পকে নিষে হিটলারের ছবি তোলার দৃষ্টিতেও খুব সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়িতকদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশের জনসাধারণকে অম সাগানো যাচ্ছে না,—সুতরাং এ ছবির গোয়েবল্‌সের কাউন্টার-পার্টটি হিটলারকে পবামর্শ দিলেন জন-সাধারণের মনোব পূজ্যীভূত বিশ্বব্যাপক অন্য গণে পরিচালিত করতে—অর্থাৎ এই জনাই সাধারণ লোককে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হল। শব্দ হিটলারের জার্মানিতেই এ ব্যাপারটা ঘটেছিল মনে করলে ভুল করা হবে। আমাদের দেশে অগুরুগুরুয়ের আমলেও এই শব্দ, ক্রম এবং নানাবিধ অর্থ-নৈতিক এবং রাজনীতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলেই হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল এবং আজকের দিনে পাকিস্তানের শাসনকর্তারা আগাগোড়াই দেশের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন না বলেই, এই হিন্দুবিদ্বেষের চোরাবালির ভেতরই দেশের জনসাধারণকে আকর্ষণ নিমজ্জিত করে রাখতে চান—যাতে দেশের সত্যিকার সমস্যাগুলো তাদের দৃষ্টিপথে না পড়ে।

ছবির ইহুদি অংশে দেখা যায় নায়িকা হানা, অর্থাৎ পলেট গডার্ড, একটি অনাথ মেয়ে—তার বাবা-মা আগেই মারা গিয়েছেন। অর্থাৎ জার্মান সৈন্যরা ইহুদি পাড়ায় এসে বাঁধস অত্যাচার শুরু করে, বাড়িগুলোর দরজা, জানলা সব ভেঙে দেয়, সবই লুটপাট চালায়, হানার গারে পচা টোমাটো ছুঁড়ে মারে।

নাগিত-চার্লি এই পাড়াতেই থাকে। অসুখে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে—কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে হাসপাতালে ছিল—কয়েকদিন হয় পালিয়ে এসেছে। আগে এখানে তার একটি সেলুন ছিল—অনেকদিনেব অব্যবহারে সব ময়লা হয়ে রয়েছে—নাগিত-চার্লি আবার সব মেজ-ঘবে পরিষ্কার করছে—এমন সময় জার্মান সৈন্যরা তার নেকানে এসে হাজির। জানলার উপর ইহুদি লম্বাটি লিখে তারা চলে যেতে প্রস্তুত কিন্তু নাগিত-চার্লি তাদের সামনেই লেখাটি মুছে দেওয়ার জন্যে চার্লিকে প্রচুর মাথাব্যস্ত করল।

ছবির কাহিনীর যোগসূত্র টেনে দেওয়া হয়েছে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পটভূমিকার সঙ্গে। সে সময় চার্লি সেলুন ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের মাঝে শুল্‌স নামে এক আহত জার্মান বৈমানিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন চার্লি।

হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ পর্বে চার্লির সেলুনে যখন জার্মান সৈন্যরা অত্যাচার করছে, হঠাৎ শুল্‌স এসে হাজির। সে এখন এক বিরাট নাগসী নেতা। সৈন্যদের সে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। গত যুদ্ধে

চার্লি তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সেখানে তার মনে ছিল—কিন্তু নাগিতবন্দী চার্লি যে ইহুদি একথা সে জানতো না।

হিটলারের একটি প্রাসাদের দৃশ্য দেখানো হয়। এক বৈজ্ঞানিক তাঁবু আবিষ্কৃত বুলেট-প্রুফ পোশাক নিয়ে এসে হাজির। হিটলারের আদেশে স্বয়ং আবিষ্কৃতাকে সেই পোশাক পবিষে তার উপর গুলী চালানো হোল—সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার দেহ। হিটলার গোয়েবল্‌সকে দাব্য ধমক দিলেন ভবিষ্যতে এই ধরনের আক্রমণকে লোক এনে তাঁবু সময় নষ্ট না করতে। এ ছাড়া আরও অনেক মজার মজার দৃশ্য আছে।

হিটলার আর গোয়েবল্‌সে পরামর্শ হচ্ছে অস্ত্রা আক্রমণে। গোয়েবল্‌স হিটলারকে বোঝালো যে কিছুদিন বাদে তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। সামনে ছিল একটা পোশাক—সেটকে নিষে লোকলুপ্তির দৃষ্টিতে চমৎকারভাবে হিটলারের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন চার্লি। পোশাকটা শেষ পর্যন্ত ফেটে গেল—অতি সূক্ষ্মভাবে হিটলারের ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন চার্লি এই দৃশ্যে এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

অস্ত্রা আক্রমণে দেরি হওয়ার জন্যে বেগে গিয়ে হিটলার আদেশ করলেন শুল্‌সকে বন্দী করতে। শুল্‌স সে কথা আগে থেকে জানতে পেরে ইহুদি পাড়ায় গিয়ে গা ঢাকা দিল। শুল্‌স এবার ভেতরে ভেতরে ইহুদিদের গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললো হিটলারকে হত্যা করার জন্য। কার উপর হত্যাব দায়িত্ব দেওয়া হবে এ নিষে খুব একটি মজার দৃশ্য আছে—লটারি করে এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি করা হবে—একটা বড় কেক পলেট সবাইকে কেটে ভাগ করে দেবেন। যার কেকের টুকরোয় একটা কয়েন পাওয়া যাবে সে-ই এ কাজ করবে বলে ঠিক হল। পলেট কিন্তু একটি কয়েনের বদলে কেকের ভেতর অনেকগুলো কয়েন ভরে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকের কেকই কয়েন আসে—এবং একে অন্যের অলঙ্কারে নিজের টুকরোটা পরের স্কেটে চালান কবে দিতে চান। চার্লির কাছে এল তিনটি কয়েন—তিনি সবগুলো গিলে ফেললেন—শেষে হেঁচকির সঙ্গে সঙ্গে কয়েনগুলো পেটেব ভেতব বাজতে শুরু হলো। অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে এ দৃশ্যে।

হিটলার এদিকে এই বড়বস্ত্রের কথা জানতে পেরে চার্লি আব শুল্‌সকে বন্দী করে আনবার হুকুম দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত দুজনকে বন্দী করা হল।

এরপব মুসোলিনী এবং হিটলারের কয়েকটি দৃশ্য। কে কার থেকে বড় একথা প্রমাণ করতেই দুজনে ব্যস্ত—অনেক রকমের হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক বসন্ত

এদিকে নাপিত-চার্লি এবং শুল্ফস বন্দী-শিবির থেকে পালালেন।

হিটলার এই সময় অস্ত্রের আক্রমণ করে বসলেন। একদিন হিটলার নৌকায় চড়ে হাঁস শিকার করতে গিয়ে যখন বন্দুক চালাচ্ছেন তখন হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। যিলেব কাছে ছিল সব জার্মান সৈন্য—বন্দুকের আওয়াজে তাবা এদিকে ছুটে এল এবং হিটলারকে ইহুদি নাপিত ভেবে গ্রেপ্তার করে বসল।

বন্দীশিবির থেকে নাপিত-চার্লি আর শুল্ফস অস্ত্রের দিকে চলেছেন—সেখানে যে তখন শুল্ফস চলেছে সেখান থেকে তাবা জানেন না। মাঝপথে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে দেখা—তাবা ভাবলে হিটলার এসেছেন রণাঙ্গন দেখতে মহাসমাদরে দুজনকে গাড়িতে তুলে তাবা এগিয়ে চললো।

ব্যাগগানে গুলী-গোলাব ভেতন সবাই গিয়ে হাজির হলেন—এবপর চার্লিকে বক্তৃতা দিতে হলো। এ বক্তৃতা বাঙালী অনুবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে।

চার্লির ভেদ : এ ছবিটি চার্লি'র অন্যান্য ছবির থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। চার্লি'র স্মৃতি ট্রাম্প চরিত্রটিকে এ ছবিতে দেখা যায় না। একটি আদর্শ-কাব্যসম্পন্ন বোটে ছিমছাম ধরনের কেরানীই এ ছবির নামক—এবং এই রোলে নেমেছেন চার্লি'র বন্ধু।

অন্য সব বইতে চার্লি ক্রাউনের ভূমিকার দৃশ্যকদের হাসিয়েছেন। কিন্তু ভেদ'র ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে আধুনিক সমাজের প্রতি বিদ্বেষ। অল্পট হাসবার খোঁজও খুঁজে পাবেন।

১৯৩০ সালে জগৎজুড়ে মন্দার রাজ্য দেখা দেয়। এই সময় ভেদ'র দেখেন যে—স্ট্রী এবং ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দাবির পেমেন্ট মবিয়া হয়ে গিয়ে অর্থ উপার্জনের এক অভিনব পন্থা তিনি আবিষ্কার করলেন। মিথ্যা পবিচয় কয়েকটি খনী মেয়েকে বিয়ে করে, তারপর তাদের হত্যা করে তাদের টাকা-পয়সা তিনি চুরি করে নিলেন। শেষকালে তিনি ধরা পড়ে যান এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

রবার্ট পেইন এই ছবিটা সম্বন্ধে বলেছেন :

"Monsieur Verdoux is many things—there never was such a complex film—but it includes the study of a murderer. By definition, since the film is subtitled 'A Comedy of Murder' he is a comic murderer.... 'I intended, said Chaplin, to create a pity for all humanity under certain drastic conditions.'"

হাইমলাইট : অতীতযুগের বহু নাম-করা কর্মোভিনয়কে এই ছবিতে আবার অভিনয় করতে নামিয়েছেন চার্লি। নায়িকার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন ইংল্যান্ড অভিনেত্রী ক্লেভার ব্রুমকে দিয়ে। চার্লি'র পবি-বাববও প্রায় সবাই নেমেছেন। বড় ছেলে চার্লি চ্যাপলিন জুনিয়ার, তার ছোট সিডনে চ্যাপলিন জুনিয়ার, উনার তিনটি ছেলেমেয়ে সবাই এ ছবিতে আছে। উনাও ক্লেভার ব্রুমের বদলে দুটি দৃশ্যে আছেন—অবশ্য লঙ্ সটে তোলা এ দুটি দৃশ্যে উনােকে চেনা যাবে না। চার্লি'র দাদা সিডনে এই সময় ইউরোপ থাকতে নামতে পারেন নি। এগন কি অতীত-যুগের বিখ্যাত কুতুব বিন্ টিন্ টিন্কেও নামানো হয়েছে হাইমলাইটে।

ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে মাতাল অবস্থায় চার্লি হেলতে-দুলতে শো-পার্ট'র বোর্ডিং হাউসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। হঠাৎ নাকে এল গ্যাসের তীর গম্ভ—নেশা ছুটে গেল। ঋজুতে ঋজুতে নর্তকী ক্লেভার ব্রুমের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। হস্তাশয় এবং দাবির পেমেন্ট আদায়ের উদ্দেশ্যে সে গ্যাস পাইপ খুলে দিয়ে শুরুর আছে। তখন ডাক্তারকে খবর দিলেন চার্লি, আর ক্লেভারকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। তাকে সেবা করে সুস্থ করে তুললেন, তাকে বোঝালেন জীবনযুদ্ধে ওভারে ভেঙে পড়তে নেই, দাবির পেমেন্ট সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। চার্লি'র উৎসাহ

এবং অনুপ্রেরণায় জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখলো ক্লেভার। এরপর থেকেই সে নার্সের হিসাবে ক্রমশ নাম করতে করতে খ্যাতিব উচ্চ শিখরে উঠল। এই সময় এক দৃশ্যে স্ন-শিল্পীর সঙ্গে তার পবিচয় হয়—চার্লি'র থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং তাবপর হয়।

চার্লি কিন্তু ক্রমশ জর্নপ্রযতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেউ আর তাঁর ক্রাউনিং দেখে খুশি হয় না। শেষকালে সম্প্রদায় থেকে তাকে বর্জ্য করা হলো।

চার্লি'র এই দুর্দিনে কিন্তু ক্লেভার তাঁকে ভুলে যায় নি। তার নাচের দৃশ্যে চার্লি'র জন্য সে একটি ছোট ভূমিকা জুটিয়ে দিল কতৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে। থিয়েটার থেকে একদিন বেবিরে আসছেন চার্লি, হঠাৎ পুরনো দিনের আর এক ক্রাউন বস্টার কীটনের সঙ্গে দেখা। সে চার্লিকে জানালো যে ক্রাউনটি ক্লেভারের নাচের দৃশ্যে অভিনয় করছে, তাকে কতৃপক্ষের ভাল লাগছে না বলেই তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। একথা শুনে দৃশ্যে, বেদনার অভিভূত হয়ে পড়লেন চার্লি। বেশির ভাগ সময় মদের দোকান এবং এদিকে-ওদিকে ভবঘৃণের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষকালে লণ্ডনের এম্পায়ার থিয়েটারেব সামনে গিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বসে। এদিকে ক্লেভার তাঁকে ঋজু ঋজু সাবা—শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার সহ এখানে এসে চার্লিকে ধরে ফেললো ক্লেভার।

সুলেখা

প্রতিদিনের প্রয়োজনে

সুলেখা
ডুইং এর
কালি

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি

অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম

সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াক

সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

সুলেখা
ওয়ার্কস
লিমিটেড

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

গাঙ্গাহিক বসুমতী

এককালের বিখ্যাত ক্রাউনের এই দৃশ্য শা দেখে মানেজারের মনটাও সহানুভূতিতে ভরে গেল। চার্লি'র জন্য একটি সাহায্য-বক্ষণীয় বন্দোবস্ত করলে সে। এই অনুষ্ঠানে চার্লি'রও একটি অভিনয়ের ভূমিকা ছিল। প্রাণ ঢেলে অভিনয় করলেন চার্লি। দর্শকরা খুবই উপভোগ করছিল এই অভিনয়-হাততালি আর ধামতে চলে না। আনন্দে, উত্তেজনাতে চার্লি'ও মতে উঠেছেন—আবার তিনি পূর্ব-গোবব ফিবে পেয়েছেন—আবার তাঁর জন-প্রিয়তা ফিবে এসেছে—আবার তাঁকে পার কে। এরপর বাস্তব, কীটেনের সঙ্গে একই দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন চার্লি। ধরাধরি করে তাঁকে স্টেজ থেকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু আবার তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনা গেল না। এইখানেই ছবি শেষ করা হয়েছিল।

মাকে মাঝে এমন এক-একটি ছবি তোলা: হু-হা দর্শকের মনে অনেক অব্যক্ত এবং গভীর ভাবানুভূতিগুলোকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়। লাইমলাইট এই শ্রেণীর ছবি।

চিত্রপরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে চ্যাপলিনের খ্যাতি এ যুগের বিস্ময়। বিভিন্ন দিকে নিজের প্রতিভাকে তিনি প্রয়োগ করেছেন—সবাক এবং নির্বাক ও মুক অভিনয়ে। লাইমলাইটে তিনি পূর্বাংশে একটি নাট্য-শিল্পের সূচীচাক্ষুর্ দেখিয়েছেন।

ক্রাউন এবং ব্যালে নর্তকীর জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে প্রথমেই পর্দার উপর ভেসে ওঠে—

রোমান্ড উপভাসের শাস্ত্রকর

দানেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিক্টেটিভ
উপভাস ১ম অধ্যায় ৩০০ টাক

২য় ভাগে—৫খানি বৃহৎ উপভাস
২য় অধ্যায় ৩০০

জাতীয়-কাব্য রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, সুরেন্দ্রনাথ, কন্দেবী, কুমার-
সম্ভব, নীতিকুমারজাতি, কাকী-কাবেরী,
কবির জীবনী ১৭খানি একত্রে ২০০।

শ্রামিকের তরুণকানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়া স্পন্দ শারী রোগ নির্ণয় ও
পরামর্শ নিরূপণ)
২য় অধ্যায় এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

'The Glamour of Limelight through which age must pass as youth enters.'

অপেক্ষা কথার জীবনের এই চরম সত্যটি আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুরু হয় কাহিনী। চ্যাপলিন যে সীমিত অর্থে চিত্রপরিচালক নন, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই চিত্রের 'Theme Music' থেকে। অতি সুন্দর, কোমল এবং বিষাদময়, অথচ সহজ সুবে এটি রচিত। ছবি শেষ হবে যার—কিন্তু দর্শকের মনে এ সুবেব মুহূর্ত না নিবন্তর ব্যাকার তুলতে থাকে। সঙ্গীতের এই চরমতম বৃপের বর্ণনা করতে গিয়েই শেলী বলেছেন—

"Music when soft voices die
Vibrates in the memory."

লাইমলাইটের ক্যালভারো সত্যিকারের উচ্চ জাতের শিল্পী—অথচ একজন সংবেদনশীল সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষের, মত মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভীতি, ভালবাসা এবং মর্মান্বোধ যেমন-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা হয় না।

নর্তকী টেবীকে আত্মহত্যা করতে না দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসার পর, বিছানার তলা থেকে ট্রান্ডজার বের করবার সময় বেই-মাত্র তার নিশ্বাস ক্যালভারোর মুখে এসে পড়লো। সশো সশোই মস্ত অবস্থাতেও শুধু মেশানো দল দিয়ে কুলকুচি কবে ফেলা যেমন লঘুভাবে হাসাকব, তেমনই হাসাকব বিবাদ-ময় পরিবেশে টেবীর সঙ্গের কথাগুলো—

Teray : Why did you not let die?

Calvaro : What's your hurry?

ছবির কাহিনী যেমন জটিল, অভিনয়ও তেমন অসাধারণ। ক্যালভারোর কাছে জীবন অমূল্য—আত্মহত্যা তার মতে একটি ঘৃণ্য কাজ। কাণ কোটি কোটি বৎসরের এভোলিউশনে যে মানবজীবনের সৃষ্টি, তাকে ধ্বংস করা এবং সমস্ত অস্তিত্বের বাদুটুকুকে মুছে ফেলা একই রকম পাপ। 'Wipe out the miracle of all existence.' ক্যালভারো বার বার টেবীকে জীবনের আলোকমন্ডিত দিকটাকে দেখবার চেষ্টা করেছে। বলেছে—

"There is something just as inevitable as death it is Life."

টেবীর বখান মনে হোল তার পা-দুটি একেবারে অবশ হয়ে গেছে, তখন ক্যালভারোর ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করলেন। ডাক্তারের কথার ক্যালভারো বুঝলেন টেবীর ব্যাখ্যা মূলত মানসিক। টেবীকে ভাল কবে তুলবার তার সে সময়কার প্রচেষ্টা কি অসাধারণ। একদিকে স্নেহ, মমতা—অপর-দিকে কঠোর শাসন। টেবীকে নানা কথার ভুলিয়ে রাখার মধ্যে তার জীবনে প্রেমের কথা

তুলে সঙ্গীত বর্চয়িতা নেভিলের প্রসঙ্গ বখান এসে পড়ল তখনকার সাধারণ কবিতার মত সুন্দর—এখানটাতে টেবী স্বানাবিশেষ মত শব্দে ব্যর্থ, আর ক্যালভারো বলে চলে.....

"In the elegant melancholy of twilight, when the candles will flutter and your eyes dance with them and the who'e of London seem dreamy, he will tell you he loves you and you will tell him you have always loved him."

যাঁরা বলেন চ্যাপলিনের প্রতিভা ব্যাকের জগৎকে স্পর্শ করে নি তাঁদের বার বার এই ছবিটি দেখবার কথা বলতে ইচ্ছা করে।

তারপরে বহুদিন বাদে ক্যালভারোর সঙ্গে অবতরণের ঘটনাটি। আগের মত তার সুন্দর ভো নেই—এই এবং অন্য নামে নামলে হয়তো সুবিধা হতে পারে এই ভেবে এই প্রচেষ্টা। মিউজিক হলের কমেডীতে অসামান্য সম্পর্কে ক্যালভারোর মত ছিল এই যে, বসন হবার সশো সশো মানুষের ভেতরে একটা sad dignity এসে যায়। এর ফলে তার পক্ষে আর হাস্যকর হাসিকর ভাবে লোক হাসানো সম্ভব হয় না। এ অসুবিধাটা কাটানোর জন্য ক্যালভারো প্রচুর মদ খেয়ে স্টেজে নামতেন। কিন্তু টেবীকে সুস্থ করে তোলবার জন্য যেমন জীবনের ভাল দিকগুলো সম্পর্কেই বর্ণনা করতেন, সেই সঙ্গে নিজেরও মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে নেমে এবার অভিনয় করবার সময় ক্যালভারো বেশ বুঝতে পারছিলেন তার কর্মকে কারোই হাসি পাচ্ছে না। মিউজিক হলের দর্শকেরা কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ কথা বলছে এবং বেশির ভাগই উঠে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ক্যালভারো প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব দর্শকই উঠে পড়লো। এই সময় ক্যালভাববুপী চার্লি'র মুখে যে বিবাদময় ভাবটা কুটে ওঠে, তা দেখে এ ছবির দর্শকের মনে একটা গভীর বেদনার অনুভূতি না হয়ে পাবে না।

তারপর টেবীর সঙ্গে রাগে দেখা হওয়ার পর এই সদাহাস্যময় মানুষটি বখান "I am washed up, I am finished, the cycle is complete." বলে হতাশার স্তেজে পড়েন, তখন মনে হয় না কোন চলচ্চিত্র দেখছি, মনে হয় এ কোন সেন্সপ্যাঁটারের কোন নাটকের কোন দৃশ্যে কোনও বিরাট প্রতিভাবান মানুষের বিবাসপূর্ণ মৃত্যুদৃশ্যটি সুনিপুণভাবে অভিনীত হচ্ছে। এখানে অভিনয়রকমকে চ্যাপলিন সে উচ্চস্তরে তুলে ধরেছেন তার তুলনা হয় না—বর্ণনা করার সে অভিনয়সৌন্দর্যের পরিচয় দেব সে শক্তিও আমার নেই।

চার্লি'র জীবনের ইতিহাস এইখানেই শেষ করলাম।

—সমাপ্ত—

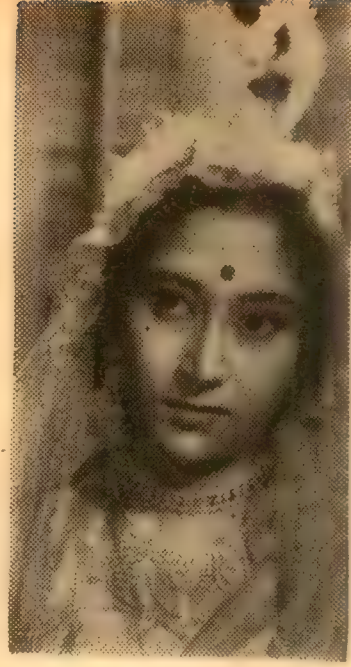
বঙ্গভাস্কর্য

শিশু চলচ্চিত্র সমিতির গলদ

এতদিন পর্যন্ত যা লোকমুখে শোনা যেতো শেষ পর্যন্ত তা পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শিশু চলচ্চিত্র সোসাইটির কার্যকলাপে কমিটি গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে উক্ত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক লক্ষাধিক টাকা এবং এক হাজার ডলার এবং ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ৬১ হাজার টাকা ক্ষতি করেছে। দশ বছর পূর্বে এই সংস্থা গঠিত হয়েছে। এরূপ একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করতেন। শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ এবং চলচ্চিত্রকে শিক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু চলচ্চিত্র সোসাইটির মত সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই দশ বছরে এই সংস্থা ৬৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে মাত্র ৪২ খানি ছবি করেছে। এসব ছবি সাধারণত ২ থেকে ৫ মিলের হয়ে থাকে। দূর-একটি হয়তো আরো বড় ছবি আছে। এই ৪২টি ছবির অধিকাংশ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তাও ব্যাপকভাবে দেখাবার ব্যবস্থাও হয় নি। গ্রামাঞ্চল তো দূরের কথা কলকাতার মত শহরেও এই ছবিগুলি দেখান হয় নি। বাস্তবিক ছবিগুলি দেখাবার মত কোন ব্যবস্থা শিশু চলচ্চিত্র সমিতির নেই। যদি সিনেমার মালিকরা দেখাবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে শিশুদের ছবি দেখাবার কি ব্যবস্থা আছে? কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রজেক্টর থাকতে পারে; আর বছরে একবার করে কলকাতায় শিশু চলচ্চিত্র মেলায় আয়োজন বেসরকারীভাবে হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র অপেক্ষা বিদেশী শিশু চলচ্চিত্র অধিক দেখান হয়। কারণ বিদেশী ছবি প্রচুর পাওয়া যায়, এবং বিদেশী দূতাবাসগুলি এই ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা করে থাকে। বিদেশীদের কাছে যে সহযোগিতা পাওয়া যায় শিশু চলচ্চিত্র সমিতির কাছে সেই সহযোগিতা পাওয়া যায় নি।

শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারেও ব্যর্থতা চূড়ান্ত। আমাদের দেশে প্রচুর এবং সমৃদ্ধ শিশুসাহিত্য রয়েছে, কিন্তু ছবি করার গল্পের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়। অথচ ভারতীয় সাহিত্য ও লোক-গাথা অবলম্বনে সৌভাগ্যে রাশিয়া প্রভৃতি দেশে উপভোগ্য শিশু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সে সব ছবি এদেশে দেখান হয়েছে এবং দেখে আমরা আনন্দ লাভ করেছি। এদেশে চলচ্চিত্র এখন পর্যন্ত একটি ব্যবসা মাত্র। সুতরাং শিশু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ী দিকটি খুব উজ্জ্বল হবার কারণ নাই। একারণে সাধারণ প্রযোজক ও পরিচালকরা শিশু চলচ্চিত্র করার জন্য উৎসাহবোধ করে না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র সমিতিতে ঠিকভাবে গল্প গ্রহণ, উপযুক্ত পরিচালক নির্বাচন এবং প্রদর্শনের যথার্থ ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই কাজগুলি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র সমিতির ব্যর্থতা সর্বজনবিদিত কথায় পরিণত হয়েছিল। এতদিন যাবৎ শিশু চলচ্চিত্র সমিতি একজন লোকের মেজাজ, ও খেয়ালের ওপর নির্ভর করেছে। এই সমিতির টাকা-পয়সার অপব্যবহার ও খেয়াল মারফক কাজ সম্পর্কে কেবল অভিযোগই শোনা গেছে। এখন পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টের পর সমস্ত গলদ যদি দূর হয়ে যায় তবে তা শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শূন্য হবে। অবশ্য তার জন্য কর্তৃপক্ষকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। উপযুক্ত গল্প বাছাই ও ভাল লোক দিয়ে যেমন ছবি করতে হবে তেমন ছবিগুলি শিশুদের মধ্যে দেখাবার ব্যবস্থাও করতে হবে। প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রেক্ষাগৃহ মালিক ও ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর না করে নিজস্ব ব্যবস্থা এবং সহযোগী সংস্থাগুলির ওপর নির্ভর করা উচিত।

—সুজন



‘ফিরে চল’ ছবির নায়িকা নবিতা বসু

চিত্র আলোচনা

জাপানী ছবি ‘হিগানবানা’

(ওয়ার্সিজিরো ওজু)

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ১২ই ডিসেম্বর প্যারাডাইস ও সোসাইটি সিনেমায় ‘হিগানবানা’ ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। জাপানের খ্যাতনামা পরিচালক ওয়ার্সিজিরো ওজু পরিচালিত এই ছবিতে একটি পারিবারিক সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে। পরিবারের কঠোর হিরায়ামা সামাজিক জীবনে উদার এবং তরুণ-তরুণীদের প্রেম-সিদ্ধ বিবাহ সমর্থন করেন। কিন্তু বাড়িতে নিজের কন্যা যখন নিজের পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করতে চায় তখন তিনি কঠোর হয়ে ওঠেন। তাঁর আপত্তি। এমন অনেকে আছেন যারা মঞ্চে প্রগতিশীল, কিন্তু ঘরে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করেন। হিরায়ামা এরকম ব্যক্তি। এই মূলকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি উপকাহিনী। ষাড়ে মূলকাহিনীর বুনো মজবুত হয়েছে এবং হিরায়ামার বাঁহর ও ভেতরের চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এক ক্ষেত্রে পিতার আপত্তি থাকায় কন্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। এবং দেখা গেছে সে কন্যা ‘বার’-এ কাজ করা সত্ত্বেও উচ্চশ্রম নয়। স্বামী-স্ত্রীতে তাদের সুখীজীবন আর



নিম্নোক্ত 'জ্ঞানবন্দী' ছবির অন্যতম নায়ক দিশীপ মূদ্রাক্স

এক ক্ষেত্রে কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে মা পাঠ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মায়ের চোখে বাক্যে ভাল লাগছে তার কাছেই কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে। কন্যার কাছে এ-ব্যাপার অসম্মানের মনে হচ্ছে। কন্যার দৃঢ়তা ও স্ত্রীর সমর্থনে শেষ পর্যন্ত হিরায়ামার কন্যার বিয়ে হচ্ছে এবং লোকনিন্দার ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিরায়ামা উপস্থিত থাকে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারে যে, আন্তরিক সমর্থন ছিল না বলে বিয়ের সময় কন্যা মনমরা হয়েছিল তখন সে কাঁদাবিলম্ব না করে কন্যা-জামাতার নতুন বাসস্থান হিরোসিমা অভিমুখে যাত্রা করে। অবশ্য এ-ব্যাপারে কন্যার বাস্তবীর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

পরিচালক ওজু এই সহজ ও ছোট কাহিনীকে অপূর্ণ শিল্প-কৃতিত্বে রূপান্তরিত করেছেন। জাপানের শিক্ষিত-সমাজের পারিবারিক-জীবন, আধুনিক তরুণ-তরুণীদের সূক্ষ্ম নীরতিবোধ, নতুন ও পুরাতন জেনারেশনের মধ্যে চিন্তাধারাগত সংঘাত এবং জাপানের নিজস্ব নৈসর্গিকতা ও শিল্পধারণা ফুটে উঠেছে। ছবির বস্তব্য মাঝে মাঝে প্রতীকের সাহায্যে ব্যস্ত হয়েছে। কন্যা-জামাতার হিরোসিমা যাওয়া নতুন জাপানের প্রতীক; এবং শেষ দৃশ্যে ব্রীজের ওপর আস্তে আস্তে ট্রেনের মিলিয়ে যাওয়া অপূর্ণ। এরূপ ছবি সাধারণের প্রদর্শনের জন্য মূল্যবান করা উচিত।

সিনে সোসাইটি, কলকাতা

সিনে সোসাইটি, কলকাতার উদ্যোগে দর্শকপূর্ণ 'একডেমি অব ফাইন আর্টস' হল-এ দুইটি সোভিয়েত চিত্র 'মউন্টেন পাস' ও 'স্টোরি অব ড্রামার বর' যথাক্রমে ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর প্রদর্শিত হয়। 'মউন্টেন পাস' ছবিটিতে প্রমিত-জীবনের অভিব্যক্তি থাকলেও

প্রেমের প্রতিবন্ধিতাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য সবশেষে সত্যই জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটি স্পাইন্স সম্পর্কে নির্মিত হলেও এতে শিশু-জীবন ও বিবাহিতা নারীর স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও পরিষ্কৃত হয়েছে।

নাটকের কথা

মুদ্রাক্স

(থিয়েটার ক্যাম্প)

থিয়েটার ক্যাম্প সম্প্রদায়ের প্রথম আত্ম-প্রকাশ 'আমরণ' নাটক দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম; তাদের দ্বিতীয় নাটক 'মুদ্রাক্স' দেখে আমরা চমকিত হয়েছি। আমরণ-এর নাট্যকার কণিক সিংহের রচিত এই 'মুদ্রাক্স' নাট্যকারের মৌলিক ক্ষমতা ও পরিচ্ছন্ন সমাজ দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। বারো প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দেখেছেন তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে নাট্যকার ও পরিচালককে ধন্যবাদ জানাবেন। নাটক পরিচালনা করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৫ই ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে 'মুদ্রাক্স' নাটক প্রথম মণ্ডপ হয়েছিল। এই নাটকে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার শিক্ষালয় থেকে বাবসাক্ষের পর্যন্ত কিভাবে দুর্নীতির রাহু-গাঙ্গে পতিত হয়েছে এবং সম্মান, সত্যতা ও সত্যিকার শিক্ষা কিভাবে ব্যবসায়ের মানদণ্ডে ওজন করে মূল্য নিরূপণ করা হয় তারই এক বাস্তব চিত্র দেখান হয়েছে। শিক্ষাজীবী থেকে তথাকথিত জনসেবক অথবা জনসাধারণের প্রতি-নিধিরা অর্থদেবতার পায়ে আত্মবিক্রয় করে যে

ভরস্কর মূর্তি ধারণ করেছে সেই চেহারা এই নাটকে ফুটে উঠেছে। মানুষের আর্থিক সংকট এবং সরলতার সূচক নিয়ে দুর্নীতির শিকারীরা কিভাবে ফাঁদ পাতে এবং অর্থ-লালসায় পড়ে কিভাবে সংমানুষও অসং হয়ে উঠতে পারে তারই জ্বলন্ত ঘটনাবলী 'মুদ্রাক্স'। এই নাটক প্রামাণিক সত্য বহন করছে; যাতে শহরবাসীর অনেক পরিচিত মুখের নকশা ফুটে উঠেছে। এখানেই নাট্যকারের সাফল্য।

নাটকের শত্রু এক বিদ্যালয়ের টিচার-স্বপ্নের দৃশ্যে। এখানে আমরা পরিচিত হলান অসীমের মত আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের সঙ্গে এবং সমস্যা-জর্জরিত জীবন আরো শিক্ষকদের সঙ্গে। হেডমাস্টারের মাধ্যমে জানলাম বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীণ চিত্র। যেখানে অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে ফেল-ছাত্র পাশ হয়; প্রভুদের সেবা করতে পারলে আদর্শ শিক্ষকের পুরস্কার জোটে। আদর্শ শিক্ষক অসীম চাকরী হারিয়ে এক জনসেবক এম-এল-এর খপ্পরে পড়েছিল— সোনালী নামের এক তথাকথিত অভিজাত মহিলার ছলনায়। এই জনসেবকের বোনামী ঠিকাদারী ব্যবসায় আড়কাঠি ছিল সোনালী। যার কাছে হৃদয় ও মানবচরিত্রের কোমল বৃত্তিগুলি ব্যবসায় পুঁজি ছাড়া আর কিছু নয়। অসীম সোনালীকে বিশ্বাস করে প্রথমে কাজকে সহজভাবে গ্রহণ করলেও কিছুদিনের মধ্যে তার দ্রাবি় দূর হলো। তখন তার অবস্থা একদিকে অর্থের লোভ ও সোনালীর প্রতি মোহ আর একদিকে ভয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেও অর্থলালসায় পথেক নিমজ্জিত হলো। অর্থরূপী রাক্ষসের কবলে পড়ে সেও নতুন অভিজাত হয়ে উঠলো এবং সোনালী ও জনসেবকের উপর টেকা দিল। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে তার বিবেক হঠাৎ যেন জেগে উঠলো। এক পুরাতন সহ-কর্মীর কাছে এই পাগ জীবনের ও সমাজের স্বরূপ উন্মোচন করে সে যেন এককলক আলোর মত নতুনভাবে ভবিষ্যৎকে দেখতে পেল।

নাটকটি কিছু উচ্চস্বরে বাঁধা থাকলে শ্রেয়স্কর মূহুর্তের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। আবার এর কোমল মূহুর্ত-গুলিও সূক্ষ্ম কাজে মর্মস্পর্শী। প্রতিমূহুর্তে এখানে হাসি ও কান্না পাশাপাশি চলেছে এবং দর্শকচিন্তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এনে ফেলেছে। কিন্তু নাটকের পরিণতি অসম্পূর্ণ। এখানে দীর্ঘ এক বক্তৃতার, নাটকে যবনিকা ফেলা হয়েছে। এই দীর্ঘ বক্তৃতা হাততালি পাবার মত হলেও নাট্যরীতিতে রস-ভঙ্গ বলেই বিবেচিত হবে। যৌক্তিকতার দিক থেকেও অসমীচীন। কারণ যে অসীম মুদ্রাক্ষের কবলে পতিত হয়েছে; সে মোহ-ভঙ্গের পর সেই পাগের রাজ্য থেকে মূহুর্তের মধ্যে মুক্ত হলো কি করে? মোহমুক্তি এত সহজ ব্যাপার নয়। নাটকের পরিণতি সম্পর্কে



‘চারপকবি মনুস্ব নান’ ছবিৰ একটি দৃশ্যে সন্নিৱৰ্তিত বঙ ও অন্যান্যরা

নাট্যকাৰ যদি দ্বিতীয়বাৰ চিন্তা কৰেন তবে
মাস্তবধৰ্মিতাৰ নাটকটি আৰো সাফল্যলাভ
কৰে।

নাটকটিৰ প্ৰতিটি চৰিত্ৰ স্ৰ-অভিনীত।
জনসেবক এম-এল-এ যুগে শংকৰ ঘটক
এখানেও আগৰ নাটকেৰ মত সকলৰ বিশেষ
দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰেছে। সোনালীৰ দুৰূহ
চৰিত্ৰে নতুন হৰেও নুপুৰ মুখোপাধ্যায়
অভিজ্ঞা অভিনেত্ৰীৰ মত চমৎকাৰ ৰূপদান
কৰেছে। অসীম চৰিত্ৰে নিখিল সেন এখানে
একজন সৎ ও আদৰ্শবাদী শিক্ষকেৰ ভূম-
কাৰ্ণিতকৈ বহুখণ্ট ব্যক্তিৰ দিগে স্বাভাৱিকভাবে
প্ৰকাশ কৰেছে; কেবলমাত্ৰ তাঁৰ শেষ
যত্নতকৈ সহজভাবে গ্ৰহণ কৰা যায় নি।
মুন্ডামাণ্ডাৰ ও অন্যান্য প্ৰতিটি চৰিত্ৰে অভি-
নয়তাদেৰ স্বাৰ্থকতাৰ নাটকটি উপভোগ্য
হৈছে। নিৰ্মল গুহৰাজেৰ দৃশ্য-পৰিকল্পনা
ও আলোকসম্পাত প্ৰশংসনীয়।

মুদ্ৰাৱাক্ষ-এৰ মত বলিষ্ঠ নাটকেৰ মণ্ড-
মুপায়ণেৰ জন্য আমৰা থিয়েটাৰ ক্যাম্পকে
অভিনন্দন জনাই।

সুঁতিও থাৱ

‘শব্দবেলা’ৰ চিত্ৰগ্ৰহণকালে

ব্ৰাহ্ম ছিন্‌মাস সুঁতিও-তে অগ্ৰগামী গোষ্ঠীৰ
‘শব্দবেলা’ ছবিৰ কাজ প্ৰায় শেষ হৈছে।
গত সপ্তাহে শেষ দিনেৰ স্যুটিং-এ উপস্থিত
ছিল। চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হ’ল উত্তমকুমাৰকে
নিয়ে।

অধিক ব্ৰাহ্মে স্বামী মন থৈয়ে বাড়
ফিৰেছে। স্ত্ৰী অপেক্ষাৰ ছিল, ছোট একটি
কথাত জিজ্ঞাসা কৰলো তুমি আবার মন থাকে?
জবাব শোনা গেল—মন আমি ছাড়তে পারবো
না।

এই ছবিতে উত্তমকুমাৰ স্বামীৰ চৰিত্ৰে
অভিনয় কৰেছে, স্ত্ৰীৰ ভূমিকায় মাধবী
মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমাৰ এক সেলস্-
মানেজাৰ। সেলস্ প্ৰিজেণ্টেচনটোত থেকৈ—
ধাপে ধাপে মানেজাৰেৰ পদে উঠেছে। সৰে

সৰে বাড়িৰৰ থেকৈ জীবনযাত্ৰাৰ পৰিবৰ্তন।
একাদিন সে ছিল সাধাৰণ ক্ষণিকত যুৱক,
অনেক লম্বে-ভৰা জীবন; সে এখন উচ্চবিত্ত
প্ৰেমীৰ সঙ্গে পৰা দিতে চেষ্টা কৰেছে।
তথাকথিত অভিজাত হৈ জীবনেৰ প্ৰাৱকে
পৰিবৰ্তন কৰে দিৱেছে। ক্ষণিকত পাক্ষা থেকৈ
উঠে—বড়লোকেৰ পাড়ৰ এসেছে; সেভাবে
গৃহেৰ সাক্ষসৰসায় সাজিৱেছে। শব্দ এখানেই
শেষ নহ। বাকৈ ভালবেসে বিয়ে কৰেছিল
সেই স্ত্ৰীকে আজ তার কড় মেকলে মনে হয়।
সে চাৰ স্ত্ৰীও তার লগে সোমাইটিতে থাক,
পাৰ্টিতে বসে মন থাক, সেভাবে সাজপোষাক
পৰুক। যেমন কৰে এই সোমাইটিৰ অতি-
আধুনিকায় কবহাৰ কৰে থাকে। কিন্তু স্ত্ৰীৰ
কাহ্ন এই মেকী জীবন অৰ্থহীন। যাঁটি ও
মানুহেৰ সম্পৰ্কহীন এই নকল জীবনকে সে
মেনে নিতে চায় না। নৈতিকমূল্য দিগে সে
জীবনেৰ বিচাৰ কৰতে চায়। স্বামী-স্ত্ৰীৰ
মধ্যে এখানে কল। এই কল তাদেৰ নিগে
বাছে বিচ্ছেদেৰ পথে।

অগ্ৰগামী গোষ্ঠীৰ প্ৰতিটি ছবি একটি
বলিষ্ঠ বক্তব্যকে অবলম্বন কৰে নিৰ্মিত

সাপ্তাহিক বসুমতি

গল্প হলেও সত্যি

হয়েছে। এই ছবিতেও অতি-আধুনিকদের কৃত্রিম জীবনের দৃষ্টিকে প্রতিফলিত করবে। তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটিয়ে তুলবে।

ছবিটির জন্য অত্যন্ত ব্যস্তবহুল যে সেট নির্মিত হয়েছে দেখলে মনে হয় কোন ধনীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি। জুইংরুম, রেস্টরুম, কিচেন ইত্যাদিকে কৃত্রিম মনে করার কোন উপায় ছিল না। আর্ট ডিরেক্টর সুধীর খাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাকে এ কাজের জন্য প্রশংসা করলে তিনি বললেন, হাসপাতালের সেটটা যদি দেখতেন তবে আরো খুশি হতেন। ভাল করে কাজ করতেই তো চাই। কিন্তু প্রযোজকরা দায়সারা করতে চান বলে হয়ে উঠে না। কিন্তু অগ্রগামী গোষ্ঠী এ-ব্যাপারে সচেতন এবং উদার। তারা অর্থের কাপণ্য করেন না। তাই মনের মত করে সেট তৈরি করতে পেরেছি।

সম্পাদনাগারের কাজ শেষ হবার পর ছবিটি আগামী মার্চ মাসের দিকে মুক্তিলাভ করবে। আশা করা যায় এই ছবিতে দর্শকরা নতুন স্বাদ লাভ করবেন।

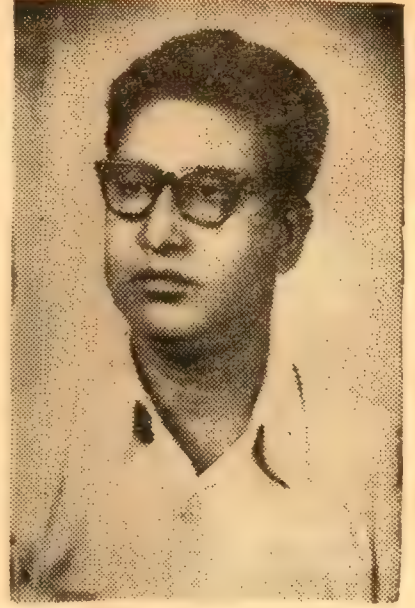
তপন সিংহের পরবর্তী ছবি 'গল্প হলেও সত্যি'। এই ছবির সূচনা-কাজ নিউ থিয়েটার ২ নম্বর স্টুডিও-তে আরম্ভ হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নিয়মিত কাজ শুরু হবে। ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বপালন তপন সিংহ নিজেই করছেন।

বাঘিনী

সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' কাহিনীকে চিত্র-রূপ দিচ্ছেন এস. এম. ফিল্মস। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিজয় বসু। বিজয় বসুর 'রাজা রামমোহন' ও 'ভগিনী নিবেদিতা' সমালোচকদের প্রশংসা ও ব্যবসায় সাফল্য আশাতীতভাবে লাভ করেছে।

বধুবরণ

ডি. এস. প্রোডাকশন্সের 'বধুবরণ' ছবির



আর্ট ডিরেক্টর সুধীর খাঁ

চিত্রগ্রহণ দিলীপ নাগের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিও-তে শুরু হয়েছে। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন কমল দাস-গুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেবেন প্রদীপ-কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, অতি ভট্টাচার্য, অজয় বিশ্বাস ও রাখী।

সংবাদ বহানা

'চারুলতা'র প্রেস্ট পুরস্কার লাভ

আর. ডি. বনশাল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' মেক্সিকোর গ্র্যাকা-দলকো চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন হেড অব পালানকুরে লাভ করেছে। গত ২রা ডিসেম্বর ছবিটি উৎসবে দেখান হয়েছে। 'চারুলতা'র প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জী ও শৈলেন মুখার্জী।

ওয়ারিহদা রহমান-প্রেস্ট অভিনেত্রী

ইংরেজী ছবির 'দ্য গাইড'-এ অভিনয় করার জন্য চিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়ারিহদা রহমান প্রেস্ট অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন।

প্রমোদকর মৃত্ত 'রাজা রামমোহন'

'রাজা রামমোহন' ছবিটি উড়িয়া সরকার কর্তৃক প্রমোদকরমৃত্ত ঘোষিত হয়েছে। ইতিপূর্বে



নির্মীতমাণ 'রাজপ্রোহী' চিত্রে তরুণকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক

শ্রীমতী এবং আসাম সরকার হাঁচিটকে
প্রমোদক মন্তি দিয়েছেন।

চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ও ভারতে চেকো-
স্লোভাক দূতস্থানের যুগ্ম উদ্যোগে ফাইন
আর্টস একাডেমি হলে আগামী ৩রা হতে ৯ই
জানুয়ারী এক চলচ্চিত্র উৎসব হবে। এই
উৎসবে সাতটি চেকোস্লোভাক পূর্ণাঙ্গ ও
সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হবে।
পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলির মধ্যে থাকবে—

(১) ডায়মন্ড অব দি নাইটস—পরি-
চালক, জান নেমেক। মেনহাইম উৎসবে সর্বোচ্চ
পুরস্কারপ্রাপ্ত। (২) যোশেফ কিলিয়ান—পরি-
চালক, পাবেল জুরাকোব। ওয়ার হাওসেন
উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারপ্রাপ্ত। (৩) এনাদার
ওয়ে অব লাইফ—পরিচালক, ভেরা চিটিলোভা।
মেনহাইমে সর্বোচ্চ পুরস্কারপ্রাপ্ত। (৪) ডেথ
কলথ এজেলচেন—পরিচালনা, জান কাদের
এবং এলমার ক্রুস। মস্কা উৎসবে সর্বোচ্চ
পুরস্কারপ্রাপ্ত। (৫) ট্রান্সপোর্ট ক্রম প্যারা-
ডাইস—পরিচালক, জেভ, রাইনিচ। লোকসর্গো
উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারপ্রাপ্ত। (৬) ডিফেন-
ডেন্ট—পরিচালক, জান কাদের ও এলমার
ক্রুস। মস্কা উৎসবে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
(৭) ব্লার এন্ড ডেথ—পরিচালক, পেটার
সলোন। লন্ডন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সমা-
লোচকদের পুরস্কারপ্রাপ্ত। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি
সাতটিও বিভিন্ন উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

এস্ এফ্ সিনে ক্লাব

সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত
এস্ এফ্ সিনে ক্লাব কলকাতার একটি নতুন
চলচ্চিত্র সংস্থার নাম। সভাদের জন্য মাঝে
মাঝে নানা দেশের বিখ্যাত সাল্লাস ফিকশন
ও ফ্যানটাসি ফিল্মের প্রদর্শনীর আয়োজন
করা হবে সংস্থাটির প্রধান কাজ। এই জাতীয়
চলচ্চিত্র সংস্থা ভারতে এই প্রথম। আগামী
২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটির
উদ্বোধন করা হবে এবং সত্যজিৎ নির্বাচিত
একটি উপভোগ্য ফিল্ম দেখানো হবে।

মুক্কাভিনেতা অরুণাভ

বর্তমানে মুক্কাভিনয় শিল্পকলা আমাদের
দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জনপ্রিয়
করে তোলার মূলে অন্যতম মুক্কাভিনেতা
অরুণাভ মজুমদার। সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব
ভারতে তাঁর অভিনয়কলা পরিবেশন করে
এলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে। প্রতিটি
অনুষ্ঠানে অরুণাভ তাঁর আশ্চর্য অভিনয়-
নৈপুণ্যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে
উপস্থিত দর্শকদের আমন্ত্রণদান করেছেন।
উড়িষ্যার সম্বলপুর শহরবাসীদের সম্বর্ধনাও
পান। এ'র একক মুক্কাভিনয়ের প্রতিটি
অনুষ্ঠানের দর্শক উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেন।
অরুণাভ'র অনুষ্ঠান ছিল উচ্চতর অর্থ
সহজ ও সরল পরিচ্ছন্ন।



লোকশিল্পী কার্তিকচন্দ্র দাস

বাংলার নিজস্ব গান গেয়ে যারা জীবিকা
অর্জন করেন, কার্তিকচন্দ্র দাস তাঁদেরই এক-
জন। কার্তিকবাবু প্রকৃত একজন গ্রামা-
শিল্পী। কার্তিকবাবুর জন্ম ফরিদপুর
জেলার মাদারিপুরের একটি গল্পীতে। চাব-
বাসের কাজের ফাঁকে কার্তিকবাবু গল্পীগীতি



কার্তিক দাস

দোতারা বাজিয়ে আপন মনে গেয়ে নিজের
অবসর সময়টুকু মধুর করে তুলতেন।
বাল্যকালেই তার মধুর কণ্ঠস্বর গ্রামের
সবাইকে আকৃষ্ট করত। ১২ বৎসরের বালক
কার্তিকচন্দ্র যাত্রাদলে গান গাইবার জন্য
যোগদান করেন। যাত্রাদলে গান গেয়ে তিনি
অল্প সময়েই বেশ সুনাম অর্জন করেন।

এল ১৯৪৭ সন। এই সাতচল্লিশ
সনের ভারত-বিভাগ তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়
ঘটল। ১৯৫০ সনে স্বদেশে বসবাস অসম্ভব
হয়ে পড়ায় তিনি কলকাতায় গল্পীগীতি
গেয়ে দৃ-মুঠো অন্ন জোগাড়ের জন্য আসেন।

উদাস্ত হয়ে এলেন কলকাতায়। মাথা পুঁজ
ধাকবার জন্য একটু জায়গার খোঁটা করলেন
তিনি, কিন্তু কোথাও একটু ঠাই মিলল না
তাঁর অবশেষে নারিকেলডাঙার একটি
বস্তিতে তিনি স্বা-পুত্র-পরিবার নিয়ে দিন
কাটাতে লাগলেন। কার্তিকবাবু গান গেয়ে
বহুকষ্টে পরিবারের চারটি প্রাণীর মধ্যে আন
তুলে দেন। ভিক্ষার অন্ন—কোনদিন জোটে
আবার কোনদিন জোটে না। অনেক দিনই
তাঁদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়।

কার্তিকবাবু সত্যিকারের একজন সূ-
কণ্ঠধারী লোকশিল্পী। তিনি যে গানগুলি
সাধারণত গেয়ে থাকেন তা হল দেহতত্ত্ব-
মূলক ও বাউলতত্ত্বমূলক প্রাচীন লোক-
গীতি।

কার্তিকবাবুর একটি দেহতত্ত্বমূলক
গানে খুবই উচ্চতরের দার্শনিক তত্ত্বের
উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন—

মন তুই বন্দাবনে ঘাব
নিজের রতন কর গিয়ে যতন
সেই যতনে রতন পাব।
নৌকায় কর নিজ চালান

সুখে কাল কাটাও,
এবার মালের জেরে গুদায় ঘটে
গদির উপর বসতে পারাব।
দেহে আছে সপ্ত তাল
খুঁজে নে তার চাবি,
চাবি দিয়ে তাল খুলে
সোনার মানুষ দেখতে পাব।

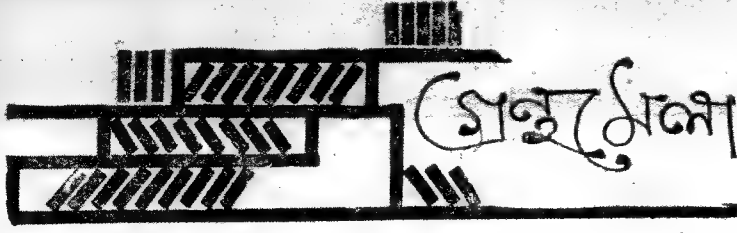
কার্তিকবাবুর আরো অনেক এই ধরনের
দেহতত্ত্বের গান আছে। দেহতত্ত্ব ছাড়াও তাঁর
অনেক বাউল গান আছে বার মধ্যে দিয়ে
বাউল ধর্মের শ্রাব্যবাদ, সহজিবাদ ও গুহ-
বাদের কথা পাওয়া যায়।

এই গুরুবাদের কথা পাই তারই একটি
গানে। যেমন—

গুরুকে মন দিয়া ডাক না
ডাকার মতন না ডাকিলে,
কাছে থাকলে দেখা দেয় না।
গুরুকে করে পাতি,
কর গিয়ে সাধন রাত্তি,
হবে না অধোগতি,
বলে রসিক-জনা,
আশ্বতত্ত্ব ঠিক হইলে
সকল বাবে জানা।

কার্তিকবাবুর এইসব গান এক-একটি
রসবিশেষ। এত রসের অধিকারী যে শিল্পী,
তাঁকি আজ অনাহারে দিন কাটাতে হলে।
লোকসংগীত লোকসংস্কৃতির একটি
বিশেষ অঙ্গ। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির
বাঁচাতে হলে সবার আগে প্রয়োজন কার্তিক-
বাবুর মত লোকশিল্পীদের জীবনরক্ষা
করা। এসব শিল্পীর অচ্যুত হুঁচিরে আমাদের
সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। তবেই প্রকৃত
লোকসংগীতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

—বৃন্দাবন রায়



দেবতার চেয়ে বড়—রাজকুমার সেন।
মোহন লাইব্রেরী, ৩৫এ, মির্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯। মূল্য: তিন টাকা।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নরনারীদের
নিম্নে বঙ্গভাষার আধুনিক উপন্যাস প্রায়
সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বিহিংগকে কেন্দ্র করে যে
সুখপাঠ্য উপন্যাস রচিত হতে পারে তার
প্রকৃষ্ট প্রমাণ “দেবতার চেয়ে বড়”।
উপন্যাসটির মধ্যে যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
তা হচ্ছে এই যে, স্বামী পরম দেবতা হলেও
সেই দেবতার অধিক এমন ভালবাসার মানুষ,
যাকে পাবেন যিনি জীবনে সব কিছু
স্বার্থের উদ্দেশ্যে। জরুরীকালে দয়ালরাম
কেই সেই ধরনের একজন অকপট চিত্তের
সংগীতপিসাদ, মানুষ। ব্যবসারে বীর প্রচুর
অসুবিধা হলেও তাতে লোভ নেই, বরং সেই
ধাবসাকে তিনি হেলায় বিলিয়ে দেন বৈজ্ঞ-
ন্যকে। এমন কি যে লক্ষ্মীবাসিকে একদা
তিনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই
লক্ষ্মীবাসি-এর সন্দেহপরায়ণ স্বামী কালো-
ধাক্কারী করে ধরা পড়লে তাকে বিপদ থেকে
রক্ষা করেন দয়াল। তবে এমন তাঁর মোহহীন
মন-লক্ষ্মীবাসিকে একদিন গান্ডি মধ্যে পেয়েও
শেষ পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করেন। উপন্যাসে
যদিও সীতার গীতগীতের সঙ্গে দয়ালের
জীবনের এক মিলনপর্ব দেখানো হয়েছে।
কিন্তু সেখানেও নিষ্কলুষ দয়াল চরিত্র আরো
প্রোজ্জ্বল। তেমনি বারানসীতে সীতারাকে
দেখা যায় নতুন রূপে। সেখানে ঘটেছে তার
জীবনের উত্তরণ। উপন্যাসটিতে একদিকে
লালসা, অন্যদিকে মোহ জয় করাই আসল
উপজীব্য। পশ্চিম ভারতের দৃশ্যপট ঘটনাক্রমে
স্বভাবতই এসেছে। অবশ্য বাংলাদেশের
কল্যাণোলাও বাদ পড়ে নি। ঘটনানুগ
চরিত্রের মধ্যে মোহনচাঁদ, বৈজ্ঞান্য প্রভৃতি
উল্লেখযোগ্য। মনস্তত্ত্বপ্রধান চরিত্রের মধ্যে
দয়াল, সীতার ও লক্ষ্মীবাসি-উপন্যাসটির
মূল বক্তব্যকে ঘনীভূত করেছে। উপন্যাসটির
নামকরণে চমক না থাকলেও চমৎকার
আছে।

দেবী বিকুপ্রিয়া—শ্রীবিষ্ণু, সরস্বতী।
প্রাপ্তস্থান : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স,
১৪ বিস্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
মূল্য : দু' টাকা।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কতো
হাজার গ্রন্থ আছে, হরতো আজ তার সঠিক
সম্মান নেই। অবশ্য পদ্যের মাধ্যমে তার প্রথম

জীবনী পদ্যেই পেরেছিলাম। কিন্তু সেই পদ্য
রচয়িতাদের অন্তর্দৃষ্টির গুণে শ্রীচৈতন্যের
মহাশক্তি এই ভূমডলে প্রচারিত হয়েছিল।
কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনে যিনি রূপান্তর
সাধন করেছিলেন সেই বিকুপ্রিয়ার কথা কি
বাঙালী বিস্মৃতপ্রায়?—না। কবি শ্রীবিষ্ণু
সরস্বতী কৃষ্ণকায় লিখেছেন, “বাংলা,
কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম ভাগে মহাপ্রভুর
যেন মনেই ছিল না এই জীবগণের প্রতি দৃষ্টি-
পাতের কথা। বিকুপ্রিয়া দেবীর সহিত শূভ-
পরিণয় সময়ে শূভদৃষ্টির পর হইতেই জীব-
প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাতের কথা মনে পড়িয়াছিল।”
অর্থাৎ এই দেবী বিকুপ্রিয়াই বলছেন,—

অঙ্গের অঙ্গনে জন্ম, আমি তোমাদের
এক মেয়ে,
জীবন কেটেছে সম তোমাদের
স্নেহ-প্রীতি পেয়ে।

ভারপর কাব্যের ছন্দে বাস্তব হয়েছে তার
জীবনধারা এবং গোরালা-সাহসর্বা। অবশ্য
বিকুপ্রিয়া নিজের কথা বলতে গিয়ে প্রাধান্য

জরুরী সেন

দিরেছেন শ্রীগোরালাকেই। তিনি বলছেন,
“দেখিলাম মানুষ যে কত ভালো হয়, দেখিলাম
প্রিয় মাঝে প্রেমসুখোদয়। দেখিলাম নিজচক্ষে
নব অবতার, পরদৃষ্টিতে দ্বীভূত করুণাপাথর।
ইত্যাদি। তবে, “আসিল সন্ধ্যা, নিবে গেল
আলো, নারীর জীবনে অধির এলো, নব-
যৌবনচন্দ্র উদয় বিচ্ছেদ মেঘে ঢাকিয়া গেল।”
কিন্তু জীবনসর্বস্ব নিমাই-এর মধ্যে নিজেকে
হারিয়েই তাঁর অপার আনন্দ।—এইভাবে
পরিণতি ছাড়া একশটি অধ্যায়ে কাব্যখণ্ডটি
সমাপ্ত। বিভিন্ন রকম ছন্দের প্রয়োগও
কাব্যটির অন্যতম বৈচিত্র্য। কোনো দেবপূজা
নয়, মনুষ্যকে বা পুণ্যতা দান করে সেই
গুণই কাব্যটিতে অনুরাগিত।

রাষ্ট্র-বাণী — শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
কর্তৃক ১৮ সাউথ টাংরা রোড, কলিকাতা-
৪৬ থেকে প্রকাশিত। মূল্য: অনুলিখিত।

এটি একটি প্রচার-পত্র। অবশ্য প্রচারিত
রচনাটির প্রচার অপেক্ষা কর্ম-রূপায়ণই
অধিকতর প্রয়োজন। তাই প্রচার-পত্রটি সম্পর্কে
আমরা কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারগুলির
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রচার-পত্রটি রচনা

করেছেন শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। “এ স্বাধীন
জন্ম বৈশিক এডুকেশন এক দি মিডিয়াম অব
ইনিক্সিজ ফুড প্রডাকশন অ্যান্ড ক্রেশন
অব এ নন-ভারলেট বডি অব সত্যগ্রহীত্ব
ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স”—বিকুরে এমন তথ্য-
মূলক প্রবন্ধ রচনা করা সত্যীশচন্দ্র দাশ-
গুপ্তের পক্ষেই সম্ভব। বলা বাহুল্য, বর্তমান
জরুরী সময়ে যখন খাদ্যকে জাতীয় প্রতি-
রক্ষার মূখ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে,
তখন খাদ্যসংকট সমাধানের উপায় হিসেবে
এই প্রবন্ধ অনেকখানি সহায়তা করবে।
বিশেষ থেকে ভারত অর্থ ও সম্প্রদায়—
কৃষিকার্যের জন্য “সাহায্য নামক” অংশ
পেয়েছে। তবে, ভারত খাদ্য সমস্যার যেখানে
ছিল সেখানেই আছে। এর কারণ অবশ্য অণু-
দাতা আমেরিকাতেও গবেষকগণ বের করে-
ছেন। তাদের মতো ভারতে কৃষিকার্য করার
অতো শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ তাঁর হয় নি। কথাই
বুড় হলেও সত্য। ভারতে গান্ধীবাদীরাও এই
কথা বলেছেন। আক্সাড্রান্টিকরা হয়তো
কথাটা পছন্দ করেন না। তাই মানুষের চেয়ে
লাভলটাকেই বেশি মূল্য দেন। বা হোক,
গান্ধীবাদী সত্যীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কৃষিকার্য
স্বয়ংনির্ভর হবার পথ দেখিয়েছেন এবং সেই
কারণে বিভিন্ন মত, পন্থাসহ ব্যক্তিগত
নিজের অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। তিনি কৃষি-
উন্নতির মূলে বৈশিক এডুকেশন-এর উপর
জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। “বৈশিক এডু-
কেশন” কী—সে সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা
করেছেন। আমরা মনে করি এই ক্ষুদ্র
পুস্তিকাটিকে আমাদের সরকার ক্ষুদ্র বলে
অগ্রাহ্য করবেন না; বরং ভারতের বহু
সমস্যার সমাধানের বড় পথ এখান থেকেও
সরকার লাভ করতে পারেন।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সর্বমুদ্রিত প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর চাঁদার হার

বার্ষিক	...	১৪.০০
ষাণ্মাসিক	...	৭.০০
ত্রৈমাসিক	...	৩.৫০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা

চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়

লাকুলেশন ম্যানেজার

টলস্টয়ের 'দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস' নাটকটির প্রডাকসন সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রযোজক স্ট্যানিসলাভস্কি লিখেছেন:

'দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস' নাটকটির প্রডাকসন সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রযোজক স্ট্যানিসলাভস্কি লিখেছেন:

কিন্তু যা মনে মনে চাইছিলাম আসলে তা হচ্ছিল না। স্পিরিচুয়াল দিকটা পরিস্ফুট করতে পারছিলাম না আমরা—এই রূপায়ণে সার্থকতার যে স্তরে ওঠা দরকার তা তখন পর্যন্ত আমাদের হয় নি। এই ব্যর্থতাকে ঢেকে দেবার জন্য আমরা অগত্যা বাহ্যিক দিকটাকে অতিরঞ্জিত করে দিলাম—ভাবভঙ্গী, ধরণ-ধারণের ব্যাপারগুলোর ওপর অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করা হোল। করা হোল বটে, কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণ যদি আত্মিক ভিত্তির ওপর না গড়ে ওঠে তবে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে এক্ষেত্রে তাই হল—অর্থাৎ the result was naked naturalism. ফলে আমাদের প্রডাকসনে স্পিরিচুয়াল ডার্কনেসের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া

বহুমেধ ও দেশে এবং দেশে শ্রীশ্রীমান

গেল না এবং সেই জন্যই বাহ্যিক ও ন্যাচারেলিস্টিক ডার্কনেসের দিকটাকে দর্শকরা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারল না।

স্ট্যানিসলাভস্কি এখানে শিল্প-সৃষ্টির একটি মূল সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। শিল্পী যদি ভেতর থেকে অনুপ্রাণিত না হন, তবে বাহ্যিক অনুকরণে কোন জিনিসের সত্যিকার রূপায়ণ হয় না। বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা কস্তা ককেলো বলেছেন:

'The soul creates the body, not the body the soul.'

শ্রীমান ভয়াবহ—কারণ তার অন্তর এবং মানসিক সম্ভাটাই ভয়াবহ। আবার স্ট্যানিসলাভস্কির বক্তব্যে ফিরে আসি। তিনি পাওয়ার অব ডার্কনেস সম্বন্ধে আরও বলেছেন:

'দৃশ্যসজ্জা এবং বেশবাস সম্বন্ধে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করতেও চ্যুটি করি নি। আর এ কথা আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, এর আগে মন্ডের ওপর এত বাস্তবভাবে গ্রামের দৃশ্য কখনও ফুটিয়ে তোলা হয়

নি। গ্রাম্যজীবন এবং গ্রাম সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার জন্য আমরা টুল গাবারনিয়াতে গেলাম—কারণ এই গ্রাম টিতেই আমাদের নাটকে বর্ণিত ঘটনা-গুলো ঘটেছে বলে লেখা হয়েছে। দু'সপ্তাহ এই গ্রামে আমরা ছিলাম এবং পরে কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি গ্রামও পরিদর্শন করলাম। সিমভ এবং গ্রিগোবাবেভা, যাদের ওপর পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করবার ভার। তারাও আমাদের সঙ্গে ছিল। কুড়ে-ঘর, কোট ইয়ার্ড, শস্যাগার ইত্যাদির প্ল্যান তৈরি করে নেওয়া হোল। গ্রাম্য-জীবনের আচার-ব্যবহর, বিবাহ উৎসবের রীতিনীতি, সাধারণ জীবন-যাত্রার ধারা, কিভাবে ফার্মের কাজ সম্পন্ন করা হয় এসব বিষয় বেশ ভাল করে জেনে শুনিয়ে নেওয়া হোল। ওখান থেকে পোশাকপত্র, সার্ট, ছোট ওভার-কোট, ডিস এবং যে ধরনের ফার্নিচার ব্যবহৃত হয় সে সব আমরা সঙ্গে নিয়ে এলাম। শব্দ তাই নয়, আমরা দু'টি জীবন্ত স্পেশিয়েল নিয়ে এলাম ঐ গ্রাম থেকে—একজন বৃদ্ধ পুরুষ ও একজন বৃদ্ধা রমণী। অভিনয়ের



গোপালের নাট্যকর্মী। রূপায়িত 'ভেদ, সোলসের' একটি দৃশ্য

ব্যাপারেও এরা দুজন পরে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল, বিশেষত বৃদ্ধা মহিলাটি। এদের দুজনকে আনা হয়েছিল এই কারণে যে, গ্রাম-বিশ্বক সমস্ত ব্যাপারে এরা আমাদের উপদেশ দেবে। কয়েকটি রিহাসালের পরই এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজেদের রোলের সংলাপ এমনভাবে রপ্ত করে নিলে যে আর প্রস্পটিং-এরও তাদের দরকার হচ্ছিল না।

যে অভিনেত্রীটি ম্যাট্রিয়োনার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন তিনি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়তে, বৃদ্ধা মহিলাকে আমরা অনুরোধ করলাম ঐ অভিনেত্রীর জায়গায় সংলাপ বলতে। বৃদ্ধার অভিনয়ে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হোল—

It was she who showed us for the first time on the stage the Real Russian village, in all its spiritual darkness and power.

বৃদ্ধা যখন এনিশিয়ার হাতে তার স্বামীকে হত্যার জন্য বিষ মেশানো পাউডারের প্যাকেটটি দিল, এবং নিজের বাকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বিষের প্যাকেটটি বের করে বেশ ধীরে-সুস্থে এনিশিয়াকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে লাগল কিভাবে পাউডারের সঙ্গে বিষটা মেশাতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে এবং গোপনতা বজায় রেখে স্বামীকে কিভাবে বিবাহ করতে হবে। এই সংলাপের সময় বৃদ্ধার নিরাসক্ত ভাব, যেন একটা অত্যন্ত সাধারণ কাজের কথা সে বলছে এবং তার ভেতর কোন বিভীষিকা বা ঈশাচিকতার স্পর্শ পর্যন্ত নেই, এই ধরনের একটা অভিব্যক্তি বৃদ্ধার চেহের মধ্যে কুটে উঠেছিল। এ দৃশ্যের অভিনয় দেখে আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। লিও টলস্টয়ের ছেলে মার্গে লোভিচ এই রিহাসালে উপস্থিত ছিলেন—বৃদ্ধার অভিনয় দেখে তিনি অমনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং বারবার আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন তাকে দিয়েই ঐ রোলটি মধ্যে অভিনয় করাতো। আমাদেরও এ প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয়ই মনে হচ্ছিল। যে অভিনেত্রীর ম্যাট্রিয়োনার ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ছিল, তিনিও বৃদ্ধাকে পাট্টাটি ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু এর পরেই একটি দুর্ভাগ্যবশত বাধা এসে উপস্থিত হোল। যে সব দৃশ্যে ম্যাট্রিয়োনার সোয়ায় করবার কথা, বৃদ্ধা সেখানে টলস্টয়ের সংলাপকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে নিজের ভৈর

শব্দ ব্যবহার করতে লাগল—অথচ আমরা জানতাম ঐ সব শব্দ মঞ্চে ওপর বলা চলবে না, কারণ সেন্সর-শিপের তরফ থেকে বাধা আসবে। আপ্রাণ চেষ্টা এবং অনুরোধ সত্ত্বেও বৃদ্ধাকে এর থেকে নিরত করা গেল না—

It was impossible to convince her that she could get along on the stage without vulgarity. In her opinion on this was impossible for a true village type.

অপরদিকে আবার দেখছিলাম বৃদ্ধা তার অভিনয়ের মাধ্যমে টলস্টয়ের ঈর্ষাজড়ী অতর্নিত এবং বাহ্যিক বস্তুর এমন সম্পর্ক এবং সত্য ভাষা দিচ্ছিল বার কালে আমাদের বস্তুবাদের প্রভাবসনের প্রত্যেকটি বস্তুটিই পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল—

She interpreted the inner and outer contents of Tolstoy's tragedy so fully and truthfully, she justified each of our naturalistic details of production to such an extent that she became absolutely essential.

বুটোভা এনিশিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন—চাষী রমণীর রোলে তাঁর এ্যাকটিংও হচ্ছিল অভুল-নীয়—বৃদ্ধ-মহিলা এবং বুটোভার এই যুগ্ম অভিনয় এমন একটা উচ্চ-স্তরে উঠে বাচ্ছিল যা চিরকাল আমাদের স্মৃতিপটে গাঁথা থাকবে।

ভ্রমহীন আমি শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাকে ঐ রোল থেকে বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ কিছুতেই তাকে সোয়ায় করানো থেকে নিবৃত্ত করা গেল না। শিপটরের বাড়ির সমানে যে জনতার সমাবেশ হয় তার ভেতর তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল। পেছনের সারিতে তাকে অদৃশ্যভাবে রাখা হোল—কিন্তু তার কান্না অন্যদের হৃদয়কাষে ধনিকের ভয়ানকভাবে ছাপিয়ে উঠতে লাগল। অথচ তাকে বাদ দিতে ইচ্ছা হয় না। এক জায়গায় বিশেষভাবে বিরতির ব্যবস্থা করলাম—ঠিক করলাম এই সময়টার বৃদ্ধা স্টেজ ক্রশ করে চলে যাবে গান গান করে গান গাইবে—এবং দূরে কাউকে উদ্দেশ্য করে ডাকবে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাপ্তি ছিল এবং এমনভাবে রাশিয়ান ভিনোজের স্পিরিট তার থেকে স্ফূর্তিত হচ্ছিল যে সে মন্ত থেকে বেরিয়ে যাবার পর, আমাদের কারোর স্টেজে আসাটা

প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সুতরাং তাকে স্টেজে আসাটা বন্ধ করতে হোল—ঠিক করা হল উইংসে দাঁড়িয়ে সে গান করবে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল অভিনেত্রীদের পক্ষে এ ব্যাপারটাও বিপজ্জনক। এরপর, আমরা মহিলার গানের একটা ফোনোগ্রাফ রেকর্ড করলাম এবং সেটাকেই ব্যাকগ্রাউন্ড এ্যাকশনের জন্য ব্যবহার করলাম। এর ফলে সে দৃশ্যের আসেবলও অব্যাহত রইল।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এই মহিলার অব্যবহৃত প্রতিভাকে আমরাও ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলাম না। কিন্তু আমার এ পরীক্ষা একেবারে নিষ্ফল হয় নি। রিহাসালের সময় অনেকবারই আমি একথা প্রমাণ করে দিলাম যে, স্টেজে রিয়ালিজম জিনিসটা গিয়ে ন্যাচারেলিজমে পর্যবসিত হয় তখনই, যখন—

It is not justified by the inner experience of the actor.

একবার নিজেকে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে রিয়ালিজম ব্যাপারটা হয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে, না হয় অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়—

Thanks to the blending of inner and outer life, I would advise all theoreticians who do not know this from their own experience to test on the stage whether I am right or wrong.

আমাদের দুর্ভাগ্যবশত দি শাভায়ার অব ডার্কনেস নাটকের বাইরের রিয়ালিজম ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি অভিনেত্রীদের আর্থিক অনু-ভূতির স্বাধীনতা—ফলে পালাটির ওপর জিনিসপত্র, প্রস্পটিং এবং জীবনের বাহ্যিক রূপের চাপ এবং প্রাধান্যটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

Having slipped from the line of intuition and feelings, we found ourselves on the live of manners and its details, which strangled the spiritual content of the play and role.

[My Life in Art—Stanislavsky]

বিখ্যাত রাশিয়ান নট চেরকাশভ তাঁর নোটস অব এ মোডার্ন এ্যাক্টর বইতে টলস্টয়ের দি ক্রুটস অব এন-লাইটনেসেট নাটকে তাঁর অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

সাপ্তাহিক বঙ্গভাষী

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দি ইংস স্পেক্টেটরস থিয়েটার আমাকে লিখ টেলস্টেয়ার 'দি ফ্রুটস অব এনলাইটন-মেন্ট' নাটকের জেজিডিংসেভ চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য আহ্বান করল।

দেখলাম এ ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে চরিত্রটির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ করতে হবে। চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে বেশ ভাস্‌ভাবে জানতে হবে—কারণ তার ম্বারাই তার আচার-আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত। যে পরিবেশে সে মানদুঃ তারই ওপর নির্ভর করছে তার ব্যক্তি-সত্তার বিশেষত্বগুলি। এ ধরণের চরিত্রে এর আগে কখনও অভিনয় করি নি—সুতরাং আমার কেরিয়ারকে এ চরিত্রটি যেন কয়েক পা এগিয়ে দিল।

এই নাটকেই প্রথম আমি আমার জীবনে মনস্তাত্ত্বিক রোলে অভিনয় করবার সুযোগ পেলাম। ভূমিকাটি আসলে রিয়ালিস্টিক কমেডী চরিত্র। টেলস্টেয়ার যে ভাব নিয়ে নাটকটি লিখেছেন সেই ভাবটিকেই পরিষ্কৃত করে তুলতে হবে আমাদের মণ্ডাভিনয়ে—সুতরাং উঠে পড়ে আমরা কাজে লেগে গেলাম—এ নাটক তৈরি করতে গিয়ে অনেক বিষয়ে নতুন করে শিক্ষা-লাভও করলাম।

আমার জেজিডিংসেভের চরিত্রায়ণ হল এই ধরণের—একজন মূর্খ, আলস্যপরায়ণ, ধনী এবং যৌর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসাবেই তাকে আমি রূপায়িত করেছিলাম। অথচ বাইরে থেকে দেখলে তাকে মনে হবে শিক্ষিত। ভাবভঙ্গী, পোশাক-আশাক, কথাবার্তার ধরণে সে হচ্ছে সম্পূর্ণ এয়ারিস্টেক্রেটিক।

যে ধরণের কমিক চরিত্রে এতকাল অভিনয় করেছি তার ফলে কতকগুলো অভ্যাস আমার অভিনয় ধারায় প্রায় গেথে গিয়েছিল। অথচ টেলস্টেয়ার চরিত্রটিতে সে ধারাটা একেবারে বেখাপ্পা দেখাবে। ভারি মন্থকলে পড়লাম। কোন দৃশ্যে কিভাবে অভিনয় করবো, মন্ডিকদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো, নিকোলাইয়ের স্পিরিটের সঙ্গে কিভাবে আলাপ করবো, কিভাবে স্ত্রীর খাতানি খেয়ে পালিয়ে যাব—এ সব চিন্তা আমার মাথা খারাপ করে দেবার যোগাড় করলো।

And while I did commit some errors, particularly because I was paying too much attention to the questions, "how to do this?"

and "how to do that?" nevertheless I succeeded in making certain episodes realistic and life-like, and the encouraging applause showed that I was doing the right thing.

প্রথম রজনীর অভিনয়ের পর কিন্তু দর্শকেরা আর এ জাতীয় প্রশংসাধ্বনি করলো না। কত রকমে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথায় ভুল হচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

Disappointed and puzzled, I decided I would not stop trying to achieve the effect I had so successfully hit upon the first night. I rehearsed the lines at home and at the theatre, but all in vain. I worked out the rhythm of the scene and all the movements to the last detail, repeated the two lines hundreds of times, but the intonation was just not there.

এই দুটি লাইন হচ্ছে—জেজিডিংসেভ যখন পরিচারিকা ট্যানিয়াকে প্রথম অঙ্কের শেষে বাটলার সেমিয়ন সম্বন্ধে বলছে—

'I have try known that he is a medium.'

এবং এ অঙ্কেরই শেষে জেজিডিংসেভ নাচতে নাচতে ভ্যালো ফিডরকে গিয়ে আদেশ দিলেন সিয়ান্সের ব্যবস্থা করতে এবং অত্যন্ত সহজভাবে বললেন:

'We shall have our own medium at the trial seance to-day.'

The second line, in fact, became an anti-climax. Things were going from bad to worse. Utterly dissatisfied with myself, I came to the conclusion that realistic and psychological roles were beyond my abilities. Exhausted by the search for missing intonation, I reconciled myself to defeat. And then one evening,

after I had stopped thinking of the scene and the two lines, they unexpectedly resounded with the same force as at the premiere and were drowned in applause. That evening I understood that in a realistic play one should never think of how to play an episode if one wants it to be true to life. Realism, I saw, comes with the proper understanding of the situation and of the psychology of the character portrayed.

আমার এই ধারণা সম্বন্ধে কনফার-মেশন পেলাম স্ট্যানিসলাভ স্কিকর অনুভূত বইটি—'মাই লাইফ ইন আর্ট'-থেকে। এ বইটি থেকে আমি বহু জ্ঞান আহরণ করেছি—নিজের অনেক বিষয়ে অনেক মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি—শেষত বাস্তবধর্মী নাট্যাংশ সম্পর্কে।

এই প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের কথা স্মরণ হচ্ছে—তিনি আমাকে বারবার বলতেন নাট্যমণ্ডের অভিনয়শিক্ষার্থীদের বারবার করে স্ট্যানিসলাভ স্কিকর 'মাই লাইফ ইন আর্ট', 'ওথেলো' এবং 'সিগাল' সম্বন্ধে লেখা রচনাগুলি পড়া উচিত। প্রথম বইটিতে বিশদভাবে স্ট্যানিসলাভ স্কিকর তাঁর অভিনয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আর সেক্সপীরের ওথেলো এবং চেম্বের সিগাল সম্বন্ধে কম্পোজিশন মডেলস্ট এবং এ্যাকশন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডারোগামের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন স্ট্যানিসলাভ স্কিকর এ দুটি নাটক কিভাবে তিনি প্রডিয়ুস করেছিলেন। আমি নাট্যাচার্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলাম একটি বাংলা নাটক নিয়ে এই ধরণের কাজ করতে। তিনিও খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন বটে, তবে সমস্যা-ভাবে এ কাজ করতে পারেন নি। যদি এ কাজটা তিনি করতে পারতেন তাহলে আমাদের নাট্যাংশের ইতি-হাসে একটি অমূল্য কাজ হিসাবে এটি পরিগণিত হতো।

(কমলা)

মনের
মণ্ডন
গয়না

বি. প্রকার
রায় ও সঙ্গ
২২৪, ২৪/৮ বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা

‘সবার অলঙ্কা’ নামে ধারাবাহিকভাবে ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’-তে প্রথমে ভূপেন-কিশোর রক্ষিতরায় বাহা লিখিতছেন। তাহা বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় ‘বি, ভি, গুপের’ একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা বলা যায়। ‘বিশ্বের যুগে বি, ভি, গুপ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং বাংলার যুব-মানসে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। ‘দেওভোগ শ্রুতি’ গ্রামলা পথন্ত যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পরের অধ্যায় হইতে নেতাজী ও ‘বি, ভি, গুপ’ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্পর্কে কিছু সংশোধন ও সংযোজন হওয়া দরকার; নচেৎ উহা আজ-স্মৃতিমূলক প্রচারণা হইবে। সত্যিকারের ইতিহাস হইবে না। লেবেং মামলার রবি-ব্যানার্জির ভূমিকাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। অথচ সেই যুগের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা বাহা জানি তাহ অনারূপ বলে। এ মামলার অভিব্যক্তি বিপ্লবীদের মধ্যে উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রাণদণ্ড মকুব ও যাকজীবন দীপান্তর দণ্ডভোগ না করিয়াই দ্বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে চূড়ান্ত দুর্বলতা না আসিলে ‘শুধু ‘সবার সারহেব’ পিতার কথাই আন্দামানের নির্জন প্রকোষ্ঠে সহকর্মীদের ফেলিয়া রাখিয়া হইতেন না। অভিন্নহৃদয় বন্ধু, শহীদ ভবানী ভট্টাচার্যের আজাদন ও তাহার বিবেককে নাড়া দিত।

‘বামা ফ্রন্ট ও নেতাজী’ অধ্যায়ে বামরি অবস্থিত বিপ্লবীদের অবদান সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নাই। ভুবোজহারজের অনু-শীলনের ‘প্রফুল্ল দত্ত, শ্রীপতি রায়, নেতাজীর প্রচেষ্টার জামাতা শ্রীহরিদাস মিত্র প্রমুখ ঝাঁরা উড়িয়ায় উপকূলে নেতাজীর নির্দেশে অবতরণ করিয়া রোমাণ্ডকর অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বাদ যাওয়া দুঃখের ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীহরিদাস মিত্রের সহযোগিতা সহধর্মিনী ‘বেলা মিত্র—তাহাদের ফাঁসীর হুকুম রদ করাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পাতা হইতে হরিবার নয়।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্তি আন্দোলন লইয়া সারা ভারতে যে গণজাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ থাকা উচিত ছিল।

দেবধানী রায়
অজনগড়, দমদম

সাপ্তাহিক বসুমতীর গত ১ই ডিসেম্বর সংখ্যায় লিখিত আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ‘বঙ্গ চিন্তা’ পড়লাম। প্রবন্ধটির জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই মূল স্রোতার দিকটা আজ প্রায় সমগ্র জাতির কাছেই উপেক্ষিত ও অগ্রহেলিত। কল্যাণ আমাদের নৈতিক চরিত্র নির্যাতিত্বের ও



কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই সমস্যার রূপরেখা এবং গুরুত্বের অনুপাতে আপনার পত্রিকার একটি প্রবন্ধ কতটুকু কার্যকরী ও ফলবতী হওয়া সম্ভব?

মাফ করবেন, প্রশ্ন করে আপনার কাছে আমি উত্তর চাইছি না—আমার বক্তব্য এই যে, প্রশ্নটা যদি সঠিক বলে মনে করেন, তবে আপনার সীমিত সুযোগ ও শক্তির দ্বারা এমন কিছু করুন যাতে উক্ত প্রশ্নের কারণ দূর হওয়া সম্ভব হয়।

জরবিদ্য রায়

১০৬এ, নারকেলডাঙা নর্থ রোড,
কলিকাতা-১৬

আপনার পত্রিকা উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি একজন পাঠক হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত।

আপনাদের ‘ভারত দর্শন’, ‘বঙ্গদর্শন’, ও ‘আন্তর্জাতিক’ খুব ভাল লাগে। কারণ এতে থাকে সত্যের প্রচার, নির্ভীক স্পষ্টতা। ‘আজকের মানস’ও অনেক জনার থাকে। তবে এমন প্রতি সংখ্যার একটি করে গল্প থাকে কেন? বিদেশী গল্প বাদ দেবেন না। অন্তত দুটো বারের গল্প থাকা উচিত। একটা দেশী, আর একটা বিদেশী। ‘অধিরামাদিক’ শেষ হলো তো; এবার ‘উপলক্ষ্যার’ পরিসরটা বাড়ান। এ বিষয়ে আপনাদের কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন। আপনারা কান দেন নি। কেন? আশা করি এবার থেকে তাই হবে। পারেন তো আর একটা সামাজিক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের করতে থাকুন। ‘প্রবন্ধ-মেলা’র ইদানিং উপন্যাসের আলোচনা হয় দেখে খুশি হইয়াছি। হ্যাঁ বেশি পত্রিকার আলোচনা না করে গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের আলোচনা থাকলেই ভালো। ‘বাগ্যেজ একাল সেকাল’ শেষ হয়েছে দেখে খুশি। আমি পাঠক হিমাংশু ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে মত দিয়ে বলাছি যে ওটার পরিকল্পনা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে খুব ভালো হয়। আপনার পত্রিকার বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থাকুক না। ওটার প্রচলন করিবেন। তা সে ধারাবাহিক হোক আর নাই হোক। তবে হালকা ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। গুরুগম্ভীর নয়। ‘ফেলোজাদ প্রসঙ্গ’ বাদ দেবেন না। সংবাদকথা রাখবেন। ‘চার্লি চ্যাপলিন’ শেষ

হলে অন্য কোন ধারাবাহিকের পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী আলোচনা করবেন।

শ্রীকমলেশ্বর ব্যানার্জি,
প্রভাষপত্র, পাতিহাল।
(হাওড়া)।

সাপ্তাহিক বসুমতী বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত জেনে সত্যিই গর্ববোধ করছি। আমার এক বন্ধু এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিল। আজ আর সে পাঠক নেই। কিন্তু আমি হয়ে পড়েছি একনিষ্ঠ ভক্ত। এর ‘উপলক্ষ্যার’ উপন্যাসখানা আমাকে যেন ছায়ার মত আকর্ষণ করে রেখেছে। কিন্তু প্রতি সংখ্যাই আমাকে অত্যন্ত সন্তোষ রেখে পড়তে হচ্ছে। আপনাকে আমি সর্বাধিক অনুরোধ করছি আমার মনে বিরক্তির বৃক্ষ রোপণ না করতে। অবশ্য ‘সবার অলঙ্কা’ স্বাভাবিকভাবেই মনকে বেঁধে রাখতে পারে। সেকথা স্বতন্ত্র। আপনাদের নির্ভীক মতামত প্রচারে বাংলা সাপ্তাহিকের মধ্যে প্রথম, একথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি। তাই তা আমি নিজেই হক করে আপনাদের সাপ্তাহিক (দৈনিকও) কয়েকজনকে গাইয়ে দিয়েছি। তারাও আমার মতে মত দিয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছে। পাঠক-মনের ডালি ভরে উঠুক নানা সমালোচনায় (আজ সমালোচনা ছাড়া) যাতে আমার মত তা পড়ে অন্য পাঠকও আপনাদের সাপ্তাহিকের প্রেমে পড়ে। নতুন লেখক হলেও আপনাদের ছোটগল্প কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ংকর সুন্দর হয়ে দাঁড়ায়। যা চিত্রতার খোরাক জেটায়। স্বাদ পাওয়া যায় যথেষ্ট। যাওয়ার আগে আর একটা বলাছি সেটা হচ্ছে ‘বসুমতী’র মূল্যও খুবই কম। মাত্র ২৫ পয়সা। তদুপরি বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরও নেই। তা হলে কিন্তু দাম চড়িয়ে দেবেন না। আপনাদের পত্রিকায় সর্বাঙ্গসুন্দর হোক, এই কামনা করি।

দলমুকুতার ভট্টাচার্য

দমদম পুস্তকালয়/কলি-২৩

নবপরিবার সাপ্তাহিক বসুমতীর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এর তৃতীয় বর্ষ এখনও পূর্ণ হয় নি কিন্তু অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনের সার্টিফিকেট দেখে সত্যি খুব আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি।

লক্ষ্য করছি গ্রাম বাংলার বিভাগটি প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে না, এর নিয়মিত প্রকাশ আশা করি। তার সঙ্গে আশা করি কলিকাতা মহানগরীর অতি নিকটের গ্রাম-গুলিরও পরিচয়। যেমন মহেশতলা থানার অধীন মহেশতলা গ্রাম, আকড়া কৃষ্ণনগর গ্রাম, বাটানগর শিল্পাঞ্চল ও অন্যান্য গ্রাম। এ বিষয়ে যদি কোন সাহায্য চান আমরা তা সানন্দে করব।

শ্রীকমলেশ্বর ব্যানার্জি, সম্পাদক, আমরা কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসংঘ, পোঃ বাটানগর (চন্দ্রিশ পরগনা)।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে হাইজাম্প বিজয়ী লরেটো কলেজের কঞ্চনা দাস

রোভার্সের শেষ অঙ্কে

মোহনবাগান এবারও রোভার্সের ফাইনালে উপনীত হয়েছে। ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হবে বোম্বাইয়ের মফ্বলাল মিলস দল। এবার রোভার্স কাপের সেমি-ফাইনালের একদিকে হয় দুই কলকাতা দলের শক্তি পরীক্ষা অন্যদিকে দুই বোম্বাই দলের লড়াই। বোম্বাই লীগ বিজয়ী সেন্ট্রাল রেল দল ২-১ গোলে পরাজিত হয় মফ্বলাল দলের কাছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বোম্বাইয়ের হারউড লীগে দুবারই মফ্বলালের ৩-১ গোলে পরাজয় খেটেছিল সেন্ট্রাল রেল দলের কাছে। অবশ্য রোভার্সের খেলায় উন্নত ক্রীড়াধারার সাহায্যে খোয়া দল হিসাবেই মফ্বলাল দল জয়লক্ষ্যীর অনুরোধ লাভে সক্ষম হয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনালে দুদিন খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর কলকাতার ইস্টার্ন রেল দল শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন পরাজিত করে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে। টাটা দলের বিপক্ষে রেল দল সরাসরি ২-০ গোলে জয়ী হয়। ইস্টার্ন রেল দলের পক্ষে প্রথম গোল করেন উদয়শঙ্কর চৌধুরী এবং দ্বিতীয় গোলটি দেন বাগচী।

এরপর সেমি-ফাইনালে কলকাতা লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং ইস্টার্ন রেল দলের প্রথম

দিনের সাক্ষাৎকার অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার প্রথমার্ধে মোহনবাগান দলের লেফট-ইন কাজল মুখার্জী একটি গোল করে দলকে অগ্রগামী করেন। কিন্তু প্রথমার্ধের ঠিক শেষ সময়ে উদয়শঙ্কর চৌধুরী গোলের নিকট থেকে একটি তীর স্টের সাহায্যে মোহনবাগানের গোলরক্ষক কমল সরকারকে পরাজিত করে গোল পরিশোধ

শ্রীঅমিত্যভ

করেন। দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরে অতিরিক্ত সময়েও কোন মীমাংসা হয় না। মোহনবাগানের পুরোভাগের আক্রমণধারা সংবলিতভাবে না হবার ফলে কয়েকটি গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রথমার্ধে অশোক চ্যাটার্জীর দেওয়া বিজয়সূচক গোল মোহনবাগানকে ফাইনালে প্রবেশের পথ করে দেয়। এইদিন মোহনবাগানের পুরোভাগে আক্রমণধারাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন অশোক এবং কাজল।

এই লেখা যখন প্রস্তুত করা হয়েছে তখনও ফাইনাল খেলা অনিশ্চিত হয় নি। তবে মনে হচ্ছে রোভার্স কাপের কলকাতার আতিথ্য গ্রহণ করার সম্ভাবনাই বেশি।

ডুরান্ড কাপের খেলা এখন পুরোদমে চলেছে রাজধানী দিল্লীতে। গতবারের রোভার্স বিজয়ী বি এন রেল দল বৈমন রোভার্সের আসরে প্রথম খেলাতেই বিশারদ নিতে বাধ্য হয়েছে, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় পাজাব পুলিশের কাছে ২-১ গোলে বি এন রেল দলের পরাজয় ঘটেছে ডুরান্ডে আসরেও।

এই সপ্তাহে কলকাতার খ্যাতনামা দলের আবির্ভাব ঘটবে দিল্লীর ডুরান্ডে আসরে। রোভার্সের ফাইনাল খেলাটি নির্ধারিত দিনে অনিশ্চিত না হবার ফলে দুটি দলের ডুরান্ড কাপের খেলায় তারিখ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় টুর্নামেন্ট কমিটি।

বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস

একটি মিলন মেলা সাঙ্গ হলে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। ১৯৬৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসের পরিসমাপ্তি ঘটল; তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উভয় বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে বিদ্যাসাগর কলেজ। ছাত্রদের বিভাগে মোট ১৬ পরেন্ট সংগ্রহ করে বিজয়ী হয় বিদ্যাসাগর সান্থা এবং ছাত্রীদের বিভাগে ৪৮ পরেন্ট লাভ করে বিদ্যাসাগর কলেজ চ্যাম্পিয়ান হয়।

ব্যক্তিগত বিজয়ীর সম্মান ছাত্রদের

শাস্তাহিক বঙ্গবর্তী

বিভাগে অর্জন করেন বিদ্যাসাগর সান্থা কলেজের সমীর চ্যাটার্জী এবং ছাত্রীদের বিভাগে বিদ্যাসাগরের চিত্রা গাঙ্গুলী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গতবারও বিজয়ী হন চিত্রা গাঙ্গুলীই।

এবারের প্রতিযোগিতায় মাত্র চারটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিন হ্যামার প্রে-তে বিদ্যাসাগর কলেজের রঞ্জিত ঝা ১০০ ফুট ৪ ইঞ্চি ছুঁড়ে মণীন্দ্রনাথ কলেজের বি মাহাতো প্রতিষ্ঠিত ১১৬৩ সালের রেকর্ডটি ভংগ করেন। দ্বিতীয় স্থানার্থিকারী বহরমপুর কলেজের মহম্মদ মহসীন আলিও পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন।

শেষ দিন তিন বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত এবং তিনটি বিষয়েই নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন ছাত্রীরাই। ২০০ মিটার দৌড় ২৮.৬ সেকেন্ডে অতিক্রম করে দীনবন্ধু এ্যান্ড্রাস কলেজের গীতা নন্দী ১৯৬০

সালে গ্রীষ্মকায়তনের অনিভা মুখার্জী কৃত রেকর্ডটি স্নান করেন।

৮০ মিটার হাউলসে নিজেরই প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভংগ করেন চিত্রা গাঙ্গুলী। চিত্রার পূর্বের রেকর্ডটি ছিল ১৪.৯ সেকেন্ডের, এবার তার সময় হয় ১৪.৭ সেকেন্ড।

৫৯ সেকেন্ডের নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রীদের ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে। লরেন্সো কলেজের কম্পনা দাস, সুজিত ভাইস, তন্তালিতা গুপ্ত ও জয়শ্রী নবিশের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে তাদেরই কলেজের ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডটি স্নান হয়।

ছাত্রদের ২০০ মিটার দৌড়ে সমীর চ্যাটার্জী পূর্ব রেকর্ড স্পর্শ করতে সক্ষম হন। ছাত্রীদের হাইজাম্পে বিজয়ী লরেন্সোর কম্পনা দাস অক্লেপের জন্য রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেন নি।

শেষদিন প্রতিযোগিতায় শেষে বিশ্ব-



প্রশোক চ্যাটার্জী

বিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী এন কে ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন মন্যী শ্রীফজলুর রহমান।

সমাচার দর্শন

রাশিয়ান ফুটবল দল তাদের ভারত সফর শেষ করল অপরাধিত অবস্থায়। শেষ প্রদর্শনী খেলাটি রাশিয়ান দলের অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে। এই খেলার রাশিয়ান দল ০-০ গোলে এ আই এফ এস দলকে পরাজিত করে। রাশিয়ান দল বোম্বাইয়ের প্রদর্শনী খেলায় কোনক্রমে ১-০ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। এই খেলার কয়েকজন রাশিয়ান খেলোয়াড় কিছুটা অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেন।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার আহত ক্রিকেট অধিনায়ক প্রুত আরোগ্যের পথে। কিছুদিন পূর্বে তার হাতে আঘাত লাগে ত্রিসবেনে সৌফল্ড শীল্ডের খেলায়। এক্সরের পর দেখা যায় যে সিম্পসনের হাতের বে জায়গায় আঘাত লাগার ফলে হাড়ে সামান্য চিড় ধরেছিল ঠিক হয়ে গিয়েছে।

* * *

সফরকারী লন্ডন স্কুল দলের বিপক্ষে দিল্লীতে তিন দিনের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার অংশগ্রহণের জন্য ম্যানেজারবিহীন অবস্থায় ভারতীয় স্কুল দল বোম্বাই দল থেকে ফ্রান্সিসের মেলবোঙ্গে দিল্লী হওয়া হয়ে যায়:



চিত্রা গাঙ্গুলী

টেনিসের রবার্ট ব্রুস

টেনিসের রবার্ট ব্রুস এমার্সনের বিদায় স্রোত মনে হচ্ছে বিশ্ব টেনিসের অগ্নি থেকে। তাঁর ক্রীড়াশৈলীর প্রদীপ্ত আলোক আজ স্তিমিমাণ: মনে হচ্ছে তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলে ভাঙন ধরেছে। ১৯৬৫-র উইমবলডেন বিজয়ের পর থেকে মনে হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রেষ্ঠ অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড় নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন, বিস্মৃতির পথে ধীরে ধীরে তাঁর গমকেণ্ডা বেধে সত্যই দৃঢ় হচ্ছে। ভার্জিনিয়ার তরুণ অনামী খেলোয়াড় আর্থার গ্র্যাসের হাতে দেশের মাটিতেই এমার্সনের দুবার পরাজয় টেনিস জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব টেনিসের অগ্নিতে এক বৃন্তে দুটি ফুল এমার্সন আর স্টোলে, এই দুজনেরই সঙ্ক্ষে অস্ট্রেলীয় টেনিসের মর্যাদা রক্ষার গুরুদায়িত্ব। এ মাসের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার ডেলিস কলেজের বে মর্যাদার লড়াই হবে তাতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল রয় এমার্সনের।

অধ্যবসায়, একাগ্রতা, কঠোর অনুশীলন এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বারা বে নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করা যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল রয় এমার্সনের খেলোয়াড়ী জীবন। পরাজয়ে বিস্মৃত্য ব্যর্থমনোরথ না হয়ে অধ্যবসায়ের স্বারা অবশেষে নবম প্রচেষ্টার 'এমোকে' লক্ষ্যে উপনীত হতে দেখে সত্যি



ববি সি-পসন



গীতা নন্দী

স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও শাকড়সার গল্পের কথা মনে পড়ে যায়।

জন্ম এমার্সনের কুইন্সল্যান্ডের রয়াকটে। পিতা স্থানীয় ধনাঢ্য কৃষক। জন্মের পর থেকেই প্রাচুর্যের মধ্যে এমার্সন মানব। বাড়ির সঙ্গে তাদের প্রচুর জারগা, বাড়ির মধ্যে একটা ছোট্ট সুইমিং পুল, একটি কুকুরকে তকতকে টেনিস কোর্ট আর খেলার মাঠ। এই পরিবেশে খেলে আর দৌড়াপ করে ছোটবেলায় বেশ সময় কেটে যেত।

একজন জাত খেলোয়াড়ের প্রয়োজনীয় গুণগুলি সাথে করে জন্মেছিলেন এমার্সন, সুযোগের ফলে তার মধ্যে অশ্রুতির গুণগুলির বিকাশ ঘটে লাগল। দেখা গেল যে, যে খেলাই তিনি ধরেন, অস্পষ্ট তাতে লাভ করেন যথেষ্ট পারদর্শিতা। কৈশোরের শেষ অঙ্কে দেখা গেল এমার্সন অস্ট্রেলীয় টেনিস জগতের আগামী দিনের সম্ভাবনা বলে

চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ই এক বিরাট চিন্তার সন্মুখীন হলেন তিনি। মনে মনে স্বল্প চলতে লাগল, কেন? পথে অগ্রসর হবেন এই প্রসঙ্গে। কারণ এই সময়ে দেখা গেল গ্র্যাথলেটিকসে তিনি দারুণ সাফল্য অর্জন করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১০০ গজ মাত্র ১০.৬ সেকেন্ডে অতিক্রম করলেন দৌড়ে আর লং জাম্পে দেখা গেল ২১ ফুট ৩ ইঞ্চি পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু বড় হতে গেলে একজন খেলোয়াড়ের জীবনে দুটি খেলার সহ-অবস্থান অসম্ভব। উপায় নেই, যে-কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে, অন্যটিকে জনসাধারণ হতে চিরবিদায়। শেষ পর্বন্ত টেনিসের আকর্ষণের কাছে নীতি স্বীকার করলেন এমার্সন; রানিং স্ট্রু আর স্টাটিং ব্লক ছেড়ে হাতে তুলে নিলেন টেনিস রয়াকটে। অনেকের মতে এমার্সন যদি গ্র্যাথলেটিকসকে পরিত্যাগ না করতেন তবে তিনি

অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াও, হকিও অস্ট্রেলিয়াকে উপহার দিতে পারতেন স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক। অবশ্য টেনিস ক্রিকেট এমার্সন অস্ট্রেলিয়াকে এনে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

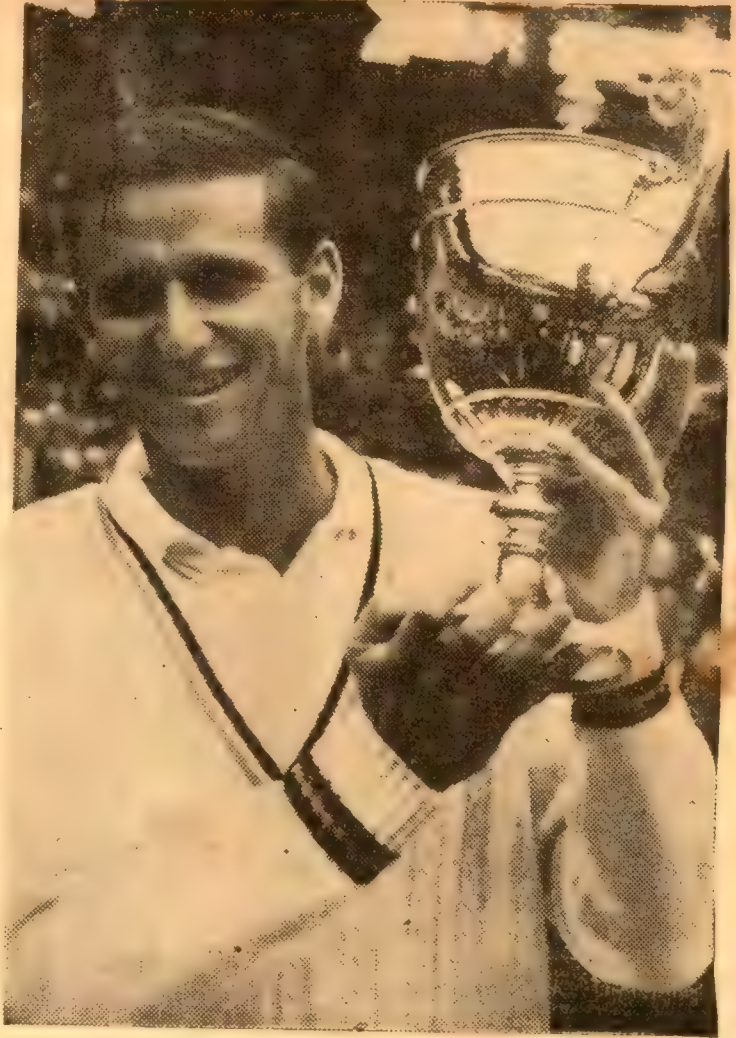
শৈশব থেকেই এমার্সনের অদম্য বাসনা বিদেশ ভ্রমণ। টেনিসকে গ্রহণ করে তাঁর সেই বাসনাও পূরণ হয়েছে। এমার্সনের বাড়ির টেনিস কোর্টে গোটা পরিবারটাই টেনিস খেলতেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য এমার্সনেরও জ্ঞান হবার সাথে সাথেই হাতে র‍্যাকেট উঠল। এগারো বছরের কিশোর এমার্সন জীবনের প্রথম পুরুষকার লাভ করেন স্থানীয় একটি প্রতিযোগিতার আসরে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যদলে এমার্সন স্থান পেলেন।

এমার্সনের সঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মিল আছে। খেলোয়াড় জরোন্সলাভ জুবনীর অত্যন্ত মিল আছে। জরোন্সলাভ জুবনী এবং এমার্সনের কীভাবে অনেকটা একই ধরনের; দুজনেরই খেলার মধ্যে সৌন্দর্যের স্পর্শ কম। জুবনী একাদশবার চেন্টার পর প্রথম উইমবলডেন জয় করেন ১৯৫৪ সালে আর আশ্চর্য ঠিক সেই বছরই বিশ্ব টেনিসের লীলাভূমি উইমবলডেনে আসরে বসে এমার্সনের প্রথম পদক্ষেপ। ঠিক একাদশ বছর বাদে উইমবলডেনের মকুট মাথায় উঠল প্রথম বয়স এমার্সনের ১৯৬৪ সালে।

প্রায় ১৯৬১ সাল থেকেই বয়স এমার্সন উইমবলডেনের আসরে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছেন। অবশ্য এই সময় বিশ্ব টেনিসের দরবারে এমার্সনেরই দেশের ছেলে রড লেভারের রাজত্ব চলছিল। দুইবার উইমবলডেনের সম্মান করায়ত্ত করে রড লেভার অপেশাদারের পোশাক ত্যাগ করলেন। ১৯৬০ সালে উইমবলডেনের বাছাই তালিকার শীর্ষে স্থান পেলেন এমার্সন। ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে উইমবলডেনে তাঁর পরাজয় ঘটেছিল ভারতের রমানাথন কৃষ্ণানের কাছে এবং ১৯৬২ সালে স্বদেশবাসী মার্টিন মুলিগানের কাছে।

উইমবলডেনের সোভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় ১৯৬০ সালে বিরূপ ছিলেন। পরলা নম্বর বাছাই বয়স এমার্সন কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেন জার্মানীর এক অখ্যাতনামা তরুণ খেলোয়াড় বুৎগার্টের কাছে পরাজিত হয়ে। ১৯৬৪ সালে অবশেষে এমার্সন লক্ষ্যে উপনীত হলেন, ফাইনালে ফ্রেড স্টোলেকে পরাজিত করে লাভ করলেন উইমবলডেনের দুলভ সম্মান। ১৯৬৫ সালেও উইমবলডেনে সম্মান আবার তাঁর হাতে এল।

এমার্সন ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্র-



বয়স এমার্সন

লিয়াকে সাহায্য করে আসছেন ১৯৫১ সাল থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে আজ পর্যন্ত ডেভিস কাপের খেলায় সিংগলসে অপরাধিত আখ্যা অক্ষর রেখেছেন। উইমবলডেনের কাছে এমার্সনের সংগ্রহশালায় আছে ফরেষ্ট হিল, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া আর ইটালির পৃথিবীর খ্যাতিনামা টেনিস প্রতিযোগিতাগুলির বিজয়ীর সম্মান আর আছে অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতার পুরুষকারের রাশি। এমন কি ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ীর সম্মানও তিনি অর্জন করেছিলেন কয়েক বছর পূর্বে। ২১ বছরের এই খেলোয়াড় এমার্সন হলেন দুই সন্তানের পিতা। তাঁর বছরের বেশির ভাগ সময়ই

জীবিতবাহিত হয় দেশ-বিদেশের টেনিস কোর্টে। এমার্সনের সত্যিকারের মিত্র দুজন; এক হল টেনিস আর অন্যজন হলেন তাঁরই টেনিস মাঠের প্রধান শত্রু ফ্রেড স্টোলে।

উইমবলডেন জয় এমার্সন করেছেন এখন তাঁর লক্ষ্য হল টেনিসের শ্রেষ্ঠ পুরুষস্কার “গ্র্যান্ড সলাম”। বিশ্বের চারটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা উইমবলডেন, ফরেষ্ট হিল, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়ার আসরে বিজয়ীর দুলভ সম্মান একই বছরে লাভ করাকে “গ্র্যান্ড সলাম” বলে। দুবারের উইমবলডেন বিজয়ীর কাছে বিপুল অর্থের প্রলোভন এসেছে, কিন্তু সেই প্রলোভন তিনি জয় করেছেন কারণ তিনি স্বপ্ন দেখছেন গ্র্যান্ড সলামের।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গবন্ধু প্রেস হইতে প্রিন্ট্রুকার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৮৫৯
আজকের মনোব	...	১৮৬০
ভারতদর্শন	...	১৮৬১
আন্তর্জাতিক	...	১৮৬২
উপন্যাস (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র —	১৮৬৩
মামক বিপ্লবী মতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৬৪
বঙ্গদর্শন	...	১৮৬৫
প্রাথমিক	— জয়ন্তী সেন	১৮৬৬
অপরূপ নেহারল ওকলাহোমা ও টেন্নিস	— এস. কে. গ্রানবার্গ	১৮৬৭

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

• • স্বল্পপ্রমে পর্যাপ্ত কল অবশ্যপ্রার্থী • •
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অধিতীয় সাহায্য গ্রন্থ।

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—০.৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১.০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

(প্রতি খণ্ড : মূল্য আট টাকা)

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

সম্পাদিত পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্ভুত বার্তেমস
শারদ-জ্যোৎস্না—চার্লস-স্টিব ইন্সব্রু
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকার
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ববয়সের
অনন্ত নিবন্ধ—বিশ্বসাহিত্যগৌরব উপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—মিকোলান মিকলি :
বারনাবি বজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
অঙ্গণে এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৥০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১.৫০ ২য় খণ্ড ২.৫০
৩য় খণ্ড ১.০০ ৪র্থ খণ্ড ২.৫০

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১০৯, বাণবাহারী বাজারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



স্টুডীপত্র



বিবরণ	লেখক	মূল্য
কেন্ট জাতির কথা ও কাহিনী	— নরেন ভট্টাচার্য	১৪৪০
মৃত পাগলের উত্তি থেকে (কবিতা)	— শান্তনু দাস	১৪৯২
স্বপ্নের অন্তরীক্ষা	— ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	১৪৯৩
জলবাসীর জন্যে (গল্প)	— মিহির পাল	১৪৯৯
ইয়োহান স্কেন্দারিয়ান বাথ	— দীপকর সেন	১৯০৪
স্বপ্নগণ	— ...	১৯০৭
স্বপ্নগণ—এদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৯১৩
পাঠকমন	— ...	১৯১৬
স্বপ্নমালা	— প্রীতমিতান্ত	১৯১৭

বক্তৃতাগুলির বিবরণী ওক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নিরীক্ষিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনাকিন, অনন্তানন্দের গল্প, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিভ্রম, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালিক কথামঞ্জা

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

১ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপজ্ঞান এবং ৩ খানি বড় লেখা—স্বপ্নগ্রন্থ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভাতভরণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বপ্নাচারী, আশা, সহাজয়া, সপ্তপদী

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বহু-বাহুরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

২য় ভাগে—বাসুদেব, চোবের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, ভরুবালা, রজনীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক প্রতি ভাগ আড়াই টাকা।

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বহুবিরোধ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতগুরু, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধুমকেতু, শরৎকাল, দেবরাজী, বাউল বিংশতি, মাথের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত।

মূল্য—৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংকলিত ও বাংলা-বচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিত্তাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরার

গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—গীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া

বহামায়ার চর ও পূর্ণমামলন

মূল্য দুই টাকা

উপজ্ঞান সাহিত্যের প্রদীপ ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চৌপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

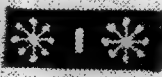
তৃতীয় ভাগ—বেলহাতিয়া, বঙ্গসংসার সনাতন গৌড়ামী, পূজার মালা ও রাণী রজনন্দরী।

মূল্য—এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২



সাপ্তাহিক বাসুমতী



সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৭০ বর্ষ : ৩০শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় বর্ষাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 30th Dec., 1965

বিশ্বভারতী ও বিদ্যায়ী উপাচার্য

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরজ্ঞান দাশের কার্যকাল শেষ হবে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য।

শ্রীসুধীরজ্ঞান দাশ দীর্ঘ ছ' বছর ধরে যে কঠিন পবিত্র দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর সুকঠিন দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, উপাচার্য পদে তিনি যখন অভিষিক্ত হয়েছিলেন—তখন বিশ্বভারতীর অবস্থা কী ছিল। 'বিশ্বভারতী' সম্পর্কে তখন দেশব্যাপী শব্দ হয়েছিল গুঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সেখানে অস্বাভাবিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না সে সম্বন্ধেও ছিল দেশবাসীর অকুতোভয় প্রশ্ন। কেন না, বিশ্বমণীষীদের মিলনকেন্দ্র 'বিশ্বভারতী'ই মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে অমৃততামূলিক শিক্ষার অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হওয়া উচিত নয়, যেখানে ডিগ্রি দিয়ে জগৎ জয় করার প্রেরণাও দেওয়া অন্যায্য। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'তে চলবে বিদ্যার উদ্ভাবনা। "কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে নিবিষ্ট আছেন।"

বলতে বিধা নেই, অনন্যসাধারণ 'বিশ্বভারতী'তে 'গৌণ কাজ'টাই মূখ্য হয়ে উঠেছিল এবং মনীষীদের নামমাত্র আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মামূলিভাবে রক্ষা করা হচ্ছিল। কেন না 'বিশ্বভারতী' তখন আর সৃষ্টির কেন্দ্র ছিল না, সেখানে শব্দ ডিগ্রিই সৃষ্টি করা হচ্ছিল।

ঠিক সেই মহতের ছ' বছর আগে জওহরলালজীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীসুধীরজ্ঞান বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীদাশের কাছেও জওহরলালজীর

অনুরোধ ছিল "বিশ্বভারতীর উপাচার্য হওয়া আপনার কর্তব্য, গুরুদেবের কাছে আপনার ধর্ম।"

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের শব্দ অনুপ্রাণিত থাকাই নয়, যিনি বিশ্বভারতীতে সেই প্রথম যুগ থেকে তার সঙ্গে মনে প্রাণে জড়িত তিনি উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলে হয়তো 'বিশ্বভারতী' অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে পারে—এই ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা গতানুগতিক কুগ্রন্থতার হাত থেকেও কি ভাবে 'বিশ্বভারতী'কে রক্ষা করা যায় সে কথাও সুধীরজ্ঞান ভাবলেন ও সেই ভাবনাকে কার্যে রূপায়িত করে তুললেন।

"আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিন্তার সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে—তাই হবে সহজ সত্য। কুগ্রন্থ হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়,—প্রাণধর্মের মধ্যে শর্তবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।...নিত্যকালের মতো কিছুই কম্পনা করা চলে না—তবে, এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে একথা আমি আশা করি—সে-কথা এই যে, এটি বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে।"

গত ১৬ই ডিসেম্বর 'বিশ্বভারতী'র কর্মীদের পক্ষ থেকে সুধীরজ্ঞানকে যে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে সেখানে ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের ভাষণে যে বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে তদ্বারা উপর্যুক্ত রবীন্দ্রচিন্তাকেই শ্রীদাশ কতক গ্রহণ করার কথাই জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'বিগত ছ' বছর 'বিশ্বভারতী'ই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয়। তাছাড়া প্রকৃত জীবনরসিক হওয়ার ফলে শান্তিনিকেতনের প্রতিটি অনুষ্টানে, সাহিত্যসভায়, সংগীত সভায়, নৃত্যনাট্য অভিনয়ে, খেলাধুলার মাঠে, পিক-

নিকে—সবই তিনি আগ্রহবাসীদের সহচর হয়েছিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি জীবনকে রসে সম্বল করে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনের পুরানো আবহাওয়া ও পরিবেশ তিনি কিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

আমাদের মতে এই কাজটাই সুধীরজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কাজ। রবীন্দ্রনাথের সময় এই পরিবেশের মধ্যেই সৃষ্টি-শক্তি আপনা থেকেই প্রকাশমান হয়ে উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে তা লুপ্ত হতে বসেছিল। সমবেত ভালবাসায় সুধীরজ্ঞান সেই লুপ্তির হাত থেকে 'বিশ্বভারতী'কে রক্ষা করলেন এবং এইভাবেই হয়তো গুরুদেবের স্বপ্ন পরিপূর্ণ করাই সম্ভব হয়। এবং যেদিন আগ্রহের শিক্ষা শেষে বালক সুধীরজ্ঞান গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলেন, সেদিন তাকে তিনি এই আশীর্বাদই করেছিলেন, 'আমাদের আগ্রহে যেটুকু পেলে তা জীবনে পূর্ণ করে তোলা।' রবীন্দ্রনাথের সেই আশীর্বাদ বাস্তব সত্ত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংসারের প্রয়োজনে সুকঠিন কর্মকে অন্য জীবনে গ্রহণ করে তিনি ধন্য হলেও যে আগ্রহে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সূচনা—সেখানেই তাঁর জীবন-গৌরব উপাচার্যরূপে সৃষ্টির রত পালনে মহিমাম্বিত হয়ে উঠেছে।

আজ আমরা কামনা করি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি হচ্ছেন—তিনিও বিশ্বভারতীর মূখ্য উদ্দেশ্য রক্ষা করবেন এবং তাঁর কাছে আগ্রহবাসী, ও দেশবাসীর সহযোগিতা স্নেহ-ভালবাসা তিনি লাভ করবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজ্যের সংগে ভারত-আজাদ্য প্রীতি ও সংস্কৃতিগত দেশবন্ধন অনেক কালের। তাই অগোপন্যগরের এ-কূল এবং ও-কূলের মধ্যে ভৌগোলিক ফারাকও খুব বেশি নয়। এক লহমায় এ-কূল ও-কূলের মায়াবী মনকে দেখতে পায়। স্বাধীনোত্তর জীবনে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পরস্পর সহযোগিতা ও সম্ভাব সৃষ্টির প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র অর্থাৎ আফগানিস্তান, নেপাল ও মালয়েশিয়া সিংহল-এর মত বার্মাও ভারতের বন্ধু ও সংস্কৃতিতে আত্মস্থানীয়। বর্মার বিপ্লবী পরিবর্তন চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইন আবার নতুন করে সেই পুরাতনী ঐক্য ও মিলনের ভাবকে জাগিয়ে তুলে। পরস্পর দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনবন্ধন আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

জেনারেল নে উইন একটি পরিচিত ও প্রিয় নাম। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ, গভীর দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত এই মানুষটি জন-জীবনের কাছে বহু আলোচিত। হরেক রকম কড়-ঝড়ার অনুকূল-প্রতিকূলের সাক্ষী এই একটি নাম। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্যোগ-সংকট ও সমস্যার জটিল আবর্তের আবহাওয়া থেকে শান্ত-সুনীল পরিবেশের আওতায় আনার কৃতিত্বে নে উইনের ব্যক্তিগত উল্লেখ। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার বিষয়ক বন্ধনই শাখা-প্রশাখায় পঞ্জাবিত হতে চেষ্টা করেছে, নে উইন, ব্যক্তিগত দৃঢ়তায় তখনই, সেই দুঃসময়কে আমূল উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অসন্তোষের বিচারে এ নীতি বাই হোক না কেন আশা, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন করলে তার এ প্রচেষ্টা অনেকাংশেই উল্লেখ্য। বার্মায় নে উইন গভর্নমেন্ট আউং সান প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসী বিরোধী পিপলস ফ্রন্ড লীগের এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের একাদশ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। এই সকল নেতাদের মধ্যে ছিলেন ফ্যাসী বিরোধী লীগের প্রেসিডেন্ট উ বা শোয়ে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউ কে নেনইন এবং ইনসেইন প্রদেশের একটি ইউনিটের সভাপতি উ উইন। সরকারের প্রচারদপ্তর এই গ্রেপ্তার সম্পর্কে জ্ঞাতিছিলেন যে, দেশের শান্তি রক্ষার সরকারী প্রচেষ্টা বানচাল করায় অভিযোগে এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে নে উইন সৈদিন ও উনাত কণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন যে তারা যদি সরকারকে সাহায্য করেন, তবে তাঁদের প্রাণ ক্রমা প্রদর্শন করা হবে। প্রথমাবস্থাতেই এ ব্যাপারে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে নে উইন প্রার্থিত আশাপ্রদ ফল সৈদিন পাওয়া গেছিল। নে উইন সৈদিন দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, বাক্যভাড়া উল্লেখের মানুষের কাছে এরই ফলে

তাই অনেকটা হালকা হয়েও যেতে হয়েছিল।

চারিত্রিক দৃঢ়তা—অসমী সহনশীলতা ও রাজনৈতিক স্বাতির প্রখরতা নে উইনকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আসনের অধিকারী করে তুলেছে। ফলে নে উইন আজ আর শুধু স্বদেশের জনজীবনের কাছেই যে পরিচিত ভা নয়, রাজনৈতিক দুনিয়ায়ও নে উইন নিজেকে স্বীকৃত করতে পেরেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর রোগদন সময় স্বদেশের জীবনের সাথে ভারতবর্ষের অতীত আত্মীয়তাকেই পুনরায় নতুন বন্ধনে গ্রথিত করল। নে উইন ও শাস্ত্রী আলোচনা-শান্তিতে বিশ্বাসী মানুষের কাছে আজকের এই পারিপার্শ্বিক সংকট মহাভেদে অনেক কারণেই

অমিল হওয়ার উদ্ভূত তার প্রধান সেনাপতি জেনারেল নে উইনের হাতে দেশের শাসন-কর্মভা তুলে দিয়ে নিশ্চিত হন ও তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। যদিও তাঁদের উভয়ের মধ্যে সর্ত ছিল যে, সংকটাবস্থা দূর হয়ে গেলে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনপর্ব সমাপ্ত করে জেনারেল আবার ফিরে যাবেন সৈন্য বাহিনীতে। এই মৌখিক বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া কথার এতটুকু হের-ফের নে উইন সৈদিন করেন নি। অসম্ভোচে তিনি সৈদিন তার পূর্বপদে ফিরে এসেছিলেন। তাই সব মিলিয়ে নে উইনের রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষাকৃত সহনশীল ধৈর্য, সমর ও সীমার বাঁধনে বাঁধা। ফলে দেশের মধ্যে তার কার্যমী ক্রমতা নিয়ে খুব বেশি প্রকাশ্য ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভীষণ রূপ নিতে পারে নি।

গভীর দেশপ্রেমে উদ্ভূত মানুষ নে উইন বার্মার জনজীবনকে পুনর্গঠিত করার কাজে, তাঁদের মধ্যে ঐক্যচেতনা এনে স্বদেশের জীবনকে সমাজতন্ত্রের গণে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ভুলবশত এই মানুষটির



জেনারেল নে উইন

বিশেষ উল্লেখের বলে অনুভূত হবে নিঃসন্দেহে।

বিস্ময়ের বীরবোধ ও দেশপ্রেমিক নে উইন সম্মান ও জনপ্রিয় মানুষ। তিনি স্বদেশের প্রধানমন্ত্রী উ-ন-র বিশ্বস্ত ও একান্ত কাছের মানুষ—তার দাঁকপহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। উ বা শোয়ের সাথে মতের

মধ্যেও মাঝে মাঝে ঐচ্ছিকের অভাব ও বিদ্রোহিত ভাবও বেশ দেখা গিয়েছে। ১৯৬২ সালে কর্মতার ফিরে আসা ও চীনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা অনেককেই সন্দেহিতও করেছে। যদিও চীনের সঙ্গে স্বদেশের সীমান্ত মীমাংসার আলোচনার তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।



ভারতদর্শন

শান্তিনিকেতন অগ্রবর্তী ভারতীয় ঘাঁটিতে বৈদেশিক সামরিক এটাচিফ

কবীন্দ্র ভাবনা

শান্তি উপবন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও কাম্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং যে ভাষণ দান করেন, সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উভয়েই তাঁরা ভারতের শান্তিপ্রিয় মনোভাব ব্যক্ত করে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বোধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাগ্রহে আলিঙ্গনের পক্ষপাতী, যদিও ভারত তার স্বমৰ্যাদা ও স্বকীয়তা বজায় রেখেই তা করতে চায়।

শান্তিনিকেতনের শান্ত পবিত্রতার মানব মনে নির্মল শুভচেতনা আপনি তার আসন বিহার; সেখানকার পক্ষীকজনগুঞ্জিত পল্লব-মর্মরিত প্রাকৃতিক গুণ্ডার্য মানবস্বেরী মানুষের মনেও জাগায় সত্য শিব সুন্দরের চেতনা। সংকীর্ণ আত্মসীমা মনোভাব মাথা অবনত করে দিগ্‌প্রসারিত সুনীল সবুজের দৃষ্টি দেখে। দৃষ্টবশে বিষয়, কবির সেই উদার মস্তিষ্ক স্বপ্ন, মানবসম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আতীশা, অমৃত লভের এবং আশ্রমিক-গণের মনে বিপুল ব্যাপ্তির উদার চেতনা সৃষ্টির আকাংক্ষা আজ কবি-কল্পনামাত্রে পর্ববাসিত হতে চলেছে। বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিশিষ্টতার দাবিদার ছিল, কবির সুমহান বিপুল ব্যক্তিত্বের জন্তর্ধানের পর থেকেই কবি-স্বপ্নও অন্তর্হিত হতে আসেছে। শান্তিনিকেতন তো কেবলমাত্র

পৃথিবীপাঠের বিশ্ববিদ্যালয় নয়; শান্তিনিকেতন ছিল কর্মজীবনে প্রবেশের প্রাকালে পরিশুদ্ধ একটি নিটোল নিবিড় মনোজীবন জাতির জন্য উপাসনা-মন্দির। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত যৌদীন তিরোধান করলেন, মন্দিরের কাংস্য ঘণ্টা ভংগুর কল্লি বেলে রূপান্তরিত হল। মঠ-ময়দানে মাথা তুলল ইট-কাঠের বাহার। কিন্তু হার হল ঠিক সেইখানেই। উপবন হল প্রাসাদ সংলগ্ন বিলাসী গুন'। পরিশুদ্ধ চেতনার স্বপ্ন আশ্রয় নিল, পরিচর্যা-পীরামিডের গহবরে।

শাস্ত্রীজী ও করণ সিং শান্তির বাণী দান করেছেন। বাণী বহুশ্রুত। কবি রবীন্দ্রনাথ বাণীর কারিগর ছিলেন বটে, কিন্তু বাণী সর্বস্বতর তার বিশ্বাস ছিল না। আর সেজন্যই শান্তিনিকেতন। মানুষের বাণী নয়, প্রকৃতির বাণীতেই চেতনার সমৃদ্ধি তিনি বিশ্বাস করতেন।

বিশ্বভারতীর আচার্য শাস্ত্রীজী কবীন্দ্র-ভাবনাকে যদি শান্তিনিকেতনের পরিবেশে যথাসাধ্য ধরে রাখবার আয়োজন সন্তব করতে পারেন তবেই তাঁর আকাংক্ষা চিরতার্থ হবে।

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীজী বলেছেন, শিক্ষাজীবনান্তে নতুন জীবনকে আলিঙ্গন করতে হবে ছাত্রসমাজকেই। জাতীয় জীবন সংকটাপন্ন আর তাঁরা সেই সংকটময় রাস্তা-জীবনেই নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করতে চলেছেন।

ভারতীয় যুববৃন্দের প্রতি আহ্বান

জানিরে ডঃ করণ সিং বলেছেন, তরুণ ভারতই তো নবরূপ দান করবেন তাঁদের স্বপ্নে-দেখা ভারতবর্ষকে। যতদিন না দেশের লোক লোক দরিদ্র জনসাহায্য সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে, লোক লোক অভূক্তের হৃদয়ে দেওয়া যাবে কৃষার জন্ম ভুলে, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিত করা সম্ভব হবে লোক লোক শিশুকে, ততদিন আমাদের স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন অগৃহীত থেকে যাবে। যুব সম্প্রদায়ই সেই নবীন ভারতকে সৃষ্টি করবেন।

আর এ. একই সম্মেলনে শাস্ত্রীজী ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন যে, ছাত্ররা যত অধ্যয়নেই মনসংযোগ করে এবং কর্মকর্তা ক্রিকেটাদি রাজনৈতিক ব্যতীত সৃষ্টির জন্ম গ্রহণ না করে সে কারণে ছাত্র সমাজকেই নেতৃত্ব দিতে হবে নিজেকে দিয়ে।

কলা বাহুল্য, একই সময়ে পরস্পর বিরোধী আহ্বানে সাড়া দেওয়া যেমন অসম্ভব, দেশপন্থের আহ্বান জানিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকার উপদেশ দেওয়াও যে অনুর্বণ বিভ্রম্বনা, সিনিয়র দেশনেতৃবৃন্দের কাছে সে সত্য উৎখাপিত হওয়ার সময় এসেছে আজ।

প্রধানমন্ত্রী এবং ডঃ করণ সিং উভয়েই ছাত্রদের নবভারত গঠনে আহ্বান জানিয়েছেন সুতরাং ছাত্রসমাজের এখন গালে হাত দিয়ে চাববার সময়, রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে হারা তাদের স্বপ্নের ভারত গঠন করবে কী করে। দেশ গঠনের যাবতীয় প্রস্তুতি তো রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। নেতারা যে পথে অগতী নির্দেশ করবেন সেই পথেই এগিয়ে যাওয়া দেশের পক্ষে যে সব সময়

সাম্প্রতিক বসন্ত

কল্যাণকর প্রেরণকর, এ বোধে ছাত্রসমাজ সমীপ-গত-না-ও হতে পারেন। আজকের ছাত্রসমাজ, বিশেষত উচ্চশিক্ষার্থী বয়স্ক যুক্তিবাদীসম্পন্ন ছাত্রসমাজই আগামী ভারতের নেতা। তারা তাঁদের বৃদ্ধ নেতৃকুলের পথ নির্বাচনে যুগগত দ্রাবিড় অথবা আদর্শগত গরমিল লক্ষ্য করলে সে সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরপনে বিরত থাকবেন অথচ দেশ গঠন করবেন এমন যুক্তির সারবত্তা খতিয়ে বার করা কঠিন। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে পিঠ ফিরিয়ে ছাত্রসমাজের পক্ষে নির্দেশ পালন মাত্র কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হলে জাতির গণ-তান্ত্রিক চেতনা কতদূর সজীব থাকবে তাতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ছাত্রসমাজকেও দেশ গঠনের জন্য গৃহীত সমস্ত প্রস্তাবই জাতীয় কল্যাণের কণ্ঠস্বরে ঘষে-মেজে পরীক্ষা করে নিতে হবে। না হলে শিক্ষা হবে অসমাপ্ত। না হলে দ্রাবিড় হবে পর্বতপ্রমাণ। না হলে ছাত্র সমাজকে মিলিটারি মুনিফর্মের সাজাতে হবে, যাতে নির্দেশ পালনই তার কর্তব্য হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদী দুর্নিয়াজনা এই মুনিফর্ম-ভক্ত। মুনিফর্ম বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে, স্বাধীন চিন্তাকে বধ্যভূমিতে হত্যা করে। গণতান্ত্রিক দেশের ছাত্রসমাজ তাই রাজনীতি নিরপেক্ষ গ্রন্থকীট মাঠে পরিণত হতে পারেন না, হলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ। তবে লক্ষণীয় এই যে, শাস্ত্রীজী সক্রিয় রাজনীতির প্রসঙ্গে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের প্রশ্নে জোর দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে বহু-ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত ধর্মঘট ও বিক্ষোভে ছাত্রসমাজ যোগদানে অনেক

ক্ষেত্রে সহযোগিতার স্বারা প্রায় বাধ্য হন। ফলত জাতীয় উন্নতির জন্য নয়, দলীয় স্বার্থ-সিঁথির জন্যও বহুক্ষেত্রে ছাত্রবৃন্দ হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন। এমত ক্ষেত্রে অবশ্যই ছাত্রসমাজকে বারম্বার বিচার করতে হবে। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের আহ্বানমাত্রই যে জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যসাধক নয়, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে সম্যক পরি-চিতি থাকলেই ছাত্রসমাজ তার সঠিক বিচার করতে পারবেন। অন্যপক্ষে দেশ নেতৃবৃন্দকেও মনে রাখতে হবে, ধর্মঘট বিক্ষোভ মিটিং মিছিল মাঠেই জাতীয় ক্ষতির কারণ নয়। এ সমস্তর দ্বারা জনসাধারণ তাঁদের দেশের শূভাশুভ সম্পর্কে সাধারণ দাবিকে ব্যক্ত করেন। সুতরাং ছাত্রসমাজের পক্ষেও সর্বতোভাবে এ পথ ত্যাগ করে দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখা কতদূর সম্ভব তা নিরপেক্ষ চিন্তাই বিচার করবে।

ডঃ করণ সিং বলেছেন, ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এ ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রের অবস্থা বর্তমানে চারি গাছের মত। এই গণতন্ত্রের সবল শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সর্ব পরিচর্যা।

শিশু গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন দেশের জনগণ হবেন প্রকৃত আলোক-প্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতি চেতনাসম্পন্ন, ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণে উৎসাহিত। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সঙ্গে দেশের দৈনন্দিন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিমিশ্রিত। এককে বাদ দিয়ে অপরটির রূপদান অবাস্তব।

সুতরাং আমাদের আলোচনার পরি-প্রেক্ষিতে একটি মাত্র উপসংহারেই উপনীত হতে হয় যে, ছাত্রসমাজকে প্রকৃত পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনার মূর্তদৃষ্টি থাকতে হবে। দলগত স্বার্থসিঁথির বিরুদ্ধে দেশ ও জাতির কল্যাণকর সর্বকর্মের প্রকল্পে এগিয়ে এসে সর্বপ্রথমে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে এবং জাতীয় কল্যাণই হবে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

শিক্ষার অন্যতর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি? জাতির কল্যাণ তথা মানব কল্যাণ-সাধনের জন্যই তো প্রয়োজন শিক্ষা। জীবিকার জন্য, জীবিকা সন্ধানের জন্য শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু কেবলমাত্র তারই জন্য যে জ্ঞানার্জন তাকে জ্ঞানার্জন বললে অত্যাধিক হবে, তা হল, ভাল থাকার জন্য মূলধন সংগ্রহ। প্রকৃত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হল জনকল্যাণ সাধন। আর এই জনকল্যাণ সাধনকে রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করার অর্থ হল, মাটিকে অস্বীকার করে পায়ে হাঁটার কল্পনা।

সুতরাং শাস্ত্রীজী নিশ্চয়ই রাজনীতি-চেতনাকে পরিহার করতে বলেন নি (তঁরাই ছাত্র সমাজকে এককালে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভূত করেছিলেন)। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় বলতে চেয়েছেন, ছাত্রসমাজের কর্তব্য, অধ্যয়নকে ছাত্রজীবনে মূল বস্তু বলে গ্রহণ করা, এবং লক্ষ্য, জাতীয় কল্যাণ সাধন। এজন্য কূট-রাজনৈতিক স্বার্থের দলগত বিরোধে তাঁরা যেন অংশ গ্রহণ না করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এমত বক্তব্য অনস্বীকার্য, এবং শ্রম্যার সঙ্গে ছাত্রসমাজের পালনীয় কর্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

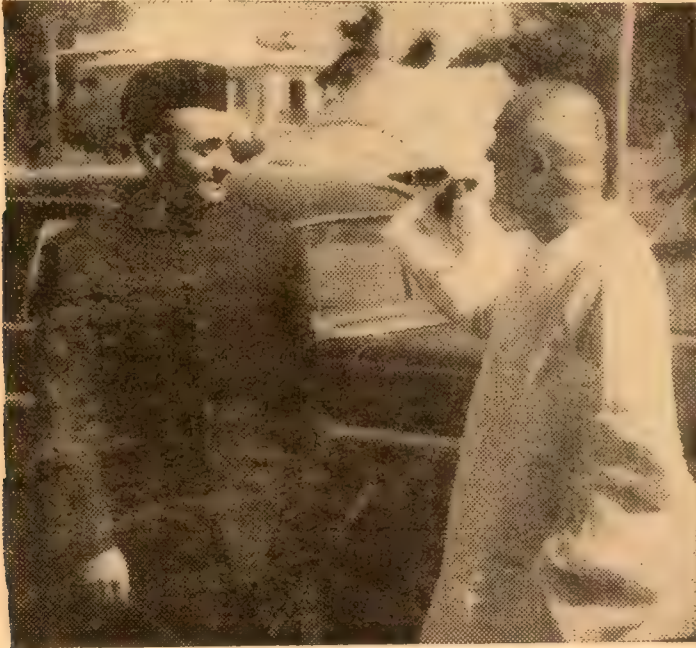
পদস্থ কর্মীর পুনর্নির্ভোগ

চেনাযুগ আঁকড়ে থাকার জড়তা কাটিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবার একটা কিছু করবার জন্য কোমর বাঁধছেন বলে প্রকাশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাকি এই মর্মে সকল মন্ত্রককে নির্দেশ দান করেছেন যে, ষাট বছর পর্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কার্যকাল বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্ক বিবেচনার প্রয়োজন।

সংবাদটি অপেক্ষাকৃত নবীনদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই। তবে সব ব্যবস্থাতে দূরবস্থা আসন গেড়ে বসে আছে। সব আইনই একটি করে “হাঁদা” দ্বারা অনুসৃত।

অর্থাৎ নিয়মটা উপরোক্তরূপ হলেও তার মধ্যে একটি সর্বশক্তিমান “কিন্তু” ঘাপটি মেরে বসে আছে।

অবসর দিতে হবে, হাঁদা বাঁকে অবসর দেওয়া হবে তাঁর সমতুল উপযুক্ত অফিসর না



ডঃ করণ সিং-এর সঙ্গে আলোচনারত শ্রীবৃদ্ধিরজন দাশ

পাওয়া গেলে নিয়মটিকে শিথিল করবেন কর্তৃপক্ষ।

প্রশ্ন হল, সমস্ত কর্মকর্তার হিসাবটি কখনে কে এবং কিরূপে। যাকে কর্মতার দেওয়াই হল না তিনি উপযুক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত তার পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় কেমন করে। এজন্য অবসর গ্রহণের সময় থেকে বা তার প্রাকালে অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয়জনের হাতেই বরং সকল ক্ষমতা তুলে দিয়ে একটি 'ষ্ট্রোল ইয়ার' লক্ষ্য করা উচিত যে সময়ে তিনি তার কর্মকর্তার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে তার কাজে যাতে কোনও 'ইন্টারেস্টেড পার্টি'র হাত না থাকে তারও জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বিচারটাই প্রধান করে তুললে উচ্চপদে জনাচার প্রবেশ করতে পারে। পদাধিকারের প্রলোভনে পা শিথিলানো একটা রীতি হয়ে যাচ্ছে। রাজা গেলে রাজ্য চলে, নেতৃবর্গী প্রকৃতির নিয়মে বিলাস নিলেও ভারতের রাষ্ট্রতরবারি হাল ধরবার লোক পাওয়া যায়, আর একটা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেখানে জনগণের রথ গাড়িয়ে চলাই নিয়ম। একজন অবসর নিলে অন্যজন সে পদের মর্যাদা রক্ষা করতে অক্ষম হবেন এমন বক্তব্য 'দুর্ভাগ্য'ের লিপিবদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকলে মান্যরাজ্য।

সংবাদে প্রকাশিত অন্যতর একটি প্রস্তাব বরং সমর্থনযোগ্য যেখানে বলা হয়েছে: যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ফলাফল দু-এক বছরে লাভ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তির অবসরকালে শৈথিল্যপ্রদর্শন বা শুনানিযোগ্য চলবে। তা চলুক। অবশ্য শুনানি না চলাই শ্রেয়। তবে সর্বত্র লোকোত্তর যাতে পরবর্তীদের কর্মক্ষমতার উৎসাহের অভাব সৃষ্টি না করে সৌদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন তারা বিশেষ ক্ষমতার ও প্রভাবের

অধিকারী। আপন চাকরি আরম্ভ টিকিয়ে রাখার পক্ষে তাই তাঁদের সুযোগও স্বল্প নয়। কিন্তু সেই সুযোগের অপব্যবহার সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরগোষ্ঠীতে সারিবদ্ধভাবে উৎসাহহীনতার সৃষ্টি করবে এ সত্য যেন বিস্মৃত না হন নির্দেশদাতাগণ।

মুড়ো থেকে লাজ্য পর্যন্ত ঠাটো করে বসিয়ে রেখে বড়োদের চাকরি বজায় রাখার নীতিটা যে পুরোপুরিই মন্দ, সেটাই বরং সমাধিক সত্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বিলাস বিকার

সম্প্রতি নিরম দায়িত্ব পাওনার পরিবর্তে ভারতের বিলাস বহরের একটি অতি নগণ্য চিত্র তুলে ধরেছেন নিখিল ভারত জনসংঘ দলের সংগঠন সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ রাও যোশী। কিন্তু শ্রীযোশী পরিবেশিত এই কিশিষ্ণা তথ্যটিই বর্তমান ভারতের বিলাস প্রায়ভার এক চমকপ্রদ উদাহরণ।

প্রকাশ, প্রসাধন পরিচর্যা যাতে ভারতীয় বিলাসী রমণীগণ কেবলমাত্র গুপ্তরজনীর জন্যই বছরে দু'কোটি টাকা খরচ করে থাকেন। এ গুপ্তরজনীর মধ্যে অবশ্য দেশী লিপিস্টিকের অঙ্ক বরা হয় নি। এই দু'কোটি টাকা বিদেশী লিপিস্টিক সংগ্রহে প্রতি বছর বাইরে চলে যাচ্ছে। শুধু লিপিস্টিক যাতে যেখানে দু'কোটি, মর্যাদা রাজত, সুগন্ধিত ও সুশোভিত করার জন্য ভারতের সম্ভা-বিলাসিনীরা তাহলে কী পরিমাণ অর্থব্যয় করছেন তার পরিসংখ্যান কবলে চকু চড়ক-গাছে চড়বে। বিশেষত এ প্রসঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার অনটনের প্রশ্নও বিবেচ্য। আর ভারতের অধিকাংশ লোকের অর্থসাহারী দারিদ্রের কথা? ওটা মূলত্ববী থাক। একের দারিদ্রের অস্তিত্বেই তো, অপরের বিলাস লক্ষণীয়। সবার ঠোঁটই রাঙা থাকলে রাঙা ঠোঁটের কদর কমবে। তাই দারিদ্রের প্রশ্নকে বৈভবের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বাহুল্য-

বাহ। এক বিহনে অপরের বিশেষ দ্বন্দ্ব নাস্তি।

মহারাষ্ট্র:

সাহিত্যের ভূমিকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবন একটি দীর্ঘাশীষা প্রজ্ঞা দিলে করে মারাঠি সাহিত্য সম্মেলনের ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন কালে জাতীয় প্রতিরক্ষায় সাহিত্যের ভূমিকার প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেছেন, দেশকে এক জাতি এক প্রাণ একতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করার গুরুদায়িত্ব সমভাবে পালন করতে হবে সাহিত্যসেবীদের। জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমেই একমাত্র জয় সম্ভব।

আজ ভারতীয় সাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগ নেই যে যুগে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মত স্বাধিকল্প সত্যমন্ডীর প্রভাবে সাহিত্য প্রোত-স্থিনী এক মহান জল্যাধিপের আকর্ষণে তার ধ্রুব লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সাহিত্য রুপে সুতরাং আজ মহা নেত্রের অভাব। ভারতীয় সাহিত্য আজ এক কয়লা দিগ্ভ্রান্ত।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাওয়াই-এ সাহিত্য-শরীরে কিছু এলাজির রোগপ্রসার লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, বার সঙ্গে শ্রীচারণকথিত জন-সংযোগের তিলমাত্র সম্পর্ক আছে এমন কথা বলা যায় না। জনসংযোগ বলতে অবশ্যই হাটুরেপনা বোঝায় না। জনগণমনের স্পর্শ-লেশশূন্য লেখকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনো-বিলাসের ফসল যে সাহিত্য, তারকই বলা যেতে পারে, জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন সাহিত্যরচনা। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় রাসিকেন্দ্রিকতার চাষাবাদেই আজকের সাহিত্যভূমি অতিরিক্ত-ভাবে খড়াজক (fragmentary)।

ভারতীয় সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানীয়কারী বাংলা সাহিত্যের আওতায় কতিপয় ক্ষেত্র



আমরা সবাই ভারতীয়
আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজ এক হোক

সাপ্তাহিক বসুমতী

এই রূপটি তাঁর আকার ধারণ করেছে ও করছে। জনদরদী সাহিত্য আশ্রয় নিচ্ছে মুষ্টিমেয় শ্রেণী চেতনার বন্ধ প্রকোষ্ঠে, কিম্বা কেবলমাত্র একান্তভাবে ব্যক্তি উপলব্ধির কূপ গহ্বরে। শিল্পী আপামর জনসাধারণের সঙ্গে, ফলত, শৃঙ্খল সংযোগ হারিয়েছেন তাই নয়, সাধারণের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশের ঔষধতা তাঁকে আপন পাণ্ডিত্যভিমানের চৌহদ্দিতে আটক করে ফেলেছে। সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুস্থ-দুস্থ হর্ব-বেদনার কলা-কাহিনী হচ্ছে রূপ মানসিকতার ডাক্তারী ডায়রী। যে সাহিত্যকারকে আমরা সহৃদয় সংবাদী হিসেবে প্রিয়জন করে কাছে টেনে নিই এবং যার ফলে সাহিত্যের মাধ্যমে জন-শিক্ষার প্রসার অধিকতর নিতর্যোগ্য, সেই সাহিত্যকারকে বিকৃতিসম্পন্ন স্টেথোস্কোপ ও থার্মিটার সহ আসরে অবতীর্ণ দেখলে খুব জোর তাঁর গবেষণা-চেষ্টার সাফল্যের বাসনা জাগতে পারে আমাদের। ডাক্তারী অতিরিক্ত এ জাতীয় সাহিত্যে যেহেতু কিছু মুখরোচক বিকার-কলিত অথবা বিকৃত-সমৃদ্ধ গালগল্প শক্তিশালী ভাষা ও শৈল্পিকতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেজন্য এজাতীয় সাহিত্যের বাজার-কাটটি যথেষ্ট ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় বটে। তবে তত্ত্বারা না সাহিত্য, না সাহিত্যিক, না পাঠক, কেউই বিশেষ উপকৃত হতে পারেন না। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিলাসী মানসিকতা জনমনে সাময়িক উত্তেজনা সঞ্চারের প্রভূত কৃতিত্ব অর্জন করে ব্যবসায়িক সাফল্য কুড়িয়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আপত্তি ছিল না। কেউ দৃ পয়সা টাঁকে পুরলে এই মাণিকগন্ডার বাজারে, এই বিলাস বিভব প্রীতির অকস্মাৎ উন্মাদনার উৎক্লিষ্ট হাঁকালপনার যুগে (এবং বিশেষত বাঙালীর ব্যবসায় যখন ডুগদুগ) এমন পয়সা কুড়ানোর তাল্পব পথাবিস্কারে আপত্তির কারণ সত্যিই ছিল না, যদি এই জাতীয় ব্যবসায়িক সাহিত্যের পেছনে তাগড়াই দর্শনের সমর্থন জানিয়ে সাধারণের মধ্যে একটি চতুর বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস না থাকত। আপত্তির কারণ, সুস্থ মানুষের মনে আবর্জনার অস্তিত্ব সৃষ্টির এই সচেতন প্রয়াস জাতির জীবনে এক মহা সংকটকে ঘনীভূত করে তোলার আয়োজন করেছে। যার পেছনে কোনো বিশেষ দুর্যভ-সাম্য লক্ষ্যায়ত আছে কিনা কল্যাণরত্নী সর-কারের স্নে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে বলিষ্ঠ জাতি গঠনের জন্য সাহিত্য সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, সে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত বলিষ্ঠ এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের অবশ্যই অসম্ভাব নেই, কিন্তু সস্তা জিনিস বাজারকে গ্রাস করলে, প্রকৃত সত্যসম্পন্ন সাহিত্যের রচয়িতারা একদিন ভাত পাবেন না। এমন দিন হয়ত আসবে, যখন ব্যবসায়ী প্রকাশককুল লোপমানবল্লভ উত্তেজক সাহিত্যের ওজন করে

জ প্রকাশ করবেন। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আহ্বানের জবাবটি কী হতে পারে, আশা করি তা আর অধিক বাগাড়ম্বরে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

উত্তর প্রদেশ :

ছায়া ক্যাবিনেট

রাম না হতেই রামায়ণ সৃষ্টি করেছেন। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী (মিন্তসভা বিরোধী) দল। আই পি-এর সংবাদে প্রকাশ, এই দল আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল-রূপে উত্তর প্রদেশ ক্যাবিনেট দখল করবেন



শ্রীকামরাজ

বলে বিশ্ববিশ্বাসী। আর সেকারদেই তাঁরা আগে-ভাগে একটি ছায়া ক্যাবিনেটের পত্তন করেছেন। বিরুদ্ধবাদী দল বর্তমানে রাজ্য কংগ্রেস কমিটিতে প্রভূত প্রভাব-পতিপত্তির মালিক। এবার তাঁরা আইনসভা দখলের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিরুদ্ধবাদী দলের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা নিয়েছেন দলের সাংগঠনিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। অপর বারী সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নিয়েই এই ছায়া ক্যাবিনেট।

সংবাদে আরও প্রকাশ, বিরুদ্ধবাদীরা ইতিমধ্যে সেই সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের নিজস্ব প্রার্থীর তালিকাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন যেগুলি মিন্তসভাবাদীদের একচেটিয়া আয়ত্তের অধীন।

আর এতোই যখন হয়েছে তখন লক্ষ্য ভাগের ব্যাপারে বেশ একটা মতৈক্যও তাঁরা উপনীত হয়েছেন বলে সাধারণে আশা করতে পারেন।

দলচক্র কামরাজ

উত্তর প্রদেশ দলদলীর কুশী চেহারাটা ম্বরং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীকামরাজকে কেন্দ্র করেও আত্মপ্রকাশ করেছিল।

শ্রীকামরাজ তাঁর সাম্প্রতিক সফরে যখন উত্তর প্রদেশবাসীর মনে একাবোধ জাগ্রত করার জন্য মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছেন, রাজ্য কংগ্রেসের দলদলি তখন মান-অভিমানের হিসেবের খাতা খুলে তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে নিষ্ফল করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মিন্তসভার কোনো সিনিয়র নেতা উপস্থিত ছিলেন না। কানপুরে তো একটি প্রতিবাদী বিক্ষোভের আয়োজনও তরীই করেছিলেন। এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী। কিন্তু মিন্তসভাবাদীদের সম্মুখে কামরাজ-সভা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। বারামসীতে শ্রীকামরাজ চিপঠার বক্তৃতায় বারী বাধাদান করেন, প্রকাশ, তাঁরা মিন্তসভাবাদী স্থানীয় নেতৃবর্গ।

রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যাখ্যাকারগণ ও বিরুদ্ধবাদীরা বলছেন, এ সমস্তের মূলে আছে মিন্তসভাবাদীদের কামরাজবিরোধী ধারণা। তাঁরা মনে করেন, শ্রীকামরাজের স্নেহযন্য শৃঙ্খল বিরুদ্ধবাদীরাই। আর সেজন্যই

গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল :

“কীলর দি ট্রেডার”

বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই নিজগুণে ওটিকে চমাত্তক শব্দ-চরন মনে করে শৃঙ্খরে নিয়েছেন নিশ্চয়। না নিয়ে থাকলে তাঁদের কাছে অনুরোধ, ঐ শিরোনামটি এবং সংবাদ অংশের অপরাপর স্থানে ঐ একই চমাত্তক ছাপার কাজটিকে তাঁরা এইভাবে পড়ুন :

“কীলর দি ট্রেডার”

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, ছাপাখানার কারসাজিতে কিছু কিছু ত্রুটি ইতস্তত এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে বা থাকতে পারে, সেজন্য লেখক দৃষ্টিত।

কামরাজ-সভা বজ্রনের এই উদ্যোগ-আয়োজন। বিরুদ্ধবাদীদের সুস্পষ্ট অভিযোগ, কামরাজ বিরোধিতার ইন্সন বোগানদার ছিলেন শ্রী সি বি. গুপ্ত এবং বানারসী দাস। মিন্তসভাবাদীরা নাকি কংগ্রেস সভাপতির কাছে একটি লিখিত স্মারকলিপি পেশ করে চিপঠা জোটের প্রতি তাঁর আশ্বাস প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীকামরাজ তবে কি বৃথাই একের বাণী প্রচার করে এলেন? ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেই যেখানে খেয়োখোঁয়, জাতীয় একের বাণী সেখানে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করবে? এই দলদলিটা এমন প্রকাশ্যে না ঘটে সরকারী-ভাবে ঘটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।



শান্তী-নে উ ইন শূভেচ্ছা বিনিময়

ফ্রান্স:

শেষ পর্যন্ত চার্লস দ্য গল রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলেন, অর্থাৎ আরও সাত বৎসর তিনি এই পদে থাকবেন। ১৯শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বিতীয় ব্যালটে দ্য গল নির্বাচিত হয়েছেন।

দ্য গলের নির্বাচন নিয়ে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথমে ব্যালটে দ্য গল জয়লাভ করতে পারেন নি। মোট ছজন প্রার্থীর মধ্যে দ্য গল সর্বাধিক ভোট পেলেও ফরাসী সংবিধান অনুসারে মোট ভোটের শতকরা ৫০ ভাগের

চেয়ে কম পেয়েছেন বলে তিনি নির্বাচিত হতে পারেন নি। এই নির্বাচনে দ্য গল শতকরা ৪৪টি ভোট, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থী প্রার্থী ফ্রান্সিস মিস্তেরা শতকরা ৩২টি ভোট, দক্ষিণপন্থী প্রার্থী জঁ লেসান্দ্র শতকরা ১৬টি ভোট, এবং বাকি ৩ জন মিলে শতকরা ৮টি ভোট পেয়েছেন। এই অবস্থায়, ফরাসী সংবিধান অনুযায়ী নির্ণেয় ব্যক্তিদের বাব দিয়ে প্রথম দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয় এবং একেই বলে দ্বিতীয় ব্যালট। ১৯শে ডিসেম্বর এই দ্বিতীয় ব্যালটে মিস্তেরার সঙ্গে দ্য গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। এবার দ্য গল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৫ ভাগ পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। দ্য গল পেয়েছেন ১২,৮৬৮,৬৬১টি ভোট, আর মিস্তেরা পেয়েছেন ১০,৫৮৬,১৫০টি ভোট।

পরাজয়ের পর ইউরোপের রাজনীতিতে রকম উল্লেখযোগ্য পরাজয় আর ঘটে নি।

দ্য গলের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী খুবই খুশি। দ্য গলের প্রতিদ্বন্দ্বী নষ্ট হওয়ায় এরা সবাই উল্লসিত। এমন কথাও শোনা গিয়েছে যে, এদের পক্ষ থেকে দ্য গলের পরাজয়ের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। 'ন্যাটোর' বিরুদ্ধে দ্য গলের ভূমিকা, জার্মানীকে কেন্দ্র করে বহু-জাতিক পরমাণু বাহিনী গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা, কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য দ্য গলের চেষ্টা এবং পূর্ব ইউরোপ তথা কমিউনিস্ট জগৎ সম্পর্কে নরম নীতি গ্রহণ করার জন্য দ্য গল এই সব দেশের কর্তাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্য গল স্পষ্টই



মিস্তেরা



দ্য গল

মার্কিন-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই নির্বাচনে দ্য গলের বিপর্যয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি এই কথাই বলার চেষ্টা করেছে যে, ফ্রান্সের জনসাধারণ এই সব প্রচলিত গল্প-নীতির বিরোধী, তারা মার্কিন-বোম্বা নীতি পছন্দ করে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল। ফ্রান্সের অধিবাসীরা দ্য গলের ওপর চটেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তারা মার্কিন অনুগামী হয়ে পড়ে নি। মিস্তুরার প্রধান সমর্থক ছিল কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা। এরা দ্য গলের চেয়েও বেশি মার্কিন-বিরোধী। যে শতকরা ১৬ ভাগ ফ্রান্সের পক্ষে ভোট দিয়েছে, খুব জোর এদের 'ন্যাটো' সমর্থক, মার্কিন সমর্থক বলা যেতে পারে। ফরাসী জনগণ সাধারণভাবে দ্য গলের বিরুদ্ধে গিয়েছে, কারণ ৭০ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধের হাতে তারা দেশের শাসনভার দিতে চায় নি। দ্য গলের একনায়কত্বও দেশবাসী হাঁপরে পড়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা সবাই চায় ঠিকই, কিন্তু তার জন্য সমাজকল্যাণের কাজ বন্ধ করে, হাসপাতাল ও স্কুলের জন্য ব্যয় হ্রাস করে, পরমাণু বোমা তৈরির নীতিকে ফ্রান্সের লোক আজ আর সমর্থন করতে চায় না। এই বিক্ষোভেরই প্রকাশ হয়েছে এবারের নির্বাচনে।

দ্য গল রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেও, তার মর্যাদা যেভাবে নেমে গেছে তাতে করে আগের মত দাপটের সূণে তিনি আর শাসন চালাতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্য গলের প্রভাবও কমতে বাধ্য।

দ্য গলের বিপর্যয়ে বিরোধীরা খুবই খুশি। পরাজিত প্রার্থী মিস্তুরা দ্য গলকে অভিনন্দন জানাতেও অস্বীকার করেছেন। মিস্তুরা বলেছেন, এই নির্বাচন ফ্রান্সের পক্ষে ভাল হবে না। ১৯৬৭ সালে ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচন হবে। সাধারণ নির্বাচনে গল্পপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইয়েমেন :

ইয়েমেনের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ অবসানের চেষ্টা কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে? প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে তিন সপ্তাহ ধরে হারাদে যে বৈঠক হাঁছিল, হঠাৎ তা বন্ধ করে দেওয়ার এই আশংকা দেখা দিয়েছে। অবশ্য বৈঠক বন্ধের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, রামজানের জন্য এক মাস বৈঠক বন্ধ থাকবে, রামজান মাসের শেষে আবার বৈঠক শুরুর হবে।

কিন্তু উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের কণ্ঠে যে স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সহকারী নেতা ও ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি-পরিষদের সদস্য আহমেদ মহম্মদ নোমান সানাত্তে বলেছেন,

প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য সকল ইয়েমেনবাসীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নোমানের কথা শুনে জবাব দিতে গিয়েই যেন বেইরুট থেকে বিতাড়িত নৃপতি ইমাম মহম্মদ আল বদরের মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন, রাজতন্ত্রীরা সব সময়ই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

১৯৬২ সালে ইমাম মহম্মদ আল বদরকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রীরা ইয়েমেনের শাসনভার গ্রহণ করে। আবদুল্লা সালাল ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি হন। অবশ্য এই বিদ্রোহের পেছনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ইমামের পেছনেও সৌদি আরব ও বৃটেন নড়ায়। সৌদি আরব ও বৃটেনের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের জোরে এবং কিছু উপজাতির সমর্থনে ইমাম প্রজাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরুর করেন। তিন বৎসর ধরে এই বিদ্রোহ চলেছে। নাসের-প্রেরিত সন্তর হাজার সৈন্যের সাহায্যেও বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। গৃহযুদ্ধের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষের মত লোক মারা গিয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে জেদ্দার যখন নাসের সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন উভয়ের মধ্যে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। জেদ্দা চুক্তি অনুসারেই হারাদে প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রী উভয় পক্ষের মধ্যে বৈঠক শুরুর হয়। ঠিক হয়, রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা সালাল কিংবা ক্ষমতাচ্যুত রাজা ইমাম মহম্মদ আল বদর, কেউ-ই মীমাংসা-বৈঠকে যোগ দেবেন না।

প্রত্যেক পক্ষ থেকে ৩০ জন করে প্রতিনিধি হারাদ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিদলের নেতা হচ্ছেন ইয়েমেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবদুল রহমান ইরিরানি, আর রাজতন্ত্রীদের নেতা হলেন রাজার আমলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ সানি। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সৌদি আরবের

পক্ষ থেকে কয়েকজন পরিদর্শকও বৈঠকে যোগ দেন।

আন্তর্জাতিকতার মধ্যে বৈঠক শুরুর হলেও কোনরূপ মীমাংসার সূত্র এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। আগের থেকেই ঠিক করা হয়েছে, আগামী বৎসর দেশব্যাপী গণ-ভোটের দ্বারা স্থির হবে ইয়েমেনে রাজতন্ত্র থাকবে, না প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কিভাবে শাসন চলবে, তাই নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন মতের দেখা যাচ্ছে না।

তবে আশার কথা এই যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সৌদি আরব, কেউই আর ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ চালাতে চায় না। এরা যদি সমর্থন না করে, তবে প্রজাতন্ত্রী বা রাজতন্ত্রী কারও পক্ষেই নিজের জোরে লড়াই চালানো সম্ভব নয়। তাই যদি এ দুটি রাষ্ট্র জোর চাপ দের তবে বিরতমান পক্ষদ্বয়ের পক্ষে মীমাংসা না করে উপায় থাকবে না।

সুদান :

সুদান পার্লামেন্ট কমিউনিস্ট পার্টি'কে নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেছে। অবশ্য বর্তমানে পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছে।

কোন প্রকার রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা চলাবে না, তা হলে গণতন্ত্র থাকবে না, এই বক্তব্যের ভিত্তিতে সুদানে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন শুরুর হয়েছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আব্বাস ইসমাইলকে সভাপতি করে 'ন্যাশনাল কমিটি ফর দি ডিফেন্স অব ডেমোক্রাসি' নামে একটি সংগঠনও গড়ে উঠেছে। কেবল কমিউনিস্ট নয়, কমিউনিস্ট-বিরোধী অনেক রাজনৈতিক দলও এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে। এদের অভিযোগ, উম্মা ও মুসলিম ব্রাদারহুড দলের কোরালিশন সরকার দেশকে একনায়কত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে।



হারাদে প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের বৈঠক

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

কর্দান আগে গণতন্ত্র রক্ষা কমিটির আহ্বানে খাতুঁমে সত্তর হাজার লোকের এক বিরাট মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সরকার সমর্থক ইসলামিক চার্টার ফ্রন্টের সমর্থকদের সংগে



আবদীন ইসমাইল

এই মিছিলের সংখ্যক বাধে, এবং প্রায় ১০০ জন আহত হয়। এই ঘটনার পর সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আহমেদ মাহবুবের শান্তির আবেদনেও বিশেষ ফল হচ্ছে না।

একদিকে দেশে চলছে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই, অপরদিকে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের বিচ্ছিন্নতার দাবিও জোরদার হচ্ছে। দক্ষিণের নিগ্রোরা নিজেদের অঞ্চলকে সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আরব কতৃৎমুখ পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানাচ্ছে। সরকারী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা যাচ্ছে না।

চীন :

চীন আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিবোধপার করেছে। 'পপলস্ ডেইলি'র ২১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশ্বাসঘাতক, এমন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বলে গালাগাল করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে মস্কো থেকে 'প্রাভদা' চীনের সমালোচনা করে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করে, 'পপলস্ ডেইলি'র এই প্রবন্ধ তারই জবাব। প্রাভদার বক্তব্য ছিল, চীন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করছে।

'পপলস্ ডেইলি' তাঁর ভাষায় সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলেছে, ক্রমশঃ সরাণো হলেও বর্তমান নেতৃত্ব ক্রমশঃ নীতিবোদ্ধ অনুসরণ করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ভারতকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমর্থন করেছে বলে সোভিয়েট নেতৃত্বকে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে। আরও

বলা হয়েছে, ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কবর খনন চালাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করছে না। নিরস্ত্রীকরণ, জার্মান সমস্যা প্রভৃতি বিষয়েও সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এই সব আচরণের দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্ববের ক্ষতি সাধন করছে। জনসাধারণের মত্বিসংগ্রামের বিরোধিতা করছে, এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। 'পপলস্ ডেইলি'তে এমন কথাও বলা হয় যে, সোভিয়েটের মহান জনগণ কিছতেই নেতৃত্বের এই বিশ্বাসঘাতকতা দীর্ঘদিন বরদাস্ত করবে না। এ কি সরাসরি বিদ্রোহের উস্কানি?

সোভিয়েট নেতৃত্ব বঙ্গমতী বোশ অনুভব করছেন যে, চীনের সংগে মিটমিট একরূপ অসম্ভব।

বার্মা :

বার্মার বিপ্লবী পরিবাদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমালবাহাদুর শাস্ত্রী তিন দিন ব্যাপী বার্মা সফর শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন।

শ্রীশাস্ত্রীর এই সফরের সংগে বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল না। এ নেহাৎই সৌজন্য-সফর। এর আগে নে উইন ভারত সফর করে গিয়েছেন। তাই শ্রীশাস্ত্রীর এটা ফিরতি সফর। তবে এই সফরের ফলে ভারত ও বার্মার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। বার্মা ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের সংগে ভারতের যেমন বিবাদ আছে, বার্মার সংগে ভারতের তেমন কোন বিবাদ নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে ঘনিষ্ঠ বন্ধন স্থাপন করা ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দিক দিয়ে শ্রীশাস্ত্রীর বার্মা সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্মার সরকার ও জনসাধারণ শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর সহযাত্রীদের বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

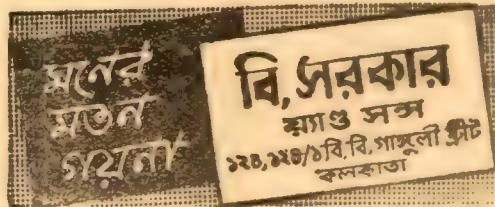
শাস্ত্রী-নে উইন বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট কোন বিষয় ঠিক করা না থাকলেও, ভারত ও বার্মার পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের

মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে উভয় রাষ্ট্রনেতা ভিয়েতনাম যুদ্ধের দ্রুত অবসান এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার আইয়ান স্মিথ শাসন উভয়ের দাবি জানিয়েছেন। পাক-ভারত বিরোধ নিয়েও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। নে উইন তাসখন্দ বৈঠকের সাফল্য বামনা করেছেন। ভারতের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণের সময় বার্মা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। এখনও বার্মা তার নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই বার্মার প্রতিবেশী, উভয়ের সংগেই বার্মার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়া বার্মার পক্ষে মর্শকল। চীনের সংগে বার্মার ভাল সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও বার্মা যে ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে নি, এ কথন নয়। রেগুন আলোচনার নে উইন পাক-ভারত সমস্যা সম্পর্কে নতুন কিছু বলেছেন কি না তা জানা যায় নি।

ভারত যেমন পাকিস্তানের সংগে বৈঠকে বসছে, সেইরূপ চীনের সংগে ভারতের কোন বৈঠকের জন্য কি নে উইন প্রস্তাব করেছেন? শাস্ত্রী-নে উইন আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এমন কোন প্রস্তাবের কোন উল্লেখ নেই। তবে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই চীন-ভারত বিরোধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কলম্বো প্রস্তাবের অন্যতম রচনাকারী বার্মা যদি সত্যি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

শাস্ত্রী-নে উইন আলোচনার ফলে বার্মার ভারতীয় অধিবাসীদের অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হবে। নে উইন ঘোষণা করেছেন, ভারতীয়রা বার্মার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাবে।

শ্রীশাস্ত্রীর চেষ্টার নেপালের সংগে ভারতের সকল প্রকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। শ্রীশাস্ত্রীর এবারের চেষ্টার বার্মার সংগে ভারতের সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে, সবাই এই আশাই করে।



॥ छन्दोग ॥

4045

সাহসিক বসমতী

পারল না? সে কেন এমন করে
জ্বাকিয়ে রইল? কেন জোর করে
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল না? কেন
জোর করে বলতে পারল না, 'আমার
ঘরে চল।' তা হলে স্বাভাবিক কি না
গিয়ে পারত?

কিন্তু নিজের ঘরকে কুঁড়ে ঘর
ভেবে যে পূরুষ ভয় পায়, অথচ
প্রাসাদ ভুলবারও যার ক্ষমতার কুলোর
না তার পিছনে পিছনে স্বাভাবিক আর
কর্তাদিন ছুটবে? কতকাল আর তার

জন্য অপেক্ষা করবে। কাল অনন্ত,
কিন্তু তার জীবন তো অনন্ত নয়।

কি আক্কেল তোর স্বাভাবিক। এখনো
ঘরে আলো জ্বালিস নি। এই ভয়-
সন্ধ্যায় এমন অন্ধকারে কেউ থাকে?



DA 65/412 (Comp.)

সর্ব স্বত্ব ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ

দিনে, বাড়িতে, স্কুল, রুটি, ঘোরে
জামলালের কাজে কামাই নেই।
অবশ্য নামে কি এসে যায়। আমাদের
জামলাল ডাক পিওন হতে পারেন,
টেলিগ্রাফ পিওন, লাইনম্যান,
রেলের ডাকগাড়ীতে চিঠি
বাছাইকারী, টেলিফোন অপারেটর,
টেলিগ্রাফিস্ট, কেরানী অথবা ডাক ও
তার বিভাগের সাড়ে চার লক্ষ কর্মীর
যে কোন একজন হতে পারেন, তবে
উদ্দেশ্যে অনেকেরই ঘড়ির কাঁটার
নিয়মে কাজ করেন।

৯৪ হাজারেরও বেশী পোস্ট অফিস,
৮০০০ টেলিগ্রাফ অফিস, ২২০০ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (৭.৬ লক্ষ
টেলিফোন) এবং আরও অনেক
বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয়
ডাক ও তার বিভাগ জাতির সেবা
করছে। প্রতিদিন যে কাজ হয় তা
হ'ল ১৮০ লক্ষ চিঠি পত্র, পার্সেল,
মনিঅর্ডার ইত্যাদি, ১.৫ লক্ষ
টেলিগ্রাম এবং ১.৬ লক্ষ (কার্যকরী)
ট্রান্স কল এবং এছাড়াও আরও
নানা রকম কাজ করতে হয়।

এগুলি সব দৈনন্দিন কাজ হলেও
জামলাল তার কাজ বেশ যত্নের
সঙ্গে সম্পন্ন করেন। যোগ্যতা ও
দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সম্পর্কে
জামলাল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা ও
শুভেচ্ছা থাকলে এই কাজ আরও
ভালোভাবে করা যায়।

আপনাদের আরও সেবা
কল্পতে আমাদের সাহায্য
করুন।



ডাক ও তার বিভাগ



অমলা এসে ঘরে ঢুকলেন। সুইচ টিপে আলোও জেলে দিলেন।

‘আমি ভাবলাম ঘরে বুদ্ধি কেউ নেই। আজও বুদ্ধি তুই বেরিয়ে পড়েছিস।’

স্বাতী বলল, ‘না মা। বেরোই নি। ভালো লাগছে না শরীর।’

‘কেন, কী হয়েছে? জ্বরজ্বারি কিছু হল নাকি?’

অমলা মেয়ের কপালে হাত রাখলেন। তার পর আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ‘না, গা তো ভালোই আছে। ভালোই তো আছিস তবু কেন সন্ধ্যা-বেলায় অমন করে শুয়ে আছিস—বল তো।’

স্বাতীর হাসি পেল। ভালো থাকা না থাকা সম্বন্ধে মার কি ধারণা। যেন জ্বর না হলেই মানুষ ভালো থাকে। যেন জ্বর ছাড়া মানুষের আর কোন জ্বালায়ন্ত্রণা কি অশান্তি থাকতে পারে না।

অমলা বললেন, ‘উঠে বোস। এ সময় সুস্থ মানুষের অমন করে শুয়ে থাকতে নেই। ওতে অকল্যাণ হয়। সত্যিই অসুখ-বিসুখ দেখা দেয় শরীরে।’

স্বাতী বলল, ‘উঠছি। তুমি যাও মা। কাজকর্ম সব হয়ে গেছে তোমার?’

‘হল আর কই। সবই তো একা একাই সারতে হয় আমাকে। তোদের কি কোন সাহায্য আমি পাই?’

স্বাতী এবার উঠে বসল। তার পর এদটু হেসে বলল, ‘কি করতে হবে বলো। তোমার ওই এক চিরকালের খোঁটা। কিছুই আমরা করি নে। কিছু করতে গেলেও তো তুমি আবার করতে দাও না। অন্যের করা কিছু পছন্দই হয় না তোমার।’

অমলা মেয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ‘তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্বাতী।’

‘বেশ তো করো না।’

অমলা একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর দ্বিধাসংকোচ কাটিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ‘হিমাংশুর সঙ্গে তোর কি কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছে?’

স্বাতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মা যে এই কথা জানবার জন্যেই এখানে এসেছেন তা তার বুঝতে বাকি নেই।

একটু সময় নিল স্বাতী। তারপর বলল, ‘কই না তো।’

‘হিমাংশু যে কদিন ধরে আসছে না। ব্যাপারটা কি?’

স্বাতী চটে উঠে বলল, ‘কি ব্যাপার তা আমি কী করে জানব। কেউ একজন

কদিন না এলেই বাকি ঝগড়াঝাটি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।’

মেয়ের কাছ থেকে উল্টো ধমক খেয়ে অমলা ফের কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ‘না হলেই ভালো। তার পর তোদের সেই বড় বড় প্ল্যানের কি হল?’

স্বাতী বলল, ‘বড় বড় প্ল্যান মানে বড় বড় খেলা। হিমাংশুর স্বভাব তো ওইরকমই।’

অমলা বললেন, ‘তা হোক। বড় বড় লোকের অমন বড় বড় খেলায় থাকে। বদ খেলায় কিছু না হলেই হল।’

স্বাতী চুপ করে রইল। বদ খেলায় যে কিছুই একেবারে নেই তা কী করে বলে। আবার সে সব খেলার কথা মাকে বলেই বা কী করে।

অমলা বললেন, ‘অবশ্য ওর বাড়ির যা অবস্থা তাতে এখনই বোধহয় কিছু ওর করবার দরকারও নেই। ব্যবসার ট্যাক্স যদি না হয় ভালো চাকরি-বাকরি করুক। সেই বরং ভালো। ওকে সেই পরামর্শই দিস।’

‘আমার পরামর্শ সে নেবে কেন?’

অমলা বললেন, ‘নেবে নাই বা কেন? তাহলে আর বন্ধু কিসের?’

স্বাতী চুপ করে রইল। তেমন বন্ধু কি তাদের মধ্যে সত্যিই হয়েছে? স্বাতীর মাঝে মাঝে মনে হয় এ শব্দ তাদের অবসর যাপনের বন্ধু। কিছুটা সময় বেশ তাঁর নেশার ভিতর দিয়ে কাটে। তারপর সেই মাদকতা শেষ হলে কিসের এক অবসাদে মন ভরে যায়। স্বাতী যা চেয়েছিল তা কি এই? সে কি শব্দ কারো ক্ষণিকের অবসর-সিগন্যাল হতে চেয়েছিল? স্বাতীও তার মনের মত কিছু একটা গড়ে তুলতে চায়। সেই গড়নের কাজে আর এক-জনের সহায়িকা হতে চায়। কিন্তু সেই কর্মী পদবষ কোথায়?

অমলা এবার সরাসরি আসল কথা পাড়লেন, ‘তোদের মধ্যে বিয়ে-টিয়ের কথা কি কিছু হয়েছে?’

‘বিয়ে?’

‘আকাশ থেকে পড়লি যে! হ্যাঁ বিয়ে। যেভাবে মেলামেশা করছিস আমি তো ভেবেছি তোদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে।’

‘না মা। সে সব কিছুই হয় নি।’

‘কী বোকা রে তুই। কথা আদায় করে নিস নি অথচ এমন করে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিস? তোর কি বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু হয় নি? মেয়ে না তুই?’

স্বাতী চুপ করে রইল।

তার পর হঠাৎ মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে

বলল, ‘ওকে আমি বিয়ে করবার যোগ্য বলে মনে করি নে।’

অমলা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু কঠিন স্বরে বললেন, ‘যোগ্য বলেই যদি মনে না করিস তাহলে অত মেলামেশা করছিস কেন? ছেলেখেলার বয়স কি আর আছে? তা ছাড়া ওসব ছেলেদের মানায়। মেয়েদের একেবারেই মানায় না।’

স্বাতী কোন জবাব দিল না।

অমলাও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কোমলস্বরে বললেন, ‘অযোগ্যতার কিছু তো আমি দেখি নে। অবস্থা ভালো। গাড়ি-বাড়ি আছে। শিক্ষিত বংশিমান চালাক-চতুর ছেলে। আবার কি চাই। দোষের মধ্যে একটু অস্থিরমতি। বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হলেই ওসব সেরে যাবে। স্থিরতা আসবে। সময় বুঝে কথাটা এবার তুই পাড়। বরোহিস? আর দেরি করা ঠিক নয়।’

স্বাতী বলল, ‘না মা। আমি ওসব পারব না।’

অমলা বললেন, ‘তুই না পারিস আমাকেই পারতে হবে। ব্যাপারটা এমন করে লুকিয়ে রাখা তো আর যায় না। লোকে কি বলবে। তা ছাড়া নিজেদেরও তো ভবিষ্যৎ-টবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।’

স্বাতী বলল, ‘ওসব ভেবে কাজ নেই মা।’

অমলা হাসলেন। তারপর সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, ‘না ভাবলে কি চলে। আমাকে বলতেই হবে। আমাকে জানতেই হবে ওর উদ্দেশ্যটা কি।’

স্বাতী হঠাৎ মুখ তুলে মার দিকে তাকাল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, ‘আমি তোমাকে বলছি মা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই করব। যা বলবার আমিই বলব।’

অমলা মেয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ‘বেশ বোল। জেনে নাও সব। যদি সদুত্তর পাও তো ভালো। না হলে ওর সঙ্গে তোমাকে আর আমি মিশতে দেব না।’

কথা শেষ করে অমলা উঠে দাঁড়ালেন।

মহাকবিবীর যতীনদাস

যতীনদাস মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

২ দশ ২

“দেশের জনসাধারণ দেশের জন্য ত্যাগ কবিত্তে প্রস্তুত; কিন্তু তাহাদের সেই ত্যাগ-বল্লভে ইচ্ছাকে কি কবিষা সঠিকভাবে পরিচালিত কবিষা দেশকে বড় কবিষা তুলিতে পাবা যায় তাহা নেতৃবৃন্দ বড় বেশী চিন্তা করেন নাই। দেশের যুবশক্তিকে আজ সেই ভাব গ্রহণ কবিত্তে হইবে।

“যতীনদাস আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত কাজ কবিষা যাইতে হইবে। যতীনদা জেলায় জেলায় সংগঠন তৈরী কবিষাছিলেন। তেমনি কবিষা দেশের যুবশক্তিকেও সাবা দেশে সংগঠন তৈরী করিতে হইবে। তাহা না হইলে বাঙালা ও ভাবত বড় হইতে পাবিবে না।

“যতীনদাস কাজ কবিষার প্রগালীতে ছিল সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা। তাহার কর্মপদ্ধতিতে আংশিক শৃঙ্খলা বলিতে কিছু ছিল না। পূর্ণ অনাবিল শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠাই যতীনদাস কর্মপ্রগালীতে দৃষ্ট হয়। সেইভাবেই জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে যে জাতি আজ অনাহাবে মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বাঁচান যাইবে না। আজ ভাবতে বৈ স্বাধীনতা আসিযাছে দেশবাসী যদি যতীনদাস আদর্শ অনুসরণ কবিষা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাব পথে কাজ না কবে তাহা হইলে তাহাযা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পাবিবে না।

“আপনাবা যতীনদাস মতো দেশের যুবক ও ছাত্রগণের মধ্যে সংগঠন কবিত্তে প্রস্তুত আছেন কি?

“যতীনদা বাঙালাদেশ তথা সারা ভাবত-কবে বৃটিশ শক্তিব বিরুদ্ধে গুপ্ত এক গভর্নমেন্ট তৈরী কবিত্তে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই বাঙালা কেবল চাঁৎকাব করিতে ছানে। সাবা দেশে যতীনদাস আদর্শ সামরিক সংগঠনের মতো সৃষ্টিশীল এক

সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই যতীনদাস প্রতি প্রকৃত শ্রমী জ্ঞাপন করা হইবে...”

বিশ্ববী সংগঠক এবং যতীনদাসের প্রিয় সহকর্মী ডাঃ তারকনাথ দাস দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর বাদে কয়েক মাসের জন্য জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে প্রকাশ্য জনসভায় যতীনদাসের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় উপবোধ ভাবণে স্পষ্টই জোর দেন সামরিক সংগঠনের মতো যে শৃঙ্খলার সাহায্যে যতীনদাস দেশের যুবশক্তিকে উদ্ভুদ্ধ কবে তুলেছিলেন, সেই মহান কর্মপদ্ধতির ওপর।

এবং দেখা যায় যে যতীনদাসের সঙ্গে পবামর্শ কবে জাপান হয়ে আমেরিকা গিয়ে ১৯০৭ সালেই ডাঃ তারকনাথ দাস পূর্ব আমেরিকায় একটি মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরুর কবেছেন—সামরিক শিক্ষার বাংলায় তথা ভারতের যুবশক্তিকে উদ্ভুদ্ধ কবাব কর্মসূচীর অংশ হিসেবেই!

বিদেশে ডাঃ তারক দাসের কার্যবলীর আলোচনা কবাব আগে দেখে নিতে হবে দেশে তিনি কী কাজ কবে বিদেশ যান।—

তারক দাসের বিদেশ যাত্রার প্রকালে যশোবে যতীনদাসের সঙ্গে তাঁর গুপ্ত বৈঠকের উল্লেখ আগেই কবেছি। বাংলাদেশে বিশ্ববী সংগঠনের সূচনা-কাল থেকেই তারকদাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে দেশ-জননীর চরণে নির্বোধ কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিক্ষমকব সংগঠকব পরিচর বেন। তাবপব, যতীনদাসের সঙ্গে পরামর্শ কবে তিনি মাদ্রাজে চলে যান। সেখানে তাঁর কার্যবলী সম্বন্ধে খুব বিশেষ কিছু বহুকাল জানা যায় নি। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ মন্তের “স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস” গ্রন্থে কিছু আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

* আনন্দবাজাব পত্রিকা : ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২। যতীনদাসের ৩৭তম স্মৃতি-বার্ষিকীতে, দীর্ঘ ৪৭ বছর বয়ে স্বদেশে ফিরে শৃঙ্খলাপ্রিয় ডাঃ তারকনাথ দাস এই উক্তি করেন।

সম্প্রতি মাদ্রাজের বিখ্যাত একটি দৈনিকে Akoor Anantachari নামে জনৈক মাদ্রাজী লেখক একটি চমৎকার প্রবন্ধে তারকনাথ দাসের মাদ্রাজ-প্রবাসের কিছু কিছু মন্তব্য উল্লেখিত কবেছেন।* উক্ত প্রবন্ধ থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে দিই:

“Madras was considered in the early years of this century a quiet province, mostly dominated by moderate politicians. It came in contact with trends in Bengal, first through Vivekananda who had a sort of a royal reception in Madras after his return from Chicago. The next emissary of Bengal politics in Madras was Bepin Chandra Pal, More or less simultaneously with Bepin Chandra, there was another man from Bengal who created a reputation for himself in Madras and was Tarakanath Das.

“Tarakanath Das was a regular member of the Jugantar group of Calcutta and he came to Madras on behalf of that group. Vivekananda created in Madras a favourable ground for Bengali social or political workers, particularly of a Bengali sannyasi... Tarakanath went on a roving tour in different parts of Bengal and then of India in the garb of a sannyasi.

“After some time he found Madras a suitable place for organising revolutionary groups. He

* Sunday Standard : May 31, 1964

travelled extensively in the province....

"in Madras, Taraknath could form the nucleus of a revolutionary organisation. Chidambaram Pillai, Subramanya Sivam, Nilkantha Brahmachari and others were early recruits. By that time Bepin Chandra Pal came to Madras and started his lecture tour. His speeches were highly emotional.

"...Chidambaram Pillai, apart from his politics, was also noted as the organiser of the Tuticorin-Colombo Steamer Services, the first Indian steamer company in the South....* He incurred official displeasure for this enterprise.

"...Chidambaram was sentenced to transportation for life, but on appeal this was reduced to nine years. He, was the real organiser of the revolutionary movement in Madras and got his initiation into revolutionary politics from Taraknath as."

ডায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে প্রভৃতি বিপ্লবীর রচনা থেকে এবং অন্যান্য বিস্মৃত সূত্র থেকে জানা যায় যে, তারকনাথ দাস, অমর লস্কর, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে প্রমুখ ভারতীয় ছাত্রেরা ১৯০৭ সালেই ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি India Committie স্থাপন করে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষত শিখদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের কাজ শুরু করেন।

সাময়িক শিক্ষালভের জন্য তারকনাথ দাস যান প্রিন্সটন মিলিটারি ইউনিভার্সিটিতে (মহাভারত, ভারমন্ট-এ) অধ্যয়ন করতে। এবং অমর লস্কর আর পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজেকে পাঠান মন্ট্রি কামলপাইস মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে।

এদের প্রচারকার্যের অগম্যরূপ বেসব প্যামফ্লেট ছাপতে, তার কিছু কিছু তারা ভারতেও পাঠাতেন। সেইসব পুস্তিকার একটি ভাড়া কয়েকজন শিখের হাতে ওরা পাঠান দ্রাওয়ারপিণ্ডির বিপ্লবী লাসা পিণ্ডাসের কাছে। সেগুলি ১৯০৭ সালেই ধরা পড়ে

ডাবতে। ফলে পিণ্ডাসের নামে মামলা শুরু হয় এবং তাঁর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে এবং অরিগন স্টেটেব পোর্টল্যান্ড-ও এরা শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেই-সঙ্গে ওয়াশিংটনে এবং কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারণা সম্প্রসারিত করেন।

১৯১০ সালের গোড়ার দিকে, তারক দাস যে মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন, ইংরেজ সরকারের বিশেষ অনুবোধে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষপক্ষ তারক দাসকে বিতাড়িত করেন। ভারত ভারতীয় বিপ্লবের কাজ আমেরিকাতে খানিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তারকনাথ দাস নতুন উৎসাহে কাজ চালিয়ে যান। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিউইয়র্ক থেকে তারক দাসকে বলেন আরো সূতর্ক হয়ে কাজ করতে, নইলে লোক জ্ঞানজানি হতে পারে।

এই ঘটনার পিঠ-পিঠ তারকনাথ দাস চলে যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, সিয়াটেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে, এবং ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজ চালাতে চালাতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯১৪ সালের মধ্যে বি-এ এবং এম-এ পাশ করেন যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে।

সিয়াটেল থেকে পোর্টল্যান্ড মাত্র শপদরেক মাইলের ব্যবধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, ওইসব অঞ্চলে তখন কয়েক সহস্র ভারতীয়ের বাস; তাদের অধিকাংশই অরণ পল্টনে ছিলেন। এদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য প্রচার করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।—লিখেছেন বিপ্লবী পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজা। তারকনাথ দাস কেন যে ওই অঞ্চলে পড়াশুনা করতে গেলেন, তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে এর থেকে। এবং তিনি সিয়াটেল যাবার পরেই—১৯১০ সালে, আমেরিকান ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল পোর্টল্যান্ড। ধনী কপ্টাইব কাশীরামকে তারক দাসই বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, এবং কাশীরাম হয়ে ওঠেন পোর্টল্যান্ড কেন্দ্রের মহামান্য। কাশীরাম তার ধনসম্পত্তি যা-কিছু ছিল সব্ব ঢেলে দেন এই বিপ্লব প্রচেষ্টায়। মোহন সিং গ্রন্থীজ এসে যোগ দেন তাঁর সঙ্গে, এবং ১৯১১ সালে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এই সংগঠন। এদের কার্যবলীর অন্যতম ছিল সাইক্লো-স্টাইল করে পুস্তিকাদি ছাপিয়ে সর্বত্র চাটুর করে দিয়ে দলবান্ধি করা।

১৯১২ সালে যতীন্দ্রনাথের অনুজপ্রতিম কর্মী সত্যেন সেন (যশোর) এসে পৌঁছলেন পশ্চিম আমেরিকায় এবং তারকনাথ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে তারক দাস ডায় ভূপেন দত্তকে লেখেন যে, দেশ থেকে সত্যেন সেন এসেছেন; তিনি অমর

এনেছেন—দেশে খুবই ভাল কাজ চলেছে। ভূপেন দত্ত তখনো নিউ ইয়র্কে। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তারক দাসের পরামর্শে যতীন্দ্রনাথের দত্ত সত্যেন সেন পোর্টল্যান্ডের বৈপ্লবিক কেন্দ্রে যোগদান করে কাশীরামের নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। তারক দাস নিজেকে সর্বদা প্রচ্ছন্ন রেখে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ কবডেন। প্রকাশ্যে তাই সত্যেন সেনই এই দলের প্রথম বাঙালী সভ্য।

সত্যেন সেন এসে পৌঁছনোর কয়েক মাসের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের অপূর্ণ দত্ত জিতেন লাহিড়ী এসে সাক্ষাৎ করলেন তারক দাসের সঙ্গে। তিনি ডায় ভূপেন দত্তের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। তিনি আমেরিকায় গিয়ে খবর দিলেন যে, দলের পুরনো কর্মী ও নেতারা সকলেই সমবেতভাবে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাজে নেমেছেন। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। বেশি কথা ও হুজুগের পরিবর্তে বাঙালী মুখ বুজে বুক বেঁধে কাজে নেমেছে। দলার্কিল ভূলে সম্ববদ্ধ হয়েছে।

১৯১৩ সালে পোর্টল্যান্ডের বিপ্লবী কেন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন লাল হরদয়াল। স্বর্ণশীর্ষ একটি ঘটনা। কারণ যেমন এর সংগঠনের ক্ষমতা, তেমনি বিচিত্র এর উগ্র বৈপ্লবিক মতবাদ। ১৯০৬ সালে ইনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। মেধাবী ছাত্র। হঠাৎ বৃত্তির প্রতি কেন বিতৃষ্ণা জাগল সঠিক জানা যায় না। ১৯০৮ সালে বৃত্তি ত্যাগ করে দেশে ফিরে এলেন। সে এক বিহীন যুগ-সমীক্ষণের ভারতবর্ষ। এর কয়েক বছর আগেই, গ্রীষ্মকালের সহকর্মী ও প্রথম বিপ্লব-শিষ্য জে. এন. ব্যানার্জী সম্যাসী হয়ে স্বামী নিরলম্ব নাম নিয়ে পাজাবে আসেন। যেগন বিদ্যাবুদ্ধির কলকাতার বার্ষিকে জে. এন. ব্যানার্জীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ব্যানার্জী অত্যন্ত প্রচার সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখেন। ব্যানার্জী সম্যাসী হয়ে পাজাবে গিয়ে গ্রীষ্মকালের বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করতে থাকেন।

এই উপলক্ষে লাল লাক্ষপং রায়, সর্দার অজিত সিং, তার ভাই কিশোর সিং (শহীদ ভগৎ সিং-এর পিতা), সূক্ষী অম্বাপরসাদ, ডাঃ হরিচরণ মুখার্জী, হৃষীকেশ লাটা প্রভৃতি পাজাবের প্রান্তঃস্বর্ণীয় বিপ্লবী নেতারা সমবেত হন স্বামী নিবালবের চতুর্দিকে : স্বামীজীর নিষ্ঠা ও উদাহরণ, গ্রীষ্মকালের ভাবধারা ও প্রেরণা, যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবাত্মক কর্মযোগ ধীরে ধীরে আগুন ধরিয়ে দিল স্বাধীনতা-প্রেমিক পাজাবী যুবকদের মনে—বেশ্যে লাল লাক্ষপং রায় ইতিপূর্বেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

* চিদাম্বর পিল্লাই কলকাতারও আসেন এবং গ্রীষ্মকালসম্পাদিত 'খম' পত্রিকার তাঁর কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দেন।

—গুণদীপনাথ

* ডায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম : পৃষ্ঠা ৮০৪

পাণ্ডাহিক বসুদত্ত

১৯০৮ সালে বিলেত থেকে ফিরে হব-দয়াল লেহিহান হয়ে উঠলেন এই বহির স্পর্শে। দেশের তরুণ ও যুবকদের হৃদয় নিংড়ে তিনি প্রবাহিত করে দিলেন স্বাধীনতা-কামী দেশপ্রেমের শতদ্রু। প্রকাশ্য সভায় তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন : অপূর্ণ তাঁর বাক-শক্তি।

দিল্লীতে স্বামী নিবালস্বের প্রথম শিষ্য ও কর্মীদের অন্যতম ছিলেন আমীবর্চাদি। স্বামীজীব সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তিনি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্রতি অনুভাব সঞ্চার করতেন। হরদয়ালও ১৯০৮ সালে আমীবর্চাদের সাহচর্যে আসেন। হবদয়াল আবার বিদেশ যাবার সময় এর ওপরেই ন্যস্ত হ'ল দলেব ভার। চাকার ছেড়ে দিয়ে রাসবিহারী যখন দলের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি দেবাদুর্নে তার পূর্ব-পরিচিত জে. এন. চ্যাটার্জীর কাছে হবদয়ালের সহযোগীদের খোঁজ করলে চ্যাটার্জী দীননাথকে বলেন রাসবিহারীকে আমীবর্চাদের কাছে নিয়ে যেতে। এইভাবে আমীবর্চাদের সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয়। বসন্তে বিশ্বাস তখন রাসবিহারীর সঙ্গেই থাকতেন। দিল্লীর বিপ্লবী আউখবিহারী রাসবিহারীর অনুরোধে বসন্তকে একটা ওষুধের দোকানে কম্পাউন্ডারের কাজ জুটিয়ে দেন।

ওদিকে কলকাতার বাজাবাজারে যখন অমৃত হাজরা (ওবফ শশাঙ্ক) ধবা পড়ে গেলেন, তাঁর একটি খাতা বহু বিপ্লবীর নাম-ঠিকানা পেবে বাধ পুঁলিশ : যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের হৃদয়ও এইভাবেই সম্ভবত পায় পুঁলিশ।* বেগতিক দেখে

* বিপ্লবের এই পূর্বে বোমার ওস্তাদ বলতে চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েককেই বোঝাত। তিনি ছিলেন মতিলাল রায়ের সহকারী, কিন্তু মতিলালের অগোচরেই অতুল ঘোষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। অমৃত হাজরা (শশাঙ্ক) বোমা তৈরি করা শিখতে চান এবং অতুল ঘোষকে বিশেষ অনুরোধ করে অবশেষে তাঁর মাধ্যমে মণীন্দ্র নায়েকের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু মতিলালের অজ্ঞাতে বাববার মণীন্দ্রবাবুও কাছে ষাণ্ডা অশোভন মনে করে অতুলবাবু শশাঙ্ককে চন্দননগরে নিয়ে গেলেই মতিলালবাবু সঙ্গেও দেখা কবতেন। শশাঙ্ক মানুষকে পায়ের ধুলো নিয়ে আপন করে ফেলতেন এবং এইভাবেই মতিলালবাবু বিশেষ রেহভাজন হয়ে ওঠেন। এ-সূত্রে তিনি মতিলালবাবুর মাধ্যমে অল্প দূরত্ব বহু বিভলভার সংগ্রহ করে ফেলেন।

সে-সময়ে উত্তর ভারত থেকে রাসবিহারী বসু, যেসব বিপ্লবীদের পাঠাতেন, তাঁরা মণীন্দ্র নায়েকের মাধ্যমেই অতুল ঘোষের নাকাল পেতেন এবং যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের

রাসবিহারী ও আর-কয়েকজন বিপ্লবী চন্দননগরে গা ঢাকা দিলেন। আমীবর্চাদি, বাল-মুকুন্দ, আউখবিহারী, দীননাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রেরণার করা হয়। এঁরা সবাই সম্মত নির্ধাতন হাসিমুখে বরণ কবেন এবং ফাঁসীব মধ্যে ওঠেন—দীননাথ ছাড়া : তিনি রাজ-সাক্ষী হলেন। তিনি এবং জে. এন. চ্যাটার্জী লালা লালপণ্ডারের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন হরদয়ালের সঙ্গে।

ফিরে যাই হবদয়াল প্রসঙ্গে। স্যান ফ্রান্সিস্কোতে গিয়ে তিনি যুক্ত হলেন তারকনাথ দাস প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের সঙ্গে এবং নিজে 'যুগান্তর' আশ্রম ও 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা কবলেন। সেই থেকে দলের নামও হল 'গদর'—অর্থাৎ বিদ্রোহ বা 'যুগান্তর' : শ্রীঅবিনন্দ-প্রবর্তিত বিপ্লবেরই প্রতীক। 'যুগান্তর' আশ্রম পরিচালনায় সহ-যোগিতা কবতে এগিয়ে এলেন পোর্টল্যান্ড কেন্দ্রের কাশীরাম।

এ-ই হল 'গদর' দলের জন্ম-তাহনী। দলেব দুটো বিভাগ খোলা হল : (ক) প্রচার বিভাগ—হরদয়াল স্বয়ং তার কর্মসিঁচি : আর (খ) সামরিক বিভাগ—যার কর্মসিঁচি পাণ্ডুবঙ্গ খানখোজে (ইনি খোদ তারকনাথ দাসের লোক)।

'গদর' দলের মূখপত্র 'গদর' পত্রিকা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং অনির্নামিতভাবে ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকল। আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়াও ভারতবর্ষ, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, শ্যাম—যেখানে যেখানে ভারতীয় বা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আছে, সবাই 'গদর' পত্রিকা জন-প্রিয় হয়ে উঠল। 'গদর'-এর আহ্বানে তরুণ-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলেই অনুপ্রেরিত হয়ে উঠল। 'গদর' প্রচার-বিভাগে হবদয়ালের সহকারী হলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র পেশোয়ারি, ডাই পবমানন্দ প্রভৃতি।

দলে একজন মূলমন্ত্র প্রচার-সিঁচির প্রয়োজন এল। টোঁকিও কিশোরবিদ্যালয়ের প্রাচ্য-ভাষার সুপণ্ডিত অধ্যাপক বরকতুল্লাকে আমেরিকা যেতে আহ্বান জানানো হয়। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৯১৪ সালে এসে 'গদর' দলে যোগ দেন হবদয়ালের সহকারী-রূপে।

অনেকেব সঙ্গে দেখা করে শশাঙ্ক বহু ঠিকানা সংগ্রহ কবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সেই খাতা পুঁলিশ হস্তগত কবে। তিনি ভাল মেকানিক ছিলেন : মণীন্দ্রবাবুর পদ্ধতিতে শেখা বোমার ওপর তিনি সিগারেটের খোল লাগিয়ে ট্রিগার পবাঁচ্ছিলেন—সেসব সমোতই ধরা পড়ে যান। উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবেরও বহু বিপ্লবীর নাম এইসুত্রেই ফাঁস হয়ে পড়ে।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

ওদিকে 'গদর' দলের সামরিক-বিভাগেব কর্মসিঁচি পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজেব নামে চিঠি নিয়ে মহাযাত্রের গুপ্ত-সমিতি থেকে এই সময়েই উপস্থিত হলেন আগাশে নামে তরুণ বিপ্লবী।

গদরব একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হল এই ঘোষণা : "চাই বাঁচ সৈন্য—ভারতে বিপ্লবের কাজের জন্য। যেতন—মৃত্যু। পূর্বস্কাব—মৃত্যুঞ্জয়িত্ব। পেনসন—স্বাধীনতা। যুদ্ধ-ক্ষেত্র—ভারতবর্ষ।" তা ছাড়া বাংলায় তথা সব ভারতের মহান শহীদদের কীর্তি-কাহিনী ফলাও করে 'গদর' পত্রিকায় ছেপে পাঠকদের মনে এঁরা প্রেরণা জোগাতে লাগলেন। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দু, মাঝঠা, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষায় বৈপ্লবিক গান বচনা ও প্রচাৰ করাও এঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত হল। 'গদর' কা গুঞ্জ নামে একটি গীত-সঙ্কলনও এঁরা প্রকাশ করেন।

সামরিক বিভাগেব প্রধান কাজ ছিল নানা রকমের কুচকাওয়াজ, বোমা প্রস্তুত, পিস্তল ছোড়া, রাইফেল ড্রিল, সামরিক শিক্ষার উত্থাপিত প্রভৃতি সবশ্বে সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলা। বোমা প্রস্তুতের সময় হরনাম সিং নামে একজন কর্মীর একটা হাত কনুই পর্যন্ত উড়ে যায়—যেমন ঘটেছিল বাংলা দেশে, স্বতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ইন্দ্রনাথ নন্দীর ক্ষেত্রে।

* আমেরিকায় প্রস্তুতির ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিলাম। এবাব আসি ইউরোপেব কথায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে বসে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, ১৯০৯ সাল নাগাদ ইনি (জার্মানীর মহা-মান্য সম্রাট কাইজার) ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করেন এবং বার্লিনেই ইনি একটি ভারতীয় মজলিস প্রতিষ্ঠা কবান, যাতে করে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ সম্ভব করে তোলা যায়। জার্মান যুববাহুও পিতাব পদাঙ্ক অনুসরণ কবলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে পবদর্শনে গেলেন, তাঁর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের দহরম-মহরম অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।*

মাণিকতলা বোমার মামলাব সময়েই যে-সব ভারতীয় বিপ্লবী জার্মানীতে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন অধ্যাপক শ্রীশ সেন। আবার স্মরণ করিয়ে দিই : তারক দাস, অধব লস্কর, শ্রীশ সেন, সত্যেন সেন প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীদের ১৯০৬ সালেই স্বতীন্দ্রনাথ সম্মিলিত করেছিলেন যশোবে, বিশেষ এক বৈঠকে। উদ্দেশ্য : বিদেশে গিয়ে

দলেব কাজ সম্প্রসারণ করা। ইনি সেই গ্রীষ্ম এসে। ১৯০৩ সাল নাগাদ ইনি পবিচিত হন ভগিনী নিবেদিতা জে. এন. ব্যানার্জী (নিরালম্ব স্বামী), যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে, এবং দলেব এবং প্রথম অবস্থা থেকেই ইনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বৃত্ত ছিলেন। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত মহানাবক যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকে। গ্রীষ্মাব্দ জার্মানীর একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy with special reference to Vedic Philology বিষয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন কৃতিত্বের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা-তেও অক্লান্ত সংগঠকরূপে কাজ করে যান। তার মধ্যে জার্মানীর শাসকশ্রেণীর মধ্যে ভারত-বর্ষ ও তাব স্বাধীনতার সংকল্প সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করা এবং তাঁদের আগ্রহান্বিত করে তোলা ছিল। তাঁরই কাজ। 'প্রথম মহাদুদ্ধ' বাধাবাদ সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম সেন এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য জার্মান সরকারের বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যারন ওপেনহাইমের সঙ্গে পরামর্শ করে Deutscher Verein der Freunde Indien (ভাবত-বন্দু জার্মান সমিতি) নামে সমিতি স্থাপন করেন এবং তাব কাজ চালু করে দিলে—অত্যন্ত জরুরি তথ্যাদি সমেত তিনি ডক্টরেটের মাস্তা ত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন।

উক্ত সমিতিতে উচ্চপদস্থ বহু জার্মান এবং বেশ কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন। অধ্যাপক গ্রীষ্ম সেন, ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায় (Chatto), অধ্যাপক সত্যীশ দাস, বীরেন সরকার প্রভৃতি বাঙালী সদস্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। তা' ছাড়া ছিলেন বোম্বাই অঞ্চলের অনেক অধ্যাপকও।

কিছুদিনের মধ্যেই আর যারা এসে বার্লিনের এই বিপ্লব-সমিতিতে যোগ দিলেন—তাঁদের মধ্যে ডাঃ জ্ঞান দাশগুপ্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই, রহমান, দাদা চান্দ্রী কেরাসাম্প, অধ্যাপক গোপাল পরাজপে, নারায়ণস্বামী সান্বাটে, ডাঃ সূত্রাক্ষর, ডাঃ বোশী, সদাশিব রাও, সিদ্ধিকি (পরে হাষদ্রাবাদ ওসমানিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), কল্যাণকর, ডাঃ মনসুদর আহমেদ প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে এলেন-অকৃত কবিংকর্মী সংগঠক তারকনাথ দাস। বার্লিন সমিতির সঙ্গে আমেরিকার সংগঠনের প্রথম মিলন-সূত্র সুদৃঢ় করে আমেরিকায় ফিরে যান তিনি।

বার্লিন কমিটি জার্মান সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্যারন মাজ ফ্রাইহাফ ফন প্রুসেনহাইম, খোদা কাইজারের অকৃতম বন্দু আলফ্রেড বালন (হামবুর্গ-আমেরিকা স্টীমার কোম্পানীর স্বাধিকারী), চীনাভাষাবিদ ডাঃ অল্ফ্রেড হসিম্যানসন, ভেনসন ডব্লু.

হেলমুট ফন প্লাজেনাপ (কিছুদিন পরে শোষিত দুর্জন বোগ দেন) প্রভৃতি।

উপরোক্তদের মধ্যে সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ থেকে চম্পকরমণ পিল্লাই এবং বাসেল থেকে ডাঃ জ্ঞান দাশগুপ্ত আগে থেকেই পৃথক পৃথক সংগঠনের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন এবং মহাদুদ্ধের প্রাক্কালে কাইজারের কাছে গিয়ে আবেদন জানান: বার্লিনে এরা বৃটিশ-বিরোধী কার্য-কলাপের কেন্দ্র খুলতে চান।

কাইজার স্বয়ং জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের মাধ্যমে এঁদের অনুরোধ করলেন গ্রীষ্ম সেন, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এইভাবে সংগঠন দানা বেঁধে উঠল।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ইনি, ডাঃ তারক দাস, অধ্যাপক গ্রীষ্ম সেন, ডাঃ ভূপেন দত্ত, পিল্লাই, বরকতভূম্মা, সুফী আব্বাসসাদ প্রভৃতি ভারতীয় নেতারা যে অতুলনীর স্বাক্ষরযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় কর্মরত বিপ্লবী সহকর্মীদের—সেই মহান ইতিহাস বোঝান পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা হবে, সেদিন স্বতঃই দেশবাসীরা অন্তর-হৃদয়ে স্বেচ্ছায় উঠবে অবিচল প্রস্থার আর সমুদ্রের তীব্র অক্ষয়শরীর এঁরা।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে, লন্ডনে ভারতীয় বিপ্লবপন্থীদের তব্ব থেকে এই বীরেননাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী মদনলাল খিড়ড়া প্রতিবাদ জানালেন ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের উপর যে দমননীতি অবলম্বন করেছে ইংরেজ সরকার—তারই বিরুদ্ধে। উপবোধ তারিখে লন্ডনের প্রকাশ্য এক সভায় তব্ব মদনলাল খিড়ড়া হত্যা করলেন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি-র এড্‌ভান্সপ অত্যাচারী স্যার কার্জন ওয়াইলিংকে। মদনলাল ধরা পড়লেন। তাঁর পকেটে একটা চিবুটে আগুন-জ্বালানো ভাষার লেখা: 'নির্মম শাসনের অজুহাতে ভারতবর্ষে যেভাবে তব্বদের ফাঁসি ও ষাঁপান্তরের পথে টেলে দেওয়া হচ্ছে, তারই সামান্য প্রতিফল দিলাম।'

ভারতবর্ষের শহীদদের নামের তালিকা বৃষ্টি করে গেলেন মদনলাল খিড়ড়া।

খিড়ড়া থাকতেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার India House-এ, এবং বীরেন চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও, মাদাম কামা, বিনাশত দামোদর সাভারকর প্রভৃতিও সঙ্গে মিশতেন।

এর আগে এঁরা চতুর্ভুজ নামে এক কর্মীর হাতে কুড়িটি পিস্তল দেশে পাঠিয়েছিলেন; তারই একটি পিস্তল দিয়ে ১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর জ্যাকসন নামে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা হত্যা করেন। সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনের ফাঁসি। তিনজনকে ষাঁপান্তর। হত্যার সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলোড

থেকে গ্রেপ্তার করে ভারতে আনিবার সময়ে জাহাজ থেকে তিনি জেলে ঝাঁপিয়ে পড়েন—সে কাহিনী আজ সুবিদিত। ফরাসী উপকূল থেকে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশে এনে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় শাস্তি হল: সাভারকর চলে গেলেন স্বাধীন জীবন স্বীকার করে।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের ব্যারিস্টার উপাধি খোয়া গেল। বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আর ব্যারিস্টার হতে প্রবৃত্তিই গেল না।

ইওরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের গরম গরম প্রবন্ধ দ্বিধিতে লাগলেন। মূল সূত্র: মদনলাল প্রভৃতি শহীদদের কর্ম সমর্থন করা। বীরেনের বোন কবি সুরোজিনী নাইডু কাগজে কাগজে ইন্তাহার জেগে দিলেন যে বীরেনের সঙ্গে তাঁদের পত্রবাদের সকলে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, কারণ বীরেন বিপ্লবগামী।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন বীরেননাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জ্ঞান: এশিয়ার শব্দ প্রবন্ধটি জার্মান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ভারতবর্ষের বিপ্লব কাজে সেই সুবাদে জার্মান সরকারের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আদায়ের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা-একজন। পরে তাঁর অন্যান্য রচনা পড়ে রুশ-বিপ্লবের কণ্ঠস্বর লেনিন-ও চমকিত হয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ অ্যান্ড-রিকারে মার্কিন সরকার লালা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে নৈরাজ্যবাদ (anarchism) এর অভিযোগে। জার্মানে খালাস হবে হরদয়াল কনস্টিভুনোপলে পালিয়ে গেলেন। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর মারফৎ সেই সুবাদ পেয়ে বীরেননাথ চট্টোপাধ্যায়ই হরদয়ালকে সেপ্টেম্বর (১৯১৪) নাগাদ জার্মানিতে নিয়ে এসে দলে টানবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু বার্লিন কমিটির সহ-সভাপতি বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ ব্যারন মাজ ফ্রাইহাফ ফন ওপেনহাইম-এর সঙ্গে প্রথমেই ঠকুর লাগে হরদয়ালের। বহু কষ্টে বরকতভূম্মা হরদয়ালকে বার্লিনে-সুদ্বিক্রে আবার কাজে নামান।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারক দাস, হরদয়াল

* কনস্টিভুনোপলে ষাষাষ আগে সুইৎজারল্যান্ডে (জুরিখে) বড় একটা বাড়ি ভাঙে—নিম্নে যুগান্তর আশ্রম ও গদর পত্রিকা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছিলেন; ইহাও মত পরিবর্তন করে কনস্টিভুনোপলে চলে যান। সম্ভবত anarchy-এব প্রতি তাঁর তখন আস্থা থাকায় 'যুগান্তর' বা 'গদর'-এব কাজ করা অনুচিত মনে করেন—যার জন্যে প্রথমে বীরেন চট্টোপাধ্যায় আহবানও সাড়া দেন নি তিনি এবং বার্লিন যান নি।

—পঞ্চদশনাথ

এবং বার্লিন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমেরিকার 'গদর' দলের কর্মীরাও বার্লিন কমিটির পরিচালনা অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন। আমেরিকার বার্লিন কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে গেলেন হেরশ গুপ্ত। মাসে মাসে আমেরিকার কাজের জন্যে বার্লিন কমিটি থেকে মোটা টাকা আমেরিকায় পাঠানো হতে লাগল। তারক দাস ফিরে গেলেন আমেরিকায়।

জার্মান মিলিটারি আতশে বিখ্যাত জনবল ফন্ড পাপেন এবং তাঁর সহকর্মী ক্যুন্স্ট্যান্ট ব্রান্ড্ট মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতা কবতে লাগলেন।

অন্তর্জাতিক শাসনশাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের বৈদেশিক প্রচেষ্টার প্রধান কেন্দ্র বার্লিন কমিটি যেসব পরিচালনা নিয়ে কাজ করেন, তার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় এখানে দিই।*

“এক—ভারতবর্ষে বিশেষত সমাজের উচ্চস্তরসমূহে ইংরেজ অধীনতার বিরুদ্ধে দ্রুত অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কলো বিভিন্ন প্রদেশেই বহু গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠেছে বৈশ্বিক স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে। ইংরেজ শাসকেরা আশ্রয় চেষ্টা করেও এদের উচ্ছেদ করতে অকৃতকার্য হয়েছে। এই গুপ্ত-সমিতিগুলিই ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রধান সহায়। বিদ্রোহেব সময়ে ভারতের শিক্ষিত জনগণও এতে যোগ দিতে প্রস্তুত। ইংল্যান্ডের এই বুদ্ধিজীবী শোচনীয় দুরবস্থার মুহূর্তে ভারতের কোন কোনও নেতারা চান ইংরেজ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করে ফেলতে।

“ওদিকে ‘ধর্মযুদ্ধ’ (Religious War) বেধে ছাবার ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হবারও বিরাট এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; অবশেষে ভারতবাসী তাদের জাত-ধর্মের কৌদল ভুলে এক হতে চলেছে। এই সুবাদে আমাদের কমিটি থেকে বারোজন সদস্যকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলাপ কববার জন্য। সদস্যরা সকলেই হাতে-কলমে বোমা প্রস্তুতি প্রস্তুত করবার পদ্ধতি শিখে

গিয়েছেন এবং সম্যকরূপে তার সম্ভাবহারও করবেন।*

“আমাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী আফগানিস্থানের আমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদি ঘোষণা করেন, ভারতের বিপ্লবী নেতাদের সহায়তায় তা হলে ভাবতীয় সৈন্যবাহিনী-গুলিকে সীমান্তদেশে বিদ্রোহের কাজে মোতায়েন করা যাবে, সর্বত্র ব্রিটিশদের চোখে সর্বোচ্চ দোষের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো সব দখল করে ফেলতে হবে। জনসাধারণের ছাপা ইস্তাহার বিলি করে তাদের সহায়তা ও সহযোগিতা অর্জন করা চাই। শরৎকালে হিন্দুদের উৎসবের সময়েই তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করা সবচেয়ে সহজ হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, দ্বিসপ-মেল্লা, শিক্ষা পবিত্র, মুসলিম লীগ প্রভৃতির বার্ষিক সম্মেলনও ওই সময় নাগাদ হয়। সেখানেও ইংল্যান্ডের বর্তমান সরকারের সঠিক সংবাদ পৌঁছে দেবেন আমাদের সদস্যরা।

“দুই—ইওবোপ, আফ্রিকা এবং বিশেষত আমেরিকায় যেসব ভারতবাসী আছেন, তাঁদের মধ্যেও প্রকাশ্য ব্রিটিশ-বিশ্বের লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় ভারতীয়রা যে দুর্য্যবহার পাচ্ছে, তা নিয়ে ভারতের জনমনেও যথেষ্ট অসন্তোষ ও উদ্বেগ জমেছে।...কানাডা-প্রবাসী ভারতীয়েরা এতদূর বিচলিত হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধন-সম্পত্তি পরিত্যক্ত ফেলে বেধে দলে দলে দেশে ফিরতে শুরু করেছে—ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে গিয়ে বিদ্রোহ করবে বলে। আমেরিকায় এবং কানাডায় যেসব প্রাক্তন পতন আছে (বিশেষত লিখ ও পাঠান), সাহসে ও স্বকপে তারা কম নয়। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে আনুমানিক চার হাজার ভারতীয় আমেরিকা থেকে ফিরেছে; জনমনে এবং ভারতের সৈন্য-বাহিনীর ওপর এদের প্রভাব সামান্য নয়। তা ছাড়া বিশেষত অ্যামে-

*ডঃ জুপেন দত্ত লিখেছেন, “সে এক সময় গিয়েছে।...ভারতের সর্বদিকে বিশিষ্ট লোকদের নিকট লোক পাঠান হইয়াছিল।...পাক্ষা ও বঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে কিন্তু বৈপ্লবিকদের ভেতন সাড়া পাওয়া যায় নাই।...বঙ্গে বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের ও জার্মান সাহায্যের বার্তা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ লোক দ্বারা প্রেরিত হয় ও নিরাপদে পৌঁছায়।

...বিভিন্ন দল একত্রিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বার্লিন হইতে প্ল্যান ঠিক ছিল যে বালেশ্বরে অস্কাই গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বাংলা বিপ্লবীরা তথায়...ইউনিভার্সাল এস্পোরিয়াম নামক কারবাং খোলেন।”

† ‘কামাগাতামার’ ১৯১৪ সালে এই উদ্দেশ্যে ইন্দু জোগান। —পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

রিকার হাজার হাজার ছাত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এইসব সংঘব মধ্যে ‘গদর’ দল এবং ‘হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন’ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এরা ভারতীয়দের মনে মারাত্মক-বকম ব্রিটিশ-বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন।

“আমাদের কমিটির যে-দুজন কর্মী* আজ আট সপ্তাহ হল আমেরিকা গিয়েছেন, সেখানে শুব উদ্‌দেব ভারতীয় কর্মীদের সংগ্রেবে এসেছেন তাঁরা, এবং অনেককেই বার্লিনে পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় পাঁচজন ভারতীয় এসে পড়েছেন, এবং শীঘ্রই টেলি-গ্রাফের মারফৎ আবে উজ্জ্বল-খানক নেতাকে ডেকে আনা হবে।...আমাদের পরিচালনা আছে যে, আমেরিকা মারফৎ অত্যন্ত পশ্চিম-জন এমনি নেতাকে ভারতে পাঠাতে হবে অসংখ্য কর্মী সমভিষায্যে। এর জন্য আমেরিকায় তাঁদের হাতে কমপক্ষে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জার্মান মার্ক দিতে হবে।

“তিন—যে-দুজন আমেরিকায় গিয়েছেন এখান থেকে, তাঁদের হাতে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকবে। তাঁদের মধ্যে একজন আমেরিকা থেকে অপব একজন ভারতীয়কে নিয়ে শাংহাই ও টোকিও হয়ে ভারতে ফিরবেন।†

“উক্ত দুটি কাজের প্রথমটি হলঃ শাংহাই-এ একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র গড়ে তোলা—যেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সঠিক সংবাদ নিয়ে গোপনে বিপ্লবীরা ভারতবর্ষে আনাগোনা করবেন। ভারতে বিপ্লবের কাজে অস্ত্রের গুরুত্ব যে সর্বোপরি, সে-কথা স্বম্বয় বাস্তব হবে। আমবা সেদিকে যথেষ্ট মন দিচ্ছি।

“অপব কাজটি হলঃ অনুরূপ একটি ঘাঁটি জাতীয় (ব্যটালিয়নে) গড়ে তোলা। আমাদের উপরোক্ত কর্মীটি শাংহাই হয়ে ব্যটালিয়া যাবেন ঠিক হয়েছে। ব্যটালিয়া ও ভারতের মধ্যে হামেশাই চিঠিব ব্যবসারীরা নৌকায় ও জাহাজে আনাগোনা করেন।†

*নারায়ণস্বামী মারাঠে এবং ধীবেন সরকার (কমিটির প্রধান সম্পাদক)। ধীবেনের বদলে ডঃ মুলের কমিটির প্রধান সম্পাদক হন।

† ধীবেন সরকার এবং মারাঠের ওপর এই কাজের ভার পড়ে। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা অবিলম্বে নির্দিষ্ট পথ অনুযায়ী অগ্রসর হন এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন টোকিও পৌঁছে।

† যতীন্দ্রনাথের হবু ভগ্নীপতি সুধাময় মুখার্জী (উত্তরপাড়া) চন্দ্র, চিনি ইত্যাদির ব্যবসার ছলে এই পথে ‘মাল’ (অস্কাই) আমদানী কববার কাজে নিযুক্ত হন কলকাতার বিপ্লবীদের তরফ থেকে।

* দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসে রক্ষিত জার্মান গভর্নমেন্টের সরকারী নথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম (মূল জার্মান ভাষা) অবলম্বনে এই চূষকটি রচনা কবছি। দ্রষ্টব্যঃ Microfilm of Records of the German Foreign Office : Roll No. 397.”

ব্যাপ্তিভার্য কয়েক সহস্র ভারতীয়ের বাস; অধিকাংশ প্রাথমিক ও ব্যবসায়ী তারা।

“চারি—ভারতের বিপ্লবীরা অধিকাংশই প্রাথমিক প্রয়োজন-বিধি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হলেও ভারতবর্ষে অস্ত্রের সংখ্যা এতই নগণ্য যে অধিকাংশ বিদেশ থেকে অস্ত্র সরবরাহ না করলেই নয়। আমদের যে বিপ্লবী সদস্য আমেরিকা হবে বর্তমানে টোকিও গিয়েছেন, তাঁর হাতে আমরা টোকিও-স্থ চৈনিক বিপ্লবী নেতাদের নামে চিঠিপত্র দিয়েছি* ডাঃ সান-ইয়াং সেন-এব প্রভাব সেখানে খুবই বেশি এবং টোকিও থেকে আমরা প্রায় বাট হাজার অস্ত্র কিনতে পারবো। এই মর্মে বার্লিনে একটি টেলিগ্রাম এসেছে।...তা ছাড়া আমেরিকা থেকে অস্ত্র প্রতি একশ কাহুজ সমেত কুড়ি হাজার অস্ত্র কেনার সম্ভাবনা দেখা গেছে। সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীরা ও জার্মান সরকারের লোকেরা আমেরিকা চার্লিশ হাজার অস্ত্রের জোগাড় করেছেন আলাদাভাবে। এ-বিষয়ে বিশদ বিবরণ শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

“এখন প্রশ্নঃ ভারতের কোথায় কোথায় কোন কোন নেতা এই অস্ত্র খালাস করে দেবেন? তা নির্ধারণ করার জন্যে আমাদের দুজন সদস্যকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছে। তারা বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। কথা পাকা করে নিলে তারা দূত পাঠাবেন ব্যাপ্তিভার্যে এবং শাহাই-এ; এই দুভেদ্য মৌখিকভাবে আমাদের ঘাঁটিতে এসে জানিয়ে দেবেন অস্ত্র নামারের স্থান ও পাত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত; সেইমতো ব্যবস্থা করা হবে।

“পাঁচ—মক্কায় বিপ্লবীদের প্রচার চালানো খুবই সোজা হবে কারণ প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ওখানে যান এবং ইংরেজদের তরফ থেকে কোনও পাহারার ব্যবস্থাই থাকে না। গত এই অগাস্ট (১৯১৪) আমরা দুজন

ভারতীয় মুসলমান সদস্যকে মক্কায় কাজের জন্যে পাঠাতে মনস্থ করি। এখনো তা স্থিরীকৃত হয় নি।

“ছয়—দক্ষিণ পাবস্য, বসারায় ও পাবস্য সাগরের উপকূলে পনোবো হাজার ভারতীয় সৈন্য (মুখ্যত মারাঠী, পাঞ্জাবী ও কণ্ণাটী) মোতায়েন রাখা হয়েছে—বিশুদ্ধ সুদেব সংবাদ। এই সৈন্যদের দলে টানা এবং বিপ্লবী কাজে উদ্বুদ্ধ করা খুবই সহজ হবে; সম্ভব হলে ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে পাবস্য থেকে এই সুবাদে ইংরেজদের উৎখাত করা যাবে। ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে পারস্য সাগর দিয়ে অবাধে আনাগোনার পথ এইভাবে সুগম করে নিতে পারলে ভারতে সৈন্য ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করা সহজ হবে যাবে। এইভাবে বেলুচিস্তান-এর ভেতর দিয়ে সৈন্য-সমেত আমাদের লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বিদ্রোহে সাহায্য করতে পারে।

“সাত—আফগানিস্থানে ইংরেজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বহু ভারতীয় আছেন। সেখান থেকে পাহাড় ও গিরিবন্ধ অতিক্রম করে হরদম ব্যবসায়ীরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা আনাগোনা করেন। উক্ত ভারতে। তাই আফ-গানিস্থানের ভারতীয়দের সাহায্যে নিরাস্ত্র-ভাবে সংবাদ, অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি, প্রচার-পত্র প্রভৃতি অনায়াসে পাঞ্জাবে পাঠানো যেতে পারে।...

“আট—গ্রেটব্রিটেনে, বিশেষত লন্ডনে, এখনো কয়েক সহস্র ভারতীয় আছেন যারা ইংলেন্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দুরবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে অসুখী ওয়াকিফহাল নন। তাঁদের যদি দলে টানা রাখা এবং এই সময়ে কাজে ভর দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, ভারতবর্ষের বিপ্লবী নেতারা তা হলে বহুদূর বলায়ান হয়ে উঠবেন। একজন উচ্চতর ডাবতীয় বিপ্লবী এখনও লন্ডনে রয়ে গেছেন; যুব-পথে তার কাছে টেলিগ্রাম করে তাঁকে বার্লিনে আনতে হবে। তিনিই তখন লন্ডনে ফিবে গিয়ে একাজে মন দিতে পারবেন।

“নয়—ফ্রান্সের ব্রুসেট যে-সব ভারতীয় সৈন্যদল লড়াই করছে তাদের মধ্যেও ইংরেজ-বিশেষ প্রচাব করা সহজ হবে। আমাদের কয়েকজন সদস্য এই কাজের জন্যে শীঘ্রই বওনা হবেন এবং নীরবে তারা এই সৈন্যদের কিছু কিছু করে জার্মান সীমানায় পাঠিয়ে দেবেন।

“কয়েক সপ্তাহ হল আমরা জেনারেল-স্টাফ (জার্মান সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগ) থেকে কোনও চিঠি পাই নি। কয়েকটা কাজে হাত দেবার জন্যে তাঁদের সহযোগিতার পথ চেয়ে আমরা আকুল হয়ে আছি।”

*জার্মান সরকারের নথিপত্র থেকে মূল জার্মান ভাষায় প্রাপ্ত বার্লিন কমিটির সংক্ষিপ্ত

জার্মান সরকার যে নিম্নক মুখের কথা দিয়ে ভারতবাসীদের প্রবোধ দেন নি, ভারতীয় বিপ্লবের জন্যে সত্যিই যে তারা আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন তার দৃষ্টান্ত নমুনা এখনো দেওয়া দরকার। তাব আগে স্বল্প রাখতে হবে যে লিখিতভাবে জার্মান সরকারের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা যে চুক্তি করেছিলেন তাতে স্পষ্টই উল্লেখ ছিলঃ জার্মানীর কাছে থেকে যে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তা ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে বিপ্লবীরা “জাতীয় স্বাধীন” হিসেবে ফেরত দেবেন; কিন্তু—সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যগত স্বার্থ ছাড়া ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার জার্মানীর অন্য-কোনও রকম স্বার্থ থাকবে না বা ভারতবর্ষ জার্মানীর কাছে কোনও রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করবে না।—এই মর্মেই অকপটভাবে উচ্চপদস্থ জার্মান অফিসার, মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট জার্মান ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে গোপনে যে-সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে এ-দিক থেকে কোনও রকম কপট মনোভাব সেদিন জার্মান সরকার পোষণ করেন নি।

১৯১৪ সালের এই ডিসেম্বর আমেরিকা থেকে জার্মান মিলিটারি আতশে ফন্-পোপেন-এর পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার ও লুই-সিয়াল টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন বার্লিনেঃ “...ভারতবর্ষের জন্যে এগারো হাজার রাই-ফেল, চার্লিশ লক্ষ কাহুজ, আড়াই শ’ মাউজার (mauser) পিস্তল এবং গুলী-সমেত পাঁচ শ’ বিভাজ্যাব কিনে ফেলোছি।... দক্ষিণআমেরিকা থেকে টার্কির জন্যে রাইফেল কেনবার চেষ্টার আছি।”

১৯১৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বার্লিন থেকে জার্মান সরকার টেলিগ্রাম করে ওয়াশিংটনে (পোপেন-এর কাছে) খবর দিয়েছেনঃ “ভারতবর্ষের জন্যে কেনা অস্ত্রশস্ত্র পরপাঠ জাহাজে করে চীন অভিমুখে পাঠিয়ে দিন। এবং তদনুযায়ী শাহাই-এর কনসাল জেনা-বেল যেন মারাত্মক খবর দেন।...”

১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর ইম্পি-রিয়াল জার্মান দূত ভিনো থেকে জানাচ্ছেন যে উক্ত মাসের পাঁচ তারিখে, কলকাতা থেকে আগত জার্মান কনসাল জেনাবেল কাউন্ট টুন শুল্শেব-প্রাকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিশদ রিপোর্ট দিয়ে-ছেন, তা পাঠানো হল।

উক্ত সুদীর্ঘ রিপোর্টে কাউন্ট টুন এক জায়গায় রানবিহারী বোসের হাডিজ হত্যার

* বিপ্লবীদের তরফ থেকে প্রথম সত্যেন সেন এবং তাবপব ভগবান সিং-এর নাম পাওয়া যায়, যারা দুজন টোকিওতে গিয়ে সান-ইয়াং সেন ও অন্যান্য চৈনিক বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যথেষ্ট সাড়া পান।

† বঙ্গা বাহুল্য, অস্ত্র বলতে এখানে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলা হয়েছে।

‡ ডাঃ জুপেন দস্ত লিখেছেন যে, বার্লিন থেকেই নির্ধারণ করা হয়েছিল উড্ডিয়ার উপ-কূলে বালেশ্বরে অস্ত্র-বোঝাই জার্মান জাহাজ এসে থামবে। সেই ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়েই বিদেশ থেকে সত্যেন সেন (নভেম্বর ১৯১৪) এবং জিতেন লাহিড়ী (মার্চ ১৯১৫) দেশে ফিরে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বালেশ্বরে যান। দূতরূপে যতীন্দ্রনাথের শিষ্য নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) ও ফণী চক্রবর্তী ব্যাপ্তিভার্য যান।

মাস্তাহিক বঙ্গমতী

চেষ্টার পক্ষেই দেয়াদুন গিরে ইংরেজের রাজত্ব সম্বন্ধে আন্দোলন-ভরা বক্তৃতাটির উল্লেখ করে বলছেন: "...এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাবতবাসীরা তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আজ গোপন বেঁচে মূর্খে কেমন রাজতন্ত্র ঘোষণা করে চলেছেন প্রকাশ্যে।..

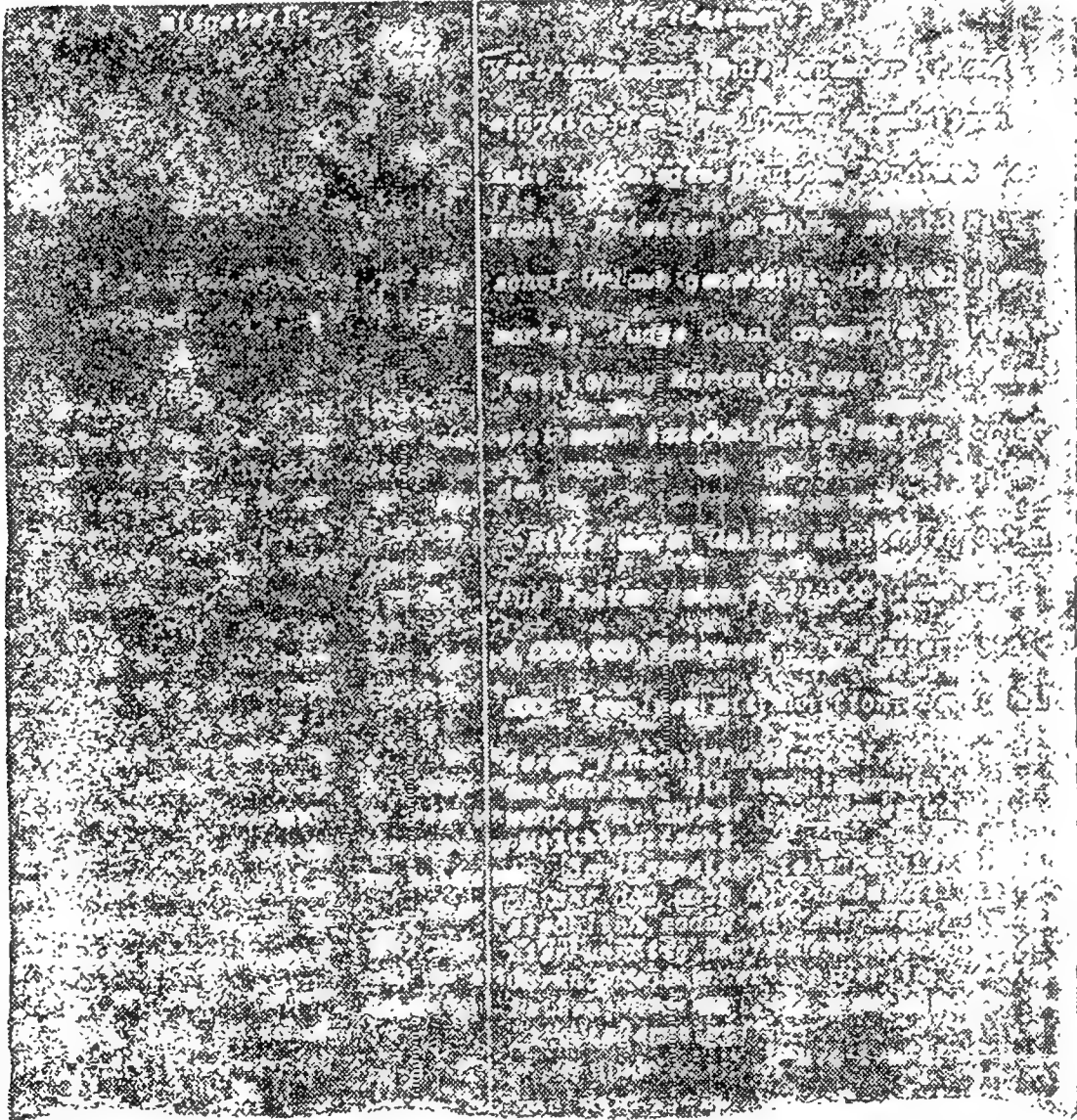
"এই সমস্ত ঘটনাগুলি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভাবতীয় সৈন্যদলের আন্দোলনের গণচ্যুতও আন্দোলন কোন আন্তর্বিহীনতা নেই, ইংরেজরা তাদের কাগজে বতাই ফলাও করে ছাপুক না কেন ভাবতবাসীদের রাজতন্ত্রের কথা। বাঙালী চরমপন্থী নেতারা যেভাবে শিশুদের মধ্যে—বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর অসন্তোষ প্রচার করে আসছেন, তাই সাহায্যেই সৈন্য-বাহিনীর বর্তমান মনোভাব ও ব্যবহারের কারণ আঁচ করা যায়।

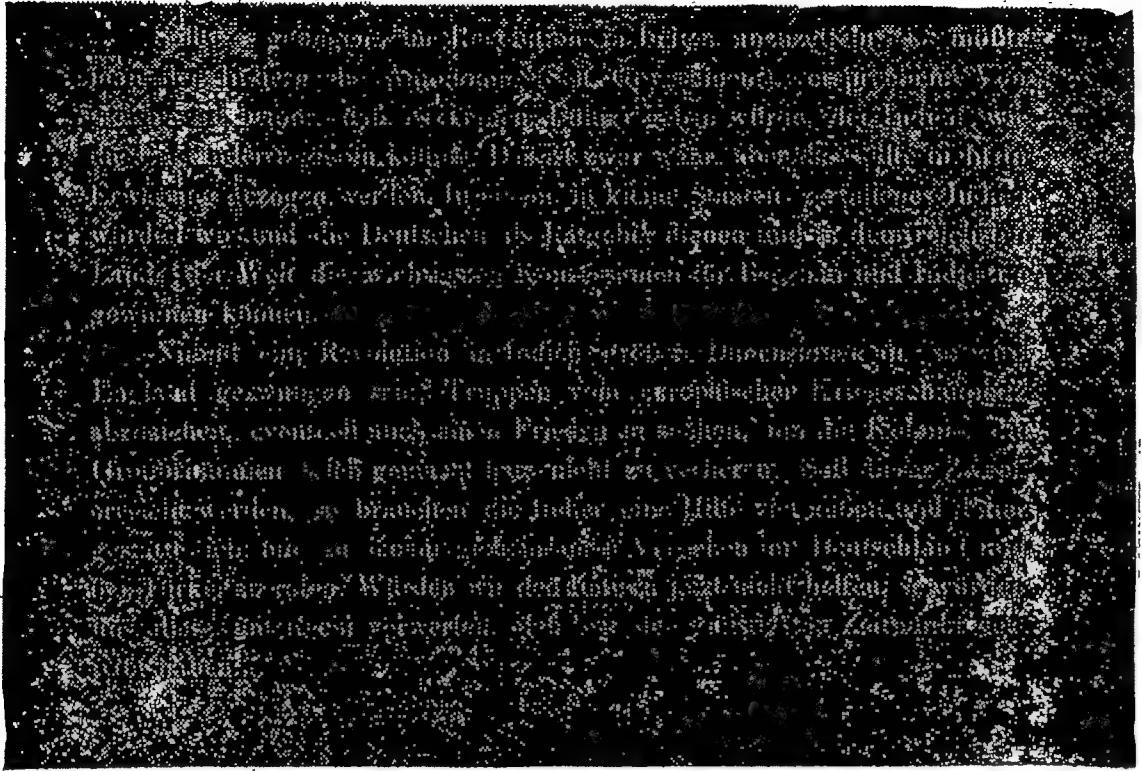
"ভারত সরকার এ-বিষয়ে বোল আনা সচেতন বলেই মুক্তিকামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত উত্তর ভারতের গৃহ সশস্ত্র-গুলির বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অস্ত্র প্রয়োগ করতে কসর করে নি। এই বছরের শ্রবণ থেকে ধলেশ্বরী কমপক্ষে পাঁচটা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়েছে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে: তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'।...হিন্দু-মুসলমানের মিলন

সাধনের জন্যে বিপ্লবীরা ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োচনা দিচ্ছেন।

"দিল্লী পুলিশের কপালে এমন শিবে দৈবাৎ দু-একটা ছিঁড়লেও দুর্ভাগ্য বগড়ে হবে কলকাতা পুলিশের; নাহলেই হলে গোছে তাবা বাংলার কর্মরত বিপ্লবীদের সম্মান করে হবে। হালে কলকাতার একটা বোম্বা হাব-খানা তারা আবিষ্কার করে থাকলেও নেতাদের তিসীমানায় তাবা পৌঁছতে পারে নি। এদর সর্বভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র আজ বাংলাদেশই—সেখান থেকে দেশের সর্বত্র নিরাস্তিত হচ্ছে গৃহ সশস্ত্রিত বাহিনী।



আমেরিকা থেকে ফল পাগেন-এর ভরফ থেকে ব্যানস্টার্ক ও লুসিসাস-প্রেরিত টেলিগ্রামের প্রতিলিপি
[প্রীতপদকুমার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের নোজেনো প্রাপ্ত]



কলকাতা থেকে আগত জার্মান কনসাল জেনারেল কাউন্ট টুন-প্রেরিত রিপোর্টের শেখাংশ
[ব্রীজেন্দ্রকুমার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

“এখন প্রশ্ন : ইওরোপের মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে গণবিপ্লব আনা এখন সম্ভব কিনা? এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি বিপ্লবীদের শক্তির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বর্তমান সামর্থ্যের তুলনা করব।...

“ভারতবর্ষে আজ কম করেও আড়াই লক্ষ সক্রিয় গুপ্ত-সমিতি আছে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার কথা প্রচার করছে; এদের সকলেরই হাতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র যে আছে তার প্রমাণ—সংগের এই সংবাদপত্রের কাটিং।* কলকাতার চাপা গুলুবে যে দমদমের বিখ্যাত অ্যামুনিশন ফ্যাক্টর থেকে প্রচুর মোলা-বারুদ আঁকাল উধাও হয়ে যাচ্ছে, বিশেষত যুদ্ধ বাধবার পর থেকে।... দিল্লী স্বতন্ত্র রামলাল রাজসাক্ষী বলে যে দশ হাজার তরুণ বিপ্লবীকে সামরিক শিক্ষা দেবার এক পরিকল্পনা রাসবিহারীর মাধ্যম আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রপাতিও তাঁদের হাতে রয়েছে।

“এ-কথা সুবিবর্তিত যে গত দু বছরে

কলকাতা থেকে অসংখ্য তরুণ উধাও হয়ে গিয়েছে; তাদের বাড়ির লোক বা পুলিশ থেকে তাদের কোনও হাঙ্গামা পায় নি। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলকাতার সর্বত্র, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে দেয়ালে দেয়ালে এ-জাতীয় বহু প্রচার-পত্র কুলুতে দেখা গিয়েছে : ‘ওঠ, ভাই, ইংরেজের শেকল ভেঙে ফেল। বিশ হাজার সশস্ত্র তরুণ যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে!’—এমন বহু রকমেই এরা প্রচার করে চলেছেন আসন্ন অভ্যুত্থানের কথা।...

“...কোমা-গাভা-মারু ব্যাপারে যেমন, তেমনি প্রচণ্ড উল্লাস ভারতবাসীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল ভারত সাগরে পরাক্রমশালী ‘এমডেন’ গিয়ে পৌঁছলে : তাদের খুবই আশা ছিল আশ্চর্য্যময় থেকে বিপ্লবীদের মন্ত্রণ করে এমডেন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনবে।...

“ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলন যদি সফল করে তুলতে চান জার্মানীর তরফ থেকে, তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে।...

“এই বিপ্লবে সঠিক ইশ্বন যদি জোগানো যায়, তবে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।...এর জন্যে বাইরে থেকে ভাবতবর্ষকে সাহায্য করা নিতান্তই প্রয়োজন, এবং সেই-দ্ব্যন্যে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করছি

জার্মানী ও টার্কি সমবেতভাবে এ-বিষয়ে অগ্রসর হলেই ভাল। এই মাহেশ্বকণে আমরা ভারতবর্ষকে সাহায্য যদি না করতে পারি তবে ভবিষ্যতে ভারতবাসীদের কাছে আমরা উপহাসের পাণ্ড থেকে যাব—সময়ের কাজ সম্বল করতে জানি না বলে।”

১৯১৫ সালে ৯ই জানুয়ারি ব্যারন ওপেনহাইম বার্লিন থেকে লিখছেন : “পারস্যদেশী পাসপোর্ট নিয়ে অ্যামেরিকা থেকে প্রফেসর বরকডুলা সবে এসে পৌঁছেছেন। ভারতবর্ষে অস্ত্র পাঠানো ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি বললেন। নিউ ইয়র্কে তিনি বার্লিন্যার লোকালান্ডসাইগ্যার পত্রিকার প্রতিনিধি গেরগ ফন্ স্কালের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন; আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা রুম্মানের মাধ্যমে তাঁদের আলাপ। ফন্ স্কাল-এর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গিয়েছে যে গ্রিশ হাজার রাইফেল, পাঁচ হাজার অটোম্যাটিক পিস্তল এবং তদনুযায়ী গুলী সংগৃহীত হয়ে গেছে। ভারতের প্রতিবেশী কোনও বন্দবে এগুলি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে; সেখান থেকে সেগুলি ভারতবর্ষে পাচার করা হবে।

* কলকাতার কাগজে উক্ত কাটিং-এ রডা কোম্পানীর অস্ত্র গুলুের একটি বিবরণ আছে। সেইসঙ্গে যাদের প্রেক্ষার কথা হয়, তাঁদের নামও আছে।—পৃথিবীরাজ।



আচার্য শ্রীশান্তীর কাছ থেকে দেশিকোত্তম উপাধি নিচ্ছেন (বা বিক থেকে) শ্রীভাভ নৃনোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র মিত্র ও শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

শ্রীশ্রী নেতাজী স্মৃতি

তেইশে জানুয়ারী নয়; তেইশে ডিসেম্বর চৈনিশ শ' পয়ষটি সাল, স্মরণীয় দিবস তালিকার মধ্যে একটি নতুন সংযোজন হয়ে রইল। সেই বহু-বিতর্কিত নেতাজী স্মৃতিচারণ বঙ্গের প্রতি-মূর্তি অবশেষে স্থাপিত হল মরদমে শহীদ বেনারী কাছে। না আঁচন পর্বন্ত বহু মোকেরই বিশ্বাস ছিল না যে আদৌ নেতাজীর প্রতিমূর্তি সংস্থাপন করা হবে কি-না। গড়িমসি, স্থান নির্বাচন করতে করতে বাংলা দেশ তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি অবশেষে পেলে।

নেতাজীর পূর্ণ আবির্ভাব দিবস, তেইশে জানুয়ারী এ মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হলে এই বিশেষ দিনটি, যে দিন একটি জাতীয় উৎসব প্রতিজ্ঞা ও স্বাধীনচেতনার রঙে রাঙা দিন, সেই দিনটি আরও বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারত। তবে মাসাধিককাল পুবেই যে অর্ধ বিলম্বিত ব্যাপারটি অবশেষে স্বয়ং ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমাপ্ত হল, সেজন্য আমরা আপাতত একটি অবশ্য-কর্তব্য পালন করতে পেরেছি বলে আনন্দ প্রকাশ করতে পারি। ২০শে জানুয়ারীর সপ্তে ২০শে ডিসেম্বরও আজ থেকে স্মরণীয় দিবস

এইদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মতকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নেতাজীর মত একনিষ্ঠ স্বদেশ চিন্তা নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীগণের মনেও ছিল না। নেতাজীই ছিলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা-বৃন্দের মধ্যে মহানতম বিপ্লবী নেতা।

শাস্বত সত্যকেই উচ্চারণ করা হয়েছে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।

হয়ত এই ঐতিহাসিক যোগাযোগের জন্যই নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি এতাবৎকাল

বিলম্বিত হয়ে এসেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম বীরযোদ্ধা মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখছি শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যেই। পরাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সেনা স্বাধীন জনতার কর্ণধার নেতাজী স্মৃতিচারণের মূর্তির আবরণ উন্মোচন তিনিই করলেন। এই মহৎ যোগাযোগের অপেক্ষাও তাৎপর্যপূর্ণ।

জয়ন্ত নেতাজী, নেতাজী জিন্দাবাদ। সহস্র কণ্ঠের এই উল্লসিত পূলকিত ধ্বনিসমষ্টি নব চেতনার উদ্দীপ্ত জনগণকে উদ্বেলিত করে তোলে। আর সেই মুহূর্তে বর্তমান জওয়ান ভারতের প্রেরণা শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর গম্ভীর উদ্যত আহ্বান শ্রুতে পান যুব ভারতবর্ষঃ নেতাজীর জীবন থেকে তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে দেশপ্রেম ও দেশসেবার শপথ।

শান্তিনিকেতন

পবিত্র উপাসনা সঙ্গীত প্রত্যয়ের অক্ষুট আলোকে সবুজ ঘাসের শিখে স্বচ্ছ দিশির-বিন্দুটিতে স্পন্দন তুলেছিল শান্তির অমৃতময় পরিবেশ শান্তিনিকেতনে।

২০শে ডিসেম্বর পৌষ উৎসবের উদ্দেশ্যে করলেন উপাচার্য শ্রীসুধীরজন দাশ। তাঁর কণ্ঠে কবীন্দ্রের পৌষ উৎসবের ডাক শুনলেন সমবেত আশ্রমিকগণ ও বহু আগ্রহী দর্শক।

ছাতিমতলার ১৯১৪ সালে কবির ভাবগতি ধীরোদাকণ্ঠে পঠিত হয় প্রণত প্রস্থার পরিবেশে।

প্রত্যয়ের অরূপভাষ্য কবির স্বপ্ন উচ্চারিত হচ্ছিলঃ “বিরাত বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরোর অমৃত পানে উন্মত্ত হয়েছে, সেই মানুষের পরিচয় আজ কি আমরা পাব না?...যে অজ্ঞান মোহে মানব মনকে বঁধা করে দরে পরিহার

করে, সেই মোহের মন্দির, সেই মূর্তির মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না? আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের।”

শ্রোতৃমণ্ডলী, আর শান্তিনিকেতন, গাছ-গাছালি আর আকাশ বাতাস, পশুপাখালি আর রাঙামাটি কবির সেই আহ্বান কান পেতে উৎকর্ণ আগ্রহে শ্রবণে আসছে শ্রবণে, বেরন তারা শ্রুতে আসছে কবির গানে কথার কবিতায়।

আর শ্রবণ হিংসার উন্মত্ত পৃথনী, বিদ্রূপে ঠোট উল্টে ধরে।

কিন্তু কবি বলেছেন, “আমরা দুঃস্বপ্নে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব—তাতে আমরা ভয় করব না।” স্মৃত্যু মা ভৈঃ।

শ্রীসুধীরজন দাশ তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলেন, “এই উৎসব ধনলাভ, খ্যাতিলাভ ও সম্মানলাভের উৎসব নয়। তাগের রত গ্রহণের উৎসব।”

শ্রীদাশের মুখে এতাদৃশ ভাবগই অনিবার্য। বিশ্বভারতীর সেবার শ্রীদাশ নিজেই তাঁর বক্তব্যকে রূপ দান করেছেন বখার্বভাবে। আমরা ইমানীং কাঁকা কথার কার-বারি। সৌভাগ্যের বিঘর, শ্রীদাশের ভাষণ আপন আচরণ থেকে লক্ষ বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি। তাই শ্রীদাশই বলতে পারেন, “দেশ-বাসীর কাছে গুরুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান এই বিশ্বভারতী। আর আমাদের মহা সৌভাগ্য আমরা সেই মহান দানের উত্তরাধিকারী। শ্রীদাশ উপাচার্য হিসেবে তাঁর গুরুদায়িত্ব যেই মহান উত্তরাধিকারের পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই পালন করেছেন।

উপাচার্য পদ থেকে শ্রীদাশ অবসর গ্রহণ করছেন ৩১শে ডিসেম্বর। আর-আগামী পয়লা জানুয়ারী থেকে এই সম্মানজনক

ও দায়িত্বপূর্ণ পদের উত্তরাধিকার লাভ করছেন ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য।

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব এবারও দর্শন পেল আচার্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীমতী শাস্ত্রীর, বহিরাগত উল্লেখযোগ্য অপরজন হলেন কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ বরণ সিং।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে 'দেশ-কোত্তম' উপাধিতে বরণ করা হয়েছে এবার গোসাঁইজী (শ্রীনিধানন্দবিনোদ গোস্বামী) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্রকে।

বাল কর্মীর মৃত্যু?

বাইশে ডিসেম্বর জর্নৈক স্টেটবাস চালক শ্রীমাখনলাল দত্তের (৪২) জীবনাবসান ঘটে আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে আনীত হওয়ার কালেই। শ্রীদত্তের এই আকস্মিক মৃত্যুতনা কতবারত অবস্থায় ঘটে নি। স্টেটবাস শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিলে গণেশ এ্যাভিনিউর ওপর দিয়ে যাবার সময় শ্রীদত্ত গুরুত্বরূপে আহত হন। পুলিশী হস্তত্যা, শ্রীদত্তকে একটি প্রাইভেট গাড়ি ধাক্কা মেরে আহত করে। কর্মচারীদের বিবৃতি, কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির লোকের দ্বারা অকস্মাৎ মিছিলটি আক্রান্ত হওয়ার ফলে এই মর্মান্তিক মৃত্যুতনা ঘটে।

এখনও পর্যন্ত (২৪-১২-৬৫) এই দুই সপ্তাহের কোনোরকম সত্যমিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু গুন্ডামি বা মোটর এ্যাভিডেট হাই হোক, এ মৃত্যুতনা একটি জীবনকে দাবি করেছে। এবং যেহেতু শ্রীদত্ত তখন বিক্ষোভ মিছিলে, তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর এই অমূল্য

জীবনের জন্য কোনো ক্ষতিগ্রহণও হয়ত পাবেন না। একটি জীবনের সঙ্গে একটি পরিবারের ঘরের প্রদীপ নিভে গেল।

এই ঘটনায় উত্তেজিত স্টেটবাস কর্মীগণ সেদিনের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখেন। কলিকাতা, হাওড়া ও শহরতলীর যাত্রীরা তারই ফলে বিনা নোটিশে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে যান। একটি জীবনের অবসান যথেষ্ট মর্মবিদারক সন্দেহ নেই; তথাপি অকস্মাৎ বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার যে অগণিত জনসাধারণ বিনা অপরাধে প্রভূত বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন, সেই ঘটনাও কোনোক্রমেই প্রশংসনীয় নয়।

কর্মীগণ অপরাধীর শাস্ত দাবি করেছেন, শাস্তি দাবি করবেন জনসাধারণও কিন্তু একের দুষ্কার্যের শাস্তি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে তো কোনো যুক্তি নেই। শ্রমিক-মালিকে বিরোধ হলে, যাত্রী-কন্ডাক্টরে বিরোধ বাধলে তার ফলাফল সমগ্র জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার এ হেন নীতি কোনোও যুক্তিবাদী মনেই কোনোরূপে আবেদন সৃষ্টি করে না। দুষ্কৃতকারীর শাস্তি দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও সুস্পষ্টভাবেই জানাতে চাই যে, পরিবহনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে ট্রান্সপোর্ট কর্মীগণ যেন তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সমান সচেতন থাকেন ও জনসাধারণকে অথবা দুর্ভোগের শিকার করে কোনো বিক্ষোভকে প্রকাশ না করেন।

এই সঙ্গে বিশেষ উদ্বেগের প্রশ্নটিও বিবেচ্য। যদি গুন্ডামির ফলশ্রুতিই মৃত্যুর কারণ হয় এবং এই গুন্ডামির সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য হয় তবে সেক্ষেত্রে সমস্ত মেহনতী মানুষের

মনেই দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনা সঞ্চার স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য সে বিক্ষোভের প্রকাশ কর্মীগণ তাদের পূর্ব নির্দিষ্ট সভায়ই প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন, সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অপরাপর পথও উন্মুক্ত (এখনো পর্যন্ত)।

তদ্রূপে অভিযোগ সত্য হলে প্রতিবাদ সর্বস্তরে সোচ্চার হয়ে ওঠা উচিত।

যে বিক্ষোভ মিছিলটিতে এই করুণ ঘটনা ঘটেছিল সে মিছিলটি ছিল শ্রমিক কর্মচারীদের রুটির দাবি প্রকাশের শোভাযাত্রা। তাদের দাবি, দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, বোনাস, এবং দুমূল্য ভাতা বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য এই দাবিগুলোর প্রত্যেকটিই যুক্তিসংগত। যেভাবে বাজার মূল্য নিত্যদিন গগনচুম্বী হয়ে উঠছে এবং বিভিন্ন কর্মসংস্থায় মাহিনা ভাতা ও বোনাসের কল্যাণে যেভাবে সাধারণের আয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক অসমতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তদ্বারা সংস্থা বিশেষের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ও আধা-সরকারী সংস্থার নিযুক্ত কর্মীগণ দুঃসহ আর্থিক অবস্থার মধ্যে কালান্তিপাতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার যদি সচেতনভাবে বিভিন্ন সংস্থায় আয়ের বৈষম্য যথাসাধ্য কমিয়ে আনতে চেষ্টা না করেন তবে কর্মিসমাজে বিক্ষোভ চক্রাকারে পাক খাবেই। একই শ্রম একই বিদ্যাবৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতার বিনিময়ে এ রাজ্যে যে পর্বত-প্রমাণ প্রকৃত আয়গত বৈষম্য প্রাপ্য তা কেবলমাত্র ঔচিত্যের প্রশ্নই উত্থাপন করে না, অন্যায়ভাবে সমাজে বহুতর শ্রেণী সৃষ্টি করে জনমনে বিক্ষোভকে জাগিয়ে তোলে।

এতৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে। স্টেট ট্রান্সপোর্ট



বোলপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে শ্রীমধীরেন্দ্র নাথের বিদায় সন্মেলনা



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের কত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহোদয় প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মুভসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজীকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অন্যক ভাঃ বোম্বেন চেন্স বোম্ব, এম-এ,
আনুর্কেনশাজী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেল্লা ভাঃ নরেন চেন্স বোম্ব,
এম-বি, বি-এস, আনুর্কেনশাজী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

কর্মীদের মাহিনা ছাড়াও অর্ধ বর্ষ প্রমের (ইম্যানিক) দাবীও বিশেষ বিবেচনায় অঙ্গীকার হবে।

নদীয়া :

কলকাতা বাঁচাও

শহর কলকাতা কেবলমাত্র বাণিজ্যপ্রধান একটি আন্তর্জাতিক নরনারীর বসবাসের স্থান বলেই নয়, তামাম পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বলেই নয় এবং রাজ্যপাল থেকে মন্ত্রী উপমন্ত্রীর সচিব সচিবেরদের জন্যই নয়, কলকাতায় বহু বৃহৎ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শীশাল ব্যবসায়ের সদর দপ্তর বলেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে শোষণ করে কলকাতায় জন্য বিবিধ ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করছেন; কারণ কলকাতা বাঁচলে ব্যক্তি মফস্বল বাংলায় ছেঁকে করে গেলেও একেবারে ভাষা চাটবেই, পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ স্বার্থ বাঁচবে।

এজন্য সরকার কলকাতার জন এবং শিলিগুড়ি আসানসোল দুর্গাপুরের মত বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির জন্য শূণ্য রেশনিং-এর সুবন্দোবস্ত করেছেন। সরকারকে ধন্যবাদ।

মিষ্টিয়া নিয়ন্ত্রণের পর কলকাতায় দুধের যোগান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ুক না বাড়ুক, ঠিকান করা দুধের বদলে খাঁটি গো-দুধের যোগান হরিণঘাটা মিষ্টি ডিপো মারফৎ চালুও করেছে। সরকারী ব্যবস্থায় পুঙ্খলিহিত হওয়ার কারণ আছে।

বাংলাদেশ কলকাতার বাঙালী ছাড়াও কয়েক লক্ষ অবাঙালীর মাতে অসুবিধা না হতে সেজন্য প্রভূত ব্যবস্থা করে রেখেছে।

কিন্তু শহর কলকাতায় চড়ুই-কুঁহুরীতে রাঁধা স্থান করে নিতে পারেন নি তাদের কলকাতার দুধ চেয়েই সরকারী আদেশে বেশ মতো কলকাতার কুঁহুরী-সামান্য করতে হচ্ছে।

মফস্বলবাসীর শিশুসন্তানের দুধ থেকে দুধের কিছুকিটো কলকাতা ও অন্যান্য শিশু-সন্তানের স্বার্থে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সংপ্রতি কৃষ্ণনগরে দুধের অনটন সম্পর্কে নদীয়া মকুর যে সংবাদটি প্রকাশ করেছেন সেটি পাঠ করলে কলকাতার সুবিধাবাহিনী জনসাধারণ পর্যন্ত দুধের বাট দুধে ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। নদীয়া মকুরের নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদটি নিম্নরূপ :

“সরকারী আদেশে দুধ বিক্রয় বন্ধ হয়েছে। কলকাতার শিশু দুগ্ধী প্রভৃতির দুধে দুধ দেবার জন্য কলকাতার বাহিরে অন্যান্য জেলায় যে-সব প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে দুধ নির্ধারিত মূল্যে নিয়মিত বিক্রয় করছেন তা সরকারী আদেশে বন্ধ হয়ে গেছে। নদীয়া জেলার চিত্রশালী ডেমারী লিঃ কৃষ্ণনগর শহরে ও আশেপাশে দীর্ঘদিন দুধ দিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকারী আদেশে হঠাৎ তারা দুধ দেওয়া

বন্ধ করে এক বিশেষ বিজ্ঞাপিত প্রত্যেক গ্রাহকের কাছে পাঠিয়েছেন। আর কলকাতার ও আশেপাশের বহুলোকের বাড়ির শিশু দুগ্ধীরা নিয়মিত দুধ বা দীর্ঘদিন ধরে পানিচলি আজ তা বন্ধ হয়েছে। সরকারী আদেশে একজনের দুধে দুধ দেবার জন্য আর একজনের দুধ বন্ধ হয়েছে।”

৪১২১৬৫

পুলিশগুদার কবলে

নদীয়াস্থ কুপার্স ক্যাম্পে বাইজেন পুলিশের তত্ত্বাবধানে একটি পুলিশ ফাঁড়ির গঠন করা হয়েছিল মহৎ উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য, স্থানীয় জনসাধারণের ধনসম্পত্তি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব বাঁদীর ওপরে চাপান হয়েছিল, তারা সে দায়িত্ব একের জন্য পালন না করে অপরের জন্য করছেন। রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এমনটা ক্ষেত্র বিশেষে হয়েই আসছে। আর সেজন্যই পুলিশের সূচনা না থাক বেশ কিছু নাম ডাক আছে।

পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের সাধারণ লোকে ভয়ে জুড়। ওদিকে মাগী চোর-জুয়াড়ী-মাতাল-গুডা এবং তাদের মাতাম্বর বা পরিপোষক বেদাগী ভৈরবলোকর পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণে বহাল তবিয়তে বদমাইসী চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহত ভাবেই।

এ সম্পর্কে একটি সংবাদে স্থানীয় “শ্রমিক ও সমাজ” পত্রিকাটি লিখেছেন :

“সমাজ-বিরোধীরা অপরাধ করিয়া কোন শাস্তি ভোগে পায়নি না, উপরন্তু নিষ্পত্তি ও অভিযোগ দায়ের করিতে গেলে পুলিশের নিকট লালিত হয়। ফলে, জনসাধারণ এক অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হইতেছে। কয়েকজন পুলিশ সব সময় শ্রীসুধাংশু কুন্ডুর চায়ের দোকানে বাসিয়া সব সময় সমাজ-বিরোধীদের সহিত আড্ডা দেয় ও সলাপালাম করি। কিছুদিন পূর্বে বাজারের কয়েকটি দোকানে চুরি হয়। পুলিশ রহস্যজনকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।”

৪১২১৬৫

এমন ঘৃণ্য-দোস্ত পুলিশ ও গুডা-পোষক চাখানা পাইক বরকন্দাধী যুগে অব্যাহত প্রচলিত ছিল বলে জানা আছে। ইদানীং এমন সব ঘটনা ‘সংবাদ’ হয়ে ওঠে। তবে ঘৃণ্য-বংশ সেসব সংবাদ ফুঃ ফুঃ করে উড়িয়ে দিতেই অভ্যস্ত।

কিন্তু সেটা সি ভালো দেখায় না ভালো শোনায়। ‘শ্রমিক ও সমাজ’ পত্রিকা কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন। আমরাও সে কর্তব্য পালন করছি। কিন্তু ‘শ্রমিক ও সমাজ’ বাঁদীর মতপন্থ তারা কি ইচ্ছে করলে স্থানীয়ভাবে বিধিবদ্ধ উপায়ে নিজেরাই অগ্রণী হয়ে এই ব্যাধিগ্রস্ত পুলিশ পোস্টের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের

জন্য উপযুক্ত কতৃপক্ষের কাছে সরাসরি দাবী উত্থাপন করতে পারতেন না? কাগজী সংবাদে কতদূর কতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকি তারা বর্তমান লেখকের থেকে ভালো করেই না-জানেন?

সংবাদ ছাপার সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে আরও কর্তব্য তাঁরা পালন করলে এই ছোট ছোট পাইকী নট্যমির আশ্রয় সমাপ্ত আশা করা যায়।

বীরভূম :

ছাত্রবন্ধনের কাছে লাভপুর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কলেজ কতৃপক্ষ কতৃক বিশেষভাবে উৎপীড়িত মনে করেন এবং নিজদের সন্তোজনক অবস্থায় কথা ব্যক্ত করে স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক “সেবা” পত্রিকার মাধ্যমে পত্রযোগে নিম্নলিখিত আবেদন রেখেছেন। তাঁদের আবেদন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় পত্রটি “সেবা” পত্রিকা থেকে বহু-বধ উদ্ধৃত হল, বাদিও এবিষয়ে কোনোও মতামতের দায়িত্ব বঙ্গদর্শন গ্রহণ করছে না।

“লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কলেজ কতৃপক্ষ কতৃক দারুণভাবে উৎপীড়িত, নিষ্পত্তি, লালিত ও বহিস্কৃত। কতৃপক্ষ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিজের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দারুণভাবে অত্যাচার আরম্ভ করেন। কতৃপক্ষ লিখিত ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ কারণবশত প্রিন্টেট পরীক্ষায় বসিতে না পারায় জন্য কতৃপক্ষ ক্লাস ক্লাসে গিয়া ছাত্রছাত্রীগণকে দারুণভাবে শাসন ও পুনরায় পরীক্ষা দিতে আদেশ দেন। ইহাতে ছাত্রছাত্রীগণ সম্মত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের নামগুলি দিয়ার ব্যবস্থা করেন ও কলেজ হইতে তাড়িয়া দিয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিশেষ কতৃপক্ষ লিখিত ছাত্রী পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের নাম রাখা হয় ন। এই সকল কারণে ছাত্রছাত্রীগণ এক খোলা প্রতিবাদ জানায়ে কতৃপক্ষ জোর করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করিয়া দেন ও কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদিগকে সময় না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে জোর-পূর্বক হোস্টেল হইতে বাহিন করিয়া দেন। হোস্টেলের ছেলেরা গৃহস্থেই হইয়া গাছতলায় কাল কাটাইতেছে। ছাত্রদিগকে এইভাবে উৎপীড়নের ফলে সমগ্র ছাত্র-সমাজকে অবমাননা করা হয়। বীরভূম জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি চৌধুরী আব্দুর রহিম ও শ্রীকানাইলাল সাহা গত ১১/১২/৬৫ তারিখে লাভপুর কলেজে যান। তাঁরা এক প্রকাশ্য সভায় ছাত্রদের মনোবল দোঁখিয়া ভরসী প্রশংসা করেন এবং ছাত্রদের দাবিগুলি সম্মানজনক ভিত্তিতে বিনাসর্তে অবিলম্বে মানিয়া লইবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করেন। আমরা সমগ্র ছাত্র-সমাজের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রী

প্রতিনিধিরা আমাদের ডাকে সাড়া দেন ও ইহার বিহিত ব্যবস্থার জন্য অগ্রসর হউন।”

১২/১২/৬৬

জলপাইগুড়ি:

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ প্রস্তুতিতে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার যুগপৎ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে স্থানীয় জনগণের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা বিরূপ সমালোচনার শিকার হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, যথাসময়ে অনুমতিপত্র হস্তগত না হওয়ায় দরুণ কর্তৃক বছর ধাবতই পরীক্ষার্থী-গণ অসুবিধা ভোগ করে আসছেন। অথচ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও এমন কিছু বেশি নয় যার জন্য কিছু অব্যবস্থা অবশ্যস্বাভাব্য হয়ে উঠতে পারে। পরন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বয়স চার। সুতরাং এই দীর্ঘ চার বছরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গাফিলতি না থাকারই কথা।

বর্তমান বছরে মফস্বলস্থ বহু স্নাতক শিক্ষক নাকি বিশেষ সাম্মানিক পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষারও বসতে পারেন নি শুধুমাত্র সঠিক সময়ে অনুমতিপত্র তাঁদের কাছে পৌঁছায় নি বলেই।

পরীক্ষার ফল প্রকাশেও গাড়িমারি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রকাশ, গত বছর একটি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় মহাশূন্যের দিন। বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষার ফল এমন সময় প্রকাশিত হচ্ছে যার ফলে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী অন্যত্র কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পানো না।

অথচ বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসন যিনি অলঙ্কৃত করে আছেন, তাঁর কর্মদক্ষতার কারণে সন্দেহান হওয়ার কারণ নেই। তিনি নিজে সদাব্যস্ত কর্মপ্রিয় মানুষ।

তাঁরই সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা তাঁকে স্থানীয় সাপ্তাহিক ‘জনমত’ পত্রিকার প্রকাশিত কয়েকটি অভিযোগের আশু সূত্রাহার করার অনুরোধ রাখছি। আশা করি, উপাচার্য মহাশয় নিজে এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ও ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ যাতে ভবিষ্যতে একটি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন না হন তার জন্য আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

‘জনমতের’ বক্তব্য নিচে যথাযথ উদ্ধৃত হল :

“উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা কি পশ্চিমের দিক হইতে বা ফল প্রকাশের দিক হইতে এক প্রচণ্ড প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণকে একটি অংশে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়—উদ্দেশ্য, বাংলার ছাত্রগণ নিখিল ভারতীয় পরীক্ষার

মৌখিক অংশে ভাল করিতে পারে না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত ও মিঃ এই মৌখিক পরীক্ষার তাহারা কৃতিত্ব অর্জন করিয়া নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভ করিবে—স্বাধীন উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। প্রহসনের এইখানেই শেষ নহে। এই পরীক্ষায় কোন ভীতি নাই। অপরাধী কোন কুইনাইন পিলের একমাত্র পরিবেশক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরীক্ষায় সকলেই উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষা গৃহীত হয় এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। কিন্তু এইসব পাশের সংবাদ ঘোষিত হয় আগস্টের প্রথমে। এবার এখনকার একটি স্থানীয় কলেজ জুলাই মাসের মধ্যভাগে গ্রীষ্ম অবকাশের পরে খোলে। দেখা গেল কলেজে কোন ছাত্রী নাই, কেন না কোন পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয় নাই। বোধ হয় যথারীতি ক্লাশ শুরু হয় আগস্টের মধ্যভাগ হইতে। কা কস্য পরিবেদনা। কাহারো কোন মাথা ব্যথা নাই। শিক্ষকগণ সন্তুষ্ট—না পড়াইয়াই মাহিনা পাইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ খুশি; কোন কামেলা পোহাইতে হয় না। মৌখিক অভিভাবকগণের, তাহাদের যথারীতি মাহিনা যোগাইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব Pass পরীক্ষার ফল কি জুলাই মাসের মধ্যভাগে ঘোষণা করা যায় না?

“উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর হইতেই কলেজগুলির গ্রীষ্ম অবকাশ শেষ হয় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। আথে কলেজগুলি খুলিত ১লা অথবা ২রা জুলাই। জুলাই, আগস্ট সেপ্টেম্বর এই তিন মাস পূরা পড়া হইত এবং পাঠ্যসূচী শেষ হইত। নব বিধানের স্পেশাল পরীক্ষা লইয়া পরীক্ষার সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং মে মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চলে বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকদিন পর্যন্ত কলেজগুলি জুন, জুলাই বন্ধ থাকে। এবার কলেজগুলির নতুন শিক্ষাসূচী আরম্ভ হইয়াছে আগস্টের মধ্যভাগ হইতে এবং কলেজগুলি পূজার জন্য বন্ধ হইয়াছে ২৩শে সেপ্টেম্বর। এইভাবে পড়াশুনা হইতেছে। বিষয়টি এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রস্তাব উঠিয়াছে দু-একটি পরীক্ষা বাতিল করিয়া দেওয়া হোক এবং পরীক্ষার সময়সূচী নতুন করিয়া বিন্যাস করা হোক বাহাতে পূর্বের মত এপ্রিলের শেষভাগেই সব পরীক্ষা শেষ হইয়া মে মাসের প্রথমে কলেজ বন্ধ হইতে পারে। এইজন্যে কলেজ অধ্যক্ষগণের একটি সভা হওয়ার কথা ছিল। আমরা জানি না এই সভা কবে আহ্বান করা হইবে। শোনা যায়, ক্ষমতার আসীন ব্যক্তিবিশেষ নাকি তাহার কোন একটি পরীক্ষা বাতিল করিবার ঘোর বিরুদ্ধে।

“বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বৎসরও প্রায় শেষ হইবার মুখে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়মাবলী কেহ জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার নিয়মাবলী প্রকাশিত না হওয়ার কেহই জানে না কাহারো কি অধিকার

বলে যথেষ্টচার চালাইতেছে। বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলী ঠিক সময় প্রকাশিত হয় না। এ পর্যন্ত কি নিয়মাবলী প্রকাশ বা বন্টনের ব্যবস্থা করা গেল না?

“শোনা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে উপযুক্ত লোক থাকে সত্ত্বেও বাহির হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ বিষয়েও গত বৎসরের পরীক্ষার বহু অভিজ্ঞ শিক্ষককে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ কি? স্থিতিশীল প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষকের পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়াছে ইহা কি অর্থের অভাব না ব্যক্তি-বিশেষের জিদ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে পরীক্ষার মানের উপর। বিশেষত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে খুবই সতর্ক থাকিতে হয়। আমাদের এই নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সে বালাই নাই। এখানে সবাই মেডাল পায়। স্টেটসম্যান পত্রিকা একদা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিরাট ভাষা (Elaborate joke), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ইহার কোন লাভকর্য নাই। কোন একটি পত্রিকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ইহা একটি হিমালয়ীর অপচর। আমাদের মতে এই নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যাবলীর আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।”

১০/১২/৬৬

অরাজক আলিপূরদুয়ার

খান্দাল ভ্রম সম্পর্কিত নতুন সরকারী খাদ্যনীতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে সরকারী আমলাবর্গকে মারমুখী জনতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে একটি চাপল্যাকর সংবাদ জানিয়েছেন দৈনিক বঙ্গবন্ধুর নিম্নলিখিত সংবাদদাতা। প্রকাশ, সমগ্র মহকুমায় জনগণ বিক্ষোভে এক-একটি বিক্ষোভের দ্রব্যে পরিণত হয়েছেন। স্থানীয় কলেজ হলে পৌরপতি ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভায় খাদ্যনীতির স্বপক্ষে বক্তৃতা করতে উঠলে সভাস্থ প্রোত্বেশের দ্বারা রীতিমত অপদম্ব হতে হয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ রক্ষী গ্রীষ্মকেন্দ্রীয় দাশগুপ্তকে।

আলিপূরদুয়ার সম্ভবত একটু তাড়াতাড়ি পা ফেলেছে। নচেৎ নয়া নীতি নিয়ে জুল বোকাবুর্কি ও অজ্ঞতা জনমনে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে প্রায় সর্বত্রই। আর তার কারণও অস্পষ্ট নয়। নয়া খাদ্যনীতির মতো একটি সর্বগ্রাসী প্রকল্পের জন্য যতদূর প্রচুর প্রয়োজন ছিল, আদৌ তা করা হয় নি।

নয়া খাদ্যনীতি তার প্রচুর দৃষ্টি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জনস্বার্থের মুখ চেয়েই রচিত হয়েছে। সুতরাং এই নীতি কার্যকরী করার প্রাক্কালে সভাসমিতি ও আইন সভায় এ নীতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল। বিশেষত এ নীতির স্বপ্ন স্রাসার মাটির

আকাশবাণী (কলকাতা) অনাচার !

স্মৃতি সাদে নটা। আকাশবাণী, কলকাতা। প্রচারিত হচ্ছে 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রোভা থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত পার্শ্বদেশী আক্রমণের পর একটি বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার পর এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের মননীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীহিন্দ্রা গান্ধী এই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিচারে ভালমন্দ খবরাখবর রাখেন। তাঁর কাছে আমাদের নিবেদন—

গত সোমবার ২০-১২-৬৫ তারিখে 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-এর অনুষ্ঠান যারা শুনছেন, তাঁরা তার বীভৎস রূপাংশে হতবাক। এদিনের এই অনুষ্ঠান প্রোভাদের শব্দ নিম্নাপহরণ করে নি, এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য গভীর চক্রান্তমূলক। আমাদের জিজ্ঞাসা, এই অনুষ্ঠানে এমন অবিদ্যাস্য বিষয়ের অবতারণা করা কিভাবে সম্ভব হোল? কার অনুপ্রেরণায় এদিনের অনুষ্ঠানের খসড়াই বা রচিত হয়েছিল? এমন দুর্দান্ত সাহস কার—যিনি বহু-জনের মতে কুর্নাসিত একটি গ্রন্থকে টেনে এনে পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে মিলনসূত্ররূপে খাড়া করলেন? 'সাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে' যিনি আলোচনা করলেন, তিনি কবেই বা সমালোচক হলেন? আর বেতারে সমালোচনার অধিকারই বা তাঁকে কে দিল? এই সমালোচক বেতারের একজন চাকুরিয়া হয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একটি বহুনির্মিত ও বহুনির্ভরিত বইয়ের প্রচার কি করে করলেন?

যড়যন্ত্র কি গভীর থেকে গভীরতর নয়? কলকাতার মাত্র একটি দৈনিক পত্রিকাতেই (শেষ শহর সংস্করণ : ২০-১২-৬৫) 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-এর সেদিনের একেবারে বিপরীতধর্মী অনুষ্ঠানের সংবাদ (তথ্যাকথিত সমালোচিকার নামসহ) বিশেষ খবর হিসেবে কি করে প্রকাশিত হল? ঐ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট জনৈক ব্যক্তি প্রণীত পৃষ্ঠপোষক হওয়ার ফলেই কি উক্ত পত্রিকাকে অগ্রিম সংবাদ পাঠিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান আকাশবাণী পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন?

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আকাশবাণী সর্বজনের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে কিভাবে এবং কার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এই জঘন্য ঘটনা ঘটলো? যখন দেশের বহুজন, বহু বিদ্বান ব্যক্তি ও নানা শ্রেণীর পাঠক এই বইটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আপত্তি জানালেন তখন বেতার কেন্দ্রের ন্যায় সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কিভাবে একটি দলের মূদ্রণ হয়ে বহুনির্মিত বইটি সম্পর্কে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হোল?

সাময়িক সাহিত্য আলোচনার নামে আকাশবাণী মারফত প্রোভাদের ধাপ্পা দেওয়া হোল কেন? অর্থাৎ নোংরামীর একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বইকে একটি সুন্দর ও চমৎকার সৃষ্টিরূপে আলোচনা করে প্রোভাদের প্রতারণার অধিকারই বা কে আকাশবাণীকে দিল?

আকাশবাণীতে নাকি একজন সাহিত্য শলাহকার আছেন। তিনি বা এই সম্বন্ধে কি শলাহ দিলেন?

এই কয়েকটি প্রশ্নের আমরা উত্তর চাই। এই উত্তর শুধু আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকেই চাই না, আমরা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে থেকেও চাই। আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি। কারণ সাহিত্য মূল্যবোধে ব্যস্ত স্বাধীনতার ব্যাপার নয়, সর্বজনের কল্যাণের ব্যাপার। এই সম্বন্ধে যে-কোনোরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ যিনি করবেন, তিনি উত্তর দিতে বাধ্য।

মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক কারবারে লিপ্ত হতে চলেছে, তখন নয়া নীতির ব্যাখ্যা যে রেডিও, খবর কাগজের মাধ্যমেই কেবলমাত্র প্রকাশ করার যথেষ্ট ফললাভ করা যাবে না—সে চিন্তাও সহজেই উদ্ভূত হওয়ার কথা। এদেশে অভ্যাসমিতই নাকি বন্ধ হতে চলেছে। তবে গ্রামদেশে পণ্ডায়েত পাণ্ডারা থাকবেন। দু-দশ কথা তাঁরা বলতে পারবেন আশা করি। অবশ্য একতরফা তাঁদের কথাই বা কতদূর দায়বদ্ধতার মনে বিশ্বাসযোগ্য হবে তাও ভাববার কথা। সুতরাং আলিপুরুষদের বর্তমান অরাজকতার জন্য প্রচার-ব্যবস্থার প্রতিটিকেই যদি কেউ দায়ী করেন তবে হয়ত অত্যন্ত ঠিক হবে না।

গণ-অনশন:

গণ-অনশন

পূর্ণ রেশন-এর দাবিতে সোনারপুর-কামরাবাদ, প্রতাপনগর, রণপুর ও হরিনাতি প্রভৃতি অঞ্চলের নারী-পুরুষ সংখ্যায় দেড় লাখ) সমবেতভাবে সোনারপুর থানা অঞ্চলে পুরো রেশনের দাবিতে সফল আটটা থেকে বৈকাল চারটে অবধি গণ-অনশন পালন করে।

পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু না হলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অনশনেই দিন কাটাতে হবে। বর্তমানেও একরূপ অর্ধ অনশন চলেছে ঘরে ঘরে।

অবশ্য তৃপ্ত জাতীয় খাদ্যের কথাই এখানে আলোচ্য। যারা প্রায় অনশনে আছেন তাঁরা সমবেতভাবে উপবেশনানশনের দ্বারা পূর্ণ রেশনের দাবি আদায় করতে চান। অর্থাৎ অনশনের কবল থেকে মুক্তির জন্য অনশন করেছেন। ঘটনাটি প্রাণিয়ানযোগ্য বটে।

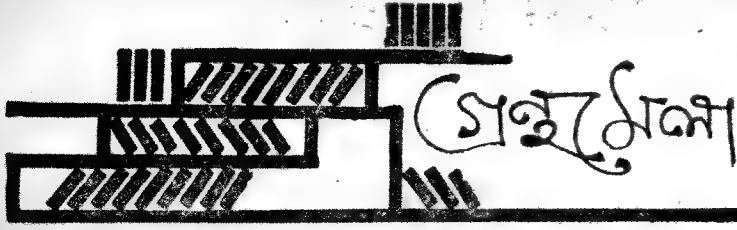
তবে অনশনকারী সত্যগ্রহীদের এক কালে বিদেশী বণিকরাও ভয় করত। এঁদের ঐক্যবদ্ধ স্বেচ্ছাশ্রমে সরকার বাহাদুরেরও টনক নড়বে না এমন কথা বলা যায় না। তবে প্রসঙ্গত হালতু এলাকার কথা পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে অথবা খাদ্যের দাবি বাড় একটা পাতা পড়ছে না।

সত্যগ্রহী মহিলাগণ এবং বিভিন্ন গ্রাম-বাসিনীরা থানা অফিসর ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করে থানার মজুত চাল বটনের জন্য এবং শস্য, সোনারপুর এলাকার পুরো রেশনের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

অনশন ভাঙের পর একটি মহতী জন-সভায় পুরো রেশনের দাবিতে সমবেত জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

বহুবারের মত আরও একবার বলতে হচ্ছে, শহরতলী ও মফস্বলকে আমল না দিয়ে কলকাতা আসানসোল শিলিগুড়ি-দুর্গাপুরের ব্যবস্থা করায় রাজ্য সরকার যে একচক্র নীতি গ্রহণ করেছেন তা তখনই সমর্থন পাবে যখন নতুন খাদ্য নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটের মানুষেরা পুরো আহার পান-না-পান অনাহারে কালাতিপাত করতে বাধ্য না হবেন। দুঃখের বিষয়, তেমন অবস্থার এবং বর্তমান অবস্থার উন্নতির কোনো চিহ্ন এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এজন্য অনাহারের ভয়াল ছায়া শহরতলী ও মফস্বলের মানুষকে গ্রাস করেছে। এই দুঃসহ অবস্থার অবসানের জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বিক্ষোভ বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করবে এবং খাদ্য নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণও এর দ্বারা ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা হয়।

আশা করি উপযুক্ত মহল এ সম্পর্কে অধিক দিন নির্দিষ্ট দর্শকের ভূমিকায় গ্রহণ করে থাকবেন না।



সহস্র বুলে ধরেছেন তা একনিষ্ঠ গবেষণার
ফলাফল। ইতো কোথাও কোথাও
মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়, তবু সেখানেও
গণসম্মত বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। পরিশোধিত
আলোচিত লেখকদের গ্রন্থ তালিকাটি
মূল্যবান ॥

আখর—সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
কানাই কর্মকার, ১৬৯ই, কাশীনাথ দত্ত রোড,
কলিকাতা-৩৬। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

একটি সাহিত্য সংস্কার পক্ষ থেকে এই
ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রটি প্রকাশিত। এটি নবম
বর্ষের বিশেষ সংখ্যা। অধিকাংশ রচনাই
অন্যান্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত।
অবশ্য এই ধরণের সংকলনের জন্য সম্পাদকদের
ধন্যবাদ। বর্তমান সংখ্যায় 'বিশ্বকোষ'
নামক বিখ্যাত রচনার উল্লেখিত উল্লেখযোগ্য।
ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি যুক্তিযুক্ত।
শেখপীরের কয়েকটি সনেটের অনুবাদ
ভালই হয়েছে। মাছের কথা প্রবন্ধটি
মংসীতহাস। আখর কোনো পত্রিকার সঙ্গে
প্রতিশ্রুতিভার ভাণ না করেও নিজস্ব
প্রশংসনীয়।

চারুচন্দ্র কলেজ পত্রিকা—সম্পাদক :
অলক রায়চৌধুরী। চারুচন্দ্র কলেজ, কলি-
কাতা-২২।

চারুচন্দ্র কলেজের নৈশ বিভাগ থেকে
প্রকাশিত। এতে দুটি বিভাগ বাংলা ও
ইংরেজি। অধ্যক্ষের নিকট লেখা তারাসংকল্পের
চিঠি ব্যক্তিগত হলেও এর আবেদন সর্বজনীন।
অধ্যাপকদের পাশে ছাত্রদের লেখা গল্প ও
কবিতা দায়িত্ব সহকারে লিখিত। এতে
লিখেছেন ডঃ সুকুমার মিত্র, শিরশমুখ সরকার,
পাথসারথি মথোপাধ্যায়, গায়ত্রী পাঠক,
জ্যোতি চক্রবর্তী, সহদেব সাহা, দেবপ্রতাপ
চক্রবর্তী, চন্দন সেনগুপ্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়,
সুতোষ মথোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ঘোষাল ও
সুবীর ঘোষ।

'সংগঠন' সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতিময়
বর্তী। পোঃ রামচন্দ্রপুর আশ্রম, পুরুলিয়া।
দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

সংগঠন সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতিময়
মাসিক পত্রিকা। আশা বহুর ধরে এটি
মফস্বল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। শহরে
রচনার জৌলুস এতে নেই, তবু লেখকদের
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রতিটি রচনায়
পরিষ্কৃত। ধারাবাহিক রচনার মধ্যে রাখাল-
চন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকেট ইতিহাস' আকর্ষ-
ণীয়। অন্যান্য রচনার মধ্যে গল্প, কবিতা
ও নাটক উল্লেখযোগ্য। জোয়ানদের নিয়ে
কবিতা লিখেছেন অসীমানন্দ। শৈলবালা
ঘোষজায়া লিখেছেন ধারাবাহিক উপন্যাস
সভারত। পত্রিকাটির প্রচ্ছদটি সাদাসিধে
হলেও পরিচ্ছন্ন।

থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের যথার্থ স্বরূপ তুলে
ধরাই লেখকের যে উদ্দেশ্য—তা সার্থক
হয়েছে। দেশের রাজনীতির মর্মস্পর্শক অবস্থা
বৃদ্ধবার জন্য এই উপন্যাস-সচেতন পাঠকের
প্রশংসা লাভ করবে, একথা আমরা মনে-প্রাণে
বিশ্বাস করি।

বিলুপ্ত জঘন—আজাহারউদ্দীন খান।
ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কন'ওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬। দাম : তিন টাকা।

উপযুক্ত গ্রন্থটিতে আটজন বাঙালী
মুসলমান লেখকের সম্ভবমতো জীবনী ও
প্রভাবের সাহিত্যপরিচয় দেওয়া হয়েছে।
এরাই অবিভক্ত বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির
অন্যতম শরিক। মধ্যযুগের পরবর্তীকালের
পর এবং আজো বারো বর্তমান রয়েছেন তাঁদের

জরুরী সেন

কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। বাংলা দেশ
বাহ্যত বিভক্ত হলেও, বঙ্গ-চিন্তা অখণ্ড।
তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্যই অবিভক্ত
বঙ্গের প্রতীক। মানস-জগতের আকাঙ্ক্ষিত
আশা। এই সাহিত্যের প্রতীকের ভুলে থাকার
অর্থ দেশ, জীবন এবং সংস্কৃতিকে ভুলে
থাকা। মীর মশারফ হোসেনের
(১৮৪৮-১৯১১) বিবাদ-সিদ্ধ অবিস্মরণীয়
গ্রন্থ। তারই সৃষ্টি 'জমিদার দর্পণ'—এতে
জমিদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী
তুলে ধরা হয়েছে। অন্য প্রসঙ্গে আজাহার-
উদ্দীন বলেছেন, "কাম্বোজবাদের পরিচয় যা
তার নাম একালের পাঠকেরা জানেন কিনা
জানি নে।" আমরা বলি, ইচ্ছুলপাঠে তিনি
না থাকলেও, বিস্মৃত নন। আব্দুল করিম
সাহিত্যবিশারদ সাহিত্যের কক্ষাল সাধক
নন—যথার্থ সাহিত্য-রাসিক। তিনিই আবিষ্কার
করেছেন সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল
হাকিমের—

যে সবে কণ্ঠেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ার।
নিজ দেশ ভের্যাণ কেন বিদেশে না যায় ॥
(নূর নামা)

মোজাম্মেল হক, এস-ওরাজেদ আলী,
শাহমাদ হোসেন, গোলাম মোস্তাফা, জসীম-
উদ্দীন প্রভৃতির যে সাহিত্যিক পরিচয় খান

মুখাম্মদী—চাপকা সেন। ক্লাসিক প্রেস,
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
দাম : দশ টাকা।

চাপকা সেন মুখবন্ধে গ্রন্থটির রূপরীতি
সম্বন্ধে বলেছেন, "মুখাম্মদী সমকালীন
ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিক আলোচ্য।" এই ধরনের
বাক্য ব্যবহারে গ্রন্থের সুর এককথায় বোঝা
যায় না, তাই এটিকে আমরা 'রাজনৈতিক
উপন্যাস' বলতে অধিকতর আগ্রহী। যে
রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে উপন্যাসটি
সৃষ্টিত, যা আধুনিককালের উপন্যাসে খুব কমই
দেখা যায়; যেটুকু দেখা যায় তা আবার
মনোহর গল্পের গাঁথনিতে খেই হারিয়ে
ফেলে। বরং একালের বলিষ্ঠ নাটকে রাজ-
নৈতিক ঘটনাবলী সূক্ষ্মরূপে বিভাজিত হয়।

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটিতে উদয়চন্দ্র
প্রদেবের মুখাম্মদী কৃষ্ণবৈপ্লবের মন্দির
পতন ও এ মন্দির রক্ষার কাহিনী বিধৃত
হলেও এ যেন স্বাধীন ভারতের এক-একটি
রাজ্যের মুখাম্মদীদের উত্থান-পতনের কাহিনী।
একদিকে বিধানসভার দল-নেতা, অন্যদিকে
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি—এই দুয়ের কোন্দল
অর্থাৎ একজন রাজা আর একজন 'কিং মেকার'
এই দুয়ের গোপন সংঘর্ষ মুখাম্মদীতে এমন-
ভাবে বিবৃত যে, সাধারণ মানুষের ধারণা
হবে—এই রাষ্ট্র জনসাধারণের নামে পরিচালিত
হলেও তা একেবারে 'ভেত'। অবশ্য মহাজ্ঞানীর
আলম-শিলা দুর্গাভাই-এর মতো লোক
আছেন, বারো মন্দির নিতে বাধ্য হয়েও সব-
কিছু স্বার্থের উর্ধ্বে। মুখাম্মদী কৃষ্ণবৈপ্লব
তাকে তথাকথিত বাস্তব রাজনীতির সম্বন্ধে
শিক্ষা দিতে চেষ্টাছিলেন কিন্তু সে সুযোগ
গ্রহণ করার মতো মানুষ তিনি নন, তবু
কৃষ্ণবৈপ্লবের তিনিই 'সেভিয়ার'; কারণ আর
এমন কেউ নেই যাকে বিন্দুমাত্র কিস্বাস করা
যায়, জনস্বার্থের নামে সবাই ত' সুযোগ-
সমধানী। যা হোক কৃষ্ণবৈপ্লবের মন্দির-পতন
নিয়ে চাপকা সেন ভারতের বাস্তব রাজনীতির
বে আলোচ্য রচনা করেছেন তা সাধারণ
মানুষের পক্ষে ভীতিজনক। এই যদি অবস্থা
হয়, তবে দেশের স্বার্থ কে দেখবে? এর
মধ্যে অবশ্য নাম করা যায় কৃষ্ণবৈপ্লবের জনৈক
পুত্রের — যিনি পিতৃদ্রোহী এবং অন্যায়ের
বিরুদ্ধে। আর একজন আছেন যিনি শান্ত-
প্রকৃতিতে সব সহ্য করেন। ইনি হচ্ছেন কৃষ্ণ-
বৈপ্লবের স্ত্রী। উপন্যাসিক মুখাম্মদীতে
খুদা চরিত্রের মুখোশ খুলে ফেলেছেন। প্রতিটি
চরিত্রকে কোথাও ভাবাবেগ নেই। শূন্য

আপদাপ লেখাবলি ওকলাহোমা

ওকলাহোমা

ওকলাহোমা

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর।
সকাল নাটার সময় ঝকঝকে স্যাঁটা ফে
ষ্টেন এসে ওকলাহোমা স্টেটের নর্মান থামল।
আমরা আঠারোজন ইন্টার-ন্যাশনাল এডুকেটর
স্টেশনে নেমে পড়লাম। স্টেশন বলে বোঝাই
যায় না। কুঁলির ভিড় নেই, হকারের হৈ-ঠে
নেই। প্ল্যাটফর্ম বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু
চোখে পড়ল না। গাড়িগাড়ি বৃষ্টি পড়ছিল।
আকাশ মেঘলা।

স্টেশনে নেমে দেখি আমাদের সাদর-
অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন আমাদের ইন্টার-
ন্যাশনাল টিচার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের
অ্যাকাডেমিক ও অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ কোঅর্ডি-
নেটর বথাক্রমে ডক্টর লয়েড পি. উইলিয়মস ও

মিস্টার জিন রাসেল এবং অনেকগুণি হোস্ট
ফ্যামিলির লোকজন। অনেকের সঙ্গে হ্যান্ড-
সেকের পর ডক্টর উইলিয়মস আমাকে আমার
হোস্টেস মিসেস উইলিয়মস পাওয়েলের সঙ্গে
আলাপ করিয়ে দিলেন। শুনছিলাম আমি

এস. কে. গ্রীনবার্গ

ও আমাদের গ্রুপের একজন ভারতীয় বন্দু
মিস্টার বা একসঙ্গে মিস্টার ও মিসেস
পাওয়েলের পরিবারে অতিথি হয়ে থাকব।
মিসেস পাওয়েল জানালেন যে, মিস্টার পাওয়েল
ইউনিভার্সিটির কাজে ব্যস্ত আছেন বলে

আসতে পারেন নি। মিসেসের সঙ্গে ছিল
তার চার বছরের নাতি রেমন্ড। সে মিষ্টি
হেসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল।

স্টেশনের গায়েই চকচকে র্যামরার গাড়ি
দাঁড়িয়েছিল। মিস্টার বা ও আমি আমাদের
মালপত্রের টেনে গাড়িতে তুললাম। আমার একটা
সুটকেস বেশ ভারী ছিল। ডক্টর উইলিয়মস
আমাকে সাহায্য করলেন। গাড়িতে ওঠার
আগে জিন রাসেল মিসেস পাওয়েলকে
বললেন, 'আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং-এ
সাড়ে এগারোটার সময় পৌঁছে দেবেন।
আজকে এঁদের ইউনিভার্সিটির কোনো কোনো
কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া
হবে।'

মিসেস পাওয়েল উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা,
তাই হবে।'

মিসেস পাওয়েলের বয়স ষাটের কাছাকাছি।
কিন্তু স্বাস্থ্যে বয়সের তেমন ছাপ
নেই। বেশ গাভীৰ্পর্শ অথচ স্নেহশীল
চেহারা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে আমরা
দুজনে কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ওঁর বাসায় এসে
পৌঁছলাম। দোতলা কাঠের সুদৃশ্য বাড়ি।
সামনে মনোরম রাস্তা।

আমাদের গৃহে অভ্যর্থনা জানিয়ে মিসেস
পাওয়েল বললেন, 'আমার ঘর আপনার ঘর।
আপনারা ঘরোয়াভাবে এখানে থাকুন।'

মিসেস পাওয়েলের নির্দেশে আমরা মাল-
পত্রের টেনে ওপরতলার নিয়ে গেলাম। সিঁড়ি
দিয়ে উঠে মৃদুস্বপ্নের মতো ঘর। চমৎকারভাবে
সাজানো। একটির রঙ সবুজ, অপরটির রঙ
নীল। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'আপনারা
ঠিক করে নিন, কে কোন ঘর নেবেন।'

আমি সবুজ ঘরটি নিলাম। ঘরের মধ্যে
আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। সেটি
একটি কালো বেড়াল। শুনলাম তার নাম
'ঘোষ'।

জিনিসপত্রগুলো ঘরে মোটামুটিভাবে
গুছিয়ে রেখে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। মিসেস
পাওয়েল আমাদের জন্যে বরফ দেওয়া ঠান্ডা
জল দিয়ে গেলেন। আমার ঘরটা উত্তরদিকে।
জানলার কাছে একটা ওকগাছ ছিল। নির্জন
মুহুর্তে এই গাছটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার
এক মস্ত সংগী। এই গাছটির মধ্যে বাতাস
বইলে যে শব্দ হত তাতে আমি সমুদ্র ভারতে
আমার জানলার কাছে কুঞ্চুড়া গাছের দীর্ঘ-
শ্বাস শুনতে পেলাম। একটা জিনিস আমাকে
খুবই বিস্মিত করেছিল। সেটা হচ্ছে এখানে
পাখির সংখ্যা খুবই কম। মধ্যে মধ্যে এক-



ওকলাহোমা মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং

সাপ্তাহিক বঙ্গভাষা

করনের মাল ছোট পাখিকে দেখতে পাওয়া
হত। তবে পাখির ডাক খুব কমই শুনছি।

সন্ধ্যা এগারোটায় সময় মিসেস পাওয়েল
গাড়ি করে আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের
পশ্চিম দিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর
কম্পাউন্ড পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমরা
মিস্টার রাসেলের সঙ্গে দেখা করলে উনি
আমাদের ইউনিয়ন হলের একটা মিটিং রুমে
নিয়োগ দিলেন। সেখানে আমি আরো কয়েক-
জন লোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। জানতে
পারলাম আমরা হোস্টেল ক্যাম্পাসে ব্রেকফাস্ট
করব। লাঞ্চ ও ডিনার বাইরে কোথাও করতে
হবে। মিটিং-এর শেষে আমাদের ইউনিভার্সিটি
ক্যাম্পাস দেখিয়ে দেওয়া হল। পেট্রোলিয়াম
ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্য
ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিখ্যাত।
এখানকার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টও খুব পুরনো
এবং তারও খুব নামডাক। এখানকার হোস্টেলের
খুব সখ্যাত আছে। 'বুকস অ্যান্ড' বলে
যে পত্রিকাটি এখান থেকে বের হয় তার কোন
কোন সংখ্যা আমি ভারতবর্ষে থাকাকালীন
দেখিছিলাম। এই পত্রিকাটির স্ট্যাণ্ডার্ড বেশ
উঁচু।

ক্যাম্পাসটি দেখে খুবই ভালো লাগল।
এদেশে অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের তুলনায় ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়
আরও ছোট হলেও এর মান অনেকের চেয়েই
ছোট নয়। মিসেস পাওয়েল প্রথমেই মোটরে
বলেছিলেন, 'তুলনামূলকভাবে আমাদের বিশ্ব-
বিদ্যালয়টি আরও ছোট হলেও মানে ছোট
নয়।' ক্যাম্পাসের মধ্যে অনেক ওক ও সিডার
গাছের নিচে মৃত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে স্মারক-
চলক স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটির
এই সব ছাত্রেরা গত মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন।
ভারি শান্ত পরিবেশ। জায়গাটি ছবির মতো।

ক্যাম্পাস দেখে আমরা ইউনিয়ন বিল্ডিং-
এর ক্যাফেটেরিয়াতে লাঞ্চ করতে গেলাম।
ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা ভারি সুন্দর। পরপর
খাদ্যদ্রব্য সাজানো থাকে ও একজন করে লোক
(সাধারণত মহিলা) খাদ্যের প্রত্যেক আইটেমের
চার্জ থাকে। ট্রে ও কাঁটা চামচ, ছুরি ইত্যাদি
নিয়োগ প্রত্যেকের কাছে গিয়ে নিজের পছন্দ
মতো খাবার চেয়ে নিতে হয়। শেষকালে
একজন কি কি খাবার নেওয়া হয়েছে দেখে
দাম চেয়ে নেয়। এই ব্যবস্থার ইচ্ছে মতো
খাবার বাছার সুযোগ থাকে ও টিপসের জন্যে
পরসাদা দিতে হয় না।

এখানকার লোকের প্রায় সব জিনিস ঠান্ডা
থায়। দুধ কেউ গরম খায় না। ভাত খুব
কমই পাওয়া যায়। স্টেপল ফুড বলতে বিফ।
এই বিফ আসে অধিকাংশই ক্রশ ব্রিডিং-এর
ফলে উদ্ভূত এক ধরনের ক্যাটেল থেকে।
রোজ্জারেশনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ফুড তৈরির
জন্যে স্টেনলেস স্টিলের ওভেন ইত্যাদি
দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

ইউনিভার্সিটি মেমোরিয়াল ইউনিয়ন

বিল্ডিং-এর মধ্যে অবস্থিত উইল রোজাস
ক্যাফেটেরিয়া, বুকশপ ইত্যাদিতে অনেক ছাত্র-
ছাত্রী পার্ট-টাইম কাজ করে। কোন কাজকেই
এরা ছোট বলে মনে করে না। কাজে এদের
ক্লান্তি নেই, কোন ফাঁকি নেই। সুপার-
ভাইজারের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। এরা
খাটেও বেমন, খায়ও তেমনি বেশি। এদের
অনেকেরই ওভার-ওয়েট। আমাকে একদিন
একজন অধ্যাপক জিজ্ঞেস করেছিলেন,
'আমাদের রোগ হয় ওভার-নিউট্রিশন থেকে।
আপনার সাধারণ রোগ কি কি?'

আমি বলেছিলাম, 'ম্যাল নিউট্রিশন।'

লাঞ্চ খেয়ে লাইব্রেরী দেখতে গেলাম।
খুব বড় লাইব্রেরী। ওপন সেলফ থেকে বই
নিয়োগ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ছে। খুব ঘরোয়া
পরিবেশ। বই ফেরত দেবার সময় এসক্যালের
সমন্বিত বক্সে ফেলে দিলেই হয়। রিসিট
নেওয়া-নেওয়ার হাঙ্গামা অধিকাংশ স্থলেই
নেই। মুখের কথাই যথেষ্ট।

আমি একটা সেলফের বই দেখছিলাম।
হঠাৎ পেছনে কে বেন বললেন, 'মাক করবেন,
আপনি কি ভারতীয়?'

পেছনে তাকিয়ে দেখি, একজন মধ্যবয়সী
ভদ্রলোক। মুখে ফ্রেঙ্ককাট দাড়ি। রঙটা ময়লা,
কিন্তু বেশ মজবুত গড়ন।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আমি
কলকাতা থেকে এসেছি।'

ভদ্রলোক এবার একেবারে বাঙলায় জিজ্ঞাসা
করলেন, 'কলকাতার কোথায় থাকেন?'

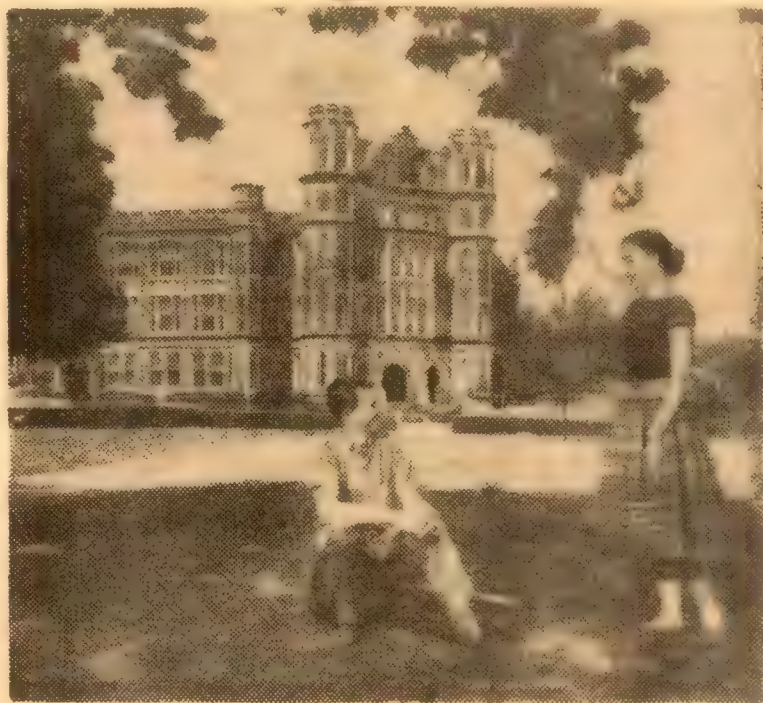
পাড়াভাষা শুনে মনটা মৃদু হতে প্রসন্ন হয়ে
উঠল। ভাব জমতে দেরি হল না।

ভদ্রলোকের নাম জে. মজুমদার। ভবানী-
পুরের ছেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে
সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন। কিছু
পরসাদা জমিয়ে বারো-তেরো বছর আগে
ভাগ্যান্বেষণে এদেশে পাড়ি দেন। অনেক
জায়গায় ভেসে ভেসে শেষে এসে ওঠেন
নর্মান। অনেক স্ট্রাগল করে সোস্যাল সার্বেস
মেজর নিয়ে এম. এস. করেছেন। এখন ডক্টরেট
করছেন। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন একটি
রেড ইন্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে। আমরা কলেজ
অ্যাভিনিউর যে রকম থাকি উনিও এপার্টমেন্ট
নিয়োগ সেখানেই থাকেন।

'আপনার কি ফেরবার ইচ্ছে নেই?' আমি
কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কি করে ফিরব বলুন? আমার তো
ফেরার খুবই ইচ্ছে। অনেক জায়গায় এখান
থেকে দরখাস্ত করেছি, ওখান থেকে কেউ
উত্তরই দেয় না। মোটামুটি একটা কাজ
পেলেই ফিরে যাই। আমার স্ত্রী কেবলই
ভারতে যাবার কথা বলে।'

পরে জানতে পারলাম মজুমদারের
মা বাবা ভাই বোন সবাই কলকাতাতেই আছেন।
মিস্টার মজুমদার ঠিক যাবার শরীর খারাপের
কথা শুনে খুবই চিন্তিত। ঠিক মতো অনেক
ছাত্রই সুবিধামতো চাকরি জোগাড় করতে না
পারার জন্যে ভারতবর্ষে ফিরতে পারে না।
অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা একটু বেশি



ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটির হোস্টেল হল

জৈনিক হলে যোগাভাষ্য করে একটি বৈশিষ্ট্য আশা যে না করে তা নয়। আর একটা জিনিস ভাববার আছে। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা এখনে যা দেখে, অনেক ক্ষেত্রে দেশে ফিরে গিয়ে তার প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ তারা পায় না। এখানে গবেষণার সুযোগ প্রচুর। প্রত্যেক অধ্যাপকেরই নিজস্ব চমৎকার ঘর আছে এবং সেই ঘর প্রয়োজনীয় অনেক বই ও গবেষণার জিনিসে ভর্তি।

ডক্টরে ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রত্যেক অধ্যাপকেরই আছে। প্রমোশনের প্রধান মাপকাঠি রিসার্চ। আর একটা কথা। এখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে ও ইন্টারভিউ নিয়ে সাধারণত অধ্যাপক ইত্যাদি পদে লোক নিযুক্ত হয় না। কারো ভালো রিসার্চ ও অন্যান্য গুণগণনার খবর পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহী কতৃপক্ষ তার কোন পরিচিত লোক মারফৎ তাকে অফার দেন। এইজন্যে কেমনা অধ্যাপক প্রায়ই এক ইউনিভার্সিটিতে বৈশিষ্ট্য দিন থাকেন না। তা ছাড়া গ্যাজেট মাস্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রী ভিন্ন ভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে করাই সাধারণ রেওয়াজ। এইভাবে ট্যালেণ্ট দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশের স্টাডেন্টকে উঁচু করে। অন্যান্য ইউনিভার্সিটির মতো ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের বেশ নাম আছে। ডক্টর উইলিয়ামস একবার বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশের ছাত্রেরা খুব সৌরিয়াস।'

মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। উনি বললেন, 'জানেন আমি কেবল কলকাতার স্বপ্ন দেখি। ইডেন গার্ডেনে এখন তো ক্রিকেটের মরশুম লেগে গেছে। শরতের রৌদ্রের মনোমোহনের মাথাটা কি সুন্দরই না দেখায়। খেলা দেখে ফেরার পথে এক-একদিন আলুকাবলি ও ফুটকা খাওয়া। কবে যে যাব।' একটা ব্যাকুলতার সুর বেজে ওঠে গুর গলার।

খানিকক্ষণ গল্প করার পর উনি বললেন, 'এখানে বসে কথা বলা ঠিক নয়। চলুন বাইরে যাই।' হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউ-এর তো এখনি আসার কথা। আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

দুজনে বেরিয়ে এলাম। নিচে নেমে দেখলাম গুর স্ট্রী সাইকেল হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

মিস্টার মজুমদার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সময়টা কেমন যাবে জানতে—
জ্যোতিষালয় 'Stellar House' এ আসুন।
৬৯৯, কাস্টলিয়া রোড, শিবভলা, হাওড়া-৪
এশিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত জ্যোতিষ-রসায়ক **শ্রীনিবাসেশ্বর ভট্টাচার্য** ক্যাব-ব্যা ক র প তী থ, জ্যোতিষ-ভারতী-শাস্ত্রী। প্রতিভা ও সম্পাদক, হাওড়া জ্যোতিষ পরিষদ। (সাপ্তাহ : প্রত্যহ ৭-৯টা। বাসরুট-৫২।)

আমাকে গুরের বাসার বাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। আমি ডিনার খেতে সেলাম। ইউনিয়ন বিল্ডিং-এ ক্যাফেটেরিয়াতে আমাদের গ্রুপের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। হলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণটিতে ভারতীয় ছাত্রেরা সাধারণত বসত। আমিও ঐ দিকটিতে বসলাম। আমাদের গ্রুপের সাউথ ইন্ডিয়ান মহিলা মিস রাজেন্দ্রম আর একজন ভদ্রমহিলা ডিনার খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আসুন না, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

আমি গুরের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিলাম। মিস রাজেন্দ্রম ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গুর নাম জুন সিলভা। গোয়ানিজ। বোম্বাইতে গুর বাবার বড় কারবার আছে। ভাইয়ের সঙ্গে এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তারপর এয়ার হোস্টেসের চাকরি নেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এ্যাড-মিন নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। অনেক গুলি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন। কোথাও মন টেকে নি। শেষকালে ওকলাহোমাত্রে এসে মেডিক্যাল সায়েন্স পড়ছেন। মা পাগল। তাই সাইকো এনালিসিসে বিশেষ আগ্রহ। যদি মাকে ভাল করতে পারেন। উনি রাজেন্দ্রমের হোস্টেস। বেশ ছিমছাম চেহারা।

রাজেন্দ্রম বললেন, 'জানেন তো সিলভা এখানকার ইন্ডিয়া ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।'

সিলভা বললেন, 'আসবেন একদিন আমাদের ক্লাবে। অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আলাপ হবে।'

উইলোজার্স ক্যাফেটেরিয়ার দেওয়ালে বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা উইল রোজার্সের জীবনসম্পর্কিত কয়েকটি সুন্দর চিত্র আঁকা রয়েছে। রোজার্সের জীবন যেমন বিচিত্র তেমন শিক্ষাপ্রদ। আমি কিছুদিন পরে উইল রোজার্সের বিখ্যাত মিউজিয়মটি দেখতে গিয়েছিলাম। মিউজিয়মটির প্রসঙ্গেই রোজার্সের কথা মধ্যস্থানে আলোচনা করব।

ডিনার শেষ করে বাসার ফিরে দেখি লিভিং রুমে মিসেস পাওয়েল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে চেয়ারে বসে টেলিভিশন দেখছেন। অনুমান করলাম উনিই মিস্টার পাওয়েল। একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি। আমাদের দেশে বৃদ্ধ বলতে যখন যে অবস্থা বোঝায় এখানে তেমন অবস্থা হতে অনেক দিন লাগে। মিসেস পাওয়েলের বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু উনি যেমন কমিউনিস্ট তেমনই এদেশে অনেক অপব্যবহার ক্ষেত্রেও দেখা যায় না। উনি সকালে উঠে আমাদের ব্রেকফাস্ট করে দিতেন। তারপর ঘরঘোর পরিষ্কার, সাজানো-গোছানো, কাচাকুচি ইত্যাদি বাবতীয় কাজ করে স্কুলে পড়তে যেতেন। পড়িয়ে ফিরে গার্ডেনিং, ডিনার তৈরি করা প্রভৃতি নানা কাজ। ডিনার খাওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি ফেফালিট ক্লাবের মিটিং-এ, নয়তো কোনো ক্লাবে। ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ

স্বয়ংক্রিয় নিজে করতে হয় বলে এখানকার অধিকাংশ বাসের বাড়িই একতলা, না হয় দোতলা। বাড়ি থেকে চিঠি গেলে মিসেস পাওয়েল আমার হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। খুলে যখন চোখ বুলিয়ে নিতাম তখন সাগ্রহে প্রশ্ন করতেন, 'খবর সব ভালো তো?' একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমার বৃদ্ধ মায়ের শরীরটা ভালো নয়। কেবলই ভুগছেন।' উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার মায়ের বয়স কত?' আমি বলেছিলাম, 'আটম।' উনি তাতে বলেছিলেন, 'আমার বয়স তো ষাট। আমার নিজেকে একটুও বড়ো মনে হয় না।' সত্যি এখানকার লোকের স্বাস্থ্যের তুলনা হয় না। খেতে না পাওয়ার শীর্ণ চেহারা আমার চোখেই পড়ে নি। মিস্টার পাওয়েলের কর্ম-ক্ষমতার নিদর্শন দেখে পরে বিস্মিত হয়েছি। তাকে বৃদ্ধ বলবে কে?

আমাদের দেখে মিসেস পাওয়েল উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনারা পথ হারিয়ে ফেলেন নি তো?' মিসেস পাওয়েল সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম, 'না'।

'ইনি আমার স্বামী মিস্টার পাওয়েল। সকালে ইউনিভার্সিটিতে কাজ ছিল বলে সকালে স্টেশনে যেতে পারেন নি।'

মিস্টার পাওয়েল আমাদের সঙ্গে কনসারভেটর করে বললেন, 'এ বাড়ি আপনারা নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন। এ হবে নিজের বাড়ি থেকে বহুদূরে নিজের আর একটা বাড়ি। এই ঘর রান্নাঘর ইত্যাদি সব জায়গায় যখনই ইচ্ছে হবে আসবেন। টেলিভিশন দেখবেন। আচ্ছা, ওপরে আসুন।'

ওপরে মিস্টার ও মিসেস পাওয়েলের পেছনে পেছনে আমরা আমাদের ঘরের পাঁচমুঠ দিকে গুর লাইব্রেরীতে এলাম। বিভিন্ন বিষয়ের বই; অংক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা থেকে শুরু করে ওকলাহোমার ইতিহাস, পশুপক্ষী, ফুল, সৌন্দর্যচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বই রয়েছে।

মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'তোমাদের যখন ইচ্ছে হয় এখানে এসে পড়বে। দরকার হলে টাইপরাইটার ব্যবহার করবে। সবসময় মনে করবে এটা নিজেরই বাড়ি।'

প্রায় সমস্ত আমেরিকান বাড়িতেই একটি করে সুন্দর লাইব্রেরী দেখছি। শিক্ষিত প্রত্যেকেই সাধারণত টাইপরাইটার ব্যবহার করে। প্রায় প্রতি স্কুলেই টাইপরাইটিং শেখার ক্লাস থাকে। এই কারণে সাধারণত এদেশের লোকের হাতের লেখা তেমন ভাল নয়।

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর ওঁরা চলে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মিসেস পাওয়েল বললেন, 'কিছু প্রয়োজন হলেই বলবে। কাল সকালে সাতটার ব্রেকফাস্ট মনে থাকে যেন।'

বোন জাতি

কথা ও কাহিনী

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

■ শ্রীমতী পূর্ব ■

ব্রিটিশ-দেবতা

যেহেতু গেলীয় এবং ব্রুটনরা একই ক্রোম জাতিবদ্দ দুটি শাখা, স্বাভাবিকভাবে এটাই আশা করা যায় যে, উভয় গোষ্ঠীর দেব-দেবীদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে, এবং কাৰ্যত ঘটেছেও তাই। ব্রিটিশ দেবতারা মোটামুটি তিনটি পৰিবাবে বিভক্ত—দনের বংশ, লুডের বংশ এবং লিভের বংশ। দনেব সংগে গেলীয় দল্লর, লুডের সংগে গেলীয় লুডাডা এবং লিভের সংগে গেলীয় লেবেব সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এই তিন বংশের মধ্যে দনের বংশই আদি, যাকি দুটি বংশ দনের বংশ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। দন-বংশীয় দেবতারা আকাশের সংগে সম্পর্কিত। দনের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে নুড বা লুড যে নিজেই একটি পুত্রক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই দেবতাটির পূজা একদা বহুল প্রচলিত ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান সেন্ট পলের গীজার্ট পূর্বে লুডের মন্দির ছিল।

আবার ওয়েলসেব পুরাণে লুডেব তত দাপট নেই যত আছে তার পুত্র গুইন-এর। আদিতে গুইন সম্ভবত বৃক্ষ এবং মৃত্যুর দেবতা ছিল। গুইন ছিল লুডের কন্যা ক্রেউরিডাডেব প্রণয়ী এবং এই বিষয়ে তার প্রতিবন্দী ছিল গুইনর নামক অপব এক দেবতা। প্রতি বছর মে মাসেব প্রথম দিনে এই দুই প্রতিবন্দীর মধ্যে নৃত্যব্যবস্থা হয়।

অপরূপ দেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেবী দনেব ডাই মাক্স, যে ছিল পবন জ্ঞানী এবং যে তার ভাশেন গুইডিয়নকে মন্ত্রাণ্ডি ও ইন্দ্রজালের বিশেষজ্ঞ করে তুলেছিল। এই গুইডিয়ন চারিদিকে টিউটন দেবাদিদেব ওডিনের ছাপ আছে। গুইডিয়ন ছিল দেবতাদের ড্রাইড (পূর্বোক্ত) যে তার নিজের বোন এরিয়ানরডকে বিবাহ করেছিল। এতে অবাক হবার কিছু নেই। গ্রীক দেবাদিদেব জিউস তার ভগ্নী হেরাকে বিবাহ করেছিলেন, মিশরীয় দেবতা ওসিরিসের স্ত্রী আইসিস ছিলেন তাঁর বোন, যজুর্বেদে আছে অম্বিকা শিবের বোন, পরে যাকে শিব বিবাহ করেছিলেন (বাক্সনেরী সংহিতা, ৩।৫৭)। গুইডিয়ন এবং এরিয়ানরডের যুগ্ম সন্তান ডাইলান এবং লিউ, যথাক্রমে আলো এবং অন্ধকারের প্রতীক। ডাইলান দুর্ভাগ্যক্রমে তার কাকার হাতে মারা যায়।

গুইডিয়নের অপর পুত্র লিউর কাহিনী বড় মনোরম। লিউ যখন বালক তখন তার পিতা তাকে তার মা এরিয়ানরডেব দুর্গে নিয়ে যায়। কিন্তু লিউকে দেখে তার মা মোটেই খুশি হয় না। সে গুইডিয়নকে বালকের নাম জিজ্ঞাসা করে। গুইডিয়ন জানায় যে বালকের কোন নামকরণ হয় নি। তখন এরিয়ানরড তার অতিশাপ দেয় যে, সে নিজে নামকরণ না করা পর্যন্ত বালকের কোন নামই থাকবে না।

এখন নাম না থাকা আদিম দৃষ্টিতে একটা বড় অপরাধ। কাজেই গুইডিয়ন একটা কৌশল অবলম্বন করল। তার পিতাপুত্র দুটি সাজল এবং সমুদ্রের ধারে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে রইল। এদিকে এরিয়ানরডের জুতার প্রয়োজন থাকাব জন্য সে সমুদ্রের ধারে পারের মাপ দেবার জন্য এল। গুইডিয়ন

নরেন ভট্টাচার্য

যখন তার পারের মাপ নিচ্ছিল তখন একটি হিলে সামুদ্রিক পশু তাদের মারতে এগিয়ে এল। তখন বালকটি ভীত দিয়ে সেই পশুটির সামনেব পারে আঘাত করল। বালকটির ভীত ছোঁড়া দেখে এরিয়ানরড বলল যে, “এ বোন পাকা হাতের সিংহেব মাঝ”। তৎক্ষণাৎ গুইডিয়ন নিজ পুত্রের জন্য এই নামটি গ্রহণ করল—লিউ-লও-জাইকেন্স (লয়ন উইথ দি স্টোড হ্যান্ড)।

অতঃপর তারা নিজেদের পরিচয় দিল। এতে এরিয়ানরড আরও হতু হত। সে আবার অতিশাপ দিল যে সে নিজে বালকের হাতে অস্ত্র তুলে না দেওয়া পর্যন্ত লিউ অস্ত্রধারণ করতে পারবে না। ফলে গুইডিয়ন আবার কৌশল অবলম্বন করল। এবার তাবা দুজনে চারণ সাজল এবং এবিধানবডের দুর্গে সাদবে আগ্রয় পেল। এদিকে ইন্দ্রজালেব দ্বারা গুইডিয়ন একটি দুর্গেব সৃষ্টি করল। দুর্গটি হচ্ছে যে শত্রুবা দুর্গ আক্রমণ করেছে। ভীত এরিয়ানরড এদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করল কি কবা উচিত। তখন এরা তাব কাছ থেকে অস্ত্র চাইল। যে মুহূর্তে এরিয়ানরড লিউ-এর হাতে অস্ত্র তুলে দিল সংগে সংগে গুইডিয়ন ইন্দ্রজালের প্রভাব কাটিয়ে দিল। তারপর তারা আত্মপরিচয় দিল। এরিয়ানরড এভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারও হতু হত। সে

অতিশাপ দিল যে লিউ কখনো বিবাহ করতে পারবে না।

এরিয়ানরডের অতিশাপ ব্যর্থ করার জন্য গুইডিয়ন তার মাতুল মাথকে দিয়ে তৈরি করল এক পরমাসুন্দরী নারী, যার নাম ব্রোডেউয়েড। তার সংগে লিউর বিবাহ হল। কিন্তু এরিয়ানরডের অতিশাপ লিউর পশ্চাতে ঘুরছে। একদিন রাতে লিউ গুহে ছিল না। সেই সময় গ্রোনো নামক অপর এক দেবতা লিউর দুর্গে আগ্রয় নেন। লিউর পত্নী ব্রোডেউয়েড তার সংগে ব্যভিচারিণী হয় এবং উভয়ে মিলে লিউকে হত্যার চক্রান্ত করে। এই কেল্টীয় ডেলাইলা কৌশলে লিউর মৃত্যুর উপায় জেনে নেন। লিউকে ঘরের ভিতবে বা বাইবে হত্যা করা যাবে না; সে যদি স্নান করে সিন্ধু বসনে একটি চালাঘরের নিচে একটি ছাগলের পিঠে পা দিয়ে দাঁড়ায় তখন যদি এক বছর ধরে নির্মিত যন্ত্রাশ্রমে পবির একটি বর্শার দ্বারা তাকে আঘাত করা যায়, তবেই তার মৃত্যু হবে। তাবপব একদিন একটি অনুরূপ সুযোগের সৃষ্টি করে গ্রোনো লিউকে আঘাত করে। আঘাত পেয়ে সে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে মাঝ কিন্তু পক্ষমুহূর্তেই একটি ঈগল হয়ে সে আকাশে উড়ে যাব। তখন গ্রোনো এবং লিউব পত্নী ব্রোডেউয়েড নিশ্চিন্দ একত্র বসবাস করতে থাকে।

এদিকে গুইডিয়ন সম্মান করতে করতে অবশেষে তাব ঈগলরূপী পুত্রকে খুঁজে পেল। তাবপব মন্ত্রবলে সে লিউকে তাব পূর্বের চেহারা নিয়ে এল। তাবপর পিতাপুত্র বিশ্বাসঘাতিনী ব্রোডেউয়েডকে পাকড়াও করল। গুইডিয়ন মন্ত্রবলে তাকে নিশাচর পেচকে পরিণত করল এবং তাব প্রণয়ী গ্রোনোকে লিউ হত্যা করল।

দেবী দনের অবশিষ্ট পুত্রদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাইনিও এবং পেইবো। এরা সর্বদা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করত যে কাবপে অপর দেবতাদের অতিশাপে তারা দুজনেই বলদে পরিণত হয়েছিল। দেবী দনেব কন্যা পেনারডনেব সংগে সমুদ্রদেবতা লিভের বিবাহ হয়েছিল। এদের পুত্রদেব নর্থ মানোয়াইডডান। লিভের অপর পত্নী আওয়ারইডের গর্ভে জন্মেছিল দেবতা গ্লান ও দেবী গ্লানওয়েন। শেষোক্তজন দেবী আফ্রোদিতিব মত প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। এরাই হচ্ছে খ্রীষ্ট ব্রিটিশ দেবতা। এরা ছাড়াও প্রাচীন ব্রুটনরা আরও কয়েকজন

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

স্বপ্নদেবী পূজা করত। তবে সেগুলি খাঁটি হুটিশ নয়, রোম থেকে আমদানী। তাদের নিয়ে বর্তমানে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

পিউইলের কাহিনী

পিউইল ছিল ডাইফেডের রাজা এবং বহুগুণে গুণী। একদা সে তার দলবল নিয়ে শিবির করত গিয়েছিল। সেখানে সে দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অরণ্যের মধ্যে যখন সে বিগ্রাম করছিল তখন একদল কুকুর একটি হরিণকে তাড়া করে তার সামনে নিয়ে এল। কুকুরগুলি দেখতে অপরূপ, মনে হয় যেন একগুয়ের নয়। পিউইল সেগুলিকে দেখে নিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ঠিক সেই সময় একজন দেবতা, যার নাম আরাওন, এসে কুকুরগুলি তার নিজের কল দাবি করল এবং সেগুলি অপরূপের জন্য পিউইলের নিকট কৌফর দাবি করল। পিউইল ক্ষমা চাইলে আরাওন তার উপর একটি সত্ আরাওন করল। পিউইলকে আরাওনের হস্তবশে তাব দেশে যেতে হবে, এবং তার হয়ে হাফগানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। পিউইল রাজী হলে আরাওন পরম্পরের চেহারা পরিবর্তন করে নিল। সে নিজ পিউইল সেজে ডাইফেড চলে এল এবং পিউইল আরাওন সেজে হাফগানকে বধ করতে গেল।

আরাওনের দেশে পিউইলকে দেখে কেউ যুক্তিতে পারল না যে, সে আরাওন নয়, এমন কি আরাওনের স্ত্রী পর্যন্ত নয়। কিন্তু পিউইল আরাওনের স্ত্রীকে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সর্বস্বের পরিচয় দিল। এক বছর পরে যুদ্ধে হাফগানকে নিহত করে পিউইল আবার সেই স্থানে ফিরে এল। আরাওনও ডাইফেড থেকে সেখানে এসেছে। তারপর তারা পুনরায় চেহারা পরিবর্তন করে যে যার দেশে ফিরে গেল। আরাওন ফিরে গিয়ে যখন তার স্ত্রীকে আলাপন করল তখন তার স্ত্রী বিস্ময়ের স্রোতে জিজ্ঞাসা করল এক বছর পাবে তাকে আলাপন করার অর্থ কি। তখন আরাওন তাকে পিউইলের কথা বলল। পিউইলের চারিত্রিক দৃঢ়তার উত্তরেই সন্তুষ্ট হল এবং তারা পিউইলের বিস্ময়জনক বশুতে পরিণত হল।

পিউইলের দুর্গের অনতিদূরে একটি টিবি ছিল যেখানে বসলে হয় আহত হতে হত নয় কোন একটা অশ্রুত জিনিস চোখে পড়ত। পিউইল একদিন সেই টিবির উপর বসল। এবং তৎক্ষণাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মেঘের ছবি। মেরুটি হচ্ছে হেভিডের কন্যা বিয়ান। তারা পক্ষপক্ষকে ভালবাসল। তাবপব একদিন তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে পিউইল একশো জন অনুচরসহ রিয়াননের পিঠার দুর্গে যাত্রা করল।

সেখানে পিউইলের সংবর্ধনার জন্য একটি

ভোজসভা বসল। খুব জোর খাওয়া-দাওয়া চলছে এমন সময় একজন যুবক সেখানে হাজির হয়ে পিউইলের কাছে একটি বব চাইল। পিউইল বর দিতে রাজী হলে সে বলল যে রিয়াননকে তার চাই। এই যুবকের নাম গ্ল, পূর্বে এ ছিল রিয়াননের পাণি-প্রার্থী। পিউইল উভয় সন্ধিতে পড়ল, শেষ পর্যন্ত রিয়াননের পরামর্শে সে জানাল যে, এক বছর পরে সে রিয়াননের দাবি ছেড়ে দেবে।

পর বছর ওই একই দিনে আবার ভোজসভা বসল। পিউইল দরদর পোশাক পরে বাদ্যশাস্ত্রসম্পন্ন একটি ব্যাণ নিয়ে সেখানে হাজির হল। অতঃপর সে গ্লের কাছে বর চাইল যে তার ব্যাগটিকে জিনিসপত্র দিয়ে ভরে দিতে হবে। গ্ল অনন্দের সঙ্গে রাজী হল। কিন্তু জিনিসপত্র দিয়ে সে কিছুতেই ব্যাগটি ভরতে পারল না। শেষ পর্যন্ত রিয়াননের প্ররোচনায় সে নিজেই পিউইলের ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করল। তৎক্ষণাৎ পিউইল ব্যাগটি বন্ধ করে দিল এবং সে এবং তার সঙ্গীরা সেই ব্যাগটিকে নিয়ে ফুটকি খেলতে লাগল। এই খেলেই নাকি 'ব্যাকগাব ইন দি ব্যাগ' নামক খেলাটির উদ্ভব হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পদাঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে গ্ল পিউইলের সত্ সন্ধি করতে বাধ্য হল। সাবাস্ত হল যে, রিয়াননের উপর গ্ল তার দাবি ছেড়ে দেবে, এবং পরেও কোন প্রতি-হিংসামূলক অচরণ করতে পারবে না। গ্ল রাজী হল। তখন তাকে মুক্ত করা হল।

অতঃপর পিউইলের সঙ্গে রিয়াননের বিবাহ হতে আর কোন বাধা রইল না।

রানওয়েন ও রান

আমরা পূর্বে সমুদ্রদেবতা লিরের সন্তান-সম্ভবতার কথা উল্লেখ করছি। দেবী মনের কন্যা পেনারডানের গর্ভে জন্মেছিল মানাওয়াইডুডান এবং জাওরাইডের গর্ভে জন্মেছিল রান ও রানওয়েন। এ ছাড়া পেনারডানের পূর্বস্বামীর ঔরসে জন্মেছিল দুই পুত্র নিসসেন এবং এডলিসলেন। এই কয়েকজনকে নিয়ে লিরের পবিত্রাব। এদের নেতা ছিল রান।

একদা যখন তারা সমুদ্রের ধারে বসেছিল, তখন হঠাৎ দু'থেকে তেরটি জাহাজ তাদের দৃষ্টিগোচর হল। খুব নিম্নে জানা গেল জাহাজগুলি আশল্যাণ্ডের রাজা মাথোলোচের এবং সে এসেছে রানের বোন রানওয়েনকে বিবাহ করতে। রান অনন্দের সঙ্গেই তাব ভগ্নীকে সমর্পণ করল। কিন্তু রানের সৎ-ভাই এডলিসলেন এতে ক্ষুব্ধ হল, কেন না তাব সম্মতি নেওয়া হয় নি এবং সে মাথোলোচের মোডাগলির লেজ কেটে নিল। আরল্যাণ্ডের রাজা এই বিষয়টিকে অপমান বলে গণ্য

করল। রান ব্যাপারটি জানতে পেয়ে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে উত্তরপক্ষের শান্তিস্থাপন করল। রানওয়েনের সঙ্গে আরল্যাণ্ডের রাজা মাথোলোচের বিবাহ হল।

কিন্তু এক বছর পর আরল্যাণ্ডে জানা-জানি হয়ে গেল যে, তাদের রাজা বৃট্টেনে অপমানিত হয়েছিল। ফলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাণী রানওয়েনের উপর অত্যাচার আরম্ভ হল। তাকে নিজহাতে রানী করত হত। শেষ পর্যন্ত সে তার নিজের কথা বৃট্টেনে কোনগাতিতে পৌঁছে দিল। তখন রান ক্ষুব্ধ হয়ে এক বিশাল নৌবাহিনী সংগ্রহ করে আরল্যাণ্ডে অভিযান করল।

আইরিশরা জানত যে রানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের নেই। তখন তারা সন্ধি করল রানের সত্ই। সম্মান উভয় পক্ষের বীরদের নিয়ে ভোজসভা বসল। সেখানে রানওয়েনের পুত্র, রানের ভ্রাতৃপুত্র আনা হল। রানের তিন ভাই শিশুটিকে আদর করল, কিন্তু চতুর্থ ভ্রাতা দুর্ভাগ্যবশত এডলিসলেন বালকটিকে তুলে নিবে জ্বলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করল।

সারা প্রাসাদজুড়ে তখন একদিকে হাহাকার, অপরদিকে প্রতিশোধের আগুন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ লেগে গেল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ধ্বংস হল। আহত রান তার অনুচরদের অনুরোধ করল যেন তাবা তার মাথাটি কেটে নিয়ে বৃট্টেনের সমুদ্রপাক্ষে স্রোতের দিকে মূখ্য করে পড়ে দেয়।

রানের সন্তান অনুচর তাব মৃত্যু এবং রানওয়েনকে নিয়ে বৃট্টেনের দিকে যাত্রা করল। রানওয়েন সমুদ্রের মধ্যপথে এসে একবার আরল্যাণ্ড এবং একবার বৃট্টেনের দিকে তাকাল। আমায় অন্য দুটি দেশই ধ্বংস হল, এই কথা বলে ভানবদলে সে প্রাণত্যাগ করল। তাকে সমাধিস্থ করা হল আলক নদীর তীরে, স্থানটির নাম হল ইনিস রানওয়েন। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে এই স্থানটি খুঁড়ে অর্ধদগ্ধ অস্থি ও ভস্মবাশি পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা এগুলি সেই বৃট্টেনের অস্ত্রোচিত রানওয়েনের দেহাবশেষ।

রানের মৃত্যুটিকে তার নিজের কথিত পশ্চিমতে সমাধিস্থ করা হয়। বৃট্টেনের গ্রামবাসীরা আজও মনে করে যে রানের মস্তক তাদের স্বীপকে এখনো পাহারা দিচ্ছে।

ঐন্দ্রজ্যোতিকে যুদ্ধ

এই ঘটনার পর লিরের বংশে রইল শব্দ মানাউইডুডান; কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তবুও বের মতই সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। শেষ পর্যন্ত সে আশ্রয় পেল প্রাইদেরী কাছে। প্রাইদেরী ছিল পিউইলের পুত্র (পূর্বকথিত পিউইলের কাহিনী স্মরণ্য)। ডাইফেড রাজ্যে প্রাইদেরী মানাউইডুডানকে আশ্রয় দিল এবং পিউইলের

সাম্প্রতিক বসন্ত

বিধবা স্ত্রী রিয়ানের সঙ্গে তার বিবাহ দিল। প্রাইদেবীর স্ত্রীর নাম কিচতা। এই চাবজনেয় সম্পর্ক-খুবই কষ্টপূর্ণ ছিল।

একদিন তারা তাদের দু'গের নিকটবর্তী প্রত্নজাতিক শিল্পসম্পদ টিবিটির (এটির কথা পিউইলের গল্পে বলাইছে) উপর বসন্ত, ভবিষ্যৎ জানবার প্রেরণায়। কিন্তু আকস্মিকভাবে সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল এবং তাবা দেখল যে, তাবা একটি নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক ফাঁকা কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রথম দিকে হতাশ হলেও ক্রমে তারা সামলে উঠল। তারা ঠিক করল তাদের বাঁচতেই হবে। ওইখানেই তাবা একটি কুটির বেঁধে বসবাস করতে লাগল। প্রথম দিকে তাদের শিকার করে পেট চলত। তারপর তারা চাববাস শুরু করল।

এদিকে একদিন দেখা গেল কে বা কারা প্রাইদেবী ও রিয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। মানাউইড্‌ডান তাদের প্রচুর খোঁজ করল, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। এ ছাড়া আরও একটি বিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। তারা যে ফসল রোপণ করেছিল সেগুলি ঠিক পাকবার মতোই কে বা ফারা কেটে নিয়ে যায়। তারা একদানা ফসলও ঘরে তুলতে পারে না।

মানাউইড্‌ডান প্রতিজ্ঞা কবল যে, যেমন করেই হোক এ রহস্য-ভেদ করতে হবে। একদিন ব্যয়ে সে তার ক্ষেত পাহারা দিতে লাগল, হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে একপাল ইন্দুর এসে সমস্ত ফসল খেয়ে চলে গেল। মানাউইড্‌ডান কেবলমাত্র একটি ইন্দুরকে ধরতে সক্ষম হল।

সে ঠিক করল যে, ফসল চুরির জন্য সে ইন্দুরটির ফাঁস দেবে। প্রাইদেবীর স্ত্রী কিচতা তাকে বলল যে, তার মত লোকের পক্ষে একটি ইন্দুরকে ফাঁস দেওয়া শোভা পাবে না। কিন্তু মানাউইড্‌ডান জানাল যে সে ইন্দুরটিকে ফাঁস দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হাঁতমধ্যে একটি ব্যাপার ঘটল। কোথা থেকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এসে হাজির হল। সে ইন্দুরটির মৃত্যুর জন্য এক পাউণ্ড দিতে চাইল। কিন্তু মানাউইড্‌ডান তা প্রত্যাখ্যান করল। তারপর এল একজন পুরোহিত। সে ইন্দুরটি মৃত্যুর জন্য তিন পাউণ্ড পণ্ডিত দিতে রাজী হল, কিন্তু সে-ও প্রত্যাখ্যান হল। শেষ পর্যন্ত এল এক বিশপ। সে ইন্দুরটির মৃত্যুর জন্য চাবিশ পাউণ্ড দিতে চাইল। মানাউইড্‌ডান রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত বিশপ ইন্দুরটির মৃত্যুর জন্য তার সমুদয় সম্পত্তি দান করতে চাইল।

মানাউইড্‌ডান একটি দাম কলল, তা হচ্ছে রিয়ান এবং প্রাইদেবীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিশপ রাজী হল। তখন মানাউইড্‌ডান জানতে চাইল ইন্দুরটি কে।

বিশপ বলল যে, ইন্দুরটি তার স্ত্রী। তার আসল নাম লুয়েড, প্রাইদেবীর পিতা পিউইল তাব প্রতিশ্রুতী গ্রন্থকে নিয়ে যে ব্যাঙগার ইন দি ব্যাংগ খেলেছিল তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য সে এই সমস্ত কাজ করিয়েছে।

এখন মানাউইড্‌ডান তাকে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞাগুলি কবে নিল: ডাইফেড রাজ্যটিকে পূর্বের মত করে দিতে হবে এবং পরে সে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে না। লুয়েড রাজী হল। তখন মানাউইড্‌ডান ইন্দুরটিকে ছেড়ে দিল। অবশেষে সেই মৃত্যুতেই ইন্দুরটি মানবীতে রূপান্তরিত হল।

রাজা আর্থার

ফেন্টার উপকণ্ঠার রাজা আর্থারের আগমন একটি সমস্যা। এ কথা পিউইয়েরা বলে থাকেন। সম্ভবত আর্থার ছিলেন দুজন, একজন দেবতা আর্থার, অপরজন মানুষ আর্থার, এবং এই দুইটির একসঙ্গে মিশে গেছে। আর্থারের গোলটেবিল একদিকে যেমন গেলীয় কাহিনীর ফিন ও ফেনীরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরদিকে তেমনি গুইডিম্নর সংক্রান্ত বৃটিশ কাহিনীগুলির প্রভাবও আর্থারীর উপকথাগুলির মধ্যে বিদ্যমান। আর্থার, তার স্ত্রী গুইনাইডডোর (গুইনগেভে) এবং তাঁর ভ্রাতৃ মেরডক (মেরডক) প্রভৃতি প্রেমকাহিনীগুলি ফিন, তার স্ত্রী গ্রাইন এবং তাব ভ্রাতৃ ডায়ারমারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী আর্থারের মৃত্যু হব নি, তিনি মহাবীর্য করেছিলেন এভিনন নদীর উপত্যকায়। অনুব্রূপ কাহিনী ফিন ও ফেনীরদের সম্পর্কেও বিদ্যমান। অপরদিকে আবার গুইডিম্নের কাহিনীগুলির সঙ্গে আর্থার-কাহিনীগুলির মিল আছে। সেগুলির দিকেও আমরা দৃষ্টিপাত করছি।

আর্থারের গোলটেবিল সম্ভবত কোন দেবদেবীর দ্বারা অর্পিত দেবতাদের চক্রের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। তাঁর নাইটদের কাষকলাপের মধ্যে প্রাচীন দেবগণের ক্রিয়া-কলাপের মিল পাওয়া যায়। আর্থারচক্রের উদ্ভব জ্যোতিষ ছিল মিরডীন যে পরবর্তী নর্মান ফ্রেন্স রোমান্সগুলিতে মার্লিন নামে পরিচিত। তাব স্ত্রী এলেন ওয়েলশ-কাহিনীতে সুপরিচিত। মার্লিন চরিত্রে গেলীয় দেবতা লুথ এবং বৃটিশ দেবতা লিউ-এর প্রভাব আছে। কথিত আছে মার্লিন শেষ জীবনে বন্দী হয়েছিল আকাশে। এ থেকেই বোঝা যায় যে সে সূর্যেরই একটি মানবীয় রূপ। আর্থারচক্রের আর একটি ব্যক্তি হচ্ছে কাই বা সার কে, সম্ভবত যে ছিল অগ্নির প্রতীক। অপর একজন যার নাম মার্চ, সম্ভবত কোমার মোর্কের চরিত্রের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। মার্চের

শুকরসম্পদ আর্থার অপহরণ করেছিলেন, যেমন গুইডিম্নর অপহরণ করেছিল প্রাইদেবীর শুকরসম্পদ। আর্থারের স্ত্রী গুইনাইডডোরের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃ মেরডক বা মেরডকের প্রেম পরবর্তীকালের সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। এই নিয়ে উভয়ের যে যুদ্ধ হয় তার ফলে আর্থার মৃতকল্প হয়েছিলেন।

বৃটেনে জাতীয় বীর হিসাবে আর্থারের প্রতিষ্ঠা তাঁর বীর্যপূর্ণ কাষকলাপের জন্য। বৃটেনের ভেরিটি মৌলিক সম্পদ উদ্ভাব, জাতি দ্রাভা কুলহুডের বহুপ্রাপ্তি নিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ, আরল্যান্ড বিজয় প্রভৃতি কাষ তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদা আসন দিয়েছে। বৃটেনে খৃস্টধর্ম প্রসারের জন্য খৃস্টীয় প্রচারকেরা আর্থার-কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছে। আর্থারকে খৃস্টের একনিষ্ঠ সেবক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং “হোলি গ্রেল” বা পবিত্র পাত্রের অনুসন্ধান কাষরূপ একটি কাহিনী আর্থারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। খৃস্ট যে পাত্র শেষ ভোজন কবে-ছিল সেটাই হচ্ছে হোলি গ্রেল। সেই পাত্র অনুসন্ধানের জন্য আর্থারের নাইটদের এডভেঞ্চার, যদিও এই এডভেঞ্চারের নামকরা—যথা সার পেঞ্জাস, সার বোরস, সার পার্সি-ভাল ও সার গালাহাড—আসলে পরিবর্তিত চরিত্র দেবতা ফিন আর কিছুই নয়।

তবে আর্থার-চরিত্রে কিছুটা ঐতিহাসিকতাও থাকতে পারে। ইংল্যান্ডের বিনি আদি লোকায়ত ঐতিহাসিক সেই জিওফ্রে অফ মনমাউথ তাঁর গ্রন্থের দুটি খণ্ডে আর্থার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, আর্থার আরল্যান্ড, আইশ-ল্যান্ড, গথল্যান্ড এবং অরকেনি দখল করেছিলেন, তা ছাড়া নরওয়ে, ডাকিয়া (ডেনমার্ক?) একুইটাইন এবং গলদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু এবপর জিওফ্রে বর্ণনা পৌরাণিক হয়ে গেছে। মর্যাপন্ন অহত হয়ে আর্থার যখন এভালন নদীর তীরে বসে তখন তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয় ক্যডোরের পুত্র কনস্টানটাইন, যে ছিল কনওয়ারের ডিউক। কিন্তু আর্থারের ভ্রাতৃ মেরডক তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয় এবং আর্থারের স্ত্রীকে বিবাহ করে। অবশ্য এর প্রতিশোধ আর্থার নিয়েছিলেন কম্বলার যুদ্ধে, যেখানে সকলেই মারা যায়, আর্থারও বাদ যান নি।

দেবতার রূপান্তর

আর্থারীর কাহিনীগুলি ফিন প্রসঙ্গে বলার ইচ্ছা আছে। কৌতুহলী পাঠক ওয়েস্টনের কিং আর্থার এন্ড হিজ নাইটস এবং আলফ্রেড নাটের লিঙ্কেন্স অফ দি হোলি গ্রেল পাঠ করে দেখতে পারেন। বর্তমানে এটাই দেখাবার চেষ্টা করছি যে, আর্থার চরিত্রটি গঠিত হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে, দেবতার রূপান্তর ঘটেছে মানুষে।

মৃত পাগলের উক্তি থেকে

শান্তনু দাস

সেই পথ...

মনে পড়ে

মাসকলারের ক্ষেত

সাপের চোখের মত সন্ধ্যার পশ্চাদীঘি ঘাট।

ধুলো পায়ে আলপথে হেঁটে,

দীর্ঘ সড়ক বেয়ে আমি আজ মিশে আছি দিকচক্রবালে

শীতের জ্যোৎস্নার মত নির্লিপ্ত প্রেমিকা-হৃদয়

এখনো অম্লান মূখে, আলগোছে স্বপ্ন দেখে নাকি?

আমরা তো স্বপ্ন দেখি

স্বপ্ন গড়ি

স্বপ্ন নিয়ে হাঁটি

দেয়ালে লটকানো ছবি অশরীরী আত্মা হয়ে ঘেরে,

কারা যেন ক্রমাস্বয়ে কাঁদে...

দীর্ঘশ্বাস, চড়ুইয়ের মত

জানলা গলে কোথায় মিলেয়?

'...কাল বৃষ্টি সূর্য উঠবে না

বিমর্ষ প্রদীপ, আলোগুলি অশ্বকারে মোড়া

ভয়াত' দোকান-পাট অনায়াসে কাঁপ বন্ধ হ'ল...'

নিয়মিত প্রসন্ন সকালে

হকারের দড়িগোড়া সফেদ কাগজ

অনায়াসে সূর্য নিয়ে আসে।

...সব যথাস্থানে আছে, যা কিছুই গতানুগতিক,

দ্রোণ,

বাস,

স্নাতা ঘাট, শরতান, মৃৎখোশ

আরও...আরও নশ্ব কিছু।

শুধু এক আত'নাদ ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ফেলে

'কারা? কারা যেন ভেগে আছে ঘরে

কাল বৃষ্টি সূর্য উঠবে না

তবে কেন ভয়াত' দোকানগুলো,

অনায়াসে কাঁপ বন্ধ হ'ল...'

দীর্ঘশ্বাস চড়ুইয়ের মত

জানলা গলে কোথায় মিলেয়।

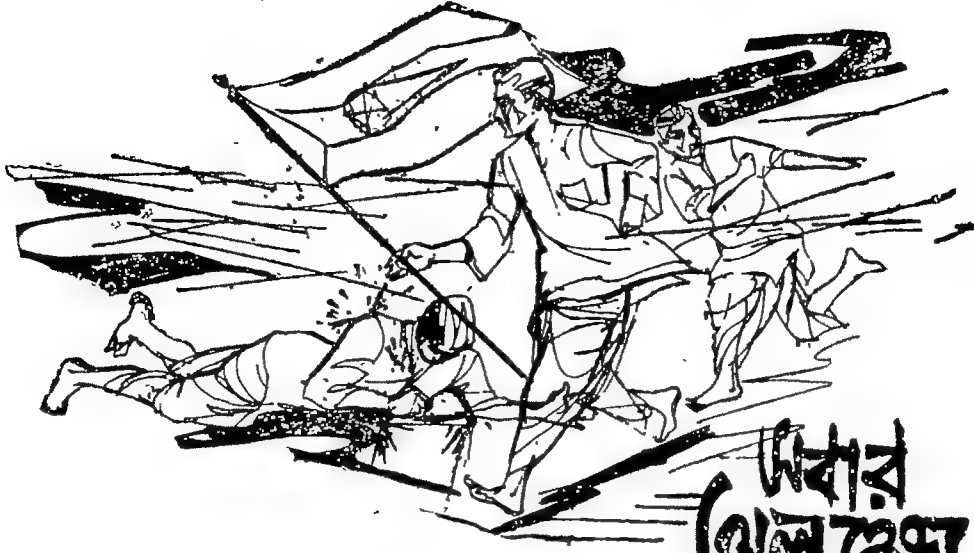
এই পরিবর্তন শুধু আর্থিক চরিত্রই লক্ষ্যের নথ। আমরা দেবতা মূর্তির কাহিনীও উল্লেখ করতে পারি। এই আকাশের ঠান্ডাটি আর্থিকের জ্ঞান হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। ইনিও বৃটেনের অন্যতম জাতীয় ঐতিহ্য। যিনি তিনব্যব বটেনকে স্লেগের হাত থেকে বন্ধ করেন, হান্সব্রুপী এক অসুস্থকে বধ করেন এবং দেশের খাদ্যাভাব দূর করেন। পরবর্তীকালে এই লুড সমুদ্রদেবতা লির-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষিত হয়। এই লিরের কন্যা জেউডিলড, যাকে জিওফ্রে উল্লেখ করেছেন কডেইল্লা বলে এবং যে সের-শীয়ারেন নাটকের কডেইলিয়া। জিওফ্রে কাহিনী অনুযায়ী ব্রাউডের পুত্র লির বা লিমার তার রাজ্য তিন কন্যা গনোরিলা, রিগান ও কডেইলিয়ার মধ্যে ভাগ করে নিতে ক্ষম্ব করে, কিন্তু গনোরিলা ও রিগানের তোষামোদের জন্য স্পষ্টভাবী কডেইলিয়াকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করে। গনোরিলার বিবাহ হয় আলবানিয়ার (উত্তর বটেনের আলবা) ডিউকের সঙ্গে, রিগানের হয় কার্নোয়ালের ডিউকের সঙ্গে। ফ্রান্সের

রাজা আগনাইস্পা কডেইলিয়াকে বিবাহ করে। কিন্তু অতঃপর নিজেদের ভাগ পেয়ে যাবার পর গনোরিলা ও রিগান পিতাকে অশ্রদ্ধা ও তাব উপর অভ্যচার শব্দ করে। তখন কডেইলিয়া পিতাকে আশ্রয় দেয় এবং তার স্বামী ফ্রান্স বাহিনী আলবানিয়া ও কার্নোয়ালের ডিউকদের হারিয়ে। ইংলন্ড অধিকার করে পিতাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর রাজা লিমার তিন বছর বৈচিত্র্যলেন এবং তাঁকে সমাধিস্থ করা হযেছিল লিসেস্টারের (লির-সেস্টার) নদীতটে। লিরের এই সমাধি মন্দিরটি গত শতকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেসগীয়ার এই পৌরাণিক কাহিনীটি তার নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

উপসংহার

কেল্টীয় কথা ও কাহিনী টিউটনদের মত জটিলমকর্পণ নয়। পঞ্চমস্তরে জটিলমকর্পণ সত্ত্বেও টিউটন কাহিনীর একঘেয়ে ভাব কেল্টীয় উপকথা অনুপস্থিত। কাহিনীগত দিক থেকে টিউটন উপকথা বেশি সমৃদ্ধ কিন্তু সব কাহিনীগুলিই যেন একছকে বাঁধা-বাঁধ

নারক নিজ গুণপনার নারিকার হৃদয় জয় করে, কিন্তু ভাগ্যচক্রে শত্রুর বড়বন্দে তাকে প্রাণ হারাতে হয় প্রিয়তমাকে কাঁদবে। ঠিক এই ধরনের কাহিনী কেল্টীয় উপকথার বিরল। অপর দিকে, টিউটন উপকথার খৃস্টীয় প্রভাব বড় কম, যা কেল্টীয় কাহিনীতে অনেক বোঁশ। এ পরিষ্কার বোঁশা বার, খৃস্টীয় প্রচারকেরা কিভাবে পুরাতন কাহিনী-গুলিকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগিয়েছেন, কিভাবে প্রাচীন দেবতাদের সেটে খৃস্টানিত করিয়েছেন। কেল্টীয় কাহিনীগুলির বারবার হান্সব্রুপী হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে। সেই কারণেই টিউটন-কাহিনীতে যেমন 'জমাট' গল্প আছে, কেল্টীয় কাহিনীতে তা নেই। বহুব্রার হাত বদলের জন্যই কেল্টীয় দেব-দেবীর চরিত্র তেমন ভাল করে ফোটে নি, যেমন ফুটেছে টিউটন দেব-দেবীর চরিত্র। বস্তুত ওডিন, বা বলডার বা লোকির কাছে লুয় অথবা লুয়াডা অত্যন্ত স্থান, ফ্রেঙ্ক্সা কিংবা ইডানের পাশে কোন কেল্ট দেবীকে বসানো-বাস না, জোতান দৈত্যদের প্রতিপত্তির তুলনায় ফ্রেমররা বড়ই নিপ্ৰভ।



বিহার এল হুম্রা

ভূগোলবিজ্ঞানের স্মৃতি-স্মারক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

**বিপ্লবের ইতিহাসের তথ্য কে দেবে?
কাকে দেবে?**

আমাদ্-হিন্দ-ফোজের কর্মকাণ্ড বা ১৯৪২ সনের আন্দোলনের কথা বাদ দিলে বাংলা তথা ভাৰতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাস সব-টাই কতিপয় গুপ্ত-সমিতির ইতিহাস। এ ইতিহাসেব পনের অনানই অব্যক্ত। বাকি এক ছানা পাওয়া যাবে ব্রিটিশ আমলের সবকারী রিপোর্ট-গুলোর মাধ্যমে। সবকারী রিপোর্ট-গুলোর দেওয়া ঘটনাগুলোর তাবিখ ইত্যাদি ও কিছু কিছু সংবাদ ব্যতীত বাকিটা কত-দূর নির্ভরযোগ্য তা বিচারবিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। যারা শত্রু সবকারী রিপোর্টের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখতে চান বা প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছেন বলে খুশি অনুভব করেন, তাঁদের স্বাধীন রাখেতে হবে যে উহাতে খুশি হবার কারণ নেই। পুঁলিশের তথ্য সংগৃহীত হত সাধারণত তাদেরই স্পাই এবং ওখাচারদের দেওয়া রিপোর্ট থেকে, বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তি থেকে এবং সবকারী এক্সেস্ট-প্রভোকেটর বা এ্যাপ্রডাবদের বক্তব্য থেকে। বিপ্লবীদের মধ্যে যাবা একটু কাঁচা তাদের কাছ থেকেই স্বীকারোক্তি আদায় কবত পুঁলিশ মাৰপিট কবে, অকথ্য ট্রাস সৃষ্টি কবে এবং বহু ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে। তথাকথিত এসব স্বীকারোক্তিগুলো অনেক পৰীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেগুলো দেওয়া হত দুটি কারণে: (১) পুঁলিশের অভিবৃতি মত মামলা সাজানব জন্যে, এবং (২) পুঁলিশের কাজ দেখাবার ও উপবণ্ডখালারদবকে খুঁণি কবে চাকরিতে উন্নতি কবাব দুবন্ত আগ্রহ থেকে। আমবা বহুক্ষেত্রে জানি যে পাতার পর পাতা 'কন্ফেসান্' পুঁলিশের প্রয়োজনে একান্ত নিৰ্ণাতিত, ভয়-

গ্রস্ত ও মৌকাপ্রাপ্ত কিশোরদের কাছ থেকে আদায় করে অৰ্ধসত্য ও মিথ্যা জড়িত সাক্ষ্যর সাহায্যে তাদের ও অন্যদের সাজা দেওয়া হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে মাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহাব করার পরও বে-আইনী-ভাবে পুঁলিশ তার সূষণ কোর্টে নিবেছে। অথচ সে-স্বীকারোক্তিব কোন মূল্য নেই—কারণ তার সাড়ে পনের অনানই পুঁলিশের সাজানো কথা, স্বীকারোক্তি যে কবেছে তার কথা নয়। খাপা দিয়ে তার কাছে আখ-অনা কথা আদায় করে বাকি সাড়ে পনের অনা তার অজ্ঞাতেই অনেক সময় ঐ বিবৃতিতে ঢাকিবে দিয়ে তাকে এবং তার সঙ্গী বন্দী-দেবকে ঝায়েল কবাব চেষ্টা কবেছে ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী ব্রিটিশের গোলাম স্বদেশী-পুঁলিশ। অভ্যেব পুঁলিশ-রিপোর্ট বা কেস-রিপোর্ট-গুলোর উপর নির্ভব কবে যে ঐতিহাসিক অগ্রসব হতে চান, তিনি 'বিপ্লবের ইতিহাস' (গুপ্ত-সমিতিগুলোর ইতিহাস) বচনা কবতে পারবেন না। সূতবাং সাধারণ বুদ্ধি থেকেই আমবা বুঝতে পারি যে, ঘটনার তাবিখ ইত্যাদি ও বিপ্লবকার্যের ভাসা-ভাসা খবর ছাড়া সবকারী রিপোর্টগুলো বা মামলাব নথি-পত্র বিপ্লবীদের বিলবকর্মের গোপন তথ্য কিছুই নির্ণয় কব না। গুপ্ত-সমিতিগুলোর যা-কিছু ব্যক্তকর্ন তার সত্যমিথ্যা খানিকটা পুঁলিশের ফাইল থেকে পেলেও তাদের অযান্ত বা গোপন কর্মের সংবাদ সম্পর্কে পুঁলিশের উপর নির্ভব কবা অৰ্থহীন, কারণ তারা কিছুই জানতো না। জানলে বিপ্লবীরা কোন যাকশান-ই কবতে পারতেন না। সংগোপনে নিজেদের অতিত্ব বহুবাব পর বহুব বাঁচিয়ে রেখে কাজ কবে যাওয়া অসম্ভব ছিল।...

তবে বিপ্লবের এই গোপন ইতিহাসের আসল তথ্য দিতে পারেন কে বা কাহাবা? পূর্বেই বলেছি যে, তা দিতে পারেন শত্রু সেসব বিপ্লবীবাই যাবা বিশ্লব-কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কিন্তু বিশ্লবর নেতাবা কালের ধর্ম অনুসাবে আন্তে আন্তে এই পৃথিবী থেকে সবে যাচ্ছেন। তবু আজো যাবা বেঁচে আছেন তাঁবা একত্র হয়ে ঐতিহাসিকদের জন্যে গুপ্ত-সমিতিগুলোর পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে বেতে পারেন। সে-সব তথ্যাবলী আশ্রয়ে ঐতিহাসিক-দৃষ্ট থেকে একমাত্র দেশাত্মিক ইতিহাকাব-ই বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাস প্রণয়ন কবতে পারেন। আবার বলি অরবিন্দর ভাষায়, সেই ইতিহাসকাবে 'স্বপকাব' হতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি কথা উঠেছে যে, দলের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যেসব বিপ্লবী আজ পর্যন্ত বর্তমানে লিখেছেন সেখানে তাঁবা নাকি দলের উদ্দেশ্য উঠতে পারেন নি—নিজেদর দলের পক্ষ টানতে গিয়ে তাঁবা অপককে ছোট করেছেন, অপাবাব যা প্রাপ্য তা উল্লেখ করেন নি।

এ-কথা একেবারে মিথ্যা না হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ নামী বিপ্লবীদের দু-একখানা বই আমরা দেখেছি—তাতে তাঁবা দলের উদ্দেশ্য উঠাব চেষ্টা কবেছেন। নির্ভব-শীল বিপ্লবীদের দেওয়া তথ্যের উপবই ঐতিহাসিককে নির্ভব করতে হবে। তথ্যাদাতার স্মৃতিশক্তি দূর্বলতা বা একটু বাড়িয়ে ধলাব চেষ্টা থেকে সে-সব তথ্য কিছু ত্রুটি থাকলেও তা ইতিহাসকে বিকৃত কবে না। এবং এই স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা বা নিম্নেব দলের প্রতি গুরুপাতিত্ব দেখানর চেষ্টা ইত্যাদিও

হুলাংশে আতঙ্ক করা সম্ভব, যদি একাধিক হুমায়ুন প্রত্যক্ষণী বিপ্লবী একত্রে বসে গুণাসংগ্ৰহগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেন। ...তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে 'দল' কথা লিখলেই তাতে নিজের দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, অথবা অপব দলগুলোকে উপেক্ষা করার দোষও বর্তে না। নিজেদের দলের কথা নিজেরই লেখা কর্তব্য, কারণ অপরের তা জানবার হেতু নেই।...

‘সবার অলঙ্কো’ লিখবার প্রয়োজন কোথায়?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ‘সবার অলঙ্কো’ বাংলাদেশের বিপ্লব-ইতিহাসের পটভূমি লিখিত বিশেষ করে ‘বেঙ্গল ড্যান্সিটরাস’ নামক বিপ্লবী-সম্ভার ইতিহাস। অসংকে হস্ত প্রদান করবেন যে আমরা সমগ্র বাংলার সম্পূর্ণ বিপ্লব-ইতিহাস না লিখে শুধুমাত্র একটি দলের ইতিহাস লিখেই যেমি গোলাম কেন? অথবা দলের ইতিহাস বড়টুকু লেখা হয়েছে তা আবার কিছুটা বিশদ করে লেখা হল না কেন?

এ প্রশ্নের কিছু উত্তর ‘সবার অলঙ্কো’ ভূমিকায় আছে। এখানে সেই কথা পরিষ্কার করে লিখছি।

ইহা আজ আর অজ্ঞাত নয় যে বাংলাদেশে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির কর্ম-ইতিহাস লিখিত হলেই ‘সব’ বাংলার পূর্ণ বিপ্লব-ইতিহাস রচিত হতে পারে। এবং যারা দল-বিশেষেব নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখবার অধিকারী তারা সরকারী সাহায্য না পেয়েও যদি নিজের চেষ্টায় দলের ইতিহাস লিখে যান তবে কাজ বহুদূর এগিয়ে যার। আমরা তাই ‘বি-ভি-র’ ইতিহাস লেখা স্থির করি। এ ইতিহাস লিখছি সমগ্র বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসের পটভূমি। অন্যান্য দলের অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস ততটুকুই আমরা দিবেছি, যা দেবার যথার্থ বোগ্যতা আমাদের আছে।

‘বি-ভি-র’ ইতিহাস লিখতে গিয়েও আমরা অভাব বোধ করছি বিশেষ করে গ্রীষ্ম পাল, খগেন দাস, প্রমথ চৌধুরী, আলিমদ্দিন সাহেব, কৃষ্ণ অধিকারী ও অনিল রায়ের। তারা ইহজগতে নেই। বস্তুতঃ তৎসম্পর্কে ‘বি-ভি-র’ নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ এবং হরিদাস দত্ত, রাজেন গুহ, সুরেন বসু, সত্য বসু থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয় কর্মীরা অধিকাংশই জীবিত থাকার এবং এই ইতিহাস রচনার তারা সর্বশেষ সাহায্য করার আমরা ‘বি-ভি-র’ সংকল্প অচ্যুত প্রামাণ্য ইতিহাস লিখতে পেরেছি। এ-ইতিহাস জাতির স্বাধীনতা-স্বপ্নেব ইতিহাস-রচয়িতাদের প্রয়োজন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যে গোপন ইতিহাস পৃথিবীর মানুষের জানবার কথা নয়, যে-ইতিহাস প্রচণ্ড কর্মের গোপন রসালার সৃষ্টি হয়েছে-সে-ইতিহাস উহার স্রষ্টাদের

মুখনিঃসৃত হয়ে আমাদের সঙ্কলিত এই সবার অলঙ্কো গ্রন্থে আক্ষরিক বর্ণ গ্রহণ করেছে। অন্তঃব বিপ্লব-ইতিহাসেব একাংশের সুনীতি এই রচনা পূর্ণ করার সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি। ভাবী ঐতিহাসিকদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা হলো ‘সবার অলঙ্কো’ লিখবার অপর কারণ। অবশ্য ইহা ‘গোপন’ কারণ। বিপ্লবীর ধারণা মত ইহা ‘প্রধান’ কারণ হতে পারে না। আমরাও এই কারণকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কারণ বলই মনে করি। বিপ্লবপন্থীদের ধারণা মত বিপ্লব-ইতিহাস লিখবার যে ‘মুখ্য’-বা প্রধান কারণ, সে-সম্পর্কে বিশদভাবে পূর্বেই লেখা হয়েছে।... (‘বিপ্লববঙ্গের অবদান’ গিরোলাপি প্রবন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ‘সবার-অলঙ্কো’)

বিপ্লবের ইতিহাস মিউজিয়ামে সুরক্ষিত মূর্তির ইতিহাস নয়। বিপ্লবের ইতিহাস গুরুমান কর্তার ইতিহাস, দুকূলপ্রাণী স্রোতস্থানীর ইতিহাস। এ ইতিহাস জীবনের—বে জীবন মৃত্যুহীন।

‘ফোরার রক্ত হতে, উম্মুর উম্মুস্রোতে, বন্দীবার উচ্চারিত অলঙ্কো’

কী অভিনন্দন! (বঙ্গ-ক্যাপের রাজবন্দীদের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতার কবিতা হইতে)

কাজেই জাতীয়-জীবনে বিপ্লব-ইতিহাসের প্রয়োজন, সৃষ্টির জীবনে সুরালোকের প্রয়োজন যেমন।...

তবে একথাও ঠিক যে, জাতির ঐতিহ্য গোপনে সঞ্চারিত থাকে তাব রক্তে। তাই উহা অলঙ্কোও কাজ করে। গত সত্তের বঙ্গের জীবনে আমরা ঘনাম্বকরে-মুদ্রপাক খেয়েছি। তামসিকবৃত্তি দুঃখের পথে আমাদের-টেনে নিয়েছে। কিন্তু অসহায়ের মতও বিগত শৌর্কের কথা কখনো কি আমরা ভাবি নি? হয়ত ভেবেছি। তবে পক্ষাঘাতমুগ্ধ মানসে প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খাবার হয়তো-বা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সেই ধাক্কা এলো ‘পাকিস্তান’ থেকে। সহসা যেন কালো দিগন্তের বক চিরে বহনিত হল প্রাণসূর্বের স্বধর্ষর।...

অধার মেখে রূপালী রেখা

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সাল। ভারতবর্ষে যথার্থই শ্রুত দিন সমাপ্ত হয়েছে। এত দুর্লভকণ বৃষ্টি গত আঠার বছরের রাষ্ট্রিক-ইতিহাসে ভারতের ভাগ্যে আর আসে নি। এই পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য করেই উঃ রামাকলাস বলেছেন: “ভারতবর্ষের এবাব নবজন্ম লাভ হল।” (দৈনিক বসুমতী—১৪-১০-৬৫)... আবার শাকিন রাজনীতিক চেষ্টার বোল্জ কলছেন:

“To-day India is bristling with self-confidence, proud of its extraordinary record of Unity, proud of its army which everyone had

wrongly assumed could not fight on a man to man basis with the Pakistanis.” (Amritabazar Patrika—25. 10. 65)

আজ যে পাকিস্তান ও চীন ‘সবার’ দুর্পে ভারতকে আক্রমণ করেছে তাতেই ভারতের অন্তরে ‘মেবতা’ জেগে উঠেছে। ভারতের যৌবন ব্যাকুলচিত্তে নিজে তাকিয়েছে তার অতীত ঐতিহ্যের পানে। ‘সে-ঐতিহ্য’ থেকে প্রেরণা লাভ করে এগিয়ে যাচ্ছে তরুণ-দল সম্মুখের দিকে অভ্যাস গড়তে। যে দুঃখের শহীদদল এইতো সৈনিক আশ্রয়ান করে গেছেন—তাদেরই স্মৃতি জন্ম নিয়েছেন আজকের অভিজ্ঞ, তাকর, প্রবাল ও তপন প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকদের মধ্যে। জন্মগ্রহণ করেছেন, অতীতের অলঙ্কোভরা, হাতিলাসার রহস্য আলি বা হাতিলাসার আশ্রয় গণি আজকের মৃত্যুঞ্জয়ী সেনানী হাতিলাসার হাতিম বা রিগেডিলার মহাম্মদ ওসমান প্রমুখের রক্তে। সঞ্চারিত হয়েছে মহানারক রাগবিহারী-বতীন্দ্রনাথ-সুর্ষ সৈনের ‘সংকল্প’ আজকের যুদ্ধকামী-নেতৃবর্গের মনসে। রূপারিত হয়েছে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-কোজের দেশপ্রেম ও-রক্ষাকৌশল আজকের ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্দম পদক্ষেপে।... আজ বিদমান বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলো ‘এক সূত্রে গাঁথা’ হয়ে জাতীয় সম্মান বাঁচাতে বন্ধপরিকর। আজ কালোবাজারীও যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—অন্তত সরকার ও জনতার কঠিন চাপে তাকে শাস্ত্যস্ত করার সুযোগ এসেছে। আজ পরম একেবারে বাপী কণ্ঠে নিয়ে বীর্য ও পৌরুষের পূজাগৃহে সমাগত দেশের নর ও নারী।...

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ বিশ্বমহীন কণ্ঠে স্বীকার করছেন যে: শক্তি সত্তর না করলে কোন জাতিকে কোন রাষ্ট্রই পরোয়া করে না। এ শক্তি বড় বড় ভাষকের মধ্যে লুকিয়ে থাকে না, এ শক্তি থাকে বড় বড় কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, ফাইটার-প্লেন বা যুদ্ধজাহাজের মধ্যে। এ-শক্তি পশ্চাতে অটল হয়ে থাকলেই পৃথিবীর শক্তিমান জাতিগুলো কথা শেনে, সাদরে শান্তির বাণীকেও নেড়েচড়ে দেবে। প্রচণ্ড আঘাত দেবার কমতা বার আছে, সেই আঘাত করার মতলবে যে ‘দুর্ভবদৃশ্য’ এগিয়ে আসে তাকে প্রতিহত করতে পারে।...[অবশ্য ঐ সব বৃহৎ কামান-বন্দুক-ট্যাঙ্ক মানুুষের হাতের অশ্রু হওয়া চাই। দস্যুর নয়, ক্রীষেরও নয়। কাজেই মানুুষ-গড়ার আবেদন সর্বত্র।]...

শাস্ত্রীজী আরো বলেছেন যে: আমরা এখন থেকে শক্তিমান হব। এক ঘা খেলে প্রত্যন্তর আরো দশ ঘা বসিয়ে দেবার শক্তি অর্জন করব। নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে ‘অহিংসাব’ পরিবর্তে প্রয়োজনে অবশ্যই ‘অহিংস’-যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। কারণ

এখানে আমাদের শিক্ষা হয়ে গেছে যে, হিংস্র শত্রু কখনো অহিংসকে মর্বাদা দেয় না, অহিংসকে দুর্বলতার লক্ষণ মনে করে। কাজেই হিংস্র শত্রুকে শিক্ষা দিতে হবে তার নিজস্ব ভাষায়—অর্থাৎ সহিংসায়। অধিকন্তু ভারতের স্বার্থে আমাদের বৈদেশিক নীতিও ঢেলে সাজতে হবে। নান্যঃ পৃথগা বিদ্যতে।...

বাস্তব রাজনীতিকের মতই আদর্শনিষ্ঠ শাস্ত্রীজী তাই গিসকিউরিটি কাউন্সিলে (ইউ. নো) পাকিস্তানী বৈদেশিক মন্ত্রী জুটোর অশ্লীল গালাগালি দেবার ব্যতী শূন্যে বলতে পারলেন:

“A great and dignified nation like India will not give retort to Pakistani vulgar languages in similar strain. But its vile abuses will be met by India's arms and might.” (All India Radio—28. 10. 65)

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ অহিংসার মতুল করে ব্যাখ্যা দিলেন: আমরা চেষ্টা করব শত্রুকে ভালবাসা বা ভাল কথাবার্তা দ্বারা যুক্তির

ments and ‘Strange alignments’ was that there could be no substitute for self-reliance and that there could be no compromise on national sovereignty.”...

আজ প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ—এমন কি রাজাজীও বলছেন যে, ব্রিটিশ বা আমেরিকা আমাদের শত্রুতা করছে, তাদের সংগে মিত্রালি রাখা বড়ই মুশকিল। তাদের সংগে ভাল করে বোঝাপড়া করার দিন এসে গেছে।...

বহুব্যবসায়ী, বহু কক্ষাতি ও অপমান-লাঞ্ছনা স্বীকার করে আজ যে শিক্ষা কংগ্রেসী নেতারা লাভ করেছেন তার মূল্য অসামান্য। জাতির জীবনে একান্তই শুল্কলপন সমাগত, কারণ তার কর্ণধারগণ আজ আত্মসম্মতি ফিরে পাচ্ছেন।...

পূর্বেই বলেছি নেহরুজীর ভারতবর্ষ ভেবেছিল যে, অহিংসার দ্বারা ইংরেজের হৃদয় জর করে তার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এ ভুল-তার মূল ভুল। তাই নেহরুজীর ভারতবর্ষ সমগ্রত্ব তৈরির কারখানাগুলো ছেলেমেয়েদের খেলনা গড়ায় মন দিল। কারণ, ‘বিস্বশান্তি’ রচনায় তার কোন কপটতা থাকলে চলবে না। পারমাণবিক যুদ্ধের মহড়া আমেরিকা-রুশ-জাপান-চীন দিলেও আমরা যে ‘মিসিনগান-এর সম্মুখে’ গাইবো ‘শুই ফুলেরই গান’। এ পণ্ডিত রচয়িতা জানতেন যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তিকভাবে সত্য, তা সমষ্টিগত জীবনে সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল ধরে নিলেন যে একটা জাতিও সেই শক্তিই অর্জন করে ফেলেছে অহিংসা মন্ত্রের লালনে, যার বলে সত্য সে কামান-বন্দুককে নস্যাত করে দিতে পারে! সুতরাং পারমাণবিক বোমার কথা তো আমরা ভাবতেই পারি নি এতকাল। এবার চীন-পাকিস্তানের বেরসিক জগ্মীবাজির মার খেয়ে অন্তত ‘Atomic deterrent’ হিসেবে পারমাণবিক শক্তিকে প্রয়োগ করার কথা আমরা ভাববো কি? না ভাবলে আরো কিছুর মার খেয়ে ভাবতেই হবে একদিন।...

জওহরলালের ভারতবর্ষ ‘শুই ফুলেরই গান’ শুনতে গিয়ে কোন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল? তার জোরানদেহকে খেতে হল কেমন মার লাডাক ও নেফা ফ্রন্টে? ভারতীয় সমরনেতৃত্ব অর্জন করল কেমন অপমান, পরাজয় ও গ্লানি?.....এতে নেহরুজীর আকাশচরী-রূপনায়ও অবশ্য বাস্তবের স্পর্শ লাগতে শুরুর করল। তাঁর দেহরক্ষার পূর্বেই তাই তাঁর অনুগামীরা লোকমতের চাপে একটু একটু করে কঠিন মার্টিটে পদাঙ্গণ করতে লাগলেন। আমাদের সামরিক প্রস্তুতি এগিয়ে চলল। তবে কছ রণাঙ্গনে আমরা ‘ডিমোমেটিক মার’ খেলায়। এবং আমাদেরই অসতর্ক মূহুর্তে হাজার হাজার জগ্মীব

অনুপ্রবেশকারী ঢুকে গেল কাস্মীর এলাকার। উদ্দেশ্য, সুপারিকলিপিত একটি বিদ্রোহ ঘটানো।...এবার আমাদের শান্তি প্রচারের মোহ চরম অঘাত পেল। আমরা যথার্থ সন্নিবি ফিরে পেলাম।...এখন আমাদের নেতৃ-বৃন্দ ‘মার্টিনারডম’-এর কথা বলছেন। সশস্ত্র অভিযানে রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুবশক্তিকে তাঁরা উদ্বেগ করার চেষ্টা করছেন। অত্যন্ত ভরসার কথা যে, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা স্বিধাহীন কঠোর স্বীকার করেছেন:

“...If it had not been for the Revolutionaries in Bengal and Punjab in the old days and for the great non-violent struggle of Mahatma Gandhi, the United Kingdom would not have transferred power to us.”...

(A. B. Patrika—28. 10. 65)

কিন্তু অপর কোন নেতাকে পরম বিপৎ-কালেও নেতাজী বা বিপ্লবীদের নাম নিতে



অভিযুক্ত চট্টোপাধ্যায়

পথে আনতে। সেটা শক্তিমানেই কাজ। কিন্তু তবু যদি শত্রু সম্মুখে আমাদের দেশকে বিপন্ন করে, তবে সশস্ত্র যুদ্ধে তাকে পরাভূত করব। আত্মরক্ষা যেকোন প্রকারে করার অধিকার প্রাণী মানবেরই আছে। সেটা অহিংসাধর্মের ব্যতিক্রম নয়। অহিংসা মানে ‘দুর্বলের মার খাওয়া’ হতে পারে না। অহিংসা মানে শক্তিমানের মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ান।...

প্রতিরক্ষামন্ত্রী চাবন-এর কণ্ঠে আজ শোনা যায়:

“The first lesson for the people of India from the recent develop-



তপন চৌধুরী

শোনা যায় নি। ‘আকাশবাণী’ দেশের লোকের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্যে হিম্মিসম খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে ভুলেও একবার নেতাজীর কথা বা শহীদদের জীবন নিয়ে আলোচনার চেষ্টা দেখি নে। অথচ এই নেতাজী সম্পর্কেই সরোজিনী নাইডুর অননুক্রমণীয় উক্তি:

“Subhas is a Flaming Sword!”

সংগ্রামী কংগ্রেসের সংগ্রামী প্রতীক সরোজিনী নাইডুর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের সন্তাকে সেদিন ‘বহিদীপ্ত ভরবারি’ রূপে অনুভব করা সম্ভব হলেও বর্তমানের আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে নেতাজীর সেই প্রোম্পট রূপ ধারণা করা সম্ভব নয়।

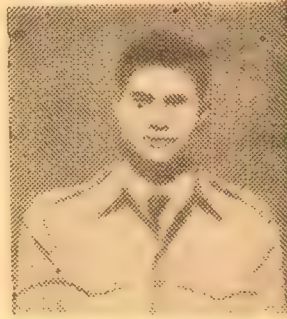
তবে পূর্বেই বলছি, পাকিস্তান ও চীনের প্রচণ্ড আঘাতে নেতাদের হস্ততো 'আত্মপ্রসাদ' লাভের মোহ কেটে যাচ্ছে। ব্রিটিশের প্রতি মোহান্বিত আসক্তিও হস্ততো একটু স্থান হয়ে আসছে। অথচ কবি মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য-মর্ম অনুসারে বলা যায় যে, ১৯২১ সাল থেকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটি মাত্র পদব্রূই এই মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন—তিনি সুভাষচন্দ্র বসু...যাহোক, বর্তমানের নেতারা যদি অনেক ঠেকে কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকেন তবে তার চেয়ে শান্তির কথা আর কী আছে? কিন্তু যে 'বোধ' তাদের লাভ হয়েছে তা যেন স্থায়ী হয়। এই 'বোধ' কিছুমাত্র কারসাজি বা কারচুপি থাকলে অসুস্থ শস্ত নিয়ে 'সিঙ্গ-ফায়ার লাইনে' আমাদের শ্রেষ্ঠ যুবশক্তিরা দাঁড়িয়ে থাকা ব্যর্থ হবে; কারণ ডিপ্লোমেটিক যুদ্ধে এবারও আমরা হেরে যাবো। 'অহিংসা' এবং তথাকথিত 'শান্তি'র প্রতি মায়ী এবং ইংরেজ-মার্কিনের প্রতি 'অহেতুক ভক্তি' নির্মূল না করলে বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করার পথে আমাদের বিঘ্ন ঘটবে। নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা বা কপটতা কিন্তু চীন-পাকিস্তানের দৌলতে জাতি যতটুকু 'সাবালক' হয়েছে, তাও স্থায়ী হতে দেবে না...শাস্ত্রীজী থেকে অতুল্য বোধ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ 'বৈদেশিক নীতি' দেলে সাজবার কথা ভাববার কালে কুপালিনজীর কথাগুলো স্মরণ রাখলে তাঁরা দেশেরই উপকার করবেন।...আচার্য কুপালিন বলছেন:

"The country was being told that its foreign policy had 'eminently succeeded'. But what had succeeded was not foreign policy, which had isolated India, but the country's Military machine. From the very beginning India's foreign policy had been miserably misconceived. Foreign policy depended upon a proper assesment of situations and anticipation of events. But was this the case with India's policy on Tibet, China and Pakistan? Did we understand the situations properly? India had sought to solve international problems with the principles of non-violence as if international affairs were a Zamindari. Had India understood Mao Tse-tung, she would not have suffered at the Chinese hands. Her nations misunderstood situations and failed to anticipate

events they came to grief. India's military preparedness was such that the country staggered at the first blow of the Chinese in NEFA. Instead of arming herself, India's armament factories had been (at that period) producing locks!"...

(A. B. Patrika, 17. 11. 65)

[দেশবাসীকে শোনান হয় যে, ভারতবর্ষের 'বৈদেশিক নীতি' নাকি অমৃত সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু আদর্শে সফল হয়েছে ভারতীয় সামরিক বশ্ত, বৈদেশিক নীতি নয়। ...শত্রু থেকেই একান্ত ভুল ধারণার উপর আমাদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। বৈদেশিক নীতি নির্ভর করবে অবস্থা ও ঘটনাবলীর বার্থ মূল্যায়ন এবং দূরদর্শিতার উপর। কিন্তু তিস্ত-চীন বা পাকিস্তান সম্পর্কিত নীতি অবলম্বনে এসব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল কি? আমরা কি কোন সময় অবস্থার গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি



ডাক্তার গুহরায়

করেছি? ভারতবর্ষ অহিংসা নীতির লালনে বিশ্বরাজনীতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চেয়েছিল, যেন সেসব তার খান তালুকের সমস্যা! ভারতবর্ষ যদি মাও সে-তুংকে বুঝবার চেষ্টা করতো তবে চীনের হাতে তাকে অমন করে মার খেতে হতো না। ঘটনা বা অবস্থার বার্থ মূল্যায়ন করতে না পারলেই জাতিকে দুঃখ পেতে হয়। তাই সেদিন সামরিক তৈয়ারির অভাবে নেফা রণাঙ্গনের প্রথম ধাক্কাই জৈয়ানদের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। আমরা তখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না থেকে অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলোর 'তালি' তৈরি করছিলাম!...

যাহোক এবার অপূর্ব সুযোগ এসেছে। এবার কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের মত ও পথকে সুন্দরভাবে শূন্যে নিয়ে সত্যি দেশকে বৃহৎ নেতৃত্ব দান করতে পারেন। আজ তাঁদের হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বোকা উচিত যে কেবল মাত্র চীন-পাকিস্তানের আঘাতেই

দেশের জৈয়ানরা সাহসী হয়ে ওঠে নি, হঠাৎ দেশপ্রেমের বন্যা এসেও তাদেরকে ভাসিয়ে নেয় নি—অথবা নেতৃবৃন্দও আচমকা ঠিক পথ ধরে অমন দৃঢ়তার চলা শুরু করেন নি। বৃহৎ হবে যে—ভরুগদের রক্তে রয়েছে বিপ্লবী ভারতের রক্তপ্রবাহ, তাদের জানা-অজানা চৈতন্যে রয়েছে ইম্ফল-চট্টগ্রাম-রাইটাস-বালাসোরের শৌর্যময় ঐতিহ্য; আর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বিস্মৃতি বিচূর্ণ করে চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁদেরই অতুলনীয় সংগ্রামী ইতিহাস। কাজেই জাতি ও তার নেতৃত্ব আজ যে 'বোধের' অধিকারী হয়েছে তা আকাশ থেকে ঝরে পড়ে নি। তা ধার করা বস্তুও নয়। তা' মূর্খমূর্খ ছিল তাদেরই মধ্যে। তা স্মৃত ছিল তাদেরই রক্তে। আজ পাকিস্তান ও চীনের ভীষণ আঘাত তাদের সেই স্মৃতি বা মোহ সহসা দূর করে দিয়েছে। এই নির্মম আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এক হিসেবে ইহা বিধাতার দৃঃসহ আশীর্বাদ!...

আজ কংগ্রেসী কর্তারা ভাল করে জানুন যে, দেশরক্ষার জন্যে 'সহিংস যুদ্ধ' যদি প্রশস্ত হয়, তবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার জন্যেও সহিংস সংগ্রাম অপ্ৰশস্ত নয়। ক্ষমতার না কুলালে অথবা 'ট্যাকটিক্স' রূপে 'অহিংসা'র পথে স্বাধীনতা আনার চেষ্টা মোটেও দোষণীয় নয়, কিন্তু 'সহিংস' সংগ্রামকেও তৎসঙ্গে দুষণীয় মনে না করাই দেশপ্রেমিক ও বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে বিধেয়!...

ভারতবর্ষের যে-যুবশক্তি বিপ্লবযুগে ইংরেজকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধে আঘাত করেছিল, যে যুবশক্তি আন্দামান-নিকোবর স্বীপপুঞ্জ দখল করে স্বরাজ ও শহীদ স্বীপ রূপে নতুন নামকরণ করেছিল, যে যুবশক্তি মণিপুর রণাঙ্গনে মিত্র শক্তির সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল—সেই যুবশক্তিরই রক্ত আমাদের বর্তমান ভরুগদের ধমনীতে বহমান। কেবল দুর্বল নেতৃবৃন্দের ত্রুটিতে জাতির সে মৌবন বিপথগামী হয়ে চলেছিল। উচ্ছৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত তার পথঘাটা যতই দৃঃখের হোক, যৌবনের বেগ সেখানে অপগত নয়। কাজেই সঠিক নেতৃত্ব সঠিকভাবে তাদের কর্ণকুহরে গভীর আহবান পেঁছাতে পারলে তারা স্বপথে ফিরে আসতে বাধ্য। "আপনি আচার্য ধর্ম জীবের শিখার"—এই আস্ত বাণী নেতাদের ভুলে চলেবে না। বিপ্লবের নেতারা কিন্তু কোন মূহুর্তেই এই বাণী ভোলেন নি। তাই তাঁদের আহবানে "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাদ্র-তাড়ি" কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো!...

বিপ্লবযুগের 'হা' 'সহিংস' হোক বা 'অহিংস' হোক নিয়মানুবর্তিতা, মার্কারভম, চরিত্রবল, দৃঃসাহস, পরাধীনতা ও অকপট আদর্শানুগত্য ব্যর্থ হতে পারে না—ব্যর্থ হয় নি। তাই তার পরিত্যক্ত আজ রেখে যাবেন

ক্ষেতের কৃষাণ, কারখানার মজদুর, আপিসের কেরানী, দরিদ্র মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের ভারতবাসী যার-যার কর্মস্থলে, দেশের প্রতি-রক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট রাখবার আহবানে। তারই পরিচয় আজকের জোষানদল ও তরুণ সেনাপতিবৃন্দ বৃকের ন্তে অব্যাসে রেখে যাচ্ছেন কাম্মীর-লাহোর-রাজস্থানের রুদ্ধ প্রান্তে, পূর্ব সীমান্তের নানা ক্ষেত্রে, নেফা-ভাডাকের অরণ্যপর্বতে।...

বিপ্লব বাধ্য হয় না। বিপ্লব চিরন্তন।...

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের দুঃখানা পত্র

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বর্ধন বি-ভির প্রবীণতম কর্মনেতাদের অন্যতম। তিনি হরিদাস দত্ত মহাশয়দের সমসাময়িক। বর্তমান বয়স সাতাত্তর। তিনি রঙপুর জিলায় 'নাগেশ্বরী' গ্রামায় বি-ভির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ও নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি-জন। 'রডা'-অস্ত্রলুপ্তের প্রধান আসামী হাবু, ক্ষেত্রে তার আগ্রহেই রাখা হয়েছিল। তিনি মিজে সূচিকিংসক ছিলেন এবং সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁর মতেষ্ট প্রভাব ছিল। হাবু, মিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য লেখককে প্রদত্ত তাঁর নিম্নোক্ত পত্র দু-খানায় লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে সুরেনবাবু পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় 'সুভাষগঞ্জ' গ্রামে বাস করছেন।]

(প্রথম)

সুরেন্দ্রনাথ বর্ধন,
পোঃ সুভাষগঞ্জ,
পশ্চিম দিনাজপুর।
তাং ১-১১-৬৫

ভাই ভূপেন,

...শ্রীশদা (শ্রীশ পাল) হাবুকে সঙ্গে করিয়া মৃৎলুপ্তের বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যার পরে ফুলীর বেশে আমার ওখানে (নাগেশ্বরী, রঙপুর) আসেন এবং পরদিনই ভোরে



এবাল রায়

(হাবুকে রাখিয়া) তিনি কলিকাতা ফাঁরয়া যান।

হাবু আমার কাছে মাস দুই ছিল। প্রথমে (আমার বাসায়-ই অবশ্য) একটু সংগোপনেই থাকিত। কিন্তু স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া শেষটার সে আমার কথা শুনিত না, আমার ঘোড়া লইয়া ছুটাছুটি করিত। গ্রামের সকলের সঙ্গেই সে মেলামেশা শুরু করিল। ফলে সকলের নজরে পড়িয়া গেল, বিশেষত খানার লোকেদের। আমার ওপর পুলিশের কিছু দৃষ্টি ছিল, তদুপরি নতুন লোক দেখিয়া এবং খাস কলিকাতার কথা উহার মুখে শুনিয়া পুলিশের সন্দেহ দানা বাঁধিয়া ওঠে।... আমি অন্তত পুলিশের গতি-বিধি দেখিয়া এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম

খানার সহকারী দারোগা আমার অনুগত ছিল। একদিন সে আমাকে জানাইল যে, কলিকাতা হইতে আই-বি পুলিশ আসিতেছে, বোধহয় আমার বাড়ি সার্চ হইবে। আমি সেইদিনই সন্ধ্যায় হাবুকে হরিদাস দত্তের ছোট ভাই যামিনী দত্তের (বর্তমানে স্বর্গগত) হোপাজতে আসামের সীমান্তে আমার বিশেষ বন্ধু এবং একান্ত বিশ্বাসী নীলকমল দাসের (বৈরাগী) নিকট পাঠাইয়া দিই। পরের দিনই পুলিশ আমার বাড়িমর ও ডিপেন্সারি তালিস করিতে আসে এবং হাবু মিত্রকে না পাইয়া বড়ই হতাশ হয়।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বলিয়া-ছিলাম যে, আমার কাছে আমারই এক মাসভূতো ভাই ছিল, হাবু মিত্র বলিয়া কেহ নহে; সেই ভাই চাকুরির উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল এবং চাকুরি না পাওয়ায় গত রাত্রিতে চাঁলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে দুইজন আই-বি



হাভিলদার রহস্য জাগ

(পঞ্চম লাইট ইন্সপেক্টর লুধিয়ানাধারী সৈনিক-বিদ্রোহের অন্তরালে লিপ্তাপ্রদে ১৯১৫ সালে কোর্ট মার্শালের বিচারে মৃত্যু বরণ করেন)

অফিসার আসিয়া এই তালাস পরিচালনা করে। হাবুকে না পাইয়া তাহারা স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহারা রুলিল যে, গত রাত্রি ১০টা পর্বন্ত তাহাদের লোক হাবুকে আমার বাড়িতে দেখিয়াছে, ইতিমধ্যে ঐ লোক কোথায় বাইতে পারে?

যাহা হউক আমার বাড়িমরের মধ্যে ও জমি বিস্তার খুঁড়িয়া-ও পুলিশ তাহাদের পছন্দসই কোনকিছু না পাইয়া শেষটার চাঁলিয়া গেল। ইহার পর বহুদিন ধরিয়া নানান দিকে লোকজন পাঠাইয়া পুলিশ হাবু মিত্রকে খোঁজ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডোভড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

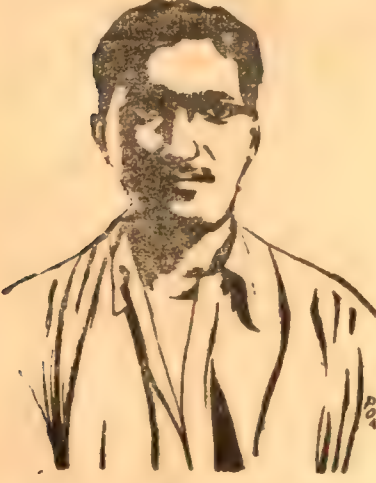
—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

সাপ্তাহিক বসুমতী

করিয়াছিল। এবং, আমাকে-ও কড়া নজরে রাখিয়াছিল।

হাব্দু আসাম-সীমান্তে 'রাভা' নামক পার্বত্যজাতিদের মধ্যে ছিল। আমাদের জানিত



আসাকাকউরা

(কাকোরী মালগায় দণ্ডিত শহীদ)

একটি রাভা-যুবক ছিল উহার সঙ্গী। হাব্দুকে 'রাভা'রা মহিষ চরাইবার কাজে লাগাইয়াছিল।...

ইতি—

আং

সুপ্রেম বর্ধন

(দ্বিতীয়)

পোঃ সুভাষগঞ্জ,

পশ্চিম দিনাজপুর।

তার ২১-১১-৬৫

গরম স্নেহাপদেব,

তোমার প্রেমের উত্তর নিম্নে দিলামঃ—

(১) রভা-অস্তলুঠের কিছু পূর্বে ঢাকা হইতে গোপনে দাদা (হেমচন্দ্র ঘোষ) আমাকে একটি সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতায় একটি মেজর-রাক্‌শান হইতে পারে এবং আমি যেন সতর্ক থাকি। ইহার দুই-চার সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ রভা-রাক্‌শানের অন্যতম প্রধানকর্মী পলাতক হাব্দু মিত্র সহ শ্রীশদার (শ্রীশ পাল) নাগেশ্বরী আগমনের কথা পূর্বে পত্র জানাইয়াছি।

(২) হাব্দুর সঙ্গী আমাদের বন্ধু একটি 'রাভা'-যুবক ছিল। দীর্ঘকাল কয়েদখানায় থাকার পর আমরা সকলে বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া আসাম-সীমান্তবাসী রাভাদের আশ্রয় খোঁজ লইয়া জানিতে পারি যে, হাব্দু এবং উক্ত রাভা-যুবক এ আসতানা হইতে বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। উহারা কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। তবে রাভা-দের-ও ধারণা যে উহারা পাহাড়ের দিকেই গিয়াছে। সুতরাং হাব্দুর শেষ পরিণতি অজ্ঞাত ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিবার মধ্যে ঘটিয়াছে

বলিয়া আমার-ও ধারণা। তাহার মত প্রাপক, সাহসী ও দুর্ভাগ্য যুবকের পক্ষে অবিস্মরণ্য চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। আমরা দীর্ঘকাল জেলে থাকার জন্যই হাব্দুর মত কর্মী নিখোঁজ হইয়া গেল। ইহা আজও আমার কাছে একটি কঠিন বেদনাদায়ক বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তবে যেভাবেই হউক দুর্গম স্থানে তাহার মৃত্যু যে শহীদদের মৃত্যু হইয়াছে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

(৩) সেবার কলিকাতায় গিরীনবাবুর স্মৃতি-সভায় এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, হাব্দু মিত্র নাকি চন্দননগরে মারা গিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। হরিদাস দত্ত তখন বলিয়াছিলেন যে, হাব্দু চন্দননগরে মারা গেলে বিপিনবাবুরা জানিতে পারিতেন, হাব্দুর নিকটতম আত্মীয়দের-ও ইহা অজানা থাকিত না।...আবার কাহারো নাকি ধারণা যে, হাব্দু অরবিন্দ-আশ্রম চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যেন গান্ধলী প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাব্দু মিত্র নামে কেহ কোন কলে অরবিন্দ-আশ্রমে পদার্পণ করেন নাই।...যাহা হউক আমি জানি যে, হাব্দুর একটা কোক ছিল যে, আরও কার্য শেষ না করিয়া সে ধামিত না এবং সেই কাজের জন্য যে-কোন বিপদে ঝাপাইয়া পড়া তাহার পক্ষে সহজ ছিল। কাজেই ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিবার কোকে বেঘোরে প্রাণদান করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; চন্দননগরে সবার অজ্ঞাতে রোগে মৃত্যুবরণ করা অথবা প্যাঁড়চারি-আশ্রমে বাইয়া সাধু হওয়া সেই বয়সে অন্তত তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে বলিয়া আমার-ও ধারণা।

(৪) 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র (১১-১১-৬৫ তারিখের) 'সাধক বিপ্লবী বতীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে পৃথ্বীন্দ্রের উক্তি উল্লেখ করিয়াছ নন্দগোপাল-হত্যা সম্পর্কে। ভদ্রলোক নন্দগোপাল-হত্যার সঠিক তথ্য জানেন না। কেবল পুলিশের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করিলে বিড়ম্বিত হইতে হয়। শ্রীশ পালের নন্দলাল-হত্যা সংবাদ পুলিশ জানিত না। উহা আমরা জানি এবং প্রক্টের বিপিনবাবু, হরিশ সিকদার, অনুকূলবাবু প্রমুখ নেতারা জানিতেন।

শ্রীশ পালের রভা-রাক্‌শান সম্পর্কিত অবদান-ও যোগ্য স্বীকৃতি পায় নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অবশ্য শ্রীশ পালের মত কর্ম-নেতার কাজ বিপ্লবী-জগতেও একান্ত গোপনে ঘটিয়াছে। কিন্তু বথাকালে যখন গোপন কার্যকলাপ ব্যস্ত করিবার সময় আসিল তখনও তৎকালের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা শ্রীশ পালের কার্যকলাপ গোপন রাখিয়া গেলেন কী বুদ্ধিতে তাহা আমি বুঝি না।

আমি জানি যে, রভা-রাক্‌শান কার্যক্রম করার জন্য সমস্ত দলগুলিকেই তৎকালে ডাকা হয়। আমি জানি যে, এমন কি বগুড়ার বতীন্দ্রনাথ (বতীন রায়) প্রমুখ সকলেই এক-ব্যাক্যে উহা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। শ্রীশদার ইচ্ছা ছিল সকলে মিলিয়া কার্য হাসিল করিবেন, কিন্তু বিপিনবাবুর দল ছাড়া আর কোন দলই উহা সম্ভব মনে করে নাই। শ্রীশ পাল বলিয়াছিলেন—'বেশ্যানে অসম্ভব, সেইখানেই সম্ভব।' তাই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া হাব্দু মিত্র, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় এই কার্যটি সুসংগঠিত করিয়া অনুকূলবাবু, কালিদাস বসু, ভূজঙ্গধরবাবুদের সক্রিয় সাহায্যের কথা তুমি সঠিক লিপিবদ্ধ করিয়াছ। বিপিনবাবুদের দলের সাংগঠনিক সাহায্যে, শ্রীশবাবুর দুর্জয় নেতৃত্বে এবং হাব্দু মিত্র ও হরিদাস দত্তের মত দুঃসাহসীদের কৃতিত্বে এই অভাবনীয় কার্যটি সেই বৃগে কলিকাতার বৃকে দ্বিনন্দপুত্রে সংঘটিত হয়।...আমি নিজে তখন 'নাগেশ্বরী' (রঙ-পুস্তক) ছিলাম। কিন্তু বগুড়ার বতীন্দ্রনাথ (বতীন রায়) নিকট আমি বিস্তারিত শুনিয়া-ছিলাম। তিনি অধিক-কিছু বলার লোক



হাতিবদার হাসিদ

ছিলেন না। শ্রীশ পালের অপূর্ণ সাহস ও অকৃত নেতৃত্বের প্রশংসা কেবল বতীন্দ্রনাথ আমাকে শোনান নাই, হাব্দু মিত্র-ও উহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুনাইয়াছে। তাহা ছাড়া আমি নিজে শ্রীশ পালকে জানি। ঐ বৃগে তাহার মত একটি দক্ষ বিপ্লবী কর্মনেতা আমাদের চোখে পড়ে নাই। তাহাকে আমরা মনে করিতাম—An Action-Wizard....

আং

সুপ্রেম বর্ধন

১ সমাপ্ত ১

১৮১৮

ভালবাম্বার জন্মে

মিহির
ধাল



নূপেন চট্টোপাধ্যায়

এসপ্লানেডে এসে বখন নিত্য পৌঁছাল,
তখন অন্ধকার তার ভরাল থাবা মেলে কল-
কাতাকে গ্রাস করতে চাইছে। কিন্তু কলকাতা
তার নিয়ন আলোর বাদু দিয়ে আধারের মন
ভোলাতে ব্যাপ্ত। নিত্য দেখল এসপ্লানেডটা
ফাঁকা ফাঁকা। বাজ পড়ে কলসে-বাওয়া ভাল
গাছের মত রিক্ত। অসংগত শূন্যতা দেখে
নিত্য অসহায় বোধ করল আর এই সময়েই
ভিসেসবরের শীত তার হাড়ের মাঝে ঢুকে
পড়ে তাকে কাঁপাল। গায়ের রং জ্বলে-
বাওয়া কোন এককালে মীরার বদনে গুঁড়িয়া
সোয়েটারটা সে হাত দিয়ে টেনে সর্বগ
চাকতে চাইল। কিন্তু টানতে গিয়ে সাবধানী
হয়ে হাত গোটল। এককালে মীরার পেরে
এক ধরনের গোপন মমতা জন্মান থেকে
সোয়েটারটার পেরেও তার ভীষণ মারা জন্মে-
ছিল। শুব মমতা মাখান স্বপ্নের সাথে সে
এটা ব্যবহার করত। নানা বাস্তব অবস্থার
পরিপ্রেক্ষিতে মীরার পেরে তার অনুভব
ফিকে হয়ে আসার মত সোয়েটারটাও রং

পাল্টে অনুভবের বিবর্ণ হয়েছে ও দু-তিন
জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। একটু ছোট হয়ে
আসা সোয়েটারটা টানাতে ছেঁড়া জায়গাগুলো
বড় হয়ে পড়ায় আশঙ্কা দেখা দেওয়ার নিত্য
এক্ষণে সচেতন হয়ে হাত গোটল।

চৌরঙ্গী হয়ে ট্রামগুলো হালকা বোকা
নিরে হেলতে-দুলতে বাজিল। লোকজন
নামা-ওঠার চিরপরিচিত ধন্দাধস্তির দৃশ্যপট
পাল্টে দু-চারটে লোক ধীর শ্বিথর সূক্ষ্ম
চিন্তে নামাছিল বা উঠাছিল। সে সবে পেরে
দৃষ্টি নিবন্ধ করে অনামনস্ক হতে গিয়ে
নিতার হঠাৎ মনে পড়ল আজ স্টেটগভর্ন-
মেটের কি একটা ব্যাপারে ছুটি ছিল। তাই
বাসে ট্রামে আলতো ছড়ানো বাত্মী। কিসে যাবে
যাবে ভাবছে নিত্য। যানবাহনগুলো ফাঁকা থাকায়
আর কলেজে যাবার প্রয়োজন কুরিয়ে ফওয়ার
সে এবংবিধ ভাবনার অবকাশ পেয়েছে।
নিত্য দেখেছে ভিড়ের চাপ কখনও কোন
ভাবনার বা নিভৃত চিন্তার অবসর দেয় না।
ফলে রোজ গুল্লবস্তির ধর্ম অনুযায়ী

সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে যাওয়া নিতার আজ
অন্তত এ ব্যাপারে স্বাধীনতা জুটে গেছে।
এবং এ স্বাধীনতাবোধে সে আনন্দিত ও
যুশি। ধার কলসে-বাওয়া, শ্বাল হয়ে আসা
অনড় চিন্তাধারাকে সে এপাশ-ওপাশ নড়তে
দেখল। আর এক্ষণে নিত্য তার স্বাধীন
সত্তার জন্মের স্বাদ পেল। সেই স্বাদ যেন
নদীর কুলকুল ধমনিতে আর হাওয়ার লনলন
শব্দে সিক্ত। সেই স্বাদে যেন কেমন সুখের
আমেজ মাখান। তিন পরস্পর অতিরিক্ত খরচ
করার বিলাসটুকু আজ তার অসহায় সঙ্গত
বোধ হল। চৌরঙ্গীর পাশ দিয়ে যাওয়া বুটে
না ধরে সে আধারে-ঢাকা রেসকোর্স ঘুরে
যাওয়া ট্রামটা ধরায় সাবাস্ত করল। এক
এগিয়ে শ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে প্রথম
শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসল।

ট্রামটা শূন্যপিস অন্ধকারে মধ্য ভুলে
দাঁড়িয়ে থাকা মনমোহনটার পাশ দিয়ে ধীর
লয়ে সোঁসোঁ শব্দের পাল ভুলে এগোচ্ছে।
দুপাশে পরপর কটা ক্লাবের তাঁবু পড়ল।

কোথাও সামনের লগে চোখ ধাঁধান তাঁর আলোর ফোকাসে ব্যাডমিন্টন খেলা চলেছে, আবার কোথাও মৃদু রেডিও-সঙ্গীতের সাথে সাথে পানীয়ের আসর জমেছে। মেসোর ঘোড়ার-চড়া মডিটিটির পাশে এসে ট্রামটা দাঁড়িয়ে গেল। সামনে দিগ্রে প্রাইভেট কার ও জাম্বীগুলো পশ্চিমদিকের ময়দানের আঁধারের দিক থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাম লাইনের বুকের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে তুলে চলে যাচ্ছে আলোর সরণী বেয়ে পূর্বদিকের আলো কল-জল মূসসী কলকাতার মাঝে। সামনে দিগ্রে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোর মসৃণভাবে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে নিজের মনে হচ্ছিল একরাস হাঁস যেন জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।

নব্বই চিত্রী কোণ রচনা করে তুলে রাখা পূর্ণিমার হাতটা শূন্য ডিগ্রিতে মিলিয়ে আসার সাথে সাথেই তাদের ট্রামটা আবার লচল হুল। একটানা শব্দ সর্বাপেক্ষে মেখে ট্রামটা এখন রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। রেসকোর্স ঘিরে বিন্দু, বিন্দু, আলোর মালা ট্রামের চলার সাথে সাথে কেমন যেন বৃত্ত হয়ে ঘুরছে, অথবা যেন বিস্তৃত অশ্কাবর নদীর পরপারে আলোজ্বল্য বিম্ব বন্দর চোখ মেলে ডাকিয়ে। বা উৎসব অবসানে পরিভ্রম্য ব্যক্তির প্রজ্জ্বলিত আলোকরাশির মত এই আলোগুলো নিজের চোখে নির্জন, একক ও উদাসীন ঠেকেছে। একটু আগের শব্দ আকাশের মত প্রসন্ন হয়ে-ওঠা মানসিকতা রেসকোর্সের ঘুরে উপড়ে করা অশ্কাবর, আলোর সংখ্যা-তীত ফটিক আর মাঝে মাঝে মূসসী গাছ দেখতে দেখতে কেমন এক আঁধারে নির্মলিত হয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র প্রান্তর, বিচ্ছিন্ন কক্ষ-রাজির নিভুতে দাঁড়িয়ে থাকা, ট্রাম-রাস্তার পাশে পাশে ও খানিক দূরে দূরে ফুটে-ওঠা নিয়ন আলোর মায়াবির পরিবেশ—সব মিলিয়ে নিজের চেতনাকে কেমন অবশ করে ফেলেছিল। চলমান ট্রামের জানলার পাশে বসে যেতে যেতে নিজের নিজেকে দূর্বল, পরাজিত ও বিপন্ন বোধ করল। গত কিছুদিন ধরেই সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত বুকের মাঝে হালকা ছড়িয়ে-পড়া একটা তিরতির কাঁপন যেন একপে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হল। দেখতে দেখতে কোথা হতে একটা দম বন্ধ করা অবোধ মন্ত্রণা কাঁপিয়ে পড়ে নিজের বুকে মোচড় দিতে দিতে স্থির হল। নিজের যেন কণ্ঠে কাঁদবার মত অবস্থা হল। সেই কণ্ঠের সাথে কেমন একটা সূক্ষ্ম ও জড়িয়ে ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে। যন্ত্রণাটাকে নিজা সহিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল চেতনার মাঝে। নিজের স্পষ্ট টের পাচ্ছিল সেই মন্ত্রণাটা ক্রমশ গাঢ় ও তীব্র হচ্ছে। অনুভূতির চাপে তার বুকেটা শিরশির করছিল। নিজের সেকেন্দ্র প্রজ্জ্বল আলোর ভালবাসা বলে চিনতে পারছিল। সেই ভালবাসার শিখাটা জ্বলবার অবলম্বন না পেয়ে শিখ খেয়ে খেয়ে তার মূকটাকে পেতে পেতে লাগল। চারপাশের

অশ্কাবর মাঝে একরাস আলো নিয়ে ট্রামটার হুটে-চলা অনুভব করতে করতে নিজের মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবী তার চার-ধার থেকে আগুয়া হয়ে সরে যাচ্ছে, শব্দ ভালবাসার বোধটা সমস্ত সন্তাকে ঘিরে মোচাক বুননে রত। নিজের যেন নেশা করবার মত অবস্থা হল। আর, ভালবাসা। আমার ভালবাসা। নিজের কথটাকে বারবার আউড়ে কেমন এক স্বাদে মগ্ন হতে চাইল। কোন এক নারীকে ভালবাসার আকৃতিতে, সমগ্রণের ইচ্ছে, আশ্রয় নেবার তাগিদে তার চিন্তা মথিত হল। মায়ারী রেসকোর্সের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের ডুকরে কাঁদতে চাইল। নিজের তখন মায়ারী কথা মনে পড়ছিল। আসলে গত কদিন ধরে ঘুরেফিরে মনে-পড়া মায়ারীর মুখখানা নিজের সমস্ত অন্তরের পরে চাপ দিচ্ছিল।

২ দুই ২

মায়ারী ছিল তার পিসতুত দাদা, মার্টিন-বার্নের করণিক, নরেন্দ্র বসুর শ্যালিকা। মায়ারী কথা ভাবার সাথে সাথেই দর্পণে ভেসে উঠল সেই শ্যামলী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে যার ছোট্ট কপাল, টোল খাওয়া চিবুক আর কথা বলবার বিশিষ্ট ভঙ্গিমাটিকে তাকে এককালে খুবই আকর্ষণ করত। মায়ারীকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাকে অনবরত পেষণ করত মায়ারীকে কাছে পাবার ইচ্ছা তার মাঝে মাঝে প্রবল হত। তাই মায়ারীর বাড়ি তার যাতায়াত সমস্ত ভ্রমতার সীমা অতিক্রম করে বৃষ্টি পেয়েছিল। নিজের মানসিক আবেগের ভেড়ে ভেসে-যাওয়া নিজের মায়ারীর মনের গলিখুঁজিতে সন্ধানী আলো ফেলবার অবকাশ পায় নি। নিজের শব্দ মায়ারীর কথা শোনার ভাণ করে তাকে দেখতে খুঁটে-খুঁটে আর মায়ারী না বোঝার ভাণ করে একটানা কথার মালা সাজিয়ে যেত। মায়ারীর মনের সদর দেউড়িতে পাহারা বাসিয়ে সে মায়ারীকে বুকে উঠতে পারাচ্ছিল না। মন জানাজানির অনেক কৌশলী প্রশ্ন মায়ারীকে সহজে এড়িয়ে যেত। নিজের মায়ারীকে নিয়ে এক অস্বস্তিতে ভুগছিল।

৩ তিন ৩

স্কুল ফাইনাল পাশ নিজের যদিও তখন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে মাত্র পিয়নের চাকরী নিয়ে ঢুকেছিল—তবুও নিজের শব্দ-সমর্থ একটা পুরুষ মানুষ—এ হিসেবে তার একদিন বিয়ের কথা উঠেছিল। এখানে-ওখানে কথাটা হাওয়ার নড়ছিল। হরত ঠান্ডা করেই তার নবেন্দ্রদার শ্রী নীরা বৌদি কথাটা টাইম বোমার মত ফাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিজের প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল যখন, শুনছিল মায়ারীর আপত্তি রয়েছে এ প্রস্তাবে। প্রকারান্তরে নিজের কারগটাও জানতে পেরে-ছিল। অর্থাৎ চেহারার যিনি নিজের এবং

চারদ্রে যিনি প্রেমিক, তিনি কুম্ভক্রে যদি পিয়ন না হয়ে কেরানী হতেন তাহলে মায়ারী নামক মেয়েটির প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধে ঘটত না। অর্থাৎ প্রেমিক-কেরানী-নিজা এই দ্বিবেণী সংগম না ঘটতে সমস্ত ব্যাপারটার ফলাফল নিজের নামক ব্যক্তির পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে প্রেমের ব্যর্থতাজনিত দিকার ছড়িয়েছিল তার সমস্ত জীবনের পরে। প্রচণ্ড অভিমানের তীব্রতা তাকে মায়ারী সন্দর্শনে যাওয়া হতে নিরস্ত করেছিল। অবশেষে অভিমানের ফেনা খিতালে পরে বাস্তব অবস্থার উপলব্ধি একদিন তাকে কেরানীর অর্জনের সাধনার কলেজে পড়ায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৪ চার ৪

মায়ারীর বাবা যিনি ত্রিশ বছর ধরে বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করতেন সেই নির্মল মিত্র তাঁদের বাসায় আত্মীয়তার সূত্র ধরে নিজের মনন যাতায়াত সূত্রজের দেখতেন না—সে কথা নিজের অজানা ছিল না। কারণ, তাঁর মেয়ে মায়ারী কোনদিন নিজের আকর্ষণের টানে বেরিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে বসবে—তা তাঁর চিন্তার পক্ষে অসম্ভব, জীবনের পক্ষে কতস্বরূপ। নিজের যতই সদ্‌বংশজাত বা আত্মীয়ের সন্তান হোক—আসলে তো সে চাকুরী জীবনে একজন পিয়ন ছাড়া আর কিছু নয়। নির্মল মিত্রের পক্ষে তাঁর বড় জামাই নবেন্দ্র পরিচয় দেওয়া গৌরবজনক, কিন্তু নিজের ছোট জামাইতে পরিণত হলে তার বিবরণ সাধারণত প্রকাশ করা তাঁর নিজের পক্ষে সম্মান হানিকর হয়ে দাঁড়াবে। তাই নিজের আসা-যাওয়া নিয়ে শ্রী কনকের সাথে তাঁর অনেকদিন বাকবৃন্দ অসমাপ্ত থেকেই ক্ষান্ত হয়েছে।

মায়ারীর মা কনকের অবশ্য নিজের চাকুরী নিয়ে খানিকটা অস্বস্তিবোধ থাকলেও, আসলে নিজেকে তাঁর খুব পছন্দ। নিজের দেখতে সুন্দর, স্বভাব নম্র ও কথাবার্তা সপ্রতিভ। হরত ঘরকুনো মেয়েমানুষ বলেই সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত অবস্থাটি সম্বন্ধে তিনি খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অবশ্য চাকুরী সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল যে পুরুষ মানুষ উদ্যোগী হলে উন্নতি করতে কতদিন। এ অভিমতের যথার্থ্য যে কতখানি প্রাপ্তির পরে প্রতিষ্ঠিত—মায়ারীর বাবার এ বিষয়ে অনেক প্রমাণপ্রয়োগও তাঁর সিদ্ধান্ত টলাতে পারে নি।

এ সমস্ত ব্যাপার নিজের সবই টের পেত। কিন্তু সে আসলে মায়ারীর পরেই ভরসা রেখেছিল। সে শব্দ মায়ারীর মূখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল যতদিন পর্যন্ত না মায়ারী তাকে নিরস্ত করে।

১ পাঁচ

গ্রামটা কখন খিদিরপুরের আদিগঙ্গার রাজ পেরিয়ে মোমিনপুরে হলে গোপালপুরের কলে এসে ভিড়ছিল—নিত্য টের পায় নি। শব্দ তার বৃকের মাকের মন্তশাটী শিব খেয়ে খেয়ে উঠছিল আর মাঝে মাঝে কেমন এক অস্থিরতার দপদপ করছিল। খিদিরপুরের আলোর বহর, লোকজনের হুন্স, জাজেস কোর্ট রোডের জোনাকজ্বলা নির্জনতা—কিছুই তাকে নাড়া দিতে সমর্থ হয় নি। শব্দ সে তার কামায়ের অস্পষ্ট বোধটাকে মীরা-সজ্জাত ভিত্তি বাসনার মাঝে ছুঁকিরে দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল যে সমস্ত আনন্দ-বেদনা-ভিত্তির ইতিহাস স্মৃতি হয়ে একস্থানে এতদিন গোহান ছিল বটে কিন্তু অনেক জ্বলার-খোঁয়ার জা অস্পষ্ট মিলন হয়েছে। সে সব স্মৃতির মালা পর পর সাজাতে বসে সে বিস্মিত হয়ে গেল এই ভেবে যে, তার মনে মীরার দুর্ব্যবহার-জনিত কোন জ্বালা বা ক্ষোভ জমে নেই। বরং তার মনে হচ্ছিল এক বেদনার ধারা তাকে এইক্ষণে মীরার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ মীরাতে সে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হুবে যাচ্ছিল।

কারণ অনুসন্ধানে নিত্য অনেক আকাশ-পাতাল ভাবল। এক প্রখর ইতিহাস-চেতনার আলো নিয়ে সে খুঁজল আতিপাত্ত করে মীরা-অবিমুখীনতার রহস্য, তা অবশেষে তাকে এক সিদ্ধান্তের সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। গুঁছিয়ে বললে তা নিম্নরূপ শোনাবে।

গত পাঁচ বছরের কিছু অধিককাল সময়ে দু'হাজার বার পৃথিবী মূর্ধ্বকে প্রদক্ষিণ করেছে আপন অক্ষরেখার পরে লাটুর মত থাক খেতে খেতে। এই পাঁচ বছরে পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে পটপরিবর্তন ঘটেছে অনেক। দেশের মাঝেও পরিবর্তনের আব-হাওয়া কোথাও কোথাও পুরোনকে সিরিয়ে দিয়ে নতুনের বিজয়কতন উড়িয়েছে। কিন্তু নিত্য-মীরাদের পরিবর্তন ঘটেছে সামান্যই। নিত্য চাকুরীতে সামান্য একথাপ এগিয়ে এখন রেকর্ডস্টার। জীবনের মোক্ষলাভ কেরানী অর্জন হয়ত কোন এককালে তার কপালে ঘটবে, আর তার সাধন্যতেই সে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছিল। সামনের বছর সে বি এ পরীক্ষা দিচ্ছে। আর-ওদিকে মীরার এখনও বিয়ে হয় নি। আর আজ-কালকার বাজারে অর্থ খরচে অপারগ বাপের বেকার মেয়ের বিয়ে হওয়াটাও খুব দুর্লভ ব্যাপার। নিত্য জানে না এখনও মীরার সেই ছোট্ট কপাল, টোল-খাওয়া চিবুক, কথা বলা-ফালীন সেই বিমুগ্ধ ভাগিটি কতটুকু বজায় রয়েছে। নিম্নবিত্ত সংসারের বিয়ে না হওয়া উত্তর বিশেষ মেয়েদের যৌবনের জ্বলসই বা কতটুকু বজায় থাকে। মীরারও নিশ্চয়ই

চেষ্টার উজ্জ্বলতার ধার করেছে। আর এই বিবেচনায়ই নিত্য বোধহয় মীরা-সজ্জাত ভিত্তির জন্যে কোন ক্ষোভ পুড়ে রাখে নি। কারণ মীরার মাঝে এখন এমন কিছু সপ্রতিভতা, উজ্জ্বল্য আর দীপ্তি অবশিষ্ট নেই বা এমন কোন ঐশ্বর্য বা গুণ যুক্ত হয় নি—যার জন্যে তাকে ঈর্ষা করা চলে।

২ ছয়

গ্রামটা হাজিরা-মোড় পেরিয়ে কালীঘাট উপোতে সরীসৃপের মত ঝাড় বাঁকিয়ে চুকছিল। আর লোকগুলো আসন ছেড়ে নামবার জন্যে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। নিত্য চমক ভেঙে উঠে দাঁড়াল। আর সাথে সাথে সে অনুভব করল মীরার জন্যে ভাল-বাসার মমতায় তার বৃক ভিজে উপচে পড়ছে। অনুভবের গাঢ়তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। গত কিছুদিনের ছমছাড়া মেঘ এখন জমাট বেঁধে বৃকের মাঝে যেন ধমধম করছে। নিত্যর যেন জ্বর আসবার মত আবহা শিরশির বোধ। সে তার সমগ্র সত্তার অস্থিরতার বিচলিত বোধ করল। নিজেকে সামলে রাখা তার দায় হল। ফলে নিত্য হঠাৎ পাঁচ বছর বাদে মীরাদের বাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর সাথে সাথে মীরাকে দেখবার আকৃতিতে তার হৃদয় হুহু করল। ভালবাসার গাঢ় বোধ নিয়ে মীরার মূখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, বৃক জড়িয়ে ধরে—সে মৃত্তির সন্ধান করবে। নিত্য দ্রুত গ্রাম থেকে নেমে হাটতে শুরু করল। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততার দরুন মীরা বর্তমানে পিয়ন হতে রেকর্ডস্টার উন্নীত নিজাকে গ্রহণের জন্যে তৈরি রয়েছে কিনা—সে কথা সে ভাবতে ভুলে গেল।

৩ সাত

দরজা খুলেই মীরা চমকে উঠল। দু'পা যেন পিছিয়ে গেল। 'আপনি'—ছটকে যেন কথাটা নিত্যর মুখের পরে আছড়ে পড়ল। মীরার বিস্ময়ের মাঝে আনন্দ শিহ-রণের কোন অস্তিত্ব রয়েছে কিনা—নিত্য খুঁজতে চাইল। কিন্তু আঁধারের আড়ালে থাকার এবং নিজের মাকের উজ্জ্বলতার প্রবল-তায় নিত্য মীরার মূখ্যনা অনুধাবন করে উঠতে পারল না। নিত্য আবেগে ধরধর কাঁপছে।

চমক লাগান ধারাল কথা নিত্যর মুখে জোপাল। এক অল্প অনুভূতিতে বোবা হয়ে থাকা নিত্য কোনমতে ভোতলাল—এই এলাম...

ভেতরে রাসাঘর থেকে মীরার মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে এলো রে মীরা?

মীরা চমক ভেঙে নড়ল। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন অভাবিত ও আকস্মিক যে

মীরা এতক্ষণ স্থানরে মত্ত দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য বা নির্ধারণে সে বিস্মৃত হয়েছিল। মায়ের কণ্ঠস্বর তাকে সূত্র ধরিয়ে দিল। সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত 'আসুন' বলে মীরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। ছোট্ট বারান্দা পার হয়ে সে ঘরের মাঝে ঢুকল। পূর্বের মত নিজেকে আগে এগিয়ে যেতে দিল না। হয়ত মীরা তার পুরোন অভ্যাস ভুলে গেছে। নিত্য মীরাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল যেন শূন্যে পা রেখে রেখে।

মীরার গহন জলে ডুব দিয়ে তার বৃককে কষ্ট ও যন্ত্রণার অনুভূতির উপশম ঘটবে—এমনি একটা আশ্বাস ভাব নিয়ে নিত্য ঘরের মাঝে এসে দাঁড়াল। মীরার দু'পাছু পিছু আসতে আসতে তাকে আঁকড়ে ধরে তার বৃকের অসীম তৃষ্ণা মেটাবার এক তরল বাসনার সে কাঁপছিল। মীরা দ্রুত ঘর পার হয়ে রাসাঘরের দিকে গেল।

নিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীরাদের সেই পুরোন ঘরখানাকে ঘোলাটে আলোয় দেখছিল। গত পাঁচ বছরে ঘরখানার বেশ-বিন্যাসে কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে সে মনে করতে পারল না। জানলার পাশে রাখা নিত্যর প্রিয় চেয়ারখানাও স্থানচ্যুত হয় নি।

কনক খুশিমেখে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকলেন—বাক, এতদিন পর তাহলে আমাদের মনে পড়ল। কতকাল আস নি বল তো।

ততক্ষণে নিত্য কনককে প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—হ্যাঁ, মাসীমা। অনেকদিন আসা হয় নি। সমগ্র একেবারে পাই নে। জা আপনার শরীর ভাল তো? আর বলতে বলতে দেখল যে মীরার মায়ের মুখে বয়সের রেখা অনেক গাঢ় হয়েছে, কানের পাশে অনেকগুলো পাকা চুল চকচক করছে।

কুশল প্রশ্নে কনকের মুখ দীপ্ত হল। বললেন—আর ভাল থাকব কি করে বাবা। কত ভাবনা আমার কুরকুরে যায়। দেহটা কোনমতে টিকে রয়েছে।

মীরা ধূমায়িত চা নিয়ে ধরে ঢুকল। অন্য হাতে হালুয়ার শ্লেট। কনকের বোকা হঠাৎ মনে পড়ল—জা রে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? বসো বাবা, বসো।

নিত্য কোথায় বসবে ভাবতে গিয়ে জানলার পাশে রাখা তার প্রিয় পরিচিত চেয়ারখানার দিকে তাকাল। তারপর মীরার মূখ্যনাকে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কঠিন মুখের অন্তরালবর্তী কোন রেখাকে প্রত্যক্ষ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। খানিকটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে নিত্য মীরার টেবিলের পাশে রাখা চেয়ার-টাতেই বসে পড়ল। চারপাশের নিরন্তরক পরিবেশের মাঝে পড়ে সে কেমন বিমর্ষ বোধ করল।

মীরা সামনে চা ও খাবার রাখল। কনক বললেন—ভূমি খাও। আর

কৃত্রিম দেখি গে। কনক বোঁরিরে গেল।

মীরা আর নিত্য এখন শীতের নিরুদ্ভাপ ঘরের মাঝে ডামির মত বাঁড়িয়ে ও বসে। হৃদয়ে কেউ কোন কথা বলছে না। নিত্য কি দিয়ে শূন্য করবে ভাবছে, আর মীরা নিত্যর মনোভাবকে আঁচ করবার চেষ্টায় রত। মীরা বুঝতে পারছে না নিত্য এতদিন বাদে আবার কোন উদ্দেশ্যের খুঁজা নিয়ে হাজির হয়েছে। যদি পুরোন অভীসাই সে নতুন করে ব্যস্ত করতে চায় তবে আশ্রয়কার জন্যে কোন হাতিয়ার সে ব্যবহার করবে—সেই সম্বন্ধে সে অনুসন্ধানে রত হল।

নিত্য পাশে দণ্ডারমান মীরার সামিখ্য পেতে পেতে তার বৃকের মাঝে বয়ে-বাওয়া কল্লুর ধারকে আবার অশ্লীল ও দুর্বীর হয়ে উঠতে দেখল। যে অনুভূতিটা সেই তখন থেকে তার বৃকের মাঝে মাথা খুঁড়ছিল—সেটা এখন মেরুন রংয়ের শাড়ি জড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাকা মীরাকে অবলম্বন করে স্পষ্ট হতে চাইল। নিত্য যেন মীরাকে পাবার জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সে মীরার মূখের দিকে প্রকবার তাকাল। চীনেমানের মত নির্বিকার মুখ নিয়ে মীরা দেয়ালের গায়ে আঁকা কোন এক রহস্য সমাধানে ব্যাপ্ত। সেই ছোট্ট কপাল, টোল-খাওয়া চিবুকের ছায়াটা আজও মীরার মুখে ছড়িয়ে। নিত্য আবেগে আবেশে কাঁপছে। সে মীরাকে বলতে চাইল—মীরা, দেখ দেখ, ভালবাসা আমার পথে বার করে কাঁদাচ্ছে। আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি নে। তুমি কি আমার অগ্রয় দেবে না। কিন্তু আসলে সে আচমকা ডেকে উঠল—মীরা—। একটা আকৃতি মাখান আহবান প্রচ্ছন্ন আবেদন নিয়ে মীরাকে ঘিরে ঘরের মাঝে ছড়াল। তারপর কে'পে কে'পে মিলিয়ে গেল। মীরা যেন এমনি এক অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সাথে সাথে সে বলে উঠল—আপনি খেয়ে নিন। কথাটা যেন শোনাল—আপনি যেতে পারেন।

নিত্য অপ্রস্তুত। নিত্যকে যেন বোকার মত দেখাচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল সূরটাই তার কেমন বিশদৃশ হয়ে গেল। যে ছবিটা সে রামধনুর রংয়ের আঁকতে চেয়েছিল তাতে যেন খানিক ভুলো কালির আঁচড় পড়ল। অথবা সে এও ভাবছিল যে, এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে তার লড়াই শূন্য হয়েছে। এখানে বিজয়ীর সম্মানলাভ খুব সহজ নয়। নিত্য কেমন করে আবার তার মানসিকতাকে মীরার কাছে প্রকাশ করবে—সে বুঝে উঠতে পারছে না।

নিত্যর অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মোহন নিয়ে মীরা আবার তাড়া দিল—চা যে জুড়িয়ে গেল। খেয়ে নিন।

চারপাশের শূন্যতার মাঝে একটা আশ্রয় স্থানটির ভাগিদেই যেন সে খাবারের দিকে ছাত বাড়াল। চামচ দিয়ে কেটে কেটে সে

হালুয়া খেতে লাগল। আর সাথে সাথে চারে চুমুক দিচ্ছিল।

মীরা যেন অবাস্তবিক পরিবেশটাকে সহজ করার মানসে জিজ্ঞেস করল—সে কাজেই তো রয়েছেন?

উত্তর দিতে নিত্য যেন মিথিয়ে গেল। মীরা কি তার আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল। কোনমতে নিত্য বলতে পারল—হ্যাঁ, তবে একটা ছোট্ট প্রমোদন জুটছে।

মীরা খামল না। সে যেন কোমর বেঁধে দাঁড়াল নিত্য ও তার মাঝের জটিল হয়ে-ওঠা গ্রন্থিগুলোর জট উন্মোচনের সংকল্পে—দেখুন, এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম বলে বোধহয় আমার পক্ষে আচার-আচরণে সামঞ্জস্য রাখা করে চলা সম্ভব হয় নি। ফলে আমার নির্বোধ আচরণে হয়ত অনেক ভুল বোঝা-বুঝির অবকাশ সৃষ্টি করেছিল। আজ এই সুযোগে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

নিত্যর খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। গরম গরম চা হালুয়া গলাধঃকরণ করে সে খানিকটা উৎসাহিত বোধ করল। মীরাকে পরাজিত করার সংকল্পে নিত্য কেমন দৃঢ়তা বোধ করল। কারণ মীরাকে যেন-তেন প্রকারে অরত্ব করতে না পারলে তার গোটা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে—এমত একটা ধারণা তার মাঝে বদ্ধমূল হচ্ছিল। ফলে নিত্য মীরার কথার জবাবে সরাসরি বলল—মীরা, তুমি আমাকে আজ শ্বিতীরবার দৃশ্য দিতে উদ্যত হয়েছ। মীরা তোমার কাছে আমি আগ্রয় চাইছি, তুমি কি আমার বাঁধিত করবে।

মীরা স্পষ্ট কথার বিরত বোধ করল। সে জবাব দিল—আজ পাঁচ বছর পূরে হঠাৎ ধুমকেতুর মত উদয় হয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। আমি ধুমকেতুদের বন্ড ভয় করি।

নিত্যর বৃকের নিরবচ্ছিন্ন বন্দগাই যেন তার মুখে ভাষা জোগাল।—মীরা আমি ধুমকেতু হতে চাই নে। আমি সূর্য হতে চাই, চন্দ্র হতে চাই, আমি স্থান চাই, স্থিতি চাই। আমি তোমাকে ঘিরে বসত চাই।—অবশেষে নিত্যর কণ্ঠস্বর বুজে এল।

মীরা যেন কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। নিত্যকে আঘাত করার লোভ যেন সে সামলাতে পারল না। তাই বলল—আপনি যদি একথা বলতেই এসে থাকেন, তাহলে বড় ভুল করেছেন। অনেক বসতিতে গিয়ে বাস করার প্রয়োজন আমি বোধ করি নে। কেন না আমি নিজেই বসতি গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখি। আমি শীঘ্রই স্বাবলম্বী হচ্ছি, আর সেই বসতিতে শ্বিতীর প্রাণীর প্রয়োজন ঘটলে তখন খুঁজে নেওয়া আমার পক্ষে দুরূহ হবে না। মীরা কথা শেষ করে কেমন যেন হাঁফাতে লাগল। মূখের রেখাগুলো শক্ত দেখাল।

মীরার বন্ধবোয় স্পষ্টতা, কণ্ঠস্বরের স্বচ্ছতা ও ভগ্নির অনমনীয়তা নিত্যর আগ্রহ ও আবেগের পূরে, তার হৃদয়ের উত্তাপের পূরে আকস্মিক নেমে-আসা হিমপ্রবাহ সদৃশ হল। বৃষ্টিভেজা বারুদের মত নিত্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকল। এবং ধীরে ধীরে তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, ভালবাসার গাঢ় বেধের পূরে সে একটা ভেজা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়তে দেখল। ঘরের মাঝে বসে নিত্য কেমন শৈত্যবোধ করল। অভ্যাসবশে নিজ সোয়েটারটা ধরে টানতে বাঁচ্ছিল।

এ কথা নিত্য বুঝতে পারছিল যে মীরা সরাসরি তাকে খারিজ করে দিয়েছে। মীরার কাছে আশা করবার মত অবশিষ্ট আর কিছু নেই। আজ পাঁচ বছর পরেও মীরা যেন তার সেই ভূমিতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং তার দাঁড়বার ভগ্নিটি এখন অনেক দৃঢ়তা-ব্যাক্ত। অর্থাৎ বৃকের মাঝে যে বন্দগা ও কামা নিয়ে সে এখানে উপস্থিত হয়েছিল—মীরা তার অংশভাগী হতে তৈরি নয়।

স্বভাবতই নিত্যর কার্যকারণ সম্পর্কটির কথা মনে পড়ছিল। তা তাকে কেমন এক হতাশার মাঝে ঠেলে দিচ্ছিল। নিত্যর মাথার শিরাগগুলো দপ্‌দপ্‌ করছিল।

কনক ঘরে ঢুকল। নিত্য মুখে চেষ্টা-কৃত হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল—আজ উত্তি মাসীমা।

—এসো মাঝে মাঝে। আজকাল তো আসা ছেড়েই দিয়েছ।

নিত্য মাথা কাত করল এবং দরজার বাইরে পা রাখল। পেছন থেকে মীরা বলল—আবার আসবেন। কথাটা অবসাদগ্রস্ত নিত্যর কাছে সন্তানর মত শোনাল।

প্রত্যাখ্যানের সামিল হয়ে নিত্য তার বৃকের ভালবাসা নামক বোকা নিয়ে অথবা ভালবাসার দৃশ্য চিত্রভঙ্গম বয়ে বয়ে অবসন্ন হয়ে রাসবিহারী এডেনিউ হয়ে হাটছিল। মাথাটা তার নিচের দিকে ঝুঁক-পড়া আর হাত দুটো বাহুদুল হতে আলতো হয়ে ক'লছিল। হাটার ভগ্নি অসমান ও ক্লান্ত। জুরায় হেরে সবস্ব বন্ধক রেখে এইমাত্র লোকটা যেন আত্মাধানা ছেড়ে রাস্তার কোরোল—নিত্যকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আশে-পাশের লোকজনের কথাবার্তা, শব্দের ঝড় ভুলে ষ্ট্রামবাসের যাতায়াত, হর্নের কর্ণবিদারী আওরাজ—কিছুই তাকে বস্তৃত স্পর্শ করতে পারছিল না। এ পৃথিবীতে কারও সাথে কোন যোগসূত্র সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এত আলো, শব্দ ও জনতার মাঝে তার নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও একক বলে বোধ হচ্ছিল। অথচ সে মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে উৎসুক হয়েছিল। হৃদয়ে হৃদয় মেলানর ভাগিদে, আগ্রয়ের সম্মানেই তো সে মীরার কাছে হাজির হয়েছিল। কিন্তু সে এখন হাল-ভাঙা মাঝিকের মত নির্জনতার একাকীত্বের অভিশাপ নিয়ে জাসছে।

ভাসতে ভাসতেই সে বৃদ্ধি রাসবিহারী-রসা রোড়ের মোড়ে পৌঁছে গেল। নিত্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও স্মৃতিবিভ্রম। অথবা এও মনে হতে পারে যে দারুচিনি স্বর্গেশ্বর ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ আবিষ্কারের অভিপ্সায় নিম্ন গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিজের নিজেকে এতখানি ক্রান্ত, নিঃসহায় ও আত্ম মনে হচ্ছিল যে কোথাও আশ্রয় না পেলে তাকে আর পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এমনি একটা বোধ তার মাঝে রম্ভমলে হচ্ছিল এবং তাকে তা কুরে-কুরে খাচ্ছিল। আকস্মিক অগ্নিসংযোগে ঘাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া মানুষের মত তাকে লবংহারা দেখাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় দুশ্চিন্তা তুলে সে নিম্পন্দ হয়ে থাকিরে।

নিজের এই সময় হঠাৎ কেমন করে ইত্বর কথা মনে পড়েছিল। পাহাড়ের চড়া হতে হুড়ে-মারা এবং ভূমি স্পর্শ করার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত গ্রিশকুর মত নিত্য এতক্ষণ শূন্যে ভাসছিল। ইত্বর কথা স্মরণে আসাটা তার ভূমির নাগাল পাবার সাক্ষ্য হল। ঘন অন্ধকারের মাঝে অকিঞ্চিৎ ধরবার মত উজ্জ্বল আলোকশিখা তার চোখে স্পষ্টতর হল।

II আট II

ইতু তার ছেলবেলাকার বন্ধু অরুণের ঘর। ফসাঁ, কৃষাণী, বাকচতুরা। এদিকে আরার পড়াশুনো নিয়ে খুব সিরিয়াস। ফালীঘাটের একই পাড়ায় তাদের বসবাস। লগ্নাহের মধ্যে অলতত দুইতিন দিন ইতু আসবে তার কচছ বই নিতে, বই দিতে বা প্রশ্ন করতে। আর প্রায়ই বলবে—আপনার আর কি। আপনি ডিস্টিনশন নিয়ে পাশ করবেন। আপনার যা আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। আমার খারা কিছ হবে না। কতবার বসতে হবে—কি জানি।

ঠাট্টা করে নিত্য হয়ত বলত—না হলেই যা কি। সময় কাটাবার জন্যে পড়া তো! আগের দায় নেই তো!

—কে বলেছে। আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি লগ্নাহের দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় না। আর বিয়ে হয়ে যাবার যে ইশিত দিচ্ছেন—জা সেই বিয়ে হতে গেলেও পাশ থাকার দরকার। আপনাদের মত ছেলেরাই তো আরার পাশ করা রোজগারে মেয়ে খুঁজবেন।

নিত্য জবাব শুনে কেমন অপ্রতিভ হজে পড়ত। ইতুর কথাটা পেছনে কোন বক্ত কটাক্ষ নেই তো। না ইতুর কথাটা কোন গভীর মেন্দা হতে উৎসারিত।

III নয় II

রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই উজ্জ্বল ক্রান্তটির কথা ভাবার মধ্যে সাথে নিত্য যেন

খানিকটা শান্তি করে পেল। এগিয়ে গিয়ে একটা দোকানের দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখে সে আবার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সাড়ে সাতটার সময় ইতুর এ পথ ধরেই ব্যানার্জী রোডে টিউশানী করতে যাবার কথা।

এক সময় নিত্য ইতুকে দ্রুত আসতে দেখল। নিজাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হল। কাছে এসে বলল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যে?

ইতুকে দেখে নিত্য উৎসাহ ফিরে গেল। জীহনের নিশানা সে শির করে ফেনেছে, তার বুকের ভালবাসার বোঝাটা কোন মারীর কাছে গচ্ছিত না রাখতে পরলে সে যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই নিত্য জবাব সোজা-সুজি বলল—তোমার আশায়। আমি বক্ত ক্রান্ত ইতু। তুমি একটু বসবে কি?

ইতু নিজের চোখে চোখ রেখে কেমন বিভ্রান্তি বোধ করল। তারপর সেটা যেন পাশ কাটাতে তৎপর হল—নিত্যদা, এখন বাস কি করে বলুন দৌঁব। আজ এমনিতেই দৌঁব হয়ে গেছে। ছাত্রদের এ্যান্ড্রাল পরীক্ষা সামনে। এখন কামাই করলে আবার মাইনে নিয়ে ঘোরাবে। আর এ টাকার পরেই তো আমার কি দেওয়া নির্ভর করছে। তাছাড়া—

আঃ ধাম। নিত্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রচণ্ড এক ধমক দিল। ইতু বক্তকণ বকে খাচ্ছিল নিজের মনে হচ্ছিল একরাশ অর্থহীন শব্দ যেন নির্বিচ্ছিন্নভাবে উঠত হচ্ছিল। ক্ষোভে তার রক্তচাপ জ্বলছিল।

নিত্য বুকে পারছিল বাকপট্ট চতুর মেয়ে ইতু কৌশলে আসল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। কারণ ছাত্র হিসেবে নিত্য ইতুর প্রশংসাধরা হলেও স্বামী হিসেবে সে অভিল্যভিতদের মাঝে পড়ে না।

ধমকের প্রচণ্ডতর একটু দূরে বসে কমলা-লেবু বিক্রি করা লোক তিনটে ফিরে তাকাল। দুটো বটপালিশ ছোঁকা শিব দিয়ে উঠল। দ-চরজন পঞ্চায়তী দাঁড়িয়ে পড়ে বীত বের করে হাসল। ইতু বিমূঢ় অবস্থায় নিজের মূখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। ইতুকে সে অবস্থায় রেখে রেখে, অপমান, হতাশার নিত্য শিথিল ভঙ্গিতে অসহায় পা কেলে কেলে হাঁটতে লাগল কোন ধ্বংসাত্মকে লক্ষ্য না রেখেই। পৃথিবীকানী উল্লেখ্যহীনতা তার সামনে কোন নিরক্ষরতা না মেনে দ্রুত লাগল অর্থশূন্যভাবে।

IV দশ II

বিশ শতকের বক্ত দশকে নিত্য নামে তিরিশ বছরের কোন এক বৃদ্ধি যে কম-জীবনে কেশরীর সরকারী অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অথবা রেকর্ডসটির ছিল এবং কেরানীর মোকদ্দলাভের আশায় রাতের কলঙ্কে বি এ পড়ছিল—সে ডিসেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যা ভালবাসার টাটকা পশরা নিয়ে

কলকাতার পথে ফির করতে বেরিয়েছিল। ধ্বরে ধ্বরে ঘুরে তার মত চাকুরের কাজ-থেকে ভালবাসা সওয়া করবার জন্যে কাউকে প্রস্তুত থাকতে না দেখে সে ক্রান্ত হয়ে পড়ে-ছিল। অথচ তার বুকে ছিল অনেক উজ্জ্বল ভালবাসার আগুন। খুঁজতে খুঁজতে সে অবশেষে বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনের একান্তে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে পৃথিবী সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে অসচেতন মনে দূরের নিশিদ্ধ আধারের দিকে তাকিয়ে যেন পৃথিবীর শেষ সীমা খুঁজছিল। সেখানে একসময় ভিসটাণ্ট সিগনালের গোটা দুই লাল চকুকে জ্বল জ্বল করতে দেখতে পেয়েছিল। পৃথিবীর শেষ সীমা খুঁজতে থাকে সেই বৃদ্ধি অবশেষে সেই অতন্দ্র রক্তচকুর হামিয়ারীর দিকে নির্নিমেয়ে তাকিয়ে থেকে কেমন যেন এক ভয়ে আশঙ্কার বমকে গেল।

তার মনে হচ্ছিল সেই রক্তচকুর দুটো তার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড টাট্টা ও কৌতুকে অভিহাস করছে। সেই অভিহাসের মাঝে যেন এই কথাটা ঘোষিত হচ্ছে যে বর্তমানে এই পৃথিবীর নিরিখে নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা, তার চিন্তা মনন সব কিছই শূন্যলাহীন অর্থ-শূন্যতার নামান্তর। কারণ প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি বস্তুগুলো তাদের অর্থ বহুকাল হারিয়ে পণ্ডভুতে বিলীন হয়ে গেছে। আর সেই অর্থশূন্যতার পরে ভিত্তি করে জাতি কমপ্লেক্স-বিবাদ-অভিমান-হতাশা প্রভৃতি হাস্য-করভাবে জন্মতব। আসলে শূন্যগর্ভের মাঝে কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা সম্ভব নয়, পারের তলার কোন ভূমি না থাকলে অন্য কোন ভূমিতে পৌঁছনের প্রচেষ্টার কোন জ্ঞান হয় না। শূন্যতার মাঝে ভাসমান কোন বস্তুর জন্যে কোন শূন্যতার দিকে ভেসে বেড়ানই শূন্য স্বাভাবিক।

তাই সেই রক্তচকুর দুটো নিজের দিকে তাকিয়ে দ্রুত করছিল আর হা হা করে হাসছিল। নিত্য সে দিকে তাকিয়ে কেমন এক ভয়ে অস্বস্তিতে অস্থির দিশাহারা হয়ে আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশা, জেব-রোহি ঘেরা পৃথিবীর দিকে ছুঁতে লাগল।

প্রবীণ বঙ্গোপন্যাসিক

অসমত মুখোপাধ্যায়ের

অসমত গ্রন্থাবলী

৩খানি বড় উপন্যাস ও ৫খানি

নির্বাচিত গল্প। মূল্য : তিন টাকা।

বসন্তমতী গ্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ঠাট্টা

কলিকাতা-১২

ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ

বাখ পরিবারে সঙ্গীতের মাধনা ছিল জীবনাচরণের মত। তাই জার্মানীর মুরিগিয়া অঞ্চলে অনেকের মনে এমন একটা ধারণা ছিল যে—সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রই বাখ পরিবারভূক্ত। এই ধারণা আরও বন্ধমূল হয়েছিল এরফোর্ট শহরে বাখ পরিবারের বেশ কিছু সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ বসবাস করার জন্য। একটা জনশ্রুতি আছে—বাখ পরিবারের মধ্যে পরিচিত পাঁচজন বলত যে, বাখদের শ্রমের রক্ত নেই আছে সঙ্গীতের ধারা। এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, নিজেকে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ তা পেরেছিলেন। শূন্য ভাই নয়, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর অবদান এত বিরাট যে পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক হিসাবে তাঁর নাম আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম, আর মাত্র দশ বছর বয়সের সময় তিনি পিতৃহীন হন। কিন্তু ভাইয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হবার সময় থেকেই তাঁর প্রবল সঙ্গীতানুরাগের কথা লোকে জানতে পারে। এ বিষয়ে একটি চমককার গল্পও আছে। বাখের যখন বারো বছর বয়স তখন তাঁর গুরুজনেরা তাঁকে কোন একটি স্বরলিপি বইতে হাত দিতে নিষেধ করেছিলেন। এতে প্রথমে তাঁর চরানক অসুবিধা হল। শেষে, সকলের অগোচরে, গভীর রাতে চাঁদের আলোয় বসে তিনি গোটা বইটির নকল করে নিলেন। বলা বাহুল্য এর জন্য তাঁর একাধিক রাত্রি না ঘুমিয়ে কাটতে হয়েছিল।

বাখের ছাত্রজীবনের শুরু ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে আর সেই সময়েই তিনি লুনবার্গের একটি “কন্সার্ট” দলে গায়ক হিসাবে যোগ দেন। এই সময় হামবুর্গে রাইনকেন বলে একজন অর্গানবাদক থাকতেন। এঁর বাজনা শোনবার জন্য লুনবার্গ থেকে তিরিশ মাইল হেঁটে বাখ বহুবার হামবুর্গে গিয়েছেন।

আরও তিন বছর পরে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ভাইমারের ডিউকের ছোট ভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায়ে তিনি প্রথমে চাকরী নেন, কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই সে কাজ ছেড়ে তিনি আনস্টাউট শহরে একটি চাকরী খুঁজ নিলেন। এই সময় লুবকের বিখ্যাত অর্গানবাদক ডিউক-স্টেইউডের সম্পর্কে আসার সুযোগ তাঁর

দীপঙ্কর সেন

ঘটেছিল। ইনি ভেবেছিলেন যে নিজের মেয়ের সঙ্গে বাখের বিয়ে দিয়ে পরে নিজের জায়গার তাঁকে বাসিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাখের সম্মতি না থাকায় তেমন কিছু ঘটে নি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই কোন কিছু করতে বাখ কখনো রাজী হন নি।

বাখ ছিলেন সত্যিকার ধর্মপ্রাণ শিল্পী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে—সব সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের মহিমা প্রচারিত হয়। নিজের রচনার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন—যে কোন ধর্মনিষ্ঠ

শিল্পীই একটু পরিশ্রম করলে আমার মত সঙ্গীত রচনা করতে পারেন। এ অবশ্য বিনয়ের কথা। তবে প্রটেষ্ট্যান্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি একেবারেই শ্রম-বিমুখ ছিলেন না, বরং কঠিন শ্রমকে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে মনে করতেন।

মানুষের মধ্যে যেমন মহত্ব আছে, তার মধ্যে তেমন ক্ষুদ্রতাও আছে। অতি অল্প বয়েসেই বাখ বুঝতে পেরেছিলেন যে সর্ব ক্ষেত্রেই আমাদের সত্যিকার প্রগতির প্রধান অন্তরায় হল মানুষের এই অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্রতা। এক শ্রেণীর বুদ্ধিহীন মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব কিছুকেই নিয়মের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়। এমনই একদল লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল আনস্টাউটের গীর্জায়। এখানকার অর্গানটি ছিল নিখুঁতভাবে তৈরি। আঙুলের ছোঁয়া লাগতে-না-লাগতেই এটি যেন আপনা হতে গান গেয়ে উঠত। গীর্জার উপাসনার সময় অর্গান বাজতে বাজতে বাখ মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট গংগুলি না বাজিয়ে অশ্রুত কোন সুরের ছন্দে অপূর্ব এক মায়ার সৃষ্টি করতেন। গীর্জার কতৃপক্ষ কিন্তু এতে মোটেও খুশি হতেন না। তাঁদের অভিজ্ঞতায় এমন একটি ব্যাপার যে ঘটতে পারে এ তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। কয়েক-বার এরকম ঘটবার পর বিরক্ত হয়ে তাঁরা লিখিতভাবে বাখের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ পেশ করলেন। বাখকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ওই গীর্জার তাঁদের কোন সুরকারের প্রয়োজন নেই। তাঁরা চান একজন যন্ত্রবাদক। বাখের একথা বোকা উচিত ছিল যে, কোন ধর্মমন্দিরে উপাসনার সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে অন্য সুর সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনাচারের সামিল। চাকরীর সত্য অনুসারে বাখের উপাসনা সঙ্গীত বাজানোর এবং “কন্সার্ট” দলকে তাঁর বাজনার সঙ্গে গান শেখানোর কথা। কিন্তু সেসব তিনি কিছুই করেন নি। স্বার্থপরের মত নিজেই কেবল অর্গানটি বাজিয়েছিলেন। তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল যে এ গীর্জাটি খ্যালখুশি মাফিক অর্গান বাজাবার জায়গা নয়। সুতরাং চাকরী বজায় রাখতে হলে ভবিষ্যতে এসব করা চলবে না। বলা বাহুল্য বাখ এ চাকরী বজায় রাখতে পারেন নি। মনের মন্দিরে যে সুরে তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করতেন অন্যের ফরমায়ের মত তাকে বদলে নেওয়া ছিল অসম্ভব।

এ কাজটি ছেড়ে দেবার পর আরও বেশি বেতনে তিনি আর একটি গীর্জায় এক চাকরী জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু সেখানে হল আর এক বিপদ। গীর্জার অর্গানটি দেখে তঁর তাঁর চকুস্থির। এত ছোট অর্গান তিনি



বাখ

স্বাভাবিক কি করে! গীর্জার কতৃপক্ষ তাঁর কথা শুনে বিরক্ত যতটা না হলেন অবাক হলেন তার শতগুণ। সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও সামান্য একটা যন্ত্রের আকার নিয়ে কেউ এত বাড়াবাড়ি করতে পারে এ তাঁদের ধারণার অতীত। বাথ চাকরী গ্রহণ না করায় তাঁরাও স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে যাচ্ছিলেন।

এইসব মতামতের জন্য বহু আর্থিক ক্ষতি হলেও ইতিমধ্যে বাথের নাম চারদিকেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্গানবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতির কথা তখন সর্বজনবিদিত। তাঁর বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে অর্গান থেকে যে সুর নির্গত হত, তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে স্বরগুলিকে আয়ত্ত রেখে ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে গতি-ময় তালগুলিকে তিনি সজীবিত করে তুলতেন। বড়ো আঙুল আর তার পরের আঙুল দিয়ে কম্পিত সুরের মর্ছনা তুলে, চতুর্থ এবং পঞ্চম আঙুল দুটি দিয়ে তিনি এক অপূর্ব মেলোডি বাজাতে পারতেন।

বাথের জীবনে একবার খুব মজার এক ঘটনা ঘটেছিল। জাঁ লুই মারস' নামে এক ফরাসী অর্গানবাদক একবার জার্মানিতে এলেন। ইনি সর্বত্র বলে বেড়াতেন যে, সারা বিশ্বে এর মত অর্গানিস্ট আর নেই। ভাসিই দরবারে প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করার ফলেই নিজের সম্পর্কে এমন একটা উচ্চ ধারণা তাঁর মনে এসেছিল। এই সময় বাথ ভাইমারের ডিউকের সভায় প্রধান অর্গানবাদক। এদিকে জার্মানীর বিভিন্ন দরবারে মারস'র প্রতিপত্তির বহর দেখে জনসাধারণও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কেউ কেউ বলতে শুরু করে দিল যে, তিনি বাথের চেয়ে অনেক বড় শিল্পী। বাথের যারা প্রকৃত গুণগ্রাহী তাঁরা এসব কথায় একেবারেই কান দিলেন না। অবশেষে তাঁদের পীড়াপীড়িতে বাথ হয়ে বাথ এই ফরাসী সংগীতজ্ঞকে আর পাঁচজন নামকরা সংগীতজ্ঞের উপস্থিতিতে এক প্রতিযোগিতার আহ্বান করলেন। মারস' অকুণ্ঠিতভাবে এই প্রস্তাবে সন্মতি জানালেন। বিচারক নির্বাচিত হল, প্রতিযোগিতার জন্য একটি স্থানও নির্দিষ্ট হল। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিযোগিতার দিন অপেক্ষমাণ প্র্যাকটিকলের মাঝখান দিয়ে বাথ নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। মারস' কিন্তু এলেন না। খবর পাওয়া গেল পারিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকমত বুঝতে পেরে তিনি স্বদেশে পলায়ন করেছেন। এই ঘটনার পর বাথের খ্যাতির কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ভাইমারে থাকতে থাকতেই বাথ অর্গান এবং ক্লাভিয়রের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ চ্যুনাগুলি সম্পন্ন করেছিলেন।

জীবিত অবস্থায় খুব কম শিল্পীই উপযুক্ত সমাদর পেয়ে থাকেন। বাথের

ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। জার্মানিরা বাথের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত সংগীতের প্রতি ততটা আকৃষ্ট না হয়ে প্রধানত সংগীতবাদক হিসাবেই তাঁকে তারিফ করত। তাই যৌদিন তাদের মনে হল যে একজন অর্গানিস্টকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার কোন মানে হয় না, সেদিন নিল্দুকের দল তাঁর বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য এগিয়ে এল। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার হয়েছিল তার মধ্যে দুটি কথা মনে রাখবার মত। প্রথমত একথা শোনা গেল যে সুইডেনের যুবরাজের উপহার দেওয়া অর্গানিস্টটি আঙুলে পরা থাকলে বাথের নাকি অর্গান বাজাতে গিয়ে তাল কেটে যায়। নিল্দুকেরা একথাও বলেছিল যে হাঙেলের সংস্পর্শে এলে বাথ বক্তৃতা পারতেন যে তিনি নিজে কত ক্ষুদ্র।

আর একটি বিষয়ে জনসাধারণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত আবিচার করেছিল। অন্যের ফরমাসে মত বাথ কখনো সুর সৃষ্টি করতে পারতেন না। অনেকের মনে হ'ল এ তাঁর দাম্ভিকতা। সুতরাং এজন্যও তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নিল্দার স্রোত বইতে লাগল। নিল্দার স্রোত সর্বদাই নিম্নগামী। কখনো এই স্রোতের ধারা এত প্রবল হয় যে, নিল্দিত মানুষটিকে নিয়েই তা নিচের দিকে চলতে থাকে। বাথেরও প্রায় সে অবস্থাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল। নিল্দুকেরা ক্রমে তাঁর সম্বন্ধে যত ইচ্ছা অপবাদ দিতে আরম্ভ করল। এক সময়

তিনি যখন কোন একটা গীর্জায় গিয়ে করছেন তখন নিল্দুকেরা বলতে শুরু করে দিল যে বাথ আজকাল উচ্চমাগের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে কেবলই গীর্জার মন্দের ভাঙের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চলা, বলা, আচার, ব্যবহার সবই অস্বভূত। গৃহ-মুগ্ধ একজন দুঃখ করে সেদিন বলেছিলেন, 'বাথকে আপনারা চিনতে পারেন নি; তাঁর মত অসাধারণ প্রতিভা এ যুগে কারোর নেই'। নিল্দুকেরা জবাব দিল—'প্রতিভার কথা জানি না, জানবার প্রয়োজনও নেই। আমরা চাই একজন নিষ্ঠাবান অর্গানবাদক, যে আমাদের কথামত কাজ করবে। বাথ কখনই তা করেন না'।

এই সব নিল্দাবাদে কিছুটা আহত হলেও এগুলি তাঁর অন্তরকে তেমন করে স্পর্শ করতে পারে নি। হৃদয়ে যার আনন্দের জোয়ার—এসব তুচ্ছ কথা তাঁকে কতটুকু দুঃখ দিতে পারে। ওরফু, আর্নস্টট্ট, মাল-হাউসেন, লুবক, লাইপজিগ প্রভৃতি নানা শহরে কাজ করে অবশেষে তিনি ভাইমারের ডিউকের দরবারে প্রধান সংগীতজ্ঞের পদ লাভ করেন।

রাজা ফ্রেডারিক যখন তাঁর রাজ্য বিস্তারিত খুব ব্যস্ত। সে সময় তিনি বাথের নাম শোনেন। ফ্রেডারিক একদিকে যেমন স্বল্প রাজনীতিবিদ অপরাধকে তাঁর শিক্ষানুরাগও ছিল প্রবল। তাই কটনর্সি বা রণনীতিতে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনই বাথ

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি

সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে

অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি

সুলেখা
ওয়ার্কস
লিমিটেড

সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াশ

সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

সংগীত, চিত্রবিদ্যা এবং দর্শন-
লক্ষ্যেও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁর
আমন্ত্রণে বাথ তাঁকে রাজ্যে শোনাবার জন্য
বালিনে গিয়েছিলেন। সে কাহিনীও
অনেকটা রূপকথার মত। তাঁর বালিনে
শেখাবার খবর পেয়েই রাজা ফ্রেডারিক
তাঁকে দেখবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা
করতে লাগলেন। তার একটু পরেই বাথ
এসে দরবারে প্রবেশ করলেন। একের পর
এক দরবারের সাতটি পিয়ানোতেই সুরের
লহরী তুলে তিনি সকলকে বিমগ্ন করলেন।
তাঁদের মনে হল বাথ তাঁদের অন্য এক জগতে
নিরে গেলেন।

ফ্রেডারিক জানতেন যে বাথের প্রতিভা
শুধু বহুসংগীতের আলাপের মধ্যেই গণ্ডি-
বদ্ধ নয়। তিনি তাকে তাঁর নিজের রচনার
প্রতি কিছু বাজিয়ে শোনাতে অনুরোধ
করলেন। একথা শুনে বাথ বললেন—
আমাকে যে কোন একটি কাহিনী লিখে
দিন, আমি সেটিকে ছটি অংশে ভাগ করে
নিরে সুরে তার রূপ দেব। ফ্রেডারিক
বাথের কথামত একটি কাহিনী লিখে দিলেন
জার নির্বাক বিস্ময়ে তার সাংগীতিক রূপটির
প্রতীকার স্থির হয়ে বসে রইলেন। বাথ
জান বহু হয়েছেন, যৌবনের সমস্ত শক্তি
নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মনে তখনো
জ্বরেছে অদম্য উদ্দীপনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই
তাঁর আঙুলের স্পর্শে পিয়ানো থেকে সুরের
মুহূর্ত্ত নায়েম এল জলপ্রপাতের ধারার মত।
রাজ্যের রাজা সেদিন তাঁর সব ক্রান্তি তুলে
গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—“ভবিষ্যতে
সারা পৃথিবী কেবল তোমারই রচিত
সংগীতের জন্য সমগ্র বাথ পরিবারকে মনে
রাখবে”।

বাথ রচনেন সংগীতের সৃষ্টি স্থাপত্যের
বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। জারগামত আরোহণ
আর আনন্দে মগ্ন হওয়ার মধ্যেই স্থাপত্যের মত কিছু
সৌন্দর্য। সংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।
ঠিকমত রাগ-রাগিণীর ঊর্ধ্ব এবং নিম্নগতির
মধ্যে দিয়েই সংগীতের চরম উৎকর্ষের
বিকাশ। সংগীত হচ্ছে স্বর্গ এবং মর্ত্যের
মধ্যে এক সেতু। এই সেতু গুরে কতকগুলি
সুর চলেতে শুরু করে দিলে আরও কিছু
সুর তাদের অনুসরণ করে। এর মধ্যে
কয়েকটি চার ফিরে আসতে। কেউ বা
ফিরেও আসে। সুরপ্রবাহের এই আগ্রা-
জাসার মাঝখানে কিছু কিছু ধ্বনি বলে
ওঠে আয়তন আঁছ। তারপর তাম্রা মিলিয়ে
যায়। এর সুরে দিগন্তে তালে চলে তাদের
পিছনে ফেলে রেখে মৃত তালেয়া এগিয়ে
যায়। ফ্রেডারিক সুরের শব্দ উদ্বেগ করত বা
নিশ্চিন্ত। এই আসা আর যাওয়া, ওঠা আর
নামা, কখন আর মৃত্তির অপূর্ণ সমন্বয়ে
হার্মোনির জন্ম।

মানবসমাজের সমস্ত মহৎ সৃষ্টিই
হার্মোনির ছাঁচে গড়া। বাথ-মানুষের মত

আছে, সীমিত তার শক্তি, তাই তার রচনা
প্রচেষ্টায় সব কিছু করা সম্ভব নয়। আরও
একবন্ধ প্রচেষ্টায় কি না করা যায়।
সংগীতের রাজ্যেও একটিমাত্র রাগ অথবা
রাগিণীর পক্ষে বা ব্যক্তি করা অসম্ভব, নানা
সুরের মিলন উৎসবে তা আপনিই ফটে ওঠে।
বাথের নিজের একটি উক্তি থেকে তাঁর রচনার
সম্বন্ধে মূল কথাগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে
প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—

In the architecture of my
music I want to demonstrate
to the world the architec-
ture of a new and beautiful
social commonwealth. The secret
of my harmony? I alone know it.
Each instrument in counterpoint,
and as many contrapuntal parts as
there are instruments. It is the
enlightened self-discipline of the
various parts—each voluntarily
imposing on itself the limits of its
individual freedom for the well-
being of the community. That is
my message. Not the autocracy
of a single stubborn melody on
the one hand. Not the anarchy
of the unchecked noise on the
other. No—a delicate balance
between the two—an enlightened
freedom. The science of my art.
The art of my science. The
harmony of the stars in the heavens,
the yearning for brotherhood in
the heart of man. This is the
secret of my music.

সুরের এই মহৎ সাধনার একান্তর
নিজের বয়েসের ভারটা কোন্‌দিনই তেমন করে
বোঝতে পারেন নি। বয়েস তবুও নিয়ম-
মতই বেড়ে গেছে। পঁচষট্টি বছর পার
করেও তাঁর মনে হয়েছে যে মৃত্যুর সময়
জাসতে এখনো অনেক দেরি। বিশেষত
কত কাজ ত এখনও বাকি আছে। কিন্তু
হৃদয়শক্তি ক্রীণ থেকে ক্রীণতর হয়ে চলেছে।
সংগীত রচনার কাজ জনের সাহায্য ছাড়া
আর করতে পারেন না। তিনি বলে যান আর
কেউ স্বরলিপি লিখে নেই। এমনি করে
কাজ চলে। আবার এও মাকে মাকে মনে হয়
যে এ জীবনে বড় কম কাজ ত তিনি করেন
নি। আজ একথা কারোয় অজানা নয় যে
জীবনের প্রথম চল্লিশ বছরের মধ্যেই তিনি
বেশব সংগীত রচনা করেছিলেন কেবল

সেখানেই তাঁকে অসুস্থ করে রাখার পাশে
রখেত।

বুন্ডের লাহনার কাহিনী অবলম্বনে
রচিত সেন্ট ম্যাথু'স প্যাসন' অথবা সেন্ট
জন' প্যাসন' শুনে মনে হয় তিনি সংগীত
জগতের মিস্টার। এসকিলাশের আগেও
যেমন বিশ্বদাশ নাটক ছিল, বাথের আগেও
তেমনি 'প্যাসন মিউজিক' রচিত হয়েছে।
কিন্তু বাথই প্রথম এই জাতীয় সংগীতকে
একটি রীতিসম্মত রূপ দেন। তাঁর রচনা-
কৌশলের স্বাভাব্য সংগীতের এই শাখা
এক অভূতপূর্ব সজীবতা লাভ করেছিল।
জীবনে বহু সংগীত তিনি রচনা করেছেন।
কেবল অগানের জন্যই তাঁর দৃশ্যের বেশ
সংগীত আছে; এছাড়া প্রেলিউড, ফিউগে,
ক্যান্টাটা (বহু এবং কঠোর উপযোগী) এবং
তারের বহু অথবা বাঁশ জাতীয় যন্ত্রের জন্য
বহু কনসার্টও তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে।
এত প্রতিভাবান পুরুষ হয়েও, পরিচিত পাঁচ-
জনের সঙ্গে তিনি স্বাভাবিকভাবে মেলায়েশা
করতে পারতেন। নিজের সম্পর্কে কোন
বিজ্ঞি ধারণা তাঁর কোন্‌দিনই ছিল না। তাঁর
রচনার উপর তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের অনেক-
খানি ছাপ দৈখতে পাওয়া যায়। সেজন্যই
সেগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, অনাবশ্যক
আড়ম্বরহীন এবং ভিত্তিসে আপ্যুত।
ভোরের পাখির গানের সহজ সরল সুরে
সুর্ষের আলোকে ডেকে আনার মধ্যে যে
সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়—তেমনিই এক নির-
লক্ষ্য সৌন্দর্যে তাঁর সমস্ত রচনা পরিপূর্ণ।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুলাই বাথের
মৃত্যু হয়। পরের দিন লাইপজিগ স্ট্রিনকালে
সামান্য একটু শোক-সংবাদও প্রকাশিত
হয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার মানুষ বাথকে
ঠিক চিনতে পারে নি। বাথের মৃত্যুর পর
তাঁর বহু পরিবারের বোঝা এসে পড়ল তাঁর
বিধবা স্ত্রীর উপরে। বাথের সারা জীবনের
সমগ্র এত অল্প ছিল যে, পরিবারের ভরণ-
পোষণের জন্য এই মহিলাকে অল্পের দয়-
কামিগণের উপর বেশ কিছুটা নির্ভর করতে
হত। এরপর তিনিও একদিন মারা গেলেন।
বাথের সমগ্র রচনাবলী সেন্ট জন' ভোল্টের
একটি আলমারিতে অনাদৃত অবস্থায় পড়ে
রইল। ভাবলে মর্মহত হতে হয় যে এই
পাণ্ডুলিপির বহু পৃষ্ঠা খাবারের মোড়ক
হিসাবে ব্যবহার করে সেখানকার ছাত্ররা নষ্ট
করেছেন।

বাথ যে ঠিক কতটা প্রভাবশালী ছিলেন
তা তাঁর মৃত্যুর এক শ বছর পরে সবাই
বুঝতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে মেন্ডেল-
সনের অবদান বিরাট। আজ একথা বললে
কেউ আপত্তি করবে না যে, বাথ সত্যি-সত্যিই
প্রমাণ করে গিয়েছেন যে সংগীত স্বর্গ ও
মর্ত্যের সেতু।

স্বপ্নজ্যোতি

সঙ্গীতশিল্পী গিরীন চক্রবর্তী

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী গিরীন চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে। এই সংবাদে সঙ্গীত-জগতের সাথে পরিচিত এবং সঙ্গীত-রসিকমাত্রই শোকাভিভূত হয়েছেন। যদিও গিরীন চক্রবর্তী দীর্ঘকাল যাবৎ রোগ ভোগ করছিলেন, তবু তাঁর মৃত্যু আকস্মিক মনে হয়েছে। কারণ দূরন্ত হাঁপানী রোগে কবু হয়েছে যখনই একটু সুস্থবোধ করেছেন তখন কোন অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে তিনি সঙ্গীতসাধনা করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীত-চিন্তা থেকে তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন নি।

কবি নজরুল ইসলামের কাছে শিক্ষায় ও তাঁর মহৎ হৃদয়-প্রভাবে বাংলার যেসব শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গিরীন চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। কবি নজরুলের অফুরন্ত প্রাণোচ্ছ্বাসে গিরীন চক্রবর্তীর মত শিল্পীরা বাংলার লোকসঙ্গীতকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যে সঙ্গীত উপেক্ষিত হয়ে ছড়িয়েছিল গ্রামে-গ্রামান্তরে, ক্ষেতে-খামারে, মাঝে-মাল্লার কণ্ঠে কণ্ঠে, সেই সঙ্গীতকে এরা গ্রামোফোন রেডিও মারফৎ ছড়িয়ে দিয়ে আঞ্চলিকতা মুক্ত করেছেন। বাংলার সঙ্গীত-জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। একসময় তিনি ঢাকা রেডিও-য় গাইতেন, পরে কলকাতা রেডিও-র নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর গান বাড়িতে বাড়িতে আগ্রহের সঙ্গে শোনা হয়। একসময় রেডিও-গ্রামোফোনে লোকসঙ্গীত পরিবেশনে তাঁর জুড়ি ছিল না।

দীর্ঘকাল থেকে গিরীন চক্রবর্তীর গান আমরা রেডিও-গ্রামোফোনে শুনে এসেছি। প্রথম এক অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠে শুনেছিলাম কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী'। কি সেই কণ্ঠ, অপূর্ব অভিব্যক্তি, কত দরদ দিয়ে গাওয়া। গৌরবর্ণ, সুঠাম দেহ, মাথার ঝাঁকড়া চুল। গানের সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলি দুলছিল; 'বল বিদ্রোহী বীর' বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখে-মুখে সে কী দীপ্তি! সেই

দৃশ্য, সেই গানের সুদ আজও আমার মনে আছে। গিরীন চক্রবর্তীর কথা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলায় বিদ্রোহী গানের সুদ আমার কানে ভেসে আসে। তার পরে তাঁর গলায় অনেক অনুষ্ঠানে অনেক গান শুনেছি। আর একটি গান শুনেছিলাম কবি নজরুলের জন্মাংসব অনুষ্ঠানে। 'দূরের বন্ধুরে --- কোথায় থাক তুমি'—করণ সুদে হৃদয়ের আকৃতি, বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যেন ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই গানে। পল্লীসঙ্গীতের মাধুর্যে গানটি হৃদয়মন উতল করা। গানটির রচনা ও সুদ গিরীন চক্রবর্তীর নিজেরই দেওয়া। কবি নজরুলের উদ্দেশ্যে প্রীতিময় দিনের স্মরণে লেখা। প্রতি বছর এই গানটি তিনি বিশেষ একটি দিনে গেয়েছেন।

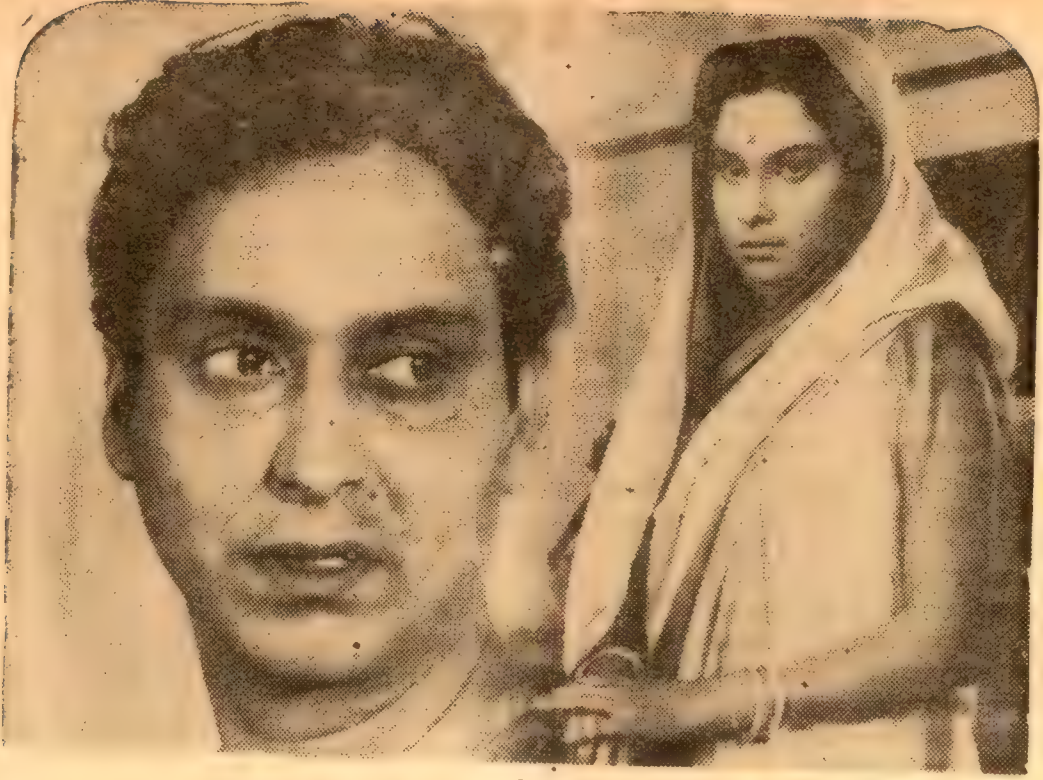
বাংলার সঙ্গীত-জগতে গিরীন চক্রবর্তীর গান কম নয়। আজ লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে অনেকে হাজার

হাজার টাকা আয় করেন। গিরীন চক্রবর্তীদের সময়ে হাজার টাকার বাজার ছিল না। যখন হাজার টাকার বাজার হয়েছে তখন তিনি অসুস্থ। তবে সুস্থ থাকলেও লোকসঙ্গীতকে বিকৃত করে তিনি হাজার টাকার গান গাইতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জীবনের শেষ সময়ে তিনি ছিলেন শহর থেকে দূরে প্রায় এক কুঁড়ে ঘরে। যদিও এই কুঁড়ে ঘরে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তিনি সুখের নীড় রচনা করতে চেয়েছিলেন,—তবুও ৫০ বছরের বেশি তিনি থাকতে পারলেন না। একদিকে রোগ, আর একদিকে দারিদ্র্য। এই দুইয়ের সাথে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। আমাদের দেশের সরকার নাকি শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি দরদী। অনেককে সম্মানী দিয়েছেন, মাসোহারা দিয়েছেন। অনেক সুস্থ সবল যুবক সাহিত্যিকও আজো সরকারী মাসোহারা পেয়ে থাকেন অথচ তদ্বির-তদারকের অভাবে গিরীন চক্রবর্তীর ন্যায় খ্যাতনামা শিল্পীরা দুঃসময়ে কোনো সরকারী সহানুভূতি পান না। সরকারী বৃত্তিলাভ করলে তাঁর জীবনের আয় আরো বাড়তো কিনা জানি না। তবে দেশের সঙ্গীত অনু-রাগীরা অনুভব করতেন সরকার সত্যিই শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দল ও চক্রের গণ্ডির বাইরে ব্যক্তি পরিবেশন করে থাকেন। গিরীন চক্রবর্তীর মত শিল্পী হয়তো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিলাভের গর্ব অনুভব করতে পারতেন।

—সুজন।



গিরীন চক্রবর্তী



‘একই অঙ্গে এতরূপ’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখার্জী

চিত্র আলোচনা

একই অঙ্গে এতরূপ

বিশ্ব এবং বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্যের স্বাদ রয়েছে ‘একই অঙ্গে এতরূপ’ ছবিতে। ছবিটির গঠন ও বিন্যাসে পরিচালকের সুস্থ চিন্তাশক্তি এবং শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীদের অভিনয় সাফল্য এবং সঙ্গীত মাধুর্যে ছবিটি উপভোগ্য।

ছবির নায়িকা হাসি বিবাহের পূর্বে ভালবেসেছিল সৌমেনকে। যৌবনের প্রারম্ভে সৌমেনের ব্যক্তিগত সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এই প্রণয়মেহের মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সৌমেন আর তার জীবন অভিন্ন। তারপরে চাকরীর সম্মানে সৌমেন বাইরে চলে যায়। দীর্ঘকাল তাদের কোন যোগাযোগ নেই। অভিভাবক হাসির বিবাহ স্থির করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে হয়। বিয়ে করে হাসি খুশি। কিন্তু এই সুখের দিনে হঠাৎ একদিন সৌমেন উপস্থিত হয়ে দাবি করলো তার অধিকার। সে সমাজ ও একটি সুন্দর পরিবারের মানসম্মান উপেক্ষা করে হাসির কাছে দাবি করলো হয় প্রতিশ্রুতি পূরণ কর, নতুবা দুজনে মৃত্যুবরণ করে পরজীবনে

মিলনের পথে অগ্রসর হই। এই দাবিতে হাসি বিমূঢ় ও অসহায় হয়ে পড়লেও বিষপাত্র হাতে তুলে হঠাৎ যেন তার সন্ধি ফিরে এলো। ভালবাসা কখনো মৃত্যুকে আহ্বান করতে পারে না। জীবন আর ভালবাসা অভিন্ন। সে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মৃত্যুকামনা করে সেখানে মোহ যত প্রবল প্রেম তত নয়। হাসি তাই শূন্যে দিল, আসলে সৌমেন তাকে ভালবাসে না। এই চেতনার শেষ পর্বন্ত সৌমেনও এক হান্দি থেকে মৃত্যু হয়েছিল এবং প্রেমের শূচি স্পর্শ কর্তব্যের সম্মান দিয়েছিল। স্বামীর কাছে হাসি সব কথা জানিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষিত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন স্বামী—অতীতকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে বর্তমানকে গ্রহণ করে হাসিকে নিয়ে সুখী হয়েছিল।

পরিচালক হরিশাধন দাশগুপ্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রামাণিক চিত্র-জগতের লোক। তাই এই ছবিতে প্রামাণিক চিত্রের রীতি কিছুটা প্রশ্রয় পেয়েছে। সে কারণে হাসি ও রমেনের সুখী দাম্পত্যজীবনের মুহূর্তগুলি ক্যামেরায় দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখা ও পৌনঃপুনিকতার ছবির গতি বড় বেশি শিথিল হয়ে উঠেছে। এই শিথিলতার জন্য উপভোগ্য রোমাণ্টিক মুহূর্ত-গুলিও এক-এক সময় বিরক্তিকর মনে হয়েছে। সঙ্গীতের জলসা দৃশ্যে আলি আকবর খাঁ সাহেবকে দীর্ঘক্ষণ পর্দায় ধরে রাখা ইত্যাদি পরিচালকের ওপর প্রামাণিক চিত্রের প্রভাবের ফল। বাস্তবিক পক্ষে সৌমেনের উপস্থিতির

পরই কাহিনী শূন্য হয়ে গেছে এবং ছাঁখ ভঙ্গ-ভোগ্য গতি লাভ করেছে। পরিচালক প্রথমার্শকে যদি আরো দ্রুতগতি ও ঘটনাবহুল করতে পারতেন তবে ছবিটির উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেতো। এই দৃষ্টি সত্ত্বেও সমাজের দিক থেকে এই ছবির এক বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। এই বক্তব্য অত্যন্ত কালোপযোগী এবং সুখী ও সুন্দর জীবন গঠনের সহায়ক। এদিক থেকে এই ছবিটি অভিনন্দনীয়। পরিচালক হিসাবে ব্রীদাশগুপ্তের শক্তি এই ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নিঃসঙ্গতাজ্ঞাপক দৃশ্য, মৃত্যুর মুখোমুখি হাসি ও সৌমেন এবং হাসির চিঠিটি পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি মুহূর্ত-গুলি প্রশংসনীয়। ‘একই অঙ্গে এতরূপ’ যে গতানুগতিক বাংলা ছবির অনেক উর্ধ্ব তা দর্শকমাত্রই উপলব্ধি করবেন।

অভিনয়রাশি হাসির চরিত্রে মাধবী মুখার্জী এমন এক তরুণীবধূকে উপস্থিত করেছেন যার হাসিকান্না, ব্যথা ও শঙ্কার কথা দর্শক-মনে সমবেদনা জেগেছে। তাঁরই পাশে আরো কঠিনতর একটি চরিত্রে সৌমিত্র মুখার্জী সৌমেনের হান্দি চিন্তাধারা ও মোহ, উদ্ভ্রান্ত চিন্তা, অবশেষে প্রেমের শূন্যপর্শে হান্দি-মুষ্টির মুহূর্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর সুন্দর ও সুখী-জীবন প্রত্যাশী প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন স্বামী রমেনের চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী সার্থক অভিনয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হলেন চট্টোপাধ্যায়,



‘ভগীরাত’ হিন্দী ছবিতে প্রদীপকুমার ও মীনাকুমারী

ছায়া দেবী, সন্মিতা সান্যাল, সোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, ছন্দা, সুবল দত্ত, নিবারণ সেন প্রমুখ প্রত্যেকেই এখানে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন গুস্তাফ আলি আকবর খান। খ্যাত সহশিল্পীদের সহযোগিতায় তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতাংশ উপভোগ্য। প্রশংসনীয় চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ করেছেন দীনেন গুপ্ত এবং ভরুণ দত্ত।

ভিগিরাভ

‘ভিগিরাভ’ এক গ্রিকোথ প্রেমের কাহিনী। বর্ষশস্তু এক রাতে নিজের সম্মান রক্ষার এক তরুণী ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল। এক সহৃদয় মহিলা তাকে আশ্রয় দিয়ে মেয়ের গভর্নেস নিযুক্ত করেছিল। সেই মহিলার প্রতি প্রেমাসক্ত হয় এক শিল্পী। আর একদিকে আশ্রয়দাত্রী মহিলার ভাইও তার প্রতি অনুরক্ত হয়। এই নিয়ে সামাজিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পর কাহিনী পরিণতি লাভ করে। ছবির সব চরিত্র উচ্চবিত্ত সমাজের লোক। উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতি মোহশক্তি ছাড়া ছবির আর কোন উদ্দেশ্য প্রত্যয় হয় না। প্রথম দৃশ্যে এক সুইমিংপুলে সুন্দরী তরুণীদের নানা অঙ্গভঙ্গী আর তাদের পেছনে একদল তরুণের লম্বাভাবে রসিকতার উদ্ভট দৃশ্য। সুইমিংপুলে এরূপ আশালীনতা কোথাও চলেতে পারে কিনা

জানি না। কিন্তু হিন্দী ছবিতে তামাসার যে প্রচলিত রীতি আছে—এ ছবিতে তাকে আরো ছাড়িয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এখানে বাস্তববোধের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ছবিটি ১৭ রিলের দীর্ঘ। পরিচালনা করেছেন কালিদাস। অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী, অশোককুমার ও প্রদীপকুমার প্রমুখ।

নাট্যসংস্থা

বিধি ও ব্যতিক্রম

(অনুশীলন সম্প্রদায়)

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা অনুশীলন সম্প্রদায় দুটি নাটক নিয়ে আবার নিয়মিত অভিনয় আয়োজন করেছেন। এই দুটি নাটকের মধ্যে বিখ্যাত বাটল ব্রেশট-এর নাটকের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত ‘বিধি ও ব্যতিক্রম’ এক নতুন ধরনের নাটক। দ্বিতীয়টি রমেন লাহিড়ী রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক ‘পান্থশালা’। এই নাটক দুটি অনুশীলন সম্প্রদায় থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে প্রতি বৃদ্ধবার নিয়মিত অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

‘বিধি ও ব্যতিক্রম’ নাটকে এক ঠিকাদার

চলেছে নতুন তেলের খনির সম্মেলন। সঙ্গে মালপত্তর বহন করে চলেছে এক কুলি, তার সঙ্গে রয়েছে পথপ্রদর্শক ছাড়িদার। অন্য ঠিকাদারদের অন্তত একদিন পেছনে ফেলে যাবার জন্য ঠিকাদার কখনো নরম, কখনো গরম হয়ে কুলিদের চালাচ্ছে। কুলিদের প্রতি তার চরম অবিশ্বাস। কিন্তু কুলিরা যে মোটেই অবিশ্বাসের পাত্র নয় সে কথা সে ভাবতেই পারে না। এই সম্মেলন থেকে প্রথমে সে ছাড়িদারকে বিদায় করলো। বাধ্য হয়ে নদী পায় হতে গিয়ে কুলির হাত ডান্ডার পরও—সে তাকে গুলী করে হত্যা করে। কিন্তু বিচারে ঠিকাদার বে-কসুর খালাস পায়। এই নাটকে একদিকে ধনতান্ত্রিক মানসিকতা আর একদিকে শোষিত মানবের চিন্তাধারা পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও গরীব মানুষেরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় কিন্তু ধনতান্ত্রীরা তাদের সম্পর্কে কত বেশি আতঙ্কগ্রস্ত এবং দেশের আইন ধনতান্ত্রীদের রক্ষা করার জন্যই যে রচিত—সেকথা এই নাটকে পরিষ্কার কুটে উঠেছে। এরূপ নাটক অভিনয় করার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আজকের নতুনবে নাটকটি দর্শনীর এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে উপভোগ্য। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি এই নাটকে দর্শকরা নতুনবেই স্বাভাবিক পাবেন। ধনতান্ত্রিক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি ঠিকাদার ও কুলির অভিনয়ের ওপর নাটকের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। এদিক থেকে শেষোক্ত চরিত্রে প্রীতিময় বোধের

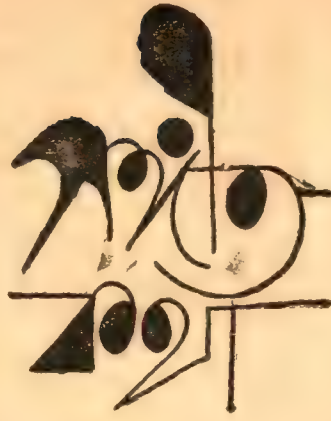


চরণকবি মজুমদার ছবিতে সবিতারত দত্ত

সার্থক রূপদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ঠিকাদারের চরিত্রে অরুণ দেব অভিনয় মোটা-মুটি সার্থক। অন্যান্য অভিনেতাদের দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয় প্রশংসনীয়। এঁদের মধ্যে আছেন—সুত্রত নন্দী, সমীর মুনোপাধ্যায়, হরিদাস কাবাসী, আদিত্য পাল, সুবিনয় রায়, মজুমদার, ননী নাগ এবং সুত্রধর রূপে সুদীপ্ত বিবাস। নাটকটির রূপায়ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য মমতাজ আহমেদ থাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্ষুধা

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'ক্ষুধা' নাটকটি অভিনয় করলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ট্রাফিক একাউন্টস ব্রাণ্চের 'ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাবের' শিল্পীসদস্যরা রঙমহল মধ্যে। শিল্পীগোষ্ঠী দলগত অভিনয়-সৌকর্যে নাটকটির সাফল্যের সোপান প্রশস্ত করেছেন। প্রতিটি চরিত্র মধ্যে প্রাণবন্ত রূপ পেয়েছিল। নির্দেশনায় ছিলেন সলিল দত্ত। সদার চরিত্রে সুদীপ্ত ঘোষ, গজার চরিত্রে নারায়ণ মুনোপাধ্যায়, রমার চরিত্রে ভূপেন চক্রবর্তী, জগৎ চৌধুরীর চরিত্রে বিভূতি চ্যাটার্জী, বাবুয়ার চরিত্রে বিভাস বটব্যাল অভিনয় করেছেন। মানবী ও প্রভার ভূমিকায় প্রতিমা পাল ও সবিতা মুনোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন—সন্ধ্যা মজুমদার, সুকুমার মুনোপাধ্যায়, শ্রীপদ সমাজপতি, কানাই ভট্টাচার্য ও প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়।



নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'

গত ১১শে ডিসেম্বর একাডেমি ফাইন আর্টস হলে শ্রীমতী যুদ্ধিকা দাশগুপ্তার প্রযোজনায় 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-গীতি-নাট্যের অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, বয়সে কাঁচ কাঁচ হয়েও বেরূপ দক্ষতার সাথে নৃত্য-নাট্যটির রূপদান করেছে তাতে সেদিনের সন্ধ্যাটি সকলের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এদের কারো বয়স তের-চোদ্দ-র বেশি নয়। কিন্তু শিক্ষার ও নিষ্ঠার এরা 'চণ্ডালিকা'-কে সার্থকভাবে রূপদান করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য 'চণ্ডালিকা'-র বারী রূপদান করে থাকেন সেরূপ খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের সাথে তুলনা না করেও বলা চলে এই কিশোরীরা সেদিন সন্ধ্যায় আশার অধিক আনন্দ দান করেছে।

এই নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনার কৃতিত্ব অসিত চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি কথাকলি, ভারতনাট্যম এবং লোক-নৃত্যের মাধ্যমে এক সমাজ পরিবেশ ও জীবনবোধ এবং ক্ষুধা ও সংস্কারের গভীর থেকে উত্তরণের মহৎ জীবনদর্শনের বাণী প্রকাশ করেছেন। কিশোরী শিল্পীরা এই বাণী সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। এই কিশোরীদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে প্রকৃতির চরিত্রে সূতপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের চরিত্রে পদ্মিনী দাশগুপ্ত। সূতপা প্রকৃতির বাধা ও আকাঙ্ক্ষা এবং নতুন জীবনের পথে উত্তরণের মুহূর্তকে সার্থকভাবে অভিব্যক্ত করেছে। পদ্মিনী মায়ের কোমল-কঠোর চরিত্র এবং মানবিকবোধকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছে। আনন্দের চরিত্রে জয়ন্তী লাহিড়ী সৌম্য সুন্দর ও শান্তিময় জীবন-প্রতীক রূপায়িত করেছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বাঁশরী চক্রবর্তী, সুদীপ্তিকা দত্ত, শিবানী দাশগুপ্ত, কাজরী চক্রবর্তী, যশোধরা মোহান্তী, রুমা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রানী দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা সকলেই প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হিমমতী রায়চৌধুরী। সদাতাংশে গীতিবিদ্যার অদ্বিতীয় সেনগুপ্ত সর্বকণ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সুদীপ্ত কণ্ঠের গানে সকলে মুগ্ধ। তাঁর সঙ্গে তুলনায় অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন কিছুটা দুর্বল। এই দুর্বলতা না থাকলে সঙ্গীতাংশের স্বার্থকতার নৃত্য-নাট্যটি আরো উপভোগ্য হতো। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছে রুনা মতিলাল, শ্যামা সিংহ-রায়, ইরা মেহ, মীনাক্ষী ভৌমিক, অঞ্জলি গুহ, রবীন্দ্র গান্ধী, চিত্রা সেনগুপ্ত, নন্দুর সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পী দেবরত বিশ্বাস দুটি গান গেয়ে পরে তার ইংরেজী অনুবাদ গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। এই অনুষ্ঠান বিদেশী প্রোতাদেশের পক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বাদ ও সুরমাধুর্য উপভোগের সহায়ক।

দ্রবীর সাগরিকা

গত ১৬ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে দ্রবী সংস্থার প্রযোজনায় রবীন্দ্র-নাথের 'সাগরিকা' কবিতা অবলম্বনে এক গীতি-নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান হয়েছে। নৃত্য-নাট্য ও দৃশ্য-পরিকল্পনা করেছেন বীরেন মজুমদার; নৃত্য রূপায়ণ



নির্মীরমাণ 'সুভাষচন্দ্র' ছবিতে প্রফেসর ওয়েনের ভূমিকায় ল্যান্স জ্যানি

করেছেন শ্রীমতী শূদ্রা ঘোষ। গ্রন্থনায় ছিলেন দর্দান্ত রায় ও অর্চনা দাশ-গুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের সাগরিকা কবিতা অবলম্বনে নৃত্য-নাট্য-পরিকল্পনার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যখন প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর অঙ্গের নেশায় মাতন লেগেছে, আন্তর্জাতিক ও মৈত্রীবোধ বিস্মৃতির পথে, এমন দৃঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার নাট্যরূপ হয়তো ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে করিয়ে দেবে একদা ভারতীয় সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বিস্মৃতি ঘটেছিল অঙ্গের শক্তিতে নয়, রাজকীয় দম্ভেও নয়; প্রেমের সাধনায়। সেই শূভচেতনা যদি জাগিয়ে তুলতে পারে তবে এই গীতি-নৃত্যানুষ্ঠান সাংগঠনিক। উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য চেষ্টার হ্রদ্বীপ করেন নি। কেবল গীতি-নৃত্যের ওপর নির্ভর করতে না পেরে তারা পটভূমিকারূপে ছায়াচিত্র সংযোজন করেছেন। ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রকৃষ্ণ জ্ঞাপনের দৃশ্যটি প্রশংসনীয়। বাকি দৃশ্যগুলি দেখতে চমকপ্রদ হতে পারে কিন্তু ফাবের মেজাজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে নি। আতিশয্যে নৃত্যের রসসৃষ্টিকে ম্লান করেছেন। অনুরূপ কথা সঙ্গীত সম্পর্কে প্রযোজ্য। সঙ্গীতের আতিশয্যে নৃত্যানুষ্ঠান অনর্থক দীর্ঘ হয়েছে। যে বক্তব্য ও রসসৃষ্টি আরো অর্ধেক কম-সময়ে হতো তাকে গানের পর গান যোজনায় দীর্ঘ করে একঘেয়ে করা হয়েছে। এবং এই প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য সাগরিকা কবিতা হারিয়ে গেছে বললে



চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে পদ্মিনী দাশগুপ্ত (মা) ও সূতপা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃত)



চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য



শ্রমীর সাধারণ নৃত্যনাট্যে শূদ্রা ঘোষ ও স্বর্ণা বসাক

অত্যাধিক হবে না। মূল পরিকল্পনার দোষে নৃত্য-পরিকল্পনার কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ ছিল না। যারা নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে শূদ্রা ঘোষ নৃত্যে পারদর্শিনী। অন্যান্যদের মধ্যে স্বর্ণা বসাক, কৃষ্ণা ব্যানার্জী, শিপ্রা ঘোষ, রীরা বোস, শিপ্রা রায়, ডলি ঘোষ, সুচন্দ্রা ব্যানার্জী, সঙ্ক্যা

ঘোষ, দীপালি মাস্তা, সুস্মিতা দাস প্রশংসনীয়। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছে নন্দিতা দত্ত, রিফা রায়, মীরা মিত্র, রূপালী গুপ্ত, উর্মিলা মজুমদার, সংহিতা মজুমদার, পান্না সান্যাল, তরুণ ব্যানার্জী।

এই নৃত্যানুষ্ঠানের পূর্বে লোক-সঙ্গীতের এক আসর বসেছিল। এই আসরে অংশগ্রহণ করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী—কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, কুনাল দত্ত, প্রদীপ ব্যানার্জী, সুনির্মল বসু, প্রদীপ বসু, সুশান্ত দত্ত। এই ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব-বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং আসামের লোক-সঙ্গীত পরিবেশন করেছে।

করে তাঁদের শিক্ষণ-কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সেই সঙ্গে নৃত্যাচার্য হিমাংশু রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের “ক্ষুধিত পাষণ” নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যাংশে ছিলেন শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী দত্ত, মিতা কর, রুদ্র দাস, প্রতিভা সাহা, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যাপী পকেট রেডিও

জাপানের পকেট রেডিও আবিষ্কার।
কড় কড় রেডিওর মতন আওয়াজ। অল ট্রান-
জিস্টার এবং লাউড স্পীকার গ্যারাণ্টীবদ্ধ।
জাপানে প্রস্তুত। বেড়াইতে বেড়াইতে গানবাজনা
শুনুন। স্থানীয়-
ভাবে জগতের প্রত্যেক
ফেটন হইতে শুনি-
বার জন্য গ্যারাণ্টী-
যুক্ত। ব্যবহার ও
প্রদর্শনোপযোগী করিয়া
সরবরাহ করা হয়।



টচ সেলে চালাইতে হয়। ক্ষুদ্র এবং
হালকা ওজন। ৩ বৎসরের গ্যারাণ্টীবদ্ধ।
নং টি পি-৮৮ মূল্য ৩৫, টাকা ভি পি পি
চার্জ ৪, টাকা রেডিওর কেসের জন্য ৫, টাকা।

SULEKHA TRADERS
(WBM-88)
BEAT NO. 13, ALIGARH

ছন্দমের অনুষ্ঠান

গত ৫ই ডিসেম্বর মহাজাগতি সদনে
“ছন্দম্” সঙ্গীত শিক্ষায়তনের চতুর্দশ
বার্ষিক মিলনোৎসব হয়েছে।

শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা—শম্ভুনাথ
মুখোপাধ্যায়, মনোজ সেনগুপ্ত ও
বিমলেন্দু চক্রবর্তীর পরিচালনায় ধ্রুপদ,
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গীটার পরিবেশন



ভরুণ চৌধুরী

মনে মনে অপারিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আন্তর প্যাভেলোভিচ চেখভ—কিন্তু সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন টলস্টয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। টলস্টয় জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশে, নিজে ছিলেন কাউন্ট, তাঁর শিরা-উপশিরাই প্রবাহিত হোত রাজরক্ত—তাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে সারা জগৎজুড়ে তখন তাঁর প্রচণ্ড নামঘণ। কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই টলস্টয় খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। মদ্যিকের পোশাক পরতেন এবং প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রম করতেন।

চেখভ ছিলেন প্রায় সবদিক দিয়েই টলস্টয়ের বিপরীত। তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন সফর। কঠোর শ্রম করে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তারই বিনিময়ে তিনি নিজের এবং পরিবারের সবার স্বাধীনতা ক্রয় করেছিলেন। এজন্য প্রতি লোক বাবদ তাঁকে সাতশো রুবল করে খরচ করতে হয়েছিল। এই সময়টায় চেখভের বাবার বয়স ছিল ন' বছর। তিনি কিন্তু তেমন কিছুই লেখাপড়া শেখেন নি—এমন কি নিজের এই বিশ্ববিখ্যাত ছেলের লেখা বোঝবার মত বিদ্যার্জনও তাঁর হয় নি। চেখভের বাবা কিছুদিন একটি জেনারেল স্টোর চালান—এতে অবশ্য খুব কিছু আয় হোত না। চেখভের বাবা এবং পরিবারের আর সবার সমস্ত ভরণ-পোষণ চলতো চেখভের টাকায়—যে টাকা চেখভ আয় করতেন ডাক্তারী করে এবং রচনার থেকে।

তাঁর স্বল্প বয়সের বেশির ভাগ সময়টাই চেখভ তাঁর বাবা, মা, চার ভাই এবং এক বোনের সমস্ত খরচ চা্লিয়ে এসেছেন। চেখভের বাবা ছিলেন অসহ্য ধরনের স্বেচ্ছাচারী—দুটি ভাইয়ের দাম্পত্য-জীবন ছিল অত্যন্ত ভাসুখী এবং তার ফলে এঁরা দুর্দান্ত মাতালে পরিণত হয়েছিলেন। এই ধরনের পরিবেশে মানুষ হওয়াতে চেখভ কখনও টলস্টয়ের মত মদ্যিকদের প্রশংসায় পণ্ডমুখ হয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি বলতেন :

“There is mujik blood in my veins, and mujik virtues do not surprise me”

চেখভ টলস্টয়ের মত প্রফেট ছিলেন না। কোনো বিষয়ে দৃঢ় মতাবলম্বীও তিনি হতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সংশয়বাদী—অবশ্য তাঁকে পেসিমিস্ট বললে ভুল করা হবে। কিন্তু একথাও ঠিক জীবনের কোনো উদ্দেশ্য বা অর্থ আছে কিনা, সে-বিষয়েও তাঁর কোনও দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয় ছিল না। যে সব জিনিসকে

বইমেলা ওদেশে এবং গদেশে

টলস্টয় পরিবর্জন করোছিলেন সে সবে একটা বিশেষ মূল্য এবং আকর্ষণ ছিল চেখভের কাছে। আর এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, চেখভের প্রতিভা দারিদ্র্যপিষ্ট অবস্থার ভেতর দিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল।

চেখভ অন্তর থেকে ভালবাসতেন শিল্পকে, ভালবাসতেন সৌন্দর্যকে, আর মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতেন অল্প পরিমাণ বিলাসকে—যেটুকু বিলাস করায়ত্ত্ব করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হোত না।

অন্তরটা দয়ামায়াকে ভরা ছিল বলেই পরিবারের লোকেরা, লেখক বন্ধুরা এবং গরীব রোগীরা বেশিরভাগ সময় চেখভকে এক্সপ্লয়েট করে এসেছেন।

তাঁদের বংশে ছিল ক্ষয়রোগের ইতিহাস—এমন কি তাঁর একজন ভাইও এই কালব্যাদিতে মারা গিয়েছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে যখন প্রথম ফফলা অর্জন করতে শুরু করেছেন,

সেই সময়েই প্রথম এই রোগে আক্রান্ত হন চেখভ। অসুখ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, চেখভের প্রকৃতিতে একটা অদ্ভুত বৈতভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে—অবশ্য এই বৈতভাবটা আগাগোড়াই অস্ফুট অবস্থায় চেখভের মানস-প্রকৃতিতে ছিল। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন আলাস্যপরায়াণ ও নিষ্ক্রিয়—আবার অদ্ভুত কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং সক্রিয়। নিজের এই দ্বিবিধ বিপরীত প্রকৃতির জন্য চেখভ কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে আত্মবিশ্লেষণ করে—নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। মস্কোর বাইরে মেলিখোভোতে থাকবার সময় চেখভের প্রায় সব সময় অতিথিদের আপ্যায়নেই ব্যস্ত থাকতে হোত—তাছাড়া সামাজিক এবং জনহিতকর সবরকম প্রচেষ্টার সুযোগই তিনি জড়িত ছিলেন। এতরকম হট্টগোলের ভেতর থাকলেও আসলে কিন্তু চেখভ ভালবাসতেন সম্পূর্ণ একলা নিজের স্বপ্নরাজ্যের ভেতর বিচরণ করতে।



‘ভট্টর আইবোলিট’ ব্যালের একটি দৃশ্য



অপেরা মোরোজকোর একটি দৃশ্য

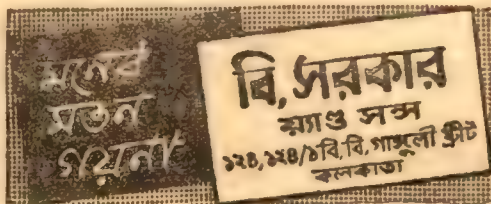
ওখানে তাঁর নিজের জমিতে একটি পুকুর ছিল। বৃন্নিদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, চেখভ প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ পুকুরের ধারে ফিসিং রড্ হাতে বসে থাকতেন—যদিও অনেকের ধারণা ছিল যে, ও পুকুরে একটিও মাছ ছিল না। আবার সময়ে সময়ে চেখভের মনে তাঁর বাসনা হোত ভ্রমণে বের হবার। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শাখালিনে গেছিলেন সেখানকার অবস্থা নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখতে—তাছাড়াও অন্যান্য অনেক রকমের উত্তেজনাপূর্ণ কাজের ভায়ে এসে পড়ে তাঁর ওপর। এইসব

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই চেখভের জীবনদীপ বোধ হয় ক্রমে ক্রমে নিভে আসছিল। জীবনের শেষ কয়েক বছর ডাক্তারের উপদেশে অপেক্ষাকৃত গরম ইয়াল্টাতে কাটাতে হয় চেখভকে। শহরে থাকতে চেখভ একেবারেই পছন্দ করতেন না—মনে হোত যেন বাজারের ভেতর বসবাস করছেন। আরও ভাল লাগতো না এখানকার ইউরোপীয়ান এবং প্রভিন্সিয়াল ক্যারেক্টার। মস্কোর ঠান্ডা এবং গোলমেলে আবহাওয়া এবং পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। 'সি গাল' নাটকে যখন ট্রিগোরিন নালিশ জানা-

চ্ছেন যে, তিনি নিজের কাছ থেকে নিজে পরিগ্রাণ পাচ্ছেন না—সেখানে ট্রিগোরিন চেখভেরই একটি নিজস্ব মনের ভাবকে প্রকাশ করছেন।

“These contrasts in Chekhov have been discussed in some detail because they recur, though in exaggerated or even caricatured form, in the characters of his plays. Chekhov's plays are admired, as are his novels, not least because they present such a vivid picture of Russian life. This they certainly do. But one would not find them so moving if they did not also give us a strangely distorted reflection of the another himself.” [Martin Lamm.]

চেখভ বিশ্বাস করতেন যে, তিনি প্রলিটেরিয়েটদের এক গোত্রের লোক—প্রলিটেরিয়েট বলতে তিনি সেই শ্রেণীর লোকদেরই বুঝতেন, যারা মাত্র কিছুদিন আগে দাসত্বদশা থেকে



মুদ্রিতলাভ করেছে। তাছাড়া চেখভ একমাত্র জানতেন যে তিনি মৃতপ্রায় ইনটেলিজেন্সিয়ারও অন্তর্গত। আদর্শকে কৃষ্ণগত করবার জন্য চেখভকে সারাজীবন আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি তাঁর চিঠিপত্রে ধারবার অনুযোগ করেছেন যে, নাট্যকার হিসাবে সহজাতভাবে সে স্বাধীনতা বোধ তাঁর হয় নি, যে বোধটা সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর লেখকদের ভেতর আপনাতথেকেই ফুটে উঠেছে। তাঁর মত লেখকদের, অর্থাৎ সমাজের নিচের স্তর থেকে বাদে গুপের উঠে আসতে হয়েছে আপ্রাণ সাধনার স্বারা—বন্দনবিহীন মানসদৃষ্টি আরম্ভের ভেতর আনবার জন্য বিনিময়ে বিসর্জন দিতে হয়েছে নিজের যৌবনকে। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সাহিত্যিক বলতে চেখভ বোধহয় টলস্টয় এবং টুর্গেনেভের কথাই মনে ভেবেছেন—

“And it must have been with a certain amount of envy in his heart that, speaking of Tolstoy as a misanthrope, he once said, ‘I do not think he can ever have been unhappy.’”

চেখভ যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন—১৯০৪ সালে চুয়াশ্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান, অর্থাৎ ঠিক দুর্ভাগ্য-পূর্ণ বিদ্রোহের আগে—তাহলে তিনি দেখে যেতে পেতেন যে, আগেকার শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধার অবলম্বিত হয়ে।

এইখটিজে যখন চেখভ যশের একেবারে উচ্চশিখরে উঠেছেন, তখনই রাশিয়াতে প্রতিভ্রম্যর যুগ শুরু হয়ে গেছে। এর দশ বছর আগে লোকে উচ্চাশায়-ভ্রম দিবাস্বপ্ন দেখেই সময় কাটাতে। কিন্তু সে সব উচ্চাশা যখন ফলপ্রসূ হোল না, তখন বিদগ্ধ শ্রেণীর লোকদের ভেতর একটা ‘প্যাসিভ ফেটেলিজমের’ ভাব দেখা দিল। একথা চেখভ অবশ্য বিশ্বাস করতেন না যে, সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—তবে তাঁর সমসাময়িক অনেকের মতন তিনিও উপলব্ধি করতেন যে পায়ের তলার মাটিটা বেশ নাড়া দিয়ে উঠেছে।

মার্টিন ল্যাম লিখেছেন :

“Chekhov never proclaimed any political message, but Soviet Russia has never tired of maintaining that he would have been a Marxist if he had lived longer,”

এখানে ল্যাম যেন একটু ঠাট্টা ছলেই কথাটা বলেছেন। অথচ আমার তো মনে হয় চেখভের লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকলে একথা বেশ সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট আমল অবাধ বেঁচে থাকলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি মার্ক্সবাদী হয়ে দাঁড়াতেন। ‘থ্রী সিস্টার্স’ নাটকে ভারসির্নিব ‘এক-জায়গার তিন বোনকে সম্বোধন করে বলেছেন—‘এর পরে এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরাই আউট অভ ডেট হয়ে যাবে—ভবিষ্যতে যে সব লোক জন্মগ্রহণ করবে তাদের অবস্থা হবে সব দিক দিয়ে তোমাদের থেকে অনেক ভাল।’

বিখ্যাত আমেরিকান সমালোচক ইভাল্য গ্যালিয়েন বলেছেন :

“And what a mighty and accurate vision he had of the future. In Torfimov’s wonderful lines at the end of the second act of ‘The Cherry Orchard’ it is as though the Russian Revolution had been foreseen as inevitable and its essence laid bare. ‘All Russia is our garden... etc.’”

ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে যে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বর্তমান কালের ওপরেই তার ছায়াপাত করে যায়। ট্রফিমভের উপরিউক্ত সংলাপটি থেকে সেই কথাই বারবার মনে হয়। চেখভ যেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যতের রাশিয়ান রেভোলিউশনের কথা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর ট্রফিমভ বলতে পেরেছেন :

“Think only, Auya, your grandfather, and great-grandfather, and all your ancestors were—slave owners—the owners of living souls—and from every cherry in the orchard, from every leaf, from every trunk there are human creatures looking at you, Connot you hear their voices? Oh, it is awful!”

চেখভের রচনাতে তৎকালীন রাশিয়ার ভয়াবহ সামাজিক অবস্থার একটা জ্বলন্ত আলো ছায়া ছিল বলেই আজও পর্বন্ত রাশিয়ানরা অত্যন্ত প্রশ্রা এবং সমাদরের সঙ্গে চেখভের ওয়াকর্স বিশ্লেষণ করে পড়ে থাকেন।

তবে একটা কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। তত্ত্ব বা উপদেশাবলী পরিবেশন করেই চেখভ পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন নি। তাঁর রচনার কাব্যিক অংশটাই তাঁকে এতোটা খ্যাতি এবং যশের অধিকার করেছে।

চেখভের ভাই মাইকেল বলেছেন যে, স্কুলে থাকতেই চেখভ তাঁর প্রথম নাটক ‘ফাদারলেস’ রচনা করেন। কিন্তু পরে স্কুল ছাড়বার পর চেখভ এ নাটকটি ছিঁড়ে ফেলেন। ১৯২০ সালে চেখভের একটি নাটকের ম্যানাস্ক্রিপ্ট আবিষ্কৃত হয়—এ নাটকটির কোন টাইটল দেওয়া ছিল না। ‘ফাদারলেস’ নাম দিয়েই নাটকটি প্রকাশ করা হয়—যদিও নামের সঙ্গে নাটকটির বস্তুর কোন সঙ্গতি ছিল না। এর নামক হচ্ছে একুশ বছর বয়সের স্কুলমাস্টার শ্বেটেনিভ—তার ধারণা ভেতর থেকে সে একেবারে ক্ষয় গেছে। সে বলে—

“My soul has long been a skeleton, and it is too late to re-awaken me.”

(রমশা)

সালফার গায়োমাথা সাবান



শরৎ ঋতুতে বিশেষ উপকারী।
শেতর এই সাবান নিভা ব্যবহারে,
বিশেষতঃ গরমের দিনে, বোস,
কোড়া, চুলকানি, খামাচি প্রভৃতি
রোগের নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

সাপ্তাহিক বসুমতীর ২৩শ সংখ্যায় শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্যের 'গ্রাম বাংলার কথা' প্রসঙ্গে সব সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যে রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাহা আদি সপ্তগ্রামের জনগণের অন্তরঙ্গপাণী গ্রন্থকথা। এই গ্রন্থকথা প্রকাশের নিমিত্ত অধিবাসীগণের পক্ষে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রচনায় স্থানীয় জুনিয়র হাই স্কুল সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, একটি বিষয় ছাড়া আর সম্পূর্ণই প্রকৃত চিত্র। বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেই স্থান সম্বন্ধে যে তথ্য রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তাতে কিছুটা দৃষ্টি-বিচ্ছাতি ঘটেছে। জাতীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত জমিতে বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবসনক্রমে একটি খেলার মাঠ লে-আউট প্রদান প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু উহা আইনসম্মতভাবে এখনও হস্তান্তর করা হয় নি। ঐ স্থানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের কল্পনা অধিবাসীগণ পোষণ করেন না। কারণ বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের নিমিত্ত বিদ্যালয় কার্যনির্বাহক সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় স্থানীয় বাজারের পূর্বদিকে জি. টি. রোড সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমি ইং ১৯৬১ সনে রেজিস্টারী মতে কার্যনির্বাহক সমিতিতে দান করেছেন। আবশ্যিক বিষয় তিনি আরও জমি দান করতে স্বীকৃত আছেন। সুতরাং বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের নিমিত্ত স্থান-সমস্যা বলতে কিছুই নেই। নির্ধারিত ভূখণ্ডে তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত কার্যনির্বাহক সমিতি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে গত ১৪-৮-৬১ তারিখে উপায়ুক্ত পুনর্বাসন বিভাগে বিদ্যালয় গৃহের প্রায়সহ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি পরিকল্পনা দাখিল করার পর উহা গৃহীত হয়। কিন্তু মান্যপ্রকার আইনগত দাব্যবিশিষ্ট নিমিত্ত গৃহীত সাহায্য পেতে বিলম্ব ঘটেছে। বর্তমান বৎসরের মার্চ মাসে গৃহনির্মাক্ষেপ সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত অর্থপ্রাপ্তিতে যাতে বিলম্ব না ঘটে সেজন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। জুনিয়র হাই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা করি। ১৯৫৮ সালের ২২শে এপ্রিল এক শব্দ মুহূর্তে মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে ৫ম শ্রেণীর কার্য আরম্ভ করি। কার্যরিতে একমাত্র গ্রীষ্মকৃত্যুমার গাঙ্গুলী মহাশয় সহযোগী হন। ১৯৫৯ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কার্য আরম্ভ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ০৯ জনে বৃদ্ধি পায়। এই বৎসরের শেষে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালে বিদ্যালয়টি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তারপর ধীর পদক্ষেপে বিদ্যালয়ের কার্য অগ্রসর হতে থাকে। বহু বাধাবিঘ্ন ও আপত্তি-বিরোধিতা সত্ত্বেও চরম অর্থনৈতিক



সংকটের মধ্যে আমরা দৃঢ় মনে অটল সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়টি সরকার-অনুমোদিত হয়। বর্তমান বৎসরে ১৯৬৫ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে সহ-শিক্ষাও মঞ্জুর হয়। বিদ্যালয়টিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীর কার্য চলছে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য দশম শ্রেণীর শর্তাদি পূরণ করতে না পারায় এবারও উহা সরকারী অনুমোদন পায় নি। বর্তমানে আমরা দশম শ্রেণীর শর্তাদি পূরণে সক্ষম হয়ে দশম শ্রেণী করিছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন। ইহাই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গ ইতিহাস। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তিতে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত হতে যাতে বিলম্ব না ঘটে সেজন্য আপনারদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত

আদি সপ্তগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুল
শোঃ মগরা (হুগলী)

গত ২রা ডিসেম্বরের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের 'সবার অলঙ্কার' শীর্ষক 'প্রেসিডেন্সি জেলে ডায়া তিনজন' সত্যই প্রশংসার যোগ্য। লেখক তাঁর অভূতানীয় লেখনীতে তিনজনের জীবনী হৃদয় ভুলে ধরেছেন। শৃঙ্খলায় বর্ণনার নয়, রূপে, রসে গম্ভীর সমস্ত দিক থেকেই তাঁর রচনা সার্থক। তিনজনের জীবনের যে সমস্ত দিকগুলির ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন তা সত্যই মনোরম। দেশের জন্য কারাকতরে বসেও যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করতেন, বিশ্লেষণ করতেন দেশের পরিস্থিতি—তার পরিচয় পাই আলোচ্য রচনার মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়েও আজ মনে হচ্ছে সত্যই তিনজনের 'প্রথম জনকে লেখক যেভাবে বৃত্তে পেয়েছেন তা আমার পক্ষে বোঝা এখনও সম্ভব হয় নি। তাঁর জীবনের অনেক পাতার খবর দেখলাম লেখকের নবদর্পণে।

বলিষ্ঠ রচনা, সত্যের প্রকাশে, লেখক নম্রা। তাঁর জীবনের অনেক কথা আজ পর্যন্ত জেনেছি। কিন্তু আগে এত সুন্দরভাবে সেটা উপলব্ধি করতে পারি নি। এক অনাবিল আনন্দে মন আজ ভরে উঠেছে। সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম রচনা এর আগে গাই

নি। এরকম রচনা প্রকাশ করার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' সত্যই পাঠকদের মনোহরণ করেছে। দিনে দিনে এর প্রচারবৃদ্ধি হোক এই প্রার্থনা। আর সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য রচনার মতো সত্যিকারের সার্থক ও সুন্দর রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের জানতে দিন বড় বড় মানুষদের কথা। তাঁদের জীবনের পথ দেখে যেন আমরা সচকিত হয়ে চলতে পারি সার্থক ও সফল পথে।

অজয় গুপ্ত

('অমলেন্দু দাসগুপ্তের জাগনের')
কলি-৪৭

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৯ই ডিসেম্বরের সংখ্যাটি পড়লাম। এই সংখ্যায় তিনটি জরুরী ও সমরোপযোগী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল—(১) সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'বঙ্গচিন্তা', (২) হলধর পটল লিখিত 'নতুন খাদ্যনীতি' প্রসঙ্গে ও (৩) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় লিখিত 'সবার অলঙ্কার'—র পঞ্চদশ অধ্যায়টি। আমার মত সাধারণ লোকেরা যে-সব কথা বলতে পারে না কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে, এগুলিতে সে-সব কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে বলে এ তিনটি লেখা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। এ সময় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-ই একমাত্র পত্রিকা যাতে এ রকম নির্ভীক সমালোচনা দেখতে পাচ্ছি। এ রকম সমালোচনা আরও হওয়া দরকার, যন্ত্রা আমাদের দেশের লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ, তাঁরা আমাদের স্মারাই নির্বাচিত হয়েছেন। যে দেশে শতকরা আশি জন অশিক্ষিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্রের অর্থ বোঝে না ও ভোটের মূল্য বোঝে না এবং প্রলোভিত হয়ে কিংবা ভয়ে বা দারে পড়ে ভোট দেয়, সে দেশে এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়! ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় মহাশয় ঠিকই লিখেছেন যে দেশে মানুষ তৈরি হচ্ছে না। যে দেশে মানুষ গড়ার কাজ ধীর করেন, সেই শিক্ষকগণ অবহেলিত জীবন যাপন করেন, সে দেশে মানুষ গড়তে হচ্ছে কার জাগে! উচ্চশিক্ষিত নাগরিকগণের উদ্বাসিতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নাগরিকগণের মধ্যে গড়ে তুলেছে এক দূরত্বের ব্যবধান। কে কাকে রাস্তা দেখাবে? এখন আদর্শবাদ কেবল টেক্সট বকে লেখা ও বক্তৃতা দেবার জন্য। কে করবে আত্মভাগ্য? কে দেবে আদর্শের দৃষ্টান্ত? আমরা অধীক্ষিত ছাত্রেরা তাই দিশেহারা।

গজেন্দ্রনাথ মিত্র

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
কানপুর



স্পেনের ডেভিস কাপ খেলোয়াড়দের ডেভিস কাপ সহ দেখা যাচ্ছে

সোভিয়েত টেনিস খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[সোভিয়েত টেনিস খেলোয়াড়দের
যে দলটি ভারত সফরে এসেছেন,
তাদের নেতৃত্ব করছেন ভ্যাডিমির
সেরেভেনিকোফ।]

তিউ সূদে

মেয়েদের সিঙ্গেলস-এ নতুন সোভিয়েত
টেনিস চ্যাম্পিয়ন তালিন-এর ২১ বছর
বয়স্কা সুবর্ণকেশী তিউ সূদে টেনিস কোর্টে
আতি দ্রুত সঞ্চারশীল। স্থানীয় শিক্ষক-
শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আন্ডার গ্রাজুয়েট
তিউ সূদে ট্রেড ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাব
কলেভ-এর সদস্যা। সব সময় তাকে ট্রেনিং
দিয়েছেন এইচ. কালামা। কিন্তু খেলায় তার
সব সময়ের জুটি জ্যাক সিম্পসনও এককভাবে
তার শিক্ষক। জ্যাক নিজেও এস্টোনিয়ার
সেরা ২০ জন খেলোয়াড়ের অন্যতম।

সূদের প্রধান প্রধান গুণাবলী হল তার
দৈহিক পটুতা ও প্রমানদুরাগ। বস্তুত তার
ব্যাংকহ্যাণ্ড ও ফোরহ্যাণ্ড শটগুলি, স্লেস
করে মারগুলি খুবই নিখুঁত। নেটে তিনি
গুরো আস্থা নিয়ে খেলেন ও বলির উপর
তার পুরো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

১৯৬৪ সনে সোভিয়েত যুগোস্লাভি়ে তিউর
স্থান ছিল অষ্টম, কিন্তু ১৯৬৫ সনেই তিনি
প্রথম স্থান অধিকার করেন (সোভিয়েত নিয়ম
অনুযায়ী জাতীয় সিঙ্গেলস-এর বিজয়ী ১

নম্বর খেলোয়াড় বলে গণ্য হন)। গত
সেপ্টেম্বর মাসে খারখোফে অনুষ্ঠিত ৩৩তম
জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সূদে
এই সম্মানের অধিকারিনী হয়েছেন।
সাপ্তাহিক বছরগুলিতে ১ নম্বর খেলোয়াড়
আনা দুমিত্রিয়েভার অনুপস্থিতিতে খারখোফে
তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সূদে ও কিয়েভ-এর
জি, বাকশেরেভার মধ্যে। ফাইনালে সূদে
বাকশেরেভাকে পরাজিত করেন; এই বাক-

প্রীতিমিতাভ

শেয়েভা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে মস্কোতে
অস্ট্রেলিয়ার জে, টেগার্টের বিরুদ্ধে জয়ী
হয়ে বিশ্বের সৃষ্টি করেন।

আলেকজান্দার সেরেভেলি

সোভিয়েত ইউনিয়নের ২নং সিঙ্গেলস্
খেলোয়াড় জর্জিয়ার আলেকজান্দার সেরেভেলি
একাধিকবার জাতীয় খেতাবের অধিকারী
এস্টোনিয়ার তুমাস লেজ্জসের মতই দেশে ও
বিশ্বে সমান জনপ্রিয়। বস্তুত বহু টেনিস
অনুরাগী তুমাসের সূক্ষ্ম ও কোর্টে
“দাবার” স্টাইলের চেয়েও আলেকজান্দারের
প্রকৃতিগত ও তীক্ষ্ণ স্টাইলকে বেশি পছন্দ
করেন। ১৯৬৫ সনে সোভিয়েত যুগোস্লাভি়ে
জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সিঙ্গেলস্, ডাবলস্
ও মিক্সড ডাবলস্-এ এস্টোনিয়ার খেলো-
য়াড়ি তিনটি স্বর্ণপদকেরই অধিকারী হলেও

জর্জিয়ার ব্যাকেটখারীটিও তুমাসের মতই
শক্তিশালী।

১৯৬৫ সনে লেজ্জস বনাম সেরেভেলির
সাতটি খেলার মধ্যে কষ্টটি পরিশ্রম ফলাফল
সমান ছিল ০-০; কিন্তু সিঙ্গেলস্ খেতাবের
ফাইনালে পঞ্চম সেটে আলেকজান্দারকে
পরাজিত করে (৮-৬) তুমাস ক্লাফনকে
সপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হন (৪-০)।

২১ বছর বয়স্ক সেরেভেলি জর্জিয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা স্নাতকোত্তর
তৃতীয় বার্ষিক প্রোগ্রাম ছাত্র। কোর্টে সর্বকক্ষ
কৌশল তার আয়ত্ত এবং এর পরের মারটি



রাশিয়ার টেনিস খেলোয়াড় তিউ সূদে

ভাবি কি হবে, বিশেষ করে যখন নেটে ভাঁল মারতে যান, তা আগে থাকতে বলা প্রায়ই শব্দ হয়ে পড়ে। সেই মূহুর্তেই প্রতিভাত হয় তাঁর অসাধারণ দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও নমনীয়তা। নিখুঁত সার্ভিস, ফোরহ্যান্ড ড্রাইভ ও বিচিত্র রকমের ভাঁলর জন্য আলেকজান্দার বিখ্যাত।

মেট্রোভেলি আধুনিক দ্রুত, অ্যাথলেটিক-দুলভ ও আক্রমণাত্মক টেনিস খেলার বিশিষ্ট প্রবক্তা। বয়স যখন কুড়ি বছরেরও কম তখনই আলেকজান্দার কোর্টে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন এবং ১৯৬২ সনের জুনিয়ার উইম্বলডনে ফাইনালে ওঠেন। যে সোভিয়েত যুব টীমটি ১৯৬৪ সনে ফ্রান্সের ভিশিতে গালিয়া কাপ বিজয়ী হয় এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সনে এই বেসরকারী ইউরোপীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স-আপ হয় তার নেতৃত্ব করেছিলেন মেট্রোভেলি।

ভেভিস কাপে সোভিয়েত যুক্রান্তের প্রধান ডাবলস্ টীম হলেন লেজুস ও মেট্রোভেলি। আলেকজান্দারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য

কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাধা করে তিনি স্থানীয় পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ভ্রাদিমির সেরেরেনিকোফ-এর তত্ত্বাবধানে তিনি সাত বছর ধরে অনুশীলন করছেন।

গত মে মাসে সোভিয়েত আজারবাইজানের কিয়েভে যে ছয়-জাঁতির জুনিয়ার আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হয় কাকুলিয়া তাতে বিজয়ী হন। এক মাস পরে লন্ডনে জুনিয়ার উইম্বলডনে বিজয়ী মস্কোর ভ্রাদিমির করোৎকোফ-এর বিরুদ্ধে ফাইনালে তিনি চমৎকার বিজয় অর্জন করেন।

মিন্স্কে জাতীয় জুনিয়ার প্রতিযোগিতার বিজয় অর্জন করে তেইমুরাজ ১৯৬৫ সনের আগস্ট মাসে মস্কো আন্তর্জাতিক অস্ট্রেলিয়ার কে. স্টাবস-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করেন। মাত্র কিছুদিন আগেই স্টাবস যুক্রান্তের এফ ফ্রিলিং ও অস্ট্রেলিয়ার জে. নিউকোম্বের মত বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের পরাস্ত করেছিলেন।

১৯৬৬ সনে গালিয়া কাপে সোভিয়েত যুক্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন কাকুলিয়া। আসন্ন ভারত সফর বিদেশে তাঁর দ্বিতীয় সফর; প্রথম বিদেশে যান ১৯৬৪ সনে হাংগেরিতে।

মেট্রোভেলির মতই তেইমুরাজও কোর্ট ফিট, আক্রমণাত্মক স্টাইল পছন্দ করেন আর খেলা যত দ্রুতগতি হয় তত বেশি তিনি তা পছন্দ করেন; কারণ তা হলে অপ্রত্যাশিত পাঁচটা মারে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেকাষা ফেলতে পারেন।

মফৎলাল রোভার্স বিজয়ী

রোভার্সের জয়লক্ষ্মী মোহনবাগানের প্রতি কেন জানি না বিরাট। এবারে কুপারেজে তাঁদের অপ্রত্যাশিত পরাজয়কে লক্ষ্য করেই যে এই মন্তব্য করা হয় তা নয়। গতবারের কথাও বিস্মৃত হই নি। গতবারে এই রোভার্সের আসরে ফাইনালে মোহনবাগান পরাজিত হয় বি এন রেলের কাছে। এক বিতর্কমূলক গোত্র মোহনবাগানের পরাজয় ঘটে। এবার অবশ্য মোহনবাগান যে গোলে পরাজয় বরণে বাধ্য হয়েছে তা সত্যই ছিল আকস্মিক। অতর্কিতে নেওয়া মেননের সট গোলে প্রবেশ করে মোহনবাগানকে এবারও বিজয়ীর সম্মান-লাভে বঞ্চিত করে। গোলেরক্ষক কমল সরকার বলটি মাত্র স্পর্শ করার শব্দ সুযোগ পান, কিন্তু বল তাঁর হাত থেকে বারের এক কোণে লেগে জালের বুকে আশ্রয় পায়।

মোহনবাগান মোট সাতবার রোভার্স কাপের ফাইনালে উন্নীত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে কিন্তু, ছবার তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বিজয়ের সম্মান নিয়ে। ১৯৫৫ সালে কেবল মোহনবাগানের ভাগ্যে জুটছিল বিজয়ীর সম্মান। মফৎলালও এই সর্বপ্রথম রোভার্স

জয় করল। বোম্বাইয়ের সিভিলিয়ান দল হিসাবে একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ১৯৫৮ সালে রোভার্স জয় করে এবং মফৎলাল হল বোম্বাই-এর দ্বিতীয় ভাগবান বেসামরিক দল।

মফৎলাল প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে। অবশ্য মাঝে মাঝে অতর্কিতে তারা হানা দিতে থাকে মোহনবাগানের গোলে। মোহনবাগান কিন্তু প্রথম থেকেই বিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। মফৎলালের রক্ষণবাহু ভেদ করে লক্ষ্যবস্তু লাভ করতে পারেন নি মোহনবাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা, যদিও অপর পক্ষে কয়েকটিমাত্র আক্রমণধারা রচনা করে, অতর্কিতে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইপিংসত বস্তু লাভে সক্ষম হয়েছে বোম্বাই-এর মফৎলাল। কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের পুরোভাগে চুনী গোস্বামীর অনুপস্থিতিতে মোহনবাগানের আক্রমণভাগকে সুসংবদ্ধ রূপ দিতে পারে নি। যদিও অশোক বা কাজল আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দলের ভাগ্য ফেরাবার কিন্তু

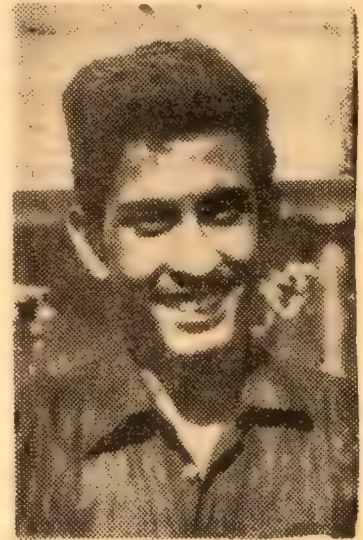


অবর রাও

বিজয়সমূহের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কে, ফ্রেচার, মার্কিন যুক্রান্তের এ, ফল ও ডি, ডেল, ডেনমার্কের জে, উলরিচ, ফ্রান্সের জে, থাকলে, চেকোস্লোভাকিয়ার জে, কোদেশ ও হল্যান্ডের টি. ওবকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ। ১৯৬৫ সনে মস্কো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তিনি পান প্রথম পুরস্কার ও ১৯৬৪ সনে হাংগেরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

তেইমুরাজ কাকুলিয়া

জর্জিয়ার আঠারো বছর বয়স্ক তেইমুরাজ কাকুলিয়া থাকেন ভিবলিসিতে। গত গ্রীষ্ম-



পরিমল দে

শেষ কাজ—মানে একটি গোল আর তাঁদের করা সম্ভব হয় নি। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী দল বোম্বাই-এর মফৎলালের কাছে পরাজয় সত্যই একদিক থেকে খুবই আনন্দের কথা।

জঙ্গী ক্রিকেট

সত্যি বাংলা ক্রিকেটের নয়নের খাঁনি হলেন অম্বর রায়। বাংলার ক্রিকেট মর্যাদাকে উঁচুতে তুলে ধরবার গুরুদায়িত্ব স্বল্পে নিয়েছেন যে কয়জন খেলোয়াড়—তাঁদের মধ্যমণি হলেন তরুণ অম্বর। বর্তমানে বাংলা থেকে টেস্টের আসরে প্রবেশের যোগ্যতা তরুণ অম্বর রায়ের আছে।

অবশ্য সেইজনাই অম্বরকে গতবার সিংহল-দলের বিপক্ষে বেসরকারী টেস্টে ভারতীয়দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা পূর্বাঞ্চলের রঞ্জী ট্রফির খেলায় ব্যাটা শুরুর করল উড়িষ্যা দলকে এক ইনিংস তিন রানে পরাজিত করে। খেলাটি অনশ্লিষ্ট হয় কটকে। বাংলাদল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায়, কিন্তু রানসংখ্যা আশানুরূপ পর্বায়ে উন্নীত হবার পূর্বে উইকেটের ভাঙন ধরতে থাকে। অম্বর রান তখন দলের পতন রোধের জন্য এগিয়ে আসেন। অম্বর ব্যক্তিগত শতরান অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করেন ১১৭ রান। বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩১৩ রানে। সংপতি ৮৯ রানে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট। উড়িষ্যা দল প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে মাত্র ১২৯ রানে। বাংলার দুই তরুণ সুই বোলার উড়িষ্যা দলের বিপর্যয় ঘটান। সুরত গুহ ৩৭ রানে ৪টি এবং ৩৯ রানে ৩টি উইকেট।

উড়িষ্যা দল ফলো-অনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে কিন্তু আবার বিপর্যয়। বাংলার তরুণ বোলার টি. জে. ম্যানাজারী সুন্দর বোলিং-এর কাছে এক-এক করে নতিস্বীকার করে প্যাডেলিয়ানে ফিরে যায় উড়িষ্যা দলের খ্যাতিসম্মানের। টি. জে. ম্যানাজারী এই প্রথম ব্যবসায়ের পক্ষে খেলার সুযোগ পেলেন। আশুতোষ কলেজের ছাত্র টি. জে. সংগ্রহ করেন পাঁচটি উইকেট মাত্র ৩২ রানের বিনিময়ে। সুরত গুহর ভাগ্য লাভ হয় ২টি উইকেট। উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৮১ রানে এবং বাংলা জয়ী হয় এক ইনিংস তিন রানের ব্যবধানে।

দুরাণ্ড কাপ

রাজধানীতে ডুরান্ডের আসর জমে উঠেছে। আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব অনারসে পৌঁছেছে তৃতীয়

রাউন্ডে। ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলের ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দিল্লীর ফ্রাণ্টারার ক্লাবকে। পরিমল দে হ্যাট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেন, অপর দুটি গোল করেন অসীম মৌলিক ও সীতেশ দাস। রোভার্সের আসরে এবার অনুপস্থিত ইস্টবেঙ্গলদল বেশ করেকদিন পর বড় প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন। পরবর্তী খেলায় ইস্টবেঙ্গল খেলবে কাম্বীর অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। গতবার ডুরান্ডের আসরে ইস্টবেঙ্গল রানার্স-আপ হবার সম্মান অর্জন করেছিল।

বিস্ময়ের দৃষ্টি হয় কুশারেজের সফল রোভার্স বিজয়ী মফঙ্গালার পরাজয়ে। ডুরান্ডের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় মফঙ্গালার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মাদ্রাজের ইন্সটিগাল কোচ ফার্স্ট। মফঙ্গাল কোচ ফার্স্টর কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হয়। কলকাতার ইস্টার্ন রেলদল বোম্বাই-এর আসরে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন, কিন্তু দিল্লীতে ব্যাসালোরের সি আই এল-এর কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয় ইস্টার্ন রেল। তাদের প্রথম দিনের খেলায় ড্র হয় এবং দ্বিতীয় দিন কলকাতার রেলদল ব্যাসালোর দলের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়।

মহামেডান স্পোর্টিংস দল সিমলা ইয়ংসকে ২-১ গোলে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে; কিন্তু কলকাতার আর একটি দল রাজস্থান পাঠানদলের কাছে পরাজিত হয়।

গতবারের ডুরান্ড বিজয়ী মোহনবাগান দ্বিতীয় রাউন্ডের খাপ অতিক্রম করেছে, স্থানীয় দিল্লীর শেষ দল ইয়ংস্টারকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম গোলাটি করেন কাজল মুখার্জী এবং দ্বিতীয় গোলাটি জে দত্ত। পরবর্তী খেলায় মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী গুরখা রিগেড।

মোহনবাগান গতবার ডুরান্ডের ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে ট্রফি জয় করে।

খেলোয়াড়ের বিপদ

কলকাতার পরলা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় বিলি আলভারেজ প্রথম এলেন ভারতবর্ষে। প্রায় এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেশে বহু বিচিত্র কাহিনী শুনছেন। দমস্ক বিমানঘাটিতে পৌঁছে আলভারেজ তাই ভারতীয় লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত অগ্র এবং প্রদীপ মুখার্জীর কাছে দাঁড়ি খেলা আর জানমতীর খেলা জানা বাদুকের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন যে, তিনি শুনছেন যে এই ভারতবর্ষে এখন একজন বাদুকের আরছেন যিনি মাত্র একটি বাদুদ সঞ্চালনে অদৃষ্ট করতে পারেন একটি অস্ত্র মের গাড়ি আরেহী সৃষ্টি।

বৌশ সময় নয়, অল্প কিছুক্ষণ পরেই আলভারেজ এক অশ্রুত ভেষজী খেলা দেখে হতভম্ব। তিনি তাঁর মালের টিকিট বখন কাউন্টারে দিলেন, তখন সেই কাউন্টারে উপস্থিত ভ্রমলোক জানালেন যে, তাঁরা খুব দ্রুতের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, আলভারেজের মালপত্র তাঁদের কাছে আসে নি। যাই হোক হতভম্ব আলভারেজ জানালেন যে, মালপত্র গেনেই থাকার কথা, কারণ বাসিন্দারো থেকে রোসে এসে গেনের বদল করার সময় পর্যন্ত তাঁর নিজের মালপত্র তিনি দেখেছেন। যাই হোক সংশ্লিষ্ট এয়ার লাইনের ভ্রমলোক তাঁকে জানান যে, তাঁরা অবিলম্বে মালের অনুসন্ধান করছেন এবং আশা করা যাচ্ছে তিনি তাঁর মালপত্র ফের পাবেন। কিন্তু অবিলম্বে আলভারেজকে রওনা হতে হবে আসামে টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য, গেন অল্প কিছু সময় পরে। যাই হোক এক-কপাড় তাঁকে রওনা হতে হল অসাম অভিমুখে, উচ্ছলতা উবে গিয়েছে এক ভেষজীর রোগে।

॥ টেনিসের নতুন সূর্য ॥

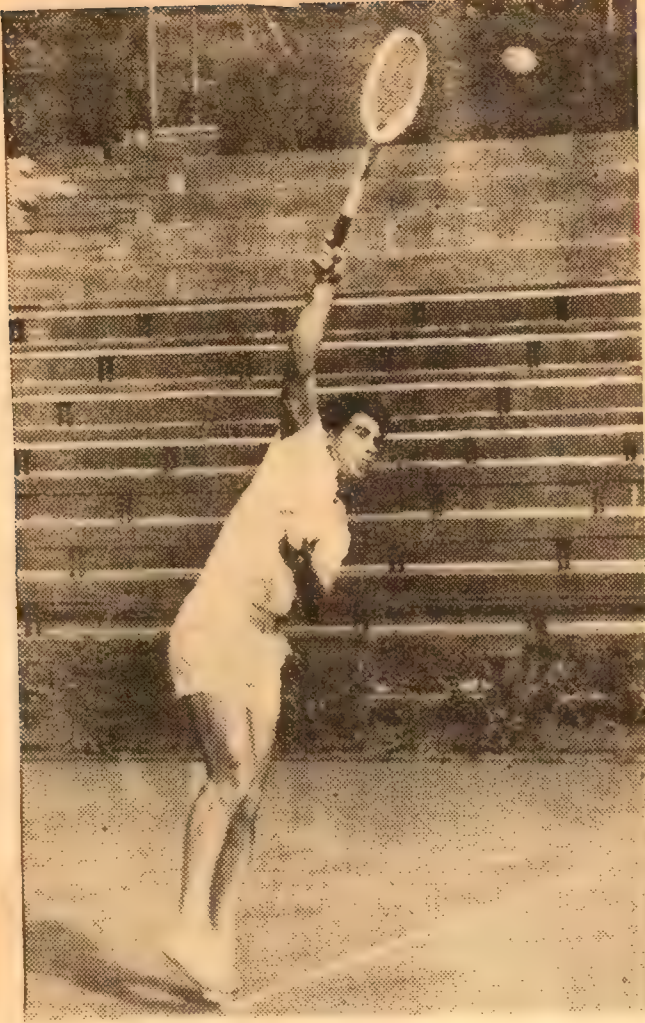
প্রদীপ নিজে যাবার আগে হঠাৎ জুড়ে ওঠে আলোর রোশনাইয়ে ভরিয়ে দেয় চতুর্দিক। কিন্তু হঠাৎই যেমন সে জুড়ে ওঠে ঠিক তেমনই হঠাৎই দপ করে নিভে যায়। তার এই ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলতা মনে হয় যেন ক্ষণিকের মোহময় স্বপ্ন। তাই আজ টেনিসের আকাশে যে নতুন সূর্যের উদয় ঘটেছে, তার সম্ভাবনার ইংগিতকে কেন জানি না মনে নিতে মিশা হচ্ছে। নতুনরূপে আজ ম্যানুয়েল সান্তানার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বটে, কিন্তু টেনিসের অঙ্গনে তাঁর পদার্পণ বহুদিন পূর্বেই ঘটেছে।

সাতাশ বছরের স্প্যানিয়ার্ড ম্যানুয়েল সান্তানা লক্ষ্যপ্রস্তুত হয়ে হাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন শক্তি সঞ্চার করে তিনি একবার

শেষ চেষ্টা করতে চান, লক্ষ্য তাঁর রয় এমার্সনের অধিকৃত মসনদ। রড লেভার বখন অপেশাদার টেনিসের রাজত্ব ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন ম্যানুয়েল সান্তানা প্রথম সারিতে রাজত্বের যোগ্য দাবিদার হিসাবে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ১৯৬০-র উইমবলডেন চোখের সামনে দিয়ে তুলে নিয়ে গেলেন আমেরিকার চাক ম্যাকিনলে। ১৯৬৪ সালে উইমবলডেন গেল রয় এমার্সনের হাতে ১৯৬৬ সালের উইমবলডেনের আসরে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানাকে দেখা গেল না। পারিবারিক কারণে সান্তানাকে উইমবলডেনের আসরে যোগদানে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু টেনিস জগতের অনেকেই সান্তানার এই অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে গ্রন্থ করলেন। তাঁর মনে করলেন

যে ব্যর্থ মনোরথ ম্যানুয়েল সান্তানা কৃষ্ণ নিজেকে ধীরে ধীরে টেনিসের অঙ্গনে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ঠিক উইমবলডেনের পর দেখা গেল যে, নতুন উদ্যমে নব অভিযান শুরু করেছেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা।

ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে তিনদিকে সাগর দিয়ে ঘেরা স্পেন দেশ, তাই রাজধানী রিয়েল মাদ্রিদ। এই শহরের গ্রেগেট টেনিস ক্লাবের 'বল বয়' হিসাবেই ম্যানুয়েল সান্তানার জীবন শুরু। সান্তানার বাবাও ছিলেন এই ক্লাবেরই মালী। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে ক্লাব পরিচালকদের দয়ায় এই কাজটি সে পায়। বল কুড়োয়, ফাই-করমান খাটে, ককককে-উকতকে রাখে কোট গুলো। যতকণ খেলা চলে



ম্যানুয়েল সান্তানা

কিশোর সান্তানা কিছু মাঠের পেছন থেকে এটটুকু নড়ে না, একমনে লক্ষ্য করে যায় খেলা।

দিনের শেষে খেলা অবসান হলে নিঝুম হয়ে যায় খেলার মাঠটি, তখন কিশোর সান্তানা ছুটি পায়। একলা আনমনে বসে থাকে, আর বিভোর হয়ে যায় টেনিসের স্বপ্নে। ক্লাবের খেলোয়াড়দের মুখে বড় বড় টেনিস খেলোয়াড়দের নাম শুনেছে, টিলাডেন, কোশে, ডোনাল্ড বাজ প্রভৃতি। ইংল্যান্ডের উইমবলডেন, আমেরিকার ফরেষ্ট হিল, ফরাসী লন টেনিস প্রতিযোগিতা এই সব বিশ্ববিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতার কথা তার কানে আসে। মন তার কল্পনার জাল বোনে, ডানা মেলে উড়ে যায় পীরেনীজ পর্বত পার হয়ে দেশ-

দেশান্তরে। লেখাপড়ার সুযোগ তার হয় নি কিন্তু সে বড় হতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ না আছে বিদ্যা, সম্বল শুধু পেশীবহুল দুটি হাত।

কাজের ফাঁকে সান্তানা হাতে তুলে নেয় র্যাকেট, সুরু করে দেয় টেনিসের চর্চা। সান্তানার মধ্যে সুদৃঢ় প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। অল্পদিন পরে দেখা যায় যে টেনিস বেশ আয়ত্ত করেছে সান্তানা, শুধু তাই নয় ক্লাবের কেউই এঁটে উঠতে পারছে না। তার স্বাভাবিক প্রতিভা দেখে ক্লাবের সভ্যরা তাকে উৎসাহ দেয়। আশার আলো দেখতে পান সান্তানা; তার বহুদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলে। মাত্র তিন বছরের সাধনায় অসাধ্য সাধন করেন “বল বয়” ম্যানুয়েল

সান্তানা। আঠারো বছরের ছেলে ম্যানুয়েল সান্তানার ছাঁব ছাপা হয় স্পেনের প্রতিটি সংবাদপত্রে স্পেনের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হিসাবে।

টেনিসে স্পেনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বলে কিছুই তেমন ছিল না, স্পেনের পতাকা বহন করে বিশ্ব টেনিসের অঙ্গনে প্রবেশ করছেন সান্তানা। মাত্র পাঁচ বছরের সাধনায় সান্তানা লাভ করলেন ইউরোপের সেরা টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান। মাত্র ২৩ বছর বয়সে প্রথম লাভ করলেন জীবনের স্মরণীয় ট্রফি— ফ্রেঞ্জ লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ। তিনিই প্রথম স্প্যানিয়ার্ড যিনি বিদেশের ঘাসের থেকে বিজয়ী পুরস্কার এনে উপহার দিয়েছেন স্পেনকে।

১৯৬৩ সালের উইমবলডেন, পীরেনীজ পর্বত পার হয়ে সান্তানা গেলেন, ওই দুর্লভ ট্রফি জয় করতে, তখন তিনি ২৫ বছরের যুবক। তাঁর সামনে, তাঁর নাগালের মধ্যে উইমবলডেন, জিততে পারলেই ভাগ্য ফিরে যাবে। এর ঠিক পূর্বে তিনি পেয়েছেন লক্ষাধিক টাকার পেশাদারী আহ্বান। চোখের সামনে আশার রোশনাই। সেবার উইমবলডেনের মর্যাদা তালিকায় তাঁর নাম বিশ্বতীয় স্থানে, প্রথম স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্চন। কিন্তু ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে তবু হাসি হাসলেন। সান্তানা হেরে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলের কাছে। অপ্রত্যাশিত এই ফলাফলের পর সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন তাঁকে। তিনি বললেন, “আমরা স্পেনে বাঁধান টেনিস কোর্টে খেলতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশে ঘাসের ওপর কেউ টেনিস খেলে না। ঘাস সেখানে গরুর খাদ্য। ঘাসের কোর্টে আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের নিপুণ কলা-কৌশল।” ১৯৬৪-র উইমবলডেনের আসরেও পরাজয় এসে তাঁকে স্পর্শ করল আর ১৯৬৫-র উইমবলডেনে তিনি অনুপস্থিত থাকলেন।

এখন তাঁর লক্ষ্য আগামী উইমবলডেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত এক বাছাই তালিকায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশজনের মধ্যে তিনি শীর্ষে স্থান পেয়েছেন। এবার ডেভিস কাপের খেলার স্পেনকে উপনীত করতে সাহায্য করেছেন ফাইনালে। তবে বর্তমানে সান্তানা যে দুর্দম গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে অস্ট্রেলিয়ার বৃক থেকে ডেভিস কাপ ছিনিয়ে নিলে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। এখন দেখা যায় যে, এই প্রাধান্যের গতি বজায় রেখে তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, তিনি লাভ করতে পারেন কিনা ১৯৬৬ সালের উইমবলডেনের আসরে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসন্ত (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১১

বসন্ত প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুদীপ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯২৭
আজকের মানুষ	...	১৯২৮
বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গ	— ভবানী মৃথোপাধ্যায়	১৯২৯
প্রকাশ (কবিতা)	— সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	১৯২৭
ভারতদর্শন	...	১৯২৮
সাংস্কৃতিক	...	১৯৩১
প্রাক-গ্রীক ইউরোপের কথা ও কাহিনী	— নরেন ভট্টাচার্য	১৯৩১
দুখ জাগানিয়া (কবিতা)	— পিনাকরঞ্জন সাহা	১৯৩১
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৯৩১
ভেনেজিয়ান ডোমোকে (কবিতা)	— তপন মৃথোপাধ্যায়	১৯৪১
টপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৪২

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবি

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন পাদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি ইনি লিখিয়াছেন—

“...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।”

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’র অভিমত—

“স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিগণ রুমে বিভ্রান্ত ও আদর্শহীন হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।”

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

বাঁহার চামুলাকর কাহিনীগুণি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কোতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাসিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

- ১। স্বকের ধন; ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদ্রিরামের কীর্তি, ৫। বেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সংগুন—চাঁবি ও খিল, একরস্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সংগুন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারাথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হাচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জাগা। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন	...	১৯৪৫
বাচ্চা বোড়া (অনুবাদ-গল্প)	— সুশান্ত চক্রবর্তী	১৯৫১
হেলে (গল্প)	— নমিতা চক্রবর্তী	১৯৫৩
সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৫৬
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১৯৬৪
অপরূপ নেহারল ওকলাহোমা ও টেন্সন	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	১৯৬৫
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তোপাধ্যায়	১৯৬৮
রক্তকণ	...	১৯৭১
রক্তমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৯৭৭
পাঠকমন	...	১৯৮০
খেলাধুলা	— প্রীতমিতাভ	১৯৮১

ভট্টর পণ্ডানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

‘রক্তনদীর ধারা’, ‘অপরাধ বিজ্ঞান’ ও ‘বিখ্যাত বিচার কাহিনী’ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্য ঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি! অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রন্ধনবাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম, সর্বাত্মক, নিরপেক্ষ আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

১০খানি দৃশ্যপ্রাপ্য আলোচ্য ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতার
প্রতিলিপি সম্বলিত

মূল্য—১.৫০

উপন্যাস-সম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-
কীর্তি উপন্যাসিক—লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী
‘ভারতী’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী
সুদ্রা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস,
প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ
সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে
কাশ্মীর, এক যাত্রায়, কুলকাটা, দ্বুঃখীরাম, পান-সুপারি।
মাত্র ১১০ টাকায়ঃ

৪ঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সর্গচ্ছন্দ)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১০৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭০ বর্ষ : ৩১শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পরস
বৃহস্পতিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় বর্ষাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 6th Jan., 1966

সাহিত্যের পুরস্কার

বাংলা তথা, ভারতীয় সাহিত্যে এখন পুরস্কারের ছড়াছড়ি। টাকার অঙ্কে সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি জানানো কখনোই সম্ভব নয়। তছাড়া ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত, তা বিপণ্নজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে—সাধনার ফলশ্রুতির জন্যে পুরস্কার, না, একগুণ সাধনার জন্যে পরবর্তী সময়ে সেই পুরস্কার। কল্পসাধনাও অনেক সময় সাধক হয় না—কিন্তু সেখানে পুরস্কারের আশা নিরর্থক। আবার দলীয় স্বার্থে অনেক সময় মেকী সাহিত্যের জন্যও যে পুরস্কার দেওয়া হয় না, একথাই বা কে অস্বীকার করতে পারে? তা ছাড়া, পুরস্কারপ্রাপ্তি নামক লোভনীয় ব্যাপারটি অনেক সময় সত্যিকারের সাহিত্যিক-মনে বিষম সৃষ্টি করে। কারণ তাঁদের করার মতো শক্তি যদি নেই কিংবা কোনোরকম সুপারিশে যদি বিশ্বাস নেই—তিনি সং-সাহিত্য সৃষ্টি করেও তথাকথিত সাহিত্য-সমাজবাহিত্ত। কেন না, পুরস্কার নামক শব্দটি লোকসমাজে এমন একটি স্থায়ী প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, সেই পুরস্কারের মাপ-কাঠিতে সাহিত্য ব্যত্যয়ে সাহিত্যিকেরই বিচার হয়। ফলে, সাহিত্যও বিঘ্নিত হয়। এই সব কারণে আমাদের দেশে আর্থিক পুরস্কার দানের পরিবর্তে এমন নতুন কিছু করা দরকার যাতে সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিকাজে অধিকতর মনোযোগী হতে পারেন ও সাহিত্যের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। দৈহিক অঙ্কম লেখকদের জন্য সরকারের একটি তহবিল আছে, থাক এবং থাকই উচিত; কিন্তু যেসব লেখক সৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়েও বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত—তাঁদের কথাও সরকারকে অবশ্য চিন্তা করতে হবে। সরকার অন্য কিছু করতে নাই পারুন, শব্দে তাঁদের রচনাসৃষ্টিকারী শক্তিকে নিয়োগ করার মতো কিছু সুযোগ দান করুন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন লেখক

কেরানী বা শিক্ষক হলেও কি একমাত্র কেরানীর বা শিক্ষকের মতোই একঘেয়ে দিন কাটান করে যাবেন? রচনাসৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশে তাঁকে কি বছরে দু-এক মাসের জন্য বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করা যায় না। অথবা দেশভ্রমণের জন্য কিছু সুযোগ, তাঁর নিজের অর্থ এমন পরিমাণ নেই—যাতে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশে গিয়ে দিন কাটানো বা দেশ ভ্রমণ সম্ভব, একমাত্র সরকারী আনুকূল্যে এ ব্যাপার সম্ভব হতে পারে। যেসব স্থলে আজ লেখকরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিয়োগ-কর্তারাও প্রয়োজন হলে সরকারী নির্দেশেও সে সুযোগ দিতে পারেন। দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য এ রকম হওয়া দরকার। না হলে আর্থিক পুরস্কারের মূষ চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি?

আমাদের মতে আর্থিক পুরস্কার যদি দেওয়াই হয়—তা বেন প্রাথমিক ব্যাপার না হয়। প্রথম বা হওয়া দরকার তা হচ্ছে সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া যাতে ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। বর্তমান আর্থিক সংকটাপন্ন সমাজ ও নিম্ন-মোটোভিত্তিক সাহিত্যের নিরিখে 'পুরস্কার' আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

জানি না, এ ব্যাপারে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আমরা কতোটা সাড়া পাবো? রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতায় জানিয়েছেন, আর্থিক সংকটাপন্ন কবিরও সবচেয়ে বড় পুরস্কার টাকা নয়। পাঠকের স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়া ফুলের মালাই তাঁর যথার্থ পুরস্কার। অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সরকারী পুরস্কার সম্বন্ধে নিজের বিরুদ্ধ মত পোষণ এবং দেশের স্বার্থে 'নাইটহুড' পদবী পরবর্তীকালে ত্যাগ করলেও তিনি আন্তর্জাতিক 'নোবেল প্রাইজ' গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অর্থের এক কপর্দকও তিনি নিজের জন্য খরচ করেননি। যে কৃষি-বীজস্বার্থে জন্মে আজো আমরা হা-হুতাশ করছি, তাঁর উমতিবিধানকল্পে সেই অর্থ তিনি কৃষি ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন।

বন্দুর জানা গেছে, ব্যাংকে গচ্ছিত সেই টাকা পাকিস্তান সরকার হস্তম করে দিয়েছেন। এখানেই পাকিস্তানী কর্মকাণ্ডের শেষ নয়। পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে টাকা রেডিও থেকে বিদায় করার হুমকি দিয়েছেন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সবই সম্ভব। বিশ্ববাসিত কবি, তাদের কাছে কিছুই নয়, এবং গান ও কবিতার বিকৃতি ঘটিয়ে অবিভক্ত বঙ্গের প্রতীক নজরুলকে কাটছাটি বা বিদায় করা তাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন স্বাধীনচিত্ত মানব ও সংবাদপত্র সেই হুমকির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে যেমন নিজ-দের গৌরবান্বিত করলেন, তেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকেও অর্থের পরিবর্তে জুসুমী প্রস্ফার গ্রহণ করার দাবিতে দান করলেন পুরস্কার। এই পুরস্কারই হচ্ছে যথার্থ পুরস্কার।

ভবু আর্থিক পুরস্কারের নেশা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বলেই ভারতীয় জ্ঞানগীতি-প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার পুরস্কারের শিকে কাঁচ ভাঙে ছিঁড়বে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। পুরস্কার লাভের সংবাদও আগেভাগে প্রকাশিত হয়েছিল, আর প্রতি-বাদও বের হয়েছিল, এবং সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। কেন এমন হোল আমরা বুঝি না। আমরা তাই চাই, পুরস্কারলাভের রোমহর্ষক সংবাদের পরিবর্তে এমন কিছু করা, যদ্বারা সাহিত্যিক উপকৃত হতে পারেন, সৃষ্ট সাহিত্য ও সংগীত সম্প্রসারিত হয় এবং দেশেরও কল্যাণ বহুগুণ বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।

সম্পাদক

আব্দুল মালিক

ভারতীয় আলো-হাওয়ার লালত হয়েও পৃথিবীর অনেক প্রান্তের মাটির সাথেই আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়েছিলো একটি গ্রাম, যে জীবনের বহু বছর অতিবাহিত হয়েছিলো সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের নিষ্ঠাভাজন জগতে। যে জীবনের কাছে 'এ দ্য লোক মধ্যম, মধ্যম পৃথিবীর ধূলি।' শিল্পী-জীবনে যে মানবচরিত্র আছে হতাশা ও পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতা এসে পথ রুদ্ধ করে দিয়ে 'যেতে আমি দিব না তোমায়' বলে সোচ্চার ধ্বনি ফুলেছে, অথচ পরিণামে সেই রুদ্ধ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। যেতে তাঁকে দিতে হয়েছে। তাঁর শিল্পজীবনকে কেন্দ্র করে সাময়িক হতাশা ও ব্যর্থতাবোধও মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তা তাঁকে ককচ্যুত করতে পারে নি। বরং এই হতাশা ও সাময়িক অসম্পূর্ণ ব্যর্থতাই ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথকে সুপ্রসঙ্গিত করে তুলেছে মনে হয়। তাই শিল্প-জীবনে একের পর এক নিরুৎসাহের কুয়াশা থেকে পথে ছোট্টে যিনি আজ প্রতিটি শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগী মানুষের কাছে বিশেষ-ভাবে পরিচিত তিনি হলেন জলিতকলা একাডেমীর সপ্রতি নিযুক্ত চেয়ারম্যান ডঃ মূলকরাজ আনন্দ।

জীবনে চলার পথে ডঃ মূলকরাজ আনন্দ 'ভাদ্রশ্রবণ' জীবনের ধ্রুবতারা ভেবে এগিয়ে গিয়েছেন। পারিপার্শ্বিকতার হাতছানি সংকল্প থেকে তাঁকে কখনো এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। তাই রাজনৈতিক মতানৈক্যের দরুন পিতার কাছ থেকে পালিয়ে আসেন, ও পরে কবি ও দার্শনিক ইকবালের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে দর্শনে মনোনিবেশ করেন।

শিল্পের জগতে ডঃ আনন্দ দীক্ষিত হয়ে-ছিলেন 'নর্থ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির' একজন বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের কন্যা 'আম্মারন'-এর যারা। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের দিন-গুলির রচনার প্রেরণার কাছে যেমন 'আম্মা' ততখুড়কে স্বাভাবিক স্মরণে আসে। ডঃ আনন্দের জীবনে 'আম্মারনে' রূপমূর্তি আরো অনেক বেশি পরিমাণে আম্মাদের মনে করিয়ে দেয়। ডঃ আনন্দ 'আম্মারন'কে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছেন। 'আম্মারন' তাঁকে জাউভারিতে নিয়ে গেলো। অতঃপর 'আনন্দ' তারই স্বীকরণে ২,০০০ পাতার এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর 'আম্মারন' তাঁকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। দূর্ভাগ্যের বিষয় ডঃ আনন্দের সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল না গ্রন্থটি আকারে সর্বত্র হওয়ার। 'দ্বি সয়েল

অফ বটেন'-এ। 'সারে ডঃ আনন্দের জীবনে ভালোবাসা ও শিল্পরূপই যে শব্দ তাঁকে জড়িয়ে ফেলেছিলো তা নয়। তিনি সে সময় লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ জনতার ওপর ব্রিটিশ পলিশের গুলী চালানাকে। এই ঘটনা ডঃ আনন্দের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে-ছিলো। তিনি তাঁর চোখের সামনে সেদিন দেখতে পাচ্ছিলেন দুটি ব্রিটিশ শক্তিকে, যার একটি হ'ল ধনিক গোষ্ঠী ও অপরটি হ'ল দারিদ্রের প্রতিমূর্তি। এরই ফলে মূলক-রাজ ট্রেড ইউনিয়নের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি মাস্তুরী দর্শনে আগ্রহী হলেন।

সামান্যমাত্র প্রাথমিকশিল্পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ১৯২৭ সালে মূলকরাজ দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং এর পর তিনি কিছু সময়ের জন্য ভারতবর্ষের দিকে ফিরে এলেন। তাঁর জীবনের অনেকাংশ এপার-ওপারের স্রোতে ভাসমান। অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মানস-সমুদ্রের



ডঃ মূলকরাজ আনন্দ

সৈকতে ইনি পদচারণা করেছেন। জীবনে শব্দ থেকেই তাঁর মধ্যে স্বপ্ন রঙীন বাস্তবতা লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। তাঁর জীবন যশ-খ্যাতি ও সার্থকতার মিনারকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে।

রাতা নদীর তীরে নেহরুজী যেদিন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে দ্বিবার্ষিক রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন, সেদিন 'আহর কংগ্রেস সেমিনে' উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বটেন থেকে তাঁর পুনরায় ডাক এলো।

সেখানে তিনি কবি টি. এস. এলিয়টের সাথে 'রিব্রটরিয়ন' পত্রিকায় কাজ করছিলেন ও সক্রিয় নোট লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইকবালের কবিতা তাঁর কাছে দৃঢ়মুদ্রিতবস্তু ও মোহময় ছিলো। তিনি বক্তৃতাও করেছিলেন সেদিন লন্ডনে ভারতীয় সমাজের কাছে।

১৯৩০ সালে মূলকরাজকে বিভিন্ন মহাদেশ ও ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের ভাড়ার পরিচয় ও পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছিলো। চিত্রশিল্পের ওপর তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পারিশিয়ান পেইন্টিংস' ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হোলো 'দ্বি হিন্দু ভিউ অফ আর্ট'।

অতঃপর ১৯৩২ সালেই তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে এলেন ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লেকচারারের' পদের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু তখন সেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠার কোনো হিন্দুর জন্য স্থান সেখানে ছিলো না। মূলকরাজ তখন গান্ধীজীর সাথে যোগদান করলেন ও 'সবরমতি আশ্রম' কাটাতে লাগলেন। এই বছরই মূলকরাজ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম উপন্যাস 'আনট্রিবেল' প্রণয়ন করেন।

'এশিয়াটিক আর্ট' সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তিনি প্যারিসে গেলেন। এবং প্যারিস থেকে ফিরে এলেন লন্ডনে। তিনি তাঁর উপন্যাস প্রায় উনিশজন প্রকাশকের কাছে নিয়ে গেলেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকেই তা ঘুরে এলো। কোনো ফলই হোলো না। এই ব্যর্থতার ফলে ভেঙে পড়লেন ডঃ আনন্দ। মানসিক অসুস্থতা তাঁকে এত নিরাশ করে তুললো যে তিনি আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করে ফেললেন। কিন্তু সেদিন তিনি সাধনা পেলেন কবি অসওয়েল ব্রাকস্টোনের কাছে। কবি ব্রাকস্টোন ডঃ আনন্দের জীবনের পরম নিরানন্দ সময়কে উত্তীর্ণ করে রক্ষা করেছিলেন। অতঃপর একজন প্রকাশকও সম্মত হলেন তাঁর 'আনট্রিবেল' গ্রন্থ প্রকাশে। এবং তাঁর লিখে যাওয়ার জন্য তাঁকে ১০০ পাউন্ড স্বর্ণস্বরূপ তুলে দেন।

এরপর ১৯৩৮ সালে ডঃ আনন্দ পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চললেন। প্রগতিবাদী লেখক আন্দোলনের সমর্থনে তিনি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিলেন শাজাদ জাহির ও আব্দুল হালিম-এর দিকে। পরিশেষে ১৯৪৮ সালে ডঃ আনন্দ ভারতে ফিরে এসে দেখলেন তিনিই প্রগতিবাদী লেখকদের ঘোষণায় 'সেকলে' বলে বিবেচিত।

এরই ফলে মূলকরাজ স্বেচ্ছাবিক দৌর্বল্যে ভেঙে পড়লেন। ১৯৬২ সালে ডঃ আনন্দ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিল্প ও সাহিত্যের' ঠাকুর অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তাই মূলকরাজ আনন্দের মতো এক-জন পূর্ণ মানুষকে চেয়ারম্যানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে জলিত কলা একা-ডেমী যোগ্যতা ও গুণেরই স্বীকৃতি দিলেন।



কিপুলিঙ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কিপুলিঙের কম্পলোক

একশ বছর আগে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে ব্রিটিশ লেখক রাডার্ড কিপুলিঙ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নয়, সাম্রাজ্যবাদী এই মনোবী লেখককে স্মরণ করতে হয় অনেক কারণে। তাঁকে ভোলা কঠিন, ভারতকে তিনি শাসক-সম্প্রদায়ের মেজাজ নিয়ে দেখলেও ভারতবর্ষই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ হয়ত এই ভারতবর্ষ না হলে সম্ভব হত না।

রাডার্ড কিপুলিঙকে সত্যনিষ্ঠ বলা যায়, কারণ তিনিই সেই কবি যিনি কপট গলায় বলতে পেরেছিলেন—‘পূর্ব পূর্বই আর পশ্চিম হল পশ্চিম, কোনো-দৈন এদের মিলন হবে না।’

ডিক্টোরীয় সাম্রাজ্যবাদের তিনি একজন গোড়া সম্প্রসারণবাদী, সেই হিসাবেও আজ তাঁকে সকৌতুকে স্মরণ করতে হয়, তাঁর সাধের সাম্রাজ্যবাদের অটল সিংহাসন আজ টলটলায়মান, একে একে অনেক উপনিবেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হস্তচ্যুত হয়েছে এবং ভারতবর্ষও আজ স্বাধীন। কিপুলিঙ যদি এই মহত্বের বেঁচে থাকতেন তা হলে কষ্ট পেতেন সন্দেহ নেই। যেমন কষ্ট চার্চিল ভোগ করে গেছেন, কারণ, তিনিও সদম্ভে বলেছিলেন, আমি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তিসাধনের ব্যাপারে পৌরোহিত্য করতে পারব না।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সাহিত্যিককে ভারতবর্ষ অকুণ্ঠিতচিত্তে সাহিত্য উপকরণ দান করেছে। ভারতবর্ষ কিপুলিঙকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে যার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত কিপুলিঙের মূল্য তুলছে।

কিপুলিঙের বাবা জন লকউডকিপুলিঙ ছিলেন বোম্বাই শাসকের জে. জে.

স্কুল অব আর্টের প্রিন্সিপাল। কেউ কেউ বলেন বোম্বাই মদ্যজরমের কিউরেটর। উত্তরাধিকারসূত্রে কিপুলিঙ-এর দেহে ইংরাজ, স্কট এবং আইরিশ রক্ত প্রবহমান ছিল সেই কারণে ‘গ্রেট ব্রিটন’ বলা যায়, কারণ যে তিনটি দেশের সমন্বয়ে গ্রেট ব্রিটন সেই তিনটি দেশেরই তিনি প্রতিনিধি।

শৈশবে হিন্দুস্থানী শেখার সন্নিবিষ্ট



রাডার্ড কিপুলিঙ

হয়েছিল কিপুলিঙের, আর সেই বাজার-চলতি হিন্দুজ্ঞান তাঁকে উত্তরকালে সাহায্য করেছে।

জীবদ্দশায় তাঁকে সবাই বলত সাম্রাজ্যবাদের কবি। সিসিল রোডস যেমন সাম্রাজ্যবাদের একজন স্তম্ভ বিশেষ তেমনিই কিপুলিঙ ছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রের সিসিল রোডস। এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিভিমান, সর্ববিষয়ে তারাই মহৎ এই গর্ব কিপুলিঙের অন্তরে

ছিল। কিন্তু, এখন কালের প্রচণ্ড কৌতুকে সেসব অহংকার ও অভিমার কোথায় ভেসে গেছে, এই সব কারো স্মরণে থাকবে না। তবে কিপুলিঙের সাহিত্যিকখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অম্লান থাকবে।

সাম্রাজ্যবাদ সংকীর্ণতাপূর্ণ রচনা ধূয়ে-মুছে যাবে, বড়জোর সাম্রাজ্যবাদ মানুষের মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে মাঝে মাঝে উল্লিখিত হবে, সেই যুগের মানুষের পক্ষে হয়ত এই চিন্তা যথা-যোগ্য। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সেই সব উক্তি এবং সিদ্ধান্ত ছেঁড়া কাগজের বুড়িতে পড়েছে। আজ সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের বস্তু, একটা ঘণিত শব্দ মাত্র। সুতরাং যেসব লেখক সেই সাম্রাজ্যবাদের নকীব ছিলেন তাঁরাও একালের মানুষের কৃপার পাত্র।

কিপুলিঙের সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়, যেমন তিনি বা লিখেছেন তা তাঁর মনের কথা নয়, প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাঁর স্বদেশের প্রেচ্ছা এবং গুণকীর্তন করেছেন, কিন্তু সেই উক্তি নিছক মন ভুলানো কথা। কিপুলিঙকে বরং ধন্যবাদ যে, তিনি ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মনোভাবের একটা নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর লেখা ‘সঙ অব দি ইংলিশ’, ‘এ্যান ইমপিরিয়াল রেসক্রিপ্ট’ এবং সম্পাদকীয় ছড়া তাঁর উৎকট সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। তিনি তাঁর কালের শাসনব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন এবং সেই শাসনতন্ত্রের পক্ষে যেখানে বা প্রয়োজন হয়েছে তা করেছেন। যেমন বঙ্গের যুদ্ধে ব্রিটিশের মর্যাদা ভুলান্ধিত হওয়ার পর কিপুলিঙের ক্ষোভ ফুটে উঠেছে তাঁর সম্পাদকীয় ছড়ায়। ব্রিটিশের নিন্দাও তিনি করেছেন অনেক, যেখানে যেমন প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি বৈদেশিক

শিক্ষাগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে জাতিকে ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিপ্লিঙ জনতার কাঁব, জনতার ধামধামের চাক—তাই তিনি লিখেছেন। তাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে হয়ত নয়, আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনেই এইভাবে আত্মবিকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না এই অহংকার সকল শ্রেণীর ব্রিটিশের মধ্যে প্রবল ছিল। কিপ্লিঙ তার ব্যতিক্রম নন।

অনেকের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে 'দি এম্পায়ার অন হুইচ দি সান নেভার সেটস' এই উক্তি কিপ্লিঙের, এ ছাড়া ভারতবর্ষকে 'দি ব্রাইটেস্ট জয়েল অব দি ব্রিটিশ ক্রাউন' এই গৌরবের অধিকারী করেছিলেন রাডার্ড কিপ্লিঙ। সামরিক ছাউনি এবং সৈনিকদের মেসে এই সব কথাগুলি যীশুর দর্শনটি অনুশাসনের মতই মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। কিপ্লিঙের বাবা জন লকউড বিবাহ করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বার্ন জোনসের শ্যালিকাকে, তিনি স্ট্যানলী-বলডুইনের পিসিমা ছিলেন, এই বলডুইন পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। জন লকউড আর্ট স্কুলের কাজের অবসরে 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' নিয়মিত লিখতেন। এই হল কিপ্লিঙের পারিবারিক পরিবেশ।

সেকালে সাহেবদের বাড়ি দাসী-চাকরের সংখ্যা হত গণনাতীত, বালক কিপ্লিঙ—আম্মা এবং বাড়ির খানসামা বোয়রাদের কাছে বাজার-চলতি হিন্দি শিখেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ থাকার খেলাধুলার তেমন পারদর্শী ছিলেন না কিপ্লিঙ, তবে সাতার কাটতে পারতেন, স্কুলের ম্যাগাজিনের সম্পাদনাও করেছেন কিছুকাল। বারো বছর বয়সে কিপ্লিঙকে য়ুনাইটেড মার্ভিন্স কলেজে ভর্তি করা হয়। এইখানকার জীবনীচরিত্র কিপ্লিঙ তার 'স্টলবী অ্যান্ড কোং-এ কিছু লিখেছেন। সতের বছর বয়সে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন কিপ্লিঙ।

সেই অল্প বয়সেই একটা চাকরী জুটে গেল, একেবারে 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেটের' এডিস্ট্যান্ট এডিটর। স্যার ডেভিড স্যাসন ছিলেন পিতৃবন্ধু, তিনিই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনকাল সহজ ছিল তাই বিনা অভিজ্ঞতায় এবং সম্ভবত অল্প লেখাপড়া সত্ত্বেও কিপ্লিঙ একেবারে এডিস্ট্যান্ট এডিটর হতে পেরেছিলেন।

সৈন্যদল কাজকর্ম ভালো লাগত না কিপ্লিঙের। তিনি গল্প লিখতেন বর্ণনামূলক কাহিনী। সামান্য করেকটি

কথায় একটা ছবি ফুটিয়ে তোলার অসামান্য দক্ষতা ছিল কিপ্লিঙের। কিপ্লিঙের রচনারীতি ছিল স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র।

'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেটে' কিছুকাল কাজ করার পর 'কিপ্লিঙ' এলাহাবাদের 'পাইওনীর' পত্রিকার যোগদান করেন। পোষাক-পরিচ্ছদের অবিন্যস্ত ভাবের জন্য সম্পাদক কিন্তু কিপ্লিঙকে সুনজরে দেখতেন না। এই 'পাইওনীর' পত্রিকার সঙ্গে তরুণ সামরিক অফিসর উইনস্টন চার্চিলও এক সময় যুক্ত ছিলেন। কিপ্লিঙের রচনারীতি ছিল সাংবাদিকের, শেষ পর্যন্ত এই সাংবাদিক-বৈশিষ্ট্য কিপ্লিঙ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। সংবাদপত্রের সঙ্গে জীবনের প্রথম পর্যায়ে সংযুক্ত হওয়ার ফলেই হয়ত এই বিশেষ রচনাভঙ্গীর অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

'পাইওনীরে' যখন কাজ করতেন কিপ্লিঙ তখন প্রকাশিত হয় 'ডিপার্ট-মেন্টাল ডিটস' (১৮৮৬), 'প্রেস টেলস ফ্রম দি হিলস' (১৮৮৭), 'সোলজার্স ব্রী', 'দি স্টোরী অব দি গ্যাডসবাইস' 'অনডার দি দেওদারস', 'থি ফ্যানটম রিকসা', 'উই উইল উইনক' (১৮৮৮-৮৯) প্রভৃতি। শেষোক্ত রচনাবলী এলাহাবাদ ক্লাবের একজন পদস্থ রেল-কর্মচারী তিন হাজার টাকায় কিনে নেন। কিপ্লিঙের তখন বয়স মাত্র চন্দ্রিশ বছর, তিনি 'পাইওনীরের' কাজে ইস্তফা দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন, আর ফিরে আসেন নি।

যাত্রাকালে তদানীন্তন 'পাইওনীর' সম্পাদক কিপ্লিঙকে উপদেশ দিয়েছিলেন লেখালেখির কাজ ত্যাগ করে জীবিকা-অর্জনের জন্য যেন অন্য কিছু করার চেষ্টা করা হয়, কারণ লেখক-বৃত্তির যোগ্যতা তোমার নেই। সেই কালের নিরিখে এই উপদেশটিকে বখা বলা যায় না, কারণ ঠিক সেই সময়েই এক বিখ্যাত প্রকাশক কিপ্লিঙের সব পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়েছিলেন প্রকাশের অযোগ্য বলে। আর কিপ্লিঙের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'কিমের' প্রাতি কৃপাদৃষ্টি করতে কেউ আর রাজী হয় না। অথচ এই উপন্যাসটি 'ম্যাকমিলনস ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য কিপ্লিঙকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে-ছিলেন।

'দি রুপী বুকস' এবং 'ম্যাকমিলনস ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত 'দি ইনকারনেসন অব কৃষ্ণ মূলবাণী' ও 'দি হেড অব দি ডিসট্রিক্ট' গল্পগুলি কিপ্লিঙকে খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করল।

কিপ্লিঙের রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য তাঁর আশ্চর্য পরিদর্শনশীল। তথ্যের জন্য আকুলতা, জীবনের ঘটনাটির প্রাতি আগ্রহ কিপ্লিঙকে ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এক বিস্ময়কর প্রতিভারূপে প্রকাশিত করেছে। কিপ্লিঙ ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, মিশর, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঘাঁটির চিত্র যেমন উদ্ঘাটিত করেছেন, তেমনই আবার সাতসাগরের ঢেউ আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ও নৌবাহিনীকেও অমরত্ব দান করেছেন। কিপ্লিঙও তাঁর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে উদ্ঘাটিত করেছেন, প্রকাশিত হয়েছেন।

এই সব কারণেই কিপ্লিঙ সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করতে পারেন নি। তাকে যেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়ে থাকে তার মধ্যে 'an imperial megalomaniac' কথাটি খুবই প্রযোজ্য।

কিপ্লিঙের সাহিত্যকর্মের বিচার করতে বসে তাঁর চরিত্র এবং বিস্ময়কর জীবনযাত্রার কথা বিস্মৃত হওয়া প্রয়োজন। একটি সাহিত্যপ্রণেতার সাহিত্য-বিচারে তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ, ব্যক্তিগত জ্ঞান বা পূর্বসিদ্ধান্ত মনে থাকলে সমালোচকের কর্তব্যবৃত্তি ঘটে এবং সেখানে সফলতা লাভের আশা করা সমালোচকের পক্ষে উচিত নয়। কিপ্লিঙ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তাই নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন সর্বাধিক।

গল্পলেখক হিসাবে কিপ্লিঙ তাঁর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে কিংবা মানবিক অনুভূতির প্রকাশে লেখক হিসাবে ব্যক্তিগত আবেগকে যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। কিপ্লিঙ যৌথ-চরিত্র বা শ্রেণীর চিত্র রূপায়িত করেছেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে, সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজনে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং সেইভাবেই সাম্রাজ্যবিলাসী মানদণ্ডের চিত্রে পালক সৃষ্টি করেছেন, পাঠক হিসাবে তাঁরা লেখকের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এখানে পাঠক আনন্দ পেয়েছেন যৌথভাবে। কিন্তু সেই পাঠক নিজস্ব ভূমিতে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁকে বিচার করতে হয়েছে অন্য দৃষ্টিকোণে। তখন পাঠক অপরাধিত। স্বতন্ত্রভাবে পাঠকচিন্তে তাই কিপ্লিঙ-সাহিত্য কোনো বিশেষ বাণী বা কোনো আর্থিক ক্ষয়কে তৃপ্ত করে না।

কিন্তু নিজে যেমনটি দেখেছেন পাঠক-

প্রকাশ

সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত

গলাবেসে কে তুমি ডেকেছ
মনাস্বীয় পৃথিবীতে?
য-পথে তীরের রেণু
গ্যামল অঞ্জলি
সুধারসে ওঠে ছলচ্চলি।

পাবায় শূন্যের বিকে
নিরুদ্ভূত নিরুদ্ভূত—
বজ্রাহত বন্যপতি তোমার পদে
বন্দ্য বসুন্ধরা
নির্ভাবার রচেছে কুণ্ডলী।

এবার রহস্য এ-কী
ভলবেসে শূন্যের ভরাও
সংগোপন স্পর্শে শূভকণে
সৃষ্টির তোরণ খুলে দাও।

কেও ঠিক তেমনটি স্থানে দেখতে
পেরেছেন সেখানেই তিনি সার্থক হয়ে
উঠেছেন, সেখানেই তিনি উজ্জ্বল হয়ে
উঠেছেন, তখনই কিপলিঙ-সাহিত্য-
পাঠকের মন ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠেছে
কোনো বিশেষ চরিত্রের বেদনায়। কোনো
বিশেষ একটি মহত্বের আনন্দময় পরি-
বেশকে রঙ-রেখায় ধরে রাখা হল
লেখকের শক্তির পরিচায়ক, থাকমান
কালকে একটিমাত্র কথায়, একটি
অসাধারণ উক্তিভে ধরে রাখা যদি লেখ-
কের কৃতিত্ব এবং শক্তিমত্তার নিরিখ হয়,
তাহলে কিপলিঙ-শক্তিও কৃতিত্বের
পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অনেকগুলি
অবিনশ্বর রচনায়, তাই তিনি অমরশীল।

দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা এবং তীক্ষ্ণতা
ছিল কিপলিঙের রচনার বৈশিষ্ট্য।
যেমন দেখেছেন তেমনই দেখিয়েছেন
পাঠককে। কিপলিঙের কাহিনী মনকে
ভরিয়ে তোলে, তাঁর কবিতার সহজ ছন্দ
ফানে বাজে।

কিপলিঙের 'জাঙ্গল বুক' নামক
গ্রন্থটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম
ধরা হয়। যেখানে আদিবাসী বা
সমষ্টিগত চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে
সেখানে কিপলিঙ অম্বিতীয়। সেরখান
নামক ব্যাঘ্র এবং কাশীরা নামক কৃষ্ণ-
চিত্তাবাঘ, বালু নামক নিম্রাল, বাদামী
ভালুক, তাছাড়া ঘৃণ্য বান্দরলোগ আর
মোগলী, মানুষ ও পশুর মধ্যে আশ্চর্য
সংযোগ সেতু। এই মোগলী একদল
নেকড়ের মধ্যে মানুষ হয়েছিল,
জাঙ্গলের প্রাণীর আচার-ব্যবহার এই
পালক সমাজে সে শিখেছিল। এই গ্রন্থ
সর্বকালের আনন্দ সম্পদ। কাশীরা,
বালু এবং নিঃসঙ্গ নেকড়ে একেলা
ছিল মোগলীর সুখ-দুঃখের সহচর।
যেখানে বানরদের সঙ্গে কিপলিঙ
অন্তরঙ্গতার পর মোগলী ফিরে এসেছে

তখন তাকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে আশ্চ-
র্যের প্রয়োজনে, সেই অংশটুকু
চমৎকার।

কিপলিঙ ভারতবর্ষ থেকে বন্ধন
ইংলণ্ডে ফিরে যান তখন তিনি জাপান
ও আমেরিকা ঘুরে গিয়েছিলেন, আমে-
রিকায় তাঁর সঙ্গে কারোলিন স্টার
বালান্টটীরার পরিচয় হয়। পরে তাঁকেই
তিনি বিবাহ করেন।

সিসিল রোডসকে আদর্শ পুরুষ
মনে করতেন কিপলিঙ, এবং সেই গ্রন্থা
তাঁর মানসিকতা গঠনে অনেকখানি
সহায়তা করেছে। বয়স যুগ্ম সম্পর্কে
সিসিল রোডসকে প্রশংসা করলেও এক
শ্বেতাঙ্গ জাতি কতৃক অপর শ্বেত
জাতির ওপর প্রভুত্ব করাটা তাঁর মনঃ-
পূত ছিল না। তিনি বলেছিলেন :

'It is the greatest crime
that a politician can
commit.' এই উক্তির পর জনৈক
রিপোর্টার প্রশ্ন করে—

'What about black
men?'

তাঁর উত্তরে কিপলিঙ যা বলে-
ছিলেন তা তাঁর মনোভঙ্গীর উপবৃত্ত—

'I am against slavery,
if only for the reason that
the white man becomes
demoralised by slavery.'

তবে কিপলিঙের এই সাম্রাজ্যিক
দুর্বলতার জন্য সাহিত্যিক হিসাবে
তাকে অপারক্তের করা যায় না। তাঁর
'কিম' ইংরাজী সাহিত্যের এক অপূর্ব
সৃষ্টি।

কিপলিঙ অমরর লাভ করেন নি।
তাঁর অনেক রচনাই বর্তমানে অচল,
অসামগ্রিক। তার কারণ তিনি বিশ্বাস

করতেন যে ব্রিটিশ জাতি ঈশ্বরের এর
বিশেষ সৃষ্টি। তিনি লিখেছিলেন—

'He has smote for us a
pathway to the ends of all
the earth—'

তাই ব্রিটিশরা তালুক থেকে পাইন-
বন পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে
পেরেছিল।

তথ্যগি শিল্পচেতনা কিপলিঙের
মধ্যে প্রচন্ডভাবেই ছিল এবং ইংরাজী
ভাষার তিনি একজন মহৎ প্রতীক।
১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে কিপলিঙ বন্ধন
নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তখন
টমাস হার্ডি, জর্জ মেরেডিথ, সুইনবার্ন
প্রভৃতি পূর্ণ গৌরবে বর্তমান, তথ্যগি
কিপলিঙকেই সেদিন সম্মানিত করা
হয়। কিপলিঙ রচিত 'কিম' গ্রন্থটি
কিপলিঙ যে ছোটগল্প ছাড়া অন্য
ক্ষেত্রেও অনুরূপ শক্তিমান ছিলেন তা
নোকা যায়। এই গ্রন্থের প্রকৃত নায়ক
কিপলিঙের ভারতবর্ষ, কিপলিঙের
কল্পলোক। এই গ্রন্থে তিনি ভারতের
এক বৃহত্তর এবং সমষ্টিগত চিত্র
এঁকেছেন। এর মধ্যে ভারতীয় এবং
ইউরোপীয় চরিত্রের সংগে রাজনীতি ও
সমাজচিত্রও ফুটে উঠেছে। এই বৈচিত্র্যের
জন্য 'কিম' এক বিশিষ্ট গ্রন্থ। তিস্ততী
লামা, 'হরী' বাবু, মাহমেৎ আলি ঘোড়া-
ওয়াল, ইংরাজ অফিসার, দৈনিক এবং
সর্বোপরি কিম নামক ছোট ইংরাজ তনয়;
ছেলটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে
মানুষ হয়েছিল। এই গ্রন্থের পটভূমি
লাহোর, বারাণসী এবং গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড।

কিমের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ
সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষের সংগে কিপ-
লিঙের যোগাযোগ থাকার জন্য এবং
এই ভারতবর্ষই কিপলিঙের শ্রেষ্ঠ
রচনার কল্পলোক।

ভারতদর্শন

নতুন প্রভাত

অ র ও একটি বছরের সংগ্রামমুখর দিনগুলি পিছনে ফেলে নববর্ষের নতুন অরুণোদিত আশার সন্ধ্যা ঘর বাঁধতে চললাম আমরা।

নিশানা ঠিক থাকলে এবং উপযুক্ত কাগরী মিললে অভিযান হয় সার্থক। ভারতবর্ষ নেহরু পরবর্তী যুগে তার কাগরীরাপে যাকে পেয়েছে নিঃসন্দেহে নতুন অভিযানের দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর সমর্পণ করে এগিয়ে চলার ভরসা রাখে।

নেহরু উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রারম্ভেই ভারত-কাগরী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দ্বারা অনায়াস প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সমস্ত সংশয় দূর করে আপন আসন দৃঢ়তর করে নিয়েছেন।

সমস্যার চেটে ভেঙেছে একের পর এক, গার হয়েছেন সাবধানে।

পাক-ভারত সংঘর্ষ

বিগত বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ঘটনা কাশ্মীরে পাক আক্রমণ, যার মোকাবিলায় ভারতের মধ্যপক্ষে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতীয় নেতৃত্ব। এই ঐতিহাসিক বিপর্যয় একাধারে ধ্বংস ও গঠনের ইতিকথা-রূপে ঐতিহাসিকের আলোচ্য হবে। এ সমস্ত ভারতীয় শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের সমাহার জাতির মনে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে। ভারত সরকার ইতিপূর্বে কি ঘরোয়া, কি বৈদেশিক ব্যাপারে এমন অকুতোভয় নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। ভারতীয় জনগণও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত ভেদাভেদ ভুলে একই পতাকার তলে সমবেত হয়ে বহির্বিশ্বকে মালুম দিয়েছে, বিপন্ন দেশের চাকে ভারতীয়মাত্রেরই এক প্রাণ এক জাতি ও একই প্রতিজ্ঞায় কেমন অবিচল এবং সৈনিকোপম দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দিতে পারে।

এই সঙ্কটমুহুর্তে ভারতবর্ষ অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছিল যে, তার নিজস্ব প্রচার দুর্বলতা তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেমনভাবে দৃঢ় পরিচিতির গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখেছিল। ফলত ভারতবর্ষকে সাময়িকভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল, ভারত তার বৈদেশিক নীতির স্ব-অনুল করবে কিনা। সৌভাগ্যবশত ভারত পুনরায় তার নিজস্ব জিহ্বা আত্ম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতের বক্তব্য ক্ষময়ক্ষম করেছেন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গও ভারতের বক্তব্যকে ঠেলে ফেলতে পারে নি।

কাশ্মীরের ব্যাপারেও ভারত যে দৃঢ়তাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছে বাইরের কোনও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ চাপ সেই নীতি থেকে ভারতকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

ভারতের এই দৃঢ় রূপের জন্য সমভাবে ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ সঙ্কল্প, ভারতীয় নেতৃত্বের অনবদীয় সত্যপ্রিয় বনোভাব এবং জল-হল-অন্তরীকে ভারতীয় জওয়ানদের অতুত-পূর্ব শৌর্য-বীর্য অভিনন্দনযোগ্য।

চৈনিক চাপ

পাক-ভারত সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ চাপের সৃষ্টি করেছিল উত্তর সীমান্তের চৈনিক চাতুরী। একটি 'আলটিমেটাম' পর্যন্ত রেখে ভারতের মানসিক উত্তাপকে বাপতে চেয়েছিল লাল চীন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মনোভাবে তছুরি কিছুমাত্র পৈশিলায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। আপন কিস্তীর চালে চৈনিক চাতুরী আপনি মাং-হয়েছিল বরং। চৈনিক দোস্তির দৌড়টা পাকিস্তান তথা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল যাত্র। ভারতকে এতটুকু চান গেল না।

খাদ্য সমস্যা

গত বছরে ভারতের যদি কূটনৈতিক দুর্বলতা কিছুমাত্র প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তার কারণ ভারতের খাদ্য সমস্যা। একমাত্র এখানে এসেই বিষমভাবে ঠেকতে হয়েছে তাকে। তবে এর জন্য যতটুকু জটিল তা প্রথমাবধিই হয়ে আসছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির জন্য সবিশেষ নজর দেওয়া হয় নি। বিশুদ্ধ ১৯৬৫ সাল তাই ভারতের আকাশে সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়ের ঘনঘটা সৃষ্টি করল খাদ্যকে কেন্দ্র করে। ক্ষুধা নিরে উচ্চশিরে দর্প প্রকাশ যে বাতুলতামাত্র ১৯৬৫ সো কথা লোভাধারে ঘোষণা করল হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত।

সময়োচিত শিক্ষা

ভারতের এই মারাত্মক ভুলটি ধরিয়ে দিলেন মাকিনী বহুরা। বস্তুতপক্ষে খাদ্যের বোগান বৃদ্ধির সাময়িক হুমকি বাহ্যত যতই বনঃপীড়ার কারণ হয়ে থাক, প্রকৃতপক্ষে ভারতের চরম খাদ্য সমস্যাকে এমন একটি সঙ্কট মুহুর্তে মাকিনীরা আমাদের চোখের সামনে কঠিন নমু সত্যের দৃষ্ট তুলে ধরলেন যাতে গোটা দেশের টনক

দৃঢ় ভরসা। তবু এমনি একটি ভারতবর্ষ সন্দেহে ধরোজন ছিল। মাকিনী বহুরা যে শিক্ষা দিলেন (এবং আবার ভারতকে উপযুক্ত মুহুর্তে দৃষ্টিকের ফসল গ্রাস থেকে উদ্ধার করলেন) ভারতীয় নেতৃত্বের যে শিক্ষা, যথার্থভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যতীত কোন জাতি যে নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে যাবা উঠু করে চলতে পারে না- এই অতি বাস্তব শিক্ষার পর খাদ্য সমস্যা সমাধানের সাধ্যা সর্বপ্রকার উপায় আবিষ্কার করাই হবে বর্তমান বছরের প্রধান করণীয়। অন্যথা ভারতের মর্যাদা রক্ষার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে মাকিনী মুন্ডরাষ্ট্র ভারতের প্রতি পরম মিত্রমূলত ব্যবহারই করেছেন যার জন্য প্রত্যাক ভারতবাসী সন্তোষ প্রাপ্ত হবেন। আর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে আয়রা নীতি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৌছতে পারলে, ইতিহাসও মাকিনী গুণ স্মরণে রাখবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়

বিগত বৎসরের সঙ্কটকাল আর একটি সত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা যে গণতান্ত্রিক ভারতের মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে—এ সত্য প্রমাণ করেছেন কাশ্মীরের জনগণ আক্রান্ত ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শতক্ষেত্রের সঙ্গে অবিচলিত মোকাবিলার দ্বারা। প্রমাণ করেছেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জওয়ানরা। প্রমাণ করেছেন শান্তিপ্রিয় প্রতিটি নাগরিক।

কাশ্মীর-ভারতের ওপর পাক আক্রমণ নিমিত্ত প্রতিক্রিয়ায় তাই এক হিসেবে আশীর্বাদ।

অন্তর্দর্শ

সর্বোচ্চ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ভারতের রাষ্ট্র
ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সাবধানবাণীও এই সত্য



ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

শান্তিাহক বন্দোবস্ত

শান্তিাহকের সবদা মনে রাখা উচিত। পাক-ভারত যোদ্ধাবিরার ভারতের শৌর্য-বীর্যের ঘটনাকে যে অত্যন্ত সঠিক চোখে দেখছি আমরা—আমাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলির দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করে সে মোহ কাটিয়ে ওঠা উচিত। রাষ্ট্রপতিই ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র, যিনি আজকের উন্মাদনার কালে এই জাতীয় স্বির নির্দেশ আমাদের দান করেছেন।

বহির্বিবেশ তাঁর দুটিমালীও ছিল তাই সংযত, সংযত এবং শান্তিবাদী। তিনি ভারতের সীমান্ত সত্ত্ববর্ধনের অবসান কাহনা করেছেন। এমন কি তাঁনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে কেলতেও যে আমাদের ইচ্ছাকৃত করা উচিত নয়, রাষ্ট্রপতির দলোভাবে তেমন ইচ্ছিতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এজন্য অবশ্য (অত্যন্ত সংঃ ও দুর্ভাগ্যের কথা) অনেকে রাষ্ট্রপতির মনোভাবে সায় দিতে পারেন নি। অনেক উচ্চতর প্রশ্নও উত্থাপন করতে ছাড়েন নি।

সেটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজ্যিক এবং মহান চিন্তাধারার নাগাল সাধারণের পক্ষে পাওয়া স্বাভাবিক হবে কি করে।

তবে বঁয়রা অভ্যুত্থান দর্পে আবদ্ধ দৃষ্টি আমাদের স্মরণ করা উচিত, ভারতবর্ষ সীমান্ত সত্ত্ববর্ধন বজায় রেখে তার গঠনমূলক কার্যাবলী থেকে কেবলমাত্র পিছু হটতেই বাধ্য হবে।

স্বাধীন ভারতে এখনো অস্বাভাবিক অবসান হয় নি। জাতীয়তাবোধ এখনো সাময়িক উত্তেজনার ফলস্বরূপ।

ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত বিকশিত করেছিল সে কাহিনী আমরা নিশ্চিত এতো তাড়াতাড়ি ভুলি নি। পাঞ্জাব শান্তিকরণের যে ধুরো উঠেছে তা যে কোনো-ক্রমেই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ নয়, এ সত্য স্বীকার করাই ভালো : ভারতের রাজ-নৈতিক দলগুলির মধ্যে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে (কম্যুনিষ্ট পার্টি ও এস এস পি, পি এস পি ভারত প্রভৃতি) তা যে বলিষ্ঠ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে খুব সহায়ক এমন মনে করার কারণ নেই (কেন না গণতন্ত্র বহু বিচ্ছিন্ন দলের অস্তিত্বে অধিকতর সংখ্যাগুরু শাসনের কারণ হয়)। এবং কর্মতাসীন দলে যে দেশব্যাপী ভাঙন, স্বার্থবিদ্বেষ এবং নীতিব্রষ্টতা দেখা যাচ্ছে, তাও বলিষ্ঠ জাতি-সচেতনতার পরিচায়ক নয়।

নেহরু-তিরোধানের পরমুহূর্তেই সর্বপ্রাণী কানোবাজারী ও স্বার্থচক্রান্ত প্রকাশো জনগণের সর্বত্র লুপ্ত করতে নাতির শা'র মতো ধাঁপিয়ে পড়েছে। এদের কাছে ভারতবাসীর স্বার্থপরকার প্রশ্ন কোনো আবেগ সৃষ্টি করে না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দলীয় প্রসার অনেক জরুরী পরিকল্পনার প্রতিবন্ধক হয়েছে। এমন কি দুর্নীতিজ্বরের কাছে খয়ং খরাত্তরীকে

পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে হেঁট বুকে আপন স্বার্থতা স্বীকার করতে হয়েছে। সমগ্র জাতি যখন দলিক্রের ভয়াল ছায়া দেখে আতঙ্কিত কালোবজার তখন নতুন মুনাফার স্বপ্ন দেখেছে।

এহেন প্রস্তুতি কি দেশের মধ্যে দেশপ্রেমী ও ঐক্যবাদী জাতীয় স্বার্থবাদী জনগণের পরিচয় বহন করে।

অতর্ক্যাহে জর্জরিত রূপ জাতির কর্তব্য, স্বতন্ত্রাং, অকারণ বলকর নয়, কর্তব্য, নিরুপকব আবহাওয়ার সৃষ্টি করে জাতীয় অগ্রগতির পথকে নিকটক করে তোলা।

শান্তির আদান

গোভাগ্য ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব উপরোক্ত সত্যের প্রতি পূর্ণভাবে সচেতন।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নতুন করে বলিষ্ঠ বন্ধন স্থাপনের সহায়ক হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি-আলোচনার ভারত কখনো এমন কোন অবস্থায় সৃষ্টি করে নি যত্না পাঞ্জির পথে তিলমাত্র বিলুপ্ত হতে পারে। তবে প্রধানমন্ত্রী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অনিবার্য এবং উপযুক্ত দৃঢ়তা সর্বদাই বজায় রেখেছেন, তা হ'ল ভারত তার সত্যপ্রিয় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে নারাজ।

প্রধানমন্ত্রী শান্তির আদাননে পাড়ি জমিয়েছেন নতুন বছরের প্রাকালেই। কেবলমাত্র ভারত সীমান্ত প্রশ্নেই নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিদারও ভারতবর্ষই।

ভারতই উপনিবেশিকতা এবং অন্যায়ে বিরুদ্ধবাদী এশীয় শক্তি। ভারতের এই ন্যায়নিষ্ঠা এবং শান্তিপ্ৰিয়তাই তাকে প্রতিবেশী সমাজে প্রতিষ্ঠা দান করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

বর্তমান বছর, স্বতন্ত্রাং, ভারতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর, যে সময় ভারতকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হিসেব করে পদক্ষেপ করতে হবে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অক্লিমের নয়। তার ওপর সমাজবিরোধী ও স্বার্থসন্ধিচ্ছ-চক্র এবং ছদ্মবেশী শক্তিবাহিনী আজও ভারতের বিভিন্নস্থানে বাঁচি গেড়ে বসে আছে (প্রসঙ্গত বেরিলির রবার ক্যান্টরীতে বিস্ফোরণ ও কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি সমরণীয়)। সর্বপ্রথম এদের সঙ্গে যুদ্ধে হবে ভারতবাসীর। সীমান্ত শক্ত প্রত্যক্ষ। তার সঙ্গে যোদ্ধাবিরার জন্য আমাদের সাময়িক শক্তিই যে যথেষ্ট এ প্রশ্ন পাওয়া গেছে। আভ্যন্তরীণ শক্ত তদপেক্ষা নারাজক, কেন না সমুখ সমরে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। এই স্বপ্নজ্বরের সর্বপ্রাণে বতন করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন শক্ত সঙ্গে সর্বতোভাবে যোদ্ধাবিরার

করার সবজোরপ প্রস্তুতি। একমাত্র শান্তি আবহাওয়াই আমাদের প্রস্তুতির সহায়ক। স্বতন্ত্রাং শান্তি প্রতিষ্ঠাই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

বিপত্ত বছরে ভারত পরিচালনাতে বুঝেই সঙ্কটকালে ভারতের নিতের সংখ্যা কত দৃষ্টমেয়। এজন্য তেমন কূটনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করাও আমাদের অন্যতম আবশ্যকীয় আগামী প্রয়োজন—যার দ্বারা ভারতের প্রতি দ্বাণ্ড মনোভাবের ইঙ্গিত হয় বহির্বিবেশে।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ভারতের জনগণ বুঝাশক্তি ও আর্থিক অসমবন্টনের গুরুত্বকে আজও পীড়িত। অসমবন্টনের নীতিই দুর্নীতির গর্ভধারণী। ভারতবর্ষ যে সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন দেখে (অর্থাৎ বাস্তবে তার থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে) সেই সমাজতন্ত্রের পথেই সঠিক নিপাতা করে বর্তমান বছর থেকেই আমাদের সাবধানে না ফেরে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রকৃতির প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক দেশ। এদেশের ওপর সৌরী দৃষ্টি কেনে সার্বিক পারের বিদেশীরা ভুটে এসেছিল। সেই সৌর-শক্তির বেশকিছু গঠন করতে হবে পঞ্চম ইজিবের সঙ্গে। আর তা করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের দিকে তাকিয়েই “কন্যাগবৃত্তী” সরকারকে তাঁদের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করতে হবে। মুষ্টিবদ্ধ ব্যবসায়ীর লোভের আওতা থেকে পূর্ণ মুক্তি না হলে সোনিার ভারত গঠনের স্বপ্ন সার্থক হবে উঠবে না।

আমরা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বচ্ছিশালী ভারত গঠনের স্বির লক্ষ্য সামনে রেখে যেন নতুন বছরের ইতিহাস রচনার মনঃসংযোগ করতে পারি।

বৈজয়ন্ত

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ : ভারতে তৈরি প্রথম ট্যাংক বৈজয়ন্তের চাল, চাকা চাক্ষু করেন স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবর। মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত কারখানার তৈরি বৈজয়ন্ত কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিন বছরের মধ্যেই পুরোপুরি একটি গোটা ট্যাংকের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এই অভ্যুত্থানের মধ্যে ট্যাংক তৈরির ঘটনাটি যথার্থ আনন্দের কারণ।

নাটোর পর বৈজয়ন্ত ভারতের বিজয় বৈজয়ন্তীর অন্যতর লক্ষণ হিসেবে ভারতবাসীর আনন্দের কারণ, সম্ভেদ নেই।

তাসখন্দে'র তাস খেলা

লন্ডন 'টাইমস' পত্রিকার করাচীস্থ সংবাদ-দাতার খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান তার স্পল-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিন ডিভিশন পদাতিক সৈন্য বাড়িয়ে এবং এদের সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করার জন্য নয়া চীন ইতিমধ্যেই

কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানে প্রেরণ করেছে। সংবাদ আরও প্রকাশ, চীন ও ইন্দোনেশিয়া উভয়েই পাকিস্তানকে মিলি বিমান দিতে চেষ্টা করছে এবং মিলি জলনল জল শিফাগ্রহণ করে পাকিস্তানী বন্দনচালকরা চীনে গিয়ে। পাকিস্তানকে সমরাস্ত্রের সজাবার জন্য ইন্দো-নেশিয়র মাধ্যম বড় বেশি রকম টাট্টিয়ে উঠেছে বলেও উল্লিখিত সাংবাদিক জানিয়েছেন।

তাসখন্দে শান্তি-আলোচনার সময় পাকিস্তানের ইন্দোনেশীয় ও চীনা বন্ধুরা পাক-মিতাকে আরও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গরম রাখতে চাইছে, উপরন্তু সবসঙ্গে তাই-ই প্রতীয়মান হয়। পাকিস্তানকে বিশ্বাস নেই। যারা চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের নামে মার্কিন অস্ত্র গ্রহণ করে তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং এমন সময় নতুন করে সংঘর্ষ শুরু করে বন্ধন কঙ্ক-ষটিত চুক্তির ফলে প্রতিভার বসবার চেষ্টা করছে ভারতবর্ষ। সেই পাকিস্তান তাসখন্দে বসে আলোচনার কালেই যে আবার নতুন করে ভারতের বিরুদ্ধেই রণসাজে সাজছে না ভারতই। গ্যারান্টি কোথায়। ভারত সীমান্ত জুড়ে টুকটাক সংঘর্ষ তো চলছেই। পাক চাচুরীর এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একোলে-ওকোলে চলাচল করে পাক অতিসম্মিহিত ইতি কি জানবো সন্তব হবে। নাকি তাসখন্দ হবে পাকিস্তানের নয়া ভূরূপের চ্যোবল—এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ যে নেই তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

নতুন অর্থমন্ত্রী

‘এই প্রথম একজন বাঙালী’ (শ্রীশচীন চৌধুরী) ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করলেন বিদায়ী অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর নিকট থেকে।

এই মূহূর্ত পর্বন্ত (১-১-৬৬) শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় নি। শ্রীকৃষ্ণমাচারী নিজে শারীরিক দৌর্বল্যকেই এ পর্বন্ত তার পদত্যাগের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

দেশের বিচক্ষণ নেতৃবর্গও এ পর্বন্ত তাঁদের মতামত প্রকাশে বিরত। তবে দু-একজন উৎসাহী সোজাসৃজি কিংবা পাকে-প্রকারে তাঁর পদত্যাগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রকাশ, নতুন অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী মার্কি শ্রীকৃষ্ণমাচারীর একজন বিশিষ্ট সমর্থকই ছিলেন। বিদায়ী অর্থমন্ত্রী যদি নীতিগত বিরোধের কারণেই পদত্যাগে বাধ্য হয়ে থাকেন তাহলে শ্রীচৌধুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কেমন করে সেটাও কম বিস্ময় নয়।

এ সমস্ত কূট রাজনীতি দলীয় সভায় পুণ্ডানুপুণ্ডরূপে বিচারের পরই অবশ্য শ্রীশচীন চৌধুরীকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। এ বিষয়ে, সুভারায়, মনোভিজ্ঞ বাগাড়ম্বরে কলকোপ না করাই শ্রেয়।

শ্রীশচীন চৌধুরীর অর্থমন্ত্রী হিসেবে

যোগদান বিভিন্ন মহলে উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করেছে। শ্রীচৌধুরী বাঙালী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদে তিনি প্রথম বাঙালী। এজন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে শ্রীচৌধুরীর নিয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ হয়ত ‘দাদ-খানি চাল মুসুরির ডালের’ আশা পোষণ করবে না কেন্দ্রীয় বর্তননীতিতে আশ্বস্ত হওয়ার কারণ পশ্চিমবঙ্গের নেই। তবে বাঙালী অর্থমন্ত্রী পেয়ে গর্ব অনুভব করবে নিশ্চয়।

শ্রীশচীন চৌধুরী ১৯৬২ সালে খেদিমী-পুরের ঘাটাল কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচিত হন এবং দু-দুবার রাষ্ট্রসভা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি বিশিষ্ট আইনজীবী (বার-এ্যাট-ল) এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞ ও কোম্পানী আইনে



শ্রীকৃষ্ণমাচারী

বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে বাবাটি। স্কুল ও কলেজ-জীবন কলকাতায়। আইন শিক্ষা ইংল্যান্ডে।

মহীশূর :

একটি অসাধারণ পদত্যাগ

মন্ত্রীরা বড় একটি পদত্যাগ করেন না, করবার জন্য আশ্বাসন অনেকেই করেন পরে যথাসম্ভব মন্ত্রীদের গদী আঁকড়ে থাকতে তাঁদের ইচ্ছাতে বাধ্য না বলেই অভিযোগ। বিশেষ করে একটি নীতির প্রমেনে দৃম করে পদত্যাগ করার ঘটনা বিরল। অবশ্য পশ্চিম-বঙ্গে শ্রীসংখ্যাবিশ্বকর নীতির প্রমেনে মন্ত্রি-সভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। শ্রী সি ডি দেশমুখও নীতির প্রমেনেই পদত্যাগ করে-ছিলেন। শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগের মূলেও নীতিগত বিরোধ আছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। তথাপি এ সমস্ত ক্ষেত্রে নীতির সঙ্গে রাজনীতির জটও কম ছিল না।

সম্প্রতি মহীশূরের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

শ্রীমতী যশোদারা দাসাপ্পা একটি ‘সামান্য’ (মন্ত্রি ছাড়ার পক্ষে সামান্যই বটে) সামাজিক নীতিগত প্রমেনে পদত্যাগ করছেন বলে প্রকাশ।

মহীশূর সরকার মাদকবর্জন নীতি শিথিল করার মাদকদ্রব্য এলাকার লোকেরা মাদকদ্রব্য গ্রহণে উৎসাহ বোধ করবেন—এই প্রমেনে শ্রীমতী দাসাপ্পা পদত্যাগ পেশ করেছেন। রাজ্য মধ্যমন্ত্রী মাদকবর্জন নীতি শিথিল করার সপক্ষে ব্যক্তি দেখিয়ে শ্রীমতী দাসাপ্পাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী দাসাপ্পা প্রতিজ্ঞায় স্থিরসম্বন্ধ। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পদ-ত্যাগপত্র গৃহীত হোক বা না হোক, সরকারী নীতির প্রতি তাঁর সমর্থন না থাকায় তিনি সে সরকারে নিজের নাম টাঙিয়ে রাখতে নারাজ।

শ্রীমতী যশোদারা দাসাপ্পা গান্ধী-শিষ্য। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা সমগ্র দেশে একটি অনন্য-সাধারণ আদর্শের নজীর স্থাপন করল।

দাদ্রাজ :

দেবতার দান

দেশে যখন বৈদেশিক মদ্রায় একান্ত অনটন তখন একটি সংবাদে প্রকাশ, তিরুপতি মন্দিরের দেবতার পারে দৈনিক সহস্রাধিক তীর্থযাত্রী তাঁদের কেশগুচ্ছ প্রদান করে থাকেন যার বাৎসরিক মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা হবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই নিবেদিত কেশ বিক্রি করে ভারত সরকার মোটো বৈদেশিক মদ্রা অর্জন করবেন বলে আশা রাখেন।

আরও প্রকাশ, এক মার্কিন কোম্পানী তিরুপতিতে একটি পুরুল্লা তৈরির করখানা স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।

বর্তমানে মন্দির কর্তৃপক্ষ নিলামে কেশ বিক্রয় করে বাৎসরিক হারে প্রায় বার লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।

কথায় বলে, রাখে কেউ মূরে কে। দেবতার পারে মস্তকমণ্ডনের এই প্রথা আজ বৈদেশিক মদ্রায় হাঁকরা চাহিদায় দু-এক টুকরো খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করল। দেবতার দান সময় বিশেষে এইভাবেই অবাচিতরূপে আসে। হায়, মস্তকমণ্ডন প্রথা মসজিদ ও গীর্জার চালু থাকলে সেকুলার সরকারের বৈদেশিক মদ্রায় অনটন কিছু পরিমাণে হয়ত মিটতে পারত।

ভ্রম-সংশোধন

গত সম্বন্ধে প্রকাশিত

শান্তনু দাসের ‘মৃত’ পাতালের উক্তি থেকে কবিতার দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম স্তবক এইভাবে শব্দ হবে :

করা? করা কেন জেগে আছে যারে’

‘...কাল বাকি সুখ উঠবে না

বিমর্ষ প্রদীপদান,

আলোগুলি অশ্বকারে মোড়া

ভারত দোকান-পাট অনায়াসে কাঁপ বস

হল...

পরাত্ত বৈদ্যনা বয়স

বার মাসের তের পান্থন চুকিয়ে এবার
পর্যায় হিসাবের পালা। কি পেলাম। কি বা
দিয়ে এলাম।

বছরের পর বছর পার করে এসেছে
ইতিহাস। পেয়েছে কতটুকু। পেয়েছে,—
কত সূক্ষ্ম করে কাড়তে হয়, পেয়েছে তারই
নতুন নতুন পথ। পতনে উত্থানে রক্তিম যাত্রা-
পথ অনন্ত তীর্থযাত্রী মহাবিশ্ব চলেছে অনন্ত
আধিরার স্তর ভেদ করে। দু হাতে স্বত
সরায়, চারি পাশে অন্ধকার ততই চেপে ধরে
তাকে। আলোর চেয়ে অন্ধকারের আকর্ষণই
বৃদ্ধি বেশি। বছরের গোড়ায় যে আলোকিত
স্বপ্ন কেরক শতদল বিস্তারের প্রস্তাবনা
রাখে, বছরের শেষ পক্ষে এসে দেখা যায়,
সব মিথ্যে, সব ভাঁওতা, আমরা সেই তপ্ত
আলকাতরার স্রোতে ঘর্মাক্ত বিপর্যস্ত হয়ে
অবিপ্রান্ত দাড়ি টানছি। মানুষের আশান্বিত
অস্তিত্ব অন্ধকারের পাকের টানে তলিয়ে
তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালের
অভিজ্ঞতাও এই চিরায়ত ঐতিহাসিক
বিবর্তনেরই অভিজ্ঞতা।

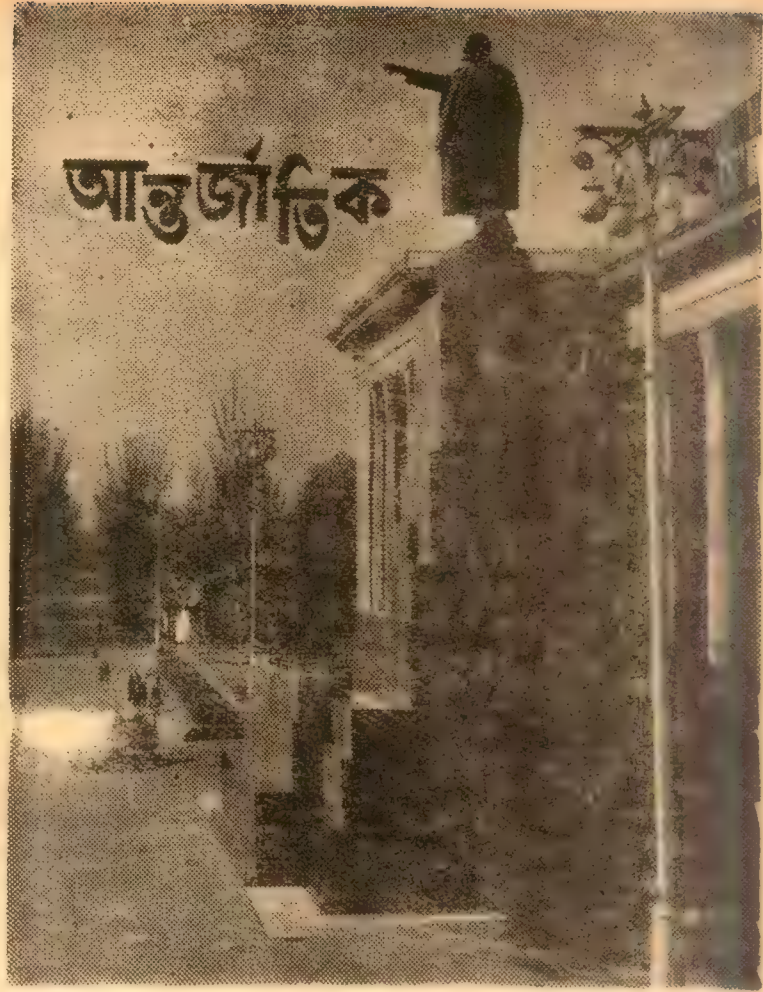
এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ
কোথাও মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য
উৎকর্ষের প্রকাশ নেই। আছে অবদমন,
হানাহানি রেবারেখির কাহিনী। বিশেষত
যেখানেই বৃহৎ শক্তির স্বার্থ, সংঘর্ষ দানা
বেঁধেছে সেখানেই।

মানুষের অগ্রগতির একমাত্র বিস্ময়কর
সাফল্য দেখা গেছে বিজ্ঞানের রাজ্যে। সাহিত্য
সংস্কৃতির জগৎ, দার্শনিক চিন্তাদর্শের জগৎ
খুঁজে পায় নি কোনও উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব।
বরং সেই একই বয়ানে অতি উজ্জ্বল দেশ-
গুলির তরুণ সমাজ ইতিহাসের পেছন পাতায়
ফিরে বাওয়ার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন,—
সেই বিশ্ববাসের অভাব, সেই নগ্নতার স্বপ্নের
হুলি।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বিশ্বাস

অথচ মানুষ কেন যে বিশ্বাসে ধৈর্য পাবে
না বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিকে তাকিয়ে
তার স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া ভার।

যে মানুষ তারশূন্য অন্তরীক্ষে ঘেরে
অন্যায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসছে
বারম্বার; যে মানুষ মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে
অবলীলাক্রমে; গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কে নতুন
খানখারগার সুযোগ ঘটেছে প্রতিদিন; মানুষের
চন্দ্রাভিযান ও মঙ্গলগ্রহ যাত্রার অভীশা
পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; নিত্য
নতুন বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে জটিল জীবন
যাত্রা কত বিভিন্ন উপায়ে রক্ষণীয় প্রকৃতির
সাহায্য লাভ করছে; তখন সেই সব সাফল্যের
দিনে হতাশা মানুষকে কি কারণে পেয়ে
বসবে তা দুর্বোধ্য। কিন্তু সাহিত্য ও
শিল্পের ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে এটা হতাশার
সঙ্গ। এক গোষ্ঠী লিপ্সু নিজেদের বিদ্রোহী



তাসত্ত্ব লেনিনের প্রস্তরমূর্তি

বলে পরিচয় রেখে যথেষ্টচারের মানব
কল্যাণ ধ্বংসী পথে পা বাড়িয়েছেন। প্রচলিত
সৌন্দর্যবোধে আর আস্থা নেই। নগ্ন
যথেষ্টচারের মধ্যে কোন মূর্তির সম্মান তারা
পাবেন তা তারা জানেন, তবে মানুষের
বৈজ্ঞানিক উন্নতি তাঁদের মনে বিশেষ দাগ
কাটছে না নিশ্চয়। কাটলে সাহিত্যে শিল্পে
হতাশার স্থান গ্রহণ করত বিজ্ঞান। তা সম্ভব
হয় নি।

গত বছরে সাহিত্য শিল্প সমাজে
মানুষের এই বিপর্যস্তমুখী অভিজ্ঞানের,
নগ্নতাবিলাসের উন্মাদনার চমকপ্রদ সংবাদ
সৃষ্টি করেছিল নিউ জার্সি। প্রকাশ, যৌন-
পুস্তক নিষিদ্ধ করণের জন্য রচিত আইনের
খসড়াটিই নাকি যৌনতাস্ত্রানী হাজার হাজার
ক্রেতাকে আকর্ষণ করে। অশ্লীলতার সংজ্ঞা
নিরূপণের জন্য আইনী খসড়ার উদ্দেশ্যে
নিদর্শনের লোভেই এজাতীয় ক্রেতা-উৎসাহ
দেখা গেছে। পৃথিবীতে একটি যৌনতাবাদী
দুনিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। যা পশ্চিমের ক্ষুদ্র
গড়ীতে প্রত্যাভর্তন করে মানবিক গুরু-
দায়িত্বকে সাবধানে এঁড়িয়ে যেতেই অধিকতর
প্রয়াসী।

নয়া আদর্শের পরাজয়

১৯৬৫-র পৃথিবীও সর্বমানবিক
কল্যাণ ও মূর্তির বিজয় অভিযানের কোনো
সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পারল না। এশীয়
ভূখণ্ডে যে নয়া সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া গড়ে
উঠছিল, চৈনিক গেরিলাত্মিক আবিষ্কার-
কারিতার ফলে তা প্রচণ্ডভাবে মার খেল।
চৈনিক অধৈর্য রাশিয়াকে দূরে ঠেলে দিল;
ইন্দোনেশিয়ায় ঘটল দর্পার পরাজয়, কমকম,
গৃহবিবাদ। দুনিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ
বিশ্বাসী দল উপদল ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে গেল।
সাম্যবাদী দুনিয়ার হতাশার মেঘ পুরোপুরি
তার পক্ষ বিস্তার করল। তথাকথিত সাম্যবাদ
অবশেষে হাত মেলাতে চাইল বৈষম্যবাদী
দমননীতির সঙ্গে।

ভাগ্যহত ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার ঔপ-
নিবেশিক দেশগুলির জন্য সাহায্যের বাহু
প্রসারিত করে দুনিয়ার বাগাড়ম্বরবাদী শক্তি-
গুলির কেউই এগিয়ে আসতে পারলেন না।
উল্টোপথে তারা শান্তি ও সহাবস্থানে
বিশ্বাসী একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক শক্তি
ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ চাপে কাবু করে

গাইক বেট ছাড়ে কিত্তে চাইলেন কংগা
হুনিয়া দম-বাদী ফাসিস্ত পাকিস্তানকে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো আদর্শ বিশেষ
১৯৬৫ সালেও বিক্ষুব্ধ রূপ নিয়েছিল।
কিন্তু হায়, কোথাও কখন আশার আলোক
দেখা গেল না।

ভিয়েনাম

ভিয়েনামকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পুনশ্চ তিক্ততার
মুহূর্তপাত হয়েছে। ভিয়েনামের সাময়িক
বৃদ্ধ-বিরতি কোনো কাজে আসে নি।
প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন সম্প্রতিভাবে ঘোষণা
করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েনামের
চার দফা দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই
ঘটকীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে। ওদিকে
মার্কিনী মিত্রবাহিনী নতুন করে জমি দখল
শুরু করেছেন। এশিয়ার শান্তি স্বপ্ন নস্যম
হতে বসেছে ভিয়েনামকে কেন্দ্র করে। তাই
তাসখন্দে শাস্ত্রী-আয়ুব বৈঠকের ফলশ্রুতি
বাই হোক, ভিয়েনামের অশান্তি বখাৎপূর্ণ
পাটানোই রইল।

গত বছরের দ্বিতীয় মাসেই মার্কিনী
বমানবাহর উত্তর ভিয়েনাম আক্রমণ করে।
হানায় কর্তৃপক্ষও অন্তর্দৃষ্টি এই বৈদেশিক
আক্রমণ ঠেকিয়ে আসছেন। তাদের জেনেতা-
হুতির দাবি মেনে নেন নি মার্কিনী কর্তৃপক্ষ।
মার্কিনীদের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া
এবং নিউজিল্যান্ডের সৈন্যও এই অভিযানে
অবতীর্ণ হয়েছে।

পোপের শান্তির আবেদন শূন্যে
হ্রস্বাঙ্গীর্ণ করেছে মাত্র।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার গৃহবিবাদ চরমে উঠেছে
১ বছর। নব অভ্যুত্থানের কালে কম্যুনিষ্টরা



হা-চি-মিন

একপ্রকার সময়ের অপেক্ষার নিচ্চুপ ছিল।
এখন তারা স্বমর্তি ধারণ করছে।

ডঃ সুকর্নের প্রতিশ্রুতদ্বী বিশ্ব সংস্থা
পঠনের হুমকী অবশ্য উপহসিত হয়েছে
কর্নেল উনভাং-এর নেতৃত্বে ৩০শে সেপ্টেম্বরের
সামরিক অভ্যুত্থানে। ডঃ সুকর্ন বেসামাল হয়ে
ইতস্তত কিহু অক্ষম আত্মকালন প্রকাশ
করেছেন মাত্র। তার 'ভারত স্বতন্ত্র' করার
দৃষ্টান্তও ফলবতী হয় নি। ধর্মীয় জিগির
তুলে নিজেকে কম্যুনিষ্ট আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন
করেছেন তিনি ইসলামের রক্ষক এখন
আপনাকে রক্ষা করতে বাস্তব আর সেই মহা-
বিপত্তির ফাঁকে ঐসলামিক পাক শাসক
ছোটোছোটো শত্রু করেছেন ওয়াশিংটন থেকে
তাসখন্দে। বার্থ হয়েছে ইন্দোনেশীয়-চৈনিক
মদত।

মালয়েশিয়ার প্রতি বিশ্ববই ভারতের প্রতি
ইন্দোনেশীয় আক্রোশকে তীব্রতা দান করে-
ছিল। ভারতীয় দূতবাসের ওপর ঘণ্য
আক্রমণ করে ইন্দোনেশিয়া সে আক্রোশ
কেটেতে চার। ভারত তাতে ইখন যোগান
দেয় নি অবশ্য।

অতি দর্পে হতা লংকা, ডঃ সুকর্নের
নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার অগ্রগতির স্বপ্ন এই-
ভাবেই বিপর্যস্ত হল। আলো থেকে অন্ধকারের
দিকে ইন্দোনেশিয়া পদাধর্ষ করল ১৯৬৫
সালে।

পাকিস্তান

পাক প্রেসিডেন্ট নাকি বেয়নেটের ডগায়
ডেউ কুড়িয়ে গত বছর নিজেকে নির্বাচিত
শাসকরূপে দাবি করেছেন, পাকিস্তানী জন-
গণের মনোভাবে এ কথাই প্রকাশ পায়।

ওদিকে পাকিস্তানের রাণী যুবক
(বয়সে নয়) ছোটো সাহেব ক্ষমতার খেল
দেখাতে শুরুর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে কম্যুনিষ্ট সম্প্র-
সারণ রোধ করার জন্য প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র অবাধে
স্বাধীন করেন গণতান্ত্রিক ভারত ধ্বংসের জন্য।
আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দর বাড়াবার মানসে
দুনিয়া ছাড়া চীনাগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
বিশ্ববাসীর মস্তক বিধ্বংস করার আয়ো-
জনও শুরুর করে দেন। সম্প্রতি আণবিক
বোমার অধিকার দাবি করে চোটপাটের
দ্বিতীয় বছর প্রদর্শন করতে চার ঘূর্ত
পাকিস্তান।

দোষ অবশ্য তাদের নয়। পাক লক্ষ-
কক্ষে দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গেরও যথেষ্ট
শিরশীড়ার কারণ ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
এমন কি রাশিয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ
পৃষ্ঠে (ভারতের হাতে প্রচণ্ড পাল্টা মার খাও-
য়ার পরিণতি) প্রলেপ লাগাতে বেশ বাস্তব-সম্মত
হয়ে উঠেছেন। তাসখন্দে শাস্ত্রীজী চলেছেন
আরদ্রী মান ভাঙতে, কেন না রাশিয়াকে
দস্যৎ করে পাকিস্তান আজ রাশিয়ার চেয়ে



হু-সং

যুবই মহাঘাৎকল্ললে প্রতিভাত। সোভিয়েটের
সঙ্গে এখন তার অর্থনৈতিক চুক্তি সমাধা
হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সক্ষম
করেছেন। কিন্তু তন্দর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার
কি সত্যিই মানুষের মস্তির স্বপ্ন পূর্ণ হবে?

আশা কীপ্তর হচ্ছে তাসখন্দকে সামনে
রেখেও। জঙ্গী-পাকিস্তানের সাধারণ মান্দ্য
চার ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।
এই দাবি তাদের আরও জোরদার হয়ে উঠতে
পেরেছে পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানের
অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের
যে বৃদ্ধবাজ সরকার পাক-জনগণকে যুদ্ধের
আবহাওয়ার আটক রেখে তাদের অগণতান্ত্রিক
জনসমর্থনহীন সরকারকে কারেম রাখতে চার
ত্রিশাঙ্কি স্বাধীনতা (মার্কিন, রাশিয়া, চীন)
সেই জঙ্গী শাসনকেই সাহায্যদান করে জন-
গণের আশা স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে
দিতে উদ্যত হয়েছে। ত্রিশাঙ্কির প্রত্যেকেই
দুর্বিনীত পাক শাসকচক্রকে আপনাপন দলে
টেনে রাখার প্রয়াসে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি
করেছেন যাতে পাকচক্র পৃথুদন্ত জঙ্গী পাক
সরকারই সর্বশেষে আন্তর্জাতিক পিঠ-
চাপড়ানিলাত জনিত বিজয়ীর হাসি হাসার
সুযোগ পাবে। কল্যাণবাদী সোস্যালিস্ট
দুনিয়াও পাক-ভাষণে নেমে প্রকারান্তরে
পাকিস্তানের অন্যান্য আচরণকেই সমর্থন
জানালেন।

তাসখন্দ

তাসখন্দে যে আলোচনাচক্র বসেছে
সেখানে পাক-ভারত বিরোধের কোন সমাধান
সূচিত হবে আজ (৩-১-৬৬) সে কথা
আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। তবে
পাকিস্তান যে চীন, রাশিয়া, মার্কিনকে
খেলিয়ে তোলার চেষ্টা পাবে এমন সংশয়
অবান্তর নয়। তাসখন্দ বৈঠক অবশ্য ১৯৬৬-র
প্রারম্ভে একটি শূভসূচনা বা ১৯৬৫-র

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি। তাসখন্দে এই শান্তি বৈঠকের একমাত্র আশা প্রদ তাৎপর্য এই যে, সেখানে বহির্দেশীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কম। তরুণ শান্তির আশায় প্ৰদীপিত হওয়ার কোন লক্ষণ এতাবৎ সুস্পষ্ট নয়।

সোভিয়েট দুনিয়া

সোভিয়েট দুনিয়ার সম্প্রতি যে পদাধিকারের রদবদল হয়ে গেল তদ্বারা অবশ্য এশিয়া মহাদেশকে নতুন চিস্তার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। সোভিয়েট দুনিয়ার এর ফলে কোনরকম নীতিগত হেরফের হয় নি। প্রেসিডেন্টের মর্যাদাপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে শ্রীআনাস্তাস মিকোয়ানকে। তাঁর আসন অধিকার করলেন শ্রীনিকোলাই পদগোর্নি। শ্রীপদগোর্নির এই পদপ্রাপ্তি অবশ্য প্রকটরূপে ক্ষমতা হ্রাস। কেন না তিনি



আইয়ান শি

হোমরা-চোমরা হওয়ার সাথে তথা এশিয়ার মাতাম্বরীর লোভে লাল চীন কাড়াকাড়ি জ্ঞান হারিয়েছে। সাম্যবাদের ধ্বংস ধারণ করে দমনমূলক শাসননীতির সংগে হাত মেলাতেও তার কুঠা নেই। যে ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অবিচলিত সমর্থক এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বার অবদান বিশ্ব-রাজনীতিতে অনস্বীকার্য, সেই ভারতের সমস্ত গঠনকাঠে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টির জন্য ভারত সীমান্তে একটা লড়াই-এর প্রস্তুতি বজায় রেখে এশীয় ভূখণ্ডে চীন শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চাইছে। পারমাণবিক বোমার আশ্বাফলনে মানবতার জয়যাত্রাকে স্তম্ভিত করার অপকৌশল আজকের চৈনিক নীতি। ভারতকে তার জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত করার জন্য পাকিস্তানের সংগে হাত মিলিয়ে চীনের চাপ সৃষ্টিও এশিয়ার স্বনকে বানচাল করারই চেষ্টা।

জোট নিরপেক্ষতাবাদের নেতৃত্ব থেকে ভারতকে বিচ্যুত করার অর্থই হল এই নীতির

দুর্বলতা প্রমাণ করা। কিন্তু তার শ্রম্য মানবের কোন কল্যাণটা সাধিত হবে। আবার যুদ্ধ, আবার ধ্বংসের অবক্ষরে চীন কোন মহাসত্তার দর্শন লাভ করবে, দুনিয়ার মানব তার কোন হৃদয় পায় না। জোট নিরপেক্ষতার অবসান মানেই আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধকে দ্ব্যর্থমিত করা। কিন্তু সমগ্র সময় অপেক্ষা কূটনৈতিক যুদ্ধেই এ পর্যন্ত চীন আত্মকর্তৃপ্ত লাভ করেছে। তার আশ্বাফলন এবং হঠকারিতার ফলে দুনিয়ার সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্ববাসী জনগণের মধ্যে নতুন হতাশার সঞ্চার হয়েছে।

নতুন রাষ্ট্র

জাম্বিয়া, মালদ্বীপ এবং সিঙ্গাপুরের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের (রাষ্ট্রসংঘ বিংশতি বৎসরে পদাধিকার করেছে) সদস্য-পদ লাভ করেছে।



পদগোর্নি

ছিলেন সাক্ষর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। পার্টি সম্পাদক গ্রীয়েজনেভের সহকারীরূপে শ্রীপদগোর্নির পরিত্যক্ত পদ অধিকার করলেন শ্রীশেলোপিন।

পাক-ভারত সংঘর্ষের কালে বৃহৎ শক্তিশর্গের মধ্যে সোভিয়েট দুনিয়াই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং আশা করা যাচ্ছে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে শান্তি আবহাওয়ার শাস্ত্রী-আয়ত্ব বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে রাশিয়ার নিরপেক্ষতার কারণেই।

গাল চীন

রুশীয় সমাজতন্ত্রের সংগে কক্ষের লড়াই ফসতে গিয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার



বৃহৎমিরেন

মালয়েশিয়া ভেঙে সিঙ্গাপুরের স্বাধীন সত্তা বিচ্ছেদ বিভেদেরই আর একরূপ।

স্বর্ণপ্রসবিনী আফ্রিকা

আফ্রিকার সম্পদ আহরণের জন্য শতবর্ষ-ব্যাপী শোষণের পর আফ্রিকাবাসীরা যখন মুক্তির আলো দেখতে শুরু করেছেন ঠিক তখনই রোডেশিয়ার আইয়ান স্মিথের সংঘাত লঘু শ্বেতসরকার আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের প্রোতে প্রচণ্ড বাধার মত এসে দাঁড়ালেন। বৃটেনের শ্রমিক দল এই জবরদস্ত ক্ষমতা অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যে আশ্বাস রেখেছিলেন কর্মসূচি তার কিছুটা গহীত হয় নি। অর্থনৈতিক অবরোধের

মাস্তাহিক বঙ্গমতী

প্রতিষ্ঠাত্রী রোডেশিয়ান কেশপাও স্পর্শ করে নি। রোডেশিয়ান এই ক্ষমতালোভী সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন উপনিবেশবাদী পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ আফ্রিকা। কালো মানুষের মন্দির স্বপ্ন বানচাল হয়ে গেছে।

এজেন্সির স্বাধীনতার স্বপ্নকেও পর্যুদস্ত করেছে উপনিবেশিক লোভীচক্রান্ত।

আফ্রিকান রাষ্ট্রজোটের আলজিয়ার্সে এ্যাফ্রো-এশীয় সম্মেলনে মিলিত হওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল কর্নেল বুমোদিয়নের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট বেনকেয়ার ক্ষমতাচ্যুতিতে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছ প্রতিনিধিরা অশান্ত আলজিয়ার্সে বৈঠক বসতে রাজী হলেন না। বুমোদিয়ন তখন দ্বিতীয় দফা সম্মেলনের প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু গত নভেম্বর মাসেও এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল না। সম্মেলনে যোগদানে লাল চীনের অসম্মতি দ্বিতীয় উদ্যোগকে অন্ধুরে বিনাশ করল।

রোডেশিয়ান ব্যাপারেও আফ্রিকান রাষ্ট্র-জোট কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে পারলেন না স্থিরলক্ষ্য একের অভাবে।

কণ্ঠ্য

শেষ পর্যন্ত কণ্ঠ্যের মন্দিরদাতা লম্বদ্বার স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ক্ষমতালোভী মবুতু কণ্ঠ্যালিজদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কঠ-রোধ করেছেন। লম্বদ্বাকে সরিয়ে কাশা-

বুতুর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল শব্দ কালক্ষেপের প্রয়োজনেই হয়তবা গত নভেম্বর মাসে প্রধান সেনাপতি মবুতু আবার একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটরে কাশাবুতুর ক্ষমতালোভের ইতি করলেন আকস্মিকভাবে। কাশাবুতুর আশার বেলুন ফেসে গেল। ক্ষমতাচ্যুত হলেন তিনি আর জেনারেল মবুতু সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের প্রথাটাই বাতিল করে দিয়ে ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে বসলেন। আগামী পাঁচ বছর তিনিই থাকবেন কণ্ঠ্যের প্রেসিডেন্ট (যদি না অন্যতর অভ্যুত্থানে কণ্ঠ্য পুনশ্চ কবলিত হয়)।

কণ্ঠ্যের মন্দির স্বপ্ন মবুতুর পদভারে আত্মর মাথা নোয়াতে বাধ্য হল।

ফ্রান্স

জেনারেল চার্লস দ্য গল ফিরে এলেন পুনরায় ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা রূপে। তবে এবার তাঁকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রতিনিবন্ধী মিস্তারী ফ্রান্সকে জানিয়েছিলেন একনারকী শাসন-ব্যবস্থা থেকে মন্দির আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়াও মিলেছিল আশাতীতভাবে। শেষ সন্ধা হয় নি। ফিরে এলেন দ্য গল। ফ্রান্সও প্রত্যাবর্তন করল প্রজাতন্ত্রী একনারক্যের নেতৃত্বাধীন দ্য গলীয় শাসনের আওতায়।

সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকিয়ে ১৯৬৫



দ্য গল

সালের ১৯৬৫ সালের খাতা খুলে ধরলে আমরা পাই মন্দিরকামী মানুষের পরাভূত বেদনারই অগ্রদূত।

ক্ষমতার লড়াই আর পরাজয়ের অন্ত-বেদনা সাধারণ বিশ্বমানবের ভাগ্যলিপিতে শব্দগুলোর চিহ্নই একে গেছে। কোথাও স্বাধীন সত্তার জয়দ্বন্দ্ব পদধারী শোনা যায় না। আপাত বন্ধনমোচনও যে মন্দির নয় এ সত্যও আজ পরিষ্কার। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলেই একটি জাতির মন্দির সম্পূর্ণ হয় না। দানিয়া যত ছোট হয়ে আসছে বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ততই বিস্তৃতিলাভ করছে। উপ-নিবেশিক শাসনের অবসানে দেখা দিচ্ছে অর্থনৈতিক নয়া উপনিবেশবাদ। যা ছিল রাজকীয় শব্দগুল, প্রত্যক্ষ শোষণ আজ তা পাকে পাকে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমকে বাঁধছে।

জাতিগতভাবে আজকের উত্থান-পতনের ওপর দূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক শক্তির চাপ।

এই সর্বগ্রাসী বন্ধনই কি আজকের মানুষের মনে হতাশা এবং অবিশ্বাসকে জাগ্রত করেছে। এরই কুফলে মানুষ কি চাইছে যথেষ্ট জীবনব্যাপনের উন্মাদনার মধ্যে পরাভূত বেদনাকে ভুলে থাকতে! কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ করে দুর্যোগকে কে এড়াতে পারে।

মানুষের মন্দির আকাঙ্ক্ষা; বৃহৎ শক্তি-বর্গের ক্ষমতাস্বপ্নের শিবির থেকে জাতি-বর্গের মন্দির আকাঙ্ক্ষা, মনের গহনে ভীতুতাই পাকে। যদি আশাবাদে বিশ্বাস রাখতে হয়, তবে এ্যাফ্রো-এশীয় জাতিগুলিকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে, বৃহৎ শক্তির নয়া উপনিবেশিক নিগড় বাঁধন থেকে আমরা একজোটে মন্দির চাই। আর সেই মন্দির জিন্না অন্যতর মন্দির অর্থহীন। অর্থহীন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। অশান্তিক্ষণ ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরই এ মন্দির প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

রূপার বই

উপন্যাস

প্রাণপথের—দেবব্রত রেজ	...	...	৭.৫০
চক্রে আমার কুখ্যা—বাণী রায়	...	...	৬.০০
এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী	...	...	৫.০০
শেষ বসন্ত—অজিত কৃষ্ণ বসু	...	...	৪.০০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	...	...	৪.০০
বাতাসী বিবি—অজিত কৃষ্ণ বসু	...	...	৪.০০
জঘ্নে ব্রিগদী—আশাপূর্ণা দেবী	...	...	৪.০০
শ্বেতচন্দন তিলকে—শৈলজানন্দ মুনোপাধ্যায়	...	...	৩.৫০
আজও তারা ডাকে—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	...	...	৩.৫০
উত্তর মেলেই—সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৩.৫০
প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	...	৩.০০
নিঃসঙ্গ নায়ক—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	...	...	৩.০০

গল্পসংগ্রহ

বরকর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	...	৩.০০
অনেক বসন্ত দুটি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি	...	...	৩.৫০

—মাদের পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য লিখুন



১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-১২

আব-গ্রীক ইউরোপের কথা ও কাহিনী

গ্রীক-পূর্ব ইউরোপ ও জী

গ্রীকসংস্কৃতিকেই ইউরোপীয় সভ্যতার জননী বলা হয়। কিন্তু এই ধারণাটি ঠিক নয়। এ রকম ধারণা একথা ভারতবর্ষেও ছিল যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবেই আর্বসংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু অধুনা প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্বদের আগমনের বহু পূর্বেই এখানে সুউষ্মত অনাব-সভ্যতা বর্তমান ছিল, এবং তাকেই ভিত্তি করে পরবর্তী ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ঠিক সেইরকম আধুনিক গবেষণা একথা প্রমাণ করেছে যে, গ্রীকসংস্কৃতি বলে আজ যা পরিচিত তা মোটেই মৌলিক নয়, তার উৎস অন্যত্র। এই উৎস উল্কাটনের বীর প্রাথমিক দাবিঃ, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক সেলিম্যান। তিনি প্রথমে টিরাইনস ও মাইসেনি নামক দুটি নগরীতে খননকার্য চালিয়ে তথাকথিত হোমারিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে উক্ত নগরীস্বর থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির চারিদিকে মোটেই স্থানীয় নয়। শেষ পর্যন্ত এগুলির মূল উৎস খুঁজে পাওয়া গেল। তা হচ্ছে মূল গ্রীক ভূখণ্ডের বাইবে, জীট স্বেপে।

বিশ্বাস করার কাণ ঘটল যে গ্রীক-সংস্কৃতি (যাকে ঐতিহাসিকেরা হেলেনীয় সংস্কৃতি আখ্যা দেন) অনেক কিছুই প্রাক-গ্রীক। দেবতা জিউস বা ডিমিটার, এমন কি হোমারের কাব্যও হরত আদিতে এই জীট স্বেপকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এই নব আবিষ্কৃত সভ্যতার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রিটরান সভ্যতা। আমাদের ভাবতবর্ষে হবুপা ও মাহেন্দ্রোদরো আবিষ্কার হবার পর যেমন ভারতের সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের দ্বারা আমূল বদলে গেছে, যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান হিন্দুধর্মের বাবো-আনাই অবৈদিক (যদিও আর্ববাতিকের মোহে আমাদের পণ্ডিতেরা এই সরল সত্যের স্বীকৃতি দিতে নারাজ), তেমনি এই জীটদেশীয় সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার পর ইউরোপীয় সভ্যতাব উৎস বলে যে গ্রীকসভ্যতা পরিচিত ছিল তারও ভিত্তি টলে গেছে।

জীটেরও আগে

জীটের সভ্যতা যদি ইউরোপের ঐতিহ্যের প্রথম অধ্যায় হয়, তা হলেও তার পিছনে একটি বহু পুরাতন ভূমিকা আছে। এই

ভূমিকার শব্দ হচ্ছে ইউরোপের পুরাতন প্রস্তরযুগের দিনগুলি থেকে। ফ্রান্স এবং স্পেনের প্রাগৈতিহাসিক গুহানিবাসগুলির সাক্ষ্য থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলির চিত্রাবলীর সঙ্গে প্রাচীন জীট, মিশর এমন কি মেসোপটেমিয়ার শিল্পকর্মের উদ্দেশ্যগত সৌন্দর্য্য আছে। পুরাতন প্রস্তরযুগের শিকারীরা হাতীর দাঁত ও অস্থির উপর শিল্পকার্যে পারদর্শী ছিল। গুহার ছাদগুলিতে তারা যে সব পশুপাখীর চিত্র অঙ্কিত করেছিল, কলাসৌকার্যের দিক থেকে তা মোটেই অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার চেরে ন্যূন ছিল না। ফ্রান্স থেকে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন নারীমূর্তিসমূহ বহুলাংশে জীট ও মিশরে প্রাপ্ত মূর্তিসমূহের অনুরূপ।

নরেন ভট্টাচার্য

আসলে পুরাতন জগতের সর্বত্রই ধানধারণার ক্ষেত্র অভিন্ন। এই বিষয়ে বহুকাল আগে হিউ মিলার যা লিখেছিলেন তা বিশেষ প্রণয়নযোগ্যঃ “পাথরের যুগকৃত্যের বিচিত্র সমাবেশ আমি মিউজিয়মে দেখেছি; সেগুলি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির। তাদের কতকগুলি এসেছে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে, কতকগুলি দক্ষিণ সমুদ্রের স্বীপগুলি থেকে, কতকগুলি আবার আমাদের দেশ থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি যা দেখে অবাক হয়েছি সেগুলি হচ্ছে তাদের কিস্করকর সাদৃশ্য। প্রাচীন স্কটল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড, যে দুই দেশের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কথা কল্পনাও করা যায় না, সেই দুই দেশের অস্ত্রের মধ্যে কী কিস্করকর সাদৃশ্য! একটির সঙ্গে অপরটির প্রভেদ কোথায় তা বুঝতেই পারা যায় না। আদিম্য-বস্ত্রার মানুস সর্বত্রই সমান প্রাপী ছিল, তার সজ্জনশক্তি গল্প তৈরিতেই হোক আর বুদ্ধ-কৃত্যের নির্মাণেই হোক, সর্বত্রই একইভাবে ক্রিয়ালীল, কেন না পৃথিবীর সব জায়গায় আদিম কাহিনীগুলি প্রায় সর্বত্রই একই রকম।”

কথা ও কাহিনীর ক্ষেত্র

প্রাচীন যুগের কথা ও কাহিনীগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কিস্করকর। তবে দেশভেদে স্থানভেদে সেগুলির আকারগত পরিবর্তন

হওয়া শব্দই স্বাভাবিক, যদিও গুণগত প্রভেদ শব্দই কম। বিভিন্ন বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের কথা ও কাহিনীর উদ্ভব হয়, আর বিশ্বাস গড়ে ওঠে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানুষের অভিজ্ঞতা সর্বত্র সমান নয়। কৃষি-কেন্দ্রিক জীবনের নিবন্ধে যে কাহিনী গড়ে ওঠে তা শিকারী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা কাহিনী থেকে যে পৃথক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা হিউপুর্বে টিউটন ও কেল্ট পুরাণে দেবতা ও দৈত্যের বৃক্ষের কাহিনী পেয়েছি। আমাদের দেশেও এই রকম কাহিনী অল্প আছে। আসলে এগুলি প্রাকৃতিক বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেদে বর্ণিত ইন্দ্র ও বৃক্ষের বৃক্ষ আসলে বৃক্ষেরই রূপক, বৃক্ষ কথটি বৃ থেকে নিঃপন্ন হয়েছে যার অর্থ আবৃত করা, অর্থাত বৃক্ষ মেঘেবই প্রতিরূপ; ইন্দ্র বজ্রাঘাতে সেই মেঘকে বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে বর্ষণ ঘটান। প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে বৃক্ষের তারপর্ব। আমরা পবে দেখেছি, ব্যাবলনীয় উপকথায় দৈত্য টিন্নাক্ত ইউক্রেতিস নদীতে বন্যা ঘটাত, সে নিহত হয়েছিল মেরোডাচের হাতে। ডেনমার্কের শিকারী ও মৎস্যজীবীরা দক্ষিণের দেশগুলির কাছ থেকে কৃষিকার্য শিখেছিল। তাই তাদের কাহিনীতে দেখি শিশুদেবতা ফ্রেক সাগর পার থেকে এসেছিল ফসলের আঁটি হাতে নিয়ে। অনুরূপভাবে ব্যাবলনীয় কাহিনীতে দেবতা তম্মুজ শিশুরূপে প্রতি বছর আসত ফসলের বারতা নিয়ে।

হেইনারিখ সেলিম্যান

ইউরোপীয় প্রাগৈতিহাসিক চর্চা যার কাছে সবচেয়ে ঋণী, তিনি হচ্ছেন হেইনারিখ সেলিম্যান নামক জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক। বালক বয়স থেকেই তিনি হোমারের ইলিড ও অডিসি কাহিনীসমূহ শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং যখন তাঁর বয়স মাত্র আট বছর তখন তিনি বড় দিনের উপহার হিসাবে একটি ছবির বই পান যাতে একটি ছবি ছিল যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রয়নগরীর ধ্বংসসাধন। এই ছবিটি তাঁর মনের চিত্রপটে চিরকাল মুদ্রিত ছিল।

আর্থিক অভাবের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে বেশিদূর লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি একটি দোকানে শিক্ষানবিশীর কাজে লেগে যান। উনিশ বছর বয়সে তিনি একটি জাহাজে কের্ন-বর-এর কাজ নেন। চম্বিশ বছর বয়সে তিনি

সাম্রাজ্যিক বন্দুত্ব

প্রাচীন কোম্পানিতে কাজ নেন, এবং কর্ম-সূত্রে তিনি রূপ দেখে আন। সেখানে নীলের ব্যবসা করে তিনি বহু অর্থের অধিকারী হন।

এইবার তিনি তাঁর ছেলেরদের স্বন্দরক সাধক করার কাজে এগিয়ে গেলেন। পূর্ব-বর্তী পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে, হোমার-বর্ণিত ট্রয়নগরী বুনাবাসির সমীকটস্থ স্বীপের মধ্যে একটি পর্বতশিখরে অবস্থিত। কিন্তু সেলিম্যান বললেন যে, ট্রয়নগরী লুকিয়ে আছে আরও উত্তরে সমুদ্রতীরে হিসারলিক নামক একটি টিলার উপর। সেলিম্যানের এই মতবাদ পণ্ডিতেরা উপহাস করে উড়িয়ে দিলেন। ১৮৭০ সালের বসন্তকালে সেলিম্যান হিসারলিকে খননকার্য শুরু করলেন। বেশ ফুটে প্রাচীরের নিচে তিনি একটি প্রাচীর আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এ কাজে রীতিমত বাধা এল তুর্কী সরকারের কাছ থেকে, কেন না স্থানটি তুরস্ক সাম্রাজ্যের জলাকার মধ্যে। পর বৎসর অবিকৃত গভীরে অনুসন্ধান করে একটি গ্রীক ভাস্করের নিদর্শন পাওয়া গেল, কিন্তু তা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। ১৮৭০ সালে তিনি ভাগ্যদেবীর আনুধ্য সাহা করলেন। হিসারলিকের টিলা থেকে তিনি কয়েকটি প্রাচীন নগরী বন্যবাসের আবিষ্কার করলেন। তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম নগরীটি হচ্ছে ট্রয়।

কিন্তু তুর্কী সরকারের ক্রমাগত বাধা-ধনের ফলে সেলিম্যান হিসারলিকে আর খননকার্য চালাতে পারলেন না। তখন তিনি মূল গ্রীক ভূখণ্ডে মাইসেনি ও ট্রাইনিস নামক দুইটি স্থানে খননকার্য চালালেন। এই দুটি স্থান থেকে হিসারলিকের নগরীর অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গেল। জনশ্রুতি অনুযায়ী মাইসেনি নগরীটি তৈরি করেছিল সাতজন দৈত্য বাবা এসেছিল লিসিয়া থেকে। প্রচলিত গ্রীক কথাকাহিনীর ভিত্তিতে এবং তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে সেলিম্যান এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গ্রীক সভ্যতার মূল উৎস হরত বৃজে পাওয়া বাবে ক্রীটে। তিনি নোসে পাহাড়ে খনন-কার্য চালাবেন বলে স্থির করলেন, কিন্তু ১৮৯০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি চঠাৎ প্রাণত্যাগ করলেন।

ক্রীট ও তথাকথিত লন্ট এটলান্টিস

গ্রীকসংস্কৃতির মূল উৎস যে ক্রীট, এটা প্রমাণ করার জন্য সেলিম্যান ক্রীটের পৌরাণিক রাজা মিনোসের কাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেন না পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী মিনস জিউসের পুত্র যিনি ক্রীটের একটি পুত্রায় জন্মগ্রহণ করেন। হোমার, হেসিওড, স্ট্রাবো, থুকিডাইডিস এবং হেরোডটাস এই পৌরাণিক রাজার উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যুর পূর্বে সেলিম্যান স্লেটো বর্ণিত লন্ট এটলান্টিসের কাহিনীর ভিত্তিতে ক্রীট-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। তিনি একটি উইল করে তাঁর একজন বংশধরকে উত্তরাধিকারী করে যান যিনি তাঁর লাইনে গবেষণা করে যাবেন। সেলিম্যানের পৌত্র ডঃ পল সেলিম্যান এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্লেটোবর্ণিত লন্ট এটলান্টিসের কাহিনীর উৎস মিশরীয়। সোলোন নামক জনৈক এথেনীয় রাজপুত্র মিশরে বেড়িয়ে গেলে সেবী নীটের পুরোহিতেরা তাঁকে জানান যে, আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে একটি বিরাট দেশ ছিল যার পূর্ববিককর সীমানা ছিল তথাকথিত হারিকউলিসের স্তম্ভ এবং যে দেশের রাজারা সমগ্র গ্রীক ভূখণ্ড এমন কি মিশর পর্যন্ত জয় করেছিলেন, সেই সব দেশ-বাসীকে উন্নত ও সুসজ্জ করেছিলেন, কিন্তু যে দেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বন্যায় এবং ভূমিকম্পে রাতারাতি এটলান্টিকের জলের তলায় নিখিল হয়ে যায়।

এখন এই লন্ট এটলান্টিস প্রকৃতই কোন দিন বর্তমান ছিল কিনা তা নিয়ে তথাকথিত গণের মধ্যে মতভেদ আছে। জেমস গেইক বলেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরে একদা যে এক বিশাল ভূখণ্ড ছিল, এটা নিতান্তই অজগৃহীত ধারণা। কিন্তু এডোয়ার্ড হালের মতে লন্ট এটলান্টিসের কল্পনার মূলে কোন সত্য থাকতে পারে।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে টাইমস পত্রে কোন এক অজ্ঞাত লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাতে ক্রীট স্বীপের সঙ্গে স্লেটোবর্ণিত লন্ট এটলান্টিসের সাম্য দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, মিশরীয় পুরোহিতের কাহিনী ক্রীটের নৌগতি ও বাণিজ্যাত্মক কেন্দ্র হবেই গড়ে উঠেছিল। তথাকথিত এটলান্টিসের অধিবাসীরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নত ছিল এ কথা স্লেটো বলেছেন। ক্রীটও ছিল তাই। তা ছাড়া এটলান্টিসের প্রাকৃতিক বিবরণ সম্বন্ধে স্লেটো বা লিখেছেন তাঁর সঙ্গে ক্রীটের প্রাকৃতিক অবস্থানের কিছু মিলও আছে। এটলান্টিসের কাহিনীতে পাথরের তৈরি বাজপ্রাসাদ, জনগণের জন্য স্নানাগার এবং বাড়ির লড়াই-এর উল্লেখ আছে। এই তিনি বিবয়ই ক্রীটে বর্তমান ছিল।

তা ছাড়া এটলান্টিস ধ্বংসের সঙ্গে ক্রীট সভ্যতার ধ্বংসেরও সাম্য আছে। মিশরে যখন অষ্টাদশ রাজবংশ রাজত্ব করছে তখন ক্রীট আকস্মিকভাবে বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়—যার ফলে মিশরের সঙ্গে ক্রীটের সামুদ্রিক বাণিজ্যের আকস্মিক ক্ষেদ পড়ে যায়? এই আকস্মিক বিরতির জন্যই কি মিশরীয় পুরোহিত এটলান্টিসের আকস্মিক বিলুপ্তি কথার ঘোষণা করেছিল? তা ছাড়া স্লেটোর মতে এটলান্টিসের শাসকরা মিশর গ্রীস ও লিবিয়া জয় করেছিলেন, এবং

ক্রীটের সূভ্য করেছিলেন। ক্রীটের সংস্কৃতি যে ক্রীটের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, এবং গ্রীক সভ্যতার ভিত্তি যে ক্রীটের এ কথা আগেই বলেছি। এও সম্ভব যে, ক্রীটসভ্যতা ক্রীট পুরাতন সে বিষয়ে স্লেটোর কোন ধারণা ছিল না এবং তাঁর ভুলগোলের জ্ঞানও সামান্য ছিল। লন্ট এটলান্টিসের সম্ভাবনার এই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাজা মিনোস

গ্রীসের কবি ও ঐতিহাসিকেরা ক্রীটের পৌরাণিক রাজা মিনোসের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। মিনোস আবির্ভূত হয়েছিলেন ট্রয়বৃক্ষেরও অনেক আগে। স্ট্রাবোর মতে তিনি নোসে বাস করতেন, এবং তিনি যে আইন তৈরি করেছিলেন তা পবিত্রীকালে গ্রীকরা মেনে চলত। ঐতিহাসিক থুকিডাইডিসের মতে মিনোসই প্রথম দৌবহর তৈরি করেন এবং ইজিয়ান অঞ্চলকে জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

মিনোস জিউসের পুত্ররূপে কল্পিত হয়েছেন, তাঁর মা ছিলেন ফিনিসিয়ার রাজা এথেনের কন্যা ইউরোপা। কথিত আছে স্নানবতা ইউরোপাকে দেখে জিউস মগ্ন হন এবং একটি সুন্দর বাড়ির রূপ ধরে সেখানে আসেন। বাড়িটির চেহারা দেখে কৌতুকের বশবর্তী হয়ে ইউরোপা তার পিঠে আবেশ করেন আর তখনই বাড়িরূপী জিউস তাঁকে নিয়ে সোজা ক্রীটে হাজির হন। সেখানে ইউরোপার তিনটি পুত্র হয়—মিনোস, রাজালাখল এবং সারপেডন। এই ইউরোপা থেকেই কি ইউরোপের নামকরণ হয়েছে? হেরোডটাস কিন্তু এই কথাই বলেন। তিনি লিখেছেন যে ক্রীটেরগণ ফিনিসীয় উপকূলে টাথার বন্দবে অবতরণ করে সেখানকার রাজকুমারী ইউরোপাকে অপহরণ করেছিলেন।

হেসিওড, হোমার, থুকিডাইডিস এবং হেরোডটাস মাত্র একজন মিনোসের কথা বলেছেন, যিনি ছিলেন জিউসের পুত্র। কিন্তু ডায়োডোরস ও প্লুটর্ক স্বীকৃত একজন অত্যাচারী মিনোসের কথা বলেছেন। এই মিনোসের একটি পুত্র ছিল যার দেহ মানুষ ও বাড়ির সমবায়ে নির্মিত হয়েছিল। তার নাম ছিল মিনোটর।

এই মিনোটরের বসবাসের জন্য মিনোস একটি গোলকধাড়া নির্মাণ করান একজন এথেনীয় মিস্ট্রীকে দিয়ে যার নাম ডিডেলাস। কিন্তু কাব্যসিদ্ধি হবে গেলে মিনোস ডিডেলাসকে সেই গোলকধাড়াতেই বন্দী করে রাখেন। কবী অবস্থায় ডিডেলাস দু'জোড়া মোমের পাখা তৈরি করে। একজোড়া তার নিজের দেহে লাগায়, অপর জোড়াটি দেয় তার পুত্রকে। তাব পব দুজনে সেই পাখার সাহায্যে উড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু পুত্র ইকারাস সুবের নিকট দিয়ে যাওয়ার জন্য

তার মোমের পাখা গলে যায়। ফিলে-সে লুনা থেকে সমুদ্রে পতিত হয়ে মারা যায়। কিন্তু জিডেলস পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই কাহিনীর সঙ্গে ব্যাবিলনীয় এটানার কাহিনী এবং কোরানবার্গিত নিমরডের কাহিনীর মিল আছে।

মিনোস আদেশ দিবেছিলেন যে, মিনোটুরের খাদ্যের জন্য প্রতি বছর যেন এথেন্স থেকে সাতজন যুবক ও সাতজন যুবতীকে পাঠান হয়, কারণ মিনোসের এক পুত্র এস্ত্রাক্কিয়স এথেন্সে প্যানথেনিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় নিহত হয়েছিল। প্রতি বছরই এইভাবে চোমক্সন করে এথেনীয় মিনোটুরের খাদ্য হত। তৃতীয় বছরে এথেনীয় যুবক থিসিউস আরও তেরজন সঙ্গী ও সঙ্গিনীসহ ক্রীটে প্রেরিত হয়। সেখানে সে মিনোসের কন্যা এরিষাডেনের সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং এরিষাডেন তাকে একটি যাদু-তরবার ও মৃত্যুর বাঁশল দেখা। প্রথমটির স্বারা থিসিউস মিনোটুরকে বধ করে এবং দ্বিতীয়টির স্বারা সে নিরাপদে গেলকথাধা থেকে বেরিয়ে আসে। ফেবাব সময় থিসিউস এরিষাডেনকে সঙ্গে নেয়, কিন্তু পরে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ন্যাক্সোস দ্বীপে পবিত্যাগ করে।

এই গল্পটি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, একদা এথেন্স ক্রীটের অধীনে ছিল।

নোসের রাজপ্রাসাদ

মাইসেন ও টিবাইনে সেলিম্যান যে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে আবার চাঞ্চল্য শুরু হল যখন একজন স্থানীয় ক্রীটবাসী নোস থেকে মাইসেনীয় ধরণের কয়েকটি পাত্রের টুকরা আবিষ্কার করলেন। অতঃপর ঘাপকভাবে ক্রীটে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হল। ১৯০০ সালে সাব আর্থার ইডলস নোসে ও মিস হোগার্থ ডিকটর্যান গৃহার কাজ আরম্ভ করলেন। নোসের তথাকথিত রাজপ্রাসাদ থেকে পাওয়া গেল অনেক দেওয়ালচিত্র, যোগ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাত্রবাহকের ছবিটি, যেখানে বর্ণলিপনের কৌশল দেখবার মত। তা ছাড়া ইডলস আবিষ্কার করলেন 'অজ্ঞান' টালি-লিপি। আবিষ্কৃত হল রাজা মিনোসের সিংহাসন, তাঁর রাজসভা এবং অজ্ঞান সম্পদ। প্রমাণিত হল হেলেনীয় জাতি গ্রীসে আসার পূর্বে ক্রীটে একটি প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল—যেখান থেকে হেলেনীয় গ্রীকরা অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল। এ আবিষ্কারের সঙ্গে একমাত্র প্রাক-বৈদিক হরপ্পা ও মহাজনপদবো আবিষ্কারের তুলনা করা চলতে পারে। হইনবিধ সেলিম্যান যে কল্পনা করেছিলেন, ইডলসের স্বাভাবিকতা সত্য প্রমাণিত হল।

ক্রীটের জিউস ও ডাওনিসস

ক্রীটের জিউসের পূজা প্রাক-গ্রীক

ক্রীটেও প্রচলিত ছিল। জিউস শব্দটি এসেছে যিব শব্দ থেকে যার অর্থ 'উচ্ছ্বল-বা আলোকিত'। সংস্কৃতে ইনি দ্যোঃ; ল্যাটিনে ডায়োসপিতের, ডিবল, ডিয়োবিল এবং জোড; অ্যালো-সাকসন টিউ এবং নর্স টির বা টাইর; ওডিনের প্রাচীন জার্মান নাম দিবল বা টিউ এবং তাঁর রংশধররা টিউব নামে পরিচিত। প্রাচীন গ্রীসে বহু ধরনের জিউস পূজা বর্তমান ছিল।

ক্রীটের জিউসের কাহিনী মোটামুটি এইরূপঃ ইউরানাস এবং গাইয়া ক্রোনল নামক এক দেবতাকে অভিশাপ দিবেছিলেন যে, তাঁর একজন পুত্র তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। ক্রেনস অতঃপর তাব স্ত্রী রাইর গর্ভে যত-গুলি সন্তান জন্মাত সবগুলিকেই গিলে ফেলত। পর পর পাঁচটি সন্তান গ্রাসিত হবার পর রাইরা ক্রীট দ্বীপে চলে যান এবং সেখানে জিউসকে প্রসব করেন। তারপর একটি প্রস্তর-খত দিবে মুড়ে নিয়ে সেইটাকে নবজাত শিশু বলে রাইরা ক্রোনসের হাতে তুলে দেন এবং ক্রোনাস বিনা শ্বিধায় তা পলায়ন করবে।

বড় হয়ে জিউস পিতার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ক্রোনাসের পেট চিরে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পাঁচ ভ্রাতাকে মুক্ত করেন। এই ক্রীটের জিউস প্রতি বছরই মাঝে যতেন এবং প্রতি বছরই জন্মাতেন। এদিক থেকে তিনি গ্রীষ্ম প্রাচ্যদেবতা এডোনিস, এটিস ও অর্সিবিলের সঙ্গে অভিন্ন। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জিউস আসলে শস্যদেবতা, ফসলের বাৎসরিক জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় তাঁরও জন্ম-মৃত্যু ঘটে।

জিউস ছাড়া প্রাচীন ক্রীটের ধর্মে ডাওনিসস একজন দেবতা ছিলেন। ইনিও ফসলের দেবতা। পরবর্তী গ্রীক পুর্বরূপ এ'কে ওলিম্পিয় দেবগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নি। তা হলেই বুঝতে হবে এই দেবতার উৎস অন্যত্র। জিউস ও ডাওনিসস, এই দুই শস্যের দেবতার অস্তিত্ব থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ক্রীটের সভ্যতা ছিল কৃষিকেন্দ্রিক। আর তা ছাড়া এও ঠিক যে, কৃষিকার্যগত পটভূমিকা না থাকলে প্রাচীনকালে কোন নাগরিক-সভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। পশুপালক-সমাজ থেকে কখনো নাগরিক-সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না।

ঠিক কোন যুগে জিউস ও ডাওনিসসের পূজা ক্রীটে প্রচলিত হয়েছিল, তা বলা খুবই কঠিন। কেউ কেউ বলেন যে, কৃষিকেন্দ্রিক এই দেবতা দুটির আমদানী হয়েছিল মিশর থেকে। ডাওডোবাস সিকুলাস বলেন যে, "ডাওনিসসের রহস্য মিশবে ওর্সিবিলের রহস্যের সঙ্গে অভিন্ন, এবং একথা আইসিস ও ডিমিটারের ক্ষেত্রেও খাটে। পার্থক্য যা কিছু, তা 'শুধু নামের'। হেরোডটাস লিখেছেন, "গ্রীকগণ ওর্সিবিলকে ডাওনিসস (বাকুাস) আখ্যা দিয়েছিল।"

ক্রীটের জিউস মাতৃদেবী রাইরা পূজা, কিন্তু সেই সঙ্গে তার স্বামীও বাটে, আব্রাহাম একই সঙ্গে ক্রোনাসকে রাইরার স্বামী বলা হয়েছে। অনুবাদে মিশরীয় ওর্সিবিল আইসিসের পুত্র, তথা ভ্রাতা, তথা স্বামী। ব্যাবিলনীয় তমুজ দেবী ইস্তারের পুত্র এবং স্বামী এবং পরবর্তীকালে আডোনিস, দেবী অলেক্সান্দ্রির পুত্র এবং স্বামী। আসলে গোষ্ঠীগত দেবদেবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় একটি রীতিমত সমস্যা। লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্গা শিবের স্ত্রী। কিন্তু কলতে পারেন, দেবীপূজার বাইবেলস্বরূপ যে খ্রীষ্টীয় চণ্ডী গ্রন্থ সেখানে কোথায় একথা বলা হয়েছে? সবটাই তো দেখি—নাবায়ণী নমোহস্তুতে। এখানে দেবী নাবায়ণের পত্নী মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রের দেবীকে নাবায়ণ-প্রদর্শনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সেই একই স্থানে তাঁকে কৃষ্ণ-ভগিনী বলা হয়েছে। তা হলে নাবায়ণের সঙ্গে কৃষ্ণের অথবা শিবের সম্পর্কটা কি? সেটা কি জিউসের সঙ্গে ডাওনিসসের মত? চণ্ডী-বর্ণিত দুর্গা ও চণ্ডিকার সম্পর্ক কি আইসিস ও নেপথ্যাইসের মত? গ্রীক বা মিশরীয় পুরাণের এই জাতীয় রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত পুর্বানুষ্ঠান ভারতে কখনো হব নি, কেন না সার মেন্সের মত পণ্ডিত ভারতবর্ষে জন্মায় নি, কোনোদিন জন্মাবে কিনা সন্দেহ।

আবার ডাওনিসসের কথায় ফিরে আসা যাক। ডাওনিসস ছিলেন ডিমিটারের পুত্র, এবং উভয়েরই উদ্ভব ক্রীটের বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ফরমিকাস মেটরনাসের মতে ক্রীটের জুপিটারের (জিউস) অবৈধ পুত্র, যাকে জুপিটারের পত্নী জুনো (গ্রীক হেবা, এখানে সম্ভবতই বোমক নাম ব্যবহার করা হয়েছে) অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কোন এক কার্ণোপলকে জুপিটার ক্রীট দ্বীপ থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। যাবার আগে ডাওনিসসকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। কিন্তু ক্রীট জুনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে টাইটান-দেব (গ্রীক পুরাণের অসুর) সঙ্গে চক্রান্ত করেন যারা ডাওনিসসকে গ্রাস করে ফেলে। তার ভ্রাতা মিনার্ভা (গ্রীক এথেনা) ডাওনিসসের হৃদপিণ্ডটি উদ্ধার করেন। অন্য কাহিনী অনুযায়ী সেই হৃদপিণ্ডটি জুপিটারের কাছে গেলে তিনি তা সেমিগিলকে ভক্ষণ করতে দেন, এবং তা ভক্ষণ করার পর সেমিলিগ গর্ভে পুনরায় ডাওনিসসের জন্ম হয়। ডাওনিসসের জন্মাতরের কাহিনী থেকে তাঁর দুটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়—একটি ক্রীটিয়, অপরটি গ্রীক।

ক্রীটিয় মাতৃদেবী

ক্রীটিয় মাতৃদেবীর নাম অজ্ঞাত, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই পরবর্তীকালে রাইরা বলে আখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তী-

দুখ জাগানিয়া

পিনাকরজন সাহা

ওগো দুখ জাগানিয়া এখন গানের জাহ্নবীতে
ও কার মঙ্গলঘণ্টে দিনাবসানের ছায়া পড়ে;
বিদায়বেলায় তবে স্মরণের স্বর্গদেহলীতে
কেন গান শোনাবার কলকণ্ঠ সাগরে নিকরে
রেখে, মৌন চলে গেলে; যখন বেদনা ঝরাফুলে
ভেসেছে দক্ষিণে বামে ছলোচ্ছল সাগর সঙ্গমে;
হে দুখপ্রতিম কেন কুয়াশায় প্রাচীন নিখিলে
নির্জন ঘণ্টার মতো কেনে উঠলে অন্ধকার ঘূমে।

ওগো দুখ জাগানিয়া এখনো তোমায় কিছু গান
শোনাবার অবকাশ ছিল, যখন সকল নদী
চুমণ পভীর হয়, যখন মেঘের অবসান
মন্দিরফলকে শ্রান ছায়া ফেলে; কেন নিরবধি
তখন বকুল ঝরে যায়, কেন তখন তোমায়
দুখ জাগানিয়া, গান শোনাবার বেলা বয়ে যায়।

কালে এই দেবীকে গ্রীকরা গ্রহণ করেছিল এবং
ওলিম্পিয় দেবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি স্থান
দিয়েছিল। এই দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা,
এবং তার সঙ্গী হচ্ছে একটি সিংহ। এ দিক
থেকে দুর্গার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।
তিনি ছিলেন যম্ভীর মত শিশুপ্রতিপালিনী
দেবী, পরবর্তীকালে যে কাজটি গ্রীক
হেস্টিয়া অথবা রোমক ভেস্টারের অধিকারে
ছিল। রীহার মিতীর কাজ হচ্ছে এই যে,
তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গ্রীক ডিমিটার
বা রোমক সেরেসেব মত। তার সন্তান
জিউস এবং পসেইডন, রোমক পুরাণে বার
জুপিটার এবং নেপচুন। তার স্বামী হচ্ছে
বন্য ক্রোনাস।

গ্রীক বীহা স্বয়ম্ভূ ছিলেন না। তার
মা ছিলেন পৃথিবীদেবী গাইয়া, এবং পিতা
ছিলেন ইউরেনাস আকাশপতি। ইউরেনাস-
গাইয়া বৈদিক আৰ্যদের দ্যাবাপৃথিবীর
অনুরূপ, যদিও ইউরেনাসের সঙ্গে ধানিগত
দিক থেকে বরুণেরই নাম মেল বেশি।
পশ্চিমতবা অনুমান করেন যে, রীহার সঙ্গে
গাইয়া, ডিমিটার, আটোমিস (রোমক গরনা),
আফ্রোদিতি (রোমক ভেনাস), আথেনা ও
ত্রিভূবী সিবিলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে,
কেন না এই সমস্ত দেবদেবী প্রকৃতির বিভিন্ন
শক্তির প্রতীক এবং এদের প্রত্যেকেরই গুণের
কিছু কিছু অংশ প্রাক-হেলেনীয় ক্রীটির
মাতৃদেবীর চারিত্রিক মিল ছিল।

দেবী গাইয়ার প্রকৃত চরিত্র বড় অস্পষ্ট।
পৃথিবীদেবী হলেও তিনি কিছুটা ভাগ্য-
দেবীও বটে—বৈদিক থেকে তাঁর সঙ্গে সূর্যের
চিহ্নভেদের তুলনা চলতে পারে। ডেলফীয়
সর্প তার অন্যতম প্রতীক, এদিক থেকে
মিশরীয় আইসিস এবং লেকথাইসের সঙ্গে
তার সাদৃশ্য আছে, কেন না উভয়েরই প্রতীক
সর্প। ডিমিটার হচ্ছেন শস্যমাতা। গ্রান-
হাউট বলেন ক্রীটির ভাষায় ডিমাই মানে হবে,
মাতের অর্থ মাতা। মেলানিপিডিস এবং
ইউরিপিডিস তাঁকে অবশ্য রীহার সঙ্গে
অভিন্ন ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীকালে
গ্রীসে এই ডিমিটারের উৎস হত যার নাম
এলিউসিয়ানা। ডিমিটারের কন্যা ছিলেন
কোর-পার্সিফোন। তার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত
কাহিনীটি বর্তমানঃ

একদা যখন পার্সিফোন পুষ্পোদ্যানে
চুমণ করছিলেন তখন পাতালের অধিপতি
প্লুটো তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান।
পার্সিফোনের মা ডিমিটার কন্যার খোঁজে
সারা জগৎ পরিভ্রমণ করেন। তারপর যখন
তিনি জানতে পারলেন যে, পার্সিফোন প্লুটো
কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন তখন তিনি ক্রোধে
দেবতাদের আবাস ওলিম্পিয়া পরিত্যাগ
করেন এবং বসুন্ধরাকে অভিশাপ দিয়ে যান
যে, সে বন্ধ্যা হবে। তারপর কন্যার সন্ধান
তিনি এলুসিয়ার হাঙ্কর হন। সেখানকার
রাজা সেলেনাস তাঁকে আশ্রয় দেন এবং তিনি
তার পুত্র ডেমোফোনের রক্ষণরূপে নিযুক্ত
হন। এই বালকটির প্রতি তার মমতা জন্মে
এবং তাকে অমর করার জন্য তিনি সচেষ্ট
হন। একদিন রাতে এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন
ডেমোফোনকে জ্বলন্ত অগ্নির উপর শায়িত
রেখেছিলেন, তখন বালকটির আসল মা সহসা
সেই ঘরে প্রবেশ করে এবং পুত্রকে ওই
অবস্থার দেখে তাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে তুলে
নিয়ে চলে যান। ফলে ডেমোফোন না হল
মানুষ, না হল দেবতা। হুবহু একই কাহিনী
মিশরের আইসিস সম্বন্ধে বর্তমান। তার
উল্লেখ পরে করব।

এদিকে ডিমিটারের অনুপস্থিতিতে
পৃথিবী কথ্যা হয়ে গেল। কোথাও এককদা
শস্য ফলল না। তখন দেবগণ পূজা থেকে
বঞ্চিত হলেন। তাঁদের টনক নড়ল। শেষ
পর্যন্ত জিউসের মধ্যস্থতার স্থির হল যে,
অন্তঃপর পার্সিফোন তার মারের কাছে বন্ধুরে
চার মাস থাকবে, আর আট মাস থাকবে
পাতালে প্লুটোর কাছে।

এই ডিমিটার-পার্সিফোনের কাহিনীর
তরুণ দেবী ঠিক সেই ভূমিকায় অভিনয়
করেছেন, যে ভূমিকায় ছিলেন ব্যাবিলনীয়
তম্মুজ বা আডোনি। তাঁরও ছ'মাস করে
পাতালে থাকতেই বাকি ছ'মাস পৃথিবীর
উপরে। তাঁরও ছিলেন ফসলের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট, তবে তাঁর পুত্র, নরী নন।
পর্জেনিয়াস একজন কৃক-ডিমিটারের কথা
লিখেছেন, যার মূর্তি রক্ষিত ছিল ফিগালিয়ার
একটি গুহায়। মূর্তিটি কাঠের, একটি
পাথরের উপর উপবিষ্টা, নিকটে একটি
ঘোটকীর মূর্তি, উপরে সর্প ও দানবদের

চিত্র, এক হাতে একটি দানবের মূর্তি, অপর
হাতে একটি মৃদু। আমাদের কালী-কল্পনার
সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, স্বীকার করতেই
হবে।

এটা খুবই সম্ভব যে আদিম ক্রীটির
ধরিত্রীদেবীর পৃথক পৃথক গুণকে কেন্দ্র
করে পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন দেবী গড়ে
ওঠে। এ বিষয়ে ডঃ ফার্নেল বলেছেনঃ
“আদিতে সম্ভবত ডিমিটার এবং কোর-পার্সি-
ফোন একই দেবী ছিলেন, পরবর্তীকালে
নামভেদে তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তির হয়ে ওঠেন।
দুর্গা সম্বন্ধে দেবীভাগবতের টীকাকার
নীলকণ্ঠ যেমন বলেছেন, “শতাক্ষী, শকুন্তলী
এবং দুর্গা—এই তিন দেবী আসলে একই,
কিন্তু নামভেদে ও কর্মভেদে তাঁরা পৃথক হয়ে
গেছেন।”

উপসংহার

ক্রীট থেকে প্রাপ্ত লিপিমালার পাঠোন্মার
এখনো হয় নি, কাজেই আমাদের পক্ষে কোন
নিখুঁত তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। তবে
আমরা মিনোসের রাজপ্রাসাদ দেখতে পারি,
প্রাচীন নগরীর রাস্তার পাথরগুলির উপর
দিয়ে হাটতে পারি, ক্রীটির মূলাপগুলির
পরিবেক্ষণ করতে পারি, প্রাচীন ক্রীটের
দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যাবলীর ফ্রেসকো দেখতে
পারি, প্রাপ্ত শীলগুলি পরীক্ষা করে বুঝতে
পারি ভূমধ্যসাগরে ফিনিসীয়দের আসার
পূর্বেও কিরকম জাহাজ চলত বা তারই একটি
স্বীপের দেবদেবী কিবুপ ছিল আর কিভাবেই
বা তাদের পূজা হত, সমাধিগুলির ধরণ
দেখে বুঝতে পারি মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে
তাদের কি ধারণা ছিল, প্রস্তর নির্মিত ফুল-
দানীগুলির বাইরের চিত্র দেখে আমরা সেকালের
মূর্তিযোশা, সৈন্য ও শোভাযাত্রীদের চিনতে
পারি, তাদের অলঙ্কার আসবাব এবং অস্ত্র-
শস্ত্র দেখে তাদের সভ্যতার মূল চরিত্রটি
অনুধাবন করতে পারি। এইভাবেই পশ্চিম
ও গবেষকেরা যা সিদ্ধান্ত করেছেন তাতে
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তথাকথিত হেলেনীয়
গ্রীকসভ্যতার “ষাদুর জেরা” অনেকেই
কিছু, তার যা কিছু মূল প্রেরণা সমস্তই
ক্রীট থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

কেন যামিনী না যেতে না আপালে না
বেলা হল মরি লাজে।

শিথিল কবরী। অবিন্যস্ত কেশ।

দিল্ চোখ মেলে দেখলো ঘরমর শূন্য
আলো। করোখার ফাঁক দিয়ে মধ্যাহ্নের
জ্বলন্ত এসে ঘরখানা ভরে দিয়েছে। রাতের
ঝাড়লগ্ননগুলো কেউ নিভিয়ে যায় নি। কার
এত সাহস? যুবরাজের বাত আঁজকাল রাণা
দিলের ঘরেই কাটছে। রাজপ্রাসাদে এ খবরটুকু
কার না কানে গেছে? সে ঘরে প্রবেশ করবে
কে? কার এত সাহস?

জীবনে রাণা দিল্ কখনও এত
আলো দেখে নি। কোন্‌রকম আসছে এত
আলো? চোখ বুজলেও সে যেন দেখতে
পাচ্ছে তার সামনে আলোর মহান্ দ্যুতি।
চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ঘরে যুবরাজ
নেই। না থাকারই কথা। এত বেলা হয়ে
গেছে। তাই তো। সে টেরও পেল না কখন
তার অলক্ষ্যে যুবরাজ নৃত্যগৃহ ছেড়ে চলে
গেছেন। যুবরাজ নারাজ হন নি তো?

রাণা দিল্-এব মনে দৃষ্টিস্তর তুফান
করে ঝেঁটে লাগলো। দিল্ নিয়ে খেলা করে
একটা অগব্দপ আনন্দই সে এতদিন অনুভব
করে এসেছে। দিল্-এব খেলার এত তীব্র
দহন জ্বালা রাণা দিল আঁজ কর্দিদন থেকেই
সেটা ভিলে ভিলে, পলে পলে অনুভব
করেছে।

দাসীটাকে ডাকলো। ঠিক দাসী নয়।

হাবেমের প্রহরীগণলো পূর্বদৃশ্যও নয়। নাবীও
নয়। তাদের একটা বাইরে বোধ হয় এতক্ষণ
রাণা দিল্-এর নির্দেশেরই অপেক্ষা করছিল।
ঠাকা মাথ ঘরে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

তজ্জনীটায় ইংগিতমাত্র দিয়ে রাণা দিল্
তাকে ঝাড়লগ্নন নির্ভয়ে নাচঘর সাজাবাব
নির্দেশ দিল। নিজে সুকোমল তাকিয়ায়
হেলান দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বসেই রইলো।
আঁজকাল নর্তকীরও মাঝে মাঝে মনটা
ঝরোখাব বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মারে। এসব
কথা জীবনে সে পূর্বে কখনও শোনেও নি।
জানতোও না। দার্শনিক যুবরাজই সেদিন
তাকে বলছিলেন, মনটা যখন চঞ্চল হয়ে
উঠবে, দুর্নিয়ব কোনো জিনিসই যখন আর
ভালো লাগবে না, রাণা দিল্, তখন তুমি
ঐ ঝরোখাব ফাঁক দিয়ে আশমানের দিকে
তাকিয়ে দেখো। আশমানে তোমাব মন তখন
ছুটে যাবে দূর-দূরান্তে। দুর্নিয়ব সব
কণ্টের যিনি প্রম্টা, সব জ্বালা-বল্লগার গ্রামকর্তা
ভার দুয়ারে পেঁছে যাবে তোমার মন। তখন
মনে শান্তি পাবে। মাঝে মাঝে আশমানের
দিকে তাকালে আঁজকাল রাণা দিলের চঞ্চল
মনটা সত্যিই যেন খানিকটা শান্ত হয়।

সত্যিই যুবরাজ কত মহান্। কত বড়
দার্শনিক। তার তুলনায় রাণা দিল্? একটা
নর্তকীমাত্র। যুবরাজ নিচয়ই মদিয়ার
ঝোঁকেই তখন তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে
জীবনের প্রথম প্রেম নিবেদন করছিলেন।

যুবরাজ বলছিলেন, রাণা, ইতিফাক
বিশ্বাস করো? ইতিফাক সাক্ষী করে তোমার



বলছি জীবনে কখনও কাউকে প্রাণ দিবে এত
ভালবাসি নি। আঁজ তোমার অলিঙ্গনে আমি
যেন জীবনে সর্বপ্রথম প্রিয়া সামিধ্য অনুভব
করিছি। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গই এ পৃথিবীতে
নেমে এসেছে।

নর্তকীর জীবনে এ প্রেম নিবেদনের
প্রহসন এই প্রথম নয়। তবুও কেন যেন
রাণা দিলের বুকের ভিতর তখন কে যেন তুফান
বইরে দিচ্ছিল।

যুবরাজ বলছিলেন, ধর্ম সবই
এক। সব ধর্মই আমি মানি। তুমি

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

যদি প্রাণ দিবে একবার বলো, আমার জীবন-
সামিগনী হবে তাহলে দিল্লীভিত্তি উত্তরাউস ছেড়ে
দিতে হলেও জানবে রাণা, আমি তোমাকে
জীবনসামিগনী কবে ধন্য হব।

রাণা দিল্ মদিয়ার পাঠ নতুন কবে ভবে
দিল। যুবরাজ বললেন, মনে করো না
নেশার বোকে তোমাকে এ সব কথা বলছি।
আমাব পূর্বে জানেই তোমাকে কথা দিচ্ছি
এ রাজপ্রাসাদের কোনো বসনীকে যদি হৃদয়
দিয়ে যুবরাজ কখনও মহম্বত পেশ কবে
থাকেন সে ভাগ্যবতীর নাম রাণা দিল্।

বাণা দিলেব হাত থেকে সুবাপাঠ পড়ে
গিয়েছিল। সে প্রথমতন কুর্নিশ কবে এ
প্রেমবাণী গ্রহণ করতে ভুলে গিয়েছিল।
নৃত্যজন্দের তালে তালে যুবরাজের সামনে
গিয়ে সে শূন্য শব্দ অলিঙ্গনে যুবরাজকে
জড়িয়ে ধরেছিল। তাব এ দীর্ঘ নর্তকীর
জীবনে সে সর্বপ্রথম বুকের স্পন্দনে অনুভব
কবলো এ অলিঙ্গন প্রহসন নয়। এ নয়
রূপোগজীবনীর প্রেমাত্মনয়।

যুবরাজ বললেন, ঐ দেখো অদূরে যমুনা
প্রবাহিত। জ্যোৎস্না পূর্নকিত রঞ্জনীতে
যমুনায়ও যেন আঁজ নবরূপ। যমুনাব কলতান
রাজপ্রাসাদের নৃত্যগৃহেও প্রতিধ্বনিত। নদীর
প্রবাহের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের
জীবনদর্শন। এ বিরাট বিশ্বে মানুষ শূন্য
জীবনের দুটি দিক আগলাতে গিয়ে হিমশিম

খেয়ে যাচ্ছে। সূর্য আর চন্দ্র। যেন নদীর
জোয়ার আব ভাটা। ওপরে আশমান, নিচে
নদী। দূরান্তে দিকচক্রবালে যেন একজন অপব-
জনকে ছুটে গিয়ে চুম্বন দিচ্ছে। আকাশ
আর নদী। দুজনেই যেন ছুটোছুটি করে
লুকোচুরি খেলছে। আকাশ চাইছে নদীকে
স্পর্শ কবতে। নদী ছুটে চলেছে আবও দূরে।
কেউই কাউকে ধকতে পাচ্ছে না। ঠিক যেন
নর আব নাবী। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম দিন থেকে
নর ছুটে চলেছে নারীর পিছনে। ধবি ধরি
করেও ধকতে পাচ্ছে না নাবীর মন।
এ যেন ধবা-ছোঁয়াব বাইবে। নব-নাবীর এ
লুকোচুরি খেলায় বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতে
যে মহান্ শিল্পী অলক্ষ্যে আপন খেলায়
মেতে আরছেন জানো বাণা তাঁব নাম?

রাণা দিল্ কম্পিত কণ্ঠে মাটিব সাথে
মিলে গিয়ে বলেছিল, না। যুবরাজ আমি
অশিক্ষিতা। তুমি দুর্নিয়ব একজন কত বড়
দার্শনিক। তোমাব প্রশ্নেব জবাব কখনও রাণা
দিলেব মনন সামান্য নর্তকী দিতে পাবে?

যুবরাজ দারা বাণা দিলেব দিকে তাকিয়ে
শূন্য হেসেছিলেন। তাবপর বাণা দিল্কে
বুকের পাশে টেনে এনে বলেছিলেন, বিদ্যের
জাহাজ হলেই তাব মৃদু হয় না। হব না
জ্ঞান। আসলে যেটাব প্রয়োজন সেটা হলো
মন-দিল্। মনটা পবিত্রাব-ধাবলে দুর্নিয়ব
সব দর্শনের দূরার তাব কাছে আপনা থেকে
এসে থরা দেয়। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতে যে
মহান্ শিল্পী আপন সৃষ্টিতে আপনি পাগল,
তোমার আমাব লুকোচুরি খেলায় মজা
দেখছেন—বলতে পারলে না তাঁব নাম।

নর্তকী তবুও সেদিন নাবব ছিল।

হঠাৎ খপ কবে হাতখানা ধবে যুবরাজ
বাণা দিল্-এব অনামিকার দিকে দৃষ্টি
ফেললেন। কি লেখা রয়েছে? কে বলেছে
রাণা দিল্ তুমি অশিক্ষিতা? কে বলেছে বাণা
দিল্ দর্শন বোঝে না? দুর্নিয়ব সব দর্শনের
সাবমর্ম যে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আপন
অগুরুবীর দিকে তাকালেই দেখতে পায়
কে বলবে সে নাবী অশিক্ষিতা?

রাণা, তোমাব অগুরুবীরব একটি কথা
ভেতর আমি পাচ্ছি আমার সমস্ত জীবনের

সাংসাহিক বসুধাত

মতা-সম্মানের পথনির্দেশ। কি মধুময় শব্দ। সমস্ত পার্থিব ধর্মের সারমর্ম, মানবদর্শনের সব চেয়ে বড় সত্য, চঞ্চল সমুদ্রের পিয়াসী বধূতারা কে ভূমি বেঁধে রেখেছে আপন অঙ্গুবীতে। এ অঙ্গুরীর আজ থেকে আমাব। তল্ল পরিবর্তে এই নাও হীরক-খচিত শূন্য পবিত্র অঙ্গুরীর। তোমার মন

আজ থেকে দ্যায়, খোলাডালার মেহেবানীতে হোক স্ফটিক-স্বচ্ছ।

যেন একটা অভিনয়। একি স্বপ্ন? একি মারা? একি মতিভ্রম?

না বোধ হয়।

এই তো এখনও রাণা দিলেব অনামিকার লাগানো রয়েছে যুবরাজের দেওয়া আংটি।

আংটি বদল হয়ে গেল?

বাকী? বাকী শব্দ মালা বদল? হৃদয়ের বিনিময় কখন হবে গেছে সবলা সুন্দরী নর্তকী তা টেবু পেলে না। যমুনাতীরে নববসন্তে পল্লবিতা বৃক্ষশাখা কখন তার অজানাতেই পাঁপিয়া ডেকে চলে গেছে নর্তকী তার কোনো খবরই পায় নি।

তবে আংটিতে তার মনের কথাই লেখা ছিল। তার ছোট্ট মনের আশ্বিনায় একদিন সসাগরা হিন্দুস্থানের ভাবী একচ্ছত্র অধিপতি কোনোদিন উর্কি-ঝুঁকি মাঝে পড়বেন এ কল্পনাও তার শবীরে বোমাণ জাগাত। কিন্তু তার জীবনে এ স্বপ্নই পেয়েছে রূপ। যে আংটিতে একদিন শব্দ বেরাল বসে রাণা দিল্ লিখে বেরেছিল 'প্রভু'—স্বাক্ষরের রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে তিনি যেন জীবন্তভাবে তার সামনে দাঁড়ালেন এসে। দাবাশিকের সর্বধর্ম সম্বন্ধে মূলমন্ত্র যেন প্রতিধ্বনিত হলো রাণা দিলেব আংটির একটি শব্দ—'প্রভু'।

আজকাল চোখ বন্ধ করলেও সে যেন দেখতে পায উল্লেখ্য জ্যোতিষ্মান আলোক-ছটা। কোথেকে আসছে এতো আলো? যুবরাজের মুখমণ্ডলে সে জীবনে সর্বপ্রথম দেখেছে সরল সৌম্য কান্তি ব অনন্ত জ্যোতি। যুবরাজ দারাব কথোপকথনেও যেন একটা ঐশ্বর্যজালিক শক্তি বসেছে। যখন দিল্ সাবাটি দিন শব্দ যুবরাজের কথা ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে পড়েছিল তার নিজেরই খেয়াল হয় নি। গোখলি লেনে ঘবময় কাড-লণ্ঠন জ্বালিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদের কর্মচারী। গৃহকোণে নিদ্রিতা রাণা অবচেতন মনে তার উপস্থিতি বিলম্বিত টের পায় নি।

অদূরে কোন প্রাসাদ ঘর থেকে ভেসে আসছে সংগীত-লহরী। কোনো বাদ্যজীবী কণ্ঠধ্বনি। কাওয়ালীই বোঝে হব। কপালে কোমল স্পর্শে রাণা দিলেব তন্দ্রা ভেঙে গেল।

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বাণা দিল্ আলিঙ্গন-পাশে যকে আবদ্ধ করতে চলেছিল কিম্বদ্বিত চকিত চোখে দেখলো তিনি যুবরাজ দাবাশিকো নন দিল্লীর এই রাজপ্রাসাদে যকে সবাই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সশরীরে তিনি নৃত্যেরে বাণা দিলেব সামনে দাঁড়িয়ে। বাদ্শা বেগম জাহান-আবা কখনও বাণা দিলেব নৃত্য-ধবে ঢুকতে পারেন সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

বাণা দিলেব বৃদ্ধ হিমশীতল হয়ে গেল। তাহলে তার জীবনেও কি ঘটবে আনন্দকলিষ জীবনের পুনরাবৃত্তি? এই জীবন্ত রক্ত-মাংসের শবীরটা দেওয়ালেব গায়ে গেথে দেওয়া হবে? ভাবতেও সর্বশরীরে শিহরণ জাগে।

রাণা দিল্ জানে রাজপরিবারে তার সাথে যুবরাজের প্রণয়ে কেউই সন্তুষ্ট নব। স্বয়ং সন্ন্যাস নিজেব মূখে প্রকাশ্যভাবে যুবরাজকে এ নর্তকীকে পরিত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।



সাদনা দধান

সাদনা দধান নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দস্তুরোগের ভয় থাকে না। দস্তুরাজী সুষ্ম, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ওষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ওষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৬



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ.আর্যবৈদ্যাস্ত্রী, এফ.সি.এস(লণ্ডন), এম.সি.এস(আমেরিকা) ডাঃগলপুত্র কলেজের ব্রাহ্মণশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কনিকাজিকেন্দ্র-ডাঃনরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস(কলিঃ) প্রাক্তনবৈদ্য

ভেবেচিলাম তোমাকে

তপন স্মরণোপাখ্যান

অনেক-অনেক দিন পর
কনে-দেখা আলোয়
আবার তোমাকে একা পেলাম।
তুমি জানলে না
এই দিনগুলোতে
পৃথিবী কত অন্ধ স্মৃতিকে খুঁটে খুঁটে
তুলে নিয়ে গেছে।
আর
আমাকে বিশেষ দ্রষ্টব্য করে
বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজকাল আমাদের তোমাদের পৃথিবীর স্বাদ
বড় ভেতো মাগে,
তাই মরে মাঝে গান গাই
মাঝে মাঝে জল মেশানো কবিতাগুলো নির
দুঃখ করি
আমার চোখে তো এত জল কেনও দিন ছিল না।

পৃথিবীর এই সব ভাষা
পৃথিবীর এই সব গান
আমাকে বড়

করে তোলে।

আমি বাকে ভালবাসতাম বলে শুনছি
এমন কি সেও
যন্ত্রণায় সবুজ হয়ে যাওয়া
আমার বৃক্ষে উজ্জ্বল পা' চেয়ে
যেন বলতে চায় :
গত বসন্ত বসন্ত।
এই সব ফুলগুলো ফুটেও ফোটে নি।
হয়তো তা তাই
আগ্নায় আমি যে স্মৃতিটাকে দেখেছি
সেটা বড় কাঁপা কাঁপা
ভিক্টোরিয়ান যে আমাকে
ঘাস আর জীবনের এলোমেলো চুলে
আঙুল চালাতে দেখেছি
সে আমি অত্যন্ত বোকা।

একদিন
মদ্যপ সূর্যের রক্তিম যন্ত্রণা দেখে
যে আকাশকে ব্যথার নীল হয়ে যেতে দেখেছি
কেবল
সেই আমাকে বলবে না :
গত বসন্তটা কুষ্ঠরোগীর মত
কারণ

ও জানে পৃথিবীটা কত এক

সম্রাজ্ঞী সমতাজ মূখে কিছুই
বলেন নি। তবে তিনিও এ ব্যাপারে সম্রাটের
মতই পোষণ করেন। তাঁর অবশ্য একটা
স্বভাব কারণ আছে। আপন আত্মীয়া নাদিরকে
বয়স বাড়ছে। সম্রাজ্ঞী একাধিকবার নাদিরকে
এ বাজপ্রাসাদে এনে আদব-অভ্যর্থনায় স্পষ্ট
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পুত্রবধূ হিসেবে নাদিরকে
নেই তুলনা। সেটা হয়তো মিথ্যাও নয়। তবে
এ ব্যাপারে রাণা দিল্ অপারগ। যুবরাজের
কোনো অসম্পূর্ণ হব নি তো? এ অসময়ে এ
নাচঘরে বেগম সাহেবাব উপস্থিতি?

রাণা দিল্ বাকশক্তি রহিত হলে দাঁড়িয়ে
ছইলো। বেগম সাহেবাকে কুর্নিশটুকু করতে
পারেন্ত তুলে গেল।

মৃদু শাস্তভাবে সম্রাটনন্দিনী বাণা দিলের
অনামিকা অঙ্গুরীয় লক্ষ্য করে বললেন,
এটা তোমাকে যুবরাজ দারামাশকে
দিয়েছে?

কম্পিতকণ্ঠে রাণা দিল্ বলল,
মাদার বেগম সাহেবা। আপন জানেব কসম
থেকে বর্জিত হুজুর বিশ্বাস করুন আমি
কখনও যুবরাজের কাছে এ আংটি চাই নি।
সেচ্ছায় নিজের হাতে তিনি আমার আঙুলে
এ আংটি পিঁবে দিয়েছেন।

জাহান-আবা বললেন, আমি জানি।
তাই হাতে 'প্রভু' অঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি তুমি

তাকে দান করেছো সেটাও জানি। তুমি
পরম ভাগ্যবতী নাবী। হিন্দুস্থানের ভাবী
সম্রাটের তুমি মন হরণ করেছো। তিনি শব্দ
হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাটই নন। তুমি নিশ্চয়ই
জানো শব্দ দিল্লীর নয় সমগ্র হিন্দুস্থানে আজ
যুবরাজের সমকক্ষ দার্শনিক বিরল। যদিও
যুবরাজই আমার গুরু—আমি বসে যুবরাজের
জ্যোতি ভগিনী। তাই তোমাকে আশীর্বাদ করতে
এলাম। আজ থেকে তোমার ও নর্তকীর
পোশাক তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। আজ
থেকে তুমি যুবরাজের পরিণীতা স্ত্রী। জানবে
বোন পৃথিবীতে স্বামীকে চেয়ে বড় আশ্রয়
আব কোথাও নেই। এর চেয়ে বড় নিভরও
বিবল। স্বামীহীন নাবীর জীবন নিবর্থক।
সম্পর্কে অর্থহীন ঠিক যেন সুখবিহীন
আকাশ।

বাণা দিল্ বুঝতে পারছিল না সে হাসবে
না কাঁদবে। যা শব্দে তা সত্যি দিল্লীর
প্রাসাদের বাদশাবেগম জাহান-আবাব কণ্ঠ-
ধ্বনি না দিবাস্বপ্ন। এ কি তরি অলৌকিক
কল্পনা? কিন্তু ঐ যে, সৌম্য শাস্তভাবে
সালঙ্করা বুপের ডালি হাতে তার সামনে
দাঁড়িয়ে সম্রাটনন্দিনী জাহান-আবা।

অভ্যাস বসে কুর্নিশ করার বাসনা
জাগলো।

বাণা দিল্ এদিক-ওদিক না তাকিয়ে

আপন প্রকৃতির প্রবল আবেগে জীবনে যা
কখনও করে নি তাই কবে বসলো। টিপ করে
সে জাহান-আবাকে একটা প্রণাম করে
বসলো।

জাহান-আবা রাণা দিলের চিবুক
স্পর্শ করলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন,
সাবিত্রী মত স্ত্রী হও। নিষাদবাজ নলের
জীবন যাব সত্যি, ভক্তিতে, প্রেমে, ভাল-
বাসায় ফিরে এসেছিল, সেই হোক তোমার
জীবনের আদর্শ নারী। যুগযুগ ধরে হিন্দু-
স্থানের নাবী যার পারে পুজার অর্ঘ্য জানিয়ে
এসেছে—আজ যুবরাজের জীবনসংগিনী
হয়ে তুমি দিল্লীর বাজপ্রাসাদে সেই সাবিত্রীকে
আপনবূপে প্রাতিষ্ঠিত করো।

দাসী দবজাব বাইরে ছিল। জাহান-
আবাব নির্দেশে সে এক এক কবে শাড়ি-
গবনা বেশ-বিন্যাসের সামগ্রী সামনে তুলে
ধরলো।

চকিতে রাণা বিস্ময়ে, 'কৃতজ্ঞতা জাহান-
আবাব দিকে মাথা উচু করে তাকালো।

জাহান-আবা বললেন, ফুলের সাজ
পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ যুবরাজের ফুলশয্যা।
তোমার ভয় নেই। এ বিবাহে আমি সম্রাটের
অনুমতি আদায় করে এনেছি।



(পূর্ব-প্রকাশিতের ৭৭)

৥ চতুর্থ ৷

দিনকয়েক বাদে হিমাংশু নিজেই ফের এসে হাজির হল। অমলার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'কী ব্যাপার মাসীমা কেমন আছেন সব?'

অমলা একটু মুখ ভার করে বললেন, 'আর বাবা। আমাদের আবার থাকা-মা-থাকা। তোমার জন্যে আমরা খুব চিন্তিত ছিলাম।'

হিমাংশু বলল, 'কেন বলুন তো?'
'বাঃ চিন্তা হয় না? কোন খোঁজ নেই খবর নেই কোথায় চলে গেছে—'

হিমাংশু হেসে বলল, 'মাঝে মাঝে আমার অমন একটু-আধটু নিরুদ্দেশ হবার অভ্যাস আছে। সে জন্যে খাবড়াবেন না। স্বাতী কোথায়?'

'দেখ বোধ হয় ঘরেই আছে।'

হিমাংশু হেসে বলল, 'খুব রাগ করেছে বুঝি? আচ্ছা মেয়ে আপনার।' বন্ধু যেন স্বাতীর সঙ্গে নয়, স্বাতীর মায়ের সঙ্গেই যেন হিমাংশুর ঘনু কালের সৌহৃদ্য।

স্বাতীর ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। হিমাংশু বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলল, 'সতে পারি?'

স্বাতীর কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না।

হিমাংশু ওকে আর একটু সময় দিল। বলল, 'কী হল বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

স্বাতী মৃদুস্বরে বলল, 'এসো।' আগে এ বাড়ির দুটিয়রুম ছাড়া

আর কোথাও ঢুকত না হিমাংশু। কিন্তু আজকাল সব ঘরেই তার যাতায়াত আছে। এই অধিকার সে নিজেই করে নিচ্ছে। কে কি মনে করল না করল তাতে হিমাংশুর যেন কিছু এসে যায় না।

ঘরে ঢুকে হিমাংশু একটা চেয়ার নিয়ে স্বাতীর সামনে বসল। তারপর একটু হেসে বলল, 'কী ব্যাপার। তুমি নাকি খুব রাগ করছে।'

স্বাতী খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল। হিমাংশুর দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বলল, 'রাগ করব কার ওপর? কী অধিকারে?'

হিমাংশু হেসে বলল, 'ওরে বাবা। এ যে একেবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে গভীর অভিমানে বাণী বেরিয়ে আসছে। দেখ, আমি ঠিক এই রকম-টাই চেয়েছিলাম। অনেকদিন তোমার ওই অভিমান ভরা কথা শুনতে পাই নি।'

ওর কথায় ভাগিতে স্বাতী রাগ করতে গিয়েও পারল না। হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেলল। 'দায় পড়েছে আমার অভিমান করতে? কোথায় এতদিন ছিলে বলতে?'

হিমাংশু বলল, 'একটু নিখোঁজ হয়ে থেকে দেখলাম কেউ খোঁজ খবর করে কি না।'

'করি নি খোঁজ খবর?'

হিমাংশু স্বীকার করে বলল, 'কয়েক। দুখানি চিঠি আসে অন্তত দশ-বারোটি ফোন গেছে এরই মধ্যে।'

ফিরে এসে শুনলাম। শুন্যে কী ভালোই যে লাগল।'

'খুব মজা? তাই না? তোমার বাড়ির লোকজন কি রকম বলতো? তোমার কোন খোঁজখবর কেউ রাখে না। দিতেও পারে না।'

হিমাংশু বলল, 'কি করে দেবে বলো। আমি জানতে দিলে তো জানবে? তুমি কেন আই বি ডিপার্টমেন্টের লোকও আমার ঠিকানা খুঁজে পায় না। তুমি যদি না পেয়ে থাকো তোমার লন্ডারও কিছু নেই, অগারবেরও কিছু নেই।'

স্বাতী হিমাংশুর দিকে তাকাল, 'আই বি ডিপার্টমেন্টের লোক তোমার পিছনে সত্যিই লাগে নাকি?'

হিমাংশু বলল, 'লাগে। তবে বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তুমি সবাইকে হার মানিয়েছ।'

স্বাতী হেসে বলল, 'আমি কি আই বি ডিপার্টমেন্টের লোক?'

হিমাংশু বলল, 'কী জানি কোন ডিপার্টমেন্টের। তবে আই বি-তে গেলে তুমি উন্নতি করতে পারতে।'

'দরকার নেই আমার উন্নতি করে। তুমি এতদিন কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তাই বলো।'

'তোমার কি ধারণা আমি শূদ্ধ হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম?'

'শূদ্ধ হাওয়া কেন, আরো কিছু কিছু নিশচয়ই খেয়েছ?'

হিমাংশু হেসে বলল, 'ওরে বাবা! সেবনেও বেরোই নি। দরকারেই শ্বাভী বলল, 'আমি তোমার কোন
শুধ থেকে ঠে ফুটেছে দেখছি। শব্দ বেরিয়েছিলাম। দেখ, এবার ব্যবস্থাটা কথাই আর বিশ্বাস করিনে।'
বেড়াতে বেরোই নি। জল বার প্রার করে এনোছি।' হিমাংশু হেসে বলল, 'ও ভয়ে



DA 65/528 Bengali

প্রতিটি ৫৮ গ্রামের (৫ তোলা)
৩২০০টি সোনার নেকলেস দ্বিধ
আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য
শুধুমাত্র একটি ট্যাক্স কেনা যায়।

দোশের সেবা ককুন
স্বর্ণবণ্ড নিন



কাম্পত নয় আমার হৃদয়। আমি ছানি। দুর্দিন বাদে বিশ্বাস করবে। এখন গাছ দেখছ তখন ফলও দেখবে। আর সেই ফলবান বৃক্ষকে একটি স্বর্ণলতা পাকে পাকে জড়াবে।

পর্দার আড়াল থেকে অমলা ডাকলেন, 'হিমাংশু!'

হিমাংশু একটু দ্বিভ কটে বলল, 'এই যে মাসীমা!'

'ও ঘরে এসো, খাবার দিইছি তোমাদের।'

হিমাংশু উঠে এসে খাবার ঘরে ঢুকল। আহাযের ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হল।

হেসে বলল, 'করেছেন কি মাসীমা! এ যে একেবারে নৈশভোজের ব্যবস্থা!'

অমলা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কী আর এমন ব্যবস্থা হয়েছে হিমাংশু? কিছু কি পাওয়া যায় আজকাল পছন্দ-মত খাবারটাবার তৈরি করব? কিছু ফ্রায়েড রাইস করছি। দেখ তো কেমন হয়েছে।'

হিমাংশু আমার দিকে চেয়ে বলল, 'দৃশ্য হিসাবে ভারি চমৎকার হয়েছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

অমলা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি কথা! তবে এ সব কললাম কার জন্যে।'

হিমাংশু বলল, 'আপনার স্নেহের তুলনা নেই মাসীমা। কিন্তু এই ঘাড়তেই এই ঘরের, এই টেবিলে বসে এসে কেউ যদি আমার সততায় সন্দেহ করতে থাকে, আমার যে কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে, তাতে যদি কেউ একটি নম্রা পরসার বিশ্বাসও না রাখতে পারে তাহলে পরম পেটেকের ও কি পেটে খিদে থাকে মাসীমা? মানুষ কি খাবার জন্যে বাঁচে? না বাঁচার জন্যে খায়?'

হিমাংশুর কথার ভাঙিতে অমলা হেসে উঠলেন। স্বাতীও মুগ্ধ ফিরিয়ে হাসতে লাগল।

অমলা বললেন, 'স্বাতীর ভারি দোষ। তোমার মত ছেলেকে তার সন্দেহ করা উচিত হয় নি।'

হিমাংশু বলল, 'সন্দেহ যখন করেই বসেছে তা ভজন করবার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। কারণ দায়টা তো আমারই।'

অমলা একটু হেসে বললেন, 'দোষটা শুধু মেরেরই নয় হিমাংশু। আমিও ভাবছিলাম। ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি এখনকার মত সুবিধে না হয় তুমি একটা ভালো চাকির-বার্কির জোগাড় করে নাও বাবা। সেও তো অসম্মানের ক্ষয় নয়।'

হিমাংশু খেতে খেতে বলল, 'কোন

কাজেই আমার অসম্মান হয় না। কিন্তু চাকিরও আমি করতে পারব না। কী করব বলুন। আমার হাতে সয় না। হাতে খড়ি যে দু-এক জায়গায় এর মধ্যে হয়েছে গেছে। কিন্তু সেই খড়ি বেশিক্ষণ হাতে রাখতে পারি নি। মাটিতে পড়ে চৌচির হয়ে গেছে। তাই ভেবেছি হারি-জিতি বাণিজ্যটাই একবার—। তবে একা করতে সাহস পেলাম না। একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিতে হল। তার নিজেরও ইচ্ছা আমার সঙ্গে থাকে। তার সবই আছে। শুধু সাহস বল ভরসা আর কিছু অর্থ। আমি তাকে আম্বাস দিইছি মাসীমা। আম্বাস পেয়েছি বলেই দিতে পেরেছি।'

হিমাংশু পরিষ্কার করে না বললেও সে যে কী বলতে চায়, কার কাছ থেকে সে কী পেয়েছে তা অস্পষ্ট রইল না। শুনতে শুনতে স্বাতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। 'ছি ছি ছি, হিমাংশুর যদি কোন রকম কান্ডজ্ঞান থাকে। মার সামনে ওইভাবে কেউ কথা বলে। যতই বন্ধুর মত ব্যবহার করুন মা-ই তো।'

হিমাংশু বলল, 'আজই সব স্বাতীকে দেখাতে নিয়ে যাব।'

অমলা বললেন, 'সে কি আজই?' হিমাংশু বলল, 'হ্যাঁ দেরি করে আর লাভ কি। শুকে একবার দৌখবেই ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেলব।'

অমলা বললেন, 'ও এসব ব্যাপারের দেখবেই বা কি বুকেবেই বা কি। আমার তো মনে হয় সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে তখন দেখানোই ভালো।'

হিমাংশু বলল, 'আমার মন কিন্তু তাতে সায় দিচ্ছে না মাসীমা। যাকে নিয়ে কাজ করব, তাকে আগে থেকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে না নিতে পারলে আমি স্বস্তি পাব না মাসীমা। অবশ্য আপনার যদি তেমন অমত থাকে সে কথা আলাদা।'

অমলা বললেন, 'আমার মতামতে কি এসে যায় হিমাংশু? যে যাবে তাকে জিজ্ঞেস করো। স্বাতীকে বোঝাড়া করবার সুযোগ দিয়ে অমলা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

স্বাতী বুকল মা একটু শক্ত হতে চাইছেন এবং তাকেও শক্ত হয়ে থাকতে বলছেন।

হিমাংশু এ পর্যন্ত যে ব্যবহার করেছে তাতে তার কথাবার্তায় সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। তবু আশ্চর্য, মায়ের ওপরই কেন যেন স্বাতীর মন

অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অত সতর্কতার কি দরকার। হিমাংশু যখন এত বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে তখন স্বাতী না হয় একটু বেরলোই তার সঙ্গে। সে তো ওর সঙ্গে এই প্রথম বেরোচ্ছে না।

স্বাতী চুপ করে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল হিমাংশু কিছু বলে কি না।

হিমাংশুই প্রথমে কথা বলল। একটু হেসে বলল, 'তোমার মা তো তোমার ওপর বরাত দিয়ে গেলেন তুমি কী করবে?'

স্বাতী বলল, 'কী আর করব আমি কি আর মায়ের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি। তুমি কি আমাকে সেই রকম মেয়ে মনে কর না কি?'

হিমাংশু নিরীহ ভাঙিতে বলল, 'তা কেন করব? তুমি হলে লক্ষ্মী মেয়ে।'

স্বাতী বলল, 'লক্ষ্মী নয় তো কি? তোমার মত উড়ুন চুড়ী? তাছাড়া মায়ের মতামত দিয়ে কি হবে আমার নিজেরই তো তোমার সঙ্গে আর এক পা-ও বেরোবার ইচ্ছে নেই।'

'কেন আমার অপরাধ?'' 'অপরাধ? নিজেকে জিজ্ঞেস করো। বলে স্বাতী উঠে পড়ল।

এটো হাতে হিমাংশুই বা একা একা বসে থাকে কি করে। সেও মুগ্ধ হাত ধরে বাইরের ঘরে এসে বসল। একটি সিগারেট ধরাল। ভাবল, তাহলে স্বাতীর মতলবটা কি।

তৈরি হতে বেশি সময় নিল না স্বাতী। বেশি সময় তার দরকার হয় না।

বেরোবার আগে অমলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'মা ঘুরে আসছি একটু।'

অমলা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি। তুই সত্যিই যাবি নাকি? সেদিন অত কথা হল। ও তো মাসের পর মাস কেবল ঘোরাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছে। তবু যাবি?'

স্বাতী বলল, 'হাই। কী যেন দেখাবে বলছে, দেখে আসি।'

অমলা বললেন, 'আমার তো মনে হয় সব বাজের।'

স্বাতী বলল, 'দেখাই যাক না কী দেখায়। একটু ঘুরে আসতে দাঁড়া কি।'

ক্ষতি হলেও স্বাতীর না গিয়ে উপায় নেই। ওর স্বভেদ ঘোরান শেষ লেগেছে।

বঙ্গদর্শন



ভাতমারা মৌসিন

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে, “.....পারে না, বন্দুক ঘাড়ে”। বাংলাদেশে ইতস্ততভাবে সরকারী বেসরকারী ক্ষেত্রে এমনতর বরকন্দাজের অভাব নেই; কক্ষ-অপকক্ষ কোনটাই করতে পারেন চাই নাই পারেন, বন্দুক একটা ধারণ করেন তাঁরা। গোলাগুলি ছুটুক নাই ছুটুক বোলবুলির অভাব বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সম্প্রতি সোরগোল বাঁধিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বন্দুক ঘাড়ে না তুলেই নাকি ছাড়বেন না কতৃপক্ষ। বন্দুক কেন, সাক্ষাৎ কামান বলাই ভাল। লেটেস্ট মডেল। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় যে কামানগুলি দাগতে শুরুর করেন বলে প্রকাশ, সেগুলির মডেল যথাক্রমে: (১) ০৮২ স্টার, (২) ৫১৪ রিপ্রেজিউসার এন্ড গ্যাং পাণ্ডিং, (৩) ০৭৭ কার্ড কোলেটর এবং (৪) ৪০২ একাউন্ট মৌসিন।

প্রস্তাবিত এই কামানগুলির সাহায্যে, এটা সুনিশ্চিত যে, বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট সংখ্যক কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিতে পারবেন। কারণ মৌসিনগুলি প্রয়োজনীয় যাবতীয় মনুষ্যকর্ম আর্থ-পল্লবের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাধা করবে বলে জানা আছে।

কতৃপক্ষ অবশ্য বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পদ্ধতি পুরোপুরি চালু করবেন না বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র ট্যাবুলেশনের কাজেই সাহায্য নেওয়া হবে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পদ্ধতির। ফলত, কতৃপক্ষের বক্তব্য, ছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী নয়।

কিন্তু কতৃপক্ষের এই ছেলে ভুলানো আশ্বাসে কর্মচারীরা বড় একটা ভরসা পাচ্ছেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে তাঁদের আশঙ্কা

বিপদের কথা জানিয়েছেন এবং ওয়া জানুয়ারী থেকে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিবাদ ব্যাজ ধারণের ও ৪ঠা জানুয়ারী সাধারণ সভার আয়োজন করেছেন। কর্মচারী সমিতির ইস্তাহারে ছাঁটাই-এর আশঙ্কার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে:

“.....শুধু টেবুলেশনের কাজ যদি হয়, তাহলে দৈনিক ৭ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করলে এ মৌসিনের খুব বেশি হলে সপ্তাহ তিনেকের কাজ রয়েছে। তারপর কী মৌসিন বসে থাকবে? মৌসিনের ভাড়াও গোশা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে, আর মৌসিন বসে থাকবে, এটা হয় না। অপরদিকে টেবুলেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কত টাকা খরচ করতে হয়? তা কি দু’লক্ষ টাকারও বেশি? কেন না মৌসিনগুলির ভাড়া বাৎসরিক প্রায় দু’লক্ষ টাকা। সুতরাং, শুধু টেবুলেশনের কাজ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লোকসানও হবে। আর একটি কারণ থাকতে পারে যা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সমিতির প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন, সেটা হল টেবুলেশনের কাজে নাকি কিছু হ্রুটি থেকে যায়। আমাদের প্রশ্ন, হ্রুটি যদি থাকেই সেটা কী এতই বিশাল যে, মৌসিনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? এত বছর চলল কী করে? প্রতি বছর এ সময় কন্ট্রোলার অফিসে ২৫।৩০ জন নতুন কর্মচারী নেওয়া হয়। ঘটনা হচ্ছে, এ বছর একজনকেও নেওয়া হয় নি। কেন? এরাও কী টেবুলেশনের কাজ করতেন?

আসলে আপাতত প্রি-ইউনি-ভার্সিটি সংক্রান্ত সমস্ত কাজই এই মৌসিনের সাহায্যে করা হবে, এটাই বিভিন্ন মহল থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি। তবে, এ মৌসিনের যা ক্ষমতা, ডুমতে প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সমস্ত কাজ করেও বছরের দীর্ঘ সময়

মৌসিনের জন্য কাজ থাকবে না, যদি না অন্যান্য পরীক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজে এ মৌসিন ব্যবহার করা হয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, যাবতীয় পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ করেও মৌসিনের পুরো বছরের কাজের খোরাক থাকবে না।”

বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য সুতরাং যে মৌসিন আমদানি হচ্ছে না, এই আশঙ্কাটাই কর্মচারীগণকে সন্তুষ্ট করে তুলেছে।

বস্তুতপক্ষে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য যদিও ভারতবর্ষের মত হতদরিদ্র দেশে বেশ কিছু হোমরা-চোমরা পদের অস্তিত্ব আছে, মানুষের মৃত্যুর অল্প যথার্থ যোগান দিয়েও মৌসিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হবে, এমন নজীর বিশেষ নেই। ঠুটো মৌসিনের কথা স্বতন্ত্র, উচ্চপদে খ্রীষ্টীয়গম্মাথ-স্বরূপ ঠুটো অফিসের প্রশ্নও ধর্তব্য নয়, কিন্তু কল্যাণরতী রাষ্ট্রে কর্মহীন মানুষের রুটির ব্যবস্থা আছে এমন তো চোম্ব বছরে শুনি নি। অতএব কর্মচারী সমিতির আশঙ্কা যে অমূলক নয়, এটা মেনে নেওয়াই ভাল।

মার্কিন মূল্যকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ১৯৫৫ থেকে ’৬০ সালের মধ্যে এক চতুর্থাংশ করণিক কর্মচ্যুত হয়েছেন এবং একষটি থেকে পয়ষটির ভেতর কর্মহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আরও চল্লিশ লক্ষ কর্মীর ক্ষেত্রে।

ভারতে এমনই বেকার সমস্যা সর্বগ্রাসী অর্থাৎ সব পরিবারকেই গ্রাস করে আছে কোনো না কোনোভাবে। তার ওপর কতরা যদি মৌসিন-বিলাসী হয়ে পড়েন তবে উদ্ভূত কর্মচারীদের পরিবারে যে অন্ধকার নেমে আসবে, তাতে কতদের রোমক নিগ্রহবিলাস যেমনভাবেই চরিতার্থ হোক না কেন, দেশের সমস্যা জটিলতরই হবে। সুতরাং ব্যাপারটি সম্পর্কে রাজ্য সরকার

কার্যেরও, এবং সমস্যাটি যখন বেকার দৃষ্টিতে সহায়ক তখন কেন্দ্রীয় সরকারেরও, দৃষ্টিদান সমস্যা থাকতেই প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয় কাজীকামী মানুষকে কর্মচ্যুত করার বিলাসিতায় আমাদের সরকার ইদানীং উপর্যুপরি অবগাহন করেছে; আর তাই আশঙ্কার কারণ তদর্থেও অমূলক নয়।

কর্মচারী মহলে হ্রাসের সঞ্চার অতএব স্বাভাবিক। কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতিই নয়, পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী মহল এই হ্রাসবাদকে এক মহাবিপ্লবের ইঙ্গিত বলেই গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই সে লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কলকাতার কর্মচারী মহলে বেশ চাপলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা অল্পকালের মধ্যে এক বিরাট প্রতিবাদের আকারে ঘূর্ণন হলে আমরা বিস্মিত হব না।

‘আকাশবাণী’ কি দেশের বাণী?

র‍্যেডিও একটি প্রচারযন্ত্র সন্দেহ নেই। তবে ক্ষমতাসীন সরকারই এই যন্ত্রটিকে দেশের ও দেশের প্রয়োজনে প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বেতার প্রচারের ক্ষেত্রেও পৃথিবীব্যাপী; সুতরাং বেতারে প্রচারিত বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। এজন্য বিশেষ সরকারী সংস্থা, বহু অর্থব্যয়, এবং একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রয়োজন হয়। বেতার সংস্থাটি সরাসরি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখা হয়েছে বেতারের ক্ষমতা বিবেচনা করেই।

বেতার নামক যন্ত্রটি যদি কখনো বিজ্ঞাপন প্রচারের ভূমিকা গ্রহণ করে তবে সে বিজ্ঞান ও সরকারী কর্ম ও মীতিতেই বিজ্ঞাপন হয়।

দুর্ভাগ্যবশত কলকাতার আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ দেশ বৃহত্তে একটি পত্রিকাতেই বৃহৎ বসবনে একতরফা অসম্ভব কর্মসূচী দেশের লোকের ছিল না। সম্প্রতি এই পত্রিকার জনৈক নিয়মিত লেখকের ‘স্মৃতি’ এবং এই পত্রিকারই জনৈক লেখিকা (উভয়ে একই ব্যক্তি) আকাশবাণীর কলকাতা শাখায় গুচ্ছিয়ে বসতে-না-বসতেই (তিনি ওখানেই চাকরি করেন) আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের উর্বর মস্তিষ্কে দেশ বলতে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাতেই দৃষ্টি দিয়ে বিদেশী দর্শন প্রভাবিত একটি বহুবিভক্তিত উপন্যাসের (যার মধ্যে সমালোচনায় বহু গুণীজন ও

বিশিষ্ট ব্যক্তি লেখনী ব্যবহার করে বাধ্য হয়েছেন) অপপ্রচার সম্ভব করেছে। অষ্টনঘটনপটীয়সী আর কাকে বলে!

আলোচ্য উপন্যাসটির গুণাগুণ বিচারে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা ব্যবহার করার অধিকার আমাদের নেই। কারণ আকাশবাণী (কলকাতা শাখার) মত যন্ত্রের বিশেষ প্রকাশকের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিম্বল করার স্থান এটা নয়। ন্যাকারজনক শব্দসম্ভারে ভারতান্ত সেই বিশেষ ‘অপন্যাসটির’ সপক্ষে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে প্রকাশকের ব্যবসায়িক স্বার্থসিঁথির ব্যবস্থা (আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যেমন করেছে) করতে পারলো না। আমাদের বক্তব্য তাই বিশেষ কোনো পত্রিকা—যে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই পত্রিকার মালিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রকাশন সংস্থা, যারা উপন্যাসটি প্রকাশ করেছে—অথবা যৌন আবেদনে পরিপূর্ণ অভিধানে বহিষ্ঠূত (যেমন, ‘লে হালুয়া’, একই সঙ্গে এই শব্দ সমাহার কোনো অভিধানে চোখে পড়ে নি) শব্দনিচয়ে ভারতান্ত উপন্যাসটি সম্পর্কেও নয়; আমাদের বক্তব্য, অষ্টনঘটনপটীয়সী শ্রীমতী সিংহকে (ওরফে রায়চৌধুরী) ঘিরেও নয়; আমাদের বক্তব্য, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের অবিস্মৃতিভাবকে কেন্দ্র করে।

শ্রীমতী সিংহ না হয় ‘প্রাপ্তবয়স্ক’দের জন্য ‘পাপ পুণ্য পেরিয়ে’ মুক্ত-দৃষ্টির লেখিকা। তাঁর পক্ষে বাংলা-দেশের ‘একমাত্র অস্তিত্ববাদী লেখকে’র (কার অস্তিত্ব, কিসের অস্তিত্ব—যৌনাবেগের, মাতলামির অথবা মনো-বিকারের?) বিবরাচিত প্রচণ্ড দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্ত আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে এমন বিষয়রোগে ধরল কেন? তাঁরা সরকারী বেতার প্রচার-যন্ত্রের মাইকটিকে ব্যক্তিগত বা দলগত উকিলী (সওয়ালের) টোন্টের ভাষায় এনে ধরলেন কেন?

‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ অনুরূপটি শোনাতক চক্কু আমার চড়ক গাছে। এহেন একটি ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ চেয়ার টেবিলে বসেই সারলেন কী করে। তবে কি আকাশবাণীকর্তার চেয়ার বর্তমানে চড়ক গাছের কাণ্ডখণ্ডে নিম্নিত হয়েছে! জানি না অতশত। তবে হলেও বিস্মিত না হওয়াই ভাল। বৈ

জ্ঞানে সে চেয়ার যাদ আবার প্রকাশক মহাশয়ের বিশেষ রপ্তানী হয় তবে পাবলিশার্সের বিশেষ রপ্তানী হয় তবে তাদৃশ অসম্ভব-অনায়াসেই সম্ভবপর বটে। কেন না তাঁরাই বাংলাদেশের ‘একমাত্র অস্তিত্ববাদী লেখকে’র দর্শন পেয়েছেন। ধন্য, প্রকাশক। কিন্তু হায়, ধন্য বাংলাদেশের ইচ্ছাত গেল। বঙ্গ আমার, জননী আমার’ মুখে গাদা গাদা চুপ কালি রাখলেন। অনুরূপে আলোচিত ‘অপন্যাসের’ নায়কপুঙ্গবের জননীর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

“...দরজা খুললাম, আর খুলেই দেখলাম শ্রীমতী অনুসূয়া দেবী দাঁড়িয়ে। যার একমাত্র দাবি হল তিনি আমাকে পর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে মাইরি, কিসের দাবি এবং কে সেই দাবি দিয়েছিল, আমি তাঁর তুলসী দিয়ে হালপ করে বলতে পারি, আমি এর কিছুই জানতাম না।”

আহা, যাঁ কি হইরাছেন! কিন্তু প্রশ্ন হল, বঙ্গদেশের তাবৎ সন্তানই কি তাঁদের মায়ের প্রতি এরূপ ধারণাই পোষণ করেন। আর মায়ের বাপ চিনিয়ে না দিলে হেসেব সন্তানরা তার জন্ম-গ্রহণের ‘কিছুই জানতাম না’ মাইরি বলে বারবনিতাকে মধ্যরাতে হত্যা করে বাড়ি ফেরে এবং বহুভোগ্যা ভগিনীর নতুন নাগরের কুকর্মের পরিমাপ করতে করতে নিজের পেটের মালের পরিমাণ মাপে, বঙ্গদেশ কি সেই সব গভঃপ্রবের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে দেশের প্রচারযন্ত্র কলকাতা শাখার আকাশবাণী বিবেচনা করেন? না করলে ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ অনুরূপে এই ‘নব বঙ্গায়ন’টির মূল্যায়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ এমনভাবে উন্মোচিত হয়ে উঠলেন কেন?

‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ বিভাগটি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক বোগাযোগ প্রতিষ্ঠা-কল্পে সৃষ্ট। তা বঙ্গমাতার এতাদৃশ রূপে উভয় বঙ্গের কেউই কি বিশেষ প্রীতি বোধ করবেন? উল্লিখিত উপন্যাসে এইভাবেই যদি পশ্চিমবঙ্গের চেহারা তুলে ধরা হয়েছে বলে উপন্যাসটি আকাশবাণীর বিশেষ আলোচ্য হয়ে থাকে তবে বৃহত্তে হবে পশ্চিমবঙ্গ গোস্তায় গেছে এবং পূর্ব-বঙ্গের এমত একটি যৌনবিকারগ্রস্ত উন্মাদ খন্ডায়নের সঙ্গে বোগাযোগ রাখা আদর্শেই সমীচীন নয়। আকাশবাণী (কলকাতা) কর্তৃপক্ষের কাছে কিন্তু দুই বঙ্গে ফারাক সৃষ্টির জন্য

সাপ্তাহিক বসুদত্তী

“বঙ্গ আমার জননী আমার” অনুষ্ঠানটি প্রবর্তন করার কোনো সরকারী নির্দেশ ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছিল কি না তা আমাদের জানা নেই।

আমরা যতদূর জানি তা হল: পাক-ভারত সম্পর্কের কালে প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের কোনও বিরোধ নেই বলে এবং ভারত পাকিস্তানী জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে বসবাস করতে চায় বলে একটি ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণার পর কলকাতা আকাশবাণী কতৃপক্ষ অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ দুই বঙ্গের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনার জন্যই “বঙ্গ আমার জননী আমার” অনুষ্ঠানটি প্রবর্তন করেন।

কিন্তু যে উপন্যাসটিকে ঐ অনুষ্ঠানে আলোচ্য করা হয়েছে, পশ্চিম-বঙ্গের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার কিছুমাত্র অবাস্তব বোগাযোগ পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কলকাতাও পশ্চিম-বঙ্গের এই বাঁভাগস চোহারা আমরা দেখতে পাই না। লেখকের অবশ্য অধিকার আছে যথেষ্ট চরিত্র আঁকার এবং বস্তুতে এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে থাকতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটাই পশ্চিম-বঙ্গের পরিচয় নয়। আর তাই যদি না হবে তবে কিসের জন্য আকাশবাণী ঐ উপন্যাসটিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে আলোচ্য করলেন?

এ বিষয়ে অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন। আকাশবাণীতে কর্মচারী দ্বারা কোনো বিশেষ প্রকাশকের প্রচার কতদূর সঙ্গত, সেই সঙ্গে সে বিচারটাও প্রয়োজন। সমগ্র ঘটনাটি কেবল সন্দেহজনক নয়, এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলকাতা শাখার আকাশবাণী কর্মীদের আচরণেও সাধারণের মনে এমন সন্দেহের উদ্রেক হওয়াও অসম্ভাব্য নয় যে, আকাশবাণীতে অনুষ্ঠানের বাসা বাঁধছে, যার মারাত্মক পরিণতি সমগ্র দেশের স্বাধের পক্ষেই হানিকর হতে পারে।

প্রসঙ্গত বলি, সহযোগী যুগান্তর পত্রিকার ‘হাফজতার এলোমেলো’ শীর্ষক আলোচনায় (২৪-১২-৬৫) স্বাধীন সাংবাদিক যে সন্দেহের অঙ্কুর রোপণ করেছেন, সে সন্দেহ সকলের মনেই জাগতে পারে। তিনি লিখছেন: “কোনো বই সম্পর্কে এজাতীয় ওকালতিতে শ্রোতার দলীয় ব্যাপার মনে করতে বাধ্য হয়।

“কিন্তু... ওরা যদি আরও বই-এর বিজ্ঞাপন ঠিক এইভাবেই দেয়... তা হলে তো দলীয় ব্যাপার সন্দেহ হবে না?”

“ওরে, তোর কথায় একটা গল্প মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের কোনো স্নেহস্পদ শান্তিনিকেতনে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাতে নতুন লেখকদের কাছে টাকা নিয়ে (মোটো হরফ আমাদের) তাদের লেখা ছাপা হত। রবীন্দ্রনাথ একদিন একথা শুনে... বললেন, ‘ওহে, খুব ভাল কাজ করেছে, খুব প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তবে কাজটা শান্তিনিকেতনের বাইরে গিয়ে কর, এখানে চলবে না।’ “বুকেতে পার্জািস আমার ইঞ্জিতটা।”

তিনি স্পষ্ট করে ঘৃণাঘাষের কথা বলতে লজ্জা পেয়েছেন তবে অন্যত্র বলেছেন, “এই বিজ্ঞাপন সিলোন রেডিওতে প্রচার করলে নিশ্চয় হাজার দুই টাকা দিতে হত।”

আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ যাকে শান্তিনিকেতন থেকে বাইরে গিয়ে সংকল্প সমাধা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন ঐ একই কাজ করে তিনি শ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন প্রবেশের দুঃসাহস নিশ্চয় রাখতেন না। তবে বঙ্গবাসী কোনোও প্রকাশকের বিজ্ঞাপন প্রচারের অবিস্মৃতিকারিতার জন্য যদি ক্ষমতাসীন অফিস থেকে আকাশবাণী ভবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র পার্জািসটি ফর্ম খুলতে বলার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রচার মন্ত্রণালয়ের কাছে দাবি জানান তবে সেটা কি খুব ভুল করা হবে?

ভুল নিশ্চয়ই হবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্যের জন্য যা করেছেন; সরকার অসততার বিরুদ্ধে তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

প্রাণ নিয়ে খেলা

পনের নম্বর ক্রিকেড লেন, চিন্দুয়া (হুগলী) থেকে শ্রীহৃদয়কিশোর ভট্টাচার্য মহাশয় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একটি সংবাদের (বিবরণ পত্র ৪২) সূত্রে আমাদের দপ্তরে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেছেন। ডাক্তারী অবহেলায় একটি তরুণ ছাত্রের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অক্ষয় কিভাবে চিরন্তন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে কী অশুভ অনায়াসের দ্বারা আবৃত করা হয় শ্রীভট্টাচার্যের এই করুণ পত্রটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। জনৈকের অপরূপে একটি সুস্থ পরিবার (এবং কে জানে সে ছাত্র দেশকে কী দিত,

সুতরাং দেশও) যা হারাল কোনো বিশেষ শাস্তি তা অবশ্যই প্রত্যাশিত ক্ষমতা রাখে না। তবুচ অপরাধের শাস্তি না হয়ে কেন যে অপরাধীর ভাগ্যে পুরস্কার জোটে তাও কম বড় বিস্ময় নয়।

শ্রীভট্টাচার্যের পত্রেই বিশদ বিবরণ পাঠ করে এই সরুপ কাহিনীটির সঙ্গে সাধারণে পরিচিত হ'ন, এ বিষয়ে আরও বক্তব্য বাহুল্যমাত্র।

“বঙ্গদর্শন” কেবলমাত্র এই মর্মভেদী পত্রের প্রতি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের এবং উদ্ভবিত কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থাবলম্বনের দাবি জানান :

“এই ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া কৈফিয়ৎ হিসাবে নিবেদন এই যে, “বসুদত্তী” পত্র-পত্রিকা ইদানীং যেভাবে নির্বাহিত দৃষ্টান্ত্য ব্যক্তিগতের মর্মবেদনা ভাষায় রূপ দিতেছেন, তাহা সভ্য ও সঙ্গত ভাষণের অপূর্ব সং সাহসে পরিচালক মনে করিয়া এই আশয়ে আমার অভিযোগ স্থাপন করিতেছি— বাহাতে এই পরালিখিত বিষয়টির উপরে আপনার সহানুভূতি সহ মনোবোধ আকৃষ্ট হয় এবং প্রতিকারের জন্য সম্ভবমত চেষ্টা করা হয়। আপনায় সাপ্তাহিক “বসুদত্তী”র ২য় অগ্রহায়ণ, ১৩৭২, ১৮। ১২। ৬৫ তারিখের ১৫০০ পৃষ্ঠায় “ইহা কিসত্যা” শীর্ষক প্রবন্ধে যে সূচিকবসক সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে সেই চিকিৎসকের নাম P. R. De (প্রিয়রঞ্জন দে অথবা এরূপ) হইলে এবং ৩। ৪ বৎসর পূর্বে কলিকাতাতে “নীলরতন সরকার” হাসপাতালে House Surgeon হিসাবে কার্য করিয়া থাকিলে, তিনিই এই হতভাগ্যের সংসারকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং বৃন্দ বসন্তে আক্রান্ত এবং আমার স্ত্রীকে শোকাবর্ণী করিয়া দেহের দিন গণনা করিবার অবকাশ আনিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমাদের স্বেচ্ছায়ী পুত্র স্বর্গীয় সমরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য নাকে Polley operation (Minc operation) করিবার নামে তাহকে হত্যা করিয়াছেন। Operation করিবার সময় আমার সেই পুত্রের নাক হইতে অজগর রক্ত বহিতে থাকিলে, তিনি তাহাকে Table-এ পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটনামূল্য হইবে যথার্থ হত্যাকারীর ন্যায় পলায়ন করেন—কারণ operation করিবার পূর্বে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল, তিনি তাহার কোনও ব্যবস্থা না করিয়াই operation করিয়াছিলেন,

এবং যে সকল সতর্কতামূলক আয়োজন করা অতি কঠোর ছিল, তাহাও করেন নাই এবং হয়তো defective operation করিয়াছিলেন যে কারণে রোগীর জন্য কোন চেষ্টা না করিয়াই, রোগীকে সম্পূর্ণ অসহায় ভাণ্ডার উপরে পরিত্যাগ করিয়া কোনও গুপ্তস্থান দিয়া যথার্থ হত্যাকারীর মতই সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরেই কোনও চিকিৎসক বা অন্য কোনও ব্যক্তি রোগীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে বেলা শেষে H. Surgeon উপস্থিত হইলেন এবং Medical College হইতে আত্মাদিগকে রক্ত জ্ঞানবার আদেশ দিলেন এবং আশ ঘণ্টার মধ্যে রক্ত লইয়া হাজির করিলে আত্মাদিগকে জানান হইল যে, ইতিপূর্বেই রোগী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং চিকিৎসার নামে এই প্রহসন সৃষ্টি করিয়া একটি সম্ভাবনাপূর্ণ কিশোর জীবনকে নষ্ট করা হইল। ততক্ষণে মৃতের মা, কলিকাতাতে কোনও আত্মীয় বাড়িতে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, পুত্রের শব্দস্বরগমনের পরিবর্তে তাঁহার নিকট প্রায় পুত্রের মৃত্যুসংবাদ উপস্থিত হইল। সম্পাদিকা মহাশয়া, জাশনি মা, সেই অবস্থায় মৃত পুত্রের মৃত্যুসংবাদে মৃত্যুর করুণ আতর্জনাদ শুনিলে নিশ্চয়ই মর্মান্বিত হইতেন এবং আমার অবস্থাও কল্পনা করিয়া লইবেন। অতঃপর আত্মীয়-বন্ধুদের পরামর্শে সেই H. Surgeon-এর বিরুদ্ধে হাসপাতালের Principal এবং স্বাস্থ্য-দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের বরাবর অভিযোগ দায়ের করা হইল; ইতিমধ্যে “যুগান্তর পত্রিকার” Staff Reporter তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে সেই মেধাবী ছাত্রটির মৃত্যু নিছক অবহেলায় ঘটিয়াছিল এবং তিনি উক্ত পত্রিকায় বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ব্যাপারটা বহুল প্রচারিত হওয়াতে principal পরে আমাকে Board-এর তদন্তের আমন্ত্রণ দিলেন এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তদন্তের Report-এর মকল আমাকে যথাসময়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কিছুকাল পরে তদন্ত-বোর্ড মিল, এবং অন্যান্য লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হইল, কিন্তু চমকিত ফলাফল কি হইল তাহা আমাদের জানান হইল না—অনেক লিখা-লিখির ফলেও প্রতিশ্রুত “Report-এর নকল” আমাদের পাঠান হইল না। বিষয়টি ঘোরতর মনোহস্যাতক অনুমান করিয়া—কলিকাতা Police Comnr-এর

নিকট লিখিত এজাহার দাখিল করা হইল, সুদীর্ঘকাল, উত্তীর্ণ হইবার পরে কলিকাতা Comnr. office হইতে জানান হইল যে, Department কোনও action লইতে পারেন না—স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইল—অন্যমানে বৃন্দালাল যে স্বাস্থ্যবিভাগের অনুমতি ছাড়া Police বিভাগ কোনও Initiative লইতে পারেন না এবং Cognizance-ও লইতে পারেন না। অনেকের ন্যায় আমারও ধারণা এই যে, সরকারের আশ্রয়ে থাকিলে সকল রকম দৃষ্টান্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং সাধারণের পক্ষে এইরূপ ধারণা পোষণের উপযোগী ছুরি ছুরি দৃষ্টান্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অতিপ্রায় ছিল যে, যাহাতে এই অব্যাহতি ছদ্মহীন ব্যক্তি সরকারের আশ্রয়ে থাকিয়া ভবিষ্যতে পনেরায় এইরূপ সমাজবিরোধী কার্যের সূচনা না পায়, এবং আমার ন্যায় দুর্বল প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তিদের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়, তাহার বিধান করিবার চেষ্টা করা—কারণ Private practice-এ এরূপ দায়িত্বহীন যথেষ্টাচারের সূচনা কোথায়? যথাসময়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের Secretary এবং উক্ত Medical College এর Principal-এর সহিত দেখা করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলাম—এবং উভয়েই যথারীতি দৃষ্ট প্রকাশপূর্বক জানাইলেন যে, অপরাধী ব্যক্তিকে চাকুরি হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মৃত পুত্র সম্বন্ধে এখানে কিছু বিবরণ দেওয়া কঠোর মনে করি—কারণ আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে একটু ধারণা জন্মাইতে চাই। আমাদের উক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে হুগলী College-এ যে Condolence meeting-এর আয়োজন হয় তাহাতে তৎকাল Principal তাঁহার সহানুভূতি-সূচক পদে আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, উক্ত সময়েই উক্ত কলেজে বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্র এবং এই ছাত্রটি জন্মায়িক চরিত্রের দ্বারা সকলের জয় জয় করিয়াছিল—এবং Principal Professors এবং অগণিত বন্ধু ও পরিচিত মহলে—বিশেষ প্রতিষ্ঠানভ করিয়াছিল এবং B. Sc. Honours Class-এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রেরণীতে এই কিশোরের একটি বিশিষ্ট চরিত্রের ভূমিকা ছিল। যে পরীতে আমরা বাস করিতাম সেখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহই

ছিলেন না যিনি তাহার এই অকাল মৃত্যুতে চক্ষের জল না ফেলিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে—দৈনিক “বঙ্গবাসী” পত্রিকায় ১১শে ফাল্গুন, ১৩৬৯, (৪-৩-৬৩ ইংরাজী) তারিখে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহাতে এই মৃত্যু প্রসঙ্গে গভর্নমেন্টের অতি উচ্চপদস্থ দুই ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, যাহাতে জানা যায় যে, উভয়েই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে শাস্তি হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই ঘটনায় আমার দরিদ্র সংসারে কিরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়াছে তাহাও নিবেদন করিতেছি। সেই ঘটনার পরে আমি নিজে হৃদরোগে প্রায় শয্যাগত হইয়া আছি—আর মৃতের মা অর্থো-স্মাদিনী হইয়া হৃদয়ভেদী জাতনাতে চতুর্দিকে বিষাদছায়া ফেলিতেছেন।

পূর্বে লিখিয়াছি যে, আমাদের জানান হইয়াছিল যে, অপরাধী H. Surgeon-কে চাকুরি হইতে অপসারিত করা হইয়াছে—কিন্তু ইরা অগ্রহাষণ-এর তারিখের সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখা গেল যে, উক্ত ব্যক্তিকে সকলের সম্মুখে না রাখিয়া—বদলি করা হইয়াছিল মাত্র, এবং বর্তমানে তাহাকে Tufanganj Hospital-এ Promotion দেওয়া হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এই তারিখের সাপ্তাহিক “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনও তদন্ত হইবার আশা কম—আর তদন্ত হইলেও তাহার নির্দোষী প্রতিপন্ন হইবার এবং আর একটি Promotion পাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা ঘাইতে পারে।

এখন আমার প্রার্থনা এই যে, আমার লিখিত বিবরণে সরকারের আশ্রিতব্যক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করুন এবং সাধারণকে একটি সম্পূর্ণ ধারণা করিবার সূচনা দিন। ইহা করা সম্ভব ও সমীচীন মনে করিলে, আমার এই পত্রই তাহার Basis হইতে পারে এবং আমার কোনও করণীয় থাকিলে উপদেশ প্রার্থনা করি এবং তদন্ত একখানি ভাটখানিকটও পাঠাইতেছি। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি P. R. De না হন, এবং নীল-রতন সরকার হাসপাতালে চাকুরি না করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য কিছুই করিবার নাই।”

মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই চিন্তাছেন

‘বাবু’ বাঙালীদেব ওপব মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সত্যিই

চটেছেন। কিছুদিন আগে বাবুদের (যাদের মধ্যে তিনি নিজে মণ্ডিগুপ্তার সদস্যবৃন্দ এবং শ্রীযতীন চক্ৰবর্তী প্রমুখ বিবোধীরা গণ্য।) চাল গম বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন স্মরণ থাকতে পারে। বিগত ৩০শে ডিসেম্বর জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসম্মেলন বার্ষিক শিবির পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী পুনশ্চ 'বাবু' সম্প্রদায়ের প্রতি সচেতন হয়ে পড়েন। তিনি বলেছেন, বাঙালী শক্তি অপেক্ষা ক্রীড়া সমৃদ্ধ পছন্দ করেন। তাঁরা সেনা বাহিনীতে যোগদানে বিমুগ্ধ, কায়িক পরিশ্রমের জন্য বাঙালীদের প্রয়োজন হয় ভিন্ন রাজ্যবাসীকে। সুতরাং কাঁচকালাই বাঙালী বাবুদের একমাত্র ভক্ষ্য পদার্থ হওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে নতুন স্বাভাবিক বিশেষ কিছুই লক্ষণীয় নয়। এ নিয়ে বহু বাদানুবাদ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ার আগেও আলোচিত হয়েছে বারম্বার। উল্টো বক্তব্যে বাঙালী চিন্তাবিদরা বলেছিলেন, একতরফা নিষেধাবাদ অনুচিত। কায়িক পরিশ্রমের জন্য যারা প্রস্তুত, তাঁদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই।

কলিকাতার এম্পায়রমেণ্ট এক্সচেঞ্জ কায়িক শ্রমে গব্বরাজী নন এমন আবেদনকারীরা বি বধাষক কাজকর্মে বহাল হয়েছেন।

অবশ্য বাবু বলতে মুখ্যমন্ত্রী যদি কেবলমাত্র কায়িক সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে থাকেন তবে স্বীকার করতেই হয়, ঐ কাজটিতে ভিড় বেশি (সম্প্রতি দক্ষিণীরা তাতে মোটা রকমের ভাগ হাসিয়েছেন)। এর কারণও হয়ত বা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের কায়িক পরিশ্রমের প্রতি অনীহা নয়। এর কারণ বাংলার সমাজচেতনায় কায়িক শ্রমের প্রতি ষড়্ধেষ্ঠ শ্রম্যার ভাব এখনও পর্যন্ত জাগ্রত হয় নি। স্কুল-কলেজে ঢুকেই বাঁরা কোনে "লাইন" ঠিক করে না রাখেন তাঁরা হয় করণিক, নয়, শিক্ষকতাকেই জীবিকারূপে বাছাই করেন। কায়িক শ্রমে অধিকতর অর্থগম্য হলেও সে পথে কেউ লক্ষ্য স্থির রাখেন না। এজন্য দায়-দায়িত্ব সাধারণের নয়। যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বাবুমানীর বিরুদ্ধে অনুপার্জিত ব্যবসায় করে থাকেন দায়িত্ব তাঁদেরই। তাঁরা মুখে শ্রমিক কৃষকের যতই গালভরা জয়ধ্বনি করে জবোদপথে হেড লাইন সংগ্রহ করুন, নিজেরা টুসটুসে ফুলবাবুটি হয়ে এবং ধাবতর মহলে হবনব করে নিজেরাই প্রমাণ করেন যে, কাঁচি ধতি, স্মৃতি

নেকটাই এবং থলথলে নাদা ভূঁড়িটি ন। দেখাতে পারলে মণ্ডিগুপ্তা থেকে কংগ্রেস ভবন পর্যন্ত কোথাও বিশেষ পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। অন্যান্য প্রশাসনিক সাবেব সুবাদেব কাছে তো কথাই নেই।

কায়িক শ্রম যারা করেন তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মৰ্যাদা জ্ঞাপনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করার দিকেই বরং যদি আমাদের বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা কিছুটা সক্রিয় দৃষ্টিদান করে তবে হয়ত কায়িক শ্রমের সঙ্গে ছুঃমাগের যে প্রশ্ন আজ বিজড়িত তা ক্রমশ অবলুপ্ত হবে।

সেনা বাহিনীতে বাঙালীর পিছিয়ে থাকাটা যে কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাগেই তা স্বীকার করবেন। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ একটি দুর্বল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যে মগজের মূল্যে বাঙালী এককালে আপন মায়ের কাছে মাথা উঁচু করে মুগ্ধ দেখাতে পারত; আজ সেই মগজেও দৌর্বল্যের, চাটুকারিতার ও স্বার্থসিদ্ধির ভেজাল ঢুকে সে মগজকে পোষা গজ-মগজে পরিণত করেছে। সুতরাং গব্বের বস্তু সে গুড়েও বালি।

সেনা বাহিনীতে বাংলা তার নিজস্ব অংশ রাখতে পারে নি। অবশ্য সেনাধিনায়ক নিজে বাঙালী। বর্তমানে নৌ-সেনাধ্যক্ষও বাঙালী, শ্রী এ কে চ্যাটার্জী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এতৎসত্ত্বেও বাঙালী রেজিমেন্ট নেই।

তুগ্ধ বাংলা দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে সেনা বাহিনীতে যোগদান করলে বাঙালী রেজিমেন্টের দাবি পূরণ করতে একদিন কতৃপক্ষ বাধ্য হবেন।

চাল পাচার

একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা হয়ত যথার্থ দেশকে ভালো বাসি না। গ্রামের লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এমন কি কুষ্ঠরোগীর

মারফৎ রোজদীন শহুরে বাবুদের জন্য মগ মগ চাল পাচার হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করি এমন দেশপ্রেমের টাটকা নজির আমাদের হাতে নেই বটে। তবে চাল পাচারে সাধারণ মানুষের যোগসাজস যে একে-বারেই নেই, বরং পদূলিশে-কালো-বাজারীতেই এই ঘৃণ্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এ কথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি।

কয়েকটি জেলার প্রাপ্ত চিহ্ন নিম্নরূপ

বর্ধমান:

"বর্ধমান হুগলী সীমান্ত হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের ঝাপানডাংগা স্টেশন দিয়ে দিন প্রায় ৫০০ করে নরনারী চাল পাচার করছে। ফলে এই অঞ্চলের চাউলের মূল্য কেঁজি প্রতি ১.২০ পয়সা হতে ১.৩০ পয়সা হয়েছে। বাহিরের খরিদ্দারদের জন্য স্থানীয় লোকেরা চাউল পাচ্ছে না। বর্ধমান হতে হাওড়াগামী ৪-৪০-এর ট্রেনে এই বিপুল পরিমাণ চাউল পাচার হয়। অথচ পদূলিশ পাহারা থাকে। এত দিনের মধ্যে এই প্রথম সৈদীন জামালপুর থানার কনস্টেবল শ্রীনিরঞ্জন দত্ত জোঁগ্রাম স্টেশন হতে ঐ ট্রেনে প্রায় ৬ কুইণ্টল চাউল ধরে থানায় পাঠিয়েছেন।" —দামোদর

রেল গার্ড ও কর্মীদের চোখেব ওপর এই ব্যবসা চলছে। যারা চালাচ্ছেন তাঁরা কি সাধারণ মানুষ?

চাল পাচারে বিশিষ্ট কংগ্রেসী শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ করে নদীয়ার স্থানীয় পত্রিকা "লোকসাবিতা" জানাচ্ছেন:

"কালনা ১৬ই ডিসেম্বর: বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যাহারা আন্তর্জেলী চোরাকারবারের কাজে লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কংগ্রেসকর্মীদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। সরকারী



কিয়ান
লন্ঠন
অম্বোৎকৃষ্ট

গৌরমোহন দাস

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৬ দীনা বাজার ট্রাট, কলিকাতা-১

লুপ্ত প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তা অনেক সময় মূলীয় চাপে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। মূলিশও অনেক সময় এরূপ কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে অনুরোধ-উপ-রোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ মহকুমায় বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আরো অনেকের নাম পুন্নিশের ডাইরীতে লেখা আছে।

চাল যখন ক্রমশঃ পচাচর হচ্ছে তখন কালনা শহর থেকে যে খোলা বাজারের চাল উঠাও হবে তাতে আর সন্দেহ কি? এ সম্পর্কে “মুদ্রাস্তর” পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা একটি চমকপ্রদ পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করেছেন যার কিরদংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলঃ—(মোট হরফ আমার)

“শুধু কালনা শহরে কেন, মহকুমা-ধীন সর্বত্র হাট ও গজগদালিতে চালের কোন আমদানী গত ১৮।২০ দিন হল হচ্ছে না। যদি কোথাও কোন চাষী অল্প কিছু চাল বেচতে আনে, তাে খন্ডেরেণ্ডে এত হুড়োহুড়ি লাগে যে, সকলের কাছে দাম আদায় দৃষ্কর হয়ে ওঠে। আর তা ছাড়া, নিয়ন্ত্রিত দাম কেঁজি প্রতি ৭৫ পরসাতে বেচতে চাষীরা রাজী হচ্ছেন না। চোরবাজারীর অভিযোগে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চাল পাচারের অভিযোগে শে কজন আসামী গত ২ মাস ধরে মহকুমা কোর্টে এসেছেন, হিসাব করে দেখা গেছে যে, তাঁদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ হল ২ কে-জি চাল পাচারের মামলা, ২৫ শতাংশ হল ৩ থেকে ৬ কিলো, ৮ শতাংশ হলো ৭ থেকে ১০ কে-জির মামলা এবং ১০ শতাংশ হলো ১০ কিলো থেকে ২০ কিলো চাল পাচারের মামলা।

এ পর্যন্ত বড় ধরনের চাল পাচারের রাঘববোয়াল একাটুও হাডেনাতে ধরা পড়ে নি—পাচার কিন্তু আজও অব্যাহত আছে। রোজ নিয়মিতভাবে ৭।৮টি ‘দুর্দৃষ্কত’ এলেকা দিয়ে হুগলী ও নদীয়া জেলায় রীতিমত খান পাচার হচ্ছে। কডনিং ও পাহারার কাজে ৫০টি চেকপোস্ট আছে এবং সংশ্লিষ্ট রক্ষীদের সংখ্যা হল চার শয়ের উপর। জেলা কডনিং ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে।

এদিকে কালনা শহরে নতুন আমন চাল কিলো প্রতি ১-৪০ পরসা হতে ১-৬০ পরসা দরে বিক্রী হচ্ছে। বিক্রী একান্ত সংগোপনে ও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে। পঞ্জী এলেকার কয়েকটি অঞ্চলে যেখানে নতুন আমনের ফলন

খুবই কম, সেখানে এই দর ১-৮০ পরসাতেও পেঁছেছে।”

—১৯-১২-৬৫

নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের একটি চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেল “মধ্যবিস্ত” সাপ্তাহিক পত্রিকায়। সংবাদটি নিম্ন-রূপঃ

“সম্প্রতি চন্দননগরে কোন এক জুটমিলের ওয়েল ফ্যোর অফিসার মিসেস চাটজারি বাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বর্গেশ্বর শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ শতাধিক লোক নিমন্ত্রিত ছিল এবং খুব চর্বাচোষ্যলেহ্য পের সহযোগে আতিথ্যের আপ্যায়িত করা হয় ঐ মহামান্যদের সমক্ষেই।

আগরপাড়ায় কোন এক বিয়ে-বাড়িতে পুন্নিশের কামেলা প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীতুলসী-চরণ মুখোপাধ্যায়কে দারোয়ানের ভূমিকায় দেখা যায়।” ১৬।১২।৬৫

জলপাইগুড়িঃ

স্থানীয় সাপ্তাহিক ‘নিরপেক্ষ’ তার ১৫-১২-৬৫ তারিখের পত্রিকার একটি সংবাদ দিচ্ছেনঃ

“হাসিমারার হাটে এক শ্রেণীর ফড়িয়া চাষীদের নিকট হইতে সমস্ত চাউল কিনিয়া লইয়া হাটে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য লাভ করিতে থাকার স্থানীয় জনসাধারণ ও বাগিচা শ্রমিকেরা অত্যন্ত দুর্ভোগ ভুগিতেছে।”

এমনতর দুর্ভোগের কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। গোটা চিত্র তুলতে হলে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়। সমুদ্রের জলবিন্দুটি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিপথে আনয়নের এই চেষ্টাই যথেষ্ট মনে করি। তিনি একবার বিন্দুতে সিন্দু দর্শনের স্বাদ নিল।

সর্বশেষে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত জনমত পত্রিকার একটি সংবাদ (২০-১২-৬৫) তাঁদেরই মন্তব্য সহ উদ্ধার কবি শুধু এইটুকু জানাতে যে, চাল পাচারের ব্যাপারটা বোধ করার ইচ্ছে থাকলে এ্যাদিনে তা সম্ভব হত। উদ্ধৃত সংবাদংশে এটুকুও স্পষ্ট হবে যে, এ ঘটনা আজকে নতুন কোনো বিস্ময় নয় বহুদিনের গাছপাকা ফলেরই ফলভাগী আমরা।

‘জনমত’ বলছেনঃ

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যে কালো-বাজারী বন্ধ করিতে ও জনসাধারণের মধ্যে স্ফুটভাবে খাদ্য বন্টনের জন্য

নতুন খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে পুন্নিশের রেশনিং-এর ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য আংশিক রেশনিং-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং এই নীতিকে চালু করিতে সরকার লেভী প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে হাটে বাজারে সরকারী এজেন্ট দ্বারা ধান ও চাউল ক্রয় করিতে সূচরু করিয়া-ছেন। যাহাতে এই ব্যাপারে দুর্নীতি না চলে তাহার জন্য না কি বাছিয়া বাছিয়া এজেন্ট ঠিক করা হইয়াছে ও কডনিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছে। জনসাধারণ ধৈর্যের সহিত সরকারী নীতির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ী সরকারকে ব্যাঙ্গালী দেখাইয়াছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি একটি আত-জাতিক চোরাকারবারের ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ঐ স্থানে কোন প্রকর কডনিং-এর ব্যবস্থা নাই। রাতারাতি চাউল পাচার হইয়া যাইতেছে এবং কিছুদিন পর ঐ চাউল “নেপালী চাল” মার্কী লইয়া আসিতেছে। গত বৎসর এই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল। এবং একই ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম অঞ্চল ও নেপালের ভদ্রপুর অঞ্চলে গুদাম রাখিয়াছিল। এই সব ব্যবসায়ী লাইসেন্স লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর হইতে চাউল জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে না আনিয়া সোজা-সুজি ভদ্রপুরে লইয়া গিয়াছিল। তারপর ভদ্রপুরের চাল হইয়া গেল। আমরা খুব কড়া করিয়া শিখিয়াছিলাম কিছু অসং ব্যবসায়ী ধরা পড়িয়াছিল কিন্তু ছড়া পাইয়াছে। আবার সেই ব্যবসা চালিতেছে। কয়েক দিন পূর্বে শিলিগুড়ির আশেপাশের হাটে চাউল উঠিতে থাকে এবং যথারীতি এক টাকা কে-জি দরে বিক্রয় হইতে থাকে এবং কোন কোন স্থানে এক টাকা অপেক্ষা কম দরে। কিছু সমাজসেবী ও কিছু ছন্দবেশী ব্যবসায়ী তাহাদের উপরে হামলা করে—তাহাদের বহুব্য সরকারের কাছে বেচিতে হইবে। ফলে গ্রামের লোক আর চাউল লইয়া আসিল না। চারদিন শিলিগুড়ি হাটে চাউল ছিল না। পরে পুন্নিশের পাহারায় ধরুধর ব্যবসায়ীদের “নেপাল মার্কী” চাউল বেশি দামে বিক্রয় হয়। শিলিগুড়িতে আজও কডনিং-এর ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে আশেপাশে দুর্নীতি আরও বাড়িয়াছে। দার্জিলিং জেলাশাসক এই ব্যাপারে কি চিন্তা করিতেছেন আমরা জানি না।”



বাড়ি থেকে বোরয়ে পিছনেব দরজাটা
দৈনে ভোজয়ে দিলে ঘোফিম আস্তাবলে গেল।

খানিক আগে জন্মানো বাচ্চাটা ঘোফিমের
অভিজ্ঞাত মাদি ঘোড়ার স্তনের বোটার মূখ
দিয়েছে—এই ঈষৎ উত্তেজিত বিশৃঙ্খল
দৃশ্যেব সমুখে দাঁড়িয়ে ঘোফিম পকেট
হাতডাতে লাগল, কাঁপা হাতে বের করল
তামাকের পাউচ, সিগারেট পাকল, আর
তখনই সে প্রথম কথা খুঁজে পেল।

“তাহলে হল তোমাব বাচ্চা, নব? খুব
ভালো সময়ই বেছে নিরেছ তুমি—” তাব
গলার স্ববে একটা তিক্ত ঝাঁজ ছিল।

ঘোড়াটা যখন আস্তাবলের অনাদিকে
গিয়ে জুইয়ের খলে নিয়ে চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে
মানা ছিটেতে লাগল, ঘোফিম দরজার পিঠে
হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াব বাচ্চাটাকে বৈরীর
চোখে দেখেছিল।

“এটাকে নিবে কী করি?”

বাচ্চা তখন ভাব রোগা রোগা ভেল-
ভেটের মতো নরম পায়ের খেলনা ঘোড়ার মতো
উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘোফিম তাব তামাকের
মাগ ধরা বড়ো আঙুল ছুঁড়ল বাচ্চার দিকে।
“আমি কি ওকে স্নেহে ফেলব?”

মাদি ঘোড়াটা তার রক্তের ছিটে দেওয়া
চোখ ঘোরাল, পিটপিট করলে, আর তাঁর-
দৃষ্টিতে একবার প্রভুর দিকে তাকাল...

স্কোয়াজন কমান্ডার একটা পেতলের চা-
ন্ডবা মগ হাতে বসেছিল—ঠিক যেভাবে সে
অলোরাবের হাতল থাকে বৃশ্বে কাঁপিয়ে
পড়বার আগে। তন্মাত্রা চোখে একদম
তাকিয়েছিল আলোর দিকে।

...“তামাতেই হোক আর কালোই হোক—
দুই করে দেব ওকে, বাস্। ঘোড়ার বাচ্চা

সংগ নিলে আমারেব ঠিক একদল জিপসীর
মতো দেখাবে”—ঘোফিম ঘোষণা করল।

“এ হে, আমিও ঠিক এই কথাই বলতে
চাইছিলাম। জিপসীর মতো—তাছাড়া যদি
সি.ও আসেন, কী হবে?”

“ঠিক—যদি সি.ও আসেন আমাদের
বেজিমেন্ট ইন্সপেক্ট করতে, আব ঘোড়ার
বাচ্চাটা ল্যাজ উঁচু করে ভিড়িং বিড়িং নেচে
লাইনের প্রথম সারিতে গিবে দাঁড়ায়—সেটা
সমস্ত রেড-আর্মির সামনে আমারেব লক্ষ্য
ফেলবে।”

পরের দিন সকালে একটা রাইফেল হাতে
নিযে ঘোফিম বাড়ি থেকে বেরল।

“ঘোড়ার বাচ্চাটাকে গুলী করতে যাচ্ছে?”
স্কোয়াজন কমান্ডার জিজ্ঞেস করল।

ঘোফিম হতাশভঙ্গীতে সাথ দিল; তাবপর
বাঘ হয়ে চল গেল আস্তাবলে।

স্কোয়াজন কমান্ডার মাথা কড়কিরে দাঁড়িয়ে
গুলী বর্ষ শোনবার জন্যে তৈরি হল।
এক মিনিট কাটল। দু’মিনিট। কিন্তু ওদিকে
কোনো সাড়া নেই। একটু পরে মনমবা
বিপর্যস্ত ঘোফিম আস্তাবলের কোণ থেকে
বেরিয়ে এল। —“বেশ। কী হয়েছে?”

“আমার মনে হচ্ছে রাইফেলটা জ্যাম হয়ে
গেছে।”

“বটে। দেখি তোমার বন্দুক।”
ঘোফিম অনিচ্ছকভাবে রাইফেলটা দিল
কমান্ডারের হাতে। স্কোয়াজন কমান্ডার
রাইফেলের পিছনটা খুলে নিরীক্ষণ করল।
—“এর মধ্যে কার্তুজ নেই।”

“অসম্ভব।” ঘোফিম অবাক হল।

“আমি বলছি এতে—নেই।”

“আ—আমি বের করে ছুঁড়ে ফেল
দিয়োছি ওখানে—আস্তাবলের পেছনে।”

স্কোয়াজন কমান্ডার বাইফেলটা সবিয়ে
রাখল। —“হী হী, ঠিক আছে, চুলোব বাক
এটা। ওকে বাঁচতে দাও কিছুদিনের জন্যে—
আর কি বলা থাকে।”

মাসখানেক পরে ঘোফিমের সৈন্য-
বাহিনী ইউনিট একটি কসাক সৈন্যদলের সংগ
মুখ্বে জড়িয়ে পড়ল উস্খপাবন্দ্য গায়েব
কাছে। সূর্য ডোবাব একটু আগে দু’দলে
হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ হল।

এগেবার সময় ঘোফিম বিচ্ছিন্নভাবে
তাদের প্যাট্রনের পেছনে পড়েছিল। ঘোড়ার
মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল—না চাবুক, না
ঘোফিমের তীর প্রহর, কিছুই ঘোড়াটাকে
জোরে চালাতে পাবছিল না। মাথা উঁচু
করে বর্ষগলায় হ্রেবধনি ববতে ববতে
ঘোড়াটা অপেক্ষা ববছিল, বভরণ না বাচ্চাটা
পিছন থেকে লাফাতে লাফাতে এসে তাব সংগ
ধরল।

ঘোফিম লাকিয়ে নামল। খাপে ঢোকাল
হাতেব অলোরাব; রাগে তাব মুখ বিকৃত
হ। উঠেছিল। হ্যাঁচকা টানে কাঁধ থেকে
নামিয়ে নিল রাইফেলটা।

সৈন্যবাহিনীর ডানদিকের লোকব
হোয়াইট গার্ডের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।
ভীষণ চড়াইয়ের কিনারাব সৈন্যব আন্দোলিত
ভিড় এগোচ্ছিল, পিছিরে আসিছিল, যেন
হাওয়াব ঠেলায় চলেছে। তাবা নিঃশব্দে যুদ্ধ
কবছিল। কেবল মাটি কাঁপছিল ঘোড়ার
খুঁবে খুঁবে।

ঘোফিম একদর দেখল কী হচ্ছে, তাবপর
বাচ্চা ঘোড়াটাব যেন-কুঁদে-তোলা সুন্দর
মাথার দিকে রাইফেল তাক কবল। উত্তেজনা
হাত কাঁপার দরুন, কিস্বা অন্য কোনো কারণে,

চিহ্ন চিহ্ন করে উপহাসের— ভঙ্গীতে
লাগি ছড়ল বাচ্চাটা; শূরের ঘারে পেরুরা
খুলোর ঘূর্ণি ভুলে—কিছুদূর দৌড়ে গিরে
ঝামলা।...

সে রাতে সৈন্যবাহিনী স্তম্ভপ-য়ের একটা
সম্মীর্ণ গলির মধ্যে ছাউনি ফেলোছিল।
সৈন্যরা যথাসাধ্য কম ধূমপান করে কাটাচ্ছিল।
ঘোড়ার জিন পছন্দ কেউ খোলে নি।

একদল টহলদার ডল নদীর কাছ থেকে
ফিরে এসে খবর দিল বিশাল শত্রুসৈন্য নদীর
ওপারে পৌঁছেছে।

ভয়ের আগে নরম আলো-আঁধারিতে
স্কোয়াড্রন কমান্ডার ফ্রোফিমের কাছে এসে
তার পাশে বসল।

“ফ্রোফিম ঘুমোচ্ছো?”

“না স্যার, কিছুক্ষি একটু।”

কমান্ডার শেখরতের ব্যাপসা অনুজ্ঞা
তার গুলোব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।—
“তোমার ঘোড়ার বাচ্চা হাত থেকে ছাড়ান
পেতে হবে, ফ্রোফিম। লড়াইয়ের সময় ব্যাটা
সকলকে ভয় পাইয়ে দেয়।”

“কী করব—বেই বাচ্চাটাকে দেখি, আমার
হাত কাঁপতে থাকে—কিছুতেই ঠিকমতো
জলোয়ার চালাতে পারি না। আসলে ঠিক
গাঁ-ঘরের পোষা জন্তুর বাচ্চা মতো লাগে।”

“এটা ওর থাকবার জায়গা নয়, এই
হৃদয়ের মধ্যে—”

কমান্ডার স্বনান্দুরভাবে হাসল। কিছু
ফ্রোফিম হাসিটা দেখতে পেলো না। সে চুপ
করে রইল। তার শিশিরে ভিজে ঠাণ্ডার
কাঁপতে কাঁপতে গ্রেট কোটে নিজের মাথা
ঢেকে আঁচল তাড়াটাড়ি ছুঁসিয়েও পড়ল।

দুপুরবেলা নদী পার হওয়া শুরুর হল।
স্কোয়াড্রন কমান্ডার তাঁর তামাটে হালকা
ঘোড়ার পিঠে বালির গর্ত থেকে নদীর ধার

পর্যন্ত দুলকি-চালে এল, তারপর সবার সাজ-
কাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে চতুর্দিকে জল
ছিটিয়ে তার পিছনে জমা হল সৈন্যবাহিনী—
একশ’ আটজন অধীন মানুষ আর অতগুলি
বিভিন্ন রঙের ঘোড়া জলে নাকল। জিন-
গুলো তিনটে দাঁড়ানা নৌকার চাপিয়ে নদী
পার করার ব্যবস্থা হল। তিনটে নৌকার
একটাতে দাঁড় টানছিল ফ্রোফিম। সে নিজের
ঘোড়া প্ল্যাটুন কমান্ডার নেচেপুয়েনকোর
হাত দিয়েছিল।

নৌকার মধ্যে দাঁড়টা নাচতে নাচতে
ফ্রোফিম উঠে দাঁড়াল, রোদের জন্যে চোখ
পিটপিট করতে করতে ঘোড়া আর মানুষের
ভিড়ে—বাচ্চা ঘোড়ার আঁহরোষ্টের মত মাথাটা
খোঁজাব আকুল অকাঙ্ক্ষার জলের দিকে
তাকিয়েছিল।

একসময় ক্রান্ত চোখে ফ্রোফিম বাচ্চাকে
খুঁজে পেল। ছোট ঘোড়াটা অনভ্যস্ত পা
ছুঁড়ে সাঁতার কাটছিল। কখনও জল ছেড়ে
উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল, কখনও জলের এত
তলাষ ডুবে যাচ্ছিল যে নাকের ডগাও চোখে
পড়ছিল না।

ঠিক তক্ষণি দমকা হাওয়াব জলেব মতো
সূক্ষ্ম কাঁপ ছেঁচবদনি ফ্রোফিমের কানে এল :
“চিহ্নিহ্নি”।

সেই তীক্ষ্ণ আত্নানব ফ্রোফিমের হৃদয়ে
আঘাত কবল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের যুদ্ধে
ফ্রোফিম কখনও ভেঙে পড়ে নি। নিম্পলক-
চোখে মৃত্যুর মুখামুখি হয়েছিল সে বিনা
শঙ্কায়। কিন্তু এই মুহূর্তে খোঁচা খোঁচা
লাল দাড়ি আড়ালে তার মূখ ছাইয়ের মতো
পাশাপাশি হয়ে উঠল।

দাঁড়া আঁকড়ে ধরে সে স্রোতের বিবৃন্দে
বাইতে লাগল, যেখানে বাচ্চাটা জলের একটা
ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দলটা

যেখানে পাব হচ্ছিল, জলেব টান বাচ্চাকে
সেখানে থেকে অনেকদূরে নিয়ে গিরোছিল।
ছোট ঘূর্ণিটা ওকে জেরে ঘোরোচ্ছিল, আর
হিষ্টে তরঙ্গসকল সবুজ জল ঘোড়াটার পিঠে
চেটে যাচ্ছিল।

ফ্রোফিম বিকারাক্ষমভাবে দাঁড় আহুড়ে
ফেলোছিল জলে—কাঁকুনি খেতে খেতে নৌকে
ছুঁটিছিল।

মেশিন-গান চালানোর একটা চাপা
বিস্ফোরণ আর ক্রম্ভ গুলীব কাক জলে এনে
পড়ার আওবাচ্ছ হল।

সিঁদুর ক্যানডাসের জামা পবা একজন
অফিসার নিজের রিডলাভার দেলাতে দেলাতে
চেঁচাচ্ছিল।

বাচ্চাটা আত্ন শূন্য গলাষ ডাকছিল;
তার কাঁপ তীক্ষ্ণ-গলাব কামা ধীরে ধীরে
কমে আসছিল। ঠিক শিশুবৈঠেব কামার
মতো শোনাচ্ছিল বাচ্চা ঘোড়াটার ডাক।

রাইকেপটা চেপে ধবে কাঁপতে কাঁপবে
ফ্রোফিম ঘূর্ণির তলায়-তলিষে-বাওয়া মাথার
নিচেটা লক্ষ্য করে গুলী চালাল। তাবপব
নিজের বটুজোড়া ধুলে একনিম্বাসে কিছু
বিভবিড় কবতে করতে দুই বাহু ছাড়িয়ে
কাঁপিয়ে পড়ল জলে।

নদীর ডান পাড়ে ক্যানডাস শার্ট-পরা
অফিসার গজ্ঞন করলেন : “গুলী কবো।”

ঘোড়ার বাচ্চা কছে পেঁচাতে ফ্রোফিমের
মিনিট-পাঁকে সময় লাগল। তার নিম্বা
বন্ড হয়ে আসছিল, অবসম্ভব মতো হেঁচবি
তুলতে তুলতে ঘোড়ার কনকনে ঠাণ্ডা পেটে
তলটা জড়িয়ে ধরে সে বার্দিকেন তীব্রের দিবে
চলল। শেষ প্রাণান্তকর স্ফেষ্টার সাঁতার
দিচ্ছিল সে, করে যাচ্ছিল তার পায়ের তলা।

অবশেষে বাচ্চা ভিজে তেলা শবীব-
টাকে বালির উপর টেনে আনল। ফুঁপিয়ে
কাঁদতে কাঁদতে খানিকটা সবুজ জল বমি
কবে ফেলল ফ্রোফিম। তাবপব হাতদুটো
অস্থিরভাবে নড়াচ্ছিল বালির উপর। টলতে
টলতে উঠে দাঁড়াল, দুপা এগোল বালির উপর
দিবে, কেঁপে উঠল একবার, তাবপব মুখ
থুপড়ে পড়ে গেল সে। মনে হল, একটা
তীক্ষ্ণ ছুরি বিধে গেছে তার হৃদকে; পড়বার
সময় সে গুলীর শব্দ শুনল।

কেবল একটি গুলী পিঠে এসে বিধল
—নদীর ডান পাড় থেকে ছোড়া।

আব নদীর ডান পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্যানডাস
শার্ট-পরা অফিসারটি যখন ধুমায়িত খেলটা
ফেল দিল, ঘোড়ার বাচ্চা কছে থেকে কবেব
পা দূরে তখনও ছটফট করছিল ফ্রোফিম।
কড়ো পাঁচ বছর ধরে কোনো শিশুকে চমো
খেতে না পাওয়া তাব ফাটা ফাটা নীল ঠোঁট
স্মিতহাসি আর রক্তের ফেনার মাখামাখি হুস
রইল।

লেখক : মিখাইল শলোখফ

অনুবাদ : সত্যজিৎ চক্রবর্তী

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতার অমর অবদান

= অরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বাস্কমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ২৭রাজা অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাস
- আনন্দমঠে—‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের পুস্ত-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—ঋষি বাস্কম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অঙ্গীকৃতাক্ষর সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১৫

ছেলে নমিতা চক্রবর্তী



পাঁচ মাসের বাচ্চা। হাসত, বড়বুড়ি কেটে ঠোঁট গোল করে বলত—বু-উ-উ। গোব্দা গোব্দা হাত-পা। মায়ের চুলের মূঠি আঙুলে জড়িয়ে নিত শক্ত করে। সেই বাচ্চা সোনাবালার হবে গেল তিন দিনের জুবে। সুন্দর ছেলে খেলছিল বাবাম্মার কাঁধার শূয়ে। কোথা হতে এল একটা হুলো বেড়াল, এটো-কটি কেলো গেল তার গারে। শূচিবাই শাশুড়ীর। সেই ভগ্নস্বয়ংবেলা হুড়হুড় করে ছেলের গারে ঢেলে দিল তিন ঘটি ঠান্ডা হিম-জল। অমৃত্য মাসের দোবসা দিন, এমনিতেই ঠান্ডা লাগবার ভয়ে কাঁধা দোলাই গারে চাপায় মানুষ, আব এতো একটা ফটি বাচ্চা। রাত্তিই জ্বর এলো হুড়মুড় করে ছেলের। কি কয়েক ডাক! নিশ্বাস ফলতে পাবে না ছেলে। কঁকিয়ে কাঁদছে, খাচ্ছে না মায়ের বুকের দুধ। কত ডাকল, আদর করল সেনা। কিন্তু ছেলে তো চোখ চায় না, ডাক্তার-বাসি কিছ; না। কেবল তুলসী-শাতার রস মধু দিয়ে খাওয়ালে কখনো জ্বর নেমে। তাও যে সে জ্বর নয়, 'নিমুনি' জ্বর। দুক ফেটে গেল সোনার। উবুড় হয়ে পড়ে মাদতে লাগল সে।

সোনার শব্দে দমদমায় নামকরা মানুষ ঠরনী ম'ডল। দশোটি তাল গাছ বহুবে জল নিল সে এককালে। হাঁড়ি হাঁড়ি

বানাত। কি তার স্বাদ! কত বাদ-ভায়েরা তবণীর রস খেতে আসতো কিলেতী মাল ছেড়ে। এখন, এই বড়ো বয়সে আর গাছ কাটতে পাবে না সে, তবে রস কিনে এখনো ব্যবসা চালায়। তাতেও টাকা আসে মন্দ না। খোলার চাল দেওয়া পাকা বাড়ি, গিল্লীর গারে আছে দু-চার ভরি সোনার গরনা। লুকানো পুঞ্জিও আছে কিছু। মেয়ে তিনটির বিয়ে হয়েছে ভাল ঘর-ববে। ছেলে? ছেলে ঐ একটিই—মাণিকলাল। মাণিক চাকরি কবে। ভাল চাকরি। কলকাতার সেন সাহেবের জ্যাইভার সে। মোটা মাইনে—দেড়শো টাকা। খাওয়া আবার পরাও। খাঁকি রঙ-এর পাংলুন আর সালা ধবধবে শার্ট পরে গাড়ি চালাতে হয় মাণিককে, সব দেন মনিব। হোস পাখের চম্পল কিনতে হয় তাকে। বড়লোকের বাড়ি, ব্যবসাদারের বাড়ি চাকরি করে মাণিকের মনেও আছে বাঁবসা—স্বাধীন ব্যবসা করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিছু টাকা জমাতে পারলেই দমদমায় নিজেব বাড়ির একদিকে এক খুঁপাি তুল সেও আরম্ভ করে দেবে কাজ-কারবার। কি কাজ আর করবে সে? মোটর ইঞ্জিনের ডাবগতিক মোটামুটি জানা আছে তার, জানে সাইকেল মেবামত করবেও। ছোট করে এই ব্যবসাই আরম্ভ হবে মাণিক। প্রাণপণে টাকা জমাচ্ছে তাই।

কিন্তু কি যে বাদ জানে শহর কলকাতা, দণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত এড়াতে পাবে না মাণিক। হরেক রকম সিনেমা, ভাল ভাল খাবার, সিগারেট, মাঝে মাঝে একটু বিলেতী ইয়ে—হুস কবে বেরিয়ে যার মাণিকের জমানো টাকা। বাড়িতে অবশ্য টাকা-পয়সা বিশেষ দিতে হয় না। হল বা বাপের জন্য নিয়ে গেল মটনের মাংস, মায়ের জন্য দোড়াপাতা, সোনাবালার জন্য লুকিয়ে কিছুট, মাদ্রাজী টিপ। তবে এদানী ছেলেটা হয়ে ভারি মেজাজী হয়ে উঠেছে বউ। কুমকুমি আনো, রঙচঙে জামা, পায়ের জন্য বুপোর মল—হাজার বায়নাচ্চা। তবে প্রথম সন্তান, আড় চার, হাসে পুটেপুটে করে—নিজের মনেও ওঠে নানান জ্বিনিস দেবার ইচ্ছে।

ছেলে ষাওয়াতে মনটা খারাপ হলো মাণিকেরও। তবে কি ভগবানের ইচ্ছে, একটা সুযোগও চলে এল একেবাবে মাণিকের হাভের মধ্যে। সেনসাহেবের ছোট ছেলে, ছোটসাহেবের একটি ছেলে হল একেবাবে গিছুবন কাঁপিয়ে। হাজার টাকা খবচা, নার্সিং হোস, মস্ত বড় ডাক্তার আব বাড়িব লোকদের হিমশিম খাইয়ে শিশু এল একদিন ভোরবেলা পৃথিবীতে। ছেলে, সুন্দর, ফুটফুটে কিন্তু ভীষণ দুর্বল। অনেক ঘর অনেক চেষ্টা করতে হবে তাকে ভাল রাখবার জন্য।

সেনসাহেব আর সেনসাহেবের চিন্তার কখনো গাড়ি চালাতে চালাতে শোনে মাণিক আর অবাক হয়ে ভাবে কেনন করে দুর্বল হল ছেলে। কত দুঃখ-কষ্ট, ক্রীম-কেক্স, মাস-ডিম। বছর-বছর হাওয়া বদলানো তবু ছেলেকে সবল করতে পারল না ছোট সেনসাহেব। সোনালী গাভী খেত কেবল ভাত আর ডাল। মাঝে মাঝে এক-আধ টুকরো মাছ। ফল-দুধ-ডিম। সে গাভী স্নায়ের ভোজ। বছরে হয়তো সাতদিন খায় নি এমন ভাল জিনিস। কিন্তু ছেলেটা হয়েছিল কি মোটকা, কি জোর ছিল গলায়।

সত্যি চিন্তিত হয়েছিলেন সোনাল সেন এবং তাঁর স্ত্রী। দুর্বল শিশু। ডাক্তার বলেছেন, মায়ের দুধ একান্ত দরকার তবু কিন্তু শিশুই মায়ের বুকে নেই সেই প্রাণ-মগ্নারী অমৃত। শব্দে ভুবনের ওপর প্রথম দুর্বেব আলো পড়লে যে বর্ণ বিচ্ছিন্নিত হয়, তেমনি গায়ের রং লীন। অনিন্দ্য দেহবস্ত্র। কেবল ইংরেজী নয়, ব্রহ্মও বঙ্গের অনর্গল। সন্তত গুণ রয়েছে রূপের সঙ্গে কিন্তু ছেলেকে পালন করতে পারবে না সে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন ওয়েট-নাস' রাখবার জন্য। ওয়েট-নাস' দুঃখ-মা। ওপরভার কি মেনকার মধ্যে ঘাট। শূনে চমকে উঠল মাণিক। নতুন ঘাসের জন্য দুঃখ-মা রাখবেন সেনসাহেব। পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবেন তাকে। পঞ্চাশ টাকা। দুঃখ-মাসে একশো। কত কি করা যায় সে টাকা। দুঃখ-মাসে মেনকার হাত কাড়িয়ে মিনতি কবল মাণিক।

আমার বোকে ঠিক করে দাও দিদি।

—তোমার বোকে? একটু ভাবল মেনকা।

গাভী মবে গিয়েছে এমন মেরে কি রাখবে সেনসাহেব।

—স্বাস্থ্য কেনন তোমার বোকে?

—স্বাস্থ্য? ভীষণ জোয়ান। দুটো বাবে খেয়ে কুরোতে পারবে না। জোয়ালো গলায় কাল মাণিক।

—আহা! কি কথাব গী। আচ্ছা, বলে দেখব মেনসাহেবকে। মন্সিক কি জান। স্বাস্থ্য মন্সিকটা আব প্রকাশ করল না মেনকা।

একটু ভাবতে হল মিসেস সেনকে। লীনার সতত ছিঙ্কেস করলেন। স্ট্রাইভার মাণিকের ঝট? স্ট্রাইভারেরও বট? কি কাণ্ড। বাচ্চা নেই? তাতে কি। বরং ভালই, সবটা মন অনগেহড থাকবে।

সাতদিন পরে ঘোমটা-টানা কালো-কালো সোনালী এসে জড়েন্দো হয়ে দাঁড়াল সেন-মাণিকের সিন্ডলার আর মেনকার চোখের ইসারা পেয়ে সিস্টেটের ওপর কপাল টুকল বার দুই।

স্বাস্থ্যবতী আঠারো বছরের মেয়ে, বুকে তার অকুরন্ত জীবনপ্রবাহ। রোগা, দুর্বল সব পাউন্ডের বাচ্চা খেয়ে কুরোতে পারে না সে দুঃখ। বুকের কাপড় ভিজিয়ে সিস্টেটের ওপর দাম খায় শক্তিরে থকে জাঁজিত

ভাগ। বাচ্চাকে দুখ দিতে দিতে কাদে সোনা-বালা। মনে পড়ে যায় শক্ত মোটোসোটা নীলকে। নীল, নীলমাণিক, নীলমাণিক—কত নামেই না চুপিচুপি ছেলেকে ডাকত সোনা। আর ছেলেও শিখছিল চোখ কাঁপিয়ে সাদা দিতে।

ওমা! একদিন হঠাৎ চমকে উঠলো সোনা। এও তো শিখেছে বুকের দিকে চেয়ে হাসতে, অবিকল নীলুর মতই এও উপড় হতে শিখেছে। বাট! বাট! ছেলের গায়ে চোখের জল পড়তেই নিজেই চোখ ব্রাভিলে, ছেলেকে চুমা খেল সোনা। ভারী খুশি লীনা। বিবির ওজন বেড়েছে প্রায় দশ পাউন্ড এই ক্যাসে। এখন আর ওকে কোলে নিতে একটুও ভয় হয় না। বেশা বানিকটা সময় ভালই লাগে আদর করতে। সোনালীকে একটা সিন্কেস শাড়ি দিয়ে দিল লীনা।

সেনসাহেবও খুশি। বেশ মেরে সোনা। শান্ত আর সরসেরে বড় গুল খুব পরিষ্কার। বিবির ওপরও মায়া হচ্ছে খুব। তিন মাসের মধ্যে একদিনও নিজের বাড়িতে যায় নি। বেতে বললেও বিবির অসুস্থি হবে ভেবে বাড়ি নাড়ে। সোনার মাইনে বাড়িয়ে সন্তরটাকা করে দিলেন, মাণিকের কলসার কাবখানাটির দ্বিত পত্তন হল।

দুঃখ-মাসে উঁচু করে খেয়ে বিবিকে চোখ পাকিয়ে ধমক দের সোনা আর বিবি ঝলঝল করে হেসে সোনার নাকে হাসি খায়। কত রসই যে শিখেছে দুঃখ-মাসে। সেই ডাকাতের মতই চুল টানে, বু-উ-উ বলে, বু-বু বলে, লাগি ছোঁড়ে ছোট ছোট শায়। সব বেহুস সোনা। সেই, তার সেই নীলুই ফিরে এসেছে ছল করে রোগা দুর্বল হয়ে অন্য মায়ের পেটে। না হলে যে আবার হিমের রাতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে ফের নিমর্দন লাগাতো ওকে শাশুড়ী। বিবির গালে গাল লাগিয়ে সোনা ডাকে—নীলু, নীলমাণি আমার। আর হেসে কুটিকুটি হয় বিবি। ও বেহুসে ধবা পড়ে গিয়েছে, ধরা পড়ে গিয়েছে মায়ের কাছে। বোকা বোকা না যে ধবা না পড়ে উপায় ছিল না। স্বতই সিন্কেস জামা পরাক, পাউডার মাখাক, গায়ে ঠিক আছে সেই দুঃখ দুঃখ গন্ধ। গায়ে আলিভ তেল মাখিয়ে তারপর সাবান বুলাবে বিবিকে স্নান করার সোনা। -নেয়ে উঠে, পাভলা চুলে লাল টুকটুক নরম চিরুনী বোলানো, হালকা জামা আর এক পেট খেয়ে মহারাজ যান ছোট মেনসাহেবের ঘরে। সেইতো এবাং মা হয়েছে নীলুর। তা হোক গে। তার জন্য হিৎস করে না সোনা। লীনা সেনসাহেব মা হয়েছে বলেই না নীলুর এত রাজ-ঐশ্বর্য। বেচে থাক নীলু, কোল-জোড়া হয়ে থাক তাব নতুন মায়ের, সোনার বুকেও ঠান্ডা থাকুক।

সোনা হিৎস করে না, কিন্তু লীনা? বিবির মা? হি হি। এও কি একটা কথা যে লীনা হিৎস করবে ছেলের ওয়েট-নাস—

স্ট্রাইভারের ঝটকে, মাইনে পেয়ে যে বিবিকে দুখ খাইয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। মনে ভাবলেও হাসি পায়। কিন্তু কি যে মনের গতি, তার সেই গহীন অন্তরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। কি যেন অল্প একটু ব্যথার অনুভূতি। কোথায় বসে আছে দুঃখ। যখন ক্রাবে যায় বেড়ান, গান করে—সুখের সেই খলমবে কলগলিতে দুঃখের ব্যাপও টের পায় না লীনা। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন দেখতে পায় সোনার গলা জড়িয়ে ধরে তার সাবা দুখ লালে ভিজিয়ে দিচ্ছে কিংবা—আঁকড়ে ধরে আছে সোনার চুল আর সোনালান কালো দুখ দিয়ে সুখের আশ্রয় করে করে পড়ছে তখন লীনার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে।

একদিন মনটা যখন বোশ ধরাপ, স্বামীকে হাসতে হাসতে বলেই ফেলল লীনা—শোন, বিবী আমায় চেঁচের ওর দাইকেই বেশি ভালবাসে।

অমলও হাসল। সে তো স্বাভাবিক, আমি তো ছোটবেলা মায়ের চেঁচের পিসিমাকে অনেক বেশি ভালবাসতাম। সেই ছোটবেলা আর পিসিমাকে একটু মনে পড়ে বুঝি অন্য-মনস্ক হয়ে গেল অমল। লীনার কিন্তু রাগ হল। কোথায় পিসিমা আর কোথায় একটা ঝি। কিন্তু অমল অমনি। শ্রেণীব্যব মানবে না সে। বাপের সঙ্গেও এই নিয়ে সর্বদা মতবিরোধ তার। দর হতে বেরিয়ে এল লীনা। বিবি রাতে বসেছে, তার দুই পা ছাড়িয়ে সোনা চাপাড়াচ্ছে—

আকা ডোম বাবা ডোম ঘোড়া ডোম সাজে—

চেল, ঘাঁহর, কাঁকর বাজে।

বিবি হাসছে। দুখটা বিশেষ ভাল লাগল না লীনার, তবু হাসিমুখে সোনার দিকে চেয়ে বিবিকে স্নেহের জন্য হাত বাড়াইল সে। সঙ্গে সঙ্গেই সোনার কোলে কাঁপিয়ে পড়ল বিবি। জেয়ে সোনার গলা আঁকড়ে বলতে লাগল—না না না। পলকে প্রায় ঘটে গেল। সোনার প্রতি যে বিশ্বাস লুকানো ছিল মনের গোপন গহ্বর, সে উঠে এল, প্রবল বেগে আচ্ছন্ন করে দিল লীনার সব স্বচ্ছ বুদ্ধি।

অমল, মিসেস সেন এমন কি স্বয়ং সেনসাহেব পর্বত অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন। লীনার এককথা—একটি একটি বিদায় দিতে হবে সোনালীকে। দোষ? না দোষ কিছু করে নি সোনা, এমন ওকে আব রাখতে চায় না লীনা। বিবির এক বছর কয়েস হয়েছে। বুকের দুখ থাকে না গত মাস হতে সুতরাং সোনালীকে দিয়ে দরকার নেই। ভাল কি জানা আছে, লীনার বাপের বাড়ির ঝি। বোঁদীর বাচ্চাকে দেখেছে সে, তারই রংবে লীনা। স্বামীর-শাশুড়ী গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং অমল শেখবার বোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বোঁদীকে গেল বাড়ি হতে। বোকা চোখের আশ্রয় তাকানো নিয়ে সেই মাখ মাসের

অবিপ্রসন্ন বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বের হতে হল সোনাকে। মাগিককেই নিয়ে যেতে হল।

রাসে কান-মুখ দিয়ে কাকি বেরুচ্ছিল মাগিকে। মাসে মাসে সন্তর টাকা—একরাশি টাকা, সোনার খালায় রাজভোগ। সেই চাকরি খোরাল হাবামজাদী বউ। উঃ! পথে রাগ দেখাতে পারল না, তাই আবে বাড়ল সে রাগ। বাড়ি এনেই দুই লাখ লাগাল মাগিক বউয়ের পিঠে। হতভম্ব হয়ে গেল মাগিকের বাপ-মা। এতদিন পর বাড়ি এনেই বউকে মার! আবার যেমন-তেনন মাং নয়, একেবারে তুলেধোনা কবে ছাড়ছে। ব্যাপার কি!

ব্যাপার শোনা গেল মাগিক পরই। এক ধাক্কা বউকে উঠানে বের করে দিয়ে মাগিক বাস পড়ল ঘরের-সেকের ওপর। জানাল বাপকে—বউটার চাকরি গিয়েছে। অ্যা! চাকরি গিয়েছে। কি সম্বালা। ভুকে কৈদে উঠল না; কিন্তু তর্কণী স্বামীধর্মক ধমক খেয়ে ধামায়ে হল শোক। তরপী মণ্ডল জানতে চাইল চাকরি বাবার কারণ।

—‘কিছু জানি না আমি!’ কাঁঝরে উঠল মাগিক।

—‘ভাত খেবে মোটে উঠেছি, গাড়ি বের করব, হুকুম হল—ওকে পৌঁছে দিতে। কিছু কি খোঁজ করবার সময় পেলাম নাকি?’ তবে সম্প্রদায় নিষাধ চুবি-চামাটি কবেছে ছোটমেমের কোন দায়ী কাপড়। যাক গে! ওকে কিন্তু হবে চুকতেও দেবে না, খেতেও দেবে না। অমরক গরুক হারামজাদী।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই মাগিক বেব হয়ে গেল। আব উঠানে মুখ গুঁজে পড়ে রইল সোনা। কপাল ফুলে উঠেছে, হাড়-পাজবা টনটন করছে। সেই সকালবেলা কি একটু খেঁষাছিল সোনা, তাবপর খানিকটে বেরিয়ে আসতে হয়েছে—আব এই দুর্দান্ত মাঘের শীতে আকাশভাঙা বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু কিছু বেন হুকুম নেই সোনার। কেবল মনে হচ্ছে—নীলুকে, ওর নীলুসোনাকে কেড়ে নিয়েছে কোল হতে।

সম্ভাব্য দিকে বৃষ্টিটা একটু থরলে ও বাড়ি হতে এল মাগিকের জ্যাঠাইমা। হাত ধবে সোনাকে ধরে ফুলে আনল, ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শূঁইয়ে দিল চাপাচুপি দিয়ে। সমস্ত শরীর কঁকড়ে তখন কাঁপছে সোনা। জ্যাঠাইর বয়স হয়েছে। তার অবস্থা ভাল, তোয়াকা করে না করে। আর বড় ভাঙে তো সে তরপীর। মাসের পবই স্থান। কবে বকুন লাগাল গুণমাশ দেওব-জাকে।

—‘কি তোমাদের আক্কেল! শোকাভাপা বউটাকে পাঠালে চাকরি করতে, আব এমন তোমাদের টাকার লোভানি যে, মনিব ছাড়িয়েছে বলে এই গরু ঠেঙানি দিয়ে জলে ফেলে রেখেছে। বলি এমন পিচেশের বুদ্ধি কবে হতে এল তোমার মাগিকের বাপ? পুরুষ-মানুষ বউয়ের রোজগারের পিতোশ করে, এমন ক্ষমার কথা শুনি নি বাপু—জন্মেও!’

চুপ করে রইল তরপী মণ্ডল। কথাটা ঠিকই বলেছে বউবউ। তরপীর গাধা মিনিমিন কবে কিছু একটা বলতে গিয়ে ধমক খেল আবে কড়া—‘হারা-গিন্তি নেই তোর?’

লক্ষ্মী পেল মাগিকের মা। সারাদিনের উপোসী বউটা। ভাত এনে ডাকল বউকে। কিন্তু খাবে কে। সব-গেগে ব্যাথা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে সোনা। গা কি গরম, যেন ধান দিলে ঠৈ ফোটে।

দুর্দিন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বইল বউ। না কথা, না মুখে জলটুকু। ডব পেল শব্দ—‘দাদা’। মাগিকও এল ছুটি নিয়ে। মেনকাল কাছে সব বস্তান্ত শুনছে সে। কষ্ট হয়েছে মনে, কোন দোষে দোষী নয় বউটা—খেল এমন নির্দয় মা। সাবু-নিছার কিনে তানল মাগিক। দটো কমলালেবু। আছা অভ মাং খেয়েছে, থাক শূটো ভাল-মন্দ জিনিস। জুব ছাড়লে বউকে একদিন বাইস্কেপ দৌখিয়ে আনবে এমন সম্পকণও করল মনে মনে।

কিন্তু জ্বর তো ছাড়ছে না। চোখ লাল বেন জ্বাকুল। সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে বাড়ি এল মাগিক। নিয়ে এল দুটোকা কব্লে মোড়ের মাথার কম্পাউভারবাবুকে। কান নল লাগিয়ে খুব ঠেসে বুক-পিঠ দেখল রজ-মোহন কম্পাউভার; একেবারে নামী ভক্তারদের মত হাবভাব তার। কি বুকল রোগীর অকথা কে জ্বল, মস্ত মস্ত সামা বাড়ি খেতে দিল সোনাকে।

অনেক রাতে চটকা ভেঙে খড়খড়িয়ে উঠে বসল মাগিক। কি বলেছে, কিছুকিছু করে কি বলেছে বেন সোনা। তারি মাল্লা লাগল মাগিকের।

—‘কি, কি বলিছ বউ? জল খাবি একটু?’

মাগিকের কথার উত্তর দিল না সোনা। বারে বারে ডাকতে লাগল।

—‘নীলু, নীলুসোনা। ও! ভারী বজ্রাত হয়েছে তুমি, একটু পড়ে ঘোঁস খাট হতে।’

পাশ-বালিসটাকে দুহাতে জড়িয়ে বুক জড়িয়ে নিল সোনা।

—‘খাট খাট, মনাটা আমার!’

এবার চোখে জল এল মাগিকের। ছেলে, চলে যাওয়া ছেলে বানিয়েছিল বরিকে সোনা। বোকা-বুন্ধি বউটা, বড়লোকের ছেলের দাই হওয়া যায়, কি সাহস তাব মা হবার। কিন্তু কে বোকাবে সোনাকে। ও যে জ্বরের ঘোরেও দেখছে ওর নীলু ববি হয়ে আবার ক্রির এসেছে।

দশদিন পর সোনাকে পড়িয়ে শেষ করে মনিববাড়ি এল মাগিক। সামা বাড়ি, লাল জল কিছুতে জ্বর কমে নি সোনার। এমন কি চার-টাকাওলা ডাক্তার পর্বন্ত এনেছিল দেখ-

দিনটাকে, কিন্তু সব মিথো। নীলু-নীলু—কেবল নীলু বলে ডাকতে ডাকতে একদিন ঠা ডা হয়ে মবে গেল সোনা। সিঁদুব, লাল-পাড় শাড়ি আব আলতাতে সেজে সবাব কাখে চড়ে শ্মশানে গেল সোনা। সবাই কাঁদল, মাগিক দেখাছিল সোনার কপাল। বড় জেঠি সেখানে সিঁদুব লেপে দিয়েছে, তার তসার নীল হয়ে বয়েছে তখন পর্যন্ত; মাগিক যে চুলেব মূর্তি ধরে কপাল ঠেকে দিয়েছিল সেই নীল।

জ্বাইতারের বউ, ছেলের দাই মারা গেলে বেটুকু সহানুভূতি দেখানো দবকার, তা দেখালেন সেনপরিবার। ওপরের ঘরে মাগিককে ডেকে নেওরা হল। সবাই শুনল সোনার রোগের বিবরণ। উত্তর দিতে দিতে বার বার খেমে যেতে হাঁছিল মাগিককে। বারে বারে তার চোখ চলে বাঁজিল ঘরের বাইরে বারন্দার। সেখানে ধবধবে শাড়ি-জামা পরা শুব সভ্য নতুন ক্রির হাত হতে বল নিয়ে বয়ে বারে ছুঁড়ে ফেলছে ববি আর হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। ববি—সোনার নীলুসোনা। ওকে ডাকতে ডাকতেই ভে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে সে।

সালফার গায়োনাথা সাবান



পক্ষক চমরোগে বিশেষ উপকারী।
স্বেচ্ছা এই সাবান নিত্য ব্যবহারে,
বিশেষতঃ শরীরের দিনে, যোম,
কোড়া, চুলকানি, বামাটি প্রভৃতি
চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

মহাকবিবরীয়া মতিন্দ্রনাথ

দুইদিনের মুখোমুখি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

“গত ২১শে অক্টোবর (১৯১৪) শিখ পুর্বোহিত ভগওয়ান সিং ‘গদর’ দলের প্রতিনিধি হয়ে সামন্তানিস্কে থেকে জাপান রওনা হয়েছেন, সেখান থেকে তিনি চীন, গাম ও রুসদেশে যাচ্ছেন। ইনি মূলত অস্ত্র কোথায় কোথায় নামানো বাব সেইসব জায়গা পরিদর্শন করবেন। ভগওয়ান সিং টোঁকওতে গিয়ে ডঃ সান-ইয়াং-সেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। সামন্তানিস্কে কনসালের মধ্যমে তিনি পিকিং-এর জার্মান দূতবাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

“শ্রীমৎকাঠের প্রস্তাব অনুযায়ী টোঁকওতে অস্ত্রাদি কেনা কিভাবে সম্ভব, তার নির্দেশ দিয়েছেন প্রফেসর বরকতুল্লা; ইনি তিন-বছরের বেশি টোঁকও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। প্রফেসর বলছেন যে, একমাত্র টৈকি বিপ্লবীরাই জাপানে অস্ত্র কেনা বিষয়ে সহায় হতে পারে তাদের জাপানী বন্ধু-বান্ধব সহযোগিতা নিয়ে। ডাই ডাঃ সান-ইয়াং-সেনের কাছে ভগওয়ান সিকে এবং তাঁর পিঠাপিঠই মরাঠেকে পাঠানো হয়েছে। ডাঃ সান এখন বিখ্যাত জাপানী রাজনীতিবিদ তেরামার অতিথি; জাপানী রাজ্যসভার সদস্য ডাঃ তেরাও-এর সহযোগিতায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এরা ভারতবর্ষে যে পাঠাতে পারবেন, এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।”

সুপরিচিত এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নমস্কার নেতা প্রফেসর বরকতুল্লা জাপান থেকে আমেরিকায় যান ‘গদর’ দলের কাজে—একথা আগেই বলেছি। সেখান থেকে শীঘ্রই আবার জার্মানীর বার্লিন কমিটির তরফ থেকে লাফা হরদফাল বরকতুল্লাকে ইংরোপে যাবার নিমন্ত্রণ জানান। এ-নিমন্ত্রণ প্রথমে বরকতুল্লা রক্ষা করতে পারেন নি। নিম্নোক্ত চিঠিতে তার কাবণ তিনি দেখিয়েছেন। অবশ্য কয়েক মাস বাদেই তিনি ইংরোপে যান এবং বার্লিন কমিটির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভগওয়ান সিংকে তিনিই সম্ভবত নির্দেশ পাঠান জাপানের ও চীনের কাজে সদ্য ভারত থেকে জাপানে আগত বাসবিহারী বসুকে সঙ্গে টনতে। হরদফালকে লেখা বরকতুল্লার চিঠিটা পুরো-ই

গোনাই। এটি ১৯১৪ সালের ২৪শে নভেম্বর লেখা।

“আপনি আমার কনস্টান্টিনোপলে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এতদিন তা দৃষ্টি করলে সম্ভব হয় নি। প্রথমত আমাদের শত্রুপক্ষ থেকে সমস্ত পথই সবয়ে আগলে রাখা হয়েছে; খানখোজ, বিবেশ সিং-প্রমুখ আমাদের বেশ ক’জন বন্ধু গত সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই টার্কি রওনা হয়েছিলেন কিন্তু আজ অবধি তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা পাই নি।

“দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ এটি—ক্যালিফোর্নিয়াতে তখন আমার না-থাকলেই নয় অবস্থা। গত কয়েক মাস একটু দম ফেলার সুস্বাদু ছিল না। পণ্ডিত রামচন্দ্র, ভাই ভগওয়ান সিং আর আমি সিরিয়েল থেকে মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত একটার পর একটা সভার অনবরত বক্তৃতা দিয়েছি—ওসব জায়গাতেই আমাদের লোক কর্মরত। ওদের মধ্যে থেকে আমরা যোদ্ধা বেছে নিছি ভারতে ও রুসদেশে পাঠাব বলে। যুক্তরাষ্ট্রে এবং কানাডায় আমাদের দেশবাসী যে অতৃপ্ত পূর্ব উদ্ভাসদানব সঙ্গে সাড়া দিয়েছে আশা কবি তা আপনাদের অগোচর নেই। অর্থ দিয়ে প্রাণ দিয়ে এরা দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত। এদের অনেকেই ভাবতে গিয়েছে গণবিপ্লবের বোম্বা হিসেবে; নিজদের টাকার দেশে ছুটে গিয়েছে দেশের ডাকে—এক শব্দা আমাদের থেকে নেব নি। অবশ্যই, ‘গদর’ দল থেকেও টাকা দিয়ে যোদ্ধা পাঠানো হয়েছে। বাদেব ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি, যে-কোন দেশই তাদের মতো রক্তের জন্মভূমি বলে শ্লাঘা বোধ করবে, গোঁবাবাসিত হবে। এমন এখনও অজ্ঞান আছে যাদের টাকার অভাবে আমরা পরাতে পারি নি। এদের আমরা দুইভাগে বিভক্ত করে পাঠিয়েছিঃ একদল ভারতবর্ষে মথ্যই

কাজ করবে, অন্যদল রুসদেশ থেকে শত্রু করে হংকং শাহাই পর্যন্ত। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথমে ভারতের মধ্যেই বাজ শব্দ করে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল-সমূহে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে পড়ে যেন। ভাই ভগওয়ান সিং একদলকে জ্যামদেশে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে পাঠিয়েছেন—যারা সেখান থেকে শাহাই-এর দিকে অগ্রসর হবে। আপনাদের বোধহয় জানা আছে যে রুসদেশ থেকে শাহাই পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই বলতে গেলে আমাদের দেশবাসীর হাতে।

“ইংরোপের সংগ্রামের সঙ্গে ভাল রেখে ভারতবর্ষে এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশ-গুলোতে বিপ্লব ফরাসিত করতে গেলে আমাদের এখানে টাকাকড়ি আরো দরকার হবে। বার্লিন কমিটি, কোন কোন মার্কিন বন্ধু আমাদের পবামর্শ দিচ্ছেন মার্কিন ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে টাকা ধর করতে। তাব অরুণ, ওঁরা বলছেন, আমরা যেন একটা অস্থায়ী সরকার এখানে গড়ে তুলি। এই সংগে তাঁদের পবামর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু প্রস্তাব আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু এভাবে ঋণ ক্রবাব পরি-বর্তে আমাদের জার্মান বন্ধুদের কাছেই হাত পাতা ভাল, আমাব মনে হয়। আপনাবাই বার্লিন থেকে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন বোধহয়। গত মাসে শ্রীমরাঠে আপনাদের নির্দেশ নিয়ে এখানে এসেছিলাম; তিনি জানান যে, বার্লিনে আমাদের প্রতি-নিধিব সংগে জার্মান সরকারের একটা বন্দো-বস্ত পাকা হয়ে গিয়েছে।

“...ভেবেছিলাম এবার যুঁকি আপনাদের কথামতো আমি কনস্টান্টিনোপলে যেতে পারব; তা’ হলে আপনাদের সঙ্গে দেখাও হ’ত এবং একটাই আমবা কাবুল শাটা করতে পারতাম পারস্য হয়ে। কিন্তু আপনি বার্লিনে ফিরেছেন খবর পেলাম এবং এদিকের পথেব ঝুঁকি বেড়েছে দেশে নিউ ইয়র্কের বন্ধুরা আমার যেতে দিতে নারাজ। তাঁদের ধারণা এখানকার কাজ জেরালো হবে দিতে সমর্থ হবে আমি কিছুদিন যদি থাকি নিউ

* ডাঃ ভরক মাস প্রথম যেখানে কেন্দ্র খোলেন : অত্যন্ত সক্রিয় কেন্দ্র এটি। ডাঃ মাসও ইতিমধ্যে বার্লিন যাবার আমন্ত্রণ পান।

माथ्याईक वग्दुष्यती

I came from San Francisco where I was for some time, going you to see you and your family. I then went to Kabul to see the situation. I have seen an increase of danger in the route to Kabul. I have come to New York to persuade you to send more troops to Kabul. I am setting up forces in motion in the East. I am doing things that I can do from here on the ground. I shall let you know from time to time. Lala Rajput I hear, has come to New York. Dr. Bose last saw whom I hope to see soon. What attitude should I adopt?

74

toward them in your opinion, and

in hopes to hear from you soon, with Sunday material.

Yours Sincerely,

Marshall

નમ્ન્યા વિશ્વર્ણી વરકકુલ્લાર ખલેર આશનિક પ્રતિજિનિ

[ঐচ্ছিকপদ্ধতিতেই বসে এবং মিত্রীর নামনান আকাঙ্ক্ষিতের সোচ্চনে প্রাপ্ত।

ইয়ক! এখানে বসে আমি নিরাবালভে
জাঁতাই অনেক কাম্ব কবতে পারব এবং মাঝে
মাঝে আপনাদের কাছেও তাব বিবরণ পাঠাব।
শুনছি জালা লাজপৎ রায় গত শনিবার ডাঃ
বোসের* সঙ্গে নিউ ইয়র্ক এসেছেন; শীঘ্রই

তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। ওদের
সঙ্গে কিভাবে মেলানামেশা করা আমার
উচিত হবে, আপনার মনে হয়?

“আপনার দ্রিষ্টি শীঘ্রই পাব আশা করি।
বন্দেমাতরম ॥

জার্মান সরকারের তরফ থেকে নিম্নোক্ত
চিঠিটি (বার্লিন : ৭-৯-১৯১৪) তিনটি
ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়। ব্যাঙ্ক-তিনটির
নাম :

(১) জার্মান-এশিয়ান ব্যাংক হেও
অফিস, বার্লিন,

* ডাঃ সূর্যশীলনাথ বসু (?)

কেন্দ্রের অবস্থা জর্জ ফ্রীম্যান, নিউ ইয়র্ক সিটি)"

(૨) ઇસ્કા-શાશરે વાન્દ, શમ્બુગ

(৩) এডমন্ড হ্যাগেল্ডন এন্ড কোং
স্বত্বাধিকারী : হিন্‌ডস, হামবুর্গ)।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, “বিশ্বাসম্ভব বিশদ-
ভাবে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব যদি সেন,
কৃতজ্ঞ থাকবে :

“এক।—নিকট এবং দূরপ্রাচ্যেব কোথায়
কোথায় আপনাদের শাখা আছে?

“দুই।—সেইসব শাখার মধ্যে কোনগুলি
এখনো তাদের লেনদেন চালু রাখতে
পেবেছে?

“তিন।—আপনাদের বৈদেশিক শাখা-
গুলির মধ্যে কি রকম সম্পর্ক বজায় আছে?
বিশেষত নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে?”—
ইত্যাদি।

১৯১৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ব্যান
ওপেনহাইম নিম্নোক্ত চিঠি দেন হের্‌ ভেসেন-
টস্ক-কে :

“এক।—হের্‌ নরেনহোফার নিম্নোক্ত
পত্রটি হামবুর্গ-এর ফিমা এডমন্ড হ্যাগেল্ডন
কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ
করছেন :

“আপনাদের পক্ষে কি বৃটিশ অধিকৃত
ভারতবর্ষের কোনখানে ‘আগামী অক্টোবর-
নভেম্বর বা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তিন-
চারটি কিস্তিতে আড়াই লক্ষ জার্মান মার্ক’
ভারতীয় মূল্যের ভাণ্ডারে দেয়া সম্ভব হবে
বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের এক বা একাধিক
নাগরিকের হাতে?...এ-বিষয়ে ভারতীয় অনু-
সন্ধান আপনারা টেলিগ্রাফেই যদি করেন ভাল
হয়, এবং তৎক্ষণাত খরচ আমরা বহন করব।

“দুই।—ওর প্রস্তাব : হল্যাণ্ডে যে
জার্মান দূতাবাস আছে, সেখান থেকে কেউ
যেন বিশ্বস্ত কোনও ব্যবসায়ীর মাধ্যমে
নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি জ্ঞাতর শাখা আছে এমন
কোনও ব্যাংক-এর কর্তৃপক্ষকে করেন :

“(ক) দুই লক্ষ জার্মান মার্ক-এর মতো
টাকা কি তারা চিঠি বা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে
জ্ঞাতর পৌঁছে দিতে পারেন, যদি আমরা
হল্যাণ্ডের কোনও ব্যাংক সেই টাকা জমা
দিই?

“(খ) ওদের জ্ঞাতর শাখার পক্ষে কি
উক্ত অর্থ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের
মধ্যে তিন-চার কিস্তিতে (চিঠি বা
টেলিগ্রাফের সাহায্যে) বৃটিশ অধিকৃত ভারত-
বর্ষে পাঠানো সম্ভব? উক্ত অর্থ কি বৃটিশ-
ভারতের, বিশেষত বোম্বাই বা কলকাতার
কোনও বৃটিশ-ভারতীয় নাগরিকের (অথবা
নাগরিকদের) নামে আমরা এখানে জমা দিতে
পারি?

“শ্রবণীয় প্রশ্নটির উত্তরে যদি হল্যাণ্ড
এবং জাভা, বা জাভা এবং বৃটিশ-ভারতের মধ্যে
কোনও চুক্তির অপেক্ষা রয়েছে তা হলে সে-
চুক্তি যেন টেলিগ্রাফের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়;
তার দরম খরচ আমরা বহন করব।”

১৯১৪ সালের ১৭ই অক্টোবর অ্যামেরিকা

থেকে গ্রাফ (কাউন্ট) কন্‌ ব্যালস্টক টেলি-
গ্রাম করছেন :

“একজন ভারতীয় নেতা জেনারেল-
কমন্ডেণ্টে এসে খবর দিয়েছেন যে, বিশ্বাস
একটি অ্যামেরিকান কোম্পানী অন্ততপক্ষে
ষাট হাজার ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের
নিজেদের দায়িত্বে জাহাজে ক’বে পৌঁছে দিতে
স্বাক্ষর করেছেন।...”

এর উত্তরে জার্মানী থেকে ওপেনহাইম
২৪-১০-১৯১৪ তারিখে লিখছেন :

“ভারতীয় বিপ্লবের কাছে ষাট হাজার
ডলার সংগ্রহ কববার একটি পরিকল্পনা
পাঠাচ্ছি। হের্‌ কন্‌ গোফিনেনরার-এর
পরামর্শ অনুযায়ী বাণিজ্য-সম্প্রদায় হ্যারমান,
জার্মান ব্যাংকের জরেন সদস্য এবং আমাদের
বিশ্বস্ত কর্মী দলগতভাবে এ-বিষয়ে আলোচনা
করে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।...”

২০-১১-১৯১৪ তারিখে ক্যান্সটক
আর লুইসিস বোথ টেলিগ্রামে জানাচ্ছেন :

“বার্লিন থেকে ভারতবর্ষে যাবার পথে
টোকিও থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সভা
নারায়ণভাই (মারঠে) চিঠি লিখেছেন—জার্মান
পররাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে কথামত তিনি ওখান
থেকে গুলীবারুদ সমেত ষাট হাজার রাইফেল
কিনছেন, তৎক্ষণ টাকার প্রয়োজন। আমার
কাজে কোন নির্দেশ না থাকায়, নির্দেশের
অপেক্ষায় আছি।”

২৪-১১-১৯১৪ তারিখে জার্মান সরকারী
রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে :

“ওরাশিয়ান থেকে আমাদের মিলিটারী
আত্মরক্ষা অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে কিনবেন, সে-
বিষয়ে জেনারেল-স্ট্রোকের হাউসম্যান (ক্যাপ্টেন)
নামক লিটার সপেক্স আলোচনা হয়েছে।
নামক লিটার ধারণা অসংলগ্নই উদ্দেশ্য
সাধনের প্রশস্ত মাধ্যম এবং বর্তমান পরি-
স্থিতিতে অস্ত্র-প্রতি পাঁচ ডলার খরচ করবার
সামর্থ্য আমাদের আছে। মিলিটারী আত্মরক্ষা
অন্তত বিশ হাজার রাইফেল কিনতে পারেন।
প্রেরিত নমুনার খুব ভালই কাজ চলবে।
সেইসঙ্গে যদি ‘দু-ডিনশ’ অটোমোটিক
পিস্তলও কেনা হয়, ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা
তা হলে সেখানকার ইংরেজদের প্রাণ অতিষ্ঠ
করে ফেলবেন সহজেই।

সেইজন্য এক লক্ষ চার্লিশ হাজার ডলারের
প্রয়োজন। অনুমোদন প্রার্থনীয়।

“জাহাজেব কথা মিলিটারী আত্মরক্ষা যদি
ফিলারেলজিকার আইরিশ বাসিন্দা স্মিটার
গ্যারিটির সঙ্গে আলোচনা করেন, ভাল
হয়।”

২৯-১০-১৯১৪ তারিখে ব্যাংকক থেকে
নিম্নোক্ত ভারবর্তী পাঠন ইম্পিরিয়াল শাফ
দ্য আফের, রেমী :

“চিঠি লেখবার ও টেলিগ্রাফ পাঠানোর
জন্যে বার্লিন থেকে ব্যাংককের নিশ্চিত
ঠিকানা এইসঙ্গে পাঠালাম :

“চিঠির ঠিকানা :

“এক।—ম্যাকলেলাম অ্যান্ড থানসি,
ব্যাংকক

“দুই।—ভাইহ্যাম অ্যান্ড করবিট, ও
“তিন।—হেউড অ্যান্ড আর্স, ও
“চার।—হাগিন্স অ্যান্ড কস্মি, ও
“টেলিগ্রাফ : ম্যাকলেলামথানসি, ও।”

(বারো)

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম প্রচেষ্টার তারিখ—
২১শে ফেব্রুয়ারি, সমাসন্ন। অথচ বিদেশ
থেকে প্রতিক্ষিত সাহায্য এখনো এল না।
যতীন্দ্রনাথ বাঘা হয়েই অনুমতি দিলেন রাজ-
নৈতিক ডাকাতের সাহায্যে এক মাসের মধ্যে
এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করব।

১৯১৫ সাল। ১২ই জানুয়ারি।

কলকাতায় গাভের রীচ অঞ্চলে যতীন্দ্র-
নাথের শিবগোরা গিরে বার্ড কোম্পানী থেকে
দিন-দুপুরে আঠারো হাজার টাকা লুট করে
আনলেন। এবং পূর্ব-বাংলা অনুযায়ী টাকাটা
কয়েক ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে অনুষ্ঠান-
কারীরা উদ্যোগ করে গেলেন। এই ডাকাতের
পরিচালনার ভাব ছিল নরেন ভট্টাচার্যের ওপর
এবং কথা ছিল, যতীন্দ্রনাথকে তিনিই গিরে
খবর দেবেন যে, কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১২নং ব্রীজার্কর লেন : এখন কলকাতা
রো। গণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আশীর্-
সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ‘স্বারসানাথ
বিদ্যাবৃক্ষের বাড়ি এখানে। এ’র নাতিরা
সকলেই যতীন্দ্রনাথের অনুগামী। এ’দের মধ্যে
কলী চক্রবর্তী ছিলেন যতীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা
শিষ্য এবং বিশিষ্ট কর্মী। এ-বাড়িটার
যতীন্দ্রনাথ মাকে-সদে আসেন। তাঁর টানে
ফেরারী বিপিন গাঙ্গুলী, অতুলকৃষ্ণ বোষ,
হরিকৃষ্ণ চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য, বাদুগোপাল
মুখার্জী প্রভৃতি সকলেই এখানে আসতে
হয়।

এ-বাড়িতেই যতীন্দ্রনাথ এসে নরেনের
জন্যে অপেক্ষা করবেন কথা ছিল। কিন্তু
নির্দিষ্ট সময়ের পরেও নরেন ভট্টাচার্য ফিরে
না দেখে যতীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
এমন সময় বিপিন গাঙ্গুলী এলেন। বললেন,
নরেন একটু দূর-পাশে আসছে। এই এল বলে।

খানিক বাদে খবর এল : কাঁটাগুড়ুর লেন
পার হবাব সময় নরেন ভট্টাচার্য অত্যধিক
পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন। পুলিশ
ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জী এত জন্য দম্মী।

নরেনকে তখন ভারত-জার্মান সম্পর্কের
প্রধান সংযোগকারীদের অন্যতম বলে নিযুক্ত
করা হয়েছে। এমন সম্বন্ধজনকভাবে তাকে
তো এ-সময় হাজতে পচতে দেওয়া যায় না।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের থেকে
পাঠালেন। বললেন : “ও রে, এখন যে আমার
নরেনকে চাই-ই। আজ সমস্তর ওকে যখন
আলিপুর থেকে লাগবাজারে নিয়ে যাবে, তখন
গাড়ি ভেঙে নরেনকে তোলা বার করে আন।



যে-কোনো খেলাই বাটার জুতোর সহায়তায় আরো সহজ ও সমুন্নত হতে পারে

বাটার খেলার জুতা সক্রিয় পদচালনার সহায়, গতিশক্তি সম্ভারক। অক্রেপে দ্রুত পদক্ষেপ এই জুতোর একমাত্র সঙ্গী। এর পার্বক আপনি পারে দিয়েই স্বকৃত পারবেন, অনুপম অনুভূতি। কোনো বাধা নেই, বিষ নেই, আছে শুধু সাব-জীল পদসম্প্রদানব স্বাধীনতা। পারের আরাম আর স্বচ্ছন্দ চলন—এই অভিজ্ঞাষে বাটার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন : ফুশন আর্চ আর ইনসোল আকর্ষক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ফনবুনোট ক্যান্সিসের আপাব—ফ্রিশীল সলিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বামপার টোগাড। আপার আর জুতোর তলির অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল আর হিল এমন হস্তাশলে তৈরি যা পরতপক্ষে হড়কাবে না। স্বমিলিয়ে, নির্মাণে আর উপকরণে এমন সমর্থ সমাবেশ আর দেখা যায় না।

Bata



→ টোপার্ট সম্মান ৮.৫০

→ সেক্টারকোর্ট ১১.২৫

→ রেসার ৮.৫০

এর জন্যে দাম দিতে হবে অনেক-কিন্তু...
আমি-আমি দেব।”

কয়েকখানা মোটরে লালবাজার-বোর্ডিংক
স্ট্রীটে ওখান থেকে ডালহৌসী স্কোয়ারের
কোণ পর্যন্ত কয়েকজন বিপ্লবী যুবক অপেক্ষা
করে রইলেন যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে।

জর্নেক বিপ্লবী লিখেছেন : “সেদিন দামার
আদেশে জেলখানা আক্রমণ করে নরেনকে বার
কবে আনবার পণ নিয়েই আমরা বেরিয়ে-
ছিলাম; সকলেরই মনে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ,
পুলিশের শত্রুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে
সকলে প্রস্তুত—কোনখান দিবে যে সময় বয়ে
যেতে লাগল খেয়াল ছিল না; এমন সময়
জেলখানার ভ্যানের সঙ্গে অনুসরণকারী
আমাদের ছেলে বাবা ছিল, তাই এসে বললে—
আমাদের দুর্ভাগ্য, নবেনকে আজ লালবাজারে
আনলে না। তাকে সোজা জেলে নিয়ে
গেল।”

উপবোধ কমীটি আরো লিখেছেন, “যাফ-
মনোরথ হয়ে ফিবলাম। দাদা আমাদের
আশীর্বাদ কবলেন। বললেন—যাই হোক,
তোরা যে ঠিক এগিয়ে গিয়েছিলি, এইটুকুই
আমার সন্তুষ্টি।” ...

এই কিছুদিন পবেই চেষ্টা করে নবেন
ভট্টাচার্যকে জামিনে খালাস করানো সম্ভব
হল।

নরেন ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে দেশের
কাজের যে-কতি করলেন ইন্সপেক্টর সুরেশ
মুখার্জী, তার দরুন তিনি চিহ্নিত হয়ে
রইলেন বিপ্লবীদের খাতায়। তার ওপর আবার
কলকাতার রাজনৈতিক ডাকাতিগুলোর ভদ্রতের
দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি যখন উঠে-পড়ে
লাগলেন বিপ্লব-প্রচেষ্টা দমনের সহায়তার,
যতীন্দ্রনাথ বললেন সুরেশবাবুকে সবিবে
কেন্দ্রে।

এই আদেশ-ক্রমে বিপ্লবীরা ব্যর্থমনোবশ
হয়ে পর পর কয়েকদিন ঘুরে এলেন সুরেশ-
মুখার্জী নাগাল না পেয়ে—যতীন্দ্রনাথ বললেন :
যত্নসহ সুরেশ মুখার্জী বেঁচে আছে, আমি
জলস্পর্শ করব না।

সাংবাদিক কথা! ... অতুল ঘোষ ভেবে
ফন্দী ঠাউরালেন। সুরেশবাবুর ব্যতিক্রম আছে,
তিনি বলে উঠলেন, পলাতক বিপ্লবী দেখলেই
এগিয়ে যাবরা (নরেনকে এইভাবেই তিনি
স্মরণ কাটাচ্ছিলেন লেনে আই-বি ব্যারাকের
জামিনে); পলাতক চিত্তপ্রিয় রাঘবচৌধুরীকে
হেদোব মোড়ে দাড়ি ফাঁড়িয়ে তৈরি থাকলেই
সুরেশবাবুকে মাং করা যাবে।

তথ্যসূ! ..

এলাহাবাদের PIONEER পত্রিকায়
১৯১৫ সালের ২৯রা মার্চ তারিখে সুরেশ
মুখার্জী হত্যার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত
হল :—

“Calcutta, 28th February :—

Police Inspector Suresh Chandra
Mukerjee, who has been engaged
in connection with the recent
taxi-dacoities here, was shot dead
while on duty in Cornwallis Square
(Hedua) early this morning, by
four young men with revolvers.
His orderly was also wounded.
The assassins escaped.

“From further details, it
appears that owing to the coming
Convocation of Calcutta Univer-
sity on Saturday next, over which
the Viceroy is to preside, there
was a police rehearsal at College
Square this morning. The police
officers who were to take part
were leaving from various places
to attend the rehearsal. About
6.45 a.m. Babu Suresh Mukerjee,
...was waiting at the corner of
Cornwallis Square to catch the
Shambazar car for College Square.
Just as the car was approaching,
another C. I. D. officer pointed
out three Bengalee youths on the
western footpath and told him
the men were moving about
suspiciously. Suresh began to
watch the men. Shortly after he
saw another Bengalee youth believ-
ed to be Chittapriya Roy* on the
eastern footpath. Recognising
the man as wanted for the recent
motor bandit raids he sent his
orderly to catch the man. The
orderly went and caught him by
the hand and brought him to the
Sub-Inspector. “You are Chitta-
priya Roy!” - Said the Sub-In-
spector. It is stated that the man
said he was. A struggle followed
whereupon the man took out a

* পলাতক চিত্তপ্রিয়ের নামে তখন গ্রেপ্তারী
পযোগীনা বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁদের ওইভাবে
হেদোব মোড়ে পাঠিয়ে দিয়ে অতুল ঘোষও
কৌচাচা খুঁট গায়ে জড়িয়ে মাণিকতলার
বেড়াছিলেন; আব বিপ্লবী কবল মুখার্জী
খাচ্ছিলেন মাণিকতলার অপর দিক দিয়ে।

—যতীন্দ্রনাথ।

Mausser Pistol from his waist and
fired point blank at the officer.
Suresh fell and the other three
men first observed came up and
all four fired at the officer as he
lay on the road. The orderly
Sew Prasad Kahar was also fired
at and had to be removed to the
Medical College Hospital, severely
wounded... The assailants all ran
away. It is stated that the
deceased officer was shortly before
warned by letter.

“The outrage caused quite a
panic among the shopkeepers in
the vicinity and passersby, none
of whom dared approach or arrest
the armed gang who, finding them-
selves masters of the situation,
fired a volley in the air and brand-
ishing their revolvers as a warning
against interference coolly walked
away and disappeared.

“Sir Frederick Halliday, who
was at the time supervising
the rehearsal of the police parade
for the Viceroy's arrival and other
officers were on the spot and the
posse of European reserve police
sergeants (armed) were despatched
to the scene. On arrival they
were directed to search the
thoroughfares for suspects concerned
in the tragedy, all of whom were
described to be attired in the
Indian way covered over with
heavy alwans or shawls. Armed
police sergeants were also posted
at various outlets of Calcutta, each
being furnished with a description
and dress of the armed gang.

“...A searching Police investi-
gation is proceeding, but so far
there have been no arrests. It is
stated, the deceased officer was
armed with a loaded revolver, but
he had no time to use the weapon.

“...Good hopes are entertained
of catching the murderers who
appear to have been Bengalee
students of the Bhadrakol class.

“In connection with the

murder...the Calcutta Police and C. I. D. have been engaged in searching a number of houses Particularly in the neighbourhood of Sukia Street and Wellesly Street. No arrests are reported, but it is stated that some important papers throwing light on this and other recent cases were found at the search of a house in Wellesley Street

"The police orderly wounded in the outrage is still alive and seems likely to recover. The bullets extracted show that the weapons used were Mauser pistols."

শ্রীমান বাবু, একের পর এক সুরেশ মুখার্জী যেভাবে বিপ্লবীদের অনিষ্ট করে লেগেছিলেন তাতে উক্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ্যুতি ঘটে। আগেই লেখি, তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন, "আজ সূর্যাস্তের আগে ও-লোকটাকে তোরা যদি মারিয়ে না দিতে পারিস, আমি তবে আব জল-গ্রহণ করব না।"—তাই সাত-সকালেই চিত্ত-প্রিয় প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দার হয়েছিলেন নেতার গণরক্ষা কবতে, দেশদ্রোহীর রক্তে দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের ইন্ধন জোগাতে।

তিন নম্বর মৃত্যুগামবাসী স্ত্রীটো, উত্তর-বঙ্গেব বিখ্যাত বিপ্লবী বোম্বের দে-সবকারেব ঘাড়তে সেদিন যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন। যতীন্দ্রনাথের বন্ধু বগুড়ার নেতা যতীন রায়ের সঙ্গী বোম্বেরাবাদ।

প্রথম প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন এসে যতীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিলেন—তাঁরা সফলকাম হবে কিবে এসেছেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁদের জানালেন প্রসন্ন আশীর্বাদ।

সেদিনই রাতে, যতীন্দ্রনাথের প্রিয় আত্মত্যাগী বালিগঞ্জ সরেঙ্গ কলকাতা মেস-এ গিয়ে মহানারক উঠলেন; সঙ্গে তাঁর চিত্তপ্রিয়, নীবেন, স্নানরঞ্জন, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি কর্মীরা।

ভোর বাতে—গুপ্ত-সমিতির সংবাদ বহন করে ডাঃ বাদুগোপাল মুখার্জী গিয়েছেন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কবতে। শীতকাল। বাদুগোপাল ঘর ঘুরে দেখেন, আপ্যায়নমস্তক ব্যাপার মড়ি দিয়ে সকলেই ঘুমুচ্ছেন।

স্তাব মধ্যে কোন ব্যক্তি দাড়া, জানব কি করে?—লিখলেন ডাঃ বাদুগোপাল। সেই-জন্য আন্দাজে একজনকে মূর্খের ঢাকা যেই মূর্খের, অর্মান ব্যাঘ্র-রূপে লায়িয়ে উঠে সেই ব্যক্তি আমার ওপর রিভলভার তাক করে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে, ফিসফিসের চিৎকার যত জ্বরে হয় তাই করে বললাম : আমি, আমি—

আমি বাদুগোপাল!... তাতেই স্বপ্ন!... সে-ব্যক্তি আর কেউ নয়—স্বয়ং চিত্তপ্রিয়!...*

সরকারী বাহিনী উত্তেজিত কঠিন হয়ে উঠল। এবং কিছুকালের মধ্যেই কলকাতার পথে-ঘাটে সর্বত্র সূর্যাস্ত গাড়িতে করে সশস্ত্র প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল; সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হল অলিতে-গলিতে। বড় রাস্তাগুলোব লোহার পাল্লা বসল—ঠিক যেভাবে রেললাইন বন্ধ করা হয়, তেমনি। থানার থানার বসল সাইরেন। সামান্য বিপদের আভাস পেলেই গোটা নগরীকে যাতে সচকিত করে তোলা যায়।

উত্তর আব পূর্ব কলকাতার খাল পার হবার বত পোলা আছে—চিৎপুর, টালা, বেল-গাছিয়া, মাণিকতলা, নাবকেলডাঙা ও হাওড়ার পোলে সশস্ত্র প্রহরী বইল। প্রত্যেক পথ-চাবীকেই এবং প্রতিটি গাড়িই তন্নয়ন করবার হুকুম জারি হল।*

যতীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকা পুস্কাব দেওয়া হবে : দিকে দিকে ইংরেজ সরকার তা' ভালভাবেই বাস্তব করে দিলেন। তবু যতীন্দ্রনাথ ধরা পড়লেন না। বহস্যজনকভাবে তিনি ঘোবাকো কবতে লাগলেন এক কেন্দ্র থেকে অপব কেন্দ্র—যেন ভোজবাজী জানেন।

দেহের প্রত্যেক মাংসপেশীর ওপর তাঁর জটিল দৃষ্টি যে, শোনা যায়, মূর্খের চেহারা পর্যন্ত তিনি অনেকখানি বদলে ফেলতে সক্ষম। তা' ছাড়া, অনেক সময়েই পুলিশের লোক তাকে সনাক্ত কবতে পেবেও কেমন যেন মোহমত্ত হয়ে পড়েছে—অনেকে এ-ব্যাপার প্রত্যক্ষ কবেছেন। পুলিশ তাকে দেখেও সাহস করে এগিয়ে যায় নি। গ্রেপ্তার কবে নি তাঁর। আবার, ভালবেসে শ্রদ্ধাভরেও দেশী পুলিশেরা কত সময়ে না-দেখবার ভাপ করে সারে দাঁড়িয়েছে দেশেব মুক্তিযজ্ঞের প্রধান পর্বোত্তেব ছারামাত্র কলুষিত না কবে—দূর থেকে সম্ভ্রমভাবে দেখেছে তাঁর গমনাগমনের দৃশ্য, ব্যক্তকবে প্রণাম জানিয়েছে তাঁর উদ্দেশ্যে।*

এমনি অজ্ঞান ঘটনা, অসংখ্য জনপ্রতি আক্ষেপ কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে বয়েছে দেশের নানা স্থানে।

* ডাঃ বাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় : 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পৃঃ ৩৮৬ ॥

* তর্কিনী গুহ নামে পুলিশের এক ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট তখন ছিলেন হাওড়ায়। পূর্ব দাসের ভক্ত ছিলেন তিনি। পরে হ'ল সত্যল ঘোষের ভক্ত। অনেক স্বরই আগে থেকে তিনি দিয়ে বিপ্লবীদের, বহু সময়ে বাঁচিয়েছেন বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মীর মাধ্যমে ব্যর্থ।

একবারের ঘটনা বর্ণনা।—

খুলনা স্টেশনে সাদা পোশাকে যতীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষার দাঁড়িয়ে বসেছেন চাল'স টেগার্ট আর লোম্যান, সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী। গোবেন্দা বিভাগ তাঁদের খবর দিয়েছে : অমুক ট্রেনে যতীন্দ্রনাথ খুলনা পৌঁছবেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা চাই।

ট্রেন এল। যাত্রীরা নামল। প্রায় সব যাত্রীই একে একে বেরিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথকে তো তাদের মধ্যে দেখা গেল না। টেগার্ট চাপা গলায় বলছেন, "কী ব্যাপার? যতীন মুখার্জী কি মস্তবলে উবে গেল নাকি? হয়তো বা এ-ট্রেনে আসেই নি, কিম্বা—"

টেগার্টের মূর্খের কথা শেষ হল না। মূর্খ তাঁর ছাইরের মতো নিশ্চল হয়ে গেল। বিস্ময়িত চোখে টেগার্ট তাকিয়ে রইলেন এক ফকীরের গমন-পথের দিকে। কেমন বেন্ বিহীন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন টেগার্ট।

এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে লোম্যান জিগ্যাস করেন ফিসফিস করে, "কী ব্যাপার?"

সংবিত পেয়ে টেগার্ট মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ালেন টনটনে কর্তব্য-বোধের ত্যাগে। ফিরে এল তাঁর কর্তৃকচেতনা। তখনো স্বয়ং আবিল্ট। বললেন, "ফকীরকে চিনতে পারলে না? আমার চোখে চোখ রেখে একটু হেসে চলে যেতেই, বিশ্বাস কব, আমি যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে হলাম। ফকীরের চোখদুটো এত মারাত্মক, এত দুর্জয় লাগল : ও চোখ যতীন মুখার্জীর না হয়ে যায় না।"

আবিল্টে মুস্কিল আসানকে গ্রেপ্তার কবতে ছুটল পুলিশের দল। হেঁ হেঁ করে স্টেশনের আশাপাশ তন্নয়ন করেও তিসীমানায় কোনও মুস্কিল আসানকে দেখা গেল না।

টেগার্টের শিক্ষানবিশীর যুগেব প্লাসি-জনক এই কথা তিনি ভোলেন নি কোনদিন। ভবিষ্যতে তাঁকে দু-একবার এদিনেব স্মৃতি নাড়াচাড়া করতে শোনা গিয়েছে।

এবার যতীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই কাজ করে এসেছেন—অতি আপন অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যবাও কোনদিন তাঁর কর্মধারাব সম্যক পরিচয় পান নি, কোনদিন পান নি তাঁর চিন্তার গভীরতম উচ্চতম স্বরূপেব নাগাল। সেই যতীন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে প্রচলিত কবে দিল সন্তুষ্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। সম্পূর্ণ নেপথ্য থেকে যে-মহাত্মাব বহুরের পব বহুব অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন নাম-ভূমিকায়—কজন আর জানত তাঁর অতি বিচিৎ জীবন-ধারা?

তাই, শাপে বর হল, যখন দিকে দিকে প্রচলিত হয়ে গেল যতীন্দ্রনাথের কীর্তি, অলোকসামান্য ওই বীরত্ববাজক সূর্যব চেহারা দেখে পবিচিত-অপরিচিত সকলেই দুঃশত দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁর সম্মান রত্নের আভাস

শাস্তাহিক বঙ্গদত্ত

পায়ে মনে নতুন উৎসাহের আগুন নিয়ে চলে
পার নিজেব নিজের পাথে।

নির্বিকার, 'বঙ্গ-প্রতিপত্তিতে উদাসীন
মহানায়ক, বিদেশ'। রক্তচক্ষু শাসন উপেক্ষা
করে ভাবনাহীন চিত্রে চিত্র-নিভীক পদক্ষেপে
এগিয়ে চলেন নিজের সাধনালম্ব পাথে, ধ্যানের
মহনে জীবনদেবতা উৎসব করে দিচ্ছেন যে
প্রনির্বাণ মনস্ফারনা—তারই সিস্থির সঙ্কল্প
নিয়ে। প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁব জাতির বুকে
দৃষ্টি কবতে লাগল গভীর আলোড়ন। একটি
চিত্র, একটি নাম, একটি মাত্র আদর্শ জেগে
উঠল জাতির অন্তরে; চেতনার তরঙ্গের
উদ্ভিত হলেন তিনি সপ্তর্ষি-প্রদর্শিত 'উত্তম-
মাকার্ষেণ অদ্রাস্ত বেই জ্যোতিষের স্রোত।

বতীন্দ্রনাথকে প্রেরণা করবার পথোন্ধান
নিয়ে গিয়েলেন পলিশ বন্ধন সর্বত্র ঘুরে
বেড়াচ্ছে, তেমন সঙ্কটের এক দিনে নির্বিকার
বতীন্দ্রনাথ হঠাৎ তাঁর এক শিষ্যকে ডেকে
পাঠালেন জনবহুল প্রকাশ্য একটি স্থানে।
শিষ্যটি এলেন। বতীন্দ্রনাথ তাকে জব্বুরি
কিছু কাজের ভার দিলেন। অরমেশ শিরো-
ধার করলেন শিষ্যটি।

কিন্তু, বিদায় নেবাব সময় শিষ্যটি
প্রতিবাদ জানালেন: দাদা, এই নিদারুণ
সঙ্কটের দিনে এমন জানা জায়গায় এমনি
বেপবোষাভাবে আপনার ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত
অনুচিত।

"হ্যাঁ রে, সব-সময় লুকিয়ে লুকিয়ে
নিজের প্রাণ বাঁচাবই চেষ্টা করি," বতীন্দ্রনাথ
দৃঢ়বরে বললেন, "তা' হলে যে-উদ্দেশ্যে
তোদের সঙ্কলকে নিয়ে দেশের মাটি বাঙালীর
রক্তে উর্বর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটোছুটি
সে-পথে চলতে পারব কেন? জেনে রাখিস,
মরণের সঙ্গে যে কোলাতুলি করতে প্রস্তুত
থাকে, তার মরণের কিছু বিলম্ব হয়—
মামাদের সকলেরই তো মরণ হয়ে গেছে,
চাই, বেক-কটা দিন আছি, সে-কটা দিন
বাপদকে এড়িয়ে চলা চলবে না।"

কলকাতা। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের
শিরদণ্ড।

বতীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের বললেন—এই মহা-
নগরী কলকাতার বুকে যদি বৃটিশের শাসন-
ব্যবস্থাকে টালিয়ে দেওয়া যায়, অকিঞ্চিৎকর
কবে তোলা যায় তাব নিয়ম-কানুনকে, তবে
তা' অনেক গুণেই দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ও
লাম্বা বাড়িয়ে তুলবে, অর্থ-শিক্ষিত-
অশিক্ষিত জনগণের চেতনা থেকে উপড়ে
ফেলতে হবে সাদা চামড়ার প্রতি মোহ, ভয়,
হীনমন্যতা।

গার্ডেন রীচে দিনে-দুপুরে টাঙ্গি চড়ে
টাকা লাঠি করে আনবার পথ বিপ্লবীরা
তেমন অসমসাহসিকতার সঙ্গেই এবার হানা
দিলেন বেলেঘাটার এক আড়তে। টাকার

সেখানে ছাতা পড়ছে। দেশের কাজে সেখানে
থেকে মাত্র বিশ হাজার টাকা তাঁরা নিয়ে
এলেন।

এবই পিঠিপিঠি—১৯১৫ সালের শেষ
পর্বন্ত আরো কয়েকটি জায়গায় বিপ্লবীরা
এমনি চমকপ্রদভাবে 'রাক্ষস' আদার করলেন।
...হিমাসিম খেয়ে গেল বৃটিশের শান্তি-সঙ্কট
কোর্টাল আর নগরপালের প্রহরীরা।

গদ্বার আদেশমত অর্থ সংগৃহীত করে
দলের কাজে ব্যয় করা না তা ব্যবহার করা
হচ্ছে, তত্ত্বক্ষণ ক্রান্ত হবেন না অতুলকৃষ্ণ
মোহ, নরেন ভট্টাচার্য, বিপিন গান্ধলী
প্রভৃতির দল।

পলিশ মরিয়া হয়ে তাঁদের সম্মান করে
চলল।

অবশেষে এসে পড়ল ২১শে ফেব্রুয়ারী,
১৯১৫ সাল।

ব্যাপক অভ্যুত্থানের জন্য নির্দিষ্ট এই
দিনটির কিছুকাল আগে হঠাৎ নেতাদের
সম্মেলন হল, সরকার হস্তোক্তের পেয়ে গিয়েছে
বিদ্রোহের তারিখ।

তাই একুশের পরিবর্তে উনিশে ফেব্রুয়ারী
ধার্য হল। পরিকল্পনা রইল; বিদ্রোহ সফল
হাঁদ হয়, তবে ওদিন পাঞ্জাব মেল কলকাতার
আসতে দেবেন না বিপ্লবীরা—সেটাই হবে
নিশানা, কোনও-বাধা-রিপত্তি ঘটে নি জানিয়ে
দেবে তা'। এবং প্রহরস্বরূপ বাংলার
বিপ্লবীরা পূর্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে
ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন।

সেইমত সর্বত্র প্রস্তুত রইলেন বিপ্লবীরা।
কিন্তু বাধা হয়ে গেল এই প্রচেষ্টাও।

মীর্জাফকির দেশে এবার এসে দেখা দিল
কৃপাল সিং নামে এক বিশ্বাসঘাতক। শত্রু-
পক্ষের কাছে সেই সব কথা ফাঁস করে দিল।
বিশেষত পিথলে, রাসবিহারী ও কতীর সিয়কে
সে ধাবিয়ে দেবার আশ্রয় চেষ্টা করল।

কতীর সিং ধরা পড়ে গেলেন তাঁর
অধীনস্থ কর্মীদল সমেত। শত্রু হল
লাহোর বড়বন্দু মালগা'। বিচারের প্রহসন-
শেষে অমর শহীদ কতীর সিং-এর কিশোর
প্রাণটার ছেদ পড়ল ফাঁসীর স্রোত। তিনি
অ্যামেরিকা থেকে বিমান তৈরির কৌশল
শিখে এসেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার
জন্যে। তাঁব সে বিদ্যা-কাজে লাগবার আগেই
চলে গেলেন তিনি বীরোচিত স্বর্গলোকে।

আরো কত বীর শহীদ হলেন ফাঁসীকাঠে,
স্বাধীনতার, কারাগারের নিরঙ্ক প্রকোপে—
একটি মাত্র কৃপাল সিং-এর স্বাধীনপরতায়।

প্রতিকূল ভাগ্যের নিকটর পরিহাসে
মহানায়ক বতীন্দ্রনাথ টললেন না। তবে
রাসবিহারী মনে মনে খানিক চোট খেলেন।
পিথলেকে নিয়ে তিনি পাথিয়ে গেলেন
কাশীতে—স্বভাবতই, হুম্মবেশে।

শত্রু ইউরোপ অ্যামেরিকাতাই একের
পরে এক কর্মীরা গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের

ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে ব্যাপক করে তুলেছেন, ক্ষেত্র
প্রস্তুতও কবেছেন—এমন নয়। এশিয়ার
অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাঁরা সংযোগ স্থাপন
করে রেখেছিলেন পূর্বাহ্নই। ভারতবর্ষ
থেকে বর্মী, চীন, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা
প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন গমনাগমনের পথ স্থলে
এবং জলে প্রস্তুত রেখেছিলেন বিপ্লবীরা,
এবং প্রত্যেক জায়গাতেই শক্তিশালী ঘাঁটি
স্থাপন করে স্থানীয় ভারতবাসী ও ভারতের
প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মনে বিদ্রোহের
প্রস্তুতাই উদ্দীপিত করেন নি, সৈন্যবাহিনীর
মধ্যে পর্বন্ত বিদ্রোহের জন্যে উপযুক্ত পরি-
বেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন তাঁরা।

বৃন্দ বাধবার আগেই বর্মী থেকে শ্যাম
পর্বন্ত একটি রেল লাইন স্থাপনের কাজে
বহু জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ও সশস্ত্র কাজ করতে
এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অনেক পাঞ্জাবী
এবং স্থানীয় সহযোগী। ১৯১০ সালে
কলকাতা থেকে বিপ্লবীরা পাঠান ভোলানাথ
চট্টোপাধ্যায় ও ননী বোসকে বর্মার ও শ্যামের
প্রচারের জন্যে।

সামুদ্র ছন্দবেশী ননী বোস ননী
মহারাজ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন ধর্ম-
ভীরু পাঞ্জাবীদের মধ্যে। সেই সুযোগে
চমৎকার আদান-প্রদান শুরুর হয়ে গেল
বৈশ্বিক ভাবধাবার। আশাতীত সাড়াও
পাওয়া গেল।

ইঞ্জিনীয়ার অমর সিং, কেল কর্মচারী
নাবায়ণ সিং, বাঙালী উকিল কুমুদ মদ্যাজী
প্রভৃতি শ্যামের উৎসাহী কর্মীদের অন্যতম
ছিলেন।

মহানায়ক বতীন্দ্রনাথকে বহুবার বলতে
শোনা যায় যে, শ্যামদেশেই হবে প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্যের মিলনভূমি। তিনি বলতেন,
"শ্যামদেশ হবে আমাদের সুইজারল্যান্ড!"*

*এই সময় দেখা যায় অ্যামেরিকা থেকে
ব্যানার্টফ' রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ব্যাংককের কার্ভি-
কলী সম্বন্ধে: "শ্যামদেশে বিপ্লবীদের জন্মে
বোমা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্মার প্রস্তুতি
সম্পন্ন। ভাবতে বিদ্রোহ শুরুর হবার সপ্তে
সঙ্গেই এরা আক্রমণ করবে। ...ভারতবর্ষ
থেকে ধবর এসেছে যে কলকাতা, পাঞ্জাব ও
সিঙ্গাপুরে ইংবেজরা দড়ো করে এয়েছেন
আনিচ্ছে।...এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ
হংকং থেকে ৪০ শিখ রেজিমেন্টকে ইংল্যান্ডে
নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের বদলে আসবে
২৫০০ শিখ রেজিমেন্ট। হংকং-এ এখন
৩২৭ জন জার্মান বন্দী; কলকাতায় ৩৭৫
জন।

গ্রেগরনে দেড় হাজার ভলান্টার আছে।
...গোটা বর্মাই বিদ্রোহের আগুনে তেতে
উঠেছে। এখন থেকে আত্মা মদ্রাছে কিছু
আত্মসম্মান পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওয়ার্ল্ডপিঙ্ক ৯-৪-১৯১৫ঃ

—ব্যানার্টফ'—

* ভূপতি মজুমদারের রচনা থেকে।

সাহিত্যিক বসুমতী

যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ জৈনিক বিপ্লবী দার্শনিক লিখেছেন, "তিনি সৃষ্টি করেছেন, কথা বলেন নি। তাই তাঁর কাজ ও সহযোগী-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়াও শক্ত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর কাজকর্মের বা পরিচয় সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় তা থেকে তাঁর যোগাযোগগুলোও অনেক অনুমান করে নিতে হয়।... শত্রু, ন্যাশনাল আর্কাইভসের ফাইলে পড়েছি, কউবাজারে এক শিখের গ্যারেজ থেকে একখানি মোটর সাইকেল নিয়ে এক বাঙালী বেরিয়ে পড়তেন বিপ্লবের কাজের ধান্দায়। আমরা জ্ঞান, এক যতীন মুখার্জী ছাড়া ও যুগে বাঙালী বিপ্লবী কেউ মোটর সাইকেল চড়ায় কল্পনাও করে নি।..." এই বিপোর্টে দেখা যায় যে, শিখের উক্ত গ্যারেজটিব সংগে একদিকে যেমন পাকিস্তানের বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্র সংযুক্ত, তেমনি তার যোগাযোগ প্রসারিত সুদূর শ্রাব্যককেব বৈশ্বিক ষাটি পর্যন্ত।

শ্যামদেশের প্রতি যতীন্দ্রনাথের অনু-
স্মরণ এই আবেগটি প্রমাণ:

ফিরে আসি ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দিন গুণিছিল বর্মার পনেরো হাজার মিলিটারি পদাংশ। অভ্যুত্থানের কবেকদিন আগে একদল বাহাদুর সৈন্য বোম্বাই থেকে রেগড়নে পৌঁছল। সেখানকার বিপ্লবী মুসলমানদের প্ররোচনাধা বাহাদুর সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহে যোগ দিতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্রোহ সম্ভব হবার আগেই বর্মার কতৃপক্ষ খবর পেয়ে বান এবং নৃশংস দমননীতিবরণ করেন।

বিদ্রোহ একমাত্র সফল হল সিঙ্গাপুরে। মালয় স্টেটস গাইড অব ফিক্স লাইট ইন-ফ্যান্সি বিদ্রোহে যোগ দেবে, প্রতিশ্রুত ছিল। সর্বসাকুল্যে হাজারখানেক শিখ ও মুসলমান সৈন্য দিন গুণিছিল বিদ্রোহে যোগ দেবে বলে। —পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে তারা গিয়ে স্থানীয় কেল্লা আক্রমণ করল। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত করে দিল। জার্মান রাজ-কন্ডীও সেখানে অনেক ছিল; কিন্তু তাদের কাছে ইতিপূর্বে বিদ্রোহের সংবাদ বা তথ্যপত্র পৌঁছয় নি বলে বিদ্রোহীদের স্বপক্ষে তারা সাক্ষ্য দিতে পারেন না। তবু বিদ্রোহীরা জরী হল। সাক্ষ্য হল অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা।*

পূরো সাতদিন কুতিত্বের সংগে সিঙ্গাপুরে অবরোধ করে বিদ্রোহীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন—কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে।

কোনও নির্দেশ, কোনও সাহায্যই পৌঁছল না।

অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণ

* কিস্তারিত বিবরণের জন্যে F. W. Wilson -এর World War I প্রবন্ধ।

করলেন ইংরেজের কাছে। বিদ্রোহের অপব্যবহে চরম শাস্তি তাঁদের মাথা পেতে নিতে হল। নির্বাসন, ব্যবসায়ীক করাণ্ড, মৃত্যু!...

সিঙ্গাপুরের নামকরা এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর ফাঁসী হয়ে গেল: বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্যে তিনি রেগড়নের তুর্কি কন-সালের কাছে জাহাজ এবং সৈন্য চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—সেই অপরাধে।

পিংলে গেলেন মীরটে। সৈন্যবাহিনী তখনও আশা ছাড়ে নি। গোপনে তিনি সৈন্যবাসে প্রবেশ করে রাত কাটালেন সেখানে। ভোর হলেই সৈন্যবাস অবরোধ করলেন—এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

মাঝবয়েত হঠাৎ এক ইংরেজ অফিসারের কানে এ খবর পৌঁছল। পিংলেকে চুপি চুপি সনাক্ত করে নিয়ে তিনি ব্যারাক ঘেরাও করিয়ে ফেললেন। অস্ত্রাগার এবং ফটকের চাবি লুকিয়ে রাখা হল।

ভেনবেলা সমস্ত দেশী সৈন্য সমেত পিংলে ধরা পড়ে গেলেন।

পিংলের ফাঁসী হয়ে গেল। ইনিও অনেক স্বপ্ন অনেক আশা নিয়ে অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবেন বলে।

উক্ত ভাবতের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী নলিনী মুখার্জী লিখেছেন, "পিংলে জড়িতে মারাঠী রাজ্য। মেহ ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। বয়স পঁচিশ বৎসর। পাঠানদের মত পোশাক ও মাথায় তুর্কি ক্যাপ।... লাহোর ক্যান্টনমেন্টে তিনি বেরুপ দক্ষতা ও সুকুমার স্বাধীন সহিত বিপ্লবের আন্দোলন চলাইয়া-ছিলেন, তাহাতে সত্যিই ১৮৫৭ খঃ সিপাহী বিপ্লবের অমর বাব নানাসাহেবের প্রেরণা-দায়ক বাবুদের স্মৃতি জাগ্রত হবে।"

এবার রাসবিহারীর পালা। তিনি গা-ঢাকা দিয়ে চলে গেলেন চন্দননগরে। যতীন্দ্রনাথের সংগে নেতাবা গিয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে জার্মানী ও অন্যান্য এশীয় দেশের বিপ্লবীদের সাহায্যে জাপান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের যে কাজ চলাছে, তাকেই রাসবিহারী গিয়ে স্বাধীন করবেন।

হারি আশুদ সঙ্গ-এব স্ববিক্রম চক্র-বর্তীকে যতীন্দ্রনাথ ভাব দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে সংবাদ আদান-প্রদান চালানোর। আব, শ্রমজীবী সমতা-এব তবু থেকে উত্তর-পাড়ল বিপ্লবী কর্মী সমাধা (সখাময়) মখার্জী চুন, তিনি প্রভাবিত ব্যবসায় অজ্ঞাতে শ্যাম, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের সংগে জলপথে সংযোগ রাখেন। কিছু টাকা এবং অস্ত্র ইতিমধ্যেই এ পথে এসে পড়েছিল।

রাসবিহারীর বিদেশ যাবার অর্থ সংগৃহীত হল। ততদিন তিনি নবম্বীপে গিয়া আত্মগোপন করে রইলেন। ১১১৫ সালের ১১ই মে তিনি পি এন. ঠাকুর হুম-নামে জাপানী জাহাজ পানকিমারা করে চলে গেলেন জাপানে।

এগিয়ে চললেন তার পরিকল্পিত বিপ্লবের পথে। এই বিপ্লবের হোমানলি তো ভাবতবাসীর সর্বনাশা সৃষ্টি দীর্ঘ করে তাকে দীক্ষিত করবে সনাতন ভারতের শাসনত আদর্শে।

[ক্রমশঃ]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও
তাত্ত্বিক, গডফ্রেট উপাধিপ্রাপ্ত

ব্রাজ জ্যোতিষী



মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ
হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী জ্যোতি-
র্বিদ, হাউস অব
এম্প্রাইজ, ৪৫এ
শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী রোড,
কলকাতা-২৬ (হাজরা
পার্কে'র ঠিক পূর্বে)
ফোন : ৪৭-৪৬৯৩। তিনি
শাস্ত্রীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে
জন্মপ্রাপ্ত। হস্ত, কপাল

রেখা ও নির্ভুল কোষ্ঠী বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
প্রশ্ন গণনাধা সিম্বলিস্ট, ভূত, ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান নির্ণয়ে অশ্বিতীয়।

যোগবলে ও তাত্ত্বিকক্রিয়া এবং শাস্ত্র-
স্বস্তায়নাদি দ্বারা দুর্ভাগ্যের ও কোপিত
গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা মোকদ্দমায়
নিশ্চিত জয়লাভে সহায়তা কবিতো তাঁহার
ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। ভারত, পাকিস্তান, বর্মী,
সিংহল, ইংলন্ড, অমেবিকা, ফ্রান্স, আফ্রিকা,
চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বহু বিশিষ্ট
মনীষিবৃন্দ জ্যোতিষমর্নির্বাণে পণ্ডিত
মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অবাচিত সহায়
সহস্র প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন।

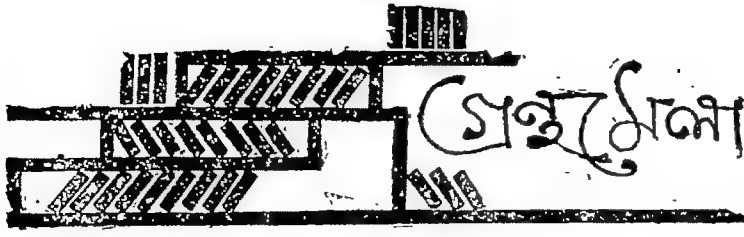
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকালী ও নবগ্রহ'
মন্দিরে নিজ তত্ত্বাবধানে আর্ষ ঋষিদের
শাস্ত্রানুযায়ী তন্ত্রমতে প্রত্যেকটি কবচের
পূর্বচরণাদি কার্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়াই
কবচগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধালী ও প্রত্যক্ষ
ফলপ্রদ হয়।

মহাশাস্ত্রসম্পন্ন কয়েকটি জাগ্রত কবচ
শাস্ত্র কবচ :—পরীক্ষা পাশ, মানসিক
ও পারিবারিক ক্রেশ, আকস্মিক দুর্ঘটনা
প্রভৃতি দুর্গতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
সাধারণ—৫; বিশেষ—২০।

বগলা কবচ :—সামলয় জয়লাভ, রাজ
কুপালাভ, ধন ও সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায়
শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। গৃহীর
মঙ্গলদায়ক। সাধারণ—১২; বিশেষ—৪৫।

আকর্ষণী কবচ :—শত্রুকে মৈত্রীসূত্রে
আবদ্ধ করিতে এবং অভীষ্টজনকে বশীভূত
কবিতো ইহার ক্ষমতা অপারিসর। সাধারণ—
১২; বিশেষ—৫০; অতিবিশেষ—২০০।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত হস্তবেধা শিখিবাব
ও বিচার করিবার দুইটি শ্রেষ্ঠ অবদান—
সাম্প্রতিকর (বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণ)—৬;
জুয়েল অব পামিষ্ট্রী (ইংরাজী)—৭।



মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন—
স্বদেশবন্ধন দাস, র‍্যাডিক্যাল 'হিউম্যানিস্ট', ১৫,
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।
দায় : ১৫.০০

মানবেন্দ্রনাথ, আসল নাম যার নরেন্দ্রনাথ, যিনি আমেরিকায় আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে নতুন নাম মানব+ইন্দ্র=নর+ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন—তার জীবনের ঋঁটিনাটি বিবরণ আজো আমাদের অজ্ঞাত। তাঁর সম্পর্কে জানার জন্যে কৌতূহল আমাদের আছে, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধি এতো বিরাট যে যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করা এক কঠিন দূরূহ কর্ম। অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ নিজের প্রচুর লিখে গেছেন, তাঁর বিদেশীভাষা বচিত গ্রন্থ বা প্যাম্পলেটস—যা পাওয়া গেছে তন্মাত্রা তাঁর সামগ্রিক পরিচর লাভ করা যায় না। বিশেষত তাঁর অনেক বচনা আজো অপ্রকাশিত যা অজানার অন্ধকায়ে প্রায় বিলীনমান। এই অবস্থায় স্বদেশবন্ধন দাস উপবৃত্ত গ্রন্থ রচনা করে মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচর ঘটিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তন্মাত্রা তিনি ধন্যবাদার্থ।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, একথা প্রাতিকট হলেও সত্য যে, বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে মানবেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন আবেশ করার যেমন প্রয়াস নেই, তেমনি তিনিও প্রায় স্ফুটিত মন্থে অস্তহিত। কেন এই দশা ঘটলো? তাহলে কি তাঁর ভক্তের কাঠিন্য বা হুঁটি, কিম্বা উদ্ভবসাধকদের অবহেলা? আমাদের মনে হয়, যে মানবেন্দ্রনাথকে আমরা ঋঁটিকার মতো প্রবলগতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে দেখেছি, স্বদেশ সাধনার যিনি আদর্শস্থল, জীবনে যিনি ধর্মিকমল ও বিবেকানন্দের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন—শেষ পর্যন্ত তিনি স্বকীয় জীবন ও আদর্শের সঙ্গে বিলাস-চিন্তার এক মানসিক বিরোধ ঘটিয়ে ফেলেছেন। ব্যক্তিচেনার তিনি অত্যন্ত প্রথব। গ্রন্থকারের মতে, "তাঁর সাধনাই ছিল নিজ নামকে সার্থক করে তোলা; তাঁরই জন্যে তাঁর বিকশিত ব্যক্তির সাধনা।" (পৃঃ ৭৮) ব্যক্তি সাবভৌম অধিকারে বিশ্বাস করতেন মানবেন্দ্রনাথ। ব্যক্তিমাত্র দম্ভিসম্ভাব আছে বিকসে যাযে না, চরম দাসকে অধঃপতিত হবে না—এই উপলব্ধিতে মানবেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন নব-মানবতাবাদ দর্শন।

"মানুষের স্বাধীনতা ইকনমিক মানে স্বাধীনতা নয়—শ্লেচ্ বা শ্লেচ্ জ্বাইভার হবে পরমা রোজগার করবার স্বাধীনতা নয়," (পৃঃ ৫৬০) —এই মতাবলম্বের প্রবর্তক রায়-ই তবু জেল থেকে চিঠিতে লিখেছেন— "দাবিপ্রব পীড়ন, নোরা বসিততে বাস, নিতা অভাবের জ্বালা আদর্শ প্রেমিক যুগলকেও পবসপের প্রতি তিস্ত করে তোলে। আজ যে পৃথিবীতে এত কম ভালবাসাবাসি তার কারণ বর্তমানের অভাব-অনটন ইত্যাদি।" শ্রীরায়ের উক্তবচন কামনার টানা-পাড়েনের জন্য নব-মানবতাবাদ যুগপিত আমাদের কাছে অননুভূত থেকে গেছে। অবশ্য শ্রীদাস শ্রীরায়ের যাবতীয় মতামত আলোচনার দ্বারা জানিয়েছেন যে, "রায় দেখলেন, তাঁর নব-মানবতাবাদ এতই অভিনব যে, লোকে ঠিক

জয়ন্তী সেন

ধরতে পারছেন না। যাদের হোখার কথা সেই অতি উচ্চশিক্ষিত মহলও বুকে উঠতে পারছেন না।" (পৃঃ ৫৬১) হয়তো না পারার কারণ তা জনতার স্বার্থে রচিত হলেও জনোপযোগী সহজগ্রাহ্য নয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় শিবনারায়ণ বার একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, "মানবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের চিন্তার সঙ্গে মার্ক্সবাদের সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠা সম্ভব।" সেই কারণে তিনি গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নয় এবং আমবাও নই। তবু বর্তমান গ্রন্থটি রচনার শ্রীবাসের ভূরসী প্রশংসা করতেই হবে। শূদ্র মতাদর্শে এক মনে হলেই জীবনী রচনা করা যায় না। শ্রীদাস যে পর্ববেক্ষণ ও অনুসন্ধানের সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথের অনুস্মৃতি জীবনী তুলে ধরেছেন তা নিবল সাধনা ও কঠিন পবিগ্রমের দ্বারাই সম্ভব। তা ছাড়া মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচর থাকার সৌভাগ্য তাঁর দর্শন সম্পর্কেও তিনি মতামত বস্ত করতে পেরেছেন।

গ্রন্থটি পঞ্চম খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে 'মাত্জোড়ে নরেন্দ্রনাথ' থেকে 'আমোবকা অভিমুখে নরেন্দ্রনাথ' চিত্তীয় খণ্ডে 'নব-জীবনের সূত্রপাত', বিশেষে চাকলাকার জীবন-যাপন ও আচিন্ত্যনীয় কাব্যবঙ্গী, তৃতীয় খণ্ডে 'যারের ভাবতে প্রত্যাবর্তন', গ্রেপ্তার ও কংগ্রেসে যোগদান, চতুর্থ খণ্ডে 'জী অ' র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন' প্রতিষ্ঠা যুগ্মোক্ত ইটোপ ও রায়; পঞ্চম খণ্ডে নব-মানবতাবাদের উদ্ভাবনা থেকে 'রায় যদি আজ

থাকতেন'। গ্রন্থকার এলেন রায়কে শ্রীরায়ের বখা জীবনসঙ্গিনীরূপে মৃত করে তুলেছেন। রায় রচিত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকাটিও মূল্যবান। শ্রীরায়ের কয়েকটি দূরত আলোকচিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শ্রীমতী—প্রধান সম্পাদিকা : শ্রীমতী আতা চট্টোপাধ্যায়, ২১, ওয়াটারলু স্ট্রীট, (পি. ৫. বক্স—২৬০৬), কলিকাতা—১।
দায় : ১ ২৫ পরসা।

সচিত্র 'শ্রীমতী'র বর্ডার সংখ্যা গল্প, কবিতা, সম্পূর্ণ উপন্যাস ও বিভিন্ন চিত্রকর্ষক ও শিক্ষণীয় বিভাগ রয়েছে। বর্ডার সম্পর্কিত তিনটি সুলিখিত বিশেষ রচনা এ সংখ্যার স্থান পেয়েছে। মিখাইল শলোকফ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ কয়ালের প্রবন্ধটি তথ্যময়। শলোকফের ছবি থাকাও উচিত ছিল। সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য : চিত্র : শিল্প : আর্ম—এই মূল্যবান বচনার জন্য 'শ্রীমতী'র সম্পাদিকা অবশ্যই কৃতজ্ঞ দাবি করতে পারেন। এতে সত্যজিৎ অনেক নতুন কথা শুনিয়েছেন। 'শ্রীমতী'তে উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন—রজনী পানিকর (অনুবাদের আতা পাকড়াশী), ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত, বিজয়কুমার ঘোষ। শিববাম চক্রবর্তীর সমাপ্তে পর্বৎ সূত্র দেবরত মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক 'পর্বৎ' নাটক মনস্তত্ত্বপ্রধান। সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন মিলন দত্ত। সীমা রায়চৌধুরীর রামমোহন সম্পর্কিত বিতর্কবহুল রচনা আকর্ষণীয়—কবিতা মোট সত্তেটি। কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য, কৃষ্ণ ধর, দুর্গাদাস সর্কার, সুনীল হাজরা, বঙ্কিম গুহ, শান্তনু চন্দ্র প্রমুখ।

ভারতশ্রী—সম্পাদক : রাইমোহন সাহা, ৩৩।২, রাণী পার্ক, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬।
দায় : ৮০ পরসা।

এই পত্রিকার একটি মূল্যবান রচনা সাধন-কুমার ভট্টাচার্যের নাটক বিচাৰ। এ ছাড়া যুগ্ম সম্পর্কিত গল্প, অবলম্বনপ্রধান গল্প ছাড়া নাটক, অনুবাদ ও কবিতাও আছে। বিতর্ক-মূলক রচনা হচ্ছে 'সাবভৌমের আসর'। সম্পাদকীয়তে সাধারণ মানুষের মূখের কথাই ফুটে উঠেছে—কিন্তু সেসব কথা কে শুনছে? পত্রিকাটির দীর্ঘায় কামনা কবি।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বীয় সর্বাঙ্গী

প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর চাঁদার হার

বার্ষিক	...	১৪.০০
মাংসাসিক	...	৭.০০
ত্রৈমাসিক	...	৩.৫০

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পরসা

চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়

পার্ক পেশন মানেমার

আপনার লেখা

ওকেনা হোনা

ও

চৈতন্য

লকাত নটায় আমাদের সৌম্যর আরম্ভ।
জাই ব্রেকফাস্টের পর সময় পাব না বলে স্নান
করে ব্রেস পরে নিলাম। ঠিক সাড়ে সাতটার
সময় নিচে বস্টাখানি হল। আমরা সাড়া
দিয়ে নিচে নেমে দেখি বেসডই ঘটা বাজছে।
আমরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসলাম।
মিসেস পাওয়েল আমাদের সান্ত করে নিজেও
খেতে বসলেন। তিনি আমাদের বাড়ি ও
পরিবারের খবরাখবব নিলেন। মিস্টার কা
হলেন, 'টেবিল ম্যানার্স' আমাদের কোনো
ছুটি ঘটলে দয়া করে সংশোধন করে দেবেন।'
মিসেস পাওয়েল বললেন, 'তা নিশ্চয়ই
দেব। কিন্তু এ রকম ছুটিতে বিরত বোধ
করার কোনো কারণ নেই। কেন না এক
দেশের লোক অন্য দেশে গেলে তারা সব
ম্যানার্স জানবে এমন আশা করা অন্যায্য।
আমি ভারতবর্ষে গেলে নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম
সেখানকার অনেক প্রথাই জানব না।'

মিস্টার পাওয়েল ভাবতবর্ষের পশুপক্ষী,
গাছপালা, খনিজসম্পদ, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে
অনেক প্রশ্ন কবলেন। একটি লম্বা কেটে
আমাদের দিতে দিতে বললেন, 'তোমরা এটা
চিনতে পারছ তো?'

আমরা প্রায় সমন্বরে বলে উঠলাম,
'কোথার পেলেন?'

তিনি একটু হেসে উত্তর দিলেন,
'আমাদের এক বন্ধু বিদেশ থেকে কতকগুলি
লম্বা গাছ নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি
লাইব্রেরি বিল্ডিং ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-
এর মধ্যকার জায়গায় পোতা হয়েছে। তোমরা
ওসিকে গেলে দেখ।'

মিস্টার কা কক্ষিতে পাউরুটি ভুবিয়ে
খাচ্ছিল। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'আমরা
এ ভাবে খাই না।' মিস্টার কা খোসা
ছাড়িয়ে একটি আলত কলা খেতে গেলে বেমণ্ড
ফিসফিস করে তার দাঁদমার কানে কানে
বললে, 'হি ইজ ইটিং লাইক এ মশিক।'
তার কথায় চিরন্তন শিশুহৃদয়ের প্রকাশ
ঘটলেও মিস্টার কা মৃদু লজ্জার লাল হবে
উঠল।

ব্রেকফাস্টের পর মিস্টার পাওয়েল
বললেন, 'চল, তোমাদের পেপাছে দিবে আমি
আমাব অফিসে চলে যাব। তোমাদের
সেগিনব এডুকেশন বিল্ডিং-এ হবে তো?'

আমরা মাথা নাড়লাম। মিস্টার পাওয়েল
তাঁব নাতি ও স্ত্রীকে চুমু খেয়ে আদব
করলেন। বৃন্দ-প্রমের এই সয়ল ও সহজ

অভিব্যক্তি খুব ভালো লাগল। এর পর লক্ষ্য
করেছি মিস্টার পাওয়েল প্রাতিদিনই স্ত্রীকে
এইভাবে আদর করে বেরতেন।

মিস্টার পাওয়েলের গাড়িতে অল্পক্ষণের
মধ্যেই আমরা এডুকেশন বিল্ডিং-এর সামনে
পৌঁছলাম।

ঠিক নটায় সময় ডক্টর উইলিয়মসের
সেগিনব শব্দ হল। আমরা মোট কুড়িজন।
এঁরা এসেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে।
সেগিনবের বিষয় আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার
ওপর ইউরোপীয় প্রভাব। আমেরিকার শিক্ষা-
রীতিতে কেবলমাত্র বহুতা পশ্চাতিব স্থান নেই।
এখানে প্রশ্ন-উত্তর-প্রণালীর অনুসরণ করা
হয়। তাই ক্লাশে কারো চুপ করে বসে
থাকার উপায় নেই। যদিও এই রীতিতে

এস. কে. ব্রানবার্গ

কোনো কোনো সময় বহুতাকারীকে বেশি বাধা
দেওয়া হয় তবুও সাধারণভাবে এই পশ্চাতিতে
শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত শ্রমী হলে ওঠে
এবং প্রত্যেক ছাত্রকেই শিক্ষা প্রণালীতে সক্রিয়
অংশ না নিলে চলে না। তাই আমেরিকার
কোনো ক্লাশেই মুখচোরা লম্বুক স্বল্পভাষী
ছাত্র দেখা যায় না। আব সর্বত্র প্রায়ই শব্দভে
পাওয়া যায় 'কোশেন, কোশেন, এনি
কোশেন।'

ডক্টর উইলিয়মসের বহুতা অত্যন্ত চিন্তা-
কর্মক। এতো ভালো শিক্ষক আমি জীবনে
খুব কম দেখেছি। দৃঢ় মজবুত চেহারা
একটা আশ্চর্য কমনীয়তা। মুখে সবদাই
প্রশান্ত কোঁকোজ্বল হাসি। মাথা খুব
ছোট ছোট করে চুল ছাটা। চুলের এই ছাটাই
আমেরিকায় খুব চলত। বৃটিশ হাডুবাসের
কালস ইংললটন প্রশ্ন করবার জন্যে হাত
তুললেন। ডক্টর উইলিয়মস বহুতা থামিয়ে
বললেন, 'ইয়েস, ইউ ফেরার, গুডলুংকিং
আ্যান্ড ইনট্যাক্সপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল টিচার...'
ইংললটন নিগ্ৰো। তাকে ফেরার গুডলুংকিং
বলাতে সে একটু বিরত হল। ডক্টর উইলিয়মস
সকলকেই এই কথা বলে উল্লেখ করতেন।
তাই সেই গভীর মিশ্র কণ্ঠস্বর এখনো কানে
বাজে। চিলির কার্টুনিস্ট ও লেখক পার্সি
ইগলহাস্ট আমাদের একটি সুন্দর কার্টুন
এঁকে তাতে লিখেছিল, 'ফেরার, গুডলুংকিং
আ্যান্ড ইনট্যাক্সপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল এডু-
কেটর্স।'

দুপুরে ইউনিয়ন বিল্ডিং-এর ক্যাফে-
টেরিতে লাগু খেয়ে নিলাম। তাবপর ডক্টর
স্নাইডারের একটি সেগিনবে বোগ দিলাম।
এই সেগিনবের বিষয় ছিল, 'দাদ অর্গানাইজেশন
অব আমেরিকান এডুকেশনাল ইন্ডিভি-
জুয়ালিটি।' ডক্টর স্নাইডারের বয়স ষাটের
ওপর। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ অধ্যাপক।
সেগিনবের পর লাইব্রেরীতে গেলাম। উত্তর
দিকের দরজার সামনে কতকগুলি লম্বা গাছ
চোখে পড়তে মিস্টার পাওয়েলের কথা মনে
হল।

লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ বেশ ভালো।
ভাবত সম্পর্কে কয়েকটি বই আছে, কিন্তু
বাংলা বই একটিও ছিল না। আমি একটি
বাংলা বই লাইব্রেরীতে পবে পাঠিয়েছিলাম।

লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে সময়ের খেয়াল
ছিল না। খাবার পর ইউনিয়ন বিল্ডিং-এ
গিয়ে দেখি সেখানকার ক্যাফেটেরিয়া বন্ধ হয়
গিয়েছে। মিস্টার কা বললে, 'শুন, ইউ
টাউন থেকে কিছু কল দৃশ ইত্যাদি ধর
বাসায় নিয়ে গিয়ে খাব।'

ডাউন টাউন থেকে দৃশ, কলা, আগেল
ও পাউরুটি কিনে বাসা ফিরে দেখি রেমণ্ড
তার দাদু ও দাদিগার সঙ্গে বসে টোলভিসন
দেখছে। মিস্টার পাওয়েল আমাদের সারা
দিনের কাব্যকলাপের খবর নিয়ে বললেন,
'বেমণ্ড কেবলই দরজা খুলে দেখছিল তোমরা
আসছ কিনা আর জিজ্ঞাসা করছিল, আমার
লোকেরা এত দৌব করছে কেন? বাস্তা
হারিয়ে ফেলে না তো?'

আমি শিশুহৃদয়ের এই আন্তরিকতার
গভীরভাবে মুগ্ধ হলাম। নতুন করে
বুঝলাম শিশুর স্বরূপ সব দেশকালেই এক।
এর পর থেকে লক্ষ্য করেছি রেমণ্ড আমাদের
'সাই ম্যান' বলে উল্লেখ করত। আমরা বাসা
না ফিরলে ও কিছুতেই ঘুমোত না। ও
যখন কয়েকদিন পরে ডালাসে ওব মায়ের কাছে
চলে গেল তখন কি শুন্যতাবোধই না আমরা
অনুভব করেছিলাম।

আমাদের হাতে খাবারের জিনিসগুলো
দেখে মিসেস পাওয়েল জিজ্ঞাসা করলেন,
'এ সব কি?'

আমি বললাম, 'আমরা লাইব্রেরীতে বেশি
রাতি পর্যন্ত ছিলাম বলে ইউনিয়ন বিল্ডিং-
এব ক্যাফেটেরিয়াতে ডিনার খেতে পারি নি।
তাই এগুলো নিয়ে এসেছি।'

মিসেস পাওয়েল বললেন, 'তোমরা

এগুলো কিচেনে রেখে ওপরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এস। কিচেনে বসেই এগুলো খাও। আমরা খাবারের জিনিস কিচেনেই রাখি এবং সেখানেই খাই। অন্য ঘরে এগুলো নিলে পোকমাকড় হয়।'

আমরা মিসেস পাওয়েলের কথা মতই কাজ করলাম। খেয়ে দেয়ে কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখলাম। টেলিভিশনে একটি নিগ্রো ছেলে একটি মেসেব সংগে জাজ-সংগীত গাইছিল। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'জান এরা গান করে বা রোজগার করে তা অনেক গভীরও পায় না।' একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'জাজকের 'ওকলাহোমা ডেইলী' দেখেছ? ওতে তোমাদের গ্রুপের একটি নিগ্রো টিচারের ছবি আছে। অনেক দেশের টিচারই তো তোমাদের গ্রুপে রয়েছে। সব ছেড়ে একটি নিগ্রো টিচারের ছবি বেরুল কেন?'

মিস্টার পাওয়েল ফেফুন কাটলেন, 'এ সব বিজ্ঞাপনের কাহদা!'

বুলালাম এ'বা নিগ্রোদের ওপর বিশেষ প্রসন্ন নন।

কিছুক্ষণ টি ভি দেখে আমরা ওপরে এসে শব্দে গেলাম। দক্কা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি লকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক নেই। মিস্টার কাকে বললাম, 'কাল ব্রেকফাস্টের সময় মিসেস পাওয়েলকে বলতে হবে।'

পর দিন সকালে মিসেস পাওয়েলকে লকিং-এর কথা বলতে উনি বসলেন, 'আচ্ছা ঠিক করে দেব।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আমরা দরজা ভেঙিয়ে বাধা। লক করার দরকার হয় না। নক না কবে কেউ দক্কা খুলবে না।'

দুপুরবেলা ইউনিয়ন বিল্ডিং-এ সাপ্তাহিক গ্রুপ লাগে যোগ দিলাম। গ্রুপ লাগের উদ্দেশ্য ছিল পবনবের সংগে আলাপ-আলোচনা হত। মিস্টার বাসেল গ্রুপ মিটিং-এ ঘোষণা করলেন যে সামনের শনিবার ক্রেমসনের সংগে ওকলাহোমার যে ফুটবল মাচ হবে ইচ্ছা করলে আমরা তা দেখতে পারি।

নামে ফুটবল খেলা হলেও আসলে রাগবি। বলের আকার অনেকটা পটলের মত। হাত দিয়ে খেলে। একজন বল নিয়ে ছুটলে তাকে বাধা দেওয়ার জন্যে বিপক্ষের অনেকে তার ওপর খাপিয়ে পড়ে। খেলোয়াড়দের অমিত স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হয়। তাবপর দেহ সুরক্ষিত করবার জন্যে তারা মাথায় হেলমেট, বকে প্যাড প্রভৃতি পরে। ফুটবল আমেরিকার জাতীয় খেলা। এতে যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় তা চোখে মা দেখলে বিশ্বাস হয় না। ফুটবল খেলোয়াড়দের এদেশে খুব খ্যাতির। ফুটবল কোচের সন্মান দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড ফুটবল কোচ একজন ফুল প্রফেসরের চেয়ে বেশি

মাইনে পান এবং তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের অধীন।

শনিবারে সকাল থেকেই টাউনে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা গেল। বাসন্ত্য রাস্তার স্রাগ। পার্কিং-এর জায়গাগুলি ভর্তি। কেনা কোনো বাড়িওয়ালা তাদের কমপাউন্ডে গাড়ি পার্কিং করতে দিয়ে বেশ কিছু ডলার রোজ-গার করছে। শহরে চারিদিকে লোক জমায়েত হচ্ছে। ইউনিয়ন বিল্ডিং-এর কার্ফোর্টার্সরা এতো ভিড় যে আমার লাগ খাওয়া হল না। আশে পাশের দোকানও জারগা নেই। অগত্যা প্যাকেটেরা স্ট্রান্ডে চিকেন ও দুধ খেয়ে স্টেডিয়ামে গেলাম। বেশ বড় স্টেডিয়াম। কিনার ঘরে বৃত্তাকারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্রাগে জাতীয়তাবোধ উচ্চারিত। স্টেডিয়ামে ভিলা ধারণের স্থান নেই। প্রথমে জমকালা বেশে জাতীয় সংগীতের পর কেউ ফিজিকাল ফিটস দেখালে। ১-৩০ মিনিটে খেলা আকস্ম হল। বিশেষ করে চোখে পড়ল চায়ার বচ ও গাল-দের স্রিমাকলাপ। দুই পক্ষের চায়ার বচ ও গালেরা মধ্যে মধ্যে সুনির্বাচিত প্রগলভে হাত ও পা ছুড়ে এবং চীৎকার করে নিজদের দলকে উৎসাহ দিতে লাগল। শব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত খেলাব উত্তেজনা ও উল্লাসনা বিস্ময়কর। প্রচণ্ড সূর্যের তপে গলদর্শক হলেও কাবো উৎসাহের এতটুকু কমতি নেই।

প্রথমে ক্রেমসন দল পর্যাটে এগিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওকলাহোমা দলই ১৪ পর্যাটের বিপক্ষে ৩১ পর্যাটে জিতে গেল।

রবিবারে ডক্টর উইলিয়ামসের বাড়িতে আমরা ডিনাব ফেলাম। ইউনিভার্সিটির অনেক অধ্যাপক এলেন। ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ডক্টর ক্রস অন্যতর বস্তু থাকায় আসতে পারলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী এলেন। মিসেস ক্রস ভারত সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। তিনি কয়েকবার স্বামীর সংগে ভারত ভ্রমণ করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে আবার ভাবতে যেতে পারেন। মিসেস ক্রস আমাকে বললেন, 'আমার স্বামী আমার মতই ভাবত-বর্বতে ভাবতেন। এখনে অনেক ভারতীয় ছাত্র আছেন। ভারতীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে আমার স্বামীর খুবই উচ্চ ধারণা। আগামী মঙ্গলবার আমাদের বাসার আপনদের বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আপনি আসছেন তো?'

আমি মাথা নাড়লাম। এডুকেশনের ডিন ডক্টর জোনস এবং ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর আণ্ডারের সংগে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক কথা হল। তাদের জিজ্ঞাসাব বিষয় নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি, ভারতে খৃস্টানদের অবস্থা ইত্যাদি। মিসেস উইলিয়ামস হঠাৎ এসে বললেন, 'আমার স্বামী আপনাকে ডাকছেন।' আমি তাঁর সংগে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখি ডক্টর উইলিয়ামস আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাতে শানিভিনের বই। আমাকে দেখে মিল্ট হেসে বললেন, 'কুমি

এডুকেশনাল ফলজারি সম্পর্কে বই চেয়ে-ছিল। এই ভিনটে বই পড়।'

আমি বইগুলি তাঁর হাত থেকে নিলাম। এমন সময় মিস্টার বাসেল ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি এখানে। আমি আপনাকেই খুঁজছি। আপনার নামে একটা চিঠি আছে।' তিনি আমার হাতে একটা চিঠি দিলেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘব থেকে বেরিয়ে এলাম। মিস্টার বাসেল আমার সংগে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'ডক্টর উইলিয়ামসের কাছ থেকে বই পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। খুব ইম্প্রেসড না হলে উনি কাউকে বই পড়তে দেন না।'

মঙ্গলবার ডক্টর ক্রসের বাড়িতে বৈকালিক চা-চক্রে হাজির হলাম। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের উত্তর দিকে সাদা রঙের দোতলা সুন্দর বাড়ি। খুব সাজানো-গাছানো। মিসেস ক্রস আমাকে অনেকগুলি ভারতীয় পুতুল, শাড়ি, রেকর্ড, ইত্যাদি দেখালেন। ডক্টর ক্রসের সুন্দর লাইব্রেরীটি খুবই ভালো লাগল। ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটি প্রেসের বেশ নামডাক আছে। এখান থেকে অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট বই প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর ক্রস আমাকে ইউনিভার্সিটি প্রেসের একটি পুস্তক তালিকা উপহার দিলেন। তাঁর সৌজন্য ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করল।

পবদিন সকাল নটার সময় নর্মান সিনিয়র হাই স্কুল দেখতে গেলাম। এত সুন্দর স্কুল বিল্ডিং আমি আমেরিকাতেও খুব কম দেখেছি। আমেরিকার স্কুল প্ল্যাটে কাচের ব্যবহার বিশেষ করে চোখে পড়ে। নরম ও উজ্জ্বল লাল রঙের ইটের দেওয়াল, স্বাভাবিক আলোব সংগে কৃত্রিম আলোর সামঞ্জস্য, দীর্ঘ করিডর, মডেল পাঠশালা ও ফার্নিচার ইত্যাদি আমেরিকার স্কুল প্ল্যাণ্টের বিশেষত্ব। নর্মান স্কুল প্ল্যাণ্টের বিষয়ে ইতালি প্রভৃতি বিদেশের অনেক জায়গায় বিজ্ঞপ্তি বোঝিয়েছে শুনলাম।

আমরা ঘুরে ঘুরে স্কুলের অভ্যন্তরীণ, ব্যাড রুম, মিউজিক রুম, সয়েন্স ল্যাবরেটরী, জিমনাসিয়াম, লাইব্রেরী, লাউন্ড প্রভৃতি দেখলাম। আমেরিকার রূপ ও শরীর চর্চার ওপর বিশেষ জোব দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভোটে নির্বাচিত একজন বিউটি ফুইনও তাব অ্যাটেণ্ডেন্ট থাকে।

স্কুলের লাইব্রেরীটি চমৎকার। এতে অনুমান ৭০০০টি বই, ৩০টি জার্নাল ও ২টি নিউজপেপার আছে। যারা পরে লাইব্রেরিয়ান-শিপ পড়বে তারাই লাইব্রেরীতে অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করবে। লাইব্রেরিয়ান আমাকে স্কুলের জার্নালিজম ক্লাস থেকে প্রকাশিত 'টাইগার টেলস' পত্রের একটি সংখ্যা উপহার দিলেন।

প্রিন্সিপ্যাল জানলেন তাঁর সমস্ত শিক্ষকেরাই গ্রাডুয়েট এবং টিচিং সার্টিফিকেট

ধারা। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের মার্চাল ডিগ্রী আছে। কয়েকজন শীর্ষে উর্জের ডিগ্রী পাবেন। শিক্ষকদের প্রারম্ভিক মাইনে বৎসরে ১০০০ ডলার। ইনক্রিমেন্ট হয় ১০০ ডলার হিসাবে। তাঁরা বছরে দশ মাসের মাইনে পান। দুই মাস ছুটিতে অনেক অন্য কাজ করেন। স্কুলের মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ২:৫।

জানতে পাবলাম আমেরিকার সব হাই স্কুলই কো-এডুকেশনাল। মাত্র কয়েকটি স্কুলেই কো-এডুকেশনাল নয়। প্রিন্সিপ্যাল আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'এডোলেসেন্স আমেরিকার একটি বড় সমস্যা। স্কুলেও বিবাহিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়েছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার কি স্কুলে ধাক্কালালী বিবাহের সমর্থন করেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'না। আমরা বিবাহিত ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের কোনো কর্মিটি, অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতিতে নিই না। এইভাবে আমরা এই ব্যাপারটাকে ডিসকালিম করি।'

বাতারাতের সুবিধা অনুসারেই সাধারণত স্কুল এরিয়া গড়ে ওঠে। অবশ্য অধিকাংশ স্কুলেরই বাস আছে। কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী নিজের মোটর নিজেই ড্রাইভ করে স্কুলে আসে।

আমি গ্রেড টেনের একটি কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঢুকে দেখি সেখানে অ্যাটম সম্পর্কে একটি ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। খবর নিয়ে জানলাম ক্লাসেব পাঠ্য বিষয় অ্যাটোমিক স্ট্রাকচার। আমেরিকার স্কুলেও সায়েন্সেব স্ট্যান্ডার্ড দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বিকেল চারটের সময় ডক্টর রিজেন্সের স্ট্যাটিসটিক্যাল মেম্বর ইন এডুকেশনেব ক্লাসে যোগ দিলাম। ডক্টর রিজেন্সের সুন্দর মঞ্জবুত চেহারা। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। বয়সে তবুও আমাকে দেখে বললেন, 'হ্যালো ইয়ংম্যান, তুমি কোন দেশ থেকে আসছ?'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষ থেকে।'
—'ভারতবর্ষের কোন জায়গা?'
—'কলকাতা।'
—'কলকাতার স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে না?'

—'হ্যাঁ।'
—'ওখান থেকে 'সংখ্যা' নামে যে পত্রিকাটি বের হয় তার স্ট্যান্ডার্ড বেশ উচ্চ।'
স্ট্যাটিসটিক্সে আমার অ্যাডভান্সড ডিগ্রী আছে শুনে বললেন, 'আপনি এই ক্লাসে যোগ দিচ্ছেন কেন?'

আমি বললাম, 'এডুকেশনে আপনি বে-ডাবে স্ট্যাটিসটিক্যাল থিয়োরির প্রয়োগ করেন তা আমার খুবই ভাল লাগে।'

ডক্টর রিজেন্সের ব্যক্তিগত ও ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আমাকে তাঁর অনেক পেপার ও বই পড়তে দিতেন। আমি তাঁর সংগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে খুবই উপকৃত হয়েছি।

পরদিন গ্রুপ লাম্প মিটাবে চারি বক্তৃতা দিলেন। তিনি এদিকে একটি কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিনি মাদ্রালিয়র কমিশনের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি ছিলেন। বক্তৃতার তিনি বললেন, 'আমরা আমেরিকার যে সব এডুকেশনাল মেম্বর শিক্ষাব সেক্টরালিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়ে খুব বিচার-বিবেচনা করতে হবে। ভারতবর্ষের শতকরা আশীজন লোক গ্রামে বাস করে। আমেরিকার আরবিন ও রুবারের তফাৎ প্রায় নেই বললেই হয়। তথাকথিত গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলের তুলনায় ঘরবাড়িগুলো শূন্য একটু বেশি ছড়ানো আর্মিনিটি দুই জায়গায় অনেক পরিমাণে একই। একটি কুম্ভকবে বাড়িতেও ইলেকট্রিসিটি, টেলিভিশন, রেডিও, মোটর, হট ও ক্রোল্ড ট্রাপ ওয়াটার প্রভৃতি আছে। সাধারণত শহরবাসীর তুলনায় তার জিনিসগুলো কম দামী এই বা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দুই অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই সমান।' মিস্টার চারি এখন এমবাসীর এডুকেশন অফিসার।

শনিবার দুপুরে ডক্টর উইলিয়ামস আমাদেব কয়েকজনকে ওকলাহোমা স্টেট ফেরারে নিয়ে গেলেন। শুনলাম এই মেলাতে প্রতি বছর অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকের ভিড় হয়। মেলাতে কি আছে আর কি নেই তাই বলা মুশ্কিল। ছেলে যুবা বৃন্দেব দল নানাভাবে আনন্দ গোটায়ে ব্যস্ত। নানা

ধবনেব খেলা, ম্যাজিক ও নাচের জগজমাণী আসব। কেউ নাগবদোলায় চড়ে, কেউ ছবি তুলছে, কেউ শূটিং খেলা করছে, কেউ কেনাকাটার ব্যস্ত। হট ডগ (বীফের ঠৈবি এক রকম খাবার), প্যাপি কবুন; আইসক্রিম, কোকো-কোলা; চকলেট ফিরছে লোকদের হাতে হাতে। শিশুদের মজাই বেশি। তাদের গোশাকের বৈচিত্র্যের বেন শেষ নেই। একটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ল। সেটি হচ্ছে হস্তশিল্পের লক্ষণীয় স্তর। পুতুল, খেলনা ইত্যাদি প্রায় সবই মেশিনে তৈরি। হস্তশিল্পের মধ্যে শিল্পিমানেব যে বিকাশ ঘটে তা বেন আমেরিকাব শান্তিকৃতময় জীবন থেকে প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এই জন্যে অন্য দেশের হস্তশিল্প আমেরিকানদের সহজেই আকর্ষণ করে।

একটি তাঁবুর কাছে খুব ভিড় দেখে উর্কি মারলাম। দেখলাম তাঁবুর সামনে জন ছয়েক প্রায় নগ্ন তবুও খুব উচ্চকিতভাবে সেক্সগেজে চেমাবে বসে আছে। পাশে লেখা চুল ইওর পার্টনাব অ্যাড ডান্স। দুটি যুবক এগিবে গিয়ে দুটি মেয়ের হাত ধবে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল। ঠিক সেই সময় একজন প্রোট কোর্ট ঝাড়তে ঝাড়তে বোরবে এল। নাচতে গিবে হরতো। সে পড়ে গিয়েছিল।

আমরা সম্মে নাগাদ নর্মানে ফিরে এলাম।

[কমপঃ]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

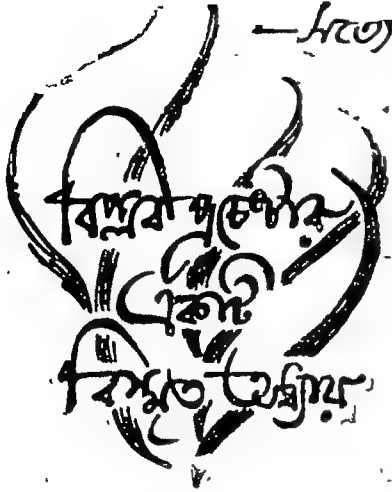
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - গোহাটী



—মতোশ নাথ মারোয়াড়ী—

রুডার অস্ত্রলুপ্তের পরিসমাপ্তি

“পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রকাশ, আর বাংলায় জার্মানীর অস্ত্র অবতরণের আশা, ১৯১৪-১৫ সালে বিপ্লবীদের মধ্যে একটা অতি আকর্ষণীয় সহযোগিতার উদ্রেক করে। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে মেসার্স রুডা এন্ড কোম্পানীর অস্ত্র লুপ্ত ও তার বিতরণের ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের কাছে অকাট্য সাক্ষ্য আছে।” (সিডিশন কর্মিটি রিপোর্ট, প্যারা ৯৫, পৃঃ ৬৮)। এই সম্বন্ধে রাওলাট সাহেব আরো বলেছিলেন যে, রুডা কোম্পানীর পিস্তল লুপ্তের আগে বিপ্লবীদের কাছে একটিমাত্র মশার পিস্তল ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ আগস্ট ১৯১৪ সালের পর জানুয়ারী ১৯১৮ সালে উক্ত কর্মিটির কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত নানা স্থানে খানাতল্লাসীর মাধ্যমে পুলিশ যে সমস্ত তালিকা উদ্ধার করেছিল তা হতে প্রতিপন্ন হয় যে, ষথাসময়ে রুডা কোম্পানী থেকে লুপ্তকরা পিস্তলগুলি নিম্নলিখিত দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ষথঃ—মাদারিপুত্রের দল, পশ্চিমবঙ্গের যতীন মুখার্জীর দল, চন্দননগর গোষ্ঠী, বিপিন গাঙ্গুলীর দল, বরিশাল, উত্তর-বাংলা এবং ঢাকার বিভিন্ন সমিতির মধ্যে।

এইভাবে বাংলার তথা ভারতের শিস্তি রিপ্লবের ভিত্তিকে একাদিক থেকে দৃঢ় করে যে সমস্ত স্বনামধন্য বিপ্লবীরা অন্তত তখনকার মত আত্মগোপনের মাধ্যমে গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিদাস দত্ত, হরিশচন্দ্র শিকদার, শ্রীশ-চন্দ্র পাল প্রভৃতি অন্যতম। এই সম্পর্কে ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন—“হরিদাস দত্ত, ভূজঙ্গ ধর, কালিদাস বসু ও নরেন

ব্যানার্জীর কারাদণ্ড হয়। বিপিন গাঙ্গুলী ফেরারী থাকেন—সরকার ধরতে পারে না। এই মশার পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের প্রকৃত শক্তিবৃদ্ধি করে। বেশে চামুচ ও উৎসাহের সঞ্চার করে। অস্ত্রের ক্ষমায় কর্মীরা কত ক্রেশ ভোগ করছিলেন—রুডার অস্ত্রলুপ্তন দর্ভিক্ষের দিনে এক মস্ত আহাৰ্য-সংগ্রহ। এখানে বিপিনদার মহন্ত বর্ণনাতীত।” (বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি—পৃঃ ৩৮২)। অপরদিকে অস্ত্রগুলি উপরোক্ত উপায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও কয়েক হাজার স্লাউন্ড টোটা তখনও উদ্ধৃত থেকে যায়। বিপ্লবী কালীপদ বাগচী বলেন—উক্ত টোটোর কিসদংশ সিরাজগঞ্জের উপেন্দ্রনাথ রায় মারফৎ সিরাজগঞ্জে পাঠান হয়েছিল। তারপর বাকি টোটোগুলি সঙ্গে সঙ্গে সরানোর ব্যবস্থা হয়েছিল বড়বাজার অঞ্চলে, স্বনামধন্য মারোয়াড়ী প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা, ওস্কারমল সরমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায়। তারা তখন ছিলেন বিপিনদার গুণমুগ্ধ অনুচর। এই কথা শোনা গিয়েছিল প্রক্কেয় শ্রীআশুতোষ লাহিড়ীর কাছে ৩০/১৯৬৩ তারিখে। প্রভুদয়াল এই সম্পর্কে পরে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন, তবে প্রমাণ অভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন। সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, সেই রাতেই উক্ত টোটোর কিসদংশ সরান হয়েছিল বড়বাজারে ওনং কান্দুলালের গলির একটি ঘরে। কিন্তু পুলিশ কোন সূত্রে খবর পেয়ে এই টোটোগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই।—“গোপাল দাস নামে একটি মারোয়াড়ীর ছেলে বলেছিল যে, ওনং কান্দুলালের গলি হচ্ছে তারই সম্পত্তি। ...৬ই তারিখে সেই ঘরে খানাতল্লাসী হয়। পুলিশ দরজা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে টোটা-ভরা কতকগুলি পিস-বোডের বাক্স পেয়েছিল।” (এ বি পত্রিকা, ২৪/১০/১৪)। ১৯১৪ সালে ৬ই নভেম্বর বিচারকের সামনে মিস্টার টেগার্টের সাক্ষ্য দেখা যায় যে, উক্ত কান্দুলালের গলিতে অবস্থিত গুদাম তল্লাসীর পর ৯৬০টি বুলেট পাওয়া যায়। তবে এই সম্পর্কে কোন গ্রেপ্তারের আভাস পাওয়া যায় না। পরে উক্ত টোটোর বাকি অংশ রাখা হয়েছিল বড়বাজার অঞ্চলেই ৩৪নং শিবঠাকুরের গলিতে, আর এক গুদামে। এই বাড়িটি ছিল বড়বাজারের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ী মঙ্গলচাঁদের ভাই বৃগোলকিশোরের বিষয় পত্নীর নামে। উক্ত বিষয়

ছেলের নাম ছিল মতি। “বাচাই বেনিয়া বলেছিল যে, জুজুশে সেস্টেবর দুটি বাঙ্গালী বাবু এসে খোঁজ করেছিলেন... ভাড়ার জন্যে কোন খালি ঘর আছে কি না। অনন্তর দারোয়ানের কাছে সে জানতে পারে যে একটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, আর সেই গুদামে ১১/১২টি বাক্স রাখা হয়েছিল।” (এ বি পত্রিকা, ২৩/১০/১৪)। পূর্বোক্ত মারোয়াড়ী ভদ্রলোকদের সহায়তায় এই কাজগুলির প্রায় সমস্তই সমাধা হয়েছিল বিপ্লবে প্রজ্জ্বলিত প্রাণ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও তাঁর সহকারী হরিদাস দত্তের দ্বারায়। শোনা যায় শ্রীশ পালও অনেক সময় সঙ্গে থাকতেন। বিপিনবিহারীর তখন ছদ্মনাম ছিল সুরেশ গাঙ্গুলী।—“আশুতোষ কর্মকার সুরেশ গাঙ্গুলীর যোগাযোগের বিষয় সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সনাক্ত করার জন্য ডাকা হলে, সে বলে যে, আসামীদের মধ্যে ডাকের ওপর সেই লোককে দেখা যাচ্ছে না। তবে আশুতোষ কর্মকারের ১৭ই সেপ্টেম্বরের কথা মনে আছে... ভাড়া নেওয়ার ঠিক আগের দিন সুরেশ গাঙ্গুলী তার পাশের বাড়িতে এসে... বলেছিলেন যে, তাঁর ভাই কনওয়ারালি স্ট্রীটের এক মেসে থাকেন। তিনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করেন... সে (সাক্ষী) দু'বার সুরেশের সঙ্গে আর একটি লোককে দেখেছিল...” (এ বি পত্রিকা, ৩/১১/১৪)।

মঙ্গলচাঁদের বিষয় দ্রাঘতদ্ব্যপেক্ষ পূর্বোক্ত কান্দুলালের গলির ঘটনা পূর্বে কিছু শুনিয়েছি। তাই সে মঙ্গলচাঁদের কাছে সেই দুটি বাঙ্গালীবাবুর বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করে। মঙ্গলচাঁদও পরাধীন জাতির স্বভাবসুলভ কতব্যের সমাধা করেছিল অনতিবিলম্বে জোড়াবাগান থানায় খবরটি পৌঁছে দিয়ে। তৎক্ষণাৎ কনস্টেবল আলি হোসেন নিযুক্ত হয় গুরুত্বপূর্ণ ৩৪নং শিবঠাকুরের গলির সেই গুদামটি পাহারা দেওয়ার কাজে। এইভাবে দেশের সাধারণ লোকের দিক থেকে সহযোগিতার অভাব সৈদিন যে কত প্রকারে বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়েছিল, আজ তার হিসাব পাওয়া শক্ত। অবশ্য্যভাবে ফলস্বরূপ কয়েক দিন পরেই হরিদাস দত্ত সেই গুদাম পরিদর্শনে এসে গ্রেপ্তার হন। কনস্টেবল আলি হোসেনের কথায়—

“...একটি বাঙ্গালীবাবু বেরিয়ে আসেন। সাক্ষী সেই বাঙ্গালীবাবুটিকে তাড়া দিলে তিনি দৌড়িয়ে পালাতে থাকেন। সিকদারপাড়া লেনে গিয়ে সে বাবুটিকে ধরে ফেলে... কনস্টেবল হরিদাস দত্তকে সনাক্ত করে।” (এ বি পত্রিকা, ২৪/১০/১৪)। শিবঠাকুরের

সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী

গাল থেকে পালিশ যে ১৪টি বাক্স হস্তগত করে তার মধ্যে ৫টি বাক্স খালি ছিল আর ৯টি বাক্সে আরো ২১,২০০ টোটা পাওয়া গিয়েছিল। শোনা যায় গ্রেপ্তারের সময় হরিদাস দত্তের কাছে ঐ গদামের চাবিও ছিল।

প্রাক্তন হরিদাস সেদিন ছুটেতে ছুটেতে কোন রকম পথে ঢকে পড়ার জন্য গ্রেপ্তার হন। তখন তাকে ৩৪নং শিবঠাকুরের গলিতে গদামের কাছে আনা হলে, তিনি পিপাসার ভাণ করে পথের ধারে এক জলের কলের কাছে গিয়ে ঐ

চাবিটি কোন প্রকারে নিজের মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে শেষে একমুখ জলের সঙ্গে চাবিটি নদীতে ফেলে দেন। কাজেই প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার জন কামেল তাঁর বিচারে সিদ্ধান্ত দিলেন— “গদামের চাবি আসামীর কাছে মোটেই



সর্ব স্বত্বতে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ

দিনে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, বৃষ্টি, বোমে
জামলালের কাজে কামাই নেই।
অবশ্য নামে কি এসে যায়। আমাদের
জামলাল ডাক পিঙ্কন হতে পারেন,
টেলিগ্রাফ পিঙ্কন, লাইনম্যান,
কেলের ডাকগাড়ীতে চিঠি
বাছাইকারী, টেলিফোন অপারেটর,
টেলিগ্রাফিষ্ট, কেরানী অথবা ডাক ও
তার বিভাগের সাড়ে চার লক্ষ কর্মীর
যে কোন একজন হতে পারেন, তবে
তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঘড়ির কাঁটার
নিয়মে কাজ করেন।

৯৪ হাজারেরও বেশী পোষ্ট অফিস,
৮০০০ টেলিগ্রাফ অফিস, ২,২০০ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (৭.৬ লক্ষ
টেলিফোন) এবং আরও অনেক
বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয়
ডাক ও তার বিভাগ জাতির সেবা
করছে। প্রতিদিন যে কাজ হয় তা
হল ১৮০ লক্ষ চিঠি পত্র, পার্শেল,
মিনিঅর্ডার ইত্যাদি, ১.৫ লক্ষ
টেলিগ্রাম এবং ১.৬ লক্ষ (কার্যকরী)
ট্রাক কল এবং এছাড়াও আরও
নানা রকম কাজ করতে হয়।
এগুলি সব সৈন্যদল কাজ হলোও
জামলাল তাঁর কাজ বেশ যত্নের
সাথে সম্পন্ন করেন। যোগ্যতা ও
দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সম্পর্কে
জামলাল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা ও
সুভেচ্ছা থাকলে এই কাজ আরও
জালোভাবে করা যায়।

আপনাদের আরও সেবা
করতে আমাদের সাহায্য
করুন।



ডাক ও তার বিভাগ



পাওয়া যায় নি। গুদামের দরজাটি ভেঙ্গে খোলা হয়েছিল এবং তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ৫টি খালি বাক্স আর ৯টি বাক্সে ভরা ২১,২০০ বুলেট।" (এ বি পত্রিকা, ১।৯।১৫)। এইভাবে ২২/২০.০০ টোটা সৈনিক বিপ্লবীদের কাছ থেকে বেহাত হয়ে যায়। তবে এই-জাতীয় ক্ষতি সৈনিকের বিপ্লবের উদ্যমকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করতে পারে নি। তার প্রমাণ বিপ্লবীদের ভাষায়— "১৯১৪ সালের লুটকরা অস্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৩১ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুটনের সময় পর্যন্ত।" এই সম্পর্কে আর একটি তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।—১৯১৮ সালের আর্মিস্টিস ঘোষণার পর বিপ্লবীরা তখন সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বরাহনগরের খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 'বটুলদা' আজ আর ইহাঙ্গে নেই। কালের সবগ্রাসী ক্ষুধা কিছুদিন আগে সেই স্বতন্ত্র প্রাণটিকে অসময়ে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তার এই দেহাবসানের বছরখানেক আগে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন যে উক্ত সময়ে, অর্থাৎ বিপ্লবীদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একদিন সকালে বিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (বরাহনগরের খগেন্দ্রনাথ) স্মরণে তিনি একদিন প্রেরিত হন, ৪৮নং দুর্গাপুরী লেনে, বিপ্লবীদের বাড়িতে। বিপ্লবীরা তাকে তার বাড়িতে অপেক্ষা করতে বলেন। নিজের আজানুলব্ধিত প্রকান্ড অলেক্সটারটি গায়ে চাপিয়ে বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে কোথায় বার হয়ে যান। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরে অলেক্সটারের বড় বড় পকেট থেকে তিনটি মশার পিস্তল আর কিছু টোটা বার করে তাকে (অর্থাৎ 'বটুলদাকে') বলেন— "এইগুলি নিয়ে খগেনকে দাওগে বাও। কি করি বল.....এ হচ্ছে সেই ১৯১৪ সালের সংগ্রহ, রডা কোম্পানীর মাল। আন্দালের এক স্থানে মাটির ভিতরে রাখা ছিল। সামান্য মরচে পড়ে গেছে। যাই হোক, সময়ে ঠিক কাজে লাগবে। এইরূপ আরো কিছু রাখা আছে। এগুলি এখন ব্যাতিল করা কাজের কথা নয়।" (২৬-৮-১৯৬২ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে শোনা)। এখান থেকে এইটুকু অন্তত আন্দাজ করা যাবে যে 'রাওলাট' সাহেব তাঁর রিপোর্টের ৯৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রে মশার পিস্তলের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সকল বিপ্লবী সংস্থার নাম করেছিলেন, সেইগুলির

মধ্যে বর্ণিত হয়েই উক্ত অস্ত্রের শেষ হয় নি। এই অস্ত্রের ভান্ডার ছিল অনেক গভীরে, তখনকার রাজশক্তির নাগাল থেকে বহু দূরে। এই সম্পর্কে আর একটু বলা প্রয়োজন যে, উক্ত অস্ত্র লুটের ব্যাপারে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে (১) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (২) কালিদাস বোস, (৩) গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) ভূজঙ্গভূষণ ধর, (৫) বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ও (৬) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন (৭) উপেন্দ্রনাথ সেন। তারপর পাবলিক প্রসিকিউটর মিস্টার এন গুপ্ত, ২০-১০-১৯১৪ তারিখে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সুইনহোকে জানান যে, এই সম্পর্কে আরো তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যথা (৮) হরিদাস দত্ত—ওরফে 'কুজ'—ওরফে 'অতুল', (৯) আশুতোষ রায় এবং (১০) প্রভুদয়াল মাজেরদারী (বর্তমানে আর্টন) প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা। উক্ত মামলা আসলে শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। তারপরে ক্রমে পুলিশ-কোর্ট থেকে হাইকোর্টে পৌঁছে এই মামলার সমাপ্তি হয় ১৯১৫ সালের ৩১শে আগস্ট। মিস্টার জাস্টিস চ্যাট্টি ও মিস্টার জাস্টিস রিচার্ডসনের বিচারে দেখা যায়— "চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মূলত দশটি লোককে বিচারার্থ আনা হয়েছিল..... তিনজন অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আর তিনজন নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছিলেন। শ্রীশ গ্রেপ্তার হন নি। মহামান্য বিচারপতিরা বিচারের ঘোষণা বলেছিলেন যে কালিদাস, নরেন্দ্র এবং ভূজঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে..... হরিদাস স্ববশে এমন কোন প্রমাণ নেই যার স্মরণ তাকে অস্ত্রলুট ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করা যায়....." তবে "এম্পায়ার বনাম গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অপরাপর" শিরোনামের মামলার গিরীন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেও হরিদাস দত্তের বিরুদ্ধে শেষোক্ত আর্মিস্টিস আর্টিকেল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার বহাল ছিল। তাঁরা বিচারে বলেছিলেন— "আর্মিস্টিস আর্টিকেল-এর ১৯ এফ অনুচ্ছেদ হিসাবে আমি আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করছি এবং আমি তাকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।" (এ বি পত্রিকা ১-১-১৫)। এই আদালত প্রদত্ত হয়েছিল ৩৪নং শিবঠাকুরের গলিতে ২১,২০০ বুলেট আবিষ্কারের ওপর। (ক)

(ক) শ্রীনিবাসীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলার বিপ্লববাদ' নামক পুস্তকে 'রডা বন্দুক চুরির ব্যাপার' শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ: ২৭৬-২৭৮) এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "যতদূর জানা যায় রডা কোম্পানীরই একজন কর্মচারী শ্রীশ সরকার..... শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ বলেন—শ্রীশ (সরকার) আসিয়া বলে, বন্দুক ও কার্তুজের বাক্স নির্জন স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। অতুলবাবু ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য রডার ঐ সকল অস্ত্র আনিতে উদ্যোগী হন। নরেন্দ্র রাগিতে ঐ সকল জিনিসপত্র অতুলবাবুদের ২নং শ্রীদাম মূদির লেনস্থ বাড়িতে নিয়ে আসে। ইহাও সম্ভব—এক গাড়ি বাজের কতক বাক্স অতুলবাবুদের ওখানে যায় এবং তাঁহারা উহা পেনোটির বাগানবাড়িতে প্রথম সরাইয়া দেন।" শ্রীশ মিত্রের (সরকার নয়) আবাল্য জীবন আলোচনার ভিতর দিয়ে (সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধু ২৬-৮-১৯৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং অধুনা আলোচিত বিভিন্ন প্রমাণসাপেক্ষ তথ্যের মাধ্যমে দেখা যায়—প্রথমত শ্রীশ মিত্রের পক্ষে একটা অতবড় সংঘটনের পর মলগা লেন থেকে শ্রীদাম মূদির লেনে তৎক্ষণাৎ ছুটে যাওয়া একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের মনে হয় অস্বপ্নগুলি সেই রায়েই যথাসম্ভব বর্জন করে দেওয়ার প্রয়োজনবোধে, মধ্য কলকাতার বিপ্লবী সংস্থার কোন প্রতিনিধির স্মরণে "শ্রীশ" এই নাম বলে খবরটি অতুলবাবুদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই স্বাভাবিক। পরে তাঁদের অংশটি দেবার জন্য অতুলবাবু ও নরেন্দ্র হয়তো উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং এইভাবেই "নরেন্দ্র রাগিতে" যথার্থ অংশ নিয়ে "২নং শ্রীদাম মূদির লেনস্থ বাড়িতে প্রথম নিয়ে আসে।" এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'সে যুগের আশ্রয়' নামক পুস্তকের একাংশে দেখা যায়— "মালসমেত গরুর গাড়ি প্রথমে মলগা লেনে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে প্যাকিং কেসগুলি নানা কোণে কলিকাতার বাহিরে পানি-হাটী ও চন্দননগরে লইয়া যাওয়া হয়।" ইত্যাদি (পৃ: ৬৪)। পূর্ব-আলোচিত তথ্যের সঙ্গে এখানেও যেন সঙ্গতির অভাব দেখা যায়।

স্বপ্নজগৎ

চলচ্চিত্রে ‘সু’ অনুরাগ

মাংসার চলচ্চিত্র অভিনেত্রীরা সম্ভবত নামের প্রথম অক্ষর ‘সু’ দিয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করেন। নতুবা এখানে সু দিয়ে আদ্যাক্ষরের এত হুড়াহুড়ি কেন? দেখুন না, সুচিহ্না, সুপ্রিয়া, সুলতা, সুমিতা, সুতপা, সুব্রতা, সুনীতা আরো যে কত ‘সু’ আছেন, সবার নাম মনে পড়ছে না। এক সুমিতা নামেই তো রয়েছেন দৃ-জন। বারী সু-র সুযোগ নিয়ে পারেন নি তাঁরা স-শ-এর কাছে রয়েছেন। সু-ও স-এর প্রতি এত অনুরাগ কেন সে প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। কিন্তু তার জবাব অভিনেত্রীরা নাও দিতে পারেন।

আসলে ব্যাপার কি জানেন? ‘সু’ আদ্যাক্ষরের নাম বড় পয়া। দেখুন না সুচিহ্না সেন। চলচ্চিত্র অভিনয়ে জীবনে কত ওপরে উঠেছেন। বর্তমানে বাংলা-দেশের তিনি প্রথম চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। দ্বিতীয় সুপ্রিয়া চৌধুরীকে মনে করতে পারি। তাঁরও যথেষ্ট সাফল্য। সুলতা চৌধুরী কম কিসে! সুমিতা সান্যালকেও পিছনের সারিতে রাখা যায় না। তারপরে আরো সুদের কথা ভেবে যান। নতুন আসছেন সুনীতা। সুচিহ্না সেনের আগে চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের নামে এত সু-র ব্যবহার ছিল না। তাঁর সাফল্যের পর থেকে ‘সু’ দিয়ে নামটা বড় বেশি দেখা যাচ্ছে। তাও চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের মধ্যে এদের প্রায় সকলেরই আসল নাম ‘সু’ দিয়ে নয়। মা-বাবা নিশ্চয় এদের ভবিষ্যৎ গণনা করে সুচিহ্নার সাথে মিলিয়ে নাম রাখেন নি। যেমন সুচিহ্না সেনের ব্যক্তিগত জীবনে নাম রমা; তেমনি এদেরও নাম রয়েছে।

অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের সঙ্গে অশ্ববিশ্বাস ও সংস্কার পাশাপাশি চলে। যেখানে আত্মবিশ্বাস নেই, নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা নেই সেখানেই আসে দৃষ্টিভ্রম, অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা। চলচ্চিত্র প্রযোজকরা ছবির মনোরম করেন কালীঘাটে পূজা দিয়ে। প্রার্থনা জানান, মা-কালী, আমার ছবিকে আর্থিক সাফল্য এনে দাও। এরই সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনেও তাঁদের কারো কারো মনে কত রকমের অশ্ব-ধারণা জমাট বেঁধে আছে। উপযুক্ত কাহিনী নির্বাচন, ক্ষমতাবান পরিচালক নিয়োগ এবং উপযুক্ত শিল্পী বাছাই ও যথার্থ শিল্পবোধের পরিবর্তে এরা নির্ভর করেন অলৌকিক শক্তির উপর, ভাগ্যের উপর। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রযোজকদেরই সৃষ্টি অনেক ‘সু’। বারা রমা, পারুল, বাণী ছিল তারাই প্রযোজকের ইচ্ছায় ‘সু’ আদ্যাক্ষরের তারকা হয়ে জ্বলছে! বর্তমান সমাজব্যবস্থায় চলচ্চিত্র জগতের এই নিয়ম। প্রযোজকরা এখানে ভাগ্যান্ভর। তারা পদতুলের মত তারকা গড়ে, আবার পদতুলের মত ভাঙে। এই ভাঙাগড়ার খেলায় ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া তারকাদের উপায় থাকে না। কিন্তু প্রতিভা না থাকলে কেবল ভাগ্যের দাস হয়ে কতদিন সম্ভব?

—সুজন



সৌম্য চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রের আর একটি বছর

১৯৬৫ সাল বিদ্যার নিয়েছে। ১৯৬৫ সালকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

নতুন বছরকে বরণ করে নেবার মুহূর্তে একবার ফিরে তাকাই পেছনের দিনগুলির দিকে। গত বছর বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প কি দিয়েছে, কি পেয়েছে এবং কোন দিকে যাচ্ছে।

১৯৬৫ সালে ৩১টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। আগের বছর মুক্তিলাভ করেছিল ৩৫টি। ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল ৩১। দেখা যাচ্ছে গত কয়েকবছর পর্যন্ত বাংলা ছবি ৩১ থেকে ৩৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির নামঃ রূপসনাতন, আলোর পিপাসা, মহালক্ষ্মী, তুকা, থানা থেকে আসছি, প্রথম প্রেম, অন্তরাল, জুয়া, রাজকন্যা, ঘুম ভাঙার গান, ভারতের সাধক, কাপড়বু ও মহাপুরুষ, অতিথি, সুরের আগুন, আকাশকুসুম, দেবতার দীপ, দিনান্তের আলো, অভয়া ও শ্রীকান্ত, বার বদল, একটুকু বাসা, পতিসংশোধনী সমিতি, ওকে, রাজা রামমোহন, সুব্রতপা, সুবর্ণরেখা, দোলনা, গুল মোহর, একটুকু ছোঁরা লাগে, তাপসী, মুখ্যো পরিবার, একই অঙ্গে এত রূপ।

এই ৩১টি ছবির মধ্যে ব্যবসায়ের দিক থেকে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে অতিথি, একটুকু বাসা, সুব্রতপা, মুখ্যো পরিবার, রাজা রামমোহন, অভয়া ও শ্রীকান্ত আলোর পিপাসা ইত্যাদি। কাপড়বু ও মহাপুরুষ, আকাশকুসুম এবং সুবর্ণরেখার ব্যবসাও খারাপ



অশোক সেন পরিচালিত 'দুশান্ত সা' ছবির নায়ক বসন্ত চৌধুরী

নয়। কয়েক সপ্তাহব্যাপী দর্শকরা এই ছবি-মূল দেখেছে। ব্যবসার দিক থেকে বা হোক গত বছর সবচেয়ে আলোচ্য ছবি ছিল কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, সুবর্ণরেখা, আকাশকুসুম। এই তিনটি ছবিতে বিষয়ের বলিষ্ঠতা, বক্তব্যে নির্ভরতা এবং নির্মাণকৌশলের অভিনবতা বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। আরো উল্লেখযোগ্য যে এই তিনটি ছবির পরিচালকদের (যথাক্রমে সত্যজিৎ রায়, ঋষিক ঘটক এবং মৃণাল সেন) ছবি দেখার বিশেষ দর্শক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এঁরা দর্শকদের দৃষ্টি পরিবর্তনে সাহায্য করেছেন। এঁদের সমগোত্রীয় না হলেও গত বছর হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এতরূপ' ছবিটিও গঠনসৌকুমার্যে ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতার জন্য উল্লেখযোগ্য। গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজা রামমোহন' জনপ্রিয়তা এবং সরকারের সমর্থন একই অঙ্গে লাভ করেছে। এই প্রথম একটি বাংলা ছবি প্রমোদকরমুদ্র হয়েছে। অবশ্য তার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি হিন্দী ছবিকে প্রমোদকর মন্ত্রি দিয়েছিলেন। "রাজা রামমোহন" জনপ্রিয় হলেও সমালোচনার উদ্ভেদ নয়। বিধান পরিষদে ছবিটির বিরুদ্ধে কয়েকজন সদস্য আলোচনা করেছেন। ছবিটি রামমোহনের খণ্ডিত জীবনী। তার জীবনের একটা বড় দিক মৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রমোদকের অর্থ কাপটে ছবিটি প্রামাণিক মূল্যের

দিক থেকে দূর্বল। ব্যবসায়ের দিক থেকে ব্যর্থ হলেও 'ঘুম ভাঙার গান' ছবিটি একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই ছবিতে জনতাকে যেভাবে মূগুর করে তোলা হয়েছে ইতিপূর্বে বাংলা ছবিতে সেরূপ দেখা যায় নি।

গত বছর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প কয়েকজন নতুন পরিচালক লাভ করেছে। হীরেন নাগ, অজয় বিশ্বাস, বলাই সেন, অজিত গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ দত্ত এই পাঁচজনের মধ্যে হীরেন নাগ একটা বলিষ্ঠ কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ দত্তের (বায়ু বদল) সম্ভাবন্য বেশি।

বাংলা ছবিতে যারা নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ। নতুন কোন শিল্পীকে নায়কের চরিত্রে দেখা যায় নি। বিশ্বজিৎ বাংলা ও হিন্দী দুই জগতের ছবিতেই অভিনয় করেছেন, তবে মূলত তিনি হিন্দীর যোগ্য অভিনেতা হতে পারেন, বাংলার অচল। অভিনয় ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও একমাত্র প্রচারের জোরে যে নায়ক হওয়া যায় বিশ্বজিৎ তার দৃষ্টান্ত। নায়কাদের মধ্যে সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখার্জী। অভিনয় নৈপুণ্যে এই অভিনেত্রী অভিনন্দনীয়। অনাড়ম্বর ও শিল্পে দৃষ্টিহীন পরিচালকদের যদি এড়িয়ে চলতে পারেন তবে এঁর ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল। মাধবীর পরে অভিনয়

করেছেন সন্ধ্যা রায়, নাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অঞ্জনা ভৌমিক, সুলতা চৌধুরী প্রমুখ। সূচিন্দ্র সেনকে কোন ছবিতে দেখা যায় নি। নতুন যাদের দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রীণা ঘোষ, অমৃতা রায়, শিউলি মজুমদার। এঁরা কেউ অভিনয়ে সুবিধা করতে পারেন নি।

দুটি ছবি গত বছর আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। চারুলতা ও আরোহী। চারুলতা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, বার্লিন ও মেরিকোতে সম্মান লাভ করেছে। ভারতের বাইরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরব গত বছরও অক্ষুণ্ণ রেখেছে বাংলা ছবি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা ছবি যোগ্যতানুসূপ ভারত সরকার প্রেরণ করেন নি।

কিন্তু বাংলা ছবির সামগ্রিক চেহারা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। একত্রিশটি ছবির মধ্যে ৩।৭টি ছবি বাদ দিলে বাকি ছবিগুলির গতি বোম্বাইমুখীন। সেই বস্তাপচা কাহিনী, সেই নায়ক-নায়িকার একঘেয়ে কাঁদুনী। পরিবর্তনশীল জগৎ, দেশ ও জাতির সমস্যা এবং অভিজ্ঞতা বাংলা ছবিতে অনুপস্থিত। এখনো বাংলা ছবিতে জমিদার, বৌদ্ধ পরিবার, পারিবারে ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদির প্রাধান্য। বাংলা ছবিতে দেশবিভাগের বস্ত্য নেই, কালো-বাজারী ও দূর্নীতিপরায়ণ আমলাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নেই, গ্রামের সমস্যা ও চেহারা নেই। কাণাগুলিতে আবদ্ধ বাংলা ছবিতে তাই এসে



'মর্জিনা' ছবির নবাগতা সূতপা ভট্টাচার্য

পাড়েছে নাইটরান, স্ল্যাকসপরা মেয়ে এবং যৌন আকর্ষণের জন্য বিদেশী ছবির নিলঞ্জ অনুরাগ।

বাংলা চলচ্চিত্রের আর এক বিপদ দেখা দিচ্ছে। হিন্দী চিত্রজগতের শিল্পীদের বাংলা ছবিতে অভিনয়। গত বছর মালা সিনহা, শুদ্ধা এবং আজরা তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। মালা সিনহার জন্ম বাংলার, বাংলা-ছবিতে তাঁর অভিনয়জীবন সুরু। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুণ তাঁর কথার জড়তা ছিল। আজরা তো বাংলা বলতেই পারেন নি, অভিনয়ের ক্রমতাও নেই। তা সত্ত্বেও এঁদের বাংলা ছবিতে নেওয়া কেন? বিশেষ কোন আকর্ষণ আছে কি? আকর্ষণ বা আছে তা দর্শকদের নয়, প্রযোজকের। কোন কোন শিল্পিকারকের অর্থের লোভেই এঁদের ছবিতে নেওয়া হয়। একটি বাংলা ছবি সম্পূর্ণভাবে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের নিয়েই করা হয়েছে। এর ফলাফল বিপদপূর্ণ। এমন দিন আসতে দেরি হবে না—যখন বোম্বাইতেই বাংলা ছবি তৈরি হবে। বাংলার প্রযোজকরা হিন্দী শিল্পীদের ডেকে এনে এবং নিজেরা বোম্বাইতে গিয়ে বাংলা ছবি করে সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। একদিন তারাই মাথায় হাত দিয়ে ধসবেন। বাংলার শিল্পী ও টেকনিশিয়ানরা বেকার হবেন। গত বছরে ছবিতে এই সংকেত পাওয়া গেছে। চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকদের সমভাবেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।



চেকোস্লোভাক ছবি 'ডেথ কল্ড' ছবির একটি দৃশ্য

আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, ডার্টক এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা

লেখক : ভিটালি ক্রাভচেনকো

(সাপ্তাহিক বসুমতীর জন্য লিখিত)

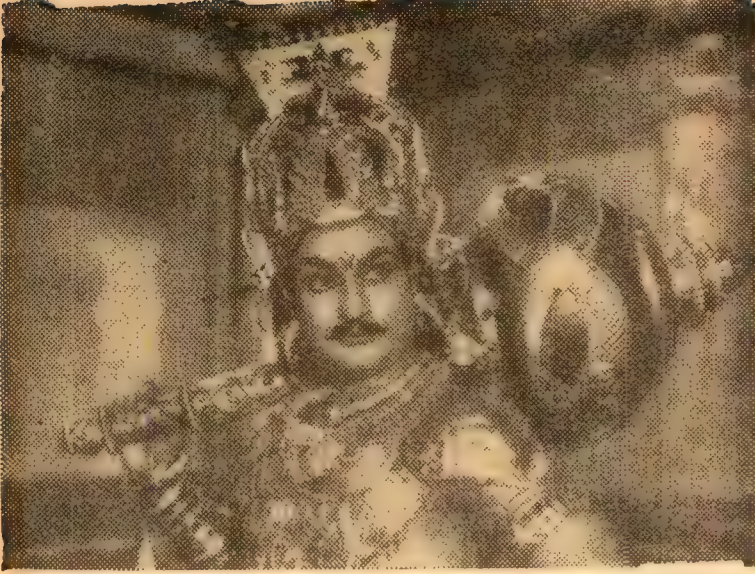
মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টির বিকাশ ঘটে দেশ ও জাতির পক্ষে আলোড়নকারী ঘটনার

মধ্যে। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব এমন অনেক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, যারা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতির গর্বের পাত্র হয়েছেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমন করেকজন প্রতিভাবান সৃষ্টি হয়েছেন—যাঁদের ছবি আজো আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি, আলোচনা করি, ছাত্র দিয়ে অনুভব করি।

এঁদের মধ্যে এক বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তি সেগেই আইজেনস্টাইন। যিনি সোভিয়েত চলচ্চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর প্রচলন শব্দ সোভিয়েত চলচ্চিত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তাঁর পাশে আর একজনের নাম করতে হয়; তিনি ভেসেভোলভ পুডোভকিন। যে মহৎ প্রযোজক আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে পর্দার উপস্থিত করেছেন। এই দুই-জন পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেছেন। প্রামাণিক ও তথ্য-চিত্রের ক্ষেত্রে কিগা ডার্টকের নাম উল্লেখযোগ্য। যিনি সোভিয়েত প্রামাণ্য-চিত্রের ভিত্তি রচনা করেছেন। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রপ্রযুক্তাদের সৃষ্টির মধ্যে স্বেচ্ছা থাকলেও একদিকে তাঁদের চিন্তা ও মনের মিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালবাসা। তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন মানুষের জীবনকে, তাদের আনন্দ ও বেদনা, তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা, তাদের ভালবাসা ও ঘৃণাকে নিষ্ঠুর সাথে রূপ দেওয়া তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য।



সেগেই আইজেনস্টাইন



‘পাণ্ডবের বনবাস’ চিত্রে ভীমের রূপসজ্জার রসাতন ও

এই মহৎ প্রকল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে ষ্ঠ্যকর্ষবাদের জীবনদর্শন ও বিজয়ী বিপ্লবের গুণের ভিত্তি করে। সোভিয়েত ব্যবস্থার উত্থানে এই জীবনদর্শন তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই অনুপ্রেরণায় তারা নতুন দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রকে আবিষ্কার করেছেন। রূপ জনসাধারণের নতুন জগৎ তাদের চোখে প্রতিফলিত হয়েছে; তারা বিপ্লবী-জনতার প্রেরণাময় স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

আইজেনস্টাইনের অনুগামী মিখাইল রস বলেছেন, ‘আইজেনস্টাইনের পূর্বে বিপ্লবী-প্রেরণাময় চলচ্চিত্র ছিল না। তখন পর্যন্ত আমাদের চলচ্চিত্র ছিল প্রাক-বিপ্লবী বর্জ্যোয়া ঐতিহ্যবাহী। সেগেই আইজেনস্টাইন যখন চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে আসেন তখন তিনি একজন পাকা শিল্পী। প্রথম ছবিতেই তিনি কেবল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নয়, সারা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এতদিনের নামকপ্রধান ছবির ধারণায় প্রবল আঘাত করেন। বর্জ্যোয়ান নন্দন-তাত্ত্বিকদের ‘মুক জনতা’ যে ছবিতে কতবেশি মূর্খ হয়ে উঠতে পারে এবং ছবির জগতে ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে—এই ছবি তার মূর্ত্যন্ত। ‘স্ট্রাইক’ ছবিতে তিনি রাশিয়ার কোন একটি বড় কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও বলপ্রয়োগের কথা বলেছেন। এই ছবি তার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হলেও এখানে জগৎসম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শিল্পরূপে চলচ্চিত্র-সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে তার শক্তির মহড়ামাত্র। এখান থেকে শক্তি সঞ্চার করে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘ব্যাটলশিপ পট্টেমকিন’ নির্মাণ করেছেন। জগতের সকল দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখন পর্যন্ত এই ছবিকে শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা দান করে আসছেন, যদিও ছবিটি চল্লিশ বছরের পুরাতন। এই

চল্লিশ বছরে চলচ্চিত্র-শিল্পের অনেক উন্নতি ঘটেছে। এই শিল্পের আঙ্গিক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ‘ব্যাটলশিপ পট্টেমকিন’-এর প্রাথমিক সাফল্যগুলি আজ আর বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও এই ছবিতে এমন এক মেজাজ রয়েছে, বাস্তববোধের এমন বলিষ্ঠতা রয়েছে যে, বার স্বামী তাৎপর্য দর্শকরা অনুভব করেন। এইখানে প্রথম বিপ্লবী-জনতা চলচ্চিত্রের নামক হলো। পুরাতন ব্যবস্থা ও পুরাতন জগতের বিরুদ্ধে এই জাহাজ বিদ্রোহের যে পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল তার শক্তি, তার প্রেরণা আজো অক্ষুণ্ণ। এখানে দর্শকরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এ ছবি থেকে প্রেরণা পায়। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তিস্রোত। এই ছবির মাধ্যমে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রে বিপ্লবী-শিল্পের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন; এবং দেখিয়েছেন যে, বারাসং, প্রগতিশীল এবং অগ্রগামী তারা বিপ্লবের সহায়ক। যদিও তিনি পরবর্তীকালে ‘আইভান দি টেরিবল’-এর মত অসাধারণ ছবি সৃষ্টি করেছেন, তথাপি ‘ব্যাটলশিপ পট্টেমকিন’কে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি বলা চলে।

চার্লি চাপালিন আইজেনস্টাইনকে বলেছেন, ‘চলচ্চিত্র-শিল্পের কবি’। এই উক্তি থেকে এই মহৎ প্রকল্পের ছবির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। যে-কোন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে হোক না কেন তার ছবি কাব্যিক এবং রূপময়।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের আর এক দিকপাল ভস্কেভোলভ পুডোভ্কিন। ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস ‘মা’ অবলম্বনে সৃষ্ট তার ছবি ‘মাদার’ ‘ব্যাটলশিপ পট্টেমকিন’ের পরে মূল্যায়িত করে এবং প্রমাণ করে যে, পুর্বোক্ত ছবিটি এক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; সোভিয়েত চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ। অনেকে মনে করেছেন, ‘মাদার’ অনেকবেশি জীবনের ঘনিষ্ঠ, অনেক-

বৈশিষ্ট্য খোলা মনির ছবি। প্রমিতজীবনের বাস্তবতা এ-ছবিতে ফুটে উঠেছে; দর্শকরা নিজেদের ভাবনা-চিন্তা ও জীবনকে এখানে দেখতে পেয়েছে। জারের রাশিয়ার অনেক দৃষ্টান্ত, কারখানার ধোঁয়া ও হতাশ জীবনের মধ্যেও এখানে জীবনের উজ্জ্বল রশ্মি দেখা যায়। আনন্দময় জীবনের সম্ভাবনা দেখা যায় বিপ্লবে বিশ্বাসী পাবেলের সংগ্রামে। মানুষের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যে সংগ্রাম করছে। এক সাধারণ নারী, পাবেলের মায়ের দৃঢ় বিশ্বাসে প্রভাব হয়েছে বিপ্লবের অর্থ-সত্য; এবং প্রত্যেকের এই সত্যের জন্য অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য কাজ করা উচিত। পুডোভ্কিন তখন বয়সে তরুণ হলেও বিপ্লবের তাৎপর্য এবং বিরূপ শক্তিকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

সেকালে প্রামাণিক চিত্রের ক্ষেত্র অসাধারণ এবং সাহসিক সৃষ্টি দেখা গেছে। বাসবাদিক থেকে নতুন এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই নতুন রীতির ছবির স্রষ্টা কিংবা ভার্টক তার ‘সিনমোউথ’, ‘দি সিনেমা আই’, ‘দি ম্যান উইথ দি ক্যামেরা’ এবং ‘দ্য সন্তু এন্ড উইথ লেনিন’ ছবিতে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। ভার্টক প্রামাণিক চলচ্চিত্রের নিজস্ব এক রীতি সৃষ্টি করেন। বর্তমানকালের প্রামাণিক চলচ্চিত্র নির্মাতারা তত্ত্বগত এবং বাস্তব রীতি কৌশলের দিক থেকে তার কাছে যথেষ্ট ধারেন। কাব্যিক মেজাজ সত্যকে প্রকাশ করা এবং তার শক্তিকে স্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে তার ছবির প্রভাবে প্রায় সকলেই প্রভাবান্বিত।

বর্তমানকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যারা ছবি নির্মাণ করছেন—তারা আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন, ভার্টকের মত দিকপালদের অনুসরণ করছেন। তারা চেষ্টা করছেন তাদের পূর্বগামীদের কাজের ধারা বৃদ্ধিতে এবং ঐতিহ্য অনুসরণ করতে। বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রযোজক এম, রস, এস, যুর্কেভিচ, আই, পিরিয়েভ, ওয়াই, রেইজম্যান, জি, কোজিনৎসেব পুর্বোক্ত দিকপালদের ছাত্র। শিক্ষকদের প্রভাব এদের ছবিতে প্রতিফলিত। তরুণ প্রযোজকরাও এই প্রভাব মুক্ত নয়। তারকাভাস্কর ‘আইভানস চাইল্ডহুড’ সারা বিশ্বে সাফল্যলাভ করেছে। কেবলমাত্র কিশোর ভানিয়ার জীব-কাহিনী এই ছবি নয়। যে কিশোর যুদ্ধের বলি হয়েছিল। ফ্যাসিস্টদের দ্বারা কলুষিত মাতৃভূমির জন্য এবং আত্মীয়দের রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সে আত্মদান করেছিল। এই ছবি সু এবং কু-র মধ্যে সংগ্রামের এবং অমানবিক যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে একটি জবাব। এই ছবিতে ভানিয়ার কাব্যিক চরিত্র সৃষ্টিতে আইজেনস্টাইনের প্রভাব দেখা যায়। প্রামাণিক চিত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি অনুদীক্ষিত সোভিয়েত সিনেমাটোগ্রাফারদের কংগ্রেসে এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই কংগ্রেসে সেগেই গেরোসিমভ

বলেছেন, 'আমরা আজও জনগণের বিপ্লবী কর্মকর্মতা ও উদ্দীপনাকে প্রকাশ করার পক্ষেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের ছবিতে জাতীয়চরিত্র ও জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। যা আমরা আলোক-জাদুর ডববেঙ্কের কাজে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করছি চাপারেভের মত চরিত্রকে তুলে ধরতে অথবা পুডোভস্কিনের ছবির চরিত্র সৃষ্টি করতে।'

নাটকের কথা

চলচ্চিত্র কত 'বিধি ব্যতিক্রম'

চলচ্চিত্র নাট্যসংস্থার চতুর্থ ও পঞ্চম নাটক 'রঙ্গ' এবং 'বিধি ব্যতিক্রম' গত ২৭শে ডিসেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। প্রথম একাঙ্কটি লিখেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দুই অঙ্কের নাটকটি বাটল ব্রুস্টের নাটকের বাংলা নাট্যরূপ। অনুবাদ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

'বিধি ব্যতিক্রম' নাটকে দুই মানসিকতা প্রকাশিত। একদিকে প্রবল বা ধনিকপ্রণী আর একদিকে দুর্বল বা শ্রমিকপ্রণী। একজন প্রিয়জনকে ভয় করে। একজন ভয় করে তার স্বার্থ বা লোভের পথে বাধা দেবে বলে, আর একজন ভয় করে আরো হারাবে বলে। প্রবলের পক্ষের প্রতিনিধি এক ঠিকাদার তার প্রতিযোগীদের হারাবার জন্য প্রাণপণশক্তিতে চলেছে মুনাকার উদ্দেশ্যে। তার মাল বয়ে নিয়ে চলেছে শ্রমিক। প্রতিমুহূর্তে শ্রমিককে সে সন্দেহ করে চলেছে। আর শ্রমিক প্রাণপণশক্তিতে নিয়োগকর্তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ভূমির চেষ্টাকেও ঠিকাদার উদ্দেশ্যমূলক মনে করে। এবং এই সন্দেহের পরিণতি শ্রমিকের প্রাণনাশ। ধনিকশাসিত সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের নামে অনেক বিধি আছে। কিন্তু যখন মালিকরা এই শৃঙ্খলা-ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হন তখন বিধি হয় ব্যতিক্রম। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও ঠিকাদার শ্রমিককে হত্যা করেও 'বিচারে বেকসুর বলে মর্জি পেরেছিল। ছোট ছোট সংলাপে এই নাটকে ধনিকপ্রণীর লোভ এবং নিষ্ঠুর চেহারাটা প্রকাশ করা হয়েছে। তারই বিপরীত শ্রমিক



রেলওয়ে বোর্ড স্টক সোশ্যাল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশনের 'পথের দাবী' নাটকে বিচার-দৃশ্য।

চরিত্র। অল্প দু'নিরাশ্রয়ী আইন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বলে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। 'বিধি ব্যতিক্রম' নাটক আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার এক বাস্তব রূপ তুলে ধরেছে। দর্শকমণ্ডলে এই নাটকের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এরূপ নাটকের বহুল অভিনয় প্রয়োজন।

চলচ্চিত্র-এর এই নাটকে শেষের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন রবি ঘোষ। তিনি কিছুটা কৌতুকরসের আশ্রয় গ্রহণ করায় মূলচরিত্র প্রকাশ বর্ধাৎভাবে করতে পারেন নি। এবং তার জন্য নাটক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের মতে এই চরিত্রে রবি ঘোষকে নির্বাচিত না করলেই ভাল হতো। তুলনায় কুলির চরিত্রে হুসী চক্রবর্তী ভাল অভিনয় করেছেন। ছাড়া দারের ভূমিকায় সত্যিন্দ্র ভট্টাচার্য চরিত্র প্রকাশ করতে পারেন নি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—অনুভা গুপ্তা, গোরা চট্টোপাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, প্রণব চক্রবর্তী, বাণী ভট্টাচার্য, রঞ্জিত দেব, চিত্ত ঘোষ, ভবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, পরেশ পাল। সুরেশ বা প্রস্তাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তোলা দত্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই নাটক অনুশীলন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। সেই অভিনয় আলোচনা আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করেছি। আমাদের মতে অনুশীলন সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ ও চরিত্র অভিনয় চলচ্চিত্র গ্রুপের তুলনায় বেশি সাকল্যের দাবি করতে পারে।

পথের দাবী

২৩শে ডিসেম্বর নেতাজী সুভাষ ইন্সটিটিউটে রেলওয়ে বোর্ড স্টক সোশ্যাল এন্ড

কালচারাল এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। পরিচালনা করেন শ্রীঅবনী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অশোক বসু, ননী চক্রবর্তী, শিশির চক্রবর্তী, শচীন মিত্র, কালী ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষগোঁসাই, শিশির দাশগুপ্ত, রঞ্জন চ্যাট্টোপাধ্যায়, অধীর কাঞ্জিলাল প্রমুখ। মন্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিপ্রা সাহা, শাম্বতী রায় ও বনশ্রী চক্রবর্তী। প্রত্যেক শিল্পীই নিজের নিজের ভূমিকাকে বর্ধাৎ রূপ দিয়ে নাটকটিকে সামগ্রিকভাবে সাকল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী এ. সি. চ্যাট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ব্রিগেডিয়ার জে. এস. ধীলন। শ্রুতেন্দ্রনাথ প্রেরণ করেন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মূখার্জী, শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চারহাজার এক টাকা 'জওয়ান রিলিফ ফান্ড' দান করা হয়।

প্রশ্ন

গত ২৫শে ডিসেম্বর অবসারিকার ব্যবস্থাপনার 'জি. আ. ক. খ'-এর প্রযোজনায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় তত্ত্ব সাহিত্যিক সুভাষ সমাজদলের কাহিনী অবলম্বনে বিজু দত্তের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় 'প্রশ্ন' নাটকটি সাকল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—অরুণ গঙ্গুলী, অক্ষুর সেন, স্বাধীন দাস ও আরতি দাস।

আ রা গান চাই

রাজশ্রী সংপ্রদায় খ্যাতনামা নাট্যকার রমেন নাথিড়ী বিরচিত সমাজ-সমস্যামূলক মৌলিক মার্টক 'আরা গান চাই' নির্মিত মণ্ডাভিনয়ের প্রয়োজন করেছেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় পরিবেশন করবেন এ'রা আগামী ৮ই জানুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় হাওড়ার ই. আই. রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বে আছেন পি. এ. অধিকারী।



সঙ্গীত কথা

নৃত্যভারতীর বাষক অনুষ্ঠান

কলকাতার সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্র নৃত্যভারতীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ২৫শে ডিসেম্বর একাডেমি অব ফাইন আর্টস এঞ্চে। বিভিন্ন নৃত্য প্রদর্শনে নৃত্যভারতীর শিক্ষার্থীরা তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-ভিত্তিক 'বাসবদত্তা' নৃত্যনাট্যটি মণ্ডল্য হয়। প্রবীণ নৃত্যপরিচালক শ্রীপ্রহ্লাদ দাস তাঁর নবীন দৃষ্টিতে শ্রীনবনশ্যাম সিংহের সঙ্গে যোগমভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপভোগ্য নৃত্যপ্রদর্শন করেন কেশোরায় মাসা (বাসবদত্তা), চিত্রেশ দাস (উপ-গুপ্ত), মীরা বসাক (আলারিপদ ও লক্ষ্মী), পল্লবী ভাটিয়া (ময়ূরনৃত্য), নবনশ্যাম সিংহ, শ্যামল বসু, কৃষ্ণা বসু, গায়ত্রী গুহঠাকুরতা

'পাগল ঠাকুর' ছবির নন্দভূমিকায় নবাগত স্বপনকুমার

(নাগা ও গুজরাটী লোকনৃত্য)। মন্ডসঙ্গীত পরিচালনা সন্তোষ চন্দ্রের।

নৃত্য ও সঙ্গীতে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, বনানী সেন, গায়ত্রী অধিকারী, শ্রীমতী ব্যানার্জী, স্বপ্না মন্ডল, আফসার খানম, ভারতী দাস, সঞ্চয়িতা দত্ত, তপস্বী সরকার, শিখা বিশ্বাস, অর্চিতা ভট্টাচার্য, পম্পা ব্যানার্জী প্রভৃতি।

নৃত্যভারতীর বহুমুখী কার্যধারার সঙ্গে দর্শকমণ্ডলীর পরিচয় করিয়ে দেন শিক্ষার্থ-শ্রীকান্ত রায়, বিজয় কল্যাণাধ্যায় ও শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী।

ভিক্টর জীনের থেরা ও লেডী রাণু মৃধাজী নৃত্যভারতীর এই বিশিষ্ট প্রযোজনাকে স্বাগত জানান।

আর্টস হল হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনে উদ্যোগে এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কুমা চট্টোপাধ্যায়ের ভজন গানের পরিবেশন করেন চৌধুরীর পরিচালনায় হিমাংশু-গীতি পরিবেশন করেন মিতা চক্রবর্তী ও অনূপ ঘোষাল। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন সূর্যমিতা চট্টোপাধ্যায়, দেববানী সেন ও চন্দ্রম চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগীতি ও রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন অনূপ ঘোষাল ও তপস্বী মৈত্র। মণিগঙ্গাকরের পরিচালনায় নটরাজ কলা মন্দিরের শিল্পিবৃন্দ নৃত্যপ্রদর্শন করেন। নৃত্যে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণা বসাক, রামগোপাল ভট্টাচার্য ও দেবানন্দ মথুরা প্যাথায়। কমলেশ মৈত্র তবলাতরঙ্গ বাজিয়ে শোনান।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

গত ২৬শে ডিসেম্বর একাডেমি অব ফাইন

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীনন্দগোপাল সেন-গুপ্ত ষষ্ঠ বার্ষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন।



আমরা সবাই ভারতীয় ...

কেউ যেন আমাদের মাধ্যমে

বিভিন্ন সৃষ্টি করতে না পারে

DA 63/73
Bengali

রাশিয়ান নাটক : টুর্গেনেভের দুজনের মত প্লাটোনভও প্রতিপন্ন করতে চায় যে, সে একজন দার্শনিক এবং এই কারণেই সে শ্রম এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়—অথচ আসল কাজের সময় সে কিছুই করতে পারে না। অবার সবসময়েই দেখা যায় সে মাতাল হয়ে রয়েছে এবং নিত্য-নতুন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ছে। সে নিজেকে উপলব্ধি করে যে, তিরিশ বছর বাদেও যে এই একই ধরনের জীবন কাটাবে এবং তার চরিত্রের কোন উন্নতি হবে না। পরিণতির সঙ্গে অবশ্য তার এই ধারণার মিল হয় না। একজন বিবাহিতা মহিলা থাকে সে একসময় প্রলুব্ধ করেছিল, প্লাটোনভকে গুলী করে হত্যা করে।

এ নাটকের প্রটটি সম্বন্ধে উল্লেখ হবার মত তেমন কিছু নেই। কিন্তু নাটকটির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কারণে যে, এর পরেও এই ধরনের বহু চরিত্র চেখভের অন্যান্য রচনার দেখা দিয়েছে—এরা সেই শ্রেণীর লোক “who have come to the wrong place and feel that they are superfluous in life.”

প্লাটোনভ বড় বড় কথা বলে—যদিও সেসব কথাই পেছনে সারবস্তু কিছুই থাকে না। তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে বারবার হাস্যলম্বার ইচ্ছার চরিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বহুমেধ ও দেশে এবং বিদেশে

কিন্তু চেখভের নাটকটি ইবসেনের ‘দি ওয়াইল্ড ডক’ নাটকের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। সুতরাং প্লাটোনভ চরিত্রের রূপায়ণে চেখভ কোনোভাবেই ইবসেনের কাছে ধরা পড়েন। বরং বলা যেতে পারে রাশিয়ান উপন্যাস সাহিত্যে প্লাটোনভের অনেক পূর্বসূরীকে দেখতে পাওয়া যায়।

চেখভ প্রথমে কয়েকটি একাঙ্ক নাটক লেখেন। এর ভেতর ‘দি বোয়ার’ নাটকটি আজও পর্যন্ত নানা দেশের মঞ্চে প্রায়ই অভিনীত হয়। এরপর চেখভ তাঁর চার অঙ্কের নাটক ইভানভ (১৮৮৭) রচনা করেন। এ নাটকের নায়কও প্লাটোনভের সমগোত্রীয়। সেন্সরের হস্তক্ষেপের ফলে এ নাটকের একটি বিকৃত রূপ মস্কোর ক্রস্ থিয়েটারে মণ্ডস্থ করা হয়—এর পর নাটকটি পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত করে ষথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে সেইন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

অভিনেতার দল এবং সমালোচকেরা

এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে যে নানাধরনের ভাষা দিচ্ছিলেন তার ফলে নাটকটির সঠিক ভাষা কি হবে তাই বুঝে ওঠা মস্কুলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কারণেই এ ব্যাপারের একটা সহজ সমাধান করে দেবার জন্য চেখভ পরপর কয়েকটি চিঠিতে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধু সুভোরিনের কাছে অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, ঐসব চিঠিতে তিনি নাটকটির ব্যাখ্যা যত সহজভাবে করেছিলেন, মূল নাটক পড়ে অত সহজে তা বোঝা যায় না।

চেখভের মতামত ঠিকভাবে বুঝতে গেলে আগে ঐ নাটকটি সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। ইভানভ একজন শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোক—তিনি গ্রামেই বসবাস করেন। তিনি বিয়ে করেন একজন জুয়েলকে। মেয়েটির বাবা, মা, যেহেতু মেয়ে জেস্টাইলকে বিয়ে করেছে এবং ব্যাপটাইজড হয়েছে, সেই কারণে মেয়েকে ত্যাগ করেন।



ইভানভের আত্মীয়-স্বজনের কাছেও লেগেই থাকে না—এর ফলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সংগ্রহ ত্যাগ করে ইভানভকে একধরনের এককজীবন যাপন করতে হয় এবং ক্রমশঃ তিনি সর্বনাশের পথে গিয়ে দাঁড়ান। এর পর ক্ষয়রোগাক্রান্ত স্ত্রীর প্রতিও তার ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি যুবতী রাশিয়ান মহিলা সানার প্রতি ইভানভ আকৃষ্ট হন। মেয়েটিও তার প্রেমে পড়ে। তারপর ইভানভের স্ত্রী মারা যায় এবং তার চিকিৎসক ইভানভকে জানায় যে, তার হৃদয়হীনতার জন্যই তার স্ত্রীর এই অকালমৃত্যু ঘটেছে। শেষ অঙ্কে দেখা যায় যে, ইভানভ ঠিক করে ফেলেছেন সানাকে বিয়ে করবেন বলে—এদিকে আবার পূর্বে স্ত্রীর প্রতি যে অন্যায় করেছেন তার জন্য মনে তাঁর অনুশোচনা শুরু হয়। নতুন বিবাহ অনুষ্ঠানের অল্প আগে ইভানভ গুলী করে আত্মহত্যা করেন।

সুভোরিনের মতে, চেখভ ইভানভকে বদচরিত্র হিসাবে প্রতিগম্য করবার জন্য এ নাটকে এভাবে রূপায়িত করেছেন। একথা কিন্তু চেখভ তাঁর চিঠিপত্রে স্বীকার করেন নি। ইভানভ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করবার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে—অসাধারণের কোন চিহ্ন তাঁর ভেতর নেই—যদিও তিনি নিজেকে মনে করেন যে, যথেষ্ট বড় বড় কাজ তিনি করেছেন। রাশিয়াতে এই সময় বেশির ভাগ ভদ্রলোকগ্রেণীর লোকদের বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যেত—তারা সমসময়েই নিজেদের অতীত জীবন নিয়ে খুব গর্বভরে কথা বলতেন। এদের মতে বর্তমান কালটা সর্বদিক দিয়েই অতীতের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কেন?

“Because Russian irritability has this peculiar quality, that it is quickly followed by exhaustion.”

চেখভ আরও বর্ণনা করেছেন কিভাবে একজন রাশিয়ান স্কুলের গণ্ডী পার হতে না হতে, এমন সব দায়িত্ব নিয়ে বসে বা সম্পন্ন করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ায়। স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, চাষীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সামাজিক দুর্নীতির সংশোধন করা এই সব ব্যাপার নিয়েই সে মস্ত হয়ে ওঠে। এর ফলেই পরিত্রিশ বছর বয়স হতে না হতেই সে জরাজীর্ণ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পড়ে অনেক লোক, যাদের কোন কল্পনাবলি বা



তার ইচ্ছাভঙ্গি ব্যতিরিক্ত সমস্তের বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চেখভ

আদর্শের বালাই নেই, তাদের পারিপার্শ্বিকের ওপর সমস্ত দোষ আরোপ করতে চায়। নিজেদের মনে করে বাহুল্য—প্রত্যেকই যেন এক-একজন হ্যামলেট—এইভাবেই জীবনযাত্রাতে গা ভাসিয়ে দেয়। ইভানভ কিন্তু এক হিসাবে সরল, সোজা এবং নির্ভীক ধরনের লোক। নিজের ভেতর যে পরিবর্তনটা এসেছে তা তাঁর সৌজন্যবোধকে বিবর্ত করে তোলে। বাইরের দিক থেকে এর কোন কারণ তিনি খুঁজে পান না। এর পর নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং ভ্রমপূর্ণভাবে একটা অপরাধের অনুভূতিকে আবিষ্কার করেন। তখনকার দিনে এ ধরনের অনুভূতি ছিল a typical Russian feeling. ইভানভের মত লোকেরা কখনও কোন সমস্যার সমাধান করেন না বা করতে

পারেন না। সমস্যার চাপে তারা নেতিয়ে পড়েন।

“Thy lose themselves, do not know what they ought to do, become fidgety, quarrel, behave stupidly and give way to their nerves. They lose the ground under their feet and join the ranks of the downtrodden and misunderstood.”

পরে চেখভ তাঁর একটি চিঠিতে খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাঁর এই নাটকে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ান চরিত্রের বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন। অতিরিক্ত ভাবাবেগ, “অপরাধ-করেছি” এই ধরনের একটা মনোভাব, ক্রান্তিবোধ—এ সবই হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন রাশিয়ান চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েট আমলের রাশিয়ানদের ভেতর অবশ্য এ জাতীয় নৈরাশ্যবাদ, হতাশা এবং আলস্যের চিহ্নমাত্রও দেখতে পাবেন না। আসল কথা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব অনুসারেই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে।

চেখভের নাটকে বিশেষভাবে সেই সময়ের রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্টিশিয়র কথাই বলা হয়েছে। সমাজের এই শ্রেণীর লোকদের নিয়েই তিনি বেশিরভাগ নাটক রচনা করেছেন। চেখভ মনে করতেন তিনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত—যদিও এই শ্রেণীতে তিনি জন্মগত অধিকার নিয়ে আসেন নি। ইভানভ চরিত্রের সঙ্গে কোন কোন সমালোচক তার প্রস্তুত চরিত্রের খানিকটা অস্পষ্ট সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন।

পরের আরও কয়েকটি নাটকে চেখভ বিভিন্ন ধরনের কয়েকজন ইন্টেলেক্চুয়ালের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। ভালভাবে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা না করলে এই নামা ধরনের বিদ্বান ব্যক্তিদের চারিত্রিক একোটা দিকটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে চেখভ তাঁর চিঠিতে

বহু অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য সরকারী, বেসরকারী ও বহু মার্চেন্ট অফিসের কার্য-পদ্ধতি অবগত হয়ে লিখিত

MAN OF BUSINESS

কাজের লোক বা কোরাণী শিক্ষাদর্শন পাঠ করিলে আর চাকরীর জন্য উদ্বেগী করিয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। বাহারা অভিজ্ঞ কোরাণী বলিয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন, অভিজ্ঞতা সঞ্চার করিবেন, কাজের লোক হইবেন।

মূল্য ১০ টাকা

শ্রীমৎ গোম্বারী বিরচিত

শ্রীমৎ গোম্বারী বিরচিত

[বিশ্বনাথ চন্দ্রবীকৃত টীকাসহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লালার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমৎ গোম্বারীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-ধামন্য নাটক রচনা করা হইয়াছিল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালস্কার।

এছে কবির বিনা নহে রসের প্রচার॥”

মূল্য : তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৬, বিপিনবিহারী বাগদানী স্ট্রীট, কলি-১২

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—
এই কমন পেরেটটি হচ্ছে—

The easily aroused enthusiasm quickly followed by apathy and hatred of the world.

এই ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে—চেখভের মনে—কোন একটা বিরূপ উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিদারুণভাবে পরিশ্রম করে যাওয়া। এই চিন্তা-ধারাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ‘আস্কল ভ্যানায়ার’ নাটকে—‘দি উড্ ডেমন’ নাটকেও স্পষ্টভাবে না হলেও এই কথাই ইঙ্গিতের সাহায্যে বলা হয়েছে।

‘দি উড্ ডেমন’ নাটকটির রচনা সমাপ্ত হয় ১৮৮৯ সালে। নাটকের প্রধান চরিত্র ডাক্তার এবং জমিদার। বহিঃপ্রকৃতিকে তিনি সত্যিকার অর্থে থেকে ভালবাসেন। নিজের জমিদারীতে যে বনভূমি আছে তাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে তিনি লালন করেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এই কারণেই তাঁর নামকরণ করেছেন, ‘দি উড্ ডেমন’। বন্যদের ধারণা এই ডাক্তার-জমিদারের মনের গহনে সত্যিসত্যিই একটি উড্ ডেমন বাস করছে।

নায়কের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাশিয়ার দুর্ভাগ্যবশতই তার বনভূমিগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। আবার যদি এইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত বনানীসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, তবেই রাশিয়ার সুদিন এবং সৌন্দর্য ফিরে আসবে। এবং তার ফলে সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রাপ্রণালীও উন্নত হয়ে উঠবে। এ নাটকের কয়েকটি বিভিন্ন সংস্করণ আছে—এখন এই সবক’টি সংস্করণেরই ছাপানো ভার্সন পাওয়া যায়। আগের দিকের ভার্সনগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, তখন ঐ উড্ ডেমন চরিত্রটির ওপরই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পরের সংস্করণগুলোতে ক্রমশ এ প্রাধান্য কমে আসে। তারপর ‘আস্কল ভ্যানায়ার’ নাটকে এসে চরিত্রটি আরও নিঃপ্রভ হয়ে যায় এবং ডক্টর এস্ট্রভের মাধ্যমে তার একটা অস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়। এ নাটকে এস্ট্রভ বারবার নালিশ জানিয়েছে—

That the forests of Russia hear too much of the woodman's axe.

এস্ট্রভ মনে করে একটি কুবকের বনভূমিকেও যদি সে কাঠরিয়াদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, সেইটাই হবে তার সব থেকে বড় পুরস্কার। চেখভ শহরের ছেলে হলেও নিসর্গ সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর একটা অন্তরের টান ছিল। মেলিকোভোভে ছোট জমিদারীর মালিক

হবার পর বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষসংরক্ষণ নিয়েই তিনি সব সময় মেতে থাকতেন।

With his inexhaustible capacity for laughing at himself he allowed the Demon of the Woods to be charged with being a poseur, and Doctor Astrov with being a drunkard.

এ ছাড়া, ‘দি উড্ ডেমনের’ যেসব চরিত্র—‘আস্কল ভ্যানায়ারে’ও ঠিক তাদেরই আমরা দেখতে পাই। অনেক সংলাপ লাইন বাই লাইন এ-নাটক থেকে ও-নাটকে তুলে দিলেও কোন দিক থেকেই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। অহংকারী এবং খটখটে মেজাজের অধ্যাপকটি এবং তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—যে খুব ফ্লাট করতে ভালবাসে এবং যার জীবনযাত্রা অত্যন্ত তাঁর ধরনের—এদের যে দক্ষতার সঙ্গে চেখভ রূপায়িত করেছেন তা বোধহয় এই সময় এক ইবসেন ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উচ্চাশী সন্ন্যাসী ডইন্টস্কি, আস্কল ভ্যানায়ার যতই প্রাণবন্ত এবং সজীব চরিত্র। জীবনটা ব্যর্থতায় পূর্ণবিসিত হওয়ার সেন্নে নিজেকে গুলী করে হত্যা করলো। এ নাটকটি কিন্তু মঞ্চে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি এবং এরপর প্রায় সাত বছর চেখভ নাটক লেখবার চেষ্টা করেন নি। আর এর পর ‘কিং সলোমন’ বলে একটি গ্রেট ড্রামাট লিখে ফেলেন—নিজের জীবনের ক্লান্তি এবং হতাশার ভাবটা এ নাটকে ফুটিয়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল চেখভের—কিন্তু লেখাটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

১৮৮০ এবং ১৮৯১ সালের ভেতর যেসব ফার্স এবং ভেডেজিল চেখভ রচনা করেন, সেগুলোই খুব বেশি মণ্ডসাফল্য অর্জন করে। মার্টিন ল্যাম বলেছেন—

This may be the reason why during his great creative period after 1890 he persisted in calling his plays comedies. His more serious plays were described by contemporary critics as dramatized novels, though they had considerably more plot than his masterpieces. In these plots, however, there is no compelling logic, it is already clear that Chekhov was destined to be a master of the static drama. He admitted freely that as drama his plays were weak, but “the characters are alive and real, not just invented.”

[কম্পা]

আপনার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের (২০-১২-৬৬)

পাঠক মনে প্রকাশিত গ্রীষ্মকালীন রায়ের পড়লেন। তিনি অভিযোগ করছেন যে, দার্জিলিং গভর্নর স্ট্রিট অফিসে রবি ব্যানার্জীর ভূমিকাকে প্রসঙ্গ ভূপেনবাবু 'অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন।' ভূপেনবাবু আজ একটি পরিশ্রান্ত আবেহে বসিয়া তিরিশ বৎসর পূর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করিবার কালে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকেরই প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও দোষভোজি যে গ্রীষ্মকালীন রায়ের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। আমি সংক্ষেপে আমার ধারণামত অভিযোগের উত্তর দিব।

'সবার জলজো' রচয়িতা বলিয়াছেন যে, রবি ব্যানার্জী Confession করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে পাবলিশ Approver করিতে পারে নাই। Confessor এবং Approver এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সাধারণ লোকে বোঝে না বলিয়াই লেখককে হয়তো কিছুটা বিশদভাবে ঐ প্রসঙ্গে লিখিতে হইয়াছে। রবি ব্যানার্জী স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। তাহার দারুণ নির্বাসনে) দুর্বলতা আসিয়াছিল—তাহাও ঠিক। রবি ব্যানার্জী যাহা জানিতেন তাহা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন এমন তথ্যই। এই সব যেমন সত্য, ঠিক অনুসরণ সত্য হইলে যে রবি ব্যানার্জী কখনো Approver হইতে পারেন নাই। এই তথ্য কোর্টের ফাইল, পাবলিশ রিপোর্ট বা তৎকালীন দৈনিক-কাকতালীর পৃষ্ঠা খুলিলেই জানা যায়। অধিকন্তু ইহাও জানিতে হইবে যে কোন Approver-কে গভর্নমেন্ট কখনো বন্দীদের সঙ্গে রাখেন না, কারণ তাহার জীবন নাশের ভয় থাকে। অথচ দার্জিলিং হইতে সাম্রাজ্যান্তর পর একই কামরার সহ-বন্দীদের সঙ্গে রাখিকে রাজসাহী জেলে আনা হয়। তাছাড়া রাখিকে বাংলার জেলে অথবা আন্দামানেও বংশধারিকাল সহ-বন্দীদের সংগেই রাখা হইয়াছিল, এবং বন্দুরা তাহার প্রতি বা অপরাধ ক্রমসূত্রে চোখেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ তাহাকে কখনো অপারাত্তর করিয়া রাখেন নাই? 'Approver' হইলে তাহার রাখিকে সহ্য করিতেন কি? প্রসঙ্গ ভূপেনবাবু, বিশলী-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি হইতেই রবি ব্যানার্জীর প্রতিটি আবেগ ভাব করিয়া তাহার অবদান কি ছিল তাহাই লিখিয়াছেন এবং তাহাকে Confessor বা Approver বাহারা বলিতে চান তাহাদের রাজনীতিকজ্ঞানের অভাব সম্পর্কেই আমাদিগকে অবহিত করাইতে গিয়াছেন।

গ্রীষ্মকালীন রায়ের অপর অভিযোগ অর্থহীন। ভূপেনবাবু নেতাজীর অন্তর্ধান ও বঙ্গভঙ্গের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন-র যত্নসূচী গোপন যোগাযোগ ছিল তাহাই উল্লেখিত করিয়াছেন। কেন তিনি বহুতর পরিধি দেয়া ইতিহাস লিখেন নাই তাহা তাহার



লেখার ভূমিকায় এবং শেষ অধ্যায়ে পরিষ্কার লিখিত আছে। সমালোচক মৈত্রী সহকারে উহা পাঠ করিলেই বুঝিবেন যে, কহারাও কথা লেখা না হইলেই তিনি উপেক্ষিত হন না। তাহার নামের শেষ scope থাকা চাই।

পারুল বর্মান
১২, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আপনার পত্রিকায় গ্রীষ্মক পুস্তকীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের' জীবনী পড়িতেছি। প্রথম দিকে সত্যিই একটু বিরক্তি আসে। যেন অতিরিক্ত ও সাহিত্যই পাইতেছি। তিনিও একজন মানুষই ছিলেন। পরের কয়েক সপ্তাহে লেখকের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রস্রাবিত। তাহার পরিচয় ও ঠিকানা পাইলে আলাপ করিবার সুযোগ পাইতাম। দুই-এক দিনের জন্য পরিচিত মহাশয়েরও যতীন্দ্রনাথের জীবনী লিখিয়াছেন—সিঁমোরা বইও বাইর হইল।

তাকে 'বাঘা' আখ্যা দেওয়ার ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। কে বা কাহারও এই আখ্যা দিলেন জানিবার ইচ্ছা হয়।

Class-এর ছাত্রকে যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানিতে চাওয়ায় সে উত্তর দিল—'এই বাঘ মারিতেন একজন শিকারী' বাঘা আখ্যার এই পরিণাম—ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের নিকট তার পরিচয়। জানাইয়া রাখি আমি একজন বৃদ্ধ অচলপ্রায় শিক্ষক। শৈশবে—যতীন্দ্রনাথকে দেখি। 'বাঘা' আখ্যা দেওয়ার যতীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ ভূতপূর্ব মন্ত্রীপ্রবর গ্রীষ্মক ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের নিকট কয়েক দিন যাই—আলাপ-আলোচনা করি। গ্রীষ্মক নলিনী কর মহাশয়কে পত্র দিই—উত্তর পাই নাই। যতীন্দ্রনাথের বহুদিনের সঙ্গী, ভক্ত ও তাহার প্রতি প্রাণান্তিক ও আকৃষ্ট—এক বৃদ্ধ—নাম যতীন্দ্রনাথ মহাশয় ৪০।১।১ আমহান্ট স্ট্রিট। তিনি আমাকে বালককাল হইতে স্নেহ করেন। তাঁর নিকটে এই বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে—যেন বিরক্ত হন—বলেন, 'মাদার (যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের) সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল। তাকে নিয়ে যিনি যিনি খেলা হইছে।'

জন্মের যখন প্রথম কলিকাতায় আমি

তখন 'স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথের' স্ট্রীকে প্রথম করিবার জন্য (বোধ হয়) গাড়িমারটার ব্যক্তিগত কয়েক দিন ব্যাভায়াত করি।

মনে হইতেছে বর্তমান লেখক গ্রীষ্মক মুখোপাধ্যায় বয়স্ক লোক—অনেক সম্ভান লইয়াছেন ও পরিশ্রম করিতেছেন। সত্যি হয়ত বা একটা কাজ হইবে। তাকে আমি আন্তরিক প্রস্রা জানাই। 'বাঘা' আখ্যার দ্বিতীয় বিষয় তিনি একটু চিন্তা করিলে কতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪।১৪-এ বিজয়গড়
কলিকাতা-৩২

১৪ই পৌষ-এর বসুমতীতে ভারত পুস্তকের সাহিত্যের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম এবং মনে আশার সঞ্চার হল। বাংলা-দেশের তথাকথিত উপন্যাস ও রম্যন্যাসমূলক সাহিত্যের প্রতি যে সমালোচনা করা হয়েছে তা যেমন একদিকে যুগোপযোগী অপর দিকে তেমনি তা অধীর্ণিত ও সাধারণ পাঠক-সমাজের নিকট সতর্কতার বাণী পরিবেশনই সক্ষম। তাছাড়া যে সাহিত্যের আবেদন সমাজে বসবাসকারী মানুষকে জীবনের কোল সত্য ও স্পষ্ট লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয় না তার সাহিত্যমূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রবন্ধকারের এই উক্তি সত্যিই যে 'এই বিলাসী মানসিকতা জনমনে সাময়িক উত্তেজনা সঞ্চারে প্রভূত কৃতিত্ব অর্জন করে ব্যবসায়িক সাফল্য কুড়িয়ে পরিভ্রুত হয়'। এসব সাহিত্যের উপাদান পাঠকমনের উৎকর্ষ-সাধন না করে তার রূপ মানসিক বিন্দি-গুলিকে ক্রমশ প্রকট করে তুলছে। এ সমস্ত উপন্যাস পাঠে পাঠকের চিন্তাধারা, হৃদয়ের পবিত্র দুর্দমনীর আবেগ অস্তিত্ব হতে বসেছে। তথাকথিত উপন্যাসগুলির দুর্ভাগ্য পৃষ্ঠা, নাড়চাড়া করলেই মনটা স্বতঃই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে কিভাবে লেখক পাঠকে রচনাশৈলীর যাদু-দণ্ডের স্পর্শে ঘুম পাড়িয়ে রাখছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উল্লেখ করি। এ জাতীয় সাহিত্যে 'বড় বড় সাধারণ-ভাবে কথা আছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে তাহা আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া সজ্জিত হইয়া উঠে নাই।'

আজ এ জাতীয় উপন্যাস সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের মতো সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকেও দাবি জানানো উচিত নয় কি? অন্যথা প্রবন্ধকারকে।

বাস্তব মুখোপাধ্যায়
গ্রাম—বাল্লভপুর
পোঃ শ্রীরামপুর (হুগলী)

ডুরান্ড কাপের আসরে

প্রবল এক শক্তির পতন ঘটল রাজধানীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে। গতবারের রানার্স ইস্টবেঙ্গল যে ডুরান্ডের আসর থেকে এত পূর্বে বিদায় গ্রহণ করবে তা সভাই কল্পনা করা যায় নি। তরুণ শক্তি সমন্বিত অনামী দিল্লী গ্যারিসন প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করল ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে। দিল্লী গ্যারিসনের পুরোভাগের মধ্যমণি ভূপিন্দর সিং রাওয়াং ইস্টবেঙ্গলের তিনজন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের কড়া প্রহরা এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক খংগরাজকে ফাঁকি দিয়ে একমাত্র বিজয়সূচক গোল করে বসলেন খেলার দ্বিতীয়ার্ধের বারো মিনিটে। এই বিজয় নিঃসন্দেহে দিল্লী গ্যারিসনের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বিজয়।

প্রাপ্ত একটি সুযোগের সম্ভাবহার করেই যে দিল্লী গ্যারিসন বিজয়ের আশ্বাদ গ্রহণে লক্ষ্য হয়েছে তাই নয়, অনুপ্রাণিত গ্যারিসন হল বেশ কয়েকবার হানা দেয় ইস্টবেঙ্গলের গোলে এবং সৃষ্টি করে সমূহ বিপদের। প্রায় তিনটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত গোলরক্ষার কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন পিটার খংগরাজ। দলগত হিসাবে বিচারে বলা চলে যে, ইস্টবেঙ্গল নিকট ক্রীড়ামানের পরিচয় দিয়ে পরাজয় বরণে বাধ্য হয়েছে, কারণ কোন সময়েই এই ঐতিহাসালী ক্লাব নিজস্বের ধ্যানিত অনুযায়ী আশানুরূপ ক্রীড়াধারার পরিচয় দিতে পারে নি। ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের ছয়ছাড়া আক্রমণধারা লক্ষ্যভেদ হয়েছে আর রক্ষণভাগ বিপক্ষ দলের আক্রমণের ডেউ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্যারিসন দল গোলাটি করার পর ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়াধারার আরও অবনতি ঘটে, নৈরাশোর ছায়া ফুটে ওঠে তাদের খেলার মধ্যে এবং ফলে তাদের লক্ষ্যহারা ক্রীড়াধারা তাদের পরাজয়কে আরও নিশ্চিত করে দেয়।

শুধু ইস্টবেঙ্গলই নয়, মহামেডান স্পোর্টিং ও কোয়ার্টার ফাইনালের ধাপ থেকে ডুরান্ডের আসর ত্যাগে বাধ্য হয়েছে, মোহনবাগান প্রকদিন ড্র করার পর দ্বিতীয় দিন জয়লাভ করে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে। আমাদের কলকাতার দলগুলির এই ব্যর্থতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব। বর্তমানে দিল্লীর মাঠে আমাদের কলকাতার খেলোয়াড়দের পক্ষে স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা প্রায় দুঃসাধ্য। কারণ আমাদের খেলোয়াড়েরা গ্রীষ্মের এবং বর্ষার সময় খেলতেই অভ্যস্ত, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের দিল্লীর প্রচণ্ড শীত কাটিয়ে খেলতে গিয়ে কলকাতার দলগুলি তাদের স্বাভাবিক এবং দুরন্ত গতিবেগ ফিরে পাচ্ছে না। এই শীতে অনভ্যস্ত খেলোয়াড়দের আবার পেশী সংকোচনের ভয় খুবই বেশি।

একই দিন মহামেডান স্টেটিং এবং ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।



সিনক্রোর ট্রাফিক প্রোভে বাউন্সম্যানের পুরস্কার গ্রহণ করছেন উপনায়ক বাউন্সম্যান

ইস্টবেঙ্গল ৫-১ গোলে পরাজিত করে কাশ্মীরি অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনকে এবং মহামেডান ০-১ গোলে ইন্ডিয়ান কোচ ফাউন্ট্রীকে পরাজিত করে। মহামেডান কোয়ার্টার ফাইনালে সম্মুখীন হয় পাজাব পুলিশের। পাজাব পুলিশ কোনক্রমে ১-০ গোলে পরাজিত করে হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল

ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে বাওগালের সি, আই, এল-এর শক্তি পরীক্ষা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয়

অস্ট্রেলিয়া আবার প্রমাণ করে দিল যে বিশ্ব টেনিসের শীর্ষে তারাই অগ্রগণ্য করছে। ডেভিস কাপের সম্মানের জন্য অস্ট্রেলিয়া ৪-১ খেলার ব্যবধানে জয়ী হল স্পেনের বিপক্ষে। ক্রে কোর্টের ছেলের দাপ হল সিডনির ঘাসের কোর্টে। স্পেনের একমাত্র সান্দ্রনা হল ম্যানুয়েল সান্দ্রনা একটি জয়। ম্যানুয়েল সান্দ্রনা

প্রীতিমিত্রত

পুলিশ লাইনকে তৃতীয় রাউন্ডের খেলায়। মহামেডান স্পোর্টিং দলের দুর্ভাগ্য, ভাল খেলে, খেলার বেশির ভাগ সময় প্রাধান্য প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে পাজাব পুলিশের কাছে পরাজিত হয়, এমনকি মহামেডান প্রাপ্ত একটি পেনাল্টির সুযোগও নষ্ট করে। পরবর্তী রাউন্ডে সেমি-ফাইনালে পাজাব পুলিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দিল্লী গ্যারিসনের সঙ্গে।

গতবারের ডুরান্ড বিজয়ী মোহনবাগান তৃতীয় রাউন্ডে খেলা ১-১ গোলে অসম্মানিতভাবে শেষ করে প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন অবশ্য মোহনবাগান ০-১ গোলে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করে। দলের পক্ষে একাই তিনটি গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেন দীপু দাস। প্রথমার্ধে মোহনবাগান ০-০ গোলে অগ্রগামী থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বেণু কুমার একটি গোল পরিশোধ করেন। পরবর্তী খেলায় কোয়ার্টার



দীপু দাস

দাপ্তরিক বঙ্গমতী

কম্বের শ্রেষ্ঠ অংশাদার টেনিস খেলোয়াড় উইমবলডেন বিজয়ী রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গেলস এবং দ্বিতীয় দিনের ডাবলস এবং শেষ দিনের একটি সিঙ্গেলস খেলায় স্পেনের পরাজয় ঘটে।

উল্লেখনীয় খেলাই অনুষ্ঠিত হয় ফ্রেড স্টোলে এবং ম্যানুয়েল সান্তানার মধ্যে। সান্তানা আপাত চেষ্টা করতে থাকেন এই প্রথম খেলায় জয়ী হবার জন্য। সিডনির হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে সমবেত প্রায় পাঁচ শত স্প্যানিয়ার্ড প্রথম থেকেই তাঁদের প্রিয় টেনিস-তারকা ম্যানুয়েল সান্তানাকে হর্ষধ্বনির মাধ্যমে উৎসাহিত করতে থাকে। প্রথম দুটি সেট করায়ত্ত করেন ম্যানুয়েল সান্তানা ১০-১২ এবং ৩-৬ গেমে। তৃতীয় সেটে ফ্রেড স্টোলে খেলার ভাগ্য নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন, তিনি এই সেটটি জয় করেন

৬-১ গেমে। এই তৃতীয় সেটে স্টোলে দারুণ খেলেন। চতুর্থ সেটটি করায়ত্ত করলেন স্টোলেই ৬-৪ গেমে। শেষ সেটটির ওপর নির্ভর করছিল খেলার ভাগ্য। তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলল দুজনের মধ্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭-৫ গেমে সেটটি জয় করে বিজয়ী ফ্রেড স্টোলে অগ্রগামী করলেন অস্ট্রেলিয়াকে। ম্যানুয়েল সান্তানার এই খেলাটিতে পরাজয়ের ফলে তাদের সমস্ত আশা এবং সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটল।

দ্বিতীয় সিঙ্গেলস খেলার অতি সহজেই ৬-৩, ৬-২ এবং ৬-২ গেমে রয় এমার্সন পরাজিত করলেন গিসবার্টকে। ফলে প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া অগ্রগামী থাকল ২-০ খেলায়। দ্বিতীয় দিন ডাবলস খেলার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অবতীর্ণ হয় এবারের উইমবলডেন ডাবলস বিজয়ী তরুণ নিউকম্ব এবং রোচে জুটি। স্পেনের ডাবলস জুটিতে

ছিলেন সান্তানা এবং আরলো। এং ডাবলস খেলায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন জন নিউকম্ব। বলতে গেলে নিউকম্বের অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলেই ডাবলসে অস্ট্রেলিয়া লাভ করেছে এই অনায়াস সাফল্য। ডাবলস খেলার ফলাফল হয় ৬-৩, ৪-৬, ৭-৫ এবং ৬-২। ডাবলস খেলায় মাঝে মাঝে ম্যানুয়েল সান্তানা তাঁর নিখুঁত কলাকৌশলের দৃঢ়-চারটি নানা উপহার দিচ্ছিলেন সমবেত প্রায় সাত সহস্র দর্শককে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী কলাকৌশল জয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না; অপর দিকে নিউকম্বের অসামান্য নৈপুণ্য একশো এগারো মিনিট স্থায়ী ডাবলস বৃক্ষে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে সাহায্য করে।

শেষ দিনের খেলার আকর্ষণ ছিল না দ্বিতীয় দিনেই খেলার ফলাফল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নির্ধারিত হবার ফলে। শেষ দিন একমাত্র আকর্ষণ ছিল বর্তমান অপেশাদার টেনিস জগতের দুই নিপুণ শিল্পী এমার্সন এবং সান্তানার সাক্ষাৎকার।

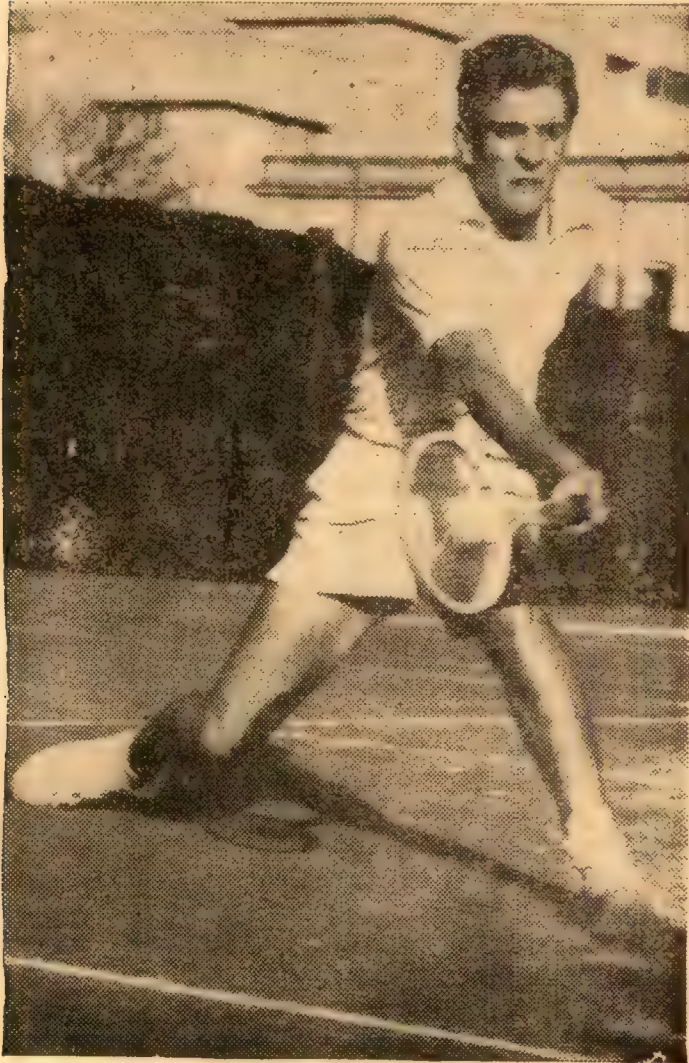
প্রায় একশত স্প্যানিয়ার্ড দর্শক আনন্দে নৃত্য করতে করতে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে মাঠে প্রবেশ করে ম্যানুয়েল সান্তানাকে মাথায় তুলে নেয় এমার্সন-সান্তানা সিঙ্গেলস যুদ্ধের পর। ম্যানুয়েল সান্তানা উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-ধারার পরিচর দিয়ে ২-৬, ৬-৩, ৬-৪ এবং ১৫-১৩ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন। সংকট মুহূর্তে এবং প্রয়োজনের সময় সান্তানার দৃঢ়তা এবং উপস্থিত বুদ্ধি তাঁকে জয়লাভে সাহায্য করে। অপর দিকে কিন্তু এমার্সনের খেলার মধ্যে মাঝে মাঝে ছিল ব্যর্থতার ছোঁয়াচ। বিশ্বজয়ী পরাজয় যে টাফের কোর্টে স্বদেশের মাটিতে ঘটেবে তা সভ্য আশ্চর্যের কথা। অবশ্য কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে রয় এমার্সন তাঁর সাবলীল ক্রীড়াধারার জৌলুস হারিয়ে ফেলছেন।

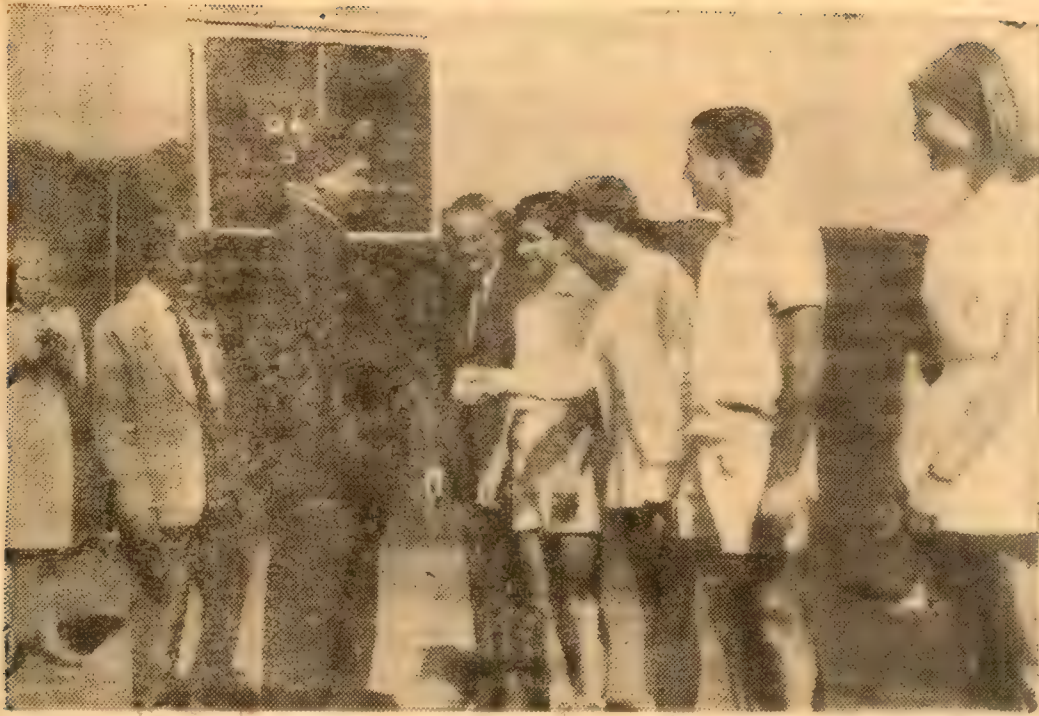
শেষ সিঙ্গেলস খেলায় পরাজয় ঘটে গিসবার্টের, ফ্রেড স্টোলের কাছে। ফ্রেড স্টোলের জয়ী হতে কোনই কষ্ট হয় নি।

১৯৫০ সাল থেকে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলার মোট বোলবার ফাইনালে খেলেছে অস্ট্রেলিয়া-এর মধ্যে পনেরো বারই তারাই লাভ করেছে ডেভিস কাপের সম্মান। মাত্র একবারই এর মধ্যে তাদের পরাজয় ঘটেছে আমেরিকার কাছে।

আর একটি নতুন মূখ

এবার ইডেনে রঞ্জী ট্রফির আসরে আমরা একটি নতুন তরুণের সন্ধান পেলাম। দলীপ ট্রফির আসরে মাত্র কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কার করেছিলাম সুইং বোলার সূত্রত গুহকে-আর এবার আসামের বিপক্ষে রঞ্জী ট্রফির আসরে আত্মপ্রকাশ করলেন তরুণ বোলার





উডবর্ন পাক্‌ এশিয়ান লন টেনিসের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মসূচী করছেন বিভিন্ন কার্যক্রম।

তপনজ্যোতি বানার্জী। এই মরশুমে তপন-জ্যোতি সন্দর খেলছেন, গতবারও বিভিন্ন খেলায় তিনি উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। গত মরশুমে অল ইন্ডিয়া এসো ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় এবং এই আসরে প্রস্তুত খেলোয়াড়ের সম্মান তিনিই লাভ করেন। আশুতোষ কলেজের ছাত্র টি জে বানার্জী সর্বভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বর্তমানে কলকাতার প্রথম ডিভিশন ক্লাব মিলন সমিতির সদস্য টি জে বানার্জীর বাংলা দলে অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করেছে যে বাংলার ক্রিকেট পরিচালকদের সুবাস্থি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একজন তরুণ খেলোয়াড়ের কথাও উল্লেখ করছি। তিনি হলেন কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড় অলক মজুমদার। এখনও স্কুলের ছাত্র অলক মজুমদার বর্তমানে কিছুদিন ময়দান ক্রিকেটের আসরে ব্যাটে বলে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। এই তরুণ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আরও অনেক কিছুই আমরা আশা করি।

বাংলাদল রঞ্জী ট্রফির খেলায় আসামকে পরাজিত করেছে এক ইনিংস এবং ১৬৮ রানে। বাংলাদল প্রথম ব্যট করার সুযোগ পেয়ে সংগ্রহ করে ৪২৬ রান। বাংলার এই বিরাত দলীয় রানসংখ্যার মধ্যে ছিল শ্যাম-সুন্দর মিত্রের সেঞ্চুরী সহ ১৫৫ ব্যক্তিগত রান এবং আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত অবদান হল অম্বর রায়ের ৫২ রান।

আসাম প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ করে মাত্র ১০৫ রানের মধ্যে। ফুটবল-তারকা চুণী গোস্বামী বাংলার হিসাবে তাঁর নৈপুণ্য প্রমাণিত করেন মাত্র ১২ রানে ৩টি উইকেট দখল করে। টি জে বানার্জীও মাত্র ২৫ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট।

প্রথম ইনিংসের শেষে বাংলাদলের থেকে ৩২১ রান পশ্চাতে থাকার ফলে আসামদল ফলো অনের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ৩২১ রানের বাধা অতিক্রম করা আসাম দলের পক্ষে অসম্ভবই ছিল, কিন্তু তারা চেষ্টার দৃষ্টি রাখে নি। আবার সেই টি জে বানার্জী এবং চুণী গোস্বামী সন্দর বোলিং করে ঘটলেন আসামের ব্যাটিং বিপর্যয়। দ্বিতীয় ইনিংসে আসামদলের দলীয় রানসংখ্যা ১৫০ রানের কেউয় গিয়ে শেষে গেল। তপনজ্যোতি বানার্জী মাত্র ৩১ রানে দখল করলেন ৫টি উইকেট এবং চুণী গোস্বামী ১৮ রানে ৪টি উইকেট। বাংলা ফলে জয়ী হল এক ইনিংস ১৬৮ রানে। পূর্বাঞ্চল রঞ্জী ট্রফির শেষ খেলা হল বাংলার বিহারের বিপক্ষে।

টেনিসের মেলা

উডবর্ন পাক্‌ এশীয় টেনিসের আলরে ভারতীয় খেলোয়াড়দেরই প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী যে কজন খেলোয়াড় এবারের এশিয়ান টেনিসে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই কৃষ্ণ-জয়দীপের স্তরের নন। বিদেশীদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ান মেগ্রেভেলি,

ককুলিয়া; জাপানের ইশিগুরো ও ওরচি...; কলম্বিয়ার ব্রিল আলভারেজ এবং গ্রীসের কালোগোরপলাস।

রাশিয়ার ককুলিয়া এক আলেকজান্ডার মেগ্রেভেলির মধ্যে মেগ্রেভেলি সাফল্য অর্জন করেন ভারতের ডেভিস কাপ খেলোয়াড় প্রেম-জিৎকে পরাজিত করে। কিন্তু সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণের নিকট তিনি পরাজিত হন।

উপভোগ্য হয় পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জী এবং কালোগোরপলাসের ৬৮ মিনিটের আকর্ষণীয় টেনিস

এবীশ রসোপন্যাসিক শ্রী অমর মুখোপাধ্যায়ের

অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী

৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি
নির্বাচিত গল্প। মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

হুয়া তরুণ গ্রীক প্রাচ্যবাস্তবতার আভাস দিলেও জয়দীপ মুখার্জী টেনিসের কলা-কৌশলের সূক্ষ্ম বিষয়েই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ফাইনালে ভারতের এক নম্বর এবং দুই নম্বর কৃষ্ণাণ এবং জর্জের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

ভারতের ডেভিস কাপ ডাবলস জুড়ি জয়দীপ ও প্রেমজিৎ পরাজয় সতাই কিংবদন্তির সৃষ্টি করে। ভারতের এই দুই তরুণ খেলোয়াড়ের জুড়ি এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডাবলস জুড়ি বলেই উল্লেখ করা যায়। এবার এশিয়ান টেনিসে ডাবলসে সম্ভাব্য বিজয়ীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুড়ি। ভারতের দুই তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় বিনয় ধাওয়ান এবং শ্যাম মিনোত্রা জুড়ি পরাজিত করেন জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুড়িকে। জয়দীপ



রমানাথন কৃষ্ণাণ

সেমি-ফাইনালে জাপানের ইশিগুরো ওয়াটানবে জুড়িকে পরাজিত করতে পারলে বোকা যাবে বিনয় ধাওয়ান এবং শ্যাম মিনোত্রার সতাই ভবিষ্যতে সম্ভাবনা আছে। ফাইনালে তারা উন্নীত হতে পারলে বোধহয় কৃষ্ণাণ-নরেশকুমার জুড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে।

সমাচার দর্পণ

সোভিয়েট ফুটবল চ্যাম্পিয়ন মস্কো টর্পেডো দলের হাফব্যাক ভ্যালেরী ভেরোনিন ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন। ফুটবল সাপ্তাহিকের পরিচালনায় এই নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রায় নব্বইজন ক্রীড়া পর্মালোক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত করেন ভেরোনিনকে এবং উল্লেখযোগ্য হল যে ভ্যালেরী ভেরোনিন উপধর্পার শ্রিতীয়বার এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করলেন।

* * *

দক্ষিণাঞ্চল এক ইনিংস ২০ রানে মধ্যাঞ্চলকে পরাজিত করে দলীপ ট্রিফ বিজয় সাধন করল। মধ্যাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যা হয় ১২০ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৭ রান। দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে

৩১০ রান। দক্ষিণাঞ্চলের বি কে কৃষ্ণেন সেঞ্চুরী করেন, তাঁর ব্যক্তিগত রানসংখ্যা ছিল ১০০ রান।

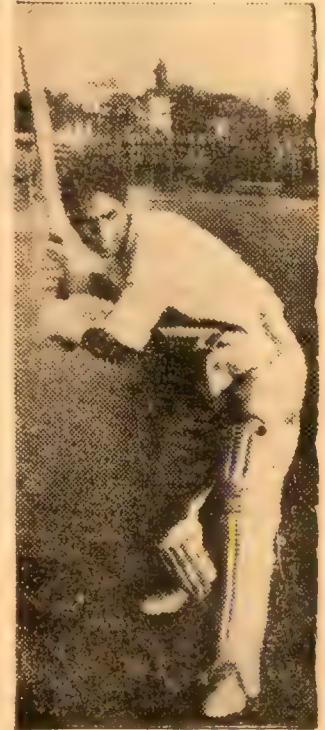
* * *
ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ভারত চেক চতুর্থ টেনিস টেস্টে ভারত ৫-০ খেলার পরাজিত হয়। মাত্র ৭১ মিনিটে খেলার তাদের বিপক্ষে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে সম্পূর্ণরূপে। ইডেনের বিজয়ের ফলে তারা ৪-০ টেস্টে অগ্রগামী থাকল।

* * *
আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতার আসর এবার বসবে কলকাতায়। প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ১৭ই জানুয়ারী দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে।



জয়দীপ মুখার্জী

এবং প্রেমজিৎ দুজনেই নিজেদের মধ্যে বোকা-পড়া করে খেলার চেষ্টা না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ফলে তাঁদের ছয়ছাড়া খেলার সুযোগে ধাওয়ান-মিনোত্রা খেলা নিজেদের অনুকূলে আনেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে জয়ী হয়ে যান।



শ্যামসুন্দর মিত্র

কাইন্যাল খেলার জন্য নির্ধারিত তারিখ হচ্ছে ২৯শে জানুয়ারী। ভারতীয় রেলওয়ে স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষে এই আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ইস্টার্ন রেলওয়ে এ্যাথলেটিকস এ্যাসোসিয়েশন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসকুমার গহেমজীদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুচীপত্র

বিষয়	লেখক	মূল্য
সংবাদকার	...	১৯৮৭
আজকের মানুষ	...	১৯৮৮
ভারতদর্শন	...	১৯৮৯
আন্তর্জাতিক	...	১৯৯২
একটি ঐতিহাসিক বিদায়	...	১৯৯৬
উপছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৯৬
গাছটা (গল্প)	—মিতা সেন	১৯৯৮
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)	—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়	২০০৪
গ্রীস ও রোমের কথা ও কাহিনী	— নরেন ভট্টাচার্য	২০০৭
একটি প্রতিজ্ঞা জরনে (কবিতা)	— অপরাধিতা গোস্বামী	২০১২
বঙ্গদর্শন	—	২০১০

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত মূল্যবান বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী। ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।

আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃষ্ণবাসী রায়গুণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সভা—বঙ্গোপকূল—মন্ডলের কার্য

বাক্যমঞ্জুর গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, মৃগলাপ্তরীর, মৃগালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দর্পেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারানী, সীতারাম। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুন্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—২, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মৃচিরাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—২, টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সামা, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—২, টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০১৭
দৃশ্যান্তর (ছোট-গল্প)	— কল্যাণ সেন	২০২৫
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২০৩০
অপূর্ণ নৈহারল, ওকলাহোমা ও টেক্সাস	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	২০৩৩
রঙ্গরঙ্গ	— ...	২০৩৬
রঙ্গরঙ্গ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পিল	২০৪২
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২০৪৫

সর্বপূরণ, সর্বভন্দা, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সংকলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে অক্ষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পূরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মণ্ডিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সংকলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সম্মিলিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? —তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্টা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রজনালসনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মন্মথ কলন, হেক্টর বধ। —দুই টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসবিহার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের শ্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জমাই ব্যরিক, বিয়ে পাগলা বড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগ—সখবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানব, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ি গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, প্লামশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর্গ মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুদের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাংলালার নব গীতিকবিভার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু, কবি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবহন গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা



৭০ বর্ষ : ৩২শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 13th Jan., 1966

শোকাঙ্কলি

প্রভাতী সংবাদপত্রে আকুলজনতা তাস-
খন্দের ঘোষণাপত্র পাঠের জন্যই প্রস্তুত ছিল।
তাসখন্দের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে
এমন মর্মবিদারী সংবাদ হাজির হবে, এ ছিল
কল্পনাতীত; পঁচাত্তি বৎসর বয়স্কা লালবাহা-

দুর জননী যেমন মহামান
অবস্থায় পত্রের মৃত্যুসংবাদ
বিশ্বাস করতে পারেন নি,
ভারতের কোটি কোটি
বিস্ময়াকুল মানুষ বিশ্বাস
করতে পারে নি যে, তাদের
আপনজন লালবাহাদুর আর
নেই! সেই অতি সাধারণ
বেশে যিনি হাসিমুখে জন-
তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে-
ছেন, জীবনের শেষ
মহুতটি পৰ্যন্ত যিনি
শান্তির জন্য সর্বশক্তি
নিয়োগ করেছেন তাঁর মৃত্যু
আত্মোৎসর্গেরই নামান্তর।

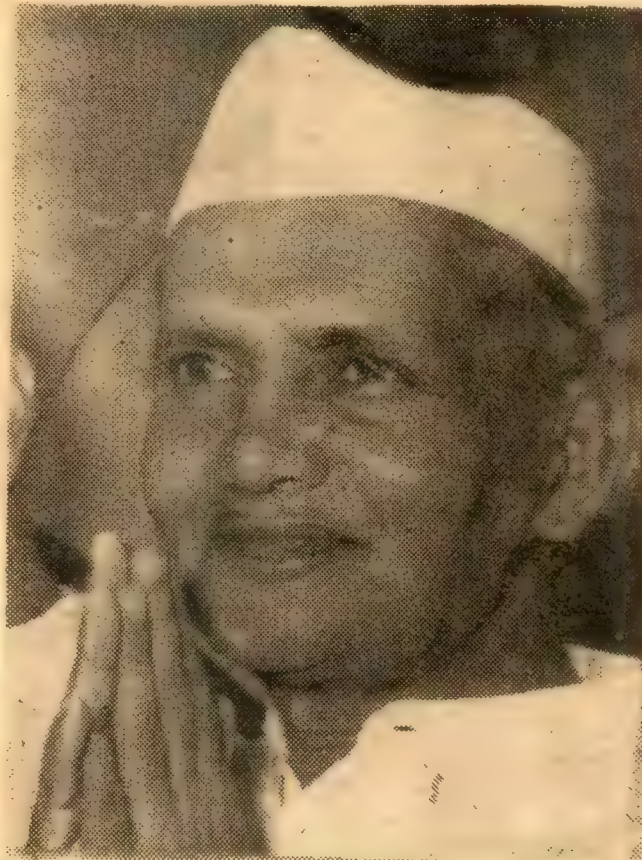
বিগত আঠারো মাসে
প্রধানমন্ত্রীরূপে ভারতের
বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও
জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান
সম্পর্কে লালবাহাদুরের যে
প্রচেষ্টা ও কৃতিত্ব আমরা
দেখিছিলাম, তাতে আমাদের
এই বিশ্বাস হয়েছিল যে,
তাঁর নেতৃত্বে আমরা অভয়
এবং ভারতের জন্য যে
গরিমামণ্ডিত পথ তিনি
রচনা করছেন তদ্বারা আমরা
তাঁর ভাগবাসার বন্ধনে যে-

অব দি কমনার' বলে অভ্যর্থনা জানানো হয়ে-
ছিল। আবার ভারত যখন আক্রান্ত হয় তাঁর
মধ্যে আমরা যে দূততার পরিচয় পেয়েছিলাম,
তা যদু যদু ধরে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে
আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লাল-

আকস্মিক মৃত্যুর কিছু পূর্বে শান্তির
বাণীতে তিনি আমাদের বলে গেছেন, "আমরা
এই যুদ্ধে (ভারত-পাকিস্তান) সর্বশক্তি নিয়োগ
করেছিলাম। এখন, সর্বশক্তি দিয়ে শান্তির
জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে।" তাঁর এই

বাণীর মৰ্যাদা আজ
আমাদের রক্ষা করতে
হবে। আমরা এই মহত্বের
প্রতিদ্রুতি গ্রহণ করবো,
যে নব প্রেরণার ভারতকে
তিনি উদ্ভূত করেছেন,
বিশ্বশান্তিকে গতিসম্পন্ন
করেছেন, তা আমাদের
অক্ষর কবচরূপে বিরাজ
করুক।

তবু মৃত্যুর গভীর
শোক থেকে আমাদের
মুক্তি নেই। তাঁর মৃত্যুতে
শুধু তাঁর পরিবার
বগাই বিষাদগ্রস্ত নয়,
আজ সারা দেশ বিষাদাচ্ছন্ন,
কিছু আজ ব্যাকুল। হয়তো
শোক ও বিষাদেও একদিন
সামান্য আমরা লাভ করবো;
কিন্তু যে ভারত-নারকে
দর্শন করে আমরা নিজেদের
আত্মীয়, বন্ধু ও পথ-
প্রদর্শককে দেখে শুধু
ও শান্তি অনুভব
করতাম তাঁর পরিসমাপ্ত
বেন না হয়। সাত-
চল্লিশ কোটি জনতার
অন্তরে আজ গভীর



কোনো দুর্বোধ্য সহজেই অতিক্রম করতে সমর্থ
হবো। লালবাহাদুর ছিলেন সাধারণ মানুষেরই
একজন আবার বজ্রাদর্শি কঠোরানি, মর্দুনি
কুসুমাঙ্গি। কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন
বর্মায় গিয়েছিলেন তখন তাঁকে 'গ্রেট লীডার

বাহাদুরই শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য যে নতুন
পথ তাসখন্দে থেকে তৈরি করে গেলেন,
ইতিহাসের পাতায় তা হয়ে থাকবে অবি-
স্মরণীয়। তাই সাধারণ মানুষের একজন হয়েও
লালবাহাদুর ইতিহাস-পুস্তক।

কামা গুদরে গুদরে উঠুক। যিনি আমাদেরই
লোক, প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে আসীন থেকেও
সেই পরিচয়েরই বীর শেষ পরিচয় তাঁকে দেবার
জন্য আর যদি কিছু নাই থাকে, নাই থাকে,
থাক এই অপার ভাগবাসার বিমণ্ডিত শোকাঙ্ক।

অন্ধ কের মাঝে

‘হে নতুন এসো তুমি.....’ বলে ইংরেজী ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ তুলতেই, কোথায় কি ফেলে এসেছি মনে করার চেয়েও নতুন বছরের শপথ নেওয়ার জন্য আমরা ব্যস্ত। চোখে-মুখেও সেই নতুনের স্বপ্ন। আর এই সাথে বছরের সূচনার এগিয়ে এলেনও একটি নতুন মানুষ—হাসি-খুশি প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ এক উজ্জ্বল নিরহংকারী ব্যক্তি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যিনিই হলেন এই প্রথম কেন্দ্রীয় বাঙালী অর্থমন্ত্রী—নাম তাঁর শ্রীশচীন চৌধুরী। দেশের ও মানুষের শংকল ও উন্নতিই যার কামনা। যার দৃঢ়কণ্ঠে স্থান পেয়েছে “সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই”—জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনই সরকারকে শক্তিশালী করতে পারে। তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনতার সহযোগিতা। তবেই বহুবিধ সমস্যা-জর্জরিত এই বিশাল দেশের উন্নতি করা সম্ভব। নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দেশ ও তাঁর উন্নতির এই চিন্তা ও তাঁর দীপ্ত বোধনা আমাদের আশ্বস্ত করেছে। বহুবিধ সমস্যা-জর্জরিত জীবনে ও চলার পথে আলোর রশ্মিনাই জ্বলে উঠেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের বয়স আঠারো। চোখে-মুখে তার সোনালী স্বপ্ন। সোনালী আশমানের বৃক সে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে রক্ত ও রেশমের মাধ্যমে। প্রাক-বৌদ্ধ মন্দিরের ধর্ম তাই। ভাঙাঘড়ির হাট বসেছেও তাই স্বাভাবিক কারণেই; কিন্তু তবু কোথাও যেন কোনো চাপা বেদনার আতর্নাদ নেই; আর স্বাক্ষরেও তা নিয়ে হা-হুতাশ-অনুশোচনা-রাগ-অনুরাগ-মান-অভিমানের দর কষাকষি নেই।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই আসনটি বড়ো আশ্চর্য ও রোমাণ্টিক। গোটা আসনটাই যেন একটি নিটোল ইমেজ। তাই অর্থমন্ত্রীর এই আসনে শ্রীশচীন চৌধুরী হলেন ছাত্রজীবনের পর এই সপ্তম। তাঁর পূর্বে আরো ছয়জনকে আমরা একই আসনে দেখেছি। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কোনো আসনেই বোধহয় আর এত রকমফের হয় নি। তবে এই সপ্তমবারে অর্থাৎ নতুন বছর ‘৬০তে যা হলো, তা সপ্তমার্চের তো বটেই, বরং আরো কিছু এই অর্থে যে ইনি হলেন আবার বাঙালীও। অর্থাৎ নতুন বছর একেবারে পুরোপুরি অর্থেই নতুন।

হংগলীর বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের ৯ম পুরুষ শ্রীশচীন চৌধুরী। ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে উত্তর কলকাতার বাদুড়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার চৌধুরী পরিবারের শ্রদ্ধাতি বিস্ময়কর। এক-একটি উজ্জ্বল কর্মক্ষেত্রে এ বংশ গৌরবান্বিত। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর গাথা প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কলকাতার অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী ব্যবসায়ী।

জীবনের প্রথম প্রভাতে উত্তর কলকাতার সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন শ্রীযুক্ত চৌধুরী। ১৯১৯-এ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ-তে ভর্তি হন। আই-এ পাশ করার পর তিনি ১৯২৩ সালে কেন্দ্রীয় থেকে স্নাতক হন। তারপর এল-এল-বি ও লিংকনস হন। অতঃপর ১৯২৭ সালে দেশে ফিরে এলেন কেন্দ্রীয় থেকে এম-এ পাশ করে। তাঁর জীবনের পরবর্তী দিনগুলো কেটেছে আইনের জগতের ব্যস্ততার মধ্যে এবং আইনজীবন হিসেবে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর অসাধারণ ব্যক্তিগত সত্যিই বিস্ময়ের। হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, প্রিন্স কাউন্সিল বিশেষ করে কোম্পানী আইনে সর্বত্রই এই

সম্মতিশীল দিয়ে দেশকে উঠতে হবে জনসাধারণ ও সরকারের মিলিত শক্তি দিয়ে। তাঁর এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকেই আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী ভারতীয় আইন কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য, দুবার রাষ্ট্রপুঞ্জ ও অন্য ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আইন ও বাণিজ্য-জগতের তুলনায় কৃতী অর্থাৎ রাজনীতির জগতে শ্রীযুক্ত চৌধুরী অপেক্ষাকৃত নতুন। ইনি ১৯৬২ সালে মেদিনীপুরের ঘাটাল কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচিত হন। এর পূর্বে অর্থাৎ ‘৫২ ও ‘৫৭ সালে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মধ্যে কোনোদিনই কোনো প্রকারের রাজনৈতিক এক-গুরুত্ব নেই। তাঁর সাথে বন্ধুত্বের মেল-বন্ধন ও প্রসন্ন হাসির বিনিময় সকলের সাথেই সমান। শ্রীযুক্ত চৌধুরীই মুন্সী মামলার বিদায়ী অর্থমন্ত্রী কুমারচাঁদীর পক্ষে সওয়াল করেন।



শ্রীশচীন চৌধুরী

একটি নাম সুদীর্ঘ সময়ের বৃক স্বাধীন-সুনায়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আইনের জগৎ ছাড়াও তিনি বাণিজ্য-জগৎ সম্পর্কেও সমৃদ্ধ ধারণার অধিকারী বলেই তিনি কলতে পেরেছেন “এ কাজের দায়িত্ব অনেক। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও খাদ্য-শস্য দেশের সামনে আজ বড়ো হস্তে দেখা দিয়েছে। তাই “জরও দাও” “জরও চাই” এটা চলবে না।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর দুই মেয়ে, দুই ছেলে এবং ছটি নাতি-নাতনী বর্তমান।

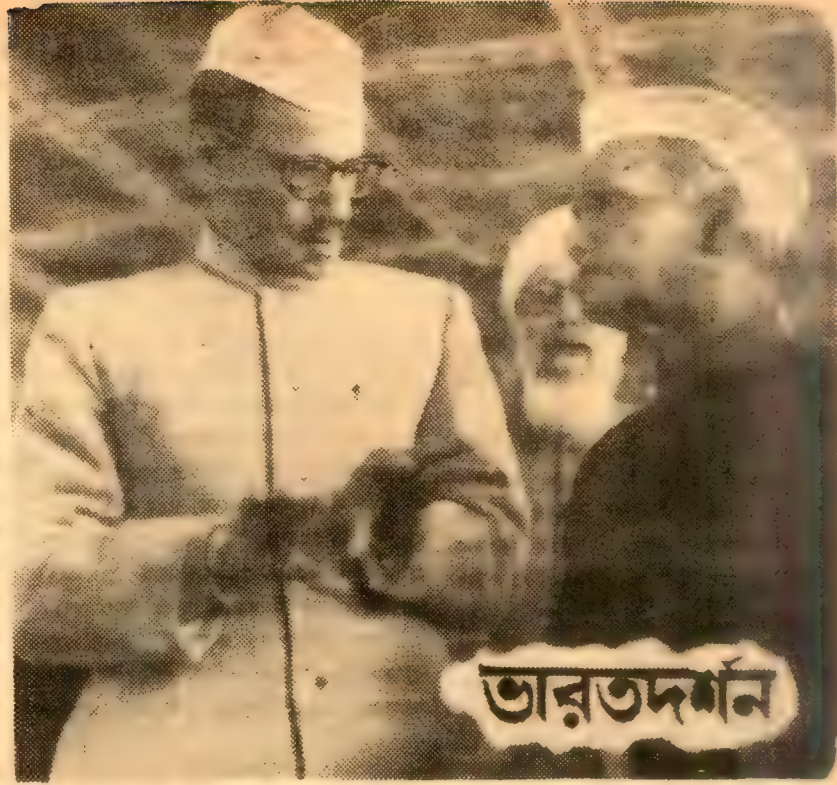
প্রসন্ন হাসির মধু ছেঁটানো, সহিষ্ণু মনে মানুষ শ্রীযুক্ত চৌধুরীর রাজনীতির জগতে এই গুরুত্বপূর্ণ নতুন পদক্ষেপ আজ আমাদের কাছে গর্ব ও গৌরবের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আসনে তিনি সফল হোক এই কামনা করি।

ভাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তান প্রশংসনীয় আতিথেয়তার উত্তরে প্রশান্তভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করছেন বেশ কয়েক বসেই। আজ (১-১-৬৬) প্রভাতী সংবাদের ওপর সাগ্রহে চোখ বুন্নিরেও নতুন কিছুই পাওয়া গেল না। বুঝা গেল বিগত সংখ্যা 'ভারত দর্শনে' (১-১-৬৬-তে লিখিত) পাক-ভারত "ভাসখন্দে" সম্পর্কে যে ফলাফলের আশা করা হয়েছিল তার কার্যত তাই-ই ঘটতে চলেছে ঐতিহাসিক ভাসখন্দের বৈঠকে।

পাকিস্তান পাক পক্ষের সেই অপরিহার্য প্রণুটিকেই টেনে এনেছেন। কাশ্মীর প্রশ্ন। যার সমাধানক সমাধান না হলে 'অনাক্রমণ' 'মুহূর্ত্তন' প্রভৃতি চুক্তি অর্থহীন একথা পাকিস্তান স্বাধীনভাবেই ঘোষণা করেছে। ওদিকে ভাসখন্দে যাওয়ার প্রাক্কালেও ভারত কাশ্মীর বিষয়ে কোন আলোচনায় নামতে রাজী নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিল। আশা করা যায়, ভারতের এই বক্তব্য সম্পর্কে পাকিস্তান অনবহিত ছিল না। তবুও তারাও ভাসখন্দে নিমন্ত্রণ রক্ষার এসেছিলেন একটা যুগ্মই অবস্থার সম্মুখীন করণ করেই। সে অবস্থাটা যে কি প্রধান সূর্যের রঙ দেখেই তার আঁচ পাওয়া গেছিল। বৈঠকের গোড়ার দিকে প্রশানমন্ত্রী শ্রীকোমিগিন ভারতকে কাশ্মীর-এর ওপর আলোচনা চালাতে অনুরোধ জানানেন। তবে তিনি অতিথির পূর্ণ বর্ণনা রক্ষা করার জন্যই এই অনুরোধ ওভেচ্ছাসম্পন্ন প্রতিবেশীর নভই উপস্থাপিত করেছিলেন। বাস্তবিক তিন রাষ্ট্রের এই মিলন অর্পুই সোভিয়েট আতিথেয়তার একটি অসাধারণ নজির হয়ে রইল। ফলাফল বাই হোক না কেন।

ফলাফল যে সহজে ইতিহাস ওলট-পালট করে দেবে না সে সম্পর্কে নিশ্চয় কারও মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পাকিস্তান এখন ত্রিশজির (মাকিন সোভিয়েট চীন) টাগ অব ওয়ারকে যতক্ষণ কাছে লাগান যায় লাগাবে বৈকি। ইতিমধ্যেই সে হারানো ঝাঁট ফেরৎ পাওয়ার বায়নাও ধরেছে। অর্থাৎ ঝুঁটি খেলিয়ে সে এখন ভাসখন্দের জুলাই নির্ধারিত আব-হাওয়ার বাস্তবতার চাল চালতে বেশ প্রসার পাচ্ছে। ভারতীয় ব্যাপ্তকে এইভাবে কার্যদা করে মিরতে পারলে যে বিরাট জয় পাক সরকারের কুক্ষিগত হবে, সে জয় গণতান্ত্রিক মুক্ত দুনিয়াকে পরাজিত করার পর্বে আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় পাক সরকারের সেমত জয় যেন অনেকেরই আকাঙ্ক্ষিত। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ও কল্যাণবাদী দুনিয়াকে পাক সাক্ষ্যের মাধ্যমে আর একবার প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার বিরাট ভুল হয়ত বা ভাসখন্দের মাটিতেও ঘটে যেতে পারে। সেই আশঙ্কায় গণতান্ত্রিক দুনিয়া আজ শক্তিতেই প্রতি মুহূর্ত্তের সংবাদের অপেক্ষা করছে।

পাক-ভারত প্রশ্নটি আজ একটি উপ মহা-



ভারতদর্শন

ভাসখন্দে যাত্রার প্রাক্কালে একটু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্ত

দেশের সমস্যা মাত্র নয়। এই সমস্যাকে ঘিরে বৃহৎ শক্তিবর্গের আপন আপন স্বার্থেও গিঁট পড়েছে। স্মরণ্য ভাসখন্দের মীমাংসার ওপর আন্তর্জাতিক হাওয়ার গতি-প্রকৃতিও বেশ ভাল ভাবেই টের পাওয়া যাবে। দুনিয়ার মানুষ তাই আজ ভাসখন্দে চোখ রেখেছে।

এ পর্যন্ত ভাসখন্দের (১-১-৬৬) বৈঠক—সাক্ষ্য সম্পর্কে এক কথায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার হরশ সিং যা বলেছেন তাই, সেই চুকুই লাভ। তিনি সাংবাদিকগণের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ভাসখন্দ সম্মেলন সম্পর্কে ভারত আশান্বিত। আর ভাসখন্দের এ পর্যন্ত সাক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি: শত্রু সতর্কতার পর এই বৈঠক বসেছে। **এটাই লাভ; এটাই অগ্রগতির নিদর্শন**

চীনের উৎসাহ

ইরাকান্ডর চীন তার আপন কাজ টিকই চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানকে বদত দেওয়ার জন্য একবার তারা একটি নিফল আলটিমেটাম দিয়েছিল। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, আবারও ভাসখন্দের শান্তি আলোচনাকে বিধিত করার জন্য একটি চৈনিক চিঠি ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত হয়েছে, যার ভাষা তাঁর আক্ষানক-কঠোর।

হায় চীন, পাকিস্তানকে তারা এখনও চিনতে পারে নি। ভারতকে জব্দ করার জন্য

এবং পাক মনে শান্তির সন্নিহার ফটল সৃষ্টিব জন্য তার এই নয়া অভিযোগপূর্ণ চিঠিটি বক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ার আবার শান্তিকে বিধিত করতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু পাকিস্তানকে বদত দিয়ে চীন কী লাভ করবে?

কিন্তু না হোক নিজের নাক কেটেও যদি পরের খাতা ভজ হয় তবে সেটাই কি কম লাভ।

এই কম লাভের পেছনেই আপাতত দুনিয়াটা ভুটেছে, যদি পশ্চিমঘো ততো-ধিক কিছু জুটে যায়, তবে সেটাই বা কি কম লাভ।

ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য

ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি হল সাম্প্রতিক ভারত-সোভিয়েট-এর মধ্যে একটি নতুন পাঁচাল্লো চুক্তি সম্পাদনার মাধ্যমে। নয়া দিল্লীতে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন ভারতের পক্ষে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ। তিনি এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক চুক্তি' বলে বর্ণনা করেন। আর সোভিয়েটের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এন এস পাভোলি চুক্তিতে তাঁর স্বাক্ষর রেখে বলেন, চুক্তিটি উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির হয়ে ওঠারই নিদর্শন। শ্রীমশোক মেহতার সোভিয়েট দুনিয়া পরি-দর্শনের সময়ট এ জাতীয় একটি চুক্তির সম্ভাবনা অঙ্কিত হয়।

সাহিত্যিক এ চুক্তি যেন কিছুটা অস্বাভাবিক। সোভিয়েটের ন্যায় অন্য কোনো দেশের সঙ্গে এমন কতহারে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নি। যেখানে ১৯৬৪ সালের চুক্তিতে বেনগলেনের সম্পর্ক উভয় পক্ষে পঁচাত্তর কোটি টাকা, বর্তমান চুক্তি অনুসারে ১৯৭০ সাল নাগাদ উভয় দেশের বেনগলেনের সম্পর্ক দাঁড়াবে বিংশ পরিমাণে, অর্থাৎ বাৎসরিক দেড় শত কোটি টাকায়।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের আর্থনো-রপ্তানি হবে মোট তেরশত কোটি টাকার অধিক।

সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট যৈত্রী অব্যাহতভাবে উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে। সোভিয়েট দুনিয়ার ক্ষমতার বদলন হয়েছে, ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছু ভিন্নতার উদ্ভব-বিশ হই নি। সোভিয়েট দুনিয়া পাক-ভারত সত্ত্বকালে একান্ত নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে ও ভাগবংশ পাক-ভারত শীর্ষমিলনের ব্যবস্থা করে এই উপমহাদেশের শান্তির আবহাওয়া গড়ে তুলতে চায়। সোভিয়েট জনগণের সেই ক্ষেত্রেরই বাস্তবরূপ এই বাণিজ্যচুক্তি।

বঙ্গের আজি দুনিয়ারছে ঘায়

বঙ্গের কমিগণের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে কর্তৃ-পক্ষকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিনের বঙ্গের কর্তৃপক্ষ বণিক-সভাগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

কি রাজ্য কি বা কেন্দ্র, সরকারী ও আধা-সরকারী চাকরিতে আদীন কর্মচারিবন্দের কেউ কেউ সাধারণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন বলে বহুবার বহু বোম্বা, আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে গেছে। অকস্মাৎ বঙ্গের কর্তৃপক্ষগুলিই কেন এমনত বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন-এমন প্রশ্নের উত্থাপন না করে বলতে হচ্ছে, বণিক-সভাগুলির ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন। তাঁদের জন্য বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের সু-বিভূত বঙ্গপটে উদার আহ্বানের তরঙ্গভক্ত শুরু হয়েছে। সুবের কথা। তবে এবত উদার বর্ধন দেখা দিয়েইছে তখন বণিকসভা ছাড়াও দেশের বাদবাকি জনসাধারণ এবার হয়ত আশা করতে পারবেন যে, সরকারী দপ্তর-গুলিতেও মোটা মোটা খাতা চালু হবে। প্রয়োজনের কালে পিওন বেয়ারা বাবুটির পিছু পিছু তাঁদের আর 'স্যার' স্যার' করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। প্রয়োজন সাধনের ব্যবস্থা ত্রুণ কর-চারিবৃন্দ এগিয়ে এসেই করবেন।

শুধু বঙ্গের নয়, সরকারি অফিসগুলির 'উন্মুক্ত বন্ধ' প্রকৃষ্টির সকল ঘরই এইভাবে উদারপূর্ণ স্বাগতম জানালে সাধারণেরও মা-
১৩০

প্রকাশ, বঙ্গের কর্তৃপক্ষ-বঙ্গ আরও কিছু বঙ্গ-দুটির স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন।
যেমন:

প্রহারার ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রত্যেক বঙ্গের ডি এস পি বর্ধনাসম্পন্ন একজন করে সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ করা। প্রবীণ অফিসারদের নিয়ে টেওয়ারচক স্থাপন করা। স্টক ও টেটার পরীক্ষার কামোবস্ত।

বলা বাহুল্য এ সবই সুবিশেষত্ব নলেহ বেই। অবশ্য সব কিছুই 'ফলেন' পরীক্ষিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কথার ববে, 'মান প্রপোজেন্স, গড ডিসপোজেন্স।' অভিজ্ঞত অনেক ক্ষেত্রে বলছে, সরকার সুব্যবস্থা করেন না এমন কথা বলা যায় না, তবে ব্যবস্থা করা ও ব্যবস্থা কার্যকরী করার মধ্যে তফাৎ আসমান-জমিন। সিকিউরিটি অফিসার রাখা এক কথা, আর অবশ্যকে 'সিকিউরিটি' রাখা অন্য কথা।

বঙ্গের কর্তৃপক্ষকে বনাবাদ। এবন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দায়িত্বশীল অফিসারদের। সাকল্য অসাকল্য সবই তাঁদের হাতে।

ঐতিহ্যচেতনতা

কেন্দ্রীয় শিক্ষাবন্ত্রী এী এম সি চাপরা পুণা ঠেকান কলেজে পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা। পর্যটনের একবিংশতম অবিকেশনে জনসাধারণকে দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবার আহ্বান জানান ও সেই উদ্দেশ্যে বাসমাণ বাদুকের ও প্রদর্শনী সংগঠনের প্রস্তাব করেন।

শিক্ষাবন্ত্রীর নিকট থেকে এমন একটি আহ্বান টিক এই সুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও আমরা অতীত গৌরব ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বতদূর সচেতন ছিলাম, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে, আশঙ্কা হয়, সে সচেতনতায় অনেক শৈথিল্য এসেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, এমন কি ভাবে চরিত্র ও শিল্প দর্শনেও বহু থেকে কলকাতা, পশ্চিম থেকে পূর্ব পাড়া সাহেব বনতে (শুধু যা ভাষাগত দোড়ে ছাড়া) বাকি রেখেছি। কতি ছিল না যদি পাশ্চাত্য উন্নতিকে পাকড়াবার জন্যই আমরা এমন করে উন্মুগ্ন হয়ে উঠতাম। যদি জাপানের মত পাশ্চাত্যের সেরাক ভাঙার ধনুর্ভাঙা পণ করেই আমরা পশ্চিমী কেতাকে হজম করে নিয়ে আপন দেশকে গঠন করে তুলবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতাম। দুর্ভাগ্যত, ওপথে পা বাড়ানোর যে পরিশ্রম তা করবার মত বৈধ ও শক্তি নিমুক্ত করতে রাজী নই কেউ। (যাক করবেন, বীরা এবত গোষ্ঠীর বাইরে, তাঁদের প্রতি সন্নিহন নিবেদন, এ বক্তব্য তাঁদের জন্য নয়)।

আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছি, যারা নিজেরদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যানুসরণকে

উন্নতিকর্তার সঙ্গে পাইহারেই সমাধক রাখত। আসলে ভারতীয় ঐতিহ্যের সত্যক চর্চার অভাবও এর অন্যতম কারণ। সময় বিপণে একথাও শুনতে হয় যে, 'বাপ-ঠাকুরদার আমলে' কী ছিল সেটাই ঘুরে বাবে নাকি হে।' অবশ্যই নয়। ইতিহাস আঁকড়ে ধরে কেউ বসে থাকে না। ইতিহাসপুঙ্খ অবাধ পদাতিক। তাঁর চলার বিয়ার নেই। তাঁকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা অসম্ভব। চলটাই নিয়ম। চলতে হবেই।

কিন্তু পথ হাঁটিতে হলে পাথের চাই। একটি জাতির পথ পরিক্রমার সেই পাথের হল তার গৌরবময় ইতিহাস; সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে কাব্যে লোকাচারে চিন্তার এবং কর্মের গারার সে ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। সেই ইতিহাসের সঙ্গে সত্যক পরিচয় দরকার। জাতির রাজ্য ভাঙাপড়ার ইতিহাস নয়, জাতির প্রাণপশনের ইতিহাস, বয়োবুদ্ধির ইতিহাস। সেটাই পাথের। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তবেই অগ্রগমন সম্ভব। দুর্ভাগ্যত ঐতিহ্যচেতনতা থেকে ক্রমশ আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ছি।

শিক্ষাবন্ত্রী ভারতের সেই অতীত গৌরবের প্রতি সচেতন করতে চেয়েছেন সাধারণ ঐতিহ্য-বিমুগ্ন মনকে।

তিনি ঐতিহাসিক স্মারক সৌধগুলির সংরক্ষণ ও ঐতিহাসিক চিহ্নগুলির অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রসহলকে একান্ত আগ্রহী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

কেবলমাত্র শিক্কা ধনন ও ঐতিহাসিক কীর্তি উদ্ধারই নয়, আমাদের প্রয়োজন, শিক্ষা-ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা যদ্বারা তরুণ ছাত্র-সমাজ উত্তরোত্তর ঐতিহ্যচেতনতায় প্রাক্ত হতে ওঠেন। বাপ-পতামহের উত্তরাধিকারের গর্ব যেমন আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, জাতীয় ঐতিহ্যের গর্বও তেমনি জাতির বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়। আমাদের সেই মূল-ধনের স্তম্ভ সম্পর্কে তরুণ ভারতকে সচেতন রাখার গুরু দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত শিক্ষাবন্ত্রীর দৃষ্টিতে আজ এই বক্তব্য রাখার সুযোগ গ্রহণ করলাম। আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আপন দপ্তরের যতটুকু করণীয় সে কাজ অবিলম্বেই গ্রহণ করবেন।

পাঞ্জাব:

আবার সূচ্য

পাক-ভারত সত্ত্ববৎসর সময় পাঞ্জাবী সূচ্য আন্দোলনের নেতা গুস্ত ফতে সিং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তাঁর আদরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা তক্ষ করে যখন পাঞ্জাববাসীকে জাতীয় প্রতি-রক্ষায় যোগদান করতে আহ্বান জানান, তখন সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হলে পাঞ্জাবী সূচ্যের প্রশ্ন বিবেচিত হবে বলে সরকারী আশ্বাস দেওয়া

হয়েছিল। তৎপক্ষে পাঞ্জাবী স্রাব প্রণীত বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেট পর্যায়ে একটি এবং সংসদ পর্যায়ে আরও একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কমিটিগুলি তাঁদের মতামত প্রকাশের পূর্বেই পাঞ্জাবের স্বাধীনতা আন্দোলন-কিষণ কয়েকটি বিবর্তিত স্রাব বিবেচনা করার আবহাওয়া আবার গরম হয়ে উঠেছে।

ওদিকে পার্লামেন্টারী সাব-কমিটিতে চেয়ারম্যান পদে লোকসভার স্পীকার শ্রীতম সিং (মিনি শিখ) মনোনীত হওয়ার স্রাব-বিরোধীরা আরও চটেছেন। পাঞ্জাবী স্রাব দাবি বিবেচিত হলে পাঞ্জাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে বলেও স্রাব-বিরোধীরা ভয় পান। স্বয়ং রাজ্য স্বাধীনতা, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীভগবৎ বরদা ও শ্রীমতীরা সিং স্রাবের ঘোরতর বিরোধিতার এমন উত্তর দিয়ে আছেন।

কিন্তু পার্লামেন্টারী সাব-কমিটি একটি স্রাব বিপুল মতাবিরোধে পাঞ্জাবী স্রাব দাবি সমর্থন করেছেন। তা ছাড়া হিন্দুপ্রধান হরিজানার লোকেরাও নরম মনোভাব গোষণ করছেন। সন্তজীর সঙ্গে হরিজানা প্রান্ত আন্দোলনের নেতা শ্রীমলচাঁদ জৈনের একটি সমঝোতা গড়ে উঠছে। সন্তজী হরিজানা প্রান্তের দাবিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, যেমন হরিজানা প্রান্ত আন্দোলনের নেতারা স্রাব দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছেন বলে স্থির করেছেন।

এনত অবস্থাকে স্রাব আন্দোলনের পক্ষে জয়ের সূচনা বলেই ধরে নিতে হয় এবং 'স্রাব' আন্দোলনে যে বিরাট রক্তের কোনো রক্ত স্রাবের সম্ভাবনা আপাতত নেই, তাও মনে করা অনায়াস নয়।

কিন্তু পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী কংগ্রেসগণ স্রাবের কঠোর বিরোধী। তাঁদের মতামতকে পাশে দিচ্ছে রাধাও সন্ত নয়।

ওদিকে গুরুমুখীভাষী জনগণের ভাষা-ভিত্তিক প্রবেশের দাবিকেও এক কথার উড়িয়ে দেওয়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারতের অন্যত্র ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবি স্বীকৃত হয়েছে। এখন পাঞ্জাবী ভাষার দাবিকে চট করে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি করে। রাজ্য কংগ্রেসের ও হিন্দীভাষী জনগণের বিরোধিতার স্রাব দাবিকে উপেক্ষা করা হলে জাতীয়তাবাদী শিখ জনগণ হতভম্ব হয়ে অন্যত্র পলা প্রবেশের দিকেও ঝুঁকতে পারেন। জাতীয়তাবিরোধী শিখগণের প্রবক্তা তারা সিং জো ওং পেতেই আছেন। কিন্তু তাঁর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপকে শিখ জনগণ সমর্থন জানান নি। তাঁরা সন্তজীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই নিজেদের ভাষাভিত্তিক প্রবেশ আদায় করতে চাইছেন।

এ বিষয়ে সুভাষা, গভীর চিন্তার পর কোন প্রণীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ধীর। অন্যথা

পাঞ্জাবের মতো নীচের রাজ্যে অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কলে যদি কোনো বিপর্যয় দেখা যায় তবে তার দায়িত্ব ভরন বর্তমান কনজাঙ্গীন রাজ্য সরকার ও রাজ্য কংগ্রেসের ওপর অনেক বেশি বর্তাবে। কিন্তু যে রাজ্যের সমাজ সেওয়ার কনজা তাঁদের কতকটা গুটাই বীর চিন্তার বিষয়।

উত্তরপ্রবেশ:

টিনেজ ক্রাফ

রাধা উৎপাদনের মর্যাদা নীচের পৌরসভার উদ্দেশ্যে গঠিত 'টিনেজ ক্রাফের' (উত্তর প্রবেশ) উদ্যোগ প্রসঙ্গে আরোজিত সন্তেনে কেবল কৃষি ও স্বাধীনতা শ্রী সিং স্রাববিরোধ একটি স্রাবের পরিবেশন করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত পশ্চিম স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। ভারতে গবেষণারত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীই তাঁর এই উত্তির ভিত্তি।

মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার উন্নতিসাধনও তাঁকে অনুরূপ আশার আশ্বাসিত করেছে। তিনি মনে করেন চাষের জমি বাড়িয়ে রাধা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য চাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রকৃতির প্রবর্তন।

কৃষিকর্মীর উপরোক্ত উক্তিতে অশ্রু নতুন কিছুই নেই। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে সকলেই জানেন যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির স্রাব প্রবেশ করাটাই সহজতর পথ। আমরা যে সে সত্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করছি এটা আশ্চর্যের কথা। তবে সেই সঙ্গে অর্থনীতি শাস্ত্রের একটি পাঠও মনে পড়ছে। 'ল' অব ডিমিনিশিং রিটার্নের প্রণী। উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোনো বিশেষ উপাদানের অধিকতর নিম্নিত্র জন্মেই আনুপাতিক হারে উৎপাদন হ্রাসের কারণ হয়। ভারতের ক্ষেত্রে অশ্রু যে কথা এখনই প্রযোজ্য নয়। বৈজ্ঞানিক মূলধন প্রবেশের সবে শুরু। সুভাষা এই পদ্ধতি এখন নির্ভাবনার মর্যাদা কনজা পর্যন্ত প্রযুক্ত হতে পারে। তারপর উৎপাদনের আনুপাতিক হ্রাসের চিন্তা।

ভারতের কৃষিজ্ঞানের যে আশাবাদ চিত্র কৃষিকর্মী ভুলে যাবে না সকল ভারতবাসীরই গর্বের বিষয়। গুরুগণগণের, সুভাষা প্রারম্ভেই অভিনন্দন জানাতে হয় এবং তাঁদের কাছে এই আশা রাধা যায় যে, অনভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁরা কৃষিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন করে কৃষিকর্মীর আশাকে সক্ষম করে তুলবেন।

কেরালা:

প্রকৃত কৃষিকর্মীর

কে বলে ভারত আজ ভূমির প্রভাবহীন গণপালিত দেশ। ভূমির ইচ্ছা কি অত সহজে বুঝে কেরালা বস।

কেরালার কুন্তনাদ জমিদার ভূমিদার (ল্যান্ডলর্ডস) কেরালা সরকারকে চোখ বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, চালের দাম পঁচাত্তর টাকা কুইণ্টালে বেঁধে না দিলে তাঁরা এক হাত সরকার বাহাদুরকে দেখে নেবেন। অর্থাৎ কেরালা রাজ্যের চাল বিক্রী করে নিজেদের বাহাদুরীর মরম হাতেনাতে প্রযাপ করে ছাড়বেন। এই চালের রাধা হয়েছে প্রকাশ্য সভায়।

চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, ল্যান্ডলর্ডস মমতির সভাপতি শ্রী পি জে যোশেপ। এখানে উল্লেখ্য এই যে, কুন্তনাদ কেরালা রাজ্যের অন্যতর বৃহত্তম চালের সরকারস্বত্বকারী জমিদার।

শ্রীযোশেপ ব্যঙ্গ করে আরও বলেছেন, রাজ্য দিবস ল্যান্ডলর্ডস কৃষিকর্মীর গণ 'ভেত কল লানিং'। তাঁরা যা কোরেন কৃষির 'ক' অর্থের যা করতে পারেন প্রকৃত কোনো কাজ।

শ্রীযোশেপ সুঃসাহসী সন্তেই নেই। ভূমির উত্তাপে আজও তিনি প্রতাপান্বিত অশ্রু স্বীকার কিছু সেই সঙ্গে একথাও অশ্রু স্বীকার যে, শ্রীযোশেপই প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছেন যা কালোবাজারী মুসলমানের নিঃশব্দেই। অশ্রু লোকের কি কালোবাজারী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় নি সরকারকে। স্বঃ স্বীকার করতে স্রাব প্রকাশ না করে সত্য কথা বলতে হলে বলতে হয়, কালোবাজার সরকারী যদিছাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। তবে তাঁরা নেপথ্যের শয়তান। শ্রীযোশেপ এই পরতানি চক্রান্তের কথা স্রবে ঘোষণা করে স্বঃ সংসাহসেরই পরিচয় রেখেছেন। কি হলে কালোবাজারের যোদ্ধা স্বঃ না, শ্রীযোশেপের বক্তব্যে তাই শব্দেই জানান দেওয়া হয়েছে। সুভাষা আশা করা যায়, কুন্তনাদ মনোমত হলে অশ্রু এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জকারীরা পরিচয় হতে পারেন।

অন্যত্র ভেদন ঘোষণা পোনা যায় সিং। কুলা স্বঃস্বামী। নালেশ স্বঃস্বামী। সুভাষা শ্রীযোশেপের মত একটা ঘোষণাও হরত কেরালা-বাজারী নেতাদের কাছে বাতুলতা বলে মনে হতে পারে। কালোবাজারী মুসলমানের স্রাব নীচা নির্দেশ কেমন কথা। যত পার কুইণ্টা-বাও-ই কালোবাজারী দর্শন।

শ্রীযোশেপ আর যদি করে থাকেন, বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। এমন কথা মনে যায় না।

তিনি একই সঙ্গে সরকার, জনসাধারণ এবং কালোবাজারীদের মিম নজরে পড়বেন। কালোবাজারীরা হরত ডাক দিয়ে বলবে, তোমাকে গর্দার করতে বলল কে। মুসলমান (কালোবাজারে ও মনোপালিতে) আবার স্বঃ-পরিমাপ আছে নাকি। তিনি অশ্রু দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে।

হায়, শ্রীযোশেপ, অতঃপর তিনি স্বঃ বলবেন, নচেৎ সন্ত হরিপদ।



তাসবন্দ বৈঠকে তিন প্রধান

সিংহল সরকার সংখ্যালঘু তামিল ভাষা-ভাষীদের দাবি কিছুটা মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করার দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয়গোষ্ঠী থেকে শব্দ করে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পর্যন্ত সবাই সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ভাষা আইনের প্রশ্ন নিয়ে যে পরি-স্থিতির উদ্ভব হয় তার ফলে সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সিংহলের প্রধান দুটি ভাষা সিংহলী ও তামিল। দ্বীপের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে তামিল-ভাষীদের বাস। এই তামিলভাষীরা ভারতীয় নাগরিক নয়, এরা অন্যান্য সিংহলীদের মতই সিংহলের নাগরিক। কিন্তু তামিলভাষার দাবি অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র সিংহলীকে দেশের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বিগত নির্বাচনের পর ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির নেতা ডাডলি সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু কেবল তার নিজের দলের সমর্থনের ওপর তিনি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি—অন্যান্য দলের সঙ্গে তাকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়েছে। সেনানায়কের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তামিলরাও স্থান পেয়েছেন। প্রধানত এই কারণেই সেনানায়ক তামিল ভাষীদের দাবি অন্তত কিছুটা মানতে স্বীকৃত হন। স্থির হয়, তামিলভাষী অঞ্চলে সরকারী কাজে সিংহলীর পাশাপাশি তামিলভাষার ব্যবহার চলবে। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টের নিন্মকক্ষ ‘প্রতিনিধি সভায়’ ৮ই জানুয়ারী বিল উত্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে প্রতিনিধি-সভার বিরোধী নেত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে প্রায় সব কণ্ঠি বিরোধীদল এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে। তামিলভাষাকে তারা কোন সুবিধাই

দিতে চায় না। বিল উত্থাপনের দিন ৮ই জানুয়ারী সমগ্র দেশে তারা প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল পালনের ডাক দিয়েছে।

বিরোধী দলগুলির উদ্দেশ্য অন্তত স্পষ্ট। এই সুযোগে তারা সরকারকে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তুলতে চায়। দেশের অধিকাংশ লোক সিংহলীভাষী। সুতরাং, ভাষার নামে তাদের উত্তোজিত করে নিজেদের পক্ষে আনাই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তা না হলে শ্রীমতী বন্দরনায়ক কিংবা ডঃ এন. এম. প্যারেরার মত ব্যক্তি তামিলভাষীদের এই সামান্য সুযোগও দিতে চান না, এ কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না। সেনানায়ক সরকারের পতন ঘটিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণের জন্যই তারা ভাষা আইনকে ব্যবহার করছেন। ভাষার প্রশ্ন অতি সহজেই মানুষের মনে আবেগ সৃষ্টি করে। এই আবেগকে উল্কে দিয়ে দেশব্যাপী গোলমাল বাধাতে পারলেই বিরোধীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।



ডাডলি সেনানায়ক

রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতার কারণ না হয় বোকা পেল, কিন্তু বুদ্ধি ভিক্ষুদের বিরোধিতার কারণ কি? ভিক্ষুরা স্বাভাবিক সম্যাসী, মানব সেবাই তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখানে এক প্রশ্নের বুদ্ধি ভিক্ষুই তামিলভাষা বিলের সবচেয়ে বিরোধী। এদের প্রতিষ্ঠান মহাসং পেরুমেনা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বুদ্ধি ভিক্ষুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-শোভাযাত্রা করে বেড়াচ্ছে। ইতি-মধ্যে একজন ভিক্ষু পুদিশের গুলীতে প্রাণ দিয়ে ‘শহীদ’ও হয়েছে। সিংহলের রাজ-নীতিতে এই ভিক্ষুদের ভূমিকা রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিংহলের জন-প্রিয় প্রধানমন্ত্রী সোলোমন বন্দরনায়কের হত্যার পেছনে এই ভিক্ষুদের চক্রান্ত ছিল। সিরিমাভো বন্দরনায়কের মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করার যারা নির্বাচনে এঁদের পরা-জিত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে, এই ভিক্ষু-গোষ্ঠী তাদের পুরোভাগে ছিল। আজ আবার এরাই তামিলভাষীদের বিরুদ্ধে রুদ্ধ দাঁড়িয়েছে। আর উল্লেখযোগ্য, যে ভিক্ষুরা সিরিমাভো বন্দরনায়কের মৃত স্ত্রীকে হারিয়ে দিল, আজ তারাও মৃত স্ত্রীকে সঙ্গে একযোগে তামিল-ভাষা-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছে। বন্দরনায়ক, প্যারেরা, বা সিলভার এতে কোন আপত্তি নেই!

৮ই জানুয়ারী কলম্বো ও দেশের কোন কোন স্থানে বিরোধীদের আহুত হরতাল কিছুটা সফল হয়েছে, তবে যতটা সাফল্য আশা করা গিয়েছিল তা হয় নি। সরকারপক্ষীয় দলগুলির চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক সিংহলী হরতালের বিরোধিতা করেছে এবং তামিল-ভাষা বিলের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। ভাষা-আন্দোলনের ফলে যাতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সরকার সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সেনানায়ক ঘোষণা করেছেন, দরকার হলে হামলাকারীদের গুলী করে মারা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যত বিরোধিতাই আসুক না কেন তারা ভাষা বিল পাশ করবেনই। কোয়ালিশনভুক্ত সকল দলের পার্লামেন্ট সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে বিলকে সমর্থন করেছেন। ৮ই জানুয়ারী তারিখেই সৈন্যদলের কড়া পাহারায় প্রতিনিধি সভায় বিলের ওপর বিতর্ক শব্দ হয়েছে।

তামিলভাষা বিল উত্থাপন করে ডাডলি সেনানায়ক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেনানায়ক নিজে সিংহলীভাষী। এই বিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, এ কথা তিনি জানেন। তবু তিনি তামিলভাষীদের ন্যায্য দাবি সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

নাইজেরিয়া :

দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিষয় আলোচনার জন্য লাগোসে ১১ই জানুয়ারী থেকে কমনওয়েলথ

প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বসছে। সাধারণত লন্ডনে যেভাবে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এ সম্মেলন সেদৃশ নয়। এই সম্মেলনের আহ্বানকও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী দেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, ভিন্নভাবে এই সম্মেলন বসছে।

বৃটেন, আফ্রিকা তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ রোডেশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীভাগ শাসক আইয়ান স্মিথ যখন একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন, বৃটেন অন্তত তার নিজের কতৃৎ রক্ষার উদ্দেশ্যেও আইয়ান স্মিথের বেআইনী শাসন উচ্ছেদের জন্য কার্য-ক্ষরী কিছু করবে। কিন্তু থানিকটা ধমক, আর একেজো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের বেশি বৃটেন কিছু করতে রাজী হয় নি। দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বৃটেনের অক্ষমতা বা অসিদ্ধির বিরুদ্ধে আফ্রিকার দেশগুলি; বিশেষ করে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার বাইরেও এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় হঠাৎ নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার আবু বকর তফাওয়া বলেয়া তাঁর রাজধানী লাগোসে কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে বসেন। আইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে কার্যকরী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করাই এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য।

আফ্রিকা একা সংস্থা' যখন দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রবল বৃটেনের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল, তখন নাইজেরিয়া কতৃৎ একক-ভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করা অনেক আফ্রিকীয় নেতারই পছন্দ হয় নি। ঘানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামে নকুম্মা ও তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি জোসেফ নিরেরে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন না। মাল্যাবার প্রধানমন্ত্রী হেন্টিংস বাঙা সম্মেলনের বিরোধিতা না করলেও, তিনিও যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। আরও অনেকেই হয়তো আসবেন না।

তবু ১২ই জানুয়ারী সম্মেলন বসবে। নাইজেরীয় সরকার আশা করছেন, অন্তত ১৮টি দেশের প্রধানমন্ত্রী বা তাঁদের প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী লাগোস যেতে পারবেন না। কারণ, তিনি ভাসখন্দ সম্মেলনে ব্যস্ত। তবে তাঁর প্রতিনিধি-রূপে কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন লাগোস সম্মেলনে গেছেন। শ্রীসেনের সঙ্গে আছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শ্রীআজিম হুসেন।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হারল্ড উইলসন সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মেলনের তারিখও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি বৃটেনের রোডেশিয়া নীতির তীব্র সমালোচনা করবে এবং স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তারা চাপ দেবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বৃটেন এই সম্মেলন আহ্বানে খুঁশ হয়েছে। কারণ, এই সুযোগে বৃটেন কমনওয়েলথ, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিকে আর একবার বোকাবার চেষ্টা করবে, তারা সত্যিই স্মিথের শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরোধী এবং তাদের অবলম্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই স্মিথ সরকারের পতন ঘটবে।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য লাগোসের পথে দিল্লী যাবার সময় শ্রীঅশোক সেন কলকাতার ঘোষণা করেন, ভারত স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও সমর্থন করবে। কমনওয়েলথে অবশ্বেতাঙ্গদেরই প্রাধান্য। তাই শেষ পর্যন্ত বৃটেনের পক্ষে কমনওয়েলথের অধিকাংশের দাবি অগ্রাহ্য করা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। দেখা যাক, লাগোসে কি হয়।

ভিয়েতনাম :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন থেকে শব্দ করে ছোটো-খাটো মার্কিন অফিসারেরাও জোর গলায় বলা শব্দ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিকতার সঙ্গে ভিয়েতনামে শান্তি চায়।

এই আন্তরিকতার প্রমাণ দেবার জন্য বড়-দিনের সময় থেকে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখা হয়েছে। অবশ্য ভিয়েত

নাম খেপিলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

কিভাবে ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য জনসন অনেকগুলি শান্তি মিশন প্রেরণ করেছেন। জনসনের বিশেষ দূত হিসাবে উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হামফ্রে, রাষ্ট্রসংঘ স্থায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্থার গোল্ডবার্গ, বিশেষ ভায়ামাপ দূত অ্যাডেরাল হ্যারিমান, মেনেন উইলিয়ামস, ক্রিমেন্ট জ্যাবলিক প্রভৃতি বলতে গেলে সারা পৃথিবী চষে ফেলেছেন। অ্যাডেরাল হ্যারিমান ঠিক ভাসখন্দ বৈঠকের আগে দিল্লীতে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী ও রাওসালপাণ্ডিতে আমর খাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। উদ্দেশ্য : এঁরা যাতে ভাসখন্দে গিয়ে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনের কাছে মার্কিন বক্তব্য রাখতে পারেন। হ্যারিমান কায়রো গিয়ে আবদুল গামেল নাসেরের সঙ্গে কথা বলেছেন। নাসেরের সঙ্গে চীন ও উত্তর ভিয়েতনামের ভাল সম্পর্ক। নাসেরের মারফৎ এঁদের ভাল জানার চেষ্টা করাই হ্যারিমানের উদ্দেশ্য। হুবার্ট হামফ্রে টোকিওতে জাপানী প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাটোর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, যাতে সাটো চীনের সঙ্গে কথা বলেন। আর্থার গোল্ডবার্গ লন্ডনে বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী হারল্ড উইলসনের সঙ্গে কথা বলেছেন। জেনেভা সম্মেলনের যুগ্মসভাপতি বৃটেন যাতে অপর যুগ্মসভাপতি সোভিয়েট সনিয়েনের সঙ্গে আলোচনা শব্দ করে, গোল্ডবার্গ এই চেয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য, ভিয়েতনাম

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডোভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্ব - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গলুরু - শ্রীহর - গোহাটী

তাসখন্দ সম্মেলনের সাফল্য

সম্পর্কে ১৯৫৪ ও ১৯৫২ সালে জেনেভা সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার রাজী। দুই ভিয়েতনামের মিলনেও তাদের আপত্তি নেই। তবে ভিয়েতকন্দের হাতে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছেড়ে দেবে না। কিতাবে উত্তর ভিয়েতনামে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে একাকক ভিয়েতনাম পুনরু ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব সে বিষয়ে তারা আলোচনা করতে প্রস্তুত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবারের শান্তি-প্রচেষ্টার কিছুটা সড়া পাওয়া যাচ্ছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও যুগোস্লাভিয়ার মত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও মার্কিনী প্রচেষ্টার উৎসাহ দেখাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হারল্ড উইলসন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনকে চিঠি দিয়েছেন, তিনি মার্কিন শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে কোসিগিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য ২৯শে ফেব্রুয়ারী মস্কো যাবেন। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্থার গোম্বারগ শান্তি-প্রস্তাবের কথা জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাটকেও চিঠি দিয়েছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নও ভিয়েতনামে শান্তি-প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভাবছে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক অলেক-জান্ডার সেলেপিনের অকস্মাৎ হায়ান যাত্রা ও উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি-মিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

তবে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটাই স্বতন্ত্র নয়, কিতাবে শান্তিপ্রতিষ্ঠা হবে সেটাই বড় কথা।

ঐতিহাসিক তাসখন্দ সম্মেলন সফল হয়েছে। বলপ্রয়োগের পথ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ মীমাংসা এবং দু'দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এক ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছেন। ঘোষণাপত্রে মোট নয়টি বিষয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে।

তাসখন্দের প্রতিশ্রুতি

একে অপরের ভূখণ্ড থেকে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্ব স্ব সশস্ত্র বাহিনী অপসারণ করে গত ৫ই আগস্টের পূর্বকার অবস্থান-স্থলে নিয়ে যেতে ও যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি পালন করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছেন।

পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিই সম্পর্কের ভিত্তি হবে বলে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছেন।

উত্তর পক্ষ স্ব স্ব দেশে অপর দেশের বিরুদ্ধে প্রচায়ে নিরুৎসাহ দানের সিদ্ধান্ত করেছেন।

স্ব স্ব হাই কমিশনারগণকে তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থানে প্রেরণে ও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়েও তারা সম্মত হয়েছেন।

যুদ্ধ-বন্দীদের প্রত্যর্পণের কাজ কার্যকরী করার জন্য তারা স্ব স্ব প্রতি-নিধিদের নির্দেশ দানে সম্মত হয়েছেন।

উষ্মাস্তু সমস্যা ও বেআইনী অভিবাসন উচ্ছেদ প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে উত্তর পক্ষই আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন। উষ্মাস্তু-স্রোত রোধের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে উত্তর পক্ষই রাজী হয়েছেন।

সম্মুখের পর থেকে এক পক্ষ অপর পক্ষের যেসব সম্পত্তি ও সম্পদ হস্তগত করেছেন উহা প্রত্যর্পণের জন্য আলোচনা করতেও উত্তর পক্ষ সম্মত হয়েছেন।

আরও কি কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সরকারস্বয়ং রিপোর্ট প্রদানের জন্য ভারত-পাক বৌধ পর্ষৎ গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

(বিলম্বে প্রাপ্ত)



তাসখন্দের উজবেক ন্যাশনাল থিয়েটারে তিন প্রধান

একটি ঐতিহাসিক বিদায়

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

লালবাহাদুর তাঁর পূর্বসূরী স্বর্গত নেহরুজীর মতই শান্তি ও সৌহারদের বাণীকেই আপন উত্তরাধিকাররূপে দান করে বিদায় নিলেন সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতবর্ষকে শান্তিত শোকাভিভূত এবং বেদনাহত করে। ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তিতে শেষ স্বাক্ষর রেখে মহাশান্তির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন বিশ্বের অন্যতম কর্মব্যস্ত পুরুষ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

এগার তারিখের প্রভাতী সংবাদ-স্তম্ভে ফুটে উঠল বেদনালগ্নিত অশ্রু-সজল শব্দাবলী। শাস্ত্রীজী নেই। আছে তাঁর আশা-কল্পিত অঙ্গুলির শেষ প্রতিশ্রুতি, শান্তি, শান্তি, শান্তি!

পাক-ভারত সীমান্তে স্থায়ী শান্তিকে বরণ করে আনার জন্যই লালবাহাদুর বিগত বছরে সমগ্র জাতির প্রতি ন্যায়-যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আহ্বান জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের ভাইবোনদের প্রতি, বিরোধ নেই, ভোমাদের সঙ্গে বিরোধ নেই ভারতের। সংঘর্ষের মাঝেও শোনা গেছে শাস্ত্রীজীর উদাত্ত আহ্বান, সম্মানজনক শর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত সাগ্রহী সর্বদা। উ খাণ্টের আহ্বানে সাড়া দিতে তিলমাত্র দেরি হয় নি প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর, যেমন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীকোঙ্গিগনের আমন্ত্রণে তাৎক্ষণিক সাড়া জানিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর শান্তির স্বপ্ন, নেহরু-ভারতের শান্তির স্বপ্ন, তাসখন্দ সম্মেলনে অঙ্কুরিত করে বিদায় গ্রহণ করার ঐতিহাসিক সার্থকতাও তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

ভারতের কর্ণধাররূপে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী বড় অল্পক্ষণ, বড় অল্পক্ষণ আমাদের মধ্যে ছিলেন। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে তিনি ভারত রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরেছিলেন; বড় বয়ে গেল তারপর; অন্তরে বাহিরে অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ। শাস্ত্রীজী অবিচলিত কাঁড়ারী। তাসখন্দে তিনি তাঁর নোঙর ফেললেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোঙ্গিগন ছিলেন শান্তি বন্দরের অধিনায়ক। কিন্তু তার পরও যাত্রা ছিল বাকি প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। প্রতিবর্ষি কাবুল এই মহান নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁর জন্য অপেক্ষাকৃত। কিন্তু তাসখন্দে

পাক-ভারতের শান্তিশপথ গ্রহণ করে ও গ্রহণ করিয়ে শাস্ত্রীজী পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন। কিন্তু বড় আকস্মিক-ভাবে ভারতবর্ষ এই স্থিতধী দৃঢ়চেতা অমায়িক এবং অতি অসাধারণ সাধারণ মানুষটিকে হারাল। শাস্ত্রীজীর আরক্ত কর্মের সবে সূচনা। মাত্র একঘণ্টা বছরের



রুদ্ধ-ব্রাস কর্মজীবন। মাত্র দেড় বছরের দায়িত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর পদ। অথচ এই দেড় বছর, এই স্বল্প সময় একটি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে তিনি বিদায় নিলেন।

...বিদায় মাগেই শোকাবহ। শাস্ত্রী-জীর বিদায় তারও থেকে অনন্য। তাঁকে

হারিয়ে ভারতবাসী আজ শোকাবেগে শূন্যিত। ইতিহাস অবাক।

ইংরাজি মতে ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ সাল ভোর রাতি ১-২৫ মিনিট। শাস্ত্রীজী অকস্মাৎ বেদনা অনুভব করলেন ঐতিহাসিক তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর রেখে প্রধানমন্ত্রী কৌঙ্গিগনের ডেজসডায় প্রফুল্লভাবে আতিথ্য গ্রহণ করে এসে। তারপর মাত্র সাতটি মিনিট, শাস্ত্রীজী নেই। তবে তিনি কি ছিলেন ঐ ঘোষণার দায়িত্ব পালনের জন্য। বীর ভারত কি ছিল 'অশোক ভারতের' পূণ্য-ম্রোক উদ্ধারণের জন্য বিশেষ সংঘাত-জর্জর ভারত সীমান্তে শান্তির পদ-ধনিকের কান পেতে শোনার জন্য অতন্ত প্রহরী। হায়, এই গুরুত্বপূর্ণ সময়, আর একটু বেঁধে রাখতে পারল না সে ভারত-নায়ককে।

মাটির মানুষ শাস্ত্রীজীর বিশদ বিবরণের জন্য প্রতিটি মানুষ এখন উন্মূখ। ঠিক এই মুহূর্তে, যখন টেলিপ্রিন্টারে অবিগ্রাম শোকবার্তা একের পর এক ফুটে উঠছে, আর ব্যস্ত প্রেস উত্তেজিত ছুঁপিগুড়ের উত্থান পতনের মত ছেপে চলেছে মহান নেতার তিরো-ধানের বেদনাময় সংবাদ, তখন আমরা বসেছি আমাদের প্রিয় নেতার প্রতি প্রজ্ঞাজলি জানাতে।

এখনো বিস্তারিতভাবে তাঁর বিদায় মুহূর্তের সংবাদ কিছুই জানতে পারি নি। ভাষা কেবল আবেগের বার্তাবহ হয়েছে। কেনেইহি শূন্য তিনি নেই। নেই জওয়ান-ভারতের পরিচালক। নেই ভারতবর্ষের শান্তির দূত।

ঐতিহাসিক এ বিদায়। বিদায়ের মুহূর্তেও তিনি রেখে গেলেন নবীন উবার শপথ; রচনা করে গেলেন নতুন ইতিহাস।

স্বল্পস্থায়ী এই কর্মজীবন ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অধ্যায়।

আমরা তাঁকে হারালাম। তাঁর বাণীকে নয়, তাঁর কর্মকে নয়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অদ্বুতপূর্ব অবদানকে নয়।

আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের প্রণাম তাঁর পবিত্র লোকান্তরিত আত্মার প্রতি; আমাদের শোক সমগ্র ভারতবাসীর শোক; সমগ্র দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের শোকের সঙ্গে একাকার।

উপহাস

নব্ব্বদনাথ মিত্র

২ পট্টিশ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গাড়িতে উঠে স্বাতী পাশে বসল না হিমাংশু পিছনে গিয়ে বসল।

হিমাংশু একটু হেসে বলল, 'ওকি স্পর্শ দোষ বাঁচিয়ে চলবার ইচ্ছে না কি?'

স্বাতী বলল, 'তা বটে। তুমি কি স্পর্শের যোগ্য?'

হিমাংশু বলল, 'তা বটে। ছুরো না ছুরো না ব'ধ ওইখানে থাকো। তারপর? আগে একটু ঘুরে টুরে আসব? না সোজা একেবারে কর্মক্ষেত্র?'

স্বাতী বলল, 'ঘোরাঘুরি তো অনেক হল। এবার তোমার কাজ দেখতে চাই। নিজের কিছু কাজ করতে চাই।'

হিমাংশু বলল, 'লক্ষ্যী মেয়ে। আচ্ছা চল। আগে কাজের জায়গাই দেখে আসা যাক। তারপর অবসর বাপনের কথা তুললে কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না।'

স্বাতী বলল, 'কাজ আরম্ভ করতে না করতেই অবসরের কথা।'

হিমাংশু বলল, 'এখন অবসরের কথায় তোমার আপত্তি হচ্ছে। এর পর অবসর যখন একেবারেই মিলবে না তখন কিন্তু এক ফোঁটা ছুটির জন্যে মন কাতর হয়ে উঠবে দেখে নিয়ো।'

স্বাতী বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কাজের বহর আগে দেখি তো।'

মিশন রোয়ের একটি তিনতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি রাখল হিমাংশু।

তারপর স্বাতীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'এসো। লিফট নেই। একটু কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে।'

স্বাতী হেসে বলল, 'আহা কষ্ট আবার কিসের। আমি কি বড়ি নাকি যে সিঁড়ি ভাঙতে পারব না?'

তিনতলা ঘরের একটি ফ্লাট। নতুন নতুন চেয়ার-টোবল-আলমারিতে সুন্দর করে সাজানো। হিমাংশু ঘুরে ঘুরে স্বাতীকে সব দেখাতে লাগল।

হিমাংশু বলল, 'এই মাঝখানের ঘরটিকে করব ভিজিটরস রুম। যাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসবেন—তাঁরা এখানে বিশ্রাম করবেন। আর ওই যে পিছনে সারি সারি দেখানো ঘর ওর একটিতে অফিস। আর পাশের ঘরটি রিটার্নিং রুম। আমাদের বিশ্রম্ভা-লাপের জন্যে।'

স্বাতী বলল, 'আবার সেই বিশ্রামের কথা। কাজের নামে দেখা নেই কেবল রেস্ট আর রেস্ট?'

হিমাংশু বলল, 'এখন রেস্টের নামে নাকি কু'চকাছে, কু'চকাছে কিন্তু এর পর একটুও ফুরসৎ জোটে তো কি বলেছি।'

স্বাতী বলল, 'আমি কাজকে ভয় করি নে। আমি কি তোমার মত?'

খোলা দরজা দিয়ে আরো একটি ঘরে ঢুকল হিমাংশু।

এ ঘরখানিও চেয়ার টোবলে সুসজ্জিত।

ঘরখানিতে ঢুকে বেশ ভালো লাগল স্বাতীর। পূর্বে দক্ষিণে দৃ-দিকেই জানালা আছে। নতুন এবং দামি আসবাবপত্র এ ঘরও বেশ সুসজ্জিত। দক্ষিণ দিকের একটি টোবলে বসে আর একটি ঘুরক প্যাডের

কাগজে কী বেন লিখছিল স্বাতীদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

হিমাংশু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'প্রভাস মৃধাজী। আমাদের বন্ধু এবং পার্টনার। আর এর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। স্বাতী সোম। আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। এখন এক সঙ্গে কিছু কাজকর্ম করবার ইচ্ছা।'

প্রভাস স্মিতমুখে বলল, 'বেশ তো। আমরা তো—তাই চাই। আপনায় আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসুন।'

হিমাংশু আর স্বাতী পাশাপাশি বসল। স্বাতী লক্ষ্য করল প্রভাস দেখতে মোটামুটি সুন্দর। মাথার টাকের জন্যে বরসটা একটু বেশি দেখায়। তাও চৌদ্দিশ প'য়সিশের বেশি নিশ্চয়ই হবে না। সৌম্যদর্শন অনুচ্চভাবী এই ভদ্রলোককে দেখতে ভালোই লাগল স্বাতীর।

একটু চুপ করে থেকে স্বাতী বলল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছা। কাজ করতেই চাই। হিমাংশুর কাছে সব শুনবে থাকবেন।'

প্রভাস হেসে বলল, 'শুনছি। আমার কিছু কারবারপত্র এখানে-ওখানে আছে। তবে কিছুই সচল অবস্থায় নেই। সব চালিয়ে নিতে হবে। সেই জন্যেই হিমাংশুকে ডেকেছি।'

স্বাতী বলল, 'আপনি ডেকেছেন
প্রভাসকে। তিনি আবার
আমাকে ডেকে এনেছেন।'

প্রভাস বলল, 'ভালই তো। কাজের
মানুষ যত বাড়ে ততই ভাল।'

স্বাতী বলল, 'কাজের কি অকাজের
কি জানি। তবে আমাকে দিয়ে কেউ
যদি কাজ করিয়ে নেন তবে আমি
বোধ হয় কাজ করতে পারি।'

প্রভাস হেসে বলল, 'আমাদেরও
তো সেই অবস্থা। আমরাও কারো
সাহায্যে কর্মঠ হবার অপেক্ষায় আছি।'

হিমাংশু এতক্ষণ চুপ করে ওদের
কথা শুনছিল। এবার বলল, 'ওহে
প্রভাস। লোকজন কোথায় তোমার।
একটু চা-টার আশা কি করতে পারি?'

প্রভাস বলল, 'নিশ্চয়ই তা পার বই
কি। কাজের লোকজন এখনো নেওয়া
হয় নি। তবে চা পান জোগাবার
একজন দুজন অবশ্যই নিতে হয়েছে।'

বেল টিপল প্রভাস। সঙ্গে সঙ্গে
একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। দেখলেই
মনে হয় বেশ চালাকচতুর। কালো
স্বপ্নের ওপর লম্বাটে ধরনের মুখের
ডোল।

'তিন কাপ চা বানাও অর্জুন।'
তারপর স্বাতীর দিকে চেয়ে বলল,
'আর কি খাবেন বলুন?'

স্বাতী লজ্জিত হয়ে বলল, 'আর
কিছু না। চায়েরও দরকার ছিল না
আমার। আমি চায়ের তত ভক্ত নই।'

প্রভাস একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা!
ভক্ত আমরাই। আপনারা কেন ভক্ত
হতে যাবেন। হ্যাঁ, লোকজন বিশেষ
কাউকে এখনো নেওয়া হয় নি। তবে
কৈবল ফ্লাটটা দখল করবার জন্য ফার্নি-
চারটারিচারগুলি এনে বেরিয়েছি। আজ-
কাল বাড়ি পাওয়া যা হাঙ্গামা। এই তো
ছোট্ট একটু ফ্লাট। কিন্তু এই ফ্লাট
ভাড়া নেবার জন্যে যা কাঠখড় পোড়াতে
হয়েছে আপনি ভাবতে পারবেন না।'

ব্যাপারটা একেবারে অভিভূত নয়
স্বাতী। বাসের জন্যেই হোক আর
ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যেই হোক বাড়ি
জোটানো আজকাল সহজ কাজ নয়।
কিন্তু এদের এ কেমন ধরনের অফিস?
শব্দ ফার্নিচার কিনে জড়ো করেছেন।
কিন্তু কোন লোকজন নেই, কাজকর্মের
ধরণ-ধারণও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

স্বাতী বলল, 'আমাকে এখানে কী
করতে হবে?'

হিমাংশু সপ্নেহে ছোট একটি ধমক
দিল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ক্রমে
সবই জানতে পারবে।'

চা এসে গিয়েছিল তাতে চুমক

দিয়ে প্রভাস বলল, 'কী করতে হবে?
ধরুন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ
সবই। যে দুজন অকর্মী পুরুষ
আপনার সামনে এখন বসে রয়েছে
তারাও দেখবেন আপনার মহৎ দৃষ্টান্তে
এক একজন বিশ্বকর্মা হয়ে উঠেছে।'

স্বাতী হেসে বলল, 'উঠলেই ভাল।
আপনার পক্ষে হয় তো বিশ্বকর্মা
হওয়া তেমন কঠিন হবে না। তবে
আপনার বন্ধুটিকে দিয়ে কিন্তু তেমন
ভরসা পাচ্ছি নে।'

হিমাংশু হেসে বলল, 'বটে? এরই
মধ্যে এতখানি পক্ষপাতিত্ব। স্বাতী
তোমার মতিগতি তো সুবিধের নয়।'

চা-টা খেয়ে হিমাংশু উঠে পড়ল।
বন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, 'প্রভাস আজ
আসি' ভাই।'

প্রভাস বলল, 'সে কি? এখনই
উঠবে। এইমাত্র তো এলে। অনেক
পরামর্শ করবার ছিল। এই কি তোমার
কর্মতৎপরতা?'

হিমাংশু বলল, 'সে সব কাল হবে।
আর ভাবনা নেই। এবার কিছু না
কিছু একটা হবেই।'

প্রভাস বলল, 'তুমি দেখছি দারুণ
অপটিমিস্ট।'

হিমাংশু বলল, 'কী করব বলো
দুঃখবাদটা আমার ধাতে নেই। দুর্দিন
দুর্ভোগ আমার জীবনেও কম আসে
নি। ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দিয়েছে।
কিন্তু বেশিদিন আমাকে ধরাসায়ী
করে রাখতে পারে নি। আবার উঠে
দাঁড়িয়েছি।'

প্রভাস বলল, 'কৈবল কি দাঁড়ানো?
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছে। তোমার ওপর
আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।'

হিমাংশু বলল, 'তা জানি। এখন
সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি
তবেই তো—'

নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর
স্বাতী হিমাংশুর সঙ্গে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ির মূর্খ পর্যন্ত এসে হঠাৎ কী
যেন মনে পড়ে গেল হিমাংশুর।
স্বাতীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল,
'একটু দাঁড়াও। প্রভাসকে একটা কথা
বলতে ভুলে গেলাম। বলে আসি।'

হিমাংশু ফের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।
বন্ধুর সঙ্গে কথা শেষ করে দু-তিন
মিনিটের মধ্যেই ফের বেরিয়ে এল।

এবার আর স্বাতীকে পিছনে
বসতে দিল না। হিমাংশু। পাশেই
বসাল। বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল,
'আমাদের অফিস কেমন লাগল?'

স্বাতী হেসে বলল, 'কতকগুলি
চোরার টেবিল থাকলেই কি অফিস হয়?
এর চেয়ে একটা ফার্নিচারের দোকানে
নিরে গেলেই তো পারতে।'

হিমাংশু হেসে বলল, 'ওরে বাবা।
এবার দেখি খুব কথা ফুটেছে। যতই
বল না কেন ফার্নিচার ডিলারটিকে
তোমার খুব ভালই লেগেছে। আমি
আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সব
দেখছিলাম।'

স্বাতী লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ।'

হিমাংশু বলল, 'আর যা যা করে
কী হবে। ভাগ্যে কী আছে কে জানে।
যাবার জন্যেই এখানে এসেছি কিনা
তাই বা কে বলবে।'

স্বাতী বলল, 'কী যে বলো,
তোমার কথার কেন মাথাব্যস্ত নেই।
এলামই না, এখনই যাবার চিন্তা।
সত্যি, কিসের তোমাদের বিজ্ঞেস
কিছুই বললে না সবই গোপন করে
রাখলে।'

হিমাংশু তাকে ভরসা দিয়ে বলল,
ভেব না কিছুই গোপন থাকবে না।
সবই জানতে পারবে। মন্তগুপ্তিটা
অবশ্য দরকার হবে। কিন্তু সে অন্যের
কাছে নিজেদের কাছে নয়।'

(ক্রমশঃ)



কিষান
লন্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৬৩ চীনা বাজার ট্রাট, কলিকাতা-২



গাছটা

মিতা তুমত

নরম বৃন্দ বৃন্দে ধূলোর উপর
ভারি জুতোর ছাপ ফেলে মাঠের খান্নে
কাঁচা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চললেন
অনন্ত মল্লিক। রাজ্যের বিরক্তি তাঁর
চর্বিতে ভরা গোলগাল মুখে উঁচু নিচু
খাঁজ কেটে গেছে। মজা নদীর শূকনো
বালির গারে যেমন লম্বা লাইন পড়ে।
শীতের হাওয়া বেশ তীক্ষ্ণ মনে হয়
শহুরে লোকদের কাছে তাই গলাবন্ধ
কাশ্মিরী কোটের উপরে মাফলার
দুফেরতা জড়ানো। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত
গরম মোজা। হাতে পশমের দস্তানা।
হয়তো সেই কারণেই অনন্ত মল্লিকের
ফর্সা মুখ সিঁদুরে লাল হয়ে উঠেছে,
কপালের খাঁজে বিন্দু বিন্দু ঘামের
চিহ্ন।

রাস্তাটা মাঠের মাঝখানে একটা
সরু নদীর মতো অনেক ঘুরপাক খেয়ে
বাঁশের বেড়া ঘেরা একটা পুরোনো বাংলো
বাড়ির সামনে এসে থেমেছে। বেড়ার
গায়ে সাদা টগর ফুলের ছিটেফাঁটা।
লাল টালির ছাদে সবুজ লতার ঢাকনি
পরানো। ফটকের গায়ে রং চটা কাঠের
ফলকে প্রায় মূছে-বাওয়া হরফে লেখা
পড়তে দস্তুরমত কষ্ট হয়, তবু ভারি
শরীর নিচু করে ঝুঁকে পড়ে নামটি
খুঁটিয়ে দেখলেন অনন্ত মল্লিক। হ্যাঁ,
এটাই সদানন্দ চৌধুরীর বাড়ি। হাতে
ছড়িটা শক্ত করে ধরে জোরে নিঃশ্বাস
ফেলতে ফেলতে অনন্ত মল্লিক ভাঙা
বাঁশের বেড়ার ফোকর দিয়ে অতি কষ্টে
চুকলেন, কারণ নড়বড়ে কাঠের ফটকের
গায়ে ময়চে খবা প্রকাশ্য তালিটা চাবি
দিয়ে আঁটা।

অনন্ত মল্লিকের মনের সবখানি
জুড়ে অসম্ভব রাগ সমুদ্রের ঢেউ-এর

মত গুঠা-নামা করছে। রোদ ঝলমলে
সকালে ভোর রাত্রির কুয়াশা অনেকক্ষণ
মিলিয়ে গেছে, তবু যেন চোখের সামনে
ডালপালা ছড়িয়ে সেই প্রকাশ্য পুরোনো
বট গাছটা আলো আড়াল করে সবুজ
সবুজ অশ্বকর ঢেলে দিচ্ছে। গাছটা,
উঃ সেই গাছটা। জীবনে সব কিছুর
সহজে কেড়ে কুড়ে নিতে অভ্যস্ত বলেই
অনন্ত মল্লিক একটা পুরোনো গাছ আর
একজন আধ বৃদ্ধো ভীমরতি ধরা
মানুষের পাগলামীকে কিছুরেই বর-
দাস্ত করতে পারছেন না।

ফটকের ভেতরে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত
বুনো ঘাস, পায়ে-চলা রাস্তা সহজে
নজরে পড়ে না। এলোমেলোভাবে
কিছু কিছু মরশুমী লাগানো হয়েছে।
ফুল, হালিহক, কসমস, সুবাস, গাঁদা
ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে রয়েছে। তারই ফাঁকে
ফাঁকে প্রায় অদৃশ্য রাস্তা ধরে অনন্ত
মল্লিক বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন।
বেশ গাড়ি রোদ একখানা হলুদ চাদর
বিছিয়ে রেখেছে, সেখানে, আর সেই
চাদরে গা পেতে দিয়ে সদানন্দ চৌধুরী
খুব নির্বিকার মুখে গড়গড়র নল
থেকে ধোঁয়া টানছেন। বারান্দার
সিঁড়িতে লাঠি ঠুকে ও জুতো ঘষে
অনন্ত মল্লিক নিজের আগমন বার্তা
জানানো সত্ত্বেও ভদ্রলোকের মুখের
ভাবের পরিবর্তন ঘটল না।

‘আমি অনন্ত মল্লিক—’ গলা
চাড়িয়ে অবশেষে আত্মপরিচয় দিলেন
তিনি।

‘হু—’ একমুখে দুটো চড়ুই
পাখীর ছটফটে ভাগির দিকে তাকিয়ে
রইলেন সদানন্দ চৌধুরী।

‘আপনার সঙ্গে গাছটার বিষয়ে কথা
বলতে চাই—’ প্রায় ধমকের সুরে
চিৎকার করে বললেন অনন্ত মল্লিক।
নির্লিপ্ত নির্বিকার আবহাওয়া তাঁর
কাছে অসহ্য ঠেকছিল।

‘হু—’ শব্দটা আর একদফা
উচ্চারণ করে আঙুল নেড়ে একটা
নড়বড়ে টুলের দিকে আঙুল দেখালেন
সদানন্দ চৌধুরী। এক বোঝা ধুলো
মাখা টুলের পায়াগুলোর শক্তি সম্পর্কে
সন্দেহ হয়ে অনন্ত মল্লিক লাঠিটা
সজোরে ঠুকে গলা কিছুরা নরম করে
বললেন—‘আমি কি বলতে চাই বোধহয়
বুঝতে পেরেছেন।’

‘হু—’ আমার গাছ কেটে ফেলার
মতলব। কিন্তু সেটি হবার জো নেই।
আইন আমার দিকে—।’

‘দেখুন সদানন্দবাবু। আপনাকে
একটা বিবেচনা করে দেখতে বলছি—
আশ্চর্যভাবে মৈজাজ সামলে ঠান্ডা
গলায় কথা বললেন অনন্ত মল্লিক।
বিশেষ ফল হল না। একটা শালিখ
এক পায়ে নাচছে, সেদিকে তাকিয়ে
লোকটি আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল।
অনেকক্ষণ হেঁটে হাঁপাতে হাঁপাতে
অগত্যা ধুলোমাখা টুলটার খুব সাব-
ধানে বসে পড়লেন তিনি। এবারে
কথাটা কিভাবে পাড়া যায় সেই সুযোগ
খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে
গেল।

‘কি বলছিলেন যেন—’ পাকা ভুবু
কুঁচকে সদানন্দ চৌধুরী হঠাৎ বলে
উঠলেন—‘গাছটা—। হ্যাঁ, আমার সেই



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ম
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ম।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ম সাধনার
অব্যর্থ মহোৎসব প্রতিদিন আহ্বারের পর
ছুইবার করে দু'চামচ লুভসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজ্যাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
বিশেষ ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
যেক্টে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অনেক ডাক যোগেন চন্দ্র বোস, এম-এ,
আইনকোশাঙ্গী, এম, সি, এস, (সেভেন),
এম, সি, এস, (আমেরিকান), ডাকসপ্ত
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাক মনেন চন্দ্র বোথ,
এম-বি, বি-এস, আবুদেব্বাচাখি।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

গাছটা। সেটি কিছুতেই কাটা চলবে না। এই হল আমার শেষ কথা।

বৃকের কাছে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল, তবু অনেক চেষ্টা করে উদ্বেজনাতে বাড়তে দিলেন না অনন্ত মল্লিক।

‘আপনি ভুল করছেন সদানন্দবাবু। গাছটা আপনার নয়, আমার—। আপনার জমি আপনি অনেক দিন আগেই সামসুল হককে বেচে দিয়েছেন।’

‘সামসুল ছেলেটা ভাল। ওর বাবাকেও চিনতাম। খাশা লোক—’

‘আর আমি সামসুল হকের থেকে সেটা আবার কিনে নিয়েছি। জমির সঙ্গে সঙ্গে গাছটাও এখন আমার সম্পত্তি হয়ে গেছে। গাছটা আমি কাটতে চাই, কারণ মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা চওড়া রাস্তা না থাকলে লরি আর ট্রাকগুলোর যাতায়াত করতে অসুবিধা হবে। আশা করি আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে।’ এক দম্বে কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন অনন্ত মল্লিক।

‘হু—। পরিষ্কার তো হবেই, একেবারে জলের মত। উকিলগুলোকে নইলে এক গাদা টাকা খরচ করে পাঠিয়েছিল কেন। তবে আমার তাতে কিছু এসে যায় না। ও গাছ কাটা চলবে না।’

‘ওটা আপনার গাছ নয়।’ এতক্ষণে ঘেঁষ হারিয়ে চিৎকার করে অনন্ত মল্লিক প্রতিবাদ জানালেন।

‘কিন্তু আমার কাছে একটা চিঠি আছে—’ জলের উপর খুব হালকাভাবে যেমন ডেউ কাঁপে, সেই রকম নিস্তেজ কণ্ঠে সদানন্দ কথাটা বলে ঘাসের ভগায় ফড়িং-এর পাখনার রং দেখতে লাগলেন।

‘আমি জানি। সে সব কথা বহু-বার শুনছি—আর শোনার—’

কথা শেষ হবার আগেই সদানন্দ শান্ত গলায় আবার বললেন—‘চিঠিতে খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, জমি যারই হোক ও গাছ আমার অনুমতি না নিয়ে কাটা চলবে না। সামসুল হক যখন জমি কিনেছিল, তখন তিনজন সাক্ষীর সামনে ওকে সই দিতে হয়েছে। তা নইলে জমি বিক্রী করতাম না কি।’

ঠিক একটা ক্রিমন্ত কোলা ব্যাং-এর মত মুখের ভাব নিয়ে বসে আছে বৃড়োটা—মনে মনে কটন কথা চিন্তা করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে অনন্ত মল্লিক মুখে বললেন—‘কিন্তু কোর্টে ঐ চিঠির কোনই দাম নেই।’

‘ও—মামলা করতে চাও তুমি, মামলা করো। ভালভাবেই করো।’

সদানন্দের নির্বিকার মুখে যেন হাসির ছোঁয়া লাগল। চিন্তিত হয়ে উঠলেন অনন্ত মল্লিক। হঠাৎ বেকাঁস মামলার কথা তেঁলো ঠিক হয় নি। কোর্টে অবশ্য ওই চিঠিটার সত্যিই বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আইন আদালতের ব্যাপার তাঁর ভাল করেই জানা আছে। একবার ওধারের ছায়া মাড়ালে সহজে কোন ব্যাপারের নিষ্পত্তি হতে চায় না। এদিকে কারখানা এ বছরের শেষে চালু হওয়ার কথা।

‘দেখুন চৌধুরী মহাশয়—’ গলার সুর কঠিন করে অনন্ত মল্লিক বললেন—‘আমি অন্যান্য মত কিছু চাইছি না।’

‘হু—’ সেই একই সুরে উত্তর এল। খারমোমটারের পারার মত মেজাজ লাফিয়ে উঠলেও সংযত গলায় আবার বললেন—‘আমি তোমাকে ঐ চিঠিটার বদলে পঞ্চাশ, না—একশ টাকা দিতে রাজী আছি। কোর্টে ওটা দেখালে অবশ্য আমারই জিত হোত—তবু তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই বলেই আপনাকে একথা বলছি।’

‘না’ ফড়িং দেখতে দেখতে অন্যান্যাসে বলে উঠলেন সদানন্দ—

‘কি বলছেন?’

‘না—আমি বলছি সে হবে না—’

লোকটার মাথা নিখাত খারাপ—।

‘দেখুন—’ হঠাৎ গলার সুর নরম করে অনন্ত মল্লিক বললেন—‘একশ টাকা কিছু কম নয়। ঐ চিঠিটার দাম এক টাকাও নয়, সে কথা আপনি ভাল করেই জানেন। তা ছাড়া দেশের উন্নতির পথে আপনি বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারেন না।’

‘পারি—’ সদানন্দ হঠাৎ উড়ে এসে বসা একটা সোনালী প্রজাপতির ডানায় আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে আবার উড়িয়ে দিয়ে বললেন—‘কারণ গাছটাকে আমি ভালবাসি।’

কথাটা বলে ইঁজিচেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে সদানন্দ চৌধুরী হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি, হঠাৎ চোখে পড়ল হলদে ছোপ লাগা বেড়াল চেয়ারের তলায় রোদে পিঠ বাকিয়ে সবুজ চোখ মেলে। তাঁকে দেখে যেন মিট মিট করে হাসছে।

বস্তৃত এতবড় পরাজয় তাঁকে কোন দিনও স্বীকার করতে হয় নি। সাধারণ অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে কেবল উঠেই এসেছেন সমস্ত বাধ-বিপত্তি ভুছ করে। একবার মনে হল ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে দেওয়া যাক লোক-

টাকে। ইচ্ছে করে কানে রকাছে চিৎকার করে বলতে—গাছটা আমার, এবং আমি বা খুঁশি তাই করব। তোমার চিঠিকে খোঁড়াই কেয়ার করি। ততক্ষণে সদানন্দ চৌধুরীর নাক ডাকতে শুরুর করেছে। ঘুমন্ত মানুষটাকে ঠিক দোলনায় শেয়ানো একটা কচি ছেলের মত দেখাচ্ছে—অনেকটা তাঁর মেয়ে রেখার পাঁচ মাসের বাচ্চাটার মতন—মনের মধ্যে কোথায় যেন নাড়া খেলেন অনন্ত মল্লিক। তারপর বারান্দার সিঁড়ির ধাপ কটা পেরিয়ে বুনো ঘাসে ঢাকা সরু রাস্তা ধরে ফিরে চললেন। এবারে তাঁর জুতোয় খুব বেশি শব্দ হল না।

আচ্ছা, গাছটাকে একবার চোখে দেখলে মন্দ হত না। একশ টাকার বদলেও লোকটি চিঠিটা কেন হাতছাড়া করতে চাইল না, তার কারণ কি হতে পারে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে চওড়া নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, সেদিকে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অনন্ত মল্লিক এগিয়ে গেলেন। রাস্তাটা হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ডালপালা ছড়ানো বট গাছের সামনে এসে থমকে থেমে গেছে। অনেক পুরোনো বৃদ্ধির নামা কুঁচকে-ওঠা গাছের বাকল দেখলে কোন রকমেই উচ্ছ্বাসিত হওয়ার কারণ নেই। কোন ফুল বা ফলের গাছ হলেও বা কথা ছিল, এই প্রয়োজনহীন জায়গা জুড়ে থাকা গাছটার দিকে তাকিয়ে নতুন করে তাঁর মনের মধ্যে রাগ টগবগ করে ফুটে উঠল।

নিজেকে গাছের মালিক লে জাহির করে বেশ কিছু টাকা আদায় করে নেওয়ার ফন্দি ছাড়া এ আর কিছুই নয়। জুদালানী কাঠ ছাড়া এ গাছ দিয়ে কিছু হবে না, অথচ তিনি অকারণে একশ টাকা দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এখুনি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। ভাগ্যিস শান্ত হাজরাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন। কলকাতার ছোট আদালতের নাম করা উকিল, জেরার জবরদস্তিতে শাসালো মক্কেলেরও পিঁলে চমকে দেয়।

‘বৃদ্ধকে শান্ত—একশ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। বৃড়োটা কিছুতেই রাজী হল না। তা হলে নালিশ করেই দেওয়া যাক—কি বল?’

‘কিন্তু তার মানেই তো আবার বৃদ্ধিয়ে রাখা।’

‘আরে বাবা তোমরা কি তাড়াহুড়ো করতে পার না?’

‘তা পারি—। তবে—’

‘তবে কি?’ অনন্ত মল্লিক চোখ জাল করে তাকালেন।

পাদ্যাহিক বসুদত্তী

এখনকার আদালতে আগে মামলা উঠবে। সদানন্দ চৌধুরী এই অশ্লেল লোক, সবাই চেনে জানে। আসলে আপনাদের শহরের চলাফেরার দ্রুত তাল মফস্বলের লোক এখনও বুঝতে পারে না—।

‘ননসেন্স—।’ ও সব বাজে কথা রাখ। এখন তা হলে কি করা যায়। আরও বেশি টাকার লোভ দেখাব—?’

শান্ত চৌধুরী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে মাথ দিলেন। একশ কেন, দরকার হলে পাঁচশ পর্যন্ত ওঠা চলে, কারণ শেষ পর্যন্ত গাছটা কেটে ফেলতে পারলে অনেক টাকা ও সময়ের অপচয় বন্ধ হবে।

উকিল ব্যারিস্টারের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার যথার্থ সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ হয় উঠলেন অনন্ত মল্লিক। কিন্তু আর কোন পথ নেই। বুড়োটা বন্ধ পাগল, অথবা সাক্ষাৎ শয়তান। একটা পাখীর পালকের মত হালকা শরীর, মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। কিন্তু কি ভীষণ কামেলায় না ফেলেছে।

যখনকার যা কাজ, তখন তাই করা অনন্ত মল্লিকের জীবনের একমাত্র দর্শন। মানিব্যাগে করকরে একশ টাকার নোট কয়েকটা ভরে নিয়ে অবেলায় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় আবার সেই ধুলোর উপরে জুতোর ছাপ ফেলে বাঁশের বেড়াটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রোদ এখন আরও কড়া, তাই মাফলার, দস্তানা খুলেই রেখে এসেছেন। সদানন্দ চৌধুরী ঠিক সেই এক ভাবেই শূয়ে! বেড়াটা চেয়ারের পায়ের পিঠ ঘসছে। চড়ুই পাখীর কিচির-মিচির, কাকের ডাক, আর এক পাশে ঝাউ গাছের উপরে ঝির ঝির হাওয়ার শব্দ, সব মিলিয়ে একটা ঘুমন্ত আমেজ।

‘চৌধুরী মশাই—’ পায়ের শব্দে ঘুম চোখ খুলতে দেখে গম্ভীর অথচ মরম গলায় বললেন অনন্ত মল্লিক—‘আইনের চোখে আপনার চিঠির দাম একটা কাগজকড়িও নয়, তবু এ নিয়ে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক তেতো করতে চাই না। একশর জায়গায় পুরো দুশ টাকা আমি আপনাকে দিচ্ছি। এ চিঠিটা আপনি আমাকে দিয়ে দিন।’

সদানন্দ চৌধুরীর ঝিমন্ত শরীর যেন একটু নড়ে উঠল। কোথায় একটা পাখী তীক্ষ্ণ স্বরে শিষ দিচ্ছে। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া এক ডাল থেকে অন্য ডালে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়-ওড়া সবুজ পাতার মত। বেড়াটা রেলিঙের উপরে বসা চড়ুই পাখীর গায়ে প্রায়

কাঁপ দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু হাত নেড়ে তাকে বারণ করলেন সদানন্দ চৌধুরী।

মুখে বললেন—‘না—’

‘চৌধুরী মশাই—আমি কি বললাম আপনি শুনতে পেয়েছেন—।’

‘পেয়েছি। আমি একবারেই কানে খাটো নই। ঐ যে পাখীটা শিষ দিচ্ছে, ও হল এক জাতের ময়না। যাই হক, দুশ টাকা দিলেও আমি চিঠি ফেরত দেব না।’

নিজেই জানেন না কি করে সংযত গলায় বুক পকেটে মানিব্যাগটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে বোঝাতে শুরুর করলেন অনন্ত মল্লিক।

‘দেখুন, আমার গাছটা—’

‘গাছটা আমার—’ সোজাসুজি জবাব এল ও তরফ থেকে।

এ দিকে তর্ক বিতর্ক শুরুর করে বিশেষ লাভ নেই, কারণ মাথা পাগল লোকের সঙ্গে যুক্তির সাহায্যে কোন কিছু মীমাংসা আশা করা নির্বৃদ্ধতার পরিচয় মাত্র।

‘আচ্ছা গাছটার উপর আপনার এত টান কেন?’

‘বরাবরই টান রয়েছে। গাছটা খুবই সুন্দর।’

কিন্তু এমন বেয়াড়াভাবে জায়গা জুড়ে থাকলে কি করে চলবে? আমার রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে—।’

‘বেয়াড়াভাবে জায়গা গাছটা জুড়েই পারে না। তুমি যখন জন্মাও নি, তখন থেকে ও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে।’

‘বনবাদাড়ে কেই বা গাছটাকে দেখতে যায়—।’ অনন্ত মল্লিক এবারে বিদ্রূপের খোঁচা মারলেন ক্রোধের সুরে।

‘কেউ দেখবে বলে তো গাছ গজায় না, নিজের খুঁশি মত যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তার শেকড় বসায়।’

কোলের উপরে ছাই রঙের আলোয়ান টেনে নিয়ে সদানন্দ চৌধুরী আবার চোখ বন্ধ করলেন। বেড়াটা এবারে এক লাফ দিয়ে কোলে উঠে হাত পা বিছিয়ে ঘুমোতে শুরুর করল।

‘ঠিক আছে, দুশর জায়গায় তিনশ টাকা দেব আমি। কি বলেন চৌধুরী মশাই?’

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, তিনি চোখ বন্ধ করে ঘড়ির পেঁড়ুলামের মত মাথা নাড়তে লাগলেন—।

‘আচ্ছা, পাঁচশ। পাঁচশ টাকায় রাজী হয়ে যান।’ উত্তেজনার মুখে বলে ফেললেন অনন্ত মল্লিক। বলেই কিন্তু অনুশোচনা হল। জীবনে অনেক

চড়াই উৎরাই পার হয়ে এসেছেন বলে মূল্য বোধ বা বিচারে তাঁর ভুল হয় না।

আবার নিস্পন্দ শরীরে একটু দোলা লাগল। কেবল মাত্র ইশারায় আবার জানিয়ে দিলেন সদানন্দ চৌধুরী টাকার লোভে গাছের স্বত্ব তিনি মোটে ছাড়তে রাজী নন।

‘আচ্ছা ঠিক আছে—’ যুদ্ধের ভীষণে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে অনন্ত মল্লিক গর্জন করে উঠলেন এবারে—‘জমি আমার, সেখানে আমি যা খুঁশি তাই করব। আচ্ছাই কন্সট্রাক্টরকে ডেকে বলছি, কালকে সকালের মধ্যে যেন লোক লাগিয়ে দেয়। তারপর যার খুঁশি, সে আদালতে যেতে পারে। আমি গ্রাহ্য করি না।’

সত্যিই গ্রাহ্য করার মতন নয়, অনন্ত মল্লিক মনে মনে ভাবছিলেন। কিই বা করতে পারে আইনের ভয় দেখানো ছাড়া। আর আদালতে যদি শেষ পর্যন্ত নালিশ করেই বসে, বড় জোর দু-একশ টাকা জরিমানা করবে। বিশেষ ক্ষতি হবে না। গোড়া থেকেই এই ব্যবস্থা করলে অনর্থক সারাটা দিন এভাবে নষ্ট হত না।

পরদিন দুপুরবেলা বিপ্রাম না করে ধীরে সুস্থে গাছটা দেখতে রওনা হলেন অনন্ত মল্লিক। সকাল বেলাই গাছ কাটার লোক দুজন কাজে হাত দিয়েছে, অতএব পুরোটা না হক, অর্ধেকের বেশি নিশের মাটিতে ধরুসে পড়েছে। নতুন তৈরি রাস্তাটা ধরে প্রফুল্ল মনে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি এগিয়ে চললেন। এখানে ওখানে পাখীর ডাক, দুপুরের হাওয়া ঝড়ের মত বইছে। কিন্তু গাছ কাটার শব্দ তো শোনা যায় না। তা হলে বোধ হয় গাছটা কাটা হয়ে গেছে।

রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সে দিকে আর কয়েক পা এগিয়ে চোখে পড়ল। গাছটা একভাবেই আকাশ ঢেকে উদ্ভতভাবে দাঁড়িয়ে। গাড়ির কাছে সবুজ সবুজ অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। গাছ কাটতে এসে দুটি লোক দিবা ছায়ায় বসে বিড়ি মুখে গালগল্প করছে।

‘এ্যাই—কি হচ্ছে কি? গাছ কাটস নি কেন?’

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে একজন ঘাড় ফিঁরিয়ে বলল—‘আপনি কে বাবু?’

‘আমি মালিক—’ রাগে ফেটে পড়লেন অনন্ত মল্লিক।

‘সে বাবুও বলল তিনিই গাছের মালিক। ঐ যে মগডালে উঠে বসে আছে। দেখুন না।’

একটা সন্দেহ বৃকের মধ্যে আল-

গানের মত খুব জোরে ফুটল। সদানন্দ চৌধুরী। নিশ্চয়ই সেই এসে জুটবে। গাছের নিচে এসে কুলন্ত শেকড় সরিয়ে পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলেন বেশ উঁচুতে মোটা একটা ডালে গা এলিয়ে হাসি-হাসি মুখে সদানন্দ চৌধুরী বসে আছেন।

‘শয়তান, কুচুটে, মতলব-বাজ বদ-মাস—’ মনে মনে বললেন অনন্ত মল্লিক। কিন্তু মুখের ভাব মোলায়েম করতেই হল।

‘নেমে আসুন চৌধুরী মহাশয়। এরা কাজ করতে পারছে না।’

‘না—’

‘কতক্ষণ বসবেন ওখানে। শেষ পর্যন্ত নামতেই হবে—’

‘না শীতকালটা দীর্ঘ। এখানে কাটিয়ে দেব ভাবছি।’ ফিকফিক করে হাসতে শুরু করলেন সদানন্দ চৌধুরী। কুল গাছ নাড়া দিলে ঝর ঝর করে কুল ঝরে পড়ে, অনেককাল আগেকার সেই স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ উঁকি দিয়ে পেস বলে মোটা গাছের গাঁড়িটা দু হাতে প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখলেন অনন্ত মল্লিক। বিশেষ লাভ হল না, উল্টে কাক্সর কাছে পড়ঘোন বাত টনটন করে উঠল।

‘আপনি না নামলে আমিই উঠব।’ অনন্ত মল্লিক সত্যি সত্যিই কামিরী কোটটা গা থেকে খুলে ফেললেন। হাতের ছিঁড়ি, মাথার ফেস্ট হ্যাট মাটিতে রেখে একটা শক্ত মত ডালে পা দিয়ে হাতে ধরবার মত আরেকটা ডাল খুঁজতে লাগলেন। ছেলোবেলার তিনিও গ্রামে থাকতেন, গাছে চড়া তখনকার দিনে শিলের মত সহজ ছিল। কিন্তু তার পরে অভ্যাসের বদলের সঙ্গে সঙ্গে শরীর দখলী হয়ে গেছে। ওজনও নেহাৎ কম নয়। পাখীর পালকের মত হালকা লোকটা যেভাবে গা এলিয়ে অত উঁচুতে বসে আছে, তত খুব তিনি পেরেছে পারবেন কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে আর এক দফা বড়িয়ে বলার চেষ্টা করা যাক।

ঠিক যেন এক ঘর দর্শকের সামনে গলাবাজী করে বক্তৃতা দিতে নেমেছেন, এমনি ভাবভঙ্গি করে হাত নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন অনন্ত মল্লিক। একবার বললেন পরোপকারের মত মহৎ গুণ নেই, আর একবার পালিশের ভয় দেখালেন। এই বয়সে স্যাং-সেতে ঠান্ডায় ওখানে বসা বিপজ্জনক, গাছটা এখনই কাটার হুকুম দিলে পিছলে পড়ে মাথা ফাটবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

‘তারা দুজনে লোকটাকে ওখন

থেকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে আর—’ হুকুম করলেন অনন্ত মল্লিক।

‘না বাবু, আমরা গাছ কাটি, মিছি-মিছি গাছে চড়ার কেন। তা ছাড়া এখন দু’ঘণ্টা আমাদের দুপুরের ছুটি—’

লোক দুটো স্বস্তিপ্রাপ্তি গাঁড়ি দিয়ে নিয়ে যে ঝর মত চলে গেল। আর উপায় না দেখে দুহাতে চেপে বেশ কয়েক ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলেন অনন্ত মল্লিক। চারদিক থেকে ডালপালা, পাতা কোলানো শেকড় যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তাঁকে ঘিরে ফেলল। মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, কিন্তু তরুণ কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। জমাট পাতার ছাউনীর মধ্য দিয়ে একটু ঝিরঝিরে হাওয়ার ছোঁয়া আর কুচি কুচি সোদের কথা। ছেলোবেলার অনেক গল্প কোথা থেকে বকুল ফুলের মত মনের মধ্যে টুপটাপ করে পড়তে লাগল। গ্রামের দাঁঘির পাড়ে রাজ-হাসির দল, সারা বিকেল শামুক খুঁজত। একবার সাদা ধবধবে একটা হাঁস ধরতে গিয়েছিলেন দুজনে। তিনি আর শিবু নামে দস্তদের চ্যাঙা ছেলোট। বাধানো ঘাটের শ্যাওলা-পছল সিঁড়িতে পা হড়কে একেবারে জলের নিচে তলিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। জলের ভেতরটা সবুজ দেখায়। চোখ খুলতে ভয় করছিল, কিন্তু তবু চোখ খুলে সবুজ লতাপাতা কত রকম পোকা দেখেছিলেন সেদিন। অনেকটা এই পাতা-খেরা সবুজ অশ্বকারের মত। শিবুও সত্যিই জানত না। বুদ্ধি করে শ্রীকৃষ্ণ কাকাকে ডেকে এনেছিল, নইলে কি হত বলা যায় না।

খানিকটা উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা মোটা ডালে পা ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন অনন্ত মল্লিক। শহর থেকে দস্তদের বড়-ছেলে বিজন দু-তিনজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছিল। মোহনপুরের ফঙ্গলে শিকারে যাওয়ার কথা হল। ওদের সঙ্গে দুটো বন্দুক ছিল। শিবু ভোর রাস্তার হুপি চুপি ডাকতে এসেছিল, লোভ সামলাতে পারেন নি তিনি। জগল দেখা সেই প্রথম। গাছের পর গাছ জড়াঝড়ি করে যেন প্রকাশ দেওয়ার মত চারদিক ঘিরে ফেলেছে। মাথার উপরেও আকাশ দেখা যায় না। অন্যমনস্কভাবে কি করে যেন দল ছাড়া হয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার পরে পথ হারিয়ে সে কি দুর্ভোগ। বুনো মুরগীর পাখার ঝটপট শব্দ, গুলীর আওয়াজ আর বৃকের মধ্যে উজ্জনার ধাক্কা।

এখানে গাছ পাতার আড়ালে ঠিক

সেই পথ হারানোর অনুভূতি নতুন করে টের পেলেন অনন্ত মল্লিক। রোজকার জীবন থেকে অনেক দূরে, নাগাল ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটা জগতের সীমানায় তিনি পৌঁছে গেছেন। অসম্পূর্ণ রাস্তাটা বড়ি এ পর্যন্ত এসে হারিয়ে গেছে চেনা থেকে অচেনার রাজ্যে।

এতক্ষণ বেশ শান্তিতে ছিলেন, রাস্তার কথা মনে হতেই সদানন্দ চৌধুরীর হাসি ভরা মুখটা চোখের সাননে ভেসে উঠল। মুখ তুলে আরও উঁচুতে তাকিয়ে দেখলেন ঠিক যেন নিজের বাড়ির বারান্দার আরাম কেন্দ্রায় শূন্যে ঘুমোচ্ছে বড়োটা। জুলে থাকা রাগ আবার শ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠল ছাই-চাপা আগুনের মত।

‘দুনেছেন, নেমে আসবেন কিনা শেষ বারের মত বলুন—’

কোন উত্তর এল না। তাঁকেই উঠতে হবে তা হলো। এ পর্যন্ত ভাবি ডালগুলোর পা দিয়ে উঠতে খুব অসুবিধা হয় নি। বাঁ দিকে বেশির ভাগ ডালই খুব সরু, একটু চাপ পড়লে মনে হয় সহজেই ভেঙে যাবে। ডান দিকে অবশ্য একটা ডাল নজরে পড়ল তবে নাগালের মধ্যে নয় বলে পা কসকে যাওয়ার ভয় আছে। তবু ঝুঁকি নিতেই হবে। জীবন ভোর অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন অনন্ত মল্লিক। সাক্ষ্যের উঁচু ধাপে ওঠা যে খুব সহজ কাজ নয়, সে কথা খুব ভালভাবেই জানেন তিনি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে একটা সরু ডালের খোঁচা লেগে সিন্কেস সাঁট অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। পিঠের কাছে ছড়ে জ্বালা করছে। কিন্তু সেদিকে নজর না করে নাগালের বাইরে শক্ত ডালটার দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

‘দেখো, দেখো সাবধানে—’ ঘুমন্ত মানুষটা সজাগ হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলল।

চমকে উঠলেন অনন্ত মল্লিক। ছারোছারা অশ্বকারে সব কিছু কুয়াশার মতো ঘোঁরাটে, তবু এদিক-ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল শক্ত ডালটার গোড়ার কাছে একটি ছোট-খাট পাখীর বাসা। কালো মত পাখীটা দু ডানা ছাড়িয়ে ঘর আগলে বসে আছে। মুখটা কিন্তু তাঁরই দিকে ফেরানো। শান্তিতে ভরা এই নিরবিলাতে একজন মানুষের উপস্থিতি যে একেবারেই পছন্দ হয় নি, তা তার পদতিল মত চকচকে চোখ দুটো দেখলে বেশ বোঝা যায়।

‘দিয়েছিলে আর একটা হলেই

আড়িয়ে। পাখীটা তাহলে উড়ে পালাতো।

‘বেশ হাত—’ বিরক্ত চোখে মুখ ফেরালেন অনন্ত মল্লিক। পাখীটা মাথা উঁচু করে লক্ষ্য করছে, তাঁকেই। সামান্য হাত-পা নড়লেও তার ডানা দুটো থর থর করে কেঁপে উঠছে।

‘আপনি নামবেন কিনা বলুন—’
‘না’

‘তাহলে আমিও উঠব। পাখী-টাখী, আমি গ্রাস্য করি না।’ অনন্ত মল্লিক মুখ দিয়ে শব্দ করে হাত নেড়ে পাখী তাড়াতে চেষ্টা করলেন। পক্ষীর মত চোখ দুটো যেন হীরের কুচি। ডানা দুটো কাঁপিয়ে পাখীটা সামান্য নড়ে উঠল, কিন্তু উড়ে গেল না। প্রতিপক্ষের শক্তি পরখ না করে ছাড়বে না, এমনি চ্যালেঞ্জের ভাব ওর দৃষ্টিতে। পাতা সূক্ষ্ম একটা সরু ডাল মট করে ভেঙে নিয়ে সজোরে পাখীর গায়ে খোঁচা দেওয়া মাত্র ভীষণ জোরে ডানা আপটে বাসা ছেড়ে আরও দূরের একটা ডালে গিয়ে বসল। খড়কুটো জড়ানো ছোট একটি বাসায় তিনটি হালকা নীল খুঁদে খুঁদে ডিম সাজানো।

‘দিলে তো তাড়িয়ে—। আর পাখীটা ফিরে আসবে না’ সদানন্দ চৌধুরী আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন।

আপদ বিদায় হয়েছে—মনে মনে ভাবলেন অনন্ত মল্লিক। বৃক্ষ জিতে পরাজিত শত্রুর দিকে যেভাবে মানুষ তাকায়, ঠিক সেইভাবে চোখ ফেরালেন খালি পাখীর বাসাটার দিকে। কিছূ নয়, নিশ্চয় পবিত্রত্মের ফলে বৃকের মধ্যে খড়কুটো কবছে। বৃকে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন মোটা ডালের কিনারে। তিনটি নরম তুলতুলে পাখীর গাছা যেন ওই খালি বাসাটার থরথর করে কাঁপছে।

‘দোষটা কার?’ ঝাঁজিয়ে উঠলেন অনন্ত মল্লিক—‘এখানে আমি ইচ্ছে করে উঠি নি। আর ভারি তিনটে ডিম।’

অনন্ত মল্লিকের চোখের সামনে ডিমের স্বচ্ছ খোলা ভেদ করে পাছাগুলো যেন আবার নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মা পাখীটা উড়ে যায় নি এখনো। সামনের ডালে বসে তাঁকে লক্ষ্য করছে। এক পা এক পা করে বাসার দিকে এগোলেও এখনও যেন মানুষকে তাব বিশ্বাস নই।

‘একেবারে অজমুখ—আমি যেন ওকে ডিমে তা দিতে বারণ করেছি—।’

‘তোমার পেছায় ওজনে গোটা গলটাই ভেঙে পড়বে—সে কথা পাখীটা

বুঝেছে—’ উপরতলা থেকে সদানন্দ চৌধুরী-উঁকি মেরে জানালেন

এ সরু ডালটায় পা না ঠেকিয়ে আর উঁচুতে ওঠা অসম্ভব। সবুজ কুয়াশার মধ্যে ঠিক যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন অনন্ত মল্লিক। নিচে নামতে গেলেও এখন যে তোলপাড় হবে। তাতে মা পাখীটা ভয় পেয়ে ঠিক উড়ে চলে যাবে। দুপূরের পর বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। আস্তে আস্তে ঠান্ডায় ডিমের ভেতরে প্রাপের স্পন্দনটুকু বরফের মত জমে উঠবে। তারপর সব শেষ।

‘তার চেয়ে আমি এখানে বসে থাকি। বোকাটা যখন বৃকবে ওর ডিমের প্রতি আমার কোনই লোভ নেই—তখন আপনা থেকেই ফিরে আসবে বাসায়।’ নিজের মনেই বিভ্রিবিড় করে বকতে শব্দ করলেন অনন্ত মল্লিক।

জায়গাটি মন্দ নয়। পিঠের কাছে ঠোকা দেওয়ার মত আর একটা শক্ত ডাল রয়েছে। পা ছিড়িয়ে বেশ আরামে বসে এতক্ষণ বাদে মনে পড়ল দুপূরে এই সময়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেবার কথা। তাই বোধহয় চোখ দুটো—নিজের

শান্তাহিক-বসুদত্তীর আগামী মাকর্ষ

চটগ্রাম জন্মগার লেটনখাত বাঁর বিপবী
প্রীতানন্দ সিংহ আগামী ৩৪ল সংখ্যা
(২৭-১-৬৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে
লিখছেন প্রাধান্যতা সংগ্রামের ত্যাগ ও
নবীকর অবব ক হিনী

অগ্নিশৃঙ্গের একটি অধ্যায়

থেকেই ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। হয়তো বা আকাশে হঠাৎ মেঘ করলো বলেই চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এল।

‘যদি বন্টি হয়? মুখ তলে জড়ানো গলায় বললেন অনন্ত মল্লিক

‘নাঃ, ভাল হবে না বোধহয়—’

সদানন্দ বাতাসের গন্ধ কুঁকরায় দিলেন ‘ওভাবে চাপ কবে বসে থাকো। পাখীটা তাহলে ফিল্মতেও পারে। একটা নয়, অন্তত এক ডজন পাখীর বাসা দেখতে পাচ্ছি এডালে-ওডালে। কাজেই আর হেঁচকি কোর না।’

গাছেব ছালটা খসখসে, শুকনো, রস-কবহীন। কিন্তু অন্তত এক ডজন পাখী এখানে বাসা তৈরি করেছে। এ ডিমগালাব মত আরও কত ডিম—উত্তাপ আর আশ্রয়ে একটু একটু করে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

‘চৌধুরী মশাই—’ অনন্ত মল্লিক চোখ কচলে ফিস ফিস করে ডাকলেন।

‘উঃ—’

‘এ গাছটা কত পুরোন—’

‘তা অন্তত একশ বছর তো হলই।’

—আকাশ আলু মাটির মাঝখানে শূন্যে এক বৃলন্ত আসনে বসে অনন্ত মল্লিক দেখলেন মেঘ সরে যাওয়াতে চারদিকের অন্ধকার দেওয়াল যেন সোনালী হয়ে উঠল। আবার হাওয়া উঠেছে, আর ঢেউ-এর মত পাতাগুলো এঁদিক থেকে ওঁদিকে সরে সরে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে ডালপালা নড়ায় শব্দে আবার ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে অনন্ত মল্লিক হিসেব কবতে বসলেন একশ বছর ধরে কত পাখী এই-সব ডালে বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে চলেছে। গাছের পাতা নয়, সেই সব রাশি রাশি পাখীর ডানা কি চোখের সামনে কাঁপছে? খালি বাসাটার চারদিকে তারা যেন ঘুরে ঘুরে কেবলই উড়ছে। হাত বাড়ালেই ওদের ছোঁয়া যায়, কিন্তু একটু নড়লেন না অনন্ত মল্লিক। খুব শান্তভাবে চোখ বন্ধ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙে গেলো— আনন্দের আতিশয্যে প্রায় চিৎকার কবে উঠেছিলেন আর কি। পাখীটা আবার ফিরে এসেছে—। খালি বাসায় সেই ডিম তিনটি ডানা ছিড়িয়ে ঢেকে সেও যেন শেষ দুপূরবেব রোদের আমেজটুকু উপভোগ কবছে।

‘চৌধুরীমশাই—’

‘উঃ—’

‘পাখীটাকে দেখেছেন?’

‘দেখিছি—।’

‘ওটা কি পাখি?’

‘এক জাতের ময়না—। শীতের শেষে ওরা এসময়ে ডিম পাড়ে।’

গাছের নিচে এসময়ে গোলমাল শোনা গেলো। গাছ কাটবে বলে কুঁল দুটো ফিরে এসেছে। কাজেব গাফিলতির জন্যে ওভারশিয়ানবাবু বকাবকি কবছেন চড়া গলায়।

‘গাছটা আমি কাটব না চৌধুরী মশাই—।’

‘হঃ—’ বলে সদানন্দ চৌধুরী এবারে নামতে শুরু করলেন। তাঁর পেছনে পেছনে অনন্ত মল্লিক নিজেও। রাস্তাটা বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে পারে। খরচ অবশ্য অনেক বেশি পড়বে। তবু মনের আনন্দে বেসুরো গান গাইতে গাইতে অনন্ত মল্লিক অনেক নিচে একটা ডালে পা রাখার জন্যে বৃলে পড়লেন।

(বিদেশী ছায়াম)

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন পূর্বের কথা। গান্ধীজীকে দেশ-বাসী 'মহাত্মা' আখ্যায় বরণ করবে। কিন্তু রাজনীতিক-ক্ষেত্রে ভানতবর্ষের মত দেশে 'মহাত্মা'-আখ্যাটির আমদানী বাবা পছন্দ করেন নি তাঁদের অন্যতম ছিলেন ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ও। এ-বাপারে তিনি বিপিনচন্দ্র পাত্র ও জিন্নার সগোত্র। অথচ মহাত্মা গান্ধীকে শ্রীশচন্দ্র কারো চেয়ে কম প্রাণ্য করতেন না। গান্ধীজীর প্রত্যেকটি আন্দোলনে শ্রীশবাবু যোগ্য অংশ গ্রহণ করতেন। 'মহাত্মা' শব্দটির বিবরণে শ্রীশবাবুর কোন নালিশ ছিল না। অথবা গান্ধীজী যে 'মহৎ আত্মা'-র ব্যক্তি সে-বিষয়েও তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল রাজনীতিতে 'মহৎ' রাজনীতিক নিশ্চয়ই আসবেন; কিন্তু রাজনীতিক পেরিয়ে 'মহত্ব' প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাব স্থান ধর্মজগতে। গান্ধীকে বিদ্রান্ত করতে হলেই রাজনীতিতে 'ধর্ম' আমদানী প্রসঙ্গ। শ্রীশচন্দ্র তা চাইতেন না। আধ্যাত্মিক ভাবলব্ধতার স্রোতে ডেমে যাবার লোক ছিলেন না বলেই তিনি তৎকালের ঐ ভাবাবেশের বিরুদ্ধতা করেছিলেন।...

শ্রীশচন্দ্রের দীর্ঘকালীন কর্মজীবনে দুর্বল-তাব সশ্রেণে আপোষবক্ষা করতে দেখা যায় নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার সামর্থ্য তাঁর মধ্যে ছিল। কংগ্রেসকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি উহার আভ্যন্তরীণ সংগ্রামী-শক্তিকে প্রাণ্য করতেন বলে। কিন্তু যেখনই ঘটেছে সে-শক্তির অপঘাত এবং মিথ্যা ও দুর্বলতার সশ্রেণে আপোষবক্ষা-সেখানেই তিনি একক হলেও কন্দ-কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করে গেছেন।...

মনে পড়ে নেতাজী এবং আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর কীর্তিকলাপ ভারতবর্ষে প্রকাশিত ছবার পর 'এ-আই-সি-সি'র একটা অধিবেশনের কথা। বোম্বাই শহরে তার সভা জমেছে। জনমতের চাপে এবং নিজস্বের অক্ষম-সম্ভার মান বাঁচাবার জন্যে কংগ্রেস-কর্তারা একটি প্রস্তাব আনলেন উক্ত সভার কংগ্রেস-তাড়িত সভ্যচন্দ্র অর্থাৎ নেতাজীর 'সাহস' ও 'দেশপ্রেমের প্রশংসা করে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কর্তাদের ভণ্ডামীর সীমা বইল না। নেতাজী প্রশস্ত-প্রস্তাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে— 'though misguided' কথা দুটি।...প্রস্তাব শুনই বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জী। প্রতিবাদে তিনি বললেন : "ঐ দুটি শব্দ তুলে দাও, নইলে তোমাদেরই মান থাকবে না।"...কিন্তু ভোটের জোরে গান্ধীজীর কংগ্রেস নিজস্ব প্রস্তাব পাশ করে নিল। 'বিপথগামী' নেতাজীর 'সাহস' ও

'দেশপ্রেম' স্বীকার করে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পথচারী কর্তারা দেশবাসীকে কৃতার্থ করলেন এবং নিজেরা ভণ্ডামীর আনন্দে তৃপ্ত হলেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের মত সত্যিকারের বিপ্লবী-কংগ্রেসীরা সেদিন এতে তৃপ্ত হন নি।...

ভারতবর্ষের ভাগাভাগি শ্রীশচন্দ্র কোন কালে মেনে নেন নি। মেনে নেন নি বলেই তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে কংগ্রেস-ভূমিতে চলে আসেন নি। পাকিস্তানে ফেলে-আসা হিন্দুদের জন্যে কংগ্রেসের দ্রষ্টব্য নেই। তাই অর্ধাঙ্গ পরিত্যাগ করে বাকী অর্ধেকের তত্ত্বাবধানে তৎপর হতে গিয়ে যে-নাটক তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাব সশ্রেণে

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত দ্বারা

শ্রীশচন্দ্রের কোন যোগাযোগ থাকলো না। তিনি সেদিন-ও পবিত্র কর্তৃক বসেছেন :

"...জাতির জাগ্রত মনোভাবের বিকাশে অন্তরায় হওয়া, আপোষজনক স্বাধীনতা গ্রহণ করা, ক্ষমতার লোভে স্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করে দেশবিভাগ—এসব কোন অপরাধের ক্রমা নেই।"

(‘আমার অভিজ্ঞতা’—সাপ্তাহিক বঙ্গমতী, ১২-৮-৬৬)

বিবোধী-দলের নেতারূপে তিনি 'পাকিস্তান' কন্সটিটিউশন-এ আসে-যায়-এত এসেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের পাকিস্টানিক সম্পর্ক তখন বিঘ্নে ভেঙা হয়েছে। জনৈক মুসলিম সদস্য এ্যাসেমব্লিতে হঠাৎ সগর্বে বলে উঠলেন : "আমরা জনসংখ্যায় হিন্দু-স্থানের এক-চতুর্থাংশ হতে পারি; কিন্তু হিন্দুরা ভীড়। বখতিয়ার খিলজি মাত্র ১৭ জন অম্বাবোহী নিয়ে হিন্দুর বাংলা জয় করেছিল—কাজেই আমবা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে ভয়েই হিন্দুবা আত্মসমর্পণ করবে"—ইত্যাদি।...

শ্রীশচন্দ্র দমবার পাত্র নন। তিনি সহস্রো উত্তর দিলেন : "যাইরে থেকে যেসব মুসলমান এদেশে এসেছিল তাদের সংখ্যা স্থানীয় হিন্দুদের তুলনায় খুবই কম ছিল স্বীকার করি। এবং এ-ও স্বীকার করতে হয় যে পাকিস্তানী মুসলমানদের অতি নগণ্য সংখ্যকই তাদের বংশধর। পাকিস্তানী-মুসলমানবা পূর্বে হিন্দু ছিল এবং বিহাণত মুসলমানদের জগৎই তারা ধর্মত্যাগ করে আজকের বীরপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। অথচ ভারতে অবশিষ্ট বে-হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে স্থানীয় সদস্য বৃন্দে হিন্দু-কী

শোনছেন সে-হিন্দুসমাজ কিন্তু কারো ভয়ে ধর্ম বা ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে এসে মত 'সাহসী' হতে পারেন নি।"

পাকিস্তানের এ্যাসেমব্লিতে এ-ধারার প্রতিবাদ করার মত বৃকের পাটা এক শ্রীশচন্দ্র জাতীয় বিপ্লবীরই ছিল। অমন ভয়ভরহীন উচিত বক্তা কংগ্রেসী-বিপ্লবীদের মধ্যেও বিরল। শ্রীশচন্দ্রের এ-উক্তি এতই সত্য, এতই কঠিন ছিল যে, সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে উহার কান্ন হলো একটি জীবন্ত 'বম্বেশেলের' মত। সকলে নিশ্বাস হয়ে গেলেন। শব্দ পরের দিন করাচীর 'ডব্লু' পত্রিকা প্রস্তুত করলো :

"What Chattopadhyaya means ?"

মিঃ চট্টোপাধ্যায় কি 'mean' করেছিলেন তা পুনরায় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছিল না। অন্তত প্রশ্নকর্তার জন্যে তো নয়ই।...

পাকিস্তান কন্সটিটিউশন-এ এ্যাসেমব্লিতে ১৯৪৯ সালে লিয়াক আলি খান বললেন :

"The Muslim League is to convert Pakistan into a laboratory where we could experiment upon the principles of Islam to enable us to make a constitution to the peace and progress of mankind."

[মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে একটি গবেষণাগারে পরিণত করবে ইসলামের নীতি বিশ্লেষণ করার মানসে, যাতে ঐ নীতির ভিত্তিতে আমদের রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হতে পারে মানবের শান্তি ও অগ্রগতি বজায় রাখার সক্ষমতা।]

উক্তের দুর্ভাগ্য পূর্বব শ্রীশচন্দ্রের পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছিল :

"I am told that a country where a non-muslim is the head of the administration, Muslim cannot say 'Jumma Nema'!...Therefore the words 'equal rights as enunciated by Islam' are—I do not use any other word—a camouflage. It is only a hoax to us the non-muslims. These cannot be 'rights' enunciated by Islam."

[আমি শুনেছি যে শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানে কোন অমুসলমানকে বসালে নাকি কোন সং মুসলমান জুম্মার নামাজ পড়তে পারবে না।... তাই বলি, ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দেবে—ঐ উক্তিকে আমি আর কিছু

হলবো না, হলবো ভীত। এ-টাই
অমূল্যমানদের করছে একটি নির্যেট হলনা।
ইসলাম কাউকে 'অধিকার' দিতে পারে
না।।...

এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সংবিধান-সংসদে
ঐসলামিক-রাস্ট্রের বিলম্বিতকর আদর্শ ও
উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন :

"...The resolution makes the
state the sole authority received
from God Almighty through the
instrumentality of the people.
People have no power or authority,
they are merely post boxes accord-
ing to this resolution. The state
will exercise authority within
limits prescribed by him (God).
Where are the limits? Who
will interpret them? Surely
they are not people? One day
a Louis XIV may come and say—
'I am the state, annointed by the
Almighty', and thus paving the
way for advent of Divine Right
of kings afresh."

[সংবিধান প্রস্তাবটি জনসাধারণকে নিমিত্ত
মাত্র করে বিধাতার একমাত্র প্রতিনিধিত্বপে
প্রাপ্তকে খাড়া করতে চাচ্ছে। জনসাধারণের
হাতে কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকছে না।
তারা এ-প্রস্তাব মত পাবে শূন্য ডাকবাক্সের
মর্বাদ। রাষ্ট্রই হবে আদত নিয়ন্তা, ভগ-
বানের দেওরা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। কিন্তু
সে সীমা কতদূর? কে তার পবিধি নির্ণয়
করবে? জনসাধারণ নিশ্চয়ই নব?—এবং
একদিন হরতো একজন লুই- XIV (চোন্দ)
জাতীয় পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি
বলবেন—আমিই রাষ্ট্র, ভগবৎপ্ররিত আমি-ই
স্বাধীনতা,—এবং সেই পথেই নতুন করে
আসবে হরতো ভগবৎপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিষ্ঠিত
রাজতন্ত্র।।...

শ্রীশচন্দ্র সে-সাবধাবাগী লিখকব আলি
খানকে একদিন নিজের বকের বস্ত্র দিয়ে
ঘুমতে হয়েছিল, পাকিস্তানের জনসাধারণ ও
রাজনৈতিক দলগুলিকেও পবে সেই সাবধান-
বাগীই মর্ম দিয়ে অনুভব করতে হয়েছে।...

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এ ধাবার সংগ্রাম-
শক্তি লক্ষ্য করেই সঞ্জীবাঘা (কংগ্রেস-সভাপতি
থাকাকালে—১৯৬২ সাল) শ্রীশচন্দ্রের জন্মোৎ-
সব-দিনে লিখেছিলেন :

"He faught against the partition
of the country and since partition
became inevitable, he chose to
remain in E. Bengal, his state and
thus as leader of the opposition in
the Constituent Assembly he

opposed, though without success,
the establishment of a theocratic
state, believing that such a state
is an anomaly in modern lines."

[তিনি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন।
কিন্তু তৎসময়ে দেশ বিভক্ত হলে তিনি পূর্ব-
বঙ্গে তাঁর নিজের বাসস্থান থেকে যান, এবং
বিরোধী-পক্ষের নেতৃত্বপে ঐসলামিক-রাষ্ট্র
গঠনের বিবোধিতা করেন। যদিও ভাঙে
কড়কাষ হন নি, তবু বর্তমান যুগে ধর্ম-
নির্ভর-রাষ্ট্র যে অচল তা তিনি জানিয়ে
গেছেন।।...

শূন্য সংবিধান তাঁর কবার কালেই নয়,
বিগত আঠার বৎসর ধরেই শ্রীশচন্দ্র পাকি-
স্তানের বিধানসভা, জনসভা বা যে-কোন
ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ও অমূল্যমানদের স্বার্থ
রক্ষার্থে প্রচণ্ড সাহস ও তৎপরতা দেখিয়ে
এসেছেন।।...

এই নির্ভীক পুরুষই আবার ১৯৫৯
সালে দিল্লী সফরে এসে জওহরলালের সঙ্গে
দেখা করে তাঁর কুশলপ্রশ্নের উত্তরে বলে-
ছিলেন :

"You are the cause of our
difficulty."

[আপনিই আমাদের সকল দুর্ভাগ্যের
কারণ।]...

* * *
শ্রীশচন্দ্র ঘুরেছেন বহু দেশ। কিন্তু তাঁর
স্বকীর্ত্য সবার উর্ধ্ব বিরাজিত থাকতো
বলেই বিদেশীরা তাকে সোৎসাহে গ্রহণ
করতেন।... বঙ্গের ধর্ম-পাঞ্জাবী পরিহিত
শ্রীশচন্দ্র inter Parliamentary Conference
-এ (আন্তর্জাতিক বিধানপরিষদীয় মহাসভা)
উপবিষ্ট। তারিখ হল ১৯৫৩ সালের ২৭শে
মে। শ্রীশবাবুকে দেখে ইংলন্ডের রাণী
জিজ্ঞাসা করলেন উক্ত মহাসভার চেয়ারম্যান
মিঃ হেরল্ড হোল্টকে :

"Who is this distinguished
looking man in white?"

[শূন্যবসন পরিহিত ঐ বিশিষ্ট ভদ্র-
ব্যক্তিটি কে?]।

তখন শ্রীশবাবুকে রাণীর সঙ্গে পরিচিত
করে দেবার কালে হেরল্ড হোল্ট বলেছিলেন :

"He is one of the best loved
member of the Parliament Associa-
tion who is known affectionately
to hundred of members of the
Association throughout the world
as 'Charlie'. He is Mr. Chatto-
padhaya, leader of the opposition
in the Constituent Assembly in
Pakistan. He has the head of
Socrates and is most photographed
member of the Association."

[ইনি সংসদ-সংস্থার একজন প্রিয়তম
সভ্য। সংস্থার পৃথিবীব্যাপী শত শত
সদস্যরা আদর করে একে 'চার্লি' বলে
ডাকেন। এর নাম মিঃ চট্টোপাধ্যায়। পাকি-
স্তান সংবিধান-পরিষদের ইনি বিরোধী-
পক্ষীয় নেতা। সক্রিয়তাবাদ মত ইনি প্রাক্ত,
এবং সংস্থার সদস্যদের মধ্যে এর ফটো-ই
উঠেছে সর্বাধিক।]...

পাকিস্তানেও শ্রীশবাবুকে দল-উপদল
নির্বিশেষে সকলেই কিন্তু ভালবেসেছেন,

রূপার বই

অনুবাদ-সাহিত্য

উপন্যাস

ভাতার জিতাগো—বরিস পাস্টেরনাক	
অনু : দীপক চৌধুরী	১২.৫০
কাদম্বরী—বাণভট্ট	
অনু : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	১২.০০
অপমানিত ও জাহ্নিত—ডস্টয়েভস্কি	
সম্পাদনা : গোপাল হালদার	
অনু : সমরেশ খাসনাবিশ	৮.০০
জম্বুত-আলোডে—হেরমান হেস	
অনু : শিউলি মজুমদার	৬.০০
অন্তগামী সূর্য—ওসামু দাজাই	
অনু : কল্পনা রায়	৮.৫০
অচেনা—আলবার কামু	
অনু : প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮.০০
পতন—আলবার কামু	
অনু : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুনোপাধ্যায়	৮.০০
দাম্পত্য প্রেম—আলবার্তো মোরাভিয়া	
অনু : চিত্তরঞ্জন মাইতি	৩.৫০
উন্মত্ত—স্বেফান জেরায়াইগ	
অনু : দীপক চৌধুরী	৩.০০
রম্মী—স্বেফান জেরায়াইগ	
অনু : দীপক চৌধুরী	৩.০০
উত্তরণ—স্বেফান জেরায়াইগ	
অনু : দীপক চৌধুরী	৩.০০
শেষ প্রাঙ্গণ—বরিস পাস্টেরনাক	
অনু : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩.০০
মোনো লিসা—আলেকজান্ডার লারনেট- হলেনিয়া	
অনু : বাণী রায়	২.৫০
৩ বছরের পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকার জন্য লিখুন	
১৫ বাৎসরক চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা—১২	

প্রাধা করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুও তিনি কৌতুকোচ্ছ্বল রসমিশ্রণে পরিবেশন করতেন বলেই তাঁর গালমন্দ কাজকে কোন-দিন ক্ষুণ্ণ করে নি।

তাঁর জনপ্রিয়তার একটু পরিচয় পাওয়া যাবে পাকিস্তান জাতীয়-পরিষদের সদস্য প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খানের একটি লেখা থেকে। শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কেই তিনি লিখেছেন : ...“বয়স আশির উপর। মাথার চান্দ্র বারো। আমরা যমুনার কাঁচি চরের মত একদম পরিষ্কার। গোফকোড়া বাঘা। রসগোল্লা পাকি আড়াই সের হলে আজকাল কোন রকম চলে। লুচি গণ্ডালশেকের তিতিং কম হলেও বিশেষ আপশেষ নাই (নিভাঁজ স্বাস্থ্য তো, সংবন আছে)।

“বাণী—দেহ ভূগত হতে বিনির্গত হয়—পাখরে বাধা-পাওয়া উৎসর্গের উচ্ছ্বাসের মত। স্বরাব ইংরেজের বস্তুত্বকে উপেক্ষা করে চলেছেন—আজ কোথাও সত্যকথা বলতে ভয়-ভর নাই।

“বহুবীর বিদেশে গিয়েছেন। পাশ্চাত্যের মসিকরা এই ধৃতিপরা বড়ো খোকাটিকে পেলে ভেঙে উঠে।”... (১৯৫২—৫৩ সন)

আবদুল কাদির তাঁর ‘In Profile’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

“Sris is a typical Bengali. As a politician he has a taste for oratory. He combines idealism & commonsense”

[শ্রীশচন্দ্র খাঁটি বাঙালী। স্বাক্ষরীভূত তিনি। বাম্পী তিনি। তাঁর মধ্যে আদর্শবাদ ও সামরাজ্যবাদের অপূর্ণ সমাবেশ।]

(Illustrated Weekly of Pakistan, 22. 3. 53)

শ্রীশচন্দ্র সত্য সিংহপুত্রের। জীবনে গারিগকে বরণ করেছেন তিনি ত্যাগী সাধকের মত। নইলে প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন তিনি তাঁর ওকালতি-ব্যবসার থেকে। কিন্তু প্রথমাবধি তিনি দৃষ্টান্ত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই বড়লোক মজেলদের দিকে তেমন নজর দিতে পাবেন নি। ঢাকার এমন একটি রাজনীতিক (বিপ্লবীদেরকে জড়িয়ে) মামলা সম্বন্ধিত হয় নি তার সংগে উকিল হিসেবে শ্রীশচন্দ্র যুক্ত ছিলেন না। বলা বাহুল্য, এতে তাঁর অর্থ-প্রাপ্তি তো দূরের কথা অর্থ-ব্যয়ের সম্ভাবনাই থাকতো অনেক সময় বেশি। তাঁকে তৎকালে বলা হতো—“The standing counsel of the revolutionary”:-:-

বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় তাঁদেরই হয়ে মামলা লড়বার অবকাশে। এবং এই অবকাশেই তিনি নিজের মধ্যেও একটি বিপ্লবী-মনকে খুঁজে পেরেছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলায় চুবাইন গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল নবীন চট্টোপাধ্যায়। চার বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয় এবং মাতা শিবকামিনী দেবীই পুত্রকে বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ করে তোলেন। অপূর্ণ স্বাধা প্রচুর মেধা ও বুদ্ধি শিশু বয়স থেকেই শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে পবিস্মৃতি হতে থাকে। দেশপ্রেম এবং ঔদার্য তাঁর যেন পূর্বজন্মের অর্জিত কৃত্য।

শ্রীশচন্দ্র তখন বালক মাত্র। মহাবাদী ভিক্টোরিয়ার অর্থশাস্ত্রী-ম্যাক্স বাক্সকাল পূর্ণ হওয়ার তার সুবর্ণজন্মতী। সে উপলক্ষে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদেরকে রুমমারি উপহার ও মেটাই দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ছোট বালক শ্রীশচন্দ্র এ-উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। হেডমাস্টার-মশাইকে বলছেন তিনি—“মাদারী ভিক্টোরিয়া তো আমাদের বাণী নন, আমরা এতে যোগ দেব কেন?”... ক্ষুদ্র বালকের মধেকার এই বিদ্রোহীকে সেদিন পাড়াগাঁয়ে লোকেরা হস্ততো উপেক্ষাই করেছিল। কিন্তু সে-বিদ্রোহীই তো ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করে একদিন উত্তর বাংলার উত্তরাসে স্রাধা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন।... তিনি ছিলেন বাংলায় বিপ্লবীদের সুদৃঢ়, তিলক ও অরবিন্দের অনাবাগী, দেশবন্ধু-মতিলাল ও গান্ধী-জিন্মার বন্ধু।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি জাতীয়-সংগ্রামে অবলিপ্ত থেকে পাকিস্তানের জন্ম-লাভের পর বিবোধী-পক্ষের নেতৃত্বপেও বিধান সভায় এবং বাহিবে এতাবৎ সংগ্রাম করে এসেছিলেন অমঙ্গলমানদের স্বার্থ ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে। কিন্তু আরও খাঁ পালার-মেটারী গভর্নমেন্টের ও গণতন্ত্রের কণ্ঠবোধ করার পর ৯২ বৎসর বয়সে কলকাতা চলে এসেছিলেন তিনি পুত্রপৌত্রদের কাছে। এই অবসর-গৃহীত জীবনে ৯৩ বৎসর বয়সেও তাঁর চিন্তা ও বান্ধি সদা জাগ্রত ছিল। অধুনা প্রকাশিত তাঁর অতি ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধ থেকেই তাঁকে সমাক বোঝা যায় বলে সে-প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে দিলাম : “আমরা গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ নীতি স্বীকার করি নি। আমাদের আপোষ মনোবাস্তি ছিল না। ইংরেজের অনুগ্রহে স্বাধীনতা লাভ আমাদের কাম্য ছিল না। কারণ সে-স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। বলহীন ভরতবাসীকে শক্তিমান করে তোলা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের নীতি ছিল বলপ্রয়োগে ভাবভেদ দাসত্বলোপ। গান্ধীজীর আদর্শ—অহিংস অসহ-যোগ স্বাধা আত্মশুদ্ধি ও আত্মার স্বাধীনতা লাভ। এখানেই আমাদের সংগে তাঁর আত্মশ-পাতাল ব্যবধান।”... (‘আমার অভিজ্ঞতা’—বঙ্গমতী সাপ্তাহিক—১২-৯-৫৫)

শ্রীশচন্দ্রের মত হৃদয়বান, ক্ষিত্তভাবী ও

শ্রীরবুদ্ধির লোক দুর্লভ। তিনি কারো উপর ব্যক্তিগত রাগ বা শ্বেষ পোষণ করতেন না। অল্পে ভুষ্ট এই ব্যক্তি নিজে যোরপ্যাচের ধার ধারতেন না বলেই সরল পথ ও সরল মনের সান্নিধ্যে তিনি শিশুর মত খুশি হয়ে উঠতেন। ১৯৪৮ সনের ঐ ইংলিশ পালার-মেটারী কনফারেন্সের সময়ই তাঁকে একদিন বিলেতের কনসারভেটিভ পার্টির মিঃ বাটসার প্রশ্ন করেছিলেন :

‘Do you abuse us now?’

[আপনি কি আমাদের এখনো গালমন্দ করেন?]

উত্তরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীশচন্দ্র অনতিবিলম্বে বললেন :

‘Why should I abuse you now? At that time you were treated as heaven-born, so I had to abuse you. Now we are equals and I am not a member of a Subject Nation.’

[এখন আমি গালমন্দ করবো কেন? তখনকার দিনে আপনারা নিজেদেরকে ভগবৎপ্রেমিত বলে মনে করতেন, তাই আমাকে গালির আশ্রয় নিতে হবো। কিন্তু এখন তো আমরা সমান-সমান; আমি এখন পরাধীন জাতির লোক নই।].....

বাটলার সাহেবের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীশচন্দ্রের একটি কৌতুকোচ্ছ্বল উক্তি এখানে উদ্ধৃত করব। কাম্মীর-প্রসঙ্গেই তাঁর সঙ্গে একদিন পাকিস্তান সংবিধান-পরিষদেরই অন্যতম সদস্য শ্রীভবেশ নন্দীর-আলাপ হচ্ছিল। শ্রীশচন্দ্র ভবেশ নন্দীকে বলছেন : “এমন কথা কোনদিন কি শুনেছি যে ‘ফরিদাদি’ হয়ে মামলা রুজু করতে গিয়ে কেউ ‘আসামী’ হয়ে বেরিয়ে আসে?”—জওহরলাল নেহরুর ইউ-নোতে কাম্মীর প্রসঙ্গে যে হাল ঘটেছে তাকে কটাক্ষ করে এ-উক্তি হলেও এতে ক্রোধ নেই, ক্ষোভ নেই—আছে হিউমার-মিশ্রিত ককককে সত্য। চার্লি-র ঢঙে এই যে সত্য ভাষণ, এ কিন্তু শূন্য নেহরুজীর বৈদেশিক-নীতি সম্পর্কে নয়, তাঁর কমন্-ওয়েলথ-বিশ্বাসী বুদ্ধি সম্পর্কেও।...

এই ইন্ডিয়ান টেম্পল পারসোনালাটি সত্য বাংলায় খাঁটি সন্তান, শোষলোভী বণ্ণের টিপকাল চরিত। ডিরানবুই বৎসবেই এই সবল ইতিহাসখানির সঙ্গে কথা বলে দুর্বলও শক্তি পেয়েছে, নৈরাশ্যের পুজারীও সহসা আশার আলোক চোখে দেখেছে। কিন্তু জীবন্ত সে-ইতিহাস আজ অতীতের বস্তু হয়ে গেল। পবন বেদনার উভয় বাংলার মানুষ জেনেছে যে, শ্রীশচন্দ্র আর ইংরেজের নেই। গত ২২২ জন্মদিয়ারী তিনি দেহরক্ষা করেছেন। প্রচণ্ড কর্মশক্তির কর্মঅতিব্রত-লোকে মহাপ্রয়াণ ঘটেছে।...

গ্রীস ও রোমের

ঐতিহাসিক

প্রথম পর্ব

ভূমিকা

[আমরা হিটলারের টিউটন, কেল্ট ও গ্রাক-হেলেনার ইউরোপের কথা ও কাহিনী আলোচনা করেছি। টিউটন ও কেল্ট জাতি-গোষ্ঠীর উপকথার ক্ষেত্র খুব বেশি ব্যাপক নয়; কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যেই সেগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও পরিসর অল্প বলে কাহিনীগুলির শৃংখলায় আউটলাইনটুকু দিয়ে গেছি, বাওয়ালফের মত বহু আখ্যানকেও মাত্র কয়েকটি লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু গ্রীক উপকথার ক্ষেত্রে বৃকি সেটুকু করাও সম্ভব নয়, কারণ তার ক্ষেত্র অতি বিদ্যমান। আমাদের অষ্টাদশ পুরাণের যতই সার সংক্ষেপ করা যাক না কেন, শৃংখলায় তার সুচীপত্র প্রণয়নেই একটি ছোটখাট গ্রন্থের পরিসর হবে। গ্রীক ও রোমক কথাকাহিনীর ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে। তা ছাড়া অন্তরঙ্গ কথায় এই যে, বিভিন্ন গ্রীক কাহিনীর মধ্যে পাঠকদের অনেককেই পরিচিত। এই কারণে নিছক কাহিনী বলার পরিবর্তে আমি বিভিন্ন দেবদেবী ও বীরের ব্যক্তিগত দিক-গুলিই তুলে ধরব। তাতে অনেক নতুন তথ্যও পাওয়া যাবে, এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু কাহিনীরও আস্বাদ লাভ করা যাবে। আমার চরিত্রচিত্রণের ভঙ্গীটি হবে আভিধানিক, সেই কারণে আমি গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে কোন পার্থক্য টানছি না, কেন না উভয় দেশের দেবদেবী ও জাতীয় বীরেরা এক এবং অভিন্ন, পার্থক্য শব্দ নামের; জিউস হয়েছেন জর্পিটার, হেরা হয়েছেন জুনো, হেরাক্লিস হয়েছেন হারকিউলিস, এইকম।]

অরোরা

রোমক দেবী, বীর গ্রীক নাম ইওস। ইনি গ্রীক ও রোমের উষা-দেবী, সূর্য-দেবীর উষা-সঙ্গে বীর অভিন্নতা পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন। ইনি টাইটান হাইপেরিয়ন এবং থেইয়ার কন্যা এবং হেলিওস এবং সিলোনির ভগ্নী। এ'র কেশদাম স্বর্ণাভ, বাহু-মূলে এবং অঙ্গুলিসমূহ রক্তবর্ণ, এবং পক্ষযশ্বেত। তিনি পূর্ব-সমুদ্র থেকে প্রত্যহ উদ্ভূত হন, সূর্য-মণ্ডিত রথে শ্বেত অশ্বদ্বারা বাহিত হয়ে। সেই রথে তাঁর সঙ্গী থাকে চাবজন-ক্রিটাস, কেফালস, ওয়াকন এবং টিথোনাস। অরোরা বা ইওস শূন্যতা ও

পরিব্রতার প্রতীক। বৈদিক উষার সঙ্গে ইওসের ধানিসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আইসিস

আইসিস আসলে মিশরীয় দেবী, কিন্তু তাঁর পূজা গ্রীস ও রোমে প্রচলিত ছিল। গ্রীক কাহিনী অনুযায়ী আইসিসের স্বামী ওসিরিস তাঁর ভাই টাইফোন কর্তৃক নিহত হলে, তাঁর মৃতদেহের খোঁজে আইসিস জগৎ পরিভ্রমণ করেন। কালক্রমে তিনি গ্রীসে মৃত্যু ও নবজীবনের প্রতীকরূপে পূজিতা হতে থাকেন। রোমে মিতারি পিউনিক যুদ্ধের

নরেন ভট্টাচার্য

পর্ব থেকেই আইসিস পূজার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। প্রতি বছর ৫ই মার্চ আইসিসের উৎসব হত। এই দেবী সম্বন্ধে বিশদ তথ্য আমরা ওসিরিস অনুচ্ছেদে প্রকাশ করব।

আথেনা

আথেনা বা পালাস আথেনা বোমক মিনার্ভার গ্রীক সংস্করণ। তিনি ছিলেন দেববাজ জিউসের কন্যা। কথিত আছে জিউস তাঁর প্রথমা পত্নী মেটিসকে গিলে ফেলেছিলেন এই আশঙ্কায় যে তাঁর পুত্র তাঁর চেয়ে বেশি বলবান হতে পারে। তখন হিফেস্টাস, মতান্তরে প্রমিথিউস একটি কুঠার দ্বারা জিউসের মস্তক ছেদন করে এবং সেখান থেকে কৌমাণের প্রতীকরূপী আথেনা-দেবী জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে তিনিই প্রথম মানুষকে কিতাবে লাঙলে বলাদ জুড়তে হয় তা শেখান। তিনি যুদ্ধদেবীও বটে কেন না তিনি পার্সিউস, বেল্যবোফোন, জেসন, হেরাক্লিস, ডায়োমেডেস ও অর্জিসউসকে সঙ্গ দিয়েছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। শিল্পী ফিডিয়াস কৃত আথেনা-বর্মী বিন্ধ্যবিখ্যাত। আগেই বলেছি, তাঁর বোমক সংস্করণ হচ্ছে মিনার্ভা। এখানে তাঁর কার্যকলাপের ক্ষেত্র আবার প্রশস্ত। তিনি বয়নশিল্প, রপ্তানিশিল্প, চর্মশিল্প, ডান্সিং, চিকিৎসা, অভিনয়, কাব্য, শিক্ষা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সম্রাট অগাস্টাস এই দেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

আনুবিস

এই দেবতাকে উৎপত্তিও মিশরীয়। ইনি ওসিরিসের পুত্র। ভাস্কর্যে এই দেবতাকে শৃগালরূপী দেখানো হয়েছে। আইসিস এবং সেরাপিসের পূজা গ্রীসে প্রচলিত হবার সময় আনুবিসের পূজাও প্রবর্তিত হয়। রোমক কল্পনায় এই দেবতার দেহে কুকুরের মূর্তি সংযোজিত। গ্রীসে আনুবিসকে দেবতা হার্মেসের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। এ'র সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাহিনী নেই।

আর্টেমিস

আর্টেমিস বিখ্যাত গ্রীক দেবী, বোমের ইনি ডায়ানা নামে পূজিতা হতেন। আর্টেমিস, জিউস এবং লেটো বা লাটোনার কন্যা, অ্যাপোলোর ভগ্নী। ইনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক নির্জন স্থানসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শিকার জীবনের সঙ্গে এ'র যোগ খুব বেশি। তিনি সকল পশুর রক্ষকরী। তাঁর প্রিয় নিবাসস্থল আর্কাডিয়ায় পাহাড় ও জঙ্গল। স্পার্টার অধিবাসীরা যুদ্ধবাহার পূর্বে এই দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করত। ম্যারাথন যুদ্ধের পূর্বে মিলেটিয়াডেস আর্টেমিসের নিকট মানস্ত করেছিলেন। কখনো কখনো এই দেবী চন্দ্ররূপেও কল্পিতা হয়েছেন। নাবীজাতি যৌবন রক্ষার জন্য এই কুমারী দেবীর নিকট মানস্ত করত। আর্টেমিস পূজা মূল গ্রীক ভূখণ্ড ছাড়িয়েও বহুস্থানে প্রসারলাভ করেছিল। ক্রিমিয়ায় তিনি টৌরিক আর্টেমিস রূপে পূজিতা হতেন। একটি কিস্মদন্তী অনুসারে রাজা ওরেন্টেস এবং ইফিজেনিয়া সেখান থেকেই তাঁর মূর্তি স্পার্টার নিয়ে আসেন। তাঁর আবার দুটি রূপ হচ্ছে আর্টেমিস ওরথিয়া ও আর্টেমিস এফিসাস। রোমে আর্টেমিস ডায়ানা নামে পূজিতা হতেন। আর্ভিসিয়া নামক প্রান্তরে নেমাস কুণ্ডে এই দেবীর পূজা হত, বর্তমান নেমিস সর্বোবরের তীরে। এই কুণ্ডে ভাববিয়াস নামক একজন পুরুষ দেবতারও মন্দির ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই ভারবিয়াসই ছিলেন হিম্পো-লাইটাস, আর্টেমিসের আদি পুরোহিত এবং প্রণয়ী। দেবী ডায়ানা প্রধানত স্ত্রীলোকের দ্বাবাই পূজিতা হতেন যারা সুপ্রসবের জন্য তাঁর কাছে মানস্ত করত। সার্বভাস টুলিয়াসের আমলে রোমের আভেটাইনে এই দেবীর একটি বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

আম্মা গেব্রের:

নাম শুনে মনে হয় যেন আমাদেরই অমরদেবী। ইনি বিশুদ্ধ রোমক দেবী, যার কোন গ্রীক সংস্করণ নেই। সম্ভবত এই দেবী চন্দ্রব সংগে অভিন্ন। রোমকগণ ১৫ই মার্চ এ'র সম্মানে উদ্ভূত আকাশের নিচে পূজা করত। পরবর্তীকালে ধারণা অনুযায়ী ইনি ডিডেব ভদনী এবং তাঁর মৃত্যুর পর কার্ণেজ থেকে ইতালীতে পালিয়ে আসেন, কিন্তু ল্যাভিনিয়ার ঈশ্বর জন্য নুর্মিসিয়াস নদীতে ত্যাগোপান করেন ও একজন জলপরীরূপে অবস্থান করেন।

আরেস

গ্রীক আরেস ও রোমক মার্স অভিন্ন। আরেস যুদ্ধদেবতা, জিউস ও হেরার পুত্র। এই রক্তলোলুপ যুদ্ধদেবতাটি প্রেসীয়দের মধ্যে বসবাস করতে ভালবাসতেন। ঐশ্বর্য্যে ইনি প্রোজানদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু অসম্ভব শক্তি ও সাহস সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থতার পরাজিত হয়েছেন। হেবাক্সেস এবং ডায়োমেডেস তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন। দেবী অক্সোদিতিস সংগে তাঁর প্রেম হয়েছিল, যার ফলে অক্সোদিতিস পাঁচটি সন্তান হয়—এরোস, অ্যারটেবাস, ডেইমস, ফেবস ও হার্মোনিয়া। ফর্সা এবং মশাল ছিল তাঁর প্রতীক। রোমে আরেস মার্সে পরিণত হয়েছিলেন। রোমক কিস্তদস্তী অনুযায়ী মার্স নাকি বোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা রোসলোসের জনক। মার্সের স্ত্রী ছিলেন নেরিও বা নেবিইন। বোমেও তিনি যুদ্ধদেবতা ছিলেন, তবে শস্যের দেবতারূপেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। গ্রীক আরেস ও রোমক মার্সের সংগে ক্রমবর্ধমান মঙ্গলব সাদৃশ্য পণ্ডিতেরা রূপনা করেন, তা কতদূর সত্য সেটা অবশ্যই বিচার্য।

অ্যাটিস

অ্যাটিস আসলে ফ্রিজিয় দেবতা, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর পূজা গ্রীস ও রোমে প্রচলিত হয়েছিল। 'সিবিলী-অ্যাগাডিস্টিস' নামক ফ্রিজিয় দেবীর পুত্রের শক্তি এত বেশি বড়ে গেছিল যে অপরাধের দেবতাবা চক্রান্ত করে তাকে নিহত করে। তার দেহের রক্ত থেকে একটি আলমণ্ড বৃক্ষ সৃষ্টি হয়। সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে স্যাণ্ডারিয়াস নদীর কন্যা নানা দেবী গর্ভবতী হন এবং তাঁর গর্ভে অ্যাটিস জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে অ্যাটিস দেখতে এত সুন্দর হয়ে ওঠেন যে স্বয়ং দেবী সিবিলা-অ্যাগাডিস্টিস তাঁর প্রতি প্রেম হৃদয়ভর্য্যেতে থাকেন। কিন্তু অ্যাটিস রাজা পেসিনাসের কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলে ঈশ্বরীশ্রী সিবিলা তাঁকে উদ্ভূত করে দেন। সেই অবস্থায় অ্যাটিস একটি পাহাড়ের নিম্নে পদ্রুপ বিনাশ করেন। তখনই দেবী সিবিলা জিউসের নিকট

আবেদন জানান যাতে তাঁর প্রেমাস্পদের দেহ কোন ব্যক্তির স্পর্শ না ঘটে। এই প্রার্থনা গৃহীত হয়। ডিডিমাস পাহাড়ের সিবিলায় মন্দিরে অ্যাটিসের সমাধি নির্মিত হয়। অ্যাটিসের অনুকরণে তাঁর মন্দিরের পুরোহিতদের পদ্রুপধারী হতে হত।

অ্যাটলাস

অ্যাটলাস হচ্ছেন ইমাপেটাস ও ক্রাইমেনিস পুত্র, মেনোটিয়াস প্রমিথিউস ও এপিমেথিউসের ভ্রাতা। হেসিওডের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জগৎকে পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্র প্রমাণ কাঁধে করে দাঁড়িয়ে আছেন। টাইটানদের সংগে যুদ্ধে তিনি টাইটানদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলেই জিউসের আদেশে তাঁর এই দণ্ডভোগ। তাঁর দুই পত্নী, স্পাইওন ও এপ্রা—প্রথমজন স্পাইওন ও শিবতীক্ষণ হারাদেসের জননী। পসেইডন কর্তৃক ত্যাগিত হয়ে অ্যাটলাসটি তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে পশ্চিম দিক সম্বন্ধে গ্রীকদের জ্ঞানবিস্তার হলে তারা অ্যাটলাসকে আফ্রিকার এই নামেই পাহাড়ের উপর স্থাপন করে। অল্প একটি কাহিনী অনুযায়ী অ্যাটলাস একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁর অসৌজন্যের জন্য পার্সিউস তাঁকে একটি বন্যের পর্বতে পরিণত করেন।

অ্যাডোনিস

সাইপ্রাসের বন্যকন্যা আইবহা বা স্পাইনাইস সংগে তার পিতা সিনিরাসের অবৈধ মিলনের ফলে অ্যাডোনিসের জন্ম হয়। যৌবনে তিনি সম্ভবতঃ হয়ে ওঠেন, ফলে দেবী অক্সোদিতিস তাঁর প্রেমে পড়েন। একদিন শিকার করার সময় এই পবন সুন্দর ভবন শিকার কর্তৃক নিহত হন। মৃত্যুর রাজ্যে গেলে, মৃত্যুর দেবী পার্সিফোন তাঁকে ভালবেসে ফেলেন, এদিকে দেবী অক্সোদিতিসও তাঁকে ছাড়তে নারাজ হন। তখন জিউসের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, বছরে ছয় মাস অ্যাডোনিস অক্সোদিতিস সংগে পৃথিবীতে বাস করবেন, বাকি ছয় মাস বান্দববেন মৃত্যুর পুরোহিত। এই কারণেই অ্যাডোনিস প্রতি বছর জন্মান ও প্রতি বছর মারা যান। অ্যাডোনিসের এই কাহিনী সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করেছিল।

অ্যাপোলো

অ্যাপোলো ছিলেন জিউস এক লেটোব পুত্র, অ্যাটোমিসের ভাই যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডেলস দ্বীপে সিম্বাস পাহাড়ের উপর, আদিতে তিনি অঞ্জলের দেবতা ছিলেন, এই হিসাবে তাঁর সংগে দেবতা হেলিওসের যথেষ্ট সাদৃশ্য। জন্মলাভ করার পরেই তিনি পাইথন বা ডেলফাইন নামক দানবকে বধ করেন। সেই উপলক্ষে এই দেবতার সম্মানে প্রতি বছর

এথেন্সে ডেলফিনা উৎসব হত। কবির উদ্ভবিতও অ্যাপোলোর যথেষ্ট অবদান আছে। তাছাড়া তিনি পশুপালকদেরও দেবতা। তিনি আমাদের বরুণের মত নৈতিকতারও রক্ষক। এই কারণেই তিনি ঐশ্বর্য্যে গ্রীকদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সমগ্র গ্রীসে পুজিত হলেও সম্ভবত আদিতে অ্যাপোলো স্পার্টার দেবতা ছিলেন। রোমে রাজা টারকুইনাসের আমলে অ্যাপোলোর পূজা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। দিল্পী প্রাক্সিটিলিস নির্মিত অ্যাপোলোর 'ভাস্কর্য' জগদ্বিস্মিত।

অক্সোদিতিস

অক্সোদিতিস ছিলেন গ্রীসের প্রেমের দেবী যিনি বোমক ভেনাসের সংগে অভিন্ন। তিনি জিউস ও ডায়োনের কন্যা। রূপে তিনি সকল দেবীকে পরাস্ত করেছিলেন। তাঁর সংগে অ্যাডোনিসের প্রেম ও তার পরিণতির কথা পূর্বেই বলেছি। তবে তিনি বহুজনের সংগেই প্রেম করেছিলেন। আসলে তিনি হিক্সোসের পত্নী, তৎসত্ত্বেও তিনি দেবতা আরেসের সংগে প্রেম করেছিলেন যার ফলে তাঁর পাঁচটি সন্তান হয়। তাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অ্যাংকাইসেসের সংগে প্রেমের ফলে তাঁর গর্ভে ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করে। রোমে তিনি ভেনাস নামে পরিচিত ছিলেন। এখানেও তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। ল্যাভিনিয়ায় রোমকরা তাঁর নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। তাঁর আদি রোমক নাম ছিল মুরিসিয়া বা মিরিট্যা। ৪৬ খৃস্টপূর্বাব্দে সীজার তাঁর একটি মন্দির নির্মাণ করেন, আরও একটি মন্দির তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় হার্মিয়ানের দ্বারা ১৩৫ খৃস্টাব্দে যার ধ্বংসসূচক এখনো আছে। রোমক কিস্তদস্তী অনুযায়ী সেখানে ভেনাসই গণিকাবৃত্তির প্রচলন করেন। প্রাক্সিটিলিস নির্মিত অক্সোদিতিসের মূর্তি জগদ্বিস্মিত।

ইয়াকাস

জিউস ও ইজিনার পুত্র যিনি ছিলেন মিরমিডনসের শাসক। ইনি জিউসের পুত্রই প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিশার বলেন যে, ইয়াকাস ক্রকের প্রাচীর গড়তে অ্যাপোলো ও পসেইডনকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি চিরের কন্যা এন্ড্রোইসকে বিবাহ করেছিলেন যার গর্ভে জন্মান টেলামন এবং পেলিউস অ্যাড্রাক্স ও অ্যাকিলিসের বাবা ছিলেন পিতা। কথিত আছে সমগ্র গ্রীস দেশে জলাভাব দেখা দিলে ইয়াকাসের প্রচেষ্টার প্রচুর বর্শি হয়েছিল, এই কারণে কৃতজ্ঞ গ্রীকগণ তাঁর একটি মন্দির নির্মিত করেছিল। অবশ্য ইয়াকাস কোন বড় দেবতা ছিলেন না।

ইউরেনাস

আস্কারক অর্থে ইউরেনাস বলতে স্বর্গকে

গাথ্যাহিক বসন্তমতী

বোঝাব। ইনি ছিলেন পৃথিবী দেবী গেইয়ার স্ত্রী ও পুত্র। গেইয়ার গর্ভে ইউরেনাসের ঔষবে টাইটানরা, সাইক্লোপরা এবং হেকাটন-চেরিরা জন্মগ্রহণ করে। ইউরেনাস তাঁর সন্তানদের আলো দেখতে দিতেন না এবং তাদের পৃথিবীর গভীরে বন্দী করে রাখতেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গেইরা তাঁর সন্তানদের পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ফলে টাইটানদের নবকনিষ্ঠ ক্রোনাস তাঁর মাতৃপ্রদত্ত একটি কাস্টের দ্বারা ইউরেনাসকে পূর্বদৃষ্টিহীন করেন। সেই সময় তাঁর যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল তা থেকে এভিনেস নামক মানবদেব উদ্ভব হয়েছিল। আর তাঁর শত্রু বা সমুদ্রে পতিত হয়ে ফেনার বৃন্দপান্ধবিত হয়েছিল তা থেকে সৃষ্ট হেরোছিলেন সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি।

ইজেরিয়া

কর্ণাব অবিস্তারী দেবী। রোমক কাহিনী অনুযায়ী ইজেরিয়া বাজা নৃম্য প্রাণিনী এবং মস্তপাদাতা ছিলেন। এই নৃম্য কয়েকদে অবাঞ্ছিত একটি নির্জন কুজবনে ইজেরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বাজা নৃম্যর মৃত্যু হলে ইজেরিবা আরিসিয়ার ডায়ানা দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দেবী ডায়ানা তাঁর উপস্থিতিতে বিবস্ত্র বোধ করেন এবং তাঁকে একটি কপার বৃন্দপান্ধবিত করে দেন। বড়ব চরিত ছোটব নিগ্রহ সর্বদাই ষটে, দেবদেবীর ক্ষমতাও তাঁর ব্যতিক্রম নৈই। ইজেরিয়ার কর্ণান্ত গর্ভবতী রোমক স্কেরেরা মানত করত।

ইলেকট্রা

এ্যাগামেমনন এবং ক্লাইটেমেন্স্টার কন্যা। ইনি ওবেস্টসকে তাঁর পিতার হত্যাকারীর হস্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছিলেন। ইলেকট্রাও সপ্তে পাইলেডেসের বিবাহ হয়। ইনি অবশ্য মানবী ইলেকট্রা কিন্তু একজন দেবী ইলেকট্রাও আরছেন জিউসের সঙ্গে যার মিলনের ফলে ট্রোজান রাজবংশের আদিপুরুষ ডাবডানাসেব জন্ম হয়।

এরোস

গ্রীকদের প্রেমের দেবতা, যিনি রোমক কিউপিড, আমরদের মদন বা অনঙ্গ। হোমার এই দেবতাটির কোন উল্লেখ করেন নি, কিন্তু হেসিওড তাঁকে সুলভতম দেবতা বলেছেন। দেবতাদের মধ্যে এবোস সর্বকনিষ্ঠ। ইনি আফ্রোদিতি ও আরেসের পুত্র, কিন্তু আফ্রোদিতির অন্যতম প্রেমিকও বটে। বহু মেঘেরই তিনি ক্ষতি করেছেন। তবে তাঁর প্রকৃত প্রাণিনী ছিলেন সাইকি, যাকে তিনি অপহরণ করেছিলেন এবং যাকে বহু জ্বালায়ন্ত্রণা দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করেছিলেন।

ওলিম্পাস

প্রাচীন গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে ডাদব দেবতারা ওলিম্পাস পাহাড়ের চূড়াষ বাস করেন। এই পাহাড়টি খেসালীতে অবস্থিত। হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী এই পাহাড়ের শিখরদেশ চিবকালই মেঘশূন্য। এখানে জিউস ও অপবাপর দেবতা বাস করত। পাহাড়ের শিখরদেশ অপব অংশের থেকে পৃথক। মধ্যস্থলটি কঠিন মেঘে আবৃত যা ভেদ কর স্তম্ভবাসীর শিখর উঠবার কোন সম্ভাবনা নৈই। পরবর্তীকালে ওলিম্পাস পাহাড়ের সম্ভব মানস্রব ধাবনা পরিবর্তিত হলে—কেন না পাহাড়টি মাত্র দশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট—ওলিম্পাসকে আকাশ স্থানান্তরিত করা হয়। ওলিম্পিয়ান - পদ বলতেই গ্রীক দেবতাকে বোঝায়।

ওরায়ন

ওরায়ন ছিলেন একজন পৌরাণিক শিকারী যার আকাষ ছিল বিশাল। তিনি দেবতা পসেইডনের পুত্র এবং পিতার কাছ থেকে তিনি সমুদ্রের উপব দিয়ে হাটবার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তাই পত্নী সাইডি জিউসপত্নী হেরার কোপে নবকক্ষ হেরেছিলেন কেন না তিনি ত্রযাৰ সঙ্গে তাঁর বৃপের তুলনা করেছিলেন। এই ঘটনার পর ওরায়ন সমুদ্র পাৰ চরে চিওস রাজ্যে এলোপিয়নের কন্যা মেবোপিক বিবাহ করতে যান, কিন্তু মন্তা-বন্দ্যাস তিনি মেবোপির কৌমার্যতানি স্কাল মেবোপির পিতা তাঁকে অশ্ব করে দেন। কিন্তু সর্বদেবের কপার তিনি আবার দৃষ্টিশক্তি ফিবে পান। ওরায়ন আর্টেমিস কর্তৃক নিহত হন কেন না তিনি আর্টেমিসকে যশ্বে চ্যালেঞ্জ স্তম্ভছিলেন। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী তিনি বশিচকদংশনে নিহত হয়ে-ছিলেন। হোমারের গ্রন্থে দেখা যায় যে, অর্ডিসিউস তাঁকে পাতালে দেবেছিলেন। ওরায়নের কাহিনীগলি প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র জগতের কার্যকলাপের বৃন্দপমাত্র।

ওসিরিস

আদিতে মিশরীয় দেবতা যার পূজা তাঁর ভগ্নী ও স্ত্রী আইসিসের পূজার সঙ্গে গ্রীসে আমদানী হয়েছিল। গ্রীকরা তাঁকে ডাওনি-সেব সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। মিশরে তিনি কৃষিকারের প্রবর্তক ও নৈতিকতাৰ রক্ষক হিসাবে পূজিত হতেন। কথিত আছে তাঁর ভাই টাইফন, মিশরীয়গণ যাকে সেট নামে অভিহিত করে, তাঁকে হত্যা করে তাঁর দেহটিকে গোপন করে ফেলেন। তখন শোকাহুরা দেবী আইসিস বিভিন্ন স্থানে সেই দেহ অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে ফিনিশিয়াৰ বিবলাসে তা পুড়ে পান। ইতি-মধ্যে টাইফন সেই দেহটিকে আবার অপহরণ করে সেটিকে চোদ্দ ভাগে ভাগ করে চার দিকে

ছাড়িয়ে দেন। আইসিস বহু যত্নে সেই অংশগুলিকে উদ্ধার করেন এবং সেগুলি একত্র করে উত্তর মিশরের ফিলে নামক স্থানে সমাহিত করেন। পরে ওসিরিস ও আইসিসের পুত্র হোরাস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন টাইফনকে হত্যা করে। গ্রীসে ব-জীবনের দেবতা হিসাবে ওসিরিস বিশেষতঃ পূজিত হতেন।

কাইকনস

কথাটির অর্থ 'হংস'। কাইকনস আরেস এবং পেলেগিপ্যার পুত্র। হেসিওড লিখেছেন যে কাইকনস হেরাক্লেস কর্তৃক যশ্বে নিহত হন, ফলে আরেস পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য স্বয়ং হেরাক্লেসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত জিউসের হস্তক্ষেপে এই যুদ্ধ বন্ধ হয়। দ্বিতীয় একজন কাইকনসের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়, যিনি পসেইডনের পুত্র। তাঁর জন্মের পরেই তাঁর মা তাঁকে সমুদ্রতীরে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু জেলেরদের চেন্টার তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। ইনি বিশেষ শক্তিশালী ও বিশালদেহী ছিলেন। ট্রয়যুদ্ধে ইনি ট্রোজানদের পক্ষ অবলম্বন করেন, এর বশব্দে অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হন।

গেইয়া

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে গেইয়ার কথা উল্লেখ করেছি। ইনি অতি প্রাচীন দেবী যার উদ্ভব ক্রীটির। আসলে ইনি পৃথিবীদেবী যার স্ত্রী ছিলেন ওরানস বা ইউরেনাস। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র ক্রোনাস কর্তৃক পিতার পূর্বদৃষ্টিহানির কাহিনী পূর্বে বলেছি (ইউরেনাস দেখুন)। হোমার লিখেছেন যে পার্থিব সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হবার জন্য জিউস তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন। এখেন্সে ইনি বিশেষভাবে পূজিত হতেন। রোমে ইনি টেলাস নামে পরিচিত ছিলেন। ২৬৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে বোনে তাঁর একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ভূমিকম্পের সময় তাঁর পূজা বিশেষভাবে করা হত। পবিত্র কুমারীরাই তাঁর পূজার অধিকারী ছিল। গেইয়া বা টেলাস দেবীর পূজা রোমকদের চেন্টার জগতের বহুস্থানেই প্রচলিত হয়েছিল।

জানুস

এই দেবতাটি একান্তই বোমক যার কোন গ্রীক সংস্করণ নৈই। বলিদানকালে সর্বপ্রথমে এর নামেই বলি দেওয়া হয়, প্রার্থনার সময় জুপিটারের আগে তাঁর নামই করা হয়। আদিতে সম্ভবত জানুস সূর্য ও আলোকের দেবতা ছিলেন। ইংরাজী জানুয়ারী মাসটি তাঁর নাম বহন করছে। কথিত আছে যে দেবতা হবার আগে ইনি মানুষ ছিলেন এবং টাইবাব নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁর রাজ্য ছিল। রোমান নৌবহরে জানুসের প্রতিকৃতি রাখা

হতে। সূত্রটির একে শিস্যদের হিসাবে
স্মৃতিত করা হত।

জিউস

জিউস হচ্ছেন গ্রীক দেবতাদের সম্রাট, সমগ্র গ্রীক পুরাণের ইনিই একচ্ছত্র নায়ক। এই দেবতারটির প্রাক-গ্রীক চরিত্রের কথা আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। জীটির কাহিনী অনুযায়ী তিনি জোনাস এবং দেবী রীহার কনিষ্ঠতম পুত্র ছিলেন। জোনাস তাঁর প্রতিটি সন্তানকে গলায় ফাঁস করে, এই কারণে দেবী রীহার জীটির একটি পর্বতগৃহে জিউসের জন্মদান করেন। সর্বজন-জ্ঞ হলে জিউস জোনাসের পেট চিরে তার মাতা ভগিনীদের উদ্ধার করেন এবং তাদের সহায়তায় জোনাসকে ক্ষমতাস্বত্ব করে নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। জিউস হলেন স্বর্ণের রাজা, পসেইডন সমুদ্রের এবং হেডেস পাতালের। কিন্তু এদের মধ্যে জিউসই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। জিউস প্রথম বিবাহ করেছিলেন সেটিসকে। তাঁর শিবতীয়া স্ত্রী হচ্ছেন হেরা, যার গর্ভে জন্মেছিলেন আরেস, হিকেষ্টাস এবং হীরা। এ ছাড়া জিউস আরও অনেক স্ত্রী ও মানবীকে উপভোগ করেছিলেন, কেনন থেমিস, ইউরিনোম, ডিমিটার, সিনসো-লিন, লেটো, ডোডোনা, ডিয়োন, আলকমেনি ইত্যাদি। জিউস আকাশের প্রতীক, সংস্কৃত স্রোত কথ্যটি যেমন আকাশব্যঞ্জক। তিনি স্রোত বৃষ্টি বৃদ্ধ ও সূর্য্যালোকের দেবতা। জিউস পূজা মূল গ্রীক ভূখণ্ড ছাড়াও আরও বহু স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রোমকরা তাকে জুপিটার নামে গণ্য করত। রোমক জুপিটার স্যুটার এবং ওপসের পুত্র, রীহার গ্রীক সংস্করণ হচ্ছে ইউরেনাস ও রীহার। গ্রীক জিউস ও রোমক জুপিটার শব্দ দুটি নামেই অভিহিত ছিলেন না, কর্মেও অভিন্ন ছিলেন। [জিউস পাতের=দিয়াউস পাতের=দিওবিস পাতের=ইউপিতের=জুপিটার]।

জুনো

জুনো হচ্ছেন জিউসপত্নী হেবার রোমক সংস্করণ। ইনি জোনাস ও রীহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, জিউসের ভগিনী এবং স্ত্রী। কথিত আছে জিউস কোশলে তাঁকে ক্রয়বস্ত্র করেন, কোকিলের বৃশ ধারণ করে। তাঁর স্বামীর বহুপ্রণয়ে জনাই জিউসের সঙ্গে তাঁর মোটেই বিনিবদা ছিল না। উভয়ের কলহ নিয়ে বহু আখ্যান বিচিত্র হয়েছে। তাঁর ঈর্ষার জন্য অনেকেরই জীবন নষ্ট হয়েছে। জিউস তাঁর এই কলহপরায়ণ স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখত ভয় করতেন। তবে হেবার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে তাঁর জীবন কলঙ্কশূন্য, অনন্য গ্রীক দেবীদের মত তিনি ন্যায়চারিণী ছিলেন না। জিউসের সঙ্গে

তাঁর কলহ সময় সময় দাম্পত্যের সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে যেত। একদা ত্রোয়ে জিউস নিজপুত্র হেক্টরাসকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেছিলেন। হেরাও একবার জিউসকে বন্দী করে রাখেন পসেইডন এবং আথেনার সাহায্যে। শেষ পর্যন্ত দেবতা ইগ্যারন জিউসকে উদ্ধার করে। ব্যক্তিগতভাবে হেরা এবং তাঁর রোমক সংস্করণ জুনো নৈতিকতার রক্ষক হিসাবে প্রথমে সঙ্গ পুজিতা হতেন। কথিত আছে প্যারিস বথন হেলেনকে অপহরণ করার ইচ্ছা করেন, হেরা তখন প্যারিসের এই দূর্মতি দূর করার স্বার্থে চেষ্টা করেছিলেন।

টাইটান

টাইটানরা ছিলেন গ্রীক তস্মর, বসিও তাঁদের ব্যবহারে আদ্যবিক কিছু ছিল না। আদিতে এরা উরানাস এবং গেইয়ার ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা ছিলেন। ওলিম্পাস এবং ডেইস, হাইপেরিয়ন এবং থিরা (হেলিওস, সেলিনা এবং ইউরেনের জনকজননী), ক্রিসেস এবং কীবি (লেটো এবং আর্ক্টোরাসের পিতামাতা), জোনাস এবং রীহার (ডিমিটার দৈত্যগণের পিতামাতা), ক্রাস (ইউরিসিয়ার, পালাস এবং পার্সেসের পিতা), ইরোপেটাস (থ্যাটাস, মেনিসাস, প্রমিথিউস এবং এপিমেথিউসের পিতা), থেমিস (হোরাসের মাতা) এবং সিন্মোনি। গেইয়ার প্রচোচনার জোনাস উরানাসকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু জোনাস নিজে নিজ পত্নী রীহার দ্বারা প্ররোচিত জিউস কর্তৃক ক্ষমতাস্বত্ব হন। অতঃপর জিউস ওলিম্পীয় দেবদেবীদের নিয়ে পৃথক হন। ব্যাক সকলে অতঃপর টাইটান বলেই পরিচিত হন। এই টাইটানদের সঙ্গে ওলিম্পীয় দেবতাদের দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলে, আমাদের দেবাসূত্রের সংগ্রামের মতই।

ডাওনিসাস

এই দেবতারটির কথা আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। আদিতে উর্বরতার দেবতা হলেও পরবর্তীকালে ইনি প্রধানত মঙ্গল দেবতারূপেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি জিউস ও সেমেলীর পুত্র বিনি জীবসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হেরার ক্রোধের ফলে সেমেলী নিহত হলে ডাওনিসাস নাইসা পাহাড়ের পর্বতের দ্বারা পালিত হন। মদ্যপিপিত এই দেবতার পূজা মূল গ্রীক ভূখণ্ড ছাড়িয়েও বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। ডাওনিসাসের পত্নীর নাম এরিডানে। কথিত আছে জলদস্যুরা একবার তাঁকে একটি জাহাজে বন্দী করে রাখে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, জাহাজের মাঝতলটি দ্রুত ও অস্বাভাবিকভাবে উঠেছে এবং ডাওনিসাস সিংহরূপ ধারণ করেছেন। তখন জাহাজের সবাই প্রাণভয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। তা ছাড়া ডাওনিসাস সিংহরূপেই হেরাক্লিসের

সঙ্গে দেবগণের দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ডাওনিসাস কৃষিকারের আবিষ্কারকর্তা হিসেবেও প্রসিদ্ধ। রোমে এই দেবতা ব্যাকাস নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে উৎসব হত তার নাম ব্যাকো-নোলিয়া। আলেকজেন্ডার সমকালীন ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে ডাওনিসাসের পূজা মিশর, সিরিয়া এমন কি ভারতের গঙ্গা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। একদা কলার অর্থ এই যে, ডাওনিসাস এবং শিব উভয়েই লিঙ্গরূপে পুজিত হতেন, কাজেই এখানে শিবলিঙ্গের পূজা দেখে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ডাওনিসাসকে স্মরণ করেছিলেন।

ডায়োনিসাস

এরা বৃক্ষ দেবতা, অম্বপালক, সেই হেতু সহজেই আমাদের বেদান্তে অশ্বিনীকুমার-স্বরের সঙ্গে অভিন্নতা কল্পনা করা যায়। জিউসের আশীর্বাদে এরা প্রত্যহ জীবিত হতেন এবং প্রত্যহ মারা যেতেন। পান্ডিত্যের বলে যে এরা দুজন আসলে শক্তিতারা ও সম্মতারা। এরা অ্যাটিকা অভিব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং থিসিউস কর্তৃক পরিভ্রম্য হেলেনকে উদ্ধার করেছিলেন। এদের একজনের নাম ক্যান্টর, অপরজনের নাম অলিভিউল (ল্যাটিন পল্লব)। ইডাসের সঙ্গে যুদ্ধে ক্যান্টর মারা গেলে প্রলম্ব শব্দই কাতর হয়ে পড়েন। তখন দেবরাজ জিউস পল্লবকে অমর প্রদান করেন। সম্ভবত শক্তিতারা সম্মতারা পৃথক নয় বলেই দুজনের এক জনকে মারা যেতে হয়েছে।

ডিমিটার

গ্রীক শস্যের দেবী, যার রোমক সংস্করণ হচ্ছেন সেরেস। তিনি জোনাস ও রীহার কন্যা। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে ডিমিটারের কন্যা পার্সিফোনের কাহিনী বলা হয়েছে। (প্রাক-গ্রীক ইউরোপের কথা ও কাহিনী দ্রষ্টব্য) পার্সিফোন হেডেস কর্তৃক পাতালে অপহৃত হয়েছিল। জিউসের জ্ঞাতসারেই তা হয়েছিল বলে ক্রোধে ডিমিটার পৃথিবীকে বন্ধ্যা করে দেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল যে, পার্সিফোন বৎসরে আট মাস থাকবেন মায়ের কাছে, বাকি চার মাস হেডেসের কাছে। সেই অবধি বছরে আট মাস ধরিত্রী শস্যশ্রামলা থাকে, বাকি চারমাস বন্ধ্যা থাকে। পসেইডন ও ডাওনিসাসের সঙ্গে ডিমিটারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, পার্সিফোনের পিতা পসেইডন, জিউস নন। রোমে ডিমিটার সেরেস নামে পুজিতা হতেন। এখানে পার্সিফোন হয়েছেন প্রোসার্পিনা। সেরেসের সঙ্গে প্রোসার্পিনার মিলন উপলক্ষে রোমে প্রতি বছর ফসলের উৎসব হত।

থেমিস

জেরিউস এবং ডোরিসের কন্যা

পেলিউসের পত্নী এবং অ্যাকিলিসের মাতা। ইনি দেবতাদের সাহায্যকারিণীরূপে বিখ্যাত। যখন জিউস, হেরা আরথেনী ও পসেইডনের হাতে বন্দী হন, তখন থেটিস ইগ্যারনকে পাঠিয়ে জিউসকে উদ্ধার করেন। হিফেস্টাসকে জিউস স্বর্গ থেকে ক্ষেপে নিক্ষেপ করলে থেটিস তাকে নদ্র বৎসর লুকিয়ে রাখেন। ডাওনিয়াস যখন লাইকরগাসের নিকট থেকে পলায়ন করছিলেন তখনো থেটিস তাকে সাহায্য করেন। হেরা কর্তৃক পালিতা থেটিস জিউস ও পসেইডনের সঙ্গে পরিণতি হন, কিন্তু যখন থেমিস ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, থেটিসের পুত্র পিডাস চেরেও বড় বীর হবে তখন তাকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ পেলিউসের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেন। এই বিবাহের ফলেই অ্যাকিলিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। থেটিস অ্যাকিলিসকে অমর করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি।

নার্সিসাস

নদীদেবতা সেফিসাসের পরম সুলভ পুত্র। তাঁর রূপে মূগ্ধ হয়ে স্বয়ং দেবী আফ্রোদিতি তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন কিন্তু নার্সিসাস কর্তৃক তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। তিনি নদীতীরে বসে নিজ সৌন্দর্যে মূগ্ধ হয়ে নিজেরই ছায়া দেখতেন। এই কারণে আফ্রোদিতিস অভিশাপে তিনি নার্সিসাস ফুলে পরিবর্তিত হন। পার্সিফোন পাতালে বাবাব আগে একটি নার্সিসাস ফুল নিয়ে গেছিলেন। নার্সিসাস ফুল এই কারণে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক। ক্রমাগত নিজের ছায়া দেখে চলে মৃত্যু অনিবার্য। এই বিশ্বাসটির উৎস সম্ভবত নার্সিসাস।

নাওবি

ট্যান্টালাস এবং ডায়োনের কন্যা, পেলোপসের ভগিনী এবং ধীবরের অ্যামফিক্রনের পত্নী। তাঁর বারটি পুত্রকন্যা ছিল এবং সেই কারণে নিজেকে জিউস পত্নী লেটোর সঙ্গে তুলনা করতেন। আগেই ফলেছি দেবতাদের মধ্যেও ছোট-বড়র ভেদ ছিল, কাজেই ক্ষুদ্র দেবীর মূখে এই জাতীয় কথা বড় বড় দেবতার সহ্য করলেন না। অ্যাপোলো এবং আর্টেমিস তাঁর ম্বারা আর ধারটি পুত্রকন্যাকেই হত্যা করেছিলেন এবং জিউস নাওবিকে প্রস্তরমূর্তি করেছিলেন। নাওবির প্রস্তরমূর্তি লিডয়ার সিপাইলাস পাহাড়ে এখনো আছে

নেপচুন

গ্রীক পসেইডনের রোমক সংস্করণ। তিনি সমুদ্র ও জলের অধিপতিরূপেই পূজিত হতেন। রোমে ২০শে জুলাই নেপচুনালিয়া বা নেপচুনের উৎসব উদ্‌যাপিত হত। গ্রীক

কাহিনী অনুযায়ী পসেইডন ক্রেনাস ও রীহার পুত্র, জিউসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি জলাধিপতি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অ্যামফিটাইট, পুত্র টাইটন। সম্ভবত তিনি ভূমিটারের প্রেমে পড়েছিলেন, কথিত আছে ভূমিটার কন্যা পার্সিফোন তাঁরই উরসজাত সন্তান। প্রথম যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের পক্ষেই ছিলেন, তবে হোমারের কাহিনী অনুযায়ী যেহেতু অডিসিউস তাঁর পুত্র পলিফেমাসকে বন্দী করেছিলেন সেই কারণে পসেইডন আগাগোড়া অডিসিউসের সঙ্গে শত্রুতা করে বান।

পেলোপস

লিডয়ার রাজা ট্যান্টালাস এবং অ্যাস্টাস কন্যা ডাওনের পুত্র। তিনি যখন বালক তখন তাঁর পিতা তাকে হত্যা করে সেই মাংস দেবগণকে পাক্ষরশন করেন। কোন দেবতাই তা গ্রহণ করেন না, শুধু কন্যাসোকাহুরা ভূমিটার কাঁধের এক টুকরো মাংস ভক্ষণ করেন। জিউসের আদেশে হার্মেস বিভিন্ন অংশগুলি সংগ্রহ করে বালককে পুনরুজ্জীবিত করেন; ভূমিটার তাঁর ভক্ষিত কাঁধের জায়গার হাতের দাঁতের একটি কাঁধ দেন। সেই অবধি পেলোপসের বংশধরদের স্কন্ধদেশ স্নেতবর্ণ। পরিণত বয়সে ইনি পিসার রাজকন্যা হিপোডামিয়ারক বিবাহ করেছিলেন। ওলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার প্রবর্তক হিসাবে পেলোপসের খ্যাতি আছে।

প্রিপ্রাপাস

ডাওনিয়াস এবং আফ্রোদিতির সন্তান, উর্বরতার দেবতা হিসাবে পূজিত। এর পূজার উদ্দেশ্যে হেরাছিল এলিয়া মাইনরে, কালক্রমে তা গ্রীস ও বোমে প্রচলিত হয়েছিল। সমারগত উদ্যানসমূহে এর পূজা হত লিগনরূপে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর পিতা ডাওনিয়াসও লিগনরূপে পূজিত হতেন।

প্রিমিথিউস

টাইটান ইয়রপটাসের পুত্র। তাঁর সম্বন্ধে হেসিওড লিখেছেন, যখন টাইটানরা দেবগণের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হলেন তখন সত অনুযায়ী প্রিমিথিউস দেবগণের সেবার নিযুক্ত হলেন। জিউস ছিলেন মানবশ্রেণী এবং প্রিমিথিউসকে কড়া হুকুম দিয়েছিলেন যে, মানুষকে বেন আগুনের ব্যবহার না শেখানো হয়। কিন্তু প্রিমিথিউস মানুষকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। ফলে জিউস ক্রুদ্ধ হন এবং প্রিমিথিউসকে বন্দী করেন। তাকে একটি শৃঙ্গের মধ্যে রাখা হয়। প্রতিদিন একটি ঈগলপাখী এসে তাঁর লিডারটি ভক্ষণ করত, এবং প্রাতঃরাতে নতুন করে তাঁর লিডার তৈরি হত। এইভাবে দিনের পর দিন প্রিমিথিউস শাস্তি ভোগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হেরাক্লিস এই ঈগলকে বধ করে প্রিমিথিউসকে

উদ্ধার করেন। নাট্যকার এসকাইলাস প্রিমিথিউসকে নিয়ে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—প্রিমিথিউস দি ক্যায়র বিদ্যাবার, প্রিমিথিউস বাউন্ড এবং প্রিমিথিউস রিলিজড। এসকাইলাস প্রিমিথিউসকে মহান মানবতাবাদীরূপে চিত্রিত করেছিলেন। তাঁর রচিত কাহিনী একটু পৃথক খবরের। সুযোগ পেলে পরে তা বর্ণনা করব।

মার্ক্যারি

রোমক দেবতা যার গ্রীক সংস্করণ হচ্ছেন হার্মেস। বোমে ইনি বাণিজ্যের দেবতা হিসাবে বিশেষভাবে পূজিত হতেন। গ্রীক হার্মেস জিউসের পুত্র, জন্মস্থান অর্কাডিয়া পাহাড়ে। ইনি তাঁর ভ্রাতা অ্যাপোলোর পঞ্চাশটি গরু চুরি করে এমন জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন যেতে কেউ তাদের সম্মান না পায়। অ্যাপোলো গণনার ম্বারা চোবকে ধরে কেলেদন এবং জিউসের কাছে এ বিষয়ে নালিশ করেন। জিউস হার্মেসকে গরুগুলি ফেরত দিতে আদেশ দেন। ইতিমধ্যে হার্মেস অ্যাপোলোব হাতের বাঁধা দেখে মূগ্ধ হন এবং নিজ সম্পদেব বিনিময়ে তা হস্তগত করেন। অতঃপর জিউস তাঁকে দেবতাদের ঘোষক এবং পাতালের পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে হার্মেসের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি গ্রীকদের প্রধান দেবতাদের একজন রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্বাহী

উরানাস এবং গেইয়াব কন্যা, এবং নিজ ভ্রাতা টাইটান ক্রেনাসের পত্নী, সকল ওলিম্পিয় দেবতাদের জননী। ইনি অতি প্রাচীন দেবী যার উদ্ভব ক্রীটিয়। এই দেবী সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি (প্রাক-গ্রীক ইউরোপের কথা ও কাহিনী দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে এই দেবী স্ত্রিধ্বংসিবলী বংগে অভিন্না বলে বোঝিতা হয়েছিলেন। আমাদের দুর্গার মত ইনিও সিংহবাহিনী।

সেমিলী

ক্যাডমাস এবং হাবগোনিয়াব কন্যা, জিউসের প্রেমিকা। ঈর্ষাতুরা হেরা তাঁর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাঁর ধাত্রী সেন্সে বলেন যে, যদি জিউস কোন বর দিতে চান তাহলে সেমিলী যেন জিউসের আসল রূপ দেখবাব ইচ্ছা-প্রকাশ করেন। সেমিলী জিউসের কাছে সেই রকম বর চাইলে জিউস বন্ধুবিদ্যাব্যবস্থাপে তাঁর সামনে হাজির হন, ফলে সেমিলীর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। সেই অবস্থায় সেমিলী একটি শিশু প্রসব করে গভার হন। সেই শিশুই পরে ডাওনিয়াস রূপে বিখ্যাত হন।

সিসিফাস

ইওলাসের পুত্র, যিনি করিন্থ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, জিউস দেবতা

একটি প্রতিজ্ঞা জ্বলে

অপরাধিতা মোক্ষপী

ওখানে রাত্রিদিন একি কান্না!

দুঃসহ মৃদুস্তি যন্ত্রণা

কঠিন প্রাচীরে মাথা ঠোকে,

মাথা ঠোকে,

নীষবে নিভুতে

লাঞ্ছিত জীবনদেবতা।

রাতি অশ্বকারে

ক্ষমতার বস্ত্রমুঠি ছাড়িয়ে

দূরে—নক্ষত্র জ্বলে।

পদ্মার কোল ঘেঁষে

সবুজ বন প্রান্তর ছাড়িয়ে

রিক্ত ধানের ক্ষেতে

একটি প্রতিজ্ঞা জ্বলে।

জ্বলে ওঠে

তন্ত বালুর হৃদয় ঘিরে

একটি স্বপ্ন;

ব্যাপ্ত, শান্তি

আর অনন্ত সৌন্দর্যের

দৃঢ়ত পিপাসা।

ওদের মৃত্যু নেই কেন—

যুগে যুগে বারে বারে

জন্ম নিয়েছে ওরা

গোপনে,

সহস্র বিন্দু সঞ্চিত

অশ্রুসাগরে।

রশ্মি রশ্মি

জ্বর হিংসার আগুন,

অসহ্য দহনে

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোরে

দেবতার নামে কোরেছে প্রচার—

এ অভিশাপ।

শিব-জাতিতত্ত্বের অভিশাপ॥

পরাদীন জাতির

ইপ্সিত স্বাধীনতার

ঐক্য মগ্নে,

দুর্যোধনের রক্তলিপ্সার

দ্রোণদী তাই বার বার

হ'য়েছে লাঞ্ছিত।

এই লাঞ্ছনার তীর যন্ত্রণা হোও

জন্ম নেবে না কি

অমিত শক্তির?

ঘণ্টিতের রক্ত-সমিধ হোতে

জ্বলে উঠবে না কি

সুতীর আগুনের লৌলহান শিখা।

সে আগুনে ধ্বংস হবে

মিথ্যা মন্ত আর

পৌরুষহীন

নির্লক্ষ্য ব্যক্তিরে॥

অসোপাসের কন্যা ইজিনা গোগনে অপহরণ করেছিলেন। এই কুকাঁতি সিসিফাস প্রকাশ করে দেন। ফলে জিউস তার প্রাতি অভ্যন্ত হন এবং তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। কিন্তু সিসিফাস মৃত্যুদেবতাকে পরাস্ত করে তাকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে রাখেন। ফলে দরতই মৃত্যু লোপ পায়। শেষ পর্যন্ত অবেস মৃত্যুকে সিসিফাসের কবন থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর সিসিফাসকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্তিটি হচ্ছে তাকে একটি গড়ানে পাথর ঠেলে একটি পাহাড়ে তুলতে হবে, পাথরটি গাড়িয়ে নেমে এলে আবার ঠেলে তুলতে হবে।

হোডেস

জিউস ও পসেইডনের স্রাতা, মৃত্যুর রাজ্যের অধিপতি। এর অপর আর এক নাম হুডেস। ইনি ডিমিটারের কন্যা পার্সিফোনকে অপহরণ করেছিলেন। তার প্রিয় কুকুরের নাম সার্বারাস। তার নাম অনুসারেই গ্রীক পরলোকের নামকরণ হয়েছে। অর্ডিস মহা-কবো হোডেস বা মৃত্যুর রাজ্যের বিশদ বর্ণনা আছে। হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী এই মৃত্যুর রাজ্যে আছে চারটি বড় বড় নদী। পরলোকগত আত্মার প্রথমে লৌহ নদীর পান করিয়ে পৃথিবীর কথা ভুলিয়ে

দেওয়া হয়। তারপর চারণ নামে এক ব্যক্তি নদী পার করে আত্মার হারার রাজ্যে নিয়ে যায়। প্রাচীন গ্রীক ধরনা অনুযায়ী আত্মার দেহ, মন এবং চিন্তাসূত্র। একমাত্র চির-সিয়াস পার্সিফোনের কবে মৃত্যুর পরেও চেতনা হারান নি।

হেলিওস

গ্রীক সূর্যদেবতা। টাইটান হাইপেরিয়ন এবং থিমার কন্যা, চন্দ্র দেবী সিলেনী এবং ইওসের স্রাতা। দেবতা ও মানুষদের আলোক-বিস্তরণের জন্য তিনি চারটি কুসারশূন্য অশ্ববাহিত রথে প্রভাত থেকেই যাত্রা শুরু করেন। তার চারটি ঘোড়ার নাম ইউপস, এথিওস, ফোটে এবং স্টেরোপে। সন্ধ্যায় পর তিনি মহাসমুদ্রের গভীরে বিহীন করেন। কোন কিছুই তার চোমকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি হিফাস্টাসকে আরেস ও অফ্রোদিতির প্রেমের কথা বলেছিলেন। হোডেস যে পার্সিফোনকে অপহরণ করেছেন, একথা হেলিওসই প্রথম ডিমিটারকে জানান। ইউরিপিডিসের যুগে হেলিওসকে অ্যাপোলোর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হত। রোমে হেলিওস সেল নামে পরিচিত হতেন।

উপসংহার

এখানে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান গ্রীক দেব-

দেবীগণের পরিচয় দেওয়া হল। বর্ষের কথা বলা হল তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক দেব-দেবী আছেন। আমাদের বৈদিক দেবতাব মত গ্রীক দেবতারও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। শিবতীর্থ আমরা যে সমস্ত গ্রীক দেবতাদের কথা আলোচনা করলাম তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মনুষ্যদেব দেবতা। আর্যদের বৈদিক শাখাটি যেমন ভারতে এসেছিল, তেমনি হেলেনীয় শাখাটি গ্রীসে গিয়েছিল। কাজেই উভয় শাখার দেবতাদের নামে ও চরিত্রে যে সাদৃশ্য থাকবে তা স্বাভাবিক। বস্তুত উনিশ শতকের প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বৈদিক এবং গ্রীক দেবতার গুণগতভাবে অভিন্ন। গ্রীক দেবতাদের চরিত্রে যেমন প্রাক-হেলেনীয় ক্রীট সভ্যতার প্রভাব আছে, তিক তেমনি বৈদিক ধর্মের উপবেও প্রাক-বৈদিক সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব আছে। তবে গ্রীসের ক্ষেত্রে প্রভাবটি বোধহয় আর একটু বেশি। রীহা বা ক্রোনাস বা ডায়োনাসের পিছনে যেমন ক্রীটীয় প্রচ্ছদপট বর্তমান, সেইরূপ বৈদিক যুগ বা আদিবর্তক কল্পনার মূলেও প্রাক-বৈদিক সভ্যতার অবদান আছে।

পর্বতবর্তী প্রদেশে আমরা গ্রীক বীরগণের কাহিনী বর্ণনা করব।

বঙ্গদর্শন



ইংরেজ প্রভু

ইংরেজ প্রভুদের ইতি হলেও ইংরাজ মনিবের দাপট যে কী দুঃসহ-রূপে বর্তমান সম্প্রতি স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রিট এন্ড কোম্পানী সম্পর্কে একটি চাণ্ডাল্য-কর তথ্যে তা অবগত হওয়া গেল।

বিধান সভা সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে শ্রীবিজয়সিং নাহার প্রদত্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে, উক্ত কোম্পানীর ইংরাজ বড়কর্তা জাতীয়-স্বার্থ রক্ষার্থে কোম্পানীর বাঙালী ওয়ার্কস ম্যানেজার মুখ খোলায় (পাক-হামলার সময়) তাঁকে বিনা কারণে বরখাস্ত করেছেন। এই ইংরাজ প্রভুটি পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা ফেঁদে জনৈক পাকিস্তানী কর্মচারীকে চাকরিতে বহাল রাখার জন্য বড় কঠিন প্রয়াস পেয়েছিলেন : উক্ত বাঙালী ওয়ার্কস ম্যানেজার তখন বড়কর্তার পাক-প্রীতি যে ভারতের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী একথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এদেশের আইন মেনে চলতে ইংরাজ প্রভুকে অনুরোধ করেন। ব্যাপারটি বড়কর্তার মনঃস্ফূর্ত হয় নি। তবু সরকারী চাপের ফলে তাঁকে পাক-প্রীতি বিসর্জন দিতে হয়। ফলত এহেন দুঃখটিনার শিকার হলেন যখন শেষ পর্যন্ত বাঙালী ওয়ার্কস ম্যানেজার এবং তাঁর চাকরীটি বিনা কারণে খতম করে দিলেন মহা পরাক্রমশালী ইংরাজ প্রভু।

শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, কোন কারণ না দেখিয়ে ওয়ার্কস ম্যানেজারের চাকুরি খতম করার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে কী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে সরকার চিন্তা করছেন।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দেশের স্বার্থে কথা বলতে গিয়ে বাঙালী ওয়ার্কস ম্যানেজার বিদেশীর হাতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করছেন, সুতরাং

কথা। দেশবাসী এ বিষয়ে চিন্তা করে এক কথায় রায় দেবেন, অবিলম্বে তদন্ত করে দোষী বিদেশী অফিসারকে দেশ থেকে অপসারিত করা হ'ক। পাক-ভারত সম্বন্ধকালে যে ভদ্রলোক পাক-প্রীতিতে এতাদৃশভাবে ভরপূর হয়েছিলেন, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সে ভদ্রলোক ভয়াবহ।

আর যে বাঙালী ওয়ার্কস ম্যানেজার জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁর অমদাতার সঙ্গে এমন সুস্পষ্ট বিরোধে অনায়াসে অবতীর্ণ হতে পেরেছেন তিনি যাতে সম্মানে তাঁর কার্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ করেন সে বিষয়েও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হ'ক। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থের প্রমোথ্যপনের জন্যই যদি তিনি আজ কর্মচ্যুত হয়ে থাকেন, তবে জাতীয় চেতনাসম্পন্ন আদর্শ কর্মী হিসেবে তিনি সবার মধ্যে প্রচার লাভ করুন, এই সঙ্গে আমরা এই কামনাও করি।

ভেজাল ওষুধ

চার বছরে সাতাশটি ভেজাল ওষুধের কারখানা খরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। গ্রেপ্তার হয়েছেন মোট সাত-চল্লিশজন। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দশ-জনের বিরুদ্ধে চার্জ-সীট এবং চোদ্দ-জনের সাজা হয়। এই মোট চল্লিশ-জনের খবর জানিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাক্টমন্ত্রী।

ওষুধে ভেজালের মতো নিকৃষ্ট ব্যবসা আর একটি আছে শিশু-খাদ্যে ভেজাল। দুটিই দুর্বলের ওপর পার্শ্ব আচরণ। ভোজালদানকারীরা কতদূর শাস্তিভোগ করেন তার বিস্তারিত খবর জনসাধারণ জানতে পারেন না। এদের জন্য চরমতম শাস্তির নতুন বিধান তৈরি হওয়া প্রয়োজন। হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান তৈরি করেছিলেন আইনসচিব-

কারীরা। হত্যাকারী বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করেন, তার সঙ্গে বহু জটিল প্রশ্নও বিজড়িত থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থগৃহ্যতার জন্য যারা সহস্র মানুষকে ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ খাইয়ে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে এগিয়ে দিচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হচ্ছেন তাঁদের জন্য শাস্তির বিধানে অনেক শৈথিল্য আছে। অর্থাৎ গুরু পাগে লঘু দণ্ডের বিধান। ন্যায় বিচারের চক্ষে এই প্রাতিদ্বন্দ্বিক ন্যায়নীতির শৈথিল্য অবলুপ্ত, হওয়া উচিত। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি ইতিপূর্বেও আকর্ষণ করার প্রয়াস রেখেছে 'বঙ্গদর্শন'। বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে 'বঙ্গদর্শন' সরকারের কাছে এ বিষয়ে কঠোরতম আইন প্রণয়নের জন্য বিতর্কীয় দফা আবেদন রাখে। এমন আইন, যে আইনে এই দুষ্কৃতকারীদের কোন ক্ষমা নেই। যারা জীবন কাড়ে অগণিত মানুষের, এমন আইন চাই, যে আইন তাঁদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য কেড়ে নেবে প্রকৃতির আলোবাতাস, যা প্রাণের মতই পরম সুন্দরের দান। প্রাণদণ্ডও নয়, আবর্জনার মত এদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করাই হবে উপযুক্ত শাস্তি। যে শাস্তি দেশব্যাপী এ জাতীয় ঘণ্য কাজের প্রদর্শন ভয়ঙ্কর হাস সৃষ্টি করে সঙ্কম হবে।

মিছিল মানুষ

বিগত সপ্তাহের মিছিল মানুষদের মধ্যে ছিলেন ফেরিওয়ালার এবং ক্ষুণ্ণ-কাতর সম্প্রদায়। অবশ্য এই দুই জাতের মিছিলকে আলাদা করে দেখাবার কারণ নেই। দুই মিছিলই রুটির দাবিদার।

ফেরিওয়ালাদের বিকল্প কর্ম-সংস্থান হয় নি, অথবা ফেরিওয়ালার-বিস্তি চালিয়ে যাওয়ার মত বিকল্প স্থান

নির্দিষ্ট হওয়ার আগেই তাঁদের রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে ফেরি করার স্থান থেকে উৎখাত হওয়ার পর; প্রশ্নটা তাই শুদেরও রুটিটাই প্রশ্ন।

শ্রিতীয় যে মিছিলটি বিধান সভা ঘনিষ্ঠমুখে ঘাটা করে, তাঁদের দাবি পেট ভরিয়ে রেশন দাও। সাধারণ মানুষকে ২৪ শত গ্রাম এবং শ্রমিক মানুষকে ৩৩ শত গ্রাম রেশনের দাবি ছিল তাঁদের কণ্ঠে।

ফেরিওয়ালাদের রুজিরোজগারের পথই বন্ধ হয়েছে, যেমনভাবে বন্ধ হয়েছিল স্বর্ণকারদের করে খাওয়ার পথ, যেমনভাবে ছাঁটাই হয়েছে মিষ্টান্ন কারিগরের সংখ্যা। একথা ঠিক, কলকাতার কর্মব্যস্ত রাস্তাঘাট সকাল সন্ধ্যা জনসমুদ্রে ভাসছে; চতুর্ভুজ যানের ভিড়েও মানুষের পথচলা দায়। এমত অবস্থায় ফেরিওয়ালারা উচ্ছেদের স্বারা সরকার একাধারে জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করেছেন যার একান্ত প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল বহু কাল ধরে। সরকার সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন ফেরিওয়ালারা উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বৈঠক নয় যে, ফেরিওয়ালাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে এই অর্গণিত পরিবার কি অনাহারে মরবেন।

আমরা বহুকাল যাবৎ একটি মাত্র দৃষ্টবোধই পুনঃপুনঃ উত্থাপন করেছি এই মর্মে যে, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কারও কর্মহানি করা কল্যাণ-ব্রতী সরকারের পক্ষে অনুচিত। যে সরকার দেশে পুরোপুরি কর্ম সংস্থানে অক্ষম তাঁবাই হেটে-খাওয়া মানুষের রুজিরোজগারের পথ বন্ধ করে দিলে সে আচরণ ব্যর্থতার গণিতকে পরিণত হয়। আশা করি, সরকারী দৃষ্টি ফেরিওয়ালারা সমস্যার প্রতি যথাযোগ্য আকৃষ্ট হবে এবং এঁদের ভরাবহ বেকারত্ব থেকে উদ্ধারের একটি সুচিন্তিত পথ সরকার আবিষ্কার করবেন অবিলম্বে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা বৈঠকে সংশোধিত রেশনের 'কোটা' বাড়িয়ে তের শত গ্রাম থেকে পনের শত গ্রামে তোলায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই 'কোটা' বৃদ্ধি চাল ও গম্মে দেওয়া হবে। সংশোধিত রেশন এলাকায় এযাবৎ যে তীব্র খাদ্য সংকট গোছে তাতে এই দু'শ গ্রাম বৃদ্ধিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় কিছুটা সুরাহা করবে। তবে তার দ্বারা বিক্ষোভ মিছিলের দ্রোত যে কমবে এমন

আশা করা সম্ভব নয়। মিছিলকারীরা চেয়েছেন, ২৪ শত গ্রাম।

এ ছাড়াও এই মিছিলে সরকারী দুধের দাম হ্রাস ও সভা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার করার দাবিও তোলা হয়েছে।

রেশন সম্পর্কে জন-বিক্ষোভের যথার্থ কারণ অনস্বীকার্য। অবশ্য কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের জন্য সরকার সাধ্যমত ব্যবস্থা করেছেন ও করছেন। যদিও তাও একটি মানুষের ভরপেট খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সরকার দুধের দাম যেভাবে অকস্মাৎ বাড়িয়ে দিলেন তাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সন্তানাদি ও অশক্তের মধ্যে গোদুগ্ধ ভুলে দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ দেশে সবচেয়ে অনুভূত ব্যাপার এই যে মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে কারও বিশেষ চেতনা নেই। যে সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবেন সেই সরকারই কিভাবে মূল্যবৃদ্ধিতে ক্রমাগত উৎসাহ দান করে আসছেন সরকারী সংস্থায় উপস্থিত দ্রব্যাদির ওপর দাম চড়িয়ে? এদিকে মানুষের রোজগার সে তুলনায় বাড়ছে না। সুতরাং কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য এক একজন মানুষকে চরিত্র ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হচ্ছে, কেবলমাত্র গগনস্পর্শী মূল্যবৃদ্ধির তালে তাল রেখে পরিবারবর্গ প্রতিপালনের জন্য। সে এক দুঃসহ অবস্থা। মানুষের এক মহত্ব অবসর হাপনের সময় তো নেই-ই, অর্থোপার্জন ভিন্ন অন্যতর চিন্তা করার কোনও উপায়ও বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা রাখে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সময় হাবতায় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় সেই হানুয়ারী মাসেই যাবতীয় ব্যবহার্য জিনিসের মূল্য নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই?

কিন্তু করণীয় না থাকলে মূল্যবৃদ্ধির এই যথেষ্টাচার প্রতিনিধি সাধারণ মানুষের গলায় উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি কবে তরুণের অন্তিম দশার সৃষ্টি করবে।

তবে সরকার অকস্মাৎ হস্ত করণীয় কিছু করেন, তা হ'ল আপন কর্মচারীদের গোটা পাঁচেক টাকা মাহিনা বৃদ্ধি। তাও অনেক দূর কষাকষি ও মিটিং মিছিলের পর। অবশ্য দূর বাড়তির সমুদ্রে যে তুফান তরঙ্গ তাতে ঐ পাঁচ টাকার প্রসাদ কোনো লাইফ বেস্ট নয়, তা সামান্য উপলব্ধির সঙ্গে তুলিত হওয়ার সাক্ষ্য হয়ত বা।

যাই হোক, বিক্ষোভ মিছিলগুলি

অবস্থাপাতিকে অবশ্যম্ভাবী হতে দাঁড়িয়েছে।

সভা শোভাযাত্রা বন্ধের তাগিদ সে কারণেই অনুভূত হচ্ছে এমন কথাই বিরোধী দল বলবেন। বলছেনও। তাঁদের আশঙ্কা জনসাধারণের মূর্খত্ব কণ্ঠের আতনাদ বন্ধ করার জন্যই নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রস্তাব।

এ সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন'ের মতামত ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু এইমাত্র বক্তব্য যে, নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সত্যকার সমস্যার সমাধান হয় না, সমস্যাকে বরং জটিল করেই তোলা হয় আরও বেশি করে।

বীরভূম:

বিবরের অঙ্কার

নলহাটি থেকে মাইল ছয়েক দূরে বরুলা গ্রাম। স্থানটি সারা বাংলা সাহিত্য মেলায় শ্রিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উন্মোচন করা হয় উত্তর-শরৎঘটকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কথাসাহিত্যিক তারাগন্ধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষণ পাঠ করে।

সারা বাংলার কথাসাহিত্য ও কাব্য-কলা সম্পর্কে এ যুগের যশস্বী কথাসাহিত্যিক যে ভাষণ দান করেছেন (অসুস্থতাবশত তারাগন্ধর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন নি) তাতে বাংলা সাহিত্যের একটি "অধঃপতিত কালের" চিত্রই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তারাগন্ধরবাবু লিখেছেন: "আজ বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্টরূপে একটি দুর্দিন ঘনায়মান। কবিতায় ক্ষুৎ্রকাতর সম্প্রদায়ের আবির্ভাব এবং গল্পে উপন্যাসে গহবরের, বিবরের অঙ্কার-পুঞ্জের ধুমকুন্ডলীর মতো আবির্ভাব একটা অধঃপতিত কালের সূচনা করছে সমগ্র জাতির পক্ষে।" "অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেশের উত্তরে চীন এবং পূর্বে-পশ্চিমে পাকিস্তান আক্রমণোদ্যত হয়ে অস্ত্র উর্চিয়ে বসে নেই—অস্ত্রাঘাত করে পুনরায় অস্ত্র উত্তোলন করেছে—তখন বাংলা সাহিত্য, যে সাহিত্যের সাধনায় প্রথম মুসল্লী দেশ চিম্মারীরাপে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন, আমরা বন্দে মাতরম বলে দেশকে প্রণাম করেছিলাম, যে সাহিত্যে গোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, জনগণ-মন অধিনায়ক রচিত হয়েছে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভারের প্রভাবে একটি জাতির অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার অভিব্যক্তি হয়েছে—সেই বাংলা সাহিত্য অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে

গহ্বরোদ্ভূত... অন্ধকারপঞ্জের... মন্থো...
নির্মিস্ত হলে গেল।.....

তারশঙ্কর কল্যাণবাদী তাই আশার
বাণীও এই সঙ্গে তিনি শুনিয়েছেন।
লিখেছেন, "...সাময়িকভাবে জীবনের
জলাভূমির বিষয়াদি চেতনা হারালেও
তাদের (জাতি হিসেবে বাঙালীর)
(বন্দনীর আমাদের) অপমৃত্যু ঘটবে না।
যা ঘটতে পারে না।"

বাস্তবিক। বিবরের অন্ধকার
গৃহবাসীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে
পারে, কিন্তু উদার সূর্যালোকের
আহ্বান মানুষকে ক্ষুদ্র গম্ভীর থেকে
আকর্ষণ করবেই। গত থেকে বেরিয়ে
আসাটাই মানুষের ধর্ম, গতে প্রবেশ
করা নয়।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় 'ভারতদর্শন'
শীর্ষক আলোচনার সাপ্তাহিক
বঙ্গমতী এই মর্মে খেদ প্রকাশ করে-
ছিল যে, সাহিত্য আজ নেতৃত্বহীন।
সৌভাগ্যত বাংলা সাহিত্যের আভিনব
অগ্রজ সাহিত্যিক তারশঙ্কর বন্দো-
পাধ্যায় শিল্প সাহিত্যে ঘনিষ্ঠমান অন্ধ-
কার সম্পর্কে আমাদের প্রথম সচেতক
উপদেশ শোনান। সাহিত্যের দর্দিনে
বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যিকগণ তার-
শঙ্করবাবুর ন্যায় সুস্পষ্ট ভাষণে
আরও শুভাশুভ আলোচনা করবেন,
তারশঙ্করবাবুর ভাষণের পর এই আশা
আমরা পোষণ করতে পারি।

বস্তুতপক্ষে অন্ধকারের সপক্ষে যত
ওকালতি এই দশকে হয়ে আসছে,
আলোকিত পথ প্রদর্শনের জন্য তেমন
করে আবেগ অনুভব করেন নি কেউ।

উত্তর-শরণযুগে বাংলা উপন্যাসের
ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করে অগ্রণী
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অগ্নিদলিমের
যে কয়েকজন তাঁদের মধ্যে দু'জন
(মানিক-বিভূতি) আজ নেই। জীবিত
দু-একজনের মধ্যে বিনি আছেন, তিনি
যে বহুল প্রচারিত অকল্যাণকে মূখ্য
বন্ধু স্বীকার করে নিতে পারেন নি।
তা তাঁর সৃষ্টিতে ও ভাষণে আজ স্পষ্ট।
তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য তাই বিশেষ
গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার উপযুক্ত
সময় সমুপস্থিত হয়েছে। এ শব্দ
ভিন্ন রুচির প্রশ্ন নয়, সমগ্র জাতির
কল্যাণ-অকল্যাণের মূল প্রশ্নকে ধরেই
তারশঙ্কর তাঁর মূল্যবান মতামত প্রকাশ
করেছেন।

মদ্যীয়াঃ

রফা বন্দোবস্ত

রাণাঘাটের "শ্রমিক ও সন্ন্যাস"
পাক্ষিক পত্রিকার সংবাদদাতা পুন্ডলিশী

রফা বন্দোবস্তের একটি নয়া নীতি
উপস্থাপিত করেছেন বছরের পয়লা
দিবসিক সংখ্যায়।

সংবাদদাতা স্থানীয় বাজারে গিয়ে
পুন্ডলিশী রফা বন্দোবস্তের যে চিত্র
সংগ্রহ করে এনেছেন তা যদিও সাধা-
রণের কাছে নতুন কোনো বিষয় বলে
বোধ হবে না, তবে সরকারী নজরে এই
চমকপ্রদ সংবাদগুলিকে পেঁছে দেওয়ার
দায়িত্ব সাংবাদিকগণকে বহন করতেই
হবে। নিম্নোক্ত অংশে সংবাদদাতা
সেই দায়িত্বই পালন করেছেন। আমরা
তাঁর এই চমকপ্রদ সংবাদটি উদ্ধৃত করে
উপযুক্ত কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিচ্ছিঃ

"...একাকী দাঁড়িয়ে আছি অন্য-
মনস্কভাবে। ছোট ছোট খলে নিয়ে
ছুটে এলেন জনকয়েক অতি নিরীহ
কৃষক; হাঁপাতে লাগলেন। কারণ
জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললেন, "আর
বলবেন না বাবু, আমাদের কপাল।"
"কপাল মানে? খুঁলেই বলুন না কি
হয়েছে"—সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুধুলাম।
বললেন, "পুন্ডলিশী তাড়া করছে চাউল
বিক্রী করছি বলে। তারা বলে—বন্দো-
বস্ত কর।" উৎসুক হয়ে জানতে চাই-
লাম 'বন্দোবস্ত' মানেটা কি। তারা
আমাকে জলের মত বুদ্ধিরে দিলেন যে,
সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বেশি দামে
চাউল বিক্রী করলে মাসে কিস্তিবন্দী বা
প্রতিদিন পুন্ডলিশীকে চুড়ি মত টাকা
দেওয়াটাই 'বন্দোবস্ত'। তাঁদের মতে এটা
নাকি ঠিক ঘৃণ পর্ষয়ে পড়ে না। কারণ
পুন্ডলিশী বে-আইনী কাজ করবার সুযোগ
না দিলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সংসারই
অচল হয়ে পড়বে।

বাদ্যের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎ
তাদের কারও নিকটই ৪।৫ কে-জির
বেশি চাউল ছিল না। এঁরা সকলেই
গ্রামের সাধারণ কৃষক। সামান্য ২।৪
কে-জি চাউল বিক্রী করে সংসারের
অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি কিনবেন।

সন্দিগ্ধ হয়ে বাজারে ঘুরতে
লাগলাম কথাগুলির সত্যতা যাচাই
করতে। জুটে গেল অনেক খবর।
জোর খবর। অবিশ্বাস্য খবর।

রাণাঘাট ডাক্তার লেনের 'ডাক'
হয়েছে। পক্ষ দুইটি। একপক্ষ পুন্ডলিশী
অন্য পক্ষ ব্যবসায়ী। মাসের 'ডাক'।
মাসের চুক্তি বা সেই বন্দোবস্ত। অর্থাৎ
ডাক্তার লেনের (রাণাঘাট) ব্যবসায়ীরা
পারা মাস যত চোরাকারবারই করুক না,
কেন পুন্ডলিশী চোখ বন্ধ করে চুপচাপ
থাকবে, কিছুই বলবে না, দেখবেও না।
বিনিময়ে সকলে মিলে ৭০.০০ (সত্তর)
টাকা পুন্ডলিশীকে দেবে। জানা গেল;

এখনও রফা হয় নি। পুন্ডলিশী নাকি এত
কম টাকায় রাজী হচ্ছে না। পূর্ববর্তী
হরিসভা লেন, রেলবাজার প্রভৃতির ডাক
নাকি আরও অনেক বেশি টাকা উঠেছে।

যাহা বন্ধা গেল তাতে একটা রব
হতে আর বেশি সময় লাগবে না। কয়েক
টাকা বেশি দিতে ব্যবসায়ীদের মোটেই
বাধে না। চাউলের দাম ১.৭০ টাকা
থেকে ১.৭৫ আর মাছ ৪ টাকা থেকে
৫ টাকা পড়তা ফেললেই পুন্ডলিশীকে
খুশিমত দিয়েও ব্যবসায়ীদের লাভের
উপর আরও বেশ দুটাকা থাকবে।..."

কল্যাণী স্পিনিং মিল

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত
হইয়াছি যে, কল্যাণী স্পিনিং মিলসের
কর্তব্যক্তিদের মধ্যে বেশ একটা মতভেদ
সৃষ্টি হয়েছে আর তার চেউ এসে
পড়েছে কর্মীদের মধ্যে। আমরা জানি
এই মিলের অগ্রগতির মূলে এর অভিজ্ঞ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী আর আর
চ্যাটার্জী। তাঁর নিপুণ পরিচালনার
দরুন বিগত পাঁচ বছর এই মিলে কোন
প্রকার উল্লেখযোগ্য শ্রমিকসংঘাত হয়ে
উৎপাদন ব্যাহত হয় নি, উপরন্তু প্রতি
বছরই এই মিল উন্নতির পথে এগিয়ে
গিয়েছে। আর তারই ফল স্বরূপ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাবড়াতে আর একটি
স্পিনিং মিল খুলেছেন এবং তার নাম-
করণ করেছেন কল্যাণী স্পিনিং মিলস
নং ২। দূর্ভাগ্যবশত চ্যাটার্জী মহাশয়
শারীরিক অসুস্থতার দরুন ৩।৪ মাস
এই মিলের কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে
দেখতে পারেন নি এবং তার ফলে
ভ্রমাত্মক আভ্যন্তরীণ গোলমালের কথা
শোনা যাচ্ছে—তার কারণ কোন কোন
অফিসার অধিক ক্ষমতার প্রার্থী হয়ে
শ্রীচ্যাটার্জী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী
হয়েছেন। এখনও ঠাণ্ডা জড়ই চলেছে।

এদিকে মিলে গুদাম ভর্তি মাল।
শোনা যাচ্ছে প্রায় দেড় কোটি টাকা
মাল জমে রয়েছে। মালের দাম কমিয়েও
মাল বিক্রী হচ্ছে না। মাল বিক্রীর
ব্যাপারটা নাকি দু-একজনের কাছে এক-
চেটিয়ার মত ন্যস্ত আছে। অগ্রাধিকার
পাওয়াল যারা ক্রেতা হিসাবে বরাবর
অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছেন তাঁদের নানা
অজুহাতে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এই
মিলের সূতোর বাজারে খুব সুনাম
থাকা সত্ত্বেও বিক্রী হচ্ছে না। আমরা
মনে করি মাল বিক্রীর ব্যাপারে কোথাও
যেন একটা বড় রকমের গলদ আছে এবং
কিছু ক্রেতগোষ্ঠীর এই ব্যাপারে হাত
রয়েছে। সরকার এবং মিঃ চ্যাটার্জীর
এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা
আছে।

আমরা আরও শুনতে পাচ্ছি যে, এই মিলের কোন উদ্ভূত অফিসার নাকি সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মিলের কর্তৃপক্ষ দলের প্রয়াসী হয়েছেন। গোপনে তাঁর গৃহে ইতিমধ্যে অনেকে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। বড় রকমের একটা কর্মসূচীও গ্রহণ করাও হচ্ছে যার ফলে মিলে শীঘ্রই একটা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। উপরোক্ত সংবাদটি পরিবেশন করেছেন স্থানীয় সাপ্তাহিক “গণ পণ্ডায়ত”। সংবাদটি উপযুক্ত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে উদ্ধৃত করা হল। মন্তব্য অনাবশ্যক।

হাজি'লিং:

প্রকাশ, শিলিগুড়ি পৌরসভার এলাকাধীন এক ও দুই নম্বর ডাবগ্রাম উদ্ভাস্তু কলোনীর ওপর সাতদিনের একটি সরকারী নোটিশ জারি করা হয়েছে। নোটিশের নির্দেশ, সাতদিনের মধ্যে কাঠাপ্রতি তিনশত দুই টাকা জমা দিতে হবে এক নম্বরের অধিবাসীকে আর কাঠাপ্রতি তিনশত পঁচাত্তর টাকা হিসেবে মূল্য দিতে হবে দুই নম্বরের বাসিন্দাদের। এইভাবে তাঁরা যদি নিজ নিজ জমির পাকা দািলল করে নিতে অক্ষম হন, তবে উক্ত জমি থেকে তাঁদের উৎখাত করে পুনর্বাস্তবাস্ত দেওয়া হবে।

এমত স্বরূপকালের নোটিশ জারি যে বিলকুল অসম্ভব সে প্রশ্নকে পাশে রেখেও স্থানীয় জনসাধারণ এবং নোটিশের শিকার উদ্ভাস্তুগণ অন্যতর প্রশ্নে অধিকতর আশঙ্কাতুর হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় সাপ্তাহিক “দৈনিক” এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলা হয়েছে: “আমাদের মনে হয় এই জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য বহু বিস্তারিত বাঙালী ও ব্যবসায়ী অবাঙালী উদগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে। সরকারী নোটিশ কার্যকরী হলেই তারা কর্মক্ষেত্রে কাঁপিয়ে পড়বে... গড়ে উঠবে আকাশচুম্বী অট্টালিকা এবং বহুনাশতন কলকারখানা ও সর্বগ্রাসী আয়তনের গদ্যদাম, অফিস, ইত্যাদি।”

উক্ত ‘সৈনিক’ পত্রিকায় সরকারী নোটিশ সম্পর্কে উদ্ভগ প্রকাশ করে কয়েকটি প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সূচীভিত্তিক প্রস্তাবগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

সৈনিকের প্রস্তাব (১) জমিরকুইজিশনের সময়ে নির্ধারিত জমির মূল্যমানের ভিত্তিতে বর্তমানে জমির মূল্য নির্ধারিত করা সরকার। উন্নয়ন খরচাদি উদ্ভাস্তুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনিচিত। (২) জমির মূল্য বহনযোগ্য কিস্তিতে পরিশোধ্য বলে গণ্য করতে হবে।

প্রথম প্রস্তাবটি আমাদের মতে একারণেই সমর্থনযোগ্য যে, যে সময় উদ্ভাস্তুগণ এই জমিতে পুনর্বাসিত হন তখন তাঁদের হাতে যদি পরস্যা থাকত তবে তখনকার মূল্যেই তাঁরা ঐ জমির মালিকানা অধিকার করতে পারতেন। ঐসব অনুন্নত জমিতে বসবাসকালে অনেক দুর্ভোগ ও দুর্ভোগ তাঁরা সহ্য করেছেন। অথচ তাঁদের জীবনে এই দুর্বিপাক ঘনিষে তোলার জন্য তাঁদের নিজস্ব কোনো দায়িত্ব ছিল না। দেশের স্বার্থে (এবং দেশের নেতৃবর্গ দেশকে অর্থায়িত অবস্থায় বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্ত করতে অক্ষম হওয়ার জন্যই তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিটে ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আসতে হয়। সুতরাং তাঁদের পুনর্বাসিত করার নৈতিক দায়িত্ব ছিল সরকারেরই। সরকার সে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আজ তাঁদের বসবাসের ফলেই যে সমস্ত অনুন্নত জমি উন্নত ও বাসযোগ্য হয়ে উঠছে তার জন্য তাঁদেরই ওপর বর্ধিত মূল্য চাপিয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি একটি সাধারণ নিয়ম পালনেরই ব্যাপার। রাত পোহালেই টাকা দাবি করলে চলবে কেন। এই দাবি আদায়ের জন্য একটা ন্যায়সঙ্গত কিস্তিবদ্ধী ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে তাঁরা অকস্মাৎ চাপের ফলে জমির মূল্য পরিশোধে অক্ষম না হন। যেহেতু উদ্ভাস্তু জমি বন্টনের ব্যাপারটি স্বাভাবিক জমি বন্টনের তুল্য কোনো ঘটনা নয়, সেজন্য জমির মূল্যের ওপর বা কিস্তির ওপর সুদ বাবদ বা উন্নয়ন বাবদ খরচাদি ধার্য করাও অযৌক্তিক।

মুর্শিদাবাদ:

ফাঁকা বাড়ি: অপচয়

পাটনার (বিহার) একট প্রসুতি হাসপাতাল সম্পর্কে এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে চিকিৎসক ও বিধিবদ্ধ সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রোগীরা না আসায় কর্তৃপক্ষ নতুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হয়েছেন। ‘পেসেন্ট’ ভাকর্ষণের জন্য প্রতিদিন দুধের ও মেডিকেল

কলেজের প্রধান চিকিৎসকদের নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে।

আর পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরের ওপর নবনির্মিত হাসপাতালের দুরবস্থার কথা জানিয়ে ঠিক এই সময়ই স্থানীয় “জনমত” পত্রিকায় আমরা নিম্নরূপ সংবাদ পাচ্ছি:

“বহরমপুর সদরে যেমন নবনির্মিত হাসপাতাল করে চালু করা হবে তা স্থানীয় জনসাধারণ জানেন না তেমনি কান্দী শহরের উপর নতুন হাসপাতালের যে বিরাট অট্টালিকা উঠেছে তা কবে চালু হবে? এতদিন বন্ধই বা আছে কেন? এই প্রশ্ন স্থানীয় জনসাধারণের মনে জাগে। হাসপাতালের ঘর হয়েছে। স্টার্ট কোয়ার্টার, মিনিয়ালস কোয়ার্টার হয়েছে, জলের ব্যবস্থা হয়েছে। লাইট হতেও কোন বাধা নেই। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে এই হাসপাতালটি চালু না কোরে লোক দেখানোর জন্য ফেলে রাখা হয়েছে তা বোঝা মুশ্কিল। ইতিমধ্যে নতুন হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারে নার্সরা বাস করতেও শুরুর কোরছেন কিন্তু রোগীরা নতুন হাসপাতালের সুযোগ পায় নি। এখনই সেই অপরিচ্ছন্ন আলো-বাতাসহীন পুরনো হাসপাতালে রোগীদের পচতে হচ্ছে। জনশূন্য হাসপাতালের রক্ষাবেক্ষণের জন্য দারোগার বা নাইট গার্ডের খরচ আর কতদিন সরকার বহন কোরবেন?” —৩১।১২।৬৫।

তবে কান্দীর জনগণকে সেই শূন্য দিনের অপেক্ষার থাকতে হবে, যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে পেসেন্ট আকর্ষণ করবেন।

হাসপাতালের অভাবে পেসেন্টকুল “পগার পার” হলেই অবশ্য তেমন দিনের মোলাকাত হতে পারে।

বলা বাহুল্য ততদূর ধৈর্য ধারণে কেউ রাজী হবেন না। অর্থের অপচয় এবং অকারণে হাসপাতালকে দর্শনী করে রাখার নেপথ্য কারণ জানার জন্যই বরং দাবি উঠবে।

সে দাবির সঙ্গে, বলা বাহুল্য, কণ্ঠ আপনি মিলে যাবে বঙ্গদর্শনেরও। প্রশ্ন তাই, গৃহ্য কারণটা জানানো হ'ক। জনসাধারণ কারণ জানার জন্য একান্ত উদগ্রীব।

মহাকবিবন্ধু যতীনন্দন

যতীনন্দন প্রমথোদয়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

২ অজ্ঞাতবাস ২

২ এক ২

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের গোড়াব দিক। তটস্থ কলকাতা। যতীনন্দনের নামে মোটা টাকার পুরস্কার। তাঁর অনেক শিষ্যের নামেও। এদের যদি কেউ ধরিবে দিতে পারে, তবে—সাত পুরুষ তাকে রাজার হালে রাখবে বিদেশী সবকার।

সুবেশ মুখার্জী হত্যার মাত্র কয়েক দিন পূর্বের ঘটনা। পাখুবিষাঘাটার গোপনে মিলিত হয়েছেন অতুল ঘোষ এবং অন্যান্য নেতাবা, যতীনন্দনের সঙ্গে কিছু পরামর্শের জন্যে।

জান্না দিবে একটা ছায়া এসে পড়ল। দ্রুতপ্রহর সতর্ক চিন্তাপ্রবের দৃষ্টি তখন দানিয়ে উঠল। বিভলভাব তুলে নিলেন তিনি। ছায়াব গতিক দেখে অনুমান করতে দৌঁর হল না কাবার অবস্থান কোথায়।

বিভলভাব গজ্ঞে উঠল।

সবাই চিত্তর দিকে তাকালেন। দু-একজন ছুটে বাইরে গিয়ে দেখেন—বারান্দার উপড় হয়ে পড়ে আছে গায়ন্দা নীরদ হালদার। অনর্গল রক্তে ভেসে বাছে বাবালা।

“আর এখানে নয়”, যতীনন্দন বললেন, “পুলিশ এল বলে। সবাই চলে যা।”

নীরদ কিন্তু মরে নি তখনো। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। গুলী আওয়াজ শুনে পুলিস, লোকজন সবাই ছুটে এল। কেউ কোথাও নেই তখন। নীরদ শব্দ বজাৎ ফলেববে পড়ে আছে।

তখনই নীরদকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। জ্ঞান হলে নীরদ জ্ঞান দিলঃ যতীন মুখার্জী আমার গুলী করেছেন। আমার মৃত্যুর জন্যে তিনি দায়ী।

এটুকু বলবার অপেক্ষাতেই বোধহয় সে বেঁচে ছিল। শেষ নিশ্বাস ফেল সে দেশ-দ্রোহীর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

আবার যতীনন্দন?... কেন্দীয় সরকারের টনক নড়ল।...সাজ সাজ রব।

কিনাইদা স্টেশনের কাছেই—সিঙ্গে স্টেশন।

যতীনন্দনের কণ্ট্রিয়ার ব্যবসার মাগুয়া শাখা থেকে নলিনীকান্ত কর সিঙ্গে এসেছেন কল্যা কান্তে। আপাতদৃষ্টিতে ইনি যতীনন্দনের কর্মচারী হলেও বিপ্লবী সংগঠনের তিনি বিশেষ উচ্চদের কর্মী।

দশ সালে সামসুল হত্যার পরই নলিনী-বাবু অন্তর্ধান করে উড়িষ্যার বন জঙ্গলে, বালেশ্বরের কাছে আশ্রয়গোপন করেছিলেন এক বছর। ১৯১১ সালে যতীনন্দন ছাড়া পেলে ইনি কলকাতার ঘিবে কিছুদিন অতুল ঘোষের বাড়িতে থেকে, যতীনন্দনের নির্দেশে চলে যান পাবনা শহরে—depressed class-এর মধ্যে ‘মাস্টারি’ করতে। ইতিমধ্যেই যতীনন্দন সেখানে পাঠিয়েছেন কুণ্ডিয়ার ক্ষিতীশ সান্যালকে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে। এবং ওখানেই যতীনন্দনের স্নেহভাজন কর্মী গোপেন বাবের বাড়ি। বি এস-সি পাশ কবে গোপেনবাবু নতুন করে সংগঠনের কাজে নামেন। এবং যতীনন্দন কণ্ট্রিয়ার অজ্ঞ-হাতে ঘনঘন এখানে এসে কেশগুলিকে দানা বাঁধতে স্বাধীনত করেন—বিশেষত যখন সারা রিক্সের কণ্ট্রি তিনি নিলেন। স্থানীয় বহু তবু ও যুবককে বিকটে করা হয় তখন। সরকারি প্রেক্ষারাব জগদীশ লাহড়ী বহু অর্থ দিয়ে এঁদের সাহায্য করেন।

১৯১২ সালে এই কেন্দ্র থেকে নলিনী কবকে সরিয়ে নিয়ে যতীনন্দন তাঁকে মাগুয়া বসান।

কল্যা কান্তে নোকোর তুলিয়ে, নলিনী কব স্টেশন মাস্টারের সাঙ্গে বসে সিঙ্গে স্টেশনে গল্প করছেন। হুঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এলঃ “যতীন মুখার্জী নীরদ হালদারকে গুলী কবে মেরেছেন। ওদিকে যান কিনা, সজাগ দৃষ্টি রেখা।”

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে, দিদি আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যথোরে (কিনেদার) শেখবাবের মত দেখে যান যতীনন্দন। সেই সময়েই নলিনী কবকে বলে যানঃ “ওরে

সময় এসেছে। শীগির তোর ডাক পড়বে। তৈরি থাকিস।”

সবল মনে স্টেশন মাস্টার টেলিগ্রামটি নলিনীবাবুকে পড়ে শোনাতেই নলিনীবাবু বুঝতে বাকি রইল নাঃ এই ডাক পড়ায় সশ্কেত। তবে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, স্বয়ং যতীনন্দন হত্যা করতে যাবেন নীরদ হালদারের মত ছাপোষা সরকারি চাকুরেকে। নলিনী কব লিখেছেনঃ “দাদা নিজে হাতে Shoot কবেছেন এ কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। বহুদিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে যেটুকু বুঝেছিলাম, তাতে তাঁর স্বাভাবিক সম্ভব নয়। আর তিনি হলেন অধিনায়ক—এই সব কাজ তিনি করবেনই বা কেন?”

এই কথাবই প্রাতিধানি কবেছেন নলিনী কব, “স্বাভাবিক লিখেছেন তাঁরা দাদার বাইরের বাহুবলটাকেই বড় কবে দেখেছেন এবং দেখাবার চেষ্টা কবেছেন। তাঁর বিবাক্ত অন্তর-শক্তি আতি সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র হচ্ছে তাঁর ওই বাইরের শক্তি। তিনি একাধারে বৃক্ষের প্রাণ, চৈতন্যের প্রেম, শব্দবের জ্ঞান, নেপোলিয়নের শৌর্য ও দুর্জয় সাহস নিয়ে জন্মেছিলেন!...এই ৭২ বৎসর বয়সে কত মানুষ দেখলাম। তেমনিটি আব চোখে পড়ল না। তিনি ছিলেন পবনমাণ। তাঁর ছোঁয়া লাগলেই শোহা সোনা হবে যেত।”

যতীনন্দনের ভবিষ্যৎ জীবনীকাবের উদ্দেশ্যে তিনি বলে বেখেছেন, “...তবে তাঁর হাতে বন্দুক রিভলবার দিয়ে তাঁকে বীর সাজে সাজিও না। তাঁর সান্নিধ্যে না এলে তিনি যে কী বতন অন্য কেউ জ্ঞানতে পারে না। তাঁকে জানা তো খুবই কঠিন, তাই চেষ্টাও সূচকিত তাঁকে লেখনীতে প্রকাশ করা।”

সিঙ্গে স্টেশন থেকেই নলিনী কব ঠিক করে ফেললেন তাঁর কর্তব্য। তদনুযায়ী, যথাসম্ভব নির্বিঘ্নভাবেই বিদান নিয়ে এলেন তিনি স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকে—রওনা হলেন নিজের পথে।

অজ্ঞাতবাসে যতীনন্দন।

কলকাতার কলক-এই ভাঁকে চাকিতে
জালাপেল অমৃত অঙ্গল; খবর-থেরে
কলিঙ্গ-চুটল তরি সম্মানে। ততক্ষণে কিন্তু
মাদ্রা পড়ে গিয়েছে মহানন্দীর অপর প্রান্তে:
যতীন মুখাধীকে সেখানে নাকি দেখা
গিয়েছে?

অর্থাৎ কোথাও হাদিস নেই যতীন্দ্র-
নাথের। কলকাতার সর্বত্রই তিনি বিচরণ
করছেন। অথচ বিপ্লবীদের কাজ অব্যাহত-
ভাবেরে এগিয়ে চলেছে তার পরিকল্পিত দিকে।
দুর্ভাগ্যবশত বহাল আছে তার কর্মখানা।
দুর্ভাগ্যের দমনও যেমন চপ্পে, তেমনি বহাল
আছে দুর্ভাগ্যের সেবা, অর্থাৎ রাগ।

বিপ্লব প্রচেষ্টার গোটা বেহয়স্র অমন
দুঃখ দুঃখের দেখেই না বিপ্লবের প্রতি
সহানুভূতিশীল জনগণ অবস্থিত হন যে
হৃদয়-মস্তিস্কও অক্ষতই আছে।

এমনি একদিন-হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ হাসি-
মুখে উপস্থিত হলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহ-
ভাজন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দীর্ঘকালের
মধ্যে এই প্রথম আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে
মরাদ অবসর পেয়েছেন।

অমন আচমকা যতীন্দ্রনাথকে আসতে
দেখে ফ্যাকাসে হয়ে যায় আত্মীয়টির মুখ:
মনস্তত্ত্বের বিচিত্র বহু-মুখী প্রতিফলন-
ভরে, আনন্দ, লোভে তিনি চিত্তাঙ্গিতের মত
হসে বইলেন।

স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা অট্টহাসিতে
বৈঠকখানা মুখরিত করে যতীন্দ্রনাথ আসন
গ্রহণ করতে গিয়ে হঠাৎ আত্মীয়টির ভাবান্তর
লক্ষ্য করলেন। বিহবল সেই চেহারা দেখে তাঁর
কাঁধে হাত রেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন:

“কিরে, আমি এসেছি বলে তুই বড়
খুব ঘাবড়ে গেছিস? বেশ, আমি চললাম।...”
মূল আত্মীয়টির পিঠে নসেন্ধে একটি চাপড়
দিয়ে যতীন্দ্রনাথ পথে পা বাড়ালেন।

বহাদুরের অদ্ভুত ক্রান্ত দেশনায়ককে
সৈন্য আশ্রয় দেবার মত বৃকের পাটা কটা
লোকবই বা হিস পবানীন এই দেশে?
জাতিব অন্তরে শতই প্রাতিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত
খুকুন না পরম স্মরণীয় চির বরণীয় সাধক-
বিশ্ববী-বাহির দুয়ার থেকে তাঁকেই সৈন্য
আমরা কি ফিরিয়ে দিই নি স্বার্থপরের মত
যা? নস্কর জানিবে? তবু তিনি আমাদের
ক্ষমা করে গেলেন, তাঁর আত্মীয়সেব দুয়ার
জানিয়ে গেলেন তিনি আমাদেরই মতো
আত্মসর্বস্ব কদ্যশর জাতিকে ভালবেসে
আমাদের কল্যাণ কামনাতেই পথকে করে
তুলেছেন ঘর, দুবেকে করেছেন নিকট, পরকে
ভাই।

সে বেদনাই বড়ি বাসর হয়ে রক্ত-
গোলাপের অর্ঘ্যের মত ফুটে উঠেছে
আমাদের জনপ্রিয় কথামিশ্রণীর লেখনীতে:

“তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ
নও-তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইত
দেশের খেয়াভরী তোমাকে বহিতে পারে না,

সাঁতার দিয়া তোমাকে পুষা* প্রায় হইতে
হয়-জাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে-
রূপ, দুঃখ পাহাড়পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া
চলিতে হয়-কেন? বিস্মৃত অতীতে
তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়া-
ছিল, কারাগার ত শূন্য তোমাকে মনে করিয়াই
প্রথম নির্মিত হইয়াছিল-সেই ত তোমার
গোরব। তোমাকে অবহেলা করিবার সাধ্য
কার? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে
বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই
জন্য। দুঃখের দুঃসহ গদ্যভার বহিতে
তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা
তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি-
পথের অন্বেষণে। পরাধীন দেশের হে রাজ-
বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার।”
তোমাকে শত কোটি নমস্কার।

আমেরিকা থেকে বার্নস্টার্ক খবর
দিচ্ছেন বার্লিন কমিটিতে যে চীনের জার্মান
রক্ষণদূত হিন্‌সে তাঁকে টেলিগ্রামে জানিয়ে-
ছেন-০-২-১৯১৫ তারিখে: “ভারতবর্ষে
এবং ব্রহ্মদেশে ঠিক সময়েই বিদ্রোহ শুরু
হচ্ছে।...শাহাই-এব কসাল জেনারেলের
তত্ত্বাবধানে আমি কেন্দ্রীয় একটি আস্তানা
গঠন করছি সেখানে, যাতে করে বলকাতা,
পেনন, ব্যাংক প্রভৃতি স্থান থেকে নিরাপদে
বিশ্ববীবা ওখানে হাতারাত করতে পারেন।

“আমার এক লক্ষ বশ হাজার জার্মান
মার্ক চাই পরবর্তী ছয় মাসের জন্যে; কিছু
অস্ত্রও। শাহাই-এ হের ফরচ (Vere's
sch) আমাদের সহযোগিতা করছেন।
ব্যাংককের দুতাবাসকে আমাদের শাহাই-এর
পারকল্পনা জানিয়ে সহযোগিতার নির্দেশ
পাঠান টেলিগ্রামে।...

“...ভারতবর্ষে অন্য অস্ত্র তি পাঠানো
হয়েছে? কবে নানাদ সেগুলো পৌঁছবে
মনে হয়?”

নিউ ইয়র্ক থেকে মিলিটারি স্রোতশে
ফন্ পাপেন ১২-২-১৯১৫ সালে
জানাচ্ছেন:

“অ্যানি লার্সেন জাহাজে কবে স্যান
ডিয়েগো থেকে মেক্সিকো টপালো বম্পোতে
অস্ত্রসম্পদ পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে
ওগুলো ইয়েবসেন কোম্পানীর স্টীমার
লোণোর-এ তুলে নেওয়া হবে এবং মেক্সিকোর
নিশান উড়িয়ে ওগুলো ব্যাংককে পৌঁছে
দেওয়া হবে। সেখান থেকে খোঁজ নেওয়া
হবে শান স্টেটের মধ্যে দিবে স্বল্পপথে
ভারতবর্ষে অস্ত্রগুলো যদি নিয়ে যাওয়া
সকিষে হয়, ভালই নইলে সোজা জাহাজে
কবে ভারতে ওগুলো খালাস করাতে হবে।

*স্মরণ থাকতে পারে, কয়ালারমের
গোড়াই নদী পুষারই মেয়ে।

পেপির-এ খবর দেওয়া হয়েছে। এ জাহাজে
পাঠান ভরিতার থাকবে।

১৫-০-১৯১৫ তারিখে স্যান ফ্রান্সিসকো
থেকে বার্নস্টার্ক এবং হুসিয়াল টেলিগ্রামে
জানাচ্ছেন:

“গুপ্ত (হেরস্ফাল) জানতে চান যে
সুবেজ খাল যদি তুর্কিরা অবরোধ করে
থাকেন তা হলে এখন প্রচুরেব জন্যে তো
জার্মানী থেকে ভারতীয়েরা আফগানিস্তানে
যেতে পারেন; আরো আট হাজার রাইফেল, দু
হাজার রিভলবার এবং কয়েকটি মেশিন গান
তাঁরা বাংলার জন্যে চান।

“অস্ত্রসম্পদ আমরা এখন থেকে সংগ্রহ
করতে পারি। অনুমতি পেলে আমরা এখন
থেকেই টাকা খরচ করে কেনার কাজে হাত
দিতে পারি।”

১৪-০-১৯১৫ তারিখে ফন্ পাপেন
নিউ ইয়র্ক থেকে খবর দিচ্ছেন:

“...ভারতবর্ষে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া
আমাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব নিজেদেবই
জাহাজে করে। নিয়মিত মালবাহী জাহাজে
বড় জোর আমরা মেরেকেটে ব্যাংকক অবধি
অস্ত্রসম্পদ নিয়ে যেতে পারতাম মিসো কাগজপত্র
দেখিয়ে। তারপর আমাদের মালের স্বরূপ
ধরা পড়তে বাধ্য, যদি ছাড়টে জাহাজ নেওয়া
হয়। অতএব তা অসম্ভব। পিকিং, শাহাই
এবং স্যান ফ্রান্সিসকোর দুতাবাসের সঙ্গে বহু
পরামর্শ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ
আভৌরিক জাহাজটা কিনে নিয়ে তাতে করেই
ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেব ছয়মাস বাবে বেনব
অস্ত্রসম্পদ কিনে মজুদ রেখেছি আমরা।

“স্যান ফ্রান্সিসকোর নৌ-বিশেষজ্ঞের
পরামর্শে আমরা গত ২০শে মার্চ এক লক্ষ
বিশ হাজার ডলার দিয়ে দুশ টন সামর্থ্যের
স্ট্যাডার্ড অয়েল স্টীমারটি কিনেছি।.....

“আম সব কারণেব চেরেও বড় কারণ এই যে
অস্ত্রসম্পদ অনেকখানি আমরা চার সপ্তাহের
ওপর হাল ইয়েবসেন কোম্পানীর জাহাজ
অ্যানি লার্সেন-এ চাপিয়ে দিয়েছি এবং শুল্ক
বিভাগ থেকেও তা ছাড়পত্র পেয়ে মেক্সিকো
রওনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অ্যানি লার্সেন
ভারতবর্ষে অবধি যেতে অনেককাল লেগে
যাবে; খুব ছোট জাহাজটা। আমার ধারণা
“আভৌরিক” জাহাজ কিনে আমরা খুবই বড়
দাঁও মেবেছি; মার্কিন পতাকা উড়িয়ে এই
জাহাজটা ব্যাংকক গিয়ে পৌঁছবে আন্দাজ
মে মাসেব শেষে। সেখান থেকে আমাদের
লোক খবর দেবে তারপর কোন পথে যেতে
হবে। উক্ত অস্ত্রগুলি পৌঁছে দেবার পর
সুমাট্রার পশ্চিম উপকূল থেকে ভাবতে
চোরাই অস্ত্র নিয়ে বাবার কাজে “আভৌরিক”
নিযুক্ত হবে। এখন থেকে সুমাট্রা অবধি
অস্ত্র পৌঁছে নিয়ে যাওয়া অবশ্য খুব সহজ
হবে না তখন; চেষ্টা করছি আমরা। ... তা
ছাড়া নতুন আন্তর্জাতিক আইন পাশ হবার
পর জাহাজের গন্তব্য স্থান পরীক্ষা না করে

106

New York, den 11.2.1915.

Indien.

Waffen sind auf Schoner, an Hilarson von Sandiego nach
Topolo Dampo Mexico verschifft. Werden dort umgeladen
auf Japan Steamer Leonore unter mexikanischer Flagge
und laufen Bangkok an, wo inwieweit Ermittlungen
angestellt werden; ob Weitertransport durch Rhin-Steat-
ten empfehlenswert oder ob und wo unmittelbare Lan-
dung Indien möglich. Peking ist benachrichtigt. 5
Jnder sind an Bord. Güter sind getroffen.

gez. Papen.

Handwritten signature

জার্মান মিলিটারি আতশে ফন্ পাপেন-এর টেলিগ্রাম

[শ্রীচুপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

শুদ্ধ বিভাগ তখন অস্ত্র ছাড়তে রাজী হবে
কিনা তাও সম্ভবহা...

“ভারতীয় বিপ্লব প্রসঙ্গে” ১৯১৫ সালের
জানুয়ারিতে বাধ্য হচ্ছি যে গুপ্ত চান—

আফগানিস্থান অভ্যন্তরীণ শত্রু হবার আগে
ভারতবর্ষে অবশ্যই যেন বিদ্রোহের প্রথম ঢেউ
দেখা দেয়!...গুপ্ত ভারতবর্ষের জন্য আরো
আট হাজার রাইফেল, দু’হাজার রিকলভার

এবং কয়েকটি মেশিনগান চাইছেন। এ-বিষয়ে
নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। বুয়েনোস
আইরেস-এ কেনা হচ্ছিল—এ মেশিন-
গানগুলো এই কাজে ব্যবহার করব কি?...?”

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

এর অগ্রগতি একটি টেলিগ্রামে (চীন থেকে ০. ২. ১৯১৫ তারিখে পাঠানো) আমরা হের্ৎ ফরচ্-এর নাম পেরেছি। চীনের ক্যান্টন থেকে পাঠানো পিকিং-এর একটি ফরাসী পত্রিকার কাট-ও মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ কবে প্রকাশিত হয় ১৫. ১০. ১৯১৪ তারিখে :

“দক্ষিণ চীনে একটি বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলেছে—ইন্দোচীন ও চীনের সরকারের বিরুদ্ধে—বিশেষত এই তিনটি প্রদেশে : কোয়াংটুং, কোয়ান্সি এবং ইয়ুনান-এ।

“উক্ত প্রদেশ তিনটিতে সমাগত আনামিৎ বিপ্লবীদের এবং চীনে বিপ্লবীদের মধ্যে নিবিড় সংঘর্ষিত হয়েছে বিশেষত প্রেসিডেন্ট ইউয়ান-এর সরকারের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার উদ্দেশ্যে। সন্দেহাত এসের নেতা হলেন হোয়াং-ফোং মাও, যিনি এখন কোয়ান্সিতে আছেন। এই বিদ্রোহের ফলে দক্ষিণ চীনের জার্মানদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতার প্রকাশ্য বহর দেখা যাচ্ছে। হোয়াং মাওর সঙ্গে সংগেই দেখা যায় জার্মানরা চেষ্টা করছে ইন্দোচীনের ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করতে, যাতে করে ফরাসীদের বাধ্য হ’য়ে জাপানী এবং ইংরেজদের শরণ নিতে হয়।

“অসিয়ার ব্রাগার, জার্মান ভাইস-কন্সাল, ইন্দোচীনে প্রেরণ হয়েছেন একেবারে হাতে-নাতে। এর বিরুদ্ধে মামলাচালাই হবে।

“হংকং-এর জার্মান কন্সাল হের্ৎ ফরচ্ তো খেলাখুলিভাবে আনামিৎ-বিপ্লবীদের সঙ্গে বোগাবোগ রেখেছিলেন। বাধ্য হ’য়ে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে; ফরচ্ এখন হংকং-এর চেয়ে কম গুরুত্ব কনক জায়গার ভরি বাধ্যতামূলক ‘ছটি’ কাটাবেন বলে ব্যাবক গিয়েছেন এবং সেখানেই আছেন। * চীনে বিপ্লবের সহায়তা করবার জন্যে একটি স্লকে তিনি এক লাখ ডলার জমা দিয়েছেন।

“ইওরোপ মহামুখের অবস্থা অনুকূল হলেই বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবেন বলে তৈরি হচ্ছেন সর্বত্র।”

এই রিপোর্টেরই আরো বিশদ বিবরণ এর পরে মূল জার্মান ভাষায় জার্মান খবর-মেন্টের নথিপত্রের স্থান পেরেছে।

সুমাত্রার ঘাঁটি স্থাপন করে সেখানে থেকে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠানোর পরিকল্পনা বার্লিন কমিটিও কিভাবে করে-ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। এটিও জার্মান সরকারের নথিপত্রের অস্তিত্ব—বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষরে লেখা। পরিকল্পনাটির শিরোনাম, ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকালী ঘাঁটি : সুমাত্রা।

চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, “ডাচ ইন্ডিয়ান প্রশস্ততম কর্মকেন্দ্র জাভায় নয়, সুমাত্রায় পূর্ব উপকূলে; এখানেই আমাদের আস্তানা হতে পারে। অসংখ্য ভারতীয়ের বাস এখানে। ভারতের খুব কাছে। সংযোগের ব্যবস্থা ভাল।

“জনগণ মোটের ওপর সাহেব-বিরোধী, এবং চেষ্টা করলে ব্রিটিশ-বিরোধী করে তোলা যায়, ডাচ সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি না-করেই। ছোটখাট বহু ব্যবসায়ের (যেমন বেকারি প্রভৃতি) ভারতীয়রা সক্রিয়; বহু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অধিবাসী এখানে। মালয় দেশের অনেক রাজবংশীয় মূল্যমানও আছেন—আকর্ষণ করে ছুবে তাঁরা সারাদিন আলস্যেই কাটান। হাজীদার সহায় কাছের প্রচার ভালই হ’বে। তুর্কি মূলতানের চিঠি নিয়ে যদি ওখানে কাজ করতে যাওয়া হয়, চমৎকার ফল দেবে। দুটি মালয়-ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা আছে। ‘শারিকাহ-ই-ইসলাম’ প্রেস থেকে আমাদের প্রচারপত্রাদি অনুরূপে ছাপা চলবে।

“পূর্ব উপকূলের সবটাই বাদা আর জমা জমি, আর ছোটখাট জনহীন স্থানে ভরা; অস্ত্র, গোলা-বারুদ এনে এইসব স্থানে মজুদ রাখা যায়। সুমাত্রা থেকে বঙ্গলার উপকূলে হামেশাই জেলেনোকো আনাগোনা করে থাকে। গোটা একটা স্থান আমরা লীজ নিতে পারি; অভ্যস্ত কম দামে এবং সহজেই লীজ পাওয়া যায়। নারকেলের ব্যবসার অছিলায় তুর্কি সরকারের মধ্যস্থতায় ধীরে আসতে আসতে হ’বে।

“দৌলখীলা অধিবাসী সঙ্গে ভারতীয়রা নির্বিবাদে এই উপকূল থেকে আনাগোনা করতে পারবে। বাটাবিয়ার দৌলখীলা অধিবাসীদের কাছ থেকে এস্তার পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজ-পত্র কিনে আনা যায়। জার্মান কন্সালের হাতে এ-ফাজের ভার দেওয়া চলে। মাদেন-এ ভাইস কন্সাল হচ্ছেন হেব সারডেল; তাঁর ওখানেই তো আড়াই শ’ প্রায় জার্মান আছেন—পূর্ব উপকূলের ওই জেলাতে। আবার কয়েকশ’ প্রায় জার্মান আছেন জাভা প্রকৃতি অঞ্চলে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ যখন ভারতবর্ষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, অস্ত্র নিয়ে এ-বাও তখন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করে বিদ্রোহীদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবেন।”

উক্ত ফ্রান্সেব লীজ থেকে ১২. ৪. ১৯১৫ তারিখে জার্মান সরকারের কাছে ভিন্সেন্স্ জাক্ট (Kiaft) নামে একজন জার্মান ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সদস্য চিঠি লিখছেন :

“সিঙাপুরের বিদ্রোহের পটভূমিকায় আমি নিম্নোক্ত কয়েকটি মন্তব্য পেশ ক’রাই :

“মালাক্কা (পেনাং) উপদ্বীপের মুখো-মুখি যে ডাচ পূর্ব-উপকূল, সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য ডাচ উপনিবেশের চেয়ে

বহুদূরে পৃথক। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে দশ হাজারের ওপর ভারতীয় বাস করেন। তা’ ছাড়া অনবরত ভারতবর্ষ থেকে ফেরিওয়া ও বাজিকর এখানে যাতায়াত করেন।

“আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এই অধিবাসীরা বেশির ভাগই ব্রিটিশ-বিশ্ববাসী। গেল বছরের অগাস্ট মাসে আমি যখন সিঙাপুর, সাবং এবং কলম্বো যাই, তখন নিজে চোখে দেখেছি স্থানীয় লোকেরা কী প্রকাশ্যে অবিশ্বাসের চোখে দেখে ব্রিটিশদের পাঠানো যুদ্ধবিবরণী প্রকৃতি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, এমডেন প্রভৃতির আবির্ভাব, সিঙাপুরের বিদ্রোহে জাপানীদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ফলে সেই প্রকাশ্য অবিশ্বাস কত প্রখর হ’য়ে থাকবে, সহজেই অনুমেয়।”

“এখান থেকে প্রচার-পুস্তিকাদি সবকিছুই ভারতে নিয়ে যাওয়া সহজ—চীনে জাহাজ, মালয়দেশের হাজী এবং স্থানীয় ভারতীয়দের সহায়তায়; বিশেষত মেডা-এর ‘শারিকাহ-ই-ইসলাম’ প্রেস থেকে ডাচ সরকারের অগোচরেই ভারতীয় পুস্তিকাদি ছেপে নেওয়া যাবে।

“ডাচ উপনিবেশ বাটাবিয়ার আমাব জমি। যুদ্ধের আগের পাঁচ বছর আমি সেখানে চাষ-আবাদ করতাম আমার জমিজমায়। যুদ্ধ বাধলে আমি ডাচ পাসপোর্ট নিয়ে জার্মানী যাই এবং স্বেচ্ছাসেবক-রূপে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিই। আমার এখন সাতাশ বছর বয়স। মালয়ের ভাষা বলতে পারি। পূর্ব উপকূল সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কারণ সেখানে আমি দেড় বছর ছিলাম। আমার যদি ভারতীয় বিপ্লবের সাহায্যার্থে ওখানে পাঠানো হয়, আমি বিশেষ কৃতকার্য হ’ব আমার বিশ্বাস।...

“আমার সৈন্য-বাহিনীর কাজ শেষ হ’য়ে এসেছে। মিলিটারি সর্বাধিনায়কের মারফৎ এই চিঠি আমি তাই সরকার বাহাদুরকে পাঠাচ্ছি।”

বার্লিন কমিটি থেকে এই পর পাঠ ক’বে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারকে ২৪. ৪. ১৯১৫ তারিখে লিখলেন :

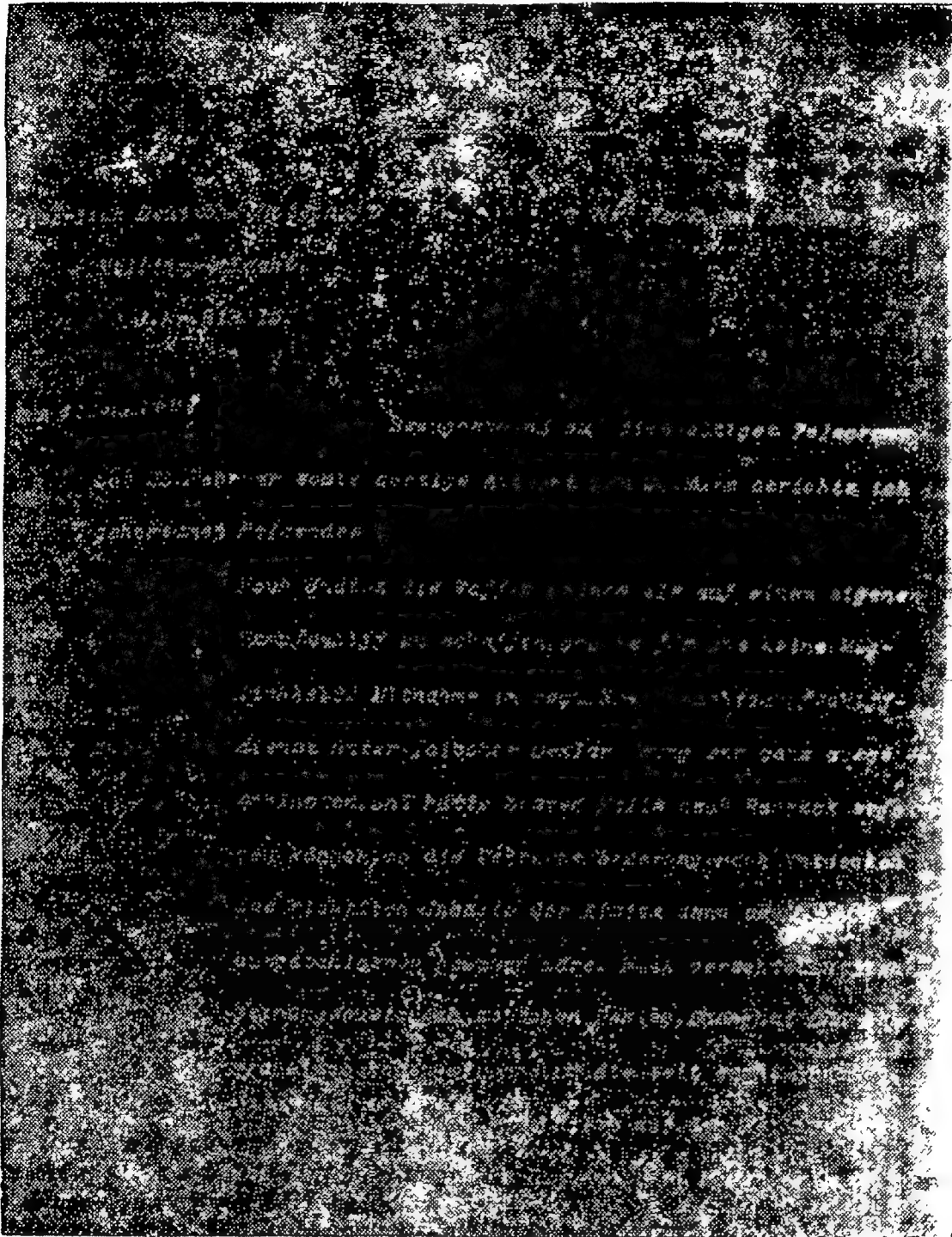
“জেনারেল-স্ট্রাকের কতৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, জাক্ট-কে মিলিটারি সার্ভিস থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমাদের সহায়তার জন্য পাঠানো হোক।”

তখন জাক্টের নামে জার্মান সরকার নিম্নোক্ত আদেশ পাশ করলেন :

(ক) : ১২. ৪. ১৯১৫ তারিখে ‘১৯১৫’...

ব্রিটিশ এবং ফরাসী অধিকৃত ভারতবর্ষের সঙ্গে গাফাফা-রকম সংবাদ লেনদেনের কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা; বিশেষত আমাদের যুদ্ধকালীন বিবরণী ইত্যাদি ভারতীয় এলাকায় চড়িয়ে করা।—(খ) ভারতীয় বিপ্লবীদের সর্বত্র কাজে সহযোগিতা করা এবং বিদ্রোহ বরাবৃত্ত করতে উৎসাহ দেওয়া;

* এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করেছেন। —পৃথ্বীন্দ্রনাথ



জার্মান মিলাটারি জাভাশে ফন্ প্যারেন-প্রেরিত টেলিগ্রাফের প্রতিমাণ

[শ্রীমন্তেন্দ্রকুমার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের সৌজন্যে]

বিশেষতঃ অসম্পন্নাদি সূচকরূপে বিভিন্ন ভারতীয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার ব্যাকসা করা।

“এস মরণ, তাঁর ছাড়া ও সন্মাহা ব্যাটার
জাভা-থরচ হিসেবে তাঁকে এককালীন এক
জাভা-ভিনশ অঙ্গী জার্মান মার্ক দেওয়া
হবে। এবং ১৬ই মে থেকে তাঁর জার্মান

প্রত্যাবর্তন অবধি মাসিক তিনশ চমিশ
মার্ক...দেওয়া হবে।...”

■ দৃষ্ট ■

স্যান্ডার্সিস্কে ... শাহুই ... ব্যাঙ্কক
মিলাপদ্র...সন্মাহা...কলকাতা—

ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক
সংগঠন থেকে লোক অনবরত আনাগোনা
করছে এক ঘটি থেকে অন্য ঘটিতে, যে
কেন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহ কবে পৌঁছে গিয়েছে
অন্য কেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছে অসম্পন্ন, বিদ্রোহের
গণিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া, অর্থ ইত্যাদি।

দলের সভ্য আব্বারাম চাঁন হুইরে ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর দিকে পৌঁছলেন গিরে ব্যাংকক। ব্যাংককের জার্মান কনসাল রেমী লিখেছেন, “আমি তখন আত্মা সিকে ভারত-ধর্ম পঠালাম সঠিক করেছিটি সংবাদের জন্যে। আত্মা সিং অভ্যন্ত কর্মকর্ম লোক।—ইংরেজ চরদের চোখ এড়ানোর জন্যে তিনি সবদাই খুব গরীবের মতো পোশাক-আশাক ব্যবহার করতেন। আমি ওকে বলে দিই, যে-ক’রে হোক বাংলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গিরে দেখা যেন করেন।...”

আত্মা সিং কলকাতার এসে পৌঁছলেন। বতীন্দ্রনাথের অন্তর্বঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যে নতুন সেনের সঙ্গেই-বোধহয় তাঁর প্রথম যোগ হয়—বহু অবশেষের পর। তাঁর কাছেই অন্যান্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সংবাদ সব পাওয়া গেল। এবং দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আত্মা সিকে নির্দেশ দিয়ে তাঁকে ফেরৎ পাঠানো হল ব্যাংককের কনসালের কাছে; এবং সেখানকার অন্যতম সংগঠক উকিল কুমুদ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশও রইল।

ব্যাংককের কনসাল রেমী লিখেছেন, “মাস-দুই বাদে অবশেষে আত্মা সিং ফিরে এলেন আশাপ্রদ প্রচুর সংবাদ নিয়ে। কলকাতা, মাদ্রাস এবং পাঞ্জাবের কয়েক জারগাল ইতি-মধ্যে বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে; ইংবেজ সরকারের সমুদ্র ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনেক ইংরেজের জীবন নাশও হয়েছে।

“বেলুচিস্তান থেকে বাট হাজার মুষ্টিসৈন্য যদি ভাবতে এখন প্রবেশ করে, তাহলেই ইংবেজ সরকার নাস্তানাবুদ হবে।”

“আত্মা সিং বলেন যে, বহু মেহনত করে তবে তিনি বাংলার নেতৃবৃন্দের আত্মভাজন হতে পারেন; প্রথমে তাঁকে কেউ বিশ্বাস করে নি তেমন। অবশেষে জার্মান কনসালের সীলমোহর দেখান তিনি। তাঁর মরফৎ বাংলার কিছু টাকা পাঠানো গিয়েছে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে বাংলায় বিপ্লবীরা সর্বতোভাবে বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের হাতে এখনো বাস্তব অস্ত্র ও অর্থ পৌঁছল না। এখনো অস্ত্র ও অর্থ যদি পৌঁছত, সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্ত্রাধান শব্দ করত পারেন।...”

“ভাবতীয়া বিপ্লবীদের দুটি মাত্র ঘাটি এখনো আছে। একটা, ব্যাংককের তাপান-চ্যাম (কালো-সাঁকো) অঞ্চল, জনৈক ভাবতীয়া

বঙ্গ-ব্যবসায়ীর বাড়িতে। অন্যটি, শ্যাম-দেশের উত্তরে নদী-রেলওয়ের প্যাথো স্টেশনের কাছে। সম্ভবতঃ সিং (নেহাল)-এর বদলে এখানেই নেতা এখন কপূর সিং।*

ব্যাংককের কনসালের তরফ থেকে এবার কলকাতার এলেন সেখানকার উকিল কুমুদ মুখার্জী।

১৯১৬ সালের মার্চ মাস।

আমেরিকার সংগঠনের প্রত্যক্ষ অধিনায়ক নিয়ে এবং ইংরেজের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেশে ফিরলেন জিতেন লাহিড়ী। তিনি পাকা শবর নিয়ে এলেন যে, বাইশে এপ্রিল স্যাক্সাম্পস্কা থেকে ‘মাতেরিক’ জাহাজ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হচ্ছে। পথে ‘অ্যানি লার্সেন’ তাঁর রসদও তুলে দেবে ‘মাতেরিক’ জাহাজে। তৃতীয় একটি জাহাজ ‘হেনরি এস’ আসবে কয়েক দিন পরে। সঙ্গে থাকবেন ভেডে (Wehde) এবং জর্জ পল্ বোহ্ম (Boehm) নামে দুইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ।

ভেডে প্রসঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে সার্বভৌম টেলিগ্রাফ ব্যানিশক জানাচ্ছেন (১৯ এপ্রিল, ১৯১৬) : “গত বলাছেন, আরো দশ হাজার রাইফেল ও কিছু মেশিনগানের প্রয়োজন। তার জন্যে আরো একটা স্টীমার কেনা দরকার। তিন লক্ষ ডলারের মধ্যেই এক-কাজ সেরে ফেলতে পারব। তা ছাড়া গুলু বলাছেন যে, শিকাগোর-র বিখ্যাত পণ্ডিত এবং পুরাতত্ত্ব-বিশারদ ভেডে-কে যদি অকিলাবে ম্যানিলা এবং ব্যাংকক হয়ে ভারতবর্ষে পাঠানো যায় খুব ভাল হয়, কারণ ভারতে তাঁকার অত্যন্ত জম্মীর প্রয়োজন এখন। মার্কিন ব্যাংক থেকে ভারতীয় কোলও ব্যাংক মারফৎ ভেডে-র নামে দুই লক্ষ জার্মান মার্ক আমরা ভাগিয়ে দিতে পারি—তিনি শিকাগো মিউজিয়ামের জন্যে প্রাচীন শিল্প নিদর্শন কিনতে ভারতে যাচ্ছেন, এই অজ্ঞহুতে। ভেডে স্বয়ং মার্কিন নাগরিক। সব্ব অনুমতি চাই এবং আমার হাতে যদি মোটা কিছু টাকা এখন দেওয়া হয় তা হলে বার বার আপনাদের অনুমতির পথ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না, ভারতীয় বিপ্লবের জরুরী এই পরিস্থিতিতে।”

* ডাঃ ভূপেন সত্য লিখেছেন, “আব্বারাম ও কাপূর সিং চাঁন থেকে পদব্রজে ব্যাংকক যান; সেখান থেকে শ্যামের ইঞ্জিনিয়ার অমর সিকে কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামের জার্মানরা মৌলমেনের পথে বর্মী আক্রমণ করবেন ঠিক হয়। চীনের জার্মানবা দুই ভাগে (একদল, শ্যামের দলের সঙ্গে; অন্যদল, বর্মী রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীকে সামনে বসে ডামোর পথে উত্তর বর্মী দিয়ে) আক্রমণ করবেন।”

ওমিক আমেরিকা থেকে পদব্রজে দলের সভ্য ভগবান সিং জাপান ও চীনে গিরে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বাংলা থেকে রাস-বিহারী বসু গিরে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। কাজ ভালই চলছিল। রাসবিহারীর সহযোগিতার জন্যে বতীন্দ্রনাথের দলের সভ্য অবনী মুখার্জীকে জাপানে পাঠানো হল।

জাপানে রাসবিহারী এবং অন্যান্য নেতৃ-বৃন্দের সঙ্গে অবনী বহু কাজের সুযোগ পেলেন দলপতির পর নিয়ে যাবার সুবাদে। এবং বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে দেশে ফেরবার পথে তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে শাংহাই যান। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগ চারিদিকে সতর্ক জাল পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উড়িয়া ও বিহারের সরকারী রিপোর্টে লিখেছে, “১৯১৬ সালের ২৪—২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গোয়েন্দা নীতি হালদারকে হত্যা করার অপরাধে বতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নামে একাদিক্রমে বহু মাস বাবং কলকাতার প্রধান প্রধান পথে-ঘাটে বাংলা ও ইংরেজী প্র্যাকার্ড এবং পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হল—মোট পুরস্কার দেওয়া হবে যদি তাঁকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারে। ক্রিমিনাল প্রিন্সিপাল কোর্ডের ৮৭ ধারা অনুযায়ী তাঁর নামে এই পর্বোক্তা বার করা হয়। এবং সাব-ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে হত্যার অপরাধে চিঠিপত্র রাক্ষসীয়রীর নামেও পরোয়ানা বার করা হয়। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের অন্তত তা’ দুটি আকর্ষণ করে।...”

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার গডফ্রে চার্লস ডেনহ্যাম, সি-আই, বিশেষভাবে নিবৃত্ত হলেন বতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে। ইংল্যান্ডের Dictionary of National Biography-তে চার্লস টেগার্টের জীবনী-চুম্বকে বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছে,

“State of affairs, after 1914, was worsening beyond control. The unrest in India had attracted the attention of Germany, whose officials and nationals in the United States joined with certain Indians in a plot to ship weapons to India for the use of revolutionaries....”

এর পরবর্তী বাক্যটির ইংবেজসুলভ গাম্ভীর্য ভেদ করে যে গভীর শঙ্কায় স্বর ধ্বনিত হয়েছে, তা’ লক্ষণীয় :

“The scheme had serious possibilities but was fortunately soon discovered.., an important

* আক্ষপানিস্তানের ভিতর দিয়ে মুষ্টি-সৈন্য ভাবতে আনা প্রসঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ‘অপ্রকাশিত বাজনেতিক ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য। জার্মান সরকারের নিষিদ্ধপত্রও প্রচুর তথ্য আছে; এখানে সেগুলির অবতারণা এতদূরে সুদূরগালি আর জটিল কবলাম না।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

...se of operations being unearthed in Calcutta...."

ছায়ার মতো সর্বত্র গোপেন্দ্রাবা ঘুরছে যতীন্দ্রনাথের অবস্থিতি অনুমান করে। কিন্তু তাঁর নাগাল পেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না; পরে ডেনহ্যাম বড়লাটের কাছে লেখেন,

"Jatin Mukherjee, perhaps the boldest and the most actively dangerous of all Bengal revolutionaries."

আব, তাই বুঝি বালেশ্বর যুদ্ধের খবর পেয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেন,

"Nothing can be more praiseworthy than the action of Kilby and Sergeant Rutherford!"

সে-প্রসঙ্গও এখন থাক।

কঠোর এই পরিস্থিতির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের মনে কটার মতো একটি প্রশ্নই বিধ্বস্ত থাকে : এমন মায়াবী পবিত্রবেশে মধ্যে মহানারক যতীন্দ্রনাথ এখনো কেন সংগঠনের কাজে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন! এতবড় বিপ্লব-সংস্কার মিস্ত্রিক আর হৃদয় একাধারে তিনি। অত্যাশ্চর্য সমস্ত প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তাঁর কিছু ঘটে দৈবাৎ। আরো কত যুগের জন্য স্থগিত থাকবে ভাবতের আসন্ন স্বাধীনতা—কে জানে?

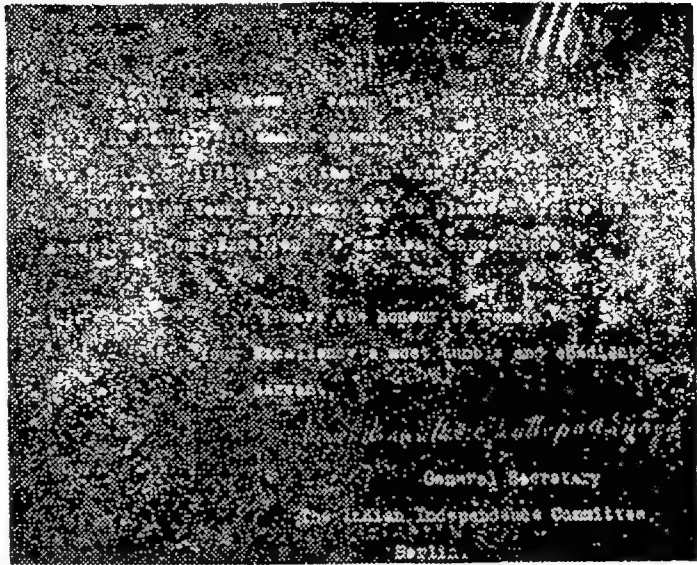
সবার সামনেই এই সমস্যা : কী করে দাদাকে নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে রাখা যায়—অন্তত সাময়িকভাবে, কিছুদিনের জন্য, যতদিন না জার্মানীর সাহায্য এসে পৌঁছচ্ছে?

কিনাইদা থেকে মাগুরার না ফিরে, যতীন্দ্রনাথের সহকারী নলিনী কর সোজা উপস্থিত হলেন কলকাতায়। তিনি লিখছেন, "আমার অনুমানই ঠিক। দাদা নন, নীরদকে গুলী করে মেরেছে চিত্তপ্রিয়।... আমাকে দেখেই অতুল (ঘোষ) বলে উঠল : তোকে বিশেষ প্রয়োজন।..."

প্রয়োজন বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছেন নলিনীকান্ত।

অতুল ঘোষ বললেন : "বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে, দাদাকে নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া। দাদাকে সবাই লুকিয়ে থাকতে বলছেন। তিনি তাতে রাজী হচ্ছেন না। তাঁর কথা হচ্ছে, লুকিয়ে থাকলেও তো একদিন ধরা পড়তেই হবে।..."

আগেই বলেছি যে, ১৯১০ সালে সামসুল হত্যার পর নলিনীকান্ত ও দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো) হু-মাসের জন্যে ময়ূরভঞ্জের কাপ্তানদার মহলাডিহা গ্রামে গিয়ে মণীন্দ্র চক্র-



প্রাতঃস্মরণীয় বিপ্লবী নেতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মারক-সম্মিলিত প্রকাশ : জার্মান-সম্রাট কাইজারকে লেখা।

[নাশনাল আর্কাইভস ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্তের সৌজনে প্রাপ্ত]

যতীর আগ্রহে আশ্রয়গোপন করেছিলেন।* দেবীপ্রসাদ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ এবং সুব্রেন

* এই আশ্রয়স্থলের পরিকল্পনা ইতিহাসে শোনাই—১৯০৮-০৯ সালে যখন জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সভাপতিত্বে কলকাতার মূল অনুশীলন সমিতির তরফ থেকে Bengal youngmen's Zamindari Cooperative Society প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাই প্রথম কেন্দ্র গোসাবায় খুলে কিছু জমি সংগ্রহ করা হয় এবং মাগুরার শিক্ষক হীবালাল বাবাকে সেখানে পাঠানো হয়, তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর ও অম্বিকা উকিলের সঙ্গে সুব্রেন ঠাকুর পবামর্শ করেন : একটি network of shelters দেশে কিভাবে গড়ে তোলা যায়?—সুব্রেন ঠাকুরের আবও একটি প্রশ্ন ছিল : কি করে ঘবছাড়া বিপ্লবী কর্মীদের ঘোরাঘুরা ও জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা যায়?—তখন ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান ছিলেন মাগুরার দেবেন্দ্রনাথ সিংহ। ইনি ব্রজেন্দ্রকিশোরের পবিত্রিত। ব্রজেন্দ্রকিশোরই সুব্রেন ঠাকুরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাবাও তখন কাপ্তানদার; চাকরি করতে করতে তিনি সেখানে বেশ কিছু সম্পত্তি করেন—তার মধ্যে পাবিতোষিকস্বরূপ কিছু জমিজমাও পান। সুব্রেন ঠাকুরের পবিত্রিতে দেবীপ্রসাদ বায় প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জানতে পারেন যে তাঁর দাদার বন্ধু মণিবাবুর কাছেই তাঁকে যেতে হবে আশ্রয়ের জন্যে।

ঠাকুর, অম্বিকা উকিল, ব্রজেন্দ্রকিশোর বায়-চৌধুরী প্রভৃতির মধ্যে বোগসূত্র; যতীন্দ্রনাথের পবামর্শ নিয়ে এঁদের কাছে যাতায়াতের কাজ ছিল তাঁর। আব দেবীপ্রসাদের দাদার বাল্যবন্ধু মণীন্দ্র চক্রবর্তীর দেশও নদীয়া—যতীন্দ্রনাথের প্রধান কর্মক্ষেত্রের অন্যতম। বিপ্লবী সংগঠনের সভ্য না হলেও বিপ্লবের সহায়তা যাবা করতেন, জীবনের সর্বস্ব পণ করে বিপ্লবীদের কাজে জ্বালানত করেছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়দের প্রথম একটি নাম মণীন্দ্র চক্রবর্তী : খাঁটি সোনার তৈরি তাঁর অন্তর, পরকে বকে টেনে নেওয়া তাঁর ধর্ম।

নলিনীকান্ত তাই অতুল ঘোষকে বললেন : ১৯১০ সালে আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম দাদাকে সেখানেই রাখা যায় কিনা, তোমাদের কেউ একজন এসে দেখে যাও। তারপর দাদাকে সেখানে যেতে অনুমতি কলবেই হবে।

তদনুযায়ী যতীন্দ্রনাথের অপব অন্তর্ভোগে সহকর্মী নবেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) গেলেন নলিনীকান্তের সঙ্গে। কাপ্তানদার

সুব্রেন ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান দেন অম্বিকা উকিল : দু'জনে মিলে Hinduathan Cooperative Insurance-এর পরিকল্পনা করেন।

নাশনাল আর্কাইভসে রক্ষিত বেংগল পাবলিশ বিপোর্টে এই ইনসুরেন্স কোম্পানীকে বার বার revolutionary organisation বলে উল্লেখও করেছে।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

আত্মরক্ষা দেখে তিনি পরিতুষ্ট হয়ে ফিরে এসে অতুল ঘোষ প্রভৃতিকে বললেন—চমৎকার আশ্রয় হবে এটি, এবং কাছের, উড়িষ্যার উপকূলে বালেস্বরে জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে এখানে মজুদ রাখাও সহজ হবে।

জাহাজ আসবার চূড়ান্ত সংবাদ পাবার পর অবশেষে যতীন্দ্রনাথ বালেস্বরের নিকটবর্তী এই কপিপদাঘর ঘেঁটে রাজী হলেন। অর্থাৎ যতদিন না জাহাজ আসছে, ততদিন আসন্ন অভ্যুত্থানের হেডকোয়ার্টার হবে কপিপদা।

ঠিক হল—একটি জাহাজ আসবে নোবাখালি কিংবা হাতিয়ার। পূর্ববঙ্গের তরক থেকে বিবশালের বিপ্লবী অধিনায়ক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দেন শিষ্য নরেন ঘোষচৌধুরী, ধনোয়জন গুরু প্রভৃতি এই রসদ খালাস করে নেবেন। যতীন্দ্রনাথের কন্ফেডারেসী-র মতান্তর গুরুত্বপূর্ণ দল এই বিরশালের গ্রুপ।

বিত্তার জাহাজটি আসবে সুন্দরবনের রায়মণ্ডলে। যতীন্দ্রনাথের অনুরক্ত বন্ধু—ঐয প্রতাপাদিত্যের বংশধর, নুবনগরের রাজা যতীন বর তার লোকজন মাঝ-রাাত্রা নৌকো প্রভৃতি প্রস্তুত রাখলেন এই জাহাজের রসদ নামিয়ে নেব বলে জ্ঞান্যে। হ্যারি অ্যান্ড সন্সের বিখ্যাত হাবিচুমা চক্রবর্তী এইসিকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন; তাঁর সহযোগী রইলেন নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy); বাদগোপাল মুখার্জী, অশ্বিনী রায় প্রভৃতি। আর প্রস্তুত রইলেন বসিবহাটের মহাপ্রাণ ডাঃ যতীন ঘোষাল (এখনও জীবিত)। এঁরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রবেশ করলে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে অপেক্ষমাণ দেশী সৈন্যবাহিনী দেখে অন্যদেরও তাবা দলে টেনে নেবে; ফোর্টে উড়িয়ে দেবে স্বাধীন ভারতের পতাকা। সবার দেশের সৈন্যশিবির, অস্ত্রাগার, অস্ত্রের দোকান, সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অববোধ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম মহানগর কলকাতা দখল করবেন বিপ্লবীরা। ফণী চক্রবর্তী, ব্রজেন দত্ত (জগা) প্রভৃতি ডিনামাইট ইত্যাদি প্রস্তুত রাখলেন। দেশী সৈন্যরা বিদ্রোহ করে পেশোয়ার পর্বত ছাড়িয়ে পড়বে।*

*ওদিকে তারকনাথ দাস, অজিত সিং, হুম্বীকেশ লাট্টা, শ্রীনাথক, কেশরনাথ, আমীন শর্মা, দাদজী কেরসান্দ, সুফী, অম্বা পেরশাদ, বসন্ত সিং, চৈত সিং, মীর্জা আব্বাস, শরকতুল্লা, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজা, আগাশে, প্রমথনাথ দত্ত (দাউদ আলী) প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর সহযোগিতায় চেষ্টা করছেন তরক, পারস্য ও আফগানিস্তান পথে

বিদেশী সরকারের সৈন্য ও প্রেরণীদের ব্যাভার্য বন্ধ করবার জন্যে এবং তাদের রসদ দ্রবরাহ অচল করবার জন্যে প্রধান রেলপথগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে। বাংলা-সাম্রাজ্য রেলপথ উড়িয়ে থেকে অচল করে দেবেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরিত্র। B. J. Ry. উড়িয়ে দেবেন ভোলানাথ চাট্টোজো। আর সতীশ চক্রবর্তী উড়িয়ে দেবেন অজয়ের পুত্র J. I. Ry।

তৃতীয় এবং চতুর্থ জাহাজ থাকবে সবচেয়ে বেশি মাল। এই জাহাজটি উড়িষ্যার উপকূলে বালেস্বরে নামিয়ে দেবে তাৎপের মাল। মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ এই জাহাজটির ভার নিলেন।

বালেস্বরের চাঁপদা গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের ওপরেই। ১৯০৫ সালে কামানের গোলা পরীক্ষা করে দেখেব জন্যে সমুদ্রতীরে একটি সরকারী সৈন্যবাস এখানে স্থাপিত হয়। অতীতে এই ঘাঁটি দখল করবার ভারও নিলেন যতীন্দ্রনাথ।

জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে উড়িষ্যার পথ পরিষ্কার করে সদলবলে সিংহম হয়ে মেদিনীপুর দিয়ে কলকাতার গিরে পৌঁছবেন যতীন্দ্রনাথ। পথে অন্যান্য ঘাঁটি ক্ষেত্র বিপ্লবীরা সমবেত হতে থাকবেন। এবং মিলিত হবেন গিরে কলকাতার।

ওদিকে, সুন্দর হ'য়ে একাধিক জাহাজ আসবে ঠিক বইল পশ্চিম ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রে। ডাঃ খানসাদ বর্মী পূর্বপারিকল্পনা অনুযায়ী এক-জাহাজ অস্ত্র খালাস করে ডেবান্মাইলখান্নে তাঁব বাড়িতে বাসব ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, জাহাজ করাচীতে পৌঁছনো-মাত্র দুবিরে দেওয়া হয়।

মহাযাত্রের বিভিন্ন স্থানে এবং গোকর্ণী অঞ্চলেও বিশেষত বিপ্লবীদের শক্তিশালী ঘাঁটি সক্রিয় ছিল। পান্ডাব পর্বত বিস্তৃত ছিল এঁদের সংযোগ।* পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের

হবে ভরতবর্ষে মুক্তিসৈন্য-বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করতে। ও-সব অঞ্চলের দেশী সৈন্যবাহিনী-সময় বলে, “বাবুজী, পাঁচ হাজার লোক দিয়ে পাঁচের দিন আমাদের : কোয়েটা থেকে কলকাতা কুচ করে যাব : পথে পাঁচ হাজার লোক পঞ্চাশ হাজারে পবিণত করব।”

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

*ডাঃ সাভাবকরের ভাই শ্রী এন. ডি. সাভাবকর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালীন বালাদে শ্রীকৃষ্ণনাথের কিছু বিপ্লবী সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং মহারাজ ও বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের ইনিই ছিলেন। তখন যোগসূত্র। এঁর তাছ থেকে পরিচিত-পত্র নিয়ে ভোলানাথ চাট্টোজো ও বিনয় দত্ত গিয়েছিলেন

সেই একই-সময়ে পান্ডাব পৌঁছে উদ্দীপ্ত করে তুলবে স্বাভারতীয় বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি। মাত্র বায়ো হাজার ইরেজ সৈন্য ছিল তখন আসন্ন হিম্মাচলে : সাধা কি, তারা রোধ করে এই সুমহান বিপ্লবের তরঙ্গ?

“একটি অস্থায়ী ভাবত-সরকার স্থাপন করবার দিকে বিশেষ ঝোক ছিল,” লিখেছেন বাদগোপাল মুখার্জী। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিচালনার কথাও চিন্তা করে বেখেছিলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ। চাকরি-জীবনে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনব্যবস্থাটি সময়ে অব্যাহত করে নেবার সুবিধা পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিপুঞ্জের শাসন-পদ্ধতিও তাঁর নখদর্পণে।

তাই বুদ্ধি ভূপতি মজুমদার লিখেছেন, “...ইরেজের বহু বিরোধী শক্তির সঙ্গে সৈন্যদের নাম-শব্দ বিরাগী এই মনীষী সাধারণভাবেই জীবনযাপন করতেন,” অথচ “এই লোকটির মস্তিষ্ক থেকেই অমলজীতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।”

বালেস্বরের যতীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা এক সাইকেল ও ঘড়ির দোকান এর আগেই খুলেছেন : নাম তার ইউনিভার্সাল এস্পোরিয়াম। কলকাতার হ্যারি অ্যান্ড সন্স-এর শাখা এটি। চালাচ্ছেন শৈলেশ্বর বসু, নিমাই (তারাপদ) চক্রবর্তী প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, বালেস্বরে যাবার আগে কিছুদিন তিনি বাগদানে তাঁর বিপ্লবী বন্ধু, হেডমাস্টার অতুলচন্দ্র সেনের বাড়িতে কাটাবেন।* সেখান থেকে মেদিনীপুরের কুমার-আড়া গ্রামের দলের সভা এবং বাগদান স্কুলের হেডমাস্টার হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অল্প সময় কাটাবে রওনা হবেন বালেস্বরের দিকে।

(কম্বোঃ)

গোয়া-য়। গোকর্ণীতে (বা গোকর্ণদে) অস্ত্র নামালে পর তা বিলি করে দেওয়া হয় ছিল মহারাজের উক্ত বিপ্লবী দলের কক্ষ। মজুমদার গুপের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠ বোধ ছিল।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

*প্রথম যুগের বিপ্লবী কর্মী, আমেরিক-প্রভাণ্ড শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস (কালকাতা কেমিক্যাল) লিখেছেন, “অতুলবাবুর বাড়িতে (যতীন্দ্রনাথ) ব্যাভার্য করতেন। অতুলবাবু মাকে মাকে মোটা টাকা আমদের নিকট জমা রাখতেন এবং জিজ্ঞাসা করলে বলতেন যে তাইবা লক্ষ্যের ক্ষরবার করেন এবং সেই বাবদ টাকা।...”

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

লোহার গেটটা হাত দিয়ে ঠেলে
ওরা পার্কে ঢুকলো। বিকেল মরে
সন্ধ্যা নামছে এখন পার্কের ভেতবে:
খুব আবছা, মোলায়েম অন্ধকার। ওরা
ঘেঁষে বাতাস টের পাচ্ছিল; অমিয়ের চুল
উড়ছিল হাওয়ায়, মীনার ঠোঁট বাতাসে
জুড়িয়ে যাচ্ছিল, শাড়িতে খসখস শব্দ।
‘অদ্ভুত, পথেঘাটে এ হাওয়া টেরই
পাওয়া যায় না’—অমিয় ভাবছিল।
এখনো দূরের লোক চেনা যাচ্ছে; মীনা
দেখতে পেলো—দেবদারু গাছের মাথায়
টুকরো টুকরো রোদ এখন ক্রমশ মলিন
হয়ে আসছে; অজস্র পাখির শব্দ ওদের
ভাল লাগছিল। আকাশে এক আশ্চর্য
বিভ্রাম আর অবসাদ মেঘের ওপর
লুটিয়ে পড়েছে। অমিয় আকাশ দেখ-
ছিল; মীনা গাছের মাথায় ক্রমশ মুছে
যাওয়া রোদটুকুর ওপর চোখ রেখেছিল।
একটা দিন যাই-যাই করেছে মুখ ঘুরিয়ে
আর একবার সবকিছু দেখে নিচ্ছে—
এই বিকেল, হাওয়া—এমন কি তাদের
পছন্দ।

কোন কথা না বলে অমিয় খুব
আসতে, মেন হঠাৎ কঠিন কিছু ভাবছে;
এমনভাবে হেঁটে যাচ্ছিল; বস্তুত দিন
শেষে, বাইরে যখন সব আলো জ্বলতে
শুরু করেছে, তখন এই কোমলতার
গন্ধের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে—
এই মৃদুভর্তে অমিয়ের ভাল লাগছিল—
ক্রমশ চারপাশ সন্ধ্যার নৈঃশব্দে মগ্ন
হয়ে আসছে—আমরা কেমন অন্যরকম
হয়ে যাচ্ছি—কেমন রুঢ়, ককর্শ অমিয়ের
হঠাৎ মনে হলো কথাটা। অমিয় আবার
চোখ তুললো—শূন্য আকাশ, কালো
কালো বিন্দুর মতো অনেক পাখি।
অমিয় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ক্রমশ অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে; কয়েকটা
তারা চোখে পড়লো অমিয়ের; ‘তারা
দেখলেই আমার মার কথা মনে পড়ে;
আর ছোটবেলার সেই বিপুল
মাস্টারকে—যে বলতো তুই যদি ভাল
ভাল সব কাজ করিস তবে অমনি
আকাশের একটা তারা হবি।’ ঠিক—

এখন কথাটা মনে পড়তেই অমিয়ের
হাসি পেলো—বিপুল মাস্টার কী তারা
হতে পেরেছে—তারার মতো? অমিয়
জ্ঞানে বিপুল মাস্টার মোটর দুর্ঘটনায়
মরেছেন...তবু এখন তারই কথা মনে
হলো অমিয়ের; তার বিশ্বাসের কথা।
আর দুর্বোধ্য এক শিহরণ অনুভব
করলো ভেতরে ভেতরে।

কার গল্পে হীরার কুঁচির সঙ্গে
একটা তুলনা পড়োছিল—এখন মনে
হলো—না তা নয়—সন্ধ্যাতারা—দূর!
যদি আমিও কিছু লিখতে পারতাম!

অমিয় ধাক্কা খেল মীনার কথায়।
মানে একটু অন্যমনস্ক হয়ে আকাশের
দিকে তাকিয়ে একটু উঁচু কথা ভাবছিল
সে। অন্যসময় ভাবে না, ভাবা যায়
না। এখন স্লিয়মাণ অপরাহ্নে ভাল
লাগছিল এ সব।

মীনা বললো—এটা পথ, একটু
মাটির দিকে তাকিয়ে চল। লোকের
গায়ে পড়লে বুঝবে তখন। মীনা বোধ-
হয় হাসছিল, কিন্তু অমিয়ের হঠাৎ
মনে হলো মীনার কথা এখন প্রথর
হাসির মতো জ্বলছে। আর হঠাৎ
কিছুটা ভাবুক হয়ে পড়ায়; আর সেটা
মীনার নজর এড়ায় নি দেখে, বেশ
অপ্রস্তুত বোধ করলো সে।

—মাঝে মাঝে এক-একটা মৃদুভর্তে;
কিছু সময় বড় সুন্দর মনে হয় না
তোমার? একটা কিছু ভয়ানক খুঁশি
হওয়ার ইচ্ছা?

—তবু যা হোক, আমি তো ভাব-
ছিলাম—মীনার চোখে এখন নীলাস্ত



দৃশ্যভিষ
কল্পনা মেন

কোতুক। ও ঠোঁট চেপে আরও ছেলো
মানুষী অভ্যাস করছে এখন।

—কী ভাবছিলে?

—কী আবার, তোমার যা কাজ—
মানে ‘রেবার তটে চাঁপার তলে’—ওর
হাসি অমিয়ের সমস্ত অনুভবকে যেন
এখন স্পর্শ করছিল।

হঠাৎ অমিয় বললো—তোমার মাঝে
মাঝে অতীতের কথা ভাবতে ভাল লাগে
না?

—মানে?—মীনা অবাক হয়ে

অনিষ্ট লক্ষ্য করছিল, চোখে কিছু বৃদ্ধিতে চেষ্টা করছিল। তারপর দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো কখন আর্দ্র হয়ে এলো গতো কখন আর্দ্র হয়ে এলো মীনার কথা—তুমি আছ বেশ—মানুষ এখন পৃথিবী ছেড়ে গছে ছুটছে—আর তুমি, রেবা, শিপ্রা, বৈষ্ণবতী আর মণিলিনীর আশেপাশেই এখনো ঘুরে মরছো—একটু থামলো মীনা—তারপর আবার বললো—উব্ব যদি নিপুণিকা চতুরিকার দল তোমায় দয়া করতো। মীনার গাঢ় আরেগ লব্ধ বাতাসে মিশে গেল ক্রমশ—অমিয় এখনো অন্য কথা ভাবছিল।

—আচ্ছ আজকাল যা কোনো কাজেই লাগবে না, এমন একটা 'Dead language' নিয়ে এত পড়াশুনা করে নিজেকে এভাবে নষ্ট করলে? তোমার ওই কাব্য-পাঠ কী চাকরির কাজে লাগবে?...মীনার কথায় অধৈর্য, বিতৃষ্ণা করে পড়ছিল।

এ অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও বহুবার বহুভাবে মীনা একই কথা বলেছে। মিছোমিছি একটা অকাজে সাবজেক্ট বেছে নিলে? অমিয় কিছু বলতে পারে নি; প্রতিবাদ করার আগ্রহ বোধ করে নি, অথচ এখন মনে হলো বলে—এতদিন জ্ঞানতাম একটা জ্ঞানগা অন্তত—আছে যেখানে—মীনার চোখে চোখ পড়তেই কেমন শীতল নিম্প্রহতা ওকে যেন বোবা করে দিল। চুপ করে রইল অমিয়।

এখনো বেশ ভিড় পাকটায়। ওরা একটা নির্জন বেঞ্চ খুঁজছিল। একটু আগে প্যারামবলেটের ঠেলতে ঠেলতে মারা বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তারা ক্রমশ ফিরে যাচ্ছে—লাঠি হাতে কয়েকজন বৃদ্ধ এখনো পায়চারী করছেন; দৃশ্যটা হঠাৎ অমিয়কে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। যাকে ঢোকায় সময় দেখেছিল—এখনো সেই বৃড়ি বাদাম নিয়ে আলোর নিচে বসে আছে। খুব শব্দ করে কয়েকটি মেয়ে সমানে হাসছে; অমিয় টের পেলে—ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি বার কয়েক ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। রকমারী বেলুন নিয়ে হ্যাফ-প্যান্ট পরা একটা ছেলে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল এইমাত্র।

যাক কপাল ভাল; মীনা ভাবলো। সামনের বেঞ্চটা খালি। ওর মনে পড়লো পরশুদিন কতকগুলো ছেলে ওদের সামনে বসে জটলা করছিল—এদিকে

মুখ ফিরিয়ে সিগারেটের বাদামী ধোঁয়া ছেড়েছে দু-একজন—আর উচ্চারণ করা যায় না এমন একটা মন্তব্যও সারা মুখে রক্ত ছুটে এসেছিল।

অসহ্য! কোথাও আজকাল আর ভরতা রাখার উপায় নেই, আর ছেলে-গুলোও কী? পড়াশুনো সব মাথার তুলে এসব করতেই বড়ি পাকে, মাঠে ঘুরঘুর করে? কথাটা তখন মনে হয়েছিল তার।—তাই এখন পরিচ্ছন্ন নির্জনতা ওর ভাল লাগলো—আর সেই গোপন অনুভব এখন অমিয়কে ও বৃদ্ধিতে দিল না।

—এই, কী এত ভাবছো? অমিয়ের দিকে তাকিয়ে মীনা জিজ্ঞেস করলো। ওর কণ্ঠ এখন স্বচ্ছ মসৃণ আর যিন্মত মনে হচ্ছে।

—কই কিছু না তো! অমিয়ের সারা মুখে, ভস্মিতে আশ্চর্য নিলিপ্ততা টের পেলো মীনা। পেরে ভয় পেল এবং দৃষ্টি। দূর ছাই শব্দ, শব্দ ও মন খারাপ করে আছে কেন? মীনার অভিমান যেন উথলে উঠছিল। খুব আন্তে বললে—তোমার ভাল লাগছে না বৃদ্ধি? অথচ ওর ইচ্ছে ছিল বলে—তুমি শব্দই রাগ করছো এখন—আমি তখন তোমায় ঠাট্টা করছিলাম—মীনা বলতে পারল না—নীরবে অন্ধকার দেখছিল অমিয়।

—অত গম্ভীর হয়ে দার্শনিকের মতো বসে থাকতে হবে না—ব্রেশ আর বলবো না, হলো ত? মীনা হঠাৎ যেন আদরে আর নরম ভঙ্গিতে অমিয়কে দেখলো একবার।

অমিয় শব্দ বললো—ছেলে-মানুষ! মীনার চুলের ক্রান্ত গাঙ্গে এই মূহুর্তে অমিয় রাগির কথা, জনহীন অজ্ঞান তারার-ভরা কোনো অলৌকিক রাগির কথা ভাবছিল। কিন্তু ও টের পেলে মীনা এখন আবেগে এবং সামিধ্যে যেন কেমন জিজ্ঞে যাচ্ছে। তোমায় জন্য আমার কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়—অমিয় অক্ষুণ্ণে কথাটা নাড়াচাড়া করলো—অথচ হঠাৎ ও তরলকণ্ঠে বললো—এই নীল রঙটার আজ তোমায় হঠাৎ খুব নতুন লাগছে—

—থাক আর ইয়ে করতে হবে না, আমি যে সুন্দর নই, সেটা বারবার তত ঘটা করে না বললেও চলে—মীনা অন্যদিকে চোখ রেখে কথা বলছিল—আর ডখন একেবারে হঠাৎই অমিয় ওকে আকর্ষণ করলো—তারপর বললো—না সত্যি, অন্তত আমার চোখে—

—যাও, ভাবি—তারপর হঠাৎ দুজন একসঙ্গে হেসে ফেললো।

ওরা টের পেলে না কখন আকাশ তারপর ভরে গেছে, বাতাস ভারী হয়েছে; অন্ধকারের গম্বীর মধ্যে ওরা বসে রইল। আরও কিছুক্ষণ।

আদরে আলোতে দেখা গেল—একজন পাজাবী ভদ্রমহিলা সঙ্গে কুকুর নিয়ে ঘুরছেন। মীনা কিছুক্ষণ কুকুরটা দেখলো—কুকুরটা মাঝে মাঝে দৌড়াচ্ছে; বেশ কিছুটা চলে যাচ্ছে; আবার শব্দ করতেই মাথা নামিয়ে ছুটে আসছে; কান দুটো মাটিতে ঝুলে পড়েছে।

—দেখো কী সুন্দর কুকুরটা; কেমন ভদ্রমহিলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে; আচ্ছা কুকুর খুব পোষ মানে; তাই না?

অমিয় ওর গলায় উচ্ছ্বাস টের পেলো এখন—বললো—সে তো ছেলে-বেলার গুড়োছো; খালি ফেলো যাওয়ার গম্ভ। অমিয় হাসছিল।

—বুঝলে আমিও একটা ও রকম কুকুর পুষবো; বিকেলে রোজ সঙ্গে নিয়ে ঘুরবো—তেইশ বছরের মীনার চোখে-মুখে এখন সতেরো বছরের চামুলায় বিন্মরিন করছে।

—ততো পুষবে; তবে আর একটি জীব যে পুষছো; তার কী হবে?

—ধো, অসভ্য। মীনা ওকে চিমটি কাটলো। অমিয় ওর চোখ দেখেছিল এবং মূখের লাবণ্য।

বাতাস ক্রমশ ভারি হচ্ছে; এখন গাছের শব্দ শোনা যায়, অমিয় দেখলো একটার পর একটা গাড়ি, আলো ফেলতে ফেলতে চলে যাচ্ছে।

—তোমার ইন্টারভিউটার কী হলো?

মীনার গলা এখন ইম্ব প্রখর, অন্ধকারে ওর মুখ দেখতে কষ্ট হচ্ছিল অমিয়ের।

—দিয়েছি; কিন্তু ওতে চাকরি হয় না—মনে হলো অনেক দূরে কোনো শূন্য প্রান্তরে খুব বিষম বাতাস যেন নিঃশ্বাস ফেলেছে; অমিয় নিজেই অবাক না হয়ে পারলো না।

—মীনা আবার আকাশ দেখলো—তারপর রেবা গাছ। হঠাৎ যেন কাউকে গ্রামার বোঝাচ্ছে এমন অভিজ্ঞ কণ্ঠে বললো—অত ভাবছো কেন?—দেখো ঠিক হবে। এম-এতে তোমার এত ভাল রেজাল্ট—অমিয় শব্দ হাসল; কিছু বললো না। অথবা তার মনে হচ্ছিল এই মূহুর্তে মীনা অন্য কিছু বলুক; অন্য প্রসঙ্গ; অন্তত কোনো 'লিনেমার' কথা। তারপর খুব আশ্বস্ত করার সুরে বললো—তাই ভাবছো!



স্বাভাবিক প্রতিরক্ষার জন্য আপনার সেনা সমর্পণ করুন।
সেবার আশীর্বাদে পবিত্র এক উজ্জলতর এই সেনা আপনাকে
আবার ১৫ বছর পর ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

দোশের সেবা করুন—স্বর্গবণ্ড নিন

জিন্দগী তাদার সেনা, অকর্ষিত সেনা।
কর্ষিত নিশাখিত সেনা সক্রিয় সেনা।
জনকরের হাতে এই সেনা থাকার অর্থ
ইমেসিক মুদ্রা, ঘরপাতি, কাঁচা মাল এবং
প্রতিরক্ষার লাক সন্তানকে কোমর ভক্ত
চার অস্ত্র প্রয়োজন।
কোন প্রায় করা হয়না
সেনা, সেনার গিনি বা সেনার অলঙ্কারের
বিস্ময়ে আপনি কোন কর্তব্য নেও তখন
এই সেনা কোমর পেয়েছেন সে সম্পর্কে
আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হয়না। কর্তব্য
প্রদান বা বহিষ্কৃত আইন অনুযায়ী
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়না।

কর্ষিত থেকে আর
এটি ১০ গ্রাম সেনা (বিশুদ্ধ সেনা)
যেকোনো প্রতি বছর আপনি ২ টাকা করে আর
করতে পারবেন (এক তোলা ১১.৩৬ গ্রামের
সেনা, একটি সেনার গিনির ওজন ৮ গ্রাম)।
আপনার পুরনো সেনার অলঙ্কার এবং
অস্ত্র সেনার গিনি থেকে একটি আর
কমার এই দুই দ্রব্যের কাছে লাগান।
অলঙ্কার তৈরীর ব্যয়ের কতিপূর্ণ
আপনি যদি সেনার অলঙ্কার দেখে তাহলে
অলঙ্কার তৈরীর ব্যয়ের কতিপূর্ণ হিসেবে
এতদ সেনার প্রতি লক্ষ্য প্রায় ০ টাকা
করে দেওয়া হবে। অলঙ্কার বা বোঝিত
সেনা দিয়ে আপনি যদি কর্তব্য করেন তাহলে
১৫ বছর পর সন্তানকে যে সেনা ফিরিয়ে
দেবেন তা যে কোন বিত্তহীন পরিষেবা করে

ভাবত মন্ত্রকালয়ের কর্তৃত্বকৃত ও প্রচলিত

আবার অলঙ্কার তৈরী করিয়ে দিতে পারবেন।
জামিন হিসেবে স্বর্গবণ্ড
কর্ষিত জামিন হিসেবে রেখে আপনি ব্যক্তি
যেকোনো টাকা ধার করতে পারেন।
কর রেহাই
কর্ষিত থেকে যে আর হবে তার ওপর কোন
আধিক্য নেওয়া হবে না। কর্তৃত্বকৃত অস্ত্র
সম্পন্ন কর দিতে হয়না। কর্তৃত্বকৃত বিদ্যুতী
করে যদি কোন লোক হয় তাহলে তার ওপর
কোন কর দিতে হয়না।
এক বছরে ৫,০০০ গ্রাম পর্যন্ত (প্রায় ৫২৬
তোলা) সেনার সুলার কর্তৃত্বকৃত, প্রথমবার
কাউকে উপহার দেওয়া হলে তার অস্ত্র
উপহার কর দিতে হয়না। উত্তরাধিকার সূত্রে
কোন যদি কর্তৃত্বকৃত পাম তাহলে প্রথমবার
ফিনি পারেন তাকে ৫০,০০০ গ্রাম (প্রায়
৫,২৬৮ তোলা) পর্যন্ত কোন সম্পত্তি কর
দিতে হবেনা।

কর্ষিত কোমর পাওয়া যায়
ব্যাংকলার, ঘোড়াই, কলিকাতা, যাদাও,
লসপুত্র এবং হুতন বিদ্যেতে অবস্থিত ভারতের
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে এবং ভারতে
অবস্থিত স্টেট ব্যাঙ্কের এবং এও সহযোগী
ব্যাংকগুলির সমস্ত শাখায় কর্তৃত্বকৃত দেওয়া হয়।
বেশকৈ সাহায্য করুন
এক আপনি কি পরিমাণ সেনা বিক্রয়
করেন তার ওপর জাতি এবং আপনার
ধর্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। সেপের
সেবার আপনার সেনা করে লাগান।

সম্ভার সেই দৃ-একটি নীলাভ তারা আকাশের অজস্রতায় যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে এখন। বোধহয় এমনিই হয়; 'সব সুন্দর মনুষ্যত্বই বড় ক্ষণিক, বড় ভঙ্গুর' আমি মনে মনে উচ্চারণ করলো কথাটা; হঠাৎ তার মনে পড়লো ছোটবেলায় বিকেলে প্রথম তারা দেখলে সে কোন এক মূর্খের নাম জপতো; তার মা শিখিয়েছিল একটা সুন্দর খেলা ছিল সেটা তখন।

কোলে ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে এসে তাদের সামনে হাত মেলি দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টিটা নতুন নয়; বরং এখন অমিয় বিরক্তিবোধ করে, ক্রান্তি বোধ করে—যখন-তখন পথে-ঘাটে পার্কে এরা পেছনে লাগে। ওর ইচ্ছে ছিল যেতে বলে, কিন্তু অমিয় কিছু বলার আগেই মীনা ওর সুন্দর ব্যাগটা খুলে ফেললো; তারপর কিছু ক্ষুদ্রো পয়সা তুলে মেয়েটির হাতে দিল। কপালে হাত ঠেকিয়ে মেয়েটি চলে গেল এক-সময়।

হালকা হওয়ায় মীনার চুল উড়ছিল; ঠিক করে নিতে নিতে বললো—সত্যি খুব খারাপ লাগে—এরা—

—তোমার-আমার খারাপ ভালো লাগায় কী এসে যায় বল? অমিয়

সঙ্গীত-সুধাকর

শ্রীবিশেষজ্ঞ বাল্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রী

বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিন

দাদার শেষ স্বাস্থ্য-হিন্দুরাজ্যের ইতিহাস—সঙ্গীত-সাধন—বিষ্ণুপুরের বাদকগণ—অভিনয়—কাব্য-সাধনা—কথক-পরিচয়—বাঁদীজী সম্প্রদায়—ভূমায়ী ও শিল্পীগণের জীবন-সাধনার সহিত—ভারত বিখ্যাত গায়কগণের লোক-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সমূহের স্বরলিপির অপূর্ণ সংকলন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কীর্তি-সম্পদ চিত্রে প্রদর্শিত।

মূল্য—১০।

পুস্তকচর্চা চিবনুতন মণিসঙ্ঘ

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাভাষ্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত—হুতোম প্যাচাব নন্দা বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল, পুণ্যকীর্তি কবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—ভ্রান্তিবিলাস।

একত্রে ৯ টাকা মাত্র

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৩৬, বিনয়বিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১২

নিম্পূর্ণ জবাব দিল—তারপর অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকলো। আর পারবে ওঁদিকে সাদা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মীনা রসে রইল।

—সুদূরটা বেশ সুন্দর না?...

—কীসের?

—ওই যে, দোতলা বাড়িটা থেকে গাঁটারের সুন্দর আসছে।

অমিয় শুনলো—স্ট্রোডওতে এখন কে বাজাচ্ছে—ক্রান্তি আমার ক্ষমতা কর প্রভু—এই নিভৃত অন্ধকারে যেন ধীরে ধীরে সুদূরটা মিশে যাচ্ছে।

—জানো, আমার খুব গাঁটার শিখতে ইচ্ছে করে।

অমিয় তাকালো মীনার মুখের দিকে। কী আশ্চর্য! ছেলেমানুষী পেয়ে বসেছে ওকে; একটু আগে কুকুরের কথা বলছিল, এখন গাঁটারের কথা বললো। বোধহয় তুমি এখন চারপাশের অস্তিত্ব আর বসসটা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে মীনা। অথচ আমার বে ঠিক কী ইচ্ছে করে; কী জিনিষ কেনোদিন তা বোঝাতে পারবো না; সম্ভব নয়। দূরের আলো এখন অন্ধকরকে ক্রমশ দূষিত করছে—অমিয় সেদিকে তাকিয়ে থেকেই কথাটা ভাবলো একবার।

—দিদিমণি আজ ফুল নেবেন না?

ওরা লক্ষ্য করলো আজও লোকটা এক-রাশ রজনীগন্ধা নিয়ে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মীনার অস্বস্তি বাড়ছিল। লোকটা পেয়ে বসেছে। কয়েকদিন কিনেছে ওর কাছ থেকে। মুখে বললো—না থাক, আছে বাড়িতে; পরে এসো তুমি। মীনা শীতলকণ্ঠে উত্তর দিল।

একটু হাসলো ফুলওয়াল।—আমি তো রোজই আসি দিদিমণি; নিলে পারতেন, আজকের গুলো খুব তাজা ছিল।

—না, তুমি পরেই এসো, অমিয় এবার কথা বললো।

আর লোকটা চলে যেতেই যেন হঠাৎ একটা জটিল অশ্ব মিলে গেছে, এমন তরল উল্লাসে মীনা বলে উঠলো—দেখেছো, একদম ভুলে গেছি! কিনলেই ভাল হতো।

—হঠাৎ?

—কাল জয়ন্তীর বিয়ে—ইস, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

—অমিয় আচমকা প্রশ্ন করলো—জয়ন্তী কে?

—এ মা, তোমার মনে নেই? আমার বন্ধু জয়ন্তী! একটু থেমে আবার বললো—জানো, জয়ন্তীটা অত সুন্দর আর বিয়ে হচ্ছে নাকি একটা কালো

ছেলের সঙ্গে! তারপর অমিয়ের চোখে চোখ বুলিয়ে বললো—তবে ছেলে নাকি দুর্গাপুরে ভাল পোস্টে আছে; ফোর-ম্যান-টোরম্যান কী একটা যেন।

—ভালই তো; সং পাত্র। অমিয় থেমে থেমে কথা বললো।

—হ্যাঁ, ভালো না ছাই; কালো কুচ্ছিন্ন বর হলে—

—কী হয়? অমিয় হাসলো।

—আবার? খালি ইয়ারকি!...

মীনার চোখে, অমিয় ভাবলো—কোঁতুক উপছে পড়ছে এখন। মীনা শব্দ না করে হাসছিল। আর হাসি থিতিয়ে সরে গেলে ও বললো—আচ্ছা, ওকে কী প্রেজেন্ট করা যায় বলা তো?

—তোমার বন্ধুকে তুমি কী দেবে, অমিয় তার কী বললো—তা ছাড়া দেওয়াটা শব্দ তো ইচ্ছের ওপর নয়; ক্ষমতার কথাটাও ভাবতে হয়।

কথাটা মীনা শুনলেই বলে মনে হলো না; হঠাৎ বললো—আচ্ছা একটা ঘড়িপ্রেজেন্ট করলে কেমন হয়?

—ঘড়ি? অমিয় ওর মুখের দিকে তাকালো একবার; বললো—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

—হলেই বা, এতদিনের বন্ধু; আজেকাজে জিনিস দেওয়া যায় নাকি?

কী এক দুর্বোধ্য মন্তব্য অমিয় ক্রমশ আবিষ্ট হচ্ছিল—হঠাৎ ভয়ানক বিশ্বাসী কণ্ঠে বললো—তা ঠিক; আমাকেও এ রকম এক বন্ধুর বিয়েতেই অনেক খরচ করতে হয়েছিল; একটা বিদেশী ক্যামেরা দিয়েছিলাম, প্রায় শ'তিনেক টাকার ব্যাপার।

—বন্ধুর বিয়েতে অত টাকা খরচ করলে? মীনার গলা যেন অন্ধকারে বাতাস চিরে চিরে এখন প্রখর হলে জ্বলছে; অমিয় বদলে ও বিস্মিত হয়েছে।

—কি অস্বাভাবিক বল? টাকাটাই তো সব নয়; এতদিনের বন্ধুটা তো তুচ্ছ নয়—অবশ্য পরিমল দারুণ প্লাজড হয়েছিল ক্যামেরাটা পেয়ে। অমিয় অভ্যন্ত মৌলারেম দ্বরে কথা বলছে।

—তা তো হবেই, মনে হচ্ছে কোনো কাল্পনিক আবেগে মীনার চোখ চিক-চিক করে উঠছে; আস্তে আস্তে বললো—অতগুলো টাকা ক'জনই বা খরচ করতে পারে। অমিয় বদলে মীনা এখনো মনোনিবেশ করে উঠতে পারছে না। ওর ভঙ্গীতে চণ্ডলতা টের পেল সে।

—তুমি কী অন্য কিছু ভাবছো, অন্য রকম কিছু; মানে যা—অমিয় শীতল-তায় আচ্ছন্ন হতে হতে এবং ক্রমশ স্নায়বিক নিরুত্তাপ গন্ধের মধ্যে আশ্রয়

নিতে নিতে মীনা কে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে চাইছিল।

ঘাসের মৃদু, কোমল শব্দের মতো মীনার ঠোঁটেও এখন শব্দ টের পেল অমিয়। আর কিছুক্ষণ পরে খুব মিস্পাহ কণ্ঠে মীনা বললো—অনেক রাত হয়েছে, চল এবার ফেরা যাক।

অন্যদিনের মতোই ওরা পাশাপাশি হাঁটিছিল। হাটিতে থাকল। মীনার পায়ের যেন কোনো শব্দ নেই, ঘুমে মথ্যে যেন চলেছে; অমিয় কী ভেবে সিগারেট ধরতে গিয়েও আবার রেখে দিল। এখন রাত ঘন, পাকের বাতাস ভারি; নির্জন অন্ধকারে গাছগুলো প্রহরীর মতো সতর্ক। অমিয় আর একবার আকাশ দেখলো, তারপর দোতলা বাড়িটা; জানলার আলো জ্বলছে।

বাস-স্টপে এসে গেছে প্রায়। মীনা যে বাস ধরবে; সে তার উল্টোদিকে। রোজ তাই করে। এতক্ষণ পাশাপাশি বসেছে। রাতি নিষ্ঠুর দরদর তৈরি করবে এবার। বাসটা যখন চলতে শুরু করবে, আর মীনা ক্রমশ তার গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছবে, অমিয়ও তখন বাসের জন্য অপেক্ষা করবে।

হঠাৎ মীনা বললো—ইস্ একদম ভুলে গেছি! কী যাচ্ছেতাই হচ্ছে এখন আমাব, কেবল ভুলে যাচ্ছি; আমাকে একবার ছোটমাসীমার বাড়ি যেতে হবে; অল্প—আমার মাসতুতো ভাই, ওর অসুখ; দেখে যেতে হবে; এই তো কাছেই; হেঁটেই চলে যাবো। তুমিও

আর দাঁড়িয়ে দেরি করো না। অন্ধকারের অস্পষ্ট অবয়বের মধ্য থেকে অমিয় শব্দ বললো—আচ্ছা।

এখন বাস প্রায় ফাঁকা। অমিয় জানলায় চোখ রেখেছিল। ঘনঘন হাই আসছে তার, বাইরের অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে; ক্রান্তিতে এখন তার চোখ বুজে আসছিল। মানে হয় না, কোনো মানে হয় না একই প্রহসনের অভিনয় বাববার দেখতে। আমরা বোধহয় ক্রমশ নিরাশ হয়ে যাচ্ছি; হঠাৎ মীনা কে এখন মনে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে মার কথাও। ছোট ভাই দীপদকে কলেজে ভর্তি করতে হবে, যেমন করেই হোক তাকে টাকা জোগাড় করার কথা মা আজ সকালে বলেছিল। এতক্ষণ মনে হয় নি, এখন হলো; ছিঃ আজও সে চাইল না, চাইতে পাবলো না। নিশ্চয়ই মীনা তাকে নিরাশ করতো না। বন্ধুর বিষয়ে ভিড় প্রজেক্ট করবে! এ কটা টাকা হযতো কিছুই নয়; চাইলেই সুন্দর ব্যাগটা খুলে ওর হাতে টাকা তুলে দিতে দিতেই বলতো, আরও আগে বললেই তো পারতে; স্পষ্ট অভিমান। অমিয় যেন অনুভব করতে পারলো এখন। তার পকেটেও একটা ভারী ব্যাগ আছে, অনেকগুলো দরখাস্তের নমুনা; আজো বাজে কাগজে ভর্তি। আজও সে সংকোচ কাটাতে পারলো না।

মাথার বাঁ দিকে স্পষ্ট একটা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে মীনা; হাত দিয়ে কপালের রগ টিপলো কিছুক্ষণ।

নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে এখন। অজস্র ক্রান্তির ডেউয়ে সে কোথায় যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। পাশ দিবে একটা বাস চলে গেল। কী মানে হয় একটা প্রাচুর্যের প্রজ্ঞাপতি হয়ে এভাবে অমিয়কে প্রতারণিত করার? ও সবটাই হয়তো বিশ্বাস কবে; আজকের গল্প-টাও বোধহয় অবিশ্বাস কবতে পারে নি। মানে হয় না, মানে হয় না উজ্জ্বল রংমশালের মতো জ্বলতে চাওয়ার।

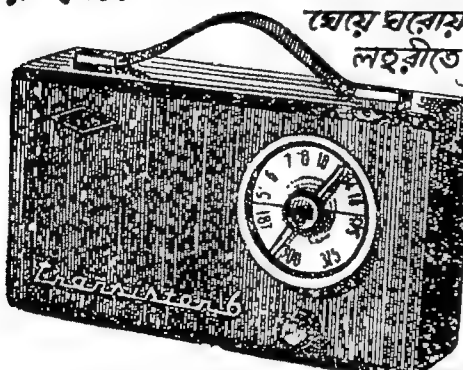
এখনো হয়তো বারান্দা অন্ধকার; বাবার মৃদু মনে পড়লো একবার। অন্ধকারে বসে বসে এখন হয়তো সমানে কাশছে বাবা। আজও ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে যেতে পাবল না সে। এখন কষ্ট পেলো চিন্তাটায়।

চাইলে অমিয় নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না; ওর ব্যাগটাই কত ভারী। এখন মনে হলো তার; কোনো কিছুই নাম করে চাইলেই—বন্ধুকে অত দাম দিবে প্রজেক্ট কবে? নাঃ আজও পারল না। কিছুতেই না।

আকাশে তারাবা এখন নিদ্রাতুণ; বাতাস কখন মরে গেছে। ঘরের মধ্যে অসহ্য গুমোট এখন; চাবপাশে কোনো শব্দ নেই। কেবল অবিরাম জল-প্রপাতের শব্দের মতো রাতি-সময়, আর নীলাভ এই অন্ধকার সব ধরে যাচ্ছে এখন।

প্রথম দেখা সেই সুন্দর তারটার কথা ভাবতে ভাবতে বেলগাছিয়ার মীনা আর কালীঘাটের অমিয় সেদিন অনেক রাত অবধি জেগে থাকল।

জ্বর ও জরুরীতর কক্ষারে আপনাকে ঘর মানদয় খবর করে
তুলবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং আর ই সি রেডিও...
আর ই সি-র একটি রেডিও আপনার ঘরে রাখুন, আপনার এক
ঘোরে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহুর্তে জ্বর ও
লহরীতে হাড়ুয়াময় করে তুলবে...
আর ই সি মডেলগুলি একান্ত
নির্ভরশীল ও শক্তিশালী...
পৃথিবীর সব স্টেশনই মুহুর্তে
ধরা পড়ে...
৬ ট্রানজিস্টর মডেল ৫ মডেল
মডেল-৬টি ৪ মূল্য-১৬৫ টন
জানীয় কর জাতিরিঙ





অর্থ সংগ্রহের নতুন পরিকল্পনা :
মোটর ডাকাতি

১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে বাংলার বিপ্লবীরা একত্র মিলিত হয়ে এক সংগঠনের পরিকল্পনা নেন এবং জার্মানীদের সাহায্যে নিজেদের শক্তিকে কয়েমী করে সারা ভারতব্যাপী এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন...

“সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গার্ডেনরিচ ও বেলিয়াঘাটার ডাকাতি সংঘটিত হয় ১২ই জানুয়ারী ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পর-পর...” (সিডিসন্ কন্মিটি, ১৯১৮, রিপোর্ট, প্যারা ডিন, পৃঃ ৮১) অন্যত্র দেখা গেছে রাওলাট সাহেবের রিপোর্টের ৬৯নং অনুচ্ছেদে দু’জন নামজাদা বিপ্লবী নেতা স্বতীন মুখার্জী ও বিপিন গাঙ্গুলীর নাম এই নতুন ধরনের ডাকাতির নায়করূপে অভিহিত করা হয়েছিল। আসলে এই নেতৃবৃন্দ ডাকাতি অপেক্ষা সেবা ও সংগঠনের যে বেশি পক্ষপাতী ছিলেন সেই আভাসও স্বেচ্ছা পাওয়া যায়। প্রশ্ন হতে পারে, তবে তাঁরা ডাকাতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কেন? এর উত্তর পাওয়া যায় মিস্টার জে সি নিল্গন, আই-সি-এস-এর গোপন বিবরণী থেকে—“সভ্যদের সংগঠিত ও সুসজ্জিত করার জন্য এবং জার্মান মধ্যস্থতার সঙ্গে সংস্পর্শ অক্ষম রাখার অভিপ্রায়ে অর্থের প্রয়োজন ছিল।” (পৃঃ ৭০)। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের প্রারম্ভে একটা বড় রকমের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁরা সেদিন উতলা হয়ে ওঠেন। অথচ একটা বিরাট পরিকল্পনাকে কার্য-করী করে তোলার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বোধ হয়েছিল তা উপরোক্ত উপায় ছাড়া তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করার মত অপর কোন পন্থা তখন তাঁদের সামনে ছিল না। দেশের দুর্দশার কথা ভেবে তাঁদের অন্তরে সম্ভবত

—মৃত্যু নাত্র গম্যমাধ্যম—

তখন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল শ্রীঅরবিবদের ছন্দে—

“My gasping wounds are a
thousand and one
And the Titan kings assail,
But I cannot rest till my task

is done
And wrought the eternal will.”

(God’s Labour, 14th Stanza)

—১.

অসুদর রাজের প্রচণ্ড আঘাতে
স্বাসযন্ত্র যেথা আঘাতিত হয়
শতক সহস্র বাব—
বিগ্রাম নিতে পারি না তো সেথা
কতব্যের সমাধার আগে,
শ্রমাসম্ম ইচ্ছা সনাতন
পূর্ণ না হ’লে।

প্রসঙ্গত মনে পড় স্বামী প্রজ্ঞানা-
নন্দ সরস্বতীর উক্তি—“ডাকাতি—?
এই যে আমরা জীবনপণ করে দেশোদ্ধার
রতে রতী হয়েছি, তার পরিণামে লাভ
হবে কার? কিন্তু দেশ তা’ বোঝে না।
তাই তারা আমাদের সাহায্য করে না।
কিন্তু এতবড় কাজ টাকা না হলে
সম্ভব নয়। তাই আমরা তাদেরই
ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কর আদায় করি।
.. রাষ্ট্রের কর না থাকলে রাষ্ট্র চলে না।
আর রাষ্ট্র না থাকলে মানুষের চলে না।
সমাজও অচল হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কর
ক’জনা ইচ্ছা সূত্রে নেয়?...” (শ্রেণ্য
শ্রীমদ্রাজন গদ্যের অপ্রকাশিত
ডায়েরি)। বলা বাহুল্য, এই সকল
বিপ্লবীদের সকলেই ছিলেন হিন্দুর
সুপরিচিত ধর্মগ্রন্থ গীতার বিশেষ ভক্ত।
সেই ভাবে সম্ভবত ভগবৎ প্রেরণা
হিসাবেই উদ্ভাবিত হয়েছিল অর্থ-
সংগ্রহের ঐ নতুন পরিকল্পনা, রাওলাট
সাহেব যেটাকে “new features in
revolutionary crime” বলে
বর্ণনা করেছিলেন। তবে এই জাতীয়
ডাকাতি সাধারণত অনুষ্ঠিত হোত, হয়
সাহেবের টাকার ওপর আর না হয়
বিফল ধন-সম্পত্তির ওপর। ১৯১৫
সালে কলকাতা শহরে এইরূপ তিনটি
ডাকাতি পর পর সংঘটিত হয়েছিল।

(১) ১২-২-১৯১৫ তারিখে অনু-
ষ্ঠিত গার্ডেনরিচ ডাকাতি। লুণ্ঠিত
অর্থ ১৮,০০০ টাকা।

(২) ২২-২-১৯১৫ তারিখে অনু-
ষ্ঠিত বেলিয়াঘাটার ডাকাতি। লুণ্ঠিত
অর্থ ২২,০০০ টাকা।

(৩) ২-১২-১৯১৫ তারিখে অনু-
ষ্ঠিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের ডাকাতি।
লুণ্ঠিত অর্থ ২৫,০০০ টাকা। (এই
হিসাব রাওলাট রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত
করা গেল)। উক্ত তিনটি ডাকাতি ছাড়া
ঐ সময় বরাবর আর একটি ডাকাতির
কথা মনে পড়ে—২রা আগস্ট, ১৯১৫
সালে অনুষ্ঠিত আগরপাড়ার ডাকাতি।
এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা
হয়েছে।

তখনকার দিনে বিভিন্ন সওদাগরী
অফিসের টাকা, ঠিকা ঘোড়ার গাড়ির
সাহায্যে কর্মচারী ও দুচারটি পিয়নের
সহায়তায় স্থানান্তরে পাঠান হত।
এইভাবে বার্ড কোম্পানীর ক্যাশ সরকার
নকুন বেলে, রামসুচিত ও সুদর্জ
সিং নামক ক্যাশ পিয়নের সাহায্যে সেক-
ম্যাথবার একটি ঠিকা ঘোড়ার গাড়িতে
করে সেদিন তাঁরা ষাটখিলেন চার্ভার্ড
ব্যাংক থেকে চেক ভাঙিয়ে গার্ডেন-
রিচের শাখা অফিসে পৌঁছে দিতে।
বিপ্লবীরা আগে থেকেই এই সকল খবর
সম্বন্ধে গুপ্ত সূত্রে ওয়াকিবহাল
থাকতেন। তাই তাঁরাও সেদিন নির্দিষ্ট
স্থানে যথাসময়ে অপেক্ষারত ছিলেন
একটি ট্যাক্সিতে বসে। তারপর সেক-
ম্যাথরা পরিচালিত ঠিকা গাড়িটি বার্ড
কোম্পানীর টাকা নিয়ে যথাস্থানে
পৌঁছান মাত্র দু’জন বিপ্লবী তড়িৎবেগে
সুটে এসে সেই ঘোড়ার মুখের লাগাম
ধরে গাড়িটি থামিয়ে দেন ও অপর
বিপ্লবীরা টাকাগুলি ছিনিয়ে নিয়ে
অপেক্ষারত তাঁদের সেই মোটরের
সাহায্যেই অদৃশ্য হয়ে যান। একথা জানা
যায় রামসুচিতের সাক্ষ্য থেকে—
“মেসার্স বার্ড কোম্পানীর ক্যাশ পিয়ন
রামসুচিত তেওয়ারী.. বলেছিলেন ...
তাঁদের গাড়িটি গার্ডেনরিচ ও সার-
কিউলাব রোডের সংযোগে পৌঁছান মাত্র
একজন যুবক এসে ঘোড়ার বল্লা তথা
লাগাম ধরে গাড়িটি থামিয়ে দেন। পর-
ক্ষণেই তাঁরা টাকার থলিগুলি নিকটে
অপেক্ষারত মোটরগাড়িতে স্থানান্তরিত
করেন। আর সেই সঙ্গে ‘সোফার’ তথা
মোটরচালককে বলপূর্বক গাড়ি থেকে
সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে গাড়িটিকে
প্রচণ্ডবেগে চালিয়ে দেওয়া হয়।” (এ বি
পত্রিকা—২।৭।১৯১৫)। রতন সিং-এর
বিবৃতি অনুযায়ী ঐ ট্যাক্সিটি ভাড়া করা
হয়েছিল হাওড়া স্টেশন থেকে মেটিয়া-
বুর্জের বাবার জন্য। কাজেই কাজ
সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে উক্ত ট্যাক্সি-
চালককে সম্ভবত গাড়ি থেকে সরিয়ে
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। (এ বি

পত্রিকা-৩।৭।১৯১৫)। এই সকল কথা ভাবতে গেলে অসুন্দররাজের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত দেহ বিপ্লবীদের কর্তব্য-নিষ্ঠার উদ্ভাবনার কথাই মনে পড়ে।

বেলেঘাটার ডাকাতি অনর্ন্তিত হয়েছিল অনুরূপভাবেই, ইস্ট ক্যানাল রোডে অবস্থিত ললিতমোহন চন্দ্রের এক চালের আড়তে। মালিক ললিতমোহনের বিবৃতি অনুযায়ী দুটি ট্যান্ডি সহযোগে বিপ্লবীরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁর আড়ত থেকে ২২,০০০ টাকা নিয়ে উঠাও হয়ে যান। সংবাদে প্রকাশ, “গৃহ-স্বামী গুরুতর ক্ষতি থেকে সম্প্রভব রক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ তিনিই পরে বলেছিলেন যে সেদিন তাঁর গৃহে দেড় লক্ষ টাকা সঞ্চিত ছিল।” (এ বি পত্রিকা-২৪।২।১৯১৫)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, লক্ষাধিক অলস টাকার অধিকারী হয়েও দেশের মুক্তিকল্পে অর্থব্যয় করতে তাঁরা বিমুগ্ধ হতেন তাঁদের উপরেই আরোপিত হোত ডাকাতির ঐ অভিনব পরিকল্পনা। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রম্বেয় শ্রীঅবিনাশ রায় বলেছিলেন—“বেলেঘাটার ডাকাতিতে দাদা তথা স্বতীন মুখার্জী নিজ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়, সিরাজগঞ্জের উপেন রায়, পাবনার গোপেন রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা।” (১।৫।১৯১৬ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে শোনা)।

তারপর কর্পোরেশন স্ট্রীট ডাকাতি অনর্ন্তিত হয়েছিল বর্তমান ৬৬নং সুব্রহ্মনাথ ব্যানার্জী রোডে অবস্থিত ফকিরচন্দ্র দত্তের দোকানে। সংবাদে প্রকাশ—“৬৬নং কর্পোরেশন স্ট্রীটের একটি ধনী মহাজন ফকিরচাঁদ দত্তের দোকানে গত সম্মুখ ৭।৩০ মিনিটের সময় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে.....তারা পাঁচ মিনিট আন্দাজ লুণ্ঠন চালিয়ে বহু স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদি নিয়ে গেছে.....ডাকাতরা সংখ্যায় ছিল পাঁচ জন, আর তাদের মটর-চালক ছিল মাধার পাগাড়ী বাঁধা ও খাঁকি পোশাক পরিহিত একজন শিখ.....” (এ বি পত্রিকা-৩।১২।১৯১৫)। এই ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের পদলিখ কখনই ঠিক ঠিক হিঁদাশ করতে পারে নি। এ যেন ছিল—

“I rise like a fire from the
mortal's earth
Into griefless sky
And drop in the suffering soil
of his birth
fire seeds of ecstasy.”
(* Blue Bird- Sri Aurobinda)

ব্যাখ্যাহীন আকাশেতে উদয় আমার
নশ্বর ভূতল হ'তে—
অগ্নিসম উল্লাসের বাজ
দুঃখক্লিষ্ট জন্মভূমি মাঝে
বিন্দু বিন্দু ছড়াই তাহাতে।

উপরোক্ত প্রথম দুটি ডাকাতিতে অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মোন্নতি সমিতির বিমানচন্দ্র ঘোষ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর শোনা যায় কর্পোরেশন স্ট্রীটের ডাকাতির সংগঠক ছিলেন বিমানচন্দ্র। তবে এইটিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। শেষে ১৯১৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে যারা বিনা বিচারে বন্দী হয়ে অপতরীণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিমানচন্দ্র ছিলেন একজন। সংবাদে প্রকাশ—“বিভিন্ন গৃহে হানা দিয়ে ঐ সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ওপর একসঙ্গে নির্বাসনের হুকুম জারি হয়।—৯।১ মুসলমানপাড়া লেনের সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (তখন হাইকোর্টের উকিল), রামতনু বসুর সেকেন্ড লেনের অধিবাসী, নৈমিত্যখালীর মহেন্দ্রনাথ সেন, বোস-পাড়া লেনের অধিবাসী হরিদাস চক্রবর্তী, তালতলা—নেউগাঁওপুকুর লেনের অধিবাসী, বি-এস-সির ছাত্র বিমানচন্দ্র ঘোষ, ডিকসন লেনের সত্যীচন্দ্র দে, কটন স্ট্রীটের ভোলানাথ বর্মণ, বেলিয়া-ঘাটার অশ্বিনী দে, নয়ান দত্ত লেনের অতীন্দ্রনাথ বসু তাঁর পুত্র সহ। (এ বি পত্রিকা-৮।৩।১৯১৬)। শোনা যায়, কর্পোরেশন স্ট্রীটের ডাকাতিতে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন হরদয়াল সিং নামে এক পাঞ্জাবী যুবক এবং আসলে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন মাননীয় বিচারপতি স্যার জন উডারসের মোটর চালক। এই হরদয়াল সিং-ই তখনকার একাধিক মোটর ডাকাতিতে ট্যান্ডি সরবরাহ করেছিলেন আর কর্পোরেশন স্ট্রীটের ডাকাতির জন্য ট্যান্ডি ও মোটর চালকও দিয়েছিলেন তিনি। এই মোটর চালকের নাম ছিল সম্ভবত তেজ সিং। তা ছাড়া উক্ত ডাকাতিতে যে সকল বিপ্লবীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরশ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ বসুরায়, বিধু রায় ওরফে উপেন রায়, কুমিল্লার অধিবাসী ও তখন সেন্ট জোজিয়ার কলেজের ছাত্র জিতু রায়, আর ময়মনসিং-এর অধিবাসী ও তখন বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র হরেশ রায়। হরেশ রায় তখন নাকি থাকতেন মাণিকতলায়, স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রম্বেয় শ্রীহীরালাল রায়ের বাড়িতে। (সরশ্রী সুধীন্দ্রনাথ

বসুরায় ও মনোরঞ্জন গুপ্তের কাছে শোনা)।

অনেকের ধারণা শেষোক্ত ডাকাতিতে স্বারা সংগৃহীত অর্থের প্রায় সমস্তই পরে পদলিখের হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে বহু নির্লিপ্ত লোক ছাড়াও যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আর যাঁদের নিয়ে পরে মামলা রুজু হয়েছিল সে খবর পাওয়া যায় ৪ঠা জুলাই, ১৯১৬ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায়। সারাংশ নিচে উদ্ধৃত করা গেল।—

“কর্পোরেশন স্ট্রীটে ডাকাতি।”

“...স্পেশাল ট্রিবিউনাল—মিঃ স্মিথ, জেলা জজ, ঢাকা; মাননীয় প্রভাসচন্দ্র মিত্র এবং দেওয়ান বাহাদুর হরিনাথ রায়, ভূতপূর্ব অফিসিয়ালিট জজ, কলকাতা হাইকোর্ট।—

“...সূর্য, হরদয়াল, হিরুয়া ওরফে হীরালাল, পাম্মালাল মন্ডল, জ্যোতিষ রায় এবং দেব সিংকে উক্ত ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচারের জন্য পাঠান হয়।” কিন্তু আসল বিপ্লবীদের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল নিম্নোক্ত বর্ণনায়—

“The dacoits are all described as young men of very determined nature and their age varying from twenty to thirty.” অর্থাৎ ডাকাতরা সকলেই তরুণ বলে বর্ণিত, বয়স ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে, তবে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।” (ইংলিশম্যান-৪-১২-১৯১৫)

প্রসঙ্গত শ্রম্বেয় শ্রীদেবেন চৌধুরী বলেছিলেন—হরদয়াল প্রভৃতি যারা ধরা পড়েছিলেন এবং সেইভাবে উক্ত সংগৃহীত অর্থের যে অংশ পদলিখের হস্তগত হয়েছিল, তাঁর পরিমাণ তুলপ ছিল। মূল অর্থ বিপ্লবীদেরই কাছে লেগেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের লোকের এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে শ্রম্বেয় মনোরঞ্জন গুপ্ত ও সুধীন্দ্রনাথের কাছে শোনা যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হবে গহনা ইত্যাদিতে বোঝাই করা তাঁদের ট্যান্ডি, রাস্তার পূর্ব দিকে তড়িৎবেগে ছুটেতে থাকে। পরে লোয়ার সাকুলার রোড ধরে তাঁরা ভবানীপুরের পশ্চিম-পুকুর অঞ্চলে গিয়ে হাজির হন লর্ড সিংহের কোন আশ্রয়ের বাড়িতে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তখন গৃহে না থাকায় তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে হাজির হন ভবানীপুরের

কাসারিপাড়ায় অবস্থিত হরদয়ালের গৃহে। অতঃপর হরদয়াল সিং-এর স্থিতির মাটির তলায় মালগুদা তখনকার মত গচ্ছিত রেখে বিপ্লবীরা ফিরে যান স্ব স্ব আশ্রয়ে। উপরোক্ত শ্রদ্ধা-ভাজনদের কাছে আরো জানা যায়, এই কাজে সৈদিন বিশেষ সহায়তা করেছিলেন পদ্মপুত্রের অধিবাসী হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রখ্যাত উকিল গোবিন্দচন্দ্র রায় ও তাঁর ভাই ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। পরে ঐ সমস্ত জিনিস মাটির নিচে থেকে বাইরে নেওয়ার সময় কি পরিমাণ মাল বিপ্লবীদের হাতে এসেছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। তবে বিপ্লবীদের দ্বারায় এই অংশের বিপ্লুমাত্রণও অপব্যবহার হয় নি।

বেলেঘাটা ডাকাত সম্পর্কে সম্ভবত কেউ গ্রেপ্তার হন নি। শোনা যায় গাভের্নরির ডাকাত পরিচালিত হয়েছিল শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল ঘোষ ও নরেন ভট্টাচার্য (পরে এম এন রায়) দ্বারায়। এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন—“অতুল ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজের এম্ এন্স সিং ছাত্র বিমানচন্দ্র ঘোষ, সেন্ট জোন্সের কলেজের বি এন্স সিং ছাত্র, বারুইপুত্রের এক উকিলের পুত্র রত্নাকান্ত বসু, বেঙ্গল মিলের কর্মচারী বিজয়কুমার ঘোষ, শিক্ষক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ধসর গোমাস্তা গোপালচন্দ্র দত্ত—মগলবার ট্যাক্সি সহযোগে গাভের্নরিতে ডাকাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। (এ বি পত্রিকা ১৭।৩।১৯১৫)। তাঁদের মামলার শুনানী হয়েছিল আলিপুরের জজস্ট্র ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্টলের এজলাসে। রাজপুত্রের নরেন ভট্টাচার্য (পরে এম্ এন্স রায়) জামিনে খালাস পেয়ে আত্মগোপন করেন এবং তদবধি পুলিশ তাঁর আর হিঁদিশ পায় নি। সেই কারণে ১৬ মার্চ ১৯১৫ তারিখে কোর্ট ইন্সপেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটকে বলোছিলেন—“রাজপুত্রের মরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বেলে খালাস হয়ে

পর্যন্ত আত্মগোপন করেছেন।.....” (এ বি পত্রিকা ২০।৭।১৯১৫)। শোনা যায় সেন্ট জোন্সের কলেজের ফাদারের সাক্ষ্যে বিমানচন্দ্র ঘোষ ও উক্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আরও জানা যায় নিজের কলেজের সুনাম অক্ষয় রাখার জন্য স্বনাম-ধন্য ফাদার নাকি বলোছিলেন—যে নির্দিষ্ট সময় বিমানচন্দ্র ঘোষ কলেজে হাজির ছিলেন। শিক্ষকসমাজের অন্তর্ভুক্ত এই আদর্শ ফাদারের কথা মনে হলে তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত হয়ে আসে। অতঃপর প্রমাণ অভাবে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল ঘোষ ও বৈদ্যনাথ বিশ্বাসও মুক্তি পেয়েছিলেন—সোমবার ১৯শে এপ্রিল। (এ বি পত্রিকা—১৬।৩। ১৯১৫)। এইভাবে মামলা যখন ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়, পুলিশ স্টেট সময় ২০নং ফাঁকির দস্ত লেনের এক বাড়ি থেকে চাবিটি তরুণকে গ্রেপ্তার করে—(ক) রাধাচরণ প্রামাণিক, (খ) নিবঞ্জন দাস, (গ) হীরালাল বিশ্বাস এবং (ঘ) পতিতপাবন ঘোষ। এঁদের কাছে রুডা কোম্পানীর লটকরা একটি মশার পিস্তল ও ২০ রাউন্ড বুলেট পাওয়া যায়। এই গ্রেপ্তার গাভের্নরিচ ও বেলিয়াঘাটায় ডাকাতের কিছু পরেই সংঘটিত হয়। (এ বি পত্রিকা—২৫।৫।১৯১৫)। এই তরুণরা ছিলেন ফরিদপুরের স্বনামধন্য বিপ্লবী নায়ক পূর্ণ দাসের দলের সভ্য। আলোচ্য সময়ে তাঁরা স্বতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পরিচালনায় কাজ করছিলেন। সংবাদে প্রকাশ—“ইন্সপেক্টর এস চ্যাটার্জী, সোমবারে, কিড্ স্ট্রীটের পুলিশ কোর্টে ১৫ হতে ২০ বছর বয়সের চারটি তরুণকে বিচারার্থে এনেছিলেন।” (এ বি পত্রিকা—১৬। ৩। ১৯১৫)। কথা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্তের কাছে শোনা—রাধাচরণের তখন বয়স ছিল অনধিক ২২ বছর, আর হীরালাল ও নিবঞ্জনের বয়স ছিল আন্দাজ ১৬।১৭ বছর। হরিদাস দত্তও তখন শিবঠাকুরের গলির বুলেট সংক্রান্ত ব্যাপারে হাজতে ছিলেন, আর এই তরুণরা তাঁর পালনের হাজতে ৪৪ সেলে আটক ছিলেন। ক্রমান্বয়ে হাজতবাস ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশের স্বভাবসুলভ উৎপীড়নের মধ্যে থেকে তরুণ সঙ্গীদের কণ্ঠে রাধাচরণের অস্তরে ব্যথার উদ্বেগ হয়। অপরদিকে পুলিশ রাধাচরণকে নিয়ে গাভের্নরির মামলা খাড়া করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। আবার এই ডাকাত সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সমস্ত যুবককে সৈদিন গ্রেপ্তার করা

হয়েছিল তাঁদের কারো স্বরূপে কোন প্রমাণ ছিল না। কোন স্বীকারোক্তিও পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনই অবস্থায় রাধাচরণ তাঁর তরুণ সঙ্গীদের মুক্তি-কল্পে, সমস্ত অভিযোগই তাঁর নিজের কৃত বলে স্বীকার করার বিষয় চিন্তা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বার্টলে তাই তাঁর বিচারে লিখেছিলেন—“এক নম্বর আসামী (রাধাচরণ প্রামাণিক)..... বলেছেন যে, অপর তিনজন আসামী ঐ পিস্তল সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং এই ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের ওপর গ্রহণ করতে রাজী আছেন..... আমি তাই ইন্ডিয়ান আমস্ অ্যাক্টের (অ্যাক্ট ৯-১৮৭৮) ১৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী... ১নং আসামী রাধাচরণ আর ৩নং আসামী হীরালাল বিশ্বাস ওরফে ‘তপ’, প্রত্যেককে দু বছর করে সশ্রম কাবাদিতে দণ্ডিত করলাম...” (এ বি পত্রিকা—২৮। ৫। ১৯১৫)। কিন্তু কাঠগড়া থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে পতিতপাবন ঘোষ আবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গাভের্নরিচ ডাকাত সংক্রান্ত ব্যাপারে। শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্তের কাছে শোনা—এইভাবে আলোচ্য অভিযোগ থেকে সঙ্গীদের মুক্তি দিতে পেরে, শ্রদ্ধেয় রাধাচরণ যখন আবার হাজতে ফিরেছিলেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। ধন্য রাধাচরণ আর ধন্য তাঁর বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষা। পরে গাভের্নরিচ মামলা সম্পর্কে রাধাচরণের সম্ভবত আরো পাঁচ বছর জেল বাসের হুকুম হয়। এই প্রকারে তিনি সর্ব সমতে সাত বছর কারাবাসের হুকুম হাসতে হাসতে বরণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে এভাবে জেল-ভোগ থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সকল কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের ছন্দ—

“Image of ecstasy, thrill & enlance,
Image of bliss !
I would see only thy marvellous face.
Feel only thy kiss !”
(* Bird of fire, 3rd Stanza)—1
আলিঙ্গন
শিহরণ
মূর্তি উল্লাসের—
অ-গো
আনন্দ বিগ্রহ!
ইচ্ছা খালি
দেখি তব
মুখ বিস্ময়ের
জাগরু প্রাণেতে মম
অনুভূতি
তব চুম্বনের।

প্রবীণ রূপোপন্যাসিক
ঐ অসমম যুগোপাধ্যায়ের
অসমম যুগোপাধ্যায়ের
অসমম যুগোপাধ্যায়ের
০খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি
নির্বীচিত গল্প। মূল্য : তিন টাকা।
বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আপদাত্মক ও বলাহোনা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডক্টর উইলিয়ামস একদিন ক্লাসে বললেন, 'প্রজ্ঞা সেন্ট ফ্রান্সিস ডি সেলস সেমিনারীর রেভারেন্ড জে, পল ডোনোভান আসবেন। তাঁর ইচ্ছা তোমরা তাঁর সেমিনারী দেখে। কে কে যাবে বল।'

দক্ষিণ ভারতীয় ক্রিশ্চিয়ান মাদ্রাজবাসী মাদ্রাজ রাজেশ্বরম, কলম্বার ডোরা রিনকন, নেপালের মিস্টার প্রেস্টো ও আমি যাব বলে জানালাম।

সকাল ১১টা নাগাদ বেভারেন্ড এলেন। বেশ সৌম্য শব্দে তারুণ্যময় চেহারা। ওকলাহোমা সিটিতে তাঁর সেমিনারীতে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগল। সেমিনারীর বিশিষ্ট খুবই সুন্দর। চারিদিকে অজস্র সবুজ গাছপালার শব্দে পরিবেশে সেমিনারী-টিকে আশ্চর্য আশ্বিনময় বলে মনে হল। এই সেমিনারী ডাওসেস অব ওকলাহোমা সিটি অ্যান্ড টেলসা কর্তৃক পরিচালিত। রেভারেন্ড ডোনোভান বললেন, 'এখানে ৪ বছর স্কুল ও ২ বছর কলেজে পড়তে হয়। এব কারিকুলাম ক্র্যাসিক্যাল হাই স্কুলের মতো।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন ছাত্র সংখ্যা কত? এদের মধ্যে সাধারণত কতজন শেষ পর্যন্ত প্রিন্স্টনের জীবন গ্রহণ করে?'

রেভারেন্ড বললেন, 'বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৫০। শেষ পর্যন্ত সাধারণত ১৫ পাবসেট উপার্জন হয়।'

—'আচার-আচরণের কঠোরতা কেমন?'

—'অশেষ্ট। হাই স্কুলের ছাত্রদের স্ন্যাক করতে দেওয়া হয় না। অবশ্য কলেজের ছাত্রেরা স্ন্যাক করতে পারে।'

এর পর বেভারেন্ড আমাদের বিশপ ম্যাকগুইনেস হাই স্কুলে নিয়ে গেলেন। এটি কো-এডুকেশনাল ক্যাথলিক স্কুল। প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাদের স্কুলের ফলাফল বেশ ভাল। এখানকার ছাত্রদের প্রায় ৭৫ পরসেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।'

জানতে পারলাম এখানে বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয় না।

এখান থেকে সেন্ট জেমস ক্যাথলিক স্কুল বেশি দূরে নয়। অস্পষ্টভাবে অর্থাৎ আমরা সেখানে পৌঁছলাম। যে সব ক্যাথলিক পরিবারের ছেলেমেয়ে এখানে পড়ে তখন প্রত্যেকে মাসিক সাত ডলার করে দিয়ে এই স্কুলকে সাহায্য করে। ক্যাথলিকদের টাকার এই স্কুল চলে। তবে ক্যাথলিক

নয় এমন লোক এখানে শিক্ষকতা করতে পারে। প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'গভর্নমেন্ট থেকে আমরা কোন সাহায্য পাই না। আমাদের ছাত্রেরা স্কুল বাসে চড়তে পার না তবে আমরা যে রিলিজিয়ন পড়াই এতে গভর্নমেন্ট বাধা দেয় না।'

প্রায় সন্ধ্যার সময় রেভারেন্ড আমাদের নর্মানি পৌঁছে দিবে গেলেন।

ডক্টর উইলিয়ামস একদিন আমাদের ওকলাহোমা সিটিতে ওকলাহোমা পাবলিশিং কোম্পানীতে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে 'দেইলি ওকলাহোমা' ও 'ওকলাহোমা সিটি টাইমস' প্রকাশিত হয়। বিরাট অফিস এডিটোরিয়াল, কম্পোজিং, প্রেসরুম, ওয়ার-হাউস, এনগ্রোভিং, ফটো রুম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলি ঘুরে দেখলাম। সর্বত্র যন্ত্রের ব্যবহার দেখলে বিস্মিত হতে হয়। অ্যাসোস-

এন. কে. ব্রানবার্গ

সিফটেড প্রেস ওয়ারফটো মেশিন, ডেট প্রেসেসিং, হাই-স্পিড প্রিন্টার, মেলবল টিউবের মধ্য দিয়ে মৌলিক প্যাকেট করে প্রিন্স সেকশন থেকে প্রিন্টিং রুম ম্যাটার পাঠানো ছাপার মেশিন, প্যাক কবল মেশিন ইত্যাদি খুবই আশ্চর্যজনক। ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'আমেরিকার মধ্যে ওকলাহোমা পাবলিশিং বেশ বড় কোম্পানী।'

প্রেস থেকে ১৮০১ নর্থ এলিসনের ওকলাহোমা সিটি পাবলিক স্কুলের ব্রড-কাস্ট সেন্টারে গেলাম। এখানে তিনটি টি ভি চ্যানেল আছে। চ্যানেল ২৫ ওকলাহোমা সিটি পাবলিক স্কুলসেব সম্পত্তি এবং তাবাই এটা চালায়। এর স্টুডিও এইখানেই চ্যানেল ১০ ওকলাহোমা এডুকেশনাল টেলিভিশন অথরিটি নামে একটি সংস্থার সম্পত্তি এবং তাবদই কতৃদ্বারা। এর স্টুডিও নর্মান ও ওকলাহোমা সিটিতে। এখানকার আব একটি চ্যানেল চ্যানেল ১০-ব টেলিকাস্ট ব্রডকাস্ট করে। এটি চ্যানেল ১১। এ ছাড়া ওকলাহোমা সিটি পাবলিক স্কুলসেব একটি রেডিও স্টেশন আছে। টিভি বহু প্রচলনও এখানে বোডকে পরিহার করা হয় নি। কেন না মিউজিক, স্টোরি টেলিং পট মেকিং ইত্যাদি কতকগুলি প্রোগ্রামে রেডিওর শক্তি অনস্বীকার্য। এখান থেকে

প্রতি সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার টেলিভিশন বোসন ব্রডকাস্ট করা হয়। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ প্রোগ্রামই লাইভ, বাকিগুলি ভিডিও টেপ করা। ৫৫ জন কর্মচারীর মধ্যে ২৪ জন স্টুডিও টিচার। ৭০,০০০ জন ছাত্রছাত্রী ৫ ২,৬০০ শিক্ষক এই টেলিভিশন ও রেডিও ব্রডকাস্টে উপকৃত হয়।

এর পর ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম হলে ওকলাহোমা স্টেটের গভর্নর মিস্টার বেলমেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গভর্নর হাউসে তেমন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। আমন্ত্রণ আসার কথা আগে থেকে জানানো ছিল। আমাদের গেস্ট রুমে এনে বসানো হল। আমি দরজা কাছের বসেছিলাম। হঠাৎ একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ঘবে ঢুকে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমি উঠে দাঁড়ালেই আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আমি মিস্টার বেলমেন।'

আমি ভাবতেই পারি নি এতো সাধারণভাবে গভর্নর আসতে পারবেন। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

এব মধ্যে ডক্টর উইলিয়ামস এগিয়ে এসেছেন। তিনি পবিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমাদের গভর্নর মিস্টার বেলমেন। আর এ ডক্টর।'

মিস্টার বেলমেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষ থেকে।'

—'এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

—'না।'

ডক্টর উইলিয়ামস সকলের সঙ্গে মিস্টার বেলমেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর গভর্নরকে দিকে চেয়ে বললেন, 'এবা আপনায় সঙ্গে ছবি তুলতে চায়। একটু কষ্ট করে আপনি যদি—'

ভাব কথা কেড়ে নিয়ে মিস্টার বেলমেন বললেন, 'বেশ তো চলুন না।'

পূর্ব দিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিস্টার বেলমেন আমাদের সঙ্গে ছবি তুললেন। ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'আপনাব কণ্ঠের জন্যে ধন্যবাদ।'

সাংস্কারিক বসন্তঃ

একটি মোটরে করে মিস্টার বেলমেন চলে গেলেন। সোফার ছাড়া সপ্তে কোনো দেখ-রক্ষী দেখলাম না।

ওকলাহোমা সিটি মেটাল হসপিটালে সেদিন আব ষাওয়া হল না। কদিন পরে গেলাম। মেটাল রিটার্ভেডেবল নর্মাল করবার জন্যে এখানে নানা প্রকার আধুনিক যাবস্থা করা হয়ে থাকে। পোর্টিং, মডেলিং ইত্যাদিতে ক্লিনেটিভ আর্জ ভাগিয়ে মেটাল রিটার্ভেডেবল বিষয়ে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে বলে শুনলাম। স্পিচ থেরাপী ও অডিওলজি নিয়েও এখানে গবেষণা করা হয়। একজন তবুও রাশিয়ানের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি স্পেসে লোক খেলে তার চামড়ার ওপর কি ধরনের রিঅ্যাকশন হতে পারে তাই নিয়ে গবেষণা করে অস্ত্রজাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের তৈরি মেশিনটি দেখালেন। যে সব চৌবাচ্চার জলের সাহায্যে চামড়ার ওপর বায়ু চাপের প্রভাব পরীক্ষা করা হয় সেগুলি দেখলাম। এত বড় রিসার্চ স্ট্রাকচার, অথচ সব দিকে তার খেলাল আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন যথোচিত, তেমনি রিঅ্যাকশন স্পন্দনভাবে গোছানো-গাছানো।

ভ্রমলোক স্মিতহাস্যে আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। লিভারশিপের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। ভ্রমলোক আমাকে তার কয়েকটি পেপারের রিপ্রিন্ট দিলেন। তিনি বললেন, 'পেপার পড়ে কিছু শিখাইকরলে আমাকে জানাবেন।'

হসপিটাল থেকে বেরিয়ে লাঞ্চ খেতে নিলাম। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই ভগলাস হাই স্কুলে পৌঁছলাম। ভগলাস একজন স্কোল ছিলেন। তাঁর মাস্টারের কাছ থেকে তিনি পাসিয়ে বান এবং তাঁর স্বজাতিব একজন নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। তাঁর নামেই এই স্কুল। এটি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে খোলা হয়। এখানে একটিও হোয়াইট ছাত্র বা শিক্ষক নেই। প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'এখানকার ছাত্রেরা প্রধানত লোরার সোসিও ইকনমিক গ্রুপ থেকে আসছে। গ্রুপ অউটের কারণে মৃত্যু অর্থনৈতিক।'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'নিগ্রোদের চাকরি-বাকরির সুবিধা কেমন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'বেশন হওয়া উচিত ততটা নয়।'

ডক্টর উইলিয়ামস জানালেন, 'আমেরিকার কয়েকটি স্কুলে নিগ্রো ও হোয়াইট ছাত্রছাত্রীদের ইন্টিগ্রেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উভয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা বলে অচিরে উভয়ের স্ট্যান্ডার্ডে তারতম্য দেখা দেওয়ার এই চেষ্টা বিশেষ ফলবর্তী হয় না।'

এর পর ডক্টর উইলিয়ামস আমাদের আদ্যতে ইস্ট সেন্ট্রাল স্ট্রিট রুলেজে নিয়ে গেলেন। টিচার-ট্রেনিং কলেজ হিসাবে এই কলেজটির বিশেষ খ্যাতি আছে। এডুকেশনের প্রফেসর জন ডেন্সফোর্ড চমৎকার লোক। তিনি আমাদের

বিভিন্ন বিভাগে নিয়ে গেলেন। এখানকার টিচার-ট্রেনিং প্রোগ্রাম বেশ উদ্ভবের। মোট ১২৪ ঘণ্টা প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে ৫০ ঘণ্টা জেনারেল এডুকেশন, ২৮ থেকে ৪০ ঘণ্টা স্পেসাল এডুকেশন, ৩২ থেকে ৪০ ঘণ্টা এলিমেন্টারি এডুকেশন এবং ১৮ ঘণ্টা প্রফেশনাল এডুকেশন। এর বিবৃতি লাইব্রেরীটি আমাকে মৃদু করলে। এই লাইব্রেরীতে ৬০,০০০ বই, ৫০০ ম্যাগাজিন ও ৫০,০০০ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট আছে। তা ছাড়া রয়েছে 'নিন্টাইনক' টাইমস'-এর অনেক কপিও মাইক্রো-ফিল্ম। এই মাইক্রো-ফিল্ম ব্যবহারে যেমন সবেক্ষকের জারণা বাঁচে, তেমনি কোন ডকুমেন্টের বিষয়কে বহুদিন অবিকৃত রাখা যায়। মাইক্রো-ফিল্ম স্বীকারে কয়েকটি মাইক্রো-ফিল্ম দেখলাম। 'টিচার-ট্রেনিং-এ অডিওভিসুয়াল প্রোগ্রাম আছে কিনা জিজ্ঞাসা কবতে মিস্টার ডেন্সফোর্ড বললেন, 'এটা অপশনাল ব্লক কোর্সেসের মধ্যে পড়ে। ৮ সপ্তাহের প্রোগ্রাম।' একটু গোমো বললেন, 'অনেকের ধারণা আমেরিকার টিচার-ট্রেনিং প্রোগ্রামে মেথডের ওপর বড় ছোয়া দেওয়া হয়, সে তুলনার কনটেন্টের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কথাটা ঠিক নয়। মোট ১২৪ ঘণ্টার প্রোগ্রামের মধ্যে কেবল জেনারেল এডুকেশনই ৫০ ঘণ্টা।'

নভেম্বরের ৫ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটির কেলগ সেন্টারে কৌরব্য ডেভালপমেন্ট সেমিনার হল। প্রায় প্রতি স্টেটের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এতে বোগ দিলেন। হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, শিকাগো, লস এঞ্জেলসের সাধার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, টেনেসস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের এই সেমিনারে দেখা মেল। বেশ গুরুগম্ভীর অথচ অন্তবঙ্গ আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা হতে থাকল। যে সব পেপার পড়া হল তাদের মান স্বত্ব উচ্চ। প্রতি পেপার পড়ার পর সেই পেপার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরের পালা চলল। অনেক ক্ষেত্রে বক্তা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন। এইসব আলোচনার বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত সমস্যাতে একটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। কেন না আমেরিকার সাধারণত সব বিষয়কে ইউটিলিটি ও প্র্যাকটিক্যালিটির দিক দিয়ে ভাবা হতে দেখছি। এই সেমিনারের দুটি পেপার আমাব বিশেষ করে ভাল লাগল। একটি, ডক্টর কালটিন ডবলউট বেবেন্ডার পেপার, 'হোয়াট ইজ ম্যান?' এবং অপরটি, ডক্টর উইলিয়ামসের পেপার, 'পায় রিক্রেকশনস অন স্ক্রিম ইন এ ওয়ার্ল্ড অব নিহিলিজম।' ডক্টর বেবেন্ডার নিজস্ব বিষয় সম্পর্কে দক্ষ, তেমনি অনবদ্য বাচনভঙ্গি। শুনলাম তিনি প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের অধীনে কাজ করেছিলেন। ডক্টর উইলিয়ামসের বিষয়ের বিন্যাসও চমৎকার। তাঁর পেপারের একটি বিষয়ে আমি তাঁর

লিখেছিলেন যে, আমেরিকার আধুনিক সব রকমের উন্নতিই অ্যাকসিডেন্ট। আমি বলেছিলাম যে ইতিহাসের দিক দিয়ে কোন কিছুই অ্যাকসিডেন্ট নয়, কেন না যে বিষয়ের কার্যকারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না তাই অ্যাকসিডেন্ট বলে মনে হয়।

কয়েক দিনের মধ্যে ডালাসে ষাওয়া স্থির হল। ষাওয়া-পথে প্রথমে পেলাম চ্যান্স-ডট এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরীতে। বিরাট চান্ড। মধ্যে প্রবেশের আইনকানুন খুব কড়া। আমাদের আসার কথা জানানো ছিল। ডক্টর উইলিয়ামস আমাদের পরিচয় দিতে আমর, মধ্যে চোকবাব অনুমতি পেলাম। এলাফি ব্যাপার। এখান থেকে গত মহামাশ্বে সূচেরে দুভগামী বিমান তৈরি হয়েছিল। এ সপ্তে অনেকগুলি বিমান তৈরি হচ্ছে। কয়েকজন উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মচারীকে দেখলাম। এ এক স্বতন্ত্র ও বিচিত্র রাজ্য। আমেরিকার বিমানশক্তির কথা নতুন করে মনে হল। দেখলাম ফ্যাক্টরীতে গায়ে লাগান একটি বিশৃঙ্খল ক্রেতার ওপর কতগুলি বিমান ম্যানোভারিং করছে। ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে আসার সময় একজন বিসিভলিনিস্ট আমাদের প্রত্যেককে একটি করে সুন্দর বিমানের ছবি উপহার দিয়ে বললেন, 'আশা করি আপনার এই ভিজিট স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এর পর পেলাম মনোরম টানার ফলস দেখতে। শীতকাল বলে এখন জল কম। লালচে পাহাড়ের ভাঁজ দিয়ে ফলসটি নেচে নেচে নেমে এসেছে। নীচের দিকে সবুজ গাছপালার সমারোহ। সত্যিই অপূর্ণ দৃশ্য। ভোরা আবেগের মাধ্যম বলে উঠল, 'আমি এমন একটি ফলস হতে চাই।'

ইংলটন তার স্বাভাবিক রসিকতার চাপা কণ্ঠে বললে, 'আমি তা হলে এই বৃক্ষ পাহাড় হতে রাজী আছি।'

ভোরা তার কথা বলার ধরনে হেসে ফেললে।

চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব খুব স্পষ্ট। মিস্টার রাসেল বললেন, 'এগুলি মাটির নানা রকমের স্তর। ভূমিকম্পে ওপরে-ঠেলে উঠেছে। এইসব স্তর পরীক্ষার জন্যে জিওগ্রাফির অনেক ছাত্র এখানে আসে।'

এখান থেকে আমরা পেলাম ডালাসের সাউথল্যান্ড সেন্টার। ডালাস খুব ধনী জায়গা। পেট্রোলিয়ামের অনেক বনি এখানে। সাউথল্যান্ড সেন্টার শব্দ ডালাসের নয়, সমগ্র দক্ষিণাঙ্গেরই একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। সাউথল্যান্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এই সাউথল্যান্ড সেন্টারের নির্মাতা এবং এটি তারই সম্পত্তি। সাউথল্যান্ড লাইফ আমেরিকার প্রথম প্রেনারি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। সাউথল্যান্ড লাইফ টাওয়ার ৪২ তলা। এর ৪১ তলায় অবজার্ভেশন ডেক আছে। আমরা অব-

জ্যোতিষন থেকে উঠলাম। এখান থেকে পশ্চিম দিকে ফোর্ট ওয়ার্থ শহর এবং ডালাসের বিখ্যাত অঞ্চলগুলি দেখা গেল। আমেরিকার বহু জায়গায় দেখা যায় সাদা রঙের একটি বহু ধাতব বৃন্দবৃন্দ আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে। আসলে এগুলি জলের টাঙ্ক—অনেক জায়গায় মাটি থেকে পাম্প করে জল তুলে শহরে সরবরাহ করা হয়। জল এখানকার মূল্যবান কমোডিটি। টাওয়ার থেকে চারিদিকের অনেকগুলি ছবি তুললাম। ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'টাওয়ারের ওপরে হেলিপোর্ট আছে। এই টাওয়ার মাটির ওপর ৫৫০ ফুট উঁচু এবং মাটির নীচে ৫৫ ফুট বিস্তৃত।'

টাওয়ারের গায়ে ২২ তল, বেরাটন-ডালাস হোটেল। এতে ৬০০টি রুম আছে। আধুনিক সব রকমের সুবিধা এখানে পাওয়া সম্ভব। সাউথল্যান্ড সেন্টারে যে গ্যারেজ আছে তাতে ২,৫০০ মোটর রাখা যায়। মিস্টার রাসেল বললেন, 'সাউথল্যান্ড সেন্টার তোমার নানা রকমের প্রয়োজন মেটাতে পারে। ভূমি কোন উপহার খুঁজছ? তোমার চুল কাটবার দরকার? নতুন কোনো সূট কিনবে? কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুল পাঠাবে? কিদে পেরিয়েছে? কোথাও বাবে ভাবছ? মোটরের তেল ফুরিয়ে গেছে? জনের জন্মদিনে একটা খেলনা দেবে? এই রকম নানা প্রয়োজনের পূরণ এখানে সম্ভব।'

ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'এবার আমাদের ডাউন টাউনে কলেজের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তোমাদের নিতে হোস্ট ফ্যামিলিরা আসবে।'

আমরা ডাউন টাউনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হোস্ট ফ্যামিলিরা সব এলেন। হংকং-এর লরী লাও ও আমি গেলাম মিসেস মন্টেগোমারির সঙ্গে। ডক্টর উইলিয়ামস মিসেস মন্টেগোমারিকে বলে দিলেন, 'কাল ও পরশু সকাল ৯টার সময় ওদের এখানে পৌঁছে দেবেন।'

মোটরে উঠে দেখলাম মিসেস মন্টেগোমারির দুটি ছেলে মোটরে রয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার স্বামী জাকার। উনি এখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেন নি। তাই আমিই আপনাদের নিতে এসেছি।'

ডাউন টাউনে একটি মার্কেটের সামনে মোটর থামিয়ে মিসেস মন্টেগোমারি কিছু জিনিসপত্র কিনে নিলেন। প্রায় দু'ঘণ্টা জ্বাইভ করে তিনি কলানি শ্বেসে তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে এলেন। বাড়িতে ঢোকার রাস্তার প্রান্তে একটি দন্ডের ওপর আটকানো একটি লম্বা বাস খুলে দেখলেন। লরী জাকাস দাঁড়িয়ে তাকাতো মিসেস মন্টেগোমারি বললেন, 'এটা লটার বস। পিয়নকে মধ্যে মনেকটু ঢুকান হয় বলে এখানেই তার পক্ষে চুই দেওয়ার সুবিধা।'

বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম একটি সুদৃশ্য ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরটির দেয়াল-আলমারির মধ্যে অনেক রকমের বই ও হস্তশিল্পের নিদর্শন। মিসেস মন্টেগোমারি বললেন, 'আপনারা পাশের বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে বইটাই দেখুন। আমার স্বামী এখনি এসে পড়বেন।'

তিনি চলে গেলে লরী বললে, 'এদের খুব বর্ষিক পরিবার বলে মনে হচ্ছে। একক রেসিডেন্সের জন্যে এ রকম দোতলা বাড়ি খুব বেশি দেখা যায় না।'

আমি বললাম, 'ডাক্তারেরা এখানে প্রচুর মাইনে পায়। তাই তাদের প্রফেসনকে বলে হোয়াইট প্রফেশন। আসবাবপত্র সেখাে এদের খুব ধনী বলে মনে হচ্ছে।'

—জানেন তো এখানে সার্ভেন্ট কুক ইত্যাদি রাখা খুব ব্যয়সাধ্য। এদের দেখছি মহিলা নিগ্রে কুক ও সার্ভেন্ট দুইই আছে।'

অল্পকণ্ঠের মধ্যেই ডক্টর মন্টেগোমারি এলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা ড্রাইংরুমে এসে বসলাম। মিসেস মন্টেগোমারি এলেন। সঙ্গে তাঁর আর্টটি পুত্র। মিসেস মন্টেগোমারি বললেন, 'এদের দু'জনের সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে। এই সব কটি আমার ছেলো।'

লরী রহস্য করে বললেন, 'তাহলে আপনাদের এবার মেয়ে সন্তানের দরকার। ডক্টরের বয়স চঞ্জিশের কাছাকাছি। বেশ আঁটোসাটো চেহারা। মাথায় দীর্ঘ টাক। স্ত্রীর বয়স বেশি হলে প'রতিশ-ছত্রিশ। খুব সুন্দর চেহারা। আর্টটি সন্তানের জননী বলে বোধ হয় না।'

মিসেস মন্টেগোমারি বললেন, 'আমার মা করেকবার পৃথিবী টুর দিয়েছেন। দু'বার তিনি ভারতবর্ষ ও হংকং-এও গিয়েছেন। তিনি আগামী রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন। অনেক বিদেশী জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন। এই দেখুন আমার এই গাউনটি একটি ভারতীয় বেনারসী শাড়ি কেটে তৈরি। সত্যি বলতে কি ভারতীয় শাড়ির এই ব্যবহার আমার ভালো লাগল না।'

ডক্টর মন্টেগোমারি ভারত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। হঠাৎ জনসংখ্যা নিয়ে কথা উঠল। ডক্টর মন্টেগোমারি বললেন, 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে ভারতের খাদ্য সমস্যা আরো সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে। ভারতে ব্যাপক বার্থকন্ট্রোল করা উচিত।' তিনি বার্থকন্ট্রোল সম্পর্কে একটি ন্যাতদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

কেন জানি এই চঞ্জিশ বছর বয়সে আর্টটি সন্তানের পিতার মধ্যে বার্থকন্ট্রোলের এতো বক্তৃতা আমার অসহ্য বোধ হল। বাঁচিয়ে দিলে ডক্টরের ছোট ছেলে ডেভিড। সে রেড ইন্ডিয়ানের পোশাক পরে এল। মিসেস মন্টেগোমারি বললেন, 'ডেভিড খুব ভালো ইন্ডিয়ান নাচ শিখেছে। ও আপনাদের নাচ দেখাতে চায়।'

লরীও হাঁপরে উঠেছিল। বললে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ডেভিড মোটামুটি মন্দ নাচল না। নাচ শেষ হলে মহিলা কুক এসে বললেন, 'ডিনার রেডি।'

চিকেন সহযোগে উত্তম ডিনার খেলাম। তারপর আবার ড্রাইংরুমে এসে বসলাম। ডক্টর নিজের পাশে করে দু'লাস উত্তম ওয়াইন নিয়ে এলেন। আমি ওয়াইন খাই না। লরী খেয়ে খুব প্রশংসা করলে। আমি কফি খেলাম। খানিকক্ষণ গল্প করার পর যখন শব্দে গেলাম তখন রানি বারোটা।

পরদিন রেকফাস্ট টেবিলে করেকজন নতুন অতিথি দেখলাম। ডক্টর পরিচয় করিয়ে দিতে বসলাম এ'রা সব প্রতিবেশী। সকলেরই পেট্রোলিয়াম ফিল্ড আছে এবং মাল্টি-মিলিওনার। অথচ এখানে সকলকে খুব সাধারণ মনে হল। এ'রা সকলেই নানা প্রমোদ আমাদের জর্জরিত করতে লাগলেন। মিসেস মন্টেগোমারি আমাদের সান্ত্বনা করতে এলেন। বললেন, 'কুক চাটে যাচ্ছে। আজ রবিবার। তাই আমাকে সব একলা করতে হল বলে একটু দোঁরি হল।'

একটু পরেই দেখলাম নিগ্রে কুকটি সুন্দর পোশাক পরে মাথায় একটি সুদৃশ্য লাল টুপি দিয়ে বেশ একটি দামী গাড়ি হাঁকিয়ে চাটে চলে গেল।

[কমপ্লিট]

রোমার উপন্যাসের বাছুর দানেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—এখানি প্রবন্ধ ১ ডিক্টেটিক

উপন্যাস দুলা ৩১০ টাকা

২য় ভাগে—এখানি বহু উপন্যাস।

দুলা ৩১০

ভাষায়-কবি একলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পান্ডিত্য, অরুণাচলী, কবিদেবী, কুমার-
নন্দ, নীতিকুমারজি, কাকী-কাবেরী,
কবির জীবনী এখানি একত্রে ২০০০

গ্রন্থাকান্ড তর্কপকানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদাপকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও

পরীক্ষা নিরূপণ)

দুলা এক টাকা

বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-১২

স্বপ্নসাহ

কাঁচা ফিল্মের সমস্যা

একজন প্রযোজক কথাপ্রসঙ্গে আক্ষেপ করছিলেন—কাঁচা ফিল্মের অভাবে তিনি ছবি করতে পারছেন না। কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি ছবি তৈরি করেছিলেন। সে ছবিতে লোকসান না হলেও লাভ তেমন হয় নি। কারণ সেরূপ চড়া সুদে তাকে টাকা ধার করতে হয়েছিল তাতে লাভের ভাগ লক্ষ্যী-নারের ঘরেই উঠেছিল। কয়েক বছরের চেষ্টায় আবার তিনি ছবি করতে প্রস্তুত হয়েছেন; কিন্তু কাঁচা ফিল্মের কোটা পাচ্ছেন না। তাঁর মত আরও অসংখ্য প্রযোজক প্রতীক্ষায় আছেন কখন কাঁচা ফিল্ম পাবেন। নিয়মিত ধারা ছবি প্রযোজনা করেন তাঁরা ছাড়া অন্যদের পক্ষে এখন ফিল্ম পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেরূপ নিয়মিত প্রযোজক বাংলাদেশে ক'জন আছেন! সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বর্তমানে এক কঠিন সময় উপস্থিত হয়েছে।

অবশ্য ধারা কালোবাজারের সুযোগ গ্রহণ করেন তাঁদের প্রতিবন্ধকতা কম। তাঁরা নামমাত্র কিছু ফিল্ম কিনে সরকারী প্রহার চোখে ধুলো দিয়ে অধিকাংশ ফিল্ম চোরাপথে কিনতে পারেন। অবশ্য চোরাপথে সকলে কিনতে পারেন না। ধাঁদের চোরা পথে আরের পথ আছে তাঁরাই পারেন। এমন একদল প্রযোজক আছেন, ধারা চোরা পথে অর্জিত অর্থ সামলাবার জন্য চলচ্চিত্র প্রযোজনায় আসেন। এই শিল্প-জগতের অসুবিধা বা সমস্যার কথা তাঁরা ভাবেন না, তাঁরা পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মত এখানে বিচরণ করে যান।

একই সঙ্গে এক্স-রে ফিল্মের সমস্যাও বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। যক্ষ্মা-প্লুরিসী ইত্যাদি রোগাক্রান্তদের এক্স-রে করার জন্য লাইনের দিকে তাকালে এই সমস্যার ভয়াবহতা বুঝা যায়। যে রোগীর দু'টি স্পেস্ট দরকার ডাক্তাররা একটিতেই কাজ সারছেন, মাসিক বা ত্রৈমাসিক চেকিং হতে পারছে না ফিল্মের অভাবে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কালে সরকার ফিল্ম আমদানীতে উৎসাহ দেবেন না। অস্ত্র আমদানীতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে, ফিল্ম আমদানীতে হবে কেন! কিন্তু চলচ্চিত্র ফিল্ম না হলে যদিও চলে, এক্স-রে ফিল্ম যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তার কি হবে? এক্স-রে ফিল্মের অভাব ডাক্তার ও রোগীদের ডাবিগি তুলেছে।

ভারতের নিজস্ব ফিল্ম কারখানার কথা আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কয়েক বছর শোনা গেল স্থান সমস্যার কথা। পরে জানা গেল উটকামন্ডে কারখানা হবে, এবং কোন ফরাসী কোম্পানীর সহযোগিতায়। কয়েক বছর চূপচাপ থাকার পরে শোনা গেল কারখানার কাজ অগ্রসর হচ্ছে। তার পরে কারখানা কোন পর্যায়, ফিল্ম কখন তৈরি হবে—সেসব কথা আর জানা যাচ্ছে না। এদিকে ফিল্মের অভাব বেড়ে চলেছে। গত বছর ফিল্ম ফেডারেশনের পক্ষে বলা হয়েছিল, সোল্ডিয়েট রাশিয়া থেকে ফিল্ম আমদানী হবে। তাতে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হবে না। এই ব্যাপারে যে কিছু হয়েছে, তা নবন হয় না—এক্স-রে ফিল্মের অভাব দেখে।

ফিল্ম প্রয়োজনীয় জিনিস। কেবল প্রমোদ চলচ্চিত্রের জন্য নয়। এক্স-রে, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ছবিতে ধরে রাখা এবং সংবাদ প্রচার ইত্যাদির জন্য ফিল্মের প্রয়োজন। এ যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ফিল্ম। তা হলে কাঁচা ফিল্ম নির্মাণের ব্যাপারে আমাদের দেশে এই শব্দকগতি কেন? যারা এদেশে মনোপলি ফিল্মের ব্যবসা করছে, তারা কি বামা দিচ্ছে? অথবা দেশীয় শিল্পপতিরা এ ব্যবসাকে সরকারী পরিচালনায় করতে দিতে রাজী নয়? অথবা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী কিনা কে জানে।

—১ সূজন



মোলগোবিন্দের কণ্ঠা' ছবিতে প্রাণী বন্দু

চিত্র আলোচনা

চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এবং চেকো-স্লোভাক কনস্যুলেটের যুগ্ম উদ্যোগে গত ৩রা জানুয়ারী হতে চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই পর্বত কয়েকটি হলে এই উপলক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চেকোস্লোভাক কনসাল জেনারেল এবং দূতাবাসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিন প্রদর্শিত হয়েছে আনকারার ও এলমার ক্রুজের 'দি ডিফেন্ড্যান্ট'। ছবিটি ১৯৬৪ সালে কার্লোবিভারির চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেষ্ঠ ছবির গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশের দর্শকদের পক্ষে এটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ছবি। বিষয় বস্তুর দিক থেকে একেবারে আলাদা জাতের। গত কয়েক বছর যাবৎ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আদর্শগত বিরাট আলোড়ন চলেছে। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে দুই মতাদর্শের ম্বন্থে অনেক গুলট পালট হয়েছে। এই আলোড়নে ফিল্ম নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের মতামতের বাইরে অন্তত চলচ্চিত্রের চলা যে সম্ভব নয়, সে কথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য।



‘স্বপ্নশিখর প্রাঙ্গণে’ ছবির নায়িকা মালা সিন্‌হাকে অভিনয় জানাচ্ছেন প্রযোজক কালীপদ দত্ত

আমাদের দেশের দর্শকরা ব্যক্তিজনকে কৌশলিক ছবি দেখতে অভ্যস্ত। এখনো আমাদের ছবিতে শিল্প, সাহিত্য বা রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ছবি করার কথা ভাবা যায় না। ‘দি ডিফেন্ড্যান্ট’ ছবিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার আমরা সমাজ-তান্ত্রিক দেশে অভিযোগ ও অভিযুক্তদের কথা, বিচার ব্যবস্থার কথা শুনে থাকি। অবশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই সে সব সংবাদ বিকৃত হয়। এই ছবিতে দর্শকরা বিচারব্যবস্থা, অভিযুক্তদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল, অভিযুক্তদের অধিকার এবং কমিউনিস্টদের নৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় লাভ করবেন। এক ধর্মালমার পাওয়ার স্টেশনের ডিরেক্টর কুসন্ন, রাষ্ট্রের অর্থ অপব্যয়ের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। অডিট কমিটির রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল তিনি শ্রমিকদের অতিরিক্ত বোনাস দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত দুজন সহকর্মী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ স্বীকার করে। কিন্তু কুসন্ন নিজেই নির্দোষ বলে। যদিও তাঁকে লঘুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কিন্তু রায়ের সাথে তিনি একমত হতে পারেন নি।

সমাজতন্ত্র গঠনের পথে যে জিজ্ঞাসা ও লমস্যা উপস্থিত হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মবিশ্লেষণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালক ছবিটি পরিচালিত করেছেন। ছবির আক্রমণের লক্ষ্য আমলাতন্ত্র ও দর্পনীতি। ছবিতে অভিনয় অত্যন্ত উন্নত ধরনের।

ট্রান্সপোর্ট ফ্রম প্যারাডাইস

৪ঠা জানুয়ারী প্রদর্শিত হয়েছে আইনেক্স টাইমস পরিচালিত ‘ট্রান্সপোর্ট ফ্রম প্যারাডাইস’। এই পরিচালক প্রবীণ দলের। এরা

নিউ ওয়েভের পরিবর্তে রিয়ালিজমে বিশ্বাসী। তাঁর তিনটি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু গম্ভীর। ছবির টাইটেল স্লেষপূর্ণ। এই স্লেষের মধ্য থেকে এক হৃদয়ঙ্গমশী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ছবির বিষয়বস্তু কাহিনী দর্শক-মাঝেই অভিভূত করে, ফ্যাসিসিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে। এখানে একজন নাৎসী কটাকাবাহিনীর অধিনায়ক এলো ইহুদীপাড়ার আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে পরিদর্শন করতে দেওয়া যায় কিনা দেখতে। সে সময় নাৎসীরা ইহুদীদের কত সুখে রেখেছে তা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছবি তুলেছিল। অফিসারের নজরে পড়লো ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এক পোস্টার? সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। এই পোস্টার করা দেয় খুঁজে বার করার জন্য নাৎসীরা মরিয়া হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বাছাই করা, ইহুদীদের গ্যাসচুম্বীতে প্রেরণের জন্য লিস্ট তৈরি হলো। এবং মালগাড়িতে করে তাদের পাঠান হলো। এই মূহূর্তগুলিকে নিয়ে পরিচালক ইহুদীদের ও নাৎসীদের বিভিন্ন মূড, মানসিকতা, স্নেহ, প্রেম, ভাগ এবং স্বপ্নভঙ্গের দৃশ্যগুলি উপস্থিত করেছেন। ছবিতে শব্দ ব্যবহার ও প্রতীক ইত্যাদি অপূর্ণ শিল্পবিশ্বের পরিচয় দেয়। যেমন নাৎসী অফিসার আসার মূহূর্তে রাস্তার উপর ভেড়ার পাল, একটানা ভ্যা ভ্যা শব্দ। পরবর্তী দৃশ্যে একইভাবে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে গ্যাস-চুম্বীর দিকে। একজন শেব কথাটা শুনিয়ে দিয়ে গেল আর ভেড়ার মত মরতে চাই না। কলাকৌশল, ও বক্তব্যের দিক থেকে ছবিটি সকলের ভাললাগার মত।

নাটকর কথা

ডলস্‌ হাউস

‘সম্মানীড়’ শহরের কতিপয় সৌখীন শাটানরাগীর সংস্থা হলেও নাট্যজগতে সুপরিচিত। এই সংস্থার নাটকগুলি প্রযোজনা, নির্দেশনা ও অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে। সংস্থার কার্যকরী কমিটিতে এমন করেকটি নাম দেখা যায় যারা নাটকের মহলে সূচ্যাত। সুতরাং এই সংস্থা সৌখীন হলেও নাটকের বিষয়ে যে সিরিয়াস তা এই নামগুলির অবস্থিতিতে যোকা যায়।

গত ২রা জানুয়ারী গ্রীষ্মকায়তন হলে সম্মানীড় মণ্ডল্য করেছে হেনরিক ইবসেনের একটি নাটক—নাম ‘ডলস্‌ হাউস’। নাটকটি অনুবাদ করেছেন অশোক সেন। গ্রীসেন নাট্য-সমালোচক, নাটক-অনুবাদক এবং লেখক হিসাবে সাক্ষালাভ করেছেন। ‘ডলস্‌ হাউস’-এর অনুবাদ তিনি কয়েকটি সতর্কতার সঙ্গে করেছেন। ‘ডলস্‌ হাউস’ ইতিপূর্বে কলকাতার মণ্ডল্য হয়েছিল, এখনো মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। তবে সে নাটকে ইবসেনের নাটককে অনুভব করা যায় না; বলা চলে ভাবানুবাদ। অথবা ইবসেন অবলম্বনে লিখিত কোন বাঙালী আধুনিক নাট্যকারের পুতুল খেলা। সেদিক থেকে অশোক সেন অনুদিত ‘ডলস্‌ হাউস’-এ মূল নাটকের মেজাজ ও বক্তব্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। এই নাটক স্বপ্নভাবে পরিচালনা করেছেন অশোক সেন এবং সূচ্যাতা অভিনেত্রী বিন আ রায়।

নাটকটি তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত হলেও একই হেলমারের বৈঠকখানায় সমস্ত পারদর্শী



ফরাসি দি ডার্ভিট হিষ্টরী' ছবির চিত্রগ্রহণকালে পরিচালক ফ্রেডরিক অর্লার ও মি: শালগিন

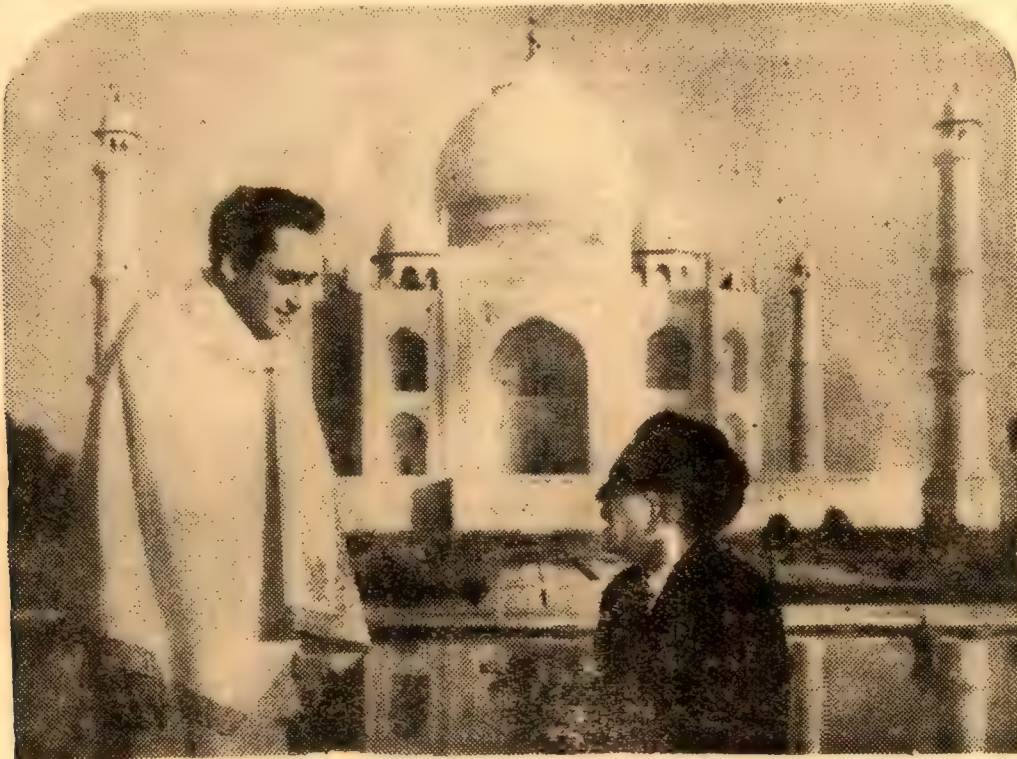
উপস্থিত হয়েছে এবং এখানে ষ্টুটগার্ট দ্বিতীয়
আনন্দ উৎসবের প্রস্তুতি থেকে হেলমার
নোরার জীবনের চরম পরিণতি ঘটে গেছে।
স্বামী-স্ত্রীর আপাতদৃশ্যে সুখী দাম্পত্য
জীবনের মধ্যেও অন্ধকার জমাট হলে থাকতে
দেখা যায়। স্বামীর অবচেতন মনে থাকে
প্রভু মনোভাব। স্ত্রীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব
অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি পায় না। এই অবস্থায়
প্রেম তার মর্যাদা হারায়। আর প্রেমহীন
দাম্পত্যজীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। হেলমারের
হৃদয় ব্যবহার সত্ত্বেও একদিন নোরা অনুভব

করেছিল প্রেম অপেক্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের
বন্ধনে তারা এক জায়গায় মিলিত হয়েছে।
স্ত্রী যদি ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে
সমান মর্যাদা লাভ না করে তবে সেই দাম্পত্য-
জীবনে সত্যিকার সুখ আসে না। এই অনু-
ভূতির পর হেলমারের গৃহে বাস করা তার
কাছে অসহ্য মনে হয় এবং সে নিজের পায়ে
দাঁড়বার উদ্দেশ্যে সে রাতেই বেরিয়ে পড়ে।
হেলমারের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন অশোক
সেন। অশোক সেনের অভিনয় রীতিতে
নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর প্রভাব লক্ষ্য করা

যায়। এবং এই অভিনয় রীতি দর্শকদের ভরা
লেগেছে। নোরার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিনতা
রায়। কোনরূপ ম্যানারইজম-মুগ্ধ অভ্যাস
সহজ সরলভাবে তিনি নোরার অনুভূতি ও
বেদনাবোধকে প্রকাশ করেছেন। এই স্বচ্ছন্দ
অভিনয়ে দর্শকদের মনে নোরা এক আবেদন
রেখে গেছে। অন্যান্য চরিত্রে দিলীপ দে
(ডাঃ রায়চন্দ্র), গীতা সেনগুপ্ত (মিসেস লিও),
সুখময় সেনগুপ্ত (ক্লগস্টাড), বিশ্বনাথ রায়
চৌধুরী (হেট্টর) রূপদান করেছেন।

অবসরিকার অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২০শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর অব-
সরিকার ময়দানে অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান
পালিত হয়েছে। প্রথম দিবসের সাম্য
অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রধান
মন্ত্রা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বস্বী বিধু-
ভূষণ ঘোষ, বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র এবং
পৌরপিতা ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানে
সংস্থার শিশু সভা ও সভাবৃন্দ "অত্যাচারী
রাজা" গীতিনাট্যটি মণ্ডল্য করেন। গীতি-
নাট্যটি রচনা ও পরিচালনায় শ্রীদুলাল নাগ
(ক্লাব সভা) মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। নৃত্য
নির্দেশনায় মীনাঙ্কী দাসগুপ্তার কাজে
আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি
বিশেষ অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সেন-
গুপ্তার নৃত্যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় মেলে।
প্রথম দিনের শেষ অনুষ্ঠানে "শিশু চাই"



এসীম ব্যানার্জী পরিচালিত 'হারানো প্রেম' ছবির মহিমেশ্বরে নির্মলকুমার ও বিকাশ রায়

নাটকটি সঞ্চয় করেন সংস্থার সভাপতি। ২য় দিবসের অনুষ্ঠানে বাদ্যকর এ সি সরকার অপরূপ বাদ্যবিদ্যা প্রদর্শন করেন। মৃদাঙ্কিত-নেতা প্রীতিলীপ বসুর মৃদাঙ্কিতের অভিনয়ন-যোগ্য। সংগীতানুষ্ঠানে যোগদান করেন সবশ্রী রবীন্দ্র ব্যানার্জী, প্রদীপ দাসগুপ্ত, সত্যেন্দ্র মৃদাঙ্কী, কল্যাণ মৃদাঙ্কী, মন্টু বসু, অধ্যাপক ননী দত্ত, পূরবী ব্যানার্জী, শ্যামলী বিশ্বাস, কৃষ্ণা দাসগুপ্তা এবং আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের ৩য় দিবসে গভবাসের ন্যায় এবারেও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং “মানবিক নাট্য সংস্থা” (অবশেষে) নাটকটি সঞ্চয় করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনুষ্ঠানের ৪র্থ দিবসে পুরস্কার বিতরণী উৎসব এবং মিলন অপেরা কতৃক “ধর্মের বলি” সাতাঙ্কিতের সঞ্চয় করা হয়। ৫৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়। অবসরিকার সভা ও সভাপতি জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বীকৃতি

এগ্রিকালচারাল ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি গত ২৯শে ডিসেম্বর স্টার মধ্যে স্বীকৃতি নাটক অভিনয় করেছেন। এক অর্থে সন্তানকে কেন্দ্র করে নাটকের বিকাশ ও পরিণতি। ক্লাবের সদস্যগণ স্বা-মুখভাবে চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন: প্রভাত চ্যাটার্জী, যশোদাদুলাল চ্যাটার্জী, বিমল রায়, শিশির চক্রবর্তী, দেবী শর্মা, শাম্বতী রায়, শিখা ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকার প্রচ্ছদপট অভিনয়নযোগ্য।

চলচ্চিত্রে স্মৃতিকথা

ইতিহাসের রাসের সম্মুখীন

সোভিয়েতের চলচ্চিত্র পরিচালক জেন্ডরিক এমলার তিন বছরের পরিগ্রহে একটি ছবি নির্মাণ করেছেন। এটি একটি নতুন ধরনের ছবি। এমিল থেকে-যে এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে থাকে দেখা যায় তিনি অভিনেতা নন। প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়েছে। ছবির মূল বিষয়বস্তু দুই দৃষ্টিভঙ্গীর ও জীবন মর্মের সংঘাত। পরিচালক এমলার ছবিটি সম্পর্কে বলছেন: এই ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফিক আনি ব্যবহার করেছি আমাদের দেশ ও জনগণের পক্ষে বা গুরুত্বপূর্ণ তাকে ফাঁটিয়ে তুলতে। এখানে সমসাময়িক কালের চিন্তা প্রতিফলিত।

আমি চিত্র পরিচালক। লেখক নই। লেখক



‘ডলস হাউস’ নাটকে নোরার ভূমিকায় বিন তা রায় ও ডটর রাস্কের ভূমিকায় দিলীপ বে

ভ্যাডিমির ভ্যাডিমিরভের সঙ্গে একবার আমার স্ক্রিপ্ট লেখা সম্পর্কে কথা হয়েছিল। আমরা দুজনেই প্রামাণিকতার ভিত্তিতে ছবি নির্মাণের পক্ষপাতী। আমরা ঠিক করলাম মিঃ শালগিন সম্পর্কে ছবি তুলবো। এই শালগিন কে? সোভিয়েতের প্রবীণ ব্যক্তিরা এই শালগিনের নাম জানেন। এই মিঃ শালগিন সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ রাজ-নৈতিক শত্রু ছিলেন। ইনি রাজতন্ত্রী, স্টেটভূমিতে চরম নীকশব্দীদের নেতা, ব্যাক হান্ডেড-এর সম্পাদক। ১৯১৭ সালে রাজ-তন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শালগিন আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরে শালগিন হোয়াইট গার্ডদের তত্ত্বগত নেতা হয়ে-ছিলেন। হোয়াইট গার্ড আর্মির সংগঠকদের মধ্যে শালগিনের নাম ছিল ২৬ নম্বর। পরবর্তীকালে দেশভাগী হয়ে বিদেশ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত শালগিন সোভিয়েত-বিরোধী কাজ চালাইতে থাকেন। সোভিয়েত লালফৌজ যখন যুগোস্লাভিয়াকে ক্যামিস্ট-দের কবল থেকে মুক্ত করে তখন মিঃ শালগিন গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিচার হয় এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই মিঃ শালগিন বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস করেন। কয়েক মাস আলোচনার পর তিনি ছবি তোলার জন্য তাঁর জীবনের ব্যস্তত বলতে রাজী হন।

আমি তাঁর সাথে হাসপাতালে দেখা করি। তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৮৬ বছরের বৃদ্ধ

কথা বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কর্তৃক কষ্টস্বরে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করেন।

আগে থেকে কোন স্ক্রিপ্ট লিখে আমি এই ছবি তোলার কাজে আগ্রহ হই নি। আমরা প্রাতিদিন প্রধান চরিত্র মিঃ শালগিনের সঙ্গে কথা বলে তাই নোট করে স্ক্রিপ্ট করার এবং সেই অনুসারে ছবি তুলতাম। স্ক্রিপ্ট লেখার সময় তাঁর সাথে আমাদের তরুণক তর্ক-বিতর্ক হতো। কারণ দুই দৃষ্টিভঙ্গী, দুই জীবনমর্মের সংঘাত এখানে উপস্থিত হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিঃ শালগিনই আপোষ করে নিতেন। যদিও একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, মিঃ শালগিন তাঁর অতীত জীবনের সমস্ত তুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এসেছেন এবং আমাদের নতুন জীবনের সব-কিছুকে গৃহণ করতে পেরেছেন। কিন্তু ইতি-হাসের অগ্রগতি, সোভিয়েত দেশের বিরাট শক্তি, সারা বিশ্বে মহাদা শালগিনকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। তিনি বলেন, তোমরা কমিউনিস্টরা রাশিয়ার জন্য যা করছ তা কেবল যে ভাল তা নয়, এরূপ করারই প্রয়োজন ছিল। সব রাশিয়ানরা যারা এখন বিদেশে আছে, অথবা বিদেশে জন্মেছে তাদের এই কথা মূহুর্য্য দরকার।

ছবিতে প্রতিটি সলাপ মিঃ শালগিনের সাথে আলোচনার মতো সৃষ্টি হয়েছে। এই ছবিকে বলা চলে film-remainscence বা চলচ্চিত্রে স্মৃতিকথা। ডিরেক্টর হিসাবে

আমার কাজ ছিল মিঃ শালগিনকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যাতে তিনি ছবিবনের প্রধান ঘটনাগুলি বলেন। ঠিক এইভাবে মিঃ শালগিন বলেছিলেন ১৯১৭ সালের হুয়া মাচের কথা। যা ঘটেছিল পল্কাভে রাজকীয় গাড়িতে, যেখানে দ্বিতীয় নিকোলাই রাজত্যাগের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন।

সেই রাজকীয় গাড়িকে পরবর্তীকালে ধানুঘের পরিণত করা হয় এবং লেনিনগ্রাদের নিকটে রাখা হয়েছিল। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় তাতে আগুন ধরে যায়। একটি খোদাই মূর্তি, একটি ক্যালেন্ডার, একটি নোট বুক, একটি চেয়ার, দেওয়াল আবরণের বস্তুর কিছু অংশ এবং কিছু ফটোগ্রাফ মাত্র রক্ষা পেয়েছিল। এইগুলিকে ভিত্তি করে শিল্পী আলেকজান্দার ব্রেক ঐতিহাসিকদের সাহায্য নিয়ে এমন নিখুঁতভাবে রাজকীয় গাড়ির ভিতরটা তৈরি করেন যে, মিঃ শালগিন তা দেখে চিৎকার করে উঠেন। আরে এই তো সেই গাড়ি, সব জিনিসই আছে দেখছি, কেবল লোকগুলি বিদায় নিয়েছে। কেবলমাত্র আমি একা বেঁচে আছি।' পরে এই কথাগুলি ফিল্মে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

আবার বলতে চাই 'ফোর্সিং দি ভার্ভিউ অব হিস্টরী' ছবিটি কেবলমাত্র ফিল্মে স্মৃতিকথা

নয়, এটা ফিল্মে দর্শনগত বিরোধ। ইতিহাসের একটি দলিল। (প্রাপ্ত)

স্টুডিও অব

বধূবরণ

দিলীপ নাগ পরিচালিত 'বধূবরণ' ছবিতে বোম্বাইয়ের প্রদীপকুমারের বিপরীতে অভিনয়ের জন্য হিন্দী চিত্রজগতের মীনাকুমারী চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন জানা গেল। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করবেন প্রবীণ সুরকার কমল দাশগুপ্ত।

সম্মাসী

সলিল সেন 'মণিহার'-এর পরে আর একটি ছবির কাজে হাত দিচ্ছেন। এই নতুন ছবির নাম 'সম্মাসী'। নিজের রচিত একটি একাঙ্কিকা অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। ছবির প্রযোজক সরকার প্রোডাকশন্স।

শশ্ববেলা

অগ্ন্যগামী পরিচালকগোষ্ঠী 'শশ্ববেলা' ছবির স্টুডিও কাজ শেষ করেছেন। এবার তাঁরা

কয়েকটি বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করবেন। প্রতি উত্তমকুমার ও মম্ববী মুখার্জীকে নিয়ে তাঁরা মাইখন গিয়েছিলেন। মাইখনে ছবির দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী, পাছাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, নবাগত বাপি ও মৃণাল। ছায়ালোকের পরিবেশনার ছবিটি মুক্তি পাবে।

কেদার রাজা

'সুরের আগুন' ছবির পরিচালক বলাই সেন এবার বিহুভূতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কাহিনী অবলম্বনে যে নতুন ছবি করছেন তার নাম হবে 'কেদার রাজা'। রাধামোহন ভট্টাচার্য ছবির মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করবেন।

পাণ্ডবের বনবাস

সুরজনা পরিবেশিত গোপীকৃষ্ণ ফিল্মস-এর বিরাট পৌরাণিক বাংলা ছবি 'পাণ্ডবের বনবাস' আগামী ১৪ই জানুয়ারী শহর ও শহরতলীর কয়েকটি বিশেষ চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। কলকাতা ও মাদ্রাজের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ ছবির সংলাপ রচনা করেছেন মম্বধর রায়। গীত রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত কুমার, শ্যামল মিশ্র, খনজর ভট্টাচার্য, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী, গীতা সেন। তত্ত্বাবধায়ক উমাপ্রসাদ মৈত্র।

বিমল রায়ের

জীবনাবসান

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীবিমল রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বোম্বাই ও কলকাতার চলচ্চিত্র-জগৎ শোকাচ্ছন্ন। বিমল রায় প্রথমে নিউ থিয়েটার্সে সহকারী ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে তিনি 'মুক্তি' ও 'দেবদাস' ছবিতে ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করে সুখ্যাতি লাভ করেন। বাংলা ছবিতে বাস্তববাদের এক নতুন যুগ সূচনা করেন বিমল রায় তাঁর 'উদয়ের পথে' ছবিতে। 'উদয়ের পথে' যেমন টেকনিক্যাল দিব থেকে তেমন বিষয় বস্তুতে বাঙালী দর্শকের অভিনন্দন লাভ করে। এই একটি ছবিতেই তিনি গৌরবের আসন লাভ করেন। তার পরে তিনি একে একে 'অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'পহেলা আদমী' প্রভৃতি ছবি করে তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি বোম্বাই চলে যান এবং 'মা', 'দো বিঘা জমিন', 'বিরাজ বহু', 'দেবদাস', 'পরিণীতা', 'মুমতী', 'সুজাতা', 'পরশ', 'বিন্দী',



'পরিণীতা' নাটকের একটি বিশেষ মুহুর্তে শশ্বতী রায় ও প্রভাত চ্যাটার্জী

‘প্রেমপত্র’, ‘ইহুদা’ ইত্যাদি ছবি পরিচালনা করেন। তাঁর প্রযোজনায় ‘উসনে কথা’, ‘কাবুলিওয়াল’, ‘গৌতম বুদ্ধ’, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গ ও জীবনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। বিমল রায় পরিচালিত ও বিমল রায় প্রোডাকসন্সের ছবিগুলি হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে পরিচয় ও বলিষ্ঠ বক্তব্যপূর্ণ ছবির নিদর্শন হয়ে ওঠে, এবং হিন্দী চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে বাংলা সাহিত্যের ও সমাজ-জীবনের পরিচয় ঘটায়। পরিচয়তাপ্রদে বিমল রায়ের ছবি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকার লাভ করে। বিমল রায় পরিচালিত ‘দো বিধা জমিন’ এবং বিমল রায় প্রোডাকসন্সের ‘গৌতম বুদ্ধ’ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে।

তিনি ভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সৌভাগ্যে রাশিয়ায় প্রেরিত ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলে তিনি ছিলেন, এবং মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক-মণ্ডলীতে স্থান লাভ করেছিলেন। কয়েকবার তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিত্বপে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প, বিশেষভাবে হিন্দী চলচ্চিত্র-জগৎ একজন ক্ষমতাশীল পরিচালক ও প্রযোজক হারালো। মৃত্যু-ফালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সঙ্গীতকথা

লোকশিল্পী যমুনাবালা দাসী

লোকচক্রের অন্তরালে নিহতে গিয়ে বসে
ধনের আনন্দে গান বেঁধে যাঁরা গান গেয়ে
ধাকেন তাঁরাই হলেন প্রকৃত লোকশিল্পী।
এঁরা লোকের বাহবা নেবার জন্য গান বাঁধেন
না—নিজেকে জাহির করার জন্য গান বাঁধেন
না। প্রকৃতির যে সুন্দর আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে
রয়েছে তাকেই এ শিল্পীরা বেঁধে রাখেন
তাঁদের গানের মাধ্যমে। এই ধরনের শিল্পীদের
মধ্যে যমুনাবালা দাসী অন্যতম।

যমুনা দাসী পূর্ববাংলার মাদারিপুত্র
মহকুমার পাঁচখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর পিতাও ছিলেন প্রকৃত লোক-
শিল্পী।

যমুনা দাসীর সঙ্গীত শিক্ষা পিতার
হাতেই। পিতার সঙ্গে নান্য স্থানে যমুনা দাসী



যমুনাবালা

গান গেয়ে ফিরতেন। পিতার মৃত্যুর পর যমুনা-
বালা তাঁর পিসিমার কাছেই মানুষ হন।

দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় লোক-
শিল্পী কৃষ্ণদাস বৈরাগীর সাথে।

যমুনা দাসীর কণ্ঠস্বর খুবই সুস্বাদু।
বর্তমানে তিনি ৫০ বৎসরের প্রোচা। এখনও
তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলে মূহু হতে হয়।

যমুনা দাসী ১৯৫০ সনে পূর্ববাংলার
তাঁর বাসভূমিতে ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য
হন। বাস্তুহারা হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে
তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বর্তমানে তিনি
উল্টোডাঙার একটি বস্তিতে বাস করছেন।
খুবই কষ্টে দিনযাপন করছেন। ভিক্ষে করে
দিনপাত করেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়
প্রায়ই তাঁকে একতারা বাজিয়ে গান গাইতে
দেখা যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিক্ষে
করে বা পান তাই দিয়ে তিনিটি পেটের সংস্থান
করেন।

যমুনাবালা দাসী বহু অমূল্য লোক-
গীতির অধিকারিণী। তাঁর প্রত্যেকটি গানই
উচ্চস্তরের ভাবের। তাঁর একটি দেহতত্ত্ব গানে
সুন্দর একটি দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া
যায়, যেমন—

দেহে আছে সাড়ে চব্বিশচন্দ্র পঞ্চতত্ত্ব

গুরুর কাছে জান

দেহের দশ ইন্দ্রিয় সহায় করে

জ্ঞান রশিতে টানা

কুলকুণ্ডলিনী সহায় করে

উর্ধ্ব বাদাম টান

গোসাই ফটিক বলে নিগূঢ় ঘরে

আছেরে মানুষ রতন

যমুনা দাসীর আর একটি গানে শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগের একটি সুন্দর চিত্র
ফুটে উঠেছে। যেমন—

সাধের একখান ভরী নিয়ে গো সুবল,

আমি কংস নদীর খোয়া বাই

দেখি ঘাটে আসে কিনা রাই।

(সুবল রে) রাধা আমার অঙ্গের আখ

দেখে প্রাণ জুড়ায় রে,

আমি রাধার লাগি পাগল হইলাম

আমি বনেতে খেন্দ চরাই।

সুবল রে একদিন সেই নিম্নকবে

গিরোজিলে রাধাল সনে রে,

আমি আরনেরই ভরে সুবল রে,

কৃষ্ণ কালী হরে বাই।

যমুনাবালা দাসীর এ ধরনের বহু গান
আছে বা সভাসতাই লোকসংস্কৃতির এক-একটি
রসাবশেষ।

আজ যমুনা দাসীকে রাস্তার রাস্তায়
ভিক্ষে করতে হয় বৃথাবস্থায়। আর আমরা
নীচবে চূপ করে দেখে বাই ও মূখে লোক-
সংস্কৃতির বড় বড় বুলি আঙড়াই। একটি
বারও যমুনা দাসীর মত লোকশিল্পীদের কথা
ভেবে দেখি না।

আমাদের দেশের বহু প্রাচীন লোকসঙ্গীত
আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে এবং ক্রািয় লোক-
গীতির ভিড়ে অকৃষ্ণিম লোক-গীতিগুলি
হারিয়ে যেতে বসেছে।

অকৃষ্ণিম লোকগীতিগুলিকে বাঁচাতে হলে
সবার আগে আমাদের যমুনাবালা দাসীর মত
লোকশিল্পীদের বাঁচাতে হবে। যমুনা দাসীর
মত প্রকৃত লোকশিল্পীরাই হলেন ‘খাঁ’ ও
অকৃষ্ণিম লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

—বুদ্ধদেব রায়

সঙ্গীতে কৃতিত্ব

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়ো-
জিত আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এই
বৎসর সঙ্গীত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র
শ্রীমান স্বরাজকুমার রায় পূর্বব বিভাগে সর্ব-
শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কার লাভ করেন এবং
ক্যান্টন টি. গার্লস, এম.বি মহাশয়ের কন্যা
কুমারী নর্মিতা গার্লস মহিলা এবং পূর্বব
বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শ্রেষ্ঠ
প্রতিযোগীর পুরস্কার লাভ করেন। এত
উজ্জ্বলই সঙ্গীতচার্য শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
এর নিকট সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেছেন।



স্বরাজ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ

রাশিয়ান থিয়েটার:

চেখভের চিঠিপত্র এবং স্টেজ ডিরেকশন্স থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বরচিত নাটকে প্রধানত কাব্যিক-সৌন্দর্যের দ্বারা ইচ্ছিত করতে চেয়েছেন। সমালোচক মার্টিন ল্যাম বলেছেন:

"They also contain lyrical passages, but these are really extra. eous to the main theme."

ল্যামের এই মতবাদটি অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না। জোর করে নাটকের ভেতর কাব্য ঢোকাবার প্রচেষ্টা চেখভ কোনও জায়গাতেই করেন নি। আসলে এ্যাংলো-আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে এখন পর্যন্ত রাশিয়ান নাটক বোঝবার মত ঠিক মেন্টাল মেক্-আপটা তৈরি হয় নি। চেখভের নাটকের বে সব ওয়েস্ট এন্ড প্রডাকশন আমি দেখছি, তাতে স্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে যে, নাটকগুলোর ruling idea অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতে পারে নি। রাশিয়াতেও মস্কো আর্ট থিয়েটারের আগে যারা চেখভের নাটক মণ্ডস্থ করবার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁরাই অকৃতকার্য হয়েছেন।

স্ট্যানিসলাভস্কি এসে প্রথম দেখিয়ে দিয়েছেন ঠিক কিভাবে চেখভের নাটক মণ্ডস্থ হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করব।

'দি সি গাল' লেখার সময় থেকেই চেখভ তাঁর নাটকের মূলে দৈন্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন। এই সময় থেকেই আবার প্রত্যেক প্লের ভেতর সাক্ষে-তিকতার মিশ্রণ দেখা যায়।

১৮৯৫ সালে চেখভ আবার নাটক সম্বন্ধে নতুনভাবে ইন্টারেস্টেড হয়ে ওঠেন। এর প্রধান কারণ ছিল এই—চেখভের বন্ধু স্ভোরিন এই বছরেই সেইন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর 'দি লিটল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা করেন। সমালোচক এবং নাট্যকার হিসাবে মণ্ডাভিনয় সম্বন্ধে স্ভোরিনের ছিল বিশেষ অনুরাগ। স্ভোরিন তাঁর থিয়েটারে টলস্টয়ের 'দি পাওয়ার অভ ডার্কনেস' মণ্ডস্থ করেন—তা ছাড়া ইবসেন এবং হাউস্টম্যানের কয়েকটি নাটকও এখানে

অভিনয় করানো হয়েছিল। স্ভোরিনের কাছে লেখা চেখভের চিঠিপত্রাদি থেকে বোঝা যায় এই ব্যাপারে চেখভেরও কতটা উৎসাহ ছিল। চেখভ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, লিটল থিয়েটার মণ্ডের রেপারটরী লিস্টে মোটারলিস্কের প্লে'ও নেওয়া দরকার এবং বিশেষ জোর দেওয়া উচিত ডেকেডেট সিম্বলিস্টিক প্লের অভিনয় সম্বন্ধে। চেখভ নিজেকেও সাক্ষেতিক লেখক হিসাবে মনে করতেন এবং তাঁর অনেক লেখার ভেতরই সাক্ষেতিকতার একটা ক্রীণ ধারা প্রবহমান। 'দি সি গাল' যুবক কনস্ট্যানটিন ট্রেগলেভ সেই সময়কার থিয়েটারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি এবং ছক অনুসারে তৈরি ঘটনা দেখতে পাচ্ছি এসব নাটকে—দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো লোক "eating and drinking, flirting, strolling and wearing fine clothes."

নতুন ফর্মের দৃষ্টান্ত which will "show life, not as it is or ought to be, but as one sees it in a dream." 'দি সি গাল' নাটকের সমস্ত পরিবেশটা যেন স্বপ্নালুতার ভরা।

চেখভের নিজের রচিত 'দি সি গাল' নাটকে একই সঙ্গে দেখা যায় সাক্ষে-তিকতা এবং বাস্তবতা। প্রথম যখন এ নাটকটি মস্কোর ইম্পিরিয়াল থিয়ে-টারে মণ্ডস্থ করা হয় দর্শকদের ভেতর এর প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত আত্মতর্কিক। দর্শকরা সমস্ত ভুল জায়গাতে হাসির হুজুড় তোলেন এবং ফলে চেখভের মনটা হতাশায় ভরে যায়। মার্টিন ল্যাম বলেছেন:

"Nowadays The Seagull, parti- cularly to a Scandinavian reader, appears the most straightforward of the four plays which made Chekhov one of the most out- standing figures in modern drama."

একটি বিরাট ভ্রমস্পত্তি—তার ধারাই একটি ভ্রম—এই হচ্ছে নাটকের সেটিং। নিনা—এই মেয়েটি একজন অপেশাদারী অভিনেত্রী—স্টেজের উপর এসে বলে সি গালের মতই এ হৃদয় সঁদা সঁদা তাকে আকর্ষণ করে। এর পর আসে কনস্ট্যানটিন—সে নিনার প্রেমে একে-



মিউজিক্যাল কমডী 'লিমেড' অভিনয় করছেন স্ট্যানিসলাভস্কি এবং তাঁর বোম-সেকোলোভা

বারে আত্মহারা—একটি 'সি গালকে' শিকার করে এনে সে নিনার পায়ের কাছে সেটিকে ফেলে দেয়—তারপর বলে অনতিবিলম্বে এই 'সি গাল'টির মত নিজেকেও সে গুলী করবে। নিনা আপত্তি জানায় যে কন্সট্যানটিন সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে এবং এই জনাই তার কথাবার্তার মর্ম বোঝা দৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছে। নিনা বলে এই 'সি গাল'টি নিশ্চয় একটি সিম্বল—কিন্তু এই সিম্বলের প্রকৃত অর্থ সে বুঝতে অক্ষম। As 'The Wild Duck' was for Ibsen, so 'The Seagull' is for Chekhov a Symbol of shattered illusions, and its fate is woven into the real plot.

দার্শনিক লেখক ট্রিগোরিন হচ্ছে কন্সট্যানটিনের মায়ের প্রেমিক—সে আদেশ দেয় এই 'সি গাল'টিকে স্টাফ করে দেবার জন্য। ট্রিগোরিন ঠিক করে ফেলে একটি গল্পে সে 'সি গাল'টিকে ব্যবহার করবে—একটি যুবতী মেরের কাহিনীতে—যে বড় হয়ে উঠেছে মদ্রু এবং স্বাধীনভাবে এবং প্রাণের আনন্দে হৃদের ধারের এই 'সি গাল'টির মতই। তারপর একজন পথিককে দেখা যাবে এই পথ দিয়ে চলে যেতে—সে লক্ষ্য করবে এই 'সি গাল'টিকে এবং তাকে গুলী করে



ট্যানিসলাভস্কি—জিমন্যাশিয়ার ছাত্র
১৮৮০

মারবে। এই গুলী করার ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়—শুধু যেন সময় কাটবার জন্যই করা—অন্য আর কোন কিছু করার নেই বলেই যেন পথিকটি ওভাবে গুলী ছোঁড়ে।

এই গল্পটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখা হয় নি। কিন্তু নিনার ভবিষ্যৎ তাকে এই 'সি গাল'টির মতই সর্বনাশের পথে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে

কামনা জাগ্রত হল একটি পুরুষের এবং নিনা হয়ে দাঁড়াল তার শিকার—অর্থাৎ ট্রিগোরিন নিনাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেল এবং পরে তাকে পরিত্যাগ করে আগের মিস্ট্রেসের কাছে ফিরে গেল।

এর পর নিনা যখন সফর করে বেড়াচ্ছে তখন সে এই স্বপ্ন দেখেই কাটার, যেন সে নিজেই একটি 'সি গাল'। কন্সট্যানটিন কিন্তু তখনও তাকে ভুলতে পারে নি—কিন্তু নিনা তার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে চায় না। তাদের ভেতর অবশ্য চিঠিপত্র চলে—নিনা তার চিঠির তলায় সই করে 'দি সি গাল'। এইভাবে দু বছর কাটে—নিনা ফিরে আসে তার পুরানো আবাসে। এখনও সে ট্রিগোরিনকেই ভালবাসে—যদিও সে জানে ট্রিগোরিন তাকে একটি গল্পের চরিত্র হিসাবেই দেখেছে, তার থেকে বেশি নয়। ট্রিগোরিনও আবার এই জমিদারীতে ফিরে আসে। তাকে সেই পুরানো এবং তারই আঙ্গামত স্টাফড 'সি গাল'টি দেখানো হয়—কিন্তু এ ব্যাপারটা ট্রিগোরিন আর মনে করতেই পারে না। এই সময় অফ স্টেজে একটি গুলীর শব্দ পাওয়া যায়—পরে জানা যায় কন্সট্যানটিন এই ভাবে আত্মহত্যা করেছে।

ইভানভ নাটকটি চেকভের অন্যান্য



থেকো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্মুখে নাটক পড়ছেন চেকভ

নাটকের থেকে একেবারে আলাদা ধরনের। এটিকে চেখভের একটি অসফল নাটকও বলা যেতে পারে— কারণ চেখভের নাটকের শিল্পসৌন্দর্যের কোনো পরিচয়ই এ নাটকে পাওয়া যায় না। একমাত্র ইভানভ চরিত্রটির ভেতর চেখভের পরবর্তী কালের বিখ্যাত নাটকগুলির নানা চরিত্রের সংগে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়—তাছাড়া চেখভের মাস্টারপিসেসের সংগে ইভানভের কোনই ঐক্য নেই। এ নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য একটি ট্রাজিক ইম্প্রেশন ত্রিয়েট করা—কিন্তু এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে যে ধরনের ক্ষমতার দরকার, সে ধরনের দক্ষতা বা মনোভাব চেখভের খুব অপরিপূর্ণভাবে ছিল না। 'সি গাল'ই চেখভের বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘোষণা করে। ১৮৯৬ সালে নাটকটি যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন অবশ্য প্রডাকসনটি আনসাকসেস-ফুলই হয়েছিল। কিন্তু এর বছর দুই

বাদে মস্কা আর্ট থিয়েটারের যশঃ সৌরভ ছড়িয়ে দেয় এই 'সি গাল' নাটকটিই। চিরচরিত প্রথা এবং নাটক লেখবার নক্সাকে বর্জন করে চেখভ এই স্লেতে একদল মানুষকে দর্শকদের সামনে এনে হাজির করেন এবং সুস্পষ্টভাবে তাদের চরিত্র পরিষ্কৃত করে তোলেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর জোর দিয়ে এ নাটক লেখা হয় নি।

এই নাটকের কাহিনীটি বর্ণনা করে বুঝিয়ে বলা প্রায় অসম্ভব। চরিত্রগুলি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সংগে জড়িত। কোন চরিত্রকেই আলাদাভাবে বিচার করা যায় না—'দলগত-চরিত্র' হিসাবেই এদের প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই অভিনয়ের সময় অত্যন্ত সাবধানে চেখভের নাটকের চরিত্র রূপায়ণ করতে হয়। বিশেষ-ব্যক্তিত্ব দেখাতে গেলেই চরিত্রচিহ্ন ঠিকমত হয় না।

এলারডাইজ নিকল বলেছেনঃ 'সি গাল' নাটকের পরিসমাপ্ত হচ্ছে ট্রেপলেভের আত্মহত্যা তা সত্ত্বেও নাটকটিকে ট্রাজেডী অভিধা দেওয়া চলে না। সি গালে বহু চরিত্র বহু-ভাবে অন্তরের মর্মদাহ আত্মার পীড়ন অনুভব করেছেন সত্য—তবুও সে সবকে ছাপিয়ে উঠেছে একটা প্রাণ উচ্ছ্বল করা হাসেব প্রবাহ।

"It was, indeed, Chekhov's unique discovery that the spirit of high comedy could be evoked by means of effects which in the hands of another author might have led only to the tragic or the melodramatic.

নাটকের আরম্ভের দিকে মেড-ভেডেকো মাসাকে প্রশ্ন করে—'তুমি সব সময় কালো পোষাক পর কেন?' মাসা জবাব দেয়—'জীবন ভরেই আমি শোকদিবস (মোর্নিং) পালন করছি। আমি অত্যন্ত অসুখী'—এই জায়গাটা থেকে পরের দৃশ্যগুলোর মূড বোঝা যায়। ব্যাপারটা সিরিয়াস, কিন্তু কোন জায়গাতেই ট্রাজিকেলী সিরিয়াস নয়।

'সি গাল' নাটকটি এমনভাবে লেখা যে উপর উপর দেখে মনে হবে এটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী নাটক। কিন্তু মনঃসংযোগ করলেই বোঝা যায় যে, কাব্যিক মাধুর্য এবং কল্পনায় ব্যাপ্ত 'সি গালকে' সত্যিকার মহৎ নাটকের শ্রেণীতে তুলে ধরেছে। নিকল বলেছেনঃ

"Partly this comes from the way in which unobtrusively Chekhov weaves symbol into reality, so that what in Ibsen remains something tacked on to the action is here so integrated with the outward movement that the two cannot be disentangled. Partly it comes from the sharp juxtaposition of different thoughts uttered by two or more characters as each remains involved in his own meditations. The effect occasionally is akin to the juxtaposition of images in a passage of lyrical poetry: it is as though the imaginative quality of a Hamlet soliloquy were orchestrated for a quartette; it is as though Hamlet and many Hamlets, their tongues incapable of fully expressing their thoughts, were desperately trying to make others listen without anyone to heed them or understand."

[Alardyce Nicoll—The World Drama.] (জবাব)



নাটকের চেখভ — ১৮৮৮ সালে তোলা

ফুটবলের অকাল বোধন

ফুটবলের অকালবোধনে আবির্ভাব হল অকাল বর্ষণের। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সিন্ড্র অংশে উচ্চাঙ্গের ফুটবলের স্বাক্ষর রেখে গেলেন চেকোস্লোভাকিয়ার জনপ্রিয় ফুটবল ক্লাব শ্লেভান ব্রাটিস্লাভা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত শ্লেভানদল ফুটবলের সর্ববিষয়েই আমাদের থেকে অনেক উচ্চ একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পথে কলকাতার দুটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে গেলেন শ্লেভান ব্রাটিস্লাভা। আগন্তুক দল প্রথম খেলায় অংশগ্রহণ করেন আই, এফ, এ একাদশের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় খেলায় শ্লেভানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রাজধানী দিল্লীতে জুরাভের আসরে ক্রীড়ারত মোহনবাগান দল বিমানপথে এলেন কলকাতায়।

চেক দলের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ১৯৬২ সালের চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বা জুর্নেস রীমেট কাপের ফাইনালে অংশগ্রহণকারী দুজন খেলোয়াড়, স্টপার পপুলার এবং গোলরক্ষক স্করিয়াক। গন্ত-টোকিও অলিম্পিকে ফুটবল বিজয়ী চেক জাতীয় দলের উরবানও এই দলে ছিলেন, এ ছাড়া দলে ছিলেন আরও প্রায় পঁচিশজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়।

প্রথম প্রদর্শনী খেলা

ভারতের দীর্ঘমেয়াদী গোলরক্ষক ঞংগরাজের সমন্বয় ক্রীড়ানৈপুণ্য ছিল প্রথম দিনের খেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খেলা হয় সেদিন আগন্তুক দলের পুরোভাগ বনাম ঞংগরাজ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আই, এফ, এ একাদশের ভাগ্যে জোটে ৫-১ গোলে পরাজয়ের আশ্বাদ। পর পর কয়েকটি অবধারিত গোল-রক্ষার পর, শ্লেভান দলের একটানা আক্রমণের ডেউ প্রতিহত করতে করতে ঞংগরাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েন, সে পরিচয় পাওয়া যায় শেষ দুটি গেলের ক্ষেত্রে তাঁর অসহায় দশকের ভূমিকা গ্রহণের ভাণ্ড দেখে।

আই, এফ, এ একাদশের খেলার মধ্যে ছিল চরম বোকাগড়ার অভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন। অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জী তাঁর সন্ধান অনুসারী খেলতে পারেন নি, সুরুয়ার সমাজপতির খেলার মধ্যে ছিল ব্যর্থতার ছাপ। পরিমল দে কিন্তু স্বীয় প্রচেষ্টায় বল সংগ্রহ করে সতীর্থদের বল যোগানোর চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত। রক্ষণভাগে অরুণ ঘোষ এবং প্রশান্ত সিনহার খেলা উল্লেখযোগ্য।

প্রথমদিনের খেলায় ওবার্ট একাই করেন দুটি গোল, বাকি তিনটি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন জোকুল, কোবেজ, হাডলিকা। কোবেজ একটি কন্যার কিক থেকে হেডের সাহায্যে দর্শনীয় গোল করেন। ভারতীয় দলের পক্ষে গোলটি পরিশোধ করেন আপ্পালারাজু। শ্লেভানদলের সংযম



রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মোহনবাগান ও শ্লেভান দলের প্রদর্শনী খেলার পূর্বে দুই অধিনায়ক কর্মর্মান করছেন।

আক্রমণধারা এবং গোলাভিমুখে তাঁর সটগুদিল সতাই ছিল উপভোগ্য। তাদের স্টপার পপুলার ছিলেন অচল, অটল, বদিও তাঁকেই

গ্রীষ্মমিতাভ

ফাঁকি দিয়ে পি, কে ব্যানার্জী সহজ একটি গেলের সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং আপ্পালারাজু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলা

রৌদ্র-মেঘের লুকোচড়ি খেলার সাথে এক আকর্ষণীয় ফুটবলযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক সহস্র দর্শকের, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায়। মোহনবাগান ৫-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু তারা যত্ন করেছে সাহসের সঙ্গে। আহত জার্নেল সিং পায়ের মাংস-

পেশীর টানের জন্য প্রথমার্ধে খেলার পর দ্বিতীয়ার্ধে অবসর গ্রহণ করেন। চুনী গোস্বামী জামসেদপুরে বিহারের বিপক্ষে রঞ্জী ট্রফির খেলার অংশগ্রহণের পরান্নিই এসে মোহনবাগানকে ফুটবলযুদ্ধে সাহায্য করতে মাঠে অবতীর্ণ হন।

খেলা শুরু হবার দ্বিতীয় মিনিটে শ্লেভান দলের চৌকিশ ফরোয়ার্ড ওয়ার্ট জার্নেলকে অভিক্রম করে পরাস্ত করেন গোলরক্ষক বর্মণ। এর পর তারা মোহনবাগানের রক্ষণভাগের ওপর চাপ দিতে থাকে কিন্তু আর গোল করতে ব্যর্থ হয়। গোল লাইন থেকে দুটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী। মোহনবাগান পুরো ভাগের আক্রমণধারাকে বিপক্ষ দলের হাফ লাইন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। প্রথমার্ধে মোহনবাগান পেছিয়ে থাকে মাত্র ১-০ গোলের ব্যবধানে।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান দলে কয়েকটি

পরিবর্তন হয়। জার্নেল সিংয়ের স্থান পূরণ করেন রহমান, বর্মণের স্থানে আসেন কমল সরকার এবং দীপু দাস ও বিদ্যুৎ মজুমদারের বদলী খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে নামেন দুলাল মণ্ডল এবং নিত্য ঘোষ।

দ্বিতীয়ার্থে কমল সরকারকে প্রতিহত করতে হয়েছে বেশ কয়েকটি নিশ্চিত সুযোগ। কমল সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন পতন রোধ করার, কিন্তু রক্ষণভাগের দুটির সুযোগ নিয়ে মাত্র চার মিনিটের মধ্যে চেকদল তিনটি গোল করে নাসে। দ্বিতীয় গোলটি করেন সিসোলার, তৃতীয়টি গুবার্ট এবং চতুর্থটি সিভেটোর। এই সময় আর একটি গোলরক্ষা করতে গিয়ে চেকদলের একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কমল সরকার, তাঁকে স্ট্রোকে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর স্থানে আসেন প্রদ্যুত বর্মণ।

দ্বিতীয়ার্থের শুরু থেকে প্রায় পনেরো মিনিট মোহনবাগানের খেলার উন্নতি হয়। তাদের পুরোভাগের আক্রমণধারা গিয়ে পৌঁছায় চেকদলের গোল পর্যন্ত। কাজল মুখার্জীর একটি সুন্দর স্ট প্রতিহত করেন গোলরক্ষক স্করিঅফ। চুনী গোস্বামীর একটি প্রচণ্ড স্ট অস্পর্শ জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর পর চুনী গোস্বামী মাঠ ত্যাগ করেন। দুলাল মণ্ডল, কাজল মুখার্জী, অমল চক্রবর্তী, নিত্য ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বানার্জী এবং দেবনাথের খেলা উপভোগ্য হয়।

শ্লোভানদের পক্ষে শেষ গোলটি টোনা-সেক বর্মণকে পরাভূত করে করেন। দ্বিতীয় দিনে প্রথমার্ধের খেলায় চেকদলের খেলা কিন্তু মোটেই উন্নত পর্যায়ের হয় নি। তাদের স্টগুলি কিন্তু বিপথগামী হতে পাকে। দ্বিতীয়ার্থে অবশ্য শ্লোভানদের খেলোয়াড়েরা তাদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগে শেষ পর্যন্ত জার্নেল সিং থাকতেন এবং চুনী গোস্বামী যদি নিজে না খেলার চেষ্টা করে সতীর্থদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তবে হয়ত এত গোলের ব্যবধানে মোহনবাগানকে পরাজয় স্বীকার করতে হত না। চুনী গোস্বামী যতই উচ্চ দরের খেলোয়াড় হোন না কেন, নিজের খেলাকে অত প্রাধান্য দিলে দলের জয়ের পথ সুগম হয় না, দুর্গমই হয়ে ওঠে।

টোনস লনে বিদ্রোহ

উডবার্ন পার্কের সবুজ ঘাসের বুকেও সৈদিন লেগেছিল বিদ্রোহের আগুন। সিংহাসনচ্যুত হলেন ভারতের টোনস অধীশ্বর রমানাথন কৃষ্ণাণ। দীর্ঘ বারো বছর দেশে একচ্ছত্র প্রাধান্য উপভোগ করার পর রণক্লান্ত স্বীর বোম্বা, বয়সের ভারে শ্রান্ত কৃষ্ণাণ এশীয় টোনস চ্যাম্পিয়ানের গোরব মুকুট তুলে দিতে

বাধ্য হলেন বাংলার ২৩ বছরের তরুণ জয়দীপ মুখার্জীর হাতে। ১৯৫০ সালের পর এতদিন কৃষ্ণাণ ভারতের মাটিতে ভারতীয় খেলোয়াড়ের কাছে ছিলেন অপরাধিত। কিন্তু জয়দীপ হানলেন একটি সেট সেটে পরাজয়ের আঘাত, ভেঙে গেল কৃষ্ণাণের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা দুর্লভ রেকর্ডটি। সৈদিন উডবার্ন পার্কে শীতের দুপুরের সোনালী রোদ্দরের মতো পরশের সঙ্গে প্রতিটি দশক অনুভব করেছে বাংলার একটি উদীয়মান সূর্যের চারিদিক উদ্ভাসিত করা প্রথম তেজ।

ভারতীয় টোনসের অঙ্গনে গৌরবময় কৃষ্ণাণ যুগের অবসানের দিন সমাগত। প্রায় একশু বছর ধরে দক্ষিণ ভারতের তনয় কৃষ্ণাণ রাজত্ব করেছেন ভারতীয় টোনস জগতে। ভারতীয় টোনসের গৌরব পতাকা বিদেশের আসরে উড়িয়েছেন রমানাথন কৃষ্ণাণ। বিদেশের আসরে অনেকেই ভারতীয় টোনস মানে রমানাথন কৃষ্ণাণকে জানে।

বাসের্দোনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা যাচ্ছে জয়দীপ মুখার্জী ধীরে ধীরে নিপুণ কলা-কৌশলের সঞ্চার বৃদ্ধি করে বিজয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। কৃষ্ণাণ কক্ষীর ব্যাথার তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়াধারা প্রদর্শনের সুযোগ এখন পাচ্ছেন না।

জয়দীপ মুখার্জী প্রথম সেটটি ৬-৪ গেমে দখল করেন। দ্বিতীয় সেটটি ৬-৩ গেমে এবং তৃতীয় সেটটি ৬-২ গেমে অধিকার করে দুর্লভ এশীয় চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব অর্জন করেন।

জয়দীপ মুখার্জীর খেলা ছিল বিভিন্ন শক্তিশেলের প্রাচুর্যে পূর্ণ। জয়দীপের গ্রাউন্ড স্টগুলি ছিল অপূর্ব। তাঁর ব্যাক হ্যাণ্ডের টপস্পিন ব্যতিবাস্ত করে তোলে কৃষ্ণাণকে। ক্রশ কোর্ট এবং সাইড লাইন ঘেঁসা জোরালো ফোরহ্যাণ্ড স্টগুলি প্রতিহত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় কৃষ্ণাণকে। দ্বিতীয় সেটে কৃষ্ণাণ তাঁর বার্থতাকে অতিক্রম করে পুরাতন ক্রীড়াশৈলী ফিরে পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণাণের সেই খেলার ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেন জয়দীপ।

বাহাঙর মিনিটের এই টোনস যুদ্ধে জয়ী হয়ে জয়দীপ মুখার্জী দীর্ঘ পনেরো বছর পর হাত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। দিলীপ বোস প্রথম এই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব অর্জন করেন ১৯৫০ সালে। জয়দীপ মুখার্জী টোনস শিক্ষালাভ করেন সাউথ ক্লাবের লনে এই দিলীপ বসুর কাছেই।

ডাবলস খেলায় কৃষ্ণাণ অবতীর্ণ না হবার ফলে জাপানের ওসুমা ইশিগুরো এবং ওয়াটনবেকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। মিলড ডাবলসে বিজয়ী হয় রাশিয়ার মেট্রোভেলি এবং টি, সোমে, তাঁরা পরাজিত করেন প্রোসেন এবং কালোজেরোপোলাসকে। মহিলাদের সিংগলসে জয়ী হন রাশিয়ার টি সোমে

আমেরিকার কারোল প্রোসেনকে পরাজিত করে। মহিলাদের ডাবলসে বিজয়ী সম্মান লাভ করেন টি সোমে এবং কারোল প্রোসেন, বাংলার রীটা সুব্রাহ্মা ও বেগম খানকে পরাজিত করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ার অল্প বয়স্কা মেয়ে টি সোমে ত্রিমুকুট জয়ের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছেন। স্কুলের মেয়ে সোমের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল।

নবাগতের নব কীর্তি

গতবর্ষের পুরাতন নজীর স্পর্শ করলেন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটদলে নবাগত মাত্র কুড়ি বছরের ছেলে ডগলাস ওয়াল্টার্স। প্রায় একশত বছর পূর্বে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে পর পর দুটি টেস্টে সেগুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন অস্ট্রেলিয়ার বিল পলসফোর্ড। মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে রিসবেনের প্রথম টেস্টে ওয়াল্টার্সের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং প্রথম দর্শনই তিনি সকলের হৃদয় জয় করেন।



মিস টি সোমে

সাপ্তাহিক বসুমতী

সেপ্টেম্বর গৌরবমণ্ডিত ব্যক্তিগত ১৫৫ রান করে। তার মেলবোর্নের শ্বিভীর টেস্টে শত রান সহ একটি ব্যক্তিগত ১১৫ রান তিনি উপহার দিলেন দলকে।

ত্রিসবনের প্রথম টেস্টে হাতের আঘাতের জন্য অনুপস্থিত ববি সিম্পসন মেলবোর্নের শ্বিভীর টেস্টে অধিনায়কত্বের গুরু দায়িত্ব নিজের ক্ষম্বে নেন বুধের হাত থেকে। শ্বিভীর টেস্টে প্রথম ইনিংসের সূচনা করার কার্যভার গ্রহণ করে অস্ট্রেলিয়া দলই। পিচ ছিল ব্যাটসম্যানদের স্বপ্নসম, রানের ফুলকুঁড়ি ছুটে থাকে ব্যাটসম্যানদের উইলোদগড় সঞ্চালনের সংগে তাল রেখে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার দলীয় রান সংখ্যা হয় ৩৫৮। দুর্ভাগ্য কাউপারের ব্যক্তিগত ৯৯ রানে তাকে প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়াতে হয়; মাত্র এক রানের জন্য সেপ্টেম্বর গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হন। বিল লরীর ৮৮ রান এবং ববি সিম্পসনের ৫৯ রান ছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান সংখ্যা। বিপক্ষ দলের বোলারদের সংগ্রহের কুন্ডলিতে ছিল নাইটের চারটি উইকেট এবং জোন্সের তিনটি উইকেট যথাক্রমে ৮৪ রান এবং ৯২ রানের বিনিময়ে।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দলীয় রান সংখ্যাকে পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে যায়, এবং ইনিংস শেষ করে ৫৫৮ রানে। এডরিচ এবং কাউন্সের দুটি সেপ্টেম্বর রানের প্রত্যর্ষে ভরিয়ে দিয়েছিল প্রথম ইনিংসকে। কলিন কাউন্স এই মেলবোর্নের উইকেটে লাভ করলেন তিনটি টেস্ট সেপ্টেম্বর। ইতিপূর্বে এই মাঠে তিনি ১৯৫৪ সালে ১০২ রান, ১৯৬২ সালে ১১০ রান সংগ্রহ করেন; এবার লাভ করলেন ১০৪ রান আর এডরিচ ১০৯ রান। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল জিম পার্কসের ৭১ রান এবং কেন ব্যারিংটনের ৬০ রান। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাককোই ১০৪ রান মূল্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট।

এবার আসে অস্ট্রেলিয়ার শ্বিভীর ইনিংসের পালা। ইংল্যান্ডের দুই সেপ্টেম্বর প্রত্যন্তরে, অস্ট্রেলিয়াকে উপহার দেন দুটি অনোরম সেপ্টেম্বর পিটার বার্জ এবং ডগলাস ওয়াল্টার্স। বেসবল মাঠের হীরো পিটার বার্জ ইংল্যান্ডের বোলিং শক্তিকে উইলোদগড়ের আঘাতে জর্জরিত করে সংগ্রহ করেন ১২০ রান আর ওয়াল্টার্স ১১৫ রান। তবে ওয়াল্টার্সের খেলার মধ্যে ছিল অনেক সতর্কতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সময়েচিত আঘাতের ছোঁয়া। প্রথম ইনিংসের মত শ্বিভীর ইনিংসেও উল্লেখযোগ্য হল লরীর ৭৮ রান এবং সিম্পসনের ৬৭ রান। ৪২৬ রানে অস্ট্রেলিয়া যখন তাদের শ্বিভীর ইনিংসের খেলা শেষ করে তখন শ্বিভীর টেস্ট শেষ অঙ্কে উপস্থিত। মাত্র দশ মিনিটের জন্য ইংল্যান্ড শ্বিভীর ইনিংসে খেলার সুযোগ

পেলেন। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ২২৭ রান, ইংল্যান্ড বিনা উইকেটে তুলল ৫ রান। একটি সাধারণ জয়ের মধ্যে শ্বিভীর টেস্টের সমাপ্তি ঘটে মেলবোর্নের মাঠে।

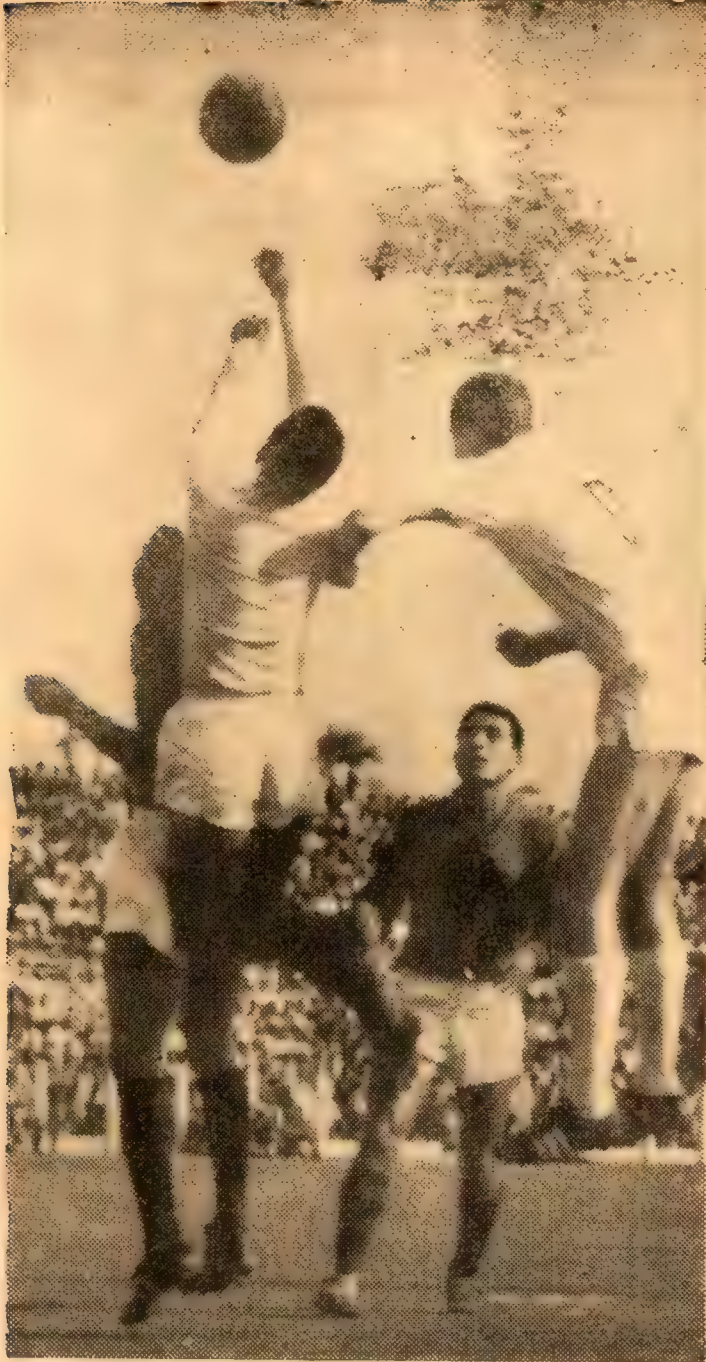
ডুরান্ডের শেষ অঙ্কে

রাজধানীর কর্পোরেশন স্টেডিয়াম উন্মোচনার ফেটে পড়ল যখন রেফারী বি. এ. চৌহান হাত দিয়ে পেনাল্টি স্পটটা দেখিয়ে দিলেন। নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে চুন্নী গোম্বামীকে নইম অবৈধভাবে বাধা দিয়ে রেফারী অশ্রু পুর্লিশ দলকে চরম দণ্ড দেন। এই পেনাল্টি থেকে জার্নেল সিং গোল পরিশোধ করেন। ডুরান্ড কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান-অশ্রু পুর্লিশের খেলায়

আবদুল্লাহ দর্শনীর গোলের সাহায্যে প্রথমার্ধে ১১ মিনিটে অশ্রুদল অগ্রগামী ছিল। পেনাল্টিতে মোহনবাগান গোল পরিশোধ করার পর সেপ্টার হবার সম্বন্ধে সাথে চুন্নী গোম্বামীকে মারাত্মকভাবে ফাউল করেন সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে মহম্মদ ইউসুফ। রেফারী ইউসুফকে মাঠ থেকে বহিস্কৃত করেন। চরম অশান্তির মধ্যে কোনক্রমে খেলা চলতে থাকে। খেলা শেষ হবার মাত্র দুমিনিট পূর্বে অরুম-নৈগম বজ্রসূচক গোলটি করে মোহনবাগানকে ফাইনালে পৌছাতে সাহায্য করে। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। জুলাফিকার অশ্রু পুর্লিশকে অগ্রগামী করে এবং চুন্নী গোম্বামী দলের পক্ষে গোলটি পরিশোধ করেন।



উত্তমান পার্ক এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ান হবার পর বর্ষকদের মধ্যে জন্মদীপ সুখাচারী



মোহনবাগান ও মোহান দলের খেলায় গোলেবন্ধক কমল সরকার একটি বল ফিল্ট করছেন

কোয়ার্টার ফাইনালে দুদিন খেলার পর অর্জন করে। বাঙ্গালোয়ের সি আই এল-এর মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে খেলার বোগ্যতা সঙ্গে প্রথম দিনের খেলার মোহনবাগান

অগ্রগামী থেকেও খেলা শুরু করে। এদিন খেলার মান অনুযায়ী বাঙ্গালোর দলেরই জয়লাভ করা উচিত ছিল। দীপু দাস দলকে অগ্রগামী করেন। দ্বিতীয় দিন খেলার দীপু দাসই মোহনবাগানের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এই লেখা প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় নি। ফাইনালের নির্ধারিত দিন রবিবার। মোহনবাগান ফাইনালে মিলিত হচ্ছে পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে। পাঞ্জাব পুলিশ দিল্লী গারিসনকে সেমি-ফাইনালে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করে। মোহনবাগানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দুই গোম্বামী কলকাতা থেকে দিল্লী গিয়ে সেমি-ফাইনাল খেলার অবতীর্ণ হন। অরুণ এবং জার্নেল সিং আহত ছিলেন কিন্তু বর্তমানে দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ।

সম্মাচার দর্পণ

মহিলা বিশ্ব স্ক্টিং চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার মিসেস ইনসা ভরোনিয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ইনসাকে ছুরিকাঘাতে মৃত অবস্থায় তার মস্কোস্থিত ফ্লাটে পাওয়া যায়। অবশ্য ইনসার এই শোচনীয় মৃত্যুর খবর রাশিয়ার সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পায় নি। ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬২ সালে তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন।

ইংলন্ডের টেস্ট ক্রিকেটের প্রাক্তন উইকেট-রক্ষক জর্জ ডাকওয়ার্থ ৫৫ জন্মবার্ষী ওয়ার্মিংটন হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। রাস্তার চলবার সময় হঠাৎ তিনি অচেতন হয়ে পড়েন, এবং তাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। মৃত্যুর সময় ডাকওয়ার্থের বয়স ছিল ৩১ বৎসর। ডাকওয়ার্থ রিশ দশকে ইংলন্ডের পক্ষে প্রায় চব্বিশটি টেস্ট ম্যাচে অবতীর্ণ হন।

লন্ডন স্কুল একাদশ ও ভারতীয় স্কুল দলের ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টটি বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার ফলাফল ছিল লন্ডন স্কুল ৩৮৭ রান ১ উইকেটে ডিক্রেয়াড এবং ভারতীয় স্কুল হল ১ উইকেটে ১৩৫ রান।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বঙ্গবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মাদ্রাস ও প্রকাশিত।

সুচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৫৯
আজকের মানুষ		২০৬২
জালালবাহাদুর	— শিব্রেন	২০৬৩
একটি উদাত্তকণ্ঠ শব্দহীন, হে দৈবর (কবিতা) — শান্তনু দাস		২০৬৪
শান্তীর আঠারো মাস (কবিতা)	— দীপক গোস্বামী	২০৬৪
ভারতদর্শন		২০৬৯
জাতর্জাতিক		২০৬২
স্মৃতির টুকরো	— শ্রীসংবাদিক	২০৬৬
সাধারণের অসাধারণ শাস্তীজী	— কুমুদ দাশগুপ্ত	২০৬৯

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাণ্টের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ প্রদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি! অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রন্ধনশাস উন্মেষণ ও জন্মচরিত্র।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা?

—তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্তা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ী কানন, হেক্টর বধ।

—দুই টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট, সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর কীর্তি উপন্যাসিক—লক্ষপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন মল্লিকপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সূরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, এক যাত্রার, কুলকাটা, দঃখীরাম, পান-সুপারি।

মাত্র ১১০ টাকা।

ডঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

মুদ্রিত

বিষয়	লেখক	মূল্য
বঙ্গদর্শন	...	২০৭৪
উপজায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ সিংহ	২০৭৮
মৃত্যুঞ্জয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী	— হর্ষবর্ধন	২০৮০
গাথক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মধুপাধ্যায়	২০৮৩
স্বপ্নের নায়ক (গল্প)	— নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯২
অপরূপ নেহারল ওকলাহোমা ও টেক্সাস	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	২০৯৭
একেক মানব তাই অমরত্বের লীন (কবিতা)	— সুদীপা ভাদুড়ী	২১০০
রক্তজগৎ	...	২১০১
রক্তমণ্ড—ওমেগা এবং এডেন্সে	— শিলালি	২১০৬
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২১০৯

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লক্ষ্য হইল, সেইদিন হইতে হিন্দু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে মনোহরী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম প্রেমী হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদেব কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়ছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি ইনি লিখিয়াছেন—
“...চমৎকার বই। শ্রীবিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই বইয়ের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।”

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’র অভিমত—

“স্বধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিপন্থ রসে বিভ্রান্ত ও আদর্শহীন হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।”

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাণ্ডাল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কোতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাসিঁপী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রস্তুত রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

- ১। বকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। বুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সপ্তয়ন—চাঁচি ও শিল, একরত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সপ্তয়ন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকটা হাঁচি, শয়তান, ভেলিকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হিলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গদত্ত প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭০ বর্ষ : ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত

Price : 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

Thursday, 20th Jan., 1966

হৃদয়ে হৃদয়ে লালবাহাদুর

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী শ্রীমহোদয়ের শ্রুত্যাগমন পূর্ণ করার জন্যে যেদিন আইত হয়েছিলেন, সেদিন জনসাধারণ তাঁকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিলেও অনেকের মধ্যে এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল যে, প্রধান-মন্ত্রিস্বরের বিরাট দায়িত্ব পালন—তাঁর পক্ষে পরিপূর্ণভাবে সম্ভব কি-না।

সেদিন হয়তো সংশয়শীল কারো কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক ছিল না। তার প্রধান কারণ এই যে, বিরাট পদের যোগ্য হবার জন্যে বাহ্যিক বিরাটই শাস্ত্রীজীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মূলধন হিসেবে ছিল না কোনো ভারীকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, এমন কি দর্শনমাত্র আকর্ষণ করার দৈবশক্তিও তাঁর ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর যা ছিল, তা একেবারে ভারতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে যা তিনি বিশ্বাস করতেন তাকেই তিনি সারল্য ও সত্যতার সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন।

একেবারে এই খাঁটি ভারতীয় মানবটিকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে পেয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মবিশ্বাস অর্জন করা হয়তো খুব দোষের ছিল না। কেন না, আমরা নিজেদের গণভীক্ষ জগতে যা দেখতে অভ্যস্ত নই, তা যদি সত্য-সত্যই একদিন দেখা যায়—তখন তার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্ভিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, লালবাহাদুর গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নব ঐতিহ্যের যে নতুন দিগন্ত প্রসারিত করে গেলেন, তা শব্দে অতুলনীয়ই নয়, নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

ভারতের বিপদ-আপদের দিনে—তা থেকে উদ্ভূত হওয়ার জন্যে নিঃশঙ্ক যে বলিষ্ঠ শীতের প্রয়োগ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, তা ভারতের মর্যাদাকে বিবেক বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। সাধারণ মানুষের এই প্রতিনিধিকে, তাই, বিশ্বের রাষ্ট্র-

নীতিবিদগণও অকুণ্ঠচিত্তে সম্মান-স্বীকৃতি দান করেছেন।

দেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় কার্যপদ্ধতিকে কিভাবে গ্রহণ করছে তা জানার জন্যে প্রধান-মন্ত্রী শাস্ত্রীর মতো ব্যাকুলতাও খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি, মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি টেলিফোনে তাসখন্দ সম্মেলনের সাক্ষ্য সম্পর্কে জন-সাধারণের প্রতিক্রিয়া কি—সে কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের কাটিং-গুলি তাঁর জন্যে ষাতে রক্ষিত থাকে—এই নির্দেশদান তিনি তখনই করেছিলেন।

জনসাধারণের মতামত জানার জন্য আজ তাঁদের সেই প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নেই। তবু জনসাধারণের মনের কথা সর্বদাই যার চিন্তের দরবারে পৌঁছত, তাঁর কৃতকার্যকে সানন্দে গ্রহণ করার মতো সুস্থ বিশ্বাস জনসাধারণের আছে—একথা আজ তাঁকে প্রত্যক্ষ জানানো সম্ভব না হলেও, সেই বিশ্বাসের বোধেই জনসাধারণ আজ জানাচ্ছে তাদের পূর্ণ সমর্থন, যে সমর্থনের বলে দ্রুতিতেই হয়ে থাকবে তাঁর সমস্ত নীতি। এবং পৃথিবীর বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলি এই পথেই নিজেদের সৌহার্দ্য ও শান্তি খুঁজে পাবে।

শাস্ত্রীজী বরাবর অসামান্য ঘটনাকে যেমন সামান্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তেমনি সামান্য জিনিসকেও অসামান্য মর্যাদা দিয়েছেন। এমন কথা কখনো তিনি বলতেন না, যা গ্রহণ করা অসম্ভব বা অবাস্তব। সংস্কৃত দর্শনের বোধের অধিকারী হয়েও সর্বদাই তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মাপকাঠিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতেন। এর কারণ ভারতের সাতচালিশ কোটি জনতার নিকট যা দূর্বোধ্য—তা নিয়ে বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু আসল লক্ষ্যে কখনোই পৌঁছানো যায় না। শিল্পায়ন বা কৃষি-উৎপাদন ব্যাপারেও তাঁর বক্তব্য এমন ছিল—যা সহজ-

সাধ্য। ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের একেবারে নিকটে থাকার তিনি কৃষি-উৎপাদনের জন্য সহজ মতামত প্রকাশ করে যাঁদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথনির্দেশ করেছিলেন। শিল্প ও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে তাঁর মতামত সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হবার আগেই আমরা তাঁকে হারালাম। নচেৎ তাঁর জীবিত-কালে যে সমস্যার মধ্যে আমরা বাস করছিলাম, তা অচিরে দূরীভূত হতো। অবশ্য তাঁর জীবিতকালেই ফলাফল অনেকটা লক্ষ্য করা যেত—যদি আকস্মিক অক্রমণে রাষ্ট্রের স্বা-ভৌমিক অধিকার বিপদাপন্ন না হতো।

লালবাহাদুর আমাদের জন্যে যে সম্পদ রেখে গেছেন তার বিচার আমরা ধীরে ধীরে করতে পারবো। অবশ্য সম্পদহীন ও অশ-গ্রস্ত অবস্থায় যেভাবে তিনি চলে গেলেম, তাম্বারা প্রমাণিত হয়, নিজের স্বার্থকে কিভাবে তিনি তুচ্ছ করেছিলেন।

শাস্ত্রীজী যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর সার্বিক পরিচয় আমাদের কাছে অনুস্মৃতিভূতই ছিল। আত্মপ্রচারে ভীত শাস্ত্রীজীর জাগরণের পরিচয় তাই অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। এই জাগরণই যে ভারতীয় রাজধর্ম পরিচালনার অসাধারণ এক আদর্শ। এই আদর্শের বিকাশ যতো বেশি সম্ভব হবে, রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে ততো বেশি। তাই মনে হয়, আজ যিনি প্রধানমন্ত্রীর পথে আসীন হবেন তিনিও যেন জনসাধারণের স্বার্থ প্রতিনিধিরূপে হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

সম্পাদকীয়

শ্রীমতী শান্তী

শূন্যতা! চারিদিকে অসীম শূন্যতা! লোক লোকের শান্ত পদক্ষেপের মধ্যে এমন শূন্যতা কল্পনাতীত!

শূন্য আজ ১০নং জনপথ!

আরো শূন্য সেই হৃদয়! একাধারে যিনি স্ত্রী, বন্ধু...এবং কি নয়?

শোকবিহীন জনতার কান্না এখনো গুমেরে গুমেরে ওঠে যখন দু'চোখে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য—যখন শবাবধার উত্তোলনের জন্য শব-বাহকেরা প্রস্তুত; আর সেই শবাবধারের পাশে সেই গগনাবদারী আকুলকণ্ঠ 'মুঝে ছোড় কর মা'ত্ বাও। মে' তু'হারে সাথ যাওঁগা'—

এ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হাচ্ছিল স্ত্রীসম্মান আকাশে। শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর এই কণ্ঠে প্রতিভাবিত হাচ্ছিল সেই করুণ আক্ষেপ,—আমার নিজের বলতে আর কিছই থাকলো না।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর আজীবন সঙ্গিনীর জন্যে হয়তো আজ আরে সমগ্র জাতির সমবেদনা, রুদন, হা-হুতাশ; কিন্তু মহারসী নারীর যে হৃদয় শূন্য করে দিয়ে লালবাহাদুর বিদায় নিলেন—এখন প্রশ্ন আর সেই শূন্য ঘট শূন্য প্রতিদিনের চোখের জলে পূর্ণ করা ছাড়া উপায় কি?

প্রধানমন্ত্রীর পরলোকগমনের ঠিক আগের দিন শ্রীমতী শান্তী গণেশ পূজা উপলক্ষে গ্রহণ করেছিলেন উপবাসের ব্রত। প্রাণের আকৃতিতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, শাস্ত্রীজীর জীবন-রত্নের সফলতা আর দীর্ঘ আয়ু।

পরদিন রাগিতে তাসখন্দের সাক্ষ্যের কথাই বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর জন্মতার সগে। প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হয় নি। তিনি কথা বলবেন শ্রীমতী শাস্ত্রীর সগে। কিন্তু বলা শেষ হবার আগেই দূরভাষণ অপ্রত থেকে যায়। হায়, বিকল কন্ঠ, ভীষণ সে নিষ্ঠুর। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোর্সিনগনের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও যিনি স্বামীর সঙ্গী হতে পারেন নি—মৃত্যুর কণকাল আগেও যদি তিনি বলতে পারতেন একটি কথা! কিন্তু মৃত্যু, সে যে বড় চুপি চুপি আসে। বড়ই নির্ভর তার আঘাত। এখন শূন্য স্মৃতি—সে স্মৃতি অধঃপতনের।

শ্রীশাস্ত্রী তেইশ বছর বয়সে শ্রীমতী ললিতাকে যেদিন গৃহবধু করে আনেন, সেদিন শাস্ত্রীজীর একমাত্র পণ ছিল, এ হবে পণহীন পরিণয়। সেকালে এরকম ঘটনা অসাধারণ ছিল, তবু শাস্ত্রীজী ঘরপী করে যাক এনেছিলেন—তিনি যে আরো অসাধারণ তা যতো শাস্ত্রীজী নিজেও ভাবতে পারেন নি তখন।

অথচ কতো সাধারণ নারী! ভারতীয়

নারীর যে আদর্শ—তার এক পা এদিক-ওদিক নয়। শূন্যজনে ভক্তি, ইশ্বরে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, স্বামীর সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী।

শাস্ত্রীজীর পিতা ছিলেন সামান্য শিক্ষক। দরিদ্র শিক্ষকের সন্তান লালবাহাদুরের সেদিন দারিদ্র্য ছিল অকল্পনীয়। একমাত্র মনের অসীম ঐশ্বর্য নিয়ে লালবাহাদুর কাঁপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার সংগ্রামে। মাত্র চার আনাও হাঁর সম্বল নেই, তাঁর পক্ষে অভাবনীয় এই কঠিন ব্রত পালন করা সহজ ছিল না। তবু তা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল সেইভাবে, যেভাবে অভিমত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অর্জুনকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন উত্তরা। ঠিক তেমনি স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প লাভ করেছিলেন লালবাহাদুর সাধনী স্ত্রী ললিতার কাছে। আর সে ললিতার মনের গর্ভ ছিল বুনো রামনাথের ভগ্নশব্দ হিম শাড়ি-দরা সাধনী স্ত্রীর মতোই—যিনি ক্ষুধা নিবৃত্তিতে তেঁতুল পাতাতেই সন্তুষ্ট।

আর নেই। উপায় নেই। মোট নব্বছর কেটেছে কারাগারের অন্তরালে। সেদিন স্বামীর কারাবাসও শ্রীমতী শাস্ত্রীর দুঃখ ছিল না মনে। আর্থিক কষ্ট—তাকেও হৃদয় করেন নি তিনি। প্রতি পদে ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষু। তাতেও ভীত ছিলেন না শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী। নিজেই সংগ্রহ করে তুলে ধরেছেন সন্তানদের মুখে ক্ষুধার অম। বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্য প্রসারিত করেছেন সেবার হস্ত। দিবসের শেষে প্রার্থনা করেছেন—

জীবন এখন শূন্য হয়ে যায়,
করণাধারায় এসো।

ভক্তিমতী নারীর অশ্রু-ল্যাবিত চোখে বেরিয়ে এসেছে গান। রচনা করেছেন তিনি একের পর এক সংগীত। মীরাবাই-এ যিনি মংখ, সেই ললিতাভক্তিগী লিখেছেন জীবনের গান।

তবু স্বামীর দুঃখ দুঃখ আরও স্বামীর সুখে সুখকে আজীবন গ্রহণ করার মন্ত যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর সগে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় বা কর্ণদেব?

এখনো দু'চোখে ভেসে উঠছে সেই সুখকর দৃশ্য। কলকাতার ময়দানে শাস্ত্রীজীর সভামণ্ডে এসে যিনি উপস্থিত হলেন। দীর্ঘাংগী, কমললোচনা, লাল-পেড়ে শাড়ি কপালে সিঁদুরের ডাগর টিপ। জনতার উদ্দেশ্যে করুণদল বন্ধ।

জননীস্বরূপা এই ভারতীয় নারীকে দেখে সেদিন জনতার আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আর আজ স্বামীহারা রোরুদ্যমান কথ

ভাবতে গিরে কার হৃদয় বিমোহিত হয়ে না ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শাস্ত্রীজী বেবানেই গেছেন প্রায় সেখানেই নিয়ে গেছেন শ্রীমতী শাস্ত্রীকে। সারা জীবন যিনি অশ্রু কুটির বসবাস করে আগের স্বপ্ন দেখেছেন, লালবাহাদুরের দুঃখের দিনগুলিতে যিনি প্রদীপের শিখা জ্বলে রেখে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পরোক্ষে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন, আমরা তাঁকে কর্ণদেই বা অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছি? তবু আঠারো মাসের মধ্যেই শ্রীমতী শাস্ত্রী পৃথিবীর চোখে ভারতীয় নারীর আদর্শকে তুলে ধরে অর্জন করেছেন সকলের প্রাণা।

আজ মনে পড়ে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সোভিয়েট দেশে শাস্ত্রীজীর অভ্যর্থনার কথা। কিন্তু সেদিন সোভিয়েট নারীর চোখে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় উৎপাদন করেছিল শ্রীমতী শাস্ত্রীর ভারতীয় আচার-আচরণ আর আদর্শ।



শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী

শাস্ত্রীজী স্ত্রীর খোঁজ করতে গিরে শোনে শ্রীমতী শাস্ত্রী রেজেন্ড-পর্যায় অন্তরে!

শ্রীমতী শাস্ত্রীর শোক সান্থনা দেবার মতো ভরসা আমাদের নেই। সোভিয়েট দেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে নেমে সোজা ছুটে গেছিলেন ১০নং জনপথে। শোকপ্রস্তা ললিতার সামনে তিনি শূন্য নীরব দর্শক। তাঁর দু'চোখে ল্যাবিত হয়েছে নিরুদ্ভ অশ্রু। দর্বেশা ভাবার আগল-ভাঙা দেশান্তরের এই শোকাশ্রু নিকেদন অভূতপূর্ব ও তুলনাহীন।

স্বামীগতপ্রাণ যে নারী আজ স্বামীকে হারিয়ে অসীম শূন্যতায় দিনাতিপাত করছেন, আজ তাঁকে শূন্য অর্থ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে আমরা যেন মৃত্যুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তাতে যেমন ভারতের গৌরব, তেমনি তাঁর হৃদয়ের শোক দেশের কল্যাণে কিছুটা লাঘব হতে পারে।

লালবাহাদুর

“আমার কাজ আপনাকে করতে হবে!” পরিশ্রান্ত নেহরুজী বলেছিলেন ছোট মানুষ লালবাহাদুরকে। বাঘা বাঘা লোকের কি অভাব ছিল! পয়তাল্লিশ কোটি সন্তানের জননী ভারতবর্ষে কি ঐ ছোট মানুষটি ছাড়া আর মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় নি কোথাও?

এ প্রশ্ন ভারতবাসীর মনকে যত মা হোক, বহির্বিষয়ের মানুষকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। গর্বিত ঋজুদেহী নেহরুর পর বিনম্র খাটো মানুষ লালবাহাদুর। সেদিন নেহরুজীর নির্বাচনকেও হয়ত মনে মনে উপহাস করেছিলেন দুনিয়ার দীর্ঘদেহীরা। ভারতবর্ষ কিন্তু শাস্ত্রীজীকে চিনত। ভারতের নেতৃবর্গ তাই ক্ষমতার লড়াই-এ নামেন নি। নেহরুজীর ওভার কোট শাস্ত্রীজীর গোড়ালি পর্যন্ত প্রলম্বিত হলেও তাঁরা চিনতে ভুল করেন নি: ঐ, ঐ ছোট মানুষ লালবাহাদুরই নেহরুজীর উপযুক্ত উত্তরসূরী। কিন্তু কেন? না, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই যে তিনি বিভিন্নভাবে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার নয়, বারান্বয়ে। কিন্তু অত ঘরের খবর তো পরের জানার কথা নয়, তাই বহির্বিষয়ে কেউ কেউ সেদিন মৃদু মুচকে হেসেছিলেন। উত্তরে হেসেছিলেন আর একজন, যিনি সর্বকাজে সবার অলক্ষ্যে অমনিভাবেই হেসে থাকেন।

শাস্ত্রীজীর কিন্তু ও-সমস্বে বড় একটা যায় আসত না। ছোট মানুষ বলে নিজেকে তিনি কম সচেতন ছিলেন না। শিশুদের মধ্যে গিয়ে বলতেন, তোমাদের মত ছোট বলেই বৃদ্ধি তোমাদের মধ্যে ডেকেছে আমাকে।

শিশুরা অবাক চোখে তাকালে, তিনি মনে মনে বলতেন, আমি তো তোমাদেরই একজন।

বাস্তবিক। হলেই বা এক্ষটিতে তাঁর ক্ষণজন্মা জীবনের মহাপ্রয়াণ। আসলে তিনি চির শিশু। অর্থাৎ চির-নবীন আর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার এক মহিমময় জীবন্ত বিশ্বাস। হ্যাঁ, তাঁকে দেখলে, তাঁকে জানলে, সেই বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের ভরসা জাগে যে, সত্যের প্রবলক্ষ্য থেকে তিলমাত্র বিচলিত না হয়েও ‘মানুষের রাজ্যে’ প্রতিষ্ঠাকে জয় করা যায়। আজকের আশিশ শতকে এমত কীর্তিতে আর

কতজন রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত—অত হিসেব আমার জানা নেই; সম্প্রতি জানলাম, লালবাহাদুরকে। বিশ শতকের হতাশা-অনুজ্জ্বল যুগে সুযোগ মিলল তাঁকে দেখবার। আর একবার উচ্চারণ করতে সাধ জাগল, “তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়”।

বস্তুত, আজ চতুর্দিক থেকে অবিশ্বাস আমাদের ঘিরে ধরেছে।

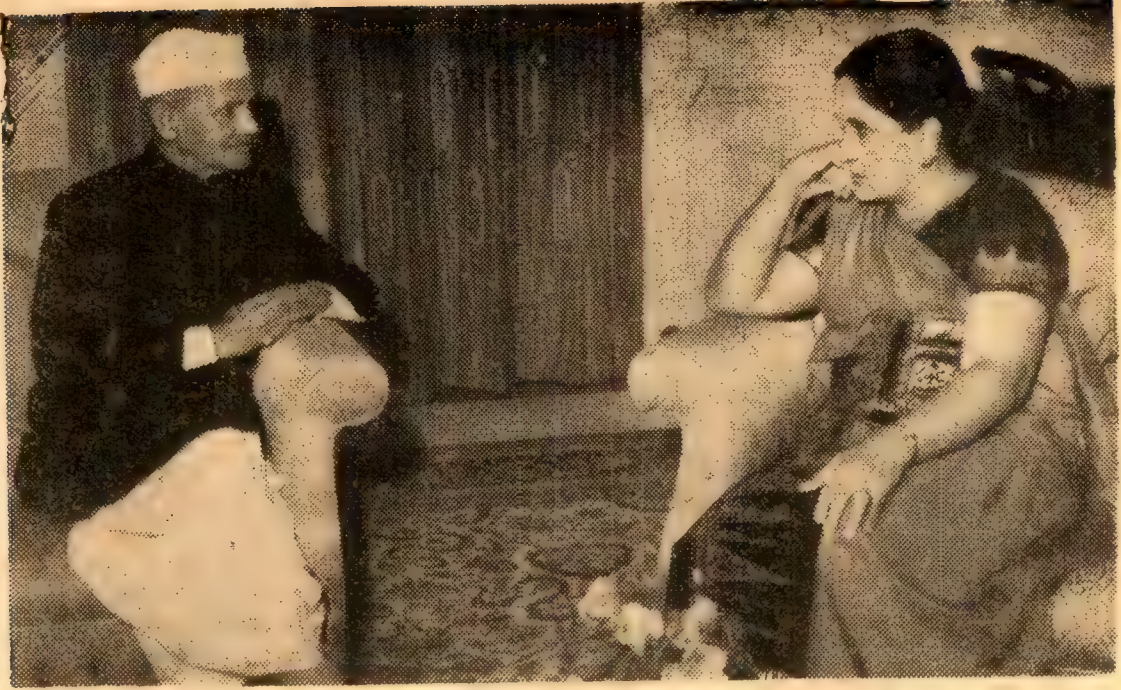
মিন্টেন

হারিয়ে ফেলেছি, ‘সত্য’ নামক একটি ধারণায় আস্থা। মনে হচ্ছে, ওসব পুথির পাতায় লেখা ঠাকুমাঝির আদিকালের স্বপ্নকথা। আর ঠিক সেই সময় বহু দীর্ঘদেহী পুরুষের ভিড় তেলে বোরিয়ে এলেন শাস্ত্রীজী। যেন বললেন, আমার দিকে তাকাও, অবিশ্বাস তোমাদের মনের দ্রাবি় শূন্য:

স্বীকার করতে হল, হ্যাঁ, ওটা দ্রাবি়তম। কূট-রাজনীতির নোংরা হাতও শাস্ত্রীজীকে স্বধর্মচ্যুত করতে পারে নি। আপন ব্যক্তিত্বের গণ্ডীতে এবং আপন ক্ষমতার এস্তিরারে তিনি সত্যের পথে নিজেকে ঝাড়া রেখেছিলেন। জানি না, অধিকতর দিনের কূট-রাজনীতির চাপ সহ্য করতে হলেও তিনি তাঁর ধ্রুব জ্যোতিকে চির-দেদীপমান রাখতে পারতেন কি-না, তবে শাস্ত্রীজীর অতীতকে স্মরণ করলে এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারা যায় যে, (১৯৫৬ সাল) যেমন-ভাবে যোগাযোগ ও রেল মন্ত্রীর পদ থেকে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন, (যদিও রেলপথ দুর্ঘটনার সূত্রে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ কোন দায়-দায়িত্ব বর্তমান ছিল না। তবুও যেহেতু রেল-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তিনিই, সে কারণে নিজের ওপর সকল দায়িত্বের বোঝা তুলে নেওয়ার প্রতিজ্ঞায় কোনো মোহই বাদ সাধতে পারে নি) অন্যান্য রাজনীতির



অগ্রবর্তী দাঁটিতে একটি প্যান্ট ট্যাকের সাহায্যে শাস্ত্রীজী



শ্রীমতী গিরীমাকো বন্দরনায়কের সঙ্গে শ্রীশাস্ত্রী

চাপ আসলে সত্যের মহিমাময় বেদি-মূলে তুচ্ছ প্রধানমন্ত্রীদের গৌরবও তিনি তেমন করেই নামিয়ে রাখতেন। শাস্ত্রীজী তাই বিশ শতকের বিশ্বাস। শাস্ত্রীজী তাই জবাকুসুমসংকাশম্ লালবাহাদুর।

জওহর সেজন্যই জহর চিনতে ভুল করেন নি। নেহরুজী আবিষ্কার করেছিলেন শাস্ত্রীজীকে।

দেসরা অক্টোবর। ভারতে এই ঐতিহাসিক দিনটি বরণ করে এনেছিল গান্ধীজীকে। আর ঐ একই তারিখে ভূমিস্ত হ'ন লালবাহাদুর শাস্ত্রীও। সেটা ছিল উনিশ শ' চার সাল। উনিশ শ' চারের অক্টোবর থেকে উনিশ শ' ছেয়টির ১০ই জানুয়ারী রাত্রি একটা বগিশ মিনিট (ইংরেজি মতে ১১ই জানুয়ারী ভোর রাত্রি) এই একষটি বছর তিন মাসের লালবাহাদুর, মাত্র দেড় বছরের রাষ্ট্রনেতারূপে কী প্রচণ্ড ভাঙা-গড়াই না করে গেলেন দেশের মধ্যে, সীমান্তের বাইরে। অভাবনীয়, অকল্পনীয় দ্রুতগামিতা। ভারতের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদ প্রতিজ্ঞায় লাল, বীরত্বে বাহাদুর, সংকল্পে অটুট, ঠেংখেরে স্থিতধী এবং শান্তি-অভীপ্সায় প্রোজ্জ্বল। এষুগ লালবাহাদুরের যুগ। দেড় বছরের যুগ।

কিন্তু ঐ দেড়টি বছরের পেছনে ছিল লালবাহাদুরের আশৈশব সাধনা।

নিভূতে নেপথ্যে, আত্মপ্রচারের রাজপথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশ্রমে লালিত হয়েছিলেন সে সাধক। লালিত হয়েছিলেন অতি সাধারণ প্রায় দরিদ্র মধ্যবিত্তের কুটীরে।

সাধারণত কানার নাম পশ্মলোচন হয়। ছোট্ট মানুষ শাস্ত্রীজীর নাম রাখা হয়েছিল লালবাহাদুর। পুণ্যাত্মা পিতামাতা। ছেলে তাঁদের নামের মর্যাদা রক্ষা করে গেলেন। প্রাক প্রধানমন্ত্রীদের কথা নাই তুললাম। দেড় বছরের প্রধানই বাহাদুরিতে অবাক করে গেলেন দেশ-বিদেশ।

কিন্তু বাহাদুর কি কেবলমাত্র বাইশ দিনের মদুধ লড়েছেন বলেই। নাকি বাকি মেরুদণ্ডের মানুষজনকে খাড়া করেছিলেন বলে। নাকি লাহোর অবরোধের সিংহাস্ত গ্রহণ করায়। অথবা ডাহা ডাহা বিদেশী হুমকীর সঙ্গে অবিচলিত মোকাবিলায় সার্থক হয়েছিলেন বলে?

কোনটাই নয়। আদপেই তা নয়। যুদ্ধ জেতাটা কোনোকালেই একটা বিরাট মনুষ্যধর্ম বা মনুষ্য কর্মরূপে বিবেচিত হয় নি ভারতের সবুজ শ্যামল মিত্তি মাটিতে। এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীর বরং বারংবার বিধৌত হয়েছে প্রেমের বন্যায়। আসন্ন হিম্মাচল শৃংগেছে শান্তি আর সৌহারদের স্তোত্র পাঠ।

নায়যুদ্ধে যদি বা, যুদ্ধে কদাচ

নয়। কুরুক্ষেত্রে যদিবা যুদ্ধ ন্যায়ানু-সারী, ভারতীয় দর্শনে 'যুদ্ধে' চিরকালই 'হতা লঙ্কা'। তাই রাবণে নয়, দ্রোণেই তাঁর ভক্তি অবিচলিত।

সেই ভারতবর্ষে বাইশ দিনের যুদ্ধ জয়ের ঠিক ততখানিই, ষতখানির জন্য সে যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। আক্রমণের প্রত্যুত্তরে প্রত্যাবর্তের অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রীজী সে-কর্তব্য পালন করেই তো আজ ভারতের বাহাদুর নেতা, 'ভারতরত্ন'।

কিন্তু একথাও খাঁটি সত্য, শয্যু-মাত্র ঐটুকুতেই পাক্সা বাহাদুর বনতে হলে লালবাহাদুরকে জন্মগ্রহণ করতে হত অন্যত্র। ভারতে নয়। ভারতের মাটি বড় নরম; ফের ততোধিকই কড়া। লালবাহাদুর বাহাদুর ছিলেন আগা-গোড়াই।

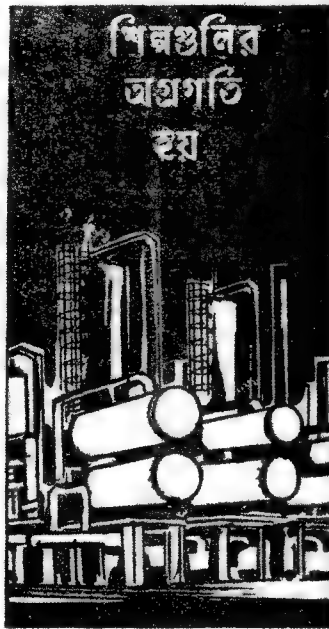
দরিদ্র মধ্যবিত্ত শিক্ষকের কুটীরে জন্ম। দেড় বছর বয়সে লালবাহাদুর পিতৃহীন (আর কী আশ্চর্য, চিন্তাকুল জাতিকে পিতার মত আশ্রয় দান করেছেন তিনি দেড় বছর-ই)। অর্থান্ধ ছিল লালবাহাদুর পরিবারের নিত্য-সঙ্গী। যিনি ভারত-কান্ডারী হয়েছিলেন শেষ জীবনে, তাঁর সৈনিক 'খেমার' পারাপারের কড়ি ছিল না। কাণাকড়ির ওপরই বিধবা মায়ের ভরসা। ভরসা ঐ ক্ষীণদেহী পুত্রের প্রত্যক্ষদীপ্ত দৃষ্টি। লালবাহাদুরকে

দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে হয়েছে। আশা মেটে না। সুতরাং মা ভৈঃ। সমুদ্রতীর্ণ হলেন ভালভাবেই। হারিশ্চন্দ্র চ্যালেঞ্জের (দারিদ্রের চ্যালেঞ্জ) মোকা- হারিশ্চন্দ্র তখন সেই প্রথম লাল বাহাদুরের শত্রুবাগ্ন। বাহাদুরের সঙ্গে সেই প্রথম তাঁর প্রথম শত্রু। অন্তর-বিশ্বে সেই প্রথম প্রতিজ্ঞার স্বপ্ন। সৈনিক তাঁর প্রথম পরীক্ষায় লালবাহাদুর দুরন্ত পথিক।

ইউনিট গুলি থেকে...



ভারতের ইউনিট ট্রাস্টে ইউনিট থেকে আপনার বেশ ভালো একটি আয় হয়। পড় বছর এই ট্রাস্টে লতকরা ৩২ টাকা লভ্যাংশ দেয় এক ট্রাস্ট থেকে অর্জিত ১০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর কোন আয়কর নেওয়া হয়না। ইউনিট ট্রাস্ট থেকে অর্জিত লভ্যাংশকে "অর্জিত আয়" বলে ধরা হয়। এই চাইতেও বড় কথা হল, বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি করা হয় বলে মূলধন হিসেবে ইউনিটগুলি খুব নিরাপদ থাকে এবং লব্ধকেই ভাকানো যায়।



ইউনিট ট্রাস্টে আপনার এই সকলকে বিশেষ বিচার বিবেচনা করে নানা রকম শিল্পে লগ্নি করে। একে শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সাহায্য হয় এবং আর্থিক সুনির্মাণও দৃঢ় হয়।



প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে ইউনিট ট্রাস্টে লগ্নি করে। কাজেই আপনার ইউনিট গুলি জাতীয় প্রতিরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করে।



ইউনিট ট্রাস্টে লগ্নি করা সব চাইতে ভালো ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট

প্রধান অফিস: বোম্বাই - বোম্বাই লাইক বিল্ডিং, ৪৪ বীর নরীমান রোড... পোস্ট বক্স নং: ২০৪৩
শাখা অফিস: কলিকাতা - রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এনেক্স, ১৩ নেতাজী সুভাষ রোড.
পোস্ট বক্স নং: ৪৪২
মাস্তান - রিজার্ভ ব্যাংক বিল্ডিং, কোর্ট প্রাসিড, সাউথ বীচ রোড

DA/65/550 Bengal

একদিকে দরিদ্র সংসারের নিত্য
নিঃস্রাব; অন্যদিকে দরিদ্র ভারত-
জাতার নিত্য লাঞ্ছনা। বেদনা পূজীভূত
হল ছোট্ট মানুষটির প্রকাণ্ড হৃদয়ে।
সেনাধিনায়ক গান্ধীজী হলেন ধ্রু-
তারা। সৈনিক লালবাহাদুর নিলেন
সৈনিকের শপথ। হ্যাঁ, কেবলমাত্র
একটি খাঁটি জওয়ানের শপথ।

জওয়ান! যার বীর্য প্রায় অপ্রত-
খ্যে যায়; অথচ যিনি লড়েন সম্মুখ
সমরে। জওয়ান, যিনি ফলের আশা
করেন না, অতীতের প্রতি সবগে
মোহিত হন।

লালবাহাদুর কখনো নিজেকে
নজরে আনার প্রয়াস পান নি।
সকলের অলক্ষ্যে এই নির্লোভ বীরের
সাধনা। কখন তিনি প্রস্তুত হয়েছেন,
বিশেষ কেউ টের পায় নি। পাওয়ার
কথাও নয়। তিনিই ছিলেন প্রকৃত
‘সার্ভান্ট অব দি লিউপিল’ (কাশী
বিদ্যাপীঠের স্নাতক লালবাহাদুর
‘সার্ভান্ট অব দি লিউপিল সোসাই-
টিতে’ যোগদান করেন ১৯২৬ সালে।
তদবধি আমরা তিনি জনতারই
অক্লিষ্ট সেবক।) গর্ববদ্ধ আত্মভরিতা-
হীন কোটি কোটি সাধারণের মধ্যে
অস্বাভাবিক অসাধারণ। ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র
বিচিত্রবিশ্বয় হিমালয় কান্দিবরুপ।

এমন এক জীবন্ত বিরোধাত্মকে
আবিস্কার করার জন্য চাই তেমন এক
নিভুল আলংকারিক। এই আলংকা-
রিকের দায়িত্বটাও পালন করে গেছিলেন
ভারত-অলংকার জওহরলাল নেহরু।
পাকা জহুরীর মত বেছে বার করে-
ছিলেন আপন উত্তরাধিকারী। অবাক
করেছিলেন অনেককেই।

আগেই বলেছি, সবার অলক্ষ্যে
নেপথ্য পদসঙ্ঘের লালবাহাদুর তাঁর
সৈনিক কতব্য পালন করতেন।
উনিশ শ’ ব্রিটিশ সাল এই নেপথ্য
মানুষটির কর্মতৎপরতায় প্রচণ্ড অবাক
হয়েছিল। ছোট্ট ঘটনা। জাতীয়তা-
বাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ‘এলাহাবাদ
ক্লক টাওয়ারে’ জাতীয় পতাকা তুলবেন।
পুলিশ বেষ্টন প্রধান বাধার প্রাচীর।
কিন্তু বাধা যেখানে দূর্বীর লালবাহাদুর
সেখানেই।

একসময় সবিস্ময়ে পুলিশ বেষ্টনী
ফিরে তাকাল। ক্লক টাওয়ারের সিঁড়ি
বেয়ে একটি ক্ষুদ্র বোরখা দ্রুত
দৌড়ছে। ও কে!

জবাব মিলল জাতীয় পতাকা ক্লক
টাওয়ারের ওপর পত পত করে উড়তে
দেখে। উপস্থিত সকলে দেখলেন,
ক্লক টাওয়ারের সিঁড়িতে সে ব্যক্তি

বোরখাঢাকা মুসলিম নারী নন, স্বয়ং
লালবাহাদুর।

লালবাহাদুরের বাহাদুরী ছিল
এমনিই সবার অলক্ষ্যে। প্রস্তুতির
স্বরে নয়, পূর্বতার প্রহরেই তার
গোটা রূপ দর্শনীয়। আবার সে রূপও
প্রভাত-সূর্যের মত নিরুতাপ। বা
দুটোখ ভরে দেখা যায়। যে বিশানের
দিকে বিস্মিত চোখ মেলে নিভরে
এগিয়ে যেতে পারে সাধারণে।

ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনেতাদের যদি
আমি বলি, ‘হাতুড়ি’, তবে নির্লোভ
বিনয়-কঠোর লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে
বলব, ‘ইম্পাতের চাদর’। একদল রাজ-
নীতি করেন, নিজের জন্যে। ক্ষমতার
শীর্ষস্থান অধিকার করে সাধারণের
ওপর তার গুরুভারের দাপট প্রয়োগ
করার গর্বিত অহংকার তাঁদের নেতা
বানায়; আর শাস্ত্রীর মত মানুষ আসেন,
কর্তব্যের আহবানে, দুর্বলকে আপন
নেতৃত্বের পক্ষপাতি আপন দেওয়ার
দুর্নিবার আকর্ষণে। সেই আকর্ষণই
তাঁর মহৎ স্বার্থ। সেই আকর্ষণই
প্রাণপাত পরিশ্রম। অন্যতর লক্ষ্য নেই।
এরা আমাদের প্রিয়জন। এরা
আমাদের ব্যথার ব্যথী। এমন নেতা
পেলে আঠার বছরের কাজ আঠার
মাসেই সমাপিত হতে পারে। লাল-
বাহাদুর শাস্ত্রী সেই মৃষ্টিমেয়েরই
একজন। লালবাহাদুরদের কাছে এ
‘হাতুড়ি-হাতে’ স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভীরা
কী ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, কী নিদারুণ
হাস্যকর আর দীন!

এ শব্দ আমার দেশের নেতা
বলেই নয়, এবং আজ তিনি আমাদের
মধ্যে নেই বলেই উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে
বলছি না, লালবাহাদুরের এটাই আসল
পরিচয় আর এজন্যই তিনি সার্থকনামা
লালবাহাদুর।

এই স্বল্পস্থায়ী নেতৃত্বের মহি-
মোজ্জ্বল রূপটি আজ ভিনদেশী নেতৃ-
বর্গকেও অভিভূত করেছে এমনভাবে
যে—তাঁদের মধ্যে কয়েকজন লাল-
বাহাদুরকে এষুগের শ্রেষ্ঠ আসনে
বসাতেও কুণ্ঠিত হন নি।

মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি গ্রীহুবার্ট
হামফ্রে লালবাহাদুরকে তুলনা করে-
ছেন মানবপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট কেনেডির
সঙ্গে।

হামফ্রে: “বিবেকী বিশ্বের
দুর্ভাগ্যের ফলে আমরা হারালাম দুজন
শান্তিদ্রুতকে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির
হত্যাকাণ্ডে শোকাহত মার্কিন জাতি
উপলব্ধি করেছেন, ভারতীয় জাতির
প্রাণে আজ কত ব্যথা শাস্ত্রীজীকে
হারিয়ে।”

রাষ্ট্রপতি গ্রীলিন্ডন বি জনসন
বলেছেন, “শ্রীশাস্ত্রীর মৃত্যু মানবতার
আশা ও অগ্রগতির ওপর প্রচণ্ড আঘাত
হানল।”

জাপানের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রী এন
ফুনাতার উক্তি: রাজা ভগীরথ যেমন
মর্ত্যভূমিতে পবিত্র গঙ্গাকে আনয়ন
করেছিলেন, শ্রীশাস্ত্রীও তেমন তাসখন্দ-
চুক্তির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে
শান্তির ভিত্তি রচনা করেছেন।

শ্রীফুনাতা শাস্ত্রীজীকে মহাত্মা
আখ্যায় ভূষিত করে ভারতীয় জনগণের
হৃদয়ে গঙ্গার ন্যায় শাস্ত্রীজীর একটি
পবিত্র আসন থাকবে বলে দৃঢ়বিশ্বাস
প্রকাশ করেছেন।

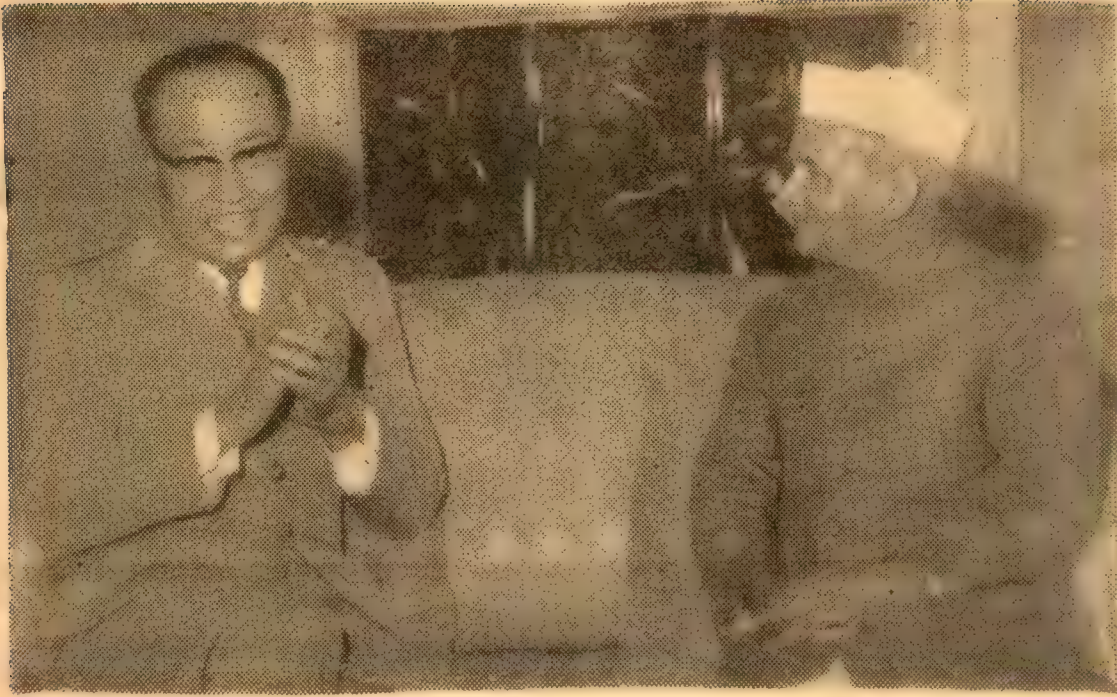
আর আমাদের ‘কাছের মানুষ’
সোবিয়েত জননেতা শ্রীআলেক্সি
কোর্সিগিন ভারতীয় জনগণ, ভারত-
বর্ষের মহান ঐতিহ্য ও মনোভাবের
প্রতিভূতরূপ শাস্ত্রীজীর প্রতি বারম্বার
আনত শ্রদ্ধা প্রকাশ করে অতি আপন-
জনের মতো সমব্যর্থীর কণ্ঠে উচ্চারণ
করেছেন: আমরা লালবাহাদুর
শাস্ত্রীর সপলাভ করছি ও কিভাবে
একজন সুবিক্ত রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা-
সম্পন্ন সংক্ষী মহান ব্যক্তিত্ব ভারত ও
সারা বিশ্বের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ
সমস্যার সমাধান ধৈর্যভরে খুঁজছেন,
তাও আমাদের লক্ষ্য করার সুযোগ
ঘটেছে।

পশ্চিম জার্মানি বলেছেন, পৃথিবীর
সকল ভালো লোক এই মহান ব্যক্তির
ভিরোধানে পরমাত্মীয় বিরোগ-বেদনা
অনুভব করবে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ব্যক্তিগত
প্রতিনিধি গ্রীফারুকও বলেছেন: এমন
কেউ নেই বা থাকতে পারে না, যার
অন্তর শাস্ত্রীজীর সরলতা, আন্ত-
রিকতা ও সহৃদয়তা স্পর্শ করে নি।

দুর্দিন্যার প্রায় সকল শান্তিকামী
জননেতাই একবাক্যে লালবাহাদুরকে
মহান ব্যক্তি বলে অকপটে স্বীকার
করেছেন। আর এই মহৎ শাস্ত্রী-
চরিত্রের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব, তাঁর কার্য-
বলী তাঁকেই বাস্তব রূপ দান করেছে।

লালবাহাদুরকে বাহাদুর বলব তাঁর
এই চরিত্রগত মহত্ত্বের জন্যই। যিনি
নির্লোভ—মন্ত্রিত্বের তোয়াক্কা করেন নি;
যিনি ক্ষমতামদে ধরাকে সরা জ্ঞান করে
সাধারণকে নগণ্য করেন নি; যিনি
সত্যকে ধুবজ্ঞানে আর সর্বকষুকে
সাধারণে পরিহার করেছেন; যিনি কটু
রাজনীতির আকর্ষণে দেশের কাজে
নামেন নি, দেশকে ভালবেসে রাজনীতি
করেছেন; যিনি নিজেকে তুলে ধরতে



জেনারেল নে উইনের সঙ্গে শ্রীশান্তী

মিয়ে আপনাকে ছোট করেন নি, আপনাকে সিরিয়ে রেখে নিজেকে মহান করেছেন; লোভী দুনিয়ায় তিনি সত্যকার মহৎ ব্যক্তি বৈকি। আর সেই মহত্বই তো মানুষের আসল বীরত্ব। বীর লালবাহাদুর সেজন্যই আজকের 'হিরো', আগামী কালের আদর্শপুরুষ।

সবাই জানেন, ক্ষমতার উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেও তিনি কোনো মানুষকে অথহেলা করেন নি। কাউকে আপনার থেকে ছোট করে দেখেন নি। লালবাহাদুরের এই সমষ্টিচেতনা আমাদের মনে গভীর বিশ্বাস ও আশা জাগ্রত করছিল, বহু প্রতিশ্রুত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারত গঠন সম্পর্কে। সমষ্টির সার্বিক প্রচেষ্টাই যে জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধক, এ চেতনা পৃথিবীর পাতায় চোখ রাখলে জাগে না, জীবনে কর্মে এই ভাবনার সমষ্টির সেই মহান ভূমিকা সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন থাকা চাই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাই প্রমাণ করে, লালবাহাদুরের সমষ্টিচেতনা একদিন ভারতবর্ষকে সেই বহু-প্রতিশ্রুত সমাজবাদী সভ্যতার স্ফূর্তি দেখাবে নিয়ে উপনীত করত। দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর!

সবাই জানেন, মন্ত্রিসভার মোহ লালবাহাদুরকে বাঁধতে পারে নি। রেল-

দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বলা হয় নি,—এমন পদ-ত্যাগের নিজের বিরল। বলা হয় নি, একমাত্র নির্লোভ লালবাহাদুরকেই ডেকে এনে মন্ত্রিসভা দিতে হয়েছে, যেতে গিয়ে মন্ত্রিসভা দখলের পাত্র তিনি ছিলেন না। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরি-কল্পনা অনুসারে মন্ত্রিসভা থেকে পদ-ত্যাগের জন্য অনায়াস সাড়া মিলেছিল লালবাহাদুরের কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর বিরূপ ব্যক্তিত্ব যে দেশের প্রয়োজন ছিল। তিনি সরে থাকতে চাইলে কী হবে, ভারতবর্ষ তাঁকে ছুটি দিতে নারাজ। নেহরু-মন্ত্রিসভায় তাই লালবাহাদুরের ডাক পড়েছিল কয়েক মাস পরেই। দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন নেহরুজী। আপনাকেই আমার কাজের দায়িত্ব বহন করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কে?

না আর কেউ নয়। অন্তত তিনি থাকতে নয়।

নেহরুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীকে পেয়ে ভারতবর্ষ আশা করেছিল, শাস্ত্রীজীর শুদ্ধাচার এবং ন্যায়নিষ্ঠা ভারতের আদর্শ হবে। সুতরাং ও হয়েছিল অনেক কাজের। কিন্তু এমনভাবে ঘৃণ ধরেছে অনাচারের যে দেড় বছরে তাতে ওষুধ ধরানো সম্ভব ছিল

না। তার ওপর এই দেড় বছরই লালবাহাদুরকে প্রতি মুহূর্তে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারতের যে বিরোধ স্বাধীন ভারতের আত্ম সমস্যা, আপন দায়িত্বে সে সমস্যা মীমাংসার ভার তুলে নেওয়া ও মত্যা-পূর্বকণে তার সমাধানে পৌঁছানো এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। একমাত্র লালবাহাদুরই এই অসম্ভবকে সম্ভব করার বিশ্বাস রাখতে পারেন। সে বিশ্বাস তাঁর ছিলও।

লালবাহাদুরই পেরেছিলেন চীনা হুমকিকে ছেঁড়া কাগজের মতো তুচ্ছ করতে। পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রিস্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাজাব-লৌহমানব মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রৌকে পদ-চ্যুত করার বলিষ্ঠ দায়িত্ব গ্রহণ করতে। শেখ আবদুল্লাহকে সমাচিত জবাব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকেই সাজে। কেন না সিংধান্ত গ্রহণে লালবাহাদুরের তৎপরতা আরও বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত। কি ভাষা আন্দোলনের ঝড়, কিবা হাজারত রলের পবিত্র কেশ অপহরণের মামলা সামলানো। পাজাবী সুবাস আন্দোলনে অথবা বহুধা বিচ্ছিন্ন দলা-দলিকে আয়ত্তে রাখা শাসনতান্ত্রিক নৈপুণ্যে লালবাহাদুর অতুতপূর্ব সাক্ষ্যের পরিচয় রেখেছেন।

একটি উদাত্ত কণ্ঠ শব্দহীন, হে ইশ্বর

শান্তিন, দাস

স্বপ্নাবলী লবণাক্ত জল হতে আসে,
সেতারের জর বাজে স্তম্ভ হাহাকারে,
ভাঙা রেকর্ডের মত আতর্নাদ ক্রমশ গোঙায়...
বিরাট শূন্যতা নিয়ে আশাহত নিঃসীম আকাশে ডাকাই।

ইশ্বর দেয়ালে থাক রাখারীতি পূজ্যপাদ হয়ে,

আমি আর ওদিকে বাঘো বা,
বেদনার বুক চেপে শেষবার তীরস্বরে চেয়েছি জবা
বিমর্ষ উদ্যানে যদি কুল দিলে, গান দিলে;

সব যদি দিলেই বিধাতা
সংগীত-বাজনাগুণি অতীকৃত কেড়ে নিয়ে কত লেখা হুঁতু
কতখানি জমা হল, অর্বাচীন হিসেবের পাতা।

শাস্ত্রীয় আঠারো মাস

দীপক গোস্বামী

তোমাকে নিয়ে এখন অনেক কিছুর লেখা যায়।

যেহেতু তুমি সত্য মিথ্যা,
দেহ বৈদেহ, আলো অন্ধকার
পার হয়ে গেছ—সুতরাং অতি সহজেই
গল্পে ও কাব্যে আজগুবি জলছবি হবে।
রাজনীতি বাসিন্দা
তোমার গলার দিয়ে
দূর থেকে হাসবে অনেকে।

প্রয়োজন কি সে সব অলীকে?

অনেক পাণ্ডিকে দৌঁধ জ্ঞানযোগ
নাম দিয়ে রাজনীতি শূন্যপাত্র চটে।
কিন্তু তোমার কর্মালোকে
ভর পায় অন্ধ পেঁচারা:
তুমি যে তুমিই। এবং আমরা—আমরা সকলে।
তাই মহামানব দূরে থাক। রাজনীতি
মৃতদেহ ঘিরে শবুনেরা চোঁচাক অসুখে।
শুধুই তোমাকে চাই।

আঠারো মাসে সকলের বছর আসে না।
কোথাও আঠারো বর্ষ আঠারো মাসেতে
—সেই দেখি তোমার আয়না।

ভাণ্ডা লালবাহাদুরের। তাঁর
মতো নেতা পেয়েও তাঁর নিজের দল
সামগ্রিকভাবে তাঁর আদর্শকে গ্রহণ
করতে পারে নি। আর তাই লাল-
বাহাদুর আরও যা করতে পারতেন সে
পথে বাধার প্রাচীর গেঁথেছেন তাঁরাই,
যাঁরা নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন
তাকে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
নেহরুজীর ইচ্ছাকে গ্রহণ করে লাল-
বাহাদুরের মধ্যেই উপযুক্ত নেতার
সন্ধান পেয়েছিলেন বলে গর্ব প্রকাশ
করেছিলেন সৈদিন।

তরাচ ইতিহাস উল্টে ধরতে
অক্ষমতা প্রকাশ করতে হয় নি লাল-
বাহাদুরকে। ইতিহাস রচনা করতেই
যে তাঁর আগমন। সে রচনাও সমাপ্ত
হ'ল, তাঁর কাজও ফুরল। অভাবনীয়
তাঁর তিরোধান।

গৃহসমস্যায় বিরত গৃহস্বামী
তারই মধ্যে প্রতিবেশী-সমাজেও যে কত
বড় আসন সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন—
তাঁর বিদায়কালে তারই প্রভূত
পরিচয় পেয়ে ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব
অশ্রুচর্য অবাক। নেহরুজীর তিরো-
ধানে যাঁরা মনে করেছিলেন রহিবিশেষ
চারত যে আসন সংগ্রহ করেছিল তার
থেকে বৃষ্টি তার বিচ্যুতি ঘটল।
লালবাহাদুরের অন্তিম যাত্রার প্রাক্কালে

ও অব্যবহিত পরেই সকলে স্তম্ভিত
বিস্ময়ে দেখল ভারতের মর্যাদা আন্ত-
র্জাতিক ক্ষেত্রে লালবাহাদুর বাড়িয়েছেন
বৈ কমান নি।

বাইশ দিনের বিজয় অভিযানকে
বিস্মৃত হতে বিশ মিনিটও সময় লাগে
নি ভারতবর্ষের। সেটাই তাঁর ধর্ম।
আর তারই প্রমাণ তাসখন্দ। অধিকৃত
স্থান প্রত্যর্পণে এমন সহজ সম্মতি
আর কোথাও মিলত কি না সন্দেহ।
কিন্তু ভারতের মাটিতে সেটাই স্বাভা-
বিক। আজ বলে নয়। ইতিহাসও
বলে সেই একই কথা। ভারতের দৃষ্টি-
কোণে সেটাই সব বড়ো বীরত্ব। লাল-
বাহাদুর সেই বীরত্বেরই স্বাক্ষর রেখে
এসেছেন তাসখন্দে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলে-
ছিলেন, “খোদা হাফিজ” (খোদা
আপনার সহায় হোন)।

লালবাহাদুরের স্মিত উত্তর ছিল,
“আচ্ছা হি হো গয়া” (সবই মঙ্গলময়
হ'ল)।

তখন আয়ুব খাঁ বলেছেন, “খোদা
আচ্ছা হি করোগা” (খোদা ভালই
করবেন)।

বাইশ দিনের যুদ্ধের পর এ কোন্
বাইশ যুগের শূভেচ্ছা বিনিময়!

খোদা নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রীজীকে দিয়ে আসল কাজটি
করিয়ে নিয়ে পবিত্র মানুষকে চির
পবিত্রতার মধ্যে একেবারে শান্তিবনে
টেনে নিয়ে গেলেন। এর চেয়ে ভালো
কাজ বোধকরি খোদার আর জানা ছিল
না। হায়, শান্তির শপথে বৃষ্টি স্বয়ং
খোদারও অনাস্থা। তাই ঐ কর্মক্লান্ত
ক্ষীণদেহী মানুষটিকে তিনি চির-
শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

শাস্ত্রীজীর আরম্ভ কাজের শেষ।
আমাদের নতুন করে শুরুর।

শুভক্ষণে যাত্রা শুরুর। শুভক্ষণ
ছাড়া কি বলব। ঝড় আর ঝামেলার
অবসান ঘটিয়ে লালবাহাদুর বিদায়
নিয়েছেন। পবিত্র আত্মার দীর্ঘভোগে
বিরাট ‘না’ কার নথিবন্ধ হয়ে আসছে
যুগে যুগে। কেবলমাত্র কর্মের
আহ্বানেই তাঁদের আগমন। সমাপ্তে,
মহৎ বিদায়।

বাহাদুর মানুষ এমন করেই
আসেন, ‘লালবাহাদুররা’ অর্মান করেই
চলে যান। তাঁদের পিছনের টান নেই।
তাই শিছুও তাঁদের ডাকতে নেই।

বলতে হয়, বিদায়! হে বীর, কর্ম-
ক্লান্ত ভূমি। তোমাকে ধরে রাখব না।
কিন্তু তোমার বীরত্বকে আপন করে
গেঁথে রাখব বৃকের মধ্যে। তুমি
এসো! তুমিই বার বার এসো!

ঠিক যে মুহূর্তে তাঁকে আমাদের মধ্যে প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি সেই মুহূর্তে তিনি নেই। ঠিক যে মুহূর্তে সারা বিশ্বে শান্তি প্রচেষ্টার এক অভূতপূর্ব নজীর তৈরি করল, সেই মুহূর্তেই তাসখন্দ চুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী তিন প্রধানের অন্যতম ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মাত্র সাতটি মিনিটের একটি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত সময়ে তাসখন্দকে বিস্মিত হতবাক করে চির-শান্তির পারাবারে তাঁর একাকী তরণী ভাসিয়ে বিদায় নিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন সত্যিই কখনো এতোবড় ফাঁকিতে ইতিপূর্বে পতিত হন নি নিশ্চয়। শাস্ত্রীজীর এই মর্মান্তিক বিদায় সংবাদ তাঁকে যে কী প্রচণ্ড আঘাত করেছে তা সহজেই অনুমেয়। গৃহস্বামীকে ফাঁকি দিয়ে কবে কোথায় এমন মহৎ অতিথি নিঃশব্দে পলায়ন করেছেন? এমন রহস্যের জন্য কেই-বা প্রস্তুত থাকে। ভারতবর্ষ তাই তার চরমতম শোকাচ্ছন্ন মুহূর্তেও শ্রীকোসিগিনের মানসিক বেদনাকে যথার্থ পরিমাপ করতে পেরেছে। তাসখন্দের জনগণ যে মুহূর্তে পরমাঙ্গুরী বিষম ভারতের কথা ভেবে কেমন মহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, ভারতবর্ষ তাও উপলব্ধি করতে পারে।

শ্রীকোসিগিন তাই আর এক মুহূর্তও দেরি করতে পারেন নি। পলাতক লাল-বাহাদুরের পরিত্যক্ত মরদেহ বহন করে অপেক্ষারত বিমানে তুলে দিয়ে নিজেও (শাস্ত্রীজীর পুণ্য শরীর বহন করেছিলেন তিন প্রধানের অন্যতম প্রেসিডেন্ট অয়্যুব খাঁ-ও) তখনই ছুটে এসেছিলেন বিয়োগব্যথাভুর ভারতবাসীর শোক-মুঢ় অবস্থায় সোবিয়েত জনগণের গভীর সমবেদনা নিয়ে। মহান পুরুষ লালবাহাদুরের স্বপ্নসম্পন্ন সঙ্গ সোবিয়েত নেতৃবৃন্দ ও শ্রীঅয়্যুব খাঁকেও কী পরিমাণ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল তা তাঁদের প্রজ্ঞাজলিতেই স্বপ্রকাশ। সোবিয়েত জনগণের বেদনার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বলেছেন, 'প্রিয় বন্ধুগণ, ... এই মুহূর্তে সোবিয়েত জনগণ তাদের বন্ধু ভারতীয় জনগণকে, তাদের গভীরতম সমবেদনা জানায়। গতকাল যদি আপনারা তাসখন্দে থাকতেন তা হলে অনুভব করতেন সোবিয়েত জনগণের এই শোকানুভূতি কতখানি গভীর ও আন্তরিক।

"তা হলে আপনারা দেখতে পেতেন, হাজার হাজার নরনারী রূপধি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আপনারা প্রধানমন্ত্রীর অন্তিমযাত্রায় প্রজ্ঞা জানাতে ...।"

তাসখন্দের এই চেহারা পরও কি ভারতের শোকবিহ্বল রূপের বর্ণনা সম্ভব? যে অবিশ্বাস্য ঘটনাকে তাসখন্দেই বিশ্বাস করতে সময় লেগেছে, সেই নিষ্ঠুর সত্যকে ভারতবাসী কেমন করে বিশ্বাস করবেন!

মনে হয়েছে টেলিফোন ভুল বলছে, ভুল



সব হারাবার হাহাকার

লিখছে টেলিগ্রাফার, ভুল শব্দ ছি সবাই আকাশ-বাণীর বিষয় ঘোষণা। কিন্তু একটা একটা করে প্রভাতী সংবাদপত্রে ভারতবাসী যখন দেখলেন ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর রেখে তাসখন্দের মাটি থেকেই শাস্ত্রীজী চির-নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তখন অবিশ্বাসী-আশা কুহকিনী আর কোন সামান্য অবশেষ রাখতে পারল না। শিথিল তন্দুকা ভারতভূমি ব্যর্থতার অবসাদে ভেঙে পড়ল।

তাসখন্দবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীকে যে-সময় অভিনন্দিত করার জন্য সমগ্র ভারত প্রতীক্ষারত, সে সময় শাস্ত্রীজী তাঁর কল্যাণময় আশীর্বাদটুকু মাত্র পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। ললিতাদেবীকেও একটি কথা বলে গেলেন না। ভারতবাসীকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তির বাণী, মঙ্গলময় আশীর্বাদ।

শাস্ত্রীজীকে আমরা কোমল-কঠোর দুটো-প্রতিজ্ঞা এবং শান্তিপ্রিয় নেতারূপে জানতাম। আমরা জানতাম, শাস্ত্রীজী শৃঙ্খাচারী, ন্যায়-পরায়ণ, ধার্মিক, কর্তব্যে অটল, স্থিতিশীল এবং সরল সহজ সাধারণ জনতার নেতা, মাটির মানুষ। আমরা জানতাম, শাস্ত্রীজী আশৈশব কঠোর পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ যুক্তিবাদী রাজ-

নীতিজ্ঞ। জানতাম, ভারতের বহু জটিল সমস্যার গ্রন্থিমোচনে শাস্ত্রীজীর স্থির বিবেচক নীতি কোথাও অসামর্থ্য হয় নি। তিনি জিতে এসেছিলেন কাম্মীরে (পবিত্র হজরতবলের কেশ অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাম্মীর যখন বিক্ষুব্ধ)। তিনি প্রধান কর্ণধারের মত ভাষা আন্দোলনের কালে জাতীয়তাবিরোধী অশুভ তরঙ্গগ্রহত ভারতকে প্রশান্ত তটসন্নিধে উপনীত করেছিলেন। তিনি পাক্সাবের কার্যরো-বিরোধী গণমতকে মর্বাদে দান করেছিলেন এক সুসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি শেখ আবদুল্লাহর জাতীয়তাবিরোধী কার্য-কলাপকে অবদমিত করেন। আবার তিনিই বহুকালের প্রতিবেশী শত্রুর উপযুক্ত মোকা-বিলা করে ভারতকে একমুহুরে উদ্ধৃত করে ভারত সীমান্তের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের অতাল্পকালের মধ্যে একটি আশাপ্রদ সমাধানের পথে অগ্রসর করে যান। এক আধারে বীরত্ব ও মহৎ তাগের বাস্তব প্রত্যয় শাস্ত্রীজীর মত এমন করে এখানে খুব কম মানুষের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করেছে। বলতে বাধা নেই, তেমন ব্যক্তিত্ব স্মরণ হয় না।

শাস্ত্রীজীর রত্নস্বাস কর্মজীবন বাট পাল

হলেও, ভারতবর্ষকে বীরবে মর্ষাদায় এবং মহৎ ভাষণে জাগ্রত করার জন্য সময় পেয়েছিলেন তিনি মাত্র মাস পাঁচ-ছয়। ভারতই মধ্যে ভারতের ইতিহাসে লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে অভাবিতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করে অকস্মাৎ আঘাতের ভায়ে ভারতবর্ষকে বিহ্বল করে ঐতিহাসিক বিদ্যায় গ্রহণ করলেন তা এক অতি-মানবীয় শক্তির পরিচায়ক। ভারত-বাসীর মনে গৌরবোন্মত্ত ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার দ্বারা শাস্ত্রীজী এক অতিপ্রয়োজনীয় অভাবনীয় কীর্তি রেখে গেলেন।

অথচ কী ভরস্কর প্রতিকূলতার মধ্যে কী অবিচলিত পন্থাক্ষেপে তিনি এই ইতিহাস রচনা করেছেন তা ভাবলেও অবিশ্বাস্য বলে হয়।

বিনি ছিলেন এমত শক্তির, তাঁর বিনয়, পরমত্তের প্রাতি সহিত্বতা এবং সর্বভূতে প্রজ্ঞা গর্বোন্মত্ত উন্নয়ন দৃষ্টির প্রতি প্রচণ্ড প্রতিবাদম্বরূপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্রীজী স্বদেশের শক্তির দম্ভকে নস্যাৎ করে দিয়ে, মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণবাদী শক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকে অত্যন্তকালের মধ্যে স্বাচর্য কঠিন প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। বিদিত ঐশ্বর্য চরিত্র মানুষের জগতে প্রজ্ঞার আসনে

কেবলমাত্র ইতিহাস-পুস্তকরূপে বেঁচে থাকেন। তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের পাম্ববর্তী হওয়ার অক্ষমতা মানুষকে স্বল্পকালের মধ্যেই কার্যত তাঁদের বিস্মৃত হতে সাহায্য করে। তথাপি এঁদের উপস্থিতি মাঝে মাঝে বিপ্লবগামী মানবতাকে সচেতন করে যায়।

ভারতের পরম সৌভাগ্য, জগতের কাছে সে একাধিকবার নিরভিমাত্রী মহৎ পুস্তক উপহার দিতে পেরেছে। এ পুস্তক শাস্ত্রীজীই সেই উপহাররাশির মধ্যে সর্বাধুনিক উৎসর্গ।

শাস্ত্রীজী যা কিছু করেছেন, যতটুকু করবারের সম্পর্কে এসেছেন তার সম্পূর্ণ দায়ভাগ বহনের দায়িত্ব নিজের ওপরই গ্রহণ করেছিলেন। রেলমন্ত্রী পদে ইস্তাফা ভারতই পরিচর। পাক-ভারত সংঘর্ষের দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী ছিলেন তিনি নিজে। তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর, সে-ও শাস্ত্রীজীর বিচক্ষণ দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক।

তাসখন্দ চুক্তিকে সর্বস্তরের মানুষ এখনও সমান সাপ্তাহে বরণ করে নিতে পারেন কি বটে (সম্প্রতি পুনর্বাসিনদপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীর দারুণ উদ্ভেজনার সংবাদ সকলেই

জানেন। তাঁনি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে বলেছেন উদ্ভেজনার বশে)। দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে হতাশ মানুষের অভাব দেখা যায় নি। তদ্রূপ একথা ঠিক, দৃষ্টির শান্তিবাদী মানুষ তাসখন্দের সাফল্যকে শাস্ত্রীজীর বিশেষ অবদান বলে মন্তব্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আমরা এ পুস্তক শাস্ত্রী-সিদ্ধান্তের শ্রুত ফলই পেয়েছি; তাসখন্দ চুক্তিরও কিছু কিছু শ্রুত ফল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে যার দীর্ঘ-তালিকা উপস্থাপন বাহ্যল্যামাত্র। এটুকু শ্রুত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি যে, এই চুক্তির ফলে ঘরে বাইরে এবং সীমান্ত দ্বারে ভারতের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া বইতে শুরু করেছে। সৌভাগ্যত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতা অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমূলজারিলাল নন্দ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পর পর দু'টি অধিবেশনে তাসখন্দ চুক্তির ঘোষণাকে অনুমোদন দান করেছেন।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কেবলমাত্র একটি খাটি সং মানুষই ছিলেন না, তিনি নিজের প্রতি চরম অবহেলাও প্রদর্শন করতেন।

এ ইতিহাস ভারতের আজ সুবিদিত যে, শাস্ত্রীজী কর্তব্যরত মানুষের মধ্যে কখনো কোনরকম স্তরভেদ করতেন না; কারোকে সামান্য উঁচু কথাও বলেন নি কোনোদিন। তিনি তাঁর দপ্তরের কর্মিবৃন্দের প্রতি সাধারণভাবেই মর্ষাদাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। হুকুম করা জিনিসটা তিনি অপছন্দ করতেন। আর ভারতই জন্য সমগ্র পৃথিবী বিস্মিত হয়ে শুনল, শাস্ত্রীজী যখন বকে ব্যথা অনুভব করেন তখন তিনি নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহায্য চান। হায়, ভারতের যে-কোন হেঁজি-পেঁজি প্রশাসনিক অফিসর বারী আপন ভাড়টে বাড়িতে রান্ধার কল থেকে নিজেরা জল ধরে আনেন, তাঁরাও যেখানে অফিসে গিয়ে ফাইলের ফিতেটা পুস্তক নিজে খুলতে পারেন না, সেই সাহেবগুলোর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর অস্তিত্ব সময়ে তাঁর কাছে কোনও সাহায্যকারী ছিলেন না। অত্যন্ত অনুতাপের কথা এ বেদনাকে বহন করে শাস্ত্রীজীকে উঠে আসতে হয়েছিল। সে ঘরে যদি কলিং বেলের ব্যবস্থা থেকে থাকে তবে তারও সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন নি।

দুর্ভাগ্য আমাদের, শাস্ত্রীজী বস্তুতপক্ষে নিজেকে একান্ত অবহেলা করেছেন। নচেৎ তাঁর অত্যধিক পরিপ্রমত্তা শরীর যে অকস্মাৎ আঘাত সহ্য করতে পরাম্ভ হতে পারে, একথা চিন্তা করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই তিনি সংগে নিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর স্বার্থ পরিচরার অভাব হিচ্ছিলই এবং সেজন্য শাস্ত্রীজীর আত্মনিক বিনয়ও অন্যতম কারণ। তিনি সংগে নিয়ে যেতে পারতেন আরও দু'একজন সূচিকবৎসক বারী তাঁকে পরীক্ষা করে তাঁর পক্ষে ভোজসভাদিতে উপস্থিত থাকা বিশ্রামহীন পরিপ্রমত্ত কতদূর সহনীয় তার নির্দেশ দিতেন।



শ্রীকোর্সিগন শ্রীমতী শাস্ত্রীকে সাহুনা দিচ্ছেন

আমরা জান, শাস্ত্রীজী নিরাক্ষরশীল এবং তিনি 'চিকেন পোলাও' গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তিনি তাঁর পরিপ্রবেশের মধ্যে তাল রেখে প্রয়োজনীয় আহাৰ্য্যবস্তু গ্রহণ করতেন কিনা সে সম্পর্কে আমরা কিছুই ভালমত জানি না। এইটুকু জানি, ষেপথ তাঁর নিদ্রাঘ্র অর্ধেকঘণ্টার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, বার মানে যথেষ্ট পুষ্টিসাধনের মত শরীরে আহাৰ্য্য-বস্তুর যোগান দেওয়া তাঁর পক্ষে তিনি সেতু বছর বয়সে পিতৃহীন) সম্ভব হয় নি।

শাস্ত্রীজী প্রচণ্ড পরিপ্রমী ছিলেন। জানি না, পরিপ্রমের মধ্যে সমতা রক্ষা করে তিনি উপযুক্ত পরিচর্যা (বৈজ্ঞানিক) পেয়েছিলেন কিনা। যতদূর তাঁর চরিত্রের পরিচর্য আমরা অবগত আছি, তরত সন্দেহ হয়, শাস্ত্রীজী হয়ত সে সবের কিছুই ভোগ করেন নি।

শাস্ত্রীজী নিজেকে অবহেলা করে আমাদের যথিত করেছেন দীর্ঘদিন তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব-ভাভের সুযোগ থেকে—একথা আজ দৃষ্টের মধ্যে মনে এলো। এতদ্বিধায় অধীন অবশ্যই অনিভিত্ত। কিন্তু তাঁর মনের এই কোভের উৎস হল ঐ কাহিনী যি, যুকে বেদনা নিয়ে সাহায্যের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী খর ছেড়ে নৈজেই পৌঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এই মহৎ ব্যক্তি পরিবারবর্গের জন্য কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন নি দীর্ঘকাল হস্তিসভায় অবস্থানের পরও। তিনিই বরং আপন মাস মাহিরা থেকে আড়াই শ' টাকা নিরমিত দান করে গেছেন।

শাস্ত্রীজী ব্যতীত কণ রেখে গেছেন। একটি ছোট গাড়ি কেনার জন্য এ কণ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শাস্ত্রীজীর কোনো জীবনবীমা নেই। শাস্ত্রীজী একবার ওভার-কোভের অভাব বোধ করেছিলেন আমাদের মনে আছে।

এমন একটি সৃষ্টিছাড়া মানুষকে কালো-বাজার অধ্যুষিত ভারতবর্ষ কী বলে তিরস্কার করবে জানি না।

সম্ভবত শাস্ত্রীজীর বেহেতু কোনো সম্পত্তি নেই সেজন্য কোন 'উইল'ও নেই।

শাস্ত্রীজীর শেষ ইচ্ছা তাসখন্দ চুক্তি। এই উইলের 'প্রকট' তাঁর উত্তরাধিকারী জরতকে গ্রহণ করতে হবে।

রাজধানীতে বিশিষ্ট নেতৃবর্গ

শাস্ত্রীজীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ রাজধানী নয়াদিল্লীতে উপনীত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করেন। রামলীলা মঙ্গদানে বিশ্বনাথকব্জ এবং তাঁদের প্রতিনিধি-বর্গ একের পর এক মহান পুরুষরূপে প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে শাস্ত্রীজীর রাষ্ট্রনায়করূপে রাজ-নৈতিক কৃতিত্ব এবং ব্যক্তিগত অমারিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে আবেগকম্পিত

কণে প্রজ্ঞা নিবেদন করেন। সভার পৌরোহিত্য করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ। একবাক্যে উপস্থিত সকলেই যে কথাটি স্বীকার করেন তা হল শাস্ত্রীজী ব্যক্তি ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে মহান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর শান্তি প্রচেষ্টা মানবজাতির প্রভূত মঙ্গলসাধনের প্রেরণারূপে পরিগণিত হবে।

ভারতে শাস্ত্রীজীর অস্বেতিষ্ঠিত্যার যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর দেশীর কাজে ব্যাপৃত থাকার আসতে পারেন নি বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-সভাপতি গ্রীহমফ্রে হামফ্রে জানিয়ে গেছেন। গ্রীহমফ্রে হামফ্রে প্রেসিডেন্টের বাণী নিয়ে আসেন।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মুখশীর্ষী ভাষণে সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সরকারের একান্ত সমবেদনা ও শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি গ্রীহামফ্রে ভাষণে সোভিয়েত প্রচেষ্টা ও শাস্ত্রী-সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে বলেন, শাস্ত্রীজীর এই বলিষ্ঠ সাহসিক প্রচেষ্টা সমগ্র শান্তিকামী মানবের প্রশংসানীয় হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জনসন বলেছেন, শাস্ত্রীজীর অকালমৃত্যু মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। শাস্ত্রীজী ব্যতীত এ দুনিয়াকে সত্যিই ছোট মনে হয়।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি শাস্ত্রীজীর প্রয়াণে সমগ্র বিশ্ব ক্রটিগ্রস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

পাক বাণিজ্যমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ও ভারতীয় জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, পাকিস্তান বিশ্বাস

করে পাক-ভারত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সম্ভব। তিনি বক্তৃতা করতে উঠলে হৃৎযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়।

বটেন, পশ্চিম জার্মানী, কাম্বোডিয়া, আফগানিস্থান, ফ্রান্স, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, যুগো-স্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কগণ একের পর এক ভারতের মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কবুল থেকে শাস্ত্রীজীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার্থ্য হিসেবে একগুচ্ছ মার্গিস ফুল ও এক পয়কট গুড় পাঠান ভারতবাসীর প্রার্থের সীমান্ত পান্থী দ্বার আবদুল গফ্ফর খান।

ভারতের মাটিতে ভিরেতনামের শান্তি আলোচনা

রাজধানী পরিভ্রমণের পূর্বে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী গ্রীকোর্সিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি দীর্ঘ সময় ধাবৎ ভিরেত-নামের শান্তি প্রশংসা আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য জানা যায় নি। তবে এই আলোচনা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি আলোচনাকে গঠনমূলক আলোচনা বলে বর্ণনা করেন। ভিরেতনামে মার্কিন শান্তি প্রচেষ্টা সম্পর্কে মার্কিন দূতগণ বিভিন্ন স্থানে যে সব আলোচনা চালাচ্ছেন তন্মধ্যে কোর্সিন-হামফ্রে আলোচনা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত রাজনৈতিক পরবৈক্ষকগণ—সেকথা স্বীকার করেন।

গ্রীহামফ্রে আরব সাধারণতন্ত্রের জাইস প্রেসিডেন্ট গ্রীহুসেন এল শফির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন নয়াদিল্লীতে।

তাসখন্দ বৈঠকের সাফল্য ভিরেতনামের শান্তি প্রচেষ্টার সাফল্যকে বৃদ্ধিমান্য করবে আজ এমন বিশ্বাস লালন করা যেতে পারে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাণপুত্র

বেজওয়াডা - ঐনগর - গোহাতী



শেখ সাক্কর: ঐতিহাসিক তাসখন্দ মজল

সোভিয়েট ইউনিয়ন:

অসাধারণ সাধন সম্ভব হয়েছে। যখন সবাই নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, তাসখন্দ বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনরূপ মৈত্রী সম্ভব নয়, বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তখনই শোনা গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ যুক্ত ইচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন এবং উভয় রাষ্ট্রনেতাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দু'চোখা ব্যক্ত করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে। যখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরাও স্বীকার করেছেন যে—না, কোন মীমাংসা হল না, তখনও কোসিগিন চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি ঘটনার পর ঘটনা শাস্ত্রী ও আয়ুবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। একটা মীমাংসাসূত্র বের করতে সক্ষম হয়েছেন। কোসিগিনের উদ্ভাবিত মূল অনুসারেই শাস্ত্রী ও আয়ুব শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

ঐতিহাসিক তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষরের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু সমগ্র ঘটনাকে

আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে। শান্তির জন্য কাজ করতে করতে শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তাই শাস্ত্রী শান্তির জন্য শহীদ। শাস্ত্রী নিজের জীবন দিয়ে তাসখন্দ ঘোষণা রচনা করে গেলেন; বিশ্ব কূটনীতির ইতিহাসে এই ঘটনা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তাসখন্দ ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান কেউই নিজের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। ভারত-পাক মৈত্রী সম্পর্কে উগ্রতা করতে হবে। উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক কার্যকলাপ আবার চালু করা হবে, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সম্পর্ক সহজ করা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি উভয়েই সম্মত হয়েছেন ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা এই আগস্ট তারিখে যে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাবে, এবং এই প্রত্যাবর্তনের কাজ ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বে-আইনী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। এ ছাড়াও তাসখন্দ ঘোষণায় বলা হয়েছে, উভয়ের মধ্যে কাস্মীর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং উভয় পক্ষই এ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

কোসিগিন এই ঘোষণার জন্য শাস্ত্রী ও আয়ুবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এই ঘোষণার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তির পথ খুলে গেল। বিশ্বের সর্বত্র এই ঘোষণার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট আশা প্রকাশ করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবোধের অবসান ঘটবে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাসখন্দ চুক্তিতে স্বত্তি প্রকাশ করে বলেছে যে, এইবার ভারত ও পাকিস্তানকে প্রচুর পরিমাণে মাকিন সাহায্য দেয়া হবে। এমন কি যে বুটেন প্রধান থেকেই তাসখন্দ বৈঠকের অপমৃত্যু কারনা করছিল সেও খুশি হয়েছে। তাসখন্দ সাক্ষ্যের জন্য বুটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সোভিয়েটের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোস্লাভিয়া, বার্মা, সিংহল প্রভৃতি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে। একমাত্র চীন এখনও খুঁধ খোলে নি। স্বাভাবিকভাবেই চীন খুশি নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ নিটুক, এটা চীন চায় না।

তা ছাড়া তাসখন্দ সাক্ষ্যের প্রধান কৃতিত্ব সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী। চীনের পক্ষে এটা অসহ্য।



ভাষ্যে শব্দার্থবাহী কোসিগিন ও আয়ুব খাঁ

এবশ্যই ভারত বা পাকিস্তান যা চেয়েছিল, ভাষ্যে তা কারও ভাগ্যেই মেলে নি। ভারত চেয়েছিল, অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। আয়ুব ভাতে রাজী হন নি। তবে বল-প্রয়োগ না করার নীতি যদি পাকিস্তান মেনে চলে তবে তা শেষ পর্যন্ত অনাক্রমণ চুক্তির কাছাকাছি গিয়েই পৌঁছবে। কাশ্মীর নিয়ে কোন আলোচনা করা হবে না, ভারতের এই দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে, এবং ঘোষণাপত্রও সে কথাই উল্লেখ করতে হয়েছে। এই আগস্টের দ্বায়ে ভারতের সৈন্যরা ফিরে যাবে না বলে যে ঘোষণা শাস্ত্রী করেছিলেন, তাও রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বিপরীত দিকে পাকিস্তান? তার বক্তব্য ছিল, কাশ্মীর প্রশ্নে একটি নীমাংসা না হলে অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হবে না। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না করেই পাকিস্তানকে শাস্ত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছে। বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা, এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিও ঘোষণা করতে হয়েছে।

এ কথা সবাই জানেন এ জাতীয় বৈঠকে কখনও কারও পক্ষে ঘোলা আনা আদায় করা সম্ভব হয় না। ভারত বুনি, কাশ্মীর সম্পর্কে কোনরূপ নতি স্বীকার না করেও পাকিস্তানের কাছ থেকে বলপ্রয়োগ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করা গেছে। পাকিস্তানও বুনি, ভারত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করেছে, এই আগস্টের

জায়গায় সৈন্যাপসরণে রাজী হয়েছে। উভয় পক্ষকে এই অবস্থার নিয়ে আগার কৃতিত্ব কোসিগিনের।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের গার উন্মুক্ত করা হল ভাষ্যে। এখন আসল কাজ শুরু হবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মন্ত্রী, কর্মচারী ও সেনানায়ক পর্যায়ে অনেকগুলি বৈঠক করতে হবে, ভাষ্যে চুক্তিকে স্বাধীনভাবে কার্যকরী করার জন্য। দুই দেশের জনসাধারণকেও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। এ কথা সবাই বুঝেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ কারও স্বার্থেই কার্যকরী নয়। এ বিরোধ মেটাতে হবে। ভাষ্যে তারই উদ্ভূত।

ভারত ভাষ্যে চুক্তি অবশ্যই কার্যকরী করবে। ভারত শান্তি চায়, পাকিস্তানের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভাষ্যে ঘোষণা প্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কীর্তি। ভারত শাস্ত্রীর মৃত্যুকালীন প্রতিশ্রুতি অবশ্যই মানবে। তা ছাড়া এই চুক্তির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্ত। সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্ত হতে পারে, এমন কোন কারণ ভারত এখন করতে পারে না।

কিন্তু পাকিস্তান? আয়ুব খাঁ বলেছেন, পাকিস্তান ভাষ্যে চুক্তি নিশ্চয়ই মানবে। পাকিস্তান সরকারও এই চুক্তিকে অনুমোদন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা ভাষ্যে চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু

করেছে। এর চেয়েও বড় কথা, পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র ভাষ্যে ঘোষণার যে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে এই চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রীতিমত ভাষ্যে সন্দেহ হয়। মুখপাত্র বলেছেন, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান কোনরকম নতি স্বীকার করে নি। ভারত মতে এখন কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা সম্ভব হবে। এর চেয়েও ভয়ের কথা, কেউ কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে ভাষ্যে ঘোষণা যে কথা বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখপাত্রটি বলেছেন যে কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, এটা একটি 'বিরোধী' অঞ্চল স্বতন্ত্র; এখানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এমন কোন প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান দেয় নি।

ভারতেও ভাষ্যে চুক্তি অবিশিষ্ট অভিনন্দন পায় নি। শাস্ত্রীর মৃত্যুর ফলে সমালোচনা কিছুটা চাপা পড়েছে। শাস্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু না হলে এই সমালোচনা হয়তো আরও ব্যাপক হত। আয়ুবের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করা ভুল হয়েছে এর ফলে ভবিষ্যতে কাশ্মীর নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার পথ খুলে দেয়া হল। ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে ওরুহপূর্ণ হাজিপুর ও কারগিল ছেড়ে আগার সিদ্ধান্ত গ্রহণও স্বাভাবিক হয়েছে। হাজিপুর আর কারগিলই যদি ছাড়তে হয়, তবে এত ঝড়ঝঞ্ঝার কি প্রকার ছিল? রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবেও তো এই কথাটাই ছিল, সে প্রস্তাব তাহলে গ্রহণ করা হয় নি কেন? যে

পাকিস্তান কক্ষ চুক্তির পরবর্ত্তে ভারত আক্রমণ করতে পারে, যে ভাসখন্দের বলপ্রয়োগ না করার ও অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি মেনে চলবে, এই ভরসা কোথায়? আর এই ভরসাই যদি না থাকে, তবে ভারত তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে না কি?

এ সব সমালোচনার মধ্যে হয়তো কিছুটা সত্য আছে। তবে শাস্ত্রীর পক্ষে ভাসখন্দের ঘোষণায় স্বাক্ষর না করে উপায় ছিল না। তিনি ইতস্তত করেছেন, বারে বারে ভেবেছেন। তিনি যে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভাসখন্দের ঘোষণায় স্বাক্ষর ও মৃত্যুর অন্তর্বর্তীকালে শ্রীমতী শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর টেলিফোন বার্তায়। ভারতে ভাসখন্দের ঘোষণার কি প্রতিজ্ঞা হয়েছে তা শাস্ত্রী জানতে চেয়েছেন এবং সকল সংবাদপত্র কাবলে তাঁর জন্য পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

পাকিস্তান যখন নিষিদ্ধভাবে বলছে যে সে বলপ্রয়োগ করবে না, এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না; তখনও যদি শাস্ত্রী এই ঘোষণায় স্বাক্ষর না করতেন তবে বিশ্বের কাছে ভারত শান্তি বিরোধী বলে প্রমাণিত হত। তা ছাড়া কোসিগিনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করাও শাস্ত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ভবিষ্যতে আবার পাকিস্তান চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে, এই কথা ভেবেও শাস্ত্রীকে এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

আপাতত সবাই কামনানোবাক্যে এই আশাই পোষণ করবেন যে, ভাসখন্দের চুক্তি প্রতিপালিত হবে।

ভাসখন্দের বৈঠকের ফলে স্ট্রটেনৈতিক ভগ্নাঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বটেন ও নাকিন যুদ্ধরাষ্ট্র দীর্ঘ দিন চেষ্টা করেও যা করতে পারে নি, রাষ্ট্রসংঘ যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবার সে কাজ করতে পেরেছে। বিবর্তমান দুই পক্ষকে একত্র বসিয়ে মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়েছে। এই ঘটনার ফলে এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের মর্যাদা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মর্যাদা বাড়বে।

নাইজেরিয়াঃ

১১ই ও ১২ই জানুয়ারী লাগোসে দুই দিন ধাপী কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। ১১ জন রাষ্ট্রপ্রধান সহ ১৯টি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্যার আবুবকর তফাওয়া বালেওয়া সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বটেনের প্রধান-

মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন, ক্যানাদার প্রধানমন্ত্রী লিচার পিয়ারসন, মাল্টার প্রধানমন্ত্রী জ্যাক্স বর্গ অলিভার, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ, গিয়েরা লিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলবার্ট এম বারগাই প্রভৃতি সম্মেলনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ভারতের বঙ্গবাসী সম্মেলনে উপস্থিত করেন এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার উক্ত শ্বেতাঙ্গ শাসক আইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দাবি সমর্থন করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর শোকছায়ায় সম্মেলন শুরু হয়। সকলে শ্রীশাস্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত অধিকাংশ প্রতিনিধি বটেনের রোডেশিয়া নীতির তীব্র সমালোচনা



আবুবকর তফাওয়া বালেওয়া

করেন। বটেন ইচ্ছা করেই আইয়ান স্মিথ সরকারের উচ্ছেদ করেছে না, এমন অভিযোগ করা হয়। বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই; বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই আইয়ান স্মিথ সরকারের পতন ঘটবে বলে উইলসন যে বক্তব্য রাখেন, প্রায় কেউই তার ওপর আস্থা দেখান নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ঘোষণায় এই ঐক্যমতের পরিচয় পাওয়া যায়।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের ঘোষণায় বলা হয়েছে, আগামী জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। বটেনের অবলম্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে এর মধ্যে যদি দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ শাসক আইয়ান স্মিথের সরকারের পতন ঘটে স্বেচ্ছা ভাল, আর তা না হলে জুলাই মাসে আবার কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন বসবে এবং তখন দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘোষণায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা

হয়েছে, বল প্রয়োগের দ্বারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস করেন। সম্মেলনে এও ঠিক হয় যে, রাষ্ট্রসংঘকে সমদ অনুযায়ী দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হবে। বটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা তদারক করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীর গঠন করেছেন। লণ্ডনে এই কমিটির বৈঠক বসবে।

এখনি দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমনওয়েলথের অধিকাংশ দেশের যে প্রস্তাব আপাতত উইলসন তা মূলত্বীয় রাখতে সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত কিস্তি এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবে তাঁকে সম্মতি জানাতে হয়েছে। বটেন যাই আশা করুক না কেন, জুলাই-এর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে পড়ে আইয়ান স্মিথ সরকার ভেঙে পড়বে এমন আশা দুরাশা মাত্র। তখন জুলাই-এ তো কিছু করতেই হবে। বটেনের পক্ষে তখন পশ্চাদপসরণ মুশকিল হবে।

বিধাশ্রুত যিনুদী নীতির জন্য ইতিমধ্যেই বটেন আফ্রিকায় অত্যন্ত অগ্রিম হয়ে উঠেছে। বাস লাগোসেই কমনওয়েলথ সম্মেলনের সময় বটেন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে। এই বিক্ষোভে পুলিশের গুলীতে দুজন মারা গিয়েছেন। লাগোস সম্মেলনের পর উইলসন জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় কেনেথ কোণার সঙ্গে আলোচনার জন্য গেলে সেখানে জনসাধারণ “উইলসন ফিরে যাও” বলে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

তাই, লাগোস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বটেন অবশ্যস্তারী সামরিক ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হোক, এই আশা সবাই চায়। তা না হলে হয়তো আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদেরই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার অপূর্ণ গৌরব লাভ করার মাত্র ক'দিনের মধ্যে নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্যার আবুবকর তফাওয়া বালেওয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নাইজেরিয়ার শাসন ক্ষমতা দখলের এক চাকল্যাকর সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ১৫ই জানুয়ারী এই সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বলে লিওপোল্ডভিল থেকে জানানো হয়েছে। এই প্রবন্ধ লিখার সময় পর্যন্ত (১৬ই জানুয়ারী) যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, সৈন্যবাহিনীর একাংশ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী কেপ্টুট ওবাচি এবাকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা শাসনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি দখল করেছে। বিদ্রোহীদের হাতে পশ্চিম নাইজেরিয়ার প্রধান-



আহমেদ, বেঙ্গো

শ্রী স্যামুয়েল আকিনটোলা ও পূর্ব নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার আহমেদ বেঙ্গো নাকি নিহত হয়েছেন।

অভ্যুত্থানের বিস্তারিত সংবাদ না জানা পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা মুশকিল। তবে গত অক্টোবর মাসে পশ্চিম নাইজেরিয়া প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে সারা দেশে ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী আকিনটোলা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী তফাওয়া বালেগুয়া সমর্থক। তিনি জোর-জবরদস্তি করে, নির্বাচনী নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করে বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হারিয়ে দিয়ে নির্বাচনে জিতেছেন, এই অভিযোগ উঠেছে। এরপরই বিরোধীরা গোলমাল শুরু করেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিরোধের ফলে তিন মাসে ১৫৩ জন মারা গিয়েছে।

গত সপ্তাহে তফাওয়া বালেগুয়া তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে বিনামন্ত্রী ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রন্ত্রী জাভা ওয়াচুককে অপসারণ করার পব থেকেই উদ্বেগনা চরমে উঠেছে।

ভিয়েতনাম :

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক আলেকজান্ডার শেলেপিন ছয় দিন ধরে হ্যানয়ে উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন, প্রধানমন্ত্রী ফাম-ভান-ডং ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে মস্তকায় ফিরে এসেছেন।

শেলেপিন কি হো-চি-মিনের সঙ্গে ভিয়েতনামে শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করার জন্য হঠাৎ হ্যানয় গিয়েছিলেন? শুধুদিনের সময় থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতুম শান্তি প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে একদম

সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও উত্তর ভিয়েতনামের নেতাদের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন, শেলেপিন হ্যানয়ে পরিকারভাবে ঘোষণা করেছেন, মাকিন আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে যাবে। এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম-ভান-ডং-ও বশি হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে যে সাহায্য আশা করা গিয়েছিল তা পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অবশ্য এখনও তারা সে সাহায্য পাচ্ছে। সাহায্য ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

ফাম-ভান-ডং-এর এই ঘোষণা চীনের গালে চপেটাঘাতের মত মনে হবে। চীন বরাবর বলে আসছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর ভিয়েতনামকে কোন রকম সাহায্য দিচ্ছে না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছে, তার প্রমাণ এই ঘোষণা।

শেলেপিন হ্যানয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, যুদ্ধের নীতি পরিহার না করলে ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধান হবে না। তিনি একথাও বলেছেন যে, ভিয়েতনাম সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে গেলে নাশপনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে (ভিয়েতকং) বাদ দিলে চলবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন একদিকে ভিয়েতনামের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে, আর একদিকে শান্তির পথ অনুসন্ধান করছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এবং ভিয়েতকং-এর সঙ্গে আলোচনায় রাজী হলে শান্তির পথ ঝঞ্জে বের করা কঠিন হবে না।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে, উত্তর পক্ষের মধ্যে আলোচনার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিপূর্বেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সে আলোচনায় বসতে রাজী আছে। সম্প্রতি মাকিন রাষ্ট্রপতি লিঙ্গন বি জনসন মাকিন কংগ্রেসে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ভাষণে ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনামে যুদ্ধ অবসানের জন্য যে কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে প্রস্তুত। এর থেকে মনে হয় ভিয়েতকং-এর সঙ্গে আলোচনায় এখন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী।

শেলেপিন-হো-চি-মিন আলোচনার পর শেলেপিনের বক্তৃতা থেকে বেশ বোঝা যায়, ভিয়েতকং-এর আলোচনায় অংশীদার হলে উত্তর ভিয়েতনাম মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছে।

উত্তর পক্ষের আলোচনার ফল কি হবে

যে পক্ষের কথা, আপাততঃ জানা যায়নি। বাক্যের বাবস্ত্ব তো করা হোক। বাক্যের পরিবর্তন এইরূপ আলোচনার খুবই উপযোগী হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে নোমাবধন বন্ধ রেখেছে। ভিয়েতনাম সংগ্রামের উত্তর পক্ষই ভিয়েতনামী নববর্ষ উপলক্ষে তিন দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করেছে। তাছাড়া ভিয়েতনাম ভাষিত-পাক শান্তি চুক্তির প্রভাবও রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিধীতে শান্তির অন্তোষ্টক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি চার্লস হানক্সের মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। হানক্সে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি হুসেন-এল-সকির সঙ্গেও আলোচনা করেন। নিছক সৌজন্যপূর্ণ সাক্ষাৎ এগুলি নয়। ভিয়েতনাম নিয়ে নেতাদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে কথাবার্তা হয়েছে। ভারতের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমন্তলালাল নন্দের সঙ্গেও কোসিগিন ও হানক্সে আলোচনা করেন।

দ্বিধী থেকে মাকিন পররাষ্ট্রপতি ভিন রাড লোজা সায়গন যান। তাঁর সঙ্গে যান আভেরাল হ্যারিসান। হ্যারিসান সম্প্রতি ভিয়েতনামে শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

তবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই শান্তি প্রয়াসকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক-চক্র সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে বাধা দেবে। ইতিমধ্যেই সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা শোনা যাচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেভাইন কাও কাইকে গরিয়ে আরও কঠোর আপোষ-বিরোধী নেতাকে সামরিক নেতারা গলীতে বগাতে চায়। ভিয়েতকং-এর সঙ্গে একাসনে বসে আলোচনার পরিবর্তে যুদ্ধ করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে এই সামরিক নেতারা বেশি পছন্দ করেন।



শেলেপিন

স্মৃতির ঝুঁকুরো

ভারতবর্ষ থেকে অনেক-অনেক দূরে সুদূর মধ্যাশিয়া অতিক্রম করে তাসখন্দে একটি শীতাত' রাগি নেমেছিল।

য়োজ যেমন নামে। আসমুদ্র হিম্মাচলের কোটি কোটি মানুষ পরম নিশ্চিন্তের শব্দায় ঘুমে বিভোর হয়ে শ্বস্ন দেখাছিল।

সুখস্বপ্ন। তাদের প্রতিনিধি হয়ে যে খবরকতি মানুষটি গিয়েছিলেন তাসখন্দে তিনি কখনো করেন নি। পরাজয় আর বাথ'তা তাঁর জীবনের কাথাও লেখা নেই। তিনি আসবেন। ফিরে আসবেন জয়ী হয়ে। নিয়ে আসবেন ভারত ও পাকিস্তানের এই বিশাল উপমহাদেশের অজস্র ও অগনন মানুষের সুখসমৃদ্ধি আর শান্তিময় জীবনের নতুন অভিজ্ঞান! নিয়ে আসবেন যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত, দারিদ্র্যের অভিশাপহীন এক পরম নিশ্চিন্ত জীবনধারণার নিশ্চিত ইঙ্গিত!

স্বপ্ন সত্য হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে বাস্তবে। কিন্তু—

কিন্তু যিনি সেই স্বপ্নকে সাথ'ক করেছেন সেই পরম প্রিয়, আমাদের বড় কাছের মানুষ লালবাহাদুর আর নেই!

কী অবিশ্বাস্য—এই না-থাকা। কী মর্মান্তিক এই মৃত্যু! প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা আর চরম খ্যাতি-ভরা জীবনের স্রোতের ভেতর থেকে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে!

এই দেশ—গীতা উপনিষদের দেশ। আমরা জানি, সেই বিখ্যাত সেই জগজ্জয়ী শ্লেোক, বাসাংসি জীর্ণানি বথা বিহায়, নবানি গহ্বাতি নরোহ-পরানি। জানি, মৃত্যুর জন্য এদেশ কখনো অশ্রু বিসর্জন করে না। জানি, এদেশের কবির উক্তি, “পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে। পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে। এই জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া আঁজার খেলা দেখিলে, আমাদের কোন ভয় থাকে না.....।” তবুও—

তবুও আমাদের বুক ঠেলে ঠেলে ওঠে কান্নার ঢেউ। তাঁর একটা বাথা পাক দিয়ে উঠছে গলার কাছে। কারণ?

বড় আপনার। বড় কাছের। একেবারে একান্ত প্রিয়জন। একেবারে নিজের লোকের মৃত্যুতে মানুষ সব ভুলে যায়। ভুলে যেতে বাধ্য হয়ও। মনের বাঁধ ভেঙে যায়। অপরূপ বাথা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে।

মানুষ জানে মৃত্যু অনিবার্য। তবুও কান্দে। এই নিয়ম সংসারের।

আজ স্মৃতির ভেতরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সেই দিনটির কথা যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। নয়াদিক্রীতে এক এম, পি-র বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছে। ঘরোয়া আসর। বিশাল সামিয়ানা নেই। ইলেকট্রিক আলোর জেঞ্জা নেই! মৃষ্টিময় প্রোতা।

শ্রীশাংবাদিক

বেশিরভাগই এম, পি আর জনকরেক মশ্রী ছিলেন। তখন লালবাহাদুর রেল আর সরবরাহের মশ্রী!

ডেপুটী মিনিষ্টার নয়। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নয়। দ্বীতিমত মিনিষ্টার! অথচ কী আশ্চর্য। পোষাক-আসাকের এতটুকু চাকচিক্য নেই! গলাবন্ধ কোটের গলার কাছটা ছেঁড়া ছেঁড়া। মাথার তেলের দাগ। দুটো হাতের নিচে যে তিনটে বোতাম থাকে। তাও নেই। তার জম্জমাট দুটো ময়লা সুতো ঝুলছে। ধূতিরও সেই অবস্থা। মোটা খাদি তো বটেই। তাও আবার ময়লা!

অথচ মানুষটি কিন্তু নির্বিকার। কীর্তনের সুরে বিভোর হয়ে আছেন। আর তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন! কীর্তনের শোনার নাম করে আসরে বসে পাশের সহকর্মীদের সঙ্গে পলিটিব্লের কথা আলোচনা করছেন না। নেহরুজীকে খুশি করার জন্য কী করছেন তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে বাহাদুরী করছেন না!

এই হলো লালবাহাদুর শাস্ত্রী! মনে আর মূখে এক। কাজে আর কথায় এক। ভগবানের নাম শুনতে এসেছি—নাম শুনবো ভক্তি ভরে। কেন হবো অনামনস্ক? কেন অন্য কথা বলবো!

বাঙালী এম, পি। বাঙালী কীর্তনীর কণ্ঠে বাংলাদেশের

কীর্তনের মধুর সুরের ম'ছনা শুনে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

—কেমন লাগলো বাংলা কীর্তন?

—বাংলাদেশের কীর্তন আমার খুব ভাল লাগে—

আরো একদিন। আরো একবার শুনোঁছ বাংলার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার উক্তি। ময়দানে জনসমুদ্র। শরৎকালের বেলা শেষের রোদ রক্ত-চন্দনের মত ঝরে ঝরে পড়ছে। শাস্ত্রীজী উঠলেন বক্তৃতা করতে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হর্ষধ্বনিতে দূরে নিস্তরঙ্গ গঙ্গার জলরাশি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বলোছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে বাংলা সারা দেশকে নেতৃত্ব ও প্রেরণা দিয়েছিল.....

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড করতালির শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল!

এল যুদ্ধ। পাক-ভারত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী কে? হ্যাঁরো ইউনিভারসিটিতে পড়া যুদ্ধবিহারদ উইনস্টন চার্চিলের মত কেউ নয়। নেহা'ই লালবাহাদুর। কাশীর অদূরে অখ্যাত এক গ্রামের অবখ্যাত এক স্কুল-মাস্টারের ছেলে। যুদ্ধ তো দূরের কথা। একটা বন্দুকের শব্দ পর্যন্ত শোনে নি। কিন্তু—

কিন্তু লালবাহাদুর—সত্যিই বাহাদুর! বড় বড় জেনারেল রণাঙ্গন থেকে ট্রাঙ্ককল করে পরামর্শ চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছেন। নিভুল অমোঘ নির্দেশ!

—আন্তর্জাতিক রেখা পার হবো?

—পাকিস্তান যদি ইউ, এন, ও-র কোন নির্দেশ না মানে, তাহা যদি ইন্টারন্যাশনাল লাইন পার হয়ে আমাদের দেশের মাটি অধিকার করে, তখনও কি আমরা চুপ করে বসে থাকবো?

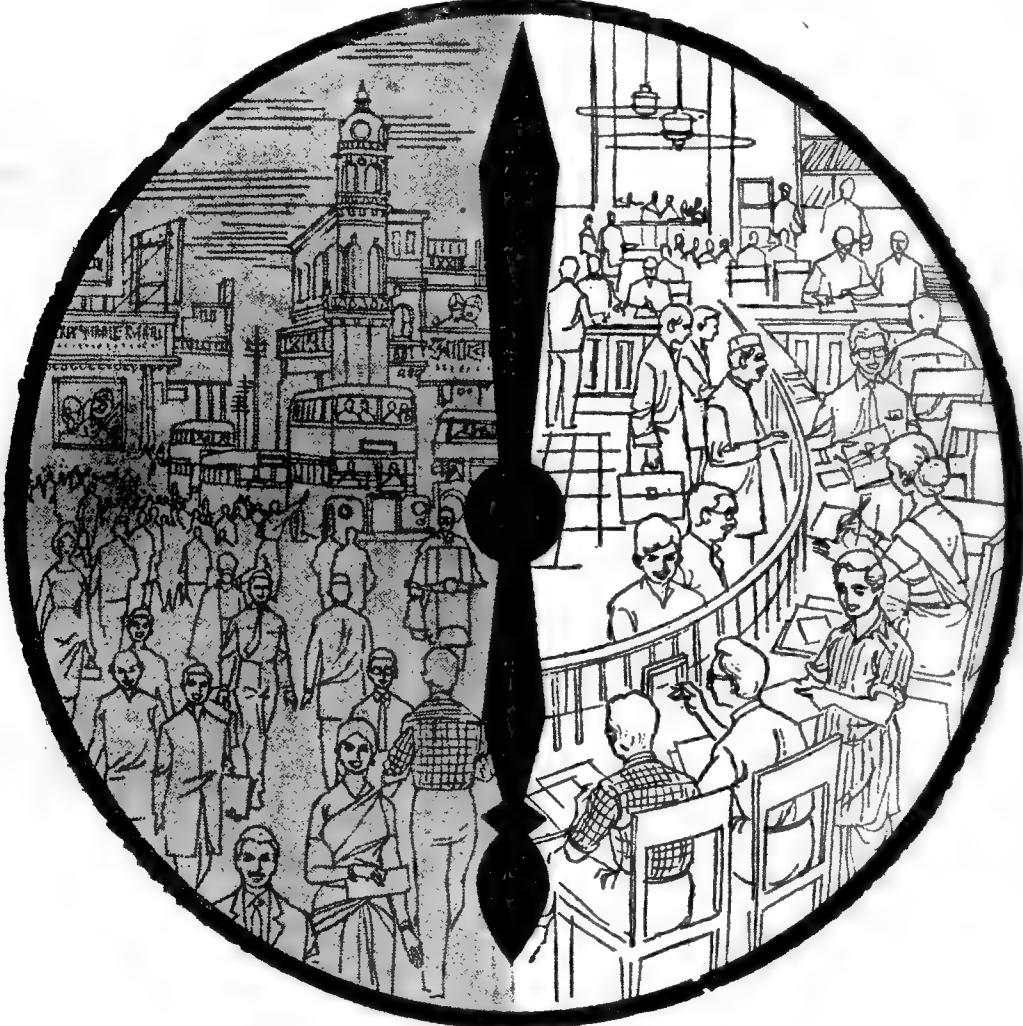
অতএব।

অতএব লোকসভায় উৎকণ্ঠিত সভ্যদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন। ঘোষণার আগে তাঁর ম'খাবয়ব উত্তেজনার জ্বলজ্বল করছিল। দেহের সব রক্ত যেন মূখে এসে জমা হয়েছে। পাতলা ঠোঁটদুটো কাঁপছিল। থরথর করে কাঁপছিল। ধীরে ধীরে কেটে কেটে মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করার মত করে বলোছিলেন, আমরা ইন্টারন্যাশনাল

লাইন অতিক্রম করেছি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকা অন্যায়.....
লাহোর। শিয়ালকোট। কাশ্মীরের উরি অঞ্চল। এক-একটি জায়গায় জওয়ানদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করছে। আর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আহারে বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে আর

একটি মানুষের! হ্যাঁ, এই লাল-বাহাদুর! ঝঞ্জাবিষ্কৃৎ সমুদ্রে বিচক্ষণ নাবিক যেমন করে দৃঢ় হাতে হাল ধরে তাঁরে নিয়ে আসে তরী, তেমনি করে দেশকে নিরাপদ করেছিলেন। সেই নিদারুণ সংকটে নিভুল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আরো একবার। ১৯৬৫ সালের ৩১শে অক্টোবর। শাস্ত্রীজী এসেছিলেন কলকাতায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দনে অভিভূত হয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন, কলকাতা সফর তাঁর পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হয়েছে।
—এই অভিনন্দনে বাংলাদেশ



অফিসের কাজের সময়ের পরেও যে পোস্ট অফিস কাজ করে যায় :

কলিকাতার কেনারেল পোস্ট অফিস, অফিসের সময়ের পরেও কাজ করে যায়। সাপ্তাহিক কাজের সময়ে যারা পোস্ট অফিসে যেতে পারেন না তাঁদের সুবিধের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই স্বল্প পোস্ট অফিসগুলিকে নৈশ পোস্ট অফিস বলা হয়। আমাদের দেশের নাগরিকগণের জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে এই স্বল্প মোট ৪২টি পোস্ট অফিস আছে।

সর্ব সময়ের জন্য সর্ব প্রকারে আপনাদের আরও ভালো করে সেবা করার জন্য ডাক ও তার বিভাগ যে চেষ্টা করছে এটা হ'ল তার অন্যতম একটি নিদর্শন।



ডাক ও
তার বিভাগ

DA 65/272 BANG

সম্মুখে আপনার কি ধারণা হলো?
জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁকে।

স্মিত হেসে বলেছিলেন, কলকাতা ও বাংলা সবদাই নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে নেতৃত্ব দেবে আজকে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিনন্দন তার প্রমাণ। আর—

একটু গম্ভীর হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে বলেছিলেন, আর পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যাপারে এই নগরের মানুষ যে কিভাবে সরকারের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছেন তার পরিচয় এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে—

এইবার—শেষবার। এই তো মাত্র আঠারো দিন আগে ময়দানে নেতাজীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। পৌষের হলদে রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। ময়দানের সবুজ ঘাস রোদের টোপের পরে মাথা দু'লিখে দু'লিখে হাসছে। নেতাজীর প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে বললেন 'বড় ভৈরবী হায়'—আরও বলেছিলেন—বাঙালীর মনের কথা—'সুভাষ ভারতের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী নেতা'—সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তিনি অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। একক প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনই তার স্বাক্ষর—

বাংলাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন শাস্ত্রীজী। বাঙালীর সংস্কৃতিকে, বাঙালীর কাব্যপ্রীতিকে, বাঙালীর বিদ্যানুরাগকে কত নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতন সমাবর্তন উৎসবে বলতে পেরেছিলেন—শান্তিনিকেতনের শান্তি ও সদিচ্ছার পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত রবিরাস্মি সারা পৃথিবীতে ব্যপ্ত হয়ে আগামী বৎসর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও মৈত্রী বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে—

শ্রীরূপ গোলামী নিবর্তিত

নিদর্শন-মাধব

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাগাক্ষর অপ্রাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোলামীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করা হয়েছিল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“অধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালংকার।

এইছে কবির বিনা নহে রসের প্রচার॥”

মূল্য : তিন টাকা।

বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বািশাখবাহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১৬

আরও—আরও অনেক কথা ভিড় করে আসছে মনে। মনে পড়ছে, সেদিন (শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর আগে) বন্ধুদের এক আড্ডার কথা।

—শাস্ত্রীজী একটা 'একসেশন' হে?

—কেন?

বন্ধু বলতে সুরু করলেন, দেখ এ যুগটা হল অর্থ আর কৌলীন্যের যুগ। সংসারে কিছুর করতে হলে হয় চাই টাকার জোর না হয় মামার (কৌলীন্য) সরকারী দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আশ্রয়িতা) জোর। এই লোকটার এসব কিছুর ছিল না। গ্রামের স্কুল-মাস্টার সারদাপ্রসাদের ছেলে কেবল-বিস্ট, কারও ছেলে নয়।

কাশীর হরিশচন্দ্র কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ইস্তফা দিয়ে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এরকম স্বদেশী তো কত লোক করেছে। দেখ গিয়ে তারা আজও ভলান্টিয়ারী করে দিন কাটাচ্ছে। যেতে পাচ্ছে না দু'বেলা পেট ভরে—

—তাহলে লালবাহাদুর যে এত বড় হল তার সিক্রেট কি?

—সিক্রেটটা কি বৃদ্ধিতে পারছে না?

—না।

বহুদর্শী বন্ধু বিরক্ত হলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। হয়তো নিজের দেশের কাজে কারাবরণের দিন-গুলোর কথা মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দেখ, দেশের কাজের শেষটা হল ভাইরাসের মত। রক্তের ভেতরে বিষের মত মিশে যায়। মৃত্যু এসে ছিনিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত এই রোগ যায় না। চিন্তা করে দেখ, কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে শাস্ত্রী উপাধি নিয়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে এক দিনও বিশ্রাম নেন নি। সেই সারভেন্টস অফ দি পিপলস সোসাইটির মেম্বর, আগ্রা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার থেকে সুরু করে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক হয়ে সংযুক্ত-প্রদেশ কমিটির সম্পাদক পর্যন্ত ধাপে ধাপে এগিয়েছেন। এগিয়েছেন দুট ও সংঘত পায়। দেশের সেবা করেছেন। মানুষের সেবা করেছেন প্রাণ ঢেলে। তাই দেশের লোক তাঁকে বারে বারে চেয়েছে। একবার নয়। দুই-দুই বার ইউ, পি, আসেম্বলির মেম্বর হলেন। তার পরে ইউ, পি-র পুন্নিশমন্ত্রী থেকে একেবারে কেন্দ্রীয় রেল আর সরবরাহের মন্ত্রী!

যখন যে দপ্তরে সঙ্কট দেখা

দিয়েছে, তখন নেহরু তাঁকে ডেকেছেন। তাঁর ধীরস্থির মস্তিষ্কের বুদ্ধি আর পরামর্শ নিয়েছেন। আবার এইভাবেই বাণিজ্য ও শিল্পের মন্ত্রী! তারপরে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভারও তাঁকে নিতে হয়েছে কিছুরদিনের জন্য!

ব্যাপার কি জানো, 'শো' না থাকলেও যার চরিত্রে সিনিসয়ারটি আছে তাকে লোকে ডাকবেই! ওর 'সিক্রেট' হচ্ছে তাঁর ক্যারেক্টারের ইন্টিগ্রিটি! বন্ধু থামলেন!

শাস্ত্রীজী নেই। কিন্তু জীবনের চাকা চলবে। এক-একটি করে দিন কেটে যাবে। আরও কত মানুষ প্রধানমন্ত্রী হবে। দেশ জুড়ে কত নতুন নতুন ডায়াম হবে, প্রোজেক্ট হবে। কত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ হবে। কিন্তু—

সেই অনেক পাওয়ার আনন্দের ভেতরে একটি দুঃখ থাকবে, শাস্ত্রীজীর মত খাঁটি মানুষ পাবো না। আর পাবো না সেই দুঃখ নিভৃত পল্লীর কুড়ুমের থেকে জলে কাদায় মাটিতে বড় হওয়া আমাদের বড় আপনার মানুষটিকে। পাবো না তাঁকে, যিনি আর পাঁচটা গরীবের ছেলের মত খেলাঘাটের পয়সা দিতে না পেরে নদী সীতেরে স্কুলে যেতেন রোজ।

প্রধানমন্ত্রীর এক অন্তরংগ বন্ধুর মধ্যে শুনছি, কুম্ভমেলায় গিয়ে লাল-বাহাদুরের মা, শ্রীমতী রামদুলারী দেবী মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

—তোমরা আমাকে আমার ছেলের কাছে পেঁছে দাও—

—কি করে তোমার ছেলে?

বলতে পারে না। হয় তো জানেও না তার ছেলে এই বিশাল দেশের রেল ও সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী!

সেই রামদুলারী দেবী আজ দশ নম্বর জনপথ রোডের কোন অন্ধকার গৃহকোণে বসে নিঃশব্দ চোখের জল ফেলছেন। পাশে ললিতা দেবী শোকে স্তম্ভ। হয়তো সব কান্না ফুরিয়ে গেছে। আছে শতবর্ষের বৃদ্ধ কাকা। আছে পুত্র-কন্যারা। আছে—আছে—সব আছে—

নেই শব্দ সেই মানুষটি। একদিন কুম্ভমেলায় মা হারিয়ে গিয়েছিল। আজ ছেলে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে অজানা এক জগতের আর এক মেলায়।

হয়তো স্তম্ভ নিশীথ রাতে শোকা-কুল বৃন্দা জননীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—তোমরা আমাকে আমার ছেলের কাছে নিয়ে চল..

সাধারণে অসাধারণ মাত্রাভী

ভুবনেশ্বরের ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনের সেই দিনটির কথা স্মরণে উপস্থিত কোন সাংবাদিক জীবনে ভুলতে পারবেন না। ক্রান্ত নেহরুজী মাত্র তাঁর আগের দিন চিকিৎসকদের বারণ উপেক্ষা করে পারাদীপ ঘরে এসেছেন। অধিবেশনের সম্মুখে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে প্রস্তাব। দীর্ঘ জটিল পথ পরিক্রমা করে সমাজবাদী সমাজ গড়ার সুস্পষ্ট পথরেখা কংগ্রেসের সম্মুখে। দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা আভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নে নয়, আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের জোটনিরপেক্ষ ভূমিকার বিরোধী। আবার অন্যদিকে বামপন্থী বলে পরিচিত নেতৃবৃন্দ দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনায় মগ্ন। সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সামনে সমস্যার অন্ত নেই।

তারিখটা ঠিক মনে পড়ছে না কিন্তু ছবিটা স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছে। উত্তেজনা মূখর অধিবেশনস্থল। বঙ্গাহীন ভাষায় শ্রদ্ধা প্রথম সারির নেতৃবৃন্দই নয়, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিগণ নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে চলেছেন একের পর এক। ক্রান্ত পন্ডিতজী সুসজ্জিত বিস্তৃত মণ্ডের একদিকে নীরবে বসে আছেন। যেন একটি দৃষ্টি বোধ পরিবারের কর্তা বাড়ির একটি উৎসবের দিনে কিছুটা নিস্পৃহভাবেই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বপালনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছেন। হঠাৎ দেখা গেল নেহরুজীর ক্রান্ত চোখে ক্রান্তির ছায়া। কন্যা ইন্দিরার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি মণ্ড থেকে নেমে এলেন। নেহরুজীকে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হোল। ঠিক তার পরেই মণ্ডে উঠে এলেন শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী—নেহরুজী যে জায়গাটিতে বসেছিলেন তার কাছাকাছি গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

ঠিক সেই মূহুর্তে কথাটা মনে পড়ে নি—কিন্তু পরে মনে হয়েছে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আর একটা পথ-রেখা সেদিনই অলক্ষ্যে রচিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক মণ্ডই শ্রদ্ধা নয়, জীবনের মণ্ড থেকে পৃথিবীর অন্যতম

শ্রেষ্ঠ একজন বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদের বিদায়ের পটভূমিকা রচিত হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকারে, প্রকৃতিতে শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত অথচ

কুসুদ দাশগুপ্ত

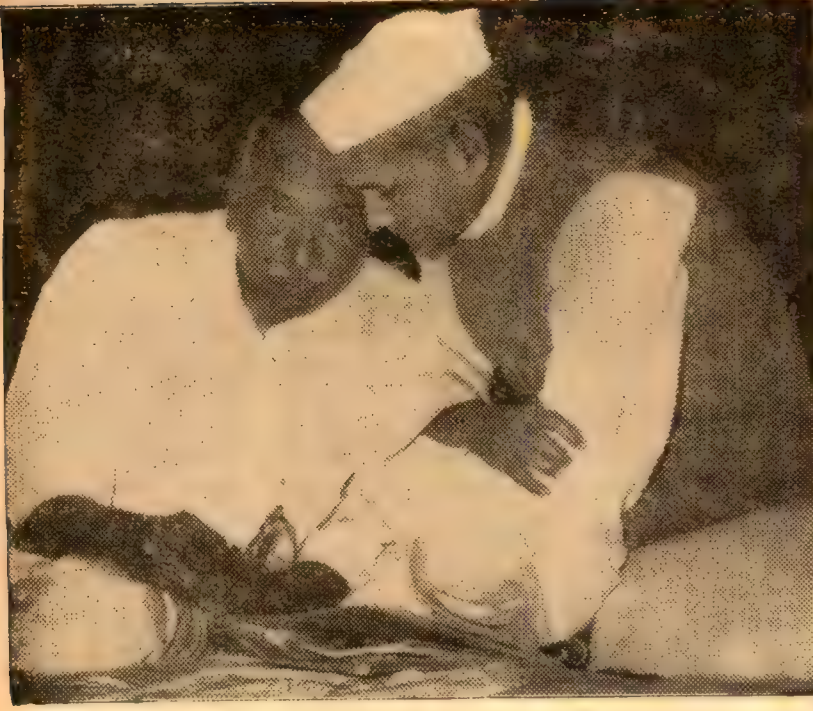
পূর্বসূরীর একান্ত অনুগত নিষ্ঠাবান শিষ্যের জীবনরংগমণ্ডে পাদপীঠের সম্মুখে সারিতে সর্বপ্রথম স্থান গ্রহণ করার পটভূমিকা ইতিহাসের অমোঘ

বিধানে অনেকের অলক্ষিতেই রচিত হয়ে গেল।

অনেকের অলক্ষিতে হলেও সমস্ত ঘটনাটা এবং তার পরিণতি সাংবাদিকদের দৃষ্টি এড়ালো না। বিকেলের দিকে নেহরুজীর 'স্ট্রোকের' সংবাদ একজন সাংবাদিকেরও অজানা রইলো না। পরদিন ওদিকে রাজভবনে নেহরুজী জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধিমুখে। কংগ্রেস অধিবেশনস্থলে একটা বিস্ময় আবহাওয়া। স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল নেহরুজীর জীবনের শেষ দিন ঘনিষ্ঠ



দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে নেহরু, ইন্দিরা ও লালবাহাদুর



দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশনে আলোচনারত শ্রীকামরাজ ও শ্রীশাস্ত্রী

এসেছে। সপ্তে সপ্তে এতদিনের চাপা প্রশ্নটা সামনে এসে হাজির হোল। ভারতের সাংবাদিকদের কাছে এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা বড় হয়ে দেখা দেয়া সত্ত্বেও ঐ আশঙ্কাময় মুহূর্তে সকলেই নীরব রইলেন। কিন্তু বিদেশী সাংবাদিক এবং বিদেশী সংবাদপত্রের ভারতীয় প্রতিনিধিরা নীরব রইলেন না। সেদিন ডুবনেশ্বরের অধিবেশন-স্থলে ক্ষণস্থায়ী তারকেন্দ্র থেকে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে পশ্চিমী জগতে সাংবাদিকদের প্রেরিত ডেসপ্যাচ-গুলোতে নেহরুর উত্তরাধিকারী নিয়ে জল্পনা-কল্পনার বিরাম ছিল না। আর সকলের ডেসপ্যাচেই আরও অনেকের কথা থাকলেও ছোটখাট একটি মানুষ, আচারে-আচরণে-শিক্ষায় যিনি খাঁটি ভারতীয়, চোখ-ধাঁধানো জৌলুস যার কোন দিকেই নাই সেই শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথা সেদিন কোন সাংবাদিকই তাদের ডেসপ্যাচে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে ভুল করেন নি। অথচ সেদিন কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে শাস্ত্রীজী ছিলেন মন্ত্রিসভার বাইরে।

তবু সাংবাদিকদের ধারণা যে ভুল ছিল না তা পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করে। শূদ্ধ সাংবাদিকরা নন, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাস্ত্রীজীর

নেতৃত্বলাভের বিরোধিতা করেছেন তাঁরাও জানতেন মনোনয়নদানের সময় থাকলে হেহরুজী শাস্ত্রীজীরই নাম করে যেতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশও করে গেছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে বৃদ্ধির প্রাথবের দিক থেকে নেতৃত্ব লাভের আরো যোগ্যতর ব্যক্তি থাকতেও শাস্ত্রীজীর কথা নেহরুজীই বা মনে করতেন কেন আর নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচিত সাংবাদিকদেরই বা তাঁর কথা মনে হয়েছে কেন? সে কি শূদ্ধ দলের মধ্যে মতগত পার্থক্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই। এই কেনর উত্তর দিয়ে গিয়েছেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর মাত্র আঠার মাসকাল প্রধানমন্ত্রিত্বের জীবন-ইতিহাসের মধ্য দিয়ে।

আজ একথা উল্লেখ করতে বাধা নেই যে, শাস্ত্রীজীর মনোনয়নে সেদিন সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্নের অন্ত ছিল না। শূদ্ধ আকর্ষিত হোটে মানুষ বলেই নয় তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, তাঁর কাশী বিদ্যাপীঠের শিক্ষা-দীক্ষার পটভূমিকা শূদ্ধ সাধারণ মানুষের কাছেই নয় অনেক উন্নাসিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সামনেও বহু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রধান-মন্ত্রিত্বলাভের পর তাঁর প্রথম কলকাতা

সফরে অন্তত পাশ্চাত্যবঙ্গের সাধারণ মানুষকে তেমন উৎসাহী হতে দেখা যায় না। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস যেতে না যেতেই একেবারেই বিরূপ সমস্যার সামনে তিনি যে সবল নেতৃত্ব দিতে সুরু করলেন তাতে সব শ্বিধা সব আশঙ্কা কেটে গেল। তাই প্রথম সফরের ময়দানের জনসভা আর পাকিস্তানী হামলার মোকাবিলার পর ময়দানের জনসভার আকর্ষিত ও প্রকৃতিতে অত পার্থক্য। তাই এক বৎসর আগে সিনেমা গৃহে দলিল-চিত্রে লালবাহাদুরকে দেখে যে মানুষকে হেসে উঠতে দেখা গিয়েছে এক বৎসর পর সেই মানুষই স্থানকাল ভুলে চিত্রে শাস্ত্রীজীকে দেখে জয়ধ্বনি দিয়েছে— আর আজ আঠার মাস পরেই সেই মানুষের চোখ থেকে দু গুণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। না, আজ আর একটি লোকেরও সন্দেহ নেই নেহরুজীর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সেদিন ভুল হয় নি।

সব-জান্তা বিচক্ষণ-মন্য সাংবাদিকও আজ প্রশংসায় মদুখর। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে কঠোর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবার তাসখন্দ সম্মেলনে সমগ্র ভারতবাসীর চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তির পথ সুগম করে দিয়ে শাস্ত্রীজী আজ প্রতিটি ভারত-বাসীর কাছে প্রথম পদরুম। তাঁর অন্তরংগ বন্ধু ও অগণিত সহকর্মীদের তো বটেই সাংবাদিকদের কাছেও শাস্ত্রী-চরিত্রের অন্যান্য বিশেষ গুণ-গুলো পরিষ্কৃত।

গত আঠার মাস সকালে কর্তব্য-ব্যপদেশে কলকাতার সাংবাদিক হয়েও বারংবার শাস্ত্রী সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমাদের হয়েছে—কখনো-বা ময়দানের সভায় মণ্ড থেকে অনেকটা দূরে, কখনো বা অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে সাংবাদিক বৈঠকে আর কখনো বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনকালে প্রায় তাঁর পাশাপাশি। আজ বারংবার সেই সব ছোট বড় ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ছে। রাজধানী সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে শুনছি শূদ্ধ সংবাদ পরিবেশনেই নয় ভদ্রতার দিক থেকেও শাস্ত্রীজী ছিলেন প্রতিটি সাংবাদিকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিতিতেও আমাদেরও সেই একই অভিজ্ঞতা। দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশনের কথা মনে পড়ে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়ে গেল তবু সর্ব-

সম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। মতভেদ। শেষ বৈঠক শেষ হতে হতে
জোটানিরশেক্তার প্রাঙ্গণে ন্যাকি প্রবল রাত প্রায় বারটা। শীতের রাত—জন-
তিনেক সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের কুটীর প্রাঙ্গণে জন্মায়ত হয়ে আছি। বৈঠক

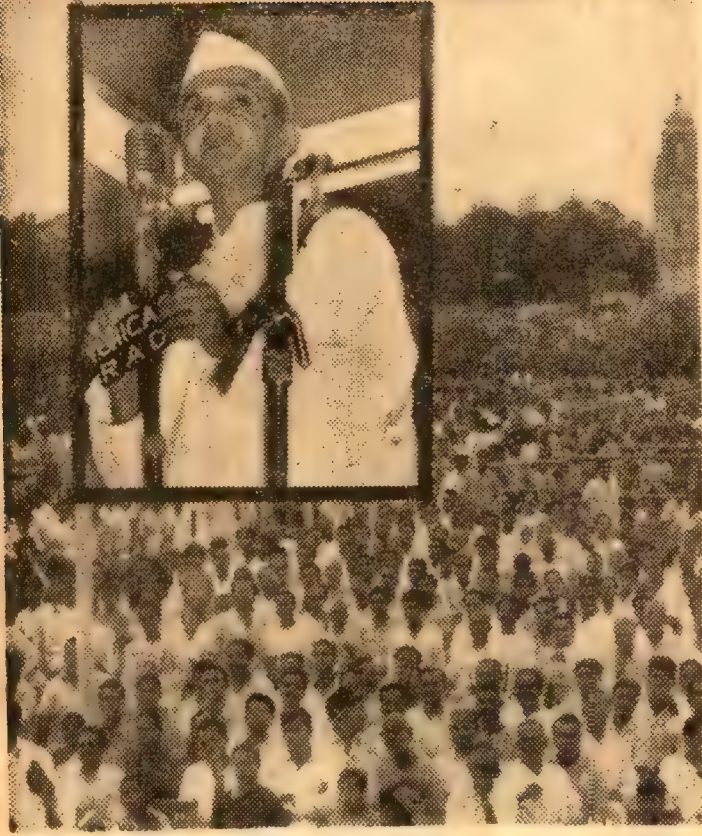


DAKSHIN BANER

প্রতিটি ৫৮ গ্রামের (৫ তোলা)
৩২০০টি সোনার নেকলেস দিয়ে
আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য
শুধুমাত্র একটি ট্যাক কেনা যায়.

দেশের সেবা করুন
স্বর্ঘবত্ত্ব দিন





রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভাষণদানরত শাস্ত্রীজী

শেষে নন্দজীর ঘরের সামনে গিয়ে হাজির সবাই। নন্দজী যিনি সব সময়েই নাকি খুব কর্মজীনকেটিভ তিনিও মুখ খুললেন না—কুটীর প্রাঙ্গণে নবনির্মিত রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছি—ওদিকে শাস্ত্রীজী পায়েচাির করতে করতে ‘ওয়ার্কিং’ কর্মটির বৈঠকের রেশ টেনেই আরো দু-একজন নেতার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। দূরে আমরা লাইন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শাস্ত্রীজী তাঁকিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েই কথা বলতে বলতেই এগিয়ে এলেন। তারপর যদিও খুব বেশি কিছু পাওয়া গেল না তবু ডেসপ্যাচ পাঠানোর মত মালমসলা কিছু জোগাড় হয়ে গেল। আমার মত কলকাতার সাংবাদিকের কাছে এটি নিঃসন্দেহে নতুন উদাহরণ।

রাজভবনে দু-তিনটি সাংবাদিক বৈঠকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি হওয়ার অভিজ্ঞতা নতুন তো বটেই—তাছাড়া শাস্ত্রী চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সে বৈঠকগুলো উজ্জ্বল।

প্রথমেই লক্ষণীয় শাস্ত্রীজীর আন্ত-রিকতা—রাজনীতিজ্ঞের চাতুর্য দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। যতটা সম্ভব খোলাখুলি জবাবই দিয়েছেন। একই বৈঠকে বসে নাগা সমস্যা থেকে সূর্য করে কাম্মীর সমস্যা, খাদ্যসমস্যা, কেরালা কংগ্রেস অন্তর্বির্ভেদ প্রভৃতি জাতীয় জগতস্য আর চীন-পাকিস্তান সহ সমগ্র আন্ত-জাতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠেছে। মুখে হাসিটি নিয়ে ধীরে শান্ত কণ্ঠে প্রায় সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—এমন কি অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নেরও। তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের বিশ্বাস করতেন—কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য অনুরোধ করেছেন তাঁর বক্তব্য সংবাদপত্রে না লিখতে। আর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি সংবাদ-শিকারী সাংবাদিকগণ, যাদের অধিকাংশই সংবাদ প্রকাশের লোভে কোন ন্যায়নীতিই মেনে চলেন না তাঁরাও শাস্ত্রীজীর খোলামনে কথার অপব্যবহার করেন নি। অনেক সময় প্রশ্ন

করলে তিনিই পাষ্টা জিজ্ঞেস করেছেন, —“আপনারা কি বলেন?” এ প্রশ্ন সাংবাদিকদের অপ্রস্তুত করার জন্য নয়। সত্য সত্যই যেন তিনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে জনমতের রায় জানতে চেয়েছেন।

কাশী বিদ্যাপীঠে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং গান্ধী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শাস্ত্রীজী বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক ঘাত-সংঘাত এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা অনুসরণে সমর্থ হবেন না বলে এক ধরনের চিন্তাধারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল—কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শাস্ত্রীজী সেই আশঙ্কা দূর করে দিতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণের পূর্বে নেপাল ছাড়া যিনি আর কোন-দিন বিদেশযাত্রা করেন নি সেই মানুষটি মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রশ্নে সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে ময়দানের লক্ষ লক্ষ জনতার সম্রাধি অভিনন্দনের মধ্যে শাস্ত্রীজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমস্ত জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা, জনগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, দেশের মর্যাদা রক্ষার্থে বজ্রের মতো কঠোর চিন্তে বিনা সন্দেহে সঙ্কল্প গ্রহণের ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়েছি। যতবার শাস্ত্রীজীর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি ততবার তাঁকে মনে হয়েছে সত্যসত্যই তিনি অগণিত দরিদ্র, দীর্ঘদিন বিদেশী শোষণে নিষ্পেষিত এবং আজকের অজস্র সমস্যায় পীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান শাস্ত্রীজী একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ঘরের লোক তেমনি কৈশোর থেকে সূর্য করে জীবনের প্রতিটি দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিকের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধিও করার অধিকার পেয়েছেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল খোলাখুলি আর স্পষ্ট, ম্যার্থহীন—সে বক্তব্য সরাসরি মস্তিষ্ক আর হৃদয়ে প্রবেশ করে।

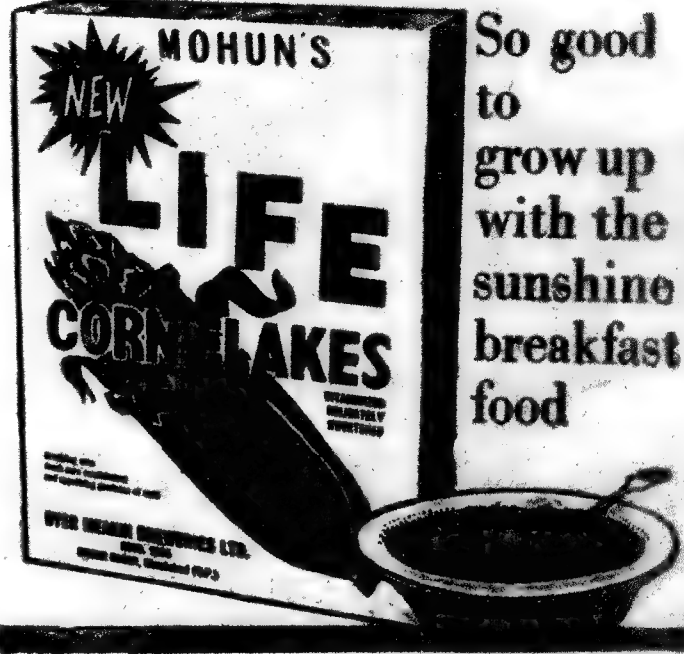
শুধু প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থেকে বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত করা শুধু তাঁর মত্বের কথা ছিল না। দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যখন কংগ্রেসের এক শক্তিশালী অংশ থেকে ভারতের পূর্ব অনুসৃত পথ

ত্যাগ করে পারমাণবিক বোমা তৈরি এবং জোটনিরপেক্ষতা ত্যাগ করার জন্য জোর চাপ এলো, শাস্ত্রীজী তখন তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক ধৈর্যের সঙ্গে অশ্রুচ অতান্ত দৃঢ়ভাবে তা প্রতিহত করলেন। দুর্গাপুর কংগ্রেস অধি-বেশনে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে শাস্ত্রীজী শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। চরম উত্তেজনা মুহূর্তেও চীন আর পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতের যে কোন বৈরিতা নেই—একথা তিনি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই তো দেখি যে মানুষ দীর্ঘদিনের পুরানো দৌর্বল্য ত্যাগ করে লাহোর-শিয়ালকোট অভিমুখে সামরিক বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানানো, সেই মানুষ-ই মুযোগের বিন্দুমাত্র অপচয় না করে তাসখন্দে ঐতিহাসিক শান্তির দলিল রচনা ও তাতে স্বাক্ষর দিলেন।

শান্তির পতাকা বহন করে বিজয়ী বীর ফিরে আসবেন—সমগ্র দেশ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাবে—১০ই জানুয়ারী রাতে তাসখন্দ সম্মেলনের সাক্ষ্যের সংবাদ পেয়ে এই কথাই বারবার মনে হয়েছে। পাকিস্তানের হামলা রোধের পরে মহানগরীর জনতা তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিল মহানগরীর শান্তিকামী বিপ্লবী মানুষ এবার শান্তির বিজয়ী বীরকে বিগড়ান উৎসাহে সম্বর্ধনা জানাবে। কিন্তু মহানগরীর মানুষের সে সৌভাগ্য আর হোল না।

এই মহানগরীর সঙ্গে শাস্ত্রীজীর শেষ স্মৃতি জড়িয়ে রইলো ময়দানে ভারত-পাকিস্তান নেতাজীর মূর্তির সঙ্গে। ২০শে ডিসেম্বরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নিচে ধীর শান্ত অশ্রু উজ্জ্বল উজ্জারিত “জয় হিন্দ” আর “সুভাষচন্দ্রকী জয়” ধ্বনির আর ‘নেতাজীকে’ ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী আখ্যা দেওয়ার মধ্যে শাস্ত্রীজীর শেষ কণ্ঠ এই মহানগরীতে স্মরণীয় হয়ে রইলো। আজো ময়দানের বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপিত হস্ত প্রসারিত

নেতাজীর মূর্তি জাতিকে এগিয়ে চলার “হিন্দ” আর ‘জয় কিষণ’ মন্ত্র মিলিত যে আহ্বান জানাচ্ছেন তার সঙ্গে হয়ে জাতির অগ্রগমনের হস্তক্ষেপ ভারতের আর এক কর্ণধারের “জয় নিঃসন্দেহে আরো দ্রুততর করবে।



মোহনের

“নিউ লাইফ”

কর্ণ ফ্লেবুস



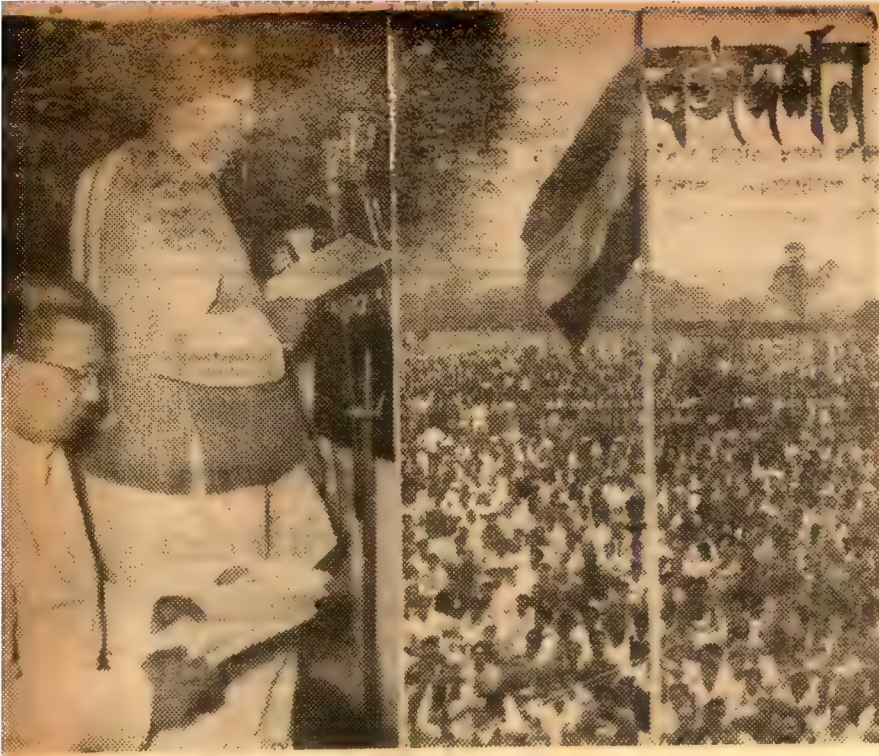
আপনার শিশুকে প্রাতরাশ হিসেবে মোহনের “নিউ লাইফ” কর্নফ্লেবুস খেতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পুষ্টিগুণ অশ্রু লঘু পাক খাদ্য দেওয়া—মজবুত এবং স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ দেহ গড়ে তোলার বাপ-মায়ের সতর্ক যত্নের মতোই বা আবশ্যিক।

১০০ বছরেরও বেশী কালের অভিজ্ঞতাপূর্ণ আমাদের দ্ব্যাবলী
ডায়ার মীকিন ব্রিওয়ারীজ লিঃ

স্থাপিত—১৮৫৫

মোহননগর, গাজিয়াবাদ (ইউ, পি)

OMB-HP-77



ময়দানে শাস্ত্রী-স্মরণ সভা

শোকসন্তপ্ত মহানগরী

ভোর সকালে কলকাতা মহানগরীর গাথে ইতস্তত জটলা। স্তম্ভ জটলা। বিদ্রোহ মূখ। বিস্ফারিত চোখ। একটিমাত্র প্রশ্ন, “কী বলছেন!” একটি মাত্র উত্তর, “বিশ্বাস আমারও হয় নি, কিন্তু তাই শুনছি, উনি নেই!”

অবিশ্বাসী পথচারী থমকে দাঁড়াচ্ছে। তারপর ধীরপায়ে হেঁট-মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আগন্তুক পথচারীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে একই সংবাদ, “উনি নেই। অবিশ্বাস্য, তবু বলছি, উনি নেই!”

যাঁরা ঘুমচোখ ধুতে যাবেন, পাশের ঘাড়ের ব্যারাম থেকে সদ্য জাগরিত প্রতিবেশীর মধ্যে একই দুঃসংবাদ শুনেন ছুটে এসে তাঁরা রেডিওর ঢাবি ঘোরান।

না, অবিশ্বাসের উপায় আর রইল না। অবিশ্বাসী আশাকে প্রচণ্ড আঘাত করে রেডিও ট্রান্সমিটার নতুন ক্রান্ত বৈষণ সূত্রে একই ঘোষণা করে যাচ্ছে: আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি...

স্তম্ভ গৃহকোণ নিঃস্পন্দনের মত শূন্যে। শূন্যে তাসখন্দের ঐতিহাসিক শান্তিচূড়িতে স্বাক্ষর রেখে ভারতের শান্তিদূত প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী বিদায় নিয়েছেন, যাত্রা করেছেন অনন্ত অব্যাহত শান্তির জম্বানে।

এ কী প্রচণ্ড আঘাত, এ কী অবিশ্বাস্য সংবাদ!

জনতা পথের মোড়ে এসে সংবাদ-

নতুন গাড়ি ও হকারের ওপর কাঁপিয়ে পড়ল। বিস্মৃত সংবাদ চাই! ছুটে গেল সংবাদপত্রের অফিসগুলিতেও। বিস্তারিত সংবাদ চাই। যেন আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে দিশাহারা হয়েছে মহানগরী। বিস্মৃত বেশবোধে জানতে চাইছে, যাচাই করতে চাইছে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদকে।

কিন্তু সত্য বড় নিষ্ঠুর। শোকমুগ্ধ স্তম্ভ নগরী অতঃপর নিরুপায় ক্রান্তিতে অর্ধনিমিত জাতীয় পতাকার নিচে হেঁটমুখে মূর্ত গণনা করল অনেক-অনেকক্ষণ। দোকানপাটে ঝাঁপ পড়ল। অফিসে ইন্সকুলে বিজ্ঞাপিত বদলল:

তাঁর সম্মানে শোকসন্তপ্ত নগরী দুদিন অথর্বের মত মূহমান। কাজ কারবার বন্ধ, আমোদ-আহ্লাদ, সিনেমা-থিয়েটারের প্রশ্নই ওঠে না। বিষন্ন কলকাতাও মৃত।

স্মৃতি তখন রোমন্থনের কাজ শুরু করেছে। এই তো সেদিন শাস্ত্রীজী এসে দাঁড়িয়েছিলেন উন্মুক্ত ময়দানে লক্ষ লক্ষ দর্শনাধীর সামনে। বীর ভারতের নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন জওয়ান ভারতের বলিষ্ঠ পরিচালক ক্ষীণদেহী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। সেই মহা সৌভাগ্য। দুই বীর নেতাকে পাশাপাশি অবলোকনের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। নেতাজী ছিলেন না সশরীরে হাজির, ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী। এক বীরের পাশে

অপর বীরকে দেখে মহানগরী কলকাতা যে উল্লাসে উত্তেজনা স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল, ১১ই জানুয়ারী তারই স্মৃতি রোমন্থন করে মহানগরী যেন কিছু বা উত্তাপ সঞ্চার করতে চেয়েছিল।

: এই তো সেদিন তিনি আমাদেরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নানিয়ে ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে।

আশা ছিল, তাসখন্দ থেকে ফিরলে তাঁকে আবার পাবে মহানগরী কলকাতা। তাসখন্দ থেকে তিনি ফিরলেন একেবারে শান্তিবনে। না, নাগরিকগণ আর তাঁকে সশরীরে তাঁদের মধ্যে পাবেন না। তবু তাঁর বলিষ্ঠতা, তাঁর ঐক্য-চিন্তা এবং তাঁর শান্তি-প্রচেষ্টাকে মহানগরী যদি মনেপ্রাণে লালন করতে পারে তবে লালবাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের মধ্যেই থাকবেন: বিশেষ অনুষ্ঠানে নয়, সকল কর্মোদ্যোগের মধ্যেই।

প্রশ্রুত

নাগরিকগণ দলমত নির্বিশেষে ময়দানে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি প্রশ্রুত নিবেদন করতে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার আলোচনায় শাস্ত্রীজীর মহত্বকে উল্লেখ করে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ তাঁর নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, বলিষ্ঠতা এবং সার্থক নেতৃত্বের ইতিহাস স্মরণ করেন। দেশের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার এবং আক্রান্ত দেশকে অভয়মগ্নে উদ্দীপ্ত করে দেশের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার অনন্য যোগ্যতার কথাও স্বীকৃতি লাভ করে নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে। শাস্ত্রীজীর শান্তি-প্রচেষ্টাকেও এই সভা শাস্ত্রীজীর প্রতি প্রশ্রুত নিবেদনের মাধ্যমে স্বীকৃতি জানান।

প্রশ্রুত সভাপনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিনিয়ান চার্চের মাননীয় আচার্যবিশপ। শান্তির জন্য বিনি সংগ্রাম করে গেলেন মাননীয় আর্চবিশপ সেই শান্তিদূত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কলিকাতাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল শ্রীউইলিয়াম কে হিচকক। তিনি প্রেসিডেন্ট জনসনের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি পুনরাবৃত্তি করে বলেন শাস্ত্রীজী ব্যতীত পৃথিবীকে আর সত্যিই ছোট লাগে।

শাস্ত্রীজীর ওদার্য ও সবার প্রতি একান্ত নিরপেক্ষ সমান ব্যবহারের এবং তাঁর সুবিনয়ী হৃদয়তাপ সর্বল চরিত্রের উল্লেখের দ্বারা নেতৃবৃন্দ শাস্ত্রীজীর মহত্বকে পরম ক্ষতি হিসেবে গণন করেন।

কাতারে কাতারে শোকসন্তপ্ত জনতা মিছিল করে সভামঞ্চে প্রবেশ

করতে থাকেন সভার কাজ শূন্য হয়ে যাওয়ার পরও। এবং এই স্তম্ভ জনতার বিষয় মূখে সেদিনকার শোকবিমূঢ় মহানগরীর প্রকৃত বেদনামগ্ন চিত্রটি স্বতঃস্ফূর্ত রূপে পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে।

মনের মানদুৰ

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বাঙালীর কেবলমাত্র প্রিয় নেতাই ছিলেন না, বাঙালীর মনে তিনি অতি আপন জনের আসন অধিকার করেছিলেন। ধৃতি পরিহত অনাড়ম্বর সরল ও প্রত্যয়দৃষ্ট মানদুৰটির মধ্যে বাংলা দেশ খুঁজে পেয়েছিল তার মনের মানদুৰকে। শাস্ত্রীজীর সহজ সাদাসিধে সারল্যের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল বাংলার মাটির মানদুৰের আদর্শ। তাঁর বিনম্র মাধুর্য ও আত্মমৰ্যাদাবোধ এবং দেশ-প্রীতি, তার মহৎ আত্মত্যাগের প্রভূত পরিচয় বাংলার আত্মত্যাগী নেতাদের স্মৃতিকেই স্মরণ করায়। নিজেকে দেশের জন্য দেশের জন্য এমন করে বিলিয়ে দেওয়ার, এমন আত্মোৎসর্গের ও নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বাংলা-দেশ যারই মধ্যে পেয়েছে—তাকেই অন্তরের একান্ত আপনজন করে বরণ করে নিয়েছে। শাস্ত্রীজীও তাঁর বিরাট মহৎ ব্যক্তিত্বের দ্বারা বাংলা দেশের হৃদয় জয় করেছিলেন।

বাঙালীর পক্ষে তাকে হারানোর বেদনা পরমাশ্রয়ী বিরোগ-ব্যথার মতই একান্ত আন্তরিক। প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর এবং মানদুৰ লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর মধ্যে এই সাধারণ ও অসাধারণ দৃষ্টি রূপই বাঙালীকে মূগ্ধ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাই শাস্ত্রী-বিরোগজনিত ব্যথা একান্ত তীব্র ও মর্মস্পর্শী। বিশেষ ভাবাবেগ বাঙালীর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য; আবার যুক্তি ধৈর্য তীক্ষ্ণতা, বিচক্ষণ যুক্তি-বাদিতা, একান্ত শান্তিপ্রিয়তা ও দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে সর্বদা প্রস্তুতি বাংলার ভিজে শ্যামল উর্বর মাটিরই গুণ। আর এ সমস্ত গুণেরই অপূর্ব আনুপাতিক সমাহারে শাস্ত্রীজী বাঙালীর প্রিয় নেতার আসনটি সহজেই দখল করেছিলেন।

শান্ত দেশপ্রেমী স্থিতধী নেতা শাস্ত্রীজীকে হারানোর আঘাত বাংলা দেশের পক্ষে আজ প্রচণ্ড এবং অসহনীয় হয়েছে।

বাঙালী তার একান্ত আপন আদর্শপুত্রকে হারিয়েছে।

জননী ললিতাদেবী

বাংলার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ শ্রীমতী

শাস্ত্রীর কাছে তাঁদের গভীর সমবেদনার বাদী পাঠিয়েছেন, শাস্ত্রীজীর মহান কীর্তির কথা স্মরণ করা হয়েছে তার মধ্যে।

শ্রীমতী শাস্ত্রী। জননী ললিতা, বাংলা দেশে আজ আর একটি নাম,

যে নাম বাঙালীর হৃদয়কে মগ্নিত করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জননী ললিতার বিমাদবাকুল চিত্রের দিকে তাকিয়ে গোটা বাংলা দেশ (পশ্চিম বঙ্গ, কেন না পূর্ব বঙ্গের নাম আজ পূর্ব পাকিস্তান) রুদ্ধবাক এবং স্থির

যাক একে দাঁত
আর সুন্দর হাসি

সাদনা দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ.আম্বুর্বেদ্যাস্ত্রী, এফ.সি.এস(লণ্ডন),
এম.সি.এস(আমেরিকান) ডাঙলপুর কলেজের ব্রহ্মায়ন্যাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ লক্ষ্মীচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস(কলিকাতা) আম্বুর্বেদ্যাস্ত্রী

হয়ে গেছে। জননী ললিতার শূন্যতা-
বোধ বাঙালীর নরম হৃদয়ে মরুভূমির
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

ললিতা দেবীর মধ্যেই (বর্তমান-
কালে) বাংলা দেশ দেখতে পেরেছিল
তার ভাবজগতের গোটা মায়ের রূপ :
সেই স্বামীপুত্র গর্বে সুখী বিনম্র
সলাজ লক্ষ্মীস্বরূপিণী; সেই দারিদ্র্যে,
অজস্রতায় সমান সাহস, সমরূপ পরি-
তৃপ্তা শান্তি প্রবাহিনী; সেই পরিশুদ্ধ
পবিত্রতায় কল্যাণময়ী মতিমতী
প্রেরণা; একধারে জননী জন্মভূমি।

জননী ললিতাদেবী বাংলার মর্ম-
মূলকে স্পর্শ করেছেন। প্রতিটি
পরিবার ললিতা দেবীর বেদনাকে অতি
একান্ত নির্বিড়ভাবে অনুভব করছেন
আজ।

“আমার আদর কেউ রইল না!”
পরিপূর্ণ ললিতা দেবীর এই আক্ষে-
পোক্তি বাংলা দেশের বড় পরিচিত বড়
ঘরোয়া বেদনা। আর বাঙালী জানে,
এই মহৎ বেদনার প্রকৃত সাক্ষ্য নেই।

জননী গো! সঙ্কমা জনাবার ভাষা
সত্যিই নেই। তোমার সেই লক্ষ্মী-
স্বরূপিণী রাঙা আভরণ মুছে ফেলে
যখন তুমি আমাদের সামনে এসে
দাঁড়ালে তখন আমরা মুক, আমরা চোখ
তুলে তোমার সেই রক্ততাকে দেখবার
ক্ষমতাও রাখি না। বেদনায় নতদৃষ্টি।

তবু বলব, তোমার মত পরিপূর্ণ
আর কে আছেন। তুমি সংহত হও!
তোমাকে ঘিষে রইল তোমার কোটি
কোটি সন্তান। যাদের মধ্যে অনেকেই
আজ বড় অবদর, বড় বিপথগামী।
প্রধানমন্ত্রীর যে শিক্ষা, যে মহৎ শৃঙ্খা-
চারী ত্যাগদর্শে ওতপ্রোত তুমি
সার্থক সহধর্মিণী; মাগো, তোমার
সন্তানের মধ্যে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা
দাও; প্রতিষ্ঠা দাও অবদর সন্তানের
মনেও।

সাগর তীর্থ

সব তীর্থ বার বার, গঙ্গা সাগর
একবার! সেই একটি দিনে, মকর
সংক্রান্তিতে সহস্র পুণ্যসঙ্ঘের সুযোগ
যাঁরা গ্রহণ করতে উন্মুখ, দলে দলে সেই
সব স্বনাথশ্রী গিয়ে পুণ্যস্থান সেরে
এলেন সাগর-সঙ্গমে। কচুবোড়িয়া
থেকে কপিলমুনির পুণ্যশ্রম জনসমুদ্রে
অবগাহন করেছে। পুণ্য সঙ্ঘের এ
এক সমারোহ।

ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ চলে। আগে
রাজকোষে তীর্থ-কর থেকে বেশ মোটা
টাকাও আসত, গত বছর থেকে সেই

তীর্থ কুড়ানি অবশ্য আর নেই। বান-
বাহনের সুবিধা-সুযোগও সাগর-সঙ্গমে
পুণ্যালোভীদের ক্রেশ হ্রাস করেছে।
কিন্তু কলোরাডি উপসর্গ বধাপূর্বক।
একদিনের জন্য একটা লোকালয়
পুণ্যে অধিকতর সুব্যবস্থা অসম্ভব।
ভিড়ের চাপে মৃত্যু ও হারানো-প্রাপ্তি-
নিরুদ্দেশ্য অপ্রতিরোধ্য।

হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই-
ভাবেই পুণ্যলাভ করে এসেছে ও
আসছেন। পুণ্যলাভের এমত বিচার
সব ‘সট কাট’, মানুষের বিশিষ্ট
আবিষ্কার। তর্কাতীত সে ক্ষয়ক্ষতি,
লাভ সঙ্ঘ।

যাঁরা সাগর-সঙ্গমে পুণ্যলাভের
ঝুঁকি নিতে অক্ষম হয়েছেন, তাঁরা
পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগাহন করে এবং
ভেলা ভাসিয়ে নিজেদের মহৎ বশুনার
হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু
সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হওয়ার আনন্দ
আকর্ষণ, দুর্দর্শা দুর্ভোগ, কোনটারই
ফলভাগী হতে পারেন নি।

সাগরতীর্থের সেটুকু লাভ এবং
লোকসান বাস্তবিক গণনীয়।

ভারত-বিরাগ

রাজ্য বিধান পরিষদে ইংরাজের
ভারত-বিরাগ সম্পর্কে একই সভায়
কয়েক দফা অভিযোগ উত্থাপিত
হয়েছিল।

এক। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর প্রয়াণে
যুক্তরাজ্যে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়
নি।

দুই। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের
ওপর বিনা কারণে অত্যাচারের সংবাদ।

এবং পূর্বসূত্র অনুসারে ঐ সভায়
স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীট সম্পর্কে আলো-
চনায়ও ইংরাজ মালিকের সাম্প্রতিক
ভারত-বিশ্ববৈষম্যের কথাই স্মরণ হয় এবং
তিনি যে পরিষদ অবমাননার ভুল্য কাজ
করেছেন এ সম্পর্কেও অভিযোগের
ওপর ঐ দিনই মাননীয় পরিষদ সভা-
পতি রুলিং দান করেন।

সমগ্র বিশ্ববাসী যখন একবাক্যে
লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে মহান ব্যক্তি
বলে প্রশংসা নিবেদন করেছেন, তখন
কে কোথায় আপন বিরাগে কতবো
ভুল করল তা নিম্নে মাথা বামাতেও
লজ্জা। মাননীয়কে মর্যাদা দানের
মধ্যে নিজের মর্যাদাই বৃদ্ধি পায়,
একথা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বোধশক্তি
জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভা

মানুষ শিখে থাকে। বৃটেনকে আমরা
পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য জাতি বলেই
জানি ও গণনা করি। তবে মতিভ্রম
বলেও একটা রোগ বিশেষের অস্তিত্ব
আছে, যা জ্ঞানী-গুণী সভ্য-অসভ্য
যে কোন মানুষকেই সময় বিশেষে
আক্রমণ করতে পারে। আজ যদি
সূর্য-না-ডোবা সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক
চাতুরীও ভরাডুবি হচ্ছে ভেবে ‘সম্মতি’
মর্যাদায় আঘাত লেগে থাকে ও
তজ্জনিত কিছু মতিভ্রম দেখা দিয়েই
থাকে তবে সেজন্য দুনিয়ার সভ্য
মানুষ ব্যাপারটাকে ‘তুটিয়ে বৃতিয়ে’
মানিয়ে নেবেন। অমন একটু-আধটু
হয়। জমিদারি যাওয়া আর জমিদারি
মেজাজ যাওয়া এক কথা নয়। এক
যার তো আর এক আঁকড়ে থাকতে চায়
মোহের বশবশত। আর সে বাঁধন বড়ই
কঠিন বাঁধন। তার পিছ টানও
সাংঘাতিক। ও রোগ ক্রিমির মতো।
আপনার পেটে বাস করে আপনাকেই
ধ্বংস করবে। অথচ ক্রিমি সম্পর্কে
কি আর করণীয় আছে। একমাত্র
উপায়, ভুক্তভোগী যদি সময় থাকতে
চিকিৎসা করান তবে আত্মের সুফল
পাবেন।

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর
নির্ঘাতন অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিরাগের
কারণ। রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন,
ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সর-
কারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

খুব ভালো কথা। আসলে ওই
ব্যাপারটাও কেন্দ্রীয় সরকারেরই
বিষয়। তবে ভারতের নাগরিক হিসেবে
বহির্দেশে ভারতীয়গণের নিরাপত্তা
রক্ষার দাবি ভারতীয় মাত্রেই উত্থাপন
করবেন। আর সরকারকেও সে বিষয়ে
সর্বপ্রথম গ্রহণ করতেই হবে। এজন্য
আমাদের মনে যথার্থ প্রশ্ন ও বিক্ষোভ
জাগবেই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এ সব গুরু-
তর ব্যাপারের আলোচনা সংসদের সঙ্গে
করাই বাঞ্ছনীয় কেন না, এসব
প্রস্তাবের একটা আন্তর্জাতিক প্রতি-
ক্রিয়া আছে।

ব্যাপারটাই যখন আন্তর্জাতিক
(বৃটেন-ভারত সম্পর্কে) তখন আন্ত-
র্জাতিক প্রশ্ন তো থাকবেই। সেজন্য
সংসদী ভাষণ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সেই
সঙ্গে এটাও অনস্বীকার্য যে এজাতীয়
ব্যাপার জাতীয়-সমস্যায় চেয়ে বড় বৈ-
ছোট নয়। আর এ সম্পর্কে
আমাদের সচেতন থাকার দরকার
সম্মতিক। কারণ বহির্ভারতে ভারতীয়-
দের নিরাপত্তাবিধান শুধুমাত্র

সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রশ্নই হাজির করে না, তার সঙ্গে বিজড়িত থাকে জাতির মর্যাদার প্রশ্নও। সুতরাং প্রশ্নটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীন সলিলে

কলকাতা মেট্রোপলিটান জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা কর্তৃপক্ষ সংস্থা বিলাটি বিধানসভায় অনুমোদিত হয়ে গেলে ব্যাপারটিকে কংগ্রেস সহ অধিকাংশ কাউন্সিলারই সরকার কর্তৃক স্বায়ত্ত শাসিত কর্পোরেশনের ক্ষমতা দখলের অভূতপূর্ব নজির রূপে বর্ণনা করেন ও তাঁর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, সরকার এইভাবে কর্পোরেশন (কলকাতা-হাওড়া) এবং বহিরাংশ পৌরপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকার করলেন। এর পর আর তাঁদের কাউন্সিলারপদ অলঙ্কৃত করে থাকার কোন মানে হয় না। পদত্যাগ করাই উচিত। পৌর কল্যাণ রুক ও ইউ সি সি সঙ্গে সঙ্গে 'টোপ' ধরে ফেলে বলেছেন, বহুত আচ্ছা, কংগ্রেসী সদস্যগণ পদত্যাগ করে পথ প্রদর্শন করুন!

তা করুন তারা। তবে তেমন সম্ভাবনা কম। কর্পোরেশন জায়গাটি মন্ত্রিসভার চেয়ে এবং আইনসভা অপেক্ষা সাধারণ জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনেক বেশি মধুর। মন্ত্রিসভার দায়-দায়িত্বের চাপ তবু কিছু থাকে। আইনসভার সদস্যদের দৃষ্টির কথা বলতে হয়, শুনতে হয়। কিন্তু একবার কর্পোরেশন পৌরপ্রতিষ্ঠান জমাতে পারলে অমন নির্ভাবনার আশ্রয় আর নেই। সুতরাং যে দেশে মন্ত্রিসভা বা আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করতেই স্বাসকষ্ট ওঠে, সে দেশে কর্পোরেশনী মোচাক ত্যাগের সিদ্ধান্ত যে বেশি দূর গড়াবে না তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে একদল কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগের প্রস্তাবে জোর সমর্থন জানিয়েছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে প্রকাশ, প্রভাবশালী সদস্যরা এ বিষয়ে বেশ সাড়া দিচ্ছেন বলে জানা যায় নি। এ সম্পর্কে একটি দলীয় সভা ডাকার পরিকল্পনা আছে। আলোচ্য বিলাটি সম্পূর্ণ বাতিল করার দাবি প্রস্তাবের আকারে গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল এ্যাসোসিয়েশন এবং বিলের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নদাবাচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন কলকাতা পৌরসভা। মেয়র স্বয়ং দাবি করেছেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করার পর সেটি পরিচালনার দায়িত্ব পৌরসভার ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

কংগ্রেসী সদস্য শ্রীগণপতি সুর ও বিনয় ব্যানার্জি বলেছেন, এই বিল কার্যকরী হওয়ার পর মর্যাদার মাড়ে অতিরিক্ত করভার চেপে বসবে।

বিলের দ্বারা শহর থেকে বাঙালী বিতাড়নের চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, পৌর কল্যাণ রকের নেতা ও ইউ সি সি-র সম্পাদক।

এদের যুক্তিতে অনেক সত্যই আছে বা অনস্বীকার্য। ভয়-ভাবনার কথাও কম নেই।

কিন্তু সব চেয়ে বড় সত্য হল, এই বিলের পথ প্রশস্ত করেছেন কারা, সেই প্রশ্ন।

বলা বাহুল্য, কর্পোরেশনগুলির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একান্ত ব্যর্থতা ও সমস্যাকে দিনে দিনে জটিলতর করে তোলার দায়িত্ব পৌরপিতারা আজ অস্বীকার করতে পারে না কোনো-ক্রমেই।

পরিপ্লুত জলের, জল নিকাশ ব্যবস্থার ও জল সরবরাহের গুরুদায়িত্ব এতকাল তারা পালন করতে ব্যর্থতাই প্রকাশ করে এসেছেন। অথচ ঐ তিনটি অপরিহার্য বিষয়ে আশু দৃষ্টিদান করা না হলে বৃহত্তর কলকাতায় সমূহ বিপদ কেবলমাত্র স্বরান্বিতই হবে। তাছাড়া বৃহত্তর কলকাতার সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে

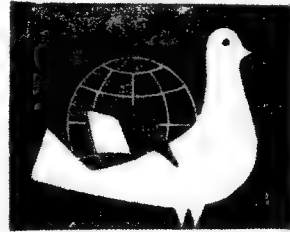
বিভিন্ন দায়িত্বশীল পৌর-প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে না দিয়ে একটি সংস্থার ওপরই পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা স্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর।

এজন্য পৌরসংস্থা ও কর্পোরেশনগুলির ক্ষমতা কিছু খর্বিত হল বটে; এবং ডেপুটি মেয়র শ্রীমাহিরলাল গাঙ্গুলী যেমন বলেছেন, প্রতিদিন নাগরিকরা তাঁদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে পৌর-প্রতিনিধিদের কাছে আসেন। এরপর তাঁদের কাছে কোন জবাব থাকবে।

জবাব কিস্তিকালেও কোনো নাগরিক পেয়েছেন কিনা (অর্থাত্ যথার্থ অভিযোগের আশু প্রতিকার) এ কথা অনেকেরই জানা নেই। কর্পোরেশন সম্পর্কে নাগরিকগণের মনে অসন্তোষ এবং অভিযোগই বরং পর্বত প্রমাণ। কদাচিৎ তার প্রতিকার সম্ভব হয়। হলে সেটা বিচিত্র ব্যাপার

সুতরাং আজ দৃষ্ট কাল লাভ নেই।

এমত ব্যবস্থার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের অক্ষমতাই প্রধানত দায়ী। এখন স্বাধীন সলিলে নিমজ্জিত হয়ে খড়-কুটো ভিন্ন অন্য সাহায্য কি লাভ হবে!



বিনামূল্যে উপহার সোভিয়েত দেশ

রুশ-ভারত মৈত্রীর সচিব পার্শ্বক পঠিকা পড়ুন ও গ্রাহক হোন
তিন বৎসরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সনের একখানা সাত পৃষ্ঠার সচিব পঠিকা হইবে।

আজই তিন বৎসরের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে পাঠান। চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে একখানা ক্যালেন্ডার ও পুস্তিকা উপহার পাঠান হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন ৩১-৩-৬৬ (ইংরেজী) পর্যন্ত কনসেশন হার চালু থাকিবে।

এক বছরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সালের একখানা ক্যালেন্ডার পাঠান হইবে।

চাঁদার হার	এক বছর	তিন বছর
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়	— টা ৫'০০	টা ১০'০০
ইংরেজী ভাষায়	— টা ৬'০০	টা ১২'০০

—: নীচের ঠিকানায় মণিঅর্ডার পাঠাইবেন :—

‘সোভিয়েত দেশ’

১/১, উড স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬।

উপহাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দ্বাদশ ॥

ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা।

অমলা মূখ ভার করে বললেন,
'আজ আবার এত দেরি করলি, উনি
তো রাগারাগি করছেন।'

'কে, বাবা?'

অমলা বললেন, 'আবার কে?
আমার হয়েছে মহা জ্বালা। যে যার
খুশিমত চলবে। কৈফিয়ৎ দিয়ে
মরতে হবে আমাকে। আমি আর এ
সব পারব না বাপু। আমাকে তোমরা
অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে
দাও।'

স্বাতী বলল, 'বাবা বুঝি আজ
খুব রাগ করেছেন? কিন্তু তুমি কি
সত্যিই অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে
পারবে মা? একদিনও পারবে?'

অমলা বললেন, 'পারব না জেনেই
তো তোমাদের সবায়ের অত্যাচার।'

সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সঙ্গে দেখা
করল না স্বাতী। খানিকক্ষণ তাকে
এড়িয়ে এড়িয়ে রইল।

কিন্তু খাবার টেবিলে আর এড়াতে
পারল না। বাবা একা খেতে ভাল-
বাসেন না। ছেলেমেয়েকে নিয়ে গল্প
করতে করতে খাওয়া এবং খাওয়ার
টেবিলেই সংসারের ছোট বড় যাবতীয়
সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা মিঃ
সোমের বহু দিনের বিলাস। এ
ব্যবস্থার ব্যতিক্রম তিনি সহ্য করতে
পারেন না।

তাই স্বাতী খাবার টেবিলে উপস্থিত
না থেকে পারল না। তিনি ডাকডাকি
শুরু করলেন। ফলে স্বাতী যেতে
বাধ্য হল। একটু দূরে সরে বসতে
চেষ্টা করল কিন্তু মিঃ সোম তাকে ডেকে
সামনে বসালেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেয়ে
চললেন মিঃ সোম। ধারণধারণ দেখে
মনে হল না তিনি কিছু বলবেন।

অমলা একবার জিজ্ঞাসা করলেন,
'মাংসটা কেমন হয়েছে?'

মিঃ সোম বললেন, 'ভাল।'

অমলা একটু হেসে বললেন,
'ভাল হলেই ভাল। যেভাবে খাচ্ছিল
তাতে—'

বাবলু বলল, 'রান্না খারাপ হলে
বাবা কি এত শান্তভাবে খেতেন নাকি
মা? তুমি বাবাকে আর একটু দাও
মা।'

হেসে বললেন, 'বুঝিছ।' তারপর
ছেলের পাতে আরো খানিকটা মাংস
ঢেলে দিলেন।

স্বাতী নিজের মনে খেয়ে যাচ্ছিল
হঠাৎ মিঃ সোম বললেন, 'স্বাতী
তোমাকে একটা কথা বলব।'

'স্বাতী মূখ তুলে বলল, 'বলো।'

'তোমরা এখন বড় হয়েছ। ভাল-

মন্দ বুঝতে শিখেছ। চাল-চলন
সম্বন্ধে তোমাকে নতুন করে কিছু
বলতে হবে তা আমি ভাবি নি।'

স্বাতী চুপ করে থেকে বলল,
'হঠাৎ আজ এমন কী হল—'

মিঃ সোম বললেন, 'শুরু আজই
নয়, আমি ক'দিন ধরেই ব্যাপারটা
তোমাকে বলব বলব ভাবছি।'

অমলা আলোচনা এখনকার মত
বন্ধ রাখবার জন্যে বললেন, 'ওসব কথা
পরে হবে। তোমরা আগে খেয়ে ওঠো।
বাবলু অমন হাঁ করে বসে রয়োঁছিস
কেন! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।'

বাবলু বলল, 'আমাকে তাড়া দিতে
হবে না। আমি তো তাড়াতাড়িই
খাচ্ছি।'

ছোট ভাইয়ের সামনে মেয়েকে যে
বেশি কিছু বলা উচিত নয় স্বামীর

দিকে তাকিয়ে সেই ইঙ্গিত করলেন
অমলা।

কিন্তু মিঃ সোম যেন তা দেখেও
দেখলেন না। কি স্ত্রীর অনুশাসন
গ্রাহ্য করলেন না।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,
'তোমাকে বলা দরকার তাই বলছি।'

স্বাতী বলল, 'বলো।'

'হিমাংশু না কি ওই ছেলেটোর
সঙ্গে তোমার যেখানে-সেখানে যখন-
তখন ঘুরে বেড়ানোটা মোটেই শোভন
নয়।'

এমন সরাসরি ভাষায় বিশেষ করে
ছোট ভাইয়ের সামনে বাবা তাকে শাসন
শুরু করবেন স্বাতী ভাবতে পারে নি।
অবশ্য বাবা একবার বলতে শুরু করলে
ওঁর কান্ডজ্ঞান থাকে না। ঘরে কে
আছে না আছে তা যেন তাঁর একেবারেই
খেয়াল থাকে না। কেউ খেয়াল করিয়ে
দিলেও বিরক্ত হন। কি গ্রাহ্য করতে
চান না।

অমলা ছেলের দিকে তাকিয়ে
বললেন, 'তোমরা তো খাওয়া হয়ে গেছে
বাবলু, তুই এবার যা। মূখ হাত
ধুয়ে নে।'

বাবলুর উঠবার তেমন ইচ্ছা ছিল
না। দ্বিধা বকুনি খেতে দেখেই সে
মজা পাচ্ছিল। কিন্তু মায়ের ধমকে
শেষ পর্যন্ত তাকে উঠে পড়তেই হল।
স্বাতী প্রথমে কিছুক্ষণ কোন
প্রতিবাদ করল না। বাবাকে বলে যেতে
দিল।

তারপর আস্তে আস্তে বলল,
'বাবা, হিমাংশুর সঙ্গে আমার আলাপ-
পরিচয় এই নতুন নয়। আমরা অনেক-
দিন এক সঙ্গে পড়ছি। তা ছাড়া

তোমাদের সঙ্গেও ওর যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে।

মিঃ সোম বললেন, 'পরিচয় থাকলেই তুই এত রাত পর্যন্ত ওর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরতে পারিস নে। লোকে কি বলে।'

স্বাতী বলল, 'সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মিঃ সোম চটে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। যতদিন তুমি আমার কাছে আছ তোমার জন্যে আমি না ভেবে পারি নে। সমাজে আমার মান-সম্মানের কথাও তোমার ভেবে দেখা উচিত।'

স্বাতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার যাতে অসম্মান হয় এমন কাজ আমি করব না। বাজে লোকের বাজে কথায় তুমি কান দেবে না এটুকু আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।'

আর কিছু না বলে স্বাতী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ সোম তাঁর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কিন্তু স্বিতীয় কোন কথা আর বললেন না।

আরো রাতে শোয়ার সময় অমলা এসে বসলেন মেয়ের কাছে। স্বাতীর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'রাগ করিস নে। আমরা যা বলি তোর ভালোর জন্যেই বলি।'

স্বাতী বলল, 'কিন্তু ও যখন প্রথম এ বাড়িতে আসে, আমি তো ওকে তেমন আমলই দিই নি। তোমরাই বরং তখন—'

অমলা বললেন, 'তখন কি আর জানতাম? ভেবেছিলাম ভালো ছেলে বাড়ির অস্থায়ী ভাল। বংশটংশও ভাল। এখন তো নানা রকম কথা ওর সম্বন্ধে শুনছি।'

বন্দুর নিন্দায় নিশ্চয় স্বাতী আহত হল। প্রতিবাদ করে বলল, 'বাজে লোকে কত বাজে কথা বলে বেড়ায় তার সবই কি সত্যি হয় মা? সব কথাই কানে দিতে হয়?'

অমলা বললেন, 'সত্যি না হলেই ভালো মা।'

স্বাতী বলল, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আজ আমি ওদের অফিস দেখে এসেছি।'

'কিসের অফিস?'

'কিসের তা ঠিক ভাল করে বুঝতে পারি নি। তবে নানা রকম ব্যাপারই আছে। ওর এক বন্ধু আছেন অংশীদার, মনে হল তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে।'

অমলা বললেন, 'থাকলেই ভাল বাছ। কাজকর্ম নিয়ে থাকলে মানুস

ভালো থাকে। অফিস না হয় হল ব্যবসা-বাণিজ্যও না হয় হল। কিন্তু তাই বলেই কি তুই ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারিস? কথাটথা পেলি কিছু?'

স্বাতী একটু আরক্ত হয়ে থেকে বলল, 'সে জন্যে ভেব না মা। যখন যা হয় তোমাকে জানাব। তুমি ভেব না।'

শেষ পর্যন্ত বাবার কাছ থেকে হিম্মতদেবের অফিসে যাওয়ার অনুমতি পেল স্বাতী। প্রথমে তিনি একটু আপত্তি করেছিলেন। 'জানা নেই শোনা নেই কী ধরনের অফিস কিছু বুঝতেই পারলাম না।'

স্বাতী বলল, 'ক্রমে সবই জানতে পারব বাবা। যদি ভাল না লাগে তবে তো চলেই আসব। এমন তো বাধ্য-বাধকতা কিছু নেই যে ভাল না লাগলেও থাকতে হবে, ভাল ব্যবহার না পেলেও ওখানে আটকে থাকতে হবে।'

মিঃ সোম কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন তারপর বললেন, 'বেশ দেখ গিয়ে কি রকম লাগে। তবে একটা কথা। যতক্ষণ থাকবে অফিসেই থাকবে। বাইরে ঘোরাঘুরি চলবে না। আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। সমস্যার আগে আগেই চলে আসবে। নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে। যদি অসঙ্গত কিছু করো নিজেই বিপদে পড়বে। ভাল-মন্দ বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে।'

স্বাতী বুঝতে পারল তাকে অফিসে যেতে দেওয়ার ইচ্ছা বাবার হয়তো তেমন ছিল না। কিন্তু পাছে স্বাতী অবাধ্য হয় তাই একেবারে না করবার ভরসা পেলেন না।

তাকে যে নিম্নরাজ্য করতে পেরেছে স্বাতী আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট মনে করল।

সেদিন শ্রুদ্দ ফার্নিচার দেখে এসেছিল দিন দুই পরে গিয়ে আরো কিছু লোকজনও দেখল। একজন মোড়ি

টাইপিস্টও এসেছে। টেলিফোন এলে সেই ডেকে দেবে। নাম রাণা রায়। মোটামুটি সুশ্রী চেহারা। প্রভাস তাকে ডেকে স্বাতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

আলাদা ঘরে স্বাতীর বসবার ব্যবস্থা। টেবিল চেয়ারে সাজানো ঘর। কাগজ চাপা, কলমদানির কিছুদ্রই অভাব নেই। কিন্তু কাজ কোথায়? স্বাতী কি শ্রুদ্দ খালি ঘর পাহারা দেবার জন্যে এসেছে?

প্রভাস এসে হেসে বলল, 'কেমন আপনার ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

স্বাতী বলল, 'তা তো হয়েছে। কিন্তু কাজ কোথায়? চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া তো আমি কোথাও কাজ দেখছি নে।'

হিম্মতদেব বলল, 'কাজ কাজ করে স্বাতী অস্থির হয়ে পড়ছে। ওকে ভারী রকমের কাজের বোঝাই চাপিয়ে দাও দেখি।'

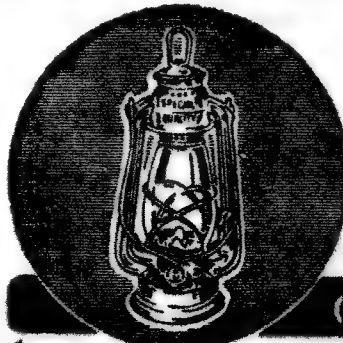
প্রভাস হেসে বলল, 'কলমপেশা তো ডিরেক্টরের কাজ নয়। তার জন্যে কেরানীরা আছে। যখনই দরকার হবে আমরা আপনার পরামর্শ নেব। সেই হবে আপনার কাজ।'

'শ্রুদ্দ পরামর্শ দেওয়া?'

প্রভাস হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সুপরামর্শ দেওয়া। সে বড় সহজ কাজ বলে মনে করবেন না। ভাববেন না মিস সোম, কাজ আসছে।'

দুই বন্দুর মধ্যে কি যেন পরামর্শ চলে। তারপর দরকারি কাজে কখনো একা প্রভাস কখনো বা দুজনেই বেরিয়ে পড়ে। তারপর ফিরে এসে স্বাতীর ঘরে জড়ো হয়। চা চলে, গল্প চলে, হাসি ঠাট্টা চলে।

সময়টা ভালই কাটে স্বাতীর। কিন্তু মাঝে মাঝে অবাধ হয়ে ভাবে এদের এই বিরাট স্টাবলিসমেন্ট চলে কি করে? কতদিন এরা এভাবে চালাতে পারবে? [ক্রমশঃ]



কিষাণ
লঠন
নবোৎকৃষ্ট

(গৌর মোহন দাস এডুকো)

ফোন-২২-৬৫৮০

২০৬, ৩৬ চীনা বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১

মৃত্যুঞ্জয় নান বাহাদুর শাস্ত্রী

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুতে দেশবাসী স্তম্ভিত। তাসখন্দে ঐতিহাসিক পাক-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরের পর সমগ্র দেশ যখন শ্রীশাস্ত্রীকে বিজয়ী বীরের সম্বন্ধনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন এল তার মহাপ্রয়াণের মর্মাক্তিক সংবাদ।

উনিশ মাসের মত লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শাস্ত্রী অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নেহরুর মৃত্যুর পর দেশে-বিদেশে সর্বত্র এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, নেহরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া যাবে না—উপযুক্ত নেতার অভাবে এই বিরাট দেশে গণতন্ত্র ভেঙে পড়বে। নেহরুর শূন্যপদে যখন শাস্ত্রীকে নিৰ্বাচন করা হল, তখন অনেকের

মনেই সংশয় ছিল, তিনি কি পারবেন? কিন্তু উনিশ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত প্রমাণ করেছে, সেদিনের নিৰ্বাচন ভুল হয় নি, শাস্ত্রী যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্বভার পালন করেছেন। কেবল যে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেছেন তাই নয়, তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে ভারতের গণতন্ত্রকে

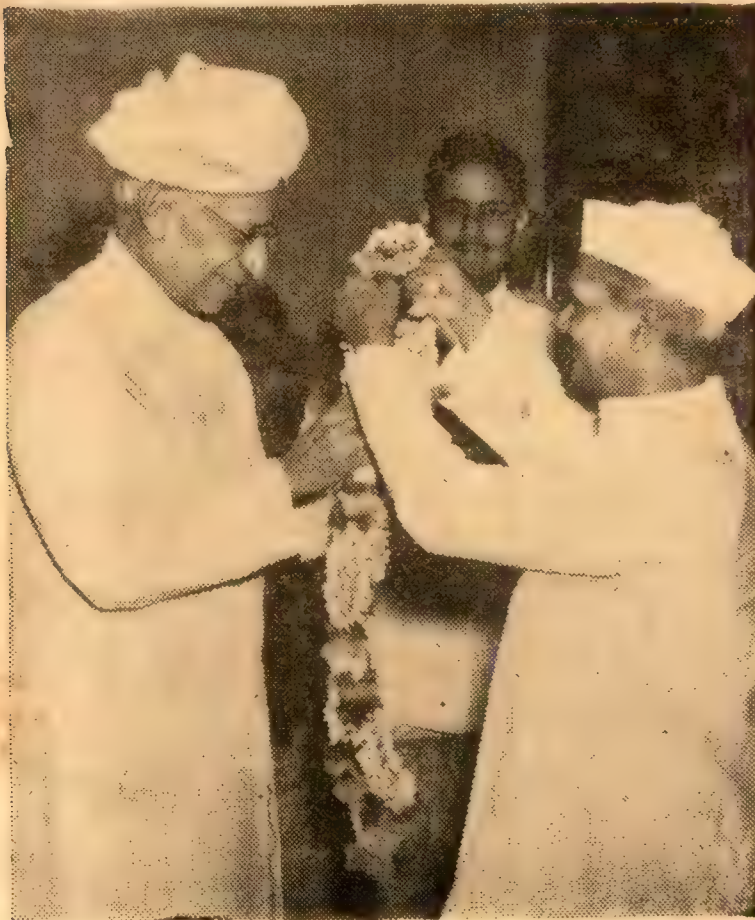
হৃৎবর্ধন

আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন, দেশবাসীর মনে গভীর আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন, এবং বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। শাস্ত্রীযুগ ভারত-ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

এবার আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় শাস্ত্রী যে দৃঢ়-

তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। লাহোর ও শিয়ালকোট আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। ভারত যে কেবল পড়ে পড়ে মার খেতেই জানে না, দরকার হলে সে পালাটা মারও দিতে জানে, এই প্রথম তার পরিচয় পাওয়া গেল। এই ঘটনা কেবলমাত্র যুদ্ধের গতিই পরিবর্তন করে নি, পাক-ভারত সম্পর্ক এমন কি ভারতের সামগ্রিক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ভারতের এই প্রতি-আক্রমণে পাকিস্তান থমকে দাঁড়িয়েছে; ভারতের কাছ থেকে এমন মরণ-কামড় সে কখনও খায় নি। সেদিন শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবং জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী ও এয়ার-মার্শাল অর্জন সিং-এর পরিচালনায় ভারতের বীর জওয়ানরা সীমান্তে যা রূপ দেবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, আসমুদ্র হিমাচল ভারতের আপামর জনসাধারণ তা অন্তর দিয়ে সমর্থন করেছে। দেশ-রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করেছে দেশবাসী। পাকিস্তানী হানাদারদের উচিত শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন শাস্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—কাশ্মীর নিয়ে কোন আলোচনা চলবে না।

পাকিস্তান কতৃক ভারত আক্রমণের সময় ইংগ-মার্কিন মহল থেকে নানা চাপ এসেছে। অস্ত্র সাহায্য বন্ধ হয়েছে, অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের হুমকী এসেছে, খাদ্যাভাব-পীড়িত ভারতের খাদ্য সাহায্য বন্ধের কথা শোনা গিয়েছে, তবু শাস্ত্রী মাথা নত করেন নি। একা দাঁড়িয়ে লড়ব, লড়তে লড়তে শেষ হয়ে যাব, না খেয়ে মরব, তবু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোষ করব না, আক্রমণকারীদের অন্যায় দাবি মেনে নেব না, ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কাশ্মীর বিকিয়ে দেব না, এই মনোভাবে অটল ছিলেন শাস্ত্রী। সমগ্র দেশ সেদিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের প্রতিবাদে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সভাকক্ষ ত্যাগ এই নতুন নীতিরই আর এক নিদর্শন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইতিপূর্বে ভারত কখনও এমন দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে নি।



রাষ্ট্রপতির জন্মদিনে



শাস্ত্রী—নেহরুজীর সঙ্গে। হিমাচলপ্রদেশের রাজ্যপালের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য দান গ্রহণ করছেন

(ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০)

পাকিস্তান সম্পর্কে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে এই বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণের সুফল ফলেছে। পাকিস্তানকে পিছ হটতে হয়েছে, পশ্চিমী গোষ্ঠীকে স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে, এবং রাষ্ট্র-সংঘ ও ভারতের অনাভিপ্রেত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে শেষ পর্যন্ত সাহসী হয় নি।

শাস্ত্রীর এই দৃঢ়তা মূহুর্তের মধ্যে ইতাকে জন-গণ-মন-অধিনায়কে পরিণত করেছে।

যুদ্ধ ভারতের ওপর চেপে বসেছে, তাই ভারতকে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু ভারত শান্তিকামী। যুদ্ধ ও গান্ধীর দেশ ভারত যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীও তাই শান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন, সেই একই সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি আয়ুব খাঁর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পাকিস্তান ভারত বিবেকে অথ, ভারতের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন কুৎসা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, কাশ্মীরে নাশকতা-

মূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, এবং দিনের পর দিন যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসে কি লাভ? পাকিস্তান যখন কাশ্মীর প্রসঙ্গ কিছুতেই বাদ দেবে না, তখন মীমাংসার পথ কোথায়? তবু শাস্ত্রী তাসখন্দ ছুটেছেন। শান্তির আশায়। যুদ্ধের পথ পরিহার করতে হবে, যেভাবে হোক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই মনোভাব নিয়ে শাস্ত্রী চেষ্টা করেছেন তাসখন্দে। শান্তির জন্য শাস্ত্রীর ব্যাকুল আগ্রহ ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতায় অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষ নিজ নিজ দিকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেবে, এবং পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তারা বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এই মর্মে শাস্ত্রী ও আয়ুব চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। তাসখন্দ চুক্তির নানা দিক নিয়ে হয়তো রাজনীতিক মহলে বিতর্ক দেখা দেবে, কিন্তু শান্তির নিদারুণ আগ্রহই যে শাস্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। তাই তাসখন্দ চুক্তি শাস্ত্রীর অমর কীর্তি বলে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শান্তির জন্য কাজ করতে করতে শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শান্তির জন্য শহীদ শাস্ত্রী।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রী বাস্তবতার স্পর্শ এনেছেন। তিনি বুঝেছেন, কেবল বড় বড় আদেশের বুলি কপচালেই হয় না, কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হয়। পাকিস্তান সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ, এবং পরে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, দুই-ই তাঁর গভীর বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। বৈদেশিক নীতির প্রথম কথা, প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। দীর্ঘদিনের নানা হুটির ফলে প্রায় সব ক'টি প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। শাস্ত্রী এদিকে নজর দেন। নেপালের সঙ্গে তিনি সম্পর্কের এতটা উন্নতি করেন যে, শাস্ত্রীর মৃত্যুতে নেপাল বলেছে, “নেপালের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু হল”। সামান্য কদিন পূর্বে তিনি বার্মার গিয়ে সেখানেও অবস্থার পরিবর্তন সূচনা করেন। তাসখন্দ থেকে ফেরার পথে তাঁর

আকগানিস্থান যাবার কথা ছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দুটি অঞ্চল ব্রহ্মই বেশি করে প্রভাব বিস্তার করছে, সেই আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন শাস্ত্রী। সম্প্রতি এই দুটি অঞ্চলে তিনি কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শাস্ত্রী একটি নতুন রীতিগত প্রবর্তন করেছেন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তিনি বিরোধী দলনেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পাকিস্তানী আক্রমণের সময় এই বৈঠক প্রায় নিরন্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাসখন্দ শবর পূর্বেও তিনি এঁদের সঙ্গে বসেছেন, সকলের মতামত শুনছেন। খন্দ সমস্যা নিয়েও তিনি এরূপ আলোচনা করেছেন। ভারতের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বিকাশে এই প্রয়াসের গুরুত্ব অনেকখানি। শাস্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন ও গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে শাসনের দায়িত্ব তাঁর ওপর, পার্লামেন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর পেছনে, তবু তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে বিরোধী দলগুলিকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ তিনিই করবেন, কিন্তু তার পূর্বে অপরের মতামত শুনতে আপত্তি কি? বিরোধী দলসমূহ শাস্ত্রীর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলেরও যে একটা স্থান আছে, এর দ্বারা তা স্বীকৃতি পেল।

শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী কেন্দ্রে, এবং অন্যান্য মধ্যমস্তরীয়া রাজ্যে যদি এই রীতি অনুসরণ করে চলেন, তবে ভারতে গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ হরান্বিত হবে।

কেবলমাত্র বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের শাসনের ব্যাপারেও যে শাস্ত্রী দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন, তার প্রমাণ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা ও রেশনিং-এর প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিভিন্ন রাজ্য ও কারেমী স্বার্থের চাপ অগ্রাহ্য করে তিনি এর স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী দীর্ঘকাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী কিম্বা প্রধানমন্ত্রী, যে পদেই তিনি কাজ করুন না কেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কখনও তিনি ইতস্তত করেন নি। সদালাপী, নিরহংকার, অনাড়ম্বর শাস্ত্রী সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশেছেন, সকলের কথা শুনছেন, অপরের দুঃখ-বেদনা অনুভব করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তিনি কঠোরতম সিদ্ধান্ত গ্রহণেও স্বেচ্ছা গ্রহণ করেন নি। শাস্ত্রীর সম্পর্কেই তাই বলা যায়, তিনি ফুলের মত কোমল অথচ বজ্রের মত কঠোর ছিলেন।

ইয়লুয়ের রেল দৃষ্টিনার পর কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর পদ থেকে শাস্ত্রীর ইস্তফাদান রাজনীতিক্ষেত্রে এক উচ্চ নৈতিক মান স্থাপন করেছে। রেল দৃষ্টিনার জন্য যন্ত্রবিদরা দায়ী, খুব

জোর রেল-পরিচালকরা দায়ী, কিন্তু নীতিনির্ধারণ ক্ষমতাকে নিশ্চয়ই এর জন্য দায়ী করা চলে না। তবু শাস্ত্রী নিজের কাঁধে এর দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং এর জন্য পদত্যাগ করেছেন। আইনের দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন, নীতির দিক দিয়ে এই ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশি। শাস্ত্রী-চরিত্রের আর একটি দিক এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সাফল্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রী অতি সাধারণ ঘরের মানুষ। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের রাজত্ব এখানে—তাই সাধারণের একজন শাস্ত্রীর পক্ষেও সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসন প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। রামলীলা ময়দানের শোকসভায় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ যথার্থই বলেছেন, বংশ, মর্যাদা বা সম্পদের কোন জোর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছিল না, চরিত্র ও নিষ্ঠার বলেই তিনি সামান্য একজন রাজনৈতিক কর্মী থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভে সক্ষম হয়েছেন।

নেহরুর পর কে? এই প্রশ্নের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে ভারতের গণতন্ত্র। বটবুকের দিন হয়তো শেষ হয়েছে, কিন্তু দুঃমূল কঠিন বৃক্ষের অভাব নেই। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শাস্ত্রী এমন যোগ্যতার পরিচয় দেবেন, যে ভাবতে পেরেছিলাম? অবশ্যই এ কথা বলতে হবে, শাস্ত্রী হঠাৎ নেতা নন, চঞ্জিশ বংশের ধরে ধীরে ধীরে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এখানেই গণতন্ত্রের জয়।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই মরজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেও, ভারতবাসীর মনোজগতে তাঁর মৃত্যু হয় নি। যে দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাসের মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। সমগ্র বিশ্বে তিনি শান্তির মানুষ, তাসখন্দের বিজয়ী বীর বলে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী দীর্ঘজীবী হোন।



জারজির্না নাইডু স্মারক ডকুমেন্ট প্রকাশ উপলক্ষে দিল্লীতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪) শ্রীক্ষমদারী ও শ্রীঅশোক সেনে বসে শাস্ত্রীজী।

মহাত্মা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(দ্বিতীয়-প্রকাশিতের পর)

৭ তিল

১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকাল। বোধহয় চৈত্র-মাস।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে রওনা হচ্ছেন। বাংলাদেশ ছেড়ে অনিশ্চিতের পথেই তিনি পা বাড়ছেন নতুন করে।

যতীন্দ্রনাথের এদিনের কর্মসূচীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিপ্লবী বন্ধু অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রবাবুর সহযোগিতা কবেন বিপ্লবী মাখন সেন ও বামচন্দ্র মজুমদার।

স্থিতি হ'লে, নৌকোর কবে গঙ্গা পাৰ হয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে যতীন্দ্রনাথ রামবাগাতলা সর্বাধি যাবেন। এবং সেখানে তিনি ট্রেন ধরে রওনা হবেন বাগনান অভিমুখে; সঙ্গে থাকবেন মাখন সেন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও চিত্তপ্রিয় বারুচৌধুরী।

এবই ঠিক পাঁচ বছর আগে, এমনি সময়েই শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যান—চিদিদেব জন্মে। সেদিন যারা শ্রীঅরবিন্দের সেই ঐতিহাসিক প্রয়াণের সাক্ষী ছিলেন, রামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আর যতীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ ত্যাগ করে যাবার প্রাকালেও উপস্থিত রইলেন রামচন্দ্র মজুমদার। শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ, উভয়েই স্নেহভাজন বন্ধু ছিলেন রামবাবু।

অশ্রুভাবাক্রান্ত কণ্ঠে বামচন্দ্র মজুমদার সেদিন মাখন সেনকে বলেন, “বাংলার প্রাণ আজ আপনার হাতে দেওয়া হল। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। নিজের দায়িত্ব বুঝে নেন।”*

জাতৃত্ব প্রাপ্যোপম শিষ্য বন্ধু সহকারীদের যাবা যতীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন সেদিন গোপনে, নয়লে তাঁদের দীপ্ত সঙ্কল্প—মহানায়কের নির্দেশ অনুযায়ী যে বীর নিজের কেন্দ্রে ধূনি জ্বালিয়ে বসে থাকবেন। প্রতীক্ষা কবেন যতীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—যতীন্দ্রনাথের পবিত্র নেতা : যতীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কলকাতার কেন্দ্রগুলি তথা দেশের সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিরই পরিচালনা করবেন তিনি বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন নয়ন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অতুল ঘোষের সমস্ত সন্তাই যতীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রেমের প্রভাবে এমন টাইটেন্ডার যে, যতীন্দ্রনাথকে এইভাবে অনিশ্চিতের পথে যেতে দিতে সারা মন তাঁর শিশুর মতো অসহায় বোধ করেছে সেই ক্রমে।

বাগনান।

হেডমাস্টার অতুল সেনের বাড়িতে অল্প কয়েকদিন কাটিয়ে বাগনান স্কুলের হেড-পাণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিষ্য যতীন্দ্রনাথ গেলেন হেমবাবুর গ্রামে—মহিষা-দলের নিকটবর্তী কুমার-আড়ার।

ইতিমধ্যে নলিনী কর ও নবীন ভট্টাচার্য দেখতে গেলেন কপ্তিপদার নতুন আটচালা কেমন উঠল। নলিনীকান্ত লিখেছেন, “...আমি আর নয়নদা (M. N. Roy) মহলাডিহা (কপ্তিপদা) যাবার দিন বিকালে দাদার সঙ্গে দেখা করতে বাগনানে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীযুত অতুল সেন দাদাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দাদার সঙ্গে তখন চিত্তপ্রিয় ও বিপিন গাঙ্গুলীকে দেখেছিলাম।”

কুমার-আড়া গ্রাম থেকে বিপিনবাবু দু-তিন দিন বাদে কলকাতা ফিরে যান। যতীন্দ্রনাথ আরো কয়েকদিন রইলেন সেখানে। তারপর মহলাডিহার তদারকবে দায়িত্ব নলিনীকান্তের ওপর ন্যস্ত হবে নবীন ভট্টাচার্য কুমার-আড়া ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আরো কয়েকজন অনুচরও এলেন। সকলকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রওনা হলেন বালেশ্বরে।

বালেশ্বর শহর। সমুদ্রে থেকে মাত্র আট মাইল দূরে।

শৈলেশ্বর বন্দু ও তাঁর সহকর্মীরা স্টেশন থেকে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহগামী কর্মীদের নিয়ে গেলেন ইউনিভার্সাল এসোশিয়েশন-এ।

সেখানে কাজ খুব চমৎকার চালু রেখেছেন শৈলেশ্বর : আবগারি বিভাগের কিছু কর্ম-চারীকেও দলে টেনেছেন।

মহলাডিহা থেকে নলিনীকান্ত কর ও মণীন্দ্র চক্রবর্তী এসে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গেলেন কপ্তিপদা—মহলাডিহার আশ্রয়স্থান। যাবার পথে একটু দূরে দেশীয় রাজ্য নীলগিবি হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন গিরে গন্তব্য-স্থলে, যাতে করে দুগাঙ্গবন্দু কেউ জানতে না পারে কোথায় তাঁরা গেলেন।

কপ্তিপদা।

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর আতিথ্য গ্রহণ কবলেন যতীন্দ্রনাথ। মহলাডিহা মৌজার মণীন্দ্রবাবু থাকেন। সেখানে থেকে আধ-মাইল আন্দাজ দূরে গোপালডিহা-একখানা আটচালা বাঁধিয়েছেন তিনি আশ্রয়স্থানে।

কে এই মহাপ্রাণ দেশভক্ত—বিনি ভেনে-শ্রুনেও যতীন্দ্রনাথ-হেন অগ্নিহোতাকে শিষ্য সাদরে বরণ কবে নিলেন জাতির ইতিহাসের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এক দিন-বদলের সন্ধিক্ষণে?

মণীন্দ্রবাবুর পিতা *কেদারনাথ চক্রবর্তী ছিলেন মন্ত্রবল্লভের পুত্রিশ ইন্সপেক্টর। বহু ডাকাত তিনি দমন করেছিলেন। তাই, অতিবড় দুঃসাহসী ডাকাতও কেদার চক্রবর্তীকে সম্মিহ কবে চলত।

কেদারবাবু বখন অবসর গ্রহণ কবেন, তাব পিঠপিঠই মন্ত্রবল্লভ রাজস্বের ক্ষুদ্র রাজ্য কপ্তিপদার দেশা দেয় বিশৃঙ্খল। কেদারবাবু কপ্তিপদার দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি অবস্থা আয়ত্মান আনলেন। এই কৃতকার্যতা জন্মে তিনি পারিতোষিক পেলেন এই মহলাডিহা মৌজা।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী কেদারবাবুর একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। সেখানে যতীন্দ্রনাথের জন্য আটচালা পড়ল, সেটা মণীন্দ্রবাবু বাড়ি থেকে মাত্র আধ-মাইল দূরে, জামগাটাব নাম হাটের গোপালডিহা—যখন ১৯১০ সালে যতীন্দ্রনাথের শিষ্য দেবীপ্রসাদ রায় ও নলিনীকান্ত কর এখানে এসে আশ্রয়প্রাপ্ত কবেন, সেই সময়ে নলিনীবাবুর ছদ্মনাম হয় গোপাল রায় এবং

* ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ‘বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি’ প্রবন্ধ।

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

সেই নামেই উক্ত জায়গাটি তিনি বিপ্লবীদের জন্যে সংগ্রহ করে নেন আইনত।*

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর জ্বানাই বালি, মহাবাজা রামচন্দ্র ভট্ট-দেও বিপ্লবীদের কাজের সমর্থন করতেন।...সেই সময়ে (১৯১০ সালে) তিনি একবার কপিলপদায় এলেন থানা পরিদর্শনে। মহলাডিহার পরপারেই থানা। দেবীপ্রসাদ নদী পার হয়ে মহারাজের সঙ্গে দু-ঘণ্টাধিক আলোচনা শেষে তাঁর কাছে একটা জঙ্গল লাজ চান। মহারাজা সম্মত হন। এবং পছন্দ-মতো জঙ্গল বেছে নিতে বলেন। সেইসূত্রে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমরা (নলিনী কর ও মণীন্দ্র) পোড়ালিডা জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম। ময়ূরভঞ্জন মেঘাসন পর্বত-প্রণীর পাদদেশ অবধি বিস্তৃত এই জঙ্গল আজ কল্যাণদেব রক্ষার জন্যে উড়িয়া সরকার দুরীকৃত করলেও, সে-মুণের মতো হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের প্রাচুর্য এখন আর নেই। এই জঙ্গলটি নলিনীকান্তের পছন্দ হল। তাঁরা এটি রেজিস্ট্রি করে নেন গোপাল রায়ের নামে। ফলে এর নাম হয় গোপালডিহা।*

কপিলপদায় পৌঁছে, বতীন্দ্রনাথ একদিন এই অরণ্যের দুর্গমতম কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন। সঙ্গে রইলেন নরেন ভট্টাচার্য, চিত্তাপ্রিয় প্রভৃতি প্রমোদ-মোহন জন শিষ্য। প্রয়োজন হলে যাতে করে একরে বহু বিপ্লবী-সৈন্য সম্মুখকালে এসে আশ্রয় নিতে পারেন এবং রেড-ফাইট দেবার জন্যে সমুদ্র যুদ্ধেও যাতে অবতীর্ণ হওয়া যায়, এমন একটি জায়গার সন্ধান করছিলেন বতীন্দ্রনাথ।

মেঘাসন পর্বত-মালার দুপুরোহা একটি শৃঙ্গ যতীন্দ্রনাথের পছন্দ হল। শৃঙ্গটির নাম ভূভিগড়। ভূভিগড়ের পাশেই পাঁচিশ-ত্রিশ হাত ব্যবধানে তেমন আর-একটি শৃঙ্গ। দুটি শৃঙ্গের মাঝে ফাঁকটুকু কে যেন মাটি ও পাথরে ভরে গোপন একটি পথ বানিয়ে রেখেছে। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস : শিবাজীর আমলে মারাঠারা এই বানিয়েছে এই পথ।

দুই পাহাড়ের মাঝের গর্ভটিতে মুন্সিমেস ফরেকজন অশ্বখরী বিপ্লবী বা একটিমাত্র মেশিনগান গোপনে ঝাড়া করে দেওয়া যায়, তবে অতিবড় শত্রু-বাদিনীরও সাধ্য নেই পাহাড়দুটির দিসীমানায় পৌঁছতে পারে।

ভূভিগড় পাহাড়ের চূড়ার এক সমতল জমি : অনায়াসে সেখানে পাঁচ-ছয় হাজার বিপ্লবীর মতো ছাউনি পড়তে পারে। দুটি গুরুত্বও আছে, ভাঙে প্রচুর জল। জলের ধারে টালির আকরে পাতলা পাতলা ইট ছড়ানো।

* এখানে বতীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন মধুবাবা নামে। চিত্তাপ্রিয় হলেন কালিদাস; নরেন-শঙ্কু; মনোজ্ঞ হলেন যোগানন্দ; আর জ্যোতীশ পাল-প্রমথ।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী আমন্ত্রণ জানিয়ে জে-ছেন—উত্তরকালে কারো যদি এই বর্ণনাগুলি অবিস্মার্য মনে হয়, স্বচক্ষে গিয়ে ভূভিগড় পাহাড় যেন পরিদর্শন করে আসেন।

ভূভিগড় পাহাড়ের চারদিকেই হাতীর খাত। পাহাড়ের গা অত্যন্ত খাড়া, দেয়ালের মতো, দুর্লভ্য। আবার শৃঙ্গের গুপ্তরেও সমতল জমিটি বেদন্তন হবে থাকে-থাকে পাঁচিলের মতো পাথর সাজানো।

পাশের পাহাড় ভরাতি বাঁশের ঝাড়। এক-মাত্র বুনো হাতী সেখানে উঠতে পারে। তার প্রমাণ—হাতীতে এসে বাঁশঝাড় মুড়িয়ে যাবার ছাপ সর্বত্র ছড়ানো। কচি বাঁশ হাতীর প্রিয় খাদ্য।

চমৎকার এই প্রাকৃতিক কেন্দ্রটি ছাড়াও বনের মধ্যে বহু টিলা দেখা গেল, যেখানে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে বোমা প্রস্তুতের কাজ চলতে পারে।

গোপালডিহা থেকে বতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে নরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে গেলেন। দ্রুতগতিতে ওদিকের উদ্‌যোগ-আয়োজন চলল, রাখরার জন্যে কলকাতা থেকে বালেশ্বর, বালেশ্বর থেকে কপিলপদায় এই গোপন আশ্রয়-স্থল গোপালডিহা, গোপালডিহা থেকে কল-কাতা—নির্মিত সংবাদ-আদান-প্রদানের বন্দো-বস্ত পাকা হয়ে গেল। তা ছাড়া দেশের বিশদ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মণীন্দ্রবাবু নামে নির্মিতভাবে বতীন্দ্রনাথ বেকলী পত্রিকার বাংলা সংস্করণটি আনাতে লাগলেন—পাছে স্বনামে বা বোনামে আনাতে গেলে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

গোপালডিহাব সাধুবাবা—বতীন্দ্রনাথ। হস্তাবেশের খ্যাতিতে তিনি গৌরব ধারণ করলেন। সাধুবাবার পাঠশালার নিরক্ষর গ্রামবাসীরা আসতে লাগল : স্বয়ং বতীন্দ্রনাথ তাদের লেখা-পড়া শেখাতে শুরু করলেন। আর, ক্ষেত্র-বিশেষে বণন করতে লাগলেন অভীষ্ট বীজ।

সাধুবাবার সংস্পর্শে যারাই আসে, তাঁর উদার প্রেমের বশবর্তী না হবে পাবে না। এসেব প্রমথ আর অকুণ্ঠ প্রেম ভাবা পায় বতীন্দ্রনাথের 'স্বামীজী-রাজা' নামকরণে।

আপদে-বিপদে সুদে-দুর্দশে স্বামীজী-রাজার কথাই এদের প্রথম মনে জাগে, ছুটে আসে তাঁর কাছে। দক্ষতার সঙ্গে হোমিও-প্যাথিক এবং প্রয়োজনে কিছু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও করেন বতীন্দ্রনাথ। দুঃস্থ গ্রাম-বাসীদের অসুস্থ-বিসুস্থে ডাক্তার আসে না। দিন নেই, রাত নেই, বর্ষান স্বামীজী-রাজা খবর পান, সাগ্রহে তার সেবা-শুশ্রূষা চিকিৎসা করেন। খুব অসহায় যে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন তারক। ওষুধ-পথ্য দেন। সারিয়ে তোলে।

অভাব অনটনে জরুর দরিদ্র গ্রামবাসীদের দেখে রমতার ভরে ওঠে বতীন্দ্রনাথের অন্তর। জুটো মৃদুখান্ন খুঁলে দিলেন তিনি এদের

পুঁথিখাণ্ডে : সামান্য মূল্যে বা আধকাণ্ডে সময়েই বিনামূল্যে তাঁর ঘোড়ান থেকে গ্রাম-বাসীরা নিয়ে যান চাল, ডাল, গুড়, তেল, নুন, মশলা; অসুস্থের সময়ে সবুধানা, চিড়ে।

কলকাতা এবং অন্যান্য কেন্দ্রের নেতারা নিয়মিত বতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে ফিরে যান যে যার কর্মস্থলে। নলিনী কর বহাল রইলেন খাল-দুতের পদে। তা ছাড়া নরেন ভট্টাচার্য, ডাঃ যাদুগোপাল প্রভৃতি সহকর্মীরাও যাতায়াত করতে থাকেন।

কিন্তু সবাসরি বতীন্দ্রনাথের কাছে যাবার অধিকার ও উপায় কারোই নেই। সাক্ষাৎপ্রার্থী কেউ এলেই, প্রথমে তাঁকে বেতে হব বালেশ্বর শহরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের দোকানে। সেখান থেকে ভারপ্রাপ্ত কর্মী শৈলেশ্বর বসু ছাড়পত্র ও পথপ্রদর্শক দিলে তবেই মহানারকের বাসস্থান কপিলপদায় যাওয়া চলে।

অ্যামেরিকান শিকাগো থেকে, জার্মান পুত্রাত্ত-বিশারদ ভেডে Wehede জর্জ-পল বোয়, স্ট্রীলেক (ওফেল সত্যেন্দ্র) এবং জনৈক ভারতীয় বিপ্লবী প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ম্যাবিলার পৌঁছলেন-১৯১৫ সালের জুন মাসে।*

ইতিমধ্যে জার্মানী থেকে জার্মান সরকার ও ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটি যুদ্ধ-ভাবে তাদের প্রতিনিধি ভিন্সেন্‌স্‌ ক্রাফ্টকে ব্যাটাভিয়া পাঠলেন সেখান সক্রিয় ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সমেত।

ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখছেন, "১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে অ্যামেরিকা থেকে বার্লিনে থকর আসিল যে, ভারতে অস্ত্র পাঠান হইয়াছে : তিনিই জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া পূর্ব ভাঙতে আর দুটি সুযোজ্য দিয়া করাচী যাইতেছে। একজন আমেরিকান জার্মান ভারতে যাইতেছেন antiquities কিনিবার নামে বিপ্লবীদের অর্থ দিবার জন্য।..."

বতীন্দ্রনাথের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হল যে, সংগঠনের পক্ষ থেকে, জার্মানী ও অ্যামেরিকা থেকে আগত দু'জনের সক্রিয় সংবাদ দেবার জন্যে, এবং অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত পাকা করবার জন্যে নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy)-কে ব্যাটাভিয়া যেতে হবে।

চার্লস্‌ মার্টিন হুস্মানমে নরেনকে বতীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন। কপিলপদা থেকে গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, নরেন ভট্টাচার্য রওন হলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ মেলে। নলিনী কর তাঁকে রেনে তুলে দিয়ে এলেন।

ব্যাটাভিয়া থেকে জার্মান প্রতিনিধি ভিন্সেন্‌স্‌ লিখছেন, "সুমাত্রা উপকূলে বিপ্লবীদের ঘাঁটি বানানো যায় কিনা সে বিষয়ে ভিন্সেন্‌স্‌ ক্রাফ্ট খোঁজ-খবর নি...শাহাই গিয়েছিলেন জরুরি বৈঠকের কাছে। সেখান

* জার্মান সরকারের রিপোর্ট অবসম্বন্ধে।

যেহে তিন খুব আশাপ্রদ সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে...আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ চমৎকার ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে।...

“ভারতের এই কাজের জন্যে সাবাং-এ একটা বা দুটো জার্মান জাহাজের প্রয়োজন হবে। সাংহাইয়ের বণিক এ নিয়ে পরামর্শ করছি আমি।...”

জার্মান সরকারের চার পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ একটি রিপোর্টের এক জায়গায় লেখা আছে, মার্টিন (নরেন ভট্টাচার্য) প্রসঙ্গে, “...বহুস পার্টিশনের মতো; কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপ্লব-সংস্থা থেকে ব্যাটাভিয়া আসেন দু’তরপে—প্রথমে ১৯১৫ সালের মে মাসে এসে ষ্টা জুন কলকাতার ফিরে যান তথ্যাদি নিয়ে। তারপর ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আবার দু’তরপে তিনি প্রেরিত হন। সেখান থেকে তিনি সাংহাই চলে যান।...”

ব্যাটাভিয়ার গিগ্রে নরেন ভট্টাচার্য তার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর ক্রাফ্ট সেখানে এসে পৌঁছলে তাঁর সঙ্গে নরেনেরই প্রথম দেখা হয়। ডাঃ জুপেন দত্ত (তখন বার্লিন কমিটির ইনি কতৃপক্ষের একজন) লিখেছেন, “...ওখানে একটি ভারতীয় আড্ডা গাড়িয়া উঠে। বতীন্দ্রনাথের লোকেরা kraft-এব সঙ্গে স্থানে মিলিত হন।”

ডাঃ জুপেন দত্ত লিখেছেন, “(নরেন) ভট্টাচার্য বলেন: বতীন্দ্রনাথ জার্মানদিগের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহার্থে তাঁহকে ব্যাটাভিয়া পাঠান। (বার্লিন) কমিটির প্ল্যান অনুযায়ী এই আয়োজন হয়।”

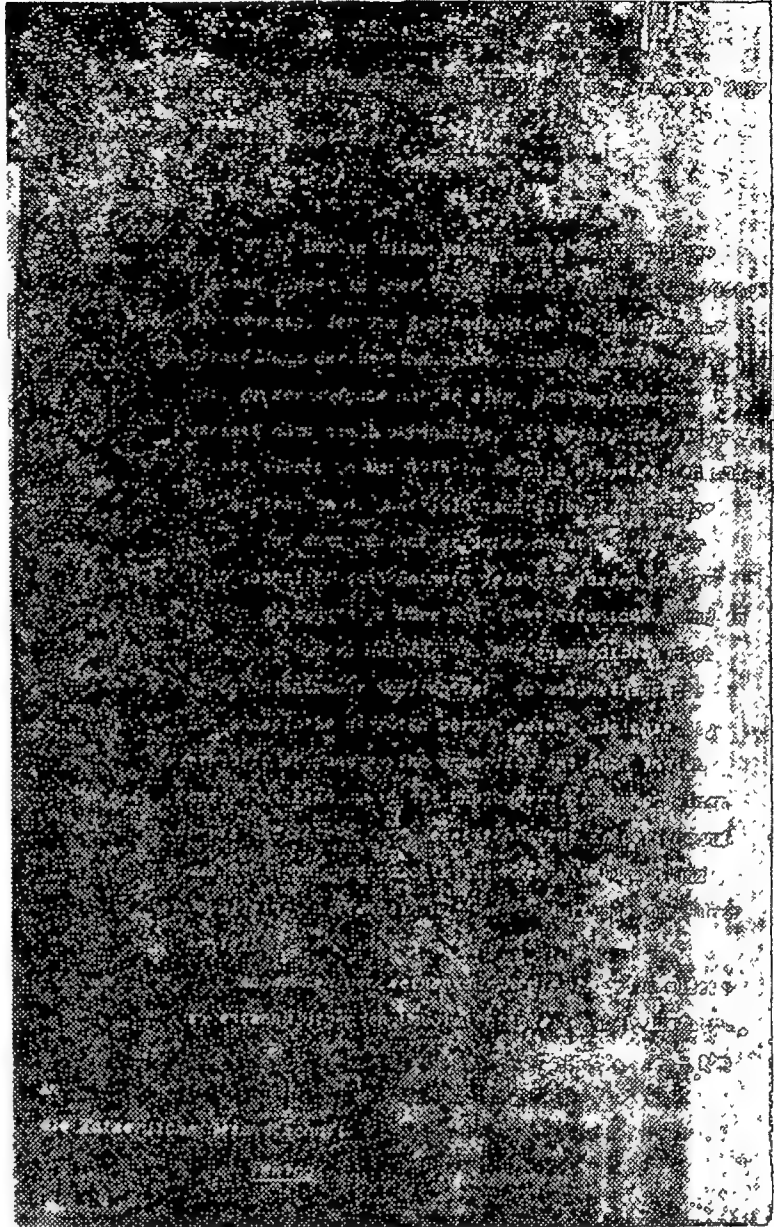
জুন মাসের মাঝামাঝি। ১৯১৫ সাল।

একদিন সকালবেলা কপ্তিপদার এসে আবির্ভূত হলেন বতীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ কর্মী নরেন ভট্টাচার্য—ব্যাটাভিয়ার জার্মান বাণিজ্যদূত ফন্ হেলফেরিস্-এব সঙ্গে এবং অন্যান্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবে মানাধিক কাল পবে তিনি ফিরে এলেন।

বতীন্দ্রনাথকে প্রণাম কবে, নাটকীয়ভাবে নরেন গবুর চব্বতলে ঢেলে দিলেন একথলে গিনি-সোনা। জানলেন যে অভ্যাসানব রসদ দু’তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান জাহাজ এসে পৌঁছছে। ভারতের অধিসন্ধি বার্লিন কমিটির মাধ্যমে তরা জেনে বেখেছে। কোথায় কী ভাবে অস্ত্রাদি লাগবে, নরেন তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন।

প্রমাণস্বরূপ নলিনী কব লিখেছেন, “আমাদের একটা কাগজ দেখালেন নরেনদা। দেখতে একটুকরা সাদা লেখবার কাগজের মত। তাতে আঁদুল দিয়ে পড়িয়ে দিতেই, একখানা পোড়া কাগজ, তহত রায়মণ্ডলের navigable স্থানটার একটা চিহ্ন দেখলাম।...”

“তারপর নরেন্দা ফিরে গেলেন কলকাতায়, জাহাজ এলেই যাত্রা অস্ত্রগুলি নিয়ে rise



সাংহাই থেকে নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) -প্রসঙ্গে জার্মান দূতের দীর্ঘ পত্রের প্রথম অংশ।

[গ্রীষ্মপেন্দুকুমার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কবা যায় তার ব্যবস্থা কবতে। আমাদের মধ্যেও একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাজা পড়ে গেল।

“কিন্তু দাদাব কোনও পরিবর্তন দেখলাম না।

“কলকাতার সমস্ত বন্দোবস্ত করে নরেনদা আর যাদুদা (যাদুগোপাল) এলেন মহলিডহাতে দাদার পরামর্শ নিতে—কোথায় এবং কেমন কবে অকস্মাৎ আঘাত হানতে হবে।

“দাদা বলে উঠলেন: প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়ম attack করা হোক।...”

প্রায় আড়াই হাজার নতুন সজা এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে recruit করা হয়েছিল। নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁরা সামরিক শিক্ষা নিতে লাগলেন। গড়েব মাঠে বিপ্লবীদের ট্রেনিং ক্যাম্প পড়ল—বলেছেন সুব্রহ্মোহন ঘোষ: নতুন করে সামরিক কার্যদাৰ আলোক-সঙ্কেত, নিশান-সঙ্কেত (scmaphore) ঘোড়দৌড়, মোটর চালানো, শেখানো হতে লাগল।

দেশের সর্বত্রই বিপ্লবীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলল।

সাম্প্রতিক বসুমতি

৭ চার ৪

এরই মধ্যে শৈলেশ্বর বসুর সঙ্গে এসে পৌঁছলেন পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী মাদারীপুরে গুপের অন্য দুই বন্দু। নীরেন দাসগুপ্ত আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। কলকাতাতেই এঁরা দুজনেও যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মহানায়কের স্নেহের আশ্বাসে থনা। এদেব দুজনের আগমনে উৎফুল্ল হলেন চিঠিপ্রিয়।

তাবও কিছুদিন ব্যাধ এলেন জ্যোতিষ গাল।

চিঠিপ্রিয়ের বাড়ি মাদারীপুর মহকুমার খালিয়া গ্রামে, বিখ্যাত জমিদার-পরিবারে। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম পদ্মানন্দ বারচৌধুরী। চার ভাইয়ের মধ্যে চিঠিপ্রিয় তৃতীয়।

হাইস্কুলে তিনি যখন সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র, তখনই তাঁর ছোট্ট বৃকে বিরট অগ্নিশিখা নিকটে জ্বলল উঠেছিল। সেই অগ্নিশিখার সংক্রামক শক্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন গ্রামের অভিভাবকস্থানীয়েরা।

চিঠি যখন প্রথম প্রেশীতে উঠলেন, একদিন স্কুলের হেডমাস্টার মশাই করেকটি ছাত্রের নাম কবে স্কুলের অন্য ছাত্রদের আদেশ করলেন পূর্বোক্তদের সঙ্গে না মিশতে। তাদের অপরাধ—তারা ‘দেশদ্রোহী’, অর্থাৎ তারা দেশের (ইংরেজ) শাসকদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।—এই নিষেধাজ্ঞা শুনে চিঠিপ্রিয়ের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল, তিনি তখনই প্রতিবাদ জানালেন, “স্যার, আমি যে জানি, যাদের নাম আপনি করলেন, তারা সকলেই চরিত্রবান এবং সৎ। কর্তব্যই তাদের মতো খাঁটি ছেলের সঙ্গ বাবা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, আমি তাদের দলে নেই।”

কর্ণদিনের মধ্যেই হেডমাস্টার আদেশ জারি করলেন, “আমার নিষেধ সত্ত্বেও চিঠিপ্রিয় যখন অব্যাহতিদের সঙ্গ ত্যাগ করে নি, তখন তার পক্ষে এই স্কুল ছেড়ে দেওয়া বিধেয়।”

চিঠিপ্রিয় অস্ফাল বদলে সে-স্কুল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অন্য-কোনও স্কুলের কর্তৃপক্ষই এই ঘটনার পরে তাকে আর ভর্তি করতে চাইল না।... অবশেষে কোনক্রমে তিনি গোয়ালন্দ স্কুলে প্রবেশাধিকার পেলেন।

সিদ্ধ এক তান্ত্রিকের বংশে চিঠিপ্রিয়ের জন্ম। শৈশব থেকেই মন তাঁর অন্তর্দুর্খী। কতদিন গভীর রাত্রে দেখা গিয়েছে ভাবে বিভোর চিঠিপ্রিয় গিয়ে বসে আছেন মাঠে, মদীবা ধারে, শ্মশানে, কালীবাড়িতে। সাধনার এক অজানা দ্বার খুলে গিয়েছিল তাঁর অস্তরে, আর তাই বসে একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁর জন্তর আব বাহির।

তাই বড়ি, ১৯১৪ সালে প্রথম যখন কলকাতায় তিনি মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়লাভে থনা হন, যতীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম কলে বসেন, “আচ্ছা, দেশের কাজ করে কি মাকে পাওয়া যায়?”

বীরক-দ্রুতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যতীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল। দৃঢ় দৃষ্টি তমস্বরে মহানায়ক জবাব দেন চিঠিপ্রিয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে, “তা যদি না পাওয়া যেত, আমার অন্তত এ-পথে দেখাতিস না।”

সেই অপ্রাপ্ত দিক্‌নির্দেশে, সেই বৈদ্যুতিক স্পর্শে, সেই দৃষ্টির অতল আত্মবিশ্বাসের ক্ষুরঝরে বীর্ণ হয়ে যায় বীর চিঠিপ্রিয়ের সমস্ত সংশয়, দেশজননী আর জগদ্বন্দ্বননী যে অবিকল্প—সেই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়ে যায় তাঁর হৃদয়ে।

ফিরে বাই চিঠিপ্রিয়ের ইতিকথা। গোয়ালন্দ স্কুলে পাঠকালেই তিনি রাজকোষের প্রত্যক্ষ আওতার পড়ে গেলেন। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে ‘Emperor Vs. Purna chandra Das & others’ নামে এক রাজনৈতিক মামলার অঙ্কহাতে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হল। চিঠিপ্রিয়ও তাঁদের সঙ্গে আটমাস জেল খেটে এলেন।

জেলে, একদিন একটি সোডার বোতল খুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটলেন তিনি। বোমার মতো কেটে গিয়ে বোতলেব বেশ কয়েকটি টুকরো কাঁচ চিঠিপ্রিয়ের মাংস ফুড়ে সারা দেহে ঢুকে যায়। হেসে চিঠিপ্রিয় তখন বসে ওঠেন, “বাবা, একি অঘটন!”... ডাক্তার এসে অপারেশন কবে সেইসব কাঁচের টুকরো যখন বার করতে থাকেন, চিঠিপ্রিয় তখন ডাক্তারকে বলে চলেছেন, “ডাক্তারবাবু, এখানটা আর একটু সেলাই করে দিন না।... দেখুন তো, এখানে আরো একটুকরো ছোট কাঁচ আছে না?... একটু বেশি কবে কাটুন না।...”

ডাক্তার আগাগোড়া চিঠিপ্রিয়কে লক্ষ্য করছিলেন। বাবাব সময় সন্তব্য করে গেলেন, “এ-রকম ছেলে যে থাকতে পারে, একে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।”

মামলা থেকে খালস পেয়ে আবার পড়াশুনোর চেষ্টার বহু ঘোরাঘুরি করলেন চিঠিপ্রিয়। কিন্তু তাঁর নাম শোনামাত্র কর্তৃপক্ষ বিমুগ্ধ হন সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত কলকাতার কেশব একাডেমিতে তিনি ভর্তি হলেন। আর কলকাতার সক্রিয় নেতা মহাপ্রাণ জুড়ুল ঘোষের মাধ্যমে তিনি এবং মাদারীপুরের অন্যান্য চার-পাঁচজন বন্দু লাভ করলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য।

তারপূর্ব নবীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গার্ডেন-রীচ ডাকাতের পর, নরেন ধরা পড়ে গেলে চিঠিপ্রিয়ের নামও পরোয়ানা বার হব। তাব-পর, সুবেশ মুখার্জীকে হত্যার বাস্প তো আগেই বেলি।

অন্তরে যখনই চিঠিপ্রিয় দুর্বল বোধ করেছেন, শাস্ত মনে ভগবানের কাছে তাকে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে। বাড়ির লোক একবার তাকে বিশেষ যত্ন উভায় করেন সংসারে মন দেবার জন্যে, গোপনে তখন চিঠিপ্রিয় ঠাকুরঘরে ঢুকে শিবলিঙ্গের গলা জড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন, “ঠাকুর, বল দাও,

আমার বল দাও,”—বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

শোনা যায় চিঠিপ্রিয়ের করভল ছিল আশ্চর্য : একটিও করুণা তাঁর ছিল না। আর মুষ্টিয় জোর সহপাঠীদেব এবং সম-বয়সীদের কারোই অবিদিত ছিল না। সবাই তাকে সম্প্রম কবে চলত তাঁর অলৌকিক শারীরিক শক্তির জন্যে।

নীরেনের পিতা *লজিভমোহন দাসগুপ্ত ছিলেন মাদারীপুরের একজন প্রের্ত কবিরাঙ্গ। তাঁদের বাড়ি শৈয়ারভাঙা গ্রামে। একাম্বর্তী পরিবারে ইনি মানব। পাশের বাড়িতেই থাকতেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। নীরেন আর মনোরঞ্জন আশৈশব বন্দু। একই বিদ্যালয়ে দুজনে পড়েছেন। রাজনীতি শিখেছেন একই পুরুর কাছে। আর একই মহানায়কের সঙ্গে জীবনপণ করে রতী হয়েছেন দেশজননীর কখন মোচনে।

সরলাচন্দ্র, শৈলাধুলার অধিতায় নীরেন। রাশভারি অচ সবার প্রিয়। প্রথম দেখলেই তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছে বার। সব পরিবেশের সঙ্গে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পটু। দেখে অমানুষিক শক্তি। এই শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

প্রবল মাতৃভক্তি তাঁর। শৈশবের সেই মাতৃভক্তিই রূপান্তরিত হ'ল কৈশরে দেশ-ভক্তিতে। ১৯১২ সালে নীরেন যখন প্রথম প্রেশীতে পড়েন, তখনই স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনিও কাজে নেমে পড়েন। আর-বশজনের জন্যে যেসব কাজ কষ্টসাধ্য, হাসিমুখে তা তিনি করতে যেতেন। এই তাঁর স্বভাব।

একবার, শিবচরের কাছে একটা গ্রামে আগুন লগে। লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আগুন নেভাতে গিয়ে। একটা বাড়ি প্রায় ধুসে পড়েছে, এমন সময় তার ভিতর থেকে ভেসে এল নাবীকণ্ঠের আত কান্না।

নীরেন তখনই গিয়ে পৌঁছেছেন মাগ। সবাই-ই তন্তৃত করছে। নীবেন কাঁপিয়ে পড়লেন নারীব কান্না লক্ষ্য কবে, আগুনের বৃক চিবে। ফিরে এলেন ডান কাঁধে এক মহিলা আর বাঁকাঁধে অটুতন্য একটি শিশুকে নিয়ে। ক্রুদ্ধ লেলিহান শিখা বিন্দু নীরেনের পায়ে গিটে সর্বত্র একে দিল তার পরশ-চিহ্ন—বীরের পুরুষকার সেই দাগ আমরন বহন করবে হয় নীরেনকে।

নীবেন কোনদিন ভব বলতে কিছু জ্ঞানেন নি। অত্যন্ত বেপবোয়া স্বভাবের ছেলে। ছাদের কার্নিশের ওপর দিয়ে বুদ্ধবাসে দৌড়তে তিনি ভালবাসতেন। একতলাব ছাদ থেকে দু-হাতে দ্রুতি ছাতি নিয়ে কখনো বা কাঁপিয়ে পড়েছেন।

মাদারীপুর বড়বন্দু মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি খালস পাবার পর কলকাতায় গিয়ে বন্দু

শাস্তাহিক বসুমতী

হন অতুল বোকের মেহের বাঁধনে; সেই থেকে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ভাগ করেন নি তিনিও। বেশেঘাটার আড়ৎ থেকে টাকা লুট করে আনবার পর তাঁর নামে হুদুলা বার হয়। নীরেনের অজ্ঞাতবাসের পর্ব শুরু হয়।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। এঁদের তিনজনের সর্বকনিষ্ঠ। সার্থক তাঁর নাম। সদা হাস্য-মণ্ডিত নম্র উজ্জ্বল চেহারা। অভ্যস্ত সুদ্রী। চণ্ডা হাড়। দীর্ঘ গোরবর্ণ বগু। কোনদিন কেউ তাঁকে মুখতার করে থাকতে দেখে নি। ক্রিষ্ট আনন্দের উৎস অব্যাহত ছিল তাঁর হৃদয়ে। দারুণ বিপদেও তাঁর মুখের হাসি অস্থান দেখা গিয়েছে। সামান্য বেন লজ্জুক প্রকৃতি। আবেগ-প্রবণ। সরল।

পিতার নাম 'হলধর সেনগুপ্ত'। ঐয়ার-ভাঙা গ্রামে ১৮৯৬ সালে মনোরঞ্জনের জন্ম। চার ভাইয়ের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। সমসাময়িক অনেকে বলেন, "মানুষ চিনতে চিনতে বড়ো হলো, কিন্তু মনো-কে চিনতে পারি নি। তার অমন সরল চেহাবার আড়ালে অতবড় সর্বশেষ বস্তু লুকনো থাকতে পারে, কেউ ধারণাই করতে পারি নি।"

১৯১২ সালে মাদারীপুর্ব হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠকালেই তিনি বিপ্লবের কাজে নামেন। পর্বের বছর মাদারীপুর্ব ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে আট মাসের কারাবাস নেহার লক্ষ্মী ছেলোটর মতো মনে নেন নি। জেলের রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বি-চাল্লশটি অভিযোগ। জেলের আইন নিত্য-নতুন অত্যাচারে তিনি টাললে দিচ্ছিলেন। এবং রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করছিলেন কঠোর শ্রমের মনে।

কন্টসহিষ্ণুও ছিলেন তেমন। মল্ল চার পরসার খাবার খেয়ে গোটা দিনে সস্তর-বাহাস্তর মাইল পথ একবার তিনি হেঁটে অতিক্রম করেন।

জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতার New Indian School-এ ভর্তি হন। কিন্তু দেশের ডাক হৃদয়ে তখন এত প্রবল যে মা সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে তিনিও কার-মনোবাক্যে যতীন্দ্রনাথের হাতে তুলে ধরেন নিজে। গাভের রীচের মোটর-ডাকাতের পর থেকেই তাঁর অজ্ঞাতবাস শুরু।

যুক্তিতর্কের ধার তিনি ধারেন নি। কেউ একদিন তাঁকে খাতের তাকে প্রশ্ন করেন, "হ্যাঁ, এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কি ইংরেজের মতো এতবড় শক্তিমান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা বুদ্ধিমানের কাজ?"—উত্তরে মনোরঞ্জন সায় বললেন, "আমি বাপু অত-শত বুদ্ধি না। খেতে এসেছি, আমি খেয়ে যাব। যার ইচ্ছা সে পাতা গুঁতে পারে—আমি জানি শব্দ দ্বারা আর গদ্য।"*

* যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত জীবনী বিপ্লবের যল' থেকে।

"কলকাতায় গোপনচারা হয়ে-মাসের পয় মাস 'বাঁকবার' পরে একেবারে বাহ্যাহীন শঙ্কাবিহীন অরণ্যার (কপ্তাপদার) এসেই তাঁদের বাঁধনহারা প্রাপ চমক হ'য়ে উঠলো," নলিনী কর লিখেছেন, "আর আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেল।"

আগুন নিয়ে খেলাই বটে। একদিন একটা মাউজার পিস্তল হাতে নিয়ে মনোরঞ্জন নীরেনকে ভয় দেখাচ্ছেন, "সারি? মাঝি?" বলে, আর ধাওয়া করছেন তাঁর পিছু পিছু। হঠাৎ পিস্তলের ঘোড়ায় কি করে আঙুল পড়ে গেল। অমনি একটা গুলী ছিটকে বেরিয়ে এল। এফোর্ড-ওফোর্ড হয়ে গেল নীরেনের জানু। ভাগ্যক্রমে পাখের হাড় বাঁচিয়ে গুলীটা বেরিয়ে গেল।

"যারা জীবন-মৃত্যু সত্যিই পারেন ভূত-এব নিঃশেষে প্রাপ উজাড় করে দেলে দিয়েছে শমাতৃকার বেদীমূলে—মরণ-বাঁপায় যাদের সূর বেজে উঠেছে, তাদের কাছে জীবন-মরণের খেলাও ছেলেখেলাই মনে হয়," লিখেছেন নলিনীকান্ত কর; সেই দৃশ্যে একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী।

"এ ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে তেমন-কোনও গুপ্ত-পত্রও নেই। মণীন্দ্র-বাবু তো কিংকং, কোন গুপ্ত-পত্রের ধার ধারেন নাই"—নলিনীবাবু লিখেছেন।

কুটানির বাড়ি বাঁ ছিল, তাই গুঁড়া করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে যতীন্দ্রনাথ তখনি ব্যাডেজ কবে দিলেন। আর শৈলেশ্বর বসুকে বালেশ্বরে খবর পাঠাতেই তিনি টোলগ্রাম করে কলকাতা থেকে দলের ডাক্তার আশু দাসকে ডেকে পাঠালেন।

ব্যাডেজ শুলে আশুবাবু দেখলেন, ভয়ের কিছু নেই। থ্রেস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। লোশন, ব্যাডেজ, মলম সর্বকিছু রেশে সেলেন আশু দাস থ্রেস করবার পর কলকাতা ফিরবার সময়। যা মাসখানেকের মধ্যে ভাল হয়ে গেল, কিন্তু নীরেনের পা একটু কম-জোরাই হয়ে রইল।...

এবই মধ্যে কাটা হল কুস্তির আখড়া।

স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসম্মত দাঁড়-প্যাঁচ শেখাতে লাগলেন শিষ্যদের। ছাত্রাবস্থায় কলকাতার বিখ্যাত অম্বু গৃহ আব ক্রেত গৃহের আশুড়ায় তিনি কুস্তি শেখেন। বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে সেখানেই তাঁর সেরুগে আলাপ হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যবোধ করতে করতে শিষ্যবোও বেশ পটু হ'য়ে উঠলেন। নীরেনের পা তখনো ভাল হয় নি। তিনি তাই আশুড়ায় বসে প্রথম প্রথম প্যাঁচগুলো লক্ষ্য করতে থাকলেন। পা ভাল হল। তিনিও আশুড়ায় নেমে পড়লেন। অল্পদিনের মধ্যেই অন্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠলেন।

নিরামিত যতীন্দ্রনাথ গীতার ক্লাস নেন। খীতা তাঁর আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ। গীতা তাঁর

প্রাপ। গীতার আদর্শ পুঙ্খবু তো বতীন্দ্র-নাথই। দিনেব পর দিন গীতাব অপূর্ণ ভাব্য শোনে শিষ্যেরা যতীন্দ্রনাথের উল্লাসের আলোকে।

তা ছাড়া শিষ্যদের নানা রকমের লেখার মধ্যে দিয়ে চিন্তাশক্তি প্রসার বাড়ান জন্যে এবং অন্তরের ভাব গভীরতর উচ্চতা বরে তোলাব জন্যে যতীন্দ্রনাথ উৎসাহিত ববতে লাগলেন।

তিনি স্বয়ং কয়েকটি রচনা দিকে তখন মনোনিবেশ করেছেন, সবকিছু বিপোর্টে তার উল্লেখ দেখি।* সেগুলি ঘটনাচক্রে সাক্ষ্যের উচ্চ-মহলে গিয়ে পৌঁছয়। এবং সেখানে গুজ্বন ওঠে, "এত অসাধারণ ব্যার মেধা, এমন উচ্চ ব্যার ভাবধারা—তিনি তো সমগ্র বিশ্বের চিন্তা-নায়েকদের অগ্রগণ্য হবার অধিকারী।"

সে-প্রসঙ্গ এখন থাক।

কাজেই নদী। নদীর ধারে চাঁদমাঝি খটানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শেখান যতীন্দ্রনাথ। প্রথম কদিন শিষ্যদের কেউই পরপর চেষ্টা কবেও লক্ষ্যভ্রম করতে পারছেন না। তার কদিন আগেই চিত্তপ্রস কলারায় আক্রান্ত হন; অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রথম কদিন চাঁদ-মারিতে তাই তিনি অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু সঙ্গীদের অক্ষমতা দেখে তিনি তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে চাঁদমারিতে পদার্পণ করলেন।

* বালেশ্বর যুদ্ধের মামলায় সম্ব এই রচনাগুলির উল্লেখ করে বিচারক বলেন:

"The papers consist of two pencil drafts and the fair copy of an extremely inflammatory political article inciting to action towards the overthrow of British rule in India by taking advantage of the entanglement of Britain in the Great European War, and the fair copy is entitled, 'The Children of the Mother India: The Voice Of A Devotee'. One of the drafts is found in a note-book in which the writer also corrected English compositions of another person whose writing seems to resemble that of Manoranjan though he denies that it is his.

(Judgement of the case between King Emperor Vs. Niren Dasgupta, Manoranjan Sengupta and Jyotish Pal. Balasore, October 16, 1915).

— পুঙ্খবুদ্রনাথ

ধীরে ধীরে গুরুব চরণখলি মাথায় নিলেন।
(আগেয়ার হাতে উঠে দাঁড়ালেন।
নিশানা-ঠিক করে নিয়ে গুলী চালানো
মার—সফাভেদ। অব্যর্থ।

“আমবা তো আশ্চর্য!” নলিনীকান্ত
লিখছেন, “আমরা কদিন চেষ্টা কবেও টার-
গেটের অশেপাশে ছাড়া টিপ লাগাতে পারি
নি। আব চিত্তপ্রিয় প্রথম গুলীই টারগেটে
লাগিয়ে দিল।”

সবকাজই চিত্তপ্রিয় এমনি তবপর।

বাধন তিনি চমৎকার এবং প্রায়ই বধিতে
বসেন অজ্ঞাতবাসের এই পর্বে। কালো এক-
হাবা চেহারা; অত্যন্ত শক্ত, বিশিষ্ট ধবণের
হাতদুটো, যাকে বলে বজ্রহস্ত। দৃঢ় মাসে-
পেশী। গোল চিবুক। টিকসো নাক। মুখ-
মণ্ডলীতে সংকল্পের কঠোরতা। স্বল্পভাবী।
আশ্চর্য ধাতুতে গড়া। প্রকৃত বোঝা যাকে বলে।
কোনও কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে নাযায়।
তিনি। নলিনীকান্ত লিখছেন, “চেহারা খুব
রোগা হলেও তাকে কুস্তিতে আটকে রাখা দায়
হত। ভিসিগ্লিন যেমন সে মেনে চলত,
তেমনি অন্য কেউ যদি এতটুকু ভিসিগ্লিন
ভেঙেছে দেখলে তাকে সে ক্ষমা করতে জানত
না।...”

বাংলা দেশ ত্যাগ করবার আগে চিত্তপ্রিয়
গ্রামে গিয়েছিলেন তাঁর গভর্নরশীকে প্রণাম
করতে। সেই সময়েই তিনি বলে আসেন :

“মৃত্যু আমার শিরের এসে দাঁড়িয়েছে।
আমি তাতে ভয় করি না।... আবাব জন্ম নিয়ে
কার্যক্রম হবে আসব।... শ্রীসরবিল্ল বলেছেন
এবং গীতাতেও আছে যে আত্মা অবিনশ্বর,
আত্মার মৃত্যু নেই। পুনঃ পুনঃ নব কলেবর
ধারণ করাই আত্মার কাজ।...”

নীবেন প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত যা লিখছেন
তাঁর থেকে কিছু অংশ পূর্বে ব্যবহার করেছি।
তা ছাড়া তিনি লিখছেন, “নীবেন ধীর প্রকৃতি
হচ্ছে। কথা খুব কম কহিত।... ভিনজনের
মধ্যে সে-ই বোধ হয় Mal'culat'ion
পাশ ছিল।...”

তিনজনের অপর জন, মনোবজ্ঞান প্রসঙ্গে
নলিনীকান্ত লিখছেন, “সবচেয়ে ছোট ছিল
মনোবজ্ঞান।... সে সব সময়ে দাদার সঙ্গে ছায়া
মতো থাকত। দাদারও নিজস্ব কাজ যেটুকু
ছিল তিনি মনোবজ্ঞানকে দিয়েই করাতেন। তাতে
সে নিজেকে ধন্য মনে করত। দাদার নিজস্ব
কাজ কেবল মনোবজ্ঞানই করে, চিত্তপ্রিয় না
করতে পেয়ে একটু ক্ষুব্ধ হত বলে মনে হত।
নীবেন নির্বিকার থাকত।...”

“কিছুদিন মনোবজ্ঞানকে কুস্তি লড়াবার
পর তার শক্তি এবং দম এত বেড়ে গেল,”
নলিনীকান্ত লিখছেন য, “তার দম ফুবোবার
আগেই আমার দম ফুরিয়ে যেত। তাব চেহারা
দেখতে হয়েছিল যেন পাঞ্জাবী পালোয়ান।”

যতীন্দ্রনাথের ছোট একটি চিঠি একেছেন
নলিনীকান্ত, “দাদা গেরুয়া পত্র থাকতেন।
দেখতে পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর মতো। গলায় একটা

ব্রহ্মক বঁধা ছিল। ওটা স্বামী ভোলানন্দ
গিরির শিষ্যদের সবাইকে পবতে হয়। তিনিও
স্বামী ভোলাগিরির শিষ্য। গোপালগিহা বেন
একটা আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। এই আশ্রমের
স্বামীজী ছিলেন দাদা, আর আমবা তাঁর
কাছে মন নীতাম কাজের যোগ্য হবার
জন্য।...”

কপ্তপদার যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়দাতা মণীন্দ্র
চক্রবর্তী আরো জীবিত আছেন। নন্দুইয়ের
কাছাকাছি বরস যতীন্দ্রনাথের জীবনী রচিত
হচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত
এই বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক তাঁর বিশাল জীবনের
সমস্ত মাধুর্য দিয়ে তিনিটা খাতা ভরে কাঁপা
হাতে লিখে পাঠিয়েছেন মহানারকর উড়িয়া-
প্রবাসের টুকরো-টুকরো চিঠি—যা অন্যান্য
বিপ্লবীর বিবৃতির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়
এবং এই স্মৃতিচিহ্নে নিভরযোগ্য অনেক
নতুন তথ্যও পাওয়া যায়।

মণীন্দ্রবাবুকে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্নেহ ও
প্রজ্ঞাভরে দাদা বলে অভিহিত করেন। তিনিও
যতীন্দ্রনাথকে দাদা-ই বলতেন। মণীন্দ্রবাবু
লিখেছেন :

“আজ শ্রুতিদিন। মহাশক্তিগুণী ক্রিষ্ণ-
ময়ী মা আজ বিশ্বরূপের বিরূপ রূপকে
মানবের মানসলোক প্রভাবিত করিয়া পরম
স্নেহময়ী মা হইয়া তাহার ব্যাপ্ত রূপকে
মানবের মরচকুর সম্মুখে আবির্ভূত করিয়া-
ছেন। আজ মহাসপ্তমী, ১৩৬৬ সাল।

জগতের প্রেত জীব মানব। কিন্তু পূর্ণ
মানব ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া সাধারণ
মানুষের পাশে প্রায় অসম্ভব। তবে
বাহারা কালোপবোগী পূর্ণ, সত্তা লইয়া
জন্মিয়া থাকেন, তাহারা স্বীয় প্রতিভার
মানুষকে উন্মোচিত করিয়া থাকেন; এরূপ
মহামানবের সাক্ষাৎ আমবা সাধারণে কখন
কখন পাইয়া থাকি।

“যখন ভারতের ভগ্ন-মেরুদেশ মানুষ
অচল হইতে বাঁসিয়াছিল সেই দুর্দিনে
পরাদীনতা-পীড়িত ভারতবাসীকে শক্তি
সম্পাদনের জন্যই যেন যতীন্দ্রনাথ যুগোপাধ্যায়
স্ব-পরিচয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
রাজশক্তিধারী ইংরেজ তখন প্রবল হইয়া
পরাধীন ভারতবাসীকে দাস-জীবন বহন
করিতে বাধ্য করিতেছিল।...”

দেশের এই অস্বস্তিকর মুহূর্তে অনেক
যুবক ও কিশোর প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য
সংকল্প লইয়াছিলেন। এই গতিবেগ ইংরেজ
বোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল।
কিন্তু কৈ, তাহা তো পাবে নাই। একবার
কিছু স্থিমিত হইলে আবার বিগলিত বেগে
এই আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সময়ে শ্রীযুক্ত
যতীন্দ্রনাথ নিজের কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইলেন।
ভারতের নানা স্থানে তাহার কর্মকুশলতার
পরিচয় প্রচারিত হইতে লাগিল।... তিনি
কর্তব্যকার্যে পশ্চাদপশ হইতেন না। তাহা যতই

ভয়ঙ্কর হউক না। তাহার এইসব কীর্তি
কথা দেশবাসীর প্রাণে বীরত্বের প্রেরণা
জাগাইত। তাহাকে শান্ত করিবার আশায়
বড় বড় সরকারী চাকরীর প্রলোভন দেখান
হইয়াছিল—এমন কি তাহাকে উড়িয়ার লাট-
সাহেবের নিকট একটি বড় চাকরীও দেওয়ার
প্রস্তাব হয়। সজদয় লাট তাহাকে বহু সদৃশ-
দেশ দিয়াছিলেন।... তাহাকে ইংরেজ বন্দী
করিয়াছিল। বন্দী মানব-সিংহকে দৌলবার
জন্য কত শত সাহেব আসিত।...
যখন তাহাকে জামিনে ছাড়িবার কথা
হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন : আমি
অন্য লোককে জামিন দিব না, আমিই আমার
জামিন হইব। তাহার এই আত্মপ্রত্যয় কত
বে বড় ছিল তাহা বলাই বাহ্য।... ক্রমে
যতীনের নাম ভারতের আকাশে বাতাসে
ছড়িয়া পড়িল।... পৃথিবীর প্রায় অধীশ্বর
বৃটিশসিংহ বিদ্রোহী দলকে চূর্ণ করিতে
মনস্থ করিয়াছিলেন... যতীনের কাজকে বিশেষ
অপ্রীতিকর ভাবিয়া তাহাকে ধরিবার আশ্রয়
চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নন্দী-প্রবাহের
বারি যেমন বোধ করা যায় না, ইংরেজের
অবস্থাও তাহাই হইল।... ইংরেজরা বলিত :
যতীন হিপনোটাইজ করিতে জানেন।...”

যতীন্দ্রনাথের উড়িয়া-প্রবাস সম্বন্ধে মণীন্দ্র-
বাবু লিখেছেন, “দুই কি চারদিন অতর
অন্তর দুই, তিন, চার হইতে দশ-পনেরোজন
লোকও কোন কোন দিন আসিতেন এবং
যতীনবাবু সহিত তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে
পরামর্শ করিয়া দুই-চারদিন থাকিয়া ফিরত।
হইতেন।

“কোন কোনদিন দেখিয়াছি কাংজের
উপর ঢালা রইয়াছে আদ্যাত তিন-পাঁচ
উচ্চ সভ্যদের স্তূপ। কখনো কখনো নেয়ট,
গাদা। যতীনবাবু আমাকে বলিতেন : দাদা
ওই সভ্যরেন হইতে তুমি এক কি দুই আঁজা,
লইয়া যাও।—আমি বলিতাম : ভাই, দেশের
রক্ত দেশে কাঁবেই ব্যতিত হউক।...”

মণীন্দ্রবাবু রোহি যতীন্দ্রনাথ ও অন্যদের
সঙ্গে এসে প্রাত্রাশ সেরে নিতেন। তিনি
লিখেছেন যে, প্রাত্রাশের পর, বাঁরা সাইকেল
চড়া জানেন না তাঁদের সাইকেল চড়া শেখানো
হত। আর আশ্রয়দাতা ব্যবহার করা। তার-
পর, স্নানের আগে নিয়মিত ধানিকঙ্কণ কুস্তি
করা হত। লালমাটি মেখে কুস্তির শেষে
আখড়ায় ধানিক জ্বিগে, স্থানীয় নদীতে—
গিয়ে বহুকণ সাঁতার কেটে তাঁরা আশ্রমে
ফিরতেন।

একদিন কুস্তির শেষে যতীন্দ্রনাথ তাঁ
ডান পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে
বললেন : তোরা ওটা দেখ আমার পা।

মণীন্দ্রবাবু লিখছেন, “আমরা দলে সৌক-
ক্ষমজন ছিলাম। সকলেই গায়ের জোরে তাঁদের
পায়ের কোন না কোনও অংশ ধরিয়া উঠাই-
বার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমাদের মিলিত
যুবশক্তি পরাজিত হইল।...”

আর-একদিনের ছবি দিয়েছেন মণীন্দ্রবাবুঃ লাইফেল শিশুবার রাস্তায় একটা বড় গাছ নিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছে শিক্ষার্থীদের। তাই, স্থির হ'ল, গাছটা কেটে ফেলা হবে। ফাটতে বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু, গোড়া-কাটা অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হ'ল সমস্যা। বহু চেষ্টাতেও কেউ কিছু করতে পারেন না। একচুলে নড়ল না গাছ।

তখন বতীন্দ্রনাথ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত। দূর থেকে এই ব্যাপার দেখে ছিলেন তিনি। এগিয়ে এসে তিনি সবাইকে একপাশে সরে দাঁড়িতে বললেন। তারপর, অবলীলাক্রমে গাছটাকে ঠেলে ফেলে দিলেন রাস্তার চৌহদ্দি পার করে-দূরে।

১৯১৫ সালের প্রথম গ্রীষ্মে শেষ ভাগ। অনাবৃষ্টি। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। এমন সময় কপ্তিপদার দর্ভক্ষ লাগল। গ্রামে গ্রামে দারুণ অল্পকণ্ট। একবেলা ভাত জোটা যায়।

এমন একদিন। দুপুরবেলা। একটা খালী কিলে আনা হয়েছে। চিঠিপ্রিয় মাসে রাখছেন। বেলা একটা বজ্জ। সকলেই ক্ষুধার্ত। অবশেষে মাসে নামল।

সবাই খেতে বসলেন। পাত পাত মহা-সমারোহে গরম ভাত আর মাসে পরিবেশন করলেন বতীন্দ্রনাথ। সেদিন সবসম্মুখ প্রায় আঠারোজন উপস্থিত।

কেউ ভাত মাখছেন। কেউ-বা মুখে গ্রাস জুলছেন। কেউ-বা সব্ব আত্মবাদ তারিফ করছেন। সকলেই প্রায় যুবক। পেটে প্রচুর খিদে। এমন সময়-একদল আদিবাসী ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুরুষ কোথা থেকে জুটল এসে। চিৎকারের ভঙ্গীতে তারা বলতে লাগল, 'স্বাব্দুমনে, কিছ খাইবাকু দিয়ো! কিছ খাইবাকু, বাব্দুমনে—'

তাদের আত্ম এই মর্নিত শব্দে, তাদের শীর্ণ-মলিন দেহ আর বেশকিছু দেখে কারো মুখেই আর ভাত উঠল না।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'কাহারও মুখের অন্ন গলাধঃকরণ করা অসাধ্য হইল। বতীন বলিলেন : আজ মহা সৌভাগ্যের দিন রে। আজ বহুদিক্ষিতের মূখে আমাদের এই অন্ন প্রদান করি।'

'সকলেই আসন ত্যাগ করিলেন। এবং এই অন্ন-বাজন দলপতির দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তাহাদের সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।'

পরম পরিতৃপ্তির সেই গরম মাসে আর ভাত খেতে আদিবাসীরা চলে গেল।

'এই কার্যের সমস্ত দলের কাহারও স্ত্রিমাল বা অসুখী বোধ করিতে দেখিলাম না,' মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন।

দর্ভক্ষ ছাড়িয়ে পড়ছে দেখে মবিয়া হয়ে উঠলেন বতীন্দ্রনাথ। গ্রামবাসীর দুরবস্থায় বিচলিত হয়ে তিনি দর্ভক্ষ ঠেকানোর জন্যে

শিশু চাষ-বাসের কাজে নামলেন। উদয়ান্ত ক্ষেতের কাজ শুরুর হ'ল।

বধেষ্ঠ ফসলও ফলল। দূরপ্র-গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজেদের সঞ্চিত সামান্য বাকি কিছু ছিল, তা-ও বিলিয়ে দিলেন বিপ্লবীরা। সাময়িক সুফল দর্শাল।

'কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না,' মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'আদিবাসী প্রকৃতি জাতিবা, এমন-কি উড়িয়াও অভাবে পাহাড় আলু, তুলাচেন প্রকৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অর্থী-হারে দিন ব্যাপন করিত। কথিত সময়টি এই-রূপ বড় অসময় ছিল।

'সেইদিন হইতে, বতীন্দ্রনাথ এইরূপ অতিথিদের দিবস জন্য সাধ্যমতো ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।...'

ঘরে ঘরে লাগল কলোরা। মৃত্যুর তান্ডব। শিশু বতীন্দ্রনাথ প্রতিটি পর্ণকুটির গিরে গুহু ও পথের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ব্যাধিভারাক্রান্ত রোগীদের মন থেকে জীবনের আশা লোপ পেয়ে যাচ্ছে : দারুণ শঙ্কা চারিদিকে : সারাবাত রোগীর পাশে বসে কাটছেন বতীন্দ্রনাথ উৎসাহের দেদীপ্যমান শিখার মতো—'ক্রান্তিবিহীন সংগ্রামরত বোম্বার মতো—' ফিরিয়ে আনছেন রোগীদের মনে বাঁচার সঙ্কল্প। দুরবর্তী গ্রামের রোগীদের এনে নিজেব আটচালার বেধে শয্যা করছেন সকলে মিলে।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'নানা প্রকার বনা আলু ও শাক ভোজনের জন্য অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যু-সংখ্যাও কম ছিল না।...'

এমন দুর্দিনে, চিঠিপ্রিয়ের পেটে অখাদ্য কুখরোর নিপীড়ন আর সহ্য হল না। তিনিও আক্রান্ত হলেন এই মারাত্মক রোগে। অনবরত অসাড়ে ভেদ হচ্ছে। নিকুম অচেতন্য দেহ। তাঁর চিকিৎসা, তাঁর শয্যা সবই বতীন্দ্রনাথ স্বহস্তে করছেন। দেশের ডাকে সর্বস্ব পণ করে যে-সহমানবের পতাকাভালে তাঁরা সমবেত হয়েছেন, সুখে-দুখে তিনিই তো তাদের কান্ডারী : পরম নির্ভরতার সঙ্গে পূর্ববালের এক সঙ্গতিপন্ন জমিদারের তনয় চিঠিপ্রিয় রায়-চৌধুরী শায়িত আছেন দেশবরেণ্য বিপ্লবী সাক্ষর বতীন্দ্রনাথের কোলে মাথা রেখে।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'তাহার সেই বাহ্য ও বমি দুইহাতে অঞ্জলি কবিতা পরিষ্কার করিতেছিলেন বতীন্দ্রনাথ নিজে।'

বন্দুরা শঙ্কাকুলচিহ্নে বসে আছেন প্রিয় বন্ধুকে ঘিরে। এখন-তখন অবস্থা। অল্প-ক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরল চিঠিপ্রিয়ের। বতীন্দ্রনাথের কেলে মাথা রেখে ম্যান হেসে তিনি বন্ধুদের বললেন, 'ও রে, মিছামিছ তোরা ভাবছি। রোগ-ব্যর্থতার ভুগে মরব বলে জন্মেছি নাকি? রক্তে নেয়ে সামনা-সামনি যুদ্ধ করে মরণের সঙ্গে বোঝাপড়া কবে যাব।'

অল্পক্ষণ বিধাতা ব্যর্থ বললেন, 'তথ্যসূত্র।'

ফাঁড়া কেটে গেল। ধীরে ধীরে ভালর দিকে ফিরল চিঠিপ্রিয়ের অবস্থা।

বতীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ যাদু-গোপাল মুখার্জী লিখেছেন, 'তাঁর চারিদিক লোকোত্তর বলা যেতে পারে। অতুল ঘোষ ঠিকই বলেন : 'শিবাজীর মতো গণকুশলী দেশপ্রেমিক ও চৈতন্যের মতো হৃদয়বান একাধারে পেলে আমরা পাই বতীন্দ্রনাথকে।'

'তাঁর মধ্যে বিপরীত গুণের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। একাধারে হনন ও প্রেম; নিদ্রাতা ও দয়া। বধকর্তা ও বধ্য যেন একাধারে বিজড়িত। মায়ের মতো রোহ-কোমল হৃদয় ভালবাসার ভরা। সে অবস্থায় যে তাঁকে দেখেছে তাব মনে হ'বে না যে ইনি আবার কুলিশ-কঠোর হ'তে পারেন কর্তব্যের তাগিদে। যে লোক বৃদ্ধা রমণীর ঘরসর বোঝা স্বয়ং মাথায় করে নিয়ে গিয়ে তার কুটীরে পৌঁছে দিয়ে আসেন, যে ব্যক্তি ওলাউটা বোগাবী মলমূত্র অঞ্জলি ভরে সাক করেন, যে ব্যক্তি মাসের সমস্ত বেতন অকাতরে অপব্যয় করে তাবই কাছ থেকে পাঁচটি পরমা ধার নিয়ে ট্রামে বাড়ি ফেরেন, যে ব্যক্তি প্রান্ত অনুচরকে পাখার বাতাস ও শয্যা দিয়ে ঘুম পাড়ান, সেই ব্যক্তিই নির্মম, নিরঙ্কুশচিহ্ন-স্বপ্নের মুখে এগিয়ে যানাব হুকুম দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে-অশ্রুত এ-সমাবেশ। আর তাঁকে দেখছি-মুর্তি পরিগ্রহকারী গীতা। এর ওপর আর কথা নেই। বলেইছি তো ভয় জিনিসটি কী তা তিনি জানতেন না।... ভয়ের কথা কি আর বলব? তিনি কোনদিন চমকেছেন বলে মনে হয় না।'

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই কত হিতকর কার্য না করিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে সাধুবাদ নাম দিয়াছিল, সেই নামে তাঁহার এখানে পরিচয় হইয়াছিল। হৃদয় যেন, নবনীত কোমল। আবার দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে পাষাণভুল্য কঠোর। আশ্চর্য সমাবেশ। সংগী-রাও দেখিয়াছি সকলে তাই। কর্তব্যনিষ্ঠ দেবভাবাপন্ন মানুষ ইহারা।...'

২ পাঠ ২

মাফসমা সহোদর্য বিনোদমালা দেবীর চিঠি এসে পৌঁছয় সহোদরতুলা শিষ্যদের মাঝফৎ; কপ্তিপদার অরণ্য বসে মহানায়ক বতীন্দ্রনাথের মানস-পটে জেগে ওঠে দ্বিদির রোহসুন্দর মুখ, জেগে ওঠে সহধর্মী ইন্দু-বালা আর তাঁর আদরের তিন সন্তান আশা-লতা, তেজেন আব বীরেন্দ্র কণা। সকাল-সন্ধ্যা আকুল প্রতীক্ষা দিন গুঞ্জন গুণ্ডা

* যাদুগোপালবাবু স্বয়ং এই স্নেহের অধিকারী হ'য়েছিলেন বলে তাঁর একটি পত্রে উল্লেখ কবেছেন ২

† বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (পৃঃ ৪১১)।

গৃহকোশে—বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে।

শিখোয়া, সহকর্মীরা সকলেই দিদি বিনোদবাবাকে মাতৃভাষা প্রাধা করেন, ভাল-বাসেন, ভাসেন সকলেই—যতীন্দ্রনাথের ধর্ম ও কর্মজীবনের অন্যতম প্রেরণা প্রেরণা হচ্ছেন দিদি। দিদির কাছে তাঁরা তেমন স্নেহও পান। অনেক সময়েই যতীন্দ্রনাথকে সামনে না পেয়ে দিদির কাছে তাঁরা ছুটে গিয়েছেন কত সময়ে পরামর্শের জন্যে। দিদি বিনোদ-বাবা, বৌদি ইন্দুবালা—এঁদের দুজনের কাছে যতীন্দ্রনাথের শিষ্যরা ঘরের ছেলের মতোই সমন্বয় পান। ঘরের ছেলের মতোই এঁরা সকলে এসে দিদি আর বৌদির কাছে পেঁপেছে দিবে যান যতীন্দ্রনাথের কুশল আর তাঁর অজ্ঞাতবাসের বিবরণ। সাধ্যমতো চেষ্টা করেন সংসারের দেখাশোনা করতে।

দিদি ইতিপূর্বে একটা চিঠিতে লিখে-
ছিলেন, “দেখিস, যতি, যেন শুনতে না হয় যে সিংহ পিঙ্গবাবা!”—অর্থাৎ যে মহৎ কর্মের অভিপ্রায়ে নিঃসন্ত হয়েছেন মহানারক, তা আরম্ভ হবার আগে কোনমতেই যেন যতীন্দ্রনাথের কেশাগ্রও স্পর্শ না করতে পারে বিদেশী শাসকেরা।

দিদির যতীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বসলেন:

ও

৩রা জৈষ্ঠ

শ্রীশ্রীচরণকল্যাণ—

দিদি আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমি বেশ ভাল স্থানে সর্বত্রগীর্ণ কুশলে আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা কবিবেন না। কর্মের নিমিত্ত বাহির হইয়াছি, ভবিষ্যতে সাক্ষাতাদি কর্মের উপবই নির্ভর করিতেছে। শীঘ্রও হইতে পারে, কিছু বিলম্বও হইতে পারে। তবে নিরাশ হইবার বা ভয়ের কোন কারণ দেখি না। সর্বদা স্মরণ রাখিবেন “ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি”।—আমি আশীর্বাদ সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি—তিনি সমস্ত কর্মে সর্বদা যেমন সাহায্য করিয়াছেন, এ বর্তমান অবস্থায়ও তেমনি সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই—তাহাবই প্রেরণা এ কর্ম-সমূহে কাঁপাইয়াছি, তিনিই কুলে লইবেন। আপনি যে মা ব সন্তান তাহাব হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া আপন হৃদয়ে বল রাখিয়া যে সকল রক্তগুণ আপনাব নিকট আছে তাহাদের যাহাতে উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্মের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যতে মায়ের পুজায় অর্পণ করিতে পাবেন, সেই চেষ্টা করিবেন। আপনি ব্যস্ত হইলে ইন্দুদের নিকট কি আশা করেন? আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সমস্তই বুঝেন। সংসারে সমস্তই যে কত অশ্রুয়া তাহা আপনি অনেক প্রকারে দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন। এই অশ্রুয়া সংসারে অশ্রুয়া জীবন যে ধর্মার্থে বিসর্জন করিতে অবকাশ পায় সে ত ভাগ্যবান এবং

তাহাব সমস্ত শূভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন বিশেষতঃ তাহার মাতৃস্থানীয় সাহাদরা যদি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে নিজেদের বংশের সৌভাগ্যের কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ধর্মার্থে বহির্গত ব্যক্তির সাধনায় সিস্থির পূর্বে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, বরং তাহার মস্তুর সাধন পথের সহায়তার নিমিত্ত তাহার অবর্তমানে গৃহে বৃদ্ধ বাঁধিয়া ভগবানে নির্ভরতা সহকারে পরম্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তিদান করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং এই প্রণীত ব্যক্তিরাই জগতে ধন্য এবং সাধক মাতৃসন্তান পান করিয়াছেন। হা-হুতাশ ত সকলেই করিয়া থাকে, আপনি আমিও যদি তাহাই করি তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয় মাতৃদেবী পরমেশ্বরী গর্ভে জন্মিয়া-ছিলাম কেন? আমরা ত সাধনপথের ন্যায় দুর্বলহীন অবিবাসী সামান্য মায়ের সন্তান নই—আমাদের মা জীবন ভরিয়া কি সকল ব্যাপার হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়া গিয়াছেন একবার ভাবিয়া দেখুন ত আর তাজ তিনি জীবিত থাকিলে তিনি স্বয়ং আমাকে আমার কর্মে-বরণ করিয়া লইতেন সন্দেহ নাই। তাহার অবর্তমানে বাহির হাতে আমরা কে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলাম, আমরা সেই মাতৃ-স্বর্ণপিণী সাহাদরা ও গুরু, ভূমীর কি করা কর্তব্য একটু ভাবিয়া দেখিবেন। আপনি ইতিপূর্বে একসময়ে কোন বিপদের সময়ে আমাকে লিখিয়াছিলেন, “আমাদের অপেক্ষা যিনি তোমাকে বেশি ভালবাসেন তিনিই সর্বদা তোমার কথা ভাবিতেছেন, আমরা তোমার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া কি করিব।”—আপনাব অবস্থা এতদিনে আরও উন্নত হওয়ার কথা। হৃদয়ের বল এখন আরও অধিক হইয়াছে আশা করা যায়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মন শান্ত করিয়া সমস্ত ইন্দুক রক্ষা করিবেন। সন্তানগুলি বাহাতে মানুষ হয় তাহার চেষ্টার যেন কোন দ্রুতি না হয়। কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইলে তাইদের কাঁধকেও স্মরণ করিবেন এবং আমার মত জ্ঞান করিয়া প্রয়োজন জানাইবেন, অভাব থাকবে না। কোথাও আছি জানিয়া প্রয়োজন নাই—পূর পাইলেন তাহাও কাহাকে বলিবাব প্রয়োজন নাই। প্রেরিত লোকের নিকট বক্তব্য যদি কিছু থাকে জানাবেন। সমস্ত গুরুজন-দিগকে প্রণাম ও আশীর্বাদভাজনগণকে স্নেহাশীষ্য দিবেন। স্মরণ রাখিবেন বিপদের সময় সৈম্ব সহকায়ে বৃদ্ধির অগ্রয় গ্রহণ

করাই যিবে। পরমাত্মা শ্রীগুরুদেবের চরণে পদা মতি রাখিবেন। তাহাকে পরমি লিখিবেন।
শ্রীচরণে নিবেদন ইতি
প্রণতঃ সেবক—

সে-যুগে যতীন্দ্রনাথের দিদি বিনোদবাবা দেবী খুবই শিক্ষিতা ছিলেন। তাইয়ের অজ্ঞাত-বাসকালে তিনি প্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিকের ভরণ-পোষণের জন্যে শিক্ষকতা শুরু করেন। আত্মীয়-স্বজনদের উপর পড়ে সরকারী রোষ জারোপিত হয়, সেই ভয়ে বিনোদবাবা দেবী বা ইন্দুবালা দেবী তাঁদের সঙ্গে এ-সময় কমই মিশতে চান।

যতীন্দ্রনাথের সন্তানদের কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলে না। এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় নতুন নতুন জায়গার কিছুদিন পড়তে না পড়তে সরকারের হুকুম আসে বিদ্যালয়েই পরিচালকদের ওপর : বিদেশী সবকার অন্তত যতীন্দ্রনাথের সন্তানদের শিক্ষার কোন সুযোগ দিতে আগ্রহী নয়।

ওদিকে সংসারও প্রায় অচল। বিরাট বহরের মানুষ যতীন্দ্রনাথ। বিরাট বহরের মানুষ তাঁর দিদি বিনোদবাবা দেবী। স্বল্প আয়ে স্বল্প-বিস্তারভোগীদের মতো করে চলতে অনভ্যস্ত তিনি।

এ-হেন পরিস্থিতিতে কি দিদি বিনোদ-বাবা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর সহজাত সৈম্ব? অটল তাঁর ধর্মবিশ্বাস—কি টলে উঠেছিল মহত্ত্বের জন্যে? কেন যতীন্দ্র-নাথ উদ্ধার কবলেন গাঁতের কষ্ট অধ্যায় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি?

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : প্রমথ সংগে একবার যিনি যোগের পথে পা বাড়িয়েছেন, তাঁর জো কোনও বিনাশ নেই। সমস্ত দ্রুতি, সমস্ত বিচ্যুতি, সব অসামান্য থেকে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সংগ্রহ করে প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি সিস্থিবই পথে অগ্রসর হন।

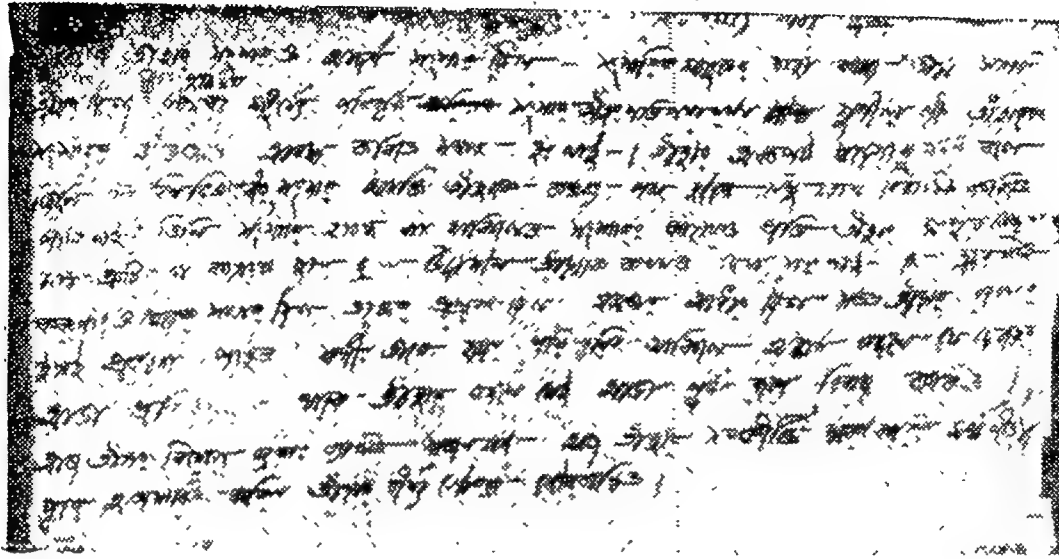
শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি উল্লেখ ছিল অজ্ঞানের সাময়িক সংশয়। বাসনা-কামনাব পর্বত হতে শূভাশুভ বিচার করে মনবুদ্ধি পরিচালিত অজ্ঞান তাঁর পথে রুত্বী হয়েছিলেন। তাই তাঁর মনে জেগেছিল সংশয় : এই যে যোগের শিক্ষা নিয়েছেন তিনি, তার স্বরূপ পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি কবে তাঁর ভর হল—এই যোগে প্রবৃত্ত-হবেও দেবতা যদি স্বয়ং মৌখিক আসে, অকৃতকার্য হন তিনি? তখন তাঁর কী গতি হবে?

দিদি বিনোদবাবার মনে তখন হয়তো এমনি কোনও সংশয় : কী গতি হবে যতীন্দ্র-নাথের নাবালক তিনটি সন্তানের? কী গতি হবে তাঁর সহধর্মিণীর? কী গতি হবে এই সোনার সংসারের?

তাই কি যতীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সমাধানের কথা?

* যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী।

† যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ও শিষ্যদের কথা বলছেন।



যতীন্দ্রনাথের দ্বিদি বিনোদবালা দেবীর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

[যতীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা উষারানী দেবীর সম্পদলন থেকে]

আর জানিবে দিলেন যে তাঁর অবতরমানে তাঁরই বিপ্লবী ভাইয়েরা রক্ষাবক্ষণ করবেন তাঁর পুত্র-পরিবারের, আর তাঁর মাতৃসমান্য সহোদরার।

অবশ্য যতীন্দ্রনাথের শেষোক্ত আশা যে বোল আনা সফল হয় নি, বোল আনা কেন অনেকটাই—তার প্রধান কারণ ইংরেজ সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা, যার ফলে যতীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা রাজ-দ্রোহের পর্যায়ভূক্ত হ'ল। দ্বিতীয় কারণ, যতীন্দ্রনাথের অনেক শিষ্যই আকস্মিক করেন যে মহানায়কের অস্তবের স্পর্শমণির ছোঁরা লেগে তাঁদের প্রবৃত্তিগত প্রকৃতির লোহা সবটাই প্রায় সোনা যেমন হয়ে উঠতে দেখি লাগে নি, অতি ভীরুও হ'ল উঠেছিলেন বাঁধ, তাঁদের অনেকেই বিদ্যাব্যপস্পর্শরহিত চম্পকের মতো পুনর্মুখিক-রূপ ধারণ কবলেন যতীন্দ্রনাথের অবতরমানে। অনেকেই মনে নিলেন গতানুগতিক জীবনের ঠাকা-আনা-পাই হিসেবের ক্রান্তিকর বিভ্রমণ। আর-কোনও দিকে নজর দেবার অবসর পেলেন না তাঁরা।

আমাদের মনে স্বতই প্রশ্ন ওঠে : এ-চিঠি লেখবার সময়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহযাত্রী ইন্দুবালাকেও কি দৃষ্টি চিঠি লিখতে পারলেন না? ইতিবৃত্তের পরিমণ্ডলে আমাদের মনে কি জাগে না সংসারভ্যাগী সিন্ধুধর্মের মহাবীর কথা, শ্রীচৈতন্যের বিরহ-কল্যাণ অবসাদে মুহাম্মান দেবী বিকৃতপ্রায় কথা?

নাকি বিনা স্মিয়ার হাসিমুখেই যে ইন্দুবালা মনে নিয়েছিলেন তাঁর বাঁধ স্বামীবা সমন-মাগের এই চরম পরিণতি, প্রাচীনকালের

রাজপুত্র রমণীদের দৃষ্টান্ত স্মরণ কবে বিনি পরম ভরসার যতীন্দ্রনাথকে যেতে দিয়েছেন তাঁর অস্তরের স্বধর্ম অনুযায়ী স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোতার ভূমিকা অবতীর্ণ হবার জন্যে—সেই ইন্দুবালায় জ্বলো সাম্রাজ্য বাপী কই, শান্তির বারি কই?

ইন্দুবালা দেবীকে যতীন্দ্রনাথ লিখলেন : পরমকল্যাণবরাসু—

ইন্দু, আমার স্নেহাশীষ লও। তোমাকে আর পৃথক কি লিখিব, দ্বিদিকে যে পত্র আমি লিখিলাম উহা পড় ও মর্ম অবগত হও। ভগবদ্বিদ্ভাব আজ ১৫।১৬ বৎসর আমার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল যখন সময় পাইবাহি তখনই বহুপ্রকাবে বৃষ্টিতে চেষ্টা করিয়াছি প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায়। অদ্য যে অবস্থা আসিয়াছে এ অবস্থা যে এক সময় আসিবেই এ সম্বন্ধে নানাপ্রকাবে তোমাকে বৃষ্টিয়াছি এবং প্রস্তুত থাকিতেও বলিয়াছি। আশা করি তোমার মত ক্ষেত্রে আমার সে সকল শিক্ষার বাঁজ আশানুরূপ ফল প্রসব কবিয়াছে। বহু বহু সহস্রের মধ্যে একজনের নিকট যেরূপ শক্তি, ধৈর্য ও কর্তব্যজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তোমার নিকট প্রকৃতিই তাহাই আশা করি। সন্তানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষ্যের সন্তান বলিয়া পরিচিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিও না। ক্ষণিক দুর্বলতা সকলেই আসিতে পারে; সেদুপ অবস্থায় দ্বিদিকে সাহায্য করিও ও তাহার সাহায্য গ্রহণ করিও। সর্বদা মনে রাখিও যে প্রকৃতি লইবাই পুরুষ পুর্ন—যত দূরই থাকি না কেন, তোমার প্রসন্নতা ও শুভেচ্ছাপূর্ণ শক্তির সাহায্য বেন

সদা পাই। সর্বদা শ্রীগুরুদেব ও ভগবৎ চরণে তোমার স্বামীর সিন্ধুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিও এবং হৃদয়ে বল রাখিও।

হীত—

রোমাঞ্চ উপভোগের বাস্তব

দানেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি পুস্তক ৭ ডিটে কটি

উপভোগ যুগ ৩।০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি পুস্তক উপভোগ,

যুগ ৩।০

জাতীয়-কবি রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রত্নলাল-গ্রন্থাবলী

পান্ডিত্য, পুস্তকসম্বন্ধী, কর্মদেবী, কুমার-
সম্বন্ধ, নীতিকুসুমাজলি, কাঞ্চী-কাবেরী,
কবির জীবনী ৭খানি একত্রে ২'০০।

গ্রাম্যাক্ষয় তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

নাড়াজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী শর্মা দ্বারা রোগ নির্ণয় ও

পরামর্শ নিরূপণ)

যুগ এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-১২



নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের নাহ্যক

আকাশের শেষ পাখিটাও নীড়ে ফিরে গেছে বোধহয়। সারাদিনমান উড়েছে, উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়েছে। তারপর ফিরে পেয়েছে শেষ আগ্রয়টুকু।

আকাশজুড়ে অসীম শূন্যতা। দূরের টেলিগ্রাফের তারের চিহ্নটুকুও আধারের সঙ্গে মিশে গেছে ততক্ষণে। এই টেলিগ্রাফের তার কোথায় গিয়ে মিশেছে কে জানে!

নীতা অন্ধকারে বসেছিল। ঝি এসে আলো জ্বালিয়ে দিতেই চিস্তার পলক পড়ল। ঘরের আলো তারের জ্বালে তৈরি লোহার জানালা থেকে বাইরে এসে পড়েছে। আলো যেন নীতাকে হেসে বলছে, এই দ্যাখ, কেমন তারের জ্বালকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বাইরে এসে হাসছি।

বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। শশিড়ি কি একটা ধর্মের ছবি দেখতে গিয়েছে। স্বামী বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে হয়ত। ফিরবে সেই রাত দশটায়। নেহাৎ রাতটুকু বাইরে থাকা যায় না তাই।

কিছুক্ষণ একা একা গান গেয়েছে নীতা। বাড়িতে সবাই থাকলে গান গাওয়া যায় না। এখানে কেউই যেন নীতার অনুভূতিটাকে উপলব্ধি

করতে পারে না। স্বামী কতিদিন বাইরে থেকে এসে বলেছে, গান-বাজনা, গল্প-কবিতার বই এই সব যদি এতই ভালবাস, তবে আমার ঘরে না এসে—কথাটা অবশ্য হেসেই বলে ওর স্বামী। কিন্তু নীতার কাছে গোপন থাকে না স্বামীর মনোভাব। ও অনুভব করে দুজনের চিন্তায় মধ্যে কি সীমাহীন ব্যবধান। রাস্তার আলোটাকে কিসে যেন বারবার চক্রের মত কাটছে। নীতা চোখ যে বাতেই দেখল ফ্যানটা। ঘুরছে ওটা। আর তারই ফলে মনে হচ্ছে কে যেন আলোটার সঙ্গে চক্র নিয়ে ঝুঁপ করছে।

ঘড়িতে শব্দ শোনা গেল। বোধহয় সাতটা বাজল। দূরের বড় বাড়িটাকে অনেক বাড়ির ভিড়ে খুব অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। শূন্যে ওরা বিরাট বড়লোক। ওদের বাড়ির বড় ছেলে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে।

বাইরের আলো অনবরত কাঁপছে। আর কাঁপছে। ঘরের মধ্যে ওর কুমারী জীবনের ফটো। এখন আর সেদিকে ফিবে তাকাবারও অবসর হয় না নীতার। ছিপছিপে নীতার সেই রূপ যেন আর নেই। কালো চোখে শূন্য ক্রান্তি। ফটোর গলায় সাদা লকেটমালা মালাটা

আজ যেন নীতাকে দেখে ওটা করছে। উঠে গিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিল নীতা। কিছুক্ষণ পর গান ভাল লাগল না। বন্ধ করে দিল নীতা। কেন যেন এখন নিজের মতোমুখি বসে নিজের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। মন চাইছে অতীতের আমির সঙ্গে বর্তমানের আমি, ভবিষ্যতের আমির সংযোগ খুঁজে পেতে। কোন একটা নির্জন মূহুর্তে মানুষ মনে মনে বোধহয় এই ধরনের কামনাই করে।

ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়ে নীতার। বাবা রেলের কাজ করতেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে নীতা। আগা, বেনারস, কানপুর আরও কত জায়গা। প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন বাবা। নিজেও গান-বাজনা ভালবাসতেন। বাড়িতে সব সময় লোকজন।

মানুষই বোধহয় মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। সেই অল্প বয়সেই নীতা বুঝেছিল মানুষকে। তাকে নিয়ে কত ছেলের কাঙালপনা। কত মিথ্যে সাজসজ্জা। মা-বাবার মন পেয়ে নীতাকে জয় করার কি আপ্রাণ চেষ্টা। নিজেদের মধ্যে কি অশুভ ঝেঁষাঝেঁষ। অথচ এদের কারোর মধ্যেই সে নিজেকে খুঁজে পেতে না। ভাল

লাগত না ওদের কাউকেই। সুন্দরী নীতা ওরা চলে যাওয়ার পর আয়নার এসে মুখ দেখত আর মনে মনে হাসত। আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড়িয়ে রেখে মনে হত, পেছন ফিরলেই সে দেখবে ওইসব ছেলেদের। সবাই হাত বাড়িয়ে আছে নীতাকে ছোঁবার জন্য। নীতাও জানত আয়না থেকে মুখ সরালেই সে দেখবে কেউ নেই।

বড়লোকের বাড়িটার মোটরের হর্ন শোনা গেল। বোধহয় বড় ছেলে এল। বাড়িতে কত কি শোনে নীতা। ওই বড়লোকের ছেলেটা নাকি এক ডজন মেয়ে নিয়ে গাড়িতে করে ঘোরে। একেক দিন এক-একজনকে সঙ্গে নেয়।

পাশের বাড়ির বাচ্চা ছাগলটা সেই থেকে চিৎকার করছে। বড় কণ্ট লাগছিল নীতার। বোধহয় বাইরে বের হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু বেরোবে কি করে? শেকল দিয়ে বাঁধা যে!

মোটরের হর্ন আবার শোনা গেল। ঘরের মধ্যে ঘড়িটার টিকটিক শব্দ। পাশের বাড়ির ছেলেরা মেয়েরা মিলে খেয়েটারের মহলা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে খেয়েটারের সংলাপ। মেয়েটা বলছে, হাতদিনে তোমাকে চিনলাম। আমার লগ্নো শব্দে ভালবাসার অভিনয় করে গেছ। এখন বিয়ের কথা বলতেই বলাছ, মাপ করো, তোমাকে বন্দু মনে করে ছুরতে পারি কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারি না। কারণ আমারও তো একটা স্ট্যাটাস আছে!

নীতা কান পেতে সংলাপগুলো শুনছে। মেয়েটির মূখের ভাবটা দেখতে ইচ্ছে করছিল নীতার। ওর চোখে-মুখে এখন কিসের অভিব্যক্তি?

ছেলেটি বলছিল, ঠিকই তো। তুমি লেখাপড়া জানো না। দ্যাখো, সমানে সমানে ছাড়া ভালবাসা হয় না। অভিনয় করা যায়। ভালবাসা হয় না। সামাজিক আর অর্থনৈতিক মূল্যটাকে এত ছোট করে দেখ না। সের্টিফিকেট তো দুদিন পরে বন্ধুদের মত মিলিয়ে যাবে। অতএব—ছেলেটি বোধহয় চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি বোধহয় ছেলেটির নাম ধরে একবার চিৎকার করে ডাকবে।

বাস, তারপর কিছুক্ষণ কান্না। নাটক শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু নাটক শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নাটক শেষ হয় না। একথা কি দর্শকরা মনে রাখে? বোধহয় রাখে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নীতার। বাজনা বাজছে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। পরিচালক মিউজিসিয়ানকে বলছে, আরও করুন, আরও প্যাথোস

নোট চাই। অভিনেত্রীটিকে বলছে, আরও। যন্ত্রণা ফোটাতে হবে মুখে। আরও। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল সে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। ইউ ফিল ইট। এক্সপ্রেসনে আরও বেদনা, আরও যন্ত্রণা।

সকরুণ সুরে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বেজে চলেছে। মেয়েটা বোধহয় ঠিকমত ফোটাতে পারছে না। নীতার ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে পরিচালককে বলে, আমি পাটটা করি। ও কি করে বুঝবে, প্রত্যাখ্যানের বেদনা! চোখে-মুখে আর কতটা ফোটানো যায়, যদি মনের মধ্যে না ফোটে।

ড্রেসিংটোবলের সামনের আয়নাটার নিজের চোখ পড়তেই নীতা দেখল, ওর চোখে জল!

চোখের জল মুছল নীতা। এ তো জল নয়, এ জ্বালা! জানাল দিয়ে তাকিয়ে দেখল পুরুষ অভিনেত্রীটিকে। বেশ বড়লোকের ছেলে। বড়লোকের ছেলে বলেই মনে হয়।

চোখে চোখ পড়তেই ছেলেটি হেসে বলল, কি বুঝছেন বৌদি? কেমন এ্যাকটিং করছি? হাততালি পাব তো?

—নিশ্চয়ই! আপনাদের মত লোকদের অভিনয়কে হাততালি না দিয়ে পারা যায়?

কথাটা এমনভাবে বলল নীতা, যেন নিজের কানেই বিদ্রী়া শোনাগ।

নীতা মনে মনে লজ্জা পেল। ভাবল, কি মনে করল ছেলেটা কে জানে! অথচ কত ভাল ছেলে ও। নীতা বুঝতে পারছিল না এই ছেলেটাকে এভাবে রাগ দেখাবার, কি মানসিক কারণ থাকতে পারে? ছিঃ!

নিজেকেই যেন তিরস্কার করল নীতা।

পরিচালক ছেলেটিকে ডাকতেই ছেলেটা ভেতরে চলে গেল।

নীতা উঠে গিয়ে রোডিওটা চালিয়ে দিল। ভাল লাগল না। সেতর নিয়ে বসল। দেখল, অনেকদিন হাত না পড়ায় কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে সেতারের সুরকে। এখন যেন নিজের সুরকে নিজেরই চিনতে ইচ্ছে করে না নীতার। হয়ত চিনতেও পারে না।

দৈম্যালের ক্যালেন্ডারে জাহাজের ছবি। নীতা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জাহাজটার দিকে। বোধহয়—এমনি একটা জাহাজেই অরুণ বিদেশে চলে গেছে। তারপর...! আর কিছু যেন ভাবতে চায় না নীতা।

উঠে গিয়ে হাতের সেতারটাকে বাজের মধ্যে রেখে দিল। বহুদিনের রঙ চটে-যাওয়া একটা

পুরানো বাস। ভেতরের সেতারকে বাইরে না রাখাই ভাল। দেখলেই গানের কথা মনে পড়ে যায়।

একেকদিন সন্ধ্যাবেলাটা বড় খাঁ খাঁ করে। কে যেন নেই, কি যেন নেই। ছেলেদুটো ওর পিসীদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। তবু ওদের দেখলে বুকটা যেন ভরে ওঠে। মনে হয় কেউ না থাকুক, ওরা তো আছে।

নিজের অস্পষ্ট স্মৃতির দিকে আরেকবার তাকাল নীতা। স্মৃতিও যেন অস্পষ্ট আজকে! সেতর বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে নীতার। তারপর দুটো বাচ্চা হয়েছে। দীর্ঘ সময়। অথচ এ সময়টুকু কী ভয়াবহ—ক্রান্তিকর। প্রতিদিন নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা। নিজের সঙ্গে অভিনয়, অপরের সঙ্গে অভিনয়। দেহটাকে মনে হয় অশুচি। সন্তানকে মনে হয় কামনার ফল। সব কিছুই ঘটেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যার মধ্যে কোন মানসিক মিলনের স্মৃতি নেই। পাশের বাড়ির রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। নীতা কান পেতে রইল কিছুক্ষণ। বাঃ, সুন্দর গানটাতো! নিজেরই যেন এখন গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

এই গানই যেন নীতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সবার সঙ্গে লড়াই করেও গানকে বাঁচিয়ে রেখেছে নীতা। মাঝে মাঝে ফাংশনেও গান গায়।

গানের কথার সঙ্গে নিজের কথাকে বোধহয় মিলিয়ে নিচ্ছিল নীতা। আয়নার সামনের টেবিলে রাখা বুদ্ধদেবের মূর্তিটার ছায়া। একটু তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে। একমনে দেখছিল মূর্তিটাকে।

মূর্তিটার পেছনে আরও একটা ছায়া পড়েছে। দীর্ঘ একটা ছায়া। নীতার কানের মধ্যে এখন আর কোন শব্দই প্রবেশ করতে পারছে না। চোখের সামনেও সব দৃশ্য যেন সরে গেছে এখন।

নীতা যেন আপনমনে কোন একটা দৃশ্য তৈরি করে নিয়েছে। সময় পেলে, একাকী থাকলে নীতাই এ দৃশ্যটা সাজায় আপনমনে। মনের ওপর তো কোন পাহারাদার নেই।

লুকিয়ে লুকিয়ে বলা কথাগুলো, অনুভব করা স্মৃতিগুলো নিজেই যেন গল্পের আকারে সাজিয়ে নেয়। একাকী থাকলে আরেকজনের কথাও সে মনে মনে অনুভব করে সুখ পায়। বেদনা বাড়ে!

নীতা নিজের মনেই বলে, 'এই, এখন কেউ নেই, তুমি চট করে চলে এসো।' দুজনে অনেক কথা বলতে পারলো। আমাদের দুজনের কাউকেই ভয়ে ভয়ে কথা বলতে হবে না এখন।

আর আশ্চর্য। দীপক যেন নীতার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে এসে হাজির হয়। বলে, এসেছি।

নীতার তবু ভয় যায় না। চোখে সংশয়। মূর্খে লজ্জা। একটু হেসে বলে, এখানে যদি কেউ দেখে ফেলে তোমাকে।

দীপক হেসে বলে, দেখুক ভয় কী? আমি তো আছি?

হাসি মৃদু আরও হাসি হয় দীপকের। আরও নীতার কাছে এগিয়ে আসে। তাকিয়ে থাকে আপনমনে। নীতা সুন্দরী। কিন্তু ও যেন এই দৃষ্টির মধ্যে দেহকে ছাড়িয়ে আরও একটা অপরিপাকের স্বাদ উপলব্ধি করে।

তার কালো হরিণের মত চোখের এখন আলাদা বিশেষত্ব। সুন্দর কোঁকড়ান চুলের এখন অন্য মর্যাদা। নীতা বেন টুকরো টুকরো হয়ে কারো কাছে অনেককালের নীতা হয়ে গেছে।

—নতুন কি লিখলে?

—এখনও লেখা শেষ হয় নি। লেখা শেষ হলেই তুমি পাবে।

কথা বলে দুজনেই কেমন যেন চুপ হয়ে যায়। যেন এই কথার আড়ালে আরো একটা কথা লুকিয়ে আছে। যেটা অনুভব করেছে দুজনে এখন চুপ।

নীতা যেন একসময় মৃদু না তুলে ধরছে আজকাল। আর ডাকলেও সাড়া পাই না। আসো না।

দীপক যেন হেসে বলছে, সময় পাই না। তাছাড়া—

নীতা মৃদু স্মিতমানী। বলছে, সময়ের অজুহাতটা বদ দাও। ওই বস্তুটিকে সাক্ষী রেখে অনেক মিথ্যে কথা বলা যায়। তাছাড়া আমি যদি সময় করতে পারি এত নিষেধের মধ্যেও তুমি পার না কেন?

দীপক যেন চুপ করে আছে। মৃদু মৃদু হাসি।

অভিমানী নীতা আবার বলে, আসলে ভাবুক মানুষ তুমি। নিজের খেয়ালটাই তোমার কাছে বড়। সত্যি কথা বলতে, তোমার ওপর নির্ভর করা যায় না।

দীপক হেসে বলে, কেন আমি লোকটা কি খায়াপ?

নীতা মৃদু নিচু করে জবাব দেয়, একজন মানুষ সম্পর্কে এইটুকুই কি সব কথা?

কবে যেন দীপকের সঙ্গে নীতার দেখা হয়েছিল। মনেও পড়ে না আজ সেই দিনটার কথা। আত্মভোলা, সহজ সরল এক লেখক। মৃদু হয়েছিল নীতা। মনে হয়েছিল নিজেরই যেন আরেকটা প্রতিচ্ছবি। কিন্তু— এই কিন্তু ভাবতে গিয়ে সে শব্দ কন্ঠ পেয়েছে। নিজেরও টের পায় নি মনে মনে কখন যেন সে জড়িয়ে পড়েছে। অথচ এই জড়ানোর কত বিশ্বাস, কত ভয়।

এই আলোর ভরা ঘরটা যেন আরও আলোকিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে সরে গিয়ে যেন আরও একটা কম্পনার পৃথিবী তৈরি হয়েছে। রেস্টুরেন্টে দুজনে মৃদুমুখি। বাইরে ব্যান্ডপাইপ বাজিয়ে, আলো সাজিয়ে একটা বিয়ের মিছিল যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে দেখা যায় ট্রামের তারের জ্বলে-ওঠা আগুনকে। কেমন যেন কর্কশ শব্দ। চারদিক জ্বলে লোক আর লোক। জানালা দিয়ে বড় আকর্ষণটিকে দেখা যায় না। সামনে পড়ে আছে চায়ের কাপ। দুজনেই মৃদুমুখি। আরনায় দেওয়ালে আঁকা উড়ে-যাওয়া পাখির ছবিগুলো পড়েছে।

এক সময় নীতা বলেছিল, বস্তু একা লাগছে। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসার কথা। নিজের গনের অসহায়তা আর করুণ রেশটা কাটাবার জন্যই নীতা স্নান হেসে বলেছিল; বেশ ভালো জাপনমনে। একদিন দিয়ে ভাল। অন্য কোন মনের ধার ধারতে হয় না।

দীপক কথা বলে নি। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তারপর একটু চুপ থেকে শব্দ বলেছিল, নীতা।

স্পষ্ট গলার আওয়াজ। এই কন্ঠ-স্বরের মধ্যে কেন বিশ্বাস নেই। ভীরুতা নেই। এই ছোট ডাকটুকুর মধ্য দিয়ে দীপক যেন সহস্রের সঙ্গে কোন এক গভীর বিশ্বাস ও সত্যের কথা বলেছিল।

কি এসে ঘরে ঢুকেছে। এসে দাঁড়িয়েছে। বৃন্দদেবের মূর্তিটা আড়াল পড়েছে এখন। কি জিগেস করছিল রান্নার কথা।

নীতার মনে হঠাৎ এতক্ষণ ও যেন কোন স্বপ্নের জগতে ছিল। কানে আবার আসছে থিয়েটারের সংলাপ। চোখের সামনে এ মাসের ছেঁড়া ক্যালেন্ডার।

দীপক চলে গেছে। নীতাও বাইরের বারান্দায় এল। বারান্দায়

অন্ধকার তবু এই অন্ধকারকেই ভাল লাগছিল নীতার। সেও যেন এই অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আলো খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবল, দীপককে আবার সে ডাকে। ডেকে বলে, আমাকে আশ্রয় দাও। আর পারি না নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে। তবু বৃকের মধ্য থেকে ভয় যায় না নীতার। কি যেন একটা আশঙ্কা। শেষ পর্যন্ত কী হবে নিজেরই যেন বৃকতে পাল্লো না। শব্দ মনে হয় দুজনেই। দুজনেই ঠকানো। এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করা আর স্বপ্নের মধ্যে কথা বলা কতদিন ভাল লাগে। একদিন যেন মন চায় তারা পরস্পর আরো কাছে হোক। নীতার ভয় হয়, যদি কোনদিন জানা-জানি হয়ে যায়? সৈদিন নীতা দাঁড়াতে কোথায়? আসলে দীপককে সে নির্ভর করতে পারছে না। একজন সং, আদর্শবান নিরাসক্ত মানুষকে ভালবাসার যে অনেক দায়। শেষ পর্যন্ত সবটাই যদি ছেলেখেলা হয়? এই ভয় থেকেই নীতাও মাঝে মাঝে ভেবেছে, দীপককে সে আর বেশিদূর এগোতে দেবে না। যদি একল ওকুল দুকুল যায়? মানুষ তো আর স্রোতের ফুল নয়? আশ্চর্য, নীতার এক মন ওকে দারুণ বিশ্বাস করে। ভালবাসার প্রতি বিশ্বস্ত মনে করে। আবার আরেক মন মাঝে মাঝে বলে, ও উদাসী। তোমাকেও একদিন ও দূরে সরিয়ে দেবে। ওর কাছে শিল্পই বড়। তুমি শব্দ ওর শিল্পের ছায়া মাত্র। কিন্তু নীতা এখন কি করবে? সে যেন শিল্প আর প্রেমের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এই জটিলতার জট যত খুলতে যাচ্ছে তত সে একাকী বোধ করছে নিজেকে।

জানালা দিয়ে আবার তাকাল নীতা। সেই পুরনো সংলাপ। মেয়েটি স্টেজে একা একা দাঁড়িয়ে সংলাপ বলছে।

‘আর পারি না নিজের সঙ্গে অভিনয় করতে।’ ইশ্বর এ অভিনয়ের জগৎ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

‘বাকি মনে মনে চাই না কেন তারই সঙ্গে আমাকে চিরকাল টিকে থাকতে হবে। যেখানে ভালবাসা নেই, প্রীতি নেই, যেখানে শব্দ প্রয়োজনের থাবা। সে জগৎ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে আমার কম্পনার জগতে আমাকে যেতে দাও। শব্দ, মানুষ নাকি স্বাধীন। কিন্তু এখানে এই পৃথিবীতে এই কয়েদ-খানায় প্রতিমুহূর্তে আমি অনুভব

করছি, আমি আমার নয়। আমি যেন কতগুলো চিন্তার স্বীকৃতদাসী।

ব্যাকগাউন্ড মিউজিক বাজছে। নারিকার মানসিক অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা চলছে। আকাশের দিকে চোখ রাখল নীতা। দূরে তারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বস্তু দূরের মনে হয় ওকে। যেন অসহায় হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া তার আর মানুষের যেন কিছু করার নেই। কিন্তু অসহায় মনে হচ্ছিল নীতার নিজেকে। মানুষের রূপ, যৌবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা যেন কোন চৈতন্য পাতালপুরীতে বন্দী করে রেখে দিয়েছে। মানুষ যত খুঁজে বেড়ায়। দৈত্য মনে মনে তত হাসে।

নীতাই কতদিন দীপককে বলেছে, আমি আপনার মত কম্পনাবিলাসী নই। পুরো নাস্তববাদী। আপনার ভাবনা সাহিত্যে চলে। জীবনে নয়।

তারপর কখন যেন ওরা আপনি থেকে তুমি তে এসেছে। কিন্তু তুমির নৈকট্য যে শুধু জ্বলাই বাড়ছে। তবু যে নীতার মন চায় এই ঘণ্টা পরিবেশ, এই সাজানো সংসার, মেকি প্রীতির সম্পর্কের সূতো ছিঁড়ে দিয়ে, সে কম্পনার মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে হাঁটে। নীতা তখন গান গাইবে।

‘গায়ে আবার পুলক লাগে।

চোখে ঘনায় ঘোর।

কে বাঁধল হৃদয়ে মোর

রাঙা রাখির ডোর।’

নীতারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দীপকের মত সেও একা একা কোথাও বেরিয়ে পড়ে। খুঁজে আনে সাহসের কোটটা।

স্বামী যদিও জানে না দীপক আর নীতার গোপন ঘটনাটা তবু ভয় যায় না নীতার। আর নিজেরই বা কতদিন এভাবে নিজের সঙ্গে প্রবণতা করবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নীতার। দীপকের কোমল মুখখানা চোখের সামনে ভাসছে। দীপকের অবস্থাও খুব ভাল নয়। এই অন্ধকারে দুজনকেই কেমন যেন অসহায় মনে হয়।

—খুকু।

ডাক শুনে তাকিয়ে দেখে, মা। ছেলেবেলার আদরে ডাকটা শুনে নীতার দৃঢ়তা যেন এই মূহুর্তে কাপসা হয়ে উঠতে চাইছিল। হয়ত এমনিই হয়। মায়ের চোখের দিকে তাকাল নীতা। স্নেহময়ী জননী। বোধহয় তার নৃশিঙিতে কিছু লুকানো থাকে না।

—চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি।

—এমনিই।

কখন যে মা এসে গেট খুলেছে নীতা টেরও পায় নি।

মা চুপ করে গেল। মা নিশ্চয়ই বুঝেছে। এমনি কথাটা এমনি নয়। মানুষ নিজেকে লুকোবার মূহুর্তে আর কোন কথা খুঁজে না পেলেই এমনিতে টেনে আনে। মাঝে মাঝে নীতা ভাবে, দীপকের সঙ্গে মায়ের আলাপ কবিয়ে দেয়। মাকে যতটুকু জানে নীতা, মা কিছু মনে করবে না। ওর মা অনেক বড় মনের দিক থেকে। মা বেশিক্ষণ থাকে নি। একটু পরে স্বামী এসেছিল। শাশুড়ি, নন্দ সব মিলিয়ে সংসারটা আবার ভরপুর। তবু মনে হয় বস্তু কোলাহল। একটু নীরবতা পেলে নীতা বোধহয় বেঁচে যেত।

রাতে স্বামী পাশে রয়েছে। দেহের দাহ মেটাবার পর লোকটার যেন আর প্রয়োজন নেই নীতাকে। দেয়ালের স্বামীর ফটোকে মনে হয় যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর হাসি। এখন নাক ডাকছে লোকটার।

নীতা বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে এল। অন্ধকারের বোধহয় আলাদা একটা ভাষা আছে। বস্তু আপন করে নেয়।

পাশের বাড়িটার রাজহংসী প্যাঁক প্যাঁক করছে এই দুপুরে ঘাতেও। আলোহীন অন্ধকারে রাজহংসীটা কেন এরকম করছে? সঙ্গে তো আরও অনেক হাঁস রয়েছে। সবাইকে পেয়েও কি তাহলে ও কাউকে পাচ্ছে না? খুঁজে পাচ্ছে না যাকে ও চায়? নীতার মনে হল, জীবনের সর্বগ্রহী বাঁধন। উঃ, এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না? আত্মাকে কণ্ট দিয়ে কিসের বাঁধন? কিসের ন্যায়। অন্যায় আর নীতি?

বেশিক্ষণ থাকতে পারে না বাইরে। বৃকের জ্বালা যেন অন্ধকারে আরো বাড়ছে। স্বামীর নাক ডাকা আওয়াজ বেড়েছে। বেশ আছে লোকটা। দীপকের মুখখানা আবার মনে পড়ল নীতার। কম্পনায় ওকে পাশে দাঁড় করিয়ে মনে মনে বলল। দেখছ লোকটার কি ভাবে নাক ডাকছে। তোমার কণ্ট হয় না আমার জন্য? আমাকে ভালোবাসো? সত্যি করে বলত? তাহলে—

পাশের বাড়ির বাচ্চাটা ফেঁদে উঠেছে। বোধহয় কোন স্বপ্ন-টপ্প দেখেছে? উঠে চলে এল ভেতরে। ছেলেদের কথা মনে হল নীতার। লোকটা চিং হয়ে হাঁ করে শূরে আছে। যেন সব সময় কিছু গিলতে চাইছে।



মৃত্যুর মত বকবাক্যে

উজ্জ্বল.....

আপনার দাঁতের মাচা নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে আপনি শুধু ডেন্টনিক দিয়ে দাঁত মাছা, অভ্যাস করুন।

কৌ রো কি জে মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সান্নাভে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ডেন্টনিক টুথ পাউডার

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী



নীতা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শূন্যে পড়ল।

শূন্যে শূন্যে ভাবছিল বাচ্চা দুটোর কথা। কেমন যেন অসহায় মনে হল নিজেকে। দীপকের সঙ্গে যদি আরো আগে দেখা হত! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নীতার। সন্তানদের কথা ভেবে এক অদৃশ্য পাপবোধ ওকে কণ্ট দিচ্ছিল। তবু মনে হল, কিসের পাপ? অ-ভালবাসাই পাপ।

ভালবাসাই হচ্ছে সত্যি। ভাল-বাসলাম না অথচ তারই কামনার ফল ঘরে বেড়ালাম, সেই কামনার স্মৃতি নিয়েই যে মেয়ে বেঁচে থাকে সেই তো জসতী। বেশির ভাগ বিবাহিত মেয়ের মত নীতাও সেই অর্থে জসতী। তবু ঘাইরের বিরোধ আর মনের বিরোধে ক্রতবিস্কৃত হয় নীতা। মনের চিন্তা এক পা এগোয় তো আরেক পা মশ্বর। আসলে সে যেন জীবনের কোথাও নিঃসরতা খুঁজে পাচ্ছে না। না তার প্রেমের, না জীবনের। কোথাও যেন কোন নিশ্চয়তা নেই। নিজের জ্বলে নিজেই যেন বন্দী। হয়ত প্রথম প্রেমের প্রত্যাখ্যানের বেদনা থেকেই ভয়ের জন্ম। দূরত্বের ঘুম আসতে চায় না। ভাবে। যদি আবার ঠিক। এবার ঠিকলে আর কোন পথ নেই। আকাশের তারাগুলো বড় নিশ্চয়। মানুষের

অসহায়তা যেন ওরা বেশি করে ভাবার। তারাগুলো যেন স্বপ্ন হয়ে শব্দ দুটোর থেকে যায়। দীপক অবশ্য মাঝে মাঝে বলেছে, সে সত্যতঃ বিশ্বাসী। জীবনে যে কোন অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়াতে সে পারে। সে সাহস তার আছে।

এমনি আরও অনেক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বয়েছে নীতা দীপকের মনের কথা। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দীপকের মনোভাব। তবু সংশয় যায় না নীতার। দীপককে সং, অকপট সত্যিকারের প্রেমিক-হৃদয় বলে মনে হয়েছে নীতার। তার বহু প্রমাণ পেয়েছে নীতা। তার অসুখের সময় লুকিয়ে লুকিয়ে খোঁজ নেওয়া। আরও অনেক ঘটনা। আসলে সত্যের একটা আয়না আছে তাতে তার প্রতিচ্ছবি শত লুকোতে চেষ্টা কবলেও ছায়া পড়বেই।

ফাইনাল রিহার্সালের দিন দেখতে গিয়েছিল নীতা, পাড়ার ছেলেরা বলেছিল দেখতে।

নীতা একপাশে বসে। শেষ দৃশ্যে মেয়েটা স্বামী-পুত্র সবাইকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে।

মেয়েটি সেই প্রথম প্রত্যাখ্যানের পর বিয়ে করেছে। কিন্তু যাকে বিয়ে করেছে তার সঙ্গে মেয়েটির চিন্তার কোন মিল নেই। প্রতি মূহুর্তেই মানসিক বিরোধ অনুভব করে মেয়েটি। সব শেষে নতুন একটি ছেলে এল। তাকে ভালবাসল মেয়েটি। ছেলেটিও ভালবাসে।

এই প্রেমিক নতুন চিন্তার মানুষ। তার কাছে ভালবাসার মানদণ্ডই সত্য। ন্যায়-নীতি এমন কি কোন পুরনো সংস্কারও নয়। সে আদর্শবাদী এক লেখক। ছেলেটি বলছে, তোমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু। আমার খুশির আকাশটা বন্ধ ছোট। বন্ধ অন্ধকার। তুমি কি সেখানে সুখী হতে পারবে? ভেবে দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ।

মেয়েটি বলছিল, আমি এতদিন খুশির আকাশ দেখছি। এবার আমি সুখের আকাশে যেতে চাই। আমি সব পারব এই বড় আকাশের জন্য।

ছেলেটি একটু নীরব থেকে বলল, কিন্তু তোমার কম্পনা? মানে তোমার সন্তান? পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বাজছিল, সবাই চুপ। পরিচালক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সমস্ত দৃশ্যটাকে। কান পেতে শুনছে সংলাপ।

হঠাৎ মেয়েটি বলল, যদি প্রয়োজন

হয় তাও পারবো। ওদেরও ছেড়ে থাকবো। কারণ ওরা তো আমার কম্পনার নয়, ভালবাসার সন্তান নয়। কোন একটা মূহুর্তের আনন্দ নিয়ে ওরা জন্মেছিল। তারপর আমি কম্পনার শিশুকে না পেয়ে কামনার শিশুকেই বড় করে তুলেছি। কারণ আমিও তো স্বপ্ন ছাড়া বাঁচতে পারি না।

ছেলেটি বলল, তোমার ভয় করে না?

মেয়েটি এবার ছেলেটির চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলল, ভাল-বাসার কাছে ভয়কে আমি হারিয়ে দিয়েছি। এ যুদ্ধের নায়ক-নায়িকা আমরা দুজনেই। একা কিছুতেই পারতাম না।

স্টেজের সব আলো নিভে গেল। আর তারপর নতুন আলোতে দেখা গেল ছেলেটা আর মেয়েটা দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনেরই হাসি হাসি মুখ। অনেক সংগ্রামের পর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আত্মসমর্পণের আনন্দ।

অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর পরিচালক ছেলেটি এসে বলল, কেমন লাগল বৌদি বলুন?

নীতা হেসে বলল, খুব ভাল। পরিচালক ছেলেটিকে নীতা বলল, চলুন আমাদের গুঁথানে চা খাবেন। চা তৈরি করতে করতে নীতা নিজের অজান্তেই দুটো চায়ের কাপে চা ঢালছিল।

পরিচালক ছেলেটিকে চা দিতে গিয়ে নীতা বলল, আসল যে লোক তাকে ডাকতেই কিন্তু ভুলে গেছি। আদর্শবান সাহিত্যিকের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল সেই অভিনেতা ছেলেটি। যে সব কিছু ফেলে ভাল-বাসাকে মূল্য দিল। বড় সুন্দর লেগেছে ওকে।

নীতা পরিচালক ছেলেটিকে বলল, ওকে ডাকুন আমার নাম করে।

পরিচালক হেসে বলল, ডাকতে হবে না, ও নিজেই আসবে। আপনি চায়ের কাপে চিনি দিন।

নীতা হাসিমুখে ধীরে ধীরে সাদা কাপটায় দুধ ঢালল। চিনি মেশাল। চায়ের রঙে কাপটা ভরে উঠছে ধীরে ধীরে। নীতার মনে হচ্ছিল সেই আদর্শ-ভোলা, সং, অকপট-স্বপ্নের নায়ক একটু পরে এসেই ওর হাতের তৈরি চা খেয়ে বলবে, বাঃ সুন্দর।

আর এই সুন্দরের জবাবে নীতা শব্দ হাসবে। অনেক দিন ধরে হৃদয়ের এই গোপন হাসিটুকুর জন্যই যেন ও অপেক্ষা করেছিল।

সঙ্গীত-সুধাকর

শ্রীমশঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কণীত

বিশ্বপরিচয়—দ্বিতীয় দিক

বাহ্যজীবন—শেষ—স্বামী-স্ত্রী—জীবন—ইতিহাস—সঙ্গীত—সাধন—বিশ্বপরিচয়—বাসকগণ—অভিনয়—কাব্য—সাধন—কথক—পরিচয়—বালিজী সন্তান—ভ্রমরী ও শিল্পগণের জীবন-সাধনার সচিত্র—ভারত বিখ্যাত গায়কগণের লোক-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সমৃদ্ধ স্বরলিপি অপরূপ সঙ্গসন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিচয় কীর্তি-সম্পদ চিত্রে প্রদর্শিত।

মূল্য—১০।

পুরাতন চিবনতন মণিগঞ্জ

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারিত—জ্যোতম প্যাচার মন্ডা বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক প্যাচার মন্ডা—আলালের ঘরের দুলাল, পূণ্যকীর্তি চন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসার প্রণীত—ভ্রান্তিবলাস।

একটি ৫ টাকা মাত্র

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০৬, বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অপরাধ লেখক ও কলাহোমা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অতিথিরা চলে গেলে মিসেস মণ্টগোমারি আমাদের বাড়ির পিছনের দানে নিয়ে এলেন। এদিকে বাড়ির এক্সটেনসন হচ্ছে। দুটি বিরাট খাঁচার মধ্যে অনেক রকমের পাখি দেখলাম। মিসেস মণ্টগোমারি বললেন, 'স্বামী পাখি সংগ্রহ করতে খুব ভালবাসেন। অনেক ডলার ব্যয় করে এই সব পাখি যোগাড় করেছেন। এটা তাঁর একটা ভীষণ হবি।'

লরী আমার কানে কানে বললেন, 'অর্থের অপচয় অর্থ থাকলেই ঘটে।'

দেখলাম ছেলেদের খেলাধুলার জন্যে দানের মধ্যে সসসাড়ি, দোলনা ইত্যাদি রয়েছে।

ডক্টর আমাদের ডাক দিলেন। দেখলাম তিনি মোটর বার করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমাদের ডাউনটাউনে নিয়ে এলেন। কলেজের কাছে পৌঁছে দাঁখি অনেকেই এসে গিয়েছে। ডক্টর আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বাসের ব্যবস্থা ছিল। সকলে এসে পৌঁছতেই বাস ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা টেক্সাসের স্টেট ফেয়ারে পৌঁছলাম।

ওকলাহোমা স্টেট ফেয়ার ও এই ফেয়ারের চরিত্র প্রায় একই। তবে এই ফেয়ারে জিনিসের সংগ্রহ ও বৈচিত্র্য বেশি। ওকলাহোমা স্টেট ফেয়ারে হস্তশিল্পের অভাব খুব বেশি করে চোখে পড়ছিল। এই ফেয়ারে রেড ইন্ডিয়ানদের হস্তশিল্পের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হস্তশিল্পও প্রদর্শিত হয়েছে দেখলাম। ভারতীয় হস্তশিল্পের একটি স্টল চোখে পড়ল। বোম্বাইয়ের এক কোম্পানী এই স্টল দিয়েছে। জিনিসের মধ্যে অধিকাংশই রাস ও বেলমেটালে তৈরি ফুলদানি, অ্যাসট্রে, বাতিদান ইত্যাদি। আমি দুটি ফুলদানি ও একটি অ্যাসট্রে উপহার দেওয়ার জন্যে কিনলাম। হোস্ট ফ্যামিলির ছেলেদের জন্যে কিছু টর্ফি নিলাম। মেলার মধ্যস্থানে টিপি ক্যাল টেক্সাস ড্রেস-পরা একটি বিরাট মূর্তি। মাথায় লম্বা টুপি। গায়ে লাল রঙের

সার্ট, কোমরে বেল্ট ও পায়ে বুট। আমরা সকলে ছাড়িয়ে পড়লাম। ঠিক হল বিকেলে এই মূর্তির কাছে সকলে একত্র হবে।

আমি প্রথমে গেলাম আইস ক্যাপাডেস দেখতে। এ হচ্ছে বক্সফের ওপর নাচ ও খেলাধুলো। কলকাতায় যে হিলিডে অন আইস দেখেছি এও তাই। গ্যালারিতে আমার পাশে একটা সিট খালি ছিল। আমার পাশে মিস্টার বা এসে বসল। পাশের গ্যালারীতে

এস. কে. গ্রীনবার্গ

চিলির মিস্টার ইগলহাস্ট ও মেক্সিকোর মিস পিনিশেকে দেখিয়ে বললে, 'দুজনে দাঁখি জোড় বেঁধেছে।'

আমি বললাম, 'বাঁধুক না।'

—'আরে তুমি দেখ না বাসের মধ্যেই যা তা করে।'

—'কি যা তা করে?'

—'চুক চুক করে।'

যতদূর মনে হল সে চম্পন জাতীয় কোন ব্যাপারকে বোঝাচ্ছে। কথাটা ঘোরানোর জন্যে আমি বললাম, 'ওরা যা ইচ্ছা করুক। আমাদের কি?'

বেশ বুদ্ধিমান মিস্টার বা আমার কথায় খুশি হল না। এসব ব্যাপারে মানুষের জিলাসি বিচিরাভাবে কার্যকর হয়। বার হয় সে অনেক সময় নিজেও জানে না।

মিস্টার বা আবার বললে, 'মেক্সিকোর মেয়েদের চেহারা ভালো, তাই না?'

আমি বললাম, 'ওরা খুব সাজগোজ করে।'

—'কেন, পিনিশের চেহারা ভালো নয়?'

—'পিনিশের রঙ মোটেই ফর্সা নয়। বাঁধানো দাঁত তো রীতিমত পীড়াদায়ক। তবে হাঁ, পিনিশে খুব সাজ-সজ্জা করে।'

মিস্টার বা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললে, 'ইগলহাস্ট তো বিবাহিত। শুনিয়েছি

ওর তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে। পিনিশে ওর সঙ্গে মেয়ে কেন?'

—'জানি না ভাই। পিনিশেকে জিজ্ঞাসা কর।'

মিস্টার বা আমার উত্তরে খুশি না হয়ে উঠে গেল।

শোর পর ঘুরে ঘুরে মেলা দেখলাম। মেলার একটা প্রধান অঙ্গ খাওয়ার ব্যবস্থা। কারো হাতে আইস-ক্রিম, কেউ পপিকরুন আছে, কেউ ফ্রায়েড চিকেনের বাস্ক নিয়ে চলেছে। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভিলাজে গিয়ে তাদের নাচ দেখলাম। লাইভস্টক কলিসিয়ামে হর্সশো বেশ ভালো লাগল। ঘুরে ঘুরে অ্যাকুইরিয়াম, হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, ওয়াক্স মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখলাম। ডি, এ, আর, ইউসে আমেরিকার ফ্লাগের রূপান্তর রীতিমতো বিস্ময়কর।

বিকেলবেলা মূর্তিটির কাছে পৌঁছতেই দাঁখি অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে এসে হাজির হলে আমরা বাসে করে ডাউন টাউনে এলাম। সেখানে পৌঁছে দাঁখি অন্যান্য হোস্টের সঙ্গে ডক্টর মণ্টগোমারি আমাদের দুজনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাঁর গাড়িতে উঠলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফেয়ার ভালো লাগল তো?'

আমরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হাঁ।'

বাড়িতে পৌঁছে দাঁখি মিসেস মণ্টগোমারির মা ড্রাইব্রুমে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই মিসেস মণ্টগোমারি তাঁর মায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের কাছাকাছি। খুব বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তিনি কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই গিয়েছেন। আমাকে বললেন, 'ভারতবর্ষ বড় অশুভ দেশ। এত বৈচিত্র্য আর কোন দেশে আছে বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'দক্ষিণ ভারতের

কোন জায়গায় তো আপনি যান নি। সেখানে গেলে এই বৈচিত্র্য আরো স্পষ্ট হবে। তবে সব বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা বিস্ময়কর একা আছে এবং সেটাই ভারতবর্ষের আত্মা।

কথায় কথায় কলকাতার প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, 'আমি গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছিলাম। রোড রোড ধরে ড্রাইভ করতে খুব ভাল লাগত। এসপ্লানডে জায়গাটা বেশ। ধর্মতলার মুখে ফলের দোকানগুলো ইন্টারেস্টিং।' একটু থেমে বললেন, 'কলকাতা থেকে কলকাতার পদতুল এনেছি। মাটিতে এমন জিনিস তৈরি হতে পারে আমার জানা ছিল না।'

অনেকক্ষণ গল্প হল। ডিনার খেয়ে যখন শূন্যে গেলাম তখন রাতি এগারোটা।

পরদিন ডক্টর মণ্টগোমারি খুব সকালে একটা কাজে বেরিয়ে গেলেন। তাই মিসেস মণ্টগোমারি আমাদের ডাউন টাউনে পৌঁছে দিলেন। দেখলাম আমাদের সকলেই পৌঁছে গেছেন। ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'আজ আমরা সিন্ধু ফ্যাগসে যাব। আশা করি খুব এন্টারটেনিং ট্রিপ হবে।'

বাসে করে সিন্ধু ফ্যাগসে পৌঁছলাম সকাল ১১টা নাগাদ। সিন্ধু ফ্যাগস ডালাস ও ফোর্ট ওয়ার্থের মধ্যে টার্ন-পাইকের ওপর অবস্থিত। সিন্ধু ফ্যাগসে ঢোকবার আগে তার পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'সিন্ধু ফ্যাগসে তোমরা দেখতে পাবে টেক্সাসের ১১৫ বছরের পুরনো অতীত ও তার বিস্ময়কর সম্ভাবনাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দুঃসাহসী মনোভাবে টেক্সাস শব্দ আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর মধ্যেও এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। গত ৪০০ বছরে বিভিন্ন সময়ে টেক্সাসের ওপর স্পেন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কনফেডারেসিস, রিপাবলিক অব টেক্সাস এবং ইউনাইটেড স্টেটসের কর্তৃত্ব ও প্রভাব পতাকা উড়েছে। তাই এর নাম সিন্ধু ফ্যাগস ওভার টেক্সাস। এর ছটি বিভাগ—স্পেন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কনফেডারেসিস, টেক্সাস ও ইউনাইটেড স্টেটস। বিভিন্ন সময়ের বিশেষ বিষয়গুলি বিভিন্ন বিভাগে উপস্থাপিত হয়েছে। এটা অনেকটা ডিক্রি ল্যাণ্ডের মডেলে তৈরি। টেক্সাসের ঐতিহ্য, এই ছয় সময়ের সংস্কৃতির এক বিচিত্র বর্ণবহুল সমন্বয়।'

মিস্টার রাসেল বললেন, 'মধ্যে ঢুকে আমরা ছাড়িয়ে পড়ব। আর বিকেল ৪টে নাগাদ গेटের কাছে মিলিত হব।'

মধ্যে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল পর পর ছটি ফ্যাগ উড়ছে। ডান দিক দিয়ে দেখলে প্রথমে স্প্যানিশ, তারপর ফ্রান্স, মেক্সিকো, কনফেডারেসিস, রিপাবলিক অব টেক্সাস এবং ইউনাইটেড স্টেটস। ফ্যাগগুলির পেছনে সবুজ লাল আর সামনে নীল ফোয়ারা।

প্রথমে গেলাম মেক্সিকো বিভাগে। চারদিকে একটা খুশির পরিবেশ। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টে লোক মেক্সিকান ডিস খাচ্ছে। বাজারে মেক্সিকান নানা হস্তশিল্প, যেমন—বাস্কেট, চেয়ার, ফুলদানি, ছড়ি, মালা, পদতুল, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। এই

পরিবেশকে মাতিয়ে রেখেছে স্ট্রোলিং মিউজিসিয়ানদের চমৎকার গান আর গাছে গাছে ঝাঁচায় বন্দী ট্রপিক্যাল পাখিদের মনমাতানো ডাক। চা-চা-চা-চা ট্রেনে করে মেক্সিকান বিভাগ ঘুরতে নানা মজার দৃশ্য চোখে পড়ল। কোথাও স্পেনে প্রচলিত বুলফাইট, কোথাও ষান্তিক গাধার পেটমোটা বড়ো সওয়ারী মাথা নাড়ছে আবার কোথাও মেক্সিকান গানের সুরে খড়্‌জাতীয় জিনিসে তৈরি এক বিচিত্র মূর্তি নাচছে।

এর পর টেক্সাস বিভাগের দিকে এগোতে গেলেই ইন্ডিয়ান ভিলেজ। ভিলেজে পৌঁছে ইন্ডিয়ানদের নাচ দেখতে পেলাম। দেখলাম তারা কতকগুলো বড় রিং হাতে ও পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নাচছে। টেক্সাস বিভাগের ক্রেজি হর্স সেলুনের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী সেলুনের মধ্যে ঢোকবার জন্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানালে। আমি মধ্যে ঢুকে কোকোকোলা খেয়ে নিলাম। মধ্যে ষৌখিনসঙ্গীত, গ্যাস ফুটলাইট ও গ্রীজ-পেপেট এক পুরনো রহস্যময় পরিবেশ। সেলুন থেকে বেরিয়ে পুরনো আমলের স্ট্রিম ইঞ্জিনে টানা গাড়িতে উঠে সিন্ধু ফ্যাগের চারদিকে ঘুরে এলাম। টেক্সাসের পথে, দোকানে ও বাড়িতে অ্যাডভেঞ্চারের ছড়াছড়ি। কোথাও কোর্ট হাউসে অপরাধীরা ফাঁস হচ্ছে, আর্টিস্টিক চিনসোরিয়াল সেলুনের সামনের রাস্তায় বাব্বার কারো শরীর থেকে বুলেট বার করতে যাবে বলে কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও রিভলভার নিয়ে যুদ্ধের পর দুর্বৃত্ত মরে চিং হয়ে পড়ে আছে—বুকে রক্তের দাগ, মাথা থেকে টুপি উড়ে কিছ্র দুয়ে গিয়ে পড়েছে, হাতে রিভলবারটা অসহায়ভাবে ধরা, কোথাও দুর্বৃত্তের কবর হচ্ছে। এবার চারটে সাদা ষোড়ার টানা স্টেজ কোচে করে যানিকক্ষণ এক উদ্বেজনাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে গেলাম। কোথাও ভাঙা রিজের পাশ দিয়ে জলময় অঞ্চল পাশ হলাম, কোনো এক জায়গায় এক মৃদুশাসনীয় ডাকাত আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, আবার এক সময় আমরা ব্যাফেলো কার্ডিষ্ট প্যাড়ি দিয়ে চললাম।

কনফেডারেট বিভাগে পৌঁছতে প্রথমেই কানে এল সুন্দর ব্যাণ্ডের শব্দ। এক জায়গায় দেখলাম সৈন্যরা ড্রিল করছে ও তার পাশেই একজন গুপ্তচরকে গুলী করে মারা হচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বিরাট মড়ার মাথার মতো ঘর। কানে এল একটি



টেক্সাস স্কুলবুক ডিপোজিটরি

ছোট মেয়ে বলছে, 'মামি, এখানে কি আছে?'

মা উত্তর দিলেন, 'এর নিচে জল-দস্যুরা ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে।'

ফ্রান্স বিভাগে প্রথমে উনবিংশ শতাব্দীর স্মিভারবোটে করে নদীপথে বেড়িয়ে এলাম। তারপর চড়লাম অ্যাস্ট্রোলিফটে। অ্যাস্ট্রোলিফট থেকে সিন্স ফ্র্যাগের দৃশ্যাবলীকে অপূর্ব বলে মনে হল। এবার বোটে চেপে এক রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার করে এলাম। জলপথে যেতে যেতে কোথাও দেখলাম স্প্যানিশ দুর্গ থেকে গোলা এসে জলে পড়ছে, কোথাও দুজন স্প্যানিশ সৈন্যকে গাছে গলায় দাঁড়ি দিয়ে মারা রয়েছে, কোথাও ক্ষুধার্ত ভদ্রুক, কোনখানে পদ্মা ওৎ পেতে আছে। যে ছেলেটি ট্রিপিট বর্ণনা করছিল তার যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি কথা বলার ধরণ। সত্যিই মনে হচ্ছিল এক দূরন্ত জীবনের পথ ধরে চলছি। স্কাল আইল্যান্ডে সিঁড়ি দিয়ে একটি চার্লিশ ফুট গাছের মাথায় উঠে, গুঁড়ি খুঁড়ে তৈরি—তার ভিতরকার গর্ত দিয়ে গাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম।

স্পেন বিভাগের সবচেয়ে উদ্ভেজনা-ময় অভিজ্ঞতা হল একটি রহস্যময় চন্দ্রকের ঘরে ঢুকে। এই ঘরে আপাত-দৃষ্টিতে নিউটনের ল অব গ্রাভিটি অচল। জল ও বল এখানে গাড়িয়ে ওপরে উঠছে। সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।

ইউ এস এ বিভাগে নতুন যুগের পরিবেশ। আধুনিক ধরনের মোটর, হাইওয়ে, ড্রিলিং রিগ প্রভৃতি। সবচেয়ে ভালো লাগল এখানকার অ্যানিমাল কিংডমে সীল, হাতী প্রভৃতি জন্তুর সঙ্গে দর্শকদের বন্ধুত্বকে। কেউ হাতীর পিঠে চড়ে, কেউ সীলের বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, কেউ ঘোড়াকে আদর করায় ব্যস্ত।

খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার আবার কনফেডারেট বিভাগে গিয়ে নেলার্স স্প্যানাটেশন রেস্টুরেন্ট গিয়ে চিকেন রোস্ট ও কফি খেয়ে নিলাম। তারপর খানিকটা ঘোরাঘুরি করে গেটের কাছে পৌঁছে দেখি এক-মাত্র ডক্টর উইলিয়ামসই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কেমন লাগল?'

আমি বললাম, 'এক কথায় অপূর্ব।'

একে একে সকলে এল। ডক্টর উইলিয়ামস রহস্য করে বললেন, 'সিন্স ফ্র্যাগস যে সকলের খুব ভালো

লেগেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আজ কারো সময়জ্ঞান নেই।'

এখান থেকে ডাউন টাউন এবং সেখান থেকে বাড়িতে ফিরতে প্রায় রাত ৮টা হয়ে গেল। খুব ক্লান্ত হয়ে-ছিলাম। তাই ডিনার খেয়েই শুব্রে পড়লাম।

পরদিন সকালে রেকফাস্টের পর ডক্টর মণ্টগোমারি লরী ও আমাকে ডাউন টাউনে পৌঁছে দিলেন। আসার সময় মণ্টগোমারির ছেলেদের জন্যে এক বাস্‌ টাফ ও একসেট ভারতীয় ফুল-দানি উপহার দিয়ে এলাম। ফুলদানির সেটটি মিসেস মণ্টগোমারির খুব পছন্দ হয়েছিল।

বাসে করে প্রায় তিনটে নাগাদ নর্মান ফিরে এলাম।

রবিবার দিন মিস্টার ও মিসেস পাওয়েলের সঙ্গে ম্যাকফারলিন মেমোরিয়াল মেথোডিস্ট প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে গেলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন গাড়িতে বসেছি—তখনও দেখি বাড়ির দরজা লক করা হল না। আমি একটু বিস্ময় বোধ করলাম। মিস্টার বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ির দরজা লক করবেন না?'

মিসেস পাওয়েল হেসে জবাব দিলেন, 'দরজা ভেজানো থাকলেই

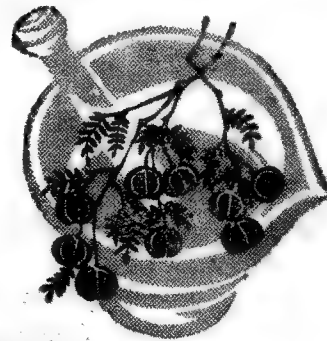
যথেষ্ট। এখানে চুরির ভয় নেই। কেউ ঘরে ঢুকবে না।'

মিস্টার বা আমার কানে কানে বললেন, 'সাধারণ মানুষের অভাব কতটা না থাকলে দেশে চুরির ভয় থাকে না ভেবে দেখ।'

চার্চে পৌঁছে কফি খেলাম। মিস্টার পাওয়েল অনেকের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রার্থনা আরম্ভ হওয়ার আগে মিস্টার নতুন সদস্যদের নামের সঙ্গে অতিথি হিসাবে আমাদের নাম ঘোষণা করলেন। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার করলাম।

মিস্টার তাঁর ভাষণে আমেরিকানদের নৈতিক দুর্নীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের উপর জোর দিলেন। তিনি বললেন, 'ওকলা-হোমার ডিভোর্সের সংখ্যা ম্যারেজের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এর অন্যতম কারণ অল্প বয়সের ম্যারেজ। স্কুল-কলেজে ম্যারেড স্টুডেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরিণত মনে জীবন-সঙ্গিনীর নির্বাচন প্রায়ই ঠিক হয় না বলে ডিভোর্সের সংখ্যা এত বেশি।'

বিদেশীদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও এই ধরনের খোলাখুলি আত্মসমালোচনা আমাকে মুগ্ধ করল।



ভারতের
আদিতন
কনসার্ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত



চ্যবনপ্রাশ শূন্য ও পুরাতন সর্দি কাশি,
শ্বসন ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ার বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে বেহের
দৌর্বল্য ও ক্লান্ততা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
বাহন করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

একেক মানুষ তাই অমরত্বে লীন

সুদীপা ভাদুরী

নেই!

নেই সমুদ্রে অমৃত—

যে অমতে দেবতা অমর।

এবং দেবতা আজ মানুষের মনের গহনে।

তাই নিয়ে এ-পৃথিবী স্বর্গ অতঃপর

হতে পারে। তারি জন্যে এক এক জন

দিয়েছে জীবন।

তাই

সমুদ্র-মন্থন নয়, চাই হৃদয়-মন্থন,

যেখানে জাগবেই ভালবাসার সম্প্রীতি,

গড়ে উঠবে মানবীর গীতি।

সত্যবন্ধ সবাই যখন,—

ফুলে ফুলে হবে চমকিত

অশ্রুভূষিত পদ্মবন।

দ্যাখো

এখনো অনল জ্বলে চিতার উপর।

সে-অনলে আলোকিত হয় কি দৃ' চোখ?

শূন্যগর্ভ নয় যদি শোক—

শোন তবে অদৃশ্য কে মৌন কথা কর:

হে পৃথিবী, আছে আছে এখনো সময়।

একেক মানুষ তাই অমরত্বে লীন॥

বিস্মৃত নিজেদের রুটির বিষয় অবহিত
হলেই তাকে দূর করা সম্ভব।

মোটরে বাসায় ফেরার পথে মিস্টার
বা মিস্টার পাওয়েলকে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'আচ্ছা, সেদিন বাসে দেখলাম
লেখা 'উড ইউ লাইক টু অ্যাডস্ট এ
চাইল্ড? এর মানে কি?'

মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'এর
মানে যদি কেউ ইচ্ছা করে তবে কোনো
অফ্রানকে অ্যাডস্ট করতে পারে।'

—'সোসাইটি কি সেই ছেলেকে
নিজের ছেলের মতো মর্যাদা দেয়?'

—'নিশ্চয়ই না। যেমন ডিভোর্স
আমাদের সোসাইটিতে চালু হলেও
তাকে লোকে ভালো চোখে দেখে না।'

ইউনিভার্সিটি মোশন পিকচার
প্রোডাকশনের ডিরেক্টর মিস্টার নেড
হকম্যানের সংগে একদিন আলাপ হল।
তিনি অনেকগুলি প্রাইজ উইনিং
পিকচারের ডিরেক্টর। খুব অমায়িক
ভদ্রলোক। ভারতবর্ষে প্রায় দশ-বার বছর
ছিলেন। তার মধ্যে টেলিগঞ্জ স্টুডিওতে
কাটিয়েছেন প্রায় পাঁচ-ছয় বছর।
ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী কমেন্টারি
নাকি তিনিই করেন। তাঁর সংগে
ফটোগ্রাফি ও মোশন পিকচার সম্পর্কে
আলোচনা করে খুবই উপকৃত হয়েছি।

মোশন পিকচার প্রোডাকশনের বিষয়ে
তিনি আমাকে কয়েকটি সুন্দর ফিল্ম
দেখিয়েছেন। বাংলা ও হিন্দী ছবি
সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দী
ছবি প্রায়ই অযথা আড়ম্বরপূর্ণ ও
শ্যালো আর বাংলা ছবিতে ডেপথ
থাকলেও সের্টিমেণ্টাল।' তিনি সত্য-
জিৎ রায়ের ছবি দেখেন নি, তবে নিউ
ইয়র্কের এক বন্ধু 'পথের পাঁচালী'কে
অত্যন্ত নির্মম দৃষ্টির ছবি বলে উল্লেখ
করেছেন।

অডিও-ভিসুয়ালে ডক্টর লটন,
ডক্টর ফুলটন ও ডক্টর ইককে বিশেষ করে
মনে হয়। ডক্টর লটনের 'ব্রডকাস্টিং
অ্যান্ড সোসাইটি' এবং 'অ্যাডভান্সড
টিভি প্রোডাকশন' ক্লাসে যোগ দিতাম।
ক্লাসে অত্যন্ত যত্নোয়া আবহাওয়া।
এমন কি ছাত্র-ছাত্রী প্রফেসরের সামনেই
স্মোক করে। ডক্টর লটনের কথামতো
একদিন ৫০০ চাউটকোয়ার্ড তাঁর
বাসার অনারারি ব্রডকাস্টিং ফ্রেটারনিটির
একটি মিটিং-এ যোগদান করলাম।
দেখলাম তাঁর অ্যাডভান্সড স্টুডিও-টরাই
এই ফ্রেটারনিটির কার্যালয়। তাঁরা
বেভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি
আলোচনা করলেন তা থেকে তাঁদের
বিশ্লেষণশক্তি ও আন্তরিকতা স্পষ্ট

হয়ে উঠল। ডক্টর ফুলটন অত্যন্ত
অভিজ্ঞ অধ্যাপক। বরসে বৃন্দ, কিন্তু
উৎসাহে তরুণ। টিটিং মেশিন ও
স্ক্র্যামবেলড বুকের তুলনামূলক উৎ-
কর্ষ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে
চাইলে তিনি বলেছেন, 'টিটিং মেশিনের
অত্যধিক ব্যবহার শিক্ষারীতিতে
শিক্ষকের নেতৃত্ব কমিয়ে তাকে যান্ত্রিক
করে তুলবে। স্ক্র্যামবেলড টেক্সট বুক
অনেকাংশে টিটিং মেশিনের ব্যবহার
কমিয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।'

আমেরিকায় টিভি ও রেডিও
সেটের ব্যবহার যেভাবে বেড়েছে তা
ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৫০
খৃস্টাব্দে ৮০ লক্ষ টিভি সেট আমে-
রিকায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংখ্যা
১৯৬০ খৃস্টাব্দে ৫ কোটি ৪০ লক্ষে
গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে গৃহ ও
গাড়িতে রেডিও ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে
২ কোটি ৯০ লক্ষ। এই সংখ্যা ১৯৬০
খৃস্টাব্দে যথাক্রমে ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ও
৪ কোটি ১৫ লক্ষে গিয়ে ঠেকেছিল।
এই গণনার মধ্যে ট্রানজিস্টর সেট ধরা
হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,
১৯৬০ খৃস্টাব্দে আমেরিকায় হাউস
হোল্ডার সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১৫
লক্ষ। [ক্রমশঃ]

স্বপ্নজ্যেষ্ঠ

সম্মানিত শিল্পী

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়
সম্মানজনক উৎসবে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী
উদয়শংকর এবং ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী
তম্ভা বড়ো গোলাম আলি খানকে ডি-লিট
সম্মানসূচক ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে।
ভারতের এই দুই কৃতী সম্মানকে সম্মানিত
করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের
পথে অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প
ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই এজন্য রবীন্দ্র-
ভারতীকে অভিনন্দন জানাবেন। সম্মানজনক
অনুষ্ঠানে উপাচার্য রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষার
আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
তিনি বৃত্তি, প্রীতি ও কর্মবৃত্তির সমন্বয়

সাধন এবং তাকে বিকশিত করে তোলার কথা
স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানকালে
কেবল ছাত্রদের নয়, সকল মানুষকেই একথা
স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-
নাথ ও তাঁর শিক্ষার কথা নিয়ে শিক্ষা-
সমাজের মানুষ গৌরববোধ করে। কিন্তু
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে তাকালে
মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে আমরা ইতি-
মধ্যেই ভুলতে বসেছি। তাঁর মৈত্রী, প্রীতি
ও মানবতাবাদ আজ শিক্ষিত-সমাজে অল্প
দেশপ্রেম, জাত্যাভিমান ও মূঢ়তার প্রাচীরে
আটক পড়েছে। এক জংগী উন্মাদনায়
আমাদের চেতনা অসাড় হয়ে পড়েছে। তার



উদয়শংকর

শোচনীয় প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সাহিজ ও
শিল্পে। আমাদের সাহিত্যিকরা পুঁতিপল্লব
বিবরে আগ্রহ নিচ্ছেন কেবলমাত্র অর্থকে পরমার্থ
জ্ঞানে। আমাদের চলচ্চিত্রগুলি (দু-চারটা ব্যতীত)
মেকা জীবন ও মিথ্যা আশ্বাসে মানুষকে
বিভ্রান্ত করছে। আমাদের খুব কম নাটকই
মৃত্যু ও নৈরাসের মধ্যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার
সাহস যোগাচ্ছে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র-
স্বপ্নের হরেও আজ জীবনবিষম হয়ে
পড়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রভারতী এখন
দুর্জন কৃতী শিল্পীকে সম্মান জানালেন, যার
অর্থ জাত্যাভিমান ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত—
উদয়শংকর জনজীবনের অঙ্গ লোকনৃত্যগুলিকে
আঞ্চলিকতা মুক্ত করে সর্বভারতীয় রূপদান
করেছেন এবং ভারতীয় জনজীবনের বালিস্ত
সংস্কৃতিথারা লোকনৃত্যকে কবিসভার পরি-
বেশন করেছেন। ভারতের সাথে পশ্চিম ও
পূর্ব গোলাপের প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেছেন। বড়ো গোলাম আলি
খান সাহেব ভারতীয় সংগীত-জগতের এক
ঐতিহ্যময় প্রাচীন গীত-রীতির উত্তরসূর্য।
যিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন পরিচয়
যুটিয়েছেন। তাঁর সংগীত-অনুরাগীরা
ভারতের সীমারেখার মধ্যে নর। সারা ভারত-
পাক জুড়ে রয়েছে তাঁর গুণমুগ্ধপ্রোভা। যার
সংগীত মানুষকে সত্য ও সন্দেহাভিমুখী
করে তোলে। রবীন্দ্রভারতীর স্বার্থে আমরা
এই দুই কৃতী শিল্পীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন
করাছি।

এই সঙ্গে আমরা আশা পোষণ করবো
রবীন্দ্রভারতী বছরে বছরে এমন গুণীজনকে
বরণ করে নেবেন—যারা রয়েছে মাটির কাছ-
কাছি। যাদের সম্মানে লোকশিল্প ও
ঐতিহ্যময় সংগীত, জীবনধর্মী নাটক ও
চলচ্চিত্র—উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবে। যে শিল্প
মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস ও
প্রেরণা দেয়।

—সুজন



তম্ভা বড়ো গোলাম আলি খানকে ডি. লিট, উপাধি প্রদান করছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল ত্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

চিত্র আলোচনা

গত বছরের বিদেশী চলচ্চিত্র

১৯৬৫ সালে কলকাতার জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য ১৪২টি ছবি মুক্তিলাভ করেছিল। বাংলা এবং হিন্দীতে তুলনায় বিদেশী ছবির প্রদর্শনের ব্যাপক। এক দশক ধরে প্রদর্শিত হলেও সারা ভারতের শত শত প্রেক্ষাগৃহে একটি বিদেশী ছবি দর্শকের দেখতে পায়। বাংলা নিজের অঞ্চলে জীবাশ্ম। হিন্দী সর্বভারতীয় হলেও দক্ষিণে তেমন সুবিধা করতে পারে না। গত বছর সেন্সর সিনেমার এবং মিনার্ভা সিনেমার কোন ছবি প্রদর্শিত হতে পারে নি। সেন্সর সিনেমাটি বর্তমানে পুনর্নির্মিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, এটি শহরের সর্বাধিক পুরাতন প্রেক্ষাগৃহ। এক সময় এই প্রেক্ষাগৃহে অপেরা হাউস নামে পরিচিত ছিল, এবং এখানে ইংরেজী নাটক বিদেশীদের দ্বারা অভিনীত হত। শহরের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাচীন স্মৃতি জড়িত এই প্রেক্ষাগৃহের পেছনের দেওয়ালে অভীতের নাম ও তার জীবনকাল লিখিত রয়েছে। মিনার্ভা আইনগত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এই দুটি সিনেমার ছবি প্রদর্শিত হলে বিদেশী ছবির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল।

বিদেশী ছবিগুলির মধ্যে গত বছর সর্বাধিক সময় চলেছে এলিট সিনেমার 'মাই ফোরার লেজি'। বার্নার্ড শার উপন্যাস উপরিস্থিত অল্পসংখ্যক এই ছবিটি নির্মিত। ছবির ব্যয়বহুল সেট দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার পরে মেট্রোর 'অপারেশন ক্রমবো', লাইটহাউসে 'কাইটিং স্কোয়াড্রন' সর্বাধিক সময় চলেছে। এ দুটি ছবি গত বছরের পটভূমিকার—বীরত্ব ও বুদ্ধির কাহিনী। 'বেকেট' হাউসহোল্ডার, ডাইভার্স ইতালীয়ান স্টাইল, হার্লে, হাউ দি ওরেল্ট ওরাজ ওন, দি ডে অব জার্মান, লিখিত ইত্যাদি ছবিগুলি দর্শকের প্রশংসাপাভ করেছে। জনপ্রিয় ছবির সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে হলিউড বা মার্কিন চলচ্চিত্র-জগৎ ভাল ছবি উপস্থাপিত করতে পারে নি। ব্রিটিশ ছবিই বেশি প্রশংসা পেয়েছে। তন্মধ্যে ইতালীয় ও জাপানী ছবি ধীরে ধীরে বেশ দর্শক আকর্ষণ করেছে।

গত বছর চারটি 'বাই নাইট' ছবি মুক্তিলাভ করেছে, তারপরে ও ধরনের আরো কয়েকটি ছবি। এসব ছবি কাহিনী বর্জিত, কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের নাইট ক্লাব ও মারীদেহ-প্রদর্শনের এক ন্যাকারজনক ছবি। যা কোন বুদ্ধিশীল দর্শকের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে

এসব নোংরা ছবি এদেশে আমদানী হয়েছে এবং সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে।

গত বছরে আর একটি বিষয় দ্রোহা গেছে চলচ্চিত্রকে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার। এ ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন চিত্রনির্মাতারা সমভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। মার্কিনরা দেখিয়েছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে এক প্রণয়ী সমাজবিরোধী দাঙ্গাবাজদের কার্যকলাপরূপে। ব্রিটিশরা দেখিয়েছে আফ্রিকার জুলু জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাইপ্রাসের মুক্তি সংগ্রামকে বিকৃত করে। এসব ছবিতে কলোনিয়ালিজমকে সমর্থন করা হয়েছে। ভারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে—এই ঘোষণা সত্ত্বেও এদেশে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার নির্বিঘ্নে চলেছে। গত বছর সাধারণের জন্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের মধ্যে একমাত্র রাশিয়ার তিনটি ছবি এলিট সিনেমার মুক্তিলাভ করেছিল এক সপ্তাহের জন্য। মানের দিক থেকে তিনটিই বিশেষ ভক্তমানের ছিল না।

পণ্যচিত্রের দিক থেকে এই অবস্থা হলেও—ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাব অব ক্যালিফোর্নিয়ার সদস্যরা কয়েকটি ভাল ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এই দুটি সংস্থার উদ্যোগে পোলিশ, ফরাসী, জাপানী, রাশিয়ান, মেক্সিকান, সুইডিশ ও চেকোস্লোভাক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এসব ছবিতে চলচ্চিত্রের দুটি জগৎ—ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক জগতে আদর্শগত সংগ্রামের চিত্র আমরা দেখতে পেরেছি। বিশেষ করে রিয়ারলিজম ও নিউ ওরেন্ডের দৃষ্ট দর্শকরা দেখার ও ভাবার অনেক কিছু পেয়েছেন। এই ছবিগুলির সব কর্মটির সম্পর্কে দর্শকের সকলের মতের মিল না হলেও চলচ্চিত্র আজ কত শক্তিশালী দৃষ্টপূর্ণ নিজে প্রতীতি করেছে তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। গত বছর প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে আন্দ্রে মুনকের গিঁদ প্যাসেজার, মিখাইল রুয়ের নাইন ডেজ অব ওরান ইয়ার এবং কয়েকটি পোলিশ ও জাপানী ছবি দর্শকের মনে বিশেষ রেখাপাত করেছে। গত বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বহু ফিল্ম ক্লাব ও সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরতলীতে এবং জেলার জেলায় এ ধরনের সংগঠন গঠিত হয়েছে। এসব সংগঠনের দ্বারা পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। তার মধ্যে ফিল্ম সোসাইটির 'চিত্রপট' এবং সিনে ক্লাবের 'চিত্রকল্প' এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির মনুষ্যপট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব পত্র-পত্রিকা ও ফিল্ম সোসাইটির প্রভাব বাংলা চলচ্চিত্র বিশেষ দেখা না গেলেও এক প্রণয়ী সমকালীন দর্শক যে তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

পশ্চিম জার্মানীর তরুণ চলচ্চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা

পশ্চিম জার্মানীর চারজন ফিল্ম পরিচালক নতুন ছবির পরিকল্পনার রত। উক্ত নির্দেশকগণ সকলেই তরুণ এবং ফিল্মজগতে নব আলোকপাতে রত। চিত্রাচারিত দৃষ্টি ভাঙ্গা এঁদের ছবিতে পাওয়া যায় না। যদিও চলচ্চিত্রের আদর্শ নিয়ে মতভেদ আছে—কিন্তু এঁদের ক্ষেত্রে এটুকু বলা চলে যে মাত্র আমোদ-প্রমোদের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এঁরা ফিল্ম তৈরি করেন না।

এঁদের মধ্যে গ্রীভল্ ট্রেমপারের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয়। ফিল্মক্ষেত্রে নবতর দৃষ্টি তথা কর্মপদ্ধতির জন্য ইনি ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। বিখ্যাত জার্মান ছবি 'গিড হাল্‌ব—স্টারকেন' এবং 'নাসের আসফাল্ট' এর কথোপকথন এঁরই রচিত। তা ছাড়া ইনি বার্লিন সমস্যা নিয়েও দুটি ছবি তৈরি করেছেন। 'ফ্লুখট নাখ বার্লিন' ও 'এন্ড-লোজে নাখট' ছবি দুটি বিশেষভাবে মানবিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে তৈরি হয়েছে। বিভাজিত দেশের বেদনাময় প্রকৃত পরিস্থিতি তিনি মানবমনে গভীরভাবে অঙ্কিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

তার আগামী ছবিকেও তিনি বার্লিনের পটভূমিকাতেই তৈরি করছেন। এই ছবির পরিকল্পনা অনুসারে বার্লিন নগরীকে 'সহ-অভিনেত্রী'র ভূমিকায় নাবতে হবে। গ্রীট্রোপার উক্ত ছবি 'অলারাক্সান ডেমার সরী'—তে মহানগরীকে এক নতুন রূপে চিত্রে রূপায়িত করছেন। ১৯৬২ সালেই সমালোচকগণ গ্রীট্রোপারের ছবি 'অন্তহীন রাতির' প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি বার্লিন সমস্যার প্রকৃত রূপ চিত্রে তুলে ধরেছেন। সেই থেকে তিনি ফিল্ম নির্দেশক হিসাবে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ফিল্ম নির্মাণে গ্রীট্রোপারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি প্রায়ই সাধারণ লোকের মধ্যে থেকে ছবির নায়ক ও নায়িকা নির্বাচন করে থাকেন। সেই সংগে অতি অল্প খরচেও তাঁকে ছবি তৈরি করতে হয়। বলা বাহুল্য, গ্রীট্রোপারের জায়গার যদি অন্য কেউ ফিল্ম নির্দেশক হতেন, তবে উক্ত অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই বহুব্যয় চিন্তা করতেন। কিন্তু গ্রীট্রোপার আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে আজ পর্যন্ত উক্ত ফিল্মগুলি করে এসেছেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রীঅলেকজান্ডার কুগের নামও উল্লেখযোগ্য, যিনি ফিল্ম পরিচালনার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাধারণভাবে গ্রীকুগকে ওবারহাউজের গোষ্ঠীর মুখপাত্র বলা হয়। উক্ত গোষ্ঠী চলচ্চিত্র-জগতের তরুণ শিল্পীদের নিয়ে তৈরি জার্মান ছবির উক্তর মানের জন্য বিশেষ সন্মতি হয়েছেন। ১৯৫৯ সালে গ্রীকুগ 'রটালটেট ইন স্ট্রটস' নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে-

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ছিলেন। তাতে তিনি নাৎসীকালের ভীষণ ঘটনা সম্বন্ধে নানা তথ্য চিত্রবন্দ্য করেন। তারপর থেকে জার্মানীর অতীত সম্বন্ধে অনেক চিত্রই তৈরি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নাৎসী বাহিনীর ঘটনা নিয়ে একটি চিত্র ও বাস্তব তথ্যসহ পুস্তক রচনা করেছেন।

উক্ত পুস্তকের ওপর তিনি “আরলিড্ ফন গেল্টার্ন” নামে চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। “অনীতা জি” নাম্নী একটি তরুণীর আত্ম-কাহিনী এর বিষয়বস্তু, যে ঘটনাক্রমে এমনি এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গিরে পড়ে যে, সূক্ষ্ম আবহাওয়ার ফিরে যাওয়ার সামর্থ্যও তার লোপ পায়। অতি বিবাদপূর্ণ কাহিনী। সমালোচকরা এই ছবি সম্বন্ধে যে মতামত দেন তাতে তরুণ পরিচালককে বিশেষ উৎসাহিত করে। কিন্তু ছবিতে আধুনিক মানব-জীবনের যে অন্ধকার দিকগুলি দেখানো হয়েছে, তা সদাসর্বদা ঘটে না। ফলে ঘটনাবলী বাস্তবের সীমা অতিক্রম করেছে। তা ছাড়া উক্ত কাহিনী জার্মান জীবনযাত্রারও বথার্থ প্রতিফলিত হয় নি। তবুও প্রথম প্রয়াস হিসাবে সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগতই জানিয়ে-ছিলেন।

শ্রীপেটার শামনী সম্বন্ধেও একই কথা। যদিও শ্রীশামনী এ পর্যন্ত ছোট ছোট ছবিই তৈরি করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি বড় সম্পূর্ণ ছবিতে হাত দিয়েছেন। এই কাহিনী লিখেছেন তরুণ জার্মান লেখক শ্রীগুস্তোন জয়রেন। লেখক সমাজ-জীবনের যে দিকে আলোকপাত করেছেন, সৈনিক নিয়ে খুব বেশি আলোচনা এ যাবৎ হয় নি। সাধারণত পিতা-মাতার শাসনে সন্তানদের কিছু অভিযোগ থাকেই। কিন্তু তারা যখন পিতামাতার পদে

অধিষ্ঠিত হয় তখন তারাই আবার নিজ নিজ সন্তানদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য অভিযোগও শোনে। লেখক বিশেষ দৃষ্টিতে সঙ্গো দেখিয়েছেন যে, শিশু যখন বড় হয় তখন তার ওপরও সামাজিক দায়িত্ব আসে। কিন্তু চিত্রাচারিত প্রথা বদল বা রদ করবার দিকে তখন আর প্রয়াস থাকে না। এই বিষয় নিয়ে নবোদিত লেখকদের মধ্যে এর আগে ভাবনা দেখা যায় নি। এই জন্য “ডাস্ গাটার” নামক উপন্যাসটি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়। উপন্যাসের ভাবধারাকে শ্রীশামনী বিশেষ মনোজ্ঞভাবে ছবিতে রূপায়িত করে জার্মান চিত্রজগতে গভীর রেখাপাত করেছেন।

অন্য একটি নতুন দিকে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেছেন শ্রীমিশারেল ক্রেগহার। কঠোর সভাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো তাঁর সংকল্প। বর্তমান তরুণ পরিচালকগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীক্রেগহার ইতিমধ্যে তাঁর একটি নিজস্ব আসন লাভ করেছেন। শ্রীকুর্ট গোয়েৎস্-এর রচনা অবলম্বনে “ডি টোটে ফনব্যাবেলি হিলস্” নামক তাঁর চিত্রটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। এই ছবিতে চলচ্চিত্রের সকল রসেরই আমদানী তিনি করেছেন, সেই সঙ্গে পুনিশের ওপরেও কঠোর ব্যঙ্গোক্তি করতে ছাড়েন নি। তাঁর দ্বিতীয় ছবি “জেরেনাডে ফুর ট্‌স্‌ভাই শিপওনে” গোয়েন্ডা কাহিনীর প্যারোডি। এই ছবির মাধ্যমে তিনি বর্তমান গোয়েন্ডা-কাহিনী চিত্রগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন। বর্তমানে তিনি আইপেন ডফ্ রচিত “আউস তেন লেবেন আইনেস টাওগেনিস্টন্” কাহিনীর চলচ্চিত্র তৈরি করছেন। জার্মান ভাষার এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

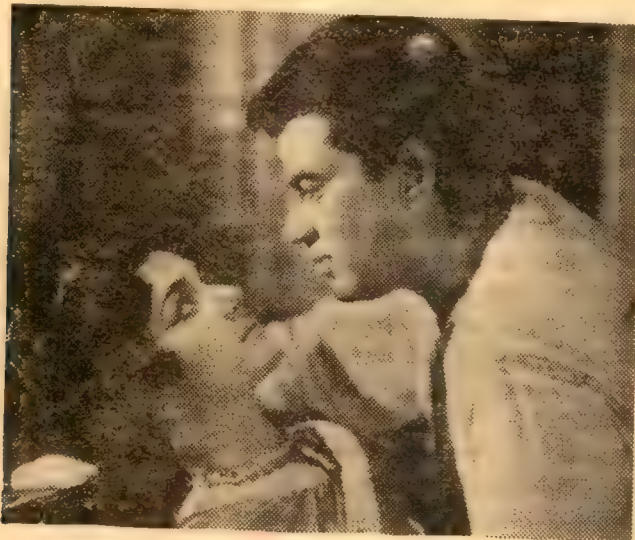


‘পাভেল বনবাস’ ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় রাজা সুসোচনা।



শান্তিনিকেতনে লোক-উৎসব

পৌষের হিমেল সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলাটি এবার বেশ অল্প-জমাট ছিল। একদিকে বাতীবাহী ছই-লাগায়ে পরুর গাড়ির ভিড়। অপরদিকে দোকান, রেস্টুরেন্ট ও সার্কাসে লোকে লোকারণ্য। বেশ ঠান্ডা পড়েছিল। কিন্তু লোকসমাবেশ তা বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। বৈদ্যুতিক আলো ও মাইকের আওরাজে মেলা প্রাণগত ছিল সরসরহ। গ্রাম্য পরিবেশে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ বেশ ভালই লাগছিল। ওদিকে বিম্-



‘কাজল’ চিত্রের একটি দৃশ্যে গম্বিনী ও হরিশ্চন্দ্র



নির্মলমাণ 'রেক' ছবিতে প্রদীপকুমার ও মাদমী মৃদালী

ভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রাটিভ অফিসের বাম পার্শ্বে মেলা প্রাঙ্গণে যে সিমেন্ট বানানো প্রস্তুত বেদীটি ছিল, তাতে চলেছে লোক-সংস্কৃতির আসর। প্রতিদিনই এখানে গ্রাম-বাংলার লৌকিক সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। এটি গ্রন্থের প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শব্দ বীরভূম অঞ্চলের লোকসংগীতই নয়—পরন্তু সমস্ত বাংলাদেশের লোকসংগীতের সমাবেশ এইখানে হয়। তাই সত্যগীরের পাঁচালি, যাত্রা, কবিগান, বাউল ও অন্যান্য লোকসংগীতানুষ্ঠান মেলা প্রাঙ্গণকে মার্তিয়ে রেখেছিল।

এবার, প্রখ্যাত শ্রীশান্তিদেব ঘোষের নিকট হতে এই লোকসংগীতের আসরে মুকুন্দ-দাসের যাত্রার গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে ২৫শে ডিসেম্বর গাইতে এসেছিলাম। বহুদিনের ইম্প্রিমেন্ট শান্তিনিকেতন দর্শন ও তথায় সংগীত পরিবেশনের এমন অপূর্ব সুযোগ মার্তিয়ে অভাবনীয়। যাই হোক, আমার ভিন-জন সহ-শিল্পীসহ এই লোকসংগীতের আসরে উপস্থিত হলাম। বীরভূম, বাকুড়া ও মুর্শিদাবাদের বাউলরা ছাড়া কলকাতা থেকে আমরা ঠটিদল আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম,— এই পৌষ মেলায় লোক-সংস্কৃতির আসরে গাইবার জন্য। আমার দল ছাড়া, এসেছিলেন, পরেশ দেব সম্প্রদায়, রুপেন চৌধুরী ও মণীন্দ্র দাস। রাত সাড়ে সাতটার আরম্ভ হলো এই লোকসংগীতের অনুষ্ঠান। সিমেন্টের বেদীটিকে ঘিরে বসেছিল প্রোতা ও দর্শকের দল। বেদীটির উপর নানা বেশে উপবিষ্ট ছিল বাউল ও শিল্পীর দল। আমার পোষাক ছিল মুকুন্দ দাসের যাত্রার গৈরিক আলখালা ও পাগড়ি। প্রথমে আমন্ত্রিত শিল্পীদ্বয় মনোজ ও তদীয় ভগ্নী মঞ্জুরী চক্রবর্তী।

শেষতকণ্ঠে ও এককভাবে চাবিশ পরগনার লোকসংগীত বলে যে গান করলেন তা কোন সংগীতই নয়। এরা তিনটি গান করলেন। এর মধ্যে একটি আধুনিক লেখকের লেখা বন্দুর গান। আর একটি হলো বিখ্যাত “মন মাঝে তোর বৈঠা নে রে আমি তো আর বাইতে পারলাম না”। এ গানটি পূর্ব বাংলায় একটি লোকসংগীত। তাও এমন বিকৃত সিনেমার সুরে গানটি পরিবেশন করা হলো যে সমস্ত প্রোতমণ্ডলী বলতে বাধ্য হলো যে এ গান বন্ধ করে বাউল সংগীত আরম্ভ করতে। অগত্যা তাই করা হলো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই যে অন্তত শান্তিনিকেতনের এই লোকসংগীতানুষ্ঠানে যেন কোন নবিশ-গোজামিল দেওয়া পল্লীসংগীত পরিবেশন করা না হয়। তা ছাড়া, এদের সঙ্গে কোন সংগত না থাকতে আরও ব্যাপ্য লেগেছে। যাই হোক, বাকুড়ার সনাতন দাস বাউল গান আরম্ভ করলো। গলা খুব চাঁচা নয়—তবু গান গাইবার ও সেই সঙ্গে নাচবার এমন একটি সুন্দর ভাগিনা ছিল যে সকলেরই ভাল লেগেছে। ইনি গাইলেন দুটি বাউল গান। একটি মেহতত্ত্বের। তারপর মুর্শিদাবাদের বাউল যতীন দাস নামলেন আসরে। বোধহয় ইনি কলকাতা বেতারেও গেয়ে থাকেন। এঁর গানটিও বেশ ভাল লাগলো। ইনি একখানা গানই করলেন। তবে নাচেন নি। সনাতন এবং যতীন দাস উভয়েই দোতার গলায় বুলিয়ে, বাজিয়ে গাইলেন। এইদিন বহু বসন্তের পরে শান্তিনিকেতনে এক অশীতিবর্ষ মুর্শিদাবাদের বৃন্দ বাউল এসেছিলেন। নাম তাঁর বন্দাবন দাস। তাঁকেই এইবার তুলে দেওয়া হলো। সত্যিই বৃন্দের কী রস সৃষ্টির ক্ষমতা। প্রেম

ভরপুর। ভান হয়ত ছিল একতারা আর বাই হাতে কোমরে কোলানো বান্না। এদের সহ-যোগে বৃন্দ নেচে নেচে বাউল সংগীতের এক রসোত্তীর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। এঁকে দিয়ে একাধিক সংগীত গাওয়ানো হলো। এর পর এইদিনের শ্রেষ্ঠ বাউল বিশ্বনাথ দাস গান ধরলেন। ইনি বীরভূমেরই লোক। খুবই অল্প বয়স। কিন্তু গলা একেবারে চাই গাই করছিল। বোধহয় চড়ার “জি” সাক্ষ্যই সা করে গান ধরেছিলেন। সমস্ত মেলা প্রাঙ্গণ গম-গম করছিল। তবে বাউলের আগে তিনি যে গানটি করেছিলেন তা হলো বিখ্যাত চট্টকা গান “প্রেম জানে না রসিক কালা চান্দ”। এটি তাঁর বাউলিরা কণ্ঠে ঠিক হয় নি ও কারো ভালও লাগে নি। কিন্তু পরের বাউল গান দুটি অপূর্ব হয়েছিল। ইনি খমক সহ-যোগে নেচে নেচে গান করেছিলেন। সময় অল্প থাকার দরুন প্রোতার অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও এঁর গান বন্ধ করতে হলো। এঁর গানের আগে শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের ছাত্র শ্রীবিজয় চক্রবর্তী দুটি পল্লীসংগীত গেয়ে প্রোতাদের বেশ আনন্দ দিয়েছিলেন। যাই হোক, এইবার কলকাতার আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ দাসের ভাগিনার, মুকুন্দ দাসের যাত্রার স্বদেশী গান গাইতে হলো। সংগে সংগীতে কণ্ঠদান করেছিল সর্বশ্রী যতীন দত্ত ও অমলেশ দলুই। জ্বলা সহযোগিতায় ছিল শ্রীসমরসাহন মৃদা-পাখ্যায়। “হাসিতে খেলিতে”, “আয়রে দুলালী”, “জাগ গো জাগো জননী”, এবং “সাবধান! সাবধান!” এই ঠটি বলিষ্ঠ সংগীত প্রোতাদের শোনানো হলো। করতালির উচ্চ-রবে আশা করি প্রোতাদের ভালই লেগেছিল মনে করতে হবে। এরপর আউলের গান করলেন শ্রীরশেন চৌধুরী। তিনি আউল, ফকিরী ও মুর্শিদী গেয়েছিলেন। তবে তাঁর গান প্রোতারা খুব ভাল নিতে পারে নি। রুশেনবাবুর গানের পর পরেশ দেবের গান বেশ ভাল লেগেছিল। তিনি বহু পুরনো লোক-শিল্পী। কণ্ঠও ভাল। তিনি কীতনের আখ্যানবহু অবলম্বনে লোকসংগীতের সুরে অনেকটা গলা ধরনের পল্লীসংগীত শোনালেন। তবে একটু যেন শহুরে ছাপের আঁচ পাওয়া গেল। সবচেয়ে শেষ শিল্পী ছিল কল-কাতার বেতারশিল্পী মণীন্দ্র দাস। এঁর উত্তরবঙ্গের ডাওয়ারীয়া ও চট্টকা গান খুবই ভাল হয়। কিন্তু এইদিন ইনি অনেকগুলি গান করলেন এবং প্রোতাদের সমর্থনও যথেষ্ট পেলে, কিন্তু গানগুলো খুব উচ্চারণের হয় নি—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ এঁর গান অন্যান্য দিনও শুনছি। কিন্তু তা অনেক উচ্চ কলাকৌশলের এবং বিষয়বস্তুও ভাল। এইদিন ইনি চট্টকা জাতীয় হাস্য-রসাত্মক গানই বেশ পরিবেশন করলেন। তাহলেও বলবো, সোঁদনের পৌষ মেলায় সাধারণ কালীন লোকসংগীতের অনুষ্ঠানটি শহরের



প্যারাডাইস পিকচার্সের 'গৃহস্থানে' ছবিতে বিকাশ রায়

প্রাণী) হিন্দী ভবনের প্রধান অধ্যাপক শাস্ত্রীজী, বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইত্যাদি বহু সুখী বিম্বজনকে। প্রমথের উপাচার্যের বাড়িতে এলাম। সত্যিই নিরহংকার ঝুঁকি। অত্যন্ত সাদাসিধে ভালোমানুষটি। মনেই হয় না ইনি এত বড় পদে অধিষ্ঠিত। বাড়ির লোকজনেরাও তাই। এমন কি তাঁর আমন্ত্রিত বন্ধুবর্গও সেইরকম ভাল মানুষ। এইরকম সহজ অভ্যর্থনার আমি খুব তাড়াতাড়ি এঁদের সঙ্গে মিশে গেলাম এবং প্রাণভরে রজনীকান্ত, নজরুল, পরিগ্রাহক, নীলকণ্ঠ, দশরথি রায়, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকুমার নন্দী, বিবেকানন্দের গান, পদাবলী কীর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করলাম প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। এরকম মুগ্ধ প্রোভা জীবনে পাই নি। এঁদের অনুরোধে মুরুন্দ দাসেরও কিছু কিছু গান শোনাতে হলো। এঁরা সকলেই আমার সাথে একমত হয়ে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথের বিরট সঙ্গীত-সাগরের মধ্যেও বাংলার এইসব গানের প্রয়োজন আছে এবং এইসব গান রবীন্দ্রপ্রভাবমূর্ত্ত হয়ে এই গানগুলোর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বজায় রেখে গাওয়া প্রয়োজন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের টম্পা গান আছে আবার নিধুবাবুরও টম্পা সঙ্গীত আছে। কিন্তু নিধুবাবুর টম্পা যদি রাবীন্দ্রিক ঘাঁটে গাওয়া হয়—তবে কী তা নিধুবাবুর টম্পা থাকবে? সুতরাং আকাশে বিরট সুবর্ষের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রাজির অবস্থানের ন্যায় বাংলার অন্যান্য গানেরও অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। সেদিন গৃহগ্রাহী এই প্রের্ত্ত ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

॥ —গীতিচারণ শ্রীসত্যেন্দ্র
মুখোপাধ্যায় ॥

একথিয়ে চটল সঙ্গীতের জলসার পাশে এক আদর্শ ও অভিনব অনুষ্ঠান বলে মনে হয়েছে। বহুদিন এ অনুষ্ঠান স্মৃতিপটে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরপরে সেদিন সারা রাত ধরে "যাত্রা" গান শুনু হর।

পরের দিন সকালে মণীন্দ্র দাস ও আমি যখন আমাদের খড়-বিছানো ঘরে বসে সঙ্গীত-চর্চা করছিলাম, তখন বর্তমান বিশ্বভারতীর্ উপাচার্য প্রমথের কালিদাস ভট্টাচার্যের প্রাকৃতপূত্র শ্রীসত্যেন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধরলেন তাঁর কাকাকে ভক্তিমূলক গান শোনাতে। এ আমার পরম সৌভাগ্য। উপাচার্য একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পরম ভক্ত। তাকে গান শোনানো তো আমার সৌভাগ্য। আমি রাজী হয়ে গেলাম। উপাচার্য প্রমথের কালিদাসবাবু, তাঁর দু-চারজন বন্ধুকেও এই উপলক্ষে গান শুনতে নিমন্ত্রণ করলেন। যেমন শান্তিনিকেতনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত দাশ (ইনি প্রাক্তন উপাচার্য 'প্রমথের সুখীরজন দাশের কনিষ্ঠ

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

অরবিন্দের

ANANDAMATH

অমি বাক্যমচেন্দ্রের অমর তানন্দমঠের অমর হংরাজী ওমুবাড়

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বসূচক
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পুত্র-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অঙ্গশতাব্দীর সাধনে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

বিশ্বমঞ্চ ও দেশে এবং দেশে মিনামিন

রাশিয়ান থিয়েটার: স্ট্যানিস-
লাফস্কি তাঁর 'মাই লাইফ ইন আর্ট'
বইতে 'ইন্টুইশন (স্বজ্ঞাত হওয়া)
এন্ড ফিলিং (অনুভূতি)' পরিচ্ছেদে
মস্কো আর্ট থিয়েটারের, 'দি সি গাল'
প্রডাকসনের বিশদ আলোচনা করেছেন।
তিনি লিখেছেন:

আমি এক সিরিজ অভ প্রোডাকসনস
এবং প্লেজ এই 'ইন্টুইশন এন্ড
ফিলিং' রীতির অনুধাবন করে আমরা
মগ্নস্থ করেছিলাম। এই শ্রেণীতে পড়ে
চেখভের সমস্ত নাটক, হাউস্টম্যানের
অনেক প্লে, টুর্গেনেভ এবং ডস্টয়-
ভস্কির রচনা এবং অন্যান্য কয়েকজন
নাট্যকারের লেখা।

এই সিরিজের প্রথম নাটক হচ্ছে
চেখভের 'দি সি গাল'। চেখভের নাটক
কল্পনা করে বোঝাবো এ ধরনের মৃদুতা
অবশ্য আমার নেই। চেখভের নাটকের
সৌন্দর্য সংলাপের উপর নির্ভরশীল
নয়। সংলাপের অন্তরালে যে নিহিত
অর্থ আছে, বিরতির কার্যকারিতা,
অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিব্যক্তি এবং
তাদের ভাবপ্রকাশের অভিনব কৌশলের
সাহায্যেই চেখভের নাটকের মাহাত্ম্য
সুপরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। এ সব নাটকে
প্রত্যেকটি জিনিস প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে
—যথা, নাটকের প্রপার্টিজ, শব্দাদি,
দৃশ্যাবলী, অভিনেতাদের দ্বারা সৃষ্ট
ইমেজেস্ এবং মগ্নস্থ নাটক।
Here it is a case of intuition and
artistic feeling.

এই স্বজ্ঞাত হওয়া এবং অনুভূতি
সম্বন্ধে চেখভই প্রথম আমাকে অবহিত
করেন। চেখভের নাটকের অভিনয়স্থ
বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে হলে চেখভের
অন্তরের গহনে প্রবেশ করা দরকার।
অবশ্য যে সব নাটকে গভীর আত্মিক
সত্তার ছাপ আছে, তাদের ক্ষেত্রে
সব সময়েই এই ধরনের অনুপ্রবেশ না
করতে পারলে নাটককে ঠিক আয়ত্তে
আনা যায় না। চেখভের নাটকের
বেলায় এই রীতিটা আবার বিশেষভাবে
প্রযোজ্য। এভাবে না করলে চেখভের
নাটকের সার্থক মগ্নরূপায়ণ সম্ভবই
নয়। রাশিয়ার সমস্ত মঞ্চে এবং
ইউরোপের অনেক নাট্যালয়ে চেখভের
নাটকের ভাষা দেবার প্রচেষ্টা করা
হয়েছে পুরানো ধরনের অভিনয়-

রীতিতে। আচ্ছা ফল কি হয়েছে?
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অসফল্য।

There is no theatre and no pro-
duction that has shown Chekhov
successfully by employing the
usual theatrical methods, and this
despite the fact that his plays have
been tackled by the best actors of
the world, actors whose talent,
technique and experience have
never been questioned.

আর্ট থিয়েটারই হচ্ছে একমাত্র দল
যারা এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছে—
এবং যে সময় তারা সাফল্য অর্জন
করেছে তখনও পর্যন্ত তাদের অভি-
নেতা-অভিনেত্রী দল অভিনয় করবার
ব্যাপারে খুব পাকাপোক্ত হন নি।
অথচ যে সব পুরানো দল চেখভের
নাটক করতে গিয়ে অসফল হয়েছে
তাদের ভেতর কিন্তু পৃথিবীর সেরা
সেরা এ্যাক্টরসস্তা ছিলেন—যাদের
প্রতিভা টেকনিক এবং অভিজ্ঞতা
সম্বন্ধে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন পর্বন্ত
করে নি। আর্ট থিয়েটার এ বিষয়ে
সফল হয়েছে কারণ চেখভকে আমরা
নতুনভাবে বোঝবার উপায় আবিষ্কার
করেছি—

—an altogether different
approach, and that is our main
contribution to dramatic art.

প্রথম পঠনে চেখভের নাটকের
গভীর কাব্যিক সৌন্দর্যের অনুভূতি
হয় না। প্রথমবার চেখভের নাটক
পড়বার পর আপনি মত প্রকাশ
করবেন: 'ভাল, কিন্তু এমন অসাধারণ
কিছু নয়, বিস্মিত হবার মতই বা
কি আছে। যেখানে যা থাকা
দরকার তা অবশ্য আছে এবং যা আছে
তা যে সত্যি ভাও জানি। কিন্তু এর
ভেতর নতুন কিছু কোথায়?

চেখভের নাটকের সঙ্গে প্রথম
পরিচয়ে অনেক সময়ে হতাশারই উদ্বেক
করে। নাটকগুলো পড়বার পর এমন
কথাও মনে হয় যে, এ সব রচনা সম্বন্ধে
বলবার মত কিছু নেই। কাহিনী এবং
বিষয়বস্তুকে দু'চার কথায় বলে
দেওয়া যায়। চরিত্রলিপি? অনেক
ভাল ভাল রোল রয়েছে কিন্তু এমন

চরিত্র নেই যা আকর্ষণ করতে পারে
সেরা শ্রেণীর অভিনেতাদের—যারা ভাল
রোলে ছাড়া অভিনয় করে না (এ ধরনের
কিছু অভিনেতা দেখা যায়)। আরও
অন্যান্য ছোট ছোট রোল রয়েছে।
এক পাতাতেই এদের সংলাপ শেষ
হয়ে যায়—কয়েকটি মাত্র কথা বা দু'-
একটি দৃশ্য। কিন্তু মজা এই স্মৃতির
দ্বারা আল্লা করি দিলে, বারবার এই
সব নাটকের কথা চিন্তা করতে ইচ্ছা
জাগে—ছোট রোলের অভিনেতাদেরও।
কয়েকটি জায়গার অন্তর্নিহিত আবেগ
বাধ্য করে অন্যান্য জায়গার বিষয়
চিন্তা করতে, সমস্ত নাটকটিকে সমগ্র-
ভাবে ভেবে দেখতে। চেখভের নাটক
বারবার পড়া দরকার, কারণ প্রত্যেক বার
নতুন করে পড়বার সময় নতুন নতুন
অনেক জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়
নাটকের ভেতর থেকে।

চেখভের নাটকের কিছু কিছু
চরিত্র আমি শতাধিকবার অভিনয়
করেছি—প্রত্যেক অভিনয়ের সময়েই
নতুন নতুন অনুভূতি আমি হৃদয়ের
গহনে উপলব্ধি করেছি—নতুন গভীরত্ব
এবং সুক্ষ্ম শিল্পসৌন্দর্য আবিষ্কার
করেছি।

চেখভের নাটক কোন দিক থেকেই
কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না। কারণ
তাঁর কোন নাটকের কাহিনীই সাময়িক
বা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে লেখা নয়—
but about Man with a capital M.

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে জীবনের
প্যাটার্নটা কি ধরনের হবে সে বিষয়ে
চেখভ যে ধরনের স্বপ্ন দেখতেন তা
ছিল বিরাট আদর্শমণ্ডিত, মহিমান্বিত
এবং উদার আবেগ-প্রসূত—সংকীর্ণতা
বা ক্ষুদ্রতার চিহ্নমাত্র তাতে ছিল না।
হয় তো এই আদর্শকে কখনও সত্যে
পরিণত করা সম্ভব হবে না—এবং এ
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা প্রায়
অসম্ভব মনে হলেও তার জন্য আপ্রাণ
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

Chekhov's dreams of future
life speak of lofty spirit, of the
World's Soul, of the Man who
does not want "three arshins
(Russian measure of length equal
to 28 inches) of earth" but the
whole of the earth, of the wonder-
ful life for whose achievement we
must work, sweat and suffer two
hundred, three hundred and even
a thousand years. All this is
from the realm of the eternal
which cannot but arouse one's
excitement.

মাস্টারিক বসন্ত

চেখভের নাটকগুলো অত্যন্ত দ্রুত এবং বাস্তব-বাহ্যিক ক্রমপরিণতির দিকটা গোপন, এই সাফল্যের জন্য প্রধানত দায়ী ভেতরকার সুন্দর, স্বচ্ছ এবং শিল্পসম্মত পরিষ্কৃতি। নাটকের পাত্রপাত্রীর বাহ্যিক কর্মবিমূখতা (ইন্‌এ্যাক্টিভিটি) যেন ঐ সব চরিত্রের ভেতরকার জটিল সক্রিয়তাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। চেখভের মত স্পষ্টভাবে কেউ বোঝাত পারেন নি যে, নাটক দেখতে দিয়ে ইনার এ্যাকশনের তাৎপর্যটাই বিশেষভাবে বোধগম্য হওয়া দরকার—এই ব্যাপারটার ওপর ভিত্তি করে যদি নাটক প্রতিদ্বন্দ্বী করা হয় এবং নাটকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সর্বস্বকমে বর্ণনা করা হয়, তাহলেই সত্যিকার ড্রামাটিক স্টোর প্রাপ্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

বাহ্যিক সক্রিয়তা দর্শককে আনন্দ দেয় এবং উত্তেজনার ইন্ধন জোগায়।

অন্তরের সক্রিয়তা দর্শকের আত্মাকে প্রভাবিত এবং আয়ত্তাধীন করে রাখে। একের কাজ খুঁটি করা, অপরের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। যে নাটকে দুটো দিকই (অর্থাৎ ইনার এবং আউটার এ্যাকশন) দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে, সে নাটক হয় সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। কিন্তু সে কথা যাক, ইনার এ্যাকশন জিনিসটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই সব কারণেই ভাসা-ভাসা ভাবে বড়ো চেখভের নাটক মণ্ডস্থ করতে যাওয়া ঠিক নয়। ঠিক নয় ভেতরকার অনুভূতি এবং ভেতরকার জীবন না বড়ো মণ্ডের ওপর ইমেজিং-গদ্যে ফুটিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা। চেখভের স্টোর সত্যিকার ঐশ্বর্য হচ্ছে নাটকীয় চরিত্রগুলোর অন্তর-জীবন এবং স্পিরিচুয়াল ডায়ালগ দিকটা।

এই জন্যই যে সব অভিনেতা বা অভিনেত্রী চেখভের নাটকে অভিনয়

দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে বা প্রদর্শনী করছি এই মনোবৃত্তি নিয়ে মণ্ডবতরণ করবেন তাঁদের প্রথম থেকেই ভুল হবে। চেখভের নাটকে তাঁরা আছেন এই কথাটাই প্রমাণ করতে হবে। 'তাঁরা আছেন' বলতে তাঁরা যে প্রাণবন্ত এবং তাঁদের অস্তিত্ব আছে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, *pro ceeding along the deep inner line of spiritual development.*

চেখভের এই অন্তর্মুখীন রচনাশৈলীর ভেতর একটা বহু-মুখীনতার ভাব আছে। কখনও তিনি ইম্প্রেশনিস্ট, কখনও সিম্বলিস্ট—আবার দরকার মত রিয়ালিস্ট এবং সময় সময় প্রায় ন্যাচারেলিস্ট।

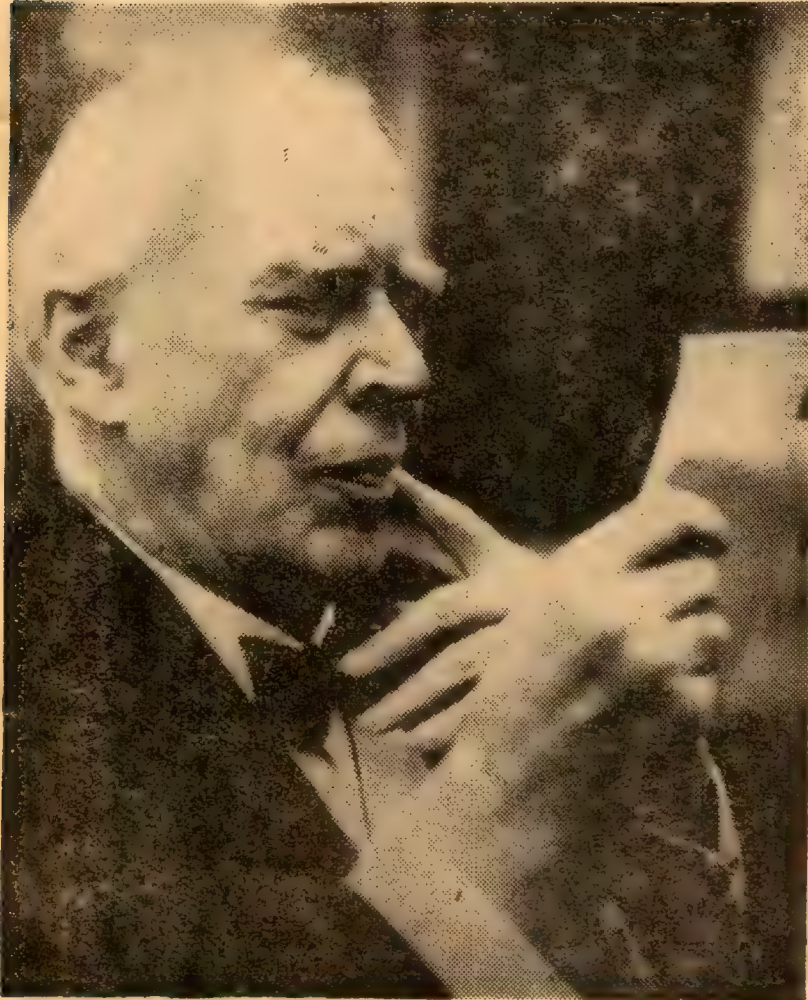
সময় সন্ধ্যা..... আকাশে চাঁদ উঠছে..... দুজনে, একটি পুরুষ এবং অপরজন মহিলা, অর্থহীন শব্দের আদান-প্রদান করছে যে সব শব্দ শুনলে বাক্য যায় তারা ঠিক মনে মনে বা অনুভব করছে তা কথার বলছে না (চেখভের চরিত্ররা অনেক সময়েই এই ভাবে কথাবার্তা বলে)। দূরে কে একজন পিয়ানো বাজছে। হঠাৎ মেয়েটির প্রেমে-ভরা-অন্তর থেকে একটা কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। তারপর ছোট্ট একটি কথা বা ঘোষণাও বলা যেতে পারে: “আমি পারি না... আমি পারি না... আমি পারি না...” দৃশ্যটিতে সাধারণভাবে কিছু বলা হয় না—কিন্তু অনেক কিছু জড়িত-ঘটনা, বহু বিগত স্মৃতি, অস্বস্তিকর অনুভূতির কথা মানসপটে ফুটে ওঠে।

আবার একটি ঘটনা—একজন বৃদ্ধ, প্রেমে পড়ে সে প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠেছে, একটি সাদা ধবধবে সি গালকে শিকার করে নিয়ে এসে তাঁর প্রেমিকার পায়ে কাঁচ ফেলে দেয়। এটি একটি অদ্ভুত, সুন্দর, প্রাণবন্ত সংকেত। বা, কবিত্বহীন শিক্ষকটির কথাই ধরুন না। সে সব সময় স্ত্রীকে একই কথা বলে জ্বালাতন করে—“বাড়ি চল—বাচ্চাটা নিশ্চয় কেঁদে-কেটে একাকার করছে।”

এই তো রিয়ালিজম।

এর পর একটি বিপ্লী দৃশ্য আছে—মা এবং আদর্শবাদী ছেলের ভেতর ঝগড়া—এ জায়গাটা প্রায় ন্যাচারেলিজমের পর্যায় চলে গেছে।

পরিণতিতে—শরতের সন্ধ্যা, বৃষ্টির জলধারা জানালার গায়ে এসে আঘাত করছে, কয়েকটি লোক বসে তাস খেলছে, দূর থেকে শোপারি ওয়াল্টজের করুণ ধ্বনি ভেসে



বাসিলিয়ান স্ট্রোভিউসার 'কনিসলভাভি'

আসছে—এ শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যায়।
মূল্যী আওয়াজ হয়.....মৃত্যু।

এটা হচ্ছে ইম্প্রেসনিজম।

হিউমান মডুকে কিভাবে বাছাই করে নিয়ে পরিস্ফুট করে তুলতে হয় এ কৌশলটা চেখভের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। এই সব মডুকে আবার প্রাতিষ্ঠিক জীবনের বিভিন্ন জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৌতুকের মিশ্রণে জ্বলজ্বলে করে ধরতে হয় একধাও তাঁর অজানা ছিল না।

অনিভীজ্ঞ চোখ নিয়ে দেখলে মনে হতে পারে চেখভ জীবনের অপ্রধান দিকগুলোর খুঁটিনাটি নিয়ে বর্ণনা করেন এবং এর কোন আবশ্যকতাই নেই। কিন্তু এরও যথেষ্ট দরকার আছে—চেখভের অন্তরের যে বিরাট স্বপ্ন, বৈপরীত্য প্রথায় তাকেই ফুটিয়ে তোলা হয় এই সন্ধ্যোগে। সে স্বপ্ন, ব্যথার ভেতর দিয়েই আশা এবং আকাঙ্ক্ষার বাণী বহন করে আনে।

চেখভ তাঁর নাটকে একই সঙ্গে বাহির এবং অন্তরের সত্যকে অত্যন্ত কুশলী শিল্পীর মত উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। জড় স্টেজ-প্রপার্টিজ, সিনারি এবং লাইটিং ইফেক্টকে চেখভের মত প্রাণবন্ত করে তুলতে আজও কেউ পারেন নি। স্টেজের উপরকার জড় কল্প, সাউন্ড এবং লাইটিংয়ের ভেতরও প্রাণ আছে, যেমনটা দেখা যায় ঠিক সত্যিকার জীবনের ক্ষেত্রে এবং মানবাত্মার উপর এরা গভীর প্রভাব বিস্তার করে—এ সব কথা আমরা চেখভের নাটক অভিনয় করতে গিয়েই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

গোধূলি, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, বজ্রপাত, ঝড়, বৃষ্টি, ভোরের পাখীর গান, ঘোড়ার খরের আওয়াজ, গাড়ি চলার শব্দ, ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি, কি'ক' পোকের ডাক, ঘণ্টার শব্দ—চেখভ এ সবের ব্যবহার স্টেজ-ইফেক্টের জন্য করেন নি, মানবাত্মার স্বরূপ উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন এদের সাহায্যে। কারণ সজীব এবং জড় প্রাণী এবং বস্তু স্বাভাবিক মানুষের পারিপার্শ্বিক এবং প্রকৃতি সৃষ্ট এবং মানুষের মনস্তত্ত্বের উপর এদের প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী।

অত্যন্ত অসংগতভাবে কেউ কেউ আ. দর প্রডাকশনের কি'ক'র ডাক এবং লাইট ও সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে বিদূষ করতেন—কারণ চেখভের নাটকে এ সবের ব্যবহার তাঁরই নির্দেশমত আমরা করেছি।

আর এসব জিনিস বাদ দিলে নাটকের আভ্যন্তরীণ সত্যকে মণ্ডাভি-

নয়ে স্ফুটভাবে ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব হতো না।

মঞ্চে ভেতর-বাইরের সমস্ত কিছু মিথ্যাকে কি ভাবে অপসারিত করা যায় সে কৌশল এবং প্রতিভা চেখভের আয়ত্তা ছিল বলেই প্রতিষেধক হিসাবে সৌন্দর্য, শিল্পানুমোদিত এবং নিখাদ সত্য দিয়ে স্টেজকে সর্ব-রকমে সজ্জিত করে তুলতেন।

সাধারণ সস্তাদরের ভাবাবেগ বা গতানুগতিক ফিলিংস ইত্যাদির কোন ব্যবহার চেখভের নাটকে দেখা যায় না।

Chekhov seeks for his truth in the most intimate moods, in the innermost recesses of the soul. This truth excites one by its unexpectedness, by its mysterious ties with the forgotten past, by its inexplicable presentiment about the future, its particular logic of life in which, it seems, there is no common sense and which scoffs and gibes at people, nonplusses them or makes them laugh.

কঠিন এবং জটিল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আমরা 'দি সি গাল' নাটকটি মগ্নস্থ করি। চেখভ এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন—কারণ আবার নতুন কয়েকরোগের আক্রমণে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনের অবস্থা তখন এই রকম যে আবার যদি সি গাল মণ্ডাভিনয়ে অসফল হয়—প্রথমবার পিটার্সবার্গে এ নাটক মগ্নস্থ হয়ে ফেল করেছিল—তাহলে সে আঘাত সহ্য করার মত শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। সত্যিই এ নাটকে নতুন অসাফল্য তাঁর পক্ষে মারাত্মক হতে পারতো। চেখভের বোন মারিয়া পাভলোভনা—চোখে তখন তাঁর জল এসে গিয়েছিল—এ বিষয়ে আমাদের সাবধান করে দিয়ে অভিনয় শ্রাগিত রাখতে বললেন। কিন্তু ব্যবসার খাতিরে তখন আমাদের নতুন নাটক নামানো দরকার—সুতরাং উন্মোচন রজনীতে কি অবস্থায় যে আমাদের অভিনয় করতে হচ্ছিল তা সহজেই সবাই বুঝতে পারবেন।

When we were on the stage there was an inner whisper in our hearts : "You must play well, you must play better than well ; you must create not only success, but

triumph, for if you do not, the man and writer you love will die, killed by your hands."

এখন ঠিক মনে নেই কিভাবে আমরা অভিনয় করেছিলাম। প্রথম অঙ্ক শেষ হোল—চারদিকে গোর-স্থানের মত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। একজন অভিনেত্রী স্টেজে উপরই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমিও যেন নৈরাশ্যের ফলে দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি—পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তি অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহ থেকে আনন্দের হুজোড় উঠল। কার্টেন খুলে গেল, আবার বন্ধ হোল, আবার খুললো। অডিটোরিয়ামের দর্শকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখল আমরা স্থাগুণ দাঁড়িয়ে আছি। পর্দা আবার বন্ধ হোল, খুললো, ফের বন্ধ হোল, আবার খুললো—অথচ আমরা তখন পর্যন্ত এতোটা সর্ব্বং ফিরে পাই নি যে এগিয়ে গিয়ে বাউ করবো। সবাই আমাদের কন্‌গ্রাচুলেট করতে লাগলো, আলিঙ্গন করলো, যেমনটা ইস্টার নাইটে হয়ে থাকে। মারিয়া লিলিনা—যে মাসার পাট করেছিল—প্রচুর প্রশংসা পেল।

এই সাফল্য প্রতি অঙ্কে আরও বাড়তে লাগল। বিরাট সাফল্যের সঙ্গে নাটকভিনয় শেষ হোল। চেখভকে টেলিগ্রাম করে সব কথা জানানো হোল। সবচেয়ে ভাল অভিনয় হয়েছিল অলগা নিপারের (আরকে-ডিনা) এবং মারিয়া লিলিনার (মাসা)।

(ক্রমশঃ)

অ-আ-ক-অ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রণীত

মূল্য ব র আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও বৃত্তাকরসহ বানান শিক্ষা যেসকল অতুলনীয় ছন্দে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষার সহজ হইয়াছে। এ গ্ৰন্থে বাঙালি যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুথিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঙ্গীন আট

পেপারে বড় হরকে ছাপা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৬, বিশিষ্টাবাসী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১৯



প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে টোকিও অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক এবং ম্যানেজার

ঐতিহাসিক বিজয়ের কাহিনী

ভূর ওয়র ইতিহাসের পাতায় লেখা হল এক নতুন ঐতিহাসিক বিজয়ের গৌরব কাহিনী। শ্রুতপ্রাপ্ত প্রভুত্বের দুর্ভেদ্য বেড়াভাল ভেঙে করে যে মোহনবাগান ১৯১১ সালে আই-এফ-এ শীর্ষে উঠে যায় করে তারা ভারতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সেই মোহনবাগান রাজধানীর মাঠে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে পরপর তিনবার লাভ করল ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক ট্রফি ডুরাও কাপ। ডুরাওয়ের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ট্রফি হ্যাট্রিক করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে ইতিপূর্বে দুটি গোরা দল। হাইল্যান্ডার্স ইনফ্যান্ট্রি (১৮৯৩-৯৫) এবং ব্র্যাক ওয়াচ (১৮৯৭-৯৯) পরপর তিনবার ডুরাও কাপ লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী।

প্রীতিমিত্র

বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হবার পর যে দলই পর পর দুবার ডুরাও লাভ করেছে, শত চেষ্টাতেও তৃতীয়বার ডুরাও স্বন্দরীকে কোন দায়ার বন্ধনেই আবদ্ধ করতে তারা সক্ষম হয় নি। হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ডুরাও হ্যাট্রিকের দুর্লভ সম্মান একবার মোহনবাগানের কাছে গিয়েছে ইতিপূর্বে। ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে ডুরাও জয়ের পর ১৯৬১ সালে ডুরাও মোহনবাগানকে হারাতে হল। ১৯৬২ সালের ডুরাওয়ে খেলা অনুষ্ঠিত হয় নি টীনের নতুন আক্রমণের ফলে ভারতে জরুরী অবস্থার উদ্ভব

শান্তির একনিষ্ঠ তাপস

শেষ গোলাপটি অকালে ঘরে গেল তাস-খশের বৃকে। শুধু ভারত নয়, বিশ্ব হারাণ শান্তির একনিষ্ঠ তাপসকে। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আর আমাদের মধ্যে নেই। বেদনার্ত হৃদয়ে তাই তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি জানাচ্ছি আমাদের শোকাপূত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ক্রীড়াঙ্গনে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রবেশ ঘটে নি বাটে, কিন্তু জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং অক্ষরে অক্ষরে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত খেলোয়াড়। একজন আদর্শ ক্রিকেটারের মত শাস্ত্রীজী জীবনের সকল সমস্যায় উত্তীর্ণ হয়েছেন স্ট্রাইট ব্যাটে খেলে।

খেলাধুলার অন্যতম পূর্ণপোষক শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে ভারতের ক্রীড়া-জগৎ বিশেষভাবে কলঙ্কিত। তিনি ছিলেন একজন সভ্যকারের ক্রীড়ানুরাগী, তাই তাঁর কর্তব্যে জীবনে তিনি খেলাধুলার উন্নতির জন্য যেভাবে চেষ্টা করেছেন তা ভারতের অপরিচিত ক্রীড়াবোীদের স্মরণে থাকবে। এবার যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত সফর বৈদেশিক বস্ত্রের অভাবে বাতিল হতে বসেছিল তখন শ্রীশাস্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত সফরের প্রয়োজনীয় অর্থ যত্ন সহজেই ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজই সফর বাতিল করে দিল শেষ পর্যন্ত। আমরা হারিয়েছি আমাদের সেই প্রিয়জনকে, শান্তির সন্ধানে তাসখশে গিয়ে বৈঠককে সফল করে নিয়েই অকস্মাৎ পা বাড়ালেন চির শান্তির পথে।

হবার কলে। ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে মোহন-বাগান ডুরাও জেত করে আবার কলকাতায়। ১৯৬৫ সালে ডুরাওয়ের আসরে মোহনবাগানের ওপর সকলেরই দৃষ্টি, এক একটি ধাপ মোহন-বাগান অতিক্রম করতে লাগল, আর ক্রীড়াবোীদেরও জল্পনা কল্পনা বাড়তে লাগল। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের ধাপে মোহনবাগান সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে লড়াই করে অবশেষে উপনীত হয় ফাইনালে। সকলেরই মনে শুধু একটি প্রশ্ন জন্ম নেয় নাহয় উপনীত হতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান। অনেকের মনে আশঙ্কা হতে থাকে যে বিজয়ের পানপাত্র যুথের কাছে উঠেও কষ্টে পড়ে ভেঙে চুরুর না হয়ে যায়, রোডার্সের দৃর্ভাগ্য বেন লর্ড না করে মোহনবাগানকে।

শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান প্রায় অসম্ভববে সম্ভব করল ফাইনালে পাঁচবার পলিশ দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। এ পর্যন্ত মোহনবাগান মোট আটবার ডুরাওয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে এবং মোহনবাগান বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে দু'বার এবং দুবার তাদের বিজিতের সম্মান নিয়েই লড়াই থাকতে হয়েছে। এবার ডুরাও হ্যাট্রিকের সঙ্গে উপর্যুপরি দবার ফাইনালে উন্নীত হবার কতিবের অধিকারী হল মোহনবাগান ক্লাব।

১৯৬৫ সাল মোহনবাগানের ইতিহাসে গতাই একটি অন্যতম স্মরণীয় সবস্মরণ। এবার তারা লাভ করেছে কলকাতা ক্রিকেট লীগ, আই-এফ-এ শীর্ষ এবং রোডার্স কাপে তাঁরা

সাপ্তাহিক বন্দরভা

লাভ করেছে রানারের সম্মান। মরশুমের শেষ খেলায় হল তাদের সমরকীয় ড্রাও বিজয়। কুটবলের ক্ষেত্রে বর্তমানে আগ্রহপ্রকাশ করেছে পাঞ্জাব রাজ্য। পাঞ্জাবের প্রথম দল হিসাবে পাঞ্জাব পুলিশ সর্বপ্রথম ড্রাও কাপের মত প্রথম সারির প্রতিযোগিতায় ফাইনালে খেলার সুযোগ লাভ করল। শক্তিশালী মোহনবাগানের কাছে মর্যাদার লড়াইয়ে পাঞ্জাব পুলিশের পরাজয় ঘটেছে বটে কিন্তু তারা কর্পোরেশন স্টেডিয়ামের প্রাপ্যে রেখেছে উল্লেখযোগ্য জীড়াধারার স্বাক্ষর।

মোহনবাগান এবং পাঞ্জাব পুলিশের ফাইনাল যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে প্রায় তেরো হাজার দর্শক সমবেত হয়। খেলাটি তাঁর প্রতিমুহুর্তেই হওয়ায় খেলার আকর্ষণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। খেলার প্রথমার্ধের কুড়ি মিনিট পাঞ্জাব পুলিশ ঘণ্টে বেগ নিতে থাকে মোহনবাগানকে। মোহনবাগানের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে পাঞ্জাব পুলিশও উপনীত হয় মোহনবাগানের গোলের সীমানায়। খেলার দ্বিতীয় মিনিটে যোগীন্দর সিংয়ের তাঁবু সট লক্ষ্যবস্তু হয়। এরপর চলে কিছুক্ষণ মোহনবাগান দলের একটানা আক্রমণবাহার। প্রথমার্ধে মোহনবাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা করেকটি গোলের সহজ সুযোগের অপব্যবহার করে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহনবাগানকে একটি নিশ্চিত গোলের হাত থেকে রক্ষা করেন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী; গোল লাইনের ওপর থেকে একটি বল ছেঁত দিয়ে তিনি দলকে বিপন্নভুত

করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক মতেরো মিনিটে মোহনবাগান অগ্রগামী হয়। অকস্মিক একটি দর্শনীয় পাশ থেকে গোল করেন দীপু দাস। প্রথম গোলের পর মোহনবাগান অনুপ্রাণিত হয়ে খেলতে থাকে। ছাব্বিশ মিনিটের সময় অশোক চাটার্জীর কাছ থেকে বল পেয়ে পাঞ্জাব পুলিশের গোলরক্ষককে পরাজিত করে চুনি গোস্থারী দ্বিতীয় গোল করে দলের জয়ের পথ জগন করেন। খেলার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

কলকাতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ

পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের খেলা শেষ হল পাটনায়। গতবার সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে বিজিতের সম্মানের অধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল পূর্বাঞ্চলে তাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য এবারও অক্ষুণ্ণ রাখল ফাইনালে—বাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

আঞ্চলিক বিজয়ের পথে এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তিনটি খেলায়। প্রথম দুটি খেলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন ল কলেজের ভাস্কর গুপ্ত, নির্বাচিত অধিনায়ক অমর রায়ের অনুপস্থিতিতে। প্রথম দুটি খেলার কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল। অমর রায়, দেব মুখার্জী, সুব্রত গুহ, কৃষ্ণ জিজিবর এবং টি জে ব্যানার্জী জামসেদপুরে

বিহারের বিপক্ষে দ্বিতীয় টুর্নিক খেলার পর পাটনার এসে ফাইনাল খেলার অংশ গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় রবীন সামন্তের বোলিং-সাকল্যের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের একটি পুরাতন রেকর্ড তিনি ভঙ্গ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক খেলার এক বছরে সর্বাপেক্ষা বেশি উইকেট লাভের রেকর্ড ছিল পলি উমরীগড়ের, মোট ২৪টি উইকেট। রবীন সামন্ত ফাইনাল খেলায় কলকাতার বিপক্ষে প্রয়োজনীয় উইকেট সংগ্রহ করে সেই রেকর্ড ভাঙ করেন। সামন্তের মোট সংগ্রহীত উইকেট হল মোট ২৬টি। এবার একটি খেলায় রবীন সামন্ত সেকুরী করারও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিলিত হয় গোরক্ষপুরের সঙ্গে। গোরক্ষপুর দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৮৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১২০ রান। প্রথম ইনিংসে কলকাতা দলের ভাস্কর গুপ্ত সংগ্রহ করেন ২৫ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট এবং সুপ্রকাশ সোম সংগ্রহ করেন ৩০ রানের মূল্যে ৩টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে ৫টি উইকেট দখল করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কলকাতা দলকে এই ইনিংস খেলতে হয় ৭ উইকেটে ৪২৭ রান সংগ্রহের পর কলকাতা দল ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কলকাতা দলের পক্ষে দুটি



রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মোহনবাগানের অধিনায়ক জার্শেল সিং



চুন্নাত নিজামী মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন

সেকুরী হয় এবং সেকুরী করার গৌরব অর্জন করেন সুরীর গাঙ্গুলী এবং পি দাশগুপ্ত। সুরীর ব্যক্তিগত ১০৪ রানে ছিলেন অপরাধিত এবং পি দাশগুপ্ত ১১০ রানে অপরাধিত। ডাক্তার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত রান হল দেব মুখার্জীর ৬৭ রান, সুরত গুহর ৬২ রান এবং অরর রায়ের ৪৫ রান।

দ্বিতীয় খেলায় কলকাতা উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখীন হন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৫৬ রানে। খোঁসী ২৬ রানে ৪ উইকেট সংগ্রহ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ২০৪ রান সংগ্রহ করার পর সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই খেলাতেও ডাক্তার গুপ্ত ব্যক্তিগত ৫৫ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রবীন মুখার্জী সংগ্রহ করেন ৩৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খেলার অবশিষ্ট সময়ে ৮২ রানে এক উইকেট সংগ্রহ করার ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী হয়ে কলকাতা ফাইনালে পৌছয়।

ফাইনালে সেই দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী সাক্ষাৎ, কলকাতা এবং যাদবপুরের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু

করে। কলকাতা দলের পক্ষে একটি সেকুরী হয় এই খেলায়, সেকুরী করেন ডাক্তার গুপ্ত। ডাক্তারের ব্যক্তিগত রান হয় ১০৩ এবং ডাক্তারের খেলা নতাই উপভোগ্য হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত রান হল দেব মুখার্জীর ৬৭ রান, সুরত গুহর ৬২ রান এবং অরর রায়ের ৪৫ রান।

যাদবপুর দল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে কিন্তু ১২৬ রানের বেশি সংগ্রহ করতে না পারার ফলে ফলো আন্সের সম্মুখীন হয়। সুরত গুহ এই ইনিংসে সংগ্রহ করেন ৫৪ রানে ৫টি উইকেট এবং সুপ্রকাশ সোম দখল করেন ৪টি উইকেট। যাদবপুর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২১০ সংগ্রহ করার পর খেলা শেষ হয়। যাদবপুরের প্রবন্ধ গুহঠাকুরতা সেকুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন—তার ব্যক্তিগত রান ছিল ১১০। কলকাতার পক্ষে টি জে ব্যানার্জী ৪টি উইকেট এবং সুপ্রকাশ সোম ৩টি উইকেট দখল করেন।

দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতায় পরবর্তী খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, যাদের পক্ষে আর্ডেন টেস্ট খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর।

অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয়

ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে সবই সহজ। রাইচ সিংহ অবলীলাক্রমে তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে ধরাধারী করলেন। একটি শ্যাটে এগিয়ে থাকা সহজ কথা নয়, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার স্বদেশে—ইংলও যখন অস্ট্রেলিয়ার পদার্পণ করল, তখন তাদের জিতবার আশা বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে ঠিক করলেন, —অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যে পীচ এবং ইংলওর ভাগ্যে এক। কিন্তু ক্রিকেট খেলা বাঁধাধরা হিসাবকে বানচাল করতে ওস্তাদ। এক্ষেত্রেও তার বাতিক্রম হল না।

অস্ট্রেলিয়ার এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, তাদের অধিনায়ক ববি সিম্পসনের অভাব, তিনি অস্বস্থ হয়ে পড়লেন এবং অধিনায়কত্বের ভার পড়ল ব্যাটান বুথের ওপর। নতুন অধিনায়ক দলের মধ্যে প্রাণস্ফার করতে পারলেন না। ডাক্তারের মুখে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় নিজের অশোগাভা প্রমাণ করলেন।

টসে জিতে ইংলও আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে অস্ট্রেলিয়ার বোলিংকে নাভোহাল করে দিল। দু-দুটো সেকুরী করলেন—বারবার ১৮৫, এডরিচ ১০৩। দলের রান উঠল ৪৮৮। এবার অস্ট্রেলিয়ার পাল। ২২১ রানে তাদের প্রথম ইনিংস বতম। বৃষ্টি ৬৩ রানে ৫টি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে

সাপ্তাহিক বসুমতী

জ্যাকব বাগিয়ে দিলেন। মাইক সিদ্ধ ফলো অনের জুযোগ নিলেন। ২৬৭ রান পিছিয়ে থেকে নিজীব হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। পিচের অবস্থা তখন নিদারুণ। খেলার ধরণ দেখে মনে হল যে, তাদের পরাজয় এড়াবার দূততার একান্ত অভাব। ভাঙা মন ও ভাঙা মাঠের জুযোগ নিয়ে মাইক সিদ্ধ অস্ট্রেলিয়াকে এক ইনিংস ৯৩ রানে হারিয়ে দিলেন। এ ধরণের পরাজয়ের আশ্বাদ স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে বহু দিন গ্রহণ করতে হয় নি।

আগামী ২৯শে জানুয়ারী এডিনেডে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট খেলা। অধিনায়ক ববি সিম্পসন বঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তৃতীয় টেস্টের ক্রিক পূর্বে। চতুর্থ টেস্টে তাঁর অংশ গ্রহণ অনিশ্চিত। হাই হোক ইংলণ্ড দলপতি মাইক



গুরুত গুরু

পেশাদার গ্রহণের প্রশ্নকে বিনেচনা করতে পারেন। এর পূর্বে নয়।

ভারতীয় টেনিসের পরলা নথর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেনিসের আগের অবতীর্ণ হবেন না। হাতের কব্জীর আঘাতের জন্য তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর নাম প্রত্যাহার করেন। কলকাতার উডবার্ন পার্কে এশীয় লন টেনিসের ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জীর কাছে পরাজয়ের পর কৃষ্ণ এই দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে বিরত থাকলেন।

এবারের জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান ব্যাঙ্কালোরে পূর্ব নির্ধারিত দিন অনুসারে ১৯শে জানুয়ারী শুরু হচ্ছে। আমাদের বঙ্গত প্রধান-

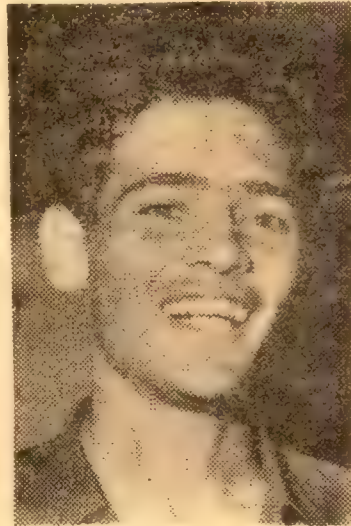


চাকর গুরুত

সিদ্ধ তৃতীয় টেস্টের বিজয় গোরবের স্ববাদ গ্যাম্পেনে যেন রিভোর হয়ে না থাকেন। কারণ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলবার জন্য অস্ট্রেলিয়া মরণকামড় দেবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এ্যাসেসজের প্যাসেজ বুক করতে হলে মাইক সিদ্ধের দলকে কিউ-এ পাড়িয়ে প্রচণ্ড লড়াই করতে হবে। তবেই মিলবে আকর্ষিত টিকিট।

সমাচার দর্পণ

অপেশাদার টেনিস জগৎ এবার দৃষ্টি দিয়েছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুজন অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়ের দিকে। একজন হলেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা—অন্যজন অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলে। রোজওয়াল সান্তানার সামনে তুলে ধরেছেন মোটা টাকার লোভনীয় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সান্তানা বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের উইম্বলডেন এবং ডেভিস কাপের খেলার পর



অম্বর রায়

মন্ত্রী শ্রীমানবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জাপনের উদ্দেশ্যে এবার কোন উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে না।

পাঞ্জাব রাজ্য সাইক্লিং এ্যাসোসিয়েশনের মহাসভাপতি শ্রীহরবন্স সিং এবং সম্পাদক শ্রী জি এম চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ওই এ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা নাকি একটি সভার সভাপতির প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং তাঁকে মারধোর করেন।

মন্ত্রী টুফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মূল খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে নক আউট পর্যায়ে আগামী ২৮শে জানুয়ারী থেকে।



দেব মুখার্জী

বোম্বাইয়ে বাংলা দল বোম্বাইয়ের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাংলা এবং বোম্বাইয়ের খেলা শুরু হবে আগামী ২৮শে জানুয়ারী।

লণ্ডন স্কুল দলের সফরে প্রথম জয়লাভ করার পৌত্তাগ্য ঘটে মাদ্রাজ স্কুল দলের বিপক্ষে মাদ্রাজে। লণ্ডন স্কুল দল মাদ্রাজ স্কুল দলকে পরাজিত করে এক ইনিংস ৭৮ রানের ব্যবধানে।

মোহনবাগানের ঋণাত্মক গোলরক্ষক কমল সরকার প্রমাণিত করলেন যে, তিনি একজন ভাল ক্রিকেটারও ঘটে। মূলত কমল সরকারের দুর্ধর্ষ বোলিংয়ের ফলেই দ্বিতীয় ডিভিশন দল স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউশনের পক্ষে প্রথম ডিভিশনের পুলিশ ক্লাবকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। কমল সরকার মাত্র ২১ রানে দখল করেন ৫টি উইকেট।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১১৫
আজকের মানব	...	২১১৬
সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ ফৌজের তাৎপর্য—প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত	...	২১১৭
অগ্নিবর্গের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২১২০
ভারতদর্শন	...	২১২৭
জাতজাতিক	...	২১৩০
উপাছায়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২১৩৪
সুভাষচন্দ্র	— অমল্য সেন	২১৩৬
দুই দেশ (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১৩৮
বঙ্গদর্শন	...	২১৩৯
বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গ	— ভবানী মল্লোপাধ্যায়	২১৪৩

আত্মজীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মূল্য—দুই টাকা

“এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন”—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কথী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩।

মোহন মেলা

শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথাশিল্পীর
মন-সংগীত-সঙ্গার ছাড়াও গল্প ভরণ।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির ঘিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঁড়র মাথার চোখের জল, তুলসী তুল, মূর্গা চাঁচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটোর বগলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাড়ুর গল্প, ইঁদুরের কীটিকাহিনী, বীজেরা মৌলিচকড়ি।

ছড়া—হট্টমালার বজ্রবাড়ী, হোহোহো বুঝে, পালোয়ান প্যালায়াম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা স্রাবের ব্যায়াম, হাববাবুর মনের কথা, আদি কালের বুদ্ধি বড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুবর্ষ রায় কর্তৃক
অঙ্কিত।

উপহার দিবার মত বই।

হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুষা

২।

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত পুথি—পাণ্ডুরকেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের

জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ব্যস্ত-
প্রতিঘাতময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্ত পর্যন্ত আত্মক
ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—
লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক
সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপরিণতি
হইয়া বস্তু হইতে চান ত সঙ্গর লাল
লাজপৎ রায়ের জীবনী পাঠে উদ্বীপিত
হউন—বদেশমঙ্গলযজ্ঞে আত্মহতীর জল
আদর্শ দেখিয়া সম্বোধিত হইবেন।

মূল্য—।০ আনা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মানবেন্দ্রনাথ রায়	— গৌরীপদ ভট্টাচার্য	২১৪৫
ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমার আঁড়জতা	— হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৪৮
দায়ক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মদ্বোপাধ্যায়	২১৫১
অপরূপ নেহারল ওকলামোনা ও টেন্নাল	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	২১৫৫
সমাজতন্ত্রী সুভাষচন্দ্র	— নির্মল বসু	২১৫৮
আজন্ম সৈনিক	— সুভাষ সমাজদার	২১৬০
দিন গুণি একটি পদধনীর (কবিতা)	— অপরাজিতা গোস্বামী	২১৬৫
রঙ্গজগৎ	— ...	২১৬৬
রঙ্গমঞ্চ—ওমেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২১৬৯
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২১৭৩

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের প্রসঙ্গ আলোচ্য। শাসক শাস্ত্রদায়ের দ্বারা নির্ধ্যাতিত বাস্তব্য মুকুন্দরাম গ্রন্থ ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কবি—ব্যক্তির মুখে কি করিয়া সর্বজনের মুখে হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। সুবিশুদ্ধ ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বিভিন্নতায় লিখিত), ৬। বিতৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬ষ্ঠাংশ রচনা ৫৩০ পৃঃ—৩

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের বাহিনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবলিনী—ইংরেজ ধরে সে গেছিল—

গুরগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—
নীরকাশের বসনদে থাক, তাঁর সহায় হয়ে

বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

নীরকাশের—পাপিহা এই রাজ্য ইংরেজের
সের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
ভাড়াতে হবে—

অভিনব নকশরণ—মূল্য: দুই টাকা।



৭০ বর্ষ : ৫৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১০ই জানু, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 27th Jan., 1966

আমাদের প্রতিশ্রুতি

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতেতিহাসের এক পূর্ণদিন। এই দিবসের সাংবিধানিক মর্মাদা সবার উদ্দেশ্য। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিবস। এই দিনটি শোষণ, বীর্ষ, ভাষার প্রতীকরূপে জনচিত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই দুই দিবসে জনগণের স্বতন্ত্র আনন্দ কিভাবে উদ্বেলিত হবে ওঠে, তা প্রতি বছরই লক্ষ্য করা গেছে এবং সেই আনন্দের অংশীদার হয়ে ভারত-কল্যাণের স্বার্থে আমরা আত্মনিয়োগ করতে একযোগে উদ্বেগ হয়েছি।

এই তো সেদিন অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী কলকাতায় এসে উন্মোচন করে গেলেন নেতাজীর মূর্তির। সেই সভা-চিত্র অবিনশ্বর। তেমনি আর এক চিত্র, যা পৃথিবীর ইতিহাসে শব্দ উল্লেখযোগ্য নয়, নবতম। সেই ঘটনা সূচিত হল ভাসখন্দে। সেই ঘটনার প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের শান্তির জন্যে শেষ স্বাক্ষর দিয়ে বিদায় নিলেন শাস্ত্রীজী।

তারপর ভারতের এই কঠিন সময়ে যিনি রাষ্ট্রের হাল ধরলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনপর্বও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। একদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীমোরারজী দেশাই, আর একদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। গণতন্ত্রসম্মত নির্বাচন-শেষে বিপুল ভোটের অধিকারী হয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। যৌথ নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি লাভ করেছেন। এই যৌথ নেতৃত্বের ভার গ্রহণ যতই কঠিন হোক না কেন, যুবশক্তির অসাধারণ প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী সংশয়হীন ও বলিষ্ঠ। তেমনি শ্রীমোরারজী দেশাই-এর এক নেতৃত্ব প্রাপ্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোট অনুলুপ্ত নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয় ভারতের যুবশক্তির জয়—যে যুবশক্তি স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের যে কোন প্রয়োজনে আত্মদানে উদ্বেগ। এই যুবশক্তির মুখেই যুগান্তরের জয় ঘোষিত

হয়। তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বহুক্ষেত্রে এই 'যুবগোষ্ঠী' আজ দিশাহারা। যদিও তারা দুর্লভ কোন বস্তু কামনা করে না, তারা চায় রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দুমুঠো অমের পরিবর্তে দেশসেবার অধিকার। আমরা মনে করি, বেকার যুবরীকরণ, প্রতিভার বখাব শ্রীকৃতি প্রকৃতি ন্যায্য অধিকারদানের মাধ্যমে পরিণত যুবশক্তিকে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যুবশক্তির সামগ্রিক রূপ লক্ষ্য করে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে তাদের সহায়তা দান করুন—এই আমাদের কামনা। প্রয়োজন হলে, সংবত-পরায়ণ যুবশক্তিকে মাঠে, মরদানে, বীক্ষণাগারে, বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, সাহিত্যে, শিল্পে কিভাবে আত্মনিয়োগের সুযোগ দান করা যেতে পারে—সেকথা বিবেচনা করুন।

অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আজ সর্বপ্রথমেই যে বিষয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দান প্রয়োজন, তা হচ্ছে খাদ্য। আমাদের দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভর হতে পারে নি। তা না হওয়ার কারণ যথেষ্ট। কিন্তু আত্মনির্ভর হওয়া অসম্ভব, একথাও কেউ বলেন নি। সুতরাং বহুদেশগুলির কাছে সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হলেও, খাদ্যে স্বাবলম্বিতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শাস্ত্রীজীর 'জয় কিষণ' ধ্বনিটি তাঁর অবতমানে হিমালয় থেকে কুমারিকাণ্ঠি বার বার ধ্বনিত হোক। সেই সূত্রে এগিয়ে চলুক কাজ। একমাত্র এই কাজের মাধ্যমেই আমরা শাস্ত্রীজীকে অন্তরে বরণ করে নিতে সক্ষম হব। খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতার দ্বারাই শাস্ত্রীজীর স্মৃতিকে ভারত জনগণচিত্রে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রধানতম উপায়।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর করণীয় প্রধান কাজের বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি জনগণের বাটার পক্ষে ন্যায্য ও উপযুক্ত দান ও সমান সুযোগদান সম্পর্কে সজাগ থাকবেন।

শ্রীমতী গান্ধীর এই বক্তব্যে পিতার আদর্শই প্রতিফলিত। শ্রীনেহরু জনচিত্রে স্বাধীন আসন লাভ করেছেন। গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তিনি ছিলেন সর্বসম্পন্ন। তবু সেই মহৎ কাজে বহুদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। বরং বলা চলে জনগণকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করে দিয়ে রাষ্ট্রের বিনিয়োগকে দৃষ্টি করারই মার্গক বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। ভারতের যুবশক্তির কল্যাণময়ী প্রতিনিধিরূপে সেই বিনিয়োগে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করে তুলুন—যাতে দরিদ্র আরও দরিদ্র না হয়, ধনী না হয় আরও ধনী।

রাস্তাভাষা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী মতামত আমাদের অজানা নেই। প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভার আনিচ্ছুক অন্য ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে। সুতরাং তথাকথিত রাস্তাভাষার খবরদারীতে ভীত হবার কোনও কারণই থাকল না।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বাধিক দৃষ্টিমান আজ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রয়োজন হলেও বৈদেশিক ব্যাপারেও সতর্ক পদক্ষেপ চাই। অবশ্য পিতার সাহচর্যলাভে ধন্য শ্রীমতী ইন্দিরার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এইসব কারণে আমরা একথাও বলতে পারি যে, শ্রীমতী ইন্দিরার নেতৃত্বে দেশ ও দেশের কল্যাণ অবশ্যস্বার্থী। আমরা তাকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বাবতীয় কল্যাণকর কার্যে আমাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দান করছি।

সম্পাদিকা

আজকের মাতৃ

ভারতের আকাশে আজ নতুন সূর্য, ভারতের ইতিহাসের আজ নতুন পথ পরিভ্রম। সে নতুন সূর্য, ইতিহাসের সে নতুন নায়ক। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা ছাড়া আর কে হতে পারেন?

যেদিন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন ইন্দিরা নতুন সূচনা করলেন তিনি সেদিনই।

ইন্দিরার কংগ্রেসী পিতা মনে রাখলে অবশ্য আজকের ঘটনায় বিস্ময়ের কোন অবকাশ থাকে না, তাঁর শিষ্য শিষ্য, প্রতিটি ধর্মনীতিতে যে রয়েছে প্রগতি ও তারুণ্যের প্রবাহ। উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি যেন তা পিতামহ মতিলাল নেহরু এবং জওহরলালের কাছে তা লাভ করেছেন।

ইন্দিরা যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতের ইতিহাস এক নতুন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করছে। ১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বরের পূর্ব দিনে পৃথিবীতে এলেন ইন্দিরা, অসার মটের চেমসফোর্ড প্রান্তরের বিরুদ্ধে ভারত তখন অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে তৈরি হচ্ছে। বাবা জওহরলাল কাঁপিয়ে পড়লেন সে-আন্দোলনে, আর ব্রিটিশরাজ যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল চার বছরের কঠোর কারাবাসের জন্যে তখন ডাগর ডাগর চোখ কুটি মেলে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

এর পরে, অনিবার্যভাবেই সংগঠন নিয়ে জড়িয়ে ১২ বছরের কিশোরী ইন্দিরা। সারা ভারত জুড়ে তখন চলেছে আইন অমান্য আন্দোলন।

নেতারা প্রায় সবাই কারাগারে নীকন্তু হলেন, আত্মগোপন করতে হলো অনেককে। জেদেই সঙ্গে বোম্বায়ে স্থাপনের জন্যে, আন্দোলনকে সাফল্যের পথে আর এক ধাপ নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে খানার সেনা গঠন করলেন। উত্তরকালে বোম্বাই এ-ব্রিগেডের সদস্য সংকীর্ণ দাঁড়িয়েছিল ৬০ হাজারে, সেদিনই ইন্দিরার সাংগঠনিক প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

ধর্মীর দুলালী হয়েও নেহরু-ভনয়া ইন্দিরা বিলাস-বাসনে গা ভাসাতে পারেন নি; গভীর রাজনৈতিক বোধের ফলে তিনি যত্নে সেপোজিলেন যে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন না হওয়া পর্যন্ত আরাম-বিলাসের অবকাশ নেই। তিনি আরো জানতেন দেশের ৯০ ভাগ লোকই গরীব, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। দেশকে বিদেশীর শাসনমুখে করতে হলে তাই দেশের লোকের চেতনাবোধ আনতে হবে। নারী-সমাজ না জাগলে দেশের ও সমাজের প্রকৃত মতি যে হতে পারে না এ-উপলব্ধি আসতে ইন্দিরার দোর হয় নি। আর হয় নি বলেই

তিনি কোমরে আচল বেঁধে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন কর্মক্ষেত্রে।

গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে ইন্দিরা গেলেন পুণার হরিজনদের বস্ত্রীতে বস্ত্রীতে, সেবা করলেন অনাথ শিশুদেরও। শিশু-মঙ্গল ও নারীকল্যাণের কাজে ইন্দিরার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অফুরন্ত, সেই সময় থেকেই ইন্দিরা নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন অগণিত ভারতবাসীর সেবার আত্মনিয়োগের জন্যে।

সুইজারল্যান্ড ও অক্সফোর্ডের সোমার-ভিল কলেজে ইন্দিরার শিক্ষালাভ। ইংল্যান্ডেই ইন্দিরা প্রথম র্যাডিক্যাল ভাবধারার প্রতি অকৃত্রিম হন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রচলিত ইন্দিরার জীবনকে নতুনভাবে



শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

আলোকিত করেছে। রাজনৈতিক কারণে যখন পুণালিশের আবির্ভাবে যখন বাড়ির শান্তি বিঘ্নিত তখন কাঁপুরুষের সান্নিধ্যই ইন্দিরাকে সত্যিকারের শান্তির সন্ধান দিতে পেরেছিল।

একুশ বছর বয়সে ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী প্রচারণার নেমে পড়েন ১৯৩৭ সালে। এলাহাবাদের নারীসমাজে তখন এই এক ফোঁটা ইন্দিরা গভীর আত্মবিশ্বাস ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪২ সালে ইন্দিরার বিবাহ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর পরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের অপসারণে স্বামীকে সন্তোষ প্রসন্ন হন।

ইন্দিরার কর্মপ্রতিভার স্বীকৃতি মিলতে বেশি হয় নি। তিনি কংগ্রেস জাতীয় কমিটির সদস্য, কংগ্রেসের মহিলা শাখার চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের সদস্য, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের এবং এ-আই-সি-সি যুব শাখার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তিনি পৌরোহিত্য করেন। তিনি যে স্বল্পকাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল।

তাছাড়া ইন্দিরা কয়েক ডজন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িতও রয়েছেন। অনাথ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, কমলা নেহরু গ্রামা নারী ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু আমোদ-প্রমোদ সংস্থা, ভারতীয় শিশু মঙ্গল পরিষদ ও আন্তর্জাতিক শিশু-মঙ্গল পরিষদ তাদের মধ্যে কয়েকটি। এ ছাড়াও ইউনেস্কো কার্যকরী বোর্ডের তিনি সদস্য এবং জাতীয় সংসদে কমিটির চেয়ারম্যান।

প্রিন্সের মৃত্যুর পর শ্রীমতী ইন্দিরাকে শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব হয় ১৯৬৪ সালে ভাষা ও বেতারমন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু সৈদিক দিয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অল্প মনে হলেও প্রায়টিকাল বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে ইন্দিরার সম্যক মেলা ভার। বরও বলা যায়, ইন্দিরা তরুণ হলেও অভিজ্ঞতায় তিনি প্রবীণ। শিতার সঙ্গে ইন্দিরা পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তেই সফর করেছেন, অর্জন করেছেন প্রচুর মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

সিংহলের শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দর-নারায়ণের পর শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ, তার প্রধানমন্ত্রীর গদীলাভ বিশ্বের নারী সমাজের পক্ষে আনন্দ ও গর্বের বস্তু। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা শ্রীমতী গান্ধীকে আজ গভীর সম্মান মূল্যবোধ হতে হবে। অর্থ-নৈতিক সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, ভাষা-সমস্যা, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাসখন্দ হুজির কার্যকরী করার দায়িত্ব। কিন্তু সারা বিশ্বের আশীর্বাদ মরি ওপর বর্ষিত, যিনি গান্ধী-প্যাটেল-নেহরুর পদতলে বসে রাজনৈতিক পাঠ নিয়েছেন, যিনি আশিশব জনসেবা করে আসছেন, 'খরার বুকে প্রাণ ঢেলেছেন' তাঁর পক্ষে কিছই শঙ্ক হবে না। শেষের দিকে জওহরলালকে বহু বিষয়ে ইন্দিরা পরামর্শ দিতেন, বুদ্ধি বাংলা দিতেন, আজ পিতার আসনে বসে সে কাজগুলো করা মোটেই দুরূহ হবে না। জননেত্রী সরোজিনী নাইডু ইন্দিরার সম্পর্কে যে কথা পাঁচ দশক আগে বলেছিলেন: 'The new star of India, ভারতের নতুন আত্মা' হিসেবে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন ইন্দিরা তাঁর মর্যাদা রাখবেন, তাঁর ওপর ভারতের জনগণের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ যৌথের আন্দোলন

অমোদবন্ধন জনগণ

২০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক দিবস। সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করবার জন্য ও তাঁকে প্রজ্ঞা নিবেদন করবার জন্য ঐ দিনটিতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নবনারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসংখ্য জনসভায় ও মিছিলে সমবেত হয়ে থাকেন। ঐ দিনটি বাঙালীর মনে একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা এনে দেয়, তারা সজাগ হয়ে ওঠে।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই অসাধারণ ভক্তিপ্রজ্ঞা ও বিশ্বাস নিশ্চয়ই অহেতুক নয়; নিশ্চয়ই তার পশ্চাতে একটা গভীর কারণ অন্তর্নিহিত রয়েছে। খুবই দৃষ্টিভঙ্গি বিষয় যে, সুভাষচন্দ্র সর্বদা যত পুস্তক-পুস্তিকা-প্রবন্ধ লেখা হয়েছে—তার সংখ্যা কম নয়—ভাবপ্রবণতাই তাতে প্রধানালাভ করেছে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক মানদণ্ড দিয়ে তার চিন্তা ও কর্মের বিশেষ কোনো মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয় নি।

সুভাষচন্দ্রের অমরকীর্তি আজাদহিন্দ ফৌজ। আজাদহিন্দ ফৌজ একটা বিজয় ঘটনা নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাস্তবিকপক্ষে আজাদহিন্দ ফৌজ ছিল ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি।

প্রথম থেকেই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে দুইটি বিপরীত ধারা সুস্পষ্ট-রূপেই দেখা দিয়েছিল। প্রথম ধারাটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আপোহীন সংগ্রাম—সে সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের প্রথম দিকেই বাংলা ও বিহারে ঘটেছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—যা প্রকৃতপক্ষে ছিল একটা ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ। সেই থেকে শুরু করে ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খুব কম করে ২০টি গণ-বিদ্রোহ ঘটেছিল। এইসব বিদ্রোহগুলি ছিল স্থানীয়, এক-একটা বিশিষ্ট এলাকার সীমাবদ্ধ।

তারপরই ঘটল ১৮৫৭ সালে ভারতের একটা বিরাট অংশে জাতীয় মহাবিদ্রোহ। এই মহাবিদ্রোহের একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য হল এই যে, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম যে জনসাধারণ সচেতনভাবে নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে একটা সরকারকে ধ্বংস করে দিয়ে সেই স্থানে নিজেদের একটা সরকার স্থাপন করতে চেয়েছিল। ভারতের রাষ্ট্রগঠনে ভারতীয় সাধারণ মানুষের এই প্রথম প্রচেষ্টা।

ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারাটি হল আপোহ-আলোচনার মধ্য

দিয়ে ক্ষমতা লাভ করা। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই এই ধারাটি প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৯১৯ সালের পর থেকে জনসাধারণ কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগল ও কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তুলল। স্বভাবতই জনসাধারণের দাবি-দাওয়া নিয়ে বামপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যে প্রচলিত বিস্তার করতে লাগল। ক্রমশ বামপন্থীরা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, তারা পরপর দুই বৎসর ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে হরিপুত্রা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করতে সক্ষম হল।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম যে সভা-

পতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। তখন পর্যন্ত সভাপতি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমেই হয়েছে। পটুভ সীতারামাইয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট হেরে যাবার পর গান্ধীজী বলেছিলেন—এ পরাজয় আমারই পরাজয়। কিন্তু এই সময়ে জওহরলাল “নিরপেক্ষ” হয়ে গেলেন ও সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র একাবাক থাকলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হল। সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাব্যবস্থা শুরু হল।

বিশ্বব্যবস্থা সুভাষচন্দ্রের নিকট একটা প্রচণ্ড



আজাদ হিন্দ ফৌজের মূখপত্রের প্রচ্ছদপট

মুসোলিনী নিয়ে এল। কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী। ভারতে ইংরেজ শাসন খুঁস করার জন্য স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবাসীকে যে একদিন সংগ্রামে নামতে হবে একথা তিনি কখনোই ভুলে যান নি। তিনি একথাও ভালভাবে জানতেন যে, "সিপাহী" বিদ্রোহের ঐতিহ্য ভারতের জনসাধারণও সিপাহীদের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। সেই কারণেই ভারতের বিপ্লবী-পন্থীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলতেন। জা. ছাড়া, যেহেতু সুভাষচন্দ্র আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন তাঁর মন থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহ্য কেনোদিনই মুছে যায় নি। উপরন্তু, তিনি একথাও ভালভাবেই জানতেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেসব ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতে ও ভারতের বাইরে সিপাহীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তাতে তাঁরা বিদ্রোহের প্রচেষ্টার ব্যপ্তে সাড়া পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধন বাদল তখন সুভাষচন্দ্র নজবন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এইভাবে পদ্ম হয়ে বসে থাকার মতো লোক তিনি ছিলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে, বিশেষ করে জার্মানী থেকে যেভাবে বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সেইরূপ সুযোগ এসে উপস্থিত হল।

কিন্তু এই দুইটি যুদ্ধের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল নিছক একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—দুই পক্ষই ছিল সমান সাম্রাজ্যবাদী; কোনো মহৎ আদর্শের স্থান এখানে ছিল না, উভয় পক্ষই সাম্রাজ্য বিস্তার, পরদেশ জয়, বিদেশী বাজার দখলের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এই যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের পক্ষে "আমার শত্রু শত্রু, আমার বন্ধু"—the enemy of my enemy is my friend—এই পরাকর্ষন নীতি অনুসরণ করা সহজ ছিল। সুতরাং সেই সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষে ইংরেজের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনো নৈতিক বাধা ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এই যুদ্ধ ছিল মূলত, সামাগ্রিকভাবে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাশীল উগ্র সাম্রাজ্যবাদী জার্মানি, জাপান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্ট শক্তিশালী বিরুদ্ধে বর্জ্যগণগণতান্ত্রিক দেশগুলির ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত-এর লড়াই। এই যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলিই ছিল যুদ্ধের প্ররোচক ও প্রথম আক্রমণকারী (Aggressors)। এইরূপ পরিস্থিতি ভারতীয় বিপ্লবীদের নিকট একটা ভীষণ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করল। যে-জার্মানী খোলাখুলিভাবে চরম জাতি-বিষয়ী, জার্মানি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সমগ্র দুনিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তারে যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, কবচবর্ষকে সে তার দখলে আনতে

চায়, সেই দানবীয় হিটলার—জার্মানীর সঙ্গে জাতীয় স্বাভাবিক ও স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বিপ্লবীরা কি করে যোগ দেবেন?

পক্ষান্তরে একথাটাও উপেক্ষা করা চলে না যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পৃক্ততাও কোনোপ্রকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেটা নিছক একটা প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক। স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের এই অপূর্ব সুযোগের প্রশ্নটা ভারতীয় বিপ্লবীদের নিকট ধামাচাপা দেওয়া খুব সহজ নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব। প্রমিতপ্রণীর এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিদ্বন্দ্বীতাশীলদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য; সোভিয়েত ইউনিয়নই তখন সমগ্র দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণের ও মুক্তিকামী পরাধীন দেশগুলির একমাত্র অকুণ্ঠিত বন্ধু ও সমর্থক। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মবার্ষিকী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই প্রমিত-রাষ্ট্রকে খুঁস করা। তাই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে সোভিয়েতকে রক্ষা করা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মুসোলিনির আবির্ভাব। আক্রমণে পশ্চিমী শক্তিগুলি কোনো বাধাই দিল না। স্প্যানিস গণতন্ত্রকে তারা হত্যা করল জাপান বন্ধন চীন আক্রমণ করল তখনও তারা কোনো বাধা দিল না। সবশেষে সোভিয়েত-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল ১৯৩৯ সালে মিউনিক প্যাক্টে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে গেল এবং সোভিয়েতকে একেবারে কোণঠাসা করে দিল। এই ভয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধজোট ভাঙবার জন্য স্টালিনকে বাধ্য হয়ে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করতে হল।

এইরূপ একটা বিভ্রান্তিকর জটিল আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে একটা কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হল। যুদ্ধের এই অপূর্ব সুযোগকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজে লাগাবার জন্য তিনি বন্ধনশরীর হয়ে উঠলেন। অতি দুঃসাহসের সঙ্গে সমস্ত বাধা-বিপদ অগ্রাহ্য করে বৃটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুল্ল্যা পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে কাবুল ও মস্কো হয়ে জার্মানীতে এসে তিনি উপস্থিত হলেন আজাদহিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে।

কিছুকাল পরে হিটলার বিনা কারণে সোভিয়েত-জার্মানি যুদ্ধ-বিরোধী চুক্তি ভঙ্গ করে হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে বসল। তার ফলে দুনিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটল। যুদ্ধের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেই যুদ্ধ

হাচ্ছিল এবং সেই যুদ্ধে ভারতবন্ধু সোভিয়েত ছিল নিরপেক্ষ। এই অবস্থাতা ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে খুবই প্রতিফল। কিন্তু হিটলারের সোভিয়েত-আক্রমণের ফলে স্বভাবতই জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ল। কিন্তু যে পথে তিনি একবার পা বাড়িয়েছেন সেখান থেকে ফিরবার কোনো পথ নেই, তাকে সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তাকে সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে।

তার পর সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আগমন, সেখানে জাপানের সাহায্যে আবার আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি ঘটনা সর্বজন-বিদিত, এই প্রবন্ধে তার পুনরাবর্তি নিষ্প্রয়োজন।

যুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্র বন্ধন বিদেশে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করছিলেন তখন ভারতের অন্যান্য বামপন্থীদলগুলি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারও বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনই আমরা ভালো-তারা বন্য়ার নিজেদের ভাসিয়ে দেই।

ষা ১৯৪২ সালের "বিপ্লব" ঘটতে-ছিল, ষা নিয়ে গর্ব করে থাকেন, তাঁরা কি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির কাজ করেছিলেন, ১৯৪২ সালটাতাই কি বিপ্লবের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল? বিনা প্রস্তুতিতে কি বিপ্লব বা সমাজতন্ত্র এত সহজে ঘটন যায়? তারপর বন্ধন চার বৎসর পরে আই, এন, এ আন্দোলন, ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহ ও বৃটিশ বাহিনীতে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দেবার ফলে বন্ধন সত্য-সত্যই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, বিপ্লব এসে ঘরের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল তখন সেইসব বিপ্লবীরা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা গণ-যুদ্ধের শ্লোগান দিয়েছিলেন। এঁদের সবশেষও প্রশ্ন ওঠে যে গণ-যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁরাই বা কি প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন? যুদ্ধের সময় তাঁরা যেসব কৌশল অবলম্বন করে-ছিলেন তা কি গণ-যুদ্ধের, জনসাধারণের একাবল্ল্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলে-ছিল, তাঁরা কি জনসাধারণকে গণ-যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন? ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহের সময়ই বা সেইসব নেতারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইসব প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ পর্যন্ত তার উত্তর বিশেষ কেউ সম্বধান করেন নি।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও বহু প্রশ্ন আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একেবারেই আলোচিত হয় নি। একদল লোক তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে অন্ধভাবে পূজা করেন, আর বৎসরে একবার করে তাঁর প্রতিমূর্তিতে

সাম্প্রতিক বসুমতী

গলা পারলে দেন এবং ভাবেন যে তান এসে আমাদের সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করে দেবেন। একদল মতলববাজ লোক মাঝে মাঝে মর্টিয়ে দেয় তাঁকে এখানে দেখা গিয়েছে, ওখানে দেখা গিয়েছে, কিংবা অমূলক সাধু-বাবাই তিনি, সংগে সংগে অসংখ্য লোক ছোট্টে উন্মত্ত হয়ে সেই দিকে।

ইঙ্গ-আমেরিকানরা এবং ভারতেও অনেকে সুভাষচন্দ্রকে “কুইসলিং” বলেছিলেন। ইঙ্গ-আমেরিকানদের কথাই বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাদের অপোষহীন শত্রু—সুতরাং তারা যে তাঁকে গলাগালি দেবে ভরত প্রতিবাদ করার কিছু নেই। কিন্তু যেসব ভারতীয় তাঁকে কুইসলিং বলেছিলেন তারা কি এই কথাটির অর্থের খোঁজ নিয়েছিলেন? কুইসলিং ছিল নরওয়ে দেশের একজন বিশিষ্ট নেতা। জার্মান নাগরীরা নব্বয়ে দেশ দখল করলে কুইসলিং তাদের সংগে যোগ দিয়ে যেসব নরওয়েজিয়ান তাদের দেশকে বিদেশীয় হাত থেকে মুক্ত করতে চেষ্টাছিলেন তাঁদের কুইসলিং মনন করতেন। কুইসলিং ছিল বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। সুভাষচন্দ্রের সংগে কুইসলিং-এর সামঞ্জস্যটা কোথায়? সুভাষচন্দ্র কি নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, না বিদেশী শাসনের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে চেষ্টাছিলেন? হতে পারে যে সুভাষচন্দ্র যে বিপ্লবজনক পথ বেছে নিয়েছিলেন তা তাঁদের মতে সঠিক ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক মত-ভেদের জন্য কাউকে বিশ্বাসঘাতক বলতে হবে এটা কি একটা মস্ত বড় অপরাধ নয়?

আরও একদল লোক অছেন যারা সুভাষচন্দ্রকে মার্কসিস্ট বলে ঘাবি করেন। এটা সত্যি কথা যে, তিনি মার্কসবাব থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। কথ্যটা ঠিক, কিন্তু বর্তমানে তা অনেকেরই করে থাকেন। অনেক উদারপন্থীও মার্কসবাদ থেকে অনেক কিছু নেন, কিন্তু তাতে তারা মার্কসবাদী হন না। মার্কসবাদী তাঁরই যারা মার্কসবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।

তা ছাড়া, সুভাষচন্দ্র যে কমিউনিজম ও ফ্যাসীজম-এর সমন্বয়ে (synthesis between Communism and Fascism.) তত্ত্ব দাঁড়ি কবাবার চেষ্টা করেছিলেন তা খুবই হাস্যকর, কেন না এই দুটি হচ্ছে একেবারে বিপরীত জিনিস — ফ্যাসীজম হচ্ছে চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদ, আর কমিউনিজম সাম্রাজ্যবাদ খুবসকারী। তেলে আর জলে যেমন মিশ খায় না, ফ্যাসীজম ও কমিউনিজমের সম্বন্ধও তেমনই।

প্রথমদিকে সুভাষচন্দ্রের যে ফ্যাসীবাদের প্রতি অনেকটা আকর্ষণ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জার্মানী ও ইতালীয় যুবসংগঠন

ও সামরিক চাকর্য্য তাঁর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসোলিনি যখন আবির্ভাব লাভ করল, জাপান চীন দখল করার চেষ্টা করল ও ফ্যাসিস্টরা যখন স্প্যানিস গণতন্ত্র আক্রমণ করল তখন ফ্যাসিবাদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের মোহ অনেকখানি ভেঙে ছিল। মোটকথা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র তাত্ত্বিক ছিলেন না, রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি শিখতেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন অত্যন্ত গতি-শীল ব্যক্তি। একস্থানে তিনি কোনদিনই দাঁড়িয়েছিলেন না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে তিনিও অগ্রসর হতেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা তিনি সিক্সপ্তের রোডিও থেকে জার্মানীর পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালে ২৫শে মে তারিখে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন (এইটেই প্রায় তাঁর শেষ বক্তৃতা) তা থেকে ভালভাবেই বোঝা যায়। তাতে তিনি বলেছিলেন :

“যে সমস্যাটি আজ প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক ঘটনার অনুসরণকারী পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—তা হচ্ছে ভবিষ্যতে ইওরোপ কি-ভাবে চলবে? এই সম্বন্ধে আমার মত খুব পরিষ্কার। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি যে জার্মানীর পরাজয় থেকে শত্রু হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইঙ্গ-আমেরিকানদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ। সমস্ত পৃথিবী জানে যে সোভিয়েতের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ইঙ্গ-আমেরিকানদের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সোভিয়েত সরকার জানে যে জার্মানীর পরাজয়ের সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে সোভিয়েত জনসাধারণের ও তার সামরিক শক্তির অসাধারণ বীরত্ব, ধৈর্য ও আত্মত্যাগ। সুতরাং তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই ইওরোপের পুনর্গঠনের ব্যাপার ইঙ্গ-আমেরিকানদের হাতে ছেড়ে দেবে না।...

“পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর ইওরোপের জন্য জার্মানীর একটা পরিকল্পনা ছিল। আজ সে পরাজিত।

“যুদ্ধোত্তর ইওরোপের জন্য কেবলমাত্র আর একটি রাষ্ট্রের একটা পরিকল্পনা আছে—সে রাষ্ট্র হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন। ...আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তার সরল “আমেরিকার শতাব্দী” স্থাপনের জন্য যতই উদগ্রীব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোক না কেন, সে কখনই ইওরোপে তার আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবে না। তা ছাড়া, ইঙ্গ-আমেরিকানরা, যারা সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী কখনও পুনর্গঠনের

এমন পরিকল্পনা দিতে পারবে না যা ইওরোপের জাতিগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

“সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে সোভিয়েত পরিকল্পনা ছাড়া ইওরোপেব জন্য আর কোনো পরিকল্পনা নেই—বিশেষ করে সে পরিকল্পনা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে সফলতালাভ কবেছে। একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করাই আজ জার্মান জাতির পক্ষে প্রধান কর্তব্য—সে রাষ্ট্র হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু।

“মার্সাল স্ট্যালিনই হচ্ছেন আজকের দুনিয়ার একমাত্র ব্যক্তি যার ওপর সমস্ত ইওরোপের ভাগ্য নির্ভর করছে। সুতরাং সমস্ত পৃথিবী, বিশেষ করে ইওরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির প্রতি আগ্রহের সংগে দৃষ্টি বোঝে চলবে।” (Testament of Netaji, PP. 79-81)

সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনটি সম্বন্ধে একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই আবেদনটি শত্রু জার্মানদের প্রতিই নয়, দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষেরই নিকট ছিল তাঁর এই আবেদন, যে সময়ে সুভাষচন্দ্রই আবেদন করেছিলেন, তখন কেবলমাত্র জার্মানীই পতন হয়েছিল। জাপানের পতন হয়েছিল আরও কয়েক মাস পরে। তখনও সুভাষচন্দ্রকে জাপানের সংগেই চলতে হচ্ছিল, সুতরাং তিনি সমগ্র এশিয়ার কাছে আবেদন করতে পাবেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ আবেদনে বেসব কথা বলেছিলেন তা যে জাপানী নীতির বিরুদ্ধেই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সুভাষচন্দ্রের উক্তি ও তাঁর কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বর্তমান ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ণয়ের জন্য ঐতিহাসিক বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী
চলচ্চিত্রের সচিত্র কাহিনী এবং
সত্যজিৎ রায়ের গল্প নিয়ে বেরুলো
চতুর্থ বার্ষিক বিশেষ জয়ন্তী সংখ্যা

আশ্চর্য!

জানুয়ারী ১৯৬৬ দাম ১,
বার্ষিক চাঁদা সভাক ১,
অ্যালফা-বিটা, বঙ্গ ২৫০৯, কলিকাতা



প্রায় দু'বছর আগে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড দৈনিক ইংরেজী পত্রিকায় (পুরো একটি বছর প্রতি সপ্তাহে এক সূতা জুড়ে) আমি 'Chittagong Hero's Fight for Freedom'— এই শিরোনামের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখেছিলাম। আরম্ভ করেছিলাম ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সকাল বেলায় আশু আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব থেকে; আর শেষ করেছিলাম আমাদের স্বাধীনতার সাজা হয়ে যাওয়ার পর যখন 'Badura' নামে সমুদ্রগামী একটি চুক্তি করা জাহাজে আমাদের পারে বোড়ি ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চলেছিল সুন্দরবনের পথে ফলকাতায়।

এইখানেই কিন্তু চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নয়। মাস্টারদার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আরো দু'টি বছরের মরণজয়ী সংগ্রাম আক্রমণ ও খণ্ডযুদ্ধের যে বিপ্লবী অধ্যায় রচনা হয়েছিল সেই পর্বের শেষ হোল সেই দিন—যে দিন মহান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ শাসকের ফাঁসির রজ্জ্বকে উপহাস করে বিজয়গোরে জয়মালায় সুশোভিত হলেন।

আমার ইংরেজী লেখার মধ্যে এই মূল্যবান পর্বের কিছুই লিপিবদ্ধ করা হয় নি। তা ছাড়া হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ১৯৩৪ সালের ঘটনা থেকে শব্দ করার

জন্য বাদ পড়ে যায় পূর্বের আরও অনেক বছরের চট্টগ্রামের অগ্নিযুগের ইতিহাস—যে ইতিহাসের শীর্ষস্থানে আছে ১৯২৩ সালের 'নাগারখানা' পাহাড়ের যুদ্ধ। এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো বাংলার লাটবাহাদুর Lord Lyton-এর Bengal Ordinance জারী এবং আমাদের ৮৩ জন বিপ্লবী ও সুভাষচন্দ্রের বিনা বিচারে জেলে আটকের সঙ্গে।

আমি মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী দলে যুক্ত থাকার সময় থেকে মাস্টারদার জীবনাবসান পর্যন্ত যে বিপ্লবী-অধ্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম সেই বৈপ্লবিক ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত গদ্যটিকতক পাতা ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যাবার চেষ্টা করবো মাত্র। মনে মনে খুবই আশঙ্কা আছে হয়তো বা যা বলার বা যাদের কথা জানাবার ইচ্ছা আছে তা' নিজের অক্ষমতার জন্য যথাস্থভাবে ব্যস্ত করতে পারবো না। তবু আমার আতি নিকটতম আপনজনেরাই আমাকে এই গুরুদায়িত্ব নিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের দাবি—আমাকে আমার বিপ্লবীস্মৃতি লিখে যেতে হবে। তাদের এই দাবি উপেক্ষা করে তাদের অমর্যাদা করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পরিচালক ও সম্পাদকমণ্ডলীর ভারতের অগ্নিযুগের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেই বীরদের

সংগঠন, বীরবিক্রম ও মৃত্যুবরণের ইতিহাস পরিবেশনের একান্ত আগ্রহ উপলব্ধি করে আমি তাঁদের আহবানে আকৃষ্ট হয়েছি। তাঁদের এইরূপ ইচ্ছা ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েই আমার লেখা আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সাপ্তাহিক বসুমতীতে পরিবেশিত হওয়ার জন্য উৎসাহ বোধ করছি।

কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিপ্লবী সত্ত্ব তাদের কার্যধারার গতি পরিবর্তন ও পরিচালিত করেছে। তাই প্রয়োজন-বোধে লেখার মধ্যে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছি।

ভারতের অগ্নিযুগের এই অধ্যায়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে একটি দিকে আমি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি যাতে এ কাহিনী মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। ভারতের সমকালীন রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা, ভারতের ইংরেজ শাসনের ইতিবৃত্ত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির অবতারণা করে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করে আমার এ কাহিনীকে আমি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কারণ তাতে পাঠকের মন মূল বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা।

আর একটি বিষয় আমার মনে হয়েছে যে, কেবলমাত্র নিছক ঘটনার উল্লেখ করলেই অগ্নিযুগের ইতিহাসের

কথা বলা হয় না। সেই যুগের ইতিহাস এই নয় যে, বিপ্লবী বন্ধুদল হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বোমা পিস্তল দিয়ে কোন-না-কোন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-রাজপুরুষকে হত্যা করেছে।

সক্রিয় বিপ্লবীদের বিদ্রোহ ঘোষণা ও আক্রমণের পেছনে ছিল তাদের মানসিক প্রস্তুতি — অনুরূপ একটি পরিবেশ। কত মা-বোনের স্নেহ-ভালোবাসা ও অশ্রুজল, কতজনের অকুণ্ঠ সাহায্য, সমর্থন ও সমবেদনা—কত আত্মত্যাগ, কত না আশীর্বাদ সঞ্চিত ছিল তাদের সশস্ত্র অভিযানের পেছনে! এইসব বাস্তব চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলা না যায় বিশেষ বিশেষ সংঘর্ষের ঘটনাগুলি—তবে যে অনেক সত্যিকার দরদী বিপ্লবী-জননী, ভগ্নী ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং তাতে বিপ্লবীদের বিজয়ের পেছনে যে উৎসাহ উদ্দীপনা স্নেহ মমতা ও হাসি কান্নার ব্যাপক ইতিহাস রচনা হয়েছে তা' যে অনুস্মোচিত থেকে যাবে। তাই আমি আমার সাধ্যমত চট্টগ্রাম বিদ্রোহের একটি সর্বাস্বক চিত্র দেবার চেষ্টা করবো।

আমার মনে হয় যারা অগ্নিশূন্যের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা যদি কেবল সেই সেই পরিচিত অধ্যায়ের বিবরণ লেখেন তবেই হয়তো ভারতের অগ্নি-যুগের সামগ্রিক ও সর্বাস্বক বিপ্লবী ইতিহাস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। আমি প্রত্যক্ষভাবে যেটুকু অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নিজ সংগঠন মারফৎ যেটুকু জানি ও যা' অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই মধ্যে আমার এই বিপ্লবীস্মৃতি নিবন্ধ।]

আলোর সন্ধান

‘টক্’, ‘টক্’—‘টক্’। দরজায় মৃদু করাঘাত। ঘুম ভেঙে গেল।... মনে পড়ে সৈদিনের কথা!—

তখনো ভোর হয় নি। ঘুম-জাগা পাখির দল বাসায় বসেই তাদের অস্তিত্ব জানাচ্ছে—আমার দরজায় শব্দ হোল ‘টক্’ ‘টক্’, একটু থেমেই আবার ‘টক্’। পরিচিত শব্দ; আগন্তুক আমার সহ-পাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমোদ—ক্রাসের সেরা ছেলেদের একজন। সৈদিন সেই রাস্তামুহুর্তে আমি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে, আজ সকালে যার সঙ্গে পরিচয় হবে আমার, সে আমার জীবনে এক নতুন পথের দরজা খুলে দেবে, যে পথে প্রতি পদক্ষেপে আছে বিপদের সংকেত, জীবন-সংশয়, আর মৃত্যুর প্রতি তুচ্ছতা; আর সেই বন্ধুর রক্তধরা পথের অপরপ্রান্তে রয়েছে উজ্জ্বল আশার আলো—মাছু-

ড়িমর বন্ধনমোচন! সৈদিন স্বপ্নেও কি অনুমান করেছিলাম আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমোদ চৌধুরী আর দশ বছরের মধ্যেই হাসতে হাসতে ফাঁসির দাঁড়ি গলায় পরবে? সৈদিন কে জানতো আমার অন্যতম সহপাঠী ও অকুণ্ঠ বন্ধু গণেশ ঘোষ হবে আমার জীবনের প্রতিটি দিনের সাথী—জয়-পরাজয়, বন্ধন-মুক্তি, আনন্দ-নিরাশা সবকিছু ভাগ করে নেব দু'জনে সমান ভাগে?

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রমোদ। মা-বাবা এবং প্রতিবেশীদের অগোচরে সাবধানে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমার দাদা ও দিদি ছিলেন কাজে আমার সহায়ক। প্রমোদ খবর এনেছে—আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে; জায়গা চিনি দেবে সে। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম তাকে। বাঁধানো রাজপথ ছেড়ে কাঁচা সড়ক—মাঝে মাঝে পায়-চলা পথে মাঠ পেরিয়ে পথের দু'রহু কমিয়ে আনিছি। তবু বেন পথ আর শেষ হয় না। জানি না কি জন্য চলছি,—শুধু জানি প্রশ্ন করলে উত্তর পাবো না—কারণ প্রশ্ন করাটাই নিয়মের ব্যতিক্রম।

চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কণ্-ফুলীর তীরে পাথরঘাটা নামে পল্লী। সেখানে গিয়ে থামলাম আমরা। আঙুল তুলে দেখালো প্রমোদ—নদীর ধারে একটা খড়ের ঘর, ঐ আমার গন্তব্যস্থল। আর কোন কথা না বলে সে চলে গেল।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটি নদীর ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। কুটিরটিতে যেতে হোলে অসমান মাঠ, শুকনো নদমা আর ভাঙাচোরা ইট-পাথরের ওপর দিয়ে এগোতে হবে।

ঘাটে এসে চারিদিকে তাকলাম। সেই দিনের সেই সকালে প্রকৃতিদেবী তার সমস্ত সৌন্দর্য অকুণ্ঠ হাতে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার চোখের সামনে। সূর্য আকাশ লাল হোলে উঠেছে; পূর্বপ্রান্তে সূর্যোদয়ের আভা, নদীতে পড়েছে তার ছায়া। সেই আবীর-গোলা জলের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে কয়েকটি সাম্পান (চট্টগ্রামের বিশেষ ধরনের নৌকা), বড় নৌকার মাঝিরা পাল তুলে মাঝদাঁরায়, যাবার চেষ্টা করছে; দূরে নোঙর করা দু-একটি স্টীমলঞ্চ, তাদের এখনো ঘুম ভাঙে নি। কোন এক সাম্পানের মাঝি দেশীয় সুরে অবোধ্য ভাষায় গান ধরেছে—সে গানের সুরও এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক ছন্দে গাঁথা।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম নীরবে। তারপর রুদ্ধভাবে নদীর বাতাস নিয়ে এগিয়ে চললাম সেই বন্ধুর পথে

কুটিরের উদ্দেশ্যে। কি ভাবছিলাম তখন? হায় রে প্রকৃতির অজস্র সম্পদ। আমার মনের মধ্যে তখন অন্য প্রকৃতির লীলাখেলা চলছে। ভাবছি, আজ নিশ্চয় এরা আমাকে একটা রিভলবার দেখাবে, আর শিখিয়েও দেবে তার গোপন তথ্য—কোন অঙ্গে কেমন করে হস্তস্পর্শ করলে একটা শুধু শব্দ, ব্যস—একজন ইংরেজ রাজপুরুষ খতম।

সেই বয়সে বিপ্লব সম্বন্ধে এর বেশি ধারণা এগায় নি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের আগে ভারতবাসীর কাছে ইংরেজের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র ছিল। অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের হত্যা করে, সরকারী অর্থ এবং সরকার-সাহায্য-পুষ্ট ধনীর অর্থ লুণ্ঠ করে, দেশময় একটা বিভী-ষিকার রাজত্ব সৃষ্টি কবে ইংরেজদের রুঝিয়ে দিতে হবে যে এদেশে তাদের অর্থ এবং প্রাণ কোনটিই নিরাপদ নয়—এটা ই ছিল সে যুগে বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। আমি তখন সবেমাত্র বিপ্লবী বলের সংস্পর্শে এসেছি; বিপ্লব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বয়স তখনও হয় নি, কাজেই একটিমাত্র রিভলবারই আমার কাছে বিপ্লবের সিংহদরজা খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সৈদিন সেই সকালে সূর্যোদয়ের সংগে সংগে কী বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা' আমি জানতাম না। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যের ভাস্কর্য রূপ দেখবার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারণ তার পূর্বে কুটিরে ঢোকা নিষেধ ছিল। ভাবছিলাম এই সূর্যোদয়ের সংগে সংগে আমার জীবনের একমাত্র আশা সফল হবে, আমার হাতে আসবে একটি রিভলবার—আর সেই রিভলবারের গুলীর শব্দে ঘোষিত হবে ইংরেজ শাসনের প্রতিভূ কোনো রাজপুরুষের মৃত্যুদণ্ড। হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি নিজেব কানেই শুনতে পাচ্ছিলাম—আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তাব পবেই—। মূর্খ আমি, সৈদিন কুটির থেকে ফেবার পথেও বৃষ্টিতে পারি নি সত্যিই অজ্ঞানে আমার জীবন-গগনে নব-অরুণোদয় হোল—নবজীবনের মন্থে দীক্ষাব পথে হোল প্রথম পদক্ষেপ।

বিপ্লবী হোতে হোলে কি চাই—? সংকেত মত দবজার ধাক্কা দিতে কুটিরের দরজা খুলে গেল, বৃকের ওপর তিনটে আঙুলে সংকেতটিছ এঁবে দিয়ে বোঝালাম আমি মিত্রপক্ষের লোক। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র খাট, আর একজন মাত্র লোক—তাঁর চেহারা হাবভাব কিছই আমার স্বপ্নে গড়া বিপ্লবী নেতার

অনুরূপ গল্প—একে পাব আমি আগে যাস্তে দীক্ষা। তিনি কিন্তু আমাকে দেখে চিনলেন, বললেন, “ও বড়ো ছি, তুমি অনন্ত। তোমার কথা আমি শুনছি”—তারপর একটু হেসে প্রশংসার সুরে বললেন—“তুমি তো তোমাদের স্কুলের রামমূর্তি!”

এখানে একটু ইতিহাস আছে। ছোটবেলায় বাবা যখন মা-দাদীকে বিপ্লবীদের কাহিনী বলতেন—সুদীপ্তরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতির নানা চমকপ্রদ কাহিনী—তখন তা’ শুন শুন সেরেই বয়সেই নিজেকে ভবিষ্যতের বিপ্লবীরূপে কল্পনা করতাম। বড় হোয়ে স্কুলে ভর্তি হোয়ে সৌভাগ্যবশত প্রমোদ, গণেশ, অফিসরউদ্দীন ও অন্য মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে পেয়েছিলাম। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবন্দুরা সকলেই আমাদের এই উৎসাহী দলটিকে পছন্দ করতেন। তাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আমাদের ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদের কাষধারা সীমিত ছিল স্কুল ম্যাগাজিন, ডিবেটিং ক্লাব এবং Physical culture Association-এর মধ্যে।

এই সময়ে শহরে এলেন রামমূর্তি—দেখালেন তাঁর অবিশ্বাস্য শারীরিক ক্ষমতা—বিরাট হাতী বৃকে তুলে, লোহার ভারী শেকল ভেঙে ফেলে, মোটরগাড়ির গতিরোধ করে যুবক-সমাজে আলোড়ন জাগিয়ে দিলেন—আর চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে নিজের অজান্তে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। সৌদীন থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হোল কি করে প্রোফেসর রামমূর্তির মত শক্তির অধিকারী হব।

শুরু হোল একলব্যের সাধনা। হাতীর দৃপ্রাপ্যতা বিচলিত করতে পারল না আমাকে—বসবার বেগ বৃকে নিয়ে তার ওপর দাঁড় করলাম। আটজন ছাত্রকে, শেকলের অভাব মোচন কবলো মোটা দাঁড়, আর মোটর গাড়ির বদলে ফুটিজেন ছাত্রের বিরুদ্ধে একা দাঁড় টনাটনি করে স্থির রইলাম।

এতেও কিন্তু শিষ্যের তৃপ্তি হোল না। গুরুদেব মত প্রদর্শনীর আয়োজন না করলে শক্তি সঞ্চয় তো ব্যথা। তার ব্যবস্থাও হোল। মনে আছে দিনটি ছিল শুক্রবার, কারণ মুসলমানদের সাপ্তাহিক নমাজের দিন বোলে একঘণ্টা টিফনের ছুটি ছিল। এ সুযোগ কাজে লাগানো গেল। পূর্বাহ্নের আয়োজন ও বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মাঠের একপাশে জড়ো হোল

ছাত্ররা। প্রমোদ চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিল আমাকে সকলের সামনে : “প্রোফেসর এ সিং—ইনি আজ আমাদের এই সভায় অম্লভূত শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাবেন”—সবাই কৌতুকে হাততালি দিয়ে উঠলো।

আমি তখন চলনে বলনে একেবারে প্রোফেসর রামমূর্তি—ইউনিফর্ম পরে ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করছি। একে একে সবরকম ক্রিয়াকৌশল দেখালাম। সমবেত ছাত্ররা উৎসাহে, আনন্দে কৌতুকে বারবার হাততালিতে ফেটে পড়ছে। তখন বৃক্কি নি আমার ক্ষমতার প্রদর্শনীর চেয়ে রামমূর্তির অনুকরণ ভঙ্গীটাই তারা বেশি উপভোগ করেছিল।

তাই সৌদীন অপরিচিত মুখে সেই ঘটনার উল্লেখে কুণ্ঠিত হোলেও একটু খানি গর্বও অনুভব করেছিলাম। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি—বয়সই বা কি—তাই প্রশংসা ভালোই লেগেছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তখন ভিন্ন। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি কোথায় সেই অজ্ঞাত রয়টি লুকানো থাকতে পারে? ঘরের একটিমাত্র খাটে মাদুর পাতা, বালিশ নেই। একটি টেবিল, বৃক্কি শেল্ফে কয়েকটি বই, বাস। সব দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। একটা আলমারি বা একটা ট্রাস্ক পর্যন্ত নেই যে, যেখান থেকে হঠাৎ দেখা দেবে আমার চিরঈশ্বর সাধনার ধন একটি রিভলবার। নদীর ধারে এই নির্জন কুটিরটিকে পরিঘ্রতা ও গাম্ভীর্য দান করেছে কেবলমাত্র একটি কালীমূর্তি, আর অতি সাধারণ চেহারার একজন অসাধারণ লোক।

আমার চোখের দৃষ্টিতে যে হতাশা প্রকাশ পেয়েছিল তা’ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রশ্ন করলেন : “মনে হচ্ছে তুমি নিরাশ হোয়েছ? এখানে কি দেখতে পাবে আশা করেছিলে?”

—“ভেবেছিলাম একটা রিভলবার পাবি আর কি করে ছুঁতে হয়—”

—“রিভলবার? কেন? আমি তো পুলিশও হতে পারি? যদি তোমাকে ধরিয়ে দিই!”

—“না না, আপনি পুলিশ নন। কখনই না।”

—“যাক্ গে। আসল কথা, আমার কোন রিভলবার নেই, তোমাকে দিতেও পারব না।”

—“একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?”

—“হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।”

—“আপনি কি একজন স্বদেশী? আপনি কি নিজে রাজনৈতিক ডাকাতি করেছেন, সাহেব মেরেছেন?”

স্বদেশী শান্ত সুরে উত্তর পেলাম,—“না, এমন কিছু করি নি এখনো যা’ বলে তোমাকে খুঁশ করতে পারি।” কিছুক্ষণ দুঃখনেই চুপ। আমার মুখে নিরাশার ছাপ স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। তিনি তা বৃক্কিতে পেয়েই ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করলেন,—

“রামমূর্তি” আর দেশপ্রেমিক কি এক? দেশকর্মী হতে হলে, বিপ্লবী হতে হলে, মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে—শুধু শারীরিক শক্তিই যথেষ্ট নয়।”

বিপ্লবীর কাছে প্রশ্ন

কথাটা খুব ভাল বৃক্কিতে পারলাম না। প্রশ্ন করলে বালকসুলভ অন্তত প্রকাশ পাবে কি না ভেবে ইতস্তত করছি—দেখি তাঁর মুখ আরও গম্ভীর আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—তাঁর ধীর গভীর কণ্ঠস্বরে ছোট ঘরটির বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—

“বৃক্কির ওপর হাত রেখে ভেবে দেখ—ভেবে দেখ কতখানি তোমার মনের শক্তি। মনে কর পুলিশ তোমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে—পারবে তুমি তোমার ঠোঁট বন্ধ করে রাখতে? ভাল করে ভেবে বল, দেশের জন্য বিপ্লবের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে? মহাত্মার নির্দেশে পারবে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে—শাসকের সদাজাগ্রত রক্তক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় পথ পথে ঘুরে বেড়াতে?”

এ প্রশ্নের উত্তর আমার তৈরিই ছিল—কিন্তু তিনি বাধা দিলেন,—“না, আজ নয়। বাড়ি যাও, এক সপ্তাহ সময় দিলাম—ভাল করে ভেবে দেখ। তারপর আমাকে জানিয়ে যেও আমার প্রশ্নের উত্তর।”

বোধহয় ভেবেছিলাম এ কথা’র পর আমি চলে যাব। কিন্তু আমি বসেই রইলাম। কেন, তা’ নিজেও জানি না। ভাবছিলাম আরো কিছু বলবেন, কিম্বা আরো কিছু শুনতে চাইছিলাম—এখন ঠিক মনে নেই। উঠতে ইচ্ছা করছিল না, এটাই মনে আছে।

আমার মনের ভাব বৃক্কি তিনি তখন অন্য কথা জুললেন—দেবীচৌধুরাণীর কথা। ভবানী পাঠক কি করে বছরের পর বছর তাঁকে শিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা করে তৈরি করে নিলেন—কাঁচা লোহাকে ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত করে বৃক্কির উপযোগী করে নিলেন। বললেন—“দেবীচৌধুরাণী পড়, আনন্দ-মঠ পড়—আমার কথা বৃক্কিতে পারবে আরো ভাল করে।”

পরিবারের সকলকে ফসফোমিন সর্বত্র ও সুস্থ রাখা

ফসফোমিনে আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, আর আছে মালটিপল্‌ গ্লিমারোফসফেট...ওতে আপনার পরিবারের সকলকে সবল, সুস্থ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রাখে। ঘরে ফসফোমিন থাকলে ক্রান্তি ও ঘবসাদ দূর হয়। ফসফোমিন দোহে বল সঞ্চার করে, ক্ষিধে বাড়িয়ে তোলে, দোহের প্রতিরোধক্ষমতাকে গুণ্ট করে। সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য ভাল রাখে ফসফোমিন—সবুজ ফলের আন্বাদগুণ্ট ভিটামিন টেনিক।



সারবাই A century of experience builds faith

SARABHAI CHEMICALS

ক্ষীণকায় ব্যক্তি—কে উনি?

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন আর মাথায় রিভলবারের চিন্তা নেই—যদুকরের যাদু কাঠিতে শান্ত হয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ঘুমিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস। একদিন প্রোফেসর রামমূর্তির সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ দেখে মন অশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আজ এই ক্ষীণকায় লোকটির সংস্পর্শ এসে সেই চঞ্চলতার পরিবর্তে দেখা দিল স্থির প্রশান্তি। আমি নিজের মনের মধ্যে ভুবে গিয়ে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, সত্যিই কতদূর আমার শক্তির পরিধি। আর ভাবতে লাগলাম শীর্ণদেহী অঞ্চল অসামান্য মরুসিক শক্তির অধিকারী কে এই ব্যক্তি?

তখন সেই ১৯১৮ সালে কে জানতো যে চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কর্ণফুলী নদীর তীরে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন এক কুটিরের একান্ত নিজস্বতায় সমাহিত রয়েছেন ভারতের একজন মহান দেশপ্রেমিক ও সর্বজনবরণ্য বিপ্লবী নেতা?

কে জানতো যে আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন সেই নির্বাহী শিক্ষকের স্থির প্রশান্ত চোখ দুটি একদিন জ্বলে উঠে মাতৃভূমির স্বাধীনতাব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে? রবার্ট ক্রাইস্ট এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বৈমানীর প্রতিশোধ—১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্বর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ! কে জানতো যে অতি সাধারণ চেহারার এই মানুষটিকে চট্টগ্রামের বীর সন্তানেরা বিনা বিধায় তাদের অবিসংবাদী নেতা বলে মেনে নিয়ে তাঁর পতাকা তলে সমবেত হবে।

কে জানতো সেই শীর্ণ বাহু ও ততোধিক শীর্ণ পদবৃগলের অধিকারী একদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির বৃহত্তম আয়োজনকে ব্যর্থ করে—তার সমস্ত ক্ষমতাকে উপহাস করে বৎসরের পর বৎসর চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে?

কে এই মহাপ্রাণ মহাবিপ্লবী?

ইনিই মাস্টারদা, আমাদের প্রিয়তম নেতা মাস্টারদা—মাস্টার সূর্য সেন, যার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব একমাত্র কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ভাষায়ঃ—“সেদিন বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম;.....কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু, জড়পিণ্ডের বেশী সে আর কিছুই নয়।

হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির জ্বলন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে নিমেষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে, দরজা বন্ধ হল আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাইরে নেই।.....”

সেদিন পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন সূর্যের সঙ্গে পরিচয় হল আমার। সূর্য সূর্যের প্রাপের দীপ্তিতে জ্বলে উঠল অনিবার্য অগ্নিশিখা। আদি শ্লোক রচনার পূর্বাঙ্কে মহর্ষি বাস্মীকির অশান্ত হৃদয়ের মত স্বাধীনতার সৈনিকের জিজ্ঞাসা ঘুরে বেড়াচ্ছি দিশাহারা হয়ে—কে হবে তার পথপ্রদর্শক, কে হবে নেতা, কে হবে সেনাপতি? সে প্রশ্নের উত্তর মিলল যখন, তখন আর মনে কোন সন্দেহ রইল না।

সর্বজনপূজ্য নেতাকে সেনাপতি পদে বরণ করে সৈনিক আজ তুষ্ট গর্বিত। শৃঙ্খল সে জানতে চায় সেনাপতির আদেশের মর্মাদা কি সে রক্ষা করেছে? যে দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল সে কি তা পালন করতে পেরেছে?

কিন্তু কে দেবে উত্তর? সেনাপতি আজ আর পৃথিবীতে নেই। মাতৃভূমির অপমানের জ্বালা বৃকে নিয়ে জ্বলন্ত উস্কাপিণ্ডের মত চট্টগ্রাম জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগুনের শিখা জ্বালিয়ে চলেছিলেন তিনি; কিন্তু একদিন মীরজাফরের উত্তরপুরুষ বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাঁকে। সে আর এক কাহিনী। সে কাহিনী এই স্মৃতিচিত্রের বধ্যস্থানে বিবৃত করা হবে।

বিপ্লবী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক

মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী জীবনে যে সব সুক্ষ্ম অতিসুক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির পথ খুঁজে পেয়েছি তা প্রত্যক্ষভাবে আর কারো কাছে পাই নি। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এবং সুযোগ হলে এখনও বহু বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করেন মাস্টারদা সম্বন্ধে। তাঁরা জানতে চান কোন মহৎ গুণে তিনি অতজন বিপ্লবী-সংগঠকদের ও কর্মীদের পরিচালনা করেছিলেন? কি করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল সমকালীন ও সন্দর্ভবৃত্তের বিপ্লবী সংগঠকদের একতা অখণ্ড ও অটুট রাখতে? মাস্টারদার সেই সম্মোহন ক্ষমতার গুঢ়

তথ্য যা আমার জ্ঞানবৃত্তিতে বুদ্ধে-ছিলাম তা এক কথায় বা অল্প কথায় বলা যায় না। তাঁকে এক কথায় প্রকাশ করলে বলতে হবে মাস্টারদা ছিলেন সীমাহীন, অসীম গভীর স্বদেশ-প্রেমের এক জ্বলন্ত জ্বলন্ত বিপ্লবী প্রতীক ও আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রামের চিরন্তন উৎস। মাস্টারদার বিপ্লবী জীবনের ছোট ছোট স্ফুলিঙকে সমষ্টিগতভাবে বুদ্ধিতে পারলে তবেই সেই মহান বিপ্লবীকে চমকে বোঝা যেতে পারে। তাই এই অগ্নিষুগের অধ্যায়ের বর্ণনার মধ্যে দেখতে পাবো মাস্টারদার বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-গুলি, অতিশয় সংকট মূহুর্তে তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও তৎকালীন সীমিত কর্মসূচী সম্পাদনে তাঁর সূচনীয় নির্দেশ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযানের অধ্যায়টি লেখার জন্য আমার প্রয়াস সেটি মাস্টারদার বিপ্লবী জীবনেরই ধারাবাহিক চিত্র। মাস্টারদাকে ঘিরে ছিলাম আমরা। আমাদের সব সমস্যাই হোলেন মাস্টারদা। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল অতি সুক্ষ্ম নীতিবোধ ও গভীরতম বৈশ্ববিক চরিত্র। যদি মাস্টারদার বৈশ্ববিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়াই সশস্ত্র প্রস্তুতি, বিভিন্ন অস্ত্র-শিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া বা মোটর চালানো শিক্ষার বাহ্যিক ক্ষেত্রে তবে আমাদের নিরাশ হতে হবে। সেইজন্য চট্টগ্রাম বৃব-বিদ্রোহের বাহ্যিক চিত্রটি সব নয়। মাস্টারদার জীবনের আড়ম্বরহীন প্রকাশহীন গভীরতম দিক—যে অনিবার্য ভূমিকা, সার্থক করেছে চট্টগ্রাম বৃব-বিদ্রোহকে—তার উপলব্ধি প্রয়োজন।

মাস্টারদার সঙ্গে যখন আমার দেখা হোল তখন আমার দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি রিভলবার। মাস্টারদার কুটিরটি ও তাঁর ছোট্ট ক্ষীণকায় দেহ দেখে আমি নিরুৎসাহ হয়েছিলাম। উদ্ভ্রান্ত প্রশ্ন করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম—তিনি স্বদেশী ডাকাতি ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূ—কোন সাহেবকে হত্যা করেছিলেন কিনা। অতি সোজা প্রশ্ন! অতি প্রয়োজনীয় তথ্য! যদি অগ্নিষুগের নেতার রাজনৈতিক ডাকাতির বা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শত্রুকে নিহত করার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাঁর কাছ থেকে কি শিখতে পারবো? বিপ্লবী সভ্যদের এইরূপ সোজা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নেতাদের পক্ষে কত শক্ত! প্রশ্ন শুন্যেই সাধারণত অসাধারণ ক্ষমতাবান বিপ্লবী নেতা ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই তেমন তেমন বিপ্লবী নেতা খুব স্বাভাবিকভাবে আশঙ্কা

করবেন যে, যদি এরকম কোন ব্যক্তিকে বিপ্লবী কার্যের অধিকারী তিনি না হন তবে সত্যকথা বললে হয়ত বা প্রশ্নকারী সেই উৎসাহী বিপ্লবী যুবককে তিনি হারাবেন। এখানেই অন্যান্যদের তুলনায় মাস্টারদার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিচ্ছি।

মিথ্যা বড়াই:

আমাব লেখার মধ্যে কাউকে ছোট করবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে মাস্টারদার বিশেষ দিকটি প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার আছে। তাই একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি।

বিপ্লবীদের আমদা জানতাম “স্বদেশী” নামে। আমার বন্ধু আফসারউদ্দীন একদিন আমাকে পাথরঘাটার এক মেসে নিয়ে যায়। সে আমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, “উনি একজন স্কুলের শিক্ষক, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, উনি দেশের মুক্তি-যুদ্ধে সৈনিক হতে প্রস্তুত।” তাঁর বয়স ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে এবং তাঁর ঘরটিতে একটি কালীমূর্তি যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন আমি আপনা থেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়ি। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন একজন গুরু যিনি আমাদের বিপ্লবের পথে দীক্ষা দেন। আমার কিশোর মনে তাকে দেখেই ধারণা হয়েছিল উনি একজন স্বদেশী—অর্থাৎ লর্ড কার্জনকে আমলে বাৎসর্য যে বক্তৃতা দেয়, স্মরণপাত হয় সে সময় রাজনৈতিক ডাকার্জি, হত্যা, ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই বন্দী বা অন্তরীণ ছিলেন।

মনের উন্মেষ আর সামলাতে পারলাম না। খোলাখুলিভাবে তাকেও সেই একই প্রশ্ন করলাম—“আপনি কি রাজনৈতিক ডাকার্জি বা সাহেব হত্যা করেছেন? আপনি কি বৃটিশ ক্যারাগারে অন্তরীণ ছিলেন?” আশ্চর্য! তিনি কিন্তু আমার সেই ধারণা ভাঙতে চেষ্টা করেনি। ভাবে জ্ঞানালেন আমার ধারণাই সত্য। তিনি সেদিন থেকেই আমার কাছে দেবতা হয়ে উঠলেন। পরে যেদিন জানতে পারলাম তিনিও সেই সময় মাস্টারদার সমপর্ষ্যেব একজন বিপ্লবী নেতা এবং তিনিও তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বা জেলও খাটেন নি। অথচ আমার কাছে মিথ্যাভাগ করেছেন, তখন সেই আঘাত সহ্য করা আমার মত ভাব-প্রবণ কিশোরের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন সশস্ত্র আক্রমণের ভূমিকা

গ্রহণ করেছেন বললে আমাকে বিপ্লবী দলে ঢানা সহজ হবে। কিন্তু এই মিথ্যা বড়াইয়ের চেষ্টা যে কত ভুল—নিজেকে কত অসার প্রতিপন্ন করে তা বোঝার ক্ষমতা সকলের থাকে না; তাঁরও ছিল না। এখানেই অন্যদের সঙ্গে মাস্টারদার পার্থক্য, এখানেই মাস্টারদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আজ ভাবতেও শিউরে উঠছি—যদি মাস্টারদার সাক্ষাৎ আমি না পেতাম—যদি চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণদল এ হেন নেতার নেতৃত্বাধীনে না থাকতো!

উপযুক্ত নেতৃত্ব

পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মনে বশুনা ও হতাশার রেখা যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, একটি সামান্য ইশ্বরের অপেক্ষায় মাত্র থাকে, তখন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা স্ফুলিঙ্গের মত হঠাৎ জ্বলে উঠে এক ফুৎকারেই নিভে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পূর্ববর্তী অগ্নিযুগের ইতিহাস এইরকম অসংগঠিত বিপ্লবের কাহিনী। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং মাতৃভূমির প্রতি আবেগময় অনুভূতিই ছিল সেই দিন আমাদের একমাত্র সম্বল। দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা—এই মন্ত্র বৃকে নিয়ে ঘরের আরাম তছ করে যে তরুণদল বেরিয়ে পড়েছিল, তারা দেশের নেতাদের কাছ থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের নির্দেশ পায় নি, শ্রেণী-সচেতনতা তাদের বিপ্লবের প্রকৃত রূপটি দেখতে সাহায্য করে নি; গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রও তখন দেশের তরুণদের ডাক দেয় নি—কংগ্রেসের নরম পন্থায় তাদের মন বিন্দুমাত্র আস্থা খুঁজে পায় নি। শূদ্ধ ক্ষুদীরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বসু ও অন্যান্য মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শ সামনে নিয়ে এগিয়ে চলছিল তারা। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হত্যা করাটাই বিপ্লবের পথ বলে মনে করা হতো।

ক্ষুধা মনের প্রতিক্রিয়াঃ—রক্তের বদলে রক্ত, অত্যাচারের জবাবে অত্যাচার,—এই সবকেই মূল মন্ত্র বলে মনে নিয়েছিল বিপ্লবী তরুণদল। অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের আদর্শ ছিল সোজা ও সূক্ষ্মপট—বৃটিশ রাজশক্তির কবল থেকে মাতৃভূমির মুক্তি। তাদের কর্মপন্থাও ছিল ভদ্ররূপ সর্বাঙ্গ ও

জটিলতা মুক্ত—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ অফিসারদের হত্যা করে তাদের মধ্যে ঘাস সঞ্চার করা ও তাদের বন্ধুকে দেওয়া যে এ দেশে তাদের জীবন নিরাপদ নয়। এই আদর্শ এই কর্মপন্থা গ্রহণ করবার আরও উদ্দেশ্য ছিল দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে। আত্মত্যাগ ও বীর্যের নিদর্শন স্থাপন করে তাদেরও অনুরূপ কার্যে উদ্বুদ্ধ করা—যেন বৃটিশের গুলী, ফাঁসির দড়ি বা স্বািপান্তরের বিভীষিকা যুব-বিপ্লবের এই ধরনের গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অগ্রগতিকে রুদ্ধ ও নিশ্চল করে দিতে সমর্থ না হয়।

গুপ্ত সমিতি ও তাদের শিক্ষা

উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী এরকম হওয়ায় স্বভাবতই দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়বার চেষ্টা হয় নি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাবা নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধি অনুসারে ছোট ছোট বিপ্লবী দল গড়েছেন এবং তৎকালীন বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁরা সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা দলের সদস্যদের যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন তা শ্রীঅরবিন্দ, কানাইলাল, ক্ষুদীরাম—এঁদের সময় থেকে খানিকটা আলাদা হলেও মূল নীতির দিক থেকে একই বলা যেতে পারে।

কিন্তু ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটবার আগের সময়টাকে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছিল। চট্টগ্রাম শহরে বৃটিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারলে তাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় বিপ্লবী-দলে আলোড়ন হবে, সর্বত্র একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোলে বৃটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে—এরকম একটা অপরিণত ধারণা আমাদের মনে ছিল। আর ভেবেছিলাম যদি সফল না-ও হয়, তবু দেশের যুবকদের বিপ্লবের পথে প্রেরণা দিতে পারবো, আমাদের আত্মত্যাগ ও আন্তরিক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উদাহরণ দেখিয়ে।

এখন ১৯১৮ সালে ফিরে যাচ্ছি, যখন সবোন্নত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। আমাদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিল ধরাবাঁধা—সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে মা কালীর কাছে প্রার্থনা, প্রয়োজন মত ব্যায়াম, ভাগবৎগীতা থেকে খানিকটা অংশ পাঠ, তারপর নিজের মনের ভাব বিশ্লেষণ করে

প্রাত্যাহিক ডায়েরী লেখা; এর পরে ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের সঙ্গে দেখা করা, তারপর সকলে একত্রে বসে রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রতিদিনের কাজের অঙ্গ ছিল।

কেন্দ্রীয় গদ্য সমিতি ও প্রথম সারি
চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে—

১। সুর্ষ সেন (মাস্টারদা)—
ন্যাশনাল হাই স্কুলের সিনিয়র
গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক।

২। অনুরূপ সেন—চব্বিশ পর-
গনায় বুরঙ্গ হাই স্কুলের
গ্র্যাজুয়েট সহকারী প্রধান
শিক্ষক। (আদিনিবাস চট্টগ্রাম)

৩। নগেন সেন (জুলাই সেন)—
৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের
ভূতপূর্ব সদস্য—প্রথম মহা-
যুদ্ধ প্রত্যাগত।

৪। অম্বিকা চক্রবর্তী—

৫। চারুবিকাশ দত্ত—

এঁদের অধীনে দলের প্রথম সারির
সভ্য হোল:—(১) নবীন, (২) সত্যেন,
(৩) আফসরউদ্দীন, (৪) নারায়ণ, (৫)
নির্মল সেন (নির্মলদা), (৬) প্রমোদ
চৌধুরী, (৭) যশোদা, (৮) নন্দ সিং
(আমার দাদা), (৯) অবনী ভট্টাচার্য
এবং (১০) আমি—অনন্ত সিং। দলের
প্রথম সারির অন্তর্গত হলেও এঁরা
সকলে যে প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী
ছিলেন তা' কিন্তু বলা যায় না, কারণ
এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো সক্রিয়
কাজে যোগ দেবার আগেই বিপ্লব জগৎ
থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আমরা
এই দশজন প্রথমে যোগ দিই বলে প্রথম
খ্যাচের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম।

সদস্য সংগ্রহ

আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল
বিপ্লবী দলের সদস্য হবার উপযুক্ত
লোক খুঁজে বার করা ও তাদের দল-
ভুক্ত করে নেওয়া। নির্দেশ মত উঠে
পড়ে কাজে লেগে গেলাম। “charity
begins at home.” সুতরাং
প্রথমেই নজর পড়লো আমার দাদা ও
দিদির দিকে, তারপর আমার পিসতুতো
বোন শকুন্তলা ও হিরণ্ময়ীর দিকে।
ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবারটিই চলে
এলো আমাদের বিপ্লবীদলের সমর্থনে
—বাবা মা সবাই।

তারপর এল ক্লাসের বন্ধুরা।
আফসরউদ্দীন আর গণেশ ছিল ভাল
ছাত্র ও পরস্পর বন্ধু। জ্ঞান না কেন
আফসরউদ্দীন গণেশকে দলে টানতে
চায় নি। আমার তখনো কিন্তু প্রতি

মুহুর্তে মনে হোত গণেশকে বলি সব
কথা! সে আমার বিশেষ বন্ধু, আর
তাঁছাড়া ক্লাসের ভাল ছাত্র। আমার
ধারণা ছিল বারা মেধাবী ও পরিশ্রমী
তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা
জানলে নিশ্চয়ই দলে যোগ দিতে স্বীকা-
র হবে না। ইতিহাস জানে আমার
এ ধারণা মিথ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে
দেশের সেরা ছেলেরাই সৈনিক দেশ-
প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল—সহস্র
মন একসূত্রে বাঁধা হয়েছিল, সহস্র
জীবন এক কার্বে সঁপে দেওয়া
হয়েছিল।

কতবার ভেবেছি আমার প্রিয়বন্ধু
গণেশকে বলি আমার নতুন জীবনের
কথা—কতবার বলতে গিয়েও বলা হয়ে
ওঠে নি। স্বীকার একটু কারণও
ছিল। আমাদের ক্লাসে বরাবর প্রথম
স্থান অধিকার করত যে ছেলেটি,
ভেবেছিলাম তার মেধা, তার বিচার
বুদ্ধি তাকে দেশমাতৃকার বন্ধন
মোচনের মতো দীক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত
করবে। অনেক আশা বুকে নিয়ে
তাকে বলেছিলাম বিপ্লবীদলে যোগ
দিতে। কিন্তু মাত্র দ্বিধা না করে সে এক
কথায় এড়িয়ে গেল। তাই তখন
গণেশকে বলতে গিয়েও বরাবর ফিরে
এসেছি, ভেবেছি যদি সেও নিরাশ
করে! যদি সে বলে: “না, আমি ছাত্র
এখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার
সময়, বাজে হুজুগে যোগ দিলে কি
হবে?” তখন সেই প্রত্যখ্যান কি
আমি সহ্য করতে পারবো? এখন
বুঝতে পারি গণেশের সঙ্গে সেই
ছাত্রটির তুলনা চলে না। কিন্তু সৈনিক
তো বুঝতে পারি নি কাচ আর কাণ্ডনে
প্রভেদ! তাই ভয় ছিল আমার সব
কাজের সঙ্গী—আমার প্রিয়তম বন্ধু
গণেশ যদি আমাকে বলে, “না, তোমার
পথে আমি যেতে চাই না”—তবে কি
আমার সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিমেষে
ধূলিসাৎ হয়ে যাবে না?

এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের
যে উজ্জ্বল আশাভরা চিহ্ন চোখের
সামনে রয়েছে, গণেশ তার অংশীদার
হবে না—এ কথা চিন্তা করাও আমার
কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাই
একদিন স্বীকা সংকোচ ত্যাগ করে
বলেই ফেললাম কথাটা।

ফল পাঠকের অজানা নয়। গণেশ
তো শুনে লাফিয়ে উঠলো। পারলে
তখন গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে।
অগত্যা দীক্ষা নেবার জন্য, দেশের
মুক্তি যুদ্ধে সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণ
কববার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত
হয়েছিল। আমি তাকে নেতাদের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করলাম
মাত্র। তারপর যখন সে আমার স্বীকার
কথা শুনলো, তখন তার তিরস্কার ও
ও অনুযোগে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে
পড়লাম। বরাবর ক্ষমা চাইলাম তার
দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার প্রতি মনে
সন্দেহ পোষণ করেছিলাম বলে।

এক কথায় ঘটনাটা বললেও আমরা
কিন্তু হঠাৎ একদিন কাউকে বলতাম
না যে, ‘এসো, বিপ্লবী দলে যোগ
দাও।’ নানা রকম আলোচনা করে
আগে তার মন বুঝতে হোত, পুর্লিগের
গুরুত্ব কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে
হোত, তারপর ধীরে ধীরে কথায় কথায়
তাকে প্রশ্ন করা হোত যে, এ রকম
কোন দলের সঙ্গে সে কাজ করতে
ইচ্ছুক কি না। এসব বিষয়েও আমরা
নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেতাম।
তার ওপর নিজের বুদ্ধি বিবেচনা
প্রয়োগ করে অগ্রসর হতে হোত।

মানসিক প্রস্তুতি

বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা আমাদের
কি রকম ছিল তা তো আগেই বলেছি।
সে যুগে আমাদের নেতারা মাৎসিনি,
গ্যারিবল্ডি, ডি ভ্যালেরা, লেনিন,
সানইয়ান্সেন, ইত্যাদি সবাইকে একই
পর্ষায় ফেলে তাঁদের দেশপ্রেম ও
বীরত্বের কাহিনী শোনাতে—শোনাতে
ক্ষুদ্রিরাম, কানাইলালের আত্মোৎসর্গের
কথা; আর শোনাতে বালাসোজের
বুড়ীবালামের তীরে বতীন মুখার্জীর
নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয় ও অন্যান্য বিপ্লবীদের
জীবনপণ যুদ্ধের কাহিনী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবের
কাহিনী আমরা পড়তাম—মনের মধ্যে
পুঞ্জীভূত হোত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি
ঘৃণা, মুক্তির জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠতাম।
দেশপ্রেমের মোহমন্ত্র কানে দিয়ে নেতারা
শেখাতেন কেমন করে সশস্ত্র শত্রু-
বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সাহস ও
বীরত্বের জোরে জয়ী হব, কেমন করেই
বা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হাসিমুখে ফাঁসির
দড়ি বরণ করবার ক্ষমতা অর্জন করবো।
নেতাদের স্বপ্ন সফল করে আমরা
তৈরি হয়েছিলাম এক-একটি শাণিত
ইস্পাত—ব্রিটিশ শক্তির সমস্ত অত্যা-
চারের সম্মুখীন হয়ে এতদিনকার
শোষণ-শাসন ও অবিচার অপমানের
প্রতিশোধ নেব—এ বিষয়ে আমরা
ছিলাম স্থির-সঙ্কল্প। তখন বুদ্ধি-
জীবী পার্লামেন্টারী প্রতিযোগিতার
যুগ নয়; বিচাষের চেয়ে হৃদয়ের
প্রয়োজন ছিল বোঁশ, চিন্তার চেয়ে
কার্যের। আমরা সে যুগের উপযোগী
হয়েই গড়ে উঠেছিলাম—নিভীক
আবেগ চঞ্চল একদল যোদ্ধা।

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যোগাটি বছর পার করে সতেরোর পা ফেলেছে। এর মধ্যে আমরা আমাদের দুঃদুজন প্রিয় নেতাকে হারিয়েছি। হারা বছর বাতাবিধকৃত ভারতবর্ষকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছেন এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন সংগ্রহ করে দিয়ে গেছেন। ফুল-চুটি থেকে গেছে স্বাভাবিকভাবেই, যেমনভাবে মানুষের জীবন চুটিপূর্ণ। ভ্রাচ বিশ্বের চোখে এই বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষ আজ বিশ্বায়, একটি বিস্মিত প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্র ক্রুপের ছড়াছড়ি দেখা গেছে, কমতালার তীর বাসনা খুন-জখম নির্বাসন অবরোধের রক্তাঙ্ক ইতিহাস রচিত হয়েছে; ভারতবর্ষ তার সংখ্যাগতীত সমস্যার বোঝা কাঁধে করে কিন্তু এই ষোল-বছর আশ্চর্য শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পর পর দুই নেতাকে সর্ববাদীসম্মতরূপে গ্রহণ করার পর ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীকে গণতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতির মাধ্যমে স্বদেশের আস্থা অর্জন করে নিতে হয়েছে শৈত-নির্বাচনী স্বল্পে অবতীর্ণ হয়ে। প্রথম প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন দুঃচোখে শান্তির স্বপ্ন নিয়ে, দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দের বন্ধুজনের মধ্যে চোখ বুজলেন মুখে শান্তির শপথ বাক্য উচ্চারণ করে, শান্তি চুক্তিতে পরিণত স্বাক্ষর রেখে।

প্রথম কর্ণধার যুদ্ধকে এড়িয়ে আপোষ-রক্ষার মধ্যে ভারতের সার্বিক উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন; দ্বিতীয় নেতা উন্নত ভারতকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করে বিস্মিত করে গেলেন দুনিয়ার উন্নত প্রকৃতিক। জয় করে দান করার মধ্যেও ভারতবর্ষ অহমিকাকে প্রগ্রহ দেয় নি, জগতের সামনে এই আর এক গুরম বিশ্বায় এবং চরম শিক্ষা।

শান্তির জন্য ভারত যে কোনো মূহুর্তে যে কোনরূপ ত্যাগ নীকারে প্রস্তুত, তাসখন্দের বোধগা ভারতের সেই চির কল্যাণকামী রূপ-টিকেই প্রকটিত করেছে। প্রাথমিক অবনত হয়েছে তাই বিশ্ব নেতৃবর্গের হৃদয়। এক ব্যাক্যে শাস্ত্রীজীকে ভারী শাস্তিবাদী দুনিয়ার মহান আদর্শ পুরুষ বলে স্বীকার করেছেন।

ভারতবর্ষ তার জোটনিরপেক্ষ আদর্শকে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অটুট রাখতে পেরেছে শাস্ত্রী সরকারের অনমনীয় দৃঢ়তার ও মূহুর্তে সফল অভিযানে তাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে আজ। সর্বোপরি প্রমাণিত হয়েছে এই সত্য যে, পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজা-তন্ত্র কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বৃহৎ গণতন্ত্র হিসেবে তার আপন নীতিতেই সমৃদ্ধির নব বিহিবিশ্বে একমাত্র গণতান্ত্রিক দুনিয়ার চোখে ভারতবর্ষ আজ আদর্শস্থানীয় বলিষ্ঠ জাতি। আর এ-সবের জন্যই সার্থক নেতৃবর্গের সঙ্গে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সাধারণ মানুষ অভিনন্দন-



গিসিমার অভিনন্দন

যোগ্য। এসবের জন্য জওয়ান ভারতের অবদান বারম্বার স্মরণীয়। এ সবের জন্য ভারতের প্রতি বন্ধুপূর্ণ মনোভাবে অবিচল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নৈতিক সহায়তাদান গণনীয় এবং সর্বোপরি ভারতীয় নেতৃবর্গের নিরপেক্ষতা-বাদী নীতিতে অবিচলিত নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

বহির্বিপ্লবে ভারতবর্ষ

আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রীই কৃতিত্বের সঙ্গে বহির্বিপ্লবের মনে গভীর থেকে গভীরতর ছাপ ফেলে গেছেন। নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ভারতের নেতৃবর্গই নিরপেক্ষতা-বাদী দুনিয়ার ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের বন্ধু-স্থানীয় রাষ্ট্রগুলির মনে ভারত সম্পর্কে যে দ্রুত ধারণা সৃষ্টির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থচর্য সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, শাস্ত্রীজীর মহান নেতৃত্ব তাদের শত্রুতাকে ধীরভাবে এবং সাবধানে পরাস্ত করেছে। ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য দৃঢ়তর হয়েছে আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী মহলে।

তাসখন্দের ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জয়

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ঐতিহাসিক জয়লাভ হয়েছে তাসখন্দের মাটিতে। যেমন তাসখন্দের মাটিতেই ভারত হারিয়ে এসেছে তার অন্যতম মহৎ সম্পদ (অকালে) লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। তাসখন্দে ভারতবর্ষ তার শান্তি ও সৌহার্দ্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছে এবং তার জন্য যে কিছু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন ছিল অক্রেপে তাও সে করেছে।

পাক-ভারত সীমান্ত সমস্যা উভয় রাষ্ট্রকে কেবল পেছনের দিকেই টানছিল। উভয় রাষ্ট্রের সুস্থ শরীরে সে সমস্যা ছিল রিব-স্ফোটকের মত। ভারতবর্ষের আগ্রহে এবং শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আব্দুর খার প্রশংসনীয় শূভেচ্ছার দীর্ঘকালের অশান্তি ভবিষ্যৎ শান্তির মুখ দেখতে পেরেছে। ভারতের ইতিহাসে তথা পাকিস্তানের ইতিহাসে জন-খন্দ চুক্তি (পেরোপদুরি গালিত হলে) এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে। গঠন-মূলক কাজকর্মে অব্যাহত অগ্রগতি লাভ করতে পারবেন উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ, প্রজা-

জন্মের স্বপ্ন হবে সার্থক। কেন না প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রই চার বৃদ্ধবান অবাধ অগ্রগতি, স্বৈর-তান্ত্রিক সরকারে সেই প্রীতিপূর্ণ অবস্থা সম্প্রদায় নয়। তাসখন্দ চুক্তি মানুষের মঙ্গল এবং কল্যাণকেই বরণ করে আনবে, যে মঙ্গল-জন ফসল কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্তানেরই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির আব-হাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হবে।

শ্রীমতী গান্ধী ও কৃতজ্ঞতা

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জনগণ সাধারণ-জন্মের শ্রীমতীমতের প্রাকাল শান্তিময় শ্রুতিভাষ্য সর্বদা জানাতে পেরে পরিতুষ্ট।

তাসখন্দে ঐতিহাসিক ভূমিতে যে মহান জন্মের একান্ত আগ্রহ ও তৎপরতা আজ প্রাণীকৃত হই উপমহাদেশের মধ্যে শান্তির সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিল ও বাস্তব সাহায্য করল, সেই শান্তিপূর্ণ সৌভ্রাতৃত্ব ভূমির প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম প্রজা-তন্ত্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শ্রুতিকামী নাগরিক সৌভ্রাতৃত্ব ভাইবোনদের ও সৌভ্রাতৃত্ব নেতৃবর্গের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। সৌভ্রাতৃত্বের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য-চুক্তি এবং পারমাণবিক শ্রুতিভাষ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্বি-দেশের জনগণ পরস্পরের আরও কাছে এসেছেন, তাসখন্দে এই দ্বিতীয় প্রতি-শ্রুতিভাষ্য নতুন কল্যাণের পূর্বভাষ্য জানাচ্ছে।

কৃতজ্ঞ আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও। পি এল ৪৮০ অনুসারে ভারতকে ক্যান্সাস সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক কমন্সমিতি ভারতকে তার খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় চিন্তা খাদ্য সরবরাহ পুনরুৎপাদন করায় ভারতবর্ষ এক অনিবার্য দুর্ভোগের মধ্যে আজ রেহাই পেয়েছে। সাধারণতন্ত্র বিশ্বাসের শ্রুতিভাষ্য ও কৃতজ্ঞতা তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও অকুণ্ঠভাবে জানাতে পারেন আজ ভারতবাসী।

ভারতবাসী চিরকালই প্রাকৃতিক শান্তির সঙ্গ প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চেয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া বাধা সত্ত্বেও সেই একান্ত ইচ্ছা। আজ সে ইচ্ছা পূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ করছে আমরা। সীমান্তে সৈন্যপসারণ শ্রু-ত্ব করে গেছে। পাকিস্তানের জনমনে ও সংবাদ-পত্রে ভারতের প্রতি প্রীতি ও শ্রুতিভাষ্য জানোভাব গড়ে উঠেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ণা-ঙ্গ হতে ভারতবাসী তাঁদের রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত পাকিস্তানী ভাইবোনদের মৃত-জনে প্রীতি ও শ্রুতিভাষ্য জানাবার সুযোগ পেল হোল বছরে এই প্রথম।

বর্তমান প্রজাতন্ত্র দিবস এ সমস্ত কারণেই হরষে-বিষাদে বিচিত্র।

শোকার্ত প্রজাতন্ত্র

বিষাদ, শাস্ত্রীজী আজকের আনন্দের

দিনে আমাদের পাশে থাকতে পারবেন না। ভারতবাসী হারাল তাঁদের বলিষ্ঠ প্রিয় নেতাকে। যিনি ইতিহাসে নতুন রঙের তুলিতে নতুন কথা লিখে গেলেন, তিনি নব-উদ্ভাস ভারত প্রজাতন্ত্রের কণ্ঠধারের গুরু-দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে ঠিক এই মূহুর্তেই সরে দাঁড়ালেন। তাঁর অমর আত্মার আশীর্বাদপূর্ণ ১৯৪৬ সালের ভারত তার প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ণা প্রভাতে শাস্ত্রীজীর ভাগ্যদর্শে ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। শাস্ত্রীজীর পূর্ণা আত্মা সর্বপ্রান্তে শান্তি লাভ করবেন।

আর এক অধ্যায়

ভারতের সৌভাগ্য, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যিনি স্বতন্ত্র কণ্ঠধাররূপে সারসরি প্রতি-শ্রুতিভাষ্য নির্বাচিত হলেন, নেহরু-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হল সেই প্রিয়দর্শিনী ভারতললনা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বভাষ্যে ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর উপরূত উত্তরাধিকার নিয়েই নেতৃত্ব পদে সমারূঢ় হলেন।

নেহরুজীর পর নেতা বাছাই-এ সমস্যা দেখা দেয় নি। শাস্ত্রীজীকে সবার মধ্য থেকে বেছে নিয়েছিলেন ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গ। কিন্তু শাস্ত্রীজীর চিরন্তন অবসর গ্রহণের পর এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল।

শাস্ত্রীজীর পর কে? এ প্রশ্ন এতো শীঘ্র আলোচিত হওয়ার কারণ দেখা দেয় নি শাস্ত্রী-শাসনের অতি দ্রুত খাবমান দেখ বছরের মধ্যে। শাস্ত্রীজীর বিদায় অত্যন্ত আকস্মিক। তিনি একটি শ্রুতি উপসংহার সন্নিবিষ্ট নাটকের বীর হিরোর মতো তাঁর ভূমিকা সার্থকভাবে রূপায়িত করে অকস্মাৎ মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সাজঘরে প্রত্যাবর্তনের সুযোগও গ্রহণ করলেন না। যে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য তাঁদের হতাশ মুক ও মর্মাহত করেই নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন তিনি।

নাটকের উপসংহারের বীজ বপন হয় যে ক্রাইমেক্সের শীর্ষচূড়ার, তার পরই থাকে সংগ্রামে অর্জিত ফসল কাটার গুরুদায়িত্ব। শাস্ত্রীজীর পর এই গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতেই। বলা বাহুল্য সে দায়িত্ব তাঁর হাতেই অর্পিত হওয়ার যুক্তি পুরোপুরি বর্তমান। কেন না নাটকের স্বাভাবিক গতিতে বজ্রস্ব-রাক্ষতে হলে ক্রাইমেক্সের গতিকেই টেনে নিয়ে যেতে হয় দক্ষতার সঙ্গ। আর সে দায়িত্ব শ্রীমতী গান্ধীই পালন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস; কেন না তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে পূর্বসূরী দুই প্রধানমন্ত্রীর নীতির ওপর। উভয়ের প্রতি তিনি যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে প্রাশংসী তাই নন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বিনীত আবহাওয়ার তাঁর রাজনৈতিক জীবন জালিত।

শ্রীমতী গান্ধী ভারত ইতিহাসের একটি কঠিন পর্বায়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর সামনে এখন তাসখন্দ চুক্তিকে সার্থক করে তোলার গুরুদায়িত্ব। বহুদিনের রক্ত-ক্ষয় বিরোধের পর সীমান্তে শান্তির শপথ শোনা গেছে। সে শপথকে বাস্তবায়িত করতে তুলতেই হবে।

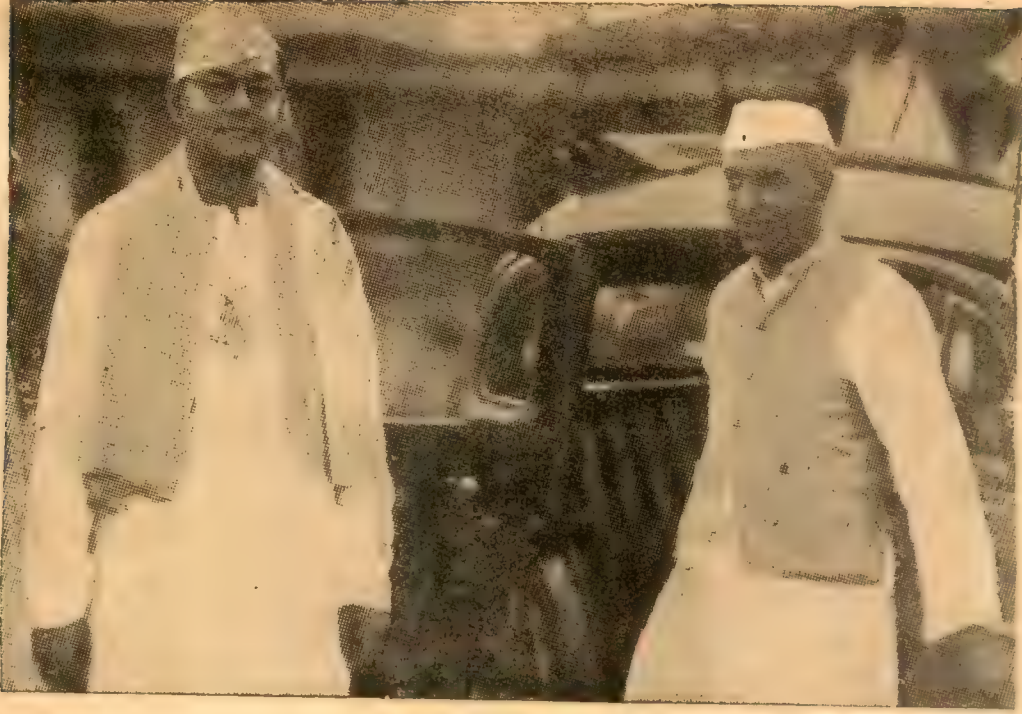
তাঁকে কৃতিত্বের সঙ্গ। খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে হবে। যদিও আগামী নির্বা-চনের আর একটিমাত্র বছর বাকি, তবু এরই মধ্যে তাঁকে এই বৃহৎ সমস্যার সমাধানের পথে এমনভাবে এগোতে হবে যাতে জন-আশঙ্কি তাঁর প্রতি এবং তাঁর দলের প্রতি পুরোপুরি প্রোথিত হয়। ভারতের অন্যতম সমস্যা সীমান্ত। লালবাহাদুর তার সমাধানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। এখনও কাজ বাকি আছে ভারত-চীন সীমান্তে। কায়-যাক আছে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও।

শাস্ত্রীজীর সঙ্গে উদ্ভূত নাগাদের ষষ্ঠকল্প কথা ছিল। নাগা সমস্যা সমাধানের ভার এখন গ্রহণ করতে হবে শ্রীমতী গান্ধীকেই। অন্যতর অশান্তি পাজাবে। পাজাবী সুবার দাবিকে বধ্যযোজ্য উত্তর দিয়ে এই সীমান্ত রাজ্য বিক্ষোভ ও মতান্তরের ইতি করতে হবে।

সর্বোপরি যে বৃহৎ সমস্যা আজ কংগ্রেস সংগঠনের মস্তিষ্ক বহুগুণে কারণ, কংগ্রেস দলে সর্বত্র দলাদলি ও ক্ষমতাস্বপ্নের সেই কুচক্রকে আরও আনা যেমন কংগ্রেসী সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দের কাজ, প্রধানমন্ত্রীর ওপরও তার দায়িত্ব অনেকাংশে ন্যস্ত থাকবে। ক্ষমতাস্বপ্নে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে পরিমাণে কৃতিগত হবে, শ্রীমতী গান্ধীর শাসনকার্য সেই পরিমাণেই ব্যাহত হতে থাকবে। সুতরাং এই বিশেষ দিকটিতে তাঁকেও নজর দিতে হবে।

ভারতবর্ষ নেহরুজীর কাছে পেরেছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি। ঘটনাচক্রে ও প্রতিকূল শক্তির চাপে নেহরুজীর সে স্বপ্ন আজও বাস্তবরূপ গ্রহণ করে নি। লালবাহাদুরের শ্রুতিভাষ্য জীবন ভারত-বাসীর মনে স্মৃতিস্বরূপ এই স্বপ্নসম্ভবের আশা জাগ্রত করে। দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁকে অকালে হারিয়েছি। শ্রীমতী গান্ধীর সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ রূপায়ণের জন্য চেষ্টিত থাকবেন বলে স্মৃতিস্বরূপ আশা পোষণ করতে উৎসাহ পাচ্ছি আমরা।

উৎসাহ পাচ্ছি এই কারণে যে, পিতার মতাদর্শ কন্যার ওপর যে প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতের জনগণের সে বিশ্বাস আছে। শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনে কোন কোন মহল সোৎসাহে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব পদ লাভের ফলে কংগ্রেস দলের প্রগতিশীল গোষ্ঠীরই জয় হল। এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের মধ্যে অবতরণ না করেও বলা যায় যে, শ্রীমতী



সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল

গান্ধীর মধ্যে আমরা এক কল্যাণমতী নেত্রীকেই কম্পনা করছি। এবং বিশ্বাস রাখি, তিনি দেশবাসীর মধ্যে আর্থিক অসাম্যের গুরুভার লাঘব করে, দেশবাপী মূল্যবোধ রোধ করে এবং কালোবাজারী স্বার্থচক্র দমন করে নতুন ইতিহাস রচনা করবেন অন্ততপক্ষে সেই খাতে দেশের আবহাওয়াকে বহমান করাবেন।

জয়তু নেতাজী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত আপোষহীন বীরদের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। “বড়া তেজী” এই মানুসিটি জানতেন বিনা রক্তক্ষয়ে স্বাধীনতা অর্জন এক অলীক স্বপ্নমাত্র। যাকে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আপাতদৃষ্টিতে সে সংগ্রাম ভারতবর্ষ করে নি এমন কথা মনে হলেও ওটা শূন্যমাত্র ফাঁকির কথা। স্বার্থ-বাদী বলিক ইংরেজ অকস্মাৎ দুর্মতি ত্যাগ করে ভারতের হাতে স্বদেশ শাসনের চাবি-ফাঁচিটি অমনি অমনি তুলে দিয়ে যায় নি। এজন্য ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা, শহীদের রক্ত-পান, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ৪২-এর বিদ্রোহ, নো-ব্রিটোহ, বিভিন্ন পর্বায়ের আন্দোলন ও ইংরেজের গুলারী মুখে অসংখ্য আত্মদান, ফাঁসীর মধ্যে আত্মোৎসর্গ ও সর্বোপরি বিহীন ভারতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা তথা সেই বাহিনীর বন্দুকের আঘাতে ইংরেজের পশ্চদপসরণ ও দেশবাপী করোগে ইয়ে মরেন্দ্রে সঙ্কল্পে সাধারণ মানুষের মনে

সৈনিকদৃঢ়তা ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বেও ভারতবাসী বৃকের রক্তই ঢেলে দিয়েছিল তবে নেতাজী যেখানে ‘বদলা’ চেয়েছিলেন, গান্ধী-ভারত সেখানে ‘বদলা’ চায় নি।

কিন্তু রক্তস্নানের শেষ হয় নি।

যত ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। যাবার সময় ভারতকে কেটে দ্বিখণ্ড করে গেছে যার বিষময় ফল অবশেষে তাসখন্দে বিশ্বক্ষয়ের শপথ গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার স্বপ্ন সম্ভব করতে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে নরনারী উদ্ধাস্ত হয়েছেন, প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অকস্মাৎ অন্ধকার ভাব-ষাতির হাতে সমর্পণ করে স্বাধীনতা চমক করেছেন। এ যদি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম না হয় তবে রক্তক্ষয় আর কেমন? স্বাধীনতার জন্য এই আত্মত্যাগ যদি সশস্ত্র বিপ্লবের চেয়ে কোন অংশে অন্যতর হয় তবে বলতে হবে সশস্ত্র বিপ্লব অপেক্ষাকৃত কম ক্রতির কারণ হয়ে থাকে। অন্তত নেতাজীর স্বপ্ন ভারতকে একই পতাকার তলে সমবেত করে ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। সে পথে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা লাভ করলে অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষ আজ দ্বিখণ্ডিত হত না।

নেতাজীর স্মৃতিচারণে তাই এখনই ভারতবাসী বসেন এখনই এই দম্ব সন্দিগ্ধ প্রশ্ন তাঁদের মনকে আলোড়িত করে। তাঁর

পথে পা বাড়ালে কি অধিকতর ক্রান্ত সম্ভাবনা দেখা দিত?

কিন্তু এ প্রশ্ন আজ অবাক্তর। নেতাজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে ভারতবাসী সৈদীন সর্ববাদী-সম্মতভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। নেতাজীর সঙ্গে নীতিগত বিরোধের জন্যই নেতাজীকে এক পাশে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল কংগ্রেস থেকে। কিন্তু ভারতপ্রেমিক চুপ করে বসে থাকেন নি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মদত দেওয়ার জন্য কল্লাকল্ল পৃথিবীর এক কোণ থেকে অপর কোণে ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্ববুদ্ধের ঘোরঘনঘটা মাথায় করে। কী ঐশ্বরিক আশীর্বাদে নেতাজী সৈদীন মনুষ্য-অসাধ্য ইতিহাস রচনা করে গেছেন তা বিস্ম-ইতিহাসে এক বিচিত্র বিস্ময় হয়ে থাকবে।

ভারতের গর্ব, বাংলার প্রিয়তম নেতা অগ্নিসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সূর্যসম জ্যোতি চির অম্লান প্রভার ব্যাবহার বীর ভারতকে প্রেরণা দান করেছে এবং করবে।

বীর ভারতের জয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়। বীরদের আদর্শ, বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর আদর্শ।

২০শে জানুয়ারী এই বীর নেতার পুণ্য আবির্ভাব দিবস। এ দিন ভারতের হৃদয়ে স্বর্গাঙ্করে লিখিত আছে। এদিন বীর ভারতের শপথ গ্রহণের দিন।

নেতাজীর ৭০তম জন্মদিবসে বীর নেতার প্রতি আমরা সম্রক্ত প্রীতি রাখি।

আন্তর্জাতিক



সাম্প্রতিক বিদ্রোহের পর নাইজেরিয়ার রাস্তায় সৈন্য-ভর্তি ট্রাক চলতে দেখা যাচ্ছে।

নাইজেরিয়া :

১৫ই জানুয়ারী নাইজেরিয়ার অক্সমাং বিদ্রোহের পর যে সব খবর পাওয়া গেছে, তার থেকে জানা যায়— (১) বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে; (২) নাইজেরিয়ার শাসন-ক্ষমতা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল আগুই ইরোনসির হাতে অর্পণ করা হয়েছে; এবং (৩) নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী আল হাজি স্যার আবু বকর তফাওয়া বালে-ওয়া বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

সৈন্যবাহিনীর একাংশের সহ-যোগিতায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বালেওয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই বিভিন্ন উপজাতির নেতা। মেজর চুকুমা এনজগবু এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী আল হাজি স্যার আবু বকর তফাওয়া বালেওয়া ও অর্থমন্ত্রী ফ্রেস্টেস ওবোট্টি এবোকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, এবং পরে তাঁদের মেরে ফেলে। এছাড়া পশ্চিম নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল

আকিনটোলা ও উত্তর নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার আহমাদু বেল্লাও বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহের ফলে সমগ্র দেশ জুড়ে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ বিদ্রোহের বিরোধিতা করায় এই বিদ্রোহ সফল হতে পারে নি। সৈন্যবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ইরোনসি দ্রুততার সঙ্গে বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসেন।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সর্বসম্মতিক্রমে সরকারের সকল দায়িত্ব মেজর জেনারেল ইরোনসির হাতে অর্পণ করে। ১৬ই জানুয়ারী তারিখেই পরিবহনমন্ত্রী আল হাজি জাম্বা বকর ডিপচারিমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেজর জেনারেল ইরোনসি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও সরকার ভেঙে দিয়েছেন। ইরোনসির নেতৃত্বে গঠিত একটি সামরিক পরিষদের হাতে দেশের শাসনভার থাকবে। বিভিন্ন অঞ্চলেও সেনানায়কদের সামরিক শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করা হয়েছে।

ইরোনসি বলেছেন, দেশের বিপদে নেতৃবৃন্দের অনুরোধেই তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। তা না হলে রাজনীতিতে অংশ নেবার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। ইরোনসি ঘোষণা করেছেন, শীঘ্রই নাইজেরিয়ার জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করা হবে, এবং তারপর সংবিধান অনুযায়ী নতুন নির্বাচন ও বেসামরিক সরকার গঠন করা হবে।

ইরোনসির ক্ষমতা গ্রহণে বাহিবিশ্ব আপাতত নিশ্চিন্ত হয়েছে। আফ্রিকার সর্বাধিক জন অধ্যুষিত এই বিরাট দেশে ব্যাপক সন্ত্রাস সূর্য হলে সব দিক দিয়েই তা চিন্তার কারণ হত। ইরোনসি শক্ত হাতে দেশের শাসন চালাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে বেসামরিক রাজনৈতিক শাসনের পরিবর্তে সামরিক ব্যক্তিদের হাতে শাসনভার অর্পণের ফলে গণতন্ত্রের গতি ব্যাহত হল, এমন মতও আছে। উগান্ডার প্রধানমন্ত্রী মিলটন ওবোট্টে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

নাইজেরিয়াকে আফ্রিকার বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হত। ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এই দেশের

প্রায় আড়াইশো উপজাতি ও চল্লিশটি ভাষাভাষীগোষ্ঠী কিভাবে একত্র রয়েছে, চরম পথ পরিহার করে কিভাবে এই দেশ উদারনৈতিক কর্মসূচী অনুসরণ করেছে, অনগ্রসর ও অশিক্ষিত এই দেশে কিভাবে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে, সেসব কথা গর্বের সঙ্গে বলা হত। কিন্তু এবারের বিদ্রোহে প্রমাণ হল, নাইজেরিয়ার গণতন্ত্র নেহাৎই তাদের ঘর। মদুহুতের আঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এমন হবার কারণ কি? বিদ্রোহের ষেটুকু পটভূমি জানা গেছে, তাতে মনে হয় গত অক্টোবরে পশ্চিম নাইজেরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল আকিনটোলা কর্তৃক জের করে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহীদের নির্বাচনে পরাজিত করার পর থেকেই গোলমাল সুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার থেকেই ব্যাপক বিদ্রোহের সূত্রপাত। যদি এই কারণ ঠিক হয়, তাহলে এর থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হয় যে, নির্বাচনে দলনীতি ও সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে।

অবশ্য নাইজেরিয়ায় নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধ রোগের লক্ষণমাত্র, রোগের কারণ নয়। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ এবং অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে এই বিদ্রোহের পেছনে। উত্তর নাইজেরিয়ার লোকেরাই যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর এদের অধিকাংশই মুসলমান। এদের ভোটার জোরে আল হাজি স্যার আবু বকর তফাওয়া বালেওয়া ও তাঁর 'ন্যাশনাল নাইজেরিয়ান অ্যালায়েন্স' দল ১৯৫৭ সাল থেকে একটানা দেশের শাসন চালিয়ে আসছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের অ-মুসলমান উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ আছে। উত্তর নাইজেরিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, কিন্তু পূর্ব নাইজেরিয়া খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ, এবং পশ্চিম নাইজেরিয়া শিল্পসমৃদ্ধ। পূর্ব ও পশ্চিম নাইজেরিয়ার অর্থ উত্তর নাইজেরিয়ার লোকদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, এই অভিযোগ আছে। তাছাড়া উত্তর নাইজেরিয়ার সামন্ত প্রভাবও অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের পার্থক্য, বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বোকা-পড়ার অভাব প্রভৃতি থেকে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার থেকেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্রোহের ফল যাই হোক, আল হাজি স্যার আবু বকর তফাওয়া বালে-

ওয়ার মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। বলতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় নাইজেরিয়া ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে। তিনি ধীর, স্থির ও উদারনৈতিক চিন্তা-ধারা সম্পন্ন। তাঁর মৃত্যু আফ্রিকার রাজনীতি থেকে একজন বিশিষ্ট নেতাকে সরিয়ে নিল।

নাইজেরিয়ার বিদ্রোহের পেছনে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ আছে কি না, এখনই তা জোর করে বলা শক্ত। তবে উপজাতি নেতা ওবাফোনি আওলোলো এই বিদ্রোহের পেছনে আছেন এবং আওলোলো এক শ্রেণীর ব্রিটিশ রাজনীতিকের স্নেহপুষ্ট, এমন অভিযোগ উঠেছে। নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ভেঙে উপজাতিদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের বিচ্ছিন্নতার দাবি নিয়ে আওলোলো দীর্ঘকাল ধরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। বালেওয়া ও অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে আওলোলো এতদিন সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠতে পারেন নি। জাতীয়তাবিরোধী কাজের জন্য আওলোলোকে দশ বৎসর জেলেও থাকতে হয়েছে। তবে তাঁর অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি।

ইরোনিরও প্রধান কাজ হবে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তা রোধ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা। নাইজেরিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আজিকিউই-ও লন্ডন থেকে এই কথাই বলেছেন। বিদ্রোহের সময় আজিকিউই লাগেসে ছিলেন না, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য লন্ডনে। তা না হলে তাঁকেও হয়তো হত্যা করা হত। আপাতত তিনি দেশে আসছেন না।

ইরাক :

পার্বত্য অঞ্চলের কুর্দ উপজাতিরা লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে ইরাকী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। ইতিমধ্যে ইরাকে বহুবার সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কুর্দদের বিদ্রোহ থামে নি।

মুস্তাফা আল বারজানির নেতৃত্বে কুর্দরা ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কুর্দস্তান গঠনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় ইরাকী সরকার বারজানির সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা করেছেন। অনেক আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, ইরাকের আর একটি প্রধান উপজাতি আসিরীয়রা কুর্দদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আসিরীয়দের প্রধান হচ্ছেন

একজন মহিলা। তাঁর নাম চেনিরম। চেনিরমের পিতা এস্টিফানও আসিরীয়দের নেতা ছিলেন।

কুর্দ ও আসিরীয়দের সম্মিলিত আক্রমণে ইরাকী সৈন্যদের বিপর্যস্ত হবার কিছু কিছু সংবাদ ইরান থেকে তেহরানের পত্রিকা 'এতেলাত' ও 'কোহান' প্রকাশ করেছে। 'কোহানের' খবর অনুযায়ী বিদ্রোহীদের হাতে গত কয়েকদিনে ৮০০ ইরাকী সৈন্য নিহত হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

কুর্দ ও আসিরীয়রাও আরবজাতি ভুক্ত। তবে তারা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাচ্ছে। প্রথম দিকে কুর্দরা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য পাচ্ছিল বলে অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। অবশ্য তখন ইরাক পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাগদাদ ছিল এই জোটের একটি প্রধান ঘাটি। বিপ্লবের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইরাকের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। তাই এখন কুর্দরা সমর্থন পাচ্ছে ইরানের কাছ থেকে। ইরান পশ্চিমী জোটের সঙ্গেই আছে।

জাতির পৃথক আত্মনিয়ন্ত্রণ সত্যি এক অপূর্ব জিনিস। কুর্দরা আগে পোত সোভিয়েট সাহায্য, কারণ ইরাক পশ্চিমী জোটে; আর এখন পাচ্ছে ইরানের সাহায্য, কারণ ইরাক বর্তমানে সোভিয়েটের বন্ধু!

অস্ট্রেলিয়া :

স্যার রবার্ট মেজিস দীর্ঘ বয়সের অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী থাকার পর অবসর গ্রহণ করেছেন।

নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, অথবা দলের আস্থা হারিয়েছেন বলে মেজিস পদত্যাগ করছেন না। বয়স হয়ে গেছে বলে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করছেন। তাঁর বয়স বর্তমানে ৭১। তিনি বলেছেন, "আমি ক্লান্ত। জনসাধারণের প্রতি ঠিক সন্নিবিষ্ট করে উঠতে পারছি না।"

রবার্ট মেজিসের জায়গায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন অর্থমন্ত্রী হ্যারল্ড হল্ট। সর্বসম্মতিক্রমে ৫৮ বৎসর বয়স্ক হল্টকে নতুন নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্যের জন্য হল্টের কৃতিত্বের কথা সকলেই স্বীকার করেন।

তবে হল্টের পক্ষে মেজিসের অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে কি না বলা শক্ত। মেজিসের ব্যক্তি বা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থেকে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি ও অস্ট্রেলিয়া সরকার বঞ্চিত হবে।

মৌজিসহীন লিবারেল পার্টি আগামী সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবে কি না, সে সম্পর্কেও বিভিন্ন মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতের কথা পরে হবে। আপাতত সকলেই আশা করবেন যে, হুট সাহায্যের সঙ্গে দেশের শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

দল ও সরকারের ওপর পূর্ণ হৃদয় থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে মৌজিস নিশ্চয়ই সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অধিকাংশ দেশেই বয়স হলেও নেতারা অবসর গ্রহণ করতে চান না। এদিক থেকে মৌজিসের আচরণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

মণ্গোলিয়া :

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মণ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিশ বৎসরের জন্য মৈত্রী, সহযোগিতা ও সাহায্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মণ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাতোর সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ এবং মণ্গোলিয়ার পিপল'স রেভলিউশনারি পার্টির প্রথম সম্পাদক ও মণ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ইউমজাগিন সেদেনবাল এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানী আক্রমণের হাত থেকে মণ্গোলিয়াকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন মণ্গোলিয়ার সঙ্গে বিশ বছরের জন্য একটি চুক্তি করে। এই বৎসর এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাই নতুন করে আবার চুক্তি হল।

চুক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সাহায্যের কথা আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রসঙ্গও আছে। মণ্গোলিয়ার সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করেছে।

এখন তো আর জাপানী আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই, তা হলে চুক্তিতে সীমান্ত রক্ষার কথা বজা হল কেন? মণ্গোলিয়ার সঙ্গে সীমান্ত তো একমাত্র চীনের রয়েছে। তাহলে এই চুক্তি কি চীনের বিরুদ্ধে? কূটনৈতিক-মহলে নতুন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

চীনের প্রলুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে মণ্গোলিয়ার ওপর। চীন বহুবার বলেছে, মণ্গোলিয়া ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সব দিক থেকেই চীনের অঙ্গ। রাশিয়ার হস্ত-

ক্ষেপে ৪৫ বৎসর আগে মণ্গোলিয়াকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তাই চীনের দাবি, মণ্গোলিয়াকে আবার চীনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের এই আগ্রাসী দাবির বিরোধী। চীনের সম্ভাব্য সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে মণ্গোলিয়াকে রক্ষার জন্য তাই এই চুক্তির প্রয়োজন হয়েছে।

রুশ-চীন যুদ্ধের এক নতুন অধ্যায় এবার মণ্গোলিয়াকে নিয়ে সূত্র হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার যে কত ঠুনকো তার একটি পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

জুলিয়ান বন্ড জর্জিয়ার প্রতিনিধি



জুলিয়ান বন্ড

সভায় (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স্) নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আইনসভায় সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারছেন না। বন্ডের অপরাধ, তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছেন।

জুলিয়ান বন্ড ২৬ বৎসর বয়স্ক এক নিগ্রো যুবক। গত বৎসরের নিগ্রো ভোটাদিকার আইন পাশের পর এই প্রথম জর্জিয়ার প্রতিনিধিসভায় নিগ্রোরা প্রবেশাধিকার পেলে। যে ৮ জন নিগ্রো এরাবের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, বন্ড তাঁদের অন্যতম। রাজধানী আটলান্টার একটি নিগ্রো-অধ্যুষিত কেন্দ্র থেকে বন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এবং শতকরা ৮২টি ভোট লাভ করে বিরাট জয়লাভ করেন।

বন্ড নিগ্রোদের অধিকার আন্দোলনের

লনের অন্যতম সংগঠন 'ছাত্র অহিংস সমন্বয় কমিটি' বা 'স্টুডেন্ট নন-ভায়লেন্ট কোঅরডিনেটিং কমিটি'র বিশিষ্ট সদস্য। এই প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের একটি সংগ্রামী সংস্থা। নিগ্রোদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সমালোচনাও এই সংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই সংস্থার সভাপতি জন লিউইস ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক আইনের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করছে, লিউইস এই কথা বলেন।

এই সম্পর্কে বন্ডের মত জানতে চাওয়া হলে বন্ড বলেন, তিনি এই ব্যাপারে লিউইসের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আর বাবে কোথায়? কি, প্রতিনিধিসভার সদস্য হয়ে এমন কথা! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিসভার বার জন শ্বেতাঙ্গ সদস্য স্পীকারের কাছে দাবি জানানলেন, বন্ডকে সদস্যপদ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত জর্জিয়া প্রতিনিধিসভা ১৮৪-১২ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বন্ডকে প্রতিনিধিসভার সদস্যরূপে গ্রহণ করা হবে না। ফলে অপর সাত জন নিগ্রো সদস্যরূপে স্বীকৃত হলেন, তারা নির্ধারিত শপথ গ্রহণও করলেন। কিন্তু বোচারী বন্ডের আর সদস্য হওয়া হল না।

অবশ্য বন্ডের উকিল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে প্রতিনিধিসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বন্ডের সমর্থক কয়েক হাজার নিগ্রো প্রতিনিধিসভা ভবনের সম্মুখে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

যে কোন আইনসভারই নিশ্চয়ই অধিকার আছে তার সদস্যের আচরণ বিচার করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের। সাধারণত দৃষ্টান্ত ও অভ্যুপায়ের জন্য সদস্যপদ থেকে কাউকে অপসারিত করা হয়। কিন্তু দেশের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করার জন্য এরূপ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্যি বিস্ময়কর। গণতন্ত্রের দেশ বলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাবি করে, সেখানে এই ঘটনা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। বন্ড বা তাঁর প্রতিষ্ঠান মোটেই কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন নন। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধিজীবীদের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে আজ জনসনের ভিয়েতনাম নীতির সমালোচনা সূত্র হয়েছে।



যা' কিছু অন্যায়, যা' কিছু অসংগত, বেআইনী তারই বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ!...ঘটনাপ্রস্রোতে গা ঢেলে দেওয়া কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন অন্যায় করার চাইতে সে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরও বেশি ঘৃণ্য অপরাধ। কাজেই তেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আসবেই।

একটা নীতিকে কেন্দ্র করেই আমি বেঁচে ছিলাম, একটা আদর্শের যুগকাণ্ডেই আমার জীবনকে আমি বাঁজ দিয়েছি, এর চাইতে বড় সাম্রাজ্য আর মানুষের কী থাকতে পারে? আমার আত্মা সহস্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আমার আরম্ভ রত্নকে সম্পন্ন করে তুলবে, এর চাইতে বড় আনন্দ মানুষের আর কী হতে পারে? আমার বাণী পর্বতে, প্রান্তরে, স্বদেশের চতুঃসীমা পেরিয়ে দূর দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হবে এর চাইতে বড় পুরস্কার মানব আত্মার আর কী আছে? আদর্শের বেদীমূলে নিরুদ্বেগ আত্মবিসর্জন অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তর সার্বকতা আর কিছুই নেই—কিছু থাকতে পারে না।

জাতির জীবনকে জাগ্রত করে তুলতে হলে ব্যক্তিকে জীবন বিসর্জন দিতে হবেই। ভারতবাসী যাতে বাঁচতে পারে, তাদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধিলাভের পথ যাতে সুগম হয় সেই জন্যই আমি মৃত্যু বরণ করে নেবো।

আমার দেশবাসীকে তাই আজ আমি বলে যাই—কীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় অভিশাপ মানুষের জীবনের আর কিছু নেই একথা কখনো ভুলে না; একথা কখনও ভুলো না যে, অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করে চলার মতো ঘৃণ্য পাপ আর কিছু নেই! সব সম্মুখ মনে রেখো এই শাস্বত সত্য—জীবন দিয়েই জীবনকে পেতে হয়; মলোদ ছাড়া না ভেবেই অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

—সত্যেন্দ্র

টোপছাড়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সাতাশ ॥

নব্ব্বদশ চিত্র

বিজ্ঞান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
কত তাড়াতাড়ি পায়ো, একবার এসো।
শ্রীবিলাসবাবুর চিঠি পেয়ে বিজ্ঞান
জ্বাক হয়ে গেল। তিনি যে সত্যিই
নিজে থেকে তার খোঁজ নেবেন বিজ্ঞান
ভাবতে পারে নি। সে ভেবেছিল
শ্রীবিলাসবাবু মৃৎখেই যেটুকু যা ভরসা
দেবার দিয়েছেন। কাজে কিছই
করবেন না। কিন্তু তিনি যখন
বিজ্ঞানকে সত্যিই খবর দিলেন সে একটু
স্বিধাগ্রস্ত হল। তাঁর বাড়িতে যাবে
কি যাবে না। তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক
স্বাধা কি আর সংগত হবে? এমন
মানুষের সঙ্গে বর্জন করাই উচিত।
তাঁর অনুগ্রহ-নিগ্রহের বাইরে থাকাই
ভালো।

কিন্তু বিজ্ঞানের বাবা এ ব্যাপারে
চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি
এগিয়ে এসে বললেন, 'ডেকে যখন
পাঠিয়েছে যা একবার। কী বলে
শুনো আর। যার সংসার চলে না তার
আবার অত গম্বু কিসের?'

সংসার যে অচল এই খোঁটা বাবা
আজকাল প্রায়ই দিয়ে থাকেন। তাঁর
দোষ নেই। এই বড়ো বয়সেও তিনি
যথেষ্ট পরিগ্রহ করছেন। তবু সংসারে
স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারছেন না। আর
বিজ্ঞান আগে পছন্দমত কাজ খুঁজেছে,
এখন যে কোন রকমের কাজ পেলেই
সে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাও জুটছে না।
ইরা একদিন হেসে বলেছিল 'দাদা,
তুমি এবার একটা মাদুলি-টাদুলি নাও।
কি শান্তি স্বস্তায়ন করাও। এত
জায়গায় এত ইন্টারভিউ দিচ্ছ। চাকরি-
গুদালি হব হব করেও হাত থেকে ফস্ক
যাচ্ছে, তোমার একটা গ্রহশান্তি-
গ্রহশান্তি করা দরকার।'

এসব অবশ্য পরিহাসেরই কথা
ইরার। ও নিজেও এসব দৈবে-টৈবে
বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞান তো করেই না।
কিন্তু তা না করলেও তার হাতের
মৃৎখো যে সব নেই তা এখন মানতে
বাধ্য হয়েছে বিজ্ঞান। বরং অনেক বস্তুই
তার আয়ত্তের বাইরে। এমন কি নিজের
স্বভাব প্রবৃত্তি প্রবণতাই কি সে ইচ্ছা
করলে বদলাতে পারে?

খানিকক্ষণ ইতস্ততের পর শেষ
পর্যন্ত শ্রীবিলাসবাবুর বাড়িতে গিয়ে
হাজির হল বিজ্ঞান। আগের দিনের মত
আজ আর তাকে বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে
থাকতে হল না। খবর পাওয়ার সঙ্গে
সঙ্গেই শ্রীবিলাসবাবু নিচে নেমে
এলেন। তারপর হাসিমুখে তাকে
বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।
'আ রে এসো এসো। সেদিন সেই যে
চাকরির কথা বলে গেলে তারপর আর
তোমার দেখা নেই। লোকে চাকরি
খোঁজে, আর তোমার বেলায় জলো।
চাকরি তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।
কিন্তু ধরতে পারছে না।'

বিজ্ঞান স্মিতমুখে বলল, 'কী করতে
হবে বলুন।'

শ্রীবিলাস তখন চাকরির ধরণের
কথা বিজ্ঞানকে বুঝিয়ে বললেন। অনেক
জায়গায় খোঁজ-খবর করে বিজ্ঞানের
জন্য উপযুক্ত কাজ জোটতে পারেন নি
শ্রীবিলাস। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই একটা
ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে তিনি বিজ্ঞানের
কাজ ঠিক করেছেন।

বিজ্ঞান বলল, 'স্টোরে কী কাজ
করতে হবে? সেলসম্যানের?'

শ্রীবিলাস একটু হেসে বললেন,

'কেন তোমার কি তাতে আপত্তি
আছে?' সেদিন তো তুমি বলেছিলে
যে কোন কাজ করতেই তুমি রাজী।'
বিজ্ঞান চুপ করে রইল।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'না সেলস-
ম্যানের কাজ তোমাকে করতে হবে না।
যারা ওই কাজে আছে তাদের দেখা-
শোনা করবে। সুপারভাইজারের কাজ।
মাইনে শ তিনেক টাকার বেশি আপাতত
ওরা দিতে পারবে না। অর্গানাইজেশন
তো বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর
তিনেক হল এটা আমরা গড়ে তুলেছি।
পরে যখন আমাদের প্রতিষ্ঠান বড় হবে
তখন এমপ্লয়ীদের সম্বন্ধেও আমরা
আর একটু বিবেচনা করতে পারব।'

বিজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব
দিল না। শ্রীবিলাস বললেন, 'ভেবে
দেখ। আপাতত এর চেয়ে ভালো
কোন কাজ আমার হাতে নেই। তাহলে
অপেক্ষা করতে হয়। কণা আমাকে
বিশেষভাবে বলোঁছিল তোমার একটা
চাকরির দরকার। তাই আমি ভাবলাম—'
বিজ্ঞান একটু চমকে উঠে বলল,
'কণা!'

কণার নাম শ্রীবিলাসের মৃৎ থেকে
সে শুনবে বলে যেন আশা করে নি।
ভেবেছিল তিনি এ নামটা সশব্দে
উচ্চারণ করতে সজ্ঞাচ বোধ করবেন।
এই নামটি তাঁর গোপন করে রাখবার
জন্যে। প্রকাশ করবার জন্যে না।

বিজ্ঞান একটু চুপ করে থেকে
বলল, 'কণাকে আপনি চেনেন নাকি?'

শ্রীবিলাস হাসলেন, 'আমি যে চিনি
তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। অনেকদিন
আগে থেকেই ওকে চিনি। তোমার

অনেক আগে থেকে। আসলে ওর
স্বাভাবিক সঙ্গী আমার বন্ধু ছিল।
তিনি অবশ্য আমার চেয়ে বয়সে
বড় ছিলেন। আমাকে খুবই ভালো-
বাসতেন। আমিও মাধ্যমত—। সে
যাক। ভারি ভালো মানুষ ছিলেন
ভদ্রলোক। খুব দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেছেন
জীবনে। তার মেয়ে ওই কণা। ওকে
আমি খুবই স্নেহ করি। কিন্তু বড়
একগুয়ে স্বভাব। দেখ, বাড়ি থেকে
আলাদা হয়ে আছে তো আছেই। এত
বলা-কওয়া কিন্তু কিছুতেই যাবে না
সেখানে। অথচ ওই বয়সের একটি
মেয়ের পক্ষে এমন একা একা থাকা
কি উচিত? মোটেই উচিত নয়।

বিজন স্তম্ভিত হয়ে রইল। কণার
সঙ্গে শ্রীবিলাসের যে সম্পর্কের কথা
সুন্দরীল তাকে বলেছিল তা কি
তাইলে সবই মিথ্যা? ওঁদের দুজনের
মধ্যে শুধু স্নেহের সম্পর্ক? তাছাড়া
আর কোন সম্পর্ক নেই? যে সম্পর্ক
কণাকে গৃহছাড়া করেছে, দুর্গতির
মধ্যে টেনে এনেছে তেমন কোন সম্পর্ক
নেই তাহলে?

একটু বাদে বিজন বলল, 'কণার
সঙ্গে আপনার তাহলে এখনো দেখা-
সাফা হয়?'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'হয় বই কি।
না হলে তোমার আবেদন তার মারফৎ
আমার কাছে এল কী করে?'

কিন্তু আমি তো তাঁকে আপনার
কাছে এসব কথা বলতে বলি নি।'

শ্রীবিলাস হাসলেন, 'তাহলেই বোঝ
তোমার ওপর তার সহানুভূতি কত
গভীর।'

বিজন কী যে বলবে ভেবে পেল
না। এ কি শ্রীবিলাসের পরিহাস না
চাপা ঈর্ষা?

কণাদের বাড়িতে সে মাঝে মাঝে
যায় একথা ঠিক। চাকরির জন্য বার্থ
চেষ্টা করে মন যখন অবসন্ন হয়ে আসে
তখন এক-একদিন কণার কাছে চলে
আসে বিজন। নিজের কথা, নিজের
সমস্যা-জর্জর পরিবারের কথা ভুলে
থাকবার জন্যে আসে। এসে চা খায়,
গল্প করে। কোনদিন কণার ঘরে তার
নাটকের দলের লোক থাকে। কণা
তাদের সঙ্গে বিজনের পরিচয় করিয়ে
দেয়। হয়তো তাদের নতুন নাটক
নির্যেই তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা
চলে। নিজেদের গুরুতর জীবননাট্যের
কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যায়
বিজন। কিন্তু কোন-কোনদিন আবার
একাও পাওয়া যায় কণাকে। সেদিন
নাটকের কথা বড় একটা হয় না।
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কণা বিজনের কথাই

জিজ্ঞাসা করতে থাকে। সংসারে কে
কে আছে, ভাইবোনদের মধ্যে বিজন
সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসে, বন্ধু
কে কে আছে? তাদের মধ্যেই বা
কে প্রিয়, কে প্রিয়তর এসব কথা জান-
বার জন্যে ভারি কৌতূহল কণার।
সারাটা দিন কী করে কাটে, কোথায়
যায়, কী করে, কণার যেন কৌতূহলের
শেষ নেই।

একদিন বিজন বলেছিল, 'আপনি
তো আচ্ছা চালাক মেয়ে। নিজের কথা
কিছু বলবার নাম নেই, শুধু অন্যের
কথা জেনে নেওয়ার দিকে লোভ।'

কণা একটু চুপ করে থেকে বলে-
ছিল, 'আমার কথা কিছু বলবার মত
নেই যে বিজনবাবু। কী বলব
বলুন তো। বলতে গেলে বানিয়ে
বানিয়ে বলতে হয়। জানেনই তো
অভিনয় আমাদের পেশা। নাট্যকারের
লেখা পাঠ মৃৎস্থ করে করে বলতে
বলতে নিজের কথা ভুলেই গেছি।
আমার কথা কিছু নেই বলবার মত।
আপনার কথা বলুন শুন।'

'কী জানতে চান বলুন?'

'সত্যি বলবেন তো?'

'আপনার কাছে কেন মিথ্যে বলতে
যাব?'

'তা ঠিক। বন্ধুর কাছে বন্ধুর
মিথ্যে বলতে নেই।'

এত স্পষ্ট উচ্চারণে ওর মুখে বন্ধু
কথাটি শুনে বিস্মিত হয়েছিল বিজন,
ভালোও লেগেছিল। এমন স্বীকৃতি
সে যেন অনেকদিন পায় নি। যেখানে
অপ্রাপ্তি চলছে দিনের পর দিন সেখানে
তিলমাত্র পাওয়াও যেন অপরিমিত
পাওয়া।

কণা সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিল,
'বলুন, কিসের এত দুশ্চিন্তা আপনার।
কেন এমন দুঃখানা শুকনো করে
রাখেন। হাসলে মনে হয় জোর করে
হাসছেন। কিসের দুঃখ আপনার?'

বিজন সত্যি জবাব না দিয়ে পারে
নি।

অবশ্য একটু পরিহাসের সুয়েই
বলেছিল, 'আপনি হয়তো নানারকম
রোমান্টিক ব্যাপার অনুমান করছেন।
কিন্তু সেসব কিছু নয়। দুশ্চিন্তার
মূলে নিতান্তই স্থূল দারিদ্র্য। বহু-
কালের বেকারত্ব।'

জিজ্ঞাসা করে করে আরো কিছু
কথা জেনে নিয়েছিল কণা।

তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল,
'আচ্ছা, দেখা যাক কী করা যায়।'

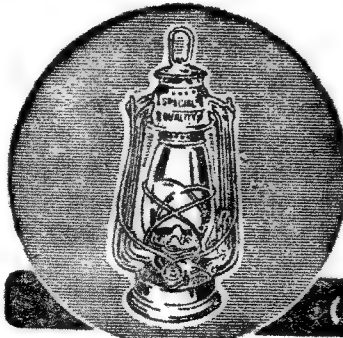
বিজন বলেছিল, 'না না আপনি
কী করবেন? আপনি কেন কণা
করতে যাবেন আমার জন্যে?'

কণা একটু হেসে বলেছিল, 'তা
অবশ্য ঠিক। আমি আর কী করব।
আমার সাধাই বা কতটুকু? বেশি
আমাদের নাটকের দলে আপনাকে দু-
এক নম্বর পাট দেওয়া যায় কিনা।
আর তা' না হলে প্রম্পটারের কাজ।
সব পাটই আপনাকে ফিসফিস করে
বলে যেতে হবে?'

বিজন হেসে বলেছিল, 'আপনি
বললে সবই পারব। মীন টানতেও
আটকাবে না।'

কণা বলেছিল, 'আটকাবে না তো?
জানা রইল।'

(কম্প)



কিয়ান
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঐকো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৬, ৩৩৬ চীনা বাজার ট্রাফিক লাইন

সুভাষচন্দ্র / আত্মজীবনী

স্বাধীন ভারতে একটি রাজনৈতিক উক্তি এই আঠারো বছর ধরে এতটা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, উচ্চতম মহল থেকে প্রচার যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে এতটা জোর গলায় চালু করা হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলাও যেন অব্যবহৃত শব্দ নয় অন্যান্যও বটে। সমগ্র পৃথিবীতে এর আগে যা কখনও ঘটে নি, তাই ঘটেছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর অসামান্য নেতৃত্বে। এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যগ্রহ আমাদের দোরে স্বাধীনতা পেঁচিয়ে দিলে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। স্বাভাবিক কারণে সে থেকেই এ দেশের স্বাধীন সরকারের পরিচালক জাতীয় কংগ্রেস, যে কংগ্রেস মহান নেতার উত্তরাধিকার আজও বহন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। বাহ্যিক মনে হয় এ উক্তি ইতিহাস-সম্মত। কিন্তু তথ্যের খুঁটিনাটি বিচারে এবং সন তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজালে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে গান্ধীজীর কংগ্রেস নিশ্চয়ই বড়ো কথা, তবুও তা একমাত্র কথা নয়। আজও আমরা জানি নে কেন তৎকালীন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদলের নেতা এ্যাটলি সাহেব সাড়বরে ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইংরেজ ভারত ছাড়বে কিন্তু ছাড়লে তারও দেড় বছর আগে, আইন করে এ ভূখণ্ড ভারত ও পাকিস্তান—এই দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রকে সাড়বরে স্বীকৃতি দান করে। এতবড়ো একটা ঘটনা নির্ধারিত তারিখের আগেই ঘটে গেল কেন? তখন তো কংগ্রেস কোন আন্দোলন করছে না, বরং ইংরেজের সঙ্গে আপোষে কথাবার্তা চালাচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে। তার পাঁচ বছর আগে বিয়াল্লিশের যে আন্দোলন সরু হয়েছিল তার আহ্বান কংগ্রেসেরই। কিন্তু সে আন্দোলন তো অহিংস সত্যগ্রহের গান্ধী পার হয়ে সশস্ত্র সহিংস বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতবর্গ বিয়াল্লিশের আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব শূন্য ঘটা করে অস্বীকার করেন নি, তার নিন্দার পশ্চম্ম হয়েছেন। বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো কংগ্রেসের বাইরে শূন্য নয়, কংগ্রেসের মতে অত্যন্ত

গাঁহিত ব্যাপার। সুভাষচন্দ্রকে দেশ-দ্রোহী অক্ষশক্তির চর বলে গালাগালি তখন শূন্য সাম্যবাদী দলই দেয় নি, কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কোন কোন নেতাও দিয়েছেন।

অবশ্য এ ইঙ্গিত এখানে করা হচ্ছে না যে শূন্যমাত্র বিয়াল্লিশের আন্দোলন এবং সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজই এ দেশের স্বাধীনতা এনেছে, এবং গান্ধীজীর কংগ্রেস গোণ। আমরা জানি, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং গ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনিই ব্যর্থ হয়েছিল বিগত পঞ্চম দশকের আন্দোলন দু'টি। বরং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজের চন্দনীত চরমে উঠেছিল এবং রক্ষণশীল দলের তৎকালীন সর্বাধিনায়ক চার্চিল সাহেব একদা সমগ্র ইংরেজ জাতির মনের কথাই জোর গলায় বলেছিলেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যকে বিলিয়ে দিতে তিনি কখনও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন নি।

কিন্তু তবুও দিতে হল বিলিয়ে, শ্রমিকনেতা এ্যাটলি সাহেবকে বলতে হয়েছিল কিছুকাল পরেই যে ইংল্যান্ডকে বাঁচতে হলে সাম্রাজ্যকে ছাড়তে হবে। এবং হলও তাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী মিরপক্ষের অন্যতম শক্তি। কিন্তু সে জয়লাভ ইংরেজের পক্ষে পরাজয়ের চেয়েও করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও তার জের ইংরেজ কি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে? সুতরাং জয়লাভ এখানে বড়ো হয়ে ওঠে নি।

তেমনই বড়ো হয়ে ওঠে নি ইংরেজের দমননীতির সার্থকতা ধাপে ধাপে প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতের জাতীয়তাবাদের অহিংস সত্যগ্রহ এবং সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন—এ দু'টিতেই ব্যর্থতা এসেছিল সত্য, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, শেষ কথা তো নয়ই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গঙ্গা-যমুনার মতো দু'টি ধারা এ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে মিলন বা সমন্বয়ের প্রয়াগতীর্থ খুঁজে পেয়েছিল। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের আভাষে পূর্বদিকগত তখনই হল রক্ত-বর্ণ। ইংরেজের দমননীতির কালো মেঘ তাকে আর আড়াল করে রাখতে পারলো না।

এ কথাই একদা বলেছিলেন

ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসের বহু তথ্যের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা এ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ভিত্তিতে তিনি করেছেন তাঁর তিন খণ্ড সমাপ্ত বিপুল গ্রন্থে—‘হিস্ট্রি অব দি ফ্রীডম্ মডুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া’তে। হিটলার সৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের শক্তির দুই মহানায়কের—যথাক্রমে গান্ধীজী ও নেতাজীর কর্মপথে রথচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এসেছে ভারত-ভূখণ্ডের স্বাধীনতা। এটাই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বিচারগ্রাহ্য তথ্যসম্মত সবচেয়ে বড়ো কথা।

লোকটোর দাবিতে সর্বাধিনায়ক নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যাবলী আমাদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তার প্রকাশে আজও আমাদের কুষ্ঠা রয়েছে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারকে আমরা পদে পদে ক্ষয় করে চলেছি। গান্ধীজীর পাশে নেতাজীকে আজও আমরা বৃহৎ জাতীয় মর্যাদায় স্থাপন করতে পারি নি। এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর কংগ্রেস এবং নেতাজীর মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব কী অপূর্ব সমন্বয়ের বাঁধাটি বাজিয়েছে, তার স্মরণ যেন আমরা শূন্যেও শূন্যে পাই নে।

বস্তুত এখানেই সুভাষচন্দ্র নেতাজী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিকার প্রতিমূর্তি সুভাষচন্দ্র, সকল ধারার পরিণতিলাভ এই মহাশক্তির পূর্বপ্রবাহের মধ্যে। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীর অহিংস কংগ্রেসের প্রতিবাদ, কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে তিনি গান্ধীজীর পথে না থেকেও গান্ধীজীরই শ্রেষ্ঠ শিষ্য। এ শিষ্যই তাঁর স্তাবকতার পথে নয়, সত্যের পথে জিজ্ঞাসার পথে, লক্ষ্যের অভিন্নতায় দৃঢ় থেবে মতভেদের পথে। জাতির জনকরূপে গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সুদূর ইউরোপের রণাঙ্গন থেকে রোডিওর মাধ্যমে সর্বপ্রথমে সত্যপথে অচণ্ডল পথিক তাঁরই অবাধ্য মানস-সন্তান সুভাষচন্দ্র। শেষ জীবনে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর যে বিপুল শ্রদ্ধা বা উদ্বেগ দেখেছিলাম, তার জন্ম বাপুজীর স্নেহময় বক্ষপটে। যদিও তাঁকে ঘিরে সুভাষ-বিরোধী

ধারা ছিলেন, তাঁদের খুঁশ রাখতে গিয়ে তিনি হৃদয়খান তাঁর নেতাজীর জন্য উজাড় করে দিতে পারেন নি। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী নীতির পরিপ্রেক্ষিতেও বৃদ্ধি মিত্র জন্মেছিল গান্ধীজীর চিন্তে। কেন না-সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নেতাজীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। এবং নেতাজী সত্যাপ্রবাহের পথে অহিংসাত্মক গান্ধীবাদী নন, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব সাধনার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের যে মুক্তি প্রয়াস, বীজাকারে তার জন্ম কংগ্রেসেরও জন্মের পূর্বে। স্বাধীন রাজনারায়ণ তার জনক। এ মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে পরিষ্কৃত, বিবেকানন্দের জীবন সাধনা, কর্মযোগ ও বাণী দ্বারা সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত। রাজনারায়ণ-দোহাইয় অরবিন্দ এ মন্ত্রের শুদ্ধ দার্শনিক নন, প্রথম বলিষ্ঠ রূপকার। অরবিন্দের পাশে বিবেকানন্দের মানসকন্যা নির্বেদিতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই দানা বাঁধলো বিপ্লব আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ রদ করতে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তার দমনে ইংরেজের চণ্ডনীতি সৃষ্টি করলে অনুকূল আবহাওয়া। স্বভাবতই এর আনাগোনা সমগ্র ভারতে সবার অলক্ষ্যে গোপন সুড়ঙ্গ পথে। দূরপ্রাচ্যে মৃত্যুপাগল যুবকদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এ আন্দোলন, মৃত্যুতে জয় করে দেশময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দেশের জনগণকে ঘামের বাঁচানোর গতিপথে এর রসদ সংগ্রহ করা। সর্বাত্মক বিপ্লবের পটভূমিকা সৃষ্টি করতে এরা সন্তাসবাদের আশ্রয় নিয়েছেন, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের নিমিত্ত ডাকাতি করেছেন, বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছেন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীগণ, লক্ষ্য স্থির রেখেছেন—ভারতের মুক্তি ইংরেজ কবল থেকে। এরা সন্তাসবাদী নন, এনার্কিস্ট নন, ডাকাত তো ননই। এঁদের ধ্যান-জ্ঞান ওই ভুবন মনোমোহিনী ভারতভূমি, এঁদের পথে একমাত্র কণ্টক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যা মাতৃভূমিকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত, এ কণ্টক উৎসাদনে এঁদের সর্বস্ব বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এরা একাধারে রক্ত ও শিবের পূজারী। একচোখে এঁদের জ্বলছে আগুন, সর্ব অকল্যাণকে ভস্মীভূত করতে, আর একচোখে এঁদের মনের আবেশ, ইংরেজ শাসনমুক্ত মুখী সমৃদ্ধ জনগণঅধাষিত ভারত-যেঁর স্বপ্ন।

সুযোগ এসেছিল এ শতাব্দীর

দ্বিতীয় দশকে ব্যাপক বিপ্লবের কর্ম-সূচী রূপায়ণের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে ইংরেজের বিপর্যয় এ সুযোগ এনে দিল। এ কাহিনী আজ ইতিহাসের কাহিনী, যাকে বাদ দিলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অর্থহীন। সমগ্র পৃথিবীর বৃহৎ কী অশ্রুত কর্মতৎপরতা তখন পরিলক্ষিত হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গদর পার্টি, ইউরোপের ও এশিয়ার সর্বত্র মর্দুটিমেয় ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থনে অপূর্ব সাড়া জাগানো, জার্মানীর সাহায্যলাভ এবং ভারতের অভ্যন্তরে অনুশীলন, যুগান্তর, আন্দোলিত সভা, হিন্দুস্থান রিপাবলিকান দল প্রমুখ বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার চাঞ্চল্যকর কর্মপ্রয়াস—শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু এ ব্যর্থতা পরম গৌরবের। ইংরেজের সকল দৃষ্টিচ্যুত এদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস তখন ইংরেজের সহযোগী, আপসে ইংরেজ শাসনের সমালোচক। অবশ্য তিলক, লাজপত রায়, এ্যানি বেসান্ট, বিপিন

পাল প্রমুখ চরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃবর্গ এর ব্যতিক্রম।

তারপর গান্ধীজীর অসামান্য নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভিনব গণ-আন্দোলন। এদেশের প্রবীণ বিপ্লবীরা তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দের বাণী যার অন্তরের অন্তস্তলে গভীর ঝঞ্ঝার তুলেছে। প্রথম থেকেই তিনি চরমপন্থী কংগ্রেস নেতা, আপসবিরোধী দেশপ্রেমিক। ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতা তিনি গভীর মনোনিবেশে লক্ষ্য করে আসছেন, তৃতীয় দশকের সন্তাসবাদী কার্যধারাকে তিনি অপর কংগ্রেস নেতাদের সুরে সুর মিলিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেন নি, তরুণের জয়ধ্বার আতিশয্যকেও তিনি নিন্দা করেন নি। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের বৃহৎ পটভূমিকার বোধহয় প্রত্যক্ষভাবে তিনি এলেন বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সংস্থাগুলির সম্পর্কে। ‘ভবিষ্যতের নেতাজীর’ মহড়া অনুষ্ঠিত হল যখন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাধিনায়ক



ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র

দুই দেশ

(এবং তাম্রলিপ্ত-কে মনে রেখে)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হোক এক মৃদুতের, তব মানুষের

নাম ধরে পরস্পর আলিঙ্গন,

তিলে তিলে সঞ্চিত ঈর্ষার নরক থেকে

এই উত্তরণ, প্রেমে অমল হওয়ার এই সাধ

পাশাপাশি দুই অন্ধকার দেশের ভিতর প্রথম আলোর মত

আমাদের পথ দেখায়। একটিই পথ। ভালোবাসা॥

হয়ে সুভাষচন্দ্র (জি, ও, সি) বাংলার তরুণ-তরুণীদের সামরিক কায়দায় পরিচালনা করবার সুযোগ পেলেন। কাগজে কাগজে মুখে মুখে তখন উপ-হাসের বন্যা ছুটোছিল, সুভাষচন্দ্র সবার মজা করে তখন বোধহয় মূর্চ্চকি হেসেছিলেন।

দু' দবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন শেষ আন্দোলনের আহবানে কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করতে। কিন্তু কংগ্রেসের হিসেবী নেতৃবর্গ তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করে ফেলত হলেন। এবার চরম বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে তিনি করলেন অন্তর্ধান। যতদূর শূন্যে ছি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন যাত্রার প্রাক-কালে। এবং তারপর বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর আজাদ হিন্দ সন্থার ও ফৌজ সংগঠন ও তার অধিনায়কত্ব। অসামান্য কার্যতৎপরতা, অলৌকিক দার্ঢ্য ও দুর্লভ শৌর্য স্বাভাবিক পক্ষে একটা ঝড় তুলে, ধূম-কেতুর মত পুচ্ছ নাড়তে নাড়তে অবশেষে তিনি বৃষ্টি মহাশয়ই বিলীন হয়ে গেছেন।

বালীন থেকে টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে এসে তিনি যখন রাস-বিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ সংস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন নীরবে এক তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটে গেল। পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ (League) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রাথমিক চর্চিত রাসবিহারীর, তাঁর দক্ষিণ হস্ত মোহন সিং। জাপান-সরকারের বিভিন্ন শিবিরে ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় বুদ্ধিবল্লীদেব দেশপ্রেমের বাঁধনে সংযুক্ত করে রাসবিহারী এ অসাধ্য সাধন করেন। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মসূচী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংককে অধিবেশন চলছিল, কার্যে স্বাধীনতা ও অবাধ্য সুযোগ লাভের জন্য জাপান-সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নানা কথা কাটাকাটি চলেছে, সভাপতি প্রবীণ অবিভক্ত রাসবিহারী দুর্দিক সামলাতে

প্রয়াস পাচ্ছেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে। অবস্থা পৌছালো চরমে। শূন্য অধিবেশন নয় এ অপূর্ব সংগঠনটিও ভেঙে পড়বার উপক্রম। রাসবিহারী অত্যন্ত বিরত বোধ করছেন। এমন সময় নাটকীয়ভাবে আবির্ভাব হল টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের। সিঙ্গাপুরের সাগর তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠলো, আনন্দে উদ্বেল হাজার হাজার ভারতীয় প্রতিনিধি স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি তুললেন, 'নেতাজী জিন্দাবাদ'। রাস-বিহারী স্বেচ্ছায় সানন্দে সুভাষচন্দ্রকে বরণ করলেন শূন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাজী রূপে নয়, পূর্ব এশিয়ার সমগ্র ভারতীয়দের সংহত স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক রূপে। তারপর তিনি চলে গেলেন অন্তরালে, নিশ্চিন্তে, প্রসন্নচিত্তে। তারিখ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩ সাল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতের বিপ্লব প্রয়াসের অন্যতম নেতা ছিলেন রাসবিহারী। তারপর ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে অন্তর্ধান করে জাপানে গিয়ে, সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর দেহাবসান পর্যন্ত (১৯৪৫)। কিন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এই অনলস যোদ্ধা অন্তরে চিরদিন ভারতীয়ই ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বিশ্বজোড়া ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার তিনি অন্যতম গুরোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বর্মিয়ান রাসবিহারী বসু সে কার্যেই নিবেদিত প্রাণ। এ কাজ তাঁর ফুরালো সেদিন, যেদিন সুভাষচন্দ্র বসু চরম সংকটমূর্ত্তে যুদ্ধবন্দীর পদবিশ্রম বেষে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাংলার দুই দামাল বসুদত্তের এ অভূতপূর্ব মিলন ও দেয়া-নেয়া ভারতের সামগ্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অপূর্ব সংযোগ সাধনের ঘটনা। অতীত থেকে বর্তমান তার উত্তরাধিকার বন্ধে নিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অলোকসামান্য কার্যকলাপ গভীর তাৎপর্যে বিকশিত হল।

একদা ১৮৫৭ সালে ইংরেজের

অধীনস্থ দেশী সিপাহীদের এক বৃহৎশ বিদ্রোহ করেছিল, কোন কোন স্থানে গণ-অভ্যুত্থানও ঘটেছিল। কিন্তু ভারত-মন্ড তখনও অনুচ্চারিত। ওই ঘটনা তাই ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের পটভূমিকা মাত্র হয়ে রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে যতীন মজুমদার, পিংলো, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূপেন দত্ত, হরদয়াল, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মী, মাদাম কামা প্রমুখ বিপ্লবীগণ ভারতমন্ড উচ্চারণ করে দেশী সিপাহীদের দলে টানবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ইংরেজের শত্রুর সাহায্যে ঘটবার প্রয়াস করলেন গণ-অভ্যুত্থান। মঠ, মন্ড ও সন্তান-বিশ্লবের এই তিনটি আনুষ্ঠানিক তাঁদের প্রয়াসে বিকশিত। এ প্রচেষ্টার সর্বশেষ ও সবচেয়ে সংহত অধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সংস্থা।

তার পরের ঘটনা বড় কাছের ঘটনা। লালকিলায় শাহনওয়াজ, ধীলন প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কদের ঐতিহাসিক বিচার, ভারত ভূখণ্ডে তা নিয়ে অভূতপূর্ব আলোড়ন এবং সন্তুষ্ট ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁদের মৃতিদান—এ সবই যেন ইংরেজের শেষ সিম্পান্তের ইঙ্গিত। ভারতীয় নৌবহরের বিদ্রোহও এ পটভূমিকায় স্মরণীয়। শোনা যায় যে, ইংরেজ নাকি গোপনে ভোট নিয়োঁছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সকল দেশী সৈনিকদের এবং সে ভোট পড়েছিল ইংরেজ শাসন অবসানের আনুকূল্যে।

তাই কি অমন তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত ইংরেজ নিয়োঁছিল এবং সর্বনাশ সামলাতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ভারত স্বাধীনতা আইন পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নিলেন এ্যাটলি সাহেব? অবশ্য ভারত ভূখণ্ড স্বাধীনতায় করে এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গের ওদ্যেবের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ তার সূক্ষ্ম কূটনৈতিক খেলা তখনও সাধকভাবে খেলোঁছিল। আজ ১৮ বছর ধরে তার জের টেনে চলেছে আমাদের মাতৃভূমি। এ দারুণ সংকট তার কবে কি ভাবে কাটবে, জানে শুধু ইতিহাসের নিয়তি।

বঙ্গদর্শন



সাধারণতন্ত্র-দিবস

আবার বছর ঘুরে এল।

“কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল”
ক্ষত-বিক্ষত করে আজ আমরা পুনশ্চ
সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা-
দিবসের ফসল তুলছি। স্বাধীনতার
ফসল। মুক্ত দিগন্তের কোল থেকে
স্বর্ণহরিত ফসল। এক বছরের প্রাতি-
দিবাসিক সংগ্রামের ফসল।

ক্ষেতখামার ভূবিষে ভাসিয়ে
ঝড়ের দাপটে এই এক বছর অনেক
ভাঙাগড়া করেছে। ষতটা গড়েছে,
ভেঙেছে অধিক। ষতটুকু আলো,
অন্ধকার তদনুপাতে কম নয়।

আলোর কথা বলতে হলে সেই
পূর্বানুভূতিই করতে হয়। এ আলোক-
প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ
এবং প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর অবদানই
স্মরণীয়। ভারতের প্রকৃত কঠিন
সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর ঐক্য এবং জাতীয়
চেতনার আহ্বানে আশ্চর্য সঙ্কল্প-
বন্ধভাবে সাড়া জাগিয়েছে। বাংলার ঘরে
ঘরে শোনা গেছে, করেছে ইয়ে মরেগে।
জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে বাঙালীমায়েই
প্রমাণ করেছে, তারা আগে ভারতীয় পরে
অন্য কিছু। ঐকান্তিক জাতীয়
চেতনা, ঐক্যবোধ এবং জাতীয় মর্যাদা-
বোধ একডাকে বাংলার মুখে তৈরি
উত্তর শুনেছে, না খাই- খাব না, ইচ্ছা
দেব না।। গোটা ভারতের মর্যাদা
রক্ষা করেছেন বীর বাঙালীবৃন্দ। নেতৃত্ব
দিয়েছেন বীর অজুদন সিং-এর সঙ্গে
বাঙালী বীর মেজর জেনারেল জয়ন্ত-
নাথ চৌধুরী।

ভয়ঙ্কর খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা
করার জন্য মধ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র
সেন প্রবর্তন করেছেন নয়া খাদ্যনীতি।
যে নীতি গৃহীত হয়েছে বাংলার
বাইরেও। নীতি হিসেবে নয়া-খাদ্য-
নীতি অভিনন্দনযোগ্য অনস্বীকার্য।
কিন্তু সরকার যা ভালোর জন্য করেন,
সরকারী আমলাবর্গ এবং সরকারী

নীতিকে কার্যকরী করার জন্য পুর্নলিখ
তাকেই বিকৃত রূপ দেয়। কথায় বলে,
“থরে আনতে বেঁধে আনা”। ঠিক
এজন্যই নয়া খাদ্যনীতি আজ সমগ্র
পশ্চিমবঙ্গে আভ্যন্তরীণ কারণ হয়ে
উঠেছে। খাদ্যনীতির উদ্দেশ্য দেশের
খাদ্যসম্ভারকে কড়িনিং-এর মাধ্যমে
সরকারী আয়ত্তাধীনে আনা এবং খাদ্যের
বণ্টনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে সকলের
জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করা। বলা
বাহুল্য, এ সমস্তই নীতি মানে পর্ব-
বসিত হয়েছে। খাদ্যনীতিকে সামনে
রেখেও খাদ্য পাচারের নশ্টারি কিছুমাত্র
প্রশমিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত
অতিক্রম করে খান পাচার হচ্ছে নিত্য-
দিন। এজন্য সরকার প্রয়োজনে গুলী-
চালানোর সঙ্কল্প গ্রহণ করছেন। আর
সেটাই সমূহ ভয়ের কারণ।

গোলাগুলি দরিদ্র সাধারণ মানুষের
ওপর স্বার্থান্বেষী পুর্নলিখ যেমনভাবে
প্রয়োগ করে থাকেন, আসল অপরাধী
তেমন করে শিকার করেন না। এজন্য
পুর্নলিখের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হন
তারা, হাঁড়িতে দুটো ফুটিয়ে নিয়ে যাঁরা
উপবাসের হাত থেকে বাঁচতে চান।
পুর্নলিখের দৌড় দূর কে-জি পর্বন্ত।
ওজনে ভারী হলে পুর্নলিখ এগোয় না।
গুলী চালানার সিঁধ্যান্তও সেই
সর্বনাশকেই ছাড়পত্র দেবে। নিরীহ
সাধারণ মানুষ মারা পড়বেন অতর্কিতে
বিনা অপরাধে অথবা লঘু অপরাধে
একথা বিশেষ চিন্তা না করও বলা
যেতে পারে।

খাদ্যনীতি চালু হওয়ার পর জন-
সাধারণের নিদারুণ অবস্থার চিত্র নিত্য-
দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে।
সরকার প্রতিকারের উপায় করলেও
সরকারী ইচ্ছাকে রূপদানের দায়িত্ব
যাঁদের ওপর ন্যস্ত—তাঁদের সদিচ্ছায়
এ পর্বন্ত ভরসা নেই। নীতি হিসেবে
খাদ্যনীতি তাই যতই অভিনন্দনযোগ্য
হোক না কেন, তিস্ত অভিজ্ঞতা এ
নীতিকে সাধারণের কাছে প্রিয় করে
তুলতে পারে নি। পরম্ভু মডিফায়ড

রেশনিং এলাকায় খাদ্যবস্তুর দীর্ঘ-
কালীন দুরবস্থা সরকার প্রবর্তিত
রেশনিং ব্যবস্থাকেও জনপ্রিয় করে নি।
একটি মহৎ উদ্দেশ্য ক্রমেই সাধারণের
চোখে ব্যর্থতার পর্যবসিত হচ্ছে।

রক্ষণা কলকাতা অবশ্য পূর্বে
রেশনিং-এর আওতার বহাল তবিরতেই
আছে, যেমন বহুস্তর শিল্পাঞ্চলে
যেখানেই পূর্বে রেশনিং সেখানেই
স্বস্তির নিশ্বাস শোনা গেছে। একমাত্র
সমস্যা সরকার কর্তৃক মূল্যবৃদ্ধি।
সরকার যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধির কালে
সাধারণের আর বৃদ্ধির কথাটা চিন্তা-
রাজ্যে স্থান দেন না। সরকারী কর্ম-
চারীবর্গই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাজার যে
অনুপাতে চড়ে তাতে অনেক কাকুতি-
মিনতি এবং সরকারী হুমকীর পর হয়ত
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অকস্মাৎ বদান্যতা
দেখিচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে ষৎ-
সামান্য আর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দেন।
কিন্তু সেই ভাতা বৃদ্ধি এতই নগণ্য
যে তাতে দারিদ্র্য বাড়বে বৈ কমে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মান্নিসভাস্থ
প্রথম কাজই নাকি হবে কেন্দ্রীয় কর্ম-
চারীদের ভাতাবৃদ্ধির প্রশ্ন বিবেচনা
করা। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা
বহুকাল যাবৎ আন্দোলন করেও
যৎসামান্য কিছু আদায় করে উঠতে
পারেন নি। যদিচ সরকার গত বছরেই
মানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধি করেছেন ও
করতে সাহায্য করেছেন, জিনিসপত্র
অগ্নিমূল্য হলেও তা রোধ করার
কিণ্ডিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নি এবং
নতুন বছরে পর পর দুধের মূল্যবৃদ্ধি
এবং রেশনের মূল্যবৃদ্ধি করে সাধারণের
ভাতা ঘাড় আরও চেপে ধরেছেন।

গত বছরে চাকুরীর সংস্থান বাড়বে
নি, আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে সন্দেশ
বন্দে, ধীরগতি মানবাহন নিয়ন্ত্রণে এবং
ক্ষেরীওরলা উচ্ছেদের সিঁধ্যান্তে। সাধা-
রণের ঘাড় বোঝার পর বোঝা চাপছে,
সরকার কেবল আদায়কারী।

প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র দিবসে মৃদুস্তির
আনন্দ স্থাপন করতে বসে দেখি সাধারণ

মানুষ অশেষ দুর্গতির ফলভাগী হয়েছেন এবং চতুর্দিক থেকে অন্ধকার তাদের অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধার মতো পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে।

তথ্যটি কী - অসীম ক্রেশভোগে শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশের মানুষ। ডি আই রুলের অস্তিত্বের জন্যই নয়, দেশকে আন্তারিকভাবে ভালোবাসার জন্য এই নিদারুণ অভাবের মধ্যেও তারা সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে এসেছিল দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে, সরকারী আহ্বানে মাড়া জানাতে।

দুর্ভাগ্য আমাদের, সরকার সাধারণের মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের বীরত্বটুকুকে মুক-বাধর মানুষের দুর্বলতা বলেই ধরে নিয়েছেন, তাই ইদনাকালে সাধারণের ওপর চাপ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার যে দ্রুততা ও তৎপরতা দেখিয়েছেন এবং দেখাচ্ছেন ও ভবিষ্যতে দেখাবেন তাতে মনে হয় সাধারণের সহ্য ক্ষমতার ওপর বর্তমানে সরকারী আস্থা অশুভ। এই নিরন্তর পেষণের শিকার যে সাধারণ মানুষ, সাধারণতন্ত্র দিবসে তাদের কাছে সরকারের দাবি কি আরও স্বার্থত্যাগের দাবিরূপেই দেখা দেবে, নাকি নতুন প্রতিজ্ঞার সাধারণের মন আলোকিত করবেন আমাদের সরকার? সাধারণতন্ত্রের প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে এই একটিমাত্র প্রশ্নই আজ উঁকি দিচ্ছে। আর সে প্রশ্নকে হাজির করার নৈতিক দায়িত্ব অসম্ভব করছি আমরা সাধারণতন্ত্র দিবসের আগমনী গাইবার সময়। (২২।১২।৬৬)

নেতাজী মৃত্যু

সস্তর বছরে পড়লেন ভারতের অম্বিতীয় লাড়িয়ে নেতা নেতাজী মৃত্যুচন্দ্র বসু। তেইশে জানুয়ারী বাংলা তথা ভারতের এই বীর সন্তানের জন্মদিবসসভা শোভাযাত্রা সহকারে দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়।

দুঃখের বিষয় বর্তমান বছরে নেতাজীকে কেন্দ্র করে মাত্র একুশে ছাত্রদের কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে ঝড় বহে গেছে। দুঃখ নয়, বলব লজ্জার এবং অকৃতজ্ঞতার এমন নজির জাতির জীবনে খুব অল্পই ঘটে, না ঘটাই থাকুক।

অনেক টলবাহানার পর যদি বা রাজস্ববনের সামনে নেতাজীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা (যে মূর্তির শৈল্পিক দৃষ্টি সম্বন্ধে এখনও বাগবিতণ্ডা চলছে) সম্ভব হল, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দল নেতাজীকে

কেন্দ্র করে তখন নতুন করে নোংরা ছোঁড়াছড়ি আরম্ভ করলেন।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৬০ সালে। তদবধি স্মারক ব্যস্ত (১) পৌর প্রতিষ্ঠান এই কর্মটি আর সমাধা করে উঠতে পারেন নি। (গুরা আবার কলকাতায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা হাত ছাড়া হচ্ছে বলে গোঁসা করেছেন। 'বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার সঙ্কল্প' কি এ জাতীয় হাস্যকর ব্যর্থতা-গদ্যলিখে লক্ষ্য করেই বলা হয়ে থাকে!) এখন ক্ষমতাসীন দল ব্যাপারটাকে ধামাচাপ দেওয়ার ফিকির খুঁজছেন। পূর্বাঙ্কে আলোচনা না করে পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজী জন্মোৎসবের আয়োজনও বাতিল করার চেষ্টা চলছিল তলে তলে। বিরোধীদের দারুণ উত্তেজনা অবশেষে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার-ব্যাপারে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাশ কামিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। এ ঘটনা সম্পর্কে খব্বারের ভাষাও খুঁজি পাওয়া ভার। নেতাজীকে নিয়ে এই প্রহসন সৃষ্টির অধিকার পৌর প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাসীন দলের কতটুকু আছে বিরোধীপক্ষ সে প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন। বস্তুত বাংলার প্রিয় নেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি যে ছেলে-খেলা নয় এ আক্কেল পৌরসভার থাকা উচিত ছিল। নেতাজীর মূর্তি বাংলার হৃদয়ে প্রোথিত আছে। পৌরসভার ক্ষমতাসীন দল সে মূর্তি প্রতিষ্ঠায় স্বার্থান্বেষিত হলে আপন ক্ষুদ্রতাই প্রকাশ করবেন। নেতাজীর প্রতি ভ্রম্বারা মানুষের অবিচলিত প্রীতিক্রমে কিছু-মাত্র বিচলিত করা যাবে না, ইতিহাসের গায়েও সামান্যতম আঁচড় পড়বে না। বরং একটি কুখ্যাত গহ্বরে বর্তমান ক্ষমতাসীন সদস্যবর্গ নির্মল্জিত হবেন। নেতাজীকে নিয়ে এঁদের এ জাতীয় ঔন্মত্য ভগবান ক্ষমা করুন, দেশবাসী করবেন না। বিশেষত যে নাগরিকগণের টাকায় এ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাঁরা কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন, তাঁদের টাকা 'নয়-ছয়' করার অধিকারের সঙ্গে তাঁদের টাকার সম্বল না করার অধিকার পৌরসভা কোথেকে পেলেন।

কার পুনর্বাসন

পূর্ববঙ্গের যে ছিন্নমূল ভাই-বোনদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার গুরুদায়িত্ব পুনর্বাসন-দপ্তরের ওপর ন্যস্ত আছে, সে দপ্তর যে কখনই মানবতাবাদী মনোভাব নিয়ে আপন

কর্তব্য পালন করে নি তা বলাই বাহুল্য।

আমরা অনেকেই বিভিন্ন সূত্রে অবগত আছি যে, এই বাংলা দেশের পুনর্বাসন-দপ্তরের বদান্যতায় প্রথম 'হিড়িক' বহু পরিবার সরকারী সাহায্যে প্রায় বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন যদিও তাঁরা খাঁটি উদ্ভাসতু কাম্বিন-কালেও ছিলেন না। অথচ পুনর্বাসন-দপ্তরের বদান্যতায় তাঁদের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করার তেমন প্রচেষ্টাই হয় নি। আর তাই দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বসবাসকারী (প্রথম দাঙ্গা-পূর্ব যুগ থেকেই) লোকেরা ভুলো পরিচয়ে উদ্ভাসতুগণের প্রতি প্রদত্ত সরকারী সাহায্যে মোটা রকম ভাগ বসিয়ে নিজেদের পুনর্বাসিত করে নিয়েছিলেন এ পুনর্বাসন-দপ্তরের অশেষ কৃপায়। যিনি ভাড়াবাড়ির একটি কামরায় কোন রকমে মাথা গুঁজতেন, তাকে দেখা গেল একটুকরো ছমি যোগাড় করে 'মোকাম' বানিয়ে বসেছেন। যিনি করতেন দালালি তাকে দেখলাম প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরূপে। যেন বঙ্গ বিভাগটা তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যই হয়েছিল। প্রকৃত উদ্ভাসতু অনেকে উদ্ভাসতু পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড পয়স্ট পেলেন না।

আর পুনর্বাসন-হ'ল পুনর্বাসন-দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দের কিছু পাইয়ে দিয়ে কিছু করে নিলেন তাঁরাও। দেশবাসীর সঙ্গে এতাবড় নিষ্ঠুরতা, স্বার্থবাদী মনোভাব তা-ও সম্ভব। বানরের পিঠে ভাগের এজাতীয় আর একবার চড়াপত সুযোগ এসেছিল সরকারী কর্মচারি ও দালাল গোষ্ঠীর। গত মহামুশ্বের কালে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে তখনও বহু-লোক উদ্ভাসতু হয়েছিলেন ল্যান্ড রিকু-জিশনের নোটিশে। তখনও প্রকৃত দাবিদারের অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন অনেকে। এঁদের মধ্যে উকীল সম্প্রদায়ও ছিলেন। যে সমস্ত উকীলের ভাগ্যে এ্যাডভোকেটের কেস পর্যন্ত ছিল স্বপ্ন, তাঁদের অনেকে যুদ্ধের কল্যাণে দালালি করে অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীসম্প্রদায়ের ন্যায্য পাওনা-গন্ডায় নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছিলেন।

সেসব আজ ইতিহাস। সে ইতিহাসে অপরাধী শিকারের বড় রকম কোনো নজর নেই।

কিন্তু নয়া ইতিহাস এবার হবার তেমন তো হয়ই নি; এবার সরকারী কর্মচারি ও দালালচক্র নতুন পুরুরে জাল ফেলেছেন। সরকারী

টাকা (বলা বাহুল্য পুনর্বাসন-দপ্তরের) আশ্রমস্বত্বের এ অভিনব উপায়। কৃষ্টিম উপায়ে জমির দর-দাম বৃদ্ধি করে এক-যোগে দালাল, জমির মালিক, পুনর্বাসন-দপ্তরের কর্মচারি। এবং ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন দপ্তরের কিছু কর্মী সরকারের সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছেন। সরকারী (বলা বাহুল্য জনসাধারণের) টাকা তছরূপের এ আর এক পদ্ধতি।

সহযোগী 'যুগান্তর' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা এতৎ সম্পর্কে একটি চাপ্ত্যাকর সংবাদ প্রব্রবেশন করেছেন ২১।১।৬৬ তারিখের 'যুগান্তরে'। আমরা সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনায় সম্পূর্ণ সংবাদটি এখানে উদ্ধৃত করলাম :

“এক শ্রেণীর দালাল সরকারী কর্মচারীদের যোগ-সাজসে কম দামের জমি বেশি দামে পুনর্বাসন বিভাগকে গচ্ছিয়ে দিয়ে প্রচুর দাঁও মারছে বলে এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ যে, সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার এই অসাধু কারবারে শুধু পুনর্বাসন বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী নয়, ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন বিভাগেরও কয়েকজন কর্মচারী জড়িত আছেন।

দালাল ও সরকারী কর্মচারীদের এই অসাধু চক্রটির কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অভিযোগে বলা হয়েছে যে, দালালরা প্রথমে এক লটে কিছু জমি ঠিক করে জমির মালিকদের বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি দরের লোভ দেখিয়ে জমি বিক্রি করতে সম্মত করায়। অতঃপর তারা পুনর্বাসন বিভাগের কয়েকজন কর্মচারীর সহায়তায় এই জমি পুনর্বাসন বিভাগকে দিয়ে কেনাবার ব্যবস্থা করে। ইত্যবসরে তারা এই সমস্ত জমি বিভিন্ন লোকের নামে চড়া দামে রেজিস্ট্রী করিয়ে রাখে। এরপর পুনর্বাসন বিভাগ যখন এই জমি কেনে তখন বর্তমান বাজারদর হিসেবে সেই বকম চড়া দামই তারা পুনর্বাসন বিভাগের কাছ থেকে আদায় করে। এই কেনা-বেচার প্রতিটি স্টেজেই বিশেষ বিশেষ সরকারী কর্মচারীদের সহায়তা থাকে।

প্রকাশ যে, এইভাবে এই অসাধু চক্র পুনর্বাসন বিভাগকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বিধা প্রতি ৪০০ থেকে ১০০০ টাকা যেখানে জমির ন্যায্য দাম, সেখানে এই চক্রের কারসাজিতে পুনর্বাসন বিভাগকে ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে হয়েছে। তার মধ্যে জমির আসল

মালিকরা পেয়েছেন বিধা প্রতি ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা—বাকী টাকা এই চক্র আত্মসাৎ করেছে।

প্রকাশ ২৪ পরগনা জেলার একটি পুনর্বাসন স্কীমের জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রে কিছুদিন আগে এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে এবং আর একটি স্কীমেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। এই সম্পর্কে ওয়াকফহাল একটি মহল থেকে দাবি করা হয়েছে যে, সরকার কোন সংলোককে দিয়ে ভালভাবে এই অভিযোগের তদন্ত করলে ফাঁকি ধরতে পারবেন। দুই-এক বছরের মধ্যে পুনর্বাসন বিভাগ যত জমির দাম দিয়েছেন বা এখন দিতে যাচ্ছেন, সবগুলি সম্পর্কেই তদন্ত করা হোক। বর্ষাকালে ২।৩ ফুট জল জমে থাকে এমন জমিও বিধা-প্রতি ৫।৬ হাজার টাকা দামে কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।”

নদীয়া :

কাছারীর কাছ

আইন-আদালত, কোর্ট-কাছারী, রোজমন্টী-সাবরোজমন্টী অফিসের কেছা কাহিনী অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে। সব থেকে বেশি যাঁদের জানা আছে তারা উকীল সম্প্রদায়; আইনকে বে-আইন এবং বে-আইনকে আইন করে যাঁরা রুতদিন জীবিকা সংগ্রহ করেন। তাঁরা জানেন, এই আইনী দুনিয়াটার চৌহদ্দিতে স্রেফ বে-আইনী কর্মকলাপ কেমন শেকড় গেড়েছে। এ নিয়ে এক হাত আইনের লড়াই-এ কস্মিনকালেও তাঁরা আসবেন না। কেন না বে-আইনের চাপটুকু তাঁদের বইতে হয় না, বহন করেন মজেল সমাজ।

বিচারকদেরও এই অবিচারের প্রতি নজর রাখা অকর্তব্য। অভিযোগ হাজির না হলে কোর্ট বসানোর অধিকার তাঁদের নেই।

পুলিশের কাজ নয় আইনের ফাঁকি দিয়ে কে কোথায় গলে যাচ্ছে তার হিসাব রাখা, আইনের ফাঁসে লটকানোই তাঁদের কর্তব্য।

সরকারের সময় নেই আদালতী অনাচারের লিস্ট তৈরি করা, আচরণের গত্বে বেঁধে দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ।

সাধারণের ভরসা নেই অবিচারের উত্তর দেওয়ার। রফা এবং বন্দোবস্তই তাঁদের লম্বাটলিখন।

তাঁই আদালতে বাবদর এক টাকা পিওনের চার আনাই রেওয়াজ। চলে আসছে, চলে আসবেও।

প্রসঙ্গ প্রবেশের আগে একটু উপক্রমণিকা রাখি।

সদ্য পূর্তাবয়োগে বাদ কখনও দিশাহারা হন, পিতৃদেবের সংসামান্য সম্পত্তির উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কিছুই জ্ঞাত না থাকে; তবে কোনো এক উকীলবাবদর স্মরণ নিন। তাঁরই সঙ্গে সোজা আদালত তীর্থ দর্শনে চলে যান। পিতৃদেবের উত্তর-রাধিকারী সম্পত্তির হাদিস করতে কাছারীতে উপস্থিত হতে হবে বৈকি। কেন না তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, এস্টেট ডিউটির নোটিশ তো মূখিয়ে আছেই। মরেও শান্তি নেই। না মূছা বরণ করে পিতৃদেব বেঁচেছেন, অশান্তি আপনন।

উকীলবাবদর রেকর্ড রুমে হাজির হন।

সারি সারি বাবদর পুরীর পাণ্ডায় মত স্ব স্ব রেকর্ড র্যাক সাজিয়ে বসেছেন। প্রবেশমাত্র সতৃষ্ণ চোখ ছেঁকে ধরবে আসুন আসুন।

ভাববেন, খাতিরের এই ঘটাপট্টা আদৌ সুবিধের নয়। কারণ জনান্তিকে ইতিপূর্বেই উকীলবাবদর জিনিয়ে রেখে ছিলেন খুচরো সিকি আখুলি টাকা সঙ্গে নিতে।

—খবরদার! বেশি টাকা একসঙ্গে বার করবেন না! পকেটে ফেরৎ আসবে না তাহলে একটাও। উকীলবাবদর বোলোছিলেন।

যথা আজ্ঞা। বার করবেন না কদাচ। ঠিক মানুষটিকে চিনে বার করবেন উকীলবাবদর।

এক মুখ না-কামানো দাড়ি; গয়লা পোশাক। নখরকান্তি দর্শনের পরও কীটানুকীট বলে ভ্রম হয়। বেকর্ড-রক্ষক বলবেন,—কতদিনের রেকর্ড। এক সাজ? তাহলে পাঁচ সিকে। পুরনো আড়ই টাকা।

দিতে হবে। গুণে গুলে টাকাটি টেবিলে রাখলে কার্ড পাবেন। টুকে নিন। নকল নিতে হয়, ব্যবস্থা করুন।

এসমস্ত করতেই পাঁচটা বাজবে। পাততাড়ি গোটাতে হবে আপনাকে। আর প্রস্থানের সময় সবিস্ময়ে দেখবেন, রেকর্ড রুমের কেরানীবাবদর বুক পকেট, পাশ পকেট, গেঞ্জী পকেট থেকে রাশিকৃত চেপ্টানো, লেপ্টানো, দলা-পাকানো নোট টেবিলের ওপর জমা করেছেন। চার আনা হিসেব পিওনের পাওনা সরিয়ে রেখে মূঠোখানেক নোট ময়লা জামার তলায় নিয়ে টোঁটের পাশে পিক গাড়িয়ে দিয়ে নখরকান্তি শরীর মোচড়াবেন। কাছারীর পথ-ঘাট শূন্য হলে হেলতে-দুলতে বাড়ি ফিরবেন। ফেরার তাগিদ নেই। মাস মাইনের কেরানী নয়, মাইনের ওপর

দিনের উপর। এক-একদিনে প্রায় মাইনের সমতুল। হাল, তবু বারিয়ার কি দর্শনীয় ঘটপটা।

পিতৃবিরেগের প্রথম অভিজ্ঞতা এমন হতে পারে।

এমত ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেবে যদি আপনি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়া-খানাকে ডানে বা বাঁয়ে রেখে জাজেস কোর্ট ধরে জজ কোর্টে হাজিরা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে আপনাকে নদীয়ার সাবরেজিস্ট্রারী অফিস গিয়ে দলিল তৈরি করতে হয় তবে ওখানকার স্থানীয় পাক্ষিক পত্রিকা 'প্রমিক ও সমাজের' সংবাদদাতা যেমন জানাচ্ছেন তেমনি অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়েই যাবেন। কেন না কাছারীর কাছা ঠিক যেখানে বাঁধা, সাদাসিধেভাবে সেখানেই ঘেতে হবে।

এ সমস্ত আকছার চলছে মশাই। সবাই চলছে।

বিস্মিত হবেন না। বস্মিন দেশে যদাচার। এতে বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই। সবাই জানে, সব 'কানা মনে মনে জানা'। তথাপি সংবাদদাতা নিম্নলিখিত কাহিনী শুনিয়েছেন, এবং শিরোনামে লিখেছেন, 'সাব-রেজিস্ট্রারী অফিসের আজবকান্ড' ভদ্রলোককে উপরোক্ত বিস্তারিত কাহিনী এজন্যই শোনাতে হ'ল। আপত্তি ঐ শিরোনামে। সংবাদটি শুনুন :

"সাব-রেজিস্ট্রারী অফিসগর্ভে এক আজব ব্যাপার। জমিদারী কায়দা বিশেষ। সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব কোন জায়গায় নিজের খেয়াল খুশিমত সামান্য সময়ের জন্য অফিসে আসেন আর কোন জায়গায় হস্ত আসেনই না। আসিলেও তার কতকগুলি সহি ছাড়া আর কিছই করেন না। কিন্তু কিছু না করিলেও বা অনুপস্থিত থাকিলেও দলিল রেজিস্ট্রারী আটকে থাকে না, কেরানীবাবুসহ সবকিছু করিতে পারেন। সম্ভবত তিনি (সাব-রেজিস্ট্রার) তাঁহার সকল ক্ষমতাই কেরানীবাবুদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কেরানীবাবুসহই সর্বসর্বা বনিয়া আছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কেরানীবাবুসহ দাতার নাম সহি করাইয়া প্রয়োজনীয় স্থলে টিপ নিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সনাত্তকারীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া দলিলের উপর সহি করাইয়া রাখিয়া দলিলের রসিদ দিয়া বিদায় দেন। বেশি টাকার বা সংখ্যালঘুদের দলিল হইলে প্রথমে দলিল রেজিস্ট্রারী করিতে নানাপ্রকার আইনের পক্ষ তোলা হয়

বটে; কিন্তু চুক্তি বা বন্দোবস্ত অন্তে নাকি সবই আইনসম্মত হইয়া যায়।"—১৬।১ ৬৬

আজব কান্ডটা কোথায় মশাই। ঐটি যদি আজবকান্ড হয় হবে শুঁদেরই কাগজেই, অন্যত্র একটি সংবাদ শুনলে তো 'চন্দ্র ছানাবড়া' বলতে হয়। কিন্তু কপালে সবই হয়েছে। এসব খবর এখন শানহীন এটোকটা কাকে পিঁপড়েও হতাশ হয়ে স্পর্শ করে না। বুদ্ধন, এদেশে বাস করেও আজ উনি ঘুরের খবরের শিরোনাম লিখছেন "আজবকান্ড"। ঘুরঘাষ যদি খবর হবে তবে নন্দাজী সদাচার করে অমনভাবে 'সমারসল্ট' খাবেন কেন?

অন্য খবরটি নিম্নরূপ :

"একজন মহিলা মেপে ঠিক দু'কে-জি চাল মদনপুর বাজার থেকে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর মুখে শোনা গেল, দু'দিন থেকে চালের সংস্থান করতে না পেরে কয়েকটি সন্তান-সন্তিককে তিনি অনাহারে রেখেছেন। নিজে তো বটেই। আজ দু'কে-জি চাল কিনতে গেলে তাঁর আনন্দের সীমা নাই। তাঁর কোলে একটি শিশু, অন্য একটি শিশু কাপড়ের খুঁট ধরে মায়ের পায়ে পায়ে চলছে। মহিলার অপর হাতে দু'কে-জি চালের ব্যাগ।

"সতর্ক' প্রহরী নিষ্ঠাবান পুন্ডলিশ এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলার উপর চাল ছিনিয়ে নিতে। চালের পরিমাণ কম দেখে পুন্ডলিশ "চাব আনা" দাবি করল মহিলার নিকট। পয়সা তাঁর ছিল না। পুন্ডলিশকে সন্তুষ্ট করতে তিনি পারলেন না। ফলে তর্ক-বিতর্ক, অনুন্নয়-বিনয় আর হুঙ্কার। একদিকে আতর্নাদ, অন্যদিকে বীর প্রতাপ। লোক জমে সব শূনে চেপে ধরল পুন্ডলিশকে। ভাবগতিক দেখে পুন্ডলিশ দিল চম্পট। শিশু কোলে মহিলা জনতাকে আশীর্বাদ করতে করতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

এবার বুদ্ধন। কিন্তু সাংবাদিকদের বোঝার কে।

বর্ধমান :

গৌরী সেনের ধান

"রায়না ২নং রকের যশাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপাধ্যক্ষ লিখিতেছেন,— সরকারের বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে বর্ধমান জেলার রায়না ২নং রকের অধীন বাতাসপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি ধান্য ক্রয় করিতেছেন এবং উক্ত সমিতির অধীন বৈদ্যপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায়

সমিতি ধান্য ক্রয়ের এজেন্সি জইয়া ডিসেম্বর মাস হইতে প্রায় ৩০০ কুইন্টাল ধান্য ক্রয় করিয়াছে। উক্ত ধান্য রাখিবার ঠিক মত গুদাম ঘর না থাকায় বাহিরে বস্তায় সাজান রাখিয়াছে। গত ৩রা জানুয়ারী সমস্ত দিন বৃষ্টি হওয়ায় ৬০ কে-জি ওজনের প্রায় ১৫০ বস্তা ধান্য জলে ভিজিয়া গিয়াছে।"—দামোদর

গৌরী সেনের চাল পচেছিল কলকাতার সরকারী গুদামে। স্থানীয় দামোদর পত্রিকা ধান পচার পূর্বাভাষ জানাচ্ছেন বর্ধমান থেকে। আশা করি এ সংবাদও যথারীতি উপেক্ষিত হবে।

সারা বাংলা দেশে কে কোথায় ছেলের মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্য কে-জি দুয়েক চাল সবুয়ে নিয়ে যাচ্ছে অমনি শূনি, পুন্ডলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেড়ে নেয় মুখের অন্ন। কী কত ব্যাপারায়ণ দেশ কী বা কতব্যের নির্দেশ! একবার তো এক মহিলাকে গুলী করে মেরে ফেলাই হল। তা হোক, তা হোক। রাস্তার মানুষের কি আর দর-দাম থাকে। গুলী পড়তো আজ আর সংবাদও নয়। সংবাদ নয়, বস্তা বস্তা চালও। সংবাদ ঐ দু'কে-জি। ঐ মতই বোধ হয় ওপরতলার নির্দেশ।

তাই বস্তা বস্তা গেল বলে 'গেল গেল' রব তোলার কী মানে হয়! ওসবের কোনো ব্যবস্থা হবে না, কোথাও সাড়া মিলবে না। স্থানীয় 'দামোদর' পত্রিকার সংবাদদাতাকে বরং অনুরোধ, তিনি 'দু'কে-জি' পাচারেরই সংবাদ দিন। কালে গোয়েন্দা বিভাগের ষড়্ কর্তা হলেও হতে পারেন। অন্তত 'নেক নজরে' থাকবেন, বিষ নজর বর্তাবে না।

এবার সরকার বাহাদুর গুলী চালাবেন শুনছি। গতশ্রে গুলী-ভোগীও জনগণ। এ সময় গোলাগুলীর মোক্ষম তাকের (লক্ষ্যের) জন্য কিছু 'দু'কে-জি' চাল পাচারকারীকে লক্ষ্য গুলীর ভেতর পাওয়া চাই। সাংবাদিক মশায়, যদি গোয়েন্দা হওয়ার বাসনা না থাকে তবে, অন্তত উল্টো পথ ধরুন, ঐ নিরীহ 'দু'কে-জি' বাহকদের সাবধান করুন, বলুন, এদেশের শান্তিরক্ষক শিকারীরা 'চিড়িয়া শিকারী'! সূতরাং সাবধান। বাঘ-ভালুকের ধার-কাছ ঘেঁষেন না তাঁরা। সূতরাং সাবধান!

সাবধান! দেড় শ' দুশ বস্তার সংবাদ দেবেন না। ওতে শূন্য দুস্কৃত-কারীর পায় ভাঙি হবে। গোঁফে বৃগুণ মোচড় পড়বে। আপনার আমায় বক্তব্য নস্যন্য হয়ে যাবে, যেমন গেছে।



উবারী মুখোপাধ্যায়

আন্তিক্যাবাদের প্রবক্তা কার্যেক্‌গারদ একশ' তিপ্পার বছর আগে ওই ১৮১০ খৃস্টাব্দে এমন একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল যাব দার্শনিক চিন্তা অতি সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এই মনীষীর নাম সোরেন কার্যেক্‌গারদ। আন্তিক্যাবাদী দর্শনের তিনিই প্রথম প্রবক্তা। তাঁর একটি গ্রন্থে সোরেন লিখেছেন তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে—

"It was in the years when money went mad, when so many notes lost their value. Something in me makes me seem big, but because of the market I am worth but little."

আজ এই মানুষটির আকৃতি সম্পর্কে তাঁর উত্তরকালের মানুষের মনে কোনো সংশয় নেই। রূপকথার বাদুর হান্স্‌ ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসেনের মত ডেনামার্কের বিদগ্ধ জীবনে সোরেন কার্যেক্‌গারদ এক মহৎ চরিত্র হিসাবে স্বীকৃত। এই প্রতিভাধর মানুষটি এক বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন অনাগত যুগের মানুষদের।

সোবেন কার্যেক্‌গারদের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হান্স্‌ ক্রিস্টিয়ানকে আক্রমণ করে লেখা এক রচনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শক্তিশালী লেখককে কার্যেক্‌গারদ ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে তাঁর সমালোচনা করেন। এই রচনাটির নাম "From the Papers of One Living." প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য-লতীর্ণ অ্যাডাবসনকে নিন্দা করেন, কারণ অ্যান্ডারসেনের রচনায় কোনও সুদৃঢ় দর্শনের ছাপ নেই। অ্যান্ডারসেনের ধারণাদেশারী প্রতিভাধর মানুষের সম্ভ্রা নিয়ে কার্যেক্‌গারদ স্লেষাচ্ছক উক্তি করেন:

"Genius is not a candle that can be extinguished by a puff of wind, but a conflagration that only a storm can challenge."

পাঁচিশ বছর বয়সে পোঁছে কার্যেক্‌গারদ

প্রতিভার সংজ্ঞা বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গে অ্যান্ডারসেনের সিংহাসনের অনেক পার্থক্য ছিল। সোরেন কার্যেক্‌গারদের রচনাকে এক হিসাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা বলা যায়। কার্যেক্‌গারদ হেগেন শহরের সত্যতা এবং সদাচরণের খ্যাতি ছিল না। ওরস্ট জটল্যান্ডের মানুষ কার্যেক্‌গারদের মনে কোপনহেগেনের প্রতি একটা প্রতিশোধম্পূর্ণ প্রবাহিত ছিল। জ্যানিশ সাহিত্য গবেষক ভিলহেলম অ্যান্ডারসেনের মতে কার্যেক্‌গারদের ব্যক্তিমানসে একটা ক্রম জেগেছিল, তিনি যেভাবে জন্মেছেন এবং যেভাবে আপনাকে রূপান্তরিত করেছেন এই স্বপ্ন সেই মানসিকতার স্বপ্ন।

ওরস্ট জটল্যান্ডের জলাভূমিতে সোরেন কার্যেক্‌গারদের পিতৃদেব মেধপালকের কক্ষ কল্পতরু। অসাধারণ বুদ্ধিমান কার্যেক্‌গারদের এই জনক আপনায় তিক্ত জীবনের কথা সিন্তা করতেন। তারপর সহসা বা স্বাভাবিক তাই হবে বসলেন, একদিন গাছাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে একদিকে স্বর্গ-রাজ্য আর অপরদিকে তাঁর ভেড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাণপণে ঈশ্বরকে অভিশাপ বর্ষণ করলেন। তারপর রাজধানীতে পৌঁছানোর পরই তাঁর প্রচণ্ড জ্ঞান তাকে পথনির্দেশ করেছে। শহরে এসে তিনি পশম ব্যবসারীর বস্ত্র গ্রহণ করেন।

চল্লিশ বছর বয়স হলে তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সঞ্চিত অর্থসম্পদের মধ্যে একরকম স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের সেই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার আর উত্তর মেলে না। তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে দীক্ষিত করলেন। পারিবারিক বাসভবনের অলিগলিতে ছুরিয়ে তাকে এক বিচিত্র কল্পলোকের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, তারপর পুত্রকে একদিন বুকের দিলেন যে, খৃস্টতন্ত্র যে বস্তুটি বিশেষভাবে দাবি করে তার নাম বাধ্যতা।

১৮৫০ খৃস্টাব্দে মতের বছর বয়সে কিশোর কার্যেক্‌গারদ ছাত্রজীবনে প্রবেশ করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা

শুরু করছিলেন, কিন্তু বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারলেন না। কাগজ পড়াশোনার পন্থাতির যে সংকীর্ণ নিয়মানুবর্তিতা তা তাঁর ভালো লাগে নি। এইকালে একের পব এবং মানসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, জীবনের দর্শন সংকলন চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হবোঁছিল। সোরেন কার্যেক্‌গারদের সকল রচনায় মধ্যে এই জীবনদর্শনের সমস্যা, নব ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের তার প্রতিটি বচনা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। আনুমানিক ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি তিনটি মধ্যযুগীয় চরিত্র বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন ডন জুয়ান, ফাউস্ট ও অহাস-ভরুস—বথাক্রমে আনন্দ, সংশয় এবং হতাশার প্রতীক। এরপর স্লেব এবং বগবন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন জীবনের দর্শনের অতি ব্যস্তির সম্বন্ধে।

লেখাপড়া হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না, শব্দ পিতাব কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই পালন করার প্রয়োজনে তিনি পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর এই প্রতিশ্রুতির কথা মনে হয় কার্যেক্‌গারদের। ১৮৪০ খৃস্টাব্দের ভদ্র মাসে অবশেষে তিনি ধর্মতত্ত্ব স্নাতক হয়েছিলেন।

সোরেন কার্যেক্‌গারদের সাবস্বতঃসংকল্প কাঙ্ক্ষ বাইরের প্রভাবে অনেকাংশে প্রভাবিত। তাঁর সমগ্রপীর আর কোনো বিদগ্ধ পুত্রদের মানসিকতা এ ভাবে বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে নি। তবে কালের ব্যবধানে এসব কথা তুচ্ছ এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

কার্যেক্‌গারদের স্বলিপিত এক উক্তি থেকে জানা যায় যে একবার এক ভূমিকম্পের ফলে তাঁর জীবনের ধারা পবিবর্তিত হব। ঠিক কোনকালে এই ঘটনাটি ঘটে তা জানা যায় না, সম্ভবতঃ ১৮৩৫ খৃস্টাব্দ—তবে নিশ্চয়ই ১৮৩৮-এ পিতার মৃত্যুর অনেক আগেই যে ঘটনা ঘটে থাকবে।

কার্যেক্‌গারদ তাঁর জ্ঞানকে লিখেছেন—

"It was when the earthquake occurred, the frightful up heaving

which suddenly forced on me a new law for the interpretation of all phenomena. Then I began to realise that my father's great age was not a heaven-sent blessing, but rather a curse: that our family's splendid intellectual capacity only existed so that we could horror each other; I felt the stillness of death deepen around me when I saw in my father an unhappy spirit that would survive us all, a Cross on the grave of all his own hopes."

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কারেক্-গারদ এই কালের মধ্যে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন তাঁর পিতৃদেব - কিভাবে ঈশ্বরকে অভিযাচ দিচ্ছেলেন এবং এর ফলেই ভাবাবেগপ্রধান পুত্রের মনে ভূ-কল্পন জেগেছিল। যাই হোক এবং যেভাবেই হোক, এই অভিজ্ঞতা কারেক্-গারদের বচনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে আর সেই সঙ্গে তাঁর মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে।

এই অশান্ত এবং অসন্তুষ্ট আত্মাকে আর এক অভিজ্ঞতা প্রভাবিত করেছে। কারেক্-গারদ প্রচুর লিখেছেন প্রেমে আশ্রিত হয়ে, তাঁর প্রিয়তমা বোজেন ওলসেন তাকে ভীষণ উৎকণ্ঠিত করেছেন। মানসিকতার ওপর এক প্রচণ্ড চাপ পড়েছে, এক বছর পরে সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, যথচ এই মহিলাটিকেই সমগ্র সাহিত্যকর্ম টেনে রাখতে পারেন কারেক্-গারদ।

কারেক্-গারদ ঠিক কি যে বলতে চেষ্টা করেন, এই মহিলার সঙ্গে কেন যে মিলন হল না তা অনুমান করা কঠিন, তবে কৈফিয়ত হিসাবে এক ভাষ্যকার বলেছেন, 'the thorn in the flesh' এবং 'the eternal night which broods in our innermost heart.'

একথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে, এই ক্ষণেও তাঁর কবিতামনসকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর রচনার কাব্যমিতির পিছনে আছে এই ইঙ্গিত। বিশেষ করে 'The Restoration' এবং 'Guilty / Not Guilty'। এই দুটি গ্রন্থ এই গড় ইঙ্গিত বহন করে এসেছে।

জীবনের শেষ দশটি বছর কারেক্-গারদ দুটি অভিজ্ঞতার জড়িয়ে পড়েন। এই দুই অভিজ্ঞতা তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর প্রচণ্ডতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'The Corsair' নামক পত্রিকে তিনি উত্তোজিত করে তোলেন, অথচ এই পত্রিকার সম্পাদক আগে তাঁর প্রতি সহস্রাব ব্যবহার করেছেন। এই সম্পাদকের নাম মায়ের গোম্ভসমিডট। গোম্ভসমিডট দ্বিগুণ হলেন কারেক্-গারদের

প্রতি। তাঁর ব্যঙ্গ তিনি কারেক্-গারদের চরিত্রে এমন কালিমা লেপন করলেন যে কারেক্-গারদ শহরের সবচেয়ে হীনতম এবং উপহাসকর চরিত্রে পরিণত হলেন। পক্ষে যদি একটু ধৈর্যের সাথে কারেক্-গারদ তখন নোয়া অবাচ্যত্বের দল এমন কি বারাক্কা-সমাজও তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। কারেক্-গারদ অনুভব করলেন এতদিনে তিনি শহীদ হতে পারছেন— "I was being ridiculed to death." ইতিমধ্যে খৃস্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতা ব্যক্তি পেল।

কারেক্-গারদের জীবনের শেষ ভূমিকল্পন হল একটি বক্তৃতা। বিশপ মাইনস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বিশপ মার্টেনসেন এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, মৃত মানুষটি 'a witness for truth.' এই উক্তিই কারেক্-গারদের মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটল। সবকিছু খৃস্টবাদের প্রতি তিনি প্রতিবাদ জানালেন, তাঁর মতে খৃস্টবাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। প্রকৃত খৃস্টবাদ সম্পর্কে কারেক্-গারদের রচনাবলী বা 'দি ইনস্ট্যান্ট' নামে প্রকাশিত তার মধ্যে তিনি সত্যের সাক্ষী হতে গেলে কি কি প্রয়োজনীয় সঙ্গুণ থাকা প্রয়োজন তা এক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই সঙ্গুণ শহীদদের চেয়ে কিশিং নিচু থাকে। এই রচনা সম-কালীন ধর্মীর বাদ-প্রতিবাদের এক পথ উন্মুক্ত করে দিল। এই বাদ-প্রতিবাদ অতি তীব্র আকার নিয়েছিল। অতিরিক্ত পবিত্রতায় ক্লান্ত এবং প্রান্ত হতে পড়েছিলেন কারেক্-গারদ। তাঁর বিরোধ ছিল 'সিলক এবং তেল-ভেট পরিহিত পুরোহিত' সমাজের প্রতি। এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কেপেন-হেগেনের ফ্রেডারিক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হল কিন্তু ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বিয়ার্লিশ বছর বয়সে কারেক্-গারদের মৃত্যু ঘটল। দেহ ও মনে তিনি জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন।

কারেক্-গারদের রচনার পিতা এবং প্রিয়তমা বোজেন প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাবহার দেখা দিয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আইদাত — অব' (১৮৪০) এবং 'স্টেজেস অব লাইফস ওয়ে' (১৮৪৬)। একত্রে বিচার করলে এই দুটি গ্রন্থে তিনটি বিভিন্ন স্তরের বিবরণ পাওয়া যাবে, কিংবা পাওয়া যাবে কারেক্-গারদের সৃষ্ট অনুযায়ী জীবনের দর্শন। এই হল কারেক্-গারদের মতে বিশেষত্ব বৈদ্য এবং এর মধ্য থেকেই মানুষকে একটা দিক নির্বাচন করে নিতে হবে। নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং ধর্ম এর মধ্যে একটি দিক গ্রহণ করতে হবে।

নন্দনতাত্ত্বিক পর্ব একটা বিশেষ মনোভাগী মাত্র, জীবনকে উপভোগ করার একটা ভংগী।

নন্দনতাত্ত্বিক সম্পর্কে এমনই যে সেখানে নব্বই ভূমিকা হল সম্মোহকের (The Diary of a Seducer), আমি সিডিউসারকে প্ররোচক বলতে চাই না। যারা নন্দনতাত্ত্বিক তাঁরা মধ্যবিস্ত্রপ্রণীর জীবন-সংগ্রামের ভূমিকাটি অবজ্ঞা করে থাকেন এবং কেবলমাত্র আনন্দের সাগরে ভেসে থাকতেই ভালোবাসেন।

এর বিপরীত দিকে, যারা নীতিশাস্ত্রানু-যায়ী 'এথিক্যাল ম্যান', তাঁদের জগৎ কঠোর এবং কর্মপার স্বাভাবিক। তাঁদের কাছে রমণী জ্ঞান কিংবা জননী হিসাবে পরম রমণীর। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ The stages—guilty or not guilty). কারেক্-গারদ তাঁর নিজের অসুস্থ-প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কিভাবে অপরাধের সমস্যা যে মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারে অসুস্থ তাকে ত্যাগ করে, এই ঘটনা তখনই ঘটে যখন কোন মানুষের জীবনে ঈশ্বরের সম্পর্কটাই মূল বা কেন্দ্রগত বিষয়ে দাঁড়ায়। এই বস্তুটিকে সে শব্দে তার মতামত বা বাসনা দিয়ে আঁকড়ে থাকে না, এই ঘিরেই তার অস্তিত্ব, বা তার অস্তিত্বের এই একমাত্র মোহ। কিংবা আরও সরলভাবে সে তার জীবনটাকেই সংকটের মুখে ঝেঁলে দেয়।

এতদ্বারা কারেক্-গারদ বলতে চেয়েছেন যে ধর্মীর জীবন এর নিজস্ব চরিত্রানুসারে, চিন্তার বিরোধী, স্বাধীন চিন্তার প্রতি তার স্বভাব বিরোধ। এ এক বিসংবাদ। এর সমাধানে অপরে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু মানুষ একেবারে নিজের দায়িত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এইসব এবং অন্যান্য অনেক রচনা বিভিন্ন ছদ্মনামে প্রকাশ করেন কারেক্-গারদ—কিন্তু ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে এইসব ছদ্মনাম তিনি স্বীকার করে নেন, 'A Concluding Unscientific Postscript' নামক গ্রন্থে।

কারেক্-গারদ বোঝাতে চেয়েছিলেন নন্দন-তাত্ত্বিক বা নীতিতাত্ত্বিক দর্শনের অসম্পূর্ণতা। জীবনের শেষের দিকে ধর্মীর দর্শনের দাবির এক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেছিলেন কারেক্-গারদ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন ধর্মীর দর্শনের দাবি সম্পর্কে। আন্তিকবাদী মানুষ যেভাবে থাকে ব্যক্তি হিসাবে খৃস্টবাদে বিশ্বাসী—সেইভাবে জীবনব্যাপন করবে। কারেক্-গারদের খৃস্টবাদের শরীক হওয়া যায় না। অপরে এই তত্ত্ব থেকে গভীর অনুচ্ছিন্ন ও প্রেবণা পেতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব অপরের সম্প্রতিতে পরিণত করা কঠিন।

কারেক্-গারদের ধর্ম হল তাঁর প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এই দিকে খৃস্টবাদ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা লেখকের খৃস্টবাদ থেকে পৃথক। কিন্তু বেবনা ও আবেগে সোয়েন কারেক্-গারদ লেখার বা প্যাসকালের সমপ্রণীভূত।

মানবেন্দ্রনাথ রায়

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস যে সব মহা-মানবের চিন্তায় ও কাজে মহীয়ান হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর যথোপযুক্ত স্থানটি হতে আজ পর্যন্তও বঞ্চিত। বুদ্ধির দীপ্তিতে দৈদীপ্যমান ও কর্মের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়েও ভারতবর্ষের জনমানসে তাঁর স্থান আজও গৌণ।

অতি সাধারণ ঘরের ছেলে এই নরেন্দ্রনাথ যিনি ভবিষ্যতে মানবেন্দ্রনাথ নামে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ২৪ পরগণার আর-বিলা গ্রামের একজন স্কুল-শিক্ষক। তাঁর জন্মের সাল তারিখও ঠিক জানা নেই। পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কীয় ভ্রাতা অশ্বিন-সুগের বিখ্যাত বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, বাংলা, ১২৯৩ সালে তাঁর জন্ম। সেটা ইংরেজী ১৮৮৬-৮৭ সাল হয়। গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে যখন ভর্তি হন তখন থেকেই বিপ্লবীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, প্রভাসচন্দ্র দে নামে এক বিপ্লবীই প্রথম স্বাদেশিকতায় মনো-নরেন্দ্রনাথকে অনুরাগিত করেন। বিপ্লবী নেতা অরবিন্দের সাথে একই ঘাড়িতে তিনি তখন বাস করতেন। শীঘ্রই একজন প্রেরিত বিপ্লবী কর্মী রূপে তিনি পরিচিত হন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ডাকাতির মামলায় তিনি ধরা পড়েন— ১৯০৭ সালের চিৎড়িপোতা ডাকাতির মামলা, ১৯০৯ সালের ডায়মন্ডহার-যারের নিকটবর্তী নেত্রা গ্রামের ডাকাতি মামলা, এবং ১৯১১ সালের হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলা। প্রমাণের অভাবে তিনবারই তিনি বিচারে মুক্তি লাভ করেন। যাদুগোপাল মৃধোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিতে বলেন যে, চিৎড়িপোতার ডাকাতিই বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম সার্থক ডাকাতি।

ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মৃধোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা এ যুদ্ধের সুযোগ নিতে যত্নপরিচর। রাসবিহারী বোস

ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করছেন। ১৯১৫ সালের আরম্ভে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্যে বাংলাদেশ থেকে যতীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে রাসবিহারী কাশীতে ডেকে পাঠান। বিদ্রোহের জন্যে অর্থ প্রয়োজন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এবং নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিপ্লবীদের চেষ্টায় ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী গার্ডেন রীচ ডাকাতি সংঘটিত হল। বিপ্লবীরা ১৮০০০ হাজার টাকা নিয়ে পলায়ন করে। আরও দুজন বিপ্লবী কর্মীর সাথে নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়লেন। জামীনে মুক্তিলাভ করেই তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র আনার উদ্দেশ্যে গোপনে সি, মার্টিন নাম ধারণ করে বাটাভিয়ার পালিয়ে যান।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক বিশ্ব-ছোড়া ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। বাংলাদেশে সে ষড়যন্ত্রের নেতা হলেন-

গৌরীপদ ভট্টাচার্য

বাঘা যতীন। জার্মানী থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার এক পরিকল্পনা করা হয়। সে অনুসারে নরেন্দ্রনাথ বাটাভিয়ার জার্মান কন্সাল ভন হেলফেরিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বাটাভিয়ারা যাবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথ নিজের বাঘা যতীনের বালেশ্বরে পৌঁছে দেন। বিদায় নেবার প্রাক্কালে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেনঃ “অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারো আর না পারো তুমি কিন্তু ফিরে এসো; তোমার জন্যে অখীরভাবে আমি অপেক্ষা করে থাকব।” বহু বৎসর পরে এ কথা স্মরণ করে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, সে বিদায় অভিনন্দনই ছিল মানবতাবাদ ধর্মে আমার প্রথম দীক্ষা।

১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে অস্ত্রের সন্ধানে নরেন্দ্রনাথ সি, মার্টিন নাম ধারণ করে বাটাভিয়ার অভিমুখে রওনা হলেন। তার পনের বৎসর পর ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ডাঃ মামুদের ছদ্মবেশে তিনি আবার ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি আর নরেন্দ্রনাথ নন—তিনি

তখন বিখ্যাত কমরেড এম, এন; রায়। এই পনের বৎসরের বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের ইতিহাস স্বল্পপাঠ্যসরে বর্ণনার অসাধ্য।

অস্ত্রের সন্ধানে নরেন্দ্রনাথের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Memoirs-এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জার্মানীর কোনই আগ্রহ ছিল না। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা মাত্র। অস্ত্রের সন্ধানে নরেন্দ্রনাথ জাভা, ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ালেন। রাসবিহারী বোস, সানু ইয়াং সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ হল। চীন থেকে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার এক ব্যবস্থা করেন। যাদুগোপাল মৃধোপাধ্যায় বলেন যে; নরেন্দ্রনাথের সংবাদ পেয়ে তাঁরা কয়েকজন বিপ্লবীকে সে অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সে চেষ্টাও বিফল হয়। নরেন্দ্রনাথ চীনে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত এডমিরাল হিঞ্জের সাথে দেখা করে একটা পরিকল্পনা পেশ করেন। হিঞ্জ বললেন যে তাঁর পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয় এবং তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে জার্মান সরকারের কাছে যেতে অনুরোধ করেন। এবার সুরু হল জার্মান ষাওয়ার চেষ্টা। আমেরিকা হয়ে জার্মান যাবেন, স্থির করলেন। আবার জাপান গিয়ে রাসবিহারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে হেরল্‌ব গুপ্তের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। হেরল্‌ব গুপ্ত ছিলেন আমেরিকাতে বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী কর্মিটির প্রতি-নিধি। স্থির হল যে হেরল্‌ব গুপ্ত আমেরিকা গিয়ে নরেন্দ্রনাথকে জার্মান যেতে সাহায্য করবেন। ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মে নরেন্দ্রনাথ সান-ফ্রান্সিসকোতে অবতরণ করেন। সেখানে থেকে Palo Alto নামে ছোট্ট একটা শহরে গিয়ে ওঠেন। এ শহরেই স্টেন-বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। সেখানে যাদুগোপালের ভাই ধনগোপালের সাথে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ। এই ধনগোপালই তাঁর নাম বদলিয়ে রাখেন মানবেন্দ্রনাথ।

জার্মান-যাবার কোন সুব্যবস্থা তিনি করে উঠতে পারলেন না। সেখানে যাবার আগ্রহও ক্রমে হ্রাস পেল। জার্মানির উপর আস্থা অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া ভারতের বৈশ্ববিক আন্দোলন তখন ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা পর্যবেক্ষিত। ফিলিপাইনে তিনি বালেম্বরে বাধা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের আত্ম-বলিদানের কাহিনী প্রথম শুনতে পেলেন। তাই তিনি ভাবলেন যে, জার্মান থেকে অন্য সাহায্য পেলেও ভারতবর্ষে তা পাঠাবার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এদিকে আমেরিকায় তিনি তখন নতুন চিন্তার আলো খুঁজে পেলেন। মানবেন্দ্রনাথ তখন নিউ ইয়র্কে। সেখানে বিখ্যাত দেশ-কর্মী লাজপত রায়ও অবস্থান করছিলেন এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে কথন্থ গড়ে উঠল। ইতিমধ্যে উভয়েই নিউইয়র্কের সোস্যালিস্টদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। সোস্যালিস্টরা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক। রায় তাঁর Memoirs-এ লিখেছেন যে, লাজপত মার্কস ও অন্যান্য সোস্যালিস্টদের লেখা অনেক বই কিনেছিলেন। সোস্যালিস্টদের সম্পর্কে এসে এবং তাদের বই পড়ে রায় সোস্যালিজমের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নিউইয়র্কের পার্বলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদের উপর বিভিন্ন বই পড়তে লাগলেন। আমেরিকা তখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ভারত-জার্মান যুদ্ধের মামলায় রায়কে প্রেরণ করা হয়। জার্মানে মৃত্তি পেয়ে তখনই তিনি আমেরিকা পরিত্যাগ করে মেক্সিকোতে উপস্থিত হলেন।

মেক্সিকোতে তখন সোস্যালিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এনার্কিজম এবং সিন্ডিক্যালিজমের তখন সেখানে খুব প্রভাব। সেখানকার সোস্যালিস্ট পার্টির সাথে রায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং ক্রমে সে পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা La Lucha-র সম্পাদক পদে তিনি অর্থাভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। সেখান থেকে মাইকেল বরোদিন মেক্সিকোতে এসে উপস্থিত। রায় নিজের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং দিনের পর দিন রাশিয়ার বিপ্লব এবং মার্কসবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রায় লিখেছেন যে, বরোদিনই শেষ পর্যন্ত

তাকে সম্পূর্ণরূপে মার্কসবাদী করে তুললেন। রায়ের সভাপতিত্বে মেক্সিকোর সোস্যালিস্ট পার্টির এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এই পার্টি কমিউনিস্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কমিউনিস্ট কতৃক ঘোষিত নীতি গ্রহণ করে এবং পার্টির নাম পরিবর্তন করে Communist Party of Mexico রাখা হল। সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে এই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল এবং রায় হলেন তার প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী। এই অধিবেশনে রায়কে কমিউনিস্টের দ্বিতীয় বিশ্বসম্মেলনে মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে রায় মেক্সিকো হতে মস্কো যাত্রা শুরু করেন। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি হয়ে শেষ পর্যন্ত মস্কো এসে উপস্থিত হলেন। কমিউনিস্টের দ্বিতীয় বিশ্বসম্মেলনে রায় ও লেনিনের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রভৃতি উপনিবেশিক দেশ-গুলিতে বিপ্লবের প্রকৃতি নিয়ে এক বিতর্ক উপস্থিত হয়। রায় বললেন যে, এ সব দেশের বুদ্ধোন্মত্তা জাতীয় স্বাধীনতা দাবি করলেও তাদের বৈশ্ববিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। লেনিন জিহ্ব মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে উভর মতই গৃহীত হল। এই বিতর্কের ফলে কমিউনিস্ট মহলে রায়ের মর্যাদা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব রায়কে দেওয়া হল। তাঁর চেষ্টার ফলেই ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল। সে প্রচেষ্টার রোমাঞ্চকর কাহিনী এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব। রায়ের চিন্তাধারা কি ভাবে গড়ে উঠল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই আমরা এবার স্কান্ত হই।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রথমে Vanguard এবং পরে Mass কাগজ বের করে গোপনে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে রায় কমিউনিস্ট প্রচারের চেষ্টা করেন। রায় তখন ভাবতেন যে, গান্ধীবাদ ভারতবর্ষে বিপ্লবের পথে প্রধান অন্তরায়। গান্ধী-জীর দর্শন, তাঁর অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বাংলায় মদ্রাক্ষর আহমেদ এবং বম্বের ডাঙ্গো তখন ভারতবর্ষে রায়ের প্রধান সমর্থক। তাঁদের কাছে লেখা বিভিন্ন চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, রায় তখন মনে করতেন যে, ইতিহাসের অমোঘ

নিয়মে গান্ধীবাদের পতন এবং নতুন বৈশ্ববিক পার্টির অভ্যুদয় ভারতবর্ষে অবশ্যম্ভাবী। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাশকেও তিনি কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন এবং সেখানেও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সম্বন্ধ কল্পার কথাই বলেন। রায়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে শোষিত জনসাধারণকে সংগঠিত করে পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে এবং এই সব পঞ্চায়েত নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে একটি গণপরিষদ বা Constituent assembly গড়ে তুলবে। সম্বন্ধ জনসাধারণের এই পরিষদ ব্রিটিশ শাসকের অগ্রহা করে এক নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করবে। তিনি বলতেন যে, এই Organised Revolution-কে প্রতিহত করা কোন বিদেশী শাসকের পক্ষে সম্ভব নয়। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশে যখন আন্দোলন শুরু হয় তখনই মানবেন্দ্রনাথ Constituent assembly-র কথা বলেন।

ইতিমধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট থেকে বহিস্কৃত হন। এর কারণ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট-আন্দোলন সংগঠিত করার জন্যে রায়কে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চীনে পাঠান হয়। চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন সে সময় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং অধ্যাপক নর্থ মনে করেন যে, স্ট্যালিন কৌশলে এই ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব রায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে কমিউনিস্ট থেকে বহিস্কৃত করেন। তাছাড়া ১৯২৮ সালে গৃহীত কমিউনিস্টের প্রস্তাবগুলি রায় গ্রহণ করতে পারেন না। কমিউনিস্ট ভারতের কমিউনিস্টদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে পৃথক পার্টি গঠনের নির্দেশ দেয়। রায় বললেন যে, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্টদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে। ইতিমধ্যে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মস্কো গিয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কতৃপক্ষের কাছে রায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করেন। কমিউনিস্ট থেকে বহিস্কৃত হয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। ছয় বৎসর কারাবাসের পর আবার তিনি ভারতের রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হলেন।

দেশে ফিরে এসে রায় ভারতবর্ষের এক নতুন ধ্রুপের পরিচয় পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণের সংগঠন সহজেই গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, দেশের

আপামর জনসাধারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে একাবন্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বন্ধপরিষ্কর। গান্ধী-বাদের বিরোধিতা তবু তিনি ছাড়লেন না তবে ভাবলেন যে, গান্ধীজীর প্রভাব থেকে জনসাধারণকে সরিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়। জেল থেকে মুক্তিলাভ কবে রায় কংগ্রেসে যোগদান করলেন কিন্তু গান্ধীবাদের বিরুদ্ধেই আশ্রয় হলে তাঁর প্রধান সংগ্রাম। তিনি ভাবলেন যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদ প্রচার করেই একমাত্র গান্ধীবাদের সার্থক বিরোধিতা করা সম্ভব। তাই তিনি সুরু করলেন এক নতুন আন্দোলন যার নাম দিলেন 'রেনেসাঁস মুভমেন্ট'।

ইতিমধ্যে সুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। প্রথমে রায় এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলেন কিন্তু ফ্রান্সের পতনের পরও যখন ইংলন্ড দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল তখন তিনি এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। এতদিনের তোষণ-নীতি পরিত্যাগ করে ইংলন্ড কেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৃঢ়-সংকল্প?—রায় এই প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন যে, ইংলন্ডের জনসাধারণ এবং লেবার পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইংলন্ডকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, যুদ্ধের পর ইংলন্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসীন হবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথ সুগম হয়ে উঠবে। বিশদ আলোচনা করে তিনি দেখালেন যে, এই যুদ্ধ পরিচালনার পর ইংলন্ডের পক্ষে তার সাম্রাজ্য বাঁচিয়ে রাখা অর্থনৈতিক কারণেই আর সম্ভব হবে না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও সোস্যালিস্ট বৃটেনের সহায়তায় এক নতুন যুগের সঞ্চার হবে—এই ছিল মানবেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস।

যুদ্ধের পর রাশিয়ার আচরণ রায়কে বিস্মিত করে। বস্কান অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে জোর করে কম্যুনিষ্ট পার্টির শাসন জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধের পরও রাশিয়া তার লৌহস্বনিকার অন্ত-

রালেই অবস্থান করতে থাকে। স্ট্যালিন বৃটেনের লেবার পার্টির সাথে সহযোগিতা না করে সম্পূর্ণভাবে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিও একচ্ছত্র শাসন রায় কোনদিন সমর্থন করেন নি। তবে তিনি ভাবতেন যে, রাশিয়া যতদিন বিদেশী শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে—ততদিন পার্টির কঠোর শাসনের হয়ত প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের পরও যখন স্ট্যালিন তাঁর পূর্বের জ্বরদস্তি শাসন শিথিল করতে রাজী হলেন না তখন রায় প্রশ্ন করলেন—রাশিয়ার পথই কি স্বাধীনতার পথ? এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিল রায়ের নতুন দর্শন যার নাম দিলেন 'নয়া মানবতাবাদ' বা New Humanism.

নয়া মানবতাবাদের মূলকথা হল যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা মানব-সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মানুষের স্বাধীনতা প্রধানত তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে নিজেকে সার্থক ও স্বাধীন করে তুলতে

পারে। স্বাধীনতা-স্পৃহা বা নিজেকে বিকশিত করে তোলার প্রেরণা যদি মানুষের অন্তরে জাগিয়ে তোলা না যায় তবে কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন মানুষকে স্বাধীন ও সার্থক করে তুলতে পারে না। রায় তাই তাঁর শেষ জীবনে দলগত রাজনীতি পরিত্যাগ করে মানুষকে তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন যে, মানুষ স্বভাবতই যুক্তিবাদী। এই যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার ফলেই মানুষ নৈতিক মূল্যগুণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ভগবানের ওপর ভক্তি ছাড়াও মানুষ নিজের বিবেক অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে নীতিনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। যুক্তিশীল ও নীতিপরায়ণ মানুষের সহযোগিতায় বিকেন্দ্রিক এক নতুন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন শেষজীবনে রায়কে বিভোর করে বেঁচেছিল। জীবনের অপরাহ্নে কম্যুনিজম ও মার্ক্সবাদ সম্পূর্ণ পরিহার করে রায় যে নতুন রাজনীতির ও অর্থনীতির ইঙ্গিত আমাদের দিয়ে গেছেন তা বিচার করে দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

কেশ পরিচর্যা
অপরিহার্য...

**বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্ডারাইডিন**
হেয়ার অয়েল

চুলের গোড়া স্নায়ু ও
সবল রাখে, চুলের গোছা
বাড়াতে সাহায্য করে
ও চুল ওঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই
কামপুর



ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমার অভিজ্ঞতা

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ সরকার যখন তার ভারত সাম্রাজ্য ভালভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হল, তখন একটি উপযুক্ত প্রশাসন-বলী উদ্ভাবনের প্রয়োজন বোধ করেছিল। তাই সেই চেষ্টা হতেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্ম। প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের মেধাবী ছাত্রদের আকৃষ্ট করে তাদের সাহায্যে এমন একটি প্রশাসকগোষ্ঠী তারা গড়ে তুলেছিল, যা দক্ষতার এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছিল। যিনি নিজেকে আই-সি-এস বলবার অধিকারী হতেন তিনিও ফলে খানিকটা আত্মতৃপ্তিলাভ করতে সমর্থ হতেন।

কিন্তু তাদের দক্ষতা ও প্রশাসন নৈপুণ্য সর্বতোভাবে নিযুক্ত হত প্রশাসক জাতির স্বার্থ সংরক্ষণে। শাসিত জাতির স্বার্থের প্রশ্ন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অব্যাহত। বরং তাদের সহিত শাসনের সঙ্গে শোষণের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ায় তাদের স্বার্থ পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত যারা এই সার্ভিসে নিযুক্ত হতেন তারা শাসকগোষ্ঠীর মানদণ্ড হওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের একটা উচ্চতর ভাব ছিল। তার ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু তা তুলনায় নগণ্য। সুতরাং সিভিল সার্ভিসেব মানদণ্ড সেকালে শাসক-জাতির কাছে সুখ্যাতি পেলেও শাসিত জাতির কাছে অখ্যাতিই ফুটিয়েছিল। ইংরেজের চোখে যে সার্ভিস তাদের সাম্রাজ্যের 'স্টীল ফ্রেম', ভারতীয়ের চোখে তা আপদ হিসাবেই গণ্য হত। তাদের সে মনোভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছিল সেই ক্ষুণ্ণতার ভেতর দিয়ে, যা বলে, 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস না ভারতীয়, না সিভিল, না সার্ভিস।' কারণ যারা এই সার্ভিসের কর্মচারী নিযুক্ত হতেন তাঁরা সকলেই যুক্তরাজ্যের মানদণ্ড, তাঁরা শাসিতজাতির সহিত ব্যবহারে ভ্রমতা প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করতেন না এবং সেবাব মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন না। প্রকৃত অর্থেই তাঁরা শাসন করতেন।

তবে একথা ঠিক যে, ঘটনাচক্রে তার একটা বৈশিষ্ট্য তা ঠিক স্বীকার করে উঠতে পারে নি। জ্যাডাসিকার ঠাসুর পরিবারের সংগোপননাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়ে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে যখন সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরলেন, তখন তাঁর অভ্যন্তরীণ জন্মগত কলঙ্ক বেধা দিল। তার পর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক ভারতবাসী সিভিলিয়ান হয়ে সে কলঙ্কের বিন্দু আরও বাড়লেন। কিন্তু তার ব্রীটিশত্ব রূপ পরিবর্তন ফলে অনেক পথে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের

সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তাঁর রূপ ধারণ করল, তখন ইংবেজ সরকার যথ্য হাথে এই ঘোষণা প্রকাশ করলেন যে, ভারত-বাসীকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। যুদ্ধের শেষে সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২১ খৃস্টাব্দে ভাবতবর্ষে আংশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হল। তারই আনুগত্যিক সিদ্ধান্ত হিসাবে আরও একটি ব্যবস্থা হল এই যে সিভিল সার্ভিসে ভবিষ্যতে যতদূর পদ প্রতি বৎসর খালি হবে তার অর্ধেক পূরণ হবে ভারতীয়দের দিয়ে। তাদের সুবিধার জন্য এই নিয়মও প্রবর্তিত হল যে, লন্ডনের পরীক্ষায় যতদূর ভারতীয় উত্তীর্ণ হবে তাদের সংখ্যা বাদ দিয়ে ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত বাকি পদগুলি ভারতবর্ষে গৃহীত একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাহায্যে পূরণ করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে সার্ভিসের অভ্যন্তরীণ রূপ অর্ধেক পরিমাণে বদলিত হয়ে গেল।

এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগে আমি ভারতীয় হয়েও এবং লন্ডনে পরীক্ষা না দিতে পেরেও ঘটনাচক্রে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হলাম। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে ভারতীয় পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে আমি শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়ে বিলাতে রওনা হলাম। যারা লন্ডনের পরীক্ষায় নির্বাচিত হত এবং যারা ভারতের পরীক্ষায় নির্বাচিত হত তাদের জন্য ব্যবস্থার একটা পার্থক্য ছিল। যারা লন্ডনের পরীক্ষায় নির্বাচিত হত তাদের শিক্ষানবিশ থাকতে হত এক বছর মাত্র, আব যারা ভারতের পরীক্ষায় নির্বাচিত হত তাদের শিক্ষানবিশের কাল বর্ধিত করে দু'বছর করা হল। সম্ভবত এই পৃথক ব্যবস্থার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে ভাবতীয় লন্ডনে পরীক্ষায় নির্বাচিত হত তার ইতিমধ্যে কিছুকাল শাসকজাতির মধ্যে বাস করা হয়ে গিয়েছে। কয়েকই তাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালীর সহিত পরিচয় হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে খানিকটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে গিয়ে থাকবে। অপরপক্ষে যারা ভারতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের শাসকজাতির সহিত কোনো পরিচয়ই হয় নি। সেই কারণেই সম্ভবত এদের জন্য শিক্ষানবিশের কাল দীর্ঘতর করা হয়েছিল। এদের সম্ভবত ধারণা ছিল যে, দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করলে এদের মতিপতি অনেকটা ইংরেজের মত হয়ে যাবে এবং শাসক-

জাতির প্রতি আনুগত্য পালন ধরা সহজ হবে।

আমার মনে হয় সে ধারণা ফলেব দ্বারা সমর্থিত হয় নি। যে ভারতীয়, তার ভাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কয়েক বৎসর বিলাত বাস করলে সামান্যই পরিবর্তিত হতে পারে। বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ভাবতীয় শিক্ষিত যুবক জাতীয়তাবোধে খানিক পকিমাণ অনু-প্রাণিত না হয়ে পারে না। কাজেই ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েও তার ইংরেজের প্রতি আনুগত্যবোধ জাগে না। অবশ্য কর্মজীবনে আনুগত্য প্রকটভাবে প্রকাশ না গেলে পদোন্নতি বা ছোটখাট সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু স্বভাবত মন যে দিকে টানে তা হতে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না।

এই পরিবেশে আমরা যারা ভাবতবাসী হয়েও এই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রচিত সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম তারা বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছিলাম। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ আর অন্যদিকে স্বদেশের স্বার্থ, দু'দিক থেকে মনকে টানত। ফলে যে দোষ্টানাব ভাব সৃষ্টি হত তা কর্মজীবনকে পীড়াদায়ক করে তুলত। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন নিজের জাতির স্বার্থের সঙ্গে শাসকজাতির স্বার্থের প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটত। ফলে শাসকজাতির নির্ধারিত নীতিকে রূপ দেওয়া আমাদের লজ্জা হয়ে পড়ত। শাসকজাতি আমাদের মনের এই দোষ্টানার বিষয় অবহিত হয়েছিল এবং তার একটি প্রতিবেদক ব্যবস্থাও করেছিল।

সে কালের ব্যবস্থা অনুসারে বাঁবা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হতেন তাদের ওপর শৃঙ্খল প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল না, জেলা-স্তরের বিচারকার্যের দায়িত্বও তাদের গ্রহণ কবতে হত। ফলে সার্ভিসের দু'টি শাখা ছিল। একটি শাখা প্রশাসনের কাজ দেখত এবং অপর শাখা বিচারের কাছে নিযুক্ত হত। সাধারণত কর্মজীবনের প্রথম দু'বছর সরকারী শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা এবং ভূমিাব্যবস্থা-ব্যবস্থার সহিত পরিচয় করতে কেটে যেত। তার পর সকলেরই মহকুমা প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। তারও পর রুট অনুসারে কেহ বিচার-বিভাগের কাজ গ্রহণ কবত, কেহ প্রশাসন-বিভাগের। এই ব্যবস্থাপট ইংরেজের সম্পর্কেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু

মাসিক বসন্ত

যখন ভারতীয়েরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হলে তখন এই অবস্থায় সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সরকার একটি নতুন নীতি গ্রহণ করল। যে ভারতীয়ের আচরণে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ হত না তাদের বিচার-বিভাগে কাজ দেওয়া হত। কারণ, সেখানে এই দোঁটানার ভাব সরকারের স্বার্থকে বিশেষ বিঘ্নিত কবত না। সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। এই নীতিতেই অনুসরণে আমাদের সমগ্র আর একটি নীতি গ্রহণ করা হয়। যাদের প্রথম দিকেই আনুগত্যের অভাব লক্ষিত হত তাদের জন্য অতিবিক্রমিত বিচার-বিভাগীয় শিক্ষণের ব্যবস্থা শুরুর হল। ফলে প্রশাসন-বিভাগে থাকার মেয়াদ আরও খানিকটা সংকুচিত হয়ে গেল। এইভাবে শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও স্বার্থের সঙ্গে তাদের নিজের মতিগতির সংঘর্ষ সিন্ধু সার্বভৌমত্বের ভাবতীর কর্মচারীদের চাকুরী-জীবনকে অনেকখানি নিরানন্দিত কবত।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগে আমার কর্ম-জীবন এই নীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তা কেনন ভাবে এবং কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিল তার সুন্দর পরিচয় মিলবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে। আমি সংক্ষেপে এবার তা বিবরণ দেব।

লন্ডনে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর ছাত্র হয়ে দু'বছর শিক্ষানবিশী শেষ করে আমি ১৯২৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলা সরকারের অধীনে কাজ পেলাম। এখানে এসেও হাতে-কলমে কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিভাগীয় পবীকার ব্যবস্থা থাকত। তখনও তা আছে। কলকাতায় অ্যানিসটেট ম্যাডিস্ট্রেট হিসাবে এক বছর থেকে বিভাগীয় পবীকা পাশ করে আবার চার মাস জবপের কাজ শিখতে ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল। পরে ১৯৩১ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে আমি প্রথম মহকুমা শাসক হিসাবে কুষ্টিয়ার স্বাধীনভাবে প্রশাসনের কাজ পেলাম। বছরটা ছিল দুর্দিক থেকে দুর্ভাগ্য। প্রথম, সে বছর মাঘ মাসে এমন বৃষ্টি হইয়াছিল যে, মাঠের বরিশা সব নষ্ট হয়ে গিয়াছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভাবি অল্পকষ্ট হয়েছিল। অপব পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রেও অবস্থা ছিল অত্যন্ত অশান্ত। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লর্ড আরউইনের যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ হওয়ার নতুন করে পূর্ণ উদ্যমে আইন-অমান্য আন্দোলন চালু হয়েছিল। কুষ্টিয়া রাজনীতির দিক হতে খুব সচেতন ছিল। কাজেই এখানে তার প্রতিঘাত বিরাট রূপ গ্রহণ করেছিল।

দুই ক্ষেত্রেই আমি নিজের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে নীতি গ্রহণ করেছিলাম তা শাসকগোষ্ঠীর ওপবমহলের অনুমোদন পাও নি। গ্রামের মানুষের অমান্যতা দু'বছরব্যয় জন্য আমি ভিক্ষা করে চাঁদা ও চাল সংগ্রহ করে বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অঞ্চলে চাল বিলি কববার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাতে দেশের ব্যবসায়ী মহলের এবং এমন কি রাজনৈতিক কর্মীরও সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

আমার ওপকম্ব যিনি জেলাশাসক ছিলেন তিনি জাতিতে ছিলেন বাঙালী, সিভিলিয়ান-গোষ্ঠীভুক্ত নয়। একান্ত কর্মক্ষমতার গুণেই এই উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি আমার প্রতি মৈত্রীশীলও ছিলেন। আমার ব্যবস্থার কথা শুনে তিনি বললেন, করেছ কি? চাল বিলির ব্যবস্থা করে নিজের বিপদ নিজে ডেকে নিয়ে এসেছ। পবে যখন চাহিদা বাড়বে সামলাবে কি কবে? সরকার তো তোমার পেছনে দাঁড়াবে না।

আমি নিতান্তই অনিচ্ছা কর্মচারী। আমি তাঁর কথা শুনে একান্ত অসহায় বোধ করেছিলাম। তিনি বললেন, ভেব না, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি তোমাকে কিছু কৃষিক্ষণ আর গরু কেনবার খণের টাকা মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি। তুমি চাল বিলি করা আস্তে আস্তে তুলে দাও আর তাব বললে খপ দাও।

এইভাবে সে সময়্যর একটা সমাধান হয়েছিল বটে, কিন্তু সে খবর ওপব মহলে যখন পৌঁছল তখন তাঁরা যে সন্তুষ্ট হই নি, তার পরিচয় পরে পেরোই।

আইন-অমান্য আন্দোলনের টেট কুষ্টিয়ার পৌঁছতে দেরি হল না। ছেলেরা দল বেঁধে পথে শোভাযাত্রা করে সরবে বৃষ্টি সন্ধানের খবর কামনা করে, আবগারী দোকানে গিয়ে ক্রেতাদের জিনিস কিনতে দেখ না। সর্বত্র একটা ধমধমে ভাব। বন্দেমাতরম শুনতে

শহরের আকাশ-বাতাস মূর্খরিত। পুলিশ স্বাধীনতা তাদের কর্তব্যপালন কবে। যারা আইন-অমান্য কবে তাদের ধরে নিয়ে আমার কাছে হাজির করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলে, তারা তা স্বীকার কবে। তাবা ত জেলে যেতেই উদ্গ্রীব। কিন্তু আমার মহকুমার ছোট জেলে কতজন কবে? সাধারণ করেদী দিবেই তা ভর্তি। আমি তাই এক নতুন ব্যবস্থা কবলাম। স্বীকৃতিভিত্তি ভিত্তিতে তাদের দোষী সাব্যস্ত কবে কেবল জবমানা করলাম, কিন্তু অনাদায়ে হাজতবাসের ব্যবস্থা রাখলাম না। আইন অনুসারে পবে তাদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি ক্রোড়ের পবওয়ানা বার হতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি? তাদের ত সম্পত্তি সংগ্রহের বয়স হই নি: ফলে দোষী সাব্যস্ত হইলেও তাবা খালাস পেয়ে যেতে লাগল।

আমাব এই অভিনব রীতিতে জেথ ভরল না, ওদিকে ছেলেরা জেলে যেতে না পেয়ে আন্দোলন চলাবার উৎসাহ পেল না। কিন্তু ওপব মহলে দেখলাম ফল হয়েছে উল্টো। সেটা জানতে পারলাম আমার জেলাশাসক মহাশয়ের মূখে। তিনি আমার মহকুমায় কাজ পবদর্শন করতে এসে বললেন, জানো, পুলিশ সুপারিন-টেনডেন্ট বলছিল, যারা রাজনৈতিক আন্দোলন করে তুমি নাকি মনে মনে তাদের প্রতি সহানুভূতি রাখ। সিক্রেটলি ইন সিমপ্যাথি উইথ দ্য পলিটিকাল গ্লাজিটোরস। কেন বলে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাগদাদ

বেজতয়াডা - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

সাম্প্রতিক বন্দুত

কলতে পারি? বলা বাহুল্য পদার্থ সাহেব ছিলেন জ্ঞাত হইতেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি যা বলেন সে ত ঠিকই। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই যে তবুবা আন্দোলন করছে, এটা আমার নস্যা। আমি কি করছি? আমি ত চাকরী করছি। তাঁকে বললাম, আমি ত ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় জেলেরদের জরিমানার মধ্যে অনাচারে হাজতবাসের নির্দেশ দিই নি বলে বোধ হয় তাঁর দুঃখ হইতেছে।

তার অল্পকাল পরেই ওপর হতে আমার একটা বদলীর আদেশ এল। ব্যবস্থা হল আমি মৈমনসিংহে গিয়ে এক বছর বিচার বিভাগের অধীন থেকে বিচারকের কাজ শিখব। সুতরাং প্রশাসকের এই অবস্থানিকর কাজ হতে আমি অব্যাহত পেলাম।

এক বছর বিচারকের কাজ শিক্ষা শেষ হলে আমার ডাক পড়ল বরিশাল জেলার এক নতুন ধবনের কাছে। সেখানে নিযুক্ত অণ্ডল জুড়ে খাসমহল আছে। দীর্ঘকাল অব্যবস্থার ফলে অনেক রাজস্ব অনাদারী পড়ে রয়েছে। তাবৎ কত নতুন চর পড়ে আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছে অথচ তার পস্তনের ব্যবস্থা হয় নি। সেই কারণে সরকার খাসমহল তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ এক সীভিলিয়ানকে এর দায়িত্ব দেবার কথা ভাবছিলেন। আমাকে টানবার কারণ বোধ হয় কুষ্টিয়ার অনেক খাসমহল ছিল এবং তা দেখাগোনা কবতে আমার খানিক অভিজ্ঞতা সঙ্গম হইতছিল, সেই কারণে।

এইভাবে বরিশাল জেলার পূর্ণ দু বছর আমি খাসমহল অফিসারের কাজ করেছিলাম। সোজাসাদি প্রশাসনের দায়িত্ব হতে মুক্ত হিলাম এবং আমার কাজ ভূমি পত্তন ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিলা বলে আমার কোনো অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় নি। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন জেলাশাসক পেরেছিলাম যার অনেক সঙ্গ ছিল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ছোট ভয়ের মতই দেখতেন। প্রায়ই একই লগ্নে কবে আমাকে নিয়ে জেলা পরিদর্শনে যেতেন। সম্ভবত আমার কাজও তার পছন্দ হইতছিল। সেটা বুঝেছিলাম অনুমানে, ওপর মহলের আমার প্রতি আচরণের ভিত্তিতে।

শীঘ্রই নতুন বদলীর আবেশ এল। সে আদেশ অনুসারে আমার চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক হবার কথা। তাই আমি নিজেও যেমন আশ্চর্য হইয়েছিলাম তেমনি অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। আশ্চর্য হইয়েছিলাম, আমাকে আবার প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে দেখে। সম্ভবত আমার তদানীন্তন মস-এর তার স্বপক্ষে সুপারিশ ছিল এবং তিনি জ্ঞাত হইতেন হওয়ার তার মূল্য দেওয়া হইতছিল বেশ। অস্বস্তিবোধ করে-

ছিলাম এই ভেবে যে আবার হয়ত শাসক-পোষ্ঠীর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রূপে চলতে না পেরে অশান্তি ঘটতে পারি। বিশেষ করে এখানে যখন জেলাশাসক হতে অরম্ভ করে সকল বিভাগীয় কর্তাই জ্ঞাত হইতেন।

অশান্তি ঘটতে সেরিও বিশেষ হয় নি। অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব ছিল জেল পরিদর্শন করা। সেখানে অনেক রাজনৈতিক বন্দীও থাকতেন, কারণ চট্টগ্রাম তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে দমননীতি প্রয়োগের ফলে রীতিমত বিকল। যে বিষয় নিয়ে এই অশান্তি ঘটল তা-ও এক রাজনৈতিক বন্দীকে ঘিরে। তিনি নিশ্চিত জেল-কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিরোধাজন হইয়েছিলেন, তা না হলে তাঁকে সম্পূর্ণ এককর্তৃপক্ষ-এ রাখা হইতছিল কেন? তাঁর কয়েক বন্ধন গোলাম তিনি অনুযোগ করলেন, তাঁর নিজস্ব যে ঘড়িটা আছে সেটাও তাঁর কাজ হতে কেড়ে রাখা হইতছে।

সে কথা শুনে আমার তাঁর রাগ হইতে গেল। নিঃসঙ্গ অবস্থার অবস্থা কতখানি দুঃসহ তা সহজেই বোঝা যায়। সে অবস্থার সময় কাটতেই চার না। সময় কতখানি কাটল তা বোঝবার নিজস্ব একটা ঘড়ি ছিল। তা কেড়ে নেবার অর্থ হল, সে সুবিধাটুকু হতেও তাঁকে বঞ্চিত করা। এ ত রীতিমত নির্যাতন।

আমি ছেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে মিস্ত্রীসা করলাম, কার আদেশে এই ব্যবস্থা হইতছে। তিনি জানালেন এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই, কারণ স্বয়ং সিভিল সার্জেন এই আদেশ দিইতেন। আমি তখন নির্দেশ দিলাম ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে।

জেল পরিদর্শনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছি। কয়েক ঘণ্টা পরে জেলাশাসকের ফোন এল। তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রদেশের সীভিলিয়ান। এখানে এসেছেন রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করতে। তিনি মোটামুটি যা বললেন তার মর্ম হল এই যে, আমি যখন আদেশ দিইছি ঘড়ি ফেরত দিতে সিভিল সার্জেন তা মানতে বাধ্য, তবে এ বিষয়ে আমার কিছু নির্দেশ না দিলেই ভাল হত।

এর ফলে ওপর মহল যে আমার ওপর আবার রুষ্ট হইয়েছিল তার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। আবার বদলীর নির্দেশ এল সিলেটে অতিরিক্ত জেলা জজ হয়ে যাবার জন্য। আমিও স্বাস্থ্যবোধ করলাম।

তারপর কয়েক বছর জেলা জজ হিসাবে বেশ নিরবিচ্ছিন্ন কেটেছিল। কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন 'ভারত ত্যাগ কর' আন্দোলন শুরুর হল, তার চেউ আমার বিচার বিভাগেরও শান্তি ভঙ্গ করল। শোভাযাত্রা, আইন অমান্য এবং আইন-

বিরুদ্ধে দল গঠন ইত্যাদি নানা অপরাধে শাস্ত প্রদান আদিভূত হতে লাগল। তাদের সম্বন্ধে প্রাথমিক বা করবার প্রশাসন বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটই তা করেন। কিন্তু তার জের অনেক সময় জেলা জজের আদালত অবধি আসত। এই সুত্রেই জেলাশাসকের সহিত আমার মনোমালিন্য ঘটে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞাত হইতেন। তাঁর কতব্য সহজ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে শাসিত জাতিকে যেন-তেন-প্রকারেই নানা রকম রাখাই তাঁর কাজ। সেই কতব্যের অনুগোষ্ঠী আমাকে তিনি একটি কঠিন ভাষায় চিঠি লিখে বললেন।

বিষয়টি হল এই। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে দাঙ্গা করবার অপরাধে কতকগুলি রাজনৈতিক কর্মী অভিযুক্ত হইয়েছিলেন। পদার্থের অনুসরণে নীচের আদালত তাঁদের জামিন দিতে অস্বীকার করেন। কাজেই বিচারসাপেক্ষ তাঁদের কারাবাসের আদেশ হয়। তার বিরুদ্ধে জেলা জজ হিসাবে আমার কয়েক জামিনের আবেদন পেশ করা হয়। ফৌজদারী বিচার-বিধি অনুসারে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ না থাকলে তদন্ত ও বিচার লগ্নেপক্ষভাবে জামিন খালাস দেবার ব্যবস্থা আছে। আমি সেই নীতি অনুসারে তাঁদের জামিনের নির্দেশ দিইয়েছিলাম। সবকারী উকিল অবশ্য যোর আপত্তি করেছিলেন।

এই নিয়ে জেলাশাসক আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অনুযোগ ছিল এই যে আলোচ্য ক্ষেত্রে জামিনের নির্দেশ দিয়ে আমি তাঁর প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি এবং এমন ক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যতে জামিন দেওয়া উচিত হবে না।

সে চিঠি পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটা লিখিত জবাব দিইয়েছিলাম। তার মর্ম হল এই: আমি যে নির্দেশ দিইছি তা বিচারক হিসাবেই দিইছি। কাজেই তার বিরুদ্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তাঁর আইন-সঙ্গতভাবে তা উপরে আদালতে স্থাপন করা উচিত। সুতরাং চিঠির মাধ্যমে আমাকে এরূপ লেখা শব্দ অনুপাত নয়, বিচারকের প্রতি অপোভন আচরণের সম্প্রদায়। সুতরাং ভবিষ্যতে অনুদ্বন্দ্ব অবস্থার তাঁর যদি জামিন দেওয়া সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে তা হলে ফৌজদারী বিচারবিধি অনুসারে তা যেন সরকারী উকিলের মাধ্যমে প্রকাশ্য আদালতে নিবেদন করা হয়, চিঠির মাধ্যমে নয়।

সেদিন বিকালে যখন তাঁর সঙ্গে টেনিস খেলার মাঠে দেখা হল, তাঁর আচরণে একটা আশ্চর্য্যবোধ লক্ষ্য কইয়েছিলাম এবং মনে হইয়েছিল তিনি যেন থাকে বলে মুখখানায় হাঁড়ি করে রয়েছেন। তা বলে দিইয়েছি আমার উত্তর পেয়ে তিনি আমার ওপর রীতি-মত রুষ্ট হইয়েছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কান্তিপদার ঘন জঙ্গল। অনেক রাত নিশ্চিন্দ অন্ধকারেব রহস্য-অতল গভীরে অন্তরের শিখাটি জেদে নিয়ে নব-বেদান্তের পদবোহিত যতীন্দ্রনাথ ধ্যানে বসেছেন।...

বিপ্লবী সাধক যতীন্দ্রনাথ ভাষ্যের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মুখ চেয়েই সংকল্প নিয়েছিলেন দেশের রাজনৈতিক মূর্ত্তি সাধকস্বরূপ। সেই সাধনাব চকম মাহেশ্বরলেন সন্তার গভীর তন্ত্রীতে বাকি শুনছেন তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বরাভব-মন্ত্র, যে-মন্ত্রের প্রতিটি চরণ প্রতিধ্বনিত অনুরণিত হয়ে উঠেছে যতীন্দ্রনাথের চেতনার সর্বত্র—অন্তরে, বাইরে, পাদদেশে, শিখরে। সেই চেতনাব প্রথব আলোক-পাখাবে মৃন্ময়ী দেশের চিম্ময়ী স্বরূপ ওত-প্রোতভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে হিরণ্ময়ী বিশ্বজননীর বিশ্ববাতীত বিমূর্ত্ত জ্যোতিপূজে।

কর্মের তীব্রতম জটিলতাব কেন্দ্রেও সমতাব প্রতীক যতীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন পবনময়রের নিঃসীম অভীষ্ট, তাঁর নির্বিকল্প রূপও। শরীরে মনে প্রাণে, আধারের অগ্নিতে পবনগত্রে আত্মদ পৈষেছেন তিনি মানসোত্তর এক জ্ঞান আর আনন্দের।...

এ উপলব্ধি তাঁর সহজাত। এই উপলব্ধির স্বতীকা বৃকে নিয়েই তো নেমে এসেছিলেন তিনি। অম্বকাবাক্ষর কুসংস্কারলিপ্ত মেনের বিবেকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন সত্ত্বগুণদীপ্ত রাজসিকতার জ্বল। জননী ভারতবর্ষ যে মহাকালীরই দেহবিশেষ, তিনি যে দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গাও, সেই সর্বাংগে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা, শ্রীঅরবিন্দের সাধনা, বিপ্লবের নতুন ভাষ্যকার যতীন্দ্রনাথের দুর্গম-সারাদ—সবই তো মহান এক অধ্যাত্ম-বিস্ময়ের প্রস্তুতি মাত্র। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত প্রহবে বসে পবনময়রের আলোকে টাইটুম্বর দেখেছেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের আকাশ।

সেই আলোর স্বর্ণধারায় ডুবে গিয়েছে মহাবিশ্ববীর্য সমস্ত জীবন, তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিটি কর্মের ধারা। কল্পনাভীত মহত্বের বিশালতার পরিপ্লুত তিনি।...

ধান্যের অবিমিশ্র এক সরোবর।...স্বচ্ছ প্রশান্তির বৃকে অক্সাৎ জগে তাঁর যন্ত্রণার ভরসা।...চেউয়ের পর চেউ ভেঙে পড়ে শরীরের বোলাত্মিতে।...ক্ষণিক কাঁপন জগে স্নান্যতমের সুক্ল পদ্য।...

কিসেব এত জন্মালা, তাঁর এই বস্তুতা? যতীন্দ্রনাথ চোখ মেলেন। আলো জ্বলান। হঠাৎ আলোর হেসে ওঠে বনভূমি। যতীন্দ্রনাথ দেখেনঃ এঁকেবঁকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে বিষাক্ত একটা সাপ।

পাশের লাঠিটা তুলে নিয়ে তখন তিনি সহোর করলেন মৃত্যুর সেই দৃতকে।

সারা গা তাঁর অবশ হয়ে আসছে। পায়ের ওপর ছোট্ট একটা ক্ষত বেয়ে তিরতির করে ক্ষীণ বক্তব্যের নেমে এসেছে। পরনের বসন ছিঁড়ে ক্ষতস্থানের ওপর সজোরে বাঁধলেন যতীন্দ্রনাথ। লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে বিবের যাতনা বহন করে ফিবে এলেন আগ্রমে।

যতীন্দ্রনাথের মুখ দেখেই শিষ্যেরা অনুমান করলেন কঠিন কিছু ঘটেছে। পায়ের পটি দেখে বুঝতে বাকি রইল না—সাপের কামড়। তারা যতীন্দ্রনাথকে সন্তপণে শাইয়ে দিলেন।

সাবারাত অত বস্ত্রণাব মধ্যেও একটিবাব কুণ্ডিত হল না তাঁর অবসন্ন মুখমণ্ডল। মাঝে মাঝে একটু হেসে শিষ্যদের সঙ্গে রাসিকতা করতে লাগলেন। কেটে গেল কালরাতি।

যতীন্দ্রনাথ উঠে বসলেন। হেসে বললেনঃ “আমাদের প্রাণ কি এত অল্পে যায় রে?”

সাপের কামড়ের পব বেশ কয়েকদিন যতীন্দ্রনাথ দুর্বল ছিলেন।

এমান সময়ে এক রাজ্ঞ গৃহস্থেব ঘরে একদিন আগুন লাগল। গ্রামবাসীদের তবফ থেকে লোক এল সাধুবাবাকে খবর দিতে।

শিষ্য যতীন্দ্রনাথ গেলেন দ্রুতপদে। শিষ্যেরা ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে ছুটলেন। ওদিকে আগুন ছড়িয়ে গৃহস্থেব গোলাঘরের চালে। সারা বছরেব ধান সেখানে মজুত।...

যতীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়ে গোলাঘরে

চুকলেন। “শাদা পাঁচ-ছয় মণের একটা একটা ধানের বোরা নিয়ে ‘হরি ও’ করছেন আর হর হতে গড়িয়ে গড়িয়ে সেগুলা বাইবে নিয়ে আসছেন,” নলিনীকান্ত লিখেছেন।

অসুস্থ শরীর তাঁর, তার ওপর এই অমানুষিক পরিশ্রম। “আমরা গিয়ে তাঁকে বাধা দিলাম,” নলিনীকান্ত লিখেছেন, “তারপর আমরা ওই ধানের বোরা পাঁচজনে কোন প্রকারে অতি কষ্টে নড়াতে পাবলাম। এটা বাইরের শব্দে হব। শূদ্রদের আত্মবিশ্বাস আর মনের জোবে সম্ভব হয়েছিল।...”

৪৪

আরো একদিনেব কথা।

গোখলির দাঁবি নেই, সমস্ত আকাশ আলোব উৎসবে রঙিন। যতীন্দ্রনাথ নির্জন একটি মঠে বসে। পাশেই মণীন্দ্র চক্রবর্তী। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হবাব পর হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ কেমন যেন নীরব হয়ে গেলেন।

যতীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা মণীন্দ্রনাথবাব, বিশেষ জ্ঞানের না। জ্ঞানের না যে বোবনের প্রারম্ভেই আধ্যাত্মিক এষণা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হবোঁছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সমীপে, নিবিড়ভাবে মিশেছেন তাঁর সঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। স্বামী অভেদানন্দ আর স্বামী অখ্যানন্দের সঙ্গে যেমন, তেমনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মতো মনীষীর সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। জ্ঞানের না যে স্বামী ভোলানন্দ গির্বি মহারাঞ্জের মন্ত্রশিষ্য যতীন্দ্রনাথ।

তাই যতীন্দ্রনাথের সহসা ভাব পরিবর্তন দেখে মণীন্দ্রবাবও আর কথা না বলে চাপ করে বসে রইলেন যতীন্দ্রনাথের পাশে। প্রশান্ত তাঁর ধ্যানপ্রদীপ্ত দৃষ্টিব বহস্যগভতা দেখে মণীন্দ্রবাবও মনে বাকি বং ধবল। যতীন্দ্রনাথের সামিধ্যে বসে তিনি উপভোগ করতে লাগলেন অব্যক্ত এক আনন্দের স্বাদ। বহুক্ষণ কেটে যায়।

দাদা হিম্মত

যতীনদাদাথের চোখে পড়ল না।
কিসের এক আবেশে তাঁর মাথা শরীর
রোমাঞ্চিত।...নয়ন বাম্পাকুল।...তার দৃষ্টি
অনুসরণ করে মণীন্দ্রবাবু তাকান সামনের
জংগলের দিকে।

"শাল, আসান প্রকৃতি গাছগুলি মাথা
উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে," মণীন্দ্রবাবু
লিখেছেন, "দিন প্রায় অবসান হইয়া
আসিয়াছে।...গাছের মাথায় এক একফালি
বোদ স্তিমিত বস্ম বিকীরণ করিতেছে—

"যতীন একসঙ্গে সমস্ত একটি শাল-
গাছের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি উঠি
উঠি করিতেছি। যতীনের দিকে নজর
পড়িতেই দেখলাম তিনি প্রস্তুতমুখিত্ব অচল,
দৃষ্টি কিন্তু ঐ সমস্ত শালগাছের দিকে।
তাঁহাকে উদবাস্থ্য দেখিয়া আমি আর
উঠিবাই ইচ্ছা করিলাম না।

"এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।...
যতীন হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া
ঘলিলেনঃ দাদা, দেখ, দেখ। ওই যে আমার
কুক!"

যতীনদাদাথের আকুল কণ্ঠ শুনে মণীন্দ্র-
বাবু বিস্মিত হইলেন—কোথায় কুক?
কিছুই তো চোখে পড়ে না।

"ওই যে, শালগাছের ডালে কসে আমার
দিকে তাকিয়ে আছেন!..."

গাছের দিকে বারবার করে তাকালেন
মণীন্দ্রবাবু। ভাল করে দেখলেন। তিনি

লিখেছেন, "কই, আমি ত কিছুই দেখিতে
পাইতেছি না।"

অথচ যতীনদাদাথ আবার বললেন, "দাদা,
ওই যে, দেখ। আমার কুক আমার দিকে
চোখে হাসছেন।..."

কয়েক মূহুর্ত বাদে ডাবের ঘোরে
যতীনদাদাথ উঠে দাঁড়ালেন। ডাবপর, "দাদা,
দেখ, দেখ, দেখ।" বলে তিনি মণীন্দ্রবাবুর
হাত ধরে তাঁকেও টেনে দাঁড় করালেন।
মণীন্দ্রবাবুর সর্বশেষ বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে
গেল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তিনি পেলেন না।
তিনি লিখেছেন, "আমিও উঠিলাম। কিন্তু
আমাব সে চোখ কই?...আমার দেখাইবার জন্য
যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও, আমি অভাগা,
সে-ভাঙ্গা কোথায় পাইব?..."

তিনি আরো লিখেছেন, "সন্দেশ অধীর
যতীন বেন—আমহারা হইয়া পড়িলেন।...
তাঁহার ক্ষম্বে কত দায়িত্ব। কাজের জন্য কত
চিন্তা; কত—গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্মুখে
রহিয়াছে। যতীন বেন সবই ভুলিয়া
গিয়াছেন।...তিনি তখন হইয়াই রহিলেন।

"যতীনের মন যে ভগবৎ-ভক্তিত পূর্ণ
ছিল তাহা আমি ইতিপূর্বে একদিনের জন্যও
উপলব্ধি করি নাই। মনে কী এক আশ্চর্য
ভাব লইয়া দুইজনে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত
বসিয়া রহিলাম। এ যে পরম ভক্ত ভাবা-
বেশ।

"সতীন, ধনা তুমি, ধনা তোমার জন্ম।"

জার্মানি মিলিটারি আভাশে ফ্রন্ট প্যাপেন
০১-০-১৯১৫ তারিখে জানাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক
থেকে টেলিগ্রাম করে :

"এক।—'মার্ভেরিক' স্ট্রীমারের সঙ্গে গত
এপ্রিলের গোড়ার 'অ্যানি লার্সেন' জাহাজের
দেখা হয় স্কোরো দ্বীপে; অস্ত্রগুলি পাচারের
ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য ছিল। মার্কিন জাহাজ
এই মাসের নাবিকবাহু তখন উপস্থিত ছিল।
খাবার জল নেবার জন্যে দুটি জাহাজই বন্দ
মার্কিন উপকূলে গিয়ে পৌঁছয় তখন মার্কিন
জাহাজ-জাহাজ 'নোশান' থেকে চারজন বিদ্রোহী
নাবিককে গ্রেপ্তার করা হয়।... এই সূত্রেই
'অ্যানি লার্সেন' আর 'মার্ভেরিক' জাহাজের
গোপন সম্পর্ক ধরা পড়ে যায় মার্কিন ও ইংরেজ
নৌবহরের কাছে। খবরের কাগজের ধারণা
হয় অস্ত্র নিয়ে জাহাজ দুটি যাক্স দক্ষিণ-
পশ্চিম আফ্রিকা। ইংরেজ জাহাজ
নিউ কাসল সম্ভবত স্কোরো দ্বীপ
অভিমুখে রওনা হয়েছে। শাহহাই এবং
বার্গিভারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে
করে দুই জাহাজ থেকেই 'মার্ভেরিক'-কে
সাবধান করে দিয়ে করাচী অভিমুখে সোজা
চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্ট্রীমারে
পটিল ভারতীয়, আছেন। তারা অস্ত্র-বালাস-
করে নিতে সাহায্য কববেন।

"এই।—যতীন কিস্তী অস্ত্রবাহী জাহাজ
আগামী ১৫ই জুন এখান থেকে বাটভিয়া
যাবে; এই ডাচ জাহাজটি নিয়মিতভাবে
যাত্রারত করে এ-পথে, এর নাম 'জেম্বার'
(Djember) : এই জাহাজে কোনও বন্দী
নেওয়া হবে না; উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে
যুরে যাবে। বাটভিয়া পৌঁছতে এর আন্দাজ
চল্লিশ দিন লাগবে। পাকিং থেকে কিস্তি
কর্মী লী-চাও-কে বাটভিয়া পাঠানো হয়েছে
সেখানে উপযুক্ত ঘাঁটি করবার জন্যে, যাতে
কবে সেই ঘাঁটি থেকে সুমারার অস্ত্র পৌঁছে
দেওয়া যায়, কিংবা—সরাসরি ভারতেই নামিয়ে
দেওয়া যায়। উক্ত স্ট্রীমারটিতে একজন
ভারতীয় থাকছেন এই ব্যাপারে সহায়তার
জন্য।...

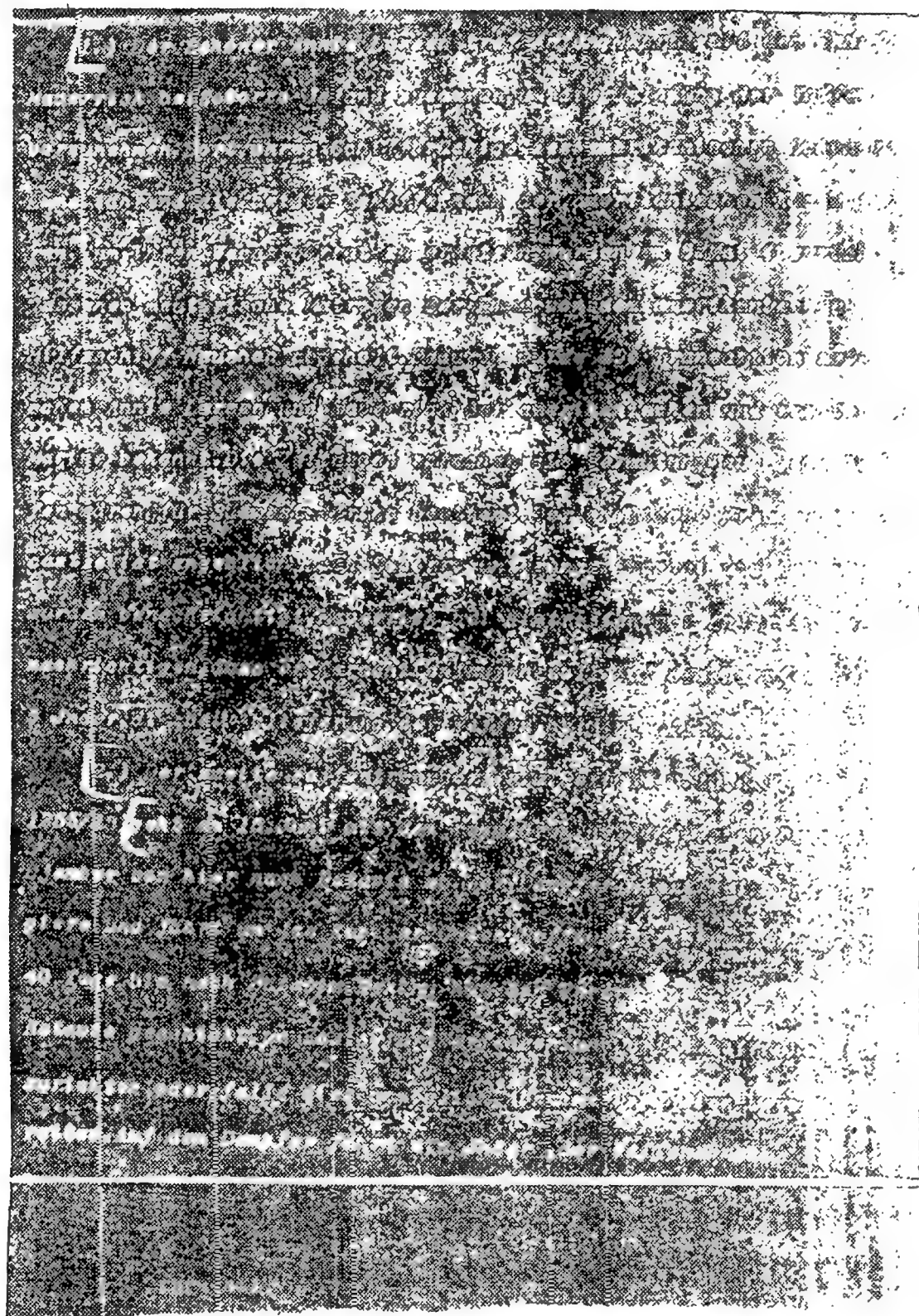
"...অধ্যাপক গুরু বেন শ্যামদেশ এবং
ভানতবর্ষে যান প্রচারের কাজে।"

জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট জর্ন বার্নস্টক
এবং মিলিটারি আভাশে ফ্রন্ট প্যাপেন স্বয়ং
ভারতের জন্যে নিউ ইয়র্ক ও ফিলডেলফিয়ার
মজুর অস্ত্র থেকে এগারো গাড়ি মাল উত্ত
'অ্যানি লার্সেন' জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন।
'মার্ভেরিক'-এর সঙ্গে এইসব অস্ত্রাদি গিয়ে
পৌঁছবে বালেম্বরে।

এই ঘটনার পিঠাপঠই, নিরাশ না হ'লে
প্যাপেন এবং বার্নস্টক যতীন কিস্তী অস্ত্র
নতুন একটা জাহাজে করে পাঠাচ্ছেন, দেখা
যাচ্ছে।

শাল-গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি উঠি
উঠি করিতেছি। যতীনের দিকে নজর
পড়িতেই দেখলাম তিনি প্রস্তুতমুখিত্ব অচল,
দৃষ্টি কিন্তু ঐ সমস্ত শালগাছের দিকে।
তাঁহাকে উদবাস্থ্য দেখিয়া আমি আর
উঠিবাই ইচ্ছা করিলাম না।

কিস্তিগদার জংগলে যতীনদাদাথের আশ্রয়দাতা শ্রীমশীন্দ্র চক্রবর্তীর হস্তাক্ষর।
[শ্রীমশীন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজনে]



জাভান মালভার আভানে ফন্ পাপেন্‌এর টেলিগ্রামের আংশিক প্রতিলিপি।

[প্রিন্সিপালস্‌মার দত্ত এবং দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসের দোজনে প্রাপ্ত]

গীতাথ সাধা ছিল তার জীবন।" বতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন ডাঃ বাদুগোপাল, "সুখ-দুঃখ, বাঁচা-মরা, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, নিন্দা-স্তুতি তাঁর কাছে ছিল তুল্য।..."

দেশের স্বাধীনতা-মুক্তি ব্যতীত তার জীবনের আধ্যাত্মিক প্রগতি ক্রিস্ট হচ্ছে—এগেই তো বতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম প্রস্তুতি থেকেই—বিংশ শতকের সূচনা-কালেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় : এ-কথা আগেও বলেছি। তিনি নিশ্চয় পুরুষ বলেই না সমস্ত কিছুর সূচনা করে তার বুদ্ধি এবং পরিণতির পর্বেও কর্মক্ষেত্রের ঘূর্ণিপাকের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থেকেছেন, ইতিহাসের ওঠা-পড়া চলেছে তাঁকেই ঘিরে, অথচ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নও তিনি, ও-সব-কিছুরও উদ্দেশ্য কোথায় বেন তাঁর স্বর্লোক : নিন্দার—তিনি বিচলিত হন নি, স্তুতিতে অভিভূত হলে নি তাঁর, জন্মে যেমন পরাজয়ে তেমন সমান প্রফুল্ল, অন্তর্মুখী, উদ্ভূতচর্যী থেকেছেন তিনি। ধরা-ছোঁয়ার আওতায় থেকেও রহস্যময় বলে তাঁকে মনে হয়েছে অনেকের। তাই বুদ্ধি ডাঃ বাদুগোপাল লিখেছেন, "বতীন্দ্রনাথ ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলকে ছাপিয়ে। তাঁর প্রাণের আলোক-শিখা যেন কোনও উচ্চলোক থেকে জ্বলিবে নিচে নামতেই তিনি।"

বাদুগোপালবাবুর মুখেই শোনাছি 'গীতার পুরুষ' বতীন্দ্রনাথের সৈব্ব আর সমতার দৃষ্টান্ত : "তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল। তাঁর চেহারা বর্ণনা-সমেত ফটো দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হল। তাঁকে ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার মিলবে, বিদেশী সরকার তাও বিধিমতো প্রচার করল।..."

"বালেশ্বরে তিনি জার্মান যুদ্ধের পর পরিণতিস্বরূপ অস্ত্রপাতি প্রাঞ্জির আশ্রয়... কালতিপাত করতে লাগলেন। কালক্রমে অস্ত্র-বাহী জার্মান-জাহাজ খুঁত হবার খবর তাঁকে দেওয়া হল। ভাগ্যক্রমে নির্ভুর আঘাত।... আমরা কত সন্মোচন করছিলাম মল খবরটা তাঁকে দিতে। এমন-কি ব্যবস্থা করেছিলাম হঠাৎ সব খবর না বলে ক্রমে ক্রমে গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে।"

"তিনি কিন্তু যেমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মনতে আস্তে করেছিলেন তেমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শোনা একনিশ্বাসে শেষ করলেন। বেন বিবম বা ক্রিট কিছু অঘটন ঘটে নি।"

"শান্তভাবেই বললেন : '...ভগবান শূন্যে। দিলেন। আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। দেশ কিন্তু নিজের জোরে দাঁড়াবে। অপরের সাহায্যে নয়।...'—তাই বলতে পারি তিনি ছিলেন বেন রূপ-মূর্ত গীতা।..."

বাদুগোপাল এই উক্তি ওপর পুরো নির্ভর ধারা না করতে চান, তাঁদের জন্য মিলনীকালত ফরের লেখাও তুলে দিই : "আমার মনে নাই

কোন একটা খবরের কাগজে জাহাজ ধরা পড়বার detail বেরিয়েছিল। নরেন্দ্র (ভট্টাচার্য) তারই cutting আমাকে দিয়ে বললেন যে, আমার ডাঙা-পথে (অস্ত্র) আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে।..."

"আমি মহলডিহার গিরে জাহাজ ধরা পড়ার কথা দাদাকে বললাম এবং cutting-টা দিলাম। দাদা শুনেনই খুব জেরে হাসতে হাসতে বললেন :

"Country's salvation from within not from without!..."

আর বাই-হোক, বিপ্লবী পক্ষে যে হাল ছেড়ে দেওয়া অসমীচীন, তা যেন বতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে দিতে চাইলেন। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাই যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের অন্তিম ভিত্তি, তারই ওপর গড়ে উঠবে সার্থকতার অপ্রলিহ মন্দির—সেই শিক্ষার বৃকে বেঁধে এগিয়ে চলেন বিপ্লবীরা।

অস্ত্রাধারের পুরাতন চেকোস্লোভাকিয়া। স্বাধীনতা-স্বার্থবশত ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী চেক-বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের মতোই, আমেরিকার বসে চেষ্টা করছেন কী করে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা করে ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রগতি দেখে মুগ্ধে বশেষ্ট সহানুভূতি দেখালেও চেক-বিপ্লবীরা অন্তরে অন্তরে বিরূপ হয়ে উঠলেন। এক মুক্তিকামী জাতি অপর মুক্তিকামী জাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন—স্বাভাবিক এই ধর্মের ওপর আস্থা নিয়ে ভারতীয়রা চেকদের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

যখন জার্মান-জাহাজে করে ভারতবর্ষের অভ্যুত্থানের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র বাবান খবর সংগ্রহ করলেন চেকরা—তখন তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ফ্রান্স আর রাশিয়ার মুখাপেক্ষী চেক-বিপ্লবীরা তলার তলার অবিসংবৈ এই এ-সংবাদ পাতিবে দিলেন আন্তর্জাতিক ফরাসী গোয়েন্দা-বিভাগকে। ফরাসীরা আকর্ষণ বকলেন ব্রিটিশদের দৃষ্টি। সার্বকৌতক ভাবায় চেক-যুদ্ধে চাউন হয়ে গেল গম্ভীরতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

দারুণ সতর্কতার ব্যবস্থা হল।

সারা ভারতে ধর-পাকড়ের ধুম পড়ে গেল নতুন করে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে ডেনহ্যাম আগেই সম্মানে বেরিয়েছেন—বতীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যোতিষ্মতুল্যকে না গ্রেপ্তার করে ক্রান্ত হবেন না, এই সঙ্কল্পে। আন্তর্জাতিক ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলে কুঠারঘাত করতে বন্ধপরিষদ তাঁরা।

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান এবং ওলন্দাজ অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে কঠোর প্রহরা বসল। প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির চর-জাহাজ বোরাফেরা করতে লাগল। তৎপর হল ফরাসী গোয়েন্দা-বিভাগ।

যাথা অতিক্রম করাই তো বিপ্লবীর প্রধান উপজীব্য। অসাধ্যসাধনেই তাঁর আনন্দ।

বিদেশীসূত্রে যেসব আয়োজন হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাই অগস্ট মাসেই বতীন্দ্রনাথের শিষ্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (ওবেক মার্টিন বা M.N.-Roy) এবং ফণী চক্রবর্তী আবার বংমা হলেন বর্মী, মালয়, সুমাত্রা হয়ে—বব্বীপের রাজধানী বার্টাভিরা (জাকার্তা)-অভিমুখে।

জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বতীন্দ্রনাথের দূতেরা জানলেন যে, জার্মানরাও হলে ছাড়েন নি এখনো। আরো কয়েকটা জাহাজের ব্যবস্থা কবেছেন তাঁরা। তাদের একটি জাহাজ আন্দামান আক্রমণ করে ভারতীয় বিপ্লবীদের বেমন মৃত্ত করে নেবে, তেমন সিঙ্গাপুর থেকে '২১শে ফেব্রুয়ারী' অভ্যুত্থানের বন্দী সৈন্যদেরও মুক্ত করে নিয়ে অগ্রসর হবে ভারত অভিমুখে। সঙ্গে থাকবে বহু হাজার রাইফেল, পিস্তল, হাতবোমা, মেশিনগান, কয়েক লক্ষ টাকা।

ওদিকে শাহহাইরে গিরে ফণী চক্রবর্তী দেখেন যে বেশকিছু হাতিয়ার ও অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু অপেক্ষা করছেন সেখানে। তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন নীলসেন নামে জনৈক ভারত-অনুপ্রাণী জার্মানের বাড়িতে।

ইতিপূর্বেই উক্ত নীলসেন কিছু টাকা ও আয়োজন সংগ্রহ করে দুটি চীনেম্যানকে পেনাং হয়ে কলকাতা পাঠান। কলকাতার বতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-সংস্থা 'সমজীবী' সম-বারের ঠিকানার বাংলার কর্মীদের হাতে ওই অর্থ ও অস্ত্র দেবার নির্দেশ দেন নীলসেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে চীনেম্যান দুটি ধরা পড়লেন সিঙ্গাপুরে।

আবার, বতীন্দ্রনাথের দূত অবনী মুখার্জী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে বশেষ্ট রসদ ও তথ্য নিয়ে ভারতবর্ষে ফেরবার পথে গ্রেপ্তার হলেন সিঙ্গাপুরে। ধরা পড়ে অবনী বহু নাম-ঠিকানা বলে দিয়ে এবং অনেক কথা ফাঁস করে বেহাই পান। এইভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে শূন্য হয় তাঁর বেপরোয়া স্বাধীন জীবন। শোনা যায় অবনীবাবু দেশের বশেষ্ট ক্রটি সাধন করেন রেহাই পাবার পরে।

অবনীর কাছে শ্যামের ইঞ্জিনীর অমর সিং-এর নাম পেলে, তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে বর্মার মান্দালর জেলে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

নীলসেন এবং ফণী চক্রবর্তীকে শাহহাইরে গ্রেপ্তার করা হল। বেগতিক বৃকে রাসবিহারী বসু পালিয়ে গেলেন জাপানে, তাঁর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। নতুন সুযোগের প্রতীক্ষা করছেন তিনি। (ক্রমশঃ)

আপরাধ নাটক ও বিনোদন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডক্টর নাটক ঈক নাটকের অধ্যাপক। তাঁর মতো অধ্যাপক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। যেমন লন্ডনের তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনি তাঁর বাচনভঙ্গি। পড়ানোর সময় তিনি স্টেজে অভিনয় করতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করাতেন। সন্দের স্পেশ্যালজ্ঞান তরুণ চেহারা। স্টেজ ক্র্যাফটস, ডাইরেকশন, অ্যান্ডিং প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা তাঁর মুখে শুনোঁছি। শেজপায়ের নাটকের বিষয়ে তাঁর মত হচ্ছে ক্যারেক্টার ম্যানিপুলেটস স্টাইল।

এখানে ইউনিভার্সিটি প্রে-হাউসে নিয়মিত নাটক অভিনীত হয় এবং যারা সেসব বিষয়ে স্পেশলাইজ করছে তারা নাটকে সেই সব বিষয়ের দায়িত্ব নেন। কমিউনিটির স্লাকস্কা টীকট কেটে এই সব অভিনয় দেখে এবং লিখে কৃত্তপক্ষকে তাদের মতামত জানান।

একদিন ডক্টর ঈক বললেন, সামনের বুধবার হোমবার্গ হলে ইউনিভার্সিটি প্রে-হাউসে 'ওরাডারফুল টাউন' হবে। আগামী এলে খুশি হব। 'ওরাডারফুল টাউন' লিওনার্ড বার্নস্টেইনের 'মাই সিম্ফনি ইলীন'কে ভিত্তি করে লেখা। খুব উঁচু দরের মিউজিক্যাল।

নির্দিষ্ট দিনে শো আরম্ভ হবে শোঁণ ডক্টর ঈক দর্শকের আসনে আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি এই বইয়ের ডিরেক্টর। তিনি স্টেজের মধ্যে না থেকে এখানে এলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'শো আরম্ভ হলে ডিরেক্টর আর স্টেজে থাকবেন না। তিনি দর্শক হিসাবে নাটকের যাচাই করবেন এবং কোন দৃষ্টি চোখে পড়লে পরবর্তী শো-তে সেটি সংশোধন করতে তৎপর হবেন। নাটক অভিনীত হবার সময় তিনি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।'

'ওরাডারফুল টাউন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখলাম একটি রাস্তার রেল স্টেশন থেকে আগত নরনারীর চলমান ভিড়। বিভিন্ন প্রায়ে-সনের লোক নানাভাবে চাৰিবিদিকে হুটুচ্ছে। হঠাৎ মনে হয় একটা বিশৃঙ্খল ভিড়, যে যেদিকে যেমনভাবে ইচ্ছা হুটুচ্ছে। হুটুতে গিয়ে কারো পায়ে পায়ে আটকে যাচ্ছে, কেউ কারো গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে, কারো হাতের বই পড়ে যাচ্ছে। এক কথায় একটা শৃঙ্খলাহীন ব্যাপার। আমি ডক্টর ঈককে জিজ্ঞাসা করলাম, অজ্ঞা, এরা তো খুশিমতো অভিনয় করছে

কলে মনে হচ্ছে। এদের কোনো নির্দিষ্ট ডিরেকশন দেওয়া আছে কী?'

তিনি আমাকে স্টেজের একটা চার্ট দেখালেন। এই চার্টে প্রত্যেকটি অভিনেতার মুভমেন্ট ছকে দেওয়া আছে। তিনি বললেন, 'জাপাতভাবে এদের অভিনয় বিশৃঙ্খল মনে হলেও তা আসলে খুবই সুসংযত ও শৃঙ্খলা-পূর্ণ। দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মিউজিক্যালের প্রথম দিকে খুব দ্রুত অ্যাকশন দেওয়া হয়।' তার পর একটু থেকে বললেন, 'অভিনেতারাই নাটকের সবচেয়ে বড় ক্লিরিটিভ ফোর্স। একজন অভিনেতার পক্ষে এরিরা অব কন্ট্রোল মেটরাল, ফিজিক্যাল ও ইন্ট্যালেকচুয়াল

এস. কে. গ্রানিবার্গ

এই তিন রকমের। শেষ পর্যন্ত তাকে তাব অভিনয়কে স্পিরিচুয়াল লেভেলে নিয়ে যেতে হয় যখন আমরা অনুভব করি, 'আমরা বিশ্বাস করছি।'

স্টেজের কতকাংশ সব সময়ে পদার্থ বাইবে খোলা রাখা হচ্ছে কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'এইভাবে নাটকের সিচুয়েশনের কনিটি-নিউটি বজায় রাখা হয় এবং দর্শকদের পক্ষে নাটকে পার্টিসিপেশনের স্বাভাবিক সুবিধা ঘটে।'

সলিলাকির সময় অভিনেতার পেছনের পদা সরে আসার কারণে বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন, 'পদা থেকে অভিনেতার দূরত্ব যত কম আসবে ততই তার ব্যক্তিগত হাইলাইটেড হবে। তাবর সে দর্শকের হাত কাছে আসবে তার ফোকাসও তত বৃদ্ধি পাবে।'

নাটকের শেষে আমার মতামত জানিয়ে ডক্টর ঈকের কাছ থেকে সৌদনের মতো বিদায় নিলাম। একটি সুন্দর সম্মান স্মৃতি আমার মনে চিরদিনের সঞ্চার হয়ে উঠল।

ডক্টর উইলিয়ামস এবং মিস্টার রায়েল একদিন আমাকে টালসা ও ক্রেয়ারমোরে নিয়ে গেলেন। টালসাকে বল হয় পৃথিবীর অয়েল ক্যাপিটাল। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক বাস করে। সন্দের কক্ষ থেকে শহর। আমরা সন্দের গাছে ছাওয়া কক্ষ থেকে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আমেরিকান ইতিহাস ও শিপের মিউনিজিয়াম গিলক্রিফ ইনস্টিটিউট দেখতে গেলাম। চমৎকার একতলা বাড়ি। সামনের বিস্তৃত সবুজ লেনে

ফুলগাছের উচ্ছ্বাসিত ভিড়। টমাস গিলক্রিফের প্রবাদি এখানে সংগৃহীত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। এই মিউজিয়ামে সংগ্রহের মধ্যে নিউ ওয়াল্ড থেকে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ছেলে ডিরাগো কলম্বাসের লেখা প্রথম পত্র, নিউ ওয়াল্ডে ছাপা প্রথম বাইবেলের এক কপি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে ঘোড়ার চড়া একটি ইন্ডিয়ানের মূর্তি এবং চিত্রাবলীর মধ্যে জন জেমস অডুবনের 'দি ওয়াইল্ড টার্ক' ও চার্লস মারিয়নের 'হোয়াব গ্রাকস স্পেল মিট' বিশেষভাবে মনকে আকর্ষণ করল। এত জীবন্ত শিল্পকলা খুব কমই চোখে পড়ে। আমেরিকানদের কাছে টার্ক খুবই পবিত্র। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে টার্কের মাংস না খাওয়া হলে চলে না।

এব পর গেলাম ক্রেয়ারমোরে উইল বোজার্স মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে। উইল বোজার্সের নাম শ্রুতি আমেরিকান নব, সারা পৃথিবীতে পরিচিত। উইল বোজার্স পৃথিবী বিখ্যাত অভিনেতা, সাংবাদিক ও বক্তা। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর ক্রেয়ারমোরে রায়ে উইল বোজার্স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্রেম ভন বোজার্স। তিনি পিতার অন্তর্য সমতান। তিনি চেরোকী ইন্ডিয়ান। তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোপ ট্রিকার। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় নিউজপেপার কলামিস্ট ও কিচার রাইটার। তিনি একাধারে আমেরিকার এক নব্বয় এয়ার-ট্রাভেলার, একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় বেডিও কমেডিয়েটর, বহু-পরিচিত ম্যুজিস্টার, সুপরিচিত দার্শনিক ও হিউমারিস্ট, প্রখ্যাত পোলা খেলোয়াড়, খ্যাত-নামা গ্লোবট্রাটর এবং অস্বীকার্য ইমপ্রপট্টু স্পিকার। তাঁকে বলা হয়, 'দি লাস্ট অফ দি ক্র্যাকব ব্যাবেল ফিলজফার।' তিনি সত্তরটি ম্যুজিতে প্রধান ভূমিকার অবতীর্ণ হন। তিনি যে সব ম্যুজিতে অভিনয় করেন তাদের মধ্যে 'প্যাফিং বিল হাইড', 'দে হ্যাড টু সী প্যাবিস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রূপমণ্ডে অভিনয় করেনও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গ্রন্থাবলী হচ্ছে 'দি কাউ বয়জ ফিলজফি অন দি পিস কনফারেন্স', 'দি কাউ বয়জ ফিলজফি অন প্রোহিবিশন', 'দি ইন্টিগ্রেটেড ডাইজেস্ট', 'লোটার্স অফ এ সেলফ-মেক ডিপ্লোম্যাট টু হিঙ্গ প্রেসিডেন্ট', 'দেয়ারস নট এ বোয়িং স্ট ইন রাশিয়া',

এবং ইথার অ্যান্ড সি অর জাস্ট রিলাক্স'।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ১৫ই অগস্ট প্রাঙ্গণের পরেই ব্যারোব কাছে রোজার্স একটি এসায়াম্পল অ্যাপ্রিডেটে মারা যান। সাময়িকভাবে তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ার ফরেস্ট মনে সমাধিস্থ করা হয়। পরে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২২শে মে ক্রেসারমোবে উইল রোজার্স মেনেরিয়াস নিমিত্ত হলে স্থায়ীভাবে তাঁর দেহকে একটি সম্মর সমাধিমন্দিরে স্থাপন করা হয়। উইল রোজার্সের নামে রাস্তা ও এয়ারপোর্ট আছে। ওয়াশিংটন ডি. সি.র ম্যাসনাল স্ট্যাটুয়ারি হলে রোজার্সের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটি রোজার্স মেনেরিয়াসের মধ্যভাগে স্থাপিত - ক্রেসার-নিমিত্ত মূর্তিটির প্রতিবৃন্দ। এটি তৈরি করেছেন জো ডেভিডসন। প্রখ্যাত ওকলাহোমান - হাস্যবসাদিনতা রোজার্সের মূর্তিকে নান্যভাবে স্থাবী মর্বাদা দেবার চেষ্টা থেকে বোঝা যায় আমেরিকানরা তাদের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে প্রকৃতির লঘু ও সরস দিকটির কত মূল্য দেয়।

ছেচলিশ ফুট এক সূদৃশ টাওয়ারের মধ্যে প্রধান প্রবেশ-পথ। আমরা ঢুক প্রথমে দ্ব্যাবতী স্থানে রোজার্সের স্ট্যাচুয়র কাছে এলাম। পি ক্রেসারমোর ডেইলি প্রোগ্রেসের প্রতিনিধি স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের একটা ছবি তুললেন। স্ট্যাচুটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কোর্টের দু'পক্ষে দু'হাত ঢুকিয়ে স্মিতহাস্যমুখে রোজার্স দাঁড়িয়ে আছেন। স্ট্যাচু পাদপীঠে লেখা, আই নেভার মেট এ ন্যান আই ডিডনট লাইক। আমার মনে হল রোজার্সের সংস্পর্শে যাওয়া এসেছিল তাদের মধ্যে রোজার্সকে ভালোবাসেন এমন বোধ হয় কেউ নেই।

এবার ঢুকলাম পূর্ব গ্যালাবীর মধ্যে। এটি রোজার্সের স্যাডল রুম। এখানে রোজার্সের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের স্যাডল ও তার অনুষঙ্গিক জিনিসপত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এইসব স্যাডলের কতকগুলি রোজার্স তাঁর পৃথিবী পরিভ্রমণের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

উত্তর গ্যালাবীরে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল ফ্যারলেন্সের ওপরে টাঙানো রোজার্সের একটি অপূর্বসুন্দর অয়েল পেইন্টিং। এটি এঁকেছিলেন ইটালীয় কোর্ট আর্টিস্ট আর্নোভো টামব্রিনি। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বেড়িয়ে এসেছিলেন তখন রোজার্সের ছোঁবা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছবি আঁকার অনুরাগিতা তান। রোজার্সের আলস্কা যাওয়ার আগেই ছবিটি শেষ হয়ে যায়। ১৯৫০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উইল রোজার্স মেনেরিয়াস কমিশন টামব্রিনির কাছে থেকে ছবিটি কিনে নেন। গ্যালাবীর প্রবেশপথের দু'দিকে সান্টস্লেস মেশিনে রোজার্সের

জীবনের নানা ঘটনার নির্বাচিত ছবি দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। এই গ্যালাবীরে বোজার্সের পাওয়া নানা ঝাঁক ও উপহারের বস্তু প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি দেখে বৃকতে পাবলার দেশের লোকদের হৃদয় কতখানি তিনি জয় করতে পেরেছিলেন।

পশ্চিম গ্যালাবীরে বোজার্সের অনেকগুলি ব্যক্তিগত জিনিস প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি থেকে বোজার্সের প্রতিভার বিস্তারিত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়। এখানে তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন দড়ি দেখলাম। মিস্টার রাসেল বললেন, 'পিড়ির কোঁশলে রোজার্সের কোনো জড়ি নেই।' এখানে একটি কেসের মধ্যে তাঁর টাইপরাইটারটি রয়েছে। এটি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। যে দু'ঘটনার তিনি মারা যান সেই সময় এই টাইপরাইটারটি তাঁর মালপত্রের মধ্যে ছিল। এর আটকে-বাঁধা চাবি ও দোমড়ানো ক্রেসার দু'ঘটনার নিদ্রারূপ স্মৃতি বহন করছে।

ক্রেসারমোর থেকে ফেবার সময় মিস্টার রাসেল বোজার্সের বিষয়ে অনেক গল্প বললেন। তাঁর কাছে শুনলাম রোজার্স বললেন, 'There ought to be a law against anybody going to Europe until they had seen the things we have in this country.' সত্যি অনেক ক্ষেত্রে আমরা একটা ফোঁড়ি-বশত বিদেশ ভ্রমণে যে রকম উৎসাহী হই নিজেদের দেশকে জানবার বিষয়ে আমাদের ভেতন আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখাই না।

এক রবিবার আমরা রেড ইন্ডিয়ান সিটি অ্যানাডার্কো দেখতে গেলাম। সম্প্রতি অ্যানাডার্কো একটি অল-আমেরিকান সিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পেরেছে। ওকলাহোমা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে এখানে কয়েকটি রেড ইন্ডিয়ান ভিলেজ তৈরি করা হয়েছে। এইসব ভিলেজের মধ্যে রেড ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটির উপস্থাপনা দেখে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমে আমরা গেলাম ইন্ডিয়ান সিটির মধ্যে ইন্ডিয়ান সিটি লজে। লজের চালু ছাদের ওপর খান্ডাববাড়ের চিত্রটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। শীত শীত করছিল। লজের মধ্যকার বেস্ট্রেরেট থেকে কফি খেলাম। একটি সুন্দর টুপি কিনলাম সূর্ভেনির হিসাবে। এব পর গেলাম ভিলেজ দেখতে। মাংস ও চামড়া শুকনোর র্যাক, ঘোড়ার আস্তাবল, চামড়া তৈরি কনিক্যাল তাঁবুর মতো বাড়ি, ডান্স আর্বার, 'উইচিটা' নামে এক রকম ঘাসের তৈরি কনিক্যাল বাড়ি, কববস্থান ইত্যাদি দেখে মনটা নতুন করে বেড ইন্ডিয়ান জীবনের বোমাণ্ড অনুরাগ করলে। যে গাইডটি আমাদের সঙ্গে ছিল সে বেড ইন্ডিয়ান এই পূর্বে যুগ্মে গির্বাছিল। সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী মোটামুটি ভালোই

বলতে পারে। নিজের জাতীয় দুঃসাহসিকতার বিবরণ দিতে দিতে তার মুখচোখ অতীতের স্বপ্নে উল্লসিত হয়ে উঠছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি তো দেখাছ ইংরেজী বলতে পার। তোমাদের নিজের ভাষার কি অবস্থা?'

সে দুঃখিত কণ্ঠে উত্তর করলে, 'আমাদের রেড ইন্ডিয়ানদের অনেক ভাষা আছে। এগুলি গভর্নমেন্ট সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। অনেক জায়গায় এগুলিকে টেপ করে রিসার্চের বিষয় করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির ডেডলপ-মেন্টের কোনো স্কাপ নেই।'

—কেন?

—কেন না ইংরেজী শিখলে অনেক সুবিধা। চাকরি-বাকরি পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ভদ্র হওয়া যায়।' একটু থেমে দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলে বললে, 'আমরা ভদ্র আমেরিকান বনে যাচ্ছি, আমরা আমাদের রেড ইন্ডিয়ান ঐতিহ্য হারাতে বসেছি।'

—ইংরেজী-জানা আমেরিকানদের সঙ্গে তোমাদের বিয়ে হয়?

—কখনও কখনও হয় এবং হলে বেড ইন্ডিয়ানেরা শীঘ্রই তাদের ঐতিহ্য ভুলতে বসে।'

—রেড ইন্ডিয়ানদের কি অনেক গভ্র মহাবুদ্ধি গিরেছিল? আমি এখানে অনেক ওয়ার ভেটেরান দেখছি।'

—হ্যাঁ, আপনাব কথটা ঠিক। রেড ইন্ডিয়ানেরা অ্যাডভেঞ্চারজাতীয় কাজ খুবই পছন্দ করে।' একটু থেমে সে বললে, 'আমেরিকা ঘুরে নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার লোকেরা আমাদের নাচগানের বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের হস্তশিল্প ও তাদের আদরের সামগ্রী। অনেক পরিবারের ছেলেকেরা আমাদের নাচগান শেখে। ভদ্র ও তাদের সঙ্গে আমাদের কোবায় একটা কাক আছে।' তার গলায় একটা বেদনার সুর বেজে উঠল।

বিকেল বেলা রেড ইন্ডিয়ানদের কিয়োরা ভেটেরানস অর্জিলারি ইন্ডিয়ান ড্যান্সের আয়োজন করলেন। নাচ আরম্ভ হওয়ার আগে সভাপতি ক্রাবের ইতিহাস, উদ্দেশ্য প্রকৃতির বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সমাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিচিত্র বর্ণের সাজে সজ্জিত হয়ে একদল মেয়েপুরুষ নাচতে আরম্ভ করলে। মাথায় পালক, গায়ে উলকি, পায়ে ঘুড়রের মতো জিনিস, চামড়ার কোমরবন্ধনী, হাতে রঙিন লাঠি—সব জড়িয়ে বর্ণবহুল সাজসরঞ্জাম। বালক-বালিকা থেকে একেবারে বৃদ্ধবৃদ্ধিও এই নাচের দলে রয়েছে। এদের বাজনায ড্রামজাতীয় বাদ্যের ব্যবহার বেশি। এদের নাচ দেখে আমার সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের কথা মনে পড়ল। বৌদ্ধব্রজনা, সারিবদ্ধভাবে বাজনা তালে তালে পা ফেলে এগোনো-পিছোনো, দেহভঙ্গি, বাজনার সুরমুহূর্ত

সাহিত্যিক বসন্ত

প্রকৃতি বিষয়ে মিল আছে। তবে রেল ইন্ডিয়ানদের পোশাক-পরিচ্ছদে স্বাভাবিকতা বেশি। যে লোকটি আমাদের গাইড হয়েছিল তাকেও নাচের সঙ্গে দেখলাম।

টুরিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ নাচেরদের আগে ছবি তুললে।

খানিকক্ষণ নাচ দেখে আমরা আবার থেকে বেরিয়ে এলাম। এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটি চাকর তৈরি কনক্যাল তৈরি। এদের মাথার কাছে আঁকা রয়েছে গুপ-চিহ্নের মতো স্থাপিত দুটো তলোয়ারের মধ্যে কক্ষের মূর্তি। আদিম ধর্মিক্রিয়াসমূহ, সাপ প্রভৃতির একটা বিশেষ স্থান আমি অন্য ইন্দ্রিয় লক্ষ্য করছি।

এরপর গেলাম সাদার্ন শেলস ইন্ডিয়ানস মিউজিয়াম অ্যান্ড ক্রাফট শপ দেখতে। এটি অ্যানাভারকার পূর্ব কোণে অবস্থিত। মিউজিয়ামে সাদার্ন শেলস ইন্ডিয়ানদের জীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শিত হয়েছে। ঘোড়ার চড়ে থাকলে শিকার ইন্ডিয়ানদের জীবনের একটি উপকায় দৃশ্য। এই শিকারের ছবি ও সাজ-সরঞ্জাম এখানে দেখানো হয়েছে। ইন্ডিয়ানদের কয়েকটি সুন্দর বাস্ট খুব ভালো লাগল।

একদিন লটন সিনিয়র হাইস্কুল ও লটন আইসেনহাওয়ার জুনিয়র-সিনিয়র হাইস্কুল দেখতে গেলাম। দুটি স্কুলই চমৎকার। লটন স্কুলের খুব নামডাক। আইসেনহাওয়ার স্কুলটির পুরো কনস্ট্রাকশন এখনো হয় নি।

লটন স্কুলের ৫০ একর জমি নিয়ে ক্যাম্পাস। বার্ষিক বাজেটের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাদের বার্ষিক বাজেট ৫৬,৮৬,০০০ ডলার।'

হাসানের বয়সের কথা উঠল। প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমাদের এখানে একটি ২২ বছরের ছাত্র আছে। বিবাহিত ছাত্রের সংখ্যা ৪০।'

এখানে অন্যান্য স্কুলের মতো পেরেন্ট-টিচার অ্যাসোসিয়েশন নেই। তবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্যে রিপোর্ট কার্ড দে আছে। শিক্ষকের সংখ্যা ৪৭।

লটন থেকে ফোর্ট সিলে ইউ.এস. আর্টিলারি অ্যান্ড মিসিল সেন্টারের হ্যামিল্টন হল অ্যান্ড ম্যাকলেন হল মিউজিয়ামে গেলাম। এই মিসিল সেন্টারটি খুবই বিজ্ঞাপিত।

হ্যামিল্টন হল অ্যান্ড ম্যাকলেন হল মিউজিয়ামে গত দুই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, রাশিয়া, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স, ইউনাইটেড স্টেটস কর্তৃক ব্যবহৃত কতকগুলি ট্যাঙ্ক, মিসাইল, বন্দুক প্রকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ও মিসাইল মিউজিয়ামের হল সংলগ্ন খোলা জায়গায় সাজানো আছে। ওপরে নির্মল নীল আকাশে গাড়ি স্পর্শবর্ণের সুখ। নীচে সবুজ ঘাসের বৃক্ক অতিকার হিংস্র জন্তুর মতো সারিবদ্ধ মারগান্ডগুলি ওত-পেতে বসে আছে। গ্রীষ্মের মেসে মিসেস অ্যাডমিরাল একটি ট্যাঙ্কের গ্যারে হাত বুলোতে বুলোতে

পরিহাসের সুরে বললে, 'তুমি সত্যতার বড় আনন্দের সম্ভান। বলো তোমাকে কিভাবে আদর করব।'

ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'মানুষ এক মাকড়শ। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো এই অস্ত্রগুলি তার জাল। নিজের জালে জড়িত হয়ে শেষপর্যন্ত সে নিজেই মরে।'

ইংলটন রণগরিসকতার ওস্তাদ। সে রহস্য করে বললে, 'আমি যদি এমন একটি মিসাইল হতাম তবে খোলা আকাশের নীচে রোদের মশারি খাটিকে ঘাসের বিছানায় দিবা দুপুরে থাকতাম।'

আমি বললাম, 'খুব ঘুমোতে?'

—না, মাঝে মাঝে খিদের চোটে ঘুম ভেঙে মেলে যেতাম।'

—কি যেতে?'

—হাওয়া।'

—স্বপ্ন দেখতে না?'

—হ্যাঁ। স্বপ্ন আমাদের মতো একদল লোক আমাকে দেখবার জন্যে অনেক উদার খরচ করে এখানে এসেছে।'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

একদিন ডক্টর উইলিয়ামস বললেন, 'ওকলাহোমা সিটিতে ওকলাহোমা এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনশন হবে। ওয়াল্ড কনফারেন্স অব অর্গানাইজেশনস অব দি টিচিং প্রফেশনের প্রেসিডেন্ট সার্ব রোনাল্ড গোল্ড আসছেন। যে যে যেতে চাও জানিও।'

আমরা সকলেই খাব বলে স্থির করলাম। ঠিক হল দুদলে দুদিন যাওয়া হবে। আমি প্রথম খাব বলে জানলাম।

বিরাট কনভেনশন। ইউ.এস. কমিশনার ও এডুকেশন মিস্টার কেনেল কনভেনশনের উদ্বোধন করে এডুকেশন অ্যান্ড দি ন্যাশনাল ইকনমি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। প্রচুর তথ্যপূর্ণ তার সুন্দর বক্তৃতার একটি কথা বিশেষ করে ভালো লাগল। সেটি হচ্ছে— 'এডুকেশন ইজ দি বেসিক বিজনেস অব সিভিলাইজেশন। সার্ব রোনাল্ড গোল্ডের বক্তৃতার মতো বক্তৃতা শোনবার সুযোগ জীবনে খুব বেশি ঘটে না। যেমন বাচনভাঙ্গ তেমন তথ্য ও তত্ত্বের পরিবেশন। প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞতার নিশ্চিত আবেদন। তিনি বললেন যে শিক্ষা হবে বয়স, সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী। শিক্ষা সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। একটি চাকরি পাওয়ারই এর শেষ নয়। প্রত্যেকের জন্যেই শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। সেদিক দিয়ে আমেরিকাতেই শিক্ষার সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য হল লোকাল কন্ট্রোল। শিক্ষা স্টেটের ব্যাপার। স্থানীয় লোকেরা অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে এর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই জন্যে এক স্টেট থেকে আর এক স্টেটের অর্থ ও সামর্থ্যের পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধারও পার্থক্য ঘটে। সার্ব গোল্ডের মতে শিক্ষাকে আরো বেশেই নিয়ন্ত্রণাধীন করা উচিত। শিক্ষার নানা আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার থাকলেও দেখতে হবে শিক্ষা কেন যেখানে পরিমাণে মানবিক হয়।

দুপুরে ডাউন টাউনে লাগু যেতে এসে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ হল। আমি একটা কাকটোরিয়াতে খাবার নিয়ে কোন টেবিলে বসব ভাবছি এমন সময় একজন ভদ্র লোক বললেন, 'এদিকে আসুন না।'

আমি তার টেবিলে গিয়ে বসলাম। জনতে পারলাম তিনি রাস্তালী। কলকাতার তার বাড়ি। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে কাজ করেন। ৮ সপ্তাহের একটা ট্রেনিং-এ ক্যানাডা এসেছিলেন। এখন একটা অবসর-ভেশন ট্যুরে ওকলাহোমা এসেছেন। কেন না এয়ারে ওকলাহোমার খুব নামডাক। এখানকার টিফিন এয়ার ফিল্ড, মিসিল সেন্টার ও ওয়াল্ড-ডট ফ্যাক্টরী বিশ্ববিখ্যাত। ভ্রমণলোকের রঙে মাজা-মাজা, কিন্তু সুন্দর স্মরণীয় দৃশ্য চোখেরা। নাম মিস্টার এ. রায়।

মিস্টার রায় বললেন, 'আমরা চারজন এসেছি। কালই ফিরে যাবি।'

আমি বললাম, 'আপনাদের ট্রেনিং বেশ সম্ভাবজনক হয়েছে তো?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। এখানকার সাজ-সরঞ্জামের তুলনায় হয় না। প্রচুর ধনী দেশ। তাই নিজেকে অবস্থা অনুযায়ী কি প্রদর্শন করব সে বিষয় বিচার করে দেখা দরকার।'

বাওয়া শেষ হলে চলে যাওয়ার সময় উনি বললেন, 'আশা করি ভারতবর্ষে দেখা হবে।'

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রী গোম্বারী বীরচিত

শিক্ষা-মাধব

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত চীকাম্ব]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ণত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্যই শ্রীশ্রী গোম্বারীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করা হয়েছে। মহাপ্রভু বলিষ্ঠাছেন—

'অধর প্রসন্ন ইহার কণা সালংকার।

এছে কবির বিনা নাহে রসের প্রচার।'

ভূজা : ভিন টকা।

বসন্ত প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিনোদিনী গান্ধী স্ট্রীট, কল-১৬

সমাজতন্ত্রী সুভাষচন্দ্র / নির্মল বসু

রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকে দ্রুতজী, সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০১ সালে করাচীতে 'নওজোয়ান ভারত সভার' অধিবেশনে সভাপতিত্ব ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, "আমি ভারতে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই।" পরবর্তীকালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারূপে সুভাষচন্দ্র এই সমাজতন্ত্রের আদর্শকেই গড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ভারত থেকে অন্তর্ধানের পর প্রথমে জার্মানিতে ও পরে পূর্ব-এশিয়াতে তিনি এই আদর্শের প্রচারই করেন। ১৯৪৪ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে সমাজতন্ত্রেরই কথা।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল। 'মুদ্রি সংগ্রাম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ফরওয়ার্ড ব্লক ও তার যৌক্তিকতা' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় পূর্ণ সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেছেন। সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের মূল দ্বীপ্তিগুলি নিম্নরূপ:

- (১) উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা;
- (২) সমাজের পক্ষ রূপে রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে;
- (৩) ব্যাপক শিল্পায়ন;
- (৪) সকলের জন্য সমান অধিকার;
- (৫) সমাজের সর্বশ্রেণীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা;
- (৬) সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার নীতির প্রয়োগ।

(মুদ্রি সংগ্রাম)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর সুভাষচন্দ্রের কোন আস্থা ছিল না। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি উদ্যোগ বা 'প্রাইভেট সেক্টর' রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। টোকিও ভাষণে তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর নির্ভর করলে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মত সমস্যার সমাধান করতে

আমাদের শত শত বৎসর লেগে যাবে। শিল্প ও কৃষি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তি-উদ্যোগের পরিবর্তে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন। তাঁর কথায়—

"Shall we leave it to private agency and private initiative or will the State take up the responsibility of solving these problems? If, we leave it to private initiative to solve the problem of poverty and unem-



প্লয়মেন্ট বেকার থেকে স্বাধীনতার ডাক

ployment for instance, it will probably take centuries. Therefore, public opinion in India is in favour of some sort of a socialist system where the initiative will not be left to private individuals, but the State will take over the responsibility for solving economic problems. Whether it is a question of industrialising the country or modernising agriculture, we want the

State to step in and take over the responsibility and put through reforms within a short period, so that the Indian people could be put on their legs at a very early date." (টোকিও ভাষণ, ১৯৪৪)।

ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করতেই হবে, এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিকল্পিত অর্থনীতির সাফল্যের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নির্বাচিত হবার পর তিনি 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠন করেন ও জওহরলাল নেহরুকে এই কমিটির সভাপতি করেন।

সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার কোন বিরোধ ছিল না। সুভাষচন্দ্র একান্তভাবে ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছেন, এবং তার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অপর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি সমর্থন জানিয়েছেন, অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করেছেন, এবং সকল স্বাধীন জাতির মিলিত বিশ্ব সংঘ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আন্তর্জাতিক। ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, কেবলমাত্র ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঔপনিবেশিক মুদ্রিসংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতেও সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রকে স্থাপন করেছেন। ১৯৩৮ সালে হরিপদুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি লেনিনের তত্ত্ব আলোচনা করে দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক শোষণের জেরেই বৃটেন ও অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী সেসব দেশের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ঔপনিবেশবাদের অবসানের দ্বারা বৃটেন প্রভৃতি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সমাজতন্ত্রের আন্দোলন শক্তিশালী

হবে। ফ্যাসিবাদের বিকল্প হিসাবেও স্ভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ১৯৩৬ সালের ১২ই অক্টোবর দিল্লীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হিটলারবাদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ভাষচন্দ্র বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে সেগুলি ভালভাবে বিচার করে তার থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি এ কথাও বলেছেন, ভারতের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের জনসাধারণের উপযোগী করে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলতে হবে।

সমাজতন্ত্র প্রতি সমর্থন জানিয়েই স্ভাষচন্দ্র ক্ষান্ত হন নি। কোন পথে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে তিনি ভেবেছেন এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তার বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। আপোষ, বিবর্তন বা সংস্কারের পথের ওপর স্ভাষচন্দ্রের কোন আস্থা ছিল না। তিনি বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি এই পথ গ্রহণ করেছেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি বৈপ্লবিক পথের নিশানা দিয়ে গেছেন।

‘বিপ্লব’ নামক বক্তৃতায় স্ভাষচন্দ্র বলেছেন, “আমাদের সম্মুখে দুইটি লক্ষ্য। প্রথমত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং ইহার জন্য চাই জাতীয় বিপ্লব। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল আমাদের দেশে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ইহার জন্য চাই সামাজিক বিপ্লব।”

সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত অংশ এই বিপ্লবে এগিয়ে আসবে। স্ভাষচন্দ্র বলেছেন, “গরীব জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বিপ্লবকে সমর্থন করে। ধনীসমাজ ইহাকে সমর্থন করিতে চায় না। গরীব জনসাধারণ জানে যে বিপ্লবে তাহাদের মঙ্গল নিহিত আছে। কিন্তু ধনীসমাজ চায় তাহাদের সম্পত্তি আগলাইয়া থাকিতে। তাহারা কেন নূতন ব্যবস্থার নামে আতঙ্কিত হয়। বৈদেশিক শাসনের আওতার থাকিয়া তাহারা জনগণের উপর অবাধ শোষণ চালাইতে পারে, বৈদেশিক শাসনের কুফল তাহাদের উপর পড়ে না। বিপ্লবের নামে ধনীসমাজের আতঙ্কিত হইবার কারণ আছে, কারণ তাহারা জানে যে বিপ্লব

হইলে তাহাদের ধনসম্পত্তি হারাইতে হইবে। কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারণ বিপ্লব সমর্থন করিবে, কারণ তাহাদের মুক্তি এই পথেই আসিবে।”

স্ভাষচন্দ্র তাঁর এই ‘বিপ্লব’ (What is Revolution?) বক্তৃতায় বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অতি দ্রুত কর্মসাধন এবং সমাজসম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পন্থার আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন। এমন কি অস্ত্রধারণ ও রক্তপাতও বিপ্লবপন্থার অবশ্যম্ভাবী হতে পারে। স্ভাষচন্দ্রের ভাষায় :

“And when you have to produce a speedy result you will have to resort to every way and use every weapon. In the process of evolution you will wait while persuasion takes time to work; in a revolution you take up arms and crush every opposition. And so the shedding of blood also becomes one of the qualities of a revolution.”

বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথই স্ভাষচন্দ্র নির্দেশ করে গেছেন।



টোকিওতে ভাষণদানরত নেতাজী

আজন্ম সৈনিক

২৩শে জানুয়ারী।

নেতাজীর জন্মদিবস—পূর্ণ্যতিথি। আজ আসমুদ্র হিমাচল এই দেশের প্রতি ঘরে ঘরে মঙ্গল-শংখ বেজে উঠবে। সুগন্ধী ধূপ আর প্রদীপের আলোয় তাঁর পূর্ণ্য আবির্ভাব দিবসের সন্মারোহ দিকে দিকে বিলসিত হয়ে যাবে। কিন্তু—

সুভাষচন্দ্রের কোন মূর্তিকে পূজা করবে সবাই? বাঙালী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি পাঞ্জাবী চাদর পরা সৌম্য চিন্তাশীল বাঙালীর প্রতিকৃতিকে!

না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত রণনিপুণ এক গর্বিত যোদ্ধার ছবি। এই ছবিকেই অন্তরের দব ভিত্তি সব শ্রদ্ধা উজাড় করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় সবাই!

আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় নেতার বোধ হয় সামরিক পোশাকে সজ্জিত, অর্থাৎ তাঁর জীবনের সাময়িক একটি বেশ এত সম্মান কোথাও পায় নি। আরও খোলাখুলি বলি—জওহরলাল নেহরু সাময়িকভাবে ওকালতি করেছিলেন। সর্দার প্যাটেলও ছিলেন এ্যাডভোকেট। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন ছিলেন ব্যারিস্টার। কিন্তু কোনদিনই কোর্ট প্যান্ট আর গাউন পরা সেই ডাকিলের বেশে সজ্জিত চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল নেহরু আর সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতিকে দেশের লোক এত বেশি ভালবাসে নি, এত সম্মান করে নি।

যুদ্ধ পেশা ছিল না সুভাষ বোসের। সাময়িক বেশ তাকে পরতে হয়েছিল স্বাধীন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অগ্নিস্করা দিনগুলো ছাড়া তাঁকে ধূতি পাঞ্জাবী পরেই দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ঝড়ের মত ঘুরতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু বাঙালীর কাছে আজ তাঁর সৈনিক মতিহি প্রিয়। অত্যন্ত প্রিয়। তখন বাঙালী গানের রাজা। বাঙালী কব্যা ভালবাসে। কাব্যানুভূতি তাদের রক্তে রক্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কিন্তু সৈনিক নেতাজীকে বাঙালী এত ভালবাসে কেন? কেনই বা খাঁটি বাঙালীর একটি ছেলে যোদ্ধা হয়েছিল—কেমন করে হয়েছিল,—সেই আলোচনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। একটি

বিস্ময়কর নমুনা। একটি উদ্যত খজা। ভারতের আর কোন নেতার সঙ্গে তাঁর মিল নেই।

জীবনের কোন ঘটনার সঙ্গে অন্য কোন নেতার জীবনের ঘটনার কোন সাদৃশ্য নেই। কেমন একটা খাপছাড়া, কেমন বিপথে চলা অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা!

এই নিবন্ধ লিখতে বসে আমার মনের পটভূমিতে একটি ছবি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে। নেতাজী আন্দামানের সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃপ্ত ভগ্নী। চোখের দৃষ্টি সুদূর। নাকে-মুখে বলিষ্ঠ স্ককপের আভাস। পরনে নিখুঁত সামরিক পোশাক। বগোপ-সাগরের উত্তাল জলরাশির ওপায়ে তাঁর

স্বজন-পরিজনের স্নেহবিজড়িত মাতৃভূমি। সে মাতৃভূমি পরাধীন—তার শৃঙ্খল মোচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আহ্বার নেই। নিদ্রা নেই।

এই যে নেতাজীর যোদ্ধার বেশ। সুদূর বিদেশের মাটিতে সামরিক অভ্যুত্থানের একচ্ছত্র নায়ক। তার অতীত ইতিহাস খুঁজতে হলে যেতে হবে অনেক—অনেক দূরে সুদূর কুয়াশাময় বিগত কালে—যখন ‘নেতাজী’ নেতাজী হন নি—যখন সুভাষচন্দ্র বালকমাত্র। তাঁর সুদূর কৈশোরের দিনগুলিকে ভেতরে ভবিষ্যতের যোদ্ধার ইতিহাস সুপ্ত ছিল।

একজন সুপরিচিত গবেষক বলেছেন—

‘Like Stalin the great leader of Soviet Russia, Subhas Chandra



ভিনোয়া নেতাজী

Bose also was born and brought up in ascetic atmosphere'.

শুধু যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়েছিলেন তাই নয়! স্ট্যালিনের মা-র মত সুভাষচন্দ্রের মাতৃদেবীও ছিলেন কঠোর ধর্মপরায়ণা আর আত্মসংযমে উজ্জ্বল ও তেজস্বিনী এক মহিলা। খুব ছোটকাল থেকেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে তাঁর মা-র প্রভাব পড়েছিল। লেখাপড়া জানা, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত সাধারণ লোকের যেমন ধর্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণাটা কুয়াশাময় হয়—জটিল হয়—সুভাষচন্দ্রের তা ছিল না! পৃথিবীর বড় বড় যোদ্ধা, বীর বিপ্লবীদের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁদের দৃষ্ট মান-বিকতার ভেতরে প্রদীপ্ত সূর্যের আলোর মত জ্বলছে ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় বিশ্বাস! ঈশ্বর-ভক্তিই তাঁদের অত্যাশ্চর্য প্রেরণার মূল উৎস!

গীতা ছিল সুভাষচন্দ্রের নিত্য-সঙ্গী। চণ্ডীর বলিষ্ঠ শ্লোক তাঁর বৃকের রক্তে রক্তে কলধ্বনি তুলতো।

এই বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী সন্তাসবাদী গীতার শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছেন। একটুও পা কাঁপে নি। বৃক কাঁপে নি। আশ্চর্য একটা দৃঢ়তার প্রলেপ লেগে-ছিল তাঁদের হাড়ে হাড়ে। কি এমন সেই মহামন্ত্র, যা মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করে দেয়। এদেশের বিপ্লবীদের শুধু বন্দক-পিস্তল ছোড়া আর ছোরা খেলা শেখানো হতো না। তাঁর সঙ্গে শেখানো হতো গীতার মন্ত্র।

তাঁরা জানতেন। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন—যেমন মানুষ পুরনো বস্ত্র ফেলে দিয়ে নতুন বস্ত্র ধারণ করে সেইরকম দেহধারীও জীর্ণ দেহ ছেড়ে আবার নতুন দেহ পায়।

প্রাণ অতি তুচ্ছ। একটা পুরনো কাপড় ছেড়ে আবার নতুন কাপড় পরার সামিল।

অতি অল্প বয়সে কটকে পুরীতে সাধুসন্তদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষ বোস। যোগ, প্রাণায়াম, ইত্যাদির দিকে তাঁর আকর্ষণ খুব নিবিড় হয়েছিল। প্রথম যৌবনে উত্তর ভারতবর্ষের সুদূর অরণ্যে পর্বতে ঘুরে

বেড়িয়েছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু সম্প্রদানে—যে তাঁকে মন্দির পথ বলে দিতে পারে!

হিউ টয় সাহেবের সুভাষ বোস সম্পর্কিত লেখা ‘সিপ্রিংগ টাইগারে’ বলেছেন— In 1914, unknown to his parents, he went with a friend on a search through Northern India looking for a spiritual master to show his way.

নেতাজীর মনে সামরিকবৃত্তির বীজ এইখানেই নিহিত ছিল। যুদ্ধে মৃত্যুভয়ের কোন স্থান নেই। জীবনমৃত্যু নিয়ে খেলাতে পারে একমাত্র সৈনিকেরাই।

১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এইখানে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের অধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি হয়েছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখতেন নেতাজী। তাই—

১৯২৯ সালে রংপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠস্বরে বক্তৃতিসময়

আরাম ও স্বাস্থ্যের জন্য—

“জয়গুরু” নিম্নলিখিত মার্কা গেঞ্জী ব্যবহার করুন

কিনলে—গ্রেটম্যান—

নিউলাইট—সান্নে—

রাজঘাট—সোসাইটি—

ভেলভেট—ব্রেসলেট—

এ্যাক্টর—গোল্ডেন স্টার—

ভাজমহল—প্রিন্স অফ সিটি—

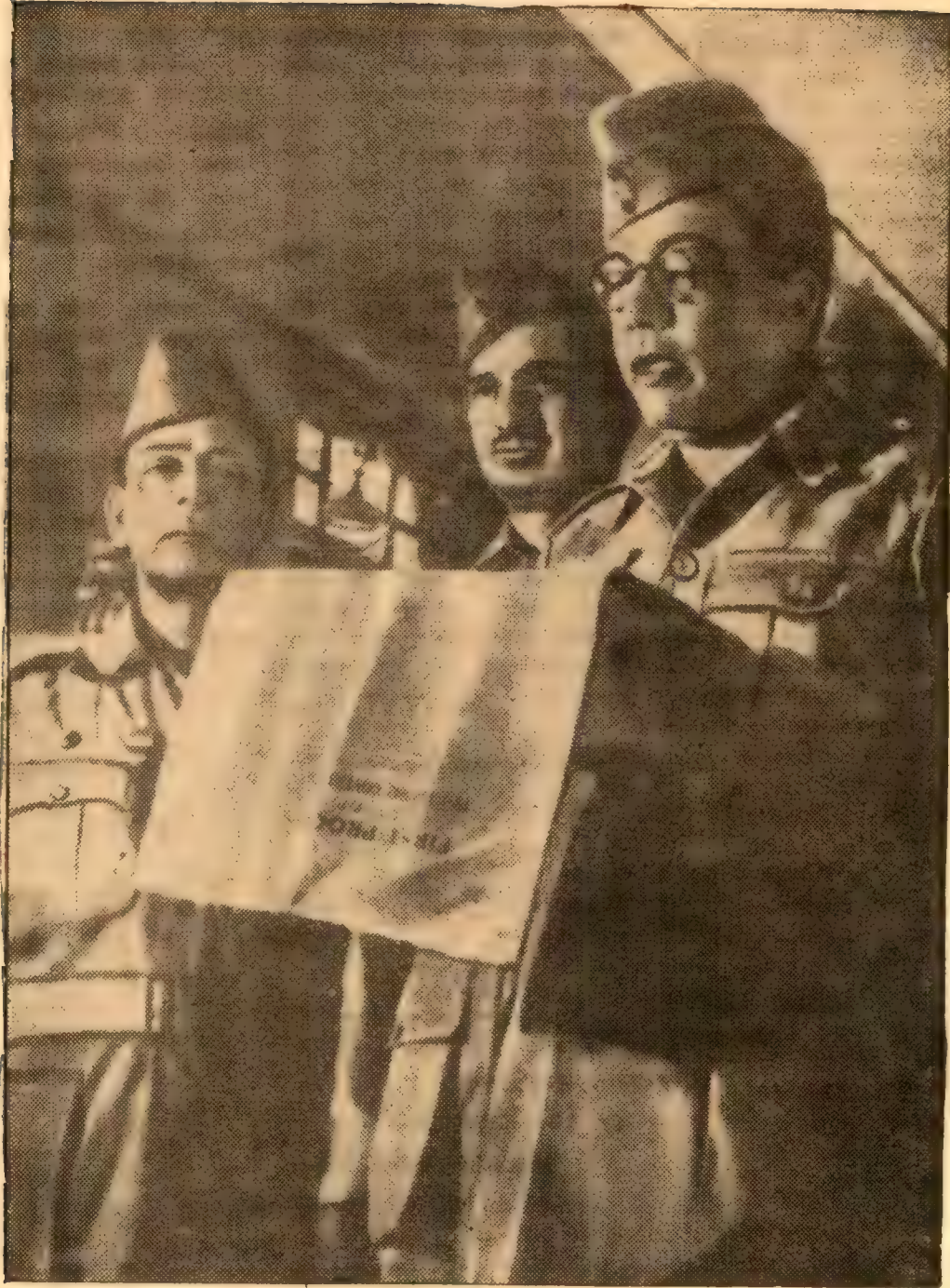
ও

২২৪০

জয়গুরু হোসিয়ারী মিলস্

পি. ২৬, স্মার রাজা রাধাকান্ত দেব জেন, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-২৭৩৮



আজাদহিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করছেন নেতাজী

গোনা গিয়েছিল— We have now arrived at the third stage of our political struggle. The first stage was the Swadeshi era, the second was the period of revolutionaries and the third is the stage of non-cooperation and socialism.

দেশের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবীদের অবদান তিনি মনোভুক্ত স্বীকার করতেন। বলতেন,— Only the military power, actual or potential, could drive out the British. কেবলমাত্র সামরিক শক্তিই ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির স্বনামখ্যাত শাহনওয়াজও সুভাষ বোসের বন্ধুপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, Even now I do not know in what proportion the man, the soldier and the statesman in him were blended. At home the

man in him seemed to dominate; at the Front and in the midst of his troops, the soldier in him shone in splendid glory...

এখনও আমি জানি না, তাঁর চরিত্রের ভেতরে কতটা অনুপাতে মনুষ্যত্ব, সৈনিকবৃত্তি আর রাজনীতি-বিদের গুণাবলী মেশানো ছিল। ঘরোয়া ব্যাপারে যেমন তাঁর নেতৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তেমনি রণাঙ্গনে এবং সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর ভেতরের সৈনিকটিকে অসাধারণ গৌরবান্বিত মনে হতো.....

তাই দেখা যায়, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে সৈন্যদের সামনে নেতাজীকে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করতে। স্বাধীন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সামনে তিনি বরাবর জ্বালাময়ী ভাষায় বলতেন— Comrades : At this critical hour, I have only one word of command to give you and that is that if you have go down temporarily, then go down Fighting

with National Tricolour held aloft; go down as heroes, go down upholding the highest code of honour and discipline.

...বন্ধুগণ, এই দুঃসময়ে আমি তোমাদের শ্রদ্ধা একটা কথা বলতে পারি, গ্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নিয়ে প্রাণ প্রতিজ্ঞা করে লড়াই করে যাও—

যদিও বাস্তব—অতি বাস্তব—কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতে এত বড় গণ-অভ্যুত্থান অর্থাৎ বিশাল সশস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ঘনি করেছিলেন—সে কথা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়! আরাকানের গভীর অরণ্যে, ব্রহ্মদেশে, মালায়ে একটি বাঙালী বড়ের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শেলীর সেই প্রমিথিউসের মত। হাতে যেন জ্বলন্ত মশাল। মুখে অগ্নিবরষা ভাষা। সব মিলিয়ে কেমন রোমাণ্টিক মনে হয়। কিন্তু—

একটুও রোমাণ্টিসিজম নেই। সুভাষ বোস জন্ম-ষোণ্ধা হয়ে জন্মেছিলেন। তা না হলে ১৯২০ সালে

যখন চতুর্থ হয়ে ভারতীয় সিভিল সারভিস পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন তারপর থেকেই তো তাঁর জীবন বেশ মাসে মাসে মোটা মাইনের বাঁধা খাতে নিশ্চিত আরামের ভেতরে কেটে যেতে পারতো। কিন্তু—

বিলেতের আন্ডার সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়াকে বললেন—I told him, said Bose, that I did not think one could be loyal to the British Raj and yet serve India honesty, heart and soul!

একসঙ্গে দুই কাজ হয় না। ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভক্তি এবং সেই সঙ্গে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভারতবর্ষকে ভালবেসে তাঁর সেবা করা কখনও সম্ভব নয়।

ক্রাসে সে আমলে—কত ইংরেজ প্রফেসরই তো বাঙালী তথা ভারতীয়দের একটু আধটু অকথা-কুকথা বলতেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কোন সাধারণ ছাত্র সাহেব অধ্যাপকদের কথার প্রতিবাদ করা

Beware of Immitation
JUPITER'S
Glorious
REGD.



কম্পনা পর্যন্ত করতে পারতো না। কিন্তু—

সভার বোস তাঁকে ঘেঁষে বসলেন। বৈদেশী জীবনীকার নেতাজীর জীবনী লিখতে বসে লিখেছেন—Then there occurred the incident which Bose afterwards called the turning point of his career:—he was expelled from his college for his leading part in an assault on one of the English lecturers.

এই অধ্যাপক ওটন সাহেবের কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। কেশর সিং গিয়ানির বিখ্যাত গ্রন্থ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মভ্‌মেন্ট ইন ইস্ট এশিয়ার পাতায় পাতায় আজ সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে—সুভাষ বোসের অপূর্ব সংগঠনী শক্তির ইতিবৃত্ত। কেশর সিং গিয়ানি ফ্রি ইন্ডিয়ায় প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন। স্বাধীন-হিন্দ-ফৌজের সূর্য থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের পাতায় পাতায় আছে সুভাষচন্দ্রের শৌর্ভের প্রদীপ্ত বিবরণ। ভূমিকায় বলেছেন—when Netaji asked them for the total mobilization of their resources to fight the enemy, the response was magnificent.

প্রকৃত মহান নেতার মত তাঁর ভেতরে আকর্ষণের ক্ষমতা ছিল অপরিমিত। একবার যে সভায় দাঁড়িয়ে আবেদন করেছেন, যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন—

Millions of dollars were collected in no time, thousands of youngmen offered themselves for national service and not a few families dedicated their all for the cause of their motherland. Never before in our history was so much spirit, enthusiasm or unquenchable thirst for freedom induced in our hearts.

লক্ষ লক্ষ মূদ্রা এক কথায় আদায় হয়েছে। সহস্র সহস্র যুবক দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে এগিয়ে এসেছে। স্বাভূমির জন্য বহু পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। ইতিহাসে এত উৎসাহ, এত আশা আর স্বাধীনতার জন্য এত তৃষ্ণা আর কখনো দেখা যায় নি। এটা যে সম্ভব হয়েছে—তার একমাত্র কারণ

নেতাজীর আশ্রয় ব্যক্তি, তাঁর আন্তরিক যোদ্ধাসত্তা!

কত গর্ব আর আনন্দের সঙ্গে তিনি স্বাধীন আত্মা হিন্দু ফৌজের অধিনায়ক নিয়োজিত। ১৯৪৩ সালের ২৫শে জুলাই ঘোষণা করেছিলেন নেতাজী। ঘোষণা করেছিলেন—In the interest of the Indian Independence Movement and of the Azad Hind Fauj I have taken over the direct command of our army from this day.

This is for me a matter of joy and pride—because for an Indian, there can be no greater honour than to be the commander of India's Army of Liberation.

এক, দুই নয়, বাইশ বছর পার হয়ে গেল এই ঘোষণা করার দিন থেকে। অথচ মনে হয় এই সেদিন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ আর শক্তিশালী বীর্যের আভাস পাওয়া যায়—যখন শুন—“ভারতের মুক্তি-সেনানীর সর্বাধিনায়ক হতে পায়রাটা যে কোন ভারতীয়ের কাছে আনন্দ আর গর্বের ব্যাপার.....

বন্দুক রাইফেল পিস্তলে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়াই সব সময় বোম্বার কাজ নয়। সুভাষ বোস অনশন ধর্মঘট করে জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁর প্রতিটি দিন—প্রতিটি রাত্রি কেটেছে সদাজাগ্রত এবং সদাসতর্ক একটি সৈনিকের মত।

ভারতের কোটি কোটি মানুষ যখন নিশ্চিন্ত আরামের শয্যায় ঘুমিয়ে রইলে সেই গভীর রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। ঠিক কেমন করে পার হয়েছিলেন, কোথা দিয়ে পার হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত।

কিন্তু বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে একমুহূর্ত তিনি বিপ্রান নেন নি। একমুহূর্ত অবসর পান নি। আদর্শ আর আশায় ঘোড়ায় চড়ে স্থির প্রতিজ্ঞার লাগাম ধরে তীরবেগে ছুটেছেন খাঁটি সৈনিকের মত।

কাষলে দীর্ঘকাল এক বন্দুর বাড়িতে থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন ইটালিতে কি জার্মানিতে যাওয়ার অনুমতির জন্য! সাহায্যের জন্য আকুল হয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন রাশিয়ার কাছে! রাশিয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাতে নিরুৎসাহ হন নি নেতাজী।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই

প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে এল জার্মানী থেকে। কুসুমের হের হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

—এই অবস্থায় আমার কি কর্তব্য হবে? বৃটিশের চারিদিকে এখন বিপদ। এখনও কি আমাদের চূপ করে থাকা উচিত—

হিটলার চূপ। চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। পৃথিবীর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিদ্যা, বহুদর্শী হিটলারের মুখে কোন কথা নেই।

হ্যাঁ, এই উপযুক্ত সময় তাদের ওপর আঘাত হানবার, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন চ্যান্সেলার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ বিপ্লবী তিনি। তাই হয়তো অতীতদিনের ঘটনাকে মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, বাইরে থেকে অন্তত ৫০,০০০ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে একযোগে আক্রমণ করা উচিত। যদি আপনি সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তর থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন—

জার্মানীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে হাল্কা হয়ে বেরিয়ে এলেন নেতাজী। তারপর—

তারপর শূন্য হলো ঝড়ো জীবন-যাত্রা। আজ রেগুদন, কাল মান্দালয়, পরশু সিংগাপুর। শূন্য সংগঠন—আর সংগঠন! আর সেই সমস্ত জ্বালাধরা উত্তেজক বক্তৃতা—... there in the distance—beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land—the soil from which we sprang—

—আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও নেতাজীর এইসব ঐতিহাসিক বক্তৃতার ভেতরে যেন তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়.....তারপর—

তারপর দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার মাটিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যতিয়ানে লেখা আছে মুক্তার অক্ষরে। লেখা আছে—With great enthusiasm and vigour, working day and night and knowing no rest or sleep, Netaji was fast preparing for the last struggle.

দিন রাত পরিশ্রম করে যাওয়া যম ছেড়ে নেতাজী শেষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে শূন্য করেছিলেন। শূন্য হয়েছিল আজ এখানে—কাল সেখানে বক্তৃতা।

তিনি ২৫শে জুলাই ১৯৪৩ সালে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবের পূর্ণ্য দিনে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়—এই আজন্ম সৈনিক—যাঁর দেহ-মন-আত্মা দেশের মুক্তির জন্য আগুনের মত

দিন গুণি একটি পদধ্বনির

অগ্নিবিজ্ঞান গোষ্ঠী

আ-সমুদ্র হিমাচল
একটি আবির্ভাবের প্রতীকায় অধীর,
অধীর—নিষ্পেষিত মানবাত্মার
মুক্তি যন্ত্রণা।
হে বিপ্লবী,
হে জাতির দ্রুতা,
মহা-ভাষ্যের রক্তরাজত
শ্বি-খণ্ডিত বৃকের তলে,
প্রতিদিন পুঞ্জীভূত বেদনার
আতঁহাহাকার,—তোমার স্বপ্নরঞ্জিত
ভারততীরের রেণুতে রেণুতে
বিশ্বাসহস্তার কলঙ্কে
হতেছে কলঙ্কিত,
হতেছে কলঙ্কিত—সত্যের অগ্নীকার।

সামোর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
ক্ষমতার দম্ভে,
প্রতিদিন হতেছে লক্ষ্যভ্রষ্ট।
হে সন্ন্যাসী—
একদিন চলিশ কোটি পরাধীন মানবাত্মার
মুক্তি যন্ত্রণা,
তোমাকে করেছিল অশান্ত চঞ্চল;
ঘরের বন্ধন হ'তে জাতির বন্ধন।
একই স্বপ্ন ধ্যানে
তোমাকে করেছিল দুর্বীর দুর্বিনীত।

এশিয়ার রণাঙ্গনে
তোমার নিভীক পদক্ষেপ,
পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত বেদনার
জড় হতে,
একই মন্ত্রে বেঁধেছিল লক্ষ প্রাণ
হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান।

যুগোত্তীর্ণ নেতৃত্বের আহবানে
এশিয়ার নব-জাগরণ
চিরতরে করেছে ভুলদৃষ্টিত
সাম্রাজ্যবাদীর বজ্রকঠিন শৃঙ্খল।

হে সৈনিক,
হে জাতির দ্রুতা,
তোমার সন্মারসণী
লক্ষ কণ্ঠে আজ তুলেছে ধ্বনি;
উত্তীর্ণ চেতনার স্রোতে
এশিয়ার আকাশ
দেখেছে মুক্তিসূর্য
তোমারই ধ্যানে।

তবু তোমার স্বপ্ন—তোমার ধ্যানের ভারত,
বন্দনমুদ্রিত যন্ত্রণা হতে
আজও পায়নি মুক্তি।
আজও সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত
পশ্চা-যমুনার জল,
স্রাত্বরে করেছে কলঙ্কিত।
এখানে মনুষ্যত্বের অবমাননা
স্বাধীনতার সূর্যকে
প্রতিদিন করেছে পদদলিত।

তাই আজিকার ভারত
তোমার প্রতীক্ষায় অধীর,
অধীর—নিষ্পেষিত মানবাত্মার
মুক্তি যন্ত্রণা,
মহামানবের মহালক্ষণকণে।
হে বিপ্লবী,
দুঃসহ রাগি মল্লিত করে,
তোমার আশ্বাসবাণী
ভারতের বৃকে আবার তুলুক ঝঙ্কার
তুমি লহ আজ

সবার নমস্কার।

ধিকিধিক জ্বলতো অহরহ—সেই
সুভাস বোস... Felt a peculiar thrill
and great inspiration in witnessing
the re-birth of Independence Burma,
next door to his own dear Mother-
land...

ব্রহ্মদেশ—তার ঘরের কাছের
দেশের স্বাধীনতায় তার বৃকের রক্তে
রক্তে মদগ্ন্য বাজতে লাগল।

রেংগুন থেকে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক
থেকে সিংগাপুর। সিংগাপুর থেকে
টোকিও। যে যেখানে ভারতীয় আছো,
এগিয়ে এস। তোমাদের মাতৃভূমির
মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করো—নেতাজীর
মুখে শুধু এই এক কথা!

শুধু হিটলার নয়, শুধু জার্মানীর
চ্যান্সেলার নয়। থাইল্যান্ডের প্রধান-
মন্ত্রীর সঙ্গে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী
তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সর্বত্র
এক কথা। এক উদ্দেশ্য—আমাদের
মুক্তিযুদ্ধে তোমরা সাহায্য করো—

নেতাজীর মনে সশস্ত্র গণবুদ্ধের
স্বপ্ন আঁকা হয়েছিল। এত বড় স্বপ্ন-
ত্যাগী বোম্বা ভারতের মাটিতে আর
কখনো জন্মায় নি। ব্রহ্মদেশের স্বাধী-
নতার হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন—
Right in the midst of World War,
an independent state is born in
Asia, out of the ashes of British
imperialism....

..ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের
ভেতর থেকে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার
জন্ম হয়েছে... Burma will now in-
spire the Indian people to rise in
arms against their alien oppressors.

বিদেশী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে
অস্ত্র নিয়ে গুথে দাঁড়াবে ভারতবর্ষ...

আরও অনেক কথা—অনেক বক্তৃতা,
অনেক প্রাণঢালা আবেদনের কথা
ছড়িয়ে আছে নেতাজীর বিচিত্র জীবনের
ইতিহাসের ভেতরে। সেগুলোর
পুনরাবৃত্তি করে নিবন্ধকে ভারাক্রান্ত

করার অর্থ নেই। অর্থ হয় না—এই
কল্প পরিসরে তাঁর মহান জীবনের
বিফলতার পরিচয় দেওয়ার! তাঁর
জীবনের কথা লিখতে বসলে নিজেকে
বড় দুর্বল—বড় অবসন্ন মনে হয়। যে
কোন লেখা—যে কোন জীবনী
নেতাজীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে
বিবৃত করতে পারবে না। মনে হবে
লেখা অসম্পূর্ণ, লেখা দুর্বল!

দিন যাবে। গঙ্গায় আরও অনেক
—অনেক জল গড়াবে। পৃথিবীর
মানচিত্রে বহু দেশের রঙ পাল্টাবে।
কিন্তু ভারতের তথা পৃথিবীর মানুষের
মনে এই আজন্ম সৈনিকের আশ্বাস
অমর মহিমা অনিবার্য মশালের মত
জ্বলবে আর স্মৃতির ভেতরে ফুলের
মত ফুটে উঠবে তাঁর প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বর
Blood is calling to blood. Get up,
we have no time to lose. Take up
your arms.... —সুভাস সমাজদল

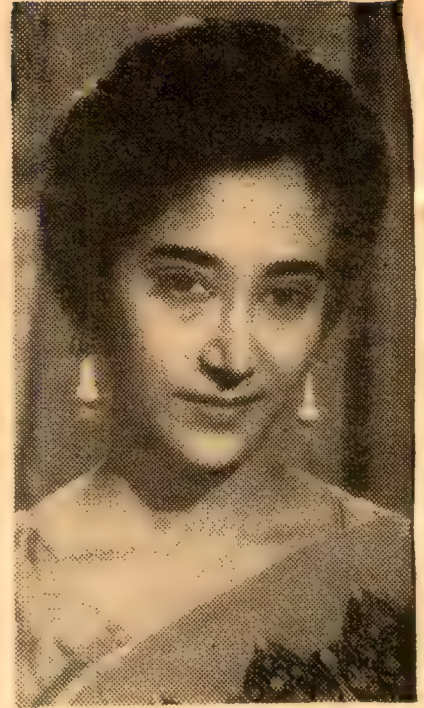
বঙ্গভাষা

জীবনীচিত্র

পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম পর কয়েকটি জীবনীচিত্র তৈরি হয়েছে। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে অথবা হিন্দী চলচ্চিত্রে বাংলার মত জীবনীচিত্র নির্মাণের সাহস নেই। পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের যে জীবনীচিত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত হয়েছে প্রত্যেকটি জনপ্রিয় হয়েছে। জীবনীচিত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সার্থক ও জনপ্রিয় হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'। অন্য ছবিগুলির অধিকাংশ হয়তো জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু সার্থক হতে পারে নি তথ্যগত ভুল এবং অসম্পূর্ণতার জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রাজা রামমোহন' ছবির কথা উল্লেখ করা যায়। ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছে সত্যি কিন্তু রাজা রামমোহনের জীবনের সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির কৃতিত্বের জীবনীচিত্রের প্রামাণিক মূল্য নষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশে জীবনীচিত্র নির্মিত হয় পরিচালক বা চিত্রনাট্যকারের একক প্রচেষ্টায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকাররা যথেষ্ট

থেটে চিত্রনাট্য রচনা করেন না। যেমন 'রাজা রামমোহন'-এ তাঁর জীবনের একটি বড় দিক আন্তর্জাতিকতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে বাদ দিয়েই জীবনীচিত্র হয়েছে।

বর্তমানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনীচিত্র নির্মিত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও এককভাবে চিত্রনাট্যকারের ওপর সব কিছুর নির্ভর করছে। জীবনীচিত্র নির্মাণে কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর না করে যদি ইতিহাস-বিদ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করা হয় তবে ছবিটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সার্থক হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যাকে নিয়ে ছবি করা হচ্ছে তাঁর বিষয়ে সর্বাধিক ভালভাবে জানেন এমন ব্যক্তিদের সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করলে, অর্থাৎ একটা উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠন করলে ছবিটির প্রামাণিক মূল্য রক্ষিত হয়। এরূপ চিত্র দর্শকদের কাছে শিক্ষণীয় হয়। জাতীয় জীবনীচিত্র ভাণ্ডারে এরূপ চিত্রেরই মূল্য থাকতে পারে। —সুজন।

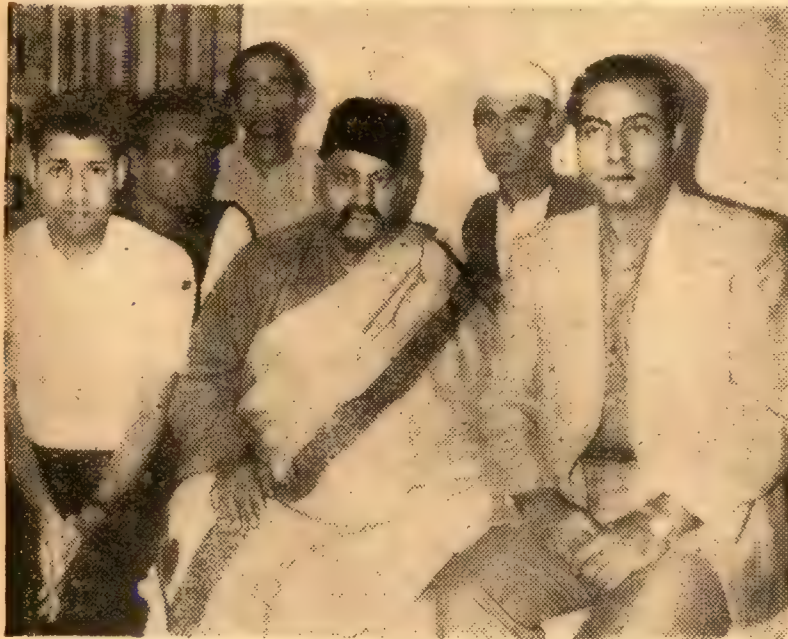


'ফিরে চল' ছবির নায়িকা সবিতা বসু

চিত্র আলোচনা

পাণ্ডবের বনবাস

(পরিচালনা—কে কামেশ্বর রাও)



অভিনয়নে 'ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির'। ওস্তাদ বড় গোলাম আলি খাঁ, ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হওয়ার নীরেন সেনগুপ্ত, ওস্তাদ মনোহর আলি খাঁ, অরুণ চৌধুরী এবং দেবী শর্মা অভিনয়ন জাপন করেন।

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'। সেই অমৃত কথাকে নিয়ে দক্ষিণ-ভারতের এই চিত্র 'পাণ্ডবের বনবাস'। এখানে কেবল শকুনির চক্রান্তে পাণ্ডবদের পাশা খেলায় হেরে যাওয়া, দ্রোণদীকে বাজি রেখে পুনরায় ভাগ্য-পরীক্ষার বিপর্যয়, সভ্যস্থলে দ্রোণদীর বস্ত্র-হরণ—তারপরে পাণ্ডবদের বনবাসপর্ব। এই বনবাসপর্বে ভীম কর্তৃক কিশোর বন্থ, কুপিত দূর্বাসার ক্ষমিবত্তি নিবারণ, হনুমানের আশীর্বাদে ভীম কর্তৃক দ্রোণদীর জন্য স্বর্ণ-কমল আনয়ন, গম্ববরাজ চিত্রসেনের হাতে দুর্যোধনের বন্দিত্ব ইত্যাদি উপাখ্যানের সঙ্গে অভিনয়রূপে সঙ্গের বলরামের পালিতা কন্যা শশিরেখার বিবাহ প্রসঙ্গে ছবিটি শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত মহাভারতের সাথে দক্ষিণী মহাভারত উপাখ্যানের কিছুটা বৈষম্য অভিনয়-শশিরেখা বিবাহ কথা সম্পর্কে ছবির প্রযোজকরা প্রারম্ভেই ঘোষণা করেছেন। এই ছবিতেও মহাভারতের বীর নায়কদের ধৈর্য, সাহস, সত্য ও ধর্মের পথে অবিরলতা ইত্যাদি দর্শিত হয়েছে।



বি. কে. প্রোডাকশনের 'রাজপ্রোহী' ছবির নায়ক উত্তমকুমার :

আরব সাধারণতত্ত্বের চলচ্চিত্র

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদানকারী এন টি রামা-
রাও, এস বি রংগরাও, গুম্‌মাডি, এল মুর্তি,
হরনাথ রাজু, প্রভাকর রেড্ডি, সাবিত্রী, রাজা
সুলোচনা, বিজয়লক্ষ্মী এবং হেমমালিনী
প্রমুখ প্রায় সকলেই অল্প রাজের অভিনেতা-
অভিনেত্রী। এঁদের সৌন্দর্য্য অভিনয়-ধারা মণ্ড-
বেশ্য। অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার
পালার ধরনে।

ছবিটিতে বাংলা সংলাপ ও গান জুড়ে
দিয়ে বাঙালী দর্শকের উপভোগ্য করার
চেষ্টা হয়েছে। এই ডাবিং সার্থক বলা চলে।
চিত্র গ্রহণ কেরামাতি ইত্যাদিতে সাধারণ
দর্শকের ভাল লাগার বহু উপাদান এই
ছবিতে আছে।

কিন্তু মহাভারতকে আমরা যেমনভাবে
অমৃত সমান বলে গ্রহণ করে এসেছি—সেদিক
থেকে বিচার করলে এই ছবি আমাদের চিন্তা-
ধারা থেকে বিচ্যুত। এককথায় বলা চলে
অতিরিক্ত গান ও অর্থহীন নাচে ছবিটি
পরিবেশকে বোঁতামুখী করে মহাভারতের
পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেছে। গানগুলির সুর ও
রচনা সংগতিহীন। নাচের পরিকল্পনা নিম্ন-
শরীর। যেখানে কেবলমাত্র ভরতনাট্যম ও
লোকনৃত্যনির্ভর হওয়া উচিত ছিল, সেখানে
মোগল আমলের কথক ভাণ্ড, এমন কি
হলিউড ছবিতে বহুল ব্যবহৃত বোঁতাপ্রকাশক
নাচের ভঙ্গীও (রাজা সুলোচনা) এখানে
দেখা যায়। এসব দৃশ্যে ছবিটি পৌরাণিক
কাহিনীর মেজাজ নষ্ট করে দিয়েছে।
মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে জনচিত্ত
বিনোদনের চটুল রূপরেখার পশরা সাজিয়েছে
এই ছবি। আসলে এটি মহাভারতের দক্ষিণী
ভাষাও নয়।

আগামী ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৩রা
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলকাতার সংযুক্ত আরব
সাধারণতত্ত্বের কতকগুলি চলচ্চিত্র নিয়ে এক
চলচ্চিত্র-সপ্তাহের অনুষ্ঠান হবে। এ সপ্তাহে
ছয়টি কাহিনীচিত্র এবং পাঁচটি খণ্ডচিত্র
প্রদর্শন করা হবে।

১৯১৬ সালে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
ইজীপ্সিয়ান ক্রাব-সংলগ্ন কাফেতে অনুষ্ঠিত
হয়। ভারতে বোম্বাইয়ে প্রথম চলচ্চিত্র
প্রদর্শনী হয় ১৮৯৬ সালে।

১৯৬০ সালে চলচ্চিত্র-গৃহের সংখ্যা ছিল
৩৯০টি।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে
মিশরীয় চলচ্চিত্র তৈরির প্রচেষ্টা হয়। ১৯২৭
সালে আজিমা আমীর 'জায়ালা' চলচ্চিত্রটির
প্রযোজনা করেন। এ চিত্রে তিনি প্রধান
চরিত্রটির রূপদান করেন।

১৯২৯ সালে প্রথম 'আল্‌তার দ্য মুনলাইট'
কথোচিত্র প্রযোজিত হয়। ১৯৩০ সালে
কাররোর ইম্বাবা অগ্লে 'রামজেস স্টুডিও'
তৈরি হয়। এখানেই প্রথম নির্বাক চিত্র
প্রযোজনার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩১ সালে প্রথম
আরবী সর্বক চিত্র 'দি ইয়ং স্যারিস্টোক্রাটস্'
নির্মিত হয়।

১৯৩৫ সালে আধুনিক সরঞ্জামের
স্টুডিও মিশর স্টুডিও-র জন্ম। চলচ্চিত্র-
শিল্পে এ এক নব অধ্যায়। এখানকার প্রথম

চিত্র 'ওয়েদাদ'-এ পৃথিবী বিশ্বাস আরব-
গায়ক ওম কাসেম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।
এছাড়া রয়েছে আরও ৪টি স্টুডিও, গালাল
নাহাস্। আল-আহারাম ও নাসিবিয়ান।

১৯৫৪ সালে প্রথম রঙীন চিত্র 'ড্যান্স
ইজ্ এ ব্রাইডগ্রুম' নির্মিত হয়।

১৯৫৬ সালে প্রথম সিনেমাস্কোপ
চলচ্চিত্র 'ডেলাইলা' নির্মিত হয়।

১৯১৮ সালে 'দি বেদুইনস্ অনার'
চিত্রে প্রথম আরব-চিত্রাভিনেতা মহম্মদ করিম
অভিনয় করেন।

আরবের প্রথম চিত্র-কটোগ্রাফার ইব-
হেলবাওয়াই (১৯২৫)। প্রথম চিত্র-পরিচালক
মহম্মদ করিম। বর্তমানে ইনি সিনেমাস্কো-
গ্রাফির উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রের ডীন। তাঁর
প্রথম চিত্র 'দি জুওলিক্যাল গার্ডেনস্' তৈরি
হয় ১৯২৭ সালে।

১৯২৭ সালে তৈরি 'সাদা দি জিপ্সী'
চিত্রে আরবের প্রথম ফিল্ম-স্টার ফিরদৌস
হাসান অভিনয় করেন।

আরবী গল্প নিয়ে প্রথম চিত্র নির্মাণ হয়
১৯১৭ সালে। পরলোকগত ডাঃ মহম্মদ
হোসেন হাইকেলের উপন্যাস 'জয়নব' অব-
লম্বনে এ চিত্র নির্মিত হয়।

১৯২৩ সালে 'দি হোয়াইট রোজ' চিত্রেই
প্রথম আরবের গায়ক জাব্দ আল-আহাব
অংশগ্রহণ করেন।

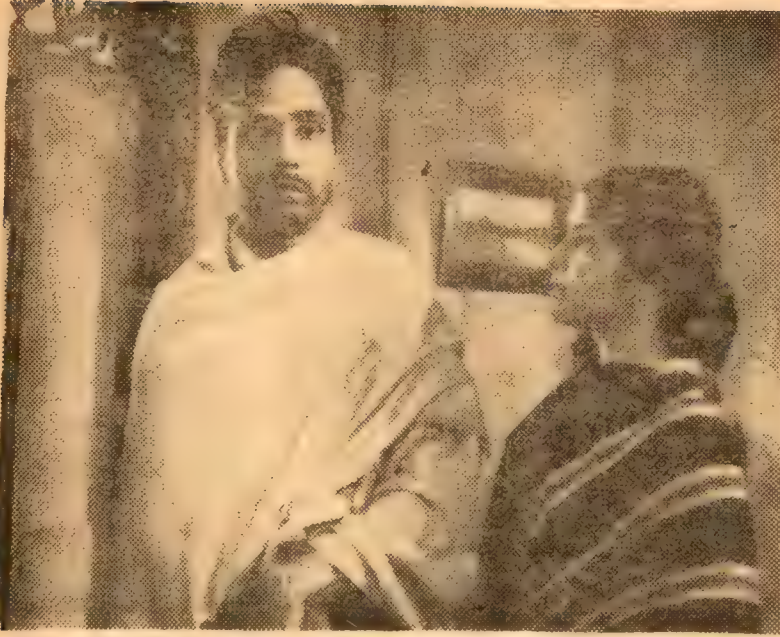
১৯৫০ সালে প্রথম সহ-প্রযোজনা হয়
ইতালীর সহায়তায়। চিত্রটি হচ্ছে 'দি ইগল
অব্ দ্য নাইল'।

১৯৩০ সালে 'মাই হার্টস্ স্টো' চিত্রে
প্রথম চিত্র-গায়িকা ওয়াদুয়া গানে অংশগ্রহণ
করেন। এ সালেই প্রথমবার বিদেশে চলচ্চিত্র
মিশন পাঠানো হয়। তার মধ্যে পরিচালনা
সমীক্ষার জন্য ছিলেন আহমদ বাদ্রাখান ও
মরিস্ কাসাব, ফটোগ্রাফি সমীক্ষার জন্য
পাঠানো হয় মহম্মদ আব্দ আল-আলিম ও
হাসান মুরাদকে।

১৯৪৪ সালে ফিল্ম-টেকনিশিয়ানদের
সিউকেট তৈরি হয়।

১৯৪৭ সালে 'ফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি-
এর মধ্যে চেম্বার অব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠা
করা হয়।

চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতির প্রথম
থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আরবের পূর্ণ-
দৈর্ঘ্যের চিত্রসংখ্যা ১ হাজার ২ শত। বছরে
১ লক্ষ ডলার খরচ হয় চিত্র পুরস্কারে।
১৯৫৭ সালে পুরস্কারের জন্য চিত্র মনো-
নয়নের কমিটি গঠিত হয়।



দিলীপ বসু, পারিচালিত 'জীবনবন্দী' ছবির একটি দৃশ্যে দিলীপ মন্ডাল ও লালি চক্রবর্তী

নাটকের কথা

চার দেওয়ালের গল্প

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর বহরমপুরের সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা রূপশিল্পীর সদস্য ও সদস্যবৃন্দ স্থানীয় গ্রান্টহল মধ্যে ত্রীপার্শ্ব-প্রতিম চৌধুরীর 'চার দেওয়ালের গল্প' নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন রাম মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার দত্ত, মায়ী সেন, কানন দাস, নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র দাস, বীরেন সিংহ, শ্রীভাষা চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী, দিলীপ বিশ্বাস, শঙ্কর কবিরাজ এবং ময় জ্যোতিপ্রকাশ। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং আবহসংগীত কৃতিত্বপূর্ণ।

সঙ্গীতকথা

১ লোকশিল্পী কৃষ্ণদাস বৈরাগী ॥

লোক-সংগীত যাদের প্রাণ, স্বপ্ন, ধ্যান-ধারণা সেই গ্রাম্য শিল্পীদের মধ্যে কৃষ্ণদাস বৈরাগী অন্যতম। যে গ্রাম্য পরিবেশে লোক-সংগীতের জন্ম, যে গ্রাম্য পরিবেশে লোক-

শিল্পী তার মনকে গড়ে তোলে, সেই রকম পরিবেশে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর্ মহকুমার একটি ছোট গ্রামে কৃষ্ণদাসবাবুর জন্ম। গ্রামটির নাম 'আমগাঁও'। পিতা রামদাস বৈরাগীও একজন কৃতী লোকশিল্পী ছিলেন। পিতার কাছে সংগীত শিক্ষার পর বালক কৃষ্ণদাস ফটিক সাধুর আশ্রমে যান ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু ফটিক সাধুও একজন সুকণ্ঠধারী প্রবীণ লোকশিল্পী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই দেহতত্ত্বমূলক গানের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় কৃষ্ণদাসবাবুর ফটিক সাধুর আশ্রমে।

১৪ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাসবাবু গ্রামের কবিগানের দলে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কবিগানের দলে গান গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

কবিগানের দলে গান গেয়ে বেশ দিন কাটিছিল কৃষ্ণদাসবাবুর। এল ১৯৪৭ সন। ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগই কৃষ্ণদাসবাবুর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটাল। একান্ত অনন্যোপায় হয়ে বালুভিটে তাগ করে তিনি চলে আসেন কলকাতায়।

কলকাতা শহর জ্ঞানী-গুণীর পীঠস্থান। কৃষ্ণদাসবাবুর বড় আশা ছিল শহরবাসী তাঁকে মাথা গুঁজে থাকবার একটু স্থান করে দেবে। কিন্তু হয়! তাঁর সে আশাই বৃথা হল—কোনখানেই তাঁর একটু স্থান হল না। বহুদিন ফুটপাথে রাত কাটিয়ে এক বৎসর পর কৃষ্ণদাসবাবু বেলেঘাটার মিঞাবাগান বসতিতে আশ্রয় নেন। বেলেঘাটার কিছুদিন থাকার পর তিনি উল্টোডাঙায় আর একটি বসতিতে আশ্রয় নেন। বর্তমানে তিনি, তাঁর

দুই কন্যা ও বৃদ্ধ পিসীমাকে নিয়ে উল্টো-ডাঙার বসতিতেই আছেন।

কৃষ্ণদাসবাবুর বয়স ৭২ হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে চারটি পেটের দুবেলা অল্প জোগাড়ের জন্য একতারা হাতে করে প্রতিদিন সকালে ভিক্টর আশায় বেরতে হয়।

কৃষ্ণদাসবাবুর নানা ধরনের পল্লীগীতির অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে। তবে তাঁর সংগৃহীত গানের মধ্যে অধিকাংশই দেহতত্ত্বমূলক। কৃষ্ণদাসবাবুর একটি দেহতত্ত্ব গানে গশরশবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়—যেমন :

গুরুর কৃপাকল্পতরুন্মূলে বসে যারে মন,
ও তার সুশীতল শীতল ছায়ায়
হবে তোর ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ ॥
গুরুর কৃপাকল্পতরুন্মূলে কর বাস,
দীনমণির কর সেখানে না হবে প্রকাশ,
দেখে শমন রাজার লাগে হাস,
সেখানে নাই জীবের অকালমরণ ॥
গাছের চার ডালে চার ফল ধইর্যাছে
জীবের দুখ-সুখ জন্ম-মৃত্যু সে ফলে আছে,
ও তুই বাইসু না ফলাফলের কাছে,
সেই গাছের ছায়ায় মিলবে প্রেম রতন ॥

কৃষ্ণদাসবাবুর আরও একটি দেহতত্ত্ব গানে উক্ত দার্শনিকতত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :

আগে দেহের খবর জান,
দেহের মধ্যে প্রেমরতন

বাইরে খুঁজলে পাবে কেন?

আছে রক্তধাতু, শুক্ণধাতু,
মাতাপিতা এই দুইজন

আছে শূন্য ধাতু ভাবিত পাশ,

তাহারে ভজনা কেন?

দেহতত্ত্ব গান ছাড়াও কৃষ্ণদাসবাবুর ভাটিয়ালী ও অন্য ধরনের অনেক পল্লী-সংগীতের সংগ্রহ আছে। তাঁর একটি ভাটিয়ালী গানে লৌকিক প্রেমের সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন :

মনের কথা কইবার আগে,

আঁখি যায় করে,

দুখ কইতাম প্রাণ খুলে,

সমব্যথার ব্যথি পেলে

শূন্যে পাবাণ বিদরে ॥

কৃষ্ণদাসবাবুর এ ধরনের অনেকই পল্লী-সংগীত আছে—যা প্রকৃত লোক-সংস্কৃতির এক-একটি রত্ন। লোকসংগীত সংগ্রহ করতে হলে, লোকসংগীতকে বাঁচাতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য কৃষ্ণদাসবাবুর মত লোক-শিল্পীদের বাঁচবার পথটিকে প্রশস্ত করে দেওয়া।

—বৃন্দেব রায়

রাশিয়ান নাটক: কারোর কারোর ধারণা যে চেখভের 'দি সি গাল' নাটকের উপর ইবসেনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। টলস্টয়ের এই ধরনেরই কথা বলেছিলেন সুভোরিনকে 'সি গাল' প্রকাশিত হবার পর। টলস্টয়ের মতে — "সি গাল অত্যন্ত বাজে অর্থহীন রচনা—ইবসেনের নাটক যেমন বিদ্রী় ধরণে লেখা, এ নাটকটিও সেই জাতীয় লেখা। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, একরাশ সংলাপের বোঝার সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এর ভেতরকার আসল উদ্দেশ্য কি বোঝা যায় না। অথচ এ ধরনের নাটক পড়ে এবং দেখে সারা ইউরোপ চিৎকার করে উঠছে 'ওয়াশ্ডারফুল!' চেখভ হয় তো শক্তি-শালী লেখক, কিন্তু 'সি গাল' খুব খারাপ নাটক।"

টলস্টয় চেখভের ছোট গল্প মন থেকে উপভোগ করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বিরাট প্রতিভার উচ্চপ্রশংসা করতেন—কিন্তু চেখভের নাটকের কোন মূল্যই টলস্টয় দিতেন না—মনে করতেন এ ধরনের রচনা মেকী এবং অসার।

শোনা যায় পরে এক সময় টলস্টয় চেখভকে বলেছিলেন—“তুমি তো জান আমার সের্গায়ারের নাটক ভাল লাগে না—কিন্তু তোমার স্নে-গুলো, বাকলে হে আন্তন পাভলো-ভিচ, সের্গায়ারের নাটকের থেকেও খারাপ।”

এসব মন্তব্য শুনতে বেশ মজার লাগে। অতবড় একজন কথাসিদ্ধ টলস্টয়—তিনি সের্গায়ার এবং চেখভের নাটকের রসোপলব্ধি করতে পারতেন না, অথচ নাট্যকার হিসাবেও টলস্টয়ের অবদান তো কম নয়।

চেখভের নাটকের চরিত্রগুলো যেন হ্যামলেটের মত। যেন একই সঙ্গে একদল হ্যামলেট জড় হয়েছে এক একটি নাটকে—তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের মনের চিন্তা-ভাবনা ভাষার প্রকাশ করতে পারে না, প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্যদের তাদের মনের কথা শোনাতে এবং বোঝাতে—কিন্তু কেউ তাদের বক্তব্য শুনতেও চায় না বা বুঝতেও চেষ্টা করে না।

চেখভের পরের নাটক 'আঙ্কল ভ্যানায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। এই একই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ১৮৮৮তে তিনি 'দি উড্ ডেমন' নাটক লিখেছিলেন। প্রফেসর সের্গায়াকভ চরিত্রটি দু'টি নাটকেই দেখা যায়—আঙ্কল ভ্যানায়া 'উড্ ডেমনে' রূপায়িত হয়েছেন আঙ্কল জর্জরুপে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আঙ্কল জর্জ আত্মহত্যা করেন। উড্ ডেমন নাটক-

বাইবেল ও দেশে এবং দেশে বিদ্যমান

টিতে অনেক দোষত্রুটি ছিল—সমগ্র নাটকটিকে ধরে রাখবার মত কোন সেন্ট্রাল টিউন ছিল না—এই কারণেই নতুনভাবে নাটকটিকে লিখে চেখভ নাম দিলেন 'আঙ্কল ভ্যানায়া'। পান্ন-মার্জিত করে নতুনভাবে লেখবার পরও কিন্তু নাটক হিসাবে 'আঙ্কল ভ্যানায়া' 'সি গালের' ন্তরে উঠতে পারে নি।

নাটকের প্রধান চরিত্র প্রফেসর সের্গায়াকভ—তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছে। এই স্ত্রীর থেকে সে যে ছোট ভূসম্পত্তি পেয়েছে, সেখানেই চাকরী থেকে অবসর নিয়ে বাকী জীবন কাটাতে এসেছে সের্গায়াকভ। এখানে ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রথমা স্ত্রীর ভাই ভ্যানায়া (ড্যানিটস্কি) এবং প্রথম পক্ষের মেয়ে সোফিয়া। অধ্যাপক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বৃদ্ধী নতুন স্ত্রী এলেনা আন্দ্রিয়েভনাকে। এলেনার প্রেমমুগ্ধ হয়ে পড়ে ভ্যানায়া এবং ডক্টর গ্র্যান্ডভ। সোফিয়া আবার মনে মনে গ্র্যান্ডভকে ভালবাসে।

অধ্যাপক সের্গায়াকভ হচ্ছে খিটখিটে মেজাজের লোক, বড় বড় কথা বলতে ভালবাসে এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী ধরনের। ভ্যানায়া সারাজীবন ধরে মৃত্যু ভঙ্গীর ভূসম্পত্তির তদারক করে এসেছে—এই কাজে সে এক রকম-ভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। সোফিয়া সাদাসিধে ভাল ধরনের মেয়ে—জীবনে সে শূন্য কাজ করেই কাটিয়েছে—জীবনের কোন কিছু আনন্দ উপভোগ করবার মত অবসর তারও জীবনে ঘটে নি। ডক্টর গ্র্যান্ডভকে সে ভালবাসে—কিন্তু পুরুষকে আকর্ষণ করবার মত কোন সম্পদই সোফিয়ার ভেতর নেই। ডক্টর গ্র্যান্ডভের চরিত্রে অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায় নৈরাশ্যবাদ এবং আদর্শবাদের। একদিকে সে মদ্যপ, কিন্তু তার বিরাট আকাঙ্ক্ষা যে সারা দেশটার বনানীর সৃষ্টি করে রাশিয়ার আবহাওয়া বদলিয়ে দেবার—জনসাধারণকে উন্নত-তর করা। এলেনা অধ্যাপক সের্গায়াকভকে বিয়ে করে আবিষ্কার করলো যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। কিন্তু তবুও সে ঠিক করলো

স্বামীর কাছেই থাকবে এবং তার প্রতি বিশ্বাসহতা হবে না।

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় প্রফেসর এবং তার স্ত্রী ফিরে যাচ্ছে—আগের মতই ভূসম্পত্তির তদারক কর ভার এসে পড়ল আঙ্কল ভ্যানায়া এবং তার ভাণ্ডারী সোফিয়ার উপর। সেই একঘেয়ে বৃদ্ধ-কিপং-এর কাজ নিয়ে ভ্যানায়া এবং সোফিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়লো—দুজনেরই মনটা বিবাদাচ্ছন্ন। সোফিয়া মামাকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে অত্যন্ত করুণভাবে বললে—“এইভাবেই আমাদের জীবনসংগ্রাম করতে হবে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। বড় কিছু বাধা-বিপত্তি, ভাগ্যের বিপর্যয় সব আমাদের ধীর, স্থিরভাবে সহ্য করে নিতে হবে। অন্যদের জন্যই আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হবে, এখন এবং ভবিষ্যতেও অর্থৎ বাধকা আসা পর্যন্ত। আমাদের জীবনে বিপ্রামের অবসর মিলবে না। শেষকালে যখন মৃত্যুর অভ্যাগম হবে তখনও কোনরকম নালিশ না জানিয়ে আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নেব। এবং তারপর কবরের সীমানার বাইরে পরপারে গিয়ে আমাদের আনন্দ করবার দিন আসবে। কোমলভাবে আমাদের বিগত জীবনের দুঃখ-দৈন্যের দিকে আমরা হাসিমুখে ফিরে তাকাবো এবং তখন আর আমাদের মনে কোন খেদ থাকবে না—এ সময় আমাদের বিপ্রাম করবারও অবসর মিলবে। আমি বিশ্বাস করি, আঙ্কল ভ্যানায়া। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি এই সত্যের অবসানে পরপারে গিয়ে সত্যিই আমাদের সুযোগ হবে নিশ্চিন্ত বিপ্রামের।” এর পরে মৃদুস্বরে গিটারের মিউজিক হতে থাকে—অদ্ভুত এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় এই আবহসঙ্গীতের ব্যাক-গ্রাউন্ডে। সোফিয়া এবার স্বর্গের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে থাকে—সেখানে সর্বদিক জ্বলজ্বল করছে—হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ছটা—পাখির কোনো মালিন্যের স্পর্শ সেখানে নেই—একটা করুণাঘন ঐশ্বরিক ক্ষমার মাধুর্যে সমস্ত বস্তুবিশ্ব যেন আবৃত হয়ে পড়ে।

যদিও আঙ্কল ভ্যানায়া স্কেপটিক

ধরণের, তবু সোফিয়ার এইসব কথায় তার চোখে জল এসে যায়। এরপর নাইট ওয়াচম্যান দরজায় নক করতে থাকে, বৃদ্ধা নার্স তার উল-বোনার কাজ শুরু করে এবং গিটারে নতুন একটি সুর বাজতে থাকে।

It is one of Chekhov's most unforgettable scenes. He himself has summarized its content in these words: "The whole purpose and drama of man lies in the workings of his soul, not in his external actions"

আঞ্চল ভানায়ার অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনার আগে সাংকেতিক নাটক এবং নাটকের জায়গায় জায়গায় সংকেতের ব্যবহার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। এ সম্বন্ধে আমার 'স্বাধীনতা পরিবর্তন' সমালোচনা বইটি থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি: "মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-

সমূহকে বিবিধ উপায়ে কলাশিল্পের ভিতর দিয়া রূপায়িত করা যায়। প্রথম উপায় বাস্তবতার পদ্ধতি অর্থাৎ বাস্তব চিত্রের ভিতর দিয়া মনের ভাব, চিন্তা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে রূপায়িত করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি বা উপায় হইতেছে সাংকেতিক পদ্ধতি—সাংকেতিকতার ভিতর দিয়া মনের সঞ্চিত জ্ঞান-সমূহ ও অনুভূতিপুঞ্জকে আভাসে ইঙ্গিতে মূর্ত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা।

"সকল শ্রেষ্ঠ নাটকেই এই দুই পদ্ধতি একই সঙ্গে মিলিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক নাটকের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, যে সব পৌরাণিক ও কাল্পনিক চরিত্র গ্রীক নাটকের পাত্রপাত্রী, উহাদের মধ্যে একটি বাস্তবতার দিক ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংকেতিকতার দিক আছে। বাস্তব চরিত্র বলিতে আমরা প্রাণবন্ত চরিত্রকেই বুদ্ধিয়া থাকি। অর্থাৎ বাস্তব চরিত্রের মধ্যে জীবনের এবং সমাজের রূপ বা চিত্র অনেকটাই প্রতিফলিতভাবে

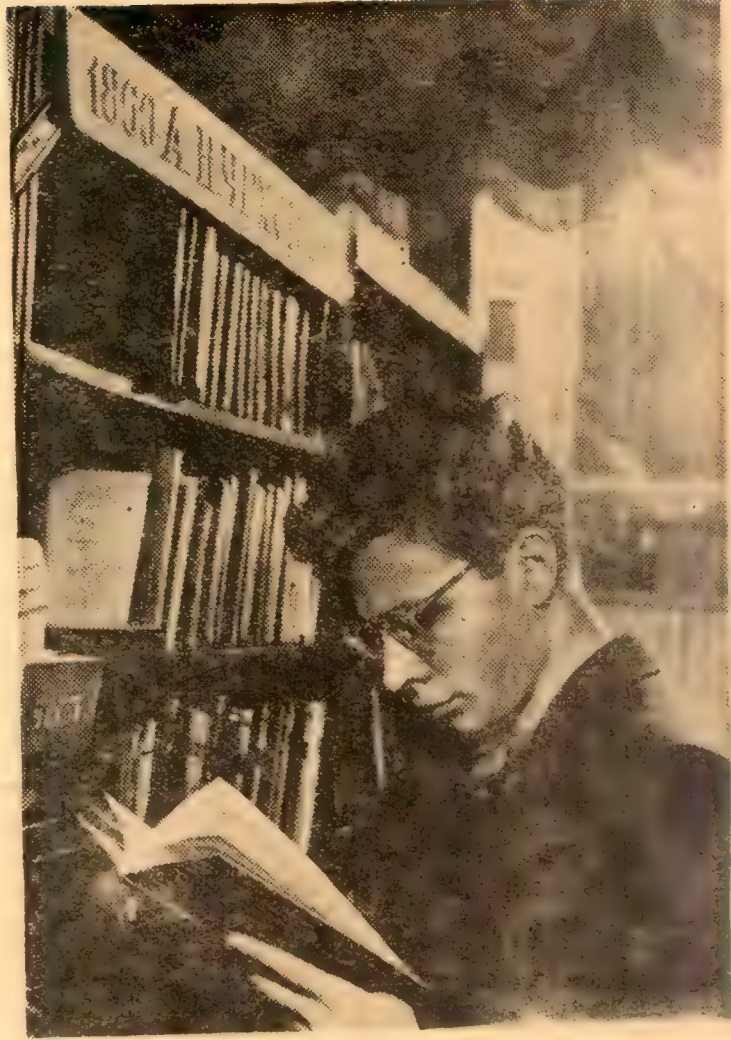
রূপায়িত হয়। এই জন্যই যে কোনো যুগের সাহিত্য হইতে সেই যুগের অনেকটা বাস্তব ইতিহাসই পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চরিত্রগুলির মধ্যে যে চিরন্তন ভাবের দিকটা রূপায়িত হয় তাহাই নাটকের পাত্রপাত্রীকে প্রতীক হিসাবে সৃষ্টি করিতে থাকে। সৃষ্টি করিতে থাকে বলার অর্থ এই যে যখন নাট্যগুলি প্রথম রচিত হয় তখন ওইসব কাল্পনিক বা পৌরাণিক চরিত্রে বাস্তবতার দিক-টারই প্রাধান্য থাকে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার দিকটা আর দর্শক বা পাঠককে আকর্ষণ করিতে পারে না। কারণ একসময় যাহা অতি সত্য এবং নিরতিশয় বাস্তব, পরবর্তী সময়ে জীবন বা বাস্তবতার সঙ্গে তাহার যথেষ্টই মিলের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতীতযুগের বাস্তবতা এবং বর্তমানের বাস্তবতার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলে একথা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নাটকের চরিত্রগুলির বাস্তবরূপের দিকটা বাস্তব বৈশিষ্ট্য হারাইতে থাকে এবং প্রতীকরূপের দিকটা নব নব যুগে নব নব ভাবের পরিম্পৃষ্টনের ভিতর দিয়া সৃষ্টি হইতে থাকে। আধুনিক পাঠক বা দর্শকের মনে গ্রীক নাটকের realism-এর দিকটা কোনোও স্বেচ্ছাপাত করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু Symbolism-এর দিকটা যে ভাব-প্রক্ষেপে তাহাদের হৃদয়ে গভীর ছাপ রাখিতে সমর্থ হয় একথা কেহই না মানিয়া পারিবেন না। উদাহরণস্বরূপ Euripides এর Ant gone নাটকটি আলোচনা করা যাউক। Antigone যে সমস্যার সম্মুখীন, আজ কালকার দিনে বাস্তবতার দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার আর কোনও মূল্যই নাই। কারণ আধুনিক সমাজে কোনও ব্যক্তিরই জীবনে আর ওই ধরনের সমস্যা আসিতে পারে না। Anti one-এর ভ্রাতা Polinices হত হইয়াছেন। যদি তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া কবর না দেওয়া হয় তবে নিজের বিবেকের কাছে নিজের ধর্মের কাছে, নিজের মনুষ্যত্বের কাছে Antigone কি উত্তর দিবেন? আবার যদি ভ্রাতার দেহ সংকার সম্পন্ন করেন তবে Thebes-এর রাজা Creon এর আইন অমান্য করা হয় এই আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ সুনিশ্চিত মৃত্যু। এই ধরনের পরিস্থিতি এবং জটিলতা আধুনিক জীবনে কল্পনাও করা যায় না কিন্তু ভাবের গভীরতার দিকটাকে



শেখ ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত নাট্যরসিক শিক্ষার্থীগণ

উপলব্ধি করিয়া দেখিতে হইলে নাটকটির Symbolism-এর দিকটা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। সে দিক দিয়া গল্পটির ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বনাম রাষ্ট্রশক্তির বা রাজ-শক্তির ক্ষমতা সংক্রান্ত কলহের কথা লইয়া নাটকের সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দিকটাই চিরন্তন এবং সেই কারণে এই Symbolism-এর দিকটাই আমাদের কৌতূহল উদ্বেক করে এবং আনন্দ দেয়। ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীনতার রাজশক্তির অন্যান্য হস্ত-ক্ষেপ ব্যাপারটা রাষ্ট্রের জন্মদিবস হইতে আজও পর্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র কতৃক অত্যাচারিত প্রত্যেক মায়ের এবং বিবেকসম্পন্ন বিদ্রোহীর প্রতীক চরিত্র হিসাবেই চিরকাল এই ধরনের চরিত্র বাঁচিয়া থাকিবে।

“এবার নাটকের স্থানে স্থানে সঙ্কেত ব্যবহার করিয়া শিল্পী বা নাট্যকার যে কিভাবে তাহার কলাকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। অতীতে যেভাবে নাটক অভিনীত হইত, আধুনিক যুগের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাহার প্রায় কোনই মিল দেখা যায় না। অন্যান্য ব্যাপারের মত নাট্য প্রযোজনায় ব্যাপারেও বিজ্ঞানের প্রভাব সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক নাট্যের টেকনিক, সেটিং বা লাইট-এর উপর নাট্যকার যেতোটা নজর দেন অতীতে তাহার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না এবং সেই কারণেই ঐ দিকগুলি তখন এভাবে বিকাশিত হইতে পারে নাই। পুরাকালের গ্রীক থিয়েটারের কথা ভাবিয়া দেখিলে একথা সহজেই বুঝা যাইবে। তখনকার দিনে যেভাবে গ্রীক-নাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল তাহাতে গ্রীক-নাটকে সূক্ষ্ম সিম্বল ব্যবহারের কোনো সুযোগই নাট্যকার পাইতেন না। সহজ ও সাধারণভাবেই তাহাকে সাংকেতিক কৌশলের সাহায্য লইতে হইত। উদাহরণস্বরূপ ইউরিপিডিসের ‘দি ট্রোজেন উইমেন’-এর কথা ধরা যাইতে পারে। যুদ্ধের যে বাস্তবতার দিকটা হোমার বিরাট ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তাহার মহাকাব্যে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়া বিস্তৃতরূপে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাকেই ইউরিপিডিস স্বকীয় আশ্চর্য কলাকৌশলে ছোট একটি সিম্বলের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়াছেন উপরি-উক্ত নাটকের বিষাদময়ী একাকিনী নারী-মূর্তি এবং তাহার বক্ষলগ্ন মৃত



চৈতন্য ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্র-প্রযোজক

শিশুর চিরের ভিতর দিয়া—“in the lonely figure of a pitiful old woman, sitting on the ground with a dead child in her arms.”

এলিজাবেথীয় যুগেও রংগমণ্ডের যে অবস্থা ছিল তাহাতে সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঙ্কেত ব্যবহারের সুযোগ বা সুবিধা হইত না। কিন্তু বর্তমান যুগের ইবসেন, শেহভ ও অন্যান্য আধুনিক নাট্যকারদিগের নাটকে সাংকেতিকতা ভাবের নির্দেশক ও প্রকাশক হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক রংগমণ্ড ও আধুনিক নাট্য-সাহিত্য বিবর্তিত হইতে হইতে যে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইবসেনের ‘জন গেরিগেল বক’ম্যান’ নাটকের সারা প্রথম অঙ্ক ধরিয়া মাথার উপরে যে পদধ্বনির

শব্দ শুন্য যায়, তাহা তো বক’ম্যান চরিত্রেরই সমস্ত ব্যর্থতা, বেদনা ও উদ্বেজনার সিম্বল ব্যতীত আর কিছু নহে। রজমাস’হলম নাটকের বসিবার ঘরের জানলার দিকের বাহিরে যে পায়ে-চলা-রিজ আছে তাহা পরিদৃশ্যমান নহে—কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সর্ব সময় সচেতন—ইহাও সিম্বল।

‘দি চেরী অর্চার্ড’ নাটকে সাধারণ অর্থে আমরা প্লট বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান নিম্নে। মধ্য স্থান অধিকার করিয়াছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্র চরিত্রের দিকটা। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নৈরাশ্রময় পরিণতির চিরন্তন ইতিহাসই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ দৃশ্যে যে গাছ কাটিবার শব্দ আসিতেছে তাহা

যেন এক যুগের অবসানে নতুন যুগের আবির্ভাবেরই সংকেত বা ইঙ্গিত দিতেছে। দ্রুত এবং ভগ্নীর জীবনের অসাফল্যের চিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকার মানবজীবনের বিরাট এবং গভীর হতাশার চিরন্তন কাহিনীকেই সম্বলিত করিয়াছেন। ম্যাডাম রান্নেভস্কির চেরী অর্চার্ডের মত, বাস্তবজীবনে আমাদেরও অনেক উচ্চাশা এবং গৌরবের সামগ্রী—ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নষ্ট হইয়া যায়। গল্প বা কাহিনী—বিষাদময় হইলেও এই নাটকে প্রধান্য পাইয়াছে চরিত্রগুলি। আর, সকল চরিত্রের ভিতরই এমন এক-একটা অদ্ভুত দিক আছে যাহার ফলে নাটকটি ট্রাজেডী না হইয়া কমেডী হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের শেষ অঙ্কে একদিকে বিদায়ের ব্যথা যেমন চরিত্রকে বেদনার ছায়া সঞ্চার করিয়াছে, তেমনি আবার ইহার মধ্যে ট্রফিমভের গলোসেস হারাইয়া যাওয়া এবং তাহার অন্বেষণ একটি অকারণ ভরলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত নাটকে এই দুইটি বিপরীত ভাব পাশাপাশিভাবে রহিয়াছে — গলোসেস

হারাইয়া যাওয়া ব্যাপারটা যেন এই তারল্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে।

শেহভের 'আঞ্চল ভ্যানায়' কয়েকটি লোকের করুণ জীবনের কাহিনী লইয়াই রচিত। নাটকের মূল বক্তব্য যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে একটিমাত্র প্রতীক-ঘটনার মধ্য দিয়া—ভ্যানায় প্রফেসরের প্রতি দুই-দুইবার গুলী বর্ষণ করিল, অথচ একবারও সাফলাল্যে করিতে সমর্থ হইল না। এই ব্যর্থতাই নাটকটির প্রতি পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দাম্ভিক প্রফেসর সেরি-রায়াকভ পূর্ব স্ত্রীর মা, ভাই ও মেয়েকে এমন ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন যেন—কালে তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আঞ্চল ভ্যানায় যখন এ বিশ্বাস ভাঙিল তখন আর নিজেকে শোধরাইয়া লইবার সুযোগ বা বয়স তাহার নাই। তাহার নিজের জীবনের ব্যর্থতা তাহার 'Oh how I have been deceived etc'. সংলাপটির ভিতর দিয়াই স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রফেসরও অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ জীবনের ব্যর্থতা।

প্রফেসরের পূর্ব স্ত্রীর মাতার চরিত্র এত ব্যর্থ যে শেষ পর্যন্ত নিজের দ্রুত বিশ্বাসকেই তিনি সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রফেসরের দ্বিতীয়া স্ত্রী এলেনার জীবনও ব্যর্থতার ভরা।

অন্য দুইটি প্রধান চরিত্রে ডক্টর এ্যাসট্রভ এবং সোফিয়াও জীবনে সুখী নয়। এই সকল চরিত্রের ব্যর্থতা বা অসাফল্যের দিকেই সংকেত করিতেছে, গুলী ফস্কাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা।"

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগসাধনার দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগগগনপ্রদত্ত পুণ্ড্রিদ্বে সসংস্কৃত ষড় অঙ্কে মূল—সরল বিশদ যোগানুবাদ সংযুক্ত পরিবর্তিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনার প্রকাশিত। ১। শিবসংহিতা, ২। খেরণ্ডসংহিতা, ৩। রত্নসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্চক্রনিরূপণম্, ৬। দত্তাত্রেয় যোগরহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগগোপদেশ। অতি দৃশ্যপাত সাতথানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুরু সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহার নিহিত ছিল—যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্রীণ, নানা রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতামি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্ষগণের বলবীৰ্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধিকারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানব দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৃতি, শৃদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃশৃদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশৃদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গল-নিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধ-ঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অতল বিভূতিলাভ সম্ভব হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নিভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য ১ তিন টাকা।



চেষ্টা ইনস্টিটিউটে চেষ্টার নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে আলোচনারত কয়েকজন অভিনেতা
১৫ অভিনেত্রী

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা



খেলাধুলা

করনীপ দুখালী

ফুটবলে বিশ্বযুদ্ধ

বিশ্বযুদ্ধের জন্য দেশে দেশে চলছে দারুণ প্রস্তুতি। যুদ্ধজয়ের এই প্রস্তুতি অভিনব, অসামান্য অস্বাভাবিক আর বলতে গেলে প্রায় অসম্ভবও বটে। বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনে বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই যুদ্ধ প্যাটন ট্যাঙ্ক, স্যাবার জেট বা আন্তর্জাতিক ক্ষেপণাস্ত্রের নয়—এই যুদ্ধ হল সবুট পা এবং বলের। ট্রয়ের যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল হেলেন, আর এই যুদ্ধের লক্ষ্য বা ইংলিস্তবস্ত্র হল বিশ্বফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবমণ্ডিত জুন্স রিমেট কাপ।

জুন্স রিমেট কাপ জয়ের জন্য প্রতিটি দেশ যে উদ্যমে এবং নিরলস সাধনার দ্ব্যর্থ ও কথুর পথে চলেছে, তা সত্যিই কোন একটি দেশের সামরিক প্রস্তুতিপর্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শুনে অশ্চর্য হবেন যে, ১৯৬২ সালে চিলিতে জুন্স রিমেট কাপের খেলা শেষ হবার পরই ১৯৬৬ সালের জুন্স রিমেটের জন্য প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়ে যায় কয়েকটি দেশে।

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের আসর বসবে ইংলেন্ডে। বিশেষজ্ঞ আর চিকিৎসকের দল পাঠালেন রেঞ্জিল। তাঁরা ইংলেন্ডে এলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। দেশের খেলোয়াড়েরা কোথায় থাকবেন, কি খাবেন এই সমস্ত ব্যবস্থা

করার জন্য গবেষণা শুরু হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে গেল। গত ১৯৬২ সালে চিলিতে খেলার সময় দেখা গেল যে, বিদেশী দলগুলি খেলার শেষভাগে পরিত্রান্ত হয়ে পড়ছে, কিন্তু স্থানীয় খেলোয়াড়েরা এইরকম কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, স্থানীয় লোকদের দেহে লাল কণিকার লৌহজাত কণ্ডুর ভাগ বেশি এবং ফলে চিলির আবহাওয়ার ওই খেলোয়াড়দের কোন অসুবিধাই হয় না। তখন বিদেশী একটি দেশের দলের চিকিৎসক

পেলে ছিলেন সব দেশের রক্ষণভাগেরই বিভীষিকা। এই পেলের দুর্দম আক্রমণ-ধারা প্রতিহত করার জন্য বিদেশের বাঘা বাঘা কোচরা মাথা ঘামাতে লাগলেন। একটি দেশ মূলত ক্যামেরার পেলের খেলার ছবিও তুলে নিলেন, কিন্তু ফুটবলের ব্ল্যাক পার্ল পেলেকে প্রতিহত করার পথ খুঁজে পেলেন না। কারণ পেলের প্রতিটি আক্রমণধারা নতুন নতুন ছকে তৈরি।

বিশ্বের ফুটবল রসিকদের লক্ষ্য হল ইংলেন্ডের বিশ্বকাপের আসর আর দেশগুলির লক্ষ্য হল জুন্স রিমেট কাপ।

শ্রীঅমিতাভ

সাবার-দাবার ও ওষুধের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দেশে ওই লৌহ-উপাদান বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলও হাতে হাতে পেলেন তাঁরই দল জয় করল দুর্লভ ট্রফি।

এক দেশ আর এক দেশের খেলা এবং আক্রমণধারা রচনার কলকৌশল বোকার জন্য কোচ এবং ফুটবল বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে দেন বিদেশে। তাঁরা খেলা দেখেছেন দেশে ফিরে তৈরি করেন রক্ষণবাহু, যাতে বিপক্ষ দেশের আক্রমণধারাকে প্রতিহত করা যায়। তবে সব বিশেষজ্ঞরাই হার মেনেছিলেন বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ ফুটবলর রেঞ্জিলের পেলের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

গতবারের রোহিংটন বেরিরা ট্রফির সান্নাধ্য আপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার সেমি-ফাইনালের ধাপ থেকেই বিদায়গ্রহণ করলেন পাটনার মাঠে। ফাইনালে এবার গিয়ে উপনীত হয়েছে ব্যাংগালোর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতাকে পরাজিত করে এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লীকে পরাজিত করে।

কলকাতার পরাজয়ের অন্যতম কারণ হল ব্যাংগালোর দলের স্পিন বোলার টেস্ট খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের ছুঁঁর্পবলের চালে ধরাশায়ী হয়েছে কলকাতাদল। কলকাতাদলের একমাত্র দুর্জন ব্যাটসম্যান

স্বাভাবিক বলমতী

জয়দীপের সাফল্য

ক্রীড়া খেলায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতরভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কলকাতাদল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দলের অধিনায়ক এবং অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান অম্বর রায়ের ব্যর্থতার। কলকাতাদলের প্রথম ইনিংসে দলের পতনরোধ করার জন্য দুজন খেলোয়াড়ের অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে হবে। এই দুজন খেলোয়াড় হলেন দেব মুখার্জী এবং অম্বর রায়। দেব মুখার্জী সংগ্রহ করেন ৬০ রান এবং কল্যাণ সেন অপরাধিত থাকেন ৫৭ রানে।

কলকাতা দল ব্যাঙ্গালোর দলের কুড়ি রান পশ্চাতে থেকে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে ১৮০ রানে। পূর্বে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ব্যাঙ্গালোর সংগ্রহ করেছিল ২০০ রান। নাগভূষণ এবং ভেক্টেশ সংগ্রহ করেন, যথাক্রমে ৫০ রান এবং ৫৪ রান। সুপ্রকাশ সোম ২১ রানে ৩টি উইকেট এবং ভাস্কর গুপ্ত ৬২ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। সুব্রত গুহ এবং যোশী দুইটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন। ব্যাঙ্গালোর দলের পক্ষে মাত্র ৮২ রানে চন্দ্রশেখর সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট।

ব্যাঙ্গালোর দল দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ করেন ২৫৫ রান। তপনজ্যোতি ব্যানার্জী ৪টি উইকেট এবং সুব্রত গুহ ৩টি উইকেট দখল করেন। অবশিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসে কলকাতা দল সংগ্রহ করে ৪ উইকেটে ১১১ রান। সুবীর গাঙ্গুলী ৫৫ রানে অপরাধিত থাকেন। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ব্যাঙ্গালোর ফাইন্যাল খেলার সুযোগ লাভ করে। অন্য একটি সেমি-ফাইন্যালে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বোম্বাই পরাজিত করে দিল্লীকে।



দেব মুখার্জী

এবার জয়দীপ মুখার্জী জয় করলেন জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নদের সম্মান। এতদিন এই সম্মান ছিল রমানাথন কৃষ্ণনের দখলে। এবার কলকাতার অনর্দিত্ত এশীয় টেনিসের আসরে সিংগলস ফাইন্যালে জয়দীপের কাছে পরাজয়ের পর কৃষ্ণন পরবর্তী আর কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন নি। দিল্লীতে অনর্দিত্ত জাতীয় টেনিসের ফাইন্যালে বাংলার দুই তরুণ জয়দীপ ও প্রেমজিতের সাফল্য হয়।

জয়দীপ অনায়াসে প্রেমজিতের কাছ থেকে জয়মাল্য ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। তাঁকে বধে পিরগ্রাম করতে হয়েছে প্রেমজিতকে নতিস্বীকার করতে। এই খেলায় অবশ্য জয়দীপ এশীয় লন টেনিস ফাইন্যালের মত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি। প্রথম সেটটি জয়দীপ তুলে দেন প্রেমজিতের হাতে, শব্দমাত্র ছমছাড়া ক্রীড়াধারার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয়



ক্যাসিনার ক্ষে

সেটে জয়দীপ ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক ক্রীড়াধারা ফিরে পেতে থাকেন এবং খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। প্রথম সেটটি জয়দীপ ৪-৬ গেমে হারালেও দ্বিতীয়টি তিনি ৬-০ গেমে দখল করেন।

প্রেমজিত শুরুরতে ভাল খেললেও দ্বিতীয় সেটের পর থেকে এলোমেলোভাবে খেলতে থাকেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সেটটি জয়দীপ প্রেমজিতের ভুলের সুযোগে সহজেই দখল করে নেন ৬-৪ এবং ৬-০ গেমে। জয়দীপ এবং প্রেমজিতের এই টেনিস-যুদ্ধ স্থায়ী হয় প্রায় ৮০ মিনিট।

পূর্বদূষদের ডাবলস ফাইন্যালটি আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। ভারতের এস পি মিশ্র এবং নরেশকুমার পরাজিত করেন জাপানের ডেভিস কাপ জুটি ওসুমা ইসিগুরো এবং ওয়াটানবেকে।



কল্যাণ সেন

রাশিয়ার মহিলা খেলোয়াড় টি সোমে বিনী কলকাতায় এশীয় টেনিসে গ্রিমকুট জয় করেছিলেন তিনি দিল্লীর জাতীয় টেনিসের আসরেও ডাবলসের সম্মান লাভ করেন। মিস সোমে সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসে জয়ী হন।

শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ

অস্ট্রেলিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বার রন ক্লার্ক ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্পোর্টস রাইটার সংস্থার উদ্যোগে এই নির্বাচন অনর্দিত্ত হল এবং এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সারা বিশ্বের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। বিশ্ববরকর্তৃ সৃষ্টিকারী অস্ট্রেলিয়ার রন ক্লার্ক সংগ্রহ করেন সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক ভোট। কেনিয়ার খ্যাতনামা দৌড়বার কিপচোগ কিনো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

“টাই” ক্রিকেট

ক্রিকেট মাঠে “টাই” বা সমান দলীয় রান হয়ে খেলা জু হবার ঘটনা সত্যি বিরল। রিসবেনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার “টাই” টেস্টের কথা চিরদিন লেখা থাকবে ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায়।

আমাদের কলকাতা ময়দানে এই মরশুমে দুটি ক্রিকেট খেলা “টাই” হল। কিছুদিন পূর্বে বরানগর ও ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর খেলার উভয় দলই ১০৬ রান করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সি এ বি নক-আউটে ইন্টার্ন রেল এবং পোর্ট কমিশনারের খেলাটিও দারুণ উত্তেজনার মধ্যে অমীমাংসিত-



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের কত
মানুষ আনন্দে যেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
ছুইবার করে দু'চামচ মুক্তসঞ্জীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজ্ঞানকারিট (৬ বৎসরের
পুরাতন) বাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অথক ডাঃ যোগেন চন্দ্র বোষ, এম-এ,
আম্বুর্কেনশারী, এক.সি.এস. (লন্ডন),
এম.সি.এস. (আমেরিকা), কামলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র চন্দ্র বোষ,
এম-বি, বি-এস, আম্বুর্কেনশারী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

সাপ্তাহিক বসুমতী

এডওয়ার্ড জে নীল ট্রফি



রন কাক ...

ভাবে শেষ হল। ইন্টার্ন রেল দল তাদের ইনিংস শেষ করে ১১১ রানে। ১১১ রানে পাঁচ উইকেটের ফলস্বরূপে পোর্ট কমিশনার্স দলের মাসজী পারোথ ও এন চ্যাটার্জী নিয়ে যান ১৮৭ রানে এবং তখন দলের ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে, বিদায় নেন পারোথ। মাত্র তিন রানে এর পর তিনটি উইকেটের পতন ঘটে। শেষ ব্যাটসম্যান উইকেটে এসে একটি রান সংগ্রহ করার সাথে সাথে উভয় দলের রান-সংখ্যা সমান সমান হয়। ঠিক এই সময় পোর্ট দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র এক রান, যাতে শেষ উইকেট। শেষ ব্যাটসম্যান মরিয়্যা হয়ে একটি রান সংগ্রহ করতে গিয়ে আউট হয়ে খেলা ড্র করলেন।

বর্তমান বিশ্ব প্রেস্ট মন্টিবোম্বা ক্যাসিয়াস ক্রিকেট বোর্ড রাইটস এ্যাসোসিয়েশন এডওয়ার্ড জে নীল ট্রফি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রথমে সনি লিস্টনকে নক-আউটে পরাজিত করে ক্যাসিয়াস লাভ করেন বিশ্ব হেভীওয়েট মন্টিবোম্বের বিজয়ীর গৌরব এবং পরে খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে ক্লয়েড প্যাটার্সনকেও প্লাম্ব রাউন্ডে টেকনিক্যাল নক-আউটে পরাজিত করেন।

মাত্র তেইশ বছরের যুবক ক্যাসিয়াস আজ পর্যন্ত মোট বাইশটি পেশাদার মন্টিবোম্ব জয়ী হয়েছেন। তিনি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক মন্টিবোম্ব স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর সরকারীভাবে বিশ্ব হেভীওয়েট মন্টিবোম্ব চ্যাম্পিয়ানের সম্মান ফিরে পেতে গেলে ক্যাসিয়াস ক্রিকেট লড়াইতে হবে টেরেলের সঙ্গে। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা মন্টিবোম্বা রায়ান লন্ডনের সঙ্গেও ক্রিকেট ইংল্যান্ডে একটি মন্টিবোম্ব অবতীর্ণ হতে পারেন। তবে তিনি প্রথমে টেরেলের সঙ্গে অথবা লন্ডনের সঙ্গে মিলিত হবেন একথা তিনি এখনও প্রকাশ করেন নি। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ক্রিকেট জানিয়ে দেবেন।

সম্রাট দর্শন

প্রথম চারটি টেস্ট অমীমাংসিত থাকার পর ব্যাংগালোরের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ভারতীয় স্কুল একাদশ ৯০ রানে লন্ডন স্কুল একাদশকে পরাজিত করে “রাবার” লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মাত্র পনের মিনিট পূর্বে খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ভারতীয় স্কুল একাদশের প্রথম ইনিংসে রান হয় ২৭৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ও উইকেটে (ডিঃ) ১৫৭ রান; লন্ডন স্কুল দলের প্রথম ইনিংসে ২০১ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪২ রান।

বোম্বাইয়ের রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম বোম্বাইয়ের মধ্যে যে রঞ্জী ট্রফি ক্রিকেট সেমি-ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে তাতে বাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পনের জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে চারজন, মোহনবাগান থেকে ছজন, কালীঘাটের দ্বজন, মিলন সমিতির,



টি. নোম

ইস্টবেঙ্গল ও টাউন ক্লাবের একজন করে খেলোয়াড় দলে স্থান পেয়েছেন। অধিনায়ক করবেন পঞ্চজ রায়।

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুজরাটকে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। কলকাতা দলের অধিনায়ক করেন অলক মিত্র এবং দলে আছেন অর্জিত লাল, মীনু আওয়ারা ও বি কে রায়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে প্রিন্স কুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সংবাদকার	...	২১৭৪
আজকের মানব	...	২১৮০
মহানুভব রোমা রোজা	— শ্রীদিলীপকুমার রায়	২১৮২
কালান্তরের পথিক রমা রমা	— প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত	২১৮৪
আন্তর্জাতিক	...	২১৮৭
সত্যসংস্থানী রমা রমা	— সরোজকুমার দত্ত	২১৯১
নাট্যকার রমা রমা	— কম্পতরু সেনগুপ্ত	২১৯৩
উপস্থাপনা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২১৯৪
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	২১৯৬
বঙ্গদর্শন	...	২১৯৭
মৃত্যুঞ্জয় (অনুবাদ-গল্প)	— আশা দেবী	২২০২
জগদীশ্বরের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২২০৪

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লক্ষ্য হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম প্রেমী হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াজেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন পাদশপাল শ্রীমাধব শ্রীহারি ইনি লিখিয়াছেন—
“...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।”

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’র অভিমত—

“স্বধর্মের মূল ও সার কথা সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শহীন হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।”

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ

হেমেন্দ্র বায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কোতূহলে হতবাক হন, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাসিলাপী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রেমী রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

- ১। স্বকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। কাদিরামের কীর্তি, ৫। যেসে দেওগে তেসে পাওগে, ৬। বড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সমুদ্র—চাবি ও খিল, একরসি মাটি, চোরাই বাড়ি, ছেলেবেলার একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনী সমুদ্র—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকটা হাচি, শয়তান, ভেলিকর হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সূচীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতদর্শন	...	২২০৭
স্বাধীন শিল্পী রোমা রোলা	— ভবানী মৃধোপাধ্যায়	২২০৯
অমোর পিপাসা (কবিতা)	— আশিসকুমার গুহ	২২১১
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২২১২
নরকের সড়কে (গল্প)	— দিব্যোদয় লাহিড়ী	২২১৬
মহাপ্রাণে (কবিতা)	— সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	২২১৮
সামক বিপ্লবী মতীন্দ্রনাথ	— পৃথ্বীন্দ্রনাথ মৃধোপাধ্যায়	২২১৯
গ্রাম বাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	২২২৪
অপরূপ নেহারল—ওকলাহোলা ও টেক্সাস	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	২২২৮
রূপগজগৎ	...	২২৩১
রূপগজগৎ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২২৩৪
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	২২৩৮

ভট্টর পঞ্চানন খোদা এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য প্রমাণের স্বর্ণখনি)

রক্তনদীর ধারা, 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উন্মোচন ও ব্যাখ্যা প্রদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জনন্তি! অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুম্মম্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরভাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি বলে সভ্যতা?

—তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ী কানন, হেক্টর বধ।

—দুই টাকা।

উপন্যাস-সম্রাজ্যের রক্তমুক্তি—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি উপন্যাসিক—লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মৃধোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

এম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নিখর, অতঃপর, পরদেশী সূরা, ববনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রণীত, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, এক যাত্রা, কুলকাটা, দৃষ্খীরাম, পাল-সুপারি।

মাত্র ১১০ টাকা।

ডঃ মতিলাল দাস প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

- ১। চলার পথে (উপন্যাস)
- ২। মনীষা (উপন্যাস)
- ৩। বিদ্যাবিশিষ্টা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
- ৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
- ৫। চার্বাক (নাটক)

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



৭০ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে ফেব্রু, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price . 25 ...
Thursday, 3rd Feb., 1966

অপরূপীয় ক্ষতি

এবারে প্রজাতন্ত্র দিবস অন্যান্যবারের মতো আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে পালিত হয়নি। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুশোকে অভিভূত জনসাধারণ প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরভাবে পালন করার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল; প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক একদিন পূর্বে অপর যে সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হল তা যেমন মর্মস্পর্শক তেমনি হৃদয়বিদারক। অল্পসের ম' রা পূর্বতনত্বে একশ এগার জন যাত্রীসহ এয়ার ইন্ডিয়া'র 'কাশ্মিরজঙ্ঘা'র চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার সেই সংবাদ অকল্পনীয়। শতাব্দিক যাত্রীর মৃত্যুর এমন শোকাবহ সংবাদ পৃথিবীর কাছে এক করুণ কঠিন আঘাতের মতোই। কিন্তু এতগুলি মলোমান প্রাপের মধ্যে আর একটি অমূল্য প্রাপকে হারিয়ে সারা বিশ্ব আজ নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর শান্তির ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্যই ছিলেন উৎসাহিত প্রাণ। দেশে দেশে এই বিজ্ঞানীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পৃথিবীর সুস্থমস্তিস্কসম্পন্ন মানুষ তাঁর অনুপ্রেরণার পারমাণবিক ভীতি ত্যাগ করার জন্যে এগিয়ে আসছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু শুধু ভারতের কাছেই নয়, বিশ্বের কাছে অপরূপীয় ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে।

ডঃ ভাবা 'কাশ্মিরজঙ্ঘা' বিমানে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সভার যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন ভিয়েনায়। বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ তাঁর কাছ থেকে নতুন প্রেরণা লাভের জন্য যখন উদ্গ্রীবচিহ্নে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁর এই মৃত্যু তাঁদের কাছে যে অধিকতর বেদনাদারক বলে মনে হবে, তা বলাই বাহুল্য। তবু, বিশ্ববিজ্ঞানী-সভার তিনি কর্মনিরত সাধনার ফলশ্রুতিতে যে

বাণী শুনিয়ে গেছেন, আশা করি তাঁরা তার সম্যক মর্যাদা দান করবেন এবং বিজ্ঞানীরাই আজ যদি সাধারণ মানুষকে পারমাণবিক ভীতি থেকে মুক্ত করতে পারেন, তাহলে সেই কর্মের স্মারাই ডঃ ভাবার মহৎ উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলা সম্ভব হবে।

ভারত পারমাণবিক বোমা তৈরী করবে কিনা—এ প্রশ্নটি যখন মুখের হয়ে উঠেছিল, তখন ডঃ ভাবাই বলেছিলেন যে, ভারত ইচ্ছে করলে আঠারো মাসের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ হতে পারে। এমন কি, তিনি ঐ অস্ত্র তৈরীর জন্যে যে হিসেব দিয়েছিলেন, তাও এমন বেশি কিছু নয়। তবু সেই অস্ত্র তৈরীর পরিবর্তে তিনি পারমাণবিক শক্তিকে কলকারখানার প্রয়োগের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা সফলতা লাভ করলে পারমাণবিক শক্তির আত্মচর্চকর কল্যাণময় ব্যবহারে বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হয়েছিলেন এবং ডঃ ভাবার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে পারমাণবিক শক্তিকে বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এখন সেইভাবে ব্যবহার করার জন্য বশ্যপরিবৃত।

ভারতের পারমাণবিক গবেষণার পিছনে ডঃ ভাবার অবদানই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু পারমাণবিক শক্তির ভিন্নতর ক্ষেত্রে প্রয়োগপদ্ধতির কথাই তিনি ভাবেননি, তিনি ভারত রাষ্ট্রকে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন করে তোলার জন্য হাজার হাজার তরুণ বিজ্ঞানীকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিচ্ছিলেন। ভারতের যে তারুণ্য শক্তির মধ্যে বিরাট শক্তি অন্তর্নিহিত ছিল, তাকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন ব্যাংগালোরে, বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউটে, ঐশ্বর পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে ভারতের প্রতিটি বীক্ষাগারে। তাই রাষ্ট্রপতি

ডঃ রাধাকৃষ্ণ তাঁর শোকবার্তার যথাযথ বলেছেন যে—

"তিনি নিজেই শুধু অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি, পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের হাজার হাজার তরুণ বিজ্ঞানীদের তিনি উৎসাহ দিয়েছেন।"

ডঃ ভাবাকে স্মৃতিভাবে তাঁর কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীজী তাঁর মস্তিস্কার যোগদানের জন্যেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ ভাবা সেই মন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকার জানিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নবভারত রচনার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছিলেন শাস্ত্রীজীকে।

ডঃ ভাবার মৃত্যুতে আজ আমরা শোকবিহ্বল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আমাদের বেদনাকর কারণ এই যে, তাঁর মতো বিজ্ঞানীর জন্ম এই পৃথিবীতে কোটিতে একটিও সহজে সম্ভব হয় না। তবু তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার আমরা লাভ করেছিলাম। তাঁর অবর্তমানে আজ আছে তাঁর মহৎ কীর্তির স্বাক্ষর, আর তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভারতের তরুণ বিজ্ঞানী দল। তাঁরা তাঁর কীর্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রতিশ্রুত হলে আমাদের অপরূপীয় ক্ষতির মধ্যেও কিছুটা সাফল্য আমরা লাভ করবো।

সম্পাদকীয়

অশোক মাস্তুল

সুন্দর গ্রামাণ্ডল। সাধারণ মানুষ। তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল শব্দ একটি নাম। সেই নামের ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে নেই তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। তবু তাদের অন্তরের ভাষায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কী এক আশ্চর্য মন্তব্যের সুর।

কলকাতার ভিড়ে পা রাখতেই ভেবে-ছিলাম, হয়তো ভুলে গেছি সেই নাম।

কিন্তু, না। ভুলবার পথ নেই। ট্রাম-বাসের ধাক্কা কতো অপরিচিত নানা ভাষা-ভাষী মধ্যে সেই একই নামের বারংবার উচ্চারণ।

কোনো কণ্ঠে হর্ষ, কোনো কণ্ঠে আক্ষেপ।

জানি, সুউচ্চ আদালত সেই গভীর কণ্ঠে আবার হবে চণ্ডল। আইনজরী আসবেন আগ্রহে শুনতে আইনের কটকটকে এক একটি নতুন পয়েন্ট। ভিড় জমবে আদালতে আদালতে।

আইনের পবিত্র অঙ্গন থেকে একদা রাজনীতির সিংহরজার বিদায় দিতে গিয়ে বাদ্যের আক্ষেপের অন্ত ছিল না, তাদের পুরানো বন্ধকে ফিরে শোনে আজ হয়তো তাদের আনন্দের কারণ থাকতে পারে—তবু স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন—একথাও আজ মুখে মুখে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যখন এক বিরাট শূন্যতার বাঙালীজাতি দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্কন হয়ে পড়েছিল, তখন বাংলা দেশের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের এক সুকঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ৪০ বছর বয়সে যে তরুণ বাঙালীর ওপর তিনি অশোককুমার সেন। লোকসভার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অশোককুমার সেনের চেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি ভারতের জাতীয় সমস্যা বলে তখন থেকে স্বীকৃতি পেতে থাকে এবং ঐ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন।

আজ যে দণ্ডকারণের চিরস্থায়ী পুনর্বাসনের সম্বন্ধ সমাধানের কথা বলে থাকি, এর পেছনে শ্রীসেনের অবদান কি পরিমাণ আছে, তা যাদের জানা নেই, তাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত।

অবশ্য মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় গ্রহণের পর এক সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে শ্রীসেন জানিয়েছেন, দেশের ও জাতির স্বার্থে তিনি যে কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

একথা কে না জানেন যে, অজুকার, দীর্ঘ-নাসা, সদা হাসময়, অধচ গম্ভীরকণ্ঠ, প্রকৃতিতে সহজ সরল শ্রীসেন ছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন। এখান থেকে স্নাতকোত্তর অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণী লাভ করে অধিকতর বিদ্যা অধিগত করার জন্যে

১৯০৭ সালে তান গান্ধন স্কুল অফ ইকনমিক্সে যোগ দেন। এই সময় তিনি হ্যারল্ড ল্যান্সি, রেজিনাল্ড সোরেনসেন, তৎকালীন ইন্ডিয়ান লীগের সম্পাদক কুকমেননের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তখন থেকেই তিনি ভারতমন্ত্রির সংগ্রামকে জীবনে বরণ করে নেন। কিন্তু এর বহু আগেই মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি যোগদান করেছিলেন তদানীন্তন বৈদ্যবিক আন্দোলনে। বৈদ্যবিক আন্দোলনে যত্ন থাকার জন্যে কুখ্যাত এন্ডারসনের সম্রাসী রাজত্বে শ্রীসেনকে প্রায় চার বছর পুলিশের নজরখানীতে থাকতে হয়েছিল।

মধ্যবিত্ত ঘরের এই মূর্তিসংকল্প তরুণের জীবন সেদিন ছিল বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর।



শ্রীঅশোককুমার সেন

আইনজীবী হিসেবে বিনি লক্ষাধিক টাকা বার্ষিক আয়কর দিয়েছেন, তিনিই মাত্র ১০০ টাকা মাইনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

দীর্ঘ ৭ বছর ধরে ভারতের পার্লামেন্টে তার কণ্ঠ বার বার ঘোষিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন শ্রীসেনের প্রধান দৃষ্টি কাজের জন্যে বাংলাদেশ চিরকাল কণী হয়ে থাকবে। কারণ কলকাতার সমস্যা তারই

প্রচেষ্টাতেই আজ পূর্ব ভারতীয় সমস্যারূপে স্বীকৃত। যিহাতিত কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অশোককুমার সেনের কার্যকর প্রচেষ্টাতেই ১৯৬০ সালে আসামের শোচনীয় ঘটনার পর প্রবাসী বাঙালীদের মনে আশা, জীবনে আস্থা ফিরে এসেছিল।

অবশ্য আইনমন্ত্রী হিসেবে শ্রীসেন তার প্রধান দায়িত্বের কথা কোনোদিন বিস্মৃত হন নি। জাতির কাছে শ্রীসেনের সব প্রধান দান তার স্বহস্তে রচিত পণপ্রথা নিবারণত আইন।

আইনমন্ত্রীর উপর যখন ডাক ও তার দপ্তরেরও মন্ত্রিত্ব অর্পিত হয় তখন তিনি ডাক ও তার বিভাগের কার্যপ্রণালীতেও অনেক অভিনব সাধন করেন। ডাক ও তারের পরিবর্তে শাস্ত্রীজী যখন শ্রীসেনের উপর সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করেন—সেই দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীসেন প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির কথা স্বভাবতই এসে যায়। এ সংস্থার কথা আর কেউ-না জানুক, বাংলাদেশের বহু দরিদ্র ছাত্র, কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ এক বহু শত অনাথ মহিলার অজানা নয়। তাদের জীবন আজ এর উপরেই নির্ভর করছে।

দেশের কাছে শ্রীসেনকে পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলাধার পরিভ্রম্য করতে হয়েছে। এইত সেদিন তিনি ফিরে এলেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। ভারপর পাকিস্তানী যুদ্ধের পর শাস্ত্রীজীর বিশেষ দূত হিসেবে যেতে হল আরা থেকে দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে। এবং শাস্ত্রীজী তাসখন্দে বাওয়ার প্রধান-মন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে তিনি গেলেন লাগসে অনুষ্ঠিত রোডোশিয়া সম্পর্কিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে।

তারপরই যেন ঝড়ের গতিতে শুরু হোল পরিবর্তন। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর গঠিত হল নতুন মন্ত্রিসভা। শ্রীসেন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেও শোনা গেল তাঁকে আহবান জানানো হয়েছে লন্ডনে হাই কমিশনারের পদ গ্রহণ করতে।

সে পদের প্রার্থী তিনি নন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, আমি কোনোদিন বেকার ছিলাম না, এখনও নই, সুতরাং আমার চাকুরীপ্রার্থী হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু বাংলাদেশ অশোক সেনকে চান তাদের নেতা হিসেবে। যিনি একদিন হাজার হাজার বাঙালী কর্মচারীকে ছাঁটাই-এর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, যে অশোক সেন একদিন কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনগুলিকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা রদ করেছিলেন, বাঙালীর যে কোনো বিপদে তিনিই কাঁপিয়ে পড়েন। অশোককুমার সেন আজ আইনের পবিত্র অঙ্গনে পুনঃপ্রবেশ করলেও তার নেতৃত্ব জাতির কাছে অপরিহার্য।

মহানুভব বোনা বোনা

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

ইংরাজীতে “গ্রেট ম্যান” বলে একটি উপাধি প্রায়ই মূখে মূখে রটে। অমূল্য তমূল্যকে ঘাড়ি ঘাড়ি এই তথ্য দেওয়া হয়। বাংলায় এ-উপাধির ঠিক তজমা আছে কি? সন্দেহ। “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” বলেছে মহাভারতে। এখানে মহাজন মানে মহাভাগ বা মহাত্মা—গ্রেট ম্যান বলতে যা বোঝায় তা নয়। আইনস্টাইন বা বার্নার্ড শ নিশ্চয়ই গ্রেট ম্যান, কিন্তু মহাজন মহাপুরুষ বা মহাত্মা (সেন্ট) নন। আমি ভেবেচিন্তে “মহানুভব” উপাধি-টিই গ্রেট ম্যান-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চালু করতে চাই। এই ব্যজনায় রোলী নিশ্চয়ই মহানুভব, ওরফে গ্রেট ম্যান। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর জাঁ ক্রিস্টফ (John Christopher ইংরাজীতে) পড়ে সেই রোমাঞ্চ—১৯২০ সালে। তখন আমি কেম্ব্রিজে। তাঁর নানা লেখাই আমার ডায়েরিতে টুকে রাখতাম। জাঁ ক্রিস্টফের এক স্থলে তিনি লিখেছিলেন “আর্ট ফর আর্টস সেক!.....ওরে দুর্ভাগ্যবান দল! আর্ট হ’ল জীবনের সন্মার্ট—জীবনকে জয় করলে তবেই আর্ট সুপ্রতিষ্ঠ হয়। কী করছিস তোরা বল তো? নিজেদের

যত কুসজ্জতা, রদুনতা, ভীরু নিরুদ্যমতা, বিলাসলুপ্ততা, ইন্দ্রিয়বশ্যতা, মিথ্যা মানবতা এই সব নিয়েই তোরা খেসাতি করিস, ছি ছি!” পড়ে কী যে আনন্দ হয়েছিল কী বলব? ঝোঁকের মাথায় তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে ফেললাম—অবশ্য ইংরাজীতেই। ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজী জানেন। কিন্তু ওমা! তিনি লিখলেন ফরাসীতে যে, তিনি শুনেন বলে একটা সুইস গ্রামে আছেন, আমি গেলে সানন্দে দেখা করবেন। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটিতে রওনা হলাম সোজা সুইজল্যান্ড। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটি পত্রে পরে লিখেছিলেনঃ ঝোঁকালো মনের বালাই বিস্তর। আমি শুনেকে গিয়েই মাথায় হাত দিয়ে পড়লামঃ ওমা! রোলী ইংরাজী জানেন না, আমিও ফরাসী জানি না। তবে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন—বলতেন পরমহংস দেব! তাই তো শেষ রক্ষা হল তাঁর বোন বিদুষী মাদালিনের কৃপায়। তিনি চমৎকার ইংরাজী জানতেন। (পরে আমার একটি রাগসংগীত-ভাষণের ফরাসী তজমা করে ফ্রান্সে ছাপিয়েছিলেন) তিনি হলেন

দোভাষী ঘটকী! বেঁচে গেলাম। তাঁকে কথা দিলাম—পরের বার ফরাসীতেই আলাপ করব রোলার সঙ্গে। পরেরবার—দু বছর বাদে ১৬ই ও ১৭ই আগস্টে তাঁর সঙ্গে লন্ডনে শব্দ যে কথাবার্তা চালিয়েছিলাম তাই নয়, পিঠ পিঠ সেসব আলাপের অনু-লিপি লিখে তাঁকে পরে পাঠিয়েছিলাম ও তিনি অনুমতি দিলে (কয়েকটি স্থানে মাত্র দু-চারটি কথা বদলে বা জুড়ে) ছাপাই আমার তীর্থংকর তথ্য Among The Great-এ। সেসব কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যকও ষটে বাস্তব-নীয়ও নয়। তাই আমি বলব শব্দ, তাঁর মহানুভবতার কথা যথাসম্মত বিশদ করে। অর্থাৎ তিনি মহানুভব পদবী পাবার দাবি করতে পারেন কেন—কেন—হিসাবে। এমন কথা বলতে হবে যা আগে লিখি নি। চেষ্টা করি তো। দেখা যাক।

আমার একসময়ে মনে হ’ত কেন সব মানুষ ঠাকুরের কৃপা পায় না। কেন যদু মধু বিধু সিধু সম্মাই উচ্চ-সঙ্গীতে আনন্দ পায় না? কেন মানুষ নিচুটানে ঝাড়িয়ে চলে জেনেশুনে যে তার ফল সর্বনাশ? রোলী আমাকে



চার্লিস গোল্ডার সঙ্গে রোলী বোনা

তার নামা কথায় তথা পথে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যার মধ্যে আমি পেরেছিলাম খানিকটা অন্তত সমাধান এ জাতীয় প্রশ্নের বা সমস্যার। তার একটি বাণী ছিল এই যে, মানুষ সবাই প্রাণের হলেও সবাই কিন্তু সমান গ্রহীতা (রিসেপ্টিভ) নয়। “সামা-বাদ” বরণীয় এই হিসেবে যে, সবাইকেই বড় হবার সমান সুযোগ দেওয়া চাই—যাতে ক’রে জন্মগত বৈষম্যের কিছুটা অন্তত নিরাকৃত হয়। কিন্তু তাবলে সাম্যাবলিবাদ কদাচ সত্য নয় : যে, সব

মোকসামান্য নিগূঢ় রহস্য গুপ্রকাশ—যোগ-
গায়নায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগগণপ্রদত্ত পুঁথিধর্মোক্ত সুসংস্কৃত
কণ্ড অক্ষরে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ
সংস্কৃত পরিবার্জিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ
দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনার প্রকাশিত।
১। শিবসংহিতা, ২। শ্বেতাসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-
সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ঘটক-
নিরূপণম্, ৬। দত্তাশ্রমের যোগরহস্যম্,
৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুপ্রাপ্য
স্বাতন্ত্র্যীয় যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে
সকল গৃহ্য সাধনভিত্তি এতদিন হিমালয়ের
নিভৃত গহ্বায় নিহিত ছিল—যে সকল মহা-
শূন্যের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—
অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন কীর্ণ, নানা
রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি,
একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনার
জাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু, সন্তান আবার
আর্যগণের বলবর্ষ, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধি-
কায়ী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-
সংগ্রামে সাক্ষ্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনার
আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ
দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম,
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৃতি,
শৃদ্ধি, শৌচাচার, সৌভাগ্য, অবগতি, মনঃ-
শৃদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশৃদ্ধি প্রভৃতি সকল
প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—
দর্শনে আত্মার সহিত পরমাশ্রমের সংযোগ
সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গল-
নিলয় দেবদেবের মহাদেব উপাসিত—সিদ্ধি-
ভাগিন্য অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—
সাধনায় যোগের অতল বিভূতিলাভ সম্ভব
হইবে। তুলসী কাগজে সুন্দর নিভুলভাবে
মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য :
তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড :
১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মানুষই সমান। তা হ’লেই পারে না।
রোলী লিখেছিলেন আমাকে যে, ভারত-
বর্ষের গভীর প্রজ্ঞা জানে বরাবরই যে
“মানুষ জন্মায় নানা স্তরের চেতনা
নিম্নে। প্রতিভা ও শক্তির সহজাত কবচ
কুণ্ডল নিয়ে জন্মায় মাত্র দুচারজন
মহানুভব। কিন্তু”—বলতেন তিনি,
চিঠিতেও লিখেছিলেন একথা—“মহানু-
ভবেরা সামান্যদের বৃত্তিতে পারলেও
তাদের ভালোবাসলেও সামান্য যারা
তারা কোনদিনই মহানুভবদের পারবে
না বৃত্তিতে কি ভালোবাসতে।”*

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বরাবরই বল-
তেন খুব জোর দিয়েই যে, মহানুভব
হ’লে যে জন্মায় সে পরদুঃখকাতর
না হ’লেই পারে না। জোহান বয়ের-এর
“দি গ্রেট হ্যাঙ্গার” বইটির তিনি প্রভূত
সুখ্যাতি করতেন। বইটির শেষে
একটি উক্তি পড়ে আমি জোহান
বয়েরকে চিঠি লিখেছিলাম দেখা করতে
চেষ্টা, তিনি সানন্দে উত্তর দিয়েছিলেন।
উক্তিটি আজও ভুলি নি (ভাগ্যক্রমে
স্মৃতিশক্তি আমাকে আজও পথে বসায়
নি) :

“Mankind must be better
than the blind powers that
order its ways.”

উক্তিটি মহৎ যদিও খানিকটা
নাস্তিকভাষ্যময় বলব শ্বেহেতু একদল
অন্ধ শক্তির কিন্তু আমাদের জীবন
নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না, এ-সৃষ্টির
পিছনে একটি মহৎ অভিপ্রায় সক্রিয়
হ’লে এসেছে চিরকালই। শ্রীঅরবিন্দের
ভাষায় :

The world was not built with
random bricks of chance.
A blind God is not destiny’s
architect

There is a meaning in each
curve and line
রচিত হরনি বিশ্ব মিথ্যা আকস্মিক
উপাদানে।
এক অন্ধ ধাতা নয় নিয়ন্ত্রিত স্থপতি
ধরায়

* Ils peuvent comprendre
cette foule. Ils peuvent meme
(ils doivent) l’amier, Mais
cette foule ne les comprendra
jamais, ne les aimera jamais
pour ce qu’ils sont... La pro-
fonde sagesse de l’Inde a su
voir, depuis longtemps, que
tous les hommes ne naissent
pas are meme age”.

প্রতি রক্ত রেখা ওতপ্রোত এক মহা
ব্যক্তনার।

কিন্তু আমরা তো পাই নি
সে পূর্ণ দৃষ্টি যে দেখতে পার এই
মহাব্যক্তনা। তাই মহানুভব মানুষ
যুগে যুগে থেকে থেকে নাস্তিকতার
ঝান্ডা উড়িয়ে এসেছেন। জোহান
বয়ের-এর এই দর্শনে যে মানুষকে
খোদার উপর খোদাকারী করতে হবে
তাই তো রোলী সাড়া দিয়েছিলেন—
যদিও সাময়িকভাবে (কারণ তিনি
ছিলেন মনে প্রাণেই আস্তিক)
এ-উপমানটির নাম করলাম আরো
এই জন্যে যে, এ-দৃষ্টিভাঙ্গ গড়পড়তা
মানুষের নয়। মহানুভবতায় যার
অধিকার সে ছাড়া কেউ সত্যি পরের
দুঃখে কাদতে পারে না—আরো বড় কথা
মহত্ত্ব দেখে অশ্রু করতে পারে না—
মহানুভব বিজ্ঞেন্দ্রলালের ভাষায় :

“পরের দুঃখে কাদতে পারা
তাহাই ভবে চরম নয়
মহৎ দেখে কাদতে শেখা
তবেই কাদা ধনা হয়

রোলীর মধ্যে ছিল এ-দুই কাগজি
পাশাপাশি। আমাকে তিনি লিখেছিলেন
একটি পত্রে (এ-চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর
পরে তাঁর ডায়েরিতে ছাপা হয়)

“Il nous faut immediate-
ment courir a l’aide des
opprime’s—hommes et peuples
—qui ne peuvent attendre.
Nous ne reconnaissons pas le
droit de distraire un seul in-
stant de l’action presente...
mon premier devoir de bate-
lier est, sur ces flots, de
sauver ceux qui s’y noient, ou
pe’rir avec eux.”

অর্থাৎ “যারা অত্যাচারে ক্রিষ্ট—
মানুষই হোক বা সমগ্র জাতিই হোক—
তাদের সাহায্য করতে আমাকে ছুটেতে
হবেই হবে—তর সন্ন না আমার। আমার
পক্ষে দুর্গতদের সাহায্যে বিরত থাকা
সম্ভব নয়—নিশ্চেষ্ট থাকার অধিকারই
নেই আমার। আমি যে মাঝি, নৌকার
টল সামলাতেই হবে যে ক’রে পারি
যাত্রীদের বাঁচাতে, না পারি যদি মরব
সেও ভালো কিন্তু হাল ছাড়ব না
কিছুতেই।”

এ চিঠিটির প্রথমার্ধ তীর্থংকর-এর
ভূতীয় সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা
হয়েছে। কিন্তু এ-অংশটি ছাপাই নি।
সেদিন রোলীর মূল চিঠিগুলি পড়তে
পড়তে এটি চোখে পড়ে চমকে
উঠলাম। মনে হ’ল—এটাই তো তাঁর

জীবনের একটি মূলমন্ত্ৰ ছিল। কেন ছাপাই নি? কারণ এতে একটি ছড়া ছিল ভগবানকে ঠেঁষ দিয়ে লেখা। তাই আজ মনে হয় — কেন ভগবানকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন? প্রীতিরবিশ্বের কাছে বারবারই কি শূন্য নি যে ভগবানকে ভুল বোঝা বা দোষ দেওয়া মানুষের মানবিকতার একটি দূরন্ত ব্যাধি? এ-ব্যাধির ফলে প্রলাপ বকতে বকতেই সে প্রলাপ তাঁর সঙ্গীত কথো-লাপের দিকে মোড় নেয়—আবহমানকাল এইই হয়ে এসেছে।

রোলান্ যে একথা বুঝতেন না তা নয়। তাঁর আর একটি পত্রে তিনি আমাদের লিখেছিলেন :

Ecoutez l'ensemble du concert : L'heure presente n'en est qu'un accord de passage—apre, riche et cruel—qui bientot va se resoudre dans la suite de la symphonie. Que chacun de nous n'ai souci de remplir exactement, sincerement, purement sa partie ! Et s'il arrive que ceux qui tiennent la partie la plus haute, ou bien la plus profonde soient meconnus par les autres, ils ne sont pas a plaindre : ils sont assez payes par la joie qu'ils eprouvent du beau chant qu'est leur lot. Qu'importe que "les autres" les jugent mal ? "Les autres" ne sont pas les juges. Le Juge est le Maitre Invisible de la symphonie.

অর্থাৎ মহান রাগমালা শূন্য এসে। আজকের দিনে যে সুর বেজে উঠেছে তা সাময়িক মাত্র, কটু, সমৃদ্ধ, নিষ্ঠুর—কিন্তু এর পরেই শূন্যে পাব বেজে উঠল সমৃদ্ধ একতান। এসে আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের ভূমিকা নির্বাহ করে চলি নিখুঁতভাবে, সরল সুরে, পবিত্র হৃদে। যারা সবচেয়ে উচ্চ পাতাকা বহন করবার ভার পেয়েছে—তাদের যদি আর সবাই ভুল বোঝে তাহলেও তাদের কৃপার মনে কোরো না। কারণ সে পতাকার ভার বহন করে তারা যে আনন্দ পেয়েছে তাতেই পেয়েছে তারা যথেষ্ট কৃতিপূরণ—কারণ তারা শূন্যে সে মধুর সঙ্গীত যা তাদের দঃখ বহন করে এনেছে। যদি আর সবাই তাদের পরে অবিচার করে তাতেই বা কি? এসব

বাইরের বিচারকদের পরে তো পরম বিচারের ভার ন্যস্ত হয় নি। পরম বিচারক কেবল একজন — তিনি এক তানের—সিমফনির শেষ নিয়ন্তা।

কী সুন্দর কথা! রোলান্ পরের দঃখে কাতর হয়ে নিয়ন্ত্রিত নামে ভগবানকে দায়ি করা তো নিছক অভিমান—যে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে রামপ্রসাদ বলোছিলেন :

‘মায়ের এমনি বিচার বটে, যে জন দিকানিশি দুর্গা বলে তার কপালেই বিপদ ঘটে।’

কোন মহানুভব মানুষ না সময়ে সময়ে ভগবানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে পুঁজি-পোলাও ঢালান দিয়েছেন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলে স্বয়ং ভক্ত-রাও কি দেন নি? হৃদয়বস্তুর একটি লক্ষণই তো এই। এও তো ঠাকুরেরই বলিয়ে নেওয়া ভক্তকে দিয়ে যে,

মায়ে গোয়ে মোকদ্দমা
বুঝা হবে রামপ্রসাদ বলে
আমি কান্ত হব যখন আমার
শান্ত করে লবে কোলে।

রোলান্ মহানুভবতার আর একটি অভিজ্ঞান তাঁর মহানুভবদের জীবনী লেখার রত গ্রহণ। এখুণে এত বড় জীবনীকার আর জন্মায় নি এক “প্রীম” ছাড়া। এ-রত তিনি উদ্‌যাপন করতে পেরেছিলেন এই জন্যই যে, যেখানেই তিনি মহত্ব দেখতেন সেখানেই নত হতে তাঁর বাধ্যত না। মাইকেল এঞ্জেলো, বীটোভেন, টেলস্টর, গান্ধী প্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—কোন মহানুভব ও মহাত্মার না তিনি গুণগান করেছেন অকুণ্ঠে? এছাড়া Musiciens d', Aujourd'hui ও Musiciens d' Autrefois ইদানীন্তন সঙ্গীতকার ও পুরাকালের সঙ্গীতকার) এ দুটি বইয়েও তিনি নানা সঙ্গীত-কারের ছবি এঁকেছেন। বলতে কি, তাঁর জীবনীগুলি সাহিত্য জগতে তাঁর অক্ষয় কীর্তিদের অন্যতম বলে গণ্য হবার দাবি রাখে। কত লেখক কত যে শিখেছে তাঁর কাছ থেকে—বিশ্বজাতিবাদ (internationalism) সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন সত্যিই মহত্বের চারা। বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে : “আমি সাধুও বুদ্ধি না, সম্যাসীও বুদ্ধি না—যেখানেই মহত্ব দেখব সেখানেই আমি যেন মাথা নোয়াতে পারি।”

বীটোভেনের জীবনীতে তিনি কী উল্লাসেই যে উদ্ভূত করেছেন জর্মন ভাষায় বীটোভেনের একটি মন্ত্রবাণী : “Musik ist hoehe

offenbarung als alle Weisheit und Philosophie—অর্থাৎ, সঙ্গীতের মাধ্যমে নামে যে-আলো তার দীপ্তি সব প্রজ্ঞা ও দর্শনকে ছাড়িয়ে যায়। বীটোভেনের সঙ্গীতকে তিনি ভালবাসতেন আরো এই জন্যই যে সে-সঙ্গীত তাঁর হৃদয়কে খুলে ধরত মহত্বের পানে, আলোর অভিমুখে। জীবনের তীর্থযাত্রায় রোলান্ পরম পাথের ছিল এই মহত্বের অনুরক্তি, পরার্থনিষ্ঠার বেদনায় মহানন্দ, সর্বোপরি অনুভবের তুঙ্গতা। তাই তাঁকে আজ নমস্কার করি। ২৯-এ জানুয়ারী—শতকর্ষ আগে তিনি ক্লামেন্সি (Clamency Nivre-এ) জন্মেছিলেন (২৯।১।১৮৬৬)। জয় হোক তাঁর মহানুভবতার মহান আদর্শের!

রূপার বই

প্রবন্ধ—

বিবাহ-সামনা—শচীন্দ্র মজুমদার

০.০০

জন্মের ঘরের আশেপাশে

—[নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত]

—ডঃ তারকমোহন দাস।

ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথ বসু,

জাতীয় অধ্যাপক

৫.০০

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস

—ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

৬.০০

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল

—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

৬.০০

সাহিত্যের কথা

—চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৬.০০

বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

৬.০০

ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন

—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.০০

চারের মৌমা—উৎপল দত্ত

৬.০০

বাংলা কাব্য প্রবাহ

—চিন্তরঞ্জন মাইতি

১০.০০

নৈরাজ্যবাদ

—ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

১০.০০

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২.০০

আমাদের পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকার জন্য
লিখুন

কী

১৫ বস্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা—১২

কল্যাণের পথিক রমা রলার

প্রমাদ রঞ্জন মেনন

ফরাসী মনীষী রমা রলার আজ একশততম জন্মবার্ষিকী। শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট এই নামটি নানা কারণে অত্যন্ত সুপরিচিত। রলার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিক্ষণীয় ছিলেন না, তিনি সমগ্র নিপীড়িত মানবজাতির কল্যাণের জন্যও ছিলেন একজন অক্লান্ত যোদ্ধা। ভারতের সঙ্গে তিনি যে আত্মিক যোগ-সূত্র স্থাপন করেছিলেন ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার জন্যও তিনি বিশেষভাবে প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট স্মরণীয়। বস্তুত রলার ভারতকে ও প্রতিটি ভারতের জনসাধারণের কল্যাণকে যেভাবে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন সে রকম উদাহরণ আর একটি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার কিছুকাল পরে রলার তাঁকে ১৯২০ সালে লিখেছিলেন, “ভারতবর্ষ আমার নিকট একটি বিদেশ ভূমি নয়। সে হচ্ছে সব থেকে মহান দেশ, সেই প্রাচীন দেশ থেকে আমিও একদিন এসেছিলাম। আমার আমি তাকে আমার অন্তরের গভীরে অনুভব করছি।”

রলার জন্মছিলেন ফ্রান্সের বারগান্ডী প্রদেশে ক্রামেসী নামক একটি শহরের একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে। রলার একজন পূর্বপুরুষ ফরাসী বিপ্লবের সময় কুখ্যাত বন্দী-দুর্গ বাস্তিল (Bastille) আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রলার জন্মের পাঁচ বৎসর পর ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে স্থাপন করেছিল পারী কমিউন। বিপ্লবের ঐতিহ্য নিয়েই রলার জীবন শুরু হয়।

রলার শিক্ষার জন্য তাঁর পিতা সশরিকারে পারী শহরে চলে আসেন এবং রলার সেখানে একটি শ্রেষ্ঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আঁরি

বেগস (Henri Bergson) এই সময়েই তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও ইরোরোপীয় সংস্কৃতি আয়ত্ত করেন। শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে গবেষণা করার জন্য একটি বৃত্তি পেলেন। ইতালীতে দুই বৎসর গবেষণা করার পর পারীতে ফিরে এসে তিনি প্রথমে একটি কলেজে ও পরে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত-ইতিহাসের অধ্যাপক হলেন।

এই যুগের ফরাসী দেশের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। “সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার” বাণী নিয়ে যে মহান ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট পরাজিত হল। তারপর থেকে চলল বহুদিন ধরে বিপ্লব মার প্রতি-বিপ্লবের লড়াই এবং সর্বশেষে ঘটল ১৮৭০ সালে জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের কলঙ্কজনক পরাজয়। এই পরাজয়ের প্লানি ফরাসী জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে ফেলল। যে ফরাসী দেশ এক সময় ছিল সাহিত্য, দর্শনে, শিল্পে, রাজনীতিতে, ইরোরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র, সেখানে নৈরাশ্য, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগ-লালসা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; উচ্চাদর্শ, সমাজচিন্তার স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শনেও এই একই অবনতি।

রলার স্কুল জীবনেই তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শবাদী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করে এইবার তাঁরা কাজে নামলেন। তাঁরা Cahiers de la Quinzaine নাম দিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন জাতীয় জীবনকে আশাবাদী ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য। বহু ত্যাগ স্বীকার করে ও অনেক পরিশ্রম করে এই পত্রিকা তাঁরা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। এই সময়কার রলার প্রায় সমস্ত লেখাই

তাঁর ‘বেটহোফেন’, ‘মিকেল আঞ্জেলো’, ‘টলস্টয়’ এবং সর্বোপরি তাঁর ‘জী ক্রিসতফ’—এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অধ্যাপনার কাজ শুরু করার পর জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রলার কয়েকখানা আদর্শমূলক নাটক লিখলেন—যার প্রধান বস্তু ছিল পরাজয় থেকেই শুরু হতে পারে মানুষের নবজন্ম, ত্যাগ, বিশ্বাস ও কর্মের মধ্য দিয়ে; মানুষ মহৎ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এই নাটকগুলির আবেদন ছিল কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নিকট, তাই তিনি জনসাধারণের নিকট পৌঁছতে পারলেন না। রলার অনেক দিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসই ছিল যে মনীষীদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণ চালিত হয়, তাঁদেরই চিন্তাধারা ক্রমশ ব্যাপ্ত হয়ে মানুষকে উদ্বেগ করে। অবশ্য পরবর্তীকালে রলার এই বিশ্বাসের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।

জনসাধারণের নিকট পৌঁছবার জন্য রলার তারপর শুরু করলেন গণনাট্য (People's Theatre) আন্দোলন ও তার জন্য লিখলেন ফরাসী বিপ্লবকে বিষয়বস্তু করে 14th July, Danton, Robespierre ইত্যাদি নাটক। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রচেষ্টা তা ব্যর্থ হল। রলার বুদ্ধিতে পারলেন যে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে তাঁকে আরও কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে বিহর্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে ইরোরোপীয় আত্মার অন্বেষণে এক গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন এবং দশ বৎসর এইভাবে কাটালেন। রলার এ সাধনা বৈরাগ্যের সাধনা নয়, চিন্তার সংগ্রামের সাধনা।

এই সাধনার ফলস্বরূপ মানব জাতি লাভ করল উপরি-উক্ত বীরা জীবনীমালা এবং “জী ক্রিসতফ”

জাঁ ক্রিস্তফ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশ্বয়কর ঘটনা। জাঁ ক্রিস্তফ লেখার পূর্বে রলাঁ একরকম অপরিচিত ছিলেন বললেই চলে। ১৯২২ সালে যখন এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হল তখন এক মূহুর্তে রলাঁ জগৎবিখ্যাত হয়ে পড়লেন। সমস্ত ইয়োরোপীয় ভাষায় তখনই তার অনুবাদ হল। সকল ইয়োরোপীয়রাই দেখতে পেল এই জাঁ ক্রিস্তফের দর্পণে তাদের নিজেদের জীবন সংগ্রামের দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা।

জাঁ ক্রিস্তফ চিন্তার উপন্যাস। মানবের চিন্তার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দেড় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এত বৃহৎ ও এত হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস লেখা চলে তা রলাঁ পূর্বে অন্য কোনো লেখক সম্পনাও করতে পারেন নি। জাঁ ক্রিস্তফকে রলাঁ বলেছিলেন ইয়োরোপের আত্মা এবং রলাঁর মতে আত্মা হচ্ছে মন ও হৃদয়ের সংযোগ। বস্তুত জাঁ ক্রিস্তফ হচ্ছে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সারমর্ম। মানবতাবাদী ঐক্যই হচ্ছে তার ভিত্তি। জাঁ ক্রিস্তফ জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ও অলিভিয়ে ফরাসী লেখক—এই দু'জনের আত্মিক বন্ধুত্ব

ও ঐক্যকে কেন্দ্র করে অনেকা, জাতি-বিশ্বেষ, অকল্যাণ, লোভ ও হিংসার চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবি সভ্যতাকে জাঁ ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। ইয়োরোপের সব দেশের মানবই উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং পরস্পরকে দেশপ্রেমের নামে হত্যা করতে শুরু করে দিল। এমন কি যে-সব লেখক ও মনীষীরা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও জাতি-বিশ্বেষের বিরুদ্ধে মানবতাবাদের উচ্চ আদর্শের কথা এতদিন ধরে প্রচার করে এসেছিলেন, তাঁরাও উগ্র স্বদেশিকতার বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রলাঁকে একেবারে এককভাবে এক মহাপরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হল।

রলাঁ কোনো লোভ, কোনো দুর্বলতা, কোনো তথাকথিত জনমতের নিকট মাথা অবনত করলেন না। সমস্ত বুদ্ধিজীবি জগতের বিরুদ্ধে রলাঁ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। সমস্ত বিপদ ও ভীতিপ্রদর্শনকে উপেক্ষা কবে

তিনি লিখলেন—Au dessus de La Melee—“যুদ্ধের উর্ধ্ব”। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তীর ভাষায় নিন্দা করলেন এবং সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান করলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। সংবাদপত্রগুলি চিৎকার করে উঠল, তাঁকে গালাগালি দিতে লাগল দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, ইত্যাদি বলে। বইয়ের দোকানগুলি তাঁর বইও বিক্রি করা বন্ধ করে দিল। রক্তমণ্ডল থেকে তাঁর নাটকগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হল। এর পূর্বে সোসিয়ালিস্ট নেতা জাঁ জোরেস যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। রলাঁর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ল।

কিন্তু যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতার ফলে এবং তার প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধিতে পারার ফলে অনেকেই ধীরে ধীরে রলাঁর পতাকাতে সমবেত হতে লাগলেন। যুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সালে রলাঁ পুনরায় এক “মানবজাতির স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী” প্রচার করলেন এবং সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ জাতিপ্রেম ও হিংসাবোধের উর্ধ্ব উঠে মিলিত হতে আহ্বান জানালেন। সব দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, লেখক, বিজ্ঞানীরা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভারতের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন।

এই সময় থেকেই গড়ে ওঠে রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—যা ভারতের কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন ফ্যাসিস্টদের প্ররোচনায় ইতালী ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং মুসোলিনির ছলচাতুরীতে মূগ্ধ হয়ে বিপথে চালিত হতে যাচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই আত্মিক সংকটের সময় রলাঁর অসাধারণ ধৈর্য ও প্রচেষ্টার ফলে রবীন্দ্রনাথের সুনাম রক্ষা পেয়েছিল।

যুদ্ধের কিছুকাল পরে রলাঁ গান্ধী ও তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, যে-আত্মিক শক্তির তিনি এতদিন ধরে অন্বেষণ করছিলেন তা গান্ধীর মধ্যেই সমাবেশ হয়েছে। গান্ধীর অহিংসাবাদ শব্দ ভারতবাসীরই নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তিসংগ্রামে একটা নতুন পথ দেখিয়ে দেবে এই ছিল রলাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর বিখ্যাত “গান্ধী” পুস্তকে তিনি সেই কথাই ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীকে ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলিষ্ট ইয়োরোপে জনপরিচয়



রলাঁ রলাঁ

করে তুলেছিলেন। সেই সময় থেকেই রলা ভারতের সংগ্রামকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমর্থন করে গিয়েছেন।

রলা শ্রদ্ধা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য থাকেন নি। ভারতের নৈতিক ও আর্থিক শক্তির সম্মানে এসে তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন বহু যুগ-যুগান্তরের নিষ্করতার পর ভারত-বাসীর নবজাগরণ ও কর্মোদ্যম। বিশেষ করে বিবেকানন্দের মধ্যে রলা বিশ্বাস করে চেষ্টা করেছিলেন ভারতের নৈতিক শক্তি ও কর্মপ্রেরণার সমন্বয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার সমন্বয়ও বটে। এই চিন্তাধারা নিয়েই রলা লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত “রামকৃষ্ণ” ও “বিবেকানন্দ”।

রলা কোনো ব্যাপারেই অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না, সব কিছুই যুক্তি-বিচার দিয়ে পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন। তা ছাড়া, সব রকমের জাতীয় দম্ভ এমন কি আধ্যাত্মিক দম্ভও তাঁর নিকট অসহ্য ছিল। “রামকৃষ্ণ”, “বিবেকানন্দ” লেখার সময় বেলুড় মঠের ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীদের সঙ্গে রলার অনেক চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। এই রকম একটি চিঠিতে—“প্রবৃদ্ধ ভারতের” সম্পাদক ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতাবাদের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে আরও অনেকে রলার নিকট দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন। রলা তাঁর জবাবে অশোকানন্দকে যা লিখেছিলেন তা খুবই প্রণয়নযোগ্য।

রলা বলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতাবাদই হোক, আর যে কোনো বাদই হোক না কেন, তা কোনো একটি বিশিষ্ট জাতির একচেটিয়া নয়; প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতিতে এবং খৃস্টধর্মের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপেও আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল ও বংশপরম্পরায় সেই বিশ্বাসের দ্বারা অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। “এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপ শ্রেষ্ঠ এশিয়ারই সমান। মানব প্রকৃতির অভিন্ন ভিত্তিই হচ্ছে এই সাদৃশ্যের কারণ। আমি যখন কোনো ভারতীয় শাস্ত্র পাঠ করি তখনই আমার মনে এই চিন্তা আসে যে, আমি একটা নতুন চিন্তা আবিষ্কার করছি না, বেন সেই চিন্তা আমার নিজের চিন্তার মধ্যেই গোপন ছিল, যেন আদিম কাল থেকে আমার মনের মধ্যে কোথাও ছিল। এইসব চিন্তা-গুলিকে একটা বাছাই-করা জাতির মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের গুটিকতক বীজ এরূপ চিন্তা করলে শাস্বত ঐশ্বরিক শক্তিকে হেয় করা হয়। শাস্বত সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রেই তার বীজ মুক্তহস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই এই বীজ অঙ্কুরিত নাও হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়, কোনো ক্ষেত্রে নিদ্রিত থাকে, কিন্তু বীজ সর্বত্রই থাকে এবং পর্যায়ক্রমে যা সুপ্ত থাকে তা জাগ্রত হয়ে ওঠে, যা জাগ্রত থাকে তা সুপ্ত হয়ে পড়ে। একটি লোক থেকে আর একটি লোকে, একটি জাতি থেকে আর একটি জাতিতে চিন্তা সব সময়ই গতিশীল। কোনো ব্যক্তি, কোনো জাতি তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। চিন্তা হচ্ছে প্রত্যেক

মানুষের মধ্যে শাস্বত জীবনের অগ্নিশিখা—একই অগ্নিশিখা। আমাদের জীবনের কাজ তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখা।” (Inde, p. 186)

কিন্তু রলা এক স্থানে কোনো দিনই থেমে থাকেন নি। জাঁ কিস্তফর যুন্সের পর “বিমুগ্ধ আত্মার” (L'Âme Echantée) আনন্দের মধ্যে নবজীবন লাভ করে বর্তমান যুগের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী পার হয়ে তিনি ভারতের সাধারণ মানুষের শোষণহীন নতুন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের সংগ্রামকে আপন করে নিয়েছিলেন।

ইয়োরোপের বৃদ্ধ ও ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলনে বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কি ভাবে তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, তার জীবন্ত সাক্ষ্য “শিল্পীর নবজন্ম” (I Will Not Rest)। সর্বত্রই ফ্যাসীবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠত। দুনিয়াব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে নবযুগ সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল রলা শেষ জীবনে মানব জাতির সেই ভবিষ্যৎকে আপন করে নিয়েছিলেন। রলা তাঁর দীর্ঘ-জীবনে অনেক চিন্তা ও কর্মের সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। রলার এই চিন্তার সংগ্রাম মানব জাতির ইতিহাসে অতুল্য দুলভ। কালান্তরের এই অবিস্মার্ত পথিককে ভারতবাসী আজ স্মরণ করে গর্ব অনুভব করে।



আমরা সবাই ভারতীয়
আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজ এক হোক

DA 65/P 2 Bengali



শীঘ্র ভিয়েতনামের একটি ভিয়েতকং-অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্কিন সৈন্যদের হেলিকপ্টারযোগে নামতে দেখা যাচ্ছে

ফ্রান্স:

মরক্কোর বামপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতা মেহদী বেন বারকার হত্যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ফ্রান্স আজ দ্য গল শাসনের সমালোচনার মুখর। দ্য গলের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের বোম্বসাজসে খাস প্যারিসে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ফ্রান্স ও মরক্কোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেরও গুরুতর অবনতি ঘটেছে।

মেহদী বেন বারকা মরক্কোর বিশিষ্ট নেতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পপুলার ফোরসেস' দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী বলেও বেন বারকার খ্যাত আছে। বেন বারকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ইউরোপের বহু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক আছেন। মরক্কোর বর্তমান রাজা শ্বিতীয় হাসান নিজে বেন বারকার ছাত্র। তবু বেন বারকা রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। ছ' বছর পূর্বে বেন বারকা দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে দু'বার তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছিল, বেন বারকা স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন। রাজা হাসান সকল রাজদ্রোহীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করছেন। বেন বারকা দেশে ফিরে এলে রাজার সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া সম্ভব হবে বলে অনেকেই মনে করছিলেন।

বামপন্থী, প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রী বেন বারকা দেশে ফিরে আসুন এবং রাজার

সঙ্গে তাঁর মিলন হোক, মরক্কোর দক্ষিণ-পশ্চীম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ উফকিরের তা একেবারেই পছন্দ নয়। তাই উফকির অত্যন্ত গোপনে বেন বারকাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন।

উফকিরের এই ষড়যন্ত্রে ভাড়াটে ফরাসী গুপ্তা ছাড়াও ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ 'এস ডি ই সি ই' ও ফরাসী পুলিশ বিভাগের লোকজন, এমন কি দ্য গল পন্থী আইন-সভা সদস্য পর্যন্ত লিপ্ত ছিলেন বলে চাঞ্চল্যের সংবাদ পাওয়া গেছে।

বেন বারকার রহস্যময় অন্তর্ধান ও পরবর্তী মৃত্যুকাহিনী রহস্যময় ঢাকা থাকত, যদি না জর্জেস ফিগন নামে এই হত্যাকাণ্ডের একজন ফরাসী চক্রান্তকারী সব ঘটনা ফাঁস করে বিভিন্ন পত্রিকার প্রবন্ধ লিখতেন। 'মিনিউট' ও 'লা এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ফিগনের প্রবন্ধ প্রকাশের পর সব ঘটনা জনাজানি হয়েছে, এবং বেন বারকার মৃত্যু-

কাহিনী ফ্রান্সের বড় বড় মের রাজনৈতিক কেলেকারীতে পরিণত হয়েছে।

ঘটনার বিরূপে প্রকাশ, ২৯শে অক্টোবর প্যারিসের বিখ্যাত হোটেল 'ব্রাসেরি লিপে' বেন বারকা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আসেন। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বেন বারকাকে ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ 'এস ডি ই সি ই'র একজন কর্মচারী ও দু'জন ফরাসী পুলিশ জোর করে একটি গাড়িতে তোলে এবং শহরতলীর 'ফনতেন-লে-ভিকমতে' অঞ্চলে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। পরদিন মহম্মদ উফকির বিমানে করে সোজা রাবাত থেকে প্যারিসে আসেন এবং নিজের হাতে ছুরি দিয়ে বেন বারকাকে হত্যা করেন। ফিগন নিজে এই হত্যার সাক্ষী। হত্যার পর উফকির জেনেভা চলে যান এবং সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে অব্যবহৃত প্যারিস ফিরে আসেন।

কেবল যে 'এস ডি ই সি ই'র এক



উফকির

বেন বারকা

ফিগন

জন কর্মচারী ও দু'জন পুলিশ বেন বারকার গুম খুনের জন্য দায়ী ভাই নর, গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগের আরও অনেকে এক 'এয়ার ফ্রান্সের' কয়েকজন কর্মচারীও এই ঘটনা জানে। হত্যার পরও তারা ইচ্ছা করেই কোন ব্যক্তি গ্রহণ করে নি। জর্জেস ফিগন কতৃক সব ঘটনা ফাঁস করে দেবার পর পুলিশ ভয়পূর্ণ হয়ে ছুটি ছুটি করেছে। ফিগনকে ধাক্কা জনা তারা চেষ্টা করে। কিন্তু ধরা পড়বার আগেই ফিগন আত্মহত্যা করেন। অনেকের মধ্যে পুলিশের লোকেরাই ফিগনকে গুলী করে মেরে ফেলেছে, আরও খবর বাত্রে প্রকাশ হবে না পড়ে, তার জন্য।

ফ্রান্সের সমগ্র সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দল একবারে এই ঘটনার জন্য ফরাসী পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের আচরণের সমালোচনা করেছে। দেশের শাসনব্যবস্থার দুর্নীতির এক বড় দৃষ্টান্তে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দা গল শাসনের বিরুদ্ধে বিবোধীরা এই ঘটনাকে বড় রকমের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দা গলের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস মিতেরা ও জা লেকনে সরকারের সমালোচনা করে বিবর্তিত দিয়েছেন। ২৫শে জানুয়ারী বিরোধী দলগুলি প্যারিসে এক সম্মিলিত সভা করে ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছে।

বেন বারকার অন্তর্ধান ও হত্যার সংগে

ফরাসী পুলিশের লোক যত থাকার সম্বন্ধে দা গল অত্যন্ত বিচলিত ও জ্বলন্ত হয়েছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে তিনি নিজের এক নিম্না করেছেন এবং গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বরখাস্ত করেছেন। বেন বারকার গুম খুন সম্পর্কে প্যারিসের বিচার সূত্র হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সংগে অভিব্যক্তিতে মরক্কোর মরায়মন্ত্রী মহম্মদ উফকির ও তাঁর অপর দু'জন সহকর্মীকে প্রেসতারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রেসতারী পরোয়ানা বের করা হয়েছে। অন্তত উফকিরই এই হত্যার আসল আসামী, কিংবা এ কথা প্রমাণ হলেও ফ্রান্সের সম্মান কিছুটা বাঁচে। কয়েকজন ফরাসী পুলিশ ও অন্য লোকেরা নেহাৎ টাকার লোভে হত্যার চক্রান্তে যোগ দিয়েছে, একথা বলা বাবে। তা না হলে ফরাসী সরকারও হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িয়ে পড়বে।

মরক্কোর রাজর কাছে দাবি জানানো হয়েছে, উফকিরকে বিচারের জন্য ফরাসী পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হোক। রাজা হাসান খুবই মশাকিলে পড়েছেন। ফ্রান্সের এই অনুরোধ রক্ষা না করলে ফ্রান্সের সংগে মরক্কোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ ফরাসী মরক্কোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ ফরাসী অর্থসাহায্য আসছে, তাও বন্ধ হবে। কিন্তু যদি আবার রাজা উফকিরকে ফরাসীদের হাতে

তুলে দেবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁর নিজের সিংহাসনই হরডো বিপন্ন হবে। দেশের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর ওপর উফকিরের প্রভাব খুবই বেশি। উফকির হয়তো রাজাকে সরিয়ে নিজেই সব ক্ষমতা দখল করে বসবেন। বারকা হত্যাকাণ্ড ও উফকিরের প্রেসতারী পরোয়ানার প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে অবনতি ঘটেছে। রাজা হাসান তাঁর প্যারিস শ্রুতজ্ঞা সফর বাতিল করে দিয়েছেন। ফ্রান্স ও মরক্কো দুই দেশই রাবাত ও প্যারিস থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরিয়ে এনেছে। মরক্কোবাসীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে যে, বেন বারকার মৃত্যুর জন্য ফরাসীরাই দায়ী। প্রতিশোধস্বরূপ মরক্কোর সকল ফরাসী পুঁজি বাজেরাণ্ডের দাবি উঠেছে। এদিকে আবার আলজিয়ারের ছাত্ররা মরক্কো দূতাবাসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, উফকির কতৃক বারকারে হত্যার প্রতিবাদে।

বারকা হত্যাকাণ্ডে ফ্রান্স ও মরক্কোর আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং এই দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

পাকিস্তান:

তাসখন্দ ঘোষণা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন মৈত্রী সম্পর্কের শুরুর সূচনা



পাকিস্তানে তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ

করেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত ভারতের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার তাসখল ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দুই দেশের সেনাপ্রধানায়কের বৈঠকে সৈন্যপসারণ সম্পর্কেও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্প্রদায় সম্পর্কে যখন নতুন করে আশার সঞ্চার হচ্ছিল, তখন পাকিস্তানী নেতাদের বিভিন্ন উক্তি রীতিমত আশংকার সৃষ্টি করছে।

অবশ্য তাসখল ঘোষণার পর থেকেই পাকিস্তানে জনসাধারণের একাংশ এই ঘোষণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে আসছে। ছাত্ররা বিভিন্ন স্থানে এই উপলক্ষে দাফা-হাঙ্গামাও করেছে। যথিকাংশ বিরোধী দল এই ঘোষণার স্বাক্ষরদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেছে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতেও বিভিন্ন দল তাসখল ঘোষণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। শ্রীমতী ফতেমা জিন্নার সমালোচনাতোও বিস্মিত হবার কারণ নেই। সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন বই কি।

কিন্তু স্বয়ং আবু বখীর কথাকে তো উপেক্ষা করা যায় না। তিনি তাসখল ঘোষণার যে ব্যাখ্যা করছেন, তাতে ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে।

আবু বখী বলেছেন, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তান ভারতকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি। তাসখল ঘোষণার ফলে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তান তার পূর্ব অবস্থা থেকে এক পাও



জনাব জনাব



আবু বখী

পরে আসে দি। স্বয়ং এখন কাশ্মীরের দাবি আদায় করা সহজ হ'ল।

এর পূর্বে পাকিস্তানী সরকারের সুখপাত্রের ভাষা বলে যা প্রচারিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। সুতরাং পাকিস্তান ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, এবং ভারত-পাকিস্তান বিরোধের প্রশ্নে বলপ্রয়োগ করবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কাশ্মীর সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়।

এই বক্তব্যের সহজ অর্থ এই মীড়ায় যে, পাকিস্তান যে কোন সময় আবার কাশ্মীরে হানাদ প্রেরণ করতে পারে, কারণ কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তর নয়, এবং ইচ্ছা করলে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণও করতে পারে—কাশ্মীর প্রশ্ন ভারত-পাক বিরোধ নয়, সুতরাং এখানে বল-প্রয়োগে বাধা কি?

তাসখল ঘোষণার কালি তোকোবার আগেই আবু বখী কাশ্মীরের পুরোনো জিগীর তুলেছেন। এই নড়ে যদি তাঁদের ভাষ্যমত তাসখল চুক্তি পালনের চেষ্টা হয়, তবে ভারতের অবস্থা কি হবে? ছাড়া পীর আর কারগিল ভারত ছেড়ে আসবে কোন ভরসায়?

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে তাসখল ঘোষণার প্রকৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা করা উচিত, এবং উভয় পক্ষের সুখপাত্রদের একই রূপ অর্থ প্রচার করা প্রয়োজন।

ভিয়েৎনাম!

বড়দিন উপলক্ষে শাকিন বজরাই উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর এক বাসেরও বেশি বোমাবর্ষণ শুরু রেখেছে। কিন্তু এখন আবার এই বোমাবর্ষণ শুরু করার কথা উঠেছে। শাকিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি. জনসন ওয়ালিংটনে তাঁর তিনটি সহকর্মী ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন। তারা নতুন করে বোমাবর্ষণ করার পক্ষপাতী তাদের মধ্যে শাকিন শান্তি প্রদানে বিশেষ কোন লাভ পাওয়া যায় নি। এ-অবস্থার যদিছার নিদর্শনস্বরূপ বোমাবর্ষণ বন্ধ রেখে লাভ কি? আর যুদ্ধের হারাট স্বয়ং সমস্যার সমাধান করতে হবে তখন দেখি করা যাবেই হলে কমিউনিস্টদের জুখোপ করে দেয়া। তাছাড়া শাকিন শান্তি প্রদানকে বিরোধীরা দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করছে। শাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে সত্যি দুর্বলবোধ করছে না সে কথা প্রমাণ করার জন্য আবার হানাদে বোমার ফেলার দরকার। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চাপ দিচ্ছে শাকিনী কর্তাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করার জন্য।

শাকিন বজরাইয়ের সাধারণ অনেক রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্বী ছাড়াও জনসমূহের উপদেষ্টাদের মধ্যেও অনেকে বোমাবর্ষণ শুরু করার পক্ষপাতী নন। বটেন, জাপান, ফ্রান্স, এবং কয়েকটি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও শাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ দিচ্ছে, এখনই বোমাবর্ষণ শুরু না করার জন্য। তাদের মধ্যে শান্তির বর্তমান প্রয়াস আবার চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই হুহুর্তে কোন ফল না পাওয়া গেলেও



হো চি মিন

ভাষ্যে সাবার আশা আছে। নতুন করে বোমাবর্ষণের ফলে এই আশা নষ্ট হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ভিয়েতকং গেরিলাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান পূর্ণাঙ্গায়ে চালিয়ে যাচ্ছে। ভিয়েতকংদের শায়েস্তা করার জন্য নতুন করে সৈন্য আমদানীও করেছে। তবু উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ রেখে শান্তির পথকে যে অন্তত কিছুটাও খোলা রেখেছে।

উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি ভং হো চি-মিন সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি-মণ্ডলীর সভাপতি পদগ্ৰহণ এবং আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, ভিয়েতকংদের রাজনৈতিক সংগঠন ভিয়েতনাম নিবারণন ফ্রন্টের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না করলে কোন মীমাংসা হবে না। এই সঙ্গে হো চি-মিন মার্কিন সৈন্যদের ভিয়েতনাম থেকে অপসারণও দাবি করেছেন।

অবিলম্বে মার্কিন সৈন্যের অপসারণ না হলেও ভিয়েতকংদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী আছে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। স্ততরাং উত্তর পক্ষে এখনও যথেষ্ট ইতস্তত ভাব থাকলেও, উপযুক্ত মধ্যস্থতের সাহায্য পাওয়া গেলে মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উত্তর ভিয়েতনাম পূর্বের উগ্র আপোষ বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করেছে বলেই মনে হয়। সম্মানজনক মীমাংসায় ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতাদের রাজী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মাইকেল গটফ্রাট বলেছেন, শান্তির প্রশ্নে উত্তর ভিয়েতনামের নেতারা দ্বিধা বিভক্ত। অন্তত একটা অংশও শান্তির জন্য আগ্রহী, এ নিশ্চয়ই আশার কথা।

বুটেন:

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এগুনে আয়োজিত এক ভোজসভায় বুটেনের প্রধানমন্ত্রী হারল্ড উইলসন ও বিরোধী দলনেতা এডওয়ার্ড হিথ উভয়েই ভারতের প্রতি তাঁদের বন্ধুত্বের কথা বলেছেন, এবং ভারতের উন্নতিব জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু দেশের রাজনীতিতে ঠিক এই মুহূর্তে উইলসন বা হিথ কারও অবস্থাই বর সুবিধার নয়। রোডেশিয়ার প্রশ্নে উইলসন এখনও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। শ্রমিক দলের বহু সদস্যই এই ব্যাপারে তাঁর নিক্ষিপ্ততার জন্য ক্ষুব্ধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুটির মূল্য বৃদ্ধি, মজুরী সঙ্কট, গ্যাসের স্বল্পতা, বিদ্যুৎ

সরবরাহে ত্রুটি প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে শ্রমিক দলের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। সাম্প্রতিক 'গ্যালপ পোলে' দেখা গেছে, নির্বাচনে বিরোধী রক্ষণশীল দলের চেয়ে শ্রমিক দলের মাত্র শতকরা ৪১/২ ভোট বেশি পাবার সম্ভাবনা। এত কম ভোটের ব্যবধানের ভবিষ্যদ্বাণী মোটেই আশাপ্ৰসন্ন নয়। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, হাল কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রমিক দল তাদের পূর্ব আগমন অব্যাহত রাখতে পারবে না। তাই হালের নির্বাচনে জয়লাভে উন্নতি হলে শ্রমিক দলের অনেকেই দাবি করছেন, এখনই সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু হ্যারল্ড



এডওয়ার্ড হিথ

উইলসন বর্তমানে নির্বাচনের ঝুঁকি নেবেন বলে মনে হয় না।

আলেকজান্ডার ডগলাস-হিউস রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বপদ থেকে অবসর গ্রহণের পর অনেকেই ভাষা করেছিলেন, নতুন নেতা এডওয়ার্ড হিথ রক্ষণশীল দলের গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবেন। মাত্র একটি-দু'টি ভোটের ব্যবধানে কোন রকমে টিকে থাকা উইলসন সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলে হিথ উইলসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন এবং জনসাধারণের সমুখে আবার রক্ষণশীল দলের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতা ও সাধারণ সদস্যরা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন। হিথের আক্রমণ মোটেই ধারালো নয়। দলের প্রথম সারির নেতারা আজ প্রকাশ্যে হিথের সমালোচনা শুরু করেছেন। হিথের ছায়া মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এনক

পাওয়েল হিথের প্রধান সমালোচক। সম্প্রতি ছায়া মন্ত্রিসভার উপনিবেশ সচিব অ্যান্ড্রাস মন্ড 'শ্বেকটের' পত্রিকায় বিরোধী দল রূপে রক্ষণশীল দলের বর্তমান কার্যকলাপের সমালোচনা করায় হিথের সঙ্গে তাঁর তীব্র মনোমালিন্য হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত মন্ড হিথের ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন।

রোডেশিয়ার প্রশ্নেও রক্ষণশীল দলের সদস্যরা বহুবিভক্ত। এই অবস্থায় রক্ষণশীল দল জনসাধারণের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার করতে পারছে না।

নির্বাচনের পূর্বে হিথের পরিবর্তে রক্ষণশীল দল অন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করবে বলেও মনে হয় না।

জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী

পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-সম্ভব, নীতিকুসুমাজলি, কাকী-কাবেরী, কবির জীবনী ৭খানি একত্রে ২০০।

গ্রাম্যাকাঙ্ক্ষ তর্কপকানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

(নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও

পরমাত্র নিরূপণ)

মূল্য এক টাকা

সঙ্গীত-সুধাকর

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিল্লী

বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দুস্বর্গের ইতিহাস—সঙ্গীত-সাধন—বিষ্ণুপুরের বাদকগণ—অভিনয়—কাব্য-সাধনা—কথক-পরিচয়—বাইজী সম্প্রদায়—ভৃগুমারী ও শিল্পীগণের জীবন-সাধনার সহিত—ভারত-বিখ্যাত গায়কগণের লোক-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সমূহের স্বরলিপির অপূর্ণী সংকলন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কীর্তি-সম্পদ চিত্রে প্রদর্শিত।

মূল্য—১০।

পুরাতন চিরনূতন মণিমঞ্জরী

সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিবরণিত—হুমায়ূন পাঁচাল নন্দা বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রের—আলালের ঘরের দুলাল—পুণ্যকীর্তি স্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর প্রণীত—জাতিবিলাস।

একত্রে ৩ টাকা মাত্র

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, নিগনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলি-১২



সত্যসন্ধানী রম্যা রলাঁ

বন্ধু ফ্রাঙ্ক হারিসের লেখা নিজের জীবনী সম্পর্কে বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, "It is like a horse caught in a camera in the act of galloping" অর্থাৎ এ জীবনী তথ্যানিষ্ঠ, কিন্তু গতানিষ্ঠ নয়। আজ বিশ বছর হলো রম্যা রলাঁর মৃত্যু হয়েছে, বেঁচে থাকলে হয়ত তিনি নিজেরই আপত্তি করতেন যেভাবে এদেশের কিছু তথ্যানিষ্ঠ রলাঁ-অনুগামী তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করছেন। গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরিতকার ভাববাদী সাধকরূপেই তাঁরা রলাঁকে দেখতে ও দেখাতে চাইছেন। কিন্তু রলাঁ ছিলেন গতিশীল ও মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের প্রতিপক্ষে, যন্ত্রণা-অর্জরিত লোকানের একটি বিশেষ মুহূর্তে, তিনি লিখেছিলেন এসব গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে, বিশেষত রলাঁর চিন্তা ও জীবন বিকাশের ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করবেন তাঁদের কাছে। কিন্তু এগুলিকে শেষ, স্থায়ী ও চূড়ান্ত বলে ঘাড়া ধরে নিচ্ছেন তাঁরা রলাঁর স্মৃতির

প্রতি অবিচার করছেন, এই আমার ধারণা।

আজ আমাদের ভারতীয়দের পক্ষ থেকে পূর্ণ ও স্বচ্ছদৃষ্টিতে পূর্ণ ও পরিণত রলাঁকে দেখবার দিন এসেছে, এবং সেটাই হবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সবচেয়ে সমীচীন।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি যখন 'I Will Not Rest' নামে

সরোজকুমার দত্ত

রলাঁর সদ্য প্রকাশিত আত্মকাহিনী পড়ি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাই। রলাঁ-দরদীরা এরলাঁর সঙ্গে কখনো আমাদের পরিচয় ঘটান নি। এই আত্মকাহিনীর শেষ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন রলাঁ, 'হে অতীত বিদায়।' এই অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন:

"বৃদ্ধের পর পাঁচ বছরের (১৯১৪-১৮) বেদনাময় আমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে অঁ দরু দ্য লা গলে ও প্রেক্যুরমোর নামক দুইটি পুস্তিকার। ১৯১৯ সালের

মাঝামাঝি এই প্রতিক্রিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটা অদ্ভুত অবস্থায়—ন যবৌ ন তসৌ। এদিকে আমি আশা করিতে লাগিলাম স্বাধীন স্বয়ং, বলিষ্ঠ, ব্যক্তি-স্বাভাব্যতার ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্বের একটি দুর্গ গড়িয়া তুলিতে পারিব; অন্যদিকে দেখিলাম, কম্পাসের কাঁটা উত্তর মুখে দাঁড়াইয়াছে—ইঙ্গিত দিতেছে সেই লক্ষ্যস্থানের, যেদিকে ইউরোপের অগ্রগামী সৈন্যদল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর বিপ্লবীদল চলিয়াছে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া। কম্পাসের কাঁটা নির্দেশ দিতেছে সেই পথের—যে পথ সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের পথ।

অভিজ্ঞতা আমার আত্মও শেষ হয় নাই। এই অভিজ্ঞতার পরিণামে একদিন আমি বলিব, বলিব কেমন করিয়া মাত্র কয়েকজন ছাড়া ইউরোপের কোন স্বাধীন মনস্বীই বাধা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। বলিব কেমন করিয়া ইউরোপে পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে ভারতবর্ষের মহাকার নিকট স্বাধীন আত্মার বলিষ্ঠ উদ্বোধনের

ও নতুন কর্মপথের সন্ধান করি। বলিব তারপর কেমন করিয়া ঘটনার পরি-
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে পারিলাম এই
আদর্শের সংঘাতকে—যাহাকে মার্কস
অর্থনৈতিক বস্তুবাদের কঠোর আইনের
নিগড়ে বাঁধিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ
পৃথিবীকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করি-
য়াছে এবং আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও সর্বহারা
ঐক্য সংঘ এই দুই অতিকায়ের মধ্যকার
পঞ্চদশ দিনের পর দিনে বিস্তৃত হইতে
বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছে। বলিব কেমন
করিয়া এই ঘাত-সংঘাতের ফলেই আমি
এই পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হইয়া সোবিয়েত ইউ-
নিয়নের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।
কিন্তু শান্তি, বড় বেদনার এ যাত্রা। এ
যাত্রা আজও শেষ হয় নাই। এ যেন
নারিক সিঁড়িদের যাত্রা। এ যাত্রা যেদিন
শেষ হইবে সেদিন বলিব। “শান্তি,
শান্তি, শান্তি। হে আমার উত্তম সন্তান, হে
আমার কুস্ত চরণ দুশানি, ঘুমাও ঘুমাও।
তোমরা যা করিয়াছ তা চমৎকার।
কঠোর, বিপদাকীর্ণ ছিল তোমাদের
যাত্রাপথ। তা হোক তবু পথই চমৎকার।
এই পথে হাঁটিয়া পা দিয়, রক্ত পড়িলেও
মুখ।”

রবীন্দ্রের এ আত্মকাহিনী যখন প্রকাশিত
হয় তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ
হ্রাসিত হইয়া পর্ববসিত হইয়াছে এবং কবিকে
তিনি ফাসিস্ত মুসোলিনির সম্মোহন থেকে
বুঝ করে সোবিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে
আত্মীয় আত্মীয়তা যুক্ত করেছেন।
সমাজতন্ত্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নের
বিকল্পে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের
প্রতিরোধের তখন তিনি পুরোভাগে,
জোসেফ স্টালিনের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং
কিছুদিন পূর্বে ম্যাক্সিম গর্কির বিশেষ
আমন্ত্রণে সোবিয়েত ভ্রমণে যান এবং
স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসেন।
তারপর আরম্ভ হল বুদ্ধ, নাৎসীদের দ্বারা
অধিকৃত হল তাঁর পিতৃভূমি ক্রান্স এবং
সেই শঙ্ক-কবলিত ক্রান্সে, অন্তরীণ
অবস্থায়, গেরিলা যোদ্ধাদের আশীর্বাদ
আনিতে আশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করলেন ইউরোপের এ যুগের
শ্রেষ্ঠ শিল্পী-যোদ্ধা।

রবীন্দ্র রবীন্দ্রকে জানতে ও বুঝতে হলে
এই যোদ্ধা রবীন্দ্রকে জানা দরকার, না
হলে শিল্পী রবীন্দ্রকে এমন কি বিটো-
ফেনের চরিত্রকার আধুনিক ইউরোপের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রীকেও বুঝা
যাবে না।

কিন্তু রবীন্দ্র এই যোদ্ধার পটভূমিতে
হবে যদি না আমরা প্রাচ্যের নিপীড়িত
জনগণের মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদানের
কথা ঐ সঙ্গে স্মরণ না করি। বনে রাখা
দরকার, গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে
তিনি যে, তুলে ধরেছিলেন তাঁর মূলেও
ছিল পাশ্চাত্য ভাবজগতের তুলনায়
প্রাচ্যের ভাবজগৎ যে পশ্চাদ্গমন নয় তা
প্রচারের প্রেরণা। তাঁর সেদিনের সে
মূল্যায়ন পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই
নাকচ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রেরণা
ছিল মূলত রাজনৈতিক এবং সে রাজনীতি
ছিল নির্ভুল। লেনিন ছিলেন রবীন্দ্রের বন্ধু।
তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিক স্থাপন করে,
সাম্রাজ্যবাদ ঘোষিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের
বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্যের
রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে
প্রাচ্যের রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের
সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ববির
পাশ্চাত্যের পাশে নবীন প্রাচ্যের
অভ্যুদয়ের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন
ভারত, চীন ও অন্যান্য দেশের মধ্যে।
পাশ্চাত্যের ঘৃণা, ভ্রুকুটি ও উপেক্ষা
থেকে, এমন কি দরদের নামে বিকৃতির
হাত থেকে প্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতি ও
বিচিত্র জনজীবনকে পাশ্চাত্যের কাছে
প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্র।
রবীন্দ্র ছিলেন ওতপ্রোতভাবে রাজনৈতিক—
শিল্পী ও লেখক হিসাবে, ইউরোপের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতরসিক
হিসাবেই রাজনৈতিক—পরিপূর্ণ মাত্রায়
রাজনৈতিক। তাঁর নিজের ভাষাতেই
তাঁর নিজের কথা শুনুন।

“মানসিক বিবর্তনের যে স্তরে
তখন আমি পৌঁছিয়াছি তখন বিপ্লবকে
আমি ভুল করিয়া একাধিক রাজনৈতিক
দলের সংঘর্ষ বলিয়া ভাবিতাম, সেইজন্য

চিন্তাধারাগুলির প্রবর্তী স্থান ত্যাগ করিয়া
বাইতে আমি রাজী হয় নাই। আজ আর
ওভাবে ভাবা চলে না। আজকার মত
সেদিন-তখনও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের এমন
কি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, অত্যন্তরটা
এমনভাবে চোখে পড়ে নাই। ‘বুদ্ধি-
জীবীর কুলীন গোষ্ঠী’ নামক (এমন
কি যখন ‘আন্তর্জাতিক’ নামে তাহারা
নিজেদের জাহির করে তখনও) অন্তত
জীবের ভিতরটা তখনও আজকার মত
পড়িতে পারি নাই। যে চরিত্রবল, নাগরিক
সংসাহস ও চিন্তার বলিষ্ঠতা ঐ গোষ্ঠীর
আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, দেখি-
লাম তাহার কিছুই নাই। ইহারা মুখে
সত্যের বড় বড় বুলি আওড়ায়, এই
বুলিতে নিজেদের ঢাকিয়া রাখে।
বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যকে ইহারা ভয় পায়।
সত্যকে ইহারা নিজেদের কাজে লাগায়।
ইহারা এতদূর যায় যে, সত্যকে সাহিত্যের
প্রসাধন হিসাবে, আর্টের কৃত্রিম অধররঞ্জনী
হিসাবে ব্যবহার করিতেও ইহাদের
বাধে না। এইভাবে ইহারা নিজেদের
জাহির করে। লেখকদের মধ্যে সৌন্দর্যের
উপাসক যিনি সব চেয়ে বেশি, তিনি
রাস্তার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার
জন্য সত্যকে পণ্য নারীর মত ব্যবহার
করেন।”

এক হিসাবে লেনিনের সহযোগী
হিসাবেই নিজের অনন্যসাধারণ শিল্প-
শক্তিকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন আন্ত-
র্জাতিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ওপ-
নিবেশিক বিপ্লবের কাজেও সমানভাবে।
তখন করাসী উপনিবেশ ইম্পেরিয়ালে করাসী
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি আন্দো-
লন চলেছিল তাঁর সমর্থনে তখনকার রবীন্দ্র
আলামদী লেখাগুলি আজকের দিনের
ভিয়েতনামী মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও স্মরণীয়।

এই জীবনযাত্রায় অস্থির সত্য-
সন্ধানী রবীন্দ্রকে, পূর্ব পরিণত বিপ্লবী
রবীন্দ্রকেই আজ স্মরণ করার দিন এসেছে।
তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বৎসরে এইভাবেই
তাঁকে আমরা স্মরণ করতে চাই।

নাট্যকার রম্মা রল্লা

১৯৬৬ সালের ২১শে জানুয়ারী ফরাসী রম্মা রল্লা জন্মশতবার্ষিকী দিবস। তাঁর জন্ম শতবর্ষ বিশেষ শান্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মানুষের কাছে অবশ্য পালনীয়। বিশেষভাবে ভারতীয়দের কাছে। ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে রল্লার পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনি যেমন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীর জীবনী লিখেছেন, মীরট বড়বংশ মামলার কমিউনিস্ট বন্দীদের সম্পর্কেও প্রতিবাদ করেছেন। একথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, ফ্যাসিজমের চক্রান্ত থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রল্লা প্রথম ইউরোপের মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী, সত্যের আবিষ্কারক ও মানুষের মঙ্গলের গুণনির্দেশক। এই মহাপুরুষকে আমরা ভারতীয়রা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবো।

নাট্যকার হিসাবে রম্মা রল্লা এক বিশেষ পরিচয় রয়েছে। আমরা এদেশে তাঁর কয়েকটি বই পড়ার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু তাঁর নাটকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নি। ভারতীয় মঞ্চে তাঁর নাটক অভিনয় হয় নি। বর্তমানকালে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর সর্বত্র পিপলস থিয়েটার মডমেণ্ট বা গণনাট্য আন্দোলন কথাটি খুবই পরিচিত। এই নামের সঙ্গে যুক্ত করে অভিনয় করতে শিল্পীরা ভালবাসে। এই পিপলস থিয়েটার মডমেণ্টের ধারণা প্রথম জগৎসমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন রম্মা রল্লা। এই নামটিও প্রথম জন্মগ্রহণ করেছে তারই কলম থেকে। রম্মা রল্লা তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন সঙ্গীতকার ও সমালোচক এবং নাট্যকার হিসেবে। ১৮৯০ সালে তাঁর লেখা প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। যোলটি পূর্ণাঙ্গ ও বহু ছোট একাঙ্ক নাটকে তাঁর নাট্যচিন্তা ও প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। সঙ্গীত-সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত বিটোভেন জীবনী এবং অসংখ্য প্রবন্ধ এক অভুলনীর রচনা ও সঙ্গীতচিন্তা।

রম্মা রল্লাকে নাট্যচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ১৮৭০ সালের দিকের ফরাসী সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। বিসমাকের নেতৃত্বে ফ্রান্সের পরাজয়। এই পরাজয়ের প্রতিজ্ঞায় সমগ্র সমাজে হতাশা। এই হতাশা থেকে একদিকে যেমন পরাজয়ের মানিতে মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছিল, আর একদিকে এই সুযোগে উগ্র-জাতীয়তা ও হঠকারী মনোভাব প্রকাশ পাইল। এই হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে

সমাজের নৈতিক জীবন ভেঙে পড়ছিল। নৈতিক জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ বিকৃত হচ্ছিল।

এই নৈরাশ্যবাদী ও নৈতিকতা-বিরোধী সাহিত্যের আধিপত্যের কালে রল্লা বড় বেদনার সাথে অনুভব করছিলেন জাতির আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং আত্ম-ত্যাগের বাসনা জাতির নৈতিকচরিত্র।

কল্পতরু, সেনগুপ্ত

তিনি লেখনী ধারণ করলেন প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য করে। অনুপ্রেরণা নিলেন ফরাসী বিপ্লবী থেকে।

বাল্যকাল থেকেই রল্লা সেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেক্সপীয়র পড়ে তিনি তাঁর চিন্তাকে রূপ দেবার ব্যাপারে নাটকের গুরুত্ব বুঝতে শেখিয়েছেন। যে সময় তিনি নাটক লেখার হাত দেন সে সময় সাহিত্যের মত ফরাসী নাট্যশালাও নৈতিক অধঃপাতের অরাজকতা চলছিল। নাটক ছিল অবৈধ প্রেম ও বৈদ্যবৈজ্ঞানিক। রল্লা প্রথম লিখলেন :

Saint Louis, Aert, Triump of Reason.

এই তিনটি নাটক হতাশা ও নীতি-হীনতার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদের মত ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর এই তিনটি প্রথম সিরিজের নাটক ট্রেজোডিক অব ফেইথ নামে পরিচিত। এই নাটকে তিনি পরাজয়ের পূর্বের অবস্থার পটভূমিতে বুদ্ধিবাদী বিশ্বাস এবং দুঃখের মধ্যে সংগ্রামী মানুষের মহত্বকে ফুটিয়ে তুললেন। আদর্শের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারলেন কেবল-মাত্র বুদ্ধিজীবী-সমাজকে লক্ষ্য করে ও কেন্দ্র করে আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই যে চিন্তার উৎস এবং সমাজের পরিচালকশক্তি এই কথা অসারতা তিনি অনুভব করলেন। ইতিহাস স্রষ্টা হিসাবে জনসাধারণের যে বড় রকমের ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা তিনি বুঝতে পারলেন এবং এই উপলক্ষ থেকে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের পথে অগ্রসর হলেন। তিনি বুঝলেন—শিল্প জনগণের জন্য, জনগণ শিল্পের জন্য। তাঁর রচিত এই পিপলস থিয়েটার-এ এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। এই উপলক্ষ নিয়েই তিনি লিখলেন—Les loups (নেকড়ে)। যে নাটক ফরাসী-সমাজে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকের সমাজের সংকট

এবং তার দায়িত্ব এড়াবার জন্য অপরের দোষ চাপাবার জঘন্য প্রবৃত্তির মতোস খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই নাটকটিকে নিয়ে এখন দল লোক এত ক্ষেপে উঠে যে, তারা কিছুতেই নাটক অভিনয় করতে দেবে না। এতে যে সমাজের অনেক মাথাওয়ালা লোকের মতোস খুলে পড়ছে। গোলমাল এমন স্তরে পৌঁছেছে যে প্রথম রাজনৈতিক নাটক অভিনয় হতে পারল না। এই সময় তিনি লিখলেন : 14th of July, Danton, Roles-pierre. এই নাটকগুলি ট্রাজেডিক অব রিভল্যুশন নামে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রচিত স্নেহাত্মক নাটক Lelulite শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আদর্শকে প্রতারণা করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সহায়ক হওয়ার জন্য আক্রমণ করলেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা মৃত্যু শাস্তি ও যুদ্ধ-বিরোধিতার বুলি উচ্চারণ করলেন অল্প দেশাত্মবোধের নামে তারা সবার আগে বুলেটের শ্রেণীর সহায়ক হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেও সামিল হয়। এই সময় সমস্ত দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্য উঠবার জন্য আবেদন করেছিলেন। আমাদের দেশে যখন গান্ধীজী স্বাধীনতা সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন রল্লা তখন যুদ্ধের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের স্বরূপ প্রকাশ ও নিষ্পত্তি করে লিখলেন Letemp Viendera (সোদিন আসিবে) নাটক। রল্লা যে যুদ্ধ সম্পর্কে কত সচেতন এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিলেন তাঁর স্পষ্ট অভিযুক্তি এই নাটকে রয়েছে।

‘আমি কাহাদের জন্য লিখি’ পুস্তকে তিনি নিজেকে আরো স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসস্রষ্টা হিসাবে বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনের দৃষ্টি এখানে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন—‘আমার সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই চিরদিন গতিপন্থী। বাহারা থামিয়া নাই, চিরদিন আমি তাহাদের জন্য লিখিয়াছি। আমি নিজে কোনদিন থামি নাই। আশা করি যতদিন বাঁচিব থামিব না। জীবন যদি সন্মুখ-পানে চিরচলমান না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবের সমুদ্রপানে, আমি আছি তাহাদের সাথে। সম্ভবতঃ শ্রমজীবী জনসাধারণের এবং সমাজ-তান্ত্রিক সোভিয়েত গণতন্ত্র সংঘের সহযোগী হিসাবে আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অগ্রাভি-রোধা উত্তাল তরঙ্গ তাহাদের বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভবিষ্যতই আমার ভবিষ্যৎ’

উপহাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ আঠাশ ॥

নবীনন্দন চিত্র

শেষ পর্যন্ত চাকরি নেওয়ার স্থির
করল বিজন। অবশ্য কাজটা তার মনঃ-
পূত হয় নি, এসব কাজের সে কিছু
জানেও না। তাছাড়া যে প্রতিষ্ঠানের
মালিকদের মধ্যে শ্রীবিলাসবাবু একজন
হৃতকর্তা সেখানে চাকরি নেওয়ার
ব্যাপারে বিজনের মনে খুবই দ্বিধা
ছিল। কিন্তু পারিবারিক অবস্থার
কথা ভেবে বিজন রাজী হয়ে গেল।

এতদিন পরে সে চাকরি পেয়েছে
শুনে বাবা-মার মুখেও হাসি ফুটল।
ঘাড়িতে আবার একটা শান্তির হাওয়া
ঘিরে এল।

আবার সেই আগেকার মত জীবন-
ধারা সকালে উঠে আনির্দিশ্টভাবে
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো নয়, কাজের খোঁজে
গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসা নয়,
একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নির্দিষ্ট
ধরনের দায়িত্ব নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে
এসে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে আসা।

দোকানে নানা বিভাগ আছে।
স্টেশনারী, হোসিয়ারী, টেইলরিং।
পশুশালায় ক্রেতার। আকৃষ্ট হয়ে ঢোকেন,
বিক্রেতার। জিনিসগুলির মর্যাদা বোকা-
মার চেষ্টা করে, দাম যে অন্য দোকানের
চেয়ে কম সে সম্বন্ধে খুন্সিরদের
নিঃসংশয় করবার চেষ্টা দেখা যায়।
সম্প্রান্ত কোন ক্রেতা এলে বিজনকেও
উঠে যেতে হয়, তাঁকে অভ্যর্থনা করতে
হয়। কী তিনি চান তার সম্মান নিয়ে
সেই ডিপার্টমেন্টের সেলসম্যানের কাছে
পৌঁছে দেয় বিজন। রিসেপসনিস্টের
খানিকটা দায়িত্বও তাকে নিতে হয়েছে।
কাজের মধ্যে লেখাপড়া চিন্তাভাবনার
কোন নামগন্ধ নেই। বড় রকমের কোন
দায়িত্বও তাকে বহন করতে হয় না।

ম্যানেজার আছেন প্রত্যেক ডিপার্ট-
মেন্টে, আলাদা আলাদা ইনচার্জ
রয়েছেন। ব্যবসার গতি নির্ধারণ,
নীতি নির্ধারণের জন্যে ডিরেক্টরদের
বোর্ড আছে, বিজনের মাথা খাটাবার
মত কিছু নেই। সে শৃঙ্খলাভিত্তিক
আদর-আপ্যায়ন করবে, বিক্রেতা তরুণ-
তরুণীদের যদি দরকার হয়, একটু
উপদেশ-নির্দেশ দেবে, কোন জিনিসের
কি নাম, কোন জিনিসের কি দাম তা
মুখস্থ রাখবে দিনভর এই শৃঙ্খলা তার
কাজ। কাজ। মাইনে হিসাবে কাজ
কিছু নয়, কিন্তু বন্দী হয়ে থাকতে হয়
বহুক্ষণ। রাত আটটা পর্যন্ত আটকে
থাকতে হয়। কিছু করবার নেই, নিজের
যোগ্যতা প্রমাণের কোন পথ নেই শৃঙ্খলা
জীবিকার জন্যে একটি ঘরের মধ্যে
বন্দী হয়ে থাকা। শর্ত যেন এই
তোমাকে সামর্থ্য দিতে হবে না, তুমি
শৃঙ্খলা তোমার সময় দাও। তোমার
অমূল্য আনন্দের খানিকটা করে আমাদের
দিয়ে যাও তার পরিবর্তে আমরা
তোমার আর তোমার পরিবারের ভরণ-
পোষণের ভার নিচ্ছি। পুরো দায়িত্ব
নয়, আংশিক।

বাড়িতে এসে মা আর বোনের কাছে
নিজের মানের খুঁতখুঁতির কথা জানাতে
থাকে বিজন।

‘এত খোঁজাখুঁজির পর কাজ যদি বা
একটা পেলাম মা, কাজটা একেবারে
বাজে। একেবারেই যাচ্ছেতাই।’

সুদরমা বলেন, ‘অমন কথা বোলো
না বাপু। পুরুষের কাছে কাজ হল
কাজ। তা ঘেরকমের কাজই হোক।
ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করবে তবে

তো কাজে উন্নতি হবে। পাঁচজনের
কাছে যশ হবে।’

বিজন বলে, ‘এ কাজের আবার যশ
কি?’

সুদরমা বলেন, ‘ওমা, যশ নেই? সব
কাজের মধ্যেই যশ আছে সব কাজের
মধ্যেই রস আছে যদি মানুষ নিজের
কাজকে ভালোবাসতে পারে। তা না
হলে কিছুতেই তার দৃষ্টি থাকে
না। কাজটা শেষ পর্যন্ত বোকা হয়ে
দাঁড়ায়। মনে হয় তাকে ঘাড় থেকে
নামাতে পারলেই বাঁচি।’

বিজন ভাবে সত্যি সংসারে আরো
পাঁচটা গুরুতর সমস্যার মধ্যে এও
একটা সমস্যা কম নয়। নিজের কাজের
যোগ্য হওয়া, কি নিজের যোগ্যতা
অনুযায়ী, রুচি-শিক্ষা প্রবণতা অনু-
যায়ী কাজ খুঁজে পাওয়া।

ইরা হেসে বলে, ‘মা, দাদাকে তুমি
কতই বোকাও ওর মতলব-টললব
সুবিষয়ের মনে হচ্ছে না। কোন দিন
চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে বলবে আমি
আবার বেকার হলাম। ওসব বেচাকেনা
বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি আর থাকছি নে।’

সুদরমা বলেন, ‘ও তা পারে। কাজ
না থাকলে ওর তো কোন কষ্ট নেই।
ওর তো ঘুরে ঘুরে বন্ধ-বান্ধবের সঙ্গে
আড্ডা দিয়ে দিয়ে বেশ সময় কেটে
যাবে। মরব আমরা।’

বিজন ভেবে অবাক হল মা তাকে
এমন নিষ্ঠুর ভাবলেন কি করে?
সংসারের জন্যে তার চিন্তাভাবনা কি
কারো চেয়ে কম! ভাইবোনদের চেষ্টা-
স্বাচ্ছন্দ্য রাখবার জন্যে সে কি কি
চেষ্টা করেছে? তবে মাঝে মাঝে বাবা-

মার কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হয় বিজন, ব্যথিতও হয়।

একটু রাগ হলেই মা বলেন, 'যত সব শেয়াল-কুকুর এসে জন্মেছে। মরেও না। মরলে নিষ্কৃতি পেতাম।'

বাবাও বলেন, 'পাপ! পাপের ফল। ফলরূপে পুরুন্যা ডাল ভেঙে পড়ে। সে ফল আর কোন ফল নয়, পাপের ফল।'

বিজনের ওপর অভিমান করেই যে তাঁরা ওসব কথা বলেন তা কি আর সে বুঝতে পারে না? বিজন কেন ছোট ভাইবোনদের জন্যে আরো বেশি পরিশ্রম করে না, সংসারের উন্নতির জন্যে আরো বেশি মনোযোগী হয় না? এ সংসার যেন পুরোপুরি বিজনের নয়। বিয়ে-টিয়ে করলে তবে সেই সংসার তার নিজের সংসার হবে। মনও বসবে। সেই সংসারের জন্যেই সে প্রাণপাত করবে। বাবা-মার কথাবার্তার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে এই ধরনের মনোভাব ফুটে বেরোয়।

কথাটা রুচু কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়। সংসারের ওপর যে মায়ামতা বৃদ্ধো বয়সেও বাবার আছে, সেই তাঁর মমত্ববোধের অভাব মাঝে মাঝে অনুভব করে বিজন। বড় একঘেয়ে আর নীরস লাগে এই চিরপরিচিত সংসারটাকে। কেন এমন হয়? মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে হয় বিজনের। কারো না কারো সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে, নিবিড়ভাবে একটি নারীকে পারার জন্যে একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। শূন্য দৈহিক প্রাপ্তি নয়। এমন একজন কাউকে চায় বিজন যার কাছে নিজের হৃদয়কে খুলে ধরতে পারে, অসংকেচে যাকে সব সুখ-দুঃখ ভাবনা-বেদনার কথা জানাতে পারে। বিনিময়ে সেই মেয়েও যেন তার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করার জন্যে উদ্বীর্ণ হয়। কিন্তু হৃদয় বিনিময়ের জন্যে উৎসুক কোথায় সে নারী? যার কাছ থেকে সব নেওয়া যায়, যাকে সব দেওয়া যায়, কোথায় সেই দয়িতা?

স্বাতীর সব খবরই কানে এসেছে বিজনের। হিম্মাশুর স্বভাব প্রকৃতি ভালো নয় জেনেও স্বাতী তার ধ্যবসায়ের অংশীদার হয়েছে। রোজ অফিসে যায় একই সঙ্গে গাড়িতে ফেরে। ফেরার আগে নিশ্চয়ই নানা ছায়গায় বেড়ায়। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার কোন কিছু বাকি নেই—সে কথা এখন আর অনুমানের বিষয় নয়, বিজনের অনেক বন্ধুবান্ধবও প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে। শুনে প্রথম প্রথম হিংসা হত বিজনের, মনের মধ্যে ঈর্ষার

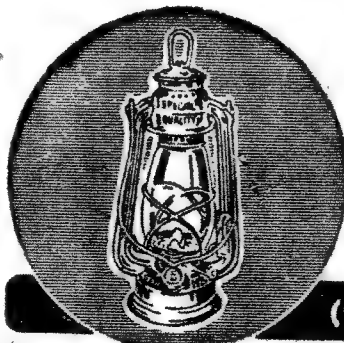
সূচি বিখত কিন্তু এখন যেন সব সয়ে গেছে। ওর সম্বন্ধে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আর একজনকে ঘিরে আর একটি আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর মনের মধ্যে উদ্ভূত হতে আরম্ভ করেছে বিজনের। কণা শিক্ষাদীক্ষায় অতখানি অগ্রসর নয় তা বিজন জানে। তার অতীত কলঙ্কমালিন সে কথাও বিজনের অজানা নেই। কিন্তু মানসিক ক্রান্তি দূর করবার জন্যে একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে বিজন যখন ডিপার্ট-মেন্টাল স্টোরের অমনঃপুত দায়িত্ব সেরে কণার বসবার ঘরখানায় গিয়ে হাজির হয়, আর সে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায় বিজন যেন একটি আশ্রয় খুঁজে পায়। চা খাওয়া, গল্প করা যখন যে নাটকের মহড়া দেয় কণা সেই নাটক সম্বন্ধে কিছু বা আলোচনা করা, যখন যে ক্লাবের হয়ে অভিনয় করে কণা সেই ক্লাবের সেক্রেটারী আর মেম্বারদের চালচলন আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রসঙ্গে কিছু হয়তো ঠাট্টা-তামাসা করা—এরই মধ্যে আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিজনের মন তার মনের বিচিত্র ভাবনা কল্পনা যেন সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। এই সাধারণ আলাপ-পরিচয়কে ঘিরেও তার মন সম্ভব-অসম্ভব নানা বাসনা-কামনার জাল বুনেতে থাকে।

সম্পর্ক গড়ে তোলা আর সেই ঘনিষ্ঠতাকে বাড়িয়ে তোলার কাজে কণা যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয় বিজনের। সে অতিথিকে ঘরের মধ্যে ডেকে আনে আদর আপ্যায়ন করে বসতে দেয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সুখ-দুঃখের গল্প করে, বিজন যখন বিদায় নিয়ে বেরোয় সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়েও দেয়; তার সোজানো শিষ্টাচারে আতিথেয়তার এমন কি বন্ধুত্ব কোন খুঁৎ নেই। তবু বিজনের মনে হয় কোথায় যেন সে দূরত্ব

য়েখে চলে। মনের গোপন একটি কক্ষ কণা যেন একাকিনী থাকতেই চায়। সেখানে প্রবেশের অধিকার সে কাউকে দেয় না। প্রথম প্রথম সুনীলকে প্রতিশ্রুতবদী মনে হত বিজনের। সে ভেবেছিল তার সঙ্গে কণার ঘনিষ্ঠতাই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু কিছুদিন বাদে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সুনীল নিজেকে সরিয়েও নিয়ে গেছে। খুবই কম আসা-যাওয়া করে আজকাল। যদি বা আসে বেশিক্ষণ থাকে না। পনের বিশ মিনিট থেকেই উঠে চলে যায়। বিজনের মনে হয় সুনীলও হতাশ হয়েছে। সেও যা চেয়েছিল তা পায় নি। অথচ এই মেয়েটির নৈতিক জীবনের শৈথিল্যের কথাই তো এতদিন শুনে এসেছে বিজন। তবু এত বাঁধাধর কেন? পুরুষের কাছে সে কী চায়? প্রচুর অর্থ? বিপুল বিস্ত-সম্পত্তি? আন্তরিক ভালোবাসার কোন আকর্ষণই কি তার কাছে আজ নেই? জানতে ইচ্ছা করে বিজনের। আমেচার ক্লাবের একজন সাধারণ অভিনেত্রীরও মনের নাগাল না পেয়ে তার অন্তরের গভীর গোপন দুর্জয় রহস্য ভেদ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে বিজন। কিন্তু অধীরতা তো সব সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হয় না।

কণার এই নিষ্পৃহতার বিজন মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবে। 'অফিস ছুটির পর... খানিকটা সময় কোন না কোন বন্ধুর কাছে গিয়ে কাটালেই তো পারো—' বিজন নিজেকে নিজেই পরামর্শ দেয়। কিন্তু যে নেবার সে, সেই পরামর্শ কানে তোলে কই?

সপ্তাহ দুই যাতায়াত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ রেখে বিজন বৈদ্যন ফের বীণার খোঁজ নিতে গেল। সদর দরজায় কড়া নাড়তেই সেই হাসিমুখে মৃদুমধুর অভ্যর্থনা, 'আসুন।' (ক্রমশঃ)



কিয়ান
লঠন
সর্বোৎকৃষ্ট

(গৌর মোহন দাস ঞ্জ কোঃ)

ফোন-২২-৬৫৮০

২৩৩, ৩৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

গ্রন্থমেনা

জ্যোতিষ্মর রচনা সংগ্রহ—সম্পাদক: দেবীদাস বসু ঠাকুর, জ্যোতিষ্মর ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা-৪। মূল্য—আট টাকা।

বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী রচিত হলে নিশ্চয়ই জ্যোতিষ্মর সেনগুপ্ত, যিনি এখন আর ইহলোকে নেই, তাঁর কথাও জানতে পারবো এবং পরাধীন ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ভূমিকায় তাঁর অবদানও নিরূপিত হবে। সম্ভ্রাসবাদী পন্থাটি গ্রহণের জন্য তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল এবং জেলের ভিতর গভীর অধ্যয়ন ও স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার ফলে তিনি মার্ক্সবাদী ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। জাপানত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা থাক। জ্যোতিষ্মর-রচিত গান, কবিতা, নাটক, অনুবাদ, ছোট গল্প ও প্রবন্ধসমূহ আমাদের কান আকৃষ্ট করে না। কিন্তু একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে সহজেই বোধগম্য হবে যে, তাঁর নিজ জীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সাহিত্যেরও মোড় ফিরেছে। অশিচ সায়া জীবনব্যাপী তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলে রয়েছে নির্ধারিত মানুষের জয়গান। মানব-জীবনই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। সেই ভাবেই তিনি পৃথিবী দর্শন করেছেন। বাস্তবিক মতান্তর কি নির্ভরভাবে তাঁর কবিতার প্রতি-ফলিত! বর্ধমান জেলা জেল থেকে লিখেছেন, (ক) “হাজির মাছির মাংস মেশানো স্বাদের তো নেই—তুলনা তার। তবু তো লপ্‌সি, গুড়ের লপ্‌সি, মিষ্টি লপ্‌সি চমৎকার।” (খ) “পাতি বড়োয়ার দুজর লপ ধনজ্যাম্বলক তন্তুসাধন।” (গ) “হিউলার, তোমাদের ডগবানের কমা নেই।” জ্যোতিষ্মর সেনগুপ্তের কবিতা আবার যেন একেবারে জাব্বাক মনের প্রতিচ্ছবি। সনেট রচনাতেও তিনি সিম্পলহস্ত। সেই সঙ্গে ছন্দ নৈপুণ্য ও অন্ত্য মিলের ব্যবহারে তিনি বহুস্থানে অভিনব দাবি করতে পারেন। তাঁর মহা-যুদ্ধের ফলে ‘ভাঙা চাক’ চালের দর প্রভৃতি নাটকের আবেদন তীক্ষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর নিজস্ব গল্পের মেজাজ ও অনূদিত গল্পের রসোত্তীর্ণতা সম্পর্কে মতভেদ না থাকাই উচিত। বিশেষত প্রবন্ধ রচনার তাঁর মৌলিক চিন্তা ও মননশীলতা বর্তমানকালে দুর্লভ। মার্ক্সীয় দর্শন বা ডায়ালেকটিকস্, ‘মূল-নীতি জগতের পরিচয়’, ‘ভাঃ ক্রমড ও মনো-বিকসনভুক্তের জাঃপাঃ’ পাঠকদের চিন্তার জড়তা কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই রচনা

সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছেন স্বধী প্রধান। জ্যোতিষ্মরের ব্যক্তিস্বরূপ ও সাহিত্য পরিচয় প্রসঙ্গে এটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবু দু-এক জায়গায় তিনি অবৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে নিজের বক্তব্যকে তুর্কর ক্ষেত্রে এনে হাজির করেছেন। যেমন, নবম পৃষ্ঠার প্রেমেন্দ্র মিশ্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শূন্য অধোভিক্তই নয়, ভুল। যা হোক, এই সুন্দর সংগ্রহটি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সংগীতশাস্ত্র প্রবেশিকা—সত্যেন্দ্র মথো-পাধ্যায়, লিপিকা, ৩০।২, কলেজ রো, কলিকাতা-১। মূল্য—তিন টাকা।

আমরা সংগীত ভ্রমণ করি। কিন্তু তার রাগ মাত্রা নয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের

জয়ন্তী সেন

পরিমাপ প্রস্ফাভীত নয়। সংগীত এখন স্কুল কলেজেও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই এবম্প্রকার ঘটনা আনন্দের। কিন্তু আনন্দের বিনিমিত হবে তবনি, যখন সংগীত-শাস্ত্র না জেনেই সংগীত শেখার প্রয়াস হবে। অর্থাৎ বিনা সাধনার শিক্ষা। যেমন, ‘কলের মুখে’ শুন্যেই একালের সিনেমার গান শ্রাক্ত জনের মুখে মুখে ফেরে। এ দশা যেন যথার্থ সংগীত শিক্ষার্থীর কপালে না ঘটে। সংগীতশাস্ত্র বিষয়টি জটিল। অবশ্য এই জটিল বিষয় সহজ হয়, যদি তা যথার্থ গুণীর হাতে পড়ে। উপরন্তু গ্রন্থটি একজন গুণীই রচনা করেছেন। সংগীত সংস্কার নিয়েই সেই গুণীর জন্ম। তাঁর নাম সত্যেন্দ্র মথোপাধ্যায়। এই নামের সঙ্গে বাংলা-দেশের কার পরিচয় নেই। কেই বা শোনে নি তাঁর দাদা সিম্বেস্বর মথোপাধ্যায়ের সংগীত? বিশেষত সিম্বেস্বরবাবুর নজরুল সংগীত অভুলনীয়। তাঁর সংগীত বহু মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সাহায্য পেয়েছেন সত্যেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ রচনার। গ্রন্থটিকে সত্যেন্দ্রবাবু শিক্ষার্থীদের উপযোগী করার জন্য প্রথমে অতি অল্প কথার অভ্যস্ত সহজ-বোধ্যভাবে স্বর, ঠাট, রাগ প্রভৃতি ব্যাখ্যারছেন। তারপর জ্যোতিষ্মরনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রের স্বরলিপি প্রদান করেছেন। তৃতীয় অধ্যায় ভারতীয় সুরাস্রবের পরিচয় দিয়ে পর্যবর্তী অধ্যায় লিখেছেন ভারতীয়

সংগীতের ইতিহাস ও বাংলার আঞ্চলিক সংগীত। সত্যেন্দ্রবাবুর স্বদেশী সংগীত পড়ে মনে হোল, এ বিষয়ে তিনি অধীর। অবশ্য তাঁর ‘সংগীতিক পরিভাষা’ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহজ সরলভাষে বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবি-সুরকারদের জীবনীও তিনি দিয়েছেন। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, স্বরসাধনা ও স্বরপ্রস্তাব—যা প্রাকটিক্যাল ক্রাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আমরা মনে করি, শূন্য প্রয়োজনের মুখ চেয়ে ছাত্রদের জনাই নয়, তিনি সর্বস্তরের সংগীত-পিপাসুদের জন্য একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করবেন। তাঁর অধিকার আছে, তাই এই অনুরোধ। গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সংপ্রশংস যে সব কথা বলেছেন, তার বেশ কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সত্যেন্দ্রবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

দুটি রবে নীরবে—হারিশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, গ্রন্থজগৎ, ৬, বিষ্ণু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

মুখ্য প্লটটিকে কেন্দ্রীভূত করেছে মূল্য তিনটি চরিত্র: জন, এলি, আইরিন। আরেকটি আছে সাবপ্লট। সেটি ফকির সাহেবকে কেন্দ্র করে রচিত। দুই গল্পের সূত্র জোড়া দিয়েছে একটি কাহিনী। যে কাহিনীর ছ’ মাস পূর্ণ হলেই চাকুরিয়ার প্রাপ্তি ঘর। পাসকেল, জ্যাকসন, নুড—সবাই সেভাবে গেছে। এবার যেন জনের পালা। সংসার আর সংস্কারাচ্ছন্ন মনে অসহ্যভীত। তাই “এলিজাবেথ যেন বড় বেশি মনমরা হয়ে গেছে। জনের দৃষ্টি সেইখানেই। প্রেমের জোয়ারে কোথায় তার ভাসবার কথা। কোথা-কার এক অহেতুক চিন্তা দুজনার মধ্যে প্রাচীর হয়ে রইল।” অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিলন হয়েছে দুজনের। মিথ্যা হয়েছে সংসার ও কুসংস্কারের। এই উপন্যাসটিতে ভারতীয় খস্টানদের চরিত্র ভুলে ধরা হয়েছে, সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস, কর্মস্থানের পরিবেশ ও জীবনপ্রণালী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বঙ্গদীপ—গিরিধারী কুন্ডু কর্তৃক সম্পাদিত। ২০২।বি।১১, আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য—দুই টাকা।

সম্ভবত আত্মপ্রচার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত। কেন না পাতার পাতার কচিকচি থেকে শব্দ করে জরাগ্রস্ত লেখকদের লেখা তাদের ছবিসহ কিভাবে ছাপা সম্ভব হয়, তা আমাদের দর্বেধ্য। অবশ্য এরই মধ্যে দু-একটি ভাল রচনার সম্ভান যে পাওয়া যায় তা নয়। তবে আমাদের মনে হয়, ভাল লেখ ও ভাল লেখক তৈরির দিকে এই পত্রিকা অধিকতর মন দিলে, পত্রিকাটি কল্যাণমূলক কাজের সহায়ক হবে।

বঙ্গদর্শন



তিরিশে জানুয়ারী

যথার্থীভি মমগ ভারতের সঙ্গে
স্মরণীয় তিরিশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান
ও সভাদি পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গেও।
শহীদ দিবস তিরিশে জানুয়ারী ইতি-
হাসে একটি ইতিহাস ও দুঃখজনক দিবস।
ভারতবর্ষ এই দিন অহিংস ভারতের
নেতা গান্ধীজীকে হারিয়ে যে বিরাট
শূন্যতাবোধে নিমজ্জিত হয়েছিল,
পশ্চিমবঙ্গে সেই শোকের ছায়া নেমে
আসে এই দিনটিকে কেন্দ্র করে।
সংস্কারের সত্যের স্বন্দ এই দিনটি
ভারতের বৃক্কে যে প্রচণ্ড আন্দোলন ও
গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, সেই
অন্যাক্ষিপ্ত অগ্রদূত স্মৃতিচারণার
মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এইদিন পূর্ণ স্মান
করে। এ বছরেও “করেঙ্গে ইয়ে
মরেঙ্গে” শপথ উচ্চারিত হয়েছে
বাঙলার মাটিতে। শহীদ বাঙলা শহীদ
ভারতের তর্পণ করেছে সাশ্রু নেত্র।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মগণের ভাতা আদায়ের সংকল্প

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্ম-
চারীগণ তাঁদের বস্তাপচা বহুদিনের
অবহেলিত মাগী ভাতার দাবিতে
পুনরায় সম্বন্ধভাবে আন্দোলন শুরুর
করবেন বলে প্রকাশ।

কোন নতুন দাবি নয়। অর্থোক্তিক
তো নয়ই। পশ্চিমবঙ্গে নিত্য দ্রব্যমূল্য
বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে বাজার
মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বরং
শোচনীয়ভাবে স্বল্প বেতনভুক্ত সরকারী
কর্মচারীদের এ দাবি পূরণের জন্য
সমুচিত ব্যবস্থা অনেক আগেই গৃহীত
হওয়া উচিত ছিল। দেশের জরুরী
অবস্থা বিবেচনা করে সরকারী কর্ম-
চারীগণ আন্দোলনের পথ ত্যাগ
করেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন
কৃষ্ণসাধনের পথকেই দেশব্রতীর
অহমিকার সঙ্গোই। অহমিকাই বলব,
কেন না পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শ্রেণীর

সরকারী করণিকবৃন্দ যে মাস মাহিনা
পান, তাতে প্রকৃতপক্ষে গামছা পরিধান
করে দুবেলা অফিস করা এবং মূড়ি
চিবিয়ে (থুড়ি, মূড়ি অধুনা রাজভোগ
বিশেষ), বলা উচিত, ফ্যান সেবন
করে (না, তাও অসম্ভব, সরকারী চালই
অগ্নিমূল্য পূর্ণ রেশন এলাকায়,
অপূর্ণ এলাকা তো গণনা বাইরে),
বরং বলালে যথার্থ হবে, অর্ধভুক্ত অব-
স্থায় দিন দিন আয়ু ক্ষণ করা ভিন্ন



বাপুজী

গত্যন্তর নেই। তগ্রাচ এই করণিক
মহলের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে
হয়, ভদ্রানা তাঁরা পূর্ববান্ধবে বজায়
রাখবার জন্য প্রমিত ঘণ্টা সংগ্রাম করছেন।
যে সমুদয় সরকারী চাকরিতে ‘বাম
হস্তের’ প্রক্রিয়া সুবিধামত, অবশ্যই
সে জাতীয় চাকুরিাবন্দ বর্তমান
আলোচনার বহির্ভূত। তবে প্রসঙ্গত
তাঁদের এই বামাচারণ সম্পর্কে একটি
মাত্র বক্তব্য হয়ত এখানে অবশ্য উত্থাপন-

যোগ্য। তা হল, সরকারী অঙ্গনচারে।
ফলেই এই ‘বামাচারে’ অগ্নিমূল্য
কর্মবৃন্দ পর্যন্ত শোষাবাদি ওদের
আদর্শ বজায় রাখতে পারেন না।
বামাবর্তে তালিয়ে যেতে থাকেন নিরুপস্থ
নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো। অবশ্য,
সেকারণেও তাঁদের বামহস্তিকরও যে
সমর্থনযোগ্য নয়, আশা করি একথা
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু যাঁদের জীবনে সে সুযোগ
অথবা দুর্যোগ ঘটে ওঠে নি সেই
স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মীদের অবস্থা সর-
কার কদাচ বিবেচনা করেছেন বলে
মনে হয় না। এই শিক্ষিত করণিক
সম্প্রদায়কে তাঁদের বাঁধা চাকরির সঙ্গে
উদ্বাস্ত অর্থ সংগ্রহের কাজে উদ্ভাস্ত
থাকতেই হয়। না হলে একটি পরিবার
কেন, একার পক্ষেই এই অগ্নিমূল্যের
বাজারে ভদ্রবেশে টিকে থাকা দুষ্কর।

এ সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করে
সরকারী মাহিনা বা ভাতা ধার্য হয় না।
ঠিক কোন হিসাবের ভিত্তিতে তা ধার্য
হয়, সেই বৈঠক নিয়মও ভাল করে
বোধগম্য করা দুঃসাধ্য।

অথচ আগেও যেমন বলেছি আমরা,
এই সরকারী চাকুরিাদেব ওপর সর-
কার বাহাদুরের দাবির অন্ত নেই।

সরকারী অফিস, কর্পোরেশনের
অফিস নয়। সেখানে হাজিরার দেরি
হলে লাল চ্যাঁড়ার ব্যবস্থা আছে,
ভিন্নখাতে রোজগার হলে সরকারকে
তার অংশভাগ প্রদানের নিয়ম আছে;
চাকুরি প্রাপ্তির পূর্বে পরীক্ষা ও
তত্ত্বানিত পরীক্ষা ফিস-এর ব্যবস্থা
আছে, এতৎ সত্ত্বেও সুপারিশের জবর-
দস্তি আছে; আছে পুলিশী কোয়েরী;
আছে সভা সমিতি প্রভৃতিতে মোগলদেব
ওপর বিধিনিষেধ। আর তারই সঙ্গ
আরও আছে দপ্তর বদলির জুজু।
শ্রমক্রেতা সরকার নিজের দিক ধরে
ভালোভাবেই কড়ার-গড়ার ব্যবস্থা নিয়ে
ছেন, নিচ্ছেন (উঃ, শনিবার পূর্ণ
দিবস অতিরিক্ত পরিশ্রম) ইত্যাদি
কিন্তু কর্মচারীর অর্ধাংশ শ্রম বিক্রেতার

প্রায়ের উপযুক্ত মূল্য দান করতে হলেই, 'পীডিস্ট'লনারী 'এ্যাকশন', চাকুরি ক্ষতম, অনগ্র বদলি এবং ভিন্নতর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি প্রয়োগে সরকারী উদ্যোগ দেখা দেবে। সরকারের এ কেমনধারা বিচার আমাদের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না।

এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারই আবার ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানাধীন কল-কারখানায় শ্রমিক-কল্যাণের নানান নিয়ম বেঁধেছেন। নিত্য নতুন সুযোগ সুবিধা, নতুনতর আশা-আশ্বাস এবং বোনাসের ব্যবস্থাপত্র তৈরি করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সৌভাগ্যবশত যারা সরকারকে সরাসরি কর্মদান করেন না, যারা সরকারী কর্মচারীরূপে আপন লালাট লাঞ্চিত করেন নি, তাঁদের প্রতি সরকারের 'কৈকেয়ী-স্নেহ'। আর যারা নিজেদের শ্রম দেশের সরকারকে নিবেদন করে অপরাধী, সরকারের 'কৈকেয়ী-নিগ্রহ' তাঁদেরই ওপর। একই রাজ্যে বসবাসকারী একই সময়ে, একই মূল্য-মানের আওতায় আবদ্ধ শিক্ষিত শ্রম-দানকারীর জন্য একই সরকার যখন আসমানজমিন ব্যবস্থার ফারাক সৃষ্টি করেন, তখন দেশের সরকার কোন নিয়মের ভিত্তিতে শ্রমমূল্য নির্ধারণ করছেন তাতে স্বভাবতই বিস্ময় জাগে। এইভাবে আর্থিক অসাম্যের ভিত্তিতে যে সরকারী মহাকরণ প্রতিষ্ঠিত সেখানে করণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মে উৎসাহ প্রত্যাশা করা এ কারণেই কি বৃদ্ধি-সম্পন্ন যে, তাঁরা সরকারের প্রত্যক্ষ চাকুরে এবং সেজন্যই তাঁদের ভাত-কাপড়ের সমগ্র চিন্তা শিকিয়ে তুলে দেশহিতায় কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে?

যিনি যে কর্মেই রত থাকুন না, প্রত্যক্ষত তিনি স্বদেশের জন্যই শ্রমদান করছেন, আপন পরিবার প্রতিপালনের জন্যই কায়িক বা মানসিক শ্রম নিয়োগ করছেন। তবে সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্যই এক শ্রেণীর মানুষকে ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতার সন্তুষ্ট থাকতে হবে ও পর্বতপ্রমাণ বিধি-নিষেধের জগৎখলে আপনাকে স্বেচ্ছা বন্দি হয়ে আবদ্ধ রাখতে এ কেমনধারা সরকারী বায়না প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন প্রতি-বারই বর্তমান লেখককে বিচলিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের দাবিকে সাধারণ মূল্যমানের নিমিত্তেই বিচার করতে হবে, তাঁদের গায়ে সরকারী ছাপ থাকার জন্য তাঁদের বিশেষ কৃচ্ছসাধনে বাধ্য করার কোন বৃদ্ধি বর্তমান আলোচক ঝঞ্জে পান না।

এক কালে সরকারী চাকুরিতে

বাড়তি সুযোগ-সুবিধা কিছু ছিল। প্রধান সুবিধা, সরকারী চাকুরি 'পার্মি-নেন্ট সেটলমেন্ট' জাতীয় একটি নিশ্চিত আশ্রয়স্থল ছিল। একবার ঢুকে পড়তে পারলে কর্মচারী একটি বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত থাকতে পারতেন, অন্যান্য অবস্থা যথাযথ থাকলে চাকুরি খোঁওয়াবার সংশয় ছিল না। আজ সে নিরমণও বেনিয়ম হয়েছে। স্থায়ী চাকুরি দূরে থাক, কর্মস্বত অবস্থায় বর্তমান পদেই বহু কর্মী অস্থায়ী চাকুরিয়ার পর্যায়ে স্থায়ী চাকুরিয়ার সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকেও বছরের পর বছর বঞ্চিত হয়ে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র সম্পাদক সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশব্যাপী খাদ্যমূল্য ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে অবিলম্বে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বলে-ছেন, কোনো কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে না বলে সরকার বহুবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও বহু কর্মী পর্যায়ক্রমে বাড়তি ঘোষিত হয়েছেন এবং অনেকের নির্বিচার ছাঁটাই-ও হয়ে গেছে।

সুতরাং এ পথেও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ আজ একটি সুনিশ্চিত আশ্রয়ের অধীনে কিছু স্বার্থ ত্যাগের প্রেরণা পাচ্ছেন এমন কথা বলা চলে না।

সরকার কর্মচারীদের প্রতি প্রদত্ত কোনো আশ্বাসই কর্মে রূপায়িত করার এ পর্যন্ত প্রয়াস পান নি। রাজ্য অর্থমন্ত্রী অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি ও মহার্ঘ ভাতার ফর্মুলা নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজও সে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

স্বভাবতই কর্মীবৃন্দ উদ্ভ্রম। প্রকাশ, তাঁরা আগামী মৌলই ফেব্রুয়ারী সান্না-বাঙলা সভা-শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁদের দাবিকে সোচ্চার করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

তাঁদের দাবি যেহেতু বকেয়া দাবি এবং এ বিষয়ে রাজ্য অর্থমন্ত্রী পূর্বাভাসে কিছু চিন্তাও করেছেন। অতএব অব্যাহত টাগ-অব-ওয়ার শব্দ হওয়ার প্রাক্কালেই যদি সরকার একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী কর্মীদের একটা সুব্যবস্থা করেন তবে উভয়ত মঙ্গল। অন্যথা সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের পক্ষে টেনে আনার দায়ভাগী সরকারই হবেন। সাধারণ জনমত তাই

বলবে এবং আন্দোলকারীরাও জম্ম সমর্থন লাভ করবেন বলেই বিশ্বাস।

পরীক্ষা বর্জন

আসন্ন পরীক্ষা বর্জন করে সরকারী মহলে চেতনা সঞ্চারের পরীক্ষা সুরু করতে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ। পঃ বঃ সরকারী কর্মচারীদের মত এদেশের শিক্ষক সম্প্রদায়ও চির অবহেলিত। বেতন বৃদ্ধির আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলন এ ক্ষেত্রেও একটি পুরাতন বিষয়। সরকার পক্ষ অধ্যাপকদের এই দাবি এক বছর ধরে টাঙিয়ে রেখেছেন। গত বছরের প্রাক্কালেই শতকরা চুরা-নব্বইজন অধ্যাপক পরীক্ষা বর্জনের শপথপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সমগ্র অধ্যাপক সম্প্রদায়ের এই বিশেষ দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরও এ দাবির যথার্থ স্বীকার করে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। তদবধি বিষয়টি ধামাচাপা আছে। কেন না দেশের অবস্থা ছিল অন্যরকম। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের আশ্বাসবাণীও তখন আন্দোলন প্রত্যাহত হয়। অর্থাৎ শিক্ষক-সম্প্রদায় তাঁদের কর্তব্য করেন। কর্তব্য পালনে কিছুমাত্র উদ্যোগ কিন্তু সরকারী তরফে এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। অগত্যা আন্দোলনের পথই বেছে নিতে হচ্ছে অধ্যাপকবৃন্দকে। যথার্থ পরিতাপের বিষয়। কিন্তু ক্ষুধার তাপ বৃদ্ধি পেলে পরিতাপ সৃষ্টি আপনি হবে; রুখবে কে! কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের প্রদত্ত অর্থের সমপরিমাণ অংশ প্রদান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। আশ্বাসে বিশ্বাসের অভাব, কাজে কাজেই দেখা যায় নি। সরকারী মহল অর্থাভাবের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেই কর্তব্য সমাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে পেট ভরে নি অধ্যাপকবৃন্দের। তাঁরা পুরোনো দাবি নতুন করে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে উত্থাপিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

এ পর্যন্ত 'সেলস্' ট্যাক্সের মত শিক্ষা ট্যাক্স চেপেছে অভিভাবকদের ঘাড়ে। চার টাকা স্কুলের মাহিনা দশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মারা পড়েছেন অভিভাবকবৃন্দ, যদিও রাজি-রোজ-গারের অবস্থাও খুবই বিমর্ষ। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে সরকারী ভাত্যার থেকেই অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন, কার্যকালে সেই অর্থ যে নতুন করে অভিভাবকদের কান মলে আদায় করা হবে না, এতোবড়



মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য আপনার সোনা সমর্পণ করুন।
সেবার আধীনার্থে পবিত্র এবং উজ্জ্বলতর এই সোনা আপনাকে
আবার ১৫ বছর পর ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

দোশের সেবা করুন—স্বর্ঘবণ্ড তিত

[illegible]

ଆବାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡେବିଡ଼ କରନ୍ତି ଯିଏ ମାଲିକାନା :
କ୍ଲାସିକ ସିନେମା ସ୍ପର୍ଶବତ୍

কর্মকর্তা জামিন হিচাবে বেশে আগমি ব্যক্তি
থেকে টাকা দাবি করতে পারেন।

কর রেছি

অবিশিষ্ট থেকে যে আর হবে তার ওপর কোন
আরও নতুন হবে না। অবিশিষ্টের আর
লক্ষণের দিকে হওয়া : অবিশিষ্ট বিহীন
করে যদি কোন লোক হয় তাহলে তার ওপর
কোন ক্রিয়াকর্ম হওয়া :

এক বছরে ২,০০০ গ্রাম পর্যন্ত (যাও ৪-৫
ডোলা) সোনার মুদ্রার আঁকণ, প্রাথমিক
কালকে উপহার দেওয়া হলে তার মত
উপহার সব নিতে হুদা। উপহারকার মুদ্রা
কেউ যদি আঁকণ পাও তাহলে প্রাথমিক
নিয়ম শায়েন তাঁকে ৪০,০০০ গ্রাম (যাও
৪-৫ ডোলা) পর্যন্ত কোন সম্পত্তি সব
নিতে হুদা।

অর্পিত কোথায় গাওয়া যায়

বাক্যের, বোঝাই, কথিতব্য, বাহ্যিক, ভাষাপূর এবং ভূতন নির্দিষ্ট অস্বীকৃত ক্রমকেই বিচার্য ব্যাকের অভিন্নপন্থিত-এক ক্রমকে অস্বীকৃত বৈধ ব্যাকের এক এক সহস্রাব্দী ব্যাকপন্থিত সমস্ত বাহ্যিক অস্বীকৃত বৈধতা হইবে বৈধকে সাহায্য করবে

● 重要提示

করেন তার ওপর ক্ষান্তি এবং আগমনের
 বিয়োগের সুবিধা বিস্তার করছে। যেহেতু
 সেবার আগমনের মনো কাঙ্ক্ষা লাগছে।

ভারত সরকারের আর্থিক কলঙ্ক প্রচাৰিত

বিশ্বাস ভারতবর্ষের সাধারণ মানবের মনে স্থান পায় না। কিন্তু আর বোঝা যাইবার ক্ষমতা কোথায়! এ প্রশ্ন অবশ্য সরকারের বিবেচ্য নয় (কল্যাণরতী সরকারের বিবেচ্য?)। হলে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন দ্রব্যাদির মূল্য মণ্ডকা-মারফিক দ্রুতহারে বাড়ত না। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এক কোপে দুধ ও চালের দাম বাড়িয়েছেন। টাকা কোথা থেকে আসবে সে চিন্তা করেন নি।

এ দেশের প্রীতিনীতির দিকে চাকিয়ে বাচাল মূক হয়, দৌড় চ্যাম্পিয়ন হয় পণ্ডা। টাকা কোথেকে আসবে প্রশ্ন সেটা নয়, টাকা সরকারের প্রয়োজন, এটাই শেখা আছে মাত্র। তাই বেতন বৃদ্ধির আবেদন এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি আন্দোলনের গুরুস্বাক্ষর হয় শাস্তি; অথচ সরকার যখন মূল্যবৃদ্ধি করেন তখন সাধারণের স্বহস্ত-ক্ষমতার ওপর অত্যাচারের প্রশ্নটি আরো বিবেচ্য হয় না।

অবশ্য সরকার বিচক্ষণ। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বিবেচনা খন্য-বাদী। একমাত্র সরকারী বাস ছাড়া অন্য মূল্য বৃদ্ধির বেলায় তারা

সুচিন্তার সঙ্গে খনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড শ্রেণীবিভাগ করে আয় অনুসারে ব্যয়ের বোঝা চাপিয়েছেন। যারা পরস-ওয়ালা গো-দুগ্ধ গ্রহণের অধিকার কল্যাণরতী সরকার তাঁদের নিশ্চয় দেবেন। কিন্তু যারা অল্পবিস্তৃত কল্যাণ-রতী সরকার তাঁদের জন্যও রঙ করা জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গোদুগ্ধের শ্রেণীভেদে, চালের শ্রেণী ভেদে আমরা সমাজবাদী সমাজে দিকে প্রধাবিত হচ্ছি!

দুর্ভাগ্যত, সমাজ-গঠনের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, সেই শিক্ষককুলকেও সরকার রঙ করা দুধের স্বাদ গ্রহণকারী শ্রেণীতে ঠেলে রেখেছেন। জ্ঞান বিদ্যা-বৃদ্ধির ওজনেও ওজন নেই। ওজন হল শের-এ ও সারমেয়ে। প্রশ্ন হল, শের কি বাচ্চা? হ্যাঁ। তবু বড় কামমে বৈঠো। প্রশ্ন হবে, শের কি বাচ্চা? না। তবু জাহাঙ্গীরে যাও। তা তোমার শিক্ষা থাক বা যোগ্যতা থাক। মাপকাঠি ওটা নয়। হলে অধ্যাপকবৃন্দের জন্য খাঁটি দুধের ব্যবস্থা হ'ত। কেন না এই সম্প্রদায়ের মগজটি যথার্থ স্নেহজাতীয় পদার্থ

গ্রহণে সাক্ষসুক্ষ না থাকলে দেশব্যাপী 'গজ' সৃষ্টির সম্ভাবনা।

কিন্তু তাতে সরকারী ভাবনায় বিশেষ প্রয়োজন কি। মগজে ও গজে তো তফাৎ নেই। ইতরও তো তরে যাবে শেরের ঘরে জন্ম হলেই। সুতরাং সরকার যে এ লাইনে মাথা ঘাবড়াচ্ছেন না তা স্বতঃসিদ্ধ দুর্ঘটনা। তাই শিক্ষকবৃন্দকে আন্দোলনের পথই হয়ত বেছে নিতে হবে। সরকারের দুধ চেয়ে পড়ে থাকলে নানান অজুহাতে বছর ঘুরবে।

কিন্তু এই অনভিপ্রেত অবস্থায় সৃষ্টি হলে ছাত্র তথা অভিভাবকবৃন্দের ওপরই তার আঘাত এসে পড়বে। সরকার নির্বিকার দর্শক মাত্র থাকতে পারবেন।

সাধারণ মানবও কিন্তু ঐক্যের ঘোরে নেই। তারা নির্বিকার সরকারকে নিশ্চয়ই বলবেন, ফিরে ভাবুন, ফিরে ভাবুন। শেরে গজে দশটা চলবে—শ্রেণীভেদের ঐ সহজ ঐখিটি পরিহার না করলে, দেশের মগজটি শুধু গজ-মস্তকে পূরণ করব শুধু শেষে একটা বড় রকমের ভরাডুবি



রেনা রুনা শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্‌ঘোষনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল দাস

আসন্ন করে তুলবেন তাঁরা। একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য সমাজের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করে সরকার শ্রেণী সামন্ত-তান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজ গঠনের পন্থা গ্রহণ করতে চলেছেন, ইতিহাসে পিঠ ফিরিয়ে তা আমাদের ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

কেবলমাত্র একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে এইভাবে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের গদীতে বসিয়ে ক্রমে তাঁদের হাতে সমাজের সর্বপ্রকার দায়িত্ব তুল দেওয়ার এই গৃহ্য পরিকল্পনা মারাত্মক।

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী অবহেলায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী যদি হটে যান এবং সেখানে মগজের স্থান ক্রমে গজে দখল করতে আরম্ভ করেন (কেন না এ 'লাইনে' থাকতে হলে এবং নির্ভেজাল শিক্ষারতীর কাজ করে যেতে হলে পূর্বপুরুষের "রেস্ট" প্রয়োজন হবে) তবে যুদ্ধভে হবে, দেশের ঘোর দুর্দিন সমাগত।

বর্তমান শিক্ষারতী সমাজের উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা না করে ও সার্বিক মূল্যবোধের শিকারে তাঁদের পরিণত করে সরকার তেমনতর একটি অবস্থাকে ঘিরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন।

এই অবস্থানীয় পথ পরিহার করে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজকে বাঁচবার উপায় করে দেওয়াই হবে সরকারী কর্তব্য। সরকার এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে আমাদের আশঙ্কা দ্রোণে পরিণত হবে।

বিশ্বমানব রোমা রলা

মহানগরী কলকাতা ভরতবন্দু মানবতাবাদী জীবনশিল্পী মনীষী রোমা রলায় জন্মশতবার্ষিকী পালন করে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

মহাজাতি সদনে আন্তর্জাতীয়তাবাদী মানব-প্রমিত এই শব্দিকল্প শিল্পীর মহান জীবন আলোচনা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও শিল্পী সাহিত্যিক-বৃন্দ রলায় বিচিত্র শিল্পীজীবনের প্রতি আন্তরিক প্রশংসার জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ-দানকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং সুপ্রিয় কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রীতীন্দ্র রায় দাস বলেন, রলা ছিলেন ভারতবন্দু। তাঁর দেশ সমগ্র পৃথিবী, তাঁর জাতি মানবসমাজ। ভারতের স্বাধীনতার দাবি রলায় কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। দাস ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর সংগ্রামী। ভারতের মহান ঐতিহ্যে আকৃষ্ট

হয়েছিলেন রলা। ভারত ছিল তাঁর কাছে এক মহান আদর্শের দেশ।

রোমা রলায় সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত সৌসাদৃশ্য টেনে রলা শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি ড. কালিদাস নাগ তাঁর প্রশংসামূল্যে বলেছেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর মধ্যেই এশিয়ার সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করেন রোমা রলা। রবীন্দ্রনাথ ও রলা ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ-স্বরূপ।

মনীষী রলা তাঁর কীর্তির চেয়ে মহৎরূপে বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসার আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বকবির মত তাঁরও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নেই। মানবতা যেখানে লাঞ্চিত এ যুগের দুই মহান মানুষ সেখানেই রেখেছেন তাঁদের শিল্পী-প্রতিবাদ। দেশকাল সংস্কার তাঁদের মহান কল্পলোকে কোন মোহাজন লেপন করতে পারে নি। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ সমস্ত ক্ষুদ্রতার মধ্যে এই দুই কবিদ্বন্দ্বের চোখে প্রতিভাত করে তুলেছিল অনন্ত অপরূপের অরুণরূপ। আপন দৃষ্টির স্বচ্ছ প্রসারতায় এ'রা আজ বিশ্ববাসিত।

রবীন্দ্রের কলকাতা তাই প্রাথমিকভাবে এই মহান শিল্পীর জীবন-আলোচনার আলোকে আপনাকে প্রদীপ্ত করার সৌভাগ্য গ্রহণ করে।

চবিশ পরগনা:

প্রজ্ঞানন্দ মাতৃসদনে
শিশু-মৃত্যুর দায়িত্ব কার?

“অশোকনগর বাতী”র প্রকাশ অশোকনগর প্রজ্ঞানন্দ মাতৃসদনে অবশ্য ও অবহেলায় একাধিকবার শিশু-মৃত্যুর কারণ দেখা দিলে উক্ত পত্রিকা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে কর্তৃপক্ষকে সার্বধান থাকার জন্য সতর্কীকরণ সংবাদ প্রকাশ করেন, কিন্তু ব্যর্থ।

সম্প্রতি জনৈক নাসের অবহেলায় খ্রীসমর ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী নাকি তাঁর শিশুসন্তানটিকে হারিয়েছেন। অভিযোগ প্রকাশ:

(২৫।১২।৬৫) “কয়েক দিন পূর্বে খ্রীসমর ঘোষের স্ত্রী এই প্রসূতি সদনে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। এখান হইতে যখন শিশু ও প্রসূতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন প্রসূতি লক্ষ্য করেন যে শিশুটির নাভির ব্যান্ডেজ চিলে অবস্থায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তিনি এ ব্যাপারে নাসের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিলে নাস উহা টানিয়া তুলিয়া দিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন। পরে বাড়ি আসিয়া শিশুটি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং ডাঃ জ্যোতিষ চৌধুরী উহাকে দেখিয়া ধনুতংকার হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ‘আই ডি’ হাসপাতালে পাঠাইবার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী শিশুটিকে উক্ত হাসপাতালে পাঠান হয় এবং তথায় আজ শিশুটি মারা গিয়াছে। ইতিপূর্বে এই প্রসূতি সদনের কল্যাণে একটি জীবিত শিশু মৃত বলিয়া ঘোষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরে উক্ত শিশুটির মাতার সাগ্রহ অনুসন্ধানে উহাকে জীবিত অবস্থায়ই আবিষ্কার করা গিয়াছিল এবং বর্তমানে সে সুস্থ শরীরে জীবিত রহিয়াছে। পরিচরার অভাবে ইতিপূর্বে শ্রীহীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর একটি পুত্রও অকালে এই প্রসূতি সদনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।”

ঘটনাটি যদি সত্য হয় এবং পূর্ব-বর্তী ঘটনার সত্যতাও যদি অস্বীকার করার যুক্তি কর্তৃপক্ষের না থেকে থাকে তবে তাঁদের তরফে ‘অশোকনগর বাতী’র প্রকাশিত আলোচনার প্রতিবাদ প্রেরণ করা উচিত ছিল। আলোচ্য পত্রিকার অভিযোগের উত্তরে কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করেছেন বলে পত্রিকায় উল্লেখ নেই।

সুতরাং ধরে নিতে হচ্ছে অভিযোগের উত্তরে কর্তৃপক্ষের ভাঙারে কোনও বক্তব্য নেই। থাকলে সে বক্তব্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। আর যদি এ জাতীয় স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদে ‘খোড়াই কেয়ার’ মনে করে কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলিকে অবজ্ঞা করে থাকেন, তবে তদ্বারা কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবই প্রকাশ পায়।

যে কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে হয় অনুদ্রুপ অভিযোগের প্রতিবাদ করতে হবে, নচেৎ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘাতে না ঘটে তত্ত্বাবধায় সজাগ থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যত প্রাপ্ত সংবাদে এ দুটির কোনটিই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রশ্নটাও সেখানেই। কর্তৃপক্ষের তরফে অবহেলা ও অবজ্ঞা যে অতি প্রবল, আলোচিত ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। অভিযোগ দায়ের করেও ‘অশোকনগর বাতী’ সাড়া পান নি। কিন্তু এজাতীয় অভিযোগের উত্তর দান বাঞ্ছনীয় ছিল।

আমরা এ বিষয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে আনুপূর্বিক বিবরণ সম্বলিত পত্রাদি আহ্বান করি।



ক্রমে তখন যুদ্ধ চলছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে যুদ্ধের গর্জন। কামান থেকে মেঘের মত গোলাবর্ষণ হচ্ছে। ঝড়ের পরে সমুদ্রের মত আকাশ যেন একটা ঘূর্ণিতে অচ্ছন্ন। দিনটা ভারি সাংঘাতিক ছিল। তার কথা মনে হলেই যেন বুক কেঁপে ওঠে। দুর্যোগময় শীতের সন্ধ্যা—বরফ পড়ছে। বিশ্রামের আশ্রয় বরফে ঢেকে যাচ্ছে। চারিদিকে মীরবতা বিরাজ করছে।

কৃষিক্ষেত্রে অশুভ ছায়া পড়েছে। চুসরাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধ-মৃত্যুর অশুভ বীজ যেন বুন দিচ্ছে। ফসল হবে কী—মৃতের স্তূপ চারিদিকে ছড়িয়ে। কেউ বা হাত তুলছে—কেউ বা ট্রেণের মধ্যে পড়ে; কারুর ছিন্ন হাত-পা মাটিতে পড়ে থেকে থেকে স্তূত হয়ে গেছে।

বিষণ উদার আকাশের নিচে একটি অল্প বয়সের সৈনিক শূন্যে ছিল। যুদ্ধ তার বিষণ। বারুদে আর যুদ্ধের নাল টেনে টেনে হাতে তার কালো কালো কড়া পড়ে গেছে। সে সাহসের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিল কিন্তু সামনে সে দেখছে আগুন আর তার বন্ধুদের মৃতদেহ পড়ে আছে। যা

হোক সে তাকালো একবার;—নান ধরে ডাকলো কিন্তু আত্ননাদ আর গোঁড়ানি ছাড়া কিছুই সে শুনতে পেল না। শেষে—একঘেরে ঠান্ডা, লক্ষ্যস্থলে গুলীবর্ষণের বাঁশ, সমস্ত ছেড়ে শান্তি আর নিশ্চিত বিশ্রামের জন্যে কোলাহল থেকে দূরে মাটির ওপর শূন্যে রইলো অচ্ছন্নতার মধ্যে তাকিয়ে—মৃত্যুর অপেক্ষা করে।

হঠাৎ সে তাকিয়ে দেখলো দিগন্তে আকাশের গায়ে তিনটে কালো ফোঁটার মত কি যেন ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওদেব পাখা আছে, সে পাখা ঘন কালো রঙের—দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ঝপ করে তারা ওর মাথার কাছে নেমে পড়লো। তিনটি ক্রাক—শূন্য বাতাসে ভর দিয়ে নোঁ পড়ে শব্দ চোখ মেলে তাদের শিকার লক্ষ্য করতে লাগলো। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন যুদ্ধের ব্যাপারে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন যুদ্ধের নিশান বয়ে আনছে তাদের পাখায় কবে।

এ আমার জন্যে এলো নাকি? আহত সৈনিক ভয়ে কেঁপে উঠলো। মাটির ওপর এত মৃতদেহ ছড়ানো—আর তাই দেখেই ওরা নেমেছে। এখন ওদের লক্ষ্য আমরাই।

কাকগুলো ভারি সুন্দর!—যেমন মোটাসোটা তেমনি ইচ্ছাপুষ্ট। গায়ে লোম থেকে পাখা পর্যন্ত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভরা। যুদ্ধ বেধেছে, চারিদিকেই মৃত্যুর স্তূপ—খাবার অভাব কী ওদের।

বাতাসে ভর দিয়ে নিচে নামলো কাকেরা। যে দিকে লাল লাল তুবার-গুলো পড়েছিল সে দিকে তারা ঠোঁট নামালো। এবার তারা কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো; আবো—আবো এগোল। যেখানে আহত সৈনিক পড়েছিল সেখানে এসে থেমে গেল।

একটা আর একটাকে ডেকে বললে: ভান্নে, আমি তোমাকে এখানে এই ফরাসী সৈনিকের জন্যেই নিয়ে এলাম। এই দেখ তোমার সামনেই পড়ে আছে। এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে—ভীরু, নির্বোধ আর অপদার্থ। দেখ ট্রেণে কোন আশ্রয় পায় নি ও, তাই মাটির ওপর পড়ে আছে।

: খুব ভালো শিকার। খুব ভালো ভোজ্য হবে। কিন্তু ওর কাছে যাবার আগে লক্ষ্য করতে হবে ওকে। তারপর আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা ঠিক করবো।

এই কথা বলল সবার বড় কাকটা। অন্য দুটো এই কথা শুনলে তাদের ঠোঁট

শেড়ে বললঃ ঠিক মজা, এস আমরা ভাগ করি।

তুমি শুনতে পাচ্ছ—সৈনিক। কি বলছে ওরা। সত্যিই কি তোমার প্রাণ বলে কোন জিনিস নেই। ওদের কথা শুনো—সামনের ধ্বংস—রক্তস্রোত কিছই তোমাকে জাগাতে পারলো না—! সে আবার নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়লো।

তারা ঠিকই বলেছিল সৈনিকের প্রাণ নেই। যখন তাদের বক্তব্য শেষ হলো তিনটে কাক তাদের পাখা মেলে, ঠোঁট বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। তাদের পাখাগুলো মতের ওপর দিয়ে দিয়ে আসছিল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

হায় রে হতভাগ্য ফরাসী সৈনিক। এরা তোমাকে ঘিরে ধরেছে তোমার রক্ত খাবে বলে—কারণ এরা বুঝেছে তুমি মৃত্যু-পথচারী—তুমি আহত।

ধীরে ধীরে তিনটে কাক এগিয়ে এলো। তারপর সে একেবারে মৃত কি না বোঝবার জন্যে তার আঙুলে একটা ঠোঁকর দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সৈনিক বেন জেগে উঠলো।—“মরে নি—মরে নি”—বলেই কাক তিনটে জাফরে সরে গেল।—

না—ফ্রান্সের আহত সৈনিক মরে নি। দেখ সে মাথা নাড়ছে। তার সর্বাঙ্গে জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠছে। তার চোখ ভরে উঠছে দীপ্তিতে—নাসারন্ধ্র নিশ্বাসে ভরে উঠছে। মনে হচ্ছে বাইরে বাতাস বহু ভারী তাই সে ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে—

শীতের সুর্ষের নরম আলো চান্দ্র-দিকে ছাড়িয়ে পড়লো—পড়লো মাটির বুকের ওপর। ধীরে ধীরে সমস্ত জড়তা কেটে যাচ্ছে—শীতের তীব্রতা কমে আসছে—। সুর্ষের আলোয় বরফ গলে যাচ্ছে—। বন্থা বসুন্ধরায় বুকে নবাস্কুর মাথা তুলছে।

জীবনের কি অপূর্ব শক্তি। আহত সৈনিকের যেন নবজন্ম হয়েছে। মাটির ওপর দুহাতের ভর দিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

সে দেখল কাক তিনটি উড়ে চলে যাচ্ছে সেই দিকে। সে দিক থেকে তারা

এসেছিল। সেই চির রাত্রির অন্ধকারে তারা বিলীন হয়ে গেল।

লোকে শুনতে পাচ্ছিল আকাশে তাদের পাখার দ্রুত শব্দ আর ঠোঁটের ককশ আওয়াজ। সেই দাঁড়কাকগুলো

পালিয়ে চলেছে ভয়ে আর নৈরাশ্যে। আর বাওয়ার পথে নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করেছে তারা।

[আলফ'স দোদের মূল ফরাসী গল্প 'লে গ্রোয়া করবো' অবলম্বনে]



সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেখীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, অধ্যাপকদাম্প্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ডাঙলপুর কলেজের ব্রহ্মচর্যশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলি) প্রমোদদাস



(পূর্ব পত্রিকাশিতের পর)

অনুদ্রুপদা

পাঁচজন নেতাব কথা উল্লেখ করেছি আগে। এদের মধ্যে অনুদ্রুপদার নাম পরে আর শেনা যায় নি। ১৯২০-২৪ সালে কিম্বা ১৯৩০ সালে যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তবে হয়ত, আমার মনে হয়, তিনিই হতেন দলের প্রধান পান্ডিত। কারণ মাস্টারদা, জুলুদা, জাম্বিকাদা—তিনজনই তাকে সম্মান করতেন। বহু ক্ষেত্রে অনুদ্রুপদার ঘূঁসুই তাঁরা মেনে চলতেন। “ভুলি নই”—এর কুন্তলদা সাহিত্যিকের সম্পনা। কিন্তু সেই কুন্তলদার কথায় আমাদের বাস্তব জীবনের গুরু ও মঙ্গলী অনুদ্রুপদার কথা মনে পড়ে। তাঁর সুস্থ দেহ দেখে কোনদিন স্বপ্নও ভাবি নি যে অপরিণত বয়সে বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন অসম্পূর্ণ রেখে নিঃশব্দে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন দুরারোগ্য টি, বি রোগে। সোঁদিন কেউ কাঁদল না। কেউ জানলো না বাংলাদেশের আরো একটি তরুণ-সূর্য অকালে অস্তমিত হল।

ভালো বলতে পারতেন, ভালো লিখতে পারতেন অনুদ্রুপদা; অল্প কথায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন

সংবিধান রচনা করোছিলেন তিনিই—পরে সেটা অনুমোদন করি আমরা সকলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রায় আড়াই বছর অনুদ্রুপদার সংগে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি আমি। তখন তিনি ছিলেন বদরুল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর আমি ছিলাম মাগিকতলার বি, টি ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ছাত্র। সেই সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর বৈশিষ্ট্য নীচ ও প্রতিভা, ইচ্ছাশক্তির মত দৃঢ়তা অথচ মানুষ্যিক বশ করবার অসীম ক্ষমতা। বদরুল গ্রামের বহু গৃহস্থের গৃহ-কোণে তাঁর আপনোপাস্য রক্ষণের কেন্দ্র ছিল। গ্রামের যুবকরা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত।

একটা ঘটনা খুব স্পষ্ট মনে আছে। জুলুদার নির্দেশে একটি অটোমেটিক পিস্তল আনতে গিয়েছি। অনুদ্রুপদার সংগে সেই আমার বদরুলে প্রথম দেখা। আমি যে যাবো তা তাঁকে আগে জানানো হয় নি। তাই একটু বিস্মিত ও সন্দেহিত হলেন তিনি। সন্দেহ দূর করলাম আমি সজ্জিত বাক্য বলে—“থোকা।” নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—“কোন পিস্তলটা চাই তোমার?”—“জুলুদা বলেছেন ৭ সট অটোমেটিক পিস্তল যাতে ‘S+S’

এই চিহ্ন আর একটা বাড়তি ১৫০০০ আছে।”

কখন নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল জানি না। বিকেল নাগাদ জিনিসটা এসে গেল—একজন প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ যুবক নিঃশব্দে হাতের প্যাকেটটি রেখে গেল অনুদ্রুপদার বিছানায়। সে চলে যাবার পর প্যাকেট খোলা হল। মৃদুচোখে তাকিয়ে দেখলাম। দ্বিভলভারের ট্রেনিং ভালোভাবে হলেও পিস্তল সম্বন্ধে আমি তখনও অজ্ঞ ছিলাম। যে অস্ত্র চালাতে জানি না তা বহন করা আমার কাছে নিয়ম বিরুদ্ধ বলে মনে হত। তাই অনুদ্রুপদাকে অনুরোধ করলাম এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে।

মাস্টারদা বা অনুদ্রুপদা—কেউই তখন অস্ত্র চালানায় খুব দক্ষ ছিলেন না। শারীরিক নয়, মানসিক শক্তির জোরেই তাঁরা বড় হয়ে উঠেছিলেন—বিপ্লবের পথে অটল ছিলেন।

পরে যখন ছোট ছোট আন্যেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য সৈন্যবিভাগের ছাপানো বই পড়েছি তখন জেনেছি কোনো গুলীভর্তি অস্ত্রের ব্যবহার শেখাবার সময় বন্দুক বা পিস্তল প্রভৃতির মৃদুটি—হয় মাটির দিকে নয় তো আকাশের দিকে রাখতে হয়। নইলে হঠাৎ গুলী ছুটে গিয়ে সামনের কোমর

জিনিসকে অস্বাত করতে পারে। আনন্দরাসের বিপজ্জনক ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুরূপদার সঠিক উপলব্ধি ছিল না আর এই নিয়মটোও জানতেন না। কারণ অসাবধানে হাত পড়ে হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল! ক্লিক্ করে একটা শব্দ—আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে কি বেরিয়ে গেল—তারপরই রান্নাঘরে রাধুনীর আতঁনাদ। তার ডান হাতে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করে গুলীটি তখন মেরুতে গিয়ে পড়েছে।

অনুরূপদা বিস্ময়ে বিমূঢ়। যখন বুদ্ধিলেন সত্যিই আমি অক্ষত দেহে আছি তখন তাড়াতাড়ি পিস্তলটা দু'কিলে ফেলে রান্না ঘরে ছুটলেন। রাধুনীর শারীরিক আঘাত সামান্য—প্রাথমিক চিকিৎসাতেই আরক্তে আনা গেল। কিন্তু শিশুতলের সামান্য আও-রাজ নিজের গ্রামের অধিবাসীদের কলন পেঁছে গেছে। সেইজন্য তখন রাধুনীর মানসিক চিকিৎসারই প্রয়োজন বেশ। সে তো আর বিস্মলবী দলের লোক নয়—এই 'সাংঘাতিক' ঘটনা লোকের কাছে বলতে ছাড়বে কেন? অনেক কষ্টে কোনমতে বুদ্ধির তাকে শান্ত করা গেল।

পিস্তল, কতুজ, ম্যাগাজিন সব ছুটলে আমার হাতে দিয়ে অনুরূপদা বললেন, “পালাও শীগগির।” পালাবার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটে বাবার উপায় নেই, লোকে মদেহ করবে। খীরে খীরে এগোতে লাগলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি মেসের দরজায় রীতিমতো ভিড়; থানা বেশি দূরে নয়। এর মধ্যেই সেখানে খবর পৌঁছে গেছে; একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার একটি কনস্টেবলকে নিয়ে সেই ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমি এ অঞ্চলে অপরিচিত। ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশি। স্টেশনের দিকে দ্রুত পা চালালাম।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে বিস্মলবী তরুণদল

সেই রাতেই পিস্তলটি নিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। আমাদের সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন—সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করতে হবে, যাকে সেযুগে বলা হত স্বদেশী ডাকাতি;—এরকম একটা অভিপ্রায় আমাদের ছিল। তবে এ বিষয়ে বিশ্বাসও ছিল প্রচুর। বিশ্বাস কারণ, সেই সময়ে ১৯২২ সালে যখন অসহযোগের আগুন বইয়ে থেকে নির্বাপিত

হয়ে দেশের যুবকদের মনে তুফের আগুনের মত ঐক্যবোধ জ্বলছে, তখন এরকম একটা ডাকাতির অর্থ—পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া যে আবার সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলছে। তাই অসহযোগ সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা চট্ করে কোথাও ডাকাতি করতে চাইছিলাম না। আবার কোথা থেকে যে অত টাকা পাওয়া সেও একটা দারুণ সমস্যা হয়ে উঠেছিল। অবিলম্বে প্রচুর টাকা চাই আর সে টাকা সংগ্রহ করতে হবে পুলিশের অগোচরে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন গান্ধী-জীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পুরোদমে চলছে। ছাত্ররা বেরিয়ে এসেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে; আইন-জীবীরা আদালত ত্যাগ করেছেন; বিশেষ বিশেষ দিনে সর্বত্র হরতাল পালিত হচ্ছে—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে সভা-শোভাযাত্রা। সে এক নতুন যুগ, নবজাগরণ। নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে দেশবাসী—বৃটিশ পণ্য বসকট্ করে, বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে, আর দলে দলে পিকেটিং আর শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় দিয়েছে।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পার্বত্য শহর এই চট্টগ্রামেও সে ঢেউ-এর ঢোলা এসে লেগেছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মহিম দাস, হিপদুরা চৌধুরী, কাজেম-আলি সাহেব—আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাঁরা। ১৯২১ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে দু'টি ঐতিহাসিক ধর্মঘট হওয়ায় চট্টগ্রামের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে; প্রথমটি ‘বুদ্ধ ব্রাদার্স’ নামে বিলাতী স্ট্রীমার কোম্পানীর ধর্মঘট, দ্বিতীয় ‘আসাম-বেংগল রেলওয়ে’ ধর্মঘট।

আমাদের গোপন বিস্মলবী দলের সদস্যরাও পিছিয়ে নেই। সুব সেন ও অনুরূপ সেনের নেতৃত্বে তারা বাঁপিপে পড়েছে অসহযোগ আন্দোলনে। স্কুল-কলেজের ধর্মঘট এবং ঐ দু'টি বড় ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমার রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যে সময়ের কথা নিয়ে এই অধ্যায় সুরু করছি, অর্থাৎ ১৯২২ সালের মাঝামাঝি, তখন আমরা দেড় বছর ধরে অহিংস আন্দোলন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে খানকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

পিতা-পুত্রের সংঘাত

এর মধ্যে তিনবার বাবার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনবার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছে। কিশোর বয়সের প্রথম উত্তেজনা, আদর্শের জন্য প্রাণ দানের আগ্রহ, পিতার উদাত্ত চরুটিকে অগ্রাহ্য করে মুক্তি-সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছে।

মনে আছে, আরো অনেক শূভা-কাঙ্ক্ষী পিতার মত, আমার বাবাও, আমাকে নিরস্ত করবার জন্য কত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিলেন—কত রকম ভয় দেখিয়েছিলেন! কিন্তু তাতে আমার মনের দৃঢ়তাই শূন্য বৃষ্টি পেয়েছে, বাবার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বাবা বলেছিলেন—

“দেখ তুমি আন্দোলনে যোগ দও তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আগে গান্ধীজী, সি. আর দাস—এদের মত বড় হও, শিক্ষিত হও, তবে তো? তুমি এখনো কত ছোট! পৃথিবীতে যে সব স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তার ইতিহাস তুমি কিছই পড় নি। আগে নিজেকে তৈরি কর। কিছ না বুকে শুনে হুজুগে পড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কি হবে?”

বাবার এই ধরনের যুক্তির উত্তর কি বলতে হবে জানতাম না। তবু নিজের সাধারণ বুদ্ধিতে যা এসেছে বলেছি—

“না বাবা, তুমি যা বলছ তা স্বার্থপরের মত কথা। স্বাধীনতার জন্য, দুশো বছরের পরাধীনতার শেকল ভাঙবার জন্য আন্দোলন সুরু হয়েছে। এখন এই গুরুত্রে যে যেমন অবস্থায় আছে তাকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন যদি আমি এবং আমার মত আরো লক্ষ লক্ষ ছেলে বলে যে আগে গান্ধীজীর মত হই তখন যোগ দেব,—তবে এখন এই আন্দোলন চলবে কি করে? ডাক যখন এসেছে, সে ডাকে সবাইকে সমানভাবে সাড়া দিতে হবে.....।”

এরপর বাবা অন্য পথ ধরেছেন—“নিরস্ত্র দেশবাসী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াবে? সরকার তো নিম্নমিভাবে আন্দোলন ধ্বংস করবে। কী করতে পেরেছে এতদিনে তোমরা? দলে দলে লোক লেগে গিয়েছে; কতজনের ফাঁস হয়েছে, স্বাধীনতার হয়েছে,—পুলিশ আর মিলিটারি এসে অত্যাচার চালিয়েছে, সব নষ্ট করে দিয়েছে! এ সব পণ্ড-প্রম-ছাড়া আর কি? এরকম পাগলামীকে

প্রদর্শন করে নিজেই ভবিষ্যৎ নথি করে না।

সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কিছুই পাড়ি নি। ওদিকে সে ধারণা বঙ্গমূল হয়েছিল তা থেকে উত্তর দিলাম—

“হ্যাঁ, এ পর্যন্ত সব আন্দোলনই ধ্বংস হয়েছে এটা ঠিক। ভবিষ্যতেও এরকম হবে; ব্রিটিশ সরকার প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন আমরা জয়ী হবো; সেই আন্দোলনই শেষ—। জানি না সেই শূন্যদিন কবে আসবে—এখনি, না আরো অনেকদিন পরে। কিন্তু তাই ভেবে তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারবো না। সকলেই যদি এই ভেবে মসে থাকে যে ‘সেই শেষ আন্দোলনে যোগ দেব’, তবে সেইদিন আর কখনই আসবে না।”

আমার এইসব যুক্তি-তর্কের অবশ্য কোনই দাম নেই বাবার কাছে। তাঁর মতে তাঁর আদেশ আমাকে মানতেই হবে। এইসব বাজে হুজুগ থেকে সরে আসতে হবে। আমি কিন্তু বাবার হুকুম মেনে সরে আসতে পারলাম না—আদেশ অমান্য করতে হল।

দেশবন্ধুর ডাক—স্কুল ছাড়

ছাত্র ধর্মঘট সকল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি তখন। আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার স্বর্গীয় দুর্গামোহন ঘোষ মহাশয় আমার বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, আমার নাম যেন স্কুল থেকে কাটিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর মতে আমিই ছাত্র-ধর্মঘটের ‘রিং-লিডার’ বা ‘প্রধান নেতা’।

স্কুলে পড়বার ইচ্ছে তখন আমার নেই। অসহযোগ আন্দোলনের পুরো ভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজী এবং দেশবন্ধু। কলকাতায় ১৯২০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি জালা লার্জপত রায় ডাক দিয়েছেন দেশ-বাসীকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ইংরেজের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব নয়। কেউ থাকে না ইংরেজের অফিস-আদালতে, কেউ ঢুকবে না স্কুলের গোলামখানায় ইংরেজের চাকর তৈরি হবার আশায়। দেশবন্ধু ছেড়ে দিয়েছেন আদালত যাওয়া। গান্ধীজী আর দেশবন্ধুর ডাকে আমরা বেরিয়ে এসেছি স্কুল থেকে। ইংরেজের হুকুম মত চলে যে বিদ্যালয়, সেখানে আমরা আর যাব না।

এই উদ্দেশ্যে সফল করতে তখন স্কুলে স্কুলে গ্রুপ মিটিং করছি।

কলেজ এবং স্কুলগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হচ্ছে যাতে একযোগে সর্বত্র ধর্মঘট সূত্র হয়।

দেশবন্ধু আসবেন চট্টগ্রামে—তাকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন চলছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের এই সমস্ত কান্ড-কারখানা দেখে ভর পেয়ে গেলেন। সমস্ত স্কুলগুলি সাত দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল যাতে ছাত্ররা স্কুলে এসে জড় হতে না পারে।

কিন্তু আন্দোলনের বন্যা যখন আসে তখন কোন বাধাই ঠেকাতে পারে না তাকে। এই সাতদিন আমরা প্রত্যেক স্কুলের অগ্রণী ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করতে লাগলাম। যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন থেকেই বিদ্যাসয় বর্জন করা হবে—এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সাতদিন পর নির্ধারিত সময়ে স্কুলের দরজা খোলা হল। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তাম। সেই স্কুলের ভার আমার ওপর। স্কুল বসবার আগে আমরা কল্লেক্সন বন্ধু মিলে উঁচু ক্রাস-গুলিহতে গিয়ে ছাত্রদের কাছে আবেদন জানাতে সূত্র করলাম এই ‘গোলামখানা’ ছেড়ে যেন তারা বেরিয়ে আসে।

এমন সময় আমাদের ক্রাস-টিচার আমাকে বললেন যে হেড মাস্টার মশাই আককে ডাকছেন। একটু ইতস্তত করছিলাম, কারণ এখনি ঘণ্টা পড়বে, আমি না থাকলে হয়ত ছাত্ররা শিক্ষকদের ভয়ে ক্রাসে ঢুকে পড়বে। তবু যেতে হল, কারণ তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ধর্মঘট।

লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি অন্য শিক্ষকদের মধ্যে হেড মাস্টার মশাই বসে আছেন। সোজা হয়ে দাঁড়িলাম তাঁর সামনে নিভয়ে। একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে দেখে নীরবতা ভঙ্গ করলেন তিনি,—

“অনন্ত, তোমার বাবা স্কুল থেকে তোমার নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তুমি স্কুলে এসে শৃঙ্খলা ভঙ্গ কর, এটা আমরা চাই না।”

আমি বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলাম,— “স্যাব চিরকালের জন্য গোলামখানা ছেড়ে চলে যাব, আর অসব না।”

ঠিক তক্ষণ একজন শিক্ষক বললেন,— “ক্রাসের সময় হয়েছে। দপ্তরীকে ঘণ্টা দিতে বলি?”

“হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি”—আদেশ দিলেন হেড মাস্টার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও দশ মিনিট ব্যাক—ক্রাস বসতে। মৃদুতঃ

এঁদের উদ্দেশ্যটা বুঝে নিলাম—আমাকে আটকে রেখে ওদিকে ক্রাস বসিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি অত সহজে ঠকতে রাজী নই। ওঁদের কিছু বুঝবার অবসর না দিয়ে হেড মাস্টার মশাই ও অন্যান্য শিক্ষকদের নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে একেবারে ছুটে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরী ঘর থেকে।

ঘণ্টা তখন বাজতে সূত্র করেছে। ক্রাস টীচার ঢুকবার আগেই আমি ক্রাসে ঢুকে আমার বন্ধুদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিতে লাগলাম। সংক্ষিপ্ত আবেদনের পর সমবেত ধ্বনি উঠল— “বন্দে মাতরম্”, “আজ্ঞা হো আকবর”, এবং “গান্ধীজী কী জয়”।

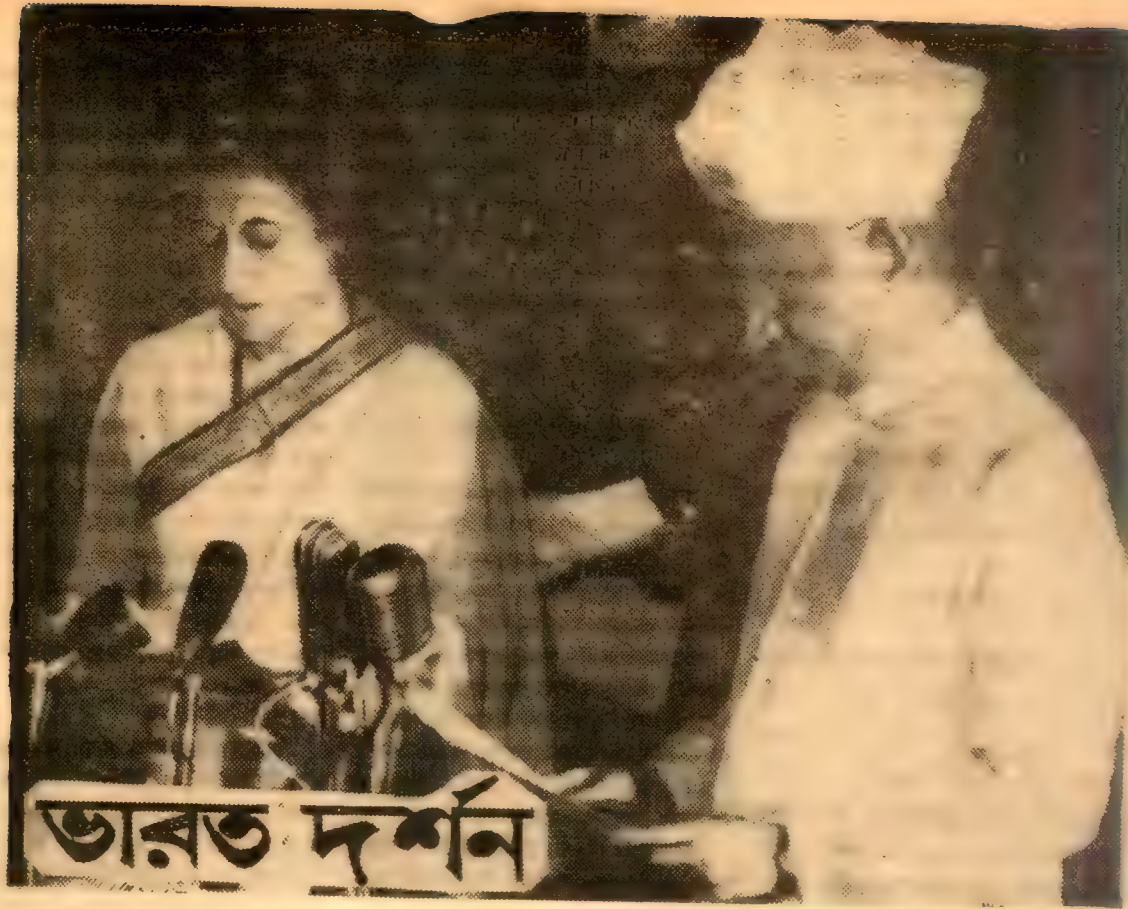
ধীরে ধীরে ক্রাস শূন্য হয়ে গেল। শূন্য বেঞ্চি আর চেয়ার-টোবল ছাড়া শিক্ষকের বক্তৃতা শুনবার জন্য আর কেউ রইল না। আমার সঙ্গীরা অন্যান্য ক্রাসে গিয়ে ঐভাবেই ছাত্রদের ডাক দিল। সমস্ত স্কুলে ছেড়ে ছাত্ররা এসে দাঁড়াল আমাদের পেছনে—তারপর সমবেতকণ্ঠে ধ্বনি তুলতে তুলতে বিরাট শোভাযাত্রা চললো রাজপথ দিয়ে।

চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, স্কুলের বারান্দায় শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রধান শিক্ষক—বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ এবং দেশের কাজের জন্য সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে বিদ্যালয়ের মধ্যে এরকম বিশৃঙ্খলা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

আশীর্বাদ

তাঁদের এ অসন্তোষ পরে আমরা দূর করেছি। অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের দায়িত্ববোধ এবং দৃঢ়তা, তাঁর পর ১৯২৩-২৪ সালের ব্যক্তিগত বৈলম্বিক প্রচেষ্টা, আমাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলার বিচার, জেল অন্তরীণ (internment) শেষে মৃত্যুপাবার পর শরীরচর্চা, যুবসংগঠন এবং সর্বশেষে ১৯৩০-এর সশস্ত্র অভ্যুত্থান—তাঁদের মনের সমস্ত সংশয়-বিরাগ দূর করে আমাদের প্রতি স্নেহ-প্রীতিতে অভিষিক্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন কেবল হুজুগে মেতে আমরা সেদিন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করি নি; দেশকে বিদেশী শাসনমুগ্ধ করবো—এই সংকল্প চিরদিন অটুট রেখেছি।

(ক্রমশঃ)



রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ প্রিন্সী ইন্দিরা গান্ধীকে শপথ পাঠ করছেন

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান

বারো দিন জাতীয় শোক পালন করার পর রাজধানী আবার উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। ভারতের সপ্তদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজধানী এক বিচিtr শোভা যাত্রণ করেছিল। সামরিক পদযাত্রীদের বলদপুত্র কুচকাওয়াজে রাজধানীর রাজপথ যেমন মুগ্ধরিত হয়ে উঠেছিল তেমনি বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুণী (tableau) এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। আগের ব্রাহ্মণের বারিবর্ষণ, সকালের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে সেদিন রাজধানীর লক্ষ লক্ষ লোক রাজপথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দিত করেছিল।

অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সবকাশ ছিল না, শাস্ত্রীজী ও ডঃ ভাবার বিরোগ ব্যাধার জাতি এখনো মুহামান। কিন্তু ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়েও এই বিশিষ্ট দিনটিকে উদ্‌যাপন করতে হয়েছে, মহিমামণ্ডিত করে ফুলতে হয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী, এন-সি-সি, অসামরিক কর্মী, নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞসহ প্রায় ১০ হাজার লোক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন।

কুচকাওয়াজে প্রায় আড়াই হাজার সামরিক অফিসার ছাড়াও পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে বারী বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তাদেরও কয়েকজন অংশগ্রহণ করেছিলেন। সৈন্যরিন, 'ডেজরাই', 'ধেম করণ' ইত্যাদি চ্যাক বখন অতিব্রম করে যাচ্ছিল তখন উৎফুল্ল জনতা করতাল দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করছিল।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সাংস্কৃতিক দল-গুণী এসেছিলেন তারাও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং বীরত্বগুণাকে তাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। এন-সি-সিরা বখন মোঁর্ষ, গুপ্ত, চোল, সুলতানী বৃগের বা রাজপুত, মারাঠা বা রাজ্য সিংয়ের আমলের বিচিত্র পোষাক পরে যাচ্ছিল তখন তা সহজেই উপস্থিত অতিথি-দর্শকদের সপ্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভারতীয় গণতন্ত্র আন্নার দাসের বিরোধী

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ জাতির উদ্দেশে যে বাণী দেন তাতে তাসখন্দ ঘোষণার ওপর জোর দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, এই দলিলটি হয়তো একেবারে নিখুঁত নয়, কিন্তু দুই প্রতিবেশী

রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে শত্রুত্বের পরিবেশ গড়ে ওঠে তার সদিচ্ছা এতে প্রকাশ করা হয়েছে। অস্ত্রের ব্যবহার বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়া যে-কোন দেশ ও জাতির পক্ষেই দুঃখজনক, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবুও মাঝে মাঝে এমন অবস্থা প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ও প্রধান-মন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের জামতরিকতা ও আগ্রহের ফলেই তাসখন্দ ঘোষণা সম্ভবপর হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আরো বলেছেন যে, বিবাহ মেটানোর উপায় হিসেবে অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ, বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করা, বুদ্ধিবিরতি সীমানা মেনে চলা এবং পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার শর্ত মানা হলেই উভয় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য ও সৌহার্দ্য বন্ধন গঠন। সেইজন্যই রাষ্ট্রপতি তাসখন্দ ঘোষণার পাশে অস্ত্রের পথে একটি বিনিমিত পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এর দ্বারা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এক নতুন দিকে মোড় নিতে পারে।

প্রিন্সী ইন্দিরা গান্ধীর লেভুয়ে ভারতে যে নতুন সুরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, সমসকারের সামনে অনেকগুণী পদযাত্র সমস্যা রয়েছে।

জীবন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জাতিগত গণতন্ত্র আদ্যের দাসত্বের বিরোধী। শ্রীমতী গান্ধী সমস্ত আদর্শের আবহাওয়ার মানস হয়েছেন। তাই ডাঃ রাধাকৃষ্ণ আশা প্রকাশ করেছেন যে, সাহস, সংহতি এবং মমতা-ধন ঘনোড়ার নিয়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে যাবেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইবেন। সৃষ্টিশীল স্বাধীন ব্যক্তির বিকাশের জন্যে কৃষা, অশ্রুতি, দূর্ভিক্ষ, নিরক্ষরতা, সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। মানবের কাছে এর চেয়ে অধিক-তর কাম্য আর কিছই থাকতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রীর বেতারভাষণ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উপস্থে তাঁর প্রথম বেতারভাষণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রগতিশীল ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, খাদ্যসমস্যাই এখন তাঁর সরকারের সামনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। তাই খাদ্যের দিকেই আগে নজর দিতে হবে, খাদ্য-সমস্যার কিছ, সুরাহা হলেই তবে অন্য সমস্যার কথা বিবেচনা করা যাবে। খাদ্য-সমস্যার প্রসঙ্গে তিনি কেরলের খাদ্যসংকটের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বেতারভাষণে প্রকৃত-সক্ষে তাঁর সরকার কী নীতি মেনে চলবেন জানাই ইংগিত দেন। প্রধানমন্ত্রী খাদ্যের দ্ব্যাপারে বলেন যে, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে দেশের সমস্যা মিটেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজনমত বিদেশ থেকে আরো খাদ্যসম্পদ আমদানী করা হবে কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থার ও খাদ্য-উৎপাদন বাড়ে বাঁধি পায় সোদিকে নজর দেওয়া হবে। অর্থাৎ দেশের স্বয়ংস্বত্বতা অর্জনের জন্যে তাঁর সরকার স্বপ্নবান হবেন।

শিল্পনীতি প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, সরকারী পরিচালনার যে শিল্পোদ্যোগগুলি রয়েছে তাদের অধিকতর উৎসাহ দেওয়া হবে, তবে দেশে বেহেতু মিশ্র অর্থনীতি চালু রয়েছে সেহেতু প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারী শিল্প-গুলিও সরকারী সাহায্য বা সহায়তা পেতে থাকবে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু, বা লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর নীতি পালন করে গেছেন তা থেকে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার বিচ্যুত

হবে না বলে জানাবেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন বজায় রাখার ওপরও শ্রীমতী গান্ধী দৃষ্টি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, ভাস্কর্য্য ঘোষণাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন যে, কথা ও কাজের মধ্যে দূরত্ব ব্যবধান দূর করার জন্যে প্রয়ো-জনীয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কার করা হবে।

উত্তর প্রদেশ :

চিত্তাভঙ্গ্যের বিসর্জন

গঙ্গা বহুনা ও সরস্বতীর পবিত্র ত্রিবেণী সংগমে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর চিত্তাভঙ্গ্য বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান নেন, তাঁর শেষ স্মৃতিও গঙ্গাকে বিলীন হয়ে যায়।

পরলোকগত বীরনেতার প্রতি শেষ প্রার্থা অর্পণের উপস্থে এই এলাহাবাদের ত্রিবেণী সংগমে প্রায় পাঁচ লক্ষ অনুরাগীর সমাগন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাতে ভক্তরা আসতে পারেন সেজন্যে স্বেচ্ছায় ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শাস্ত্রীজীর বড় ছেলে শ্রীহরিকৃষ্ণ পিতার জন্মস্থান পিতলের কলসীটি নিয়ে যখন গঙ্গা-

সবিনয় নিবেদন

ভারত-বন্ধু, রম্যা রঞ্জার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অতিরিক্ত কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সংযোজিত হওয়ার এ সূত্রে 'ভারত দর্শন'-এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদিকা

বন্ধে এগিয়ে যান তখন উপস্থিত সকলেরই চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। চিত্তাভঙ্গ্য বিসর্জনের সময় বিমান থেকে বাঁই ও গোলাপ ফুল বর্ষণ করা হয়।

বিসর্জনের পর সংগমতীরে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ ভাটে সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী, শ্রীমতী সূচোতা কৃপালনী প্রভৃতি শান্তি স্থাপনে শাস্ত্রীজীর অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন।

এলাহাবাদ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য পবিত্র নদীতে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাস্ত্রীজীর চিত্তাভঙ্গ্য বিসর্জিত হয়।

কেরালা :

কেরল বন্ধ

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৮শে তারিখে

কেরল বন্ধ উদ্ঘাটিত হয়েছে সমস্ত অফিস-আদালত, বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, বানবাহন বন্ধ রেখে। বর্ষভ্রমারে রেশনের দাবিতে কেরলের বাসিন্দা দলগুলি এসিস্ট্যান্ট নিয়-ছিল এবং কেরল কংগ্রেসও আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল।

এইদিন সমগ্র কেরলের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যদিও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতাদের পক্ষ থেকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকে নি। কয়েক জারগার জনতা উচ্ছ্বল হয়ে পড়ে। তারা মালগাড়ী আক্রমণ করে লুণ্ঠে প্রবৃত্ত হয়, বিশিষ্ট দৈনিক মাস্তুরি অফিস চড়াও হয় এবং ড্যান লুণ্ঠন করে ও পুলিশদলকে আক্রমণ করে। ফলে পুলিশকে লাঠিচালনা ছাড়াও কয়েক জারগার গুলীবর্ষণ করতে হয়েছে। তবে লাঠির আঘাতে দেড় শতাধিক আহত হওয়া ছাড়া গুলীর আঘাতে হতাহতের খবর এ-সংবাদ লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

কেরলের খাদ্যসংকট কিছুদিন ধাবি দলেই হয়ে উঠেছে, দৈনিক মাথাপিছু চালের পরিমাণ ও আউন্স থেকে ৪ আউন্স কমিয়ে দেবার ফলে খাদ্যসংকট আরো তীব্র হয়ে পড়ে। কেরলবাসীদের আরো অভিযোগ এই যে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যদিও খাদ্যের উৎপাদন রয়েছে তবুও সেখান থেকে এখানে চাল আমদানী করতে দিচ্ছে না সরকার। এ-প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার যে, এখানে এখনো রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ রয়েছে যার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ সঞ্চিত রয়েছে। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও কেরলের প্রতি এ-উদাসীন্যের ফলেই বাসিন্দাদলগুলি সাধারণ ধর্মঘটের পথ বেঁচে নিচ্ছে।

কেরল বন্ধ অভিযান বাতিলিত, রাখা হয় সেজন্যে রাজ্যপাল শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন সমস্ত রাজনৈতিকদলগুলির কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সে-আবেদনে কর্ণপাত করা হয় নি। উল্টে কেরল বন্ধ-এর দিন অজিত জৈন—ফিরে বাও' শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের এ-সংকট অবস্থাকে উপেক্ষা করে শ্রীজৈন শ্রীমতী ইন্দিরার পক্ষে ক্যানডাস করার উদ্দেশ্যে রাজ্যপালের পদে ইস্তফা দিতে চেষ্টাছিলেন বলেও জনগণের অভিযোগ শোনা গিয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজের মধ্যে কেরলে রেশনের চালের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। তা ছাড়া চালের বাফার স্টক এবং বাইরে থেকে চাল আমদানী করার জন্যে নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু এ সবই একটু বিলম্বে ঘটেছে বলে মনে হয়। মোটের ওপর কেরলের সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট থেকে বোকা যাচ্ছে যে এখানকার অসন্তোষের মূল গভীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে রোমা রোলাঁ ছিলেন বিদেশী রাষ্ট্রদূত। রাজনীতিতে বিদেশীকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার বাধা আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই বাধা নেই। একদেশের সংস্কৃতিকে অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রচার করার ভাব নিয়েছিলেন রোমা রোলাঁ। সংস্কৃতির কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, দেশ ও কালের গড়ন অতিক্রম করে তার প্রভাব-বিস্তার করার পথে কোনো বাধা নেই। রোলাঁ ভারত-বর্ষের কোনো ভাষা জানতেন না, আধুনিক বা প্রাচীনকালের কোনো ভাষার সংগে পরিচয় না থাকলেও ভারতবর্ষকে জানতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি।

রোমা রোলাঁ তাঁর কালের একজন প্রেরিত ফরাসী লেখক। সমালোচক, শিল্প ইতিহাসের বিশ্লেষক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ এবং আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে রোলাঁ স্মরণীয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে রোলাঁর সাহিত্যকৃতী নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

রোলাঁর মানসিকতা ছিল গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক, তাঁর অন্তরে মরমী-বাদ প্রচ্ছন্ন ছিল। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক, খৃস্টতত্ত্বের সব সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হয়েও রোলাঁ প্রচণ্ড জড়বাদের চাপে বিশেষভাবে আহত হয়েছিলেন, আর তার ফলে বাঁধার ধর্মীয় নীতি থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত ক্ষতি তাঁকে যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ করেছে, আজীবন সংগ্রাম করেছেন রোলাঁ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। 'দি লাইফ অব রামকুকে' রোলাঁ তাই বলেছেন—

"It is certainly not for us to depreciate Christian influences. I am a Catholic by birth, and, as such, have known the taste of Christ's blood and enjoyed the store house of profound life, revealed in the books and in the lives of great Christians, although I am outside all exclusive forms of church and religion."

এই মনোভঙ্গীর ফলে রোলাঁ অতি অল্প বয়সেই তলস্তয়ের নীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেন। আর্ট সম্পর্কিত ধারণা এবং যুদ্ধ-বিরোধী নীতিতে রোলাঁ পুরো-মায়ার তলস্তয়ধর্মী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রোলাঁ তাঁর সহযোগী মহলে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্য বিশেষ অগ্রণ ভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সারা বিশ্বের

স্বাধীন চিন্তা বানা বানা ক্রীড়ারী মুখোপাধ্যায়

গৃহযুদ্ধসম্পন্ন শান্তিকামী জনমানসে মানবদরদী রোলাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

রোলাঁর মহৎ উপন্যাস জাঁ-ক্রিসতাক, দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই উপন্যাসের মাধ্যমে রোলাঁ তাঁর নিজের জীবন-দর্শনের এক ইঙ্গিত দান করেছেন। জাঁ-ক্রিসতাক একজন জার্মান সঙ্গীতকার, গ্রন্থের অপর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের নাম ওলিভার। এই ওলিভার অনেকদিক থেকে গ্রন্থকারের প্রতিনিধি। দুই চরিত্র পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এমন এক ভাবের ইঙ্গিতদান করে, যা ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র বন্ধনের সহায়ক।

এই পর্বে রোলাঁর মনোভঙ্গী ইউরোপের এক অশুভের প্রতি প্রযুক্ত। ইউরোপের মানুষের মধ্যে কোন একতার বোধ নেই, যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে তাকে একটা মিথ্যতার বন্ধনে বাঁধা প্রয়োজন। জাঁ-ক্রিসতাক তাই বলে :—

"The Europe of to-day possesses no common book, it has no poem, no prayer, no act of faith which is the common heritage of all."

রোলাঁর লক্ষ্য ছিল এই অভাবকে পূর্ণ করার। ইউরোপের আত্মার বাণী-মূর্তি ছিলেন রোমা রোলাঁ। ইউরোপের অশুভ সাধনের এই প্রচেষ্টা একটা প্রতীক প্রচেষ্টা, রোলাঁর লক্ষ্য ছিল সারা বিশ্বের মধ্যে একটা মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করা।

স্টেফান ৎসোল্লাইখ্ রোলাঁর জীবনীকার। স্টেফান ৎসোল্লাইখ্ বিগতযুগের একজন স্মরণীয় জার্মান কথাসাহিত্যিক। ক্রিসতাক প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"Jean Christophe—the man, is the whole man, and Jean Christophe, the book embraces all that is human in the spiritual cosmos. This romance ignores no questions; it seeks to overcome all obstacles; it has a universal life, beyond the frontiers of nations, occupations and creeds."

জাঁ-ক্রিসতাক রোলাঁর জীবন বেদ। এই উপন্যাসটির রচনাকাল দীর্ঘকাল

বিস্তৃত। মূল পারকম্পনার সংগে যুক্ত হয়েছে লেখকের মানসিক ক্রম-বিকাশের অভিব্যক্তি। রোলাঁর চোখে দেখা ইউরোপ এক মহা সঙ্কটকালের ইউরোপ। জীবনরসিক সাহিত্য সাধক তাই এই বিরাট উপন্যাসে এত নিজস্ব দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১৯৩৩ 'কম্যুনে' প্রতিকার তরফ থেকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল রোলাঁকে 'কেন লেখেন, কার জন্য?'

রোলাঁ উত্তরে বললেন : "এই দুটি প্রশ্নকে পৃথক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি তাদের একত্রে জবাব দেব। লিখি, তার কারণ, না লিখে পারি না, কাগজে যদি না লিখি, তাহলে আমার মনে-মনেই লেখা হয়ে যায়, আমার চিন্তায় তাদের স্পষ্ট করে পাই। আমার কাছে লেখাটাই চিন্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, আমার কাছে লেখার অর্থ বেঁচে থাকা, নিঃস্বাস নেওয়া।"

রোলাঁ বিগত যুগের এক মহান চিন্তানায়ক। সব রকম বিষয়েই তিনি আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছেন, সার্ব বিশ্বজগৎ তাঁর আপনার, বিশ্ব মনের সমস্যা তাঁর নিজের সমস্যা।

তাই তিনি বলেছেন—'যারা চলমান আমি তাদেরই জন্য বরাবর লিখে এসেছি। আমি নিজে চলমান, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমার এই পরিকল্পনের আর শেষ নেই। জীবনের কোনো অর্থই নেই আমার কাছে যদি তা সমুদ্রপানে এগিয়ে না চলে।'

এগিয়ে চলার আনন্দে কৈশোর থেকেই পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছে জাঁ-ক্রিসতাকের মত রোমা রোলাঁর। জাঁ-ক্রিসতাক রোমা রোলাঁর চিন্তার ফলশ্রুতি এবং এই চরিত্রে তিনি নিজের চরিত্রকেও প্রক্ষেপ করেছেন।

পূরণ মতে জাঁ-ক্রিসতাক ছিলেন এক পরম বীর্ষবান বিচিত্র মানুষ, তাঁর রত ছিল যে তীর্থ-পথিকদের তিনি পারাপার করবেন। একদিন এক বালকের রূপ ধরে এলেন যীশুখৃষ্ট, তাঁকে পার করতে হবে, জাঁ-ক্রিসতাক তাঁকে কাঁপে নিয়ে নদী পার হবেন। নদীর মধ্যপথে পেঁপেছে এমন শক্তিশালী জাঁ-ক্রিসতাকও হাঁফিয়ে উঠলেন, ভার কম নয়। খন্ড তখন তাঁকে বলে দিলেন, ক্রিসতাক বিশ্বয়ের কোনো হেতু নেই, আমার সংগে আছে সারা ভুবনের পাপের ভার।

রোলা সেই ক্রিস্তাফকেই সৃষ্টি করে-
ছেন যে দেবতার সঙ্গে মানুষের পাপের
বোকাটাও কাঁধে নিয়ে চলেছে নদী পার
হওয়ার উদ্দেশ্যে।

উপন্যাস সম্পর্কে রোলা নিজেই
বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন,
তিনি বলেছেন—

“Jean Christophe and Oli-
vier had indeed to fight away
for themselves through the
political and social market-
place, giving blow for blow.
But, like their author in those
days, they had but one desire
to get out if it all and return
to their own realms: Mein
Reich ist in der Luft... the
realms of the air, the vision of
art.”

কিন্তু এই আশ্রয় লেখক পান নি,
চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এই
ভাবধারায় মধ্যে যে ভাঙামি আছে
রোলা তার প্রতিবাদ করেছেন। চিন্তার
স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য তিনি
আজীবন সংগ্রাম করেছেন। রোলা
বলেছেন বিদগ্ধ মানবের পক্ষে তার
ক্ষমলোকের সম্পদ ত্যাগ করা কঠিন,
করং আসল-রক্ত সামগ্রী ত্যাগ করা তার
পক্ষে অনেক সহজ, যা কিছু আছে,
এমন কি জীবন পর্যন্ত! কিন্তু
আইডিয়া? যদি আইডিয়াকে ছাড়তে
হয় তাহলে যেন মনে হবে অস্তিত্বই
সম্পূর্ণ হয়ে গেল কি আর রইল?

রোমা রোলা'র পথপরিভ্রমণ সাহি-
ত্যের ইতিহাসে এক অচিন্তনীয় বৈভব।
তার চোখের সামনে বিশ্বজগতের দ্বার
উন্মুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে
রোলা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দর্শনের
পরিচয় পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ
ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বজগতের
সামনে মেলে ধরেছিলেন, রোলা তাঁর
সুযোগ গ্রহণ করেছেন। চ্যাপম্যানের
হোমার পাঠ করে বীটলের মনে যেমন
একটা প্রতিবিম্ব ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথকে
প্রত্যক্ষ করে সেই অনুভূতি জেগেছে
রোলা'র মনে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব,
তার কর্মধারা ও রচনায় রোলা মুগ্ধ
হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোলা'র মধ্যে
মানসিকতার সমমর্মিতা আছে। দুজনেই
পাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে
বিশ্বাসী। রোলা যেমন মনে করতেন
ইউরোপের অনেক কিছু শিক্ষার আছে
ভারতের কাছে। রবীন্দ্রনাথও তেমনই
পশ্চিমের কাছে আমাদের হাত পেতে
নেওয়ার অনেক কিছু আছে তা বিশ্বাস
করতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“I believe in the real union
of the Orient and the Occi-
dent.”

রোলা বলেছেন — ১৯২০-তে
গান্ধীজীর নাম দিলীপকুমার রায়ের
সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শুনলেও ১৯২১-এর
এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং
১৯২২-এর এপ্রিলে কালিদাস নাগের
কাছে তাঁর সম্পর্কে শুনে তবে আমি
গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।
গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব এইভাবে আমাকে
স্পর্শ করেছে।

গান্ধীজীর সম্পর্কে রোলা এক-
খানি ছোট গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে
তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে
যে বৈপরীত্য আছে তা বিচার করেছেন।
তিনি ভারতবর্ষের এই দুই বিরাট
মনীষীর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে
বলেছেন—

“The controversy between
Tagore and Gandhi, between
the two great minds, both
moved by mutual admiration
and esteem, but as fatally
separated in their feeling as
a philosopher can be from an
apostle, a St. Paul from a
Plato, is important. For, on
the one side, we have the
spirit of religious faith and
charity seeking to found a
new humanity. On the other,
we have intelligence, free
born, serene and broad, seek-
ing to unite aspirations of all
humanity in sympathy and
understanding.”

রোমা রোলা'র মস্তিষ্ক ছিল
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিন্তু হৃদয় ছিল
মহাত্মাজীর সঙ্গে যুক্ত। এই পুস্তি-
কায় রোমা রোলা ভাবতবর্ষ এবং
পৃথিবীর কাছে গান্ধীচরিত্রের মূল্য
কি তার বিশ্লেষণ করেছেন গান্ধীজীর
অহিংসার মূল ভাষ্যের ভূমিতে
দু হাজার বছর আগে মহাবীর, বুদ্ধ
এবং বৈষ্ণববাদের মধ্যে নিহিত। গান্ধী
সেই নীতিকে বীরোচিত মর্যাদায়
পুনরুজ্জীবিত করেছেন। রোমা রোলা
তাই বলতে পেরেছেন :

“Gandhi is more than a
word; he is an example. He
incarnates the spirit of his
people, his people entombed
and then resurrected in him !”

গান্ধীজী সম্পর্কিত এই মন্তব্য

রোলা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে—তিনি যখন
কারাগারে তখন করেছিলেন। সেইকালে
গান্ধীজীর আদর্শ সফলতার সিংহস্বার
থেকে অনেক দূরে।

মহাত্মাজী এবং রোলা'র সঙ্গে
সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের
৬ই ডিসেম্বর তারিখে জিলেনাভে
নামক সুইজারল্যান্ডের বাগানবাড়িতে,
এ এক ঐতিহাসিক মিলন। এর আবার
হালকা দিকও আছে, রোলা নাকি ছাগ-
দুগ্ধের সন্ধান পথে বেরিয়ে ব্যস্ত
হয়ে প্রায় দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন,
সুইডিস চাবীরা এখনও এই গল্প করে,
কারণ, গান্ধীজীর তখন সেই ছাগ-
দুগ্ধই একমাত্র খাদ্য ও পানীয়।

ভারতবর্ষের অধ্যাপক পরিবেশ এবং
ভারতীয় দর্শনের অতীন্দ্র ধারা
রোমা রোলা'কে আকৃষ্ট করেছিল,
ভারতবর্ষের মরমী সাধনার গভীরে
অবগাহনের আগ্রহ ছিল রোলা'র, তাই
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের
জীবনী ও বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে সেই
বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে একটা
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তাঁর
সেই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি—

“Raukrishna the Man-God
and the Universal Gospel of
Vivekananda—A study of
Mysticism and Action in
Living India.”

এই নামকরণ থেকেই এই গ্রন্থ
লেখার পিছনে লেখকের কোন মনো-
ভঙ্গী বর্তমান তার পরিচয় পাওয়া
যায়। গভীর আবেগভরে ভূমিকায়
রোলা লিখেছিলেন—

“I can only see the same
river, a majestic *Chemin qui
marche* (road which marches)
in the words of our Pascal.
And because Ramkrishna more
fully than any other man not
only conceived but realised in
himself the total Unity of
this river of God, open to all
rivers and all streams, that I
have given him my love; and
I have drawn a little of his
sacred water to slake the great
thirst of the World.”

এই ভূমিকায় অত্যন্ত বিনীত
ভঙ্গীতে রোমা রোলা পাশ্চাত্যদেশীয়
মানুষের পক্ষে প্রাচ্যের চিন্তাধারার
মূল্যায়ন যে কত দূর হ'ত স্বীকার
করেছেন। কিন্তু যারা এই গ্রন্থ পাঠ
করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে
রোলা'র মূল্যায়ন নিভুল এবং নিখুঁত

হয়েছে। এই বিচারকর্মে রোলী পশ্চিমের মানব হিসাবে তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে যুক্তির বদলে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি,—বেদান্তকে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেন নি। রোলীর মতে,—

“I respect the faith of all and very often I love it. But I never subscribe it.”

এই ত' গেল প্রাচ্যদেশীয় পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত ভূমিকা। পাশ্চাত্য পাঠকের প্রতি আর একটি বিভিন্ন ভূমিকা লিখেছেন রোলী, সেখানে বলেছেন—

“I have dedicated my whole life to the reconciliation of mankind. I have striven to bring it about among the People of Europe.”

রোলী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-ধারার মিলন-সেতু রচনা করেছেন।

১৯২২ খৃস্টাব্দে রোলী তাঁর বিবর্তীয় সুবহু উপন্যাস ‘L’ Ame Enchantel’—বা মন্তমুখ আত্মা রচনা শুরু করেন। এই উপন্যাস তিনটি পর্বে সম্পূর্ণ। এই উপন্যাসের নায়িকা আনেত যুগ্মের একেবারে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে, সে হল জীবনের বাধা-বন্ধনহীন তরঙ্গ, তার মরণেই জয়, জীবনে পরাজয় নেই, ক্রান্তি নেই। সে কেবল সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। আনেত প্রেমময়ী রমণী, রাজনীতি তার রুচিকর নয়, এই ভালোবাসা আনেতকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। এই প্রেম তাকে যুগ্মের মাঝখানে নিয়ে এসেছে। তার সন্তান মার্ককে ফ্যাসিস্তরা ইতালীতে হত্যা করে, তখন আনেত—বিশ্ব-জনের মাঝে তার সেই অন্তরধনের প্রতি সঞ্চিত প্রেম ছড়িয়ে দিল। আর একজনের প্রতি ভালোবাসা নয়, সবাই তার আপন, সকলকেই সে ভালোবাসে। এই উপন্যাসের শেষাংশে সমাজবিধান, সামাজিক মনোবিদ্যা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে, রাশিয়ার বিপ্লব শেষ হলেও

প্রকৃত চিত্রটি তখনও অস্পষ্ট, তবু রোলী বা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে এই ইঙ্গিত করেছেন যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, মানবের যে শত্রু তার বিনাশ সাধনে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আনেত পুরাতন জগৎ পার হয়ে চলে এসেছে নবজাগরণের প্রদোষলসনে। যেদিন আনেত জরাজীর্ণ মৃত্যুপথ-যাত্রী, সেদিনও তার অন্তরে শান্তি, সে শৃঙ্খল আর মার্কের জননী নয়, সে যে সকলের আত্মার আত্মীয়, সে যে সকলের জননী। জীবনের মাঝে তার পরিচয়, মরণেও তার পরাজয় নেই। এগিয়ে চলার ছন্দে সে দীক্ষা নিয়েছে, সেই মন্তেই সে তার সমগ্র জীবনকে, আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এই তার গোপন্য। জাঁ-ক্রিস্তোফের পর রোলীর এই উপন্যাসটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

বাঙালী সাহিত্য সাধক রা ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে রোলীকে আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯২৫-এ কল্লোলের বন্ধুদের তিনি চিঠি দিয়েছেন কয়েকখানি, সে সব অচিন্ত্যকুমারের ‘কল্লোল’-এ আছে। কালিদাস নাগ ও গোবিন্দ নাগ দুজনে ‘কল্লোলে’ জাঁ-ক্রিস্তোফ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তখনকার কালে মূল ফরাসী থেকে। রোলী শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ (ক্ষিত্রীশ সেন কৃত অনুবাদ) পড়ে রোলী বলেছিলেন :

“What is wanted in the translation of your contemporary publications, as for example, we shall be happy to know the works of Sarat Chandra Chatterjee, whose small volume of ‘Srikanta,’ translated by K. C. Sen and Thompson, has struck our imagination by his art and original personality. Is it possible to arrange for the translation of some of the prose works of

your most distinguished living authors? That will be a work which will glorify your country, for they would be translated and spread in different countries of the West.”

রোলী মহোদয়ের এই উপদেশ আজো বাঙালী সাহিত্যিকের মর্মে পশে নি, আমরা কুমুদকে মত সামান্য প্রতিষ্ঠায় পুঙ্খলিত হয়ে আনন্দ করি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে বাইরের জগতে প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টা হয় নি।

রোলী ভালো-মন্দ অনেক রকমের বাঙালী দেখেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য জগদীশচন্দ্রকে দেখেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ না করলেও ষেটুকু জেনেছেন তার বিনিময়ে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তাঁদের জীবনী ও কর্ম আলোচনা করে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন। গান্ধীজীর সত্যগ্রহের দর্শন যেমন তাঁকে বিস্মিত করেছে, তেমনই আবার মীরট বড়-শব্দের মামলা তাঁকে ব্যথিত করেছে।

রোলীর বিরাট জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ‘I will not rest’ নামক ছোট গ্রন্থে। এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর মহান জীবনধারার বহু-মুখী চিন্তা এবং কর্ম-সাধনার ব্যাপক পরিচয় ছড়ানো আছে।

জীবন-শিল্পী এবং চিন্তানায়ক রোমা রোলী বিগত শতাব্দীর চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করেছিলেন তার মূলে ছিল সত্য, স্বাধীনতা ও মানবতার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। এই প্রত্যয়ের ভূমি থেকে তিনি কোন-দিন সরে আসেন নি, সেই তাঁর চরিত্রের মহত্তম বিকাশ, স্বাধীন-চিন্ত এই শিল্পীর জীবনের মূল্যবোধ কোনো প্রভাবে বিচলিত হয় নি, এই কারণে রোলী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আলোর পিপাসা

(ট্রিলোজি)

আশিসকুমার গুহ

বাতাসে মর্মর নেই; ঘন নীল বিষণ্ণ কুয়াসা—
ক্রান্ত জ্যোৎস্না স্বরে পড়ে অন্ধকার-আকাশের নীড়ে।
নদীর কুণ্ঠিত মূগ্ধে স্তম্ভ স্রোত-স্তম্ভিত হতাশা।
বাতাসে মর্মর নেই; ঘন নীল বিষণ্ণ কুয়াসা।

দীপের স্তিমিত দেহে তবু কাঁপে আলোর পিপাসা;
স্বপ্নের কণিকাগুলি ছবি আঁকে কস্পিত তিমিরে।
বাতাসে মর্মর নেই; ঘন নীল বিষণ্ণ কুয়াসা—
ক্রান্ত জ্যোৎস্না স্বরে পড়ে অন্ধকার-আকাশের নীড়ে।



মুসলিম-সমাজে “শাহরার” কোনো জায়গা নেই। শাহরার মানে কবি। ইসলামের পূর্বে আরবে অনেক বড় বড় কবি ছিলেন। আবু নিবাস খলিফা হারুণ অল বসীদেয় যুগের ব্যতিক্রম মাত্র। ইসলামের পূর্বে আরবে ছিল ‘কাহনুস’ আর ‘শওরা’। এরা সমাজকে নিজেদের ইচ্ছা মতন চালাতেন। ‘কাহনুস’ মানে জ্যোতিষী, ‘শওরা’ মানে কবির দল।

জ্যোতিষীদের কাজ ছিল ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎবাণী ছাড়া রণবার্তা রটনা। কবে কোন দেশের সাথে লাগবে লড়াই এইটাই বোধহয় ছিল রাজার বড় প্রশ্ন। রাজার কাজই ছিল রণক্ষেত্রে। কাহনুস-এর দল রাজার চারিপাশে ঘিরে থাকতো বুদ্ধিবিবর্তিকালে।

‘শওরা’-দের মর্ষাদা, ছিল আরব দেশে—যেমন ছিল হিন্দুস্থানে। ইসলাম বন্ধ করলো কবিতারচনা। বন্ধ করলো জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী।

“কাহনুস” আর “শওরার” দল খুঁজলো নতুন-উপজীবিকা।

মোগল কোর্টে কোনোকালে কবিতা নিষিদ্ধ হয় নি।

আব্বের থেকে শব্দ করে শাহজাহান—এরা সবাই ছিলেন কবিতা-প্রিয়। মকররের প্রথম রসটি ছিলেন কবিগ্রেষ্ঠ। আরাকে মুগ্ধ করেছে। তানসেনের মাঝাকে মুগ্ধ করেছে। তানসেনের জানের তো তুলনাই নেই।

মেয়েদের মধ্যে বাবর-কন্যা গুলবদন ছিলেন সুলেখিকা। ছিলেন বিদুষী রাজকন্যা। হুমায়ুন বাদশার জীবন-সঙ্গিনী হামিদা বানু বেগম পাণ্ডিত্যের জন্য ছিলেন পরিচিতা। ধর্ম-পরায়ণতায় তাঁর খ্যাতি ছিল আরও বেশি।

সম্রাট শাহজাহান নিজে কোনো সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেন নি। যদিও তাঁর পিতৃদেব রচিত তুঙ্গ-ই-জাহাঙ্গীরী সাহিত্যে ইতিহাস রচনা করেছেন।

এই লালকিল্লায় বসেছে কবির দরবার। কবির দল নিজেদের ভেতর কাড়াকাড়ি করেছেন নিজেদের জায়গা নিয়ে। কার জায়গা হবে সম্রাটের আসনের একটু কাছে।

জাহান-আরা ভালবাসেন এই কবির দরবার—মইফিল তাঁর প্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কবিদের নব নব ছন্দ সুন্দরী রাজকন্যাকে মুগ্ধ করে। সুফী কবিদের দল এখানে বেশি আদর পায় না। তাদের জন্য রয়েছে দারাইশকোর মঞ্জিল-ই-নিগমবোধ। সেখানে তাঁরা প্রাণভরে করেন প্রিয়-প্রিয়ার হৃদয় খেলায় বর্ণনা—গানে, গজলে। জাহান-আরার ইচ্ছা করে এই সভায় নিজেরও দু-একটা কবিতা পরিবেশন করতে।

প্রীতিবিবরণন ভট্টাচার্য

হৃদয়ের মনোরঞ্জনের জন্য কবি—এখন আর একটা রুবাই পেশ করছেন।

এক কবিতা?

এতে রয়েছে শুধু সম্রাটের স্তুতি। সম্রাটের প্রশংসা। এ কি কবিতা?

আশ্চর্য ব্যাপার! সম্রাট শাহজাহান, আহিমাচল দাক্ষিণাত্য যাত্রা করতলগত, শক্তিতে যিনি অপরাধের, নিমেষের স্তুতিবাদে তিনি গলে লল হয়ে গেলেন!

এ কি সাহিত্য?

এ কি রুবাই রচনা?

এরা শুধু সম্রাটকে কেন্দ্র করেই দিল্লীতে আজকাল রুবাই রচনা করছে কেন? এই তো সৈদীন দিল্লী-আগ্রার কবির দল সমবেত হয়েছিল লাল-কিল্লায় সম্রাট শাহজাহানের নিমন্ত্রণে। সমস্ত সম্ভ্রাহব্যাপী জাহান-আরা এই শুভ সাহিত্য-বাসরের জন্য প্রহর গুণ-ছিলেন। কিন্তু কি হল সেখানে?

দিল্লীর এই লালকিল্লায় কবিতা আবৃত্তির অপরাধে কবি শায়দারের

হয়েছিল নির্বাসন। শায়দা ছিল কবির হৃদয়নাম। শায়দা মানে পাগল। শায়দা পাগলই ছিলেন। সাহিত্যানুসারে মাতোয়ারা।

শায়দার অপরাধ?

অপরাধ হল কবিতায় সুরার গুণ-গান।

সুরাপানে দোষ নেই! সুরার গুণায় নির্বাসন।

শায়দা এই লালকিল্লাতেই আবৃত্তি করেছিলেন—

চিস্ত দানি বাড়ি-ই-গুলাগুণ

মুসাফা-ই-জৌহারি

হুসুরা পারাওয়ার দিগর উ
ইশকরা পরগম্বরি।

জানো কি মদিরার গুণ? গোলাপের মতন যার আভা, হীরকখন্ডের মতন যার উজ্জ্বল্য, সৌন্দর্যের বাহক, প্রেমের অগ্রদূত মদিরার গুণ জান কি?

শাহজাহান কি মেজাজে ছিলেন কেউ জানে না।

বেচারি কবির কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে বললেন।

কবি ভাবলেন কবিতা সম্রাটের হৃদয় স্পর্শ করেছে। মনের আনন্দে তিনি রসিয়ে রসিয়ে কবিতা পুনরাবৃত্তি করলেন। চিস্ত দানি বাড়ি-ই-গুলাগুণ—হঠাৎ সম্রাট গজল করে উঠলেন চোপরাও, বে-আদব, কামবাক্ত, বেশরম! থামোশ!

কবিতা আবৃত্তি শেষ হল না।

সম্রাটের হুকুম হয়ে গেল শায়দারের নির্বাসন দণ্ড! এতখানি বে-আদবী। কমবাক্ত বেকুব! সম্রাটের সামনে মদিরার গুণগান?

লালকিল্লায় মদিরার স্রোত বইতে পারে তাতে নেই গুণ সা। তাতে পাপ নেই। পাপ উড়ে এসে জুড়ে বসে তার আলোচনার!

কৌতুকময়ী এই দিল্লী নগরী কত কৌতুকই না দেখালে।

শুধু কি কবি শায়দা?

বেচারি চন্দ্রভান পণ্ডিত।

কবিতা লেখার অপরাধে সমস্ত জীবনের সম্ভিত রাজ-দাক্ষিণ্য হারালো। মাঝখান থেকে চাকরীটুকুও গেল। মুন্সীর চাকরীতে তবু কিছু অর্থ-গমের পথ ছিল। গেল তাও। কি আশ্চর্য। সম্রাটের কবিতার প্রতি এ বিরূপ ভাব কেন? কিন্তু বিরূপভাবই বা কি করে বলি, ভাবেন কবি শাহজাদী জাহান-আরা।

এই তো সৈদীন চোখের সামনে দেখলেন কবীর আচার্য সর্বস্বতীকে তাঁর কবিতার জন্য সম্রাট রাজকোষ থেকে উপঢৌকন দিলেন নগদ পনেরো শ' টাকা! একটা কবিতার জন্য।

মুজাহাদ শালিকে দিলেন এক হাজার টাকা।

শুধু কি উপঢৌকন?

এই লালকিল্লার কবিতা আবৃত্তি করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন দিল্লীর কবি জগন্নাথ।

কবি জগন্নাথ শুধু নিজের জগন্নাথ ছিলেন না, কলমের খোঁচায় সম্রাট শাজাহানকেও তুলে ধরলেন জগন্নাথের নাথ করে।

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথান পুরস্কৃত সমর্থঃ।
অনৈন পালৈঃ পরিদায়মানঃ
শাক্য বা স্যাক্ষবগায় বা স্যাৎ ॥

মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন—একমাত্র জগদীশ্বর আর দিল্লীশ্বর (সম্রাট শাজাহান)। অন্যান্য রাজারা যা দেন তাতে শুধু শাকটুকু কেনা যায়। অথবা মাত্র লবণটুকু।

লালকিল্লার সংস্কৃত কবিতার সমাদর কোনো অংশে কম ছিল না। পার্শ্বায়ান কোনো কবি থেকে সংস্কৃত কবির জ্ঞানগা কোনো মতে কম ছিল না। দিল্লীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জগন্নাথ এই কবিতা লিখে আপন মনোবাসনা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। জীবনে অর্থের তো কোনো অভাব রইলই না। উপরন্তু যা পেলেন তাতে হিন্দুস্থানের কবির দল ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারলেন না। লালকিল্লার সর্বজন-সমক্ষে সম্রাট শাজাহান কবির দরবারে জগন্নাথকে মানপত্র দিলেন। কবিকে নতুন উপাধিতে ভূষিত করলেন শাজাহান। জগন্নাথ হলেন “পণ্ডিতরাজ”।

জাহান-আরা অতি কষ্টে সৈদিন এ অবিচ্যাব বয়দান্ত করেছিলেন। হিন্দুস্থানে প্রকৃত কবিব আদর নেই কেন? এই দিল্লী মহানগরীতে সত্যিই কি নেই প্রকৃত কোনো কবি?

দিল্লীর কবিদের কবিতায় শুধু দিল্লীশ্বরের স্তুতিই থাকবে কেন? কেন এ আত্মপ্রবণতা? এঁদের কবিতায় কেন নেই দিল্লীর জনতার আশা-নিরাশার কথা? কেন নেই নর-নারীর সুখ-দুঃখের কাহিনী। সম্রাট এ বিষয়ে উদাসীন কেন?

জাহান-আরার মনে জাগে বিরোধ। এই এত বড় দিল্লী শহরে, সসাগরা হিন্দুস্থানের প্রাণকেন্দ্রে রাজকবি সাধারণ পণ্ডিত জগন্নাথ? কোথায় কবি কালিদাস? মেঘদূতের বিরহিণী প্রিয়ার প্রাণের পুঞ্জীভূত বেদনা কাহিনী রচয়িতার সমকক্ষ কবি নেই কেন এ বিরাট মোগল রাজসভায়?

দুলেরা শুধুমাত্র গায়ক।

তিনি পারেন না রচনা করতে
রুবাই? পারেন না মানুষের আনন্দাশ্রু
বেদনাঘন দিনের জমানো ছবি তুলতে?
মুস্তার মালার কত মূল্য? মানুষের
জীবনের কান্না-হাসির জমানো অশ্রু-
বিন্দু দিয়ে লেখা রুবাই দেখেছো কেউ,
সেই জীবন্ত ক্ষণস্থায়ী মৃত্যু? সেই
মৃত্যু রূপ পায় রুবাইতে। জাহান-
আরার রুবাইতে।

তৈমুর বংশে কেউ কবিতা লেখেন
নি। দারাইশকো তার একমাত্র ব্যতিক্রম।
আর একটি ব্যতিক্রম ঘটবে ইতিহাসে।
জাহান-আরার কবিহৃদয় নব-সৃষ্টির
বেদনাঘন মনে এক না-জানা অনুভূতিতে
চঞ্চল হয়ে ওঠে।

রুবাই লিখতে হবে মানুষের হাসি-
কান্না নিয়ে। লিখতে হবে আপন
জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনাকে কেন্দ্র
করে। অনুভূতিকে দিতে হবে রূপ।
এ নব-রূপায়ণের বিষয়বস্তু হবে
জীবনের অনুভূতি—আপন জীবনের
প্রেমময় অনুভূতি। প্রেম—ষে প্রেম
সম্মুখপানে চলতে জানে, চালাতে
জানে। যে প্রেমে রয়েছে প্রাণপ্রাচুর্যের
আনন্দ, যে প্রেমে আছে বেদনাঘন
বিরহ।

দিল্লীর লালকিল্লা থেকে এই নতুন
ছন্দ যাবে দূরে—দুরান্তে, নগরে
নগরান্তে শুধু মানুষের জয়গান গেয়ে।
জাহান-আরা যেন আশ্র ভাবতে পারেন
না।

দারিয়া বেগমকে ডাকলেন জাহান-
আরা।

দারিয়া একটু অন্যমনস্ক ছিল।

মরিয়ম তাকে ডেকে আনল।

—গুস্তাকি গাক বেগম সাহেবা।
ডেকেছিলেন?

দারিয়া বেগম, মরিয়ম শুধু জাহান-
আরার সেবিকা নয়। তারা এ শূন্য
জীবনে যেন তাঁর অতি আপন খেলার
সাথী। জীবন খেলার সখী।

মরিয়ম দারিয়ার নিকে তাকিয়ে
চোখের ইসারা দিল।

বাদশাজাদী মৃদু হেসে দুচ্চুম্বীভরা
চোখে বললেন, ‘হ্যাঁ রে দারিয়া, আজকাল
তোরা দিল্লী এত উদাস কেন বল তো?
আজকাল প্রায়ই তোকে ডেকে পাওয়া
যায় না। কখনও তুই আশ্রমানেব
দিকে তাকিয়ে থাকিস হাঁ করে। কখনও
দারিয়ার দিকে—দারিয়ার নৌকোর যে
দূরে ভেসে চলেছে তাতে তোর কি
আসে যায়? সত্যি করে বল তো কাবুদ
দিল্লী নিয়ে খেলচিস না? কোথায়
কোথায় ঘুরে বেড়াস? গুলরুখ গেল
কোথায়?’

লজ্জায় দারিয়ার সুন্দর নিটোল
মুখখানা লাল হয়ে গেল।

মরিয়ম মুস্তার দাঁতে ঝিকঝিক
খেলিয়ে হেসে গাড়িয়ে পড়ল।

জাহান-আরা বললেন, ‘শোন,
অনেক দিন তোদের রুবাই শোনানো
হয় নি। আজ আমার ভারি নতুন

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীহর - গোহাটী

লাভাভিক বসুদত্তী

রুবাই শোনাতে ইচ্ছে করছে।
রুবাই?

মাধবন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।
দারিয়া হাঁকি ছেড়ে বাঁচল।

যাক, তাহলে শাহজাদার মন
ধূশিতে ভরে আছে। তারা সেবিকা।
রাজকন্যার সুখে তাদের সুখ। রাজ-
কন্যার তাদের কান্না।
কান্নার তাদের কান্না।

রুবাই তো নিমিত্ত মাত্র।

তা ছাড়া রাজকন্যার রুবাই-এ প্রাণ
আছে। আছে যেন গোপনে বেদনার
রেশ—যে বেদনার মাখানো লুকানো
ভালবাসা। নারী-জীবনের গোপন
প্রেম। এ স্পন্দন তাদের অতি পরিচিত
জীবনদোলা। তারাও যে নারী।
তাদেরও যে রয়েছে নবযৌবন।

জাহান-আরা সাখীদের রুবাই
শোনাতে বসলেন।

বাদশাজাদী লিখলেন—

গর ময়সসর সবদ
আঁরুয়ে চো খুশিদ মরা
বাদশাহী চেকে নাওয়ারে
খুদাই বিকুনম

যদি সুখের মত জ্যোতিষ্মান তার
মুখখানা আমি পাই তা হলে চাই না
বাদশাহী, চাই না রাজত্ব।
দরিয়া, মরিয়ম, চোঁচিয়ে উঠলো,
সুবন! আল্লা বহুৎ খুব। বহুৎ খুব।
আর একটা কবিতা লিখলেন
জাহান-আরা—

ইয়ার আমদ দর বগল
বে মহনতে সব হায় হিজর
আশেকো দিয়ানা বদম
ইশতেয়াকম দাদ আজর।

আমার বন্ধু বিরহ-রজনীর স্পন্দন
বিনাই এসেছেন আমার বাহুডোরে।
আমি তাতেই ধূশি। প্রেমে আমি
জন্মী। ভালবাসায় বিনিময়েই পেয়েছি
আমার অন্তরতমকে।

মরিয়ম বললেন, 'আর একটা
হোক। আর একটা হোক।'

খোলা হিজরে কে বাশগ
আখেরশ ওয়াসল
খোলা করে কে গদদ
আয়নে আঁ আসন

এ যাতনা কি নকল?

বিরহ-যাতনার সুখ জান কি যে
বিরহের সমাপ্তি ঘটে মিলনে। নকল
আম তখন নকল থাকে না। নকলই
যে তখন আসলে দাঁড়ায়।

নক শস্ত ফনা বকাস্ত
বেরগী ইয়ে ইয়ার
বেরাগ বিশো ওয়া
রঙ হারা মশমার

বন্ধু ছাড়া, প্রিয়জন সান্নিধ্য ছাড়া
জীবন বৃথা। সাখীছাড়া জীবনে সুখ
নেই। নেই প্রাণ। মৃত্যুর নিশান
বন্ধুহীন প্রাণ। জীবনের সব রঙ
মিটিয়ে দাও। রঙের পিছনে আর
ছোটো না হে প্রাণ।

শুনবে আর একটা?

মরিয়ম, দরিয়া উৎসুক নয়নে
তাকিয়ে থাকে।

তারা শুনবে। আরও শুনবে। এ
যে তাদের হৃদয়ের কথা! এ যে বেগম
সাহেবার নিজের কাহিনী।

এ যে জীবন্ত নর-নারীর বেদনাঘন
অনুভূতির প্রতিচ্ছবি।

জাহান-আরা বলেন—

পীরে মনো খোদায়ে মন
দীনে মনো পানাহে মন
নেস্ত কসে বাগারে তো
শাহে মনো এলাহে-মন

হে আমার পীর, হে আমার খোদা,
হে আমার ধর্ম, হে আমার শরণ, হে
আমার হৃদয়ের রাজা, হে আমার হৃদয়ে-
শ্বর তোমাকে ছাড়া এ জীবন বৃথা।
আর একটা রুবাই লিখলেন সম্রাট-
নন্দিনী।

শাহা তুই আঁকে
মীরাসানদ জি সফা
ফৈজে নজর এ তো তালেবারা
বা খোদা—
বর হরকে নজর কুনি
ব মকশুদে রসদ
নদর এ নজর এ তো সদ
মগর এ নদর এ খোদা

হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি আমার
হৃদয় হরণ করেছ। খোদার কসম
তোমার নজর আমাকে তোমার দাস
করেছে। যার ওপরে পড়েছে তোমার
দৃষ্টি তার জীবন ধন্য। তোমার চোখের
আলো আজ ভুবন ফেলেছে ছেয়ে। এ
যেন দেবালোকের পূর্তরাশ্মি।

মাঝে মাঝে মরিয়ম দরিয়া ডান
হাতখানা নাচিয়ে আদাব পেশের ভাগে-
মায় বলে উঠছে বহুৎ খুব। বহুৎ খুব।
সুবন! আল্লা! সুবন! আল্লা!
এ্যাপ্রিসেশন ছাড়া আবৃত্তি ঠিক
জমে ওঠে না।

জাহান-আরা নতুন শক্তি পান
সখীদের আদাব পেশে।

লালকিয়ার সাইপ্রাস বীথির ডালে
উঁকঝুঁকি মারছে দোয়েল, ফিঙে।
আকাশে উড়ছে চাতক। অদূরে বইছে
প্রোতস্বিনী ষমুনা।

মোগল বাগানে আর কত ফুল?
ফুল ফুটেছে কবি রাজকন্যার
মনে।

জাহান-আরা গুনগুন করে
আবৃত্তি করলেন নতুন রুবাই,—

আমার বাগানে

ফুটেছে আজি গো লাখো ফুল
আমার শয্যা

কাহার গন্ধে এত আকুল?

গুলরুখ এতক্ষণ কোথায় ছিল
কেউ জানে না। জাহান-আরার এই
পরিচায়িকাটিকে খুব ভাল লাগে তার
শিশুসুলভ সরলতার জন্য। কারণে-
অকারণে গুলরুখ মম্বরের মতন বন্ধন
তখন নেচে ওঠে। মরিয়ম, দরিয়া
গুলরুখের দিকে তাকিয়ে ইসারায় চুপ
করে বসতে বলল। বলা যায় না।
মেরেটি যা চপলা, হয়তো এই
রুবাই-এর মাঝখানেই আবৃত্তির তালে
তালে নাচতে শুরু করে দেবে। গুল-
রুখের জীবনে রয়েছে একটা ছন্দ ঠিক
যেন জাহান-আরার কবিতার ছন্দর
মতন।

মদু হাসিতে গুলরুখকে ইসারায়
বসতে বলে জাহান-আরা আবৃত্তি
করলেন,—

মলীর অপূর্ব সৌরভ
ভুলার আমার মন
ভুলার সে ঐশ্বর্য বৈভব
কোথায় সে হৃদয় হরণ।

ষমুনার দুরন্ত বাতাসে
শাখে শাখে প্যাপিরা যে আসে

অদূরের কাশবন হাসে

বলে শূখ কোথা তোর প্রিয়তম জন।

তারে দিয়ে মন

এ জীবন করুক গোরব।

গুলরুখ আর স্থির হয়ে বসে
থাকতে পারলো না।

উঠে দাঁড়িয়ে এমন দেহলাসে
ভেঙে পড়লো যে সখীর দল আর হাসি
চাপতে পারল না। জাহান-আরা,
দরিয়া, মরিয়ম সবাই হাসির ফোয়ারায়
ভেঙে পড়লেন। অদূরের ষমুনার
তরণমালা খলখল ছন্দে শূখ বলল
এ হাসি কিসের জ্ঞানিস? এ হাসি
শূখ রুবাই-এর মুখ হাসি নয়। এ
হাসি চারটি জীবনের নবযৌবনের
অনাবিল হাসি। দেবালয়ে এ হাসির
তুলনা নেই।



সে রাতে ওরা মূবগীর মাংস আর আমসোলে তৈরি বিলিতী মদের আয়োজন করেছিল। তাছাড়া তিন তাসের ব্যবস্থাও ছিল। শূন্য ছিল না.....। তাই ঝণ্টা সরকার তার তামাটে-দাঁত বের করে জানোয়ারের মত হেসে বলেছিল,—এবারে পারলুম না। নেক্সট টাইমে নিওর। আসুন এবারে...। তার দুটো হাত তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং গোটা ঘরের হাস্কা বাতাস মূহূর্ত-মধ্যে সেই ঝাঁকে বিঘাঙ্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর মমতা, যদিও মস্তিস্কের প্রতিটি কোষে তখন শয়তান রাজত্ব করছিল তবুও আমি সে সময়ে একটুও কিছু ছুঁতে চাই নি। ওরা খুব সাধাসাধি করেছিল। কিন্তু, মিথ্যে বলব না, লোভ যে আমার একে-বারে হয় নি তা নয়। কেন না তখন আমার মন প্রলোভিত হবার পক্ষে যথেষ্ট উর্বর ছিল। ঠিক সেই ক্ষণ সেই মূহূর্তে যেন আমি আমার সনাতন দেহে তিনটি প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম। তিন হাজার। তারা ছটফট করছিল। আর ওরা পীড়াপীড়ি।

মনের মধ্যে যখন এই রকম দ্বন্দ্ব চলছিল তখন হঠাৎ দেখলুম ঘরে কড়িকাঠের ফোকরে দুর্গাট চড়ুই পাখি। সুখের নেশায় ঝিমিয়ে। হঠাৎ তারা চঞ্চল পাখিনায় ঢেউ তুলে যেন তাদের সুখকে সদম্বেত ঘোষণা করে আমার মাথার পাশ দিয়ে আঁধার গগনে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য! তবে কি ওরা ভর পেয়েছে? এত রাতে..., না ওরা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের নোংরামি প্রচাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছে?—রাগ কর না, তোমাব দেহেব প্রগল্ভ অঙ্গ-গুলো অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। পম্পাই নগরী থেকে শূন্য করে কোনারকেব দেওয়াল-চিহ্ন-গুলো জ্বলজ্বল করে উঠল। হঠাৎ মস্তিস্কের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় অস্বাভাবিক জ্বালা ধরে গেল। আমি তোমাকে স্মরণ করলুম। মাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলুম। এবং ডাবলুম বাবাকে স্মরণ করব না।

গহাবালিপদ্রমেয় নীল প্রকৃতিপটে ক্ষোদাই করা পাথর প্রতিমাগুলির শান্ত সমাহিত ধ্যান-গম্ভীর স্বর্গীয়

মুখশ্রী যেন অকস্মাৎ অমৃত অমৃত-বার্তা বয়ে আনল। শ্রীরঙ্গপত্তনবৈশাখ্যিত বিশাল বিষ্ণুব শীতল নিশ্চলতা যেন আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করতে চাইল। সারনাথের ভগ্ন বুদ্ধমূর্তিও শান্ত প্রসন্ন নির্বিড়তা যেন আমাকে আশ্বাস দিতে চাইল।—টাইয়ের ফাঁসটা ঢিল দিলুম। কেন না তখন আমি ঘামছিলাম।—হঠাৎ কেন এবকম হল? তবে কি আমি কোন পাপ কাজ ববে ফেলছি? কিংবা কবছি অথবা ববতে চলছি?—কবকবে তিন হাজার। শূন্য না শেষ?...কিন্তু আমি আবো চাই। সমস্ত কিছুতেই আমার অধিকার রয়েছে। এ পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই। ঠিক তা নয়, সমস্ত আইন তো মানুষেরই তৈরি। অতএব কে ঈশ্বর? কোথায় তিনি?—আমি এক গ্লাস জল চাইলুম।

নীতিন রায় নিষ্ফল আক্রোশে বলে উঠল,—বোতলের জল সামনেই আছে। খান না. কোন ভয় নেই। কেড়ে নেব না।

—প্রথম প্রথম আমারও ঐ রকম

হয়েছিল।—সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রতীপ মজুমদার বলল,—আমাদেরও প্রেসেটাজ আছে। নাথিং বাট এ ডেজ রিভ্রিয়েশান।

কে যেন বললে,—এই ভেজালের যুগে আনন্দের বড় অভাব। এখনও যে কেন বোমা পড়ে সব চুরমার হয়ে যাচ্ছে না তা বুঝে পাচ্ছি না।

জানলা দিয়ে দেখতে পেলুম অশ্বকার আকাশে অস্পষ্ট আলোর ছটা। ভূতের মত দাড়ারমান নারকেল গাছটার পাশ দিয়ে চাঁদ উঠছে। বাতাসে নারকেল গাছটার অলস পাতাগুলি সর সর করে আড়মুড়ি ভাঙছে। কিংবা আউনাদ করছে। প্রারাম্ভিক পরিবেশে দৃশ্য-মান তিনতলা বাড়িটা যেন বিশাল স্ফিংক্সের ভৌতিক গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার সামনের বন্ধ জানলা দু'টি যেন দু'টো ভয়াল চোখ হয়ে শাসনের ভাঙ্গিতে আমার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।—আমি বোধ হয় ভয় পেলুম। তবে কি আমি অসুস্থ?

—বেঁচে থাকার আর কোন মানেই হয় না। পি, ডব্লিউ, ডি'র খাই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। হেভী পাসেণ্টেজ। এদিকে পাবলিক কন্স্ট্রাক্টরকে গাল দিতে ছাড়ে না।

—তাতে কি সদ্ব্যবস্থা ফিরে এসেছে?

—কি যে বলেন! মরব নাকি? অনেস্টি কথটাই আজ ইতিহাসের গবেষণার বিষয়।

এ আমি কোথায় এসেছি? কেন এসেছি? এতই কি আমার প্রয়োজন? না পরিশ্রমের ভয়ে শটকাট?—চতুর্দিকের সিগারেটের সর্পিলা ধূম-মণ্ডলী যেন বিদ্রীহী হাইড্রোজেন সাল-ফাইডের গন্ধ ছড়াল। আমি রুমাল বের করলুম। এবং আবার জল চাইলুম।

—এই যে নিন।—একটা বোতল এগিয়ে দিল নীতিন রায়।

বোধহয় নানু চক্রবর্তী বলল,—পকেট ধরে পালাবার নিয়ম কিন্তু এখানে নেই। বদ্ব্যলেন মিস্টার—

—ওরা হেসে উঠল। ভেতরে ভেতরে রাগলেও ওপরে আমি কিছু বললুম না। কেন না ওরা আমার স্বল্প পরিচিত।

—বস্ত্র দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। এক দিনের মামলা যখন তখন সময় নষ্ট করে লাভ কি? পুরো এনজয় করতে হবে।—অনুপ ঘোষ তাস সাফল করতে লাগল।

নীতিন রায় বললে,—ডাবের জল দিয়ে খাবেন, না সোডাওয়াটার দিয়ে? প্রতীপ মজুমদার সিগারেটে সুখ-টান দিতে দিতে বললে,—র' মালই খান না। চট করে আমের আসবে।

—প্রথমে একটু হয়ত জ্বালা করবে, তার পরেই দেখবেন ইউ আর ইন ড্রিমল্যান্ড।—সাপের মত হিস-হিসিয়ে হেসে উঠল ঝট্টা সরকার।

—আরে মশাই, লজ্জা কিসের? আমরাও ভদ্রলোকের ছেলে। লম্পট কেউ নই। নানু চক্রবর্তীর গলার আওয়াজটা একটু কঠিন শোনাল।

আমি আপত্তি করলুম। ওরা অসন্তুষ্ট হল। এবং রেগে গেল। বিশ্বাস কর মমতা, সে রাতে ঠিক ঐ রকম কুটিল সময়ে তোমার কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। একটু একটু ভয়ও করছিল। যদি তুমি জানতে পাও তা হলে কি হবে? কি মনে করবে তুমি!—গভীর করে দিনও ভেবেছি তোমাকে কিছু বলব না। সম্পূর্ণ চেপে যাব। কিন্তু তাও পারলুম না। অশান্তির কাটা সর্বদাই মনের মধ্যে খঁচখঁচ করতে লাগল। তোমার বাবা বোধহয় জেনেছেন। জানি না তিনি তোমাকে কিছু বলেছেন কি না। অনেকই জেনে ফেলেছে। কেন না ছোট শহরে এসব দ্রুত ছড়ায়।—মনে আছে, টাউন ক্লাবের মাঠে এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে কি প্রসঙ্গে তুমি যেন বলেছিলে,—কোন সুস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোক, অন্তত বার মধ্য বিবেক বলে বস্তুটা আছে সে জেনে-শুনে কখনও কোন অন্যায়ই করতে পারে না।

—কিন্তু কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তার সঠিক সংজ্ঞা দেবে কে? তুমি যেটাকে অন্যায় ভাবছ আমি সেটাকে ন্যায় বলে ভাবতে পারি?

—এর উত্তর খুব সোজা সমাজ যেটাকে স্বীকৃতি দেয় না সেইটিই অন্যায়।

—তাহলে মমতা আমাদের এই মেলা-মেশাটাও অন্যায়।

—কেন?—তুমি থমকে দাঁড়িয়ে ছিলে।

—অবিবাহিত দু'টো যুবক-যুবতী সন্ধ্যার অশ্বকারে নির্জন মাঠের প্রান্তে প্রেমালাপ করছে, সমাজ এটাকে নিশ্চয় স্বীকৃতি দেয় না?—তুমি কোন উত্তর দাও নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলে। আমি জোরে হেসে উঠেছিলাম। সেই-সাথে তুমিও।—সেদিন রাতে ঐ সময়ে কেন জানি না ঐ কথাগুলিই বিশেষভাবে মনে পড়ছিল।

—আচ্ছা বেরসিক লোক মশাই।

—আগমার্ক নাকি?

ওদের মন্তব্যে হচ্ছে হল পালিয়ে আসি। এমন সময় সুশীত চৌধুরী বললে,—এবারে বসে পড়ুন রাদার।

ঝট্টা সরকার চাপা গলায় বললে,—বোর্ডের কালেকশনে এবার টনিক আসবে। এক্ষণি লোক পাঠাব।

আবার বসাটা কি ঠিক হবে? সহজ উপায়ে বিনা পরিশ্রমে এইটিই কি উন্নতির পথ? বিকেল থেকে একনাগাড়ে বসে থেকে থেকে শিরদাঁড়াটা টনটন করছে। জানলা দিয়ে দেখলুম নারকেল গাছের পাতাগুলো নড়ছে না। স্থির গম্ভীর। সেই তিনতলা বাড়িটা চাঁদকে ঢেকে অশ্বকারকে গাঢ় করেছে। শীতের রাতে জরানিত্য পাহাড়ের দুর্ভেদ্য বনে যেমন অশ্বকার ঘনায়, অমাবস্যার কালো রাতে চিল্লার বৃকে কালজয়ী মন্দিরের চব্বতরে যেমন অশ্বকার জমাট বাঁধে, ঠিক তেমন যেন জমা হয়েছে সামনের ঐ বাড়িটার গর্ভে। প্রকৃতপক্ষে সত্যিই অত অশ্বকার ওখানে ছিল না। কিন্তু 'অশ্বকার ক্রমে বাড়ছে' এই ধারণাটুকি অকারণেই যেন আমার মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

—এবারে শব্দ করুন নইলে ওরা আপনাকে কাপড়বুখ ভীরু বলবে।—কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল সুশীত চৌধুরীর কণ্ঠ।—না মমতা, আমি বসতে চাই নি। কেন না আমি ভদ্র-সন্তান। আমি ঠিক ঐ মূহুর্তে আর লোভ করি নি। কেন না আমি তোমাকে ভালবাসি।

—আঃ, বড় জ্বালাতন করছেন মশাই। নিন, তুলুন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকালুম। আর ঠিক সেই মূহুর্তেই আমার দেহের অতিরিক্ত সমবেত প্রাণ তিনটি যেন ছটফটিয়ে উঠল—আমাদের বঙ্গবাসী করবে না? আমাদের কি এমনি করে ফেলে রাখবে? নাও, তুলে নাও—রাজ্য জয় কর।

—আপনিই তো মশাই আজকের হীরা। আর সব তো মৃত সৈনিক। নানু চক্রবর্তী যেন দাঁতে দাঁত ঘষে বলল,—সত্যিই এবারে বাদাম তেলে পান্না খাব।

রাত বাড়তে লাগল। জোয়ার-ভাটার টানে টানে মনের স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণে পল্টাতে লাগল। এবং আমার সমস্ত দেহ যেন জ্বলে উঠল। ক্রম-বর্ধমান সে জ্বলন্ত আন্তে আস্তে আমার সমগ্র চেতনার সমগ্র সত্তার কোমল স্বককে যেন পোড়াতে লাগল। বিশাল বিশ্বের খবর আমি তুলে

গেলুম। পরিচিত সমাজ আমার মন থেকে মুছে গেল। বাবা-মার চেহারাও ব্যাপসা হয়ে উঠল। সর্বোপরি তোমাকে হারালুম।—মমতা, আমার তুমি ভুল বুঝ না।

হঠাৎ ঠুকঠুক করে দরজায় কে যেন আঘাত করল। আমরা সমস্ত হলুম। মৃত্যুতরঙ্গে প্রাণের সদৃশ্য উৎসর্গগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা চারদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিলুম। আবার শব্দ হল। আমরা চিন্তিত হলুম। এবারে প্রতীপ মজুমদার গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, —কে? উত্তরে দরজার বৃকে আঘাত আরো জোরে হল। আমি ভয় পেলুম।

ছুরু কুঁচকে দরজার দিকে এগিয়ে গেল প্রতীপ মজুমদার। অকারণেই আমার বৃকের স্পন্দনটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। গলাটা বড় শূন্যে শূন্যে ঠেকল। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল প্রতীপ মজুমদার।—আমার ফুসফুসের ওপর কে যেন একটা ধারালো ছুরি আমলে বসিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলুম কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। চোখের সামনে দ্রুত কয়েকটি দৃশ্য ভেসে উঠল। ফাঁসীর আসামীর চাইতেও নিজের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন মনে হল।

বাইরের আঁধার থেকে ঘরের আলোয় প্রবেশ করল একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। আমি চিনতে পারলুম—ধানার বড়বাবু। ওরা হেসে উঠল। অনুপ ঘোষ বলল,—কি ব্যাপার? গম্ভে গম্ভে নাকি?

—সে তো বটেই! মাল কই? ইন্সপেক্টর হাসতে লাগল।

—বস। বিশ্রাম কর। তারপর হবে। সাক্ষিস্বপ্নেট আনিয়েছি।

—নতুন লোক দেখছি!

—হুঁ নতুন আমদানী।—সুশীত চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিল। বড়বাবু। শ্রীবেণীমাধব সমাজদার।

হাত তুলে নমস্কার করলুম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

—কই গো শূন্য কর।—টুপিটা কোলের ওপর খুলে রেখে সেই চক্রের মাঝে বসে পড়ল ইন্সপেক্টর সমাজদার। তার টুপির নিকেলের তিসিংহ মূর্তিটা লাইটের আলোয় যেন বড় বেশি জ্বলজ্বল করতে লাগল।

শূন্য রাত। ঘরের মাঝে আমরা এককটি সভা নাগরিক। কারো মুখে কথা নেই। সামনে স্তূপ জমাছে আর

অন্তর্হিত হচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই কয়েকজনের চোখ নিঃশব্দ আক্রোশে কলসিয়ে উঠছে। অভিজ্ঞ কুলি সদীর যেন ডেভিস ল্যাম্পের শিখার সামান্য পরিবর্তন দেখে খাদে বিবাক্ত গ্যাসের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে আমরাও ঠিক তেমনি পরস্পরের মুখমণ্ডলের ক্ষীণতম পরিবর্তন সতর্ক চোখে লক্ষ্য করে মনের জটিল প্যাচিগুলি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। তবুও মাঝে মাঝে আনাড়ী কুলির মত ভুল করছিলাম এবং ফলস্বরূপ নিঃশেষিত হচ্ছিলাম।

—পাকা মাল তাই ভুল হয় না।

—সুশীত চৌধুরী হাসল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

—শেয়ানা ঘৃণা।—নীতিন রায় মন্তব্য করল।

পায়ের নিচে সব রেখে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর বেণীমাধব সমাজদার।

আমার মাথাটা ক্রমে ক্রমেই যেন একটা লোহার বলের মত ভারী হয়ে আসছিল। অশ্বকার থেকে সমস্ত কিংকিঁপোকাগুলো যেন আস্তে আস্তে আমার দিকে ছুটে এসে ভিড় জমিয়ে কলরব করছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে একটা একরোখা বুনো শূরের তার জেদের দাঁত ঘষে ঘষে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। শিকারীর গুলীতে প্রাণ হারাবার ভয়ে মোটেই সে সমস্ত নয়।—মমতা, লোভের কলুষ থাবা কি এমনি করেই মনুষ্যের সমস্ত রক্ত শুষে নেয়?

রাত কটা বাজে কে জানে। হাতে ঘাড় থাকা সত্ত্বেও হাতটা তুলে ঘাড় দেখবার প্রবৃত্তি হল না। কেন না তখন দৈহিক শক্তির বড়ই অভাব অনুভব করছিলাম। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। শব্দ মনে হচ্ছিল ঘরটার সমস্ত অস্ত্রজেন নিঃশেষিত হয়ে সে জায়গায় বিবাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস যমদূতের মত রাজত্ব করছে। তাও সহ্য হচ্ছিল কিন্তু ইন্সপেক্টর সমাজদারের ক্রমবর্ধমান হাসি কোন মতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল।

—নাঃ, ঠিক জমাছে না। মাল ছাড়।

—হায়েনাব মত হেসে উঠল ইন্সপেক্টর সমাজদার।

—এক রাউন্ড প্রসাদ হয়ে যাক।—বন্দু নর্দমার স্থির জলের মত লোভটা থমকে দাঁড়াল অনুপ ঘোষের চোখের তারায়।

কজন সিগারেট ধরাল। আর বাস্টা সবকার, নীতিন রায়, সুশীত চৌধুরী তিনটি চ্যাপ্টা বোতলের 'সীল'

মৃত্যুতরঙ্গে ভেঙে ফেললে তাদের দাঁতে।

ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। কোন এক নিশাচর পাখি তার ডানা ঝাপটিয়ে গিয়ে নারকেল গাছের মাথায় বসে বিদ্রী়ে সরে যেন কেঁদে উঠল। ওরা কেউ গ্রাহ্য করল না।

—বেড়ে মাল। একটু পশু কবতে পারলে আরো ভাল হত।—ইন্সপেক্টর সমাজদার মুখে তৃপ্তির চুকচুক ধ্বনি তুলল।

—ছিল তো সবই। ফাস্ট রাউন্ডই খতম হয়ে গেছে।

—আসুন, এবারে না বললে শুনছি না কিন্তু!—বাস্টা সরকার আমার পাশে এসে বসল।

এনার্জি নিন। নইলে স্ট্যান্ড করবেন কি করে?—নীতিন রায়ের কণ্ঠ বড়-মিষ্টি শোনাগল।

—ইয়ংম্যান, এই তো রিক্লেশনের টাইম।—ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত উৎসাহ দিল ইন্সপেক্টর সমাজদার।

বড় দুর্বল। বড় অসহায় আমি। রাষ্ট্র গভীরে আমার সম্মুখ অজিত প্রাণ অপহৃত। যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পকেটের ওপর হাতটা দিলুম। মৃদু মৃদু রোগীর মতই অবশিষ্ট প্রাণটুকু ধুকধুক করছে। না—না, তা হবে না। ভেতরের বুনো শূরেরটা যেন গর্জ উঠল—কি করছ তুমি? বন-বাদাড়-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে-খুঁড়ে যা পাবে তাই খেয়ে তুমি শক্তি সঞ্চয় করবে। সব তখনই করে দাও।

—ধরুন।—দেঁরি করবেন না।—হাতের ওপর বোতলটা দিল নীতিন রায়।

মমতা, আমাকে—তুমি ক্ষমা কর মমতা।—সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে যেন একটি গরম স্রোত বয়ে গেল। বোতলটা মুখের ওপর উল্টিয়ে দিলুম। একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো যেন জ্বলতে জ্বলতে পড়তে পড়তে

‘গুলাব চা’

তাজা ও সেরা। একবার
থিয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

মহাপ্রয়াণে

শ্রীমদীনকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাহির আকাশ থেকে জ্যোতির্ময় একটি প্রিয় তারা
অলক্ষ্যে কখন গেলো ঝরে;
এগারোই জানুয়ারী, না-জাগতেই দিবসের সাড়া,
এলো সেই বার্তা বুকে করে।
যদিও তা অবিশ্বাস্য, তবু মানতে হবে সত্যকেই,
হোক সে নির্মম অভিঘাত;
লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর এই মর্ত্যভূমে নেই—
বিনামেয়ে এ কী বজ্রপাত!

একটি মূহুর্তে যেন ভারতের অসংখ্য হৃদয়
বজ্রহত কঠিন পাষাণ;
সমবেদনার স্রোত আকাশেবও চোখ বাষ্পময়,
সরবিশ্ব শোকে গম্ভীরমান।
তবুও যে-মহাপ্রাণ দিয়ে তাঁর জীবন-সমিধ
জ্বালালেন শূভ যজ্ঞানল;
মরণ পায়ের ভূতা, জয়ী তিনি অমর শহীদ,
তাঁর কাছে তুচ্ছ হলোহল।

দীপ নক্ষত্রের মতো সত্তার প্রতিভা দীপ্যমান,
সে-আলোকে পথ আলোকিত;
সবার উপরে সত্য স্নেহ-মানুষ, তার জয়গান
দৃষ্টকণ্ঠে গিঁচ উচ্চারিত।

শুধু মহত্ত্বের মূল্যে ছোঁয়া যন্ন প্রাণের শিখর,
তিনি তার উজ্জ্বল উপমা;
মনুষ্যের প্রতি প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের নামান্তর—
এই ছিলো জীবনের প্রমা।

অটল সংকল্প নিয়ে তাসখন্দে নব ইতিহাস
করেছেন স্বহস্তে বচনা;
হিংসমত্ত পৃথিবীতে এনেছেন মৈত্রীর আশ্বাস
একোর বিপুল সম্ভাবনা।
প্রেমের অনন্তমন্ত্র, জপ করে সগোরবে তাঁর
মহারত হলো উদ্‌যাপন;
মুক্তিরঞ্জে সমর্পিত হৃদয়ের সব উপচার,
বেদনার পূজা সমাপন!

পরম স্বাধিক আজ আলোকের স্বর্গরথে চড়ে
অভিযাত্রী মহাতীর্থধামে;
বিশ্বমানবের মনে লেখা রইল অশ্রুর অক্ষরে
মহাকাব্য তাঁর পুণ্য নামে।
একটি অমূল্য গ্রন্থ যেন তাঁর সমগ্র জীবন,
কীর্তি তাঁর অপূর্ব অমৃত;
ঐ শান্তি, ঐ শান্তি—কণ্ঠভরা অমিয়বচন,
বিশ্বের প্রণয় শান্তিদূত।

বুকের মধ্যে দিয়ে নামতে লাগল।
আবার ঢেলে দিলুম। বমির ঝোঁক
সাদলাবার জন্যে একটা হাত দিয়ে
মুখটা শক্ত করে চেপে ধরলুম। উৎকট
একটা ঝাঁক নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে
এল। সেইসাথে কয়েক ফোঁটা তরল
পদার্থ। চরকিবাজীর মত যেন একটা
আগুনের হুঁকা সারা বুকের মধ্যে
পেটের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল।
বোতলের শেষটুকু আমি উজাড় করে
দিলুম। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে
এল।

বাইরের আঁধার আর দেখতে পেলুম
না। নিশাচর পাখির আর কোন কান্না
শুনতে পেলুম না। আমার চেতনায়
আর কেউ সাড়া জাগল না। তবে কি
ওরা সব মৃত? পৃথিবী নামক ক্ষুদ্র
গ্রহে আমিই কি একমাত্র জীবিত
প্রাণী? হাসি পেল। আমার প্রাণের
সামান্য স্পন্দনটুকুও যে মিলিয়ে গেল
তাও অনুভব করতে পারলুম না।
বুনো শূর্য্যোদয় এবারে ঘুমিয়েছে।
কিন্তু তবুও ও দাঁতে দাঁতে শব্দ তুলছে
কেন? আমার মাথার মধ্যে বুকের
মধ্যে হাজারটা রাস্টফারনেস জ্বলতে
লাগল।—ভাল করে তাকালুম। কত-
গুলি ঝাপসা মূর্তি। আস্তে আস্তে
তারা পরিষ্কার হয়ে যেন চেসম্যান,

হেনর্যাটি, আইসম্যান ইত্যাদিদের
মূর্তি ধারণ করল।

বহুদূর থেকে কে যেন বললে,—
বোর্ডে ধার রাখা চলবে না।

একটা নিরেট পাথরের হাত কোথা
থেকে যেন একটা ঘড়ি খুলে দিল।
এক সময়ে পেনটা নামিয়ে দিল।
তারপর কে যেন আমার হাতের ওপর
একটা রক্ততল এনে দিল। চোখ কচলে
পরিষ্কারভাবে সব কিছু দেখতে/চেষ্টা
করলুম।—পৃথিবীর রং এত লাল
কেন? এত গরম লাগছে কেন?
হিরোশিমার বিস্ফোরণে কি এত উত্তাপ
সৃষ্টি হয়েছিল?

মমতা, আমাকে তুমি ঘৃণা কর
মমতা।—আমার দেহের সমস্ত রক্তের
মধ্যে যেন কোন এক আদিম মাতাল-
করা-দামামা বাজতে লাগল। ভারী
হাতটা তুলে কপালে একটা টোকা
দিলুম। অশ্রুত গম্ভীর আওয়াজ।
মস্তিস্কের প্রতিটি কোষে কোষে তার
প্রতিধ্বনি বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘস্থায়ী
হল। ভীষণ শব্দকনো জিভটা নড়াবার
চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারলুম না।
অজস্র আলোকবর্ষ দূর থেকে যেন
এক বৃষ্টির প্রেতাখ্যার ধূসর কণ্টম্বর
ভেসে এল,—এবারে ওঠা বাক। রাত
প্রায় ভোর হল।

রাস্তার এত অন্ধকার কেন?
ধূস-নামা-খনির অতল গহবরেও কি
এত আঁধার বাসা বাঁধে?—আমি বাসায়
ফিরব। পৃথিবীটা কী ভীষণ ছোট
হয়ে এসেছে। এবারে আমি বামনা-
বতারের মত পা ফেলব। কিন্তু সব
কাঁপছে কেন? দুলছে কেন? চরমার
হয়ে যাচ্ছে কেন?—তবে কি এটলান্ট
তার কাঁধ পাল্টাচ্ছে? পুনর্জীবন লাভ
করে কি মৃতেরা কবর থেকে উঠে
আসছে?—এবারে আমি বিশ্রাম নেব।
আমি নিশ্চিতই ঘুমোব।

টুকরো টুকরো কথা আমার কানে
অস্পষ্ট হয়ে ভেসে এল। চোখ না
খুলেও বুঝতে পারলুম সূর্য উঠেছে।
মুখের ওপরে কার কোমল পরশ স্পষ্ট
অনুভব করলুম। চেষ্টা করেও হাত
দুটো নাড়তে পারলুম না। ভীষণ
ক্লান্ত। সমস্ত কিছু অবশ। দেহটা
কিছু যেন হালকা। চারপাশে অনেক-
গুলি শব্দ যেন একসাথে উচ্চারিত হল।
পরম তৃপ্তির ছোট্ট একটি নিশ্বাস
ছেড়ে আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাই-
বার চেষ্টা করলুম। দেখলুম কতগুলি
কোঁত-হলী ছায়াশরীর। আর একটি
লোম-ওঠা-রোগা-ঘেয়ো-কুকুর সন্নেহে
আমার মুখটা চেটে চলেছে।

যতীন্দ্রনাথ সান্দ্রনাথ

স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম

(পূর্ব-প্রকাশের পর্ব)

পূর্ব আত্মজীবনী

কলিকাতা। স্বাধীনতার আশ্রয়।

অগাস্ট মাসের শেষ হয় হয়। বাংলা-দেশের খবর এল: এই অগাস্ট তাবিখে স্বতন্ত্রতাবাদের বৈদেশিক লেনদেনের অফিস হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স-এ খানাদারসাঁ হবে পিঁপড়ে। হবিবুল্লাহ চক্রবর্তী আর তাঁর অনুরূপ মাখনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শৈলেশ্বর বসুর ভাইকেও।

হরিবাবু প্রভুত্ব নামে আগে থেকেই ১৮১৮ সালের তিন বেগলেশন অনুযায়ী ছায়া চাউন করা হয়েছিল। সেই আইনেই তাঁদের রাজবন্দী করে ফেলল সরকার। হরিবাবুকে গ্রেপ্তার কববার সময় ডেনহ্যাম নাকি বলেন, "I know, you are a fish of the deep water."

‘গ্রামস্বামী সমস্যা’-এর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সংবাদ পেয়ে অস্তর্ধান করেছেন তখন। তাকে পুলাশ খুঁজছে।

কলকাতার অল্পাঙ্গা সংগীন। যতীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সহকাবী নেতারা নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন: কী কতব্য?

—খরা দেওয়া চলবে না। খরা দিস না।

জবাব পাঠালেন যতীন্দ্রনাথ।

হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বরূপ সম্বন্ধে ভারত সরকার পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন ব্রিটিশ প্যাসিফিক ক্রীটের গোয়েন্দা বিভাগের সাক্ষ্যবাহিত বার্তা। তাবৎবে বিংশাবীবা বিদেশ থেকে পাওয়া ব্যাংক-ড্রফট ভাঙাতে গিয়ে একবার সন্দেহভাজন হয়ে গেলেন। এব পবে গৌজ করতে করতে হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বরূপ আরো উদ্ঘাটিত হয়।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীদেব আভাস দেন যে, এর পবেই চোম আসতে পারে বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোবিয়াম-এর ওপব: শৈলেশ্বরকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাবপরেই পুলাশের দৃষ্টি পড়বে কলিকাতার ওপব। খুব সাবধানে এখন থাকা প্রকার।

আর নালনী স্তরকে যতীন্দ্রনাথ কল-

কাতায় পাঠিয়ে দিলেন সেখানকার সকলের কুশল আনতে এবং তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দিতে: ধরা পড়া চলবে না।

যাদুবাবু লিখেছেন যে, বালেশ্বর যাবাব আগে স্বতীন্দ্রনাথ তাঁর মনের বাসনা প্রকাশ করে বলেন যে, বহু যুগ ধরে অখীন থাকার দবুশ জাতটা হীনবীর্য হয়ে গেছে। দেশের ছেলেকে বন্দুক ধবিয়ে তিনি লাড়িয়ে যেতে চান। সবচেয়ে কমপক্ষে এবরর এটুকু করে যেতে হবে। দেশের যুবক যুরে দাঁড়িয়ে লড়তে জানে, জাতির চিররে এই পবিত্র নটুকু এনে দিবে তিনি যাবেন। তাঁর কথায় কেমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল। তাঁর সামনে গেলে ভীরুও বীর হয়ে যেত। ‘না, হতে পারে না’—এমন কথা তাঁর শব্দভাণ্ডারে ছিল না। তাঁর সামনে থাকলে ‘অসম্ভব’ কথাটা অন্তর থেকে মুছে যেত।

যতীন্দ্রনাথকে ওদিকে বিদেশে সবিষে নেবার জন্যে নরেন ভট্টাচার্য উঠে-পড়ে চেষ্টা কবছেন; দেশের ভ্রমাবহ পবিস্থিতিতে বিপ্লবের গুরুকে বাধা মোটেই আর নিরাপদ নয়।

হেসে যতীন্দ্রনাথ উড়িয়ে দিলেন এই প্রস্তাব।

দু-একজন শিষ্যের মনে চকিতে খেলে গিয়েছিল স্বতীন্দ্রনাথেরই প্রিয় একটি উক্তি, “আমরা মক, জাত জগাবে তাতে।”

তবে কি? —অসমাপ্ত থাকে শিষ্যদের মনের সংশয়। অসম্ভব সেই পলিগতির কথা ভাবতেও শিউরে ওঠে তাঁদের অন্তর। শিব-বিহীন যজ্ঞ কণিকের জন্যেও যদি-বা সম্ভব হয়ে থাকে, বিপ্লবের এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ বাধাবিহীন হয়ে যাবে মহানায়কব অনুরূপ পবিস্থিতিতে!

বালেশ্বর জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট বেজিনাথ জজ কিলারি আদালতে যে বিবর্ত দেন তাতে তিনি বলেছিলেন, “৪টা সেপ্টেম্বর (১৯১৫) মাঝ রাত্তর ট্রেনে বাংলাদেশ থেকে এসে

* বিংশাবী জীবনের স্মৃতি : ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী : পঃ ৪২৮।

উপস্থিত হন মিঃ ডেনহ্যাম, মিঃ বার্ড, এবং মিঃ টেগার্ট।

“১৯১৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ভোব-বেলা আমি পুলাশ সুপারভেন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে খবর পাঠাই, তিনি অবিলম্বে আসেন। আমি তাঁকে সমস্ত কনস্টেবল সংগ্রহ কবতে বলি। বালেশ্বর শহরের জেনার্যাল (ইউনিভার্সাল) এম্পোবিয়াম খানাদারসাঁ কবা হবে।

চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট এবং লেসলি নিউম্যান বার্ড তখন কলকাতার ডেপুটি পুলাশ কমিশনার। আব গডফ্রে চার্লস ডেনহ্যাম কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ডি, আই, জি, বাংলাদেশ তোলপাড় করে তুলছেন বিংশাবীদেব নাজেহাল কববার অভিপ্রায়ে।

চার্লস টেগার্ট স্বতীন্দ্রনাথকে গর্মে গর্মে চেনেন। স্বতীন্দ্রনাথ একাধিকবার টেগার্ট সাহেবকে হাতের মুঠোয় পেয়েও করুণাব হাসি হেসে ছেড়ে দিবেছেন তাঁকে। এই টেগার্টই যৌদিন ১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী তাবিখে সমস্ত পুলাশ নিয়ে স্বতীন্দ্রনাথকে অবশেষে গ্রেপ্তার কবতে যান, তখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখিখে স্বতীন্দ্রনাথের হাতে হাতকড়া পবাতে তিনি এগিয়ে যাবার সময় এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে, হোট্ট খেয়ে পড়ে যান; যতীন্দ্রনাথ সহায়ো এগিয়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরে বলেন,

“Beg your pardon, Mr Tegart!”

এই সেপ্টেম্বর ভোববেলা পুলাশ হল ইউনিভার্সাল এম্পোবিয়াম খানাদারসাঁ প্রায় বারো ঘণ্টা ধবে দীর্ঘ অনুরূপখানের শেষে সম্ভাবজনক তেমন কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে।

তবু গ্রেপ্তার কবা হল শৈলেশ্বর বসু, তাঁর সহকাবী নিমাই এবং স্থানীয় সহচর

* ‘আত্মজীবনী’ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০ চন্দ্রাব্দ।

নারায়ণ স্বাক্ষরকারীকে। নারায়ণবাবু আবশ্যিক বিভাগেব কমচারী।

কিন্তু 'ইউনিভার্সাল এম্পায়ার' থেকে তারা হাদিস পেয়ে সেলেন কপিপদা জন্মলেন। বালেশ্বর থেকে তা' কতদূর, কি ভাবে সেখানে যাওয়া যায়, সব হাদিস নিলে টেগার্ট কিভাবে সাহেবের কাছে।

মাত্র দ্বিধা মাইলের ব্যবধান দূর, টেগার্ট স্থির কবলেন : অবিলম্বে কপিপদা যেতে হবে।

অগত্যা, বালেশ্বরের সশস্ত্র পুলিশ, নীলগিরি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ও ময়ূরভঞ্জের সশস্ত্র পুলিশকে সতর্ক রেখে, দলবল নিয়ে সাহেবেরা রওনা হলেন কপিপদা অভিমুখে।

গ্যাজেট্টে কিম্বি সিখেছেন, "দুটি মোটর নিয়ে আমরা রওনা হলাম...৬ই সেপ্টেম্বর সকালে। একটি মোটর পুলিশের, অপরটি গ্রুপ ডিপার্টমেন্টের। আমাদের দুটো ধারণা হয় যে, কপিপদা কাছাকাছি কোথাও রাজনীতির দিক থেকে আপত্তিকর করে দেবার একটি আশ্রয় আছে। ৬ই সেপ্টেম্বর পর আমরা পৌঁছলাম সেখানে।

"সেই রাতই আমি ময়ূরভঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসেব কছে চিঠি দিলাম, কারণ কপিপদা তাঁই এলাকাকূড়। তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে আট এলেন।..."

৬ই সেপ্টেম্বর সেখানে আগেই যতীন্দ্রনাথের কাছে খবর এসে মোটর করে সাহেবেরা আসলেন; তাঁদের পিছু পিছু হাতীর পিঠে ছুপে অস্ত্রধারী নিয়ে বহু পুলিশও আসছে। কপিপদার ডাকবাংলোর এসে উঠলেন আগন্তুকরা। তাঁদের ময়ূর যতীন্দ্রনাথের অজানা নর। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে নদী পার হয়ে তিনি বাংলার খুব কাছ থেকেই ঠাहर করে এলেন তাঁর পুরনো বন্ধুদের।...

চ্যুত পদক্ষেপে তিনি আশ্রয়স্থান ফিরে এলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন আশ্রয়ের সবাইকে। আর চিত্তপ্রিয় ও মনোরমকে বললেন : এখনি বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে নে।

শিখ্য দুজন বিশেষ করে পীড়াদীড়ি কর্ত্তে লাগলেন : "দাদা, আপনি আমাদের ডাকনা না ভেবে জগলের নির্দিষ্ট পথ ধরে লহজই তো অস্ত্রধারী করতে পারেন। আর তা' হলে দেরি করবেন না। আমাদের মতো সাধারণ সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণের অধিক-আপনি যদি নিজের বরণ করে নেন, লজের সনাই আমাদের কী ভাবে বলুন তো? আমরা প্রাণ থাকতে এভাবে আপনাকে বিপদের মধ্যে এগিয়ে যেতে দেব ন, দাদা।"

যতীন্দ্রনাথের চোখের পথে দুটো সঙ্কল্প ফোঁস হয়ে আসে ব্যক্তিগত ভাবনায়, "শেখেরা তোরা যাঁরা আমার খুব কাছে থাকিস—তোরা অস্ত্র তেমনই দাব্যকে জুল

বুঝাব না। বিপদে পড়ে আত্মরক্ষা করাই বুঝি নেতার প্রধান কাজ, পাগিয়ে যাওয়া? যে-যার সম্বন্ধের সামনে দাঁড়িয়েও তোরা আমার বলতে পারছিস অস্ত্রধারী করতে, সেই সম্বন্ধই তো চোরেছি আমরা মনেপ্রাণে। তাকে এই চরম লেনে সমাদরে বরণ না করে পালাতে যাব কেন বলতো?"

আশ্রমে তখন ভীমা নামে এক রোগী শয্যাগত। দরিদ্র প্রামাণ্যী সে—খানিক আগেও নিজের হাতে সাধুবাবা তাকে পথ দিচ্ছেন।

সে সজল চোখে যতীন্দ্রনাথের হাত দুটো ধরে সহজ আবেগে বলে, "স্বামীজী-রাজা, তোমাদের কেন চলে যেতে হবে আমি বুঝতে পারছি না। বোধহয় তারা এসেছে শুনছি—ওরা তোমাদের শত্রু। তবু আমি বলি, তোমার এই ভীমার মতো আবে অনেক অভাগা দিন গুণছে তোমার জন্যে। তুমি আমাদের দেবতা—তুমি যদি বিপদের দিকে যাও, আমাদের কে বাঁচাবে বল? তোমার দরদ আমি ভুলতে পারব না, তুমিই আমার জীবনটা ফিবিবে দিলে।"

"নরবে ভীমা, আমি চলে যাব না। তেমনব পাশেই ফিরে আসব আবার।" ধর্মপন করে মহানারকেব গলা।

ভীমার দেখাশোনার ভার দুজন বিশ্বাসী চাকরের হাতে দিয়ে, ভীমার শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ। বললেন, "আর শোন, যদি কেউ জানতে চায়, বলিস : বাবু, 'ন্যাবড়া' শিকারে গেছে।"

সুদূরীয়া নামে একটা চাকর কিছুতেই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়বে না। মণীন্দ্রবাবুর বহুদিনের চাকর সে। যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে গিয়ে দাঁড়ায় যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় ও মনোরমের পিছনে।

অদূরবৈ মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি। সেদিকে পা বাড়ালেন মহানারক। সুদূরীয়া তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করল না কিছুতেই।

"তাহাদের তৎপত্তা, সতর্কতা ছিল অতি প্রবল। ...বিশেষত যতীন সকল দিকেই সদা সতর্ক থাকতেন।...তবে তাহাদের সকল সতর্কতাব শেষ পর্যায়ের কথা এখন বলিব।" মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন।

"বাদল লাগিয়াছে। তিন-চার দিন কখনও বেশি কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। ডায় মাস। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল। রাত প্রায় দশটা।

"আমার কছে যতীন ও কালিদাস (চিত্তপ্রিয়) আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি দরম মধ্য হইতে বাহিরে আসিলাম। একটু বিশেষ ব্যস্তভাবেই যতীন বলিলেন : দাদা, আমরা তোমার এখান হইতে চলিলাম।

"আমি জিজ্ঞাসন্বরে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যতীন বলিলেন :...আজ এই আবহাওয়ার মধ্যে ভিত্তিতে ভিজিতে

যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে।..."

"আমি বলিলাম : তোমরা এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলে?..."

যতীন্দ্রনাথ সব কথা বিশদ জানালেন মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে। এবং বললেন, "আমি স্থান লইতে বাংলার দিকে অগ্রসর হইলাম। পথ প্রায় জনশূন্য। আমি বাংলার নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, সেখানে আলো জ্বলিতেছে। আরও একটু নিকটে গিয়া দেখিলাম, আগন্তুক কেবা সাহেবই বটে।...কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখিলাম, কপিপদার রাজ্য বাটী হইতে উহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া একটি লোক বাংলার গেল। আমি তাহার কিবিবার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেই সে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আসিয়াছে। সে মাত্র বলিল : কলকাতার সারেন আসিয়াছে। তাহারা চৌকিদারকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছে।..."

আবো কিছু কথাবার্তার পর যতীন্দ্রনাথ মণীন্দ্রবাবুকে বললেন যে তাঁরা তিনজন তালিডহাং + যাচ্ছেন : সেখানে নীবেন ও জ্যোতীশকে ডেকে নিয়ে তাঁরা নিজেদের পথে এগিয়ে যাবেন।

মণীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একটা গাদা বন্দুক ধার নিয়ে যতীন্দ্রনাথ চলে যেতে উদ্যত হ'লেন। মণিবাবু লিখেছেন, "মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এই কি শেষ বিদায়?...কয়েক মহাত পবে যতীন বলিলেন : সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আদ্যষ্টাখানেক পূর্বে, অর্থাৎ ভোরবেলার তাহারা ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছে।..."

জগলেব পথ দিয়ে সুদূরীয়া পথ দেখিয়ে শিখ্য-পরিবৃত যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে চলল তালিডহাং পথে।

মহলুডহা থেকে বারো মাইল দূরে এই তালিডহাতেও যতীন্দ্রনাথ অপর একটি আশ্রয়স্থান করিয়েছিলেন—এক সগে বেশি লোক না থেকে মাকে মাকে ছাড়া ছাড়া থাকলে জনসাধারণের দৃষ্টি কম আকৃষ্ট হবে বলে। নীরেন আর জ্যোতীশ পাল তখন ওখানে।

তালিডহা পৌঁছেই যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন : ওরে, এখনি তৈরি হয়ে নে। যেতে হবে।

এখানেও একই অনুরোধ : "দাদা, আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা করার স্বত্ব নিয়েই আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদের সামনে সেই তো একমাত্র কতব্য। বিপদের সামনে এইভাবে আমাদের জন্যে কলকক্ষেপ আপনি যদি করেন, কেন্ মূখে গিয়ে অন্যান্য বিশ্লেষীদের সামনে দাঁড়াব আমরা? আপনি যদি জগলের পথে-চলে যান, কার দায় আপনার হাদিস পায়?"

* মণীন্দ্র চক্রবর্তীর খাতা থেকে

+ মহলুডহা থেকে ১২ মাইল দূরে

বতীন্দ্রনাথ এবাবেও বুকিয়ে বলেন, 'দেখ, বহু বৃষ্ণ ধরে বিশেষরী অধীনে থেকে আমরা গোটা জাতিটাই হীনবীর্য হয়ে গিয়েছি। আমাদের বৃষ্ণশক্তি যে শূন্যে দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে সত্যের জন্যে আদেশের জন্যে জড়তে জানে—আমাদের পবিত্র বৃষ্ণে যারা এ দেশের মাটিতে জন্মাবে, তাদের জন্যে এই বৃষ্ণটুকু কববার অধিকার আমরা দিয়ে যাব। অনাগত দিনের নতুন সৈন্যবাহিনীর জন্যে আমরা পথ বৈধ দিয়ে যাব। আমাদের এই পথেই তাবা এগিয়ে যাবে মুক্তির সংকল্প লাভক সফল করে।...'

গুরুব আদেশ শিবাধার। নীরবে পা বাড়াইলেন জ্যোতীশ পাল, চিত্তপ্রিয় শ্রীচন্দ্রদেবী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, আর স্নোবজন সেনগুপ্ত—এগিয়ে চললেন তাঁরা সাধক বিপ্লবী বতীন্দ্রনাথ মুনোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

কণ্ঠগদ্যে বিশ্বস্ত চাকর সুদূরিত—স্বামীজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে শাস্ত্র নেড়ে ঘুরে ঘুরে গেল তাঁরই নির্দেশে।

জগলের ভয়াল পথ। তার ওপর অন্ধকার। কলিযুগের পশুপাণ্ডব চলেছেন ফুটিল কৌববদের দশ অকৌববীর দৃষ্টি এড়িয়ে। তাঁদের অজ্ঞাতবাসেব পর্ব যে হুঁরোর নি এখানে!

ভাদ্র মাস। ঘোর বর্ষা। কালো আকাশে পঙ্খীভূত মেঘ। মহাদুর্ভাগ্য বিদ্যুতের চমক। মাঝরাতের পর থেকে ক্রমক্রমে আকাশ-মাটি কাঁপানো বৃষ্টির দারুণ তোড় নেমেছে।

সংগেব টাকাকড়ি এবং আনন্দরঙ্গগুলো সযত্নে পুঁজু চামড়ার খলিতে বেখে চাদের মন্ডে নিয়ে বতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছেন তাঁর শিষ্য-চতুষ্টয় সমাধিবাহারে। চলেছেন অজানিতের পথে।

গোটা জাতির শৌর্ভের বীরের ত্যাগের আর দেশপ্রেমের ইতিহাস ধ্রুবতায়ার মতো তাঁদের ধ্যানের আকাশ আলো করে রেখেছে। আব বহন করে নিয়ে চলেছেন তাঁরা পবানীর এক জাতির নিরতি—স্বাধীনতার সূত্রী সংকল্প, তেজিশ কোটি মানবের প্রাণ-ভোমরা নিহিত যে আজ ওই একটি অমূল্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

এই সেপ্টেম্বর। ভোববেলা।

বিশেষ সামরিক সতর্কতা অবলম্বন করে লাহেবেরা দলবল নিয়ে রওনা হলেন কণ্ঠ-পদার জগলে বাঙালী বিপ্লবীদের প্রেরণার করণ্ডে।

কলিবি সাহেবের জ্বান : 'নির্দিষ্ট স্থানে আমরা উপস্থিত হয়েছি শুনে হাতির পিঠ থেকে আমরা নামলাম। জগলেব মধ্যে একটা বাড়ি দেখে সেটা ঘেরাও করে ফেললাম। বাড়িটা আমাদের রাষ্ট্রবাসের জয়গা থেকে মইল দুইদিক দুইদিক।

শুধু যেন বলছে কলি এল : ওখানে

কেউই নেই!—উঠানে ঢুকে দেখি চারখারের ধবগুলোর তালো জ্বলছে। উঠানের একটা গাছে একটা টারগেট টাঙানো। চতুর্দিক থেকে পঞ্চাশ পনের মতো উঠানটা। টারগেটের স্থানে স্থানে এবং গাছের গায়েও বুলেটের চিহ্ন দেখা গেল। উঠানের পাশেই একটা কুস্তির আখড়া।

“সাবর্ভিভিনাল অফিসার বললেন : এখানে বারী ছিলেন, তাঁদের বন্দুকের লাই-সেন্স ছিল না।

“আমরা গানের জয়ের দোর ভেঙে ফেলা সাব্যস্ত করলাম।...”

সমস্যা জাগল : কে এগিয়ে যাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ওই গহবরে! বাঘের ঘরে অশ্বান বদনে প্রবেশ করবার মতো উৎসাহ কম লোকেরই থাকে।

টেগার্ট সাহেব আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন সাহেবদের—বিদেশ-বিভূইয়ে কাঁচা প্রাণটি যদি শোয়াতে না চাও, তুল করেও আগ-বাড়িয়ে যেও না। বাঘের চেরেও সাম্ভাবিতক এই বিপ্লবীরা। আর তাদের নেতা ওই মোকাজ্জি সাহেব যে বাস্তবে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে কত বাঘকে নাম্তানাবদ করে 'বাবা বতীন' হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

অতএব—ময়বজ্ঞের বাঙালী হাকিম অক্ষর চ্যাটার্জির ওপর হুকুম হল সাধুবাবার আশ্রমের দরজা ডাঙবার।...

টারগেটের বুলেট চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে আর এই বিপদের মূখে একলা এগিয়ে যাবার আদেশের তাৎপর্য বুকে নিয়ে অক্ষর-বাবুর উপলব্ধি হতে দৌর লাগল না, হাকিম হবার কী কামেলা!

ইন্টনাম স্মরণ করে তিনি দুর্দ দুর্দ বৃকে এগিয়ে গেলেন। আর আশ্রমের দরজা ভাঙ করে উঠিয়ে রইল পূর্বাংশেব বন্দুক।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বার দুই হাকি মিলেন অক্ষরবাবু : ভিতরে যে-ই থাকুন, বেরিয়ে আসুন।

কেউই আসেন না। সাহেবদেবও তখন সাহস জেপে গিয়েছে। সবাই চড়াও হয়ে প্রচণ্ড লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললেন হাট করে।

ঘরের মধ্যেও কেউ নেই বিশেষ। এক কোণে অসুস্থ একজন স্থানীয় লোক—অচৈতন্য, শয্যাশায়ী। তাকে জেরা করে জানা গেল, নাম তার ভীমা বেহারা। বহু প্রশ্নে তাকে জব্বরিত করে এইটুকু মাত্র জানা গেল, বাবুরা ন্যায্য শিকারে গিয়েছেন।

ঘরের এক পাশে একটা কেরোসিন কাঠের আলমারিতে কিছু কাগজপত্রের বাঁড়ল। একটা তাকের ওপর কয়েকটা গুঁথুপত্রের শিশিবোতল। গোটাটুকু ধুঁচাচল। আরো কত কি।

কলিবি সাহেবের জ্বান :

“We looked through the

things hastily. We found books in English, some (gun) powder, some shot, a case of homoeopathic medicines and many other things. We consulted as to what should be done and first we reached a neighbouring house belonging to Manindra Chakravarti which is about 100 yards distant, but found only the ordinary occupants and not the Bengali residents of the first house...”

সপ্তম চক্রবর্তী লিখেছেন, “...বৃষ্টির কামাই নাই। আমারও শান্তি নাই। বাবুদের ঘরেব দিকে কিছু অগ্রসব হইয়া দুই-চারি বার দেখিলাম।...চাকর দুইজনকেও তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ন্যায্য শিকার করিতে বাইতেছেন। তাহারা তাহা অবিশ্বাস কবে নাই। কারণ এরূপ শিকারে বাওয়া প্রায়ই হইত।...

“ন্যায্য শিকার বলে : বাদলের সময় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার কালে বন্য জন্তুরা বনমধ্যে ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকে। নরম মাটিতে তাহাদের পায়ের দাগ পড়ে। ওই দাগ দেখিয়া...সেই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া জন্তুর নিকট পহুঁছানো যায়। এবং সতর্ক শিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোঁড়েন।...

“সকাল হইল। কেহ আসিল না। কয়েক বেলা আটটারও অতিবত্ত হইল। আমি মৃদু ধূইয়া বাইবের বড় ঢালা ঘবটিতে বসিয়া আশ্রি অশান্ত মনে। যেন শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছি।

“এমন সময় সাতাই একজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে জানাইল : বাবু, আপনাকে এস-ডি-ও ডাকিতেছেন।

“বৃক্শলায় এবার আমাব সম্মুখে বৃন্দ। তখন আমার ভয় হইল না কেন, জানি না। আমি আগে হইতেই জ্ঞানিতাম বলিয়াই বোধহয়।

“আমি একটি জামা গয়ে দিয়া একটি ছাতা লইয়া সেপাইয়ের আগে আগেই চলিলাম। সেপাই বলিয়াছিল এস-ডি-ও বাংলোর অফিসে। আমি একটু ন্যাকামো করিয়া সন্ধ্যা বাই বাংলোর রাস্তার চলিলাম। সেপাই তৎক্ষণাৎ আমার বলিল : বাবু, এদিকে, এই বাবুদের বাংলোর চলুন!—

“আমি তখন সেই পথ ধরিলাম।...”

ওদিকে, সাহেবরা বিমর্ষ চিত্তে খানিক পরামর্শ করে হুকুম মিলেন : যে যেদিকে পার, ছুটে যাও। গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে দাও—বাঙালী ডাকাতদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর টাকা ইনাম পাবে।

চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরা বসিয়ে, হাজার হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে সাহেবরা সপ্তম চক্রবর্তীর অপেক্ষা

লাগলেন। তাঁদের হাতে সময় কম।
স্বদেশের শহরে ফিরে গিয়ে আরো সৈন্য ও
অস্ত্রাদ্রব্য সাজসজ্জা সংগ্রহ করে এনে গোটা
অঞ্চলটা ঘেরাও করে ফেলা দরকার। একটা
মাছিও যেন না পাল্লাতে পাবে, বিশ্লেষী ভো
দ্রের কথা।

শিক্খদর অগ্রসর হইয়া দৌখলাম,
মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, “বাবুদের ঘরের
দুই দিকে দুই সারি পুষ্কিন বন্দুক কাঁখে
করিয়া টহল দিতেছে, আর তিনজন সাহেব
তাহাদের মধ্যে ছোটোছোটো মত ব্যস্তভাবে
এদিক-ওদিক করিতেছেন। কপ্তপদা ও
নিকটস্থ গ্রাম হইতে দশকের সংখ্যাও অনেক।

“এই দশকবন্দ্যের মধ্যে, আমার দৃষ্টি
আকৃষ্ট হইল একটি বিশেষ লোকের দিকে।
সে, কপ্তপদার হাবি মহাপাত্র। সে সাহেবদের
করুণ কাছেরেই ঘুরিতেছে। দু-একবার কি
কেন কথাও হইতেছে। তখন ব্যক্তি
পারিলাম, তালিভহার বাবুদের বে ঘর আছে,
তাহা এই হরি মহাপাত্রের আরগার।... বাবুরা
অস্বাভাবিক সংগ্রহ একবারেই করিতেন না।
ইহার কারণ সন্দেহই বুদ্ধিতে পারিতেন। কারণ
মলা বাহুল্য। সর্বক্ষেত্রেই সাবধানতা অবলম্বন
করা তো তাহাদের নীতিই ছিল।... হরি মহা-
পাত্রের সঙ্গে সাহেবদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া
আমি শঙ্কিত হইলাম। তবে কি শঙ্কু
(নীরেন) ও প্রমথ (জ্যোতীশ পাল)-কে
সেখানে ধরিতে যাইতেছে? মনটা অস্থির
হইল।

“আমি কনস্টেবলের সহিত সাহেবদের
নিকটস্থ হইবামাত্র এস-ডি-ও অফিস চাট্রো
ক্লাসের ভরিত পড়ে আমার নিকট আসিলেন।
এক বলিলেনঃ বাবুরা কোথায়?

“আমি পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী বলিলামঃ
আমার নিকট হইতে একটি বন্দুক লইয়া
তাহারা ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছেন।

“অতি সন্নিহান সাহেবগণ অক্ষরবাবুর
সহিত আমার কথা বলিতে দেখিয়া স্তব্ব
দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার নিকট উপস্থিত
হইলেন।

“প্রথমে ডেনহাম সাহেবই আসিলেন।
আমার সম্মুখ অক্ষরবাবুকে একেবারে
পশ্চাতে ফেলিয়া আমার সম্মুখীন হইলেন।
অক্ষরবাবু বলিলেনঃ এই মণীন্দ্র; আপনি
কি ইহাকে চান?

“সাহেব আমার আপাদমস্তক নিবীক্ষণ
করিতে লাগিলেন। অক্ষরবাবুকে কোন উত্তর
দিলেন না। আমাকে বলিলেনঃ

—বাবুরা কোথায়?

—ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছেন।

—কতজন?

—প্রায় দুই দশটা হইবে। ভোর-
কোলেতেই গিয়াছেন।

—কোনদিকে গিয়াছেন?

“আমি দক্ষিণ দিকের জঙ্গল নির্দেশ
করিয়া দেখাইয়া দিলাম। বলিলামঃ বিশেষ
প্রয়োজন থাকিলে এই জঙ্গলেই তাহাদের
সাক্ষাৎ মিলিবে।—আনাড়ি ভাণ কবি
আমিই পালটা জিজ্ঞাসা করিলামঃ বাবুদের
নিকট অস্বাভাবিক কি প্রয়োজন আছে?

“সাহেব ইহা উত্তর দিলেন না। আমিও
উত্তর পাইব না, তাহা ভালভাবেই জানি।...
আরো দুইজন সাহেব আমাকে ঘিরিয়া
দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

—কতজন বাবু এখানে থাকেন?

—মাত্র তিনজন।

—তাহাদের বাড়ি কোথায়?

—কলিকাতা।

—ঠিকানা বল।

—কলিকাতার ঠিকানা আমি জানি না।

“সাহেবের চক্ৰ রত্নবর্ণ ধারণ করিল।
তিনি কহিলেনঃ তোমরা একসঙ্গে থাক, আর
ইহাদের ঠিকানা জান না? ইহা কি সম্ভব?

—আমি থাকি আমার বাড়িতে। বাবুরা
তাহাদের এই বাড়িতে। আর আমি চাবী
মানুষ। আমাকে সর্বদাই ক্ষেত-খামারে
মুনিষের সঙ্গে থাকিতে হয়। তাহাদের
কলিকাতার ঠিকানা আমি জিজ্ঞাসা করিতে
যাইব কেন?

—এই সব লোক তোমার নিকট অনেক
দিন হইতে রহিয়াছে। তাহাদের চিঠিপত্র
অবশ্যই এখনে আসে। এবং ইহাও উত্তর
দিয়া থাক। নব কি?

—তাহা অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু
আমাব মত কর্মবাস্ত লোকের তাহা জানা
সম্ভব নয়। ইহারা কলিকাতার বাবু।
কপ্তপদার মহারাজার নিকট জঙ্গল ইজারা
এখানে আমি কিনিয়া চাষ করিতেছেন এবং
কপ্তপদার মহারাজার নিকট জঙ্গল ইজারা
লইবার জন্য যাতায়াত করিতেছেন, তাহাও
জানি। এবং এই সব জমির জন্য কবুলিয়া
দিয়া আমার নিকট রেজিস্ট্রি করাইয়া লইয়া-
ছেন। ইহাদের আবাসের কোনও কাগজ
তো আমি দেখিতে পাই নাই। আজ
আপনাদের ধরণ-ধারণ দেখিয়াই আমার প্রথম
সন্দেহ হইতেছে। বাবুরা কি চোর? না
ডাকাত? আপনি বলুন না।

“সাহেব ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।
পরে প্রশ্ন করিলঃ বাবুদের নিকট কি ছোট
ছোট পিস্তল ছিল?—আমি বলিলামঃ না,
তাহা আমি কখনও দেখি নাই।

“পাম্ববর্তী অনেক গ্রামের লোক এই
অশ্রুত কাণ্ড শুনিয়া ছুটিয়া সমবেত হইতে-
ছিল। সাহেব তাহার পকেট হইতে একটি
পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেনঃ

—এমনি পিস্তল লইয়া কি বাবুরা
শিকারে বাহিব হন?

—না। তাহারা শিকারে যাইবার সময়

আমার নিকট হইতে বন্দুক চাহিয়া লইয়া
যান।

“এই সময়ে, আগন্তুকদের মধ্য হইতে এক
ব্যক্তি বলিয়া উঠিলঃ হুজুর, বাবুদের হাতে
আমি পিস্তল দেখিয়াছি।

“লোকটি কপ্তপদা বাজার হাতিব মাহুত।
...বুঝিলাম, আমাব বিরুদ্ধে ইহারই মধ্যে
একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। সাহেব
মাহুতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

—বাবুদের হাতে তুমি কি করিয়া পিস্তল
দেখিলে?—তবে আগেই তিনি পিস্তলটি
পকেটে রাখিয়াছেন।

—শিকারে তাহারা যখন যান, তখন
দেখিয়াছি।

“শুনিয়া আমি একটু বিস্ত্রিত বোধ
করিলাম। সম্পূর্ণভাবেই জানিলাম, সে
মিথ্যা বলিতেছে। আমি প্রশ্ন করিলামঃ
কল দেখি, বাবুদের হাতের পিস্তল কত বড়
ছিল?

“মাহুত দুই হাত কঁক করিয়া বাহা
দেখাইল, তাহাতে সাহেব বুঝিলেন, তাহার
কথা মিথ্যা। কারণ পিস্তল তো বিষ-
প্রমাণ। অতবড় হইতেই পারে না।...
সাহেববা এ-কথাও জ্ঞানেন যে সাধারণকে
দেখাইয়া বাবুরা পিস্তল ব্যবহার করিবার
মত লোক নহেন। তাই সাহেব ধমকের
স্বরে মাহুতকে বিদায় করিলেন। আর
বাহারা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল,
মাহুতের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা ভয়
পাইয়া গেল।”

এইভাবে, বেলা একটা বেজে গেল।
সাহেবরা তখন হুজুর দিলেন, মণীন্দ্রবাবুর
বাড়ি তরাস করিতে।

অত সৈন্য-সামন্ত, সাহেব, বন্দুক, হাতী,
প্রভৃতির মিছিল দেখতে গ্রামের পর গ্রাম
থেকে বিস্মিত-বিহ্বল আবল-বৃন্দ-বনিতা
ছুটে এসেছিল। মণীন্দ্রবাবুর ভাষায়, “হাতি-
গুলিও সেই বন্দুকধারী পুলিশদের পাশে
পাশেই ঘুরিতেছিল। একটি অপূর্ব দৃশ্য।...
এই সুবহন আয়োজন মহালাভিহা শব্দ নয়,
কপ্তপদা ও কপ্তপদাব পাম্ববর্তী গ্রামগুলি
হইতে বাহুরা আসিয়াছিল সবাই দেখিয়া
বিস্মিত হইয়াছিল।

“এত বড় মিছিল এখানে, এখানে কি
এদেশে বোধহয় নিকট অতীতে কেহ দেখে
নাই।... আমাদের সার্বভাষন অফিসে খবর
দিয়া...রিজার্ভ বত পুলিশ আছে সব
সম্পন্ন হইয়া আসিবার আদেশ জানাইয়া
তাহাদের সকলকে ও বালেস্বব পুলিশ দল
সকলে তাহাদের নিকট জড়িয়াছে। এবং
নীলগিরির কিছ, পুলিশ ও হাতিও
আসিয়াছে।...

“বাবুদের ঘরের নিকট আসিয়া, বাবুদের ঘরে আছেন কিনা তাহার সম্বন্ধে ভালভাবে মা লইয়া বাবুদের ঘরে সাহেবরা আসেন মাই।”

“ইহাতেই বুদ্ধিলাস, সাহেবরা মতীনের দলকে বা বিপ্লবী বাঙালী দলকে খুব ভয় করে। উহা বা যে বাবুদের ভীষণ ভয় করে তাহা ভীমার কথাতেও বুদ্ধিলাস।...”

সাহেবরা এরপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চড়াও হলেন মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে। সবালবেলাতেই পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা ছিল। এখন এস ডি ও সাহেবের পিছু পিছু সাহেবরাও কিছু পুলিশ নিয়ে ঢুকে পড়লেন মণীন্দ্রবাবুর অন্তঃপুরে।

জলে-ভেজা বুটের অশ্লিষ্ট আওয়াজে চমকে মণীন্দ্রবাবুর শিশু পুত্র-কন্যারা।...

তরাসীঘ নামে গোটা বাড়ি চুপে ফেলে, জিনিসপত্র তছনছ করে, পছন্দমতো এটা-সেটা আত্মসাৎ করে পুলিশের সাহেবদের হাতে একতড়া চিঠিপত্র আর অনেকগুলো ধন্দুক এনে দিল। সবকটা ধন্দুকই লাই-সেন্স আছে।

মণীন্দ্রবাবু বললেন, “এতগুলি ধন্দুক রাখিবাব একমাত্র উদ্দেশ্য—জমির ধান পাকবার সময় বন্যহস্তীরা আসিয়া ধান নষ্ট করে। সেইজন্যই লোক জাগাইতে হয়।...”

তরাস-শেষে মণীন্দ্রবাবু ও তাঁর ভগ্নরা-ভাইকে নিয়ে সাহেবরা আবার চললেন সাধু-ধাবার আশ্রমে। সেখানে গিয়ে কি সব পরামর্শ করলেন। তারপর মণীন্দ্রবাবুকে তাঁরা বাবুদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

মণীন্দ্রবাবুই মতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের নতুন নতুন নামে অভিহিত করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত রকমে সেই নামগুলো কাজে লেগে গেল। খাতা-বার করে সাহেবরা লিখে নিল পাঁচটি নাম : সাধুবাবা (মতীন্দ্রনাথ), ফালিদাস (চিঠিপত্র), যোগানন্দ (মনোরঞ্জন), শঙ্কু (নীরেন), আর প্রমথ (জ্যোতীশ পাল)।

‘যোগানন্দ’ নাম শুনে ডেনহ্যাম মন্তব্য করলেন, “ওহো, এখানেও বুদ্ধি আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?”

ডেনহ্যামকে কপিপদার বাগেলার নামিয়ে দিয়ে সাহেবরা বালেম্বের অভিমুখে রওনা হলেন আবার লোকজন সংগ্রহ করতে। মহল-ডিহা ও তাব আশেপাশে সর্বত্র সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী টহল দিতে লাগল। সাধু-ধাবার আশ্রম ঘিরেই তাদের প্রধান আনা-

*ভীমা নামে যে স্থানীয় লোকটি মতীন্দ্রনাথের ঘবে শয্যাশায়ী ছিল, তার রিপোর্ট দেখলে সাহেবদের সাহসের পরিচয় পেয়ে চমকিত হতে হয়।

গোনা টেল। একদল সেখানে মোতায়েনও থাকল।

“সাহেবরা চলিয়া গেলে,” মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, “আমি বাবুদের ঘবে বাইরা ভীমা বেহারার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বৌদিন ভীমাও তখনো কিছু খাইতে পায় নাই। সে অবশ্য মরণাপন্ন দশা হইতে এখন কতকটা ভাল হইয়াছে। তাহাকে তাহার বাড়িতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। এবং কিছু খাদ্য ও জল দিলাম। সে একটু সুস্থ হইল।...”

“অনেকদিন, প্রায় তিন-চারি মাস ভীমা পড়িয়া থাকিয়া বাবুদের দোকান ও চাষবাস ছাড়াও যেন কিছু অন্য ভাব বুদ্ধি ছিল। কারণ সে বাবুদের নিকট প্রায়ই বাত্রে এবং কখনো দিনেও অন্য অনেক বাবুকে আসিতে দেখিত। স্পষ্ট-কিছুই বুদ্ধিতে না পারিলেও অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশিই সে জ্ঞানিত।

“বাবুদের দরবার সে যুদ্ধ ছিল। বাবুবাই তাহাকে ঐষ পথ্য দিয়া আবেগ্যাব পথে আনিয়াছেন। সে বাবুদের কাছে কখনও বহু টাকা দেখিয়াছে, পিস্তলও দেখিয়াছে।

“বাবুদের কাছে যে উপকার সে পাইয়াছিল সে-সময়ও সেই কৃতজ্ঞতা সে-ভুলে নাই। তাহার কথায় তাহাই বুদ্ধিলাস।...সে ও চাকর দুইটি বুদ্ধিলাস ছিল যে, বাবুদের এই শত্রুর মধ্যেও কিছু যেন গুরুত্ব আছে।...”

পাছে লোকের মনে কোন সন্দেহ জাগে, সেইজন্যে মতীন্দ্রনাথ সর্বদাই নিজেই ও তাঁর সঙ্গীদের ঘোর সংসারীরূপে গ্রামবাসীদের কাছে ফুটিয়ে তুলতেন। দোকান দেওয়া, চাষবাস করা, টাকাকড়ি হিসেব রাখা প্রভৃতিব সাহায্যে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের মনে বিশ্বাস জাগিয়াছিলেন যে, তাঁরা কেউই ভবঘুরে নন। মণীন্দ্রবাবুর ভাষায়, “এই বোচাকেনার কাছে সঙ্গীরা সকলেই অস্বস্তিবোধ করিতেন, কিন্তু লোক-দেখান একটা কাজ চাই। তা না হলে লোকে বলবে ভবঘুরে। ভবঘুরে বিশ্বাস ভাগা বড়ই বিপজ্জনক, ইহা তাহারা ভালভাবেই জ্ঞানিতেন। সেইজন্যই এই আবরণ।...”

“...বিপ্লবীরা বিদেশী শাসকদের ভয় দেখাইতে পারিয়াছেন। তাহাদের সাধনা অনেকটা সফল হইয়াছে।—এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে ভীমাকে তাহার বাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আমি বাড়ি ফিবিলাম,” মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, “কিছু জল খাইয়া আমার ভগ্নরাভাইকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের হুকুমে পুনরায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কপিপদার বাগেলার উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গীকে সাবধান হইয়া কথা বলিবার অনেক উপদেশ দিলাম। কারণ সে সে সব কথাই ভয় পায়। দুর্বল চিত্তের লোক।...”

“...প্রথমেই S.D.O. অফিসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার অনুচরদের বলিলেন : সবকার তোমার সমস্ত সম্পত্তি বজ্রোপ করিয়া লইবেন।

“আমি নিবৃত্ত হইয়াই রহিলাম। স্থির হইয়াই প্রথম দণ্ডাজ্ঞা শুনিসময়। আমি তখন সকল দণ্ডের বোঝাই বহিতে সক্ষম, মন এমনি অচঞ্চল হইয়াছিল। ”

সাবাদিনের উপবাস ও উদ্দেশ্য পূর্বে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মণীন্দ্রবাবু সপরিবারে শুরুর পড়েছেন। সাধুবাবার আশ্রম চাষাবাড়ি ও মণিবাঘের বাড়ি ঘিরেও প্রচণ্ড রয়েছে।

“বারি তখন বাবোটা কি সাত্রে বাবোটা হইবে,” মণিবাঘ লিখেছেন, “আমার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালায় হঠাৎ যেন মতীন্দ্র ডাকিলেন : দাদা! দাদা!—অবশ্য উচ্চস্বরে নয়।

“আমি ডাক শুনিয়া তাহাদের কাছে জানালায় ধাক্কা উপস্থিত হইলাম। এবং নিকটস্থ হইয়াই বলিলাম : ভাই, পুলিশ ধন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। তোমাদের পাইলেই না জানি কী ঘটনা ঘাইবে এখন।

“অবশ্য আমার ঘরের দক্ষিণ দিকেই পুকুরের পাড় ও অববৈহার স্থান। সেদিকে পুলিশ ছিল না।

“মতীন্দ্র অতি সংক্ষেপেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন : দাদা, এখানকার খবর কী?

“আমিও সংক্ষেপেই সমস্ত জানাইয়া বলিলাম : সাহেবরা ও পুলিশ বালেম্ব এবং বারিপদার দিক ঘিরিয়া আছে। তোমরা মেঘাসানি পাহাড়ে দিকে বনপথ ধরিয়া চলিয়া যাও।

“মতীন্দ্র উদাত্ত-কণ্ঠে বলিলেন : দাদা, পায়ের খুলা দাও। ভয় কি? আমরা বালেম্বের পথেই যাইব। আমরা অথবা কেন যাইব? জনারগোই যাইব।

“তাহাদের নিকট কোনও টাকা-পয়সা ছিল না তখন। আমার নিকট গচ্ছিত অর্থ হইতে দশ টাকার পাঁচখানি নোট দিলাম। পাঁচ-জনেই ... চলিয়া গেল।... পুলিশ সে-কথা জ্ঞানিতে পারিল না।... তাহাদের ধারণা ছিল বাবুবা আর কখনই এখানে আসিবেন না।

“আমার হৃদয়ানন্দ ভাইয়েরা আমার নিকট চিরবিদায় লইলেন। সে-বেদনা মনই বুকিল। আর কেহ বুকিল না। -পথের দুই ধারে দুর্মান্ত শত্রু ইংরেজের চররা যেখানে সতর্ক হইয়া টহল দিতেছে, সেই বেটনীর মধ্যে পাঁচটি তরুণ যেন জীবন আহুতি দিয়া জন্মই প্রবেশ করিল।

“বন্দে মাতরম!..

“আজ আমার আনন্দমঠ শূন্য হইল।” [শেষঃ]

স্বপ্নবাসী

বাঁশবেড়িয়া—উত্তরকালে

দৈর্ঘ্য-প্রক্ষেপ সাত্ত্ব তখন বর্গমাইল এলাকার ওপর প্রায় অর্ধলক্ষ লোকের বসতি নিয়ে বাঁশবেড়িয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান। হুগলীর প্রান্তসীমা এবং হুগুর কলকাতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহরও বটে।

পাঁচটি উল্লেখ্য কলোনী আছে এখানে। কলোনীগুলির চেহারা দেখে বিশেষ প্রীত হওয়া গেল না। যদিও এইগুলি পৌর-প্রতিষ্ঠানেরই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি পৌর সুখ-সুবিধা তারা কিছই পান না বললেও চলে। না আছে রাস্তায় আলো, না আছে পানীর জলেব কোন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটগুলির একে-বারেই দুর্ভাবনা! বর্ষাকালে বেশির ভাগ কলোনীই জলতলে সমাহিত হয়। এক হাট্ট থেকে কোমরভোর জল ভরে সর্বত্র। রিক্সা চলে না, মোটর বা লরীর চলাচলও হয় হুসুমত। কলকর্তা প্রায় অচল, বাড়ির গরু বাঘ এবং তারগের জল শূকনের কালে জনহারা কাদা, পচা লতাপাতা, শশানিহা, পোকা-সকল, জরুরজাবি, হাম-বকল, পেটের অসুখ ইত্যাদি।

অবশ্যই একথা সত্য যে, এইসব কলোনী এলাকা থেকে পৌরসভার আর অতি সামান্যই। বেশির ভাগ অধিবাসীই পৌর কর দিয়ে উঠতে পারেন না। তথাপি মন্দবের দুর্গতি ভোগেরও একটা সীমা থাকা দরকার। লোক-জন বসতি অধিবাসী নিয়ে এক-একটি অঞ্চল করে একটা দীর্ঘ সময় জলের নিচে ডুবে থাকবে, এ অবস্থার আর বাই হোক একটি পুর্ণা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যোগ্যজনক নয় নিশ্চয়ই।

কলোনীগুলি ছাড়াও বাঁশবেড়িয়া জেলার পূর্ব-প্রান্ত থেকে মাকের সড়ক এবং তার আশপাশের এলাকাও দেখা গেল অল্পট নিচু এবং জল নিকরনের বিশেষ স্থানও বন্দোবস্ত নেই। ফলে এই জায়গা-গুলিতেও সারা বর্ষাকাল ধরে জল ভরে থাকে বলে প্রকাশ।

কাচা-পাকা মিলিয়ে সমগ্র পৌর এলাকার রাস্তা আছে প্রায় ৫০ মাইল। অতি সংকীর্ণ, অতি অপরিচ্ছন্ন খোলা নদীমা এবং অতি জনতাব চলাচল হওয়া এই রাস্তাগুলি দেখলে মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগে। বিশেষ করে বাঁশবেড়িয়ার প্রধান সড়কটি—যাটি দ্বিবেশী থেকে শিবপুর হয়ে গ্যারেস জুট মিল, পৌন্ট-প্রতিষ্ঠান ভবন, সিনেমা হাউস, বিদ্যালয়, চানলপ রবার ফাষ্টরী প্রভৃতির সামনে দিয়ে গাছগাছ হয়ে সোজা চলে গেছে হুগলীর পানে, সেই রাস্তাটির দিকে তো চাইলে আভ্যন্তর

সগর্য হবে যে কোনও পথচারীর প্রাণ। দুখানি রিক্সা পাশাপাশি চলতে গেলে বেশ-সে-ঘোঁস হয়, মুখোমুখি দুখানি বাসের ক্রাশিং কালে বেধে যায় হেঁ-হেঁ। রাস্তার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাও খুব উজ্জ্বল নয়। সব মিলিয়ে পথ এবং তৎসংক্রান্ত পবিবহন সমস্যা এখানকার জনসাধারণের এক শিবপীড়। বিশেষ হয়ে আছে কললেও চলে। সমাধান-কল্পে পৌরসভা মাথা ঘামাতে চান না খুব সম্ভব। দুখারের ছোট বড় উঁচু-নিচু একতলা, দোতলা বাড়ির সারি। বেশব-ভাঙিরেই রাস্তা করা অনেক কাঠখড় কেবোসিনের ব্যাপার। কাজেই পৌরসভা চুপ, জনসাধা-রণেরই দুর্গতি অশেষ।

শিক্ষা-বিস্তারের বাঁশবেড়িয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান খুবই উদ্যোগী। শিক্ষাখরচ বার্ষিক বয় করেন এর প্রায় এক লক্ষ চার হাজার টাকার মত। চারটি ব্রী প্রাইমারী স্কুল এঁদের নিলম্ব আছে। এ ছাড়াও গ্যারেস জুট মিলের দুটি ব্রী প্রাইমারী স্কুল, একটি হরিজন বিদ্যালয়, দুটি জুনিয়র হাই স্কুল খামারপাড়া এবং মিলন পল্লীতে, গার্লস প্রাইমারী একটি, খামারপাড়া জাতীয় বিদ্যা-মন্দিরে একটি জুনিয়র হাই স্কুল, একটি

পারুল ভট্টাচার্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাহায্যে কুলকুমারী গার্লস হাই স্কুল। এবং খোদ বাঁশবেড়িয়ার বাঁশবেড়িয়া গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ও বাঁশবেড়িয়া মালটিগারশাল স্কুল। এ ছাড়াও আছে সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র—ব্রহ্মাচার চতুষ্পাঠী, বাঁশবেড়িয়া সংস্কৃত পরিষদ, বাঁশ-বেড়িয়ার চতুষ্পাঠী এবং রাষ্ট্রিকালীন আরও দুটি অতিবিক্ত বিদ্যালয়। সব মিলিয়ে উচ্চ-অনুচ্চ প্রায় গোটা পনেরো-কুড়ির কাছাকাছি শিক্ষাকেন্দ্রের সমন্বয় সাধিত হয়েছে বাঁশ-বেড়িয়ায় এই সাত্ত্ব দিন বর্গমাইল এলাকার মধ্যে।

উৎসাহ-সগর্যী নিঃসন্দেহে। তথাপি বাঁশবেড়িয়ার গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলটির সমন্বয় স্থানীয় অধিবাসীদের একটি অভিযোগও যে নেই এমনও নয়। একদা বিদ্যালয়টি মাত্র ২৫।৩০টি ছাত্রী নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাবপব স্থানীয় অধিবাসীদের চেতনা বিশেষত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, স্বর্গীয় হেমচন্দ্র কুণ্ডু, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঁশবী ব্যক্তিবর্গের যত্ন এবং পরিচর্যে এটি

একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে রূপ নেয়। উচ্চ মাধ্যমিক অধিকার লাভ কবেছে সেও বেশ কিছুদিনের কথা। কিন্তু একটু আর্থিক, আর্থিক দুটি এর এখনও রয়েছে। স্কুলটিতে বিজ্ঞান বিভাগ নেই। বিজ্ঞানে উৎসুক ছাত্রীদের যেতে হয় পাঁচ মাইল দূরে বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ে। বাঁশবেড়িয়া-বাসীর এ এক মস্ত অসুবিধে। জানা গেল বিজ্ঞান বিভাগ উন্মুক্ত করতে হলে যে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন—তা এরা পান নি বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্যই পাওরাত্ত দরকার এবং অনতিবিলম্বে। প্রায় পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্য এবং উচ্চমান সম্পন্ন এই বিদ্যালয়টির এই অসম্পূর্ণতার দুটি মেরামত হওয়া দরকার। বঙ্গীয় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের একটি শাখা রয়েছে এখানে—খামারপাড়ার। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ বড়সড় ক্রীড়া-ক্ষেত্র তাদের। অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও চলেছে এখানে এঁদেরই পরি-চালনায়। জুনিয়র ও সিনিয়র বৈদিক স্কুল, একটি কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়, সব রকমের খেলাধুলা করবার জন্য নিলম্ব খেলার মাঠও আছে এঁদের। শরীরচর্চার জন্য আছে জিমন্যাসিয়াম। ছাত্র সমবায়/সম্প্রতি খোলা হয়েছে এবং পোলারি স্কীমও চলে। সব মিলিয়ে এঁদের বহুদুখী কর্মধারা নিত্য প্রবাহমান।

শরীরচর্চার দিকটা বর্তমানে দেশে যেন দিন দিনই অবহেলিত হতে চলেছে। জীর্ণ, রুদ্র, স্বাস্থ্য-সম্পদহীন ছেলেদের জন-সংখ্যার অস্তর বাড়ার বটে, কিন্তু গণশক্তির ভার বাড়তে পারে না। দৃঢ়-মেরু-ডম্বর জাতি গড়ে তুলতে হলে মস্তক চচার সঙ্গ সঙ্গ পেশীচর্চাও যে অবশ্যই দরকার একথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। সুখের বিষয়, খামারপাড়া জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ উদ্যোগী হয়েছেন এ ব্যাপারে। শব্দ ছেলে নয়, মেয়েরাও খেলাধুলা, ব্যায়ামচর্চা করে থাকেন এখানে। শরীরচর্চার সঙ্গ সঙ্গ অপরাপর নানা জনহিতকর কাজকর্ম পরিচালনাকারী আরও দুটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাম কবা যেতে পারে সাহায্য নাস্ত বিহারী শক্তি সমিতি এবং বাঁশবেড়িয়া সন্তোষ সঙ্ঘের। এঁদেরও প্রতিষ্ঠা প্রাচীন, পবিচালনা সুন্দর এবং কাজকর্ম জনকল্যাণে উদ্দেশ্যময়। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার একটি পুরনো এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার। হুগলী জেলায় যতগুলি গ্রন্থাগার আছে এটি তাদের অন্যতমও বটে। কয়েক শত বঁধানো বইসহ

শাখাধিক বসুমতী

গ্রন্থসংখ্যা প্রায় চৌশল হাজারের কাছাকাছি। শ্রী রিডিংরুমও আছে এঁদের। পরিচালন ব্যবস্থা ভাল, তবে ছাত্র-পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা আরও কিছু বাড়াতে পারলে ভাল হয়। শিশু বিভাগ একটি আছে এবং উৎসাহী শিশু পাঠকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঁশবেড়িয়ার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। বাঁশবেড়িয়া রাজ-মংশের অন্যতম মনীষী পূর্ব কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় স্বদেশে এবং বিদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বহু তথ্য এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে মাত্র একটি আলমারী এবং ১২৯ খানি বই নিয়ে গ্রন্থাগারের প্রথম পত্তন। প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করা যায় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের। পরবর্তীকালে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায়ের করক্ষেপে গ্রন্থাগারটির ভিত্তি দৃঢ় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছিল সন্দেহ নেই। তারপর বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আজ এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

দুটি বৃহৎ শিশু-প্রতিষ্ঠান আছে বাঁশবেড়িয়ায়। একটি বাঁশবেড়িয়া গ্যাজেট ম্যানুফ্যাকচারিং, অপরটি এশিয়ার বৃহত্তম টায়ার উৎপাদন কেন্দ্র ডানলপ রবার ফ্যাক্টরী। প্রকৃতপক্ষে এঁদেরই দেওয়া টায়ারের ভরসায় কোনও রকমে চলেছে পৌরসভার কাজকর্ম। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার আয় খুবই কম। বাৎসরিক অনুমান চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকার মত। এবং এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশই বহন করেন এই দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবাসী। কাজ করেন হয় ডানলপে, নয় জুট মিলে। বাদবাকীরাও কোনও না কোনরকমে জীবিকাসংগ্রে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত। তবে দেখা গেল জুট মিলের প্রায় পাঁচ হাজার কর্মচারীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা অর্ধেকের বেশি নয়। অপর দিকে ডানলপে কিন্তু শতকরা প্রায় ৭০ জন কর্মচারীই বাঙালী। ১৯৩৬ সালে প্রথম স্থাপিত এই কারখানাটির আয়তন এখন বিরাট, উৎপাদনও পর্যাপ্ত। স্কুল, হাসপাতাল, চিত্রগৃহ, খেলার মাঠ সব নিয়ে এটি এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা, বর্ধিত বেতন হার, সম্মতাবজনক বোনাস এবং চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ডানলপ কোম্পানীর যথেষ্ট সুনাম আছে। বর্ধিত বেতন হারের নমুনাস্বরূপ সংলগ্ন বাজারটিতে জিনিসপত্রের দর-দামও দাঁড়াই চড়া। সর্বত্র ৫৫ পয়সা কিলো দরের চিম্যাটো একটাকা কিলো দরে বেশ হাঁক দিয়েই বিক্রি করছে দোকানদার দেখা গেল।

রোটারী ক্লাবের হুগলী শাখার দপ্তরটিও বাঁশবেড়িয়াতেই প্রতিষ্ঠিত। রোটারী বিশ্ব-

বিদ্রোহ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। হুগলী শাখার কল্যাণস্বার্থে হুগলী জেলার দূরতম প্রান্তে প্রসারিত।

আশ্চর্যের বিষয় পঞ্চাশ হাজার লোকের বাসস্থান পূর্ণাঙ্গ একটি পৌর-প্রতিষ্ঠানের অধীনে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে বিশেষ কিছু নেই। টিমটিমে আউটডোর মাত্র সন্ধ্যা। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী আছে মাত্র একটি। “রামবল্লভ নন্দন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী”। গত ১০৩৯ সালের ২১শে আষাঢ় রাজ-রাজেশ্বরী দাসীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এটির প্রতিষ্ঠা। গাঁহিত অর্থের আর এবং বৎসামান্য পৌরসভার দানে কোনওরকমে চলে যাচ্ছে এটি। বাড়িটি ভাল। অনেকগুলি ঘর আছে। দরজা-জানালাও প্রশস্ত। একটি হাসপাতাল বা প্রসূতি সদন এখানে হতে পারে অনায়াসেই। কয়েক-পঁচেস হাঙ্গপাতাল বা প্রসূতি সদন বলতে চুঁচুড়া সদরে ইমাম-বাড়া হাসপাতাল। শব্দ পথের দূরত্বই বাধা নয়, স্থানাভাবও সেখানে এতই বেশি যে, কখনও কখনও শান্তি রোগী এবং রোগিণীদের ভিড়ে করিডর দিয়ে হাটচালা পর্যন্ত দম্ন হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সেখানে আর রোগীর চাপ বন্ধি না করে ছোট ছোট হাসপাতাল গড়ে উঠাই ভাল।

খেলার মাঠ আছে ভাল। বাঁশবেড়িয়া স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন ঋতুর প্রায় সবারকম খেলাই হয়ে থাকে। পূর্বে এঁদের পরিচালনায় রকমারী প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। কি কারণে জানি না এখন সেগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাঁশবেড়িয়ার খেলোয়াড়মহলে একটা স্তিমিত অবসাদের যে সৃষ্টি হয় নি

এমনও নয়। আশপাশের অনেক অঞ্চলে দেখছি সুবিধে মত একটি খেলার মাঠের অভাবে সেখানকার ক্রীড়ামোদীর বধাবধ অনুশীলনের সুযোগটুকু পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। এঁদের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধে রয়েছে যথেষ্ট, তথাপি এ অবসাদ প্রশংসনীয় নয়।

গংগার তীরে তীরে দৃষ্টি দৌড়লে নজরে পড়বে সারি সারি ইটখোলা। উঁচু উঁচু চিমনি মূখে গলগল কালা ধোঁয়া। আশপাশের জনপদগুলির স্বচ্ছ আলো-বাতাসকে বিবাহ করে তুলছে অহরহ। বেশির ভাগ অবাঙালী-অধ্যুষিত এই ইটখোলাগুলি নোংরাই এবং বদমাইসির আখড়া বিশেষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আমদানী-করা মজুরদের অশ্লীল হল্লা, সময় বিশেষে মাতলামি, এমন কি মারপিট পর্যন্ত হয়ে থাকে এখানে হরদম। নগর জনপদের একেবারে গা ঘেঁসে এই ধরনের বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান রীতি-বহির্ভূত কিনা জানি নে। যদি না হয় তবে হওয়া উচিত। কোথাও কোথাও এমনই পল্লী কিংবা শহরগুলোর লোকজনের বস-বাসের মনঃ-মধ্যস্থানে ভাটিখানাও দেখছি। ইটখোলা কিংবা ভাটিখানা কোথায় হবে, গৃহ-জীবী সাধারণ মানুষের বসবাস থেকে তার দূরত্ব হবে কতখানি—সে সম্বন্ধে একটা সঠিক সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়ে যাওয়া দরকার।

আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে বাঁশবেড়িয়ায়। ১৮ বছর আগে সন্ন্যাসী স্বামীনতার দ্বারা দিতে দেশ-ধর, ভিটে-মাটি ছেড়ে বনার স্রোতে আগাছার মত ইতস্তত ভেঙ্গে এসেছিল যারা, সহায়-সম্বলহীন সেইসব উন্মাদস্থ মহিলাদের জীবন আর জীবিকার প্রতিশ্রুতি



বাঁশবেড়িয়ার কাছে গংগার মধ্যে চর, আর তার উপরই নির্মিত চাষীদের বাসস্থান।



বাঁশবেড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কম্পে স্থাপিত হয়েছিল কতকগুলি উন্মাদিত মহিলা শিবির। বাঁশবেড়িয়া উইমেন্স ক্যাম্পও তাদেরই অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় বিগত উত্তর স্বাধীনকাল ধরেই চালিত হচ্ছে শিবিরটি। একটু লম্বাটে ঘাঁচের কড় বড় টিনের দোচালা ঘর। শীতে দারুণ ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে ভাপসা গরম অশ্বকার। এক-একটি ঘরের মধ্যে চোন্দ-পনের, উর্ধ্ব সংখ্যায় খোলটি-পর্বন্ত পরিবারের বাস। গড়ে সাড়ে তিন থেকে চার হাত জায়গার মধ্যে চার, পাঁচ, ছয় কিংবা সাতটি প্রাণীর রাধা-বাড়া, খাওয়া-দাওয়া, বসামান্য তৈজসপত্রের স্থান সঙ্কুলান, রাত্রের ঘুম এবং দিনের বিশ্রাম সবই। দু'সপ্তাহ অন্তর মাথাপিছু বসামান্য রেশন, লগদ কিছু টাকা, বছরে চারখানি কাপড়। অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার একটা প্রাথমিক বন্দোবস্ত শিবিরেই আছে।

বৈজ্ঞানিক প্রথার হিম-মুরগী বা গরু-ছাগল পুতে হলেও শুনছি তাদের জন্যও নারী যথেষ্ট সুপারিসর স্থানের প্রয়োজন হয়। কারণ গারোগারে ঘেসাঘেসি করে রাখলে তাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রোগ ছড়ায়। দুখ কিংবা ডিম কমে যাবার ভয় থাকে। কিন্তু মানুস তো আর গরু-ছাগল কিংবা হিম-মুরগী নয়। ঘেসাঘেসি করে রাখলে তাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়তো হয়, কিন্তু দুখ ডিম কমে যাবার ভয়তো আর থাকে না। তাই স্বল্পতম স্থানে অধিকতম মানুসের ঘসবাসের গোয়ালের চেয়েও এই নিকৃষ্টতর পদ্ধতি অব্যাহত চলে যাচ্ছে, দিনের পর দিন নয়, বছরের পর বছর ধরে। বাই হোক সমাজ সংস্পর্শবিহীন হুম বন্ধ করা এই সংকীর্ণ পরিবেশে একটি সুদীর্ঘ সময় ধরে শরীরী প্রতীক্ষাকাল কাটিয়ে উঠতে পারলে (নাবালক ছেলেমেয়ে সাবালক হলে) অন্তে উন্মাদিত জীবনের পরম ধন পুনর্বাসন মেলে। নগদ

কাটা তিন জমি আর বাইশ শো টাকা। তাও যে সব সময়, ঠিক সময় হলেই পাওয়া যাবে এমন কোনও কথা নয়। দরখাস্ত করে বসে থাকতে হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্টের করুণা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি এবং সরকারী অর্ধভাডারের অনুকূল অবস্থা—এই ত্রিবিধ শুল্কগহের একত্র সংযোগ যদি ঘটে তবেই সম্ভব হয় ইহজীবনের ঐ মোক্ষ প্রাপ্তি। অবশ্যই অবসর সময়ে কাজ করে অর্থো-পার্জনের একটা মামূলি বন্দোবস্ত এখানেও আছে। কিন্তু ব্যাপারটা শুনেতে বত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিন্তু ভ্রত উপসাহায্যক নয়। কারণ কাজ বলতে চরকার সুতা কাটা—তুলা এবং রেশমের। পরিপ্রমের তুলনার মজুরী অতি সামান্য। এক লাইহ সুতী-সুতা তুলা পিঁজে-ধুনে পাঁজ তৈরি করে লাইহ জড়িয়ে প্রস্তুত করে দেওয়া পর্বন্ত রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয় আট ঘণ্টা। মজুরী মাত্র ৩৬ পরসা।

রেশমের ব্যাপার আরও চমৎকার। প্রায় এক ছোট কাটা রেশমের প্রয়োজন হয় এক লাইহ সুতার জন্য। এই কাটা রেশম কেছে লিখ করে কেছে, শুকিয়ে, পিঁজে লাইহ তৈরি করা পর্বন্ত সমস্ত লাগে ঐ আট ঘণ্টাই। মজুরীও ঐ ৩৬ পরসা। লাভের মধ্যে রেশম লিখ করে কাচার জন্য যে সাবান-সোড়া এবং যে জ্বালানি খরচা হয়, তার কোন মূল্য কর্তৃপক্ষ দেন না। ওটিকে কাটনির ঘর থেকে খরচা করতে হয়।

কাঁচা পাট কেটে দড়ি তৈরি করার স্ববন্দাও আছে। মৌসনিটি প্রকাণ্ড, লোহার এবং বেশ ভারী। নড়াতে গিয়ে দেখলাম যথেষ্ট শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে তবেই ওটিকে চালানো সম্ভব। এক কিলো পাট কেটে কাটনি উপার্জন করেন ৪৪ পরসা, সময় লাগে প্রায় রোল ঘণ্টা। পাট বাঁরা কাটেন তাঁদের

অনেকেই বুকে একটা ফিক ধরার বাধা অনুভব করেন বলে জানা গেল। চোখে দেখলাম কাটনি মহিলাদের মুখ ম্লান। সারা জীবনে একটা ক্লান্তি এবং অসুখতার ছাপ। বাজার আগুনে। শিবিরের ব্যবস্থিত রেশন বা নগদ টাকার চলে না কারুর। এককথায় সংসারের কোন কূলে কোথাও দিশে পাচ্ছেন না বাঁরা, জীবনী-শক্তি ক্ষয়কারী এই জীবিকাকে তাঁরাই অকিঞ্চিৎ ধরে পড়ে আছেন আজ পর্বন্ত।

শুধু এই-ই নয়। এর পরেও কথা আছে। প্রসঙ্গত জানা গেল সুপারিন্টেন্ডেন্টই এখানকার সন্মাজী। তাঁর আদেশে চন্দ্র সূর্যের উদয় হয় না বটে, কিন্তু সহায়-সম্মলহীন নিরুপায় নিরাশ্রয় এই মেয়েগুলির চোখের আলো বুকের আশা যে দপ করে নিভে যেতে পারে তার প্রমাণ প্রচুর। শোনা গেল গুণ নবেম্বর মাসে মাত্র একদিনের নোটিশে এই শিবিরেরই দুটি পরিবারের ওপরে ধুবুলিয়া শিবিরে বদলি হয়ে যাওয়ার হুকুম আসে। ডিসেম্বর মাসে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা। ঐ সময় অন্যত্র চলে গেলে বাচ্চাদের লম্ভাব্য ক্ষতি এবং শ্বিতীয়ত ধুবুলিয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু আতঙ্ককর অভিজ্ঞতা থাকার শঙ্কিতা জননী-স্বয় সময় প্রার্থনা করে বদলির তারিখ কিছুদিন পিছিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে—কর্তৃপক্ষের কাছে এক আবেদনপত্র দেন। উত্তরে তাঁদের রেশন ও অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেল। বিগত প্রায় আড়াই মাস কাল যাবৎ ছ-ছটি প্রাণী সহ এই দুটি পরিবার প্রথমে অর্ধাশ্রয় এবং এখন প্রায় অনশনে কাল কাটাচ্ছেন। সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে বথাসাধ্য আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে উর্ধ্বতনমহলে দরবার করবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু শোনা গেল কলিকাতা-স্থিত এদের যে প্রধান দপ্তর আছে সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে কোনও শিবিরবাসী মহিলাকেই সেখানে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয় না। ফলে বারবার চেষ্টা করেও ওপর মহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই এঁরা পারেন নি। কোন ব্যবস্থা নেওয়া বা অনুসন্ধান করানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্যগর্ভীন এই অতি পুরনো সাদামাটা দুঃখের কাঁটনির অবতারণা গ্রাম বাংলার কথার কেন? উত্তরে বলবো ইতিহাসেরই প্রয়োজনে। একদা এক হঠকারিতার মূল্য দিতে আপন আপন গৃহকোণের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে স্বজাঘাতে বৃত্তচ্যুত গরু-পুণ্ডের মত যারা ছিটকে পড়োছিল দিকে দিকে, তাদের উপযুক্ত আশ্রয় আচ্ছাদন এবং জীবনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেবার একটা অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি কি সমগ্র জাতির ছিল না? একথা আজ নতুন করে আর একবার জেনে নেবার প্রয়োজন হয়েছে বৈকি? একটা সম্পূর্ণ

মানবগোষ্ঠীকে ভিক্ষা-সম্বল ভিক্ষকে পরিণত করে, তারপর সেই মূর্খভিক্ষার দাঙ্কণ্যও এখন তখন যে কোনও উপলক্ষে সংকুচিত করে নেবার অধিকার কোন পদাধিকারীর আছে কি না! থাকলেও সেই দর্প, সেই ক্ষমতা-লিপ্সা, সেই নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ৎ ইতিহাস স্বয়ংই আদায় করে নেবে জাতির কাছ থেকে, আদায় করে নেবে তার অমোঘ, নিষ্ঠুর ঈশ্বরীর বিধানে।

বাঁশবেড়িয়া কাসারীপাড়া অতি প্রাচীন। পিতল-কাসার শিল্পটিও কয়েক শত বৎসরের ঐতিহ্য বহন করছে। কিন্তু বর্তমানে শিল্প তথা শিল্পকুল উভয়েরই উঠেছে নাভিস্বাস। প্যাসিলেন, চীনা মাটি এবং অথুনা আগত দিশ্বিজয়ী স্টেনলেস স্টীলের কল্যাণে পিতল কাসার থালা প্লাস জামবাটি, জামাইবন্দী রেকাবী, চুমকী ঘটি, কিংবা ছোট বে'টে-ঘাটলি হাড়ির আদর কমে যাচ্ছে দিনদিন। সাকির প্রদীপ, তামার পঞ্চপাত্র, ফলের থালা, নৈবেদ্য কিংবা ভোগপাত্রের দৌলতে প্রায় মর-মর শিল্পটির অস্তিত্ব আজও টিকে আছে কোনও রকমে। এককালে যেখানে সারি সারি বাস ছিল শত শত কাসারীর, হাপরের শৌ-শৌ, হাতুড়ির ঝটখট শব্দে পথে পথের কান পাতা দার হতো, আজ সেখানে কাসারী-পাড়ার ঠিকানা খুঁজে বার করতে হয়। স্তম্ভ পথে হঠাৎ কোনও হাপরের শব্দে চকিত পথিক চোখ কুঁচকে তাবে এ আবার কিসের ছাওয়ারা।

বলবার কিছু নেই, সময় পাচ্চেন। পিতল-কাসার গোবর বৃক্ষকে আবরিত করে আবৃত্ত হছে স্টেনলেস, চীনা মাটির, প্লাস্টিকের কাল। তথাপি মনে হয় আজও আমাদের জীবনযাত্রার সর্ববিধ প্রয়োজন থেকে পিতল-কাসাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আজও ঘরোয়া বাসনপত্রে, ফলদানীতে, টেবল ল্যাম্পে, অফিস কিংবা বাড়ির দরজার হাতল অথবা ল্যাচ এবং বৈদ্যুতিক নানা সরঞ্জামে পিতলের স্পর্শ আজও আছে। এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে সেইসব কাজেও তো লাগানো যায়। পুরাতন শিল্প জনম-পায় নতুন রূপে, ধ্বংসপ্রায় শিল্পকুল পায় বে'টে থাকবার নতুন ইসারা। কিন্তু করে কে? সময় কৈ? কোথায় উদ্যোগী কর্মী, উৎসাহী জনতা, সহানুভূতিশীল শ্রুভেচ্ছময় সরকারী কর্তৃপক্ষ। কলমের মুখে দু'ফোটা কালির আঁচড়ে দৃষ্টিতে যা লিখে ফেললাম, কর্মক্ষেত্রে তাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে এমন সবল বাহু, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, চিন্তাশীল মস্তিষ্কেরও যে আজ অভাব ঘটেছে।

ওপারে হালিশহর, এপারে বাঁশবেড়িয়া, মাঝখানে কলম্বনা প্রোভিন্সী গঙ্গা। আজ আর প্রখর তরঙ্গ নয়। অবসাদে স্তিমিত হয়েছে তার প্রবল তরঙ্গকূল। বৃকজোড়া বিশাল চর। চর নয় দ্বীপ বলা যেতে পারে। সরু দ্বীপ ফালি হয়ে



বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দুপাশে; মাঝখানে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মোট প্রায় তিন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রকাণ্ড ভূমি-খণ্ড। মানবজন বসবাস করছে সেখানে, গরু-বাহুর হালি বলদ সব নিরে। ঘরবাড়ি, চাব বাস, প্রায় আশ্রিত একটা উপনিবেশ বললেও চলে। শীতের দু'পূর, বৃককে ধারালো ইলপাতের ফলার মতো রোদ্দুর পড়েছে গঙ্গায়। ঝিকঝিক জ্বলছে জলধারা। নদীসূচক তরঙ্গ কল্লোল নেই, পুকুরের মত স্থির শান্ত। দিন দিন আরও স্থির আরও শান্ত হবে। প্রতিদিনই জলধারার তলায় তলায় জমবে, বিস্তৃত হবে সর্বনাশা বালুচর। হরণ করবে গঙ্গাপ্রান্তের প্রাবল্য। নিকটতর হবে একটি ইতিহাসের সমাপ্তি, একটি ঐতিহ্যের বিলোপ কাল।

নদীধারা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পতনের উদাহরণ সংগ্রহ করতে আমাদের খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। এই পাশেই রয়েছে সমগ্রাম। বিশ্বখ্যাত একটি বাণিজ্য-সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে গেছে কেবলমাত্র সরস্বতীর পলি আর বালুকাস্তরের নিচে পড়ে। অদূর ভবিষ্যতে ভাগীরথী-স্নেহদন্য কলকাতা বন্দরের পণ্ড অবশ্যও অনুমান করে নিতে আজ আর কষ্ট হয় না। হুগলী নদীর পলি, বন্দর কলকাতার সম্ভাব্য দূরবন্দ্য এবং তৎসংক্রান্ত ফারাফারি বাঁধের আলাপ-আলোচনাও আজ বড় পুরনো হয়ে গেছে। ও সম্বন্ধে নতুন করে কিছু ভাবতেও আজ আর ইচ্ছে করে না। কেমন যেন ক্রান্তি আর হতাশা অনুভব করি। চোখের সামনে দৈর্ঘ্য শমন এসে শিয়রে শাসাচ্ছে। গঙ্গা সোহাগিনী বংগীর সভ্যতার প্রধান ধারাটি লুপ্ত হতে চলেছে বালুচরের তলায়। লুপ্ত হতে চলেছে নৌ-সাধনক্রম বাঙালী জাতির অতীতের গর্ব, বর্তমানের বিকাশ, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ইতিহাস। চাপা পড়ছে স্মৃতি, কৃষ্টি, সাহিত্য, ভাওয়ালের সুর, ভাটিয়ালের গান। মুছে যাচ্ছে সগর রাজার সাগর খোঁড়ার

কাহিনী, ভগীরথের গঙ্গা আনার জলকর তপস্যা। গে'রো গায়কের গানের গাথা, নাম না জানা কত কবির কথা-কীর্তন—

মাথা ঘুরলো, চোখের সামনে রাশি রাশি খোঁরা জটা পাকিরে মিলিরে গেল শুলে। অনুচ্চারিত আত্মবরে প্রশ্ন করি বল নদী তুমি যদি না রইলে তবে আর কি রইলো আমাদের। এই বাংলা—আর বাঙালীর?

অনুচ্চারিত নিরন্তর নদী জবাব দেয় এই তো নিয়ম-স্রাকালের। পতন অব্যাহত বন্ধুর পন্থা—।

[আলোচ্য লেখিকা কর্তৃক গৃহীত : পরের বারে সাধক কবি রায়-প্রসাদের লীলাধনা "হালিশহর" (২৪ পরগনা)]

অ-আ-ক-স

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মারিক প্রণীত

মূল্য বঙ্গ আনা

শিশু মনোবিজ্ঞানে নিপুণ লেখক এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও বৃত্তাক্রমসহ বানান শিক্ষা যেরূপ বর্তমানের ছাত্রের সাহায্যে করিয়াছেন, তাহাতে শিশুদের শিক্ষাগ্রস্ত সহজ হইয়াছে। এ গ্রন্থকে বাঙালী যতগুলি বই আছে তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বইখানিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তিকপে নিবন্ধিত করিয়াছেন।

চিত্রে চিত্রময়—রঙ্গান আর্ট

পেপারে বড় হরকে ছাপা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১০০, বাণেশ্বরী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১৫

অপকৃত বহাণ

ওবনাতোনা
বিনোদ

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

জাগেই বলাই ডক্টর উইলিয়ামসের বক্তৃতা আমার খুব ভালো লাগত। প্রতিটি বক্তৃতা পেছনে তার বক্তৃতা প্রস্তুতি থাকত। তার বক্তৃতা ভাব ও ভাষা খুবই সুন্দর। অনেক চিত্তাকর্ষক ওখা তিনি পরিবেশন করতেন।

তিনি বলাইছিলেন আমেরিকার শিক্ষকেরা মিডল ক্লাস টেডোসকে বিক্রয় করে। তিনি মনে করতেন কালচারাল অ্যান্ড পোলাজি শিক্ষার ভিত্তি এবং ক্যাপিটালিস্ট ইকনমি শেখানোর দিকে শিক্ষার প্রবণতা থাকে। তার মতে ভালো শিক্ষা হবে প্রজেক্টেড এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বান্ডবকে নিয়ে কারবার করা।

আমি একদিন বললাম, 'আমেরিকার শিক্ষা এতো কাস্তবাপ্রায়ী, কিন্তু আমার মনে হয় এখন যথার্থভাবে ফিজিক্যাল ও ক্যামেরাল শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইয়তো এই জন্যে অ্যাডো-লোসেন এখানে নানা গারাক্স জুল করে ধসে।'

ডক্টর উইলিয়ামস আমার কথা মনে নিলেন।

সময়ের জীবন সম্পর্কে ডক্টর উইলিয়ামস একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'Life is not what we like. It is what it is.'

আমেরিকার কলার ডিসপিউট সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

'The Whitemen should learn to love before the Negroes should learn to hate.'

আমেরিকান শিক্ষকদের সম্পর্কে তার ধারণা আমার খুব ব্যক্তিগত মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকান টিচারদের অধিকাংশই মন-পলিটিক্যাল। অগ্রগতির জন্যে তারা কখনো পরিমাণে মটিভেটেড নয়। তারা অনেক মারায় স্টেটাস ফু ও ওরিয়েন্টেড। ফিনান্সিয়াল যেমনভাবে আছে সেগুলোর তেমন অবস্থাই তারা পছন্দ করে। তবে তারা খুবই কন্স-অপারেটিভ এবং স্কুলের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে খুবই দক্ষ।'

ফ্রিডম সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'Freedom is the courage to get. Freedom is a function of maturity and courage.'

ডক্টর উইলিয়ামস আমেরিকার ধর্ম-

জীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকার কনসিটিউশনে 'এড-কাল' শব্দটি নেই। রিলিজিয়ন মাত্র দ'ভারগয় আছে। সে দুটি হল—'রিলিজিয়াস ডিভম থাকবে এবং কোন অফিসের জন্যে কোনো রিলিজিয়াস ট্রেস্ট থাকবে না। তবে স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এবং ধর্মীয় স্কুলের জন্যে লোকে ট্যাক্স দেবে কিনা—এ নিয়ে এদেশে বহু কেস ও বাদানু-বাদ হয়েছে। প্যারোকিয়াল, বিশেষ করে ক্যাথলিক স্কুলের বাকি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পিউসবার্গ ও পেনসিল-ভের্নরাতে স্কুলের শাবার মতো ছাত্রদের অর্থের বেশি প্যারোকিয়াল স্কুলে পড়ে।'

আমি বলেছিলাম, 'আমার মনে হয় আমে-রিকার রিলিজিয়াস কনজারভেটিভদের একটি গভীর ও তাঁর অন্তঃপ্রেরিত আছে। আমেরিকা

এস. কে. প্রিনবার্গ

ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রয়ালিস্টিক। আমার ধারণা, কোর্টে বাইবেল নিয়ে শপথ করা এদেশে বহুকাল চলবে।'

ডক্টর উইলিয়ামস হেসে বলেছিলেন, 'তোমার মতো এতো সূক্ষ্ম ও অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা অনেক আমেরিকানেরও নেই।'

আমেরিকার শিক্ষা সম্পর্কে তিনি মনে করতেন,

'American education is more future projective and less past oriented.'

তার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, 'Flowering and developing the qualities of an individual up to the maximum extent.'

জ্যাকসন ও জেফারসন এই দুই রাষ্ট্র-নায়কের শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যায় ডক্টর উইলিয়ামসের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। দুই নেতাই মনে করতেন যে, ডেমোক্রেসিকে বাচাতে হলে দেশকে শিক্ষিত করতে হবে। কিন্তু জেফারসনের ধারণা ছিল,

'Intellectually talented should only move up.'

অপরপক্ষে জ্যাকসন মনে করতেন, 'Everybody has a right to move up.'

কল্যাণবাহী, ডেমোক্রেসির রক্ষার দিক দিয়ে জ্যাকসনের মতই গ্রাহ্য হয়েছে। ডেমো-ক্রেসির আদর্শ হচ্ছে,

'The universe is open, dynamic, creative and revolutionary. So the human beings and institutions are open, dynamic, creative and revolutionary.'

ডক্টর উইলিয়ামস এশিয়া, বিশেষ করে ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ইউরোপ সম্বন্ধে তার বক্তৃতা প্রকা-প্রকাশ পেত।

একদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ইউনিয়ন বিন্ডিং-এর রোজার্স ক্যামেরটোররার বসে ডিনার খাচ্ছি এমন সময় ডক্টর ও মিসেস উইলিয়ামস খাবার-ভর্তি ট্রে নিয়ে আমার টেবিলের কাছে এসে বললেন, 'মি উই জয়েন ইউ?'

আমি বললাম, 'স্পেস্ট গ্রাউলি।'

মিসেস উইলিয়ামস বললেন, 'তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? বাড়ি থেকে ঠিক মতো চিঠি পাব পাচ্ছ তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

—'এখনকার পড়াশুনো কেমন লাগছে?'

—'খুব ভালো। বিশেষ করে ডক্টর উই-লিয়ামসের বক্তৃতা আমার ভালো লাগে।'

—'আমারও ভালো লাগত আমি যখন টেনেস বিশ্ববিদ্যালয়ে গুর ছাত্রী ছিলাম। উনি বরুন-টিচার। তখন সবে পড়াতে শুরু করেছেন। গুর পড়া এতো ভালো লাগত যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।' বলেই তিনি মিষ্টি করে হেসে ফেললেন।

ডক্টর উইলিয়ামস তার দিকে চেয়ে বললেন, 'থ্যাক ইউ। ইউ ওয়ার ভেরি কাইড।'

পাশের একটি চেয়ার খালি ছিল। হঠাৎ এক ভদ্রলোক 'হ্যালো বিল, হাই' বলে এসে বসল। ডক্টর উইলিয়ামস পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'টেনেসে এর বাড়ির পাশে আমার থাকতাম। একে বাকি বলতে পার। এ বই-এর বাণীসা করে। এ আমারদের অনেক বই পড়াত।'

এটাওটা নিয়ে কথা বলার পর দেখলাম

উত্তর উইলিয়াম তার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি ডাড়াডাড়া তিনার সেরে 'কাজ আছে বলে' উঠে পড়লাম।

পরের দিন রেকফাস্ট টেবিলে একটি নতুন মঞ্চ দেখলাম। মিসেস পাওয়েল পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার খে ছোট মেয়ের কথা বলেছিলাম এ সেই। আগে ওকলা-হোমার পড়ত, এখন টেক্সাসে পড়ে।'

মেয়েটি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রশ্ন করলে। শেষে বললে, 'বোম্বাইতে মিস লীলা দেশাই বলে আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে। সে আগে এখানে এসেছিল। এখন একটা স্কুলে মাস্টারি করে। আমাকে সে ছায়াই সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'টেক্সাসে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কেমন?'

— 'খুব বেশি নয়। ভারতীয় ছাত্রেরা কলিফোর্ণিতে বেশি আসে না।'

সেদিন বিকেলেই মিসেস পাওয়েলের ছোট মেয়ে টেক্সাসে চলে গেল। রেমণ্ডও তার সঙ্গে গেল। রেকফাস্ট টেবিলে দেখলাম মিস্টার ও মিসেস পাওয়েল উভয়েরই মন খারাপ। মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'রেমণ্ড চলে যাওয়াতে তার অভাব খুব বোধ হচ্ছে।'

মিস্টার কা বললে, 'ওকলাহোমায় তো বেশ ভাল ইউনিভার্সিটি। আপনাদের মেয়েকে টেক্সাসে পাড়াচ্ছেন কেন?'

মিসেস পাওয়েল উত্তর দিলেন, 'এই পরীক্ষাই একটি ছেলের সঙ্গে ওর ডেটিং হচ্ছে। তাই ওর পড়াশুনো এখানে ভাল হ'চ্ছিল না। তা ছাড়া দূরে গেলেও উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ তিক থাকে কি না সেটাও দেখা দরকার। বিয়ের আগে পরস্পরের ভালবাসা যাঁটি কিনা তার পরীক্ষা হওয়া উচিত।'

মিসেস পাওয়েলের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভাল লাগল।

মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'আজ বিকেলে আমার মা আসছেন। ক'দিন থাকবেন। তারপর সামনের থ্যাংকস গিভিং ডেতে আমরা সকলে টেক্সাসের বাড়িতে যাব।'

পরদিন রেকফাস্ট টেবিলে মিস্টার পাওয়েলের মাকে দেখলাম। অশীতিবর্ষ হুঁশ। কিন্তু তিনি বেশ হাটচালা কাজকর্ম করতে পারেন। তিনিই সেদিন আমাদের সভা করলেন। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন। তোমরা রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে।'

আমি মিস্টার কারের সঙ্গে পরামর্শ করে বললাম, 'অনেক দিন আগে বলেছিলাম এক দিন আপনাদের ইন্ডিয়ান ডিস খাওয়াব। আজ একটা ভাল ওকসান। আজ আমরা রাইস ও এগ কারি রাখিব।'

বিকলে আমরা একটি রপোর বাতিঘান ও একটি লাল মোমবাতি কিলে কিরলাম। একটু, বিপ্রাম করে রাইস ও এগ কারি তৈরি করলাম। ডিনারের সময় মিস্টার পাওয়েলের

মা একটি সুন্দর মাউন পরে এলেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এটা বিল আমাদের দিয়েছে। এতো কালারফুল জামা কি আমার মতো বৃদ্ধকে মানার?'

আমি বললাম, 'আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

বৃদ্ধা সলজ্জ হাসলেন।

নতুন টেবিল ক্রথ, ফলদানিতে কদল, বাতিঘানিতে মোমবাতি, নতুন ক্রকার সেট—সব মিলিয়ে একটা অনুষ্ঠানের পবিত্র পরিবেশ।

মিস্টার পাওয়েল প্রার্থনা করলেন। তারপর খাওয়ার পালা। নিজেদের তৈরি রাইস ও এগ কারি আমাদের অপূর্ব লাগল। দেখলাম মিস্টার ও মিসেস পাওয়েল এবং তাঁদের মা খুব রেলিশ করে খাচ্ছেন। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'রান্না বেশ ভাল হয়েছে। মেক্সিকানরাও এই রকম মশলা ব্যবহার করে।'

দেখলাম তিনজনের চোখ দিয়েই জল করছে, অথচ কেউই কারি ছাড়তে পারছেন না। মিস্টার পাওয়েলের মা তিন বার কারি নিলেন। আমি বললাম, 'কারি কি বেশি হট?'

তিনি বললেন, 'হট বাট নাইস।'

ডিনারের পর বাতিঘানে মোম বাঁসিয়ে আমরা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'এই সামান্য উপহার গ্রহণ করলে আমরা খুশি হব। ভগবান আপনাকে আরো অনেক বৎসর শান্তি ও সুখে বাঁচিয়ে রাখুন।'

উপহারটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধার চোখ জল জল করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, 'আমি বর্ষাধিন বাঁচিব তোমাদের এই উপহার আমার মাথার কাছে থেকে তোমাদের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেবে। আমার প্রীতি জন্মদিনে এটিকে জ্বালাব।'

মিসেস পাওয়েল মোম জ্বেলে দিলেন মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'মামির সৌভাগ্য। এই আলো বহু দেশ ও সমুদ্রপারের স্মৃতি বহন করছে।'

মিস্টার পাওয়েলের মা আমাদের খুবই মন করতেন। প্রতিদিন আমাদের বিছানায় পরিষ্কার, ঘরদোর গোছানো ইত্যাদি তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। থ্যাংকস গিভিং ডে-র পর যখন তিনি মিস্টার ও মিসেস পাওয়েলের সঙ্গে চলে গেলেন তখন খুব খারাপ লাগল। তবে শুনলাম তিনি আবার ওদের সঙ্গেই ফিরবেন। মাওয়ার সময় মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'আমরা দু-তিন দিন পরে সামনের শনি-রবিবার ফিরব। কোনো অসুবিধে হলে একটু দূরে মিস্টার পার্মারকে খবর দিও। আমি ওকে বলে রেখেছি। নিজেরা খুব সাবধানে থেক।'

আমাদের ওপর বিশ্বাস করে বাড়ির দর কিছু ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে গেলেন। দু'দিন আমরা নিজেরা রান্নাবান্না করে চালানো। তৃতীয় দিনে মিস্টার কা বললেন, 'আজ শনিবার। ফুটবল খেলা আছে। বহু লোক



ভারতের
আদিত্য
কুসাম্বন

চ্যবনপ্রাশ

আরুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত



চ্যবনপ্রাশ পুতন ও পুরাতন সর্দি কাশি, শরতক ও শাসনহের পীড়ার বিশেষ উপকারী। টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের শৌর্কশা ও রক্তভা দৃঢ় করে ও শরীরের পুষ্টি বাধন করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা গোয়া কামপুর

ইউনিয়ন বিল্ডিংসের ক্যাফেটেরিয়ায় থাকে।
ওখানে আর খেতে যাব না। বাড়িতেই ভাল
করে রান্না করা থাক।'

ভাল করে রান্নাবান্না করে খেলে যখন
বেসিনে শ্লেট খুঁজি হঠাৎ দেখি জল নীচে
সামছে না, আটকে গেছে। অনেক খোঁচাখুঁচি
করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।
জল বেসিন ছাপিয়ে যেতে লাগল। খুব
খাবড়ে গেলাম। আমি মিস্টার কাকে বললাম,
'দেখ, এ কি হল। ওরা এসে কি ভাববেন।'

মিস্টার বা বললে, 'চল মিস্টার পার্মারকে
খুঁজা যাক।'

মিস্টার পার্মারকে বলতে উনি বললেন,
'অনেক সময় সোপের সঙ্গে অরেল ইত্যাদি
মিশে পাইপ চোকড় হয়ে যায়। আশা করি
আমি ঠিক করে দিতে পারব।' তারপর তিনি
একটি ল্যাটার আগার দুর্মশাকর্ষিত ফাঁপা রবার
আটকে নিয়ে বললেন, 'চলুন, দেখা যাক।'

তিনি পাম্প করার মতো রবার চেপে চেপে
জল তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই
কিছু হল না। শেষে ক্রান্ত হয়ে বললেন,
'আর হবে না। কোনো প্লাম্বারকে খবর দিন।'

তিনি চলে গেলে মিস্টার বা বললে, 'চল,
একবার মিস্টার চৌধুরীকে কলসার্ট করি।'

মিস্টার চৌধুরী বাড়িতেই ছিলেন,
আমাদের ব্যাপারটা শুনে বললেন, 'এ রকম
এখানে হয়। একজন প্লাম্বারকে ঠিক করতে
শারলে হবে। কিন্তু আজ শনিবার। ফুটবল
খেলা আছে। কাউকে পাওয়া যাবে কি না বলা
সুশঙ্কিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আজ যদি ওরা
এসে পড়ে, তবে তো লন্ডার মাথা কাটা
যাবে।'

মিস্টার চৌধুরী বললেন, 'আচ্ছা, চেষ্টা
করে দেখা যাক।'

ফোন ডায়ালিংয়ের ইয়েলো শেজ দেখে
একটর পর একটা ফার্মকে ফোন করা হল।
অফিসেরই এক জবাব, 'আজ হবে না।' শব্দ
একটি ফার্ম বললে, 'আমাদের কোনো মিস্ট্রী
এখন ফার্ম নেই। যদি পাঁচটার মধ্যে কেউ
আসে তবে পাঠাব।' মিস্টার চৌধুরী বললেন,
'এই ফার্মটাকে ভাগদা দিয়ে যান। আশা করি
হয়ে যাবে। আমি একটু বোকে নিয়ে
কেনেছি।'

আমরা বাসার ফিরে এলাম। মিস্টার বা
বললে, 'কি ফ্যাসাদ বলা তো।' মিস্টার
চৌধুরীও এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। জল পাম্প
করে তোলবার চেষ্টায় মিস্টার পার্মার ময়লা
জল ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছেন।
পাঁচটার মধ্যে যদি মিস্ট্রী না আসে তবে কাল
জীববারে তো বন্ধ থাকার কোন লোক পাওয়া
যাবে না। অথচ ওরা টেক্সাস থেকে আজ
সন্ধ্যার অথবা কাল অবশ্যই এসে পড়বেন।
তখন লন্ডার মাথা কাটা যাবে।'

আমরা আর ওপরে গেলাম না। ড্রইং
রুমে বসে থাকলাম। শানিক পরে টেলি-

ফোন করলাম। কোনো আশ্বাস খবর দেয়।
তবে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনবার ফোন
করলাম, সেই একই কথা—কোনো মিস্ট্রী ফার্ম
ফেরে নি। পাঁচটির শব্দ হলই চমকে উঠতে
লাগলাম। কিন্তু কা কস্যা পরিবেদনা। না,
আর প্রেস্টিজ থাকল না। বৃকের মধ্যে
টোঁকর পাড় পড়তে লাগল।

পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। আমি
বললাম, 'একবার শেষ বারের মতো খবর
নেওয়া যাক।'

দুর্ম, দুর্ম, বৃকে ফোন করলাম। ফার্ম
বললে, 'এই মাত্র আমাদের দুজন মিস্ট্রী
এসেছিল। আপনাদের জরুরী অবস্থার কথা
চিন্তা করে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি।'

মিস্ট্রী দুজন এল ঠিক পাঁচটা বাজতে
দশ মিনিটে। বলতে গেলে আমরা ইন্টনাম
জপ করছিলাম। মিস্ট্রী দুজন জলের পাইপ
পরীক্ষা করে বললে, 'নীচে কোথাও পাইপ
চোকড় হয়েছে।' তারা বেসমেটে নেমে গেল।
খানিকক্ষণ পরে উঠে এসে বললে, 'ঠিক করে
দিয়েছি।'

আমরা মৃশুভাবে তাকিয়ে দেখলাম জল
নেমে গেছে। টাব থেকে জল ফেলে দেখলাম
জল চলে যাচ্ছে, জমছে না। মিস্ট্রী বেসিন
ফোর ইত্যাদি পরিষ্কার করে দশ ডলার পারি-
শ্রমিক নিয়ে চলে গেল। আমরা হিম্ব ছেড়ে
বচিলাম। ওপরে উঠতে যাব এমন সময় কলিং
বেল বাজল। দরজা খুলে দেখলাম মিস্টার ও
মিসেস পাওয়েল এবং তার মা। মিস্টার
পাওয়েল হেসে বললেন, 'সব ভাল তো?'

আমরা দ্ব-চারটে কথা বলে ওপরে এসে
শুরে পড়লাম। রাগিতে আর ডিনার খেতে
উঠলাম না।

ওকলাহোমার থাকাকালীন সব চরে বড়
খবর প্রেসিডেন্ট কেনেডির ইত্যা। একদিন
ইউনিয়ন বিল্ডিং-এর ক্যাফেটেরিয়ায় বসে লাগু
খাচ্ছি হঠাৎ ডোরা ছুটে ছুটে এসে খবর
দিলে, 'এই মাত্র টেলিভিসনে খবর এসেছে
কেনেডি ডালাস সফরের সময় আততায়ীর
গুলীতে মারা গেছেন।' ডোরা হিফাঙ্কল।

যারা খাচ্ছিল তারা বজ্রহত হয়ে গেল।
খাবার মধ্য পথে রেখেই ছুটল টেলিভিসনে।
কেনেডি একটি দক্ষিণাঞ্চল পরিভ্রমার ডালাসে
আসবেন শূন্যেছিলাম। ডালাস, আরো সাধারণ-
ভাবে বলতে গেলে দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কিছু-
সংখ্যক হোয়াইটম্যান কেনেডির নিগ্রাসম্পর্কিত
উদার নীতি পছন্দ করত না। ডালাসে কারো
কারো মধ্যে কেনেডির কঠোর সমালোচনা
করতে শূন্যেছি। তবে সাধারণভাবে লোকেরা
কেনেডির ব্যক্তিগত, চরিত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার
প্রশংসা করত।

পরে জানা গেল কেনেডি ও টেক্সাসের
গভর্নর জন বি ফোনাট্টী তাদের স্ত্রী ও
কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে একটি খোলা
মোটরে যাচ্ছিলেন তখন একটি বাড়ির ছয়-
ডলার জানলা থেকে তাদের গুলী করা হয়।

ঘটনাটি ঘটে ডাউনটাউনে একটি পার্কের দিকে
মুখ করা ট্রিপল আন্ডারপাসের পূর্বদিকে।
কেনেডির মাথায় এবং কৈনালীর বৃকে গুলী
লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পাক'ল্যান্ড হাস-
পাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অল্পক্ষণের
মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু ঘটে।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কাজকর্ম হল
না। সকলের মুখই গম্ভীর। কারো কারো
চোখে জল। বিকেলে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের
উত্তর-পূর্ব কোণে টাউন ট্যানার রেস্টুরেন্টে
চা খেতে চুকে শুনলাম একটি মেয়ে তার
বান্ধবীকে বলছে, 'এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
কেনেডি লিঙ্কনের সমগোষ্ঠীর হলেন।'

সেদিন এবং পরের কয় দিনও অনেকেই
বৈশিষ্ট্য ভাগ সময় কাটল টেলিভিসনে
কেনেডির মৃত্যুর পরবর্তী নানা দৃশ্য দেখে।
সারা দেশে বিবাদের ছায়া। অনেকেই চোখে
জল। ঠিক যেন একজন নিকট আত্মীয়
বিরোধের মৃশুখে বিদেশীদের মন শোকাঙ্কন।
কেনেডির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরো একবার
প্রমাণিত হল যে শহীদের জীবনদান না হলে
পৃথিবীর কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না।
কেনেডির জীবন-স্বর্ষ অন্তিমিত হল, কিন্তু
যারা শান্তি ও স্বাধীনতার নতুন সীমাস্তের
অভিসারী তাঁদের মনে সেই স্মরণীয় অক্ষান
হয়ে রইল। ওয়াশিংটনে আর্লিংটন সিম-
টারিতে কেনেডির সমাধিক্ষেত্রে মিসেস কেনেডি
যে ইটারনাল স্লেম জ্বালালেন তার প্রভাব
প্রতিটি বিশ্বশান্তিকামীর অন্তর উজ্জ্বল হয়ে
উঠল।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিস্টার ও
মিসেস পাওয়েলের সঙ্গে কেনেডির মৃত্যু
সম্পর্কে নানা কথা হল। মিসেস পাওয়েল
বললেন, 'কেনেডি তার উদার নিগ্রোনীতির
জন্যে কারো কারো বিরাগভাজন হলেও এমন
একটা ব্যাপার যে ঘটবে তা আমরা ভাবতে
পারি নি।'

মিস্টার পাওয়েল বললেন, 'এমন ব্যাপার
ঘটা যে কোনো সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জাজনক।
তবে মহৎ প্রাণের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মহৎ কার্য
অগ্রসর হয়।'

কদিন আমার মন কেনেডির মৃত্যুশোকে
আচ্ছন্ন হয়ে রইল। বিশেষ করে মনে হতে
লাগল কেনেডির কফিন নিয়ে শোভাযাত্রার
সময় কেনেডির ছেলে তার মায়ের পাশে
দাঁড়িয়ে সেই কফিনকে বেভাবে স্যালুট করলে
সেই দৃশ্য, মিসেস কেনেডির শোককাতর মুখ,
আর্লিংটন সিমেন্টারিতে কেনেডিকে সমাধি
দেওয়ার দৃশ্য, জাতীয় পতাকা ভাঁজ করে
কেনেডির পিতার হাতে দেওয়া, মিসেস
কেনেডির ইটারনাল স্লেম জ্বালানো ইত্যাদি।

স্বপ্নজগৎ

মধুর রাত্রির অভিশাপ

নাইট ক্লাবের ছবির শেষ নেই। ১৯৬৬ সালের প্রথম মাসে আবার নাইট ক্লাবের নারীদেহ প্রদর্শনীর ছবি মুক্তিলাভ করেছে। আবার বুদ্ধিগত কাউন্টারের সামনে তরুণ থেকে প্রবীণদের কিউ পড়েছে টিকেট কেনার জন্য। একই সঙ্গে কলকাতার কয়েকটি সিনেমায় নৈশ প্রমোদলোকের ছবি দেখান চলছে। ব্যাপার দেখে মনে হয়, কলকাতার দর্শক এবং সিনেমা ব্যবসারীরা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র অপেক্ষা নৈশ প্রমোদ-জীবনের ছবি দেখার জন্যই বেশি আগ্রহী। ইতোপূর্বে (গত বছর) যে ছবিটি নৈশ প্রমোদলোকের ছবি মুক্তিলাভ করেছে সে কয়টি দেখে দর্শকদের তৃপ্তি হয় নি, কারণ নগ্ন নারীদেহ দেখার উৎসুক দর্শকের সংখ্যা যেন বেড়ে গেছে। এবার যে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে এটা কারো কারো মতে আরো বেশি মধুর। মধুর রাত্রির চিত্র। খুব কায়দা করে নারীদেহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখান হয়েছে। নারীদেহকে পণ্য করে নিলজ্ঞ ব্যবসায়ের এই চিত্রগুলি দেখার জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিতরা ভিড় করছে।

ইতোপূর্বে আমরা কয়েকবার এইরূপ কুংসিত সিনেমা ব্যবসার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছি। কলকাতা পৌরসভা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু কারো কানে যে সে কথা পৌঁছেছে—এমন মনে করা চলে না। ঢালাওভাবে এসব ছবি দেখাবার প্রতিজ্ঞা সমাজে কিরূপ হতে পারে সে-কথা পৌরপিতা এবং মহামান্য মন্ত্রিমণ্ডলী বুঝেন কি না জানি না। কিন্তু জনগণের এই অভিভাবকরা যখন সভা আলোকিত করে মাইকের সামনে দাঁড়ান তখন তাঁরা অত্যন্ত চড়া গলায় দেশের তরুণ সমাজের অধঃপতনের কথা বলেন। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার আবেদন জানান। একদিকে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনীর অনুরূপ দান, আর একদিকে নৈতিক অবনতির জন্য অভিশাপ বর্ষণ, দুটি ঘটনার যোগাযোগ অপূর্ব!

এই পরিস্থিতি দেখে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের সমাজ জীবনের কথাই মনে হচ্ছে। যখন অর্থনৈতিক সংকট এবং হতাশায় মানুষ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল তখন উগ্র যৌন সাহিত্য এবং যৌনধর্মী নাটক মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। হতাশা এবং সংকট থেকে বাঁচবার জন্য মানুষের কাছে একমাত্র পথ ছিল বিপ্লব। সেই বিপ্লব জনগণের দ্বারাই সম্ভব হতো। যেমন রাশিয়ায় সাধক হয়েছিল। তাই সকল দেশের কারেমী স্বার্থের দল উগ্র যৌনধর্মী সাহিত্য, নাটক ও সিনেমায় তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশেও আজ একই অবস্থা। যুদ্ধ, অর্থসংকট, চরম দুর্নীতি ইত্যাদিতে মানুষের মনে অসন্তোষ ও এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা তুষের আগুনের মত জ্বলছে। যে কোন মুহূর্তে তা জ্বলো উঠবার অপেক্ষায়। এই সময় অত্যন্ত চতুরতার সাথে দেশে 'মধুর রাত্রির' ছবি, যৌনসাহিত্য এবং যৌনজীবনধর্মী নাটক অভিনয়ে উৎসাহ যোগান হচ্ছে। ফুটপাতের বইর দোকানে যৌনসাহিত্য বিক্রয় হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ফিল্মসেন্সর বোর্ড নাইট ক্লাবের কুংসিত ছবিগুলির ছাড়পত্র মঞ্জুর করছেন। শুধু তা নয়, বিদেশী মদ্রা ব্যয়ে এসব ছবি আমদানীতেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দপ্তর অনুমতি প্রদর্শন করছেন।

এই পরিস্থিতিতে কারো রুদ্ধতে অসুবিধা হবার কথা নয়, উগ্র যৌন চলচিত্র এবং যৌন সাহিত্য প্রচারের উৎস কোথায়? এবং দেশের তরুণ সমাজের নৈতিক মান দুর্বল করে রাখাই উদ্দেশ্য।

—স.জন।



সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চিত্র আলোচনা

সুশান্ত সা

(পরিচালনা—অর্ধেন্দু সেন)

যুক্ত বাংলার এবং খণ্ডিত বাংলার জমিদার পরিবার-কেন্দ্রিক কাহিনী-চিত্র অনেক হয়েছে। 'সুশান্ত-সা' আর একটি সংযোজন। এই কাহিনী চিত্রের প্রথম অংশের গতি-প্রকৃতিও সেই পুরাতন কালের ছবির রীতি অনুযায়ী। মিথ্যা সন্দেহ কিভাবে একটি সুন্দর মনকে অসুন্দর করে তোলে এবং একটি সুখী পরিবারকে ভেঙে দিল এমন এক কাহিনীর সঙ্গে এসেছে নারীর চিরায়ত আত্মতাগের কথা। যে নারী নিজের মাথায় কলকের বোঝা নিয়ে স্বামীর জীবন রক্ষা করতে চায়।

এক সুখী জমিদার পরিবারের ছেলে সুশান্ত। দাদা-বৌদি, বন্ধু আর বান্ধবীকে ঘিরে আনন্দময় জীবন। কথা ছিল প্রতিবেশী সাবিত্রীর সাথে সুশান্তের বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ে হল ভুয়ারবালায় সাথে। জমিদারীর কালে বান্ধু থাকার ভুয়ার ঠিক মনের মত নয় সুশান্তকে পেল না। সে তখন ছলাকলা ও মান-অভিমান শূন্য করলো সুশান্তের মন পাবার জন্য। এতে ভুয়ারের প্রতি আরো আকৃষ্ট হবার পরিবর্তে সুশান্তের মনে দেখা দিল সন্দেহ এবং ঈর্ষা। এমন এক সময়ে সাবিত্রী গ্রামে ফিরে এল বিধবা হয়ে এবং সুশান্ত তাকে বাড়িতেই আশ্রয় দিল। এবার সাবিত্রীর মনেও সন্দেহ ও ঈর্ষা দেখা দিল।



শ্রীমতী প্রোডাকশনের 'মহানগর' চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জী, হারা দেবী ও সত্যা রায়

কই দিকেই এই সম্ভব ও ঈর্ষার আগুন
হৃদয়ের নবন মানবগুলি কুটিল ও বিভ্রান্ত
এরে পড়লো। তুষার বাপের বাড়ি চলে গেল
কজনকে নিয়ে। সেই সন্তানকে ফিরিয়ে
আনতে গিয়ে রক্তাক্ত কাঁড় এবং কড়ভাই
প্রশান্ত প্রাণ হারাল। এবার আদালতে আসামী
হিসাবে দাঁড়াল সন্তান। তার দণ্ড প্রায়
নিশ্চিত। নিশ্চিত দণ্ড থেকে তাকে রক্ষা
করার জন্য তুষার নিজের মাথার মিথ্যা কলঙ্ক
টেনে নিল। এই আত্মত্যাগের ফলে তাদের
পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল।

অনেক চরিত্রের উপস্থিতিতে এই পারি-
বারিক চিত্র পরিণতিতে পৌঁছেছে। মিথ্যা
জন্মের দরুন কি ভয়ানক অমঙ্গল দেখা
দিতে পারে এই স্বভাব ছবিতে স্পষ্ট হয়ে
উঠেছে। চিত্র-রূপায়ণ রীতির দিক থেকে
দ্রষ্টব্য না হলেও এই ছবি অন্তত বোম্বাই-
প্রভাবে ঢাকা পড়েনি। প্রামাণ্যবোধ কাহিনী
হওয়ার গ্রামের দৃশ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য উপ-
ভোগের সুযোগ আছে। তবে চিত্রগ্রহণে এই
সুযোগ আরো ভালভাবে গ্রহণ করার সুযোগ
ছিল। অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা পাবেন
কমল চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং
লিলি চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রে যথার্থ
অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, জ্ঞানেশ
মুখার্জী, কমল মিত্র, মলিনা দেবী, সবিভারত
এবং ভারতী দেবী, বিকাশ রায়, অমর মল্লিক
প্রমুখ। সংগীত পরিচালনা করেছেন সুধীন
চাণ্ডোগু।

ব্যটলিশিপ পট্টেমকিন-এর চিত্রনাট্য
লেখিকা

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যটলিশিপ পট্টেম-

কিন-এর চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই
চল্লিশ বছরে ছবিটি পুরাতন হয়নি। এখন
পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এই ছবির
গুরুত্ব অসামান্য। অজানা দর্শকেরা ছবিটি
দেখতে আসেন আগ্রহসহকারে।

১৯২৬ সালে প্রথম যখন ছবিটি বিভিন্ন
দেশে প্রদর্শিত হচ্ছিল তখন সংবাদপত্রে বড়
বড় শিরোনামের লেখা হয়েছিল :-

ড্রাম : 'ব্যটলিশিপ পট্টেমকিন'কে সর্বশ্রেষ্ঠ
পুঙ্খবাক্য দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা : 'একচেতিম' ঘোষণা করেছে
'ব্যটলিশিপ পট্টেমকিন' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ
ছবি এবং কু-ক্লাস-ক্যান দাবি করছে লাল
পরিচালককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া
হোক (ছবিটির সৃষ্টি উপলক্ষে আইজেন-
স্টাইন আমেরিকায় ছিলেন)।

বিশ্ব বহুর পরে রুসেলস-এ আন্তর্জাতিক
চলচ্চিত্র সমালোচকদের ভোটে এই ছবিটিকে
বিশ্বে এ-যাবৎ নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
বারোটির অন্যতম ঘোষণা করা হয়। যে দেশেই
ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে সে দেশের দর্শকেরা
বিস্ময় বোধ করেছে; অভিভূত হয়েছে।

ব্যটলিশিপ পট্টেমকিন-এর চিত্রনাট্য-
লেখিকা নানে আগাজনোভা। পরিচালক
সেগেই আইজেনস্টাইন তাঁকে আদর করে
বলতেন—নীলনয়না, লজ্জানয়, আমার প্রিয়
আশ্রয়দাত্রী। তিনি উচ্ছ্বাসের সাথে বলতেন
এই মহিলার বিপ্লবী অতীতের কথা। জারের
করাগারে তাঁর দণ্ডভোগের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ
জীবনের কথা। কেন এই উচ্ছ্বাস, তা বুঝা যায়
ছবিটি দেখে; তাঁর লেখা চিত্রনাট্যের শক্তি
অনুভব করে।

১৯২৪ সালে রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবের
বিশে বার্ষিকী পালনের জন্য এক কমিশন
গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন নানে আগাজা-
নোভাকে অনুরোধ করেছিল ১৯০৫ সালের
বিপ্লব সম্পর্কে একটি চিত্রনাট্য লিখিবার জন্য।
কমিশনের একটি সভায় এই মহিলা এবং
তার স্বামী কিরিল শাটকো উপস্থিত
ছিলেন। কিরিল শাটকো ১৯১৭ সালের
বিপ্লবে এবং গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
তিনি আইজেনস্টাইনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু
ছিলেন। আইজেনস্টাইন তখন মাত্র 'রিভোলুট'
ছবিটি শেষ করেছেন। কিরিল-দম্পতি আই-
জেনস্টাইনকে এই চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্র
নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

আইজেনস্টাইন নিজেও লিখেছেন—
আগাজনোভা এবং কিরিলের সাথে কাজ করে
তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যখন
চিত্রনাট্যটি পড়া হচ্ছিল তখন চিত্রনাট্য লেখিকা
মনে করছিলেন অন্তত চার-পাঁচটি স্টুডিওতে
কাজ না করলে ছবি করা সম্ভব হবে না।
কারণ এটা মামুলী চিত্রনাট্য নয়, অত্যন্ত
গভীর অনুভূতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-
মূলক চিত্রনাট্য। অনেকগুলি স্টুডিওর
সাহায্য না নিয়ে এ রকম ছবির কাজ হতে
পারে না। এসব চিন্তার সময় অতিবাহিত
হয়ে যাচ্ছিল। এবং শেষমুহুর্তে নির্মাতারা
অনুভব করলেন যে সমগ্র চিত্রনাট্যের ছবি
তোলা এত অল্প সময়ে অসম্ভব।

তখন আইজেনস্টাইন চিত্রনাট্যের অংশ-
মাত্র নিয়ে কাজ শুরু করার কথা ভাবলেন
এবং সেই অংশ কেবলমাত্র পট্টেমকিনের বিষয়।
তিনি তার সহকারী প্রিগারি আলেক্সান্দ্রেভকে

নিরে ওডেসা রওনা হলেন। পরে গেলেন ক্যামেরাম্যান এডওয়ার্ড টিসে।

‘ব্যাটলশিপ পটেকিন’ মাত্র দুই মাস সময়ে তৈরি হয়েছে। আইজেনস্টাইন একটি-মাত্র ঘটনার চিত্রগ্রহণেই প্রথম বিশ্ববের সমাধি প্রকাশ করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা নাও আগাজানোভা সম্পর্কে আইজেনস্টাইন বলেছেন,—‘তার মত আরো চিত্রনাট্যকার পাওয়া গেলে কত ভাল হতে পারতো। যার সিনেমা ট্রিকস্ সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং ঐতিহাসিক এবং ভাবাবেগপূর্ণ মেজাজ সৃষ্টি করে পরিচালকদের প্রভাবিত করতে পারেন।

এস্. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্‌ঘাটন

২৬শে জানুয়ারীর জাতীয় উৎসব সন্ধ্যায় একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে সায়ান্স ফিকশান সিনে ক্লাবের উদ্‌ঘাটন হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীরায় সকলকে স্বাগত জানান এবং সায়ান্স ফিকশান বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত ছায়াচিত্রের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমোদ মিত্র ক্লাব কর্মীদের আশীর্বাদ করেন এবং বর্তমান যুগে সায়ান্স ফিকশান সিনে ক্লাবের উপযোগিতা আলোচনা করে বলেন, এই ক্লাবের মাধ্যমে নতুন ধরনের চিত্রাকর্ষক উদ্দীপনার ছায়াছবির প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

উদ্‌ঘাটনী ভাষণে প্রধান অতিথি শ্রীভূষারকান্তি ঘোষ আশা প্রকাশ করেন, শীঘ্র আমাদের দেশেও ভাল সায়ান্স ফিকশান ছায়াছবি প্রস্তুত হবে।



পটেকিনের ঐতিহাসিক-ভিত্তিক কল্প তলেতে ঐ কল্পের দ্বারা নির্মিত অশ্ব-ভাস্কর্য



নিম্নোক্ত জাহাজ ‘ব্যাটলশিপ পটেকিন’

বক্সে ও দেশে এবং দেশে

রাশিয়ান থিয়েটার : স্টানিস-
লাভস্কি তাঁর 'মাই লাইফ ইন্ আর্ট'
বইতে "আপেক্ষা ভাবনা" সম্বন্ধে
এইভাবে আলোচনা করেছেন :

চেখভের আশ্রয়—"জাঞ্চল ভাবনা"

শারীরিক অসুস্থতার জন্য চেখভ
থিয়েটার সিজনে মস্কোতে আসতে
পারেন নি। কিন্তু ১৮৯৯ সালের
বসন্তকালে তিনি এসে উপস্থিত হলেন
'দি সি গালের' অভিনয় দেখবেন বলে—
আমাদের বললেন তাঁর দেখবার জন্য
নাটকটি মঞ্চস্থ করতে।

"শোন, এ নাটক দেখা আমার
বিশেষ দরকার। আমি এর লেখক।
অন্য কিছু লিখব কেমন করে, অরুণ
যদি না এ নাটকের অভিনয় দেখে
নিই?"—সুযোগ হলেই এই একই কথা
বারবার বলতে শুরু করলেন চেখভ।

আমাদের হোল মহা সমস্যা—কি
করি? সিজনে শেষ হয়ে গেছে—সারা
গ্রীষ্ম থিয়েটার আমাদের সম্পূর্ণ
অপরিচিত লোকদের হাতে থাকবে।
সিনারি, প্রপ্ প্রভৃতি অন্য জায়গায়
একটি শস্যাগার খালি করে নিয়ে তার
ভেতর গম্যমজাত করে রাখা হয়েছে।

এই অবস্থায় চেখভের জন্য বিশেষ
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা মানে নতুন
করে আবার সমস্ত আরোজনের
হাঙ্গামা পোহাতে হবে। অর্থাৎ
থিয়েটার ভাড়া নিতে হবে। সিনারি,
প্রপার্টিজ ইত্যাদি খুলে নিয়ে এসে
খাতানোর জন্য এবং সাজ-পোশাক,
মাথার চুল ইত্যাদি আনবার জন্য
স্টেজ-হ্যান্ডলস্ নিয়োগ করতে হবে,
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডেকে পাঠাতে
হবে, রিহাসল করতে হবে, আলোক-
সজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে এবং
আনুষঙ্গিক আয়ও কত কি করার
দরকার হবে। আর এর ফল হবে কি?
সম্ভবত ফেলিওর—কারণ এত তাড়া-
ছাড়া কোন নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা
করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

এছাড়াও ভয় ছিল, আমাদের
অনিজ্ঞ অভিনেতারা, একটা নতুন
স্টেজে অভিনয় করতে গিয়ে (ভাল
অভিনয়ের জন্য যে মঞ্চে অভিনয়
হবে তার সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রী-
দের একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সম্বন্ধ
গড়ে ওঠা দরকার। বিখ্যাত ইয়োজ

অভিনেতা এডমান্ড কন যে স্টেজে
ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করতেন,
শো শুরু হবার একঘণ্টা আগে মেক-
আপ নিয়ে মঞ্চে চারদিকে ঘোরাঘুরি
করে মঞ্চে সঙ্গো ইন্টিমেট হওয়া
অভ্যাস করতেন।) আত্মবিশ্বাস
হারিয়ে কেলতে পারে—তার ফলে
সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে—বিশেষত
আমরা যখন চেখভের নাটক অভিনয়
করতে যাচ্ছি।

যে থিয়েটারটি ভাড়া পেলাম
সেটাকেও দেখাচ্ছিল একটি শস্যাগারের
মত—সেখানকার সমস্ত ফার্নিচার সরিয়ে
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—কারপ মালিকেরা
থিয়েটারগাহটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কার
করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এই সময়ে।
এই রকম কক্ষালসার প্রেক্ষাগৃহে নাটক
জমে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অথচ
শেল না করলে চেখভ মর্মাহত হবেন।
চেখভের অনুরোধকে আমরা আদেশ
হিসাবেই মেনে নিলাম—সুতরাং তাঁর
মনের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করবার উপায়ও
আমাদের ছিল না।

এই বিশেষ প্রদর্শনী হোল
নিকিটস্কি থিয়েটারে—চেখভ এবং আর
জন মশেক দশক শো দেখতে এলেন।
শেল হোল—যেমনটা আমরা আগে
থেকেই ভেবেছিলাম—মাকামাখি ধরনের।
প্রত্যেক অঙ্কের শেষেই চেখভ দৌড়ে
স্টেজে ঢুকছিলেন—তাঁর মুখে কোন
আনন্দের রেখাপাত দেখাচ্ছিল না।
কিন্তু ব্যাকস্টেজের কাজকর্ম চোখে
পড়তেই তাঁর হাসি ফিরে আসছিল
এবং মূখে হাসি কটু উঠছিল—কারপ
চেখভ ব্যাকস্টেজ-লাইফ অন্তর থেকে
ভালবাসতেন। কয়েকজন অভিনেতার
অভিনয় চেখভের প্রশংসা পেলে—অন্য
কয়েকজনকে তিনি ক্রিটিকাইজ করলেন।
বিশেষভাবে একজন এ্যাকট্রিসের অভিনয়
তাঁর খুবই খরাপ লেগেছিল। বারবার
বলতে লাগলেন—"আমার নাটকে
অভিনয় য়রবার যোগ্যতা এর নেই।"
অন্য একজন অভিনেত্রীর নাম করে
বললেন—"এ রোলে সে অনেক ভাল
অভিনয় করবে—তার অভিনয়ের তুলনা
হয় না।"

"কিন্তু এ অভিনেত্রীটির থেকে
কি করে পাটটা কেড়ে নিই"—আমরা
তাঁর অনুকূলে প্রতিবাদ জানাই।

"এ কাজ করলে এ্যাকট্রিস যদি-
লাকে একরকম দল থেকে অপসারিত
করেই দেওয়া হবে। এর ফলে ঠিক
কি রকম কঠিন আঘাত লাগবে ভেবে
দেখুন।"

অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে চেখভ জবাব
দিলেন, "শোন, তাহলে তোমাদের
থেকে নাটকটা আমি ফিরিয়ে নেব।"

চেখভের দৃঢ়তা এবং কঠিন
ব্যবহারে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম।
তাঁর সাধারণ প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত
কোমল—তাঁর সারা অন্তর ছিল দয়া-
মায়ার ভরা, কিন্তু শিল্পসম্বন্ধীয় যে
কোন ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠিন
এবং হৃদয়হীন ছিলেন—কোনোরকমের
কম্প্রমাইজ করতে কিছুতে রাজী
হতেন না।

অসুস্থ চেখভ যাতে রোগে না যান
বা উত্তেজিত না হয়ে ওঠেন, সেজন্য
আমরা আর তাঁর কথার বিরুদ্ধে তর্ক
করলাম না—আমরা আশা করেছিলাম
যে, কিছুটা সময় গেলেই তিনি এ
ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবেন।
কিন্তু তা তো হোল না। এক এক
সময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে—যখন
কেউ স্পোন্সও এ বিষয়ে কিছু চিন্তা
করছে না—চেখভ হঠাৎ বলে উঠলেন—
"শোন, ঐ মহিলার আমার নাটকে
অভিনয় করবার কোন যোগ্যতা নেই।"

বিশেষ প্রদর্শনীতে চেখভ বেশ
স্পষ্টভাবেই আমাকে এড়িয়ে চলছিলেন।
তাঁর জন্য ড্রেসিং রুমে আমি অপেক্ষা
করাছিলাম—তিনি এলেন না। এটাকে
একটা অশুভ লক্ষণ বলেই আমার
মনে হোল—আমিই তাঁর কাছে গেলাম।
"আমাকে তিরস্কার করুন আন্তন
পাভলোভিচ"—আমি অনুরোধের সুরে
বললাম।

"ওয়াটারফুল!, শোন, সমস্ত
ব্যাপারটাই হয়েছে ওয়াটারফুল! শুধু
তোমার দরকার ছেড়া জুতো এবং
চেক্ ড ট্রাউজারসের।"

এর বেশি—আর কিছু বললেন না
চেখভ। কিন্তু ঠিক কি বোঝাতে
চাইলেন? তিনি কি তাঁর মনের কথা
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চাইলেন না?
আমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কি এই
ধরনের কৌশল করে কথা বললেন—
না, মনে মনে হাসছিলেন আমার
সম্বন্ধে? 'দি সি গালের' ট্রিগ-
রিন হচ্ছে একজন যুবক—সাহি-
তিক মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয়—সে
হঠাৎ ছেড়া জুতো এবং চেক্ ড
ট্রাউজারস্ পরবে কেন! আমি অত্যন্ত
সুর্দৃষ্টিপূর্ণ কমিটিউমে এ রোলে
অভিনয় করেছি—সাদা ট্রাউজারস্,
সাদা ভেস্ট, সাদা হ্যাট, নতুন জুতো
এবং সুদৃশ্য মেক-আপ-এ।



রেশমের 'দি গড ম্যান ফ্রম সেক্সুয়ালের' রাশিয়ান প্রডাকশনের একটি দৃশ্য

এরপর বছরখানেক কি তার কিছু বেশি সময় কাটল। আমি তখন আবার ট্রিগারিনের ভূমিকায় অভিনয় করছি—একদিন প্রদর্শনীর সময় হঠাৎ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল চেখভ আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সত্যিই তো, ট্রিগারিনের তো ছেঁড়া জুতো এবং চেক্‌ড ট্রাউজার্সই পরা উচিত—এবং সুন্দর সেজে—তার তো মণ্ডে নামা ঠিক নয়। এতেই তো পাটের জোলুস বাড়বে। অনভিজ্ঞ যুবতী মেয়েদের পক্ষে পুরুষ যদি লেখক হয় তাহলেই যথেষ্ট। আর তার সেন্টিমেন্টাল লেখা যদি বাজারে চালু থাকে তবে তার মত আকর্ষণীয় আর কে হতে পারে? নিনার শ্রেণীর মেয়েরা একের পর এক তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে—তারা বিচার করে দেখবে না যে লোকটার সত্যি সত্যি প্রতিভা আছে কিনা। সে যে অসুন্দর,

চেক্‌ড ট্রাউজারস পরে, তার 'সু'জোড়া ছেঁড়া এ সবও তাদের নজরে পড়বে না। অবশ্য পরে, যখন এই জাতীয় সি-গালিও প্রেমের অবসান হবে, তখনই তারা উপলব্ধি করবে যে তাদের কুমারী কল্পনায় এমন কতকগুলো জিনিস তারা কল্পনা করে নিয়েছিল, যাদের অস্তিত্ব কোনো কালেই ছিল না। অল্প কথায় চেখভের তাঁর এবং তাঁক্ষা, অথচ গভীরত্ব এবং সারগর্ভপূর্ণ মন্তব্যের মর্মার্থ এবার বুঝতে পারলাম।

'দি সি গালের' বিরাট সাফল্যের পর বহু থিয়েটারের মালিক চেখভের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। চেখভের সঙ্গে এরা কথাবার্তা চালাচ্ছিল তাঁর অন্য নাটকটি অর্থাৎ আঙ্কল ভ্যানায়ার প্রডাকশন সম্বন্ধে। আন্তন পাভলোভিচও দরজা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারের বৈষয়িক দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এসব

দেখে আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম—কারণ আমাদেরও খুব ইচ্ছা আমরা ঐ নাটকটি প্রডাক্স করি। একদিন কিন্তু চেখভ অত্যন্ত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। যে থিয়েটারকে তিনি নাটকটি দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেখানকার একজন কর্মকর্তা না বুঝে আমাদের অনেকের সামনেই একদিন চেখভকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, যার ফলে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক অত্যন্ত মর্মাহত হন।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—বোধ হয় কি বলবেন ঠিক করতে না পেরেই বলেছিলেন—“এখন আপনি কি করছেন?”

চেখভ—গল্প লিখছি, আর সময় সময় নাটক।

এরপর কি ঘটেছিল জানি না। কিন্তু ঐ থিয়েটারের রিপোর্টস কর্মিটির একটি রিপোর্ট চেখভকে

সাপ্তাহিক বসন্ত

দেওয়া হয়। তাতে তাঁর নাটকের মধ্যে প্রাণের আঁকড় থাকলেও একটি সত্য ছিল—তারা জানিয়েছিল যে, নাটকটি প্রভুসমূহের জন্য সাদরে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় অঙ্কটির শেষটা বদলিয়ে দিতে হবে—অর্থাৎ যেখানে বিরক্তিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে আশ্চর্য ভাষায় প্রফেশর সেরিয়ারাকভকে গুলী করতে যায় সেই জায়গাটা।

রিপোর্টটা যে কিরকম বোকামিতে ভরা সে কথা বলতে গিয়ে রাগে চেঁচিয়ে সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—তার পর হঠাৎ হাসিতেই ফেটে পড়ে চুক্তির খসড়াটির বর্ণনা দিতে লাগলেন—যে সময় হাসির কথা কারও মনেও আসতে পারে না, সে সময় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হাসতে পারা বোধহয় এক চেঁচকের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ভেতরে ভেতরে আমাদের একটা বেশ-যুদ্ধ জয়ের ভাব এসে গেল—আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হব—‘আশ্চর্য ভাষায়’ আমাদের হাতে এসে পড়বে। শেষে হোলও তাই, নাটকটি আমাদেরই দেওয়া হোল, আন্তন গাভলোভিচ নিজেও এজন্য খুব খুশি হলেন।

আমরা আর দেরি না করে

নাটকটি নিয়ে কাজ শুরু করলাম। চেঁচা যখন নিজে উপস্থিত রয়েছেন—তখন সবার আগে নাট্যকার হিসাবে তাঁর বক্তব্য আমরা শুনে নিতে চাইছিলাম। একথা শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন যে নিজের রচিত নাটক সম্বন্ধে ঠিকভাবে গুঁড়িয়ে বিশেষ কিছুই বলতে পারতেন না চেঁচা। আলোচনা করতে গিয়ে সব কিছু গুলিয়ে ফেলতেন এবং এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং আমাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এক কথাই বলতেন : ‘শোন, আমি সবই লিখে দিয়েছি, নাটকের ভেতরে সব কিছুই পাবে।’

অথবা আমাদের শুনিয়ে দিতেন, ‘শোন, আর আমি কখনও নাটক লিখবো না।’ সি গালের জন্য অনেক দুর্ভোগ আমাকে পেহাতে হয়েছে.....

এরপর পকেট থেকে একটা পাঁচ কপেকের মুদ্রা বের করে আমাদের দেখাতেন এবং হেসে গড়াগড়ি যেতেন। আমরাও নিজেদের সংযত রাখতে না পেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়তাম। এরপর আর কাজের কথা চালানো সম্ভব হোত না। কিছুক্ষণ বাদে আমরা আমাদের প্রশ্ন-গুলোর পুনরাবৃত্তি করতাম এবং

শেষ পর্যন্ত চেঁচা ইঙ্গিত দিতেন নাটকের কয়েকটি কৌতুকলোম্বীপক ভাবধারা বা পাঠপাঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একবার আমরা আশ্চর্য ভাষায় চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

আশ্চর্য ভাষায় ভূসম্পত্তির মালিক পরিবারের শ্রেণী থেকে এসেছেন, অধ্যাপক সেরিয়ারাকভের জমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত। এই জাতীয় ভদ্রলোকের কি ধরনের পোশাক-আশাক এবং ভাবভঙ্গী হয় তা প্রায় সবারই পরিচিত—যথা, হাই বুটস্, ক্যাপ, সময় সময় হাতে হর্সহুইপ্, কারণ—সবাই জানে এ ধরনের লোকেরা অনেক সময়ই ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। চেঁচা কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।

‘শোন’, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, ‘সব ওখানে লেখা আছে—তোমরা নাটকটা ভালভাবে পড় নি।’

মূল নাটকটা আমরা আবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, কোনো নির্দেশই পেলাম না—শুধু এক জায়গায় আশ্চর্য ভাষায় আর একটি সিলেক্ট টাই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে।

‘এইতো এখানে, এইযে—লেখা



ব্রেখলে সাপ্তাহিক 'দি গড দ্যান ব্রদ সেক্সানের' রাশিয়ান মঞ্চে অভিনয়ের একটি দৃশ্য।

রয়েছে—চেখভ আমাদের ব্যাপারটা ঘুরে দেখতে বললেন।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—‘কি লেখা রয়েছে? একটা সিনেকের টাইয়ের কথা?’

‘সেই কথাই তো বলছি। শোন, ভ্যানায়ার একটা অদ্ভুত সুন্দর টাই আছে। একথা মোটেই সত্য নয় যে, আমাদের ল্যান্ডেড জেন্ট্রিটার মাথানো বুট পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তারা অত্যন্ত শিক্ষিত-শ্রেণীর লোক। তারা ভাল পোশাক পরে। প্যারিস থেকে অর্ডার দিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করে আনায়। এ সবই লেখা আছে।’

তৎকালীন রাশিয়ান জীবনের একটা ভারি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় চেখভের এই ধরনের অতি সাধারণ মন্তব্য থেকে। অপদার্থ এবং অত্যন্ত সাধারণ স্তরের অধ্যাপকটি জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেছে এবং অথবা বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসাবে বশ এবং খ্যাতি পেয়েছে—অথচ এ ধরনের সম্মান পাবার আসল যোগ্যতাই তার নেই। পিটার্সবার্গে সে সবার উপাস্য ব্যক্তি হিসাবে লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। রচনা বলতে যে কতগুলো বাজে সাম্প্রদায়িক বই লিখেছে, তার বৃদ্ধা শাশুড়ী ভরনিটস্কায়া অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সে সব বই পড়েন আর মনে করেন তার জামাই একজন জিনিয়াস্। বহুদিন অবধি আঙ্কল ভ্যানায়াও অধ্যাপককে জিনিয়াস

হিসাবেই শ্রদ্ধা করতো এবং সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভানীপতির ভূসম্পত্তি দেখাশোনা করে যেতোটা সম্ভব টাকা পাঠিয়ে দিত—অধ্যাপককে যাতে তাকে কোনোভাবে আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে না হয় এবং একাগ্রমানে সাহিত্য সাধনা করে যশের উচ্চ শিখরে উঠতে পারে। পরে দেখা গেল সেরি-ব্রায়াকভ একজন ফ্রড্—সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েও সে সারাজীবন বেশ ভাল চাকরি করেছে এবং নবাবী হালে জীবন কাটিয়েছে। অথচ যারা সত্যিকার ট্যালেণ্টেড, যেমন ভ্যানায়া বা এ্যাস্ট্রভ, তারা অনাদৃতভাবে গ্রামের ছোট গাড়ীর ভেতর নিজেদের শূন্য করে মেলেছে। One feels like calling real workers to power and to pull down the giftless though famous Serebrayakovs from their high posts. চেখভের সঙ্গে আলোচনার পর কেন জানি আঙ্কল ভ্যানায়ার সঙ্গে চায়েকোভস্কির একটা মিল ঝুঁজে পেরেছি।

এ নাটকের কাস্টিং নিয়েও বেশ মজ্জিকলে পড়েছিলাম। কত সংখ্যক অভিনেতা আমাদের আছে এবং নাটকে কটি রোল আছে এসব বিষয়ে কোনো চিন্তা না করে চেখভ চাইছিলেন যে তাঁর প্রিয় অভিনেতাদের দিয়ে সবগুলো পার্ট করানো হবে। তাঁকে বশন বলা হোল এটা সম্ভব নয় তিনি আমাদের ভয় দেখিয়ে বললেন : ‘শোন, আমি

থার্ড একটা নতুন করে লিখে, নাটকটা রেপারটারের কর্মটির কাছে পাঠিয়ে দেব।’

এখন একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে ‘আঙ্কল ভ্যানায়ার’ উদ্ভোধন রজনীর অভিনয়ের পর আমরা এক রেসেপশ্যনে একত্রিত হয়ে হতাশভাবে বসেছিলাম—সবার কেমন ধারণা হয়েছিল যে গেলটা ফেল করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধিতে পেরেছিলাম যে আমরা তখন ভুল বুঝেছিলাম। দর্শকেরা নাটকটি নিয়েছিল—আমাদের থিয়েটারের রেপারটারে কুড়ি বছরেরও বেশি এ নাটকটিকে রাখা হয়েছিল এবং আঙ্কল ভ্যানায়া বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিল রাশিয়াতে, ইউরোপে এবং আমেরিকায়। নটনটীরা সবাই ভাল অভিনয় করেছিল—যেমন আলগা নিপার, মারিয়া সামারোভা, ভার্গিসলি লুজস্কি এবং এ্যালেক্সান্ডার ভিন্সে-ভস্কি। সর্বাধিক সাফল্য হয়েছিল মারিয়া লিলিনা, এ্যালেক্সান্ডার আরটিশ্চভ এবং আমার। আমি এ্যাস্ট্রভ চরিত্রে নেমোঁহলাম—এ রোলটি আমার প্রথমে ভাল লাগে নি এবং এ চরিত্রে আমি অভিনয় করতে চাই নি। কারণ আমি চিরকাল আঙ্কল ভ্যানায়ার রোলে অভিনয় করবো বলে স্বপ্নের জাল বুনে এসেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একগুয়েমি ভেঙে দিয়ে, আমাকে বাধ্য করেছিলেন এ্যাস্ট্রভ চরিত্রকে ভালবাসতে নেমিরোভিচ-দানসেৎকো।’ (হুমঃঃ)



লেনিনগ্রাদের গর্ক ড্রামা থিয়েটারে রেখভের ‘দি কোরিন্থার অফ আরটুরো উই’ নাটকের একটি দৃশ্য



জাতীয় হকির উন্মোচন দিনে খেলোয়াড়দের সঙ্গে করনর্ন করছেন মিঃ ভাড়া

জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিটি মাঠে ময়দানে ফুটবলকে মাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে বলেই বাংলা আজ সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুর রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের এতদিন ছিল দৈন্যদশা, ক্রিকেট ছিল মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, খেলার রাজা ক্রিকেট সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল; তাই বাংলার স্থান ছিল বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজের অনেক পশ্চাতে। কিন্তু মনে হচ্ছে ক্রিকেটের সেই দৈন্যদশা অবসানের দিন সমাগত। ক্রিকেট এখন জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছাড়িয়ে পড়েছে আমাদের মাঠে ময়দানে। টেস্ট মাঠে কানায় কানায় পূর্ণ ইডেন উদ্যানের মন মাতানো রূপ দেখে অনেকেই হয়ত মনে করবেন যে না বাংলার ক্রিকেট সমৃদ্ধশালী; উপরের চার্চিক্য হলে কি হবে অন্তরে আন্তরিক প্রচেষ্টার নিদারুণ অভাব।

এবার আসা যাক এ্যাথলেটিকসের কথায়। এ্যাথলেটিকসে বাংলার হীন অবস্থা দেখে সভাই দঃখ হয়। কিন্তু কোন উপায় নেই, সুযোগ-সুবিধার প্রচণ্ড অভাব। এ্যাথলেটিকসে যে আমরা এখনও শিক্ষানবীশ তা আমাদের ছেলের প্রত্যাশিতার আসরে দেখেই বোকা যায়। এ্যাথলেটিকসের দৈন্যদশার অন্যতম প্রধান কারণ হল যে আমরা মনে-প্রাণে একে গ্রহণ করতে পারি নি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি স্পোর্টস দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এই মরশুমে একটি জেলা স্পোর্টস দেখার সুযোগ আমার ঘটে-

ছিল (যা পায়রাডাঙ্গার ভূদেব স্মৃতি বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। স্তম্ভিত হলাম পুরুষদের এবং মহিলাদের একশত মিটার দৌড় দেখে। মনে মনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সভাই কোন জেলা স্পোর্টসের আসরে দাঁড়িয়ে আছি। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টসের আসরে ইতিপূর্বে এই ধরনের ছেলেখেলা হতে কোনদিন দেখি নি। পুরুষদের একশত মিটারে দৌড়ের জন্য সকলেই প্রস্তুত। স্টার্টার পিস্তলের ট্রিগার টিপলেন, কিন্তু হার পিস্তল বিশ্বাস-

প্রীতিমিত

যাতকতা করল। ভাস করে একটা বিদ্যুৎ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধূম নির্গত হল শূন্যমাঝ। প্রতিযোগীরা সেই ধোঁয়া দেখে একটা ধোঁয়াতে স্টার্ট নিল, একজন প্রতিযোগী যার বিজয়ী হবার সম্ভাবনা ছিল, তিনি ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে স্টার্টিং ব্লকে পা দিয়ে সভার্থীদের দৌড়ই প্রত্যক্ষ করলেন। মহিলাদের একশত মিটার দৌড়ও হয়েছিল অনুরূপ অবস্থা। আমাদের বাংলার এ্যাথলেটিকসের দৈন্যদশার কারণ আলাচনা করতে গিয়েই উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করতে হল কারণ স্বরূপ।

এবার আমরা গিয়ে পৌঁছিছি জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আসরে। জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা শেষ হল ব্যাংগালোরে। এক অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু; আমাদের স্বর্গত প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্মৃতির

উদ্দেশ্যে প্রাণ্ডা জানানোর জন্য দশ সেকেন্ড নীরবতা পালন করা হয় এবং নানা বর্ণের রাজ্য পতাকাগুলি অর্ধনিমিত অবস্থায় উড়তে থাকে। মহাশূর রাজ্যদলের অধিনায়ক আলওয়া প্রতিযোগীদের পক্ষে শপথ গ্রহণ করেন। মহাশূর দলের প্রাক্তন অলিম্পিয়ান এ্যাথলেট সোমনাথ অলিম্পিক মশাল বহন করে স্টেডিয়ামে রক্তিত পুতায় আধারে অগ্নি সংযোগ করেন। সোমনাথ ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় এ্যাথলেট দলের অধিনায়ক্য করেন এবং বহুদিন হামার গ্লোর জাতীয় রেকর্ডের পাশে লেখা ছিল তার নাম।

২২তম জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মোট ষোলটি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বালক বিভাগে আটটি, পুরুষ বিভাগে পাঁচটি, মহিলা বিভাগে একটি এবং বালিকা বিভাগে দুইটি রেকর্ড। একটি রেকর্ড এ এ এফ আই অনুমোদন করে নি, তাদের মতে বালকদের বিভাগে দীর্ঘলম্বনে প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডটিতে বাতাসের সাহায্য ছিল।

পদক সংগ্রহের তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে পাজাব রাজ্য। পাজাব রাজ্যদলের এ্যাথলেটরা সংগ্রহ করেন মোট একুশটি স্বর্ণপদক, তেরোটি রৌপ্যপদক এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক। স্বিতীয় স্থানে ছিল মহাশূর রাজ্য দল দশটি স্বর্ণ, নয়টি রৌপ্য পদক এবং পনেরোটি ব্রোঞ্জপদক সংগ্রহ করে। পশ্চিমবঙ্গ তালিকার ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে দুটি স্বর্ণপদক, তিনটি রৌপ্য পদক এবং এগারোটি ব্রোঞ্জ

পদক। একমাত্র উড়িয়া রাজ্যদল কোন পদকই সংগ্রহ করতে পারে নি।

পূর্ববঙ্গের দীর্ঘ লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বর্ণ এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেন প্রণব ব্যানার্জী এবং শিশুতোষ মজুমদারী লাভ করেন ব্রোঞ্জ পদক। প্রণব ব্যানার্জী ৭-২১ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করে গুরুত্বপূর্ণ সিং এবং সত্যনারায়ণের ৭-৩১ মিঃ দূরত্বের রেকর্ড ভাঙ করেন। বাংলার পক্ষে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন বালিকাদের সংজ্ঞাপে রুবি মল্লী। প্রতিযোগিতার উপস্থান দিনে বালকদের হাইজাম্পে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং এবারের প্রতিযোগিতায় এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। তিনজন প্রতিযোগী রাজস্থানের দলজিন্দার সিং, উত্তর প্রদেশের যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের নবীন কিশোর একসঙ্গে ১-৮১ মিঃ উচ্চতা অতিক্রম করার সাথে সাথেই ১-৮০ মিঃ পুরাতন রেকর্ড ভাঙ হয়। পরবর্তী সুযোগে যাদব এবং নবীন বিশ্বাস ব্যর্থ হন, কিন্তু রাজস্থানের দলজিন্দার সিং ১-৮৫ মিঃ বা ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির উচ্চতা অতিক্রম করে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর প্রদেশের যাদব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং বাংলার নবীন বিশ্বাস তৃতীয় স্থান পান।

বোম্বাই রোহিংটন বারিয়া ট্রফি লাভ

নাগভূষণ সেগুয়ারী ভূষণে ভূষিত করলেন ব্যাংগালোর বিশ্ববিদ্যালয় দলকে; কিন্তু তাঁর প্রাচুর্যে পূর্ণ ব্যক্তিগত ১৮৮ রানের অবদানও শেষ রক্ষা করতে পারল না ব্যাংগালোর। টেন্ট ভারকা চন্দ্রশেখরের ঘূর্ণি বলের বক্রগতির ছোবলও ব্যর্থ হল। ছয় উইকেটে নিজস্ব হয়ে পুনরায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করল সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের রোহিংটন বারিয়া ট্রফি। এবার রোহিংটন ট্রফি জয় করে বোম্বাই উপবন্দার চারবার এই ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল।

প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে ব্যাংগালোর বিশ্ববিদ্যালয় দল। কিন্তু মাত্র ১৮ রানের মধ্যে ব্যাংগালোর দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বোম্বাই দলের দুই পেস বোলারই ব্যাংগালোর দলের ব্যাটিং শক্তিকে চূর্ণ করেন। ঘটানি ৪০ রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট এবং নরভেকর ২৫ রানে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল সংগ্রহ করে, প্রথম ইনিংসে ৩৬০ রান। বোম্বাই দলের এই বিরাট রান সংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শেঠীর ৭২ রান এবং অশোক মানকড়ের ৬৬ রান। চন্দ্রশেখর ১১০ রানের বিনিময়ে দখল করেন ৪টি উইকেট এবং শ্রীনিবাসন ৪৯ রানে ৩টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে কিন্তু ব্যাংগালোরের খেলার মোড় ফিরিয়ে দেন নাগভূষণ একাই। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাংগালোর সংগ্রহ করে ৩৪৮ রান। নাগভূষণের ব্যক্তিগত ১৮৮ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল শ্রীনিবাসনের ব্যক্তিগত ৫৭ রান। খাডেনওয়াল একাই সংগ্রহ করেন ৫টি উইকেট মাত্র ৩৪ রানের বিনিময়ে। নরভেকর এবং মানকড়ের ভাগ্যে জোটে গুটি করে উইকেট।



কমল সরকার

—কটো প্রীতিসিত দত্ত

জয়ের জন্য বোম্বাই দলের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৮৪ রান। ৪টি উইকেটের বিনিময়ে বোম্বাই দল ৮৭ রান সংগ্রহ করে ছয় উইকেটে পরাজিত করে ব্যাংগালোর দলকে। চন্দ্রশেখর এই ইনিংসে সুন্দর বল করেন, তিনি ৪০ রানে সংগ্রহ করেন ৩টি উইকেট।

শ্রেষ্ঠ মৃচ্চিবোধ

নাইজারিয়ার বিশ্ব মিডল ওয়েস্ট চ্যাম্পিয়ান ডিক টাইগার ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ মৃচ্চিবোধার সম্মান লাভ করেছেন রিং ম্যাগাজিনের কাছ থেকে। এই সম্মান ডিক টাইগার

এই প্রথম লাভ করেছেন না। ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে এই সম্মান তিনি প্রথম অর্জন করেন। দু' বছর মৈথিলি সঙ্গে অপেক্ষা করার পর তিনি তাঁর হৃত গৌরব কৃতিত্বের সঙ্গে পুনরুদ্ধার করেছেন জেরী গিয়ার-ডেলোর কাছ থেকে।

রিং ম্যাগাজিনের সম্পাদক তাঁর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্তমান বিশ্বের দেহী ওয়েস্ট মৃচ্চিবোধ চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিমাস ক্রের নাম উল্লেখ করে দৃঢ় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শ্রেষ্ঠ মৃচ্চিবোধা মনোনিবেশের সময় মহম্মদ আলি ক্রের নাম গ্রহণ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্যাসিমাস ক্রে প্রথমে ছিল অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়। কিন্তু মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে মহম্মদ আলি ক্রে হবার পর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ কম হয়। এরপর ক্যাসিমাস ক্রে হয়ে উঠলেন আমেরিকার ব্ল্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন বড় পাণ্ডা। এই ব্ল্যাক মুসলিম সম্প্রদায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। মৃচ্চিবোধ ক্রে এই সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে অনেক বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছেন বলে অনেকেই তাঁর ওপর যথেষ্ট ক্রোধ করেছে। এমন কি প্যাটার্সনের সঙ্গে লড়াইয়ের পূর্বে ক্রে প্রাণনাশের এক চক্রান্তের গুজব শোনা গিয়েছিল।

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

কৃষ্ণনগরে সাখ্য মিলনীর উদ্যোগে একটি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বছরের মত এবারও বিভিন্ন স্থান থেকে খেলোয়াড়েরা এসে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আমাদের বঙ্গদেশে ব্যাডমিন্টন খেলার প্রচলন খুব কম। যার মফস্বলে ভাল প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করতেই আশ্চর্য লাগে। কিন্তু মাত্র এগার বছর আগে স্থাপিত সাখ্য মিলনী প্রতি বছর স্বেচ্ছাভাবে সম্পন্ন করে চলেছে এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। সুযোগ এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যে কত ভাল খেলোয়াড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে তা বুললাম বন্ধ সাখ্য মিলনীর ব্যাডমিন্টন খেলার আসরে উপস্থিত হলাম। খুবই আনন্দের কথা যে সাখ্য মিলনীর মত জীড়া সংস্থার সংখ্যা আমাদের মফস্বলে ব্যাধি পাচ্ছে।

এবারের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাগুদী প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় সাখ্য মিলনীর ক্রুব প্রাঙ্গণে ২৫শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। সিংগলস ফাইনালে কাচরাপাড়ার রেল ইনস্টিটিউটের দীনেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাণাঘাটের মদন কুন্ডুকে পরাজিত করে সাখ্য মিলনী সিংগলস চ্যালেঞ্জ ট্রফি লাভ করেন। ডাবলসে কাচরাপাড়ার রেল ইনস্টিটিউট কৃষ্ণনগর সাখ্য মিলনীকে পরাজিত করে লাভ করেন ডাবলস চ্যালেঞ্জ ট্রফি। দুটি ফাইনাল খেলাই স্বেচ্ছা

মাসিক বসুমতী

সম্পাদক



রূপী নন্দী

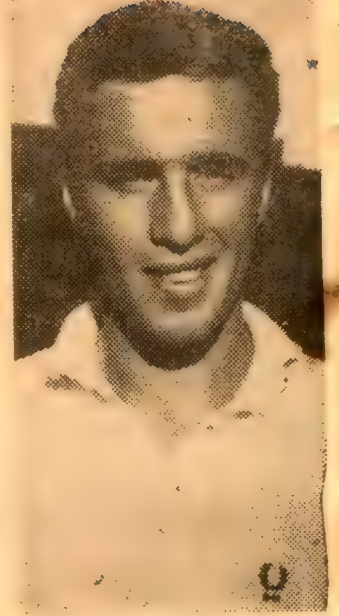
ভাবে পারচালনা করেন ডাঃ অমিতাভ ভট্ট।
কৃষ্ণনগর বি, পি, সি ইনস্টিটিউট অব টেক-
নোলজীর অধ্যক্ষ শ্রীরবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্কার বিতরণ করেন।

আন্তঃরেল হকি

সর্বভারতীয় আন্তঃরেল হকি প্রতি-
যোগিতা প্রায় সমাপ্তির পথে। ইন্টার্ন রেল
এ্যাথলেটিক ক্লাব এই প্রতিযোগিতা পরি-
চালনা করে ভারতীয় রেলওয়ে স্পোর্টস
বোর্ডের পক্ষে। যে হকিতে ভারত বিবে-
শ্রেষ্ঠের আসনে আসীন, সেই হকিকে
আমাদের ক্রীড়ামোদীরা এখনও হৃদয়ে স্থান
দিতে পারে নি দেখে সত্যিই দুঃখ হয়।
দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে
এই প্রতিযোগিতায় কয়েকজন আন্তর্জাতিক
খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছেন,
কিন্তু আশানুরূপ দর্শক সমাগম সেখানে
হয় নি। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন
ইন্টার্ন রেলের ম্যানেজার মিঃ ভায়া।

রিজার্ভ ব্যাংক রিক্রেশন ক্লাবের সপ্তদশ
বার্ষিক এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
হয় ক্লাব প্রাঙ্গণে। এবারের প্রতিযোগিতায়
ব্যক্তিগত বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন কমল
সরকার। ইতিপূর্বে আরও দু'বার কমল
সরকার ব্যক্তিগত বিজয়ীর গৌরব অর্জন
করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কমল
সরকার হলেন জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের
ফুটবল গোলরক্ষক।

সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি বিজয়ীর
সম্মান এবার লাভ করেন বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফাইনালে অপর পক্ষ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়
দল মাঠে অবতীর্ণ না হবার ফলে বিক্রম দলই
বিজয়ী সাব্যস্ত হয়। পূর্বে রাউন্ডের খেলার
অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব প্রদর্শনের জন্য
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারের খরি
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে



মেরুভেনা

ভারতীয় হকি খেলোয়াড় কিবেশলাল। কিবেশ-
লাল ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে স্বর্ণ-
পদক বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক
করেন।



টি সূমে

আলিগড় দল ফাইনালে খেলার যোগদানে বিরত
থাকে।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে খেলোয়াড়দের মধ্যে
কেবল একজনই রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী উপাধি
লাভ করেছেন। তিনি হলেন অলিম্পিকখ্যাত

আগামী এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায়
এখনও পর্যন্ত চৌদ্দটি দেশ যোগদানের ইচ্ছা
প্রকাশ করেছে। এবার প্রতিযোগী দেশের
সংখ্যা বিগত বছরগুলি থেকে বেশি। ভারতও
যুব ফুটবলে যোগদান করবে। ফিলিপাইনের
ম্যানিলায় রিজাল ট্রাক ফুটবল স্টেডিয়ামে
এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী
৩০শে এপ্রিল থেকে ১৪ই মে-র মধ্যে।

দ্বিবাসনে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া হান্ড-
কোর্ট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ এবং
মহিলাদের সিঙ্গলস খেলার বিজয়ীর গৌরব
অর্জন করেন যথাক্রমে আলেকজান্ডার মেরু-
ভেনী এবং মিস টি সূমে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হাউসে শ্রীসকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	—	২২৪০
আজকের মানুষ	—	২২৪৪
ভারতদর্শন	—	২২৪৫
আন্তর্জাতিক	—	২২৪৬
জগদ্বৈশ্বের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২২৫২
উপন্যাস (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মরেন্দ্রনাথ মিত্র	২২৫৮
সং এবং ইংরেজের অসহায়তার গান (অনুবাদ-কবিতা)	— দুর্গাদাস সরকার	২২৬০
গ্রীস ও রোমের কথা ও কাহিনী	— নরেন ভট্টাচার্য	২২৬৩
হৃদয়ের বিচার (অনুবাদ-গল্প)	— রত্না গঙ্গোপাধ্যায়	২২৬৭
লোভ-পাপ-মৃত্যু (কবিতা)	— অমিরকুমার হাটি	২২৬৮

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্কোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুন্দর আলোক। শাসক সমাজদায়ের দ্বারা নির্ধ্যাতিত বাস্তবচ্যুত মুকুন্দরাম রূপে ও বৈদ্যনাথি বাঙ্গালার প্রতিমিথি কবি—ব্যক্তির রূপে কি করিয়া সর্বকালের রূপে হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে। তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান প্রেক্ষা—

- ১। মূল কাব্য, ২। সুবিত্ত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি,
- ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বকিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিবৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ নাট্যসাহিত্যিক

ঐনুল্লাহ বক্সোপাধ্যায়ের

মাণলাল প্রদ্বাবলা

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃষ্ঠা—

বক্তব্যচক্রের উপন্যাসাবলী—(দ্বিতীয় ভাগ)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের অধিনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবসিনী—ইংরেজ ধরে সে গেছল—

ওরপন—ইংরেজ একবার পেনে ধর—

বীরকণের বসনবে বাকি, তরি গহরি হয়ে
বাঁধে হতে ইংরেজ নাই সোপ করব—

বীরকণের—পাণ্ডা এই রাজ্য ইংরেজ
দের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তড়িত হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য: দুই টাকা।



মুদ্রীপত্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ফুল থেকে তারা (কবিতা)	— গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২২৬৮
বঙ্গদর্শন	...	... ২২৬৯
অপরাধ নেহারল; ওকলাহেলা ও চেষ্টা	— এস. কে. গ্রীনবার্গ	... ২২৭০
কনকদি (গল্প)	— রণজিৎকুমার সেন	... ২২৭৬
প্রথমোদ্যো	— জয়ন্তী সেন	... ২২৮১
সমক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	— স্বর্নানন্দনাথ মল্লিকোপাধ্যায়	... ২২৮২
ভোলুফ্‌গান্স আর্নল্ডউস সোৎসার্ট	— দীপংকর সেন	... ২২৮৭
রঙ্গজয়	...	... ২২৯১
রঙ্গরঙ্গ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	... ২২৯৭
সার্ককমন	...	... ২৩০০
খেলাধুলা	— প্রীতমিতাভ	... ২৩০১

আত্মজীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুব্রহ্মচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—দুই টাকা

এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী
“একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কণ্ঠী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত অস্বপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।”

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীত-নাটক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সম্রাটের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫/-

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩/-

মোহন মেনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথাসাহিত্য
দেশ-নাট্যের সম্ভার ছাড়াও গল্পের ভরণ্য

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌদির দিনে, বন্ধুদের বৃদ্ধি, কাঁঠরের কলসি, হাওর বাড়ির তোরের জল, ফুলের ফুল, মৃগী চাচা, বন্ধুদের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, বাড়ির গল্প, ইঁদুরের কীটকাহিনী, বাঁদরেরা মেটলিচ্ছাড়ি।

ছড়া—হট্টমালার খজুরাডী, হোহোহো বৃ. ধরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাড়ির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্রামের ব্যায়াম, হাটুবাঁকুর মনের কথা, আদি কালের বন্ধি বৃদ্ধি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সুখী রায় কর্তৃক
সজ্জিত।

উপহার দাবার মত বই।

গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজুষা

২৫০

রাজনৈতিক-গণনের দীপ্ত পুঁথি—পাঞ্জাবকেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের

জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার স্বাভা-
প্রতিঘাতময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্য পর্যন্ত আমূল ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—লালাজীর জীবন-সাধনার—রাজনৈতিক সংগ্রাম—দেশস্বাধা-বোধে যদি সুপরিচিত হইয়া বস্তু হইতে চান ত সুখের লজ্জা লাজপৎ রায়ের জীবনী পাঠে উদ্দীপিত হউন—বিশেষতঃ দেশজাত আত্মহত্যার জলন্ত আদর্শ দেখিয়া সন্তোষিত হইবেন।

মূল্য—১/- আনা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



৭০ বর্ষ : ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 10th Feb., 1966

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ধর্মীয় বিদ্যালয়

প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বে আমরা ধর্ম-ক্ষেত্র না বিদ্যায়তন নামে একটি সম্পাদকীয়তে বিদ্যামন্দিরে ধর্মের অহেতুক উগ্রতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের আলোচনার বিষয় এই ছিল যে, বিদ্যার পবিত্র অঙ্গনে ধর্ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি চলছে তদ্বারা আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মগত ভেদাভেদেরই সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফল কখনোই শূন্য হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রে সর্বধর্মের প্রতি যেমন সমান সহনশীলতা থাকা দরকার, তেমন বিদ্যালয়গুলির মূল উদ্দেশ্য হবে ছাত্রদের চরিত্র সৃষ্টি করা। একমাত্র চরিত্র সৃষ্টির আদর্শেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হলে সর্বক্ষেত্রেই নবদর্শের উজ্জীবিত ছাত্রগণ ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠবে।

ভারত যখন ইংরেজের অধীন ছিল তখন কয়েকজন মনীষীর প্রচেষ্টায় ঐ কাজ কিছুটা সম্ভব হলেও, সারা ভারতব্যাপী তা সম্ভব হয় নি। আর তদানীন্তন ইংরেজ সরকার তার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই সর্বক্ষেত্রেই জাতিগত ও ধর্মগত ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রেখেছিল। ফলে এদেশের মনীষীরা ভারত-কল্যাণের আশায় বা বলোহিলেন তা অন্যান্য ক্ষেত্রে পরোপদ্রির সফল হয় নি।

স্বাধীন ভারতে, আমরা তবু আশা করেছিলাম যে, ধর্মগত দ্বন্দ্বভেদগুলি হয়তো ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে উঠবে। বিশেষত আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হওয়ায়, আমরা আশা করেছিলাম যে, অন্তত বিদ্যালয়গুলিতে—যেখানে অল্প কটি কচি প্রাণের বিকাশ ঘটছে, সেখানে ছাত্রদের ধর্মশলাকার সজীবিত করার চেষ্টা না করে অন্তত তাদের আদর্শ মানদণ্ড করে গড়ে তোলা হবে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে আম। যথেষ্ট আশাব্যবতাই হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের এই দেশের দুর্ভাগ্য

এমনই যে, সর্বত্রই সর্বকিছু সমানভাবে চলে না। অবশ্য আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একে-বিশ্বাসী এবং সর্বধর্মে সমান আস্থাশীল হয়েও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বহু বিদ্যামন্দির বর্তমানে ধর্মমন্দিরে পরিণত হতে চলেছে। এর পরিণাম ভয়ানক হতে বাধ্য। সে কথা ভেবেই ভারতের ভূতপূর্ব অ্যাটর্নী-জেনারেল শ্রী এম. সি. শীতলবাদ 'সদার প্যাটেল স্মৃতি বক্তৃতামালায় এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপের এক বিরাট অংশ এখন ধর্মীয় সংস্থাগুলির হাতে ন্যস্ত এবং এ ব্যাপার উপেক্ষণীয় নয়।'

উপেক্ষণীয় নয় বলেই আমরা ইতোপূর্বে আমাদের মবিনয় আক্ষেপ জানিয়েছিলাম। তবু বধিরকর্ণে হয়তো আমাদের সামান্য কথা প্রবেশ করে নি। তাই শিক্ষার মানদণ্ড বদলের হাতে তারা নির্বিকার। কিন্তু ধর্মের কবলে যদি শিক্ষার হৃদমন্ডল হয় তা হলে এই দেশের পরিণাম কি?

একালেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যখন একেকটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ছাত্র বের হয়ে আসে তখন তারা যে স্বধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের দিকেই তাদের সহানুভূতির দৃষ্টি অতিরিক্ত মাত্রায় দান করবে তা কি এখনো কর্তব্যাক্তির অজানা? অজানা যদি সত্যি থাকে তাহলে এই ভারতের নাগরিকদের মধ্যে একা প্রতিমুহূর্তে বিঘ্নিত হবে। সেই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

একথা গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রে লক্ষ্যজনক শোনালেও আমরা বলতে বাধ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মীয় বহু বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ তাদের অলিখিত আচার-আচরণের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। এমন কি, ধর্মীয় বিদ্যালয় আছে যেখানে বিশেষ ধর্মের ছাত্র হওয়ার জন্যেই বিশেষ কিছ, সুবিধা লাভ করে। এমন কি,

কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গও ভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। তা ছাড়া একালে যখন ছাত্রভর্তি এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে তখন ভর্তির ব্যাপারে একমাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের দিকে মৌলিক লক্ষ্য রাখাও নিম্ননীয়। আমরা কখনো কখনো এমন কথাও শুনোচ্ছি যে, ভর্তির জন্যে মৌলিক পরিষ্কার কালে সরল শিশুর সামনে ধর্মের দীক্ষিত করার প্রস্নবাপ ছুঁড়ে মারাও হয়। আবার একথা অনেকেই জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা মূখে বলা হলেও ভিন্নধর্মী অনিচ্ছুক ছাত্রদের নিজেদের ধর্মমতানুসারে পাঠ নিতেই বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে ছাত্রদের মান উন্নয়ন ও চরিত্র-গঠনের পরিবর্তে নিজেদের ধর্মপ্রচার করাটাই যেন শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। অথচ ভর্তির সমস্যা-সংকটের মধ্যে পড়ে অভিভাবকরা ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি না করেও অন্য পথ খুঁজে পান না।

সুতরাং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ধর্মের অহেতুক প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে সরকারী হাতে ঐ বিদ্যালয়গুলি গ্রহণ করাও আবশ্যকীয়। কেন না, সরকারী হস্তক্ষেপ মানেই ধীরে ধীরে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। আমাদের মতে, বিদ্যালয়গুলি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেখানে ছাত্রদের চরিত্র-গঠনই বড় কথা; কোনো বিশেষ ধর্ম, ব্যক্তি বা দলের কাজ হাসিল হওয়া অত্যাশঙ্ক্য গর্হিত ও নিন্দনীয়।

সম্পাদকীয়

অন্ধকের মন্ত্র

হঠাৎ প্রবেশ করেই মনে হোল, এ যেন এক নতুন রাজ্য! এখানে এসে মিলেছে বিশ্ব-ভুবন। দেওয়ালে যামিনী রায়ের রবীন্দ্রনাথ, শেলেকে শেলেকে দেশবিদেশী ঠাণ্ডা বই, আর অধিকাংশই চিত্র, সংগীত, নৃত্য-নাট্য আর শিল্প নিয়ে রচিত। রেকর্ডে বাজছিল পল্লবসন। দেওয়ালে দেওয়ালে পায়ের পট, ছাদেও মাড়িত রুচি।

এখানে এমনভাবে এই মূহুর্তে আসার প্রয়োজন ছিল না। একটা টেলিফোন করলেই যখন আনন্দ-সংবাদ নিবেদন করা যায়। কিন্তু জ্ঞান সম্ভব হয় নি। আলচর্য, একটা প্রয়োজনীয় টেলিফোনও তিনি রাখেন নি!

সেদিন তাঁর বাড়িতে পেঁছে মনে হয়েছিল, হয়তো তা না থাকায় ভালোই হয়েছে। অন্তত সেদিন একথা মনে হবার কারণ ছিল অনেক।

যাঁর নাম এই শতকের সেই তিরিশের যুগ থেকে শব্দে এসেছি, তাঁকে দেবার আকাঙ্ক্ষা করে না হয়?

১৯৬৫-র অকাদেমি পুরস্কারের ঘোষণা সেই সুযোগ এনে দিল। কিন্তু এই সুযোগ অনেক দেরিতেই এসেছে। অন্তত সেই কবি-সত্তার—যা বাংলা কবিতার দিকান্ত বহুদূর প্রসারিত করেছে তাকে সম্মান জানাতে অকাদেমির অথবা বিলম্ব হয়েছে, একথা কবির ঘরেই শোনা যাচ্ছিল। তবু, বিলম্ব হলেও বধ্যস্থানে পুরস্কারের স্বীকৃতি জানাতে এবার আর ভুল হয় নি। আর সেই নিভুল লাবণ্য নিবেদন করতেই সেদিন গেছিলাম ১৯৬৫-র অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত কবি বিষ্ণু দেব কাছে।

চোরবালির কবি, যিনি কলকাতাকেও চোরবালি প্রত্যক দেখেছেন আধুনিক মননে, বলেছেন—

“গানের অলসার চাঁচর বালির চড়া
এখানে কখনো বাসার হয় না গড়া।”
বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ওশে মনোহাসি নিয়েও তিনি নিজেকে এমন হৃদয়চোরা, অধ্যাপনা কাজে রত থেকেও তিনি এমন নির্খোঁষ কণ্ঠ এ যেন এর আগে কল্পনা করাই ছিল দুঃসম্ভাব্য। অথচ তাঁরই ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতার—

“কপিলে তনুবায, কামনার ধারা ধরো।
কামনার টানে সংহত রৌশলার।
হালকা হাওয়ার জ্বর জ্বালা ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী
দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!”

—এই আবেগময় তাঁর অনুরণনে কোন পার্থক্য না বিদ্যমান, বাক্যগুণ হয়েছেন?

অথচ বিষ্ণু দেবকে নিয়ে বাংলা দেশের বিশ্বজনীন একথা বিব্রাণত হয়েছিলেন একথা কলমে খুব ভাল কথা হয় না। কেউ তাঁকে

পরিচয়ছিলেন সোদন দুর্বোধিতার মতো। তাঁর ‘জড়কৃতম্’, ‘অপারিভ্রমজাবির’, ‘সোৎপ্রাসপাশ’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে সমসাময়িক কবিরাও প্রশংসা করেছিলেন।

হয়তো প্রথম যুগে যিনি শ্যামল রায় হুম্মনামেও ‘কয়েলা’ ‘মহাকলা’-এ কবিতা লিখেছিলেন তাঁর নিজের মধ্যেও সেদিন কুঠা খাড়া অব্যাবহিক ছিল না। তবু, বাংলার কাব্য-জগৎ নতুন রূপ ও রীতিতে তাঁরই হাতে যখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তখন তিনি আর প্রশংসা নন। দেখা গেল তাঁরই কাব্য সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বাজ; পাওয়া গেল তাঁকে সচেতন সামাজিক সমস্যার মধ্যে।

অথচ এই বিষ্ণু দে-ই একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে শরিয়ত করির স্বীকৃতি পেরেও দুর্বোধ্য অভিযায় প্রতিভাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে-ও তখন সমসাময়িক অন্যান্য কবির মতো বুদ্ধি ছিলেন আধুনিক বাংলা কবির হৃদয় স্বাধীনতা-স্রাব সম্পর্কে সম্ভব নয়। বরং



বিষ্ণু দে

তিনি এলিঅটকেই গ্রহণ করলেন; আর ‘উর্বশী ও অর্টেমিস’-এর ‘বেদম’ কবিতায় লিখলেন—

“হেথা নাই সুশোভন রূপদক
রবীন্দ্র ঠাকুর।”

তবু কান্দু ছাড়া যেমন গীত নেই, তেমনি বিষ্ণু দে-র মননে থাকলেন রবীন্দ্রনাথ। পাথরকা শব্দ আদর্শ আর রীতির। হঠাৎ চমকে উঠতে হয়, যখন পড়া শব্দ হয়—

“ভ্রম অপমান শয্যা ছেড়ে পুষ্পধনু!
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও

জন জরনের বেশ!”

শব্দ তাই নয়, তাঁর বিদগ্ধ রচনার সঙ্গে আলচর্যভাবে আবিস্কৃত হোল ঠাণ্ডা, সাঙুতাল, ছাঁচগড়ি প্রাণের আদিম উৎসাহ। ইতিহাস-চরিত্র, সমাজ-সচেতন কাজের দীর্ঘ পথ

পরিচয় একের পর এক রুদ্ধতার খুলতে গিয়ে দেখলেন এতকাল যত্নে তিনি যার উপাসনা করে এসেছেন সে তা মানুষ্য। তিনি অনুভব করলেন—

পৃথিবীর চোখ, গ্রামছাড়া
রাঙামাটির পথের বৃক্ষের আর
বোমানুয়ের বিধবার আর
টিকালদর্শী শিশুদের চোখ
সরহারাঘের, কারখানা ছাড়া
ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে
অগ্রিমবী জন্ম পর্বত।”

কোথায় বিষ্ণু দে-র কবিতার সেই দুর্বোধিতা বা কাঠিন্য? যদিও পৃথিবীর যাবতীয়—আর্ট, সাহিত্য, সংগীত, জাতিগোষ্ঠাবাগ, লালমোহর সেন এমন কি রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র বলিষ্ঠ মননে ভীষণভাবে অভিযুক্ত। অবশ্য এই উপলক্ষের বলেই তিনি বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতাকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাই বিস্মিত হবার বা দুর্বোধিতার কোনো কারণ থাকে না, যখন তাঁর কবিতায় ধর্মান্ত হয় বুদ্ধাভূত সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা দেশের ব্যাধি-মস্যা। শব্দ তাঁর কবিতায় প্রতীকের ব্যবহারেই যেন এ দেশের সঙ্গে ভিন্ন দেশের, মেলবন্ধন ঘটে যায়। বাংলাসাহিত্যে এ জিনিস আকস্মিক হলেও, আজ যার নিজস্ব ব্যবহার দেখা যায় চরম দলের হাতে—বিষ্ণু দে-ই তাঁর জনক।

পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদেও এমন অনুচ্চার, —এ যেন কল্পনাই করা যায় না। সাতার বছরের এই কবির কণ্ঠে অঘোষিত হচ্ছিল যেন সেই বাণী—আমি সাধ্যমতো দিচ্ছি, নেবার ক্ষমতা খুবই কম।

এই আশ্চর্যকবিতার যুগে এমন সলসল নির্বাক মনোভাব অভাবনীয়। কেন না সৃষ্টির জগতে যিনি মগ্ন, তাঁকে উপচৌকন দিয়ে খুঁশ হওয়া যায়, পুরস্কার-দানের গর্ব করা সম্ভব নয়।

বিষ্ণু দে আজো তাঁর কাব্যের জগতে আত্মমগ্ন। ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ কাব্যে গল্পের জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হলেও তাঁরই কাছ থেকে আমরা পেরেছি এলিঅট-এর অনুবাদ-কবিতা যেখানে তিনি শব্দ অনুবাদই করেন নি, নিজের আনন্দও মিশিয়েছেন। যামিনী রায়ের শিল্পকলাকেও শব্দ এদেশে নয়, বিদেশের কাছে ভুলে য়েছেন। “আর্ট অব যামিনী রায়” গ্রন্থে তাঁরই জাজ্জল্যমান প্রশংসা। আধুনিক কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত ও তাঁর সম্পাদিত এ কালের কবিতা-কে কেউ কেউ এ যুগের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংকলন বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কাব্যেই যার অভিরুচি তাঁর আর এক মাজিত রচনার পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ হতে হয়, যখন শোনা যায় তাঁরই রেকর্ড-সংগ্রহে আছে বিত্রাকেন থেকে পল্লবসন।

এই তাঁর একমাত্র ছবি। আর কবিতা? যে ‘চৈতন্য জ্যা-বন্ধ টান’ তারই এক বিমুগ্ধ ছবি। সেখানে এলিঅট-ভক্ত বিষ্ণু দে কখনো নিম্নক অন্তঃপ্রণয়র তাড়নে কাব্য লেখেন না। হয়তো লেখেন জীবনের সর্বাঙ্গ মূল্য দিয়ে।



ভারত দর্শন

সৈন্যপয়সার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় সৈন্যরা লাহোরখন্ডের অগ্রবর্তী এলাকার বিবরণটি ভেঙে ফেলছেন

মাগী ভাতা

উনিশশ তেরটি সালের জুলাই মাস থেকে উনিশশ পঁয়ষাট সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সঙ্গ-কারকে পাঁচ দফা মাগী ভাতা বৃদ্ধি করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম-চারীদের জন্য। অর্থাৎ দু'বছর পাঁচ মাসে টিপে টিপে ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও দেখা যাচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে ভাতা বৃদ্ধি প্রায় চার গুণ আকার গ্রহণ করেছে। বলা বাহুল্য, ভাতা বৃদ্ধি চার গুণ হলে মূল্যমান বহু বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং এবার ভাতা বৃদ্ধির সময় অনেকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভাতা বৃদ্ধি আদৌ কোনো কাজের কাজ নয়। ভাতা বৃদ্ধি মানেই মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি মানেই কণ্টবৃদ্ধি আর কণ্টবৃদ্ধি মানেই পদ্মচ ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলন।

কিন্তু তথাপি এই অকেজো নীতিতেই দেশের অর্থনীতি পা

বাড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রের বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ দাবি নিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তালিকাও সাবালক হচ্ছে। আর এইভাবে মূল্যবৃদ্ধির বাড়-বাড়ন্ত হলে অতঃপর যারা ললাট জোরে টিকে যাবেন, বাজারে যেতে হলে এপিঠ-ওপিঠ দু'তরফা মুটিয়া সংগ্রহ করতে হবে তাঁদের। যাবার সময় মুটিয়ার মাথায় যাবে টাকা, আসবার পথে আসবে সামগ্রী। আর সেই ভরাবহ দৃশ্যের জন্য এই দেউলিয়া দেশটাও প্রায় তৈরি।

মুটিয়ার ভার লাঘবের জন্য সরকার বাহাদুর অবশ্য আগেভাগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এক পর্যায়ে থেকে পঞ্চাশ পরসার মুদ্রাগুলির ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি এক টাকার নোট হাতে কয়েক দেখা গেল নতুন নোট পুরাতনের তুলনায় অনেক “এলোবেলে”। সুতরাং ভরসা এই যে এখনো কিছুকাল আগ্রা পটল বেগুন উচ্ছে নিতির এক পাক্কায় ভুলে অল্প পাক্কায় তার মূল্যানুপাতিক

মুদ্রা ও নোট চাপালে সামগ্রীর ভার অধিকতরই বোধ হবে। অবশ্য সে অবস্থারও আর কতকাল এখনই তা নিয়ে কেউ যদি ভাবিত হন তবে তাকে অন্তত অস্বাভাবিক মন্তব্যের অধিকারী বলা সঙ্গত হবে না। আর মুটিয়া সম্প্রদায়ের ওপরও বোকা চাপার সম্ভাবনা নেই। কেন না যা বহন করতে হবে তার তুলনায় মূল্য সূচক অনুসারে রোট তারা বাড়িয়েই নেবে। অতএব না ভেঃ। অতএব কলতে হবে, আর কী বৃদ্ধিমান সরকার। সময় যুঝে মুদ্রা ও নোটের ওজন হ্রাসের এই দৃর্দর্শিতা বাস্তবিক দুর্লভ।

তথ্য সরকারী বাহাদুরীকে অতি-নন্দিত করা গেল না। বাজারে দুর্লভ আর একটি বস্তু। তা হল, মাগী ভাতার বহর যতই টেনে লম্বা করা হ'ক উদ্ভাৱা ‘দুর্লভ’ অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের স্বপ্ন কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না যদি মাগী ভাতা বৃদ্ধি, মূল্যমানকে আরও রাখা

একমাত্র উপায় বলে চিন্তা করা হয়। মাস্গী ভাতা বৃদ্ধির দ্বারা সামাজিক-গণের 'প্রকৃত আয়' বরং তুল্যায়শে কমেই যায়। বাড়তে না কদাচ।

কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই তার প্রমাণ রেখেছেন। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই বাড়ানো হয় প্রথম দফা মাস্গী ভাতা। আবার ঢালবাহানা করে দ্বিতীয় দফা বাড়তে সরকার বাধ্য হন তারই মাত্র সাত মাস পরে। তৃতীয় দফায় আরও একটু চিন্তার সময় নিয়ে দ্বিতীয় তৃতীয়ে দশ মাসের ব্যবধান রাখা করা হয়। চতুর্থ ক্ষেপের জন্য সরকার পেয়েছেন মাত্র পঁচ মাস সময়। এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যন্ত সর্বশেষ ক্ষেপ ১৯৬৫-র ডিসেম্বরে পৌঁছাতে সরকারের সময় লেগেছে নয় মাস। তা হলেই মূল্যমান বৃদ্ধির দ্রুতগতি কোন অধঃপাতের দিকে ছুটে চলেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বারবার তিনবার ছাপিয়ে এসে পঞ্চম বারে রাজ্য সরকারগুলির চৈতন্যদর হয়েছে। সাধারণে বহুবার যে কথা বলেছেন, সরকারী মহল আজ তা নিয়ে কপাল টাটতে সবে শুরু করেছেন মাত্র। ভাতা বৃদ্ধির দ্বারা কর্মচারী মহল বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে করেন নি। তাঁরা বলেছিলেন, মূল্যমানকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা হ'ক। হয় নি। এবার রাজ্য সরকারবর্গ সে কথার প্রতিশ্রুতি তুলেছেন। তাতেও সন্নিবেহ হবে না।

রাজ্য সরকার নিজেরাই যদি স্টেট ট্রোড-এর আওতাভুক্ত বিষয়া-বলীতে মূল্যমান চড়িয়ে চলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণ। বাজারে উপায় না থাকলে কর্মচারিবর্গ বিক্ষুব্ধ।

আর সরকারী প্রতিশ্রুতি রাখতে হলে কর্মচারীদের জন্য উপরি ভাতার ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হয়। ফলত তাহলেই পরবর্তী বাজেটে ট্যাক্সবৃদ্ধির ব্যক্তি সহজে মেলে।

চমৎকার আর্থিক নিয়ম।

এক হাতে পূর্ণ কর, আর হাতে নাও তুমি কাড়ি। প্রচণ্ড অমোঘ সরকারী-এই নীতি।

মূল্যমানকে আরম্ভাধীনে রাখার চেষ্টা তো হয় নি, সরকারী অর্থনৈতিক ব্যর্থতা তাকে আয়ত্তে আনতেও পারবে না। এর পর নিউজপ্রিন্টে নোট ছাপিয়ে মদ্রাস্ফীতির মাতলামির স্বেগে কদমে কদম মেলাতে হবে সরকারী টাকশালকে।

আর কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ৫, ৮, ১১, ১২, ১০ প্রভৃতি হারে

ভাতা বৃদ্ধি করলেই কি মূল্যবৃদ্ধির বর্ষা মোকাবিলা করা যায়। ভারতের জনসাধারণের এক অতি স্বল্প সংখ্যক মানুষই কেন্দ্রীয় কর্মচারী। বাকি লোকের কি হবে? সরকারের দায়িত্ব তাঁদের প্রতি নেই? রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা টাঙ্গরা শূঁকিয়ে 'তুফা' 'তুফা' করে চীৎকার করছেন বহুকাল। অন্যান্য আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। আছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যাশিক্ষাপথ-এর মত প্রতিষ্ঠান যা কদাচ গণনার মধ্যে আসে না। রাজ্য সরকারের ভাতা বৃদ্ধি হলে আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আশান্বিত হতে পারেন, নিশ্চয়ই নেই।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধির স্বেগে স্বেগেই এই সমুদ্র মহলে বর্ষিত হারে ভাতার দাবি উঠবে। সরকার কোন ব্যক্তিতে ঠেকাবেন? বেয়নেট লাঠি ডি আই রুলে? কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না।

কল-কারখানায় মাহিনা বৃদ্ধির জের এসে পড়বে সাধারণ মানুষের ওপরই।

সুতরাং মাস্গী ভাতা বৃদ্ধিতে (যত সামান্যই হ'ক) উজ্জিসিত হওয়ার বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কারণ নেই।

স্বস্তি একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সরকারী প্রচেষ্টায় মূল্যমান স্থিতিশীল হবে।

বলা বাহুল্য, এই দুরাশা বর্তমান সরকারের দ্বারা মেটানো সম্ভব নয় বলেই ধারণা। তার তাঁরা যদি চেষ্টায় বিমুগ্ধ না হন তাহলেও অনেক হবে। সেই হওয়ার অপেক্ষায় আমরা দিন গণনা করি।

শান্তির মহড়া

সৌভাগ্য বলতে হবে, সমগ্র পাক-ভারত রাষ্ট্রব্যাপী প্রকৃত অর্থে যুদ্ধের মহড়া শুরু হতে না হতেই সৌভাগ্যেত দৌত্যের প্রচেষ্টায় এখন উভয় রাষ্ট্রের সীমানায় শান্তির মহড়া শুরু হয়েছে।

লাহোরের পাক-ভারত সামরিক প্রতিনিধিগণের যুদ্ধ বৈঠকে সমস্ত সৈন্যপাসারগণের চুক্তি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বিগত ২৯শে জানুয়ারী। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক স্বেচ্ছা।

এদিকে পূর্বপশ্চিম ও মাতে যুদ্ধ-প্রস্তুতির সমস্ত আরোজন ভেঙে দেওয়া হয় ও প্রায়ই যে সমস্ত এলাকার গুলী বিনিময় হয়ে থাকে তা বন্ধ হয়

তার জন্যও বর্তমান মাসের প্রথম তারিখে কলকাতায় মিলিত হন উভয় রাষ্ট্রের পূর্বপশ্চিম সেনানায়ক ও তাঁদের সহকারী বৃন্দ। উভয়ই আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছে বলে সংবাদও পেয়েছি আমরা।

তাসখন্দের এই ঐতিহাসিক চুক্তি ইতিহাসকে বাস্তবিক কতদূর নতুন করে রচনা করবে তার হিসেব রাখবে অবশ্য ভবিষ্য কাল। তবে সূচনা সুন্দর দেখে পরিণাম রমণীয় কল্পনায় আমরা বর্তমানে আশ্বস্ত।

উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ তাসখন্দের শান্তি চুক্তিকে মেনে নিয়েছেন। তদনু-রূপ প্রচারও হচ্ছে উভয় রাষ্ট্রে এবং ভারতবর্ষে তাসখন্দ চুক্তির বিপক্ষে কতিপয় কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পূর্ব পাকিস্তান থেকেও শোনা যায় নি।

শোনা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকার যুব সম্প্রদায় কিস্তি হয়ে উঠেছিলেন এবং যে ফতিমা জিন্না পাকিস্তানের বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের এক বৃহদংশের সমর্থন লাভ করেছিলেন, শান্তিপ্রিয় পূর্ববঙ্গের সমর্থনধন্য। সেই ফতিমা জিন্নাও শান্তিবাদী তাসখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁর নিন্দাবাদে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সৌভাগ্য এ আন্দোলন বেশি দূর গড়ায় নি। স্বেচ্ছা পাকিস্তানের 'রাগী যুবক' (বয়সে নয়) জনাব ভুট্টো আসরে নেমে বিরুদ্ধবাদীদের শান্ত করেছেন এই বলে যে, কাম্মীরে ওপর পাক দাবি তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর রাখার দরুণই নস্যাত হয়ে যায় নি। প্রেসিডেন্ট আয়ুবকেও তাঁর দেশের জনগণকে ঐ একই কথা বলে আয়ত্তে আনতে হয়েছে।

এজন্য স্বস্তি পরিবর্তে পাকিস্তান নতুন করে আবেদন রেখেছেন। বক্তব্য, সৈন্যপাসারগণের পর বেন কাম্মীর প্রসঙ্গ পুনরায় বিবেচনা করেন স্বস্তি পরিবর্ত। কাম্মীর নিয়ে পুনশ্চ ঘোষিত অবশ্যই সূক্ষণ নয়। তথ্যটি অপরাপর কালের চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ অনারূপ এটুকুই যা ভরসা।

তাসখন্দ চুক্তির অকৃত্রিম উদ্যোগ ও সাক্ষী স্বেচ্ছা সৌভাগ্যেত প্রধান মন্ত্রী। তৃতীয় পক্ষের এই বাস্তব উপস্থিতির (মধ্যস্থতা নয়) জন্য আশা করা যায় কাম্মীরকে কেন্দ্র করে পুনরায় আগুন জ্বালানো কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই অসম্ভব সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।

সুতরাং শান্তির আবহাওয়া বজায় রাখতে তাসখন্দ চুক্তির জন্য উভয় রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা আছে তা সহজে শিথিল করা যাবে না। আর সেই জন্য আশা করা যায়, দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিষ্ফল বিবেচ ও হননের পথ পরিত্যাগ করে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের মঙ্গলার্থে দেশের উন্নতির কথাই অতঃপর চিন্তা করবেন এবং এশিয়া ভূখণ্ডে ভারত ও পাকিস্তানের সহাবস্থান পাক-ভারত উপমহাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

অধিনায়ক জয়ন্ত চৌধুরী

“আপংকালীন অবস্থা অতিক্রান্ত হলেই আইনানুগ কাজ করতে হবে।”

অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে সেনাবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে উপরোক্ত মন্তব্য করে ভারতের যোগ্য সেনাধিনায়ক মেজর জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী বলেন, “একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে সরকারী কর্মজীবনে স্বাভাবিকভাবেই অবসর গ্রহণের দিন আসে এবং এটাই স্বাভাবিক ও সঠিক ব্যবস্থা।”

সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক এই আইনানুগ পন্থায় ৫৮ বছর বয়সে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করছেন আগামী ১০ই জুন, ১৯৬৬ সালে। তিনি সেনাবিভাগে একাদিক্রমে সাড়ে আটত্রিশ বছর সুযোগ্য সৈনিকের কর্তব্য পালন করেছেন এবং স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষা করেছেন তাঁর যোগ্য দক্ষতায় সমাসীন এয়ার চীফ মার্শাল অর্জন সিং-এর সূক্ষ্ম সহযোগিতায়। ভারতের এই দুই বীর অধিনায়ক পেরেছিলেন সুযোগ্য সহকারী অফিসারবন্দ এবং জওয়ান বাহিনী।

বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁদের কাছে আপন ঋণ স্মরণ করেছেন জয়ন্তনাথ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, সামরিক বাহিনীর প্রত্যেকটি কর্তব্যরত সৈনিকের অকৃতিম শ্রম ও ভালবাসাই তাঁকে তাঁর আপন কর্তব্য পালনে শক্তি ও প্রেরণা দান করেছে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এই সুখস্মৃতি এবং উত্তেজনাযুক্ত মহত্বগুলির স্মৃতিচারণাই হবে তাঁর আনন্দময় ভাবসঙ্গ।

সহযোগিতার মূল্যায়ন করে শ্রীচৌধুরী সেনাবাহিনী দিবসে বিমান বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এয়ার মার্শাল অর্জন সিংকে প্যাটন ট্যাঙ্কের একটি রোগ্য প্রতিকৃতি উপহার দেন।

শ্রীচৌধুরী সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে

যে মূল্যবান ভাষণ দান করেন তার প্রতিটি অক্ষরই যে-কোন দেশেরই সেনাবাহিনীর আদর্শস্বরূপ রূপে গৃহীত হওয়ার বিষয়।

জেনে: কুমারমঙ্গলম

স্থলবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক জেনে জয়ন্তনাথ চৌধুরীর অবসর গ্রহণের পর তাঁর গৌরবময় পদের উত্তরাধিকার লাভ করবেন স্থলবাহিনীর ভাইস-চীফ অব স্টাফ জেনে পি পি কুমারমঙ্গলম, পয়লা ফেব্রুয়ারী এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

বাম কম্যুনিষ্ট দলে নতুন বাতায়ন

বাম কম্যুনিষ্ট দলে আবার নতুন চিন্তার উদয়: ঘনঘন নীতি বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট



জেনারেল চৌধুরী

দলের ইতিহাস। বাম কম্যুনিষ্ট দলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা শ্রীসুন্দরায়ার নতুন চিন্তা সেই বিবর্তিত ইতিহাসে এবার আর এক নতুনতর পরিচ্ছেদ সংযোজিত করার জন্য তৈরি, এই মর্মে আই পি এর একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, ঘোর চীনাবাদী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বাম কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীসুন্দরায়ার পাক-ভারত সংঘর্ষ তথা চৈনিক ভূমিকা সম্পর্কে এখন নতুন বক্তব্য হাজির করছেন।

শ্রীসুন্দরায়ার মনে করেন, বিগত কাস্মীর সংঘর্ষে পাকিস্তান ১৯৪৭

সালের অনুরূপভাবে কাস্মীরে অবৈধ অনুপ্রবেশ করেছে। এবং সে কারণে পাকিস্তান কর্তৃক কাস্মীরে অনুপ্রবেশকে শ্রীসুন্দরায়ার সারসরি ভারতের বিরুদ্ধে ‘এগ্রেশন’রূপে বর্ণনা করেছেন।

চীনাবাদী হওয়া সত্ত্বেও স্বাভিকৈ স্বীকার করে নিতে সুন্দরায়ার ইচ্ছা করেন নি। তিনি স্পষ্টতই মনে করেছেন যে, পাক-ভারত সংঘর্ষ কালে ভারতের বিরুদ্ধে চৈনিক ‘আলটিমেটাম’ প্রয়োগ অন্যায়া এবং অবিচারী হয়েছে। আর সে কারণেই এই সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সোভিয়েত প্রচেষ্টা তাঁর মতে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চৈনিক বিবোধাগারও চীনা দুর্য্যক্ষ-সজ্জাত বলে শ্রীসুন্দরায়ার ধারণা। তিনি মনে করেন, সোভিয়েত নীতিকৈ ‘সাম্রাজ্যবাদ মূল্য’ নীতি বলে চিহ্নিত করাও অন্যায়া। এ বিষয়ে তাঁর সমালোচনায় শ্রীসুন্দরায়ার এখন মূধুর।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, শ্রীসুন্দরায়ার অভিমত বাম কম্যুনিষ্ট মহলে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবে।

বামপন্থী মহলে এই নব বাতায়ন উন্মুক্তি নতুন আশার সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই।

আসাম:

শ্রীফকরুদ্দিনের উত্তরাধিকার

আসাম থেকে এই প্রথম কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পূর্ণমন্ত্রীরূপে বোগদানের পদবোগ পেলেন একজন অসমীয়া নেতা। শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-রূপে বোগদানে আসামের বিভিন্ন মহলে যে উল্লাসের লক্ষণ দেখা গেছে তারও মূখ্য কারণ ঐ, আসাম এই প্রথম কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পূর্ণমন্ত্রী-রূপে একজন প্রতিনিধি রাখতে পারল।

আসামে এক ফকরুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে জোর আলোচনা। রাজনীতির কারবারীরা গবেষণায় বসেছেন। অনেকের ধারণা শ্রীআহমেদের নির্বাচনে স্বয়ং রাজ্য মূখ্যমন্ত্রী শ্রীচলিহা দিবী কংগ্রেসী দরবারে গত্যায়ত করে শ্রীআহমেদের পক্ষে ক্যানভাস করেছিলেন। অবশ্য এর মধ্যেও শ্রীচলিহার নিজস্ব উদ্দেশ্যও সর্ধিত হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। মূখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল মনে করেন, অসম দল ‘প্রকৃত শাসক’ বলে বর্ণিত শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদের প্রভাবমন্ত্রিরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীআহমেদের সংগে কিছুকাল যাবৎ মূখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য ফরাক সৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্যান্য

স্বার্থসিদ্ধিস্বরূপ এই ফারাককে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে সম্ভাবহারে উদ্যত ছিলেন। প্রকাশ, রাজ্য শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রী ডি কে বড়ুয়া মুখ্যমন্ত্রীর আসনটি নিজের জন্য সংগ্রহ করতে কিছু প্রয়াস পাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের চেষ্টায় তো ছিলেনই, শ্রীআহমেদকে দলে টেনে মুসলিম ভোটারদেরও হাত করার লক্ষ্য ছিল তাঁর।

শ্রীআহমেদকে হাত করার অর্থ মুসলিম এম এল এদের জোটবন্ধ মর্থন লাভ করা। আর এই দলের মর্থন না থাকলে স্বয়ং চালিহার আসনই টলমল করবে। এজন্যই ফকরুদ্দিন সাহেব আসাম রাজ্যে এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বরূপে পরিগণিত।

শ্রীচালিহাকে কব্জা করার জন্য শ্রীআহমেদের সমর্থন লাভের বড়ুয়া-প্রয়াসের সংবাদ শ্রীচালিহাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি শ্রীআহমেদের প্রভাব মৃত্ত হওয়ার জন্য সেকারণেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এমন সময় সুযোগ এলো। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট থেকে এক কোপে বাংলার দু-দুজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করা হল। ক্যাবিনেট পুনর্বিদ্যাসের সুযোগে অনেকে অনেকের বহুদিন লালিত বাসনা চরিতার্থ করে নিলেন। শ্রীচালিহাও তৎপর হয়েছিলেন শ্রীআহমেদকে আসাম থেকে দিল্লীতে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে আসার জন্য। বলা বাহুল্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, শ্রীচালিহাও এবার কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হলেন বলে ভাবতে পারবেন।

বর্তমানে শ্রীচালিহার সামনে দ্বিতীয় সমস্যা ঘরোয়া সমস্যা। শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে রাজ্য ক্যাবিনেটে। কিন্তু শ্রীআহমেদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের পোটফোলিও অপর কারও হাতে তিনি তুলে দেবেন কি না এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। রাজ্য বাজেট পেশের আর মাত্র পঞ্চাধিককাল বাকি। সে হিসেবেও অর্থদপ্তরের পুনর্বিদ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে নজর রেখে যিনি সুযোগের অপেক্ষা করেন, সম্ভবত সেই শিক্ষামন্ত্রী বড়ুয়া সাহেবের হাতে সহজে এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছেড়ে দিতে শ্রীচালিহা চাইবেন না। তবে তেমন সম্ভাবনাত্মক কার্যকরী হতে পারে বলে কোন কোন মহল ধারণা করেন। না হলে, শ্রীচালিহার কাছে আর দুটি পথ উন্মুক্ত। হয় অন্য কারকে

এই দপ্তরের ভার দেওয়া, নয় নিজেই এ ভার গ্রহণ করা। অন্য কারও মধ্যে যার নাম শোনা যাচ্ছে তিনি রাজ্যের বর্তমান শিক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী শ্রী কে পি ত্রিপাঠী। শ্রীচালিহা নিজে এ দপ্তর গ্রহণ করলে তাঁর বর্তমান দপ্তরগুলির মধ্যে দু-একটি হস্ত ছেড়ে দেবেন। এ সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব নয়; কেন না চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আবহাওয়া তাঁর নেই।

সম্ভাব্য নামের তালিকায় গোয়াল-পাড়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীওমরুদ্দিনকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদের পরেই তিনি মুসলিম এম এল এ বর্গের একটি উল্লেখ্য অংশের সমর্থনভোগী। শ্রীওমরুদ্দিন—আবার আসাম চেনার অব কমান্ডের চেরাম্যান। শ্রীওমরুদ্দিনের সম্ভাবনাই উজ্জ্বল বলে অনেকের ধারণা।

যাই হোক, অর্থ দপ্তরের পুনর্বিদ্যাসের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর আসন পাকা করার একটি প্রশ্নই আজ শ্রীচালিহার প্রধান বিবেচ্য।

শ্রীওমরুদ্দিনকে বসিয়ে শ্রীচালিহা হস্ত বা এক টিলে দুই পাখি বধের চেষ্টা করবেন। শ্রীআহমেদের অনুপস্থিতিতে শ্রীবড়ুয়া চালিহা-বিরোধী কাজ করার সুযোগ পাবেন না। পরন্তু অর্থ দপ্তরের সমুচিত বণ্টন করে শ্রীচালিহা শ্রীবড়ুয়ার বিরুদ্ধে শক্তি-সংগ্রহ করতে পারবেন।

তাছাড়া শ্রীচালিহার অন্যতর চিন্তা, নতুন প্রধানমন্ত্রীর সুনজরে আছেন শ্রী ডি কে বড়ুয়া। এই ঘটনাও শ্রীচালিহাকে বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে।

সব মিলে আসামের রাজনৈতিক আকাশে যে মেঘাচ্ছন্নতা বিরাজমান, তা পরিস্কার হতে আরও কয়েক দিন সময় নেবে। এবং মেঘ সরানোর কৃতিত্বে প্রমাণিত হবে শ্রীচালিহার সমস্যা সমাধানের সমর্থ্য।

উত্তর প্রদেশ:

মালিন্য সংস্কার

কংগ্রেস হাইকমান্ডের 'মাথাবাখা' উত্তর প্রদেশ ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে সর্বশেষ মনোমালিন্য সংস্কার প্রচেষ্টাও যথার্থ ফলবতী হয় নি। তবে পট-পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিচ্ছে বলে প্রকাশ।

এক ও সংহতির প্রতীক প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর চিতাভস্ম বিসর্জনের সময় মন্ত্রিসভাপক্ষী দলের নেতা শ্রীচন্দ্রভানু গদ্বতকে একপাশে

সরে দাঁড়িয়ে এবার পথ ছেড়ে দিতে হয়েছে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীকে। নেহরুজীর চিতাভস্ম বিসর্জনের কালে কিন্তু এমনটি ঘটে নি। এবার শ্রীগদ্বত 'আউট', আসরে নামলেন শ্রীত্রিপাঠী। সংগমে সভা করা, বক্তৃতা করা ও চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়ার সব দায়ব্ধি কমলাপতির হাতে।

মোরারজী সমর্থক শ্রীগদ্বত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনের পরই নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তাড়িঘড়ি শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, এলাহাবাদে তাঁর দর্শন-লাভের। কিন্তু তাতেও তাঁকে এবার বেশ কোণঠাসা অবস্থার একধারে সরে থাকতে হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সূচেনা কৃপালনীর শ্রীগদ্বতের সঙ্গে দুঃসংবাদ্যপী জরুরী বৈঠক করেছেন এবং শোনা যাচ্ছে শ্রীত্রিপাঠীর সঙ্গেও অনুরূপভাবে এক বৈঠকে তিনি নাকি শীঘ্রই বসবেন। ব্যাপার দেখে অভিজ্ঞমহলের ধারণা হয়েছে, এবার উত্তর প্রদেশে মিটমাটের উদ্যোগ আরোজনের আবহাওয়া বইছে। শ্রীগোবিন্দ সহায় এ ব্যাপারে কিছু অত্যাঙিত করে বসেছেন; তিনি নাকি শ্রীমতী কৃপালনীর মিলন-প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত দেশের সম্প্রতি পাক-ভারত মিলন প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করে বসেছেন। (বাক্যের ওপর ট্যান না থাকায় এ জাতীয় বিপত্তি?)

শ্রীগদ্বত এবং শ্রীমতী কৃপালনীর গুরুত্বপূর্ণ গদ্বত আলোচনার ফলাফল অবশ্য জানা যায় নি, তবে অনেকের ধারণা, মন্ত্রিসভা সমর্থকদের হস্ত ক্যাবিনেটে বিরুদ্ধবাদীদের গ্রহণ করার এবার সম্মত হবেন; অবশ্য আদান-প্রদান সে ক্ষেত্রে ম্বিপাক্ষিক হওয়ার দরকার। অর্থাৎ কংগ্রেস সংগঠনে তাহলে মন্ত্রিসভা সমর্থকদের দাপটও কিছু মেনে নিতে হবে।

শ্রীমতী কৃপালনীর এই দৌত্যকার্য (শ্রীসহায়ের মতে 'তাসখন্দীর দৌত্য') সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা সমর্থকদের প্রচণ্ড বিরাগ এখনও কংগ্রেস সভাপতির (শ্রীকামরাজের) ওপর একই প্যারে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীগদ্বত নাকি তাঁর পার্শ্বচরদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হয়ে সাক্ষসূক্ষ সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীতে যদি শ্রীমতী গান্ধী অথবা শ্রীকামরাজ হস্তক্ষেপ করতে আসেন, তবে, সেখানে দ্বিতীয় কোরালার সৃষ্টি হবে।



ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভীষিকা : হতাহত ভিয়েতনামী সৈন্যদের হেলিকপ্টারযোগে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ভিয়েতনাম :

সাইপ্রিস দিন বন্ধ রাখার পর ৩১শে জানুয়ারী থেকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে।

বর্ডা দিন ও ভিয়েতনামের চান্দ নব-বর্ষ উপলক্ষে এই বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপনের জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু করে, বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখা সেই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত।

কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, মার্কিন বোমাবর্ষণ আবার শুরু করা হবে। মানা মহল থেকে রাষ্ট্রপতি জনসনের ওপর এর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ভিয়েতনামের সমরনায়করাও এই দাবি জানাচ্ছিল। তাই বোমাবর্ষণ শুরু করার সংবাদে বিশেষ কেউ বিস্মিত হয় নি। তবে শান্তিকামী মাঠে এতে ক্ষুব্ধ বোধ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বিশ্বের সর্বত্র ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিস্বরূপ উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখার জন্য যে শক্তিশালী দাবি উঠেছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।

সমগ্র বিশ্বে মার্কিন বোমাবর্ষণ শুরুর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এই কার্যের তীব্র নিন্দা করে

ঘোষণা করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর ভিয়েতনামকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবে। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সবাই বোমাবর্ষণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জাপানও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট বলেছেন, এর ফলে শান্তিপ্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। পোপ পল স্কুর্বাচিস্কে বলেছেন, শান্তির জন্য তাঁর আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল না। এক-মাঠ বুটেন এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিরুপায় হয়ে এই পথ গ্রহণ করেছে, বুটেন তা অনুভব করেছে।

বোমাবর্ষণ শুরু করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি. জনসন বলেছেন, বোমাবর্ষণ বন্ধ রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, উত্তর ভিয়েতনাম তাতে সাড়া দেয় নি বলেই আবার বোমাবর্ষণ আরম্ভ করা হল। তবে সঙ্গে সঙ্গে শান্তির প্রয়াসও চালিয়ে যাওয়া হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির পথেই চলতে চায়।

শান্তির পথে চলার কার্যক্রম কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করেছে। রাষ্ট্রসংঘে স্থায়ী মার্কিন প্রতিনিধি আর্থার গোম্বার্ড নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার প্রস্তাব উপস্থাপন

করে বলেছেন, ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির সম্মেলনের ব্যবস্থা করুক।

নিরাপত্তা পরিষদে ভিয়েতনাম প্রশ্নের আলোচনা করা হবে কিনা, এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক উপস্থিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি ফেডেরেস্কা গোম্বার্ডের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, জেনেভা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী যদি মীমাংসা করতে হয়, তবে তার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন নেই। জেনেভা সম্মেলনের বৃদ্ধ সভাপতি বুটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এ ব্যাপারে যা করণীয় তা করবে। আসলে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব এনেছে, না হলে শান্তির কোন সন্দিগ্ধতা তার নেই।

দীর্ঘ আলোচনার পর ২রা ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ ৯-২ ভোটে স্থির করেছে, ভিয়েতনাম প্রশ্নে পরিষদের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বুলগারিয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। নাইজেরিয়া, উগান্ডা ও মালি ভোটদানে বিরত ছিল।

নিরাপত্তা পরিষদে ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও কবে আলোচনা হবে, তা স্থির হয় নি। মনে হয়, আরও অন্তত ১০/১৫ দিন পরে আলোচনা শুরু হবে। নিরাপত্তা পরিষদে সমস্যাটির মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যে প্রস্তাবই সংখ্যাগুরু ভোটে গৃহীত হোক না কেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে ভোট প্রয়োগ করবে। নিরাপত্তা পরিষদে বাধা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টিকে সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদে অচল অকস্মাৎ সন্টি হবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'শান্তির জন্য একবাক্য' (Uniting for Peace) সন্দ্বিষ্ট অনুসারে সাধারণ পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে, অথবা পরিষদের সভাপতি সদস্যদের মত জেনে নিয়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করতে পারেন। কোনটিই বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজ হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য, শান্তি-স্থাপনের জন্য মার্কিন প্রস্তাবে উত্তর ভিয়েতনাম সাড়া দেয় নি। এ কথা ঠিক, উত্তর ভিয়েতনামের ওপর চীনের বর্ষেক প্রভাব আছে এবং চীন হয়তো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নেরও ভাল প্রভাব রয়েছে উত্তর ভিয়েতনামের নেতাদের ওপর। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছিল, হো চি মিন আলোচনার বসতে রাজী আছেন। কিন্তু যে-কোন মীমাংসার প্রথম শর্তই হল ভিয়েতকং-দের রাজনৈতিক সংগঠন 'মুক্তি ফ্রন্টের' সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। মুক্তি ফ্রন্টকে বাদ দিয়ে ভিয়েতনাম সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিন-চতুর্থাংশ আজ মুক্তি ফ্রন্টের দখলে। কয়েকটি বড় শহরে মার্কিন সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কোনরকমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার অস্তিত্ব রক্ষা করছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রকৃত প্রতিনিধি এই মুক্তি ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে স্বীকৃত হলে তবেই আলাপ-আলোচনার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে রাজী হয় নি। সুতরাং, আলোচনা সম্ভব হল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য; এর জন্য উত্তর ভিয়েতনামকে দায়ী করা চলে না।

নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রস্তাবের চূড়িও এইখানেই। প্রস্তাবে রয়েছে, স্পেন্সিফিক সরকারগুলিকে বসতে বলা হোক। অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনাম ও

দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে আলোচনা-বৈঠকে সমবেত করার চেষ্টা চলেছে, মুক্তি ফ্রন্টকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। মুক্তি ফ্রন্টকে বাদ দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম বসবে না। আর বসলেও কোন কাজ হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছে। শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যদি তার থাকে, তবে মুক্তি ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনার জন্য রাজী হতে হবে এবং অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, দক্ষিণ ভিয়েতনামেও ভিয়েতকং গেরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ রাখতে হবে। শান্তির অনুকূল পরিবেশ রচিত না হলে শান্তি আলোচনা সম্ভব নয়। আর যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবে থাকে যে, আগোছ-আলোচনা নয়, যুদ্ধের পরেই ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান হবে, তবে তা কত ভুল ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফল কি হয়েছে? আজও দক্ষিণ ভিয়েতনামে দুই লক্ষ মার্কিন সৈন্য রয়েছে। তবু দেশের চার ভাগের তিন ভাগ বিদ্রোহীদের দখলে। মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিদ্রোহীদের নিজেদের কোন শক্তি নেই, উত্তর ভিয়েতনামের জোরেই তাদের জোর। সুতরাং উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু দশ মাস ধরে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেও তো দেখা গেল, কোন সুবিধা হল না। ভিয়েতকং গেরিলাদের শক্তি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরুর করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামেও ভিয়েতকং গেরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান তীব্র করা হয়েছে। তিন হাজার মার্কিন নৌসৈন্য সাগরগে এসে উপস্থিত হয়েছে। কোরিয়া যুদ্ধের পর এত নৌসৈন্য কখনও কোথাও আসে নি।

শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধের উদ্ভাদনা কোথায় গিয়ে থামবে, কে জানে!

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

মহাকাশ অভিযানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের সংবাদে সমগ্র বিশ্ব আজ উল্লাসিত। সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-৯ ওরা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের সময় 'খীরে খীরে' চাঁদের বৃকে অবতরণ করেছে।

এভাবে চাঁদে অবতরণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন পাঁচ বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভ

করতে পারে নি। এইবার অবতরণ করে মহাকাশ অভিযানে নতুন ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

লুনা-৯-এর চাঁদে অবতরণের সাত বর্টা পাঁচ মিনিট পরে চাঁদের বিভিন্ন স্থানের বিবরণ সহ ছবি মতের টেলিভিশনে আসতে থাকে। চাঁদের পাহাড়-পর্বত ও সমতল ভূমির ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

খীরে খীরে চাঁদের বৃকে মহাকাশ-যান অবতরণের ফলে মানুষের চাঁদে যাওয়া দরাস্থিত হবে। এর পরে চাঁদে নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে নিয়মিতভাবে মহাকাশযান প্রেরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এদিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বহু পেছনে ফেলে এগিয়ে ফেল।

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের এই ঐতিহাসিক সাফল্য তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসন, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল প্রভৃতি বাণী প্রেরণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্পর্ক যাই হোক না কেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের এই বৈজ্ঞানিক সাফল্য সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হবে।

যুক্তি :

হাল কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সাফল্য প্রামিকদলকে নতুন করে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে।

ইয়কশারারের বন্দর-শহর হালের এই কেন্দ্রে ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ১১৮১ ভোটের ব্যবধানে প্রামিকদল জয়লাভ করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রটি রক্ষণশীল দলের দখলে থাকার পর '৬৪ সালে কোন রকমে প্রামিক দলের হাতে এসেছে। সাধারণ নির্বাচনের পর প্রামিক দল ক্ষমতার আসীন হবার পর থেকে নানা কারণে প্রামিক দলের সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাই অনেকেই ধারণা করে-ছিল, প্রামিক দল এবার আসনটি হারাবে।

এবারের উপনির্বাচনে প্রামিক দলের প্রার্থী ছিলেন একজন শিক্ষক কোভিন ম্যাকনামারা। তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলের প্রার্থী ছিলেন টবি জেসেল ও উদারনৈতিক দলের প্রীমতী লান্নি মিল-ওয়ার্ড। তাছাড়া 'র্যাডিক্যাল অ্যালারেন্স' নামক সংস্কার পক্ষ থেকে বামপন্থী সাংবাদিক রিচার্ড গটও দাঁড়িয়েছিলেন। রিচার্ড গট পরিষ্কার বোঝেছিলেন, তাঁর জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, ভোট ভাগ করে প্রামিক দলকে পরাজিত করাই তাঁর

উদ্দেশ্য। শ্রমিক দলের সরকার ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিন বিরোধী নীতি গ্রহণ করুক, এই তিনি চান। সুতরাং, শ্রমিক দল এই উপ-নির্বাচনে পরাজিত হলে কমন্সসভায় তাঁদের ভোটের ব্যবধান আরও কমবে, এবং তার ফলে বামপন্থী সদস্যদের প্রভাবে সরকারের ভিয়েতনাম নীতির পরিবর্তন হবে, এই হল গটের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণ।

রক্ষণশীল দল, উদারনৈতিক দল ও 'বামপন্থী' গটের পক্ষ থেকে শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে তীব্র নির্বাচনী অভিযান চালানো হয়। সপ্তে সপ্তে পার্লামেন্টেও মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সরকারী নীতির সমালোচনা করে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের সদস্যরা বক্তৃতা করেন। এই অবস্থায় শ্রমিক দলকে অনেকটা কেণ্ডাসা হয়েই নির্বাচন দ্বন্দ্ব অবতারণা হতে হয়।

তবু যখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হল তখন দেখা গেল শ্রমিক দলের প্রার্থী গত নির্বাচনের চেয়েও অনেক বেশি ভোট পেয়ে, ৫৩২১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। উদারনৈতিক দলের গ্রীমতী মিলওয়ার্ড ৩০০০-এর চেয়েও কম ভোট পাবার জন্য তাঁর জামানত জব্দ হয়েছে, এবং গট পেয়েছেন মাত্র ২৫৩টি ভোট।

রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথ অবশ্য বলেছেন যে, এই উপ-নির্বাচনের পরাজয়ে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন নি। তবু শ্রমিক দলের কাছে এই জয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত, এবং তাঁরা খুবই উল্লসিত। এখন তাঁরা ভাবছেন, হয়তো এখনই সাধারণ নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। তবু হ্যারল্ড উইলসনকে সব দিক ভেবে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

লাঙ্গেমবার্গ:

অবশেষে ফ্রান্স ইউরোপীয় কমন মার্কেটে ফিরে আসতে সম্মত হয়েছে। জুলাই, ১৯৬৫ সালে কমন মার্কেটের অধিবেশন থেকে চলে যাবার পর ফ্রান্স আর এই সংস্থার কোন বৈঠকে যোগ দেন নি। দীর্ঘ ছ' মাস পরে গত সপ্তাহে লাঙ্গেমবার্গে কমন মার্কেটের মন্ত্রী পর্ষদের বৈঠকে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুভ দ্য মারভিল যোগদান করেছেন।

লাঙ্গেমবার্গ টাউন হলে প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ওয়ারনারের সভাপতিত্বে ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এবারও কুভ দ্য মারভিল তাঁদের পুরোনো বক্তব্য উপস্থিত করেন। ফ্রান্স ছাড়া অন্য পাঁচটি দেশ কমন মার্কেটকে একটি বহু জাতিবিশিষ্ট পন্থায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চায়,

এবং ধীরে ধীরে ইউরোপীয় একোত্র পথে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু ফ্রান্স কোন প্রকার রাজনৈতিক একোত্র বিরোধী। সংহত রাজনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তে একটি ঢিলে-ঢালা অস্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনরূপে কমন মার্কেটের অস্তিত্ব সে চায়।

এই কারণেই কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠান বা ই-ই-সি'র (ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি) সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গ্রহণের ব্যাপারে ফ্রান্স আপত্তি করেছে। এবারের বৈঠকেও ফ্রান্স যে কোন সদস্য কর্তৃক ভোট প্রয়োগের দাবী জানিয়েছে। অপর পাঁচটি দেশ এর ঘোর বিরোধী। রাসেলসে প্রতিষ্ঠিত কমন মার্কেট কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কাউন্সিলের সভা-



কুভ দ্য মারভিল

পতি পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক হল-স্টাইনের ভূমিকা সম্পর্কেও ফ্রান্সের বক্তব্য আছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ভোটের জিদ ছেড়েছে। মোটামুটি একটা আপোষ হয়েছে, কোন বিষয়ে মতভেদ হলে যতক্ষণ না একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। ফ্রান্স বর্তমানে এতেই রাজী। এখন থেকে কমন মার্কেটের সব বৈঠকেই ফ্রান্স যোগ দেবে।

ছ' মাস ধরে কমন মার্কেট বয়কট করে ফ্রান্সের কোন লাভই হয় নি, বরং ফ্রান্সের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশে এর জন্য চার্লস দ্য গলের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্য গলের ভোট সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে

কমে যাবার এটি অন্যতম কারণ। এই সব ভেবেই দ্য গল ভাল ছেলের মত কমন মার্কেটে ফিরে এসেছেন।

পাকিস্তান:

তাসখন্দ ঘোষণার যথযথ রূপায়ণের জন্য মন্ত্রীপর্ষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখ ও আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব করে ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের কাছে যে চিঠি দেয়া হয়েছিল, তার জবাব পাওয়া গেছে। ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার আরসাদ হোসেন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শ্রী সি, এস, ঝার সপ্তে ওরা ফেরুয়ারী সাক্ষাৎ করে এই পত্র দিয়েছেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য যত সঙ্কর সম্ভব এইরূপ বৈঠকের আয়োজন করতে হবে, তাসখন্দে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ফেরুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই এই বৈঠকের জন্য ভারত প্রস্তাব করেছে। কিন্তু পাকিস্তান এই তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ২০শে ফেরুয়ারী থেকে ওরা মার্চের মধ্যে এই বৈঠকের প্রস্তাব করেছে। এত দেরি করার কারণ কি?

ছাড়া মন্ত্রী টেকের আলোচ্য বিষয়রূপে পাকিস্তান যে ছয়-দফা বক্তব্য রেখেছে, তাতে দিল্লীতে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে কোন মীমাংসা সম্ভব হবে না। অপর পাঁচটি বিবয় হল: (১) ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করতে হবে; (২) জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত উদ্ভাস্তুদের সমস্যা আলোচনা করতে হবে; (৩) ভারত থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের কথা বিবেচনা করতে হবে; (৪) ফারাক্কা বাঁধ সহ পাকিস্তানে জল সরবরাহ বন্ধের যাবতীয় বিষয় আলোচনা করতে হবে; ও (৫) আর যে সব চুক্তি রয়েছে, তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাকিস্তানের প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচী দেখে দিল্লীর কর্তাদের চক্ষু ভো ছানাবড়া! এই কি তাসখন্দের ফল? ৪ঠা ফেরুয়ারী এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র-সচিবের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে।

বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তানের মনোভাব মোটেই ভাল নয়। তাই ভারতকে অত্যন্ত সাবধানে, শান্তির আদর্শে নিষ্ঠাবান থেকে কিন্তু দৃঢ়তায় সপ্তে চলতে হবে।



॥ তিন ॥

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের ওপর পুলিশী আক্রমণ

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যখন শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে তখন একজন জনপ্রিয় কর্মচারীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে 'বুলক হাউস' নামে এক স্টীমার কোম্পানীতে ধর্মঘট সুরু হয়। ব্রিটিশ কর্তারা একেই এই আন্দোলনকে দমন করার উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছিল। আবার বিলিতি কোম্পানীতে ধর্মঘট সুরু হওয়ায় অত্যন্ত বিরত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সহযোগিতার কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে রইল।

ধর্মঘটের দশম দিনে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। এস্, এস্, লক্ষা নামে কোম্পানীর একটি জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাত্রারত, করতো। সেই জাহাজটি কর্ণফুলী নদীতে সোঙর করা ছিল। নবম দিনের রাতে আমরা জলপথে একজন অতি সন্তপণে নাবিকদের ব্যবহার করার একটি পথ দিয়ে গোপনে জাহাজ পেঁছলাম। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে ধর্মঘটে তাদের যোগ দিতে রাজী করানো হলো। পরদিন জাহাজ ছেড়ে একটু দূরে যেতেই দেখা গেল তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, আর নাবিকরা সব বন্দ

করে করে জলে পড়ে সাঁতরে তাঁরা চলে আসছে।

তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন বিরাট এক মিছিলের পুরোভাগে। নির্দিষ্ট সময় মত এই ব্যবস্থা করার জন্যই আমাদের গভীর রাতে জাহাজে যেতে হয়েছিল।

প্রায়দশ দিনে গভর্নমেন্ট প্রায় বারো জন ধর্মঘটী নেতাকে গ্রেপ্তার করলো। তার মধ্যে ছিল আমার বন্ধু প্রেমানন্দ। সে আমার প্রতিবেশী, আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রিভেন্টিভ অফিসার ছিল সে। দেশবন্ধু আইনব্যবসা ছেড়ে দেবার পর প্রথম যেবার চট্টগ্রামে আসেন সেবারই সে ডাকারি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে তখনো তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।

চোদ্দ দিনের দিন শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস শোভাযাত্রার ওপর কর্তৃপক্ষের আক্রমণ সুরু হল। ধর্মঘটের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বতীন্দ্রমোহন এবং জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীদের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল রাজপথ দিয়ে। বর্ষার আক্রমণে তার ওপর কাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ-বাহিনী তাদের লাঠি, বন্দুক আর বেরোনেট নিয়ে।

জেলা-মাসক ছিলেন তখন 'মিস্টার শ্যুং'। নামে 'শ্যুং' হলেও আসলে তিনি ছিলেন রোগা, লম্বা, কুঁজো। চেহারা দিয়ে তো আর ক্ষমতার বিচার হয় না। সমস্ত জেলা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। তাঁরই আদেশে বন্দী হলেন নেতারা, বন্দী হলেন দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

সমস্ত পাটা আক্রমণের প্রয়োজনীয়তার উপলক্ষ

আমি আর গণেশ সামনা সামনি সব কিছুই দেখলাম। এত সামান্য কারণে বন্দি বরণ করার ইচ্ছা ছিল না, তাই শোভাযাত্রার বাইরে আমরা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিরস্ত শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের ওপর পুলিশের অত্যাচার লক্ষ্য করছিলাম। আর, তখনই মনে মনে ভাবছিলাম, এই পথে চললে কি পাবো, যা চাই আমরা?

শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের এই তীব্র আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জনগণ এবার গর্জন করে উঠল। শহরের সাধারণ মানুষ, যারা আন্দোলনে এসে যোগ দেন নি, শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব ধর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, এলো আশেপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ

শান্তি-প্রিয় মানুষেরা—জমাদ্বয়
স্রোত এগিয়ে চলল স্বভাবস্বতভাবে।
কেউ তাদের ডাকে নি, কেউ বলে নি
‘চল, চল’।

সেই বিরাট মনুষ্যস্রোত এসে জড়
হল জেলের সামনে। সারা রাত বসে
রইল তারা। অপেক্ষা করিতে লাগল
তাদের প্রিয় নেতাদের জন্য। সকাল
বেলা যখন বন্দীদের নিয়ে পলিশের
গাড়ি চললো আদালতের দিকে, তখন
জনতাও চলল তাদের সঙ্গে।

শহরের মাঝখানে একটি পাহাড়ের
ওপর আদালত-ভবন। পাহাড়ের
নিচের রাস্তা থেকে আরম্ভ করে
পাহাড়ের ওপরে আদালতের চারিদিক
ঘিরে গির্জা-বুধ-নর-নারীর ভিড়—
কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই।
গাছের ডালে ডালে লোক বসে আছে।
মোটরগাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে
সবাই। কয়েক সহস্র কণ্ঠ মাঝে মাঝে
ধ্বনিত হচ্ছে সমবেত আওয়াজ—
“বন্দে মাতরম্”, “আম্মা হো আকবর”।
গগনবিদারী শব্দে স্পন্দিত হচ্ছে
আদালত-ভবনের প্রতিটি কক্ষ। তারই
একটাতে বিচারক-পদে আসীন
‘স্ট্রিম্যান’ মিস্টার স্ট্র-এর হৃদয়ও কি
বারেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে না
ভবিষ্যতের আশঙ্কায়?

সেই আশঙ্কাই জেলা-শাসককে
আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য
করল। আদালতে আলোচনার পর
‘বুলক’ রাদার্স’ নতি স্বীকার করল।

ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে
চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল। আদালতের
বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দেশপ্রিয়
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—বিরাট জনতাকে
সম্বোধন করে জ্বালাময়ী ভাষায়
বক্তৃতা দিলেন। এখনো চোখের সামনে
জ্বলে ওঠে সেই নিভীক প্রশান্ত মূর্তি,
কানে আসে সেই দুঃস্থ কণ্ঠস্বর :

“এই যে কর্দন থেকে পলিশের
অত্যাচার চলেছে, গুদারী ক্ষিপ্ত হয়ে
উঠেছে, বেপরোয়াভাবে গভর্নমেন্ট
দমন-নীতি প্রয়োগ করেছে,—তার প্রতি-
বাদ করছি—ঘোর প্রতিবাদ করছি!
আমি গভর্নমেন্টকে হুঁশিয়ার করে
দিচ্ছি—ক্ষান্ত হও। এখনো ক্ষান্ত হও!
মইলে তোমাদের পরিতাপের সীমা
থাকবে না।”

সেদিন সেই বক্তৃতা শোনার পর মনে
মনে প্রতিজ্ঞা করলাম চট্টগ্রামের শান্তি-
প্রিয় নাগরিকদের ওপর এই পলিশী
অত্যাচারের—এই হিংস্রতার প্রতিশোধ
নিতাই হবে। অত্যাচারীর দণ্ডের
উপযুক্ত জবাব আমরা দেব।

এক মাসের মধ্যেই চট্টগ্রামের বৃকে

আবার গণ-আন্দোলনের ঢেউ এসে
লাগল। গান্ধীজী দেশবাসীকে ডাক
দিলে বঙ্গবন্ধু,—“আমাকে এক কোটি
টাকা আর এক কোটি স্বেচ্ছা-সৈনিক
দাও—আমি তোমাদের এক বছরের
মধ্যে স্বরাজ এনে দেব।”

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দো-
লনের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছে
চট্টগ্রামে, তখনই এল আর একটি ধর্ম-
ঘটের ডাক।

রেল-শ্রমিক স্ট্রাইক্

পলিশী আন্দোলন

চা-বাগানের শ্রমিকদের একটি
বিরাট দল মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে
বাগান ছেড়ে এসে চাঁদপুর রেলওয়ে
এবং স্ট্রীমার স্টেশনে জড় হয়েছিল।
বিভাগীয় কমিশনার কে. সি. দেব
আদেশে পলিশ এবং গুদারী সৈন্য এই
দরিদ্র অসহায় শ্রমিকদের ওপর
নির্বীচারে অত্যাচার চালালো। বৃটের
ল্যাথি, বেগনেটের গুতো, বন্দুকের
গুলী—কোনো কিছুই তারা বাদ দিল
না: উপরন্তু মৃত আহত মজুরদের
নদীতে ছুড়ে ফেলতে লাগল।

নিরীহ চা-বাগান-শ্রমিকদের ওপর
এই বর্বর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যা-
কাণ্ডের কাহিনী এসে পৌঁছল চট্টগ্রাম
শহরে—তার ওপর শোনা গেল স্টেশন
মাস্টার চারুবাবু আহত হয়ে বন্দী
হয়েছেন। রাত্রি একটার সময় খবর
এলো। সেই রাতেই বিভিন্ন দলের
নেতারা জেলা-কংগ্রেসের কর্মীদের
সঙ্গে মিলিত হলেন যতীন্দ্রমোহনের
বাড়িতে। গভর্নমেন্টের এই পৈশাচিক
প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রতিটি সাধারণ
মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে
তুললো—যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে
সহস্র চট্টগ্রামবাসী একতাবদ্ধ হয়ে
শ্রমের সম্প্রদায় করলো—এই অত্যাচারের
সমুচিত জবাব দিতে হবে।

চা-বাগান শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে
এবং নিজস্ব কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে
সুদূর হলো আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে
ধর্মঘট। যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে
প্রত্যেকটি রেলশ্রমিক যোগ দিল ধর্মঘট
সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য। শ্রমিকরা
কাজ বন্ধ করলো। কেরানীরা কলম
বন্ধ করলো,—আসাম-বেঙ্গল রেল-
ওয়ের কর্মীরা একযোগে সেই অবি-
স্মরণীয় ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে
বন্ধপরিকর হলো।

এই ধর্মঘটে যতীন্দ্রমোহনের পাশে
এসে দাঁড়ালেন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির

নেতারা—সূর্য সেন, অনুরূপ সেন,
চারুবিকাশ দত্ত, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী,
আর এলেন যুব নেতা বিনয় সেন,
সতীশ নাগ, সুখেন্দু সেনগুপ্ত,
প্রেমানন্দ, সিরাজুল হক, এবং আরো
অনেকে। এই বিরাট ধর্মঘটকে সফল
করে তুলবার জন্য আমরাও রাতদিন
খাটতে লাগলাম। তিন মাস ধরে
চললো স্ট্রাইক,—কত বাধাবিপত্তি, কত
দুঃখকষ্ট অতিক্রম করে।

নব্বই দিন ধরে পাঁচ থেকে দশ
হাজার পবনত ধর্মঘটী কর্মীদের
বিভিন্ন ক্যাম্পে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য
দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘরে
ঘরে ভিক্ষা করে, পথে পথে চাঁদা তুলে,
দিন চালালো হেত। কত স্বদেশ-
প্রেমিক ধনী অকাতরে দান করেছেন,
মেরেরা হাসিমুখে গানের গয়না খুলে
দিয়েছেন। ধর্মঘটকে সফল করবো,
অত্যাচারী সরকারের কাছে মাথা নত
করবো না—এই ছিল চট্টগ্রামবাসীর
প্রতিজ্ঞা।

নেতারাও বিস্মিত হয়েছিলেন
সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ দৃঢ়তা
দেখে। কত রাতে দেখেছি গান্ধী-
ময়দানে ধর্মঘটীদের সঙ্গে জনসাধারণ
এসে একত্রে সভা করেছে—সারা রাত
ধরে চলেছে বক্তৃতা—সাবা বাত ধরে
স্লোগানে স্লোগানে চট্টগ্রামের আকাশ
বিদীর্ণ হয়েছে।

এতদিন ধরে টাকা তুলে, অন্ন, বস্ত্র,
ঔষধপথ্য জোগাড় করে ধর্মঘটীদের
সাহায্য করা—এবং সর্বোপরি তাদের
মনোবল তাক্সি বাখা অন্তর্ভুক্ত কর্তৃক
কাজ। প্রতি তিন-চার মাইল অন্তর
আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ঘাঁটি ছিল যাতে
ট্রেন বন্ধ থাকে সত্ত্বেও চট্টগ্রাম থেকে
চাঁদপুর পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব
সাইকেলে চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে।
এ ছাড়া মাঝে মাঝেই গ্রুপ মিটিং করে
ধর্মঘটীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার
ব্যবস্থা হতো।

প্রথম মাসটা বেশ চলছিল। প্রথম
চোটে অর্থ সাহায্যও বেশ পাওয়া
গিয়েছিল, ধর্মঘটে যোগ দেবার
উৎসাহও অটুট ছিল। যত দিন বেতে
লাগলো, কড়পক্ষের অনমনীয় মনোভাব
দেখে ততই স্বভাবত দুর্বলচিত্ত
লোকেরা ভয় পেতে লাগলো। এদের
মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক কাজে
যোগ দিতে লাগলো।

তখন যতীন্দ্রমোহন অন্য নেতাদের
সঙ্গে পরামর্শ করে নির্দেশ দিলেন যে
যারা কাজে যোগ দিচ্ছে তাদের বরকট
বা একঘরে করা হবে। অর্থাৎ তাদের
বাড়িতে কোনো বি-চাকর কাজ করবে

না। ধোপা-নাগিত বন্ধ, গোয়ালী দুধ দেবে না, ঝাড়ুদার ঝাট দেবে না। এই করে তখনকার মত তবু খানিকটা কাজে যোগ দেওয়া বন্ধ হোলো।

ধর্মঘট যখন প্রায় দুই মাস ধরে চলেছে তখন আবার কিছু কিছু লোক কাজে যাওয়া শুরু করল। এরা আবার অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। দানের টাকা আর কতদিন চালাবে তারা? তার চেয়ে শ্রমিক ভালো করে কাজ করুক। সন্মুখের পড়বে। আমরাও প্রাণপণে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে চলছি। সারাদিন স্নান নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই—ধর্মঘটীদের মধ্যে প্রচাব চালাচ্ছি আর টাকা-চাল-কাপড় যোগাড় করে যাচ্ছি।

এই অবস্থায় যখন কিছু কিছু লোক কাজে যোগ দিতে লাগলো তখন আমরা নেতাদের নির্দেশে অন্য পথ বন্ধলাম। নানাভাবে এদের বিরক্ত করতাম, অপমান করতাম, আরও নানারকম বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে হাজার রকমে তাদের লোকচক্ষে হেয় করতাম।

শেষ পর্যন্ত অহিংস নীতি ছেড়ে এদের ওপর কিছু কিছু আক্রমণও চালাতে হোল। ফলে কেউ হারালো কান, কেউ নাক, কেউ আঙুল, কেউ বা মাথার কয়েক ফোঁটা রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে চললো ট্রেন লাইনচ্যুত করে ধ্বংসাত্মক কাজ চালালো।

প্রথমে ছাত্রধর্মঘট, তারপর 'বলকু সাদাস' এবং এ. বি. রেলওয়ের ধর্মঘট—এ সবই হয়েছিল কংগ্রেসী নেতা কতীন্দ্রমোহন, মহিম দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে। তবে আমাদের গুপ্ত-বিপ্লবীদের সভারা এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে শত্রু ধর্মঘটের কাজে লেগে পড়ে ছিলাম; একদিকে ধর্মঘটীদের জন্য অন্নবস্ত্র আর অর্থসংগ্রহ—অন্যদিকে ধর্মঘট ভগ্নকারীদের শাস্তি দান ও ধ্বংসাত্মক কাজ—এই বিধাবিভক্ত প্রোগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি

জনসাধারণ কিন্তু এ সময়ে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালায়ে যাচ্ছিল—কতৃপক্ষ তার জবাব দিচ্ছিল লাঠি, বৃষ্টির গুতো, সজ্ঞানের

খোঁচা আর বন্দুকের গুলি দিয়ে। আমাদের বিপ্লবীদের নেতারা সব সময় সতর্ক ছিলেন—যাতে দলের কোনো কর্মীকে বন্দিদ্ববরণ করতে না হয়। কারণ তা হলে অহিংস আন্দোলনেই সমস্ত শক্তি ক্ষয় হোয়ে যাবে,—ভবিষ্যতে হাতিয়ার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত সামর্থ্য থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত সরকার কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন—যতীন্দ্রমোহন, কাজেম আলি মিয়া, ত্রিপুরা চৌধুরী, মহিম দাস এবং অন্যান্য নেতারা বন্দী হলেন। একটা বিচারের প্রহসন করে তাঁদের কলকাতা জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হোল।

মনে আছে সেদিনের কথা—জেলে থেকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই এসেছে তাদের প্রিয় নেতাদের দেখতে, বন্দিদের এখনি পঠিয়ে দেওয়া হবে নির্বাসনে—চট্টগ্রাম শহর থেকে বহু দূরে। বাড়ির ছাদে, গাড়ির মাথায়, গাছের ওপরে, সর্বত্র লোকের ভিড়—নিশ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য হোয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ব্যান্ডপার্টির বাদ্য, বিলিটী কাপড়ের বহুতরঙ্গ, বোম্বা-বাজীর উৎসব আর ঘন ঘন আকাশ ফাটানো 'বন্দেমাতরম', 'আমরা হো আকবর' ধ্বনি—সব মিলে—সেদিন যে দৃশ্যের সৃষ্টি হোয়েছিল চট্টগ্রামের লোকেরা তা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

বন্ধ গাড়িতে কড়া পদলিখ পাহারায় নেতাদের যখন জেলের বাইরে আনা হোল তখন জনতা ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মুখে ঐ এক 'বন্দেমাতরম' আওয়াজ ও বিলিটী কাপড় পোড়ানো ছাড়া আর কেনোরকমে সে ক্ষোভ প্রকাশ করবার পথ নেই।

বন্ধদের সঙ্গে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম নেতাদের সঙ্গে শেষ দেখা করবার আশায়। স্টেশনে পৌঁছে দেখি সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হোয়েছে, অন্ধকার প্রাটফর্মের প্রতিটি গেট বন্ধ করে সশস্ত্র পদলিখ প্রহরী মোতায়েন করা হোয়েছে।

সামনের দরজা বন্ধ দেখে পেছনের পথ অবলম্বন করতে হোল। রেল-লাইনগুলি পার হোয়ে স্টেশন চত্বরে দাঁড়ানো কয়েকটি ট্রেনের কামরার ভেতর দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালাম প্রাটফর্ম—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট কামরাটির সামনে।

মিলিটারী এবং পদলিখ কর্তৃক মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয়তম নেতাকে

আনা হোলো কামরাটতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে জন-সমুদ্র দেখে এলাম বাইরে তার সামান্যতম অংশও প্রাটফর্ম পর্যন্ত এলো না। তাদের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও তো শোনা যাচ্ছে না! ব্যাপার কি?

একই উপায়ে প্রাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যখন সামনের দিকে এসে স্টেশন রোড পৌঁছলাম তখন বোঝা গেল কারণটা।

একবল গুর্খা সৈন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হোয়ে আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে ছিল। জনতার মিছিল স্টেশন রোড থেকে প্রাটফর্ম-মুখী হোতেই এরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে তাদের ওপর। অতর্কিতে এসে এই বিরাট জনতার ওপর আক্রমণ চালানোর ফলে সমস্ত মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হোয়ে পড়েছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতো, ঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ সব কার কোথায় পড়েছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের গতি এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো আমাদেরও মনে সংশয় ছিল। ধর্মঘটের সময় স্বতন্ত্রত্ব গণ-বিক্ষোভ দেখে আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় এই ঘটনা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিল। দেখলাম, এই বিরাট গণ-আন্দোলনেরও সমাপ্তি হোলো মাত্র কয়েকটি ভাড়াটে গুর্খা সৈন্যের আক্রমণে। নিরস্ত্র দেশ-বাসী সশস্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি ফল পেতে পাবে?

নীতিগতভাবে বলা যায় যে, সশস্ত্র সৈন্যের আক্রমণেও যদি জনগণ অবিচলিত হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো তবে কি কোরতে পারতো ঐ কটি মর্দনমুগ্ধ সৈন্য? কিন্তু জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই-রকম সশস্ত্রত্বভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গান্ধীজীর মত অবিচলিত ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

চাই অস্ত্র — চাই বিপ্লবী আদর্শ

যখন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র-বাহিনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল তখন আমরা একেবারে নিশ্চিত হোলাম যে, কেবলমাত্র এইভাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভেই আমরা স্বাধীনতা পাবো না। এই নীতি অনুসরণ করলে বৃটিশ সরকারকে গদীচ্যুত করে মৃত্তি অর্জন করবার স্বপ্ন আকাশ-কুসুমের পর্যবসিত হবে। যদি দেশের গণশক্তি বৃটিশ সৈন্যদলকে

পরাজিত করবার মত উপযুক্ত অস্ত্রের সাহায্য না পাওয়া তবুও শত্রু বৃদ্ধে ওমার খাওয়াই সার হবো। আজ যদি আমরা আরো কানাইলাল, ক্ষুদীরাম, প্রফুল্ল চাকী, আরো যতীন মুখার্জীর মত বিপ্লবী যুবক সৃষ্টি করতে পারি, তবে আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে জনসাধারণও সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসবে।

সেই যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লব বুদ্ধিতে চাই নি—অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে উপলব্ধি করেছি সোজা জিনিস। এইরূপ উপলব্ধি দুটি-হীন হোতে পারে না। তবু মোটকথা এইটুকু বুদ্ধিহীনাম সৈ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন ক্ষমহীন নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। সেই সশস্ত্র অভিযান সর্বশেষ রূপ পরিগ্রহ করবে, যখন জনসাধারণ আমাদের আদর্শে উৎসাহিত হইবে। অস্বস্তিক্ত হবে এবং সুযোগ-সুবিধা বুদ্ধি অতিক্রমিত মুষ্টি-মের বৃটিশসৈন্যের ওপর কাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিধ্বস্ত করবে। যখন সশস্ত্র আক্রমণ এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করবে তখন বৃটিশ সরকারের পাষাণ-বেদী টলমল করে উঠবে।

তাই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ। আমরা যদি এক-একজনে একটিমাত্র অস্ত্র নিয়ে একটি করে ইংরেজ রাজ-পুরষকেও হত্যা করতে পারি তবে এই বিক্ষুব্ধ জনতা বুদ্ধিতে পারবে অস্ত্র হাতে নিয়ে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে জড়াই করা সম্ভব।

যাই হোক, শেষ-পর্যন্ত এ বি রেল-ওয়ের ধর্মঘট সফল হোলা না। ধর্মঘটী কর্মী এবং জনসাধারণের মনোবলের অভাব ঘটে নি; সমানে সমানে বিরোধ চলছিল; পরাজয় হোলেও তা অনেক সহজ জয়ের থেকে কম গৌরবের হয় নি। এ বিষয়ে একজন প্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী বলেছেন:

“Well-contested battle even if lost will have the same moral effect like those of the easily-own victories.”

ধর্মঘটের শেষে সে যুগের সংগ্রামী নেতারা অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন নি, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনেরও অভাব ঘটে নি। গান্ধীজী নিজে লিখে-ছিলেন:

“Chittagong is in the fore of the movement.”

তবু ধর্মঘট বিফল হোল। আমাদের এতদিনের এত পরিশ্রম, ধর্মঘটীদের

এত ধৈর্য, আত্মত্যাগ সর্বকিছু ব্যর্থ করে দিল বৃটিশ সরকার—শত্রুসাম্রাজ্যিক অশক্তির জোরে। এই অশক্তিকে যদি জয় করতে না পারি সামরিকশক্তি ও কুশলতা যদি অর্জন করতে না পারি, তবে আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাই এইভাবে বিফল হোয়ে যাবে—এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করলাম এ বি রেলওয়ের ধর্মঘট থেকে।

বিপ্লবী সমিতি ভাঙনের দিকে

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবীদের সভারা যখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস নেতাদের পরিচালিত ছাত্র-ধর্মঘট, বুলক্ ক্রদাস-ধর্মঘট ও পরিশেষে এ বি রেলওয়ে ধর্মঘটে নানারকম সাহায্য করছিল, সেই সময়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চলছিল।

আগেই বলেছি, আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা ছিলেন পাঁচজন—চর-বিকাশ, জলুদা (নগেন্দ্রনাথ সেন), অনুরূপদা (অনুরূপ সেন), অম্বিকাদা (অম্বিকা চক্রবর্তী) এবং মাস্টাবদা—এরাই দল পরিচালনা করতেন। অম্বিকাদাকে আমরা প্রথম থেকে দেখি নি। তিনি রেশ্মন থেকে ক্ষিরবার পরে তাকে দেখেছি।

যতদূর মনে পড়েছে রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময়েই আমাদের দলে সম্ভবত স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে এবং তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল।

অনুশীলন পার্টির একজন নেতা (সম্ভবত ‘প্রতুলদা’—প্রতুল গান্ধুলী) এই সময়ে চট্টগ্রামে এসে চারাবাবুর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তার পরই পাঁচজন নেতার মধ্যে ঘন ঘন বিশেষ-রকম আলোচনা হোতে থাকে। আমরা দলের প্রধান গ্রুপে থাকা সত্ত্বেও এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্পষ্ট জানতাম না।

বুদ্ধিতে পরাছিলাম এঁদের মধ্যে তাঁর মতবিরোধ চলছে; মনে হচ্ছে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হবে। একদিকে চারাবাবু, অন্যদিকে চারজন। চারাবাবুর মনোগত অভিলাষ আমরা বেন পূর্ণ আবেগে গান্ধীজীর প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিই—কিন্তু তনুয়া অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী নন বলে একেবারে সম্মানে এগিয়ে গিয়ে কারাবরণ করে নিজেদের শক্তিকর করতে রাজী নন।

আমরা যাতে আন্দোলনের উত্তেজনার সামনে এগিয়ে পলিশের দৃষ্টিপথে না পড়ি সেদিকে নেতাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মনে আছে প্রকাশ্য সভায়

এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের সনে সম্মান গৌরবের ভাগী হবার ইচ্ছা দেখে মাস্টারদা আমাদের খুব বকেছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য, অস্ত্রসংগ্রহ করে দলকে শক্তিশালী করবার উপায় এক প্রকাশ্য আন্দোলনে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা ইত্যাদি তিনি ভালো করে আমাদের বুঝিয়ে দেন।

আমাদের পার্টির এইরকম মতবাদের সত্ত্বেও তা’ হেফাজতের গিটে চারাবাবু প্রকাশ্য আন্দোলনে এগিয়ে গেলেন। ব্যাকী চরজন নেতা কিন্তু এটাকে ভালো চেখে দেখলেন না।

ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে অনুশীলন পার্টির নেতা এসে গোপনে চারাবাবু সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এব পর যেনে অন্তর্ভুক্ত আরো প্রবল হোয়ে উঠলো। এই বিরোধ আমাদের সংগঠনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ আমরা স্পষ্ট কবে ঠিক বিবেচনের করণ জানতাম না, জনতা না তা আদর্শগত, নীতিগত না শাস্ত্রিকৌশলগত। চারাবাবু আমাদের সকলে সঙ্গেই পৃথকভাবে আলোচনা কবে এঁ কথটাই বোঝাত চেয়েছিলেন যে সংগঠনের নীতি অনুযায়ী অন্য নেতাক চলছেন না। নানারকম কাহিনী হেঁটে আমাদের সনে দঢ় ধবনা জন্মানেন যে এরকম বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের জন্য অন্যপক্ষই দায়ী।

আবার অপরপক্ষ সংগঠনের নীতি বর্ণনা করে নানাভাবে দেখাচ্ছিলেন যে চারাবাবুই তান্দ্রা থেকে সরে গিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এইভাবে নেতা দের মধ্যে চললো পরস্পর দোষাবোপ

ভাঙনের চরম পর্যায়

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিশ্বেষণ ফলে সংগঠনের একা দাব্দ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হোলা। অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমরা কখনো হতবুদ্ধি হয়ে যাছি। কখনো বা নেতাদের কাউকে কাউকে দোষী ভেবে দারুণ উত্তেজিত হই পড়ছি। এক কথায় পালছেঁড়া নৌকের মত সকলে বেন দিশেহাবা হয়ে পড়ছি।

মনে আছে একবার চারাবাবু আমার মনে দঢ় বিশ্বাস জন্মালেন যে জলুদাই এই সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ আর আমি প্রায় মনস্তির করি যে জলুদাকে খুন করে সংগঠনকে বাঁচাব। আবার জলুদার কাছে চারাবাবুর বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনী শনে সেটাই সত্য বলে মনে হোল। তাঁকে

আম্বাস দিলাম যে চারুবাবুকেই আমার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কল্পনা করা যায় না কি ভীষণ অবস্থা! আবহাওয়া কতখানি বিষাক্ত হলে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কতখানি চরমে উঠলে, এভাবে সমাধানের কথা মনে আসতে পারে। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত এরকম বিশৃঙ্খলা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমিই প্রস্তাব করলাম, প্রকাশ্য সভায় আমরা সকলে দুই পক্ষের মতভেদের কারণ জানতে চাই। নেতাদের সঙ্গে দলের প্রধান গ্রুপের সদস্যদের মিলিত হবার সুযোগ দেওয়া হোক। সেখানে খোলা-খুলি আলোচনা হবে। তাঁদের সিদ্ধান্তের মনে ধীরে ধীরে আভিযোগ আছে স্পষ্ট বলবেন, আর আমরাও সোজা-সুজা তাঁদের কাছ থেকে জানব সংগঠনের কোথায় গলদ হয়েছে।

সমিতির ঐতিহাসিক সভা

প্রস্তাবমতো জায়গা ঠিক হল হুমতগঞ্জ পোস্ট অফিসের বিপরীত দিকের পাহাড়ের পাদদেশে। জায়গাটি নির্জন, পুলিশের চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সময় ঠিক হল বিকাল-বেলা, যখন মাইলখানেকের মধ্যেই গাম্খান্দাদানে জনসভা চলবে। সব লোকেরা সেখানে চলে যাবে, আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

এইভাবে ব্যবস্থা করা হল সেই “ঐতিহাসিক মিটিং”—এর,—যে মিটিং-এ আমাদের দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হল, যে মিটিং আমাদের দলের পরবর্তী অধ্যায়ের বুনিসাদ তৈরি করল।

নির্দিষ্ট সময়ে জড় হয়েছি নির্দিষ্ট স্থানটিতে। পাঁচজন নেতা এবং আমরা কল্লজন। আমি বসে আছি আমার

বন্ধু প্রমোদের পাশে, আমার মন্থো-মুখি নির্মলাদা। পরিবেশ গম্ভীর; প্রত্যেকেই ভাবছি আজকের এই দুর্বোলের শেষ হবে কোথায়?

কিছুক্ষণ সভা নিস্তব্ধ কারো মুখে কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভগ্ন করলেন অনুরূপদা :

“চারুবাবু, আপনার মতটা সকলে জানতে চায়, আপনার যা বলবার আছে বলুন। আপনি কি চান?”

গত পনেরদিন ধরে পৃথক-পৃথক ভাবে আমরা সকলেরই মত শুনেছি। চারুবাবু সকলের কাছেই বিস্তৃতভাবে তাঁর মতবাদ বর্ণনা করেছেন। এখন আর নতুন কি বলবেন? তবু প্রত্যক্ষ-ভাবে সকলের সামনে বলতে হবে। তাই তিনি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য বিষয় বললেন :

“আমাদের শঙ্করদা (গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী) দীক্ষা দিয়েছেন। শঙ্করদা অনুরূপদা পাটির লোক। তিনি ১৯১৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমাকে গুপ্ত বিপ্লবী দলে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আমি জানি আমি অনুরূপদা পাটির সদস্য। তারপর এখানে যখন আমি এঁদের সঙ্গে পরিচিত হই—এবং আমরা পাঁচজনে মিলে একটা দল গঠন করি তখনো আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের এই ছোট দলটি অনুরূপদা পাটিরই একটি অংশ।”

সংগঠনের ইতিহাস

বিচ্ছেদের পালা

এইটুকু চারুবাবুর বলবার কথা। এরপর অনুরূপদা সংগঠনের ইতিহাস বলে চারুবাবুর কথার সত্যতা অস্বীকার

করলেন। প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেন :

“চারুবাবু, হয়তো তাঁর প্রথম বিপ্লবী চেতনা অর্জন করেছিলেন শঙ্করদা বা অনুরূপদা পাটির যে কোন নেতার কাছ থেকে—সেটা চারুবাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা পাঁচজনে যখন একটি গ্রুপ করি তখন তো গিরিজাশঙ্করকে (শঙ্করদাকে) আমরা এতে নিই নি। চারুবাবু অস্বীকার করতে পারেন তা? এই তো রয়েছে আমাদের সংগঠনের সংবিধান।”

একটি খাতায় ইংরাজীতে হাতে লেখা সংবিধানের ধারাদুলি দেখালেন অনুরূপদা :

এই দেখে এর মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে :

“We are pledged in the name of our country that we must remain revolutionary life-long. Five of us shall devote ourselves to build up the revolutionary organisation quite independently from any old party, or old group. In the meantime we shall try to explore Anusilan Party, Jugantar Party, or any other old group led by Purna Das etc., to ascertain who have the precise programme and adequate arms to satisfy us in the best manner?.. We shall meet together and discuss over the data collected by us. Then we will decide ourselves to whom we shall give our allegiance.” (স্বদেশের নামে শপথ করিতেছি আমরা আজীবন বিপ্লবী থাকিব।..... আমরা পাঁচজন অন্য কোন পুরাতন পার্টি বা পুরাতন গ্রুপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করিব।..... ইতিমধ্যে আমরা অনুরূপদা পাটি, যুগান্তর পাটি বা পূর্ণদাস প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত যে কোন পুরাতন গ্রুপের সহিত সংযোগ রাখিয়া অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব কাহারো আমাদের সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা স্বাধীনতা অধিক সম্ভূত করিতে পারিবে।..... এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমরা একত্র বসিয়া আলোচনা করিব। তার পর আমরা স্থির করিব কোন দলের প্রতি আমরা আনুগত্য স্বীকার করিব।)

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আয়োজন করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ব্বরে ভারতবর্ষের হৃদয়ব্যাপী পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। ভক্তকবি গোস্থানী তুলসীদাস চন্দ্রের অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা

করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসংগ্রহ মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুসংগঠিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম-বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অর্পণ করিতর নতুন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

এই সংবিধানটি পড়বার পর অনুরূপ দা জিজ্ঞাসা করিলেন :—“চারুবাবু আপনি এই সংবিধান অস্বীকার করেন?”

চারুবাবু নীরব। খানিক পরে অস্পষ্টস্বরে কি বললেন বোঝা গেল না। তবে তিনি আবার জানালেন যে, শঙ্করদাকেই তিনি নেতা বলে মানেন এবং নিজে তিনি অনুশীলন পার্টির সদস্য।

জুলুদা এবার যুক্তি দিয়ে চারুবাবুকে বোঝাতে চাইলেন :

“আপনি এতটা জেদ করছেন (adament) কেন? আমরা তো বলছি না যে আমরা অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেব না? এমন তো হতে পারে যে, অনুশীলন পার্টির কাছ থেকেই আমরা বেশি সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য পাব? প্রথমে, আপনারই গ্রহণ করা সংগঠনের সংবিধান, আপনি মেনে নিন। তার পর আসুন আমরা বাংলা দেশের সব বিপ্লবী পার্টি এবং গ্রুপের সংবাদ সংগ্রহ করি। সব শেষে আমরা সকলে মিলে আলোচনা করব যে, কোন পার্টিতে আমরা যোগ দেব। এতো সহজ যুক্তির কথা, এটা মেনে নিন না কেন?”

আমি ভেবেছিলাম জুলুদার অনুরোধের পর সংবিধান মেনে নিয়ে চারুবাবু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অবিচলিত রইলেন। জোর দিয়ে বললেন যে তিনি এটাই ঠিক করেছেন—অন্য সত্যরা নিজেদের মজিমতো তাঁদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিতে পারেন।

বোঝা গেল একা অটুট রাখা গেল না, তা’ ভেঙে পড়বে। একদিকে চারুবাবু, অন্যদিকে বাকী চারজন।

অনুরূপদা চারুবাবুর এরকম মনোভাব মোটেই পছন্দ করছিলেন না। আমার মনে হল প্রত্যেকেই চারুবাবুর অগণতান্ত্রিক মনোভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছে। অনুরূপদা তারপর সংবিধানের শেষ লাইনটি পড়ে শোনালেন : “Anybody who will violet the fundamentals of the constitution shall be done away with.” (যে কেহ এই সংবিধানের মূখ্য ধারাগুলি অমান্য করিবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।)

অনুরূপদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে। সুচীভেদ্য নীরবতা চারিদিকে। খানিক বাদে নিঃশব্দ জেনেও শেষ প্রচেষ্টা করলাম আমি। তাঁদের কাছে আমি তখন কত ছোট! তবে সেদিন

চোখের সামনে এতবড় একটা সর্বনাশ দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমার কিশোর মনের আবেগ নিয়ে বললাম :

“চারুদা, আপনাদের আলোচনা আমরা শুনলাম। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি বিপ্লবের প্রয়োজনে আপনি আপনার অগণতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করুন। বেশ তো, বিভিন্ন দলের অবস্থা পর্যালোচনা করে সকলে মিলেই ঠিক করা যাক না যে কোন দলে যোগ দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? ক্ষতি কি তাতে? চারুদা, ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের এই ছোট দলটিকে স্বধাবিভক্ত করবেন না!”

আনুগত্য স্বীকার

চারুবাবু অনমনীয় রইলেন। এখন আমাদের প্রকাশ্য সভায় জানাতে হবে কার প্রতি আমরা আনুগত্য স্বীকার করবো—চারুবাবুর না অন্য চারজনের। প্রমোদ আমাকে বলল, প্রথমে আমার মত জানাতে। আমি কিন্তু উল্টে তাকে অনুরোধ করলাম অন্যরা বলবার আগেই তাকে বলতে। এটা আমার জীবনের একটা বড় ভুল যে, সেদিন আমি সবপ্রথমে আমার মত দিই নি। তাহলে হয়ত প্রমোদ এবং আমি কয়েক বছরের জন্য হলেও পৃথক দলে চলে যেতাম না।

প্রমোদ জানালো সে চারুবাবুর দলে। এবার আর আমি দেরি করলাম না। অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই এই ব্যাপারে চারুবাবুর মতবাদেই ঘৃণিগূলি বর্ণনা কবে আমি চারজন নেতার পক্ষে মত দিলাম। বাকি আটজনও একে একে এই মতই সমর্থন করলো। তারাও চারুবাবুর ভূমিকা ভালো চোখে দেখে নি।

‘ঐতিহাসিক সভা’ শেষ হল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের নাটকীয় প্রথম অধ্যায়ের শেষে স্ববিনিকাপাত হল।

চট্টগ্রামে দুইটি বিপ্লবী দল

এই সময় থেকে চারুবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন পার্টির একটি ‘সংগঠন চট্টগ্রামে গড়ে উঠল। তার পাশে পাশে চলল সুখ সেন এবং তৎসহ অনুরূপদা, জুলুদা ও অম্বিকাদার নেতৃত্বে বাংলার অন্য বিপ্লবী দল থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি দলের রূপবিকাশ। ইতিমধ্যে আমাদের চারজন নেতা অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন, কে আমাদের যথার্থ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে?

রূপার বই

কিশোর-সাহিত্য

অমর জহর	১.০০
—পাতিতপাবন	
বন্দ্যোপাধ্যায়	
চুহলিকা	২.০০
—কল্যাণকুমার	
মুখোপাধ্যায়	
ছবির রজা ওবিন ঠাকুর	৩.০০
—অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
উড়ে চুল দাঁকি	৩.৭৫
—এন, কারাজিন	
অনুঃ সরিৎশেখর মজুমদার	
ডাকের কথা	৪.০০
—জয়িন জিলিয়াকাস	
অনুঃ পাতিতপাবন	
বন্দ্যোপাধ্যায়	

বিবিধ

মাদুকাহিনী	৮.৩০
—(নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত)	
অজিতকুমার বসু (অকুব)	
চলমান জীবন (২য় পর্ব)	৭.০০
—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	
ইতস্ততঃ	৬.০০
—এককলমী	
(পরিমল গোস্বামী)	
ইরবতী থেকে নারেন্দ্র	৬.৭০
—সুধাংশু মোহন	
বন্দ্যোপাধ্যায়	
শৈলপূরী কুমারদেব	৫.০০
—চন্দ্রজ্ঞান মাইতি	
বসন্ত বিলাপ	৫.০০
—চন্দ্রজ্ঞান মাইতি	
শিশুতীরের পথ	৩.৫০
—উৎপল হোমসায়	
জনতার কোলাহল	২.৫০
—গোপীনাথ নন্দী	
অগ্নিদূত	২.০০
—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	
সন্ন্যাসীর গীত	১.৭৫
—গোপীনাথ নন্দী	

তৎপূর্ণ পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন



১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

नमो भगवते वासुदेवाय

[পূর্ব-প্রকাশিত-পত্র]

॥ उन्निदिम् ॥

বিজ্ঞান এসে ঘরে ঢুকল। দেখে
আশ্বস্ত হল ঘরে আর কেউ নেই, কণা
প্রকাই আছে।

কণা একটু 'হেসে' বলল, 'বসুন।
আর একটু পরে এলেই আমাদের আর
পেতেন না।'

বিজ্ঞান বঙ্গল, 'কেন?'

কণা রতন, 'কেন মানে?

বেরোচ্ছিলাম ।

বিজ্ঞান বলল, 'ও তাই বলুন। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কথা বলছেন। অবশ্য এক হিসেবে নাগালের বাইরেই তো আছেন।'

শেষ কথাটা গলা নামিয়ে বলল
বিজন। কিন্তু শ্রুতির অগোচর থাকে
এমন অক্ষুণ্ট কি অস্পষ্টভাবে বলল
না।

কণা ঠিকই শুনতে পেল। বিজ্ঞানের
দিকে একবার চোখ তুলে তাকালও।
কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

একটু চুপ করে থেকে বলল,
'বসন্ত, আপনার জন্যে চা করে নিয়ে
আসি।'

- বিজ্ঞান বলল, 'না, চা আজ থাক।
আপনি কি ভাবেন আমি শুদ্ধ আপনার
এখানে চা খেতেই আসি?'

কণা বিজ্ঞানের দিকে তাকাল।
ভারপর হেসে বলল, 'তা কেন আসবেন?
একজন কি আর একজনের বাড়িতে
শুধু চা খেতে আসে? সেজন্যে তো

চায়ের দোকানই আছে। আপনি আসেন গল্প করতে। চাটা সেই গল্পের অনুপান।’

বিজ্ঞান বলল, 'গল্প করতে আসি
ঠিকই। কিন্তু গল্প তো আর একজনে
করা যায় না।'

কশা বুকেও না বোঝার ভান করল 'আপনি কি আরো লোকজন চান না কি?' তাহলে চলুন আপনাকে আমাদের নাট্য-সংসদে নিলে যাই। সেখানে লোকজনের অভাব হবে না। হৈ-চৈ হুটগোল প্রচুর পাবেন সেখানে।'

বিজ্ঞানকে বসিয়ে স্নেহে কথা ভিতরে
চলে গেল। নিশ্চয়ই চা-আর খাবার-
টাবার কিছু-নিয়ে আসবে। বিজ্ঞান
বৈদ্যনই আসবে কিছু না-থেকে এখন
থেকে সে যেতে পারে না। আতিথ্যের
কোন ঘড়ি রাখে না কথা। বিজ্ঞানের
মনে হয় এ শব্দ শব্দ সৌজন্য নয়।
আন্তরিকতার উদ্ভাপ যে আছে বিজ্ঞান
তা বুঝতে পারে-। আবার মাঝে মাঝে
সংশয়ও হয়। হয়তো নিজের অন-
রাগের রঙেই সে আর একজনের
মনকে রঞ্জিত করে দেখছে। তার
সাধারণ আচার-আচরণেও এক বিশেষ
তথ্য আরোপ করছে। শিষ্টতা ভদ্রতা
ছাড়া সেখানে হয়তো আর কিছুই
নেই। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও কি মনে
ধরে?

কণা একটি শ্লেট এনে সামনে রাখল। আর দু'কাপ চা। নিজের চায়ের কাপটি নিজে বসল সামনে।

বিজ্ঞান বলল, 'ও আবার কি?'

বশা বলল, 'একটু ছানা করেছি।
খান।' ৭

‘উহু, আজ্ঞা আর কিছু খাব না।’

কণা একটু হাসল, 'মনে হয় আপনি যেন আজ ঝগড়া করবার জন্যে এসেছেন। বেশ তো তা করতে হয় করবেন। কিন্তু খেতে আপনাকে কি। বিশেষ করে অফিস থেকে ফিরছেন। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। খিদে গেলেই মানুষের রাগ হয়।'

‘বিজ্ঞান একটু হেসে বলল, ‘আমার
মনস্তত্ত্ব দেখছি আপনার একেবারে
নখদর্পণে।’

কণা বলল, 'ঠিক নখদর্পণে নয়।
তবে এতদিন ধরে আপনাকে দেখছি
আপনার মূর্খ দেখে বৃকতে পারব না
আমি কি এতই নির্বোধ?'।

খাবারের প্লেটটা বিজন এবার সামনে টেনে নিল। তারপর একটু হেসে বলল, “মদ্রু দেখে কী বদ্বজ্ঞে পারেন? রাগ হয়েছে কি হয় নি, খিদে পেয়েছে কি পার নি এই তো?”

কণা বলল, 'আমার বিদ্যা-বৃদ্ধির
যাচাই করে দেখছেন বন্ধু? খুব বেশি
নেই। সত্যি এর চেয়ে বেশি অনুমান
করার শক্তি নেই। ওই মোটা মোটা
কথাগুলিই বন্ধুতে পারি। তার চেয়ে
সুক্ষ্ম কিছু - হলে তা আর ধরতে
পারি নে।'

বিজ্ঞান বলল, 'পারেন আপনি ঠিকই। কিন্তু ইচ্ছে করে পারতে চান না। যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগাবে কে?'

কথার জবাব এঁড়িয়ে গিয়ে কণা বলল, 'আপনি আজ দারুণ চটেছেন দেখছি।'

বিজ্ঞান বলল, 'না চটবার কিছু নেই। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?'

কণা বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন। তবে আপনি শব্দ একটা কথা জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দেবেন তা মনে হয় না। শব্দ, কী জ্ঞানতে চান।'

বিজ্ঞান বলল, 'আপনি আমার চাকরির কথা শ্রীবিলাসবাবুকে বলতে গেলে কেন?'

কণা একটু চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, 'আপনি সবই জেনেছেন দেখছি। বলতে গেলাম কেন? দেখলাম আপনার কাজকর্মের দরকার। খোঁজাখুঁজি করেও সুবিধে-মত পাচ্ছেন না। তাই যদি বললে হয় তাঁদের একজনকে বললাম। আলাপ-পরিচয় থাকলে এটুকু উপকার আমরা একজন আর একজনের করে থাকি। আমার শ্রম কাজকর্মের অভাব হবে তখন আপনিও না হয় আমাকে একটা কিছু জুটিয়ে দেবেন। উপকারের প্রত্যাশা করেই থাকি।'

বিজ্ঞান ভাবল শব্দ উপকার? আর কিছুই নয়? আগে জ্ঞানলে কে এই শব্দকনো উপকার করার কাছ থেকে নিতে যেত?

বিজ্ঞান বলল, 'আমার ধারণা ছিল শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে আপনার আর কোন সম্পর্ক নেই। অন্তত যে সব কান্ড হয়ে গেছে তাতে আপনি যে তাঁর সঙ্গে ফের যোগাযোগ রাখতে পারেন একথা ভাবা যায় না।'

কণার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তাঁক্ষু দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমিও ভেবে অবাক হচ্ছি বিজ্ঞানবাবু, এসব কথা বলবার অধিকার আপনাকে কে দিল? নিজের অধিকারের বাইরে যাওয়া কারোরই উচিত নয়।'

বিজ্ঞান স্তম্ভিত হয়ে রইল। কণা যে তাকে এভাবে অপমান করতে পারে এ তার ধারণাতীত।

বিন্দুমাত্র সম্মান বোধ থাকলে কেউ এই অশিষ্টতা সহ্য করতে পারে না। বিজ্ঞানও পারল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল। মাফ করবেন চলি।'

কণাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'না আপনি এমনভাবে

এ অবস্থায় যেতে পারবেন না। আপনাকে সব শব্দে তবে যেতে হবে।'

বিজ্ঞান ফের সোফাটার একধারে বসে পড়ল, 'বলুন। কিছু শুনবার আগ্রহ আমার আর নেই। তবে আপনি যদি বলতে চান, বলতে পারেন।'

কণা বলল, 'আমাকে বলতেই হবে। আপনাকে অনেক রুচ কথার আজ শুনিয়েছি।'

বিজ্ঞান বলল, 'রুচ কথার বলেছেন বলেই যে জীবনের গোপন কথা শোনাতে হবে তার কোন মানে নেই। সে যদি শুনতেই হয় বরং আর একদিন শুনব। আজ আমি চলি। আপনারও তো রিহাসেলে যাবার তাড়া আছে।'

কণা বলল, 'তাড়া ছিল ঠিকই। কিন্তু দেরি যখন হয়েই গেল—'

বিজ্ঞান বলল, 'না না আমার জন্যে আপনি কাজের ক্ষতি করবেন না।'

কণা কি যেন একটু ভাবল, তারপর মন স্থির করে বলল, 'আচ্ছা চলুন আপনি না হয় আমাকে ক্লাব পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন।'

বিজ্ঞান বোরিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। কণা এ ঘরের ও ঘরের লাইটগুলি অফ করল। বাইরে এসে দরজায় তালা লাগাল। তারপর বিজ্ঞানের পাশে এসে হেসে বলল, 'চলুন।'

একটু আগের সেই রুচতা রুদ্ধতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে মধুর একটি কমনীয়তা ও মৃদু-বয়বে লক্ষ্য করল বিজ্ঞান। অভিনয়ের সবটুকুই কি অভিনয়? কিন্তু বিজ্ঞানের মন যেন এই নৈরাশ্যবাদে সাড়া দিল না।

এতক্ষণ বাদে আকাশে চাঁদের দেখা মিলেছে। যদিও খন্ড চাঁদ, এবং দুটি শব্দকনো ডালের ফ্রেমে আঁটা। তবু অপরিসর গিলির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির এই মাধুর্যটুকু উপভোগ করল বিজ্ঞান। সেই সঙ্গে পার্শ্ব-বর্তিনী সঙ্গিনীর প্রকৃতির পরিবর্তন-টুকু তার কাছে আরো উপভোগ্য মনে হল।

কণা এর আগে কখনো তাব সঙ্গে বাইরে বেরোয় নি। আজ এই প্রথম সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে। অবশ্য বেড়াতে নয় তাতে তার কাজের জায়গায় পেঁছে দিতেই শব্দ সম্মতি পেয়েছে বিজ্ঞান। তবু এই সামান্য আনন্দকল্যাণ যেন কম নয়। এব মধ্যে অনেকখানি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

একটা খালি ট্যাক্সি তাদের দেখে গতি কমিয়ে দিল। বিজ্ঞান হাতের ইস্যায় ট্যাক্সিটাকে কাছে ডাকল। তারপর কণার দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন, আপনার তো দেরি হয়ে গেছে। ট্যাক্সিতে করেই আপনাকে পেঁছে দিই।'

কণা মৃদু আপত্তি করে বলল, 'পথ তো বেশি নহ, এই পথটুকু আমরা হেঁটেই যেতে পারতাম।'

বিজ্ঞান বলল, 'কী দরকার গাড়ি যখন পাওয়াই গেল।'

কণা বলল 'আচ্ছা তা হলে চলুন।'

গাড়িতে উঠে বিজ্ঞানের পাশে বসল কণা। বিজ্ঞান নিজেই একটু দরজা রাখল।



কিয়ার্ন
লন্টন
সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস ঝাংকো

ফোন-২২-৬৫৮০

২৬৬, ৩৬৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

সং এবং ঈশ্বরের অসহায়তার গান*

বেরটের রেখট

অঙ্ক : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

মুদ্রা : ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৬

আমাদের এই দেশে
সমর্থ বোকেরও দরকার হয় কপালের জোর,
একমাত্র
শক্তিমত্ত খুঁটির জোরেই
দিতে পার তার যোগ্যতার প্রমাণ।

সম্পন্ন আজ অসহায়।
আর ঈশ্বরের নৈবশক্তি শূন্যের কোঠায়।
নচেৎ ভগবান কেন
বোমারু-বিমান
নৌ-বাহিনী
ট্যাংক
আর কিংসী সব অস্ত্র নিয়ে
নির্মম অভিযান চালিয়ে গ্রাস করেন না সংলোকদের?
তাহলে হয়তো
দুঃকৃতদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারতাম।

যা সং
চিরকাল তার সংভাবে থাকার ঘো নেই আমাদের দেশে,
বেখানে হাঁড়িতে চাল নেই, আর গৃহিণীরা নিত্য
কিমাশচর্যম্ অস্তঃপরম্,
কুধার বিরুদ্ধে সেখানে ঐশ্বরিক নির্দেশও
কড়াকড়িভাবে কাজে লাগানো হয় না!

অন্তএব ঈশ্বর কেন যে তারি সৃষ্টবস্তু সবার মধ্যে বাঁটোয়রা
করে দেন না?
কেনই বা তিনি মত'ধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রকৃতির দান
দেন না বিলিয়ে?

কেন যে তিনি আমাদের কুধা ভুজ্য নিবৃত্তির পর
সুযোগ দেন না
আমাদের পরস্পরকে বন্ধুত্ব আর নির্মল আনন্দের
মিলেমিশে থাকবার?

সাম্রাজ্যের শত শত-সৈন্য গড়ে তোলে অন্যত্র যে শক্তি
সেই কমুৎসাহিক কঠোর শক্তির প্রয়োজন হয়
দুঃপদের একমুদ্রিষ্ট অক্ষ জয় করতে।
লুটেপুটে বারো খাচ্ছে
পায়ের তলায় তাদের মাড়িয়ে দিতে না পারলে
দুঃভাগাদের সাহায্য করার অন্য পথ নেই।
সুতরাং ঈশ্বর এমন একটা সরল কানুন জারি করেন না কেন
যা করলে সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও সত্যতার জয় হবেই।
তাহলে সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে সম্বিজত করে সংকে
তিনি হুকুম করুন : কামান দাগতে!
আর দুর্বলতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে!

অনুবাদ : দুর্গাদাস সরকার

* রেখটের 'এ গুড উম্যান অব সেজুয়ান' নাটকের
শেনটের এই গানটি নাট্যকার রেখটের জন্মদিনের স্মরণে
প্রকাশ করা হোল।

একটু চুপ করে থেকে কণা বলল,
'আপনাকে যা বলতে চেয়েছিলাম তা
বলবার সুযোগ বোধ হয় আজ আর
হয়ে উঠল না।'

বিজন বলল, 'নাইবা হল। শোন-
বার ঔৎসুক্য আমার এখন আর নেই।
আমি অনেকদিন বোকার মত আপনাকে
নানা কথা জিজ্ঞেস করেছি। আপনি
প্রতিবারই এড়িয়ে গেছেন। আপনদের
কাছে গোপন করব না। মনে মনে
আমার একটু রাগই হয়েছে। আমি
ভেবেছি আপনি যেন ঠিক বন্ধুত্ব
চাইছেন না। যে বন্ধুত্ব আমি চাই
হয়তো তাতে আপনি ক্লান্ত।'

কণা বলল, 'ক্লান্ত কেন হবে?

সংসারে বন্ধুর কি এতই ছড়াছড়ি যে
বন্ধুত্ব ক্লান্ত হবে? তবে সব সময়
সব কথা বলা যায় না। নিজের কথাও
অনেক সময় ভুলে থাকতে ইচ্ছা করে।
ভাবতে ভালো লাগে আমি সম্পূর্ণ
আলাদা। আমি আমার অতীত জীব-
নের জের টেনে চলছি নে। কিন্তু
ভাবলেই তো হয় না। মানুষকে তার
জের টানতেই হয়। নিজের কম-
ফনের বোঝা বইতেই হয়।'

কেন একটা বিষাদের সুর লাগল
কণার গলায়। বিজন বলল, 'আজ ও
সব কথা থাক। আসুন আমরা বরং
অন্য কথা বলি।'

কণা তার অগেয়ে বলার জের টেনেই

বলতে লাগল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।
মানুষ ভালো নয় জেনেও আমি তবু
সংগ্রহ একেবারে ছাড়তে পারি নি।
কেন পারি নি সে কথা আপনাকে আর
একদিন বলব।'

শোভাবাজারের একটি গলির
মোড়ে এসে কণা টান্টিটা থামল।
বিজনের দিকে চেয়ে বলল, 'একটু
ভিতরেই আমাদের ক্লাব? আপনি
কি আসবেন?'

বিজন একটু বিধান্বিত হয়।
তালপত্র কৌতুহল দমন করে বলল,
'না আজ থাক।'

(কমশঃ)

গ্রীস ও রোমের

(পূর্ব-প্রকাশিত)

ঐতিহাসিক পর্ব

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে গ্রীক ও রোমক দেব-দেবীর কথা বলা ছিল। এখানে গ্রীক পূর্ববর্তের কয়েকটি গল্পের অবতারণা করব। মহাকাব্য হলে পবিচিত্র হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন, সেগুলির পুনরুৎসেধ নিম্নপ্রয়োজন। মূলত যে কাহিনী-পদ্য হোমারের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এবং হোমারের পরবর্তী যুগেও সেগুলির অস্তিত্ব কোন না কোন রূপে বর্তমান ছিল, আমরা সেগুলিই আলোচনা করব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই কাহিনীগুলিও দেবতা ও মানবকে নিয়ে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নলিখিত প্রাচীনতম রূপক।

আর্গোনিটিক

পসেইডন এবং টাইফোন পুত্র পেলিয়াস তাঁর সহ-ভাই ইসনকে সিংহাসনচ্যুত করে থেসালি অধিকার করেন। ইসন, তাঁর পুত্র জেসন বাতে পেলিয়াসের ষড়যন্ত্রে বন্দি না হয়, সেই আশংকায় জেসনকে পিলিয়ন পর্বতে চিরনের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। জেসন তাঁর কাছে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত বাস করেন। তারপর তিনি নিজের দেশে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর একপাটি জুতা হারিয়ে যায়। বাকি একপাটি পরিহিত অবস্থাতেই তিনি পেলিয়াসের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং নিজ রাজ্যের ভাগ দাবি করেন। পূর্বে একজন ভবিষ্যদ্বাণী পেলিয়াসকে জানিয়েছিলেন যে, একপাটি জুতা পরিহিত কোন ব্যক্তির কাছে থেকে তাঁর বিপর হতে পারে। চতুর পেলিয়াস তাকে বলেন, তিনি জেসনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন যদি তাকে তিনি একটি জিনিস এনে দেন। জিনিসটি হচ্ছে একটি স্বর্ণাভ ভেড়া চামড়া। মস্তশত্রুশক্তি এই চামড়াটি সমুদ্র কুম্ভসাগরের ওপারে ইয়া রাজ্যের অধীশ্বর এইটেসের নিকট রক্ষিত আছে। জিউসপত্নী হেরা প্ররোচনায় জেসন বাকী হন, কেননা হোমার জেসনকে পছন্দ করতেন এবং দুর্বৃত্ত পেলিয়াসের মৃত্যুকামনা করতেন।

পঞ্চাশটি দাঁড়িয়ে যে জাহাজটিতে, জেসনরা যাত্রা করেন তাই নাম অর্গো, যা

তাঁর নির্ভাতা অর্গোসের নামে হয়েছিল। অর্গোনার নির্দেশে এই জাহাজ নির্মিত হয় এবং জাহাজে ওক কাঠের নির্মিত একটি হেবাব মূর্তি স্থাপিত করা হয়। যাত্রা এই অভিমানে অংশগ্রহণ করছিলেন তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশ। জেসন ছিলেন প্রধান পবিচালক এবং জাহাজের হাল ধরেছিলেন টিকাইস। অন্যান্য অভিযানকারীদের মধ্যে ছিলেন হেরাক্লিস, ক্যান্টন, পলিডিস, লিডাস, লিনসিয়াস প্রভৃতি।

ইওলকোস বন্দর থেকে তাঁরা যাত্রা করেন এবং প্রথমে উপস্থিত হন লেমনস দ্বীপে। এখানে শত্রু স্কেরোবাই বাস করে। বেশ কিছুকাল এখানে কাটিয়ে জেসনের দল সামোথ্রেসে যাত্রা করে; সেখান থেকে হেলাসপন্টের মধ্য

দুর্গে পৌঁছান। জেসন সব ষড়যন্ত্র পূরণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইটেস তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং মেঘচর্ম দানে অসম্মত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইটেসের কন্যা মিডিয়া জেসনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মেঘচর্ম পাবার উপায় বলে দেন। একটি ড্রাগন সেই মেঘচর্ম রক্ষা করত, তাকে হত্যা করে জেসন মেঘচর্মের অধিকারী হন এবং মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়েই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজা এইটেস জেসনকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পাবেন নি।

ইতিমধ্যে জেসনের অনুপস্থিতিতে দুর্বৃত্ত পেলিয়াস জেসনের পিতা ও ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মিডিয়া একটি চক্রান্ত করে। পেলিয়াসের কন্যাদের সামনে সে একটি বৃদ্ধ পিতাকে বলি দিয়ে আবাব সেটিকে বৃদ্ধ করে বাঁচিয়ে দেবে। এই দেখে পেলিয়াসের কন্যাদের বৃদ্ধ পিতাকে বৃদ্ধ করার বাসনা জাগে এবং মিডিয়ার প্ররোচনায় পেলিয়াসও এই ফাঁদে পা দেয়। পেলিয়াসের কন্যারা পেলিয়াসকে হত্যা করে, কিন্তু বলাই বাহুল্য, মিডিয়া তাকে পুনরুজ্জীবিত না করেই জেসনকে নিয়ে সন্তোষ পড়ে।

মিডিয়া :

জেসন ও মিডিয়া অতঃপর বিবাহিত হন এবং করিন্থ রাজ্যে দশ বছর সখে বাস করে। কিন্তু এরপর জেসন করিন্থের রাজা ক্রেমেনের কন্যা ক্রেউসাকে বিবাহ করতে মনস্থ করে। প্রতিহিংসাপরায়ণা মিডিয়া জেসনের ওপর চব্বি প্রতিশোধ নেয়। দুটি বিবাহ পরিচ্ছদ নববধূ ও তার পিতাকে উপহাসস্বরূপ সে পাঠায় এবং সেগুলি পরিধান করে তারা উভয়েই নিহত হয়। জেসনের চোখের সামনে মিডির তার নিজের দুই পুত্রকে নিহত করে এবং তারপর একটি সপ্নবাহিত রথে এথেন্সে চলে যায়।

এথেন্সে গিয়ে মিডিয়া থিসিউসের পিতা রাজা ইডিয়াসকে বিবাহ করে এবং তাঁর গর্ভে মেডাস নামক একটি সন্তান জন্মায়। কিন্তু এথেন্স থেকেও সে পালিয়ে বাধ্য হয় কেননা

নরেন ভট্টাচার্য

দিয়ে কাইজিকাস দ্বীপে যেখানকার রাজা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে তাঁরা আবাব যাত্রা করেন, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে তাঁদের জাহাজ পুনরায় কাইজিকাসে ফিরে আসে। সেখানে জলদস্যু-ক্রমে তাঁরা পুনরায় বন্দীদের সঙ্গেই বন্দী হন এবং তাঁদের পূর্ব-আশ্রয়দানকারী রাজাকে ভ্রমবশত হত্যা করেন। মাইসিয়াতে পরীরা হাইলাসকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে হেরাক্লিস বন্দুর খোঁজে দল থেকে পৃথক হয়ে যান। বিখ্যাত ইনিয়ান উপকূলে পলিডিসিউস রাজা এমাইকাসকে মৃত্যুবৃত্তি পবাজিত করেন। প্রেসেব একটি স্থানে এই অভিযাত্রীরা ফিনেয়াস নামক একজন অশ্ব ভবিষ্যদ্বাণী সাক্ষ্য পান। এই লোকটিকে দুইটি শতাব্দী পর্যন্ত পীড়ন করত। অভিযাত্রীরা সে দুটিকে নিহত করেন। এই ফিনেয়াসের কাছ থেকে জেসন সম্মান পান দুটি ভাসমান পর্বতের, যারা কুম্ভসাগরের প্রবেশপথে দাবণ বাধার সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক হেরা কুপার সেই বাধা দূর হয়। ইতিমধ্যে অভিযাত্রীদের দুজন মারা যান। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ইয়া রাজ্যে উপস্থিত হন।

ইয়া রাজ্যের রাজা এইটেস জেসনকে স্বর্ণাভ মেঘচর্ম দানে রাজ্যী হন, কিন্তু কয়েকটি

সাপ্তাহিক বসন্তমতী

সে পিসিউসকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। তারপর সে সোজা নিজের পিতার রাজ্যে ইয়াতে চলে আসে এবং দেখে যে রাজা এইটেন তার ভাই পার্সেস কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। মিডিয়া কৌশলে পার্সেসকে হত্যা করে পিতাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

আর একটি কাহিনী অনুযায়ী মিডিয়ার পুত্র মেডাস যখন তার মাতার সম্মুখে ইয়া রাজ্যে আসে তখন রাজা পার্সেস তাকে কন্দী করে। তখন মিডিয়া তার সর্পবাহিত রথের চোপে সেখানে আসে এবং নিজেকে দেবী আর্টেমিসের পূজারিণী পরিচয় দিয়ে মেডাসকে চেরে নেন, তারপর মাতাপুত্র পার্সেসকে হত্যা করে। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী মিডিয়া নাকি ইলিসিয়ামে অ্যাকিলিসের পরী হরেছিলেন। গ্রীকরা মনে করে মিডিয়া নাকি অমর।

পার্সিউসের কাহিনী :

পার্সিউস ছিলেন জিউস ও ডানার পুত্র, আর্কিসিয়াসের দৌহিত্র। দৌহিত্র কর্তৃক প্রাপ-ম্রদের আশংকা আছে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ভীত হয়ে আর্কিসিয়াস পার্সিউস ও তার মাতাকে জলে ডাসিয়ে দেন। ডিকটিস নামক একজন মৎস্যজীবী কদমার উভয়ের প্রাণ বাঁচে এবং তারা ডিকটিসের আশ্রয়ে বাস করে। ডিকটিসের ভাই পলিডিকটিস ছিল সেই ষাঁপের রাজা। পার্সিউসের মা ডানা তখনো যুবতী ছিলেন। তাকে দেখে পলিডিকটিস মূগ্ধ হন এবং পাছে পার্সিউস থাকলে অসুবিধা হবে এই আশংকায় পলিডিকটিস পার্সিউসকে দানবী মেডুসার মূণ্ড আনতে আদেশ দেন।

মেডুসা ছিল একজন দানবী বা গর্গম, তার দুই ভগিনী ছিল স্কেনো এবং ইউরায়ল। মেডুসার চোখ বার দিকে পড়ত সে-ই পাথর হয়ে যেত। তার আর দুটি বোন ছিল এক-চকু ও একনুড়। দেবী আথেনা ও হার্মেসের সহায়তায় পার্সিউস লিবিয়ায় প্রত্যন্তদেশ গ্রাই-তে হাজির হলেন এবং মেডুসার দুই বোনকে বন্দী করলেন কেননা এদের দুর্জনকার একজনের ছিল একটি দাঁত, আর একজনকার একটি চোখ। তারপর কাছ থেকে মেডুসার লম্বান পার্সিউস জেলে নিলেন। পাছে মেডুসার দর্শনে পার্সিউস পাথর হয়ে যান, সেইজন্য হার্মেস তাকে অদৃশ্য হবার ও শূন্যপথে চলাব শক্তি দিলেন।

ওসিয়ানাস ষাঁপে মেডুসা তখন নিদ্রামগ্ন ছিল। পার্সিউস একটি ঢাল দিয়ে নিজের মূণ্ডটি ঢেকে নিলেন। তাবপর পেছন থেকে গিয়ে ভরবারি এক কোপে মেডুসার মূণ্ডটি কেটে নিজেব খলিতে পড়ে নিলেন।

তারপর পার্সিউস হীথওপিয়ায় এলেন। এখানকার রাজা ছিলেন সিসফোস। এখানে তখন মড়ক চলছিল। পুরোহিত রাজাকে

জানিয়েছিল যে, যদি রাজকন্যা অ্যাস্ট্রেমিডাকে সমুদ্রদানবের খাদ্য হতে দেওয়া যায় তবেই মড়ক নিবারণিত হবে। পার্সিউস সেই দানবের হাত থেকে অ্যাস্ট্রেমিডাকে উদ্ধার করে বিবাহ করলেন।

অতঃপর পার্সিউস স্বদেশে ফিরে এলেন এবং পলিডিকটিসের রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি খলি থেকে মেডুসার মূণ্ড বাব করলেন এবং তা দেখা মাত্র পলিডিকটিস সমস্ত সকল সভাসদ পাথর হয়ে গেল। এইভাবে পার্সিউস পলিডিকটিসকে ব্যাভিচার করার শাস্তি দিলেন।

এরপর পার্সিউস থেসালীতে গেলেন। সেখানে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছিল। পার্সিউস তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন ডিসকাস ছোড়ার প্রতিযোগিতা হচ্ছিল তখন পার্সিউসের ডিসকাসটি লক্ষ্যস্থল পেরিয়ে এক বাস্তির দেহে আঘাত করে বার ফলে লোকটি মারা যায়। কয়েক গিরে দেখা গেল লোকটি হচ্ছেন রাজা অ্যাকিসিয়াস, পার্সিউসের মাতামহ, দেবজ্ঞরা গণনা করে থাকে বলেছিল যে, তিনি দৌহিত্রের হাতে মারা যাবেন।

হেরাক্লিস :

হেরাক্লিস, যাকে রোমকগণ হারকিউলিস বলত, গ্রীসের সর্বপ্রাচীন বীরদের মধ্যে অন্যতম। হেরাক্লিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন থিবসে। তার পিতা জিউস এবং মাতা ছিলেন অ্যামফিট্রিয়নের স্ত্রী আলকমেনি। বৈদ্য হেরাক্লিস জন্মগ্রহণ করতেন সেইদিন জিউস ঘোষণা করলেন যে, পার্সিউসের বংশে সেদিন এমন একজন লোক জন্মলেন যিনি স্বাধীন শক্তিতে জগতের ওপর একাধিপত্য করবেন। চতুরা জিউসপরী হেরা স্বামীর এই কথাটিকে তাকে দিয়ে প্রভিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। তিনি ঈর্ষাকুবা হয়েছিলেন কেননা তার স্বামীর অন্য প্রণয়িনীর পুত্র জগতের সর্বাট হতে বহুত্ব। তিনি নিজে ছিলেন গর্ভস্ব সম্ভান-সমূহের অধিপত্য বৈবী। সেই অধিকারে তিনি হেরাক্লিসের জন্ম সাত দিন পেছিয়ে দিলেন এবং তার জায়গায় মাইসিনের রাণী স্কেনোলেসের গর্ভে পার্সিউসবংশীর ইউরিস্থিউসের জন্ম দিলেন। ফলে বৈদ্য হেরাক্লিস জন্মগ্রহণ করতেন সেদিন জন্মান দুর্বল ইউরিস্থিউস, জিউসের প্রভিজ্ঞাব-দ্রষ্টব্য যে হল জগতের অধীশ্বর, আর তার সাতদিন পরে জন্মলেন দুর্ভাগা হেরাক্লিস যিনি বিবেক সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, অথচ হেরার চক্রান্তে যিনি দুর্বল ইউরিস্থিউসের দাস।

হেবার ঈর্ষা কিন্তু এতটাই নির্বাণিত হয় নি। শিশু হেরাক্লিসকে হত্যা করার জন্য তিনি একটি কাসসপ প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই শিশু সাপটির মূণ্ড এত জোরে চেপে ধরে যে, তার ফলে কাসসপের জীবনান্ত হয়। ক্রস বাড়লে অ্যামফিট্রিয়ন তাকে রথচালনা

শিক্ষা দেন, অটোলিকাস শিক্ষা দেন মস্তক, ইউরিসাস শেখান ধনুর্বিদ্যা এবং ক্যাস্টর শেখান অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার। চিরন তাকে শিক্ষা দেন বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান, রাশি-মাণ্ডিস শেখান দর্শন এবং ইওমালপাস শেখান সংগীত। তাবপর তাঁকে ক্রিথেরন পাহাড়ে মেগপালনার্থে প্রেরণ করেন।

এই পাহাড়ে একটি দুর্ভিক্ষে সিংহ বাস করত থাকে কেউ হত্যা করতে পারে নি। অশ্বাদশবর্ষের হেরাক্লিস তাকে অবলীলাক্রমে বধ করেন। একদিন হেরাক্লিস নিজের বসে চিন্তা করছিলেন এমন সময় দুটি দীর্ঘদ্বী তরুণী তাঁর সামনে উপস্থিত হল, একজনের নাম আনন্দ অপবজনের নাম পুন্ডা। হেরাক্লিস পুন্ডাকেই পছন্দ করলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হেরা তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যই চক্রান্ত করছিলেন। তারই পবিণতি হিসাবে হেরাক্লিস ইউরিস্থিউসের দাস্যকর্মে নিযুক্ত হলেন। এই অবস্থায় তিনি বারটি বীরবধক কাজ করেছিলেন, বাব ফলে তিনি অমর হয়ে আছেন।

(১) নিমিয়া নামক স্থানে এক ভরাবহ সিংহ বাসকরত। তার পিতা ছিলেন টাইফন এবং মাতা এথিডনা। এই সিংহটিকে হেরাক্লিস বধ করতে আদিষ্ট হন। কোনরকম অস্ত্র ছাড়াই তিনি সিংহটিকে নিহত করেন এবং তার চামড়া দিয়ে নিজের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন।

(২) টাইফন ও এথিডনার আরও একটি সপর্পুসী সন্তান ছিল, যে অর্গাসের নিকট লেন। নামক জলাভূমিতে বাস করত। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসেই যে-কোন লোক মারা যেত। তার ছিল নরীট মূণ্ড বার একটি ছিল অমর। হেরাক্লিস একটি একটি করে তাব মূণ্ডগুলি কেটে ফেলেন, কিন্তু প্রতিটি কাটামূণ্ড থেকেই দুটি করে নতুন মূণ্ডের সৃষ্টি হয়। তখন হেরাক্লিস সেই মহাসর্প কর্তৃক নিকৃষ্ট বিষ দিয়ে নিজের তীব্রগুলি মাখিয়ে নেন এবং সেই বিষাক্ত তীব্রগুলি দিয়েই তাকে বধ করেন। এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন তার সারথি ইওলাউস। এইজন্য রাজা ইউরিস্থিউস এই বীরয়ের কৃতিত্ব থেকে হেরাক্লিসকে বঞ্চিত করেন।

(৩) আর্কাডিয়াতে একটি ভয়াল ঘন-শূকর বাস করত যে ছিল এই অঞ্চলের গ্রাসেব কবণ। রাজা ইউরিস্থিউস ওই শূকরটিকে খবে আনবার জন্য হেরাক্লিসকে আদেশ দেন। তখন হেরাক্লিস তাকে তাড়া করেন এবং ব্যবফের দেশে ছুটিয়ে নিয়ে যান। সেখানে তিনি তাকে বন্দী করেন এবং তাকে নির্বে রাজা ইউরিস্থিউসের দববাবে নিয়ে আসেন। সেই বন্যশূকরটিকে দেখে ইউরিস্থিউস এত ভয় পান যে, সোজা স্নানের চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়েন।

(৪) সেরিনিয়ার পাহাড়ে বাস করত একটি হরিণ, যার শৃঙ্গম ছিল স্বর্ণনির্মিত। এই হরিণটি দেবী আর্টেমিসের উপদেশে

পরিবারের সকলকে ফসফোমিন সবল ও সুস্থ রাখে

ফসফোমিনে আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, আর আছে মালটিপল গ্লিসারোফসফেট...ওতে আপনার পরিবারের সকলকে সবল, সুস্থ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রাখে। যার ফসফোমিন থাকলে ক্রান্তি ও অবসাদ দূর হয়। ফসফোমিনে দোহে বল জগার করে, ক্ষিধে বাড়িয়ে তোলে, দোহের প্রতিরোধক্ষমতাকে পুষ্ট করে। সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য ভাল রাখে ফসফোমিন—সবুজ ফলের আদ্যাদমুত্রে ভিটামিন টনিক।



SQUIBB A century of experience builds faith

SARABHAI CHEMICALS

নির্বোধিত ছিল। হরিণটিকে স্বীকৃত করে আনার জন্য হেরাক্লিস আদিষ্ট হলেন। পরে এক বছর ধরে হেরাক্লিস হরিণটিকে খুঁজলেন এবং শেষ পর্যন্ত হাইপারবোরিয়ানের দেশে ইক্টোরের উৎসর্গে তাকে খুঁজে পেলেন। হেরাক্লিসের ভাড়া খেয়ে হরিণটি লাডোন নদীর তীরে হাজির হল এবং সেখানে তিনি তাকে কবরী করলেন।

(৬) অর্কাডিয়ায় স্টীমফলাস হুদে এক জাতীয় নরভূক পাখি বাস করত। তাদের অস্ত্রাচারে স্থানীয় লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হেরাক্লিস এই নরভূক পাখিদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বৌশির ভাগকে মেরে ফেলেন, বাকিগুলি প্রাণ নিয়ে পাগিরে যায় কুকশাগরের এরিসিয়াস ঘাঁশে যেখানে তারা অগ্নিনির্গতদের হাতে নিহত হয়।

(৬) রাজা ইউরিস্থিউস অতঃপর হেরাক্লিসকে অর্পণ দেন যে, তার কন্যা আর্ডামিটির জন্য আরাভোজনের রাণী হিপপোলাইটার কণ্ঠহার নিয়ে আসতে। বহু দেশ ঘুরে হেরাক্লিস শেষ পর্যন্ত আরাভোজনের রাজধানী থেমিসকাইরাতে হাজির হন। রাণী হিপপোলাইটা তাকে তাঁর কণ্ঠহার দিতে রাজী হলেন। কিন্তু কুচক্রী হেরা হেরাক্লিসের জীবনে অস্ত্রশয় হয়ে ছিলেন। তিনি রীতিয়ে দিলেন যে, হেরাক্লিস রাণী হিপপোলাইটার জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন। ফলে লক্ষ লক্ষ আরাভোজন হেরাক্লিসকে আক্রমণ করে বসল। তাদের পরাজিত করে হেরাক্লিস হিপপোলাইটার কণ্ঠহার নিয়ে ফিরে চললেন। পথে ট্রয়ের নিকটে তিনি এক সমুদ্রদানবকে বধ করলেন। এই দানবের হাতে রাজা লাওমেডন নিজ কন্যাকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই রাজা দানবটিকে মারান জন্য হেরাক্লিসকে পুরুষাব দিতে চেষ্টাছিলেন কিন্তু পরে তা দিতে অস্বীকার করেন।

(৭) এলিসের রাজা অজিয়াসের একটি গোশালা ছিল যেখানে গবাদি পশু ছিল তিন হাজারেরও বেশি। তাদের পবিত্র গোবর ছিল পবিত্রপ্রমাণ এবং তা পবিত্রকার করার জন্য হেরাক্লিস আদিষ্ট হলেন। তিনি আলফিউস নদীটির মোড় ঘুরিয়ে তাকে সেই কুম্ভালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে দেন। কিন্তু অজিয়াস এর জন্য হেরাক্লিসকে প্রতিদ্বন্দ্বিত পুরুষাব দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হুঙ্কার করে হেরাক্লিস অজিয়াসকে হত্যা করেন।

(৮) ক্রীটের রাজা মিনোস দেবতা পাসেইডনকে অবস্থা করেছিলেন, কাছেই পাসেইডন একটি উন্মত্ত বৃষকে ক্রীটে পাঠিয়ে দেন সেখানকার অধিবাসীদের ক্ষতি করার জন্য। হেরাক্লিস সেই বৃষটিকে মাইসিনিতে জীবন্ত করে আনবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি বৃষটিকে বধেন এবং তার পিঠে চেপে তাকে মাইসিনিতে ছেড়ে দেন। সমগ্র পেলোপোনিস জুড়ে বৃষটি অত্যাচার করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে থিসিউস নিহত করেন।

(৯) প্রেসের ক্রিস্টোনদের অধিপতি অরোসের পুত্র ডাওমেডেসের কণ্ঠকপালি খোঁড়া ছিল। তাদের তিনি তার রাজ্যে আগন্তুক ব্যক্তিদের মাংস দিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন। ঘটনা চক্রে হেরাক্লিস সেই রাজ্যে গিয়ে হাজির হন এবং রাজা আদেশ দেন যে, হেরাক্লিসকে নিহত করে তার মাংস খেন তার খোঁড়াখের খেতে দেওয়া হয়। তখন হেরাক্লিস রাজা ডাওমেডেসকে নিহত করেন এবং তাঁর মাংস সেই খোঁড়াগুলিকে খাওয়ান এবং তারপব তাদের নিয়ে এসে রাজা ইউরিস্থিউসকে দান করেন।

(১০) জেরিওনস বাস করত পৃথিবীর সর্বপশ্চিমে ইরিথিয়া ঘাঁশে সমুদ্রসন্মুখ। তার ছিল অজস্র গো-সম্পদ। এইগুলি অধিকার করার জন্য হেরাক্লিস অভিযান করেন। তিনি ইথ্রোপ ও লিবিয়ার ভিতর দিয়ে যাত্রা করেন এবং এই দুই মহাদেশের সীমানায় নিজ নামের দুটি স্তম্ভ স্থাপন করেন। এগুলি হেরাক্লিসের স্তম্ভ নামে বিখ্যাত। শেষ পর্যন্ত তিনি সমুদ্র-সম্মুখে হাজির হন। কিন্তু সর্ব প্রবলতম ক্রিশ্ন বর্ষণ করে তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তখন হেরাক্লিস সূর্যের উল্লেখ্য পরিস্থান করেন এবং তা দেখে সূর্যসেব প্রীত হয়ে তাকে সমুদ্র পার হবার উপযোগী একটি সোনালী নৌকা দান করেন। তাতে চেপে হেরাক্লিস ইরিথিয়া ঘাঁশে আসেন এবং জেরিওনসের গো-সম্পদ নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। সংবাদ পেয়ে জেরিওনস বৃদ্ধ করতে আসে। কিন্তু হেরাক্লিস তাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর তিনি সেই গো-সম্পদ নিয়ে, আই-বেরিয়া, গল, ইটালী এবং সিসিলী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু রোন নদীর তীরে হেরার প্রারোচনার লিঙ্গীয়গণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে হেরাক্লিসের জুগের সকল তাঁর ফুরিয়ে যায়। তখন জিউস লিঙ্গীয়দের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তরবৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যা ফলে লিঙ্গীয়রা রণে ভগ্ন হয়। জাহাজ করে এথ্রিয়াটিক সাগরের মধ্য দিয়ে গ্রীসে প্রত্যাবর্তনের সময় কুচক্রী হেরা বিবাক মক্ষিকাসমূহ প্রেরণ করেন এবং তার ফলে বহু পশু মারা যায়। জাহাজ থেকে অবতরণ করার পব দৈত্য অ্যালকিওনস তাকে বাধা দেন, কিন্তু হেরাক্লিস তাকে বধ করেন।

(১১) হেসপারিডিসের একটি বাগানে জন্মাত সোনালী আপেল বা হেরাক্লিস জানতেন না। পরে সংবাদ পেয়ে তিনি সেই আপেলের সম্মুখে লিবিয়া, ইজিপ্ট ও ইথিওপিয়ায় ভেতব দিয়ে যাত্রা করেন। তারপর ককেশাস পার হয়ে (গ্রীক পুরাণকারদের জুগলেদের জ্ঞান কিছ ছিল না বলেই চলে) তিনি এথিয়ায় হাজির হন। এখানে তিনি প্রমিথিউসকে মুক্ত করেন। (পূর্ববর্তী রচনার প্রমিথিউস দ্রষ্টব্য) তারপর তিনি খুঁজে খুঁজে পৃথিবীধার বারী আটলাসকে আবিষ্কার করেন। প্রমিথিউসের মন্থনায় হেরাক্লিস অ্যাট-

লাসের পাঠান সোনালী আপেল আনার জন্য এবং তিনি আটলাসের কাছ থেকে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেন। আটলাস আপেল নিয়ে ১০ বছর সে পুনরায় আর পৃথিবীর ভার গ্রহণ করতে রাজী হয় না। ফলে হেরাক্লিস বড় বিপদে পড়েন। তখন তিনি বৃদ্ধি খাটিয়ে অ্যাটলাসকে বলেন যে, সে যেন কশকালের জন্যও পৃথিবী ধারণ করে যাতে হেরাক্লিস নিজের কথিটিকে পৃথিবী ধারণের উপযোগী করে গাছিয়ে নিতে পারেন। নির্বোধ আটলাস যে মুহূর্তে পুনরায় পৃথিবীকে হাতে নিয়েছে তৎক্ষণাৎই হেরাক্লিস তাঁর পড়লেন।

(১২) তিনি পরলোকজগৎের গ্রহরী তিনমুণ্ড কুরর সারবারাসকে নিয়ে এসেছিলেন। এব জন্য তিনি হারডেস বান এবং সেখানে থিসিউসকে মুক্ত করেন। সেখানে থেকে তিনি সাবাবাসকে নিয়ে এসেছিলেন হার্মেস এবং আথেনার ইক্ষার।

এই বারটি এডভেঞ্চারের জন্যই হেরাক্লিস বিখ্যাত, কিন্তু তার ফল তিনি ভোগ করতে পারেন নি। দেবতারাই তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন। হার্মেস তাকে লিডিয়ায় রাণী ওমফালের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করেন। তাকে স্ত্রীবেশ ধারণ করে থাকতে হয় এবং চরকার সূতা কাটতে হয়। অবশ্য তাকে এই অসম্মানজনক কাজ বেশিদিন করতে হয় নি। কেননা দৈত্যগণ কড়ক আক্রান্ত হবার ফলে দেবগণের পক্ষে হেরাক্লিসের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, এবং দেবী আথেনার নির্দেশে হেরাক্লিস দেবগণকে সাহায্য করে বৃদ্ধে জরী করালেন। এ ছাড়া তিনি ট্রয়ের লাওমেডনকে বৃদ্ধে নিহত করেন। এই বৃদ্ধে হেরা প্রজ্ঞাভাবে তাঁর বিপক্ষে গেছলেন, তবে জিউসের সহায়তার হেরাক্লিস জরী হন।

হেরাক্লিসের প্রথমা পত্নী ছিলেন মেগারা, কিন্তু তাতে তিনি নিজবন্দ্য ইওলাউসকে দাখল করেন। পরে তিনি ডিরানিয়াকে বিবাহ করেন, কিন্তু যখন ডিরানিয়া জানতে পারে যে, হেরাক্লিস আইওলা নামে অপর একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তখন সে তাকে একটি বিবাক পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দেয় যা পরিধান করে হেরাক্লিসের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জিউস তাকে স্বর্গে নিয়ে যান। কথিত আছে শেষ পর্যন্ত হেরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং নিজকন্যা হীবির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন।

অ্যাগামেমনন, ক্রাইটেমনস্ট্রা এবং ওরেষ্টেস :

অ্যাগামেমনন ছিলেন অ্যাট্রিউসের পুত্র এবং মেনেলাউসের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইলিয়াডের নায়িকা হেলেনা ছিল মেনেলাউসের পত্নী এবং তার বড় বোন ক্রাইটেমনস্ট্রা ছিল অ্যাগামেমননের পত্নী। ট্রয়নগরের রাজকুমার প্যারিস কড়ক হেলেনা অপহৃত হলে যে গ্রীকবাহিনী ট্রয়নগরে যুদ্ধ করতে গেছিল তার প্রধান সেনা-

নায়ক ছিলেন অ্যাগামেমনন। তিনি দেবী আর্টেমিসকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন এই জন্য সমুদ্রে গ্রীক জাহাজগুলির গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ঠৈববাণী হইয়াছিল যদি অ্যাগামেমনন নিজের কন্যা ইফিজেনিয়াকে দেবী আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে বলি দেন তা হলে আবার পালে বাতাস লাগবে ও জাহাজ চলেবে। অগত্যা অ্যাগামেমনন তাই করেন, কিন্তু দেবী আর্টেমিস বলির স্থান থেকে ইফিজেনিয়াকে ছুঁলে নিষে চলে যান এবং তাকে টৌরিক দেশে নিজের পুরোহিতানী করেন।

অ্যাগামেমনন যখন বিদেশে যুদ্ধকালে বাস্তু, সেই অবসরে তাঁর পত্নী ক্লাইটেমনস্ট্রা অ্যাগামেমননকেই এক জাতি প্রাতঃ এগিস্থাসের সঙ্গে ব্যাভিচারিণী হয়। ট্রয়-যুদ্ধের অবসানে অ্যাগামেমনন স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে আসেন ট্রয়ের রাজকুমারী ক্যাসান্দ্রাকে। তাঁদের সম্মানার্থে যে ভোজসভা দেওয়া হয় সেখানে এগিস্থাস করেকজন দাতক নিবৃত্ত করে অ্যাগামেমনন ও তাঁর বন্দীদের হত্যা করে। ক্লাইটেমনস্ট্রা স্বয়ং ক্যাসান্দ্রাকে হত্যা করে। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী অ্যাগামেমনন যখন স্নান করছিলেন তখন ক্লাইটেমনস্ট্রা তাঁকে একটি জলের স্রারা বন্দী করে এবং তারপর সে এবং এগিস্থাস উভয়ে মিলে লগুদাঘাতে অ্যাগামেমননকে নিহত করে।

ওরেস্টেস ছিলেন অ্যাগামেমননের কনিষ্ঠ পুত্র। এই সময় তার বয়স ছিল বার বৎসর। পাছে তার কোন বিপদ হয় এই আশংকারে তার কোন এক হিতাকাংক্ষী তাকে অ্যাগামেমননের ভ্রাতাপুত্র নিকট পাঠিয়ে দেন। যখন ওরেস্টেসের বয়স কুড়ি বছর তখন অ্যাপোলো তাঁকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ওরেস্টেস মাইসেনিতে ফিরে আসেন এবং সেখানে ক্লাইটেমনস্ট্রা ও তার প্রণয়ী এগিস্থাসকে হত্যা করেন।

এসকাল্লাস লিখেছেন যে মাতৃহত্যার পর ওরেস্টেসের মনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাংঘাতিক হয় এবং অনেকে এই জন্য ওরেস্টেসকে অভিযুক্ত করে। ফলে ওরেস্টেস গ্রীসের বিচারসভা এরিওপেগাসে বিচারার্থে উপস্থিত হন। দেবী আর্চেনী ছিলেন বিচারকদের সভানেত্রী, ওরেস্টেসের প্রধান সাক্ষী ও ঊকিল ছিলেন দেবতা অ্যাপোলো। তার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটভুক্তি সমান হয় এবং আর্চেনী তার কানিং ভোট ওরেস্টেসের স্বপক্ষে দেন।

অ্যাপোলোর উপদেশে ওরেস্টেস তাঁর বন্ধু পাইলাডেসকে নিয়ে টৌরিক দেশে যান। এইখানে তিনি তার বড় বোন ইফিজেনিয়াকে দেখতে পান। এই ইফিজেনিয়াকে বলির মন্ত থেকে দেবী আর্টেমিস নিয়ে গেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মিলন হয়। ওরেস্টেস মেনেলাওসের কন্যা হারমিওনকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম টিসমেলাস। আর্কাদিয়ায় নগরীতে ওরেস্টেসের মন্দির হয়।

ইনিয়াসের কাহিনী:

ইনিয়াস ছিলেন আনচাইসেস ও অক্সোদিতির পুত্র, ইডা পর্বতের উপর তাঁর জন্ম। ট্রয়ের রাজবংশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তিনি ট্রয়যুদ্ধের প্রথম দিকে অংশ গ্রহণ করেন নি। অ্যাকিলিস তাঁর গবাদি পশু অপহরণ করলে তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাঁর বিজ্ঞতা, শৌর্য, দানশীলতা প্রভৃতি গুণের জন্য ট্রোজানরা তাঁকে খুবই ভালবাসত। অক্সোদিতি ও অ্যাপোলো রণক্ষেত্রে তাঁর সহায় ছিলেন।

ট্রয়নগরীর ধ্বংসের পর তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে অনেক ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অনুযায়ী তিনি বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে গ্রীক সৈন্যদের হাতিয়ে দিয়ে নিজের পথ করে নেন। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী গ্রীকরা তাঁকে ট্রয় থেকে চলে যেতে দেয় কেন না তিনি শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন এবং হেলেনকে ফেরত দেবার কথা বলেছিলেন। তৃতীয় কাহিনী অনুযায়ী গ্রীকগণ ট্রয় অধিকারের ফলে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলাছিল, তারই সুযোগে দেশত্যাগ করেন। ইনিয়াস রোমে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বোমকদের বিশ্বাস যে ট্রয়যুদ্ধের পর ইনিয়াস ইটালীতে এসেই বসবাস করে-

ছিলেন এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রম্যুলাস তারই বংশধর ছিলেন।

ডাক্কিলের ইন্ড মহাকাব্য ইনিয়াসকে কেন্দ্র করে রচিত। ট্রয়ের পতনের পর যখন গ্রীকরা নগরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে সেই সময় ইনিয়াস ক্ষতস্থ আহত পিতা আনচাইসেসকে নিয়ে, এক হাতে পুত্র আসকানিয়াস অপার হাতে ন্ত্রী ক্রেউসাকে নিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের আশপাশ দিয়ে কোন গভিকে ইডা পর্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ন্ত্রী ক্রেউসা পথেই মারা যায়। একটি নৌকা নিয়ে তিনি সপরিবারে থ্রেস ও ভেলসের পথ দিয়ে ক্রীট অভিমুখে গমন করছিলেন, এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁকে বেতে হবে ইটালীতে। তখন তিনি গতিপথ বদিয়ে এপিরাসে গেলেন, সেখান থেকে সিসিলীতে হাজির হলেন যেখানে তাঁর পিতা মারা গেলেন। সিসিলী থেকে মূল ইটালী ভূমিতে বাসা করলেন, কিন্তু হেরা এমন এক কড় পাঠালেন যে তাঁর ভরণী কার্ষেজ উপকূলে এসে পড়ল।

এদিকে ক্রিউসের নির্দেশে ইনিয়াস গোপনে আফ্রিকা পরিভ্রমণ করলেন এবং সাত বছর সমুদ্রযাত্রা করে টাইবারে কূলে উপস্থিত হলেন। ল্যাটিনারের রাজা ল্যাটিনাস তাঁকে একটি নগর গড়ে নেবার সময় দিলেন এবং



বিনামূল্যে উপহার সোভিয়েত দেশ

রুশ-ভারত সৈন্যের সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা পড়ুন ও গ্রাহক হোন

তিন বৎসরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সনের একখানা সাত পৃষ্ঠার সচিত্র সুদৃশ্য রঙীন ক্যালেন্ডার ও একখানা পুস্তিকা দেওয়া হইবে।

আজই তিন বৎসরের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে পাঠান। চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকে একখানা ক্যালেন্ডার ও পুস্তিকা উপহার পাঠান হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন ৩১.৩১.৬৬ (ইংরাজী) পর্যন্ত কনসেশন হার চালু থাকিবে।

এক বছরের গ্রাহকদের ১৯৬৬ সালের একখানা ক্যালেন্ডার পাঠান হইবে।

গ্রাহক হইবার জন্য চাঁদা দিবার সময় এঞ্জেণ্টের নিকট হইতে আমাদের পরিচয়পত্র দেখিয়া লইবেন অথবা মণিঅর্ডারযোগে সোভিয়েত দেশের অফিসে পাঠাইবেন।

চাঁদার হার	এক বছর	তিন বছর
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়	ট ৫'০০	ট ১০'০০
ইংরাজী ভাষায়	ট ৬'০০	ট ১২'০০

—: নীচের ঠিকানায় মণিঅর্ডার পাঠাইবেন —:

‘সোভিয়েত দেশ’

১১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

সাপ্তাহিক বসন্ততী

নিম্ন কন্যা লালিত্যের সপ্নে তার বিবাহ ছিলেন। একেই বংশেই প্রেমের প্রতিষ্ঠাতা হুয়াসের জন্ম।

ইডিপাসের কাহিনী

ইডিপাস ছিলেন ক্রান্তমাস বংশীয় লাইয়াসের পুত্র। তার করুণ কাহিনী অতি প্রাচীন। হোমারের অডিস মহাকাব্যে এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ছাড়া ইডিপাসের কাহিনী নিয়ে সিনেথন ইডিপোডিয়া নামে এক আখ্যান রচনা করেন। ইডিপাসকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করেছেন নাট্যকার এসকাইলাস ও সফোক্লস।

আগেই বলেছি ইডিপাসের পিতা ছিলেন লাইয়াস। তার মা আইওকাস্টি ছিলেন মেনোনিয়াসের কন্যা। লাইয়াস অ্যাপোলোর দৈববাণীতে শুনছিলেন যে, তার পুত্র তাকে হত্যা করবে। এই আশংকার তিনি শিশু ইডিপাসকে হত্যা করার আদেশ দেন। যার উপর এই আদেশ দেওয়া হয় সে মারাগরবশ হয়ে শিশুটিকে রক্ষা করে। সে শিশু ইডিপাসকে করিন্থ নিয়ে যায় এবং পলিবাস নামক এক কৃষির নিকট তাকে সর্পণ করে। এই পলিবাস ছিলেন পুত্রহীন। তিনি ও তার স্ত্রী অতি যত্নে ইডিপাসকে লালন পালন করেন।

ইডিপাস যখন যুবক হলেন, তখন তিনি যুদ্ধে পরলেন পলিবাস ও তার পত্নী তার অসল পিতামাতা নন। তখন তিনি তার প্রকৃত পিতামাতার খোঁজ পেতে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় গ্রীসে ডেলফি নামক স্থানে দৈববাণী করা হত। সেখান থেকে ভবিষ্যৎ জ্ঞানবার প্রেক্ষার ইডিপাস সেখানে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি যা দৈববাণী শুনলেন তা বড় মারাত্মক : তিনি তার পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করবেন।

ইডিপাসের মাথায় বেন বঙ্কপাত হল। তিনি ভাবলেন যে তার পালক পিতামাতা সম্বন্ধেই বদ্বি এই ভবিষ্যদ্বাণী। কালবিলম্ব না করে তিনি করিন্থ পরিত্যাগ করলেন। তিনি দ্রুত থীবিস অভিমুখে যাত্রা করলেন। থীবিসের রাজা লাইয়াস তার আসল পিতা। সেই সময় লাইয়াস ডেলফির মন্দির অভিমুখে আসছিলেন। তার ও তার রাজ্যের ভবিষ্যৎ জ্ঞানবার বাসনায়, কেন না থীবিস সিন্থসে কতৃক অধিকৃত হয়েছিল। রাজা লাইয়াস ইডিপাসকে পথ ছেড়ে সরে যাবার আদেশ দিলেন, ইডিপাস সেই আদেশ পালন করতে রাজী হলেন না। উভয়ের মধ্যে বচসা হল, এবং পরিশেষে যুদ্ধ হয়ে ইডিপাস তরবারের আঘাতে লাইয়াসকে হত্যা করলেন। অজান্তে তার পিতৃহত্যা হয়ে গেল।

অতঃপর ইডিপাস থীবিসে হাজির হলেন। সেখানে সিন্থসে ব্রীতিমত অত্যাচার করছিল। সে বলেছিল যে যদি কেউ তার তিনটি ধার

জবাব দিতে পারে তাহলে তার অত্যাচার বন্ধ করবে। ইডিপাস তার ধারণাগুলি জবাব দিলেন। প্রতিপ্রতিভিত সিন্থস তার অত্যাচার বন্ধ করল। সকলে ইডিপাসের জয়ধ্বনি করতে লাগল। রাজ্যের অভিব্যক্তি চিরন মৃত লাইয়াসের বিবাহ পত্নী আইওকাস্টির সঙ্গে ইডিপাসের বিবাহ দিলেন। এবং ইডিপাসকে থীবিসের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এইভাবে না জেনে ইডিপাস তার নিজের জননীকেই বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে আইওকাস্টির চারটি সন্তান জন্মাল।

কয়েক বছর পরে থীবিসে অনাবৃষ্টি ও শস্যহীনতা দেখা গেল। দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললেন যে, মৃত রাজা লাইয়াসের আত্মা তার হত্যাকারীর নির্বাসনদণ্ড প্রার্থনা করছে, তাই এই অনাবৃষ্টি। ইডিপাস তখন মৃত রাজা লাইয়াসের হত্যাকাব্যকে খুঁজে বার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং বহু অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি সিন্থস তার পিতার হত্যাকারী।

এই সংবাদ জানা গেলে রাণী আইওকাস্টি লজ্জা এবং দুঃখে আত্মহত্যা করলেন। আর ইডিপাস প্রারম্ভিক স্বরূপ নিজের দুটি চকু উৎপাটন করে নির্বাসনে যাত্রা করলেন এমন একটি অপরাধের দারিদ্র্য নিয়ে যার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দারী ছিলেন না।

ইডিপাসের অভিযান

ইডিপাসের কাহিনী প্রকাশিত হয়ে গেলে তার দুই পুত্র এটিওক্লস ও পলিনিকেস তার উদ্ভব অকথা অত্যাচার করেছিল। ফলে নির্বাসনে যাবার আগে ইডিপাস তার দুই পুত্রকে অভিযান দিয়ে গেছিলেন যে, তারা উভয়েই পক্ষপাতি মারামারি করে নিহত হবে। পিতার অভিযান সত্য হবে এই আশংকায় তারা দুজনে ইডিপাস বেঁচে থাকতেই থীবিস যাত্রা ভাঙ্গাভাগি করে নেয়। পলিনিকেস থীবিস পরিত্যাগ করে এবং অর্গোস রাজ্যে গিয়ে রাজা অ্যাড্রাস্টাসের কন্যা অরাজিয়াকে বিবাহ করে। তারপর ইডিপাসের মৃত্যু হলে তাকে তার বড় ভাই ডেকে পাঠান এবং রাজ্য ও সম্পত্তি ভাগাভাগি করা বলে। ভাগাভাগি হিসাবটা পলিনিকেসের পছন্দ হয় না—ফলে সে স্বদেশে অ্যাড্রাস্টাসের সাহায্যে বড় ভাই এটিওক্লসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আর একটি কাহিনী অনুযায়ী, ইডিপাসের মৃত্যুর পর স্থির হয় যে, এক বছর এটিওক্লস এবং আর এক বছর পলিনিকেস, এইভাবে তারা উভয়েই রাজ্যভোগ করবে। পলিনিকেস প্রথম বছর বাইবে চলে যায় এবং নির্দিষ্ট ঠান্ডা অশ্রু রাজ্য হতে চার, কিন্তু এটিওক্লস প্রতিপ্রতি রক্ষা করে না, কাজেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

এই যুদ্ধ থীবিসের বিরুদ্ধে সাতজন

বংশীয় যুদ্ধে। এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন পলিনিকেসের স্বদেশে অ্যাড্রাস্টাস। এ ছাড়া ছিলেন তার অপর ছাত্রা টাইডেউস, তার দুই ভাই হিপপোমেডন ও পার্থেনোপাস, দৈত্য কাপানিউস এবং অ্যামফিরাউস। কিন্তু কিছুতেই তারা থীবিস দখল করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় এটিওক্লস ও পলিনিকেস পরস্পর স্বদেশে অবতীর্ণ হবে, যে জয়লাভ করবে সেই অঞ্চল থীবিসের রাজ্য হবে। এই স্বদেশে দুই ভাই-ই নিহত হয়। ইডিপাসের অভিযান এভাবেই কলেছিল।

লীয়াডার ও হীরো

সবশেষে একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী শুনিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে উপস্থাপন টানব। গ্রীসের পটভূমিকায় কাহিনীটি অভিনব বলেই আমি তার উল্লেখ করছি। এই কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি ছোট মহাকাব্য কবি হুসেরাস রচনা করেছিলেন। লীয়াডার ছিল একজন যুবক যে বাস করত হেলাসপন্টে। সে হীরো নামক একটি সৈরীর প্রেমে পড়েছিল। হীরো বাস করত লেসবসে একটি নির্জন টাওয়ারের উপর। সেখান থেকে সে প্রত্যহু আলোর সংকেত দিত এবং লীয়াডার সাতের সময় পর হয়ে তার সংগে মিলিত হত। একদিন ঝড়ের রাতে লীয়াডার আলোর সংকেত দেখতে পারনি। ফলে দীর্ঘদ্রষ্ট হতে সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে সে নিহত হয়। পরদিন প্রভাতে হীরো দেখে যে লীয়াডার মৃতদেহ সমুদ্রের উপকূলে তার টাওয়ারের নীচে তরঙ্গবাহিত হবে পড়ে রয়েছে। তা দেখে তৎক্ষণেই সে টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করে। গ্রীক-রোমের কথা ও কাহিনী নিয়ে অনেক বই-ই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ছোট বিবরণটি কোথাও স্থান পায় নি। এই কারণেই আমি এই কাহিনীটির উল্লেখ করলাম।

ঐয় যুদ্ধ ও অডিসিউসের এডভেঞ্চার সমূহের কাহিনীর সঙ্গে অনেকের পরিচিত বলে সেগুলির বর্ণনা থেকে বিরত হচ্ছি। পার্সিউস ও হারিকউলসের কাহিনীও বহু পরিচিত, ইডিপাসের ক্ষেত্রেও সেই কথা খাটে। আগেই বলেছি গ্রীস ও রোমের কথা ও কাহিনীর ক্ষেত্র অতীত বিস্তৃত। সেই কারণে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক কাহিনী এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এগুলি পাঠ করে যদি কেউ আগ্রহী হন তাহলে তারা অপরাপর গ্রীক ও রোমক কাহিনী পড়ে দেখতে পারেন। এ বিষয়ে সুলিখিত গ্রন্থের অভাব নেই।

হৃদয়ের আভিযাত্রা

আমাদের হৃদয়ের রীতি-নীতি খুবই মজার,—একথা আমার এক ইটালিয়ান বন্ধু একদিন আমাকে বলেছিলেন,—হ্যাঁ, এটা খুবই আশ্চর্যের, আর এর ঠিক উল্টো দিকটা হচ্ছে বিচারবুদ্ধির। ওখানে কিন্তু কোন বিচার-বিবেচনার কারবার নেই। হৃদয়ের লাজকে কোন ওজন করা বিচার নেই। আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারের কোন হাদিস পান নি। বিনি হৃদয়ের ভেতর বেশ গোছগছ ব্যবস্থা খুঁজছেন তিনি আজও তার গ্র্যান্ডফাদারকে পান নি।

অসলে মানুষের মনটা হচ্ছে একটা গোছগছ। তার মনে অনুভূতির জগৎটা বিরাট অথচ গভীর। অন্তর জগৎ পুরোপুরি একজন মালিকের রাজ্য। হবেকরকম ভাব সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। জগৎটা মালিককে পর্যন্ত ছাপিয়ে যায়। আমার ভুল হতে পারে। তবে বাইরের জগতে সাদা-কালো, ভালো-মন্দ, কুৎসিত-সুন্দর সব রকম জিনিস ছড়িয়ে আছে। শুধু মনে এগুলো সবই রয়েছে একসঙ্গে, এক জায়গায়। তাহলে কি আমাদের মনটা বাইরের পৃথিবীর মতন নয়? এখানেও তো ভাঙা-গড়ার খেলা চলেছে। তাই বলতে হয়, মানুষের মন ই সব। খুলে বলতে গেলে ব্যাপারটা হল এই—এটা আমি আজ বলছি একটা বিশেষ কারণে। কিছুদিন আগে শুনোঁছলাম ঘটনাটা, আজও আমার মাথার ভেতর ব্যাপারটা ঘুরছে। তবু এর মানেটা দুই আর দুয়ে চারের মত কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু গভীর মনের অনুভূতি দিয়ে আমি বোধহয় ঠিকই বুঝেছি।

যাক, আসল গল্পটা বলি। আমাদের বাড়িতে মা ছিলেন। আর ছিল একজন আয়া। আমরা সবাই তার কাছেই মানুষ হয়েছি। আমাদের সেই আয়ার বয়স প্রায় ষাট। সে অবশ্য এখন আর আমাদের বাড়িতে কাজ করে না। কিন্তু এখনও মায়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। দুজনের ভেতর বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। দুজনেই দুজনকে বোঝে।

বলতে ভুলে গিয়েছি, আমাদের আয়ার নাম মেরী। তার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি গত সর্বনাশা যুদ্ধে মারা গেছে। তেইশ বছরের একমাত্র ছেলেটি চলে গেল, পড়ে রইলো শুধু সে নিজে আর তার স্ত্রী। যুদ্ধ শেষ হবার এক বছর পরে সৈন্যদের মৃতদেহগুলো নিয়ে আসা হল। পরম মর্ষাদায় সেগুলোকে সমাহিত করা হল দেশের সমাধিক্ষেত্রে।

মেরীর একটি আদরের ছেলে চলে গেছে। সমাধিক্ষেত্রের পূর্বদিকে একটুকরো পাথরের নিচে একটি কালো কাঠের ক্রশ চিহ্নের ওপর “২৪” এই সংখ্যাটি লেখা। কোন আলাদা সমাধি নয়, কোন নাম নয়। শুধু তার ছেলে, সংখ্যা ২৪। তার মনে পড়তে লাগলো ছেলের কথা। সে এইটুকু নিয়েই বেঁচে থাকলো। সন্তাহে একদিন সে সমাধিস্থলে যেত। আর সারা সন্তাহ ধরে পরসা জোগাড় করতো ফুল ও মোমবাতি সমাধির ওপর দেবার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বাস থাকতো বিষম যত্নে, কথা বলতো শেন ছেলের সঙ্গেই, তারপর নিঃশব্দ হয়ে যেত। মনে হতো কত কথা! সেই ছেলে যেন জীবন ফিরে পেয়ে মায়ের কোলের কাছে খেলা করছে। মায়ের চোখের সামনে পড়া তীর করছে। আর বিকেলে কাজ করছে।

সন্ধ্যা হলে মেরী অনেকটা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে আসতো। সন্ধ্যার বাতি জ্বালতো। সন্তাহের অন্যান্যদিনগুলো যেন তার স্বপ্নের মাঝখান দিয়ে কেটে যেতো। এমনি করে তিনটে বছর চলে গেল। গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোনদিনই বাদ গেল না।

গল্প থামিয়ে দুজনে আবার কথা আরম্ভ করলো। তোমাদের মায়ের ভাগ্য কিন্তু তুলনায় ভালো বলতে হবে। কারণ তাঁদের ছেলের নির্দিষ্ট সমাধি আছে। কিন্তু আমাদের মায়েরা তাও পান না। আমাদের ছেলেরা দলে দলে প্রাণ দিয়েছে। নির্দয় হত্যাকারীর হাতের শিকার হয়েছে। এই পর্যন্ত বলে বন্ধুটি থামলো।

—আমার কিন্তু মনে হয় তোমাদের

মায়ের ভাগ্যই বেশি ভাংছে। তোমাদের শত্রুদের এক ধরণের নিঃশব্দ দূরদর্শিতা না ছেলে দুজনের কাঁধেই ছাড়ে নি। তাই দুজনে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে আছে। কি, ঠিক বলি নি?

—হ্যাঁ, তা ঠিক.....

—কিন্তু এতে কী শত্রু বেড়ে যাবে বন্ধু। তার চেয়ে আবার আমি গল্পটাই বলি।

একদিন সমাধিস্থলের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একজন মেরীকে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনার ছেলের সমাধি ঐ বাঁ দিকের ২৪ নম্বর। সমাধির মতন একটা জায়গা, দেখিয়ে দিলেন এক টুকরো পাথর। আর একটা কালো ক্রশ...। এই ব্যাপারে মেরী যে কতটা দুঃখ পেলে মুখে বলা যায় না। রেগেও গেল। তার মনে হল যেন এইবার, এই স্বিতীয়বারই সত্যিকার তার ছেলেকে হারালো। দুঃখে, আশা-ভগ্নে সে কাঁদতে লাগলো। কে দে চলে দিনের পর দিন। আমার মা জানতে পেরে সেখানে গেলেন। মেরীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেন সময়ে তাকে একলা থাকতে দিতেন না। তাকে দেখে আমার খুবই কষ্ট হত। খুব রাগও হল।

—মেরী, তুমি অমন মন খারাপ করে থাকো কেন? তাকে সান্ধ্বনা দেবার জন্য বললাম।—তোমার ছেলে তো আজ যায় নি। ছ'সাত বছর হয়ে গেছে। অনেক তো কাঁদলে। এবারে একটু শান্ত হও। তাছাড়া, দুঃখিনী মা তুমি তো একলা নও। লক্ষ লক্ষ মা তোমার মতো রয়েছেন।

—না, না, তুমি বুঝবে না। তিন তিনটে বছর ছেলেটি আমার একা পড়েছিল। তার সমাধির ওপর দিয়ে বসন্ত চলে গেছে। শরৎ ঝরা-পাতা ফেলেছে। আর তার মা কিনা এই দীর্ঘ সময় আর একজনকে ভালবাসছিলো। আর একজনকে যত্ন করছিলো। আর একজনের জন্য তার মন কাঁদছিলো। ও কি সাংঘাতিক মাতনা!—বলতে বলতে টপ টপ করে মেরীর চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

লোভ-পাপ-মৃত্যু

শ্রীঅমিয়কুমার হাটি

লোভ মানুষকে নীচু করে,
আমরা অনেক নীচে নেমেছি
কিন্তু আর নীচে নামতে রাজী নই—
এ লোভে আমরা রইব না।

পাপ গুমরে গুমরে মরে,
অনেক রাত গুমরে কেঁদেছি;
কতকাল এরকম কাঁদব?
—এ পাপ আমরা বইব না।

মৃত্যু ডাকছে শীতল স্বরে,
ভীরুর মরণটাকে জেনেছি;
এই অন্ধকার সান্নিধ্য হ'ল কই?
এ মৃত্যু আমরা সইব না।

লোভ-পাপ-মৃত্যুকে জয় করব।
পাপ-মৃত্যুকে জয় করব॥
মৃত্যুকে জয় করব॥

ফুল থেকে তারা

গণপতি বঙ্গোপাধ্যায়

সে কি চলে গেল।

এই তো সেদিন এল; কিছ্র আগে এখানে সে
ছিল মাটির ঘাসের মধ্যে চেনা ঘাস
সবুজ পাতার ভিড়ে পরিচিত পাতা
এ-মাটির বৃন্ত-বন্দী ফুল।

ফুল বারে পড়ে।
কখনো কি চলে যার একেবারে,
কখনো কি মরে যায় মাটির আনন্দ?

অনন্ত বিদায় নয় বরা আর মরা,
সবুজে সুনীলে তার নিত্য আনাগোনা।

অসীমের টানে ফুল করে,
তারা হয়ে জ্বলে ওঠে রাতের আকাশে
প্রভাতে সে-তারা হয় ফুল।

এটা কি একই কথা নয়, মেরী?
হতেও পারে যে সে তোমারই ছেলে।
একবার ভালো করে ভেবে দেখ।
ব্যাপারটা একই—টান্ডা মাথায় আমি
তাকে বোকাতে লাগলাম;—তোমার
ছেলে কি এখন কিছ্র অনুভব করতে
পারে? এটা কি ঠিক নয় যে তোমার
ছেলে এখন...আমি বলতে চেয়েছিলাম,
তার এখন কিছ্রই নেই; কিন্তু আমি
কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

না; না—মেরী! আমাকে ধামিয়ে
দি। সে বুদ্ধিতে পেরেছিল যে আমি
নির্মম একটা কিছ্র বলতে যাচ্ছি।
কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য কিছ্র সে শুনতে
চায় নি।—না, না, দুটো এক জিনিস
নয়। কারো আমার ছেলে। কিন্তু
স্বপ্ন জন্ম আমি কেঁদেছি তার নামটাও
...নি না। এমন কি, তার মৃত্যু পর্যন্ত
দাঁখ নি কখনও। আমি কী ভাববো?
এটা কি একই, যে আমি একজন
অপরিচিত লোকের সমাধিকে যত্ন করে
মন করবো যে আমার নিজের ছেলেকেই
আদর করলাম? ওঃ, আমি কি মূর্খ!
কি মূর্খ.....

তবুও আমি তাকে অনেক করে
বোকাতে লাগলাম। বিচারবুদ্ধি দিয়ে
বিবেচনা করতে বললাম—বোকালাম যে
জিনিসটা একই। অন্যকে ভালবেসে
মেরী তার ছেলেকেই ভালবেসেছে।
কিন্তু যতই সে চিন্তা করছে, ততই

আমাকে বোকাতে চাইছে যে, আমারই
ফুল। আমি ব্যাপারটাও বুঝছি না,
মেরীর মনোভাবও কিছ্র বুঝতে পারছি
না। আবার মেরীও আমার কথা কিছ্রই
বুঝছে না। মোট কথা, আমরা দুজনে
দুজনকে কিছ্রই বুঝতে পারলাম না।
কেমন করেই বা বোঝা যাবে? মেরীর
হিসেবটা বাইরের জগতের ওপর ভর
করে আছে। আর আমার বুদ্ধি শাস্বত
সত্তাকে ঘিরে—তার ছেলে ফুরিয়ে যায়
নি। যদিও সে মাটির নিচে শূন্যে আছে,
তবু সে কান পেতে আছে মায়ের পায়ের
শব্দ শোনার জন্য, আসতে চাইছে মায়ের
কাছে। অথচ মা তাকে ভুলে বসে
আছে, তাকে ভুলে গেছে, কি আশ্চর্য!
...তাই এ কি হতে পারে যে তার ছেলে
এখন নেই একথা সে বুঝবে?...
কিছ্রতেই না। এ বিশ্বাস করা তার
পক্ষে অসম্ভব। হুমি তো জানো,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ চট্ কবে কিছ্রই
বিশ্বাস করতে পারে না। হৃদয়ের দাবি
ছাপিয়ে মনে কোন বিশ্বাস দানা বাঁধে
না।

তারপর একদিন মেরী নিজের বাড়ি
ফিরে গেল—তেমনি অশান্ত মন নিয়ে...

এই অবধি বলে ইটালিয়ান বন্ধুটি
হঠাৎ থেমে গেল। চপচাপ একটা
সিগারেট ধরিয়ে অনর্গল টানতে
লাগলো। কৌতুহলে আমি তখন ফেটে

পড়াছি। থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা
করলাম,

—তারপর? তারপর? বোচানার কি
হলো? হয়ত মন তার শান্ত হয়েছিল
আর ছেলের সমাধিতে যাওয়াও শূন্য
করেছিল। নিশ্চয়ই তাই.....

—কিন্তু আমি এবার শেষ করছি;
বন্ধুটি বললো। তোমার কথা বুদ্ধির
দিক দিয়ে ঠিক। তবে কিছ্রদিন মেরী
সমাধিতে যাওয়া বন্ধ করেছিল। কারণ
কেমন করে সে ছেলের কাছে মৃত্যু
দেখাবে? এখন আবার যেতে শূন্য
করেছে। শূন্য, এখন সে দুটো সমাধিই
ফুল দিয়ে সাজান। দুটো বেদীর
ওপরেই মোমবাতি জ্বলছে দেয়। দু'
জায়গার পাথরকেই সে আদর করে।
মেরী বলে, “এখন আমার দুটি ছেলে।
কারো আর সে। তাকেও আমি নিজের
ছেলে করে নিয়েছি, তাকেও আমি
আমার মৃত্যুর কথা বলেছি। সেও
আমাকে নিজের মায়ের মতই ভালো
বেসেছে, আমাব কথা শুনছে, আমার
সঙ্গে কেঁদেছে। এখন তাকে আমি
কেমন করে আবার মাত্হারা হতে
দেবো? মাটির নিচে রয়েছে আমার
দুটি ছেলে—দুটি আদরের ছেলে...”

মায়ের মন, হায় রে মায়ের মন...
(ফুল আরমেনিয়ান থেকে অনুবাদ)

অনুবাদ : রফা গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শন



শিল্পে সংকট

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিল-গুদামে প্রায় চার কোটি টাকা মূল্যের কাপড় অবিক্রিত অবস্থায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে বলে এক সংবাদে প্রকাশ। মিল মালিকগণ বেকারদার পড়ে এখন দু-চোখে সর্বপ পদ্প দেখতে শুরু করেছেন। তাঁরা নাকি অন্তিম অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রের সরকারী বাদ্য প্রমমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সংবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

বলা বাহুল্য, তাঁদের উদ্বেগ প্রকৃত-পক্ষে যতদূর, সাধারণ শ্রমিকদের তার লক্ষ্যগুণ বেশি। জানা গেছে, বস্ত্র-শিল্পে এই সংকটের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের পরিশ্রমীট মিলের মধ্যে পাঁচটি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, আটটি নিজে আংশিকভাবে কাজ চলেছে। ফলত ইতিমধ্যেই শ্রমিক ছাটাই-এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে হাজার খানেক। অর্থাৎ তাঁদের পরিবার পিছু গড়পড়তা পাঁচটি 'পেট' ধরলে, বস্ত্রশিল্পের সংকট সার-সারি আঘাত হানছে হাজার পাঁচেক নিম্নীহ মানুষের ওপর।

মাল জমে ওঠার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, চাল ও অন্যান্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিই বস্ত্রশিল্প সংকটের অন্যতম কারণ। বেশ ভারী মুদ্রি সন্দেহ নেই। তবে সংবাদে কিন্তু একটি তথ্য অনুল্লিখিত আছে: প্রকৃত-পক্ষে কাপড়ের পাহাড় জমে যাওয়ার কারণ কি এও নয় যে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য এ-সময় বাজারে কাপড়ের চাহিদা অনুপাতে যোগান নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যবৃদ্ধির নেশা উৎপাদককে ভবিষ্যৎ সংকট সম্পর্কে অন্ধ রেখেছিল, যার অনিবার্য ফলস্বরূপও কাপড় আজ স্তূপীকৃত হয়েছে? এও কি অন্যতম কারণ নয়?

মানুষের ঈর্ষাক্রমতাকে যতদূর পর্যন্ত নেওড়ানো যায়, সরকারে ব্যবসা-লারে ততদূরই নিঙড়ে নিরেছেন এবং নিচ্ছেন। মুদ্রিস্থের একপ্রণী, শারী

ইংরেজ-ভারতই হ'ক আর স্বাধীন ভারতই হ'ক, চিরকালই অপরের পরি-শ্রমের সমগ্র ফসল নিজেরা ভোগ করেন, তাঁরা অবশ্য বহাল তবিরতই আছেন। তাঁদের কাঁচা টাকায় কিন্তু ব্যবসায়ীর মুনাকা ওঠে না। এ মুনাকার জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের শোণিতবিন্দু দান করে থাকেন। শোণিত শোষণ মুনাকা শিকারী অর্থনীতিতে অনিবার্যভাবেই এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যখন শোষণের জন্য সাধারণের কাছ থেকে আর বিন্দু প্রমাণও লভ্য থাকে না। এই সময় শোষণবাদী অর্থনীতির দৃষ্ট চক্র বাজারে অনিবার্য মন্দার সম্মুখীন হয়। ফলে ছাটাই, উদ্ভ্রষ্ট পণ্যের অপচয় ও বাণিজ্য মন্দা দেখা দেয়।

বস্ত্রশিল্পে তারই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। উৎপন্ন দ্রব্য ধরে রেখে বাজারে দান বাড়ানোর চালাকি-জনিত এই অনিবার্য বিপর্যয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে অবশ্যম্ভাবী তাও সাধারণ নিয়ম। এবং সে নিয়মে অর্থনৈতিক সংকট আমাদের দিকে লম্বা পায়ে এগিয়ে আসছে। মুদ্রাস্ফীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ব্যাধি শীঘ্রই অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমান ব্যাপ্তি লাভ করলেও নিরুপায়ভাবে তাও আমাদের দেখতে হবে।

কিন্তু এ চার কোটি টাকার কাপড় দাম নামিয়ে কেনাদিনই সাধারণের হাতে আসবে না। গুদামে পচবে। আর ছাটাই শ্রমিকের গৃহে পচবে অভুক্ত পরিবার বর্গ।

প্রমমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং বসিয়ে এ সমস্যার কোন সমাধানে উপনীত হওয়া যাবে কিনা জানি না; রক্তে বিষ থাকলে, গায়ে বিষফোড়া মারার মলম লাগিয়ে কি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব।

বেবি ফুড

সম্প্রতি খাদ্য দপ্তর একটি বিশেষ অভিনবদানযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে এক সংবাদে প্রকাশ। যথাশীঘ্র বেবি ফুড রেশনিং-এর প্রাথমিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা খাদ্য দপ্তর যে জনমতকে মর্যাদা দান করবেন এবং সমাজের একটি অতি আবশ্যিকীয় কতব্য পালন করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে 'বঙ্গদর্শন' মাঝফৎ আমরা বেবি ফুড রেশনিং-এর প্রস্তাব এনেছিলাম। আমাদের বস্তব্য ছিল, কেবলমাত্র রেশন করলেই হবে না, এ ব্যাপারে আরও একটু র‍্যাশনাল হতে হবে। অর্থাৎ শব্দ আবেদনপত্র দেবে দেদার রেশন কার্ড বিলি হলে কালো বাজারেও সম্ভাবনা লুপ্ত হবে না। প্রত্যেকটি কার্ডের জন্য শিশুর জন্ম সম্পর্কে পরিচয় জ্ঞাপক পত্র বা সার্টিফিকেট দাখিল করা হলে তবেই একটি সার্টিফিকেটের বলে একটি কার্ডের মালিক হবেন কেতা। একমাত্র এই উপায়েই প্রকৃত প্রয়োজন মিটানো যেতে পারে।

সংবাদে বিস্তৃত তথ্যের সংক্ষেপ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। যতটুকু জানা যাচ্ছে তা হল, রেজিস্টার্ড শিশুদের জন্য ডীলার মারফৎ সহজসা মহল্লায় বেবি ফুড যোগান দেওয়ার মনস্ক করেছেন। রেজিস্টার্ড বলতে এখানে কি বলা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, যদি 'যার্থ' রেজিস্ট্রেশন-ই শিশুর রেজিস্টার্ড বলে চিহ্নিত করে তবে সর্বৈব ভাল। অন্যথা অন্যত্র কোন রেজিস্ট্রেশনে কারচুপির স্বার্থে সম্ভাবনা আছে বলে স্থির প্রত্যয় বারি। এ সমস্তই পূর্বে অভিজ্ঞতা এবং আপামর জনসাধারণের কাছে আলো পরীক্ষিত সত্য। ইতিপূর্বে ভূয়া বেশন কার্ড ধরার জন্য রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে, কিন্তু তার ফলেও যে ভূয়া কার্ড স্বার্থে পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি তা বলাই বাহুল্য। বেবি ফুডের ক্ষেত্রেও যদি একই পদ্ধতিতে রেশন কার্ড বিলি করা হয় তবে ভূয়া কার্ডের অস্তিত্বই কালোবাজারের নৃ-জন্ম দান করবে।

খাদ্য দপ্তরের প্রচেষ্টা যাতে হাস্য-
কর পরিণতি লাভ না করে। এজন্য
আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জন্ম
সম্পর্কিত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে
বেবি ফুডের রেশন কার্ড সরবরাহ
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনুরোধ
করি।

এ ব্যবস্থা চালু হলে অন্যতর
আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়
আপনা আপনি সন্ধান করি আসবে।

এদেশে শিশুজন্মের সঙ্গে গসঙ্গে
জন্ম রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব বহু নাগ-
রিকই পালন করেন না। অবহেলা
বশে বহু শিশুজন্মের হিসাবই হিসাব-
বাহির্ভূত থেকে যায়। বেবি ফুড
রেশন দপ্তরে থেকেই উপরোক্ত ব্যবস্থার
ফলে জন্মহারের একটি প্রামাণ্য পরি-
সংখ্যান অনারাসে রচিত হতে পারে।
অবশ্য তারই ওপর পুরোপুরি নির্ভর
করাও অযৌক্তিক। কারণ দরিদ্র শ্রেণীর
মধ্যে বেবি ফুড ব্যবহারের রেওয়াজ
নেই। রেওয়াজ নেই কারণ বেবি
ফুডের বিলাসিতা তাঁদের স্বল্প আয়ে
সম্ভব নয়। এ সমস্ত পরিবারের
শিশুজন্ম হয় বেবি ফুড রেশনের
পরিসংখ্যান আওতার বাইরে থেকে
যাবে। তদ্রূপ সমাজের একটি উল্লেখ্য
অংশের জন্মহার বেবি ফুড রেশনের
তালিকায় নিভুলভাবে ধরা পড়বে যদি-
জন্মবিষয়ক সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে
বেবি ফুড রেশন কার্ড বিলির ব্যবস্থা
গৃহীত হয়।

আরও একটি খবরে আশ্বস্ত
হওয়ার কারণ আছে।

বেবি ফুড প্রস্তুতকারকগণ বেবি
ফুডের মূল্যবান্থির কোনো প্রস্তাব
রাখেন নি। সুতরাং রেশন করেই
সরকারও বেবি ফুডের মূল্য বৃদ্ধি
করবেন না, এমন আশা, এমন কি
দাবিও সাধারণ রাখতে পারেন।

তবু আশঙ্কা জয়গে এই কারণেই
যে, আমূল বেবি ফুডের মূল্য বেশ
কিছুটা অধিবেশের সঙ্গে গত জানুয়ারী
মাসে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল্যবান্থির
এই নীতি অনুসৃত হলে অবশ্য সাধা-
রণের আশা নিষ্ফল।

তদ্রূপ আশা মায়াবিনী। সুতরাং
আমরা আশা রাখি। এবং আশা রাখি
জন্মবিষয়ক পরিচয়পত্রের ভিত্তিতেই
খাদ্য দপ্তর বেবি ফুডের কার্ড সরবরাহ
করবেন।

চিকিৎসকের দায়িত্ব

কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল
কলেজের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠাদিবস

সম্মানিত উৎসব উপলক্ষে রাজ্য শিক্ষা-
মন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় তরুণ
ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,
কেবলমাত্র জীবিকার জন্যই চিকিৎসা
শাস্ত্র গ্রহণ না করে দেশ সেবার স্বত-
গ্রহণ করাই তরুণ চিকিৎসক সমাজের
কর্তব্য।

বলা বাহুল্য শ্রীসিংহ একটি বহু
আলোচিত বক্তব্যকেই সুযোগমত
পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই বঙ্গ-
দর্শনের পৃষ্ঠাতেই আমরা অনুরূপ
বক্তব্য উপস্থাপিত করে ইতিপূর্বে
এমন প্রস্তাবও রেখেছিলাম যে,
চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে ইচ্ছুক
প্রবেশার্থী ছাত্রসমাজের কাছে পূর্বাঙ্কে
এই মর্মে মূচলেকা লিখিয়ে নেওয়া
যেতে পারে যে চিকিৎসকরূপে সমাজে
প্রবেশ করার সময় এই তরুণ ছাত্রদল
দেশ ও দেশের প্রয়োজনে পঞ্জী অঞ্চলে
একাধিকক্ষেত্রে কয়েক বছর বিভিন্ন হাস-
পাতালে যোগদানে বাধ্য থাকবেন।
মূচলেকার প্রয়োজন একারণেই যে,
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর অধি-
কাংশই শহরে পসার জমানোর জন্য
বাস্তব হয়ে পড়েন। গ্রামাঞ্চলে অব-
হেলিতভাবে উপেক্ষিত হয়। অথচ
চিকিৎসক হিসেবে সমাজের প্রতি,
দেশের প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব সে
দায়িত্ব পালনে কেউই স্বেচ্ছায় এগিয়ে
আসেন না, এবং এ পর্যন্ত বিশ্বাস,
কেবলমাত্র মন্ত্রীমহোদয়গণের বক্তৃতা
শুনেন তাঁদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে ছুটে
আসাও প্রত্যাশিত ঘটনা নয়। এজন্য
যেহেতু চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই
মানবকল্যাণ সাধন, যেহেতু ডাক্তারী
প্রফেশন সাধারণ ব্যবস্থা অথবা
কোরিয়ার নয়, সেজন্য ডাক্তারীকে
জীবিকারূপে গ্রহণ করার প্রাক-
মুহূর্তেই তরুণ ছাত্রসমাজকে সমাজ
সেবার আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করতে
হবে। আর ঐ মূচলেকা হবে তাঁদের
ক্ষেত্রে দীক্ষা গ্রহণকালীন দীক্ষা।

বর্তমানে পঞ্জী অঞ্চলে চিকিৎসকের
একান্ত অভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও
হাসপাতাল গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না,
আর যেখানে বা হাসপাতাল গড়ে ওঠে
সুশিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব সেখানে
তাঁরভাবে অনুভূত হয়।

শহরের ওপর চিকিৎসকের
অত্যধিক চাপ সত্ত্বেও কিন্তু তান্ত্রিক
বিষয় এই যে সামান্য দূরের চিকিৎসক
হলেই তাঁর ফীস এমন আকাশছোঁয়া
হয় ওঠে যাতে সাধারণ লোকের পক্ষে
তাঁদের নাগাল পাওয়াই ভার হয়।
এই রহস্যেরও স্বার্থ কারণ হয় বা
এই যে দেশে আসলে প্রয়োজনের

তুলনায় সুচিকিৎসকের নিতান্তই
অভাব।

পঞ্জী অঞ্চলে চিকিৎসা বিদ্যায়
হাত পাকালে আমাদের বিশ্বাস
সুচিকিৎসকেরও অধিকতর সৃষ্টি
সম্ভব হবে।

কারণস্বরূপ বলতে পারি, শহরে
চিকিৎসক অপেক্ষা পঞ্জী অঞ্চলে
চিকিৎসকের পক্ষে কর্তব্যে ফাঁকি
দেওয়ার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম।
(অবশ্যই এ বক্তব্যের দ্বারা বর্তমান
আলোচনাকারী শহরে চিকিৎসকদের
প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত করছেন না।
কেবলমাত্র তুলনামূলক আলোচনার
খাতিরে একটি তুল্যমূল্য বিচারের
প্রয়াস পাচ্ছেন তিনি)।

অধীনের বক্তব্য, শহরে পেটেন্ট
ওষুধের ছড়াছড়ি। কথায় কথায়
‘ব্রাড স্পটাম স্ট্রল’ পরীক্ষারও যথেষ্ট
সুযোগ। এ সমস্তই ডাক্তারবাবুর
রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে এবং ডায়রী
পড়ে ওষুধ দেওয়ার সুযোগ ঘাঁটতে
দেয়। পঞ্জী অঞ্চলে এই বিশেষ সুবিধা
থেকে ডাক্তারবাবুরা বঞ্চিত। সুতরাং
বিভিন্ন বিটকা প্রয়োগে কর্তব্য খতম
নয়। ব্রাড স্পটাম পরীক্ষার দ্বারা
রোগ নির্ণয়ের সহজ পথও নেই।
পঞ্জী অঞ্চলে ডাক্তারকে পুরো দায়িত্ব
নির্ভেই চিকিৎসা চালাতে হয়। বহুতর
প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে
তিনি তাঁর আপন দক্ষতার দ্বারা
মানুষকে সুস্থ করে তোলেন।

স্বভাবতই এজন্য পঞ্জী অঞ্চলের
একজন সাধারণ ডাক্তারবাবুর আত্ম-
বিশ্বাস শহরে দুর্লভ।

এই আলোচনার দ্বারা সুতরাং
তরুণ চিকিৎসক সমাজের দৃষ্টি
আকর্ষণ করে বলতে পারি, পঞ্জী
অঞ্চলে দেশের গ্রহণ করে যদি তাঁরা
কয়েক বছর জনহিতায় ব্যবহার করেন
তবে তত্ত্বারা ভবিষ্যতে তাঁদের উপকার
বই অপকার হবে না।

আশা করি, দেশের ডাকে এবং
নিজের প্রয়োজনে তাঁরা তাঁদের বৃদ্ধির
সূচনা পঞ্জী বাংলায়ই শুরু করবেন।

ওরাও কি প্রতিবন্ধক

চৌতা জানুয়ারীর দৈনিক বসুমতীর
নিজস্ব সংবাদদাতার একটি সংবাদে
চোখ পড়তে রীতিমত ভাবিত হতে
হ’ল। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, এ
‘হকার’ তো সে ‘হকার’ নয়। তবে?

সংবাদটি শুনুনঃ

‘শিয়ালদহ অঞ্চলে সকল দৈনিক
পত্রিকা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিক্রয়
গরীব হকারদের উপর আবার পুলিশের
হামলা শুরু হইয়াছে। তবে এবারে

খানার পদলিখ নয়, নবগঠিত হোমগার্ড ও কলিকাতা সশস্ত্র পদলিখের হামলায় যুদ্ধবীর সারাদিন গরীব হকারদের পত্র-পত্রিকা একেবারেই বিক্রয় হয় নাই বলিলেই চলে। শিয়ালদহ অঞ্চলে পত্র-পত্রিকা বিক্রয়তা এই হকারগণ অভিযোগ করেন যে, প্রতি ঘণ্টায় প্রতি হকার ১০ পয়সা করিয়া হোমগার্ডকে এবং প্রতি ঘণ্টায় ২৫ পয়সা করিয়া আম পদলিখকে দক্ষিণা দিলে তাহাদের এই সকল দৈনিক পত্র-পত্রিকা বিক্রয় করিতে দেওয়া হইতেছে। এই সকল হকারগণ অভিযোগ করেন যে, তাহারা প্রত্যহ এই সকল পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য দিয়া সংসার প্রতিপালন করেন এবং প্রত্যহ এমন কিছু লাভ হয় না যে, হোমগার্ড বা সশস্ত্র পদলিখকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী পয়সা দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পদলিখের ডি-সি সেন্ট্রালের সহিত যোগাযোগ করিলে তিনি জানান যে, তিনি বিষয়টি নিশ্চয় তদন্ত করিবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সকল হকার শিয়ালদহ গেটের নিকট দাঁড়িয়া প্রত্যহ পত্র-পত্রিকা বিক্রয় করেন এবং ট্রেনযাত্রীদের একাংশ এই সকল পত্র-পত্রিকা ক্রয় করেন। ১৯৬৪ সালে এই সকল হকারদের উপর একবার এই প্রকার পদলিখের হামলা হইলে কলিকাতা পদলিখের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলে হকারদের পত্র-পত্রিকা বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং সেই হইতে তাহারা বিনা মাধ্যম পত্র-পত্রিকা বিক্রয় করিয়া আঁসিতেছিলেন। এমন কি এই সকল হকারদের অনেকেই দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধাবৎ এই অঞ্চলে এইভাবে দৈনিক পত্রিকা ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা বিক্রয় করিয়া আঁসিতেছেন।

যতদূর মনে হয়, হকার সমাজের প্রতি সরকারের কোন বিবেচনা নেই। হকার উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল রাজপথ থেকে পথচারীর অসুবিধা ও অথবা এ্যাপ্রিডেন্ট এ্যাড়নের জনাই। কিন্তু মেহেতু একটি নিয়ম চালু আছে সেজন্যই নিয়মব্রহ্মক-দের হাতে এসেছে দু পয়সা তেলার সুযোগ। নিয়মব্রহ্মকরা আছেন ভাল। দেশে যত নিয়ম তৈরি হবে উপরির জংখ্যা ততই বাড়বে তাঁদের। সংবাদে দেখা যাচ্ছে পদলিখের এই উপরির উত্তোলনে এবার হোমগার্ড ও সশস্ত্র পদলিখ বাহিনীও সাপ্তাহ হইলেনে।

কিন্তু নিয়ম বৈ-নিয়ম করেই যারা

দু পয়সা করে খান, তাঁদেরও লম্বা-গদ্বা জ্ঞান থাকা উচিত।

পত্র-পত্রিকার হকাররা প্রকৃতপক্ষে সাধারণের কতদূর অসুবিধার কারণ এই বিষয়টা পূর্বাঙ্কে বিচার করে 'তোলা' ওঠানোর অভিযানে তাঁদের নামা উচিত ছিল। দৈনিক পত্রিকা দিনভোর রাত-ভোর বিক্রী হয় না। এ জিনিসের বিক্রীর বাধা সময় আছে। তাছাড়া দৈনিক পত্র একটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী যা হাতে না পেলে এবং শিয়ালদহের মত জায়গায় উপযুক্ত সময় হাতে না পেলে সাধারণেরই অসুবিধা। যাত্রীদের সুবিধার্থে বরং দৈনিক পত্র বিক্রয়েই বিশেষ ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে সাধারণ হকারের সঙ্গে একই কোঠায় ফেলে দৈনিক পত্রিকা ফেরী-ওয়ালাকে হমরানী করার অর্থ যাত্রী সাধারণের কাছ থেকে একটি অত্যা-বশ্যক সামগ্রীকে কেড়ে নেওয়া।

মফস্বলে কাগজ পৌঁছাতে যে অসুবিধা এবং খবর কাগজে পৌঁছাতে যোগান যে সেখানে সুদূর নয় তা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং মফস্বলের যাত্রী ও দূরপাল্লার যাত্রীদের হাতে প্রভাতী সংবাদ পৌঁছে দিলে এই সমুদয় হকারগণ এক পক্ষে সামাজিক কতব্যও পালন করেন।

তাছাড়া এঁদের ব্যবসারে এমন প্রচুর লাভ থাকে না বন্দ্বারা তাঁরা উপরিলোভী নিয়মব্রহ্মকদের অন্যান্য বে-আইনী দাবি পূরণ করতে পারেন।

এমতাবস্থায় ডি সি সেন্ট্রাল যে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রকাশ, তা কেবলমাত্র তদন্তকাষেই পর্যবসিত না হয়ে যদি তদন্তদ্বারা এই অবস্থার প্রকৃত বিহিত করা হয় তবেই মঙ্গল। মঙ্গল হকারদের, মঙ্গল জনসাধারণের। আশা করা যায়, কর্তৃপক্ষ নিয়মব্রহ্মক-দের উপর উত্তোলনের এই বে-আইনী জুলুম অবিলম্বে বন্ধ করে প্রভাতী সংবাদপত্র যাত্রীদের হাতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন।

সুভাষবাগে নয়া দশক

“আমরাই কংগ্রেস” হাজার হাজার কণ্ঠে এই দৃষ্ট বোধগার দ্বারাই পরিষ্কৃত হল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসকর্মীগণ জোট-বন্ধ হলেন সুভাষবাগে অনুষ্ঠিত দুই-দিবসব্যাপী কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে।

সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার নির্ভীক ঘোষণা সুভাষবাগ এই বিশেষ নামটির তাৎপর্য যেন নতুন করে ঘোষণা করল। প্রত্যেক বক্তার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হর্ষধ্বনি এক নব অভিযানের

সূত্র ধ্বনিত করে সুভাষবাগ মধুরিত করে তোলে।

গত শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সুভাষবাগে প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করেন চার হাজার নয় শত সাত জন কংগ্রেসকর্মী, তিম্পানজন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য এবং বহু বিশিষ্ট এম পি, এম এল এ ও এম এল সি। এতব্যতীত সম্মেলনে কয়েকজন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী (যারা বর্তমানে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং এককালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন) যোগদান করেন তাঁরাও।

পাঁচশত বছরের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরামলিনী চক্রবর্তী সম্মেলনের উন্মোচন করে বলেন, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের দুর্নীতি-মূলক কাজ সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে দেশকে সীমাহীন দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করেছে। এই অবস্থা থেকে সংগঠনকে বাঁচাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে প্রতি গ্রামে সংগঠনের স্বেচ্ছা প্রতিটি লোকসভা ও বিধান সভার আসনে লড়াই চালাতে হবে।

প্রধান অতিথি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা (ধিনি আসন্ন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী) শ্রীসুরেন সরকার বলেন, যদি প্রয়োজন হয়, বিদ্রোহী কংগ্রেস কেন, দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে দেশদ্রোহী চক্র ধ্বংস করা হবে।

সম্মেলনে প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীর আদর্শ বর্ণনা করে-প্রাক্তন রাজ্যকংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসসেবীর যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল,—গভীর দেশপ্রেম, নিঃস্বার্থ সেবারত, নির্মল চরিত্র, ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব ও সহাস্যমুখে নিষাধীন ভোগ ও কারাবরণ, সর্বোপরি দেশার্থে আত্মদান। কিন্তু আজও সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরি আছে।

তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখ ও উন্মেষের কথা, রাজ্য কংগ্রেসের উপর মহলে কিছু সংখ্যকের আজ আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। সেখানে ক্ষমতাপ্রিয়তা, অর্থলোভ ও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এই রাজ্যে অসদুপায়ে অর্জিত কোটি-পাঁচতর ওপর নিভরশীলতা বৃষ্টি পেরেছে। ধনীরা সাধারণকে শোষণ করে ধনতন্ত্রকে কয়েম করার সুযোগ করে নিচ্ছেন ক্ষমতাসীন গ্রহীতর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহায়তায় কিম্বা সমর্থনের দ্বারা। এই দৃষ্টচক্রে ষে-কেউ বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়েছেন, বিতাড়িত



শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর সুরঙ্গমার শিল্পীদের নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য দেখছেন

হয়েছেন তিনিই অথবা নিদারুণ প্রত্যাখ্যাত সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

এই দূর্নীতি ও ধনিকনির্ভরতা, এই নিরংকুশ ডিক্টেটরী যারা সমর্থন করতে অপারগ, যারা স্বাধীনচেতা ও স্বাধীন চিন্তার দাবিদার, যারা পাপ-চক্রের সমর্থক নন, যারা চাটুকার সাজতে পারেন নি তাঁরা হয় কংগ্রেস প্রবেশে বাধা পেয়েছেন, নয় কংগ্রেস সংগঠন থেকে কৌশলে বিতাড়িত হয়েছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু বলেন, -কংগ্রেসের করাচী, লক্ষ্মী, বোম্বে প্রস্তাবগুলি কোথাও কর্মপদ্ধতিরূপে গৃহীত হয় নি। আবাদী ও ভূবনেশ্বরের প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশে অক্ষুণ্ণ আছে চরম দারিদ্র্য। বন্দ্য আমদানীর কুফল-স্বরূপ দেশে বিদেশী মূলধন বাসা বেঁধেছে।

উপসংহারে ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু বলেন, এই সম্মেলনের ধর্মবন্ধ আজ থেকেই সূর্য হোক।

সম্মেলনে সর্বশ্রী বসন্ত দাস এম-পি, সত্যীশ সামন্ত এম-পি, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ও প্রবীণ নেতৃবর্গ ভাষণ দেন।

বার্ত্তাস :

শান্তিনিকেতনের প্রতিমা

গত ২৯শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ এবং সঙ্গীত ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষা শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে এক জন-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সুরঙ্গমা এবং পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী কিরণবালা সেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবী এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য।

শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব আগ্রম-পালিকা 'বৌঠান' প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের একমাত্র পুত্রবধূ। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি বধূরূপে ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ করেন। গুরুদেবের একান্ত সন্নিধ্যে এবং স্বামী রবীন্দ্রনাথের একাগ্র উৎসাহে তাঁর সকল গুণ বিকশিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারে ১৮৯৪ সালে প্রতিমা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শেখেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র এবং মাতা স্বর্গীয়া বিনয়িনী দেবী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন।

প্রধানত মাতুলদের প্রভাবে এবং আগ্রহে প্রতিমা দেবীর চিত্রাঙ্কন বিদ্যার অনুশীলন সূর্য হয় এবং সেই বিদ্যায় তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর কর্তৃমানি চিত্র ভারত ও সিংহলের চিত্রশালায় স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখা-শোনার ভার নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ভ্রমণ করেছেন। তাঁর শিল্প-মন সেই সুযোগের পূর্ণ সম্ভাব্যহার করে। প্যারিসে তিনি বাটিকের এবং সেরামিক-এর কাজ শিখে আসেন। ইটালীতে শিখে আসেন ফ্রেস্কোর কাজ। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা তাঁর কাছ থেকেই ঐ সব শিল্পকর্ম শিখে নেন। শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ' ফ্রেস্কা ঐ পদ্ধতিতেই আঁকা।

অভিনয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। গুরুদেবের বহু নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে নাটক মণ্ডস্থ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-নাট্য মণ্ডস্থ করার ব্যাপারেও তাঁর অবদান প্রচুর। তাঁর উপর গুরুদেবের এতদূর আস্থা ছিল যে, নৃত্যনাট্যের সাজ-সজ্জা এবং পরিচালনায় ভায় পুত্রবধূর উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন। 'পুজারিণী' কবিতাটি 'নটীর পূজা' নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল প্রতিমা দেবীর অনুরোধে।

কর্মবহুল জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আজ তিনি উত্তরায়ণের নিভৃত কোণে জীবনযাপন করছেন। কিন্তু তাঁর মন যে এখনও সেই কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ তিনি নির্বাক এবং নিজজনবাসিনী হলেও মানুষ্যের মঙ্গল চিন্তাই তাঁর অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে আছে।

সম্বর্ধনার উত্তরে প্রতিমা দেবী বললেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমেত্রীর যে বাণী রেখে গেছেন, তারই অমৃত স্পর্শ ঘরে-বাইরে সঞ্চারিত হচ্ছে। নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে, কাছে এবং দূরে চলেছে তারই কাজ। জাতিসম্বর্ধের বিবাদী আসরে যা একদিন শূন্য হয়েছিল নেহাতই বেসুরো, আজ তা দেশ-বিদেশে অনেকেরই অন্তস্তলে অনুরণিত। সকল জাতিই আজ কবি-গুরুর বিশ্বমেত্রীর আহবানে সাড়া দিয়েছে। সে আহবানের সূর সেধে মিলনের পথ প্রশস্ত করতে দেশ-বিদেশে কত মহৎ জীবনই না নিঃশেষে হচ্ছে উৎসর্গীকৃত। তাঁর সূর শব্দ আসরের আঁগকে সীমায়িত নয়, মহাজীবনের অমর আবেদন নিয়ে সর্বাধীনতায় তা সুবিস্তীর্ণ।

সম্বর্ধনার শেষে সুরঙ্গমার শিল্পীরা নৃত্য-গীতের দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করেন।

আমরা নেহালা ওকলাহোমা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কয়েকদিন পরে মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে লাইব্রেরীতে দেখা হল। উনি বললেন, 'মিস্টার রায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার আলাপ হয়েছে। উনি সোশ্যাল স্টাডিসের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

আমি বললাম, 'হাঁ। উনি তো আগে ইলিয়ন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন।'

—'উনি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকেন। উনি বলছিলেন সামনের শনিবার রাতিতে গুর আস্তানায় ইন্ডিয়ান ডিশ করে খেলে কেমন হয়। মিস্টার ব্যানার্জী তো ইউনিভার্সিটির ক্যালোগ সেন্টারের হোস্টেলে থাকেন। ওঁকেও খবর দেবেন।'

আমি বললাম, 'এর চেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব আর কি হতে পারে?'

শনিবার রাতিতে খুব হৈহুজোড় করা গেল। আমি যথাসাধ্য আমার স্বল্পশিল্প নৈপুণ্যের প্রয়োগ করে কপি দিয়ে মাছের ঝোল, টমেটোর চাটনি ও ডাল তৈরি করলাম। মিস্টার ব্যানার্জী চিকেন কারি রাখলেন। মিসেস চৌধুরী আমাদের রান্নার খুব তারিফ করলেন। বললেন, 'খুব ভাল লাগছে।'

আমি বললাম, 'আপনি দেখছি বেশ বাংলা বলতে পারেন।'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'কিছু কিছু শিখছি। ও আমাকে বাংলা শেখায়। আমি ওকে আমাদের নৈটিভ ভাষা শেখাই। বাংলা ভাষা খুব মিস্ট'

মিস্টার রায় রহস্য করে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরীর মতো, তাই না?'

মিসেস চৌধুরী হেসে বললেন, 'তা বলতে পারেন।'

অনেকদিন পরে ভালো করে হাত লাগিয়ে খেললাম। মশলা দিয়ে রাঁধা ঝোল খেতে খুব ভাল লাগল।

ডিনার পর্ব চুকলে মিস্টার রায় টেপ রেকর্ডারে অনেক বাংলা গান শোনালেন। অনেক দিন পরে হেমন্ত-কুমার, শচীনদেব, সুচিপ্রা মিত্র প্রমুখের কণ্ঠ নতুন করে সুধা বর্ণন করলো। মানা গল্পগুজবে অনেকক্ষণ কাটল।

মিস্টার রায় অনেক রাতে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরদিন দুপুরে নেপালের মিস্টার সেনের সঙ্গে ডাউন টাউনের সুন্যার সিনেমা হলে ওয়াল্ট ডিজনির 'দ্য ইনক্রেডিবল জার্নি' ছবিটি দেখলাম। এমন অপূর্ব ছবি খুব কম দেখছি। দুটি কুকুর ও একটি বেড়াল যে গৃহে থাকত সেখান থেকে বেরিয়ে কি করে

এস, কে, গ্রীনবার্গ

নানা বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে আবার তাদের পালকদের কাছে ফিরে এল তারই অনবদ্য কাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে চিত্রটি। পশু ও শিশুর জগতের এক আশ্চর্য্যময় দিক ব্যস্ত হয়েছে ছবিটিতে।

মিস্টার সেনদের বাড়ি কলকাতার বালিগঞ্জ। গুর বাবা চাকরির সূত্রে

নেপালে গিয়ে সেখানে সেটেলড করে ছিলেন। মিস্টার সেন নেপালের একটি স্কুলের ফিজিক্যাল এডুকেশনের টিচার। আগে মিলিটারীতে ছিলেন। এখানে আসার আগে একটি নেপালী মহিলার কাছে হৃদয় দিয়ে ফেলেছেন। ওঁকে খুশি খুশি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি, চিঠি এসেছে না কি?'

মিস্টার সেন কোটের বুক পকেটে হাত দিয়ে একটা ভূপ্তির নিশ্বাস ফেললেন।

আমরা টাউন ট্যাভার্নে কফি খেতে ঢুকলাম। মিস্টার সেন খাওয়ার টেবিলের কাছে গেল ঘাড়ের মতো একটি ডায়ালের ছিদ্র দিয়ে একটি ডাইম ফেলে দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলুন কার গান শুনবেন।'

যে মেরেট আমাদের কফি নিয়ে এল সে বলে উঠল, 'মেরিরান অ্যান্ডারসন।'

কেশ পরিচর্যায়

অপরিহার্য্য...

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্সারাইডিন

হেয়ার আয়েল
চুলের গোড়া বৃদ্ধ ও
সবল রাখে, চুলের গোড়া
বাড়াতে সাহায্য করে
ও চুল ওঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা-বোম্বে
কামপুর

মিস্টার সেন স্মিতহাস্যে ডায়ালের গায়ে মেরিয়ান অ্যান্ডারসনের নামের বোতাম টিপলেন। অমনি অ্যান্ডারসনের কোমলদেহের কণ্ঠের রেকর্ড পেজে উঠল। 'মিস্টার সেন বললেন, 'কি, এমন গান শুনলে কীভাবে কি চিনি খাবার দরকার হয়?'

আমি বললাম, 'তা বলতে পারেন।' রাগিতে মিস্টার বাসেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্টার বব কের্নিয়নের বাসায় আমাদের গুপ্তপন ডিনার ছিল। বব চমৎকার লোক। খুব হাসিখুশি। গত যুদ্ধের সময় জাপানে ছিলেন। ওখানে একটি জাপানী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে টেকে নি। তারপর আর তিনি বিয়ে করেন নি। নানা সোস্যাল ওয়ার্ক করে ও বই পড়ে সময় কাটান। তাঁর বাঁসাব পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আছে। ফুটবল বা ভলিবল ম্যাচের দিনে সেখানে মোটর পার্কিং কবতে দিয়ে বেশ কিছু ডলার রোজগার করেন। তিনি খুব খাওয়ালেন। খুব হৈচৈ হল। মিস্টার সেন কয়েকটা ম্যাজিক দেখালেন। মিস পিনিশে গান গাইলে। অনেক রাতে বাসায় ফিরলাম।

মিস্টার পাওয়েল একদিন আমাকে বোলিং দেখাতে নিয়ে গেলেন। বোলিং এখানকার জনপ্রিয় খেলা। একটি বিস্মৃত কাঠের প্লাটফর্মের প্রান্তে কতকগুলি মৃগুরের মত জিনিস কলের সাহায্যে এসে দাঁড়ায়। অন্য প্রান্ত থেকে একটি বড় বল গাড়িয়ে সেগুলিকে ফেলে দিতে হয়। এক সঙ্গে সবগুলি পারলে সব চেয়ে বেশি পয়েন্ট। বোল থেকে বেরিয়ে মিস্টার পাওয়েল আমাকে মোটরের দোকানে নিয়ে গিয়ে নানা রকম মোটর দেখালেন। মোটেবে যে এতটা রকম আরামদায়ক ব্যবস্থা হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। ফেরার পথে এক জায়গার একটি পদূলিস পথরোধ করে বললে, 'এ দিকে যাবেন না। একটি পেট্রোলিয়াম প্ল্যান্ট সবানো হচ্ছে।' মিস্টার পাওয়েল গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'উই অ্যাপ্রাইজেট ইওর সার্ভিস।' তারপর অন্য পথ ধরে বাড়িতে ফিরলেন।

স্থানীয় বেটারি ক্লাব একদিন আমাদের লাগের নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানালেন। লাগের সমস্ত একটি অংশ মনোহর ভাবে বিনোদিত করে।

একদিন ফরেন স্ট্রাংগার্স ক্লাবের একটি নৈশ উৎসবে সোগ দিলাম।

প্রথমে টেপস্কোর্ড চালিয়ে হাওয়াই স্ট্রীপের একটি স্ট্রোয়ে জ্যাকি কিছুক্ষণ নাচলে। তারপর যে নানা মজার খেলা হল তাদের মধ্যে যেটিতে আমি অংশ গ্রহণ করলাম সেটি হল কমলালেবুর খেলা।

দুটি প্রতিযোগী দলের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে। একটি ছেলের পর একটি মেয়ে। রুমালে প্রত্যেকের হাত পিছন দিকে বাঁধা। শব্দ মৃদু দিয়ে টবের জল থেকে কমলালেবু তুলে একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছ হয়ে সোঁটকে সারির শেষ জনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। মাটিতে লেবুটি পড়লে চলবে না। আমার পাশের জাপানী মেয়েটি আমার মৃদু থেকে কমলালেবু নিতে গিয়ে দুবার ফেলে দিলে। তৃতীয় বারও ব্যর্থকাম হয়ে বলে উঠল, 'লেট আস ইট আপ দি অরঞ্জি।' আলো ক্রিমরে দেওয়া হয়েছে স্বপ্নালোকে অনেকক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আমবাঁই জিতলাম।

কার্নিভালেও মজার অভিজ্ঞতা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাই এতে অগ্রণী হয়ে নানা জনোচিতকর কাজের জন্যে ডলার সংগ্রহ করে। শব্দটিং, থ্রোয়িং ইত্যাদি অনেক রকমের খেলা আর তাদের পুরস্কার সুন্দরীদের স্পর্শে। আমার বন্ধু মিস্টার বা দা ডলার দিয়ে একটি থ্রোয়িং-এ সফল হতেই একটি মেয়ে তার হাত চেপে ধরলে। মিস্টার বা এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশনে একেবারে ঘর্মস্র জলবর।

মিস্টার ও মিসেস পাওয়েলের সঙ্গে একদিন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি ক্লাবের ডিনারে গেলাম। এই রকম ডিনারে যোগদানকারীরা নিজেদের বাড়ি থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে খান। ডিনারের পরে ইউনিভার্সিটির গভর্নমেন্ট বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর ডানকান স্লাইড দেখিয়ে তাঁর প্রাচ্যমণ্ডলের বৃত্তান্ত বললেন। ডক্টর ডানকানের স্ত্রী ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বুকস অ্যার্ড' নামে 'সামরিকপত্রের সম্পাদিকা। মিসেস পাওয়েল মিসেস ডানকানের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে তিনি আমার পাশে বসলেন। ডক্টর ডানকান ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সব স্লাইড দেখালেন তাদের মধ্যে দেখলাম তাজমহল, ঘুটে-দেওয়া দেয়ালের ছবি, গোরুর গাড়ির সামনে একদল গ্রাম্য ছেলেমেয়ে, হাওড়া ব্রিজ, বোম্বাইয়ের মৌরন ড্রাইভ, হামের কুয়েল পাশে মেয়েদের কলসীতে জল

ভরা ইত্যাদি। ডক্টর ডানকান বললেন, 'ভারতবর্ষ আশ্চর্য বৈচিত্র্যের দেশ। নতুন ও পুরাতন এখানে বিস্ময়কর ভাবে মিলেমিশে রয়েছে। ভারতের অক্ষরন্ত প্রাণশক্তি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে বলে বিশ্বাস।'

বহুতার পরে ডক্টর ও মিসেস ডানকানের সঙ্গে ভারত সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। দেখলাম ভারতের বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান বেশ গভীর। আমার ধারণা হল সাধারণত আমেরিকানরা বহির্বিশ্বের খবর তেমন রাখে না। কিন্তু যারা রাখে তাদের জ্ঞান অনেকক্ষেত্রে বিস্ময়জনক।

ক্রমে আমাদের ওকলাহোমা ছেড়ে 'যাবার দিন ঘনিয়ে এল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা পেলাম। একটি বিশেষ ফাংশন করে ডিপ্লোমা-গুলি দেওয়া হল। হোস্ট ফ্যামিলি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এতদিনকার আনন্দের পরে এবার বিচ্ছেদের দুঃখ। কিন্তু পৃথিবীর রীতিই তো এই।

রাগিতে বাসায় ফিরে মিস্টার পাওয়েলকে একটি পাইপ ও মিসেস পাওয়েলকে একটি পার্কার পেন উপহার দিলাম। মিসেস পাওয়েলকে বললাম, 'এই কলম দিয়ে আমাকে চিঠি লিখবেন।'

স্বা আমাকে একটি ট্রাভেল ক্লক উপহার দিলেন। বললেন, 'মনে-কর তোমার এক আত্মীয় পরিবার রইল এখানে। এ দেশে কোনো প্রয়োজন হলে অসংকোচে লিখ।'

সকাল দশটার ট্রেন। তাই রাগিতেই জিনিসপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে শব্দে গেলাম।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিস্টার পাওয়েলকে দেখলাম না। শুনলাম উনি একটা কাজে 'ইউনিভার্সিটিতে' চলে গেছেন। যথাসময়ে স্টেশনে যাবেন।

আটটা নাগাদ আমরা স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। মালপত্রের মোটরে চাপিবে মিস্টার পাওয়েলের মায়েব কাছে বিদায় নিতে এলাম। বৃষ্টি-কেন্দ্রে ফেললেন। আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের কথা কখনও ভুলব না। আমার একাশী বছরের সমস্ত শব্দ দিয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক আমার শব্দচিন্তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। তোমাদের বাস্তবদানটি মৃত্যুকালেও আমার শিয়রে

জ্বলবে।' আবেগে তিনি চেয়ারে বসে পড়ে দৃহতে মুখ ঢাকলেন।

চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের উদার স্পর্শে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিদায় নিলাম চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

মিসেস পাওয়েল আমাদের স্টেশনে নিয়ে এলেন। পেঁছে দেখি আমাদের গ্রুপের প্রায় সকলেই এসে গেছে। মালপত্র বন্ধ করে দেওয়া হল। সকলের মুখ আসন্ন বিচ্ছেদের ভাবনায় ভার। মিসেস পাওয়েল বললেন, 'ডালাসে পেঁছে রেমন্ডের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বল। ও খুব খুশি হবে।'

আমি বললাম, 'বলব।'

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। একে একে সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। কেউ দিলেন টিফি, কেউ প্যাপিরন, কেউ বই। মিসেস উইলিয়মস বললেন, 'আবার ফিরছ তো?'

আমি বললাম, 'হয় তো।'

—'হরতো নয়, বল ফিরব. নিশ্চয়ই ফিরব।' তিনি প্লাভসের মধ্যে মুখ গজলেন।

ইহা দেখি মিস্টার পাওয়েল প্রায় ছুটেতে ছুটেতে আসলেন। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'এগুলো প্লাইক্লোরাইলড করতে দেরি হয়ে গেল।' তিনি আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। চোখ বুলিয়ে দেখলাম মানবতা ও ধর্ম সম্পর্কে নানা সুভাবিতের সংগ্রহ।

তিনি কাগজগুলি সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে ট্রেনে উঠে বললেন, 'কাগজগুলো ছাপতে দেরি হয়ে গেল। আর একটু দেরি হলে দেখা হত না।' তারপর পকেট থেকে একটা পুরনো মদ্রা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'সব সময় এটি কাছে রেখ। এটি লাকি কয়েন।' ট্রেন ছাড়ার সময় হলে হ্যান্ডশেক করে উনি নেমে গেলেন। অন্যান্য সকলেও নেমে গেল। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা জানলা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ওকলাহোমা স্টেশন দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল।

ডালাসে পেঁছলাম পরদিন সকালে। স্টেশনে সেলফ লকারে মালপত্র রেখে কেনেডির দেহান্তের স্থানটি দেখতে ছুটলাম। আগের বার যখন ডালাসে এসেছিলাম তখন দিন ছিল রোদ্দোজ্জ্বল। এখন মেঘলা ধমধমে আকাশ। রোদের নাম-গন্ধও নেই। তবুও চারিদিকে খ্রীষ্টমাসের আয়োজন। পথে পথে

স্যান্টা ক্লজের প্রসন্ন মূর্তি—অনেক শো-কেসে খ্রীস্টের জন্মদৃশ্য মূর্তির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

কেনেডির মৃত্যুস্থানে পেঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগল না। টেন্সাস স্কুল বুক ডিপোজিটরির সাত-তলা বাড়িটির সামনে আর, এল, থরনটোন ফ্রিওয়ে। ডিপোজিটরির ছয়তলার একটি জানলা থেকে ফ্রিওয়ের ওপরে কেনেডিকে গুলী করা হয়। প্রাচীন দুর্গের মতো লাল রঙের বাড়িটি একটা বিতর্কিত মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটির সামনে কয়েকটি স্বল্পপত্র গাছের জটিল শাখাপ্রশাখায় এক দুর্বোধ্য হে'মালী ও কুটিলতা। কেনেডিকে যেখানে গুলী করা হয় সেখানে রাস্তার পাশে তার মূর্তির উদ্দেশ্যে একটি সুদৃশ্য স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রাকচারটির সামনে সবুজ ঘাসে-ছাওয়া জমিতে ফুলের গাছ। মধ্যখানে জাতীয় পতাকা উড়ছে। অনেকে সেখানে পুষ্পস্তবক রেখে যাচ্ছে। জারগার্ট আমচর্চ স্তম্ভ ও বিষয়।

ওখান থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ ডাউনটাউনে ঘোরাঘুরি করে একটি মাঝারি রেন্ট্রোস্টে কিছু খেয়ে নিলাম। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। তাই স্টেশনে ফিরে গেলাম। এবার রেমন্ডকে ফোন করলাম। রেমন্ড বললে, 'আগে ফোন

করলে না কেন? আমি তাহলে মায়ের সঙ্গে স্টেশনে যেতাম।'

আমি বললাম, 'সত্যি ভুল হয়ে গেছে। যাক, এ যাত্রায় বোধহয় আর দেখা হবে না। তবে আশা করি পরে দেখা হবে।'

ও বললে, 'আবার এস এখানে।'

আমি বললাম, 'আমি আসব। তবে আশা করব পরের বার ভারতবর্ষে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

—'আমি তো যেতে চাই। তুমি মামিকে একটু বলে দাও।' বালকের কণ্ঠ জ্বলন্ত হয়ে এল।

আমি ওকে বিদায় জানিয়ে ওর মাকেও বিদায় জানালাম। ওর মা বললেন, 'মনে রাখবেন ডালাসে আপনার এক বোন রইল।'

বিষয় হৃদয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ট্রেন ছাড়বার বেশি দেরি নেই। লকার থেকে মালপত্র নিয়ে ট্রেনে দিকে চললাম। ব্যাগের মধ্যে রেল-রোডের টিকটটা ঠিক আছে কিনা চেক করতে গিয়ে মিস্টার পাওয়েলের লাকি কয়েনটি আমার হাতে ঠেকল। ওটিকে বার করে মাথায় ছোঁয়ালাম। একটু পরেই ডালাস ছেড়ে যাব। কিন্তু ওকলাহোমা ও ডালাসের সমস্ত মূর্তির স্মারকচিহ্ন হয়ে এই লাকি কয়েনটি চিরকাল আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গলুরু - শ্রীলঙ্কা - গোহাটী

আমাদের এই মেয়ে-হোস্টেলে একদিন ইতিহাস। কিন্তু আগরা বাথ কবি কোনো কনকদি এসে উঠলেন, বেশ কিছুকাল থাকলেন, নকল ইতিহাসের নাকি, তাই সেই যে কবে তারপর আবার একদিন চলে গেলেন। সংসারে এসে হোস্টেলের খাতায় নাম লেখালান, আজও এই আসা-যাওয়ার ইতিহাসটাই তো আসল, এখান থেকে বোঝাতে পারলাম না। বেরিয়ে

পড়লেন কনকদি। এসেছিলেন শ্বেতশঙ্কর ললাট নিয়ে, চলে গেলেন বিজয়িনীর মতো সেই গুহ্ম ললাটে সিঁদুর-চাঁদের টিপ এঁকে। এই গোখলি-সন্ধ্যায় হাতে যখন কোনো কাজ নেই, আর ঘবে নেই শ্বিতীয় কোনো বেলভীরের উপস্থিতি, এই মুহূর্তে অনেকদিনের অনেক পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আজ বন্ধু, বোশ কবে মনে পড়ে গেল কনকদিকে।

হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মনীষা ব্যানার্জীকে আগে থেকেই চিঠি দিয়েছিলেন, তারপর শিলিগুড়ি থেকে এসে পৌঁছালেন একদিন কনকলতা চৌধুরী। বাংলায় এম-এ, ডি-ফিল। হাতে একগাছা কবে চুড়ি, পবনে ভাঁতেব সাধারণ শাড়ি। সঙ্গে থাণ্ডার মধ্যে বড় একটা চাকরাব সুটকেস আর হাল্কা বোডিং জডানো হোল্ডল। আমি আগে যে-ঘরটার থাকতাম, সেখানে আমার সিট বাদে আরও একটা সিটের ব্যবস্থা ছিল। আগে ছিলেন টেলিফোনব গায়ত্রী সান্যাল; তিনি উঠে যেতে সিংগল-সিটেড কোনো রুম না পেয়ে কনকলতা এলেন সেই সিটে। দেয়াল ঘেঁষে দু'পাশে দু'জনে মুখোমুখি দুটো সিট। তিনি হলেন আমার রুমমেট। আমার বি-এ পাশের পর ছমাস ঘরে বসে কাটিয়েও যখন বাবার ইচ্ছের এবং মায়ের আগ্রহে কোথাও আসার কিছু একটা বিবেক সম্বন্ধ ঘটলো না, তখন কখনোপূর্বের ছাত্রা অতিক্রম করে কলকাতায় একটি কমাশি'বাল ফার্মের চাকরি নিয়ে এসে সিট নিলাম এই হোস্টেলে। কনকলতাও চাকরি নিয়েই এলেন, বতনমণি গাল'স হাই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। মুখের বৈখ্য তেমন একটা বরসেব ছাপ না পড়লেও অনুমান করা শক্ত হলো না যে, বরসটা চান্সের উপরেই হবে। আমার সঙ্গে পার্থক্যটা খুব কাছাকাছি নয়। গুহ্ম বরসে কেন, সে পার্থক্য বিদ্যালয়, বুদ্ধিতে এবং সম্মানেও। তিনি এম-এ, ডি-ফিল, হেড মিস্ট্রেস, আর আমি সাধারণ একজন গ্রাজুয়েট আর ডালহৌসী অফিসের এক মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। কিন্তু এত পার্থক্যের মধ্যেও যেখানটায় তাঁর সঙ্গে আমার খুব কাছাকাছি একটা মিল খুঁজে পেলাম, তা হচ্ছে আমার দু'জনেই কুমারী। বসিও তাঁর, গান্ধী'র হোস্টেলের অন্যান্য মেয়েদের কাছে তাঁর ব্যক্তিকেই পসিফিউট কবে তুলতো, ভবু তাঁর সঙ্গে নিজেকে থেকে আমি গান্ধী হবার আগেই আমাকে



রঞ্জিত কুমার জেন

কনকদি

তিনি আপন করে নিলেন। আমি বশন
মললাম—কনকদি, তিনি তখন অত্যন্ত সহজেই
আমার নাম ধরে ডাকলেন—চন্দনা, বললেন :
‘এস, আমার সিটে এসে বসো, কথা বলি।’

কথা বলতেই উঠে গেলাম কনকদির সিটে।
কিন্তু কথা জমলো না, তার আগেই এঘর-
ওঘর থেকে ছুটে এলো করুণা বিশ্বাস, রমলা
গাঙ্গুলী আর অমিয়া বসু। দু’দণ্ড অবসর
পেয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতেই এসেছিল,
তাদের সঙ্গে এবারে কনকদিকে পরিচয় করিয়ে
দিবে বললাম : ‘সামনেই পাঁচশে বৈশাখ
আসছে, আপনার সভানেত্রীকে এবারে কিন্তু
আমরা অনায়াসে এখানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন
কবতে পারি কনকদি। রমলা এই সেদিন
রেডিওর গিরে অভ্যন্তর দিয়ে এলো, রবীন্দ্র-
জয়ন্তীর ভালো আর্টিস্ট, ও একাই গান
গেয়ে ফাংশনের কাজ চালিয়ে দিতে পাববে।’

শুনে রমলা এবারে লজ্জা পেলো।

কনকদি কলেন : ‘বেশ তো, উদ্যোগ
করো না! সভানেত্রীকে কিছু প্রয়োজন হবে
না, সবাই মিলে বরণে যা পাবি, কবিগুরু
উদ্দেশ্যে নিবেদন করবো।’

এতদিনে হোস্টেলে বেন খানিকটা প্রাপ
এলো। সুপারিনটেন্ডেন্ট মনীষা ব্যানার্জী
খুশি হয়ে সেদিন স্পেশাল ফিস্টের ব্যবস্থা
করে ফেললেন। আর আমরা অবাধ হলাম
রমলার মতো কনকদির কণ্ঠেও রবীন্দ্রসঙ্গীত
শুনে। ভাবতেই পাবি নি যে কনকদি গান
জানেন। বললেন : ‘এসেই কবে এককালে
শিখেছিলাম, চর্চা তো নেই, তবু লজ্জা ফেলে
এই বড়ি বরসেও গেয়ে দিলাম; কেউ যেন
আড়ালে গিরে টিটকারি দিও না।’

কিন্তু এ নিতান্তই বিনয়। ‘কনকদির
বয়স রমলার প্রায় বৃদ্ধ হলে। এই বরসেও
তিনি যা গাইলেন, তাতে রমলা অবধি হাব
স্বীকার কবে তবে উঠলো। কিন্তু আর
একটা দিনও কনকদিকে হাবমোনিয়াম নিয়ে
বসাতে পাবলুম না। ততক্ষণে তিনি স্কুলের
কাজের চাপে রীতিমত বিবর্ত হয়ে উঠেছেন।
ফাইলের পর ফাইল, কোচেনে পেশার, পবীকার
খাতা ইত্যাদিতে টেবলটা তাই স্তব্ধীকৃত হয়ে
উঠলো। তার মধ্যে ভুবে গেলেন তিনি।

এক সময় ফাঁক পেয়ে বললাম : ‘এ ঘরে
সবাই সব সময় আসে-যায়। আপনি খুব
ডিসটার্বড হচ্ছেন। সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলে
এবারে কোনো একজন সিংগল-সিটেড মেম্বারকে
সঙ্গে সিটটা এসেচেন করে নিন না।’

কনকদির নিজের তরফে দেখলাম—এ নিয়ে
কোনো প্রশ্ন নেই। বললেন : ‘কি দবকার,
এই তো বেশ আছি। কাজ মোটামুটি চলে
যাবে। এ ঘরে না এলে তোমাকে এমন কাজের
করে পেতাম কোথায় ভাই?’

জানি না আমার মধ্যে তিনি-কী পেয়ে-
ছিলেন, কিন্তু তাঁর কথার জবাবে আর কিছু
একটাও সেদিন বলতে পারি নি।

একই ঘরের দুটো পাশাপাশি সিটে বসে

কবেও তাঁর গান্ধীর্ষকে অনেক সময় আমার
যেন কেমন ভয় হতো। মনে হতো—কেমন
যেন একটা বিচিত্র উপাদানে ঈশ্বর তাকে
গড়েছেন। ঠিক যেন একটা মোটাক, খেঁচা
দিলে মধু পেতে অসুবিধে নেই, কিন্তু কয়েক
এগিয়ে গিয়ে খেঁচা দিতেই লাগে। মাঝে
মাঝে খুব ইচ্ছে হতো—গল্প করি, বলি :
কনকদি, একটা গান শোনানি বা, অথবা কিছু
একটা আবৃত্তি। কিন্তু সেই মহুতেই অপাঙ্গে
তাকিয়ে দেখতাম—লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে
এক মনে বসে মেয়েদের পরীক্ষার খাতা দেখছেন
কনকদি। বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে আমি
নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। কখনও
হযতো ফিরে এসে দেখতাম—খাতাপত্র বুদ্ধিরে
বেশে জানালার বাইরে দু’ চোখের দৃষ্টি মেলে
দিবে কী যেন ভাবছেন তিনি। জিজ্ঞেস
করতাম : ‘খুব পরিচিত কাউকে বুদ্ধি হঠাৎ
মনে পড়ে গেল কনকদি?’

অকস্মাৎ সন্ধ্যা ফিরে গেলে অপ্রস্তুত
হবার মতো কণ্ঠে তিনি বলতেন : ‘না, না, হ্যাঁ
—মানে, তোমার কথাই যে ভাবছিলাম ভাই।
আমার কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে—তোমাদের
সঙ্গে আমি নিজেকে ঠিক মিলিয়ে উঠতে
পারছি না। আমার জন্যে নিশ্চয়ই তুমি খুব
অসুবিধে বোধ করছো।’

বললাম : ‘না, না, অসুবিধে আবার কি?
আপনি বরং কাজ নিয়ে থাকার আমি অনেকটা
বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে গেছি।’

কনকদি বললেন : ‘আমি চিরকাল কথা
বলতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু দেখতেই তো
‘পায়েচা, চাকরীটা এমন নিরোহিৎ যে, কথা বলবার
অবকাশ আর পেয়ে উঠছি না।’ নইলে—

—নইলে কি?’

—নইলে বাড়িতে বেশি কথা বলার জন্যে
কত সময় কত বন্ধুনি খেয়েছি। বগে আমার
মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে
দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন কনকদি।

এবারে তাই পাশ বেঁধে বসে পড়ে
বললাম : ‘বাড়িতে বুদ্ধি আপনারদের অনেক
লোক?’

কনকদি বললেন : ‘এককালে তাই ছিল,
তারপর ধীরে ধীরে এক সময় প্রায় সবাই ভাগ
হয়ে গেল। আমবা চার বোন—এক ভাই।
সবচেয়ে ছোট বোন পারুলের খণন চার বছর
বয়স, তখন মা মারা যান। বাবাও সেই থেকে
প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েন।’

জিজ্ঞেস করলাম : ‘ভাই-বোনের মধ্যে
আপনিই বুদ্ধি সবার বড়? না আপনার
উপরেও কেউ আছেন?’

এবারে কনকদির কি হলো কি জানি।
টেবলের উপর থেকে চািব গোছটে আমার
হাতে তুলে দিয়ে বললেন : ‘কণ্ঠ কবে আমার
সুটকেশটা একবার খোলো তো ভাই। ওর
ভিতরে একটা ডায়েরী পাবে।’

সুটকেশটা হযতো নিজেই উঠ গিয়ে
খুলতে পারলেন কনকদি, কিন্তু কি খোলা

হলো, আমাকে দিয়েই খোলালেন। ডায়েরীটি
তুলে আনতে গিয়ে অসাবধানে তার ভিতর
থেকে একটা ফোটা হঠাৎ মোকর পড়ে গেল।
দেখলাম—তাতে আমি যতটা না অপ্রস্তুত
হলাম, তাব চাইতেও বেশি লজ্জিত হসেন
কনকদি। একটা দিব্যকান্টি পুরুষের ফোটা।
—তুলে নিয়ে টেবলে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস
করলাম : ‘এই বুদ্ধি আপনার তাই?’

—না, ক্লাসমেট। আমরা এক সপ্তে
একই ইয়ারে পাশ করে বোয়িয়েছিলাম। বিদ্যুৎ-
ঘরণ ফাল্ট ক্লাশ পেরোঁচল, আমি সেন্ট্রাল
ক্লাশ।’ বলে একটুকালে ধামলেন কনকদি,
তারপর ডায়েরীকে একটা পুঁঠা খুলে আমার
সামনে এগিয়ে দিবে বললেন : ‘পড়ো।’

নীয়ে পড়ে গেলাম—

‘এম-এ পরীক্ষা দিয়েই সেবার জলপাই-
গুড়ি গার্লস স্কুলে একটা মাস্টারী পেয়ে
গেলাম। নিজের মনের দিক দিয়ে কোনো
সাদা পাই নি, তবু বাবার জন্যেই
চাকরিতে ঢুকলাম। বাবার মতে আমি
চাকরি ন্যু কবেল সংসার আয়গাঁবাব আর
বিত্তীয় লোক নেই। বাবার সঙ্গে
দাদা খুব একটা খনিবনা ছিল না; যিকের
পর প্রথম বাচ্চা হুইতই দাবা তাই সংসার
থেকে আলাদা হয়ে গেল। এমিকে বি-ও
পাশ করে নবিক; স্পট বুদ্ধিরে দিল—
দিদির জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে রাজী
নয়। এক সময় তাকে কাছে ডেকে
বললাম : ‘অপেক্ষা তেঁকে করতে হবে না,
কাকে তুই বিয়ে করবি বল, বাবুকা
করছি।’ মণিকা যাব কথা বললো, তাকে
বাদিও আমাদের বারুই পছন্দ ছিল না,
তবু সেই ফিল্ডকুমারের সংগেই মণিকার
বিয়ের ব্যবস্থা করলাম। দেন-বিদ্যোন্তে
বাদিও দাদা কিম্বা বোদি এলো না, তবু
কেহোভাবে হান্টা চুকে গেল। সাদ্ধনা
প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স পাড়ছিল। বাবা
বললেন : ‘পাবিস তো দেখে শুনে ওকেও
কারুর হাতে তুলে দে।’ কথটা আমাকে
বললেও বাবা নিজ থেকেই সেই চেষ্টা
করছিলেন। কিন্তু সাদ্ধনা ভিতরে ভিতর
যে এতটা এগিয়েছিল, কেউ ভাকতে পারি
নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে
এক সময় সে ও ডায়েরীর অবনীমোহনের
ছেলে-মণিমোহনকে বিয়ে করে দিবলো।
এবাবে সংসারে এইসময় আমি, বাবা আর
পাঙ্কজ। পারুলের বয়সটাও অল্প, পড়েও
স্কুলের নিচু ক্লাশে। ভাবলাম—ওকে যদি
অন্তত নিজের মনের মতো পড়ে ভুগতে
পারি!’...

পড়া শেষ করে ডায়েরীটা তাঁর হাতের দিকে
এগিয়ে দিয়ে বললাম : ‘আপনি বুদ্ধি নিম্নমিত
ডায়েরী লেখেন কনকদি?’

কনকদি বললেন : ‘পিলখতান, ওটা আমার

কিন্তু বেলা থেকে অভ্যাস, কিন্তু তাম্বুল আর চেন-মেনও নেই, সে সমস্তও নেই। অতীতের পৃষ্ঠা খুলে মাকে মাঝে তাই স্মৃতি-রোমন্থন করে আনন্দ পাই।

কিন্তু ডায়েরীর লেখা পড়ে মনে হলো না যে, কোথাও আনন্দ পাবার মতো কিছু আছে। বরং বিষয়টির কতকগুলো কালোছায়া সন্ন্যাসপেব মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অক্ষয়গুণকে ঘিরে। আর তার পাশে পরম সান্দ্রতার মতো আছে বিবাকান্তি বিন্দুবরণের - আলোক-চিত্রটি।

একটুকাল ধরে জিজ্ঞেস করলাম : 'তা—আপনি আর অবশিষ্ট-বিষয় করলেন না কনকদি?'

সঙ্গে সঙ্গেই এবার কথাটা জবাব না দিয়ে খাতাপত্রগুলো গুটিয়ে এক পাশে বাড়িয়ে করে রাখলেন কনকদি, তারপর একটু কাল আমাব মস্তকের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন। সমস্ত পেশাম দিয়ে ভাই।

বললাম : 'সে কি কথা?'

—'কথা তো সেই। কনকদি বললেন। আমাব চাকরি ছাড়া যেটা সংসারটা যেখানে আছে, যেখানে মণিকা আর সাইনাও আমাব চাইতে স্বাধীন, সেখানে নিজের বিয়ের কথা ভাববার আমার সময় কখন ভাই?'

এ কথার পর বোঝে কবি আর কোনো প্রশ্নই তোলা যায় না, তবু কনকদিকে তাঁর স্বাভাবিক গান্ধীজীর বাইরে আর হঠাৎ যেমন সহজ বদলে পেলাম, তাতে প্রাণপথে কথা কথ করে উঠে যেতে মন চাইল না। কনকদিও হয়তো কিছু বলতেই চেয়েছিলেন, কিছু বলে দ্বন্দ্বের উদ্ভাঙ্গন করতে চেরেছিলেন তিনি।

জিজ্ঞেস করলাম : 'আপনার বাবা কখনও আপনার বিশ্বব জন্যে চেষ্টা করেন নি? কোনো সমস্যা আসে নি কোথাও থেকে?'

—'এসেছিল। একজন সদ্য আই-এ-এস অফিসার, আর একজন বিজ্ঞানেশম্যান। কেনোটিই পাকা করেন নি বাবা। হয়তো এই ভেবেই করেন নি যে, আমি চলে গেলে মানদেব-নিষে বাবার কি করে চলবে।' বলে একটো একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে গেলেন কনকদি।

বললাম : 'তাই বলে চিরকাল আপনি একা থাকবেন?'

মান হেসে কনকদি বললেন : 'একা আর কোথায়? বেশ তো এককাল সকলের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম!'

বলতে যাচ্ছিলাম : 'একে কি কাটানো বলে?' কিন্তু তার আগেই এবারে পাট্টা প্রশ্ন করে বললেন কনকদি : 'তা তুমিই বা এ বয়স অবশিষ্ট এমনি করে হোস্টেলে একা পড়ে আছো কেন চন্দনা? বয়স পেরিয়ে গেলে বিয়ে করার আর কোনো অর্থ থাকে না।'

এবারে আমাকে বোঝা হয়ে যেতে হলো।

কি জবাব দেবো এ কথার? তবু বললাম : 'বাড়িতে বাবা-মা আছেন, তাইই দেখছেন।'

কথাটা হয়তো কনকদির ভালো লাগলো না, বললেন : 'দেখলে আর বাড়ি ছেড়ে এত দূরে এসে তুমি একা একা চাকরি করছো কেন? বিয়েব ব্যাপারে আমার মনে হয়, নিজের উদ্যোগটাও কিছু দরকার, বিশেষ করে চাকরিজীবিনী মেয়েদের।'

বললাম : 'এদেশে ছেলেতে আর মেয়েতে যে অনেক তফাৎ কনকদি।'

এবারে তাঁর কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠলো, বললেন : 'আর বোধ করি সৌদীন নেই চন্দনা। সমস্তকে আজ নতুন করে এগোতে হবে, নতুন করে ভাবতে হবে দেশকে, দেশের মানুষকে; নইলে ভেঙে-চুরে সব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

এ কথার কি জবাব দেবো, ভেবে উঠতে পারলাম না। সবসময় সব কথারই কি জবাব আছে, না জবাব দেওয়া যায়? একটুকাল চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করে বললাম : 'আপনাকে ছেড়ে আপনার বাবা আর পারুলের কষ্ট হচ্ছে না কনকদি?'

কনকদি এতটুকুও ইতস্তত করলেন না, বললেন : 'এ সংসারের কোনো কষ্টই আর আমার নেই। গায়ে বেশ পর্যাপ্ত হাত কখনো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বোধিতামার ডি-ফিলার-রেজাল্ট বেরলো। তার পরদিনই তিনি হার্টকেল করলেন; বাবার ঘণ্টা ঘূরকে আগে আমাকে একবার বললেন : 'তোব জন্যে আমি কিছু করে যেতে পারলাম না কনক; আমার ছেলে বলতেও তুই, মেয়ে বলতেও তুই, পারিস তো তুই যেন বিয়ে করিস।' পারুলের কথাটা হয়তো ইচ্ছে করেই তিনি উল্লেখ করলেন না, জানতেন—পারুলের জন্যে তার দিদি আছে। ওগদকায় স্কুল-বোর্ডিংয়ে ওকে ভর্তি করে দিয়ে ভবে আমি এখানকার রতনমণিতে এসে জন্মের করতে পারলাম। সেই সঙ্গে কাছের স্নেহ পেলাম তোমাকে।'

বললাম : 'বরং আমিই দূরবো, আপনাকে পেলাম। আপনার এ কাহিনী শুধু আপনারই নয়, গোটা বাংলাদেশের। এদের দৃষ্ট বণন মোটা দেশের চিত্রে ছড়িয়ে যায়, তখন দৃষ্ট আর দৃষ্ট থাকে না। হয়তো আপনারও নেই?'

—'নেই, সত্যিই নেই।' কনকদি বললেন : 'আমি যে এককাল নিজেকে হারিয়ে ফেলি নি, এই আমার পরম সান্দ্রনা।'

ইতিমধ্যে সুপারিনটেন্ডেন্ট মনীষা-ব্যানার্জী এসে হঠাৎ প্রবেশ করার আমন্ত্রণে কথা এখানেই থেমে গেল।

মনীষা ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করলেন : 'খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে কেনোব্যকম অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনার, মিস চৌধুরী? কখনও অসুবিধে বোধ করলে কমপেন্সন দিতে জানিয়ে দেবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ট নেবো।'

উত্তরে কনকদি কি বললেন, তা শুনবার জন্যে আমি আর অপেক্ষা করছি না, নিজের নিচে এসে বসে পড়লাম।

দিন দুয়েক বাদে এতদিন সন্ধ্যায় আমি অফিস থেকে ফিরে মোতলার উত্তার জন্যে কেবল সিঁড়িতে পা দিয়েছি, ইতিমধ্যে পিছন থেকে হঠাৎ কে একজন ডাকলেন : 'শুনুন।'

পিছন ঘিরে ডাকতেই শোকটিতে লম্বন করে প্রথম দশনই মনে হলো—একে আমি চিনি।

তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত না করে জিজ্ঞেস করলেন : 'এখানে কি ডক্টর মিস কনকলতা চৌধুরী থাকেন?'

বললাম : 'আপনি দেখা করত চন্দা তাঁর মূল্য?'

ভুললোক বললেন : 'যদি একবার খবরটা মেন।'

হোস্টেলের নিজের কোণের ঘরটা-ভিজিটাস' রুম। সেই ঘরে নিয়ে ভুললোককে বসবার জন্যে আমি অনায়াসে দিকে তাক করে দিতে পারতাম, কিন্তু তা না করে আমি নিজেই তাকে ভিজিটাস' রুমে নিয়ে গিয়ে বসে পড়া পাখাটা খন করে দিলাম। বললাম : 'আপনি বসুন, আমি দেখছি—উনি আছেন কি না। কি বলবো? বিদ্যাবরণবাবু দেখা করতে এসেছেন, এই তো?'

ভুললোক এবারে অবাক বিনম্রের আমার মুখের দিকে চোখ দুটোকে তুলে ধরলেন, বললেন : 'আমি তো এর আগের এদিকে বসনও আসি নি, আপনি আমাকে কি করে চিনলেন?'

মুখ টিপে হেসে বললাম : 'সত্যিই যেন কেমন করে চিনলাম। আপনি বসুন।' বলে আর একটুকালও অপেক্ষা না করে মোহো সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে গিয়ে কনকদিকে পেয়ে দিলাম। কিন্তু ভুললোকের নামটা ভাঙতে ইচ্ছে করলো না তাই কয়েক শব্দ খবর দিয়ে বললাম : 'নিচে আপনার জন্যে কে এক ভুললোক অপেক্ষা করছেন, এতক্ষণে আবার চলে গেলেন কি না দেখুন।'

কনকদি ক্রিষ্ণাঙ্কলেন। কাপে শেষ চুম্বক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

এবারে কি জানি কেন, আমার কৌতূহলটা ভীষণ বেড়ে গেল। কিন্তু দেখলাম—হুটো-খানেকের মধ্যেও কনকদি ফিরলেন না। তারপর যখন ফিরলেন, তখন কী ছেলেমানুষ। সোড়ে এসে দু'হাতে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন : 'তুমি রীতিমতো অবাধ করে দিবেছ চন্দনা, শুধু আমাকে নয়, বিদ্যাকেও। সৌদীন একটুবার শুধু অতীতে ফেরাটো দেখেছিলাম, তাতেই বিদ্যাবরণকে তুমি এমন করে চিনে ফেলতে পারল? আমার মূখে তোমার পবিত্র পেয়ে ভীষণ খুশি হলো ও। ছিল ফুটিবার কলসে, এবারে বদলি হয়ে এলো চন্দনগঙ্গা। আমি শুধু ডি-ফিল, আর বিদ্যাব ডি-লিট, পি-আর-



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জীবনের জন্ম
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উভোগ করবার জন্ম।

অগ্নিনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ম সাধনার
অব্যর্থ মহোষ্য প্রতিদিন আহারের পর
চুইবার করে চ'চামচ মুক্তসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) থাকেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সামান্য ঔষধমালার চাকা



অব্যর্থ তাঃ যোমেন চন্দ্র বোম, এম-এ,
আম্বের্শনশাস্ত্রী, এম.সি.এস. (ম-৩৩),
এম.সি.এস. (আমেরিকা), ভাংনপুর
কদম্বের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ণ
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র তাঃ যোমেন চন্দ্র বোম,
এম-বি, বি-এস, আম্বের্শনশাস্ত্রী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় বোম
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

এস। আমি কেন আজ আর ওর পাশে ছাড়তেই পারি না।

আমার মূখে কেন যেন এবার আর কিছু একটাও কথা এলো না। শব্দ নৃ চোখ ভরে কনকদিকে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে শব্দবন্ধন তিনি ছিন্ন করে নিলেন।

এবারে হঠাৎই যেন কেমন করে আমার মূখ্য দিবে বেরিয়ে গেল : 'বিশ্ববাসব্দর ফার্মিলী আছে : বিবে করছেন বিদ্যুৎ-বাসব্দ ?'

কনকদি বললেন : 'প্রশ্নটা মাথার ছিল না, নইলে জেনে নিতাম। বলতাম—চন্দনার শব্দ ভালো লেগেছে তোমাকে।'

বললাম : 'হান, কী যে বসে। আমার ভালো লাগালাগির প্রশ্ন এলো কিসে ?'

কিন্তু এ কথার আর জবাব দিলেন না কনকদি। নিজেব সিনে গিয়ে কি একখানি বই খুলে নিয়ে বসলেন। এই অবকাশে আমি গা ধুতে বাথবাসের দিকে পা বাড়লাম।...

এবপব বোধ করি করি মাস দু'রকও কাটলো না। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে তখন গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল। সকালে চা খেতে খেতে আমাকে লক্ষ্য করে একদিন কনকদি বললেন : 'কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি ভাই, স্কুল থেকে আরও সপ্তাহ দু'টোর জন্যে ছুটি নিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে আমরা নামে যদি কিছু চিঠিপত্র আসে, তুমি রেখে দিবে।'

বললাম : 'ইস—আপনার মতো একটা চাকরি যদি পেতাম, কি সুখেরই না হতো। কত ছুটি আপনাদের, তার আমদের সখ্যা বছর শব্দ কাজ আর কাজ।'

কনকদি বললেন : 'মার্চেন্ট অফিসগুলিতে তের্ভান মাইনে ভালো, আমাদের স্নে গড়ে বালি।'

বললাম : 'তা কেন হবে। আজকাল তো শুনিনি মাস্টার আর প্রফেসরদেরই দিন।'

—হ্যাঁ, দিন না হাতী। ব'লে উঠে পড়লেন কনকদি, তারপর গ্রীষ্ম অবকাশের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিলেন।

এবারে সারা ঘরটার নিজেকে নিয়ে বসে একা একা মনে হলো আমার। এখানে এসে অবধি নিজেকে এত নিমস্র কোনোদিন মনে হয় নি। আগে ছিলেন টোলফোনের গাররী মান্দাল, দিবা হাসিখুশি : তারপর এলেন কনকলতা চৌধুরী, যথেষ্ট গাম্ভীর্য রক্ষা করে চললেও বেশ আলাপী। দু'জনের সঙ্গেই গল্প করে আর কথা বলে খুশি হয়েছি। নইলে বোধ করি ডবল-সিটেড রুমে একটা দিনও বাস করা যেতো না। সিংল-সিটেড রুম হারা পছন্দ করে করত, আমার একটুও ভালো লাগে না; কেমন যেন গা ছম্‌ছম করে, রাগে ভাঙা করে ঘুম আসে না। পাশে কাউকে না পেলে রারিটা কেমন যেন বিভীষিকা মনে হয়। তাইতো এখানে এই ডবল-সিটেড রুমটা খুশিমনে বেছে নিয়েছি। হঠাৎ কনকদিও তাই।

কিছুদিন বাদে সকালের ভাতের হঠাৎ একদিন তার এক চিঠি পেলাম। দেবাদুনের ঠিকানা। সারা কলকাতা মাত্র কয়েকটা লাইন। লিখেছেন : '... দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে তিনটে সপ্তাহ কেটে গেল, টেরই পেলাম না। রোদের তাপ শব্দ প্রবল, সন্দেশ নেই, তবু গরমেরও যে একটা মাদকতা আছে, ইতিহাসের নানা পথ ছুঁয়ে যেতে যেতে তা অনুভব করছি। কবে ফিরবো, এখনও ঠিক কবি নি। আপাতত মসৌবী রওনা হচ্ছি। ওখানে গিয়ে তোমাকে একটা ভালো ছবি পাঠাবো। ইতি—'

চিঠি পড়ে ভাবলাম—আমার কাছে দেবাদু—মসৌবী তো চিরকালের স্বপ্ন, তবু কনকদি ছবি পাঠালে অন্তত তা দেখেই ভ্রমের আনন্দ অনুভব করে কিছু স্বাস্থ্য পাবো।

ছবি পেতেও দেরি হলো না। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম ছবির দিকে তাকিয়ে। দেবাদু বা মসৌবীর কোনো দৃশ্য নয়। মসৌবীর পাহাড়ের বিদ্যুৎবল্লভের সঙ্গে কনকদির বিয়েব ছবি। চার্লসের এন্স এতদিনে তবে ঘর বাঁধার অবকাশ হয়েছে। সঙ্গে একটা নীল লেটেরপ্যাডের কাগজে লিখেছেন : 'তাই চন্দনা, জানি এ ছবি পেয়ে তুমি অবাক হবে। তবু তোমাকেই শব্দ পাঠানো গেল। আমার পক্ষে বিদ্যুৎবল্লভ সহযোগী হয়েছিল। জেনে বিশ্মিত হয়েছিলাম যে, সে এতকাল আমারই জন্যে অপেক্ষা করেছে। তাকে তাই আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হলো না। তোমাকে নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। বাকী কথা গিয়ে সব বলবো।

ইতি—কনকদি।'

ছবিটা ভেবেছিলাম লুকিয়েই রাখবো, তারপর কনকদি ফিরে এলে একটা ফোটেস্ট্যান্ড লাগিয়ে কনকদিকেই আবার উপহার দেবো। কিন্তু সেই শব্দতেই করুণা বিশ্বাস আর রমলা গান্ধী এসে হৌ মেরে ছবিটাকে টেনে নিয়ে সারা হোস্টেলে হেঁটে শব্দ করে দিলে। হাসতে হাসতে এসে সুপারিন্টেন্ডেন্ট-মনিষা ব্যানার্জী বললেন : 'বাসন্ত, দেখিয়ে দিলেন বটে মিস চৌধুরী। এবারে এলে হাঁড়-ভর্তি মিষ্টি আদাম না করে ছাড়ছি না।'

কিন্তু সেই মিষ্টিমুখে মিষ্টিহাসির দামটাই বা কে দেবে সংসারে? নানা পাহাড়-অরণ্য ঘুরে, ছুটি যতদিন নিরোহিৎসন—তাব পুরো পদবি ভোগ করে তবে একদিন যমীর প্রথম বর্ষে ফিরে এলেন কনকদি। লগাটে সিংহুর-চাঁদের টিপ, সীমন্তে তার রক্তিম পশা। তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এলাম, ব্রোডারদের ভিত্তি ভরে গেল ঘরটা। সে হেড-মিস্ট্রেস স্কুলের ছাত্রীদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে ডোলেন, তাঁকেই নানা প্রশ্নে এবারে বিভ্রত করে তুললো সকলো। কনকদির সেই গাম্ভীর্য দেখলাম আজ তার

মুখ থেকে একেবারেই বসে গেছে। সবাইকে নিজের হাতে মিষ্টি আর চা খাইয়ে দিলেন তিনি, কিন্তু একটা দিনও আর হোস্টেলে অপেক্ষা করলেন না কনকদি। শব্দলাল বিদ্যুৎ-বল্লভবাস চন্দনগরে নতুন কোয়ার্টার পেয়েছেন। সেখানেই কনকদির নতুন সংসার রচনা।

বললেন : 'গিয়ে কিছুটা গোছাছা করে নিই, তারপর তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো ভাই। চাকরীটা রাখতে গিয়ে আপাতত আমাকে তো ডেলিপ্যাসেসবাবী করতেই হবে, পরে দেখেশুনে যা হোক কিছু-একটা ব্যবস্থা করে দেবো।'

কি জবাব দেবো, কি জবাব দিতে পারি কনকদিকে? শব্দ বললাম : 'কনসালেশন।' হেসে কনকদি বললেন : 'থ্যাংকস।' তারপর তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এক-সময় গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে রইলাম জানালা দিয়ে। মনে পড়লো কনকদির সেন-দিনের কথাটা : 'বুকের ব্যাপারে আমার মনে হয় নিজের উদ্যোগটাও কিছু দরকার, নির্দেশ করে চাকরিজীবনী মেরেদেয়। আর বোধকরি সোদিন নেই চন্দনা। সমাজকে আজ নতুন করে এগিয়ে হবে, নতুন করে ভাবতে হবে দেশকে, দেশের মানুষকে; নইলে ভেঙেচুরে সব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

অনেক অভিজ্ঞতার অনেক খাটি কথা বলিছিলেন কনকদি। এই সূত্রে এতদিনে আজ এই প্রথম অভ্যস্ত স্পষ্ট করে অনুভব করলাম আমি নিজেকে। জীবনে আমারও হঠাৎ একদিন প্রেম এসেছিল। সোদিন তরুণকুমার আমার জীবনে যতখানি সত্য ছিল, আজ হঠাৎ তাতোখানিই মিথ্যা হয়ে গেছে। এই সত্য-মিথ্যার ইতিহাস আমি ভিন্ন এ সংসারে আর কেই বা জানলো? সে যেমন কোনোদিন বিদ্যুৎবল্লভ হতে পারেন নি, আমিও হঠাৎ তের্ভান পারি নি কনকলতা হতে। এ হোস্টেলেই খাতার নাম লিখিয়ে তাই শব্দ দশটা-পাঁচটা অফিস করছি, আর নানা ইতিহাসের ইতিবৃত্তে সকাল-সন্ধ্যা নিজের মধ্যে কেবল কৌতূহলের উজ্জ্বল শিখটাকে জ্বাগিয়ে রাখছি।

‘তুলাব চা’

তাজা ও সর। একবার
থিয়ে দেখুন।

৪৬নং ক্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

শ্লেভাভিক্সর পাহাড় পাহাড়—
মিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এভারেস্ট
বুক হাউস, এ ১২ এ কলেজ স্ট্রীট
মার্কেট, কলিকাতা-১২। দামঃ ৫.৫০।

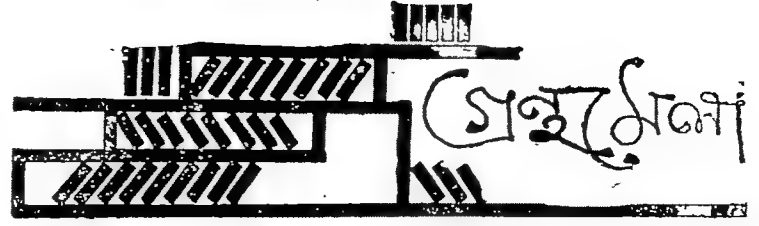
বড়দের হাতে লেখা কচকচে
রাজনীতির বই এটি নয়, কচি হাতের
এক্কেবারে পাল লেখা। আমাদের
দেশেরই একটি ছেলে চেকোস্লোভা-
ক্সার একটি ইন্সকুলে পড়ার সময় এক
মাসের ছুটিতে চেকোস্লোভাক্সার
মাঠে, কারখানায়, পাহাড় বেড়াতে
বেড়াতে কিভাবে শ্লেভাভিক্সকে বড়ের
মাঝারে নিতে পেরেছিল, তারই অপরূপ
বিবরণ আছে ২২৪ পৃষ্ঠার এই
বইখানিতে।

মিতেন্দ্রলাল বয়সের মাপকাঠিতে
বাংলা দেশের স্নিক্ততম লেখক, কিন্তু
তার বলিষ্ঠ ভাষা, বলার ভঙ্গি,
নিখুঁত বর্ণনা যে কোনো নামকরা
লেখকেরও এক নিম্নে বিস্মিত করে
দেবে। মিতেন্দ্রলাল দু'চোখে দেখা
শ্লেভাভিক্সার কথা লুকিয়ে লিখেছিল
কলকাতার আর শান্তিনিকেতনে বসে।
একদিন তার পান্ডুলিপি প্রকাশ হয়ে
পড়ল। আমরা মনে করি প্রকাশ হয়ে
পড়া দরকার ছিল, নচেৎ এমন একটি
চমৎকার বই আমরা কেনোদিনই
পেতাম না। মিতেন্দ্রলালের বয়স কম।
তবু তার দেখার চোখ অসামান্য, আর
তার মনের ভালবাসা অফুরন্ত। তাই
কমলার খনিয় অদ্ভুত বর্ণনাতেই তার
কথা শেষ নয়, সেখানে হাজির হয়েছে
প্রমিকদল—যারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস
করছে শ্লেভাভিক্সার। ভেড়ার
খোঁয়াড়ে যে রাখালরা দুধ দেয়, তারা
হাতে তুলে দেয় ছানা। এমন কি চাঁজ-
এর পুতুল পর্বন্ত। আমাদের সবচেয়ে
আশ্চর্য করেছে নানারকম গুহার
বর্ণনা। বই পড়তে পড়তে মনে হয়,
আমরা যেন আশ্চর্য সব গুহায় ভরা
সেই দেশে গিয়ে পৌঁছে গেছি।

চেকোস্লোভাক্সার গ্রামের মান-
ুষের অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার, তাঁদের
জাতিতে কোনোদিনই ভুলবার নয়,
তেমনি তাঁদের পোশাক-আশাকও
কম বিচিত্র নয়।

মোটকথা, মিতেন্দ্রলালের বর্ণনায়
মানুষ, পাহাড়, খনি, কারখানা,
কোলানো ট্রেন সবই চোখের সামনে
ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে আমরা মন্থ
হই—যখন দেখে চেকোস্লোভাক্সার
মানুষ ভারতীয়দের কতো ভালবাসে।

এই সুন্দর বইটির জন্য কোন
রকম প্রশংসা ন্যপ্রয়োজন। এ দেশের
ছেলেমেয়েদের, এমন কি বড়দেরও
হাতে তুলে দেবার জন্য এমন বই যে



লিখতে পারে, তাকেই বা দিতে পারি
আমরা কি পুরস্কার? কতগুলি ছবি
বইটির কাহিনীকে আরো মনোরম করে
তুলেছে। প্রচ্ছদপট সুন্দর।

পারিবারিক পোষ্টারী — শ্রীশান্ত
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এন্ড কোং,
৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
দাম : চার টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত
হওয়ায়, সহজেই এই বইটির গুরুত্ব
ও জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। এই
সংস্করণে এমন অনেক বিষয় লিখিত
হয়েছে, যা পূর্ব সংস্করণে ছিল না।
দ্বিতীয়ত প্রথম সংস্করণে লিখিত
সংক্ষিপ্ত বিষয়কে স্পষ্টতর করা হয়েছে।

পারিবারিক প্রয়োজনে যাঁরা
মুরগী পালন করতে চান, এ বই তাঁদের

জয়ন্তী সেন

কাজে লাগবে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে
যাঁরা মুরগী পালন করতে ইচ্ছুক
তাঁরাও এ বই থেকে উপকৃত হবেন।

বইটি পরিশিষ্টসহ সাতটি অধ্যায়ে
১৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মুরগীর ঘর
ও আনুষঙ্গিক সাজ-সজ্জা, খাদ্য, বাচ্চা
পালন, জাতি নির্বাচন, ডিম প্রভৃতি
বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত নজ্ঞা ও ছবি-
সহ আলোচনা করা হয়েছে। এই
বইটির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হচ্ছে “রোগ,
তার প্রতিবিধান এবং আরোগ্য
বিধান।” হাঁস পালন সম্পর্কে পাল-
নীয় বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দেশে যখন খাদ্যাভাব ও ডিম,
মাংস প্রভৃতি অস্বাভাবিক দরজ
তখন পারিবারিকভাবে মুরগী ও হাঁস
পালন করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন
সিদ্ধির জন্য এই বইটি মূল্যবান
সহায়করূপে পরিগণিত হবে।

অমৃতানুভব ও চাঙ্গাদেব-পাসটি
—জ্ঞানদেব বিচিত্র, অনুবাদক :

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন। সাহিত্য অকাদেমী,
নিউ দিল্লী। দাম : আট টাকা।

ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের
অনুবাদ-কর্ম বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর
পাঠকদের গোচর করাই সাহিত্য
অকাদেমীর একমাত্র উদ্দেশ্য না হলেও,
এই উদ্দেশ্যটি যে পরস্পর সহযোগিতা
ও ভারতীয় ভাষাসমূহের পরিপূর্ণ
সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তা
বলাই বাহুল্য। উপর্যুক্ত গ্রন্থটি মারাঠী
ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা
হয়েছে। অনুবাদের সঙ্গে বাংলা হরফে
মূল মারাঠী শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত
করা হয়েছে। ফলে মূলের সঙ্গে
অনুবাদ মিলিয়ে রসগ্রহণ মধুরতর হয়।
যেমন : “স্বা-পুরুষ নামভেদে”
শিবপণে যে কলে নান্দে।”

জগ সকল আধাধে। পণে জিহী
অর্থাৎ, স্বা-পুরুষ নামভেদে এক
শিবই বিরাজমান, সমস্ত জগৎ ইহা
দের অর্ধাধাভাগে ভরিয়া আছে।

প্রসঙ্গত, এই উদাহরণ-এর সাহা-
যেই প্রমাণিত হয় যে, অনুবাদে
শ্রীসেন সত্যিকারের সাফল্যলাভ
করেছেন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থটি দুই অংশে
বিভক্ত। প্রথমার্শে, ‘অমৃতানুভব’। এর
শ্লোক সংখ্যা ৮১২। এতে বিশদ
অশ্বতত্ত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে।
দ্বিতীয় অংশে ‘চাঙ্গাদেব-পাসটি’।
শ্রীচাঙ্গাদেব নামক সমসাময়িক এক
মহারাজার যোগীবরের উদ্দেশ্যে
জ্ঞানদেব যে ৬৫টি শ্লোক রচনা করে-
ছিলেন, তা নিয়েই ‘চাঙ্গাদেব পাসটি’।
এই অংশেও তত্ত্বের কথাই বর্ণিত।
পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবের ব্রহ্মের সহিত
অভিন্নতার বিষয়ক তত্ত্ব এই অংশে
প্রতিপাদিত হয়েছে।

সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত
এই গ্রন্থটি জ্ঞানগণ কর্তৃক অবশ্যই
সমাদৃত হবে। ছাপা ও বাঁধাই বিশেষ
প্রশংসনীয়।

অমিত্রবিলম্বী সত্যনন্দ

স্বাধীনতা স্তম্ভে

৮ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল। বালেশ্বর।
চারিদিকে কানায়কোণ রটে গিয়েছে।
বাঙালী ডাকাত এসেছে এ-অঞ্চলে উপদ্রব
করতে। সবাই বেন সতর্ক থাকে। ডাকাতদেব
ধবে দিতে থাকলে বহু হাজার টাকা পুণ্ডরিক
পাওয়া যাবে।

বালেশ্বর স্টেশনের তিন মাইল উত্তরে,
জগন্নাথ ট্রাক্ট রোডে অবস্থিত বড়বালায়
নদীর খেয়াঘাট থেকে শুরুর কবে গোটা এলাকা
সশস্ত্র পুলিশে ছেলে গিয়েছে। স্টেশনও
সশস্ত্র পুলিশ এবং সাদা গোষাকে গোয়েন্দারা
ঘোরাঘুরি করছে।

ভোর-বাত। কান-পক্ষী জাগে নি তখনো।
যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন বালেশ্বর স্টেশনে।
সঙ্গীবাণ ছাড়া-ছাড়াভাবে চলছেন সঙ্গে।

অপেক্ষমাণ একটা ট্রেন-তাত্তাতি টিকিট
কেটে তাঁরা গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল একটু বাদেই।

কিন্তু, যতীন্দ্রনাথের খটকা লাগল। এত
কিছু ট্রেনের অনুপাতে যাত্রী-সংখ্যা যেন নেহা
কম। ভাল কবে লক্ষ্য কবে বুঝে দেবি
হল না—এ-ট্রেনের সব বাতাই প্রায় ছন্দবেশী
পুলিশ।

যাত্রীদের ক্রান্ত চোখে তখনো ঘুম
ছড়ানো।

ইঙ্গিতে নির্দেশ ছাড়িয়ে দিলেন যতীন্দ্র-
নাথ। পিচকনেই অংশে অংশে নেমে পড়লেন
গাড়ি থেকে। টিকিট ছিড়ে ফেললেন।
স্টেশনের চৌহদ্দি পেঁচিয়ে গিয়ে তাঁরা বেল-
লাইনের পশ্চিম দিকে ধানক্ষেত পার হয়ে
শহর ছাড়িয়ে পাড়ি দিলেন মেঠোপথে।

হবিপুর গ্রাম পার হয়ে সশিষ্য যতীন্দ্র-
নাথ এগিয়ে চললেন বড়বালায় নদীর তীর-
বাবা। অনিষ্টর অনাহারেও বিপ্লবী মহা-
নাথর আব তাঁর শিষ্য-চতুষ্টয় এগিয়ে চলেন
অস্বাভাব্যে।

৯ই সেপ্টেম্বর। ১৯৫৯ সাল।

ডোবেব আলো ফুটতে এখনো অনেক
ঘোঁরি। পূর্ব-স্বাক্ষেপে জমাট অন্ধকারের বৃকে
জেগেছে ঈষৎ শব্দভার স্পন্দন। পবন
প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে উড়িয়া। ঘুমিয়ে
আছে বাংলা। ঘুমিয়ে আছে আসন্ন
হিমালয়ের জনগণ।

ঘুমিয়ে আছে যতীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র—
কিনাইদা। ঘুমিয়ে আছেন সেখানে যতীন্দ্র-
নাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী। আছে
তিনটি নবালক সন্তান : অশালত, ভেঙ্কট-
নাথ, বীবেন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে আছেন যতীন্দ্র-
নাথের মৃত্যুসমানা সহোদরা, বিনোদবালা দেবী।
বিনোদবালা স্বপ্ন দেখছেন।

বিনোদবালা দেখছেন : অনন্ত আলোকের
পাখার এসে প্রাণিত কবে দিচ্ছে জীবনের প্রতিটি
কোষ, অণু, পবমান। আলোর আলোর বিহীন
বিভ্যমো পৃথিবী।

আলোর আলোর নির্বীচল আকাশ,
দিগন্ত।

তার—সেই আলোর অকপন উৎসবমুখর
দিগন্তে দেখা দিলেন এসে—সমস্ত আলোর
কেন্দ্রস্বরূপ জ্যোতির্ময় এক পুরুষ : অস্বে
তাঁর পীতবাস। নবদুর্বাদলশ্যাম বর্ণ।

বিনোদবালা অস্তরের অভ্যন্তরে স্পন্দন
জাগিয়ে—অস্তমতলের গহনে গহনে স্নেহের
নির্ঝরিত থেকে নির্ঝরিত মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত
কবে, সেই মূর্তি দাঁড়ালেন এসে বিনোদবালায়
সামনে।

কে? ... কে তুমি? ... কে তুমি জ্যোতির্ময়
সুন্দর? ...

নমস্ত সন্তা তাঁর ধবধব কবে কেপে
উঠল। কেপে উঠে মধুস্রাবী উপকরণের
পরিচিত সন্ধ্যায়ে :

‘দিদি!’

জ্যোতির্ময় পুরুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়
বিনোদবালায় দৃষ্টিব ওপরি। বিস্মিতা হন
বিনোদবালা দেবী।—একি, এ-বে যতি! ...
এ-বে জ্যোতি! ... এ-বে তাঁরই প্রাণের নিধি
যতীন্দ্রনাথ!

জোড়-কবে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন এসে
দিদি বিনোদবালায় সামনে। জোড়-কবে
গিনতি জানালেন জ্যোতির্ময় পুরুষ :

‘দিদি!—এ-কল্পের মতো বিদার দাও
আমায়। শেষবাবের মতো ভোমসাদের দেখতে
এলাম।’

শেষবাবের মতো? শেষবাবের মতো দেখতে
এলি?—চকিতা বিনোদবালা দেবী আকুল
হবে হাত বাড়ান, কোলে টানতে চান স্নেহের
আইটিকে। তাকে স্নেহে দিতে হবে? নাহে,

না, না! ... আরো কাছে আর ডাই! কাছে
আর—

কিন্তু, কই? ...

পূর্ণরঙ্গ নাবারদের মূর্তিতে বিলীন হয়ে
যায় যতি। বিলীন হয়ে যান যতীন্দ্রনাথ।
বিলীন হবে যার বিনোদবালা দেবীর জীবনের
সমস্ত জ্যোতি! ...

অন্ধকার! ... সূচীভেদা নির্মম অন্ধকার! ...

ভুক্তির কেপে ওঠেন বিনোদবালা : নাহে,
না, তুই বাসনে বাসনে—

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে বিনোদবালা
দেখেন : অকোষ অশ্রুতে ভিজে গিয়েছে বালিশ,
ভিজে গিয়েছে বুক, পিঠ, চাদর। আর বিহুলা
ব্যাকুলা ইন্দুবালা চিত্রাঙ্গিতের মতো এসে
কসেছেন পাশে। তাঁরও প্রতীক্ষানত দুই চোখে
অনর্গল অশ্রুধারা! ...

বিনোদবালা সংবিধি কবে পান। অন্ধ-
সম্বরণ ববে নেন। কিন্তু ইন্দুবালাকে এড়ানো
যায় না। ইন্দুবালা প্রশ্ন করেন, “কী দিদি?
কী হয়েছে? অমন করছিলেন কেন? ...”

বাথার বিক্ষুব্ধ সাগর নিমেষে নিম্পন্দ
স্ফটিকের রূপ নেন। চোখের জল চোখেই
থেকে যায়। হাসবার চেষ্টা কবে দিদি
কলেন, “আবে পাগলি, আমার কথা আবে
বলিস কেন? হবে আবার কী? হাতটা বোধ-
হয় বেকায়দার পড়ে গিয়েছিল, নিশ্বাসের কষ্টে
অমনধারা কনছিলাম! ...”

ইন্দুবালা দিদির আবে জেবা করেন না।
মনে পড়ে যায় পবমাবাধ্য স্বামীর পত্রাংশ,
“ক্ষণিক দুর্বলতা সকলেই আসিতে পারে;
সেবুপ অবস্থায় দিদির সাহায্য কবিও ও
তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিও। ...”

ছেলেদের গায়ের চাদরটা ঠিকমতো করে
জড়িয়ে দিয়ে ইন্দুবালা চলে যান দৈনন্দিন
গৃহকর্মের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখতে।

আবে দিদি—চুপি চুপি চোখের জল ফেলতে
ফেলতে উঠে যান কবিতার খাতা হাতে। গিয়ে
নির্জন চিলেকোঠায় খাতা খুলে বসেন।

লেখনার মূখে বেঁচে আসে সুদীর্ঘ
কবিতার নিকর। লিখতে লিখতে দিদির
চোখের জল বাধা মানে না : *

* সত্য ঘটনা, আশা করি বলা বাহুল্য
—যতীন্দ্রনাথ

(এক) সর্বাপেক্ষা অগতঃ অপার
মুখ্যতঃ সার মুখ্যতঃ রে

(জিন) মীলোৎপাদন প্রভা নিয়ম
শ্যামল বরণ ভাতি রে।

(তাহে) ঘোর শীতবাস কোটি চন্দ্রাভাস
নেহারি বদন জ্যোতিরে।

(আজ) কি হলনা হরি! বৃকিতে না পারি
কি দিব্য মধুরী হেরি এ;

(নাহি) শশ, চন্ড, গদা, কবে পশু কোথা,
(হেরি) নারায়ণ-রূপ একি রে?

(কিবা) 'মতি' কহুবার যত্ন বৃটি কর
(কহে) মন আশারে তিতি রে।

(দ্বিদি) জনমের তরে বিদায় দাও মোরে
(আজ) স্বেচ্ছা প্রাপের জ্যোতি রে।

(বলি) 'আর! কোল আর!' ধরা নাহি পাই
চাকিতে লুকালি কোথা বে?

(হেরি) একি অগতঃ নারায়ণ রূপ
কেন আজি মোর জ্যোতি রে?

নিশা শেষে হেরি একি স্বপ্ন চমৎকার
পূর্ণরশ্মি নারায়ণ জ্যোতি একাকার?
তবে কি সে মহাক্তর নাই এ-ধরার?
প্রাণাধিক ভাই মন সত্য কিরে নাই?
উঠিল রে-কারি প্রাণ স্বপ্ন অবসানে
আর কি সে হামনিধি পাব না জীবনে?
ভাই সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে
মণিহাবা কণী আমি সে জাতি-বিহনে।
তোমাহারা দিশাহারা ছুটিয়া বেড়াই
কোথা গেলে পাব তেরে প্রাণাধিক ভাই?
বীবের জীবনরত সাধি এ ভারতে
জীবনের নবরত দেখয়ে জগতে
সত্য কি অমরধমে গেল চলি ভাই?
মায়ামুহ প্রাণ বল শান্তি কোথা পাই!
একান্তে তুমি মোর সংসার আশ্রমে
কেমনে রহিব হেমা তোমার বিহনে?
নিশিদিন কাদে প্রাণ তব গুণ স্মরি
কেন ভাই গেলে মৃত্যুরে একা পবিত্ররি?
অশেষ বসন্তী তুমি প্রাণের সোদর।
একসাথে লজিলাই মায়ের আদর,
এক মাতৃস্তন্য-সুখা গিবে প্রাণ ভরি
পবিত্র জীবন মেলা এ ধরার ধরি।
একসাথে ধলাধেলা কবেছি দু'জনে
একসাথে লতি শিক্ষা জননী-সদনে,
একসাথে পিতৃহারা শৈশব-সময়ে,
একসাথে মাতৃশোক লভেছি উভয়ে।
গৃহী করি তোমা আনি গৃহলক্ষ্মী ঘরে
পশিলাম কৃত সুখ-সংসার-আগারে।
গৃহধর্ম একসাথে করেছি সাধন,
নির্লিপ্ত সংসারী তুমি, সাধনার ধন।
মায়ার বাধনে কহু বাধা না পাড়িলে,
বিবেক-বৈরাগ্য সহ সংসার কবিলে।
আসক্তিবিহীন শূন্য মেহময় প্রাণ,
মমত-স্বাধীন চিত্ত উদয় মহান।
স্বার্থহীন ভালবাসা পবিত্র অন্তর,
আত্মজনে দয়া, দীনহীনে দান আর

জীবনের নিত্য রত পূর্ণ-উপকার
ছিল যে উষ্মত প্রাণে সাধনা তোমার।
অনিভা সংসার লীলা জ্বালিয়ে অন্তরে,
মুক্তিপথে চলেছ রে নিরন্তর-তরে।
সর্বজরী আশ্রয়ী প্রসন্ন-মুখিত
সত্য সরলতা মাথা উদার প্রকৃতি।
সুবিদ্যাল কক্ষেরে কর্তব্য সাধিতে,
আশ্রয়ী সিন্ধুস্রোত বিদ্যাশিক্ষা হও,
সুদৃঢ় সম্প্রদায় ভরা প্রশস্ত হৃদয়
সাহস উদয়পূর্ণ সদা কর্মময়,
অসামান্য বল-বীর সহ হৃদি-বল
কষ্টসহিষ্ণুতা মৈত্রী লভিলে সকল।
শৈশব জীবন হতে বিধাতার দয়া,
ভোগস্পৃহাশূন্য প্রাণ, সদানন্দ হিয়া,
শিষ্টমাত্র-সেবা সুখে বঞ্চিত জীবনে,
বিশ্বসেবা-রত্নে ততী ছিলে প্রাণপ্রণে।
রোগী, শোকী, দুঃখী তরে সদা তব প্রাণ
কারিয়ারে অকাতরে, দেহ দেবা, দান।
মৌনে অকাল্পা উক্ত পদবিলে অন্তরে,
আশা না পুড়িল তব বিদ্যাশিক্ষা করে।
সত্য শিক্ষার্থী তরে সক্রিয় প্রাণে
শিক্ষা বিধানিতে অর্থ দানিলে যতনে।
বলিতে উন্নত চিন্তা-আমার সংসার
কল্প গৃহে নহে শূন্য, জগৎ আমার।
অমিয়-পুত্রিত সেই সুমধুর কথা,
আর কি শুনিল ভাই, বাবে হৃদি-বাধা?
অহর্নিশ বাজে প্রাণে স্মৃতিব লহরী,
তোমাহারা সেই গৃহে, রহিল সংসারী।
মানব-জন্মের সার — ইন্দ্র-সাধনা,
সাধিলে অন্তরে সেই সত্য-উপাসনা,
পুণ্য পবিত্রতা শান্তি সুবিস্তৃত পথে
চন্দ্র-করিলে ভাই লবে সাথে সাথে।
ইন্দ্রে নিভব সদা, আশ্র-সমর্পণ
শিখিলে জীবনে, বাপি' কঠোর জীবন।
দুঃখিনী ভাবত-মাব দুঃখ-বিমোচনে,
কত না কবিলে বর অকপট-প্রাণে।
সত্য গৌরবে চলি মৃত্যুর সোপানে
বাথিলে অমব-কীর্তি আশ্র-বিসর্জনে।
উৎসাহ উদয় ভবা কী নিভীক চিতে
হৃদয়ে জীবন-ভরি বিপদের সাধে।
তোমা হেন দ্রাক্ষর বহু পুণ্য-ফলে
লভেছিলাম, ভাগ্যদেবে হারাই অকালে।
অমর বাঞ্ছিত তুমি, চিনি নাই?
সেই অনুভূত আজি মনস্তাপ পাই।
কর্তব্যের গুরুভাব লবেছি মাথায়
মায়ার নিগড় পরিঘাট দূর পাব।
তব শোকানন্দ হৃদে জ্বলিছে প্রথম,
ভীষণ পবীকামর জীবন আমায়।
সবলে চলিতে ভাই প্রতি পদে পদে।
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে মহা অবসাদে।
তুমি ত জীবনে দিলে উপদেশ কত,
এবে দাও শক্তি : বহি গুরুভার যত।
পরমেশ-প্রিয় তুমি, তাই মিলি কোলে
তোমা ধনে আজি তিনি লয়েছেন তুলে।
লও ভাই তাই পদে যাচিরে করুণা
মোর ভরে, দাও বল সাহিত্য-যাতনায়।

ইন্দ্র যে দুঃখিনী আজি তোমার বিহনে
দাও শান্তিবারি তার নিত্য-দক্ষ প্রাণে।
অনর্থ সংসার-জ্বালা তুলি সে জীবনে
পায় যেন চিরন্তন আরাধ্য-রতনে।
চেরে মোর জ্যোতিহারা ইন্দ্র-মুখপানে
শতধা বিদীর্ণ হিয়া খেঁবব না মনে।
তিনটি গচ্ছিত রত্ন সমীপে তাহার :
দিও শক্তি উপযুক্তরূপে পালিবর।
উহাদের মুখ-চাহি কারি দলে হৃদয়
উপদেশ-বাণী তব মনে যেন হয়।
দ্বিদি।
এ-জগতে হা হুতাশ অনেকই করে,
কর কাজ কর্মক্ষেত্রে বৃকে বল ধরে,
বিফল রোদনে কাল না করি ক্ষেপণ,
নিয়ত শ্রীগুরুপদ কবিত্ব সম্বরণ।
বাহার ইচ্ছা হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাহারই ইচ্ছায় যে জন মিলার
তা'থাকে অভাব তার শোক তাপ নাই।
—আব কি সে-কথা কহু শুনব না ভাই?
উন্নত জীবনরত যতীন্দ্র আমার।
বরেক দেখাও ওই স্বর্গীয় আকার।
স্বপ্ননে হেবিন্দু ভাই যে-মুখিত চিন্তা
সেইরূপে ভাই-রূপ হয়েছ কি লীন?
মুক্তি হেতু কবে নর কঠোর সাধন
আজি করতলে তব সে-অমূল্য ধন।
ধন্য ভাই তুমি মন ধন্য মোর পিতা,
তোমা হেন পুত্র ধবি ধন্য মোর মাতা,
বংশের গৌরব তুমি, তব বংশধর
তব কীর্তি স্মরি ধন্য হবে নিবলতব।

৯ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৬ সাল। ২০শে
আগ, ১৩২২।

বালেশ্বর।... বড়বালায় নদী বড়।
আকাশ মেঘে ঢাকা। অবিপ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে
টিপ্-টিপ্ করে।

গৌবিন্দপুর গ্রামের কাছাকাছি এসে
যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা আটকা পড়েছেন।
ভাদ্র-শেষের ভবা নদী। মাঝিরা পার করে
দিতে নারাজ। বলে : সবকালের হুকুম নেই
নদী পার করে দেওয়া।†

কিন্তু ততক্ষণে একটা মাঝির খেয়াল হইল
সে তার সঙ্গীদের উকে দিল : এবাই নিশ্চয়
বাতালী ডাকাত। এদের ধবে দিলে একর
বহু টাকা দেবেন।

গৌবিন্দপুরের আধ-মাইলটুক দূরে সানাই
সাহু এবং বৃন্দাবন মোহান্তি ঘাটে বসে মাছ
ধবছিল। সানাই সাহু ভাই বাবু সাহু
বালেশ্বর থেকে বাতালী ডাকাত আগমনের খবর

* আনন্দবাজার পত্রিকা—যতীন্দ্রনাথ স্মরণ-
সংখ্যা, (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল)—দ্রষ্টব্য।

† পরবর্তী বিবরণগুলি অধিকাংশই
সরকারী রিপোর্ট থেকে নেওয়া।
T. S. Macpherson (L. C. S.)-
এর রায় দ্রষ্টব্য।

এনে ছাড়ি দি'মিছিল এবং ফুলারি ঘাটের পলিশ চৌকীসের কাছেও গেলেন।

তারা বাঙালী ডাকাত শ্রমকে এসেছে। অপরূপদের সংখ্যা পচিজন এবং দু'থেকে বাংলা ভাষা, পরণে মাদ্রিকোচামাষা খুঁটি, আদলে গা—সবই সানাই সাহুর মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগাল। তার ওপর বাবুরা যখন বসলেন যে তাঁদের হ্যাডারসমাক ও ক্রামাকাপড়গুলোও যদি ডিঙি করে পার করে দেওয়া হয়, তা'বা নিজেরা সাঁববেই ওপারে যাবেন। এবং ভাড়া দেখেন—এটুকু জনো অবিশ্বাস্য ভাড়াই—আট আনা!

ততক্ষণে বাবুরা আরো আধ-মাইল দূরে নলপুর ঘাটে গিয়ে একটা লোকের উঠে এসেছেন এবং পনেরো-ষোল বছরের ছোকরা দু'লি মাঝকে বলছেন নদী পার করে দিতে। বাঁ দিকের ঘাটে গিয়ে নেমে দু'লি মাঝক পয়সা মিটিয়ে দিবেই বাবুরা দক্ষিণমুখো প্রাচললেন ভদ্রা গ্রামের কাছেই দু'লি এক ক্ষল অভিমুখে।

গ্রামবাসীরা হাঁক দিতে দিতে ছুটে এল : বাবুরা জঙ্গলের পথ দিয়ে এলে, নদী পার হয়ে আবার জঙ্গলের দিকে চলেছ কার খোঁজে? তোমাদের পরিচয় চাই।

বাবুরা গ্রামবাসীদের দিকে এগিয়ে গেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। সানাই তখন তাঁদের গিয়ে নদীর পাড়-বরাবর যে রাস্তা গিয়েছে, সেই পথে বেঁচে বলল। বাবুরা খানিক সে-পথ দিয়ে গিয়ে আবার জঙ্গলের পথ ধরলেন সেখান থেকে গ্রামবাসীরা আবার তাঁদের 'ভুল' শব্দে দিল।

ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে দু'লিমাঝকে পাঠানো হল থানার খবর দিতে। মনোরঞ্জনই ফুলি কঁধে আগে আগে চলাছিলেন। হাতে তার একটা রূপার কোলানা। গ্রামবাসীদের অত্যাচাবে বাবুরা বললেন যে, তারা রেল লাইনের পথে যাচ্ছেন—'সরকারী লোগ' তারা পণ্ডারের কাছ থেকে এসেছেন।

পাড়-বরাবর আরো বেশ-খানিক চলে, জিরিয়ে নেবার নাম করে বাবুরা বসলেন গিবে গাছের তলায়।

এই সন্ধ্যাবেলা সানাই গিয়ে তার দাদা বাবু সাহুকে ডেকে আনল। আব বদ্রসুদও ফিলে এল দকানবের ভাই রঙ্গ রাউতকে নিয়ে।

এরা আসতে গ্রামবাসীদের সাহস বেড়ে গেল। তারা বাবুদের ছেকে ধবে তাঁদের পবিচয় চেয়ে উভাঙ্গ করতে লগল। অবশেষে বাবুরা উঠে পড়ে নিজেদের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই গ্রামবাসীরা পথ আগলে রইল।

তাদের জোর করে সরিয়ে দিয়ে বাবুরা খেই এগিয়ে গিয়েছেন, অমনি—'ডাকাত! ডাকাত!' রোলে মধুরিত হয়ে উঠল নিঃশব্দ ক্ষ্মীর সকল। দারুণ হুটগোল।

গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল সে-খবর। হে-হে

করে অশিক্ষিত গল্পবাসীরা ছুটে আসতে লগল 'ডাকাত! দেখবার জোড়'। বেশি বয়সের বাসিন্দা তারা ততক্ষণে ডাকাতদের পিছু নিয়েছে।

গভীর অন্তঃতাপের সঙ্গে নীবেন বললেন, 'দাদা! আমরা যার জন্যে ছুঁচি করতে দেরিযোঁছি, তারাই আমাদের চোব বলে চেঁচাচ্ছে? এত পিছিয়ে বয়েছে এ-বেশন লোক?'—

যতীননাথ ঘবে দাঁড়ালেন। মিষ্টি-কথার গ্রামবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তা'বা ডাকাত নন। 'অবধা কেন হঠা করছে তারা? সরকারী কাজের জন্যে তারা এসেছেন, নিজেদের ইচ্ছেসে তা বোধিত খুঁশি যাবেন।

দর্কিদারের ভাই রঙ্গ রাউত ছোঁচিয়ে বলল, 'ওসব কথা থানার গিরে কলবেন চলুন।'—তার কথার অশিক্ষিত জনতা হুজুমে মেতে উঠল। পবন উৎসাহে বাওয়া করে চলল বিপ্লবীদের পিছু পিছু।

বাবুরা এবার পিস্তল বার করতে বাধ্য হলেন। বলে উঠলেন, 'দেখি তোমরা কি করে আমাদের আগলে রাখ!'—

সঙ্গে সঙ্গে ভীত জনতা ছাড়িয়ে পড়ে পথ কঁচিয়ে দিল।

বাবুরা পাড়-বরাবর উত্তরমুখো চললেন। নিষাপদ ব্যবধান বেগে চুনডার মিছিল চেঁচাতে চেঁচাতে চলল বাবুদের পেছনে। গ্রামের পর গ্রাম থেকে বন্ধা দেখতে ছুটে আসতে লগল লোক। সেয়ে, শিশু, বৃদ্ধা—কেউ বাদ গেল না বাকি।

কামতানা গ্রামের কাছে এসে চিত্তপ্রিয় ছোঁচিয়ে উঠলেন জনতার উদ্দেশ্যে, 'আর যদি একটুও এগোও তোমরা, এই দেখ পিস্তল; আমরা গুলী কবতে বাধ্য হব। নিজেদের ভাল চাও তো কিরে যাও এখনি!'—

কিন্তু বাবুরা যে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলী ছড়বেন, জনতা মেটেই তা আশা করে নি। তার ওপর 'ডাকাত' খবার বোশা, বহু হাজার টাকার স্বপ্ন!—তাই উত্তরোত্তর ভিড় তৈলে সাহসী গ্রামবাসীরা অগ্রসব হতে লগল।

চিত্তপ্রিয়ের মৈত্রীচূতি ঝটল। রঙ্গ রাউতকে লক্ষ্য করে তিনি দটো ফাঁকা আওরাজ করলেন।

আওরাজে চকিত হবে থমকে দাঁড়াল জনতা!

কিন্তু অজিগোভে তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সানাই সাহু আর রঙ্গ রাউত। প্রাণের মাথা তুচ্ছ করে তারা খেই যতীননাথের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, আবার গড়ে উঠল পিস্তল।

'ওয়ে, বাবুদের কাছে গুলী নেই! মিছিমিছি আওরাজ করে ডর দেখাচ্ছে!'—চোঁচিয়ে উঠল সানাই সাহু।

বাবুরা সবে গিয়ে দামুদ্রা গ্রামের কাছেই একটা চালতা গাছের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় রাজু মোহান্তি নামে একটি প্রোচ

'ডাকাত ধরলে হাজার হাজার টাকা পাবে' বলে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে করতে ছুটে এল।

নতুন উদ্দীপনার গ্রামবাসীরা তৈলে আসছে দেখে, যতীননাথের সঙ্গে কি পরামর্শ করে এবার এগিয়ে এলেন মনোরঞ্জন। গর্জে উঠল তাঁর ভগ্নিনালিকা।

রাজু ততক্ষণে যতীননাথকে ধরবার জন্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। গুলী লগল তার পারে। পাড়ের পূর্বদিকের ঢালু জমি দিবে গাড়িয়ে পড়ল তার দেহটা গ্রামবাসীদের ভিড়ের দিকে।

মুখ ধুয়ে রক্তাক্ত কলেবর রাজুকে পড়তে দেখে ভাব ভাই মূল্যী মোহান্তি 'আর সাজোয়ান ছোকরা সদারি গিরি আতনন্দ করে উঠল, 'সেয়ে ফেললে! পালাও, পালাও!' এবং নিজেরাও উত্তরমুখো রণে ডুবে দিল।

এই সন্ধ্যাবেলা, যতীননাথ, চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ, নীরন, ও মনোরঞ্জন উত্তরমুখো যতটা পারেন এগিয়ে গেলেন ময়ূরভঞ্জ বোড়ের দিকে।

তখন গ্রামবাসীরা মদুমুদু রাজু মোহান্তির চারপাশে খানিক জটলা করে, একদল বগুনা হল বলেমশবে খবর দিতে; পথেই তখনই সঙ্গে দেখা হল সাব-ইন্সপেক্টরবা। তিনি বাঙালী 'ডাকাত' ধরবার হুকুম পেয়ে তখন টহল নিচ্ছিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর তখন গ্রামবাসীদের পটিয়ে দিলেন পলিশ সদারি-স্টেডেন্ট সহস্রবের ক্রাছ এবং নিজে বগুনা হলেন অকুশলের দিকে।

রাজু মোহান্তিকে বেশিক্ষণ ভববল্লভা সহিতে হল না। তাব সঙ্গেই আহত সদারি গিরিকে দেখাশোনা করবার জন্যে দু'একজন গ্রামবাসী অকুশলে রইল। বাদবাকি, যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বিপ্লবীদের অনুসরণ করতে লগল।

তাদের মধ্যে থেকে সানাই জানা অথবা বাড়িবে ছুটে গিয়ে সাহুপাড়া গ্রামে খবর দিল : 'ডাকাতরা সেদিকেই আসছেন। লাঠি-সোটা হাতে গ্রামবাসীরা হে-হে করে এগিয়ে এল। দামুদ্রা থেকে খুবপাথে ছুটেতে ছুটেতে শিশ্য যতীননাথ এসে সাহুপাড়া দিবেই উঠলেন ময়ূরভঞ্জ বোড়ে।

পথেব পাশে একটা কবম্‌চা গাছের তল্লব বিপ্লবীরা বসে পড়লেন। সাহুপাড়াবাসীরা লাঠিসোটা হাতে এগিয়ে এসে তাদের থিয়ে খবে আবার তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়ে উভাঙ্গ করতেই নীরবে বিপ্লবীরা তাঁদের আগাবাদের গুলী ভবে নিলেন সকলের চোখের সামনেই। এবং অতান্ত ক্রান্তপদে তাঁরা ময়ূরভঞ্জ বোড় পার হয়ে বসে পড়লেন গিয়ে একটা তেঁতুল গাছের নিচে।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর চিন্তামণি সাহু তার ইউনিফর্ম জাপ কবে এসে উপস্থিত হল ভিড়ের মধ্যে। এবং আরো করেকরক

পাঠাল বলেম্বরে, সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনীর বিলম্ব দেখে।

পরপর তিন-চারদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, একদণ্ড বিশ্রাম নেই—মাইলের পর মাইল হাটতে হয়েছে রোদে, বৃষ্টিতে, কাদায়। খিদেয়ে তেঁস্তার অবসর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে যতীন্দ্রনাথ বুকলেন, সামান্য কিছু পেটে না দিতে পারলে এভাবে আর বেশিক্ষণ চলা সম্ভব হবে না।

কাছেই ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের কোণে একটেরে এক মন্দির দোকান। সেখান থেকে মাল্য করেক আনার চিঁড়া-মুড়কি কিনে, দাম দিলেন এঁরা দশ টাকা। হাতে খুচরো নেই। জাঙানি গাশে নেবার অবসর নেই। এগিরে চললেন তাঁরা।

সামান্য চিঁড়ে-মুড়কির দাম দশ টাকা?... দোকানদার অথক হয়ে মূগ্ধ তাকাল। তারপর দূরে দেখতে গেল লাঠিসোটা হাতে গ্রামবাসীরা আসছে বাবুদের পথ অনুসরণ করে। মন্দির বন্ধতে দেরি হল না—এঁরাই সেই 'ডাকাত'!

হে ঠে ব্যাধিয়ে দিল মন্দি।

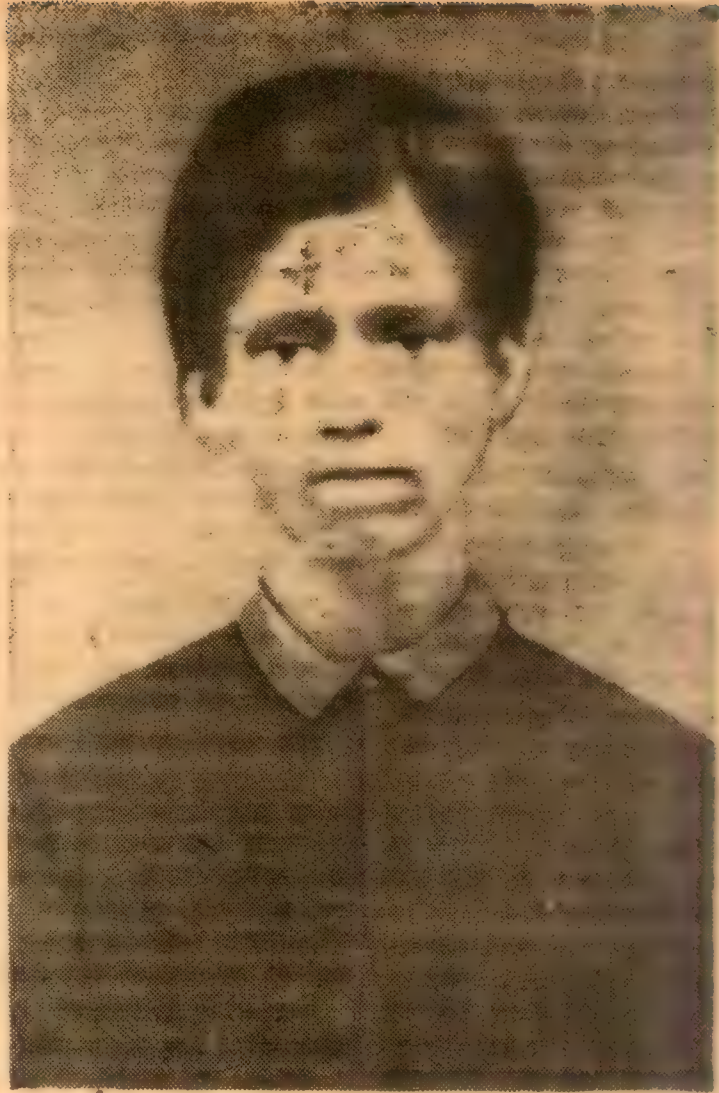
খাওয়া মাথায় উঠল। অকৃত চিঁড়ে-মুড়কি ফিলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মহানারক যতীন্দ্রনাথ। তাঁর দেখাদেখি শিষ্য-চতুষ্টয়। পেটীলা-পুটীল নিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁরা।

বে-দেশবাসীর কল্যাণ সাধনায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, নিরন্তর নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁকেই আজ স্বদেশের এক অশ্রুত পঙ্কজ-অঙ্কুরে শিব্যদের নিয়ে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে; সেই দেশবাসীরাই তাঁকে ত্যাগ করে নিয়ে চলেছে 'ডাকাত' আখ্যায় অভিহিত করে? অশ্রু সঙ্গে আছে, অথচ অশিক্ষিত জনতার গুণর সে অশ্রুর প্রয়োগও আপত্তি যতীন্দ্রনাথের। আত্মরক্ষার জন্যে একটা-দুটো ফাঁকা আওয়াজ করা হচ্ছে বড়জোর— আর প্রাণ নিয়ে পারিলে বেড়াতে হচ্ছে এদের অত্যাচারে।

নীরেরনের চোখ কেটে রুল পড়বার উপক্রম। ক্রম্বর, ওয়া জানে না কী ওয়া করছে! ওদের কমা কোর!—উজ্জ্বল বৃষ্টি তাঁদের চিত্তে বড় করে সহসা ফুটে উঠল বিপ্লবী সাগরনার অপ্রত্যাশিত এই অগ্নি-পরীকার দুর্বিষহ ঘটনার কণে!

কোথায় তাঁরা বৃজছেন পছন্দসই একটা জায়গা যেখান থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের অনাগত বিপ্লবীদের জন্যে রেখে যাবেন অভূতপূর্ব শৌর্ভের আদর্শ, দিয়ে যাবেন হার না-মানবার দুর্নিবার সংকল্প—

না, তবুওই ছুটে বেড়াতে হচ্ছে বিদেশী শাসকের ছলে ফেপে-ওঠা দেশবাসীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে। দেশবাসীর চোখে তাঁরা আজ ডাকাত ছাড়া কিছুই নন? ধন্য ইংরেজের ইল, ধন্য ভারতের আত্মবিশ্বস্ত জাতীয়তাবোধ আর হুজুগপ্রিয়তা!



বালাকালে : বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

কিন্তু, শিকল-দেবীর ওই পূজা-বেদীই কি চিরসত্য হয়ে ছাড়া রইবে? জাতি কি লাগবে না? সত্যের জয় কি সম্ভব হবে না?...

সাহুপাড়ায় অপেক্ষমাণ পুলিশ ও গ্রাম-বাসীরা এগিয়ে এসে অনবরত ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে বিপ্লবীদের।

“ভয় পেলে চলবে না,” যতীন্দ্রনাথ বুকলেন, “ওদের দঙ্গল ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে!”

পুলিশ ও সৈন্যরা ঠিকমতো বুঝে ওঠবার আগেই ছুটে ছুটে বিপ্লবীরা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সাব-ইন্সপেক্টর চিত্তামণি সাহু সাদা পোশাক পরে সজাগ ছিল। সে গিরে যেই যতীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরল—পলকে প্রলয় ঘটল।

ধূলিতর আগায় খোলামুচির মতো সাত-

হাত দূরে ঠিকরে পড়ল গিরে চিত্তামণি। একদম ভুলুণ্ঠিত।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহুদের ওই দুর্দশা দেখে থ' মেরে গেল জনতা। চিত্তামণি কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের খোঁপিয়ে তুলতে লাগল—তাজাতাড়ি এঁদের ধরে ফেলতে পারলেই হাজার হাজার টাকা পাওয়া যাবে—

জনতা নতুন উৎসাহে আবার এগিয়ে এগিয়ে এল। আবার, বাধা হলো, পোতা উঠল বিপ্লবীদের আগ্রাসন।

পথ খানিক পরিষ্কার হল। একটু এগিয়ে যেতেই, সামনে পড়ল প্রকৃতির বাধা—‘অমৃত’ নদী : পঙ্কজ-বাট গর চোড়া। অশ্রুশল্ল, কাপড়-চোপড় পুটল করে মাথায় নিয়ে সাঁতরে বিপ্লবীরা পার হয়ে গেলেন নদীটা।

চিত্তামণি এবং তার দুঃসাহসী আট-নজন সঙ্গীও সাঁতরে ওপারে গিরে পৌঁছল। জনমান

গ্রামবাসীরা মাদ্রাজ ট্রাক রোড * ধরে দক্ষিণ তীর বরাবর এগিয়ে চলল।

প্রান্ত অবসন্ন সজী-চতুর্থ নিয়ে ছুটে ছুটে বতীন্দ্রনাথ দক্ষিণদিকের ঘূর্ণপথে একটা জলা ধানখেতের কাছা ভেঙে উপস্থিত হলেন চাষাখণ্ড গ্রামের শেষ সীমায়। সেখানেই, মজে মাওয়া দেশোয়া-গাড়ী পুকুরের ধারে একটা টিলার ওপর উঠে পড়লেন তাঁরা। বহুদূর অবধি চারধারের সমতল ভূমি এখান থেকে তাঁদের চোখে পড়ল। টিলা-ভরা উইয়ের ঢিপি এবং পূর্ব কাটাগাছের কোণ বিশেষত দক্ষিণ পশ্চিম এবং পশ্চিম দিকটা চমৎকার সুসজ্জিত। প্রায় আড়াই গজ ঘন হয়ে জঙ্গল উঠছে সৈদিকে, বেড়ার মতো।

টিলীটা বতীন্দ্রনাথের পছন্দ হল। সেখানেই তাঁরা বসে জিরিয়ে নিতে লাগলেন।

নারেনের পা আহত। এক নাগড়ে এতটা হাটখাটি পরণর কদম ধরে করতে হয়েছে। আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর পা। ছোট্ট খাচ্ছেন পারে-পারে। বতীন্দ্রনাথ তুলে ধরছেন। তবু পা বুঁক আর চলছিল না।

খানিক আগেও নীরেন বলেছেন, “চিও, জনেরজন, তোরা দাদাকে বন্ধিয়ে বল, আমার জন্যে আর দেরি না করে তিনি যেন একাই এগিয়ে যান। দেশের রুম চেয়ে, স্বাধীনতার লাক্ষ্য চেয়ে দাদা যদি এগিয়ে যেতে পারেন, ভবিষ্যতে তিনি অনেক বড় করে বিপ্লব লক্ষ্যিত করতে পারবেন—”

কথটা কানে যেতেই সম্মুখে বতীন্দ্রনাথ নীরেনকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, “এক-মাত্রার পৃথক কল হতে পারে না ভাই, হতে পারে না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একসঙ্গেই লড়াই করব। মরব। মরে দেশের লোককে শিখিয়ে বাব বাঁচবার মত বাঁচতে হয় কি করে। এই মৃত্যুর চেয়ে সফলতর কাম্যতর আর-কোনও সমাপ্তি আমাদের জীবনে হতে না রে।...”

ভাদিক, গ্রামবাসীদের তরফ থেকে রক্ত রাউত ও মরলী মোহান্তি যখন বালেশ্বর পৌঁছে থানায় গিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বিশদ খবর দিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ত রাউতকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেবের কাছে। কিলবি তার আগের দিন বালেশ্বর শহরে ফিরে সৈন্য সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন।

কিলবি সাহেবের জবান :

“২ই সেপ্টেম্বর বেলা দুটো নাগাদ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে আমার জানালেন যে, পাঁচজন বাঙালীর সম্মান পাওয়া গিয়েছে।

তাঁরা একটি গ্রামবাসীকে গুলী করে মেরেছেন এবং একজনকে আহত করে রেখে শানিয়ে যাচ্ছেন।

“তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে প্রকৃষ্টভাবে দিকে যেতে নির্দেশ দিয়ে প্রফ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নিজ উপস্থিত হলো। তাঁদের মোটরগাড়ীটা ধার নেবার অনুমতি সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি, গাড়ির ড্রাইভার অনুপস্থিত। স্টাফ সার্জেন্ট রাদারফোর্ড গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত দেখে আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। আমার গাড়ির সামনেও তখন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে গিয়েছে। তাদের একটা দলকে আমরা দুই-ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম। এবং কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সার্জেন্ট রাদারফোর্ড আর আমি প্রফ ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে গিয়ে বসামাত্র গাড়ির চালকও হাজির হয়েছিল দেখা গেল।

“তবুও আমি রাদারফোর্ডকেও সঙ্গে নিলাম। আরো অনেক সশস্ত্র পুলিশ সমেত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।...”

স্টাফ সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের জবান :

“২ই সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা আমি অফিসে ছিলাম। মেজর ব্রীথ-এর নির্দেশে আমি প্রফ ডিপার্টমেন্টের গাড়ি চালিয়ে মিঃ কিলবিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাই। মিঃ কিলবি কয়েকজন সশস্ত্র বাহিনীর খোঁজে বার হাঁচলেন। তাঁর বাড়ি পৌঁছে মিঃ কিলবি আমার বললেন, চট করে বতটা পারি আগেরোস্ত্র নিয়ে আসতে।

“আমি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিয়ে পুলিশ লাইনের দিকে গাড়ি চালালাম।

“ইতিমধ্যে প্রফ ডিপার্টমেন্টের চালকও এসে পৌঁছল। আমি মিঃ কিলবিকে বললাম : আমাদের যাবার প্রয়োজন হবে কি তা? হলে?— তিনি বললেন : নিশ্চয়ই হবে। মেহেতু আমি সামরিক বিভাগের লোক, আমি জানতে চাইলাম : সঠিক নির্দেশ কি?—উনি বললেন : পাঁচজন সশস্ত্র বিপ্লবীর সম্মানে চলছেন তাঁরা; নাহেহাল হবার সম্ভব সম্ভাবনাই আছে।—আমি জানতে চাইলাম : আমাদের ওপর প্রতিপক্ষ গুলী চালালে আমাদেরও গুলী চালানোর নির্দেশ আছে কি?—এবং তিনি জবাব দিলেন : বিলক্ষণ গুলী চালাবেন ওরা! যেই গুলী চালাতে শুরু করবেন।

“প্রফ ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে একজন গ্রামবাসীও রইল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে। আরো সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন।...”

কিলবি-সাহেবের জবান :

“ফুলারিঘাটে পৌঁছে আমরা গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লাম, নৌকো করে নদী পার

হয়ে পাকা রাস্তা (ময়ূরভঞ্জ রোড) দিয়ে রওনা হলো বারিপদার দিকে।...”

রাদারফোর্ডের জবান :

“ময়ূরভঞ্জ রোড ধরে প্রায় তিন হাজার গজ যাবার পর এক চৌকিদার এসে আমাদের ডানদিকের জঙ্গল দেখিয়ে বলল যে, বাঁদেব খোঁজে আমরা এসেছি—ওই ধার দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন।...”

“আমরা তখন ময়ূরভঞ্জ রোড আর ট্রাক রোডের চৌমাথা পেরিয়ে শ’ দূরেক গজ মাত্র গিয়েছি। আমি সশস্ত্র পুলিশদের দুইভাগে বিভক্ত করে একটা দল পাঠিয়ে দিলাম সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের পরিচালনায় ময়ূরভঞ্জ রোড বরাবর।”—

কিলবি সাহেবের জবান :

“এবং আমি অন্য দলটি নিয়ে,” তিনি বলেছেন, “চৌমাথার ফিরে গিয়ে অন্য পথটা ধরে এগিয়ে চললাম। খানিক গিয়েই সাইকেল আরোহী এক চাপরাশীর সঙ্গে দেখা। তার সাইকেলটা নিয়ে আমি ট্রাক রোড ধরে এগিয়ে গেলাম, সশস্ত্র পুলিশদের তাড়াতড়ি আসতে বলি। সঙ্গে আমার রিভলভারটা মাত্র নিলাম। আমার রাইফেল ও সরঞ্জাম পেছনে একজনকে দিয়ে পা চালাতে বলে এলাম।

“বাঁ দিক দিয়ে একজন গ্রামবাসী মাঠ ভেঙে আমার দিকে ছুটে আসছে, চোখে পড়ল। লোকটি বলল : ওই, ওইদিকে আছেন ওঁরা!

“আমি বুঝলাম—বিপ্লবীদের কথাই ও বলছে। দূরে খোলা মাঠের মধ্যেও দেখলাম একদল গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে তাদের একটা লম্বা বাঁশ, তার মাথায় কাপড় বাঁধা।

“গ্রামবাসীর সহায়তায়, মাথার ওপর পিন্ডলটা তুলে ধরে আমি ট্রাক-রোডের বাঁ ধারের নালাটা পার হয়ে নিশান-সংকেত-কারীদের দিকে পা চালালাম। নালায় এক-বুঁক জল। আগের কদিন কি রকম বর্ষা হয়েছিল মনে নেই, কিন্তু আমরা সৈন্য কাম্পদা যাই সৈন্য সীতাই দারুণ বর্ষা পড়ছিল।

“নিশানধারীরা এগিয়ে এসে বলতে লাগল : এইদিকে, এইদিকে!—বলে বিপ্লবীদের বিশ্রামস্থলের দিকে নিয়ে গেল আমাদের। সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা পপ-পপ-পপ-আওয়াজ আমার কানে এল, আর গ্রামবাসীরা বলে উঠল : ওই যে, ওইখানে!...”

“আমি-একটু এগিয়ে যেতেই দেখি মোটা-পথ দিয়ে আমার দলের সশস্ত্র পুলিশেরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। যে লোকটার হাতে আমার রাইফেল কাতুজ ছিল সে এগিয়ে এসে সেগুলো আমার দিল। আমারটা পরেই ‘তিনশ’ তিন স্পোর্টিং মার্টিন মেটফোর্ড রাইফেল।...”

(কম্পঃ)

* বর্তমানে ‘বতীন্দ্রনাথ রোড’ নাম হয়েছে।

ভোলফগ্যাংগ আমাডিউস মোৎসার্ট / দীপংকর সেন

শৈশবে 'বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী' হয়ে যিনি যুরোপের রাজন্য-বর্গের সমাদর লাভ করেছিলেন এবং কৈশোর অতিক্রম করার আগেই ধর্ম্ম শিল্প সমগ্র জাতির গৌরব সেই ভোলফগ্যাংগ আমাডিউস মোৎসার্টের, মাত্র ছবিশ বছর পেরোবার আগেই, দারিদ্র্য এবং ব্যাধিতে অবলম্বিত হন। পাশ্চাত্য সংগীতের জগতে এত বড় শিল্পী খুব বেশি নেই এবং তাঁর অভুলনীর অবদানের জন্য বিশ্বের সংগীতের ইতিহাসে তিনি এক অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছেন।

মোৎসার্ট ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে শাল্‌টস-বুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা লিয়োপোল্ড ছিলেন স্থানীয় আর্চবিশপের অধীনস্থ সংগীত-শিক্ষক। মোৎসার্টের যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখন এক বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে দিয়ে লিয়োপোল্ড তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা জানতে পারেন। একদিন তাঁর ছাত্রদের একটি কঠিন সুর শিখিয়ে দেবার পর যখন তারা যে যার ব্যাঙ চলে গেছে, তিনি নিভের ঘরে বসে বিশ্রাম করছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন অতি সুন্দর-ভাবে পিয়ানোতে সেই সুরটি বাজাচ্ছে। লিয়োপোল্ড ভাবলেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ হয়ত ফিরে এসেছে। কিন্তু পিয়ানোটি যে ঘরে ছিল সেখানে গিয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে পিয়ানোতে বসে বাজাতে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

এর পর এমন প্রতিভাসম্পন্ন ছেলের সংগীত শিক্ষাকে আর অবহেলা করা চলে না। সুতরাং নিয়মিতভাবে তাঁর সংগীতশিক্ষা শুরু হল। ফলে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি সুন্দর-ভাবে হার্পিস কর্ড বাজাতে শিখলেন। কেবল তাই নয়, এই সময়ের মধ্যেই তিনি একাধিক 'মিনিউয়েটও' (নৃত্যের জন্য রচিত সংগীত) রচনা করে ফেললেন। মোৎসার্টের যখন মাত্র সাত বছর বয়স তখন পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে তিনি এক সফরে বেরিয়েছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ, চেহারা এবং বাজনা শ্রোতা এবং দর্শক-দের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিয়েছিল। একদিন ভিয়েনার সন্নাটের প্রাসাদের অতি মসৃণভাবে পালিশ করা মেঝের উপর পা পিছলে পড়ে যাবার

পক্ষ, সুন্দরী মারী আঁতোয়ানেত তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। মোৎসার্ট তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেদিন বলেছিলেন—'তুমি খুব ভাল—আমি বড় হয়ে তোমায় বিয়ে করব।'

ছোটবেলা থেকেই নানা অনুষ্ঠানে বেহালা এবং অর্গান বাজিয়ে মোৎসার্ট সকলকে বিমুগ্ধ করে দিতেন। তেরো বছর বয়সে তিনি ইটালীতে যান এবং দু' বছর ধরে ইটালীর নানা শহরে ঘুরে বেড়ান। কারণ ইটালী হচ্ছে সংগীতজ্ঞদের ভীষণ ক্ষেত্র। রোমে তাঁকে সিস্টিন চ্যাপেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে তিনি একটি বিখ্যাত ধর্ম্মসংগীত শোনেন। এই সংগীতের স্বরলিপি কোনদিনই প্রকাশিত হয় নি। একবার শুনাই মোৎসার্ট নাকি এই সংগীতের স্বর-লিপি স্মৃতির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। প্রতিভার এমনই শক্তি। প্রসঙ্গক্রমে এ যুগের এ ধরনের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। পিকাসোর পঞ্চসম্মতিত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী ঘটনাটির কথা সবাইকে জানান। তিনি বলেছিলেন যে পিকাসোর যখন বয়স অল্প তখন তাঁকে ত্যাঁছল্য করবার জন্য আমস্টারডাম স্টেট গ্যালারীর

ডিরেক্টর তাঁকে নাকি রেনেসাঁস্টের একটি ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে এমন ছবি যেদিন আঁকতে পারবেন কেবল সেদিনই নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেবেন। তার আগে নয়। পিকাসো তখন কিছু বলেন নি, তবে এই ঘটনার ঠিক দু' দিনের মধ্যেই স্মৃতি থেকে সেই ছবিটির এক নিখুঁত কপি করে নিয়ে সেই ডিরেক্টর ভদ্র-লোককে উপহার দিয়েছিলেন।

মোৎসার্টের লেখা অনেকগুলি চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলির থেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়েছে। ১৭৭০ খৃস্টাব্দের ৪য় জুলাই, বোলোনা থেকে তার বোনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

'আমার বেহালাটার তর বন্দানো হয়েছে। আমি যোড়ই বেহালা বাজাচ্ছি। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম কারণ মা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে আমি অন্যতম ছ'বার একা একা গীজ'ল গিয়েছি আর কয়েকটা চমৎকার অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থেকেছি। শুনুন খানি হবে যে আমি চারটি ইটালীয়ান সিম্ফনীও রচনা করেছি.....'

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। এই সময় তখন বয়স



মোৎসার্ট

মাত্র তেরো বছর। এর পর মিলান থেকে ২০শে অক্টোবর মার কাছে লেখা একটি চিঠিতে আছে—

‘অপেরা রচনার জন্য লিখতে লিখতে আমার হাতে এত ব্যথা হয়েছে যে, আমি আর বেশি লিখতে পারছি না। তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যেন আমার অপেরাটি সাফল্য-শ্রীভূত হয়।

এই অপেরাটি সত্যিই অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিল। লোকপ্রিয়তার জন্য এটি পর্যায়ক্রমে কুড়ি রাত মিলান শহরে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই সময় বোনের কাছে লেখা মোৎসার্টের একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন—

‘এতকাল অপেরা রচনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখে উঠতে পারি নি। সে পর্ব এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি স্বাধীন। ভগবানের আশীর্বাদে আমার অপেরাটি জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। প্রতি সন্ধ্যায় প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি আসনই ভর্তি থাকছে। বহু লোক একথাও বলেছে যে মিলান শহরে কায়ার রচিত প্রথম অপেরার এত ভিড় তারা কখনো দেখেন নি। হারা আর আমি ভালই আছি। আমরা আশা করছি ইস্টারের আগেই তোমাদের কাছে ফিরে যেতে পারব।’

এই বছরই গোপাল তাকে ‘অর্ডার অফ দি গোল্ডেন স্পার’ খেতাব দিয়েছিলেন, অর্থাৎ মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি ‘সেভালিয়া’ অথবা ‘মাইট’ হিসাবে সম্মানিত হলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাকে এই খেতাব সম্পর্কে উল্লেখ করতে কখনো দেখা যায় নি।

ছাব্বিশ বছর বয়সে মোৎসার্ট বিয়ে করেন। এর পরের পাঁচটি বছর তাঁর জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ যুগ। এই সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে দুটি সেরা অপেরা—‘দি ম্যারেজ অফ ফিগারো’ (১৭৮৬) এবং ‘ডন গিয়োটানি’ (১৭৮৭)। ‘ডন গিয়োটানি’ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত সুরকার গুনো বলেছেন—‘মোৎসার্টের “ডন গিয়োটানি” আমার কাছে জীবন দর্শনের এক অপূর্ব অভিব্যক্তির মত মনে হয়েছে। এ যেন নিখুঁতভাবে রচিত এক অপার্থিব সৃষ্টি।’ একথা অনস্বীকার্য যে মোৎসার্টের মত বিশুদ্ধ সুরকার আর একজনও নেই। মোৎসার্টের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত

অমিতব্যয়ী। তাই সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে দিনরাত পরিশ্রম করতে হত। অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি বহু ছাত্রকে সংগীতশিক্ষা দিয়েছেন এবং অজস্র সংগীত রচনাও করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রয়োজনের তাগিদে করা এই কাজের মধ্যেও এতটুকু ফাঁকি কোথাও ছিল না। তাঁর লেখা চিঠিগুলির থেকে বোঝা যায় যে তাঁর অর্থকষ্ট এক এক সময় কি পর্যায় এসে দাঁড়াত। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে স্ত্রীর কাছে একবার এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—‘আমাকে যদি তোমাদের মাঝে ফেরত পেতে চাও তাহলে হফ-মাইস্টারের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল। আমার মনের মধ্যে এখন একটা অশুভ ভ্রম চলছে। তোমাকে কাছে পেতে এত ইচ্ছা করছে যে এক একবার মনে হচ্ছে সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে চলে যাই। আবার এও ভাবছি যে অনেক টাকা উপার্জন না করে কিছুতেই ফিরে যাব না।’ দুঃখের কথা এই যে কোনদিনই তিনি অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন নি। চিঠিটির শেষ অংশে রয়েছে—‘True, I am famous, admired and popular here; on the other hand, the Frankfurt people are even more stingy than the Viennese’. সত্যিই তাঁর স্বল্পপরিষর জীবনে লোকপ্রিয়তা, যশ, খ্যাতি সবই তিনি পেয়েছিলেন—পান নি কেবল অর্থ। কেবল মাত্র অর্থাভাবেই এমন এক মহান শিল্পীর অকালমৃত্যু হয়েছিল, একথা ভাবতেও আজ অত্যন্ত দুঃখ হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর স্ত্রীর কাছে দুঃখ করে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—‘আজ সকাল এগারটায় আমার কনসার্ট ছিল। উপস্থিত সকলেই আমাকে খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু এত আয়োজন আসলে যে কারণে মৌদিকটাই ফাঁকা থেকে গেল, কারণ সবটাই হল... ‘a failure as far as money was concerned’.

একজন প্রতিভাশালী মানুষ সাধারণ পাঁচটা মানুষের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কারণ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতার উদ্বেগ উঠতে না পারলে কোন মহৎ কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। অভাবের তাড়নায় উপার্জনের অঙ্ক বাড়ানোর জন্য এমন একজন মানুষের যদি ভ্রমাগত নানারকম ফন্দি ফিকির বের করবার

চেষ্টা করতে হয় তাহলে তাঁর ভিতরকার সূক্ষ্ম জিনিসগুলি নষ্ট হয়ে যাবার অথবা বিধ্বস্ত হবার যথেষ্ট আশংকা থাকে। মৌদিক থেকে মোৎসার্টের সমগ্র জীবনটাই খুব বিস্ময়কর। মুখে ভাল করে কথা ফুটবার আগেই শিল্পী হিসাবে যিনি রুরোপের রাজা রাজড়ার কাছে অসাধারণ সমাদর লাভ করেছিলেন, সেই মানুষের যৌবন অতিক্রান্ত হবার আগেই অবর্ণনীয় অবস্থা এবং অনাদরের মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হয়েছে। শাল্টস্‌বুর্গের আর্চবিশপের বাড়িতে চাকরী করবার সময় বাড়ির চাকরদের সঙ্গে তাকে খেতে দেওয়া হত। আর্চবিশপ যে ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন তাও ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক। অবস্থার বিপাকে এসবের বিরুদ্ধে কোন দিনই তিনি কোন প্রতিবাদ জানান নি। এত সহ্য করেও তিনি কিন্তু চাকরীটি টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশপের এতটা বিরক্তি-ভাজন হয়ে পড়লেন যে বিশপের মার্শাল তাকে বরখাস্ত করলেন এবং পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিলেন।

মানুষের মনুষ্যবোধের অভাব চিরদিনই সভ্যতার ইতিহাসে বহু কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে এসব অমানবিক আচরণ সাধারণ মানুষকে যেমন করে স্পর্শ করে প্রকৃত গুণী মানুষকে তেমন করে না। ব্যবহারিক জীবনের যে অংশ শূন্য অথবা আলোকিত নয় প্রকৃত স্রষ্টা তাকে ‘আপন মনের খেয়াল দিয়েই পূর্ণ করেন।’ নেন আলোকিত করে। এ এমন এক আলোক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যাকে বলেছেন—‘the light that never was on sea or land, the consecration and the poet’s dream.’ আর এই আলো কেবল স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনকেই আলোকিত করে না কারণ এর ধারায় তাঁর কল্পনা-শক্তি নিজেকে রূপ দেবার পথ খুঁজে পায়। ক্রোচের একটি অতি সুন্দর উক্তি আছে। তিনি বলেছেন—‘বিশ্বের সব শিল্পই কল্পনাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। কল্পনার সফল প্রতিবিশ্বনেই শিল্পের সকল ঐশ্বর্য সঞ্চারিত হয়। বস্তুর প্রেরণীবিন্যাস করা, বাস্তব অথবা কাল্পনিক পদার্থ হিসাবে তাদের নির্দেশিত করা, কিম্বা পরিমিত করা এবং পরিশেষে তাদের রূপ বর্ণনা করা শিল্পীর কাজ নয়—তাঁর একমাত্র কাজ হল অনুভব করা এবং অনুভূত বিষয়-গুলিকে উপস্থাপিত করা।’ এর জন্য

সাপ্তাহিক বসন্ত

আর একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন
—তা হল আনন্দ। কারণ 'মানুষ
নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে
আনন্দে।'

তবে এ হল মনের অন্দর মহলের
কথা। কিন্তু শুধু মন নিয়েই ত
মানুষের সবটা নয়। আমাদের একটা
দেহও আছে। সবচেয়ে পরিতাপের

বিষয় আমাদের দেহটা সব সময় মনের
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। মোবসার্ট
মনের দিক থেকে সংগ্ৰাহে বিস্ময় হন
নি; কিন্তু তাঁর শরীর ভেঙে গেল।



যদি প্রতিটি নেকলেসের ওজন
৫৮ গ্রাম (৫ তোলা) হয় তাহলে এই
রকম ৪৫০০টি সোনার নেকলেস দিয়ে
আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য মাত্র একটি
ন্যাট জঙ্গী বিমান কেনা যায়.....

দেশের সেবা করুন
স্বর্ণবণ্ড নিন

স্বর্ণ বণ্ড পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৬৬
সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।



DA 45/571 Bengali

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে এক বন্ধুর কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—‘গতকাল শরীরটা বেশ ভালই ছিল। আজ বড়ই খারাপ লাগছে। কাল রাত থেকে সারা শরীরে এত ব্যথা শুরু হয়েছে যে এক মূহুর্তের জন্যও চোখ বন্ধ করতে পারি নি।.....আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ মন দুশ্চিন্তায় অস্থির। কেন মতেই এসব ঝেড়ে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারছি নে। সপ্তাহখানেক পরে আর্থিক অরুস্থতা কিছু ভাল হবে বলে আশা করছি, কিন্তু এখন শোচনীয়। তুমি আপাতত আমাকে কিছু সাহায্য করতে পার কি? বত-টুকু পারবে তাতেই আমার বিশেষ সুবিধা হবে।’

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে মোৎসার্ট তাঁর প্রেম্যতম ঘৃণাঙ্গণাল সম্পন্ন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল দুটি অপেরা আর একটি ‘রেকুয়েম’ অর্থাৎ মৃতের শান্তির জন্য রচিত সঙ্গীত। শোক-সঙ্গীতটি রচনা করবার সময় তাঁর বারবার মনে হতে লাগল এ যেন তিনি নিজেরই জন্য রচনা করছেন। আর সত্যিই এটি রচনা করবার পর তিনি মারা গেলেন। মৃত্যু হল ইউরিমিয়া রোগে। তাঁকে সমাধিস্থ করবার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছিল একজন ভিখারীর জন্যও তার চেয়ে কম কিছু করা যায় না। বন্ধু-বান্ধব, বারি সে সময়টা উপস্থিত থাকবেন বলে রওনা হয়েছিলেন তাঁরাও সেদিনকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ফলে, সমাধিস্থলের ঠিক কোন অংশে যে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল সেটা কেউ লক্ষ্য করে নি।

একজন প্রকৃত শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির বিচার করতে গেলে, তার কর্মবিকাশের রূপটি গুণী বিচারকের চোখে ঠিকমতই ধরা দেয়। বাইরের রূপ, রস, স্পর্শ এবং গন্ধের তরঙ্গ-গুলি শিল্পীর মনে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিসিদ্ধিত হয়ে নানা রসসৃষ্টির উৎসধারায় তা উৎসারিত হয়। সুদূরকার ভাগনার গুণী বিচারকও ছিলেন তাই মোৎসার্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন—
The greatest and most divine genius.

১৮১১ খ্রিস্টাব্দে মোৎসার্ট সেন্ট-মারী উপলক্ষ্যে রচিত এক প্রবন্ধে বার্নার্ড শ বলেছিলেন—

—‘there are operas and

symphonies, and even piano-forte sonatas and pages of instrumental scorings of his, on which you can put your finger and say, ‘Here is final perfection in this manner; and nobody, whatever his genius may be, will ever get a step further on these lines.’ প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি বলেছেন—
—‘In my small boyhood I by good luck had an opportunity of learning the Don thoroughly, and if it were only for the sense of the value of fine workmanship which I gained from it, I should still esteem that lesson the most important part of my education. Indeed it educated me artistically in all sorts of ways, and disqualified me only in one—that of criticizing Mozart fairly. Everyone appears a sentimental, hysterical bungler in comparison when anything brings his finest work vividly back to me.

মোৎসার্টের অপেরাগুলির মধ্যে ‘মাজিক ফ্লুট’ সর্বশ্রেষ্ঠ। মিশরের রাজপুত্র টামিনোর সঙ্গে ‘রাত্রের রাণীর’ মেয়ে পামিনার প্রেমের কাহিনী সুরের রঙে আঁকা এক অপূর্ব চিত্র। তাঁর সিম্ফনিগুলির মধ্যে ‘জুপিটার সিম্ফনি’ এমনই অতুলনীয় এক রচনা যে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে ওটি রচনা করতে মাত্র পনেরো দিন সময় লেগেছিল। ভাল অপেরা বলতে মোৎসার্ট বুঝতেন—‘...an opera is sure of success when the plot is well worked out, the words written solely for the music and not shoved in here and there to suit some miserable rhyme—.....Verses are indeed the most indispensable element for music—but rhymes—solely for the sake of rhyming—the most detrimental.’ তিনি বলেছেন—‘The best thing of all is when a good composer, who understands the stage and is talented enough to make sound suggestion, meets an able poet, that true phoenix; in

that case no fears need be entertained as to the applause even of the ignorant.’ নিজের রচিত অপেরাগুলিকে সর্বগণসুন্দর করে তুলবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তৎকালীন সাধারণ রঙ্গ-মণ্ডির বহু খবরাখবর তিনি রাখতেন। একবার লিয়োপোল্ডকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—‘অপার্থিব চরিত্রের সংলাপ অধিক সময় স্থায়ী হলে তাঁর সব মায়ানন্দ হয়ে যায়। কারণ তাতে দর্শক এবং শ্রোতার কাছে তার অলৌকিক রূপটা আর বজায় থাকে না। আমার বিশ্বাস শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকে মৃত রাজার প্রেতের সংলাপ আর একটা সংক্ষিপ্ত হতে তা আরো জোরালো এবং কার্যকরী হত।’ এ মতটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও কথাগুলি ভেবে দেখবার মত।

মোৎসার্টের শিরানোর জন্য রচিত কনসার্টোগুলির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং যে কটি ‘স্ট্রিং-কন্সার্টো’ তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলিকে একমাত্র বেটোফেন অথবা হাইডেনের রচনার সঙ্গে তুলনা করা চলেতে পারে। তাঁর ধর্মসঙ্গীতগুলি শ্রোতার মনে পরশাতীতের হৃৎ জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের যে কটি শাখায় তাঁর অবদান রয়েছে তাঁর প্রতিটিই সমানভাবে ফলে এবং ফুলে পরিপূর্ণ। সামান্য যে কটা দিন তিনি বেটোফেনের তার মধ্যেই অজস্র সঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন এবং সঙ্গীতের এমন কোন দিক প্রায় নেই যেখানে তিনি কিছু অবদান রেখে যান নি। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে দেখতে পাই যে সুরলোকের এমন এক স্তরে গিয়ে তিনি পৌঁছেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অতিক্রম করে শাস্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত আলোক সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজও পর্যন্ত অন্ধান রয়েছে। যে বাণী এমনি করে নানা রূপে, নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা সুরের ব্যঞ্জনার অপূর্ণ মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে। তাঁর ধ্যান-সমাহিত চিন্তা সুরের উৎসের সন্ধান পেয়েছিল বলেই তা তাঁকে সুখ-দুঃখের এবং জন্ম-মৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করেছে। মৃত্যু তাঁকে আঘাত করেছে, মারতে পারে নি। তাঁর জীবনের সামনের দিকে রয়েছে প্রাণের লীলা, মৃত্যু রয়েছে নেপথ্যে।

বঙ্গভ্রমর

আবার অশ্লীল প্রাচীর চিত্রের দৌরাণ্য



শর্মিষ্ঠা রায়

শুধু নাইট ক্লাবের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি নয়। সে সব ছবিতে কুৎসিত যৌন আবেদনের ছলাকলা দেখানো দৃশ্য যথেষ্ট নয়। রাস্তায় চলার সময় সিনেমার প্রাচীর চিত্রগুলির দিকে তাকানো যায় না। এখন আর কেবল বিদেশী ছবিতে চুস্বনের দৃশ্য-সম্বলিত প্রাচীর চিত্র নয়, হিন্দী ছবিগুলি আরো কয়েকধাপ এগিয়ে এসেছে। হিন্দীওয়ালারা কতদূর যে অগ্রসর হয়েছে তার নমুনা দেখা যাচ্ছে 'সন অব হাতেমতাই' নামক একটি হিন্দী ছবির পোস্টারে। কি জঘন্য মনোবৃত্তি ও কুৎসিত ইচ্ছিত সেই পোস্টারে ফুটে উঠেছে। এ ধরনের পোস্টারের কলকাতা ছেয়ে গেছে। কিন্তু পৌরসভা নির্বিকার। ফাউন্সিলারদের কারো নজরে এসব পড়ে না। অথবা নজরে পড়লেও তাঁরা এই ব্যাপারে অসহায় কিনা কে জানে! কয়েক বছর পূর্বে এরূপ কুৎসিত পোস্টারের দৌরাণ্যের বিরুদ্ধে কলকাতার নাগরিকরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদের তীব্রতা এমন স্তরে উঠেছিল যে, পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা পোস্টার ছিঁড়ে নামিয়েছিল। কয়েকটি সিনেমাও জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এরূপ তীব্র বিক্ষোভের মুখে জনতার সংগত বিক্ষোভকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার অশ্লীল পোস্টার প্রচার বন্ধ করার জন্য তাঁদের 'অহিংস' নীতিতে এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ যারা এসব পোস্টার প্রচারের জন্য দায়ী তাদের ডেকে বসিয়েছিলেন 'ওহে তোমরা পোস্টার সংযত কর'। জনতার হাতে মার খাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য পোস্টারের প্রচারকরাও পরিগ্রহণের উপায় খুঁজছিল। সুতরাং তারা রাজী হল পোস্টার প্রচারের পূর্বে সেন্সার করে নিতে। এই স্বীকৃতির সম্মান দেবার জন্য একে স্বেচ্ছাকৃত সেন্সার বলে প্রচার করলেন। যথার্থ্যে সেন্সার করার জন্য একজন নিযুক্ত হলেন। কয়েকদিন পথে পথে আলকাতারার পোঁচ দেওয়া পোস্টার দেখা গেল। রাজ্য সরকার স্বদেশী-বিদেশীদের কাছে জাহির করলেন—তাঁরা নৈতিকমানব্রক্ষার বিষয়ে কত সতর্ক, আর জনতার নৈতিক মান কত নীচু। এভাবে সেন্সার অভিনয় কিছুদিন চলার পরে ধীরে ধীরে আলকাতারার পোঁচ উঠে গেছে; এখন আর সেই বহু প্রচারিত স্বেচ্ছাকৃত সেন্সার ব্যবস্থাও নেই। এতদিনে পোস্টার সেন্সার কর্তা যদি অন্য বিভাগে বদলী নাও হয়ে থাকেন—নিশ্চয় তিনি অফিসে এসে কাজ না পেয়ে খোসগলপে সময় কাটাচ্ছেন। এদিকে তাঁর খোসগলপের অবসরে রাস্তার দু' পাশের প্রাচীর অশ্লীল পোস্টারে ভরে গিয়ে রাজ্য সরকারের 'অহিংস নীতি' ও স্বেচ্ছাকৃত পোস্টার সেন্সারের 'সাফল্য' প্রদর্শন করছে। এই সাফল্যে নাগরিক জীবনের সুস্থতা যদি নষ্ট হয়ে থাকে, নাগরিকরা যদি পুত্রকন্যা নিয়ে পথ চলতে বিড়ম্বিত বোধ করেন তবে রাজ্য সরকারের বা পৌরপিতাদের মাথা হেঁট হবার কোন কারণ নেই।

চলচ্চিত্রে ও সাহিত্যে যৌনতা বৃদ্ধি সরকারের পরোক্ষ সম্মতি ভিন্ন হতে পারে না। গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছিলাম দেশ যখন সংকটে পড়ে, যখন জন-অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়; যখন দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন ধনিক শ্রেণীর আশ্রিত শাসকরা যৌনচিন্তাধারার প্রশ্রয় দিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করে। ধনিক শ্রেণীর এই চক্রান্ত নতুন কথা নয়। পৃথিবীর সব দেশেই এক বিশেষ সময়ে ধনিক শ্রেণী যৌনচিন্তায় যুব-সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। আজ যে কিউবা আমাদের চোখে বিস্ময়ের মত মনে হচ্ছে, মাত্র নয় বছর পূর্বে সেই কিউবা যৌনতা ও পাপাচারে ভেসে যাচ্ছিল। মার্কিন দেহবিলাসীদের কাছে কিউবার নারীরা ছিল আকর্ষণীয় ভোগ্য। সারা দেশটা নাইট ক্লাবে ভরে গিয়েছিল। দলে দলে মার্কিনরা সে সব নাইট ক্লাবে প্রমোদ রজনী কাটাতে আসতো। সমস্ত দেশটাকে নৈতিক অবসাদে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বিপ্লবের গতিরোধ করার জন্য। ফিডল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবী

নেতৃত্ব কিউবাকে বাঁচিয়েছে। মার্কিনদের পদাঘাতে দূর করে আজ নতুন কিউবা জন্ম নিয়েছে। আমাদের দেশেও কিউবার মত পাপাচারের স্রোত চলেছে; যৌনধর্মী চলচ্চিত্র এবং তার আনুসঙ্গিকে দেশ ভরে গেছে। গত ৫।৬ বছরের মধ্যে নাইট ক্লাবের সংখ্যা কল্পনার বাইরে বেড়েছে। নাইট ক্লাবের অশ্লীল ছবি আমদানী করতে দিতে আজ আর সরকারের আপত্তি নেই, সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিতে যত আপত্তি। ধনিক শ্রেণীর চিন্তায় যৌনধর্মী চলচ্চিত্র, যৌনসাহিত্য এবং কুৎসিত পোস্টারে দেশ ছেয়ে যাওয়া ভাল। এতে যুবকরা যৌনচিন্তায় ডুবে থাকবে, আত্মকেন্দ্রিক হবে, রাজ্য-নৈতিক চিন্তা করার সুযোগ পাবেন না। যুবকসমাজ যদি সুস্থ চিন্তা করে, তবে, স্বাভাবিকভাবে তারা বাম-পন্থী চিন্তাধারা গ্রহণ করবে এবং তার পরিণতি ধনিক শ্রেণীর মজানা নয়। সুতরাং যুবকসমাজকে যৌন চলচ্চিত্র ও যৌন সাহিত্যে ডুবিয়ে রাখাই ওদের কাম্য। এ কারণেই দেশে আজ অবাধে নাইট ক্লাবের ছবি চলছে, অশ্লীল পোস্টারে নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়েছে। এ কারণেই শাসনকর্তারা চূপ করে আছেন।

—সুজন।

চিহ্ন আন্দোলন

মণিহার

(ত্রিভূষণ প্রোডাকশন্স : সলিল সেন)

‘উল্টোমুখ ও সিনেমা ভাষা’ পত্রিকার পরিচালক প্রসাদ সিং ও সিরীশ সিংহর প্রযোজনায় ‘মণিহার’ ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এই ছবিটি এমন প্রচুরসৌভাগ্য লাভ করেছে, যেমন ছবিটি সম্পর্কে ত্রিভূষণের কোড্রোয়াল সৃষ্টি হয়েছে। প্রযোজকদের যে ছবিতিকে উপভোগ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে লক্ষ্য করতেন তা ‘শিল্পসমরসে ও গানের মনোহরতা’র মতো।

কিন্তু এত অর্থব্যয় সত্ত্বেও ছবিটি যদিও মনোরম দর্শকদের হৃদয় করে, যদিও বিশ্লেষণ করে দেখলে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না। বলতে কি না এই বহুদিন চলতি পত্রিকার সাথে জড়িত প্রযোজকদের কাছে আমরা আরো ভাল গল্প এবং উন্নত পরিচালনার ছবি আশা করেছিলাম। মণিহার এর কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার দায়িত্ব একাই পালন করেছেন সলিল সেন। দীর্ঘদিন পরে সলিল সেন চিত্রপরিচালনা করলেন। ছবি দেখে মনে হলো তিনি নাট্যক্ষেত্রে যদিও সাফল্য লাভ করেছেন কিন্তু চিত্রক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। তারই দৃষ্টিভঙ্গী ও কম্পনা-শক্তির দৃষ্টান্ত ছবিটির আর্থিক সফল হয়ে উঠেছে এবং গানের আভিষেক ভারসাম্য রাখা করা যায় নি।

ছবির প্রধান চরিত্র অজয়কে তার মা মৃদুশঙ্কর পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মারক

একটি মণিহার দিয়েছিল সে বাড়ির নববধূকে বরণ করার জন্য এবং ছোটতাই অজয়ের বাবা-পড়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল। অজয় অক্ষরে অক্ষরে মায়ের আদেশ পালন করেছিল। অজয়ের স্বাধীনতা ও ভায়ের প্রতি অসীম সম্ভ্রম অজয় ডাক্তারী পাশ করতে পেরেছিল। ভায়ের পৈতৃক-সম্পত্তিও সে বুঝা করেছিল। শূন্য তাই নয়—বড়বরের সুগায়িকা কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সে যে ভাড়া ও নৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে সে প্রায় রামায়ণের ভাড়াপ্রেমের সমতুল্য। অজয়ের এত আত্মত্যাগকে ছোটতাই অজয় ভুল করে, নাটকীয় ক্রমের পর শেষ পর্যন্ত ভুল বোকার শেষ হয়।

কাহিনীকার ও পরিচালক গতানুগতিক পদ্ধতির হয়ে বাধা গতি ও রীতিতে মনোহর বিজ্ঞানিত সৃষ্টি করে কাহিনীর কিস্তার ঘটিয়েছেন। শৈল্পিক-সম্পত্তির বিরাট কণা সোপান করা থেকে ছোটভায়ের জন্য মাসে মাসে পাঁচশ করে টাকা পাঠানো, সবই করা হলো গানের টিউনিং করে ও গান গেয়ে। তার ওপর ছোটভায়ের বিরুদ্ধে পথে বাধা দ্রুত করার জন্য তার নামে ত্রিশ হাজার টাকার মত ব্যয় করা হয়েছে এবং সুদৃশ্য দোস্তা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া। যদি গান গেয়েই এত-সম্পত্তি করা সম্ভব হয়—তার জন্য যে সময় দরকার সেই সময়-ব্যবধান ছবিতে বোঝা যায় নি। মনে হবে যেন দৃ-চার বছরেই সব ঘটেছে। বাস্তবিক পক্ষে শূন্যমাত্র গান গেয়ে এত সম্পত্তি করা যদি সম্ভব হতো গায়িকা সবাই বড়লোক হয়ে যেতো। অবশ্য অজয়কে যদি কিলোর মিউজিক ডিরেক্টর করে দেখান হতো তবে হয়তো বিশ্বাস হলেও হতে পারতো! পরিচালক সলিল সেনকে রুচিবান কার্তিক বলেই আসাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল, অন্য তিনি

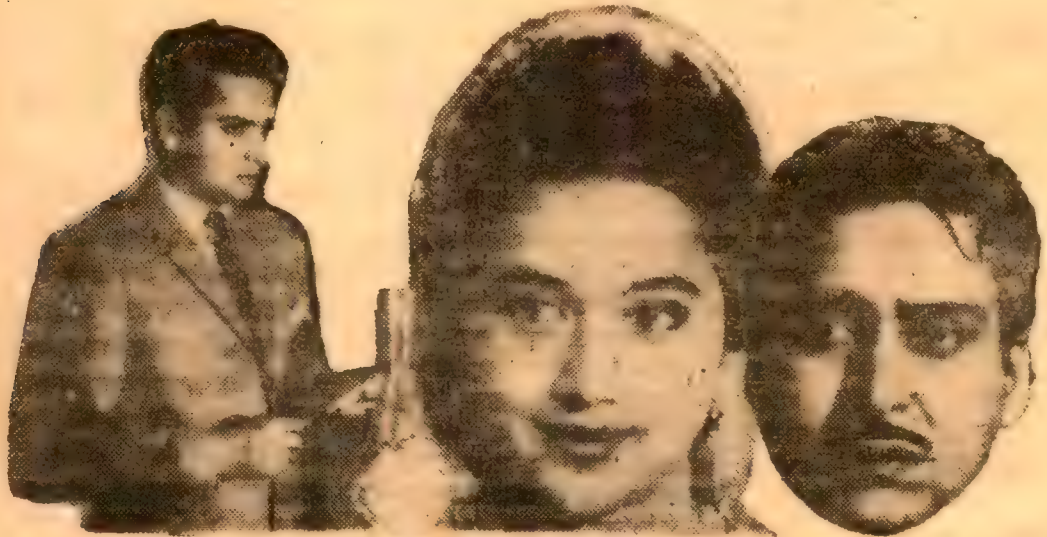
এমন একটি নাট্য সংযোজন করেছেন যার সঙ্গে কেবলমাত্র নিম্নলিখিতের হিন্দী ছবির তুলনা করা যেতে পারে। এই নিকট রুচির নাট্যটির জন্য বরক নিবন্ধন করা হয়েছে তা’ আরো হাস্যকর। ভারতী রায়ের অসুন্দর দেহের সঞ্চালনে নাট্যটি অসহ্য!

কাহিনীর শেষাংশ অবশ্য তাৎপর্যবাহক দর্শক-মন স্পর্শ করে। ছবিটির সর্বাধিক উপভোগ্য দিক গান। তবে গানের বাহুল্য এত বেশি যে, ছবির গতিক শ্লথ করে দিয়েছে এবং ভারসাম্যহীন মনে হয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, হারা দেবী, নন্দিনী বসু, রবি ঘোষ, মণি প্রিয়ানী, বিনয় ঘোষ প্রমুখ শিল্পবল প্রাণসেনারিভাবে চরিত্র রূপায়িত করেছেন। ছোট ছোট কয়েকটি চরিত্রে উপস্থিত হয়েছেন অরুণ রায়, অজিত চ্যাটার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী প্রমুখ।

দোলগোবিন্দের কড়চা

(প্রদীপ শিকচাঁপ : সারথি)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুক-রসজ্ঞক লেখার প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ রয়েছে। এই কৌতুকরসে যেমন অনাবিল আনন্দ আছে তেমনি স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণ কথাস্বাদও রয়েছে। এই কৌতুক রসজ্ঞ সাহিত্যিকের রচনা ‘দোলগোবিন্দের কড়চা’ ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। সাহিত্যের মত ছবিতে প্রচুর হাস্যর উপাদান আছে, হাসতে হাসতে পেটে খিল খিল করে যায়; নেই পান-বিশেষকে লক্ষ্য করে সাহিত্যের সেই হাল-ফুটনো জ্ঞান। সেই শ্লেষ সৃষ্টি করার মত



ত্রিভূষণ প্রোডাকশন্সের ‘মণিহার’ চিত্রে কিলিক, সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়



প্রদীপ শিকদারের 'দোলগোবিন্দের কড়চা' ছবিতে রবি ঘোষ, সত্যীন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রাবণী বসু

সমাজচেতনা যে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকদের নেই, তা আঙ্গিক সৃষ্টিতেই বোঝা গেছে।

এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র সিরিজ সবেমাত্র বিলাত থেকে ফিরে এসেছে। আসার পথে আহাজে কেতকীর সাথে পরিচয় এবং পরিচয় থেকে প্রণয়। কিন্তু দেশে ফিরার পর কেতকীর টুইস্ট নাচ দেখে সিরিজের মন বিগড়ে যায়। এদিকে বাড়িতে বাবা সাহেব, মা ঠাকুর-নর মুখী, সত্যরাজ কেতকীকে বিয়ে করার জ্ঞাপারে বাবাকে রাজী করানো গেলেও মাকে নড়ানো যাবে না। এই সমস্যার সমাধান করলো—এক কেতকীকে সিরিজের ভুল বোকার অবসান ঘটালো আবাল্যবন্ধু দোলগোবিন্দ। তার জন্য তাকে কখনো জ্যোতিষী সাজতে হয়েছে, কখনো বা সিরিজের কাকার ভগ্নীপতির পরিচয় দিয়ে বাড়ি ত্যাগ করার মত পালাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দোলগোবিন্দের বুদ্ধির গুণে সিরিজের বিপরীত-মুখী মা-বাবা কেতকীকে বউ করে দরে আনতে একমত হয়েছে। কড়চার শেষ হিসাবটা সিরিজ-এর কাকার জবরদস্তিতে দোলগোবিন্দ আর শীলার শূভ-পরিণয়ের আশীর্বাদপূর্ণ সমাপন।

পরিচালনার 'সারথি' হাসির অংশকে যেমন করে ছুটিয়ে তুলতে পেরেছে লোক-চরিত্রের অসংজ্ঞিতগুলিকে বৈ তেমন পারেন নি সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ ছাড়া আঙ্গিক

সৃষ্টিতে অহেতুক যৌনতার আশ্রয় নিয়ে নির্মল আনন্দরসকে, কিছুটা খোলাটে করা হয়েছে। শ্রাবণী বসুকে নিয়ে কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য সৃষ্টি না করলেও ছবির উপভোগ্যতার বাধা হতো না।

অভিনয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবি ঘোষ। তিনি চলার, বলার প্রতিটি মুহূর্তই উপভোগ্য করে তুলেছেন। তারপরে শ্রাবণী বসুর চরিত্রপায়ণ প্রশংসনীয়। শীলার চরিত্রে নবাগতা বিদ্যরাত্রীও সপ্রতিভ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সত্যীন্দ্র ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, সুরভা চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, শৈলেন মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সুশীল মজুমদার প্রমুখ। ছবির মেজাজ সৃষ্টিতে সঙ্গীতাংশ সহায়ক হয়েছে।

সেন্ট্রাল এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসব

আলমা-আতায় অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি কাজাকস্তানের আলমা-আতায় সেন্ট্রাল এশিয়ান চতুর্থ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে মেলিস উবুকেয়েভের 'দি হার্ড স্প্রিং'। সোভিয়েত পুরস্কারপ্রাপ্ত খিরগিজিয়ান

লেখক চোঙ্গিস আইৎমাতভের পেখা অগলমদে মেলিস উবুকেয়েভ চিত্রনাট্য রচনা ও প্রযোজনা করেছেন। এটি তার প্রথম ছবি। চবিতে দেখান হয়েছে খিরগিজ বুনক মুকাস চিত্রনাট্যে তার ছোট গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লো বৃহত্তর জগতে সৃষ্টির অনুসন্ধান। কি করে সে অন্যায় ও অবিচারের বিন্দু দাঁড়ালো। ছবিটিতে খিরগিজ জীবন এবং তার প্রাকৃতিক জগতে সৃষ্টির অনুসন্ধান। কি করে সে ভাবেই খিরগিজ। এই ছবিতে চমৎকার অভিনয় করেছেন বাকেন কাইদিকমেন (খিরগিজ সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের সম্মানিতা অভিনেত্রী)। সেন্ট্রাল এশিয়ান চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম অভিনেত্রী হয়ে পুরস্কার লাভ করেছেন।

'দি স্টার অব ওল্ডমবেক' এবং 'সেন্ট্রাল এশিয়া' ছবিতে অভিনয় করে সর্বোচ্চ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন সত্যুর বারখানভ। শেষের ছবিটির পরিচালক কাপিল ইয়ারমাতভ প্রেস্ট পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন। ইনি 'আলিশের নভই' ছবিটি জনপ্রিয় হতে পেরেছেন।

খিরগিজ মেরেজাও চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। নেলী আবুজারোভ তাসকন খিরেইক্যাল ও আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার পরে তিনি মস্কোর ডিরেক্টর ফ্যাকাল্টিতে

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তী

যোগদান করেন। তাঁর প্রামাণ্যচিত্র 'চিটার কুমার'—এর জন্য এবার তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

লোকগাথা অবলম্বনে কৌতুহলোদ্দীপক ছবি 'অলটার কোস' এবং স্বপ্নদৈর্ঘ্যের ছবি 'মি এ্যাভিস' (পরিচালক—ওসমান ফেজি) বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। কাজাক পরিচালক মামিট বেগালিনের ছবি 'ট্রেসেস গো ব্রিগ' দি হরাইজন আধুনিক ঘটনার ওপর কৌতুহলজনক ও সাহসিক দৃষ্টবাদের জন্য বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করেছে।

উজবেগ অভিনেত্রী নাসিবা কাম্বারোভা (পাঁচ স্টার অব ওল্ডগবেক) ছবিতে ফিরোজার চরিত্রে রূপ দিয়েছে) এবং আসিলা আশা-ময়েভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন সাংবাদিকতার স্নাতক, দ্বিতীয়জন খিরাগিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে জুরীদের মধ্যে ছিলেন রুশীয় ফেডারেশনের পিপলস আর্টিস্ট প্রিগরি রোশাল।

স্টুডিও থ্রা

বিজয় বঙ্গুর পরবর্তী ছবি 'বাঘিনী'

'ভাগিনী নিবেদিতা' ও 'রাজা রামমোহন'-দ্ব্যত চিত্রপরিচালক বিজয় বঙ্গুর পরবর্তী ছবিটি হবে—'বাঘিনী'। সমরেশ বসু রচিত গাড়া জাগানো উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক শ্রীবসু বর্তমানে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত আছেন। এস. এম. ফিল্মসের প্রযোজনায় ছবিটির চিত্রগ্রহণ শ্রব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে।

দুই প্রজাপতি

কৌশল চ্যাটার্জী প্রযোজিত ললিত চিত্রমের দ্বিষ্ঠি-মধুর ছবির দুই প্রজাপতি-র চিত্রগ্রহণ বোম্বাই-এর স্টুডিও-তে দ্রুতগতিতে

এগিয়ে চলেছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন : শ্যাম চক্রবর্তী। হেমন্ত-কুমার মুখার্জী ছবিটির সুরকার। চরিত্রচিত্রণে আছেন : কিশোরকুমার, তনুজা, তরুণকুমার, অসীমকুমার, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, কান্দু রায়, চন্দ্রমা ভান্ডারী, কেটে মুখার্জী ও সবিতা চ্যাটার্জী। বাবীশ্রী পিকচার্স ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

চারুণকবি মুকুন্দদাস

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিদ্রোহী অগ্নিশিখা ছিলেন—চারুণকবি মুকুন্দদাস। স্বদেশী বাহাগানের মাধ্যমে তিনি বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষকে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে গিয়ে বহুবীর্যের কারাবরণ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টকণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছিল—'সাবধান, সাবধান, সাবধান', 'আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্ধ দৃষ্ট বহিমান', 'পাণ করে সব লাগয়ে কাজে ঝাটবো মোরা দিন কি রাত', 'এসেছে ভারতে নব-জাগরণ জেগেছে ভারতে নতুন প্রাণ', 'জাতের নামে বন্ধুজাতি সব' প্রভৃতি অসংখ্য নবজাগরণের গান।

সেই বিদ্রোহী অগ্নিশিখার চারুণকবি মুকুন্দদাসের কর্মময় জীবনের কাহিনী নিয়ে ফিল্ম ক্লাসিকের সঙ্গ্রহ নিবেদন 'চারুণকবি মুকুন্দদাস' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্যরচনা ও পরিচালনা করেছেন : নির্মল চৌধুরী। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন : পবিত্র চ্যাটার্জী। মুকুন্দদাস রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন : সবিতারত দত্ত।

ছবিটিতে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন : সবিতারত দত্ত। ভবতারিণী পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

বৌদি

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী প্রযোজিত পূর্ণেন্দু প্রোডাকসনের 'বৌদি' ছবির চিত্রগ্রহণ টেক-

নিসিয়ান্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ বসু। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন : প্রণব রায়। সুরসৃষ্টিতে রয়েছেন : প্রবীণ সুরকার : রবীন চ্যাটার্জী। ঘরোয়া পরিবেশের এই ছবিটির চরিত্রচিত্রণে আছেন : সন্ধ্যারাণী, কাশী ব্যানার্জী, অনুপকুমার, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, কান্দু ব্যানার্জী, জহর রায়, সুখেন দাস, নৃপতি চ্যাটার্জী, মৃণি শ্রীমানী, ববু গান্ধলী, অশোক মুখার্জী, বনানী চৌধুরী, মলিনা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, রেণুকা রায়, সুমিতা সান্যাল, অমল্যা সান্যাল, শ্রীমান দীপক, শ্রীমান বাপী, সুশীল দাস, এবং অনিল চ্যাটার্জী ও ললি চক্রবর্তী।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন বধাক্তন : দেওজীভাই ও অমির মুখার্জী।

মমতা

ইস্টম্যান পম্ফটিতে রঞ্জিত হিন্দী চলচ্চিত্র 'মমতা'র পরিচয়লিপি অঙ্কিত করছেন বিখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে কয়েকটি বাংলা ছবিতে পরিচয়লিপি অঙ্কন করে তিনি প্রশংসা লাভ করেছেন। 'মমতা'র প্রযোজক চারুচিত্র। পরিচালনা করেছেন অসিত সেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সূচিঠা সেন।

নাটকরূপে

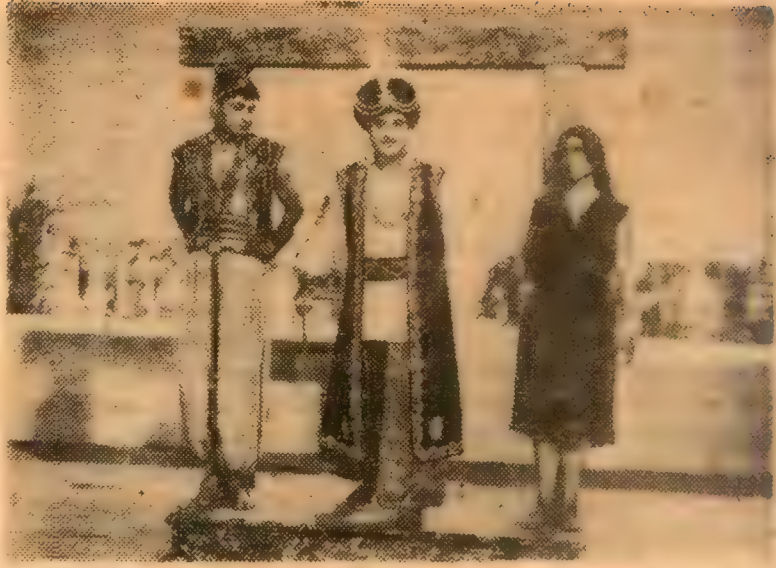
ভিলাই ইম্পাত নগরীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৬ এবং ২৭শে জানুয়ারী ভিলাই ইম্পাত নগরীতে বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে অ্যালফ স্ট্রলস ট্রেনিসদের উদ্যোগে স্থানীয় ও বিহরাগত



প্যারাডাইস পিকচার্সের 'গহসংধরন' ছবিতে বিকাশ রায়, দিলীপ মুখার্জী, রবি ঘোষ ও অঞ্জনা ভৌমিক

বহু উৎসব জনসমাবেশে দুইদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব যথেষ্ট সাকল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের বিচিহ্নানুষ্ঠানে আধুনিক এবং কয়েকটি জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেন মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, আলপনা সেন ও সত্য মুখার্জী। সঙ্গে ভাবলা সঙ্গত করেন অশোক মুখার্জী। দ্বিতীয় দিন ২৭শে জানুয়ারী স্থানীয় প্রখ্যাত শিল্পবন্দ শক্তিমান তরুণ গল্পকার রবীন্দ্র গুহর লেখা একটি নতুন রীতির নাটক মণ্ডল্য করেন। নাটকটির নাম—নাটকে লিপ্সা নেই। নাটকটির গল্পবস্তু সামান্য, নেই বললেই চলে। কিন্তু তাই বলে, সুখভোগে দর্শকদের মনে কোনো ফাঁক থাকে না। নাটকের তিনটি মূল চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন বিশ্বনাথ সান্যাল, দেবরত রায়চৌধুরী ও শ্যামল চৌধুরী। বীরেশ্বর, রাজীব, পরিভোষ ও অমিরর চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকচিহ্ন জয় করেন অতুল দে, প্রশান্ত মৈত্র, মারা বন্দ ও অমির ঘোষ। এ ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গোপা দাস, অশোক চৌধুরী, নিমল মৈত্র, দীপংকর সিন্হা, হেরাম চক্রবর্তী ও শুকলাল নন্দী। নাটকটি পরিচালনা করেছেন অতুল দে। নারীকার কৃমিকার রেশম দে অতুলদার।



গান চক্রবর্তী পরিচালিত 'দুঃস্বপ্ন, প্রজাপতি' ছবির তিনটি চরিত্রে অতুল, কিশোরেশ্বর ও জগদ এক শিল্পী

সঙ্গীত কথা

॥ চারপকবি মকুন্দদাস ॥

যজ্ঞ বা যজ্ঞেশ্বর সে একদিন চারপকবি মকুন্দদাস নামে সারা বাংলা দেশে সসম্মানে পূজিত হবেন ও স্বীকৃতি পাবেন তা হয়ত তাঁর জননী শ্যামাসুন্দরী দেবীও কোনদিন চিন্তা করেন নি। ছেলেবেলা হতেই যজ্ঞ এত দূরন্ত-পাগল ছিল যে মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী নিদারুণ দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন আর ঠাকুরের কাছে সবসময় মকুন্দদের স্মৃতি কামনা করতেন। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মন্ডানে মড়া পোড়াতে ও বাড়ি বাড়ি হরিমল্লট গায়ে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকতেন মকুন্দ দাস। সুতরাং লেখাপড়া হবে কোথা থেকে? তাই তিনি বিদ্যালয়ের গাড়ী আর পার হতে পারেন নি। কিন্তু অতিশিক্ষিত না হলেও স্বদেশের মক্তি আন্দোলনে নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া ও যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার অভিনব পদ্ধতি মনে বিপ্লবের উদ্রেক করে। বর্তমান প্রগতির যুগে কমিশনার জনা সরকারী তরফ হতে ছায়াচিত্র, ফোঁড়, লোকরঞ্জন শাখা প্রভৃতি বাহন হিসাব ব্যবহৃত হচ্ছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের নাট্যশাখার মাধ্যমে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৫০ বৎসর আগে এক

বৈদেশিক নৃশাসনের মধ্যে মকুন্দদাসের মত একজন সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে স্বাধীনিকতার প্রচার সত্যিই মনে বিস্ময় আনে। প্রকৃতপক্ষে মকুন্দদাসকেই বাংলার সর্বাঙ্গীণ-সামরিক চরপকবি বলে অভিহিত করা হয়। এরকম কল্পকর্ত, তেজদগু ভাসিমা, বলিষ্ঠ-শরীর, ততোধিক অপরাধের মনোবল বোধহয় আর কোন সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে পাওয়া যাবে না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই স্বাধীনিকতা প্রচার করে গেছেন মকুন্দদাস। সমগ্র বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে তিনি তাঁর যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশবাসীকে উদ্ধৃত করে তোলেন। আজও বহির্বাংলার প্রবাসী বাঙালীরা মকুন্দদাসের যাত্রাগানের কথা বলেন। বিশেষ করে বীরা প্রবীণ তাঁরা মকুন্দদাসের কথার উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কেন না তাঁরা স্বচক্ষে মকুন্দদাসের সেই প্রাণ মাতানো যাত্রা ও গান শুনছেন। দেখেছেন প্রোতাদের মধ্যে গানের তাঁর প্রতিভা। বছর তিনেক আগে প্রকের দিলীপ রায়ের আমন্ত্রণে আমাকে পূণার যেতে হয়েছিল। পূণাতে প্রায় ৩৪ হাজার বাঙালী বাস করেন। তাঁদের বিভিন্ন ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে। আমাকে সেইসব সংস্থার একাধিকবার বাংলা গান করতে হয়েছে। কলা বাহুল্য আমি আমার অনুষ্ঠানে মকুন্দদাসের গান পরিবেশন করেছি এবং বহু প্রবীণ ব্যক্তি শুধি হয়েছেন মকুন্দদাসের গান শুনে। তাঁদের মুখ থেকে মকুন্দদাসের যাত্রাগানের পূর্ব স্মৃতির বহু ঘটনাই শুনছি। বিস্মিত হয়েছি মকুন্দদাসের সূত্রপ্রসারী জনপ্রিয়তা দেখে। গত বৎসর নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনে লক্ষ্যোতে এই মকুন্দদাসের গান পরিবেশন করে প্রচুর সম্মতি পেরেছি। প্রকের ডাঃ রাখাকুম্ভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও প্রবাসী বাঙালীরা

মকুন্দদাসের গান শুনে তাঁদের ছেলেবেলার মকুন্দদাসের যাত্রাগান শোনার কথা বললেন। সেবার এলাহাবাদে পরিবেশন করেও বহু জ্ঞানীগুণী প্রবীণ বাঙালীদের নিকট হতে এই একইরূপ কথা শুনছি। এবার বেনারসে সর্বজনপ্রিয় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে মকুন্দদাসের গান শোনানোর পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। অপেক্ষা না রেখে নিজেই মকুন্দদাসের যাত্রাগানের বিষয় অনেক কথা বললেন। এতোগুলো উদাহরণ এইজন্যই দিলাম যে, শূন্য বাংলাদেশেই নয় বাংলার বাইরেও বহু কৃতবিদ্যা বাংলামায়ের সুসন্তান আছেন যারা প্রথম-প্রথম মকুন্দদাসের গান শুনছেন ও তাঁর যাত্রা দেখছেন। সুতরাং মকুন্দদাসের সম্বন্ধে কোন বই বা নাটক বা ছায়াচিত্র তৈরি করতে হলে অত্যন্ত তথ্যমূলক হওয়া দরকার। অতিরিক্ত কাব্যনিক হলে তাঁর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর সঙ্গীতগুণিও বিকৃত সুরে করা চলেবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ফকিরলাল নজরুল প্রভৃতি কবিদের গানের মত মকুন্দদাসও তাঁর সব গানে নিজে সুরারোপ করে গেয়েছেন। তাঁর রচিত সুরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল—যা অন্য কারও মাঝে মিলবে না। আমার মনে হয় এর জন্য দরকার একটি বিশেষজ্ঞের 'বাড'। মকুন্দদাসের পুত্র বা তাঁর ২১ জন বয়স্ক ছাত্র মকুন্দদাসের সঙ্গীতাবলীর মৌলিক সূত্রগুলি এখনও দিতে পারেন। তা ছাড়া তাঁর জীবনী সংগ্রহে প্রবীণ সাংবাদিক, বীরশাল বিদ্যোদীপ সম্পাদক দুর্গামোহন সেন, গ্রন্থকার সুরেন দাস, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, বীরশাল সেবাসমিতি প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করতে পারেন। এঁদের সকলকে নিয়ে একটি বোর্ড করে তাঁদের নির্দেশ অনুসারে এইসব মহানচরিত্রের

সিনেমা বা নাটক হওয়া উচিত। নতুবা সবটাই হাস্যকর হবে। শ্রুতি জনপ্রিয়তা ও মকুন্দদাসের নাম ভাঙিয়ে স্বার্থক চিত্র সৃষ্টি হবে না। ধারা প্রকৃত এই বিষয়ের অধিকারী তাঁদের যাহা নৈওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

মকুন্দদাস প্রকৃতপক্ষে “মকুন্দদাস” হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত হন তদানীন্তন বরিশালের শ্রেষ্ঠ জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রত্যক্ষ ভাবাবধানে। বলা যায়, মকুন্দদাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের আবিষ্কার ও সৃষ্টি। তবে বজ্রা বা যজ্ঞেশ্বর, “মকুন্দদাস” নাম প্রাপ্ত হন তাঁর বৈষ্ণবগুরু রামানন্দ অবধূত কর্তৃক। বজ্রায় অশান্ত চপলতা সঙ্গীতাত্মমুখী করে তোলেন অবধূত রামানন্দ। মকুন্দদাস রামানন্দের প্রেরণায় বহু বৈষ্ণবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বৈষ্ণব ধর্মপ্রবণতাই পরে তাঁকে কালী-সাধক করে তোলে। বরিশালের উপকণ্ঠে কাশীপুর গ্রামে, কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাঁর সাধনা ও স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জাতীয় আন্দোলন কার্যকরী করার জন্য তিনি প্রতীক্ষিত করেছিলেন আনন্দময়ী-আশ্রম। তিনি বলতেন, এই মাকে লাগিয়ে তোলে। তা হলে দেশের ও দেশের চেষ্টা ঘটবে। তাই প্রায়ই তিনি গাইতেন,—

“জাগো গো জাগো—জননী,

তুই না জাগিলে শ্যামা,

কেউ জাগবে না গো মা,

তুই না নাচালে কারো নাচবে না ধমনী ॥”

মকুন্দদাসের জন্ম প্রকৃতপক্ষে ঢাকা জেলার বানারিগ্রামে হয়েছিল ১২৮৫ সালে। তাঁর জন্মগ্রহণের পরেই উক্ত গ্রাম কীর্তিনাশার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তখন মকুন্দের পিতা

গুরুদয়াল দে সপরিবারে এবং স্থায়ীভাবে তাঁর কর্মস্থল বরিশালে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি বরিশালের কাপড়েরীতে সামান্য চাকরী করতেন। আশা ছিল তাঁর বজ্রা সেখানাপড়া শিখে বড় চাকরী করবে। তাঁর দৃষ্টি ঘটবে। কিন্তু বজ্রা সে পথ দিয়েই গেল না। তাঁকে একটি দোকানও করে দিয়েছিলেন গুরুদয়াল। কিন্তু কেন কিছতেই তাঁর বহিমুখী মনোভাব ও দুরন্তপনা রোধ করতে পারলেন না। অবশেষে তাকে অল্প বয়সেই বিবাহ দেন। এই সময় তিনি তাঁর কথুবাণধবদের নিয়ে বহু জায়গায় হরিরলুটের আসরে গান গেয়ে লোকদের মুগ্ধ করতেন। অবশেষে গুরুদাস অশ্বিনীকুমারের নজরে পড়েন। শ্রুত হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের আগুনে যে কজন অগ্নিশৃঙ্গ সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল চারনকবি মকুন্দদাস তাঁদের অন্যতম। বঙ্গভঙ্গের আনন্দময় এবং স্বামী কিবকানন্দের ওজস্বী-বাণী যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল, তারপরে অনুকূল সময় পেয়ে একদল বীর রাজত্ব বিপ্লবের গোপন পথে দেশমাতৃকায় শঙ্খলম্ভ করতে অগ্রসর হয়েছিল। মকুন্দদাসের গান তাদেরই মনোভাব প্রকাশ্য জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯০৬ সালে রাখীবন্দন উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয়-জীবন যে বিপুল উল্লসিত পন্থার সঞ্চার করেছিল, মকুন্দদাস তাকে আরও উল্লসিত করেছিলেন তাঁর কথুবাণে—

“আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরঙ্গী বণিকের গোরবরাবি
অন্তল জলে ডুবিয়ে দিতাম ॥”

তদানীন্তন বঙ্গ-বিহার-আসামের গভর্নর “বার্ণসফিল্ড ফুয়ারকে” বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে বললেন—

“ফুলার। আর কি দেখাও ভয়

দেহ তোমার অধীন বটে,

মন তো তোমার নয়।

হাত বাঁধবে পা বাঁধবে

ধরে না হয় ফাঁসী দেবে

মনকে বাঁধতে পার

তোমার এমন শক্তি নয় ॥”

প্রথম প্রথম তাঁর যাত্রার দল নিয়ে তাঁর নিজেরাই নৌকা বেয়ে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এই স্বদেশীযাত্রা করতে শুরুর করলেন। বাঙালীর তখন ভয় ভাঙার পালা শুরুর হয়েছে। তারা শুনলো অভিনব যাত্রা! অভিনব কথা! মকুন্দদাস বললেন, মাতৃবন্দনা শুরুর স্তব পাঠে হয় না। অন্তর্যারণ করে আরাতি করো। তিনি গাইলেন—

“বন্দে মাতরম্ বলে নাচের সকলে

কৃপাণ লইয়া হাতে

দেখকে বিদেশী হাসো অটুহাসি,

কাপকে মেদিনী ভীম পদাঘাতে ॥”

ইংরাজ সরকার আর স্থির থাকতে পারলেন না। এই ভয়ঙ্কর কবিকে আড়াই বংসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সুদূর দিল্লী জেলে স্থানান্তরিত করলেন। জেলখানায় অসম্মানকর নিয়মকানুন তিনি মানতে চাইতেন না। বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। এখানে অনেক অত্যাচার তিনি সেরেছেন। জেলে থাকা কালেই তিনি তাঁর সাধনী স্ত্রী সুভাসিনী দেবীকে হারালেন। নিদারুণ শোকে মূহ্যমান হলেন। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েই তিনি শিশুপুরে বালিকা কন্যার হাত ধরে আবার তাঁর অভিনয়ে মন দিলেন। ভাঙাদল জোড়া লাগিয়ে আবার তিনি গাইলেন—

“আবার বখন গান ধরেছি,

গাইবো সেই গান

বুকটা বাহে ফুলে ওঠে,

শিরায় বাহে অগ্নি ছোটে

তন্দ্রা বাহে যার গো ছুটে,

মাতার বাহে প্রাণ ॥”

মকুন্দদাস তাঁর নাটকগুলিতে অনেক সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর “মাতৃপূজা”, “পথ”, “সাধী”, “সমাজ”, “পল্লীসেবা”, “স্বচ্ছচারিণী”, “কর্মক্ষেত্র” ইত্যাদি নাটকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব নাটকে তিনি Collective-farming, Co-operative Banking, Cottage Industry, বিদেশীপণ্য বর্জন, শারীরিক শক্তি অর্জন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর সারা দেশকে গানে গানে মাতিয়ে রেখে ১৩৪১ সালে এই দৃষ্ট জীবনের অবসান হয় ॥



খারকতের প্রেক্ষণে ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্নদেশের ছাত্ররা সমবেত হয়ে নিজ নিজ দেশের শীতকালে সম্মুখে আনন্দদর করে তোলে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একদল হাণ্ডেরিয়ান ছাত্র গীটার বাজাচ্ছে।

—সত্যেন্দ্রের মৃত্যুপাধ্যায়

রাশিয়ান নাটক : প্রথম প্রদর্শনীর সময় 'দি সি গাল' ভয়ানকভাবে ফেল করেছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অন্য ধরনের অনুপ্রেরণা না পেলেও নিশ্চয় ভেতরের তাগিদেই তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর মাস্টারপিপেস 'দি থ্রি সিস্টারস' ও 'দি চেবী অর্চার্ড' নাটক দুটি রচনা করতেন। কিন্তু পিটার্সবার্গে 'দি সি গালের' অসাধক প্রদর্শনীর পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড উৎসাহ এবং গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করলেন চেখভ যখন মস্কোর আর্টস থিয়েটার প্রথম অভিনয়ের দৃবছর বাদে বির্যাট সাফনার সঙ্গে 'দি সি গাল' নাটকের মণ্ডাভিনয় করলো। এরমাত্র দু'মাস আগে মস্কো আর্টস থিয়েটার তাদের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু অল্প দিনের ভেতরেই এই দলটি কন্টিনেন্ট এবং ইংল্যান্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক থিয়েটারগুলোর তুলনায় অনেক বেশি যশ এবং খ্যাতি অর্জন করে নিল নিজেদের কাজ দেখিয়ে। 'Chekhov proved a true prophet of Russia's future when he wrote, as early as 1899, that when a history of modern Russian drama was written this theatre would give it its finest pages.'

[Martin Lamm.]

'দি মস্কো আর্ট থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন দু'জন লোক—স্ট্যানিসলাভস্কি, ইনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে এবং একজন সৌখীন। 'ভি নে তা—আর' নেমিরোভিচ-ধানশেঙ্কো, নাট্যকার এবং নাট্যকলার শিক্ষক। স্ট্যানিসলাভস্কি ছিল বির্যাট প্রতিভা প্রতিউসার এবং অভিনয়-শিক্ষক হিসাবে। তাঁর যশ এবং খ্যাতি আজ পৃথিবীর সবত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যানিসলাভস্কির প্রভাব আজ সর্বজনস্বীকৃত। বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং অভিনেতা বারটল্ট ব্রেক্সটের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত স্ট্যানিসলাভস্কির সিস্টেম অদ্ভুত একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইউরো-আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে। পরে সুযোগমত স্ট্যানিসলাভস্কি প্রবর্তিত অভিনয়রীতি এবং ব্রেক্সট প্রবর্তিত অভিনয়রীতির তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করবো। এখানে শুধু একটা কথা বলা দরকার—স্ট্যানিসলাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতিতে মনো-দর্শনের প্রভাবের কথা অনেকের

জানেন না। এ বিষয়ে তাঁর জীবনীকার ডেভিড ম্যাগারশ্যাক লিখেছেন :

'At the time Stanislavsky was interested in Hindu philosophy and especially in the Yoga system of abstract meditation and mental concentration, which supplied him with one of the most important elements of his own system—the circle of public solitude, consisting of a number of large and small "circles" into which the actor has to withdraw in order to keep his attention concentrated on the stage and not on the audience. His studies of Hindoo philosophy also provided him with the numerous sayings of sages with which he was fond of illustrating his talks to the actors.'

স্ট্যানিসলাভস্কির মতে অভিনয়ের সময় অভিনেতা যদি স্টেজের কাজের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন, তবেই বিনা চেষ্টায় দর্শকদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এর থেকেই তিনি উদ্ভাবন করলেন 'The circle or the circle of attention.' তারপর তিনি অনুভব করলেন যে, অভিনয়শিল্পের সব থেকে বড় বিধান হোল দৈহিক এবং আত্মিক সত্তাকে একনিষ্ঠভাবে মন-সংযোগ বা concentration অভ্যাস করানো।

অতএব স্ট্যানিসলাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতিতে মন-সংযোগের উপর একটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হোল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি আরও দেখলেন যে, স্টেজের উপর যা ঘটছে বা বলা হচ্ছে, তাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে অভিনেতার ধর্ম। অভিনেতার বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে স্টেজের সত্য নির্ধারিত হয়। একথা অবশ্য অভিনেতা জানেন যে, মঞ্চের যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি অভিনয় করছেন বাস্তব-সত্য দিয়ে বিচার করলে তার

সবটাই ফাঁকি এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু নিজেকে এইভাবে ব্যাকরে নিতে হবে যে, এইসব যদি সত্য হয় তবে আমাকে এইভাবে কথা বলতে এবং কাজ করতে হবে এবং তার ফলে মিথ্যাটাই আর্টিস্টের কাছে ঠুথ হয়ে দাঁড়াবে। এই imaginary truth সম্বন্ধে অভিনেতাকে অবহিত থাকতে হবে— কারণ এটাই যেন, যাদু-মন্ত্রে তার মনে বিশ্বাস করবার ইচ্ছাটা প্রবল করে তুলবে। If বা এই যদি তার ভাবটাও স্ট্যানিসলাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতিতে জায়গা করে নিল। All these elements, the feeling of truth as well as the relaxation of muscles and concentration, he discovered, were amenable to development and exercise. Indeed, it was only when he had discovered the importance of the feeling of truth, produced by the action of 'it' on the actor's imagination, that he succeeded in attaining a genuine and natural state of concentration and relaxation of muscles.

কাকে ও চিত্রে বিচিত্র মিলন।

চিত্র শোভা এলবাম

নবীন-মনোমোহন সুশোভন সংকলন।

কবিঃ—বিশ্বকবি কবীন্দ্র প্রমুখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শিল্পীঃ—সর্বজনসুপ্রসিদ্ধ প্রমুখ ভবানীচরণ লাহা। এ সমন্বয়ের তুলনা সাহিত্যরাজ্যে কোথায়?

চিত্রে চিত্রে চিত্রের সুশোভন এলবাম। বঙ্কিম-কৃত্যের মাদুরীছটার পুলকলীলা—আর ভাব-বিকাশের অমির মাদুরী। এ বেন কেবল জ্যোৎস্না—হীরার পান্যার—কিশলয়ে পুষ্পে ক্ষুর সঞ্চলন।

সুদৃশ্য বাধাই—মূল্য ২৫০ টকা।

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৩৩, বিপদবিহারী কলকাতা পল্টন, কলি-১৫

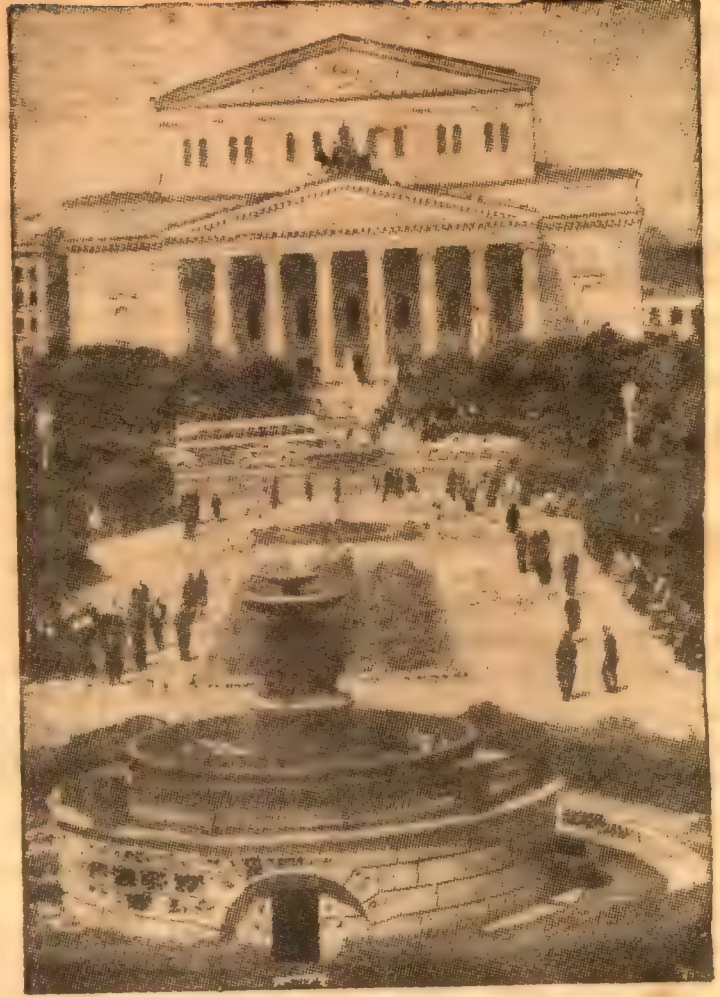
স্ট্যানিসলাভস্কির পদ্ধতিতে একথা পরিষ্কারভাবে বঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মঞ্চাভিনয়ে প্রধান সৃজন-শিল্পী হলেন অভিনেতা নিজে।

যে চরিত্রে অভিনয় করছি তার অন্তরটাকে কি করে সম্পূর্ণভাবে দর্শকদের কাছে খুলে দেখানো যায় এই ছিল স্ট্যানিসলাভস্কির কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। চরিত্রের ভেতরকার প্রধান প্রধান ভাব ও চিন্তা যাতে সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৈজন্য সবদিক দিয়ে বাহুল্য ও আড়ম্বরকে বাদ দিয়ে নতুন ধারায় প্রযোজনা শুরু করলেন—

Everything now is based on simplicity and on the inner delineation of the part.

স্ট্যানিসলাভস্কির পদ্ধতির একটা বড় নির্দেশ হল—অভিনেতাকে বঝতে হবে সবাই তার কাছে থেকে কি প্রত্যাশা করছে। জানতে হবে সে নিজে কি চায় এবং কিসের দ্বারা তার কল্পনা-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে সৃজনশীল করে তোলা যায়—কারণ এই সব বিবিধ সমস্যা এবং প্রশ্নের সমাধানেই যে চরিত্রে অভিনয় করা হচ্ছে তাকে প্রাণ-বন্ত মানুষ হিসাবে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

নাটক প্রভিউস করতে গিয়ে প্রথম ভালভাবে বঝতে হবে the inner meaning of the play. অভিনয়ের সময় সেটাকে অব্যাহত রাখতে হলে দুটি জিনিসের উপর নজর রাখতে হবে—(১) রুনিং আই-জিয়া ও (২) গ্লু এ্যাকসন।



মস্কোর বলশয় থিয়েটার

মহাকাব্য তেমনচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়ের

বৃন্দ-সংহার কাব্য

রাম—২৫

সোনার আনারস

প্রোফেসর কুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

বিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপহাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিব্যার মত বই

দ্বি বঙ্গমতী ও ইভেং নিমিটেড

১৯৬৬, ব্রিটিশবাহারী গাভুণী স্ট্রিট,

কলিকাতা-১২

শিল্পী হিসাবে স্ট্যানিসলাভস্কির মহত্ব এইখানেই যে, তিনি কখনও এক-জয়গার এসে থেমে থাকেন নি। তাঁর শিল্পবোধ এবং শিল্পের অনুভূতি, বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত তাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। অতীতে বা কিছু শিখেছেন বা জেনে-ছেন পরে হয়তো বুঝেছেন তার মধ্যে কিছু-কিছু জিনিস আর সমরোপযোগী নয়—বিনা বিচারে সে সব জিনিসকে বাদ দিয়েছেন। তেঁরাটি বহুর বয়সেও তাঁর মধ্যে যৌবনের আবেগ ও উত্তেজনা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। কিন্তু এ যৌবনাবেগে ও উত্তেজনায় মধ্যে উচ্ছ্বলতার কোনো স্থান ছিল না—অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা পুষ্ট ও পরিমার্জিত হয়ে এ যৌবন এক নতুন ধরনের শিল্পানুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

নেমিরোভিচ-দানসেস্কোর লেখা নাটক রাশিয়ার বাইরে কখনও সমাদৃত হয় নি—তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর কল্পনাশক্তির বিরাট ব্যাপ্তি ছিল এবং সাহিত্যসম্বন্ধে তাঁর সত্যিকার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় তখনকার রাশিয়ান থিয়েটারের রিপোর্টারী লিস্টগলোতে ইব্‌সেন এবং মোতারলিস্কের নাটককে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান দেওয়া হোত। চেখভের সঙ্গে তিনি আগে থেকেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরই প্রস্তাবমত ১৮৮৯ সালে চেখভ তাঁর 'দি উড্ ডেমন' নাটকে কিছু কিছু পরিবর্তন এবং পরিশোধন করেন। পিটার্সবার্গে 'দি সি গালো' প্রথম প্রদর্শনীর ব্যর্থতার পর চেখভ যোগ করেন যে, দানসেস্কে! প্রদর্শন হয়ে এই নাটকটি লিট

মাসিক বঙ্গমতী

অপমানের একশেষ হয়েছে। নাটকটির অসাফল্য। সফল নাটককে দৃষ্টান্তে মত প্রকাশ করলেন যে, 'দি সি গাল' একটি সব দিক দিয়ে সেরা রাশিয়ান নাটক। ১৮৯৭ সালে সে বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক কর বলে দানসেকোকে প্রিবোর্জভ পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পুরস্কার নিতে স্বীকার করে বিচারক কমিটির জানিয়ে দেন যে, এ পুরস্কার তার প্রাপ্য নয়, কারণ—এ বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে 'দি সি গাল' এবং কামিটি সে, নাটকটিকে বিনা কারণে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি 'দি সি গাল' সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"Here you have a real gem, here Russian drama celebrates a new triumph."

'দি সি গাল' সম্বন্ধে দানসেকো যখন এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তখন সমালোচকরা এ নাটকটিকে বিরূপ মন্তব্যের দ্বারা একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন এবং দানসেকোর লেখা নাটক 'লাইফস্' ভ্যালু' তখন সফলতার চরম শিখরে অবস্থান করছে। নেমিরোভিচ-দানসেকোই সবার জোর করে—মস্কো আর্ট থিয়েটারের রেপারটরীতে 'দি সি গাল' নাটকটিকে ঢুকিয়েছিলেন। এমন কি স্ট্যানিসলাভস্কিও স্বীকার করেছেন

যে, প্রথমটাই এ নাটকটি তিনি ভালভাবে বুঝতেই পারেন নি।

জোলা এবং আন্তোনের দ্বারা সৃষ্ট বাস্তববাদের রীতিনীতিগুলো পুরোমাত্রায় মঞ্চে কার্যকরী করবার চেষ্টা করতেন স্ট্যানিসলাভস্কি। অভিনয়স্থলটি যেন একটি চার দেয়ালে ঘেরা ঘর—স্টেজ এবং দর্শকদের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা যেন একটা কাল্পনিক চতুর্থ দেয়াল দিয়ে ঢাকা—এ ব্যাপারটা অভিনেতাদের কাছে স্বাভাবিক করবার জন্য রিহাসালের সময় ফুট লাইরে পরেই স্টেজের উপর একসার চোর বসিয়ে দেওয়া হোত with their backs to the auditorium. অভিনেতাদের বলা হোত এমন হুঁ নিয়ে তারা অভিনয় করবেন যেন প্রেক্ষাগারের দর্শকদের উপস্থিতি তাঁদের স্মরণে না আসে। বাস্তবতা-বোধ সুদৃঢ় করবার জন্য দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এবং গাড়ির চাকার শব্দ দর্শকদের শোনানো হোত। 'দি সি গালে' ব্যাঙের ডাক এবং কুকুর পোকের গুঞ্জনধ্বনি করানো হোত। প্রথমটাই এই ধরনের আলট্রা-রিয়ালিজমের জন্য চেখভ বেশ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। কিন্তু মস্কো আর্ট

থিয়েটারের দল যখন এই নাটকটি নিয়ে ইউরোপ টুরে গেল তখন সবাই এ সবার মূল্য বুঝতে পারলেন।

It was this naturalism, carried almost into symbolism, that enabled a foreign audience, unfamiliar with the language and sometimes with Chekhov's plays, to appreciate the presentation. It gave the play atmosphere and something of a feeling of Russian life. [Martin Lamm.]

আর শেষ দুটি নাটক 'দি থ্রি সিস্টার্স' এবং 'দি চেরী অর্চার্ড' চেখভ আরও যত্নসহকারে তদানীন্তন রাশিয়ান জীবনধারার বিরাট এক-মেরোমির দিকটা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ দুটি নাটকে হৈ-হুন্সোড়ে ভরা দৃশ্যের কোন অবতারণা করেন নি চেখভ। আগেকার লেখা সিরিলাস নাটকে হয় হত্যা, নী হয় আত্মহত্যার দৃশ্য আছে either on or off the stage, 'দি থ্রি সিস্টার্সে' একটি চরিত্র স্টেজের বাইরে ড্রেন্স লড়তে গিয়ে মারা যায়—'চেরী অর্চার্ড' লেখার সময় একটি চিঠিতে চেখভ মন্তব্য করেছিলেন যে, সারা নাটকে একটিও গুলীর আওয়াজের শব্দ নেই। (ক্রমশঃ)



আমরা সবাই ভারতীয় ...

কেউ যেন আমাদের মাধ্য

বিভিন্ন সৃষ্টি করাত না পারে

১৯১৭

প্রথমেই জানাই যে গত ২রা ডিসেম্বরের সাপ্তাহিকে শ্রীমতী মলি ঘোষের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে উক্ত মিলিটারি অফিসারদের মারামারি শিলিগুড়ি স্টেশনেই হয়েছিল; অনবধানতবশত আমি সান্তাহার লিখেছি।

এবার আমি এই চিঠির মূল প্রস্তাব—গত ৬ই জানুয়ারির সাপ্তাহিকে শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে চিঠি ছাপা হয়েছে, তাতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন: কে বা কারা মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে ‘বাঘা’ আখ্যায় ভূষিত করলেন।

যতদূর জানি, যতীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এই নামে কেউ কোনদিন তাঁকে অভিহিত করে নি। যতীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন এবং অগণিত মুসলিম সহকর্মীরা সকলেই বিশেষ কষ্ট পেয়ে থাকেন এই প্রাকৃতজনোচিত আখ্যায়, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছি। এমন কি কয়েকজন নমস্যা বিপ্লবী নেতার মুখে এ প্রস্তাবও শুনেছি যে, যে-দেশের লোক দেশবন্দু, দেশপ্রাণ, দেশপ্রিয়, মহাত্মা প্রভৃতি আখ্যা দিতে কপণ্য করে নি দেশের জনগণের আজ নতুন করে ভেবে দেখা উচিত যে সত্যিই ‘বাঘা’ আখ্যাটি যতীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে উচ্চারণ করে মহান এই নেতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞানো হচ্ছে কি না এবং তা যদি না হয়, তবে এই আখ্যা প্রত্যাহার করে নিয়ে নতুন কোনও যোগাতর আখ্যায় তাঁকে স্মরণ করা উচিত কি না।

আমাদের দেশে ‘বাঘা’ শব্দটির প্রচলিত প্রয়োগ সবই প্রায় অবজ্ঞার অর্থে।—অতএব দেখা যাচ্ছে যে যিনি বা যারাই এই আখ্যা যোগ করে থাকুন যতীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে, তাঁর বা তাঁদের রুচি হবে সূক্ষ্ম ছিল না। ফলে স্বভাবতই আজকের ক্রাস টেন-এর ছায় যদি যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে “এই বাঘ মারিতেন একজন শিকারী” বলে থাকে, তাকে কি খুব বেশি দোষ দেওয়া যায়? দোষ দিই তাঁদের—যাঁদের রচনা পড়ে এ যুগের কিশোরেরা শিক্ষা পাচ্ছে; এ যুগের কথায় কাহিনীতে পাঠ্যপুস্তকে যাঁরা তিলমাত্র স্থান সঞ্জালন করতে পারছেন না। দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এইসব সত্যকার নায়কদের পরিচয় প্রকাশের জন্য আর যাঁরা তাঁদের সম্পাদিত সাময়িকীগুলিতে দিলে দিলে অঙ্গলী সাহিত্যের (?) পরিবর্তে ফলে খরতে পারেন না। অবিস্মরণীয়



এইসব জীবন-চরিত। ইংরেজ আমলের কোনও সাহিত্যে এঁদের কথা স্থান পেত না, এঁদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা দেশদ্রোহ বলে গণ্য হত। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও কেন এঁদের দৃষ্টান্ত ভুলে ধরা হয়নি দেশবাসীর সামনে, তার কোনও হেতু জানা যায় কি?

ইংরেজ সরকারের গোপনীয় কাগজপত্রের অনেক স্থানেই লক্ষ্য করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হবে এবং তখন দেশের লোক যে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের অর্থ্য দিয়ে মহান বিপ্লবীদের পূজো করবে, এই জ্ঞান বিদেশী শাসকদের যথেষ্ট টনটনে ছিল। এবং সেই কারণেই তারা জাতীয় নেতাদের কারো কারো মহানতম অবদানকে ভুলিয়ে দিয়ে অনেক সময়ে তাঁদের বিকৃত চিত্র অথবা গোণ কৃতিত্বের দিকগুলোই দেশবাসীর সামনে অত্যধিক প্রস্তুত করে তুলতে সক্ষম ছিল। পরিবর্তে বিপ্লবের কাজের অযোগ্য কিছু ধামাধরা দেশ-দ্রোহীকেও বড় বিপ্লবী সাজিয়ে তুলেছিল তারা। এই প্রক্রিয়া থেকেই ‘বাঘা’ যতীন নামের জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যার ফলে, যতীন্দ্রনাথের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সংগঠন ক্ষমতা, চরিত্র-আধুষ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শৌর্য—সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা স্মরণ রেখেছি যে তিনি বাঘ মেরেছিলেন, তাঁর বাহুতে ছিল না জানি কী ভয়ঙ্কর শক্তি।

যতীন্দ্রনাথের আকস্মিক প্রয়াগের ঠিক পঞ্চবর্তী কয়েকটি বছর যে “ডাক এজ” গিয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে তাঁকে ‘বাঘা যতীন’ আখ্যায় অভিহিত রাঁরা করেছিলেন, তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের বার্ষ প্রয়াসের পরিবর্তে আজ আমাদের কর্তব্য গঠন-মূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, মহা-মানবের যোগ্য শ্রুতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। সরকারের পক্ষ থেকে যে-দেশে যোরা আনা এসব বিষয়ে নজর রাখা সম্ভব হয় না, সে দেশের জনগণেরই কর্তব্য নয় কি তৎপর হওয়া?

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে প্রকাশিত ‘সাহক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ’ আমি সাগ্রহে পাঠ করিতেছি; এবং মৃগে বিশ্বাসে লক্ষ্য করিতেছি যে কী নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সততা সহিত মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের পৌর শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্রনাথ এই ঘটনাবলী বিপুলায়তন ও অসাধারণ জীবনীটি সমগ্র দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করিতেছে, কোনপ্রকার সরকারী-বেসরকারী সাহায্যের মুখোপেক্ষী না হইয়া, প্রাচীনকালের বিপ্লবীদের স্নেহাশীর্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া পৃথ্বীন্দ্রনাথ যে গবেষণা করিয়াছে এবং এমন প্রাজ্ঞ ও মর্মগ্রাহী ভাষায় সমগ্র অগ্নিযুগের ইতিহাস এই স্বল্পে দেশবাসীকে শুনাইতেছে ইহার জন্য সমগ্র দেশবাসীই পৃথ্বীন্দ্রনাথের কাছে চিরকালের জন্য ঋণী রহিল।

শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্রনাথের রচনার আমার পরলোকগত পিতা বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার সহকর্মীরা সম্পর্কে যে সব উল্লেখ পাইতেছি তা অত্যন্ত যথাযথ এবং সত্য বিবরণ আমার পিতৃদেবের সঙ্গে বিপ্লব নেতা শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দীর ঘনি পরিচয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অমৃতবাজার পত্রিকার ৫ই নভেম্বর ১৯৬১ সালের দৈনিক সংখ্যা (How the armless man lost his arm) ইন্দ্র জ্যাঠামহা এবং আমার পিতৃদেবের অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত মিশিয়া পিতৃদেব বিভিন্ন বৈশ্ববিক কার্যকলাপের পরিচয় বাল্যকাল হইতে শুনিন; আশীর্বাদ তাহারই আভ্যন্তরীণ চি পাইতেছি পৃথ্বীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ রচনার।

সম্প্রতি শ্রীহরিশচন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি দাবি করিতেছেন যে তিনিই নন্দলালের উপর নজর রাখিবার এবং হত্যা করিবার কর্মে লিপ্ত ছিলেন; অতএব তাঁহার মতে পৃথ্বীন্দ্রনাথের রচনা কম্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথ্বীন্দ্রনাথের এই গবেষণা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রচনা যথাযথ। বিশেষত আমার পিতৃদেব (নরেন্দ্রনাথ বসু) এবং ‘নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য’ (পরে এম, এন, রায়) যে এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

তারকনাথ বসু,

Nature Cure Health Service
Pondichery-2

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে জোন্সের বলে ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক জিম পার্কস যত্নসহকারে ডিভার্সের কাজটি করছেন

বাক্যদ্বয় না মৃষ্টিমুহুর

কম্বুক বাকি বা মৃষ্টিমুহুর এক 'হাম' অঙ্গ, ক্যাসিয়াস ক্রেয় কাছে তো এই। কথা তিনি বেশি বলেন স্বটে, কিন্তু যা বলেন তাই ফলে। আজ পর্যন্ত চার গ্রানি তাঁকে স্পর্শ করতে পর্যন্ত পেরেছে। প্রায় প্রতি লড়াইয়ের পূর্বেই করেন একটি করে ভবিষ্যদ্বাণী। তার ফল স্বাভাবিক —

He will fall,
The round I call.

হ্যাঁ যতদূর মনে পড়ে, একবার শুধু সেই প্রায় অসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যন্ত হল। কয়েক বছর আগে একটি লড়াইয়ের পূর্বে স্বভাবসিদ্ধ চালে ক্রে হুড়া করেছিলেন—

Tonight when the great
crowd roar,
There he will lay at my
feet in four.

ফল বেরিয়েছিল—সত্যিই যদি কথা বাথ হবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বীর পদচুম্বন করে, প্রথম দেশভাগ করব। কিন্তু চার রাউন্ড

তো দূরের কথা আট রাউন্ডে কোনক্রমে জরী হলেন ক্রে। সেই লড়াইয়ে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেনা লিস্টন। লড়াইয়ের শেষে ক্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন রিবের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মোম্বাকে সঙ্গে নিয়ে। আর লিস্টনকে চটবার জন্যে তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন একটি ছোট্ট হুড়া। ক্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর পিঠ চাপড়ে বললেন—

He is second best to me,
Better than liston;
you wait and see.

দৈত্যকায় সেনা লিস্টনকে দুবার ধরাশায়ী করলেন মাত্র ২৩ বছরের যুবক ক্যাসিয়াস।

প্রীতিমিত্র

ক্রে। এর পর প্রাক্তন বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান প্যাটার্সনকেও ছাদশ রাউন্ডে টেকনিক্যাল নক-আউটে পরাজিত করলেন ক্যাসিয়াস। আজ এই তরুণ মৃষ্টিমুহুর বিশ্বের চোখে মৃষ্টিমুহুর জয়ভের একজনের সম্রাট; কিন্তু সরকারীভাবে বিশ্ব মৃষ্টিমুহুর সংস্থা ক্রে-কে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বলে স্বীকার করে নি, সেই সরকারী সম্মান

বর্তমানে আমেরিকার টেরেলের ভোগদখলে। ক্রে-কে এখন টেরেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিনিয়ে নিতে হবে সম্মান। তিনি বর্তমানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের একেবারে আমলই দিতে চাইছেন না। বলেছেন যে, তিলজনের সঙ্গে একরাত্তিরেই লড়াইতে পারি মাত্র মিনিট দশেক করে বিশ্রাম গ্রহণ করে।

ক্যাসিয়াস ক্রে সত্যিই চটেছেন পালিশের



জিম পার্সল

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

ওপর। তিনি মেজাজে গাড়ি চালাবেন বাধা-
বন্ধন তুচ্ছ করে: কিন্তু পদূলিশের আপত্তি
সেইখানেই। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি
চিকাগো পদূলিশ একটি গাড়ি গ্যামার যার
আরোহী ছিলেন মর্দাটম্বাঙ্কা ক্রে। ক্রুদ্ধ ক্রে
পদূলিশের সঙ্গে বাকবুদ্ধকে অবতীর্ণ হওয়ার,
তিনি অশালীন আচরণের জন্য অভিযুক্ত হন।
মাত্র দিন কয়েক আগে এই চিকাগোতে স্টপ
সিগন্যাল অমান্য করলে পদূলিশ তাকে পাকড়াও
করে। দুটি অভিযোগই বর্তমানে আদালতের
বিচারের অপেক্ষায়।

প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

ব্রাবোর্নে আমাদের বাংলার পরাজয় ঘটেছে
বোম্বাইয়ের কাছে নয় উইকেটে। বোম্বাই
গিয়ে পেঁচেছে রঞ্জী ট্রফির ফাইনালে। কিন্তু
বাংলার খেলোয়াড়দের উদ্যমের এবং প্রচেষ্টার
প্রশংসা করতে হবে। বাংলাদলের নায়ক বলা
চলে তরুণ খেলোয়াড় সুরত গুহকে। সুরত
দেখিয়ে দিয়েছেন বোম্বাইয়ের টেস্ট-খ্যাত
খেলোয়াড়দের যে বাংলার তরুণ খেলোয়াড়রাও
বজ্র করতে পারে।

বাংলার ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতার
বাংলাদল সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলা-
দল প্রথম ইনিংস শেষ করে মাত্র ১০৯ রানে।
বাপু নাদকানী'র মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে
পরাস্ত হন বাংলার খেলোয়াড়েরা, নাদকানী
মাত্র ১০ রানে সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট।

সুরত গুহ-র সন্দর সুইং বলের আক্রমণের
ফলে বোম্বাইদলেরও ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে।
মাত্র একশত রানে ছটি উইকেট হারতে হয়
বোম্বাইকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকারীর
৯১ রান ও দ্বিগুণদাকারের অপরাধিত ৮৮ রান
দলকে প্রথম ইনিংসে ২৫৪ রান সংগ্রহ করতে
সাহায্য করে। সুরত গুহ শেষ পর্যন্ত ৭টি
উইকেট সংগ্রহ করেন মাত্র ৫৯ রানের বিনিময়ে
এবং চুনি গ্যোবামী ৪৭ রানে ৩টি উইকেট
দখল করেন।

বাংলাদল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায়
অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে ২৫২
রান সংগ্রহ করে। বাংলার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে
শ্যামসুন্দর মির ৮০ রান এবং পঙ্কজ রায়
৬৮ রান করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই
দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে



সুরত গুহ

১০৯ রান সংগ্রহ করার ফলে নয় উইকেটে
জয়ী হয়।

অনিশ্চয়তায় ভরা ক্রিকেট

অনিশ্চয়তাই হল ক্রিকেটের গোপন
মুকুট। সিডনি'র পরাজয়ের ক্ষত নিরাময়
হবার পূর্বেই চতুর্থ টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড এবং
অস্ট্রেলিয়া সমবেত হল এডিলেডে। সিডনি'র
তৃতীয় টেস্টে অনুপস্থিত অধিনায়ক বাব
সিম্পসন এসে ধরলেন হাল। কথা আছে সে
পরাজিত অস্ট্রেলিয়া বিপর্যয়কে মরণ কাম
দেয়। বলতে গেলে সিডনি'র মাঠে সিম্পসন
তার বিজয় রথ চালালেন দুই সারথী গ্রাহ-
ম্যাকর্জি আর নীল হকের সাহায্যে।

অস্ট্রেলিয়ার এই দুই ফাস্ট বোলার পাথ
করে দুই ইনিংসে ইংল্যান্ডদের ব্যাটসম্যানদের
নিধনযজ্ঞে করলেন পোরোহিত্য। আর অ-
নায়ক বাব সিম্পসন এবং বিল লরী উইকেট
দণ্ড চালনার ধ্বংস করলেন ইংল্যান্ডের বোম্বাই
শক্তিকে।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনা
আঘাত হানলেন গ্রাহাম ম্যাকর্জি তার শক্তি
দিয়ে। এক এক করে খসতে লাগল ইংল্যান্ড
উইকেট। ব্যারিংটন এবং কাউড্রে পতন
করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউড্রে'র ব্যাট
৩৮ রানে গ্রাহাম ম্যাকর্জি অপূর্ব যি-
করে আশ্চর্যভাবে তাকে রান-আউট করল।
ব্যারিংটনকে সাহায্য করতে একমাত্র
হলেন জিম পাকর্স। অন্য খেলোয়াড়
উইকেটের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে ব্যর্থ



ক্যাপ্টেন সুরত গুহ

পাথ পা বাড়তে বাধ্য হলেন।
প্রথম ইনিংস শেষ হল ২৪১
পর বাট নিয়ে মাঠে নামল
এডিলেডের ক্রিকেট পিচ হয়ে
নিদের স্বর্গ, রানের ফুলকুঁড়ি
ধনাত্মক বাব সিম্পসন এবং কিল
কে। দ্বিধাত্মিক রান অতিক্রম
আর লরী করলেন শতরান।
উপাত রান হল ২২৫ এবং
ন। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে
৫১৬ রান। জেমস সারাদিন
১১৮ রানে ৬ উইকেট।
করল দ্বিতীয় ইনিংসের
২২৬ রানের বেশি তারা
করতে পারল না। এই ইনিংসে
রিংটন আর টিটমাস। ব্যারিংটন
৩৩১; তার ব্যক্তিগত রান হল
টিটমাসের ৫০ রান। নীল হক
আক্রমণখারা, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং শক্তি
করে তিনি ৫৪ রানে নিলেন ৫টি
অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করল এক
রানে। সিরিজ হল সমান সমান।
জয়ী হয়েছে সিডনীতে, অস্ট্রেলিয়ায়
। বাক্স এখন মেলবোর্নের পঞ্চম এবং
৩।

শ্রেষ্ঠ হার্ডলার

দ্বিতীয় এ্যাথলেট গুরুবচন সিং ১৯৬৫
কমনওয়েলথে ১১০ মিটার হার্ডলে শ্রেষ্ঠ
বীর বলে বিবেচিত হয়েছেন। গুরুবচন
এর কৃত সময় ১৪.১ সেকেন্ডের জোরে
দখল করেছেন। গুরুবচনের পশ্চাতে
অস্ট্রেলিয়ার জি নোক, উগাডার এ
এবং ব্রিটেনের আর মোরড। এই
সময় হল ১৪.২ সেকেন্ড। তবে
১০ মিটার হার্ডলে এই মরশুমের শ্রেষ্ঠ
১০.৫ সেকেন্ড। এই সময় অনুযায়ী



আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নর্দার্ন রেলের অধিনায়ক প্রীমতী কৃপাল
সিংয়ের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

বিশ্বের তিনজন শ্রেষ্ঠ হার্ডলার বর্তমানে
হলেন আমেরিকার ডেভেলাপোর্ট এবং সেরুলো
এবং চীনের হুসি লিন। খ্যাতিনামা ক্রীড়া
পরিসংখ্যানকার কুয়ারসেতানী এই তালিকা
প্রস্তুত করেছেন।

সমাচার দর্পণ

আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতা শেষ হল
দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে।
ফাইনালে নর্দার্ন রেল এবং ইন্টিগ্রাল কোচ
ফ্যাক্টরিকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে।
নর্দার্ন রেল পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হবার
কৃতিত্বের অধিকারী হল। ইতিপূর্বে ১৯৬৪
সালে তারা সার্ডান রেলের সংগে এবং
৬৫ সালে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীর সংগে
জয়ীর সম্মান লাভ করে। পুরস্কার
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রেলওয়ে
বর্তমান প্রীতপাল সিং এবং প্রীমতী
পুরস্কার বিতরণ করেন।

আগামী মরশুমের অস্ট্রেলিয়া থেকে যে
সরকারী টেনিস দলটি বিদেশে খেলার জন্য
যাত্রা শুরু করবে সেই দলে খ্যাতিনামা
খেলোয়াড়রা নেই। রয় এমার্সন, ফ্রেড স্টোলে,
জন নিউকম্ব, মার্গারেট স্মিথ, লেসলী টার্নার
প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় টেনিস
খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগতভাবে সম্মত করার
অনুমতি প্রার্থনা করেছেন অস্ট্রেলিয়া জল
টেনিস সংস্থার কাছে।

* * *

কুইলনে জাতীয় ফুটবলের সন্তোষ প্রদায়ক
খেলায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ গঠন করা
হয়েছে এবং দলের নেতৃত্বের ভার অর্পিত
হয়েছে জায়েদ সিংয়ের ওপর। গতবার
গোহাটিতে অনুষ্ঠিত সন্তোষ প্রদায়ক খেলায়
বাংলা দল রানার্স হয়, বিজয়ী হয় ভারতীয়
রেল দল। বাংলা দল ৬ই ফেব্রুয়ারী কুইলনে
অভিমুখে যাত্রা করছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাংলা
দল প্রথম খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অংশ-
গ্রহণের সংগে।

কাজল চোখের স্বপ্ন

কাজল চোখের মাঝে তার চাঁকরে ছিল
খিঁচাট সন্তানবির হাঁসিত; অজানা এক সন্ধ্যায়
প্রতিভার সন্ধ্যা বিকশিত ফুলটির সৌরভে
সুস্বাদিত হল চারিদিক। পুষ্পদলে পূর্ণ
বিকশিত এই ফুলটির মাঝেও যে আছে বজ্রের
হিংস্রতা কাজল চোখের আড়ালে আছে এক
প্রচণ্ড শক্তির উৎস। তা অন্বেষণে অনুভব করা
গেল; বিশ্ব ক্রিকেটের অঙ্গনে এই প্রতিভাটির
আত্মপ্রকাশের শব্দ লগেন।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ছেলে গারথ নিজেও
রোষ হয় কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি
যে তাঁকেই কিং মিলার, রে লি-ডওয়ার্ড আর
ডেভিডসনের ফেলে যাওয়া বিরট দায়িত্বের
বোঝা মাথায় নিতে হবে। ক্রিকেটের
অবিদ্যমানতার চারটি রিচি বেনো আর ডেভিডসন,
নীল হ্যাড, ম্যাকের মত ক্রিকেট তারকাদের
বিদায়ের লগেনই গারথের আবির্ভাব। ব্যাটে
বলে এই কটি অমূল্য রত্ন হারাবার পর
অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের অঙ্গনে যে কজন নতুন
প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে, তার মধ্যে ফাস্ট
বোলার গ্রাহাম ম্যাকজি হলেন মধ্যসারি।
গারথ হল ম্যাকজির সহ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের
দেওয়া আদরের ছোট ডাক নাম।

৬ ফুট ২ ইঞ্চি দীর্ঘ আর ১৫ স্টোন
ওজনের সুগঠিত বিশালদেহী ম্যাকজি একজন
আদর্শ শক্তির উৎস। তাঁর পেশীবহুল হাত
থেকে বহন দৃঢ়ান্ত গতিতে ক্রিকেট বলটি
পিচের ওপর দিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে ছুটে
আসে, দেখে মনে হয় একটা স্প্রিং-এর যন্ত্র
থেকে যেন সূনিপুণভাবে বলটি নিক্ষেপ করা
হয়েছে। গ্রাহাম ম্যাকজির এই গতিবিধি বিপক্ষে
খেলতে অতি বড় ব্যাটসম্যানও কিছটা
ইতস্তত করেন।

অস্ট্রেলিয়ার আর দশজন ছেলের মত
গারথও ছিলেন ক্রিকেট পাগল। বয়স দ্বিধন
তার মাত্র ১৮ বছর সেই সময় ম্যাকজির
জীবনে এল বড় খেলার সুযোগ। এই
ভরুপের মাঝে সন্তানবির হিংস্রতা দেখে পশ্চিম
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্মকর্তারা গ্রাহাম
ম্যাকজিকে সেরিফ শীল্ডের খেলার পশ্চিম
অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান দিলেন। তখন অবশ্য
ম্যাকজির ভূমিকা ছিল বোলার হিসাবে নয়
ব্যাটসম্যান হিসাবে। এই সময় বল তিনি
করতেন বটে, কিন্তু হালকা মেজাজে। কিন্তু
তার সুগঠিত দেহ দেখে অনেকেই তাঁকে ফাস্ট
বোলিংয়ে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দিলেন।
পরিশ্রমের ফল মিলল, আস্তে আস্তে ফাস্ট
বোলার হিসাবে গ্রাহাম ম্যাকজি পরিচিত
হতে লাগলেন।

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রান্স

করলের প্রশংসা এবং ভবিষ্যদ্বাণীই ম্যাকজির
জীবনে সৌভাগ্যের স্বার খুলে দেয়। ১৯৬০-
৬১ সালেই পূর্ণাঙ্গ ইন্ডিজ আর পশ্চিম
অস্ট্রেলিয়ার বেনায়ে তিনি ক্রিকেট একটা
নিপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি। কিন্তু
ক্রিকেটের অমর চরিত্র ফ্রান্স ওরেলের সন্ধানী
চোখ ম্যাকজির মধ্যে দেখেছিল ভবিষ্যতের
সন্তানবির নিশ্চিত জ্যোতি।

আর জানুয়ারী ১৯৬১ সালে ইংল্যান্ড



গ্রাহাম ম্যাকজি

সফরে বেনোর দলবল যাত্রা করল, দেখা গেল
গ্রাহাম ম্যাকজিও চলেছেন দলের সঙ্গে।
ম্যাকজির জীবনে এই প্রথম বিদেশ যাত্রা।
সফরের সূর্যতে কয়েকটি সাধারণ খেলাতে
ম্যাকজি অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন; কিন্তু
প্রথম টেস্ট খেলার সময় দেখা গেল তিনি
দল থেকে বাদ পড়েছেন। দ্বিতীয় টেস্টের
ঠিক পূর্বে মৃত্যুতে দেখা গেল একজন
খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই
খেলোয়াড়টির অসুস্থতাই গারথ ম্যাকজি

বহন করে এনে দিল এক অনাঘাত,
জীবনের মধ্যমর পরশ। জীবনের
টেস্ট ম্যাচে ম্যাকজি ৩৭ রানে
দখল করলেন আর ব্যাটেও মোসাম
পেলেন।

সেই সফরেই ওল্ড ট্রা
গারথের ভাগ্য খুলে গেল
জয়লাভের ছলনার সম্মুখীন
দলই। ইংল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়া
প্রায় নিশ্চিত, আর এ্যাসেসের
করছে এই টেস্টের ওপর।
অধিনায়ক, হাতে শূন্যমার
ম্যাকজির উইকেট। কিন্তু গ্রা
গ্রহণ করলেন ম্যাকজি আর
জুটিতে সংগৃহীত হল ৯৮ রান
৩২ রান সংগ্রহ করে, দলকে বি
জয়িতলক গুলোটে নিয়ে প
ফিরলেন। এই বিজয়ই অস্ট্রেলিয়ার
এ্যাসেসের ভাগ্য নির্ধারিত করে।

দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড সফরের
এবং পাকিস্তান সফরের শেষে প্রম
যে, গ্রাহাম ম্যাকজিই অস্ট্রেলিয়ার
আক্রমণের মেরুদণ্ড। এই পূর্ণ সফ
তার টেস্ট উইকেটের পূঁজি প্রায় শ
পেঁছায়। পাকিস্তান দল অস্ট্রেলি
গেলে মেলবোর্ন টেস্টে তিনটি পা
উইকেট দখল করার ফলে তাঁর শ
পূর্ণ হয়।

এর পর এক অশুভ ছায়া এ
করল গ্রাহামের খেলোয়াড়ী জীবনকে।
বোলিং শক্তির ক্ষয়প্রণালী ধীরে ধীরে
যেতে লাগল, ম্যাকজি হারাতে লাগ
খেলোয়াড়ী জীবনের জৌলুশ। এব
ইংল্যান্ড সূর্য করল তাদের অস্ট্রেলি
তখন ম্যাকজিকে দেখে মনে হচ্ছিল
ওনীলের মত তিনিও বোধ হয়
সারিতে সরে আসছেন।

সিডনির তৃতীয় টেস্টে এবার এ
১৩ রানে পরাজিত হল অস্ট্রেলিয়া, ও
এই টেস্টেই ম্যাকজি দল থেকে পড়লেন
কিন্তু এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে ম্যাকজি
দলে স্থান পেলেন। বিবি সিম্পসনের
অস্ট্রেলিয়া পূর্ব টেস্টে পরাজয়ের প্র
গ্রহণ করল ইংল্যান্ডকে এক ইনিংস
পরাজিত করে। ম্যাকজি
উল্লেখযোগ্য ছিল।
২৪
তি

সম্পাদিকা—জয়ন্তী

বঙ্গবাসী (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী

বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রীসকুমার গহমজমদার